॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

২৯শ বর্ষ

১ম সংখ্যা হইতে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 3rd February 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০ মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

পরাশ্রিত বিদ্যা

দিল্লিতে সম্প্রতি কমনওয়েলথ শিক্ষা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে কতকগুলি সময়োপযোগী প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। কমনওয়েলথের রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য আমাদের অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেও আসে না। তবে শিক্ষা ব্যাপারে অর্থাৎ আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথের মধ্যমণি ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে অনেক কালের একথা মানতেই হয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে ১৯৪৭ সালে; তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে এশিয়া-আফ্রিকার নতুন স্বাধীন অন্যান্য দেশগুলির। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের পরনির্ভরতা এখনও অব্যাহত।

আধুনিক কালের প্রয়োজনের বিচারে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন অপ্রচুর, সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। কাজেই বিদেশের সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া আধুনিক কালের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হওয়ার অন্য উপায় নেই। আধুনিক কালোপযোগী বিদ্যা মানেই পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা যার মূল সূত্র হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রকরণের সুপরিকল্পিত ব্যবহার। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা অর্জনে এবং আহরণে আমাদের উৎসাহ প্রচুর। উৎসাহ নতুনও নয়; য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজ প্রথম শুরু হয়নি। ভারতবর্ষে অন্তত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদর্শ প্রেরণার সঙ্গে জাতীয় চেতনার সংযোগ ঘটেছে এক শতাব্দীরও পূর্বে। মোটের পর আমরা তাতে লাভবান হয়েছি; আধুনিক ভারতের ভাবসম্পদ, বৈষয়িক উদ্যোগ, ব্যবহারিক কর্মকৌশল, সবই প্রায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাবাহী। কিন্তু সেই সঙ্গে মানতে হবে যে, আমাদের দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারাটি এখনও আশানুরূপ পরিপুষ্ট, সুগভীর এবং নিজস্ব স্রোতবহ হতে পারে নি। বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিপুল প্রবাহ থেকে খাত কেটে এনে ছোট ছোট কৃত্রিম জলাধার মাত্র আমরা রচনা করেছি।

পরানুগ্রহ, পরনির্ভরতা, পরানুকরণ যেমন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাসূচক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি কোন দেশের পক্ষে চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা মানসিক দীনতা ও অসুস্থতার কারণ। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমরা কি এই একান্ত পর-নির্ভর মানসিক দীনতা থেকে মুক্ত হতে সত্যিই চেষ্টিত? এ প্রশ্ন কোনরকম উগ্র স্বাদেশিক গোঁড়ামিপূর্ণ মনোভাবপ্রসূত মোটেই নয়। কথা হল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানকর্মীরা, শিক্ষাবিদগণ কি চিরকালই শুদ্ধ গ্রহীতা হয়ে থাকবেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ সৃষ্টিতে, বিস্তারে ও বিবর্ধনে তাঁরা কি কখনও স্বাধীন ও সক্রিয় ভূমিকা নিতে উদ্যোগী হবেন না?

নূতন উপন্যাস
প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক
বনফুল
রচিত নূতন উপন্যাস
ত্রিবর্ণ
আগামী সংখ্যা থেকে
প্রকাশিত হবে।

ডঃ দেশমুখ কিছুকাল পূর্বে মন্তব্য করেন, আমাদের দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে গবেষণার উৎসাহ যৎসামান্য, গবেষণার ফলাফলও আশাপ্রদ নয়। একজন রমণ, একজন আচার্য জগদীশচন্দ্র অথবা ঐ রকম কোনও অসাধারণ প্রতিভার সাফল্যকে নজীর খাড়া করে জাতীয় কৃতিত্বে গৌরব বোধ করার সার্থকতা হয়ত এক-কালে ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায়, উদ্ভাবন ক্ষমতায় আমরা যে হীন নই, শুদ্ধ এ-কথা প্রমাণ করে কিম্বা ঘোষণা করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতিযোগিতায় আমরা কখনই সফল হতে পারব না। আমরা যে সফল হতে বিশেষ চেষ্টাও করছি না তার প্রমাণ পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার উপর এখনও আমাদের একান্ত নির্ভরতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে গবেষণা-কার্যে আমরা এখনও অনেকদূর পিছিয়ে আছি তার একটি প্রধান কারণ আমাদের বিদ্বজ্জনদের মানসিক জড়তা এবং পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার চর্বিতচর্বণে, রোমন্থনে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত আসক্তি।

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার বিবিধ ধারা অনুশীলন আমাদের দেশে শুরু হয়েছে অনেক কাল। ব্রিটিশ আমলে হয়ত এর বাধা ছিল অনেক, কিন্তু মৌল গবেষণার পথ যে একেবারে বন্ধ ছিল তা নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অন্তত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র অনেক পরিমাণে প্রশস্ত এবং স্বচ্ছন্দ হয়েছে। কিন্তু তা হলেও সেই পুরানো আমলের অভ্যস্ত চর্বিতচর্বণ ও রোমন্থনের ধারাটি বদলায় নি। ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন কোন প্রখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানী আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বর্তমান গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাদের কৃতী ও মেধাবী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা নতুন কিছু আবিষ্কার চিন্তায় ও চেষ্টায় উৎসুক নন। কাজেই তাঁদের অনেকেরই বিদ্যা এবং বিদ্যাচর্চা পরার্জিত, পরাশ্রিত ("derivative")। য়ুরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতেরা নিজেদের উদ্যোগে, অধ্যবসায় বলে যে জ্ঞানসম্পদ নিরন্তর সৃষ্টি করছেন আমাদের দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই সম্পদই একমাত্র মূলধন।

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার বিবিধ সম্পদ আহরণের জন্য আমাদের দেশ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী বিদেশে যাচ্ছে, আগেও গিয়েছে। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জ্ঞানসম্পদ, ব্যবহারিক কলাকৌশল কিছু কিছু কাজেও লাগানো হচ্ছে। কিন্তু তার বেশী নয়। বিদেশী ডিগ্রীর মর্যাদা, সরকারী, বেসরকারী চাকরিক্ষেত্রে এবং সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ, এইসব গৌণ লাভই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এখনও প্রাধান্য পাচ্ছে। ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এমন কোনও বিভাগ দেখা যায় না যেখানে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের পুঁথিপত্র, গবেষণা-লব্ধ ফল ছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানকর্মীরা, বিদ্বজ্জনগণ নিজেদের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় বলে এক পা-ও অগ্রসর হতে সক্ষম। আমাদের জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানীরা নিজেরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি করায় উদ্যোগী না হলে ভারতবর্ষের পর-নির্ভরতা কোনদিনই ঘুচবে না।

কংগ্রেস ভোটারস
অতুল্য ঘোষ এবার রেকর্ড সংখ্যক নির্বাচনী প্রচার বক্তৃতা দিয়েছেন।
সাত ভাই চম্পা জাগো রে—
টি টি কৃষ্ণমাচারী এবার লোকসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
অর্থ-দপ্তর
মোরারজীর এখন উপায়?
ইংলণ্ডে পাকিস্তানীরা বসন্ত রোগের ভীতি সৃষ্টি করেছে।
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু—
কাশ্মীর প্রসঙ্গ
সম্পাদক সমীপেষু,
পৃথিবী আজই ধ্বংস হবার কথা। যদি তা না হয় আগামী সপ্তাহে আবার আমি যথারীতি কার্টুন পাঠাবো। ইতি
কুট্টি

গোয়া দখলের ব্যাপারটাকে ইলেকশন দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা বা বিচার করা উচিত কিনা তাই নিয়ে অনেক কথা-কাটাকাটি চলেছে। কিন্তু তাতে প্রশ্নটি পরিষ্কার না হয়ে তার চারদিকে যেন আরো বিভ্রান্তিকর কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। ইলেকশনের সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের ভিতর দিয়ে নানা প্রশ্নের তাৎপর্য জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠার সুযোগ পায় এইরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যার জন্য বলা হয় যে, ইলেকশনের সময়ে ভোটারদের "এডুকেট্" করার সুযোগ আসে।

আসলে কিন্তু ইলেকশনের সময় ভোটারদের "এডুকেট্" করার উপযুক্ত সময় এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। বরঞ্চ উল্টো হবারই সম্ভাবনা। কারণ এক্ষেত্রে "এডুকেট" যারা করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয় তাদের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির এই সময়ে যেন তেন প্রকারেণ ভোট সংগ্রহ করাই প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। সুতরাং এ সময়ে বাক্যব্যয় যদিও সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে কিন্তু সেটা সত্যের অনুসন্ধানে নয়। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর দোষত্রুটির ব্যাখ্যায় মুখর হয়ে উঠলেই যে সাধারণের পক্ষে সব কিছু বুঝা সহজ হয় তা নয়। দুইপক্ষের পরস্পরের বিরুদ্ধে—সমালোচনার যোগ-বিয়োগ করলেই আসল ব্যাপারটা কী বুঝা যাবে এরূপ মনে করাও ঠিক নয়, কারণ, সমালোচনার আসল লক্ষ্য যেখানে ভোট-প্রাপ্তি সেখানে পরস্পরবিরোধী হলেও দুপক্ষেরই সত্যকে এড়িয়ে যাবার দিকে ঝোঁক থাকে। একে যখন অপরের ত্রুটি ধরে তখন নিজের কিসে সুবিধা হবে সেই চিন্তাই মুখ্য হয়। সত্য কিসে সাধারণের বোধগম্য হবে সে চিন্তা নয়। নিজেদের দোষত্রুটির প্রকাশ্য আলোচনা কোনো রাজনৈতিক দলের কর্তারাই পছন্দ করেন না, তাহলেও অন্য সময়ে দলের মধ্যে আত্ম-সমালোচনার অল্পবিস্তর স্বাধীনতা হয়ত থাকে কিন্তু ইলেকশনের সময়ে দলের কোনো নীতি বা কার্যের স্বল্পতম সমালোচনাও বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হয়। আত্ম-সন্ধান বা আত্মসমালোচনা সত্যসন্ধানের একটা অপরিহার্য অঙ্গ, রাজনীতিতে সেটা প্রায়শই অবশ করে রাখাই প্রথা এবং ইলেকশনের সময়ে একেবারে বাদ দেওয়া। রাজনৈতিক দলগুলির আত্মসমালোচনার যে-কথা মাঝে মাঝে শুনা যায় সেটা সত্যের সন্ধানে আত্মসমালোচনা নয়, কেন আরো

ভোট পাওয়া গেল না, কী করলে আরো ভোট পাওয়া যেত সেটা তারই সন্ধানে করা হয়ে থাকে। সুতরাং ইলেকশনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে যে-"এডুকেশন" পাওয়া যায় তাতে ভেজালের পরিমাণ অন্য সময়ের চেয়েও বেশি থাকে।

গোয়া দখলের ব্যাপারটা নিয়ে যে-তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তাতেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই গোয়া দখলের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছে। কেন গোয়া দখল করা হচ্ছে না তাই নিয়ে এতকাল কংগ্রেসের চেয়ে বিরোধী দলগুলিই বেশি মুখর ছিল। কিন্তু যখন সৈন্য পাঠিয়ে গোয়া দখল করা হল তখন আনন্দ প্রকাশের সংগে সংগে অনেকে এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, এতদিন কিছু না করে হঠাৎ ঠিক এই সময়ে যে গোয়া দখল করার ব্যবস্থা হল এর সংগে ইলেকশনের যোগ আছে, গোয়া দখলটা অনেক পরিমাণে একটা "ইলেকশন্ স্টাণ্ট্"; এটাকে ইলেকশনে কংগ্রেস পার্টি ভোট আদায়ের কাজে লাগাবে। এই আশংকা করে বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সতর্ক করে বলা হতে লাগল যে, গোয়া দখলের ব্যাপারে কংগ্রেস পার্টির বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই, বরঞ্চ বিরোধী দলগুলিই গোয়ার মুক্তি-সাধনের জন্য সরকারের উপর চাপ দিয়ে এসেছে, গোয়ার মুক্তিতে জনসাধারণের মধ্যে যে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা গেছে সেটাকে কংগ্রেসী ইলেকশন্ প্রোপাগাণ্ডার কাজে লাগানো অবৈধ হবে। গোয়ার ব্যাপারটা সমস্ত জাতির ব্যাপার, কোনো একটা বিশেষ দলের নয়, ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে বিরোধী দলের সন্দেহ স্বয়ং পাণ্ডিত নেহরুর একটি মন্তব্যের দ্বারা দৃঢ়তর হয়। তিনি কটকে একটি বক্তৃতায় গোয়ার ব্যাপারটাকে একটা "ইলেকশন্ ইস্যু"র রূপ দেন, তবে একটু ঘুরিয়ে। গোয়ার মুক্তির জন্য সরাসরি কংগ্রেস পার্টির কৃতিত্ব দাবি করে ভোট তিনি চান না, তিনি ভোট চাইতে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক যুক্তি আমদানি করেন। তিনি বলেন যে, গোয়ার ব্যাপারে বিদেশী সমালোচকদের উত্তরস্বরূপে লোকের কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া উচিত, কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে বিদেশী সমালোচকদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, ভারতবাসীরা ভারত সরকার কর্তৃক গোয়া দখলের নীতি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পরে এই সমালোচনা আরো তীব্র হয়ে ওঠে যে, গোয়া দখলের ব্যাপারটা কংগ্রেস পার্টির একটা "ইলেকসন্ স্টাণ্ট্"।

এই ধারণাকে বাড়তে দিলে ইলেকসনে কংগ্রেসের লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। সম্ভবত সেকথা বুঝতে পেরেই পাণ্ডিতজী সুর বদলেছেন। তিনি বম্বের এক সভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি আগে যা বলেছিলেন সেটা ঠিক নয় (বলা বাহুল্য, তিনি যে ভুল করেছিলেন সেটা সরাসরি স্বীকার না করে রাজনৈতিক কথা পাল্টাবার জন্য যে-রকম ভাষা ব্যবহার করেন পণ্ডিতজীও তাই করেন), গোয়া দখলের ব্যাপারটা "ইলেকশন্ ইস্যু" হতে পারে না, গোয়া দখলের ব্যাপারে অন্য সব পার্টিরও সমর্থন ও সাহায্য স্বীকার্য, অন্য কোনো পার্টির হাতে সরকারী ক্ষমতা থকলে তারাও গোয়া সম্পর্কে এইরকম নীতি অনুসরণ করত, ইত্যাদি। পণ্ডিতজীর এই ঘোষণা অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছে, এমন কি কংগ্রেস গোয়ার ব্যাপারে কোনো বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করছে না এবং গোয়া সকল পার্টির পক্ষেই সমান ইত্যাদি বলার জন্য পণ্ডিতজীর উদারতার প্রশংসাও কেউ কেউ করছেন। আসলে পণ্ডিতজী অত্যন্ত নিপুণ চতুরতার সংগে একটা স্বকৃত ভুল শুধরেছেন এবং গোয়ার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দাবি যে করেন নি তাও কংগ্রেসেরই স্বার্থে। গোয়া সম্পর্কে বিদেশী সমালোচকদের উত্তর হিসাবে লোকদের "কংগ্রেসকে ভোট দাও" বলার মতো ভুল পণ্ডিতজী কেমন করে করলেন সেইটাই আশ্চর্য। বিদেশী সমালোচকদের পণ্ডিতজী যা বুঝাতে চান নিশ্চয়ই তা হচ্ছে এই যে, সমস্ত ভারতবাসী ভারত সরকারের গোয়া সম্পর্কিত নীতি সমর্থন করে। তাহলে গোয়াকে পার্টি ইলেকসন ইস্যু করা যায় না। গোয়ার ব্যাপারে সরকারের নীতির প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য লোকদের কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলার অর্থ গোয়াকে ইলেকসন ইস্যু করা, পণ্ডিতজী তাই করেছিলেন। পণ্ডিতজী যদি কথা না পাল্টাতেন তাহলে ইলেকসনে কংগ্রেসের বিরোধীদের পক্ষে যে-সব ভোট পড়বে সেগুলির কী ব্যাখ্যা হতো? তাহলে যে-বিদেশী সমালোচকদের উপর দৃষ্টি রেখে পণ্ডিতজী লোকদের কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলেছিলেন তাদের হাতেই কি একটা নূতন অস্ত্র জুগিয়ে দেওয়া হতো না? কারণ তারা তখন পণ্ডিতজীর ঘোষণার সংগে এবং কংগ্রেস বিরোধী ভোটের সংখ্যা যুক্ত করে বলতে পারত না কি যে, ভারতের জনমতের একটি বৃহৎ অংশ গোয়ায় ভারত সরকারের বলপ্রয়োগের নীতি সমর্থন করে না?

দ্বিতীয়ত, পণ্ডিতজী বোধ হয় পরে বুঝতে পারেন যে, গোয়ার ব্যাপার নিয়ে বিদেশী সমালোচকদের উত্তর দেবার জন্য দেশের লোকের কাছে পার্টির নাম করে ভোট চাওয়াটাই সম্মানজনক নয়। অবশ্য পণ্ডিতজীর এইরকম ব্যাপারে মানের মূল্যবোধটা একটু বিচিত্ররকমের। বিদেশীর দ্বারা সমালোচিত হলে তার উত্তরে তিনি তাঁর প্রতি দেশের লোকের আস্থার প্রমাণপত্র দাখিল করতে চান; অন্যদিকে তাঁর কোনো কার্য বা নীতি সম্পর্কে দেশে সমালোচনা হলে স্বপক্ষে বিদেশীর সার্টিফিকেট [illegible] করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এক্ষেত্রে[illegible] মনোভাব কাজ করে নি তা নয়। পণ্ডি[illegible] কটকে যখন বক্তৃতা দেন তখনও [illegible] ব্যাপার নিয়ে বিদেশী সমালোচনার প্র[illegible] ছিল, পণ্ডিতজী তখন বিদেশী সমালো[illegible]দের উপর রেগে ছিলেন সুতরাং অগ্রপ[illegible] বিবেচনা না করে লোকদের বলেছি[illegible] কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে বিদেশী সমালো[illegible] উত্তর দিতে। বম্বের বক্তৃতার সময়ে বিদে[illegible] সমালোচকদের সুর অনেকটা বদলে গে[illegible] তখন থেকে আর বিদেশী সমালোচক[illegible] উত্তর দেবার প্রয়োজনবোধ নেই।

গোয়াকে "ইলেকসন ইস্যু" না [illegible] কংগ্রেসের দিক থেকে ঔদার্যের পরিচয় [illegible] মনে করার কোনো কারণ নেই। পণ্ডিত[illegible] বলেছেন যে, ভারতে যে-দলের হাতেই ক্ষ[illegible] থাকত তারাই গোয়া সম্পর্কে এরূপ নী[illegible] গ্রহণ করত। এরূপ বলা ঠিক নয়। গো[illegible] উদ্ধার অবশ্য যে-কোনো দলই কর্তব্য [illegible] ধরে নিত কিন্তু তাই বলে একথা বলা [illegible] না যে, যে-দলের হাতেই ক্ষমতা থাক না [illegible] গোয়া উদ্ধার চৌদ্দ বছরের আগে হ[illegible]ত অথবা এই ব্যাপারে ভারত সরকার যে-সম[illegible] উল্টা-পাল্টা কথা বলে দেশে ও বিদে[illegible] নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন সেগু[illegible] অপরিহার্য ছিল। গোয়া উদ্ধারের বৈধ "ইলেকসন ইস্যু" না হতে পারে কিন্তু উদ্ধ[illegible] সম্পর্কিত অন্যসব সরকারী ব্যাখ্যা এবং ব[illegible] ইলেকসনী বিতর্কের বিষয় কেন হবে ন[illegible] গোয়ার উদ্ধার যখন হয়ে গেছে, তখন ত[illegible] পুরাতন কথা ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ [illegible] এরূপ বলাও ঠিক হবে না। কারণ গোয়[illegible] চেয়েও ঢের বেশী গুরুতর আন্তর্জাতি[illegible] সমস্যা ভারতের স্কন্ধে চেপে আছে। যাঁ[illegible] হাতে সরকারী ক্ষমতা রয়েছে তাঁরা [illegible] গুরুতর সমস্যার সম্মুখে জাতীয় স্বা[illegible] রক্ষা করে রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনা কর[illegible] যোগ্যতা রাখেন কিনা সেটা চিন্তার বিষ[illegible]

এই প্রশ্নের বিচার করতে হলে গো[illegible] সম্পর্কিত ভারত সরকারের যাবতীয় ব[illegible] ও কার্যকলাপের বিশ্লেষণ আবশ্যক। গোয়া উদ্ধারের পরে জন-সাধারণে[illegible] মধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস দে[illegible] বিরোধী দলগুলির মধ্যে একটা ধার[illegible] জন্মেছে যে, গোয়ার নাম করলেই বু[illegible] লোকেরা কংগ্রেসকে ভোট দেবে। সেই ধারণ[illegible] বশে বিরোধী দলের অনেকে জওহরলালজী[illegible] বোম্বাইয়ের ঘোষণার তারিফও করেছেন অর্থাৎ কি কংগ্রেসী কি বিরোধী কো[illegible] দলই ভোটারদের "এডুকেট" করার জন্য ব্যস্ত নয়। সকলের লক্ষ্য ভোট পাওয়া। ত[illegible] ভোটের জন্য দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়[illegible] অনেক সময়ে কিসে ভোটের সুবিধা হ[illegible] তাও অনেকে বুঝতে পারে না।

২৭।১।৬[illegible]

ধ্বনি

অবতরণিকা

এই প্রবন্ধটি আমি অতিশয় অনিচ্ছায় কিন্তু ততোধিক সানন্দে লিখছি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বাক্যটির দুই অংশ পরস্পরবিরোধী। তাই নিবেদন, অনিচ্ছায় লিখছি কারণ আমি জানি, যে বিষয়বস্তু নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটি আমার অধিকাংশ পাঠকের কাছেই নীরস বলে মনে হবে—এবং সেইটেই স্বাভাবিক। অপিচ যাঁরা এ-বিষয় নিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক তাঁদের কিন্তু এটা বিলক্ষণ কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। [illegible] প্রথম শ্রেণীকে আমি অসন্তুষ্ট করতে [illegible], এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সেবা করতে পারবো বলে আনন্দ অনুভব করছি।

এ স্থলে প্রথম শ্রেণীর প্রতি আমার আরেকটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধটি তাঁদের মনে আনন্দ না দিতে পারে, কিন্তু অযথা দম্ভ না করে বলতে পারি, এটি যদি তাঁরা তাঁদের রেফারেন্স কেতাবগুলোর এক প্রান্তে রাখেন, তবে অবরে-সবরে এটি তাঁদের কাজে লাগবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি: নার্সিস লিখব না নার্সিস লিখব; প্যারী না প্যারিস, না পারি, না প্যারী; শলীম দুরানি না সলীম দুর্‌রানী; সিরোজিন রাঁচ না সিরোজীন রশ্‌, দ্যুপ্লে না দ্যুপ্লেক্স্‌, না ডুপ্লেস; ডিক্রী লাইসাই না ডিক্রী লিসি; অডেনরে না আডেনাউয়ার; ফরাসী লেখক Gautier ও জর্মান কবি Goethe দুজনের উচ্চারণ করি কি প্রকারে, ফরাসী Comte এবং জর্মন Kant-এ কি কোনো তফাত নেই; সৈয়দ সঈদ শহীদ শাহিদ কি একই ব্যক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য উভয় শ্রেণীর পাঠককেই সাবধান করে দিচ্ছি, সব প্রশ্নের উত্তর তাঁরা পাবেন না, বিশেষত মানুষের নামের বেলা—কারণ নিত্য নিত্য নবীন লোক খবরের কাগজে আত্মপ্রকাশ করেন বলে তাঁদের ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব—এবং পেলেও হয়তো সেটি পাবেন অনেক খোঁজার পর। তবে উচ্চারণের যে মূল সূত্রগুলো আমি দেব সেগুলো ঠিক মতো খাটালে সম্পূর্ণ অচেনা নামও মোটামুটিভাবে উচ্চারণ করা চলবে।

এ স্থলে হয়তো প্রথম শ্রেণীর পাঠক প্রশ্ন করবেন, এ রকম দিগ্‌দর্শক বই কি ইংরিজিতে নেই যে, আপনি এটি বাঙলার উপর নাহক্‌ চাপাতে যাচ্ছেন? উত্তরে

নিবেদন, নেই। বাঙালী কি কি ধ্বনি জানে, কোন্ কোন্ ধ্বনি সে ইংরিজি পড়তে গিয়ে কিছুটা শিখেছে এই দৃষ্টি-বিন্দু থেকে লেখা কোনো রচনা নেই। যেমন মনে করুন, ইংরিজি অভিধানে আপনি পেলেন, জর্মন সংগীতকার Bach-এর ch উচ্চারণ করতে হবে স্কচ্ ভাষায় Loch-এর ch যেভাবে উচ্চারিত হয়। এ-তত্ত্বটি জেনে আপনার কি লাভ? আপনি সাদামাটা বাঙালী, হয়তো স্কচ্ হুইস্কির নাম পর্যন্ত শোনেন নি, চাখা দূরে থাক, Loch-এর ch কিভাবে উচ্চারিত হয় সে তত্ত্ব আপনি অবগত নন। এক অজানাকে অন্য অজানা দিয়ে 'বোঝালেই' তো আর সেটা জানা হয়ে যায় না—যদিও শুনেছি, আলজেব্রাতে নাকি দুটো মাইনাসে একটা প্লাস হয়! পক্ষান্তরে আমি যদি বলি, আমরা বিরক্ত হলে যখন বলি আ খ্ খ্ খ্! কেন জ্বালাতন করছো, তখন যে 'খ' উচ্চারণ করি সেটা খেলা বা খাঁটি শব্দের খ নয়, এখন, অর্থাৎ বিরক্তির আখ্-এর বেলা (ঘৃষ্ট—ঘসাঘসা fricative) যে 'খ' উচ্চারণ করি, সেই 'খ' আছে স্কচ Loch এবং জর্মান Bach-এ। আপনি যদি বিরক্তির আখ্ এবং খাঁটি বাঙলার খেলা, শব্দের দুই জাতীয় 'খ'-এ পার্থক্য ধরতে পারেন তবে স্কচ লখ এবং জর্মন বাখ উচ্চারণ করতে আপনার কণামাত্র অসুবিধা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি পরমানন্দে আরো মেলা ভাষায় এই ধ্বনিটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো। বলবো, উর্দুতে যখন 'খবর' বলবেন তখন ঐ বিরক্তির আখ-এর 'খ' উচ্চারণ করবেন; ফার্সী, আরবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী ভাষাতেও ঐ 'খ' উচ্চারণ করবেন (ঐ ধ্বনি বোঝাবার জন্য ঐ সব ভাষাতে যে হরফ ব্যবহার করা হয় তার নাম 'খে')। তারপর বলবো, এই 'খ'-র আবার অল্প একটু অন্য শেডের (shade)-এর খ আছে; স্পানিশ লেখক Don Quixote-এর 'x' ঐ 'খ' উচ্চারণে বলা হয়। রুশ ভাষায় চেখফ, খুদ্‌জনিক (আর্টিস্ট) শব্দে যে 'খ' আছে সে ঐ খ। তুর্কী ভাষাতে নসর উদ্-দীন খোজার 'খ' উচ্চারণেও তাই। রোমান হরফে লেখার সময় তারা লেখে 'h' দিয়ে, এবং 'h'-এর নিচে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি হুক দেয়।

এবং সর্বশেষে বলবো, আমাদের খেলা, খাঁটি শব্দে আমরা যে বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ (aspirate) 'খ' উচ্চারণ করি সেটি ভারতবর্ষের বাইরে আজ আর কোথাও নেই। আমরা বাঙলায় বলি খাকী রঙের কাপড়; ইংরেজ উচ্চারণ করে 'কাকি', আমরা হাতি ধরার জন্য যে খেদা বানাই, ইংরেজ উচ্চারণ করে 'কেডা'। খলীফা উচ্চারণ করে ক্যালিফ। ভারতবর্ষের বাইরে কেন, দক্ষিণ ভারতেও মহাপ্রাণ 'খ' নেই। দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষী বলেন, 'কাবার কাও' অর্থাৎ 'খাবার খাও'। বস্তুত দক্ষিণ ভারত তথা পৃথিবীর আর সর্বত্র—অবশ্য উত্তর ভারত বাদ দিয়ে—মহাপ্রাণ 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঠ', 'ঢ', 'থ', 'ধ', ধ্বনি নেই। এতে করে আপনার ইংরিজি উচ্চারণ শেখারও খানিকটে সুবিধা হয়ে যাবে। যেমন মনে করুন, ইংরেজ যখন লেখে ghost, আপনি ভেবেছিলেন যখন লিখেছে তখন উচ্চারণ হবে [...] কিন্তু আসলে উচ্চারণ গোস্ট। ঠিক [...] Thomson দেখে আপনি ভাবলেন th রয়েছে তখন ওটা হবে ঠম্‌সন্ [...] থম্‌সন্, কিন্তু আসলে উচ্চারণ টম্[...] ঠিক তেমনি লিখবে Bhisti (জলদেনে[...] ভিস্তি), উচ্চারণ করবে বিস্তি; [...] thug (ঠগী, ঠক), উচ্চারণ করবে [...] ধরণে সেই th—আমাদের ঠ নয়।

একেবারে কোনো প্রকারের কে[...] মহাপ্রাণ ধ্বনি উত্তর ভারতের বাইরে [...] এ-কথা বললে হুবহু ঠিক ঠিক বলা হয় [...] তার কাছাকাছি সামান্য একটুখানি [...] ইংরিজি এবং জর্মনে আছে। ইংরেজ য[...] বলে time, তখন 't'-র উচ্চারণ খ[...] বাঙলার 'ট' করে না, করে বাঙলা 'ট' ও 'ঠ' মাঝখানে (অবশ্য but বলতে তার [...] আমাদের খাঁটি 'ট'), জর্মন যখন ব[...] Pferd তখন তার 'Pf'-এর ধ্বনি আমাদে[...] 'প' এবং 'ফ'-এর মাঝখানে। কিন্তু এগুলে[...] অতি সূক্ষ্ম শেডের (shade) ব্যাপার।

আসল মূল সূত্র ঃ উত্তর ভারতীয় ভাষ[...] অর্থাৎ আসামী, বাঙলা, ওড়িয়া, হিন্দ[...] উর্দু, সিন্ধী, কাশ্মীরী, গুজরাতী, মারাঠ[...] ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে খ, ঘ; ছ, ঝ; [...] ঢ; থ, ধ, ধ্বনি নেই।[১]

* * * *

সাধারণ জনের বিশ্বাস পৃথিবীতে ধ্ব[...] অসংখ্য। আসলে তা নয়। ধ্বনির সংখ[...] সীমাবদ্ধ। আপনি যদি গোটা [...]রিশেক ব্যঞ্জন ও গোটা চোদ্দ স্বর শিখে নেন [...] অর্থাৎ বাঙলাতে আপনি যে-সব স্বর-ব্যঞ্জ[...] নিত্য-হামেশা উচ্চারণ করেন তার চে[...] নূতন গোটা চোদ্দ বেশী— তা হলে আপনা[...] আর ভাবনা নেই।

অবশ্য এটা প্রযোজ্য, ইয়োরোপীয় এব[...] এশিয়ার ভাষাগুলোর উপর। চীন-জাপান[...] তিব্বত-বর্মী ভাষা বাদ দিয়ে। এব[...] ওয়েলশ্, হাঙ্গেরিয়ন, ফিনিশ ভাষাও[...] এগুলোর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতিশ[...] সীমাবদ্ধ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমি অন্য ভাষাগুলো জানি। আসলে আমি বাঙলাটাই ঠিক মত জানিনে।

(ক্রমশঃ

এই ঘৃষ্ট খ আধুনিক গ্রীকেও আছে কিন্তু প্রাচীনকালে ছিল 'x' (এক্‌স্) এব[...] উচ্চারণ ছিল হুবহু সংস্কৃত 'ক্ষ' অক্ষরে[...] মত। সংস্কৃত 'ক্ষ' বাঙলায় 'খ' হয়ে গিয়েছে (ক্ষুধা হয়ে গিয়েছে খুদা, ক্ষিতি হয়ে[...] গিয়েছে খিতি); গ্রীকেও প্রাচীন 'x'=Ks[...] ক্ষ হয়ে গিয়েছে 'খ'।

(১) পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, পটুহারী [...] নেপালী ভাষায় বোধ হয় আছে। সেগুলো উত্তর ভারতীয়।

মস্কোর ১০০নং বইয়ের দোকান। বই বেছে ক্যাশকাউণ্টারে দাঁড়িয়ে আছি টাকা দেবার জন্য। এক ভদ্রলোক এসে ক্যাশের মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, একটু গলা নামিয়েই, 'পাস্তেরনাকের নতুন বই বেরিয়েছে কি?' মহিলা বললেন, 'শুনেছি বটে বেরুবে। কিন্তু এখনো কিছুই জানি না।' তার কয়েক সপ্তাহ পরে শুনি সে-বই বেরিয়ে শেষ হয়ে গেছে। কারণ, অল্পসংখ্যায় বেরিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বইটি তো জোগাড় হল। পাস্তেরনাকের নতুন কবিতার সংকলন এটি নয়, তাঁর সব কবিতা থেকে একটি চয়নিকা। পিছনের পাতাটা উল্টে দেখে নিলাম কত কপিতে ছাপানো হয়েছে। ত্রিশ হাজার। এটা কি অল্প? হ্যাঁ, সোভিয়েত দেশের পক্ষে এটা অল্পই। কারণ এদেশে সাধারণ কবিতার বইও অন্তত ৬০।৭০ হাজার কপিতে বেরয়। আমাদের 'লেভদা', বাংলা জানা রুশদের কাছেও রুশ তিনি ঐ নামেই পরিচিত, বলেন পাস্তেরনাকের এই বইটি ত্রিশ হাজার কেন ত্রিশ লাখ কপিতে বের করা উচিত ছিল। এই ত্রিশ হাজার বই দু' সপ্তাহেই শেষ হয়ে গেছে। বিদেশী সাংবাদিকরা এ ঘটনাকে পাস্তেরনাকের অসীম জনপ্রিয়তার লক্ষণ বলে মনে করেছেন। পাস্তেরনাকের জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে অসীম। কিন্তু এ ঘটনাটি তার প্রমাণ নয়। কারণ মস্কোয় যে-কোন প্রতিষ্ঠিত লেখকের বইয়ের ত্রিশ হাজার কপি দু' সপ্তাহে অনায়াসেই শেষ হয়ে যায়। যে শহরে বছরে গড়ে প্রতিজন ১৪।১৫টি বই কেনে সে শহরে এ ঘটনা অত্যাশ্চর্য কিছু নয়।

পাস্তেরনাকের এই নতুন বইটি যে কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে স্থৈর্য ও উদার মনোভাবের সেটিই একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রথমেই স্মরণীয় ডাঃ ঝিভাগো নিয়ে পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে যাঁরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সেই সময়েই একে একে তাঁদের

ক্ষমতাচ্যুত হন। যেমন 'লেখক সংঘের' প্রধানকর্তার পদ থেকে সরান হয় সুর্কভকে। 'নোভি মির' আর লিতেরাতুর্নায়া গাজেতার সম্পাদকীয় দপ্তরের ঘটে রদবদল।

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, খ্রুশ্চেভের আমলে স্তালিনের পূজাবেদী যখন ভাঙতে শুরু করল, তখন থেকেই প্রায় সাহিত্য শিল্প সংগীতের ক্ষেত্রে দেখা গেল, উদারতার আভাস। তার প্রমাণ হল বিংশ কংগ্রেসের বছর কয়েক পরে স্তালিন কর্তৃক নিষিদ্ধ তিনটি সংগীত রচনার পুনপরিবেশন। তার একটি হল শস্তাকোভিচের গীতিনাটক 'ম্ৎসেন্‌স্কের লেডি ম্যাকবেথ'। সেই সঙ্গে নানা গল্প, উপন্যাস, নাটক ও ছায়াচিত্রে ক্রমশ সোভিয়েত সমাজের নানা দোষত্রুটির কড়া সমালোচনা শুরু হয়। মায়াকভস্কির ব্যঙ্গ নাটকগুলি পুনরভিনীত হতে থাকে। এর মধ্যে হঠাৎ এল ডাঃ ঝিভাগো নিয়ে উন্মত্ততা। কিন্তু ক্রমশ সেই ঝড় থিতিয়ে এল। আগেই বলেছি পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে যে ক্ষুদ্রহৃদয় সাহিত্যিকেরা মারমুখো হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা আর আগের উচ্চ ক্ষমতায় রইলেন না।

বিগত একষট্টি সাল বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। গত বছরেই বেরল এরেনবুর্গের 'কাল, মানুষ ও জীবন' নামের স্মৃতিকথা। তাতে তিনি যেসব সাহিত্যিক বন্ধুদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানালেন, তাঁরা অনেকেই পূর্বে অভিনন্দিত, কেউ কেউ তার ফলে আত্মহত্যা করেছেন, কেউবা কলম সরিয়ে রেখেছেন। পাস্তেরনাক আর তাঁর লেখার প্রতিও এরেনবুর্গ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একথাও লিখেছেন যে, বক্তব্য বিষয় ও শিল্পকর্ম কোন দিক দিয়েই ডাঃ ঝিভাগো তাঁর ভাল লাগেনি। এই সঙ্গে এরেনবুর্গ আরেকজনের কথা গভীর প্রীতির সঙ্গে বলেছেন। তিনি হলেন বিখ্যাত নটগুরু মাইয়ারহোল্ড। স্তালিনের আমলে তাঁকে মঞ্চ ছেড়ে লেবার

বরিস পাস্তেরনাক

ক্যাম্পে কালাতিপাত করতে হয়। মাইয়ারহোল্ডের পুনর্মূল্যায়ন অবশ্য ঘটে কয়েক বছর আগেই এবং তাঁর জীবন ও নাট্য পরিচালনা কৌশল নিয়ে আলোচনার একাধিক বইও বেরিয়েছে। মঞ্চশিল্পীরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন।

অনেক দিন পরে, বছর দুয়েক আগে, আন্না আখমাতোভার কয়েকটি স্বরচিত কবিতা বেরয় পত্রিকায়। বহু বছর ধরে আখমাতোভা নিজের লেখা থামিয়ে কেবল অনুবাদেই রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। স্তালিনের আমলে তিনি ছিলেন নিষিদ্ধদের একজন। গত বছর তাঁরও কবিতা সংকলন বেরিয়েছে। আরো কয়েকজন নিন্দিত লেখকের বই গত বছর প্রকাশ পেয়েছে।

এই পরিবেশে একথা মনে করা চলে যে, পাস্তেরনাক ক্রমে তাঁর আসন ফিরে পাবেন। পাস্তেরনাকের যে নতুন বইটি বেরল তাকে হয়তো বসন্তের প্রথম পাখি বলা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কয়েকটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। বইটির প্রকাশ-সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। একটু যেন লুকিয়ে চুরিয়েই বইটি হঠাৎ বের করা হল বাজারে। ছাপানও হল এদেশের তুলনায় বেশ কম সংখ্যায়। সোভিয়েত দেশে অধিকাংশ বইয়ে, বিশেষ করে এ জাতীয় কাব্যসংকলনে, প্রথমেই থাকে লেখকের একটি ছবি আর তাঁর বিষয়ে একটি ভূমিকা। এ বইটি সে দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাই বোঝা যায়, সোভিয়েত সাহিত্যসমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ পাস্তেরনাকের প্রতি এখনো বিরূপ। পাস্তেরনাক এবং সেই সঙ্গে উদারনীতির পক্ষাবলম্বীদের তাঁরা ঠেকিয়ে রাখতে না পারলেও তাঁদের কাজকে কঠিন করে তুলেছেন। 'সোভিয়েত সাহিত্যসমাজ' কথাটি ব্যবহার করলাম এই কারণে যে, সরকার পক্ষ যদি পাস্তেরনাকের বিরোধিতা করতেন, তাহলে তাঁর বই মোটেই বেরত না। এবং যতদূর মনে হয়, বর্তমান নেতৃবৃন্দ সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে করপ্রসারে তেমন ইচ্ছুক নন। একথা আমরা জানি যে, সোভিয়েত দেশে দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত প্রভাবশালী স্তালিনপন্থী অনেকে ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা এখন পরাজয় মেনেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে স্তালিনপন্থীদের পরাভব সম্পূর্ণ ঘটে কিনা সেটাই দেখবার। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত 'তারার টিকিট' উপন্যাস, সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের রচনা, আর্মেনীয় ও জর্জীয় শিল্পীদের চিত্রাবলী, চুখরাইয়ের চলচ্চিত্র, ওখলোপকভ কর্তৃক 'মাদিয়ার' মঞ্চরূপ, তাগানকার থিয়েটারে ইয়ের্মোলোভার কাহিনী, শস্তাকোভিচের নতুন রচনা কি সেই নির্দেশই দিচ্ছে না? বলশই থিয়েটার কর্তৃক বেলা বার্তকের সংগীতে ব্যালে রচনা, বিশেষ করে লাভ্রভস্কির 'পাগানিনি' ব্যালেটি যার মঞ্চসজ্জা ও নৃত্যরচনা প্রচলিত সোভিয়েত রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত?

এখন প্রশ্ন, ডাঃ ঝিভাগো এদেশে বেরনর কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। উত্তর দেওয়া কঠিন। গুজব 'রমান' (উপন্যাস) পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যায় ডাঃ ঝিভাগো নাকি প্রকাশিত হয়েছে এবং সে সংখ্যা বাজারে না বেরিয়ে কিছু শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিক্ষক প্রভৃতির হাতে পৌঁছেছে। কিন্তু একথা সত্যি কি না সে বিষয়ে আপাতত কিছুই জানতে পারিনি। তবে একথাও বলা প্রয়োজন পরিচিত যে রুশরা বইটি পড়েছেন টাইপড্‌ ম্যানুস্ক্রিপ্টে বা বাইরে থেকে পেয়ে—তাঁরা কেউই সেটি পছন্দ করেননি। তাঁরা যে কেবল বাঁধাবুলি আওড়েছেন তা নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি তাঁদের বিচারবোধ, এমন কি রাজনৈতিক বিচারও—স্বতন্ত্র পথে চলে।

শুভময় ঘোষ

১৬ জানুয়ারি, রাত্রি

টোকিওতে আমাদের প্রথম দিন কাটলো। বিরাট নগর, পৃথিবীর মধ্যেই সবচেয়ে বড়ো আজকের দিনে. এক কোটি অধিবাসী নিয়ে ন্যু ইয়র্ক অথবা লণ্ডনকে ছাড়িয়ে গেছে। প্লেনে কিয়োটো থেকে এক ঘণ্টার পথ, তার মধ্যে পনেরো কিংবা কুড়ি মিনিট ধ'রে ফুজিয়ামা আমাদের দৃশ্য হ'য়ে রইলো। পাহাড়টি নিটোল ও ত্রিকোণ, ক্রমশ সরু হ'তে-হ'তে পরিচ্ছন্নভাবে উপর দিকে উঠে গেছে, এই শীতের দিনে প্রায় অর্ধাংশ তার তুষারে মোড়া। জাপানের অন্য সব-কিছুর মতো, এই বিখ্যাত পাহাড়টিও সুমিত ও সুচারু, এর সৌন্দর্য বেশ র'য়ে-স'য়ে ভোগ করা যায়, প্রবল আঘাতে নিশ্বাস কেড়ে নেয় না। রৌদ্রময় দিন ও তুষারময় চূড়া পরস্পরকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলছে: উভয় অর্থে দেখতে-দেখতে টোকিও এসে গেলো।

এয়ার-পোর্টে সস্ত্রীক এসেছেন সাবুরো ওটা। ইনিও অধ্যাপক, এবং জাপানি তুলনামূলক সাহিত্য-সংস্থার কর্মসচিব। স্বামী-স্ত্রী দু-জনের মুখেই ভাঁজে-ভাঁজে হাসি, দু-জনের হাতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা। এঁদের সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ গাড়িতে চলতে-চলতে টোকিওর বিশালতার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেলো। পথে পড়লো লৌহনির্মিত টোকিও-স্তম্ভ, ঈফেল-স্তম্ভের চেয়েও এর উচ্চতা বেশি। ইম্পীরিয়াল হোটেলে গাড়ি থামিয়ে আমার মনোমতো সিগারেটের টিন অনেকগুলো কিনে নিলুম: এ-বিষয়ে আমার ব্যাকুলতা দেখে ওটা কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করলেন। আমাকে স্বীকার করতে হ'লো—যা ইতিমধ্যেই আমার ব্যবহার থেকে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন—যে ঐ ক্ষীণ, শুভ্র ও বর্তুল ধূম্রশলাকা ব্যতীত আমার এক দণ্ড চলে না, অথচ আমার কণ্ঠনালী ও ফুশফুশে যে-সব সিগারেট সহ্য হয় তা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড ছাড়া অধিকাংশ দেশেই দুর্লভ। অতএব বিদেশে এসে আমার একটি প্রথম কর্তব্য হ'লো—আমার অনুমত ধোঁয়ার খোরাক সংগ্রহ করা; এবং এই কাজটি চুকে যাবার পরে এখন আমি টোকিওর জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত।

এক ঘণ্টায় অসংখ্য রাস্তা পেরোবার পর গাড়ি থামলো এশিয়া সেণ্টারের সামনে। এই আবাসটি ওটা আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আমিও কলকাতায় ব'সে এতে সম্মতি জানিয়েছিলুম। কিন্তু এসে দেখি, বিজ্ঞাপনে ও বাস্তবে বেশি মিল নেই—কিংবা আমারই হয়তো বোঝার ভুল হয়েছিলো। যে-ঘরে নিয়ে গেলো তাতে শয়ন ভিন্ন অন্য কোনো কর্ম অসম্ভব, বাথরুমে শরিক একাধিক, বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে হ'লে জিমনাসটিক্সের কসরৎ ভিন্ন উপায় নেই। দামে শস্তা, আমরাও লক্ষপতি নই, কিন্তু সহনীয়রকম আরাম চাই তো। প্র. ব. ও আমি ম্লানভাবে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছি; এদিকে ওটা তাগাদা দিচ্ছেন এক্ষুনি লাঞ্চ খেয়ে নিতে, নয়তো কাফেটেরিয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। কাফেটেরিয়া শুনে মনটা আরো দ'মে গেলো, ট্রে হস্তে বাঁধা-ধরা সময়ে লাইনে না-দাঁড়ালে খাবার জুটবে না? আসলে ভবনটি একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস: এবং যদিও আমাকে বিদ্যার্থী বললে ব্যাকরণের ভুল হয় না, এবং আমার হৃদয় এখনো তারুণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ব'লে আমি দাবি ক'রে থাকি, তবু এক দল সচল, সশব্দ ও অত্যুৎসাহী যুবক-যুবতীর সংসর্গে এক অপরিসর স্বল্পাসবাব ঘরের মধ্যে সপ্তাহ-কাল যাপন করার প্রস্তাবটিকে কোনো-রকমেই মনোরম ব'লে মানতে পারলুম না। কিন্তু আমরা এখানে থাকতে না-চাইলে ওটা যদি কিছু মনে করেন? বা তাঁকে বিব্রত করা হয়?—নাঃ, এ-সব বিষয়ে চক্ষুলজ্জাটা কিছু কাজের নয়, তাঁকে খোলাখুলি মনের কথা বলাই ভালো। মনস্থির ক'রে বেরিয়ে এসে দেখি, ওটা-দম্পতি লাঞ্চের মধ্য-পথে: আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে তাঁরা যে নিজেরা অভুক্ত থাকলেন না, এতেও প্রমাণ পেলুম জাপানিদের সংসারযাত্রা কত গভীর-ভাবে পশ্চিমধর্মী—বা আসলে হয়তো এই বাস্তবনিষ্ঠা তাঁদের নিজেদেরই স্বভাব-সিদ্ধ। আমাদের আবেদন শুনে ওটার কোনো ভাবান্তর হ'লো না; খাওয়া শেষ ক'রে ছিপছিপে শরীরে কর্মঠভাবে তিনি

উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর তৃতীয় বা চতুর্থ টেলিফোন সফল হ'লো, আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে বদলি হলুম গিনজা টোকিও হোটেলে। তারপর চা, স্যান্ডুইচ, আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচির আলোচনা; এমনকি, কিছুটা হাস্যপরিহাস। 'এমনকি' বলছি এইজন্যে যে হাস্যপরিহাসের জন্য অনেকখানি ভাষার প্রয়োজন হয়, এবং ওটার ইংরেজি বেশ শড়োগড়ো। সন্দেহ নেই, এ-বিষয়ে তিনি জাপানিদের মধ্যে অসামান্য ব্যতিক্রম।

হোটেলের সামনেই গিনজা স্ট্রীট, শহরের বড়ো-বড়ো দোকানপাট সব এই রাস্তায়। সন্ধেবেলা সেদিকে আমাদের অভিযান হ'লো। প্রশস্ত পথ, বিপুল জনতা, অসংখ্য যান, অন্তহীন নিয়ন-চিহ্ন, প্রকান্ড সুশৃঙ্খল শব্দহীন ব্যস্ততা। কাউকে চোখ বেঁধে এনে ছেড়ে দিলে তার হঠাৎ মনে হবে কোনো মার্কিনী শহর। সবুজ সংকেতে রাস্তা পেরোবার ভিড় দেখলে মধ্য-নাগরিক মানহাটানের কথাই মনে পড়ে। আর বিভাগীয় বিপণীগুলি—আয়তনে ও ঐশ্বর্যে ডিপার্টমেন্ট মেসির সমান না হোক, আকর্ষণে কারো চাইতেই কম যায় না। পণ্যবস্তু বহু ও বিচিত্র, সজ্জা নয়নহরণ, ব্যবস্থাপনা অনিন্দ্য। সব দেশেই, বেচা হ'য়ে গেলে, জিনিশটাকে কোনো বাক্সে বা ঠোঙায় পুরে ক্রেতার হাতে দেয়া হয়, আর সেই আধারগুলোকে সুদৃশ্য ও সুবহ করতেও সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু এই গৌণ ব্যবসায়িক বিষয়টিকে জাপানিরা যে-রকম একটি গৌণ ললিতকলায় পরিণত করেছে, সে-রকম অন্য কেউ পারেনি, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব ব'লেও আমার মনে হয় না। আছে একটি সূক্ষ্ম জাপানি স্পর্শ, তা বিশ্লেষণের অতীত, বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো যায় না, কিন্তু চলতে-ফিরতে সমস্ত ব্যাপারেই তা ধরা পড়ে। এখানে অনেক কিছুরই বাইরের চেহারা আমেরিকার মতো। এশিয়ার অন্য কোনো-কোনো দেশেও এখন এই ভাবটি দেখা দিচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে মনে হয় যে যথেষ্ট আমেরিকার মতো হচ্ছে না, আর জাপানে এলে দেখা যায় যে মার্কিনী ধরনের সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করা হয়েছে, যা খাশ মার্কিনীর পক্ষেও নতুন ও উপাদেয়।

ফেরার পথে ফুটপাতে একটি অন্ধ ভিখিরি দেখলাম। পাশে ভিক্ষাপাত্র, গায়ে শীতবস্ত্র নেহাৎ কম নেই, পিছনে এক ভক্ত কুকুর অটলভাবে আসীন। কুকুরটির চোখে করুণা, মাঝে-মাঝে সামনের পা তুলে সে এমনভাবে আবেদন জানাচ্ছে যে কিছু দেবার লোভ সংবরণ করা প্রায় অসম্ভব। পশুটির, এবং তার প্রভুর, দু-জনেরই বেশ পুষ্ট চেহারা উপবাসজনিত কার্শ্যের কোনো লক্ষণ নেই। আবার আমার মার্কিনদেশ মনে পড়লো। এক বরফ-পড়া সন্ধেবেলা ন্যু ইয়র্কের সেভেন্থ এভিনিউতে একটি ভিখিরি দেখেছিলাম; কলকাতার পুলিশম্যানদের মতো একটা আঁটো কাঠের ঘরের মধ্যে সে ঢুকে আছে, যখন চলে ঐ ঘরটাকে ঘাড়ে নিয়েই চলে, ওভারকোট টুপি ইত্যাদির দ্বারা সে এমনভাবে আচ্ছাদিত যে চোখ দুটি ছাড়া তার মুখের প্রায় কিছুই দেখা যায় না; হঠাৎ দেখলে দৈত্য-দানব ব'লে ভুল হয়। শীতের দেশে ভিক্ষে করতে হ'লেও অন্ততপক্ষে জামা-জুতো যথেষ্ট চাই।

১৭ জানুয়ারি

কপালগুণে এই হোটেলটা চমৎকার। আইনমাফিক পয়লা-নম্বরি নয়, মার্কিনী তিন-তারার পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু হয়তো সেইজন্যেই বেশি উপভোগ্য। আড়ম্বর অফুরন্তভাবে বাড়িয়ে চলা যায়, কিন্তু অচিরস্থায়ী অতিথির আরাম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এর চেয়ে বেশি ব্যবস্থা আর কী হ'তে পারে, তা ভেবে পাওয়া শক্ত। সামনের কাচের দরজাটি দুই পাল্লার; ঢোকার ও বেরোবার সময় কাছে আসামাত্র নিজে-নিজেই খুলে যায়। প্রশস্ত লাউঞ্জ; কেরানি ও পরিচারকেরা সংখ্যায় যেমন বেশি মনোযোগেও তেমনি অক্লান্ত; যে-কোনো কাজ সম্পন্ন হ'তে দু-এক মিনিটের বেশি সময় লাগে না। হোটেলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের চারটি ভোজনালয়; তার মধ্যে যেটি লঘুপথ্যের জোগানদার সেটি দিনে-রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। বেসমেন্টে সারি-সারি দোকান, আধ ঘণ্টা খুচরো সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটি বেশ। আমাদের ঘরে আছে বিশ্রামের সোফা, লেখার টেবিল, দেরাজে চার-পাঁচরকম চিঠির কাগজ, রাত্রে শুয়ে বই পড়ার জন্য যে-বাতি দিয়েছে তা অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল এই তিন রকম শক্তি ধারণ করে। বাথরুমের সাজ-সরঞ্জাম প্রায় বিলাসিতার পর্দায় বাঁধা, শয্যারচনা মনোরম, নবনীপেলব কম্বলটির উষ্ণতা, কেন্দ্রীয় তাপের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, রাত্রে আমাদের গ্রীষ্মমণ্ডলে বদলি ক'রে দেয়। কাপড়ের আলমারিতে কিমোনো ও সুতির চটি রাখা আছে; ভোরবেলা চায়ের ট্রেতে খবর-কাগজ দিয়ে যায়, আর দেয়, সাবান তোয়ালে ইত্যাদির মতো, প্রত্যহ নতুন কয়েকটি দেশলাই। ও-রকম সুন্দর দেশলাইও আর-কোনো দেশে আমি দেখিনি — কাজে অমন মজবুত, আর দেখতে অমন অসাধারণ ভালো।

হোটেলের লিফট চালায় মেয়েরা। বড়ো লিফট, ভিতরে রেডিও চলছে, তার আলো নয়নাভিরাম এবং চালিকারাও তা-ই। দিনের মধ্যে তিনবার সাজ-বদল করে এরা; সকালে দুপুরে আলাদা রঙের স্কার্ট, সন্ধ্যায় পরে কিমোনো। এদের কপোল অরুণবর্ণ, চোখ-মুখ অহরহ সহাস্য, একই লোক পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার ওঠা-নামা করলেও বিরক্তির রেখামাত্র পড়ে না, ধন্যবাদ জানালে পাংলা লাল ঠোঁট খুলে উজ্জ্বল দাঁতে পাখির মতো গলায় বলে, 'You are welcome'। লিফটগুলো স্বতশ্চল, অর্থাৎ চালক অপরিহার্য নয়, এই মেয়েদের আসল কাজ হয়তো শোভাবর্ধন, এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে মানতেই হবে যে এই উদ্দেশ্য এরা প্রভূতভাবে সার্থক করেছে। ব্যাবসাদারি? হ্যাঁ—হয়তো—নিশ্চয়ই—কিন্তু আর কোন দেশে ব্যাবসাদারি এমন মনোমুগ্ধকর?

একবার 'কুইন মেরী' জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলাম। কাকে বলে বিলাসিতা, 'রাজার হাল' কথাটার অর্থ কী, সেই পাঁচ দিনে সে-বিষয়ে কিছু ধারণা হয়েছিলো। সকালে চোখ মেলার মুহূর্ত থেকে রাত্রে ঘুমের সময় পর্যন্ত অফুরান সেবা ও সম্ভোগের ব্যবস্থা প্রতিটি ঘণ্টাকে চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছে। শুধু পান-ভোজনের আয়োজন এমন বিপুল যে মনে হয় কোনো পুরাণকাহিনী বাস্তব হ'য়ে উঠলো। ভোজনশালার কাচের দরজা খুলে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে দুটি রাফায়েলের দেবদূত, আর ভিতরে এক রুবেন্সীয় জগৎ ঐশ্বর্যে ও ইন্দ্রিয়বিলাসে উদ্বেল। অন্তহীন উপচারের মধ্যে এই মর্তপ্রকৃতির কোনো সৃষ্টি বাদ পড়েনি; পশু, পাখি, অন্ড ও জলজ প্রাণী; শাক, শস্য, দুগ্ধদ্রব্য; পঞ্চাশ রকম 'অর্দভ' বা 'সৃষ্টিছাড়া' ছোটো-ছোটো খাবার; পঞ্চাশরকম সুপ ও পনির; অতিকায় আঙুর, আপেল ও হেমন্তের অন্য সব দান; যেন স্বর্গের চাবি কোমরে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গম্ভীরদর্শন মদিরা-রক্ষী; উচ্ছল পাত্র; নীল আগুনে সুরাসিঞ্চিত মাংস; আসব-রঞ্জিত মিষ্টান্ন; কফির ঘ্রাণ, সিগারেটের ধোঁয়া;—রূপে, রসে, তাপে, সৌগন্ধ্যে বিশাল কক্ষটি যেন বাষ্পাকুল হ'য়ে আছে। এক-একবার আহার শেষ ক'রে আপনি ডেক-এ গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন, তক্ষুনি কোনো পরিচারক ছুটে এসে আপনার গায়ে কম্বল বিছিয়ে দিলে, পায়ের সামনে এগিয়ে দিলে চৌকি; আরামে হয়তো তন্দ্রা এসেছে আপনার, কিন্তু একটু পরেই সামনে নিয়ে এলো 'বীফ-টী' বা গোমাংসরস, অথবা বৈকালিক চা। প্রকান্ড জাহাজের মধ্যে যেখানেই আপনি যাবেন সেখানেই প্রাচুর্য ও বিলাসিতা, সেখানেই ভোগের আমন্ত্রণ অবারিত। কিন্তু আপনি যেহেতু ইন্দ্র অথবা জুপিটার নন, একজন মানুষমাত্র, এবং মানুষের শক্তি ও সময় যেহেতু শোচনীয়-রূপে সীমিত, সেইজন্য এই প্রাচুর্যই অবসাদের জন্ম দেয়, নিঃশ্রম নিশ্চিন্ত দিনগুলিতে যেন মৃত্যুর প্রচ্ছদ নেমে আসে। আপনাকে তাই খুঁজে-খুঁজে বের করতে হয় কোথায় আছে একটু নির্জনতা, যেখানে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের বড়ো-বড়ো পাগল ঢেউগুলির উপর দিয়ে আপনি আপনার মনকে মেলে দিতে পারেন, বা দেখতে পান বিকেলের আলোয় রূপবান নাবিক যুবাদের

অবসর-যাপনের হিল্লোল; বা সূর্যাস্তের সময় পিছন দিকের ছোটো খোলা ডেকটিতে শক্ত ক'রে থাম আঁকড়ে দাঁড়াতে হয়, পাছে দারুণ হাওয়া উড়িয়ে ফেলে দেয় আপনাকে; বা বেশি রাত্রে পানশালা নৃত্যশালা এড়িয়ে উঠে আসতে হয় একেবারে উপরকার ডেক-এ, যেখানে নেই মানুষ আছে আকাশ, আর অন্ধকারে দিকদিগন্ত আবৃত, আর মাস্তুলের আলোতে আর তারাতে মিলে যেন কোন অনন্তকে মূর্ত ক'রে তুলছে, আর যেখানে বাতাসের ও সমুদ্রের গর্জনে আবার আপনি শুনতে পাবেন আপনার হৃদয়ের ক্রন্দন সেই গোপন, সেই দুর্বোধ ভাষা, যা অকথ্য এবং অসহ্য হ'তো যদি না শুধু কবিতা থাকতো আমাদের স্মরণে ও সম্ভাবনায়।

কিন্তু আমাদের এই হোটেলটি কোথাও মরুদ্বের সীমা লঙ্ঘন করেনি; যা-কিছু থাকলে সুখ হয় তা সবই আছে, কিন্তু কোনো বিষয়ে আতিশয্য নেই ব'লে উপভোগের স্পৃহা অথবা শক্তি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে না। তাছাড়া বক্তৃতা ইত্যাদি ব্যাপারে টোকিও আমাকে বেশ খানিকটা খাটিয়েও নিচ্ছে, এবং পরিশ্রমের পরে এলেই সুখ সুস্বাদু।

অন্য একটা কারণে জাপান খুব আরাম-প্রদ; সারা দেশটা পারিতোষিকের উৎপাত-রহিত; হোটেলের বিল-এর মধ্যে যেটুকু ধ'রে নেয় তার উপরে এক ইয়েনও কারো প্রত্যাশা নেই। প্রতীচীর সঙ্গে তুলনায় এবং প্রতিতুলনায় অনেক ক্ষেত্রে জাপান নিশ্চয়ই জিতে যাবে।*

১৮ জানুয়ারি

আমাদের আজকের দিনটা টোকিওর বাইরে কাটবে; ওটা আমাদের সঙ্গী।

দৈনিক যাত্রীতে বোঝাই ট্রেনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চলেছি। কেজো সকালবেলা এখন; টোকিও আর য়োকোহামার মধ্যে দুই দিকে মিনিটে-মিনিটে ট্রেন ছুটছে; বিশ শতকের সমস্ত উদাম ও উপায়নৈপুণ্য এই দুই নগরকে মিলিয়ে দিয়ে প্রখর স্রোতে প্রবাহিত। ভিড়ের ধরনটা প্রতীচ্য; কেউ কথা বলছে না, প্রায় সকলের চোখই খবর-কাগজে নামানো, স্টেশনে-স্টেশনে নামা-ওঠার কাজটি নিঃশব্দে ও দ্রুতবেগে সম্পন্ন হচ্ছে। য়োকোহামা পেরিয়ে আমাদের অন্য একটা ট্রেনে উঠতে হলো; সেটা একেবারে ফাঁকা, বড়ো কোনো কর্মস্থলে যাচ্ছে না, বোঝা যায়। চোখে পড়লো কামরার প্রসাধন,

---

* কয়েকদিন পরে সান ফ্রান্সিস্কোতে আমরা যে হোটেলে উঠলাম তার নাম মার্ক হপকিন্স; আগে জানতুম না হোটেলটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। সেখানে আমাদের জানলার বাইরে ছিলো উপসাগর, পুলের উপর দিবা-রাত্রি স্রোতের মতো মোটরগাড়ি; ঘরের মধ্যেও অভাব কিছু ছিলো না। ভালো নিশ্চয়ই; কিন্তু বলতেই হবে যে গিনজা টোকিও-র মতো সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে পাইনি, যদিও মূল্য দিতে হয়েছে তিনগুণেরও বেশি। জাপানি জিনিশপত্র দামে শস্তা, কিন্তু গুণ-পনায় অত্যুৎকৃষ্ট। আমি ধনবিজ্ঞানী নই, কেমন ক'রে জাপানিরা এই অসাধ্যসাধন করে বলতে পারবো না; অনুমান করি এর একটা কারণ এই যে মজুরির হার জাপানে তেমন উঁচু নয়। কিন্তু গুণের সঙ্গে কম-দামের এই সমন্বয় পশ্চিম জর্মানিতেও লক্ষ করেছি।

আসনের গদির রংটি গাঢ় নীল, হাতের কাছে ছাইদান আছে, মেঝে, জানলা, জানলার কাচ—সব ঝকঝকে পরিষ্কার। পরিচ্ছন্নতার কোনো প্রতিযোগিতা হ'লে পৃথিবীর মধ্যে জাপানের জয় অনিবার্য।

যে-স্টেশনে নামলুম তার নাম মাচিদা-সিটি। ('City' শব্দের মার্কিনী অর্থ জাপানিরা মেনে নিয়েছে, দেখছি; যে-কোনো ছোটো শহর বা বড়ো গ্রামকে ঐ আখ্যা দিতে এদের বাধে না।) কাছেই টামাগাওয়া গাকোয়েন; 'গাকোয়েন' শব্দের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিদ্যায়তনটির সুখ্যাতি দেশে থাকতেই শুনেছিলুম। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কুনিয়োশি ওবারা; জনশ্রুতি থেকে মনে হয়েছে যে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর আদর্শ কিছুটা রবীন্দ্রনাথের মতো; শহরের বাইরে, 'প্রকৃতির বক্ষে' এই জাপানি আশ্রমের চেহারাটা চোখে দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিলো।

ওবারা গাড়ি পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য, পাঁচ মিনিটে বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। কাছিমের পিঠের মতো একটি পাহাড়, তার ধাপে-ধাপে বিদ্যালয়টি ছড়ানো। পাহাড়ের মধ্যপথে গাড়ি থামলো, গাছপালা নিবিড় সেখানে, চূড়ায় দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের চ্যাপেল বা—শান্তিনিকেতনের ভাষায়—মন্দির। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ওবারা-পত্নী দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় ক'রে আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে উপস্থিত হলুম। প্রটেস্টান্ট গির্জের মতো কক্ষটি, সেই রকমই ঠান্ডা। দুই সারিতে আলাদা হ'য়ে বসেছে য়ুনিফর্ম-পরা ছাত্র ও ছাত্রীরা, তাদের বয়স আট-দশ থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে; তাদের উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকেই বোঝা গেলো তারা শৃঙ্খলায় অত্যন্ত বেশি অভ্যস্ত। বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি বাইবেল থেকে উপদেশ শোনাচ্ছেন, দৃষ্টিপাতমাত্রই বুঝতে পারলুম, ইনিই ওবারা। বৃদ্ধ, কিন্তু চেহারা যুবকের মতো সতেজ; পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ-কামানো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; একমাথা রুপোলি চুলের তলায় মুখখানা সুগোল, স্নিগ্ধ ও গোলাপি রঙের; সব মিলিয়ে ও-রকম একটি সুদর্শন পুরুষ যে-কোনো দেশেই বিরল। বাইবেল থেকে নীতিশিক্ষাদান শেষ ক'রে তিনি আমাদের বিষয়ে ও উদ্দেশে দু-চার কথা বললেন; ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে নির্ভুল সুরে 'জনগণমন' গাইলে, তারপর আমাকে অল্প কিছু বলতে হ'লো, প্র. ব. শোনালেন কয়েক পংক্তি রবীন্দ্র-সংগীত। দেশপ্রেম বা রবীন্দ্র-ভক্তি কোনোটাই আমার পেশা নয়, কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানি ছেলেমেয়েদের মুখে 'জনগণমন' গান শুনে আমি ঈষৎ বিচলিত না-হ'য়ে পারলুম না—তার কারণ বোধহয় ভারতবর্ষ যতটা, তার চেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথ।

লাঞ্চের আগে ও পরে, ওবারার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বিদ্যালয় দেখলুম। দিনটা কনকনে ঠান্ডা; তার উপরে, কী কারণে জানতে পারিনি, ওবারা তাঁর আশ্রমের মধ্যে টুপি পরা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। আমি তাই যখনই যে-ঘরে ঢুকছি, প্রথমেই খানিক দাঁড়িয়ে নিচ্ছি চুল্লির ধারে, চেষ্টা করছি অন্ততপক্ষে হাত দুটোকে তাতিয়ে নিতে। আমরা যাকে লেখাপড়া বলি, বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা তাতে আবদ্ধ নয়; আছে নানা রকম হাতের কাজ ও যন্ত্রবিদ্যা, সব্জিখেত মাছের পুকুরও বাদ পড়েনি, কাচের ঘরে উত্তাপে লালিত হচ্ছে বিরল ও মূল্যবান গাছপালা। কলাভবন ও চিত্রশালাটি রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ব'লে বোধ হ'লো। ছাত্রদের ছবি দেখেও বোঝা যায় যে জাপানি চিত্রকলার ঐতিহ্যে কখনো ভাঙন ধরেনি, বা এখানে 'ঐতিহ্য' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়নি 'অচলায়তন'—নিজেদের উপর আস্থা রাখে ব'লেই এরা জগতের দিকে সবগুলো দরজা-জানলা খুলে রেখেছে। জাপানের অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো, এখানেও ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যিক, শেখানো হয় অত্যাধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে। ক্লাশে শিক্ষয়িত্রী একজন থাকেন বটে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের আসল কাজ হ'লো কানে যন্ত্র লাগিয়ে রেকর্ড শোনা। কয়েক মিনিট আমিও কান পাতলুম তাতে; ধীরে-ধীরে, স্পষ্ট ক'রে, মার্কিনী উচ্চারণে বলা হচ্ছে: 'Mary, Mary, get up from bed. It is time to go to school.' একই কথা আটবার, দশবার ক'রে বলা হচ্ছে, যাতে শিশুদের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়। শুধু যদি বলতে শেখানো উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে এই উপায় নিশ্চয়ই প্রশংস্য; কিন্তু অনুমান করছি এটা জাপানে সম্প্রতি আমদানি হয়েছে, কেননা যাঁদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করছি তাঁরা অনেকে পণ্ডিত হ'লেও নামমাত্র ইংরেজি বলেন। স্বয়ং ওবারা তাঁদেরই একজন।

একটি পঞ্জাবি যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'লো; সে কোনো-একটা ফলিত বিজ্ঞান শিখছে এখানে, সামনের বছর দেশে ফিরে যাবে। জাপানি ভাষা বেশ রপ্ত হ'য়ে ছেলেটির, তা না-হ'লে এ-দেশে শেখা যায় না। শুনেলুম, প্রতি বছর ক'রে বিদেশী ছাত্রের পড়া-খরচ ছেলেমেয়েরা চাঁদা ক'রে জুগিয়ে য়োরোপের অতিদূরবর্তী দেশ মাঝে-মাঝে ছাত্র আসে এখানে, নানা দে সঙ্গে যোগস্থাপনে এঁরা নিত্যসং যাকে বলে মানবিক বিদ্যা, এই প্রতিষ্ঠা ঝোঁকটি ঠিক সেদিকে নয়; 'skills technics' শিখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংসা জন্য সক্ষম ক'রে তুলছেন এঁরা; ব্যায়াম আবশ্যিক, ঘর পরিষ্কার বিছানাপ ইত্যাদি কাজ নিজেদেরই করতে প্রয়োজনমতো সমাজসেবাতেও ডাক আমি বালক বয়সে এ-রকম বিদ্যালয়ে হ'লে সুখী হ'তে পারতুম না; কিন্তু পেরিয়ে বেড়াতে এসে বেশ ভালো লাগে

একটা জিনিশ আমার কাছে দুর্বো থেকে গেলো: প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যা বলা হয় কেন। ছাত্রছাত্রী অধিকাং নাবালক, এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলির তেমন ব্যাপ্তি নেই; আমাদের হিশেবে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মহাবিদ্যাল কিন্তু জাপানে শিক্ষায়তনের পরিভা বোধহয় অন্য রকম; কেননা টোকিওতেই, শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশটি, যা পৃথিবীর অন্য কো নগরের পক্ষে কল্পনাতীত। এমন কি পারে না যে অন্যান্য দেশে যাকে 'স্কুল' 'কলেজ' বলে এখানে সেগুলোই আকা বড়ো হ'লে বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে গণ্য হয় খোঁজ নিয়ে যতটা জানতে পেরেছি, মনে হয় ব্যাপারটা তা-ই।

অপরাহ্নে ওবারার বাসভবনে এক বিশ্রাম। ঠান্ডায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর চুল্লির ধারে বসতে পেরে কৃতজ্ঞ বো করলুম, এবং আমাদের পক্ষে সেই মুহূর্তে যার মতো বাঞ্ছিত জিনিশ আর-কিছু ছিলো না, সেই 'কালো' বা ভারতীয় পরিবেশনে শ্রীমতী ওবারার তৎপরতা আমাদের মুগ্ধ করলে। তাঁর কাছে, অন্যান্য বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা চায়ে পরে গাড়িতে উঠলুম। ওবারা আমাদের সঙ্গে চলেছেন, তিনিই নিমন্ত্রণকর্তা; আমাদের রাত্রিবাস হবে হাকোনেতে।

চলেছি গ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু 'গ্রাম' বলতে আমাদের ভারতীয় মনে যে-ছবি জেগে ওঠে তার সঙ্গে এর কিছুই মেলে না। নেই উদার আকাশ অথবা সীমাহীন প্রান্তর; পাহাড়ি দেশ শীতে ঘনিষ্ঠ নিসর্গ, কৃষকদের কুটির, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো শহরে কাচের দরজাওলা দোকান সব-কিছুই প্রতীচীর সঙ্গে সুরে বাঁধা। যে পথ দিয়ে চলেছি তা গেছে টোকিও থেকে কিয়োটো পর্যন্ত; পুরোনো এব ঐতিহাসিক পথ এটি, ছবিতে ও কবিতায়
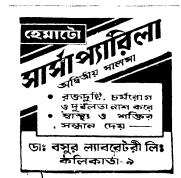
বিখ্যাত, পূর্বযুগে যাত্রীরা যাতায়াত করেছে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে। তখন এর নাম ছিলো টোকাইডো—যার অর্থ 'পূর্ব-সাগরের মুখোমুখি পথ'; এক-এক দিনের ভ্রমণের ব্যবধানে তিপ্পান্নটি বিশ্রামস্থল গ'ড়ে উঠেছিলো—পাহাড়ের কোলে, হ্রদের তীরে, পাইন-বনের শান্ত নির্জনতায়। অনেকবার মোড় নিতে-নিতে আমাদের সামনেও খুলে গেলো সেই 'পূর্বসাগর'—সন্ধ্যার ছায়ায় ইস্পাত রঙের প্যাসিফিক; তার ধার দিয়ে একটি রেলগাড়িকে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলুম। আমাদের মোটরগাড়িও উপকূল ঘেঁষে চললো খানিকক্ষণ, নামলো রাত্রি, ধীরে এগিয়ে এলো পথের দু-ধারে আলো-জ্বলা বাড়ি আর দোকান;—এই জায়গাটাই হাকোনে।

দোতলা একটি কাঠের বাড়ির সামনে আমরা নেমেছি। তখুনি সামনের ঠেলা দরজা খুলে গেলো, একটি ছিপছিপে যুবক বেরিয়ে এসে নতজানু হ'য়ে অভিবাদন করলেন। ওবারার প্রাক্তন ছাত্র ইনি, এই সরাইখানার মালিক; বোঝা গেলো, ওবারা আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন, আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। আমরা ভিতরে যেতেই একটি দাসী এগিয়ে এসে নতজানু হ'লো আমাদের জুতো খুলে নেবার জন্য, যথারীতি কাপড়ের চটি প'রে আমরা দোতলায় এলাম। বলতে পারবো না সিঁড়িটি কী সুন্দর ও নির্মল, ঘরটি কী সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তা বলা যাবে না। আভরণ স্বল্প, সেই স্বল্পতাই সবচেয়ে বড়ো আভরণ। জাপান বিষয়ে ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু শুনে আসছি, যা-কিছু পড়েছি, কল্পনা করেছি বা ছবিতে দেখেছি, ঐ ঘরটিতে ঢোকামাত্র হঠাৎ সব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো, যেন জাপানের অন্তরাত্মার একটি রূপ দেখতে পেলাম। মাদুরে মোড়া মেঝে, অর্ধেক মাদুরে মোড়া দেয়াল, দেয়ালের ও সীলিঙের কাঠে অল্প কারুকার্য, বসবার ব্যবস্থা মেঝেতে। পাশে ছোটো শোবার ঘর, পিছন দিকের লম্বা বারান্দায় হালকা চেয়ার অপেক্ষা করছে, তার ভোক্তা হবার ইচ্ছে থাকলেও এই শীতের রাত্রে কারোরই সাধ্য নেই। বারান্দার তলা দিয়ে, পাথরে-পাথরে প্রতিহত হ'য়ে, ছলচ্ছল শব্দে ব'য়ে চলেছে ক্ষীণকায় গিরি-স্রোতস্বিনী, তার ওপারে গাছপালার অন্ধকার। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে হ'লো যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বাড়িগুলোতে সাজসজ্জার যে-বৈশিষ্ট্য দেখেছিলাম তার ধরনধারন কিছুটা জাপানি।

ফুজিয়ামা কাছেই। এখন আর অগ্নি-উদ্গিরণ নেই তার, শুধু জ্বালাময় স্মৃতি উপকারী উষ্ণ প্রস্রবণে নিহিত হ'য়ে এই অঞ্চলে প্রচুরভাবে ছড়িয়ে আছে। যাঁরা বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যের সন্ধানী, এবং যাঁরা দৃশ্যের প্রেমিক, তাঁদের সকলের পক্ষেই হাকোনে একটি পীঠস্থান। আমাদের সরাই-খানার তলাতেই একটি প্রস্রবণ লুকোনো। লুকোনো বলছি এইজন্যে যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই; নৈসর্গিক তপ্ত জলকে অনেকগুলো ছোটো-ছোটো কুঠুরির মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার একটাতে ঈষৎ শঙ্কিত চিত্তে নাইতে ঢুকলুম। বাষ্পে ঘন হ'য়ে আছে কুঠুরিটা, চোখে ভালো দেখা যায় না প্রথমে, একটা চৌবাচ্চার মধ্যে অনবরত সধূম জল প্রবেশ করছে, আর-এক পাশে টবে রাখা আছে ঠাণ্ডা জল। যদিও সব রকম ব্যবস্থাই ছিলো, আমি পায়ের মোজা ভিজিয়ে-টিজিয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে অচিরেই ঘরে ফিরে এলুম; কিন্তু এটা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হ'লো না যে যারা হাত-পা ব্যবহারে আমার চেয়ে পটু, তারা এখানে স্নান ক'রে অগাধ আরাম পাবেন। বন্ধু ওটাকেই দেখলুম নগ্ন গাত্রের উপর কিমোনো জড়িয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত মুখে বেরিয়ে আসছেন।

এবার মেঝেতে ব'সে জাপানি ধরনে সান্ধ্য-ভোজ। নিচু, চৌকো টেবিলের চারদিকে চারজনে বসেছি, সকলের গায়েই সরাইখানার দেয়া কিমোনো। সুকোমল আসন, চেয়ারের মতো হেলান দেবারও ব্যবস্থা আছে। টেবিলের তলার দিকটায় কম্বল বিছোনো, সেই কম্বলের ভিতর দিয়ে পা গলিয়ে দেয়ামাত্র নিচে অতি সুখপ্রদ তাপ অনুভূত হ'লো। মেঝের তক্তা সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানে, তলায় তাপপাত্র জ্বলছে; যদি আমরা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতুম, আর টেবিলের তলায় থাকতো অগ্নিকুণ্ড, তাহ'লে যা হ'তো তার চেয়ে আরাম কিছুমাত্র কম মনে হ'লো না। পায়ের তলায় তাপ, পাশে তাপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে, হাঁটুর উপরে কম্বল, কণ্ঠনলীতে উষ্ণ সাকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে—সারাদিন পরে এতক্ষণে সত্যি-সত্যি শীত ভাঙানো গেলো। ওবারার গোলাপি রঙের মুখটি হাসিতে ও সরলতায় উদ্ভাসিত, আমাদের সুখী হ'তে দেখে আনন্দিত তিনি, আমরা যা-কিছু বলি তার ভাষা না-বুঝেই সারা মুখে প্রীত হ'য়ে ওঠেন, ওটা কথাটা বুঝিয়ে দিলে পরে তার যথাযোগ্য উত্তর দেয় আবার তাঁর অনাবিল হাসি ও চোখের উজ্জ্বলতা। এমনি বিকশিত মনে, মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিয়ে, কৌতুক ও প্রীতি-বিনিময়ের ফাঁকে-ফাঁকে, আমরা পাচকের প্রতি সুবিচার করতে লাগলুম;—এক ঘণ্টার আগে ভোজন শেষ হ'লো না। শুতে গিয়ে দেখি, রেশমের লেপের তলায় বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র দিয়েছে; ঘর অন্ধকার ক'রে দেয়ামাত্র শিয়রে নদীর কলতান ধ্বনিত হ'লো। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে—ঘুমিয়ে পড়লুম বলতে পারলেই শোভন হ'তো, কিন্তু জানি না কেন, হয়তো ঘরে অত্যধিক তাপের জন্যই, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না।

(ক্রমশ)

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪০৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

মনের যন্ত্রের তার ঢিলে হয়ে গেছে—কিছুতে ঠিক সুর লাগচে না—ঝন্‌ঝন্‌ করচে—তাই ঠাঁই বদল করে দেখবার জন্যে শ্রীনিকেতনে যাবার সংকল্প মনের মধ্যে গুনগুন করচে। ভেবেছিলুম বৌমা এলে তাঁকে দেখে তার পরে যাব, কেননা দুই অচলের দেখা সম্ভব হয় না যদি পরস্পর তফাতে থাকি। কিন্তু তিনি ডাক্তারের জালে আটকা পড়েছেন খুব শীঘ্র ছুটি পাবার আশা নেই শুনচি, তাই যাবার দিকে পা বাড়িয়েছি। তুমি যদি শীঘ্র পা চালিয়ে আসতে পারো তাহলে মন্দ হয় না দেখা সাক্ষাৎ সেরে যাত্রা করতে পারি। খবর নিয়ে জানা গেল ওখানে স্থানাভাব। যদি তোমার আসা সম্ভব হয় তাহলে সেই ভরসায় আরো কয়েকদিন থেকে যেতে পারি। জগদীশের (১) মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল। তাঁর শেষ অবসান অত্যন্ত অনুজ্জ্বল—কয়েক বছর আগে কে এমন কল্পনা করতে পারত। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য—ঐশ্বর্য যদি বা থাকে, পাত্র থাকে ভাঙা—অনেক আশা করেছিলুম, সেই আশা বাইরে হোলো বিলুপ্ত তার স্মৃতি রইল আমার কাব্যে। ২৩।১১।৩৭

কবি

১। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

॥ ৪০৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এতদিনে ফিরে এসেছি। আমি উঠেছি শ্রীনিকেতনের কেতন চূড়ার কাছে—আকাশ রয়েছে আমাকে ঘিরে—আলো আসচে সূর্যলোক থেকে সোজা আমার ঘরে পথে তাকে আটক করবার কিছুই নেই—ধরণীর সবুজ বেষ্টনী আছে দূরে—আমলকি গাছের উপরকার ডাল দেখা যায় ছাদের দক্ষিণ পাশে—হাওয়ায় দুলচে—পৃথিবীর হাঁকডাক চলা ফেরা কানাকানি সব নিচের তলায়, এখান থেকে সাড়া পাইনে—গান গাওয়া যে-পাখিদের সকাল বেলার হাওয়ায় অঞ্জলি দান তারা আছে মাটি মহলের পাড়ায়, আকাশে পাখা মেলাই যে পাখিদের গান-গাওয়ার সামিল তাদের দেখা যাচ্চে দিগন্তে দিয়েচে পাড়ি, আলোয় সাঁতার কেটে। আমার মনটাও সকালের আলোয় সেই সাঁতারে যোগ দেয়, দেহের ঘাট ছেড়ে দিয়ে যেন পাল তুলে যা নীলের মধ্যে মিলিয়ে।

এখন বেলা হয়ে এল। এইমাত্র মহাদেব এক গ্লাস খেজুর রস দিয়ে গেল। এইবার সময় এলো আমার লেখার টেবিলে বসবার। সেই বিশ্বপরিচয়ের সংস্কার করতে বসেছি সত্যেন্দ্রকে (১) যে চিঠি লিখেছিলুম, সাড়া পাইনে, বোধ হচ্চে গাণিতিক সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে—লজ্জা হয় ওরে ইস্কুলমাস্টারি সংশোধনের কথা বলতে। আমাকে যদি কোনো আনাড়ি তার কাব্য দেখে দিতে বলে তাহলে আমার কী দশা হয় সে তো জানি। আমি তাই এডিংটন প্রভৃতি ওস্তাদদের বই পাশে রেখে অতি সাবধানে মেরামতের কাজে লেগেছি—তবু কিছু কাঁচা থেকে যাবে। মাটির মিস্ত্রিকে কোটাঘরে লাগাতে গেলে কাজটা মনের মতো হবে না কিন্তু হয়তো ব্যবহারের মতো হবে। দুটো একটা জায়গায় জল পড়বে, নিচে সরা বসালেই চলবে। সত্যেন্দ্রকে শেষ যে চিঠি লিখেছিলুম তার জন্যে মন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে আছে।—তোমার বাবার শরীর কেমন আছে। ইতি ১১।১২।৩৭

কবি

১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

॥ ৪১০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কিছুদিন থেকে নানাবিধ কাজে অকাজে বিপরীত রকম ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ছুটি মিলল না। যত দিন যাচ্চে ক্রমে কাজের বোঝা কেবলি বেড়েই চলেছে, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। ছিলেম শ্রীনিকেতনের শিখর দেশে—সেখান থেকে টেনে নিয়ে এল ৭ই পৌষের ডাকে—এখানে আশ্রয় নিয়েছি বৌমাদের বাগান-কোণের ঘরটাতে। লাগচে ভালো—চারদিকে আকাশ আছে যথেষ্ট, আলোরও অভাব নেই।—জীবনের কাছে তোমার বাবার খবর পাওয়া গেল। কষ্ট পাচ্চেন শুনে ভাল লাগল না। চিকিৎসার অভাব হচ্চে না নিশ্চয়—রোগের উপরে সেও এক উপসর্গ।—বৌমা গেছেন, বোটে, রথী পালিয়ে আছে শ্রীনিকেতনে। ৭ই পৌষ ১৩৪৪

কবি

॥ ৪১১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

ব্যস্ততার কথা ক্লান্তির কথা বারবার বলে এত পুরোনো হয়ে গেছে বলতে বিতৃষ্ণা হয়। ইচ্ছে করে বলি, ফড়িঙের মতো লাফালাফি করচি আর প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। আমার এই শেষ দশার অবস্থাটা বর্ণনার অতীত এবং অযোগ্য হয়ে উঠেছে। শনিগ্রহ কাজ যা করাচ্চে তা অকথ্য। চিঠিতে অনুরোধ আসছে নানাবিধ, দর্শন করতে আসচে নানা জাতের লোক। সকালে উঠে যে চৌকিতে খাড়া হয়ে বসি সেটা ছাড়ি সূর্যাস্তের পরে আলোর অভাবে। রোজ প্রতিজ্ঞা করি, যে করে হোক ছুটি নেবই, রোজ তা ভাঙতে হয়।

প্রাণপণ চেষ্টায় বিশ্বপরিচয়ের সংস্কার সাধন করচি। ভুল আছে এ খবর পেয়েছি কিন্তু কোথায় ভুল নির্দেশ না
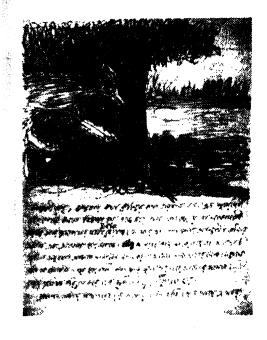
পাওয়াতে ডাইনে বাঁয়ে ওস্তাদ লেখকদের বইয়ের পাতা খুলে নিজের ত্রুটি হাতড়াচ্ছি। দু চারটে বড়ো বড়ো আগাছা নিড়িয়েছি। আরো কোথায় কী লুকিয়ে আছে তাদের খোঁজ পাওয়ার মতো সাধনা আমার নেই। আশা করছি, ত্যাজ্য জঞ্জাল বেশি বাকি নেই, সেটা নিজেকে ভোলাচ্ছি কি না তাও বলতে পারিনে। অব্যবসায়ীর এই অধ্যবসায়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। এদিকে অবিলম্বে সংশোধিত কপি নেবার জন্যে কিশোরী বসে আছে। জীবনে বিস্তর অসংগত কাজের বোঝা জমিয়ে কর্মফল বাড়িয়ে তুলেছি এটারও কোনো জরুরী ছিল না। কিন্তু পরহিতের লোভ অহিতের উৎসাহের চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিজনক। আর এমন কাজ করব না বলে নাকে খৎ দেবার কোনো অর্থ নেই—কাজ যে করায় তার উপরে হাত চলে না।

নামজাদা অতিথিরা ভিড় করে আসবেন নামজাদার আকর্ষণে—৭৭ বছরের চুল মাথার থেকে কাটতে পেরেছি কিন্তু নাম কাটার উপায় নেই—এমন কি নিমতলায় গিয়েও ওকে পোড়াতে পারব না। এই দুর্দিনে সহায়রূপে তোমাকে ডাকতে সাহস করিনে—কেননা তুমিও কষে ভিড় টানচ—তারা কেউ ধনী, কেউ বা মানী, কেউ বা জ্ঞানী। তার উপরে তোমার বাবার শরীর ভালো নয়—এই সময়ে তোমার বাবার সংগে আমার স্বাস্থ্য বদল করতে ইচ্ছে করচে তাহ'লে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারত। ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাবার সময় শরীর খারাপ করতে পারিনি, আজো সম্মানের তাড়না এড়াবার ইচ্ছায় পারচিনে। ইতি ৩১।১২।৩৭

কবি

মৃন্ময়ী

তারাপদ রায়

মৃন্ময়ী, এ কোন্ ফুল কিনে আনলে এমন বিকেলে,
কোন্ পার্কে কোন মূর্খ লক্ষ্মীছাড়া কিসের অভাবে,
অথবা লক্ষ্মীর দায়ে এমন অমল পুষ্প ফেলে
চলে গেলো; কোন্ সূত্রে একে তুমি কোথায় সাজাবে?

এ ঘরে কি রাখা যায়, শ্রাবণের বৃষ্টির নিভৃতে
কোথায় উদ্যানে কার ফুটেছিলো; বহু যত্নভারে,
বহু জল সিঞ্চনের প্রসাধনে তীব্র আকৃতিতে
অমল ধবল পুষ্প ফুটেছিল রাত্রির আঁধারে।

অমল কুসুম তুমি অলকে দিয়ো না, ফুলদানিতে
বড় স্থির, বড় তুচ্ছ মনে হবে, ঈশ্বরের ছবি
তোমার সংসারে নেই—গৃহকোণে, অলিন্দে, সিঁড়িতে
কোথায় মেলাতে পারো বনস্মৃতি, শ্রাবণসুরভি।

বৃষ্টিময় চতুর্দিক, মৃন্ময়ী বৃষ্টির অবেলায়
বনের কুসুম কেন নিয়ে এলে অন্ধকার ঘরে।
গোধূলির নগরীর সব আলো হঠাৎ হারায়,
আঁধার বিপিনে কার পুঞ্জ পুঞ্জ গন্ধ ঝরে পড়ে।

ঝরে বৃষ্টিধারা, ঝরে পুঞ্জ পুঞ্জ অস্পষ্ট শ্রাবণে।
কোথায় বাগান কার ভেসে যায় জলে একাকার;
ফোটায় ফোটায় গন্ধ, সেই গন্ধ কবেকার বনে
ঝরে আর্দ্র বৃষ্টিধারা; মৃন্ময়ী, তোমার অন্ধকার।

এরা আমাদেরই লোক।

শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, এই বাংলা দেশেরই। তুষার ঢাকা হিমালয় আর হিমেল হাওয়ার যে উপত্যকা, উত্তরের দার্জিলিং-কালিম্পং অঞ্চলে বিস্তৃত, যেখানে চায়ের বাগান, কমলা লেবুর 'অরণ্য', মেঘ-রৌদ্রের স্বর্ণাঞ্চলে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী—তারই ফাঁকে ফাঁকে এদের বসতি। এরা নেপালী নয়, ভুটিয়া নয়। আমাদের চোখে হয়ত সে পার্থক্য তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে এই লেপচারা তাদের থেকে ভিন্ন। নাচে গানে, বেশবাসের বৈশিষ্ট্যে, কাঁধে ঝোলান এই বিচিত্র চর্মবাদ্যে আর ময়ূর পালকে সাজান এই বর্ণবহুল ময়ূরপংখী প্রতীকে তাদের রীতি নীতি ধর্মাচরণের যে ছন্দ বাজে তা উল্লাসময় কর্মময় জীবনের কথাই বলে। যে জীবন আমাদের।

এরা আমাদেরই লোক।

আলোকচিত্রশিল্পী

শ্রীবিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

জলাতঙ্ক

দিব্যেন্দু পালিত

স্নানার্থীরা সবাই মাপে জল—
কেউ ঝুঁকে, কেউ গভীরতর ঃ কষ্টে, আরো নিচে।
প্রতিবিম্ব নিজেকে দ্যাখে স্বচ্ছ, অবিকল।
সারাটা দিন মিথ্যে ঘুরি পিছে।

অসম্ভবের বাষ্পে ভ'রে আচম্বিতে,
দু' চোখ যদি স্রোতের টানে বিলম্বিত তাকায়—
পুরানো জল উপচে পড়ে কলসটিতে।
অমল জাদু কলসটিকে উপুড় ক'রে রাখায়।

না হ'লে ওই মৃত্তিকার প্রান্ত ছুঁয়ে
ঢেউ-ভাঙা স্রোত তবুও কেন ভাসায় না কূল!
জোয়ার কারো উজান, কারো হৃদয় ধুয়ে—
মাল্য হ'তে হঠাৎ খসে দু' একটি ফুল।

স্বপ্ন শুধু স্বয়ংবৃত: বিবিধ ক্ষণ
যত্নে-আঁকা সিঁথির মতো একাকী রয়।
চিবুক ছুঁয়ে, তথাপি সে নির্বান্ধ জন—
পেঁচিয়ে ওঠে সত্তা জুড়ে বিষাক্ত ভয়।

চির হরিৎ

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

মেহোদ ফুলের গন্ধে রঙে রঙে একটি স্বপন—
একটি স্বপন ভাসে সঙ্গোপনে গোধূলি বাতাসে—
মহুয়ার বনে বনে—মেরুরেখা একটি স্বপন—
তনুরুচি অভিরাম, পুষ্পরাগ নয়ন রঞ্জন।
তটে তটে ওঠে ঢেউ, অনুরাগে বাঁধে বাহু পাশে,
নিটোল পেলব বাহু, বিদ্যুতের তীব্র শিহরণ,
অথচ জড়ানো মধু, অমৃতের উষ্ণ প্রস্রবণ,
আকুল বাঞ্ছনা তার, তৃণে তৃণে গুচ্ছবদ্ধ কাশে।

দুটি সে চোখের দৃষ্টি তনুচ্ছদ—ভাষার অতীত,
অনুক্ষণ ফেরে সাথে—জাগরণে অথবা নিদ্রায়,
আবেগে ভাসায় নৌকা—অনন্তের মাধুরী সন্ধানে।
বাতিঘরে বাতি জ্বলে, কণ্ঠে তোলে জীবন সঙ্গীত—
সে পূর্ণিমা অমারাতে, ভগীরথ মরুবালুকায়—
সে আমার ভালবাসা—বীজমন্ত্রে ঝলসানো ধানে।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে বড়ো শুভার্থী শিশুর আর কেউ নেই। অনেক দুঃখে জন্ম দিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে মায়েরা বড়ো করে তোলেন তাঁদের শিশুদের। নিজেরা না খেয়ে সব চেয়ে ভালো জিনিসটি তাদের খাওয়ান, নিজেরা না ঘুমিয়ে তাদের সুস্থ অবস্থায় পরিচর্যা এবং রোগের সময় সেবা করেন, নিজেদের সুখ শান্তির চেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বেশী মর্যাদা দেন তাঁরা। কিন্তু এত করেও তাঁরা যে সর্বদা সর্বতোভাবে শিশুর কল্যাণ করতে পারেন তা বলা যায় না। নিজেদের অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ, স্বার্থবুদ্ধি, নিরীশ্বর জীবনযাত্রার নানাপ্রকার হীনতা এবং চারিত্রিক নানা দৈন্য অনেক সময়ে এঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে অপরিণতবুদ্ধি শিশুদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন জীবনের যাত্রারম্ভের সময়, যার কুফল চিরদিন তাদের ভোগ করতে হয়। বাড়িতে সুশিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না বলেই প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে গুরুগৃহবাসের ব্যবস্থা হয়েছে শিশুকে মানুষ করে তোলবার জন্য। চাণক্য পণ্ডিত আড়াই হাজার বছর আগে বলে গেছেন, যে বাপমা ছেলেকে লেখাপড়া না শেখায় তারা তার শত্রু; আজকের দিনের কবিও আক্ষেপ করেছেন, বঙ্গজননী তাঁর সাত কোটি সন্তানকে বাঙ্গালী করেই রেখেছেন মানুষ করেন নি। এই মানুষ করা বলতে যে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অবশ্য আজও নানা মুনির নানা মত। কেউ বলছেন, শিশুকে খেলার ছলে শেখাও, নিজের খুশিতে ইচ্ছামতো শিখতে দাও, চলতে দাও; কেউ বলছেন, জীবনটা শুধু খেলা নয়, শিশুকে কঠিন নিয়মে থেকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে শেখাও বড়ো হয়ে সে তাহলে কোনো কষ্টেই বিচলিত হবে না। অনেক দেশে শিশুর রুচি, শক্তি এবং প্রকৃতিভেদে তাকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বড়ো হবার সুযোগ দেওয়া হয়। অনেক দেশে আবার রাষ্ট্র শিশুর শিক্ষার ভার নিয়েছে, অতীতের স্পার্টার মতো ছাঁচে-ঢালা রাষ্ট্রানুগত কর্মী ও নাগরিক তৈরির কারখানা খুলেছে সে সব দেশে। উদ্দেশ্য সকলেরই ভালো, কারো দৃষ্টি বর্তমানে বা অদূর-ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, ছোটো গণ্ডিতে বাঁধা, কারো দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যতে এবং অন্তহীন দেশে কালে বিস্তৃত, কিন্তু শুধু শিশুর দিকে এঁদের অনেকেরই দৃষ্টি নেই। নিজেদের প্রয়োজন এবং সদুদ্দেশ্য ভুলে শুধু শিশুর মুখ চেয়ে তার দেহ মনের প্রয়োজন মতো খোরাক যোগাবার ভার নিতে আজও অল্প লোকই পেরেছেন পৃথিবীতে। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে শুধু অন্যতম নন, প্রধানতম।

মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকে বহু কবি এবং শিল্পীই শিশুকে ভালোবেসে নিজ নিজ রচনায় তাকে স্থান দিয়েছেন, বহু গুরুই শিশুর চরিত্র গঠনের জন্য আজীবন পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি শিশুর সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ নিজের অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করে তার মনের কথা গল্পে, কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে এনে তার প্রতি সর্বসাধারণের সমবেদনা আকর্ষণ করতে— শিশুর জ্ঞান ও আনন্দের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার জন্য নিজের অলৌকিক সৃজনী প্রতিভার সঙ্গে অন্যের সংগ্রহশক্তিকে যুক্ত করতে, তার দৈহিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এক কথায় শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য, নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ সক্ষম হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। শিশুদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা, তাতে মাতৃস্নেহের মমত্ববোধ ও অসীম করুণার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল পিতৃস্নেহের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা, সেই সঙ্গে মহাগুরুর উপযুক্ত আদর্শনিষ্ঠা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে তাঁর ভালোবাসা একদিকে

যেমন শিশুকে তুচ্ছ বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিতে এবং তার ছোটোখাটো দোষত্রুটিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছে, তেমনি আর এক-দিকে তার স্থায়ী কল্যাণের দিকে, তার সুস্থ শরীর এবং সবল চরিত্রগঠনের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে সর্বদা সজাগ রাখতে সহায়তা করেছে। অতীতে শিশুদের বন্ধু কোনো কোনো কবির দেখা আমরা মাঝে মাঝে পেয়েছি, আদর্শ গুরুর দেখাও মাঝে মাঝে না পেয়েছি তা বলতে পারি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো একদেহে তাঁদের দুজনের সমাবেশ কখনও পাইনি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কবিগুরুর এই দুটি দিক নিয়েই আলোচনা করব।

আজ একথা অনেকেই জানেন যে, রবীন্দ্র-নাথের শৈশব খুব সুখের ছিল না। একদিকে ছিল নবাবী আমলের চালচলন ও অভিজাত পরিবারের অর্থহীন আদবকায়দাজনিত গুরুজনদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলাফেরার ঘড়িঘণ্টা বাঁধা কঠিন শিক্ষা ব্যবস্থার নিরন্ধ্র আয়োজন এবং শিক্ষকদের তর্জন-গর্জন, আর একদিকে ছিল রাজেশ্বর শ্যাম প্রভৃতি কঠোরচিত্ত লুব্ধ প্রকৃতি চাকরদের প্রভুত্বের দৌরাত্ম্য, যারা তাঁর ক্ষুধার অন্নে পর্যন্ত ভাগ বসাতে কুণ্ঠিত হত না—তাদেরই শাসনা-ধীনে দিন যাপনের গ্লানি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কলকাতার একটা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে বহুজন-অধ্যুষিত একটা প্রকাণ্ড বাড়ির কলরব এবং বদ্ধ আবহাওয়া। এই ত্রাতস্পর্শের চাপে সুকুমারমতি শিশুর প্রাণ যখন হাঁফিয়ে উঠত তখন তাঁর অনন্য-সাধারণ কল্পনাশক্তিই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখত—এখানে সেখানে দুচারটি ছুটির ক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়ে। খাজাঞ্চিখানার এককোণে রাখা পুরনো পাল্কীখানাকে সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপ কল্পনা করে তিনি আনন্দ পেতেন, ছাদে উঠে মাঝে মাঝে বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য-সাগরে ডুব দিয়ে তিনি স্নিগ্ধ হতেন। সেখানে তুলসীগাছের টবের পাশে তাঁর নিদ্রাপুরীর রাজকন্যা ঘুমোত, সেখান থেকে মেঘলা দিনে তাঁর কল্পনার ময়ূরপংখী ভাসত, চাঁদনী রাতে তাঁর পংখীরাজ উড়ে চলত সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। এই সব বাহ্য আশ্রয়ের সঙ্গে ছিল তাঁর অবুঝ মমতাময়ী মায়ের স্নেহ,—যিনি অসুখের অজুহাত মিথ্যে জেনেও তাঁকে প্রশ্রয় দিতেন মাস্টারকে ফিরিয়ে দিয়ে; আর ছিল তাঁর দিদিমার গল্প বলার আসর, যেখানে সারা দিনের রুটিনবন্ধনক্লিষ্ট শিশু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে কল্পলোকে মুক্তি পেতেন। ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক আব-হাওয়া, বড়োদের সাহিত্যসংগীতের আসরের ছিটেফোঁটা নিঃসন্দেহে সেদিন তাঁর অবচেতন মনে কাজ করছিল। কিন্তু বড়োদের অবিচার অত্যাচারগুলো এবং চারিদিকের 'ইঁটের' পরে ইঁটই সেদিন সবচেয়ে পীড়া দিয়েছিল তাঁকে। কুস্তি, শারীরতত্ত্ব ও চিত্রাংকণ শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য নানা বিদ্যা শিক্ষা দেবার নামে যে বিপুল বোঝা সেদিন তাঁর ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল তা ভাবলে আজকের দিনের গ্রন্থভারপীড়িত ছেলে-দেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। নিজে যে দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন সে দুঃখ যাতে তাঁর পরের যুগের ছেলেমেয়েরা আর না পায়, সেজন্য বড়ো হয়ে পর্যন্ত তিনি প্রাণপণে নানাদিক দিয়ে চেষ্টা করেছেন। শৈশব এবং বাল্যের সেই সব রুদ্ধশ্বাস দিন-গুলিকে তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি, শিশু, শিশু ভোলানাথ থেকে আরম্ভ করে শেষ জীবনের লেখা পুনশ্চ এবং শেষ-সপ্তককেও সেদিনের স্মৃতির ছাপ রেখে গেছেন, তাঁর সেদিনের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষাকে—শিশু হৃদয়ের অনেক ব্যাকু-লতাকে রূপ দিয়ে গেছেন তাঁর সাহিত্যে। অবশ্য ঐসব পরিণত বয়সের রচনায় শৈশবের অভিজ্ঞতার উপর কবিত্বের মায়াতুলিকার স্পর্শ পড়েছে, ফলে কতকগুলির কাব্যরস শিশুদের চেয়ে পরিণত বয়স্কদের বেশী উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু তা বলে তাদের মূল্য কমেনি। যেসব শিক্ষক এবং অভি-ভাবক নিজেদের শৈশবের কথা ভুলে গিয়ে অভ্যাসবশে না বুঝে শিশুদের ওপর অত্যাচার করে থাকেন, তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে ঐসব কবিতা; শিশুদের প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধের বোঝা লাঘব হয়েছে তাতে নানা পরিবারে এবং বিদ্যালয়ে। সাধারণত যেসব কথা শিশুদের মনে আসে অথচ তারা মুখে প্রকাশ করতে পারে না, কবি তাদের হয়ে আশ্চর্য সহৃদয়তার সঙ্গে সেই সব কথা শুনিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। তাঁর ডাকঘর নাটকের অমল বা শিশু কাব্য-গ্রন্থের 'মাতৃবৎসল' কবিতার খোকা—যে বলে 'মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে,—তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে', অথবা লুকো-চুরি বা বৈজ্ঞানিক কবিতায় যে শিশুটিকে আমরা দেখতে পাই সে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, সুতরাং তার কল্পনার দৌড় অনন্যসাধারণ; কিন্তু অতি সাধারণ শিশুর কল্পনালভ্য অনেক ছবি আমরা দেখতে পাই তাঁর 'দুয়োরানী, মূর্খু; রাজমিস্ত্রি, বনবাস, বিচিত্র সাধ' প্রভৃতি কবিতায়। মধুররস এবং করুণ রসের মিশ্রণে সমব্যথী একটি অপূর্ব কবিতা। বিশুদ্ধ করুণ রসের ক্ষেত্রে শিশুকাব্যের 'সন্ধ্যা হল গৃহ অন্ধকার' বা শিশু ভোলানাথের 'মাকে আমার পড়ে না মনে' বা পুতুল ভাঙার সঙ্গে মনে পড়ে পলাতকার সেই ছোট্ট মেয়েটিকে—যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ প্রদীপ নিবে যাওয়ায় 'হারিয়ে গেছি আমি' বলে কেঁদে উঠেছিল। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের মাতৃহীনা অমলার বাপের উদ্দেশে লেখা না-ফেলা চিঠি 'তোমায় দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে' আমাদের মর্ম স্পর্শ করে, মনে পড়ে সেই বাঙ্গালিনী মেয়েটির কথা, যে ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে সুসজ্জিতা দেবী প্রতিমাকে প্রশ্ন করছে, "তুই যদি আমার জননী, মোর কেন মলিন বসন?"—যে মাতৃহারা মা না পেলে কবির মতে সমস্ত উৎসবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। রাজর্ষি গ্রন্থের 'হাসি ও তাতা', কাবুলি-ওয়ালার 'মিনি', গল্পগুচ্ছের পথে পাওয়া যে গরিবের ছেলেটির আকাশে মেঘ দেখে ধনীর বাড়িতে মন টিকল না,—কাকে রেখে কার নাম করব? রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু বিষয়ক ছবিতে মধুর, করুণ এবং অদ্ভুত রসের ছড়াছড়ি থাকলেও হাস্যরসও খুব বিরল নয়।' 'ছোটোবড়ো'র খোকা যেদিন হঠাৎ বড়ো হওয়ার অবস্থাটা কল্পনা করে বলে, "আমি তখন চাবি খুলতে শিখে যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে" এদিকে কিন্তু দাদার খাঁচাখানা কেড়ে নিয়ে তাতে পাখী পোষবার লোভ সামলাতে পারে না, বিজ্ঞ কবিতার শিশু যখন নিজের উদ্ভট মতামতে মায়ের সমর্থন খোঁজে, তখন হাসি সামলানো কঠিন হয়। শিশু ভোলানাথের 'সময় হারায়' খোকা যখন বলে, "যত ঘণ্টা যত মিনিট সময় আছে যত, শেষ যদি হয় চিরকালের মতো, তখন স্কুলে নাই বা গেলেম; কেউ যদি কয় মন্দ, আমি বলব দশটা বাজলেই বন্ধ। তাধিন তাধিন তাধিন।" তখন বয়স্কদের মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে শিশুদের পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন ওকালতি করেছেন তারা অনেক সময় অনেক নির্দয় আচরণ করেছে তাঁর প্রতি, তার জন্য কান্নাকাটি না করে তিনি হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন তাই নিয়ে তাঁর কবিতায়। প্রহাসিনীতে উদ্ধৃত তাঁর কিশোর বয়সের লেখা 'খুড়োর পত্রে' দেখতে পাই আদরের ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর নির্মম অত্যাচার তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করছেন না শুধু—উপভোগ করছেন। ভাইপোকে লিখছেন ঃ

'মেরা উপর জুলুম করতা
তেরা বহিন বাই,
কি করেঙ্গা, কোথায় যাঙ্গা,
ভেবে নাহি পাই।
বহুৎ জোরসে গাল টিপতা
দোনো আংগুলি দেকে,
বিলাতী এক পিন বাজনা
বাজাতা থেকে থেকে।
কভি কভি নিকট আকে
ঠোঁটমে চিমটি কাটতা।
কাঁচি লেকে কোঁকড়া কোঁকড়া
চুলগুলো সব ছাটতা।
জজসাহেব কুছ বোলতা নেহি,
রক্ষা করবে কেটা?
কাঁহা গয়োরে কাঁহা গয়োরে
জজসাহেবেকো বেটা।

তুম ছাড়া কোই সমঝে না তো
হামরা দুরবস্তা,
বহিন তেরি বহুৎ মেরি
খিল খিল করকে হাসতা।'

এর টীকা নিষ্প্রয়োজন। কথা ও কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ কিশোরপাঠ্য যে-সব কবিতা রেখে গেছেন সেগুলি অর্ধশতাব্দীকাল আবালবৃদ্ধ বাঙালীকে আনন্দ ও প্রেরণা দিচ্ছে. লক্ষ লক্ষ শিশু এবং বৃদ্ধের সেগুলি আজ কণ্ঠস্থ। পরিণত বয়সে শান্তি-নিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পর তিনি ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা, অনুবাদচর্চা প্রভৃতি বিদ্যালয়-পাঠ্য বইগুলি লিখেছেন নিজের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে, ছবি ও ছড়া, ছেলেবেলা, সহজপাঠ প্রভৃতি লিখে শিশু-দের পাঠ্যভীতি কমিয়ে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগসাধন করেছেন; তাঁর নিজের ভাষায় 'যেখানে বেতের চাষ ছিল সেখানে আখের চাষ' করেছেন।

শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখার চেয়ে অন্য লেখকদের উৎসাহ দিয়ে বই লেখানোর কৃতিত্ব কম নয়। আজ যাকে আমরা শিশুসাহিত্য বলি তাঁর সময়ে বাংলাদেশে তার অস্তিত্ব ছিল না। দু'চার-খানা বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ছিল বটে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর শিশু সে যুগের সেই রকম একখানি শিশু-পাঠ্য বই-এ 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র মধ্যে কাব্যমাধুর্য আবিষ্কার করেছিলেন এও সত্য, কিন্তু আজকের দিনের শিশু সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় সে যুগের সে-সব বই অত্যন্ত নীরস ছিল, তা মানতেই হবে। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পুরানো ছড়া এবং রূপকথাগুলির দিকে দেশের সুধিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নিজে ছড়া সংগ্রহ করে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ছাপালেন, বিজ্ঞজনের উপহাসকে অগ্রাহ্য করে ঐসব অর্থহীন পূর্বাপর-সঙ্গতিহীন গ্রাম্য ভাষার শ্লোকগুলিকে মর্যাদা দিলেন, দেশবাসীকে ডাক দিলেন সেগুলিকে সম্মান দেবার জন্য, রক্ষা করবার জন্য। তাঁর মতে 'জননী নিজের সন্তানের মুখে দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপাসনা-মন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।' যে ছড়ার ভাষায়, 'মাতৃমাতা-মহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত' এবং যার ছন্দে 'আমাদের পিতৃপিতামহগণের নূপুরনিক্কণ ঝংকৃত' হচ্ছে সেগুলি সেদিন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের অবহেলায় লোপ পেতে বসেছিল, তার একটি বৃহৎ অংশকে তিনি সেদিন অবলুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে আমাদের জন্য ছাপার অক্ষরে চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন, সে জন্য প্রত্যেক বাঙালীর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁর অনুপ্রেরণায় শিশুদের আনন্দ দেবার জন্য সেদিন তাঁর বন্ধুস্থানীয় যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৈকুণ্ঠনাথ দাস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস মুখো-পাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুলেখকেরাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ'দের মধ্যে কেউ সংগ্রহ করেছেন পুরানো দিনের ছড়া রূপকথার মণিমুক্তো, কেউ এ'কেছেন অতীতের পুরাণ ইতিহাসের ছবি উজ্জ্বল রঙে কবিত্বময় ভাষায়, কেউ এনেছেন দেশ-বিদেশের গল্পপ্রবন্ধ শিশুবোধ্য ভাষায় লিখে পাতায় পাতায় ছবি দিয়ে সাজিয়ে। অনেকেই ঋণ স্বীকার করেছেন কবির কাছে, প্রত্যেকেই পেয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা। দক্ষিণারঞ্জনের সংকলিত ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকায় ১৩১৪ সালে আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'পাল-পার্বণ যাত্রা কথকতা এ সমস্ত ক্রমে ক্রমে মরানদীর মতো শুকাইয়া আসাতে বাংলা-দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকেদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তার পরে দেশের শিশুরাও কোন্ পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল? তাহাদের সায়ংকালের শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়ার ঘরের কেরোসিনদীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়, তাহাতে কেবলই ব্যাকরণবাহিত বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একে-বারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলই ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে? কেবলই বই-এর কথা? স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল? দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়?' শেষ পর্যন্ত তিনি প্রস্তাব করেছেন, বাংলাদেশের আধুনিক দিদিমা-দের জন্য একটা স্কুল খুলে সেখানে দক্ষিণা-বাবুর বইখানা পাঠ্য করা হোক। যোগীন্দ্র-নাথ সরকারের 'গল্পসঞ্চয়ের' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আজকের দিনের মা মাসিমা গেছেন গল্প ভুলে, কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলে নি। ছেলেরা আজো বলছে, গল্প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গল্প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাঁরা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকে কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।" বর্তমান প্রবন্ধের নামটি (শিশুদের রবীন্দ্রনাথ) তাঁর সেদিনের নিজের প্রতি আরোপিত উপাধি থেকেই আমরা পেয়েছি, সে কথা বলা বাহুল্য। যোগীন্দ্রনাথের অপূর্ব ছড়াসংগ্রহ 'খুকুমণির ছড়া', অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী ক্ষীরের পুতুল প্রভৃতি এবং উপেন্দ্রনাথের

ছেলেদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যকীর্তির পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা কতটা কাজ করেছে তা আজ কারও অবিদিত নেই। শিশুদের জন্য এক এক দিক দিয়ে কিছু আনন্দদানের সহায়তা অনেকে করেছেন, তাদের কল্যাণের জন্য চিন্তাও অনেকে করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন দরদ দিয়ে তাদের আনন্দ এবং কল্যাণের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা আর কেউ কখনো করেছেন বলে জানি না। কবির অনুবর্তীদের মধ্যে বহু শিক্ষাব্রতী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী সুলেখক যথা সতীশচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, সুখলতা রাও, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলার শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং মনোরঞ্জনের জন্য কলম ধরেছিলেন, পরবর্তী যুগের শিশুসাহিত্য-স্রষ্টারা অনেকেই তাঁর পরোক্ষ প্রভাবে শিশু-দেবতার মন্দিরে অল্পাধিক পরিমাণে পূজোপচার পাঠিয়ে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

পূর্বে বলেছি, শিশুদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুটি কর্মধারার কথা,—একটি প্রচেষ্টা কিসে তাদের ভালো লাগবে তার জন্য, আর একটি প্রচেষ্টা কিসে তাদের ভালো হবে তার জন্য। এতক্ষণ সাহিত্যক্ষেত্রে শিশুদের জন্য তিনি যে ঐশ্বর্য রেখে এবং রাখিয়ে গেছেন তার কথা হ'ল; এবার বাস্তব জগতের শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের বেত্রদণ্ড-বিড়ম্বিত শৈশবকে অভয় দেবার জন্য তিনি কি করেছেন তার কথা কিছু বলব। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার জন্য সবচেয়ে দরকার অনুকূল পরিবেশ, অনুকূল শিক্ষক ও অনুকূল শিক্ষা-ব্যবস্থা,—যাতে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধ উদ্বোধনের সুযোগ দেওয়া হবে। লোকালয় থেকে—শহরের বিলাসব্যসনের এবং রাজনীতির বিক্ষেপ থেকে দূরে প্রাচীনকালের গুরু-গৃহের আদর্শে তিনি যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বললেন তখন গণ্যমান্য নগর-বাসী অনেকেই কানে তুললেন না সে কথা। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের শক্তিতে যা পারেন করবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের মাঠে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলে বসলেন। বলা বাহুল্য, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি তিনি এখানে করতে পেরেছিলেন, মনোমত সহকর্মী এবং শিক্ষকও কয়েকজন পেয়েছিলেন। প্রথম-দিকে বিনা পয়সায় পড়াবার জন্যও ছেলে ভিক্ষা ক'রে আনতে হ'ত। আমাদের বাড়ির তিনজন শিশু প্রথম বছরে এসেছিলেন তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররূপে, তাঁদের কাছে পড়ার এবং খেলার, বাগান করার এবং সন্ধ্যাবেলায় গাছতলায় বসে গল্প শোনার গল্প শুনে এক সময়ে আমার কলকাতার স্কুল বাড়ি এবং ছাত্রজীবন ব্যর্থ মনে হ'ত। আঠারো বছর বয়সে নিজে যখন শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষা ভবনের এবং কলাভবনের ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করলুম, তখন আবহাওয়া অনেক বদলেছে, তবু যা ছিল তাও আমাকে কম মুগ্ধ করেনি। এখানে বাইরের প্রকৃতি আজও ছাত্রদের মনে প্রভাব বিস্তার করে, এখানে আজও ছাত্রদের মধ্যে যতটা স্বাধীনতা আছে তা অন্যত্র বিরল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার কথা ছিল স্বাধীনতা এবং ভয়হীনতা : চিন্তার স্বাধীনতা, কাজের স্বাধীনতা, নিজের বুদ্ধি

এবং শক্তিপ্রয়োগে জ্ঞান অর্জনের স্বাধীনতা, —এমন কি ভুল করবার স্বাধীনতা; আঘাত, অপমান, দণ্ড এমন কি মৃত্যুর মধ্যে ভয়হীন থেকে কর্তব্য ক'রে যাবার শিক্ষা তিনি শৈশব থেকে দিতেন তাঁর ছাত্রদের। সুখাদ্যের প্রতি যেমন শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তেমনি জ্ঞানের প্রতি তার সহজ আকর্ষণ জন্মাবে এই তিনি চাইতেন, পরীক্ষার বা শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে ছেলেরা পড়বে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শিক্ষকদের পক্ষে কায়িক শাস্তিদান নিষিদ্ধ ছিল, শিশুরা কেউ কিছু অন্যায় করলে তাদের নির্বাচিত সমিতিতে তার বিচার হ'ত, শাস্তি স্বরূপ কোনো কায়িক পরিশ্রমের অতিরিক্ত কাজ তাকে করতে হ'ত। শিশু-কাল থেকে এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়ে ছাত্রদের দায়িত্ববোধ বাড়ত। পড়ার ভয় না থাকায় পড়ায় আনন্দ ছিল তাদের। বইএর চেয়ে শিক্ষকের চরিত্রকে, তাঁদের আচরণ এবং মুখের কথাকে বেশী মূল্য দিতেন রবীন্দ্রনাথ, শিষ্যের সঙ্গে গুরুর অন্তরের যোগ না থাকলে শিক্ষাব্যবস্থাই ব্যর্থ হয় বলে মনে করতেন। শিক্ষক প্রতিদিন নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াবার চেষ্টা করবেন, নইলে না তিনি অন্যের জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগাতে পারবেন? গুরু নিজে অবসর পেলেই পড়েন, ঘরে বাইরে মানুষের এবং প্রকৃতির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেন দেখে ছাত্রের পড়তে ইচ্ছা হয়, শিল্পী নিজে মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন এবং ছবি আঁকেন, দেখে দেখে ছাত্রেরও দেখবার এবং আঁকবার আগ্রহ জাগে। সেই সময় যখন কাজে নেমে ছাত্র কোথাও ঠেকে তখন গুরুর উপদেশ চায় এবং তিনি তাকে তা দেন। এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের মতে সার্থক শিক্ষাদান এবং গ্রহণ। ছেলেরা শিশুকাল থেকে শুধু ছাপা পুঁথি পড়ে বড়ো হবে না, নিজেরা দেশময় ঘুরে দেশের ভূগোল ইতিহাস জানবে, পুরা কথা সংগ্রহ ক'রে ইতিহাস রচনা করবে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ছাত্রেরা শিক্ষকদের সঙ্গে কোপাই নদীর উৎস আবিষ্কারে গেছে, আরও কতবার কত অভিযান করেছে তাঁর প্রেরণায়। এদিকে আবার রবীন্দ্রনাথ নিজে যে শুধু নানা বিষয়ের রাশি রাশি বই ঘরে বসে পড়তেন তাই নয়, পড়াতেনও প্রাণ মন দিয়ে। একদিকে যেমন তিনি আদর্শ গুরু আর একদিকে তেমনি তিনি আদর্শ ছাত্র; উইন্টারনিটজ সাহেবের ক্লাসে আমাদের আগে গিয়ে তিনি বসতেন খাতা পেনসিল নিয়ে। নীচু বাংলায় ছিলেন তাঁর অগ্রজ ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিবারাত্র জ্ঞানচর্চায় উন্মাদ, বনের পাখীদের যাঁর খাওয়ার সময় মাথায় কাঁধে হাতে ব'সে আহারে ভাগ বসাতে দেখেছি। ওদিকে শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পুঁথিপত্র নিয়ে, অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন, নেপাল-চন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, তেজেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি দেশবিদেশের কথা, জনসেবা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং গাছপালার পরিচর্যা নিয়ে, ওদিকে নন্দলাল বসু শিল্প নিয়ে এবং স্বয়ং কবিগুরু, দীনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভৃতি সঙ্গীতনাট্য নিয়ে তপস্যারত, এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গই ছিল শিশুদের আনন্দের এবং শিক্ষার অফুরন্ত প্রস্রবণ। শিশুরা অবাধ্যতা করেছে, তাদের শাস্তি দিয়ে আশ্রমসচিব জগদানন্দবাবু উপোষ ক'রে আছেন তাদের সঙ্গে দেখেছি। দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতা যদি আঘাতের বেদনা না পেল তবে সে দণ্ডের উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ, সে তো জুলুম, সে তো পাপ। প্রেস্টিজের ওজুহাতে রবীন্দ্রনাথ কখনও ছাত্র শিক্ষকের দ্বন্দ্বে সত্যভ্রষ্ট হননি, অপরাধী শিক্ষক হলেও তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। একদিকে দেখেছি বৃষ্টির দিনে শিশুর দল নিয়ে তাঁকে মাঠে ঘুরতে শিশুসুলভ চাপল্যে, আর একদিকে দেখেছি তাঁকে বুধবারের মন্দিরে শান্তসমাহিত ঋষি-মূর্তিতে, আবার আর একদিকে দেখেছি পাঠভবনের ক্লাসে ইংরাজী এবং বাংলা

সাহিত্য পড়ানোর ছলে সরস ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কঠিন তথ্য, অতীত বর্তমানের নানা মহাবাণী ও দুর্লভ বিদ্যা পরিবেশন ক'রে শিশুদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতে। শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর অবজ্ঞা বা দয়া ছিল না, তাঁদের তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন এবং দিতে বলতেন। শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের একই দিনে শিশুদের ক্লাস এবং কলেজের উচ্চতম ক্লাস নিতে হ'ত। গানের আসরে, গল্প উপন্যাসের আসরে শিশুদের দ্বার অবারিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজে শিশু বিভাগের সভায় সভাপতিত্ব ক'রে তাদের রচনায় এবং আবৃত্তিতে উৎসাহ দিতেন। শিশুরা দেখতুম নিজেরা সাহিত্য সভা করে, পত্রিকা সম্পাদন করে, বিপদসূচক ঘণ্টা বাজলে দল বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে জল বয়ে কাছাকাছি গ্রামের আগুন নেবায়, জীবজন্তু পোষে, পাখীদের জন্য উঁচুতে পাত্র করে জল রাখে, নিজেদের বাঁধা রঙ্গমঞ্চে গুরুদেবের এমন কি কখনও কখনও নিজেদের লেখা নাটক অভিনয় করে।' ছবি, গান, নাচ, প্রতিরাত্রে এবং প্রভাতে বৈতালিক, প্রতি উৎসবে বিচিত্র সাজসজ্জা ও বিচিত্র আলপনা, সকলের উপর খোলা মাঠের এবং শাল, তাল, ছাতিম, আমলকী প্রভৃতি আশ্রমতরুর দাক্ষিণ্য তাদের চিত্তকে সরস এবং সমৃদ্ধ করে। শিশু বিভাগের দেয়ালে নানা শৈলীতে আঁকা নানা জীবজন্তুর রঙীন ছবি এবং নানা অলংকরণ-চিত্র দেখে দেখে শিশুদের চোখে-না-দেখা পশুপক্ষী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়, সেই সঙ্গে শিল্পরসবোধ জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে কলাভবন এবং সঙ্গীতভবনের যোগ, শান্তি-নিকেতনের পাঠব্যবস্থার সঙ্গে শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়ন ব্যবস্থার যোগ থাকাতে ছেলে-দের নিজ নিজ রুচি এবং শক্তি বুঝে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করার ব্যাপক ক্ষেত্র মেলে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাষাভাষী ছেলেদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করতে উৎসাহ দিতেন। শিশুবিভাগে তখন 'মাসিমা' ছিলেন না, খুব ছোটো ছেলেদের দেখাশোনার কাজে পুরুষ শিক্ষকদের সাহায্য করতেন কলেজের এবং কলাভবনের বড়ো মেয়েরা, এতে সেই মেয়েদেরও শিশুপালন শিক্ষার কাজ হ'ত। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রতি-দিন বিদ্যালয় সংলগ্ন হাসপাতালে পীড়িত শিশুদের দেখতে এবং সান্ত্বনা দিতে যেতেন, অনেককে ছোটোখাটো অসুখে বাড়িতেই হোমিওপ্যাথিক বা বায়োকেমিক ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলতেন। শিক্ষকেরা অথবা তাঁদের বাড়ির লোক কেউ বেশী অসুস্থ হলে ছোটো বড়ো সব ছেলেই পালা করে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দিবারাত্র সেবা করত। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় সকলে মিলে আশ্রম পরিষ্কার করত, রাস্তা তৈরি করত, বাগান করত, বড়ো মেয়েরা রান্নাঘরের সম্পূর্ণ ভার নিতেন। এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশ সব সময়ে থাকত না, কর্তব্যবোধেই সকলকে ঐসব কজে যোগ দিতে দেখা যেত। মনে আছে, রাস্তার ধারে একটা শুকনো কুয়া বোজাবার কাজে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব নিজে আমাদের সঙ্গে মাটি কাটার এবং বহার কাজে লেগেছিলেন। সেদিন অধ্যাপক এবং অধ্যাপকপত্নীরা ছেলেমেয়েদের বহু অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করতেন, তাদের রোগে সেবা করতেন, যথা-কালে তাদের বড়া, পিঠে, বাড়ির ফলমূল প্রভৃতির যোগান দিয়ে তাদের প্রবাসবাসের দুঃখ ভুলিয়ে রাখতেন। বনভোজনের দিনে শিক্ষক ছাত্র এক সঙ্গে উনুন গড়তেন, কাঠ কাটতেন, জল বইতেন, রান্না ও পরিবেশন করতেন। সমস্ত আশ্রমটাই ছিল যেন একটা পরিবার, সকলেই পরস্পরের সুখের সুখী, দুখের দুঃখী। সবার ওপরে জেগে থাকত একজন পরমপুরুষের অপার স্নেহ এবং অসীম আশা ঃ মানুষ গড়বার আশা, দেশ গড়বার আশা, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ তাই মিলিয়ে নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী গড়ার আশা। এই কাজে অনেক ত্যাগস্বীকার তিনি করেছেন, অনেক ত্যাগী পুরুষের সহায়তা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিল তাঁর শিশু বন্ধুরা। তাদের চোখের ওপর বড়ো আদর্শ তিনি রেখে-ছিলেন; চেয়েছিলেন চারদিকের নিরীশ্বর জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে তারা উঠবে, অন্য পাঁচটা জীবজন্তু মশামাছির মতো কেবল খেয়ে পরে মরে যাওয়াটাকে তারা লজ্জাজনক মনে করবে, তারা বড়ো চিন্তা করবে, বড়ো কাজে জীবনপণ করবে। তাঁর আশা ছিল প্রভাতে সন্ধ্যায় নীরব ধ্যানে এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণে, বিশেষ ক'রে প্রতি বুধবারের মন্দিরে তাঁর উদাত্ত ভাষণ শুনে একদিকে শিশুরা ভারত-বর্ষের অতীতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার লাভ করবে, আর একদিকে প্রতীচ্যের নব্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে, প্রকৃতির এবং মানুষের বিচিত্র রহস্য জেনে এবং সেই জ্ঞান কার্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে তারা দেশকে সমৃদ্ধ করবে। তিনি বলতেন, "নিজেকে কখনো ছোটো মনে করো না, অক্ষম মনে করো না। আশা বড়ো রাখবে, দৃষ্টি বড়ো রাখবে। পরাজয়ে ভেঙে পড়বে না, শতবারের পরা-জয়ের পরেও ধুলো ঝেড়ে উঠবে, তবেই তোমরা জয়ী হবে।" বলতেন, "নিজের দেশের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রাখো, কিন্তু অন্য দেশকে অশ্রদ্ধা করো না। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই, এমন গ্রাম নেই, যেখানে কোনো মহাপুরুষ জন্মান নি, কোনো মহাবাণী উচ্চারিত হয়নি।" বলতেন, "মন্দিরের ভিতের তলায় অনেক ইঁট পাথরকে মাটির নীচে থাকতে হবে, অনেককে নীরবে আত্মবিসর্জন করতে হবে, তবেই দেশের মন্দির উঠবে মাথা তুলে, দেশ বড়ো হবে। সকল দেশেই তাই হয়েছে। কোনো জাত সহজে বড়ো হয়নি। সবাই যদি মন্দিরের চূড়োয় ধ্বজা হ'তে চায় তবে আমাদের মন্দির আর কোনোদিন উঠবে না, সবাই যদি খ্যাতি চায়, প্রভুত্ব চায়, অর্থ চায়, তবে জাত কখনো বড়ো হবে না।" তিনি আমাদের গুরুরূপে গুরুদক্ষিণা দাবি করে-ছিলেন সেদিন। বলেছিলেন, "যখনি তোমরা অন্যের কল্যাণের জন্য বা কোনো মহৎ কাজের জন্য কোনো ত্যাগস্বীকার করতে পারবে তখনই আমি, দেখি বা না দেখি, আমার গুরু-দক্ষিণা পাব। যখনই তোমরা কোন অন্যায়কে বাধা দিতে দাঁড়াবে, কোন প্রলোভনকে জয় করতে পারবে তখনই আমি আমার গুরু-দক্ষিণা পাব।" রবীন্দ্রনাথ যুগগুরু ছিলেন, লোকগুরু ছিলেন। আজকের যুগের প্রত্যেক বাঙালী প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁর কাছে ঋণী। দেশের আজ বড়ো দুর্দিন, চারদিকে অন্যায়, চারদিকে প্রলোভন; বড়ো বড়ো মাথা তলিয়ে যাচ্ছে, বড়ো আদর্শ আজ হাসির কথা। আজকের দিনে আমাদের সকলের যিনি গুরু ছিলেন তাঁর সেই গুরুদক্ষিণার দাবিটি দেশ-বাসী সকলের কাছে জানিয়ে দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। নিজেদের যা হবার হয়েছে, আমাদের পরে যারা আসছে—সেই শিশুদের কাছে যেন শিশুদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের এই আশার কথা—এই গুরুদক্ষিণার দাবির কথা তাদের বাবা মা'রা জানিয়ে দেন—এই অনুরোধ রইল।

॥ ২৬ ॥

ব্যাপারটা যে আর চাপা নেই, তা পরের দিনই বোঝা গেল। হোটেলের কাজে শ্রীমতী করবী গুহের সুইটে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী করবী গুহ তখন তাঁর প্রাত্যহিক কর্তব্য সেরে ফেলেছেন। ফুলের দোকানদারের প্রতিনিধি তাঁর অর্ডার নিয়ে গিয়েছেন। ন্যাটাহারিবাবু তারপর সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, "মা জননী, আজ আপনাকে কোন রঙের পর্দার কাপড়, বিছানার চাদর পাঠাবো বলুন।"

আমার সামনেই করবী দেবী বলেছেন, "নিত্যহরিবাবু, অন্য লোকদের বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর রঙের পর্দা দেখি, কত নতুন নতুন রঙ বেরোচ্ছে। আপনার ভাঁড়ারে সেই সেকেলে রঙগুলো পড়ে রয়েছে।"

ন্যাটাহারিবাবু সত্যিই যেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর যেন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "মা জননী, আপনার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বাড়ি আর এই হোটেল কি এক জিনিস মা? গেরস্তর নিজের সংসারে, গেরস্তর নিজের বাড়িতে যদি দরজায় থলে টাঙিয়ে রাখে, তাও লোকের ভালো লাগবে।"

করবী দেবী তাঁর টানা টানা চোখদুটো দিয়ে নিত্যহরিবাবুর দিকে কেমন ভাবে তাকালেন। আস্তে আস্তে বললেন, "আমাকেও তো এই সুইটটা ভালো করে সাজিয়ে রাখতে হবে। রঙের সঙ্গে রঙ না মিললে এই গেস্ট হাউসের কী থাকবে বলুন?"

নিত্যহরিবাবু বললেন, "আমি যতক্ষণ আছি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। নিত্যহরি যে করে পারে, রোজ আপনার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে যাবে।"

নিত্যহরিবাবু এবার বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি বললাম, "করবী দেবী, আপনার কোনো অসুবিধে থাকলে আমাকে বলতে পারেন। আমি গিয়ে ম্যানেজারকে জানিয়ে দেবো। নিত্যহরিবাবু কি আপনার পছন্দমতো চাদর এবং পর্দা দিতে পারছেন না?"

করবী দেবী যে এই ভোরবেলাই স্নান সেরে ফেলেছেন, তা ওঁর চুলের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। নিজের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে করবী দেবী বললেন, "আপনার কিছু বলবার দরকার নেই। নিত্যহরিবাবু মনে কষ্ট পাবেন। ভারি সুন্দর মানুষটি। আমার কিন্তু ওঁকে, কেন জানি না, খুব ভালো লাগে।"

আমি চুপ করে রইলাম। করবী দেবী বললেন, "একেবারে খাঁটি সোনা। আপনাদের এখানে এতোদিন থেকেও নষ্ট হয়ে যাননি। উনি মনে দুঃখ পাবেন, এমন কোনো কাজ আমার করতে ইচ্ছে করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মিস্টার

পাকড়াশির অতিথিরা কবে এসে হাজির হচ্ছেন? তাঁদের জন্যে কোনো স্পেশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার থাকলে আমাদের এখনই বলে দেবেন।"

করবী দেবী বললেন, "মিস্টার আগর-ওয়ালা আমাকে বলেছেন, যেন কোনোরকমে ও'দের সেবার ত্রুটি না হয়। আমি ঠিক করে রেখেছি দু'জনকে দুটো কেবিন দিয়ে দেবো। আর এইটাকেই আমার বেড রুম করে নেবো। অসুবিধের কোনো কারণ নেই। আগে চার পাঁচজন গেস্টও একসঙ্গে এখানে থেকে গিয়েছেন।"

তারিখের কথায় করবী দেবী বললেন, "ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ওটা জেনে রাখলে কাজের সুবিধে।" আমার সামনেই করবী দেবী টেলিফোনটা তুলে নিলেন। আমাকে বললেন, "দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসে পড়ুন।"

আমি বসলাম। দেখলাম, করবী দেবী পা দুটো যেন পদ্মফুলের মতো। তার উপর সোনালী রঙের হাল্কা চটি পরেছেন। তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো আলতার রঙে লাল হয়ে আছে। করবী দেবী বললেন "আপনার সেই সভাপতির কীর্তি' জানেন ফিরে গিয়ে পার্সেল পোস্টে এই চটিদুটো পাঠিয়ে দিয়েছে। পায়ের মাপটা কখন জোগাড় করলে কে জানে। চটিদুটো চমৎকার ফিট করে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আপনার পায়ে চটিদুটো মানিয়েছেও ভালো।"

করবী দেবী খিল খিল করে হেসে বললেন, "অতো বুঝি না। তবে সবাই যাঁকে মাথায় করে রেখেছিল, তাঁকে যে পায়ের তলায় রাখতে পারছি, এতেই আমার আনন্দ।"

আমি চুপ করে রইলাম। করবী দেবী টেলিফোনে মাধব পাকড়াশিকে পেলেন না। আর কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। কথা শেষ করে আমাকে বললেন, "কর্তাকে পেলাম না। তিনি এ'র মধ্যেই ফ্যাক্টরীতে বেরিয়ে গিয়েছেন। প্রথমে গৃহিণী ধরলেন; পরে পাকড়াশি জুনিয়র।"

পাকড়াশি জুনিয়রের কথায় কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। করবী গুহ বললেন, "উনি কিছুই খবর রাখেন না। তবে পুত্র পাকড়াশি অনুগ্রহ করে আমাকে ফোনে জানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

আমি বললাম, "খবরটা পেলে আমাদের একটু জানিয়ে দেবেন।"

আমি এবার চলে আসছিলাম। করবী দেবী বললেন, "উঠছেন কেন? একটু ওভালটিন খেয়ে যান।"

আমি অবাক হয়ে ও'র মুখের দিকে তাকালাম। এই হোটেলে কেউ কখনও আমাকে এমন আন্তরিকভাবে কিছু খেতে বলেনি।

করবী দেবী বললেন, "থাকি হোটেলে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে ছোট্ট সংসার পেতে বসেছি। আমার নিজের রান্নাবান্নার কিছু সরঞ্জাম জোগাড় করে রেখেছি। আপনাদের হোটেলের কফি আমার সব সময় ভাল লাগে না। তখন হিটার জেবলে আমি নিজেই চা, কফি বা ওভালটিন করে নিই।"

দেখলাম হিটারে করবী দেবী একটু আগেই জল চড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, "এর থেকে প্রমাণ হয় না যে, শাজাহান হোটেলের কফি খারাপ। এর থেকে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, মাঝে মাঝে রান্নার সুযোগ না পেলে বাঙালী মেয়েদের ভাত হজম হয় না।"

করবী দেবী এবার হেসে ফেললেন

বললেন, "তা ভাই যা বলেছো। আমার মাঝে মাঝে বাঙালী মতে রান্না করে খেতে খুব ইচ্ছে করে।"

করবী দেবী অজ্ঞাতে আমার এক গোপন ক্ষতে হাত দিয়ে ফেললেন। সায়েবী খানায় ডুবে থেকে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি একদিন আমারও হাতপা ছড়িয়ে পিঁড়িতে বসে ভাত, ডাল, চচ্চড়ি খাবার সুযোগ ছিল।

আমি ছেলেমানুষের মতো বলে ফেললাম, "আপনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে রেঁধে খান।"

করবী দেবী বললেন, "মাঝে মাঝে ভাই হিটারে বাটি চচ্চড়ি রাঁধি। আমার মা খুব সুন্দর বাটি-চচ্চড়ি রাঁধতে পারতেন।"

চচ্চড়ির নাম শুনেই আমার রসনা যে সজল হয়ে উঠেছে, তা করবী দেবীর অভিজ্ঞ নারী দৃষ্টিতে ধরা পড়তে বেশিক্ষণ লাগলো না। হাসতে হাসতে বললেন, "যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তোমাকে একদিন খাওয়াতে পারি।"

"আপত্তি! আমার অবস্থা সেই লোভী শংকরার মতো যাকে জিজ্ঞেস করা হলো—'খাবি?' উত্তরে সে বললে—হাত ধোবো কোথায়?"

করবী গুহ স্নিগ্ধ হাসিতে মুখে ভরিয়ে বললেন, "তুমি না ভাই, বাউনের ছেলে। বেজাতের হাতে খেয়ে জাতটা দেবে?"

আমি সাহস পেয়ে বললাম, "হ্যাঁ, ভাটপাড়ার বাউনের রোজ এখানে আমাকে পথ্য ব্যঞ্জন রেঁধে কলাপাতায় খাওয়াচ্ছে কিনা!"

করবী দেবী বললেন, "এটা যে হোটেল। 'হোটেলে চণ্ডালের হাতে খেলেও দোষ নেই' আমার মা বলতেন। তা বলে ঘরে খাওয়া।"

"আপনার মা তো খুব উদার ছিলেন।"

"বাবা যে টুরের চাকরি করতেন। হোটেলে হোটেলে খেয়ে বেড়াতেন। উদার না হয়ে যে উপায় ছিল না।" করবী দেবী এবার ওভালটিন তৈরি করতে শুরু করলেন।

এক প্রসন্ন প্রশান্তিতে আমার মনটা যেন ভরে উঠছে। আমি যেন এতোদিনে এই হোটেলের মানুষগুলোকে ক্রমশ চিনতে আরম্ভ করছি।

করবী দেবীর নিজের হাতে তৈরি ওভালটিন খেতে গিয়ে যেন প্রথম বুঝতে পারলাম, ঘর আর হোটেল এক নয়। দুনিয়ার সেরা হোটেল—সে ওয়ালডরফ, তাজমহল, যাই হোক না কেন নিজের ঘরের কাছে (সে শিবপুর, শালকে, কিংবা বস্তী যেখানেই হোক) কিছুই নয়।

ওভালটিনের কাপে চুমুক দিতে দিতে করবী দেবী বললেন, "আসলে নিজের দেশের লোককে বিদেশে আমরা এতো ভালবাসি কেন জানেন?" (তুমি থেকে আমি আবার আপনি হয়ে গেলাম।) "নিজের ভাষায় কথা বলতে পারলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আপনাদের লীডাররা যতোই বলুন, এর মধ্যে কোনো প্রাদেশিকতা নেই।"

করবী দেবীকে দূরে থেকে এতোদিন দেখে চিনিনি। উনি যে এতো চিন্তা করতে পারেন, এতো সুন্দর কথা বলতে পারেন, তা আজ ও'র কাছে না এলে হয়তো আমার কোনোদিনই জানা হতো না।

করবী দেবী হঠাৎ ক্যাবারের কথায় এলেন। বললেন, "আপনি তো ওদের সঙ্গে ঘোরেন। ব্যাপারটা কী?"

ও'র প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে আমি বললাম, "আমি ও'দের সঙ্গে ঘুরতে যাবো কেন? তবে, আমি মিস্টার ল্যামব্রেটোর পাশের ঘরে থাকি, এই পর্যন্ত।"

"এবং সেই পাশের ঘরেই কনি দি উয়োম্যান সারাক্ষণ পড়ে থাকেন!" করবী দেবী এবার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন।

আমি বললাম, "হাজার হোক ও'র সহশিল্পী। এক সঙ্গে বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছেন।"

করবী দেবী বললেন, "কিন্তু তার মানেই যে একটা বামনের কথায় উঠতে বসতে হবে, এমন কোনো আইন নেই।"

"কী বলছেন আপনি?" আমি প্রতিবাদ করলাম।

"শোতে বামন তাঁর কৃপাপ্রার্থী, করুণাভিখারী। বাইরে ঠিক উল্টো। কনি বামনের সেবাদাসী। তার বদমেজাজের বিরুদ্ধেও কোনো কথা বলবার সাহস রাখে না মেয়েটা।"

আমি বললাম, "তাতে কী এসে যায়? শোতে কি করছেন ও'রা সেইটাই আমাদের ভাববার কথা।"

"শো নিয়ে ভাববেন, আপনাদের কাস্টমাররা", করবী দেবী বললেন। "শোয়ের বাইরে ও'রা যা করেন, তা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা। কারণ আমরাও এই হোটেলে থাকি।"

উত্তর দেবার কিছুই খুঁজে পেলাম না। ওদের জীবন নিয়ে আমরা কেন যে এমন কৌতূহলী হয়ে উঠছি, তা কিছুতেই বুঝতে পারি না।

করবী দেবী বললেন, "এটাও এক ধরনের বিলাস। ক্যাবারে নর্তকীর তো অর্থের চিন্তা নেই। কিছুক্ষণের আনন্দের জন্যে রাজা-মহারাজা, ধনী এবং ধনীপুত্ররা
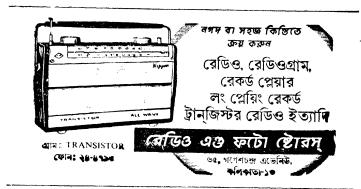
নর্তকীর পায়ের তলায় ডলার দিয়ে যায়। সুতরাং অবসরের একটা বিলাস না থাকলে খারাপ লাগে। কেউ বাঁদর পোষে, কেউ বামনকে লাই দিয়ে মাথায় তোলে।"

আমি চুপ করে রইলাম। করবী দেবী যে এমনভাবে কথা বলতে পারেন, তাই আমার জানা ছিল না।

কোনোরকমে বললাম, "বেচারা যে বামন, তার জন্যে আপনার কষ্ট হয় না?"

করবী দেবী বললেন, "ওরা আপনার মনেও কোনো অদ্ভুত উপায়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। এটা বোঝেন না কেন যে, বামন বলেই লোকটা করে খাচ্ছে। আপনার মতো লম্বা হলে কেউ ওকে কনির সঙ্গে স্টেজে অ্যাপিয়ার করতে দিতো না।"

আমি চুপ করে রইলাম।

করবী দেবী বললেন, "এ লাইনে আমি অনেক দিন রয়েছি। একটা কথা জেনে রেখে দিন। ভিক্ষে এবং এন্টারটেনমেন্টের জগতে বিকলাঙ্গ, বীভৎসদর্শনদের অনেক দাম। এদের জোগাড় করবার জন্যে শিল্পীরা অনেক দাম দেয়।"

করবী দেবী একটু থামলেন। তারপর বললেন, "দাম দাও, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে মাথায় তুলো না। তা[র] জিনিসটা বীভৎস এবং কুৎসিত হয়ে ও[ঠে] তাতে যে হোটেলে তুমি নাচছো, তা[দে]র ক্ষতি, আর নিজেরও সর্বনাশ।"

করবী দেবীকে নমস্কার করে এব[ার] কাউন্টারে এলাম। এবং সেখানের কাজক[র্ম] শেষ করে উপরে উঠে গেলাম।

কনিকে ছাদের উপরেই দেখতে পেলাম। যেন মুখ শুকনো করে বসে আছে ম[নে] হলো।

রৌদ্রে পিঠ দিয়ে সে একমনে সিগারেটে[র] ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে কনি সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিলে। তারপর সেটা ছুঁড়ে ছাদের এক কোণে ফে[লে] দিয়ে বললে, "গুড মর্নিং।"

জানি আজকের সকালটা কনির প[ক্ষে] তেমন গুড নয়। তবু অভিবাদন ফেরৎ দি[য়ে] বললাম, গুড মর্নিং।

কনি এবার উঠে দাঁড়াল। উঁকি মে[রে] ল্যামরেটার ঘরের দিকে তাকিয়ে একব[ার] দেখে নিল যে, ওকে দেখছে কিনা। তারপ[র] কোনো কথা না বলে কনি সোজা আমা[র] ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

জামাকাপড় পাল্টিয়ে এবার একটু হা[ত] পা ছড়িয়ে বসবো ভেবেছিলাম। কিন্তু [কনির] জন্যে তা হবার উপায় নেই। কনি একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, "তোমা[র] ডিউটি কি শেষ হয়ে গেল?"

বললাম, "এখনকার মতো ছুটি। আবা[র] সন্ধ্যাবেলায় যা হয় হবে।"

কনি এবার যেন একটু সঙ্কোচ বো[ধ] করতে লাগল। ওর যেন কিছু বলবার [ছিল,] অথচ বলতে পারছে না। ওর মুখে কেমন যেন অসহায়তার ছাপ ফুটে আছে।

"কিছু বলবে?" ওকে প্রশ্ন করলাম।

কনি উত্তর দিল, "যদি তোমার ক[োনো] অসুবিধে না হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে একটু বেরোতাম।"

"আমার সঙ্গে?" আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম।

"হ্যাঁ। এমন জায়গায় এলাম, অথচ কিছু না দেখেই চলে যাবো, ভাবতে কেমন লাগছে।"

বললাম, "কলকাতা দেখবার প্রশস্ত সময় তো এখন নয়। তবে, এ-সময় ছাড়া কখনই আর তুমি কলকাতা দেখবার সুযোগ পাবে?"

তবু প্রস্তাবটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। ক্যাবারে নর্তকীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে যদি কোনো গন্ডগোলে পড়ি, তা হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। কনি বোধ হয় আমার এই মানসিক অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল। সে বললে, "মিস্টার স্যাটা বোসের সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি। তোমার নিজের যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তা হলে উনি যাবার অনুমতি দিয়েছেন।"

আমি বললাম, "আপনি নিজের ঘরে

চলে গিয়ে জামাকাপড় পরুন। আমি আপনাকে ফোনে ডেকে পাঠাবো।"

কনি আর সময় ব্যয় না করে নিজের এয়ারকণ্ডিসন ঘরের দিকে চলে গেল।

আমি আর কাল বিলম্ব না করে টেলিফোনে সত্যসুন্দরদাকে পাকড়াও করবার জন্যে ছুটলাম। সত্যসুন্দরদা সত্যিই অনুমতি দিয়েছেন কিনা সে-সম্বন্ধে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। কিন্তু সত্যসুন্দরদা বললেন, "হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে কলকাতা ঘুরে বেড়াতে আপত্তি কী? ভদ্রমহিলাকে একা ছেড়ে দেওয়াও মোটেই সেফ নয়।"

আর বাক্যব্যয় না করে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার ফোনটা তুললাম। কনিকে বলে দিলাম, "আমি আর তিন মিনিটের মধ্যে তার ঘরে গিয়ে নক করছি।"

কলকাতা ঘুরে বেড়াবার জন্যে প্রসাধন শেষ করে কনি যখন বেরিয়ে এল, তখন তাকে দেখে কে বলবে, ভোরের এই মেয়েটিই রাত্রের কনি দি উয়োম্যান। স্ট্র হ্যাট, ঐ কালো চশমা ও হাঁটু পর্যন্ত টাইট স্কার্ট পরা এই মেয়েটিকে দেখলে মনে হবে যেন কোনো ট্যুরিস্ট ললনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সবেমাত্র চুকিয়ে বাবার সঙ্গে বিশ্ব-ভ্রমণে বেরিয়েছে।

কনির চোখেমুখে এখন ট্যুরিস্টসুলভ চঞ্চলতা। ছেলেমানুষীতে সে যেন পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে; অথচ অচেনা অজানা জায়গার ভীতিও সম্পূর্ণ কাটেনি। এইরকম দুজন আমেরিকান কুমারীর গল্প হবস সায়েবের কাছে শুনেছিলাম। বাবাকে বোম্বাইতে রেখে তারা একা একা ভারতবর্ষ ভ্রমণের জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। দিল্লিতে তারা নাকি মেডেনস হোটেলে উঠেছিল। ট্যুরিস্ট মেজাজে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে সব টাকা খরচ করে ফেলে তারা বাবাকে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল—

"All money spent. Can stay maidens no longer"

কনি একবার নিজের মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে তাকালে। তারপর বললে, "চলো।"

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা চৌরঙ্গীতে এসে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "এবার কোথায় যাবে? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, না লাটসায়েবের বাড়ি?"

কনি ও-সব নামে কোনো আগ্রহই দেখালে না। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এবার যে স্লিপটা বার করে সে আমার হাতে দিলে, তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ। সেই কাগজের টুকরোতে শহরতলীর এক অখ্যাত গলির নাম লেখা আছে।

"এইখানে আপনি যেতে চান?" আমি কনির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

"হ্যাঁ, ওইখানেই যেতে হবে। না হলে, শুধু শুধু কি আমি কলকাতার সৌন্দর্য দেখবার জন্যে বেড়াতে বেরিয়েছি ভাবছো?"

একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। ট্যাক্সিতে চড়ে কনি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করে ব[...] "আমি সেই গ্রেট ম্যানের সঙ্গে দেখা ক[...] চাই—প্রফেসর শিবদাস দেবশর্মা দি [...] যাঁর রিসার্চ সেণ্টার থেকে প্রথম ঘোষণা হয়েছিল, লর্ড কারজন কোনোদিন ইংল[...] প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। জগ[...] লর্ড কিচেনার কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত [...] যিনি কিচেনারকে জানাতে দ্বিধা করে[...] যে, জাহাজডুবিতে তাঁর মৃত্যু হবে।"

আমি কনির মুখের দিকে তাকাল[...] কনি দেখলাম, প্রফেসর শিবদাস দি [...] গৌরবময় ইতিহাস কণ্ঠস্থ করে রেখে[...] এঁর কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণীর : রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি [...] লর্ড ব্রেবোর্নের অকাল মৃত্যু, জার্ম[...] অধঃপতন, গোয়েরিঙের আত্মহত্যা, সু[...] চন্দ্রের ভারত ত্যাগ ও বিদেশিনী [...] এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের স্বাধী[...] লাভ। প্রফেসর শিবদাস কিন্তু এও জান[...] ছিলেন যে, অদূরভবিষ্যতে ভারত ক[...] ওয়েলথের আওতা থেকে মুক্তি পাবে ন[...]

আমি আশ্চর্য হয়ে কনির মুখের দি[...] তাকাতে কনি ব্যাগ থেকে একটা ছাপ[...] কাগজ বার করেছিল। কাগজটা আ[...] দেখানোর ইচ্ছা কনির ছিল না। ক[...] ছাপানো বক্তব্য বিষয়টি চিঠির আকারে [...] এবং চিঠির এক কোণে লেখা প্রাই[...] অ্যাণ্ড কনফিডেন্সিয়াল।

যদি আপনারা ভেবে থাকেন, এই [...] প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেট নিজে লিখ[...]

জানালে খুবই ভুল করেছেন। কারণ চিঠির প্রথম লাইনে লেখা—এই মহাপুরুষ পার্সোনালসিটিতে বিশ্বাস করেন না। এবং অর্থরূপে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে মহাপাপ বলে মনে করেন। মহাশক্তিধারিনী জগজ্জননী কালীর পুজো বাবদ যে প্রণামীর হার নির্ধারিত আছে, তাও আদ্যাশক্তি স্বয়ং স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি সত্যিই প্রচার-লাজুক। নিজের নাম দেননি। আচার্যের গুণমুগ্ধ জনৈক বিদেশী পরিব্রাজক বলে তিনি সই করেছেন। বিশ্ব এবং ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীর সুবিধার্থে তিনি নিজ খরচে এবং গোপনে এই মহাপুরুষের সংবাদ প্রচারের সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

চিঠিটা একদিকে ইংরেজি এবং অন্যদিকে হিন্দীতে ছাপা। সেখানে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেল। জানলাম, প্রফেসর শিবদাসই গোপনে মহাদেব দেশাই মারফত কস্তুরবাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্বামীর একটি ভয়াবহ রিষ্টি আছে। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর চিন্তার কোনো কারণ নেই। স্বামীর কোলে মাথা রেখেই এই সতী রমণী ইহলীলা সংবরণ করতে পারবেন।"

"বিদেশী পর্যটক গভীর দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন, অষ্টম এডোয়ার্ডকে এক্সপ্রেস চিঠি মারফত শিবদাস দি গ্রেট যে কবচ ধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা যদি তিনি ধারণ করতেন, তা হলে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্যভাবে লেখা হতো। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কবচ প্রস্তুতের জন্য যাগ-যজ্ঞে যে তিয়াত্তর টাকা চার আনা খরচ হয়, তার থেকে এক আনা বেশি নেওয়াকে শিবদাস দি গ্রেট গো-মাংস ভক্ষণ পাপের সমান বলে মনে করেন।

এই অভাবনীয় প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল চিঠি কি করে কনির হাতে এসেছিল, তা আমি পরের দিনই জানতে পেরেছিলাম। কনি বললে, "বিলিভ মি, কাল আটটা এই চিঠি আমার ঘরে এসেছিল। তাতে আমার ঘরের নম্বর পর্যন্ত লেখা ছিল।"

হোটেলের এই অদ্ভুত দিকটা আমার জানা ছিল না। গুড়বেড়িয়াকে একটু কড়া ভাষায় জেরা করতেই থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। গুড়বেড়িয়া প্রথমে বলেছিল, "না হুজুর, আমরা কিছু জানি না। কে কাকে কি চিঠি পাঠাচ্ছে, আমরা কী করে জানবো। চিঠি দিতে বললে, আমরা দিয়ে আসি।"

তারপর একটু চেপে ধরতেই জানতে পারলাম, খামে আঁটা এমন কিছু চিঠি বেয়ারাদের কাছে জমা আছে। নতুন কেউ এলেই তাঁর নাম এবং ঘরের নম্বর লিখে একটা খাম পাঠিয়ে দেয়। এই সার্ভিসের বদলে, সেই বিদেশী পর্যটকের বদলে জনৈক বাঙালী পণ্ডিতমশায় মাঝে মাঝে কিছু পয়সা দিয়ে যান। তবে এখন কম্পিটিসনের বাজার। আরও কয়েকজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষিও হোটেলের বেয়ারাদের কাছে চিঠি এবং খাম জমা রেখে যেতে শুরু করেছেন।

কনি তার হাতের ছাপানো চিঠিটা পড়তে পড়তে বললে, "তোমাদের ওয়াণ্ডারফুল কাণ্ট্রি। তোমাদের এইসব সাধু এবং সন্ন্যাসীরা মানুষের যা মঙ্গল করেন, পৃথিবীর কেউ তা পারে না।"

আমি চুপ করে রইলাম। কনি শিবদাস দি গ্রেটের ঠিকানাটা আর একবার উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে, "আর কত-দূর।"

আমি বললাম, "এখন চুপচাপ বসে থাকো। ট্যাক্সি এখনও বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলবে। তারপর সময় হলে তোমাকে আমি বলে দেবো।"

স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে নদীর উপরের পোলটার দিকে কনির নজর পড়েছিল। আমি বললাম, "হাওড়া ব্রীজ। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ক্যাণ্টিলিভার ব্রীজ।"

আমার কথা কনির কানে ঢুকলো না। তার মনে তখন কেবল শিবদাস দি গ্রেট। কনি বললে, "এই যে আমরা কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না করে যাচ্ছি, উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন?"

আমি বললাম, "তিনি তো দ্রষ্টা। আমরা না বললেও তো তিনি সব জানতে পারছেন।"

এই সামান্য কথাটা যেন কনির মাথায় আগে ঢোকেনি। সে উৎফুল্ল হয়ে বললে, "ইয়েস ইয়েস, তিনি তো সবই বুঝতে পারছেন।"

এদিকে ট্যাক্সিওয়ালা সর্দারজী রেগে উঠেছেন। আমরা যেখানে যাচ্ছি, কস্মিন কালে কোনো ট্যাক্সিওয়ালা যে বিনা রিটার্ন ফেয়ারে সেখানে যায় না, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিতে ভুললেন না।

কনি বললে, "ক্যাবম্যান তোমাকে কী বলছে?"

আমি বললাম, "ওয়েদারের প্রশংসা করছে। কলকাতার এমন সুন্দর আবহাওয়া সর্দারজীর মনেও কাব্যরস নিয়ে এসেছে।"

কনি দুঃখ করে বললে, "আমি কিন্তু পাথর হয়ে গিয়েছি। নেচার আমার মনের মধ্যে কিছুতেই আর ঢুকতে পারে না। কে

জানে। হয়তো এইসব দুশ্চিন্তা না থাকলে আমিও কলকাতার এই আবহাওয়ার জন্যে তোমাকে কংগ্র্যাচুলেট করতাম।"

কনি ঘরে ফিরে আবার শিবদাস দি গ্রেটের কথায় চলে এল। বললে, "বোধ হয় আমি ভুল করেছি। আমার নিশ্চয় খালি পায়ে আসা উচিত ছিল। জুতো পরা থাকলে গ্রেটম্যান হয়তো আমার সংগে দেখাই করবেন না।"

আমি বললাম, "দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন হলে জুতো খুলেই ঢুকবে।"

গাড়ি এবার বড় রাস্তা ছেড়ে অলিতে-গলিতে পাক খেতে আরম্ভ করেছে। সর্দারজী একমনে আমাদের গল্পগাছা চলেছেন।

কনি আবার আমার মুখের তাকালে। আমি বললাম, "আর দেরি আমরা প্রফেসর শিবদাস দি গবেষণাগারের প্রায় কাছাকাছি গিয়েছি।"

চড়ুইয়ের সঙ্গে লড়াই

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

॥ ২ ॥

আহমদনগর
১৮ মার্চ : ১৯৪৩

সুহৃদ্বরেষু,

কাল যে-কাহিনী শুরু করেছিলুম, শেষ কোথায়? এসো, আজ ঐ তোতা-কাহিনীরই আর একটা অধ্যায় তোমায় শোনাব। জানি না, মুখোমুখি বসে কাহিনী শুনলে তুমি খুশী হতে, কি ক্লান্ত হতে। তবে আমার দিক থেকে বলতে পারি এ কাহিনী আমাকে পেয়ে বসেছে। কাহিনী বাড়ছে আর বাড়ছে; তোমাকে সে কাহিনী বলার জন্য মনও চঞ্চল হয়ে উঠছে:

খুলনা শুধে বারেদ ও খোশ মাহতাবে
' না-তু ফিকায়েৎ কুনাম হর্-বাবে।

বী রাত, চাঁদ হাসে দূরে গগনে,
কথা মোর কহি তব কানে কানে॥

উপর তলার ওই বন্ধুদের ও আমার মধ্যে লাজ-ভয়-সংকোচের হালকা আবরণ ছিল, দু'দিনেই সেটুকুও খসে পড়ল। বাসা থেকে সোফায় নেমে আসবার পথে ওদের কিনা দু'-একটা বিশ্রাম স্থলেরও প্রয়োজন!

তাই এখন ওরা করে কি, জানো? বাসা ছেড়ে পহেলা মঞ্জিল—পাখার হাতায়, সেখান থেকে আমার শিরোপর, না হয় কাঁধের ওপর নেমে আসে।

বাইরে থেকে উড়ে এসে ওরা সোজা ঘরে ঢুকে পড়ে। ওখান থেকে মুখ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখে। ঘাড় দুলিয়ে সারাটা কামরার আগা-পাশ-তলা একবার আচ্ছা-সে জরিপ করে নেয়। তারপর ফুড়ুত করে উড়েই পাখার হাতায় নেমে আসে। ওখানে ক্ষণেক নেচে-কুঁদে সুরুৎ করে নেমে এসে আমার শিরে পদধূলি দেয়, না হয় চরণ-কমল-স্পর্শে আমার কাঁধটা ধন্য করে।

আহা! আজ কতদিন বাদে কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে:

'লী কো হায় উস্ কে কসদ্-এ পা
মালে,
খাক নুয়িদ সরফরাজি!
ম ধূলি হব,
চলে যেতে দলে যাবে,
সেই সুখে আজ ধূলি হব!'

ওদের অতর্কিত হামলার প্রথম দিন আমি খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বলতে লজ্জা নেই, সেদিন আমি হতচকিত হয়ে সোফার উপর ঢলেই পড়েছিলুম।

বন্ধুরাও হয়তো মনে মনে ভেবেছিল: এ কেমন ব্যাভার!

দু'দিনের মধ্যেই অবশ্য সব দুরস্ত। এর পর আমার শির আর কাঁধ দুই-ই পড়ে থাকে যেন অচল অনড় গাড়ি-বারান্দা।

পাখার হাতল ছেড়ে ওরা সোজা আমার কাঁধে নেমে আসে। কাঁধে বসে বসে ক্ষণেক চোঁ চোঁ করে। তারপর লম্ফ দিয়ে সোফায় নেমে পড়ে। কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, কাঁধ থেকে লাফিয়ে ওরা আমার মাথায় চড়ে বসেছে।

বদায়ুনীর বইয়ে আতশী কান্দাহারীর কবিতার ঐ লাইন দু'টো তুমি হয়তো দেখেছ, যেখানে তিনি বন্ধুর বিচ্ছেদের দরিয়ায় আঁখি-তরী ভাসিয়ে বন্ধুকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে তরী বাইবার জন্যে।

সর-ই শিকম রফ্‌তা রফ্‌তা বে-তু দরিয়া
শুদ, তামাশা-কুন।
বিয়া, দর্-কিশতিয়ে চশ্‌মে নসীন ও সয়র
দরিয়া কুন॥

আমাদের কবি সওদা-ও বলেছেন:

আখোঁ মে দোঁ ওস্ আয়না-রদক্ জগা, ওয়ে
টপকা করোঁহ বস্‌কে ইয়ে ঘর,
নম বহুৎহি হাঁ॥

তবে আমার মনের কথাই যেন বলেছেন শেখ সাদী শিরাজী:

গর্ বর্-সর্ ও চশ্‌মে মন নশিনী,
নাজত বকশম্ কে নাজ নয়নী!

তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে:

বন্ধু আমার চোখের কাজল,
তিলেক মাত্র না দেখিলে মন হয় রে পাগল।

এতদিন ভাবলুম, শ্রাদ্ধ যদি অত দূর গড়ালই তো আরও এক কদম অগ্রসর হতে দোষ কি? পরদিন ভোরবেলা চাউলের ঢাকনাটা ধরতে একটু দেরি করলুম। মেহমানদের বারবার আনাগোনা শুরু হলো। দস্তরখান খালি দেখে ওরা শোরগোল করতে লাগল। আমি তখন চাউলের ঢাকনা হাতের তালুতে রেখে, হাতটা সোফার উপর এলিয়ে দিলুম।

কলন্দরেরই নজর পড়ল সর্বাগ্রে! আনন্দে সে লাফিয়ে উঠল। একটা চক্কর মেরে সোজা আমার হাতের কবজিতে এসে বসল আর বসে বসে টপাটপ দানা খেতে লাগল।

একে 'কলন্দর'—তায় আবার খানার ব্যবস্থা করতে সেদিন দেরি হয়েছিল। রাগে-গোস্বায় সে এমন জোরে জোরে দানা খুঁটতে লাগল যে, তার চঞ্চুর ঘায়ে চাউলের দানা ছিটকে ঢাকনার বাইরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একটা দানা পড়ল আমার দু আঙুলের ফাঁকে। ওটা তুলতে সে এমন জোরে এক ঠোক্কর বসাল যে, সে আর কি বলব!

নেহাত ওদের প্রেমের ফাঁস গলায় পরেছি বলে ওদের সব জোর-জুলুম গা-সহা হয়ে গিয়েছে। তা না হলে হয়তো মুখ

থেকে একটা করুণ চিৎকার বেরিয়ে পড়ত:

'বাঁধিতে তায় কেন সাধ যে মরেছে
ওই আঁখিবাণে!'

এর পর ঢাকনা হাতের মুঠোয় রেখে হাতটা আমি উপরে তুলে ধরলুম। এবার যে চড়ুইটা এল, তার নাম 'মোতি'। মোতির কথা আগে বলিনি বুঝি? রসো। একটু বাদে ওর সাথে তোমার পরিচয় করে দিচ্ছি।

মোতি ঢাকনাটার চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে হলো, সে যেন আঁচ করে নিতে চায় এ দ্বীপটায় অবতরণের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান কোনটা। আবার সে ঘুরে ঢুকল, এবং ঢুকেই সোজা আমার কনুইর উপর নেমে এল।

সেখান থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে হাতের কবজিতে এবং কবজি থেকে একেবারে হাতের তালুতে গিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সে কাঁটা চামচের সদ্ব্যবহার শুরু করল। চাউলের কয়টা দানা ঢাকনার বাইরে ছিটকে পড়তেই সেখানেও সে কাঁটা চালিয়ে দিল। দেখ তো, দরাজ-দস্তি দেখাতে গিয়ে আমার এ কেমন ভোগান্তি! কিন্তু কি আর করি, বলো?

দেখে দেখে রোখ আমার আরো বেড়ে গেল। ভাবলুম, নাচতে নেমে ঘোমটার আড়াল দেওয়া কেন? আমার হাতের তালুটা তো রয়েছে। এরপর আমি হতভাগা ওই ঢাকনাটা ইয়ার বন্ধুদের সামনে ধরে বসেছি কেন?

পরদিন হাতের তেলোয় চাউল রেখে হাতটা সোফার উপর আলতোভাবে বিছিয়ে দিলুম। মোতিই এল সবার আগে। ঘাড় বাগিয়ে সে দেখতে লাগল—আজ ঢাকনা নাই কেন?

* * *

চড়ুইয়ের এই কলোনীতে মোতিই হচ্ছে সবচেয়ে খুবসুরত।

আজকাল দেশে দেশে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা আকসর হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত মেয়েকে এক-একটা দেশের "বৎসরের সেরা সুন্দরী" খেতাব দেওয়া হয়। যেমন, কেউ হয় মিস ইংলণ্ড, কেউ বা মাদমোয়াজেল ফ্রান্স ইত্যাদি। যেন একটি সুন্দর মুখাবয়বে সমগ্র দেশ ও জাতির সৌন্দর্য বাসা বেঁধেছে।

এখানে এই কলোনীতে যদি এমনতরো সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে মোতিই পাবে সেরা সুন্দরী, মানে—"মাদাম কেল্লা আহমদনগর" খেতাব।

* * *

ছুরির ফলার মতো তার ছিমছাম তনু-দেহ, বঙ্কিম গ্রীবা, নির্ভাজ সরু লেজ, গোলগাল আয়ত চোখ দুটো না-বলা কথার আবেশে যেন সদা ঢলঢল। দানা খেতে সে আসে। এক-একটা দানা সে মুখে তুলে নেয় আর আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে। দুজনার কারো মুখে রা নেই। অথচ

রবে দু'জনের মাঝে কত না কথা হয়!
আমার চোখের ভাষা বোঝে, আমিও তার
খের ভাষা পড়তে পারি।
রশ্ মঃ গরমে সওয়ালস্ত,
লব ম-কুন-রন্জা
ইহ্তিয়াজ ব পুরছিদনে জবানি নিস্ত!
নে নয়ন দিয়ে সারা দিন বসে র'ব,
নর গোপন কথা নয়নসলিলে ক'ব।

নিঃশঙ্কচিত্তে সে আমার আঙ্গুলের ডগায়
স তালু থেকে চাউল ঠুকরে ঠুকরে তুলে
য়। তার ঠোঁট না, যেন চাক্কুর ফলা! এক-
ক ঠোক্করে হাতের তালু এপার ওপার
র দিতে পারে! তবে ঠোক্কর বসাতে গিয়ে
কেমন যেন থেমে থেমে যায়। দানা
রে তুলতে গিয়ে বারবার সে আমার
খের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে। যেন সে
তে চায় ঃ বন্ধু, ব্যথা পাওনি তো?
বলোঃ এর জবাব কি?
ব্যথা পাই কি পাই না, সে বলতে পারি
। তবে তার ধারালো চঞ্চুর এক এক ঘায়ে
তের তালুটা যেন জখম হয়ে যায়।

* * *

এ কলোনীর সব বাসিন্দার কথা তো
লাদাভাবে বলা যায় না। তবে বিশিষ্ট
একজনার কথা অবশ্যই বলতে হয়।
লন্দর আর মৌচির সাথে তোমার পরিচয়
য়েছেই। এবার মোল্লা আর সুফীর কথা
ক্ষেপে বয়ান করছি।
একটা চড়ুই দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর
রি কাটছাঁট এর স্বভাব! মুখে ফড়ফড়ানি
দম লেগেই আছে। সব সময় ঘাড় তেড়া
র সিনা টান করে চলে। সামনে কেউ
ড়ে তো ভয়ে দু' গজ সরে দাঁড়ায়। এর
মনে এগোয় কার সাধ্যি! দু' চারটে
ওজোয়ান চড়ুই এর মোকাবেলা করতে
ষ্টা না করেছে এমন নয়, তবে পয়লা
ক্কায়ই সব চিৎপটাং।
বাইরে, ময়দানে যখন কাকদের মেলা বসে,
তখন রাগে-গোস্বায় গা-ঝাড়া দিয়ে
ইনে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে ওদিকে
গিয়ে যায় এবং লম্ফ দিয়ে কোন উঁচু
য়গাতে চড়ে চোঁ চোঁ করতে থাকে। সে
বস্থায় ওকে দেখলেই কা'আনীর হাসির
বিতার জামে মসজিদে বাগ্মীপ্রবরের
হারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে
ঠে ঃ

ী ওয়ায়েজেক আমাদ দর্ মসজিদ জামে,
বর্ফে হমা জামা সপেদ অজ-পাতা-সর
ৎমোস ব-সুয়ে চীপ ও চশ্মোস
ব-সুয়ে রাস্ত;
। খোদ্ কে সালামে কুনাদ আজ
মুন্এম ও মজতর।
। আ সামান কে খরামদ ব-রছন
মর্দে রছন-বাজ,
হ্স্তে খরামিদে ও মউজু ও মুআক্কর।

ফারক্ না সুদা খল্ক জে তসলিম ও
তশাহুদ
বর্ জিশ্ ত চু' বুজিনা ও বে-নেশাস্ত
ব-মিম্বর।
জামে মসজিদে এক আসে বাগ্মীবর,
শ্বেতশুভ্র জামা জোব্বা পাগড়ি শিরোপর।
ডানে বামে চারদিকে ইতি উতি চায়,
ছোট বড় সবে যাহে সালাম জানায়।
হেলিয়া দুলিয়া ধীরে চলে বাগ্মীবর,
তারের উপরে যথা নাচে বাজীকর।
তসবিহ্ তশ্হুদ সদা করে তিলাওৎ
লম্ফ দিয়ে মিম্বরেতে চড়ে কপিবৎ।
ইত্যাদি।

অতঃপর তুমিই বলো, এর নাম মোল্লা না
রেখে আর কি রাখা যায়! এর ঠিক
বিপরীত স্বভাবের আর একটা চড়ুই।
যখনই চাও, দেখবে কিসের না কিসের
চিন্তায় তন্ময় তদ্গত চুপচাপ বসে রয়েছে।
বড়জোর এর মুখ থেকে মাঝে মাঝে একটা
অস্ফুট আওয়াজ বেরোয়। চিন্তাভারে নত-
শির মানুষ যেমন সময় সময় মাথা তুলে চায়
আর হুম করে উঠে, ঠিক তেমনি।

দলের অন্যান্য চড়ুই ওর পেছনে লাগে।
দুর্বল পেয়ে ওকে নানাভাবে জুলুম করে।
কিন্তু তাতেও ওর রা নেই। তবে ওর
চোখের দিকে চাইলে মনে হবে যেন ওরা
বলছে ঃ
তু জবানে ফাহম না
ব'রনা খামুশী সোখনস্ত।
হে মৌন, না যদি কও, নাই কহিলে কথা:
বক্ষ ভরি বইব আমি তোমার নীরবতা।
আমি ওর নাম দিয়েছি সুফী। নামটা
কিন্তু ওকে খুব মানিয়েছে, যেন গায়ে রেখে
সেলাই করা একটা জামা।
ভোরবেলা এই কলোনীর বাসিন্দারা
বাইরে বারান্দা আর ময়দানে ভিড় জমায়।
তখন এক ভারি মজার দৃশ্যের অবতারণা
হয়। ফুলের টবে চড়ে কেউ নর্তন কুর্দন
শুরু করে, কেউ বা ক্রোটন গাছের ডালে
ঝোলাঝুলি খেলতে থাকে।
এক জোড়া চড়ুই গোছল করবে বলে, ফুল
গাছে জল দেওয়া কখন শেষ হবে, সে
আশায় বসে থাকে। জল ঢালা শেষ হতেই
ওরা হাউজে নেমে জোরে জোরে গায়ের

পালক খোলা-বন্ধ করতে থাকে। আর এক দম্পতি জলের আশায় বসে না থেকে "ফাতাইয়াম্মামো ছইদান তইয়েবা" তেলাওৎ করে মাটিতেই নাহান শুরু করে। ঠুকরে ঠুকরে ওরা বুক ডোবাবার মতো মাটি খুঁড়ে নেয়। তারপর গর্তে গা ডুবিয়ে এমন জোরে পর-পাখ ঝাপটাতে থাকে যে, তাতে ধুলোর ঝড় বয়ে যায়।

মোল্লা হয়তো তখন ওর স্বভাবসুলভ কায়দায় কোন বিষয় মীমাংসার জন্যে কারো সাথে কুস্তি লড়তে শুরু করে। ওদের লড়াই দেখবার মতো। লড়াইও করে ওরা হাতিয়ার বিনে। তবে ঠোঁট দিয়েই ওরা হাতিয়ারের অভাব ঠিক পুষিয়ে নেয়।

রাগে-গোস্বায় ফেটে পড়ে এক অপরকে এমনভাবে ঠোকরাতে থাকে যেন কারো কোন খাতির নেই। শূন্যে লড়াই করে করে একে অপরকে এমন ভাবে জড়িয়ে জাপটিয়ে ধরে যে, কখন কোথায় গিয়ে পড়বে, সেদিকে কোন হুঁশ থাকে না।

কয়বার ওরা আমার মাথায়ও পড়েছে। একবার আমার কোলে পড়তেই আমি দু' হাতে দুটোকে ধরে ফেললুম। সারাটা দেহ ওদের তখন আমার মুঠোর ভিতর। শুধু গলাটা বাইরে। বুক ধুকধুক করছে যেন 'এই ফাটে, এই ফাটে' অবস্থা। অথচ কী তেজ এদের! সে অবস্থায়ও একে অন্যকে ঠোকরাবার চেষ্টায় কসুর করছে না। আমার হাতের মুঠো খুলে দিতেই ওরা [illegible]থার হাতায় গিয়ে বসে এবং সেখানে বসে বসে চোঁ চোঁ করে এক অপরকে শাসাতে থাকেঃ

ভাগ্য ভাল যে, মানে মানে ফিরতে পেরেছিস!

আজ কয়দিন যাবৎ মোতির বাসায় ছোট্ট বাচ্চার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এখন সে দানা খেতে নামে আর একটা দানা মুখে পুরেই বাসার দিকে ছুট দেয়। বাচ্চাটা ওকে দেখেই চিঁ চিঁ শুরু করে। দু'-চার সেকেন্ড পর মোতি ফের আসে এবং একটা দানা মুখে পুরে বাসায় ফিরে যায়। একবার আমি গুনে দেখলাম, এক মিনিটে ও সাত-বার এল গেল।

* * *

পক্ষী-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের বই-পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, চড়ুই পাখি দিনে আড়াই শ' থেকে তিন শ' বার বাচ্চাদের খাবার খাওয়ায়। একদিনে যে খাবার বাচ্চাদের মুখে তুলে দেয়, সে যদি এক সাথে বাচ্চার সামনে জড়ো করা হয়, তা হলে দেখা যাবে খাবারের স্তূপ আকারে বাচ্চাটার দেহের আকারের চেয়ে ছোট নয় কোন মতেই। পাখির বাচ্চাদের হজম-শক্তি এত বেশী যে, খাবার পেটে যেতেই হজম শুরু হয়। এই কারণেই চতুষ্পদ জানোয়ারের বাচ্চার তুলনায় পাখির বাচ্চার দেহ ত্বরিৎ বৃদ্ধি পায় এবং অল্প দিনের ভিতর এরা সাবালক হয়ে উঠে। মোতির আনাগোনা দেখে আমার বিশ্বাস হলোঃ পণ্ডিতগণ যথার্থই বলেছেন।

দিনে দিনে বাচ্চার 'পর-পালক' বড় হতে থাকে আর অদৃশ্য ফেরেশতা এসে মার কানে সুসংবাদ দিতে থাকেঃ ওগো তোম বাচ্চা বড় হলো, এবার ওকে উড়তে শেখাও মোতির কানেও বুঝি মন্ত্র গুঞ্জরন শুরু হলো।

একদিন ভোরে দেখি, মোতি বাসা ছেড়ে 'উড়া' দিল তো ওর সাথে সাথে ছো একটা বাচ্চাও উড়বার চেষ্টা করেই নীচে পড়ে গেল। মোতি বারবার বাচ্চাটার কাছে যায় আর বাচ্চাটাকে ওড়বার ইশারা করে নিজেই উড়তে থাকে। বাচ্চার কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই। পাখা ঝুলিয়ে, চোখ বন্ধ করে নিঃসাড় নিশ্চল পড়েই থাকে। আমি উঠে গিয়ে বাচ্চাটাকে দেখি। মনে হলো, ওর পাখা ওড়বার মত তত শক্ত হয়ে উঠেনি। নীচে পড়ে গিয়ে বেচারা এমন শক্ত চোট খেয়েছে যে, ও আর এখন এপাশ-ওপাশ করতে পারছে না। ওকে তুলে আমি কার্পেটের উপর বসিয়ে দিলুম।

মোতি চাউলের দানা খুঁটে খুঁটে ওর মুখে তুলে দেয়। বাচ্চাটা মুখ খুলে, একটানা চিঁ চিঁ আওয়াজ করে দানা মুখে পুরেই দম মেরে, চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। সারাটা দিন এভাবেই গেল। পরের দিনটাও।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মা ওকে ওড়বার ইশারা করতেই থাকে। কিন্তু মৃত্যুর কালো ছায়ায় ও এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, ওর তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়

আমার মনে হলোঃ বাচ্চাটা বাঁচবে
দিন ভোরবেলা এক আশ্চর্য দৃশ্য
চোখে পড়ে। এক ফালি রোদ তির্যক-
ভিতর বহু দূর এসে পড়েছিল।
ঃ বাচ্চাটা রোদে এসে দাঁড়িয়েছে।
পালক' তেমনি ঝুলে পড়া, পা মোড়া,
আগের মতই বন্ধ।

দোখ ও চোখ মেলে পিটপিট্
চাইছে গলা বাড়িয়ে বাইরে ময়দানের
তাকাচ্ছে। 'পর-পালক' ঝেড়ে খুলে-
নিচ্ছে। এর পর সহসা লম্ফ দিয়ে ও
সামনে এগুলে এবং সাথে সাথে 'পর'
তীরের মত উড়ে বাইরে ময়দানে
ক পড়ল এবং সেখান থেকে হাওয়ার
অসীম দিগন্তের পথে আমার দৃষ্টির
লের বাইরে চলে গেল।

এ কী অসম্ভব ব্যাপার! যা দেখলুম,
তে মনে সন্দেহ হলোঃ এ কি ওই অসহায়
ড়ুই বাচ্চাটা, না অন্য কোন পাখি! কিন্তু
নজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে
পারি নে!

গত দু দিন যাবৎ বাচ্চাটা এমন অসহায়
অবস্থায় পড়ে ছিল যে, মা এত করে ওকে
উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মাটি
ছেড়ে ও এক ইঞ্চিও উড়তে পারেনি। আর
আজ অসীমের আহ্বানে ওর অন্তরে এমন
কী বিপ্লব ঘটে গেল যে, প্রথম উড়নেই
ও কিনা সব বাধা বন্ধন পেছনে ফেলে
অন্তহীন আকাশের নিঃসীম নীলিমায়
মলিয়ে গেল!

এ অদ্ভুতপূর্ব দৃশ্য দেখে বে-এখতিয়ার
এমন জোরে দু লাইন কবিতা মুখ থেকে
ছিটকে পড়ল যে, তাতে আশপাশের সবাই
চমকে উঠলঃ

ময়রুয়ে ইশ্ক্ দিন্ কে দরুই দাশ্তে বে-কিরান,
নামে না রফ্তাএম ব-পায়ইয়া রসিদাএম।
দেশের মরু, ক্লান্ত চরণ চায় না যে পথ চলি,
প্রেমের ডাকে উড়ে চলে যাই, সব বাধা পায়ে দলি!

আসলে ও এক মামুলী ঘটনা মাত্র।
জীবনের চলার পথে এ হেন তামাশা
আমাদের চোখের সামনে হর-হামেশা ঘটে
অথচ আমরা তা দেখেও দেখি না। ওই
চড়ুইয়ের বাচ্চাটার ওড়বার শক্তি পুরোপুরি
বিকশিত হয়েছিল। স্বীয় নিভৃত নীড়ের
ক্ষুদ্র সীমা ছেড়ে অন্তহীন আকাশের নীচে
অসীমের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়েও ছিল।
কিন্তু ওর আত্ম-বোধ তখনও ছিল সুপ্ত,
আপন সত্তা সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ
অচেতন।

মা ওকে বারবার ইশারা করেছে, হাওয়া
এসে বারবার ওর পালক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গেছে, চল-চঞ্চল জীবনের কল-কোলাহল
চারদিক থেকে ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

কিন্তু সব বে-কার, বে-আসর! বাইরের
কোন আবেগ-উত্তেজনা ওর অন্তরের
নির্বাপিত অগ্নিশিখা উদ্দীপিত করে
তুলতে পারে নি।

কলীম, সেকোয়া জে-তওফিক চন্দ?
সরমাত বাদ
তু চুঁ ব-রাহ্ না নিহ পায়ে, রহনুমা চে
কুনাদ?

হে কলীম,
বৃথা নিন্দ অদৃষ্টেরে, লজ্জায় মাথা কর নত,
কি করিবে রহ্নুমা, তুমি যদি না চলিবে
পথ!

আজ সহসা যেই ওর সুপ্ত আত্ম-চেতনা
জেগে উঠল, আত্মোপলব্ধির পরম ক্ষণে
যেই সে বুঝতে পারলঃ 'আমি মুক্তপক্ষ
নভোচারী বিহঙ্গম, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে
চলা আমার বিধিলিপি', অমনি ওর
মৃতকল্প, নিরুত্তাপ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেগে
উঠল নবজীবনের স্পন্দন।

দেহ-যষ্টি সোজা হয়ে উঠল, দেহভার
বহনে অক্ষম, কম্পিত পদযুগল সহসাই
দৃপ্ত হয়ে উঠল, জীবনের স্পর্শ-লেশহীন
ঝুলে-পড়া 'পর-পালক' হাওয়ায় ফরফর
করে উঠল। আকাশে ওড়বার দুরন্ত
আকাঙ্ক্ষা বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় নিমেষে ওর
সারা দেহে এক পুলকশিহরন জাগিয়ে
তুলল। আপন সত্তায় জেগে উঠে ও দেখতে
পেল ওর দুঃখের নিশি ভোর হয়েছে।
সব বাধা-বন্ধন টুটে গেছে। অন্তহীন
আকাশের বিপুল বিস্তার ওকে হাতছানি
দিয়ে ডাকছে। সে আহ্বানে, দুরন্ত বাজ-
পাখির ন্যায় ও আজ আকাশের ঠিকানা
খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

বলা যায়ঃ এ যেন শক্তিহীনের শক্তির
উদ্বোধন। সুষুপ্তি থেকে জাগরণ!
মৃত্যুর দেশে জীবনের জয়গান!—

যখন ঘটে, চক্ষের নিমেষেই এ বিপ্লব ঘটে
যায়!

একটু ভেবে দেখো। নিমেষের ওই ক্ষুদ্র
ঘটনার মাঝে জীবনজিজ্ঞাসারও একটা
সদুত্তর খুঁজে পাবে।

তী মি শাওয়াদ ইং-রহ্ ন-দরখ্ শিদনে
বরকী
মা বে-খবর আঁ, মুনতাযির শাম্মা ও
চিরাগম॥
বিজলী আলোর রোশনিতে ভরা পথ, খবর
রাখি না, তাই।
মৃৎপ্রদীপ কবে, কোথা পাব, সে আশায় বৃথা
দিন গোঁয়াই॥

বল তো! জীবন-কারায় নবীন বন্দী ওই
চড়ুইবাচ্চাটার কিসের অভাব ছিল?
আকাশে উড়ে বেড়াবার সাজ-সরঞ্জাম প্রকৃতি
ওর জন্যে পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করে রেখেছিল।
মা-ও দম-বদম ওকে ওড়বার জন্যে ইশারা
করেছিল। কিন্তু সব বে-কার। যতক্ষণ
না ও নিজে নিজেকে চিনতে পারল, ওর
'পর-পালক' সব বে-আসর পড়েই রইল।

ঠিক এমনি অবস্থা মানুষেরও। যতক্ষণ
না সে নিজে নিজেকে চিনতে পারে, বাইরের
কোন কল-কোলাহল তাকে উদ্দীপিত করে
তুলতে পারে না। কিন্তু যখনই সে আত্ম-
সত্তা ফিরে পায়, আত্মচেতনায় জেগে উঠে
যেই সে ঠিক বুঝতে পারে ঃ সে কি, আর
কি বা তার পরিচয়, অমনি চক্ষের নিমেষে
এক মহা-বিপ্লব ঘটে যায়। মাটির বন্ধন
ছেড়ে স্বীয় চেতনার আলোকে সে তখন
মহাকাশের ঠিকানা খুঁজে বেড়ায়।

এই মহাসত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে মরমী
কবি হাফিজ বলেছেন ঃ

চে গোয়েমত কে ব-ময়খানা দোস মস্তে খরাব,
সরোশে আ'লেমে গয়েবম চে মুজদাহা দাদাস্ত
কে আয় বুলন্দ নজর, শাহবাজ সিদরা নাশন!
নশিমনে তু না ইঁ কুন্‌জে মেহনত আবাদাস্ত।

তু রা আজ কংগে'রহে আ'রশ মী জানাদ সফীর,
না দানামত কে দ্‌রইঁ দমগাহ্‌ চে উফ্‌তাদাস্ত॥
কাল রাতে নেশাতুর পড়েছিনু পানিশালা মাঝে,
অলক্ষ্যে ফেরেশতা এসে দিল মোরে সে কি সুখবরঃ

রে দুরন্ত শাহবাজ! সিদ্‌রা চূড়ে বাঁধা যার ঘর,
দুঃখ-ভরা ক্ষুদ্র ওই গৃহকোণে তোরে নাহি সাজে।
নন্দনের দ্বার হ'তে কে তোরে ডাকিছে বারবারঃ
মিছে কেন ধরা দিলি মায়াফাঁদে হেথা বৃথা কাজে।

[সমাপ্ত]

প্যারিসের চটকদার শিল্পী ক্লাইন

সলিল ঘোষ

প্যারিসের চিত্রকলার জগতে যে হিড়িক-জ তরুণ শিল্পী একটার পর একটা চমক লাগিয়ে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছেন, এই ইভস্ ক্লাইন-এর নাম আমি আগে এখনও শুনিনই নি। প্যারিসের আধুনিক চিত্রজগতের কথা বলতে গেলে বিগত ষাট বছর ধরে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিত্রকলায় যিনি কর্ণধাররূপে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছেন, অশীতিপর চির-তরুণ সেই পিকাশোর নামই সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। আমাদের দেশে প্যারিস ও তার আধুনিক চিত্রকলার শেষ কথা এখনও পর্যন্ত পিকাশো। ভারতীয়দের কথায় কথায় পিকাশোর এই • উল্লেখে বহু ফরাসীকে আশ্চর্যান্বিত হতে দেখেছি। কারণ প্যারিসের চিত্রজগতে পিকাশো আজ আর কোন force নয়, তিনি এখন আর আগের পানি পাচ্ছেন না। আধুনিক চিত্রকলার grand old man রূপে সমীহ ও সম্মান পেয়ে থাকেন। সেখানকার চিত্রজগৎ আজ আর পিকাশোকে নিয়ে মাতামাতি করে না, যতটা করে অন্য দেশে। শুধু মাঝে মাঝে তাঁর বিষয় ব্যক্তিগত খবর সব প্রকাশিত হয়। যথা বুড়ো বয়সে কাকে বিবাহ করলেন, বিভিন্ন পক্ষের পিকাশো-সন্তানরা কি করছে ইত্যাদি। সেখানে আজ আরও সব নতুন শিল্পী আলোড়ন তুলছে, ম্যাথিউ, দু বুফো, বেরনার বুফো প্রভৃতি আরও অনেকে। কিন্তু এঁদের মধ্যেও বয়সে বেচাইতে ছোট ক্লাইন-এর মত হইচই আপাতত আর কেউ শুরু করতে পারেনি।

ক্লাইনের কাছে নিয়ে যাবার আগে আমার ফরাসী বন্ধু ফ্রেদেরিক ওর কথা আমাকে এমনভাবে বলেছিল যে, আমি ভেবেছিলাম প্যারিসের ৫০।৬০ হাজার শিল্পীর অন্যতম কেউ হবেও বা। "ক্লাইনের কাছে আমার কাজ আছে, তুমিও চল আলাপ করবে, ওর বেশ এলেম আছে।" সিলেকত্-এর কাছেই ওর বাসস্থান। আশেপাশের সব বাড়িগুলি দেখে মনে হল, এ অঞ্চলের শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। ক্লাইনের ফ্ল্যাটে আওয়াজ দেবার পর, বেশ কিছুক্ষণ দরজার গোড়ায় অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে ক্লাইন হাত মুছতে মুছতে দরজা খুলল। রঙ গোলাচ্ছিল। বেশ সুন্দর চেহারা, বয়স অল্প, তিরিশের নীচে বলেই মনে হয়। চোখেমুখে গোবেচারা ভাব, কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে পেটে পেটে যে এত বুদ্ধি, পরে তা জেনে হতভম্ব হয়েছিলাম। ফ্রেদেরিক ইঁন্দিয়েন আর্ট্ ক্রিতিক্ বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিল। বিরাট বড় ফ্ল্যাট, প্রকাণ্ড হল ঘর, কোন আসবাবপত্র নেই। পুরোটা মেঝে ছাই-রঙের মূল্যবান কার্পেট দিয়ে ঢাকা, তলায় "ফোম-রাবার" দেওয়া। ভেতরে ঢোকার দরজার পাশের বিরাট দেয়ালে ঝুলছে একটি বড় তথাকথিত ছবি, ক্লাইন যার জন্য বিখ্যাত। শুধু নীল রঙের চৌকোনো একটি বিরাট ক্যানভাস। পাশে রয়েছে ওর বন্ধু ভাস্কর জাঁ টিংলী-র করা একটি মূর্তি। লোহালক্কড়, নানাপ্রকার ধাতুর অংশ দিয়ে তৈরী, এমনকি বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন অংশ সচল করাও চলে। যন্ত্রপাতির নানারকম অংশ দিয়ে মূর্তি গড়ায় টিংলী খ্যাতি অর্জন করেছেন। অপর-দিকে দেয়ালের সামনে মেঝেটা একটু উঁচু করে বাঁধানো বেদীর মত, পাশে ফায়ার-প্লেস। আর কিছুই নেই এই হলে। পাশে দু-তিনটি ঘর রয়েছে। তারই একটা ঘরে দেখলাম মেঝের উপর কাগজে-রাখা একগাদা গুঁড়ো নীল রঙ, যা "ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাইন ব্লু" বা "আই-কে-বি" নামে পরিচিত হয়েছে সর্বত্র। এর আগে যেসব ফরাসী শিল্পীর এতেলিয়রে গিয়েছি, কারোরই এরকম এলাহি বাসস্থান নেই। ফ্রেদেরিক জানালো যে, এই ফ্ল্যাটটা ক্লাইনের নিজস্ব, কয়েক মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক দিয়ে কেনা। ক্লাইন এখন খুবই অবস্থাপন্ন। প্যারিসের এখনকার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র

পিকাশোর স্কেচ। প্যারিসের চিত্রজগতে এঁর প্রভাব আজ আর তেমন নেই, তরুণ শিল্পীরা আসর জাঁকিয়েছে

জাপানী যুযুৎসুর পোশাকে শিল্পী ইভ্‌স্‌ ক্লাইন

বেরনার ব্যুফাই খুব অল্প বয়সে প্রচুর বিত্তশালী হয়েছেন, যাঁর তুলনা মেলাই ভার। বিরাট স্যাতো, নানারকমের গাড়ির মালিক। এখনও অতটা না হলেও ক্লাইন শীগ্‌গিরের হয়ত ওকেও ছাড়িয়ে যাবে।
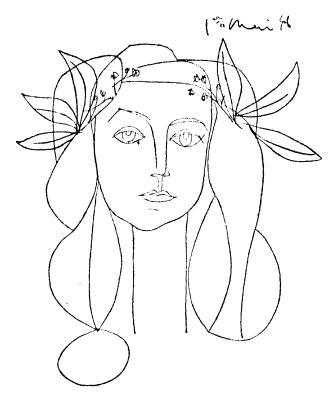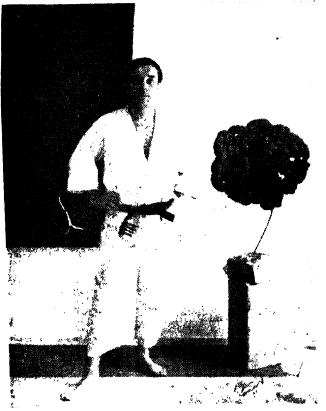
মেঝের উপর কার্পেটে বসে ক্লাইনের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। অল্পস্বল্প ইংরাজী জানে। অন্যান্য শিল্পীদের মতই ক্লাইনও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে ওঁর নিজস্ব মতামত অনেক কিছুই বললেন, সব শুনলাম। কিছুকাল আগে লণ্ডনে ওঁর চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। ইংলণ্ডের চিত্র-জগতেও তুমুল বিতণ্ডা এনেছিল ওই প্রদর্শনী। সে-সবের কাটিং, প্রদর্শনীর ছবি ইত্যাদি সহ একটা খাতাও এনে দিল আমাকে দেখতে। এর মধ্যে নিজেই কফি বানিয়ে আনল আমাদের জন্য। ফ্রেদেরিকের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলাপ-আলোচনা শুরু করল, ক্লাইন-পরিকল্পিত পুস্তক সম্বন্ধে। চিত্রকলার বিষয়ে ক্লাইন তাঁর ধারণা ও মত পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চান। নিজে লেখক নন, ভাষায় তেমন দখল নেই, তাই ফ্রেদেরিকের সাহায্য তিনি চান। ফ্রেদেরিক ওঁর লেখা শুধরে বই প্রকাশে ও সম্পাদনায় সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। আমিও এই অবসরে বিখ্যাত সমালোচকদের ওঁর ছবি সম্বন্ধে মন্তব্য পড়ে বেশ বুঝতে পারলাম, ইউরোপের মডার্ন আর্টের হালচাল এবং সেখানে রাতারাতি বিখ্যাত হতে হলে কি করা উচিত।

ক্লাইনের বিষয়, তাঁর চিত্রকলা ও মতামত সম্বন্ধে ভালভাবে জানার পর ওঁর অনেক কিছুই মেনে নিতে দ্বিধা হলেও আমি ওঁর একজন গুণগ্রাহী হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল —"ক্ষতি কি—এটাই বা ছবি হবে না কেন?"

ক্লাইন-এর ছবি হল, নানারকমের আকৃতির চতুষ্কোণ ক্যানভাস, সম্পূর্ণ নীল-রঙের মনোক্রোম। কিছু নেই তার মধ্যে। না আছে কোনো ডিজাইন, না আছে কোনো আঁকিবুকি। শুধু আছে ক্যানভাস ভর্তি নীল রঙ। অক্সফোর্ড ব্লু, কিন্তু ক্লাইন তার নামকরণ করেছেন "আই কে বি"। লণ্ডনের প্রদর্শনীতে এই রকম নানা আকৃতির ৩০টি নীল চতুষ্কোণ ছিল এবং তা চড়া দামে বিক্রিও হয়। ক্লাইন বলেন যে, প্রত্যেক রঙের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ছবিতে একসঙ্গে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে কোন প্রতিকৃতি, ফর্ম, ছবি ইত্যাদি আঁকার কোন মানে হয় না। তাতে রঙের নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যই তিনি এই একরঙা নীল চতুষ্কোণ তৈরি করছেন। তিনি বলেন, ওই নীল রঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখনও তা নিজের কল্পনা অনুযায়ী লাল বা হলদে রঙে পরিণত হয়ে যায়। এই নীল চৌকোনো ক্যানভাসে কোনপ্রকার অঙ্কন নেই। মন্দ্রিয়ান লাল, নীল, হলদে তিনটি মৌলিক রঙের চতুষ্কোণ দিয়ে যে ছবি করতেন, তারই আরেক ধাপ এগিয়ে ক্লাইন শুধু নীল চতুষ্কোণই গ্রহণ করেছেন। এমনকি মন্দ্রিয়ানের কালো লাইন দেওয়া বর্ডার বাদ দিয়ে। ক্লাইনের প্রথমদিকের কোন কোন ছবির নীল ক্যানভাসে একই রঙের নীলে চোবানো প্রবাল ধরনের বস্তু ক্যানভাসের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে দিতেন, স্পেসিং জাপানী ধরনে করা। জাপানী বাগানে মাটির উপরে ওরা যেভাবে অনেক সময় চলাফেরা করার জন্য পাথর বসায়, সেই ধরনে। এটা বোধ হয় ক্লাইন-এর জাপান বাসের প্রভাব। ক্লাইনের ছবি হল, বড় বড় চারকোনা নীল রঙের ক্যানভাস, কোনো কোনো ছবিতে নীল রঙে চোবানো প্রবাল জাপানী প্রথায় সেট করা। সাধারণ প্রথায় তুলি দিয়ে রঙ লাগানোতে অযথা সময় নষ্ট হয় বলে বড় রোলার দিয়ে ঘষে ঘষে ক্লাইন ক্যানভাসে রঙ লাগান। নিজস্ব পদ্ধতিতে,

রল বস্তুর সঙ্গে সে রং তিনি নিজের াতেই পুরে নেন। এই হল প্যারিসের াধুনিকতম আর্টের চরম নিদর্শন। "মডার্ন ার্টের ধোঁকাবাজির চরম ও শেষ নমুনা" লে একদল সমালোচক ক্লাইনের ছবিকে ল্লেখ করেছেন। আবার একদল বলেছেন Not at all a hoax—only logic reduced to absurd."

ভয়েস অব সাইলেন্স"-এর লেখক আঁদ্রে ালরো'র মত বিদগ্ধ কলারসিক পূর্ণ সমর্থন ানিয়েছেন তরুণ শিল্পী ক্লাইনকে।

যে যাই বলুক, ক্লাইন তা নিয়ে আজ ার মাথা ঘামান না বা এখন ওসব থোড়াই রোয়া করেন। তিনি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ারিসে তাঁর উপযুক্ত ছবির যখন প্রথম দর্শনী হয়, উদ্বোধনের দিন প্যারিসের াকাশে গুণগ্রাহীরা হাজার হাজার নীল বলুন ওড়ায়। ক্লাইন নিজেও চিত্রশিল্প ও চার-শিল্প, দুই ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিচক্ষণ শল্পী। ফরাসী সরকারের বিশ্ববিখ্যাত ন্টেলেকচুয়াল মন্ত্রী আঁদ্রে মালরো এই দর্শনী উপলক্ষে সরকারী তরফ থেকে এক বশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। শুধু একটি নীল চতুষ্কোণ ডাকটিকিটের আকারে ার মধ্যে দেশের নাম, টিকিটের দাম পর্যন্ত লখা ছিল না। চারিধার শুধু পারফোরেট করা। ডাকঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে সব টিকিট বক্রি হয়ে যায়। এমনই হিড়িক তোলে ওঁর প্রদর্শনী। এর পর পশ্চিম জার্মানীতে ইউরোপের মধ্যে প্রায় সর্ববৃহৎ অতি আধুনিক একটি থিয়েটার গৃহের এক বিরাট দেয়ালে ক্লাইন অলঙ্করণের কাজ পায়। থিয়েটারটির নাম—"থিয়েটার বাউটেন ডার স্টাড্ট্ গেলসেনকির্শেন"। বিভিন্ন দেশের স্থপতি ও শিল্পী এই থিয়েটার নির্মাণে জড়িত ছিলেন। যেমন স্থপতি ওয়ার্নার রুহ্নাউ, প্যারিসের ভাস্কর জাঁ টিংলী, ইংলন্ডের রবার্ট আডামস্ প্রভৃতি আরও অনেকে। থিয়েটার গৃহের বিরাট দেয়ালে ক্লাইন প্রবাল জাতীয় জিনিস বসিয়ে এবড়ো-খেবড়ো এক মুরাল অলঙ্করণ করেন। ক্লাইনের এই কাজে অভিনবত্ব আছে, দেখতেও খারাপ লাগে না।

এককালে ক্লাইন-এর পেশা ছিল আয়র্ল্যান্ডে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে দৌড়তে শেখানো ও পরে জাপানে পেশাদার কুস্তিগীররূপে জাপানী যুযুৎসু করা। প্যারিসে "যুদো" শিক্ষকরূপে ক্লাইন-এর নামও আছে। এখনও মাঝে মাঝে বক্তৃতাসহ 'যুদো' ব্যায়ামপ্রণালী দেখান। এ বিষয়ে একটা বইও নাকি ক্লাইন লিখেছেন। ওঁর বাবা জাতিতে ডাচ এবং একজন বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি অঙ্কনশিল্পী ছিলেন। পিতার কাছেই চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর হাতেখড়ি। কিন্তু চিরাচরিত ধরনে ছবি আঁকার যে মেহনত তা ক্লাইনের মনঃপূত হয়নি। উপরন্তু রেসের ঘোড়া
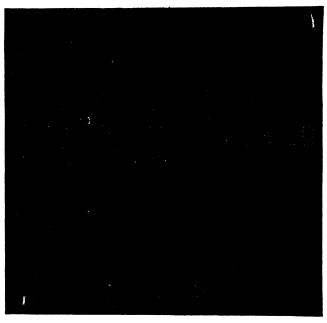
ক্লাইন কর্তৃক অঙ্কিত একটি নীল রঙের ছবি। অনেক সমালোচক 'মডার্ন আর্ট'এর চরম ধোঁকাবাজি' বলে মন্তব্য করেছেন, আবার সংস্কৃতিমন্ত্রী আঁদ্রে মালরো করেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কালো কালির পরিবর্তে 'অক্সফোর্ড ব্লু' নীল কালি কল্পনা করে নিতে হবে

শিল্পী ক্লাইন ও তাঁর 'সজীব তুলি'

তৈরি করা বা কুক্ষিত করার চাইতে শিল্পী হওয়া যে অনেক সম্মানের সে কথাও ক্লাইন বুঝেছিলেন। কিন্তু রঙ-তুলি দিয়ে ছবি আঁকা অহেতুক সময় নষ্ট ও অবান্তর কাজ। তাই একটি নতুন তত্ত্ব খাড়া করে, বড় বড় ক্যানভাসে রোলার দিয়ে ঝট্‌পট্‌ একরঙে ছবি আঁকা শুরু করলেন প্রথমে। সবুজ, লাল, কমলা লেবুর রঙে। কিন্তু পরে অন্য সব রঙ পরিত্যাগ করে নীল রঙই ধরলেন।

এই নীলরঙা ছবির দ্বারা খ্যাতি ও অর্থলাভে সন্তুষ্ট না হয়ে, মাথা খাটিয়ে ইদানীং ক্লাইন আবার এক নতুন পদ্ধতি ধরেছেন এবং অতি সহজে এখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। আজ মাত্র ৩২ বছর বয়সে প্যারিসের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ক্লাইন এখন সবচাইতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন শিল্পী। সঙ্গে সঙ্গে অর্থও অর্জন করেছেন প্রচুর। বেরনার বুফাও আজ পিছনে পড়ে গেছেন। প্যারিসের মডার্ন আর্টের জগতে, হাজার হাজার শিল্পী এত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন যে, নতুন কিছু করা সত্যিই প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু ওরই মধ্যে মাথা খাটিয়ে একটা নতুন কিছু চালু করতে পারলেই সারা দুনিয়ায় হইচই পড়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যতদিন তা চালু থাকবে, বাজার সরগরম। যে-সব শিল্পী এই ধরনের

সম্ভ্রান্ত মডেল প্রিন্সেস্ এলেনা ভেরাচিয়ার অঙ্গে শিল্পী ক্লাইন সবুজ রঙ মাখিয়ে দিচ্ছেন

একটু নতুন কিছু করতে পারবে, তা সে যতই উদ্ভট হোক না কেন, চিত্রকলার পর্যায়ে পড়ুক বা নাই পড়ুক, রসোত্তীর্ণ হোক বা না হোক, লোকে তা নিয়ে মেতে উঠবেই। ক্লাইন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক। দু-দুবার এই রকম কিছু খাড়া করে, তার সমর্থনে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরে আসর মাতিয়েছেন। আর এখন ওঁকে পায় কে!

রোলার দিয়ে ঘষে নীল রঙ লাগিয়ে ছবি আঁকতে আঁকতে একঘেয়ে বোধ করার পর ক্লাইন "সজীব তুলি"র ব্যবহার আবিষ্কার করেন। এতদিন পর্যন্ত সব শিল্পীই মডেল সামনে বসিয়ে, নানান ভঙ্গীতে, নিজের পদ্ধতিতে প্রতিকৃতি আঁকত। ক্লাইন ভাবলেন ওসব নিতান্ত সেকেলে ব্যাপার। উনি তার বদলে নগ্ন মডেলের দেহে বুক থেকে পা পর্যন্ত রঙ লাগিয়ে মেঝেতে রাখা ক্যানভাসের উপর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে বুকে হেঁটে, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত রং লাগিয়ে চলে যেতে বললেন। এতে শিল্পীকে নিজের ছবি ছুঁতেই হল না। একটা ছোট মইয়ের উপর চড়ে শুধু মডেলকে নির্দেশ দেওয়া। ক্যানভাসের কোথায় কিভাবে নড়ন-চড়ন করে ছাপ লাগাতে হবে মডেলকে দিয়ে এটুকু করানোই শিল্পীর কাজ। ক্লাইন বলেন— "আমি শুধু একজন অ্যারেঞ্জার—প্রাণী,

গাছপালা ও খনিজ দ্রব্যের মধ্যে।"
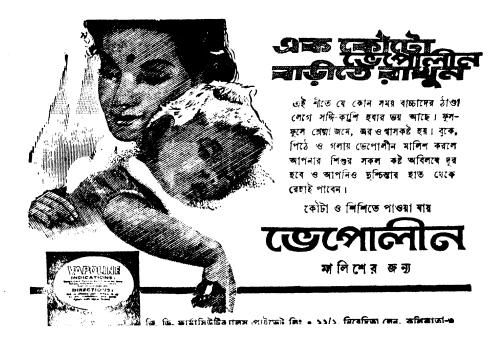
এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকার টেক্নিক ক্লাইন দিনে দিনে আরও রপ্ত করেছেন, আরও দ্রুত বেশীসংখ্যক ছবি তৈরি করছেন। দু-চার মিনিটে তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার টাকা দামের সব ছবি। চটপট্ তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার চিত্রকলার বৃহৎ-ব্যবসার আন্তর্জাতিক বাজারে। ক্লাইনের মডেলরাও সব সমাজের উচ্চস্তরের মহিলা, এমনকি রাজবংশেরও। ক্লাইন আমাকে আরেকদিন নির্ধারিত সময়ে আসতে বলেছিলেন "লিভিং ব্রাশ" পদ্ধতিতে ছবি আঁকা দেখাবেন বলে। সময়মত গিয়েছিলাম। সেদিনের মডেল ছিলেন ক্লাইনের বিশেষ ভক্ত প্রিন্সেস এলেনা ভেরাচিয়া। তিনি নিজে একজন কবি। হলের কার্পেট তুলে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে পাতা আছে বিরাট ক্যানভাস। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজকুমারী সুন্দরী ভেরাচিয়া, সম্পূর্ণ নগ্ন। সুঠাম দেহ, একেবারে যৌবনে ঠাসা। অনভ্যস্ত চোখে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু শিল্পী বা মডেল বিন্দুমাত্রও সংকোচ বোধ করলেন না। ফরাসীরা দেহ সম্বন্ধে আমাদের মত লজ্জাসরমের বালাই করে না। ক্লাইন শিল্পীজনোচিত নির্লিপ্ততা নিয়ে নগ্ন দেহের স্তন থেকে হাঁটু পর্যন্ত রঙ লাগিয়ে পাশে মইয়ের উপরে উঠলেন। তারপর ফরাসী ভাষায় মডেলকে নির্দেশ দিলেন, কোথা থেকে কিভাবে ক্যানভাসের উপর দেহ থেকে রঙের ছাপ দিয়ে ছবি আঁকা শেষ করতে হবে। নানারকম নির্দেশ দিলেন। কোথাও বেঁকতে, কোথাও বেশী চাপ দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি হয়ে গেল। ভেরাচিয়া স্নানের ঘরে গিয়ে গরম জলে শরীরের রঙ ধুয়ে একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। এই ধরনের সব ছবিই একটি রঙে আঁকা। ক্লাইন পরে কোন ফিনিশিংও করেন না। ছবিতে যদি শান্ত মধুর পরিবেশ আনতে চান তবে ক্লাইন নম্র লাজুক ঠান্ডা প্রকৃতির মডেল ব্যবহার করেন। আবার যদি জোরালো অনুভূতির কোন ছবি আনতে চান, তখন সেই অনুযায়ী উদ্দাম উদ্ধত যৌবনের মডেল ব্যবহার করেন। দু হাজার টাকা থেকে ছয় হাজার টাকার মধ্যে বিক্রি হয় ক্লাইনের এইসব ছবি। ক্লাইন ছবির নামকরণও করেন বেশ। একটি মডেলের, পায়ের আঙুল, হাঁটু ও হাতে রঙ লাগিয়ে ক্যানভাসে ছাপ দেবার পর যে ছবি হল, তার নাম রাখলেন—"ট্রায়াম্ফ অব ইনটেলেকচুয়ালিজম"।

ক্লাইন-মডেল-এর বর্ণরঞ্জিত দেহ ক্যানভাসে চেপে দেবার পর শিল্পীর ছবি। আড়াই হাজার টাকা দামে বিক্রী হবে

আবার নীল রঙের একটি চতুষ্কোণ ছবিকে মোটর গাড়ির সামনে রেডিয়েটরে বেঁধে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে এলেন। ছবিতে বৃষ্টির জল পড়ে যে এফেক্ট হল, তার নাম দিলেন- "দি উইন্ড অব দি ভয়েজ" এবং মন্তব্য করলেন—"গাড়ি চালানোর সময় আমি যে আমার সময় নষ্ট করছিলাম না, ছবিটি আমাকে এটাই মনে করিয়ে দেয়।" উপর্যুক্ত প্রথায় "সজীব তুলি" ছবির আরও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেছেন, যাতে এখন ঘন্টায় ৬০টি ছবি ক্লাইন করতে পারেন। মেঝেতে পাতা ক্যানভাসের উপর বুকে হেঁটে না চলে, দাঁড় করানো ক্যানভাসে দেহে রঙ লাগানো মডেল শুধু ছাপ দিয়ে দেয়।

ক্লাইন-এর বক্তব্য হল—"সেই একজন খাঁটি শিল্পী যে চাক্ষুষ দর্শনীয় কিছুই সৃষ্টি করে না।" তাঁর নিজের চিত্রকলা হল—"অবাস্তবের ফাঁকার মধ্যে দিয়ে তার যাত্রা।" ক্লাইন-এর এইসব বক্তব্য যতই গালভারি হোক, আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যে, শিল্পী নিজে তার এক বর্ণও বিশ্বাস করেন না। জেনে-শুনে এই শিল্পী যেন মানুষের ইনটেলেকচুয়াল প্রিটেনশনকে ইচ্ছে করেই ব্যঙ্গ করছেন। এর পরেও এসবের দ্বারাও যদি আমি খ্যাতি অর্জন করতে পারি, লোকে আমাকে নিয়ে নাচানাচি করে, আমার পকেটে "টু পাইস" আসে তাতে আমার কি দোষ এবং আমি তা কেন করব না? ক্লাইনের কাজকে আমি অবজ্ঞাও করতে পারি না। এটাও ত একটা পারিপার্শ্বিক ও যুগেরই প্রতিফলন। সমালোচকদের ভাষায় contemporary tension-এর প্রতিচ্ছবি। আর এটাও স্বীকার করতে হবে যে, প্যারিসের শিল্পকলার জগতে শিল্পীদের মধ্যে অনেকে সত্যিই ইনটেলেকচুয়াল। এরা যা কিছু করে, তা সজ্ঞানে ভেবেচিন্তেই করে, নিজের মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন উঠেছে বলেই তার সমাধান করার চেষ্টা করে। 'কেন এভাবে ছবি এঁকেছি' তার একটা ব্যাখ্যা দেবেই, আমাদের তা মনঃপূত হোক বা না হোক।

কলাশিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপের এই উদ্‌ভ্রান্ত আধুনিকতায় ক্লাইনের দৃষ্টিভঙ্গি বিরাট প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধ বলেই আমার কাছে মনে হয়েছিল। হয়তো ক্লাইন একজন আইকোনোক্লাস্ট আর সেইজনাই হয়তো, আগেকার বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও এখন আমি একজন ক্লাইন-ভক্ত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এককালে "সিলেক্ত"-এ আড্ডা দিলেও এখন আর সেখানে ক্লাইন পদক্ষেপ করেন না।

বিশুখুড়ো ট্রামে চড়িয়াই বলিতে লাগিলেন—"আমাদের এই দিনের আলোচনার খবর যেদিন পাঠকের কাছে পৌঁছুবে, সেদিন বারটা শনি, তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারি। খবর পৌঁছবার আগেই হয়ত মা বসুন্ধরা দ্বিধা হয়ে যাবেন, নয়ত প্রবল উচ্ছ্বাসে গঙ্গা এসে পৃথিবী গ্রাস করবেন, নয়ত দিকে দিকে বৈশ্বানরের সর্বগ্রাসী জিহ্বা লেকলক করতে থাকবে। আর যদি নেহাৎ কেউ তাবিজ মাদুলির জোরে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত বেঁচে থাকেন (এর পর আর এক্সটেনশন দেওয়া চলবে না) তাহলে তাঁদের কাছে নিবেদন,—তাঁরা যেন বিশুখুড়োর জন্যে"—কিন্তু খুড়ো কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, শুধু সখেদে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"ওরে তোদের বিশুখুড়ো এবার বুঝি পটল তোলে!"

আমাদের শ্যামলাল বিশুখুড়োকে সান্ত্বনা দিয়া বলে—"ভয় নেই খুড়ো! খবরে শুনলাম সরকারী আবহ অফিস নাকি অষ্টগ্রহ সম্মেলন সমর্থন করেছেন, সুতরাং মাভৈঃ!!"

কিন্তু আবহ অফিসের আভাস-বাণীতে বিশ্বাসী আমাদের জনৈক সহযাত্রী শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"জলপাইগুড়ির এক বাড়িতে একটি অষ্টমুখী বেগুন ফলেছে, সংবাদপত্রে তার ছবি পর্যন্ত বেরিয়েছে। এর পর মহাভারতের সেই মুষল-প্রসব উপাখ্যান মনে না করে উপায় নেই, কে জানে এই বেগুনের মধ্যে হয়ত রয়েছে পৃথিবীর মরণবাণ।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম তাঁর এক নির্বাচনী ভাষণে নাকি বলিয়াছেন—স্বতন্ত্র দল? ওর আয়ু ত ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত, তারপরেই নির্ঘাত শিশুমৃত্যু। শ্যামলাল শংকিত হইয়া বলিয়া উঠিল "সর্বোনাশ, মন্ত্রী মশাই কোন রেল কলিশনের ইঙ্গিত দেন নি ত!!"

আমাদের অন্য সহযাত্রী অষ্টগ্রহ প্রসঙ্গটিকে ঘুরাইয়া দিয়া নির্বাচনে চলিয়া গেলেন। বলিলেন—"সংবাদে শুনলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (পুলিস) দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর নস্কর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। বউনিটা ভালোই হল। জয় পুলিসের জয়।"

এক সংবাদে প্রকাশ দাউদ রহমানী নামে জনৈক পাকিস্তানী নাকি দাউদ রহমান নাম লইয়া ভারতীয় বনিয়া যান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে মতিহারী কেন্দ্রে মনোনয়ন পত্র পেশ করেন। তাঁহাকে অবশ্য পত্রপাঠ বিদায় দেওয়া হইয়াছে। সংবাদটা ভোটরঙ্গের। "কিন্তু এটা শুধু রঙতামাশার কথা নয়। নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকেরই দাউদ রহমানীর মতো দাদের চুলকুনি হয়" মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা কংগ্রেসের দ্বিতীয় এশীয় অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে

চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, জনসাধারণ যাহাতে এই নীলাকাশের নীচে ভালভাবে থাকিতে পারে সে জন্য তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"তাঁদের চেষ্টা ছাড়াই জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ নীলাকাশের তলাতেই আছে, মাথারওপরে এক ফালি ছাদও নেই!!"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ যে গঙ্গামাটি মিশ্রিত সিমেণ্ট আগুন দরে বাজারে বিক্রয় হইতেছে।—"আশ্চর্য কিছু নয়। অষ্টগ্রহের প্রতাপে যদি মরতেই হয় তবে গঙ্গা না পাই অন্ততঃ গঙ্গামাটি চাপা পড়েও ত মরতে পারব। তার জন্যে কিছু খরচ-খরচা করতে হবে বৈকি" বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

শুনিলাম হিমঘরে খাদ্যদ্রব্য রাখার সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণীত হইবার সম্ভাবনা আছে।—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু ভাবনা, এই আইন-প্রণয়নের সম্ভাবনাটাকে না অনির্দিষ্ট কালের জন্যে হিমঘরে রেখে দেওয়া হয়"—মন্তব্য করিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম শীতের বিক্রম শেষ হইয়া আসিল।—"আর এই সঙ্গে কাজে কাজেই মনে রাখতে হবে,—বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। আমাদের মরণ রাম আর রাবণ দুয়ের হাতেই"—টীকা করে শ্যামলাল।

একটি প্রবন্ধে পড়িলাম—আমেরিকা নাকি খুব পুতুল-প্রিয়। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"ডলারের দেশে ডলের কদর হবে বৈ কি; পরিসংখ্যান বলে—ডলস হাউসের প্রভাবও আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশি।"

সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল মালিনোভস্কি তাঁর এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন,—একটিমাত্র আণবিক আঘাতে আমেরিকা ও উহার মিত্রদের সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলিকে মুছিয়া দিতে পারি।—"গাগারিন মহাকাশ পরিভ্রমণকালে নিশ্চয়ই একটি "সোয়াগ্র" চুক্তি নিষ্পন্ন করে ফিরে এসেছেন।" খুড়ো বুঝাইয়া বলিলেন—"সোয়াগ্র মানে সোবিয়েৎ-অষ্টগ্রহ চুক্তি!"

দিল্লির জনসভায় বক্সী গোলাম মহম্মদ তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান কাশ্মীরকে সর্বরোগের নিদান বলিয়া মনে করে—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সর্বপ্রকার অকল্যাণ যেন ইহাতেই দূর হইয়া যাইবে। —"স্বপ্নাদ্য মাদুলিতে কাটা মাথা জোড়া লাগে, অন্ধের চক্ষুদান হয়, এমন কি গরু হারালে খুঁজে পাওয়া যায়" শ্যামলাল মাদুলি-বিশ্বাসী গাঁয়ের লোকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী আবার লোকসভায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া আমাদের জনৈক সহযাত্রী সহসা কবিতায়

মুখর হইয়া উঠিলেন—"যৌবন আমার, ফিরে ফিরে তব সাথে দেখা মোর হবে বারংবার।"

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বলেন আমাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শুধু সেই ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলার জন্য আমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।—"সবিনয়ে নিবেদন করব, বর্তমানটা আগে গড়ে নিলে হত না?"—বলেন বিশুখুড়ো।

"জলকে আমি ভয় করতুম, সঙ্গে লোক না থাকলে কোনদিন বাড়ির পুকুরে যেতুম না। কতদিন দুপুরবেলা চারপাশের গাছ আগাছার জঙ্গলের মধ্যে নিঃসঙ্গ গম্ভীর পুকুরটার দিকে তাকিয়ে আমার শরীর হিম হয়ে আসতো। মনে হত এখুনি গাছের ছায়ায় অন্ধকার কালো জল থেকে দুটো বিশাল কালো ডানা উঠে এসে আমাকে ঘিরে জলের মধ্যে টেনে নামিয়ে নেবে।"

সামনে সমুদ্র। পেছনে নারিকেলের বন। এখনও অন্ধকার হতে দেরী আছে। নারিকেল গাছের ভারি মাথাগুলো সমুদ্রের শান্ত হাওয়ায় দুলছিল। পেছনে নারিকেলের বন পেরিয়ে স্যানাটোরিয়াম। সমুদ্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে পরিতোষ তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। কালো ট্রাউজারের ওপর কালো চাদর জড়িয়ে পরিতোষের সঙ্গী সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসেছিল। হাতের লাঠি দিয়ে বালির ওপর দাগ কাটছিল। হেসে পরিতোষ আবার তার গল্প শুরু করল: "আমার জলে ভয় এ কথা মা বাবা দুজনেই জানতেন। বাবার কাছ থেকে মা আমার এই ভয়কে আড়াল করতে চাইতেন। বাবা কুড়ি মাইল দূরের শহরে চাকরি করতেন। সেখান থেকে মাসে দু-তিনবার আসতেন। এসেই আমাকে খুঁজতেন, পরি, পরি কোথায়! বাবাকে আমার ভয় হোত। বাবা সাঁতার

সেই ছাগলগুলোর কথা আমার মনে পড়ত। হাড়িকাঠে গলা ঢুকিয়ে দেওয়া ছাগলটার মত আমি বাবার কোলের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়তুম। গলার শিরা ফুলিয়ে চীৎকার করতুম। কত সময় বাবার বুকে হাতে এমন খিমচি কেটেছি যে আমার বড় বড় নোখের মাথায় বাবার চামড়া উঠে এসেছে। বাবা গ্রাহ্য করতেন না। পেছনে পেছনে মা নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে আসতেন। কতদিন মা কেঁদে ফেলেছেন। বাবা বোধকরি শুনতেই পেতেন না। আমাকে নিয়ে পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়াতেন।

পুকুরের জল স্থির। চারপাশ নিস্তব্ধ। আমি বাবার কোলের মধ্যে এদিক ওদিক দেখে নেবার মতো দু এক মুহূর্ত সময় পেতুম। সেই সময়টুকুর মধ্যে আমার মনে হত পুকুরের জল কী অবিশ্বাসী। পুকুরের চারধারের বেতঝোপ, আগাছার জঙ্গল মাথা উঁচু তালগাছ সব মিলিয়ে জঙ্গলটাকে আমার ভয়ানক লাগত। যেন স্বপ্নে দেখা কোন ভয়ঙ্কর মূর্তি হাঁ করে আছে। যেন...... আর কিছু দেখা যেত না। ততক্ষণে সেই উঁচু পাড় থেকে দুহাতে আমায় তুলে ধরে বাবা এক নিষ্ঠুর অশেষ শূন্যতার মধ্যে আমায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। আমি হাওয়া কেটে নিয়ে জলে পড়েছি। জল। আমার চারপাশে জলের নিঃশব্দ সহস্র কুটিল

পড়তুম বলেই বোধকরি জলের অনেক নীচে তলিয়ে যেতুম। ফুস্‌ফুস্ খালি হয়ে যখন শেষ হাওয়াটুকু প্রায় গলার কাছে এসেছে—এসেছে, এখুনি বেরিয়ে যাবে ঠিক তখনই জল থেকে মাথাটা বেরিয়ে আসতো। আঃ। বুকের মধ্যে যেন সহস্র দামামা গুড় গুড় করে উঠতো। আলো আলো। আলো। হাওয়া। কিন্তু সব এক মুহূর্তের জন্যে। হাত ছুঁড়তুম, পা ছুঁড়তুম। অথচ দেহটা ঠিক তলিয়ে যেত। এই এক দেহকে জাগিয়ে রাখা যে

শেখাতে চাইতেন, তাই ভয়। আমাদের বাড়ির পেছনে সরকারদের বড় জঙ্গল ছিল। বাবার আসবার সময় হলে আমি সেই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতুম। বাবা আমাকে খুঁজে বার করতেন। চান করিয়ে ছাগলটাকে কাঠগড়ার দিকে নিয়ে গেলে তার মনে কি হয় কে জানে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ঝোপঝাপের আড়াল থেকে বাবা যেই এসে আমাকে পাঁজা করে কোলে তুলতেন পুজোর সময় সরকার বাড়ির

রেখা। আমার কোন অনুভূতি কি বেদনা থাকতো না। বাবার হাতে ধরা পড়ার পর থেকে যে ভয়ে অস্থির হতুম, সেই ভয়টাও থাকতো না। শুধু বাঁচতে চাইতুম। এই সুবিশাল পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে পাগলের মত বাঁচতে চাইতুম। যন্ত্রণাবোধ নেই। শরীর নেই। মাথা নেই। পৃথিবী নেই। কোথাও কেউ নেই। শুধু বাঁচতে চাওয়া। একটুখানি শক্ত মাটির স্পর্শ।

অনেক দূর থেকে, অনেক উঁচু থেকে

কি শক্ত সেই ছোটবেলাতেই বুঝে ফেলেছিলুম।

জল থেকে প্রথম মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর আমার কানে আসতো। কার স্বর আমি চিনতে পারতুম না। মানুষ যখন মরতে বসেছে তখন সে কাউকে চিনতে পারে না। তার মনে হয় সে এক অন্ধকার মাঠের মধ্যে শুয়ে আছে। যেন অনেক দূর থেকে মানুষের স্বর শুনতে পাচ্ছে। আমার এ রকম হত। ঠিক

মরবে, মরছে এমন একটা মানুষের মতো আমি আমার অস্তিত্বকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিতুম। আর সেই স্বরটাকে আমার অপরিচিত লাগতোই। অপরিচিত। হাওয়া আর কুয়াশায় ভারি কোন তুহিন নিশীথে দূরাগত গীর্জার বিলম্বিত ঘণ্টা ধ্বনির মত।

তারপর আচমকা আমি সেই স্বরটি চিনতে পারতুম। বাবার কণ্ঠ। যেন আমরা কোন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি বাবা এমনি ভারি অচেনা গলায় বলতেন, পরি ভয় নেই। এইতো...এই যে আমি।

ততদিনে আমি জেনে গেছি বাঁচবার জন্যে বাবার দিকে এগিয়ে গিয়ে লাভ নেই। বাবা ঠেলে সরিয়ে দেবেন। কিংবা নিজেই সরে যাবেন। বাবা চাইতেন আমি একেবারে একা-একলা হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে যে ভাবে হোক ঘাটের দিকে এগোই। বাবা তাই চাইতেন, কেননা কোনদিন আমি ক্লান্ত হয়ে ডুবতে ডুবতে জল খেতে খেতে ঘাটে গিয়ে উঠলেও তিনি হাত বাড়িয়ে দেননি। বলেননি, এই যে পরি, এই আমার হাত। ধরে উঠে আয়। বাবা বলতেন, হাত ধরে উঠে পার নেই। তোমাকে পুকুর থেকে কেউ হাত ধরে তুললো, কিংবা নদীতেও। নদীতেও তুমি অন্য কারও হাত ধরে উঠে এলে। কিন্তু সমুদ্রে...? বাবা তাই চাইতেন আমি যেন সাঁতারটা শিখতে পারি। যেন কোনদিন কারও হাতের ওপর আমাকে না বাঁচতে হয়। কিন্তু আমি... আমি যে জলকে ভয় করতুম।

তখন আমি ক্লাস সেভেন এইট্-এ পড়ি। একদিন হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। মৃত্যু সম্পর্কে তখনও আমার কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। আমি জানতুম না মরে গেলে কি হয়। আমি টিফিনের সময় একা শীতের মাঠে ছুটে ছুটে খেলছিলুম। কে যেন বলেছিলেন, পরি তোমার বাড়ি যাও। তোমার বাবার অসুখ।

তখন পর্যন্ত আমি কোনদিন হিসেব করে দেখিনি আমি বাবাকে ভালোবাসি না ঘৃণা করি। আমার কোনদিন মনে হয়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ...হঠাৎ আমার ভীষণ কষ্ট হল। আমার মনে হয়েছিল বাবা আর কোনদিন আগের মত আমায় খুঁজে এনে উঁচু করে তুলে ধরে জলে ছুঁড়ে ফেলতে পারবেন না।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে দেখলুম মা শহরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকে মোচড় দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। মা দুহাতে আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, ছিঃ কাঁদে না।

আমি কেন কাঁদলুম আমি জানি না। আমি যে কেঁদে ফেলবো তা আমি আগের মুহূর্তেও জানতে পারিনি। কেন কাঁদলুম। বাবার অসুখের সংবাদ নিয়ে শহর থেকে গণেশ কাকা এসেছেন। গণেশ কাকা বাবার বন্ধু। বাবার সঙ্গে অনেকবার আমাদের গ্রামে এসেছেন। খুব স্ফূর্তিবাজ লোক। এক একটা রোববার চীৎকার করে, মাছ ধরে, গান গেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। বাবার বন্ধু কিন্তু বাবার চেয়ে আমার অনেকদিন মনে হয়েছে গণেশ কাকার বয়েস অনেক কম। আমার সোনা জ্যেঠিমা চাইতেন গণেশ কাকার সঙ্গে তার বড় মেয়ের বিয়ে হোক। আমি কতদিন শুনেছি সোনা জ্যেঠিমা বাবাকে বলেছেন, দিননা ঠাকরপো মেয়েটার হিল্লে করে। আপনি বললেই হবে।

বাবা সোনা জ্যেঠিমাকে বলতেন, বলবো। কিন্তু আমার মনে হত বাবা গণেশ কাকাকে কোনদিন কিছু বলবেন না। এর আগে গণেশ কাকা আমাদের বাড়ি একলা কোনদিন আসেননি। গণেশ কাকা মাকে বললেন, তাড়াতাড়ি করুন বৌদি, বলে আমার হাত ধরলেন। মা আমাদের ঘর বন্ধ করে চাবিটা সোনা জ্যেঠিমার হাতে দিলেন। আমি আর গণেশ কাকা তখন নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। নদীর ধার দিয়ে এক মাইল হাঁটলে আমরা মোটর পাব। মোটরে শহর দু ঘণ্টার রাস্তা। সোনা জ্যেঠিমা সোনা জ্যেঠিমার বড় মেয়ে দুর্গাদি নদীর ধার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন। নদীর ধারে এসে সোনা জ্যেঠিমা মাকে দুহাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরলেন। আমার মনে হল সোনা জ্যেঠিমার কাঁধে মুখ রেখে মা কাঁদছেন।

আমরা যখন শহরে পৌঁছোলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমার খুব শীত করছিল। এর আগে আমি আর মা অনেকবার শহরে এসেছি। আমরা সিনেমা দেখতে, দুর্গাঠাকুরের বিসর্জন দেখতে শহরে আসতুম। একবার বাবার থিয়েটার দেখতেও এসেছিলুম। সেই থিয়েটারে বাবা একটি মেয়েলোক সেজেছিলেন। অনেক রাত্রে বাবার বাসায় ফিরে এসে মা খুব হেসেছিলেন। অত হাসতে মাকে আমি আর কোনদিন দেখিনি। বাবাকে মেয়েলোক সাজতে দেখে আমার একদম হাসি পায়নি।

শহরে অনেকবার এলেও আমি শহরের রাস্তাঘাট চিনতুম না। মোটর থেকে নেমে বাবার বাসা কোনদিকে আমি কোনদিন ঠিক করতে পারিনি।

একবার অফিসের কি একটা কাজে বাবাকে কলকাতা যেতে হয়েছিল। পর পর দু-সপ্তাহ বাবা বাড়ি আসেননি। কোন চিঠি নেই। মা আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, পরি, মোটর থেকে নেমে বাবার বাসা চিনতে পারবি। আমি বলেছিলুম, পারবো। তারপর আমি আর মা একদিন শেষ বিকেলে মোটর থেকে নেমে একদিকে হাঁটতে থাকলুম। শহরের সব রাস্তাই একরকম। আমরা ডান দিকে গেলুম। বাঁ দিকে গেলুম। আবার ডান দিকে গেলুম। কিন্তু থানা আর পোস্ট অফিস

পেরিয়ে বাবার বাসার সেই গলিটা খুজে পেলুম না। রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে মা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা এখন কি করবো ঠিক করতে পারছিলুম না। আমি দু-একবার মাকে বললুম, কাউকে কেন জিজ্ঞেস করন না।

মা ভয় পেয়ে বলেছিলেন, কাউকে জিজ্ঞেস করে দরকার নেই। না। কপালে যা আছে হবে। আমার মনে হয়েছিল আমরা একটা অন্ধ আবর্তে পড়ে গেছি। এই তলহীন তরল অন্ধকার আবর্ত থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে আমাদের উদ্ধার করবে না। আমার গলা শুকিয়ে কান্নার মত হচ্ছিল।

সেদিন অবশ্য আমরা বাবার বাসা পেয়েছিলুম। দৈবক্রমে বাবার অফিসের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা তখনও কলকাতায় আছেন। আমরা বাবার ঘরের তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিলুম। বাড়িওলার বৌ মেয়ে আমাকে আর মাকে খুব যত্ন করেছিল। তারা...

এই যে এদিকে। পরি আমরা এসে গেছি। গণেশ কাকার ডাকে আমরা বাঁ দিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকলুম। অন্ধকার গলি। খানিকটা এগোতেই বাবার বাসা। অন্ধকারে আমি মায়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটছিলুম। মা আমায় এক হাতে জড়িয়ে ছিলেন।

অন্ধকারে বাবার বাসার সামনে কয়েকজন লোক বসে আছে। দাঁড়িয়ে আছে। বিড়ির আগুনে আমি তিন চারটি চকচকে মুখ দেখলুম। তাদের কাউকে চিনি না। এই তো এসে গেছে ওরা। কে যেন বলল। সেই অন্ধকার ভিড় থেকে বাড়িওলার বৌ উঠে এল। সঙ্গে তার মেয়ে। নদীর ধারে সোনা জেঠিমা যেমন করে মাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বাড়িওলার বৌ ঠিক তেমনি করে জড়িয়ে ধরল মাকে। বাড়িওলার মেয়ে আমার হাত ধরল। আর আমি চমকে উঠলুম। কেননা তৎক্ষণে মা পাগলের মত ছুটে গিয়ে বাবার মৃত শরীরটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে অমানুষিক করুণ চিৎকারে ভেঙে পড়েছেন। বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি থর থর করে কাঁপছি। কেন যে কাঁপছি জানি না। মা অমন চিৎকার করে কাঁদছিলেন বলে, না বাড়িওলার মেয়েটা একপাশে সরে গিয়ে অন্ধকারে তার চাদরে আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে আমায় দুহাতে জড়িয়ে তার অদ্ভুত বুকের ওপর চেপে ধরেছিল বলে আমি ঠিক করে বলতে পারব না। বাড়িওলার মেয়ে আমার গালে মুখে রেখে কি রকম খোনা খোনা ভিজে গলায় বলেছিল, পরি, কাঁপছিস কেন?

আসলে বাবা আগেই মরে গেছলেন। বাবা মারা যাবার পর গণেশ কাকা আমাদের আনতে গেছেন। খেয়ে দেয়ে অফিসের সিঁড়ি বেয়ে বাবা ওপরে উঠছিলেন। তখনও সিঁড়ির অনেকই বাকী। বাবা মুখ থুবড়ে সিঁড়ির ওপর পড়লেন। সেই শেষ পতন। ডাক্তার, লোকজন সবাই এল। বাবার শরীরটাকে ধরে তার বাসায় নিয়ে আসা হল। কিন্তু বাবা আর উঠলেন না। এখন আর ইচ্ছে থাকলেও কারও হাত ধরে তিনি উঠে আসতে পারতেন না। মৃত্যুই কি সমুদ্র? যেখান থেকে কারও হাতে ভর দিয়েই আর উঠে আসা যায় না। না মৃত্যু সমুদ্র নয়। মৃত্যুর কথা বাবা কোনদিন বলেননি।

শহরের নদীর ধারে অন্ধকার শ্মশানে বসেছিলুম। বাবার সমস্ত শরীর জ্বলছে। আমি জেলেছি সে আগুন। চিতার আগুনে অনেক দূর পর্যন্ত আবছা আবছা আলো হয়ে আছে। বাবার অফিসের লোকেরা বাবার সম্পর্কে সব ভালো ভালো কথা বলছিলেন। আমি চুপ করে বসে ভাবছিলুম, এ পৃথিবীতে আমাদের কেউ নেই। আমি আর মা। আমরা একলা। বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন সাঁতার শিখি। বাবা জানতেন সাঁতার না শিখলে এই দেহটাকে আমি ভাসিয়ে রাখতে পারবো না। কিন্তু আমার যে জলে বড় ভয়। আমি সাঁতার শিখবার আগেই যে বাবা মরে গেলেন।"

পরিতোষ ক্লান্ত হয়ে চুপ করে সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার সঙ্গী হাঁটু ভাঁজ করে তার ওপর ঘাড় গুজে বসেছিল। পরিতোষ চুপ করতেও সে মুখ তুলল না। পরিতোষ কিছু বলছিল না। চারপাশ জুড়ে সন্ধ্যা নামছিল। সাদা কাগজের ওপর উপুড় করে ঢেলে দেওয়া পাতলা জোলো কালির মত সন্ধ্যা। সমুদ্র এখন প্রথম বিকেলের মত নয়। হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে। দিনের আলো যত মরে এসেছে বাতাসের জোর ততই বেড়েছে। এই মত্ততার মধ্যে বিশ্বচরাচর যেন শ্রান্ত হয়ে শিথিল হয়ে আছে।

দূর থেকে স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা বাজছিল। বিকেলের হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া তার ছেলেগুলোকে স্যানাটোরিয়াম ফিরে পেতে চাইছিল। ঘণ্টা বাজিয়ে সে ডাকছিল সকলকে। পরিতোষের সঙ্গী উঠে দাঁড়াল। পরিতোষও। তারপর তারা চর থেকে মুখ ফিরিয়ে স্যানাটোরিয়ামের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমি ষোল বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করলুম।" পরদিন পরিতোষ আবার তার গল্প শুরু করেছে। পরিতোষের সঙ্গী রোজকার মত আজও ট্রাউজারের ওপর কালো চাদর জড়িয়ে বসে আছে। হাতের লাঠি দিয়ে বালির ওপর দাগ কাটছে। প্রজাপতি আঁকতে চাইছে। আঁকছে কিন্তু হচ্ছে না। আজ প্রথম বিকেলের হালকা, হলুদ রঙের রোদ বিস্তৃত বেলাভূমির ওপর নারকেল গাছের লম্বা লম্বা ছায়া ফেলেনি। আজ গভীর কুয়াশায় সমুদ্র আকাশ সব ঢাকা পড়েছে। "আমি পাশ করলুম।" পরিতোষ কুয়াশার মধ্যে ডুবে গিয়ে তার গল্প বলছিলঃ "তখন কলকাতায় থাকি। গতকাল আমি ঠিক বলিনি। আমি

বলেছিলুম, আমার আর মায়ের কেউ ছিল না। ঠিক বলিনি। একজন ছিলেন। বড় মামা। আমার মায়ের বড়দা। বড় মামাকে আমি আগে দেখিনি। কোনদিন আসেননি তিনি আমাদের বাড়ি। বাবা পছন্দ করতেন না। আমরাও যাইনি।

যে রাত্রে বাবা মারা গেলেন তার পরদিনই গণেশকাকা টেলিগ্রাম করেছিলেন কলকাতায়। বড় মামা এসেছিলেন দুদিন পর। অদ্ভুত লোক। কথাবার্তা বেশী বলেননি। কি রকম চুপচাপ গম্ভীর প্রকৃতির। বাড়িওলার বড় মেয়ে আমায় ছাদের ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিল, তোর বড় মামা মদ খেয়েছে।

আমি এর আগে মদ খাওয়া লোক দেখিনি। সকলেই বড় মামার দিকে কেমন অবাক চোখে তাকাচ্ছিল। বাড়িওলার বৌ দুপুরের দিকে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার আপন ভাই?

আমার মনে হয়েছিল সবাই বড় মামার সংগে আমাদের কলকাতা যেতে বারণ করছে। অথচ একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা শহরে স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়িতে চেপেছিলুম। বাড়িওলার বড় মেয়ে খেয়ে দেয়ে পুকুর ঘাটে মুখ ধুতে গিয়ে বোকার ত আমার হাত ধরে বলেছিল, পরি, মামাকে আমাদের ভুলে যাবি তো?

ঘাটে এসে জলের দিকে তাকিয়ে আমার বাবার কথা মনে পড়েছিল। তাই ভয়ে বাড়িওলার মেয়ের কাছ থেকে আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিইনি। আমি বলেছিলুম, না। ভুলবো না।

বাড়িওলার মেয়ে জলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যখন বড় হবি আমার কথা মনে থাকবে তোর?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলুম, হ্যাঁ।

আমরা বাঁশঝোপের পাশ দিয়ে হাঁটছিলুম। বাড়িওলার মেয়ে হঠাৎ আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। বসে আমার হাতটা তার বুকের ওপর নিয়েছিল। নিয়ে বলেছিল, ঠিক বলছিস আমার কথা তোর মনে থাকবে? ঠিক? কিসের ভয়ে জানি না আমার সর্বশরীর শীত লাগার মত কাঁপছিল। আমি কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম। তারপর বাড়িওলার মেয়ে আমায় সামনে টেনে বুকে চেপে আমার মুখে চুমু খেয়েছিল। আমরা শুকনো পাতার ওপর পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলুম। বাড়িওলার মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, কাউকে বলিস্ না। আমি মাথা ঝেঁকে বলেছিলুম, আচ্ছা। তারপর আমরা একটি কাঠবেড়ালি দেখেছিলুম। আমার কাঠবেড়ালিটিকে খুঁচিয়ে মারবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। মাটির ঢ্যালা নিয়ে আমি কাঠবিড়ালিটাকে মারবো বলে ছুটে গিয়েছিলুম।

একবার আমাকে নিয়ে মা বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন। বড় মামা রাজী হননি। বড় মামা চেয়েছিলেন আমরা যেমন আছি তেমনভাবে তাঁর সংগে যেতে হবে। মায়ের না গিয়ে উপায় ছিল না। তাই একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা কলকাতার গাড়িতে চাপলুম। কলকাতায় বড় মামার তিনতলা বাড়ি। মা বলেছিলেন, বাড়ি বড় মামার নয়। বাড়ি মায়ের বাবার। আমার দাদুর। বড় মামা একতলার সবটা ভাড়া দিয়েছিলেন। দোতলায় বড় মামার ছিল তিনখানা ঘর। আমরা যেতে দোতলার একখানা ঘর আমাদের ছেড়ে দিলেন। নীচে অনেক ঘর। কিন্তু তখন নীচের সব ঘরেই ভাড়াটে ছিল। না হলে আমার মনে হয়েছিল বড় মামা আমাদের নীচেই একখানা ঘর দিতেন।

বড় মামার ঘরে কোন মেয়েছেলে ছিল না। ঘরে মেয়েছেলে নেই এমন লোক এর আগে আমি দেখিনি। বড় মামার ঘরে একটা বড় খাট ছিল। আলমারি ছিল। অথচ মেয়েছেলে ছিল না। বড় মামা তার ঘরে কোনদিন ঢুকতে দেননি।

থাকবার মধ্যে বড় মামার একটা চাকর ছিল। তার নাম শ্রীনাথ। আমি শ্রীনাথকে দাদু বলতুম। মা বলেছিলেন, শ্রীনাথ খুব পুরোন চাকর। আমার দাদুর আমল থেকে আছে। আমরা যাওয়ায় সে খুশী হয়েছিল। আমরা যাওয়ায় তার কাজ অনেক কমে গেছল। এমনকি মা তাকে বাসন মাজতেও দিতেন না।

শ্রীনাথ শুধু বাজার করতো। বাজারের সময় শ্রীনাথ আমাকে তার সংগে নি[illegible] বড় মামার কি কাজ ছিল জানি না। রাত্রিবেলা রান্নার পর শ্রীনাথ দাদু বলতেন, দাদাটা কেমন হয়ে গেছে। মা [illegible] শ্রীনাথদাদু অনেক পুরোন দিনের গ[illegible] করতেন। আমি একদিন শুনেছিলুম বড় মামা যে শুধু মদ খায় তা ন[illegible] রেস্‌ও খেলে। রেস কি খেলা তা[illegible] জানতুম না।

এই এত বড় বাড়িতে আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান ছিল তিনতলার ছাদ। পুরোন শ্যাওলাধরা ছাদ। মা চাইতেন না আমি একা ছাদে উঠি। কিন্তু দুপুরে মা ঘুমোলে আমি চুপি চুপি ছাদে উঠে আসতুম। এখানে এসে আমার মনে হত আমি আকাশের কোলের কাছে চলে এসেছি। এই একলা শীতের দুপুরে ছাদে উঠে এলে আমার হঠাৎ হঠাৎ বাড়িওলার মেয়ের কথা মনে পড়ত। আমি চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতুম। আমার চারপাশে হাজার হাজার বাড়ির ছাদ। আমার সমুদ্রের কথা মনে হত। বাবা যে সমুদ্রের কথা বলতেন সেই সমুদ্র। এই উঁচু নীচু বাড়ির পর বাড়ি, হাজার হাজার ছাদ, ছাদের পর ছাদ দেখতে দেখতে আমার মনে হত আমি হঠাৎ কঠিন হয়ে যাওয়া তরঙ্গময় কোন সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমি আকাশের দিকে চাইতুম। আমার খুব একলা লাগত। হাড়ের মধ্য থেকে কম্পন উঠতো। সর্বশরীর কেঁপে উঠলে আমার মনে পড়ত, আমি কোনদিন আর সাঁতার শিখবো না।

নতুন বছরে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হোল। আমি গ্রামে ক্লাস এইট্‌এ পড়তুম। এক মাস বাদে আমার পরীক্ষা ছিল। আমি পরীক্ষা দিইনি। কলকাতায় তাই আবার ক্লাস এইট্‌এ ভর্তি হলুম। আমাদের একতলার ভাড়াটেদের একটি ছেলের সংগে আমি স্কুলে যেতুম। সে আমার সংগেই পড়তো। কিন্তু তার সংগে আমার কোনদিন বন্ধুত্ব হয়নি। ছেলেটি রোজ স্কুলের রাস্তায় আমাকে অনেক খারাপ কথা শোনাত। সে চাইত যেন আমি তার কাছ থেকে কথাগুলো শিখে নিই। মেয়েদের শরীর সম্পর্কেও তার অনেক জ্ঞান ছিল। রাস্তায় মেয়ে দেখলেই সে একচোখ বুজে তাকিয়ে থাকতো। কিভবে মেয়েদের ভোলাতে হয় সে আমায় শেখাতে চাইত। আমি কোন মেয়েকে ভালোবেসেছি কিনা অনেকদিন সে জানতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলুম, আমি বাড়িওলার মেয়েকে ভালোবাসি।

একদিন ছেলেটি স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে মরে গেল।

তারপর থেকে আমাকে একাই যেতে হত। বাড়ি থেকে স্কুল প্রায় এক মাইল দূরে ছিল। যাবার সময় আমি সোজা যেতুম। কিন্তু ফেরবার সময় অনেক ঘুরে ঘুরে বড় রাস্তা দিয়ে চৌরাস্তা দিয়ে ফিরতুম বলে দেড় মাইল দু মাইলও হাঁটা হয়ে যেত।

স্কুলেও আমার কোন বন্ধু ছিল না। আমি একা একা থাকতুম। সবাই আমাকে মেয়েছেলে বলতো; বলে আমাকে খেপাতে চাইত। আমার তাতে কোন রাগ দ্বিধা হত না। দু-একজন মাস্টার মশাই আমাকে স্নেহ করতেন। কোনদিন পড়া না করলে জিজ্ঞেস করতেন আমি কেন পড়া করিনি। একদিন একজন মাস্টার মশাই আমার দেশ কোথায় জানতে চেয়েছিলেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি চৌরাস্তার ফুটপাতে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতুম। এখানে দাঁড়িয়ে লোকজন, মানুষ, গাড়ি ঘোড়া দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষ দেখতুম। কত মানুষ। কত রকমের মানুষ। আমার মনে হত মানুষগুলো সব ছুটছে। একটা অন্ধঝোঁকে একদিক থেকে আর একদিকে ছুটছে। কি কাজ, কি করবে কোথায় যাবে যেন কারও জানা নেই। বাবা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর অনেক নীচে তলিয়ে গিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠলে যে অবস্থা হত চৌরাস্তার ভিড় ভেঙে এগিয়ে যাওয়া মানুষগুলোরও যেন সেই অবস্থা। আমি যত দেখতুম, আমার তাই মনে হত। যেন সাঁতার না জানা মানুষগুলোকে কেউ জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। আর আমার মত ওরাও কেউ সাঁতার জানে না। শেখেনি।

এখানে দাঁড়িয়ে আমার আরও অনেক কথা মনে হত। একদিন মনে হয়েছিল এরা আমাকে চেনে না। আমি কে, রোজ এখানে কেন দাঁড়াই এ কথা কেউ জানে না। এইখানে দাঁড়িয়ে এই সহস্র মানুষের ভিড়, হট্টগোলের মধ্যে অনেকদিন আমার গ্রামের কথা মনে পড়ত। দুর্গাদি। সোনা জেঠিমা। আমাদের ঘরখানা এখন কেমন হয়েছে। ঘরের জিনিসপত্র। সরকার বাড়ি। নদীর ঘাট। এই সব মনে পড়তো। আমি মনে মনে আমাদের গ্রামটাকে পুকুরের সঙ্গে তুলনা করতুম। আর এই শহরটাকে আমার মনে হত সমুদ্র।

সন্ধ্যের আগে আগে বাড়ি ফিরলে দেখতুম মা খুব ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিছু বলতেন না। নিঃশব্দে আমাকে খেতে দিতেন। আমি বইপত্তর ছুঁড়ে দিয়ে সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতুম। সে সময় রোজ নীচতলায় ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া হতো। নীচতলার সব ক'জন ভাড়াটের ঘরের সামনে এক সঙ্গে উনুন জ্বালানো হয়েছে। আমাদের বাড়ীটা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। সেই একরাজ্য ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে নীচের চেঁচামেচি, গালাগালি, ঝগড়া শুনলে আমার মনে হ'ত আমি নরকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। নরক কি আমি জানতুম না। আমার মনে হয়েছে নরক এইরকম। এরকম এক সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ বাড়ি ফিরে বড়মামা মাকে বলেছিলেন, যমুনা, বাড়ি বিক্রি করে দিলাম। আমার শেষ পরীক্ষার তখন এক মাস বাকী।"

অনেকক্ষণ ধরে স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা বাজছিল। ঘণ্টা কানে যেতে পরিতোষ থেমেছিল। পরিতোষ দেখেছিল তার সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিতোষের সঙ্গী বালির ওপর গভীর ক্ষতের মত একটা গর্ত খুঁড়েছিল। ঘাড় গোঁজ করে, এক চোখ বুজে সে সেই গর্তের দিকে তাকিয়েছিল। তার সঙ্গী গর্তের মধ্যে কি দেখছে পরিতোষ বুঝতে পারে নি। স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা তাদের ডাকছিল। তারা সমুদ্র, হাওয়া আর নারকেলের বন থেকে মুখ ফিরিয়ে স্যানাটোরিয়ামের দিকে চলে গেছল।

"আমি যে কবে পাল্টে গেলুম, বড় হলুম আমার মনে পড়ে না।" তৃতীয় দিনে পরিতোষ তার গল্প এইভাবে শুরু করল: "হঠাৎ যেন একদিন মনে হল বড় হয়ে গেছি।"

আজ সমুদ্র উত্তাল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ বেলাভূমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের অনেক ভেতর থেকে হু হু করে হাওয়া এসে নারকেলের পাতায় পাতায় ঝড় তুলছে। পরিতোষ আর তার সঙ্গীর চাদর চুল বাতাসে উড়ছিল। আজ আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা। সমস্ত আকাশের চেহারা ছেঁড়াখোঁড়া। কালো মেঘে আকাশটিকে পুরোন ক্ষতের মত বীভৎস দেখাচ্ছিল। আজ পরিতোষের সঙ্গী বালিতে আঁচড় কাটছে না। কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে হাঁটু মুড়ে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

"একদিন আবার আমি জানলুম আমাদের কেউ নেই।" পরিতোষ তার গল্প শুরু করল। "আমি আর মা। আমরা এ পৃথিবীতে একলা। এখন আমি নিজেকে চিনেছি। এতবড় সমুদ্রের মত এই শহরে আমাকে কেউ তার হাত বাড়িয়ে দেবে না। আমি যতক্ষণ পারব নিজের দেহটাকে ভাসিয়ে রাখতে চেষ্টা করব। তারপর দম ফুরিয়ে গেলে তলিয়ে যাব।

বড়মামা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছেন। বড়মামা যাবার আগেই আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি। যারা বাড়ি কিনেছিল তাদের কাছ থেকে বড়মামা তিন মাসের সময় নিয়েছিলেন। হয়তো আমার পরীক্ষার জন্যেই। বড়মামা আমাকে পছন্দ করতেন কিনা আমি বলতে পারব না। একদিন শ্রীনাথ দাদু মায়ের কাছে বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর সেও কোথায় তার দেশ সেখানে চলে গেল।

তখন নীচের একখানা ঘর ফাঁকা হয়েছে। নতুন বাড়িওলা যেদিন এল মা আমাকে নিয়ে নীচের সেই ঘরখানায় চলে এলেন। আমরা আমার দাদুর তিনতলা বাড়ির নীচতলার ভাড়াটে হয়ে গেলুম।

আমি একটি ওষুধ কোম্পানীতে কাজ পেলুম। আমাদের পাশের ঘরের লোকটা সেই কোম্পানীতে চাকরি করত। সেই একদিন নিয়ে গিয়ে কাজটা ঠিক করে দিল। লোকটা ছিল মালিকের খাস চাকর। আমার কাজটা খুব ভালো লেগেছিল। একটা বড় অন্ধকার গুদোমের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা এই আমার কাজ। সেই ঘরে নানা বয়সের পনেরোটা মেয়ে ছিল। তারা নানা আকারের সব শিশি জল সোডা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করত। আঠা দিয়ে লেবেল লাগাত। আমার কাজ ছিল এই পনেরোজন মেয়ের মধ্যে বসে ওদের কাজ দেখা। তাদের কাজের হিসেব রাখা। তারা কাজ কামাই করে গল্প করছে কিনা লক্ষ্য রাখা।

মেয়েগুলো প্রথমদিন আমাকে দেখে হেসে ফেলেছিল। আমাকে বয়সের অনুপাতে খুব ছোট দেখাত। তারা একদিন জানতে চেয়েছিল আমি এখনও দুধ খাচ্ছি কিনা। আমি বলেছিলুম, খাই। তাতে তারা সবাই সবাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে হেসেছিল। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হত আমাকে। ভোরে এক জায়গায় দুটো ছেলেকে পড়াতুম। পড়ানো হয়ে গেলে বাজারে ছুটতুম। বাড়িতে বাজার নামিয়ে চান খাওয়া করে আসতুম এখানে। এসে এই অন্ধকার গুদোমের মধ্যে বসলেই আমার খুব হাই

উঠত। গা ভেঙে ঘুম আসত। চোখের পাতা যেন কেউ আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে চাইতো। কেবল এই মেয়েগুলোই আমাকে জাগিয়ে রাখত। তারা নানারকম মজার মজার কথা বলত। আমাকে তারা কখনও আলাদা ভাবত না। তারা কখনও নিজেদের গুনতে গিয়ে মজা করে আমাকে গুনে ফেলত। বলত আমরা ষোলটা মেয়ে। মাঝে মাঝে তারা নিজেদের মধ্যে খুব খারাপ খারাপ আলোচনা করত।

এই ঘরের অনেক উঁচুতে একটা পঁচিশ পাওয়ারের ডুম ছিল। এত কম আলোয় মেয়েগুলোকে আমি কোনদিন পুরোপুরি তাদের নাক চোখ সমেত দেখিনি। কিন্তু যখন তারা খারাপ কথা আলোচনা করত আমার মনে হয়েছে আমি তাদের চোখ মুখ সব স্পষ্ট দেখতুম। তারা সবাই খারাপ কথা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসত।

একদিন আমি তাদের অনেক বানিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বাড়িওয়ালার মেয়ের গল্প-বলেছিলুম।

বিকেল পাঁচটায় আমাদের ছুটি হত। আমি রাতের কলেজে ভর্তি হয়েছিলুম। কাজ থেকে বেরিয়েই আমাকে কলেজের দিকে ছুটতে হত। কলেজ আমার তেমন ভালো লাগেনি। বোধ হয় সারাদিন খাটা খাটুনির পর কারোও ভালো লাগে না। কলেজে আমার কোন বন্ধু ছিল না। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। কলেজ থেকে আমাদের বাড়ি কাছেই ছিল। ন'টার সময় কলেজ বন্ধ হলে হেঁটে বাড়ি ফিরতে আমার পনেরো কুড়ি মিনিট লাগত। সেই রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরে আমাকে ওপরে বাড়িওলার ছেলেকে পড়াতে হত। এর জন্যে আমি কোন পয়সা পেতুম না। বাজারে বাড়িওলার দুটি মুদিখানা দোকান ছিল। তবু পয়সা দিয়ে ছেলের জন্যে সে মাস্টার রাখতে চাইনি।

কলেজ থেকে ফিরে আমার শরীরে আর জোর থাকতো না। এক একদিন আমার ইচ্ছে হত আমি ভাড়াটেদের মত ঝগড়া আর চীৎকার করি। বাড়িওলার ছেলে ঝিমিয়ে পড়ত। রাত দশটায় মাস্টার চলে গেলে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ত। বাড়িওলার ছেলে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে বাকী থাকতো। সে বাছুরের মত সরল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমি জানতুম সে কোনদিন পরীক্ষায় পাশ করবে না।

খেয়ে দেয়ে উঠতে আমার এগারোটা বাজতো। কোন দিন তারও বেশী। তখন শহরের সমস্ত বিচিত্র শব্দ একটু একটু করে মিলিয়ে আসছে। এক একদিন আমার মাথা খুব গরম হয়ে যেত। ঘুম আসতো না। আমি উঠে এসে বাইরের অন্ধকার রকে ঘুরে বেড়াতুম। আমার গল্প শেষ হয়ে আসছে।" পরিতোষ দম নিয়ে তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল, "প্রায় শেষ। আর একটুখানি।"

পরিতোষের সঙ্গী ঘাড় গুঁজে বসে রইল। কোন কথা বলল না। পরিতোষের দিকে ফিরে তাকাল না।

"সকালবেলা ......" পরিতোষ হেসে তার গল্পের শেষ শুরু করল : "একদিন সকালে ওষুধ কোম্পানীতে যাবার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমার কলেজে শেষ পরীক্ষার তখন দু মাস বাকী। একদিন একটা লোক ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে ট্রামের তলায় চলে গেল। ট্রাম থেকে নেমে দেখলুম লোকটা দু আধখানা হয়ে ট্রামের তলায় শুয়ে আছে। আমার হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। আমার মনে হল অন্য কেউ নয় ট্রামের তলায় আমিই দু আধখানা হয়ে শুয়ে আছি। ট্রামটা দাঁড়িয়ে রইল। আমি ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা বাসে উঠলুম। বাসে উঠে আমার মনে হল সেই লোকটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সে সময় গুদোম ঘরে বইপত্তর নিয়ে পড়াশুনো করছি। ওষুধ কোম্পানীর মালিক একদিন ডেকে বলেছেন, পাশ করে ফেল। তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে নেব। গুদোমের পঁচিশ পাওয়ারের ডুমটা পাল্টে তিনি একটা একশো পাওয়ারের ডুম দিয়েছেন। সেই একশো পাওয়ার আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি মেয়েদের রাস্তায় লোকটার কথা বললুম। তারা শুনে খুব দুঃখ পেল। একজন তার বাবার কথা বলল—যে ঝড়ের সময় গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে।

আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছিল। আমি লোকটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। এর আগেও আমি দুবার মৃত্যু দেখেছি। বাবাকে মরতে দেখেছি। আর সেই ছেলেটা ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছল। আমার কখনও এমন হয়নি। আমার কখনও মনে হয়নি তারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই লোকটি ছিল। এই লোকটা ছুটতে ছুটতে এসে ট্রামে উঠে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর থেকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হয়েছিল লোকটাকে যেন আমি আগেও কোথাও দেখেছি। কত চিনি।

পরীক্ষার দুদিন আগে থেকে আমি জেগে পড়তে থাকলুম। পড়তে পড়তে থামিয়ে আমি বাবার কথা ভাবতুম। বাড়িওলার মেয়ের কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত সোনাজ্যেঠিমা। সকলের শেষে মনে পড়ত লোকটার কথা। লোকটাকে মনে পড়ার কারণ ছিল না। সে সব সময় আমার মনের মধ্যে থাকতো। বাবা, স্কুলের ছেলেটা, আর লোকটা তিনজনে যেন আমাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ছিল।

পরীক্ষার দিন সকালে একটু পড়েছি। তারপর চান করে খেয়ে বেরুব। চান হয়ে গেছে। খেয়েছি। বেরুচ্ছি। মা বললেন ওপরে বাড়ীওলাদের ঠাকুর প্রণাম করে আয়। আমি ওপরে উঠেছিলুম। যখন উঠছিলুম তখনই আমার সর্বপ্রথম কষ্ট হল। কি যেন বুকের মধ্যে আটকে গেছে। পরে যখন তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, আমার ফুসফুস শুকিয়ে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল। আমি কাশতে কাশতে সিঁড়িতে বসে পড়লুম। সকলে ছুটে এল। তখন আমার গলা দিয়ে তাজা গরম রক্ত বেরুচ্ছে! আমি......"

বাক্য শেষ না করে পরিতোষ মরা চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করল। পরিতোষের সঙ্গী বালির ওপর শুয়েছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরিতোষ একটু জিরিয়ে নিল। নিয়ে বললে, "আমি এক সময় ভাবতুম পৃথিবীতে কত লোক। কেউ আমাকে চেনে না। আমি একলা। আজ একমাস এখানে এসেছি। এখন বুঝেছি পৃথিবীকে ছোট করলে সকলকে চেনা যায়। আমি এখন যে পৃথিবীতে আছি তাদের সকলকেই চিনি।"

পরিতোষের সঙ্গী হঠাৎ কেন যেন উঠে বসল। সে কিছু বলতে যাবে পরিতোষ বাধা দিয়ে বলল, "এখানে আমার সকলেই চেনা। সকলেই আমার মতো। সাঁতার না জেনে কেবল হাত পা ছুঁড়ে বাঁচতে চেয়েছিল। আমি আপনাকেও চিনি।" পরিতোষ তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করে হাসল।

দূরে স্যানাটোরিয়ামের ঘণ্টা বাজছে। সমুদ্র থমথমে। বাতাস বিষণ্ণ। চারপাশ জুড়ে গভীর অন্ধকার নেমেছে। পরিতোষের সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়েছিল। পরিতোষ হেসে বললে, "কি, শুনতে চান না কে আপনি?"

পরিতোষের সঙ্গী কি বলল বোঝা গেল না। হয়তো কিছু বলেনি। হয়তো......।

পরিতোষ অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে হাসল। হেসে বলল, "আপনি সেই লোক যে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে ট্রামের তলায় চলে গিয়েছিলেন।"

পরিতোষের সঙ্গী কিছু বলল না। তারা চরাচর থেকে মুখ ফিরিয়ে স্যানাটোরিয়ামের দিকে এগিয়ে গেল।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১০৬)

মিস্টার ঘোষাল বললে—একদিন আগেও না, একদিন পরেও না—

আর কোনও প্রশ্ন সতীর মুখ দিয়ে বেরোল না। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো তার। সেই রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার ঘোষালের চোখে মুখে যে তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠতে দেখেছিল, আজ জেল থেকে ছাড়া পাবার পর যেন আবার সেই বিষাক্ত দৃষ্টি তার চোখে। কিন্তু তবু যেন সন্দেহ হলো। ছাড়া পাবার পর আবার কী উদ্দেশ্যে এখানে। কী চায় মিস্টার ঘোষাল আজ তার কাছে? মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে সেইটেই ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করলে সতী। মিস্টার ঘোষাল তখন আরাম করে বসে পড়েছে। চুরোটটা নিবে গিয়েছিল। আবার দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিলে মুখে। পোড়া কাঠিটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কিন্তু আবার এলুম কেন, এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, না?

সতী বোবার মত এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার ঘোষাল বললে আমি বেশী কথার লোক নই, আর আমারও সময়ের দাম আছে, গোড়াতেই তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, তুমি যে আমার এগেনস্টে সাক্ষী দিয়েছিলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ—

—ধন্যবাদ? কেন?

—আমার কনভিকশন না হলে রেলের চাকরি আমার ছাড়া হতো না। ওই হাজার টাকা স্যালারিতে আমার আর কুলোচ্ছিলও না। তা ভালোই হয়েছে, আমি এখন তিন হাজার টাকা স্যালারি পাচ্ছি এক মার্কেন-টাইল ফার্মে! খবরটা শুনে তুমি খুশী তো? কী? কথা বলছো না যে? কথা বলো! যাকে তুমি চিরকালের মত ক্রাশ করতে চেয়েছিলে, এখন দেখ তার কী অবস্থা হলো? তুমি খুশী হলে কি কষ্ট পেলে সেটা খুলে বলো?

সতী আর পারছিল না। বললে—আপনি আর কিছু বলবেন?

—বলবো না মানে? আমারই তো এখন বলবার দিন এসেছে। তোমরা তো সবাই ভেবেছিলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যাচ্ছে, এবার আমাদের দশা কী হবে। আমরা বুঝি সবাই উপোস করবো! এখন উপোস করবার নমুনাটা দেখলে তো? না কি বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস যদি না হয় তো আমি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার সঙ্গে করে এনেছি। তাও দেখতে চাও?

নীল পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করলে। কাগজখানার ভাঁজ খুলে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেখ, মুখের কথায় বিশ্বাস না হয়, পড়ে দেখ ভালো করে—

সতী বললে—আমি বিশ্বাস করেছি, আপনার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করেছি, আপনার আর কিছু বলবার আছে?

মিস্টার ঘোষাল বললে কেন, তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও?

—না, তা নয়, আমার এখন একটু কাজ আছে!

—কিন্তু কাজ থাকলে তো শুনবো না। যেদিন আমার অনেক কাজ ছিল সেদিন তো তোমার কথা আমি শুনেছি।

—সেজন্যে আমি আপনার কাছে গ্রেটফুল। কিন্তু এখন সত্যিই আমি একটু ব্যস্ত, আপনি পরে একদিন আসবেন।

মিস্টার ঘোষাল বললে—পরে তো আমার নিজের সময় হবে না। যা কিছু করবার আজকেই করতে হবে।

—আর একদিনও দেরি করতে পারেন না?

—না।

—কিন্তু এখন যে আমি বড় ব্যস্ত। আমার যে মোটে সময় নেই।

—তা সময় না থাক্। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি অনেক দিন ওয়েট করেছি, এতদিন রিভলবারটার লাইসেন্স পাইনি। আমার কনভিকশনের সময় ওটা ওরা ক্যানসেল করে দিয়েছিল, এবার পেয়েছি—বলে মিস্টার ঘোষাল পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে টেবিলের ওপর শুইয়ে রেখে দিলে।

তারপর সতীর দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলো—তোমার সময় আজ থাক আর না থাক, আমার কথা তোমাকে এখানে দাঁড়িয়ে এখন শুনতেই হবে, আর আমি যা জিজ্ঞেস করবো তার উত্তর দিতে হবে—

সতী রিভলবারটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। মিস্টার ঘোষাল বললে—

মনে রেখো আমি আজ একলা আসিনি, গাড়িতে আরো লোক আছে আমার। দেখেছ নিশ্চয়ই! এখন আমার প্রথম প্রশ্ন হলো তুমি এবার আমার প্যালেস কোর্টে যাবে কি না!

সতী চমকে উঠলো। বললে—প্যালেস কোর্টে? আমি?

—কেন? তুমি প্যালেস কোর্ট চেনো না? নতুন করে তোমাকে চিনিয়ে দিতে হবে?

সতী আড়ষ্ট হয়ে উঠলো—তা চিনি! কিন্তু আবার?

—হ্যাঁ, আবার। আমার রিকোয়েস্ট নয়, আমার অর্ডার। তোমার সাক্ষীতেই আমি জেল খেটেছি। তোমার সাক্ষীতেই আমার কনভিকশন্ হয়েছে, এই তার কম্পেনসেশন আমি চাই, খেসারত চাই—আজই—

সতী মুখ তুলে চাইল মিস্টার ঘোষালের দিকে। আবার সেই তীক্ষ্ম চাউনি, আবার সেই বিষাক্ত দৃষ্টি। মিস্টার ঘোষাল বললে—এ খেসারত না দিলে আমি তোমায় ছাড়বো না আজ। আজ এখনই। হোল ক্যালকাটায় আজ আগুন জ্বলছে, কোনও ল নেই কোনও অর্ডার নেই, আসবার সময়েই রাস্তায় প্রোসেসান দেখে এসেছি, এসপ্ল্যানেডের কাচের শো-কেসগুলো সব ভেঙে দিয়েছে মব, ক্যালকাটা আজ ইনটক্সিকেটেড, আজ আমিও তোমায় অ্যাবডাক্ট করবো—

—বেরিয়ে যান এখান থেকে, বেরিয়ে যান আপনি! আপনি আজ মদ খেয়েছেন খুব। আপনার সঙ্গে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না।

মিস্টার ঘোষালের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রিভলবারটা তুলে নিয়ে আবার টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

—আপনি বেরিয়ে যান বলছি। বেরিয়ে যান এখুনি!

মিস্টার ঘোষাল গম্ভীর গলায় বললে—চেঁচিও না, তাতে তোমার খারাপ হবে। আমি একলা নই, আমার সঙ্গে আরো লোক আছে—

—কিন্তু আমি আপনার আর কোনও কথা শুনতে চাই না, আপনি এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

—তা হলে চেঁচাও, পরে রিপেন্ট করতে হবে তোমাকে, অনুতাপ করতে হবে!

—কিন্তু আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না।

—আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন, আমিও চেঁচাবো না।

—ভদ্রতা সেকেলে জিনিস। ওটা কাওয়ার্ডিস। আজকের দিনে যারা দুর্বল তারা ভদ্রভাবে কথা বলবে। আমি কোন দুঃখে ভদ্র হবো? আমি সোজা কথা সোজা করে বলবো, তাতে তুমি খুশী হও বা অখুশী হও, আমার কিছু এসে যায় না।

—তা হলে আপনি কী চান বলুন?

—আই ওয়ান্ট ইউ! আমি তোমাকে চাই।

সতীর সমস্ত শরীর তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো। মুখ দিয়ে কড়া কথা বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিলে। বললে—সেই জন্যেই আপনি রিভলবার নিয়ে এসেছেন? আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, ওটা সেন-এর জন্যে। দ্যাট দীপঙ্কর সেন এখন শিলিগুড়িতে, সে আমার পোস্ট নিয়েছে, আমার চাকরি নিয়েছে, আমাকে জেলে পাঠিয়েছে সেই। এখন তোমাকে নেবার মতলব করেছে। আমি এবার তাকে দেখে নেব,—কালই আমার লোক ভোরের প্লেনে শিলিগুড়ি যাবে এই রিভলবার নিয়ে—

—আপনি তাকে খুন করবেন?

—সোজা বাঙলায় তো তাকে তাই-ই বলে!

—কিন্তু সে আপনার কী ক্ষতি করলো? দীপু তো আপনার কোনও অপকার করেনি। সে তো আমাকে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বলে নি। আমি নিজেই সব করেছি, সে এ-সমস্ত কিছুর মধ্যেই নেই! তাকে আপনি কেন শাস্তি দিতে যাবেন মিছি-মিছি? কী করেছে সে আপনার? আপনাকে জেলে পাঠানোর জন্যে তো আমিই দায়ী, আর কেউ নয়! একলা আমি!

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমি জানি সে-ই তোমাকে পেছন থেকে ইনস্টিগেট করেছিল, উত্তেজিত করেছিল—

—না, সত্যিই না, সে এর বিন্দু-বিসর্গও জানতো না। আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করুন, সে কিছুই জানতো না! তার কোনও দোষ নেই। তাকে আপনি চেনেন না মিস্টার ঘোষাল, তার মতন ছেলে হয় না। সে সকলের ভালোই চায়, সে আপনার ভালো চায়, সে আমার ভালো চায়, সে পৃথিবীর সব লোকের ভালো চায়, জীবনে কখনও সে মিথ্যে কথা বলেনি, জীবনে কারোর সে ক্ষতি করেনি, কোনও অন্যায় করেনি কারো, আপনি তার ওপর রাগ করবেন না। আপনার কাছে আমি হাত-জোড় করে বলছি, আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না—

মিস্টার ঘোষালের চোখে যেন একটা কটাক্ষ খেলে গেল। বললে—তার ওপর তোমার এত দরদ কেন শুনি?

—দরদ?

—হ্যাঁ, তার জন্যে তুমি আমার কাছে হাত-জোড় করছো কেন? এত দরদ তো ভাল নয়! সে তোমার কে?

সতী বললে—কেউ নয় মিস্টার ঘোষাল, দীপু আমার কেউ নয়, আমার ভাই নয়, আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, আমার কেউই নয়। আমার কাছে আপনিও যা, সে-ও তাই।

—তা হলে তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

সতী বললে—তা আমি বলতে পারবো না, তবু তার আপনি কোনও ক্ষতি করবেন না দয়া করে। সে নিষ্পাপ। আমি আপনাকে বলছি মিস্টার ঘোষাল, পৃথিবীর সকলের কিছু-না-কিছু পাপ আছে, আমার মনে পাপ আছে, আমার স্বামীর মনে পাপ আছে, আমার বোনের মনেও পাপ আছে, আমার নিজের বাবার মনেও হয়ত সামান্য পাপ ছিল, কিন্তু ভগবানের মনেও যদি কোনও পাপ না থাকে তো দীপুর মনেও কোনও পাপ নেই, সে একেবারে নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ, সে এই পৃথিবীর মানুষই নয়—
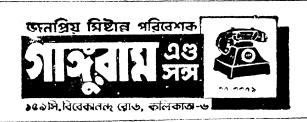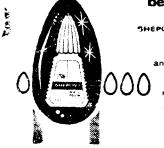
—এতখানি? মিস্টার ঘোষালের কটাক্ষ

ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে উঠলো গলার স্বরে। তারপর বললে—তা হলে তুমি চলো—

—কোথায়?

—প্যালেস কোর্টে। তুমি যদি প্যালেস কোর্টে যাও তো আমি সেন-কে ছেড়ে দেব। যে-কোনও একটা বেছে নাও—

সতী হতবাক হয়ে গেল। মিস্টার ঘোষাল বললে—খেসারত আমার চাই-ই। হয় তুমি চলো, নয় তো সেন উইল পে দি পেনাল্টি—এনি ওয়ান অব দি টু! আমার কম্পেনসেসন চাই-ই চাই, আজই—

সতী থরথর করে কাঁপছিল। মিস্টার ঘোষাল বললে—তুমি ভাবছো কী? আমার সময় নেই, আমি বেশীক্ষণ সময় দেব না তোমাকে। কোনটা বেছে নেবে বলো—

সতী হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের আরো কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। বললে—আপনি এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন কী করে?

—আমাকে জেলে পাঠানোর সময় তো তোমরা নিষ্ঠুর হতে পেরেছিলে? তখন তো মায়া-দয়া করোনি?

সতী বললে—কিন্তু দীপুকে দোষ দিচ্ছেন কেন, সে তো এর মধ্যে নেই, এর মধ্যে একলা আমিই আছি, আমিই দায়ী—

—তা হলে ঠিক আছে, ইউ মাস্ট পে দি পেনাল্টি—তুমি প্যালেস কোর্টে চলো—

—কিন্তু, কিন্তু আমি কী করে যাই!

মিস্টার ঘোষাল রিভলবারটা তুলে নিয়ে একবার নাচিয়ে আবার পকেটে রেখে দিলে। বললে—তা হলে উঠি, কালকে ভোরের প্লেনেই আমার লোক এই রিভলবার নিয়ে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছে—

সতী ছটফট করে উঠলো। মিস্টার ঘোষাল তখন দরজার দিকে যাচ্ছে। সতী বললে—দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান—

মিস্টার ঘোষাল পেছন ফিরে বললে—কী হলো?

সতী বললে—একটু দাঁড়ান, কিন্তু আপনি এইভাবে শাসিয়ে যাবেন? ভেবেছেন কলকাতা শহরে পুলিস, গভর্নমেণ্ট কিছু নেই? আপনি গুণ্ডামি করবেন, আর বাধা দেবার কেউ-ই নেই?

মিস্টার ঘোষাল বললে—যা ঘটছে এখন কলকাতায় তা তো দেখতেই পাচ্ছো, পুলিস, গভর্নমেণ্ট, মিলিটারি কিছু কি করছে? আর গুণ্ডার কথা বলছো, কিন্তু কে গুণ্ডা নয়? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গুণ্ডা নয়? মুসলিম লীগ গুণ্ডা নয়, কংগ্রেস গুণ্ডা নয়?

—কিন্তু আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে আপনি এইভাবে ভয় দেখিয়ে যাবেন?

—আমি তো ভয় দেখাচ্ছি না। আমি সোজা সরল ভাষায় তোমাকে সারেণ্ডার করতে বলছি। আর তা যদি না পারো তো সারেণ্ডার ক'রো না। সেন আছে, হি উইল পে—

সতী বললে—না, না, মিস্টার ঘোষাল, আপনি যাবেন না। আমাকে একটা রাত সময় দিন, একটা রাত ভাবতে সময় দিন শুধু। কালকে সকালটা পর্যন্ত আমি একটু ভাবি, তারপর যা হয় আপনি করবেন।

মিস্টার ঘোষাল কী যেন ভাবলে একবার। তারপর কী সুমতি হলো কে জানে। বললে—একটা রাত? কিন্তু কাল ভোর সাতটায় যে শিলিগুড়ির প্লেন ছাড়বে?

—তার আগেই আপনি আসবেন, তখন আপনি যা বলবেন আমি তাই-ই করবো।

—ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, একটা রাত মাত্র!

—আচ্ছা, ঠিক আছে—বলে মিস্টার ঘোষাল উঠলো। তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে বললে—আমি কাল সকাল ছ'টার আগেই আসবো—

মিস্টার ঘোষাল বাইরে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ হলো। গাড়িটা ছেড়ে দিলে। তখনও সতী সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দরজাটা বন্ধ করতেও ইচ্ছে হলো না। মনে হলো কোথায় দীপু রয়েছে কোন সুদূর শিলিগুড়িতে, সে কিছু জানতেও পারলে না। অথচ কাল সকালে তার চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে যাবে। পৃথিবীর কেউ জানবে না কেন, কীসের জন্যে তাকে চরম দণ্ড নিতে হলো। কেন নিজের জীবন দিয়ে অন্য আর একজনের সতীত্ব কিনতে হলো, অন্য একজনের জীবনের শান্তি, সংসার, সম্ভ্রম, মর্যাদা বাঁচাতে হলো। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কারোর কাছে কোনও কালে ধরা পড়বে না—এ মূল্য কিসের? এ মূল্য কেন? মিস্টার ঘোষালের লোকও ধরা পড়বে না। তারা অভ্যস্ত। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট থেকে শুরু করে সভ্য সমাজে সর্বত্র তারা মানুষের চোখের সামনে এই কাজই করে বেড়াচ্ছে, এই-ই তাদের জীবিকা। বিংশ শতাব্দীর ধোপদুরস্ত সভ্যতার তারাই বাহন। তাদের কেউ কিছু বলবে না। শুধু একলা জানবে সতী। আর সতী সমস্ত জেনে-শুনেও এই সংসারে বেঁচে থাকবে!

কী মনে হতেই সতী তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে উঠলো। সনাতনবাবুর কথা এতক্ষণ যেন ভুলেই গিয়েছিল। সব শুনেছেন নাকি তিনি? কিন্তু ঘরের দরজার সামনে এসেই দেখলে সনাতনবাবু তেমনিভাবেই বিছানায় শুয়ে আছেন।

সতীকে দেখে একটুও নড়লেন না। সতী আরো কাছে সরে এল। দেখলে সনাতনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। ক'দিন ধরে ঘুমোন নি। জীবনে এই যেন প্রথম শান্তি পেয়েছেন, প্রথম সহানুভূতি পেয়েছেন।

—ওগো, শুনছো?

কিন্তু ডাকতে গিয়েও সতী থেমে গেল। সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে আর তার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হলো না।

হঠাৎ সতীর মনে হলো কেমন করে দীপুকে খবরটা দেওয়া যায়! টেলিগ্রাফ করা যায় না? টেলিফোন? ট্রাঙ্ক-টেলিফোন? টেলিফোন করে সাবধান করে দেওয়া যায় না? বলে দেওয়া যায় না যে, মিস্টার ঘোষালের লোক যাচ্ছে শিলিগুড়িতে? সাবধানে থেকো, কিংবা তুমি ওখান থেকে চলে যাও। অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকো। কিংবা পুলিসে খবর দাও। কিছু করা যায় না দীপংকরের জন্যে। কিছুতেই দীপুকে বাঁচানো যায় না? চারিদিকে চেয়ে দেখলে সতী! জানালার বাইরে দৃষ্টিটা বুঝি আরো জোরে পড়তে শুরু করেছে। ঘরটা অন্ধকার। হঠাৎ সতীর মনে হলো কেউ নেই ঘরে। সনাতনবাবুও নেই যেন। পাশের ঘরে লক্ষ্মীদিও নেই। এমন কি এই বাড়িটাও নেই। এক অনির্বচনীয় শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সতী যেন নিঃশব্দে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে বাঁচাবে না আজ, কেউ তাকে রক্ষা করবে না। সতীর অন্তরাত্মার অন্তস্তলে একটা সৃষ্টিছাড়া আর্তনাদ যেন ভেতর থেকে ঠেলা মারছে। কোথায় তার প্রতিকার? কোথায় তার পরিত্রাণ? কাকে ডাকবে সে? কাকে সে বাঁচাতে বলবে?

—ওগো, শুনছো? তুমি ঘুমিয়ে পড়লে?

কিন্তু ডাকতে গিয়েও যেন গলা আটকে গেল। ডেকে কী বলবে তাকে? কেন সে শাসাবার সাহস পায় এমন করে? কোন্ অধিকার সতী দিয়েছে তাকে? কোন্ সম্পর্কের অধিকারে সে এমন করে এসে শাসন করে গেল? পুলিসে খবর দেবে? কিন্তু পুলিসকে খবর দিতে গেলেও তো থানায় যেতে হবে। থানায় গিয়ে সমস্ত বলতে হবে। সমস্ত খুলে বলতে হবে। কিন্তু কেমন করে যায় সে সব ফেলে?

বাড়িতে যে কেউ নেই। কিন্তু টেলিগ্রাফ। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ তো করে আসতে পারে পোস্ট অফিসে গিয়ে! কাছাকাছি কোথাও পোস্ট অফিস আছে নিশ্চয়ই।

কথাটা মনে পড়তেই সতী আলমারি খুলে শাড়িটা বদলে নিলে। নতুন শাড়ি একটা। কোনও দিন পরা হয়নি আগে। তারপর পাশের ঘরে গেল। লক্ষ্মীদি বিছানায় ঠিক তেমনি শুয়ে আছে। ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। আবার রাত্রে আর একবার খাওয়াতে হবে। আস্তে আস্তে আবার বাইরে এল। বারান্দায় দাঁড়াল খানিকক্ষণ। তারপর কী মনে করে আবার নিজের ঘরে ঢুকলো, সনাতনবাবু তখনও ঘুমোচ্ছেন।

—শুনছো, আমি একটু বেরোচ্ছি, আমি এখুনি আসবো—

তবু গলা থেকে যেন কথাগুলো বেরোল না।

—আমি যাবো আর আসবো। এসে সারা রাত আমরা গল্প করবো দুজনে। আজ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি এখুনি চলে আসবো বুঝলে?

গলা দিয়ে কথা বেরোল না সতীর। তবু যেন সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে ওই কথাগুলোই বলতে চাইলে। তারপর আর একবার বাইরের দিকে চাইলে। জানালার বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার। বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ করে তখনও। কিন্তু রঘু আসছে না কেন? এত দেরি হচ্ছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে খবর দিয়ে আসতে? সে থাকলে তাকে রেখে নিশ্চিন্তে যাওয়া যেত।

তারপর তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সদর দরজা খুলে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। অনেক দূরে চেয়ে দেখলে। কোথাও কেউ নেই। রঘুর কোনও চিহ্নই নেই কোথাও। রাস্তায় লোকজন চলাও কম হয়ে গেছে। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ি থেকে শেষ রাত্রে একদিন পালিয়ে আসবার সময় কিন্তু এমন ভয় করেনি। প্যালেস কোর্টে যাবার সময়ও এমন ভয় করেনি সতীর। কিন্তু আজ যেন গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠলো। তারপর সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো সোজা।

চারিদিকে অন্ধকার। কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই কারো। হাঁটতে হাঁটতে সোজা লেভেল ক্রসিং-এর দিকে চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন মনে হলো পেছনে কার পায়ের শব্দ হলো। ভয়ে ভয়ে পিছনে ফিরতেই মনে হলো অনেক দূরে কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তাকে পেছন ফিরতে দেখেই পাশের অন্ধকার গলির মধ্যে আত্ম-গোপন করলো। কে ও? কেন তার পেছন পেছন আসছে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই আর পা চললো না। মিস্টার ঘোষাল যদি কাউকে এখানে রেখে দিয়ে গিয়ে থাকে? কাউকে পাহারা দেবার জন্যে রেখে দিয়ে গিয়ে থাকে? এমনও তো হতে পারে যে লোক দুটো গাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে ছিল তাদেরই একজনকে যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে। বলেছে—নজর রাখিস একটু, দেখিস যেন কোথাও না পালায়—

সতী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল একদৃষ্টে। গলির ভেতর থেকে লোকটা আর বেরোল না। স্পষ্ট ঝিং-ঝির আওয়াজ কানে আসছে তখন দু'পাশ থেকে। তারপর আবার চলতে লাগলো। মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল সে। হয়ত অন্য লোক। পাশের গলির ভেতর বাড়ি। নিজের বাড়িতে গিয়েই ঢুকেছে লোকটা—ঘোষালের লোক নয় সে।

আবার পা চালিয়ে দিলে। আবার আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। সতীর মনে হলো এ যেন তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু বাধা, শুধু ষড়যন্ত্র, শুধু শত্রুতা। জীবন তার প্রয়োজন, সুখ তার প্রয়োজন, স্বামী সংসার সবই আজ তার প্রয়োজন। আজ সবাইকে নিয়ে তার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করছে। এ পৃথিবী বড় সুন্দর, এ সংসার বড় মধুর। এমন সময় আবার কেন এই উৎপাত! আজ এই মুহূর্তে কেন এলে? এর আগে আসতে পারতে না? যখন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না? যখন আমি মৃত্যু কামনা করেছি প্রতি মুহূর্তে? যখন সংসার আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে, যখন বঞ্চনা অভিশাপ কলঙ্ক আমার নিত্যসাথী, তখন এলে না কেন?

অন্ধকারে সামনের সব কিছু অস্পষ্ট ঝাপসা দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে লেভেল ক্রসিংটা পার হলো সতী। এখন বোধ হয় কোনও ট্রেন নেই। গেটটা ওঠানো। আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললো সতী। দীপুর ঠিকানা জানা নেই। তবু শিলিগুড়ির নাম দিলেই চলে যাবে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই পৌঁছবে। নাম বললেই সবাই চিনবে নিশ্চয়ই। এতদিন যে কেন চিঠি দেয়নি রাগ করে! কেন চিঠি দেয়নি তাকে। দু-একজন লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ মনে হল রাস্তার মোড়ে যেন একটা পুলিস দাঁড়িয়ে। পুলিসকে খবর দেবে? খবর দেবে যে, তাকে শাসাতে এসেছিল মিস্টার ঘোষাল! আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু পুলিস তো নয়, একটা গাছ! একটা ছোট গাছ। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়নি।

না, পোস্ট অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাফ করে দেওয়াই ভালো। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ। আজ শেষ রাত্রেই হয়ত পৌঁছে যাবে দীপংকরের হাতে। কিন্তু কোথায় পোস্ট অফিস! রাস্তার মোড়ে এসে ডান দিকে যেতে হবে। ডান দিকে ফিরতেই হঠাৎ নজরে পড়লো সেই লোকটা যেন আবার আসছে। যে লোকটা সেই তখন থেকে পেছন-পেছন আসছিল, সেই লোকটা।

সতী এবার সাহস করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। একেবারে সামনাসামনি। মুখোমুখি। সামনে এলেই বলবে—কেন আপনি আমার পেছনে-পেছনে আসছেন? কী দরকার আপনার? কী চান আপনি?

বৃষ্টিটা বোধ হয় আরো জোরে নামলো। কিন্তু সতীকে থামতে দেখে লোকটাও হঠাৎ থেমে গেছে। আর এগোল না। তারপর পাশের একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো লোকটা। কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সতী এবার আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এবার যেন আর তার ফেরবার উপায় নেই। সামনে পেছনে সব দিকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির ষড়যন্ত্র তাকে ঘিরে ফেলেছে। সতী যেন অসহায়ের মত আষ্টেপৃষ্ঠে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আর্তনাদ করতে চাইলো সেই নির্জন অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

রঘু প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সদর দরজা খোলা কেন? দিদিমণি কি দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে?

—দিদিমণি!

রঘু দরজাটায় খিল বন্ধ করে ভেতরে গিয়ে আবার ডাকলে—দিদিমণি—

কারো কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাইরের বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল রঘুর জামা-কাপড়। তবু সেই ভিজে জামা-কাপড়েই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। সমস্ত ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালেনি কেন দিদিমণি? অন্ধকার করে ঘরের মধ্যে বসে আছে কেন? কী হলো?

—দিদিমণি!

বড়-দিদিমণির ঘরও অন্ধকার। রঘু গিয়ে ঘরের ভেতরের আলোটা জ্বালতেই লক্ষ্মীদি যেন চমকে উঠেছে।

—কে?

—আমি বড়-দিদিমণি! আমি!

—আলো নেবা, আলো নিবিয়ে দে। আলো ভাল লাগে না আমার, জানিস্ না?

লক্ষ্মীদির আজকাল আলো ভালো লাগে না। সারা দিনরাত ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে রাখে। পৃথিবীর সব আলোকে যেন ভয় লাগে। ভয় লাগে সভ্যতাকে, ভয় লাগে মানুষকে। সভ্য মানুষ-সমাজের ওপরেই তার যেন ঘেন্না ধরে গেছে।

বললে—শীগগির আলো নিবিয়ে দে, শীগগির—

রঘু আলো নিবিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছোট-দিদিমণির ঘরে ঢুকলো। এ ঘরের মধ্যে অন্ধকার। আলোটা জ্বালতেই সনাতনবাবু জেগে উঠলেন। একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধ হয়। কয়েক রাত ঘুমোননি।

রঘু জিজ্ঞেস করলে—আলো জ্বালা থাকবে দাদাবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—তা থাক্।

রঘু আবার বললে—আপনার বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছি যে, আপনি আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবেন—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—দিদিমণি কোথায়?

সনাতনবাবু বললেন—দিদিমণি! তা তো জানি না।

রঘু বললে—যাবার সময় তো বাড়িতে দেখে গেছি, এখন হঠাৎ কোথায় গেলেন—

সনাতনবাবু বললেন—কোথায় আর যাবেন! আমি একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই হয়ত এখানেই কোথাও গেছে, তুমি ভেবো না—

তা হবে! রঘুও আর ভাবলো না। ভিজে জামা-কাপড়টা ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। আজ দাদাবাবুও খাবে এখানে। উনুনে আগুন দিলে। তরকারি কুটলো—এখন অনেক কাজ। দিদিমণি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ রঘুকেই সব করতে হবে!

তখন আরো জোরে বৃষ্টি পড়ছে। সতী তাড়াতাড়ি আবার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলো। কয়েকটা গাড়ি হুশ্ হুশ্ করে চলে গেল পাশ দিয়ে। সেই লোকটা আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে সেখানে। যেদিকে সতী গিয়েছে সেদিকেই পিছু নিয়েছে। সেই অন্ধকার সন্ধ্যেবেলায় সতী যেন বড় বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কোথায় যাবে সে? কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবে? কে তাকে বাঁচাবে? বাড়ি ফিরেই বা যাচ্ছে কেন সে? সেখানে সনাতনবাবুকে দিয়ে তার কতটুকু সাহায্য হবে? তাঁর কাছে গিয়েই বা কী লাভ? দীপুকে খবর দেওয়া যাবে কেমন করে?

হাতের কাছে পোস্ট অফিস নেই একটাও। থাকলেও এখন কি খোলা আছে? এই সন্ধ্যে ছটার পর?

সতীর মনে হলো এই সময়ে একলা বেরোনো তার উচিত হয়নি হয়ত। হয়ত রঘুকে দিয়েই পোস্ট অফিসে টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলে হতো! কিন্তু রঘুই বা এত দেরি করছে কেন? প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে খবরটা দিয়ে আসতে কি এত সময় লাগে? বাড়ি ফিরলে তো রাস্তাতেই তার সঙ্গে দেখা হতো। তবু রঘু আসছে কিনা পেছন ফিরে দেখতে গিয়েই হঠাৎ আবার নজরে পড়লো। সেই লোকটা! সেই লোকটা আবার তাকে অনুসরণ করছে।

সতী থমকে দাঁড়াল!

সতীর মনে হলো লোকটা যেন সতীকে তার জন্ম থেকে অনুসরণ করে আসছে। যেদিন তার জন্ম হয়েছিল এই পৃথিবীতে, সেইদিন থেকেই। ওরই নাম বোধ হয় মৃত্যু। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝি ভগবান মৃত্যুকে মানুষের পেছনে লেলিয়ে দেন। মৃত্যুর সঙ্গে বারবার তাই মুখোমুখি হয়ে যায় মানুষ। বারবার মৃত্যুকে দেখে তাই আঁতকে উঠি আমরা। বারবার তাই তাকে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু কার সাধ্য মৃত্যুকে এড়াবে? তার বাবা কি মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছেন? পৃথিবীর কেউ কি এড়াতে পেরেছে? সতী কি তার খোকাকেও মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে নিতে পেরেছিল সেদিন?

লেভেল-ক্রসিং-এর ওপর তখন এসে পড়েছে সতী। সামনে দু' জোড়া লাইন। ইস্পাতের মজবুত লাইন। এইখান দিয়েই প্রতিদিন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কত ট্রেন কত মানুষ বয়ে নিয়ে যায়। সেই সমস্ত মানুষগুলোর পেছনেও তো মৃত্যু অনুসরণ করে চলেছে ছায়ার মত! মৃত্যু কোথায় নেই? এই সংসারে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে করতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মানুষ! সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত

মৃত্যু তাকে কি এই প্রথম অনুসরণ করেছে? লোভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে, রোগ-শোক-কামনা-বাসনা সমস্ত কিছুর সঙ্গেই তাকে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তারা কি মিস্টার ঘোষালের চেয়ে কিছু কম হিংস্র, কিছু কম নিরাপদ, কিছু কম ভয়ংকর?

একেবারে গুমটি-ঘরটার তলায় এসে দাঁড়াল সতী।

গুমটি-ঘরটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আর একবার পেছন ফিরলো। তাকে অনুসরণ করতে করতে সেই লোকটাও যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো আবার। যেন কুটিল-জটিল এক ষড়যন্ত্রের জালে তাকে ঘিরে ফেলেছে মিস্টার ঘোষাল। এরাই কাল যাবে শিলিগুড়িতে। এরাই শিলিগুড়িতে গিয়ে দীপুকে নিঃশেষ করে দেবে।

হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো মিস্টার ঘোষালের রিভলবারটা।

হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো ছোরা।

সতী চিৎকার করে উঠলো—না—না—

সেই অন্ধকারের পটভূমিকায় সতীর চিৎকার যেন হাহাকারে রূপান্তরিত হয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। না, না, না! কিছুতেই না। দীপু কোনও দোষ করেনি। দীপু নিরপরাধ, দীপু নিষ্পাপ, দীপু নিষ্কলঙ্ক! দীপুকে মারবেন না! দীপুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। দীপু আমার কেউ নয়, দীপু আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। দীপু কারোর কোনও ক্ষতি করেনি। দীপু আমাদের সকলের ভালো চায়। আপনার ভালো চায়, আমার ভালো চায়, আমার স্বামীর, আমার শাশুড়ীরও ভালো চায়।

হঠাৎ নিজের উত্তেজনায় সতী নিজেই যেন অবাক হয়ে গেল। কই, তার গলা দিয়ে তো এতটুকু শব্দ বেরোচ্ছে না! সে যদি এখন চিৎকার করে কাউকে ডাকে তো হাজার হাজার তো কেউ শুনতে পাবে না। সে কী তবে পাগল

হয়ে গেল, উন্মাদ হয়ে গেল লক্ষ্মীদির মতন?

অনেক দূরে যেন কাঁসের একটা আলো দেখা গেল!

ট্রেন আসছে নাকি? ইস্পাতের লাইনের ওপর যেন ট্রেনের চাকার শব্দের প্রতিধ্বনি শুরু হলো। প্রথমে মৃদু, তারপর একটু স্পষ্ট। তারপর আরো স্পষ্ট হলো! অনেক দূর থেকে যেন হুইশ্‌লু বাজলো ইঞ্জিনের। তবে কি ট্রেনটা আসছে এই লাইন দিয়ে? এই গুমটি-ঘরের সামনে দিয়ে?

সতী গুমটি-ঘরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ওপরে গুমটি-ঘরের ভেতরে সেই বুড়ো গেট-ম্যানটা বোধ হয় টেলিফোনে কথা বলছে।

—হ্যাঁ হুজুর, আমি ভুষণ! লাইন-ক্লিয়ার হয়েছে?

তারপর সজোরে যেন একটা কাঁসের শব্দ হলো। বোধ হয় লিভার টানলে। তারপর ঠিং-ঠিং করে গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। আর কোনও গাড়ি আসতে পারবে না। টপ্‌টপ্‌ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো জোরে। হাওয়া দিচ্ছে পুব দিক থেকে। জলো হাওয়া। সমস্ত শরীর যেন শিরশির করতে লাগলো। থরথর করে কাঁপতে লাগলো। শাড়িটাকে আরো এঁটে গায়ে জড়িয়ে নিলে সতী। মাথার ওপর ঘোমটা টেনে দিলে। তারপর সেইখানে গুমটির নিচে দাঁড়িয়েই ট্রেনের চাকার প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলো একমনে। ট্রেনটা আসছে অনেক দূর থেকে। সতীর মনে হলো, ও যেন ট্রেন নয়, ও যেন মিস্টার ঘোষালের পাঠানো মৃত্যু-দূত। সতীর অনাদি অতীত আর অনন্ত ভবিষ্যৎ আজ যেন তার এক মুহূর্তের বর্তমানের কাছে হঠাৎ একেবারে নিরর্থক হয়ে উঠলো। আর সতী সেই অন্ধকারে ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুহূর্ত-পল-দণ্ড হিসেব করতে লাগলো অধীর আগ্রহে!

মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতে লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আলো হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে ছোট একটি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বের কোনও মূল্য নেই। কে মরলো কে বাঁচলো তা দেখবার দায় নেই মহাকালের। মহাকালের নিরিখে একটা যুগ কি একটা শতাব্দীর ইতিহাস হয়ত বড়ই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সে জানে যে প্রবল আকর্ষণ সূর্য থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে সূর্যে প্রসারিত তার মহাবিক্রমে মানুষের ইতিহাস অনাদিকাল ধরে অব্যাহত চলবে। সে জানে মানুষের অস্তিত্বরাজ্যের বিনাশ হতে পারে না। তাই গ্রহ তারা-চন্দ্র-সূর্যের দল আলো হাতে বারবার মানুষের দরজায় এসে উঁকি দেয়। উঁকি দিয়ে দেখে কোথায় কোন মানুষ জেগে আছে, কোথায় কোন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। তার বলে—কোথায়

তুমি? তোমার জন্যেই তো অনাদিকাল ধরে আমাদের যাত্রা, তোমার সন্ধানেই তো আমাদের অনন্ত পরিভ্রমণ! এমনি অনাদি-কালব্যাপী সন্ধানের পর কোটি কোটি বছর পার হয়ে যায়। পার হয়ে যায় যুগ-যুগান্তর। হঠাৎ কয়েক শতাব্দীর পর আবির্ভাব হয় একজন বুদ্ধদেবের, আবির্ভাব হয় একজন যিশুখৃষ্টের, আবির্ভাব হয় একজন মহম্মদের, আবির্ভাব হয় মহাত্মা গান্ধীর। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলোকে জয়ডংকা বেজে ওঠে, মরলোকে জয়-শংখ!

দীপংকরবাবুর চলে যাবার আয়োজন হয়েছিল। রাত্রি দশটায় ট্রেন। আমরা তাঁর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর গল্প শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন—আমি মৃত্যু দেখেছি। মৃত্যুকে অনুভব করেছি, মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তা-ও নয়। আমি মৃত্যুকে কিনেছি—

মৃত্যুকে দীপংকরবাবু কিনেছেন! আমরা যারা শুনছিলাম তারা সবাই অবাক হয়ে গেলাম।

—হ্যাঁ, আমার টাকা ছিল, আমার ধার করা লক্ষ টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমি সতীর সুখ কিনতে চেয়েছিলাম, সতীর শান্তি কিনতে চেয়েছিলাম। শুধু সতীর নয়, পৃথিবীর সকলের মঙ্গল কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হলো না। আমি টাকা দিয়ে জীবন কিনতে পারিনি, মৃত্যু কিনলাম—অঘোরদাদু আমাকে ভুল শিখিয়েছিল—

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন—যারা তোমাদের জেনারেল বই লেখেন, যারা তোমাদের টীচার, যারা তোমাদের গার্জেন তারা সবাই অঘোরদাদু। সেই অঘোরদাদুরাই আজ আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সব জায়গাতেই আছেন অঘোরদাদুরা। আমি বাঁকুড়া থেকে চলে এসেছি, বর্ধমান থেকে চলে এসেছি, হুগলী থেকে চলে এসেছি, সব জেলা থেকেই চলে এসেছি, এবার এখান থেকেও চলে যেতে হচ্ছে। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। পৃথিবীর এক জায়গায় আমি মানুষ খুঁজে পাবোই। আমার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার দল আলো হাতে খুঁজতে বেরিয়েছে। কোটি কোটি বছর ধরে তারা খুঁজছে, আরো খুঁজবে। আমি হতাশ হই না, আমি হতাশ হবো না—

বললাম—তারপর?

—তারপর?

যে অমৃতময় পুরুষ বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন, তিনি সেদিন সাক্ষী রইলেন। সাক্ষী রইল অনন্ত আকাশ, অসীম দিগন্ত। আর সাক্ষী রইল 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর অসংখ্য পাঠক। তাঁরা জানলো সতী সেদিন মৃত্যু চায়নি। সতী সেদিন সুখ চেয়েছিল, শান্তি চেয়েছিল,

স্বামী চেয়েছিল। আর আর একটি জিনিস চেয়েছিল। সে চেয়েছিল মাতৃত্ব। সে চেয়েছিল সন্তান।

হুড়মুড় করে ট্রেনটা আসছে। সামনের হেডলাইটটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষতর। সতী গুমটি-ঘরের নিচে থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল এক জোড়া চকচকে ঝকঝকে লাইনের দিকে। চাকায় চাকায় তখন দুর্দান্ত বেগ, শিরায় শিরায় তখন দুর্দম উন্মাদনা! কাল সকাল সাতটা! কাল সকাল সাতটার মধ্যেই মিস্টার ঘোষাল এসে শেষ জবাবদিহি চাইবে। তার খেসারত চাইবে। হয় দীপংকরের মৃত্যু, নয় সতীর সতীত্ব!

এবার ট্রেনটা আরো কাছে এসে পড়েছে।

তুমি আমায় ক্ষমা করো। আজ সারা রাত হাঁটতে হবে। তুমি বলেছিলে ঘরের ভেতরে আমরা দুজনে মিলে এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করবো। তুমি বলেছিলে তুমি অনেক রাত ঘুমোওনি। আমার কথা ভেবে-ভেবে তোমার ঘুম আসেনি অনেক দিন। আজ তুমি তোমার মাকে না বলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলে আমার কাছে। আমি তোমাকে আমার বিছানায় শুইয়ে এসেছি। আমি তোমাকে বলেছি—আমি এখনই আসবো। আমি বলেছিলাম—আমি যাবো আর আসবো! কিন্তু দীপু? দীপু যে শিলিগুড়িতে, কাল যে ওরা যাবে, কাল যে ওরা শিলিগুড়িতে যাবে। দীপু যে খবর পায়নি, দীপুকে যে সাবধান করে দেওয়া হয়নি! দীপু যে......

হঠাৎ সতীর মনে হলো পাশে দিকের লাইনের ওপর দিয়ে কে যেন চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে—

—কে? কে ও? মিস্টার ঘোষাল? ঘোষাল কি জানতে পেরেছে? তার চারদিকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলেছে ঘোষাল!

সতী চিৎকার করে উঠলো না, না, দীপুর কোনও ক্ষতি কোরো না তোমরা, দীপু আমার কেউ নয়, দীপুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, দীপু কিছু জানে না। সে নিষ্পাপ, সে নিরপরাধ, সে নিষ্কলঙ্ক......

ট্রেনটা তখন আরো কাছে এসে পড়েছে। আর ওদিকে মিস্টার ঘোষাল দৌড়তে-দৌড়তে তার দিকে আসছে......আরো কাছে এসে পড়লো......

তখন অনেক রাত। রঘু রান্না সেরে আবার গিয়ে ওপরে উঠলো। সনাতনবাবু ...া করে তখনও বসে ছিলেন। রঘু আসতেই সনাতনবাবু চেয়ে দেখলেন। রঘু বললে—এখনও দিদিমণি তো এল না দাদাবাবু—

সনাতনবাবু বললেন—আসবেন ঠিক, ...ম কিছু ভেবো না—

—আপনি কি খেয়ে নেবেন? অনেক রাত হয়েছে—

—দিদিমণি আসুন, তারপর খাবো না-হয়।

—কিন্তু তাঁর যদি আসতে দেরি হয়?

সনাতনবাবু বললেন—দেরি হবে কেন? তিনি তো জানেন আমি এখানে আছি—

—তা হলে আমি একটু খুঁজে দেখবো?

হঠাৎ নিচেয় সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়লে। রঘু বললে—ওই দিদিমণি এসেছে, যাই—

বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে সদর দরজাটার খিল খুলে দিলে। বললে—কী আক্কেল আপনার দিদিমণি, এত দেরি করতে হয়! আমরা ভাবছি কত। কোথায় গিয়েছিলেন?

(সি-৩৭৯৩)

—এ-বাড়িতে তোমাদের কোনও মেয়ে-মানুষে ছিল? সবাই বলছিল—এই বাড়িতে থাকতেন তিনি......

এক দল লোক। সবাই হাঁফাচ্ছিল। এত লোক দেখে রঘু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। বললে—কী চান আপনারা? কাকে চান?

—তোমাদের বাড়ির কোনও মহিলা রেলে কাটা পড়েছে? জানো তুমি?

—রেলে কাটা পড়েছে? কে?

—তা জানি না। সবাই বলছে তিনি এই বাড়িতে থাকতেন, শীগগির চলো, দেখবে চলো...

রঘুর মাথায় তখন যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। দরজা খোলা পড়ে রইল। রঘু সেই অবস্থাতেই ছুটলো লেভেল-ক্রসিং-এর দিকে। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে তখনও। অনেক লোকের ভিড় জমেছে লাইনটার কাছে। ট্রেনটা খানিক দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনটা যেন রাগে লজ্জায় অপমানে আঘাতে আপন মনেই ফুঁসছে তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

রাত যখন আরো অনেক গভীর হলো, তখন হঠাৎ ন'দিদির টেলিফোন বেজে উঠলো। ন'দিদি বললে—কে?

—আমি নয়ন। সর্বনাশ হয়েছে ন'দিদি, আমার বউমা রেলের তলায় কাটা পড়েছে—

—বলিস কী তুই?

নয়নরঞ্জিনী বললে—হ্যাঁ ন'দিদি, এই তো এখন পুলিস এসে আমায় খবর দিয়ে গেল। এখন কী করি? হাত-পা আমার থরথর করে কাঁপছে, তাই তোমায় টেলিফোন করলুম—। আমার ছেলেও সেখানে রয়েছে—

ন'দিদি কী কথাটা যেন হঠাৎ বুঝতে পারলে না। বললে—তোর ছেলেকে সেখানে পাঠালি কেন আবার?

—আমি কি পাঠিয়েছি ন'দিদি! কখন গেছে খোকা টেরই পাইনি। বিকেল বেলা একটা লোক এসে খবর দিয়ে গেল খোকা নাকি সেখানে রাতে থাকবে। ভাবলুম সকাল-বেলাই তোমার কাছে পরামর্শ চেয়ে নেব, তা এখন এই কাণ্ড! এখন কী করি বলো দিদিমণি! যদি একটা পুলিসের হাঙ্গামের মধ্যে পড়ে যাই! তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আমার কি যাওয়া উচিত?

—তা তোর বউয়ের তো অনেক টাকা আছে শুনেছিলুম। বাপের অনেক টাকা তো পেয়েছিল?

—তা তো পেয়েছিল। দেড় লাখ টাকার মতন—

ন'দিদি বললে—তা হলে এক্ষুনি যা, এক্ষুনি যা, দেরি করিস নে। টাকাকড়ির ব্যাপার, মরে যাবার পর টাকা হাত-ছাড়া হয় হামেশা—এমন ভুল করিস নে, কোথা থেকে কে এসে জুটবে শেষকালে, তখন হাত-পা কামড়াবি, যা—

নয়নরঞ্জিনী দাসী টেলিফোন রেখে দিলেন। তারপর সেই রাত্রেই শম্ভুকে ডেকে ট্যাক্সি ডাকতে বললেন।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খবর পৌঁছুলো উনিশের একের-বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাড়াটে বাড়িতে। লক্ষ্মণ সরকার অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। লক্ষ্মণ বলেছিল—তুমি বরং খেয়ে নাও, দীপঙ্কর আর আসবে না হয়ত আজকে—

ক্ষীরোদা সমস্ত দিন ধরে রান্না করেছে। কত দিনের সাধ তার। লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমি না-হয় খবর নিয়ে আসছি, একটু দাঁড়াও—

তারপর অফিসে টেলিফোন করে খবর পেলে জেনারেল ম্যানেজারের স্পেশ্যাল ক্যানসেলড্ হয়ে গেছে। এবার হয়ত দীপু সোজা এখানেই আসবে। বাড়িতে এসে বললে—তোমার সব তৈরী তো? দীপু এই এসে পড়লো বলে—

কিন্তু তারপর রাত সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, ন'টা বাজলো। শেষকালে ঢং-ঢং করে দশটাও বাজলো। আর খাওয়া হলো না। লক্ষ্মণ একলাই খেয়ে নিলে। বললে—তুমি খাবে না? কতক্ষণ আর তার জন্যে বসে থাকবে?

ক্ষীরোদা কিছু বললে না। সারা রাত জেগেই হয়ত কাটতো। কিন্তু অনেক রাত্রে কে যেন দরজার কড়া নাড়লে। গায়ে একটা ঠেলা লাগতেই লক্ষ্মণ ধড়ফড় করে উঠলো। বললে—কে? কে ডাকছে?

ক্ষীরোদা বললে—নিচেয় কে কড়া নাড়ছে —দেখো না—

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি নিচেয় যেতেই সব শুনে অবাক। বললে—সেন সাহেব? গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এ? কী হয়েছিল?

কিন্তু খবরটা ক্ষীরোদার কানে যেতেই কেমন যেন টলে উঠলো মাথাটা। সেইখানেই পড়ে গেল মেঝের ওপর। সেদিন যে কী বিপদের মধ্যেই পড়েছিল লক্ষ্মণ! এদিকে ক্ষীরোদার মাথায় জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানো, ওদিকে দীপঙ্করের অ্যাকসিডেন্ট। দীপঙ্কর যে কেন ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল, কিছুতেই বুঝতে পারেনি সেদিন লক্ষ্মণ সরকার। শেষ পর্যন্ত ক্ষীরোদার যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন লক্ষ্মণ সরকার একলাই যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্ষীরোদা ছাড়েনি। বলে-ছিল—আমিও যাবো, আমাকেও নিয়ে চলো—

মিস্টার ক্রফোর্ড নিজে এসেছিল খবর পেয়ে। জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে তুমি কী করতে এসেছিলে সেন? হোয়াট রট্ ইউ হিয়ার?

দীপঙ্কর তখনও কিছু উত্তর দেয়নি। উত্তর দেবার কী-ই বা ছিল! কেউ তো বুঝবে না কেন সে এসেছিল এখানে। সেই অল্প অন্ধকার জায়গাটা তখন লোকে লোকারণ্য। পুলিস এসেছে। মানুষের ভিড়ে জায়গাটা জমজমাট হয়ে উঠেছে। নয়নরঞ্জিনী দাসী এসেছেন। শম্ভু এসেছে। সনাতনবাবু এসেছেন, রঘু এসেছে। লক্ষ্মণ সরকার এসেছে। ছিটে-ফোঁটাও খবর পেয়ে এসেছে। ন'দিদিও এসে দেখে গেল। দীপঙ্করের তখন স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। পায়ে খুব আঘাত লেগেছিল। রেলের লাইনের ওপর সতীর দেহটা তখন আড়াআড়ি পড়ে আছে। চাকাগুলো বোধ হয় একেবারে বুকের

ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। সমস্ত জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে ভিজে গেছে। মুখখানা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। মাথার কোঁকড়ানো চুলের খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে ব্যালাস্টের ওপর। দু' পাশে দুটো হাত পাতা। সব চাওয়া সব পাওয়া সব কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার যেন সমাধি হয়ে গেছে এক মুহূর্তে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দীপঙ্করের চোখে জল পড়েনি সেদিন। শুধু মনে হয়েছিল—এই মৃত্যুর মধ্যেই যেন তার জীবনের চরম জিজ্ঞাসার শেষ উত্তরটি পেয়ে গেছে সে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভই যেন তার হয়ে গেল একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যেন জীবনের পরম অর্থ সে খুঁজে পেলে। যে প্রশ্ন সে অমলবাবুকে করেছিল, যে প্রশ্ন সে প্রাণমথবাবুকে করেছিল, যে প্রশ্ন সে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে বিশ্ববিধাতার কাছে নিবেদন করতো, সেই চরম প্রশ্নের পরম উত্তর যেন তাকে সতীই জানিয়ে গেল। সতীই যেন তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল কড়ি দিয়ে জীবন কেনা যায় না। কড়ি দিয়ে মৃত্যুই কেনা যায় শুধু......

তারপরেই তারা দীপঙ্করকে লেক হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিস রিপোর্ট দিলে এ কেস্ অব্ সুইসাইড।

তারপর বছরের পর বছর হোসেনভাই কাশেমভাই-এর অফিসে প্রতি মাসে মনি-অর্ডারে টাকা এসে পৌঁছেছে। কখনও বাঁকুড়া থেকে। আবার কয়েক মাস পরে বর্ধমান থেকে। আবার কখনও হুগলী থেকে। বাঙলার নানা জেলা, নানা গ্রাম থেকে মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠিয়েছে দীপঙ্কর সেন। লক্ষ টাকার ঋণ! সারা জীবন ধরেই হয়ত ঋণ শোধ করে যাবে দীপঙ্কর। সতীর ঋণ সারা জীবন ধরেই শোধ করে যাবে সে। রেলের এত বড় চাকরির পর অল্প মাইনের চাকরি। কোথাও আশী টাকা মাইনে, কোথাও এক শো, কোথাও দেড় শো। সেই মাইনে থেকে মাসের পয়লা কিংবা দোসরা তারিখে মনি-অর্ডার এসে পৌঁছোয়। কোনও মাসে পঞ্চাশ, কোনও মাসে চল্লিশ, কোনও মাসে ষাট। একদিন এই টাকা দিয়েই সতীর শাশুড়ীকে ঋণমুক্ত করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, এই টাকা দিয়েই সতীকে সুখী করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, এই টাকার ঘুষ দিয়েই সতীর ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু দীপঙ্কর তখন জানতো না যে, পরিবার-বোধের চেয়ে বিশ্ববোধে যতই মানুষ বড় হয় ততই তাকে আত্মবিলোপ করতে শিখতে হয়। ততই বৃহৎ ত্যাগের জন্যে তৈরী হতে হয়। ঐক্যবোধের চেষ্টার মধ্যেই যে মনুষ্যত্বের সাধনা নিহিত তা যেন সতীই তাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাত দশটায় ট্রেন ছাড়বে। আমরা সবাই স্টেশনে গেলাম তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে।

কাশী জিনিসপত্র নিয়ে আগেই উঠেছিল। দীপঙ্করবাবু গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে কোনও ক্ষোভ নেই, মনে কোনও দুঃখ নেই। বললেন—তোমরা যারা এখন ছোট, তোমাদের কাছেই আমার বেশী আশা। তোমরা একদিন বড় হবে। তোমরা আমারই মত আরো জীবন দেখবে। আমারই মতন ছিটে-ফোঁটাদের দেখবে, লক্ষ্মীদি, সতীকে দেখবে, নয়নরঞ্জিনী দাসীকে দেখবে, লক্ষ্মণ সরকার, ক্ষীরোদা, কিরণ, সবাইকে দেখবে। দেখবে বিন্তী, লক্কা, লোটন, সবাইকে। আজও যদি গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর সেই বাড়িতে যাও তো দেখবে সেখানে দাতারবাবু আছেন, লক্ষ্মীদি আছে। তাঁদের ছেলে মানস আজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে ইন্ডিয়ারই কোনও জেলখানায়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে গেলে দেখবে সনাতনবাবু আজও মানুষের লেখা পুঁথির মধ্যে মনুষ্যত্বের সূত্র বার করবার চেষ্টা করছেন। দেখবে নয়নরঞ্জিনী দাসীর মেজাজ এখন আরো উগ্র হয়েছে। বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস, শম্ভু আজও সেই শাসনের আওতায় জীবিকার যন্ত্রণা পাচ্ছে। রেলের অফিসে, পেট্রল কোম্পানীর অফিসে আজও ঘোষাল সাহেবেরা সশরীরে শাসন-দণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্বজয় করে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি না-ও দেখতে পাও তো তাদেরই মতন আরো অনেক লোক দেখতে পাবে। দেখবে অঘোরদাদুরা আজও বেঁচে আছে কড়ি দিয়ে সব কেনবার জন্যে। আজকের অঘোরদাদুরাও ঘরের মধ্যে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে পাচিয়ে ফেলছে, তবু দেবতার ভোগ দেবতাকেও দিচ্ছে না, মানুষকেও খেতে দিচ্ছে না। শুধু আমিই তোমাদের মধ্য থেকে চলে গেলাম। আর এক জেলায়, আর এক গ্রামে আমি আবার আশ্রয় চাইবো, আবার হয়ত সেখান থেকেও আমায় চলে যেতে হবে। তবু আমি হতাশ হবো না, তবু আমি আশা ছাড়বো না—মানুষ আমি খুঁজে বার করবোই।

আর বেশী সময় ছিল না। প্লাটফরমের ঘণ্টা পড়লো।

একটু থেমে বললেন—একটা কবিতা সেদিন পড়েছিলুম, কবিতাটা বড় ভালো লেগেছিল, সেটার খানিকটা তোমাদের শুনিয়ে যাই। এক বিখ্যাত ইংরেজ কবির লেখা—তাঁর নাম ডবলিউ এইচ অডেন—

All that I have is a voice
To undo the folded lie,
The romantic lie in the brain
Of the sensual Man in the Street,
The lie of Authority
Whose buildings scrape the sky;
There is no such thing as the State
And no one exists alone:
Hunger allows no choice
To the citizen or the police,
We must love one another or die

সমাপ্ত

চিত্রগ্রীব

বছরখানেক আগে খোলা রাস্তায় নিজের ছবির প্রদর্শনী করে শিল্পী প্রকাশচন্দ্র কর্মকার শহরে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেই নতুন ধরনের প্রচেষ্টার ফলে শিল্পরসিক জনসাধারণ চিন্তা ও দক্ষতায় বলিষ্ঠ কৃতিত্বসম্পন্ন এক শিল্পীর আঁকা ছবির সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ করে। স্বনামখ্যাত স্বর্গত শিল্পী প্রহ্লাদ কর্মকারের পুত্র হলেও প্রকাশচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হন এবং ছবি আঁকায় তিনি প্রথম শিক্ষালাভ করেন গবর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। দু'বছর মাত্র সেখানে থেকে আর্থিক অনটন হেতু আর্ট স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও চর্চা তিনি ত্যাগ করেন নি। স্টুডিওতে যোগদান করে তিনি দিলীপ দাশগুপ্তের অধীনে তেলরঙের মাধ্যমে ছবি আঁকা আয়ত্ত করেন এবং ১৯৫৭ সালে প্রথম একক ছবির প্রদর্শনী করেন। সে সময়কার তাঁর ছবি ছিল বাস্তবধর্মী তেল ও জলরঙের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রতিকৃতি আঁকাতেই তাঁর কাজ নিবদ্ধ ছিল।

প্রায় বছরখানেক হলো প্রকাশচন্দ্র শিল্পী নীরোদ মজুমদারের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই থেকে তাঁর প্রভাবে নিজস্ব একটি বলিষ্ঠতর শৈলীর উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। গত ২৪শে জানুয়ারি ৩১, পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে উদ্বোধিত প্রকাশ কর্মকারের ছবির একক প্রদর্শনীতে তাঁর নিজস্ব নতুন শৈলীর চমৎকৃত হবার মতো দৃষ্টান্ত দেখা গেল। প্রদর্শিত মোট
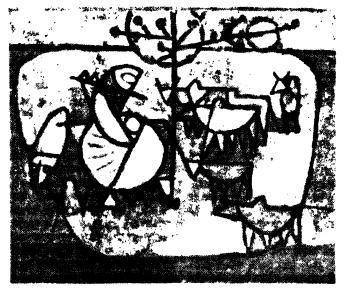
গোপাল

কুড়িখানি ছবিতেই ভারতের আদি হিন্দু শিল্পধারার অনুগামী জ্যামিতিক রেখার সঙ্গে বাঙলার পটশিল্পের রঙের প্রয়োগ-ধারার সমাবেশে এমন একটা নিজস্বতা আয়ত্ত করেছেন যা চট করেই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে. বিশেষ করে মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত ছবিগুলি। গোপিনীদের বস্ত্রহরণ (১৯নং), দশভুজা (১৫নং), ননী চোর (১৭নং), রাসলীলা (২০নং) এবং মহিষমর্দিনী (১৬নং) প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলি যেমন, তেমনি তীরে বাঁধা নৌকা (৮নং), জীর্ণ পাটাতন (১৩নং), ভাঙা জেটি (৯নং) প্রভৃতির পরিচ্ছন্ন রচনাগুণে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। পূজারিণী (১০নং), দেবদাসী (৩নং), জেলেনী (১৪নং) প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিকৃতিতে ভাস্কর্যের গঠন লক্ষ্য করা যায়।

সামগ্রিক বিচারে শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এবং রেখা ও রঙের নতুনভাবের

প্রসাধন

সমন্বয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যধারাকে পরিস্ফুট করে তোলার দিক থেকে প্রকাশ কর্মকারের ছবিগুলি সাম্প্রতিক কালের অতি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে অভিহীত করা যায়। প্রদর্শনীটি আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

(১৫)

দেখতে দেখতে পুজোর দিন ঘনিয়ে লো।

সকাল হলেই বুড়ী অট্টামা লাঠি ঠুকঠুক র এসে হাজির হয় কালীতলায়। গাঁয়ের কা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও ভিড় করে স দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্‌গ্রীব বড় বড় চোখ লে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

কবে সেই চাটুজ্জেরা কালীতলার ঘর খানা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল, বেঁটে চিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল সামনের রটা। তারপর থেকে আর খড়ি পড়েনি লে, চুনসুরকি খসে খসে পড়েছে। নে ওখানে দেয়ালের গায়ে বট অশত্থের া গজায়, গরুতে খেয়ে দেয় তাই রক্ষে। না হলে কবে দেয়াল ভেঙে পড়তো। এক লা বৃষ্টি হয়ে গেলে লোকের পায়ে য়ে সামনের চত্বরটা জলকাদায় প্যাচ প্যাচ র। ক'বছর ধরেই চেষ্টা হচ্ছে ইঁট পেতে য় সিমেন্ট করাবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল্পনা কল্পনাই হয়।

অট্টামা মাঝে মাঝে বলে, অ গুপেন, দীতলাটা বাবা শান বাঁধিয়ে দে তোরা, ড়া মানুষ কবে পা হড়কে পড়ে মরবো ই ভালো হবে!

গোপেন মোড়ল শুনে হাসে। বলে, হবে, ।

অট্টামা সান্ত্বনা পায় না সে কথায়। বলে, তোমার পাঁচজনে মিলে হবে না, তুই দে . ওটুকু বিলিতি মাটি ফেলে বাঁধিয়ে

গোপেন মোড়ল হাসে।—অত টাকা থায় গো!

—হেই মা! গালে হাত দিয়ে বিস্ময় শ করে অট্টামা, ফোকলা মুখে হেসে বলে, বিদয় মোড়লের ছেলের কথা না। সেবার, আমরা সব পোষলা ত বেরিয়েছি। উপুরঝুপুর বিষ্টি, তলা থেকে ফিরতে পারি না এমন । তোর বাপ করলে কি জানিস, ষ দিয়ে পাঁচ বস্তা ধান ঢেলে দিলে । মারতে!

গোপেন হেসে বললে, সেই সব নবাবীর জন্যেই তো আজ এই হাল হয়েছে গো অট্টামা।

অট্টামা আপত্তি করে বলে, ও কথা বলিস না গুপেন, মানুষের দেয়া ফুরোয় না, ভগবানের দেয়া ফুরোয় না। তোর বাপের তো কই কোন অভাব ছিল না বাবা।

গোপেন কোন জবাব দেয় না, মনে মনে শুধু বলে, বাপকে বোকা পেয়ে যা পেরেছো কাঁদিয়ে নিয়েছো, তা বলে আমাকে অত বোকা পাওনি।

অট্টামা অবশ্য শুধু গোপেনকেই নয়। যাকে কাছে পায় তাকেই বলে—হংসকে, গিরীনকে, এবার পেসাদকেও বলবে। শুধু দুর্গা পুজোর সময়েই নয়, কালী পুজোয় পাঁঠা বলির রক্তে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলেও ওই একই দশা।

কালীতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেইসব কথাই ভাবছিল অট্টামা, আর মনে পড়ছিল ফেলে-আসা-জীবনের সেইসব দিনগুলোর কথা। ওই বাচ্চা ছেলেগুলোর মত অট্টামাও যখন বড় বড় চোখ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতো কুমোরদের কারসাজি।

এখন আর তেমন ধানও নেই, ধ্যানও নেই। তেমন কুমোরও আসে না আজকাল, তেমন পিতিমেও হয় না।

বেদীর ওপর খড়ের গায়ে মাটি লেপছে কুমোরের দল। একমেটে শেষ হয়ে এসেছে।

বাচ্চা ছেলেগুলো আব্দার ধরে, গণেশের ইঁদুরটা করো না আগে।

কেউ বলে, মৌরটা আগে করো।

কুমোরের দল কান দেয় না সেসব কথায়, এক একবার বিরক্ত হয়ে ছেলেগুলোকে তাড়া করে। তারা ছুটে পালায় হাসতে হাসতে, আবার আসে।

অট্টামার মনে পড়ে সেইসব আগেকার দিনগুলো। খাওয়া দাওয়া ভুলে সকাল-সন্ধ্যে সব দাঁড়িয়ে থাকতো দিনের পর দিন। দেখতো, চোখের সামনে কেমন একে একে হাতের আঙুল, নাক মুখ চোখ, চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠতো প্রতিমার।

এদের মত কুমোরের দল তখন দু'দিন কাজ করেই অন্য গাঁয়ে পালাতো না। প্রথম থেকে শেষ অবধি থাকতো, কাজ সেরে তবে ছুটি নিতো। এখন আর পুজোয় প্রাণ নেই যেন। সব বাবসাদার হয়ে গেছে, মনে মনে ভাবে অট্টামা। দশটা কাজ এক সঙ্গে হাতে নেন, একমেটে করেই আবার পালাবে, হঠাৎ একদিন এসে দোমেটে করবে। তারপর আবার একদিন হয়তো রঙ করবে প্রতিমার

গায়ে, ঘামতেল দেবে। ডাকের সাজ—তাও ক্বচিৎ কদাচিৎ হয়। ওসবের নাকি অনেক খরচ।

লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর টাটিয়ে ওঠে, লাঠি নামিয়ে বসে পড়ে অট্টামা।

ছেলেগুলোকে বলে, মা দুগ্গার পুজো তোরা আর কি দেখলি মানিক। এখন আর পুজো বলে মনেই হয় না।

সত্যি, তখন এমনভাবে ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দিতো নাকি কুমোররা। বরং ডেকে ডেকে কাউকে সাপ, কাউকে ইঁদুর, প্রজাপতি, টিকটিকি সব গড়ে দিতো কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে অট্টামা। কুমোরদের বলে, ডাকের সাজ না হলে মানায় না মাকে, বুঝলে গো।

কুমোররা হাসে। বলে, টাকা না দিলে কি ডাকের সাজ হয় মা।

কখনো অট্টামা বলে, তখন সব কুমোর আসতো, পিতিমে গড়া শেষ করে, মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তবে ছুটি নিতো। তোমাদের মত এমন খেপে খেপে কাজ করে পালাতো না।

কুমোররা হেসে বলে, তখন যে একটা গাঁয়ের প্রতিমে গড়েই পেটের ভাত জুটতো!

টাকা আর পেটের ভাত! এ ছাড়া যেন কথা নেই। কই তখন তো এসব কথা তারা বলতো না। অট্টামার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মা দুগ্গার প্রতিমা গড়ছে, এ কি কম পুণ্যির কথা! ওদের মুখে পেটের ভাতের কথায় মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। চোখের সামনে কাঠের পাটায় খড়ের মেড় বাঁধা হ'ল, তার ওপর মাটি, একমেটে, দোমেটে, রঙ-সাজ... ও যে কি আনন্দ। ভাসুরের ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে ননীকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে যেদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বিয়ে দিলে সেদিন যেমন আনন্দ হয়েছিল, এও যেন তেমনি!

বসে থেকে থেকে কুমোররা যখন পুকুরে ডুব দিয়ে খেতে গেল তখন উঠলো অট্টামা। লাঠিটা তুলে নিয়ে ঠুকঠুক করে বাড়ির পথ ধরলে। ভাবলে, আর কটা দিনই বা আছি। পেসাদকে একবার ডাকের সাজ করাতে বললে হয়।

পরমুহূর্তেই কি ভেবে মাঝপথেই থমকে দাঁড়ালো। না, গিরিজাপ্রসাদকে বলা উচিত হবে না। কি ভাববে পেসাদ কে জানে। হয়তো ভাববে মাথা খারাপ হয়ে গেছে অট্টামার। তা না হলে কালীতলা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন তার। যেন একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে বলেই সব কিছু ভুলে যেতে হবে। রক্তমাংসের মানুষ তো অট্টামা, ছেলেবেলার সেই দিনগুলোর কথা ভুলবে কি করে! কালীতলায় দাঁড়িয়ে পুজো দেখতে দেখতে এখনো নেশা হয় যেন।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে অট্টামা। পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে যায়, স্বামীর কথা, ভাসুরের ছেলেমেয়েদের কথা। আর বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কথা বলার লোক পেলেই মুখর হয়ে ওঠে অট্টামা, হাসে, কথা বলে অনর্গল। অপরের আনন্দ দেখে নিজেও আনন্দ পায়। কিন্তু একা হলেই দুঃখে বেদনায় মুষড়ে পড়ে। সমস্ত বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে।

গিরিজাপ্রসাদ ভাবে, বংশী ভাবে, তেমন মানুষটা কেমন করে এমন হয়ে গেল। দিনরাত যার চোখ দুটো ছলছল করতো কোন এক লুকোনো ব্যথায়, বুড়ো হয়ে এমন হয়ে গেল কি করে সে।

অট্টামা নিজেও হয়তো ভাবে কখনো কখনো। আর নিজের মনকেই বলে, বদলে কি আর গেছি আমি? না, বদলায়নি। হাসি ঠাট্টা, অনর্গল কথার আড়ালেই বুঝি নিঃস্ব জীবনটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে।

নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে কখন যে কোটালপাড়ার দিকে ঠুকঠুক করে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে অট্টামা, নিজেই টের পায়নি।

উদাসের বউয়ের চিৎকারে চমক ভাঙলো।

পুকুর পাড়ে চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে শুনলো অট্টামা। দূর থেকে উঁকি দিলো বংশীর বাড়ির দিকে।

দেখলে উদাস সাইকেলটা মাটিতে ফেলে বসে বসে কি করছে, আর উদাসের বউ লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে।

বংশীকে কি যেন বলতে এসেছিল অট্টামা। লক্ষ্মীমণির চিৎকার শুনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরলো।

বাবলার কাঁটা লেগে সাইকেলের চাকা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। তাই বসে বসে সারাচ্ছিল উদাস। আর লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছিল।

পয়সাকড়ি দেবার নাম নেই, সংসারের ওপর একটুকু মায়া নেই; আর লক্ষ্মীমণির কোলে একটা ছেলেও দেয়নি উদাস। তাই সদাসর্বদাই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে থাকে।

কিন্তু এমন তো ছিল না উদাস। পদ্মকে দেখার পর লক্ষ্মীমণির মেজাজও যেন আরেক পর্দা চড়ে গিয়েছিল।

বনপলাশিতে উঠে এলো পদ্ম আর পদ্মর বাপ পাঁচু কোটাল। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলো বংশীর সঙ্গে।

সেই প্রথম পদ্মকে দেখলো উদাস। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতর পর্যন্ত একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এ যেন সোনা ফেলে দিয়ে ধুলোমুঠি আঁচলে বাঁধার মত। চেয়ে চেয়ে পদ্মর রূপ দেখলো উদাস, তার হাসি, তার কথা বলার ঢঙ। এমন মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছিল বংশী। অথচ মেয়েটাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে চায়নি উদাস। ড্রাইভারীর নেশায় তখন ডুবে আছে ও। ভেবেছে লক্ষ্মীমণিকে বিয়ে না করলে ড্রাইভারী শেখার সুযোগ কেড়ে নেবে লক্ষ্মীমণির বাপ।

পদ্মর মনেও একটা কৌতূহল ছিল। বাপের কাছে শুনেছিল ও, বনপলাশির উদাস কোটালের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

মনে মনে তা নিয়ে এক-আধটু স্বপ্নও হয়তো দেখেছিল।

পাশের গাঁয়ে মামার বাড়িতে গিয়েছিল ও। হঠাৎ খবর এলো উদাস আর তার বাপ এসেছে মেয়ে দেখতে। গাড়ি জুতে তখনই পদ্মকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তার মামা।

কিন্তু এসে পৌঁছলো যখন, শুনলো, উদাস চলে গেছে। মেয়ে দেখবে না সে, বিয়ে করবে না এখানে।

সেদিন কথাটা শুনে মনে আঘাত পেয়েছিল পদ্ম। ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে, সে দেখতে রূপসী, কোটালদের ঘরে এমন মেয়ে মেলে না। যেমন তেমন মেয়ে পেতেও যেখান মুঠো মুঠো টাকা লাগে, সেখানে তার মত মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না উদাস, ভাবতেই পারেনি পদ্ম।

কি আছে উদাসের! ড্রাইভারী শিখছে এই যা। উদাসের বিয়ের খবরটাও পদ্মর কানে গিয়েছিল, আর তাই লক্ষ্মীমণিকে দেখার এত উৎসাহ ছিল। ভেবেছিল, না জানি পদ্মর চেয়েও সুন্দর বুঝি। তা না হলে পদ্মকে ফেলে সে মেয়েকে বিয়ে করবে কেন উদাস।

আর, আর ভেতরে ভেতরে উদাসের ওপর একটা প্রতিশোধ নেবার বাসনাও যেন জেগে উঠলো পদ্মর মনে।

তাই সময় পেলেই এসে হাজির হতো ও উদাসের কাছে। গ্রাম্য সম্পর্ক টেনে লক্ষ্মীমণিকে বলতো, বুন। আর উদাসকে ডাকতো বোনাই বলে। ঠাট্টা রসিকতা লেগেই থাকতো মুখে।

ভোর বেলাতেই একবার ঢুঁ মেরে যেত। বলতো, কি গো বোনাই, নেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছো নাকি? বলি বুনটাকে আমার ছেড়ে দাও গো, ওর কাজ আছে অনেক।

কখনো ঘরে গিয়ে উঁকি দিতো। লক্ষ্মীমণিকে বলতো, রোদ উঠলো মাথার ওপর, আর ফিসফিস করিস না লো।

সব ব্যাপারেই রসিকতা করে কথা বলতো পদ্ম। আর রাগে জ্বলে যেত লক্ষ্মীমণি। উদাসও রাগতো; তবু বলতো না কিছু।

রাগ হবারই তো কথা। মনের মিল নেই যাদের, দুজনে দুজনকে যখন একেবারেই সহ্য করতে পারে না, তখন কেউ পীরিত ভালবাসা নিয়ে রসিকতা করলে চটে উঠবে না?

উদাস কোন কোন দিন আড়ালে বলতো, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না পদ্ম, বুকের জ্বালাটা তোমার ব্যঙ্গ শুনে আরো দপ্‌ করে ওঠে।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠতো পদ্ম। বলতো লাটের মতন কথা কইছো তুমি বোনাই। বুকের জ্বালাটা কিসের বটে, শুনি।

উদাস বিষন্ন মুখে বলতো, সে জ্বালা তুমি বুঝবে না গো বুঝবে না। ফুল-কাঁটার শয্যায় শয়ন আমার, যেদিক পানে ফিরে শুই না ক্যানে, কাঁটা ভুঁকবে গায়ে।

শুনে আরো সশব্দে হেসে উঠত পদ্ম। বলতো বুককে আমার বলে দোব!

উদাস জবাব দিতো, সে আমিই বলি তাকে, লুকোছাপো নেই গো আমার। পষ্ট কথার মানুষ আমি।

কথাগুলো বলার সময় উদাস কোন কোনদিন রেগে যেত। আর তা দেখে পদ্ম বুঝতে পারতো জ্বালাটা কোথায়। আর উদাসকে অসুখী দেখে হয়তো খুশীই হতো পদ্ম। যেন নিজের অপমানটার প্রতিশোধ নিচ্ছে এমনি ভাবে রসিকতা করতো আবার। একদিন যাকে সে চাচ্ছিলো দেখিয়েছিল উদাস, চোখের দেখাও দেখতে চায়নি, তারই জবাব যেন।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি ধৈর্য ধরে থাকতে পারতো না। প্রথম প্রথম পদ্মর ঠাট্টা শুনে উদাসকেই গালাগাল দিতো। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে যেন একটা সন্দেহ উঁকি দিতে শুরু করলো লক্ষ্মীমণির মনে। অত হেসে হেসে কথা বলে কেন সে উদাসের সঙ্গে। আর উদাসও যেন পদ্ম এলেই খুশী হয়। বসিয়ে বসিয়ে কথা বলে, গল্প করে।

প্রথম প্রথম একটু একটু ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলতো লক্ষ্মীমণি, আড় চোখে তাকিয়ে দেখতো পদ্মকে আর উদাসকে। হাসি হাসি মুখে তাদের গল্প করতে দেখতো, আর জ্বলে যেত ভেতরে ভেতরে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রাগ চেপে রাখতে পারলে না। হাজরাদের বাড়িতে ধান ভাচা নতে গিয়েছিল সে, ফেরার পথে দেখলে, ঘাটে বসে বাসন মাজছে পদ্ম, আর উদাস তার সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

দূর থেকে দুজনকে দেখেও কিছু বললে না লক্ষ্মীমণি, মনের রাগ মনেই পুষে রাখলে। ভাবলে, পদ্মকে মুখের ওপরই একদিন বলবে। এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেবে।

আরেকদিন বাড়ি ফিরেই দেখলে কোলে পুনকো শাকের ঝুড়ি নিয়ে শাক বাছছে পদ্ম ঘরের পৈঠেতে বসে, আর উদাস একটু দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

লক্ষ্মীমণিকে দেখেই মুখচোখের ভাব বদলে গেল উদাসের। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে ফেটে পড়লো লক্ষ্মীমণি। কর্কশ রুক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠলো সে।

বললে, আমার ঘরকে আর আসিস না তুই পদ্ম।

—ক্যানে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে পদ্ম।

লক্ষ্মীমণি চিৎকার করে উঠলো আবার। —এটা পীরিত করার ঠাঁই লয় তোর, নাগরকে নিয়ে রসের কথা কইতে হয়তো বাড়ি নদীর পাড়কে যেয়ে কর।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে, লজ্জায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো পদ্ম। তারপর একবার উদাসের মুখের দিকে তাকিয়েই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আর সেইদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করলে লক্ষ্মীমণির কাছ থেকে উদাসকে সে ছিনিয়ে নেবে। উদাসের জন্যে সেই প্রথম যেন একটা সহানুভূতি বোধ করলে। মনে হলো, মানুষটার মনে সত্যিই বুঝি কোন শান্তি নেই।

দিনে দিনে উদাসের ওপর মায়া পড়ে গেছে পদ্মর। মনে হয়েছে মানুষটার মন থেকে দুঃখটুকু যদি মুছে নিতে পারে।

আর উদাস অনুরোধ করে বলেছে, ও ডাইনীর কথাটা তুমি কানে নিও না পদ্ম। আমার ঘর আর তোমার ঘর পেথক নয়।

তা শুনে হাসি হাসি মুখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় উদাসের চোখে চোখ রেখে। বলে, আমার লেগে তোমার ঘর ভাঙবে, আমি চাই না বোনাই।

উদাস পদ্মর হাতখানা চেপে ধরে। বলে, আমার ভাঙা বুকটা জোড়া লাগবে পদ্ম। বলে অসহায়ের মত তাকিয়েছে উদাস।

তা দেখে পদ্মর বুকেও ব্যথা লেগেছে, চোখ ছলছল করে উঠেছে তার। উদাসের অনুনয় ভরা চোখের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

ধীরে ধীরে পরস্পর পরস্পরের কাছে এসেছে, দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়েছে দুজনে।

তারপর সেই অন্ধকার রাত্রি। গোপনে বেরিয়ে এসেছে উদাস তার ঘর থেকে। এসে অপেক্ষা করেছে পুকুরের পাড়ে, অন্ধকারে।

পদ্মর ছায়াশরীরটাও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে। আর অন্ধকারের মধ্যে দুটি ছায়া-শরীর আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে গেছে।

পরদিন থেকেই উদাস জেগে উঠেছে একটা নতুন মানুষ হয়ে। দামু পালের আড্ডায় গিয়ে বলেছে, একটা যাত্রা লাগিয়ে দাও দামুদাদা!

এমনিভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন লক্ষ্মীমণিকে এসে বললে উদাস, পদ্মকে আমি বিয়ে করবো।

স্তম্ভিত বিস্মিত চোখ তুলে উদাসের মুখের দিকে তাকাল লক্ষ্মীমণি।

উদাস আবার বললে, পদ্মর বাপকে বলেছি, মত দিয়েছে পাঁচু কোটাল।

কোন কথা বললে না লক্ষ্মীমণি; কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল উদাস। একটা ক্ষ্যাপা বেড়াল যেন রোঁয়া ফুলিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হঠাৎ চালা থেকে কাটারীটা বের করে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল লক্ষ্মীমণি। পাঁচু কোটালের ঘরের দিকে। অন্ধকারে তাকে দেখতে পেল না উদাস।

কিন্তু পদ্ম কেন যে শেষ পর্যন্ত উদাসকে একটা কথাও না জানিয়ে চলে গেল, কোথায় গেল, খুঁজে পায় না উদাস।

কালীতলার সামনে দিয়ে যেতে যেতে প্রতিমার দিকে চোখ পড়ে তার। কুমোরের দল মাটি দিচ্ছে প্রতিমার গায়ে। আর কটা দিন তো মাত্র বাকী। ওদিকে যাত্রার রিহার্সাল চলছে প্রতি রাত্রে। কিন্তু কই, আগের মত কোন উৎসাহই পাচ্ছে না যেন উদাস।

কার জন্যে গলা ফাটিয়ে অভিনয় করবে সে। কেউ তো মুগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে না, তোমার দুঃখে কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা করেচে সবাই, তুমি লাট বট গো বোনাই, পেকিতো লাট!

(ক্রমশ)

পরিচ্ছদে শালীনতা

মাননীয় 'দেশ' সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরিচ্ছদে শালীনতা' নামক প্রবন্ধে শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় শাড়ী পরিহিতা ভারতীয় নারীসমাজ থেকে শুরু করে কবি সাহিত্যিকদের পর্যন্ত তাঁর কলমের আঁচড়ে মসীলাঞ্ছিত করেছেন। সর্বশেষে তিনি একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, 'সভ্যতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে আমাদের এখনো বহু যুগ বিলম্ব আছে।'

এই জাতীয় উক্তির আকস্মিকতায় হতচকিত মনে অনিবার্যভাবেই একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে : সভ্যতার সংজ্ঞা তবে কি? তার নিদর্শন কি শুধু বাইরের আবরণেই পরিস্ফুট এবং কেবলমাত্র বেশ পরিবর্তনেই আয়ত্ত করা যায়. সভ্যতা কি এতই অনায়াসলভ্য? সভ্যতার এই বিশ্ববিদ্যালয়টিই বা পৃথিবীর কোন্ মহাদেশে অবস্থিত? শাড়ী পরে তার তোরণদ্বার অতিক্রম করার এত বড় দুর্লঙ্ঘ বাধা কি? সভ্যতার এই তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কি একহাঁটু কাদাজল? তা যদি হয়, তা হলে বলব যে, উক্ত প্রবন্ধের লেখিকা সেই কাদাজল নির্বিচারে ও নিঃসংকোচেই চারদিকে ছিটিয়েছেন।

প্রাচ্য আদর্শের দোহাই দিয়ে, বিবর্তনের ঢেউকে পাশ কাটিয়ে আজও যাঁরা শাড়ীকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, লেখিকা যে শুধু তাঁদের উদ্দেশেই বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হয়েছেন, তা নয়। বৈষ্ণব মহাজনদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত কবি, যত সাহিত্যিক শাড়ীর কথা প্রসংগক্রমেও উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও এর থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অরসিকের কাছে রসের নিবেদন যুগে যুগেই ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই।

আমাদের সাহিত্য থেকে শাড়ীকে বাদ দিলে যা থাকে তা হ্যামলেটবিহীন নাটকেরই সমতুল্য—এটিও আর একটি অতিশয় উপমা। ভারতীয় সাহিত্যিকরা চিরদিনই অন্তরের সৌন্দর্যকে বাইরের রূপের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে যেহেতু ভারতীয় মেয়েরা শাড়ী পরে থাকেন, সেই কারণেই ভারতীয় সাহিত্যে শাড়ীর প্রসঙ্গ বারেবারে উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, শাড়ীর মতন এমন সুন্দর ও লাবণ্যময় পরিচ্ছদ যে শিল্পীর মনে সাড়া জাগাবে না, এ কথা মনে করাই ভুল। সেইজন্যে মেয়েদের শাড়ী পরার জন্য সাহিত্যিকদের দোষী করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ বা বৈষ্ণব কবিদের কেউ যে Christian Dior-কে জীবনের আদর্শ করেন নি, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কলকাতার রাজপথে শাড়ী পরিহিতা মহিলাদের দুর্দশা উক্ত প্রবন্ধে লেখা ও রেখায় সযত্নে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে যখন থার্মোমিটারের পারা শূন্যের নীচেও তিরিশ ডিগ্রি নেমে যায়, অথবা সারা রাতের তুষারপাতে রাস্তায় প্রায় এক ফুট বরফ জমে যায়, তখন কেবলমাত্র স্বচ্ছ নাইলনের মোজায় পদযুগল আবৃত করে রাস্তায় হাঁটার কষ্ট কি তার চেয়ে কম?

আমাদের দেশের শাড়ীকে লেখিকা অভিহিত করেছেন 'অতি বিষম অঙ্গাবরণ' বলে। কেননা, তাঁর মতে শাড়ীর লালিত্যের আড়ালে আমাদের সাবলীলতা, আত্মপ্রত্যয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সব কিছু চাপা পড়েছে। শাড়ী পরে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দেওয়া অবশ্যই অসম্ভব—সে ক্ষেত্রে তদুপযোগী পোশাক পরিধান করলে কেউ আপত্তি তোলেনি বা তুলবে না। কিন্তু ঐ শাড়ী পরেই আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ক্ষেতের কাজ করছে, কারখানায় খাটছে, দরকার হলে ইঁট মাথায় করে ভারার ওপর দিয়েও উঠে যাচ্ছে। তৎসত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করব যে, অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে শাড়ী অসুবিধার সৃষ্টি করে। কিন্তু যে-জাতীয় আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শুধু একখানি কাপড়ের আড়ালেই চাপা পড়ে যায় তা চাপা থাকাই ভালো, তা প্রকাশের যোগ্য নয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—রূপের গভীরতা চর্ম পর্যন্ত। কিন্তু হতভাগ্য ভারতরমণীদের আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি তার থেকেও অগভীর? তা কি শুধু বাইরের আবরণেই প্রকাশমান, তার সংগে কি মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের কোন সংযোগ নেই? শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের মতে শাড়ীই আমাদের সলজ্জ, সংকুচিত ও দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। লজ্জা জিনিসটা নিন্দনীয় কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেদের স্বভাবের সংকোচ ও দ্বিধার জন্য লেখিকা কাকে দায়ী করবেন? চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য পরিচ্ছদকে দোষী করাটা উঠোনের ওপর অনর্থক দোষারোপের পর্যায়ে পড়ে। চরিত্র জিনিসটা দরজীকে ফরমাশ দিয়ে বানানো যায় না, তার জন্যে প্রয়োজন বহুদিনের সাধনা। আর লালিত্য ও আত্মপ্রত্যয় কথা দুটি পরস্পরবিরোধী নয়।

জাপানের অমতে এতদিন কিমোনো চাপা ছিল এবং এখন তার পুনরুদ্ধার হয়েছে এ সংবাদটি কোন সূত্রে প্রাপ্ত তা না জানা সত্ত্বেও বলব যে, খবরটি অত্যন্ত আশ্বাসজনক। তা হলে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে, তা হলে নিউক্লিয়ার বোমা কেন, মেগাটন বোমা পর্যন্ত জাপানে ব্যর্থ হবে। অধুনা *অব্যবহার্য কিমোনো দিয়েই জাপান আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। এই প্রসংগে উদ্ধৃতি চিহ্নের অন্তর্গত 'যাহা লইয়া আমরা যুগের উপযোগী হইব না......' এই বাক্যটিও কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বোঝা গেল না। কিন্তু এটি যদি মৈত্রেয়ীর সেই বিখ্যাত বাণী 'যে নাহং নামৃতা স্যাম...'এর প্যারোডি হয়,* তা হলে দুঃখের সংগেই বলতে বাধ্য হব যে, ভারতীয় দর্শনের এ জাতীয় বিকৃতিসাধন না করলেই ভাল হত।

বিশেষত, 'যুগের উপযোগী' এই কথাটি আধুনিককালে অত্যন্ত ভয়াবহ। পশ্চিমের মেয়েদের বেশভূষায় যুগোপযোগিতার ধুয়ো আজ উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে। সেখানে আজ যা লেটেস্ট স্টাইল, কাল তা আউট-অফ-ডেট। সেখানে বসন্তের ফ্যাশন হেমন্তে মরাপাতার মতন ঝরে পড়ে যায়। পরের বসন্তে আবার প্রয়োজন হয় নতুন পোশাকের। আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় এ-জাতীয় যুগোপযোগিতা সহ্য হবে না। শাড়ীর সপক্ষে একটি প্রচণ্ড যুক্তির অবতারণা লেখিকা নিজেই করেছেন। 'শাড়ী পরতে দরজীর শরণাপন্ন হতে হয় না। শরীরের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে শাড়ীর মাপের কোন তারতম্য হয় না।' এক কথায় শাড়ী সর্বজনীন। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ পল্লীরমণীর মধ্যে কজনের তাঁতী ও দরজী উভয়ের চাহিদা মেটাবার মতন সামর্থ্য আছে? এই নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর সত্যটি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হবার সময় এসেছে।

কর্মক্ষেত্রে শাড়ীর অনুপযুক্ততার জন্য যদি কেউ বিদেশী পোশাক পরতে চান ও তদনুযায়ী আর্থিক সচ্ছলতা যদি তাঁর থাকে, তা হলে তা নিয়ে আপত্তি করব না। সমালোচনা যা হয় তা হয় পরিচ্ছদে যাঁরা বিকৃত রুচির পরিচয় দেন তাঁদের বিরুদ্ধে। অনেক আধুনিকা এমন ধরনের শাড়ীজামা পরে থাকেন—যার চেয়ে সুরুচিসম্মত বিদেশী পোশাক অনেক শোভন। যে শাড়ীকে শালীনতার প্রতীক বলা হয়ে থাকে, তা স্ফটিকস্বচ্ছ নাইলনের শাড়ী নয়। রুচিবিকৃতি সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয় এবং তা বিদেশী মেয়েদের গ্রীষ্মবেশের নজির দেখিয়ে সমর্থনযোগ্যও নয়। অপর পক্ষে ওদের দেশের মেয়েদের পোশাকের যে নয়নাভিরাম বর্ণসম্মিলন ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা তো এখানে বিশেষ দেখা যায় না। অন্যের মন্দটাই অনুকরণ করতে হবে আর ভালটা গ্রহণ

ব্যাপার বিষয়ে উদাসীন থাকব—এটাই বা কেমন মনোভাব?

শাড়ীর বিপক্ষে হয়তো আরো অনেক চমকপ্রদ যুক্তি খাড়া করা যায়, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশী পোশাক পরতে বলা হবে কাদের? বিবর্তনের স্রোতে গা ভাসাবার সামর্থ কজনের আছে? যাদের পায়ে ছেঁড়া চটিই জোটে না, তাদের হাইহীল জুতো পরতে উপদেশ দেওয়াটা রুটির অভাবে কেক খেতে বলার মতনই হাস্যকর। সমগ্র দেশের জনসাধারণের কথা ধরলে দেখা যাবে যে, আমাদের দেশে যাঁরা ছাতি বা বর্ষাতি ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরা অসাধারণ। সাধারণ লোকের অধিকাংশেরই একটি বস্ত্রই অদ্বিতীয়—কি শীতে, কি বর্ষায়, ভারতীয় নারীদের শাড়ি পরার সমস্যায় আজ যাঁরা কাতর হয়ে পড়েছেন, তাঁদের পাশ্চাত্যের ঔজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত চোখের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করি ভারতের গ্রামাঞ্চলের সেইসব দরিদ্র মেয়েদের প্রতি, যাদের শাড়ীতে তালি দেবার বস্ত্রখণ্ডটিও ভিক্ষা করে নিতে হয়, অথবা কলকাতারাই অন্তর্গত সেইসব গোকুলে যেখানে ঘুঁটের স্তূপের পাশে গোরুমোষের শাবকের সাথে একসঙ্গে বেড়ে উঠছে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সেখানে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করলেই শালীনতা রক্ষার নিদারুণ অক্ষমতা দেখে ইচ্ছাকৃত অশালীনতা আপনা থেকেই লজ্জা পাবে।

অমিতা রায়
কলকাতা

২

সম্পাদক "দেশ",

সবিনয় নিবেদন,

গত এগার সংখ্যার দেশে শ্রীমতী এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় পরিচ্ছদে শালীনতা প্রসঙ্গে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা একাধিক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ লাইন থেকে শুরু করা যাক। "পরিচ্ছদে হ্রস্বতার চিহ্ন দেখে আজকে যাঁরা কৃষ্টি কৃষ্টি বলে আর্তনাদ করছেন, কে জানে ইতিহাস হয়তো তাঁদের প্রতি কৌতুকভরে দৃক্‌পাত করছে।" এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। এক বিশেষ পরিচিতাকে হ্রস্বদৈর্ঘ্যের জামা কেন পরেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে বলেছিলেন, উনি কনভেন্টে পড়া মেয়ে, গ্রামীণ নন। কথায় কথায় ভেনেজুয়েলা-ফেরত এক বিদেশী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, সেখানে পুরুষদের শর্টস্ পড়ে রাস্তায় বেরোনো বেআইনী। এবার প্রশ্ন করি, লেখিকা যখন "হ্রস্বতার" কথা লিখেছেন তখন পরিচ্ছদে "স্বচ্ছতার" কথা কেন লেখেননি? পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একাধিকবার এক মহিলাকে দেখেছি যাঁর ব্লাউজ্ স্বচ্ছতার এক অপূর্ব নিদর্শন। দৃশ্য অন্তর্বাস প্রদর্শনে প্রকট। পূর্বোক্ত মতের বিরোধী "বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর লোক যস্মিন দেশে যদাচারে বিশ্বাসী নন।"

শাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও লেখিকা বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলেছেন। একবার বলেছেন, "শাড়ীর অগণিত সুবিধা সম্বন্ধে আমাদের মতদ্বৈধ থাকার কথা নয়।" তারপর আর এক জায়গায় বলেছেন, "কিন্তু এই অতি বিষম অবগুণ্ঠন আবৃত করেছে মেয়েদের আত্মপ্রত্যয়, রুদ্ধ করেছে তাদের স্বাভাবিক সাবলীলতা, অঙ্কুরে বিনাশ করেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বীজ।" উচ্ছ্বাসোক্তি। যতদূর জানি, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক শাড়ী পরেই দরবার করেন; এবং বিদেশ ভ্রমণও শাড়ী পরে করেন। শাড়ী ওনার আত্মপ্রত্যয় আবৃত করেছে কিংবা স্বাভাবিক সাবলীলতা রুদ্ধ করেছে এমন কোন সংবাদ আমরা পাইনি।

সব বক্তব্যের পর উনি যে লাইন—"যাহা দ্বারা আমরা যুগের উপযুক্ত না হইব তাহা লইয়া আমরা কি করিব?" (লেখিকা জানিয়েছেন, দুরাত্মার কোটেশনের অভাব হয় না)—উদ্ধৃত করেছেন তাতে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, "জাপানকে অমৃতত্ব লাভ করতে কিমোনো উৎসর্গ করতে হয়েছে" সেইজন্য ভারতবর্ষকে অমৃতত্ব লাভ করার জন্য উনি কি শাড়ী উৎসর্গ করতে সুপারিশ করেন?

যদিও লেখিকা অত্যাধুনিক বীটনিকদের আলোচনা থেকে বাদ দিতে বলেছেন, তথাপি মনে হয় এই বীটনিকদের বহুল প্রভাব ওনার অবচেতন মনে। কারণ প্রবন্ধ পাঠের পর মনে হয় পরোক্ষে উনি অত্যাধুনিকতার পক্ষেই ওকালতি করেছেন। বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার মাধ্যমে পরিচ্ছদের অসুবিধা দূর করার চেষ্টা গ্রহণীয়। নকলনবিসীতে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোন কৃতিত্ব নেই। ইতি—

নরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৪০

বাংলা ছন্দ ঃ পয়ার

"দেশ" সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

"দেশ"-এর ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু "মানসী"-কাব্যের ছন্দ প্রসঙ্গে বাংলা ছন্দের তানপ্রধান রীতিকে পয়ার নামে পরিচিত করতে চেয়েছেন। তার উত্তরে ১০ম সংখ্যায় নীলরতন সরকার এবং ১২শ সংখ্যায় সামসুল হক মহাশয় আলোচনার সূত্রপাত করে বিষয়টিকে কৌতুকপ্রদ করে তুলেছেন। এ বিষয়ে নীলরতনবাবু বিষয়টিকে অনেকখানিই স্পষ্ট করে তুলেছিলেন কিন্তু সামসুল হক মশায় আবার অনেকখানি ভ্রান্তিবিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন বলেই সংক্ষেপে কিছু বলতে চাইছি।

নীলরতনবাবু ঠিকই বলেছেন, পয়ার বাংলা ছন্দের কোন প্রকৃতি নয়, আকৃতি। অপভ্রংশের ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ থেকে বাংলা উচ্চারণ রীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে (আদ্য শ্বাসাঘাত ও অন্ত্যস্বরবর্জন) ১৪ মাত্রার পয়ারের জন্ম। এই পয়ারের ৮, ৬-এর বন্ধন সুনির্দিষ্ট এবং অন্ত্যমিল অবশ্যকর্তব্য। জাতি বিচারে বাংলা ছন্দ তিন প্রকারঃ শ্বাসাঘাতপ্রধান বা স্বরবৃত্ত, ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত এবং তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত। এই তিন প্রকৃতিতেই পয়ার লেখা হয়েছে, তার কিছু কিছু উদাহরণ নীলরতনবাবু দিয়েছেন এবং বহু দেওয়া যায়। সুতরাং পয়ার কোন ছন্দ নয়, ছন্দোরূপ বা প্যাটার্ন। সোনার অলঙ্কারের ওপর যে নকশা কাটা যায়—তা আবার রূপার অলঙ্কারের ওপরও কাটা যায়—তাতে যে পার্থক্য ঘটে তা ধাতুগত, নকশাগত নয় অর্থাৎ প্রাণগত, দেহগত নয়। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু দেহকেই প্রাণ বলে গণ্য করে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

তবে এ ভ্রান্তিও কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য নয়। পয়ারের একটি শক্তি আছে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "শোষণশক্তি"। তার ফলে যথেচ্ছ যুগ্মধ্বনি ব্যবহার করলেও ছন্দের কোন ত্রুটি হয় না অর্থাৎ ১৪ মাত্রা বজায় থাকে। আবার তানপ্রধান ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য যুগ্মধ্বনির সংকোচন ও একমাত্রা প্রাপ্তি। তার ফলে তানপ্রধানের অন্তর্নিহিত তানপ্রবাহে যুগ্মধ্বনিগুলি খাপ খেয়ে যায়। এই যোগাযোগের ফলেই পয়ার ও তানপ্রধান একাত্ম হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও আকৃতি, প্রাণ ও দেহের মূলগত পার্থক্য আজ আর লক্ষিত নয়। তাই তানপ্রধানকে পয়ার বললে সে অপরাধ অমার্জনীয়ও নয়। ইতি—

করুণাময় মজুমদার
বাগজলা, দমদম

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র

"দেশ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

বিগত ১০ম সংখ্যা (২৯ বর্ষ) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় লিখিত "লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র" নামক পত্রটি পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সিদ্ধার্থবাবুর সমালোচনা নিশ্চয়ই সময়োপযোগী। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমি বলিতে বাধ্য যে, বি বি সি টেলিভিসানে সেই আলোচনা সভায় সিদ্ধার্থবাবু এবং অন্যান্য ভারতীয় ছাত্র যথেষ্ট প্রশংসনীয়ভাবে মিঃ মোরেস-এর বক্তব্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই—যাহার জন্য সমস্ত ভারতীয় দর্শক হতাশ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। মিঃ মোরেস ভারত সরকারের গোয়া নীতি সম্পর্কে যে মতামত বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তা অতিশয় নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই মতামতের প্রকৃত সমালোচনা করার সুযোগ সেই সভায় ছিল, কিন্তু

সিদ্ধার্থবাবু কিংবা কোনও ছাত্রই তীব্রভাবে সমালোচনা করেন নাই। তা করিলে আমরা সকলে আরও আনন্দিত হইতাম। দেশ পত্রিকাতে পত্র লিখিয়া মিঃ মোরেস-এর সমালোচনা করা সময়োপযোগী বটে কিন্তু যথাস্থানে সামনাসামনি বসিয়া সমালোচনা করা অধিকতর প্রশংসনীয় হইত।

রানী এলিজাবেথের ভারত যাত্রার প্রাক্কালে লেখেন মিঃ মোরেস। কলিকাতা মহানগরী সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচার করেন। এবং প্রতিটি ফিল্ম-এর চিত্রনাট্য লেখেন মিঃ মোরেস। কলিকাতা মহানগরী সম্পর্কে যে ফিল্মটি দেখানো হয়, তাহা দেখিলে বাঙ্গালী কেন, যে কোনও ভারতবাসী লজ্জাবোধ করিবেন। অবিলম্বে কলিকাতার মাননীয় মেয়র মহাশয়কে অনুরোধ জানাইয়া একটি পত্র লেখা হয়—তিনি যেন এর প্রতিবাদ করেন এবং পত্রের আর একটি অনুলিপি লণ্ডনের হাই কমিশনারকে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ দূরের কথা, কেহ পত্র প্রাপ্তির সংবাদটুকুও জানান নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক কিছুদিন আগে চিকাগো সম্পর্কে অনুরূপ একটি ফিল্ম বি বি সি টেলিভিসানে দেখানো হয়। চিকাগোর মেয়র শুধু প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া বি বি সি-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। কলিকাতার মেয়র প্রতিবাদ না করুন, কোনও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কী? আমাদের হাই কমিশনারই বা কী করিয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করে। ভারতবর্ষ এবং ভারত সরকার সম্পর্কে মিঃ মোরেস-এর নিন্দা বিবৃতি নিন্দনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের নিষ্ক্রিয়তাও কী নিন্দনীয় নয়?

ইতি

ডাঃ চুনীলাল রায়

নিউ ক্যাসেল

বাংলার গ্রাম

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

'বাংলার গ্রাম' সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা আরও ব্যাপকভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পল্লীগ্রামের বর্তমান দুর্দশার জন্য আমার পূর্ববর্তী লেখকগণের কেহ গ্রামবাসীদের স্বার্থপরতাকে দায়ী করিয়াছেন, কেহ প্রাণহীন আমলাতান্ত্রিক নীতি ও অকর্মণ্যতার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরের উপর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসাবে গ্রামাঞ্চলে কাজ করিবার পর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় একথা বলিতে পারি যে, পল্লীগ্রামের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য বিশেষ কোন পক্ষকেই এককভাবে দায়ী করা চলে না। এ পাপ আমাদের সকলের।

অনেকদিনের পুঞ্জীভূত অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা আমাদের গ্রামগুলিতে সংকীর্ণতা, দলাদলি ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির জন্ম দিয়াছে। এই বিভেদ ও স্বার্থপরতা গ্রামের উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা একথা যেমন সত্য, গ্রামোন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতাও তার জন্য সমানভাবে দায়ী একথাও তেমন সত্য। গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রামজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও পরিপূর্ণ বিকাশই সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলকথা। কিন্তু অজস্র অর্থব্যয় ও এতদিনের চেষ্টায়ও এই পরিকল্পনা গ্রামজীবনে কোন উল্লেখযোগ্য সাড়াই আনিতে পারে নাই। অনেক স্থলেই কেবলমাত্র সরকারী কর্মপ্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া এই পরিকল্পনা "শিবহীন যজ্ঞে" পরিণত হইয়াছে।

আমার বিগত কর্মজীবনে এই ব্যর্থতার দুইটি প্রধান কারণ বিশেষভাবে অনুভব করিতাম। প্রথম কারণ, রাজনৈতিক দলাদলি। গ্রামের সাধারণ লোক রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামায় না কিন্তু তাহাদের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন প্রভাব রহিয়াছে। ফলে দলীয় স্বার্থে গ্রামের বৃহত্তর কল্যাণপ্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রে বানচাল হইয়া যায়। উন্নয়ন ব্লকের কর্মচারীদের উপরও প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক কর্মীর প্রভাব অনিবার্যভাবেই আসিয়া পড়ে। রাজনীতির এই প্রভাব হইতে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দূরে সরাইয়া না রাখিলে ব্যর্থতার বোঝা বাড়িয়াই চলিবে।

দ্বিতীয় কারণ, যোগ্য ও উপযুক্ত গ্রামকর্মীর অভাব। গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন ও গ্রামজীবনের পূর্ণ বিকাশের পথে যাঁহারা সাহায্য করিবেন তাঁহাদের যে বিশেষ শিক্ষা ও দরদী মনের প্রয়োজন, অনেক গ্রামকর্মীরই তাহা নাই। ফলে গ্রামবাসীদের নিকট তাঁহাদের পরিচয় 'চাকুরীজীবী' একদল সরকারী কর্মচারী হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। কতিপয় সুবিধাবাদী 'তথাকথিত নেতৃস্থানীয়' গ্রামবাসী ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাময়িকভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন, আবার স্বার্থের প্রতিবন্ধক হইলে তাঁহারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামকর্মীদের বিপক্ষে দাঁড়ান। গ্রামে দেশ ও দশের কল্যাণকামী প্রকৃত সৎ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা নিজেরাই দূরে সরিয়া থাকেন। ফলে পরিকল্পনা মহৎ উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়। সমস্ত কিছুই 'ভস্মে ঘি ঢালিবার' সামিল হইয়া উঠে। বাস্তব অবস্থার চাপে আত্মনিষ্ঠ সৎ ও গ্রামের প্রকৃত কল্যাণকামী সরকারী কর্মচারীদেরও (যদিও সংখ্যায় তাঁহারা নিতান্তই অল্প) উদ্যম ও উৎসাহ স্তিমিত হইয়া আসে। অন্য দশজন সরকারী কর্মচারীর মত তাঁহারাও কোনমতে চাকুরী রক্ষা করিয়া 'দিনগত পাপক্ষয় করাকেই' প্রধান দায়িত্ব বলিয়া ভাবিতে শুরু করেন।

এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন কি সম্ভব নহে? গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অথবা কোন নীতিগত পরিবর্তনে কি এই বাস্তব সমস্যার সমাধান হইবে? সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার কোনও উপায় কি নাই?

ভবদীয়

সত্যদাস চক্রবর্তী

২

সবিনয় নিবেদন,

'বাংলা দেশের গ্রাম' শীর্ষক আলোচনায় (দেশ, ৩০ অগ্রহায়ণ) শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির জঘন্য প্রবৃত্তির জন্য অন্যান্য গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার অভিযোগ এনেছেন। সরকারী অর্থ নিজ স্বার্থে ব্যয় করে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির বাড়ি তৈরী করার দৃষ্টান্ত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত চিঠি থেকে মনে হচ্ছে যে, একজনের স্বার্থপরতার কলঙ্ক বহুবচন হয়ে আর সকলের অগৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুনেছি অর্থ বরাদ্দ করবার পর সেই অর্থ যথোচিতভাবে ব্যয় হল কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সরকারী রীতি আছে। যদি সেই রীতি থেকে থাকে তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বরাদ্দীকৃত অর্থ ব্যক্তিবিশেষের বাড়ি তৈরীর তহবিলে পরিণত হয় কী করে? এজন্য পক্ষপাতিত্ব না করেও বোধ হয় জিজ্ঞাসা করা যায়, এই অন্যায় কাজ প্রতিরোধে সরকারী দায়িত্ববোধ কি জাগরূক ছিল না? যে কোনও জনকল্যাণমূলক কাজে রাষ্ট্র থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার ভূমিকায় থাকেন জনসাধারণ, বিশিষ্ট কোনও একজন বা দু'জন নন। জনসাধারণকে বঞ্চনা করবার অবাঞ্ছিত সুযোগ যদি কেউ পান এবং তার ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপব্যয় ঘটে তাহলে সেই অনর্থের কলঙ্ক অবহেলিত গ্রামবাসীরা বহন করবেন কেন? সরকারী সাহায্য প্রকৃতির করুণা বর্ষণের মত অনুগ্রহরূপে আসে না। এতে আছে সকলের সমান অধিকার এবং সেই অধিকারভোগে যদি কোনও ব্যত্যয় ঘটে তাহলে সেই বঞ্চনার জন্য জনসাধারণই কৈফিয়ৎ চাইবেন।

দিলীপকুমার দাস

কসবা, কলিকাতা-৩২।

।। স্মৃতির পাতা ।।

ডাঃ নিশীথচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ শো ছেচল্লিশের বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব, দিল্লি আর বিহারের ভয়াবহ স্মৃতি আজও কেউ ভুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। নোয়াখালিতে দাঙ্গা বেধেছে। প্রতিদিন কাগজের শিরোদেশে সেই বীভৎস অত্যাচার আর নির্যাতনের সংবাদ দেখতে দেখতে দিনরাত্রিগুলি যখন বিভীষিকাময়ী হয়ে উঠেছিল সেই সময়কার একটি স্মৃতি আজও মনে আছে। এই পাশবিক অন্ধকারের মধ্যে মানবিক জ্যোতি। কাগজেই পড়লাম গান্ধীজী দিল্লি থেকে নোয়াখালি এসেছেন। নভেম্বর মাসে চৌমোহিনীতে এসে পৌঁচেছেন। সেই সময় আমি I N A C-তে একজন কর্মী। দুপুর-বেলায় মেসে বসেছিলাম। হঠাৎ এক বন্ধু এসে বললে, নোয়াখালি যেতে হবে। তৈরী হতে হবে এক্ষুনি, পারবে?

পারব না বলার সাহস ছিল না। পারব তাও বলতে দ্বিধা ছিল। বন্ধুটি চোখের দিকে দুবার তাকাতে আর কোন কথা না বলে কীটব্যাগের মধ্যে জামাকাপড় ঢোকাতে শুরু করলাম। দশ মিনিট পরে আমরা দুজন বেরিয়ে এলাম। সামনেই আমাদের একটি জীপ অপেক্ষা করছিল। আমি নিঃশব্দে উঠে পড়লাম। তখন ভয় বা উদ্বেগের চেয়েও একটা রোমাঞ্চকর নেশাই যেন মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। জীপ থামল এলগিন রোডে, নেতাজীর বাড়ির সামনে। বন্ধু বললেন, চল, সামনের ঘরে বসি। শরৎচন্দ্র বোসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বড় বড় লোকের সামনে এখনও যাইনি। একটু সংকোচে, একটু ভয়ে ঘরে ঢুকলাম। দু এক মিনিট পরে শরৎচন্দ্র ঢুকলেন। হেসে অভ্যর্থনা করলেন। দু চারটি কথায় জানিয়ে দিলেন যে, ওখানে প্রচুর কাজ করতে হবে। বিপদের সম্ভাবনা কম নয়। চুপ করে শুনলাম। তারপর বললেন, একটু পরেই রওনা হতে হবে।

দমদম থেকে উড়োজাহাজ ছাড়ল। সঙ্গে কে কে ছিলেন মনে নেই, তবে শরৎচন্দ্র, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের দেবনাথ দাস এবং সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী ছিলেন মনে আছে। উড়োজাহাজের মধ্যের কথাবার্তা কিছুই আজ মনে নেই। আসলে তখন সমস্ত নোয়াখালির কথাই মন জুড়ে ছিল। কলকাতা হত্যাকাণ্ডের পর নোয়াখালিতে শুরু হয় ভয়াবহ দাঙ্গা, সরকারী হিসেবেই (আর সরকার তখন মুসলিম লীগ) প্রায় দু' শো বর্গমাইলব্যাপী লুটপাট হয়েছে, হাজারখানেক বাড়ি পুড়েছে, মরেছে প্রায় দু' শো। অবশ্য সবই সরকারী হিসেব। নোয়াখালিতে একটি ব্যাপারের সুযোগ

নিয়েছিল মুসলিম লীগ। নোয়াখালিতে বেশীর ভাগ হিন্দু ছিল অবস্থাপন্ন, জমি-জমা ছিল। আর মুসলমানেরা ছিল ভাগ-চাষী। অন্যের ক্ষেতখামার করেই দিন কাটাতে হয়। ফলে মনে মনে অনেকদিনের অসন্তোষ, অভিযোগ সব জমা হয়ে ছিল। আর মুসলিম লীগের উস্কানিতে এই রায়ত আর জমিদারের দ্বন্দ্ব রূপ নিল সাম্প্রদায়িক বীভৎস কলহে। সেই অসহ্য বর্বরতার মধ্যে আবার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করতে সেই বৃদ্ধ মহাত্মা এলেন হিংসায় উন্মত্ত পূর্ব-বাংলায়। প্লেনে বসে ভাবছিলাম, যেখানে ঐ মহাত্মা গেছেন নির্ভয়ে সেখানে আমার যেতে এত ভয় কেন। কতটুকু আমার প্রাণের মূল্য। কিন্তু স্বার্থবাদী মানুষ আমরা— মহাত্মার অগ্নিপ্রেরণা তখনও প্রাণের মধ্যে কোন নির্ভয় আহ্বান জাগাতে পারল না।

উড়োজাহাজ কুমিল্লায় এল। শরৎচন্দ্রকে দেখার জন্য বেশ ভিড় হয়েছে। শরৎ বোসের সঙ্গে আছি দেখে আমাকেও অনেকে কেষ্ট বিষ্টু ভাবেনি এমন বলা চলে না। ওখান থেকে ট্রেনে চলে এলাম চাঁদপুরে— আমাদের Base Camp-এ। শত শত ছিন্ন-মূল উদ্বাস্তু এসেছে সেখানে। কোন ভাষায় তাদের বেদনা প্রকাশ করা যায় না। ভয়ার্ত বৃদ্ধ, অসহায় নারী, ক্লান্ত যুবক, ক্ষুধার্ত শিশুর সেই সকরুণ দৃশ্যের ভয়াবহ ছবি। তার ওপর শীত এসেছে। সন্ধ্যার পর ফাঁকা মাঠ থেকে হু হু করে হাওয়া আসে আর এই অসহায় মানুষগুলি সেইখানে বস্ত্রহীন, খাদ্যহীন, সহায়হীন অবস্থায় রাত দিন কাটায়। রামকৃষ্ণ মিশন একটি রিলিফ শিবির খুলেছে সেই একমাত্র আশার আলো। চাঁদপুরেই আমার কাজ। এইখানে এক গণ্যমান্য ধনী ভদ্রলোক চালা-ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন— ঐখানে থাকুন—আপনাদের I N A C-র ছেলেরা ঐখানেই থাকে। রান্নাবান্না নিজেদেরই করতে হবে। প্রথম অবস্থায় অবশ্যই ব্যবহারটা বড় রূঢ় মনে হয়েছিল। যাই হোক, পরদিন থেকে outdoor-এ কাজ শুরু করলাম।

ভোরবেলায় সে কী করুণ দৃশ্য। শ্মশানের মত ভয়াবহ। কী ক্লান্ত, নগ্ন জীবনের সর্বশূন্য বিড়ম্বনা। এরই মধ্যে

আবার দু-চারজন অবস্থাপন্ন লোকও বিনা পয়সায় ওষুধ নিতে আসার মত পুরু চামড়াওয়ালা ছিলেন। আমার চেনা একটি ভদ্রলোক দেখি একদিন লাইনে দাঁড়িয়েছে। তিনি বোম্বাইতে থাকেন। বেশ ধনী। তিনিও বিনা পয়সায় ওষুধের জন্য লাইনে।

ইতিমধ্যে আদেশ এল মধুপুরে ক্যাম্পের ভার নিতে হবে। ট্রেনে করে চৌমোহিনী এলাম। এখানেও অবস্থা ভয়াবহ। চারদিকে দোকানপাটের ভগ্নাবশেষ। সব লুটপাট হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন কম। এক ধনী কংগ্রেসকর্মীর শরণাপন্ন হলাম। তিনি অর্ধচন্দ্র দিলেন। সেই অচেনা জায়গায় অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে মরিয়া হয়ে এক মাঝির কাছে দুঃখ নিবেদন করলাম। চালের নৌকা নিয়ে সে চলেছিল। তার মনুষ্যত্ব সেই কংগ্রেসসেবীর চেয়ে বেশী ছিল তাই অপরিচিতকে সে তার নৌকায় আশ্রয় দিল। সারা রাত্রি চালের বস্তার শুয়ে এলাম। ভোরে একটি জায়গায় নৌকা থামল। আমরাও নামলাম। হঠাৎ কয়েকটি মুসলমান পথচারী আমাদের ঘিরে ফেলল। আমরা মাত্র দুজন। আমাদের পরনে খাকী পোশাক। ওরা ভাবল বুঝি মিলিটারীর লোক। আমরা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে স্টেথিসকোপ দেখিয়ে বললাম, আমরা ডাক্তার, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সেবার জন্য আমরা এসেছি। আমাদের পকেটে ছোরাছুরিও নেই, পিস্তলও নেই। বোধ হয় দয়া করেই ওরা আমাদের ছেড়ে দিল। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বিনিদ্র রাতের ক্লান্তি দূর করার জন্য চায়ের সন্ধানে বেরুলাম। এই সময়ে সংগী চেঁচিয়ে বললে যে, দূরে একটি জীপ আসছে। তার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝলাম না। তবে জীপটি কাছে আসতেই সে হাত দেখিয়ে থামাল এবং এক নিশ্বাসে বলল, আমরা মধুপুর যাব। আমরা Indian National Ambulance Corps-এর চিকিৎসক। তোমরা পৌঁছে দিতে পারবে কিনা। তারা মিলিটারী মেজাজে বলল, যাও, তোমাদের মালপত্র নিয়ে এস। সময় পাঁচ মিনিট। রুদ্ধশ্বাসে আমরা ওষুধের ভারী বাক্সটি নামালাম এবং জীপে উঠে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তারপর নিশ্চিন্তে মধুপুর বাজারে পৌঁছলাম। এখান থেকে কিছু দূরেই আমাদের শিবির। সেই কংগ্রেসকর্মীরই বাড়ি—দুটি ঘর পাওয়া গেছে। একটিতে outdoor—অন্যটিতে আমরা থাকব। সকাল থেকেই কাজে লেগে গেলাম। বেশীর ভাগই জ্বর বা পেটের রোগ। একটি প্রসবের কেসও ছিল একদিন। এইভাবে দিন কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে খবর এল : গান্ধীজী ডাকছেন।

গান্ধীজী আছেন দু মাইল দূরে একটি গ্রামে শ্রীরামপুরে। তিনি ডাক্তার খুঁজছেন—তাই অধমের ডাক পড়েছে। গান্ধীজীর প্রতি তখন আমার মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। তাঁর অহিংস পন্থা আমার প্রাণে সাড়া তোলেনি। কিন্তু সেই ক্ষোভ ভেদ করে তাঁর ডাক এল। যে ডাকে সারা দেশ উতলা—সে ডাক উপেক্ষা করার শক্তি কি আমার আছে! এক সকালবেলায় তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। শীর্ণ দেহ, শান্ত চোখ, মুখে বলিরেখা। গায়ে সাদা খদ্দরের চাদর। ভাবলাম, প্রণাম করব না। স্যালুট করে বললাম—জয় হিন্দ। মহাত্মাজী উত্তর দিলেন : জয় হিন্দ। তারপর হেসে বললেন : বৈঠো।

এ আমি আশা করিনি। এত সহজ মানুষ হতে পারে। সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর অভিমান যেন আমার মিলিয়ে গেল। মহাত্মাজী বললেন : তোমাকে রোগী দেখতে হবে মুসলমান পাড়ায়—যাবে? আমি বললাম, যাব। গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু আমাকে মুসলমান পাড়ায় নিয়ে গেলেন। একটি মেয়ের বাচ্চা হলে, anaemia-তে ভুগছে। তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে শিবিরে ফিরে এলাম। পরদিন আবার সন্ধ্যেবেলায় শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর সংগে দেখা করার জন্য গেলাম। তিনি তখন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সংগে তাঁর অনুচরবৃন্দ। বলাই বাহুল্য, কেউ আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। হঠাৎ গান্ধীজী আমাকে স্মরণ করলেন—ডাক্তার কোথায় কেউ জান? তখন আবার সেই অনুচরবৃন্দই আমাকে পথ করে দিলেন। গান্ধীজী মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর? তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এমন ভয়াবহ সম্পর্ক যে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করে। হিন্দু ডাক্তার মুসলমানের বাড়িতে যাবে—এমন পরিবেশ তখন ছিল না। আমি বললাম : ভালই। রোগী ভাল আছে। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে দেখতে দিল। আমি হাঁ বলতে গান্ধীজীর মুখে প্রশান্ত তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। যেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। বললেন, নিজের দিকে নজর দিও। ভুলে গেলাম ইনি ভারতবর্ষের মুকুটহীন রাজা। মনে হল, আমার বন্ধু। ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব কোথাও আমার আর ওঁর মাঝখানে দূরত্ব রচনা করেনি। জয় হিন্দ বলে শিবিরে ফিরে এলাম। অন্ধকারে নির্জনে মনে হত—একা নই—নই—আমার সংগে অনেকে আছে। কোন ভয় নেই।

রোজ দেখা হত না। কারণ আমার সময় ছিল অল্প, কাজ ছিল প্রচুর। কিন্তু যখন যেতাম, সেই প্রশান্ত হাসির অন্তরালে খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি খবর তিনি জানতে চাইতেন। আমার অজ্ঞাতে আমাকে জয় করে নিয়েছিলেন—জানি না কী তাঁর মন্ত্রগুপ্তি। আমি যখনই বলতাম মুসলমানদের চিকিৎসা করতে গিয়ে ভাল ব্যবহার পেয়েছি, অসুস্থতা তাদের দুর্বল করেছে বটে, মনুষ্যত্বে আঘাত করেনি—তখন তিনি তৃপ্তির হাসি হাসতেন।

ধীরে ধীরে সেই দুঃসময় শেষ হল। আমার যাবার সময় এল। এমন সময় সেবাকার্যে এলেন দুই বিলেতফেরত ডাক্তার। হাতে তাঁদের প্রচুর টাকা, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। আমার outdoor দেখে তাঁরা হেসেই আকুল। এ কী ডাক্তারি হচ্ছে! আমি বললাম, এসেছি দুর্গতদের চিকিৎসা করতে। আমি ত আর হাসপাতাল তৈরি করতে পারব না। তাঁরা হেসে বললেন, ধরুন যদি acute appendicitis-এর case আসে—তা হলে? আমি বললাম, তা হলে কিছুই করার নেই। আমি কি করতে পারি? যতটুকু আমার ক্ষমতা তাই করছি—করব। তাঁরা উপহাসের হাসি হাসলেন।

যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময় আবার মহাত্মার ডাক এল। তাঁর ঘরের পাশেই কয়েকজন খবরের কাগজের প্রতিনিধি থাকতেন। তাঁদের একজনের অসুখ। আমি এলাম—গান্ধীজী অভ্যর্থনা করলেন। বললেন : চল, আমিও তোমার সংগে যাই, দেখে আসি। গান্ধীজী এলেন—কিছুক্ষণ সেখানে কথাবার্তা বললেন—রসিকতা করলেন। আমি থেকে গেলাম তিন দিনের জন্য। তারপর বিদায়ের পালা। মহাত্মাজী আশীর্বাদ করলেন আমার প্রতিষ্ঠানকে এবং আমাকে।

তারপর আবার সেই চৌমোহনী। এবার সেই কংগ্রেসকর্মীর ব্যবহার বদলে গেছে। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর দৈনন্দিন খবরের মধ্যে আমার নামটিও খবরের কাগজে ছড়িয়েছে। কাজেই এখন আমি গান্ধীজীর স্নেহধন্য—এবার তাই আমার জন্য ভোজের ব্যবস্থা হল।

পরে অনেকবার কলকাতায় গান্ধীজীর অনুচরদের সংগে দেখা হয়েছে—তাঁরা অতি কষ্টে চিনেছেন। কিন্তু গান্ধীজী যখন বিহার যাচ্ছেন (৪ঠা মার্চ, ১৯৪৭ সালে) তখন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে তাঁকে জয় হিন্দ বলতে তিনি হেসে বলেছিলেন, ডক্টর, ইহাঁ ভি আ গয়া!

এই তাঁর সংগে আমার শেষ দেখা। বিহারেও গিয়েছিলাম পরে—কিন্তু দেখা হয়নি। কিন্তু জানি দেখা হলে তিনি বলতেন—ডক্টর, ইহাঁ ভি আ গয়া!

বিদুর

'সাহিত্য সংবাদ' দেশ পত্রিকায় নতুন সংযোজন। গাছের নতুন পাতার মতন সদ্য দেখা দিল। আপাতত চরিত্র বিচার অপ্রয়োজনীয়। ক্রমে, আশা করা যায়, আকার অবয়বে এটি পূর্ণ পত্রের রূপ পেলে নিজ গোত্র প্রকাশ করবে।

তবু একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হয়ত প্রয়োজন। মোটামুটি এই বিভাগের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হবে। ইদানীং বিভিন্ন পত্রিকায় সাহিত্য সমাচার পাওয়া যায়। আগ্রহীজন জ্ঞাতব্য তথ্য পেয়ে থাকেন। 'সাহিত্য সংবাদ' সেই একই বিষয়ের পুনরুক্তি নয়। যদিচ সাহিত্য এবং সাহিত্যিক দুইই আমাদের সংবাদের বিষয়, তথাপি পার্থক্য এই যে, নিছক তথ্য কিংবা সংবাদ জ্ঞাপন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিঞ্চিৎ অধিকের বাসনা রাখি।

সাহিত্য সর্বাগ্রে, কিন্তু এ-কথা কে না জানেন, শিল্প সর্বদা একটি বিশেষ মানুষের মনের ফসল এই মনটির স্থান কাল আছে, কোনো শিল্পীই তাঁর অন্য শিল্পকর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নন, একের সম্পর্কে একাধিকের যোগ, কথা ওঠে উৎস বা উদ্দীপনার কিংবা প্রেরণার, প্রশ্ন জাগে ঐতিহ্যের, বাস্তব এবং ব্যক্তিত্বের। সাহিত্যের অন্তরালে যিনি তিনি শিল্পী, শিল্পীর পিছনে তাঁর যুগ ও যুগোপযোগী পৃষ্ঠপট। সম্ভবত, সাহিত্যপাঠে এই পৃষ্ঠপটের কিছু মূল্য আছে। আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে এই পৃষ্ঠপটেরও পরিচয় দেবার, স্বদেশ এবং বিদেশেরও।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সম্পর্কে অনেক সংবাদ নানা কারণে দৈনিক পত্রিকার যোগ্য হয় না, যদিবা হয়, পত্রিকার কিঞ্চিৎ কালি শুষে নিয়ে ফুরিয়ে যায়। সেখানে ব্যস্ততা, বহুভজনা। একটু স্বতন্ত্র করে সব সময় কিছু দেওয়া যায় না, দেওয়া সম্ভব হয় না। এখানে অন্তত স্বতন্ত্র করে সেই সংবাদগুলি থাকবে।

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

"ইনি অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। 'চর কাশেমে'র লেখক।" কয়েক বছর আগে একজন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে অমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে। তাকিয়ে দেখেছিলাম, শীর্ণ অসুস্থ বিষণ্ণ এক ভদ্রলোক; বয়সের অনুপাতে বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। উনি হাঁপাচ্ছিলেন যেন, মুখে সামান্য হাসি, বোধ হয় জোর করে টেনে আনা। নমস্কার বিনিময়ের পর সামান্য কয়েকটি কথা হল। স্বল্পকালের সাক্ষাতেই তিনি বলেছিলেন, "আমার 'চর কাশেম' এক সময়ে খুব প্রশংসা পেয়েছিল, এখন আর আমার লেখার কদর নেই।" কথাটা আমার মনে আছে। কারণ একমাত্র এই বাংলা দেশেই বোধ হয় কোনো সাহিত্যিক রেসের ঘোড়ার মতন প্রতিটি বাজি না জিতলে দুয়ো পান। অমরেন্দ্রবাবুর কথা থেকে আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন অজ্ঞাতসারে এই কথাটা বলতে চেয়েছিলেন, দু একখানা বই ভাল লেখায় বাঙালী সাহিত্যিক বাঁচে না, তার অন্নকষ্ট মেটে না; রাশ রাশ লিখতে হয়, এবং সেই রাশিকৃতের সাহিত্য বিচারের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পাঠকের। পাঠক যাঁকে নেয় তিনি থাকেন, পাঠক যাঁকে খারিজ করে সাহিত্যরসিকের প্রশংসা তাঁকে রক্ষা করে না। 'চর কাশেম' 'দক্ষিণের বিল' 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'র লেখক তাঁর সাহিত্য জীবনের একাংশে বহু গুণী জনের সমাদর লাভ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে অসফল সাহিত্যিকের মর্ম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁর কুণ্ঠা ও হতাশা দেখে মনে হত, ক্ষমতার অতীত প্রচেষ্টায় নিজেও যেন সঙ্কুচিত। গ্রামের মানুষ; পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনের সঙ্গে নাড়ির যোগ-

সূত্রে, মাটি জলের স্বাদ সর্বাঙ্গে। স্বাভাবিক প্রেরণায় আন্তরিকভাবে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার সাহিত্যস্বাদ বহুজনকে প্রীত করেছিল। পরে তিনি হয়ত ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু ব্যর্থতা তাঁর একদার সার্থকতাকে কেন যে প্রায় সম্পূর্ণ ম্লান করল জানি না।

'চর কাশেমে'র লেখক ছিলেন বরিশাল জেলার অধিবাসী। দেশ বিভাগের পর সপরিবারে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। দুর্ভোগ ও দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করে সাহিত্য-পেশায় ব্রতী থাকেন। গত ১৯ই জানুয়ারী ৫৫ বছর বয়সে তিনি দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর জীবনাবসানে মর্মাহত।

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ চর কাশেম, দক্ষিণের বিল, একটি সংগীতের জন্মকাহিনী, ভাঙছে শুধু ভাঙছে, পদ্মাদিঘীর বেদিনী।

শান্তিনিকেতন ঃ অধ্যাপক সম্মেলন (!)

কানু বিনা গীত নেই, বাংলা দেশে সাহিত্য উপলক্ষে অধ্যাপক বিনা বুঝি গতি নেই। সভা সম্মেলনে আলোচনা অনুষ্ঠানে দু চারজন অধ্যাপক সম্ভবত গৌরব বৃদ্ধির কারণ হন। সিনেমায় যেমন 'স্টার কাস্ট'—শতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তেমনি 'অধ্যাপক সংগ্রহ'। কোন উদ্যোগী কত ডক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হাজির করতে পেরেছেন তারই প্রতিযোগিতা। কর্মোদ্যোগী-দের মধ্যে অধ্যাপক দুর্বলতার কারণ খুঁজে পাই না। হয়তো এতে গরিমা বাড়ে, বিচক্ষণ হবার ক্লেশ লাঘব হয়, দায়িত্ব পালনের ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যসভায় মঞ্চের তাকিয়া একমাত্র অধ্যাপকরাই পেতে পারেন, এমন মনে করার হেতু দেখি না। এ এক ধরনের কুসংস্কার।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের কিছু সংবাদ আমাদের গোচর হয়েছে। গত ২৪, ২৫, ২৬শে জানুয়ারী এই সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশন হয়ে গেল। সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে কিছু বাঙালী সাহিত্যিকের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউই এ-সভায় যোগ দিতে পারেননি। মনে হয় না, এর ফলে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কেননা, এই সম্মেলনের বোধ হয় পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল অধ্যাপক সম্মেলন। কিংবা উদ্যোক্তারা হয়ত ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞানদান অধ্যাপকবৃন্দ দ্বারাই হতে পারে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ অধ্যাপক-ভীতি ছিল। সেদিন সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা নিজেরা অধ্যাপক নন, অথচ সাহিত্যানুরাগী, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক ভীতির যথার্থ মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে মনে হয়। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, এঁদের অনেকেরই যে ছাপানো বই আছে, সারা বছর ধরে কাগজে কাগজে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সুযোগে রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখছেন, আবার এখানেও সেই একই কথা কেন? কথাটি অযৌক্তিক নয়। তা ছাড়া, একথা উদ্যোক্তারা কি করে জেনে নিলেন যে অধ্যাপক-শ্রেণী সর্বক্ষেত্রে অমৃত সমান উপাদেয় হবে। এই অধ্যাপকদের সুবচন শুধু ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা সভায় আসেনি। বোঝা ভার, এই সাহিত্য সম্মেলনের ফলে কোন শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হল।

দু একজন প্রবীণ সাহিত্যিক অবশ্য এই সভায় কিছু বলেছেন। স্বাদে সেগুলি যে ভিন্ন ছিল শ্রোতা মাত্রেই স্বীকার করবেন।

সংগীতের অধিবেশনটি আমাদের কাছে সর্বোত্তম বলে মনে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অধিবেশনের বক্তারা ছিলেন গুণী, সংগীত-রসিক এবং শিল্পী, এঁরা শুষ্ক কাষ্ঠ নয়, ফলে শ্রোতারা তৃপ্ত হয়েছেন।

পদ্মশ্রী তারাশঙ্কর

শিল্পীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। এ-বছরে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার যে-সব 'ভূষণ' 'রত্ন' ও 'শ্রী' বিতরণ করেছেন তার মধ্যে বঙ্গ-

দেশের শ্রদ্ধেয় ও খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান আছে। সরকারী সম্মানশালার তালিকায় এখন থেকে তিনি 'পদ্মশ্রী' যুক্ত। তাঁর এই সম্মানের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু, সরকারী বহুবিধ রহস্যময় কর্ম এবং অবিবেচনার আরও একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে এই সম্মান প্রদান আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকল। উর্দু কবি শ্রীজাফর আলি খান, মারাঠী ঔপন্যাসিক শ্রীনারায়ণ সীতারাম ফাড়কে, উর্দু কবি শ্রীনিয়াজ মহম্মদ খান, হিন্দীসাহিত্যের লেখক শ্রীরাধিকারমণ প্রসাদ সিংহ রাষ্ট্রীয় সম্মানের আরও এক ধাপ ওপরের খেতাব 'পদ্মভূষণ' লাভ করেছেন। এঁদের যোগ্যতা অথবা স্ব স্ব সাহিত্যে তাঁদের নিষ্ঠা ও সেবা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু স্বভাবী সাহিত্যিকের যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারি 'পদ্মশ্রী' সম্মান তারাশঙ্করবাবুর যোগ্যতা ও মর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাংলা ভাষা ও বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি ভারত সরকারের অনুদার দৃষ্টি, বিরূপ মনোভাবের প্রতিবাদ বহুবার করা হয়েছে। পুনরুক্তিতে লজ্জা বোধ করি। গুজরাট এবং উড়িষ্যার অপর দুই সাহিত্যিকের কপালেও অনুরূপ 'পদ্মশ্রী' সম্মান জুটেছে। আশা করি, এঁদের যোগ্যতাও কিছু কম নয়।...তারাশঙ্করবাবু বহুকাল পূর্বে তাঁর নামের পূর্বে 'শ্রী' বিসর্জন দিয়েছিলেন, আবার সেই 'শ্রী' এল, অবশ্য 'পদ্ম'যুক্ত হয়ে। এই সম্মানলাভের কথা শুনে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ 'সম্মান বোঝা হয়ে উঠেছে, নামাতে পারলেই বাঁচি।' হয়ত তারাশঙ্করবাবু রবীন্দ্রনাথের গানের কথাটি ভেবেছিলেন ঃ "এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও।"

আধুনিক উপন্যাস

আধুনিক উপন্যাস প্রসঙ্গে ইলিয়া এরেনবুর্গের সংক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য চোখে পড়ল। উপন্যাসের আচার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের জ্ঞাতার্থে এরেনবুর্গের মতামত বলা যেতে পারে। এরেনবুর্গ মনে করেন ঃ ফর্ম হিসেবে উপন্যাস খুবই জীবন্ত। প্রতিটি শিল্প শাখারই নিজের নিজের গুণ এবং ধর্ম আছে, তার নিজস্ব আচার রয়েছে। উনিশ শতকের উপন্যাস আর আজকের দিনের উপন্যাস একই ধরনের হতে পারে না। উপন্যাসের রাজ্যে সর্বপ্রকার পরীক্ষাই সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত; বরং পুরোনো কাসুন্দি চমৎকার করে তৈরী করার চেয়ে অগোছালো আড়ষ্ট ভাবে নতুন কিছু তৈরী করাই ভাল। উনিশ শতকের উপন্যাসে কি হত? সে যুগের উপন্যাস কোনো একটি পরিবার কিংবা কোনো ব্যক্তির ভাগ্য নিয়ে রচিত হয়েছে। সে-যুগের জীবনের সঙ্গে তার যোগ ছিল। আমাদের যুগে মানুষের ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তুমি স্বীকার কর আর না কর তোমার ভাগ্য বহুজনের ভাগ্যের সঙ্গে অনেকখানি জড়ানো। আগে একের সঙ্গে অন্য অনেকের ভাগ্য এতটা জড়ানো থাকত না। উপন্যাসের গঠন কৌশল বা রীতির যে পরিবর্তন প্রয়োজন তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

নিজের উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুলে এরেনবুর্গ দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রতিটি উপন্যাস বিভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা। 'সেকেন্ড ডে' বা '১৯২৫-এর গ্রীষ্ম' এক ধরনের নয়। 'দি থ' বা 'দি ফল অফ প্যারি'-র শিল্পকর্মের প্রকৃতি এক নয়।

"পায়ে উত্তাপদানকারী" মেঝে

ভারতের বহু পুরনো বাড়িতেই এখনও কাঠের মেঝে দেখতে পাওয়া যায়, তবে আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে অবশ্য কনক্রীটের মেঝেই করা হয়। এ থেকে অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে কাঠের মেঝে কি কনক্রীটের মেঝের তুলনায় ভালো? পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানীগণ এই সামান্য প্রশ্নটি নিয়েই গবেষণা করছেন; এবং ব্যাপারটি অবশ্য প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত পাথর ও কনক্রীটের মেঝেকে ঠান্ডা বলে মনে করা হয় এবং কাঠের মেঝেকে গরম বলা হয়। দুই রকম মেঝের যদি একই রকম উত্তাপ হয় অর্থাৎ কক্ষের উত্তাপ যদি একই রকম রাখা যায় তাহলে এটা কি করে সম্ভব। বসতবাড়ি, কারখানা ও অফিস-বাড়ি তৈরী করার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে কি ধরনের উত্তাপে তিনি আরাম বা বিরক্তি অনুভব করেন সে সম্পর্কে স্টুটগার্টের টেকনিক্যাল পদার্থবিদ্যা গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করে দেখে। কি ধরণের মেঝেতে, পায়ের কোন উত্তাপে মানুষ পায়ের আরাম অনুভব করে এবং এগুলির মধ্যে সম্পর্কই বা কি তা নিয়েও তাঁরা পরীক্ষা করেন।

একটা নির্দিষ্ট উত্তাপযুক্ত কক্ষে আপনি যদি জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটেন তাহলে ঠান্ডা বা গরম মেঝের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না আর যদিই বা কেউ কোন প্রভেদ অনুভব করেন তা হবে সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজেরই কল্পনাপ্রসূত। মেঝের উত্তাপ যদি যথেষ্ট বেশী থাকে (১৭ থেকে ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাহলে পাথরের মেঝেই হোক বা কাঠের মেঝেই হোক তাতে পায়ে কোন বিরক্তিকর অনুভূতি হয় না। এই রকম মেঝেতে যদি খালি পায়ে হাঁটা যায় তাহলেই শুধু খানিকটা অস্বস্তি বোধ হতে পারে। পাথর বা কনক্রীট যে দ্রুততর গতিতে উত্তাপ শোষণ করে নেয় এই ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়। ঐ একই উত্তাপে কাঠের মেঝেতে ঠান্ডা অনুভূত হয় না।

স্টুটগার্টে যাঁদের নিয়ে এই পরীক্ষা লানো হয়, তাঁরা পারলেন মোজা ও পাতলা মড়ায় তৈরী জুতো পায়ে দিয়ে পরীক্ষা হে ৪ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। জ্ঞানিকগণ পায়ের বলের উত্তাপ এবং মড়ার মধ্য দিয়ে উত্তাপ পরিশোধন ম্পর্কে লক্ষ্য রাখেন। ডাঃ ফ্রাঙ্ক এই রীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি বলেছেন পায়ের বলের ঠান্ডা হওয়ার ওপরেই রাম বা বিরক্তির অনুভূতি নির্ভর করে। টি পৃথক উত্তাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র দিয়ে

কক্ষ ও মেঝের উত্তাপ বিভিন্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছিল। মেঝে যদি ঠান্ডা রাখা হয় তাহলে পায়ের বলের ঠান্ডা হওয়ার ওপরেই আরামের অনুভূতি নির্ভর করে। ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী যদি ঠান্ডা না করা হয় তাহলে মানুষ আরাম অনুভব করে। ৬ থেকে ৯ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ হ্রাসে তাঁরা "আরামদায়ক" থেকে ঠান্ডা বলে বর্ণনা করেন, ৯ থেকে ১১·৫ ডিগ্রীতে তাঁরা শীতল থেকে "হিমশীতল" বলে বর্ণনা করেন।

পাথরের মেঝে বা কাঠের মেঝেই হোক, মোজা এবং জুতো ঠান্ডা প্রতিরোধ করার পক্ষে তা যথেষ্ট। একটা নির্দিষ্ট উত্তাপে, উত্তমরূপে আবৃত পা কাঠের মেঝের তুলনায় কনক্রীটের মেঝেতে বেশী ঠান্ডা মনে হয় না। তবে যে জিনিস দিয়েই মেঝে তৈরী হোক না কেন অবস্থিতিকালই হ'ল প্রধান কথা। স্টুটগার্টের বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে মেঝের উত্তাপ যদি ১৮ ডিগ্রী এবং তার বেশী থাকে তাহলে চার ঘণ্টা থেকেও কোন অসুবিধে বোধ হয় না। ৪ থেকে ৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে প্রথম থেকে দ্বিতীয় ঘণ্টাতেই অসুবিধে বোধ হতে থাকে এবং ৮ থেকে ১৭ ডিগ্রীতে তৃতীয় ও চতুর্থ ঘণ্টা থেকেই অসুবিধে বোধ হয়। তার অর্থ হ'ল সত্যিকারের ঠান্ডা মেঝেতে জুতো পায়ে দিয়েও বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাযুক্ত বাড়িতেও এ কথা খাটে। কিন্তু যেখানে কক্ষগুলি মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত করা হয় সেখানে মেঝে কি জিনিস দিয়ে তৈরী তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কনক্রীটের তৈরী মেঝে একটা বাঞ্ছনীয় উত্তাপ মাত্রা পর্যন্ত গরম করতে অনেক বেশী সময় লাগে। কনক্রীটের মেঝের ১৭ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে যেখানে ১৮ ঘণ্টা সময় লাগে, সেক্ষেত্রে কাঠের মেঝে ৪ ঘণ্টার মধ্যেই গরম হয়ে যায়। কাজেই এই দিক দিয়ে কাঠের মেঝে ভালো।

বাসগৃহের পক্ষে কাঠের মেঝে এইজন্য ভালো যে শিশুদের হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়াও আমাদের মধ্যে মধ্যে খালি পায়ে হাঁটতে হয়। আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়িতে যেখানে কক্ষে উত্তাপ দেওয়ার পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কাঠের মেঝে বেশী সুবিধেজনক। তবে অফিসে বা দোকানে যেখানে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, সেখানে দুই রকম মেঝেই সমান, তাছাড়া ঐ সব জায়গায় সকলেই জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটে।

মেঝে যদি কার্পেট বা আধুনিক প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢাকা থাকে সেক্ষেত্রেও এই পরীক্ষার ফলগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া আপনি যদি জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়ান বা চলাফেরা করেন এবং মেঝে বা কার্পেটের উত্তাপ যদি অন্ততঃপক্ষে ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয় তা হলে যা দিয়েই মেঝে ঢাকা থাক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। প্লাস্টিকও সহজে উত্তপ্ত হয় না তবে প্রাচীনকাল থেকে খাটের পাশে কার্পেট বা চামড়া রাখার যে ব্যবস্থা আছে, প্লাস্টিক দিয়েও সেই কাজ চলে। যদি যথেষ্ট পুরু করে প্লাস্টিক দিয়ে মেঝে ঢেকে দেওয়া যায় তাহলে কনক্রীটের মেঝের অসুবিধেগুলি এড়ানো যায়।

টেলিফোন এ্যামপ্লিফায়ার

এক হাতে টেলিফোন ধরে অন্য হাতে কিছু লেখা বা কোন কাগজপত্র খুঁজে দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। স্বভাবতঃই সেইভাবেই অবস্থান খুব আরামদায়ক নয়। বর্তমানে এমন এক ধরনের টেলিফোন এ্যামপ্লিফায়ার তৈরী হয়েছে যাতে শ্রোতাকে সব সময়েই টেলিফোনটি কানের ধারে রাখতে হয় না। শ্রোতা ইচ্ছে করলে টেলিফোনটি রেখে দিয়ে কিছু লিখতে পারেন বা খুঁজতে পারেন। পশ্চিম জার্মানীর এসেনের একজন উৎপাদক দুটি বিভিন্ন আকারের নতুন এক ধরনের টেলিফোন এ্যামপ্লিফায়ার তৈরী করেছেন। এগুলির দাম হ'ল ৯৮ এবং ১২৮ মার্ক (যথাক্রমে ২৫ ও ৩২ ডলার বা ৯ ও ১২ পাউন্ড)। এই এ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে টেলিফোনের আলোচনা এত বাড়ানো যায় যে, সেই ঘরে উপস্থিত সকলেই তা শুনতে পারেন।

রবীন্দ্রচর্চা

Tagore : A life : Krishna Kripalani 1961. Malancha, 7, Allenby Road, New Delhi-1.

মহৎ কবির জীবনীও এক মহৎ কাব্য এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই জীবনের কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে বড় সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন অল্প পরিসরে এক দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র বৃত্তান্ত সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সেই নৈপুণ্যের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এত ব্যাপার যে জীবনীকার কি রাখিবেন, কি ছাড়িবেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। শ্রীকৃপালনী যে এইরূপ সমস্যায় বিহ্বল হন নাই তাহা তাঁহার গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারি। গ্রন্থখানি পড়িয়া মনে হইবে যে, গ্রন্থকার প্রথমে স্থির করিয়াছেন যে সব কথা বলিতে গেলে কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে না। এই দৃষ্টিতে জীবনীকারের এক বিশেষ গুণ তাঁহার সংযম ; শ্রীকৃপালনীর গ্রন্থ এই গুণের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বাংলা জীবনীসাহিত্যে এখনও কোন প্রকৃষ্ট রচনারীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথ্যাংশে নির্ভরযোগ্য এবং মূল্যবান জীবনীর বড় অভাব নাই। কিন্তু কেবল তথ্য সমাবেশে জীবনী হয় না। বস্তুত বাংলা জীবনী এখনও ঠিক জীবনীসাহিত্য হইয়া উঠে নাই। গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের কেশব জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০৪। কিন্তু তথ্যের আসর হইলেও গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য নয়। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের ভূদেব-চরিত তিন খণ্ডে প্রায় ১৩০০ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থও তথ্যে সমৃদ্ধ ; কিন্তু সে সমৃদ্ধিতে মানুষটির মূর্তি চাপা পড়িয়াছে। অবশ্য বৃহদাকার জীবনীগ্রন্থও সুলিখিত হইতে পারে—যেমন মেসন-কৃত মিল্টন-জীবনী সাত খণ্ডে ৪৫৪৪ পৃষ্ঠা। কিন্তু এই গ্রন্থও আয়তনের জন্য নিন্দিত। বৃহৎ জীবনীর বড় দোষ ইহাতে ইতিহাস ব্যক্তিকে পরিস্ফুট না করিয়া তাহাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিতে চায়। পটু জীবনী-লেখক যত জানেন তত লেখেন না। শ্রীকৃপালনী বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন ; তাঁহার গ্রন্থখানি শ্রমলব্ধ সামগ্রী। সেই শ্রমের ভার পাঠককে বহন করিতে হইল না।

এই গ্রন্থের তথ্য-বিন্যাসের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার অন্যকোন জীবনীতে তেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া জানি না। ঐ ভাষায় এই গ্রন্থ কবির সর্বোৎকৃষ্ট জীবনী। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত শ্রীপুলিন সেন-কৃত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থের তালিকায় যে কয়খানি জীবনীর উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে রীস ও টমসনের গ্রন্থ দুইখানিই উৎকৃষ্ট। তথ্য ও সমালোচনার সার্থক সমন্বয়ে শ্রীকৃপালনীকৃত জীবনী উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হইয়াছে।

শ্রীকৃপালনী রবীন্দ্র-ভক্ত। কিন্তু তিনি ভাবে অধীর হইয়া হরি হরি বোলাইয়া চরিত-কথা লিখেন নাই। তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা বিফল হয় নাই। অন্য দিকে তিনি বেশি বুঝাইতে যাইয়া সব গুলাইয়া ফেলেন নাই। তিনি আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিয়াছেন। পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতার অভিমানে কোথাও প্রসঙ্গ হইতে সরিয়া আসেন নাই।

এই গ্রন্থের ভাষা আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। এমন সরল পরিচ্ছন্ন ইংরাজী একালে এদেশে দুর্লভ। বস্তুত সমগ্র গ্রন্থখানিতে যে চরিত্র ইহার ভাষারও সেই চরিত্র। আমরা হয় ইংরাজী লিখিতে পারি না, নয় বড় বেশি ভাল ইংরাজী লিখি। বেশি ভাল ইংরাজী মন্দ ইংরাজীর পর্যায়ে পড়িতে চায়। এই গ্রন্থের স্টাইল দেখিয়া আশা করিতে পারি গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের যে বৃহৎ ইংরাজী জীবনী লিখিতেছেন তাহা দেশে বিদেশে সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ১৬ খানি চিত্রই সুনির্বাচিত। শ্রীকৃপালনী এই গ্রন্থ রচনায় যে দায়িত্বজ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-আলোচনার ক্ষেত্রেও একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সে আদর্শের মূল কথা—প্রযত্ন ও পরিচ্ছন্নতা। ৪৬৯।৬১

Rabindra Prabaha : Edited by Taruni Sankar Chakravarty, Tagore Centenary Celebrations Committee Wheelers Building 15, Elgin Road, Allahabad. Price Rs. 2.50 only.

রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির চেষ্টায় যে সমস্ত রবীন্দ্রাঞ্জলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রপ্রবাহ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রধানত দুটি কারণে—ইংরেজি বাংলা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষায় আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে এবং সুলভ মূল্যে পরিবেষিত হয়েছে বলে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি এবং জীবন সমালোচনাই কেবলমাত্র এই গ্রন্থে স্থান পায় নি, রবীন্দ্ররচনা ও রচনাংশের হিন্দী এবং ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কিছু স্মৃতিকথা ও পত্রাংশও সংযুক্ত হয়েছে। কয়েকটি বিরলদৃষ্ট আলোকচিত্রের সঙ্গে কয়েকজন বিদেশী মনীষী-লেখকের অভিনন্দন ও অভিমত সংগ্রহ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত প্রতিকৃতি-আত্মপ্রতিকৃতি এবং হস্তলিপির ছবিও রয়েছে। বাংলায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অসিতকুমার হালদার, ডাঃ হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাসব ঠাকুর, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও ডাঃ শশধর দত্ত ; ইংরেজিতে সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দীতে ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও সুমিত্রানন্দন পন্থ উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন। বিজ্ঞাপন ও উৎসর্গীকৃত কবিতা এই গ্রন্থ থেকে বাদ দিলে সম্পাদক ভালো করতেন বলে মনে হয়। ৬৫২।৬১

Homage To Rabindranath Tagore. Editor : B. M. Chaudhuri, Indian Institute of Technology, Kharagpur. Rs. 3.50.

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একক ও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের ধুম পড়েছিল ; এখনো তা শান্ত হয়নি। তাদের সবগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করেছে বলতে পারি না ; তা আশা করাও সম্ভবত অনুচিত হবে। খুশি হতে হয়, যখন দেখি ব্যবসায়ী প্রচেষ্টার বাইরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হন। বর্তমান সংকলনটি সেইরকম এবং উন্নত রুচির দিক থেকে দেখলে, নিশ্চয় সাধুবাদযোগ্য।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত চৌধুরী সাধ্যমতো সংকলনটিকে পূর্ণাঙ্গ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রতিভার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট দিকগুলি যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরাও প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে ডক্টর প্রভাসজীবন চৌধুরীর 'এসথেটিক' বিষয়ক রচনাটি, ডক্টর আর্নল্ড বেক্-এর সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনার গুণে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীযুক্ত অপূর্ব চন্দের 'কানাডা ভ্রমণ' তথ্যসমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু দে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি আবশ্যকীয় গ্রন্থরূপে এর সমাদর কামনা করি। মুদ্রণ ও প্রকাশনার দিক থেকেও গ্রন্থটি সুরুচি বহন করে। ৬৯০।৬১

উপন্যাস

প্রাচীর—মীরা মজুমদার। নবযুগ সাহিত্য মন্দির: ৩, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা ১০। প্রাপ্তিস্থান : ডি এম লাইব্রেরী ও শ্রীগুরু লাইব্রেরী। মূল্য : তিন টাকা।

শ্রীমতী মীরা মজুমদার সাহিত্যে নবাগতা। তাঁর এই উপন্যাসে নবাগতার সমস্ত লক্ষণই পরিস্ফুট। কাহিনীর মধ্যে একটি তীব্র বক্তৃতাধর্মী আদর্শকে তুলে ধরবার চেষ্টা রয়েছে। আমাদের সমাজে এখনো নারীর যথার্থ মূল্যায়ন হয় নি: ফলে সে তার প্রাচীন পরিচয়ের মধ্যেই এখনো সীমাবদ্ধ। নায়িকা বিভা এই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসে: তার সহযোগিতা করে বিপ্লবী যুবক শংকর। লেখিকার হৃদয়ে উদ্দীপনা রয়েছে, উপন্যাসে তা সোচ্চার। এ-সম্পর্কে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর প্রয়াস সফল হলেই আমরা খুশী হবো। ৪৭৬।৬১

পথ অন্তহীন। অমিয়া চক্রবর্তী। প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। সান্যাল এণ্ড কোং, ৮৫, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯, মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

অতি গতানুগতিক ধারায় লিখিত 'পথ অন্তহীন' একটি উপন্যাস। আরম্ভে প্রেম; এবং অনিবার্য কারণে স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে নূতন শিক্ষা অর্জনের জন্য শহরে আসার ও বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাওয়ার বিচ্ছেদ; এবং পরিণতিতে উভয়ের একত্রে সেবাব্রতী রূপে অন্তহীন পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা। কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণে বৈচিত্র্য না থাকিলেও লেখিকার সং ও সরল প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রন্থটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ৬৪।৬২

তীর ভাঙ্গা ঢেউ—প্রসাদ ভট্টাচার্য। ডি এম লাইব্রেরী; ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য : দুই টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ না হলেও মধ্যভাগের পরের কথা। সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। সেই সময়ের কাহিনীই তীর ভাঙ্গা ঢেউ'-এ বিধৃত। মুঙ্গের তখন সারা ভারতকে যেমন বিস্মিত করেছিল তেমনি উপযুক্ত গ্রন্থটিকেও ঋদ্ধ করেছে। আবার সেই প্রসঙ্গে যে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে, তাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণদাস, পীর সাহেব, দীপক বর্ষা প্রভৃতি। সেকালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটি, স্বল্প পরিসরে না হলেও, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক চেতনারই পরিচয় দান করে। গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলা ভুল হবে মাত্র বড় গল্প বলা যেতে পারে। ৬১০।৬১

অভিসারিকা— অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : তিন টাকা।

একালে বাংলা সাহিত্যের একটি মুখ্য অংশকে অধিকার করে রেখেছে ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বর্তমান উপন্যাসটিতে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের জনমানসে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ঘটনাবহুল কাহিনী চমকপ্রদ করে লিখিত হয়েছে। যে মণিভদ্রের বাবা দুর্লভভট্ট মহারাজ আদিত্যবর্মার সভাসদ, সেই মণিভদ্রের মানসিক পরিবর্তন উপন্যাসটির মূল-উপাদান এবং মণিভদ্রের চরিত্রকে সমৃদ্ধতর করেছে যে-শান্তি—তারই আদর্শ উপন্যাসটিকে সার্থকনামা করে তুলেছে। অবশ্য, একথা বলা অন্যায় হবে না, উপন্যাসটিতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা, কল্পনা অপেক্ষা ইতিহাস-চেতনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ৪৫৫।৬১

ক্রন্দসী — শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কল্লোল প্রকাশনী; এ-১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম : দু'টাকা।

বাংলা সাহিত্যে দু-চারটি উৎকৃষ্ট রহস্যোপন্যাস বের হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এ দুজন এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রয়োজনে এঁদের অনুসরণ করাই উচিত। কিন্তু কার্যকারণ-হীন অপাঠ্য অপ্রয়োজনীয় রহস্যোপন্যাস যদি কেউ লেখে এবং তাকে কেউ অনুসরণ করে থাকে, তখন লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে যায়। 'ক্রন্দসী' সেই অপাঠ্য পুস্তকের অনুকারী-সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নয়। ডিটেকটিভ মশায় হঠাৎ-পরিচিত মেয়েটির সঙ্গে তদন্তের কিনারা করতে গিয়ে কিভাবে 'গাঁটছড়া' বাঁধলেন, সেটাই লেখকের প্রধান বক্তব্য বিষয়। রাহাজানি, খুন, আত্মহত্যা, প্রায়-মোটর-চাপা পড়া অবস্থা—সব কিছুই আছে; নেই শুধু শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মূল্যবোধ। বলা বাহুল্য, রহস্যোপন্যাস রচনার জন্য চাই কার্যকরণ সঙ্গতি, বিজ্ঞান-চেতনা ও সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রগাঢ় নৈপুণ্য। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে এর একটি গুণও থাকলে খুশি হতাম। ৫৮৫।৬১

কবিতা

গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—মোহিত চট্টোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ২২ শ্যামাপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। দু'টাকা।

তরুণ ও তরুণতর কবিদের হাতে বাংলা কবিতা ইদানীং নতুন রূপ লাভ করছে। পূর্ববর্তীরা নন, এমন কি চল্লিশের কবিরাও নন, এঁদের কবিতার সঙ্গে একমাত্র এঁদেরই তুলনা হতে পারে। কবিতার সাম্প্রতিক পর্বে যে ক'জন কবি ক্রমশ উল্লেখ্য হয়ে উঠছেন, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন। এবং যা সহজেই আশা করা যায়, এই গ্রন্থে মোহিত চট্টোপাধ্যায় পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত কবিত্বশক্তির পরিচয় রেখেছেন। সংকলিত কবিতার সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক; এবং এই সব কবিতায় একজন বেদনা-বিহ্বল, পরিমিত-বাক্, যন্ত্রণায় আত্মস্থ, তদুপরি নির্জনতায় স্মৃতি-বিলাসী কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য অসংখ্য পংক্তির মধ্য থেকে তাঁর কবি-স্বভাবের উপযোগী দু'টি পংক্তি উদ্ধার করা যাক্ :

'বিলাপ কোর না দুঃখ,
তুমি বাম পার্শ্ব থেকে বুকে এসে বোস,
কলহে কণ্টক, ঊর্ধে গোধূলির আলো
বড় নির্জনতাপ্রিয়।'

আমরা এই কাব্যগ্রন্থের সমাদর কামনা করি। রুচি-সুন্দর প্রচ্ছদটিরও প্রশংসা করতে হয়।

৫৯৭।৬১

উত্তর তরঙ্গের নায়ক—শ্রীদিলীপকুমার সেন। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১সি রানী শঙ্করী লেন, কলিকাতা-২৬। দাম ঃ আড়াই টাকা।

কবি নবাগত এবং যথার্থ 'আধুনিক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি কাব্য নাটক 'শ্বেত আকন্দ' ও অন্যান্য কবিতার মধ্য দিয়ে কবির কাব্যপ্রয়াস স্পষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিতার রীতি প্রায় নির্ভুল ভাবে তাঁর আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থে তাঁর চরিত্র নিশ্চিধায় আবিষ্কার করা যায় না। মাঝে-মাঝে সমকালীন তরুণ কবিদের প্রভাব লক্ষণীয়। তথাপি, আমরা নিশ্চিত যে উত্তরকালে ইনি কিছু ভালো কবিতা উপহার দিতে পারবেন। 'শ্বেত আকন্দ' কাব্য নাটিকায় তাঁর শক্তির ছাপ রয়েছে। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত ও শোভন।

৬৯৯।৬১

নাটক

এবাড়ি ওবাড়ি—জরাসন্ধ। কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। পরিবেশক ঃ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—দু টাকা।

'জরাসন্ধ' তাঁর কাহিনীতে প্রভূত নাটকীয় ঘটনার সমাবেশে পাঠকের নির্লিপ্ত অনুভূতি উদ্দীপ্ত করে তোলেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থখানি নাটক, তাই তিনি এই গ্রন্থে পরিমিতি বোধের সাহায্যে তাঁর নাটকীয় নৈপুণ্যকে যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। তিন অঙ্কের এই নাটকটি খুব সিরিয়াস নয়। এর মূল রস হাস্য। তবু প্রহসন জাতীয় কোনো ভাঁড়ামিও এতে প্রশ্রয় পায়নি। একতলা বাড়ির ডাক্তার, আর দোতলা বাড়ির ডাক্তারের প্রতিযোগিতামূলক দ্বেষ-বিদ্বেষের দ্বারা নাটকটির ভিত রচিত হয়েছে। তারপর নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে নতুন নতুন স্ত্রী পুরুষ চরিত্র, থানা আদালত এবং কলেজে অনুষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রীদের থিয়েটার প্রভৃতি। একতলা বাড়ির মালিক হরিনাথের ছেলে কলেজ-ছাত্র অশোক, এবং দোতলা বাড়ির মালিক হরনাথের মেয়ে কলেজ-ছাত্রী নীলিমা কিভাবে অমিল থেকে মিলে গিয়ে পৌঁছাল মূলত রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাকে অবলম্বন করে—তার সাহায্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বকেই যেন উদ্ঘাটিত করেছেন। তবে, তাদের মিলনের মধ্য দিয়েই নাটকটির যবনিকাপাত হয়নি। নাটকীয় রস ধীরে ধীরে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে তখন—যখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর হরনাথ ও হরিনাথ অধ্যাপিকা মিস সোমা গাংগুলীর কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে তার ওপরেই নিজেদের বৈষয়িক বিদ্যার আকস্মিক প্রয়োগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অবশ্য এর উপসংহার ঘটে আদালতে হরিনাথ আর হরনাথের Peaceful coexistenceএর মধ্যে। নাটকটিতে একটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় গণেশ চরিত্রাঙ্কনে। এটি অনাবশ্যক। জেল ফেরত দাগী আসামীর ওপর লেখকের মোহই অবশ্য এজন্য দায়ী।

৫১১।৬১

একাঙ্ক নাটিকা

যবনিকা—শ্রীনীরেন গুপ্ত। ভবানীপুর বুক ব্যুরো; ২বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ঃ আড়াই টাকা।

চারটি ছোট নাটিকার সংকলন। 'যবনিকা', 'অমীমাংসিত' ও 'ত্রয়ী' নাটিকা তিনটি বেতারে অভিনীত হয়েছে। 'যবনিকা'য় ভালবাসা এবং বিশ্বাসের মূল্যায়নে নিরঞ্জন, অলকা ও সুশোভন চরিত্র তিনটির যবনিকাপাত হয়েছে। 'অমীমাংসিত' নাটিকাটিতে রেস্তরাঁয় অনুষ্ঠিত একটি সহজ আড্ডাকে কেন্দ্র করে লিখিত। 'ত্রয়ী'তে মাত্র তিনটি চরিত্র। নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতায় ভালবাসার মাধ্যমে জীবনের বাস্তব দিকটিকে চরম নাটকীয়তায় রূপায়িত করে তোলা হয়েছে। চতুর্থ নাটিকাটি, সকাল-সন্ধ্যা বেলা, কখনো কোনো অভিনয় না হলেও বিভিন্ন আত্মীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র। নিছক ভূমিকা নয়, ঐতিহাসিক বক্তব্য এবং কালের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিতে, তা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ।

৬০৪।৬১

গল্প সংকলন

চলার পথে—মানিক গঙ্গোপাধ্যায়। সিলভার এরো, ১নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১। মূল্য ঃ তিন টাকা।

পনেরটি গল্পের সংকলন। জীবনে চলার পথে লেখক যে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, তাকেই তিনি বিভিন্ন ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। বৌদির গল্প, মুড়িওয়ালা, ওদের মন, চিঠি প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঐ পরিপ্রেক্ষিতেই উপস্থিত হয়েছে। দু-একটি গল্পে লেখক মনোবেদনাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যেমন, শেষস্মৃতি, ব্যর্থ প্রতীক্ষা প্রভৃতি গল্পে। কিন্তু অন্যপক্ষে মনোবেদনার কারণ এই যে, বর্তমান গল্পের ধারা সম্পর্কে লেখক একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। তাই প্রাচীন মামুলি ধারাটিকে তিনি অপ্রয়োজনীয়ভাবে অনুসরণ করেছেন। আশা করি, এ সম্পর্কে তিনি সচেতন হবেন।

৪৮১।৬১

প্রাপ্তি-স্বীকার

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা—শঙ্কু মহারাজ।

বাহাদুর শা'র সমাধি—বারীন্দ্রনাথ দাশ।

অংশীদার—গঙ্গাপদ বসু।

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানস—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত।

অভয়ের কথা ও ঠাকুরানীর কথা—'ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর

রাম না হতে রামায়ণ

মার্কিন পরিচালক মার্ক রবসন "নাইন আওয়ার্স টু রাম" নামক একটি আন্তর্জাতিক ছবি এ-দেশের পটভূমিতে তোলবার জন্যে এসেছিলেন—এ খবর পাঠকদের অজানা নেই। দিল্লী ও বম্বেতে এর বহির্দৃশ্য তোলা সম্পূর্ণ হয়েছে। কথা ছিল, বম্বের মেহবুব স্টুডিওতে এর অন্তর্দৃশ্যগুলি গৃহীত হবে। কিন্তু তা না করেই পরিচালক রবসন তাঁর দলবল নিয়ে লণ্ডনে গেছেন ওখানকার এলস্ট্রি স্টুডিওতে ছবিটি শেষ করতে।

লণ্ডনে পৌঁছেই পরিচালক রবসন ভারতবর্ষে ছবিটি তোলবার ব্যাপারে সকলকার কাছ থেকে যে সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়েছেন তার তারিফ করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। বম্বের একটি নাম-করা সংবাদপত্রে মার্ক রবসন নিজের জবানীতে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন প্রত্যেকের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্যে।

কিন্তু রবসনের দল ভারত ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে বম্বের চলচ্চিত্র মহলে তাঁদের বিরুদ্ধে বেশ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।
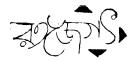
বম্বের চলচ্চিত্রকর্মীদের প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ তার সভ্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে যাতে "নাইন আওয়ার্স টু রাম" ছবিতে কেউ কাজ না করে। বম্বের যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী ঐ ছবিতে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের ওপরও এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে।

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণগোপাল একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, ঐ ছবিতে যেসব বিদেশী কলাকুশলী কাজ করছিলেন তাঁরা যাতে নির্দিষ্ট চাঁদা জমা দিয়ে এখানকার কলাকুশলী প্রতিষ্ঠানগুলির অস্থায়ী সভ্য হন তার জন্যে দাবি জানিয়েছিলেন ফেডারেশন। কিন্তু এই দাবি পালিত না হওয়ায় ফেডারেশন এই নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বাধ্য হয়েছে। এ থেকে রবসন দলের আকস্মিক ভারত-ত্যাগের আসল কারণ খানিকটা আঁচ করা যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানে শেষ হয়নি। পাঠকরা জানেন যে, মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনীর অনেকখানি অংশ রচিত। সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মাজীর জীবনের অন্তিমকালের চিত্রায়ণে গান্ধীজীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে-কে নাকি এই ছবিতে গৌরবের আসনে বসানো হয়েছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বম্বের ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি এক বিশেষ সভায় এই সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তা ভারত সরকারের নিকট পেশ করেছেন। "নাইন আওয়ার্স টু রাম" ছবিতে মহাত্মাজীর চরিত্রের অবমাননার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে আই-এম-পি-পি-এ তাঁদের সিদ্ধান্তে বলেছেন, বিদেশী চিত্রপ্রযোজকরা ভারত সরকারের কাছে যে চিত্রনাট্য দাখিল করেন, সরকারের তা আরও বেশী সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এবং এই সব বিদেশী ছবির চিত্রগ্রহণকালেও সরকারের বিশেষ সতর্ক থাকা কর্তব্য।

আলোচ্য বিদেশী ছবিতে মহাত্মাজীর

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতির পাশে গান্ধীজীর রূপসজ্জায় জে এস কাশ্যপ (দক্ষিণে)। "নাইন আওয়ার্স টু রাম" নামক যে ইংরেজী ছবিতে শ্রীকাশ্যপ অভিনয় করছেন তা নিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে

চরিত্রকে খর্ব করা হয়েছে বলে আই-এম-পি-পি-এ তাদের সিদ্ধান্তে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, গান্ধীজীর জীবনের কাহিনী যাতে ছবিতে শ্রদ্ধাবুদ্ধি সহকারে বিন্যস্ত হয় সে ব্যাপারে সরকারের অবহিত থাকা উচিত ছিল। ছায়াছবির শিল্পী কর্তৃক মহাত্মার চরিত্রাংকনের অনুমতির বিরুদ্ধেও আই-এম-পি-পি-এ তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মহাত্মার স্মৃতির প্রতি ভারতের অগণিত জনসাধারণ যে শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন, এই ছবিতে তাকে আঘাত করা হয়েছে বলে আই-এম-পি-পি-এ মনে করেন। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে বলেছেন, যতই বিলম্ব হোক, ভারত সরকারের কর্তব্য সংশিলষ্ট বিদেশী সরকারের সংগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই অন্যায়ের প্রতিকারে অগ্রণী হওয়া।

ছবিটি সম্পর্কে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার একটি প্রেস-নোট প্রকাশ করেছেন। এই নোটে বলা হয়েছে, ১৯৬১ সালে লণ্ডনের রেড লায়নস ফিল্মস ভারতে ছবিটির চিত্রগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এবং সেই সংগে ছবির চিত্রনাট্যটিও পেশ করেন। আইনত চিত্রগ্রহণের জন্য বর্তমানে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগ কর্তৃক ছবির চিত্রনাট্যটি পরীক্ষা করে দেখা হয়। চিত্রনাট্যটি একটি উপন্যাসের ভিত্তিতে রচিত। মূলত চিত্রনাট্যের সংগে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের কোন যোগ নেই। কেবলমাত্র মহাত্মার মৃত্যুর পূর্বের কয়েক ঘণ্টা নিয়ে ছবির একটি অংশ রচিত। এবং এই অংশে গডসের কার্যকলাপ এবং ফ্ল্যাশ-ব্যাকে তার জীবনের কয়েকটি কাল্পনিক ঘটনা প্রধানত বিবৃত। চিত্রনাট্যে কতকগুলি তথ্য সংক্রান্ত ভুল ছিল। এই বিষয়ে রেড লায়নস ফিল্মস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা ১৯৬১ সালের অক্টোবরে সংশোধিত চিত্রনাট্য পেশ করেন। সংশ্লিষ্ট চিত্রপ্রযোজক সংস্থাকে এটাও জানানো হয় যে, চিত্রগ্রহণে ভারত সরকারের আপত্তি নেই বলে চিত্রনাট্যটিও যে তাঁরা অনুমোদন করেছেন তা নয়। এই সংগে তাঁদের আরো জানানো হয় যে, সাধারণ প্রদর্শনীর পূর্বে ভারত সরকারকে অথবা লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারকে ছবিটি দেখাতে হবে এবং প্রয়োজন হলে ভারত সরকার অথবা লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারের পরামর্শ অনুযায়ী ছবিটির অদল-বদল করতে হবে। এটাও তাঁদের জানানো হয় যে, সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর-এর সার্টিফিকেট সাপেক্ষেই ছবিটি ভারতে প্রদর্শিত হতে পারে।

চিত্রালোচনা

প্রণয়-বিরহ-মিলন

চলচ্চিত্র সাহিত্যের সগোত্র। সব ক্ষেত্রে, সব মুহূর্তে নয়। চলচ্চিত্র যখন জীবন-ভাবনার স্পর্শ পেয়ে আর্টের পর্যায়ে উঠে আসে শুধু তখনই। সাহিত্যের ভেতর দিয়েই চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক দিকটি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী চিত্রপ্রযোজকের "বিপাশা" ছবিটি এই বিশুদ্ধতার অধিকারী কিনা তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। মতভেদ দেখা দিতে পারে কাহিনী নিয়ে—যা ছবিটির অবলম্বন। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্র এটা নয়। এই আলোচনা তাই স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে গিয়ে বলা চলে, যে চিত্রনাটকটি "বিপাশা"-য় পরিবেশিত তা সম্পূর্ণভাবে চলচ্চিত্রধর্মী। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের যে ধর্ম শিল্পের বিশুদ্ধতা বর্জন করে বাণিজ্যের দণ্ডকারণ্যে সোনার

হরিণ ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, এই ছায়াছবির গল্পে তা-ই প্রতিফলিত। ফলে জনমনোরঞ্জনের যে শর্ত এই চিত্রকাহিনীতে অনুসৃত, তা জীবনের স্বভাবধর্মটিকে অনুসরণ করেনি।

নায়িকার নামেই কাহিনীর তথা ছবির নামকরণ। নাম তার বিপাশা। বিপাশা ও দিব্যেন্দু দর্শকদের কাছে অপরিচিত নয়। অর্থাৎ তাদের চারিত্রিক লক্ষণ ও মানসিকতার সঙ্গে এর আগেও দর্শকদের অনেকবার না হলেও একাধিকবার পরিচয় ঘটেছে। প্রথম সাক্ষাতে নায়কের প্রতি নায়িকার অভদ্র অশিষ্ট আচরণ ও ক্লীবের মত নায়কের তা মেনে নেওয়া—এই ধরনের ঘটনা দর্শকরা এর আগেও প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষের পর যে ভবিতব্যটি তারা অনুমান করে নিয়েছেন তাও এই চিত্রকাহিনীতে যথাসময়ে রূপ নিয়েছে। অপ্রীতিকর সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে প্রণয়, সাময়িক বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন—এই সব কিছুই।

তবে চিত্রকাহিনীটি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের লেখনী-নিঃসৃত। তাই নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা ও প্রণয় গতানুগতিকের ধারায় গড়ে উঠলেও তাদের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন যে-সব ঘটনার আশ্রয় নিয়েছে তা চমকপ্রদ। নায়ক যখন জানতে পারে যে, সে তার পিতামাতার বিবাহিত জীবনের পুণ্যফল নয়, অবৈধ সন্তান—তখন সে তার কলঙ্কিত জীবনের সঙ্গে নায়িকাকে জড়াতে চায় না। বিয়ের লগ্নেই সে নিরুদ্দেশ হয়। এদিকে এই সত্যটি জানার পর প্রেমাস্পদের প্রতি নায়িকার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নায়িকার একনিষ্ঠতা সার্থক হল। নায়কের নিদারুণ মনোযন্ত্রণারও অবসান ঘটল। তাদের ঈপ্সিত মিলনটি কী-ভাবে ঘটল তার মধ্যে নায়কের জন্ম-বৃত্তান্ত ও তার পিতা-মাতার উপাখ্যানটি বিবৃত।

দেখা গেল, নায়কের পিতা-মাতা উভয়েই জীবিত। পিতা সন্ন্যাসী। প্রথমা স্ত্রীর অর্থাৎ নায়কের গর্ভধারিণীর সঙ্গে তিনি নিষ্ঠুর প্রবঞ্চকের মত ব্যবহার করেছিলেন। এই অনুশোচনার জ্বালা সইতে না পেরে তিনি সন্ন্যাস নেন। আর নায়কের জননী স্বামীর মর্যাদা রক্ষায় নিজেকে তার রক্ষিতা বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। পরে নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য তিনি পুরী চলে যান এবং সেখানেই দীর্ঘকাল ঈশ্বর-উপাসনায় দিন কাটাতে থাকেন। তাঁদের জীবনে এই বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল এলাহাবাদ আদালতে। আদালতে গিয়ে উভয়কে দাঁড়াতে হয়েছিল নায়কের পিতার দ্বিতীয়া স্ত্রীর অভিযোগে। তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী। যখন তিনি জানলেন যে, তাঁর স্বামীর প্রথমা স্ত্রী বর্তমান, তখন তিনি আদালতের আশ্রয় না নিয়ে পারেন নি। আদালতেই নায়কের পিতা অস্বীকার করলেন তাঁর পিতৃত্ব। কারণ বিয়ের আট মাস পর যে সন্তানের জন্ম হয়েছে সে তার পুত্র নয়। বিশেষ করে, বিয়ের পর দু' মাসের মধ্যেই তিনি বিলেত চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং নায়কের মাতা বিয়ের আগেই গর্ভবতী ছিলেন। হতভাগিনী নারী স্বামীর সম্মান রক্ষায় আদালতে এই অপবাদ স্বীকার করে নেন। এবং তাঁর শিশুপুত্র সেই থেকেই দিদিমার কাছে মানুষ হতে থাকে।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অভিযান"-এর নায়কের রূপসজ্জায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্রযুগের "কাঁচের স্বর্গ" চিত্রের একটি প্রধান ভূমিকায় মঞ্জু দে। আগামী সপ্তাহে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে

নায়ক যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সন্তান এই তথ্যটি নায়কের পিতা ছবির শেষাশেষি স্বীকার না করে পারলেন না। নায়ক কলঙ্কিত জন্মপরিচয়ের গ্লানি সইতে না পেরে এলাহাবাদের পথে যখন আত্মহত্যায় ব্রতী হল, তখন তাকে আহত অবস্থায় হাস-পাতালে নিয়ে আসেন এক সন্ন্যাসী। তিনিই নায়কের ছদ্মবেশী পিতা। পরে সন্ন্যাসী দেখা পেলেন নায়িকার। দাঙ্গায় সকলকে হারিয়ে যখন ভারতের মাটিতে এসে পৌঁছয় তখন এই সন্ন্যাসীর কাছেই সে আশ্রয় পায়, লেখাপড়া শেখে। সন্ন্যাসীরূপী নায়কের পিতা নিজের সন্তান ও ভাবী পুত্রবধূর দুঃখ-ব্যথার কথা ভেবেই নিজের পূর্ব অপরাধের কথা সব স্বীকার করলেন। স্বীকার করে নিলেন নিজের সন্তানকে। একটি চিঠিতে তিনি সব কথা লিখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। এই চিঠি তাঁরই আইন-ব্যবসায়ী বন্ধু হাস-পাতালে নায়কের হাতে দিয়ে গেলেন। নায়ক এই চিঠিতেই তার মায়ের সন্ধান পেল। মাকে ফিরিয়ে আনতে গেল নায়ক ও তার ভাবী সহধর্মিণী। দুঃখিনী জননী পুত্র ও পুত্রবধূকে জড়িয়ে ধরলেন।

ছবির এই বিষয়বস্তুর মধ্যে একাধিক উপকাহিনী সংযোজিত। কেমনভাবে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন-লগ্নটি ব্যর্থ হল, নায়ক তার বিড়ম্বিত জন্ম-বৃত্তান্ত কার কাছ থেকে কী-ভাবে জানতে পারল, দাঙ্গার দাবানলের ভেতর দিয়ে নায়িকা কী করে ভারতে এসে পৌঁছল ইত্যাদি নিয়েই অন্যান্য উপকাহিনী।

বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত এই আখ্যান-ভোলার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চিত্রনাট্যকার বস্তুকে একটি চিত্রনাট্যে সুগ্রথিত করে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রনাট্যটি স্বচ্ছন্দ-গতি। নায়ক-নায়িকার জীবনের প্রণয়-

জালান প্রোডাকসন্সের "দাদাঠাকুর" চিত্রের একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও দা'ঠাকুর-বেশী ছবি বিশ্বাস

মুহূর্তে কল্পনায়ও চিত্রনাট্যকার রসজ্ঞানের অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন।

অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী তাঁদের স্বভাব-সিদ্ধ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ছবিটিতে। প্রয়োগ-কর্মের গুণে এই চিত্র-কাহিনীকে দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য যতটুকু সমৃদ্ধ করে তোলা সম্ভব, পরিচালকগোষ্ঠী সুষ্ঠুভাবেই তা সম্পাদন করেছেন। দৃশ্যগঠনে, পরিবেশ রচনায় এবং কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলার কাজে তাঁদের রসবোধ ও কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়। পাণ্ডেত ও মাইথনের পট-ভূমিতে ছবির বহির্দৃশ্যাবলী মনোরম।

চিত্রকাহিনীর বিন্যাসে যে কোন অসংগতি নেই তা-নয়। এর মধ্যে প্রধান হল, বিয়ের লগ্নে নায়কের অন্তর্ধান। নায়ক যে তার পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান এ-সংবাদ সে তার কুচক্রী মামার চিঠিতে জানতে পারেনি। জেনেছে কলকাতায় এসে মামার সংগে সাক্ষাৎ করার পর। এই সংবাদ যদি নায়ক চিঠির মারফৎ জানতে পারত এবং নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় ও অন্তর্গ্লানিতে প্রেয়সীকে বিয়ের আসরে লগ্নভ্রষ্টা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসত তবু ঘটনাটি না-হয় মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু একটি চিঠি পেয়েই (চিঠিতে কী লেখা ছিল তা দর্শকরা জানতে পারেন না) প্রেমাস্পদাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে বিয়ের লগ্নে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ার মত দুর্বল চরিত্র এই ছবির নায়কের নয়। তাই ঘটনাটি খুবই বিসদৃশ। নায়ক নিজেকে অবৈধ সন্তান জেনেও নায়িকাকে বিয়ে করতে চায়নি,— এই কারণেই নাকি নায়কের প্রতি নায়িকার শ্রদ্ধা বেড়েছে। (নায়িকার সংলাপে যা প্রকাশ পেয়েছে।) এই যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নায়ক নিজেকে অবৈধ সন্তান জানবার আগেই নায়িকাকে লগ্নভ্রষ্টা করেছে। তারপর লগ্ন-ভ্রষ্টা অবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে নিজেকে প্রেমাস্পদের স্ত্রী বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দেওয়ার যে একনিষ্ঠতা নায়িকার মধ্যে দেখা যায় তা ভাবালুতার আতিশয্য বৈ কিছু নয়। চড়া সুরের "মেলোড্রামা"র প্রয়োজনেই হয়ত ছবিতে এটা সম্ভব হয়েছে।

ছবির অন্যান্য ছোট-খাটো ত্রুটির মধ্যে একটি নৃত্য-নাট্যের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য পীড়াদায়ক। আর অবিশ্বাস্য হল, কবিতার আবৃত্তি শুনেই অপরিচিতের ঘরে এসে তাকে কোন শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে তাকে কর্কশ ভাষায় গালাগালি দিয়ে অপমান করা—ছবির নায়িকা যা করেছে। কবিতা শোনার পর প্রতিবেশী যুবকের মতি-গতি লক্ষ্য করে দেখার স্বাভাবিক ধৈর্যটি নায়িকার চরিত্রে অনুপস্থিত।

ছায়াছবির গল্পে "আকস্মিক যোগা-যোগ" খুবই দেখা যায়। বাস্তবে যা দুর্লক্ষ্য। এই ছবির কাহিনীতে "আকস্মিক যোগাযোগে"র ছড়াছড়ি। এবং এই সব যোগাযোগের সাহায্যে ছবিতে এমন একটি রূপকথা গড়ে তোলা হয়েছে যা

ল্পের বিচারে সার্থক নয়। তবে পকথা যাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের এ-ও ভাল লাগবে। এক্ষেত্রে যুক্তি-চারের কথা তোলা বাহুল্য।

ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় রেছেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। এই ম্পতিজোড় শুধুই জনপ্রিয় নন, অভিনয়-পুণ্যেরও অধিকারী। কোন কোন ছবিতে তপূর্বে তাঁদের অভিনয় অসাধারণ, তুলনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বতেও তাঁদের এই অনবদ্য দক্ষতার ভাস মেলে কোন কোন দৃশ্যে।

নায়কের প্রাণোচ্ছল, প্রণয়ীর পার্টটি উত্তম-মার সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্র-হিনী প্রেমিক-নায়কের পৌরুষ অনেক-নি হরণ করে নিলেও, উত্তমকুমার তাঁর ভাবিক শিল্পীব্যক্তিত্ব দিয়ে চরিত্রটির এই নতা ঢেকে দিয়েছেন। চরিত্রটির বেদনা বিড়ম্বনা তাঁর অসামান্য অভিনয়ে তে।

সুচিত্রা সেন চিত্রনাট্যের আনুকূল্য র্যাপ্তভাবে পেয়েছেন। প্রণয়োপাখ্যানের ম পর্বে তাঁকে অযথা বিজয়িনীর না দেওয়া হয়েছে। প্রণয়াভিলাষে যে হূর্তে তিনি নায়কের কাছে প্রণয়িনী প আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁর সেই হূর্তের অভিনয় মধুর। নায়কের সঙ্গে ম সাক্ষাতের দৃশ্যটিতে তাঁর অভিনয় র্ভিকর। হয়তো একঘেয়ে বলে। য়কের বিরহ দৃশ্যে তাঁর অভিব্যক্তি ও ভনয় স্মরণীয়। কাহিনীতে বিপ্রলম্ভ র পরই তিনি তাঁর অনবদ্য অভিনয় মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করে নিতে থাকেন। ছবির প্রথমার্ধে তাঁর বেশবাস চরিত্রটিকে যেন অনাবশ্যকভাবে উন্নাসিক করে তুলেছে।

সপ্তক-এর সদ্য-সমাপ্ত চিত্রার্ঘ "বন্ধন"-এর একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও জহর রায়

নায়কের পিতা তথা স্বামীজীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনোগ্রাহী। একটি দৃশ্যে নায়কের জননীর রূপসজ্জায় ছায়া দেবীর অভিনয় মনে দাগ কাটে।

স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর অভিনয়ের জন্য দুটি বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে দর্শকদের প্রশংসা পাবেন তাঁদের বসু ও কেতকী দত্ত। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন কমল মিত্র, মিহির চক্রবর্তী, আশা মণ্ডল, পেশেন্স ডার্ভিনগটন, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী।

সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির বিশেষ কয়েকটি নাট্যমুহূর্তের ভাবরূপটি তাঁর রচিত আবহ-সুরে ফুটিয়ে তুলেছেন। গানের সুরারোপ সুশ্রাব্য।

ছবির নৃত্য-নাট্যের শিল্পীরা তাঁদের নৃত্যকুশলতার জন্য সাধুবাদ পাবেন। সুন্দর নৃত্য-পরিচালনার জন্য অতীন্দ্র-নারায়ণ গাঙ্গুলি ধন্যবাদার্হ।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুষ্ঠু। বিশেষ করে ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বাঙ্গীন আঙ্গিকগঠন পরিচ্ছন্ন ও শিল্প-শোভামণ্ডিত।

ভারতের পটভূমিতে আর একটি বিদেশী ছবি

আমেরিকান লেখক রবিন হোয়াইট দক্ষিণ ভারতের মাদুরা শহর ও শহরতলীর পট-ভূমিতে একখানি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের গল্পের ভিত্তিতেই ছবিটি তৈরী হবে। শ্রীহোয়াইট

বেয়ার্ড পুতুল নাচ দলের দুটি পুতুল-চরিত্র। গত সপ্তাহে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বেয়ার্ড দলের পুতুলনাচ ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সকলে উপভোগ করেছেন

মাদুরাতে তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পিতা ছিলেন একজন খৃষ্টীয় ধর্মযাজক। দক্ষিণ ভারতের এই শহরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বহুদিনের। তাই তামিলনাদ শহরের ও শহরাঞ্চলের জীবন-ধারা ও প্রাকৃতিক শোভাই তিনি তাঁর রঙীন ছবিতে কাহিনীর পটভূমি রূপে ফুটিয়ে তুলতে চান। ছবির দৃশ্যাবলী সম্পূর্ণভাবেই এই শহর ও শহরতলীতে গ্রহণ করা হবে। ছবিটি তৈরী হবে সিনেমাস্কোপে। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে বাস্তবধর্মী ছবি তৈরীর প্রেরণা তিনি সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" থেকে গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল।

"অল দি রুমস্ আয়ার ডার্ক" ছবির কাহিনীকার হিসাবে রবিন হোয়াইট প্রভৃত যশ অর্জন করেছেন। ছবি তৈরীর প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ ভারত ঘুরে গেছেন।

চিত্রনির্মাণে স্বাবলম্বনের প্রয়াস

চিত্রনির্মাণে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প কীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এ নিয়ে শিল্পমহলের নেতৃবৃন্দ ও ভারত সরকারের মধ্যে কিছুকাল ধরে আলাপ-আলোচনা চলছিল। সম্প্রতি এই আলাপ-আলোচনা একটি কার্যকর ধাপে এসে পৌঁছেছে।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বম্বেতে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ্ ও চলচ্চিত্রশিল্পের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক আলোচনায় স্থির হয়, সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্রশিল্পের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করা হবে। কমিটির সভারা চিত্রনির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভারতের চিত্রশিল্প কীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেবেন। প্রস্তাবিত এই কমিটি সম্প্রতি গঠিত হয়েছে।

কমিটিতে বোম্বাই চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরূপে রয়েছেন শ্রীমেহবুব খাঁ ও শ্রী বি এম চাটা। বাংলা চিত্রজগতের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন শ্রীতপন সিংহ। শ্রীসিংহ বাদে একজন কলাকুশলীকেও কমিটিতে নেওয়া হবে। মাদ্রাজের চিত্র-শিল্পের পক্ষ থেকে আছেন শ্রী এস এস ভাসান এবং দক্ষিণ-ভারতের সিনে টেকনিসিয়ান্স এ্যাসোসিয়েশন-এর জনৈক প্রতিনিধি।

চিত্রনির্মাণের প্রয়োজনে যে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল অবশ্য প্রয়োজনীয় তার একটি তালিকা পেশ করার জন্য ভারত সরকার এই কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্টুডিওতে সংকট

এ বৎসরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা যদি তিনের কোঠায় ওঠে, তাহলে তার অর্ধ সংখ্যক ছবি ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে মুক্তির অপেক্ষা করছে। যেসব ছবি এখন নির্মাণাধীন রয়েছে তাদের সংখ্যা সামান্য নয়। এ অবস্থায় নতুন ছবি শুরু করতে কারুরই বিশেষ গরজ নেই দেখা যাচ্ছে। ফলে স্টুডিওতে নতুন কাজের একান্তই অভাব।

কলকাতায় স্টুডিওর সংখ্যা দিন দিন ক্ষীয়মান। তার উপর বর্তমানে আরো একটি স্টুডিওতে তালা পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত ১২ই জানুয়ারী থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর কর্মীরা চারমাসের বকী বেতনের দাবীতে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। শ্রম দপ্তরের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটির আশু প্রতিকার করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি।

ধর্মঘটকারী কর্মীরা সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিও রক্ষা কমিটি নামে একটি সংসদ গঠন করেছেন। সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার, অসিত চৌধুরী প্রভৃতি ফিল্মশিল্পের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি মণ্ডলীকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এই কমিটি। তাঁদের দাবী—বকেয়া বেতন শোধ, অসমাপ্ত ছবিগুলির সমাপ্তিকরণ এবং সমবায় প্রথায় কলাকুশলী-দের হাতে স্টুডিওর পরিচালনার ভার সমর্পণ।

রেনেসাঁস ফিল্মসের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি "ঢেউয়ের পরে ঢেউ"-এর একটি দৃশ্যে দুই নবাগত শিল্পী সুহৃদ রায় ও শংকর

নাট্যাভিনয়

অনুষ্ঠান সংবাদ

আগামী সোমবার (৫ই ফেব্রুয়ারী) স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের দ্বারা রঙমহল মঞ্চে অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক "উদ্বাস্তিকী"র অভিনয় করবেন। এটি একটি ব্যঙ্গ-নাট্য। হাস্যকৌতুকের ভেতর দিয়ে বর্তমান বাঙালী জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক এর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পরিষদের পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে অভিনয় করে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের সকলকেই প্রায় এ নাটকেও দেখা যাবে। তাছাড়া কয়েকজন নতুন শিল্পীও এতে আত্মপ্রকাশ করবেন। নাটকটি পরিচালনা করবেন নাট্যকার স্বয়ং।

• • •

হাওড়ার বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠীর সভ্যগণ সম্প্রতি স্থানীয় দুই প্রধান নাট্যশিল্পী কবিভূষণ বিনয়বিনোদ ও শ্রীগণপতি বাণীবিনোদ মহাশয়দের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে যে দুটি একাংক নাটক পরিবেশন করেন তার মধ্যে রমেন লাহিড়ী রচিত "মরণের তীরে" নাটকটি রচনা ও প্রযোজনার দিক থেকেই প্রশংসিত হয়েছে। রিপুর তাড়নায় পথভ্রষ্ট করে মানুষ তখনই অমৃতের লাভ করতে পারে যখন সে অনাবিল ভালোবাসার আলোকে তার চিত্তকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে—এই তত্ত্বধর্মী কাব্যনাট্যটি যাঁদের অভিনয়ে সার্থক হয়ে ওঠে তাঁরা হলেন 'জীবন'রূপী বিভু ভট্টাচার্য, 'মরণ'রূপী বিশ্বনাথ আদক ও মৃত্যুরিপুর শিকার 'ক' 'খ' 'গ' এই তিনটি চরিত্রের অভিনেতাদ্বয় রমেন লাহিড়ী, অশোক রায় ও সুধাময় লাহিড়ী। শেষোক্তজন রচিত 'মেঘলা আকাশ' নাটকটিও পরিচ্ছন্ন বক্তব্য ও সুঅভিনয়ের গুণে দর্শকসাধারণের চিত্ত জয় করে। বিশেষ করে এই নাটকের একমাত্র অভিনেত্রী রীণা সরকারের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন প্রকাশ হালদার, গোপাল মাইতি, হারাধন বসু, লালমোহন ভাদুড়ী, অশোক রায়, সুধাময় লাহিড়ী ও রমেন লাহিড়ী।

সত্যজিৎ রায়ের ইস্টম্যান কলার ছবি "কাঞ্চনজঙ্ঘা"-র একটি দৃশ্যে পিতা ও পুত্রের ভূমিকায় হরিধন মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

ন অভিনেতা হরস্ট বুখোলজ "নাইন
র্স টু রাম" চিত্রে নাথুরাম গডসের
ভূমিকায় অবতীর্ণ

• • •

বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক "ক্ষুধা" শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচিত হওয়ায় নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যকে গত শনিবার ২৭শে জানুয়ারী বিশ্বরূপায় পরিষদ কর্তৃক আহূত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে "নগেন্দ্রস্মৃতি" প্রদত্ত এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি কবিশেখর কালিদাস রায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমন্মথ রায়।

যাদু-প্রদর্শনী

সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তরুণ যাদুকর ডি সি দত্ত নতুন ধরণের কয়েকটি ম্যাজিক দেখিয়ে দর্শকদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করেন। প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন খেলার মধ্যে "জঙ্গল-রহস্য" নামক যাদুক্রীড়াটি সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল। করাত দিয়ে স্টেজের ওপর একটি মেয়েকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্যে

ফিল্ম এভা-এর "কুমারী মন"-এর একটি দৃশ্যে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার
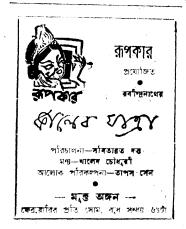
আজ হয়তো কোন নতুনত্বের চমক নেই। যাদুকর দত্ত ইলেকট্রিক করাতের বদলে সাধারণ হাতে চালান করাত ব্যবহার করে এই রোমহর্ষক খেলাটির বৈচিত্র্য সাধন করেছিলেন। স্টেজের ওপর একটি জীবন্ত মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ এবং সেই অবস্থায় তার চলাফেরা যাদুকর দত্তের আর একটি চমকপ্রদ খেলা। তাঁর ব্ল্যাক আর্টের খেলাগুলিও তারিফ করবার মত।

সমস্ত খেলাগুলি দেশী ধাঁচে পরিবেশন করে যাদুকর দত্ত বেশ খানিকটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। নিউ এম্পায়ারে প্রথম প্রদর্শনীতেই তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন তাতে সেখানে তাঁর ম্যাজিকের আসর আরো বসবে—এ আশা অনুচিত হবে না। তবে কয়েকটি প্রোগ্রাম পরিচালনায় আরো তৎপর হবার অবকাশ আছে।

ব্রিটেনের চলচ্চিত্র শিল্প

ব্রিটেনের চলচ্চিত্র শিল্পের [illegible] জানছে। [illegible] এই শিল্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ট্রেড শিল্প, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং টেলিভিশনের জন্য নানা ধরনের চিত্র। ব্রিটেনে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কাহিনী চিত্র [illegible] নির্মিত হচ্ছে, তার প্রায় দ্বিগুণ নির্মিত হচ্ছে ব্রিটিশ [illegible] কর্পোরেশন টেলিভিশন কর্তৃক।

এ থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু জানতে হলে অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে কি ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে [illegible] রাখা দরকার, যদিও আমরা যেমন কাহিনী চিত্র সম্পর্কে যে ধরনের আগ্রহ সাধারণের মধ্যে লক্ষ করা যায়, ঠিক সেই ধরনের আগ্রহ এইসব চিত্র সম্পর্কে লক্ষ করা যায় না।

ব্রিটেনে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়—একটি হল নতুন ধরনের কাহিনী চিত্র বা তরুণ [illegible] উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে।

ব্রিটেনে কোন যুবক যদি চলচ্চিত্র শিল্পে প্রবেশ করতে চায়, তা হলে তাকে প্রথম স্থির করতে হবে, তার আগ্রহ মনস্তত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা, আবিষ্কার, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিশুদের জন্য অথবা বয়স্কদের জন্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা—কোন দিকে। কারণ উল্লিখিত সমস্ত বিষয়েই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে থাকে এবং সেজন্য আছে বহুরকমের প্রতিষ্ঠান।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে: বি-বি-সির উদ্যোগে দু' বৎসর ধরে নির্মিত হয়েছে সিমেননের মাইগ্রেট কাহিনীর (Simenon's Migret Stories) ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি নতুন ধরনের চিত্র। স্বনামখ্যাত কাহিনী চিত্র পরিচালকরা কয়েকটি গোষ্ঠী গঠন করেছেন যাতে অবসর সময়ে তাঁরা টেলিভিশনের জন্য চিত্র নির্মাণ করতে পারেন। একটি বিশেষ ফিল্ম্ ইউনিট বিজ্ঞানী ডেভিড অ্যাটেনবরোর অধীনে নির্মাণ করছে টেলিভিশনের জন্য ভ্রমণ ও আবিষ্কার অভিযান সংক্রান্ত নানা ধরনের চিত্র। [illegible] হোপ এবং বিং ক্রসবি কাজ করছেন লণ্ডনের নিকটে শেপার্টন স্টুডিওয় "দি রোড টু হংকং" চিত্রে। জন অসবোর্ন-এর "দি এন্টারটেইনার" চিত্রের মঞ্চ ও চিত্র পরিচালক টনি রিচার্ডসন সম্প্রতি শেলাগ ডেলানির "এ টেস্ট অব হানি" নাটকটি চিত্রায়িত করেন। শেল অয়েল গ্রুপ গত বৎসর আফ্রিকার প্রধান প্রধান বীজাণু-[illegible] রোগের বিরুদ্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞান কিভাবে সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে একটি রঙিন চিত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে আনন্দ আছে কিন্তু তাতে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন উৎসাহ, প্রতিভা এবং কল্পনা-কুশলতা। এই তিনটি গুণ ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়।

চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির পথ খুব সহজ নয়। ব্রিটেনে গত কয়েক বৎসর বহু সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ হল টেলিভিশনের প্রতিযোগিতা এবং জনসাধারণের রুচির পরিবর্তন। কিন্তু টেলিভিশন অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় এবং [illegible] পর্দায় [illegible] দেখার আগ্রহ [illegible] পাওয়ায় চলচ্চিত্র শীঘ্রই তার স্থান [illegible] নিতে পারবে বলে এখন আশা করা যাচ্ছে।

ব্রিটেনে এখনও প্রায় ৩,০০০ সিনেমা রয়েছে। "স্যাটারডে নাইট অ্যান্ড সানডে মর্নিং"-এর ন্যায় ভাল ছবি, এবং "ডক্টর [illegible] লাভ"-এর ন্যায় জনপ্রিয় ছবির আদর এখনও রয়েছে। এই ধরনের ছবির সমাদর কেবল ব্রিটেনে নয়, বৈদেশিক বাজারগুলিতেও লক্ষ করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় ব্রিটিশ চলচ্চিত্র ব্রিটেনের চেয়ে বিদেশে আদৃত হয়েছে বেশী।

ব্রিটেনে উপন্যাস, নাটক অথবা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে রূপ-বিপ্লব লক্ষ করা যাচ্ছে তার কারণই হল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে বিপ্লব। এই বিপ্লবের সূচনা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। আমরা আমাদের পুরাতন সমাজব্যবস্থায় ক্লান্ত হয়ে উঠি এবং নূতন মূল্য এবং নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠি। আমাদের এজন্য কিছুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হলেও এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় এবং তা সর্বক্ষেত্রে লক্ষ করা যেতে থাকে—নাটকে এবং উপন্যাসে এই বিপ্লব সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। নাটকের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব আসে জন অসবোর্ন, আর্নল্ড এবং শেলাগ ডেলানির ন্যায় লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব আসে জন ব্রেইন এবং এলান সিলিটোর ন্যায় লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে।

এই শৈল্পিক জোয়ার সম্প্রতি এসে পৌঁছেছে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও।

সেন্সরশিপ ব্যবস্থার কঠোরতা কিছুটা শিথিল হওয়ায় চলচ্চিত্রের শিল্পগত পুনরুজ্জীবন অনেকটা সহজ হয়েছে সন্দেহ নেই। নূতন "এক্স" সার্টিফিকেট ব্যবস্থাধীনে বয়স্কদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত চিত্রগুলি অনুমোদন লাভ করছে; এই সকল চিত্র ১৬ বৎসরের কম বয়স্কদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সেন্সরশিপের কঠোরতা যদি শিথিল না হত তা হলে "স্যাটার্ডে নাইট অ্যান্ড সানডে মর্নিং", "এ টেস্ট অব হানি" এবং এমন কি "দি ট্রায়াল অব অস্কার ওয়াইল্ড" চিত্রের তির্যক সংলাপ থেকে দর্শকদের বঞ্চিত হতে হত।

যাঁরা আজ নূতন ধরনের চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা সকলেই প্রায় তরুণ; ত্রিশ বা চল্লিশের কোঠায় তাঁদের বয়স। এঁদের মধ্যে আছেন কারেল রীজ-এর ন্যায় পরিচালক যিনি গবেষণাকর্মী এবং চলচ্চিত্র সমালোচক এবং দলিল চিত্র নির্মাতা হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন; টনি রিচার্ডসন—যিনি টেলিভিশনে এবং রঙ্গমঞ্চেও কিছুকাল পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন; এবং জ্যাক ক্লেটন—যিনি ফিল্ম স্টুডিওর সঙ্গে বহুকাল ধরে যুক্ত আছেন এবং যিনি "রুম অ্যাট দি টপ্" কাহিনী চিত্রের পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবন রূপায়ণ সম্পর্কে স্যার মাইকেল ব্যালকন প্রভৃতি প্রযোজকগণ লক্ষণীয়ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এই ধরনের চিত্র সম্পর্কে দর্শকদের আগ্রহও যথেষ্ট বলে মনে হয়। চিত্রজগতে সৌন্দর্য বা জীবনের সৌকুমার্যের চেয়ে ভাবের আন্তরিকতা এবং প্রকাশের সততাই বেশী মাত্রায় লক্ষ করা যায়।

মুভিটক-এর "শিউলি বাড়ী"-র দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে উত্তরকুমার ও হরিহর ভট্টাচার্য

চিঠিপত্র

চলচ্চিত্রগৃহের সমস্যা

মহাশয়,

রঙ্গজগৎ বিভাগে প্রকাশিত বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনাদের ও শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের আলোচনা পড়লাম। রাধামোহনবাবু বহু লোকের ভুল ধারণা যুক্তি দিয়ে ভেঙেছেন। তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশ করে পাঠকদের খুব উপকার করেছেন।

১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৭০টি চিত্রগৃহের মধ্যে ১৭টিতে কেবলমাত্র বাংলা ছবি দেখানো হত। এই প্রসঙ্গে রাধামোহনবাবু বলেছেন, "বর্তমান মরণাবর্ত হইতে বাংলা চলচ্চিত্র প্রয়াসকে টানিয়া তুলিতে একটি বিশেষ কর্মধারার প্রয়োজন।...এই বিশেষ কর্মের একটি হইতেছে আরো অনেক অধিক সংখ্যায় চিত্রগৃহ। তদুদ্দেশ্যে বর্তমানে যে সকল বাধা আছে তাহা অপসারণের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা।" কিন্তু তিনি বাধাগুলিকে অপসারণের জন্য বিস্তারিত কিছু আলোচনা করেননি। আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কিছু জানাচ্ছি।

অধিক সংখ্যায় চিত্রগৃহ নির্মিত হলে সেখানে যে বাংলা ছবি স্থান পাবে তা জোর করে বলা যায় না। সেটা নির্ভর করে চিত্রগৃহের মালিক ও চিত্র-পরিবেশকদের ওপর। শহরের কয়েকটি বড় চিত্রগৃহ ছাড়া সমস্ত চিত্রগৃহই সম্পূর্ণভাবে চিত্র-পরিবেশকদের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশকরা ২।৩টি বাংলা ছবি প্রদর্শনীর পর হিন্দী অথবা অন্য ছবি প্রদর্শনীর জন্য পাঠান। এসব চিত্রগৃহে পুরানো ভাল বাংলা ছবি অথবা নতুন বাংলা ছবি পাঠালে দর্শকের অভাব হয় না।

তা ছাড়া কলকাতার বাইরে সমস্ত চিত্রগৃহে রবিবারে মর্নিং শোতে হিন্দী ছবি দেখানো হয়। তাই দর্শকরা (বিশেষত চাকুরে) বাধ্য হয়ে হিন্দী ছবি দেখতে যান।

দেখে দুঃখ হয় যখন একটি নতুন বাংলা ছবি মাত্র ৩।৪টি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। তাই আমার অনুরোধ, চিত্রগৃহের সংখ্যা বাড়াবার আগে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহের মালিকদের ও চিত্র-পরিবেশকদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি প্রযোজক, চিত্রগৃহের মালিক ও চিত্র পরিবেশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতি

প্রণবানন্দ গুহ,
ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগনা।

ভারতের ত্রয়োদশ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অন্যান্য গুণীজনদের সংগে এবার ৪ জন খেলোয়াড় ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বের নিদর্শন হিসাবে সরকারের কাছ থেকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব পেয়েছেন। এ'রা হচ্ছেন অতীত দিনের কীর্তিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রাবার জয়ী ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উম্রিগর ও ভারতের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণন।

এ বছরের ৪ জনকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১৫ জন খেলোয়াড় ভারত সরকারের কাছ থেকে খেতাব লাভ করলেন। এই ১৫ জনের মধ্যে ছয়জন ক্রিকেট খেলোয়াড়, তিনজন হকি বিশারদ, দুইজন সাঁতারু, একজন পোলো, একজন টেনিস ও একজন ফুটবল খেলোয়াড় এবং একজন অ্যাথলীট। ১৫ জনের মধ্যে ৪ জন পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ' এবং ১১ জন পেয়েছেন 'পদ্মশ্রী' খেতাব। নিচে খেতাবপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল:—

'পদ্মভূষণ'

সি কে নাইডু (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
বিজয়নগরের মহারাজকুমার (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
ধ্যান চাঁদ (হকি খেলোয়াড়)
রাও রাজা হনুৎ সিং (পোলো খেলোয়াড়)

'পদ্মশ্রী'

বলবীর সিং (হকি খেলোয়াড়)
মিহির সেন (ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু)
মিলখা সিং (অ্যাথলীট)
'বাবু' (হকি খেলোয়াড়)
বিজয় হাজারে (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
জেসু প্যাটেল (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
আরতি সাহা (ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী)
গোষ্ঠ পাল (ফুটবল খেলোয়াড়)
নরী কণ্ট্রাক্টর (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
পলি উম্রিগর (ক্রিকেট খেলোয়াড়)
আর কৃষ্ণন (টেনিস খেলোয়াড়)

* * *

ভারতের কাছে 'রাবার' হারার পর ইংলন্ড দল ঢাকায় গিয়ে পাকিস্তানের সংগে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা 'ড্র' করে এখন করাচীতে তৃতীয় টেস্ট খেলার তোড়জোড় করছে। ভারত সফরের আগে লাহোরে পাকিস্তানের সংগে প্রথম টেস্ট খেলায় ইংলন্ড ৫ উইকেটে জয়লাভ করেছিল। সুতরাং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এখনো তাদের 'রাবার' লাভের সম্ভাবনা। ফেব্রুয়ারীর ২ তারিখ থেকে আরম্ভ হচ্ছে পাকিস্তানের সংগে ইংলন্ডের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট খেলা। বলা বাহুল্য, এ খেলায় পাকিস্তান জিততে না পারলে ইংলন্ডই রাবার পাবে।

একলব্য

ঢাকার টেস্টে চারটি সেঞ্চুরী হলেও পাকিস্তান এবং ইংলন্ড কোন দলের খেলারই সুখ্যাতি করা চলে না। বিশেষ করে ভারতে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় ক্রিকেটের পর ঢাকা টেস্টের মন্থরতা বেশী করে চোখে পড়েছে। চারটি সেঞ্চুরী ও দুই দলের প্রথম ইনিংসের বড় রানের দিকে চোখ পড়লে আপাতদৃষ্টিতে খেলাটিকে মন্থর খেলা বলে মনে হবে না। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে চারটি সেঞ্চুরীর দুটি সেঞ্চুরী করেছেন একা হানিফ মহম্মদ। বাকি দুটির একটি জাভেদ বার্কি আর একটি জিওফ পুলার। বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে পাকিস্তানের সয়িদ আমেদ ও আলীমুদ্দিন এবং ইংলন্ডের বব বারবার ও কেন ব্যারিংটন ভাল রান করেছেন। আর সবাই দিয়েছেন রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয়। সুতরাং ঢাকা টেস্ট অল্পের সাফল্য এবং বহুর ব্যর্থতায় চিহ্নিত। যাঁরা ব্যাটিংয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরাও রান করতে এত বেশী সময় নিয়েছেন যে, দর্শকরা খেলা দেখে মোটেই তৃপ্তি পাননি। প্রথম টেস্টে পরাজিত পাকিস্তানের জয়লাভের প্রচেষ্টায় এ খেলায় অনেক দ্রুত রান সংগ্রহ করা উচিত ছিল।

টসে জেতবার পর প্রথম দিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় ২টি উইকেট হারিয়ে পাকিস্তানের মাত্র ১৭৫ রান সংগ্রহ মোটেই প্রশংসার কথা নয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্ত খেলার মধ্যে কোনই প্রাণ ছিল না। মধ্যাহ্ন ভোজের পর সয়িদ আমেদ অবশ্য মেরে খেলতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর ৬৯ রান দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দান করে। হানিফ মহম্মদ সারাদিন ব্যাটিংয়ের পর ৬৪ রান করে নট আউট থাকেন, সংগে নট আউট থাকেন জাভেদ বার্কি ৩০ রান করে।

প্রয়োজন মত মন্থর ক্রিকেটেরও আদর আছে। কিন্তু দুটি উইকেট পড়ার পর হানিফের এত মন্থর খেলার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। বিশ্ব ক্রিকেটে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে যে হানিফের নাম উঠেছিল তার পক্ষে এই ক্রীড়ারীতি শোভনও নয়।

যাই হক দ্বিতীয় দিন পাকিস্তান ৭ উইকেটে ৩৯৩ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবার পর ইংলন্ড কোন উইকেট না হারিয়ে সংগ্রহ করে ৫৭ রান। বলা বাহুল্য, হানিফের এইদিন শত রান পূরে যাওয়ায় তিনি সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরীর অধিকারী হন। আর জাভেদ বার্কি, যিনি লাহোর টেস্টে ১৩৮ রান করেছিলেন, তিনি এ খেলাতেও ১৪০ রান করে পর পর দুটি টেস্টেই সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এইদিনের আর একটি ঘটনাও উল্লেখ করার মত। ইংলন্ডের ন্যাটা স্পিন বোলার টনি লকের এইদিন টেস্ট খেলার দেড়শত উইকেট পূর্ণ হয়।

ইংলন্ড দলের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার ও বব বারবার দ্বিতীয় দিনের শেষে বেশ মারবার মন নিয়েই খেলা আরম্ভ করেছিলেন। তৃতীয় দিনের শেষে শুধু বারবারের উইকেট হারিয়ে ইংলন্ড সংগ্রহ করে ৩৩৩ রান। জিওফ পুলার ১৬০ রান করেও নট আউট থাকেন।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলায় ইংলন্ডের ব্যাটিং বিপর্যয় দেখা যায়। যাঁরা ১ উইকেটে ৩৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল তাঁদের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৪৩৯ রানে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৯ রান সমেত বাকি ৯টি উইকেটে ইংলন্ড চতুর্থ দিনে সংগ্রহ করে মাত্র ১০৬ রান। প্রত্যুত্তরে দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে পাকিস্তান ২৮ রান করলে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয়।

তৃতীয় দিন থেকেই খেলার আকর্ষণ কমে আসছিল। চতুর্থ দিনের শেষে আর কোনই আকর্ষণ থাকে না। খেলাটির ফলাফল যে অমীমাংসিত থাকবে এ বিষয় সবাই স্থির সিদ্ধান্ত করে নেয়।

তবুও শেষ দিন এক সময়ে পাকিস্তান বেশ একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। হানিফ এ ইনিংসেও সেঞ্চুরী করেন, কিন্তু পাকিস্তানের শেষ ৮টি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৮৯ রানের মধ্যে। যখন পাকিস্তানের ইনিংস ২১৬ রানে শেষ হয় তখন খেলা শেষ হবার সামান্য সময় বাকী। তার মধ্যে ইংলন্ড কোন উইকেট না হারিয়ে ৩৮ রান করলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে।

ঢাকা মাঠের টেস্ট হিসাবে এ টেস্ট নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত কোনদিন ঢাকা মাঠে এত বেশী রান হয়নি। ১৯৫৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ২৫৭ রানই ছিল এ মাঠের বড় ইনিংস। এবার প্রথমে পাকিস্তান ৩৯৩ রান করে সে রেকর্ড ম্লান করে দেয়, পরে ইংলন্ড ম্লান করে পাকিস্তানের ইনিংস ৪৩৯ রান করে। দ্বিতীয়ত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হানিফের ১০৩ রানই ছিল এ মাঠের ব্যক্তিগত বড় রান। এবার হানিফ নিজেই ১১১ ও ১০৪ রান করেছেন, বার্কি করেছেন ১৪০, সবচেয়ে বেশী রান করেছেন জিওফ পুলার ১৬৫। তৃতীয়ত এর আগে এখানে যে চারটি টেস্ট খেলা হয়েছে তার কোন টেস্টেই চারটি সেঞ্চুরী হয়নি। আর দুই ইনিংসে একজনের পক্ষে সেঞ্চুরী তো সম্ভব হয়নি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের সংগে ক্যাপ্টেন মিসেস মায়া দে (গাংগুলী)

নিজে সবরকমের খেলাধুলো করেছেন। সাঁতারের কথা আগেই বলেছি। টেনি-কোয়েট, ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস সব কিছুতেই কিছু কিছু দখল আছে। স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় হাউস সিস্টেমের খেলায় ডেককোয়েটের বিজয়িনী ও বাস্কেটবলে স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী দলের অন্যতমা। এবং বাস্কেটবলকে কেন্দ্র করেই ক্রীড়াজীবনের সূচনা।

১৯৩৬ সাল। ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগে লা মার্টিনার স্কুলকে হারিয়ে ইউনাইটেড মিশনারী স্কুলের যে টীম বাস্কেটবলের স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ পায় মায়া দে ছিলেন সেই দলের খাদ্দি পায়ের সবচেয়ে খ্যাতনাম্নী মেয়ে। মায়া দে-র খেলার উন্নত কলাকলা দেখে মিস বার্টন ওকে তাঁর ডিপ্লোমা কোর্সে যোগ দিতে আহ্বান করেন। মিস বার্টন ছিলেন বাংলা সরকারের মেয়ে স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ওয়াই ডব্লিউ সি এ-তে মেয়েদের খেলাধুলোর চর্চার জন্য প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়। মায়া দে প্রথম গ্রেডের ডিপ্লোমা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস হিসেবে চাকরি নেন বেথুন কলেজ ও স্কুলে। ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম গ্রুপের আর তিনজন বাঙালী মেয়ের মধ্যে হেমলতা সরকার একজন ইংরেজকে বিয়ে করে খেলাধুলোর চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন, সরলা চক্রবর্তী এখন ইউনিভারসিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেডি হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সাধনা বসু জলপাইগুড়ি স্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট হেড মিস্ট্রেস।

ডিপ্লোমা কোর্সে ওদের পড়তে হয়েছে —(১) থিওরী অব গেমস, (২) থিওরী অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, (৩) থিওরী অব সুইমিং, (৪) হিস্ট্রি অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, (৫) অ্যানাটমি ও (৬) হাইজিন। হাতে কলমে করতে হয়েছে জিমন্যাস্টিকস, মাইনর ও মেজর গেমস, অ্যাথলেটিক, সুইমিং ও ধনুর্বিদ্যা ও ফার্স্ট এড।

এ তো গেল খেলার কথা। ১৯৪৯ সালে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য মেয়েদের কাছে যখন প্রথম ডাক এল তখন আর দুটি বাঙালী মেয়ের সংগে মায়া দে সাড়া দিলেন সে ডাকে। অপর দুজন ইন্দিরা দত্ত ও নীলিমা সিংহ। ইন্দিরা দত্ত এখন লেডি ব্রাবোর্নের ফিলসফির অধ্যাপিকা, নীলিমা সিংহ ঐ কলেজেরই বোটানীর ডিমনেস্ট্রেটর।

দিল্লিতে আরম্ভ হল আবার শিক্ষা। এবার লড়াইয়ের কাজকর্ম। বন্দুক চালনা, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, স্কোয়াড ড্রিল, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পরিচালনা। ওয়ারলেস অপারেটিং, সাংকেতিক পরিভাষা শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে হাসপাতালে রোগীদের শয্যা পাতা পর্যন্ত।

তারপর মায়া দে এন সি সির কত ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন, কত প্যারেড চালিত করেছেন তার হিসাব নিকাশ নেই। বাঙলার বাইগাছি, রাঁচির দীপাতলা, দার্জিলিং-এর দরবার হল, নামকুম, ব্যারাকপুর, আগ্রা যেখানেই এন সি সি-র বার্ষিক শিবির বসেছে সেখানেই মায়া দে মেয়েদের কম্যাণ্ডার। তিন শো থেকে পাঁচশ মেয়ের পরিচালনার ভার ওঁর উপর। এবং পোক্ত পরিচালিকা হিসাবে সর্বত্রই সুনাম। শুধু গত বছর রামগড় ক্যাম্পে উনি যোগ দেননি। কে জানে, ওর অনুপস্থিতির ফলেই 'রামগড়' মহিলা সমর শিক্ষার্থীদের ক্যাম্প জীবনের এক কালো অভিজ্ঞতা কি না!

ক্যাম্প কম্যাণ্ডার হিসাবে যোগ্যতার পুরস্কারও পেয়েছেন মায়া দে। ১৯৫৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দিল্লিতে ১৫ দিনের জন্য এন সি সি-র যে ক্যাম্প বসেছিল, সেই ক্যাম্পে সর্বশ্রেষ্ঠ দল হিসাবে বাঙলা দল, পায় শ্রেষ্ঠ দলের 'ব্যানার'। ছেলে মেয়েদের চালচলন, কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, ভদ্রতা, শিষ্টাচার নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের যাচাইয়ের পর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত বাংগলা আর এই 'ব্যানার' ঘরে আনতে পারেননি, এক মায়া দে ছাড়া।

হুগলীর মেয়ে। পাণ্ডুয়ার কাছাকাছি গজিনা দাসপুরে পৈত্রিক বাড়ি। বাবা ছিলেন যোগব্রত দে। বাবার মৃত্যুর পর মা শিক্ষকার চাকরী নেন বর্ধমান মিশনারী গার্লস স্কুলে। কিন্তু মায়া দের স্কুল জীবনের সূচনা হয় কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস স্কুলে। এখন বিধবা মা ও স্বামী অনন্তকুমার গাংগুলীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার।

এন সি সি'র ক্যাপ্টেন মিসেস মায়া দে (গাংগুলী)

খেলাধুলোই জীবনের প্রধান ব্রত। নিজের জীবনের মতই মনে করেন খেলা ধুলায় বড় হবার জন্য সাধনা ও সংযম একান্ত প্রয়োজন।

মায়া দের মতে কলেজেই হোক, স্কুলেই হোক আর ক্লাবেই হোক, যদি উপর থেকে আরম্ভ করে নীচে পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি খেলাধুলোকে হৃদয় দিয়ে ভাল না বাসে তবে সে প্রতিষ্ঠানের কোন বড় সাফল্য সম্ভব নয়।

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 10th February, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়াপয়সা
শনিবার, ২৭ মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

জনশক্তি ও জনশিক্ষা

আগামী পক্ষকালের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন। এইবার তৃতীয়বার। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের রীতিনীতির সঙ্গে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পরিচয় গত দশ বছরে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রায় একুশ কোটি ভোটার সকলেই যে নির্বাচনের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সম্পর্কে সচেতন বা সমপরিমাণে আগ্রহী তা নয়। কোন গণতন্ত্রী দেশেই তা হয় না। তবে ভারতবর্ষের এই সুবৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর বেশ কিছু অংশ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে তাদের ভোটাধিকারের অর্থ কী, ভোট দেওয়ার মূল্য কী। শিক্ষা ও বৈষয়িক সম্পর্কে উন্নত গণতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করে আমরা অনেকে আমাদের দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে এবং সে-কারণে নির্বাচন ব্যবস্থা অর্থাৎ ভোটযুদ্ধ সম্পর্কেও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকি। কথাটা দাঁড়ায় এই যে, ব্রিটেন কিম্বা আমেরিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা হয় না। কিন্তু ব্রিটেন কিম্বা আমেরিকায় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের শুরু একশ' বছর অথবা তারও বেশী আগে; আমাদের মাত্র চৌদ্দ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর বাধা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচকমণ্ডলী তাদের ভোটাধিকার ব্যবহারে যে পরিমাণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

নির্বাচন ব্যাপারে খুব বেশী ভোটারের আগ্রহ দেখা যায় না, এরকম অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। ভোটদাতাদের চেয়ে ভোটপ্রার্থীদের উৎসাহ বেশী; সব গণতন্ত্রী দেশেই তাই। ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলীর একান্ন শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু বেশী; দ্বিতীয় নির্বাচনে সাড়ে সাতচল্লিশ শতাংশ। এর থেকে অনেকের ধারণা ভোটারদের ভোটদানে আগ্রহ ক্ষীয়মান। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে মাত্র দুটি সাধারণ নির্বাচনের ভোট-সংখ্যা দেখে এরকম নৈরাশ্যসূচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সংগত নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভোটার গ্রামবাসী; গ্রামাঞ্চলে ভোটদান ব্যবস্থার উন্নতি হলে ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। এবার প্রতি নয় শ' ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র খোলা হবে; নির্বাচন কমিশনের আশা নির্বাচকমণ্ডলীর ষাট শতাংশ এবার ভোট দেবে। ভোটদানে অনাগ্রহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কম নয়; সেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেক প্রায় ভোট দেয় না। কাজেই তুলনামূলক বিচারে বলা যায় না যে ভারতবর্ষের ভোটারদের উদাসীনতাটা অস্বাভাবিক পরিমাণে বেশী।

নির্বাচনী যুদ্ধকালে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং উত্তাপ স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। তবে যেমন ক্রিকেট খেলার তেমনি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আচরণবিধি পরিচ্ছন্ন হওয়াই নিয়ম। ভারতবর্ষে এ নিয়মের শোচনীয় ব্যতিক্রম কিছু কিছু এখনও ঘটছে। এর প্রতিকারের দায়িত্ব প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলির। ভোটযুদ্ধে হার-জিতটাই বড় কথা নয়, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের রাজনীতিক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল পরস্পর সহনশীলতার অনুশীলন। ব্রিটেনেও এককালে নির্বাচন-যুদ্ধ উপলক্ষে বহু অনাচার, বিশৃংখলা এবং অশান্তি ঘটত। আজকাল ঘটে না। তার কারণ দ্বিবিধ; প্রথমত রাজনৈতিক দলগুলির পরিচ্ছন্ন সুপরিণত দায়িত্ববোধ ও সুশৃংখল সংগঠন, দ্বিতীয়ত ভোটারদের আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান। আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় এই দুটি বস্তুরই এখনও যথেষ্ট অভাব।

সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্য কেবল ভোট সংগ্রহ নয়। নির্বাচন হল একাধারে জনশক্তির স্বীকৃতি এবং জনশিক্ষার উপায়। জনশক্তির স্বীকৃতি এ-কারণে যে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল জনশক্তির প্রতিনিধি। দল মত এবং প্রার্থীর গুণাগুণ যাচাই করে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ভোটদাতাদের। ভোটদাতাদের বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে অশ্রদ্ধা পোষণ করা মানে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ। এ কথা ঠিক যে, সব ভোটদাতার বিচারবুদ্ধি সমান নয়, কোন দেশেই নয়। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সব কিছু গূঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্য ভোটদাতারা হৃদয়ঙ্গম করবে, কোন গণতন্ত্রী দেশেই তা আশা করা হয় না। মোটামুটিভাবে দেশের ভালোমন্দ, বাস্তব জীবনের প্রয়োজন এবং দাবি সম্পর্কে ভোটদাতারা অল্পবিস্তর সচেতন; সাধারণ নির্বাচনকালে ভোটদাতাদের এই আটপৌরে বাস্তব জ্ঞানকে ভিত্তি করে ভোটপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের নানা দল এবং মতের ভালোমন্দ যাচাই-এ উদ্যোগী হওয়াই গণতান্ত্রিক বিধি। এ জন্য বলা যায়, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচন হল একাধারে জনশক্তির স্বীকৃতি এবং জনশিক্ষার সুসংহত প্রয়াস। অবশ্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাতেও বাস্তবক্ষেত্রে নানারকম ফাঁক ও ফাঁকির সুযোগ থাকতে পারে; কিন্তু তা হলেও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে এমন আর কোনও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নেই যেখানে জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে তাদের রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে। অতএব, সাধারণ নির্বাচনের সার্থকতা সর্বতোভাবে স্বীকার্য

নির্বাচনী প্রচার জোর চলেছে!
'দেখো, যেন ধোপে টেঁকে'
ভোটদাতা
কংগ্রেস পার্টি

সুচেতা কৃপালনী প্রত্যেককে কংগ্রেসে ভোট দিতে বলছেন।
উত্তর-বোম্বাইতেও কি?
কংগ্রেসকে ভোট দিন

সুরাবর্দী গ্রেপ্তার।
বাংলার বাঘ এবার খাঁচায়।

নেপালের রাজার সন্নিকটে পটকা নিক্ষিপ্ত।
কে ছুঁড়েছে?
মহেন্দ্র

পাকিস্তান সরকারের অনুরোধক্রমে কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। অধিবেশনের কার্যসূচীও গৃহীত হয়েছিল, অর্থাৎ কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তারপরে স্থির করা হয় যে, ভারতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত থাকবে। পাকিস্তানের অভিযোগ হচ্ছে যে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা ভারত সরকারের নেই, সিকিউরিটি কাউন্সিল তৎপর না হলে অচিরে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি। উত্তরে ভারত সরকার অভিযোগ এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, যদি কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা করতেই হয় তবে তা ভারতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পরে হতে পারে। বর্তমানে ভারতীয় নেতারা সাধারণ নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

সোভিয়েট সরকার সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদে খোলাখুলিভাবে এক পক্ষকে সমর্থন করে অন্য পক্ষের বিরাগভাজন হতে পশ্চিমা শক্তিদেরও বোধ হয় বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবে আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে বৃটেনই বোধ হয় পাকিস্তানের মন রাখার জন্য একটু বেশী ঝুঁকেছিল। বিষয়টিকে নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলে আবার তর্ক বিতর্কের অবতারণা না করে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান সমস্যাটি মিটিয়ে নিক, এই ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট শ্রীইউজিন ব্লাকের নাম মধ্যস্থ হিসাবে প্রস্তাব করে শ্রী নেহরুকে চিঠি লেখেন। এই প্রস্তাবে ভারত সরকার রাজী হন না। খালের জল নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে-বিবাদ ছিল শ্রী ব্লাক তার নিষ্পত্তি করতে সাহায্য করেন। কিন্তু খালের জল সম্পর্কিত বিবাদ এবং কাশ্মীর সম্পর্কিত বিবাদ এক পর্যায়ে পড়ে না। ভারত সরকার বলেন যে, যে-মামলার সঙ্গে সার্বভৌমত্বের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন জড়িত আছে তার নিষ্পত্তির জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষকে সালিশ মানতে ভারত গবর্নমেণ্ট রাজী হতে পারেন না। কেনেডির প্রস্তাবে রাজী হলেই যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হতো তা বলা যায় না। কাশ্মীরের ব্যাপারে রাশিয়ার যে-কূটনৈতিক সমর্থন ভারতবর্ষ লাভ করেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবে রাজী হলে তার শিকড় আলগা হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সম্প্রতি গোয়ার ব্যাপারে সিকিউরিটি কাউন্সিলে সোভিয়েট সরকার ভারত সরকারের কার্য সমর্থন করে ভেটো প্রয়োগ পর্যন্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীরের ব্যাপারে শ্রী ব্লাককে মধ্যস্থ মেনে নিলে সোভিয়েট সরকার নিশ্চয়ই খুশী হতেন না। প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে এ-কথাও শ্রী নেহরু হয়ত ভেবেছেন।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরেই মার্কিন সরকারও আন্তর্জাতিক পাকিস্তানের কথামতো সিকিউরিটি কাউন্সিল ডাকার পক্ষপাতী হলেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির প্রস্তাব শ্রী নেহরু মানলেন না, সেজন্য স্বভাবতই আমেরিকার জনমত ভারত সরকারের উপর কিছুটা রুষ্ট হলো। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডি প্রস্তাবটি প্রকাশ করার পূর্বে যদি একটু চিন্তা করে দেখতেন তা হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, তাঁর প্রস্তাবে ভারত সরকার রাজী হবেন না। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যে সে চিন্তা করেন নি তাও নিশ্চিত বলা যায় না। ভারতের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবে একথা জেনেও তিনি তাঁর প্রস্তাব করে থাকতে পারেন। ভারত সরকারকে একটু বেকায়দায় ফেলা, ভারত সরকারের সম্বন্ধে একটা প্রতিকূল ভাব সৃষ্টি করে রাখার মতলবও মিঃ কেনেডির থাকতে পারে। ওয়াশিংটনের উপর ভারত সরকার বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন এটা প্রকাশ পেলে পণ্ডিত নেহরু নিজেই অস্বস্তি বোধ করবেন। সেইটি করানোও মিঃ কেনেডির একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এই বুদ্ধি একদিকে ঝুঁকে পড়লাম 'নিরপেক্ষ' নীতির অনুসরণকারী বলে যাঁরা খ্যাত তাঁদের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে বড়ো আতঙ্ক। মিঃ কেনেডি হয়ত বুঝে ফেলেছেন 'নিরপেক্ষ'দের দুর্বলতা কোথায়। যাই হোক, সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ডেকে যখন পাকিস্তানের গোঁসা নিবারণ করা হয়েছে তেমনি মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করে ভারত সরকারেরও কিছুটা মন রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার নিশ্চয়ই জানেন যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাহায্যে তাঁরা কাশ্মীরের 'উদ্ধার' করতে পারবেন না, যেমন তাঁরা জানেন যে, কাশ্মীরের পাকিস্তান-অধিকৃত অংশ "উদ্ধারের" জন্যও ভারত সরকার বলপ্রয়োগ করতে অগ্রসর হবেন না। সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই পুরাতন মামলাটাকে আবার খুঁচিয়ে তোলার উদ্দেশ্যটা তবে কী? [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণ মেননের বাগাড়ম্বরে এবং গোয়া-সংঘর্ষের সময়ে ভারত পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি কিছু ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করার জন্য পাকিস্তান সত্যই ভয় পেয়েছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কাশ্মীরের পাক অধিকৃত অংশ "উদ্ধার" করার জন্য ভারত সরকারের যুদ্ধ করার যে কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই, এমন কি বিনা যুদ্ধে পেলেও ভারত সরকার 'আজাদ কাশ্মীর'কে নিয়ে নেবার জন্য মোটেই ব্যস্ত হবেন না, একথা রাওলপিণ্ডির কর্তারা অবশ্যই জানেন। সুতরাং সিকিউরিটি কাউন্সিলে যাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করা। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটা প্রোপাগাণ্ডা করার সুযোগ খোঁজার পিছনে পাকিস্তানের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই কি? প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা আর যাই হোক, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের দিক থেকে পাকিস্তানের কোনো বাস্তব লাভ হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে আর কোন্ লাভের জন্য এই চেষ্টা?

ভারতের সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই ব্যাপারের যোগ থাকতে পারে কি? বর্তমান সাধারণ নির্বাচনে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই সময়ে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটা প্রোপাগাণ্ডার প্রবাহ চালাতে পারলে তাতে সেই চেষ্টা আরো জোরদার হতে পারে। এইভাবে পরোক্ষভাবে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানী প্রভাব আমদানি করার আয়োজন হচ্ছিল কিনা সেটা ভাববার কথা। তবে বাইরের লোকের চেয়ে ঘরের লোকের উপরে নজর রেখেই হয়ত পাকিস্তানী কর্তারা এই সময় সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর নিয়ে একটা হইচই সৃষ্টি করতে গিয়েছিলেন।

শ্রীসুরাবর্দী সাহেবের গ্রেপ্তারের সংবাদ পড়ে সেই কথাটাই বিশেষ করে মনে হচ্ছে। সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন যাতে ঠিক এই সময়ে হয় তার জন্য পাকিস্তান সরকার মনে হয় খুবই চেষ্টা করছিলেন। অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসুরাবর্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বোধ হয় এই আশা করা হয়েছিল যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর বিতর্ক আরম্ভ হলে লোকের মন সেইদিকেই যাবে। শ্রীসুরাবর্দীর গ্রেপ্তার থেকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরে অবস্থার একটা সংকটের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীসুরাবর্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে তিনি পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কাজে লিপ্ত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে 'পাকিস্তানের শত্রুদের' সঙ্গে তিনি নাকি ষড়যন্ত্র করছিলেন। এই অভিযোগ কতটা সত্য তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু শ্রীসুরাবর্দীর সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা সত্যই হোক অথবা সত্যকে বিকৃত করে এই অভিযোগ বানানো হয়ে থাক, পাকিস্তানের ভিতরে যে একটা সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীসুরাবর্দী সাহেবের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র-ধর্মঘট হয়েছে। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর ঢাকায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যে ছাত্র-ধর্মঘট হয়েছে এই থেকে বুঝতে হবে যে, আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে জনমত বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। তা না হলে এই ধর্মঘট করার সাহস আসত না। এই আভ্যন্তরে সংকটের দাওয়াই হিসাবেই বোধ হয় কিছু ভারত-বিদ্বেষী প্রোপাগাণ্ডার প্রয়োজন হয়েছে।

২।২।৬২

রোমান লিপির প্রধান দোষ, স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ বোঝাবার জন্য কোনো চিহ্ন নেই। তাই ডায়াক্রিটিকাল চিহ্ন দেবার সময় a, e, i, o, u-র উপর একটি সোজা টান দিয়ে দীর্ঘ বোঝানো হয়, ইন্টারনেশনাল ফনেটিক সিমবলে স্বরের পর কলোনের মত দুটি ফুটকি দেওয়া হয়। একই স্বর পর পর দু'বার লিখেও দীর্ঘ স্বর বোঝাবার চেষ্টা জর্মানে কিছুটা আছে। Aal (বাঙ মাছ), Boot (নৌকা), Beethoven—বেটোফেন।

আরো দু' একটি ভাষা এই পদ্ধতি পুরো-পুরি গ্রহণ করেছে।

এইবারে আরেকটি ধ্বনি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। এ ধ্বনিটি বাঙলায় এবং আসামী ওড়িয়ায় নেই। তবে কেউ কেউ যখন বাস্, বাস্ (অর্থাৎ হয়েছে, হয়েছে আর না) বলেন তখন ঐ উচ্চারণটি শোনা যায়। হিন্দী 'হম্'—আমরা—বলার সময় এই স্বর আসে। ইংরিজি ফরাসী জর্মন (বর্তমান দিনের সংস্কৃত উচ্চারণেও এই ধ্বনিটি আছে) ও অন্যান্য ভাষায় এই ধ্বনিটি আছে প্রচুর—সবচেয়ে বেশী বললেও অত্যুক্তি হয় না—অথচ এর জন্য কোনো চিহ্ন নেই! একমাত্র হীব্রুতে আছে বলে তার হীব্রু নাম Schwa (উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃত 'শ্ব'-র মত) গ্রহণ করা হয়েছে ও ফনেটিক সিমবলে রোমান e অক্ষরটি উল্টো করে লেখা হয়। ইংরেজির the, polite, bird, about-র যথাক্রমে e, o, i, a-তে এই শ্ব উচ্চারণ আছে। (But, Cut-এর u-তে অন্য উচ্চারণ, এবং সেটি ফরাসী জর্মন ও অন্যান্য ভাষায় নেই)। ফরাসী le-এর e-তে, জর্মান gegeben-এর প্রথম ও তৃতীয় e-তে ঐ শ্ব উচ্চারণই হয়। এ ধ্বনিকে vague indistinct vowel বলা হয়—মতান্তরে half-vowelও বলা হয়।

বাঙলাতে আমরা সচরাচর mayor-কে মেয়োর বা মেয়র উচ্চারণ করি। আসলে mare (ঘোটকী) ও mayor উচ্চারণে কোনো তফাত নেই। অর্থাৎ mayor-এর 'o' উচ্চারণে শ্ব ধ্বনি, এবং r-টি দক্ষিণ ইংলন্ডে কেউ বড় একটা উচ্চারণ করে না।

এই শ্ব ধ্বনিটি কোনো হিন্দীভাষীর কাছ থেকে প্রত্যেক বাঙালীর শিখে নেওয়া উচিত। আমি যে-কটি ভাষা অল্পবিস্তর জানি তার সব-কটাতেই এ ধ্বনি আছে।

বাঙালী 'পাঁচ' উচ্চারণ করার সময় যে অনুনাসিক উচ্চারণ করে সেটির ছড়া-ছড়ি ফরাসীতে—ইংরিজী, জর্মন, ডাচ ইত্যাদিতে এটি নেই, এবং বর্তমান ফার্সী থেকেও এটা লোপ পেতে চলেছে। Restaurant (রেস্তোরাঁ), pince-nez (প্যাঁস-নে)-তে যে অনুনাসিক আছে ইংরেজ জর্মন উচ্চারণ করে রেস্টোরাং, পেংসনে। Romain Rolland উচ্চারণ দেখাতে লেখে Romang Rollang এবং উচ্চারণ করে রোমাং রোলাং।

বস্তুত মোটামুটিভাবে বলা চলে ফরাসীতে একই সিলেবলে যদি n, বা m অক্ষর কোনো স্বরের পরে আসে তবে সে n m চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। main (মাঁ হাত), pain (প্যাঁ=রুটি)*, entree (আঁত্রে—সাইড ডিশ, অর্থাৎ কি না যে খাদ্য সুপের পরই enter করেছে— ফরাসী ভাষায় soup এর প্রথম শব্দ potage, পতাজ, তার পর soupe, এবং তার পর bouillon=বুইয়োঁ, i-এর পর ll উচ্চারণ হয় না, এবং consomme=কঁসমে clear soup, হাল্কা সুপ, অর্থাৎ সাদামাটা হাল্কা ডালের জল, মাদ্রাজী রসম্), monde (মঁদ=পৃথিবী=রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' লা মেজোঁ এ ল্য মঁদ), ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের চন্দননগর ফরাসীরা লেখে Chandernagore, উচ্চারণ করে শাঁদে নাগো।

এই ch-এর ঝামেলা এই বেলা চুকিয়ে ফেলা ভালো।

বাঙলার 'চ' ও 'জ' ইংরিজীতে আছে, ফরাসী জর্মনে নেই, ইটালিয়ানে বিস্তর (Count Ciano=কাউন্ট চানো; Tucci—অধ্যাপক তুচ্চি; Vermicelli=ভের্মিচেল্লি; ঈদের দিন মুসলমানদের সেওই ঐ একই বস্তু)। আরবীতে 'চ' নেই (অতএব বাঙলাতে যদি কখনো কোনো যাবনী শব্দ দেখেন যেটাতে 'চ' রয়েছে তবে তৎক্ষণাৎই বুঝে নেবেন, ওটা আরবী হতে পারে না, ফার্সীই হবে; যেমন চশমা=eye glasses, চাকর=ভৃত্য) হাঙ্গেরিয়ানে 'চ' আছে, লেখা হয় cz দিয়ে।

ফরাসী 'চ' বোঝাতে হলে লেখে tch, যেমন চেকোস্লোভাকিয়া লিখতে লেখে Tchecoslovakie. স্বয়ং চেকরা লেখে শুধু C দিয়ে, উপরে একটা হুক টেনে। জর্মনরা 'চ' বোঝাতে হলে tsch লেখে। ফলে জর্মন ফরাসীতে মিলে রুশ লেখক চেখফ (রুশ ভাষায় 'চ' বোঝবার জন্য পরিষ্কার আলাদা হরফ আছে) লেখে Tchkhov, Tschekhoff, ইত্যাদি বহু পার্মুটেশন কম্বিনেশনে।

ফরাসী আমাদের বাঙলা জ বোঝাতে হলে লেখে dj, জর্মন লেখে dsch. আমাদের মহারাজা তাই ফরাসী লেখে Maharadja; জর্মন লেখে Maharadscha. কিন্তু যার রক্তে, অর্থাৎ যার জিহ্বায় যা নেই তা হবে কি করে? জর্মন উচ্চারণ করে মহারাট্শা।

মোটামুটি তাই ধরে নিতে পারেন, আপনার নাম যদি চারুচন্দ্র চাটুয্যে হয় তবে ফরাসী জর্মন উচ্চারণ করবে, শারুশন্দ্র শ্যাটার্শী! আপনার নাম যদি যামিনী ব্যানার্জী হয়, তবে উচ্চারণ করবে শামিনী বানার্শী!

এতে আশ্চর্য হবেন না। শুনেছি, আমাদের 'ধ্রুব' চীনা ভাষায় 'দুলুফো' হয়, ইংরেজি Trafalgar জাপানীতে তাফারুগার হয়! (ক্রমশ)

* পোর্তুগীজরা লেখে pao এবং o-র উপর একটি ঢেউখেলানো লাইন কাটে—অনুনাসিক (চন্দ্রবিন্দু) বোঝবার জন্য। সেই শব্দ নিয়ে আমরা বানালুম পাউরুটি। 'পাউ' মানেই রুটি। দ্বিরুক্তিদোষ হয়ে গেল, লক্ষ্য করলুম কি? ঠিক তেমনি নান রুটি। 'নন' ফার্সী শব্দের অর্থ রুটি। আমি শিলং-এ বনরুটিও শুনেছি।
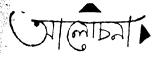
ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা

দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

গত ১৩ই মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায় 'ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা' শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লিখেছেন। বলাই বাহুল্য যে, প্রাগুক্ত প্রবন্ধের বিশেষ কয়েকটি মতামত যুক্তিসম্মত হয়নি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশ জনতার, দেশ জাতির। কিন্তু এই দেশের শাসনভার, শুভাশুভ প্রভৃতির দায়িত্ব বিশেষ বিশেষ দলের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং দলের প্রতিভূ হিসেবে যিনি বা যাঁরা কাজ করেন, তাঁদেরকেই সমালোচনা শুনতে হয়।

পথ চলতে চলতে মোটরগাড়ি যদি দুর্ঘটনা ঘটায়, তবে সে দোষ মোটরগাড়ির নয়—চালকের।

খাদ্যে যারা ভেজাল দিয়ে জাতির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাবার অপচেষ্টা করছে, একদা তাদের ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দেবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন দেশের সর্বজনবন্দিত নেতা। ফাঁসি দেওয়া তো দূরের কথা, ভেজালকারী অথবা চোরাকারবারীদের একটি কেশাগ্র স্পর্শ করার প্রয়াস অদ্যাবধি করা হয়নি। আজ যদি কেউ ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রশ্ন তোলেন, 'এ দোষ কার? কেন খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়, কেন দেশে চোরাকারবার প্রশ্রয় পাচ্ছে?' তবে কি কেউ ভেজালকারী অথবা চোরাকারবারীদের ওপর সমস্ত অপরাধ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন? বিবেকবান দুষ্কৃতকারী যেমন হতে পারে না, তেমনি দুষ্কৃতকারীদের বিবেক বলে কোন পদার্থ মনের অন্তরালে কাজ করে না। দেশের শাসনভার যাদের হাতে, তাদেরকেই দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

বিবেক বা আদর্শ কোন অলৌকিক বস্তু নয়। বিবেক ও আদর্শ শিক্ষানির্ভর। দেশের নেতৃবৃন্দ যদি বিবেক ও আদর্শের পরাকাষ্ঠা না দেখাতে সমর্থ হন, তবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিবেক ও আদর্শ আশা করা বাতুলতা মাত্র। জনতাকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব দেশের নেতৃবৃন্দের। আপামর জনসাধারণ যেখানে বুভুক্ষু, যেখানে পরিকীর্ণ মৃত্যুময়তা আর হতাশার অন্ধকার, সেখানে সৎ সুস্থ জীবনবোধের পরিচিতি কামনা করা দুরূহ। আজকে দেশের সামনে ব্যক্তির দায়িত্বের চেয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্বই বড়ো। রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির সত্তা নিতান্ত নগণ্য। রাষ্ট্রই আজ চালক, ব্যক্তি চালিত। কাজেই ব্যক্তি আজ সমালোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং তাঁদের রাজনীতি, এই-ই হওয়া উচিত সমস্ত সমালোচনার উৎস।

সবিনয়ে একটা কথা উল্লেখ করছি যে, শ্রীমুখোপাধ্যায় আসল সমস্যার ওপর আলোকপাত না করে, সমস্যা থেকে উদ্ভূত কারণগুলোকে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করেছেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় সরকারী অফিসের ক্ষুদে কর্মীদের কর্তব্যবোধ ও সততা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ কতখানি সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ, তার কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীমুখোপাধ্যায় জানেন কিনা জানি না যে, আমাদের সরকারী শাসনযন্ত্রে 'লালফিতা'র দৌরাত্ম্য বলে এক অদৃশ্য যন্ত্র আছে। সে যন্ত্রটি এমনই যে, তার কল্যাণে হওয়া জিনিস হতেও সময় নেয়। স্পষ্ট করে বলা যাক। একটি চিঠির উত্তর দিতে হয়তো বেশী সময় লাগে না, কিন্তু সেই চিঠিটি পাঁচ হাতের স্বাক্ষর ও পাঁচ টেবিলের হাওয়া খেয়ে, তবে আসল ব্যক্তির হাতে গিয়ে পৌঁছয়। প্রশাসন-যন্ত্রের এই ঢিলেমির জন্য ক্ষুদে কর্মীরা দায়ী নয়।

সুধা দাস
কলকাতা

২৬শে জানুয়ারী এবং আকাশবাণী

মাননীয় 'দেশ' সম্পাদক সমীপেষু,—

মহাশয়,

এবার ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আকাশবাণীর বাংলা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ করলাম। একজন বাংগালী শ্রোতা হিসাবে আমার কানে এগুলি বেসুরো লেগেছে।

২৬শে জানুয়ারী রাত্রি ১০॥টায় 'এক জাতি, এক প্রাণ' বলে একটি বেতার রূপক প্রচারিত হয়, বাংলা ভাষায়। সেটাতে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ভারতে বহু বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস হলেও, এই বৈচিত্র্য নিয়েও ভারত এক। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা একতার সুর রয়েছে। খুবই ভাল কথা। বহু মনীষী বহুবার এ-কথা বলে গিয়েছেন। এখানে বক্তা সেই কথাটাই বোঝাতে গিয়ে কাশ্মীর, পাঞ্জাব থেকে শুরু করে নাগাদেশ, মণিপুর, এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যেরও লোক-সংগীতের একটু করে নমুনা পরিবেশন করেছেন। এমন কি সৌরাষ্ট্রের আদিবাসীদের লোক-সংগীতও মনোমুগ্ধকর বলে বক্তা আমাদের জানালেন—কেবল জানালেন না পশ্চিম বাঙলার লোক-সংগীতের কথা। তিনি ভুলে গেলেন বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি ও কীর্তনের কথা উল্লেখ করতে। ওগুলি বোধ হয় বক্তাকে মুগ্ধ করে না, আর না হয় তিনি সতর্কতার সংগে ওগুলির উল্লেখ পরিহার করে গিয়েছেন দিল্লিকে খুশী করবার জন্য। কথাগুলি যখন বাংলা ভাষায় প্রচারিত—তখন তো নিশ্চয়ই বাঙালী শ্রোতাদের উদ্দেশেই। বাঙলা কি ঐ এক জাতি, এক প্রাণের একটা অংশ নয়, না কি ভারতের ঐ খণ্ডিত অংশটুকুকে বাদ দিলেও ক্ষতি নেই!

এবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৬শে জানুয়ারী উৎসবে পশ্চিম বাংলা অংশ গ্রহণ করেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। কারণ ঐদিনেরই দিল্লি থেকে প্রচারিত সর্বভারতীয় বাংলা সংবাদে ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলির নাম শুনতে পেলাম, কেবল শুনলাম না পশ্চিম বাঙলার নাম। এবার শোভাযাত্রায় কি পশ্চিম বাংলা অংশ গ্রহণ করেনি? না কি পশ্চিম বাঙলার নাম উল্লেখ করতে ভুল হয়ে গিয়েছে?

২৩শে জানুয়ারীর আকাশবাণীর প্রচারিত অনুষ্ঠানের কথা না বলাই ভাল। শুনে মনে হয় আকাশবাণী ঐ অনুষ্ঠানটুকু করে সুভাষচন্দ্রকে যেন ধন্য করছেন। ইতি—

রমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
জামসেদপুর

'চড়ুইয়ের সংগে লড়াই'

সবিনয় নিবেদন,

'চড়ুইয়ের সংগে লড়াই' পড়লাম। এ-জাতীয় স্বচ্ছ ঝরঝরে অনুবাদ আমি খুব বেশী পড়িনি। আমাদের ঘরের পাশেই এত বই পড়ে রয়েছে যার অনুবাদ হওয়া উচিত সর্বাগ্রে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনুবাদকরা বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত গ্রন্থের অংশবিশেষ এভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করলে এবং আমাদের মত যারা ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাদের গোচরে আনলে আপনারা ধন্যবাদ-ভাজন হবেন। আয়ুবশাহী রাজত্বে ও-ধারের সংবাদ জানার কোনো উপায় নেই।

'অগ্নিবিহীন অগ্নিকোণ' গ্রন্থের অনুবাদকের নাম আপনার পত্রিকায় আশা করেছিলাম কিন্তু পেলাম না। অনুবাদকের নাম জানতে চাই। ইতি—

নিতাইচরণ দে
গ্রন্থাগারিক, সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর।

আমাদের বক্তব্য

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর এই পত্রগুচ্ছের অনুবাদক নাম গোপন রেখে ছদ্মনাম নিয়েছেন 'আজাকলম'। এই অনুবাদগ্রন্থের প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা প্রদত্ত হল : এন হক, ৩৩ ইসলামপুর, ঢাকা-১, পূর্ব পাকিস্তান। —সম্পাদক

ভ্রম সংশোধন

শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী' শীর্ষক প্রবন্ধের (৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত) সম্পর্কে ১০ম সংখ্যা 'দেশ'-এ প্রথম যে পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে লেখকের নাম ভ্রমক্রমে নীলরতন সরকার ছাপা হয়েছে। পত্র-লেখকের নাম : **নীলরতন সেন।**

নগেশ হালদার ডায়েরি লিখছেন।

"যে দেশে আমাদের বাড়ি ছিল, যে দেশের ক্ষেত-খামার, পুকুর বাগান, যে দেশের আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, পশু-পক্ষী, নদী-প্রান্তর, যে দেশের লোকজন (এমন কি মুসলমানরাও) আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল, সে দেশ এখন আমাদের দেশ নয়। আমরা সে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছি। ভারতবর্ষের গণ্যমান্য লোকেরা একদিন আমাদের ভালোর জন্যেই নাকি দেশ ভাগ করে নিজেরা গদিতে বসেছিলেন। তাঁরা এখনও গণ্যমান্যই আছেন, কিন্তু আমরা, যারা নগণ্য তারা আরও নগণ্য হয়ে গেছি। এমন কি আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষায় কারও সঙ্গে কথা বলি, সবাই হেসে ঠাট্টা করে। তাই আপনাদের ভাষাতেই আমার ডায়েরি লিখছি, আপনাদের যদি কেউ কখনও এ ডায়েরি পড়েন, সহজে বুঝতে পারবেন।

আমাদের দুঃখ-দুর্দশার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে আপনাদের মনে অনুকম্পা উদ্রেক করবার বাসনা আমার নেই। লিখছি সময় কাটাবার জন্যে, আর কিছু করবার নেই বলে। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করি। সকাল-সন্ধ্যা হাতে অনেক সময় থাকে। যা মনে আসে লিখে যাই। আমাদের দুর্দশার অনেক বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে, আমাদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ অনেক প্রবন্ধও আমি পড়েছি, আমাদের মতো গৃহহারাদের পুনরায় গৃহস্থ করবার জন্য সদাশয় গভর্নমেণ্টেরও চেষ্টার অন্ত নেই, খরচও নাকি অনেক করছেন তাঁরা—এ সবাই জানে, এ-ও জানে যে, তবু আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। এ দেশের উপর যেন আমাদের কোনও দাবি নেই, আমরা সকলেরই কৃপা-পাত্র, আমরা কারও আপন জন হতে পারি নি, এমন কি যাঁরা আমাদের রক্তসম্পর্কের আত্মীয় তাঁরাও আমাদের আপন-জন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। তাঁরাও আমাদের দূর থেকে দয়া করেন, কাছে টেনে নিতে চান না। না, কারও মনে করুণা উদ্রেক করবার ইচ্ছা আর আমার নেই। ওই সব লোক-দেখানো বা কর্তব্য-প্রণোদিত করুণার উপর ঘৃণা জন্মে গেছে। গাছের ফুলকে বৃন্তচ্যুত করে শৌখীন ফুলদানিতে যাঁরা তাঁদের জলে ডুবিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁরা শৌখীন দয়ালু লোক হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা ফুলের আপন লোক নন। কিন্তু তবু এই অনাত্মীয় শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়দের মধ্যেই বাস করতে হচ্ছে। প্রাণপণে চেষ্টা করতে হচ্ছে আমার যোগ্যতা প্রমাণ করবার, এ দেশের উপর আমারও যে একটা দাবি আছে, আমি যে কতকগুলো খামখেয়ালী বা স্বার্থপর লোকের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র নই—এই বোধটা জাগ্রত রাখবার।

হ্যাঁ, আমি যে যোগ্য সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে আছি। এ যোগ্যতার প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। জমিটা যে উর্বর তা প্রমাণ করবার জন্যে যুক্তির দরকার হয় না। যখনই সে জমিতে সবুজ ঘাস গজায় তখনই বোঝা যায় সে জমির উর্বরতা আছে, ভালো সার দিলে সে জমিতে ভালো ফসলও ফলানো যাবে। কিন্তু আমার জীবনের মরুভূমিতে একটি তৃণাঙ্কুরও গজায় নি এখনও। বিস্মিত হয়ে ভাবি, কেন গজায় নি? আমার জীবনের সব রস কি নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে? আমার জীবন তো সত্যই মরুভূমি ছিল না। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক স্নেহ, অনেক ভালবাসা, অনেক

বিশ্বাস, অনেক স্বপ্ন...না, মনে হচ্ছে আমি যেন নিজের উপর রাশ টেনে রাখতে পারছি না।

আমার জীবন কেমন ছিল তার একটু নমুনো দিচ্ছি। পদ্মার ধারে একটি ছোট গ্রামে বাড়ি ছিল আমার। গ্রামের নাম না-ই জানলেন। আমাদের বাড়ি পাকা ছিল না। মাটির দেওয়াল, টিনের ছাদ। বাড়ির উঠান ছিল প্রকাণ্ড। উঠানের চারি ধারে ঘর। পূবের কোঠা, পশ্চিমের কোঠা, দক্ষিণের কোঠা আর উত্তরের কোঠা। তা ছাড়া ছিল ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর। রান্নাঘর দু'রকম—আমিষ এবং নিরামিষ। বাড়ির চারিধারে অনেকখানি জমি। সামনে পুকুর, পিছনে পুকুর। তা ছাড়া একটা বাগান। সে বাগানে না ছিল কি। আম, জাম, কাঁটাল, গোলাপ জাম, জামরুল, গাব, কাউ, চালতা, লেবু, সফেদা, সাপটু, পেয়ারা। সেই বাগানে জন্মাত নানা জাতের অজ্ঞাত-কুল-শীল লতা, আর তাতে ফুটত কত অদ্ভুত সুন্দর ফুল। সেই বাগানে কত নিস্তব্ধ দুপুর কাটিয়েছি, আমি আর আমার বোন বুলি। গাছে উঠে ফল পেড়ে খেয়েছি, অজানা বনলতার ফুল গুঁজে দিয়েছি বুলির খোঁপায়। পাখির বাসার সন্ধানে ফিরেছি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে। জলে নেমে গামছা দিয়ে ছোট ছোট মাছ ছেঁকে তুলেছি খালের জল থেকে, ছোট ছোট মাছও ধরেছি পুকুরে বসে ছিপ দিয়ে। বুলি যখন একাগ্র দৃষ্টিতে নীরবে ফাৎনাটার দিকে চেয়ে বসে থাকত তখন তাকে মনে হত যেন মাছরাঙা পাখি। জামদানী ঢাকাই শাড়ি আঁটসাঁট করে পরা, খোঁপায় একগোছা মৌরী ফুল, ভুরু আর নাক ঈষৎ কোঁচকানো, একাগ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফাৎনার উপর, তারপর ছিপ ধরে আকস্মিক টান এবং বঁড়শির মুখে জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব—বাটা বা পুঁটি-মাছের ছটফটানি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ওর নাম ছিল বুলবুলি, কিন্তু ওকে আমি মাছরাঙাই ভাবতাম মনে মনে। আর একটা কথাও মনে পড়ছে। বেত-বন থেকে পাকা বেত-ফল এনে সে ঝাঁকাতো নানারকম মসলা দিয়ে। খিড়কি পুকুরের ঘাটে বসে তাই তারিয়ে তারিয়ে খেতাম দুজনে। বুলি পা নাচিয়ে নাচিয়ে খেত, আর খেতে খেতে চোখমুখ কুঁচকে যেভাবে চাইত আমার দিকে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে তা এখনও ভুলি নি।

আর মনে পড়ছে মা-কে। স্বয়ং লক্ষ্মীকে কখনও দেখি নি, আমার মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর তুলনা চলবে কি না জানি না। কিন্তু আমার মা যা ছিলেন তা বর্ণনার সীমায় ধরবার ক্ষমতা আমার নেই। টকটকে লাল-পেড়ে গরদ পরে তিনি যখন ঠাকুরঘরে রাধাবল্লভের সামনে পুজো করতেন—তাঁর চারিপাশে পুজোর উপচার আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি—নানারকম ফুলের মালা, চন্দন, ধূপ, শ্বেতপাথরের থালায় নৈবেদ্য, রুপোর ছোট ছোট থালায় কতরকম ফল, রুপোর গ্লাসে গ্লাসে জল মধু আর দুধ, চকচকে তামার পরাতে অজস্র ফুলের রাশি —সে যে কি অবর্ণনীয় মহিমা—সে মহিমা রাধাবল্লভের, না মায়ের, না আমার কল্পনার তা জানি না—কিন্তু তা অপরূপ। হ্যাঁ, যদিও এই প্রসঙ্গে অবান্তর ব'লে ...

কিন্তু এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে ... সেটা—গোয়ালন্দগামী স্টীমারের ভোঁ ... যখন পুজো করতেন তখন পদ্মার উপর ... স্টীমারখানা যেত, ভোঁ দিয়ে যেত, ... দিয়ে যেত, মাকে যেন অভিনন্দন ... যেত। যেন বলে যেত, আমিও বন্দরে চ... তুমিও চলেছ, আবার দেখা হবে। ... ডাক দিয়ে যেত স্টীমারটা। গভীর নি... ঘুমের ঘোরেও তার ডাক শুনেছি। ... হয়তো ডাকে সে। আমরা আর শুনতে ... না। মা কি শুনতে পান? কে ... মা এখন কোথায়? বুলিই বা কো... এই দুটো প্রশ্ন অনেকদিন আমার দি... শান্তি এবং রাত্রের নিদ্রা হরণ করেছে, ... এখন আর করে না। মনের সে শাণিত ... ভোঁতা হ'য়ে গেছে। একদিন যা এক ... মানুষের মাথা কেটে ফেলতে পারত এখ... সামান্য তরকারিও কাটতে পারে না। স... অসাড় হয়ে গেছে। যারা আমাদের ... সর্বনাশ করেছে তাদেরই অধীনে ... করছি, যে দেশের লোকেরা পর ... আমাদের বারবার পায়ে ঠেলছে সেই ... লোকেদের সঙ্গেই আত্মীয়তার দাবি ... এবং আমার এই দাবিটা যে মুখোশের ... নয়, অন্তরের দাবি, তা প্রমাণ করবার ... করছি নিজের কাছেও। কিন্তু দাবি কি ... ভালবাসার দাবিই তো—কিন্তু না, এ ... কথা মুখ ফুটে বলবার নয়। যে ... আমার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে ... গেছে, যার দগ্ধাবশেষের সম্বলও ...
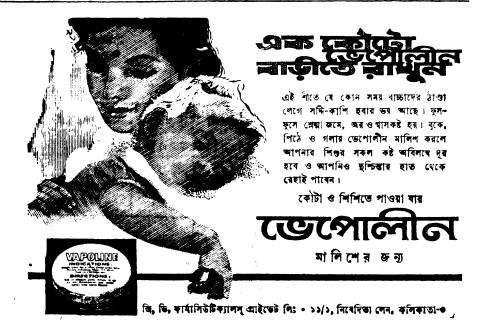
কাছে আর নেই, যার কয়লা আর ছাইগুলো পর্যন্ত নিঃশেষে গ্রাস করেছেন মহাকাল—আমার সেই অতীত জীবনে যখন বাস করতাম তখন তো এ ধরনের দাবির কথা মনেও হয় নি কখনও—মাছেদের যেমন মনে হয় না জলের উপর দাবির কথা যতক্ষণ তারা জলের ভিতর থাকে, জল থেকে টেনে তুললেই তাদের মনে হয়, এ কি হ'ল—এ কি দুর্দৈব—এ কি চক্রান্ত। ডাঙায় উঠে ছটফট করতে করতে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হয়, যেখানে এসে পড়েছি সেখানে কি আমার কোনও দাবি আছে এবং এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়ার আগেই হয়তো তার মৃত্যু হয় এবং ঝাল ঝোল অম্বল কাটলেট চাই চপে রূপান্তরিত হয়ে হয়তো সে...না থাই হারিয়ে ফেলেছি। দাবির কথা আর তুলব না। একটা কথা মনে হচ্ছে—যখন আমার বাড়িতে পিশাচদের তাণ্ডব চলছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম না, বিলেতে তখন আমি ডিগ্রী অর্জনের চেষ্টা করছিলাম। বিধবা মায়ের সমস্ত গয়না বিক্রি করে বিলেত যাওয়ার দুর্মতি আমার কেন হয়েছিল বারবার এই কথাটাই মনে হয় এখন। কিন্তু যদি সে সময়ে আমি বাড়িতে থাকতাম তা হলে কি হত? ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতাম? ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতাম? না, কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতাম? ঠিক জানি না, কি করতাম। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কে কি করবে তা আগে থাকতে কেউ ঠিক করতে পারে কি? অনেকগুলো সম্ভাবনা থাকে, যে কোনও একটাকে সে আঁকড়ে ধরে। আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত বাঁচবে বলেই। কখনও বাঁচে, কখনও বাঁচে না। বুলি কি বেঁচে আছে? আমার মা? কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল তারা। আমিও তো অবলুপ্ত হয়ে গেছি আমার গ্রামের লোকেদের কাছে। হরি, আবদুল, ফজলু, মিঠি, বদা এরা কি আমার খবর রাখে আর? মিঠিকে আমি যে বাঁশিটা দিয়েছিলাম সেটা বাজাবার সময় আমার কথা কি তার মনে পড়ে? কিন্তু আমি তো দিব্য বেঁচে আছি। বুলি আর মা কি তেমনি কোথাও সত্যি মনে হচ্ছে, বেঁচে আছে কি না তা জানবার জন্যে আমার ততটা আগ্রহ নেই, আমার কৌতূহল কেমন করে বেঁচে আছে তাই জানবার জন্য। অর্থাৎ তারা...না, কথাটা স্পষ্টভাবে ভাবতেও ভয় করে। অথচ কেউ যদি প্রশ্ন করে ভয়টা কিসের, ওসব তো কুসংস্কার যে কতটা মূল্যহীন তা কি তুমি জান না, বিলেতে তুমি কি দেখ নি যে, যে সমাজকে আমরা আদর্শ করেছি, হিন্দুরা যাকে সতীত্ব বলে সে জিনিসের কোনও কদর নেই সে সমাজে? সেখানে রাস্তায় ঘাটে পার্কে গার্ডেনে নর-নারীর মিলনের অবাধ সুযোগ কি দেখে আস নি তুমি? জাত নিয়ে, সতীত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা কি

প্রাদেশিকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার মতো হাস্যকর জিনিস নয় একটা? এসব নিয়ে কিছু ভাবা অনর্থক, কিছু লেখা বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। এ বিষয়ে একটিমাত্র সত্যই আমার কাছে একমাত্র সত্য—কাঁটার মতো বিঁধে আছে কথাটা বুকের ভিতর। সে কাঁটা তোলবার উপায় নেই, কাউকে দেখাবারও উপায় নেই।

......হঠাৎ চীনে মুরগী দুটো ডেকে উঠল তারস্বরে। চীনে মুরগীরা যখন ডাকে মনে হয় আর্তনাদ করছে। অন্য মুরগীরাও ডাকতে শুরু করেছে, কোলাহল করছে বিশেষ করে লাল বড় মোরগটা। তারপর খুব সরু গলায়—"বাবু, মুর্গি আন্ডা দেলকে, আন্ডা দেলকে"

ডাক্তারবাবুর বুড়ী দাইয়ের নাতি বিজয়ের গলা। উঠতে হল। মুরগীর ঘরের চাবি আমার কাছে। উঠে বেরিয়ে এলাম আর একটা জগতে, বাইরের জগতে, যে জগতে এখন আমি আছি।

এ জগৎটা খারাপ নয়, অতি সুন্দর। শহর থেকে দূরে, গঙ্গার তীরে। ছেলেবেলা উদ্দাম পদ্মার তীরে কেটেছে, যৌবনে টেম্সের সুসজ্জিত সৌন্দর্য উপভোগ করেছি, জীবনের আসন্ন অপরাহ্নে এসেছি গঙ্গার তটে। আমি যেখানে আছি সেখানে গঙ্গা দুকূল-প্লাবিনী নয়, সন্ন্যাসিনী। তার বিরাট খাতে কখনও জল থাকে, কখনও থাকে না। শীতকালেই সে বৈরাগিনীর মূর্তি ধারণ করে। সামান্য শীর্ণধারা বইতে থাকে এদিকে-ওদিকে, তবু তারই চারধারে নামে শীতের অতিথি পাখিরা। খঞ্জন, কাদাখোঁচার দল, সোআলোর ঝাঁক, কখনও কখনও ছোটবড় হাঁসও নানারকম। এই হাঁসেরা আসে গভীর রাতে। অন্ধকারে-শিহরন-জাগানো ওদের ডাক শুনে সেটা বুঝতে পারা যায়। কাছাকাছি মানুষ এলেই কিন্তু উড়ে যায় অদ্ভুত পাখার শব্দ করে। বন্দুকধারী মাংসাশী মানুষদের ওরা চিনে ফেলেছে। মানুষেরাই মানুষদের কাছ থেকে পালায়, পাখিরা তো পালাবেই। জলের স্রোতে অসংখ্য ছোট ছোট মাছ, প্রতিবেশী বালকবালিকাদের মনের এবং দেহের খোরাক জোগায়। ওদের দেখে মনে পড়ে যায় আমার ছেলেবেলার কথা। মনে পড়ে যায় মাছ-রাঙাকে। গঙ্গার চরে শুধু বালি নয়, পলি-মাটিরও প্রাচুর্য খুব। শীতকালে জমি চষে, গম যব বুট বুনে দেয়, কিছুদিন পরেই ধূসর চর শ্যামল হয়ে ওঠে। তারপর যখন শস্য পাকে তখন চরের আর এক রূপ। দিগন্তের নীলে গিয়ে মিশেছে পাকা ফসলের তরঙ্গিত স্বর্ণ-কান্তি। সকালে-বিকালে ভবঘুরে পাখিদের আকাশ-বন্দনা, কৃষকের কণ্ঠে প্রাণ-খোলা গান, আশপাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে ফসল চুরি করা, স্তূপীকৃত কাটা ফসলের রূপ, গরু দিয়ে ফসল মাড়ানো, তার চারিধারে শুধু মানুষ নয়, শালিক-কাক-ফিঙেদের ভিড়, মাথার উপর নীলকণ্ঠের কর্কশ-কণ্ঠের প্রেয়সী-বন্দনা, নিঃশব্দ দুপুরে চিল আর শকুনদের নিঃশব্দ আকাশ-পরিক্রমা—এ সমস্তটা মিলিয়ে গঙ্গার চরের যে শোভা আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে, তা গঙ্গারই শোভা, কিন্তু সে গঙ্গা প্রবলা প্রত্যক্ষবর্তিনী নয়, ... রহস্যময়ী নেপথ্যবাসিনী, গঙ্গা এখানে যেন উদাসিনী সন্ন্যাসিনী, কর্মচঞ্চলা তরুণী নয়। তার রাজত্ব সে যেন ছেড়ে দিয়েছে চরকে, তার চিরপরিচিত রূপ লুকিয়ে দেখা দিয়েছে যেন নূতন রূপে। দেখা দিতেই হবে, রূপ লুকিয়ে রাখা যায় না। চরের ওপারেই কিন্তু গঙ্গার সাবেক রূপ, তরঙ্গ-মুখরা স্রোতস্বিনী। লোকে সেখানে স্নান করছে, পান করছে তার জল, পূজার অর্ঘ্য রচনা করছে, সাঁতার কাটছে, নৌকা ভাসাচ্ছে। একই গঙ্গার দুই রূপ। গঙ্গার ওই তরঙ্গ-মুখর রূপ মাঝে মাঝে দেখব বলে বেরিয়ে পড়ি, হেঁটে চর পার হয়ে যাই। শুধু গঙ্গা দেখব বলে নয়, মাছরাঙা দেখব বলে। ওখানে মাঝে মাঝে মাছরাঙা দেখা যায়।

বিজয় সরু গলায় আবার বললে, "বাবু, আন্ডা দেলকে মুর্গি।"

"চল, কোথায় দেখি।"

বিজয়ের বয়স চার বছর। তার দৈনন্দিন কর্মসূচী বিবিধ এবং বিচিত্র। যে ... ছুতোয় জল ঘাঁটা, ধুলো ঘাঁটা, ... গুলি আর বল হারানো, তার বোন শান্তির সঙ্গে খুনসুটি করা, লুকিয়ে পালিয়ে ... তার পিসি রুক্মিনিয়ার কাছে খাবার ... আসা (কখনও কখনও মারও), ডাক্তারবাবুর মোটরটা যখন তাঁর ড্রাইভার বার ... পরিষ্কার করে তখন তার চারদিকে ঘুরে ... করা এবং সুযোগ পেলেই তাতে চড়ে ... গিনিপিগ আর খরগোশের খাঁচার কাছে ... তাদের সঙ্গে আলাপ করা এবং ... উচ্ছিষ্ট ছোলা পেলে এদিক-ওদিক ... সেটা মুখে পুরে দেওয়া, একটা ... তোবড়ানো ছোট টিনের মোটরে দড়ি ... সেটা টেনে নিয়ে বেড়ানো, কিন্তু ... সবচেয়ে বড় কর্তব্য মুরগীর ঘর ... ডিমটি সংগ্রহ করে মাইজিকে দিয়ে আ... মাইজি মানে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। মুর... ঘরের চাবিটা থাকে আমার কাছে, কারণ ... সঙ্গে গেটের চাবিটাও থাকে এক রিং... ডাক্তারবাবুর বাড়ির প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের এক ধারে যে 'আউট-হাউস'টা আছে ... আমি থাকি। কিছুদিন আগে যখন এ... চাকরি নিয়ে এসেছিলাম, তখন বাড়ি ... পাচ্ছিলাম না। ডাক্তারবাবু তখন স্বতঃপ্র... হয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ... 'আউট হাউস'টাতে। আমি ভাড়া... তুলেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু বললে... আমি বাড়িভাড়া নিই না। তবে ... যতদিন খুশি থাকতে পারেন। ...

লনাম, এভাবে কি থাকা যায়! তৎক্ষণাৎ ত্তর দিলেন, তা হলে থাকবেন না। তাঁর চাখে একটা চাপা কৌতুকহাস্য যেন লক্ষ্য রেছিলাম, কিন্তু তখন আর কিছু বলতে াহস পাইনি।

ডাক্তারবাবু লোকটি একটু অদ্ভুত রনের। তাঁর সঙ্গে বেশী কথা কইতে াহস হয় না। প্রায় সমস্ত দিনই বাইরে াকেন। রোগীর সন্ধানে ঘোরেন না, রাগীরাই তাঁর সন্ধানে ঘোরে, তিনি থাকেন াটে মাঠে পথে প্রান্তরে। ডিসপেনসারিতে ান অবশ্য খানিকক্ষণের জন্য, যদি দৈবাৎ দ সময় রোগী থাকে, তার চিকিৎসাও রেন, কিন্তু রোগীর জন্য হা-পিত্যেশ করে সে থাকতে তাঁকে কেউ কখনও দেখে নি। থম প্রথম আমার অবাক লেগেছিল, কিন্তু রণটা কখনও জিজ্ঞাসা করতে সাহস রি নি। একদিন তাঁরই এক বন্ধু এসে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। মি তখন তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে ালোচনাটা শুনেছিলাম। শুনে আরও বাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল নি বোধ হয় আমাদের মতো লোকের গোলের বাইরে থাকেন। বন্ধু তাঁকে জ্ঞাসা করলেন, তুমি প্র্যাকটিস যখন ছেড়ে দাওনি তখন রোগীদের অমন করে বহেলা কর কেন? ডাক্তারবাবু হেসে ললেন, রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা-ক্রেতা ুঁজি না, খুঁজি প্রণয়ী বা প্রণয়িনী। মার মনের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নেক আগে বলে গেছেন—যে জন আমার পি উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য রিবে আমাকে। যারা ঠং ঠং করে ডাক্তারের গুনে দিয়ে মনে করে ডাক্তারের মাথা নে নিলুম, তারা কখনও আমার রোগী ে না। যে সব ঘাটে হাজার হাজার ডাক্তার দের বুদ্ধির ডিগ্রীর ছিপ ফেলে নিজের জের ফাৎনার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে সব ঘাটের ত্রিসীমানাও আমি মাড়াব না। ছপ ফেলার ইচ্ছেই নেই আমার। রোগী মাকে খুঁজবে, প্রয়োজন তার। বন্ধু ললেন, কিন্তু এ মনোভাব নিয়ে বসে লে ব্যবসা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লেন ডাক্তারবাবু, আমি ডাক্তার, বেনে নই। মার ডাক্তারির উপর যাদের আস্থা আছে, রা আমার জন্য অপেক্ষা করবে, অপেক্ষা রেও যদি না পায়, আবার ফিরে আসবে। তে টাকা কম পাওয়া যায়, কিন্তু আনন্দ প্রচুর। ওইটেই আমি চাই। আমার বাবার ছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার দৈনন্দিন সারোত্রার সম্বল তিনি রেখে গেছেন। নে গাঁড়ি চড়িয়ে আমাকে চাল ডাল দার পয়সা রোজগার করবার জন্য ব্রুতে হব না। আমি সারা জীবন যদি ছুটি নিয়ে জগার করি তা হলেও আমার নি মনে তাঁর বন্ধু তখন প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার সময় কাটে কি করে? বাড়িতেও তো তোমাকে পাওয়া যায় না। আবার হেসে উত্তর দিলেন ডাক্তারবাবু, ঘুরে বেড়াই, মনের আনন্দে, চোখ কান খোলা রেখে। তাতে কি যে আনন্দ তা তোমাদের বোঝাতে পারব না।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির খামখেয়ালী লোকটির আওতায় আমি বাস করি। দশটা পাঁচটা স্কুল করি, বাকী সময়টা এখানেই কাটাই। কারও সঙ্গে আলাপ করতে সাহস পাই না। ভয় হয় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বলে পাছে কেউ করুণা করে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই করুণা তাড়া করে এসে আমার ঘরে ঢুকল। প্রথম প্রথম হোটেলে খেয়েছিলাম কয়েকদিন। কিন্তু একদিন ডাক্তারবাবুর বুড়ী ঝি এসে বললে, মাইজি বললেন, আপনি আজ থেকে এখানেই খাবেন। হামি আপনের খানা দিয়ে যাব। কুছু তকলিফ হোবে না। আপনি হোটেলে খাবেন না, ওখানে তরকারিতে খুব মশালা দেয়, ভাত ভি শকত থাকে। ওখানে নীরদবাবু খেতেন, পেটের অসুখে তিনি খতম হয়ে গেলেন। আপনি ওখানে আর খাবেন না, মাইজি মানা করে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে আমি কখনও দেখি নি। তিনি বোধ হয় আধুনিকা নন, বাইরে কখনও বেরোন না। অসূর্যম্পশ্যা হয়তো নন, কিন্তু গোঁড়া অন্তঃপুরিকা। তাঁর ছেলেমেয়ে হয় নি। বিয়েও শুনেছি অল্পদিন হয়েছে। আপাতত বুড়ী ঝিয়ের মাতৃহারা নাতি-নাতনীদের নিয়েই তাঁর সংসার। তা ছাড়াও আছে জন দুয়েক চাকর। তারাও বাড়ির পরিজনের শামিল। আর আছে মুরগী, কুকুর, গিনিপিগ, খরগোশ, ভেড়া আর গরু। গিনিপিগ, খরগোশ আর ভেড়া ডাক্তারবাবুর ল্যাবরেটরির। তিনি মাঝে মাঝে এদের রক্ত নেন রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করবার জন্য। অবশ্য তা কচিৎ। কারণ, রোগীরা প্রায়ই তাঁর নাগাল পায় না।

বুড়ী ঝিয়ের মারফত ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমে অবাক এবং পরে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আত্মসম্মান-শজারুর কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবুকে বলব, 'আমার আর এখানে থাকা পোষাচ্ছে না। আপনি বাড়িভাড়াও নেবেন না, তার উপর বিনা পয়সায় খেতেও দেবেন, এত দয়া আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। আপনি হয় আমাকে পেইং গেস্ট করে রাখুন, না হয় আমাকে ছেড়ে দিন, আমি অন্য একটা আস্তানা খুঁজে নি। এখানে চন্দ্রগুপ্ত হোটেলে একটা ঘর খালি আছে শুনেছি।'

কিন্তু দেখলাম এ কথা ভাবা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। ডাক্তার-

বাবু সকালের দিকে অবশ্য বাড়িতে থাকেন, দশটার আগে বেরোন না কোথাও, যতক্ষণ থাকেন বাড়ির বাইরে মাঠেই থাকেন, কিন্তু তাঁর চতুর্দিকে এমন একটা অদৃশ্য দুর্ভেদ্য দেওয়াল সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকে যে, সে দেওয়াল পেরিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া শক্ত। সাধারণত, এ সময় তিনি তাঁর জন্তু-জানোয়ারদের নিয়েই থাকেন। তাদের সঙ্গে কথা কন। প্রায়ই ইংরেজীতে।

"Hallo Jamboo, what is your opinion about things in general ?"

'কি হে জাম্বু, দুনিয়ার হাল-চাল সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম?'

তাঁর উচ্চকণ্ঠের এ উক্তি প্রায়ই শোনা যায়। জাম্বু, তাঁর পোষা কুকুর। স্প্যানিয়েল জাতের। গা ভরতি কুচকুচে কালো লোম। ভালুকের মতো দেখতে ছিল বলে ডাক্তারবাবু নাকি ওর নাম রেখেছিলেন জাম্বুবান। শুনেছি জাম্বুবানের এককালে খুব প্রতাপ ছিল। কিন্তু এখন ও স্থবির। বোধ হয় কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু ডাক্তারবাবু যা বলেন তা ও বুঝতে পারে। কারণ, দেখা যায় ওর মুখে অদ্ভুত একটা স্মিত হাস্য ফুটে উঠেছে, ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়ছে। ডাক্তারবাবু যখন ওর মাথা চাপড়ে আদর করেন—"জাম, জাম, জামটু, জার্মালিশ"—তখন ও যেন বিগলিত হয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ যেন ঝরে পড়ে, তারপর হঠাৎ মাথাটা নেড়ে কান চট্‌পট্‌ করে হেঁচে ফেলে সে। ওইটে ওর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গি। ডাক্তারবাবু যখন জাম্বুকে আদর করেন তখন ভুটানটা তাঁর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার ভাবটা যেন, আমার দিকে মন দেবে কখন। ভুটান ছোট কুকুর, কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর। খাঁদা নাক চ্যাপ্টা মুখ, গা ভরতি সাদায় কালোয় লোম ল্যাজটি ঠিক ক্রিসানথিমাম্‌ ফুলের মতো সর্বদাই নড়ছে।

(ক্রমশ)

আমি তখন বোর্ডিং-এ থেকে ইস্কুলে পড়ি। ফাস্ট কেলাসে।

একদিন শীতের সকালে বোর্ডিংয়ের উঠোনে কয়েকজনে মিলে আরাম করে বসে রোদ পোহাচ্ছি, এমন সময়ে বোর্ডিংয়ের সামনে রেলের এক পার্শেল-ভ্যান এসে হাজির! ভ্যান থেকে একটা লোক নেমে এসে খনখনে গলায় জিগেস করল - 'সিটারাম চকরবরতি বলে কেউ আছে এখানে?'

'না, সিটারাম কেউ নেই তবে শিবরাম বলে একজন আছে বটে।' আমি বললাম।

'না, সিটারামকে চাই।'

কেনরে বাবা, ধরে নিয়ে যাবে নাকি? সেই সময়ে গান্ধির আন্দোলনের হিড়িকে খুব ধড়পাকড় চলছিল চারধারে। গান্ধিজীর দলের বলে সন্দেহ হলে ধরে নিয়ে পুরে দিচ্ছিল জেলে। ভ্যানে চাপিয়ে সটান আমায় জেলখানায় নিয়ে যাবে নাকি? জেলখানায় আর পাহারোলায় আমার ভারী ভয়। পাছে ধরে জেলে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দেয় সেই ভয়ে গান্ধিজীর ভলান্টীয়াররা যে পথে হাঁটে আমি সেদিকে পা বাড়াইনে। ভয়ে ভয়ে শুধোলাম—কেন, কী দরকার সিটারামকে?'

'নেপাল থেকে রেলোয়ে পার্শেল এসেছে ওর নামে হোমডেলিভারির।'

'কিসের পার্শেল?'

'তা আমি বলতে পারব না। কোন প্রেজেন্ট হবে হয়তো।' লোকটা বলে।

প্রেজেন্টের নাম শুনে আমার উৎসাহ জাগে। তখন ইস্কুলের রেজেস্ট্রি বইয়ে প্রেজেন্ট হওয়া ছাড়া আর কোন প্রেজেন্ট আমাদের জীবনে নেই, কখনো আসেনি, তাই অপ্রত্যাশিত উপহার প্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হলাম।

'সিটারাম নেই তবে শিবরাম একজন আছে এখানে।' আমি জানালাম। 'আমিই সেই ভদ্রলোক। আমাকে দেবে তোমার প্রেজেন্ট?'

'শিবরাম ছিলিস বটে, কিন্তু এখন তো তুই সিটারাম।' বলল আমার এক বন্ধু : 'আরাম করে বসে আছিস তো এখন। sit plus আরাম is equal to সিটারাম।' 'তাছাড়া 'চকরবর্তী'তেও মিলে যাচ্ছে।' বলল আরেকজন।—'ওরই নাম শিবরাম ওরফে সিটারাম চকরবর্তি বুঝলে হে বাপু!'

মুখের সামনে মেলে ধরে

'এই হবে—ওতেই হবে।' বলে ভ্যান-ওয়ালা একটা রেলোয়ে রসিদের কাগজ আমার মুখের সামনে মেলে ধরল।—'আধঘণ্টা ধরে ঘুরে মরছি এই মহল্লায় তোমার খোঁজে। নাও, এখন দু'টাকা দশ আনা বার করো, পার্শেলের রেলোয়ে মাশুলটা দিয়ে তোমার মালের ডেলিভারি নাও।'

বলে সে ভ্যান থেকে উত্তমরূপে প্যাক করা একটা পেল্লায় পার্শেল এনে খাড়া করল উঠোনের ওপর। বলল—'চটপট খালাস করো—গন্ধ ছাড়ছে বেজায়।'

'গন্ধ বেরিয়েছে মালের? কিসের মাল গো?' আমরা সবাই জানতে চাই।

'মাংস। মণ খানেক মাংস। হরিণের মাংস লেখা আছে পার্শেলে। পচে গেছে মাংসটা।' সে বলে।

'পচা মাংস নিয়ে আমরা কী করবো?' আমার উৎসাহ নিভে আসে।

'হরিণ তো পচিয়েই খায় মশাই!' সংক্ষেপে সে জানায়।

'নিয়ে নে নিয়ে নে।' আমার বন্ধুরা উৎসাহ দিতে থাকে—'আজ শনিবার তো। কালকে ছুটি। বাহিরে খাসা ফিস্টি হবে এখন।'

'দিনের পর দিন ঘাস চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে তো পেটে চড়া পড়ে গেল। মুখ বদলানো যাবে আজকে।' বল্লে অন্যজন।—'নিয়ে নে মাংসটা আড়াই টাকায় এক মণ, সস্তাই তো রে।'

'আড়াই টাকা নয়, দু টাকা দশ আনা।' মনে করিয়ে দেয় লোকটা।

'এই হোলো। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন।'

দু টাকা দশ আনা খসিয়ে মাল তো খালাস করা গেল। তারপর আমরা পার্শেলের পর্যবেক্ষণে লাগলাম। এই যৎসামান্য ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের কারো নামে

আস্ত একটা হরিণের শবদেহ বেরিয়ে আসে

এত বড় পার্শেল কখনো আসতে দেখিনি।

'নেপাল থেকে পাঠিয়েছে।' পার্শেলের গায়ের লেখা দেখে বলল একজন—'কি এক রানা নাকি। সেই পাঠিয়েছে।'

'রানা বলে আমরা এক কাকা আছে, নেপালে চাকরি করে।' আমি জানাই : 'আমার সঙ্গে ভারী ভাব ছিল তার। অনেকদিন তাকে দেখিনি। আমার ছোট কাকা।'

'তাহলে সেই পাঠিয়েছে তোকে আদর করে।'

'এতো দেখছি রানা জং বাহাদুর।' খ্ুঁটিয়ে দেখে আমি বললাম : 'আমার কাকা ত চকরবরতি হলে, সে বাহাদুর হতে যাবে কেন?'

'নেপালে যে যায় সেই বাহাদুর হয়।' ছেলেটা ব্যাখ্যা করে দেয় : 'কিছুদিন থাকলেই নেপালী হয়ে যায় কিনা। যেমন আমাদের পশ্চিমা বন্ধুরা বাংলা দেশে থেকে বাঙালী হয়ে যায় তেমনি। আর নেপালী মাত্রই বাহাদুর। নেপালী হলেই বাহাদুর হতে হবে।'

'আর জং?' আমি জিগেস করি। এ প্রশ্নটাই জবর বলে আমার মনে হয়।

'বেশিদিন বাহাদুরি করলেই জং ধ যায়।' তার জবাব। 'পুরনো লোহ যেমন মরচে পড়ে।'

এর ওপর আর কথা নেই। সব জলে মতন পরিষ্কার।

তারপর আমরা জং ধরা সেই জং পার্শেলের প্যাকিং ছাড়াতে লাগি। লোহা পাতগুলো কেটে ছাড়িয়ে ফেলে চাড়া দি পেরেকগুলো তুলে শক্ত পাতলা কাঠে বাক্সের ভেতর থেকে আস্ত একটা হরিণে শবদেহ বেরিয়ে আসে।

'ওরে বাবা! এ যে অনেকখানিরে মাংসের চেহারা দেখে আঁৎকে উঠলা আমরা।—'এত খাবে কে?'

'কেন, আমাদের হোস্টেলে রাক্কোস কি কম নাকিরে?'

'তাহলে মনিটারকে ডাকি? রান্না ব্যবস্থা করা যাক।' রাক্কসদের একজ উৎসাহ দেখায়। মনিটারকে ডাকতে যায়।

'আচ্ছা, মনিটারকে দিয়ে এটা হোস্টে গছিয়ে দিলে কেমন হয়?' আমি বলি 'মানে, বেচে দিলে কী হয় হোস্টেলে খাওয়াও হয়, আবার সেই সঙ্গে দু পয়সাও আসে। আমার কাকা য আমাকে পাঠিয়েছে...'

'বারে, খাচ্ছিস তো পেটভরে।'

'সেত সবাই খাচ্ছে—যাদের কাকা পাঠায় তারাও।' আমি প্রকাশ করি।—'তাছা আমরা বামুনের ছেলে ভেবে দ্যাখ। খাও সঙ্গে আমাদের দক্ষিণে চাই। আমি কিছু লাভ নিয়ে মনিটারকে বেচে দি মনিটার তার ওপর আরো কিছু হোস্টেলকে ধরাক।'

ছোটবেলার থেকেই ব্যবসা বু আমার বেশ প্রখর।

মনিটার আমাদের সঙ্গেই পড়ে। কেলাসের ছেলে এবং ফার্স্ট কেলাস পড়াশোনায় ভালো, ক্লাসে ফার্স্ট বোর্ডিং-এ ওর ইফ ক্রি। তো আমাদের খবরদারী করা ওর কাজ। আ খবরাখবর—মানে, কে পড়ছি না পড়া করছি না করছি তার সব বার্তা সুপারিন্টেন্ডেন্টের কানে পৌঁছে দেয়।

মনিটার আসতেই আমি বললাম যোগেন, এই আস্ত হরিণটা আমার আমাকে উপহার পাঠিয়েছে।

যোগেন দেখল। **চোখ দিয়ে এবং** দিয়ে। তারপর বলল—**ধিচ্ছির** বেরিয়েছে ভাই!'

'হরিণ যে রে! হরিণ ত পচিয়ে খায় শুনিসনে?'

'শুনেছি বটে। তা আমি এই নিয়ে কী করব?' যোগেন 'পোড়াতে হবে নাকি? কি করে সৎকার করে?'

'যথেষ্ট প্রীতিগন্ধ বেরিয়েছে সার।' আমি যোগ করি।

'তা বটে। গন্ধটা বেশ জবর রকমের বটে।' বলে তিনি নাকে রুমাল চাপা দিলেন 'তা, যোগেন, তুমি এটা আমাকে উপহার দিতে যাচ্ছ কেন?'

'আপনাকে উপহার দেওয়া সার, তার মানে আমাদের নিজেদেরকেই দেওয়া।'

ওর হয়ে আমাকেই বলে দিতে হল আবার—'দেবতাকে যেমন পুজো দিয়ে প্রসাদ পায় মানুষ। আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আর সব মাস্টারকেও আমাদের পুজো দেওয়া। তাছাড়া, আমাদের নতুন হেড-মাস্টার মশাই এসেছেন। যোগেন চায় যে, মানে আমরা সবাই চাই; আপনি আমাদের হয়ে হোস্টেলের ফিস্টে তাঁকে নেমন্তন্ন করুন।'

'তবে এই ভোজটা আমরা হেডমাস্টার মশাইয়ের সম্বর্ধনা উৎসব বলেই ঘোষণা করি না কেন?' উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন।—'তাঁর জন্যই এই প্রীতিভোজ।'

'সেই ত আমরা বলতে চাইছি সার। শুধু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারছি না কেবল।' আমি বলি—'এই সুযোগে নতুন হেডসারের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হবে। সেটা মধুরেণ সমাপয়েৎ করেই সুরু করা উচিত নয় কি? আপনিই বলুন সার?'

'তাহলে বেশ। কাল রবিবার ছুটির দিন আছে। কাল দুপুরের মধ্যাহ্নভোজে হেড-মাস্টার মশাইকে হোস্টেলে নেমন্তন্ন করা যাক। সেই সঙ্গে আর সব টীচারকেও। কী বলো?'

'হাঁ সার। শিবহীন যজ্ঞ যেমন হয় না তেমনি শিবের সঙ্গে আর সব—'

বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই। ভূতপ্রেত কথাটা উচ্চারণ করাটা ঠিক আমার অভিপ্রেত ছিল না।

নেপালের হরিণ আরো উপাদেয় হয়

'শিবের সঙ্গে আর সব দেবতাকেও আমাদের যজ্ঞস্থলে।'

যোগেন বলে। এতক্ষণে একটা যোগ্য কথা বলে যোগেন।

ডাকো ঠাকুরকে। হরিণের মাংস ত রোসট করে খেতে হয়। সে কি পারবে রোসট করতে? অন্তত রোসট করা দরকার।'

ঠাকুরকে ডেকে আনা হল। দেখে শুনে সে বলল—'রোসট করতে পারি তো। কিন্তু গোটা একটা হরিণ ধরবে এত বড় হাঁড়ি পাব কোথায়? তার চেয়ে বড় বড় টুকরো করে হাণ্ডিকাবাব বানিয়ে দিই। সেও খুব খাসা হবে খেতে।'

পরদিন দুপুরে সারি সারি পাতা পড়ল আমাদের খাবার ঘরে। টীচাররা বসলেন, আমরাও বসলাম। হেডমাস্টার মশাই বসলেন মধ্যমণি হয়ে।

পোলাও পড়ল পাতায় পাতায়। হাণ্ডিকাবাবের হাঁড়ি এসে নামল আমাদের সামনে। সৌরভে সারাঘর মাত।

পাতে পাতে পড়তে লাগল বড় বড় টুকরো হরিণ মাংসের। হেডমাস্টার মশাই এক গাল কামড়ে বললেন—'বাঃ! বেশ খাসা হয়েছে ত!'

'আরো খাসা হত যদি আরো কিছুদিন পচতে পেত।' বললেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। 'তা তেমন না পচলেও সুপাচ্য হবে আশা করি সার।' আমি অনুযোগ করি।

'আমিও একদিন খাওয়াব আপনাদের হরিণের মাংস।' হাসিমুখে বললেন হেড সার: 'নেপালের এক রানার ছেলে আমার ছাত্র ছিল। সে একটা হরিণ আমায় রেল পার্শেল করে পাঠাবে বলে লিখেছে। দু চার হপ্তার মধ্যেই এসে পড়বে সেটা। খেয়ে দেখবেন তখন। নেপালের হরিণ আরো কত খাসা হয় দেখবেন।'

সটকালাম

শুনে আমার টনক নড়ল। হাত আর নড়ল না। পাতের মাংস পাতেই পড়ে রইলো। অতি কষ্টে এক আধটু চাখলাম।

আঁচানোর পরে যোগেনকে শুধালাম আড়ালে—'নতুন হেডসারের নাম কিরে? জানিস?'

'তোদের চক্রবর্তীই ত রে!' যোগেন জানায়: 'শ্রীযুক্তবাবু সীতারাম চক্রবর্তী। এম এ বি এ—বিটি।'

শুনে আমার চারধার খাঁ খাঁ করে, সব যেন এক মিনিটে এমনি হয়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে কাকচিল ডাকবার আগেই উঠে আমি হোস্টেল ছেড়ে পালালাম। ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে সটান গান্ধিজীর ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লেখালাম গিয়ে।

* *

মনে পড়লো আর-এক দিনের কথা। এই প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে ক্যালিফর্নিয়া, সেখানে আমি দু-এক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ। ঘুরতে-ঘুরতে উপস্থিত হয়েছি বিগ সুর-এ, হেনরি মিলারের আমন্ত্রণে। সান ফ্রানসিস্কো ও লস এঞ্জেলস-এর মধ্যবর্তী এই 'বড়ো দক্ষিণ'; মণ্টেরে এয়ারপোর্ট থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে এর সীমানা আরম্ভ। পথে পড়ে কার্মেল শহর, খানিকটা বেঁকে গেলে সাণ্টা ফে; যেমন ডি. এইচ. লরেন্সের স্মৃতিজড়িত নিউ মেক্সিকো, তেমনি এই অঞ্চলও এমন অনেকের বাসভূমি যাঁরা লেখক অথবা চিত্রকর, কিংবা যাঁরা শিল্পকলার প্রেমিক, বা অন্য কোনো কারণে সমাজে খাপছাড়া। তার একটা কারণ, এ-সব পাড়ায় প্রকৃতি এখনো কিছু পরিমাণে বন্য; আর এক কারণ পর্বতের বা যে কোনো নগরের তুলনায় খরচ অনেক কম এখানে।

কয়েকদিন আগে ক্ষণিকের জন্য নিউ মেক্সিকোতেও থেমেছিলাম। শুকনো হাওয়া লাল মাটির দেশ: পথে যেতে-যেতে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ মনে পড়ে। আলবাকার্কে থেকে বাস্-এ ক'রে টাওস-এ যখন পৌঁছলাম তখন ভর সন্ধে। আমি বাস্ থেকে নামামাত্র আমার কাঁধের উপর একখানা হাত পড়লো: মুখ ফিরিয়ে যাঁকে দেখতে পেলাম তিনি ডরথি ব্রেট। আদিতে ছিলেন 'অনারেবল' উপাধিধারিণী অভিজাত ইংরেজ মহিলা: ডি. এইচ. লরেন্সের অনুগামিনী হ'য়ে আটলান্টিক পাড়ি দেবার পর আর ইংলণ্ডে ফিরে যাননি। লরেন্সের প্রথম ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম ইনি, তাঁর বিষয়ে প্রথম যুগের একটি পুস্তকের রচয়িত্রী। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে আমি নির্ভুলভাবে লরেন্সীয় নায়িকাকে চিনতে পারলাম। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে আঁটো প্যান্ট ও কোর্তা, মাথার চুল ধূসর, চোখ তীক্ষ্ণ, মুখের প্রতিটি বার্ধক্যজনিত রেখাতে বুদ্ধি ও উদ্যম প্রকাশ পাচ্ছে। করমর্দনের সময় দেখা গেলো যে তাঁর হাতখানা আকারে আমার দ্বিগুণ। 'আমাকে ব্রেট ব'লে ডাকবে, সবাই তা-ই ডাকে আমাকে। পুরুষের মতো পোশাক পরি ব'লে এখানকার কেতা-দুরস্ত রেস্তোরাঁয় আমাকে যেতে দেয় না, কিন্তু অন্য আরো ভালো জায়গা আছে—চলো।' এই ব'লে আমাকে তাঁর স্টেশন-ওয়াগনে তুললেন। গাড়ির পিছন দিকে আসন নেই, আছে উঁচু একটা বিছানার মতো ব্যাপার, তাতে বিবিধ কুশানে কম্বলে পরিবৃত হ'য়ে এক বিরাট কুকুর রাজার মতো আসীন। যে-রেস্তোরাঁয় খাওয়া হ'লো সেটা কাঠের বাড়ি, এ-দেশে যাকে লগ্-ক্যাবিন ব'লে সেই গোছের, মনে হয় যেন হেলাফেলা ক'রে বানানো, কিন্তু বসবাসের অযোগ্য নয়। ইলেকট্রিক আলো নেই কিংবা জ্বালেনি, টেবিলে-টেবিলে নরম আলো মোমবাতির, আর অগ্নিকুণ্ডে জ্বলন্ত কাঠ লাল আভায় গনগনে। আমরা ঢুকতেই চারদিকে রব উঠলো—'হ্যালো, ব্রেট! হ্যালো! কী খবর?' এই ছোটো শহরে এঁকে না চেনে এমন কেউ নেই। আমেরিকার অন্য এক চেহারা দেখা যায় এখানে, সেটা পুরো-পুরি নাগরিক বা য়োরোপীয় নয়, ন্যু ইয়র্ক বা শিকাগোর চাইতে এখানকার অনেক বেশি কাছের দেশ মেক্সিকো; যে-স্বল্প-

সংখ্যক 'ইণ্ডিয়ান' এখনো ম্রিয়মাণভাবে টিকে আছে তারা অনেকেই এখানকার অধিবাসী। লরেন্স যে এই মহাদেশের মধ্যে নিউ মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছিলেন, স্বাস্থ্য-লাভই তার একমাত্র কারণ ব'লে মনে হয় না। ইংলণ্ডে যা নেই, এবং যার অভাবে লরেন্স কষ্ট পেতেন, সেই প্রসার এখানে অপর্যাপ্ত, ভৌগোলিক ও চারিত্রিক দুই অর্থেই। আহারের পরে ব্রেট আমাকে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে কিছুটা বাঙালি ধরনে গা ছেড়ে দিয়ে আড্ডা হ'লো। যে-হোটেলে রাত কাটালুম সেখানেও হোটেলিয়ানা খুব কম; ভিড় নেই, অতএব ব্যস্ততাও নেই, চালচলন ঢিলেঢোলা গোছের; দিন-রাত্রির যে-কোনো সময়ে বিনামূল্যে ধোঁয়া-ওঠা কফি বা চা পাওয়া যায়; সকলেরই সকলের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে এবং সময় আছে; যাঁরা কুঁড়েমি করার শক্তি ধারণ করেন তাঁদের পক্ষে আদর্শ জায়গা।

পরের দিন সকালে ব্রেট আমাকে নিয়ে গেলেন একটি 'ইণ্ডিয়ান' 'পোয়েবলো' বা গ্রাম দেখতে। সেখানেও অনেকে তাঁর পরিচিত; যাঁরা ইংরিজি জানে (সকলে জানে না) তারা কেউ-বা এগিয়ে এসে আলাপ করলে। বাড়িগুলো মাটির, একতলা থেকে [illegible]তলা পর্যন্ত; তাদের উচ্চ[illegible] লোকগুলোর হাব-ভাব গম্ভীর, মুখে হাসি নেই, কথাও কম; আমাদের সাঁওতালদের মধ্যে যেমন একটি প্রফুল্ল সরব কর্মিষ্ঠতা দেখা যায়, এখানে তার বদলে যেন একটা নির্বেদের ভাব ছড়িয়ে আছে; এদের অনিবার্য অবলুপ্তির অচেতন জ্ঞান তার কারণ হ'তে পারে। আমরা একটা পুকুরের দিকে যাচ্ছিলুম; একটি ছোটো মেয়ে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে তার ভাষায় এবং হাত-মুখ নেড়ে, আমাদের নিষেধ করলে; বোঝা গেলো, ঐ পুকুরটা ট্যাবু, কোনো বিজাতীয় লোক তার ধারে গেলে অপদেবতার দৃষ্টি পড়বে। ও-রকম পবিত্রতা অবশ্য বাড়িগুলোর নেই; এক গৃহস্থের ঘরের মধ্যে, ব্রেট যেহেতু পরিচিত, ঢুকে পড়া গেলো। দেখলাম, অতীতে ও বর্তমানে মিলে এক জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে; মোষের শিং, মাদুলি, পাখির পালকের সাজ, ধনুর্বাণ, তীর-ধনুক—এ-সবের সঙ্গে সাজানো আছে ইলেকট্রিক টর্চ, চামড়ার বেল্ট, এল্যুমিনিয়মের বাসন, আর আরো অনেক কলে তৈরি কম দামের জিনিশ। করুণ লাগলো দৃশ্যটা; আমার মনে পড়লো এক লাল সর্দার, এদেরই পূর্বপুরুষ, সাদা-আসা শ্বেতাঙ্গদের কাছে কয়েক পয়সায় বেচে দিয়েছিলেন—পুরো ম্যানহাটান দ্বীপ। সে-দৃশ্য আজ মুজিয়মে দেখানো হয়; এই 'পোয়েবলো', আর স্বল্পভাষী বিমর্ষ মানুষেরা—এদেরও মনে হয় মুজিয়মের সপ্রাণ প্রতিমাণ যেন; ম'রে গেছে, কিন্তু এখনো সৎকার করা হয়নি; গোধূলির ছায়ায় অর্ধলীন হ'য়ে অস্পষ্টভাবে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

এর পরে ব্রেটের বাড়িতে আধ ঘণ্টা কাটলো। ছাত্র বয়সে যখন ঢাকায় ছিলুম, রমনার নীল-খেতের একটি বাড়িকে আমি মনে-মনে নাম দিয়েছিলুম 'পৃথিবীর সীমা'। তারপরে আর বাড়ি ছিলো না, শহর ছিলো না, শুধু দিগন্তকে বিদীর্ণ ক'রে একটি রেল-লাইন চ'লে গেছে। ব্রেটের বাড়ি দেখে সেই স্মৃতি আমার মনে জাগলো—কিন্তু এর নিঃসঙ্গতা ঢের বেশি তীব্র। প্রতি-বেশী বাড়ি একটিও নেই, চারদিকে শুধু ঢেউ-খেলানো বৃক্ষবিরল মাটির বিস্তার, রোদ্দুরে তাদের ধূসর-ব্রাউন রংটিকে বেশ কড়া লাগছে। চারদিক এমন শব্দহীন, গতিহীন ও আকাশের স্বাভা আপ্লুত যে মনে হয় সত্যি বুঝি পৃথিবী এখানে শেষ হ'য়ে গেলো। একা, শুধু একটি কুকুরকে সঙ্গী ক'রে, এই নির্জনে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন প্রৌঢ়া চিরকুমারী। লম্বা ছাদের একতলা কাঠের বাড়ি, মার্কিনীরা যাকে 'লিভিংরুম' বলে সেটি বেশ বড়ো, আর সেখানে যেমন-তেমন ছড়িয়ে আছে [illegible], আরব্ধ কর্ম, অর্ধসমাপ্ত ছবি, আর [illegible] তুলি ইজেল ইত্যাদি সরঞ্জাম। ছবি আঁকেন ব্রেট; তাঁর রচিত কয়েকটি ক্যান-ভাসের সোনালি-নীল পটভূমি থেকে লরেন্সের তীক্ষ্ণ চোখ আমাকে বিদ্ধ করলে। জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে এক পাহাড়, মাথায় তার টুপির মতো মণ্ডপ, লরেন্সের স্মৃতিস্তম্ভ সেটি, তাঁর পত্নী ফ্রীডার নিবেদন। 'তোমাকে নিয়ে ওখানে যেতে পারতাম, কিন্তু এখনো পুরোপুরি বরফ গলেনি, পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা যাবে না।...আমি লরেন্সকে অনেক বলেছিলুম য়োরোপে ফিরে না-যেতে, এখানে এসে তাঁর শরীর অনেক সেরেছিলো, থেকে গেলে অমন অকালে মৃত্যু হ'তো না।...তোমার সঙ্গে লরেন্সের দেখা হওয়া উচিত ছিলো; তোমার ভালো লাগতো তাঁকে, ভালো লাগতো।' যে অল্প কয়েকটা বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার তিলতম সন্দেহ নেই এটা তারই একটা, তাই আমি এ-কথার কোনো জবাব দিলুম না।...'আমার একটা ছবি উপহার দিই তোমাকে, দেশে নিয়ে যেয়ো। এইটে—?'

ব্রেটকে নিয়ে শহরে ফিরে এলুম লাঞ্চ খেতে। যেখানে-সেখানে ছবির মেলা; রেস্তোরাঁর মালিকও কিছু আর্টের চর্চা করে; এর মধ্যে যে সবটাই খাঁটি তা বিশ্বাস করতে হ'লে অত্যন্ত বেশি আশাবাদী হ'তে হয়। তবে যাকে বলে একটা আবহাওয়া আছে। রাস্তায় মাঝে-মাঝে ভিখিরি, রঙিন ঘাঘরা আর কম্বল জড়ানো অলস 'ইণ্ডিয়ান', খুব একটা কেজো অথবা

না। আবার অনেক মার্কিনী পুরুষ, করতল সুদ্ধু পাঁচটি আঙুল টান ক'রে দিয়ে, সমস্ত বাহুটিকে সোজা তলোয়ারের মতো বাড়িয়ে দেন; এটাকেও কেমন সামরিক ভঙ্গি ব'লে মনে হয়, বা অস্তিত্বহীন হৃদ্যতার দেখানোপনা। কিন্তু মিলারের হাতের চাপ একেবারে পূর্ণ, সপ্রাণ ও সবল, তার মধ্যে কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা 'হাতে রাখা' নেই, আছে উষ্ণ ও অব্যবহিত হৃদয়ের সম্ভাষণ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তাঁর পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হলাম।

যদি না বার্ধক্যে আমার স্মৃতিলোপ ঘটে তাহ'লে, যতদিন বেঁচে আছি, বিগ সুর-এ হেনরি মিলারের গৃহস্থালির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগবে। কৃশ, ঋজু, দীর্ঘাকার হেনরি, ষাটের কাছাকাছি বয়স; স্ত্রী, ঈভ, সুন্দরী ও প্রৌঢ়যৌবনা; দুটি চার ও পাঁচ বছরের সন্তান, ভাল ও টোনি, নীল চোখ ও পটবর্ণ চুলে নয়নহরণ। ঈভ আগে ছিলেন অভিনেত্রী; এটি তাঁর তৃতীয় ও হেনরির দ্বিতীয় বিবাহ। ছেলেমেয়ে দুটি হেনরির পূর্বপক্ষের, তারা পালা ক'রে বছরে ছ-মাস বাপের ও ছ-মাস মায়ের কাছে থাকে। হেনরির মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা; কথা বলেন ধীরে ও ঈষৎ শ্লথভাবে; ঘাড় হেলিয়ে মনোযোগপূর্বক অন্যের কথা শোনেন। ইনি খাশ আমেরিকান, এঁর জীবনেও মার্কিনদেশের চরিত্র প্রতিফলিত। জন্ম গরিবের ঘরে, কলেজে পড়াশুনোর সুযোগ পাননি, যৌবনে টেলিগ্রাফের কেরানীগিরি ক'রে জীবিকা চালাতেন। এমন দিন গেছে যখন ন্যু ইয়র্কে শীতের শেষে নগণ্য দামে গা-ছাড়া করেছেন ওভারকোট। সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ ক'রে প্যারিস; সমবয়সী অন্য অনেক মার্কিনী লেখকের মতো, উদ্বেল ও বিপদসংকুল বোহেমিয়ায় নিমজ্জন। ফিরে এলেন যৌবনের শেষে কুখ্যাত ও বিখ্যাত হ'য়ে; তাঁর প্যারিসে ছাপা দুটি উপন্যাস এখনো অ্যাংলো স্যাক্সন জগতে ঢুকতে পায় না। লেখা, ছবি আঁকা, বিগ সুর-এর নিসর্গ ও সংসর্গ—এই দিয়ে আপাতত রচিত তাঁর জীবন। কদাচ পূর্বতটে যান, বিশ্ববিদ্যালয় বা ফাউণ্ডেশনগুলির সঙ্গে সংস্রব নেই; তাঁর অবস্থা কোনো-কোনো মধ্যবয়সী বাঙালি লেখকের মতো—কিছুটা খ্যাতি হ'য়ে থাকলেও অর্থ আসেনি, 'এক-একদিন এমনও হয় যে বিদেশে একটা চিঠি লেখার জন্যে দশ সেন্ট জোটে না।' হয়তো য়োরোপে দীর্ঘ প্রবসনের জন্য, বা স্বভাবেরই প্রভাবে, তাঁর কয়েকটা অভ্যাস লক্ষণীয়ভাবে অমার্কিনী: ইনি চিঠি লেখেন সর্বদা 'লম্বা হাতে', তাও অনাধুনিক ফাউন্টেন-পেনে; জেট প্লেন ও কাফেটেরিয়ার জগৎকে অন্য যে-সুবিধাজনক ও নিশ্চিহ্ন লেখন-যন্ত্র জয় ক'রে নিয়েছে, সেই তথাকথিত ডট-পেন ব্যবহার করেন না এমন আমেরিকান আমি এঁকেই শু[...] দেখেছি। এবং বন্ধুতার স্থাপনে [...] লালনে ইনি যদিও প্রতিভাবান, তবু [...] ব্যক্তিত্বটি সংবৃত; আমাকে ভালোবেসে [...] 'মিস্টার বোস' ভিন্ন আর-কোনো সম্বো[...] করলেন না; সেটা আমার পক্ষে বে[...] মনোমতো হ'লো।

পক্ষান্তরে, ঈভ দু-লাইন চিঠি লিখ[...] হ'লেও টাইপরাইটার খুলে বসেন, [...] কথা উচ্ছল, চলাফেরা দ্রুত, সরলতায় [...] কৌতূহলে ভরা চোখ, নিজেকে এমন স[...] ভাবে প্রকাশ করেন যা শুধু মেয়েদে[...] পক্ষেই সম্ভব। আমি যেন তাঁকে 'ঈ[...]' ব'লে ডাকি, এই ইচ্ছাটি তিনি অনেকব[...] ব্যক্ত করলেন, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে আম[...] সঙ্গে বরং হেনরির মিল অনেক বেশি[...] কিন্তু এই দুই ভিন্ন চরিত্রের মানুষে[...] যুগপৎ সঙ্গ আমার পক্ষে খুব আনন্দে[...] হ'লো। যাতে রান্নার সময়ে স্ত্রী[...] নির্বাসিত হ'তে না হয়, সেইজন্য লি[...] রুমেরই এক অংশে রান্নাঘর পে[...] নেয়া হয়েছে; কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা চা[...] কিছু-একটা চাপিয়ে ঈভ এসে ব[...] আমাদের সঙ্গে। হয়তো ঈভ কথা ব[...] হেনরি এলিয়ে ব'সে সিগারেট খান, টো[...] ভাল ও আমাকে নিয়ে হেনরি বেরো[...] বেড়াতে আর ঈভ বাড়িতে থাকেন স্বা[...] পছন্দসই ক'রে মুর্গি রাঁধার জন্য; আ[...] কখনো ঈভ গাড়ি চালান, হেনরি এ[...] ঘুমিয়ে নেন সেই ফাঁকে। গাড়ি না-থাক[...] ক্যালিফর্নিয়ায় বাস করা দুঃসাধ্য, [...] সুর-এ অসম্ভব। এখান থেকে নিকট[...] বাজার সেই কার্মেল শহরে, নিকট[...] ড্রাগ-স্টোর কোন না পাঁচ-সাত মাইল [...] হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হ'য়েও [...] সুর-এ টেলিফোন নেই,* যে-কোনো ছো[...] কাজেও নিজে না-বেরোলে চলে না। [...] গাড়ি চাই, আর এখানে গাড়ি মা[...] স্টেশন-ওয়াগন। হেনরিরও আছে একটি[...] সেই যানে, রাত দশটার পরে, তিনি আমা[...] আমার শয়নাগারে পৌঁছিয়ে দিলেন।

হাকোনের মতো, বিগ সুরও স্বাস্থ্যক[...] স্নানের জন্য নামজাদা। একটা জা[...] প্যাসিফিক একটু দ্রুত রেখায় বেঁকে গে[...] তার কাছে এলে তীব্র একটা গন্ধ পা[...] যায়। প্রকৃতি এই জলের মধ্যে মি[...] দিয়েছে গন্ধক; জল তাই তপ্ত, ফেনি[...] সধূম; তট ঘেঁষে, শিলাখণ্ডগুলিকে ঝ[...] ক'রে দিয়ে, এক বুদ্বুদময় আলোড়ন [...] সব সময়। কাছেই আছে স্বাস্থ্যান্বেষী[...] ভাড়া নেবার জন্য কয়েকটি কাঠের কুট[...] তার একটি, হেনরি মিলারের [...] আমার জন্য ঠিক করা ছিলো। উঁদি[...]

---

* আমি ১৯৫৪-র কথা বলছি; এখ[...] অবস্থা জানি না।

জে ও ঘনতায় বেষ্টিত পাহাড়, তার
—বড়ো হোটেল বা বিলাসী বাংলো
সরল কুঠুরিতে বহুদিন পর রাত্রিকে
গভীরভাবে অনুভব করলাম। বাঁকা
কুয়াশায় চ্যাপ্টা, সমুদ্রের উপর ঝুলে
: তাকে দলিত ক'রে অন্ধকারের তোরণ
ছে আকাশ পর্যন্ত; শিরশিরে ঠাণ্ডা
সে, ঘুমন্ত লোকের পাশ ফেরার মতো
া গাছগুলোর অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা
। ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়ামা
লো রাত্রির প্লাবন নামলো আমার উপর
ার পিছনে অরণ্য আর সামনে মহাসাগর
ার চেতনার মধ্যে পশ্চিমতম আমেরিকা
র বন্ধুতা, অন্য কত বন্ধুতার স্মৃতি
হারিয়ে-যাওয়া, ফিরে-পাওয়া এবং
ার যাকে হারাতে হবে এমনি সব স্বপ্নঃ
হলো এই রাত্রিটি ঘুমের জন্য তৈরি
। এই কথাটাকেই বলার জন্য কবিতার
ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।
লে উঠে সমুদ্রের সঙ্গে ভালো ক'রে
হলো। এখানে আধো চাঁদের আকার
য়েছে প্যাসিফিক, যেন দুই হাত বাড়িয়ে
টকে আঁকড়ে আছে; আর তট যেখানে
হ'য়ে-হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে ঠিক
ানেই কুঠুরির মালিক রেস্তোরাঁ বসিয়ে-
। আমার প্রাতরাশ শেষ হ'তে-হ'তেই
রি মিলার আমাকে নিতে এলেন।

াঠের কুঠুরিতে দুই নিস্তব্ধ রাত্রি আর
র-দম্পতির সঙ্গপূর্ণ দুই আনন্দিত
প্রাত কেটে গেলো। দেখলাম রেড-উড
অরণ্য, সবুজ অন্ধকারে ভরা
ণাক দুপুর, ড্রাগ স্টোরের জানলা দিয়ে
স্রোতে সবুজ বিগ সুর নদী—অনেকটা
লের পূর্ববঙ্গের খালের মতো, কিন্তু
দিকের তরুপল্লব অনেক বেশি নিবিড়—
রের উঠান থেকে আবছা লাল সূর্যকে
যেতে দেখলাম সমুদ্রের মধ্যে। গন্ধক-
স্নানও করা হ'লো। কিন্তু সবচেয়ে

আমার যা বেশি মনে পড়ে তা গৃহস্বামী ও স্বামিনীর আতিথ্য, তাঁদের আলাপ, আগ্রহ, হেনরির স্বতঃস্ফূর্ত, মনোযোগী ও উচ্ছ্বাসহীন বন্ধুতা। আমাকে একটি তাম্র-মুদ্রাও তিনি খরচ করতে দিলেন না; কুঠুরির ভাড়া, এমনকি প্রাতরাশের দাম—আমার ব্যাকুল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সবই তিনি মিটিয়ে দিলেন; এর প্রেরণা, আমি জানি, নেহাৎ সৌজন্যবোধ নয়, হৃদয়ের পরামর্শ। নিশ্চয়ই তাঁর হাতে তখন অনেক কাজ ছিলো, কিন্তু এই দু-দিনের সবটুকু সময় তিনি আমার জন্য ক্ষয় করলেন—একেবারে প্লেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গদানে বিরাম ছিলো না। অথচ তিনি আমাকে জানেন শুধু চিঠিপত্র- এবং ক্ষণিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে; আমার ভাষা তাঁর অজানা; আমার রচনা, চেষ্টা, সংকল্প—সবই তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে; যাকে অর্থহীন বিনয় না-ক'রে আমি বলবো আমার আসল অংশ, তা তাঁর পক্ষে প্রদোষান্ধকারে আবৃত। কিন্তু তাঁর কিছু লেখা আমি পড়েছি, তাঁর পটভূমি ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বিনা আলাপেও তাঁকে ধারণা ক'রে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব। এ-দিক থেকে আমাদের সম্বন্ধে সাম্য নেই, তাঁর দিকে পাল্লা অনেক ভারি। ভারি এই অর্থে যে আমাকে এমন সহজে ও সম্পূর্ণভাবে তিনি গ্রহণ করলেন, যেন, আমার কোনো লেখা না-প'ড়েও, আমার অন্তর তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেন তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছেন যে কাছে ব'সে, কথা শুনে যেটুকু পাওয়া যায়, তা পেরিয়েও

এঃ স্নানের একটা বর্ণনা সংক্ষেপে দেয়া
... সমুদ্রে যেখানে গরম ধোঁয়া উঠছে,
... স্নানের ব্যবস্থা—মেয়ে ও
... জন্য আলাদা। একটা টবে গরম গন্ধক
... আর-একটাতে সাধারণ জল রাখা
—পরে পরিষ্কৃত হবার জন্য। হেনরি
... নিয়ে এসে বললেন, 'নেমে পড়ো।'
রকম আব্রু নেই, সারি-সারি টব সাজানো
। হেনরি আধ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ
... হ'য়ে গন্ধক-জলে দেহ ডুবিয়ে শুয়ে
। বলা বাহুল্য, ভারতীয় অভ্যাসবশত
অনুকরণ করা আমার পক্ষে সহজ হ'লো
আমি কোনোরকমে একটুখানি গা ভিজিয়ে
... সবস্ত্র হ'য়ে নিশ্বাস ফেললুম।
ম, এক পিতা এলেন শিশুপুত্রকে নিয়ে;
... আদমের বেশে অনায়াসে স্নানে
। আমার অবশ্য অজানা ছিলো না যে
... সমাজে অনাবরণ নিষিদ্ধ হয় শুধু
পুরুষ একত্র থাকলে, কিন্তু অন্য দু-একটি
... মতো, আমাদের শারীরিক লজ্জা
দুরপনেয়।

আমার কিছু মূল্য আছে। আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে, অন্যদের কাছেও এই রকম বন্ধুত্ব আমি মাঝে-মাঝে পেয়েছি, এখন জাপানে এসেও তা ভাগ্যে জুটে গেলো। আমার ব্যর্থ জীবনের এই একটি অমল উপার্জন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি।

১৯ জানুয়ারি

সকাল: প্রাতরাশ শেষ: আমাদের যাবার সময় হ'লো। দু-চারটে ছড়ানো জিনিশ গুছিয়ে নিয়ে নিচে নামলুম।

আমাদেব অপেক্ষায় সামনের দরজার কাছে সিঁড়ির উপর ওবারা ব'সে আছেন—সকাল-বেলা তাঁকে ঈষৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাপড়ের চটি ছেড়ে জুতো প'রে নিলুম আমরা: সরাইখানার মালিক ও দাসী তেমনি আনত হ'য়ে অভিবাদন করলে। ওবারা এলেন আমাদের সঙ্গে গাড়ির দরজা পর্যন্ত: এই সদাশয়, সদানন্দ, বৎসল মানুষটির কাছে অবশেষে বিদায় নিতে হ'লো। গাড়ির ব্যবস্থা তিনিই করেছেন, যাতে টোকিওতে ফেরার আগে হাকোনের ন্যাশনাল পার্ক আমরা দেখতে পাই। এই ভ্রমণ ও রাত্রিযাপনের সমস্ত ব্যয়ও তিনি বহন করলেন।

এ'কে-বেঁকে অম্বরবেগে গাড়ি চলেছে: আমাদের চোখ চারদিকে চপল। ডাইনে ও বাঁয়ে, সামনে ও পিছনে—সবই দ্রষ্টব্য, সবই সুন্দর। পাহাড় ও হ্রদ, স্রোতস্বিনী ও বন-ভূমি, সবুজের কোলে সিঁদুর রঙের মন্দির অথবা সরাইখানা; যেখানে স্বচ্ছ নীল আশি হ্রদের মুকুরে শুভ্র ফুজিয়ামা নিজেকে অবলোকন করছে ঠিক সেখানে, তুষার-চূড়ার মুখোমুখি, একটি চিত্তহারী হোটেল। পথে-পথে প্রস্রবণ, কোথাও পাহাড়ের গা ফেটে উত্তাপের ধোঁয়া উঠছে, কোথাও হ্রদের মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য স্টীম-লঞ্চ অপেক্ষমাণ: আর কোথাও বা সেডার পাইন মেপলের রহস্য দুইদিকে ছায়া ক'রে আছে। হিমালয়ের মতো ভীষণ বা আল্পসের মতো উত্তুঙ্গ নয় দৃশ্য: বিগ সুর-এর মতো বন্যতাও নেই:—সাজানো, গুছোনো, পরিপাটি ও ত্রুটিহীনরূপে রমণীয়। য়োরোপের কোনো-কোনো ছোটো দেশের যা বর্ণনা পড়েছি, তার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়।*

১৯ জানুয়ারি, রাত্রি

এই সপ্তাহে টোকিওতে কোনো নো নাটক দেখানো হচ্ছে না: ওটা-দম্পতিকে নিয়ে একটা কাবুকি দেখতে এসেছি। উৎসাহ আমারই, কেননা আগে একবার ন্যু ইয়র্কে কাবুকি নামাঙ্কিত নৃত্যাভিনয় উপভোগ করেছিলাম।—কিন্তু সেটা যে খাঁটি জিনিশ ছিলো না, আর তার মিশোলের অংশে যে প্রতীচীর অবদান ছিলো অনেকখানি, তা বুঝতে, টোকিওর থিয়েটারে পরদা ওঠার পর, কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগলো।

আমাদের হোটেলের প্রায় পাশের বাড়ি এই থিয়েটার, এখানে কাবুকি ভিন্ন আর-কিছু অভিনীত হয় না, এবং শীত ঋতুতে প্রত্যহ অনুষ্ঠান থাকে। এ থেকেই বোঝা যাবে কাবুকি কতদূর জনপ্রিয়। নো যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত, কাবুকি তেমনি লৌকিক ধারার আশ্রয়স্থল। এতে মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন পুরুষেরা—বালক নয়, বয়স্ক পুরুষ: নাটকে থাকে হাসা, শোক, ত্রাস প্রভৃতি নানা রসের আবেদন, সংগীতের অংশ প্রচুর, এবং সাধারণত সমাপ্তি হয় সুখের। অনেকটা আমাদের যাত্রার মতো ব্যাপার—যদিও রঙ্গ-মঞ্চের গঠন পুরোপুরি প্রতীচ্য: এতেও আছে এমন গায়কবৃন্দ যারা নাটকের কুশীলব নয়, শুধু গানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। ন্যু ইয়র্কের কাবুকিতে এই গায়কবৃন্দ ছিলো না, মেয়েদের ভূমিকায় ছিলেন নটীরা, কাহিনী ছিলো ব্যালেব মতো সরল, আর নাচের কোনো-কোনো ভঙ্গির মধ্যেও ধ্রুপদী ব্যালের আমেজ ছিলো। সেই স্মৃতি নিয়ে এখানে এসে প্রতিহত হলাম।

বেশ বড়ো প্রেক্ষাগৃহ, একটি আসন তার খালি নেই। নাটকের প্রধান নায়ি[কা] প্রথম থেকেই উপস্থিত। এই ভূমিকা[য়] যিনি নেমেছেন তিনি বর্তমানে জাপানে সবচেয়ে বিখ্যাত 'নারী-অভিনেতা'। [তাঁর] কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি অবিকল মেয়েলি, তাঁর কাঁধ চওড়া, কটি ক্ষীণ নয়, কিন্তু নায়িকাটিও প্রৌঢ়া ব'লে তা মানিয়ে গেছে। তাঁর অভিনয়, ও নাটকের অগ্রগতি, প্রভূত আনন্দ দিচ্ছে সকলকে, শুধু আমরা দু[ই] অদীক্ষিত বাঙালি কাষ্ঠপুত্তলির মতো ব'সে আছি। নাটকের কাহিনীটি যেমন দীর্ঘ, তেমনি জটিল, আর তার মধ্যে অর্থ-গৌরবও বেশি কিছু নেই—অন্তত ইংরেজি চুম্বক প'ড়ে তা-ই মনে হচ্ছে। আমাদের জাপানকে এত ভালোবেসেও এই অভিনয়ের আমরা রসগ্রহণ করতে পারছি না: বরং ঘুমের আক্রমণে আমি তো থেকে থেকে বিহ্বল হ'য়ে পড়ছি; প্র. ব. আমাকে পীড়ন ক'রে জাগিয়ে দিচ্ছিলেন ব'লে কিছুটা তবু দেখতে পেয়েছিলাম। খুব লজ্জা পেলাম ওটা-দম্পতির কাছে, আপ্রাণ সচেষ্ট হলাম মনঃসংযোগে: কিন্তু দুটো অংক ধ'রে কসরৎ করার পরে হার মানতে হ'লো, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করা ভিন্ন উপায় রইলো না। হোটেলে ফিরে জাপানি বন্ধুদের নিয়ে যখন আহারে বসলাম, তৎক্ষণে আমার নিদ্রালুতা অবশ্য সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

যা অসংখ্য জাপানির পক্ষে উপভোগ্য, আমরা কেন তা থেকে কিছুই নি[তে] পারলুম না? ভাষা জানি না ব'লে? কিন্তু জর্মান ভাষাও আমি জানি না, তবু, হ্বাগনার-এর অপেরাতে গিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরতে হয়নি। আসল কথা, হ্বাগনারের জগৎ আমার পরিচিত, তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনী আমার অজানা নেই, [তা]র য়োরোপীয় গান, তাতে আমার রক্তের টান না-থাকলেও আমার পক্ষে [তা] একেবারে অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু এই কাবুকির অভিনয় যে-সব প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করছে সেগুলি—শুধু জ্ঞানের নয়, আমার ধারণার পর্যন্ত বাইরে। সেই পট-ভূমির অভাবে, তার ভঙ্গি বা ভাব [বা] সংগীত আমার মনে লেশমাত্র সাড়া জাগাতে পারলে না। জাপানি ভাষায় অজ্ঞ হ'লেও ক্ষতি ছিলো না, যদি এর অভিনয়ের ভাষা আমি জানতুম। সেই গভীরতর সাংকেতিক ভাষা জানা নেই ব'লে, একবার এর্নাকুলামে গিয়ে, আমি কথাকলি নাচের সামনে নিস্তাপ ও অসহায়ভাবে ব'সে ছিলুম। শুধু 'প্রেমে'র অভাবেই 'গানভঙ্গ' হয় না, তার জন্য অশিক্ষাও দায়ী। 'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে'—এটা নিশ্চয়ই পরম গুণগ্রহণের শর্ত, কিন্তু চরম শিক্ষা না থাকলে এই অবস্থাটি অসম্ভব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

---

* পরে, ডেনমার্কে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় গিয়ে, হাকোনের কথা আমার মনে পড়েছে।

॥ ২৭ ॥

দুটো সাইন বোর্ডে একজন সায়েব এবং একজন মেমের ছবি দেখেই বুঝলাম আমরা লক্ষ্যস্থলে হাজির হয়েছি। কোট-প্যাণ্ট-পরা সায়েব এবং বহুবর্ণে বিচিত্রিত মেমসায়েব এক সঙ্গে আঙুল দিয়ে একটা দরজার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। সেখানে লেখা—'এই যে, আদি ও অকৃত্রিম জ্যোতিষ গবেষণা কেন্দ্র। দুষ্ট দালালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অন্য কোথাও যাবেন না।' বাংলা ছাড়াও ইংরিজী, হিন্দী এবং আরও কয়েকটি ভাষায় সেই একই সাবধান বাণী সযত্নে লেখা রয়েছে।

কনি ট্যাক্সি থেকে নেমে নিজের কালো চশমাটা খুলে একবার সাইন-বোর্ডের দিকে তাকালে। ইতিমধ্যে আমরা আবার 'দুষ্ট' দালালের হাতে পড়লাম। 'গুড মর্নিং, মেমসাব', বলে একটা হাফপ্যাণ্টপরা রোগা এবং বেঁটে লোক কনির সামনে এসে দাঁড়াল।

ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে সে যা বললে তার অর্থ এই যে 'ম্যারেজ প্রবলেমে' স্পেশালিস্ট জ্যোতিষী প্রফেসর হরিদাস দি গ্রেট কাছেই রয়েছেন। তিনি এক হিসেবে অদ্বিতীয়। কারণ তিনি সার্জিক্যাল জ্যোতিষী। প্রয়োজন হলে হাতের রেখা শল্য-চিকিৎসায় পরিবর্তন করেন।

দালালের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে, কনিকে নিয়ে আমি সোজা শিবদাস দি গ্রেটের গবেষণাগারে ঢুকে পড়লাম। ঘরের মধ্যে আসবাবের সংখ্যা কম ছিল না। আর দেওয়ালের চারিদিকে ঘোড়ার ছবি। মাঝে মাঝে সস্তা ক্যালেণ্ডার থেকে কাটা সুখী দম্পতির ছবি। সবচেয়ে অবাক হলাম গোটা কয়েক চটের থলি দেখে। সেগুলোকেও পরম যত্নে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

কনিও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মনের অবস্থা ভাল নয়। অনেক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে শাজাহান হোটেল থেকে এই নোংরা গলিতে সে এসেছে। শিবদাস দি গ্রেটের একজন সহকারী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ভদ্রলোকের মুখের ভাব দেখে মনে হলো তাঁর ইংরিজী বাচনভঙ্গীর উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু ভদ্রলোকের জগাখিচুড়ি ভাষা থেকে কিছুই বুঝতে না পেরে কনি আমার মুখের দিকে তাকালে।

ভদ্রলোকের কাছে নিবেদন করলাম, "আপনার যা বক্তব্য তা মাতৃভাষায় পেশ করুন।" ভদ্রলোক একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, "ওয়েলেসলী স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, এবং এণ্টালির কত আচ্ছা আচ্ছা মেম-সায়েবের সঙ্গে রোজ বোম্বাই মেলের স্পিডে ইংরিজী চালাচ্ছি, আর আপনি কিনা বলছেন বাংলায় কথা বলতে।"

আমি বললাম, "ইনি এলিয়ট রোডের মেমসায়েবদের মতো ভাল ইংরিজী জানেন না। উনি যে আসছেন খোদ স্কটল্যাণ্ড থেকে!"

স্কটল্যাণ্ড কোথায় এবং সেখানে কি ভাষায় কথা চলে তা ভদ্রলোকের যে জানা

নেই তা একটু পরেই বুঝলাম। ভদ্রলোক বললেন, "তাই বলেন, ইংরেজী বোঝে না। আমাদের এখানে মাঝে মাঝে দু'একটা এমন সায়েব আসে। তাদের নিয়েই আমার মুশকিল। তারা না বোঝে ইংরিজী, না বোঝে বাংলা। শুধু মুখ দিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজ করে। তারপর একজন বলে দিলে, সায়েব ফরাসী। এখন বুঝে গিয়েছি সাঁই সাঁই আওয়াজ হলে ফরাসী, আর ভট ভট আওয়াজ হলে জার্মান।"

কনি এবার আঙুল দিয়ে [illegible] দিকে দেখাতেই লোকটা বললে, "আপনাদেরও কি বি-টুইল? গানিব্যাগ, হেসিয়ান, উলপ্যাক, কিংবা বি-টুইল হলে এখনই ওঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। উনি এখন মারওয়াড়ী ক্লায়েণ্টদের সঙ্গে ঐ সাবজেক্টেই কথা বলছেন।"

কনিকে অনুবাদ করে বলতেই সে যেন ভয় পেয়ে গেল। বললে, "গানি ব্যাগ দিয়ে আমি কি করবো?"

বললাম, "পাটের থলে নিয়ে যাঁরা ফাটকা-বাজী করেন তাঁরা এখানে জ্যোতিষের সাহায্য নিতে আসেন। যাঁরা রেসের মাঠে যান তাঁরাও আসেন। শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক তাঁরাও আসেন। আগামীকাল স্টক এক্সচেঞ্জে এঁরা ষাঁড়ের মতো সামনে তেড়ে যাবেন, না ভাল্লুকের মতো পিছু হটে আসবেন তা এইখানেই পণ্ডিত মশায় আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে দেন।"

কনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কনিকে বললাম, "আপনার এখানে কী দরকার?"

কনির সুন্দর মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো। বুঝলাম, ওর বলতে লজ্জা হচ্ছে। হয়তো কষ্টও হচ্ছে।

মহাত্মা শিবদাস এবার আমাদের ডেকে পাঠালেন। একটা বড় ঘরের কোণে পুজোর উপকরণ নিয়ে তিনি কার্পেটের আসনে বসে রয়েছেন। তাঁর গায়ে গরদের চাদর। উপবীতটাও গলার কাছে সামান্য একটু দেখা যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই, শিবদাস দি গ্রেট পৈতে বার করে কনিকে আশীর্বাদ করলেন। কনি বাইরে জুতো খুলে রেখে এসেছিল। নাইলনের মোজা সমেত পা দুটো এবারও যেন লীলায়িত ভঙ্গীতে দরজার কাছ থেকে পণ্ডিতের দিকে এগিয়ে গেল। নিজের স্কার্টটা সামলে নিয়ে, কনি পা মুড়ে একটা আসনের উপর বসে পড়লো। ওর স্নিগ্ধ, ভক্তিনম্র মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলবে কনি আমাদেরই ঘরের কেউ নয়। আমাদের মা, মাসিমা, দিদি হয়তো স্কার্ট পরলে হয়তো এমনি করেই দেবতার মন্দিরে নিজে-দের পুজো নিবেদন করতে আসতেন।

শিবদাস দি গ্রেট এবার তাঁর ধূর্ত অনুসন্ধানী চোখে কনিকে যাচাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শিবদাস দি গ্রেটের বয়স পাঁচের কোঠায়। তার বেশী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এবং সেই হিসেবে, মায়ের কোলে শুয়ে শুয়েই এই শিশু ঋষি লর্ড কার্জনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শিবদাস এবার কনির মাথায় হাত রাখলেন। চোখ বুজে কীসের যেন ধ্যান করতে লাগলেন। তারপর তাঁর পূর্ববঙ্গীয় ইংরেজীতে বললেন, "মাদার, মাদার নো ফিয়ার। শিবদাস উইল সেভ ইউ।"

কনি এবারও কিছু বুঝতে না পেরে, আমার দিকে মুখ ফিরে তাকালে। আমি এতোক্ষণ খালি পায়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি কনিকে বুঝিয়ে বললাম, "উনি বলছেন, ভয় পেয়ো না। চিন্তা করো না। শিবদাস দি গ্রেট তোমাকে সব দুঃখ থেকে রক্ষে করবেন।"

কনি কোনো কথা বলতে পারলে না। সে যেন পরম নির্ভয়ে শিবদাসের হাতটা জড়িয়ে ধরলে। তার চোখে হঠাৎ যেন অশ্রুর মেঘ জমতে শুরু করলে।

শিবদাস দি গ্রেট-এর বৈশিষ্ট্য তিনি প্রথমে কোনো প্রশ্ন করেন না। আগন্তুকের মুখ দেখেই তিনি তাঁর ভূত এবং ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেন। কিন্তু ওইখানেই যত মুশকিল। ঐ প্রথম বাণীতেই তো ভক্তের মন জয় করতে হবে। অথচ কাজটা যে বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ নেই। কেউ আসছে ধরিয়ে-যাওয়া সোনার গয়না কে চুরি করেছে তার খোঁজ করতে, কেউ জানতে চায় পাশের বাড়ির সেই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত তাকে হৃদয়ে স্থান দেবে কিনা। প্রথমে ধরতে ভুল হলেই বিপদ।

শিবদাস দি গ্রেট কনির বয়স, কনির ভাবভাব, কনির বেশবাস থেকে তার সমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন। এ-মেয়ে যে বি-টুইল, হ্যাণ্ড-ক্যাপ বা ইণ্ডিয়ান আয়রন সম্বন্ধে খোঁজ করতে আসেনি তা জ্যোতিষ না জেনেও যে কেউ বলে দিতে পারে। তবু শিবদাস কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন। সেই অবসরে ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে কনি তাঁর পায়ের গোড়ায় ভক্তিভরে রেখে দিল।

শিবদাস এবার অর্থপূর্ণ হাসিতে ম ভরিয়ে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, তোম মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। তোমার মন চাইছে তাই পাবে।"

সে কথা শুনে কনির মুখ যেন একা ওয়াটের বাতির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলে

সে যেন এইটুকু জানবার জন্যেই এতোটা পথ ভেঙে এখানে হাজির হয়েছে।

শিবদাস দি গ্রেট কনিকে বললেন, "তোমার দুটো হাতই সোজা করে আমার সামনে মেলে ধরো।" কনি তাই করলে। শিবদাস সেখানে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আবার কনির মুখের দিকে ফিরে তাকালে। তারপর বললেন, "আমাদের দেশে যে মেয়ে সহ্য করতে পারে না, তাকে আমরা মেয়েই বলি না। তা তুমি মা, অনেক সহ্য করেছো। আরও তোমাকে সহ্য করতে হবে।"

কনি যেন ভুলেই গিয়েছে আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। জ্যোতিষীর আন্দাজে ছোড়া ঢিল বোধহয় ঠিক জায়গাতেই আঘাত করেছে। কনি যে অনেক সহ্য করেছে, তা তো আমার নিজের চোখেই দেখেছি।

কনি বললে, "আমি আরও অনেক সহ্য করতে রাজী আছি প্রভু। হ্যারির যদি মঙ্গল হয়, তবে সারা জীবনই আমি এমনি-ভাবেই মুখ বুজে সহ্য করে যেতে রাজী আছি।"

ফাঁদে পড়েছে! শিকার তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছে বুঝতে পেরে মহাত্মা শিবদাসের মুখও এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি চোখ বন্ধ করে, স্থূল দেহটাকে আমাদের সামনে ফেলে রেখে সূক্ষ্মদেহে যেন কনির ভবিষ্যৎ সমীক্ষায় পাড়ি দিলেন। কনি অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল। তার দেহ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলবার মতো সাহস যেন তার নেই।

শিবদাস দি গ্রেট এবার চোখ খুললেন। মৃদু হেসে বললেন, "সব বুঝেছি। তোমার কি চাই, আমার আর জানতে বাকি নেই। কিন্তু তবু সেটা তোমার নিজের মুখেই আমি একবার শুনতে চাই। নিজে আব্দার করে মায়ের কাছে চাইলে মা যে খুশী হন।"

শিবদাসের বক্তব্য কনিকে ইংরিজীতে বোঝালাম। আমার রাগ হচ্ছিল। তবু দোভাষীর কাজ করতে এসে উপদেশ দেওয়াটা যে উচিত নয় তা আমি সর্বদা মনে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

"আমি কেন এসেছি? কী আমার চাই? আমার দেহ, আমার মন, আমার আত্মা প্রতি মুহূর্তে কীসের আকাঙ্ক্ষা করছে?" কনি সরল গ্রাম্য মেয়ের মতো ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে।

শিবদাস দি গ্রেট ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। কনি যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। আর সেই মুহূর্তে কনির অতীতটা যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। নাটকে, নভেলে, ছোট গল্পে কতবারই তো সেই পুরনো কাহিনীর কথা পড়েছি। অবাক হবার, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু অনেককে উপন্যাস পড়েই থেমে যেতে হয়, আমার ভাগ্যে চোখের দেখা হলো। কানে যা শুনেছি, চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় যার ছায়া দেখেছি এবার তার রক্তমাংসের রূপ দেখলাম। জীবন। লাইফ। ট্রু-লাইফ-স্টোরি।

কনি যা বলবে তা যেন বলতে পারছে না। তার কণ্ঠে যেন লজ্জা নেমে এসেছে। জনপদের চিত্ত-বিনোদিনী যেন অবগুণ্ঠনবতী বালিকা বধূর সলজ্জদ্বিধায় আক্রান্ত হয়েছে। তবু কনি বলবে। যা না বললেও চলতো, তাই সে মুখ ফুটে বলবে।

কিন্তু হঠাৎ কনি যা বললো তার জন্যে আমি কেন, স্বয়ং শিবদাস দি গ্রেটও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সুদীর্ঘ জ্যোতিষী জীবনে এমন অনুরোধ বোধ হয় কেউ কোনোদিন তাঁকে করেনি।

কনির ঠোঁটটা একবার কেঁপে উঠলো। হয়তো আমি না থাকলে তার পক্ষে আরও সুবিধে হতো। আরও সহজে মনের কামনাটি জ্যোতিষীর কাছে সে নিবেদন করতে পারতো। কিন্তু আমি না হলে জ্যোতিষীকে কে তার ভাষা বুঝিয়ে দেবে? আস্তে আস্তে সে বললে, "প্রভু, আপনারা ইচ্ছে করলে সব পারেন। আমার যা আছে সব আপনার গডের পুজোর জন্যে আমি হাসিমুখে দিয়ে দেবো, আপনি হ্যারিকে একটু লম্বা করে দিন। আমি সুখ, সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই চাই না। শুধু হ্যারি যদি সাধারণ হয়ে উঠতে পারে, তা হলে আমি আর কিছু চাইবো না। সে বেঁটে হোক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোকে যেন তাকে বামন না বলে।"

মানুষের এই সংসারে, দেখে দেখে হৃদয় আমার অসাড় হয়ে গিয়েছে। দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান, অবজ্ঞা আজ আর আমাকে তেমন-ভাবে অভিভূত করে না। তবু বলতে লজ্জা নেই, হঠাৎ মনে হলো যেন আমার দেহের সমস্ত লোমগুলো এক সঙ্গে বিষাদের বিচিত্র অনুভূতিতে খাড়া হয়ে উঠছে। মন যেন কনিকে এতোদিনে বুঝতে পারলে। নিঃশব্দ কণ্ঠে আমার অন্তরাত্মা যেন বলে উঠলো, 'ও, এই জন্যে। ওরে অবুঝ, বোকা মেয়ে, এই জন্যে তুমি আমাকে নিয়ে এখানে ছুটে এসেছো। আমার সময় নষ্ট করেছো। আমার ভোরের বিশ্রামটুকু জলাঞ্জলি দিয়েছো। তা বেশ করেছো। আমি মোটেই অসন্তুষ্ট হইনি। যদিও ছেলেমানুষী, যদিও লোকে শুনলে তোমাকে এবং আমাকে
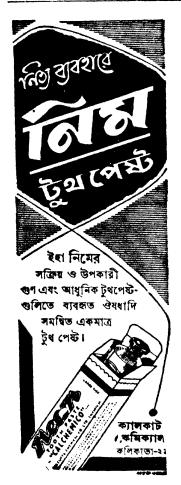
দুজনকেই পাগল বলবে, তবু আমি রাজী আছি, তুমি যেখানে যেতে চাইবে—আমার সব কাজ ফেলে তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি আমি।'

শিবদাস দি গ্রেট কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "মেমসায়েব কী বলছেন?" ভূত-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা শিবদাসও তাঁর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না।

আমি বললাম, "হ্যারি বলে ও'র এক সঙ্গী আছে। সে বামন। তার সঙ্গে......"

"বলতে হবে না। বুঝে নিয়েছি," শিবদাস বললেন। "সেই বামনকে বড়ো করতে হবে। তাকে টেনে হেঁচড়ে প্রমাণ সাইজের করে দিতে হবে।"

"হ্যাঁ প্রভু। তার জন্যে আপনি যা চাইবেন, তাই দেবো। দরকার হয়, আমি আস্তে আস্তে আরও অনেক টাকা রোজগার করে আপনার দেবতার পুজোর জন্যে পাঠাবো।"

এমন সুবর্ণ সুযোগ প্রফেসর শিবদাস দি গ্রেট বোধ হয় অনেক দিন পাননি। এমন একটি শিকারকে নিজের হাতের গোড়ায় পেয়ে তাঁর মনটা যে বেশ খুশী খুশী হয়ে উঠেছে, তা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম। মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, "এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। বামন থেকে দৈত্য, দৈত্য থেকে বামন আমাদের দেশে পুরাকালে অনেকবার হয়েছে।"

ভদ্রলোক যে এই সরলপ্রাণ মেয়েটিকে সর্বস্বান্ত করবার একটা মতলব ভাঁজছেন তা বুঝতে দেরি হলো না। আমি কিছুতেই এই দৃশ্য নিজের চোখের সামনে দেখতে পারছিলাম না। আমার চোখ দুটো যে ক্রমশ রাগে লাল হয়ে উঠছে, তা প্রফেসর শিবদাসের সাবধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল।

আমার চোখ এড়িয়ে নিজের মনেই যেন শিবদাস দি গ্রেট বললেন, "এর নাম বামনাবতার যজ্ঞ। খুবই দুরূহ এবং শ্রমসাধ্য যজ্ঞ। সাতদিন সাত রাত প্রধান পুরোহিতকে একভাবে হোম করতে হবে।"

শিবদাস দি গ্রেট হয়তো এবার খরচের বিরাট ফিরিস্তি দিতেন। কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটু ভয় পেয়ে গেলেন। আমার মনের অবস্থা জানবার জন্যেই যেন বললেন, "কিছু বলবেন?"

আমি গম্ভীরভাবে আমাদের কাসন্দের ডায়ালেক্টে বললাম, "একটা কথা মনে রাখবেন আমি শাজাহান হোটেলের কর্মচারী। ভবিষ্যতে আপনি নিশ্চয়ই চান শাজাহান হোটেলের ভিজিটররা এখানে আসুক। এই ভদ্রমহিলাও আমাদের সহকর্মী।"

কনি আমাদের কথা বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি এবার ইংরিজীতে বললাম, "হ্যারির অসুবিধের কথাগুলো ও'কে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

কনি বললে, "থ্যাংক ইউ। তোমাকে কী করে যে ধন্যবাদ দেবো জানি না।"

আমি যে কী ধরনের চীজ তা শিবদাস দি গ্রেট বেশ বুঝে গিয়েছেন। ইচ্ছে করলে, ও'র ভবিষ্যৎ ব্যবসা যে আমি প্রায় বানচাল করে দিতে পারি তাও তিনি আন্দাজ করতে পারলেন। এবার তাঁর কথার মোড় ফিরতে লাগল। নিপুণ ড্রাইভারের মতো ভদ্রলোক এবার গাড়ির গতিপথ পরিবর্তন করলেন। কনিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "বামনাবতার যজ্ঞ একালে হয়তো একমাত্র আমিই করতে পারি।"

কনি অধীর হয়ে বললে, "তাহলে, প্রভু, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি শাজাহান হোটেলে শো বন্ধ করে দিয়ে আপনার এখানে বসে থাকবো। হ্যারিকেও হাতে পায়ে ধরে, কোনোরকমে মত করিয়ে এখানে নিয়ে আসবোখন।"

আমার দিকে তাকিয়ে কনি বললে, "আমাদের তো সাপ্তাহিক কণ্ট্রাক্ট। প্রত্যেক সপ্তাহে মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে হয়, আমি আর বাড়াবো না। তুমি গিয়ে মার্কো-পোলোকে বুঝিয়ে বোলো।"

শিবদাস-দি-গ্রেট কিন্তু মাথা নাড়তে লাগলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "এই যজ্ঞের কিন্তু একটা কুফল আছে। হোমের পর বামন লম্বা হবে, প্রমাণ আকারের মানুষের সঙ্গে তার কোনো তফাৎই থাকবে না। কিন্তু......"

কনি বলতে যাচ্ছিলো, "কোনো কিন্তু নয়, হ্যারির জীবনের সব দুঃখ শেষ হবে, সে যদি আর একটু বড়ো হয়ে উঠতে পারে।"

শিবদাস-দি-গ্রেট এবার আমার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বললেন, "যজ্ঞের পর সে কিন্তু বেশীদিন বাঁচবে না। তার পরমায়ু ক্ষয় করেই তাকে আকারে বড়ো করে তুলতে হবে। ছ'মাসের বেশী কাউকে এখনও আমি বাঁচতে দেখিনি।"

কনির মুখটা এবার যেন নীল হয়ে উঠলো। সে যেন ভয়ে শিউরে উঠলো। "হ্যারি, মাই ডিয়ার হ্যারি, বাঁচবে না। হয় না। না না আমি কিছুই চাই না।"

কনি নিজের স্কার্টটা সামলে এবার তড়াং করে শিবদাসের সামনে থেকে উঠে পড়লো।

শিবদাস বললেন, "ঈশ্বর যাকে যা করতে চেয়েছেন সে তাই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে গেলে তিনি প্রায়ই কুপিত হন।"

কনি মন দিয়ে তাঁর কথা শুনলে। ঝুঁকে পড়ে ভারতীয় প্রথায় তাঁর পা স্পর্শ করলে।

শিবদাস দি গ্রেট একটা বাক্স খুলে ছোট্ট একটা মাদুলি বার করলেন। সর্ব-শান্তি

কবচ। বললেন, "এক্সট্রা পাওয়ারফ্ল কবচ। আণবিক শক্তিসম্পন্ন। স্নান করে খালি পায়ে ধারণ কোরো। আর ধারণের দিনে কারণ পান বা অনাচার নিষেধ।"

কনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কবচটা নিয়ে বললে, "আমি ড্রিংক করি না।" আরও দশটা টাকা শিবদাস-দি-গ্রেটের হাতে দিয়ে কনি প্রশ্ন করলে, "আমি পরলে, হ্যারি শান্তি পাবে তো?"

"নিশ্চয়ই পাবে। সেইজন্যেই তো এই এক্সট্রা-স্পেশাল কবচ।" শিবদাস-দি-গ্রেট শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন।

সারা পথ কনি গম্ভীর হয়ে রইল। একবারও কথা বললে না। হ্যারিকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার শেষ আশা সে যেন শিবদাস-দি-গ্রেটের জ্যোতিষ গবেষণাগারে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। একবার শুধু সে বললে, "এবার বোধহয় আমি শান্তি পাবো। তাই না?"

আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, 'বেশ তো ছিলে। সংসারের জটিলতায় ইচ্ছে করে অমনভাবে জড়িয়ে পড়লে কী আর শান্তি পাওয়া যায়?' কিন্তু আমি বলতে পারিনি। মিথ্যারই আশ্রয় নিয়েছি। কনিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, "এই সর্বশান্তি কবচ তোমার সব অশান্তির মূল উৎপাটিত করবে।"

কনি আর কথা বলেনি। সমস্ত পথ কবচটা নিয়ে দু'হাতে নাড়াচাড়া করেছে।

হোটেলে ফিরে এসেই দেখলাম কেমন একটা থমথমে ভাব। সত্যসুন্দরদা একমনে কাউণ্টারে কাজ করে যাচ্ছেন। কনিকে তিনি দেখেও দেখলেন না। কনি লিফটে উপরে চলে গেল। আমি সত্যসুন্দরদার কাছে ফিরে এলাম।

রোজীটাও ওখানে বসে টাইপ করছিল। একটা চিঠি টাইপ করা শেষ করে সেটা পড়তে পড়তে রোজী বললে, "হ্যালো ম্যান, তাহলে সকালটা খুব ফুর্তিতে কটালে। জলি গুড্ টাইম।"

আমি উত্তর দিলাম না। রোজী এগিয়ে এসে আমার কানে কানে বললে, "পুওর ফেলো, যতই চেষ্টা করো, কিছুই হবে না। কনির বুকের ভিতর যিনি বসে রয়েছেন তাঁর নাম ল্যামব্রেটো। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাও তাহলে তোমাকে অনেক বেঁটে হতে হবে!"

বোসদা গম্ভীরভাবে বললেন, "রোজী, মিস্টার মার্কোপোলো এই চিঠিগুলো সই করবার জন্যে আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন।"

রোজী বুঝলে স্যাটা বোসের সামনে শ্রীমান শংকরানন্দকে নাস্তানাবুদ করা যাবে না। সুতরাং সে এবার চিঠিগুলো নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে স্কার্ট দুলিয়ে, জুতোর খট-খট আওয়াজ করে কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে গেল।

সত্যসুন্দরদা বললেন, "তোমরা না বেরোলেই পারতে। হ্যারিটা বেশ বিপদ বাঁধিয়েছে। শুধু চিৎকার করছে। বেয়ারাদের গালাগালি করেছে। বলেছে, যেখান থেকে পারো মদ নিয়ে এসে দাও। গুড়বেড়িয়া বলেছে, ডেরাই ডে। তাও শোনেনি। শেষ-পর্যন্ত চরম বোকামি করেছে। জিমির কাছে গিয়েছে। জিমিটা এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বলেছে, এখনই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো, কিছু ব্যবস্থা হবে। ল্যামব্রেটো বোকার মতো সোজা ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে নক করেছে। তারপর বুঝতেই পারছো। কোনো ক্যাবারে গার্ল-এর ডান্সিং পার্টনার যে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হল্লা করতে পারে তা মার্কোপোলো সায়েবের জানাই ছিল না।"

বোসদা একটু থামলেন। তারপর বললেন, "হয়তো কিছু হতো না। এদিকে জিমি খবর এনেছে অন্য হোটেলে দশদিন ফ্লোরশোর সীট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টিকিটের জন্য মারামারি চলছে। আমাদের অথচ তেমন চাহিদা নেই। কয়েকটা অ্যাডভান্স বুকিং ক্যানসেলও হয়েছে।"

"তাহলে?" আমি বোসদার মুখের দিকে তাকালাম।

"যত নষ্টের গোড়া তো ওই বামনটা। কনির একমাত্র দোষ বামনটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছে। জিমি প্রথমে যা সাজেশন দিয়েছিল ম্যানেজার তাতে কান দেননি। এখন আবার অনেক কথা হয়েছে বোধ হয়। হয়তো কনিকে এখনই ডেকে পাঠাবেন।"

বোসদার সন্দেহ যে অমূলক নয় তা একটু পরে রোজী ফিরে আসতেই বোঝা গেল। রোজী খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললে, "ফল ফলেছে। স্বয়ং মার্কোপোলো দি ম্যান এবার কনি দি উয়োম্যানকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমাকে ঘর থেকে উনি বার করে দিলেন। আমারই হয়েছে মুশকিল। তোমাদের কাছে দাঁড়ালে, তোমরা বলো ম্যানেজার ডাকছে। ম্যানেজারের কাছে গেলে তিনি বলেন, কাউণ্টারে বোসকে হেল্প করোগে যাও। বেচারার অনেক কাজ। তোমরা কেউ আমাকে পছন্দ করো না।"

আমি বললাম, "অনেক কাজ হয়েছে. এবার একটু বিশ্রাম নাও।"

রোজী বললে, "বেশ।" কাউণ্টারের ভিতরে ঢুকে পড়ে সে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চকোলেট বার করে চুষতে লাগল।"

বোসদা বললেন, "রোজী, তুমি এতো চকোলেট ভালবাসো কেন?"

রোজী বললে, "আমার গায়ের রঙ আর চকোলেটের রঙ এক বলে!"

আমি দেখলাম রোজী রেগে উঠছে। বোসদাকে বললাম, "আমি তা হলে যাই।"

বোসদা বললেন, "হ্যাঁ যাও। মেয়েটার কী হলো দেখা দরকার। হাজার হোক বিদেশ বিভুঁই।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়।"

বোসদা বললেন, "আমিও যেতাম। কিন্তু হেভি প্রেসার। এখনই পঁচিশটা লোকের একটা পার্টি রিসিভ করেছি। আর একটা দল এখনই আসবে। এরা আবার ইটালিয়ান। কী বলতে চায় তাই বুঝতে আড়াই ঘণ্টা লেগে যাবে।"

"ফুল ট্যারিফ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বোসদা বললেন, "না, সব বেড অ্যান্ড

ব্রেকফাস্ট। যাক ও-সব কথা পরে হবে। তুমি এখন ওপরে চলে যাও।"

চলে যাও বলা সত্ত্বেও চলে যেতে পারলাম না। কনির ভাগ্যাকাশে যে মেঘ জমা হয়েছে তা কোনদিকে যাবে তা জানবার জন্যে মনটা তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বোসদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থাটা বুঝলেন। খাতায় লিখতে লিখতে বললেন, "এখন আর চেপে রাখবার কোনো মানে হয় না। ও'রা ঠিক করেছেন, ল্যামব্রেটাকে আর নাচতে দেবেন না। কনিকে একাই আসরে হাজির হতে হবে। ল্যামব্রেটার সংগে ও'দের কোনো কন্ট্রাক্ট নেই। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে।"

চমকে উঠে আমি বোসদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা কিন্তু মোটেই অবাক হলেন না। কাজ করতে করতেই বললেন, "কাউকে দোষ দিতে পারো না তুমি। কনিকে দেখবার জন্যেই লোকে পয়সা দিচ্ছে—ল্যামব্রেটার নাচ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।"

আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। নিজের
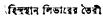
মনেই লিফটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তারপর কী ভেবে লিফটে না চড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি।

কনি। কনির সঙ্গে আমার সত্যিই দেখা হয়েছে। হোটেলের কর্মচারীর জীবনে ড্রাই-ডেগুলো সত্যিই শুকনো। ও-গুলো কোনো দিনই নয়। কিন্তু সেদিনের মতো অমন সজল শুকনো দিন বোধ হয় কোনো-দিন আমার জীবনে আসবে না। মানুষকে যারা সহজে আপন করে নিতে পারে, অপরের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে আমি তাদের দলে নই। দূর থেকে মানুষের শোভা-যাত্রা দেখেই আমি সন্তুষ্ট। তবু কেমন করে জানি না সেদিন বিদেশিনী নর্তকীর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের সুতোটা কিছুক্ষণের জন্য জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তাই এতোদিন ধরে মানবতীর্থের মন্দিরে মন্দিরে পরশ পাথরের সন্ধানে পাগলের মতো ব্যর্থ হয়ে ঘুরবার পরও, সেই মেয়েটাকে ভুলতে পারলাম না।

ড্রাই-ডের সেই বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে কনির ঘরে আচমকা অমনভাবে ঢুকে পড়াটা নিশ্চয়ই আমার উচিত হয়নি। ভবাতোর ব্যাকরণে অভ্যস্ত আজকের আমি নিশ্চয়ই তেমন দুঃসাহস দেখাতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন পেরেছিলাম। কনিকে ম্যানেজমেণ্ট কী বলেছে তা জানবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল।

আজ আমার কোনো দুঃখ নেই। সেদিন কনির ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে আমার কোনো ক্ষতিই হয়নি। বরং লাভ হয়েছিল। প্রচুর লাভ। পৃথিবীর দুর্লভ বিত্তবানদের মধ্যে আমি একজন বলে নিজেকে মনে করি। মানুষের মনের জগতে যারা জগৎ শেঠ, মর্গ্যান্স, রথচাইল্ড, নিজাম, কিংবা টাটা, বিড়লা হয়ে বসে আছে আমি যেন তাদেরই একজন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। চিবুকে হাত দিয়ে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে কনি বসে আছে। তার পোষমানা চুলগুলো হঠাৎ দুরন্ত ঝড়ে মুখের উপর এসে পড়েছে। কনি আমাকে দেখেও কোনো কথা বলছে না। যেন রেনেসাঁস যুগের কোনো দক্ষ ভাস্করের প্রস্তরকন্যা এই মৃত্যুমুখর সভ্যতার যাদুঘরে কাঁচের শো কেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যেন সব বুঝতে পারলাম। নিজের বুদ্ধিতে নিজেই যেন অবাক হয়ে গেলাম। এমন বুঝবার ক্ষমতা যদি ইস্কুলে পড়বার সময় থাকতো তাহলে এতোদিনে আমার জীবনের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে রচিত হতো। আর যেখানেই থাকি, শাজাহান হোটেলের ত্রিসীমানায় আমাকে আজ দেখা যেতো না।

বুঝছি। অথচ কী বলবো আমি? বলতে হলো না কিছু। কে যেন আমার সঙ্গে পরা-মর্শ না করেই আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে, "আই অ্যাম স্যারি। বিশ্বাস করো আমি দুঃখিত।"

কনি বললে, "আমিও যাচ্ছি। হ্যারিকে একলা ফেলে রেখে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমি শুধু একটা অনুরোধ করেছি। আই হ্যাভ্ আস্ক্ড্ ফর ওয়ান ফেভার। হ্যারি যেন এর কিছুই না জানতে পারে। ওকে বলবো, আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে আমিই চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি। আই হোপ, ওরা ওদের কথা রাখবে। ওরা হ্যারির জীবনকে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবে না। ও চেষ্টা করছে। ওর সব শক্তি দিয়ে ও নিজের খর্বতার ঊর্ধ্বে উঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। বিশ্বাস করো, ও পারছে না। যদি এ-সব কথা ওর কানে যায়, চির-দিনের জন্যে ও হেরে যাবে। কোনো দিন আর পারবে না।"

কনি একটু থামলো। "ওরা ভেবেছে, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছি। তোমা-দের জিমি এমনভাবে হাসলো যে আমার সমস্ত গা-টা রি রি করে উঠেছিল। ফর এ ডোয়ারফ্! একটা বামনের জন্যে আমি নাকি আমার ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিচ্ছি—

কিন্তু। ওরা জানে না। ওদের দোষ নেই।"

কী বলছে কনি? কনির কথার অর্থ কী?

কনির হাতের মধ্যে যে ছোট্ট একটা ফটো ছিল, তা এতোক্ষণ আমার নজরে পড়েনি। আমাকে দেখেই কনি বোধহয় আড়াল করে রেখেছিল। এখন যেন কনির আর কোনো লজ্জা নেই। অন্তত আমার কাছে তার যেন কিছুই লুকোবার নেই। আমারই সামনে সে একমনে ছবিটা দেখতে লাগলো।

আমিও দেখলাম। লবণাম্বুর অপর পারে, সমুদ্র ও পর্বতে ঘেরা স্কটল্যাণ্ডের কোনো অখ্যাত শহরতলীর কোনো অখ্যাত মহিলার ম্লান ছবি। তাঁর কোলে এক নবজাত শিশু। তাঁর পাশে আর একটি ছেলে। সাত আট বছর বয়স হবে।

কনি বললে, "চিনতে পারো?"

কেমন করে চিনবো আমি?

কনি সজল নয়নে বললে, "আমার মা।" তারপর একটু দ্বিধা করে, কোনোরকমে বললে, "হ্যারির মা।"

"আঁ!"

"হ্যাঁ। আমি কোলে রয়েছি। হ্যারি, আমার দাদার হ্যারি, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন? তখন কেউ কী জানতো হ্যারি আর বড়ো হবে না।"

কনি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। কান্নার বন্যা এসে ক্যাবারে নর্তকীর রহস্যময় ব্যক্তিত্বকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কনি বললে, "হ্যারি বড়ো হয়নি। কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক করেছে।"

সেদিন কনির মুখেই সুদূরে ইংলণ্ডের এক মা, ভাই এবং বোনের গল্প শুনেছিলাম। সংসারে কেউ দেখবার ছিল না। বামন ভাই-ই রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ করেছে। বেঁটে বয় টেবিলের নাগাল পায় না। তাই গেটে কাজ নিতে হয়েছে। বিনয়ে বিগলিত বামন অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে সুইং-ডোরের দরজা খুলে দিয়েছে। অতিথিরা আমোদ পেয়ে হাতে কিছু বকশিস গুঁজে দিয়েছেন। আর এমনি করেই বিধবা মা এবং ছোট বোনের সংসার চালিয়েছে হ্যারি।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হ্যারি কেমন যেন পাল্টাতে শুরু করেছে। হ্যারি 'ডিফিকাল্ট' হয়ে উঠেছে। মদ খেতে শুরু করেছে।

কেউ পারতো না। একমাত্র মা ছাড়া, কেউ ওকে সামলাতে পারতো না। কত রাত্রে মা ওকে বার থেকে তুলে এনেছেন। কনি লেখা-পড়া শেখেনি। তেমন লেখাপড়া শেখবার সুযোগও ছিল না। কিন্তু দাদার কাছে গান শিখেছিল। মেজাজ ভাল থাকলে দাদা গান শেখাত। মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় মেয়েরা কেমনভাবে নাচে তা দেখিয়েছে। অন্য অনেকে সে নাচ দেখে হা হা করে হেসেছে। কিন্তু কনি কিংবা তার মা কোনো-দিন হাসতে পারেননি।

নিজের অজান্তেই কনি একদিন নিজের জন্য নর্তকীর জীবন বেছে নিয়েছে। দাদাকে সে আর চাকরি করতে দেয়নি। বলেছে, তুমি বাড়িতে থাকো। মার সঙ্গে গল্প করো, তাহলেই হবে। হ্যারি রাজী হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার লোকের যাওয়া আসার পথের ধারে রেস্তোরাঁর সুইং-ডোরটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে তার মোটেই ভাল লাগতো না।

মাকে লুকিয়েই হ্যারি কনির কাছে পয়সা চাইতো। সেই পয়সা নিয়ে খুব করে মদ গিলতো। তারপর মদে চুর হয়ে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরে আসতো। মা কিছুই বলতেন না। তবু হ্যারি ভয় পেতো। মা রাগ করলে, কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু গম্ভীর-ভবে বাড়ির সব কাজ করে দিতেন। হ্যারি তখন আর চুপ করে থাকতে পারতো না। মার হাত ধরে ক্ষমা চাইতো। কাঁদতে কাঁদতে বলতো, "মা, আমি কখনও তোমার অবাধ্য হবো না।"

"মা আমার নেই। তবুও আজও হ্যারি মাকে ভয় করে।" কনি চোখের জল মুছতে মুছতে আমাকে বললে। "মরবার আগে মা বিছানার পাশে হ্যারি এবং আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হ্যারিকে বলেছিলেন, 'তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে তো? কনি যা বলবে তাই শুনবে তো?" ছোট্ট ছেলের মতো হ্যারি রাজী হয়েছিল। মা বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু সব দেখতে পাবো।' মা তারপর আমাকে বলেছিলেন, 'হ্যারি যদি অবাধ্য হয়, যদি তোর কথামতো না চলে তা হলে চোখ বন্ধ করে, মনে মনে তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস।' "

কনি বললে, "আজও যখন ওর সঙ্গে আর পেরে উঠি না, যখন দাদা আমার নেশার ঘোরে পাগল হয়ে ওঠে, তখন ওকে ভয় দেখাই, বলি—মাকে বলে দেবো।

আজও মন্ত্রের মতো কাজ হয়। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ভালো ছেলে হয়ে ওঠে। যেন সে তার সম্বিত ফিরে পায়। কিন্তু তারপরই ওর অভিমান হয়। গুম হয়ে বসে থাকে। আমার সঙ্গে কথা বলে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

তখন, দাদাকে আদর করতে আরম্ভ করি। দাদার অভিমান ভাঙতে আমার অনেক সময় লাগে। বলতে হয়, আমি না তোমার ছোটো বোন। আমি অতো বুঝবো কী করে? যদি আমার কোনো ভুল হয়ে যায়, তুমিই তো আমাকে বকবে। দরকার হলে, ইউ সুড্ বক্স মাই ইয়ারস।

দাদা তখন আবার পাল্টিয়ে যায়। আমাকে আদর করতে আরম্ভ করে। বলে, 'ইস্। দেখি। কে আমার বোনের কান মলে দেয়! কার এতোবড়ো আস্পর্ধা। আমার লক্ষ্মী বোন, আমার সোনা বোন, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার খুব ঘুম পেয়েছে। তুমি এবার ঘুমোতে যাও।'

আমি বলি, 'তুমি না ঘুমোলে, আমি ঘুমোতে যাবো না।'

দাদা হেসে ফেলে। বলে, 'বেশ, বেশ।' তারপর আমার দাদা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে।" কনি একটু হাসলো।

আর সেই মুহূর্তে কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে ছাদের উপর কনি এবং ল্যামব্রেটোর যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তার রহস্য যেন স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কনি এতোক্ষণে যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে। মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে সে বললে, "হ্যারিকে একলা ফেলে, কোথায় আমি ঘুরে বেড়াই বলো? স্কট-ল্যাণ্ডে ওকে রেখে, পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবো না। তাই ওকে নাচের সঙ্গী করে নিয়েছি। কিন্তু হ্যারি পারে না। মাঝে মাঝে আমার অবস্থা দেখে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। অথচ বোঝে না অভিনয় অভিনয়ই।" কাঁদতে কাঁদতে কনি বললে, "আমার নিজের দাদা, তবু বলবার উপায় নেই। এমন এক প্রফেশনে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।"

হয়তো আরও কথা হতো। কিন্তু ল্যামব্রেটো হঠাৎ কনির ঘরে এসে ঢুকলো। তার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।

ল্যামব্রেটোর সঙ্গে ছাদে আমার আবার দেখা হয়েছে। নিজের ব্যাগ গোছাতে গোছাতে ছোট্ট ছেলের মতো আমাকে ডেকে ল্যামব্রেটো বলেছে, "ওহে ছোকরা, শোনো। হলো তো। যেমন আমাদের রাগিয়ে দিলে, এখন মজাটা টের পাচ্ছো তো? আমরা তোমাদের শাজাহানকে কলা দেখিয়ে চলে যাচ্ছি।"

ল্যামব্রেটো বলেছিল, "মার্ক মাই ওয়ার্ডস। তোমাদের এই পচা শহরে, আমরা আর কোনোদিন ফিরে আসবো না।"

সত্যিই ওরা কোনোদিন আর কলকাতায় ফিরে আসেনি। কিন্তু কেই বা আসে? যৌবনের মরসুমী ফুল হাতে করে কোন্ পান্থশালার প্রিয়াই আবার ফিরে আসে? তবু আজও আমার কনির কথা মনে পড়ে যায়। ভোরের আলোয়, দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায়, সন্ধ্যার কোলাহলে এবং রাত্রের অন্ধকারে যাকে দেখেছি সে যেন একটা কনি নয়। কনি দি গার্ল, কনি দি মাদার, কনি দি সিস্টার মিলিয়েই যে কনি দি উয়োম্যানের সৃষ্টি, তা ভাবতে আজও আমার কেমন আশ্চর্য লাগে।

এই বৃহৎ পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে অ কনি তার ভাইকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে জানে। কোনো প্রখ্যাত হোটেলে ত নিশ্চয়ই তার স্থান হবে না।

'দেশ' পত্রিকায় লেখার প্রধান আনন্দ ও বিচিত্র পাঠকমণ্ডলী। পৃথিবীর বিভি প্রান্তে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। কো অবসন্ন সন্ধ্যায় কোনো অখ্যাত পানশাল 'দেশ'-এর প্রবাসী পাঠক যদি কোনো বি যৌবনা নর্তকীকে কোন বামনের স নাচতে দেখেন, তবে একবার তাঁকে জিজ্ঞা করবেন তার নাম কনি কিনা। যদি স সে কনি হয় তবে অনুগ্রহ করে আম একটা চিঠি লিখবেন।

আমি বড় সুখী হবো। আমি স আনন্দিত হবো। (ক্রম

রাংচিতার বেড়া অবধি এগিয়ে এসেছিল সোনাবউ, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, খোকার মা দাওয়ায় বসে ছেলে নাচাচ্ছে। তেলের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে বুকে পিঠে তেল মাখাচ্ছে। পাশেই একটা দোলনা। দোলনায় বসে সাদা রংয়ের ধবধবে একটা বেড়াল একটু একটু দোল খাচ্ছে।

দেখতে দেখতে জ্বলজ্বলে চোখের তারায় চুইয়ে চুইয়ে রক্ত উঠে এল ওর। হাতের রোগা রোগা আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল। সারাটা দিন এমনধারা হতে লাগে, অথচ এখন যেন অসুর এসে ভর করল রক্তমাংসে। এক চুলও নড়তে পারছে না সোনাবউ। যেন মাটির মধ্যে পা ডুবিয়ে গাছের মতো দাঁড়িয়েছে এখন। নড়চড়া একেবারেই আয়ত্তে নেই।

কারণ নেই, অকারণ নেই, না, ইচ্ছে হচ্ছে বাচ্চাটার চোখ দুটো খুবলে নেয়। ঘাড়টাকে মুচড়ে মুচড়ে আখের মতো নিংড়ে ছাড়ে। তারপর পুটলি বেঁধে খালধারে ফেলে আসে।

অথচ, হুট বলতে এখনি যদি এগিয়ে যায় সোনাবউ তেড়ে আসবে খোকার মা। ডাইনী বলে চেঁচিয়ে উঠে ধুলো ছাড়বে। তাই দৃষ্টিতে কিছু বিষ জড়িয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন পথ পেল না ও। তাকিয়ে রইল সোনাবউ। খোকার মা তার ছেলে নাচাচ্ছে। দাওয়া বিছিয়ে খড়ি-গোলা একপ্রস্থ রোদ পড়েছে।

খোকার মার কাণ্ড দেখে সোনাবউ উশখুশ করে হাঁপাতে লাগল। বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। হাতের চেটো ঘেমে আসছে। নাক দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল, মুখ দিয়ে বাতাস টানল সোনা-বউ। ভাবল, একবার একটু চোখ ছাড়া করলে হয়, চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নেব। একবার যদি পাই! অস্থিরভাবে সময় গুনতে লাগল সোনাবউ।

শীতের এই সাত সকালে এপথ দিয়ে আসছিল বলেই না এমন একটা দৃশ্য ওর চোখে পড়েছে। হয়ত ও হাঁটতে হাঁটতে হাটখোলার দিকেই চলে যেত। কিংবা সেই পাঁচমারির খালের দিকে। হাটখোলায় গেলে সারাটি দিন হাটুরেদের সঙ্গে কসরত করত, জনে জনে ধরে ধরে টালিয়ে তুলত। কিংবা সেই পাঁচমারির বাঁশের সাঁকোয় খুট খুট করে এপার ওপার করত। এ পারে থাকবে, না ওপারে যাবে এই সমস্যা মেটাতে মেটাতেই সমস্ত দিন কাটিয়ে আসত। অথচ তেমন কোন সুরাহা নেই দেখে থুঃ থুঃ করে থুতু ছেটাত।

বাচ্চাটা কেমন ছটফট করে মাছের মতো লাফাচ্ছে। রোস না বাপু, মজা দেখাচ্ছি। একবার একটু চোখ ছাড়া করুক খোকার মা, চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে পালাব। হিঁ হিঁ......নাক টেনে হাসতে চেষ্টা করল সোনাবউ। কারণ নেই, অকারণ নেই মাঝে মাঝে ও হাসে।

দোলনায় বসে দুলতে দুলতেই বেড়ালটা এবার চোখ বুজেছে। সোনাবউ ওর রকম দেখে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। কত ঢংই শিখিয়েছে ওকে বাড়ির বউ। সব ঢং আজ ভেঙে দিয়ে মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

ওদিকে জামরুল গাছের মাথা অবধি সূর্য উঠেছে। ডাল পাতার ফাঁক গলিয়ে পিচকিরির মতো আলো ছুটেছে। ইচ্ছে হল দু হাত দিয়ে গাছের বাধাটা ও সরিয়ে দেয়। বাধা দেখলেই দমটা কেমন ফেটে আসে সোনাবউয়ের। মনে হয়, ফুসফুসটা দু'হাত দিয়ে কে যেন চেপে ধরেছে। যতক্ষণ না দম ফাটে ততক্ষণ আর ছাড়ান নেই। ফলে পিচকিরির মতো

...গুলো ছোটো দেখে ভীষণ ধারা কষ্ট হতে লাগল ওর। চোখ ফিরিয়ে দাওয়ার দিকেই তাকাল। ঝাপসা ঝাপসা কেমন যেন ধোঁয়ায় ঢাকা বোধ হচ্ছে। যেন রাত্রিবেলার কুয়াশা-গোলা পুরোপুরি এখনো কেটে ওঠে নি। কুয়াশার মাঝেই নলের মতো আলো ছুটেছে। তাড়াতাড়ি চোখ কচলে নিয়ে আবার ও তাকাল। ধোঁয়াটে ভাবটা একটু একটু করে কেটে যেতেই আবার ও দোলনায় বসা বেড়ালটা, বাচ্চাটা আর বাচ্চার মাকে দেখতে পেল।

উঁহু, কেমন ভাবে কুঁই কুঁই শব্দ করে হাসছে দেখ। ডাঙায় যেন হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটছে। রোস, মজাটা টের পাওয়াচ্ছি খানিক বাদে। এত সুখ ভাল না খোকার মা, একটুখানি চোখ ছাড়া করে দেখ না, চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে পালাব। হি' হি'......কেমন ধারা মজা হবে বল দি' নি! সোনাবউ হাসতে গিয়ে চমকে উঠল। চট করে কাপড়ের পুঁটলিটা তুলে ধরে মুখ চাপল। এখন যদি শব্দ হয় টের পেয়ে যাবে খোকার মা। আর, তা হলেই পাগলী বলে চেঁচিয়ে উঠে একাকার করবে। কর্তাবাবু ঘরে থাকে তো লাঠি নিয়ে দৌড়ে বেরুবে। লাঠি সোটায় বড় ভয় পায় সোনা-বউ। লাঠির কথা মনে আসায় হাত পা যেন জমে আসতে লাগল। রক্তের মধ্যে ঝিমঝিম করে থিতোনি নামল। কেমন একটা অবসাদে তলিয়ে যাচ্ছে সোনাবউ। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে নেমে আসছে। টলতে টলতে বেড়ার ওপাশে বসে পড়ল সোনাবউ।

হঠাৎ, চিতার আগুনে খুঁচিয়ে দিলে যেমনিধারা ফুলকি ওড়ে তেমনিধারা আলোর ফুলকি ফুর ফুর করে চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নিমাইচাঁদের কথা মনে করিয়ে দিল। পুরনো সেই কসাইখানার দিকে অনেকদিন যায় নি ও। যেন এখন স্মৃতির পাতালে ডুবতে ডুবতে একটুখানি আলো দেখতে পেয়েছে, এমনিভাবে আবছা আবছা কসাই-খানার ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কসাইখানার চাতাল জোড়া চর্বির ছাট, মাংসের কুচি, রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। অথচ, যে লোকটা মুণ্ডুহীন পাঁঠার গা থেকে মোজার মতো চামড়া ছাড়াচ্ছে সে লোকটাকে ও কিছুতেই চিনতে পারল না। নিমাই নয়। নিমাইচাঁদ তো মারা গেছে ওলাওঠায়। একরাত্রের বাঁশ দাস্তে।

ঝিমঝিম করে বোল বাজছে মাথায়। আপনা অল্প ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠছে। আলোর ফুলকিগুলো উবে যেতে লাগল। সোনাবউ বুঝতে পারল বসে পড়ায় চোখের সামনে রাংচিতার বেড়াখানা এখন বাধার মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাংচিতার সবুজ পাতা চোখের সামনে জড়িয়ে যাচ্ছে। আঁচড়ে আঁচড়ে কয়েকটা পাতা ও ছিঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বমির মতো সাদা ডগাকে দুধ বেরল ডাল বেয়ে। অথচ, সেদিকে ওর চোখ না পড়ে ফোকর গলিয়ে দাওয়ার ওপর লাফিয়ে এল। বেড়ালটা এবার হাই কাটছে। হাই কেটে মুখের উপর একখানা পা তুলে ঘসে নিচ্ছে। উঁহু, চং দেখে আর বাঁচি না বাপু! রোস না সব মজা দেখাচ্ছি। খোকার মা উরুর উপর বাচ্চাকে তুলে ধরে কুতকুত করে তাকিয়ে

আছে। কানের পাশে টকটকে এমন একটা লালের আভা, যেন নিমাইচাঁদের কসাইখানা থেকে এইমাত্র কেটে আনা একটা পাঁঠার জিভ ওখানে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। খোকার মার চোখের মণি আরশির মতো, আলো পড়ে ঠিকরে ঠিকরে ছেলের গায় ঝিলিক কাটছে। উঁহু, কেমন ধারা হাঁটু ছুঁড়ছে দেখ না! পেলে হয় একবার চোখ দুটো খুবলিয়ে গর্ত করে নেব, মাথাটাকে আখের মতো নিংড়ে ছাড়ব, তারপর পুঁটলি বেঁধে খাল পারে ফেলে আসব। হিঁ হিঁ ......কেমন সুখ হবে তা'লে!

সুখ! সোনাবউয়ের, কারণ নেই, অকারণ নেই কাঁদতে ইচ্ছে করল। সামনে এই বেড়াটা কেন? বাধা দেখলেই বুকটা কে যেন চেপে ধরেছে মনে হয়। সারা দেহ ঘামতে থাকে। ঘামতে ঘামতে সোনাবউ দেখল, রাংচিতার গা বেয়ে দুধ গড়াচ্ছে টসটস করে। দুধের ফোঁটা ফুটকি ফুটকি শ্মশান খোঁচান ফুলকির মতো ভুরভুর করে উড়তে লাগল। আবার সেই ঝিমঝিম করা কুয়াশা নামল। কুয়াশার মাঝে ডুবতে ডুবতে সোনাবউ হারিয়ে যাচ্ছে। উঁহু, একটুখানি ঠাঁই নেই গো, কেমনধারা জ্বালা বলো!

স্বামীর কথা মনে পড়ছে। স্বামী ছিল সিঁধেল চোর। ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে ঘরে ঢুকত। সমস্ত গা তেল জবজবে করে নিত। ফলে ধরবার আগেই পিছলে পড়ে পালিয়ে আসত। নিজের হাতেই কতবার ও তেল মাখিয়ে দিয়েছে। হাসতে হাসতে কখনো সখনো লোকটা বলত, এটা আমার বাপের বাড়ি বুঝেলি সোনাবউ আর জেল-বাড়িটা আমার নিজের বাড়ি। কোন বাড়িই টিঁকলো না ওর। পাঁচমারির খাল ধারে সেই যে বছর জোড়া খুন হল সেই থেকেই ওর হদিশ গেছে।

সেই থেকেই সোনাবউয়ের নিমাইচাঁদের কসাইখানায় আনাগোনা। নিমাইচাঁদের আদর কি! পারলে যেন ছবির মতো টাঙিয়ে রাখে ওকে। আহা, এমন আমার সাধের দিনে এমন আমার সুখের দিনে কে এসে ছাই ছড়াল বল দেখি! সুখের কথা মনে পড়ায় হু হু করে কান্না আসছে।

খোকার মার দিকে তাকিয়ে সোনাবউ কান্না চাপল। এত সুখ ভাল না খোকার মা, কাঁদতে হয়। হিঁ হিঁ......খোকার মাকে কাঁদতে হলে কেমন মজা হয় বল দি' নি! সোনাবউ খুশী হয়ে একটুক্ষণ চোখ বুজল।

আবার এক গাদা শ্মশান ফুল বনবন করে পাক খাচ্ছে। কসাইখানার দাওয়ায় বসে নতুন একটা ছোকরা মোজার মতো পাঁঠার গা থেকে চামড়া ছাড়াচ্ছে। কিছুতেই ওকে চিনতে পারছে না সোনাবউ। দাওয়া জুড়ে খাসির লোম, রক্তের দাগ। রক্তে লোমে একাকার হয়ে জেবড়ে গেছে। কসাইখানার ভেজা ভেজা আঁশটে আঁশটে গন্ধটাও নাকে লাগছে। নিমাইচাঁদ তো মারা গেছে ওলাওঠায়। একরাত্রের বমি দাস্তে। অথচ, ওরই সঙ্গে ভাব জন্মেছিল সোনাবউয়ের, লগিডুব পানির মতো অতল হওয়া ভাব। অথচ লোকটা মরল ওলাওঠায়। মরার আগেই সোনাবউয়ের পেটে একটা বাচ্চা এল। নিমাইচাঁদের চিতার পাশে চেঁচিয়ে কেঁদে শোনাল ও, "তুই তো একটা ছেলের বাপ, কোথায় যাচ্ছিস শুনি? ছেলের মুখটাও দেখবি না।" পটপট করে হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে ছড়িয়ে দিল চিতার উপর। খানিকটা যেন রাগ করেই এমন করল।

এতক্ষণ যেন পায়ের নিচে মাটি ছিল। হঠাৎ সব উবে যেতে শুরু করেছে। সোনা-বউ যেন শূন্যে ভাসছে। কুয়াশার মতো স্মৃতির মধ্যে ডুবতে ডুবতে তলিয়ে যাচ্ছে আবার। সাঁতার কেটে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক সময় ও ককিয়ে উঠল। চার পাশে কি একটু আধটু আলো নেই গো। কেমন করে এগোই বল দেখি! হিঁ হিঁ করে কাঁপতে লাগল। একটু আধটু ঠাঁই নেই গো, কোথায় গিয়ে দাঁড়াই বল দেখি!

দিন এলে ছেলেটা হল। কিন্তু কেমন ধারা ছেলে! সারা গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে সোনাবউ চমকে ওঠে, যেন গুটি কয় হাড়ের ওপর চামড়ার একটা খোলস চড়িয়ে ছেলে-ভুলানো-ছেলে। ধড়টা কেবল মরা পাখির ধড়ের মতো ঢুলতে থাকে। ছেলের মুখে মাই দিয়ে সোনাবউ চমকে ওঠে। বোঁটা খোঁচালে রক্ত বেরোয়, দুধ কোথায়? দুধ বিনেই ছেলেটা একদিন হারিয়ে গেল।

স্বামী গেল নিরুদ্দেশ, নিমাইচাঁদ ওলা-ওঠায়, ছেলেটা কেন থাকবে বল। খালের ধারে ছেলেটাকেও রেখে এল সোনাবউ। খালের কথায় সাঁকোর কথা মনে পড়ল। সাঁকোটাই যত বিপদ বাধায়। এপার কর ওপার কর, কিছুতেই যেন স্বস্তি নেই। এপারে থাকবে না ওপারে যাবে ভেবেই পায় না সোনাবউ। থুঃ!

হু হু করে কান্না আসছে। হাতের কাছে কিছু একটা পেলে হয় এখন। মনের ঝাল মিটিয়ে নেব। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবল সোনাবউ। ধীরে ধীরে আবার সম্বিৎ ফিরে পেতে লাগল। দেখল, পিচকিরির মতো আলো এখনো ছড়িয়ে আছে দাওয়ার ওপর। বেড়ালটা কি নড়বে না নাকি! ইচ্ছে হচ্ছে দোলনাটাকে টান দিয়ে ছিঁড়ে নামায়।

বাচ্চাটা কেমন গড়গড় করে শব্দ করছে। বাচ্চার দিকে চোখ পড়তেই সোনাবউ শক্ত-

হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাড়ে মজ্জায় কেমন যেন অসুরে চাপল। খোকার মা-টা গেল কোথায়! নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সোনাবউ। ঠোঁট জোড়া থরথর করে কাঁপতে লাগল। মাথার মধ্যে চনচন করে রক্ত ছুটল। ছেলেটা এখন একলা একলা ঝুমঝুমি নাড়ছে। খোকার মা-র সাহস দেখে যেন ও নিজেই শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। এই ফাঁকে, যা হয় হোক এই ফাঁকেই এগিয়ে যাবে ও। এই ফাঁকেই ছোঁ মেরে তুলে নিতে হবে। হাতের আঙুল তুর তুর করে কাঁপতে লাগল। ঘেমে উঠছে সোনাবউ। হুমড়ি খেয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। চারদিকে একপলক নজর বুলিয়ে দেখে নিল, জনপ্রাণীর গন্ধ নেই। অথচ ঐ বেড়ালটা অমন তাকিয়ে আছে কেন! দোলনাটা যেন চিরকালই দুলতে থাকবে। থামিয়ে দিলে বেশ হয়।

ঘরের মধ্যে চোখ পাতল সোনাবউ। সুমসুম করছে ফাঁকা। রোস না এবার, মজা দেখাচ্ছি। চোয়াল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে দাওয়ার কাছে এগিয়ে এল ও। ছেলেটাকে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। 'এই শয়তান', ক্ষীণ গলায় ডাকল সোনাবউ। ছেলেটা যেন সব বোঝে এমনভাবে মুখ করে ওর দিকে তাকাল। বেড়ালটা তবু নির্বিবাদে দোল খাচ্ছে। 'এই ছেলে' হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে জাপটে ধরল সোনাবউ। এক থাবলা তুলতুলে মাংসের মতো ছেলেটা ওর সমস্ত বুক ভরে গেল। চোরের মতো চোখ তুলে তাকাল সোনাবউ। জনপ্রাণীর গন্ধ নেই। বেড়ালটা শুধু সাক্ষীর মতো তাকিয়ে আছে। সোনাবউ চোরের মতো পা টিপে টিপে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে এল। রাং-চিতার বেড়া ডিঙোতেই ছেলেটা কেমন কুঁই কুঁই করে কেঁদে উঠল। হাত তুলে মুখে চাপল ওর সোনাবউ। চিৎকার দিয়ে ঝিকিয়ে উঠল বাচ্চাটা। হাত থেকে খেলনা-খানা পড়ে গেল। চুলোয় যাক্। এখুনি হয়ত কেউ এসে দেখে ফেলবে। 'এই চুপ, চুপ যা বলছি।' মুখের মধ্যে নুন ঠেসে ধরলে যেন শান্তি হয়। হাত দিয়ে মুখটাকে চেপে রাখায় কান্নাটা এবার গোল গোল হয়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে লাগল।

হন হন করে খানিকটা দূরে এগিয়ে এসে সোনাবউ স্বস্তি পেল এবার। কাকপক্ষীও টের পায় নি, হিঁ হিঁ......কেমন মজা হল বল দি'নি। হাঁটতে হাঁটতে সরকার বাগানের মাঝ বরাবর এগিয়ে এল ও। ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁপাতে লাগল এবার। জায়গাটা বেশ জঙ্গলে মতো বলে ভাল লাগছিল যেন। ওদিকটায় ঢালুর মধ্যে বেতের ঝোপ দেখা যাচ্ছে। আম তেঁতুলের ঘন ছায়ায় আকাশটা কেমন ঝাপসা মতন। সামনেই একটা কোমর অবধি উঁচু হওয়া উইয়ের ঢিবি। ঢিবির পাশে একটু বসলে হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে সোনাবউ বুঝতে পারল, বাচ্চাটা ওর গা থেকে পিছলে পড়ছে। দু হাত দিয়ে সাপটে আবার ওকে তুলে ধরল। বুকটা এত কাঁপছে কেন! যেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাৎ ও পড়ে মরবে। দাঁড়াতে আর সাহস না হওয়ায় ঢিবির পাশে এগিয়ে এসে বসে পড়ল সোনাবউ। ঢিবির দিকে পিঠ ঝুঁকিয়ে ঝোপের দিকে তাকাল। ছোট্ট একটা রক্ত-শোষা সাপ পোকা খুঁজছে। কাকপক্ষীও টের পেল না, হিঁ হিঁ......আকাশের দিকে চোখ তুলল। ফিনকির মতো আলো ছুটেছে। বাধার দিকে তাকিয়ে থাকলে বুকটা বড় টনটন করে ওঠে। ফুসফুসটা কে যেন চেপে ধরেছে মনে হয়। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর উপর চোখ পাতল সোনাবউ। চোখ কেমন বিজলীর মতো ঝলসে উঠল। সামান্য একটু রোদের দিকে তাকাতেই এই, আর আগুনে যখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিমাইচাঁদকে শেষ করল,—হায়রে, ছেলের মুখটাও দেখলি না তুই। শত্তুর, তুই আমার শত্তুর ছিলি! রাজ্যি-ময় শত্রু ঘুরছে, কিলবিল করে হাত বাড়াচ্ছে রাক্ষসগুলো।

বেতের ঝোপে আবার ওর চোখ পড়ল। সংগে সংগে বরফের মতো এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস মুখের উপর লাফিয়ে পড়ে ঝাপটা কশাল। চোখ দুটো কুঁচকে ধরে শক্ত হয়ে তাকাল ও। বাড়ির সেই সাদা বেড়লটা কেমনভাবে ঝাপটি মেরে লুকিয়ে আছে ওখানে। হারামজাদা পিছু ধরেছিস! ভুল দেখছে না তো সোনাবউ। আবার খুঁটে খুঁটে লক্ষ্য করল। প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখ না। নাঃ, বসতে পারল না সোনাবউ। পুঁটলির মতো বাচ্চাটাকে বগলে ধরে উঠে পড়ল।

দু' পা হাঁটতেই মনে পড়ল, স্বামীর গায়ে তেল ডলে পিছলে করে দিত সোনা-বউ। স্বামীটা ছিল সিঁধেল চোর। ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে ঘরে ঢুকত। ধরা পড়ার আগেই আবার পিছলে পড়ে পালিয়ে আসত। হায়রে, শেষটায় কিনা নিজের হাত থেকেই পিছলে গেল!

কুঁজো হয়ে হাঁটতে লাগল সোনাবউ। বেড়ালটার চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে। সামনেই একটা মজা পুকুর। কাদার উপর নাক ভাসিয়ে কি যেন একটা নড়ছে চড়ছে। শুকনো একটা বেলের খোসা পায়ে লেগে গড়িয়ে গেল। চমকে লাফিয়ে উঠেছিল প্রায় সোনাবউ। আবার একটু কুঁজো হয়ে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বেতের ঝোপটা চোখের বাইরে চলে যেতেই হিঁ হিঁ করে হেসে উঠল সোনাবউ। হিঁ হিঁ...... বেড়ালটা এবার বুঝতেই পারবে না ও কোন দিক দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই, এই, চুপ! চুপ যা বলছি। কান্নাটা আবার গুলিয়ে গুলিয়ে পেটের সুড়ঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে ছেলেটার। এত সুখ ভাল না খোকার মা, কাঁদতে হয়। হিঁ হিঁ......সামনের পোড়ো জমিটুকু এক ছুটে পেরিয়ে এল সোনাবউ। ডাইনে হাঁটলে সর্দার পাড়া, বাঁয়ের দিকে হেঁটে চলল। আধ পোড়া ইটের পাঁজাটাকে এখান থেকে একটা ধ্বস ভাঙা দালানের মতো মনে হচ্ছে। পাঁজার উপর রোদ শিষচ্ছে। এতক্ষণে রোদের তেজটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারল সোনাবউ। এই, এই...... চুলের মধ্যে বাচ্চাটার আঙুল ঢুকে যাচ্ছিল, ঝটকা মেরে হাতটাকে ও ছাড়িয়ে নিলে। ইস্ আবার হেঁচকি তুলছে দেখ! বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল সোনা-বউ। কাঁদতে কাঁদতে কেমনভাবে ফুলে উঠছে, দেখতে দেখতে সমস্ত মন ঝিমঝিম করে দুলতে লাগল। গায়ের থেকে আঁতুড় গন্ধটাও মরেনি গো! দেখতে দেখতে সমস্ত চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

কারণ নেই অকারণ নেই টস টস করে চোখ ভিজে জল এল ওর। খাল ধারে এমনি একটা ছেলেকে ও কবর দিয়ে রেখে এসেছে। নাক টেনে কান্না চাপবার চেষ্টা করল সোনা-বউ। ইটের পাঁজায় পিঠ ঠেকিয়ে সামনের দিকে শূন্য চোখে তাকাল। শীতের মাঠে রোদ পড়ে চকচক করে কাঁপছে। আকাশটা কেমন ভুসো ভুসো শ্মশানখোলার আকাশের মতো ঝাপসা দেখাচ্ছে। ধোঁয়ার ফাঁক গলিয়ে হঠাৎ কয়েকটা শকুন বেরিয়ে এল। লাট খেতে খেতে শকুনগুলি নিচের দিকে ঝুঁকে আসছে। সোনাবউ উশখুশ করে নড়ে বসল, শকুনের দিকে চোখ রাখতে কেমন যেন ভয় লাগছে ওর। কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে মনে হল। ভয়ে ভয়েই পিছন ঘুরে ইটের পাঁজার দিকে চোখ রেখে কাঠ হয়ে রইল। কাঁচা ইট গলে গলে ঝলসে ওঠা চামড়ার মতো লাগছে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল সোনাবউয়ের। এমন সময় ইঁটের পাঁজার উপর দিকে চোখ পড়তে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কে যেন একটা চাবুক কশেছে বুকের উপর। দরদর করে ঘাম ছুটতে লাগল সোনাবউয়ের। চোখ ফেরাতে পারল না। পাঁজার উপর বাঘের মতো থাবা পেতে চকচক করে তাকিয়ে আছে বেড়ালটা। এইবার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে সোনাবউকে। বেড়ালটার দিকে চোখ রেখেই পিছন দিকে পা ফেলে ফেলে খানিকটা দূরে হেঁটে এল ও। হঠাৎ তারপর উলটো দিকে ঘুরে ছুটতে শুরু করল। সামনেই হোগলা বন। হোগলা বনে বাতাস কাঁপছে। সরসর করে খই ফোটার শব্দ হচ্ছে। বনের ভিতর হামা কেটে ঢুকে পড়ল সোনাবউ। হোগলা পাতা করাতের মতো গায়ের উপর ঘষা খাচ্ছে। ছেলেটাকে পুঁটলির মতো আঁচলের মধ্যে বেঁধে নিয়ে দু' হাত দিয়ে পাতা সরাতে সরাতে অনেকটা দূরে ঢুকে পড়ল ও। চারদিকে যখন বনের আবডাল পুরো হল, সোনাবউ পা বিছিয়ে বসে পড়ল। হোগলা বন পেরিয়ে গেলেই খাল পড়বে। খালের সেই সাঁকোটার কথা মনে এল।

নিমাইচাঁদের চিতার উপর খুঁজলে হয়ত সাদা সাদা দাঁতের মতো শাঁখার গুঁড়ো এখনো কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু, নিমাই-চাঁদের হাড়ের কুচি আর শাঁখার কুচি দুটোরই যে এক চেহারা। আলাদা করে চিনবে কিভাবে সোনাবউ।

জালের মতো হোগলাপাতার জঙ্গলের মধ্যে ডুবে বসে আছে সোনাবউ। জালের মতো বাধা দেখেই বুকটা কেমন টনটন করে উঠল। হাঁপাতে লাগল সোনাবউ। মুখ দিয়ে শ্বাস টানল।

বাতাস লেগে পাতার ডগায় শিরশির করে কাঁপুনি আসছে। বাতাসটা যেন হৈ হৈ করে ছুটে যাচ্ছে খালের ধারে। কান পেতে সোনাবউ বাতাসের ইচ্ছে বুঝতে

চাইল। মনে হল বাতাসের মধ্যে একদঙ্গল ক্ষ্যাপা কুকুর হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে মরছে। শব্দটায় ওর সন্দেহ হল। চারপাশটা দেখবার জন্য ইচ্ছে হচ্ছে। পাতার ডগা এমনভাবে কাঁপছে কেন! ইচ্ছে হল হাত বাড়িয়ে কাঁপুনিগুলো থামিয়ে রাখে।

বাতাসের মধ্যে শব্দটা যেন ঘন হচ্ছে। সোনাবউ উশখুশ উঠে দাঁড়াল। হাত ঝাপটে হোগলা পাতার কাঁপুনি থামাল। থামিয়ে, চার পাশে চোখ বুলোতেই দেখতে পেল একদঙ্গল লোক লাঠি হাতে ছুটে ছুটে এগিয়ে আসছে। সর্বনাশ, টের পেয়ে গেছে সবাই। মানুষগুলোই তাহলে কুকুরের মতো শব্দ করছিল। রাক্ষস, মরণ হয় না তোদের। সোনাবউ বিড়বিড় করে গালি পাড়ল। কিন্তু এভাবে এখন দাঁড়িয়ে থাকলে দেখে ফেলবে রাক্ষসগুলো। হুমড়ি খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ডুবে বসল সোনাবউ। যেন মাটির সঙ্গে মিশে থাকলে সবচেয়ে এখন ভাল হয়, এমনভাবে উবু হয়ে পড়ে রইল। লোকগুলো বোধ হয় পাঁজা অবধি এগিয়ে এল। ঘাড়ের কাছে কুচ করে কি যেন একটা পোকায় কামড়ে ধরেছে। হাত তুলতে সাহস হল না। চোখ ঘুরিয়ে দেখল, শকুন দুটো সোঁ সোঁ করে খালের দিকে ছুটে যাচ্ছে। খরগোশের মতো কান তুলে ধরল সোনাবউ। থুতু ছেটাতে ইচ্ছে হল। থুঃ থুঃ কয়েক চাপ থুতু ছেটাল হোগলাপাতায়। বাকিগুলো কোঁৎ করে গিলে ফেলল।

লোকগুলো কেমন ঝড়ের মতো ছুটে আসছে। হোগলা বনেই ঢুকবে নাকি! দেখবার জন্য উঁচু হল সোনাবউ। ভাল করে বুঝবার আগেই টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ছুটতে শুরু করল।

লোকগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে চারপাশ থেকে ঢুকতে চাচ্ছে, এক পলকে সোঁ সোঁ করে ওর দিকেই যেন ছুটতে লাগল। থুঃ থুঃ, থুতু ছেটাল সোনাবউ। আরো জোরে জোরে ছোটা যায় না। হাওয়ায় ভর দিয়ে যদি পাখির মতো উড়ে পালান যেত! বাপরে, কেমন ধারা রাক্ষসের মতো আসছে দেখ। পাতায় পাতায় পা জড়িয়ে আসছে। ইস্, পেলে যেন ছিঁড়ে খাবে আমাকে। কেন? তোদের আমি কোন পাকা ধানে মই দিয়েছিরে শয়তান। দাঁড়া না, গায়ের ওপর এসে পড়বি তো কামড়ে ধরব। ঝোপের গায়ে কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিল সোনাবউ। আরো খানিকটা ছুটে এসে খালধারের সাঁকোটাকে দেখতে পেল ও। নাক দিয়ে ছরছর করে জল গড়াচ্ছে। চোয়াল বেয়ে কস নামছে বুঝতে পারল সোনাবউ। থুঃ থুঃ করে আবার ও থুতু ছেটাল।

লোকগুলো সবাই বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হুটপাট করে উপরদিকে লাঠি তুলছে। সোনাবউয়ের মনে হল কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে লাফাচ্ছে ওরা। যেন

কতকাল কিছু খায় নি। হঠাৎ একটা মরা দেখে চোখ তাতিয়ে ছুটে আসছে।

ছুটতে ছুটতে বন পেরিয়ে খাল-পাড়ে এসে পড়ল সোনাবউ। হাত পঁচিশেক চওড়া খাল। মাঝামাঝি, রোজকার মতো জল দেখা যাচ্ছে। ওপারে, উপুড় করে রাখা একটা নৌকা। হয়ত তলী সারাইয়ের কাজের জন্য ওঠানো হয়েছে। ওটার মধ্যে ঢুকে বসলে হয় না। বাপরে, লাঠি খুঁচিয়ে জ্বালিয়ে মারবে। সাঁকোটা কেমন এপার ওপার জোড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে লাগল সোনাবউ। হয়ত এক-পলক দাঁড়িয়েছিল, অমনি আবার রাক্ষসগুলোর কথা মনে পড়ায় তীরের মতো সাঁকোর উপর উঠে এল সোনাবউ। খানিকটা যেন সাহস পেল এখানে। পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, আর একটু হলে লোকগুলো ওকে ধরে ফেলত। সাঁকোর গোড়া অবধি ছুটে এসেছে রাক্ষসগুলি।

কে একজন বাঁশ ধরে এগোবার চেষ্টা করছে দেখে সোনাবউ চেঁচিয়ে উঠল, 'আর এগোবি না বলছি, এই দ্যাখ জলে ফেলে দেব। হিঁ হিঁ......' বাচ্চাটার ঘাড় ধরে জলের উপর তাক করে ধরে রাখল সোনাবউ। 'হিঁ হিঁ......দেই, দেই......!'

যে লোকটা এগিয়ে আসছিল সে এবার শিউরে উঠে পিছিয়ে এল। সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ঝিমিয়ে গেছে। চোখগুলো যেন দপ দপ করে নিবে গেছে। শুনতে পেল কে যেন পিছন থেকে বলছে, 'এই, এই ওভাবে নয়। পিছিয়ে আয়। পিছিয়ে আয়। পিছিয়ে আয়।'

'হিঁ হিঁ, দেই, দেই, ফেলে দেই......' খিল খিল করে হেসে উঠল সোনাবউ। সত্যি সত্যি ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে সোনাবউয়ের। জলের দিকে একবার ও তাকাল। শিরশির করে জল কাঁপছে। বাঁশের সাঁকোর ছায়াটা চাবুকের মতো নড়ছে যেন। 'চাবুক মারবি বুঝি? আয়, আয় না!' ঝুলন্ত অবস্থায় বাচ্চাটা শক্ত ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। খুশীতে চোখের তারা নাচতে লাগল সোনাবউয়ের।

লোকগুলো এখন রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করছে। যেন মন্ত্র ছিটিয়ে গণ্ডী টেনে দিয়েছে সোনাবউ। আয় না আর একটু, কেমন তোদের মজা দেখাচ্ছি। ছেলেটার মধ্যে মানুষগুলোর প্রাণবায়ু ধুক ধুক করে কাঁপছে যেন, লক্ষ্য করল সোনাবউ। টুপ করে ফেলে দিলেই একসঙ্গে দম বন্ধ করে মরে যাবে ওরা। হিঁ হিঁ......

'এই, এই পাগলী—', কে যেন ডাকছে ওকে। 'ইস্ আমি পাগলী', সোনাবউ বকতে শুরু করল, 'পাগলীর পিছনে ছুটেছিস কেন শুনি! আমি পাগলী, কেন তুই পাগলী হতে পারিস না? তোর বাপ পাগল, তোর চোদ্দগুষ্টি পাগল। থুঃ!' থুথু ছেটাল সোনাবউ।

'আহা, বাচ্চাকে একটু তুলে ধর না, মরে যাবে যে।'

'যাবে তো যাবে। আমার কি। আমি পারব না।'

'মা হয়ে তুই এমন কথা বলছিস?' কে যেন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল।

কথাটা ঝট করে ওর কানে লাগল। বাচ্চাটাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে হাত বুলোতে লাগল সোনাবউ। লোকগুলো গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে ওকে।

আহা ষাট ষাট, সোনাবউ বাচ্চাটাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। উথলে উথলে কান্না বেরুচ্ছে। পেটের মধ্যে অনেককালের কান্না যেন জমিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ সব স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে। বুকের উপর চেপে ধরে চাপড়াতে লাগল। 'আহা থাম, থাম, পারি না আর।'

সত্যি সত্যি আর পারছিল না সোনাবউ। হাতে পায়ের সবটুকু শক্তি যেন ক্ষয় করে সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে আছে এখন।

'আহ্ আহ্ থাম। এই নে খা।' মাই গুঁজে ধরল মুখের উপর। মাইয়ের ভারে কান্নাটা চাপা পড়ে আবার পেটের সুড়ঙ্গে ঢুকতে লাগল। 'তা, আর কিইবা করতে পারি।' বিরক্তিতে দূরে হোগলা বনের দিকে তাকাল সোনাবউ। হোগলা পাতা থর থর করে কাঁপছিল। কে যেন একটা ছুটে আসছে না! চিনতে পারল সোনাবউ। নির্ঘাৎ খোকার মা।

'এই, বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দেনা, শাড়ী কিনে দেব, পেট ভরে খেতে দেব।' কে যেন আবার ওকে লক্ষ্য করে অনুনয় বিনয় করছে, বুঝতে পারল সোনাবউ। না-শোনার ভান করে ছেলেটার গায় হাত বুলোতে লাগল সোনাবউ। আহা, বুকে পিঠে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে দাগ দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ যেন বিষ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে গো। আহা, সোনাবউ করুণভাবে তাকিয়ে রইল।

'খেতে পরতে মা চাল সব দেব, ফিরিয়ে দে মা লক্ষ্মীটি।'

'না। দেব না।' রুখে উঠল সোনাবউ। 'দেখছিস না কে আসছে। ঐ দ্যাখ, হিঁ হিঁ......'

ভিড়ের সকলে চমকে পিছন ফিরে তাকাল, দেখল, হোগলাবনের ভিতর দিয়ে খোকার মা আঁচল উড়িয়ে ছুটে আসছে। উত্তেজনায় টলতে লাগল সবাই। এবার কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন মস্ত একটা অঘটন ঘটবে। কি এখন করা উচিত না উচিত কিছুই যেন ঠিক মতো ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। লোকগুলো কেমন নড়ে চড়ে গণ্ডীর বাইরে হাত পা ছুঁড়ছে, দেখতে দেখতে আবার ওর হাসি এল। হিঁ হিঁ......চোয়াল ভিজে কস গড়াচ্ছে বুঝতে পারল সোনাবউ। চোখের কোণে পুঁজের মতো পিঁচুটি জমেছে। পিঁচুটি সরিয়ে সোনাবউ আবার ওদিকে তাকিয়ে দেখল খোকার মাকে, গণ্ডীর বাইরে দেখা যাচ্ছে। চারদিক থেকে খোকার মাকে ছেঁকে ধরেছে লোকগুলি। সাঁকোর দিকে আসতে দেবে না।

'কেন? এই, এই, ছেড়ে দে বলছি।' সোনাবউ ধমকে উঠল।

ছেড়ে দিয়েছে। খোকার মাকে ছেড়ে দিয়েছে, 'হিঁ হিঁ...আয়, আয়...' ডাকতে লাগল সোনাবউ।

'আয় না।' যেন, কেবলমাত্র খোকার মার গা থেকে মন্ত্র তুলে নিয়ে একটু একটু করে ওকে টেনে নিচ্ছে সোনাবউ। 'আয় না বাপু, মাজায় জোর নেই নাকি!'

বাঁশের উপর ভর দিয়ে দিয়ে সাঁকোর উপর উঠে এল খোকার মা। বাবা, বাঁচা গেল। যেন এতক্ষণ বাচ্চাটাকে বাঁচাবার দায়-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও, এখন স্বস্তি পেল। ছেলেটাকে মাই ছাড়িয়ে উঁচু করে তুলে ধরল সোনাবউ। 'নে তো বোঠান, আমার বুকে দুধ নেই। একটুও টানল না। একটু মাই দিয়ে শান্ত কর দেখি।'

বাচ্চাটাকে দু' হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তরতর করে সাঁকো থেকে নেমে এল খোকার মা। গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলো কেমন পুতুল হয়ে দেখছে, সোনাবউ লক্ষ্য করল।

এক এক করে সব কটি লোক হোগলা বনের ভিতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল। হোগলা পাতায় বাতাস খেলছে। সাঁকোর উপর দাঁড়িয়েছিল বলেই অনেক দূরের পাঁজাটা এতক্ষণে ওর নজরে এল। শকুনগুলো গেল আবার নজরে এল। শকুনগুলো গোল হয়ে আছে এখনো।

কেমন একটা অসাড় ভাব সারা দেহে চেপে বসল সোনাবউয়ের। এতক্ষণকার উত্তেজনা হঠাৎ যেন নিভে জল হয়ে যাচ্ছে। হায় হায়, ছেলেটাকে কেন ফিরিয়ে দিলাম। কপাল চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। ছেলেটাকে কেন ফিরিয়ে দিলাম, নখ বসিয়ে নিজের বুকটাই চিরে ফেলতে ইচ্ছে হল। ক্ষোভে দুঃখে জলের দিকে তাকাল সোনাবউ। জলের উপর সাঁকোর ছায়াটা থর থর করে কাঁপছে। চিতার আগুন যেমন ভাবে বাতাস কাঁপায়, তেমনি ধারা কাঁপছে যেন ছায়াটা। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল সোনাবউ। দেখতে দেখতে আবার ও শক্ত হয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। শিউরে উঠে দেখল, জলের মধ্যে বেড়ালটাকে দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন জুলজুলে চোখে তাকিয়ে থেকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। বারকয়েক চোখ ঘষল সোনাবউ। হাতের আঙুল থরথর করে কেঁপে উঠল। ইস্, কী ভুলটাই না করেছি। তখন যদি বেড়ালটাকেই আছড়ে মারতাম। বাঁশের উপর মাথা ঠুকে দাপাতে লাগল সোনাবউ।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

এত ভোরে কেউ জাগেনি। পুরোহিত নেই, সেবাইত নেই—মন্দিরদ্বার বন্ধ। ভাঙা অতিথিশালার ফাটা মেঝেতে কটা কুকুর শুয়ে ঘুমচ্ছে। আশেপাশে কোনো বাড়ির দরজাও খোলেনি। একটি দুটি লোক পথে হাঁটছে। মন্দিরের সামনেই পাকা রাস্তার ধারে ঘনপল্লব একটি কাঁঠাল গাছ—মোটা কান্ডটি ঘিরে একটি ত্রিকোণ-কৃতি বাঁধানো বেদী। ঝোলা নামিয়ে সেই বেদীতে পা মুড়ে বসলাম। অদূরে স্কুল বাড়ির মাঠ। কাঁচা রোদ্দুরে ঘাসের আস্তরণ চিকচিক করছে। রাত্রে ট্রেনে ঘুম হয়নি। মায়ের দরজার দিকে মুখ করে কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ফুরফুরে বাতাসে নেহমনে বড়ো আরাম হলো। জড়িয়ে এল ক্লান্ত চোখ।

পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী নাতি-উচ্চ পর্বত-ধারা। লাল কাঁকর, শুকনো পাথর, ফাটলে ফাটলে বন্য গাছের জটলা। সেই ধারার পারে সানুতে পূর্বমুখ মাতৃমন্দির। দু-পাশে রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো আম কাঁঠাল গাছ কয়েকটি—গ্রীষ্মকালে ঘন ছায়ার আশ্রয়। মন্দিরের পিছনে পর্বত-ধারার এপারে ওপারে নতুন নতুন লাল মাটির রাস্তা। স্বাস্থ্যকর স্থান—বায়ু পরিবর্তনের উপযুক্ত।

শোকোন্মাদ মহাদেবের স্কন্ধলগ্ন সতী-দেহকে নারায়ণ তাঁর চক্র দিয়ে কাটেন। সতীর দেহ একান্নটি কর্তিত অংশে বিভক্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। সেই থেকে একান্নটি সতীপীঠ।

এইখানে সতীর কণ্ঠনালী পড়েছিল। অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা নলেশ্বরী। পাশে আছেন বাবা যোগীশ ভৈরব। তন্ত্র-চূড়া-মণি পীঠ নির্ণয়ে উল্লিখিত আছে ঃ

নলহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা॥
বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ এই নলহাটি।

ঘুমিয়ে পড়িনি, তবে আধা-সজাগ থেকে ঝিমুচ্ছিলাম। লক্ষ্য করিনি, কখন দুটি শিশু সংগে নিয়ে বাউরি স্ত্রীলোকটি অতিথিশালার মেঝে ঝাঁট দিতে শুরু করেছে, কখন মন্দিরদ্বার খুলেছে। হঠাৎ তন্দ্রা টুটল—কানে এল মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি। সুমিষ্ট উদাত্তকণ্ঠে কে যেন আবৃত্তি করছে। চমকে উঠে ভিতরে ঢুকলাম।

অতিথিশালাটি জীর্ণ দোতালা বাড়ি। তারপরই সুউচ্চ মন্দির। মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপ্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মাঝখানে যূপকাষ্ঠ, বাঁ দিকে সামান্য কয়েকটি ফুলের গাছ। বড়ো গাছ প্রাঙ্গণে তিনটি—স্বর্ণ-চাঁপা, কাঞ্চন আর একটি নারিকেল। মন্দিরে উঠতে প্রশস্ত লাল সিঁড়ি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে ত্রিশূলে যোনি। ডান দিকে বিশাল এক বেদী-বাঁধানো আমগাছ।

মন্দিরটি ইঁটের তৈরী। পুরোনো দিনের বালুর আস্তরণ, তার উপর সাদা চুনরঙ। সামনে মোটা মোটা উঁচু থাম। মন্দির-প্রকোষ্ঠের সামনে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা কাঠের দরজা, দরজা জুড়ে লোহার কোলাপ-সিবল গেট। চূড়াটি স্বর্ণবর্ণ।

মন্দিরের পিছন দিকে দক্ষিণ কোণে একটি চাতাল। এটি নাকি সিদ্ধাসন। কোনো সিদ্ধপুরুষের পঞ্চমুণ্ডি আসন একদা

দ্বারকানদী ঃ তারাপীঠ

সতী মন্দির : নলহাটি

ওখানে ছিল। মন্দিরের পিছনেই পাহাড়ের শুরু—নানা বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছের জটলা। সদ্য পিছনেই বিরাট দুটি নিম-গাছ—তাদের উচ্চতা মন্দির-চূড়াকে, প্রায় স্পর্শ করেছে।

এই মন্দিরের মধ্যে আছেন সতী নলেশ্বরী। কোনো বিগ্রহ নেই। দেয়ালে শিলার গোলাকার অংশে সিন্দুর-লেপিত প্রতীক মূর্তি। এই দেবীর আনন। মাঝখানে ওষ্ঠের একটু আভাস। দু-পাশে স্বর্ণনির্মিত দুই চোখ। মুখমণ্ডলের নিম্নে একটি সরু গহ্বর, সেই গহ্বরে জল ঢাললে সে জল অদৃশ্য হয়ে যায়। এই গহ্বর সতীর নলা বা কণ্ঠনালীর প্রতীক। সিন্দুর-লেপিত রক্তমুখমণ্ডল ফিরে রক্তবসনের পাড়।

আবৃত্তির স্বর অনুসরণ করে লাল সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম। মন্দির প্রকোষ্ঠের সামনের সংকীর্ণ বারান্দার এক পাশে একটি কম্বলের আসনে বসে আছে একটি কিশোর। ফরসা একহারা চেহারা, পরনে তসরের জীর্ণ ধুতি, খালি গায়ে সাদা উপবীত। প্রশস্ত কপাল, টানা টানা স্বপ্নালু চোখ, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কোঁকড়া চুলে সদ্যস্নানের আর্দ্রতা। কোলের সামনে লাল-বাঁধাই একটি বই। বইটির দিকে নতদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, মাঝে মাঝে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইছে মার মুখপানে। গম্ভীর সুমিষ্ট কণ্ঠে বলছে :

ওঁ কালীং—
কাঞ্চীরত্ন দুকুলহারললিতাং নীলাং
ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।
আবন্ধা মৃত্তরশ্মি রত্ন মুকুটাং বন্দে
মহেশপ্রিয়াম্॥

একেবারে কাঁচা কিশোর! সবে দাড়ি উঠেছে। কোথা থেকে এসেছে এই মন্দিরে এত ভোরবেলা? নিবিষ্ট চিত্তে আপন মনে মার পদতলে বসে চণ্ডীপাঠ করছে। আ
আনন্দে আত্মহারা!

লাল সিঁড়ির উপরের ধাপে বসলা
চুপটি করে শুনতে লাগলাম চণ্ডীপা
মন্দির মধ্যে পুরোহিত তাঁর নিত্যক্রিয়া শু
করেছেন। মাকে স্নান করিয়ে নূত
রক্তাম্বরে সাজানো হলো। নূতন ক
সিঁদুর পরানো হলো মুখমণ্ডলে
পুরোহিতের একজন সহকারী এসে গোছাতে লাগল নিত্যপূজার আয়োজন। চণ্ডীপাঠ শুনতে শুনতে দেখতে লাগলাম মাতৃমন্দিরের এই সব প্রভাতী কর্তব্য।

নিঃশব্দে এক পাশে বসে আছি। দু-একজন স্থানীয় পূজার্থী আসছে। অর্ঘ্য রেখে যাচ্ছে পুরোহিতের কাছে। কেউ বা চুপটি করে বসছে সিঁড়ির ধাপে। কারও মুখে কথা নেই। স্তব্ধ হয়ে শুনছে চণ্ডীপাঠ।

হে গৌরী, হে নিত্যা, হে সর্বগুণনির্গুণ সর্বশক্তিস্বরূপা, সর্বমঙ্গলদায়িনী ত্রিনয়নী জগন্মাতা, তোমাকে নমস্কার। শ্রেষ্ঠাস্ত্র-ধারিণী, অসুরবিনাশিনী তুমি, বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বপালিনী, বিশ্ববন্দিতা তুমি, তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণরূপিণী দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা, বিদ্যাপ্রজ্ঞামেধারূপিণী তুমি সরস্বতী, তুমি বিশ্বার্তিহারিণী তমিস্রা-রূপিণী মহামায়া, তোমাকে নমস্কার!

বড়ো করুণা করেছেন মা আমায়। আজ শ্রাবণ সংক্রান্তি। শারদ সূচনার প্রভাতে ভক্তি সমন্বিত চিত্তে চণ্ডীমাহাত্ম্য যে শ্রবণ করে, সমস্ত দুঃখকষ্ট তার দূর হয়, শান্তি ও সন্তোষের পরমপ্রসাদ সে লাভ করে।

চণ্ডীপাঠ শেষ করে ছেলেটি ভূমিতে দেহলুণ্ঠিত করে মাতৃপদে প্রণাম করল। তারপর আসনটি গুটিয়ে নিয়ে মন্দির ত্যাগ করল।

পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠাকুর মশাই, ছেলেটি কে?

জানিনে। এই প্রথম দেখলাম।

শুধু এই ছেলেটি বলেই নয়—কোনো নূতন যাত্রী বা ভক্ত নলেশ্বরী মন্দিরে এলে সহজে চোখ এড়িয়ে যায় না। যাত্রী-সংখ্যার বিরলতাই এর কারণ।

বীরভূম পীঠস্থানের জন্য বিখ্যাত। এই জেলায় সতীপীঠই অন্তত চারটি। অট্টহাস, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর ও নলহাটি। এছাড়া কংকালী ও দক্ষিনদীঘিকেও সতী মাহাত্ম্য-মণ্ডিত উপপীঠ বলা হয়। প্রতিটি পীঠ-স্থানই অতি জাগ্রত। অন্যান্য পীঠগুলি ভক্ত সমাগমে সারা বৎসরই পূর্ণ থাকে—মেলা বা উৎসবের সময় তো কথাই নেই। অবজ্ঞাত হয়ে আছেন কেবল সাঁইথিয়া নন্দীপুরের দেবী নন্দিনী আর নলহাটির দেবী নলেশ্বরী। এই নলেশ্বরী মন্দিরে এক দুর্গাপূজার সময় কিছুটা ভিড় হয়, তা ছাড়া নিতান্ত স্থানীয় মেয়েছেলে ছাড়

কদাচিৎ বহিরাগত কোনো যাত্রী এখানে আসে।

মন্দিরটি অবশ্য মোটামুটি সুরক্ষিত, তবে সামনের পাকা দ্বিতল অতিথিশালাটি ভেঙে ভেঙে পড়ছে। দরজাজানলাগুলি নিশ্চিহ্ন, ফুটিফাটা, আবর্জনা ভরা মেঝে সাপখোপের আড্ডা, ফাটলধরা দেয়াল, ছাদ-ভর্তি ঝুলে। ছাদ থেকে ঝুলোনো ঘণ্টাটি ফাটা, যেহেতু মাঝের ঘন্টিটি হারিয়ে গেছে অতএব সে ঘণ্টা বাজাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কুশলানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধু এই মন্দিরে বহুদিন ছিলেন। সে প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যরা গুরু নির্দেশে এই অতিথিশালা নির্মাণ করেন। তারপর এ পর্যন্ত সংস্কারের হাত পড়েছে বলে মনে হয় না।

নিত্যপূজো শেষ হলো। জনশূন্য মন্দিরে সংগী কেবল প্রৌঢ় পুরোহিত দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। কথা বলবার একজন লোক পেয়ে আনন্দ তাঁর ধরে না। চক্রবর্তী মশাই বললেন দেবী নলেশ্বরীর কাহিনী।

মারাঠা বর্গীদের প্রতিরোধকল্পে বাংলার নবাব রাঢ় অঞ্চলে যে সব সৈন্য মোতায়েন করেন তাঁদের অধ্যক্ষ ছিলেন 'শাহ' উপাধি-ধারী এক পশ্চিমদেশীয় হিন্দু সেনাপতি। রাঢ়ের এই অঞ্চল তখন গভীর অরণ্যভূমি, হিংস্র শ্বাপদরা পার্বত্য গুহায় মহানন্দে বাস করে। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই বললেই চলে। বর্গী-প্রতিরোধের জন্যে নিভৃত ঘাঁটি হিসেবে শাহ সেনাপতি এই স্থানটি বেছে নিলেন। স্থায়ী ঘাঁটি পেতে তিনি এখানে বসবাস শুরু করলেন। ইতিহাস-বিস্মৃত এই সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি এক রাত্রে মার আশ্চর্য করুণা বর্ষিত হলো। স্বপ্নাদেশে তিনি এই মহাপীঠে সতীর দেহাবশেষের পরিচয় লাভ করলেন। এই মহা সতীতীর্থে তিনিই আদি মাতৃ-মন্দির নির্মাণ করেন।

পরে স্থলপথে গয়া যাত্রাকালে নাটোরের রানী ভবানী এই স্থানে আসেন ও তাঁর কল্যাণে এই তীর্থ প্রসিদ্ধ হয়। তিনি এই মহাল ক্রয় করেন। মাতৃসেবার জন্যে তিনি সবাইত নিযুক্ত করেন ও সেবাইতদের পুরুষানুক্রমে ভরণপোষণের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করেন। পরে বহু সেবাইত পরিবার দেবীসেবার পরিবর্তে নামমাত্র খাজনায় বিনা দায়ে ও বিনা কর্তব্যে জমি ভোগ করতে থাকেন। তারপর এই মহাল হস্তান্তরিত হয় ও জমিদার হন নসীপুর রাজবংশ। নসীপুরের অনুগ্রহে এতদিন মাতৃসেবার ব্যয়ভার নির্বাহ হচ্ছিল। কিন্তু এখন জমিদারি গেছে। সাহায্যের পরিমাণও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সম্প্রতি মন্দির পরি-চালনার ভার এক স্থানীয় কমিটির হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এই কমিটি সক্রিয় নয়।

মহা দুঃখ নিয়ে চক্রবর্তী মশাই বললেন, মায়ের নামে কয়েক ঘর সেবাইত এখনো

তারা মন্দির
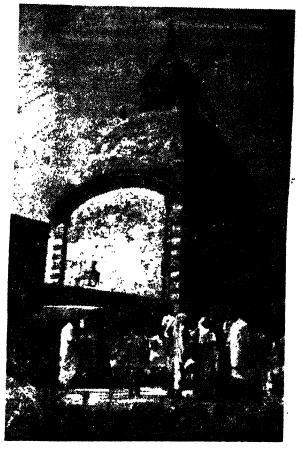
রানী ভবানীর দেওয়া মাটি কামড়ে পড়ে আছে। পালা করে মার দৈনিক পূজোপাট আর নিত্যভোগটুকু সারা হয়। আয়ের সব পথই রুদ্ধ। সাধারণের দয়াভক্তিই এখন সম্বল।

বললাম—দয়াভক্তির বিশেষ প্রাচুর্যের চিহ্ন তো দেখছিনে চক্রবর্তী মশাই!

কোথা থেকে দেখবেন বলুন? চক্রবর্তী সখেদে উত্তর দিলেন—মেলা নেই, উৎসব নেই, প্রচার নেই। পাড়ার মেয়েছেলেরা যা পূজো দিয়ে যায়, তা ছাড়া ক'জন ভক্তই বা বাইরে থেকে আসে? যদিই বা আসে, এক রাত্রি থাকার ব্যবস্থাটুকুও যে নেই! আগে থাকতে মূল্য ধরে দিলে এক বেলার মতো বাড়তি ভোগ রান্না হয়। নইলে অভুক্ত ফিরতে হয় সাধুকেও। নিতান্ত শহর-বাজার তাই, নইল নলেশ্বরী মা আমার আবার জংগলেই আত্মগোপন করতেন!

ভোগের দক্ষিণা ভোরেই দিয়ে দিয়ে-ছিলাম। নিত্যভোগের সংগে আর একজনের মতো ব্যবস্থা হয়েছিল। অতিথিশালার নোংরা মেঝের এক কোণ কিছুটা পরিষ্কার করে প্রসাদ সাজিয়ে দিলেন পুরোহিত। বললেন—আসন কিন্তু নেই, মাটিতেই বসতে হবে।

তাতে কী? মায়ের প্রসাদ মায়ের ঘরের মাটিতে বসে খাব, এ তো পরম ভাগ্য চক্রবর্তী মশাই!

এমন সময় পায়ে পায়ে সেই ছেলেটি আবার ঢুকল। পরনে খদ্দরের একটি খাটো ধুতি আর ফতুয়া। হাতে একটা মুখ খোলা র‍্যাশন-ব্যাগ—বইখাতায় ভর্তি।

পুরোহিত বললেন—এসো এসো বাবা, ভোগপ্রসাদ পাবে নাকি?

লাজুক অথচ কেমন নির্লিপ্ত গলায় প্রশ্ন—জুটবে?

জুটবে না? কী বল বাবা? বোঝাটা নামাও, চট করে ইঁদারায় মুখহাত ধুয়ে এসো।'

মায়ের মৎস্যভোগ হয়। আতপ চালের

ভাত ডাল ও তরকারির সঙ্গে একটু করো মাছের পাতলা ঝোল। ঘৃত ও একটু পরমান্ন। আমার পাশে বসে নিঃশব্দে আহার সারল ছেলেটি। মাকে প্রণাম করে তেমনি নিঃশব্দে বিদায় নিচ্ছিল—আমি ডাকলাম—এখান থেকে কোথায় যাবে ভাই?

স্টেশনে।

দাঁড়াও একটু, আমিও যাব। এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

পথে নেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কলকাতায় যাবে নাকি?

আজ্ঞে না, রামপুরহাটে নামব, সেখান থেকে তারাপীঠ।

এই শচী। শচীপদ চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়ায় বাড়ি—সেখানে বাবা মা থাকেন। রামপুরহাটে আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে কলেজে পড়বার জন্যে। রামপুর-হাট কলেজের খাতায় নাম লেখা আছে। এখন গন্তব্যস্থান তারাপীঠ।

আবার শুধোলাম—তারাপীঠে যাবে কেন?

মা ডেকেছেন যে!

কলেজ কামাই হবে না? পড়ার ক্ষতি হবে না?

গর্বভরা কণ্ঠের উত্তর—মার দয়ায় সব পড়া মুখস্থ হয়ে যাবে। চণ্ডী পড়তে সত্যিই আমার বই দেখতে হয় ভেবেছেন নাকি? যাবেন তারাপীঠে?

যাব শচী, তবে এখন নয়। মায়ের মেলার সময় যাব।

খুব ভাল হবে। আমাকে পাবেন। ঠিক দেখা হবে আমার সঙ্গে। আমি সব আপনাকে দেখিয়ে দেব। মনে থাকবে তো?

নেমে গেল রামপুরহাট স্টেশনে। বই-এর ব্যাগটা বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে চোখের আড়ালে চলে গেল। বড় ভাল লেগেছিল সরল সুন্দরকান্তি তরুণটিকে। আবার আশ্চর্যও লেগেছিল।

এ কেমন মা-পাগল ছেলে!

॥ ২ ॥

আশ্বিনের শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রে আবার চড়লাম সেই বহু-পরিচিত ট্রেনে—শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গয়াগামী রাত্রের সেই ঢিক-ঢিক যাত্রী-গাড়িতে। খাসা গাড়ি—একটি স্টেশনকেও ভোলে না, একটু অন্য-মনস্ক থাকলে বোঝাই যায় না কখন চলেছে আর কখনই বা খাড়া আছে। যাত্রীও এই আছে তো এই নেই। গঙ্গা পেরিয়ে ব্যাণ্ডেল পেঁছতেই বিলকুল ফাঁকা। গায়ের চাদরের কোঁচড়ে জুতো জোড়া পুরে নিয়ে বাড়তি চাদরটা পাগড়ি করে মাথায় বেঁধে নাও—দুর্ভাবনা গেল, আরামও হলো। ফাঁকা বেঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ো, ঘাড়ের নিচে চাদর-মোড়া জুতোর বালিশ। জুতো-চুরির ভয় নেই—এক ঘুমে রাত কাবার।

ঘুম অবশ্য আমার ট্রেনে আসে না। তাছাড়া উৎসাহী সহযাত্রীদের কল্যাণে একটু ঝিমুনির আশাও বোধহয় নেই। ব্যাণ্ডেলে গাড়ি ফাঁকা হতেই বেশ হাত পা ছড়িয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। হাতে হাতে ধূম্র-কেশিনী ভাণ্ডবাহিনী চা। বালিগঞ্জের বাসিন্দা অনিমেষবাবু ও তাঁর স্ত্রী—উভয়েই আমার অন্তরঙ্গ। অনিমেষবাবু অধ্যাপক—সারা দিন বকবক করে দিনান্তে যখন বাড়ি ফেরেন তখন মুখ খোলেন আমার বিদুষী বউঠান। এখন পা ছড়িয়ে বসে মুখ খুলেছেন দুজনে। আদিসপ্তগ্রাম থেকে উঠেছেন ভূপতি ঘোষাল মশাই। পরনে গেরুয়া লুঙ্গির উপর ভুষো ফ্লানেলের পাঞ্জাবি। হাতে তারের ব্যাগের মধ্যে মস্ত এক রাংতার মালা। কামরায় পা দিয়েই সকলকে শুনিয়ে হেঁকেছেন—আমার কাছে চুরি করবার মতো কিছু নেই মশায়! শুধু এই মালাটি—দুধের বোতলের ছিপির রাংতা দিয়ে তৈরী, একটি পয়সাও দাম নয়। এটির দিকে নজর দিয়ে কোনো ফয়দা নেই!

ইনিও রসিক লোক। দুটি স্টেশন পার না হতেই রতনে রতনে চেনাচেনি হয়ে গিয়েছে। আলাপের আর বিরাম নেই।

আলোচনা চলেছে বীরভূম কথাটির উৎপত্তি নিয়ে। অধ্যাপক বলছেন—বীরভূম নামের মূলে আছেন রাজা বীরচন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন। বাংলার মুসলমান সুবেদারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। আমি নিজে চোখে অবশ্য দেখিনি—সিউড়ির ছ-সাত মাইল পশ্চিমে তাঁর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আছে। অদূরে গভীর ভাণ্ডীরবন। সেই বনের মধ্যে বিরাজ করছেন অনাদিলিঙ্গ মহাদেব ভাণ্ডেশ্বর।

কথার পৃষ্ঠে কথা বলার জন্য তৈরী ছিলেন বিদুষী বউঠান। তিনি বললেন—এ তো হলো রাজকীয় নামকরণ। এবার লৌকিক নামকরণ শোনো। বীরভূম ছিল সাঁওতাল-প্রধান অঞ্চল। এখনও সাঁওতাল গিজ গিজ করছে। ধান কাটার সময় বীরভূমের সাঁওতালরা সারা বাংলা জুড়ে খেত-মজুরের কাজ করে। সাঁওতাল ভাষায় 'বীর' মানে জঙ্গল। সাঁওতালরা তাদের ঐ জঙ্গল-রাজ্যের নাম দিয়েছিল বীরভুঁইয়া। সেই বীরভুঁইয়াই এখন হয়েছে বীরভূম।

গলার কম্ফর্টারটা একটু আলগা করে নিয়ে ভূপতি ঘোষাল বললেন—তথ্যকথা তো দুজনে শোনালেন, এখন একটা গল্পকথা শুনুন। এও অবশ্য বহু শত বছর আগেকার গল্প। বিষ্ণুপুরের এক রাজা এলেন বীরভূম অঞ্চলে শিকার করার অভিলাষ নিয়ে। আপনার ঐ সাঁওতালরা ঠিক নামই দিয়েছিল। বীর-ভূমের জঙ্গল কঠিন জঙ্গল—শাল, অর্জুন,

বাবলা, কেন্দ আর মহুয়া গাছের জটলা। মাটিতে রোদ পড়ে না। দিনদুপুরে ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় কত হিংস্র শ্বাপদ। অরণ্যের সেই ভয়ঙ্কর জন্তুদের সংগে মোলাকাত করার ইচ্ছা নিশ্চয়ই রাজার ছিল না। হিংস্রতর বন্য অধিবাসীদের বশ করবার মানসেও তিনি আসেননি। তাহলে সংগে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকত, কাড়া-নাকাড়া বাজত। তাহলে কাঁধে পোষা বাজপাখিটি নিয়ে নদীর ধারে ধারে তিনি ঘুরেন কেন?

বউঠান ফস করে বললেন—মতলবটা তাহলে কী? গুপ্তচরবৃত্তি? সরেজমিন তদন্ত?

পাগল হয়েছেন? নিতান্ত নিরাপদ নিরীহ ইচ্ছা। পাখি শিকার করবেন। তাও নিজে হাতে তীরধনুক দিয়ে নয়—শিক্ষিত শিকারী বাজপাখি দিয়ে। নদী-তীরে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বক। রাজা বকটিকে মারবার জন্যে বাজ-পাখি ছেড়ে দিলেন। মাথার উপর এক পাক ঘুরে বাজপাখি বকের সামনে যেতেই বক ঘুরে দাঁড়াল। পালালো না, ডাক ছাড়ল না, উল্টে লম্বা ঠোঁটের একটি নির্ভুল ঠোকরে বাজপাখিকে কাহিল করে দিল। বাজপাখি দ্বিতীয়বার ছোঁ মারতে গিয়ে দেখে বকের দুই ঠোঁটের সাঁড়াশিতে নিজের মাথাটা আটকে আছে। চিঁ'চিঁ' করছে প্রাণ।

বটে? তাজ্জব ব্যাপার!

তাজ্জবই বটে। দৌড়ে গিয়ে বকের কবল থেকে সাধের বাজপাখিকে মুক্ত করলেন রাজা। পাখি শিকারে ক্ষান্ত দিয়ে বললেন—যে দেশে পাখির এত সাহস, সে দেশের মানুষ না জানি কত বড় বীর! তিনিই এ অঞ্চলের নাম রাখলেন বীরভূমি বা বীরভূম!

নিরেনব্বই মাইল দৌড়বার পর বোলপুর স্টেশনে পেঁছে বীরভূমের মাটিতে দাঁড়াল ট্রেন। তখন মধ্যরাত্রি পার—তৃতীয় প্রহরে তিন সংগীই গভীর নিদ্রামগ্ন। আমারই চোখে ঘুম নেই। ট্রেনের চাকার শব্দে মনের মধ্যে চিন্তার চাকা চলতে থাকে।

সত্যই বীরভূমি এই বীরভূম। সংঘাত না হলে সমন্বয় হয় না। সেই আদিকাল থেকে বীরভূম বহিরাগত সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে বারেবারে যুদ্ধ করেছে। পরাজিত হয়েও আত্মবিসর্জন দেয়নি। সমন্বয়ের মধ্যে আত্মাদরকে জাগ্রত রেখেছে। সেই সংঘাত ও সমন্বয়ই রাঢ় দেশের বিচিত্র সংস্কৃতিরূপ। এখানকার প্রাক-আর্য লোকধর্ম আর গণসংস্কৃতি আর্যসভ্যতার সংগে লড়াই করেছে। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংগ্রামে সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবিকে নিশান করে উড়িয়েছে। মুসলিম শাসনের দিনে ইসলামী সংস্কৃতিকেও মাথা নিচু করে মেনে নেয়নি। আর বৃটিশ যুগে বিদ্রোহের প্রথম বিষাণ বাজিয়েছে এখানকার কৃষি-জীবী—যার নাম সাঁওতাল বিদ্রোহ।

তাই ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানের লোকক্ষেত্রে আর্যব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানের চেয়ে আর্যপূর্ব লোকবিশ্বাসগুলি এখনও এখানে প্রবলতর। তাই এখানকার অধিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা ধর্মঠাকুর। তার পরেই শিব মনসা চণ্ডী ও কালী। বীরা-চারী তান্ত্রিক এখানকার অরণ্যের নিভৃতে নদীতীরের নির্জনে শ্মশানের অন্ধকারে যে কঠোর সাধনা করেছে তার সংগে শেষ পর্যন্ত নিরুপায় রফা করেছে আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। বর্ণহিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাকে অস্বীকার করেছে এখানকার সহজ সাধক। এখানকার পীরের দরগায় মানত করে হিন্দু, ধর্মঠাকুরের পুজো দেয় মুসলমান—আর আউল আর বাউল এক সুরে একতারা বেঁধে নিয়ে বিবাগীজীবনের পথে পাশাপাশি হাঁটে।

নিবে এল রাত্রের জ্যোৎস্না। আমেদপুর পার হতে না হতেই দিগন্তে ঊষার আভাস। মল্লারপুরে পূর্ব আকাশ টুকটুকে লাল।

ভরা শরৎকাল। প্রত্যুষের স্নিগ্ধ পুবালি বাতাস। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে যত-দূরে চাও চক্রবাল-জোড়া সবুজ খেত। প্রভাত-সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে ধানের পুরন্ত শীষে—ধরিত্রীর হরিৎ অঞ্চলে জ্বলজ্বল করে উঠছে সোনালী চুমকির কাজ। হ্যাঁ—হবে না হবে না করেও এবার ধান হবে বটে বীরভূমে।

ভোরবেলাতেই মনটা খুশী হয়ে উঠল। আবার তো পৌষের শেষেই আসব। কাঁধে কম্বল ফেলে হাঁটব লাল মাটির রাস্তায় আর শুকনো মাঠের শুকনো আলে আলে। দিনান্তে কৃষাণের ঘরে ঠাঁই নেব। দেখব গোলাভরা ধান, বুকভরা আনন্দ, মুখভরা হাসি। আশ্রয় পাব প্রসন্ন পরিতৃপ্ত সংসারের আতিথেয়তায়।

আপাতত আমাদের গন্তব্যস্থল বিখ্যাত পীঠস্থান তারাপীঠ—বীরভূম জেলার প্রসিদ্ধ তীর্থ। শুক্লাচতুর্দশীর দিন তারা-পীঠে মহামেলা।

তারাপীঠে পেঁছবার রাস্তা রামপুরহাট

যা মল্লারপুর স্টেশন থেকে। তবে রামপুরহাট থেকে যাওয়াই সুবিধে। রাস্তাটা চওড়া—গ্রামের পর গ্রাম আর মাঠের পর মাঠ পাড়ি দিতে দিতে শর্টকাটের সন্ধানে পথ হারিয়ে যাবার ভয় অবশ্য আছে। তখন দীর্ঘ পথ দীর্ঘতর হয়। তা নইলে মোটামুটি সহজ পথ। শীতকালে এই রাস্তায় গরুর গাড়ি চলে। তখন বিশীর্ণা দ্বারকা নদীর উপর গোযান নির্ঝঞ্ঝাটে এপার ওপার হয়ে যায়। এখন বর্ষাশেষে জোয়ারের সময় নদীতে প্রায় এক কোমর জল। রাস্তাও কোথাও কোথাও কাদায় ডোবা। আড়াই তিন ঘণ্টার পথ—মাইল আট নয় হবে সবসুদ্ধ।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য মল্লারপুর ও রামপুরহাটের মাঝখানে সম্প্রতি একটি 'হল্ট' স্টেশন হয়েছে। স্টেশনটির নাম তারাপীঠ রোড হল্ট হলেও সেখান থেকে তারাপীঠ যাবার কোনো 'রোড'-এর চিহ্ন নেই। তবে আড়াআড়ি তিন সাড়ে তিন মাইল মাঠ ভেঙে গেলে কবিচন্দ্রপুর গ্রাম

ছাড়িয়ে দ্বারকা নদীতে পেঁাছনো যায়—যার ঠিক অপর পারেই তারাপীঠ। শীত গ্রীষ্মে এই মেঠো পথ সুবিধাজনক। তখন শুকনো মাঠ, মাথা-উঁচু শুকনো আল। অন্য সময়ে আলভাঙা জলভরা ধান জমিতে অনভ্যস্ত যাত্রীর মহাবিপদ। আলের মাথা যেমন পিচ্ছল, আলের কিনার তেমনি কর্দমাক্ত গভীর। অনেক জায়গাতেই আল ভেঙে গেছে—এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে জল দৌড়াচ্ছে তীব্র বেগে। সেই সব তীব্র বেগবতী নালার জল হাঁটু ডোবানো। কোথাও গভীর খন্দের মাঝখানে গাছের একটা আঁকাবাঁকা গুঁড়ি ফেলা আছে। দু হাত উঁচুতে সমান্তরাল একটা নড়বড়ে বাখারি। সেই বাখারি ধরে কাদামাখা এবড়োখেবড়ো পিচ্ছল গুঁড়ি পার হতে পদে পদে মৃত্যুভয়।

রেল-যাত্রার সমাপ্তির মুখোমুখি এসে সঙ্গীবিচ্ছেদ হলো। ও‘রা পথ-সংক্ষেপ চান। তাই হল্ট স্টেশনে নামলেন। আমি এগোলাম রামপুরহাট পর্যন্ত। শচীর কথা মনে ছিল। বলেছিল, রামপুরহাট স্টেশনে ওর এক আত্মীয় কাজ করেন। ভাবলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে ছেলেটার খবর নিয়ে যাই। নিরাশ হলাম, ভদ্রলোক এত ভোরে ডিউটিতে নেই। হাঁটতে শুরু করলাম তারাপীঠের পথে।

সাবধান করে দিয়ে অনিমেষ-বউঠান বলেছিলেন—আমাদের সঙ্গে তো নামলেন না—একলা একলা উলটো রাস্তায় হাঁটবেন, দেখবেন কী দুর্ভোগ হয়! মাঝপথে ঠিক হারিয়ে গিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরবেন!

উত্তরে কিছু বলার ছিল না। মুচকি হেসে তাঁর ঐ উদ্বেগটুকুর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু পথ আমি হারাতে যাব কেন? আজ এ পথ তো যাত্রীতে যাত্রীতে ভর্তি। আজ বীরভূমের সব পথ গিয়ে মিশেছে তারাপীঠের মহামেলায়। আজ তারামায়ের চরণে সহস্র সহস্র ভক্তের সম্মিলিত হৃদয়ের পূজো।

তা ছাড়া এই পথ তো আমার অচেনা নয়। প্রথম যৌবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে একলা হাঁটতে শুরু করেছিলাম অচেনা পথে। শীতের শুরু, কৃষাণদের ফসল কাটার দিন। মাঠ আর মরাই জুড়ে কর্মব্যস্ততা। আমারই কোনো কাজ নেই। একলা চলেছি গ্রাম-ছাড়ানো মন-ভোলানো রাঙামাটির পথে। সংসার-পালানো বাঁধন-খসানো বৈরাগ্যের পথে। সেদিন আসন্ন অপরাহ্নে পেঁাছেছিলাম চণ্ডীদাসের নানুর গ্রামে।

তারপর কতবার একলা একলা আমি হেঁটেছি এই পথে। পথে পাওয়া কত সঙ্গী পথেই হারানো। এই পথে পিছনের হাতছানি নেই—আনন্দ প্রান্তে পেঁাছবার নয়, আনন্দ শুধু চলার। এই পথ আমার বড় চেনা। বৈশাখের খর রৌদ্রে প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরে এ পথে আমি হেঁটেছি, পথপাশে হেমন্তের শীর্ণা নদীর ধারে সায়াহ্নে আমি বসেছি, পথের প্রান্তে আকাশের নিচে তৃণ-শয্যায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আমি কাটিয়েছি শীতের অন্ধকার রাত।

এই পথ যেন বাউলের একতারা। সেই একতারার সুর আমি বুঝি শুনেছি, তাই বীরভূমের সব পথই ক্রমে ক্রমে আমার নিত্যচেনা একটি পথ হয়ে গিয়েছে। সে পথ মহাতীর্থের পথ। সে পথ গিয়েছে কংকালী-অট্টহাসের মেলায়, গিয়েছে বক্রেশ্বরের কুণ্ডে আর তারাপীঠের শ্মশানে, গিয়েছে নানুর-কেন্দুলির বাউল-বিপিনে, একচক্রার নিত্যানন্দ-নিকেতনে।

॥ ৩ ॥

তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা।
বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী॥

তারারহস্যম্ গ্রন্থে তারাপীঠের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই পীঠ মহাপীঠ। অতি দুর্গম পথ, তাই বহু যত্নে এখানে আসতে হয়, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এই তীর্থযাত্রায়। এইখানে শিলাময়ী মূর্তিতে বশিষ্ঠ আরাধিতা তারা-দেবী বিরাজমানা।

গ্রাম চণ্ডীপুর, পোস্ট অফিস তারাপুর। বড় রাস্তার ডান দিয়ে বয়ে চলেছে উত্তর-দিকবাহিনী নদী দ্বারকা। শীতকালে এই নদীর জলধারা খুঁজেই পাওয়া যায় না—এখন বড় জোর কোমর-জল। নদীতীরে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ মহাশ্মশান। শ্মশান ছাড়িয়ে বর্তমান তারামন্দির।

পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে সুউচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যস্থিত পাথর-বাঁধানো বিশাল চাতালের মাঝখানে উত্তর-মুখী মন্দির। বাংলার চারচালার রীতিতে মন্দিরটি গঠিত। বড় চারচালার উপর ছোট চালা—তার উপর চূড়া। ইঁটের তৈরী, সাদা রঙ—সামনের দেয়ালে লাল নকশা কাটা পোড়া ইঁটের বাহার। মন্দিরচূড়াটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। মন্দিরের ভিতরে প্রায় সমস্ত ছাদ জুড়ে লাল শালুর চাঁদোয়া। শ্বেতপাথরের বেদী। বেদীর উপরে মায়ের আসন।

তারামন্দিরের ঠিক সামনে প্রশস্ত নাট-মন্দির। নাটমন্দিরের মাঝখানে মাতৃমূর্তির ঠিক মুখোমুখি যূপকাষ্ঠ।

নাটমন্দিরের ঠিক উত্তরদিকে রয়েছেন চন্দ্রচূড় শিব। শিবমন্দিরটির দেয়াল আট-কোণবিশিষ্ট। নাটমন্দির ও চারদিকের প্রাচীর ঘেরা উঁচু প্রাঙ্গণ বহু যাত্রীর আশ্রয়স্থল। পশ্চিম দিকে রাস্তার ঠিক উপরেই বিরাট তোরণ। তোরণের মাথায় যাত্রীনিবাস ও নহবৎখানা। তোরণমুখ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে মাতৃপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উঠেই ডান দিকে মার বিশ্রামমণ্ডপ। এই উচ্চ মণ্ডপে মা যখন বসেন তখন পথের ও নদীতীরের অগণিত ভক্তদের উপর তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়ে।

মন্দিরের উত্তর দিকে কোন প্রাচীর নেই। একটি ছোট গেট। গেট থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়ে পড়েছে চতুষ্কোণ এক দীর্ঘিকায়। স্বচ্ছ জল, এক গাদা লাল ও পদ্মফুল ফুটে আছে। দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে আরও তিনটি বাঁধানো ঘাট। এক প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে এই দীর্ঘিকার নাম জীবৎসকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ড।

মন্দিরের পিছনে চণ্ডীপুর গ্রাম। তারা-মায়ের পাণ্ডারা এই গ্রামে থাকেন। ছাব্বিশ সাতাশ ঘর। আদি পাণ্ডারা চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের দৌহিত্র বংশীয় মুখোপাধ্যায় পাণ্ডা পরিবারও এখন অনেক। মাটির কাঁচা বাড়ি, কয়েকটি দোতলা। নিকোনো দাওয়া, পাশে ধানের মরাই। পাণ্ডারা অতি সরল, সজ্জন ও অতিথিবৎসল। স্বাভাবিক

সৌজন্য ও কর্তব্যবোধে তাঁরা যাত্রীদের সেবা ও সাহায্য করেন। দাবির চাপ দেন না, ভিক্ষার হাতও পাতেন না।

আগামীকাল শারদীয়া লক্ষ্মীপূজা। আজ শুক্লা চতুর্দশী। এইদিন মহামুনি বশিষ্ঠ এখানকার মহাশ্মশানে সিদ্ধ হন। ত্রিনয়নী তারার নয়নতারা তিনি লাভ করেন। ব্রহ্মার নির্দেশে এই তারাপীঠে মহামাতৃকা সাধনা করেন তিনি। যে মহামাতৃকা এই মহাযোগীর সামনে আবির্ভূতা হন তিনি শুধু সৃষ্টিস্থিতির নন, প্রলয়েরও মহাজননী। তিনি শিবানী, কিন্তু প্রলয়দেব মহাদেবেরও তিনি মাতৃরূপা। বশিষ্ঠারাধিতা ধ্যানমূর্তিতে তারা স্তনদাত্রী শিবপালিনী। বশিষ্ঠের ধ্যান তারার প্রস্তরময়ী মূর্তিতে প্রকাশিত। সেই প্রস্তরময়ী ধ্যানমূর্তি মন্দিরবেদীতে উপবিষ্ট। প্রতি দিন সকলে কারণস্নানের পর ভক্তগণ স্নানোদক পান করেন। এই মহোৎসবের দিন অন্ধকার প্রত্যূষে কারণস্নানের পর সেই ধ্যান মূর্তিকে বিশ্রামমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তার উপর লোকপূজিতা মাতৃমূর্তিতে সজ্জিত হয়ে তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের চোখে দেখা দিয়েছেন।

তারা বিগ্রহমূর্তি রৌপ্যময়ী। রৌপ্যমুখ, রৌপ্যদ্রংষ্ট্রা, মাথার কারুকার্যখচিত, রৌপ্যমুকুট। রৌপ্যচতুর্ভুজা, রৌপ্যমুণ্ডমালিনী। জিহ্বাটি স্বর্ণনির্মিত, মুকুটের ললাটকেন্দ্রে স্বর্ণতারা। দক্ষিণ ও বাম উভয় উন্নত হস্তেই অস্ত্র—খড়্গ ও কৃপাণ। সন্নত হস্ত দুটিতে পদ্ম ও বরাভয়। অঙ্গে রক্তাম্বর, গলায় রক্তপদ্মের সুদীর্ঘ মালা। মার শুভ্রমুখে হাসির আলো, পিছনে সারা পিঠে ছড়ানো কৃষ্ণকুঞ্চিত আলুলায়িত ঘন কেশপুঞ্জের অন্ধকার।

শ্মশান থেকে তারাদেবীকে তুলে জীবিতকুণ্ডের দক্ষিণে মন্দির স্থাপন করে প্রথম যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি এ'ড়োল গ্রামের পত্তনিদার ভক্ত রামজীবন। তারপর মাতৃপূজার ভার গ্রহণ করেন বাঘডাঙ্গার জমিদার বংশ। এ অঞ্চল মুসলমান অধিকারে আসার পর স্থানীয় সাপুরের জমিদাররা মায়ের সেবার ভার নেন। নাটোরের রানী ভবানী মুসলমান জমিদার আসাদুল্লা খাঁর সঙ্গে অন্য মৌজা বিনিময় করে তারাপীঠের ভার নেন ও মার নিত্যপূজার স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। নাটোরাধিপতি সাধক রাজা রামকৃষ্ণ তারাপীঠে এসে কিছুদিন সাধনা করেন। তারাদেবীর বর্তমান বিরাট মন্দিরের নির্মাতা মল্লারপুরের জগন্নাথ রায়। বংশধরগণ সহ তাঁর নাম মন্দিরগাত্রে শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ আছে।

সিঁড়ি থেকেই ঠাসাঠাসি ভিড় শুরু। মার বিশ্রামমণ্ডপ ঘিরে তো কথাই নেই। পাঁচিল ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাণ্ডাবাড়ির ছেলেরা ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। বিশ্রামমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে মায়ের দর্শন লাভ করে ভক্তরা যেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান, সেই অনুরোধ জানিয়ে কাতর চিৎকার করছে। সেই চিৎকার ডুবে যাচ্ছে ভক্তদের উৎফুল্ল জয়ধ্বনিতে—জয় তারা, জয় মা জগজ্জননী! সামনে ভিড়, পিছনে ভিড়—মার সামনে এক মিনিটও দাঁড়াবার জো নেই। তারই মধ্যে পুরোহিতের হাতে দিচ্ছেন সিন্দুর ও প্রণামী, পদ্ম ও রক্তজবার মালা। মায়ের শুভ্র ললাট সিঁদুরে সিঁদুরে লাল, গলায় মালার পর মালা। ভক্তের মালায় মালায় মুণ্ডমালা ঢেকে গেছে, ফুলের আস্তরণের নিচে লুকিয়ে রক্তবেনারসী।

মায়ের প্রায় কাছাকাছি পেঁৗছে গেছি। হঠাৎ সামনেই দেখি ভূপতি ঘোষাল মশাই। পায়ে কাদা, গায়ে কাদা, মুখে মাথায় কাদার ছাপ। কাদা ভর্তি কাপড়, গরম পাঞ্জাবির পিঠটা ফাটা। ব্যাকুলভাবে হাত বাড়িয়েছেন মায়ের দিকে। হাতে সেই রাংতার মালাটি। সাদরে মালাটি নিলেন পাণ্ডা-পুরোহিত—পরিয়ে দিলেন মায়ের গলায়।

এই পাণ্ডা ঠাকুর আমার পরিচিত। সেই আশ্চর্য চেহারাটি—একবার দেখলে আর যা ভোলা যায় না। সকলের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা সেই ছ ফুট লম্বা কুচকুচে কালো দেহযষ্টিটি। যষ্টিই বটে—খটখটে হাড় আর টানটান চামড়ার মাঝখানে মাংসের শীর্ণতর প্যাকিংটুকুও নেই। কঠোর একটি কঙ্কালের গায়ে অঙ্গারকৃষ্ণ চর্মের টাইট করে সাপটানো আবরণ। কাঁচাপাকা চুল, খড়্গনাক, চাপা ঠোঁট। আমার দিকে চোখ পড়তেই এক পা এগিয়ে এলেন। চিমটের মতো লম্বা হাতখানা টিপে ধরল আমার ঘাড়—হাসির সঙ্গে কাশির ধমকে নগ্ন বক্ষের পাঁজরগুলো কেঁপে উঠল ক'বার, রক্তচক্ষু ছলছলিয়ে উঠল। কাশি থামতে কাশীনাথ এক গাল হেসে বললেন—কী বাবা, এসে গেছ দেখছি!

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তারামায়ের প্রবীণতম সেবাইত ও পাণ্ডাদের অন্যতম। প্রথম যেবার তারাপীঠে আসি তাঁর নাম শুনে এসেছিলাম বক্রেশ্বরের ভোলানাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। সেই থেকে আমি তাঁর স্নেহের পাত্র। সেদিন তারামার চরণে আমার প্রথম পূজার পুরোহিত হয়েছিলেন এই কাশীপাণ্ডা। মহার্ঘ দক্ষিণা দিয়েছিলাম তাঁকে। তুষ্ট পুরোহিত নির্মাল্যস্বরূপ মার গলা থেকে বড় একটি মালা খুলে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমারই পরে পূজা দিল একটি গ্রাম্য বধূ। তারও পূজো অনুরূপ যত্নে কাশীপাণ্ডা সম্পন্ন করলেন। বাতাসার প্রসাদটুকু আঁচলে বেঁধে মেয়েটি চলে যাচ্ছে, কাশীনাথ হেঁকে বললেন—নির্মাল্য নিলি না মা?

তেমনি মোটা একটি প্রসাদী মালা তিনি বধূটির হাতে দিলেন। সে দক্ষিণা দিয়েছিল দুটি মাত্র পয়সা।

ঘোষাল মশাইয়ের মুখভঙ্গি দেখবার মতো। কাশীনাথের হাত ধরে তিনি বলছেন—মায়ের পায়ে ছোঁয়ালে ধন্য হতাম, একেবারে গলায় পরিয়ে দিলেন বাবা! ও যে ঝুটো রাংতার মালা, আমার ছোট মেয়েটির খেলাঘরে তৈরী!

ঘোষালের কর্দমাক্ত বিভ্রান্ত মূর্তির দিকে একবার তাকালেন কাশীনাথ। বললেন—মায়ের কাছে ভক্তের সব মালারই সমান দাম বাবা। অত বড় যে রুপোর মুণ্ডমালা দেখলেন না—ঐ মালা দিয়েছিলেন রাঙামাতা ঠাকুরানী। কেতাবে তাঁর নাম ছাপা আছে। মার চোখে ঐ মালা আর আপনার রাঙা মেয়ের হাতে তৈরী মালা দুইই সমান।

ভাবাবেগে ঘোষালের মুখে আর কথা সরে না।

কাশীনাথ বললেন—বলুন, জয় তারা!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মনুষ্যদেহের 'স্পেয়ার পার্টস' ডিপো

কাঁকড়ার এক বা একাধিক পা খসে গেলে অত্যন্ত দ্রুত তাদের নতুন পা গজিয়ে ওঠে। ব্যাঙাচির ক্ষেত্রেও তাই, যদিও বড় হয়ে ব্যাঙ হলে সেটা আর ঘটে না।

অনেক পোকামাকড়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখা যায়। অনেক পোকাকে দু আধখানা করে কেটে ফেলার পরও নতুন দেহ পুনর্গঠিত হতে দেখা যায়।

প্রকৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত অদ্ভুত কৌশলও অবলম্বন করে। যেমন, কোন খণ্ডিত অঙ্গ পুনর্জাত হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকা কালেই জীবটি দেহের দু প্রান্তেই মস্তকযুক্ত হয়ে গুড়ি মেরে চলতে পারে, কিম্বা চোখের বদলে শুঁড় গজিয়ে ওঠে।

কিন্তু মানুষের ক্ষতস্থানে নতুন চামড়া গজিয়ে ওঠলেও বা হাড় ভেঙে গেলে তা জোড়া লাগা সম্ভব হলেও কোন অঙ্গ বিচ্যুত হলে নতুন করে তা আর গজায় না।

তবে মানুষের ক্ষেত্রে 'স্পেয়ার পার্টস' বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বেলফাস্টের ক্যুইন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জি এম বুল সম্প্রতি প্রকাশ করেন যে, "অদূর ভবিষ্যতে মনুষ্য অঙ্গের 'স্পেয়ার পার্টস' ব্যবসা সুরু হয়ে যেতে পারে।"

এর উদ্দেশ্য হবে জীবন্ত মানুষের অঙ্গের স্টক রাখা যাতে প্রয়োজন মতো একজনের কোন অঙ্গ অপর কারুর দেহে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

অবশ্য অধ্যাপক বুল এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই জাতের চিকিৎসা কতক পরিমাণ ব্যক্তিগত অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটা বিবেচনা করে তবেই তা কার্যকর করে তোলা যাবে। তবে কোন অশক্ত রোগীর দেহে সুস্থ অঙ্গ জোড়া লাগালে সেটা বিশেষ সুফলপ্রদ হবে না।

হাসপাতালসমূহে অঙ্গের 'স্পেয়ার পার্টস' ডিপো প্রতিষ্ঠিত হলে আহত রোগীরা নতুন অঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে—নতুন দেহ বলতে হয়তো জন কয়েক বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে 'ধার' নেওয়া অঙ্গ।

এই ধরনের শল্য কারসাজিতে বৈজ্ঞানিকরা একদিন হয়তো আস্ত মানুষই, অথবা তার চেয়েও কঠিন, আস্ত স্ত্রীলোকই গড়ে তুলতে পারবে।

সবুজ মসৃণ পাথরে তৈরী অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বালিস। এক ফুট দীর্ঘ এই বালিসের পিঠে খোদাই করে রয়েছে এক টি পদ্ম পাতা আর তার গা বেয়ে রয়েছে একটি পদ্মফুল

স্বরযন্ত্র হাতে নিয়ে শোনা

যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা ইলেকট্রনিক কণ্ঠনালীর উদ্ভাবন করেছেন যার সহায়তায় পক্ষাঘাত বা কণ্ঠের কোন ব্যাধিতে যাদের বাকশক্তি নষ্ট হয়েছে তারা কথা বলতে সক্ষম হবে। এটি দেখতে টর্চের মতো এবং কথা বলার সময় গলার বাইরে ঠেকিয়ে ধরতে হয়।

যন্ত্রটির দ্বারা কিভাবে স্বরোৎপাদন সম্ভব? যাদের স্বর বের হয় না তারাও ঠিক স্বাভাবিক ব্যক্তির মতোই ঠোঁট ও জিভের সাহায্যে কথা কয়, আর ইলেকট্রনিক স্বর স্বরতন্ত্রীর মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে স্বরোৎপাদনের বদলে কণ্ঠে শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়ে দেয়।

দুটি মডেল তৈরী হয়েছে এই যন্ত্রটির। একটি হচ্ছে মেয়েদের উপযোগী উঁচু পর্দায় বাঁধা, আর অপরটি পুরুষদের জন্য নিচু খাদের স্বরোৎপাদনের উপযোগী। আঙুলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থায় পুরুষ বা নারী তার স্বর আট মাত্রার ধ্বনির পর্দায় ঠিক করে নিতে পারে।

কৃত্রিম স্বরোৎপাদন কিন্তু পৃথিবীতে এই প্রথম নয়। ১৮৯৯ সালে নিউ ক্যাসল-অন-টাইনের এক বাকশক্তিহীন ব্যক্তির কণ্ঠে একটি কৃত্রিম কণ্ঠনালী যুক্ত করে দেওয়া হয়—এবং তাতে কাজও হয়।

সংবাদপত্রের এক রিপোর্টার লেখেন: "স্বরযন্ত্রের স্থলে সূক্ষ্ম রীড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার সাহায্যে লোকটি স্পষ্ট একঘেয়ে স্বরে কথা বলতে সক্ষম হচ্ছে।

"লোকটির উঁচু পর্দার ফিসফিসানি পনের গজ দূরে থেকে স্পষ্ট শোনা যায় এবং পরিষ্কার একটানা স্বরে বিশ গজ দূরে থেকে সে কথা বলতে পারে।"

মানুষের স্বরের উৎপত্তি হয় ফুসফুস থেকে স্বরতন্ত্রী দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হতে পারলে। এই স্বরতন্ত্রী হচ্ছে বাকযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত স্থিতিস্থাপক অংশুলে শিরা-গুচ্ছে তৈরী দুটি বন্ধনী। স্বরযন্ত্র বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে স্বরযন্ত্র দীর্ঘতর হতে থাকে। পুরুষের স্বরতন্ত্রী নারীর স্বরতন্ত্রীর চেয়ে দীর্ঘতর। এই কারণেই পুরুষের স্বর নারীর চেয়েও গভীরতর শোনায়।

আমেরিকার কোটিপতি ধনী স্বর্গত টমাস কোলমান ডুপোঁর গলক্ষত রোগের জন্য স্বরতন্ত্রী ও স্বরযন্ত্র অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়ার ফলে তিনি কৃত্রিম স্বর ব্যবহার করতেন।

তাঁর সেই যান্ত্রিক স্বরযন্ত্রটি দেখতে ছিল অর্ধচন্দ্রাকার একটা পাত্রযুক্ত ধূমপান করার পাইপের মতো। ঐ পাত্রটির মধ্যে থাকতো স্পন্দিত হবার উপযোগী রবারের ঝিল্লি যা মানুষের স্বরতন্ত্রীর কাজ করতো। ডুপোঁ ওটি সব সময়েই তাঁর পকেটে রাখতেন এবং ব্যবহার করতেন কেবল কথা বলার সময়—জিভ, ঠোঁট এবং তালুর সাহায্যে কথা তৈরি করতেন আর বাকি কাজ সম্পন্ন করতো তাঁর ঐ যন্ত্রটি।
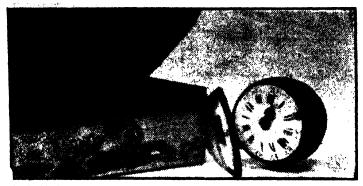
দক্ষিণ-পশ্চিম ফিনল্যাণ্ডে ডুবুরিরা জলের ১৩১ ফিট নীচে সপ্তদশ শতাব্দীর এক ওলন্দাজ জাহাজ চমৎকারভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় পায়। অফিসারদের কেবিনগুলি থেকে উপরের চিত্রে প্রদর্শিত জিনিসের মতো বহু সামগ্রী উদ্ধার করা হয় এবং সেগুলি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছে যে কেবিনে প্রাপ্ত সুরার গন্ধ চমৎকার রয়েছে এবং পানের উপযোগী।

পশ্চিম জার্মানীতে কণ্ঠনালীর ক্যানসারের চিকিৎসা আজকাল এত উন্নত হয়েছে যে ওখানে এখন শতকরা পঁয়ষট্টিজন রুগীই আরোগ্য লাভ করে। আরোগ্য লাভ অর্থে, চিকিৎসার পর অন্তত পাঁচ বছর তারা বেঁচে থাকবেই। এক্স-রে রেডিয়াম-বিকীরণের ব্যবহার ছাড়াও এই সব চিকিৎসায় অনেক সময় কণ্ঠতন্ত্রীর উপর অস্ত্রোপচার করতে হয়, এমন কি, সম্পূর্ণ বাক্‌যন্ত্রটিই কেটে বাদ দিতে হয়।

হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, যারা এই রোগে আক্রান্ত তারা বেশীর ভাগই বয়স্ক লোক। কি করে এই রোগটি তাড়াতাড়ি ধরা যায় তার জন্যে বহু প্রচেষ্টা চলেছে, কেন না যত শীঘ্র রোগ নির্ণয় হবে রুগীর নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশী। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি বিশেষজ্ঞ অধিবেশনে পশ্চিম জার্মানীর একজন কণ্ঠ-বিশেষজ্ঞ, মেঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লীচের, এই সম্পর্কে বলেছেন যে, এমন কি কয়েক সপ্তাহ পরে যদি কোন রোগ সামান্য গলা-ক্ষত বলে মনে হয় তাহলেও সেটাকে বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ। অধ্যাপক লীচের একরকম নতুন ধরনের লারিংগোস্কোপ অর্থাৎ কণ্ঠ পরীক্ষার দর্পণ-যন্ত্র বের করেছেন যেটা এমন কি সাধারণ চিকিৎসকেরা পর্যন্ত অতি সহজে ব্যবহার করতে পারবে এবং গলদেশের কোথাও ফোঁড়া হচ্ছে কিনা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে কণ্ঠনলীর ক্যানসার এবার থেকে খুব তাড়াতাড়ি ধরা যাবে।

কণ্ঠনালীর ক্যানসার-অস্ত্রোপচারের সব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বাক্‌যন্ত্রটিকে কেটে বাদ দেওয়া না হলেও এ সম্বন্ধে সবারই দারুণ ভয়। বাক্‌শক্তি হারিয়ে জটিল কারিগরী সাহায্যের মাধ্যমে ভাঙা ভাঙা আওয়াজ নিয়ে বেঁচে থাকা বড়ই বিড়ম্বনা। সেদিক থেকেও অধ্যাপক লীচের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। তিনি একরকম বৈদ্যুতিক কণ্ঠের পরিকল্পনা করেছেন যেটা দিয়ে কথা বললে খুব স্পষ্ট শোনাবে এবং ওটির ব্যবহারকারীরও কোন কষ্ট হবে না। গবেষক লীচের আশা করেন যে তাঁর এই বৈদ্যুতিক কণ্ঠ বর্তমান বছরেই মানব সেবায় ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হতে পারবে।

শহরবাসীদের জন্য গ্রাম্য-জীবন

বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ভারত সরকার শহরেও ছোট-খাটো সব্জীবাগান তৈরী করার জন্য শহরবাসীদের উৎসাহ দেন। কিন্তু ভারতের কজন শহরবাসী এই রকম বাগান তৈরী করতে উৎসাহ দেখান? তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্যই হবে। এ বিষয়ে জার্মানীর শহরবাসী অত্যন্ত সচেতন। ওদেশের ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতেও অনেকে বাগান করাটাকে একটা সখে পরিণত করেছে।

জার্মানীর প্রায় সব শহরের মধ্যভাগে ও চতুর্দিকে শত সহস্র এই ধরনের বাগান দেখতে পাওয়া যায় এবং বাগানের মালিকেরা তার গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ অপরাহ্ণ ও হেমন্তের স্বল্পস্থায়ী শনিবারের অপরাহ্ণে বাগানেই দিন কাটান। জার্মানীতে নামমাত্র ভাড়ায় অথবা নিজের কেনা আধ একরের বাগানকে 'শ্রেবার বাগান' বলা হয়। কি করে ঐ নাম হলো সেটা হয়তো অনেকেই বলতে পারবে না। কিন্তু যারা তা জানে তারা সম্প্রতি শহরের বাগানের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ড্যানিয়েল গটলিয়েব মরিটস শ্রেবারের শতবার্ষিক তিরোধান অনুষ্ঠানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ড্যানিয়েল শ্রেবার ছিলেন চিকিৎসক। তিনি লাইপজিগের একটি চিকিৎসাগারের পরিচালক ছিলেন, কিন্তু সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির দিকেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিলো। এই সম্পর্কে তিনি যে সব প্রবন্ধাদি লিখতেন তাতে তিনি ক্রমবর্ধমান শিল্পমুখীন শহরগুলিতে শ্রমিকদের জন্য ছোট ছোট জায়গা আলাদা করে রাখার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলতেন যে এই রকম ছোট ছোট জায়গা শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিতে সাহায্য করবে।

শ্রেবার অবশ্য জীবিতাবস্থায় একটিও

'শ্রেবার বাগান' দেখে যেতে পারেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর লাইপজীগে প্রথম 'ক্ষুদ্র উদ্যান সমিতি' গঠিত হয়; এবং শ্রেবারের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়।

জার্মানীতে শ্রেবার উদ্যান আন্দোলনের প্রথম দিকে বাগান করতে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে আলুবীজ বিতরণ করা হতো। যখন দেখা গেল যে ৮০০০ বর্গফিট আকারের একটি জমিতে চারজনের পরিবারের উপযোগী যথেষ্ট সব্জী উৎপাদন করা যায় তখন থেকেই এই বাগান খুব জনপ্রিয় হয়। বর্তমানে সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর ৫০০০ ছোট বাগানের ৫ লক্ষেরও বেশী সদস্য সমিতিবদ্ধ হয়েছেন।

মঙ্গলগ্রহে পৌঁছানো সম্পর্কে

পশ্চিম জার্মানীর ব্রেমেন শহরে রকেট অনুসন্ধান সমিতির যে দশম অধিবেশনটি সম্প্রতি হয়ে গেল, সেখানে মহাকাশ-বিচরণের সর্বাধুনিক কারিগরী উন্নতি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ পড়া হয়। হামবুর্গের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, মিঃ হ্যান্স-কাইজার বলেন, এখন পর্যন্ত রকেট-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যতদূর অগ্রগতি হয়েছে তাতে উপস্থিত মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ এবং চাঁদ ছাড়িয়ে মহাকাশের পথে আর বেশীদূর এগোন যাবে না।

মিঃ কাইজার বলেন,—মানুষ এখন চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহে যদিও যায় সে সমস্তই কেবল ঐ বড় বড় মহাকাশচারীদের মহান্ কীর্তি ও ক্ষণিক স্থিতির মধ্যেই সীমিত থাকবে; ওখানে কায়েমী বসবাস মানুষের পক্ষে এখন সম্ভব হবে না। মহাকাশচারী পারমাণবিক জাহাজের বর্তমান উন্নতির হার অনুযায়ী আশা করা যায় এক বছরের মধ্যেই মানুষ চাঁদে গিয়ে ফিরে আসতে পারবে। এই জাহাজের আফ্‌টাতকুলার বিহীন রীঅ্যাক্টরটি হবে ঘূর্ণি জাতীয় এবং গ্যাস জাতীয় শক্তিদ্বারা চালিত।

মহাকাশ পথে মানুষের পরিবর্তে একটি চিন্তাশীল যন্ত্র পাঠান যে কি পরিমাণ জটিল ব্যাপার হতে পারে উপরোক্ত অধিবেশনটিতে সেকথা ভাল করে বুঝিয়ে দেন পশ্চিম জার্মানীর জীববিদ্যাবিৎ ডঃ লোৎস্। তিনি বলেন,—পৃথিবীর বৃহত্তম ইলেকট্রন-মজগটিকে শুধু হ্যালো বলাবার জন্য তাকে দশ লক্ষ টুকরো টুকরো সংবাদের আধার করে তৈরী করা হয়েছে; সে জায়গায় মানুষের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের প্রায় ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক টুকরো টুকরো সংবাদ সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতা আছে। সুতরাং বর্তমান কারিগরী-বিদ্যার পর্যায়ে মানব-মস্তিষ্কের অনুরূপ শক্তিযুক্ত একটি চিন্তাশীল যন্ত্র তৈরী করলে তার আয়তন হবে আমাদের পৃথিবীর মত।

আর একজন বক্তা মিউনিক কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পেৎজোল্ড, মানুষের জীবন, জল-বায়ু ও আবহাওয়া, উচ্চস্তরের তাপমাত্রা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির উপর মহা-জাগতিক বিকিরণ ও ক্রমপ্রক্ষিপ্ত পরিবর্তনশীল সৌরবিন্দুর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আমেরিকার একজন মহাকাশবিৎ ডঃ ডইনজেন্ বলেন,—আজকের দিনেও আদি প্লাস্টিক-বেলুনের কার্যকারিতা সমানই রয়েছে, আমেরিকাতে দু কোটি আঠারো লক্ষ কিউবিক ফিট মাপের এমন একটি বেলুন তৈরী হচ্ছে যেটি একটি দুটনের মহাকাশরথকে নিয়ে ত্রিশ ঘণ্টা মহাকাশে ঘুরে বেড়াবে।

হরমোন প্রয়োগে আপেলের আকার বৃদ্ধি

পশ্চিম-জার্মানীর শ্লেষউইগহলস্টীনে এলবে নদীর ধারে ৩৭০০ একর ফলের জমি রয়েছে। আবার ওদিকে হামবুর্গ থেকে উত্তর সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত ফলের বাগান ছুটির দিনে দর্শকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এলবে নদীর ধারের জলা-ভূমিগুলি ফলচাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত, তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ওখানে রোদ্দুর অত্যন্ত কম।

এলবে নদীর ধারের ফলচাষীদের আরও একটি ভাবনা রয়েছে—সেটি হচ্ছে ফলের আকার। উপযুক্ত রোদ না পেলে ফল যথেষ্ট বড় হয় না—অথচ আপেল অথবা নাসপাতি বড় না হলে ক্রেতাদের মন ভরে না। সুতরাং এ-সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাহায্য চাই। বহু বছরের পরীক্ষার ফলে হরমোনযুক্ত একটি পদার্থ তৈরী করা হয়েছে যেটি গাছে ছিটিয়ে দিলে গাছটিতে অযথা বেশী ফলধরা বন্ধ হয়ে গিয়ে যে-সমস্ত ফলগুলি ধরে সে-গুলি আকারেও বড়, খেতেও মিষ্টি এবং দেখতেও বেশ সুন্দর হয়।

শ্লেষউইগহলস্টীনের ফলের বাগান-গুলিতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ফল বড় করান হয়, কেননা ওখানকার জলহাওয়া ফলচাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়। এদিক থেকে বিজ্ঞান আরও এগিয়ে গেছে। উক্ত হরমোনের দ্বারা ফল, ফুল, গাছগাছড়া ইত্যাদি ইচ্ছেমত তৈরী করা যায়। এখন নতুন পদ্ধতিতে বীজোৎপাদন হচ্ছে। অক্সিন পদার্থের দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী লতাগুল্মের আকার বাড়ান কমান হচ্ছে—গাছের উপর এই জিনিসটি ছড়িয়ে দিলে তার পাতা ও ফল এমনভাবে পড়বে মনে হবে ব্যাপারটি যেন কারুর আদেশ অনুযায়ী হচ্ছে। অক্সিন যদিও ৩০ বছরেরও আগে আবিস্কৃত হয়েছিল, গাছগাছড়া নিয়ন্ত্রণে এখন যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার হচ্ছে সেগুলি হলো ওরই মত সমগুণসম্পন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ। আবার এই সমস্ত পদার্থের অনেকগুলিতেই কয়েক রকম অক্সিজেনের ভাগ রয়েছে। ইচ্ছা অনুযায়ী ফল পেতে হলে সামান্য মাত্র হরমোনেই কাজ হয়ে যায়। গাছ-গাছড়ার জন্য যে সব রাসায়নিক জিনিস ব্যবহার করা হয় তাদের বেশীর ভাগই এসেটিক অ্যাসোউর মিশ্রনে তৈরী এবং ওগুলো খুব অল্প পরিমাণেই ব্যবহার করতে হয়। এমনও হয় যে, ৫০,০০০ গ্যালন জলে হয়তো মাত্র এক গ্রেন মেশাতে হয়েছে।

[১৬]

ষষ্ঠীর দিন ভোর হতে না হতেই ঢাকের আওয়াজে সারা গাঁ মেতে ওঠে। ঢাকে কাঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় সকলের।

সিরসিরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে তখন। অন্য সকলের মত লক্ষ্মীমণিও বিছানা ছেড়ে উঠে গোবর জলের ছিটে দেয় উঠোনে। ক'দিন আগেই পাশের গাঁ থেকে রাঙা মাটি আনিয়ে রেখেছে সে। টিনের 'কেটো' থেকে রাঙা মাটির ডেলা বের করে জলে গুলে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে দেয়ালে আলপনা আঁকে।

পুজোর এ ক'টা দিন অন্তত উদাসের সঙ্গে ঝগড়া করবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে লক্ষ্মীমণি। আর প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা তার খুশী হয়ে ওঠে।

উঠোনে গোবর লেপে আলপনা এঁকে বেরিয়ে পড়ে সে ঘাটের পথে। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে দাঁড়ায় ভিজে কাপড়ে। তারপর ঘিয়ের বাটি থেকে সামান্য কয়েক ফোঁটা ঘি নিয়ে সিঁদুর গুলে ঘরের দরজায় পাঁচটা ফোঁটা দেয়।

ষষ্ঠীর দিনে কপাটে সিঁদুরের ফোঁটা দিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে লক্ষ্মীমণি। সব রকম চেষ্টাই তো করেছে উদাসের মঙ্গলের জন্যে। স্বামীর মন পাবার জন্যে কি করতে বাকী রেখেছে সে! তবু কেন যে উদাসের মন পায়নি লক্ষ্মীমণি, নিজেও সে খুঁজে পায় না। উদাসের বাপও তাকে ডাইনী বলে, পাড়ার লোকও তাকে দোষ দেয়। আর সেই দুঃখে ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরে লক্ষ্মীমণি। ভাবে, ভগবান তাকে রূপ দেয়নি বলেই উদাস তাকে সহ্য করতে পারে না।

প্রথম প্রথম সন্দেহ হয়নি তার। বরং তার বাপ দশরথ যেদিন কাটোয়ার বস্তির ঘরে উদাসকে নিয়ে এসেছিল সেদিন উদাসকে ঘিরে কত স্বপনই না সে দেখেছিল। তারপর বিয়ে হলো, নতুন সংসার পাতার উল্লাসে সব কিছু দেখেও দেখেনি সেদিন। নাকি উদাস তখন সত্যিই ভালবাসতো তাকে, পদ্ম আসার পর থেকেই তাদের মধ্যে এই ভাঙন দেখা দিয়েছে!

না। লক্ষ্মীমণি বেশ বুঝতে পারে, তাকে কোনদিনই ভালবাসেনি উদাস। কোনদিনই তাকে পছন্দ করেনি। শুধু নিজের কাজ হাঁসিল করার লোভেই তাকে বিয়ে করেছে উদাস, ড্রাইভারি শিখে লাইসেন্স যোগাড় করার নেশাতেই বুঝি লক্ষ্মীমণিকে সহ্য করেছে।

কপাটের গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিতে দিতে মনে মনে তবু প্রার্থনা জানায় লক্ষ্মীমণি। বলে, ঘরের দিকে স্বামীর মন ফিরিয়ে দাও মা, সংসারের মঙ্গল হয় যেন।

ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসে ফেলে লক্ষ্মীমণি। মনে হয়, আসলে দোষ তারই। উদাসের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ব্যবহারে সে যদি এমন তিরিক্ষি হয়ে না উঠতো! কিন্তু কেন যে এমন হয়, বুঝতে পারে না। মনে মনে তাই প্রতিজ্ঞা করে, পুজোর এ ক'টা দিন অন্তত ভালভাবে কাটাবে। না স্বামী, না শ্বশুর, কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না।

ভিজে কাপড়টা ছেড়ে লক্ষ্মীমণির হঠাৎ ইচ্ছে হলো, ঘুমন্ত উদাসকে তুলে দিয়ে আজ পুজোর দিনে একটা গড় করবে।

উদাস হাসবে হয়তো, ঠাট্টা করবে। তা করুক, তবু—

কাপড় ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে লক্ষ্মীমণি। কিন্তু চৌকাঠে পা দিয়েই বিস্মিত হয়। বিছানায় কেউ নেই।

এদিক ওদিক তাকায় লক্ষ্মীমণি। না, কোথাও নেই উদাস। ও যখন পুকুরে ডুব দিতে গেছে, সেই ফাঁকে কখন চুপি চুপি বেরিয়ে গেছে সে!

হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মনটা বদলে গেল তার উদাসের

বিরুদ্ধে, রাগে অভিমানে সমস্ত মন তার বিষিয়ে উঠলো।

মিউ মিউ করতে করতে একটা বেড়াল ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, বেড়ার গা থেকে একটা চেলা কাঠ তুলে নিয়ে সজোরে সেটা ছ‍ুঁড়ে মারলো সে বেড়ালটার দিকে।

যেন উদ্দাসের দিকেই ছ‍ুঁড়ে মারলে খুশী হতো।

ঢাকের আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল উদাসের। বিছনা ছেড়ে উঠে দেখলে, কাছ-পিঠে কোথাও লক্ষ্মীমণি নেই। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলে তা দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা নিয়ে দামু পালের বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়লো। ভোরের নিস্তব্ধ বাতাসে তখন একটানা ঢাক বেজে চলেছে। বাগ্দীপাড়ার একটা ছেলেকে দেখলে নাচতে নাচতে চলেছে কালীতলার রাস্তায়। ছেলেটা নাচছে আর চিৎকার করে বলছে, ঢাক কুড়কুড় কুড়, ঢাক কুড়কুড় কুড়।

দেখে হাসলো উদাস। মনটা খুশী হয়ে উঠলো অকারণে।

তাই দামু পালের বাড়িতে ঢুকেই ফিরুকে কাঁধে তুলে নিলো, তারপর নাচতে নাচতে সুর টেনে টেনে বললে, ডাং ডাং ড্যাডাং ড্যাডাং...

হাত-পা নেড়ে এমন ভাব করলে যেন উদাস নিজেও ঢাক বাজাচ্ছে। আর তা দেখে পালবউ হেসে গড়িয়ে পড়লো।

উদাস নাচ থামিয়ে বললে, চা দাও গো বউঠান, ঘুম থেকে উঠেই পালিয়ে এয়েচি।

দামু বললে, বোস বোস, চা দিচ্ছি। তারপর চল্ আজ বাঁশ দড়ি নিয়ে আসর বেঁধে ফেলি।

আসর, অর্থাৎ যাত্রার আসর। যাত্রার কথায় উদাসের মনটা মুহূর্তের মধ্যে মুষড়ে পড়লো।

এবার পুজোয় সত্যিই যেন কোন আনন্দ নেই তার, যাত্রায় কোন উৎসাহ নেই।

অথচ এবার সময় থাকলে থিয়েটারও করা যেত, দামুদাদা বলেছে। তা থিয়েটার না হোক, চারদিন যাত্রাও আনা যেত অপেরা পার্টির। কিন্তু সব ক'টা ভাল অপেরা পার্টিরই বায়না হয়ে আছে অনেক আগে থেকে। তবে দামী ড্রেস আনা হয়েছে এবার, ভালো বেশকারী এসেছে। টাকা দিয়েছেন অবনীমোহন।

শুনে সবাই বিস্মিত হয়েছে। অমন কৃপণ মানুষটা হঠাৎ যেন রাতারাতি বদলে গেছে। ইস্কুলের জন্যে টাকা দিয়েছে, বলগাঁর বড় রাস্তার ধারে হাসপাতালের বাড়ি করে দেবে বলেছে, দরাজ হাতে টাকা দিয়েছে গ্রামের বারোয়ারী পুজোয়।

মনে মনে সবাই খুশী হয়। প্রশংসা করে অবনীমোহনের। শুধু গোপেন মোড়ল হেসে বলে, কি ব্যাপার গো দামু, যাত্রার জন্যেও টাকা দিচ্ছেন বেনে চাটুজ্যে?

আড়ালে আড়ালে এতদিন সকলেই অবনীমোহনকে বেনে চাটুজ্যে বলে বিদ্রূপ করতো। কিন্তু এখন আর সে বিদ্রূপ যেন দামু পালের ভালো লাগলো না। বললে, না গো, মানুষ ভালো উনি, ত না হলে...

গোপেন হেসে বলে, ওর বাবা জিলিপির প্যাঁচ পেটে পেটে, এমনি দিচ্ছে? ও আমি নারায়ণ সাক্ষী করে বললেও বিশ্বেস করবো না।

কথাটা উদাসের কানে গেল। নারকেল-দড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধতে বাঁধতে গোপেন মোড়লের দিকে ফিরে তাকালো উদাস। গোপেন মোড়লকে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। লোকটা যেন কারো ভাল দেখতে পায় না।

বিরক্ত হয়ে হাতের কাজ ফেলে প্রতিমার দিকে এগিয়ে গেল। ষষ্ঠীকল্প হচ্ছে, পুকুর থেকে ঘট এনে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের বউরা। ঘণ্টা বাজছে পুরুতের হাতে, আর ঘণ্টা থামলেই ঢাকের আওয়াজ উঠছে।

নতুন নতুন রঙবেরঙের জামাকাপড় নতুন জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলে-মেয়ের দল, বউঝিদের পরনেও নতুন কাপড়। আর তাদের পিছনে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাগ্দী-বাউড়ি-কোটালদের মেয়েরা। তাদের সবাই লাল পাড় নতুন কোড়া শাড়ি পরেছে। বাউড়ি-বাগ্দীদের ছেলেমেয়ে-গায়েও নতুন জামা।

তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লক্ষ্মীমণির দিকে চোখ পড়ে উদাসের। ভিড়ের মধ্যে সেও দাঁড়িয়ে আছে তন্ময় হয়ে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর টেনেছে। কিন্তু...

হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা আঘাত লাগে উদাসের, লক্ষ্মীমণির কাপড়খানার দিকে

তাকিয়ে। নোংরা পুরোনো একখানা কাপড় পরে আছে লক্ষ্মীমণি।

উদাসের হঠাৎ নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো। ছি ছি, লক্ষ্মীমণিকে একখানা শাড়িও দিতে পারেনি উদাস! না কি দিতে ইচ্ছে হয়নি। পুজোর দিনে সকলেই বাবুদের বাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় পার্বণী পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীমণি?

লক্ষ্মীমণি বলে, চাষী কোটালের বউ নই আমি যে, পাটকরুনীর কাজ করবো বাড়ি বাড়ি।

মিস্ত্রীর মেয়ে সে, তাই অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে সম্মানে বাধে তার। তাই পার্বণীও পায়নি।

কিন্তু উদাস নিজে কি একখানা কাপড় দিতে পারতো না পুজোর সময়?

উদাস বাঁশের খুঁটিতে ঠেসিয়ে রাখা সাইকেলটা নিয়ে দামু পালের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, পাঁচ টাকা ধার দেবে দামুদাদা?

—পাঁচ টাকা? কেন রে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে দামু।

উদাস ধীরে ধীরে বলে, দেবে কিনা বলো।

উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দামু, তারপর পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেয়। যাত্রাদলের খরচ-খরচার হিসেবের টাকা। তবে টাকা না পেলে হয়তো শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসবে উদাস।

টাকাটা পেয়েই কিন্তু হাসি ফোটে তার মুখে। সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বনগাঁর স্টেশনের দিকে। স্টেশনের ধারের পোশাক-আশাকের দোকানের উদ্দেশে। বলে যায়, বসো, এই এলাম বলে।

দুপুরের আগেই ফিরে আসে একখানা ডুরে শাড়ি নিয়ে। ডুরে রঙিন শাড়িখানা অনেক খুঁজে পেতে পছন্দ করে এনেছে।

বাড়ি ফিরেই সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেসিয়ে রেখে চিৎকার করে ডাকে উদাস, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

এ ডাক যেন বহুদিন শোনেনি লক্ষ্মীমণি। সেই কবে বিয়ের আগে এ নামে ডাকতো উদাস, এ নাম ভুলেই গিয়েছিল। ডাকটা তাই অনভ্যস্ত লাগলো দুজনের কানেই।

তবু ফুর্তির গলায় উদাস চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকলো।—লক্ষ্মী, শুনে যা, দ্যাখ, কি এনেচি, দেখে যা।

বিস্ময়ে কৌতূহলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো লক্ষ্মীমণি। অবোধ্য দৃষ্টিতে উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

উদাস বললে, এই দ্যাখ! বলে শাড়িখানা লক্ষ্মীমণির হাতে দিলো।

বোকা বোকা চোখ মেলে লক্ষ্মীমণি একবার উদাসের মুখের দিকে তাকালে, একবার শাড়িখানার দিকে। যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। যেন স্বপ্ন দেখছে সে জেগে জেগে।

তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, আমার নেগে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর নেগেই আনলাম।

—আমার নেগে? আবার প্রশ্ন করলে লক্ষ্মীমণি! আর সংগে সংগে তার দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো শাড়িটার ওপর।

* * *

বিমলা আর কমলা কখনো যাত্রা দেখেনি। তাই তাদের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশী। সন্ধ্যে থেকেই মাঝে মাঝে এসে যাত্রার

আসরটা ঘুরে ঘুরে দেখে যায় দু'জনে। খানকয়েক পুরোনো ভাঙা করোগেটের টিন আর ধানের বস্তার চট দিয়ে ঢেকে সাজঘর তৈরী হয়েছে আসরের সামনেই। দু'পাশে বাঁশ বেঁধে আসরে যাতায়াতের পথ তৈরী হয়েছে। ওপাশে মেয়েদের বসার জায়গা, এপাশে পুরুষদের।

যাত্রার কথা অনেক শুনেছে বিমলা, তবু চোখে দেখার সুযোগ হয়নি এর আগে। তাই যা দেখে তাতেই কৌতুক বোধ করে দু'জনেই, হেসে ওঠে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহলও কম নেই।

সাজঘরে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলতেই একবার এসে উঁকি দিয়ে গেল বিমলা।

দেখলে, বেশকারী এক সারি বাটি সাজিয়ে রঙ গুলছে। লাল, কালো, গোলাপী...

দেয়ালে ঝকমকে পোশাক টাঙানো হয়েছে। কোনটা রাজার, কোনটা মন্ত্রীর, নিয়তি আর সৈনিক—আরো কত কি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে চট তুলে উঁকি দিয়ে দেখলে বিমলা। দেখলো বেশকারীর সামনে চুপ করে বসে আছে উদাস, আর তার গালে লাল রঙ ঘষছে লোকটা, চোখে কাজল টেনে দিচ্ছে। অন্যান্য অনেকেও সাজপোশাক নিয়ে ব্যস্ত। ধীরেন সাই দাড়িগোঁফ কামিয়ে রানী সাজছে। তাকে দেখে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে এলো বিমলা।

ওখান থেকে সরে এসে প্রতিমার আরতি দেখতে লাগলো সে। আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজছে তখন একটানা, ধুপধুনোয় চাপ চাপ ধোঁয়া আর স্নিগ্ধ একটা গন্ধ, সমস্ত পুজো-মণ্ডপের আবহাওয়াটা যেন বদলে গেছে। গ্রামের সবাই এসে হাজির হয়েছে কালী-তলায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছে সকলে।

বিমলা একবার ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গেল। কাকে যেন খুঁজলো ও। ক্রাচে ভর দিয়ে বুশ শার্ট পরা অবিনাশ ডাক্তার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে। সামনের লোক সরে গিয়ে ডাক্তারকে আরতি দেখার সুযোগ করে দিলো।

বিমলাও এগিয়ে গেল ডাক্তারকে দেখে। ডাক্তারকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমলার মুখে যেন হাসি ফুটে উঠলো, আশে পাশে তাকিয়ে দেখলে। না, প্রভাকর আসেনি।

গিরিজাপ্রসাদ বারবার করে বলে দিয়েছিলেন প্রভাকরকে। গাঁয়ের সকলেই যাত্রা দেখতে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছে তাকে। আর যাত্রা দেখতে আসবে কথাও দিয়েছিল নাকি প্রভাকর। তাই সন্ধ্যে থেকেই বারবার লক্ষ করেছে বিমলা, প্রভাকর এসেছে কিনা। ভেবেছিল, ডাক্তার এলেই তার সঙ্গে প্রভাকরও আসবে। কিন্তু অবিনাশ ডাক্তারকে একা আসতে দেখে হতাশ দেখালো বিমলাকে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো বিমলা। আসরের এক পাশে মেয়েদের বসার জায়গা হয়েছে সতরঞ্চি বিছিয়ে, আরেক দিকে পুরুষদের। বাউড়ি-বাগদী-কোটালবাড়ির মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তখন থেকেই ভিড় করতে শুরু করেছে। আগে না এলে জায়গা পাবে না, পিছিয়ে বসতে হবে এই ভয়। পুরুষদের দিকেও অনেকে এসে গেছে। কিন্তু দু'দিকেই খানিকটা করে জায়গা খালি রেখেছে সবাই, খালি রেখেই বসছে। অর্থাৎ গাঁয়ের ভদ্রলোকদের জন্যে, তাদের বাড়ির মেয়েদের জন্যে।

ওদিকে এর ওর বাড়ি থেকে চেয়ে আনা কয়েকখানা ভাঙা পুরোনো চেয়ার এনে সবচেয়ে ভালো জায়গাটুকুতে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো তখনও খালি পড়ে আছে। কেউই হয়তো বসতে সাহস পাচ্ছে না।

অবিনাশ ডাক্তার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তারই একটাতে বসে পড়লো, গিরিজা-প্রসাদকেও ডাকলে।

আসরটা হয়েছে ঠিক প্রতিমার সামনেই, ওখান থেকে বসে বসে আরতি দেখা যায়। কিন্তু আরতি দেখার চেয়ে যাত্রা দেখার জন্যেই যেন উৎসাহ সকলের।

বিমলা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কমলাকে বললে, চল, ওদিকে যাই।

বলে গিরিজাপ্রসাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। আর ঠিক সেই সময়েই দেখতে পেল প্রভাকর আসছে, অবনীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রথমটা সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে বিমলা ভেবেছিল প্রভাকরকে দেখেই বুঝি সকলে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর ভুল ভেঙে গেল। দেখলে সকলেই যেন অবনীমোহনকেই খুশী করতে ব্যস্ত। এমন কি গিরিজাপ্রসাদও এগিয়ে গেলেন হাসি মুখে। গোপেন মোড়ল আর হংস মাঝখানে রাখা সবচেয়ে ভালো আর বড় চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললো অবনী-মোহনকে। আর অবনীমোহন পাশের চেয়ারটায় প্রভাকরকে বসতে বললেন।

সমস্ত আসরটা যেন মুহূর্তের মধ্যে গমগম করে উঠলো।

আসরের ভিতরে চারপাশ ঘিরে বসে গেছে তখন গাইয়ে-বাজিয়ের দল। গিরিজা-প্রসাদ দেখলেন, বংশীও আছে তার মধ্যে। চোখোচোখি হতে হাসলো বংশী। বাজনা শুরু হয়ে গেল। আর গিরিজাপ্রসাদের মন চলে গেল শৈশবের সেই দিনগুলিতে। মনে হলো যেন কিছুই বদলায়নি, গ্রামটা ঠিক তেমনিই আছে। শুধু সেই জমিদার নেই, দারোগা নেই। হ্যাঁ, মনে পড়লো গিরিজাপ্রসাদের—মাঝখানে একটা নকশাকাটা দামী চেয়ারে বসতো গাঁয়ের জমিদার হৃদয় মোড়ল, আর দারোগাবাবুকে ঠিক অবনী-মোহনের মতই পাশে বসতে বলতো। হৃদয় মোড়ল। ঠিক যেভাবে প্রভাকরকে বসতে বললেন অবনীমোহন। কই, আর তো কিছুই বদলায়নি।

দেখতে দেখতে যাত্রা শুরু হয়ে গেল। গান গাইতে গাইতে আসরে এলো মণিপুরের রানী। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বিমলা। সাজপোশাক দেখে চোখ ঝলসে যায়, আর কি সুন্দর মানিয়েছে।

কমলা ফিসফিস করে বললে, সত্যি মেয়ে নাকি রে দিদি!

বিমলা চাপা গলায় ধমক দিলে।—চুপ!

তার বোকামিটা চাপা দেওয়ার জন্যে, না বিমলা সত্যিই যাত্রা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছে!

কমলা শুধু ফিরে তাকিয়ে দেখলে অবনীমোহন উঠে চলে গেল এক সময়।

গোপেন মোড়ল, হংস আরো দু'একজন তার পিছনে পিছনে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এলো।

আসরের আর সকলেই তন্ময় হয়ে দেখছে। রাত্রি অনেক হয়েছে তখন, চতুর্দিক অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। মেয়েদের এলাকায় মাঝে মাঝে দু'-একটা কোলের ছেলে কেঁদে উঠছিল, তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিস্পন্দ বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলে দেখছে সকলেই। আর নিস্তব্ধতার মাঝে অভিনেতাদের গলার স্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে অনেক দূরে পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে সকলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই অভিনয় করে চলেছে উদাস। আর তার অভিনয় দেখতে দেখতে চোখে জল এসে পড়ে লক্ষ্মীমণির। অন্য সকলের মত সেও ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল মোছে। উদাসের অভিনয়কে কোনদিনই বুঝি এমন চোখে দেখেনি লক্ষ্মীমণি। আজ একটা দিনেই মানুষ বদলে গেছে সে। এতদিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ আর বিরুদ্ধ-ভাব যেন মুছে গেছে।

পাশের ভিড় থেকে যেন বলে উঠলো, উদাসের মত যাত্রা করতে বাবুরাও পারে না লো!

আরেকজন কে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, রাজা হয়েছে উদাস? ও মা, আমি চিনতেই নারতাম না বলে দিলে!

লক্ষ্মীমণি শোনে সে-সব কথা, আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে ওর। মনে হয় কি ভুলই না করেছিল সে, কি অবিচার করেছে স্বামীর ওপর!

না না হলে হঠাৎ তার জন্যে একখানা শাড়ি কিনে এনে দেবে কেন উদাস! কোনদিন যা আশাও করেনি সে, মুখ ফুটে বলেনি কোনদিন।

লক্ষ্মীমণি মনে মনে ভাবে, এবার থেকে খুব ভাল ব্যবহার করবে সে উদাসের সংগে। সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনবে। না, উদাসের কোন দোষ নেই। সব দোষ পদ্মর।

সাবিত্রীও বলেছিল লক্ষ্মীমণিকে। বলেছিল, ভাতারকে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখ লো লক্ষ্মী, তা নইলে পদ্ম তুক করবে।

তখন শুনে রেগে গিয়েছিল লক্ষ্মীমণি। কিন্তু তুকই করেছিল পদ্ম, নিশ্চয় করেছিল। তাই পদ্ম চলে যাওয়ার সংগে সংগে তার ওপর মন ফিরে এসেছে উদাসের।

তন্ময় হয়ে যাত্রা দেখে সে, আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে আশপাশের লোকের মুখে উদাসের প্রশংসা শুনে।

তন্ময় হয়েই অভিনয় করছিল উদাস। যাত্রায় এবার আর ওর একটুও মন ছিল না। নেহাত দায়ে পড়েই পার্ট নিতে হয়েছে। দামুদাদাকে খুশী করার জন্যে। বেশকারীর সামনে বসেও বারবার পদ্মর কথাই মনে পড়েছে তার। বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। বেশকারী অতশত বুঝতে পারেনি। যত্ন নিয়ে উদাসের গালে মুখে রঙ মাখিয়েছে সে, চোখে আর ভুরুতে কাজল টেনে দিয়েছে। তারপর রাংতা মোড়া ঝলমলে চূড়া পরিয়ে দিয়েছে মাথায়, গায়ে জোড়া বুক ছতরী। ঝলমলে মখমলের পোশাক, নকল মুক্তোর মালা, হাতে ধনু নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কিন্তু অভিনয়ে নেশা জেগে উঠেছে। সমস্ত শিরা উপশিরা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে মুখস্থ করা পার্ট মনে পড়তেই। মুহূর্তে নিজেকে ভুলে গেছে উদাস। পদ্মকে, লক্ষ্মীমণিকে, তার ড্রাইভারি শেখার নেশা, তার দ্বিচক্র বাহন, সব ভুলে গেছে। উদাস যেন বংশী কোটালের ছেলে নয়, সূতপুত্র কর্ণ—মহাবীর!

তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, গ্রাম্য উচ্চারণে বড় বড় শব্দ—যার অর্থও ভাল করে বোঝে না সে—তার অভিনয় যেন উদাসকে সত্যিই মহাভারতের যুগে নিয়ে গেছে।

আসরে নেমেই তাই অভিনয়ের নেশায় ডুবে গিয়েছিল সে। বাঁশ দিয়ে ঘেরা চৌকো আসরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে করতে অতি পরিচিত মুখগুলোর ওপর দিয়ে চোখের দৃষ্টি ঘুরছিল তার, কিন্তু কাউকেই যেন চিনতে পারছিল না। বনপলাশির মানুষ নয় যেন ওরা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র সৈনিকরা যেন ঘিরে আছে তাকে।

অভিনয় করতে করতে অনর্গল পার্ট বলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আস্ফালনের মাঝখানে থেমে পড়লো উদাস। হই হই করে উঠলো সকলে, প্রম্পটারের গলা শোনা গেল। বারবার পার্ট মনে পড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু উদাস অপ্রতিভ, বিস্মিত—অস্বস্তিতে ঘেমে উঠেছে সে।

হাসাহাসি শুরু করলো অনেকে। কেউ কেউ চিৎকার করে ঠাট্টা করলে।

আবার অভিনয়ের চেষ্টা করলে উদাস, পারলে না। গ্রামের লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ চিৎকার কানে গেল তার।

লজ্জায় অস্বস্তিতে দু' চোখ ছাপিয়ে জল এলো তার। কোন রকমে পার্ট শেষ করে ছুটে বেরিয়ে এলো সে আসর থেকে।

অভিনয় করতে করতে কেন যে দৃষ্টি পড়েছিল সাজঘরের পাশের আবছা অন্ধকারে! কেন যে...

ছুটতে ছুটতে সেদিকে এসে পদ্মর হাত দুখানা মুঠোর মধ্যে ধরলে উদাস।—পদ্ম, পদ্ম এসেছিস তুই?
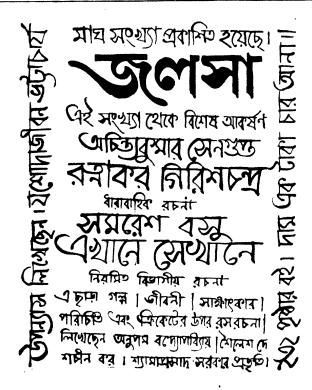
(ক্রমশ)

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪১২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজ ৬ই। আজ বিকেল থেকে বিজ্ঞানীদের অভ্যর্থনার পালা। সন্ধ্যার সময় নাচগান দেখানো হবে। মিষ্টভাষণ প্রভৃতির দায়িত্ব বৌমার মিষ্টান্ন পরিবেষণেরও তথৈবচ। আমি ক্ষণকালের জন্যে দর্শন দেব ও দর্শন করব। একজন মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে খুশি করা সহজ, কিন্তু পাইকারি হিসাবের অভ্যর্থনায় মাথা ঘুরে যায়। যা হোক সায়াহ্নেই য়ুরোপীয়েরা চলে যাবে না, কিন্তু আমার ছুটি নেই। বৌমা আগামী অভি-যানের জন্যে চণ্ডালিকা তৈরি করতে চান। তাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমার উপরে ফরমাস আছে রিহার্সেলের কর্তৃত্ব আমাকে নিতে হবে। তা ছাড়া সামনে ১৬ই তারিখে এখানে হিন্দী ভবনের প্রতিষ্ঠা হবে। চিকিৎসা উপলক্ষে রাজধানী অভিমুখে যাবার সংকল্প ছিলো কিন্তু গিয়ে আবার ফিরে আসার মতো শক্তি নেই। মারোয়াড়ী বন্ধুরা শুভদিন দেখে ১৬ই তারিখ স্থির করেছে। যদি সম্ভব হয় তোমরা ফিশরকে নিয়ে এখানে দেখা দিয়ে যেতে পারো, আমি বন্দী। হয়তো ১৭ই যেতে পারতুম কিন্তু ৬ই ফেব্রুয়ারিতে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব। আমাকে সহজে ছাড়বে না। তারপরে ১৭ই আসবেন গভর্নর। ১৮ই নাগাদ বেঁচে থাকব কিনা নিশ্চিত জানিনে। যাই হোক ১৮ই থেকে প্রায় হপ্তা তিনেক সময় পাওয়া যেতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে চিকিৎসা সেরে আসবার ইচ্ছে তখন যদি হেড্ নর্স নার্সিং হোমে স্থান দেন তাহলে আশ্বস্ত হব। কিন্তু তোমার উপরে আজকাল যে রকম উপদ্রব চলচে তাতে কোনো রকমে তোমাকে ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। সম্প্রতি আমার দেহটা খুব যে খারাপ তা নয়, কিন্তু মনটা কী রকম উত্যক্ত হয়ে আছে ভালো লাগচে না। মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যে যেন পাঁচই মে-র করুণা নেই। ইতি ৬।১।৩৮

কবি

॥ ৪১৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এবার কলকাতা অভিমুখে যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। এই সেদিন পর্যন্ত যে সব বিজ্ঞানীদের বই নিয়ে দিনরাত্রি ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছি তাদের সঙ্গে দেখা হবে। এই আশা ছিল মনে, কলকাতার মুরুব্বিরা ফাঁকি দিলে, সেই সঙ্গে লোকসান করালে প্রচুর। কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কেননা আমাদের তরফ থেকে উপরোধ অনুরোধ করা হয় নি, একেবারে গায়ে পড়ে উচ্ছ্ব অথচ আমি বাংলাদেশের সরকারী ঠাট্টার সম্পর্কীয় নই। আমার বিশ্বাস, সম্মেলনের যারা ছিল অবজ্ঞাশ্রেণীর, তা

অভ্যর্থনার ভার আমার উপর দিয়ে চালিয়ে বুদ্ধিমানরা নিজে-দের বোঝা কমিয়েছিলেন। এই শোকাবহ প্রহসনের পরদিনেই দৌড় দিতে পারতুম, কিন্তু বৌমা চণ্ডালিকার উপসর্গে আমার ঘাড়ে এমন এক দায় চাপিয়েছেন, সকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মাথা চলচে চরকার মতো। সমস্ত চণ্ডালিকার গদ্য অংশটাকেও গানে রূপান্তরিত করতে হবে—ব্যাপারটা কী দুঃসাধ্য তা বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। কবে খালাস পাব ঠিক বলতে পারচি নে। সতেরোই তারিখ পেরিয়ে যেতেও পারে। তুমি জানো বৌমার কথা ঠেলবার শক্তি আমার নেই, বিশেষত তিনি যখন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন আপনার যদি কষ্ট হয় তো করবেন না।

এইতো আমার অবস্থা, একদিকে দেহ অচল আর একদিকে দায়িত্বও অনড়। এ অবস্থায় তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি কোনোমতে একটু সময় করে নিয়ে ফিশারকে নিয়ে এখানে দেখা দিয়ে যেয়ো—খুশি করে দেব এই সত্য করচি। টমাস এসেছিলেন, আজ চলে গেলেন, তিনি আমার সাক্ষী, জিজ্ঞাসা করে দেখো। কিছুকাল ধরে বাজে লোক বিস্তর আসচে। মানব সমাজে অনাবশ্যক লোকের এত বাহুল্য, তা আগে জানতুম না। সৃষ্টিকর্তার খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না ইতিমধ্যে ক'দিন বাদলা করে সমস্ত আকাশটা যেন মন খারাপ করে গোঁ হয়েছিল—তুমি তো জানো সূর্যের আলোয় আমার মৌতাত। আকাশের এই অসৌজন্যও মনে হয় বিশেষ করে আমার প্রতিই অন্যায় আচরণ আজোও আবহাওয়াটা সন্দিগ্ধভাবে আছে। সম্প্রতি নেবে এসেছি শ্যামলীর মাটির ঘরে—বাড়িটা পঙ্গু হয়ে আছে কিন্তু আমার 'পরে এই খোঁড়ার টান আছে বলে মনে হয়। আমার অভিভাবকেরা এটাকে ধ্বংস করবার সংকল্প করচেন। সংসারে আমার পরাভবের তালিকায় এও একটি গণ্য হোলো। মনে হয় জীবনের উপসংহারের এ একটা পূর্ব সংকেত। আমার বড়ো চিঠি দেখে তুমি মনে করতে পারো—আমি বুঝি ফর্লোয়া আন্দি। একেবারে উল্টো। মনে আমার বিশ্বাস আছে, হয়তো তোমার কাছ থেকে দরদ পাওয়া যাবে। তাই মনের মধ্যে নালিশ জমলে খালাস করতে আসি। অবকাশ থাক বা না থাক। বকুনি শেষ হোলো, এখন চললুম কাজে। আমার সামনের সেই চৌকো ঘড়িতে ইঙ্গিত করচে বেলা দেড়টার। ইচ্ছে করলে ফাঁকি দিতে পারি বলেই ফাঁকি দিতে পারিনে। অতএব চললুম সন্ধ্যেবেলার রিহার্সেলের জোগান দিতে হবে।—শীতকালের রোদ্দুর যখন গাছের তলায় ছায়া মেলে দেয় তখন মন কেমন করে, কিসের জন্যে তা জানিনে।
১১।১।৩৮

কবি

॥ ৪১৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

লেফাফার উপরে আমার হস্তাক্ষর দেখে মনে খটকা লাগতে পারে যে কাল তো হালের খবর দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে-ছিলুম আজ আবার কেন।

দুঃখের কথা জানাই কাকে তাই এ চিঠিখানা পাঠাচ্ছি ঘড়-ঘড়িয়ায়, মন খোলসা করবার জন্যে। কালা হয়ে আসছি তাই একদা স্থির করেছিলুম কানে-ধরা ডাক্তারের আকর্ষণে যাব সাতই পৌষের পরের দিনে কলকাতায়। জরুর খবর এল বিদেশী বিজ্ঞানীরা আশ্রমে আসবার ইচ্ছা করেছেন। এবং ফরমাস এলো তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হবে। বৌমা ছিলেন

বোটে, আমি নিলুম ভার। বারে বারে আসচে টেলিগ্রাম। প্রথমে শোনা গেল সমুদ্র পাড়ি দেওয়া পাঁচজন বিদ্বানের কথা, তারপরে বারোজনের। উদয়নের সবাই রুগীর দল, কর্ত্রী এলেন প্রায় শেষদিনে, তাঁর অবস্থা চিরদিনই টলমলো, কখন শয্যা আশ্রয় করবেন দু ঘণ্টা আগে বোঝা যায় না। তবু কোমর বেঁধে লাগতে হোলো। বারোজনের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হোলো মান্য অতিথিদের মর্যাদারক্ষার উপযুক্ত, এমন কি তার চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ বেশি। মধ্যাহ্নে স্টেশন থেকে মোটর এলো ফিরে—পাশ্চাত্তাদেশীয়ের মধ্যে একজন অখ্যাতনামা মার্কিন ও তাঁর স্ত্রী; পাণ্ডারূপে সঙ্গে এলেন সুপরিচিত "——"। স্বদেশী এলেন ৬৩ জন, বোধহয় তাঁরা অধিকাংশই রবাহূত, তাঁদের কারো নামের মধ্যে বিজ্ঞানের রেডিয়মের ছোঁয়া কিছু আছে কিনা জানিনে, কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে ফোটেনি। আমাদের কাছে তো সবাই অচেনা, জগজ্জনের কাছে কী রকম তার খবর জানিনে। অভ্যর্থনার দায়িত্ব যাঁদের উপর তাঁদের একজনো সঙ্গে নেই। অতিথিদের নামের গৌরব না থাকতে পারে, কিন্তু আতিথ্যের দায়িত্ব যা আছে সেটা যথেষ্ট গুরুভার। বাংলাদেশে বোধ হয় দ্বিতীয় আর কোনো নির্বোধ নেই আমি ছাড়া, যার উপরে এত বড়ো অকারণ বোঝা অকস্মাৎ অম্লানবদনে চাপানো যেতে পারে। কিছুই বুঝতে পারলুম না। পৃথিবীতে আমারো তো একটা সম্মানের স্থান আছে যেটা রক্ষা করার দায়িত্ব তো দেশবাসীর আছে। এ কি ভুল পাঁজির পয়লা এপ্রিল, যাকে বলে কেক্কো ঠাট্টা সমস্ত বাংলাদেশে একমাত্র আমিই কি তার যোগ্য পাত্র? জন্মমুহূর্তে বিধাতা আমাকে যখন বাংলাদেশে নির্বাসন দিয়েছেন তখন কোনো দুর্গতিতেই বিস্মিত হব না, এ কথা বারবার মনে করি—কিন্তু বারবার ভুলে যাই। একটা কথা জোর করে বলতে পারি বিদেশের মানী লোকেরা যে মূল্যের আতিথ্য এখানে লাভ করতেন ভারতের আর কোথাও তো সম্ভব ছিল না—যেটাতে বাংলাদেশেরই নাম রক্ষা হোতো। যদি এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রয়োজন থাকে তবে অল্প কিছুদিন আগে শিক্ষা সম্পর্কে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছে খবর নিতে পারো। তাঁদের সঙ্গেও বহুসংখ্যক অনাহূত ভারতীয় এসেছিলেন, আমরা আনন্দের সঙ্গে তাঁদের পরিচর্যা করেছি। কিন্তু কালকে ধূমকেতুর উজ্জ্বল মুণ্ডটি রইল অন্যত্র, পুচ্ছটি পড়ল ঝাঁটার মতো আমাদের পিঠের উপর আমাদের দেশেও এতটা প্রত্যাশা করিনি। এই প্রহসন রচনাটা হোলো কোথা থেকে তার নেপথ্যের খবর তোমরা কিছু জান কী? প্রশান্ত এর মধ্যে থাকলে আমার এই জীর্ণ দেহের উপর এত বড়ো অসম্মানের অত্যাচার ঘটতে দিত না, এ কথা বারবার মনে পড়চে। কিন্তু সেও বুঝি এবারকার যজ্ঞে একঘরে।

এইমাত্র ভারতপ্রত্নতত্ত্ববিৎ টমাসের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি পেয়ে সান্ত্বনা পেলুম—তিনি আসতে চেয়েছেন তিনি যে ভাষায় সম্মান জানিয়েছেন সেটা তাঁর মতো বিদ্বানেরই উপযুক্ত—কিন্তু তিনি বাঙালী নন। যাক্‌গে তোমাকে লেখার একটা সার্থকতা এই যে মনটা খোলসা হোলো, তাই এখন মনে হচ্চে হয়তো আমার অজানিতে অনেক অত্যুক্তি রয়ে গেছে, হয়তো অনিবার্য কারণগুলো অগোচরে আছে। অভিমানী স্বভাবটাকে প্রশ্রয় দিলে অনেক অবাস্তবের সৃষ্টি হয়—এমন কি কারণ থাকলেও মনটাকে নির্লিপ্ত ও প্রশান্ত রাখতে পারলে আত্মসম্মান রক্ষা হয়—কথায় কথায় বাইরের নাড়া খেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলে তার পরে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই। কবিসুলভ স্বভাব নিয়ে জন্মেছি, এটা যেন ভাগ্যের প্রশ্রয় পাওয়া স্বভাব—বড়োমানুষের ঘরের ছেলের মতো। অযাচিত ঐশ্বর্যের অধিকার পেয়ে সর্বত্রই তার স্বীকৃতি দাবি করে বসি—ভুলে যাই ভিতরে যার দাম পেয়েছি বাইরে তার উপরি পাওনার জন্য হাত বাড়ানো নির্লজ্জ গরিবিয়ানা। দেবতা যাকে সম্মান দিয়েছেন সে কেন ভিড়ের লোকের সম্মান চেয়ে চেয়ে দেবতার দানের অবমাননা করে? অতএব এ চিঠির প্রথম অংশটাকে দিলুম বাতিল করে মনের মধ্যে কুয়াসার পরে যেন রোদ্দুর উঠল, আনন্দিত হোলো সমস্ত আকাশ। ইতি ১২ই জানুয়ারি ১৯৩৮

কাল

দৈহিক কান কালা হয়ে আসছে। বিধাতার ইঙ্গিত, বাজে কথায় কান বন্ধ করা।

সেপ্টেম্বর

কেতকী কুশারী

প্রথম হাওয়ার ঝাপ্‌টা ছুঁয়ে যায় পত্ররোমকূপ,
মেঘেরা চলিষ্ণু অতঃপর,
অকস্মাৎ কেঁপে ওঠে পরিণত বৎসরের রূপ,
অভিমানে জানায় মর্মর।

প্রথমে সময় ছিলো, সময়ের অন্ত নেই শেষে,
মাঝামাঝি বাৎসরিক খেলা,
কখনো সে ঋতুদের দুর্নিবার সারথির বেশে,
কখনো মন্থর যায় বেলা।

জল ছলছল তীরে মনে হয় অশ্রুর আভাস,
মুহূর্তে রোদের রেখা নামে,
কিঞ্চিৎ-শিথিল-হওয়া ফিরে আসে পুরোনো বিশ্বাস,
শরবনে সরু নৌকা থামে।

হায় হেমন্তের হাওয়া, এ কথা কি ঘুণাক্ষরে জানো
আরও আছে দিবসরজনী,
চতুর্দশ বর্ষ আর অরণ্যকাণ্ডের দুঃখ আনো,
রামায়ণ কিছুই বোঝোনি।

ওয়াশিংটনের চিঠি

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যে উৎসব-অনুষ্ঠান হয়েছিল তা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান তখন, ঐ বছরে ঐ সময় কিছু আগে কিছু পরে, চলছিল—এ খবর নিশ্চয় "দেশে"র পাঠকমাত্রেই জানেন। ছোট বড়ো প্রতিষ্ঠান যে যেরকম মাপে পেরেছে সে সেরকম মাপে উৎসব করেছে। নিউইয়র্ক শহরে সেই সময়ে যে "রাজা" নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল তা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। নিউইয়র্কের টাউন হলে শতবার্ষিকীর কেন্দ্রীয় সমিতি বড়ো মাপের সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন, সেখানে প্রখ্যাত মার্কিনী কবি রবার্ট ফ্রস্ট ভাষণ দিয়েছিলেন। এই সময়ে ইলিনয়, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া ও অন্যান্য বড় বড় শহরে নানা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রদর্শনী, উৎসব, অভিনয় চলে। এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূত্র ধরে এক সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নাম দেওয়া হয়। এ সমস্ত খবরই, মনে হয়, এতদিনে জানাজানি হয়ে পুরনো হয়ে এসেছে এবং এ সব তথ্যের পুনরুল্লেখ করবার আর কোন দরকার নেই। কিন্তু বাইরে থেকে যা [illegible] যায় না, খবরের কাগজে যে সব হিসেব ওঠেনা শক্ত সত্যিকারের হিসেবে তার পরিমাণই তো ঢের বেশী। অনুষ্ঠান হলো—এ একটা খবর। কিন্তু এই একটি অনুষ্ঠানকে সাজিয়ে গুছিয়ে গড়ে তোলার পিছনে যে অসংখ্য মানুষের দীর্ঘদিনের [illegible] সময় এবং উৎসাহ খরচ হতে থাকে, তার তো কোনও খবর নেই। বিশেষত, যেখানে বাইরে থেকে শিল্পী আনানো যাচ্ছে না, স্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে কাজ চলছে, সেখানে সমস্যার শেষ নেই, সে সমস্যার খবরই বা কে রাখছে? অথচ, এক নিউ ইয়র্ক কি ওয়াশিংটনের মতো ঐ রকম একটি-দুটি জায়গা বাদে সর্বত্রই কাজ চলেছে ছাত্রদের নিয়েই। কর্নেলের কথা বলি।

বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রী শহরে যে-সব ভারতীয়ের সম্প্রতি কিছুকাল বসবাস করবার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরাই জানেন অল্প কিছুদিন কাটালেই ছ' মাসে বছরে দেশ থেকে নতুন-আসা-মানুষের মুখ দেখা কি রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এই সমস্ত সদ্যাগত স্বদেশীয়দের নানা অভ্যাস, ধরন-ধারন, চাল-চলন নিয়ে পুরনো বাসিন্দারা দু-চার দিন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, তারপর আবার নতুনেরাও পুরনো হয়ে মিলেমিশে নতুনতর আগতদের আপ্যায়িত করবার জন্য তৈরী হয়ে থাকেন। নিউ ইয়র্ক স্টেটের ছোট শহর ইথাকায় যখন এসে পৌঁছেই পট্টনায়ক মশাই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে, কখন, রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এবং কোন এক সন্ধ্যায় বেলী সভাগৃহে তাঁর ভাষণ শোনা গিয়েছিল, তার নথিপত্র সমেত ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন তখন একে আনকোরা দেশছাড়ার খামখেয়াল ছাড়া বেশি কিছু ভাবা যায়নি। মনে হয়েছিল, এই নতুন-আসা মানুষটির এই উদ্ভট খেয়াল ঐ রকম পাঁচজনের দু-চার দিনের বলাবলির মধ্যেই থিতিয়ে আসবে। উনি উৎসাহ সহকারে সেই আদিকালের 'কর্নেল ডেলী সান'-এ রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের বিবরণী সংগ্রহ করতে লাগলেন, অন্যেরা এ নিয়ে বেশীদিন বলাবলি করাটাকেও বাহুল্য মনে করে নিজের নিজের কাজে ব্যাপৃত হলেন। এ রকম সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের পিছনে যে আমাদের এই বন্ধুটির কোনও রকম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কাজ করছে—এ কথা তখন কারো মনে ওঠেনি, অথচ এর সুফল দেখা গেল শতবার্ষিকীর বছরে। কর্নেলের প্রধান পাঠাগারে রবীন্দ্র-প্রদর্শনীতে ওখানকার বিশিষ্ট অতিথি-ভবনের পুরনো পুঁথিতে রেখে আসা রবীন্দ্রনাথের নিজের দস্তখতের প্রতিলিপি দেখানো হয়েছিল। সে যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত মুকুল দে এবং পিয়ার্সন। তাঁদের দস্তখতও এই প্রতিলিপিতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিকবার আতিথ্য নিয়েছেন এ কথা শুকনো বিবরণে জানা এক আর ঐ দূর প্রবাসে বসে পুরনো খাতায় তাঁর নিজের হাতের লেখা চোখে দেখা হল অন্য। এটি দেখতে পাওয়ার পিছনে আমাদের ঐ পূর্বোক্ত বন্ধুটির বহুদিনের অধ্যবসায় গেছে যা ঐ ব্যস্ত কাজের মহলে ঠেকান দিয়ে রাখা শক্ত।

কর্নেলের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল ৫ই মে অধ্যাপক বার্টের বেতারবার্তা দিয়ে, শেষ হলো আমন্ত্রিত অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর ভাষণ দিয়ে ১০ তারিখে। এর মাঝখানে ৬ তারিখে ঋতু-উৎসব। এটির দায়-দায়িত্ব সবই ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের, যেমন আবার মাস-জোড়া প্রদর্শনীর সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন পাঠাগার কর্তৃপক্ষ। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা তাল। আজ জুডি আসবেনা নাচের মহড়ায় কেননা কাল ওর "প্রিলিম" (পরীক্ষা)। কাল সাধু আসবে না, কেননা এটা পেরেণ্টস্ উইক এণ্ড, ওর বাবা-মা আসছেন কাল। আমাদের সংগতকার মাথুর পড়তে এসেছে ইঞ্জি-

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন: পটভূমিতে গগনচুম্বী ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট
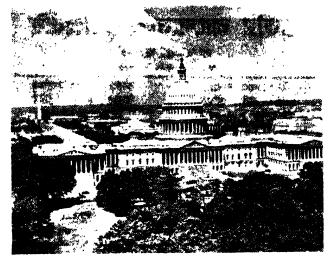
নিয়ারিং, 'কোর্স' সামলাবে, না তবলা? অথচ তবলা ছাড়া দীপু, নাচ অভ্যাস করেই বা কি করে, করায়ই বা কি করে? ওদিকে ডায়ান সেতার বাজাতে চায় গানের সঙ্গে, কিন্তু সুর তুলছে কখন, ওর সায়েন্স পরীক্ষা নিয়ে কেবল ভয়, প্রথম বছর, কেমিস্ট্রিতে যদি ঠেকে, কর্নেলে টিকতে দেবে না। অথচ ওর হাতে ছাড়া নাচের মেয়েরা আবার আর কারু হাতে শাড়ি পরবে না, কী সুন্দর পরায় ও!!

বাংলা গানের দলে লোক কম পড়বে বলে সকলে ভয় করেছিল, দেখা গেল তার ভীতি নেই। উচ্চারণের সংকোচ কাটিয়ে গলা ছাড়লে শোনা গেল মহারাষ্ট্রী মেয়ে উমার গলায় রবীন্দ্র-সংগীত অপূর্ব খেলে। কাজেই যদিও চার-চারটে কোর্স, একটি স্বামী (সে-ও ছাত্র) এবং পুরো সংসার ও মেয়ের ঘাড়ে, তবুও ওকে দিয়ে দুটোর জায়গায় তিনটে গান করাও।

এই সমস্ত অসুবিধে স্বীকার করেও সকলের যে-ধৈর্য, যে-আগ্রহ দেখা গেছে, তার তুলনা নেই। গত বছর এপ্রিল মাসেও বরফ ঝরছে। তবু, একটিমাত্র ছুটির দিন হাতছাড়া করে প্রতি রবিবার এসে জড়ো হতে হবে মহড়ায় তো তাই সই। হাঁড়ি-হেঁশেল তুলে কফি খাইয়ে এই মহড়ার দলকে জিইয়ে রাখার জন্য আছে আমাদের মাথুরের বউ ফ্লোরেন্স আর সবেরওয়ালের বউ ইডি। ফ্লো আবার ওরই মধ্যে অনুষ্ঠান-লিপিতে ভারতীয় নকশা আঁকছে। গানের অনুবাদের ইংরেজীটা ইংরেজীর মতো শোনালো কি না এ পরীক্ষার ভারও তার ওপরে। ইডি রং মিলিয়ে শাড়ি-জামা সংগ্রহ করে আনছে। ভারী ভারী শাড়ি পরে ওই আমেরিকান মেয়েরা শুদ্ধ পৌষের দলবাঁধা নাচ নাচতে পারবে তো? পায়ে-পায়ে বেধে যদি পড়ে যায় শেষে? পায়ের কথায় মনে পড়লো: পায়ে দেবার মল কই? এখন নামো ডাউনটাউনে, কিছু একটা কিনে আনতে হবে তো ওসব নকল গয়না তৈরী করবার জন্যে! এমনি সহস্রবার ছুটোছুটি আর হাজার উদ্বেগ পেরিয়ে যেদিন সন্ধ্যায় ঋতু-উৎসব শেষ হল, মনে হল যেন একশ' ঝাড়ের বাতি এক ফুঁয়ে নিবল, নিরবলম্ব অন্ধকার।

তবু, তখনো অমিয়বাবুর বলা বাকি। যেদিন এলেন বস্টন থেকে, বৃষ্টিতে বাদলে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। উড়োজাহাজ উড়েছে এই আবহাওয়ায় সেই কত, এখন কখন এসে মাটি ছোঁয়! সারা দিনের পরিশ্রমের পর অধ্যাপক স্মক সস্ত্রীক এসেছেন ওঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। টার্মিনালে সবাই শুকনো মুখে বসে। শেষ অবধি উনি এসে পৌঁছালেন। ভয় ছিল ক্লান্ত হয়ে থাকবেন, দেখি পাইলটের প্রশংসা করতে করতে হাসি-মুখেই এগিয়ে আসছেন। পরের দিন ১০ই সভায় লোক ভরে গেছে। বক্তার উঁচু ডেস্ক, আর তার ধারে ঐ ছোট্ট মানুষটি, দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনলো। বার্ট বেতার-ভাষণে ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকে কবিতা পড়েছিলেন, বিশেষত 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' কবিতাটি অপূর্ব লেগে-ছিল শুনতে। আর, এদিন অমিয়বাবুও আবৃত্তি করলেন, কিন্তু শুধু অনুবাদে নয়, কিছু কিছু বাংলা কবিতার ছোট ছোট অংশ। বিদেশীর কানে বাংলা শব্দ ঝঙকারের যে আবেদন আছে তা জানলাম সেদিন।

"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা"—অমিয়বাবুর মুখে এ শুনে যেমনি আমরা মুগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ দেখি আমাদের অসংখ্য বিদেশী বন্ধু। ফ্লো, ইডি এদের কথা ধরিনে। হোক ওরা মেয়ে ক্যানেডার, আমেরিকার, ওরা ভারতের ঘরের বউ তো বটে, ওদের ভাল লাগবেই, কিন্তু অ্যাডা? আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পরে যখন কফি নিয়ে জমায়েত সবাই, অ্যাডা গিয়েছিল আবৃত্তি শুনবার আশায়। বেরিয়ে বলেই ফেলল: "ভেবেছিলুম আরও কিছু বাংলা কবিতা শুনব। কী যে ছাই অনুবাদ নিয়ে সব কথা তুলে দিলে!! আজ কি ও শোনা হবে?"

হবে না, হওয়া শক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র হয়ে থাকা—টাইপ-রাইটার, কাজ-খাতার ভিড়ে মে মাস চলে যেতে কতক্ষণ? শেষ পরীক্ষার সপ্তাহ ঘনিয়ে আসে। তবু, ওরই মধ্যে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে গান জেগেছিল, কথা বেজেছিল, এই আশ্চর্য!

মানসী দাশগুপ্ত

গো প ন র হে না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আজ প্রত্যেকেই যেন বড় বেশী সংরাগে বিরহে
কাছে আসে, দূরে যায়।
রজনীগন্ধার সাদা যেন আজ দ্বিগুণ প্রকট।
গোলাপ দ্বিগুণ লাল। সন্ধ্যার আকাশ
অধিক নিবিড়। অন্য দিকে
শীতের মলিন পত্র গত বৎসরের তুলনায়
দ্রুত ঝরে।
নক্ষত্র নিথর হয় ভীষণ অস্বস্তিকর শব্দহীনতায়।

আজ প্রত্যেকেই যেন নিজের ইচ্ছার ঘোষণায়
সমান উৎসুক। 'আমি কবে সেই বালকবয়সে
মুকুন্দ দাসের যাত্রা দেখেছি।' বৃদ্ধের এই দারুণ বিলাপ
না-ফুরাতে যুবাদল তাই চলে যায়
অন্য পথে।
উলঙ্গ আলোর ঝড়ে সন্ধ্যাযাপনের পিপাসায়।

গোপন রহে না কিছু। আজ খুব স্পষ্ট হয় জলের করুণা।
নদীর শরীর, মেঘ, নারী।
বৃক্ষ মাননীয় হয়। আকাশ গম্ভীর হয়। অন্য দিকে
প্রেমিকের বাম অঙ্গ টলে যায়, দুই চক্ষু অপার উজ্জ্বল।
গলায় মঙ্গল-মালা, হাতে রাজ-অঙ্গুরীয়, আজ
প্রত্যেকেই সুন্দর ভূষণে
সেজেছে। সবাই যেন প্রতীক্ষায় নিরত। সবাই
একবার হেরে গিয়ে, বারবার হেরে গিয়ে তবু
দারুণ উৎকণ্ঠ এক অবসন্নতায়
টেবিলের চার ধারে ঝুঁকে আছে। যেন
আজ প্রত্যেকেই তার স্বভাবকে শেষ বাজি রেখে
জুয়ার অন্তিম দানে জিতে যেতে চায়।

আজ চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে সুস্পষ্ট মনে হয়,
নানাবিধ অন্ধকার, প্রণয়, প্রকৃতি,
চরিত্রলক্ষণ তার শেষ পরিণতির ভিতরে
এসে দাঁড়িয়েছে।
তা না-হলে সূর্য এত বিশাল প্রভায়
প্রত্যহ সকালে কেন দেখা দেয় ইদানীং? কেন
নিশীথ ক্রমেই আরও ঘোর অন্ধকার হয়ে আসে?
হয়ত প্রত্যেকে আজ আপন সত্তার শেষ পরিণতি চায়।
না-হলে মানুষ আজ এতখানি আলোকিত অথবা আঁধার
হত না। সূর্যাস্ত তার চূড়ান্ত বিষণ্ণ শোভা দেখাবার আগে
খানিক সময় নিত। মনে হয়,
পঞ্চম অঙ্কের পট উত্তোলিত হবে, এই প্রত্যাশায়
আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপরাজি দেখাবার তরে
সবাই প্রস্তুত হয় আপন ভূমিকা অনুযায়ী।
সবাই। মানুষ, মেঘ, ফুল, তরুলতা।
না-হলে আকাশ তার রূপ-রটনায় আরও মিতব্যয়ী হত।
জ্যোৎস্না দেখাত না তার সর্বাধিক কলঙ্কহীনতা।

আজ প্রত্যেকেই যেন বড় বেশী সংরাগে বিরহে
কাছে আসে, দূরে যায়।
রজনীগন্ধার সাদা যেন আজ দ্বিগুণ প্রকট।
গোলাপ দ্বিগুণ লাল। সন্ধ্যার আকাশ
অধিক নিবিড়। অন্য দিকে
শীতের মলিন পত্র গত বৎসরের তুলনায়
দ্রুত ঝরে। যেন আর
গোপন রহে না কিছু। মনে হয়,
সর্বশেষ ঘোষণার মুহূর্তে ক্রমেই কাছে আসে
'বি-বি-সি'র থেকে আরও শক্তিশালী কোনও-এক সংবাদদাতার।

যে আ গু নে পু ড়ি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমরা প্রত্যেকে পাখি, ব্যাধ খুঁজি
[illegible] তূণে তীর আছে সেই ব্যাধ,
তাদের নিরিখে আমরা পাখি হই ব্যাধের নিরিখে।
আমাদের কথাগুলি রক্তাক্ত প্রার্থনা সব
[illegible] বীজের মতো,
[illegible] তাদের মুখে সারি সারি তারকারা জ্বলে,
[illegible] আঘাত খুঁজে সেই দিকে নত হয় কথার কুঁড়িরা।
[illegible] যেখানে শোয় নগ্নদেহে সেখানেও কথাগুলি ফোটে
[illegible] মৃত্যুও শুধু মৃত্যু নয়, আরো কিছু;
[illegible] তেরা বেঁচে আছে শুধু কি জীবন নিয়ে? হয়তো না।
[illegible] কেও মাঝে মাঝে পেতে হয়—মাঝে মাঝে।
[illegible] চাঁদ ওঠে এমন আকাশী রাত মেষশাদা—নেই;
[illegible] শাখায় শুধু পাখি আর পাখি আর পাখি,
[illegible] না নীড়—নেই।

আমরা আগুনে পুড়ি
যে-আগুন ঘাসের মতন শান্ত নিরবধি সবুজ শীতল।
খেলনা-ছড়ানো নীল উঠোনে প্রথম
সে-আগুন পোহাই দুহাতে।
খোঁপার ফুলের ঘ্রাণে মুগ্ধ তারপর
ঝাঁপ দিই আগুনের হ্রদে,
দগ্ধ এই দ্বিতীয় আগুনে।
কার্নিশের শেষ প্রান্তে রোদ হেঁটে গেলে
আরামকেদারা পিঠে রোমন্থন করি সুখ
পুরোনো এলবাম ঘাঁটি, তারপর তৃতীয় আগুনে
ছাই হই, ঘুমের মতন সাদা।
জ্বলন্ত মোহর এক রক্তের স্রোতের মধ্যে কেবলই গড়ায়,
দগ্ধ করে, দগ্ধ হয়, দগ্ধ করে।

সমুদ্র বক্ষ থেকে প্রায় এগারো হাজার ফিট উঁচুতে উত্তর গাড়োয়ালের অখ্যাত গ্রাম—মালারি। বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় প্রায় আট মাস গ্রামটি শীতের প্রকোপে বরফে ঢাকা থাকে। অধিবাসীরা তখন নেমে আসে নীচের সমতলভূমিতে আর আরম্ভ হয় তখন ওদের কর্মময় জীবন যার মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

১। দূরে পাহাড় সংলগ্ন বন থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসা; ২। শস্য কোটা; ৩। মুঠিভরা শস্য কার না মুখে হাসি ফোটায়; ৪। কর্ষণের কাজ পুরুষেরাই করে, ৫। শস্য ঘরে তোলার আগে ঝাড়াই করা; ৬। হাতে সময় অল্প তাই কাজ করতে হয় পরিবারের সবাইকে।

আলোকচিত্রশিল্পী

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশু-খুড়ো কহিলেন : "ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এই শেষ ঘুম থেকে ওঠা, তারপরেই মহানিদ্রা। কিন্তু কথাটা বুঝি আমি একাই ভাবলাম। কলকাতার কাংস্য ঝংকার আর

সেই সঙ্গে চিরাচরিত প্রথা মতোই গিন্নির ঝংকার শোনা গেল। মাসের তিন তারিখ। কাগজওয়ালা, কয়লাওলা, গয়লা সবাই এসে কড়া নাড়ল, জানাতে লাগল পাওনার কথা। মূর্খ আর কাকে বলে, ক'ঘণ্টা পর কার টাকা কে খাবে। কিন্তু মোহমুদ্গর কাজে লাগে না, টাকা তাদের দিতেই হয়। আর ওদেরই দোষ কী। ঘর শত্রু বিভীষণ (বিভীষণা বলব কি ?) গিন্নি রয়েছেন, রাম নামের বদলে তাঁর মুখেও মামুলি ফরমাশ—কিছু বেগুন, সজনে ডাঁটা, ভেটকীর কাঁটা যেন অবশ্যই আনি। ভেবেছিলাম তরিতরকারি আর মাছ আজ জলের দরে বিকোবে। ভুল করেছি। ভেবেছিলাম ট্রাম আজ ফাঁকা থাকবে। সেখানেও ভুল। লেডীসরা জায়গা থাকলে পাশে বসতে দেবেন। তেমন পুণ্য করিনি। ভেবেছিলাম দেরি হয়ে গেলেও অফিসে লেট মার্ক করবে না—তেমন বাপের ব্যাটাই নয় বড় সাহেব, লেটমার্ক ত হলোই, ফাউ দাঁত খিঁচুনিও জুটল। অষ্টগ্রহের • নিকুচি করেছে বলে মেজাজ নিয়ে বসলাম।

সংবাদে শুনিলাম নির্বাচনের প্রার্থীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সহস্রাধিক।—
—"হতেই হবে। এখানে উদ্বাস্তু কলোনিতে ভিড়, স্কুল কলেজে ভিড়, খেলার মাঠে ভিড়; ট্রামে-বাসে ভিড়; সুতরাং নির্বাচনের আসনই বা ফাঁকা থাকবে কী করে! কিন্তু আমরা ভাবছি আমাদের কপালের কথা। এত সব দেশসেবক থাকতে এক কড়ার পুঁটি মাছের সমস্যা পর্যন্ত মিটল না"—সখেদে বলে শ্যামলাল।

নির্বাচনী সংবাদে শুনিলাম অষ্টবাম [illegible] জনৈক মহিলা প্রার্থী নাকি [illegible] ঘরে ঘরে গিয়া মেয়েদের মাথায় তেল মাখিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিতেছেন, কপালে সিঁদুর পরাইতেছেন, পায়ে আলতা দিতেছেন—"তেল সিঁদুরে যে ভবী ভোলে না সেটাই শুধু তিনি জানেন না, নইলে ভোট ভিক্ষার কৌশলটা তাঁর অভিনবই হয়েছিল"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

নির্বাচনী সভায় সবাই ভাইগণ, বন্ধুগণ বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিতেছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী

বলিলেন—"এটা তো সেই মামুলি সম্বোধন। আমার মনে হয়, এর চেয়ে মাতুলগণ বলে সম্বোধন করলে আব্দারটা বোধহয় আরো জোরদার হয়!!"

সংবাদে শুনিলাম যে-সকল কংগ্রেস-কর্মী কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করিয়া লোকসভা অথবা বিধান সভার নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।—"কিন্তু তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না। তাঁরা হয়ত ছোটবেলা পড়েছিলেন—একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কিত ব্যাপারে জনৈক ফরাসী বিশেষজ্ঞ নাকি বর্তমানে তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।—"এবং অবিলম্বে 'ফেণ্ড লীভ' নেওয়ার কথাও হয়ত চিন্তা করছেন"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেণ্ট্রাল স্টোরে রক্ষিত দ্রব্যাদি শুনিলাম খাতাপত্রে লেখা একরকম, আর আসলে নাকি অন্যরকম। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন "আমরা কোন মন্তব্য করব না, শুধু বলব—তোমায় পিতা বলে যেন জানি, তোমায় নত হয়ে যেন মানি!!"

এক সংবাদে শুনিলাম লণ্ডনে গৃহ-নির্মাণের একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইয়াছে, ইহাতে গৃহের ছাদ নির্মিত হইবে আগে এবং সর্বশেষে ভিত।—"অতঃপর বিলেতে ভি আই পি-রা আর ভিত্তি স্থাপন না করে ছাদ-ঢালাই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছে, এইগুলিতে ভারত হইতে নীত প্রচুর সিমেণ্ট ব্যবহার করা হইয়াছে।—"তোবা, তোবা, ভারতের সিমেণ্টে যে সবই গঙ্গামাটি, ও ছুঁলেও যে গুনাহ্ হয়," বলেন বিশু খুড়ো।

কোথায় কত মৎস্যভক্ষী আছে তার নাকি একটি সরকারী পরিসংখ্যান নেওয়া হইয়াছে। জানা গেল মৎস্যভক্ষী হিসাবে কেরল-এর স্থান প্রথম, বোম্বাইর দ্বিতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয়। শ্যামলাল ছড়া স্মরণ করাইয়া দিল—"সকল পক্ষী মৎস্য-ভক্ষী, মৎস্যরাঙা কলঙ্কিনী!"

গান্ধীজীর স্কুলের বন্ধু ও সঙ্গী নাকি বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী ক্রিকেট খেলিতেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"অসম্ভব নয়, হয়ত স্পীন বোলিং তাঁর আসত, যা থেকে হয়েছে খদ্দর!!"

প্রাক্তন পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবকে নাকি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।—"হায় ছোরাভরতি, হায়

নসীবের মস্করা", শ্যামলাল হায় হায় করিয়া উঠিল।

এম সি সি-র জনৈক খেলোয়াড় নাকি পাকিস্তান হইতে বোর্খা কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বোর্খা কেনাতে আর আপত্তি কী, পরিয়ে না দিলেই হলো!!"

লাল পাখি —শ্রীবারীন রায়

গত সপ্তাহে দুটি একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় আর্টিস্ট্রি হাউসে হায়দরাবাদের শিল্পী জেহরা রেহমতুল্লা এবং ফাইন আর্ট আকাদেমিতে খড়্গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির শিক্ষক বারীন রায়ের চিত্রের প্রদর্শনী।

বর্তমানে দিল্লি প্রবাসী কুমারী জেহরা রেহমতুল্লা হায়দরাবাদের ফাইন আর্ট কলেজ থেকে অনার্সের সঙ্গে পাস করার পর ১৯৫৫ সালে দুটি নিখিল ভারত চিত্র-প্রদর্শনীতে পদক পুরস্কার লাভ করেন। সেই বছরই তিনি ভারত গবর্নমেন্টের বৃত্তি লাভ করে আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা-লাভের জন্য রোম যাত্রা করেন। সেখানে আন্তোনিও কর্পোরার অধীনে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে অধ্যাপক কার্লো ফেরেত্তি ও অধ্যাপক মাইকেলোঞ্জালোর কাছে ফ্রেসকো ও মোজাইক টেকনিকে ছবি আঁকা আয়ত্ত করেন। ইতিপূর্বে রোম, হায়দরাবাদ ও দিল্লীতে তাঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতায় তাঁর ছবির এই প্রথম প্রদর্শনী।

প্রদর্শিত মোট একুশখানি ছবির মধ্যে প্রধানত মোটা কালো রেখায় রঙের বিন্যাস চাতুর্যের ভিতর দিয়ে বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্পধারার ছাপ স্পষ্ট এবং রোমে শিক্ষা লাভের জন্য সেটা হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলেও ছবি-গুলির মধ্যে ভারতীয়ত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট এবং মোটা রেখা ও রঙের প্রয়োগে সূক্ষ্ম ছন্দোময় ভাব ফুটিয়ে তোলায় বেশ বলিষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। "আত্মনিবেদন", "মমতা", "প্রার্থনা", "পূজা", "গল্পগুজব" প্রভৃতি ছবিগুলি প্রধানত কালো মোটা রেখার অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। "রাজস্থানী মহিলা", "শীতের সকাল", "জ্যোৎস্না ও আগুন" প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে রেখার চেয়ে রঙের প্রাধান্য। "ঘুড়ি হাতে বালক", "জল ভরণে" (ইয়েলাম্মা মল্লাম্মা) প্রভৃতি কখানি ছবিতে জ্যামিতিক রেখায় পরিস্ফুট বিষয়বস্তুগুলি শিল্পীর বহুমুখী কৃতিত্বের পরিচায়ক।

শিল্পী জেহরা রেহমতুল্লা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ নিজস্ব একটি প্রকাশধারা আয়ত্ত করে নিয়েছেন—একটি কৃতিত্ব যা অনুভূতি ও ভাবকে রেখা ও রঙের ছন্দে মূর্ত করে তোলায় সক্ষম।

শিল্পী বারীন রায় বছর পাঁচেক পূর্বে কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ইতিপূর্বে কণ্টেম্পোরারি আর্টিস্টদের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রথম দেখা যায়। এবারেরটি তাঁর ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী।

প্রদর্শিত মোট বাইশখানি ছবির সবকখানিতে তেলরঙের প্রয়োগে 'ইম্প্রে-সনিস্টিক' ধারার অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। পান খেতে খেতে মেয়েদের গল্প করা "তাদের নিজেদের জগৎ" (১৩নং), গাঁজাকাসেবীদের নিয়ে "ট্রায়ো" (৭নং), "যাদুকর" (১৯নং),

কথা নয় —শ্রীমতী জেহরা রেহমতুল্লা

পূব আফ্রিকার মাসাই শিকারী —শ্রীঅভয় খাটাও

"ফুল ও বালক" (৯নং), "জ্যোতির্ময়ী" (১১নং) ছবিগুলির মধ্যে ঐ ধারাটিই বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। রেখার চেয়ে রঙকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রঙের প্রয়োগে কোনরকম অসাধারণত্ব প্রকাশ না পেলেও মনেও কোন ছাপ দেয় না। রঙের মধ্যে নীল রঙের প্রতি একটু বেশী ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শুধু রঙের প্রয়োগে ছবি তৈরী যাতে রেখা নেই বললেই চলে, তেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে একমাত্র "চাঁদ" (১২নং) একটি প্রশংসনীয় সৃষ্টি। শিল্পীর মৌলিকত্ব এখনও তেমনভাবে ফোটেনি কোন ছবিতেই, তবে যথেষ্ট সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রদর্শনীটি আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকবে।

* * *

গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ বম্বের সমকালীন শিল্পী অভয় খাটাওর চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বম্বেতে অভয় খাটাওর নাম খুব। এক সময়ে সেখানকার বড় বড় সমালোচকেরা এ'কে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

অভয় খাটাওর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচুর প্রশংসা পেয়ে ইনি বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে। সঙ্গীতের দিকেও এ'র ঝোঁক আছে, তাই বিভিন্ন দেশের ব্যালে, ব্যালেরিনাদের পোশাক, তাদের অঙ্গভঙ্গী এ'কে আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশী। এ'র রচনার বিষয়বস্তু বহুবিধ। বিভিন্ন দেশের সমকালীন চিত্রকলার প্রভাব থাকলেও

সৌরাষ্ট্র চাষী —শ্রীঅভয় খাটাও

শিল্পী নিজের দেশকে অস্বীকার করেননি কখনও এবং সবার ওপরেই রেখেছেন এবং সব রচনাতেই লক্ষ্য করা যায় পাশ্চাত্যের [illegible] চরিত্র। বেশ গাঢ় বর্ণের প্রতি এ'র ঝোঁক। আফ্রিকার আদিম শিল্পের অনুসরণে রচিত চিত্রগুলির আবেদন আমার মনে হয় সর্বাপেক্ষা প্রবল। কিছু রচনায়, যেমন 'রাবণ ও সীতা', 'যশোদা এবং কৃষ্ণ' প্রভৃতি রচনায় নন্দলাল বসুর প্রভাবটা খুব প্রবল। শৈশবে অভয় খাটাও থাকেন পুলিনবিহারী দত্তের শিক্ষাধীনে; মনে হয় সেই কারণেই নন্দলালের প্রভাব পড়েছে এ'র রচনায়।

বম্বের বিখ্যাত খাটাও পরিবারে এ'র জন্ম এবং উঁদের [illegible] এবং মায়ের কাছেই সর্বপ্রথম শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। কলকাতায় এ'র একক প্রদর্শনী এই প্রথম হলেও বম্বে, দিল্লী, কলোম্বো, রোম প্রভৃতি শহরে এ'র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিকবার। প্রদর্শনীটি কলকাতার শিল্পানুরাগীদের প্রশংসা লাভ করেছে।

শাঙ্গ'দেব

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার

সম্প্রতি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেননা বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে এখনো যে খুব ভাল ধারণা আছে তা মনে হয় না, বাইরের জগতের কথা ছেড়েই দিলাম কেননা তাদের পক্ষে আমাদের সংগীতকেই বোঝা শক্ত। কিন্তু গোড়াতেই প্রচার বলতে আমরা কী বুঝি সেটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। প্রচার শব্দটার সঙ্গে মিশনারিদের কার্যবিধির খুব মিল আছে। সংগীতের ক্ষেত্রে যেন তেন-ভাবে এই প্রচার হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। অবাঙালীদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শোনবার চেষ্টা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে রবীন্দ্র সংগীতকে সকলের মর্মস্পর্শ করা। কেন রবীন্দ্র-সংগীত মহৎ সেইটা বুঝিয়ে দেওয়া। তা না হলে যে প্রচার হবে তা সাময়িক আবার দুদিন বাদে উচ্ছ্বাসটা কেটে গেলে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। ভীমরাও শাস্ত্রী রবীন্দ্রসংগীতের এই মহত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তাই তিনি আজীবন রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করে গেছেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় একজন মারাঠী তরুণ শান্তিনিকেতনে থাকতেন। তিনি চমৎকার বাংলা আয়ত্ত করেছিলেন এবং বাংলা ভাষার দখল হবার পর তিনি রবীন্দ্রসংগীতকে প্রকৃত ভালবাসতে শিখলেন। এই যে উপলব্ধি এর গৌরব সবচেয়ে বড় অর্থাৎ ইনটেলেক্ট দিয়ে বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা যাঁরা বাংলা জানেন না তাঁদের রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং সুরের মর্ম গ্রহণ করতে হবে— এই গ্রহণ করানটাই আমাদের দায়িত্ব।

দীর্ঘদিন কাব্যসংগীতের শ্রীবৃদ্ধির ফলে বাঙালীদের পক্ষে কাব্য এবং সংগীতের সম্পর্ক কত নিবিড় এবং কত বিচিত্র হতে পারে তা বোঝা সম্ভব হয়েছে। আবার কথার তাৎপর্য যেখানে গভীর নয়—সেখানে সুরের মধ্য দিয়ে সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার প্রচেষ্টার সঙ্গেও বাঙালীর যথেষ্ট পরিচয় আছে। অর্থাৎ হিন্দী-রাগসংগীতের চর্চাও বাংলাদেশে প্রচুর হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। উভয় ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার ফলে বাংলায় সংগীতের নবরূপায়ণ যেভাবে হতে পারে অন্যত্র সেভাবে হওয়া হয়ত সম্ভব নয়। এই কারণেই রবীন্দ্রসংগীতকে বাংলা যেমনভাবে উপলব্ধি করতে পারে অন্য দেশ তেমনভাবে পারে না; কিন্তু যখন পারবে তখন সেখানেও কাব্যসংগীতের নতুন চিন্তা জাগ্রত হবে এবং নবরূপায়ন সম্ভব হবে। এইখানে প্রসংগত একটা কথা বলি,—হিন্দী রাগসংগীত সাধারণভাবে কথার দিক দিয়ে দরিদ্র এমন ধারণা বাঙালীদের মধ্যে অনেকের আছে। এই ধারণা সর্বৈব সত্য নয় এবং হিন্দী রাগসংগীতের সাহিত্যের দিকটা আমরা এতদিন অনুধাবন করে দেখিনি এইটাও গৌরবের বিষয় নয়। বস্তুত এক সদারঙ্গের নামাংকিত খেয়াল গানগুলি বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে তাতে এমন কত বস্তু রয়েছে যার সাহিত্যিক উপাদান সমাদরের যোগ্য। বিশেষ করে খেয়াল গানে বহু ক্ষেত্রেই কাব্য এবং সাহিত্যের স্বাদ অপূর্ব হয়ে উঠেছে। যে সময়ে হিন্দী খেয়ালের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সে সময়ে ভারতের অধিকাংশ অংশেই কাব্যসংগীত পরিকল্পিত হয়নি। কিন্তু রাগসংগীতের সমধিক প্রভাবের ফলে খেয়ালে কাব্যের দিকটা কাব্যসংগীতের মত করে তুলে ধরা

য়ামি—কথাকে বিস্তারের অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এই কারণে কাব্য-গুণসম্পন্ন খেয়াল গান এবং বিশেষত্ব বর্জিত খেয়াল গান—একভাবেই গাওয়া হয়ে এসেছে, আর কেবলমাত্র গায়নবৈশিষ্ট্যেই তাদের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। ফলে যাতে কাব্যগুণ আছে তা আপনা থেকেই মনোহর হয়ে উঠেছে আর যাতে কাব্যের উৎকর্ষ ছিল না রাগসংগীতের আরোপে তা ভাবসমন্বিত হয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে সমুন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে সংগীতকে সাধারণত এইভাবেই দেখা হয় তাই রবীন্দ্র-নাথের ভাষা পেলে অনেকে তানবিস্তার সহযোগে তাকে রূপায়িত করে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে বলে মনে করেন। এমন কি কলকাতাতেও কেউ কেউ এইভাবে গেয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি সুবিচার করছেন বলেই বিশ্বাস করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, বহির্বাংলায় রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারের সময় আমাদের সেটি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। এটি করতে গেলে হিন্দী এবং অপর ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন। অবাঙালীদের মধ্যে যেসব সুধীজনের রবীন্দ্রসংগীতের মূল বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিচয় আছে তাঁদের আমরা অনুরোধ করব তাঁদের ভাষায় রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনার সূত্রপাত করুন। বিশ্ব-ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধীয় আলোচনার গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হতে পারেন—এতে সর্বত্র রবীন্দ্র-সংগীতের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

ভারতীয় সংগীতের প্রকাশ ঘটেছে তান-বিস্তারে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রূপকল্পের দিক দিয়ে এই চিরাচরিত তানবিস্তারের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন না। কেন গ্রহণ করলেন না, এটা যাঁরা তান-বিস্তারের আশ্রয়ে সাংগীতিক জীবন যাপন করে এসেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ কথার সংগে মানিয়ে প্রস্তুত করেছেন ছোট ছোট সুরের অলংকার। তাঁর কাব্যের সুরম্য পরিবেশও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সেই কাব্যলোকের পথ, ঘাট, উপবন, সরোবর সব তিনি নিজেই নির্ণয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সুদক্ষ শিল্পী মনের চিন্তাধারাকে পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারলেই যাঁরা এভাবে সংগীতকে বোধ করতে সক্ষম নন তাঁদের কাছে রবীন্দ্র-সংগীতের সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্যকভাবে প্রতিভাত হবে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ইংরেজী দৈনিকে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে একটা তীব্র আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এ প্রসংগে অনেকের সেই সব চিঠিপত্রের কথা মনে পড়তে পারে। সেই সময় আমার বার বার মনে হয়েছিল এটা ঘটেছে প্রকৃত অ্যাপ্রিসিয়েসন বা তাৎপর্য-নির্ধারণের অভাবে। বহির্বাংলার অধিবাসীরা যখন একটি রবীন্দ্রসংগীত শোনেন তখন তাতে চিরাচরিত রাগসংগীতসম্মত গায়নপদ্ধতির অভাবটা তাঁরা বিশেষভাবেই অনুভব করেন। তখনই তাঁদের কাছে মনে হয় এ গান তো খুব সাদামাটা এ নিয়ে বাঙালীরা এত মাতামাতি করে কেন?—এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপকে হৃদয়ংগম করবার জন্য পরিশ্রম করবেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। বেশীর ভাগ লোকই মনে করেন বাঙালীরা রাগসংগীতে কাঁচা তাই তারা গানকে সহজভাবে গাইতে পারলে বা শুনতে পেলেই খুসী হয়—আর এই সহজ গান নিয়ে হৈচৈ করাটা নিছক উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথ যে দীর্ঘজীবন নানাভাবে এই সহজ হবার সাধনা করে এসেছেন এবং সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য যে সহজের মধ্যেই রয়েছে—আর সুরের বিচিত্র লীলা যে প্রকৃতির মত সহজে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সে খবর রাগসংগীতের চোখ-ধাঁধানো চাকচিক্যে অভ্যস্তদের কাছে ধরা পড়াটাও শক্ত।

অবাঙালীর মধ্যে যাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছেন বা বাংলার ভাবধারার সংগে পরিচিত তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্য উপভোগ করেছেন—তাঁরা জানেন কেন রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বের মহৎসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা এ পরিচয় পাননি রবীন্দ্রসংগীতকে তাঁদের গোচর করতে হলে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে ফল হবে না, রবীন্দ্রনাথের এস্থেটিক চিন্তাকে তাঁদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে উপভোগ করতে পারলে ভারতীয় সংগীতে চিন্তার নব নব উন্মেষ সম্ভব। প্রচারের এই গুরুদায়িত্বকেই আমাদের স্বীকার করতে হবে।

বিদুর

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুণ্য-কীর্তি পুরুষ। ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম অগ্রগণ্য পণ্ডিত হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও বঙ্গসাহিত্যের এমন সর্বগুণসম্পন্ন সাধক দুর্লভ। সম্প্রতি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে হরপ্রসাদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেনে আমরা আনন্দিত। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও আরো প্রাচীন কালের বহু নিদর্শন, পাথর এই সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। উপরন্তু কুষাণ যুগের কিছু মুদ্রা এবং চব্বিশ পরগণা থেকে প্রাপ্ত পুরোনো আমলের মৃৎ-শিল্পের কিছু নমুনা এখানে রাখা হয়েছে। প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কে উৎসাহীরা এই সংগ্রহশালার দ্বারা উপকৃত হবেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা বিষয় চর্চা করেছেন। কিন্তু প্রধানত তাঁর চর্চার বিষয় ছিল : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃত কাব্য সমালোচনা, বৌদ্ধধর্ম। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও তার মর্মোদ্ধার শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ কর্মকুশলতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদের সাহিত্য চর্চার শুরু। তিনি বঙ্কিমের যোগ্য শিষ্যরূপে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন; অপরদিকে প্রবীণ প্রাচ্যবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগিতা তাঁকে প্রাচ্য চর্চায় আকর্ষণ করে। মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনের পর থেকেই হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি-সংগ্রহ-কার্যের পরিচালক-রূপে নিযুক্ত হন। তদবধি সারা জীবনই তাঁকে পুঁথি সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন পুঁথি সংগ্রহার্থে, নেপালের মতন দূর দেশেও তাঁকে একাধিকবার যেতে হয়েছিল। বাংলা পুঁথি আবিষ্কার করে হরপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তার জন্য বঙ্গবাসী তাঁর কাছে ঋণী। হাজার বছরের পুরোনো বাঙলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা (চর্যাপদ-গুলি যার অন্যতম) আবিষ্কার তাঁর অপর এক কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথ এই মনীষীকে সম্মান জানিয়ে বলেছিলেন : "অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না....হরপ্রসাদ....জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে পেরে-ছিলেন।"
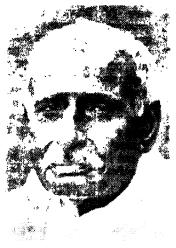
বঙ্গভাষার চর্চায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ছিল : "বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব, তাহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব ?" অবশ্য নয়। তাই তিনি 'বেডিংটা স্প্রেড করিয়া একটু সট ন্যাপ' দেবার চেষ্টাকেও যেমন বাঙ্গলা ভাষা বলে মানতে রাজী ছিলেন না, তেমনি বড় রাস্তাকে 'রাজমার্গ', বাঁশ বয়ে নিয়ে যাওয়াকে 'বংশ পরিচালনা' বলতে রাজী হননি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙলা রচনা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র পরিহাস করে বলেছিলেন, সংস্কৃত কলেজ থেকে এমন বাঙলা কি করে বেরিয়ে এল ? সম্ভবত, পরবর্তীকালের অন্যান্য বহু মনীষী ভেবেছিলেন, সংস্কৃতের প্রাচীন রুদ্ররুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়া থেকে এমন বাঙালী কি করে বেরিয়ে এল যিনি প্রাচীনের চর্চা করেন বলেই পাশ্চাৎমুখী নন, শোধনবাদী এবং আধুনিক, যিনি বঙ্গ-ভাষার অকৃত্রিম সাধক, সহস্রবার যিনি বলেছেন : যাহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে তাহাদের আশীর্বাদ করি।

রুশ কবি

'বেটার এ রেভল্যুসান দ্যান এ পোয়েট।' কবির চেয়ে বুঝি বিপ্লবই ভাল ছিল। মস্কো শহরের জনৈক পুলিসের এমন বাক্য শুনে আমার কিছু পুরোনো কথা মনে পড়ছে। পাঁচ সাত বছর আগে কলকাতার রাস্তায় কিছু তরুণ কবি 'কবিতা পড়ো' ডাক দিয়ে মিছিল তুলে পথে পথে ঘুরেছিলেন। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কোনো একদিনের 'কবি-মিছিলে' আমি কবিবন্ধুদের সঙ্গে ছিলাম, তবে পুরোভাগে নয়, সর্বপশ্চাতে মুখ লুকিয়ে। এর কারণ এই নয় যে, আমি কবিতা লিখি না। আমার ভয় ছিল, কলেজ স্ট্রীটের জনারণ্যে অপরাহ্ন-বেলায় অনেক মজাদার লোক যদি বা এই অদ্ভুত মিছিলে মজা পেয়ে ঢিল নাও বা ছোঁড়েন কোনো পুলিস গাড়ি নিশ্চয় পিছু নেবে। পুলিসে আমার অতীব ভয়। পুলিস

কবিতা বোঝে কি বোঝে না, জানি না, মিছিল বোঝে। ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ, সেদিন সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বসে, ভীত পারাবতের পুরীষে লিপ্ত হয়ে যেসব কবি কাব্যপাঠ করেছিলেন তাঁদের জন্য পুলিসের রথ আসে নি। পথ-চলতি-লোক থমকে দাঁড়িয়েছে, ট্রাম বাসের জানালা দিয়ে লোকে গলা বাড়িয়েছে এবং কলকাতা শহরের এই কবি-মিছিলকে উন্মাদের কর্ম বলে গণ্য করেছে।

মস্কো কলকাতা নয়। সেখানে সিনেট হল আছে কিনা জানি না। হাতের কাছে যে সংবাদটুকু রয়েছে তাতে দেখছি, মায়াকভোস্কি স্কোয়ারে পাঁচ হাজার কাব্যপ্রেমিক জমায়েত হয়েছেন ইভজেনি য়েভতুসেংকো (Evgeny Yevtushenko)-র লেখা কিছু নতুন কবিতা শুনতে। কবির কবিতা পাঠ চলছে এবং সেই পাঁচ হাজার শ্রোতা ঘন ঘন চিৎকার করে বাহবা দিচ্ছেন কবিকে। আনন্দ হর্ষ উত্তেজনার সে-দৃশ্য পাঠক কল্পনা করে নিতে পারবেন। কিন্তু এমন দৃশ্য কল্পনাতীত, কাব্যপ্রেমের উচ্ছ্বাসবশে কবির বসনভূষণ ছিঁড়ে নিচ্ছে শ্রোতারা, টানা হেঁচড়া করছে কবিকে, চুমু খাচ্ছে, বলছে, তোমার জন্যে প্রাণমন দিয়ে দিলাম। ফলে হৈ হট্টগোলে ভিড়ে পথঘাট বন্ধ, যানবাহন গতিহীন, ট্রাফিক পুলিস গলদঘর্ম, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ক্ষেপে গিয়ে বলছে : "বেটার এ রেভল্যুসান দ্যান এ পোয়েট।"

এমন অঘটন কলকাতায় কি ঘটবে কোনোদিন? পাঁচ হাজার শ্রোতা কি জুটবে কোনো পার্কে বা মাঠে? যদি বা জোটে কবিরা কি তাঁদের ধুতি পাঞ্জাবী ছিঁড়তে দেবেন?

মস্কোবাসীর এই কাব্যপ্রেম সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ জেনে রাখা দরকার। ইভজেনি য়েভতুসেংকো কোনো প্রখ্যাত কবি নন, তরুণ নবীন কবি। অধুনা রাশিয়ায় যে ছ সাত জন "রাগী কবি ছোকরা" দেখা দিয়েছে তাঁদের অন্যতম। সমাচার বলছে, আজকাল মস্কো শহরের হালচাল এই রকম, যে কোনো কবি তাঁর কাব্যপাঠ শুনিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি ঘোড়া রাস্তাঘাট বন্ধ করে রেখে দিতে পারে। ১৯৫৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে স্টালিনের প্রেতমূর্তির বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভ তাঁর আক্রমণ শুরু করার পর রাশিয়ায় কবিরা যেন বিদ্রোহের সঙ্গীত হিসাবে ক্রমে দেখা দিচ্ছেন। এই বিদ্রোহ অবশ্য সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, কারণ ক্রুশ্চেভ সেখানে হাত দেননি, কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্বের অনেক কুফল, ক্রুশ্চেভ যার সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে, কবিরা সঙ্গত ভাবে তারই আওতায় আছেন।

সুখের কথা, রাশিয়ায় ইদানীং গীতি কবিতা, ছোট ছোট কবিতা, নব অর্থে লিখিত কাব্য ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পত্রিকায়, সংবাদপত্রে এগুলি নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। প্রকাশ্যে পঠিত হয় বার বার। সরকারী নির্দেশ মত তৈরী করা সাহিত্য-ফর্মুলার প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা নতুন কবিদের। তারা আর কারখানা আর ট্রাক্টরের গুণগানে মুখর নয়। কবিরা, কী আশ্চর্য, রাশিয়ার কবিরা এখন প্রেমের জয়গান করে কবিতা লিখছে, কবিতা লিখছে মানুষের অনুভব অনুভূতির।

অরণ্যে রোদন

শেষ পর্যন্ত লেখকের বিচার প্রকাশকের বই বিক্রির খাতায়। বাংলা দেশে নয়, সর্বত্র। হয়ত উনিশ বিশ তফাত। ওরা আরও একটু সদয়, সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ বেশী পালিশ পেয়েছে। আমরা পাইনি।

এক ইংরেজ লেখক বড় দুঃখে আরেক কবিকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, বন্ধু দুঃখ করো না, আমিও তোমার দলে। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্যে তুমি লণ্ডনের প্রকাশক পাড়ায় পত্রের পর পত্র দিয়েছ, প্রত্যাখ্যাত হয়েছ: শত প্রত্যাখ্যান পত্রের পর তোমার মন ভেঙে গেছে, তুমি পত্রিকায় চিঠি লিখে মর্মব্যথা জানিয়েছ। কিন্তু আমারও সেই অবস্থা, আমার কাছেও শতাধিক ফেরত-চিঠি আছে।

আমার নাম এনটনি এলিয়ট। আমেরিকা, কানাডা, বেলজিয়াম, ডেনমার্কে আমার অনেক কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। ছ' ছটি কবিতা সংকলনে আমার কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কি, আমি কোনো প্রকাশক পাইনি।

সাহিত্যের যাঁরা দ্বাররক্ষী তাঁরা আমায় উৎসাহ দিয়েছেন বিস্তর, কিন্তু আমার লেখার বাজার দর নেই বলে কোনো বই কেউ ছাপেননি। তাঁদের সহৃদয় মন্তব্যের কিছু নমুনা দিলাম।

এক প্রকাশক লিখেছেন : লেখক হিসেবে আপনার প্রতিভা আমাদের পাঠকরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু......

অন্য প্রকাশকের কথা : আপনি যে প্রতিভাবান সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

আর এক সাম্প্রতিক প্রকাশক লিখেছেন : আপনার উপন্যাসটি সুলিখিত, খুবই আকর্ষণযোগ্য; আমাদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে সময় লাগল। শেষ সম্পাদক বৈঠকে সকলে আমরা একমত হতে পারলাম না, কাজেই আপনার উপন্যাস ছাপা সম্ভব হল না। আমার নিজের ধারণা, আপনার উপন্যাসে চরিত্রগুলির সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। আরও অনেক জিনিস আছে যা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু খুবই দুঃখিত, কিছু করা গেল না।

এনটনি অতঃপর বলেছেন : কত ভাগ্য হলে তবে প্রকাশকরা বই ছাপেন আমি জানি না। জানার বাসনায় লাইব্রেরীতে গিয়ে সদ্য প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ তুলে নিয়ে পাতা উলটেছি। দেখলাম, কোনো দিন বিকেলে এইসব বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখে বলে বলে এক নাগাড়ে লিখিয়ে নেওয়া যায়।

কবি এনটনি উপন্যাস লিখেও ছাড়া পাননি। আমাদের বাঙালী তরুণ কবি কি লিখবেন আমি জানি না, বোধ হয় উপন্যাস। একই হাল হবে।

উপন্যাস

প্রতিধ্বনি ফেরে। প্রেমেন্দ্র মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা ৯। চার টাকা।

দীর্ঘকাল পরে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন উপন্যাস 'প্রতিধ্বনি ফেরে' হাতে এলো। রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী লেখকদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র, যাঁর গ্রন্থ পাঠ করে পাঠককে, বিশেষত সমালোচকদের পড়তে হয় দ্বিধায়, অনেক ভেবেচিন্তেও প্রযোজ্য কোনো মন্তব্য বা বিশেষণ সহজে মনে আসে না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রায় একই ধরনের কিঞ্চিৎ অস্থির ও রহস্যময়, কিন্তু ভেতরে তাকালে দেখি মানসিকতায় তারা আদৌ পরিবর্তিত, এবং সে-পরিবর্তন এত বেশি সূক্ষ্ম যে, যে-মুহূর্তে একটি চরিত্র সম্পর্কে মনে যা-হোক একটি ধারণা জন্ম নেয়, পর-মুহূর্তেই নতুন মোচড়ে সে-ধারণার মৃত্যু ঘটে। বলা বাহুল্য, এই বিপর্যয় এড়িয়ে গেলে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হয় না। অবশ্য 'প্রতিধ্বনি ফেরে' নামকরণে লেখক পাঠকের কিছুটা সুবিধে করে দিয়েছেন; ফলে এক উদভ্রান্ত যুগের প্রতীক, ছিন্নমূল, উপন্যাসের রহস্যময় চরিত্রগুলির লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেকটা সহজ হয়ে আসে।

উল্লিখিত বক্তব্য মনে রেখে আরো একটি মন্তব্য সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখকও তাঁর সমস্ত চিন্তার সঙ্গে পরিবর্তিত হবে, এটা স্বাভাবিক। প্রেমেন্দ্রবাবুর বিষয়বস্তু—কি কথাসাহিত্যে, কি কবিতায় গত এক দশকের বিবর্তনে নতুন রূপ গ্রহণ করেছিল তা তাঁর অনুরাগী ও সচেতন পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়েছিল। বছর কয়েক আগে প্রকাশিত, তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মৌসুমী'-তে যে লেখক এক বেদনা-বিহ্বল, কিঞ্চিৎ আবেগমধুর রোমাণ্টিক বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; সেই লেখকই পরবর্তী উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আবির্ভূত হবেন, একদিকে তা যেমন বিস্ময়-কর, অন্যদিকে তেমনি সুখকর ও শ্রদ্ধেয়। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে-লেখককে আমরা প্রায় হারাতে বসেছিলুম, নতুন করে তাঁকে আবিষ্কার করার আনন্দ এই উপন্যাসের পাঠককে যে বশীভূত করবে, তা সুনিশ্চিত।

'প্রতিধ্বনি ফেরে', সংক্ষেপে, বিপ্লবী উমাপতি ঘোষালের কাহিনী। সূর্যকণার সঙ্গে তুলনীয় উমাপতি তার ব্যক্তিত্বের ধর্মে ... উদ্ভাসিত হয়ে, তার আশেপাশের

কয়েকটি নারী ও পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়ে, হারিয়ে গেল বিস্মৃতির মধ্যে। সেই উমাপতির স্মৃতিসভায় তাঁর সম্পর্কে জানবার কৌতূহল নিয়ে গিয়েছিল সাংবাদিক অসীম রাহা। স্মৃতিসভা: কিন্তু উমাপতির সংস্পর্শে এসেছিল, এমন কয়েকজন ছাড়া, এ-সভার স্বল্প জনসমাবেশ দেখে উমাপতির আগুন স্পর্শ করা যায় না। এই ক্ষোভ শাণিত হয়েছে নিশীথ পাত্রের বক্তৃতায়: 'মুষ্টিমেয় ক'টি অনুরাগী আজ এই দীন সভায় উমাপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি জানাতে যে সমবেত হয়েছে এটা ভাগ্যের পরিহাস আমি মনে করি না; এ পরিহাস উমাপতির নিজেরই: পরিহাস আমাদের সংগে, এই যুগের সংগে, মূঢ় উদাসীন জনসমাজের সংগে। ......এক আশ্চর্য-মিছিলের মশাল সে জ্বালাতে চেয়েছিল, তা পারেনি বলে নিজের শিখায় নিজেকেই সে ভস্মীভূত করে গেছে। কোন চিহ্ন যেন তার কোথাও না থাকে।' নিশীথবাবুর কথা সত্য হ'তে পারে; কিন্তু জয়ার মনের মধ্যে এর প্রতিবাদ উত্থিত হয়। উমাপতিকে জানা কি অতই সহজ! জয়ার নিস্তাপ স্মৃতির রোমন্থনে উমাপতির অতীত পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। উমাপতির রহস্য যেন জয়া এবং নীরজাদেবী, মলি, বিপিন ঘোষ, রামবাবু সকলকেই গভীর রহস্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অসীমের কাছেও উমাপতির ব্যর্থতার কাহিনী প্রশ্ন হয়ে রইল।

'প্রতিধ্বনি ফেরে' তার সমৃদ্ধ সম্পদ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে সম্মানিত হবে। শুধু প্রেমেন্দ্রবাবুরেই নয়, এই উপন্যাস সম্প্রতি-কালে প্রকাশিত বিবর্ণ সৃষ্টির তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

৬৭২।৬১

গল্পগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠগল্প। সৈয়দ মুজতবা আলী। বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা- ৯। চার টাকা।

নামে 'শ্রেষ্ঠ-গল্প'; তার উপর লেখক শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলী; যিনি প্রিয় লেখকদের অন্যতম। অবশ্য বইয়ের বিকিরণ মধ্যে লেখকের গুণপনার পরিচয় লুকিয়ে থাকে না, বাংলা দেশে তো নয়ই। তবু, প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলা যায়, আলী সাহেবের বর্তমান গ্রন্থটি হাতে পেয়ে তাঁর অনুরাগী পাঠকমাত্রেই উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত হবেন। কেননা, মুজতবা আলী সেই বিরল সংখ্যকদের মধ্যে বিরাজ করেন, পাঠকদের বশীভূত করার ক্ষমতা যাঁদের অপরিসীম; যাঁরা, সাত্য বলতে, পুলকিত পাঠকসত্তার পরতে পরতে মুহূর্তে সময়ে মিশে যেতে পারেন। অনাবিল হাস্যরসের সংগে শাণিত বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে অত্যন্ত সহজে তিনি যা পরিবেশন করেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে মেলে না। 'শ্রেষ্ঠগল্প' হাতে নিয়েও সে-কথা মনে হলো।

এই সংকলনে আলী সাহেবের বারোটি রচনা স্থান পেয়েছে। 'নোনাজল' গল্পটি বিষয়ের সারবত্তার গুণে অসাধারণ। শুধু তা নয়, অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রচনাগুলির সংগে এই গল্পটির সাদৃশ্য কম; জাহাজের খালাসিদের জীবনের একটি বিষাদাচ্ছন্ন করুণ আলেখ্য পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে; গল্পের সমীরুদ্দী যেন তার রক্তের মূল্য

প্রমথনাথ বিশীর
অনেক আগে অনেক দূরে ৪৲ **কেরী সাহেবের মুন্সী** ৮॥৹ **গল্প পঞ্চাশৎ** ৮৲ **নিকৃষ্ট গল্প** ৫৲ **ভূতপূর্ব স্বামী (নাঃ)** ২৲ **মাইকেল মধুসূদন** ৪৲ **রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ** ১ম ৫৲ ২য় ৫৲ **রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প** ৫৲ **রবীন্দ্রসরণি** (যন্ত্রস্থ)

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৬॥৹ ২য় ৬॥৹ **প্রাণকুমার** ৬॥৹

প্রাণতোষ ঘটকের
বাসকসজ্জিকা ৪৲

প্রেমচাঁদের
প্রেমচাঁদের গল্প ২৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ধূলিধূসর ৩৲ **পা বাড়ালেই রাস্তা** ৪৲ **বেনামী বন্দর** ২৲

বনফুলের
রচনাসংগ্রহ ৭॥৹

বাণী রায়ের
বর্ষাবিজয় ৩৲ **প্রেম** ৪৲ **রঞ্জনরশ্মি** ২॥৹

বিক্রমাদিত্যের
দিল্লীর ডাকে ৩॥৹

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সমীক্ষা ৫৲

বিভিন্ন লেখকের রচনা সংকলন
আমার প্রিয় গল্প ৫৲
নবজীবনের প্রান্তে ৩৲
কুমুদকাব্য-পরিচিতি ৩৲

বিভিন্ন কবির
ঐ ক তা ন ২॥৹

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অভিযাত্রিক ৪॥৹ **আদর্শ হিন্দু হোটেল** (উপন্যাস ৪॥৹ নাটক ২৲) **আরণ্যক** ৫৲ **উৎকর্ণ** ৪৲ **কিন্নর দল** ৩৲ **কুশল পাহাড়ী** ৪॥৹ **গল্প পঞ্চাশৎ** ৯৲ **দেবযান** ৫৲ **পথের পাঁচালী** ৫॥৹ **মুখোশ ও মুখশ্রী** ৩৷৹ **মেঘমল্লার** ৩॥৹ **যাত্রাবদল** ২৷৹ **লবটুলিয়ার কাহিনী** ২॥৹

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম ১৬৲

বিমল করের
খোয়াই ৩৲

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)র
মায়ের বাঁশী ৪॥৹

বিশ্বপতি চৌধুরীর
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩॥৹

বিহারীলাল গোস্বামীর
কুমারসম্ভব ৩॥৹

ভূপেন্দ্রমোহন সরকারের
জমি শিকড় আকাশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অমৃত কন্যা ৩॥৹ **পরিশোধ** ৪॥৹

মনোজ বসুর
বন কেটে বসত ৯৲
গল্পপঞ্চাশৎ ৯৲

মহাত্মা গান্ধীর
আমার ধ্যানের ভারত ৩৲
ছাত্রদের প্রতি ৪॥৹

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
অনুপূর্বা ৬৲

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
কাব্যমালঞ্চ ৫৲

রমেশচন্দ্র সেনের
গৌরীগ্রাম ৫৲
মালঙ্গীর কথা ৪॥৹

রাজশেখর বসুর
চলচ্চিন্তা ৩৲

রামনাথ বিশ্বাসের
জার্মানী ও মধ্য ইউরোপ ৩॥৹
পৃথিবীর পথে ৪৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
জীবন জাহ্নবী ৫॥৹

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কথাচিত্র ৬৲ **কবি ও অকবি** ৩৷৹ **গল্প পঞ্চাশৎ** ৮৲ **নয়ান বৌ** ৫॥৹ **মিলনান্তক** ৪৸৹ **সরস গল্প** ৫॥৹

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এই তীর্থ ৩॥৹

ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪৲ **টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ** ৪৲

শশিশেখর বসুর
যা দেখেছি যা শুনেছি ৩॥৹

ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬৲

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভারত ও বর্তমান মহাযুদ্ধ ২৲

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কুহু ও কেকা ৬৲
বেণু ও বীণা ৪৲

সন্তোষকুমার ঘোষের
রেণু তোমার মন ২॥৹

সরলাবালা সরকারের
সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ৩॥৹

সুনির্মল বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪৲

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
চরিত্র সংগ্রহ ২৷৹ **ভারতীয় সংস্কৃতি** ৫৲ **পশ্চিমের যাত্রী** ৫৲

সুবাদার সীতারাম
সিপাহী থেকে সুবাদার ৩৲

সুমথনাথ ঘোষের
অহল্যার স্বর্গ ৩৲ **ছায়াসঙ্গিনী** ২৸৹ **জটিলতা** ২৸৹ **জায়া ও জননী** ৫৲ **দিগন্তের ডাক** ৩৲ **নীলাঞ্জনা** ৭৲ **পরপূর্বা** ৪॥৹ **মর্মরবানিময়** ২৸৹ **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲ **সর্বংসহা** ৫৲

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের
কাব্যবিচার ৬৲ **দার্শনিকী** ৪৲ **রবিদীপিতা** ৫॥৹ **ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা** ৩৲

ডঃ সুশীলকুমার দের
নানা নিবন্ধ ৫॥৹

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
শরৎ নাট্য সম্ভার ৮৲

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
লীলাভূমি ৫৲

হরপ্রসাদ মিত্রের
সাহিত্য পরিক্রমা ২॥৹

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

দিয়ে ভাগ্য ও ঈশ্বরের নির্দয়তার বিরুদ্ধে 'অক্ষম' প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে হারিয়ে যায় নোনাজলের গর্ভে। সৈয়দ সাহেবের সার্থক সৃষ্টি, এই গল্পটি আমাদের সাহিত্যের স্মরণীয় সম্পদ বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে আছে, বিষের বিষ, সুর, ত্রিমূর্তি, বেঁচে থাকো সর্দি কাশি ও গাজী-র মতো নির্মল কৌতুক কাহিনী— আড্ডার মেজাজে লেখা এই গল্পগুলি বার বার পড়েও পুনর্বার পড়তে ইচ্ছা করে, ব্যবহারে পুরনো হয়ে যায় না। 'বিষের বিষ' গল্পটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। আগা আহমদ ও তার বৌ মালিকা খানমকে নিয়ে রূপকথার ধরনে যে কাহিনীটি পরিবেশিত হয়েছে, তা পড়তে পড়তে হাস্য রোধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

স্বল্প পরিসরে প্রতিটি গল্পের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয়। তথাপি, সংকলন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রকাশক লেখকের কয়েকটি গল্প গ্রন্থবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, একজন প্রথম শ্রেণীর সুরসিক লেখক প্রসঙ্গে, অন্ততঃ এইরকম সংকলনে, একটি ভূমিকা যোগ করলে কি ক্ষতি ছিলো! আর কিছু না হোক, গ্রন্থটি তাহলে সম্পূর্ণ হতো। পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধন করলে খুশি হবো। 'শ্রেষ্ঠগল্প' সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করবে।

৭।৬২

পত্রিকা

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ— সম্পাদক শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য। মার্টিন বার্ন কর্মচারী রবীন্দ্র শতবার্ষিক কমিটি কর্তৃক ১২ মিশন রো, কলিকাতা-১।

বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অসংখ্য স্মারক-পত্র প্রকাশ দেশের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার কথাই প্রকাশ করে। আলোচ্য প্রকাশনটি তারই একটি সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত। বাঙলা ও ইংরাজিতে বিশিষ্টজনের রচনা সংকলন, যার মধ্যে এদেশের সঙ্গে বহু বিদেশী মনীষীরও রচনা একত্রে পাওয়া যায়। কর্মীদের লেখা মৌলিক প্রবন্ধও কতকগুলি আছে। বহু চিত্রশোভিত এই স্মারক সংকলনখানি সাহিত্যরসিকদের খুশী করবে।

প্রাচী— সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত। ৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। প্রতি সংখ্যা ২৫ নয়া পয়সা।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক 'প্রাচী' প্রবন্ধ ও আলোচনাদির মাধ্যমে বাঙলার বর্তমান চিন্তাধারার প্রতিফলনে যে সচেষ্ট তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রথম সংখ্যাখানিতে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে খুব একটা কৃতিত্বের ছাপ না দিলেও পত্রিকাখানিকে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য সাময়িকের মতো উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনাদিও স্থান পেয়েছে। তবে কলেবরের তুলনায় মূল্য কিছু বেশী।

প্রাপ্তি স্বীকার

কথা দিয়েছিলেন—দেব সেনাপতি।

বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০—১৯০০)—আশাদেবী।

বিপুল সুদূরে—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পাপী—শ্রীমাধব রায়।

ব্রহ্মবিদগুরু শ্রীশ্রীভূপতিনাথ সান্নিধানে (২য় ভাগ)—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী।

সীমান্ত—শ্রীশিশিরকুমার দাশ।

রতি-বিলাপ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।

আরশি-নগর—রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী।

লগনশুভ—প্রবোধকুমার সান্যাল।

চন্দ্রশেখর

শিল্পশোভন চিত্রসৃষ্টি

তরুণ রূপকারদের যে-কোন নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস চিত্ররসিকদের প্রসন্ন ঔৎসুক্যের দাবি রাখে। আর প্রয়াসটি যদি সুন্দর হয় তবে অভিনন্দনের বরাভয় তাঁদের প্রাপ্য। যাত্রিক রূপকার-গোষ্ঠী তাঁদের তৃতীয় চিত্রোপহার "কাচের স্বর্গ"-র চিত্রযুগে নিবেদিত। ভেতর দিয়ে জন সংবর্ধনার বরলাভের অধিকারী হয়েছেন।

চিত্রকাহিনীর রচয়িতা ও চিত্রনাট্যকারের যুগল দায়িত্বটিও যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী সম্পাদন করেছেন। সংলাপও তাঁদেরই রচনা। চলচ্চিত্রের এই সাহিত্য-অংশের সমন্বয় করে তাঁরা কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন তা বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু প্রয়োগ-কর্মে যাত্রিক-গোষ্ঠী যে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন তা যথার্থই অভিনন্দনীয়।

চিত্রকাহিনীর ভাব-কেন্দ্রবিন্দু আশ্রয় করেছে বেঁচে থাকার সংগ্রামে বিভ্রান্ত এক তরুণের জীবনকে। জীবনের স্বপ্ন ও সাধ এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম তাকে কেমন করে পদে পদে মূল্যবোধের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সত্য-মিথ্যার কঠিন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলে তা নিয়েই কাহিনীর বসকণার বিস্তার। সংস্থান-ভাগের এই গভীর রচনায় যাত্রিক গোষ্ঠী কল্পনাশক্তি ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

কাহিনীর নায়ক অসাধারণ শল্য-চিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করে। মফস্বলের এক হাসপাতালে সে চাকুরি পায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত সে, তাই চিকিৎসকরূপে কাজ করবার আইনগত অধিকার তার নেই। তবুও সে চিকিৎসক, খ্যাতিমান সার্জন।

জীবন-সংগ্রামের কোন পর্যায়ে এসে এই মিথ্যা পরিচয়ের আশ্রয় তাকে নিতে হল তা চিত্রনাট্যের প্রথমাংশে বিবৃত। মিথ্যা-পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা তার জীবনকে পলে পলে কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বের তিক্ততায় ভরে তুলল এবং দুর্বলতা ক্ষণে-ক্ষণে তার সত্যবোধকে কেমন করে গ্রাস করে নিল তার মধ্যেই কাহিনীর মনোবীক্ষণ-মূলক নাট্যরসের বিস্তার। পথভ্রষ্ট নায়ক শেষ পর্যন্ত কী করে জীবনের সুন্দর মূল্যবোধটি ফিরে পেল এবং আদালতে অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে সমস্ত গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেল তা নিয়েই চিত্র-কাহিনীর পরিণতি।

কাহিনীর গতি ও পরিণতির পথে একাধিক উপকাহিনী গড়ে উঠেছে। অনেক চরিত্র ভিড় করে এসেছে। নায়কের জীবনে মাধুর্যের সুর এনে দিয়েছে এক তরুণী। হোটেলে নায়কের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। একটি মধুমাসের আশায় সে দিন গুনতে থাকে। সে জানে, নায়কের কারাবাসের পর তার জীবনের অন্ধকারার কপাট খুলে যাবে, একদিন তা আলোয় ভরে উঠবে।

চিত্রকাহিনীর মূল রসবিন্দুটি ছবিতে পরিমিতি-জ্ঞানের ভেতর দিয়ে বিন্যস্ত করেছেন পরিচালক-গোষ্ঠী। সারা ছবিটি তাঁদের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের এমন একটি

চিত্রযুগের "কাচের স্বর্গ"-র একটি আবেগময় মুহূর্তে কাজল গুপ্ত ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

প্রসাদগুণে আলিপ্ত যা অনিবার্যভাবে দর্শকমনকে আকর্ষণ করে। ছবির যে আখ্যান-অংশ দুর্বলতায় আকীর্ণ, তার বিন্যাসটিও প্রয়োগ-শিল্পের নৈপুণ্যে এমনভাবে উদ্ভাসিত যার ফলে যুক্তি ও সঙ্গতির অভাব সহজেই ঢাকা পড়ে যায়।

নায়ক শেষ পর্যন্ত কেন ও কী ভাবে মিথ্যা-পরিচয়ের আশ্রয় নিল তার "বিশ্বাস-যোগ্য" প্রস্তুতি নেই ছবিতে। প্রস্তুতি হয়ত আছে, কিন্তু তা কষ্টকল্পিত। দর্শকের যুক্তিবোধকে তৃপ্ত করে না। নায়ক চাকুরি পায় না। অভাবের তাড়নায় অশান্ত, জীবন-সংগ্রামের ব্যর্থতায় ম্রিয়মাণ। আর্থিক অনটনের জন্যই অসামান্য মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বুঝি সে তার অসম্পূর্ণ ডাক্তারি পড়া সম্পূর্ণ করে নিতে পারল না। কিন্তু এর আগে এত বছর সে কলেজে পড়ল কী করে, কার দাক্ষিণ্যে? যুদ্ধে কী সে অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দিয়েছিল? হয়ত তাই। তা না হলে যুদ্ধ থেকে ফিরে তাকে এত অভাবে পড়তে হয় কেন? সংসারে সে একা। সুস্থ, প্রতিভাবান যুবক সে। তার মত যুবক কী সামান্য উপায়ের ব্যবস্থা করে নিজের পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারে না? বিশেষ করে যখন ফাইন্যাল ইয়ারেই তাকে অধ্যয়ন ছাড়তে হয়েছিল? চিকিৎসা-শাস্ত্রে তার যখন এত শ্রদ্ধা? ডাক্তার হবার শখ যখন এত প্রবল?

এর পরিবর্তে আমরা ছবিতে কী দেখলাম? একজন মেধাবী, সুস্থ, সবল যুবক—সংসারে যার আর কারোর জন্যে কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই—চাকুরি যোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে! তারপর চাকুরি নিল আসল পরিচয় গোপন করে। আত্মাভিমানী যুবক—বড়লোক পরোপকারীর কাছে নিজের দুর্দশার কথা বলতে যার বাধে—কিনা মিথ্যার আশ্রয় নিল!

ছবির কাহিনীকার-পরিচালক চেয়েছিলেন একজন নকল ডাক্তার এবং তাকে কেন্দ্র করে একটি মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। গল্প গড়ে তোলবার জন্যে প্রয়োজন ছিল নায়কের জীবনের অবস্থা-বিপর্যয়। এই "বিপর্যয়" রচনা করতে গিয়ে কাহিনীকার-পরিচালক গোষ্ঠী যে ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন তা শুধু মামুলীই নয়, অযৌক্তিক।

অথচ কষ্টগ্রাহ্য এই অংশের বিন্যাস-ধারাটি মামুলী নয়। গতানুগতিকতার নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কলকাতার পথে পথে নায়কের জীবিকা অনুসন্ধানের ঘটনাটি ছবিতে এমন এক শিল্পসুন্দর প্রয়োগ-সিদ্ধির ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত যা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে।

ছবিতে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতালের পরিচালনাকে কেন্দ্র করে এক উপকাহিনী সংযোজিত। এই উপকাহিনী ছবির মূল আখ্যানবস্তুকে কক্ষচ্যুত করেছে। মূল বিষয়বস্তুর রস ও আবেদন অনেকখানি গ্রাস করে নিয়েছে। আলোচ্য উপকাহিনীতে রয়েছে এক কৃত্রিম চরিত্র-গোষ্ঠী। ছায়াছবিতে এদের অস্তিত্ব আছে, চলচ্চিত্রপটে হয়তো এরা বাস্তব। কিন্তু মাটির পৃথিবীতে এদের দেখা পাওয়া কঠিন। চরিত্ররাজির মধ্যে রয়েছে এক আদর্শবাদী ডাক্তার যে যক্ষ্মায় মারা-যাওয়া তার বাবা-মা-বোনের করুণ স্মৃতিকে সার্থক করে তুলতে চায় যক্ষ্মা-রোগীদের সেবা ও চিকিৎসায়। বিষয়বুদ্ধির ঊর্দ্ধে তার চিন্তারাজি ঘুরে বেড়ায়। তথাকথিত বিষয়বুদ্ধির চাইতে আদর্শবাদের বোকামিই তার কাম্য। দুঃখের কাহিনী বলার সময় সে করুণভাবে হাসে। কিন্তু তাই বলে অনাসক্ত পুরুষ সে নয়। বন্ধু সতোর পথ থেকে পিছিয়ে গেল বলে তার তীব্র অভিমান। বন্ধুর সম্বন্ধে

সভায় সকলের শেষে হাততালি দিতে দিতে সে প্রবেশ করে। তার চোখে-মুখে ক্ষোভ, গঞ্জনা ও বিদ্রূপ। বিপরীতধর্মী ও কৃত্রিম উপাদানে গঠিত এই চরিত্রের শত্রু দুই কুচক্রী। একজন মালিক, অপরজন তার কর্মচারী। যক্ষ্মা-হাসপাতালের মাধ্যমে কুচক্রীর ব্যবসায় প্রচেষ্টা তথাকথিত হিন্দী-ছবিতে দেখা গেলে দুঃখের কারণ থাকে না। এই ছবিতে যেন এটা অমার্জনীয়। এবং যেভাবে কুচক্রীদ্বয় ছবিতে উপস্থাপিত তাও বাংলা ছবির পক্ষে সুলক্ষণ নয়। তদুপরি মালিক-দুর্বৃত্তকে শেষের দিকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে (এমনকি তার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার সময়) তাতে মনে হয় সে যেন হিন্দী ক্রাইম-ছবির পাপ-চক্রের নেতা। হয়ত পাপ-চক্রের নেতার মতই তার চরিত্রের লক্ষণ। কিন্তু এ-ধরনের ছবিতে এই সাসপেন্স উপাদান খুবই বেমানান। অসার্থকও বটে। কারণ এই ভূমিকার শিল্পীর কণ্ঠস্বর দর্শকদের কাছে অপরিচিত নয়।

অপ্রধান দুটি বিচ্যুতির প্রমাণও ছবিতে অনেক রয়েছে। যেমনঃ চাকুরীদাতা নায়কের বাসস্থানের সন্ধান পেল কী-করে, মফঃস্বলের হাসপাতালে এতজন ডাক্তার থাকা সম্ভব কি-না ইত্যাদি।

ছবির অতি সুচারু প্রয়োগ-ধারায় বহু ব্যবহৃত উপকরণও অনুপ্রবিষ্ট। পূর্ব সংলাপের বার বার নেপথ্য-উচ্চারণ ছবির প্রয়োগ-কর্মে গতানুগতিক ধারারই পরিচয় দেয়। কোন ঘটনা বা চরিত্রের মর্মকথাটি দর্শকের অন্তরে পৌঁছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই সংলাপ বারবার উচ্চারিত। এই বিন্যাস-ধারা রসিক দর্শকের বিরক্তি ঘটায়। মেলোড্রামার দিকে পরিচালকবৃন্দের অকারণ ঝোঁকটিও ছবিতে লক্ষণীয়। নার্সের সিঁথিতে রক্ত পরিয়ে দিয়ে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া এবং স্ত্রীর পক্ষে পূর্ব-প্রস্তুতি নিরপেক্ষে হঠাৎ করে কুচক্রী স্বামীর অপরাধ ফাঁস করে দেওয়ার ঘটনা দুটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘটনা দুটি সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় বহন করে না। অতিরিক্ত সংলাপ অর্থাৎ সুন্দর সাজানো কথা—বাস্তবে যা চলে না—ছবিতে খুবই বেশী। এবং জীবন-সংগ্রামে জর্জরিত নায়কের সংলাপ ও মিছিলের শ্লোগানের দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনিতে একটি বিশেষ মানসিকতার পরিচয় মেলে। যার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামজনিত প্রতিক্রিয়ার সুরটি ধ্বনিত। এই ছবিতে এই সুর অবাঞ্ছিত, অনেকটা যেন প্রচার-ধর্মী।

এত দোষদর্শন সত্ত্বেও বলতে বাধা নেই, এই ছবির গুণের সূচীপত্রটি অনেক বড়। মূল কাহিনীর ভাবরূপটি বাদেও, কাহিনী-কার হিসাবে যাত্রিক-গোষ্ঠী এই ছবিতে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রকাহিনীতে নায়িকা হয়ত নেই, কিন্তু যে তরুণী

মাধুর্যের ডালি সাজিয়ে শান্তচরণে, নম্র নেত্রপাতে, কম্পিত আশায় নায়কের জীবনে এসে দাঁড়িয়েছে দর্শকরা তাকে ভুলবেন না। নায়ক ও তার উপখ্যানটির মধ্যে এক নিরুচ্চার রসের আস্বাদ মেলে। এই উপাখ্যানের অনুচ্চার সুরটি শেষ দৃশ্যে তরুণীর অতিরিক্ত কথায় কিছুটা কেটে গেলেও, তা দর্শকের মন ভরে তোলে। অন্যদিকে হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ও বৃদ্ধা নার্সের দুটি আপাত-সাধারণ চরিত্রকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তোলার মত রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন যাত্রিক-গোষ্ঠী।

যাত্রিক-গোষ্ঠী যে রসসৃষ্টির ক্ষমতারও অধিকারী তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ছবির একাধিক দৃশ্যে। রবীন্দ্রনাথের "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে" গানটি দিয়ে নায়কের জীবনবেদনা ও দ্বন্দ্বের সুরটি ফুটিয়ে তোলার এবং "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না" গানটি দিয়ে একটি ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করার এক সুন্দর, সার্থক রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন যাত্রিক-পরিচালক দল।

তাঁদের লাবণ্য-বীক্ষনের আরও অনেক শিল্পমধুর মুহূর্ত রয়েছে ছবিটিতে। আর সেই সঙ্গে নয়নবিমোহন শিল্পশোভনতা রূপ নিয়েছে ছবির বহিরঙ্গ দৃশ্যগঠনে ও পরিবেশ রচনায়। বহিরঙ্গ শিল্পসৌন্দর্যে এমন বাংলা ছবি বিরল।

নায়ক-চরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় এই ছবির এক বিশেষ সম্পদ। বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে চরিত্রটির মর্মমূলে তিনি স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছেন, এবং সংবেদনশীল অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি এর বেদনা ও বিভ্রম আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রটিতে যথোচিত ব্যক্তিত্ব আরোপের ক্ষমতাও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর বাচনভঙ্গী সুন্দর। শক্তিশালী অভিনেতারূপে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের এই আত্মপ্রকাশকে চিত্ররসিকরা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানাবেন।

এক আদর্শবাদী তরুণ ডাক্তারের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন ছবিটিতে। চরিত্রটির প্রাণোচ্ছলতা ও বিড়ম্বনার মুহূর্তে তাঁর অভিনয় স্মরণীয়।

নায়কের জীবনে পদক্ষেপ ঘটেছে যে তরুণীর, তার শান্ত, মধুর চরিত্রটিকে মরমী করে তুলেছেন কাজল গুপ্ত। শ্রীমতী গুপ্তর নম্র, নির্বাক অভিব্যক্তি মনে দাগ কাটে।

ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায় ও ছায়া দেবী ভিন্ন ধরনের তিনটি চরিত্রের রূপায়ণে অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে ছায়া দেবীর সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে অল্প অবকাশে অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন জীবেন বসু, মঞ্জু দে, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত, তরুণ কুমার ও গীতা দে। ছবির একটিমাত্র দৃশ্যে দেখা দিয়ে যে-প্রখ্যাত শিল্পীরা মনে দাগ রেখে যান তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত ও অসিতবরণ। এক কুচক্রী ম্যানেজারের চরিত্রে নবাগত সোমনাথের অভিনয় আতিশয্যের দোষে দুষ্ট। অন্যান্য ছোট চরিত্রে উল্লেখযোগ্য হলেন অমর মল্লিক, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র, আরতি দাস, ধীরাজ দাস প্রভৃতি।

সংগীত-পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছবির আবহ-সুর রচনায় রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের আবহ-সংগীত মনকে নাড়া দেয়। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়" গানটি দর্শকদের অভিভূত করে রাখে।

আলোকচিত্র-পরিচালনায় অনিল গুপ্ত এবং চিত্রগ্রহণকারী জ্যোতি লাহা এই ছবিতে বিরল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিতে তাঁরা আলো-আঁধারের যে রূপমায়া সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা দুর্লভ। ছবিটির বহিরঙ্গ শিল্পবৈভবের মূলে তাঁদের অবদান সর্বাধিক। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগে যাঁদের কাজ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে তাঁরা হলেন দুলাল দত্ত (সম্পাদক), মৃণাল গুহঠাকুরতা (শব্দধারক) ও সুবোধ দাস (শিল্পনির্দেশক)।

খেলার মাঠে, গ্রহ নয়, তারকা সমাবেশ

অষ্টগ্রহ সমাবেশের বিভীষিকার মধ্যে গত রবিবার চলচ্চিত্রলোকের শিল্পী ও কলাকুশলীরা বহুজনকে আতংক থেকে আনন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ করেছিলেন—অভিনয়ে বা কলাকৌশলের কারুকৃতিতে নয়—ক্রিকেটের মাঠে নেমে, ক্রিকেট খেলা দেখিয়ে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সত্যজিৎ রায়ের ও ছবি বিশ্বাসের দল দুটির মধ্যে। শিল্পী ও কলাকুশলীরা খেলেছিলেন চলচ্চিত্রের দুঃস্থ কলাকুশলী-দের সাহায্যার্থে।

সত্যজিৎ রায়ের দলের অধিনায়ক ছিলেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাসের দলের জে ডি ইরানী। শানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অরুণ দাস ও রণজিৎ সিংহ এই চারজন আম্পায়ারের দায়িত্ব সম্পাদন করে-ছিলেন। ধারাবিবরণী দেন কমল ভট্টাচার্য ও অজয় বসু। খেলায় জয়লাভ করেন সত্যজিৎ রায়ের দল।

শিল্পীদের বিশেষ করে জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই মাঠে এসে উপস্থিত হননি। যে অভিনেত্রীরা মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা খেলেননি বটে, তবে খেলার চাইতে ছোট কাজও তাঁরা করেননি। রোদের মধ্যে সারা মাঠ ঘুরে ঘুরে তাঁরা

ক্রিকেট খেলার মাঠে (বাম থেকে) ভাস্কর গাঙ্গুলী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অসিত সেন

স্মারক পুস্তিকা বিক্রী করেছেন। স্মারক পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ টাকা কলাকুশলীদের সাহায্যেই দান করা হবে। তাই তারা প্রেরণা পেয়েছিলেন পরিশ্রম করতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন রুমা গুহঠাকুরতা, সুলতা চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী গৌরী দেবী ও সন্ধ্যা রায়। স্মারক পুস্তিকা বিক্রয় প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল একটি গীটার। কিন্তু বিজয়িনীর সম্মান আলাদা করে কেউ নিতে চাইলেন না। সকলের মত নিয়ে অবশেষে গীটারটি নীলামে চড়ানো হল। দাম উঠল দেড়শো টাকা। গীটারের মূল্য দান করা হয়েছে কলাকুশলীদের সাহায্য-ভাণ্ডারে।

খেলার শেষে শুরু হল পুরস্কার বিতরণ। পুরস্কার বিতরণ করলেন মধু বসু। বেশী রান তোলার জন্যে ও বেশী উইকেট নেবার জন্যে একটি করে মারফি রেডিও পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে ইন্দর সেন ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় ও ছবি বিশ্বাস তাঁদের নিজেদের দলের হয়ে দুটি শিল্ড হাত পেতে নিলেন মধু বসুর কাছ থেকে। দুই দলের অধিনায়ক পেলেন একটি করে কাপ। তা-বাদে খেলোয়াড়, আম্পায়ার, স্মারক পুস্তক বিক্রেতারা সকলেই পেলেন স্মারক-ব্যাজ। ক্রিকেট খেলার আয়োজনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য স্মারক-ব্যাজ পেলেন অসিত চৌধুরী। কানু বিনা যেমন গীত নেই, চলচ্চিত্রমহলেও বুঝি অসিত চৌধুরী বিনা বড় কিছুর আয়োজন নেই। মাঠে স্বেচ্ছা-সেবকদের পরিচালনা করা থেকে আরম্ভ করে বিরতির সময়ে খেলোয়াড়দের লাঞ্চের তদারক করা, এবং যাবতীয় আর সব ব্যবস্থা-পনার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত দেখা গেল। স্বেচ্ছাসেবকরা—যাঁদের অধিকাংশই তরুণ কলাকুশলী—আন্তরিকতার সঙ্গে অমানুষিক পরিশ্রম করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেছেন, শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। সুশৃঙ্খল এই ক্রিকেট খেলার আয়োজনটি বাংলা চলচ্চিত্রজগতের একটি বড় ঘটনা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্রীড়ামোদীদের কৌতূহল মেটাবার জন্য ক্রিকেট খেলার স্কোর নীচে দেওয়া হল:
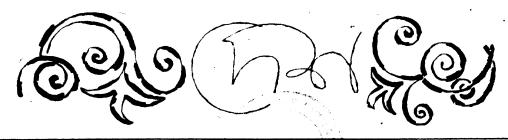
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 17th February, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ১৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

নির্বাচন ও আচরণ

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশের নানা জায়গায় কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচন-প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমর্থকগণের সংঘর্ষে প্রাণহানিও ঘটেছে। কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য ১৪৪ ধারা অনুযায়ী আদেশ জারী করতে হয়েছে। এরকম ঘটনার সংখ্যা সারা দেশে হয়ত খুব বেশী নয়; নির্বাচন উপলক্ষে অশান্তি নিবারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হয়ত খুব বেশী জায়গায় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে না। তবুও সুস্থবুদ্ধি নাগরিক-মাত্রেই আশা করি স্বীকার করবেন যে ভোটের লড়াই উপলক্ষে মারামারি, রক্তারক্তি ঘটা খুবই অসংগত। এরকম সব ব্যাপার ঘটা গণতন্ত্রের বিকাশ ও স্থায়িত্বের পক্ষে কখনই অনুকূল নয়।

নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে শিষ্টাচার, শোভনতা এবং পরস্পর সহিষ্ণুতার নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি সকলেরই মান্য করা উচিত। সকলেরই মানে যাঁরা নির্বাচন দ্বন্দ্বে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত প্রার্থী, প্রার্থীর প্রচারক ও সমর্থকগণ, ভোটাররা এবং নির্বাচনী অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার যাঁদের উপর সেই কর্মচারীমণ্ডলী। নির্বাচনী-অনুষ্ঠান পরিচালক সরকারী কর্মচারী মণ্ডলীর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অপক্ষপাত আচরণ সম্বন্ধে আপাতত কোনও গুরুতর অভিযোগ নেই। অন্তত গত দুটি সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, তাঁরা মোটের পর যথেষ্ট সতর্কতা এবং সততার সংগে তাঁদের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ভোটাররাও নির্বাচন উপলক্ষে নিজেরা কোনরকম অশান্তি বা হাংগামা সৃষ্টি করেন না। গোলমাল যা ঘটে তার মূল কারণ নির্বাচন-প্রার্থীদের প্রচারক ও সমর্থকগণের অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং উৎসাহের আতিশয্য।

নির্বাচনীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট আচরণবিধি কাগজেপত্রে অনুমোদন করে সুফল প্রত্যাশা বৃথা। যতদূর জানি কোন কোন রাজ্যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দল নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় শিষ্টাচার ও শালীনতা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাকে বলা হয় "ভদ্রলোকের চুক্তি" তাকে মান্য করাই ভদ্র রীতি। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ছলে বলে কৌশলে জব্দ করার লোভও কখনও কখনও দুর্নিবার হয়। তারপর ভোটের লড়াই-এর অস্বাভাবিক উত্তেজনাও অনেক সময়ে হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মারামারি, রক্তারক্তি, ছাড়া আরও নানা-রকম অশোভন ব্যাপার ঘটে থাকে। ব্যক্তিগত কুৎসাপ্রচারও শালীনতা-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক রীতি-বিগর্হিত। আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সব রকম গর্হিত আচরণই অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। সাময়িক সুবিধার উপর নজর রেখে এই সব নীতিহীন, অশালীন কিম্বা শান্তিভঙ্গকারী আচরণকে উপেক্ষা করলে বা প্রশ্রয় দিলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই লোকে ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ ও বীতরাগ হবে।

প্রয়োজন সুদ্ধ লিখিত পঠিত আচরণ-বিধি রচনার নয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রয়োজন রীতিমত দায়িত্ব-শীল চেতনা-সম্পন্ন ঐতিহ্য সৃষ্টির। অন্যান্য বহু গণতন্ত্রী দেশের কথা জানি, সেখানেও সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে তীব্র প্রচার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এবং তাঁদের সমর্থকগোষ্ঠীদের মধ্যে মারামারি, রক্তা-রক্তি কাণ্ড ঘটে না; প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসার কাদা ছোড়াছুড়ির দৃষ্টান্তও বিরল। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচন যে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ভোট-দাতাদের নিয়ে টানাটানি, মারামারি হয় না তার প্রধান একটি কারণ সাধারণ নাগরিকমাত্রেই রাজনীতি - সচেতন, নির্বাচনের উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন দলের কর্মসূচী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভোটার এখনও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ গ্রহণে অনভ্যস্ত; কাজেই নির্বাচন-প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবং তাঁদের অত্যুৎসাহী সমর্থকরা ভোটারদের নিজে-দের দিকে টানবার জন্য গলার জোর অথবা গায়ের জোর খাটাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। ভোটের লড়াইয়ে শোভন ও সুপরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক আচরণের ঐতিহ্য সৃষ্টির সব চেয়ে বড় বাধা অধিকাংশ ভোটারের অসহায় মনোভাব এবং অপরিণত আত্মমর্যাদা-বোধ।

সন্দেহ নেই যে এর প্রতিকার সহজে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মারামারি, বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন এবং প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার ইত্যাদি বন্ধ করা বিষয়ে সুদ্ধ গভর্নমেন্টের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা বৃথা। আমরা চাই সাধারণ নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হোক অর্থাৎ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রার্থীদের সংগে ভোটারদের যোগাযোগ স্বচ্ছন্দ এবং অবারিত হওয়াই গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রার্থীরা এবং তাঁদের সমর্থকগণ যদি এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন, এমন অবস্থা সৃষ্টি করেন যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিম্বা ভোটাররা সন্ত্রস্ত, লাঞ্ছিত বা অপমানিত হন তাহলে সমস্ত নির্বাচনী উদ্যোগটাই মারাত্মক পরিহাসে পরিণত হয়। যতদূর দেখা যায় এ-অবস্থা সৃষ্টি করা ব্যাপারে প্রধানত দায়ী এমন কোন কোন রাজ-নৈতিক দল এবং প্রার্থী গণতন্ত্রের প্রতি যাঁদের প্রকৃত অনুরাগ নেই, যাঁদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করাটা দেশের অথবা জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য জনচিত্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও গূঢ় দলীয় স্বার্থ সাধন।

আয়ুব এবার বাঘের ন্যাজ ধরেছেন।
ধরে রাখাও শক্ত আবার ছেড়ে দেওয়াও শক্ত !
পূর্ব পাকিস্তান
পশ্চিমী গোষ্ঠী নতুন করে আবার আনবিক পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
শীর্ষ সম্মেলনের পথটা হয়ত সুগম হল !
অশোক স্তম্ভ, এবং অশোক সেন
কমিউনিস্ট পার্টি
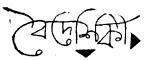
নেপালে রাজা মহেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে ক্রমশ বিস্তার-লাভ করছে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নেপালের পূর্বে এবং পশ্চিম উভয় খণ্ডেই জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে রাজকীয় সৈন্য বা পুলিসকে হটে আসতে হয়েছে। রাজা এবং তাঁর পক্ষীয় প্রচারকদের একটা বাঁধা বুলি আছে যে, বিদ্রোহীরা ভারতভূমি থেকে কাজ করার সুবিধা পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এরূপ প্রচারও চলছে যে, বিদ্রোহীরা ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রশ্রয় এবং সাহায্য পাচ্ছেন। এরূপে প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ধারণার সৃষ্টি করা যে, রাজার স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁরা বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক, বিদেশী শক্তির কাছে তাঁরা নেপালের জাতীয় স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত, ইত্যাদি। রাজা মহেন্দ্রের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরি ভারত সরকারকে সোজাসুজি নেপালের স্বাধীনতার শত্রু বলতেও দ্বিধা করেন নি।

আসলে কিন্তু রাজা মহেন্দ্র এবং তাঁর অনুচরগণ যে-নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সেটাই নেপালের কেবল স্বাধীনতা নয়, ভালো সব-কিছুরই শত্রু। ভারত সরকার নেপালের স্বাধীনতার শত্রু নন, বন্ধু, নেপালে বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার সৃষ্টি হয়, এটা ভারত সরকার আদৌ চান না। তার একটা বড়ো কারণ এই যে, বর্তমানে নেপালের কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের বুদ্ধি, চরিত্র এবং দায়িত্বজ্ঞানের উপর কোনো ভরসা নেই। এঁদের অদূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধি নেপালে চীনা অনুপ্রবেশের কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছে এবং কোনো সময়ে একেবারে চীনাদের জন্য সদর রাস্তা খুলে দিতে পারে। তখন যে অবস্থার উদ্ভব হবে এবং যে-দায়িত্ব ভারতের উপর এসে পড়বে সেটা ভারত সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই খুব স্পৃহনীয় নয়। সুতরাং সে-রকম অবস্থার উদ্ভব যাতে না হয় ভারত সরকারের সেই দিকেই লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক।

কার্যত বিদ্রোহীদের কোনোরকম সাহায্য ভারত সরকার করছেন না, বরঞ্চ নেপাল-ভারত সীমান্ত দিয়ে বিদ্রোহীদের অনুকূল অস্ত্রশস্ত্রের বা লোকজনের চলাচল বন্ধ করার জন্য অনেকগুলি নূতন চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। তবে ভারতবাসীদের নৈতিক সহানুভূতি যে বিদ্রোহীদের দিকে আছে এবং থাকবে একথা কেউ অস্বীকার করে না। নেপালের মঙ্গলকামীদের পক্ষে

এইটাই স্বাভাবিক। নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে-সংগ্রাম বর্তমানে চলছে নেপালে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। নেপালের জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষার দিক দিয়েও সেই নেতৃত্ব মহেন্দ্রের মতো রাজা এবং ডাঃ তুলসী গিরির মতো মন্ত্রীর চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু নেপালে গৃহযুদ্ধ চলুক এটা ভারতবাসীরা চায় না। তারা এখনো রাজা মহেন্দ্রের সুবুদ্ধির উদয়ের আশা করছে।

বিদ্রোহের নেতাদের বিদেশী সাহায্যপুষ্ট দেশদ্রোহী বলে প্রচার করে নেপালী জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা সফল হবে না, এটা রাজা মহেন্দ্রের এতোদিনে বুঝতে পারা উচিত। রাজাকে সরাবার মতলব নেপালী কংগ্রেসের কোনদিন ছিল না, কনস্টিটিউশনাল রাজতন্ত্র বজায় রেখে গণতান্ত্রিক শাসনের সুপ্রতিষ্ঠাই নেপালী কংগ্রেসের বরাবরের লক্ষ্য। রাজা মহেন্দ্র কৈরালা মন্ত্রিমণ্ডলীর নামে নানা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁর প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদলের সাহায্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উল্টে দিয়ে রাজকীয় স্বৈরাচারী শাসন চালু করেন। গণতান্ত্রিক নেতাদের কারারুদ্ধ, নির্বাসিত বা কর্মহীন করে রেখে রাজকীয় একাধিপত্য চালিয়ে রাজা নেপালের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেননি, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রেই যা সমস্যা ছিল তা এখন সংকটের আকার নিয়েছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদের উপর শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে রাজা মহেন্দ্র পারবেন না, আর তাদের উপর জয়ী হওয়া যদি সম্ভবও হয় তবে তা নেপালের পক্ষে—নেপালের কেবল আভ্যন্তর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পক্ষে নয়, নেপালের জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষেও মারাত্মক হবে। শ্রীবিশ্বেশ্বর কৈরালাকে মুক্ত করে তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে বসে নেপালের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের আলোচনা করার সদিচ্ছা যদি এখনো রাজা মহেন্দ্রের হয়, তবে সেটা যেমন নেপালের পক্ষে তেমনি তাঁর নিজের পক্ষেও মঙ্গলকর হবে। বিদ্রোহীদের উপর জয়ী হয়ে নেপালকে এবং নিজেকে বাঁচাতে রাজা মহেন্দ্র পারবেন না, নেপাল এবং নিজেকে বাঁচাতে হলে রাজা মহেন্দ্রকে নিজের উপর অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার লোভের উপর, নিজের নিরংকুশ একাধিপত্যের লোভের উপর জয়ী হতে হবে। রাজা মহেন্দ্রের কাছ থেকে সেটা প্রত্যাশা করা অত্যন্ত কঠিন, সেইজন্য নেপাল সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এতো বেশী।

* * *

সুরাবর্দী সাহেবের গ্রেপ্তার এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা সূচিত পাকিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থার সঙ্গে সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর নিয়ে খানিকটা হৈচৈ সৃষ্টি করার চেষ্টার যোগ ছিল বলে অনুমান হয়। এই সম্পর্কে গত সপ্তাহের বৈদেশিকীতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছিল। তবে পাকিস্তান সরকারের অনুরোধ যদি পুরোপুরি পালিত হোত এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশনে কাশ্মীর প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা স্থগিত না রেখে সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দেওয়া হোত তাহলে পাকিস্তানী কর্তারা যা চেয়েছিলেন তার উল্টো ফল হোত অর্থাৎ পাকিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থার দিক থেকে পাকিস্তানীদের মনোযোগ সরে যাওয়ার পরিবর্তে পৃথিবীর মনোযোগ সেইদিকে আরো বেশী আকৃষ্ট হোত। সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর আলোচনা আরম্ভ হলে ভারত বিদ্বেষী প্রোপাগাণ্ডার জোয়ারে পাকিস্তানের ভিতরে জমা অসন্তোষ ভেসে যাবে, এরূপ আশা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের সেই অসন্তোষের পরিমাণ সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পুরো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যতটা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায় যে, যে অসন্তোষ জমে ছিল তার বাহ্য প্রকাশ কোনো প্রোপাগাণ্ডার কৌশলের দ্বারাই ঠেকিয়ে রাখা যেতো না।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা এবং পূর্ব পাকিস্তানের এই গোলমাল এক সঙ্গে চলতে থাকলে আয়ুবশাহীর কর্তারা নিশ্চয়ই খুব স্বস্তিবোধ করতেন না এবং কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানী দাবীকে সমর্থন করতে পাকিস্তানের মিত্রদের আর কিছু না হোক একটু বাধো-বাধো অবশ্য ঠেকত। যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সেল্ফ ডিটারমিনেশন নীতির কথা কাশ্মীরীদের সম্পর্কে করাচীর কর্তারা তুলতে চান, সেই নীতির পুনঃপ্রয়োগের দাবী যে পাকিস্তানের ভিতর থেকেও উঠতে পারে, পৃথিবীর সামনে এই ব্যাপারটা প্রকট হওয়া পাকিস্তানী প্রচারকদের পক্ষে মোটেই রুচিকর নয়। সুতরাং সিকিউরিটি কাউন্সিলে যে কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায় সেটা পাকিস্তানী কর্তাদের পক্ষে ভালোই হয়েছে, তা না হলে যে অস্ত্র তাঁরা ভারত সরকারকে লক্ষ্য করে ছোড়ার আয়োজন করছিলেন সেটা উল্টে এসে তাঁদেরই আঘাত করত।

কিন্তু পাকিস্তানী কর্তাদের যেন ঐ একটি ভারত-বিদ্বেষী প্রচার ছাড়া অস্ত্র নেই। পাকিস্তানের যা কিছু মুশকিল সবের মূলেই যেন বাইরে অর্থাৎ ভারতে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে যারা গোলমাল করছে তাদের প্রতি বলপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আর যা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তাদের সঙ্গে ভারতের নাম যুক্ত করে কুৎসা রটনা। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থায় যারাই বিষাদগ্রস্ত, যারাই পাকিস্তানের পূর্ব খণ্ডের উপর পশ্চিম খণ্ডের আধিপত্যের লাঘব চায়, যারাই মিলিটারী ডিক্টেটরশিপের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী, তারাই বিদেশী প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত, বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িত, আয়ুবশাহীর বিরোধীরা পাকিস্তানের সর্বনাশের চেষ্টা করছে, ইত্যাদি রটনা চলছে।

এই ধরনের প্রোপাগাণ্ডা পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের সহায়ক হতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বাধিকার এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা চাওয়ার সঙ্গে বাইরের কোনো শক্তির প্ররোচনা আবশ্যক করে না। যারা মিলিটারী ডিক্টেটরশিপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চায় না তারা নিজেদের স্বাধীনতা বৃদ্ধিই চায়, অন্য কোনো শক্তির তাঁবেদারি করতে চায় না। আর ভারত সম্বন্ধে বলা যায় যে, যারা ভারত সরকারের মনের গতির কোনোরকম খবর রাখে তারাই জানে যে পূর্ব পাকিস্তানকে কবলিত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নয়াদিল্লীর কর্তাদের মনে নেই, এমন কি পূর্ব পাকিস্তান সেধে এলেও ভারতের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব বর্তমান ভারত সরকার বিবেচনা করতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই। পূর্ব পাকিস্তানের সুখ দুঃখের সহানুভূতি আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম এবং নৈতিক কর্তব্য। পূর্ব পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ভারতের প্রতি আরোপ করে সেই সহানুভূতির নির্মলতা নষ্ট করার চেষ্টা যেন সফল না হয়।

১৩।২।৬২

ধ্বনি (৩)

ইংরিজী ধ্বনি

ইংরিজী সব কটি ধ্বনি ভালো করে শিখে নিলে কন্টিনেন্টাল তথা আরবী ফার্সী ইত্যাদি ভাষা শিখতে প্রচুর সুবিধা হয়।

ইংরিজী f, v, z ধ্বনি পশ্চিম বাঙলায় নেই, কিন্তু পূব বাঙলায় আছে। 'ফাল মারা' (লম্ফ দেওয়া) বলার সময় পূব বাঙলার লোক ইংরিজী f উচ্চারণ করে; পশ্চিম বাঙলার মহাপ্রাণ ফ নয়। পশ্চিম বাঙলায় আমি শুধু একটি শব্দে ইংরিজী f শুনেছি, [illegible] শব্দের [illegible] [illegible] প্রফুল্ল [illegible] মহাপ্রাণ [illegible] নিয়ে ঐ শব্দটি উচ্চারণ [illegible] [illegible] [illegible] ঠিক তেমনি [illegible] পারো না [illegible]। খাঁটি ইংরিজী v পূব বাঙলায়ও কম শোনা যায়।

আরেকটি ধ্বনি ইংরিজীতে ঘন ঘন আসে, কিন্তু তার জন্য বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। Pleasure, Vision বলতে যে z জাতীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেটি z নয়। এ ধ্বনিটি ভালো করে শিখতে হয়, কারণ ফরাসীতে এর ছড়াছড়ি [illegible] [illegible] [illegible] কর্মাতে নয় (ফরাসী Bon Jour [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপরের রীতিতে উচ্চারণ করতে হয়। খাঁটি জর্মনে এ উচ্চারণ নেই, ফার্সীতে একদা ছিল, এখন নেই।

এ ছাড়া thin এবং there-এ যে th-এর দুই ভিন্ন উচ্চারণ আছে, সেগুলোও অল্প-স্বল্প কাজে লাগে, তবে ফরাসী, জর্মন, রুশ, ইতালিয়ানে নয়।

ফরাসী ধ্বনি

প্রথমেই মনে রাখা উচিত, ফরাসীতে স্বরধ্বনি প্রচুর। গুরুর সাহায্য বিনা সেগুলি আয়ত্ত করা কঠিন।

ফরাসীতে একদা শব্দের শেষ ব্যঞ্জন আদপেই উচ্চারিত হত না। দ্যুপ্লে যখন এ-দেশে আসেন, তখন তাঁর নামের শেষ Xটি উচ্চারিত হত না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে সব অক্ষর উচ্চারণ করার বাই দেখা দেয়। ফলে দ্যুপ্লে এবারে দ্যুপ্লেক্‌স্‌ হয়ে গেলেন—এখন ফরাসী দেশে গিয়ে দ্যুপ্লে বললে সাধারণ জন ধরতে পারে না, কার কথা বলা হচ্ছে। একদা তাই Aix-la-Chapelle (জর্মন

শহর Aachen-এর ফরাসী নাম) ফরাসীরা এ্যা-লা-শাপেল করত, কোনো কোনো ইংরেজ এখনো সে উচ্চারণ বাঁচিয়ে রেখেছে।১ এখন উচ্চারণ এ্যাক্‌স্‌-লা-শাপেল। ঠিক ঐ কারণেই Chamonixকে ইংরেজ উচ্চারণ করে শ্যামনি, ফরাসী করে শামোনিকস্‌।

তবে মোটামুটি বলতে পারা যায়, অধুনা ফরাসী শব্দের শেষে ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারিত হয় না। যেমন Paris পারি, Calais কালে (প্যারি কিছুতেই নয়, কারণ ফরাসী a-র উচ্চারণ কখনো এ্যা হয় না)। কিন্তু এরও ব্যত্যয় আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা শিষ্যা ছিলেন Karpeles, উচ্চারণ কার্পেলেজ, কারণ ‘স’-এর পূর্বের eতে এ্যাকসেণ্ট আছে।

স্বরবর্ণে ফরাসীর কতকগুলো ধ্বনি আছে, যেগুলো ইংরিজীতে নেই, কিন্তু জর্মনে আছে। এগুলো বাঙলাতেও নেই বলে বেশ মন দিয়ে শিখতে হয়। এবং বিপদ এই যে, ফরাসীতেও সেগুলোর জন্য বিশেষ চিহ্ন নেই। জর্মন সেগুলো আপন ভাষায় প্রকাশ করে a, o, u স্বরের উপর দুটি দুটি ফুটকি দিয়ে ও এগুলোকে বলা হয় উম্‌লাউট্‌। ফরাসীতে সচরাচর এই ধ্বনিগুলো eu, euille, un ইত্যাদি দিয়ে বোঝানো হয়। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো প্যাঁচালো বলে মনে হলেও উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে দু-তিন দিনের ভিতর শেখা যায়। একবার ফরাসী বা জর্মন শিখে নিলে অন্য ভাষার জন্য নূতন করে শিখতে হয় না।

আমরা ব্যোম শব্দ উচ্চারণ করতে যে স্বর উচ্চারণ করি, তার কিছুটা মিল আছে এরই একটি ধ্বনির সঙ্গে। জর্মন কবি গ্যোটের নাম লেখা হয় Goethe (oe না লিখে o-র উপরে দুটি ফুটকি দিলে একই উচ্চারণ হয়) এবং আমাদের ব্যোমের কাছাকাছি আসে (ফরাসী ঔপন্যাসিক Gauthier, উচ্চারণ পরিষ্কার গতিয়ে)। Goetheকে অনেকে গ্যোটে লেখেন; তা হলে সেটা অনেকটা Gaethe-র কাছে এসে যাবে, অর্থাৎ o স্থলে a এসে যাবে। Goering-এও Goethe এর উচ্চারণ, কিন্তু Goebbles-এর oe খোলা (open) উচ্চারিত হয়।

আমরা নূতন শব্দ উচ্চারণ করতে যে স্বর উচ্চারণ করি, সেটা ফরাসী u ধ্বনির কিছুটা কাছে আসে। এই ধ্বনিই জর্মনরা বোঝায় u-এর উপর দুটি ফুটকি দিয়ে। ফরাসী Musee (ম্যুজে=আর্ট গ্যালারি), কিংবা Puree (প্যুরে=আলু-ভাতের মত চটকানো খাদ্য)। জর্মনে ue বা u-র উপর ফুটকি দিয়ে। Mueller (মাক্‌স্‌ ম্যুলার), Nuerenberg (ন্যুরনবের্গ)।

ফরাসীতে শেষ e উচ্চারিত হয় না; অবশ্য তার উপর যদি কোনো accent চিহ্ন দেওয়া থাকে, তবে সেই অনুযায়ী উচ্চারিত হবে। সেটি অতি সহজ, অর্থাৎ বাঙালীর পক্ষে। এস্থলে ইংরেজকে অনুকরণ করতে যাবেন না। ফরাসী Lessee (শেষ e-র উপর accent আছে) শব্দের অর্থ ভাড়াটে, যে লীস নিয়েছে, উচ্চারণ হবে লেসে। ইংরেজ করে লেসী—অবশ্য ইংরিজী ভাষা বলার সময় তারই পদ্ধতি মানতে হবে বইকি।

এ-স্থলে বাঙলা একটি শব্দ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আমরা যখন রোঁদে বেরই, তখন সচরাচর ভাবি ওটা ইংরিজী round থেকে এসেছে। আমার মনে হয়, ওটা ফরাসী ronde (উচ্চারণ রঁদ, রোঁদ), অর্থ পেট্রোলে বেরনো, থেকে এসেছে। কারণ ইংরিজী রাউণ্ড তার স্বীয় ইংরিজী উচ্চারণ নিয়ে বাঙলায় আছে। তদুপরি ইংরিজী sound, hound ইত্যাদি যথাক্রমে বাঙলায় সোঁদ, হোঁদ হয়নি। ফরাসীতে কিন্তু উচ্চারণ ঠিক আমাদের বাঙলারই মত। আমার মনে হয়, প্রথম চন্দননগরেই পুলিস (জাঁদার্ম) ‘রোঁদে’ বেরুতে আরম্ভ করে, পরে যখন কলকাতায় চালু হয়, তখন ঐ ফরাসী শব্দটিই নেওয়া হয়। হালে বাঙলায় পুলিসের পরব হয়ে গেল—তাঁরা অনুসন্ধান করতে পারেন। (২)

ফরাসী ch সর্বত্রই বাঙলার শ; কোনো-স্থলেই ‘চ’ নয়, কারণ ফরাসীরা চ উচ্চারণ করতে পারে না। তাই শ্যাম্পেন=Champagne, ফরাসীতে শাঁপাঁন (gn একই সিলেবলে এলে একটু অন্য রকমের উচ্চারণ হয়, কিন্তু সেটা কিছু কঠিন নয়) শার্ল (Charles ইংরিজি চার্লস) ইত্যাদি পূর্বেই অন্য প্রসঙ্গে আলোচিত হয়। কিন্তু ch যদি l কিংবা r-এর আগে আসে, তবে উচ্চারণ ‘ক’। ক্লরফর্ম, ক্রনিক ইত্যাদি। এবং প্রতিধ্বনি (echo) শব্দে ‘এশো’ না হয়ে ‘একো’। কিন্তু এগুলো কঠিন নয়, দু-এক দিনেই হয়ে যায়।

ille এক সঙ্গে এলে তার উচ্চারণ প্রায় হয়ই না। কিন্তু কতকগুলো শব্দে হয়। অন্যতম ville, উচ্চারণ ভিল (অবশ্য ‘ভ’ ইংরিজী v-র মত), অর্থ শহর। যদিও hotel শব্দের অর্থ হোটেল তবু hotel de ville শব্দের অর্থ টাউনহল। একবার এক ভ্রমণকারীকে প্যারিসের hotel de ville-কে বাঙলায় ‘শহরের এক বিখ্যাত হোটেল’ বলে অনুবাদ করতে দেখেছি!

সেখানে গিয়ে পাত পাড়লেই চিত্তির।

(আগামীবারে সমাপ্য)

---

(১) যুদ্ধের সময় ফরাসী বেতার ঘোষণা করে, ইংরেজ এ্যাক্‌স্‌-লা-শাপেল শহরে আকাশ থেকে বোমা ফেলেছে। জর্মন বেতার ঘোষণা করে, ইংরেজ আথেনের উপর বোমা ফেলেছে। B B C-র সংবাদ ‘পরিবেশক’ দুটো যে একই শহরের ভিন্ন ভিন্ন নাম না জেনে, দুই ভিন্ন ভিন্ন আইটেমে খবর দিলেন, একবার এ্যাক্‌স্‌-লা-শাপেলে বোমা পড়েছে, অন্যবার আথেনে, একই নিউজ বুলেটিনে!

আসলে শব্দটি লাতিন আকুইস গ্রানুম।

(২) আমার জানা মতে মাত্র আরেকটি ফরাসী শব্দ সোজাসুজি বাঙলায় এসেছে। জগদ্ধাত্রীপুজো (বা অন্য ঐ ধরনের কোনো দিনকে) চন্দননগরে ফেস্তা বলে। সেটাও বোধ হয় ফরাসী ফেৎ, ফেস্তের, ফেস্ত—পরব অর্থে—থেকে এসেছে। বাকি প্যাঁস-নে, শোফার ইত্যাদি ইংরিজীর মারফতে বাঙলায় এসেছে।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা

"দেশ" সম্পাদক সমীপেষু,

গত ১৩ই মাঘের 'দেশ' সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত "ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। লেখকের মুখ্য বক্তব্য এই যে, যহেতু ব্যক্তিকে নিয়েই রাষ্ট্র, সেহেতু ব্যক্তিগত নৈতিক অধঃপতন ও দায়িত্বহীনতাই আজকের ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাসনিক ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ এবং ব্যক্তিগত নৈতিক মানের উন্নতি সাধিত হ'লে অতি সহজেই রাষ্ট্রীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, শুধুমাত্র সরকারকে দোষারোপ ক'রে নয়।

এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে, ব্যক্তিগত উন্নতি ও চরিত্রের ওপর। যে জিনিসটার অভাব আজকাল ভারতে বড় বেশী দেখা দিয়েছে — কিন্তু মূলে ক্ষতটা সেখানে নয়। সেটা সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের আরো গভীরে। এটি শুধু তার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বর্তমান সমাজজীবনে যখন আমরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল সেখানে আদর্শ, চরিত্র ইত্যাদি গুণাবলী একটি আপেক্ষিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। বৃটিশের পরাধীনতা, ধনিকতন্ত্রের নির্মম শোষণ ও মনুষ্যত্বহীনতা, চোরা-কারবারী, যুদ্ধ, দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারত যে জগতে আজ নির্বাসিত সেখানে মহৎ আদর্শ ও মহান চরিত্রের যথেষ্ট অভাব ঘটেছে বলেই আমার বিশ্বাস। স্বাধীনতা লাভের পর যে নতুন আদর্শ ভারতবর্ষের স্বপ্ন বলে আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ কাগজে-কলমে দেখিয়েছেন তাতেও আন্তরিকতার অভাব।

লেখক ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন কোন জায়গায় গোলমাল করে ফেলেছেন। যদিও ব্যক্তিকে নিয়েই সরকার ও রাষ্ট্র তথাপি সরকার ও রাষ্ট্র ব্যক্তি থেকেও ক্ষমতাশালী বেশী। রাষ্ট্র একটা সংস্থা, ব্যক্তি একটা ক্ষুদ্র শক্তি। যদি আমূলভাবে সেই সংস্থা বা সংগঠনীর পরিবর্তন না হয় সেখানে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব তার শত মহৎ আদর্শ ও মহান চরিত্র সত্ত্বেও সংস্থার পচনশীলতায় নিজের অপমৃত্যু ঘটাতে বাধ্য, অন্যথায় জীবন-সংগ্রামে সে হবে ভয়ানকভাবে ব্যর্থ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
দক্ষিণেশ্বর।

তি ন টি ক বি তা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কু য়া শা য়

॥ ১ ॥

আজ ভোরে বাড়িঘর কুয়াশায় নিয়েছে কবর,
পৃথিবী মৃতের স্থান মনে হয় তাই,
কিম্বা রোগী হাসপাতালের সাদা সিক্ত বিছানায়।
আমার মনের প্রান্তে মৃত কথা মৃত ছবিগুলি
এনে দেয় বুলিয়ে কে সাদা-রং তুলি!
তার হাতে হায়
নবতন কিছু নেই পুরাতন স্পর্শ শুধু পাই,
আর্ততায় এ হৃদয় কাঁপে থরথর!

ভয়ের শরীর
আমার হৃদয়ে করে ভিড়
মৃত পৃথিবীর কথা আনে।
জানে মন জানে
অমৃতের পুত্র নেই কেউ,
শুধু মৃত্যু ঢেউ ভাঙে আর তোলে ঢেউ॥

রৌ দ্র - মে ঘ

॥ ২ ॥

আশ্বিনের রৌদ্রভরা মেঘে
কৈশোরের দূরে স্মৃতি লেগে
ছবি কি আঁকায় মনে-মনে!
যে ছবি পালিয়ে যাওয়া এক বালকের,
শহরের ঘের
যাকে ধরে রাখতে পারেনি!—
চলে গেছে গ্রামে!
সেখানে হঠাৎ বুঝি থামে
দ্যাখে এক বালিকার বেণী!
দুজনের দুটো কথা থাকে শুধু জেগে
সমস্ত আশ্বিনময় বুঝি!

হৃদয়ে সে কথা আজও খুঁজি
প্রৌঢ়তায় এসে।
সে কিশোর-কিশোরীকে আমি ভালোবেসে
রেখে কি দিইনি মনে ছবির মতন?
আশ্বিনের রৌদ্রমেঘে করে তারা এখনো উন্মন॥

প্র তী ক্ষা য়

॥ ৩ ॥

পূবের সূর্য যে গেল পশ্চিম আকাশে,
আর কত দীর্ঘ হবে বলো এ জীবন,
তোমার চিতার ভস্ম স্মৃতিকে করবে নিপীড়ন
যেন মৃত্যু-গ্রাসে
আর কত দীর্ঘকাল বলো!
রক্তে ছলছলো
করত যে ভালোবাসা তা-ও শুষ্ক আজ।
তেমনি ত আছে সব রমণী-সমাজ
তবু সব ছেপে কালো চিতাধূমে শুধু
ওঠে ভবিষ্যৎময় ধূ-ধূ।
তোমার প্রতীক্ষা আছে আর কিছু নেই
অন্য আকাশের তলে শুধু তোমাকেই
পাব বলে আছি।
মনে মনে গাঁথি আজ ফেলে-যাওয়া ছিন্ন মালাগাছি॥

২২ জানুয়ারি

জাপানে আমার শেষ কর্তব্য—রেডিওতে বক্তৃতা—গতকাল সম্পন্ন করেছি। যাবার আগে আজকের দিনটা ছুটির। মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ ছিলো এক বাঙালি রাজপুরুষের বাড়িতে; সেখানে মুগের ডাল ও আলু-কপির ডালনায় প্র. ব. চমৎকৃত, আর সর্ষে দিয়ে রাঁধা মাছের ঝোলে, আমি। সন্ধেবেলা ওটা-দম্পতি এলেন; রাত্রে, হোটেলের দরজায়, আমাদের এখানকার নিত্যসঙ্গী সাবুরো ওটার কাছে বিদায় নিতে হ'লো। এ-যাত্রায় তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

কেন এমন হয় যে বিদেশীমাত্রেই জাপানে এসে দেশটার প্রায় প্রেমে প'ড়ে যান? অন্যান্য দেশ নিয়ে মতভেদ ঘটে, শোনা যায় নানাজনের মুখে নানা দিক থেকে প্রশংসা বা তার উল্টোটি, আর নির্ভেজাল প্রশংসা, বিলেত-পাগলা দিশি ছোকরাদের মুখে ইংলণ্ড বিষয়ে ছাড়া, প্রায় কারো মুখেই শোনা যায় না। কিন্তু জগৎ যেন জাপান বিষয়ে এক-মত; হোক য়োরোপীয়, ভারতীয় বা মার্কিনী সকলের পক্ষেই জাপানের মোহ দুর্বার। সকলেই, জাপান বিষয়ে কিছু বলতে গেলে, স্বতই একই ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করেন; আমার এই লেখাটাতেও ছড়িয়ে আছে 'মনোরম', 'রমণীয়', 'সুচারু' প্রভৃতি শব্দপর্যায়, যার মর্মাংশ হ'লো—মনোমুগ্ধকর। এবং মনোমুগ্ধকর বলতে ঠিক যা বোঝায়, উদারতম ও গভীরতম অর্থে জাপান হ'লো তা-ই; তার মানুষ, তার নিসর্গ, তার আচার-ব্যবহার—বাইরে থেকে হঠাৎ এসে যা-কিছু চোখে পড়ে, কোনোটাই এই বর্ণনার বহির্ভূত নয়। আছে এমন দেশ যার দৃশ্য ভীষণের মিশ্রণে আরো বেশি সুন্দর, যার সভ্যতা আরো পুরোনো বা সমৃদ্ধ, কিংবা যার উন্নতির স্তর আরো বেশি উঁচু:—কিন্তু আর-কোনো দেশ নেই, যাকে চোখে দেখা মানেই ভালোবাসা—আর তা কোনো স্মৃতি বা অনুষঙ্গের প্রভাবে নয়, তার নিজেরই জন্য।

নিশ্চয়ই এর একটা কারণ জাপানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব বিপুল; অধিবাসীরা মঙ্গোলীয়, তাদের চোখ মুখ ভাষা রীতিনীতি সবই আমাদের পক্ষে অচেনা; এবং এই দেশ, যা এই শতকের প্রারম্ভ থেকেই আধুনিক বিদ্যায় য়োরোপের সমকক্ষ, তা জগৎ-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলো মাত্রই সেদিন। এই রকম চমকপ্রদ সমন্বয় অন্য কোনো দেশে ঘটেনি। যা নিতান্ত বৈদেশিক ব'লেই নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী—যাকে য়োরোপীয় ভাষায় বলে 'exotic'—প্রতীচ্যদের, এবং আমাদের পক্ষেও, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জাপান। আর সেই সঙ্গে মিলিত হয়েছে এর আশ্চর্য সাংসারিক উদ্যম ও কর্মিষ্ঠতা, যা দেশটাকে রাতারাতি বদলি ক'রে দিয়েছে মধ্যযুগ থেকে বিশ শতকে। যে-কোনো দিক থেকেই দেখা যাক, তারিফ না-ক'রে উপায় নেই। বিশেষত আমরা যারা এমন এক দেশ থেকে আসছি যেখানে 'প্রাচী' নামক এক অবাস্তব বা সুদূরপরাহত ধারণায় জনসাধারণ বন্দী হ'য়ে আছে, আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ নয় যে জাপান ও ভারতবর্ষ একই এশিয়ার অন্তর্ভূত। এ-দুই দেশে পদে-পদে গরমিল। যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে জাপানের কারিগরী প্রতিভা অবাক ক'রে দেয় আমাদের;—কী মসৃণ ও সক্ষম এদের প্রতিটি যন্ত্র, কী নিখুঁত এদের সেবা, কী প্রকাণ্ড এদের বাণিজ্যবল, ছোটো-বড়ো সমস্ত কাজে কী নিঃশব্দ ও পূর্ণ এদের অভিনিবেশ! জগৎ-সংসারে কৃতী হ'তে হ'লে যে-সব গুণ আবশ্যক—শৃঙ্খলা, অধ্যবসায়, বিশ্লেষণশক্তি, বাস্তবধর্মিতা, বিমূর্ত ধারণার বদলে মূর্ত তথ্যের প্রতি মনোযোগ, এগুলো যেন জাপানিদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে, কোনোমতেই তার ব্যত্যয় হবার উপায় নেই। 'সময়ের মাপ আমাদের হ'লো মিনিট,' এক মার্কিনী বলেছিলেন আমাকে, 'আর জাপানিদের—সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ।' ঠিকই তা-ই; ওটার একদিন বেলা দশটায় আমাদের হোটেলে আসার কথা ছিলো; দশটার একটু আগে তিনি টেলিফোন ক'রে জানালেন তাঁর পাঁচ মিনিট দেরি হবে, আর নির্ভুলভাবে দশটা বেজে পাঁচ মিনিটেই তিনি এলেন। বক্তৃতা দিতে, বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, যখনই যেখানে গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি সময়ের হিশেব চুলচেরা; কোনো-একটা তুচ্ছ বিষয়েও কেউ যদি কোনো কথা দিয়েছে সেই কথা-মতো কাজ করতে ভোলেনি; যে-সব কাজ আমরা হীন বা কষ্টকর ব'লে ভাবি তার সম্পাদনাও অনবরত অনাহতভাবে অম্লান। এই লক্ষণগুলোকে আমরা সাধারণত প্রতীচ্য ব'লে ভেবে থাকি, কিন্তু এদের চরম প্রকাশ জাপানেই দ্রষ্টব্য। অনন্তবোধের বেদনার দ্বারা এরা যেন কখনোই বিদ্ধ হয়নি, কখনোই যেন স্বীকার করেনি যে মানুষের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে পারে; সংসারের উপর এদের আস্থা এত গভীর যে জাপানি ভাষায় ভগবানের কোনো সঠিক প্রতিশব্দ নেই। একটি শব্দ আছে, 'কামি', তার আক্ষরিক অর্থ 'উচ্চ'; সেই উচ্চতা পার্থিব বা আত্মিক হ'তে পারে; 'আত্মা', 'দেবতা', 'পূর্ব-পুরুষ', শ্রদ্ধেয় বা শ্রেষ্ঠ যে-কোনো সত্তা বা বস্তু—এই সব বিভিন্ন অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এই শ্রদ্ধার মধ্যে পূজা বা আত্মনিবেদনের ভাবটি নেই; অগ্নি, বায়ু, মৃত্যু প্রভৃতি শক্তি কার আদেশে ধাবিত হচ্ছে এই প্রশ্ন এ-দেশে অবান্তর। এ-দিক থেকে এরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুর ঠিক বিপরীত আর বিপরীত ব'লেই আকর্ষণে এত শক্তি-শালী। একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে

পারবো না। কিন্তু আমার ধারণা হ'লো যে জাপানি মানস একান্তভাবে জাগতিক, যাকে ইংরেজিতে বলে secular; 'আপনার ধর্ম কী?' এই কথা অনেককে জিগেস ক'রে স্পষ্ট কোনো জবাব পাইনি, 'হয়তো বৌদ্ধ — হয়তো শিন্টো ঠিক জানি না,' অর্থাৎ, বিষয়টা চিন্তার বা আলোচনার যোগ্য নয়। ভারতের কথা ছেড়েই দিই, ধর্ম বিষয়ে এ-রকম মনোভাব প্রতীচীতেও বিরল।

কিন্তু এই কি জাপানিদের বিষয়ে সবটুকু কথা? তা যদি হ'তো, তাহ'লে এদের আমরা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিতুম জগতের সেরা কেজো লোক ব'লে, বণিকবৃত্তির চরম চূড়ায় বসিয়ে দিতুম একেবারে — আর তার পর এদের বিষয়ে আর-কিছু বলার প্রয়োজন হ'তো না। সত্য, এরা অনেক বিষয়ে ইংরেজের মতো, কিন্তু আগন্তুকের মনের উপর লণ্ডন যে-নিস্তাপ ধূসরতা ছড়িয়ে দেয়, টোকিওতে তা অকল্পনীয়, এবং এদের শত্রুরাও কখনো বলেনি যে এরা 'দোকানদার' বা 'লেজার-পূজারি' মাত্র। আশ্চর্য এই যে এদের কেজো দিকটা, অনিবার্যভাবে লক্ষণীয় হ'লেও, কখনোই যেন খুব বড়ো হ'য়ে দেখা দেয় না; সবচেয়ে আগে যা চোখে পড়ে এবং সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা মনে থাকে, তা এই যে এরা সুন্দর। আগে একবার লিখেছি: পাশ্চাত্ত্য জাতির যে-সব সামরিক অভ্যাস এখন সামাজিক গুণে পরিণত হয়েছে, সেগুলো সবই জাপানিদের আছে, এমনকি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচ্য লাবণ্য এদের সহজাত, এবং এ-দুয়ের মিশ্রণের জন্যই বিদেশীর কাছে জাপান এমন মনোমুগ্ধকর। [illegible] দশদিন কাটিয়ে এমন-কিছু দেখলাম না যা এই কথাটার প্রমাণ না দিচ্ছে। একটা ছোটো উদাহরণ দিই: পরিচ্ছন্নতা। এই বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে ব'লে [illegible] দাবি করতে পারি, কেননা আমি সবসময় যে-টেবিলে লিখি, বা যে চেয়ারে ব'সে বিশ্রাম করি, সেখানেই দুর্লক্ষ্যভাবে [illegible] সিগারেটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি, পুরোনো চিঠিপত্র, ছেঁড়া কাগজ, [illegible] দরকারি ও বেদরকারি জিনিসের এমন একটি বিমিশ্র ও বিবর্ধমান স্তূপ, যাতে সৌন্দর্য বা সুবিধে কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার এই অভ্যাসের জন্য দেশে-বিদেশে বিবিধ মহিলাদের দ্বারা আমি তিরস্কৃত হ'য়ে থাকি, এবং যদিও আমি সব সময়ে জবাব দিই যে এই অবস্থাই আমার পক্ষে আরামদায়ক, তবু কোনো করুণাময়ী কোনো-এক সকালে আমার টেবিলটি গুছিয়ে দিয়ে গেলে, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি কত বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। মন হালকা লাগে তখন, কাজে আরো উৎসাহ পাই, শ্রম তেমন কাতর করে না। অর্থাৎ, আমার নিজের স্বভাবে তা নেই ব'লেই, পরিচ্ছন্নতা আমার ঈপ্সিত, এবং আর-কোনো দেশে ঐ গুণটিকে আমি এমন ব্যাপক, শ্রীমণ্ডিত ও মানবিকভাবে অনুভব করিনি, যেমন করেছি জাপানে। কিয়োটোর রাস্তা এত পরিষ্কার যে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলতে [illegible] আমার পর্যন্ত সংকোচ হয়েছে; এবং বিরাট টোকিওতেও এমন কোনো রাস্তা আমি দেখিনি যা নিউইয়র্ক বা কলকাতার কোনো-কোনো অংশের মতো আবর্জনায় বর্ণাঢ্য। ঘর বাড়ি দোকান হোটেল ট্রেন ট্যাক্সি, সবই একেবারে ঝকঝকে তকতকে — এদের বিষয়ে বেশি বলা বাহুল্য। কিন্তু হাকোনের সেই সরাইখানাটিকে আর-একবার স্মরণ না-ক'রে পারছি না, কেননা তার পরিচ্ছন্নতা বর্ণনাতীত প্রায় অনির্বচনীয়। সেখানে গিয়ে যেন বুঝেছিলাম প্রতীচীর সঙ্গে জাপানের মৌলিক তফাৎটি কোনখানে। আমেরিকাতেও এক-এক জায়গায় দেখেছি পরিচ্ছন্নতাকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে — কিন্তু তার ভিতরকার কথা হ'লো নিবীজিতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা, তা এমন নিষ্কলংক ও [illegible] আদর্শে [illegible] সব সময় [illegible] কিন্তু জাপানি পরিচ্ছন্নতায় [illegible] আমরা বলতে পারি [illegible] আমাদের [illegible] আবেদন আছে।

কিংবা হয়তো অন্য কথাটা ভুল হ'লো: সবটাই সাজানো, বানানো, শিল্পিত, এইটেই হ'লো জাপানি স্টাইল। তাই যদি হয়, তাহ'লে কথাটা এইখানে দাঁড়ায় যে জাপানিদের নিজস্ব একটা স্টাইল আছে, যা আমাদের নেই, বা থাকলেও বহির্জগতে এখনো প্রকাশ্য হয়নি। একদিন ওটা [illegible] এক জায়গায় এদের [illegible] বিদেশীদের দেশ ভিড় দেখলুম, রান্নার জন্য খ্যাতি আছে জায়গাটার। তুলনীয় কোনো রেস্তোরাঁ কি আছে কলকাতায়? এমন কোনো ভোজনালয়, যেখানে মলিন বাসন, অধ্যবসায়ী মাছি, বা অত্যধিক মশলা-প্রণোদিত অগ্নিমান্দ্যের আশঙ্কা না-ক'রে আমরা বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে খাওয়াতে পারি ধনেপাতা-সুবাসিত মুসুরির ডাল, কালোজিরে-চর্চিত স্নিগ্ধ লাউ, দই দিয়ে রাঁধা রুই মাছ, আর মিষ্টি-আদা-টোম্যাটোয় সম্পন্ন তীব্র চাটনি? না কি এমন কোনো ভদ্রগোছের হোটেল বা সরাইখানাই আছে, যার ধরনটাকে যে-কোনো অর্থে বাঙালি, বা ভারতীয় বা এমনকি প্রাচ্য বলা যায়? থাকলেও, আমি তার ঠিকানা জানি না; বিদেশীরাও তার সন্ধান না-পেয়ে অনবরত এমন সব হোটেলে ওঠেন, যা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর 'বিলেতি'। সেখানকার 'পাশ্চাত্ত্য' ভোজ বিস্বাদ ও বিকল্পহীন, আর 'ভারতীয়' নামাঙ্কিত যে-খাদ্য অনেক বিদেশীরা সাগ্রহে আহার করেন তা দেখে আমাদের চোখে জল আসে। আর নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদ? তা এমন নস্ত্যপচা বিলেতি মাল, আর তারই মধ্যে কৌলীন্য আনার চেষ্টা এমন করুণ, যে সে-বিষয়ে মন্তব্য করার প্রয়োজন দেখি না। পোল্যান্ড বা ইস্রায়েল বা মেক্সিকো থেকে হঠাৎ কোনো অতিথি এসে অবাক হয় — তাই তো, এদের কি নিজস্ব ব'লে কিছু নেই? ভারত-পথিক বিদেশীরা একমাত্র যা নতুন দেখতে পায় তা হ'লো কোনো-কোনো রাজ্যে সুরা-নিরোধক অনুশাসন। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিতান্তই নাস্তিধর্মী; যা সমগ্র সভ্যজগতে প্রচলিত এমন একটা ক্রিয়াকে আমরা অস্বীকার করছি মাত্র, কিন্তু এখনো এমন কিছু দেখাতে পারছি না, যা আমাদের আবহমান জীবনধারার বিশিষ্ট সৃষ্টি। আমি বলছি না যে-রকম কিছু নেই, নিশ্চয়ই অনেক আছে — কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই আমাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ; সেগুলোকে চীনে বা জাপানিদের মতো নৈপুণ্যে বহির্বিশ্বের উপযোগী ক'রে তুলতে পারছি না আমরা, আর সে-জন্যে কোনো মহলে আক্ষেপও নেই। যদি এর পরে আমাদের দেশে গোমাংসভোজন নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়, সেটাও একটা নূতনত্ব হবে বটে, কিন্তু সেটাতেও হাঁ-এর দিকে কিছু থাকবে না। এখনো কি সময় আসেনি, যখন আমরা — কলকারখানা নৌবহর বিমানবাহিনীর ব্যাপারে শুধু নয় — দৈনন্দিন জীবনযাপনেও বর্জনের চাইতে অর্জনের দিকে উন্মুখ হবো? এখন পর্যন্ত, অন্তত বাংলাদেশে আমাদের জীবন বড্ড বেশি পারিবারিক, জীবিকার ক্ষেত্রটুকু বাদ দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণই তা-ই; আমাদের জীবনের যে-অংশটিতে সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে তার পরিচয় কেউ পরিবারের মধ্যে মিশতে না-পারলে,

কোনো বিদেশী লোক কখনোই পাবে না। কিন্তু সত্যি কি আমরা শুধুই গৃহস্থ, জগতের আমরা কেউ নই?

জাপানি মেয়েদের বিষয়ে আগে উল্লেখ করেছি, কিন্তু যথেষ্ট বলা হয়নি। এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো যে রূপের দীপ্তিতে যদিও উত্তরভারতের কন্যারা শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রতিযোগী হ'তে পারেন, তবু, সংস্কৃত কবিরা যে-ভাবে তাঁদের মানসীদের চিত্রিত ক'রে গেছেন, নম্র, পেলব, সুকুমার ও ক্ষীণকায়—তার আংশিক প্রতিরূপ যদি কোথাও দেখা যায় তো পূর্ব-ভারতে—হয়তো বাংলায়, বা তার চেয়েও বেশি, আসামে। কিন্তু এখন দেখছি, জাপানি মেয়েরা 'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্' না হোক কোমলতায় অতুলনীয়া, যাকে বলেছি প্রাচ্য লাবণ্য তা এদের মধ্যে অবিকলভাবে মূর্ত। লাবণ্য, লালিত্য, কমনীয়তা যে-সব লক্ষণ আমাদের কাছে বিশেষভাবে ললনাশোভন, এ দেশের প্রতিটি মেয়েকে স্বভাবতই তার অধিকারিণী ব'লে মনে হয়, বয়স, রূপ অথবা সামাজিক মর্যাদা যেমনই হোক না। পূর্বোল্লিখিতা মাসু, তরুণী ও সুরূপা হ'লেও ব্যতিক্রম নন: গলার আওয়াজ বাতাসের মতো, মুখে ও সমস্ত দেহে একটি সংবৃত ও শোভন বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে—জাপানি মেয়েদের সামান্য লক্ষণ হ'লো এই। অথচ এদের প্রায় প্রত্যেকেরই ছাঁটা চুল, সাজ পাশ্চাত্য, বাইজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এমন কেউ নেই। দুই বিপরীতকে যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে দিয়েছে এরা। দেখলে মনে হয় পুষ্পাঘাতে মূর্ছাপ্রবণ, কিন্তু ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে এদের ক্ষমতা ও দার্ঢ্যের পরিচয় অনবরত পাওয়া যায়। চলাফেরা দ্রুত, ব্যবহারে হিন্দু রমণীর 'লজ্জা' অথবা আড়ষ্টতা নেই, কিন্তু কখনো এমন কোনো ভঙ্গি করে না যা মুহূর্তের জন্যও মনে হ'তে পারে খর, বা অসুন্দর, বা পুরুষালি। বরং, যে-ভঙ্গিটি এদের পক্ষে সহজাত ও নিত্যনৈমিত্তিক, তা হ'লো আত্মোৎসর্গের; যখন যে-কাজটুকু করছে তার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছে যেন; আর এটা যে কোনো আভিজাত্যিক শিক্ষার ফল তাও নয়, কেননা হোটেলের পরিচারিকা বা দোকানের কর্মিণীরাও, তাদের নিরন্তর ব্যস্ততার মধ্যে, ব্যবহারে নিরন্তর স্নিগ্ধ ও অবনম্র। চিত্রলতায় জাপানি মেয়েদের জুড়ি নেই।

জাপানি জীবনের যে দিকটি আমার মনে গভীরতম রেখাপাত করেছে, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তা হ'লো—এ-দেশে ইংরেজি ভাষার অবস্থা। আগেই বলেছি, জাপানিরা ইংরেজি বলাতে পটু নয়; সেই অপটুতা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয়দের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও আলোচনাযোগ্য। বিদগ্ধ, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতদের মধ্যেও এমন মানুষ অত্যন্ত বিরল, যিনি স্বচ্ছন্দে ও নির্ভুলভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে ইংরেজিতে আলাপ চালাতে পারেন। পারেন না;—তার চেয়েও জরুরি কথা হ'লো, চেষ্টাও করেন না, অত্যধিক চেষ্টাপ্রয়োগের উপযোগী ব'লেই ভাবেন না বিষয়টাকে। সাধারণ লোকেরা অনেকেই এক ধরনের কেজো ইংরেজি ব্যবহার করে; অর্থাৎ নিজের কর্মের পক্ষে যেটুকু ভাষা প্রয়োজনীয়, সেই গণ্ডির মধ্যেই তারা সীমিত; তার বাইরে পরভাষার অস্তিত্ব নেই এদের কাছে। অনেক মেয়েকে দেখেছি, হাতব্যাগে প্রসাধনদ্রব্যের সঙ্গে একটি ইংরেজি অভিধান সঙ্গে রাখে সব সময়; কোনো কথা বুঝতে না-পারলে তক্ষুনি অভিধান খুলে জেনে নেবার চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, পড়ান ইংরেজি বা ফরাশি সাহিত্য, এমন অধ্যাপকও আমার কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তরে শুধু মৃদু-হাস্য করেছেন, আমার কথাটা তিনি যে বুঝতে পেরেছেন এমন কোনো লক্ষণও দেখতে পাইনি।

এই শেষের কথাটায় আমাদের দেশে অনেক ভুরু কপালে উঠবে, মনে হয়। ইংরেজি পড়ান, কিন্তু ইংরেজি বলেন না—এ কী-রকম হ'লো? খুব সোজা উত্তর: জাপানে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন অনন্যরূপে জাপানি। স্কুলে ইংরেজি একটি আবশ্যিক বিষয়—য়োরোপেও অনেক দেশে আজকাল তা-ই; কিন্তু সেটুকু অভ্যাসের ফলে সত্যিকার শেখা কতটুকু হয় তা আমরা হাল-আমলের সাধারণ ম্যাট্রিক-পাশ বাঙালি ছেলের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবো। আমাদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে ইংরেজি কম জানলে জীবিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধে হয় আমাদের; এদের তাতে কিছুই এসে যায় না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা—সব এ-দেশে পড়ানো হয় মাতৃভাষায়; পাঠ্য-পুস্তক ও প্রশ্নোত্তর মাতৃভাষায়; গবেষণা, গ্রন্থরচনা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা—সব মাতৃ-ভাষায়। মাতৃভাষাতেই সম্পাদিত হয় বাণিজ্য, সরকারি কার্য, শাসন, বিচার, বিধান-রচনা সব-কিছু। এক কথায়, যা স্বাভাবিক, আর সবচেয়ে বেশি ফলদ, আর সমগ্র আধুনিক জগৎ যা মেনে নিয়েছে, সেই ব্যবস্থাই জাপানে বদ্ধমূল। তাই ব'লে বিদেশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার ভাবটি একেবারেই নেই; পণ্ডিতেরা তাঁদের বৈশেষিক নিবন্ধ মাঝে-মাঝে ফরাশি বা ইংরেজি বা জর্মান ভাষায় প্রকাশ ক'রে থাকেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন চেষ্টাও এঁদের থাকে যাতে বিদেশীরা জাপানি

শিখতে উৎসাহ বোধ করে। অনেক গবেষণা-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি ছাপা হয় জাপানিতে, কিন্তু তার ইংরেজি বা ফরাশি চুম্বক অন্যদের কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। নিজের বিষয়ে, জ্ঞানের কোনো বিশেষ উপবিভাগ নিয়ে বিদেশী ভাষায় কিছু লিখতে হ'লে এঁরা পরাঙ্মুখ হন না, কিন্তু সেই ভাষা কানে শোনার, বা মুখে বলার উপলক্ষ জাপানি বিদ্বজ্জনদের জীবনে অল্পই ঘ'টে থাকে। অনেকেই য়োরোপে বা আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের সমগ্র জীবনের পরিমাপে সেই কিছুদিনের প্রভাব আর কতটুকু! বৈদেশিক সাহিত্য বা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশত এঁরা প্রয়োজনীয় ভাষাটিকে গভীরভাবে পড়তে শেখেন, এবং ছাত্রদেরও তা-ই শেখান; কিন্তু সেই ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলা যে তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত, বা তাঁদের অধিকারভুক্ত, এমন চিন্তা ছাত্র বা অধ্যাপকের মনে কালে-ভদ্রে উদিত হয়। সাম্প্রতিক মার্কিনী প্রভাবের ফলে ইংরেজির প্রতি ঔৎসুক্য যদিও বর্ধিষ্ণু (ওটার, দেখলুম, বিশেষ চেষ্টা যাতে তাঁর যুবক পুত্র ইংরেজিতে পাকা হয়ে ওঠে), তবু এমন কথা সারা জাপানে অভাবনীয় যে শিক্ষা বা সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি জ্ঞানের কোনো সম্বন্ধ আছে।

পক্ষান্তরে, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচলন বিপুল। বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না, যে ইংরেজি যেখানে মাতৃভাষা নয়, এমন সব দেশের মধ্যে ঐ ভাষায় সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখা যায় সাধারণভাবে ভারতবর্ষে। এ-কথাও সত্য যে আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজি পড়া, লেখা ও বলার ক্ষমতা ততদূর পর্যন্তই আয়ত্ত করেছেন যতদূর কোনো বিদেশীর পক্ষে সম্ভব। (বিদেশীর পক্ষে একটা সীমা থাকবেই : এই পর্যন্ত, কিন্তু তার বেশি আর না।) এই অস্বাভাবী অবস্থার ফলে আমরা স্বদেশে ও বিপুল বিশ্বে অনেকগুলো সুবিধে ভোগ করছি, সে-কথাও অনস্বীকার্য। শুধু এই সুবিধেগুলোর জন্য নয় ;—বম্বাইতে বা বার্লিনে কাউকে-না-কাউকে জিগেস ক'রে হোটেলের পথ জানতে পারি ব'লে নয়; লণ্ডনে বা বস্টনে বা মন্ট্রিয়লে মাস্টারি, ডাক্তারি অথবা কেরানিগিরি করতে পারি, শুধু সে-জন্যে নয়,* মনের মধ্যে এমন কোনো কথা যদি কপাল কোটে যা অবাঙালিকেও জানাতে চাই, সেটা কোনোরকমে প্রকাশ ক'রে উঠতে পারি, সে-জন্যেও নয় ;—ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা জগতের উপর ঐ একটিমাত্র জানলা আমাদের খোলা আছে। যে-শুভদিনে আমাদের মধ্যযুগ-মানসতা সর্বতোভাবে লুপ্ত হ'য়ে যাবে, তার আগেই যদি ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষ থেকে স'রে যায়, তাহ'লে আমরা পুনর্বার যে-অন্ধকারে তলিয়ে যাবো তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। ইংরেজি ভাষার জন্য নয়, তার মধ্য দিয়ে বিশ্বের যে-বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে, আবহমান মানবসভ্যতার যে-বীজময় সংস্পর্শ আমরা পাচ্ছি, তারই জন্য তা মূল্যবান। তারই জন্য আমরা মানতে বাধ্য যে আমাদের জীবনের মধ্যে ইংরেজির অস্তিত্ব মঙ্গলজনক, আর যাতে অকস্মাৎ কোনো অন্ধতার ফলে তা দূর হ'য়ে না যায় তার জন্যও আমাদের প্রযত্ন বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই প্রশ্নটাই আসল—আজকের দিনে ইংরেজি যে-ভাবে আমাদের অধিকার ক'রে আছে, সেটা কি ভালো? ভালো কেমন ক'রে বলি, যখন দেখছি পৃথিবীর মধ্যে হত-ভাগ্য আমরাই শুধু এক পরভাষার পুতুল-পুজো করছি এখনো, তার দ্বারা লভ্য আত্মার সন্ধান না-ক'রে শুধু খোলশ নিয়ে মহোৎসাহে মেতে আছি? সাড়ম্বর, মধ্য-ভিক্টোরীয়, ক্লিশে-পুষ্পিত, বহুমাত্রিক লাতিন শব্দে মরচে-পড়া শিকলের মতো ঝনৎকৃত, ব্যাকরণে এমন অভ্রভেদী-ভাবে নিভুল যে মনে হয় কোনো মুখস্থ করা মৃত ভাষা আওড়ানো হচ্ছে এমন ইংরেজি তো ভারত-বর্ষীয় অধ্যাপকের মুখে ছাড়া আজকের দিনে আর কোথাও শোনা যাবে না। আমরা যারা নিজেদের ভাবি ইংরেজিতে ওস্তাদ, বা অন্যদের তা ভাবতে দিই আমাদের বিষয়ে—সেই আমাদের ইংরেজিতে ভুল হয়তো কমই থাকে, কিন্তু তেমনি থাকে না গতি অথবা জীবনীশক্তি, ভুল এড়াবার কঠিন চেষ্টাতেই অবসন্ন হ'য়ে পড়ি আমরা, আক্ষরিকতার কচুরি-পানায় আমাদের বক্তব্য দম আটকে ম'রে যায়। আর আমাদের মধ্যে যাঁরা কয়েক মাস 'ইউ কে'-তে* কাটিয়ে এসেছেন, এবং হয়তো পাঠ নিয়েছেন জ্যোতিষ্মান অক্সফোর্ডে অথবা কেম্ব্রিজে, তাঁরা ইংরেজি ভাষার কুটিল অ্যাকসেন্ট-গুলিকে কণ্ঠে খেলাবার জন্য এমন কঠিন সাধনা করেন যে কখনো কোনো সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচ্যুতি হয়েছে টের পেলে তাঁরা হয়তো—চেখহেভের গল্পে সেই কেরানির মতো, যে বড়োবাবুর টাকের উপর হেঁচে ফেলে তারপর আর মনের শান্তি ফিরে পায়নি—কে জানে, হয়তো বা সেই করুণ কেরানির মতোই তাঁরা শয্যা নিয়ে শয্যা ছেড়ে আর উঠবেন না।

তুলনা করলে মনে হয়, আমরা এত যত্ন নিয়ে ইংরেজি শিখেও—বা সেই জন্যেই—জাপানিদের কাছে মৌলিকভাবে হেরে আছি। এদের মৌখিক ইংরেজির কোনো দাবি-দাওয়া নেই; তার ব্যাকরণহীনতা ও অস্পষ্ট উচ্চারণ সরলভাবে বৈদেশিকতা ঘোষণা করছে, আর এদের খবর-কাগজের মার্কিনী-ঘেঁষা ইংরেজি অন্ততপক্ষে সচল ও ঝকঝকে—পাঠ্য-বইয়ের এঁটোকাঁটায় ছিটোনো নয়। বিদেশীরা ভারতে এসে অর্জন করে ধনমান, কিছুটা সামাজিক মেলামেশাও ক'রে থাকে, বছরের পর বছর বা সারাজীবন কাটিয়ে দেয় হয়তো—অথচ তার জন্য (হয়তো দু-কুড়ি ভৃত্যভাষিত হিন্দি শব্দ ছাড়া) আমাদের কোনো ভাষার একটি অক্ষরও তাদের শিখতে হয় না। আর জাপানে জাপানি না-জানলে কিছুই করা যাবে না;—না ব্যবসা, না অধ্যয়ন বা শিক্ষকতা, না বিবাহ বা বসবাস। এটাই আসল কারণ, যার জন্য নানা ভাষায় জাপানি সাহিত্যের এত বেশি অনুবাদ হয়েছে ও হচ্ছে, আনকোরা আধুনিক সাহিত্যও বাদ পড়ছে না; এদিকে বিদেশীর ভারতবিদ্যা বা ইণ্ডলজি এখনো প্রত্নতত্ত্বের জাদুঘরেই আবদ্ধ। দুটি তরুণ আমেরিকানের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো, তারা অনর্গল জাপানি বলছে, দেশটাকে খুব ভালো লাগছে ব'লে এখানেই দীর্ঘকাল তাদের থাকার ইচ্ছে। আমেরিকায় জাপানি-জানা লোকের সংখ্যা আজকের দিনে নেহাৎ নগণ্য নয়; বড়ো-বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি বিভাগ-গুলি জীবন্ত;—এর একটা কারণ নিশ্চয়ই যুদ্ধ, বা কিছুটা অ্যাটম-বোমার 'বিবেক-মূল্য'ও হ'তে পারে, কিন্তু এর প্রধান কারণ এই যে জাপানের সঙ্গে যে-কোনো প্রকার স্থায়ী ও ফলপ্রসূ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হ'লে প্রথমেই তার ভাষার অভিজ্ঞতা চাই। এরা জাপানি শিখতে বাধ্য করেছে বিদেশী-দের, আমরা ইংরেজি শিখে নিজের ভাষাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছি না;—আর সেই জন্যে আমাদের মনের কথা, হৃদয়ের কথা

---

* কথাটা লিখেই মনে হ'লো যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে য়োরোপ থেকে সম্প্রতি-আসা এমন অনেক প্রবীণ অধ্যাপক আছেন, যারা আসবার সময় প্রায় কিছুই ইংরেজি জানতেন না, আর বসবাসের ফলেও যেটুকু শিখেছেন তাকে যথোচিত বললে বেশি বলা হয়। কিন্তু তাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত ব'লে, তাঁদের ক্ষীণ শব্দকোষ ও অদ্ভুত উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের অন্তরায় হয়নি। অবশ্য তাঁরা অধিকাংশই বিজ্ঞানী ব'লে আমার ধারণা—আর বিজ্ঞানে ভাষার ব্যবধান দুরপনেয় নয়, কিন্তু সাহিত্যেরও এমন অধ্যাপক দেখেছি, যাঁরা জর্মান বা ইটালিয়ান সাহিত্যে পারঙ্গম, কিন্তু যাঁদের ইংরেজি এখনো বাধো-বাধো।

* হায় ব্লেক, ব্রাউনিং, চেস্টার্টনের ইংলণ্ড—তুমি অবশেষে 'ইউ কে'তে অধঃপতিত হ'লে!

এখনো বিশ্বজগতে পৌঁছলো না। কোন-দিকে পাল্লা ভারি তা না-বললেও চলে।

কিন্তু হয়তো ইংরেজিকে 'অবহেলা' করার ফলে জাপানের অন্য দিকে ক্ষতি হয়েছে? হয়তো জগতের জ্ঞানে ও বিদ্যায় আমরাই বেশি ওয়াকিবহাল?—দুঃখিত, ঠিক উল্টো কথাটা সত্যি। শুধু বিজ্ঞানে নয়, সাহিত্যেও এরা বিশ্বনাগরিক, এদের তুলনায় আমরাই বরং প্রাদেশিক হ'য়ে আছি—যে-আমরা ইংরেজি ইস্কুলমাস্টারের চোখ দিয়ে এখনো দেখি জগৎটাকে, যাদের কাছে 'ইংরেজি' ও 'প্রতীচ্য' প্রায় সমার্থক। যে-ইংরেজি ভাষা জগতের উপর আমাদের জানলা, সেটাই—এমনি ভাগ্যের বিদ্রূপ—আমাদের জগতের উপর পরদা টেনে দিয়েছে। কিয়োটো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে-সব ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয় তাদের মধ্যে আছে ইংরেজি ছাড়া—ফরাশি, জর্মান, ইটালিয়ান, গ্রীক-ও-লাতিন। এতগুলো প্রতীচ্য সাহিত্য পড়ানো হয় এমন কোনো ভারতীয় বিদ্যালয়ের কথা আমার জানা নেই, কিন্তু জাপানে আরো বেশি উদার আয়োজন দুষ্প্রাপ্য নয়। এদের তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থার সভ্যসংখ্যা বিপুল, এবং এই সংস্থার একটি কাজ হ'লো বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগসাধন। দেখে, শুনে ও পত্রিকাদি প'ড়ে অনুমান করছি যে প্রতীচ্য সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে অন্য কোনো প্রাচ্য ভাষা জাপানির কাছে দাঁড়াতে পারে না। আমাকে এক সভায় নিয়ে যাবার জন্য একদিন একটি মেয়ে এলো, সে সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে, গাড়িতে যেতে-যেতে তাকে জিগেস করলুম যে য়োরোপীয় সাহিত্য কিছু পড়েছে কিনা। সে তার যৎসামান্য ইংরেজিতে আমাকে জানালে যে ডস্টয়েভস্কির সে প্রগাঢ় ভক্ত, টলস্টয়, ফ্লোবেয়ার, স্তাঁদাল তার অজানা নেই। আর এ-সব বই সে পড়েছে তার মাতৃ-ভাষাতেই, অন্য বহু শ্রেষ্ঠ লেখক অনুবাদে তার অধিগম্য, 'ইউলিসিস'-এর মতো দুর্ধর্ষ পুস্তকের একাধিক অনুবাদ প্রচলিত আছে। এই অনুবাদগুলোর গুণপনা বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা অবশ্য অসম্ভব, কিন্তু জাপানে সাহিত্যচর্চার ব্যাপ্তি ও নিবিড়তা দেখে বিশ্বাস হয়* যে দেড়শো পৃষ্ঠায় একটি তথাকথিত 'আনা কারেনিনা' প্রকাশ করা এদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা বাঙালিরা সাহিত্যপ্রেমিক ব'লে শুনতে পাই, কিন্তু আমাদের ভাষায় অনুবাদ কেন সাধারণত যত্নহীন ও পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর? তার কারণ আমাদের এই অদ্ভুত ও অর্ধোচ্চারিত ধারণা যে অনুবাদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই, কেননা ইংরেজিতে প্রায় সমগ্র য়োরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ পাওয়া যায়, আর দেশের মধ্যে শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন। শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন? না কি, যাঁরা ইংরেজি পড়েন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত ব'লে গণ্য? না কি—আরো মারাত্মক কথা—যাঁরা ইংরেজি জানেন না তাঁরাই অশিক্ষিত ও ডস্টয়েভস্কি পড়ার অযোগ্য? এই সবগুলো কথাই আমাদের মনের তলায় কাজ করছে। আমরা যেন ভাবতেই পারি না—যদিও এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা মাত্র—যে ভারতবর্ষে এমন লোক অসংখ্য যারা মাতৃভাষায় ডস্টয়েভস্কির জন্য ক্ষুধিত হ'য়ে আছে, আর এমন লোকেরও অভাব নেই যারা উত্তম ইংরেজি জেনেও বুদ্ধির ব্যায়ামের জন্য শুধু অগাথা ক্রিস্টি পাঠ করেন। তাছাড়া, মাতৃভাষায় যদি বা কোনো যত্নসাধিত অনুবাদ দৈবাৎ বেরিয়ে যায়, আমরা কেমন বাঁকা চোখে তাকাই তার দিকে; কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা যেন সম্ভব হয় না যে সুধীন্দ্র দত্তর অনুবাদে পোল ভালেরি ধরা পড়েছেন, বরং তার তুলনায় অক্ষম কোনো ইংরেজি অনুবাদ হাতে এলে আমরা ব'র্তে যাই। কিন্তু জাপানিদের মনের কথাটা অনেকটা এই-রকম: ইংরেজিটা অনুবাদ, জাপানিটাও তা-ই, অতএব যদি মূলে পৌঁছতে না পারি নিশ্চয়ই আমার নিজের ভাষাতেই পড়া ভালো। আর-এক কথা: যদি ইংরেজিতে অনুবাদ সম্ভব হ'য়ে থাকে নিশ্চয়ই জাপানিতেও হ'তে পারে। জাপানিরা অন্য যে-কোনো জাতির সমকক্ষ ব'লে ভাবে নিজেদের, বরাবর তা-ই ভেবেছে, আর আমাদের এখনো কল্পনা করার সাহস হয় না যে আমরা শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ। তলিয়ে দেখলে, একেবারে ভিতরকার কথাটা হ'লো এই।

এমন একদিন ছিলো যখন গঙ্গাতীরবাসী তীক্ষ্ণচক্ষু সংস্কৃত-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সহন-শীল সমালোচকের দৃষ্টিতে নবাগত শ্বেতাঙ্গদের দেখেছিলেন। সেই সহজ ও অনাক্রমণীয় আত্মমর্যাদাবোধ, যা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরে মূর্ত হয়েছিলো, কোথায় তার স্মৃতিচিহ্ন আজকের দিনে? এখন, স্বাধীনতার পরে, বক্তৃতায় ও বুলিতে ফেনিল হ'য়ে উঠছে দেশাত্মবোধ, কিন্তু বাস্তবে আমাদের আত্মসম্মানবোধ কত দুর্বল, কী রকম প্রায় অস্তিত্বহীন আমাদের আত্ম-বিশ্বাস, আর সেইজন্য—আমরা যাকে বলি 'আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি', তার নাবা-লকদশা কী-রকম দুরতিক্রম্য—এই সবই আমরা জানতে পারি বক্তৃতা ভুলে তথ্যের দিকে মনোযোগ দিলে। মহাত্মা গান্ধী যাকে বলেছিলেন দাস-মনোভাব তা যে আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি তার প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের ইংরেজির প্রতি অসহায় ও কাতরতাময় মুগ্ধতা। ইংরেজির সামাজিক মর্যাদা বা স্বর্ণমূল্য, ক'মে যাওয়া দূরে থাক, সম্প্রতি বরং আরো বেড়েছে, এবং ভাষা থেকে এই মোহ সঞ্চারিত হয়েছে নতুন ক'রে তাদের প্রতি, যারা শ্বেতাঙ্গ আর অতএব আমাদের চেয়ে উন্নত। ঐ 'অতএব'-এর যুক্তি কী, তা জিজ্ঞাস্য বা আলোচ্য নয়, কেননা সরকারি ও বেসরকারি, সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়িক, উচ্চ ও নীচ—সব মহলে এই কথাটাকে নিঃশব্দে মেনে নেয়া হয়েছে যে শ্বেতাঙ্গরা সমগ্র ও স্বতন্ত্রভাবে
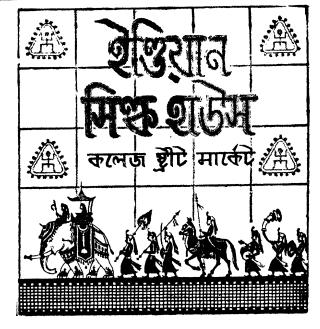
* পরে এক সুইস-জর্মান-আমেরিকান অধ্যাপকের মুখে শুনলাম যে জর্মান সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় জাপানিরা আজকাল অন্যতম অগ্রণী।

আমাদের নিজেদের চাইতে অধিক শ্রদ্ধা-ভাজন। কোনো বিদেশী গুণী ক্ষণকালের জন্য আগত হ'লে তাঁকে বিশেষ আতিথ্য ও অভিনিবেশ নিশ্চয়ই দেবো আমরা—সেটাই স্বাভাবিক ও সেটাই সভ্য আচরণ; কিন্তু যে-কোনো দিকে ঈষৎ নামজাদা কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কলকাতায় এলে আমরা যে-রকম বিহ্বল হ'য়ে পড়ি তাতে তাঁরাই হয়তো মনে-মনে লজ্জাবোধ করেন। আমাদের ভাবটা হয় ভক্তিভরে করজোড়ে কাছে যাওয়ার মতো, যেন তাঁকে মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারে বসিয়ে আমরা সদ্য-কলেজে-ঢোকা ছাত্রের মতো বাছা-বাছা প্রশ্ন করছি—আর আমাদের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ বা দিগ্বিজয়ী অধ্যাপক, অন্য কারো সাহিত্যিক হিশেবে খ্যাতি আছে। পশ্চিম বাংলার যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় জীবনানন্দ দাশ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে কখনো কবিতা শোনাতে আহ্বান করেননি, বা ক'রে থাকলেও তাঁদের উপস্থিত করেছেন শূন্য-প্রায় কাষ্ঠাসনশ্রেণীর সামনে, সে-সব বিদ্যালয়েই কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজ কবি উদিত হ'লে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকেরা পুঞ্জিত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় কাব্যসুধা পান করেছেন—সেই সব ছাত্রেরাও, যারা দুই পংক্তি রবীন্দ্রনাথ নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে পারে না, এবং সেই সব অধ্যাপকও, যাঁরা সমকালীন কবিতার বিষয়ে 'গর্ভিণীর অরুচি' নিয়ে সাধারণত স্বাস্থ্যকরভাবে কালাতিপাত ক'রে থাকেন।* এ-রকম অবস্থায় কী ক'রে বলি যে মনের দিক থেকে আমাদের স্বাধীনতা-লাভ সার্থক হয়েছে?

ভারতে উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হ'তে পারে কি পারে না, এ নিয়ে অফুরন্ত বিতর্ক চলছে দেখে আমি অফুরন্তভাবে বিস্মিত হ'য়ে আছি। কেমন সন্তুষ্টচিত্তে অনেকেই বলছেন বা ভাবছেন যে পৃথিবীর সব দেশেই যা সম্ভব হয়েছে, যার কোনো ব্যতিক্রম আধুনিক জগতে অচিন্তনীয়, তা অসম্ভব শুধু ভারতবর্ষে, যে-দেশের অবিচ্ছেদ সভ্যতার বয়স অন্ততপক্ষে তিন হাজার বছর! বিতর্কের কোনো কারণ নেই আমি তা বলি না, নিশ্চয়ই একটি বিপুল বাধা আছে, তার নাম—জাড্য। 'আমি ইংরেজিতে শিক্ষালাভ করেছি, আমার পিতা ও পিতামহও তা-ই করেছেন, এবং আমি যে পঁচিশ বছর ধ'রে শিক্ষাদান ক'রে আসছি তাও ইংরেজিতে; আমার ছাত্রকুল নানা স্থলে ছড়িয়ে ইংরেজিতে শিক্ষাদানে নিযুক্ত, আবার তাদের ছাত্ররাও তা-ই করছে অথবা করবে—অতএব কী ক'রে কল্পনা করা যায় যে ইংরেজির বদলে হঠাৎ এসে জুড়ে বসবে বাংলা অথবা মরাঠি অথবা তামিল?' এটা কোনো যুক্তি নয় অবশ্য, কিন্তু তা নয় ব'লেই মনোজ্ঞ—অন্তত এটা সবচেয়ে অপ্রতিরোধের রাস্তা, এটাকে মেনে নিলে নতুন ক'রে কোনো চেষ্টা অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংলগ্ন অন্য একটা প্রশ্ন আছে আসলে বোধহয় সেটাই মৌলিক: মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় কিনা, সত্য কিনা এই ধারণা যে ইংরেজের ছেলে যেমন ইংরেজিতে, তেমনি বাঙালির ছেলে বাংলায় পড়লে যা শিখবে তা যে-ভাবে তার মনে, প্রাণে, রক্তে গিয়ে মিশবে, সে-রকম কোনো পরভাষার দ্বারা হ'তেই পারে না। আর যদি প্রমাণ হয় যে এই ধারণায় ভুল নেই, তাহ'লে আর তর্ক কিসের। তাহ'লে বাকি থাকে শুধু জাড্যকে জয় করার প্রশ্ন, আর কিছু ব্যবস্থাপনার সমস্যা। সে-বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমরা যদি স্থিরচিত্তে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করি, তাহ'লে সেই ভাষার বর্তমান অভাব পূরণ হ'তে দেরি হবে না, অনিবার্যভাবে দেখা দেবে পাঠ্যপুঁথি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, এবং কালক্রমে ঐ ভাষাতেই নতুন জ্ঞান সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ, যুগপৎ আমাদের ভাষা হবে আরো পরিণত, এবং শিক্ষা আরো প্রাণবন্ত ও সারবান। কিন্তু যদি আমরা ভীরুতাবশত কেবলই পেছিয়ে যাই, যদি আমরা অনবরত ভাবি যে আমাদের মাতৃভাষা এখনো 'উপযোগী' হয়নি, তাহ'লে তার পরিণতির সম্ভাবনাকেও বিনষ্ট করা হবে। যেমন জলে না-নামলে সাঁতার শেখা যায় না, এও তেমনি।
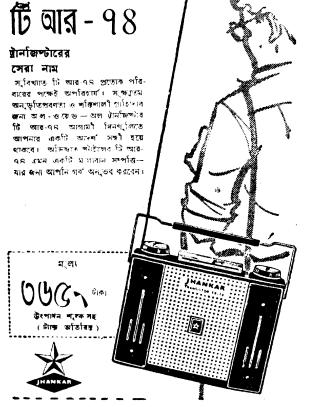
* ভারতে প্রকাশিত একখানা রবীন্দ্র-শত-বার্ষিকী গ্রন্থে দুটি প্রশংসাপত্র ফ্যাকসিমিলিতে ছাপা হয়েছে, তাদের প্রণেতা রবার্ট ফ্রস্ট ও আলবের্ট শোয়াইটজার। শোয়াইটজার 'ভারতের গোয়েটে' রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তার একটি হ'লো 'charming'; মরণোত্তর রবীন্দ্রনাথকেও শ্বেতাঙ্গরা পিঠ না-চাপড়ালে আমরা পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করি না।

এ-বিষয়ে আমাদের পক্ষে উজ্জ্বলতম উদাহরণ জাপান। উজ্জ্বলতম এইজন্যে যে জাপানও এশিয়া, আর এশিয়ার মধ্যে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়কর। এই অভ্যুত্থানের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে এখানে নব্যতম, প্রতীচ্যতম বিদ্যাও মাতৃভাষাতে বিকীর্ণ হয়েছে; জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েও, কখনো পরভাষার দাসত্ব করার মতো আত্মঘাতী ভুল করেনি। অসংখ্য বার, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সুস্পষ্ট ভিন্ন মত সত্ত্বেও, এ-রকম কথা বলা হ'য়ে থাকে যে মাতৃভাষায় শিক্ষা-দান সাহিত্য প্রভৃতি মানবিক বিদ্যায় যদি বা সম্ভব হয়, বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় ইংরেজি নাকি অপরিহার্য। কিন্তু বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় অধিক অগ্রসর কে : ইংরেজিনবিশ আমরা, না কি এই জাপানিরা, যারা মাতৃভাষায় শিক্ষিত হ'য়ে তার দ্বারাই সব কর্ম চালনা ক'রে থাকে? (আমার অনুরোধ : এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে কেউ যেন নিজেকে বিব্রত না করেন।)

২৩ জানুয়ারি

সকাল। গোছগাছ ক'রে তৈরি হচ্ছি এমন সময় জাপান এয়ার-লাইন্স থেকে টেলিফোন এলো : প্লেন বিলম্বিত। লোকটি প্রীতিকর কণ্ঠে জিগেস করলে আমাদের ন্যাশনালিটি কী, এবং আমরা কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্য ইচ্ছা করি কিনা। আমি জানিয়ে দিলুম আমরা শাকাহারী নই।

সুন্দর দিন; যে-পোর্টারটি গাড়িতে আমাদের মাল তুলে দিলো সে সুশ্রী; এয়ার-পোর্টের যুবক কেরানিটি, আমার মনে হ'লো, আমাদের মালের ওজন কিঞ্চিৎ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কোনো আপত্তি করলে না। উঠে আসতে হ'লো দোতলায়, আমাদের দেখামাত্র শ্রীমতী ওটা এগিয়ে এলেন। তাঁর স্বামী আজ জরুরি কাজে ব্যস্ত; তিনি এসেছেন দু-জনের হ'য়ে আমাদের বিদায় জানাতে। জানতেন না আজ প্লেনের দেরি হবে; ট্রেনে, বাস্-এ বহুদূরবর্তী বিমান-বন্দরে এসে দু-ঘণ্টা ধ'রে অপেক্ষা করছেন। তাও মাত্র দশ মিনিটের জন্য দেখা হ'লো। কিন্তু সময়ের অভাব, ভাষার অভাব, উভয় পক্ষের বিদায়বেদনাকে কিছুই অব্যক্ত রাখতে পারলে না।

এমন একটা সময় আসেই যখন আর পিছনে তাকানো যায় না, বা তাকালেও চেনা মানুষ হারিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, হস্টেসের হাসি, যাত্রীদের স্বর, প্লেনের ভিতরে সুগন্ধ ও রেডিওর গান, হাত-মালগুলো গুছিয়ে রাখার চঞ্চলতা। তারপর দরজা বন্ধ করার শব্দ, উপসাগরের উপর দিয়ে প্লেন উঠলো মহাশূন্যে।

সমাপ্ত

যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে প্রাচীন অনেক কিছু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আদিবাসীরা যে তাদের সরল জীবনধারা বজায় রাখতে পেরেছে তারই দৃষ্টান্ত বিহারের এই আদিবাসী সম্প্রদায়।

১। দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ফসল পাওয়ার আনন্দ; ২। ছোট বয়সেই ওরা ওস্তাদ তীরন্দাজ; ৩। বাজারের পথে আদিবাসী দম্পতি; ৪। কোথাও যেতে ওরা ওদের পদযুগলের ব্যবহারেরই পক্ষপাতী—বাচ্চাদের কাঁধে পিঠে নিয়ে বহু মাইল পথ অতিক্রম করে যায়; ৫। ভুট্টা ক্ষেতে কর্মনিরতা; ৬। প্রত্যুষে গোচারণে বেরিয়ে পড়ে ছোট ছেলেরা; ৭। জলের অভাব ওরা মেটায় বহু দূর থেকে কুয়া বা ঝরণার জল বয়ে এনে; ৮। ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত; ৯। হাট থেকে সারা সপ্তাহের সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে গ্রামে ফেরার পথে।

আলোকচিত্রশিল্পী

বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

৪
৫
৬
৭
৮
৯

সা ড়া

আলোক সরকার

সাড়া দিতে কেন যে পারি না। আর একবার ডাকো
সমস্ত বিকেল ব'সে আছি।
আলো সরে গেছে উঁচু গাছের মাথায়, ক্লান্ত মলিন আকাশ।
শেষবার কৌতুকে ফেরাও মুখ, দুই চোখে আঁকো
পুরোনো দিনের সেই সলজ্জ মিনতি। রুদ্ধ গোপন উচ্ছ্বাস
দেখি সাড়া দিতে পারি কিনা।

যে-টুকু এখনো বাকি আঁধার হবার, তার আগে
প্রিয় হাতে দরজা খুলে এসো।
সাড়া দিতে কেন যে পারিনি! উষ্ণ অনুরাগে
সেইদিন ডেকেছিলে, আমার নামের শব্দ যেন প্রতিধ্বনি
বসন্তের প্রতিটি পাতার উচ্চারণে। শেষবার ভালোবেসো
নাম ধ'রে ডেকো, দেখো অন্তরালে, দ্যুতিময় খনি।

হাওয়া আসলেই পাতা দুলে ওঠে, কত যে সহজ সাড়া দেওয়া।
কেন জেগে উঠতে পারবো না?
চিরদিন আচ্ছন্ন স্থবির ম্লান বৃন্ত অবসাদ।
শেষবার আঁধার হবার আগে সাড়া দেব, রক্ত উন্মাদনা
সমস্ত বিকেল ভ'রে কেঁপে ওঠে। আর একবার ডাকো
অন্তরালে এখনো জাগ্রত আছে হীরার বিষাদ।

চী ৎ কা র

দীপক মজুমদার

হে প্রকাশ নিষ্ঠুর নিশ্চয়
অতন্দ্র ছিলাম আমি জেগে
তুমি গড়ে নিবদ্ধদৃষ্ট ভয়
দুর্নিবার অভিপ্রায় বেগে

ঘূর্ণির চূড়ায় দিলে ছুঁড়ে।
ক্লান্ত নীল আলোর হৃদয়
কম্পমান নভতল জুড়ে
তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো 'নয়

নয় নয়' বৃক্ষেরা নীরব
নতমুখ, প্রতিধ্বনিময়
শূন্যতায় আর্ত কলরব,
দুঃসময়, একী দুঃসময়!

প্রণতির উৎসর্গ প্রণয়
খোলে স্তব্ধ মন্দিরের দ্বার
এ কী তীব্র, পঙ্গু, অস্থিসার
স্রষ্টার অমোঘ চীৎকার।

অ র ণ্যে র অ ন্ত রা লে

পরেশ মণ্ডল

পরবাসী চেতনায় ক্লান্তি নেমে এলো
দ্রিমি দ্রিমি মাদলের নিমজ্জিত তালে,
শিথিল চরণে লজ্জা শুধু এলোমেলো
পাহাড়ী গাছের শান্ত বুকের আড়ালে।

জবিপের শামিয়ানা বিছিয়ে বিছিয়ে
কঠিন এ-শিলাতলে কার বৃন্দাবন?
কে তুমি অমল জলে গোপনতা দিয়ে
আঁচলে কুন্তলে বাঁধো হরিণের মন?

সারা মাঠ জুড়ে কেন ধূসর বাসনা—
অনাবৃত অন্ধকার, নৈঃশব্দের ভিড়:
সিঁড়িতে অস্থির মৃত পদশব্দ গোনা
কোথাকার অনুচ্চার গৃহে হবে স্থির!

অরণ্যের অন্তরালে শুনি বারংবার
প্রাথমিক রৌদ্রে বোনা করুণ চীৎকার।

শেষ পর্যন্ত

রাজলক্ষ্মী দেবী

'পারি নি—' শ্রেয়া নিজেকেই বলল, 'অনীতার সঙ্গে কোনোদিনই আমি পারিনি। নামেই শ্রেয়া, কাজে শ্রেয়া হতে পারিনি। দ্বিতীয় থাকতে হয়েছে সর্বত্র, সর্বদা।'

অ্যাংলো-স্কুলের ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড। ম্যানেজার সাহেব আর তাঁর বিদেশিনী পত্নীর একমাত্র দুহিতা অনীতা। গমের মতো বাদামী তার চুল, গমের চেয়েও একটু বেশী বাদামী, লালচে গায়ের রং। চোখ দুটোতে নীল আর কালো অপরূপভাবে মিশে গেছে। নাম বলে, অ্যানিটা।

'ইংলিশ নাম, না, বাংলা?' বোকার মত প্রশ্ন করে বসেছিল বীরেশ।

'অবশ্যই ইংলিশ। নয়তো আবার এ রকম নাম কেন হবে?' অনীতা হাসছিল।

'অনীতার বাংলা মানেও হয় কিন্তু। অভিধানে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'Really? How interesting?'

অনীতা তার বাদামী চুল ঝাঁকিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল।

টেক্‌নিসিয়ান, ফোরম্যান, এমন কি মিস্ত্রীদের কলোনি থেকেও, আঙুলে-গোনা কটা ছেলে অ্যাংলো স্কুলেই পড়তে আসে। মাইনে যুগিয়ে আর বাসভাড়া কুলোনো যায় না মিস্ত্রী কি টেক্‌নিক্যাল পার্সোনেলের সামান্য আয়ে; ছেলেগুলো তাই সাতসকালে উঠে দু মাইলের ওপর পথ হেঁটেই আসে। অপুষ্ট দুর্বল শরীর; রোগা মুখগুলো ক্লান্তিতে শুকিয়ে থাকে। পড়াশোনায় তবু ওদেরই আগ্রহ বেশী। সাহেবপাড়ার ভালো পোশাক পরা ছেলেগুলো বিরক্ত মুখে ক্লাসে বসে, জানালার বাইরে থাকে তাদের চোখ। অবকাশে নিরীহদের ঠ্যাঙায়, মেয়েদের খেপায়,—চোস্ত উচ্চারণে বিলিতী টিপ্পনী কাটে পড়ায় ভালো উজবুকগুলোর সম্বন্ধে। ব্যতিক্রম শুধু অনীতাদের ক্লাসে। অনীতা যেন সাহেবপাড়ার গোবরে পদ্মফুল, কিংবা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। নীলাভ কালো চোখ বিস্তার করে ক্লাসের পড়া শোনে, পড়া শেখে নির্ভুল। ফার্স্ট হওয়া নিয়ে লেবার-অ্যাসিস্টান্ট তারাবাবুর মেয়ে শ্রেয়ার সঙ্গে তার বিষম আড়াআড়ি।

'পারিনি শেষ পর্যন্ত। যত উঁচু ক্লাসে উঠতে শুরু করলাম, অনীতাই বেশীবার ফার্স্ট হতে লাগল।'

অ্যাংলো-স্কুলের সিক্সথ্ স্ট্যান্ডার্ড। তখন বীরেশ কোথায়! বীরেশ তখন ভর্তিও হয়নি। অনীতা দশ পেরিয়েছে, পুরন্ত হয়ে উঠেছে তার শরীর ওই বয়সেই। স্কার্ট ব্লাউজ ছাপিয়ে যেতে চাইছে এক রাশ বিদেশীয় কৈশোর। আর সুন্দর হচ্ছে সে দিন থেকে দিনে। কালো, ছোট্ট, রোগাটে মেয়ে শ্রেয়া ভাবত, আর কত সুন্দর হবে অনীতা?

সবার মুখেই 'অ্যানিটা' আর 'অ্যানিটা'। তবু শ্রেয়া একবার ফার্স্ট হয়েছিল সেই ক্লাসেও। কী কান্নাই তার পর কেঁদেছিল অনীতা, ঢলঢলে চোখে যেন প্লাবন নেমেছে, ফর্সা মুখ চাপা অভিমানে রক্তিম। পিরিয়ড থেকে পিরিয়ডে টীচার বদলি হল, সবার মুখেই প্রথম প্রশ্ন, 'অনীতার কী হল? কাঁদছে কেন?'

'ও এবার ফার্স্ট হতে পারে নি যে!' ছেলেরা চীৎকার করে জানাল প্রত্যেকবার।

'সত্যি?' সহানুভূতিতে কোমল সবাই, 'যাক্ গে। সামনের বার তুমি ফার্স্ট হবে নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই।' সোৎসাহে সায় দিত ছেলেরা। মেয়েরাও। শ্রেয়ার জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই। শ্রেয়ার দলে কেউ নেই। শ্রেয়া একলা।

পরের বার শ্রেয়া সেকেন্ড হয়েছিল। ক্লাস খুশী হয়েছিল। অনীতা উজ্জ্বল হয়েছিল। শ্রেয়া ভাবতে বসেছিল, রেশিওর অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত সে ভুল করে কেটে দেয় নি ত, অঙ্কে তার দশ নম্বর কাটা গেল কেন? কাঁদত না শ্রেয়া। কেঁদে যে জীবনের অনেক যুদ্ধে জেতা যায়, শ্রেয়া তাই জানত না।

'পারি নি। তার কারণ এই নয় যে, আমার ক্ষমতা ছিল না। আমি কয়েকটা সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাই নি।'

'রূপ'—এই কথাটা বীরেশ একদিন শ্রেয়ার মুখের ওপর বলেছিল—'ঈশ্বরের দেওয়া এক সৌভাগ্য। ঠিক যেমন সুন্দর গানের গলা।'

বীরেশ আসার আগে থেকেই কি শ্রেয়া তা টের পায় নি? গান শিখতে তার দেরি

হত না, সুর শুনলে তার হৃদয় ময়ূরের মতো পাখা মেলত, পা আপনিই নেচে উঠত। তবু তার চেহারার দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাতেন টীচাররা, নির্বাচিত হত অনীতা আর ওদের দলের অন্য মেয়েরা। তা শ্রেয়ার সয়ে গিয়েছিল।

মিসেস রহমান ওদের নাচ শেখাতে না এলেই বুঝি ভালো হত। শ্রেয়ার মধ্যে কেন যে তিনি আশ্চর্য কিছু খুঁজে পেলেন, তাঁর নৃত্যনাট্যের প্রধান ভূমিকায় শ্রেয়াকেই নামাবার সংকল্প করে রিহার্সাল শুরু করলেন তিনি। আর শ্রেয়া হঠাৎ অনভ্যস্ত গৌরবে, অসম্ভব খুশীতে উচ্ছল হল তার নিভৃত অন্তরপ্রদেশে।

ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রী তাঁর সাদা গাড়ি নিজে চালিয়ে রিহার্সাল দেখতে এলেন একদিন। হেড মিস্ট্রেস থেকে সবাই সন্ত্রস্ত। মূক অভ্যর্থনা কার্পেটের মতো বিছিয়ে গেল মান্য অতিথির সামনে।

'তুমিই শ্রেয়া?' সোনালী চুল, টকটকে ঠোঁট, ভদ্রমহিলা নিরীক্ষণ করলেন তাকে—'অ্যানিটা তোমার কথা খুব বলে।'

রিহার্সাল মন দিয়ে দেখলেন, ইতিউতি তাকালেন, বললেন নীচু গলায় হেড মিস্ট্রেসকে 'শ্রেয়া মেয়েটি নাচে ভালো, কিন্তু প্রধান ভূমিকার পক্ষে চেহারাটা বড্ডো সাদামাটা নয় কি?'

দুই চুমুক দেবার পর নামিয়ে রাখলেন চায়ের অসমাপ্ত পেয়ালাটা। হেসে বিদায় নিলেন।

পরের দিনই পার্ট বদলি হল। শ্রেয়ার জায়গায় অনীতা। শ্রেয়ার ছোট্ট এক পার্শ্ব-ভূমিকা। মিসেস রহমান থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন সমস্ত দিন। জনরবে শোনা গেল, তাঁর অনেক প্রখর আপত্তি হেড মিস্ট্রেসের নির্দেশের সামনে কুটোর মতন ভেসে গেছে।

'এই ছোটো পার্ট, এই বিচ্ছিরি পার্ট—' তারাবাবু রাগে তোতলাতে শুরু করলেন, 'তোকে দিয়ে, শেষে তোর পার্ট ম্যানেজারের মেয়েকে? কী অন্যায়!'

'কালকে গিয়ে ফিরিয়ে দেব পার্ট?' শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল, 'বলব, আমি পেল করব না? আমার আর করতে ইচ্ছে হচ্ছে না বাবা।'

'ফিরিয়ে দিবি?' রাগ নেমে গেল তারাবাবুর। 'দাঁড়া, ভেবে দেখি। চট করে ও রকম করা ঠিক নয়। কী থেকে কী দাঁড়ায়! তুই বরং করে যা এখন, 'প্লে'র দিন সরে দাঁড়াবি। শরীর খারাপের ছুতো করবি। ওদের বলার কিছু রইল না, আর 'ড্রামা'ও হলো ভরাডুবি। ঠিক হবে।' হেসে উঠলেন জোর গলায়।

'কিন্তু বাবা—' শ্রেয়ার গলা করুণ শোনাল, 'মিসেস রহমানকেই যে ডোবাতে হবে তা হলে। তা আমি পারব না কিন্তু।'

'পারি নি। এই রকম সব ইতস্তত, মানসিক খুঁতখুঁতি, আমাকে প্রত্যেকবার টেনে এনেছে অনীতার পাশাপাশি, নির্বিবাদে দ্বিতীয় হবার জন্যে। কতবার ওকে ঘষে মেজে আমিই তৈরি করেছি প্রধান ভূমিকায় ঝলমল করে হাসিমুখে সোনার মেডেল নেবার জন্যে।'

অ্যালেনস্কুলের সেভেনথ স্ট্যান্ডার্ড। লেজার-পিরিয়ডের ঘণ্টা দিয়েছে। শশিকলা জৈন ছুটতে ছুটতে এল, 'নিউজ! একটা নতুন ছেলে বসে আছে প্রিন্সিপালের ঘরে।' সবাই কৌতূহলী, 'কোন ক্লাসে আসবে ছেলেটা—কোন্ ক্লাসে?'

লিকলিকে রোগা, শান্ত মুখের ছেলেটা ওদেরই ক্লাসে এল। চোখ দুটো নিরীহ, মুখের ভাবে আর শরীরের নেতানো ভঙ্গিমায় ভালোমানুষি সুস্পষ্ট। ক্লাসের ছেলেগুলো চাপা গুঞ্জন ওঠাল, টিটকিরির মতো সেই গুঞ্জনের সুর। তারা টের পাচ্ছিল, তাদের নিষ্ঠুর সব কৌতুকের শিকার জুটেছে। বাঘ বুঝি এমনি করেই লুকিয়ে-থাকা ভীরু হরিণের গন্ধ পায়। লেজার-পিরিয়ডের আগেই তাদের সুযোগ এসে গেল

অঙ্কের টীচার নাম জিজ্ঞেস করলেন ছেলেটার।

'বীরেশ জোয়ারদার—' রিনরিনে মেয়েলী গলায় জবাব দিল সে।

আর হাসির বান ডাকাল ছেলেমেয়েরা।

'হরজিন্দর!' সস্নেহ ধমক দিলেন স্যার, 'অত হাসি পেল কিসে?'

ঢিলে-হওয়া পাগড়ি সামলালো হরজিন্দর, অবাধ্য আরেক ঝলক হাসি অতি কষ্টে গিলে নিল। উঠে দাঁড়াল তারপর। 'ঐ চেহারা নিয়ে ও যদি বীরেশ হয়, তার ওপর আবার জোরদার, কে হাসি পাবে না? ওকে তো টোকা দিলে উড়ে যাবে।'

বীরেশ জোয়ারদার তাই শুনে কটমট করে তাকাল। তখনকার মতো 'স্যার' দুজনকেই বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী লেজার-পিরিয়ড থেকেই লেগে গেলো ওদের শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। 'চুহা—' এই নামে ওকে ডাকতো সর্বদাই হরজিন্দরের দল—'ইঁদুরের মতন রোগা, তেমনি কিচকিচে গলার আওয়াজ। নাম হচ্ছে বীরেশ জোয়ারদার! লাগতে আয় না, দেখিয়ে দেব।'

খেপার মতো দুই হাতে লক্ষ্যহীন ঘুঁষি ছুঁড়ে লড়াই করতে যেত বীরেশ। চোখ খুলে তাকাত কি না কে জানে—ওর বেশীর ভাগ মার শূন্যেই পড়ত। হরজিন্দররা সত্যিই কিন্তু ওকে মারত না, নেহাতই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক-আধটা চড়চাপড় হয়ত বা দিত, শুধু ফ্যাকফ্যাক করে হাসত, বলত—'চুহা যে বাঘসিংহদের কামড়াতে আসছে রে! বাঘসিংহেরা গর্ত খুঁজবে এবার।'

একদিন রাগের মাথায় একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে মেরেছিল বীরেশ হরজিন্দরের দিকে। যদি ওর লক্ষ্য ঠিক হত, তা হলে হরজিন্দরকে ফাটা মাথা নিয়ে সেদিন হাসপাতালে যেতে হত নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রায় চল্লিশ ডিগ্রীর ব্যবধান রেখে পাথরটা একটা গাছে গিয়ে লাগল; আর হরজিন্দররা খেপানো হাসির ধুয়ো ওঠাল।

সেইদিন শ্রেয়া বীরেশকে অভিভাবিকার মতো শাসন করেছিল, 'উচিত হয়নি ওইভাবে পাথর ছুঁড়ে মারা। রাগ হয় মানি। তাই বলে খুনীর মতো রাগ হবে তোমার।'

'শ্রেয়া—' বীরেশ হঠাৎ ভয়-পাওয়া গলায় বলেছিল 'রাগ হলে কিছু মাথার ঠিক থাকে না আমার। অত খেপালে ঠিক পাগল হয়ে যাব আমি।'

'দূর!' শ্রেয়া বীরেশের হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। মেয়েলী হাত, ফর্সা আর পাতলা হাতের চামড়া, রক্তের আসা-যাওয়া দেখা যায় যেন। সরু আঙুলের ডগা, লম্বা লম্বা ঢিমের মতো নখ। 'ওসব বাজে ভয় ভুলে যাও।' বীরেশকে বলেছিল শ্রেয়া-'ওদের কথায় কান না দিলেই হল।'

মনে মনে অবশ্য শ্রেয়া জানত, বীরেশের ভয়টা একেবারে বাজে নয়। জোয়ারদারবাবুদের কথা শ্রেয়া তার বাবার কাছ থেকে এর আগে শুনেছিল। কোন এক বড়ো কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ভদ্রলোক, মাথা খারাপ হয়ে চাকরিটা যায়। পাঁচ বছর চিকিৎসা-খরচ চালাবার পরে ভাইয়েরা এমন বিরক্তি দেখাল যে—একটু ভালো সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করারও সুবিধা পেলেন না ভদ্রলোক। এই সামান্য চাকরি নিতে হল। দুঃখের, ব্যর্থতার একটা মর্মান্তিক ইতিহাস।

বীরেশের জন্যে প্রথম থেকেই তাই কেমন মায়া হতো শ্রেয়ার। এই ছেলেটার ত আজ কথা ছিল ওদের মতই বড়ো মোটর চড়ে স্কুলে আসার, হরজিন্দরদের দলে সুবেশ ময়ূর সেজে ঘুরে বেড়াবার! কী ভাগ্যে আজ ওর এই দাঁড়কাক-দশা? মায়া হবার মতো চেহারাটাও ছিল বীরেশের। লতানো ছিপছিপে একটা শরীর; ফর্সা লম্বাটে মুখ; আঁকা ভুরুর নিচে টলটল করত অসহায় চোখ দুটো; চোখের পাতাগুলি এত বড়ো যে, মনে হত হাওয়ায় কাঁপছে।

শ্রেয়া বীরেশের পাশাপাশি হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। বলছিল, 'ওদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। ওরা বড়োমানুষ, আমরা গরীব। তেলে জলে মিশ খায় না। তার চেয়ে, আমরা নিজেদের মনেই থাকব।'

'পারিনি। বীরেশকে সেই কথা দিয়ে আমি বেঁধে রাখতে পারিনি।'

ধীরে ধীরে শ্রেয়া বীরেশের বাড়িকে বুঝতে পেরেছিল। স্কুল থেকে এসে নিঃশব্দে বইগুলো রেখেই বেরিয়ে যায় বীরেশ, এতটুকু আওয়াজ না করে। মা-র ঘুমভাঙানোকে তার ভয়। সন্ধ্যেবেলায় জোয়ারদারবাবু ফেরেন, হাতমুখ না ধুয়ে আগে সুজি তৈরি করেন, চা ছাঁকেন। রেবা-কাকিমা তখন একমনে ছবি আঁকছেন।

'বীরু কোথায় গেল ?'

অপার্থিব লোক থেকে ... অনিচ্ছায় নেমে আসেন বীরেশের ... তো—ও তো আমাকে কিছু বলেওনি।'

'আচ্ছা, তুমি চা খাও। আমি দেখছি।'

দরজা খুলে বেরিয়ে জোয়ারদারবাবু হাঁক দিতে গিয়েই থামেন। শ্রেয়ার সঙ্গে ফিরত বীরেশ, রোজ। শ্রেয়া তাকে জোর করে জল-খাবার খাওয়াত, রোজ। বীরেশ অভিমানী, বীরেশ সংকোচের অহংকারে হরধনুর মতো অনমনীয়, শ্রেয়া তাই মনের অনিচ্ছা লুকিয়ে সেই অদ্ভুত বাড়িতে যেত, রোজ।

তার পড়ার ঘরে শ্রেয়াকে একটা চেয়ারে বসাত বীরেশ। কী একটা অস্বস্তিতে নিজেও উশখুশ করতো, তবু শ্রেয়া যেতে চাইলে অপমানে রক্তাভ হত তার মুখ। শ্রেয়াকে তাই অনেকক্ষণ ধরে বসে বীরেশের অস্বস্তি দেখতে হত। ফিসফিসিয়ে গল্প করতে হত।

'জোরে কথা বললে—' বীরেশ বলতো, 'মার অসুবিধে হয়। মা রাগ করেন।'

আরেকদিন আচমকা সময়ে বীরেশকে খুঁজতে গিয়ে শ্রেয়া বীরেশের মা-র রাগ দেখতে পেয়েছিল। এই দেখার জন্যে বীরেশ তাকে ক্ষমা করবে না—সেই ভয়ে ছায়ার মতো লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিল শ্রেয়া। এই দেখার কথা বললে বীরেশকে হারাতে হত, শ্রেয়া তাই সে কথা কোনোদিনই মুখে আনেনি।

'পারিনি। এত সাবধানে থেকেও আমি বীরেশকে নিজের করে রাখতে পারিনি।'

অ্যাংলো-স্কুলের অ্যানুয়েল স্পোর্টস। এইখানে বড়োমানুষ-পাড়ার ছেলেরা দিক-পাল। পড়ায় না হোক, খেলায় ওরা উজ্জ্বল। স্বাস্থ্য ভাল, অভ্যাস-আয়োজনের ত্রুটি হয়নি কখনো। হার্ডল রেস, জাম্পিং, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, বেসবল সবেতেই ওরা জিতছে। মেয়েদের দিকটা জমজমাট করেছে অ্যানিটা, বারো বছরেই যার মাথা বীরেশকে ছাড়ায়।

বাদামী চুল ওড়াতে ওড়াতে অনীতা শ্রেয়ার মুখোমুখি এসে বীরেশকে সম্বোধন করলো, 'খেলাধুলো করো না কেন? একটা ইভেন্ট-এও তোমার নাম নেই।' পট করে বীরেশের হাতটা নিয়ে পাঞ্জা ঘোরানোর ভঙ্গি করে হেসে উঠলো, 'কী লিকলিকে রোগা কব্জি, তোমার তো মেয়ে হওয়া উচিত ছিল বীরেশ।'

হরজিন্দরের অসহিষ্ণু গলা শোনা গেল, 'অ্যানিটা, এর পরে আমাদের দুজনের থ্রি-লেগেড রেস, ভুলে গেলে নাকি?'

'ভুলিনি।' নীল চোখ ভরপুর করে হাসল অনীতা বীরেশের দিকে তাকিয়ে। হাত নেড়ে বীরেশকেই বলল, "Bye—" তারপর ছুটে চলে গেল মাঠে।

পরের সপ্তাহেই কী কৌশলে ফুটবল টিমে জায়গা যোগাড় করল বীরেশ। সাধারণ একটা অভ্যাসের খেলা, তবু তারই মধ্যে হরজিন্দরের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে বসে পড়েছিল 'উঃ' বলে।

তার পরে কনকনে শীতেই সাঁতার শেখার শখ হল বীরেশের।

তার পরের ব্যাপারে শ্রেয়া আরও অবাক। ব্যাডমিন্টন খেলতে অনীতার বাড়ি যাবে বীরেশ রোজ বিকেলে। শ্রেয়া বীরেশকে থামতে চাইল, 'তোমার কি খেলোয়াড় হবার মতো সুবিধে আছে বীরেশ? ভেবে দেখো, স্কুলের দু' মাইল পথ হেঁটে যাওয়া-আসাটাই কি কম পরিশ্রম?'

'হরজিন্দররা সবাই অনীতাদের কোর্টে খেলতে যায়।' বীরেশ জেদী মুখ করল। অনীতা আমাকে নিজে বলেছে। না গেলে কী ভাববে শুনি?'

শ্রেয়া চুপ করে রইল, মনের মধ্যে অসহ্য ছটফটানি নিয়ে। তবু ঈশ্বর সদয়, কয়েক-দিনেই বীরেশ ইস্তফা দিল। —'দূর, নিজের র‍্যাকেট না থাকলে বিশ্রী লাগে ওদেরটা চাইতে।'

তারপর কতদিন, কতকাল ধরে যে এই টানাটানি চলেছে বীরেশকে নিয়ে! সুন্দর-মতো এই হাবাগোবা ছেলেটাকে অনীতা নিশ্চয় চোখ চেয়েও দেখত না, যদি সে শ্রেয়ার দখলী জিনিস না হত। শ্রেয়া বীরেশকে যদি দামী না ভাবত, তবে অনীতা নিশ্চয় দাম দিত না তাকে। বীরেশ শ্রেয়ার খুব বন্ধু বলেই বীরেশের দিকে নীল চোখে জ্বলজ্বলে আগ্রহ নিয়ে তাকাত অনীতা, তাকে ডাকত গানের দোসর হতে, খেলার সঙ্গী হতে।

অ্যাংলো স্কুল থেকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ। শ্রেয়া আর অনীতার পড়ার প্রতিযোগিতা ফুরিয়েছে ততদিনে। মেডিক্যালের ছাত্রী শ্রেয়া অনীতাকে অনেক সহজেই হারিয়ে দিচ্ছে, হারাচ্ছে বীরেশকেও।

'পারিনি। তার অনেক আগেই আমি অনীতার সৌন্দর্যের সামনে মনে মনে চির-কালের মতো হেরে গিয়েছিলাম। মেডিক্যালের গানের জলসায় ওদের জুটি সবাই জানত, শ্রেয়াকে চিনত কে?'

তবু, অনীতাই সরে গেল। অন্তত শ্রেয়া তখন ত তাই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

একেবারে অজানা একটা ইঙ্গ-ভারতীয় ছেলের সঙ্গে ঘূর্ণিবায়ু-প্রেম বইয়ে দিল অনীতা; হস্টেল থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বসল তাকে। বীরেশ চার রাত ঘুমোয়নি, আর বীরেশ আত্মহত্যা করবে ভয়ে শ্রেয়া এক মাস ভালো করে ঘুমোতে পারেনি।

'জানো, ছেলেটা কী করে?' অবশেষে একদিন বলে বসলো বীরেশ, 'যে ছেলেটাকে অনীতা বিয়ে করেছে?'

'না ত। তুমি জানো নাকি?'

'একটা রেস্তোরাঁর ওয়েটার। তার কোন গুণের পরিচয় পেয়ে অনীতা মজলো, তাই ভাবছি। বিদেশ থেকে আসা ওর মা মহিলাটি নিশ্চয় নীচু শ্রেণীর, নইলে রুচি এত নিচু হবে কেন।'

'ছিঃ বীরেশ—' শ্রেয়া ধমক দিয়েছিল, 'নিজেকে ছোট করো না।'

বীরেশ তারপর কেঁদেছিল। শ্রেয়ার কাছে বীরেশের সেটাই প্রথম কান্না নয় অবশ্য, কিন্তু এর আগে কখনো সান্ত্বনা দিতে সংকোচ হয়নি শ্রেয়ার। সেদিন হল।

সেদিন শ্রেয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বীরেশকে কাঁদতে দিল।

মেডিকাল অফিসার হয়ে শ্রেয়া আবার সেই পুরোনো জায়গাতেই আসতে পারবে কে ভেবেছিল? খুশী মনে শ্রেয়া বীরেশকে চিঠি লিখতে বসল। লিখল, 'ছুটি পেলে তুমিও এখানে আসছ নিশ্চয়ই। এবার বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই।'

সেই আকাশ, সেই স্কুল-যাওয়ার আঁকা-বাঁকা রাস্তা, সেই সুইমিং পুল, যার জলে, অনীতার চোখের মতো নীল জলে ঝাঁপিয়ে বীরেশ পৌরুষ দেখাবার পাগলামি করত। সব ঘুরে ঘুরে দেখল শ্রেয়া। অনীতা নেই, অনীতার ছায়াও নেই ওদের এই নিজস্ব পৃথিবীতে আর। শ্রেয়ারই জিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

'পারিনি। কে জানত, আমার জিতকে অনীতা এমন সহজে মিথ্যে করে দেবে!'

তখনো শ্রেয়ার হৃদয়ে সুখ, শ্রেয়ার পৃথিবীতে বসন্ত। বীরেশ চিঠি লিখেছে, সামনের সপ্তাহেই সে আসছে, তারপর বিয়েটা হওয়াই চাই। শ্রেয়া তার হালকা ব্যাগটা দুলিয়ে আপনমনে হেঁটে যাচ্ছিলো রুগী দেখতে।

'I Say—শ্রেয়া, না?'

'হরজিন্দর!' শ্রেয়া হঠাৎ হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দে হেসে উঠেছিলো, 'তুমি আজকাল এখানেই চাকরি করছো বুঝি?'

'তুমিই বুঝি নতুন M O?—আচ্ছা।' হরজিন্দর সুষ্ঠু ভঙ্গিতে কাঁধঝাঁকুনি দিলে, 'একটা প্রশ্ন করি, একলা আছ, না বিয়ে করেছ?'

'কী যে হয়ে গেছ!' দুষ্টুমি করেছিল শ্রেয়া।

'আজকাল কি আর দেখে মনে হবার কিছু রেখেছ তোমরা? বাঙালী মেয়েরাও যে সিঁদুর শাঁখা ছেড়ে দিয়েছে! নিজেই বলে কৌতূহল মেটাও না।' হরজিন্দর ওর পাশে পাশে চলতে লাগল।

এইরকম কথায় কথায় শ্রেয়া তাকে বীরেশের কথা, তাদের স্বপ্নের কথা, মধুর সম্ভাবনার কথা বলে ফেলেছিল।

বীরেশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেয়া হরজিন্দর সিংয়ের কথা ওকে বলল। বীরেশ শুনছিল আর তার গাল রক্তাভ হচ্ছিল, ভুরু কুটিল হচ্ছিল। শ্রেয়া উদ্দাম হেসে উঠল—'আচ্ছা বীরেশ, তুমি ছেলেবেলার কথা ভুলতে পারোনি আজও? কী ছেলেমানুষ তুমি!'

'একটি স্কাউন্ড্রেল!' বীরেশ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল, 'ওর সঙ্গে ভদ্রলোকের কথা বলাই উচিত না। জানো ওর কীর্তিকলাপ?'

'কীর্তিকলাপ?'

'হ্যাঁ। অনীতা ওর সেই চমৎকার বরকে ছেড়ে চলে এসে আজকাল যে হরজিন্দর সিংয়ের পত্নী অনীতা কাউর হয়েছে, এসব খবর কিছুই পাওনি বুঝি? শুধু নিজের খবরই দিয়ে গেছ সাত কাহন!'

আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্র পড়লে এত চীৎকার হত না শ্রেয়া, এত দুঃখ হত না।

ভবিতব্যের মতোই ওদের দেখা হল হরজিন্দরের বাড়িতে চায়ের টেবিলে। অনীতা তার বাদামী চুল লম্বা করে, সালোয়ার কামিজ পরে নিখুঁত পাঞ্জাবী মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। সুন্দরী অনীতা হাসির লহরী তুলে বলল, 'ওঃ, আমাদেরই শ্রেয়া এখন medical officer! হরজিন্দর, আমি যে একদম বাজে হয়ে গেলাম। আমার আর কিছু হল না!'

'অনুমতি দাও তো বলি, দেবী—' বীরেশ ইংরেজীতে বলল, 'তোমার সৌন্দর্যই হয়েছে তোমার ক্ষতির কারণ।'

হরজিন্দর হা হা করে হেসে টেবিল চাপড়াল, বলল, 'Hear, hear! বীরেশ আর সেই বীরেশ নেই।'

'পারিনি। ধীরে ধীরে চোখের সামনে অনীতা বীরেশকে আচ্ছন্ন করল। হরজিন্দর কিছু না বুঝুক, আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু বীরেশ যদি সতর্ক না হয় ত আমি তাদের পথ আটকাতে যাই কেন? হরজিন্দরকে আমি কিছুই বলতে পারিনি।'

হরজিন্দর। বীরেশ নয়। কিন্তু কান্নাটা তো সেই একই। যে কান্না মেডিক্যাল স্টুডেন্ট বীরেশ একদিন শ্রেয়ার ঘরে বসে বসে কেঁদেছিল। যে কান্নার মধ্যে বীরেশের ভ্রান্ত আত্মাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে শ্রেয়া মর্মে মরে গিয়েছিল। সেদিন শ্রেয়া বলতে পারেনি। আজ বলবে। হরজিন্দরের মধ্যে শ্রেয়া একটি খাঁটি পৌরুষকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেবে না শ্রেয়া।

'হরজি!' শ্রেয়া অ্যাংলো-ইস্কুলের পুরোনো নামটা ধরেই ডাক দিল, 'অনীতাকে ভালবাসা তোমার ভুল হয়নি। তোমার ভালোবাসাকে বারবার ঠেলে দেওয়াতে ভুল হচ্ছে অনীতারই। কত বড়ো ভুল, বেচারা জানে না। বীরেশ ওকে কী দিতে পারবে?'

'তুমি ভাবছো, শ্রেয়া—' হরজিন্দর মুখ তুলল—'অনীতা আবার ফিরে আসবে—আর আমি তাকে আবারও টেনে নেব। হয়তো তাই নিতাম, কিন্তু তুমিই বা বারেবারেই হারবে কেন? তোমার কি সুখী হবার কোনো অধিকারই নেই?'

আকাশ সত্যিই শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন নীল। কোথাও অনীতার ছায়া নেই, বীরেশের ছায়াও নয়। পুরোনো পথগুলো ওদের নতুন পদচারণার জন্যে আমন্ত্রণ বিছিয়ে দিল।

'বিয়ের তারিখ আসুক চাই না আসুক—' শ্রেয়া হরজিন্দরকে বলল, 'আর আমার হেরে যাবার ভয় নেই। অনীতার জন্যেই শেষ পর্যন্ত সর্বথা জিতে গেলাম আমি।'

'আমি পতিত।'—হরজিন্দর মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করলো; দুজনের হাসি অনেক দূরের দিগন্ত ছাপিয়ে চলে গেল।

পাকিস্তানের প্ররোচনায় অন্তর্ঘাত-মূলক কার্যকলাপ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ধর্মস্থানে বোমা স্থাপন করা হইয়াছে—বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ মেনন। —"আবার ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগেও বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

বেতারে নির্বাচনী প্রচার বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম—"কুছ পরোয়া নেই,
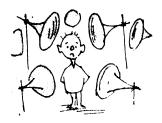
মাইক তো হ্যা আর নেই তো হাতের পাস চোঙা"—বলেন আমাদের শ্যামলাল।

স্যার জন সার্জেন্টের রিপোর্টের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলেন সাংবাদিকগণ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নাকি বলিয়াছেন—যা চাও তা দিতে পারব না, তবে এই নাও, দুটোই আছে—এই বলিয়া দুটি চকোলেট সাংবাদিকদের দিলেন। —"অতঃপর সাংবাদিকগণ সংবাদের বদলে চকোলেট পেলাম বলে ডাকড়ুমাড়ুম করেছেন কি না, তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি সংবাদে জানা গেল, পৃথিবীর পরমায়ু, আর তিন হাজার বৎসর। খুড়ো বলিলেন—"অকাল মৃত্যু সত্যিই মর্মান্তিক। যাহোক, ভোটদাতাদের দুঃখের

পুকুরে স্নান করবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তার খনন কার্য অবিলম্বে আরম্ভ না করে দিলে পৃথিবীর পরমায়ুর মধ্যে পুকুর হলেও, পুকুর প্রতিষ্ঠা আর হয়ে উঠবে না!!"

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী, কংগ্রেস যাহাতে কর্মযজ্ঞ চালাইয়া যাইতে পারে, সেই ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। —"কিন্তু যজ্ঞের ঘৃত যে অষ্টগ্রহ শান্তিতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অষ্টগ্রহের কল্পিত মহাপ্রলয়ের আগে জনৈক বামপন্থী নেতা নাকি তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—প্রলয় কাণ্ড ঘটিতে যাইতেছে, 'তাঁহারা' কী করিতেছেন, জোড়া বলদ দিয়া কি প্রলয় থামানো যায়। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃতে মর্দনেই কি প্রলয় থামে!!

কংগ্রেসের অগ্রগতির রথ বজায় রাখিবার জন্য ডাঃ রায় আবেদন জানাইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু এদিকে যে রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, এই ধাঁধার উত্তর কে দেবে!!"

পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ সাহেবের ঢাকা হইতে গোপনে করাচী চম্পট—বলিয়াছেন সংবাদ-পরিবেশক। —"কিন্তু

ভুল বলেছেন, মিলিটারি কখনও পালায় না, পশ্চাদপসরণ করে"—বলে শ্যামলাল।

নাটক-অভিনয়াদি কোথায় কী হইতেছে, খবর দেওয়ার জন্য 'আনন্দবাজার' পত্রিকার একটি বিভাগ আছে "এ সপ্তাহে কোথায় কী।" আমাদের জনৈক সহযাত্রী জবাবে বলিলেন—"টালিতে নির্বাচন, টালাতে নির্বাচন, খিদিরপুরে নির্বাচন, বালিগঞ্জে নির্বাচন, বৌবাজার, পার্ক সার্কাস, চৌরঙ্গী সর্বত্র শুধু নির্বাচনের বাদ্যি।"

খেলা প্রসঙ্গের সংবাদে শুনিলাম, ভারতীয় দল তাহাদের পূর্ব সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জামাইকাতে প্রথম জয়লাভ করে। —"জামাই-কা মাটিতে আমরা সত্যিই বীর"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

বাংলার তিনশত চিকিৎসককে উড়িষ্যার স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগ করা হইবে বলিয়া উড়িষ্যা সরকারের সিদ্ধান্তে কটকে সাত শতাধিক মেডিক্যাল ছাত্র নাকি প্রতীক ধর্মঘট করিয়াছে। —"কিন্তু তাদের জানা উচিত—চিকিৎসকরত্নং দুষ্কুলাদপি" মন্তব্য করে শ্যামলাল।

ভোটদাতাদের আঙুলে দাগ দেওয়ার জন্য চার লক্ষ শিশি কালির প্রয়োজন হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"ভোটপ্রার্থীদের পরস্পরের গায়ে ছিটনোর জন্য কতটা কালির দরকার হবে, তা এখনও জানা যায়নি!!"

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও কুয়াশার জন্য এইবারে পানের বরোজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। শুনিলাম, সরকার এ বিষয়ে সাহায্য করার কথা বিবেচনা করিতেছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী পূর্ববঙ্গের একটি গান শুনাইলেন—"পান দিলে সুপারি লাগে, আরো লাগে চূণ, ঘুসকাইয়া ঘুসকাইয়া জ্বলে পিরিতের আগুন।"

কোন এক বৈদেশিক সংবাদে জানা গেল যে, জনৈক জজ সাহেব একটি তরুণীকে (স্বেচ্ছা বিবাহের মামলায়) বলিয়াছেন যে, আগে তাঁহাকে রন্ধন-বিদ্যা শিখিতে হইবে, এই জন্য তিন মাস সময় দেওয়া গেল; তারপরে তিনি বিবাহে অনুমতি দিবেন। —"তরুণী কী বলেছেন বা কী করছেন, জানা যায়নি। তবে ব্যাপারটা আমাদের দেশে হলে 'রান্না করা চলবে না—চলবে না মিছিল' বেরিয়ে যেত"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফররত ভারতীয় দল লণ্ডনে উপস্থিত হইলে এম সি সি তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ভারতীয় হাই-কমিশনের পক্ষ হইতে কেহই উপস্থিত হন নাই, তাঁরা নাকি কোন খবরই পান নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"খেলা ছেড়ে শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে পড়ে থাকাতেই জ্যাক ডাল্ বনে গিয়েছিল।"

বম্বের "উইমেনস অউন উইকলি"তে বাঙালীদের সম্বন্ধে নাকি নানা কুৎসা রটনা করা হইয়াছে। একটি নমুনাঃ —"বাঙালীরা মনে করে ভারতের একমাত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই দান।" বিশু খুড়ো বলিলেন—"মোটেই নয়, মোটেই নয়, রবীন্দ্রনাথ তো 'উইমেনস অউন উইকলি'র দান!!"

॥ ২ ॥

ডাক্তারবাবু এই সব নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে থাকেন যে, তাঁর কাছে গিয়ে নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হয়। একদিন তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মনে হল তিনি যেন আমাকে দেখতেই পেলেন না, মনে হল তিনি যেন অনেক দূরে আছেন। এইটেতেই আমার আরও বেশী কষ্ট হয়। আমি যে তাঁর বাড়িতে তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁর কাছাকাছি আছি, তাঁর আশ্রয়ে নিজেকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করছি, সেটা যেন তিনি লক্ষই করেন না। আমার অস্তিত্বই তিনি যেন স্বীকার করতে চান না, এইটেতেই আমার আত্মসম্মানে আরও আঘাত লাগে। যে দেশ একদিন আমার নিতান্ত আপন ছিল আজ দেখছি তা আর আমার নয়, তা পরের। অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকাতে গিয়ে বরং বাস করতে পারি, কিন্তু পাকিস্তানে গিয়ে বাস করা আর সম্ভব নয়। কোথায় কি যেন ছিঁড়ে গেছে, আর জোড়া লাগবে না। যে মুসলমানদের কখনও পর ভাবতে পারি নি, তারা আজ পর। বিতাড়িত হয়ে এসে আমরা যে হিন্দুস্থানের লোকেদের আপন করে নিতে চাইছি তারা যদি ভদ্রভাবে আশ্রয় না দেয় তা হলে আমরা যাব কোথায়? ডাক্তারবাবুর মতো লোক কুকুরের সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু আমার দিকে একবার ফিরে চাইতেও তাঁর ইচ্ছা হয় না। যে অনুকম্পাভরে তিনি রাস্তায় ভিখারীকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেন বোধ হয় তার চেয়ে বেশী অনুকম্পাভরে তিনি আমাকে থাকতে দিয়েছেন, খেতে দিতেও চাচ্ছেন। অথচ আমার সঙ্গে ভাল কথাও বলেন না। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এটা কি সহ্য করা যায়? আমিও তো শিক্ষিত লোক, তাঁর মনোযোগের উপর আমার একটু দাবিও কি নেই!

একদিন মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি তখন ভুটান নামক ছোট্ট পাহাড়ী কুকুরটাকে নিয়ে মেতে ছিলেন।

'ভুটুনু, ভুটুনু, ভুটুনি ভুটুন' বলে টুসকি দিচ্ছিলেন। আর ভুটান তার পিছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে নাচছিল।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।" সসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়ে বললাম। তিনি এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যেন আমাকে এর আগে আর কখনও দেখেন নি। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "ও আপনি। কি বলবেন বলুন!"

এর পর খানিকক্ষণের জন্য বাক্‌সংকট হল আমার। কিভাবে কথাটা বলব তা সহসা ঠিক করতে পারলাম না।

"কি বলবেন, বলুন!"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার এখানে এরকমভাবে কতদিন থাকব?"

"কি রকম ভাবে?"

"আপনার অনুগৃহীত হয়ে। বিনামূল্যে আপনার বাড়িতে থাকবার খাবার দাবি তো আমার কিছু নেই—"

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু। মনে হল তাঁর কণ্ঠ থেকে শব্দের তুবড়ি বিস্ফোরণ হল যেন। আমি হকচকিয়ে গেলাম। এত জোরে তাঁকে আর কখনও হাসতে শুনিনি।

হাসি থামিয়ে তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে ফেললেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তারপর বললেন, "আপনি দাবিদাওয়া নিয়ে খুব মাথা ঘামান দেখছি। ওকালতি পড়েছিলেন না কি?"

সত্যিই আমি ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত সুবিধা হবে না ভেবে অন্য পথ ধরেছি। বিলাতী বি-এ ডিগ্রিটার জোরে এখানে চাকরি করছি। মাস্টারি।

"ওকালতি পড়েছিলাম। কিন্তু যারা উকিল নয় তাদেরও তো আত্মসম্মান থাকা উচিত।"

"তাই শুনেছি। শুদ্ধ ভাষায় ছেলেবেলায় প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম, মনুষ্যত্বের

সহিত-আত্মসম্মান ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কিন্তু বড় হয়ে সন্দেহ জেগেছে। মনে হয়েছে আমি কি এমন একটা রাজা-উজির যে নিজেকে ক্রমাগত সম্মান করে যাব? ওই যে শালিক-দম্পতি আমার বারান্দায় বাসা বেঁধেছে ওরা আমার অনুমতি নেয়নি, আত্মসম্মান নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না, ওরা নিজেদের ধান্দাতেই ব্যস্ত, ওরা সুখী। আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানের ঝামেলা তুলে কেন কষ্ট পাচ্ছেন তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এখানে যদি আপনার কোন অসুবিধা থাকে বলুন, সেটা দূর করবার চেষ্টা করতে পারি।"

"আমি শালিক পাখি নই, মানুষ। তাই আপনার বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে আর বিনা খরচায় খেতে আমার সংকোচ হচ্ছে।"

"টাকা আমি নিতে পারব না আগেই বলেছি। এতে আপনার যদি অসুবিধে হয় অন্যত্র যেতে পারেন। কিন্তু যাবেনই বা কেন আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

"আমার অস্বস্তি হচ্ছে আমাকে দিয়ে অন্তত কিছু কাজ করিয়ে নিন। সকালবেলা আর বিকেল পাঁচটার পর আমার ছুটি। সে সময় আপনার কোনও কাজে যদি লাগাতে পারি তা হলে আমার সংকোচের কারণ থাকবে না।"

"আপনাকে কি কাজে লাগাব? কাজ বলতে লোকে যা বোঝে তা তো আমি কিছু করি না। আমি যা করি তাকে লোকে বলে অকাজ। এই যে এখন কুকুরদের সঙ্গে আলাপ করছি এর মধ্যে আপনাকে কাজে লাগাব কি করে?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "তা ছাড়া আমি সমস্ত দিন যে সব জায়গায় ঘুরি, যেখানে যাই, যা করি সেখানে দ্বিতীয় লোকের স্থান নেই। আমার ড্রাইভার বেচুও সেখানে থাকে না।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার ডিস্‌পেন্সারীর হিসাবপত্র আমি রাখতে পারি। যদি বলেন—"

আবার তাঁর গলায় হাসির তুবড়ি ছুটল।

"আমার ডিস্‌পেন্সারী নেই, আমি ওষুধ বিক্রি করি না। যা আছে তা বেহিসেবী ব্যাপার। ওর জন্য কোনও হিসাব-নিকাশ দরকার নেই। এই রকেট্, রকেট্ জোর্ সে দাঁড়া! কাম্ হিয়ার।"

প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান কুকুর রকেট ছুটে এল। তার মুখে একটা কাঠের টুকরো, চক্ষু উদ্ভাসিত। প্রকাণ্ড ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে দাঁড়াল, যেন কাঠের টুকরোটা কুড়িয়ে এনে মহা কীর্তি করেছে একটা।

"ফেল্, ফেল্, ওটা ফেলে দে।"

কাঠের টুকরোটা রকেট কিছুতে ফেলবে না। ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল চার বছরের বিজয়। সে কিন্তু রকেটকে তর্জনী তুলে শাসন ক'রে বলল, "লকেট লকেট কাম্ কাম্ ছিট (Sit) ছিট্"—কি আশ্চর্য অমনি রকেট তার সামনে এসে বসল আর তার সামনের পা-টা ওর কাঁধের উপর তুলে দিল। কাঠের টুকরোটা পড়ে গেল তার মুখ থেকে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা টেনিস বল বার করে ছুঁড়ে দিলেন সেটা। বিদ্যুদ্বেগে রকেট ছুটল সেটার পিছু পিছু এবং নিমেষে সেটাকে নিয়ে এল।

"দে, আমাকে দে ওটা।"

কিছুতেই দেবে না রকেট। ডাক্তারবাবু তাকে খোশামোদ করতে লাগলেন।

দুষ্টু ছেলের মতো বলটা মুখে করে ছুটে বেড়াতে লাগল।

বিজয় চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে এবারও বলল, "লকেট কাম ছিট" কিন্তু এবার লকেট বিজয়ের কথাও শুনলে না। কারণ সে জানে ওই বলটার উপর বিজয়েরও লোভ আছে, বিজয়ের হাতে পড়লে বলটা হয়তো ও আর দেবে না। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খেয়াল হল বিজয়কে তিনি যে স্যান্ডাল-জোড়া দু দিন আগে কিনে দিয়েছিলেন সেটা তো ওর পায়ে নেই।

"বিজয়, তোর জুতো কই?"

আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে বিজয় বলল, হালা গেলে।" অর্থাৎ হারিয়ে গেছে। এর জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয় সে।

"এই পেট্‌্রিক, এই পেট্‌্রিক কোথা যাচ্ছিস্?"

একটা লেগ হর্ন মুরগী ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল একবার, ঘাড়টা একবার কাত করে চাইল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, তারপর ছুটতে লাগল।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি বললে বুঝতে পারলেন?"

"না—"

"ও বললে আমি ডিম দিতে যাচ্ছি, আমাকে পিছু ডাকছ কেন? এখনই ও ডিম দেবে। বিজয়, যা।"

বিজয় চলল, মুরগীর পিছু পিছু। এই সব ছেলেমানুষি কাণ্ড কারখানার মধ্যে আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, চলে যাচ্ছিলাম। ডাক্তারবাবু ডাকলেন।

"আপনাকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। আপনার আহত আত্মসম্মানে কি মলম দিলে সুফল ফলবে তা তো মাথায় আসছে না। আপনাকে যদি ঝি-চাকরের কাজ করতে বলি তা হলে তো আপনার আত্মসম্মান আরও কাহিল হয়ে পড়বে।"

"কি কাজ?"

"ধরুন যদি আপনাকে সুপুরি কুচুতে বা তরকারি কুটতে বলি?"

"মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

"আমি জানতাম। আমিও পারি না ওসব।"

ভুরু কুঁচকে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আপনাকে কাজ দিতে হলে আমাকেও কাজ করতে হয় কিছু। কখনও করি নি, কিন্তু আপনার যদি সুবিধা হয় করা যাবে না হয়।"

"কি রকম কাজ সেটা—"

"পাঠোদ্ধার। আমি সমস্ত দিন যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই তখন নানারকম আইডিয়া মাথার মধ্যে আসে। আসে আর উড়ে যায়। কখনও তাদের কথার খাঁচায় বন্দী করবার চেষ্টা করিনি। আপনার যদি সুবিধা হয় বলব। লিখে ফেলব না হয়। কিন্তু আমার হাতের লেখা এমন যে পরদিন হয়তো নিজেই আমি পড়তে পারব না। আপনি যদি পারেন পরিচ্ছন্ন করে লিখতে পারেন সেগুলো—"

"তাতে কি হবে?"

"আপনি একটা কাজ পাবেন। আপনাকে একটা কাজ দেওয়াই লক্ষ্য। আপনার আত্মসম্মানকে সজীব রাখবার আর তো কোনও উপায় ভেবে পাচ্ছি না। লিখবেন?"

ভদ্রলোককে হঠাৎ খুব ভাল লেগে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

"লিখব। কিন্তু পরিষ্কার করে লিখে তারপর কি করব ওগুলো?"

"আপনার যা খুশি। রেখেও দিতে পারেন, যদি আপনার ভাল লাগে। অনেক ফোটোগ্রাফার নিজের তোলা ফোটোর কপি রেখে দেন, আমার মনের নানা মেজাজের ফটো যদি পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারেন, রাখুন, আমার আপত্তি নেই। ভাল যদি না লাগে, ফেলে দেবেন, ফেলেই বা দেবেন কেন, দাইকে দিয়ে দেবেন, সে বাজে কাগজ দিয়ে ঘুঁটে ধরায়। দেখুন, দেখুন, ওটাকে চেনেন?"

একটা সবুজ রঙের ছিপছিপে পাখি এসে টেলিফোনের তারের উপর বসল।

"না, আমি চিনি না।"

"বাঁশপাতি। ওদের সঙ্গে ভাব করুন না। ওরা লোক ভাল।"

মুচকি হেসে চলে আসছিলাম। আবার ডাকলেন ডাক্তারবাবু।

"রাঘব ঘোষালের সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?"

"না। কে তিনি?"

"তিনিও একজন ডাক্তার। এবং একজন উদ্বাস্তু। সে হিসাবে আপনার সম-গোত্র। আমার বাড়ির পশ্চিমে ওই যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছেন, ওতেই উনি থাকেন। তাঁর চেহারা দেখে মাঝে মাঝে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়—বোধ হয় একবার এসেওছিলেন আমার কাছে কিন্তু আমি সময় করে উঠতে পারিনি। আলাপ-টালাপ করা আমার ধাতে নেই। আপনাদের দেশের লোক, আলাপ করলে হয়তো ভালো লাগবে। আলাপ করুন না গিয়ে একদিন। আর কিছু না হোক, সময় তো কাটবে—"

"তাঁর কপালের উপর কি একটা আব আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক।"

"আচ্ছা, গিয়ে আলাপ করব একদিন।"

চলে এলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। একটা অপরূপ সুর যেন বাজতে লাগল মনের তন্দ্রীতে।

গণেশ হালদার সেদিন এই পর্যন্ত লিখে তাঁর ডায়েরি বন্ধ করলেন। নিয়মিতভাবে না হলেও প্রায়ই তিনি তাঁর ডায়েরি লেখেন, আর এই ডায়েরিতেই তাঁর স্বরূপ চেনা যায়। বাইরে তিনি ভীরু, স্বল্পবাক এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

হিন্দী ভাষায় যাকে বলে 'চালতা পুরজা', রাঘব ঘোষাল লোকটি তাই। বলিষ্ঠ-গঠন দীর্ঘাকার ব্যক্তি। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, পিছনের দিকে গোছা-গোছা চুল, কটা রঙের। চোখের তারাও কটা। আর একটা বৈশিষ্ট্য, চোখের পলক কম পড়ে। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর একবার মাত্র পলক পড়ে, তখন অন্য দিকে তাকান। কপালের উপর আবটা প্রকাণ্ড। গায়ের রং তামাটে। গোঁফ দাড়ি কামানো। বেশ ভারী-ভরাট মুখ। মিলিটারি ছাঁটের খাকি কোট-প্যাণ্ট পরতে ভালবাসেন। পায়েও মিলিটারি বুট। যৌবনে নাকি মিলিটারিতে কাজও করেছিলেন। এখন তার বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। এ শহরে কিছুদিন আগে এসেছেন। এসেই জমিয়ে ফেলেছেন বেশ। ভাল ডাক্তার বলে নয়, নিরঙ্কুশ ব্যক্তি বলে। পয়সা রোজগার করবার কোন উপায়কেই তিনি হেয় মনে করেন না। মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন, অবৈধ গর্ভপাত করেন, জুয়া খেলেন, ফ্লাশ খেলাতে দক্ষতা আছে, অনেক চোরা-কারবারে টাকা খাটান। তা ছাড়া, ডাক্তারির জোরে যতটা উপায় করা সম্ভব তা তো করেনই। যে অসুখ তিন দিনে সারার কথা সেটা সারাতে তাঁর প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যায়, প্রেসক্রপশনের পর প্রেসক্রপশন বদলান। লোকে বলে, ডাক্তারবাবুর ওষুধের দাম না কি শস্তা, কিন্তু রুগীরা বুঝতে পারে না যে তিনি অনেক-দিন ধরে চিকিৎসা করে ওষুধের দাম শেষ-পর্যন্ত অনেক বেশী নিয়ে নেন। কিন্তু তবু তিনি জনপ্রিয়, তার কারণ তাঁর নাটকীয় ধরন-ধারন। ডিসপেন্সারীতে যখন অনেক রোগীর ভীড় তখন হয়তো শুনলেন শহর থেকে দশ মাইল দূরে কোন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে, গরীব লোক, ফি দেবার সামর্থ্য নেই, আসতে পারছে না। অমনি রাঘব বলে উঠলেন, কুছ পরোয়া নেই। আমি গিয়ে দেখে আসছি। ঝরঝরে সেকেলে ফোর্ড গাড়িটা বের করে চলে গেলেন সেখানে। তার চিকিৎসা করলেন, একটি পয়সা নিলেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিস্মুকে আড়ালে মৃদু হেসে বললেন, একটু পাবলি-

সিটি হল। বিসু হিন্দু নয়, মুসলমান। পুরো নাম বিসমিল্লা। মোটর মেকানিক। রাঘব ঘোষালের গাড়িটা ওই সচল রেখেছে। তবে এটা বললেও অন্যায় হবে যে, তিনি সব সময়ে পাবলিসিটির জন্যেই উদারতার ভান করেন। বিলুবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার টাকা তিনি লুকিয়েই দিয়েছিলেন তাঁকে। বিলুবাবু তাঁর তাস খেলার সঙ্গী, প্রায়ই হেরে যান ঘোষালের কাছে—এইটুকুই তার সঙ্গে সম্পর্ক। ঘোষালের মধ্যে সত্যিই দিলদরিয়া ভাব আছে একটা। শুধু দিলদরিয়া নয়, বেপরোয়া মরিয়া ভাব। যখন ঠিক করেন কিছু একটা করবেন, একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন তার মধ্যে, তা সে ভাল মন্দ যাই হোক। অনেক সময় প্রাণ তুচ্ছ করেও। এইজন্যেই বোধহয় স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হতেন তাঁর দিকে। ডাক্তার ঘোষালের গৃহিণী নেই। পরকীয়া নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনে একাধিক নারী এসেছে। কেউ দু-চার দিন থেকেছে, কেউ দু-চার মাস, কেউ বা দু-চার বছর। ঘোষাল যদিও এখানে নিজেকে উদ্বাস্তু বলে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু উদ্বাস্তু বলতে ঠিক যা বোঝায়, তিনি তা নন। তিনি দাঙ্গার সময় কিছুদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন অবশ্য, আর দাঙ্গার ঠিক পরেই এ-দেশে চলেও এসেছিলেন তা সত্য, কিন্তু তবু তিনি উদ্বাস্তু নন। কারণ পূর্ববঙ্গে তাঁর কোন বাস্তু ছিল না, কোনও দেশেই তাঁর বাস্তু নেই। শোনা যায় তিনি অনেক দেশে ঘুরেছেন। রেঙ্গুনে ছিলেন, মালয়ে ছিলেন, চীনদেশেও নাকি ছিলেন। আসলে তিনি ভবঘুরে লোক। হোটেলে হোটেলে কিংবা বড় জোর বাসা ভাড়া করে কাটিয়েছেন সারা জীবন। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে উদ্বাস্তুদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি আদায় করেছেন। কোথায় কি তদ্বির করলে কাজ হাসিল হবে তা তিনি ভাল করেই জানেন। এখানকার যে অফিসারটি উদ্বাস্তুদের হর্তা-কর্তা বিধাতা সেই মিস্টার সেনের সঙ্গে ঘোষালের গলায় গলায় ভাব। সুতরাং উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য সমস্ত সুবিধাই তিনি পেয়েছেন। এখানকার উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার তিনি। তার জন্যে কিছু ভাতা পান এবং তাই দিয়েই একটি বাসা ভাড়া করে আছেন শহরে। তিনি উদ্বাস্তু কলোনীর ভিতর থাকতে চান না। কেন চান না সেটা একটা রহস্য। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ও কলোনীতে যারা থাকে তাদের সঙ্গে মেলে না আমার। তিনি শহরে যে বাসাটি ভাড়া নিয়েছেন সেটি ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছেই। ছোট বাসা, একখানি শোবার ঘর সেইটেই আসবাবপত্রে ঠাসা। দ্বিতীয় ঘরটি বড়, সেটি আড্ডাঘর। এক ধারে একটি গোল টেবিল আর তার চারপাশে চেয়ার, অন্য এক ধারে দেশী ব্যবস্থা, প্রকাণ্ড একটা ফরাশ পাতা, তার উপর একটা শতরঞ্জি আর গোটাকতক তাকিয়া। এখানেই সাধারণত তাস-পাশা খেলা হয় বাজি ধরে। শোনা যায় শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকও নাকি আসেন এখানে। ডাক্তার ঘোষালের নিজের কোনও ডিসপেন্সারী নেই। শহরের একটি ডিসপেন্সারীর সঙ্গে তাঁর 'বন্দোবস্ত' আছে। সেইখানেই তিনি সকাল-বিকাল বসেন। সেইখান থেকেই তাঁর সমস্ত প্রেসকৃপশন বিক্রি হয়। ডাক্তার ঘোষালের নির্দেশ অনুসারে তাঁর প্রেসকৃপশনের দাম বাজারদরের চেয়ে কিছু কম নেওয়া হয়। ডাক্তার ঘোষাল এ শহরে এসেই তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন প্রথমেই, কিন্তু তাঁর ধরন-ধারন কথাবার্তা শুনে আর দ্বিতীয়বার যাননি। বুঝেছিলেন এঁর পালক অন্যরকম, এঁর সঙ্গে মেশা যাবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গণেশ হালদার থাকেন, এ তিনি জানতেন। গণেশ যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এ-ও তাঁর সুবিদিত ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন নি। বোধ হয় পূর্ববঙ্গের লোক বলেই করেননি (পূর্ববঙ্গের লোককে পারতপক্ষে তিনি এড়িয়ে চলতে চান), কিংবা শিক্ষক বলেই তাঁকে এড়িয়ে গেছেন। শিক্ষকদের সান্নিধ্য সাধারণত তিনি সহ্য করতে পারেন না। বলেন, ওরা এক অদ্ভুত ভিদ্‌ভিদে জাত, নাইদার ফিশ্‌ নর ফ্লেশ (neither fish nor flesh)। সমাজের সম্মানিত এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে রাঘব ঘোষালের এই ধারণা গণেশ হালদারের জানা ছিল না, থাকলে তিনি তাঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যেতেন না। তিনি প্রথমত মুখ-চোরা লোক, দ্বিতীয়ত, বিলেতে কিছুদিন বাস করার ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে বিলিতি ছাপটা তাঁর মনে বসে গেছে তাতে যখন তখন যার তার সঙ্গে যেচে গিয়ে আলাপ করা শক্ত তাঁর পক্ষে। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে (ইংরেজীতে যাকে introduce করিয়ে দেওয়া বলে) কারও সঙ্গে আলাপ করতে পারেন না তিনি। স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষককেই এড়িয়ে চলেন। ভাব একমাত্র ভবতোষ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। তা-ও খুব মন-খোলা ভাব নয়। পরস্পর দেখা হলে মুচকি হাসেন কেবল। তবু গণেশ হালদার রাঘব ঘোষালের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে গেলেন একদিন। যাওয়ার আসল কারণটা তাঁর মনে স্পষ্ট হয়নি সম্ভবত। গেলেন খামখেয়ালী ডাক্তার-

বাবুকে তাঁর হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল বলে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যখন ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছেন তখন সেটা করা উচিত। তাঁর কথাটা অমান্য করাটা ঠিক হবে না।
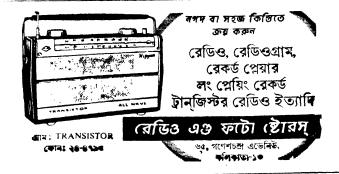
হালদার মশায় সন্ধ্যার পর ডাক্তার ঘোষালের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বাইরের ঘরটা খোলা রয়েছে, আর ঘোষাল এক প্যাকেট তাস নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেক তাসের পিছনগুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। সন্তর্পণে উঁকি দিলেন হালদার মশায়, তারপর গলা-খাঁকারি দিলেন, তাও খুব আস্তে। ঘোষাল তাসের পিছন দিকে চেয়ে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি ছোট্ট গলা-খাঁকারিটা শুনতে পেলেন না। আর একটু জোরে কাশলেন হালদার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল এবং বলে উঠলেন, 'কাউ'। হালদার মশায়ের মনে হল একটা বাঘ যেন 'হাঁউ' করে উঠল। 'কাউ' ঘোষাল ডাক্তারের অনুচর। ঠিক ভৃত্য নয়,

অনুচর। সে চাকরি করে অন্য জায়গায়, কিন্তু থাকে ঘোষাল ডাক্তারের বাড়িতে। ঘোষাল ডাক্তার ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। গোহাটি, লখিমপুর, শিলং, কাঁথি, সম্বলপুর, পাটনা, দিল্লি অনেক জায়গায় টোপ ফেলে ফেলে বেড়িয়েছেন তিনি। আর সর্বত্রই 'কাউ' তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। রেঙ্গুন থেকে এসে প্রথমে তিনি কলকাতায় ছিলেন কিছুদিন। বেশ কিছুদিন, প্রায় এগারো বছর। কিন্তু কলকাতায় তিনি সুবিধা করতে পারেননি। কলকাতাতেই 'কাউ'য়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তখন তার বয়স দশ বছর, কলকাতার এক রেস্তোরাঁয় কাজ করত। ডাক্তার ঘোষাল থাকতেন একটা একতলা ফ্ল্যাটে। একদিন অনেক রাত্রে তিনি ফিরে এসে দেখলেন বারান্দার এক কোণে একটা ছেলে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করে জানলেন, তার নাম কালু। তার মা নাকি তাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। রাত্রে তার মা আর ফিরল না। তার পরদিনও না। ঘোষালই কালুকে খেতে শুতে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোর মা কোথায় উধাও হল? কি নাম তোর মায়ের? কালু বললে, সবাই তাকে সুশী বলে ডাকত। মা আর ফিরবে না। মা যে বস্তিতে থাকত সে বস্তির লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার মা কোথায় গেছে তা কালু বলতে পারলে না। বললে, কেউ জানে না মা কোথা গেছে। মা বোধ হয় আর আসবে না। আমাকে এইখানে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার ঘোষাল তখন তাকে বললেন, তা হলে এইখানেই থেকে যা তুই। কিন্তু চাকরিটা ছাড়িস না। সেই থেকে কালু ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তখন ডাক্তার ঘোষাল যে যুবতী চাকরানীটিকে রেখেছিলেন তার একটি ছোট ছেলে ছিল, আধো আধো কথা বলত। সেই কালুকে 'কাউ' 'কাউ' বলে ডাকত। সেই থেকে তার নামই হয়ে গেল কাউ। তারপর ঘোষাল যখন কলকাতা থেকে গোহাটি, কাউও গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। গোহাটিতেও অন্য জায়গায় একটা কাজ জুটিয়ে নিলে সে, থাকত কিন্তু ঘোষালের বাসায়। এইভাবেই বরাবর চলেছে। ঘোষাল মশাই আপাতদৃষ্টিতে অবিবাহিত ব্যক্তি। কিন্তু বহুকাল আগে, তাঁর প্রথম যৌবনে, তিনি বিবাহ করেছিলেন। বিবাহ করলেও সংসার পাততে পারেননি, কারণ বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। এর পর ঘোষাল আর বিবাহের পথে পা বাড়াননি। গলি-ঘুঁজির স্বল্পালোকিত রাস্তাতেই এর পর থেকে চলেছেন তাঁর দাম্পত্যজীবনের অভিযান। সে রাস্তায় কখনও আলো ছিল, কখনও ছিল না। তাতে কখনও ঘণ্টা বাজত, কখনও বাজত না। নিঃশব্দেই পার হয়ে যেতেন তিনি গলি। তাঁর পদ্ধতি—ইংরেজীতে যাকে বলে 'টেকনিক'—এই রকম যেখানে যেতেন সেইখানেই কমবয়সী একটি ঝি বহাল করতেন, সেই ঝি ক্রমশ উন্নীত হত গৃহিণী পদে। তারপর সে জায়গা যখন ছেড়ে যেতেন তখন খেসারত-স্বরূপ কিছু টাকা দিয়ে দিলেই অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যেত। এই টেকনিকটা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বর্মা থেকে। এ-দেশে এসেও ওতে ভালই ফল পাচ্ছিলেন, কিন্তু এখানে এসে প্রথম বাধা পেলেন তিনি। নুকু বেঁকে দাঁড়িয়েছে। নুকের পুরো নাম ঝিনুক। ডাক্তার ঘোষাল ওটাকে সংক্ষেপ করে নিয়েছেন। এর কাহিনী পরে বলব। তার আগে হালদার মশায়ের সঙ্গে ঘোষাল ডাক্তারের প্রথম সংঘর্ষটা বিবৃত করা যাক। সংঘর্ষ কথাটা ইচ্ছে করেই লিখলাম, কারণ সংঘর্ষই হয়েছিল।

'কাউ' বলে চীৎকার করে উঠেই নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল। ঘাড় একটু নীচু করে চেয়ে রইলেন হালদারের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন।

"কে মশাই আপনি? হু আর ইউ?"

বাংলা বলে সঙ্গে সঙ্গে সেটার ইংরেজী তর্জমা করা ডাক্তার ঘোষালের মুদ্রা-দোষ বা বৈশিষ্ট্য। সব সময়ে না হলেও প্রায়ই এটা করেন।

"আমার নাম গণেশ হালদার। ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে আমি থাকি।"

"বুঝেছি, আই সি। আই হ্যাভ সেনসড ইউ।" হাসলেন। নীরব হাসি, কিন্তু ভয়ানক। প্রায় কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল সে হাসি, বেরিয়ে পড়ল হলদে রঙের বড় বড় দাঁতগুলো। ঘাড় ঈষৎ নীচু করে হাসিমুখেই রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কথা বললেন।

(ক্রমশ)

॥ ২৮ ॥

কনি চলে যাওয়ার পরও শাজাহান হোটেলের দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এই হোটেলে প্রতিদিন যারা আসে এবং চলে যায়, কনি যেন তাদেরই একজন। কত মানুষই তো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের মালপত্র নিয়ে বিমান কোম্পানির বাস কিংবা ট্যাক্সিতে চড়ে এখানে হাজির হচ্ছে। লাউঞ্জে পোর্টারকে দাঁড় করিয়ে রেখে, তারা কাউন্টারে সত্যসুন্দরদা, উইলিয়ম ঘোষ কিংবা আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমরা খাতা দেখে বলছি কোন তলায় কী রকম ঘর পাওয়া যাবে। তাঁরা তখন রেজিস্টারে সই করছেন। সই করে, ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে তাঁরা চাবি হাতে করে লিফটের দিকে এগুচ্ছেন। লিফট উপরে উঠে যাচ্ছে। মালপত্র কাঁধে করে পোর্টার পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করছে—কারণ ওদের জন্যে তো আর লিফট তৈরি হয়নি। আগন্তুকেরা কদিনই বা থাকেন। কেউ এক সপ্তাহ, কেউ তিন দিন, কেউ বা মাত্র একদিন। কয়েক ঘণ্টা থাকেন এমন অতিথিরও অভাব নেই। এইভাবেই চলেছে। ওয়েলকাম এবং ফেয়ারওয়েল, রিসেপশন এবং গুডবাই, সাদর অভ্যর্থনা ও বিদায় অভিনন্দন যেন গায়ে গায়ে, হাতে হাত দিয়ে জড়াজড়ি করে শাজাহান হোটেলে বসে রয়েছে। আসার মধ্যে তবু সামান্য প্রত্যাশা আছে, কিন্তু যাওয়ার মধ্যে কিছুই নেই। কেউ সেদিকে নজর দেয় না।

বোসদা বলেছিলেন, "গড়ে তিন দিন থাকেন আমাদের অতিথিরা। এঁদের মধ্যে কেউ যদি পনেরো দিন থাকেন, তা হলে মনে হয় যেন যুগযুগান্ত ধরে তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আর দু' একজন, যাঁরা এইখানেই মাসিক হারে থাকেন, তাঁরা তো আমাদেরই একজন হয়ে যান।"

কিন্তু কনি তো আর অতিথি নয়। যাদের জীবন হোটেল অতিথিদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে সে তো তাদেরই একজন। সে যদি আমাদেরই দলে হয় তবে তার বিদায় নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়হীন জীবনেও ছাপ রেখে যাবে। কিন্তু কিছুই হয়নি।

বোসদা ছাদে বসে দাড়ি কামাতে কামাতে আমাকে বলেছিলেন, "আমরা, হোটেলের লোকরা, বড়ো উদাসী। কিন্তু আমাদের থেকেও অনাসক্ত এই বাড়িটা। কনি কেন, কাউকে মনে রাখে না। আমাদেরও মনে রাখবে না, দেখে নিও। এই যে আমরা বছরের পর বছর সুখেদুঃখে ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নীরবে পান্থশালার বিলাসী পথিকদের সেবা করে গেলাম, তাও ইতিহাসের এই উদাসী প্রাসাদ মনে রাখবে না। আমরা যখন থাকবো না, তখনও সে নতুন রঙ এবং নতুন চুনসুরকির স্নো পাউডার মেখে কলকাতার এই রাজপথে বিদেশীদের মনোরঞ্জনের জন্য আপন মনেই দাঁড়িয়ে থাকবে। একবারও আমাদের কথা মনে পড়বে না।"

আমার মনটা বোসদার কথায় কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। বোসদা বলেছিলেন, "নিজের কথাটাই শুধু ভাবলে চলবে কেন? এই অনুরাগহীন নির্লিপ্ততার আর একটা দিক আছে। এই যে আমরা এখন কাজ করছি, আমাদেরও আগে এমনি করেই তো আরও অনেকে শাজাহান হোটেলের সেবা করে

গিয়েছেন। আরও অনেক নিত্যহরিবাবু বালিশ বগলে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছোটাছুটি করেছেন; আরও অনেক স্যাটা বোস দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবরাখবর নিয়েছেন। আরও অনেক কনি তাদের শুভ্র নগ্নদেহের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গীতে প্রমোদকক্ষকে মাহময় করে তুলেছে, আরও অনেক প্রভাতচন্দ্র গোমেজ তাদের শব্দযন্ত্রে নিস্তব্ধ রাত্রিকে মুখর করে তুলেছে। কিন্তু কেউ তাদের মনে রাখেনি। মনে রাখবার কথাও নয়।"

"ভাবছো, কাব্য করছি, তাই না?" বোসদা হেসে বলেছিলেন, "হবস সায়েব তো তোমাকে অতো ভালোবাসেন। পুরনো কলকাতা সম্বন্ধে তো ও'র অতো আগ্রহ, সেকালের সঙ্গে একালের একটা যোগসূত্র উনিই তো রক্ষে করছেন, উনিও বলেন—টু-ডে এন্ড টু-মরো; আজ আর আগামী কাল; এই নিয়েই আমাদের হোটেল। বিগতযৌবনা ইয়েস্টারডের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গতকাল সম্বন্ধে আমাদের একটুও মাথা ব্যথা নেই।"

বোসদা দাড়ি কামানো শেষ করে ব্লেডটা তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বলেছিলেন, "আমার যে সাহিত্য আসে না। মাতৃভাষায় দখল থাকলে মনের ভাব কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারতাম। সোজা বাংলায় বলতে গেলে আমাদের গুড মর্নিং শুরু হয় টু-ডে দিয়ে। দিনের শেষে রাত্রের অন্ধকারে টু-ডের তলানিটুকু যখন ডাইনিং হলে পড়ে থাকে, তখন আমরা টু-মরোর জন্যে পরিকল্পনা করতে বসি। টু-ডেটাই যে কখন ইয়েস্টারডে হয়ে জীবনের বোঁটা থেকে ঝরে পড়ে তার খোঁজই রাখি না।"

শুধু শাজাহান হোটেলের কর্মচারী কেন, শাজাহানের পৃষ্ঠপোষকরাও ইয়েস্টারডের খবরাখবর নিতে ভালবাসেন না। খবরের কাগজে নতুন নর্তকী আসছে, তার বিজ্ঞাপন পড়েই তাঁরা আবার খোঁজখবর করতে লাগলেন। কনি যে কোথায় গেল তা কেউ একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করবেন না। এবার আসছেন মধ্য এশিয়া থেকে আর এক নর্তকী।

আমাদের বিজ্ঞাপন পড়েই ফোন আসতে শুরু করেছে। "হ্যালো, শাজাহান হোটেল? হ্যাঁ মশায়, এতোদিনে তাহলে আপনাদের সুমতি হলো। এতোদিনে একটা বেলি ডান্সার আনাচ্ছেন।"

আমি বলছি, "হ্যাঁ, আপনারা আনন্দ পাবেন।"

ফোনের ওদিক থেকে উত্তর এসেছে, "দেখবেন মশায় জেনুইন বেলি ডান্সার তো? যা ভেজালের যুগ পড়েছে, কিছুই বিশ্বাস নেই।"

আমি ভদ্রলোকের কথার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। পাশেই বোসদা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নিলেন। বললেন, "হ্যাঁ স্যার, এটা শাজাহান হোটেল। এটা কলকাতার সস্তা রেস্তোরাঁ নয় যে, রাস্তাবাজারের জিনিস ইজিপ্সিয়ান বলে চালিয়ে দেবো।"

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "আমাদের কী দোষ মশায়? ঠকে ঠকে আমরা শিখছি। জেনুইন বেলি ডান্সার বলে টিকিট কিনে দেখি প্যাকিং বাক্সর নাচ হচ্ছে। বডির কোনো মুভমেন্ট নেই। জানেন, একটা জেনুইন বেলি ডান্সারের পেটের মাসল্ প্রতি মিনিটে কতবার মুভ করে?"

বোসদা বিরক্ত হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু টেলিফোন নামিয়ে রাখলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। চোখ বন্ধ করে থেকে কোন হরিণ যেমন ভেবেছিল শিকারীর হাত থেকে ছাড়া পাবে, আমরাও তেমনি মাঝে মাঝে ভাবি টেলিফোন ছেড়ে দিলেই রক্ষে পাওয়া যাবে।

একটু পরেই আবার টেলিফোনটা বেজে উঠলো। বোসদা বললেন, "আমি আর পারছি না, তুমি ম্যানেজ করো। শাজাহান হোটেলে এতোদিন চাকরি করে কেমন ওস্তাদ হয়েছো দেখি।"

টেলিফোন তুলেই বুঝলাম, সেই পুরনো ভদ্রলোক। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো। উনি বললেন, "ব্যাপার কী মশাই? হঠাৎ কথা বলতে বলতে লাইন কেটে গেল।"

বললাম, "ভেরি স্যরি। মাঝে মাঝে কেন যে এমন হয়।"

ভদ্রলোক বললেন, "টেলিফোনে কমপ্লেন করে দিন।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, "তা হলে স্যার, আপনি কবে আসছেন?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "আগামী কালের জন্যে দুটো চেয়ার রেখে দিন।"

আমি বললাম, "আমাদের নতুন নিয়ম স্যার টেলিফোনে টেবিল রিজার্ভ ফার্স্ট উইকে সম্ভব নয়। কাউকে পাঠিয়ে টিকিটটা কাটিয়ে নিয়ে যাবেন।"

ভদ্রলোক যেন আমার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝলেন। বললেন, "হেভি ডিমান্ড বুঝি? তা তো হবেই। জেনুইন বেলি ডান্সার হলে ক্যালকাটার লোকেরা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেই।"

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই বোসদা বললেন, "হবে। চেষ্টা করলে এ-লাইনে টিকে থাকতে পারবে।"

"আমরা তো চেষ্টা করেও টিকে থাকতে পারছি না।" কে যেন বোসদার কথার সূত্র ধরেই মন্তব্য করলেন। চেয়ে দেখি বুশ-সার্টপরা এক ভদ্রলোক। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক হাসছেন।

"আরে, কী সৌভাগ্য। অনেকদিন অধম-দের মনে করেননি কী ব্যাপার?" বোসদা ভদ্রলোককে প্রচুর খাতির করে বললেন।

"মনে করেও কী হবে? যা কৃপণ মানুষ আপনারা। হাজার সাধ্যসাধনা করলেও আপনার হাত দিয়ে তেল গলবে না। কিছুতেই মুখ খোলেন না।" বোসদার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন।

বোসদা সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললেন, "গরীবকে এবং শাজাহান হোটেলকে যদি মারতে চান, তাহলে মারুন। আপনার যা ইচ্ছে হয় তাই বলুন। তবে একটা কথা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই দাসানুদাস আপনাদের সেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।"

ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "যাক আপনার শাজাহানী বিনয় ছাড়ুন। কোনো ইন্টারেস্টিং মাল এসেছে নাকি?"

আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোনো গোপন রহস্য আছে নাকি? কিসের জন্যে বোসদা এতো আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছেন, লেনদেনই বা কিসের?

বোসদা একটু যেন চিন্তা করলেন। তার-পর পেন্সিলটা কানে গুঁজে বললেন, "না এখন একটাও ইন্টারেস্টিং কেস নেই। কাল বোধ হয় আসছে।"

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, "না, মিস্টার বোস, আমি প্রফেশন্যাল লোক। আপনার বেলি ডান্সার লায়লা তে ইন্টারেস্টেড নই।"

বোসদা হাসতে হাসতে বললেন, "না না ওসব নয়। আমরা কি আর মানুষ চিনি না? আপনি যাতে ইন্টারেস্টেড, এমন কিছুই কাল আসছেন।"

ভদ্রলোক এবার চলে গেলেন। বোসদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী, অমন বোকার মতো চেয়ে আছো কেন? ভদ্র-লোককে খাতির করবে। উনিও আমার মতো মিস্টার এস বোস। খবরের কাগজের নাম-করা রিপোর্টার। মাঝে মাঝে খবরের খোঁজে আসেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন সুন্দর ব্যবহার। এখান থেকেই কত খবর যোগাড়

করে নিয়ে গিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই খবরগুলো ঘটেছে অথচ বুঝতে পারিনি। পরের দিন মিস্টার বোসের রিপোর্ট পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছি। মিস্টার বোস বলেন, "ইণ্ডিয়ার আট আনা খবর তো এখন এয়ারপোর্ট এবং হোটেলে তৈরি হচ্ছে। ভদ্রলোক কাল হয়তো আবার আসতে পারেন। যদি আসেন সাহায্য কোরো।"

"কী সহায্য করবো?"

আমার মনে ছিল না। কিন্তু দেখলাম সত্যসুন্দরদার মনে আছে। তিনি বললেন, "কেন কালই না পাকড়াশিদের অতিথিরা করবী দেবীর গেস্ট রুমে এসে হাজির হচ্ছেন।"

পাকড়াশিদের অতিথির কথা আবার মনে পড়ে গেল। কলকাতায় তাঁদের দিনপঞ্জীর বিবরণ করবী দেবীর অনেক আগেই পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। নতুন আগন্তুকদের আবির্ভাব প্রতীক্ষায় শ্রীমতী করবী গুহ নিশ্চয়ই তাঁর গেস্টহাউস যথাযথভাবে সাজিয়ে তুলেছেন।

তদন্তের জন্যে টেলিফোনে দু'নম্বর সুইটকে ডাকলাম। করবী দেবী টেলিফোন ধরলেন। "কে? শংকর? বা আপনি তো বেশ

লোক। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে টেলিফোন করছেন। তবু আসবেন না!"

বললাম, "আপনারই তো খবর দেবার কথা ছিল। তাছাড়া এখন আপনার কোনো অতিথি থাকতে পারেন।"

করবী দেবী বললেন, "কবে যে মুক্তি হবে জানি না। কবে যে পৃথিবী থেকে বিজনেস ট্রানজাকসান উঠে যাবে বলতে পারেন? আমি তো সেইদিনের জন্যে দিন গুনছি।"

বললাম, "হঠাৎ এ-সব প্রশ্ন করছেন কেন? বিজনেস ট্রানজাকসন, সাংস্কৃতিক সফর, আন্তর্জাতিক সম্মেলন এ-সব যদি উঠে যায়, তাহলে আমাদের তো আবার পথে দাঁড়াতে হবে।"

করবী দেবী বললেন, "হয়তো আপনাদের চাকরি থাকবে না। কিন্তু শান্তি পাবেন। আমার দু'একটা অতিথির নমুনা যদি দেখতেন।"

আজকাল আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে। বললাম, "কেন আপনার তো সিলেকটেড গেস্ট। আমাদের মতো সার্বজনীন পুজোর নৈবেদ্য তো আপনাকে সাজাতে হচ্ছে না।"

করবী দেবী বললেন, "গেস্টরুমে চলে আসুন। তখন আপনার সঙ্গে কথা হবে।"

আমার হাতে কাজ ছিল না। আমার ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে। আট ঘণ্টা ধরে অতিথিদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা এবং বিমর্ষ মুখে বিদায় জানিয়েছি। একটা টি-পার্টির বন্দোবস্ত করেছি। কোন্ এক কোম্পানীর মালিক বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসেছেন। তাঁরই সম্মানে কলকাতা শাখার ম্যানেজার টি-পার্টি দিচ্ছেন। এমন চা-চক্র আমাদের এখানে লেগেই আছে। প্রায় প্রতিদিনই ব্যাংকোয়েট হল প্রখ্যাতদের পদধূলিতে ধন্য হয়ে ওঠে। আমাদেরও কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মাইক ঠিক করে দেওয়া, যিনি পার্টি দিচ্ছেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করা, এ-সব আমাদের প্রতিদিনের রুটিন। তারপর একটু বিশ্রাম মন্দ লাগে না।

সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে করবী দেবীর সুইটে এসে হাজির হলাম।

করবী দেবীর তখন সান্ধ্যস্নান শেষ হয়ে গিয়েছে। মূল্যবান এবং দুর্লভ ফরাসী সেন্ট দেহে ছড়িয়ে করবী দেবী একটা রকিং চেয়ারে বসেছিলেন, আমাকে দেখেই তাঁর দোদুল্যমান দেহ যেন থমকে দাঁড়াল। ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে আজ যেন মনে হলো ও'র বয়স বুঝতে ভুল করেছিলাম। আগে যা ভেবেছি উনি তত বয়সিনী নন!

করবী দেবী বললেন, "সমস্ত দিনটা আজ যেভাবে গিয়েছে, তা ভাবতে আমার গা বমি বমি করছে।"

আমি ও'র মুখের দিকে তাকালাম। করবী দেবী বললেন, "আপনাদের স্বাধীন ভারতবর্ষে কয়েকটা জিনিস খুব বেড়েছে। কন্ট্রাক্ট, কন্ট্রাক্টর, পারচেজ অফিসার, অ্যাকাউন্টস অফিসার এ'দের জন্যেই যেন পৃথিবী এখনও সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মিস্টার আগরওয়ালাকেই বা কী বলবো। অতিথি নির্বাচনে তাঁর কোনো রুচি নেই। যারা হোটেলের ভিতর দেখেনি কোনো দিন, যারা কোনোদিন ড্রিংকের ড শোনেনি, তাদেরও তিনি দু'নম্বর সুইটে নেমন্তন্ন করছেন, তাদেরও তিনি বার-এ ঢোকাচ্ছেন।"

করবী দেবী এবার রকিং চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, কফি তৈরি করবার জন্য হিটারে গরম জল চড়িয়ে দিলেন। সুইচটা অন করে দিয়ে করবী দেবী একবার ড্রেসিং আয়নায় নিজের দেহটাকে যাচাই করে নিলেন। নিজের রাঙানো ঠোঁটটা আয়নাতে একটু খুঁটিয়ে দেখলেন। মাথার খোঁপায় যে রজনীগন্ধা ফুলগুলো সযত্নে সাজানো ছিল সেগুলো অবহেলাভরে খুলে খুলে টেবিলের উপর রাখতে লাগলেন।

তারপর দুঃখ করে বললেন, "ছুরি কাঁটা ধরতে জানে না, চা কিংবা সুপ খেতে গিয়ে চোঁ চোঁ করে আওয়াজ করে, খাওয়ার শেষে বিশ্রী শব্দ করে ঢেকুর তোলে, এমন সব লোকদের আগরওয়ালা স্যর স্যর করেন। আশ্চর্য!"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে কফির অপেক্ষায় বসে রইলাম।

করবী দেবী বললেন, "আবার এক-একজন মানুষের দুরন্ত। কিন্তু কি ধাতু দিয়ে যে ভগবান ও'দের তৈরি করেছেন তা আজও বুঝতে পারি না।"

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, "যে-দিন আমরা এই ধাতুর রহস্য বুঝতে পারবো, সেদিন হয়তো শাজাহান হোটেল আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠবে। সেদিন হয়তো মিস্টার আগরওয়ালা এই হোটেলের এই সুইটের মধ্যে আপনাকে ধরে রাখতে পারবেন না।"

করবী দেবী বললেন, "যদি আমার এই ঘরে অদৃশ্য কোনো কোণ থেকে দিনকয়েকের জন্য নজর রাখেন তবে মানুষ সম্বন্ধে কিছুই জানবার বাকি থাকবে না। আমার যদি লেখার ক্ষমতা থাকতো, তা হলে এতোদিনে আর একখানা মহাভারত তৈরি হয়ে যেতো।"

করবী দেবী বললেন, "অথচ ছোটবেলায় ভাবতাম মানুষ কত মহৎ। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। এখন কী ধারণা হয়েছে জানেন?" হিটারের সুইচটা বন্ধ করে দিতে দিতে করবী দেবী প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "আপনি হয়তো ভাবছেন মানুষ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

করবী দেবী হেসে ফেললেন। বললেন, "আমার এখন ধারণা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে হয়তো ঈশ্বর নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই একজন পারচেজ অফিসার আছেন। তিনি সংসারের সব কিছু পারচেজ করতে চান। কিন্তু দাম দিতে মোটেই ইচ্ছে নেই। শুধু স্যাম্পেল আর নমুনা ব্যবহার করে করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবার বুদ্ধিতে এ'রা অদ্বিতীয়।"

করবী দেবী এখনও হাসছেন। কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বললেন, "আজ যে ভদ্রলোককে মিস্টার আগরওয়ালা এনেছিলেন, তিনি বেশী কথা বলেন না। মদ খাবার লোভও আছে, অথচ মাতাল হবার ভয় আছে। মদও খেলেন। তারপর এখন অন্য এক হোটেলে ক্যাবারে দেখতে গিয়েছেন, মিস্টার আগরওয়ালা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারণ ভদ্রলোক দাক্ষিণদেশ থেকে মাঝে মাঝে আসেন, আর প্রচুর মাল কিনে নিয়ে যান। ও তোমাকে মাল গছাবার জন্যে ও'রা খাওয়াচ্ছেন খাও, গেস্ট রুমে নিয়ে এসেছেন থাকো, কিন্তু তাই বলে ভনিতাগুলো। বিশ্বাস করবেন না ভদ্রলোক ড্রিংকের মধ্যেই একবার জুতো খুলে আহ্নিকটা সেরে নিলেন। মিস্টার আগরওয়ালা আবার সন্তুষ্ট করবার জন্যে বললেন, 'মিস্টার রঙ্গনাথন, আপনার কাছে এইটাই শেখবার। যেখানেই থাকুন গড্‌কে কিছুতেই ভুলতে পারেন না।' রঙ্গনাথনের তখন নেশা ধরেছে। আহ্নিকে বসবার আগে পর্যন্ত ক্যাবারে মেয়েদের নাচ

সম্বন্ধে খবরাখবর নিচ্ছেন। আগরওয়ালার কথা শুনে বললেন, 'কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমার ওয়াইফের ভয়ে। ফিয়ার ফুল লেডি। সন্ধ্যেবেলায় পুজো না করলে আমাকে খেতে দেবে না।'

রঙ্গনাথনের নাম শুনে আমি যেন একটু অবাক হলাম। মনে পড়ে গেল মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি একবার মমতাজ রেস্টুরেন্টে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

করবী দেবী বললেন, "ফোকলার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে মিস্টার রঙ্গনাথন এখন মিস্টার আগরওয়ালার স্কন্ধে ভর করেছেন। মিস্টার আগরওয়ালা আমাকে টেলিফোনে মনে করিয়ে দিলেন রঙ্গনাথন বড় শক্ত বাদাম, কিছুতেই ভাঙতে চায় না। মাঝে মাঝে ওকে শুধু কন্ট্রাক্টের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। এক লক্ষ কন্ট্রাক্ট অর্ডার ওর হাতে রয়েছে। তাছাড়া এই অর্ডারটা বাগাতে পারলে রিপিট অর্ডার আসতে বাধ্য।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে করবী দেবী বললেন, "এক এক সময় খুব মজা লাগে। জানেন, আগরওয়ালা বলে রঙ্গনাথনটা একটা সাইলক। ব্যাটাচ্ছেলে সব বোঝে। মার্কেটের ওঠা নামা ওর নামতার মতো মুখস্থ। এই মালটা যে বাজারে অনেক রয়েছে তা রঙ্গনাথন জানে। তাই আগরওয়ালাকে পিষে যতো পারে রস বার করে নেবার চেষ্টা করছে। আগরওয়ালা সুবিধে করতে না পেরে, শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে আমার এখানে পাঠিয়েছে।"

করবী গুহ এবার শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিলেন। বললেন, "এই জন্যেই মনে হয় পৃথিবীতে বেচা এবং কেনার হাঙ্গামাটা না থাকলেই ভাল হতো।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনার মিস্টার রঙ্গনাথন কী বললেন?"

"রাজী হয়ে গিয়েছেন। আগরওয়ালার সমস্ত স্টকটাই কিনে নেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। রঙ্গনাথন যাবার সময় কী বললে জানেন? বললে, ক্যালকাটা, বম্বে এই কারণেই ফ্লারিশ করছে। বিজনেস এই দুই গ্রেট সিটিতে অনেক সায়েন্টিফিক লাইনে রান করছে। এই ক্যালকাটাওয়ালা এবং বম্বেওয়ালারা জানে কী করে সেল করতে হয়। এখানকার বিজনেসম্যানরা মুদিখানার দোকান থেকে সেলসম্যানসিপ শেখেনি। রঙ্গনাথনের নেশা হয়েছিল।"

"রঙ্গনাথনকে আউট করবার জন্যে কী ড্রিংক আনিয়েছিলেন? জন হেগ?" আমি কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

করবী দেবী হেসে বললেন, রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে যেমন আমি লিনেন ব্যবহার করি, তেমনি যেমন লোক তেমন ড্রিংক সিলেক্ট করবার চেষ্টা করি। ওঁর জন্যে আনিয়েছিলাম, ওল্ড স্মাগলার।"

ওল্ড স্মাগলারের রঙীন নেশায় ভদ্রলোক বোল্ড আউট হয়ে যাননি। কিন্তু টলমল করছিলেন। সেই অবস্থায় বলেছিলেন, মিস্টার আগরওয়ালা আপনি একটা ইস্কুল খুলুন। এই ক্যালকাটারও বহু বিজনেসম্যান সেল করতে জানে না। তাদের সঙ্গে ডীল করতে গেলে আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। মনে হয় ঠিক যেন আমার ওয়াইফের সঙ্গে ডীল করছি। আমাকে যেন ওঁরা অনেকদিন আগে থেকেই কিনে রেখেছেন।"

রঙ্গনাথন থেকে আমারা আবার মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের অতিথিদের কথায় ফিরে এলাম।

করবী গুহ বললেন, "অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল ফোন করে সব ঠিক করে নেওয়া। মিস্টার অনিন্দ্য পাকড়াশিকে আপনি চেনেন নাকি?"

বললাম, "সামান্য পরিচয় আছে।"

"আগে থেকেই ওঁকে চিনতেন?" করবী দেবী প্রশ্ন করলেন।

"না, এইখানেই আলাপ হয়েছিল", আমি উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা! এই হোটেলে? উনি কি এখানে আসেন? কেমন লোকটি বলুন তো?"

আমি বললাম, "কেন বলুন তো?"

করবী দেবী হেসে বললেন, "আছে, প্রয়োজন আছে। ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।" করবী দেবী এবার ওঁর টেলিফোনটা তুলে ধরলেন।

[ক্রমশ]

জাপানের সাধারণ মানুষের স্বার্থ-জড়িত ঘরোয়া ঘটনাবলীর কিছু বিবরণ নীচে উল্লেখ করছি :

গুপ্তহত্যা

এদের জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'চুয়ো কোরনে' প্রকাশিত একটি ছোটগল্পের 'স্বপ্ন' অংশে সম্রাটকে ঘৃণ্যভাবে আক্রমণ করার ফলে—কাগজটির সম্পাদকের স্ত্রী গুরুতরভাবে জখম হন, এবং সম্পাদকের পরিচারিকাও উগ্র-দক্ষিণপন্থী এক যুবক কর্তৃক নিহত হয়। অতি সম্প্রতি, রাজকীয় প্রতিরোধ সংস্থার (হালের আত্মরক্ষা-বাহিনীর সঙ্গে এরা যুক্ত নয়) সদস্যদের—প্রধানমন্ত্রী, উদার গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের হত্যা করবার এক চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এই চক্রান্তের মজার দিকটি হল, শীর্ষস্থানীয় জনৈক সদস্য এই ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ইনি সেই একই ভদ্রলোক যুদ্ধপূর্ব কালে প্রধানমন্ত্রী ইনুকাইকে যিনি খুন করেন। সে সময় একে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ করেছিলেন মাত্র এক বছর পরে 'সদাচরণের' জন্য এবং অবশেষে এক মাঝামাঝি মাপের প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মপরিচালক হিসাবে বহাল হয়ে বসেন।

যা-হোক, এই চক্রান্তগুলিকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করে দেখা দরকার। আধুনিক জাপানে এই সব ধরনের দক্ষিণ-পন্থী গুপ্তহত্যার প্রথা যদিও স্বচ্ছভাবে দেখতে গেলে কিছুটা সমর্থন পায় তবে যুদ্ধপূর্ব যুগের থেকে জাপানী জনসাধারণের মনোভাব এ-ব্যাপারে খুবই বদলে গিয়েছে। এবং জাপানী সমাজ খুব সম্ভবত রাতারাতি দক্ষিণপন্থী সরকারের আওতায় আসবে না অর্থাৎ যেমনটা ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়।

সরকারের দায়িত্ব

গোটা বিগত বছরব্যাপী অজস্র মানবহনন দুর্ঘটনা ঘটেছে—আর এ সবই পথচারী, মালবাহী লরী, নানা ধরনের মোটরগাড়িকে জড়িয়ে। শতকরা পঞ্চাশটির মত দুর্ঘটনার হেতু হরদম অতিরিক্ত মালবোঝাই দেওয়া এই সব ট্রাক এবং এদের চালায়ও এমন একধরনের বেপরোয়া যুবক যাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বলে মগজে কোন পদার্থ নেই। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল উত্তরাধিকারীদের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অত্যন্ত কম। নিহতদের জীবন-বীমারও কোন বালাই পর্যন্ত নেই। ছোকরা ড্রাইভাররা তাদের যুক্তি দেখায় গাড়ি চালনায় অনভিজ্ঞতার আর তাদের নিয়োগ-কর্তামশাইরা দিব্যি এড়িয়ে যান দায়িত্ব। ক্যালিফোর্ণের একটি আদালতী খবর দিচ্ছি, একটি মূর্তিমান বিশালকায় ট্রাক তার পিছনে একজন ভদ্রলোককে পঞ্চাশ ফুট ঘেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যায় যখন তাঁর স্ত্রী না ফিরে ট্রাকে আরোহণ ক'রে আহাম্মক ড্রাইভারকে ট্রাক থামানোর জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। ড্রাইভারটি অবশ্য বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর জন্যে নয়, এ অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত এই সব অব্যবস্থিতচিত্ত গাড়ি-চালকদের বা তাদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির বিপক্ষে তাদের সায়েস্তা করা বা

জাপানের নৃত্যকলা

ঠাণ্ডা করার মত জোরালো জনমত গড়ে ওঠেনি।

হুবহু একই ধরনের শোকাবহ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাবে ফুকুয়োকা-কেন-এর ৯ই মার্চ এবং ১৬ই মার্চের দু দুটো কয়লা-খনির দুর্ঘটনায়, যাতে ১০৭ জন খনি-শ্রমিকের প্রাণনাশ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারীভাবে সাবধান করা সত্ত্বেও সেফটি ইন্সপেক্টরদের নির্ধারিত আইন অমান্য করার ফলেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার উৎপত্তি। আর আশ্চর্য, প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজাররা এখনো সশরীরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের কারোর ওপর কারা-দণ্ডভোগের কোন হুকুমই চাপানো হয়নি।

১৯৬১ সনের এই সব ঘটনাগুলি কিন্তু নিষ্ঠুরতাপ্রসূত কোন ব্যাপার নয়। আসলে খনিকর্মী, তাদের নিয়োগকর্তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে, মালবাহী ট্রাক-চালক, তাদের মালিকদের ব্যাপারেও যে সরকারের পুরো-পুরি দায়িত্ব রয়েছে, এই বোধের অভাবই এই সব বিপত্তির জন্যে দায়ী। ইংলণ্ডের উইলবারফোর্সের সমসাময়িক কালের সঙ্গে এবং বিলাতী পুঁজিবাদের গোড়াকার যুগের সঙ্গে এই অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে, অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রম জাপান এ বিষয়ে অধিকতর চরম সংস্কারপন্থী। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে জাপান অন্যতম। অথচ কোন-কোন ক্ষেত্রে বিপরীতভাবে বরঞ্চ মার্কিনদেরই মনে হয় সমাজবাদী। আর হয়ত এর থেকেই জাপানে দক্ষিণপন্থী হাওয়ার প্রভাব বিশ্লেষিত হবে।

খেলাধুলোর খবর

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনের একটি খবর—আন্তর্জাতিক জুদোবিজয় প্রতিযোগিতায় জাপানী বিজেতা সোন-এর (উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি : ওজন ১৯৮ পাঃ) ওলন্দাজ বিজেতা গীসিংকের (উচ্চতা ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি : ওজন ২৬২ পাঃ) কাছে শোচনীয় পরাজয়। জাপানী জনসাধারণ এবং ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ মহল এই পরাজয়ে খুব বিস্ময়-বোধ করেছেন, বিশেষ করে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার মাত্র সাত মিনিট পরে গীসিংক সোনকে ভূপাতিত করার ব্যাপারে কেননা শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে এই ধরনের কৌশল প্রয়োগ কখনো দেখাই যায় না এবং তারাও নিজেদের এভাবে কখনোই আক্রান্ত হবার সুযোগ দেয় না। এই লড়াই-এর স্থায়িত্বকাল নির্ধারিত হয়েছিল বিশ মিনিট।

যা হোক, ঘটনাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে—পরাজয়ের ব্যাপারে আনুষঙ্গিক কারণ বা ব্যাখ্যা দেখানো হয়েছে। মূলত যুযুৎসু

থেকেই জ্যুদো-র উৎপত্তি। জ্যুদো-র বিপরীত যুযুৎসুতে কতকগুলি মারাত্মক আক্রমণ স্বীকৃত হয় এবং এই সব আক্রমণ যথাযথ প্রযুক্ত হলে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। এইভাবে যুযুৎসুতে প্রতিপক্ষ বৃহৎ বপু কি ক্ষুদ্র বপু তা গণ্য করা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অপরজনের মুষ্টাঘাতের সীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণই নিরাপদ। এদিকে জ্যুদো ক্রীড়া-জগতে আবির্ভূত হবার পর থেকেই এর প্রতিযোগিতায় যাতে মারাত্মক মার-প্যাঁচ প্রযুক্ত না হতে পারে সেজন্য শারীরিক ওজনগত অসামঞ্জস্যকে গণ্য করা হয়। জ্যুদো-প্রবর্তক কানোর সংস্কারসাধনগুলি প্রধানত এই সব বিশেষ বিশেষ আক্রমণগুলি বহিষ্করণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অলিম্পিকে জ্যুদোর প্রথম সূচনাপর্বে ওজনগত বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে তিনটি বিভাগ প্রস্তুত করা হয়—জ্যুদোপ্রবর্তকের সাবেক পদ্ধতির সঙ্গে বৈষম্য সত্ত্বেও এই সংস্কার-সাধন দরকার হয়ে পড়ে।

১৯৪৬ সনে জ্যুদো দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের একটি টোকিওর কোদোকান গোষ্ঠী, অপরটি কিয়োটোর বুতোকুকাই গোষ্ঠী। মোটামুটি-ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, সাবেক দল
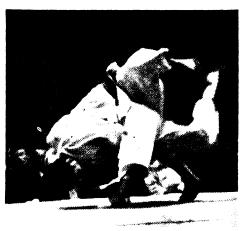
জাপানী যুযুৎসু

প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং নয়া দল দাঁড়িয়ে জড়াজড়ি-হাতাহাতি লড়াইয়ে। সমরাধিনায়ক ম্যাকআর্থার জাপানের প্রধান জ্যুদোগোষ্ঠী পরিত্যাগ করে বুতোকুকাই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। বুতোকুকাই গোষ্ঠীর শিক্ষকরা সাগরপারের দেশে ধাওয়া করেন জ্যুদো শিক্ষা-সম্প্রসারণের জন্যে—ইংলন্ড, ফ্রান্স আর হল্যাণ্ডে জ্যুদো জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে খুব। এদিকে কোদোকান গোষ্ঠীর পেশাদারদের জীবন ধারণের নিচু মান অনুযায়ী তাদের বেতন সবিশেষ কম, অধিকন্তু জাপানী জ্যুদো খেলোয়াড়দের সাবেক সুযোগ-সুবিধেগুলি থেকেও তারা বঞ্চিত হতে থাকে। গীসিংক-এর ক্ষেত্রে এ-কথা স্পষ্ট, ক্রীড়াজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়—এবং সেই জন্যই তাঁর জয়লাভকে খুব বিস্ময়কর বলা যায় না, তবু নিশ্চয়ই খুব অপ্রত্যাশিত। অধিকন্তু ১৯৬৪ সনে অলিম্পিক প্রতি-যোগিতায় জাপানের বিজয়কে সুনিশ্চয়-ভাবে গণ্য করাও যাবে না, তবে ওজনগত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঘটানোর ফলে সম্ভবত অন্তত একটা প্রতিযোগিতায় সে জয়ী হবে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিগত বছরটি জাপানের পক্ষে একটি মন্দা বছর। কম্যুনিস্ট চীনের আসনলাভের প্রশ্নটির মত যাবতীয় আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাপান আমেরিকার পক্ষাবলম্বন করেছে। জাপানের আপন সমুদ্রের বিপরীত দিকের দেশগুলির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়—এমনকি জাপানী সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী, চীন অথবা সোবিয়েত রুশিয়ায় কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল প্রেরণেও অসমর্থ হয়। ডবলিউ. এফ. টি ইউ—সাংবাৎসরিক সাক্ষাৎকারে, সো হি ও (সর্ববৃহৎ শ্রমিক সঙ্ঘ সংগঠন) সহ-অধ্যক্ষ মনোনয়ন পর্ব অগ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করে কারণ রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে রাশিয়ার ৫০ মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোকে সমর্থন করে না।

জাপানী প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে একটি সৌহার্দ্যসূচক ভ্রমণ-পর্ব চুকিয়ে এসেছেন। প্রত্যাবর্তনের পর বিবৃতি দান প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেন যে, বাস্তবিক-পক্ষে 'জাপান এশিয়ারই একটি দেশ, জাপান এশীয় নীতি বলতে নিরপেক্ষতা এবং শক্তিজোটে অসঙ্ঘবদ্ধতাকে সমর্থন করে কি না—জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নে, প্রধানমন্ত্রী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি পরিবর্তনের যে কথা ভাবা হচ্ছে তাকেও সরাসরি অস্বীকার করেন।

১৯৬১ সনের মত জাপানের ১৯৬২ সনও শান্ত-চালে অতিবাহিত হবে বলে মনে হয় না। অধিকাংশ জাপানীই আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলির চাইতে নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা, জীবন ধারণের মান, বেতনের পরিমাণ ইত্যাকার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহশীল, অবশ্য অন্যান্য দেশগুলির যে-কোন দাম্ভিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে, জাতীয় সম্মানের দিকে তারা সব সময় একত্রিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ হবে। বর্তমান বছরটি আলোড়িত হবে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা, হস্তগত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ, এবং লাল চীনকে সরাসরি ভোটদানের প্রসঙ্গের মত কতকগুলি দুরূহ সমস্যায়। এর যে কোন একটি পর্ব থেকেই গোলমাল ঘটতে পারে॥

প্রশান্ত গুপ্ত

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

॥ ৪ ॥

সাঁওতাল পরগনায় দ্বারকা নদীর উৎপত্তি। কিছুদূর পূর্বমুখী হবার পর এইখানে এসে নদী উত্তরাভিমুখী। তারাপীঠ মহাশ্মশানপ্রান্তের এই উত্তরবাহিনী দ্বারকা পুণ্যসলিলা সর্বপাপহরা। স্নানে মহাপুণ্য। গ্রীষ্মকালে হাঁটু-জলও থাকে না। মাথা ডোবাতে চিৎ হতে হয়। এখন অবশ্য নদীর মাঝামাঝি কোথাও কোথাও এক কোমর জল। দুই তীরে বিশাল জনসমাগম। শত শত যাত্রী স্নান করছে, শত শত যাত্রী কবিচন্দ্রপুরের দিক থেকে নদী পার হয়ে আসছে।

নদী থেকে মন্দির পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা ও দুধারের খোলা প্রান্তর জুড়ে মেলা বসেছে। মেলা বসেছে তারাপীঠের প্রধান রাস্তার উপর। তারাপীঠ এমনিতেই দুর্গম। ঘন বর্ষার সময় থেকেই এই দুর্গম পথ দুর্গমতর হয়ে ওঠে। এখন তো সব দিক থেকেই পৌঁছনো দুঃসাধ্য বলতে হবে। এবং এত যাত্রী কোথা থেকে এল, কী করে আসছে? আসছে খানা-খন্দ পেরিয়ে, জলে-ডোবা মাঠ আর জলা-জাঙ্গাল ভেঙে, কাদাভরা মেঠো রাস্তায় হাঁটু ডুবিয়ে ডুবিয়ে। বাসযাত্রীদেরও একই অবস্থা—হেলিকপ্টারে চড়ে কেউ আসেনি, গরুর গাড়ির সংখ্যাও বিরল। পিঠে বোঝা নিয়ে পায়ে হাঁটাই একমাত্র গতি।

তাই কেনাকাটার জমাট মেলা নয়। পণ্যের অপ্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। বড়োসড়ো দোকান মেলার মধ্যে হাতে গোনা যায়। এমনি দোকান বলতে কয়েকটা কাটা কাপড়ের আর বাসন ও সস্তা মনোহারী জিনিসের দোকান। আরশি, ছাপা ছবি, বটতলার চটি বই। পুঁতির মালা আর পিতলের অলংকার। বাঁশের গায়ে আটকানো কাগজের খেলনা। চিনাবাদাম, ঝালমুড়ি, পান বিড়ি, লেবঞ্চুস। চা, লেড়ো-বিস্কুট আর তেলেভাজা বেগুনি আলুর চপ। কয়েকটি জাঁকালো মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। মন্দিরের সামনে পুজোর ফুল-মিষ্টি সাজিয়ে বসেছে কয়েকজন। এক ম্যাজিকওয়ালা মাঠে তাঁবু ফেলেছে। তাঁবুর দরজায় বাক্স-গ্রামোফোনে খনখনে আওয়াজে শ্যামাসংগীতের রেকর্ড বাজছে। পণ্য যেমন কম, ক্রেতাও তেমনি কম। যুবতী মেলা-বেড়ানী মেয়ে চোখেই পড়ে না, শখ করে দোকানে ভিড় জমাবে কে? শিশু নেই, কার আবদারের রসদ যোগাবে পুতুলওয়ালা আর ম্যাজিকওয়ালা?

অধ্যাপক-দম্পতিকেও খুঁজে পেয়েছি। প্রাথমিক মাতৃদর্শন সম্পন্ন করে দ্বারকায় স্নান করে পথের ধুলোকাদা থেকে মুক্ত হয়েছি সকলে। মুড়ি আর আলুর চপের সঙ্গে ভাঁড় দুই করে চা খেয়ে প্রত্যেকের প্রাণ ঠান্ডা হয়েছে। বেশ চাঙ্গা লাগছে এখন—চারজনে মিলে ভিড় ঠেলে ঠেলে রাস্তায় এগোচ্ছি, দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়াচ্ছি। শচীর কথা আমি ভুলিনি, সজাগ রেখেছি চোখ—নিশ্চয়ই তার দেখা পাব। তার কথা রেখেছি। নিশ্চয় সে খুশি হবে আমাকে দেখে।

বামা মিশনের কাছাকাছি আসতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে। দোহারা গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, পোড়া তামাটে গায়ের রঙ, মাথার ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল নিগ্রোর মতো কোঁকড়ানো, কালো কুচকুচে ঘন দাড়িতে নাকের নিচে থেকে সারা মুখটা ঢাকা। জ্বলজ্বলে লাল চোখ আর লালচে পুরু ঠোঁট। গায়ে টকটকে লাল ফতুয়া আর লুঙ্গি। গলায় তিনগাছা ছোট-বড়ো রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে একটা গুলি-ওঠা অষ্টাবক্র লাঠি।

কাছে এসে দু-হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরে হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল।

জয় তারা, জয় মহামায়া—অসীম তোমার দয়া মা! একেবারে তরীর কান্ডারীকে জুটিয়ে দিলে! হেঁ হেঁ, আবার কেমন হলো বলুন তো দাদা!

সেবার যখন লোকটার সঙ্গে দেখা হয়, প্রথম থেকেই মনে জেগেছিল কেমন একটা যুগ্ম অনুভূতি—ঘৃণা আর সেই সঙ্গে

তারাপীঠের মেলা : তারামন্দির ও বিশ্রাম-মণ্ডপ

আকর্ষণ। বড়ো বড়ো কথা, ধর্ম বলো, সাধনা বলো, ভূভারতের তন্ত্রমন্ত্র বলো, সব কিছুরই সবজান্তা। সেই সঙ্গে আত্মম্ভরিতায় ডগমগ। আবার ভিক্ষার জন্যে লোক বুঝে বুঝে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা,—একেবারে তৃণাদপি সুনীচেন। সংস্কৃত ধর্মবচন আর অশ্লীল হিন্দী গালাগাল পাশাপাশি ছোটে। মহাষ্টমীর দিন হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদের পঞ্চবটীমূলে বেশ সেজেগুজে জমিয়ে বসেছিল। যাত্রী বুঝে কাছে ডেকে ডেকে লাগসই কথায় মুগ্ধ করেছিল। *দিনান্তে বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে হাঁটা দিয়েছিল কাঁচড়াপাড়ার দিকে। আমার উপর বিশেষ নজর পড়েছিল কেন জানিনে। নগদ পাঁচটি সিকে খসিয়েছিল এই দুর্মূল্যের বাজারে। নাম বলেছিল অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী,* কিন্তু আমার মনে হয়েছিল কোন ভেক-ধরা ফেরারী আসামী।

আমি বললাম—তা তো হলো ব্রহ্মচারী, এলেন কবে?

ক'দিন থেকেই আছি দাদা। আপনারই প্রতীক্ষায় আছি। তা আপনার সঙ্গীদের সঙ্গে তো পরিচয় হলো না!

পরিচয়ের অপেক্ষা না রেখেই আত্ম-পরিচয়ে মুখর হয়ে উঠল অভয়ানন্দ। অধ্যাপক মশাই আর আমার বউঠান যে স্বামী-স্ত্রী একচোখ দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল।

বউঠানকে উদ্দেশ করে সে হেঁকে উঠল—আমি ঠাকরুন, অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী। কথা একটু এলোমেলো বলি, শুনে ভাববেন লোকটা পাগল। কিন্তু জানবেন দৃষ্টি আমার স্বচ্ছ। আমার নজর ঐ নদীর পার ছাড়িয়ে যায়, আকাশ ছাড়িয়ে যায়, বর্তমান ছাড়িয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে কি দেখছি জানেন? শুনবেন? বিশ্বাস করবেন?

অচেনা সন্নিসিটির মুখে এ কী নাটকীয় সংলাপ? বউঠান একটু ঢোঁক গিলে বললেন—কী দেখছেন?

লাঠিটা বাগিয়ে অধ্যাপকের দিকে কট-মটিয়ে তাকালো ব্রহ্মচারী। তারপর খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখাতে লাগল।

—নেই, নেই মশাই, ঐ আদ্দির পাঞ্জাবি আর সোনার বোতাম, কোঁচানো ধুতি আর মসমসে জুতো কিছু নেই, সব ফরসা! মাথায় জটা, গায়ে ছাই আর পরনে লেংটি। চিমটে হাতে ফাটা পায়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মশাই—বোম্ বোম্ হাঁক ছাড়ছেন! কা তব কান্তা কস্তে পুত্র!

ভ্রূকুঞ্চিত করে অধ্যাপক বললেন—তার মানে?

—তার মানে? স্পষ্ট করে বলতে হবে? আর বেশী দেরি নেই! বিলকুল বাউরা হো যায় গা! মহামায়া কান পকড় কে লে যায় গা!

অভয়ানন্দর ভেল্কি আমার জানা ছিল। কড়া ধমক দিলাম—থামুন, কী বাজে বকছেন পাগলের মত? যেতে দিন আমাদের!

সঙ্গে সঙ্গে ভোল পালটাল। এ একেবারে অন্য গলা।

—জয় তারা, জয় মা, জয় রক্ষাকালী! *বউঠানকে উদ্দেশ করে বিগলিত কণ্ঠে বললে—আমি অভয়ানন্দ বলছি মা, ভয় নেই। আপনিই টেনে রাখবেন, বেঁধে রাখবেন সাতপাকের বাঁধনে। তবে সাবধান, একলা ছেড়ে দেবেন না, সর্বদা পাশে পাশে থাকবেন। আহা, জীবনের সাধনভজনে ঠিক যেন ভৈরবের পাশে ভৈরবী!*

অনিমেষদার মুখে হাসি ফুটল, কপট স্বস্তিতে বললেন—যাক্, বাঁচলাম!

বাঁচবেন না মশাই! হোঁ হোঁ হেসে অভয়া বললে—আপনি যে কঠিন যোগী, আপনাকে মারে কে? বামাক্ষেপার শ্মশানে এসেছেন, তাও যোগিনীকে সঙ্গে করে। এবার একটু নিভৃতে আসন করে বসে গেলেই হয়!

লোকটার মুখের আগল নেই। তাকে আর কেউ না চিনুক আমি চিনি। প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে বললাম—আমাদের সঙ্গে ঘুরবেন? তা হলে চলুন, এখানে কোথায় কী আছে, ভাল করে দেখিয়ে দিন। এঁরা সব নতুন এসেছেন!

—জরুর!

অভয়ানন্দ এইটিই নিশ্চয় চাইছিল। মহানন্দে আমাদের সঙ্গ নিল।

রাস্তা দিয়ে মন্দিরের দিকে আসতে ডান হাতে প্রথমেই পড়বে বামা মিশন প্রতিষ্ঠিত বামা মন্দির। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে এই স্থানে এক কৌশিকদম্বমূলে মহাসাধক বামাক্ষেপা দেহরক্ষা করেন। সেই পুণ্যময় স্থানে তাঁর ভক্তরা এই মন্দির গড়ে তুলেছেন। মন্দিরে বামার প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত। মিশনের সভ্য ও সংশ্লিষ্ট ভক্তরা মন্দির সংলগ্ন কক্ষে আশ্রয় পান। শিবরাত্রির দিন এখানে বামার জন্মোৎসব পালিত হয়। সমবেত শত শত ভক্ত প্রসাদ লাভ করে পরিতৃপ্ত হন।

কয়েক পা এগিয়ে শ্মশানের কোলে আরো দুটি মধ্যমাকৃতি শ্বেত মন্দির। ওই মন্দির দুটিকে ঘিরে তারাপীঠের সুপ্রাচীন কিংবদন্তী।

অভয়ানন্দ বললে—কলিযুগে তারামার আবির্ভাবের পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করুন। এ শত শত বছর আগেকার

কথা এই দ্বারকা নদী তখন ছিল গভীর-সলিলা বেগবতী স্রোতস্বতী। নদীর উপর দিয়ে নৌকা বজরা চলাচল করত। এই শ্মশানতীরে জয়দত্ত নামে এক বণিক দিবাবসানে নৌকা বাঁধলেন। নৌকা ভর্তি বণিজ্যপণ্য। মাঝিরা আহারের আয়োজনে তীরে ব্যস্ত, নৌকার মধ্যে বণিক জয়দত্ত আর তাঁর পুত্র ব্যস্ত হিসাবনিকাশে। জয়দত্তের এমনই ভাগ্য—সেই রাত্রেই পুত্রটির ভেদবমি শুরু হলো এবং ভোর না হতেই সে মারা গেল। কোথা থেকে কী অপঘাত ঘটে গেল! কোন্ মুখে বণিক স্বগৃহে ফিরবেন, কী বার্তা তিনি নিয়ে যাবেন স্ত্রীর কাছে? প্রিয় পুত্রের এই হঠাৎ মৃত্যু—এ যেন বজ্রাঘাত!

কপালে করাঘাত করে পিতা কাঁদছেন, এমন সময় দলের এক বৃদ্ধ মাঝি এসে পুত্রের মৃতদেহটি নিয়ে টানাটানি শুরু করল। কী ব্যাপার? না, দেহটি নিয়ে চলুন অদূরের ঐ কুণ্ডের জলে। কেন, কী লাভ তাতে? শুনুন তা হলে, গত রাত্রে ঐ কুণ্ডের জলে একটি কাটা শোলমাছ ধুতে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেই কাটা শোল ঐ কুণ্ডের জলের স্পর্শলাভে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

সত্যিই তাই হলো। কুণ্ডের জলে অবগাহন স্নান করাতেই প্রাণ ফিরে পেল বণিকপুত্র। জীবিত কুণ্ড ঐ কুণ্ডের সার্থক নাম।

বলেন কি মশাই? অধ্যাপক বললেন ঐ কুণ্ডের জলে স্নান করলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে?

—না ওঠে না, কে বললে ওঠে? চোখ পাকিয়ে বললে ব্রহ্মচারী ঐ কুণ্ডে জল ছিল না মশায়, ছিল অমৃত। সেই অমৃতস্পর্শে মরণশীল জীব হতো মৃত্যুঞ্জয়। মানুষের পাপ আর অবিশ্বাস জীবিতকুণ্ডের সেই অমৃতকে পানা পুকুরের জলে পরিণত করেছে। তাই এখন বলির পাঁঠাকে ওখানে স্নান করায়!

বউদি বললেন—তারপর?

—ধন্য জয়দত্ত! ধন্য সেই প্রহেলিকাময় আশীর্বাদ! দ্বিতীয় রাত্রেও পুনর্জীবিত পুত্রকে নিয়ে ঐ শ্মশানভূমে রয়ে গেলেন জয়দত্ত। মধ্যযামিনীতে ভাগ্যবান বণিকের গভীর স্বপ্নের মধ্যে আবির্ভূতা হলেন দেবী তারিণী। পরদিন প্রত্যূষে উঠে দেবীনির্দিষ্ট একটি প্রাচীন শ্বেতশিমুল গাছের তলার মাটি খুঁড়তে লাগলেন জয়দত্ত। এই শিমুলবৃক্ষমূলে ছিল ত্রেতা যুগের বশিষ্ঠ মুনির পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই আসনের নিচে থেকে প্রকাশ পেলেন বশিষ্ঠের শিলাময়ী তারা—দ্বিভুজা, সর্পযজ্ঞোপবীতভূষিতা, বাম ক্রোড়ে বৎসরূপী মহাদেব। প্রকাশ পেলেন অনাদিলিঙ্গ চন্দ্রচূড় শিব। আর আবির্ভূত হলো দেবীর শ্রীচরণশিলা।

ঘোষাল মশাই সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। তাঁর অকিঞ্চন মাথাটি দেবীর কণ্ঠলগ্ন হবার পর থেকেই তিনি যেন কেমন ভাবে-ভোলা হয়ে গিয়েছিলেন। দেবীর প্রভাতী স্নানোদক বোধ হয় তিনি একটু বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। তারই ফলে এই নির্বাক বিহ্বলতা। হঠাৎ তিনি ভাবের ঘোরে ভাঙা গলায় গেয়ে উঠলেন

মন, চল চল শিমুলতলা!

ব্রহ্মচারী বললে—ঠিক বলেছেন দাদা, ঐ শিমুলতলাই মানবসাধনার কল্পবৃক্ষ। ত্রেতায় যেমন বশিষ্ঠ, কলিতে তেমনি বামাক্ষেপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এই শিমুলতলায়। এইখানে বশিষ্ঠের যে পঞ্চমুণ্ডের আসন ছিল, বামা তাকে লক্ষমুণ্ডের আসনে পরিণত করেছিলেন। এই শ্বেতশিমুল গাছটিকে চোখে দেখেছে এমন লোক এখনও আছে। সেই বৃক্ষমূলেই গড়ে উঠেছে এই বশিষ্ঠ-মন্দির।

বামাক্ষেপার সমাধি মন্দির : তারাপীঠ

কয়েকটি চওড়া সিঁড়ি। যাত্রীরা সেই সিঁড়ির ধাপে ধাপে আশ্রয় নিয়েছেন। সিঁড়ির উপরে উঁচু চাতালের উপর বশিষ্ঠ-মন্দির। গাছের ছায়ায় ঢাকা। মন্দিরের মধ্যে পাথর-খোদা তারাদেবীর চরণচিহ্ন।

অধুনালুপ্ত শ্বেতশিমুল গাছটির পাশে জয়দত্ত তারাপীঠের প্রথম তারামন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কালক্রমে সে মন্দির জীর্ণ ও ধ্বংস হয়। তারা-মা ও চন্দ্রচূড় শিব শ্মশানের বাইরে জীবিতকুণ্ডের দক্ষিণে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। দেবীর শ্রীচরণশিলার উপর গড়ে ওঠে বশিষ্ঠ-মন্দির। শ্বেতশিমুলের পাশেই ছিল একটি প্রাচীন নিমগাছ। শিমুল গাছ ধ্বংস হবার পর এই নিমগাছটি হয়েছিল বামাক্ষেপার বড় প্রিয়। দেহরক্ষার পর এই নিমগাছের কোলে যেন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এইরূপ নির্দেশই নাকি বামাক্ষেপা দিয়ে গিয়েছিলেন। যথাকালে ভক্ত ও শিষ্যরা যখন

সমাধির জন্য নিমগাছটির নিচে খনন করেন, তখন সেইখানে ভূগর্ভে জয়দত্তের সেই প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিমূলে প্রকাশিত হয়। নিমগাছও নেই, কয়েক বছর আগে প্বারকার মহাবন্যায় ধ্বংস হয়েছে। তার কোলে গড়ে উঠেছে বামার সমাধি-মন্দির। মন্দিরের মধ্যে বামার কোনো মূর্তি নেই, আছে ধাতু-নির্মিত একটি উন্নত-ফণা সর্প।

বামার সমাধি-মন্দিরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ ছটফট করে উঠলেন ঘোষাল মশাই। চিৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন —যাব না, কিছুতেই আমি যাব না ওখানে। বয়ে গেছে আমার! কোথায় গেল আমার শ্বেতাশিমূল, আমার বাঞ্ছাকল্পতরু! জানেন কোথায় গেল?

উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। বাবার সমাধি-মন্দিরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—সেই শিমুল গাছকে গাঁজার আগুনে পুড়িয়ে খাক করেছে ঐ ক্ষেপা! জানেন সে কথা?

গাঁক গাঁক করে উঠল ব্রহ্মচারী।

—চুপ, চুপ! মুখ চেপে ধরল ঘোষালের। আমি ভাবলাম লেগে গেল বুঝি দু-জনের মধ্যে। ঘোষালের কথা কানে গিয়েছিল

অনেকের। ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠল আমাদের ঘিরে। আসলে ব্রহ্মচারীর একটা সুযোগ হলো বক্তৃতার।

—ছোট মুখে বড় কথা বলবেন না দাদা। সাবধান, সাবধান! বাবার মাহাত্ম্য হিমালয়ের চূড়ো—আপনার আমার বাজে কথার ঢিল সেখানে পৌঁছয় না। এই যে যুগযুগান্তের শ্বেতশিমুল গাছ ভস্ম হলো, সে কি যে সে ব্যাপার? তার পিছনে কত বড় রহস্য, মায়ের কী বিচিত্র লীলা, তা জানেন?

ঘোষাল তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ! ব্রহ্মচারী চারদিকে চোখ বোলালো। শ্রোতাদের মুখে আগ্রহ।

ব্রহ্মচারী শুরু করলে—সেই বিকট শ্মশান, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী রাত্রি! চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, খটখট করে হাঁটছে কঙ্কাল, বাতাসে শন্‌শন্ করছে প্রেত-প্রেতিনীর দীর্ঘশ্বাস। লক্ষমুণ্ডির আসনে বসে আছেন বামদেব, সাধনার শেষ লক্ষ্যসন্ধানে, আমরণ তপস্যায়। হঠাৎ সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে আলো জ্বলল। এ আলো সাধকের আপন ললাটের আলো। সেই আলোকে তারাদেবীকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। সেই তারা যিনি যুগযুগান্ত ধরে আত্মগোপন করে ছিলেন সেই শ্বেতশিমুল বৃক্ষে। সাধকের আহ্বানে আবার তিনি মূর্ত হলেন। শিমুলবৃক্ষ ত্যাগ করে তিনি বামার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। বাম হলেন মহাভৈরব। সেই মহাযোগী মহাভৈরবের অন্তরের মধ্যে তারা যখন বসলেন, তখন ঐ শিমুলগাছ অগ্নিদগ্ধ হলো।

আমি বললাম—এই নাকি কাহিনী?

—কাহিনী নয় দাদা, এই সত্য। আপনার আমার মত ভক্তের জন্য মূর্তির প্রয়োজন, প্রতীকের প্রয়োজন। সিদ্ধ মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের প্রতীক লাগে না, আদ্যাশক্তিকে তাঁরা বুকের মধ্যে পুরে নেন। যে প্রতীককে তাঁরা অবলম্বন করেন, সিদ্ধির পর সে প্রতীক থাকলেই বা কী আর পুড়লেই বা কী?

দ্বারকা নদীর ও-পারে কবিচন্দ্রপুরের সন্নিকটবর্তী আটলা গ্রামে ১২৪৪ সালের শিবচতুর্দশীর রাত্রে সচল শিব বামাক্ষেপা জন্মগ্রহণ করেন। আদি নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। বালককালেই তিনি তারামন্দিরে সেবার কাজ শুরু করেন। মাতৃপূজোর নিত্যকর্মে তিনি বেশী দিন রত থাকতে পারেন নি। মা তাঁকে লৌকিক সর্ব কর্তব্য থেকে বিমুখ করে মাতৃসাধনায় উন্মাদ সাধকে পরিণত করলেন। বামাচরণ হলেন বামাক্ষেপা। বামার চরণ-সন্ধানী বামাক্ষেপা। ত্রিপুরার মেহারকালীর সাধক সর্বানন্দের মতো বজ্রকঠিন বীরাচারী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি হয়েছিলেন বামদেব। সাধনা-উত্তীর্ণ বামাক্ষেপার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের মধ্যে ব্রহ্মচারী তারানাথ বা তারাক্ষেপা, নিগমানন্দ সরস্বতী ও পূর্ণানন্দ স্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বামার সমাধি-মন্দির দেখে আমরা রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগলাম। তারা-মন্দির ছাড়িয়েই বামার নামধন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান। বামদেব সংঘ। এঁর যাঁরা কর্মকর্তা ও সভ্য তাঁরাও বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত-সম্প্রদায়। অনেকখানি জায়গা ঘিরে নিয়ে এঁরা সংঘের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। আশ্রমের প্রথমেই যে প্রকোষ্ঠটি তাতে বামার মর্মরমূর্তি। পিছনের ঘরগুলি ভক্তদের আশ্রম-কক্ষ। শিবচতুর্দশীর দিন এখানেও ভক্তরা মহা আড়ম্বরে বামার জন্মোৎসব পালন করেন। বামাক্ষেপার অলৌকিক জীবন-কাহিনীকারদের মধ্যে হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'তারাপীঠ ভৈরব' নামে বামাক্ষেপার যে জীবনী প্রকাশ করেছেন সেটি একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। বামার ভক্তদের বিশ্বাস যে, যিনি বাম তিনিই ভৈরব, কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন ক্ষেপা রূপে। মনুষ্য-দেহধারী এই ক্ষেপা ভৈরবের মহাশক্তিলীলা এই গ্রন্থে বিধৃত।

নূতন এক বামা-প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে আর এক ভক্তদলও কোমর বেঁধেছেন। তাঁদের অভিলাষ বামার জন্মভূমি আটলা গ্রামে একটি বামা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। মেলার ভিড়ে ভিড়ে এই আবেদন তাঁরা প্রচার করছেন, আটলার বামা-মন্দির স্থাপনে অর্থ সাহায্য করে যাত্রীদের ধন্য হবার সুযোগ তাঁরা দিচ্ছেন।

সাহায্যের আর একটি আবেদন মহত্তর। এই আবেদন করেছেন তারাপীঠের প্রবীণতম পান্ডা যতীন পান্ডা মহাশয়। তারাপীঠে একটি যাত্রিনিবাস হওয়া প্রয়োজন। পাকা যাত্রিনিবাসের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সাধারণ ভক্ত ও যাত্রীদের সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ হবে

বশিষ্ঠ মন্দির : তারাপীঠ

না। যাত্রিনিবাসটি তৈরি হলে সত্যিই সাধারণ তীর্থযাত্রীদের বড় উপকার হবে।

বেলা দ্বিপ্রহর। ঘুরে ফিরে আবার মার মন্দিরের কাছে এলাম। জনসমুদ্র বেড়েই চলেছে। বহু সাধু এসে জুটেছে, গেরুয়াধারী, রক্তাম্বরধারী, শমশ্রুধারী, জটাধারী। বেশ গরম, মাথার উপর চনচনে রোদ। লাল হয়ে উঠেছে ভক্তদের চোখ। বিশ্রামমণ্ডপের ঠিক নিচেই রাস্তার ধারে পাঠাবলি হচ্ছে। যূপকাষ্ঠের চারদিক ঘিরে উন্মত্ত জনতা, সিঁড়ির উপর, চাতালের উপর ভিড় পেষাপেষি। তোরণদ্বারের পাশের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে যাত্রী-ঘরের কার্নিসে চড়ে একগাদা লোক পাঁড় কি-মার করে ঝুলছে। ভিড় সরাতে হিমশিম খাচ্ছেন পাণ্ডারা। পাঠা পড়ছে আর সম্মিলিত ভক্তকণ্ঠে বজ্রগর্জন উঠছে জয় তারা! একটু কায়দা করে অধ্যাপক-দম্পতির কাছ থেকে কিছুটা তফাতে হয়ে গিয়েছি আমি আর ঘোষাল মশাই। এক-কোণে দাঁড়িয়ে এই চাঁদি জ্বলা গরমে পরম ভক্তিভরে কিছুটা মহাপ্রসাদ পান করে নিয়েছি ভক্তির উল্লাস দেহের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে। সহস্র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও চিৎকার করছি—জয় তারা!

॥ ৫ ॥

এই তারাপীঠে যে আদি মহাসাধক তারা-সিদ্ধ হয়েছিলেন সেই বশিষ্ঠ কে? কোন্ যুগে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল? তারাপীঠে এসে এই প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বোক্ত বশিষ্ঠ মুনি যে স্মরণাতীত মহা-প্রাচীন কালের লোক তা বলার নয়। হরি-বংশে উল্লিখিত যে বশিষ্ঠ ঋষি ইনি ব্রহ্মার সপ্তমানসপুত্রের অন্যতম। রামায়ণ অনুসারে ইনি ত্রেতাযুগের সূর্যবংশের কুলগুরু। রাজা দশরথের ইনি কুলপুরোহিত ছিলেন। বনবাস ও লংকাজয় শেষ করে রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তিনি রামকে আশীর্বাদ করলেন। রামরাজ্যের ইনি ছিলেন বিশিষ্ট মন্ত্রী। পতিগতপ্রাণা পরমসাধ্বী অরুন্ধতী এঁর স্ত্রী। বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ দেখে মহাক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রশক্তিকে ধিক্কার দেন ও বশিষ্ঠের সমকক্ষ হবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন।

ত্রেতাযুগের সেই বশিষ্ঠই কি তারাপীঠের সিদ্ধ মুনি বশিষ্ঠ? প্রবাদ এই যে, বশিষ্ঠ কামরূপ কামাখ্যা প্রভৃতি নানা তীর্থে বহু যুগ ধরে মাতৃসাধনা করেন। কিন্তু এত সাধনা সত্ত্বেও সিদ্ধিলাভ তাঁর হয় না। শেষ পর্যন্ত তন্ত্র-মহাদেব শিবের নির্দেশে সাধন শিক্ষার জন্য তিনি মহাচীনে গমন করেন ও সেখানে ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হন মহাচীনে তন্ত্রোক্ত চীনাচার সাধন পদ্ধতি আয়ত্ত করে তিনি এই তারাপীঠে আসেন এখানে উগ্রতারার কঠোর বীরাচারী সাধন করে তিনি সিদ্ধ হন। এই প্রবাদ যদি মানতে হয় তাহলে এই বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই দশরথগুরু ত্রেতাযুগের বশিষ্ঠ নন। উগ্রতারা বৌদ্ধ তন্ত্রের এক প্রধানা দেবী বলে স্বীকৃত পণ্ডিতরা মনে করেন, এই বৌদ্ধ উগ্রতারা থেকেই হিন্দু দেবী তারার উদ্ভব। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার যুগে মহাচীন বলতে হিমালয় সমীপবর্তী নেপাল ভুটান-তিব্বত অঞ্চলকে বোঝাত। তিব্বতই বৌদ্ধতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

এই কিংবদন্তী বৌদ্ধধর্মের বহির্ভারতে প্রচার, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বিচিন্তার আদান-প্রদান এবং হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সাংস্কৃতিক সমন্বয় এই তিনটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। এই কিংবদন্তী অনুসারে এই বশিষ্ঠ কলিযুগেরই লোক। তাঁর তারাসিদ্ধি দেবীর প্রতি মহাদেবের সেই বাণীরই প্রতিধ্বনি করে বিনা আগম মার্গেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।

ইতিহাসের ধূসর দিগন্তপারে যার অবস্থিতি তাই পুরাণ। পুরাণ সেই স্মরণাতীত যুগের কল্পকাহিনী, কালের ঐতিহাসিক মাপকাঠি দিয়ে যাকে মাপা যায় না। সেই নিরূপণবিহীন পৌরাণিক যুগের আর একটি বিখ্যাত কাহিনীর সঙ্গে তারা-পীঠ যুক্ত হয়ে রয়েছে। বিষ্ণু চক্র কর্তনের ফলে সতীদেহের ঊর্ধ্ব নয়নতারা এই তারাপীঠে পতিত হয়েছিল। অনেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে এই কথা বিশ্বাস করেন। তারামন্দিরে ডিম্বসদৃশ অত্যুজ্জ্বল একটি পাথর সযত্নে রক্ষিত আছে। পরমবিশ্বাসী ভক্তরা আগ্রহ প্রকাশ করলে পাণ্ডারা অতি ভক্তিভরে এই পাথরটি হাতে তুলে নিয়ে দেখান এবং বলেন যে, এই সতীর ঊর্ধ্ব নয়নতারা। কিন্তু এই বিশ্বাস সর্বজন গ্রাহ্য নয়। প্রবীণ পাণ্ডাদের মধ্যেও অনেকে এ বিশ্বাস করেন যে—বলেন, তারাপীঠ যে সিদ্ধপীঠ তা অবশ্যই, কিন্তু সতীপীঠ নয়। পীঠ নির্ণয় খণ্ডে যে একান্নটি মহা-সতী-পীঠের তালিকা আছে, সেই তালিকায় বীরভূমের অন্তর্গত নলহাটি, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর ও অট্টহাসের নাম আছে, কিন্তু তারাপীঠের নাম নেই। শিবচরিতে যে ছাব্বিশটি উপ-পীঠের নাম আছে, সেখানেও তারাপীঠ উল্লেখহীন। পীঠনির্ণয়ের তালিকায় সবার উপরে হিংগুলার নাম—সেখানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়েছিল। হিংগুলার পরেই নাম করবীরের। এই করবীরের সতীতীর্থে সতীর ত্রিনেত্র পতিত হয়েছিল। পীঠনির্ণয় মতে—

'করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দিনী ক্রোধীশ ভৈরবস্তত্র......'

...নে দেবী মহিষমর্দিনী নামে খ্যাতা, ... মহাদেবের নাম ক্রোধীশ। সতীর ...নেত্র আলাদা করে অন্য কোথায় ...ড়েছিল তার কোনো পৌরাণিক উল্লেখ ...ছে কি?

বঙ্গদেশে পালযুগের সূচনা খৃষ্ট্রীয় ...টম শতাব্দীর মধ্যভাগে। রাজা শশাংকের ...ত্যুর পর বাংলায় যে অরাজকতা ও ...ৎস্যন্যায় চলতে থাকে, তার প্রতিরোধ-...ল্প জনমতপ্রতিভূ রাজা গোপাল এই পাল ...রাজবংশের প্রবর্তক। গোপালের পুত্র ...পাল ও পৌত্র দেবপাল বহু যুদ্ধবিগ্রহের ... দিয়ে পাল রাজ্যকে বিস্তীর্ণ ও রাজ-...শক্তিকে সুদৃঢ় করেন। পাল রাজগণ ...বৌদ্ধ ছিলেন। দেবপাল বৌদ্ধধর্মের ...একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ...হার, নালন্দা ও বুদ্ধগয়ার মন্দির ও মঠ-...গুলির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন। দেশে ...দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারেও তাঁর আনুকূল্যে ...সাফল্য হয়—বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ...র প্রধানত বাংলার বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাই গ্রহণ ...করেন। বৌদ্ধ-সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ...মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির ...সংযোগ ঘটে। দেবপালের আমলে ...তিব্বত থেকে এক রাজকীয় অভিযান বাংলা ...আক্রমণ করে ও দেবপালের সামরিক শক্তির ...ছে পরাস্ত হয়। পরে দশম শতাব্দীতে ...তিব্বতীরা আবার উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করে ... সেখানে এক তিব্বতী রাজবংশের ...প্রতিষ্ঠা হয়।

...দক্ষিণে নেপাল ও উত্তরে চীনের সংস্পর্শে ...তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রবেশ করে সপ্তম ...শতাব্দীতে। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের ...সঙ্গে তিব্বতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ...ম দশম শতাব্দীতে। এ সম্পর্ক শুধু ...যুদ্ধবিগ্রহের নয়, সাংস্কৃতিক আদান-...প্রদানেরও। রাজা ন্যায়পালের রাজত্বকালে ...বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী আচার্য ...দীপংকর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধ দর্শন প্রচারের জন্য ...তিব্বতে আমন্ত্রিত হন। তাঁর অবদান আজও ...তিব্বতে স্বীকৃত। পালযুগের শেষভাগে ...বাংলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধপন্থার উদ্ভব হয় ও ...বাংলা থেকেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা তিব্বত ব্রহ্ম ...প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

আমার কল্পনা করতে ইচ্ছা করে যে, ...তারাপীঠের এই বশিষ্ঠ বাংলাদেশেরই ...একজন সাধক ছিলেন এবং যে যুগে তান্ত্রিক ...বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে বেশ কিছুটা অপাংক্তেয় ...হয়েছিল, রাজন্যবর্গ ও উচ্চ সমাজের ...নায়কেরা উভয়েই এই তান্ত্রিকতার উপর ...ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই সময়েই ...তিনি জন্মেছিলেন। এই যুগ বাংলায় পাল ...যুগের পরবর্তী যুগ। যে যুগে বৌদ্ধ ...তান্ত্রিকেরা সবচেয়ে মার খেয়েছিলেন, সেই ...সেন রাজযুগ। সেই যুগের মাতৃসাধক বশিষ্ঠ তিব্বতে যান ও সেখান থেকে তন্ত্র সাধনায় নূতন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীরভূমের গভীর অরণ্য ও শ্মশানভূমিতে সাধনা করেন। সাধনস্থল দুর্গম, সাধনাও নিভৃত। সেই সাধনা পূরণের সিদ্ধপীঠই এই তারাপীঠ।

তন্ত্র কোনো ধর্মমত নয়,—তন্ত্র সাধনা। সাধনা কোনো ধর্মমতের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার নয়। তন্ত্রও থাকেনি—তন্ত্রের পরিধি সীমাহীন। এই সাধনা সুদূর অতীত কাল থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দু চেয়েছে মোক্ষ, বৌদ্ধ চেয়েছে নির্বাণ, তন্ত্র চেয়েছে মুক্তি—যে-সে মুক্তি নয়, শক্তির মধ্যে মুক্তি। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান—সর্ব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ যুগে যুগে তন্ত্রসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তন্ত্রসারগ্রন্থে নানা দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্র পূজাকবচাদি থাকলেও তান্ত্রিকের শ্রেষ্ঠ সাধনা শক্তি সাধনা। বীরাচার এই শক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ মার্গ।

সাধারণ মানুষ সাধনার অধিকারী নয়, সে পূজা করে। দেবতার পায়ে বিশ্বাস ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করে সে পরিতৃপ্ত হয়। পূজা-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সৎকর্ম করে পুণ্যকামী হয়। এই শক্তিপূজা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। বঙ্গবাসীরা শক্তিসাধকদের শ্রেষ্ঠ সাধক বলে সম্মান করেছে ও সেই সাধন-লব্ধ শক্তির আশায় শক্তিপূজা করেছে। বাঙালীর দেশপ্রেমও তার শক্তিপূজার অর্ঘ্য। দেশমাতৃকা শক্তিরূপে বাঙালীর বন্দনীয়া। বাঙালীর দেশাত্মবোধক মহামন্ত্র — বন্দে মাতরম্।

এই শক্তিই জগজ্জননী মহামাতৃকা। দশ-মহাবিদ্যা তাঁর দশরূপ। প্রতিটি রূপেই দাক্ষায়ণী সতীর প্রকাশ। প্রতিটি বিদ্যাই পরমশক্তিদেবী দুর্গার অংশ। সেই দশমহা-বিদ্যার প্রথমা কালী ও দ্বিতীয়া তারা। হিন্দুতন্ত্রে কালীর সঙ্গে তারা ষোড়শী ভৈরবী বগলা প্রভৃতি সকল মহাবিদ্যারই ধ্যান ও মন্ত্র রয়েছে। কিন্তু "কালিকা বঙ্গদেশে চ"। বাংলাদেশে আদ্যাশক্তিরূপে প্রধানত কালীরই পূজা। এবং বাঙালীর সাধক-প্রাণ কালীর পরেই তারাকে প্রধানা তন্ত্রমাতৃকা বলে গ্রহণ করেছে। একই মন্ত্রে কালী ও তারার পূজা—একই ধ্যানে একই ভাবনায়। বাঙালীর সাধনায় কালী ও তারায় কোনো ভেদ নেই। সাধক রামপ্রসাদ তাঁর অন্তরনিবাসিনী মহামাতা কালীকেই সম্বোধন করেছিলেন যখন তিনি গেয়ে-ছিলেন—

এমন দিন কি হবে মা তারা!

দেবী শিবানী হিমালয়কন্যা পার্বতীরূপে শিবলাভের জন্য যে কঠোর তপস্যা করে-ছিলেন সেই তপস্যায় তাঁর স্বর্ণগৌরী দেহকান্তি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল। তপস্বিনী শিবানীর সেই কৃষ্ণরূপ কালী। এই কালীই মহামায়ার অঙ্গসম্ভূতা মহাকালী মহাবিক্রমশালিনী, অসুরদলনী। শক্তিরূপিণী শক্তিদায়িনী। তিনি তামসী রাত্রি কিন্তু তাঁর কালো রূপের আলোয় সাধকের অন্তরের সমস্ত আঁধার বিদূরিত

হয়। ভক্ত তাঁর কাছে চায় শক্তির প্রসাদ, সাধক তাঁর কাছে চায় শক্তির আলোক। ভক্তের যিনি কালী, সাধকের তিনিই তারা। তিনিই ব্রহ্মময়ী — তিমিরে তিমিরহরা। সাধক যখন তারাসিদ্ধ হন, তখনঃ

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে
মনের আঁধার যাবে টুটে,—
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে
তারা বলে হব সারা॥

বেলা গড়িয়ে এসেছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ছায়া। অধ্যাপক-দম্পতি পান্ডাবাড়িতে বিশ্রাম করতে গেছেন। বশিষ্ঠ মন্দিরের সিঁড়িতে বসে কথা বলছি কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সারাদিনের ব্যস্ততার মধ্যে একটু অবসর পেয়ে কাশীনাথ আমাদের কাছে বসেছেন। তাঁর বাড়িতে অতিথি যাত্রীদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ হতে অপরাহ্ন গড়িয়ে এসেছে। একমাত্র কয়েক ফোঁটা মহাপ্রসাদ ছাড়া এ পর্যন্ত তাঁর পেটে কিছুই পড়েনি। সন্ধ্যাবেলা তারামূর্তিকে বিশ্রামমণ্ডপ থেকে আবার মন্দিরে তোলা হবে। তারপর মায়ের আবার স্নান। স্নানের পর সান্ধ্যবেশে তিনি সজ্জিতা হবেন। তখন আবার পূজারতি। এই বশিষ্ঠ মন্দিরেও মাতৃচরণে সান্ধ্যপূজো ও আরতি হবে। সব মিটতে রাত দশটা। তারপর কিছু অন্নপ্রসাদ মুখে দেবেন কাশীনাথ।

অদূরে কয়েকজন যাত্রী বানরভোজ করাচ্ছেন। তারাপীঠে যতো বাঘা কুকুর ততো ঝনো বাঁদর। বাঁদরে কুকুরে দিনের বেলা পরম হৃদ্যতা। যাত্রীদের দেওয়া খাদ্য তারা পাশাপাশি খায়। রাত্রে হৃদ্যতা কুকুরে আর শিয়ালে। তখন শ্মশানের অন্ধকারে তাদের নরমাংস ভোজ।

কাশীনাথ বললেন—আজকের এই দিনটিই আমাদের সংবৎসরের মূলধন বাবা। কতো যাত্রী, কতো যজমান! যজমানদের নাম আমাদের খাতায় লেখা থাকে। তাঁদের আমরা চিঠি দিই, তাঁরাও উত্তর দেন। তাঁরা এলে তাঁদের হয়ে পূজো দিই, ঘরে রাখি, খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা করি। অনেক যজমান আছেন, এদিনটিতে আসতে না পারলেও মাকে ভোলেন না, ভোলেন না মার সেবককে। পূজো পাঠান, প্রণামী পাঠান, আলাদা করে পান্ডার জন্যে দক্ষিণাও পাঠান। তারপর যাত্রীদের দক্ষিণা তো আছেই! জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বছরে বছরে যাত্রীদের ভিড়ও বাড়ছে। মার ভক্তরাই আমাদের রেখেছেন!

আগের চেয়ে মেলার ভিড় বেড়েই চলেছে তাহলে—কী বলেন?

নিশ্চয়ই। তারপর ধরো পাকারাস্তা যখন হবে তখন তো কথাই নেই। মার মন্দিরের চুড়ো সোনার চুড়ো হোলো বলে! তবে একটা কথা বলব বাবা—এতো ভিড়, এতো পূজো, পান্ডাদের ঘরে ধরে এতো যাত্রী,—এ সব বাহ্য! ভক্তের প্রণামী আর যজমানদের উপঢৌকন কুড়োতে কুড়োতে পান্ডা-পুরুতের নিশ্বাস ফেলতে পারছিনে আজ সারাদিন। হাজার কাপ চা আর পাঁচ হাজার করে বেগুনি ফুলুরি বেচেছে এক একটা দোকান। মায়ের নামে সন্ধ্যে হতে না হতেই শুঁড়িখানা লোপাট হয়ে যাবে। আজকের এই চেহারা কিন্তু তারাপীঠের আসল রূপ নয়!

আমি তা কিছু কিছু জানি। তারাপীঠের জনবিরল সুগম্ভীর রূপে আমি দেখেছি। মনে হয়েছে তারাপীঠ যেন এক ধ্যানমগ্ন তপস্বী। ঘোষাল মশাই নূতন, সকালবেলা ঝাঁঝালো স্নানোদক পান করে ভক্তি-বিস্ময়ে সেই যে চোখ কপালে তুলেছেন, দৃষ্টির সে বিস্ফারণ এখনো নামেনি। তিনি শুধোলেন—আসল রূপ তা হলে কী ঠাকুর মশাই?

আসল রূপ তা হলে কী ঠাকুর মশাই?

এ তো শুক্ল পক্ষ বাবা, আসল রূপ কৃষ্ণ পক্ষে! তারা মা হাজার ভক্তের প্রণামী লুটতে চান না, মা চান বিরল সাধকের সাধনা। এ মেলার ভিড়ে সেই সাধকের খোঁজ পাবে না। এখনো কত দূর দূর থেকে সাধকরা আসেন এই মহা তীর্থে। নামহীন পরিচয়-হীন তাঁরা। সমাজ সংস্কারের সব বন্ধন-মুক্ত তাঁরা। ঐ শ্মশানে তাঁরা বাস করেন। শ্মশানের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁরা সাধনা করেন। কেউ থাকেন তিন রাত্রি, কেউ তিন বছর! আবার প্রয়োজন সিদ্ধ হলে কখন্ তাঁরা অন্তর্ধান করেন! আজ কিন্তু তাঁরা কেউ নেই! আজ সাধনার দিন নয়, আজ যে পূজার দিন!

আঁ, ভৈরব ভৈরবী কারুর দেখা পাব না?

মৃদু হাসলেন কাশীনাথ, ভৈরব-ভৈরবীর খোঁজে এত দূরে এসেছেন বাবা? এত কষ্ট করে? আপনাদের শহর-বাজারে নেই?

ঘোষাল মশাই একটু অপ্রতিভ হলেন। তবু শুধোলেন—কী সাধনা তাঁরা করেন, ঠাকুর মশাই?

সাধনা বড়ো গুহ্য জিনিস বাবা! তা কি কথায় প্রকাশ করা যায়? ও প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে এই তারাপীঠের সাধনা মহা কঠিন—বড়ো সহজ বলেই বড়ো কঠিন। তারিণী তারা নাকি বামাক্ষেপাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই মহাপীঠে মাত্র তিন লক্ষ জপ করলেই সিদ্ধিলাভ হবে। তিন লক্ষ জপের কথা বাদ দাও, ত্রিশ বার জপ করতে কে পারে? জপ কি সোজা কথা? অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে যেখানে সব দৃষ্টি মুছে গেছে সেখানে আলোকের একটি মাত্র শিখা যেমন বাসনা কামনা স্বপ্ন-চেতনা যেখানে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে সেখানে একটি জপ তেমন। যেখানে জপ সেখানে আর কিছু নেই। ধ্যান যখন একটি মাত্র বিন্দুতে সন্নিহিত হয়, সেই বিন্দু জপ।

কেউ না কেউ এখানে সিদ্ধিলাভ করেন তো?

করেন বইকি বাবা। নিশ্চয়ই করেন। অতীতে কত সাধক করেছেন, ভবিষ্যতে কত সাধক করবেন। তবে আমার অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি—সিদ্ধি তো চোখে দেখা যায় না, চোখে দেখা যায় সিদ্ধাই! এই শ্মশানের ধারে জীবন কাটিয়ে সিদ্ধাই দেখে দেখে চোখ পচে গেছে বাবা!

ঘোষাল মনের কথা আর চাপতে পারলেন না। ভক্তিগদগদ কণ্ঠে কাশীনাথের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে বললেন—যা হোক, ঐ যে কী বলে—ঐ বীরাচারী সাধনার পথটা একটু বাতলে দিতে পারেন বাবা?

কাশীনাথ হেসে বললেন, এও আমি অনেক দেখেছি। এই তারাপীঠে এলেই বহু সংসারী লোকের মাথায় সাধনার ভূত চাপে। সাধনপথ গুরুই বলতে পারেন, আমি তো গুরু নই। গুরু যদি পান, তাহলে সাধনার ঠিকানাও পাবেন। তবে তারাপীঠে বসে

এ সব কথা যখন হচ্ছে তখন কুলার্ণব তন্ত্রের একটি সাবধানবাণী বলে দিই—মদ্যপান করলেই সিদ্ধি হয় না, মাংস ভক্ষণ করলেই পুণ্যগতি হয় না, আর স্ত্রী-সম্ভোগ করলেই মোক্ষ হয় না।

ঘোষাল মশাইয়ের মনটা কোন্ দোলায় দুলছে তা বুঝতে আমার বাকি নেই। আমি একটু চতুর হাসি হেসে তাঁকে বললাম —আমাকে যদি গুরু করেন দাদা, তা হলে একটি মন্ত্রে আপনার মনস্কামনা আমি সিদ্ধ করে দেব। শুনবেন সে মন্ত্র? ভৈরব-তন্ত্রের একটি মাত্র মোক্ষম লাইন—মদিরায়াং মৈথুনে চ জাতিবুদ্ধিং ন চাচরেৎ।

হো-হো করে হেসে উঠেই নিজেকে সংবরণ করলেন বৃদ্ধ কাশীনাথ। বললেন—এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ভালো নয় বাবা। যাও বরং বেলাবেলি শ্মশানটা ঘুরে দেখে এসো।

॥ ৬ ॥

তারাপীঠ মহাশ্মশান। মহা ইঙ্গিতময় মহা বীভৎসতার লীলাভূমি। যে ভীতিশঙ্কিত, এ স্থান তার জন্য নয়—এ স্থান বীরাচারীর বিহারক্ষেত্র। দ্বারকা নদীর তীরে প্রায় এক মাইলের অধিক দৈর্ঘ্য জুড়ে এই শ্মশান বিস্তৃত। শুধু শ্মশান নয়, গভীর অরণ্য। পায়ের নিচে রাঢ়ের শুষ্ক রুক্ষ ভূমি, মাথার উপর উচ্চ উচ্চ গাছের ঘন শাখা বিস্তারের জটিলতা। শাল, মহুয়া, নিম, বাবলা, কেন্দ, পিটুলি, শ্যাওড়া ও বুনো জামের জড়াজড়ি। কাক চিল শকুন ও পেঁচকের আবাস। দিনের বেলাতেও আধো অন্ধকার। দুপুর বেলাতেও গা ছমছম করে।

গ্রামগ্রামান্ত থেকে সৎকারার্থে মৃতদেহ আসে দ্বারকা-তীরবর্তী এই মহাশ্মশানে। দিনের বেলা এলে শব-যাত্রীরা মৃতদেহের মুখাগ্নিটুকু অন্তত করে, রাত্রির শব-বাহকরা শবকে কোনোরকমে মাটি চাপা দিয়ে সরে পড়ে। সেই সমস্ত নাতিদগ্ধ শবের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে সারা শ্মশান জুড়ে শিবা-শ্বাপদরা যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার উপর ঘুরছে বায়স আর গৃধ্রের পাল। শ্মশানযাত্রীরা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শবের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাকেরা তাদের তীক্ষ্ম ঠোঁট ঠুকরে চোখগুলো খুবলে নেয়। কুকুর-শিয়ালে দেহ থেকে মাংস টেনে টেনে ছেঁড়ে। শকুনরা মহানন্দে খায় নাড়িভুঁড়ি। শেষ পর্যন্ত শুধু মুণ্ড আর কঙ্কালটা পড়ে থাকে মাটিতে। কত শত শত বছর ধরে কত সহস্র সহস্র মড়া এই শ্মশানে এসেছে, ঠিক এমনিভাবেই গতি হয়েছে তাদের।

যেখানে সেখানে কালিমাখা চিতা, যেখানে সেখানে শব পোঁতার গর্ত। গর্তের ফাঁকে ফাঁকে পড়ে আছে কঙ্কাল, সর্বত্র ছিটিয়ে আছে হাত পা আর পাঁজরের অসংখ্য লম্বা লম্বা হাড়, পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে নরমুণ্ড। কোথাও আধ-খাওয়া একটা দেহ নিয়ে খেচর ভূচর চণ্ডাল দলের মারামারি।

এই শ্মশান ভূ-ভারতের তান্ত্রিকদের বড়ো প্রিয়। তান্ত্রিকই বলো আর কাপালিকই বলো, বেতাল-সিদ্ধই বলো আর পিশাচ-সিদ্ধই বলো—এমনি কেউ-না-কেউ মানুষ অন্তত দু-চারজন প্রতিদিন রাতেই এই শ্মশানে আছে। তাদের শীর্ণ উলঙ্গ দেহ, মাথাভরা জটা আর মুখভরা দাড়ি-গোঁফ আর বিঘূর্ণিত রক্ত-চক্ষু। কেউ মড়ার মাথার বৃত্ত সাজিয়ে তার মাঝখানে চোখ বুজে বসে আছে। কেউ কাদামাটির দেয়ালে নরমুণ্ড গেঁথে সেই নরমুণ্ডের কুটিরে বসে জড়িত বিকৃত কণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় বকছে। তাদের কোনো আভরণ নেই, কোনো আয়োজন নেই, কোনো পুজো নেই। তাদের দেশ নেই, পরিচয় নেই, হয়তো ভাষাও নেই। অন্তত অপরিচিত কৌতূহলীর প্রতি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কী খেয়ে তারা বাঁচে জানি নে, কোন্ সাধনা তারা করে জানি নে, তাদের রক্তবর্ণ নেশাগ্রস্ত ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে কোন্ দিগন্তের অন্বেষণ, তাও বুঝিনে। জানিনে, নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলে কিনা। জানিনে লোকচক্ষুর অগোচরে কোন্ অনুষ্ঠান তারা পালন করে—কোন্ চক্রে তারা বসে সুগভীর মধ্যযামে! বামাক্ষেপা না হলেও তারাও ক্ষেপা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে কিছুটা ভয়ে ভয়ে নূতন সঙ্গী ঘোষাল মশাইকে সঙ্গে নিয়ে শ্মশানে ঢুকলাম। তাজ্জব হ'তে দেরি হলো না। আজকের এই মহা মেলা এই ঘোরা বিভীষণা শ্মশানভূমিরও ভোল পালটেছে। সেই সব ক্ষেপার দল উধাও, সেই নরমুণ্ড নির্মিত কুটিরের চিহ্ন মাত্র নেই। কিছু কিছু সাধু এসেছে বটে—কিন্তু এঁরা একেবারে নির্জলা মেলা-মার্কা সাধু। তা তাঁদের পোশাকে পরিচ্ছদে আয়োজনে আড়ম্বরেই বোঝা যায়। দিব্যি গৈরিক বা রক্তাম্বর পরনে, গলায় সরু মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে বিভূতি, কারুর আবার হাতে ত্রিশূল। কেউ আবার সযত্নে গোটা কতক মড়ার খুলি যোগাড় করে বেশ সাজিয়ে বসেছে—চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বকছে আর মাঝে মাঝে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। একজন বেশ শাঁসালো মেক্-আপ তো করেছেই, তার উপর আবার সামনে একটা বাঁশের খুঁটিতে মা-কালীর একটা পট ঝুলিয়ে সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তারস্বরে শংকটা-স্তোত্র আওড়াচ্ছে!

কয়েক বছর আগে এক ঘোর অমাবস্যায় এই তারাপীঠ মহাশ্মশানে তান্ত্রিকদের গোপন চক্র দেখতে এসেছিল এক তন্ত্রাভিলাষী। এক পলক কী দেখেছিল তা সেই জানে, কিন্তু মুহূর্ত পরে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল এই শ্মশান ছেড়ে। আজ কিন্তু অমাবস্যা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার, ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু একটু পরেই শারদ-শশীর রুপোলী রশ্মিতে সারা ভুবন আলো হয়ে উঠবে। আজ সারা শ্মশান জুড়ে চক্রের অবধি নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে চক্র—দিন-দুপুর থেকেই শুরু হয়েছে চক্রসাধন। নদীর ধার থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত অরণ্যভূমির সমস্ত অলিগলি জুড়ে গাছের ছায়ায় ঘাস-পাতার আসনে গোল হয়ে বসে গেছে চক্রের পর চক্র। ছেলের সঙ্গে বুড়ো, কচির সঙ্গে ধাগী, কোথাও কোথাও মদ্দার সঙ্গে মাদী। মাঝখানে দিশী চোলাইয়ের বোতল আর বেগুনেভাজা আর ছোলা সেদ্ধ, নুন আর কাঁচা লঙ্কা। সারা শ্মশান জুড়ে অসংখ্য মদ্যপায়ী। কেউ খাড়া বসে আছে, কেউ গড়িয়েছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে, কেউ পড়েছে লুটিয়ে। তাই বলে এ স্থান মদের আড্ডা নয় —এখানকার সব মদই যে মায়ের পায়ে উৎসর্গ করা কারণ। তারাপীঠের এই শ্মশানে কারণ পান নিশ্চয়ই মহাপুণ্য, মাতৃপুজোর অঙ্গবিশেষ। শাস্ত্রে বলেছে—এই কারণ পান করতে করতে উলটে পড়বে, আবার উঠে পান করবে, আবার পড়বে, পান করতে করতে আর পড়তে উঠতে উঠতে পড়তে শেষ পড়া যখন পড়বে তারপর পুনর্জন্ম ন ভবেৎ।

সন্ধ্যা নামছে, ছায়া ঘনাচ্ছে, জমায়েত হচ্ছে অন্ধকার কারণ-পায়ীদের জটলা ঘিরে ঘিরে। এতক্ষণে গা সিরসির করতে শুরু করেছে, ঘেঁষাঘেঁষি করে পাশাপাশি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি আর ঘোষাল মশাই। পায়ের তলার
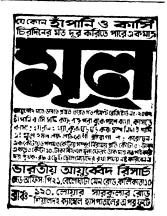
মাটি দেখা যায় না. মানুষের হাড় মাড়িয়ে চলেছি, ঠোক্কর লাগছে নরমুণ্ডে। ভয়ের ঠাণ্ডাটা আয়েশ করে বুকের মধ্যে অনুভব করবার জন্যই বুঝি আড়াআড়ি আর লম্বা-লম্বি শ্মশান মাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। এ এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগৎ—এ জগতের কোনো তুলনা নেই, কোনো উপমা নেই। এই অন্ধকার জগতে যারা বিরাজ করছে, তারা সংসারকে ভুলেছে, সমাজকে ভুলেছে। আইন তাদের স্পর্শ করে না, নীতি-দুর্নীতির ভেদাভেদ তাদের জন্যে নয়। পাপী আর পুণ্যাত্মা, চোর জুয়াচোর, ভণ্ড আর সাধু সজ্জন ভক্ত, বিজ্ঞ আর বাতুল, সংসারী আর বৈরাগী সবাই মিলেছে এই মহাশ্মশানে, সবাই বসেছে এই কারণ-চক্রে।

হঠাৎ দূরে নদীর কাছাকাছি একটি আলোকের শিখা চোখে পড়ল। ঘোষালের হাতটা চেপে ধরে সেই আলোক লক্ষ্য করে এগোলাম। এদিকটা অনেক ফাঁকা, বন্য-গুল্ম নেই বললেই হয়, জনবিরল, শুধু চিতা আর কবরের ভিড়। মড়ার হাড় মড়মড় করতে লাগল পায়ের নিচে।

ডাই করা মড়ার খুলি। সেই খুলির পাহাড়ের উপর একটি প্রদীপ। কে যেন বসে আছে প্রদীপের সামনে। পায়ে পায়ে আরো এগোলাম।

শকুন একটা কাঁদছে। দুটো বাঘা কুকুর একটা আধ-খাওয়া মড়া নিয়ে চিৎকার করে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করেছে। মোটা একটা গুঁড়ির নিচে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে দুটো মানুষ। প্রদীপের যেটুকু আলো এসে পড়েছে তাতে চিনবার উপায় নেই, মেয়ে-মদ্দা হতে পারে। পায়ের শব্দে কোনো হুঁশ নেই।

পাশ কাটিয়ে প্রদীপের কাছে এগোলাম। কে ওখানে বসে একলা? কী করছে প্রদীপ জেলে? তান্ত্রিক না কাপালিক?

প্রদীপের আলোটা মুখে এসে পড়েছে। বড়ো বড়ো চুল ঘাড় ছড়ানো, গালে দাড়িও বেশ ঝোপজঙ্গল সৃষ্টি করেছে। উলঙ্গ দেহ। কোথাও লেংটি একটা হয়তো আছে, আসন করে বসে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। চোখ দুটো বন্ধ।

আরো কাছে এগোলাম। ডান হাত দিয়ে খুলিটা ঠোঁটের কাছে তুলল। পান করল এক চুমুক। চোখে চোখ পড়ল। ভাষাহীন বাতুলের চোখ। সে চোখ দিয়ে আমাকে চিনতে পারবে কেমন করে?

কিন্তু আমি চিনেছি। ও আমার অজানা নয়। সারাদিন মেলার পথে পথে ওকে খুঁজেছি, মনে মনে ভেবেছি হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়।

ও সেই রামপুরহাটের ছাত্র শচী। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। নলহাটিতে একটি বেলার আলাপেই বড়ো ভালো লেগেছিল যাকে।

সেই ভাবে-ভোলা মা পাগল ছেলে শচী। তারাপীঠে এসে শচীক্ষেপা হয়েছে।
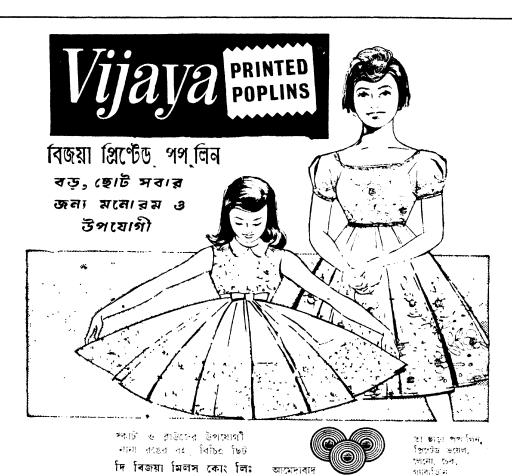
বাদামের উপকারিতা

ইংরাজীতে উন্মাদের মতো আচরণকে বলা হয় 'গোইং নাটস্' কিন্তু 'নাট' অর্থে বাদাম ধরলে প্রবচনটির উৎপত্তির সূত্রটি জানা যায় না। তবে বাদামের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতার কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

বিভিন্ন পঞ্চাশ রকমের বাদাম আছে যা গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহের লক্ষ লক্ষ লোকের দেহপুষ্টির প্রধান খাদ্যের স্থান পূরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও গত যুদ্ধের পর থেকে বাদামের ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রাজিল বাদামের কথা উল্লেখ করা যায়। এই বাদাম ইউরোপে প্রথম রপ্তানি হয় ১৬৩৩ সালে। গত যুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকা হঠাৎ এই বাদামটি 'আবিষ্কার' করে এবং এখন আমেরিকার লোকে ব্রাজিলের মোট উৎপাদনের অর্ধেক কিনে নেয়। চীনা বাদাম বা মাঠকড়াইও আমেরিকায় প্রভূত জনপ্রিয়।

আমেরিকার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ও তাঁর সহযোগীরা মিলে চীনা বাদাম থেকে তিন হাজার রকমের উপকরণ প্রস্তুতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারতে এক কোটি একর জমিতে বাদামের চাষ হয় এবং আমেরিকায় হয় পঞ্চাশ লক্ষ একর জমিতে।

আমেরিকা এবং ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয় একটি বাদাম হচ্ছে 'cashew' যা পর্তুগীজ শব্দের অনুসরণে ভারতে 'cajut' বা কাজু বাদাম নামে পরিচিত।

যুদ্ধের আগে ভারতই ছিল কাজু বাদামের সবচেয়ে বড় রপ্তানি স্থান। আমেরিকায় পাঠানো হতো বছরে সাত হাজার টন এবং বৃটেনে এক হাজার টন।

আলজিরিয়া ও মরক্কোতে ওক গাছের ফল সিদ্ধ অথবা মরা-আঁচে সেঁকে নেওয়া হয়, তুরস্কে মাটিতে পুঁতে রেখে, পরে ধুয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে শুকোতে দেওয়া হয়। তার পর তার সঙ্গে চিনি ও মসলা যোগ করে এক ধরনের সুস্বাদু মিঠাই তৈরী হয়।

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কতক রেড ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ওক ফল গুঁড়ো করা ময়দায় চমৎকার রুটি ও কেক তৈরি করে। এই ময়দা এমন পুষ্টিকর যে, গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনে খাদ্যের চরম অনটন আশঙ্কায় খাদ্য-মন্ত্রী এটির ব্যাপক ব্যবহারের এক পরিকল্পনা করেছিলেন।

সাধারণত বাদামকে মাংসের একটা উত্তম বিকল্প বলে গ্রাহ্য করা হয় না। তার কারণ আগেকার দিনের পথ্যবিদরা বলতেন বাদামে যে প্রোটিন আছে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর।

কিন্তু গত যুদ্ধের আমল থেকে খাদ্য ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীরই একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরী সি শেরম্যান প্রমাণ দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে ব্রাজিল বাদাম ও চীনা বাদামে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বিদ্যমান।

পাশ্চাত্যের গৃহকর্ত্রীরা বাদামে প্রোটিন বেশী কি কম, অথবা কোন্ শ্রেণীর তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামায় না, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার বাদামের ব্যবহার প্রভূত মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে। বাদাম পিষে তা থেকে মার্গারিন বা বনস্পতি তেল যা নিষ্কাশিত হয়, রান্নার কাজে তার প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। চর্বির চেয়ে সস্তা বলে আইস-ক্রীম, চকোলেট, কোকো, কেক প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়। সুন্দর মাখনও তৈরি হয় এ থেকে।

দুর্গন্ধবিহীন মাছের কারখানা

ব্রেমেনের হাইন্‌ৎস্ ডফেন্‌স্পেক একজন উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার। তিনি জার্মানী এবং বহু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাছের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় অসংখ্য কারখানা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। বিদেশে, বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবস্থানের সময় ডফেন্‌স্পেক একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর পক্ষে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলি এমন ধরনের মাছের কারখানা স্থাপন করতে চায়, যে সব কারখানায় অতি অল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব অধিক ভাইটামিন ও প্রোটিনযুক্ত মাছে চর্বি ও তেল সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইঞ্জিনীয়ার ডফেন্‌স্পেক অবশ্য নিজেই কারখানার

স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর কেবল সেইসব খাদ্যসামগ্রীর প্রথম দোকান বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হয় পঁচাত্তর বৎসর আগে। আজ এই 'হেলথ শপ'-এর সংখ্যা যেমন বহু হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি খরিদ্দারের সংখ্যাও। এইসব দোকানে যেসব সেলসওমান কাজ করে তাদের শিক্ষা দেবার একমাত্র স্কুলটি অবস্থিত পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত হমবুর্গের নিকটবর্তী ওয়াল্ডর্টডটেন। এখানে শিক্ষাসূচীর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি, নিরোগ জীবন, প্রাকৃতিক ব্যবস্থা নিরাময় ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য। ছবিতে মধ্যের মহিলা কনিপ পদ্ধতিতে দেহের রক্তচলাচলকে সুস্থ করে নিচ্ছে। রেভারেণ্ড সেবাস্টিয়ান কনিপের (১৮২১--১৮৯৭) নামে প্রচলিত এই পদ্ধতিটি মুখ্যত হচ্ছে ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে দেহের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দহন প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতি করা এবং দেহে সঞ্চিত আবর্জনাকে দ্রুত বিনষ্ট করা। বাঁদিকে তরুণীকে দেখা যাচ্ছে কাদার আবরণে আচ্ছাদিত অবস্থায়—এর দ্বারা গাত্রত্বক সুপুষ্ট হয়। সামনে রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ সামগ্রী সমন্বিত খাদ্যবস্তু যা 'হেলথ শপ'গুলিতে বিক্রী করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম এবং স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি সাধারণত ইউরোপ অথবা আমেরিকা থেকে কারখানার সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। কিন্তু এশিয়ার বিশেষ কারখানাগুলির জন্য যে ধরনের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সে সব ইউরোপ ও আমেরিকায় খুঁজে না পাওয়ায় অগত্যা তাঁকেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের নকশা প্রভৃতি করতে হয়। এই ঘটনার পর হাইন্‌ৎস ওফেন্‌সপেক স্নেহ-রসায়ন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবের মতে তিনি স্নেহ রসায়ন সংক্রান্ত বই পুস্তকের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যান। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁর গবেষণাগার প্রয়োজনীয় বইপত্র আর তাঁর পরিকল্পনার নানারকম নকশায় ভরে ওঠে। নতুন কারখানার কার্য প্রণালী সম্পর্কেও তিনি একটি বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। মাছের সাধারণ কারখানায় প্রধানত বায়বহুল পদ্ধতিতে মাছ ও মাছের অবশিষ্টাংশ রন্ধন করা হয়।

ড'ফেন্‌স্‌পেক এই সব পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে ইলেকট্রনের আঘাতের সাহায্যে মাছ থেকে অনায়াসে তেল ও প্রোটিন সংগ্রহ করা সম্ভব। ইঞ্জিনিয়ার ড'ফেন্‌স্‌পেক তাঁর আদর্শ কারখানায় এই নতুন পদ্ধতির কার্যকারিতা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন।

তিনি এ কথা বেশ ভালো করেই প্রমাণ করেন যে, মাছের কারখানায় মাছ রন্ধনের কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়ার ফলে কারখানা এলাকার বায়ু আর দূষিত হবে না এবং মানুষ অসহ্য দুর্গন্ধের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সত্যি কথা বলতে কি, ড'ফেন্‌স্‌পেকের এই আবিষ্কার সারা দুনিয়ার অসংখ্য মৎস্য-কারখানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাছের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য এইসব কারখানা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। যদিও মাছের কারখানাগুলি নদী বা সমুদ্রের তীরে এবং মাছের বন্দরের অতি নিকটে অবস্থিত, তবুও মাছের দুর্গন্ধ পার্শ্ববর্তী শহরের আবহাওয়া অনায়াসে দূষিত করে ফেলে। বিশেষ করে গ্রীষ্ম-কালে এই সব শহরে বাস করা দায় হয়ে পড়ে। সাধারণ দুর্গন্ধ দূরীকরণ পদ্ধতি বড়ো একটা কার্যকরী হয় না। তাই সবাই আজ সাহায্যের জন্য অনেক আশা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হাইন্‌ৎস্‌ ড'ফেন্‌স্‌পেকের দিকে তাকিয়ে আছে।

ড'ফেন্‌স্‌পেক ইতিমধ্যেই তাঁর ব্রেমেন বন্দরের গবেষণাগারে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করেছেন এবং গবেষণাগারটি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রেমেনের সেনেট তাঁর গবেষণার সাফল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সেনেটের কাছ থেকে এক বিশেষ নির্দেশ পেয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, ১৯৬২ সালের প্রথম দিকেই ড'ফেন্‌স্‌পেকের নয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত মাছের কারখানায় কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। এই কারখানার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ যথেষ্ট আশাবাদী। ড'ফেন্‌স্‌-পেকের মতো তাঁরাও মনে করেন যে, এই নয়া পদ্ধতি সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। কারণ, মাছের কারখানার নিকটে যে-সব মানুষ বসবাস করে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সে সব মানুষকে আর মাছের দুর্গন্ধ সহ্য করতে হবে না। তাছাড়া এই পদ্ধতির আর্থিক দিকটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড'ফেন্‌স্‌পেকের পরিকল্পনা অনুসারে মাছের কারখানা নির্মাণ করতে মোটেই খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না। নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হলে পুরাতন কারখানা যে একেবারে বাতিল করে দিতে হবে, তা নয়। পুরাতন কারখানা থেকে শুধুমাত্র উত্তাপ সঞ্চারকারী যন্ত্রটি সরিয়ে ফেলতে হবে।

দুনিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে ড'ফেন্‌স্‌পেকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক মাছের কারখানা স্থাপনের গুরুত্ব সত্যিই অসামান্য। কারণ, এই সব দেশ রন্ধন ও পেষণ পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে মাছ থেকে তেল ও প্রোটিন সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক।

মূল্যবান হস্তলিপি

এ বছরের শরৎকালে পশ্চিম জার্মানীর এক স্বলেখনালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রায় ১২০০ শিরোনামায় হস্তলিপি-নিলাম এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে এত বড়ো হস্তলিপি-নিলাম আর অনুষ্ঠিত হয়নি। এই নিলাম উপলক্ষে, জার্মানী, সুইজার-ল্যান্ড, ইটালী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বহু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লানের তীরবর্তী মারবুর্গে আসেন।

প্রথম দিন শুধু সংগীত ও বিজ্ঞান-বিভাগে ১৯৬০ সালে পরলোকগত সুইজার-ল্যান্ডের বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট আম্মানের বিশ্ববিখ্যাত হস্তলিপি-সংগ্রহের নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ খ্যাতনামা সুরকারগণের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ও চিঠি বেশ চড়া দামে বিক্রয় করেন। এই নিলামে কোনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই স্বাভাবিক মূল্য দিয়ে কোন হস্তলিপিই ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। এটা সত্যিই একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য বস্তুর নিলাম-অনুষ্ঠানে অনেক বছর থেকে এমনটি আর দেখতে পাওয়া যায়নি।

তবে লুডবিগ ফান বেথোফেনের স্বহস্ত লিখিত দুই পৃষ্ঠার এক সংগীত পাণ্ডুলিপি একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে। প্রথমে এই পাণ্ডুলিপির মূল্য ১২ হাজার মার্ক স্থির হয়। কিন্তু শেষে জার্মানীর জনৈক ব্যবসায়ী ৪২ হাজার মার্ক দিয়ে বেথোফেনের এই স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি ক্রয় করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর কোনো হস্তলিপিই আর এতো অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়নি।

জার্মানীর কৃতী সন্তান ইয়োহান জেবাস্টিয়ান বাখের একটি পত্রও নিলামে বিক্রয় করা হয় এবং জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ী ৩৫০০০ মার্ক দিয়ে এই হস্তলিপিটি ক্রয় করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বাখ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়োহান এলিয়াস বাখের কাছে এই পত্র লেখেন। জার্মানীর এই অমর সুরকারের আর একটি পত্রের জন্য জনৈক জার্মান চারুশিল্প ব্যবসায়ীকে ২৬০০০ মার্ক মূল্য দিতে হয়।

অন্যান্য সংগীত স্বলেখনের মধ্যে মোৎ-সার্টের একটি বিখ্যাত পিয়ানো-সোনাটা ও ইয়োসেফ হাইড্‌ন্‌-এর একটি অজ্ঞাত পিয়ানো-সোনাটার পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ প্রয়োজন। জনৈক ইংরেজ চারুশিল্প ব্যবসায়ী যথাক্রমে ২৭০০০ ও ২০০০০ মার্ক দিয়ে এই পাণ্ডুলিপি দুটো ক্রয় করেন। তা ছাড়া ব্যারন-পত্নী বাল্ড স্টেটেনের কাছে লেখা মোৎসার্টের একটি পত্র (১৮০০০ মার্ক) ও ফ্রান্‌ৎস শুবার্টের দুটো স্বহস্ত-লিখিত সংগীত-পাণ্ডুলিপিও (একত্রে ২৪৫০০ মার্ক) মারবুর্গের এই নিলাম-অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্যের পরিমাণ ৪০৫০০ মার্ক এবং আধুনিক জ্ঞান-তত্ত্বের জনক দেকার্তের ছয় পৃষ্ঠার এক চিঠি এই মূল্যে বিক্রয় হয়। প্যারিসের একজন প্রাচীন-বস্তু বিক্রেতা ২২০০০ মার্ক দিয়ে ইগনাটিউস ফন লয়োলার একটি পত্র ক্রয় করেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে বার্সেলোনা মঠের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে তিনি এই পত্র লেখেন। মার্টিন লুথারের দুটি পত্রও নিলামে বিক্রয় হয় এবং বেলিনের জনৈক ব্যবসায়ী পত্রটির জন্য ১১ হাজার মার্ক মূল্য দেন। মার্টিন লুথার তাঁর এক বন্ধুর কাছে এই পত্র লেখেন এবং পত্রে তিনি তাঁর বন্ধুকে মঠ থেকে পলাতকা কাথারিনা ফন বোরাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানান।

দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য বিভাগের নিলামেও অনেক হস্তলিপি বিক্রয় হয়। এগুলোর মধ্যে হাইনরিস হাইনের কবিতার বই "নতুন প্রেম"-এর মূল রচনা (৪৭৫০ মার্ক), মরিকের কবিতা "মালী" ও "ঐশ্বরিক পূর্ব-স্মৃতি"-র লিখিত কপি (৩০০০ মার্ক) এবং খৃষ্টিয়ান গটফ্রীড করনার ও প্রকাশক ইয়োআখিম গ্যশেনের কাছে লেখা শিলারের দুটো পত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্র দুটো যথাক্রমে ৪৫০০ মার্ক ও ৪৩০০ মার্ক মূল্যে বিক্রয় হয়।

বিজ্ঞান বিভাগে শোপেনহাওয়ারের কয়েকটি পত্র (২৫০০ মার্ক) উপস্থিত নারী-পুরুষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা ছাড়া বান্ধবী লুইজে ওটের কাছে লেখা ফ্রীড্‌রিস নীটশের সাতটি পত্র (৪২০০ মার্ক) ও হেগেলের একটি বিখ্যাত দার্শনিক রচনার কিছু কিছু অংশও মারবুর্গের এই হস্তলিপি-নিলামে বিক্রয় করা হয়।

কাঁচালঙ্কা ও বাঙালী সমাজ

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী সান্যাল বাজারের থোলা থেকে জিনিসপত্র নামাবার আগেই টেলিফোনের দিকে ধাবিত হলেন। সেভেন সিক্স ফোর এইট ফোর। এই যে অণু, এইমাত্র দেখে এলাম আই জি এ-তে কাঁচালঙ্কা এসেছে। ও মা, জানি না তো? আজই এসেছে বলল। তাড়াতাড়ি যাও, দেরি হলে আর পাচ্ছ না। থ্যাংকস দিদি। ইউ আর ওয়েলকাম।

সত্যি ঘটনা কখনো কখনো গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। মিসেস দত্ত অতঃপর কোট হাতে গাড়ির দিকে ছুটলেন। ইতিমধ্যেই টেলিফোনযোগে বাড়ি বাড়ি এই বার্তা রটি গেল ক্রমে। আই জি এ-তে কাঁচালঙ্কা, আই জি এ-তে কাঁচালঙ্কা। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে ফ্লোরিডা থেকে আমও চালান এসে থাকে বটে, কিন্তু মধ্যপশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের এই শহরের ভারতীয় জনসমাজের চাহিদা এত অল্পে মেটে না। সুতরাং ট্রাক থেকে নামতে না নামতেই আদা অদৃশ্য, কাঁচালঙ্কার কাউন্টার শূন্য, পটলবর্জিত, ভালেরাও ও থোলান গৃহিণীরা দোকান উজাড় করে তৈলাগাড়ি ভর্তি করেছেন। ভগ্নমনোরথ মিসেস দত্ত অগত্যা বাড়ি ফিরলেন। ইতিমধ্যে বারোটা কখন বেজে গেছে। লাঞ্চটাইম। গৃহকর্তা ফিরে এসে দেখেন দুই পুত্র টেলিভিশনের কলকব্জা নিয়ে নানাপ্রকার কারিকুরি করতে ব্যস্ত, রান্নাঘরের দিক থেকে সন্দেহজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। গৃহিণী অবশ্য তিনশো পঞ্চাশে পর্কচপ চড়িয়ে প্রায়ই প্রতিবেশিনীদের বাড়ি কফি খেতে গিয়ে থাকেন। দত্ত সাহেব দার্শনিক লোক, সপ্তাহে চার দিন স্যান্ডউইচ বা হট ডগে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছেন।

কিন্তু কাঁচালঙ্কা তো নিমিত্ত মাত্র। বিদেশে বাঙালী বহু বিঘ্নবিপদ দুঃখদহনের সম্মুখীন হয়েছে কেবলমাত্র ভোজন-বিলাসের জন্য। একে ভোজনরসিকতা নাম দিলেও অত্যুক্তি করা হবে না। সুমেরু থেকে কুমেরু, কার্যব্যপদেশে যেখানেই বঙ্গবাসী প্রবাসী হয়েছেন সেখানেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ফোড়নের চমৎকারিত্ব অন্যে উপলব্ধি করতে অক্ষম, দেওয়ালে রান্নার চিহ্ন আবিষ্কার করে বাড়িওয়ালী ক্রোধে অগ্নিশর্মা। অদৃষ্টদোষে যদি বাড়ি ছাড়তে হয় তাতে ক্ষোভ নেই, নিগ্রো পল্লী

থ্যাংক্‌স্ দিদি!

তো সব সময়েই আছে। কিন্তু তাই বলে মাছের ঝোল আর চচ্চড়ি খাওয়া ছেড়ে দেব বাঙালী হয়ে? নৈব নৈব চ। বাঁড়ুয্যে মশায় রাত্রে স্বপ্ন দেখেন কলাই-এর ডাল, আলু-পোস্ত আর কুলের অম্বলের। গৃহিণী যস্মিন দেশে যদাচারে বিশ্বাসী সুতরাং বার্ষিক আট হাজার ডলার সত্ত্বেও বাঁড়ুয্যে মশায়ের মনে সুখ নেই। কি হবে রেফ্রিজারেটর আর গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন আর টেলিভিশনে? ডলারের বিনিময়ে বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, কড়াপাকের সন্দেশ? গুরুদেব রক্ষা করুন।

কোনো কোনো জাতির ব্যক্তিত্ব তার আচার-ব্যবহারে প্রকট, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য তার আহারপ্রিয়তায়। আলী সাহেব কি উপায়ে টিনের প্যাক রসগোল্লা দিয়ে কাস্টমস-রূপী শত্রু দমন করেছিলেন রসসাহিত্যে তার উল্লেখ আছে। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রতি বিলাসপুরের শ্রীমতী ঘোষকে শিকাগো এয়ারপোর্টে বিষম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মূল্যবান বেনারসী শাড়ির ভাঁজের মধ্য থেকে প্যাকেটবন্ধ সাদা কালো বিচি বেরোতে দেখে কর্তৃপক্ষের তো চক্ষুস্থির। নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য মনে করে তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন আর শ্রীমতী ঘোষ ওয়ার্ডবুকের সমস্ত ভুলে যাওয়া শব্দ একত্র করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই অর্ধ-সভ্যদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে, এগুলো কালোজিরে আর কাটা সুপুরি—জীবনধারণের অপরিহার্য উপকরণ।

বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে। কিন্তু অনেক বিষয়ে এখনো বিস্তৃততর গবেষণার প্রয়োজন আছে। জীনিয়াস ও ক্ষয়রোগের মত ভোজনরসিকতা ও আর্ট অংগাংগিভাবে জড়িত কিনা সে সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারেন এমন যোগ্য ব্যক্তি আমাদের রংগভরা বঙ্গদেশে নিশ্চয় যথেষ্ট আছেন। আমাদের জাতীয়তা-বোধ, পরশ্রীকাতরতা, মানসিক উৎকর্ষ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি দোষগুণে কিভাবে মুড়িঘণ্ট, বাটিচচ্চড়ি ও আলুপোস্তর সঙ্গে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে তার পুনরুদ্ঘাটনের ইতিহাস হবে এক অনগ্রসর জাতির সভ্যতায় উপনীত হবার অবতরণিকা। বাঙালীর সামাজিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রকার চিন্তাধারার অবচেতনে এই অতি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ বর্তমান। কেবলমাত্র সমাজচেতনাই যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তার মূলে

এই অর্ধসভ্যদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে...

নেই তাও প্রমাণ করা যে কোনো সাহসী ব্যক্তির পক্ষে বোধ করি দুঃসাধ্য হবে না।

সময়ের অকুলানবশত আজকাল জীবনের নানা ক্ষেত্রে বহুবিধ সময় সংক্ষেপকারী উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। মার্কিন দেশের বিজ্ঞানবুদ্ধি এই দিকে নিয়োজিত হয়ে মেয়েদের রন্ধনগৃহের অধীনতাপাশ থেকে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছে। এক মিনিটে চা, আধ মিনিটে কফি, এক লহমায় কেক, তিন সেকেন্ডে পুডিং প্রভৃতি পূর্বপক্ক আহার্যের ভিড়ে সময় অনেক বেঁচে যাচ্ছে বটে কিন্তু কিছু কিছু দিক থেকে বিলাপের সুরও ধ্বনিত হচ্ছে যে, এর ফলে মার্কিন মেয়েরা রান্নাঘরে সৃষ্টিকার্যের মত পুণ্যকর্ম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মেয়েরা স্বভাবতই প্রিয়জনকে রান্না করে খাওয়াতে চান। বৈদ্যুতিক উপায়ে টিন কেটে গরম করার মধ্যে সুবিধে যতই থাক, রন্ধনকৌশল দেখাবার তেমন সুযোগ নেই, এতে আধুনিক হলেও গৃহকর্ত্রীর মন খুঁতখুঁত করা স্বাভাবিক। এই আদিম ও অকৃত্রিম মানসিক অবস্থার গুরুত্ব অবলোকন করে মার্কিন শিল্পপতিরা এক নতুন পদ্ধতিতে সমস্যার মীমাংসা ও তৎসংগে ব্যবসায় লাভবান হবার চেষ্টা করলেন। ফল হল অচিন্তনীয়। এতদিন এক সেকেন্ডের কেকের প্যাকেট খুলে কেবল জল মিশিয়ে সেঁকা হলেই কেক প্রস্তুত হচ্ছিল, এখন এর মধ্যে রান্নার জটিলতা বাড়াবার জন্যে জলের সংগে একটি ডিমের ভগ্নাংশ যোগ করার নির্দেশ দেওয়া হল। তৈরী খাবার খাওয়াচ্ছি মনে করে এতদিন যেসব মহিলারা নিরুদ্যম হয়ে ছিলেন, এবার তাঁরা মহোৎসাহে নিজে নিজে কেক তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। 'কেক-মিক্স' একাধারে সময় বাঁচিয়ে ও মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করে সমগ্র মার্কিন জাতিকে এক মহাসংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ করল।

...য় আমার ঝাল-দেওয়া সরষে-ইলিশ?
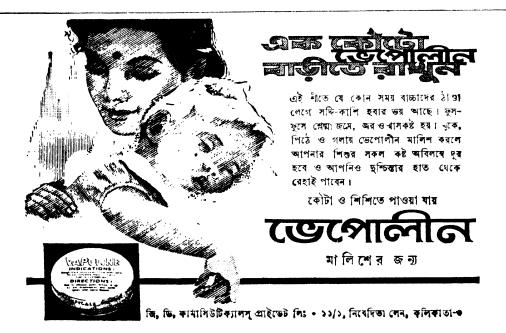
...ইরকম সব রন্ধন সমস্যা ও সমাধান ...ধ অবহিত হয়ে বঙ্গসন্তানেরা নানা- ...ব সাধু সঙ্কল্প নিয়ে দেশে ফিরে থাকেন। ... পবিত্র ভারতভূমিতে পদার্পণ করার ... সঙ্গে সেসব মহৎ উদ্দেশ্য অন্য চিন্তার ... হারিয়ে যেতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। ...ইউনিয়নগুলির কফি-কক্ষে প্রায়ই ...জাতীয় উত্তপ্ত আলোচনা শুনতে পাওয়া ... স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে এক ... সঙ্গীদের কাছে সগর্বে ঘোষণা করে... দেশে ফিরে প্রথম কাজ হবে রান্না- ...বিপ্লব বাধানো। অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ...ক বাধা দিলেন, ওহে, যেদিন রান্নাঘরে ...ব হবে সেদিন সারা ভারতবর্ষেই বিপ্লব ... মন্দ লোকে টিপ্পনী কাটলেন, খুব বড় বড় কথা বলা হচ্ছে এখন, কিন্তু ... ফিরে ইনিই প্রথমে বলবেন, কোথায় ...র চিংড়ি মাছের মালাইকারি, কই-এর ...ছ আর ঝাল দেওয়া সর্ষে-ইলিশ? ...লো কি টিন কেটে বার করা হবে? ...গত বলা যেতে পারে যে, উচ্চশিক্ষার্থ ...দের বিদেশে পাঠিয়ে পিতামাতারা ...ষ্ট হয়ে নানাবিধ সুখাদ্য খেয়ে ...তিপাত করছেন এ কথা ... নয়। বাঙালীর ভোজনরসিকতা সম্বন্ধে ...যাতে যে গুণীজনেরা বিস্তৃততর গবেষণা ...র চেষ্টা করেছেন তাঁদের থীসিসে এই সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। ...ন, প্রবাসে উপবাসে ক্লিষ্ট পুত্রের চিন্তায় ...গ্ন হয়ে এঁরা বছরে অন্তত একবার ...শূন্য টিনে ষোলোটি করে রসগোল্লা ...য়ে থাকেন। কখনো কখনো স্বাধীনতা ...র্তির পদস্পর্শ করার আগেই তারা ...রের অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অপার ...লারসও তাদের রক্ষা করতে অসমর্থ ...ছ এমনও ঘটতে দেখা গেছে। অবশ্য সেটা কচিৎ কদাচ। মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ীদের টিন-শিল্প জয়যুক্ত হোক।

আমাদের রন্ধনব্যবস্থার আশু পরিবর্তন সম্পর্কে যথোচিত মন্তব্য করার সময় এখনো হয়নি তবে সম্ভবত ভারতীয় কৃষ্টির প্রধান পরিবেশক শাড়ির মত বাঙালীর রান্নাঘরের বর্তমান ব্যবস্থার মেয়াদ এখনো অনির্দিষ্ট-কাল ধরে চলবে। চলা উচিত কি না তা নিয়ে শ্রী ও শ্রীমতি দত্তের মত তর্ক করা যেতে পারে, যদিও তা দ্বারা সমস্যার সমাধানের আশা সুদূরপরাহত। শ্রীযুক্ত দত্ত একে সমস্যা বলে মনে করেন কিন্তু যার জন্য এত দুর্ভাবনা সেই মিসেস দত্ত দিনের অর্ধেক সময় পাকশালাতে কাটাতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি বোধ করেন না। ক্রুদ্ধ দত্তসাহেব আক্ষেপ করেন, এইজন্যই তো ভারতবর্ষের এই দুর্দশা। দত্তজায়া নির্বিকার চিত্তে বলেন—বেশ, তা হলে আজ থেকে দুপুরে দুটি করে হ্যাম-বার্গার বরাদ্দ রইল, তাতে যদি ভারতবর্ষের কিছু উন্নতি হয়। এর পর থেকে দত্তসাহেব স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে মহাজনবাক্যে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন যাবতীয় সংস্কৃত আপ্তবাক্যে তাঁর প্রচণ্ড অনাস্থা সত্ত্বেও।

সম্ভবত প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীনত্বের লক্ষণই হল কূপমণ্ডূকতা। চীনারা পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েও বংশানুক্রমে নিজেদের চৈনিক ঐতিহ্য সযত্নে রক্ষা করে যাচ্ছেন। অবশ্য এ কথাও খুবই সত্য যে কোনো ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে আহারের অভ্যাস বদলানো দু-এক দিন বা মাসের কর্ম নয়। আসমুদ্র বিকশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সুপারমার্কেটে বীজাণু-মুক্ত কোমানো চিংড়ির প্যাকেটে মুড়ো দেখতে পাওয়া যাবে না, অথবা অন্য মাছের কাঁটা। ছ্যাঁচড়ার সমাদর করার মত উচ্চস্তরের সভ্যতায় এখনো বহু দুঃসাহসী জাতির হাত পৌঁছয়নি। বিদেশের অতিপরিচ্ছন্ন মুদীর দোকানে এইরকম নানা অসঙ্গতি দেখতে পেয়েই কোনো খাদ্যরসিক ব্যক্তি দেশ থেকে কিছু পায়েসের চাল এবং সর্ষের তেল আনাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তা আর আতলান্তিক পার হবার সুযোগ পায়নি।

সমস্ত বিশ্বকে শান্তির বন্ধনে বেঁধে ফেলা যায়...

আন্তর্জাতিক বোমা চোঁড়াছুঁড়ি দ্বারা সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে কিনা এক কথায় বলা কঠিন তবে চৌষট্টিকলার অন্যতম প্রধান বিদ্যা রন্ধনকলা দিয়ে যে সমস্ত বিশ্বকে শান্তির বন্ধনে বেঁধে ফেলা যায় এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। এইখানেই সভ্যতা ও বর্বরতার সুস্পষ্ট সীমারেখা। এইজন্যই অনুন্নত রাষ্ট্র ভারত-বর্ষ এখনো বহির্বিশ্বে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবশীল।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪১৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, হাতে বেশি সময় তো রাখচ না। আসবে ৭॥—৮টায় ডিনার খাবে কতক্ষণ জানিনে— তার পরে একটু নাচ-গান। এই রকম তো। পরদিন কখন দৌড় দেবে? লক্ষ্ণৌ যাওয়া তো এইখান থেকেই। বৌমা ছাপানি নিয়ে চিকিৎসা করাতে দৌড়লেন কলকাতায়। তুমিই নিয়ো কর্তৃত্বের ভার। ঘর দুয়োর অশন শয়ন তৈজসপত্রের অভাব হবে না। রবীন্দ্রনাথ ষোলো আনাই বিরাজমান থাকবেন। কচো কাচাদের মধ্যে পুপু সুনন্দা। বড়ো দরের মানুষের মধ্যে এন্ড্রুজ। হাঁক ডাকের জন্যে সুধোড়িয়া। গণিতশাস্ত্রের জন্যে কোনো জোগাড় করতে পারব না। আমি অগণিতের কারবারী। বুড়ি তার দলবল নিয়ে থাকবে মন ভোলাবার কাজে। ইতি ১৫।১।৩৮

কবি

প্রফেসর আর এ ফিশারের যাওয়া নিয়ে।

ওঁ

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

জীবন ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়,
সংসার যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয় মালা তার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২রা মাঘ, ১৩৪৪

আমার পিতৃদেবের মৃত্যু সংবাদে এই কবিতাটি লিখে কবি আমাকে পাঠিয়ে দেন।

॥ ৪১৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

পূর্ণ পরিণত জীবনের প্রায় চরম প্রান্তে মৃত্যু যখন নিশ্চিত অবধারিত, এবং যখন প্রতিমুহূর্তে জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, তখন মৃত্যুকে যিনি কখনো ভয় করেন নি, তাঁর পক্ষে মৃত্যুকে শোকাবহ বলে গণ্য করতে পারি নে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সুখদুঃখ স্নেহ প্রেমের নানা সম্বন্ধে জড়িত, বিচ্ছেদ দুঃখ তাঁদের বেদনা দেবে জানি, কিন্তু যিনি চলে গেছেন তাঁর শান্তি ও নিষ্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলে এই দুঃখকে তার তুলনায় সামান্য বলেই স্বীকার করতে হবে।

ফিশার এসেছেন। সময় ছিল সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁকে যা দেখিয়েছি, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। এন্ড্রুজকে বলেছেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে এই নাচকে এখনি ফিল্মে তুলে নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, এই জিনিসের ভিতর দিয়ে এদেশের যে পরিচয় য়ুরোপকে দেওয়া যেতে পারবে, তা খুব মূল্যবান। জেনিভা থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বলে গিয়েছেন এ জিনিসটি অতুলনীয়। কেবল একজন রোগা মতন বাঙালী দর্শক বলে গেলেন, এই রকম নাচে গানে বলহানি করচে। কন্‌গ্রেস কমিটির পরিহাসে এই জাতের দলবলের জন্যে এত আয়োজন করতে হোলো— খরচ করেচি ঢের পরিশ্রম করেচি ঢের, দুঃখ পেয়েছি কম নয়। ফিশার এই ব্যাপারটা শুনে বিস্মিত হয়েছেন। লোকটি খুবই ভালো। ইতি ১৭।১।৩৮

কবি

॥ ৪১৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার বাবার স্মরণার্থ আমি একটি চৌপদী কবিতা পাঠিয়েছিলুম, বোধ করি, যথাসময়ে সেটা পেয়েছ। আরো দু লাইন ছিল চৌপদীর সীমা বাঁচাবার জন্যে কেটে দিয়েছিলুম, তবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলুম।

দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক,
জরা আচ্ছাদন তলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক।

আজ ১১ই মাঘ। অনুষ্ঠান হবে সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে আমাকে আসন নিতে হবে। ইতি ১১ই মাঘ, ১৩৪৪।

কবি

॥ ৪১৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এতদিনে তোমাদের ক্রিয়াকর্ম বোধ করি সমাধা হয়ে গিয়েছে এবং মনে শান্তি পেয়েছ। অমলের চিঠি থেকে তোমার বাবার শ্রাদ্ধের খবর পেলুম, আমার ছোটো কবিতাটুকু তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি এখনো ছুটি পেলুম না। চণ্ডালিকা দিনের অষ্টপ্রহর অধিকার করে আছে। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বৌমা না থাকাতে আমার বোঝা আরো ভারি হয়ে উঠেছে। জিনিসটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে ভালো হবে এই উৎসাহেই দায়িত্বে আমাকে বেঁধে রেখেছে আর্টের বন্ধন— উৎকর্ষ সাধনের নেশা—এতেই পরিশ্রমকে দুঃসহ বোধ হয় না। বোধ করি সাংখ্যিকদেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। এইমাত্র খেয়ে উঠে একটু অবকাশ নিয়েছি। হৈমন্তীদের রচিত সেই ছোট ঘরে আমার বাসা— দরজা জানলার ফাঁকে রৌদ্রে ঝলমল গাছ-পালার ইশারা আমাকে কাজ ভোলাবার চেষ্টায় আছে। দূরের কথা যখন মনে পড়ে তখন নেত্রকোণার ঘরের কোণটাই মরীচিকা বিস্তার করে—ঘড়ঘাড়িয়ার রাজকীয় ঘরগুলো মনটার দখল নিতে পারে নি। চণ্ডালিকার দল চলে গেলেও নিষ্কৃতি পাব না—অন্তত ২৪।২৫শে পর্যন্ত আতিথ্যের উপসর্গ আছে। ততদিনে জলে স্থলে আসন্ন ফাগুনের ডাক পড়বে—অকারণে মন উতলা করে দেবে। এখনো শীতটা তার মুঠো আলগা করে নি—গরম কাপড়ের খোলোস ছাড়বার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। ইতি ২১ মাঘ ১৩৪৪

কবি

কবির অনেক সময়েই নেত্রকোণার জন্যে মন কেমন করতো। ওঁর চিরকালই ছোট-ঘর পছন্দ ছিল। বলতেন, ছোট-ঘরে ঘরটা খাঁচা

বোধ হয় না—সমস্ত পৃথিবীকে, আকাশটাকে সে ঘরের মধ্যেই এনে দেয়। বড়-ঘর নিজে খাঁচা হয়ে বাইরেটাকে আড়াল করে রাখে। তাই বেলঘরিয়ার গুপ্ত নিবাসের প্রকাণ্ড ঘরটা ওঁর নেত্রকোণার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হোতো। বারে বারে ওটাকে রাজবাড়ি বলে ঠাট্টা করতেন; কারণ ওঁর ভৃত্য বনমালী প্রথম দিন গুপ্ত নিবাসে এসে তার প্রকাণ্ড বাঁধানো আঙিনা, লম্বা রান্নাবাড়ি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামওয়ালা লম্বা বারান্দা এবং মস্ত মস্ত উঁচু ছাঁদের ঘরগুলো দেখে বলেছিল, "এ যেন একেবারে রাজবাড়ি। কী প্রকাণ্ড উঠোন, কী চমৎকার বারান্দা, ঘর, রান্নাবাড়িটাই বা কতো বড়" ইত্যাদি। সেই থেকে কবি বার বার ঠাট্টা করে বলতেন, "আমার নীলমণির তোমার এই রাজবাড়ি ভারি পছন্দ। আমাকে কিন্তু সেই নেত্রকোণার জানলার কোণটিই বেশী মুগ্ধ করেছিল। এই বাড়ির এই মস্ত মস্ত ঘরগুলো বিশ্রী লাগে এই জন্য যে, এর মাঝখানে বসে বাইরেটা কিছু দেখতে পাই না। বাইরের আকাশকে পেতে হলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়—এটাকে কি ভালো বলে? হোলোই বা রাজবাড়ি। আমার ঐ বোকা বাঁদরটা বড় বড় ঘরদোর দেখেই ভুলেছে। ও তো কবিতা লেখে না, তাই বুঝবে কি করে যে, কেন এই রাজবাড়িতে আমার মন ভোলে না।

॥ ৪১৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের ঘরের খবর তো একটুও ভালো নয়। প্রশান্তর যে চিকিৎসাই চলুক না, তার সমান্তরালে বায়োকেমিক ফেরাম ফস ও কেলি সলফ্ পালাক্রমে এক ঘণ্টা অন্তর দিয়ে দেখতে পারো। বড়ো জোর যথোচিত ফল না হতে পারে, কিন্তু ঐ খুদে বড়ি কয়টিতে পালোয়ানি চিকিৎসা বিধ্বস্ত করতে পারে না। আমি জানি জীবন এ রকম দ্বৈরাজ্য সইতে পারে না—কিন্তু আমাদের দৈহিক জীবনে বহুরাজকতা আহার বিহার নানা উপলক্ষ্যে সর্বদাই ঘটচে, সেই জন্যে আমি বিরুদ্ধপক্ষের গা ঘেঁষে চলতেও কুণ্ঠিত হইনে। ডাক্তার হিসাবে তাতে মর্যাদা লাঘব হতে পারে, কিন্তু যে হেতু আমার উপাধি সাহিত্য ডাক্তার সেই হেতু আমার লজ্জা নেই। কলকাতায় অভিনয়ের দিন পিছিয়ে গেল। মার্চের আরম্ভ দিকে স্টেজ পাওয়া গেছে। সময় পাওয়াতে সুবিধা হলো—কেননা চণ্ডালিকা অত্যন্ত দুরূহ, দীর্ঘ অভ্যাস ও শিক্ষা সাপেক্ষ। তা ছাড়া কলকাতার বাহিরের জন্যে চিত্রাঙ্গদা প্রস্তুত করা চাই এই দুটোতে মিলে নিঃশেষে আমার সময় অপহরণ করেছে। এর উপর অতিথি সমাগমের ফাঁক নেই কেউ এপারের কেউ ও-পারের। তৎসত্ত্বেও যখন দুপুর বেলায় আহারান্তে সংকীর্ণ ছুটিতে নতুন বোলধরা আমগাছের ছায়ায় শালিকের অকারণ চাঞ্চল্য চেয়ে চেয়ে দেখি জানিনে কেন প্রাণধারণকে সার্থক বলে মনে হয়। কাল দুপুর বেলা মনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, এ আনন্দ কিসের আনন্দ, মন বললে, বুঝে ওঠা তোমার কর্ম নয়। ইতি ১০।২।৩৮

কবি

॥ ৪২০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

১লা মার্চ তারিখে মধ্যাহ্নে তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হব এমন আশংকা করতে পারো।

দুর্বাসা তপোবনের কুটীর-প্রাঙ্গণে এসে ডাক দিয়েছিলেন। অন্যমনা শকুন্তলা সাড়া দেন নি। মুনি শাপ দিয়ে প্রস্থান করলেন। যদি তুমি সাড়া না দাও তাতে তোমার ডাক টিকিট খরচা বাঁচবে, কিন্তু আমি শাপ দেব না, প্রস্থান করবই না, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ব। আমার ক্ষমাও যেমন আমার সাহসও তেমনি।

কুঁড়েমি করতে যতই ইচ্ছে করচি কাজ করচি ততই বেগে। একটার পর একটা তাগিদ অনাহূত এসে পড়চে। বৌমা অশুভ লগ্নে আমাকে চণ্ডালিকা সমর্পণ করে নিজে সরে পড়েছেন—ত্যাগ করে মুক্তি নিতে পারচি নে। সকলের চেয়ে বিরাট একটা তাগিদ আমার মাথার উপরে ঝুলচে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্বীকার করেচি মহাভারতের উপর একখানা বই লিখব। তাই মন খারাপ হয়ে আছে।

শীত প্রচণ্ড—স্তরে স্তরে গরম কাপড়ে আবৃত হয়ে আছি মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মত—তুলনাটাতে বিনয়ের অভাব বোধ হচ্চে—কিন্তু আমার নামের সঙ্গে যোগ থাকাতে ওটাকে নমিন্যাল বলা চলে। ইতি ২৩।২।৩৮

কবি

॥ ৪২১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

চণ্ডালিকার দলের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্চি শুনে আত্মীয় বন্ধু সকলেই নিরতিশয় দুঃখিত ও আশঙ্কিত—বিবি(১) শোকাবহ একখানা চিঠি লিখেছে। আমি বলচি মাভৈঃ—আমার উপর ছায়াপাত বাঁচিয়ে চলব—সমস্ত কলকাতা জুড়ে তো ছায়া পড়বে না যাব না সেই প্রলয় বঙ্গভূমিতে। ভেবেছিলুম অভিনয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ করে যাব তা হলে সকলের মন সুস্থ থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক। শান্তির২ও সেই অনুনয়। সেই জন্যেই ঐ কয়দিন জোড়াসাঁকোয় থাকতে হবে—অর্থাৎ যদি কোনো কারণে কোনো অন্তিম স্পর্শ অর্থাৎ last touch-এর দরকার হয় সেজন্যে আমাকে প্রয়োজন আছে। জিনিসটা অত্যন্ত দুরূহ। এর জন্যে অনেক খাটতে হয়েছে। দলবল যাবে ২রা তারিখে আমিও সেই তারিখেই যাচ্চি।

হাবলের৩ মায়ের জন্যে মনে খুবই একটা পরিতাপ রইল। কী জানি হয় তো এই দারুণ পরিণাম থেকে রক্ষা করা যেতে পারত। কিন্তু সে কথা যখন নিশ্চিন্ত নয় তখন আক্ষেপ করাটাও অনাবশ্যক। যদি পারো জোড়াসাঁকোয় দেখা কোরো। আমার কর্মসূচি এখনও পাকা করতে পারিনি। ইতি ২৮।২।৩৮

কবি

---

১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, ২ শান্তিদেব ঘোষ, ৩ হিরণকুমার সান্যাল

॥ ৪২২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

অভিনয়ের কুষ্টিতে কুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে—দিনক্ষণ নিয়ে কেবলি চলচে গোলমাল। অবশেষে স্থির করেছি পরশু অর্থাৎ সোমবারে যাব। আপাতত তোমারই আশ্রয় স্বীকার করেছি। তার পরে মেয়েরা যখন খুলনা থেকে ফিরে এসে কলকাতার অভিনয়ের জন্যে তৈরি হবে তখন কয়েক দিন তাদের নিকটবর্তী হতে হবে—তার দেরি আছে। সবসুদ্ধ বড়ো জীর্ণ হয়ে পড়েছি চোখ হয়েছে ঝাপসা, কান হয়েছে রুদ্ধ, পা হয়েছে অচল, মন হয়েছে অকর্মণ্য। এদিকে মহাভারতের

মহাভার গিয়েছে মাথায়। তোমার ওখানে কাজটা আরম্ভ করব।

যাতে আপন খেয়ালে চলতে চলতে দুর্গতির গর্তর মধ্যে অপঘাত না ঘটে এই জন্যে সাবধান করবার ভার বিধি তোমার উপর অর্পণ করেছে। এতে বিস্মিত হবার কী কারণ আছে? তোমার অনুরোধ আমি মানি এ কথা তুমিই মানো না, সংসারে আর সকলের মনে কোনো সংশয় নেই। পরীক্ষা করে দেখো— তুমি অনুরোধ করবামাত্র ছায়া রঙ্গভূমিতে যাওয়া আমি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করব। ইতি ৫।৩।৩৮

কবি

পেঁছব মধ্যাহ্নে, জোড়াসাঁকোয় উঠে বৌমার সঙ্গে ভাবী কর্তব্যের আলোচনা করতে হবে।

॥ ৪২৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্চে আমি যেন সপ্তম শতাব্দীর একটা ভগ্নাবশেষ—অধিকাংশ মহলটাই কাজের বার হয়ে গেছে, কেবল একটা অংশে শেলাই করা চট আর কেরোসিনের টিনে মিলিয়ে একটা বাসা তৈরি করা আছে, উইয়ে কাটা প্যাক-বাস্কোর উপরে বসে আছি। বসে বসে চেয়ে আছি বাইরের দিকে—গরমে ফলের গুটি ঝরে পড়া আমগাছ ছেয়ে গেছে নিবিড় কাঁচা পাতায়; ফুলের অর্ঘ্য আকাশের দিকে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাতাহীন গোলকচাঁপার বাঁকা ডালের গাছ, লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে অশোক গাছে দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর প্রথম অশোকগুচ্ছ ধরেছে ঐ কাঁকরেরই মতো ঘন লাল রঙের। আমার এই জীর্ণ দেহের জানলার ফাঁক দিয়ে এখনো মোকাবিলা চলচে বাইরের জগতের সঙ্গে, কিন্তু মনে হচ্চে ওর উপরে ক্রমে আড়াল করে আসচে একটা ঝুঁকে পড়া ভাঙা ছাত। অকস্মাৎ দৃষ্টি ঝাপসা হতে আরম্ভ করেছে। শেষ বয়সে মস্তিষ্ক যখন ক্লান্ত হবে তখন ছবি এঁকে দিন যাবে এই ভরসা করে ছিলুম, কিন্তু সন্দেহ ধরিয়ে দিয়েছে। ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু কেমন আমার মনে হয় এক্স্-রে প্রয়োগের পর থেকেই আমার দেহ-দুর্গের হঠাৎ এই পতনদশা ঘটেছে। বাইরের সঙ্গে আনাগোনার রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আপন অন্তর্লোকে নির্জনবাসের একটা পালা আরম্ভ হবে, হয় তো তাতে মৃত্যুর উপক্রমণিকার একটা অভিজ্ঞতা লাভ করব—হয় তো তারো একটা কোনো রকমের সার্থকতা আছে—আগাম কল্পনায় যে শূন্যতার আশঙ্কা করি সেটা হয় তো মিথ্যা। কিন্তু যেটা মনে করতে সকলের চেয়ে খারাপ লাগে সে হচ্চে দেহযাত্রায় পরের উপর নির্ভরতা, আশা করি এঞ্জিন একেবারে বিগড়াবার পূর্বেই শেষ টার্মিনাসে এসে থামব; অসমাপ্ত পথের মাঝখানে ঠেলাগাড়ির জন্যে কুলি ডাকতে হবে না।

এখানে এসে দেখি দুখানা কালির আঁচড়-কাটা ছবি আমার অনুবর্তন করেছে। এমন দুর্মূল্য নয় যার জন্যে তোমাকে বঞ্চিত করতে পারি অথচ মাশুল খরচ করে ফেরৎ দেবার মর্যাদাও তার নেই—পয়লা বৈশাখ তোমাদের আগমন প্রত্যাশা করতে সাহস করিনে বিশেষত গরম অসহ্য—অতএব যদি মনে থাকে তবে ঐ দুটো হরিজন জাতীয় ছবি নিয়ে যাব।

খুবই গরম। কিন্তু গরম নিয়ে নালিশ করতুম না যদি আমার চোখের দুর্বলতার জন্যে ঘর অন্ধকার করে থাকতে না হতো। জীবনে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকে এই প্রথম দরজার বাইরে খেদিয়ে রেখেছি।

প্রশান্ত কেমন আছে? বৌমার প্রত্যাশায় আছি অথচ এই গরমে এখানে তাঁর আগমনটা স্পৃহনীয় মনে হচ্চে না। ইতি ৩১।৩।৩৮

কবি

॥ ৪২৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এবার সর্বসম্মতিক্রমে আমার জন্মোৎসব ১লা বৈশাখে। বলা বাহুল্য—তোমাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয় কিন্তু প্রত্যাশনীয় কিনা জানিনে। প্রশান্তর জ্বর যদি বেলা চারটে থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত প্রবল হয় তা হলে হোমিয়োপ্যাথি লাইকোপোডিয়াম ৩০x দিতে পার, যদি জ্বরের বা গ্লানির সময়টা হয় সকালে দশটা এগারোটা, তা হলে হোমিয়োপ্যাথি নেট্রম মুর। বায়োকেমিকটা বন্ধ কোরো না আধ ঘন্টা অন্তর পালা করে ফেরম ফস ও কেলি সলফ্ দেবে—সকালের দিকে কেলি ফস্। বুলা এসেছিল, তার সামনে তার বউদিদির সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সাবধানে করেছি। ইতি ৪।৪।৩৮

কবি

॥ ৪২৫ ॥

ওঁ

গৌরীপুর লজ, কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

কোথায় আছ আন্দাজ করতে পারচিনে। মনে হচ্চে যেন ছুটির মেয়াদ শুরু হয় নি। যখন হবে তখন কোথায় যাবে তার একটা নিশ্চিত আভাস পাবার সম্ভাবনা হয়েছে কি? যদি দার্জিলিঙে আসা হয় তা হলে সেটাতে আমাদের ব্যবধান কতকটা হবে জোড়াসাঁকো বেলঘরিয়ারই মতো—নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের আয়ত্তের মধ্যেই পড়বে। একতরফা হবে, কারণ আমি গিরিরাজের মতোই অচল, তোমরা মহম্মদের শ্রেণীয়। চোখের দুর্বলতার জন্যে কলম চালানো প্রায় বন্ধ—কেবল ইতিমধ্যে জন্মদিন উপলক্ষ্য করে একটা কবিতা লিখেছি। কিছুই না করার যখন ভদ্র কৈফিয়ত থাকে তখন সেটাকে সৌভাগ্যের দান বলেই গ্রহণ করা চলে, কিন্তু সেটাকে দৃষ্টি-শক্তির দাম দিতে হলে বেহিসেবী হয়। মন্দের ভালো জাতীয় সামগ্রী পৃথিবীতে কিছু কিছু আছে, মন্দের পরিমাণটা যদি সহ্যমতো হয়। ২১ বৈশাখ ১৩৪৫

কবি

মাতৃত্বের উন্মেষ   শিল্পী : সুধীরঞ্জন ভূষণ

গত সপ্তাহে কলকাতায় তিনটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী মোগল আমলের 'মিনিয়েচার পেইণ্টিং'-এর এক অনবদ্য সংগ্রহের প্রদর্শনীটি আকাদমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ। প্রদর্শিত ছবিগুলি, যার সব ক'খানিই এই প্রথম জনসাধারণ দেখবার সুযোগ লাভ করছে, সেগুলি মাননীয় শ্রীপ্রকাশেরই পারিবারিক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ছবিগুলির ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল রাজত্বকালে জাহান্দর শা বারানসীতে এসে আত্মগোপনকালে তাঁর কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে প্রচুর ছবি কিনে নেন শ্রীপ্রকাশের পূর্বপুরুষ সীতারাম শা। তারও প্রায় একশ বছর পরে, ১৯০৯ সালে বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক স্বর্গত আনন্দ-কুমারস্বামীকে দেখাতে তিনি ছবিগুলির ব্যাখ্যা এবং মূল্য নির্ধারণ করেন। সীতারাম শার বংশধরেরা এমন যত্নে ছবি-গুলি রক্ষা করে এসেছেন, যে দেখে অতি সাম্প্রতিককালে আঁকা বলে ভুল হতে পারে। প্রদর্শনীটিতে ঐ পারিবারিক সংগ্রহের সব ছবি নেই, তবে যে কখানি আছে, সেগুলির প্রত্যেকখানিই প্রাচীন ভারতের নিরক্ষর শিল্পীদের অতুলনীয় কৃতিত্ব উপলব্ধি করার একটা সুযোগ দেয়।

এই সূত্রে একটি কথা বলতে হয়। এ ধরনের প্রাচীন শিল্প-কৃতিত্বের নিদর্শন-সমূহের স্থায়ী প্রদর্শনী যাতে হতে পারে সেদিকে চেষ্টা করা দরকার। তাতে এখনকার শিল্পী এবং শিল্পরসিকরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনি ভারতের গর্ব করার মতো শিল্পৈতিহ্য সম্পর্কে দেশের সাধারণ লোকেও জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

• • •

৮ই ফেব্রুয়ারী আর্টস অ্যান্ড প্রিণ্টস গ্যালারীতে একক চিত্রের দশম প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয় বিজন চৌধুরীর ছবি নিয়ে। 'মন্দিরের চারধারে' আখ্যায় যে দশখানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, তার প্রত্যেকখানির মধ্যে ভারতীয় ধারার ভিত্তির উপর আধুনিক শিল্প-প্রগতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়।

কালিঘাট অঞ্চলে জন্ম এবং লালিত হওয়ায় ছবিগুলির বিষয়বস্তুতে কালি মন্দিরের চত্বর, নকুলেশ্বর তলা, মন্দিরে মেয়েদের সিঁদুর খেলা, গাজন, বাঙলা নববর্ষে মন্দিরের দৃশ্য, প্রভৃতিই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ছবিগুলির বিন্যাসে পট ও পোড়ামাটির কাজের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ছবিগুলিতে সিঁদুরে লাল, সবুজ,
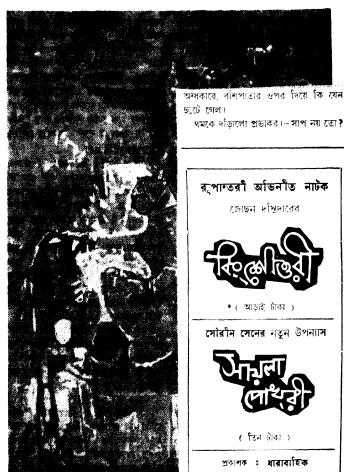
সিঁদুর খেলা

অন্ধকারে, বাঁশপাতার ওপর দিয়ে কি যেন ছুটে গেল।

থমকে দাঁড়ালো প্রভাকর।—সাপ নয় তো?

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো বিমলা, এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রভাকরের গায়ের ওপর।

মুহূর্তের জন্যে। মুহূর্তের জন্যে বিমলার কোমল যৌবনের শরীরটা জড়িয়ে ধরলো প্রভাকর। ছেড়ে দিলো।

শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে টর্চ ফেললো বিমলা। গিরিজাপ্রসাদও থেমে পড়েছিলেন।

বললেন, এদিক দিয়ে সরে আয়।

আবার পাশাপাশি হেঁটে এসে খিড়কির দরজা খুলে ঢুকলো সকলে।

বিমলার মনের মধ্যে তখন একটা তোলপাড় চলছে। সাপের কথা শুনে একটু আতঙ্ক যে হয়নি তা নয়। কিন্তু অতখানি ভয় সে পায়নি, কপট আতঙ্কেই যে ঝাঁপিয়ে এসে প্রভাকরের ওপর পড়েছিল তা যেন প্রভাকরও বুঝতে পেরেছে।

প্রভাকর যখন ওকে জড়িয়ে ধরলো, ক্ষণিকের জন্যে, তবু ঐ স্পর্শটুকুর মধ্যেই যেন স্বীকৃতির ইশারা শুনেছে বিমলা। তবে কি প্রভাকরের মনের গোপনেও ঐ একই স্বপ্ন!

লণ্ঠন জ্বালতেই কেমন যেন লজ্জা পেলো বিমলা। চোখ নামিয়েই রইলো।

গিরিজাপ্রসাদ গল্প জুড়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। শিষ্ট ছাত্রের মত শুনেছে প্রভাকর।

একবার আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকালো বিমলা, আর সেই মুহূর্তে চোখোচোখি হলো।

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলো ও।

বারান্দায় টিনের চেয়ারটায় বসে গল্প করতে করতে বিমলাকে লক্ষ্য করে প্রভাকর। একটা মুগ্ধ আবেশের চাদর যেন ধীরে ধীরে তার সমস্ত চেতনাকে মুড়ে দেয়।

লণ্ঠনের আলো পড়েছে উঠোনে। ঝোপ ঝোপ অন্ধকার আমগাছটার ডালে, ঢেঁকিঘরের ওপাশের স্তূপীকৃত জঞ্জালে, টিয়াদের ঘরের বারান্দায়, পশ্চিমের রান্নাঘরে। সদর দরজাটা বন্ধ, কিন্তু তার পাঁচিলের ওপারে খড়ের পালুই, মরাইয়ের গোল চূড়োটা—সবই আবছা আলোয় ছায়া ছায়া—কাঠকয়লা ঘষে আঁকা দেয়ালের ছবির মত দেখায়।

স্টোভ ধরালো বিমলা। কেটলী ধুয়ে জল বসালো। পেয়ালা পিরিচ ধুলো বারান্দায় বসে বসেই। চামচ, ছাঁকনি, চা-চিনির কৌটো এনে রাখলো। দুধের বাটি। খুব ভোরে উঠে চা খাওয়া অভ্যাস গিরিজাপ্রসাদের। গাই দোয়াতে বাগোলটা আসে অনেক বেলায়, তাই রাত্তিরের খানিকটা দুধ রেখে দেন নিভাননী। গরুর দুধ যেদিন থেকে ভাগাভাগি করে চায়ের পাট আলাদা করে দিয়েছে গিরীন, সেদিন থেকেই এই ব্যবস্থা।

চায়ের জল ফুটে উঠতেই স্টোভটা নিবিয়ে দিলো বিমলা। তিনটে পেয়ালায় চা ছেঁকে চামচ নাড়লো। নিঃশব্দতার মধ্যে ঠুংঠুং শব্দ উঠলো, আর দূর থেকে যাত্রার আসরের চিৎকার। নতুন দৃশ্য শুরু হয়ে গেছে।

চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলো প্রভাকর। গিরিজাপ্রসাদের হাতের কাছে আরেকটা পেয়ালা এগিয়ে দিলো বিমলা।

তারপর নিজের পেয়ালাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাটুকু প্লেটে ঢেলে খেয়ে নিলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে।

কেটলীটা ধুয়ে বাড়তি এক কাপ চা তাতে ঢেলে নিবন্ত স্টোভে বসিয়ে রাখলো।

গিরিজাপ্রসাদ উঠলেন। — দাঁড়াও, একবার ঘরগুলো দেখে যাই।

টর্চ নিয়ে সব ঘরগুলোর শিকলের তালায় হাত দিয়ে দিয়ে দেখলেন। গিরীনদের ঘরটাও। সব ঠিক আছে।

বিমলাকে বললেন, চাবিটা দে তো মা।

—কেন?

—মরাইতলাটা একবার দেখে আসি।

চাবি নিয়ে টর্চ হাতে চলে গেলেন।

প্রভাকরও উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে রইলো। গিরিজাপ্রসাদের চটির শব্দ, সদর দরজার খিল খোলার শব্দ মিলিয়ে গেল। মরাইতলায় ঘুরে ঘুরে দেখছেন গিরিজাপ্রসাদ।

প্রভাকর আর বিমলা। বিমলা আর প্রভাকর।

পাশাপাশি দুজন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের আলোটা বিদ্যুতের মত এদিক থেকে ওদিকে সরে যাচ্ছে।

বিমলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা অবোধ্য অস্বস্তি, ভয়, ভালো লাগা। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে বিমলার। বুক কাঁপছে।

বিমলার হাত ছুঁয়েছে প্রভাকর। প্রভাকরের হাতের মুঠোয় বিমলার হাত। কাঁপছে বিমলা, তবু হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

হারিকেন লণ্ঠনটায় কালি উঠছে। তেল কমে গেছে হয়তো। কাঁচটা কালো হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কাঁচটা হয়তো ফেটে যাবে। তবু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পলতেটা কমিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চিমনিতে কালি পড়ে পড়ে আলোটা কমে আসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে যেন চতুর্দিক।

পিঠের ওপর হাত রেখেছে প্রভাকর। প্রভাকরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে যেন বিমলা। মুখের ওপর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ।

প্রভাকর বললে, চলো।

মরাইতলার দিকেই পা বাড়ালো প্রভাকর। পিছনে পিছনে বিমলা।

আর সেই মুহূর্তে গিরিজাপ্রসাদের গলা শোনা গেল। —বিমলা! বিমলা! আতঙ্কের ডাক।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে পলতেটা কমিয়ে দিয়ে ছুটে গেল বিমলা।

দেখলে, বিস্ময়ের চোখে একটা মরাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গিরিজাপ্রসাদ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বড় কেটে ধান নিয়ে গেছে।

—ধান নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ, যাত্রা দেখতে গেছে সকলে। এই সুযোগে মরাই থেকে ধান চুরি করে নিয়ে গেছে কে। সামনে তখনো ধান পড়ে রয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মরাইয়ের ভিতর থেকে।

—ছি ছি ছি। গিরিজাপ্রসাদের গলার স্বর কান্নার মত শোনালো। —যাত্রা দেখতে গেছে সব, পুজোর দিন। ছি ছি ছি, তারই মধ্যে চুরি করতে এলো!

হতাশ শোনালো গিরিজাপ্রসাদের কণ্ঠস্বর।

বললেন, কত নিয়েছে কে জানে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গিরিজাপ্রসাদ।

প্রভাকর মুখ নীচু করে রইলো। বিমলাও। ও যেন কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারছে না প্রভাকরের দিকে।

জীবনের প্রথম পুরুষস্পর্শের আনন্দে ধিক্কারে বিমলার সারা শরীর তখনো রোমাঞ্চিত।

পানের ডিবে নিয়ে গুছিয়ে বসেছিল মোহনপুরের বউ। পাশে টিয়া। একমনে যাত্রা দেখছিল। সারা বছরে এই ক'টা দিন মাত্র ছুটি। না, ছুটি নয়। পুজোর সময়েই কাজ বাড়ে সংসারের। তবু কাজকে কাজ মনে হয় না। সদা সর্বদা একটা চাপা ফুর্তিতে মার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় টিয়া। আর মোহনপুরের বউয়ের মনটাও হালকা থাকে। সেই প্রথম যখন বিয়ের পর নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল, পায়ে মল পরে যখন ঘুরে বেড়াতো ঘোমটা টেনে টেনে, আর মলের আওয়াজের মত খুশিতে ভরা মন-টুকুও ঝমঝম করে বাজতো, ঠিক সেদিন-কার মত একটা অদ্ভুত আনন্দে যেন সারা মন ছেয়ে থাকে এই পুজোর ক'টা দিন।

তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ভাত-তরকারি ঢাকা দিয়ে রেখে মোহনপুরের বউ বেরিয়ে পড়ে-ছিল যাত্রা দেখার জন্যে। তোরঙ্গ খুলে বের করেছিল অনেক কাল আগে কেনা দামী বিষ্টুপুরী শাড়িখানা। নেড়েচেড়ে দেখে হেসেছিল। এতকাল আগের কাপড় তবু যেন নতুনই আছে। ক'দিনই বা পরতে পেয়েছে মোহনপুরের বউ। বিয়ের নিমন্ত্রণে দু'-চারবার পরেছে, একবার একটু ল্যাংচার রস লেগেছিল। জলে ধুয়েও দাগটা ওঠেনি। টিয়াকেও পুজোয় কেনা নতুন শাড়ি-ব্লাউজ বের করে দিয়েছিল মোহনপুরের বউ। আর টিয়া নিজে কাপড় বদলে এসে মাকে বিষ্টু-পুরী শাড়িখানা পরতে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মৃদু হেসে বলেছিল, কি সুন্দর মানিয়েছে মা তোমাকে!

বলে চুল বেঁধে দিয়েছিল, খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল সোনার 'বাগান'।

মোহনপুরের বউ লজ্জা পেয়ে হেসে বলে-ছিল, তুই কি আমায় কনেবউ সাজাবি নাকি?

টিয়া হেসে বলেছিল, সাজলে মানায় তোমাকে, সাজবে না কেন?

সিঁদুরের কৌটো এনে মার কপালে একটা বড় করে টিপ পরিয়ে দিয়েছিল টিয়া, সিঁথিতে টেনে দিয়েছিল লম্বা রেখা, তার-পর সেই সিঁদুরটুকুই হাতের নোয়ায় ঠেকিয়ে দিয়েছিল।

আর মোহনপুরের বউ টিয়ার কপালেও টিপ পরিয়ে দিতে দিতে কৌতুকের হাসি হেসে আশীর্বাদ করেছিল, এই অঘ্রানেই বিয়ে হোক্।

লজ্জার হাসি হেসেছিল টিয়া। তারপর ঘরদোরে তালা দিয়ে মার পিছনে পিছনে এসে বসেছিল যাত্রার আসরে। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে।

বিমলা আর কমলাকে মোহনপুরের বউও লক্ষ করেছিল। পুরুষদের দিকে গিরিজা-প্রসাদের পাশে বিমলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু বিরক্ত হলো মোহনপুরের বউ। ফিসফিস করে বললে, ধিঙ্গি মেয়ে, ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখ!

টিয়াও দেখেছিল। দেখে ওরও ইচ্ছে হচ্ছিল বিমলার কাছে যেতে। কিন্তু সাহস হয়নি।

তারপর প্রভাকর যখন এলো তখনো দেখেছে টিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে কনুইয়ের কাছে একটা চিমটি কেটেছে কে।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকিয়েই ফিক্ করে হেসে ফেলেই হাসি চেপেছে টিয়া। তারপর যথাসম্ভব গাম্ভীর্য টেনে এনেছে মুখে।

রেণুদি আর রাঙাবউদি। কোথায় ছিল কে জানে, কখন টিয়াকে দেখে কাছে সরে এসে বসেছে।

পালবউকে দেখে টিয়ার মা বলে উঠেছে, ও মা অধিকারীর বউ, এত পেছনে বসবে কি লো। বলে তাকে সামনে জায়গা করে দিয়েছে।

দামু পালই যাত্রা-দলের প্রাণ। দামু পাল না থাকলে যাত্রা হয় না সেবার। তাই সবাই ঠাট্টা করে তাকে যাত্রা-দলের অধিকারী বলে।

পালবউ তা শুনে খুশীই হয়।

মোহনপুরের বউকে তার সঙ্গে গল্প করতে দেখে রেণুদি ফিসফিস করে টিয়াকে বলে, তাই বুঝি এত সেজেগুজে এয়েছিস?

ফিরে তাকিয়েছে টিয়া রেণুদির মুখের দিকে। চোখের ইশারায় মাকে দেখিয়েছে।

অর্থাৎ মা শুনতে পারে।

কিন্তু প্রভাকরের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি ও। অস্বস্তি, লজ্জা—তবু ইচ্ছে হয়েছে প্রভাকর ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুক। ওর চোখে চোখ পড়ুক প্রভাকরের।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে প্রভাকর। আশ-পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু কিছুতেই ওর চোখজোড়া যেন টিয়ার দিকে আসছে না।

আগে দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রভা-করকে দেখতো টিয়া। গোপনে গোপনে রেণুদি আর রাঙাবউদির সঙ্গে হাসাহাসি করতো। কিন্তু শুধু প্রভাকরকে দেখতে পেয়েই যেন তৃপ্তি নেই আর, দেখা দিতে চায় টিয়া। চোখে চোখ পড়লে বুকের ভেতর অবধি কেমন করে ওঠে টিয়ার আজকাল। তবু দেখা না দিয়েও যেন শান্তি নেই।

যাত্রা শুরু হওয়ার পর কখন যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল টিয়া। প্রভাকরের কথাও যেন ভুলে গিয়েছিল। দামুদাদার অভিনয়, উদাসের অভিনয় বুঝি প্রভাকরের কথাও ভুলিয়ে দেয়।

তন্ময় হয়েই যাত্রা দেখছিল টিয়া। হঠাৎ আবার চিমটি কাটলে রেণুদি। ফিসফিস করে বললে, ঐ দেখ তোর জন্যে পাশে একটা খালি চেয়ার রেখেছে।

টিয়া তাকিয়ে দেখলে। অবনীমোহন উঠে গেছেন, তাই প্রভাকরের পাশের চেয়ারটা খালি পড়ে আছে। স্থির চোখে প্রভাকরের দিকেই তাকিয়ে রইলো টিয়া। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চোখে চোখ পড়লো। ক্ষণিকের জন্যে টিয়ার সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো আনন্দের আবেগে।

আর সেই সময়েই সকলে হইহই করে উঠলো। টিপ্পনী ছুঁড়লো উদাসের উদ্দেশে। পার্ট ভুলে গেছে উদাস, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না তার।

একটু পরেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে এলো বিমলা, নিভাননীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ফিরে গেল।

গিরিজাপ্রসাদকে উঠতে দেখেই টিয়াও উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনপুরের বউ ধমক দিলেন, কোথায় যাচ্ছিস!

—জ্যাঠামশাই বোধ হয়......

অর্থাৎ জ্যাঠামশাই বোধ হয় বাড়ি ফিরছেন, যদি কোন কিছু খুঁজে না পান, যদি কোন প্রয়োজন হয়।

মোহনপুরের বউ ধমক দিলেন, তুই বোস।

আবার বসে পড়লো টিয়া। তাকিয়ে দেখলে গিরিজাপ্রসাদ উঠলেন, প্রভাকর উঠলো। আর পিছনে পিছনে বিমলা।

একটা খালি চেয়ারে গিয়ে কমলা বসলো।

এদিকে ধীরে ধীরে আবার যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু যাত্রায় যেন আর মন নেই টিয়ার।

বারবার খালি চেয়ারটার দিকে, প্রভাকরের খালি চেয়ারটার দিকে তাকায় টিয়া। ওর বুকের মতই ফাঁকা যেন। এত লোক, এত ভিড়, রেণুদি, রাঙাবউদি, মা—তবু কেউ যেন নেই। টিয়া যেন একা, নিঃসঙ্গ। সমস্ত বুকটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে অসহ্য এক শূন্যতায়। যাত্রায় মন বসে না, কানে যায় না কে কি বলছে।

এতক্ষণ প্রভাকর ছিল, সমস্ত মন ভরে ছিল টিয়ার। প্রভাকর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সব আকর্ষণ চলে গেছে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে গিরিজাপ্রসাদ ফিরে এলেন, পিছনে পিছনে প্রভাকর। আর বিমলা ভিড়ের মধ্যে পথ করে করে এগিয়ে এলো টিয়ার মার কাছে।

এসে বললে, কাকীমা, ধান চুরি হয়ে ছে মরাই থেকে।

—চুরি হয়ে গেছে? চমকে উঠলো াহনপুরের বউ।

সঙ্গে সঙ্গে চাবিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। য়াও। কোলের ছেলেটা গিরীনের কোলে নিয়ে পড়েছে, অন্যগুলোও গিরীনের শেই বসে আছে ওদিকে।

তাকে ইশারায় ডাকলে মোহনপুরের বউ, রপর টিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। রীনও।

পথে যেতে যেতে মোহনপুরের বউ বললে, না বাবা, ধান চুরি হয়ে গেছে দেখেও বার যাত্রা দেখতে এলো বাপ-বেটীতে!

গিরীন বললে, যত দায় যেন আমাদেরই। টিয়া কিছু বললে না। আহা, বেচারী লা, জ্যাঠামশাই, ওরা কি কখনো যাত্রা খেছে! দেখতে পায়!

ধান চুরি গেছে কারও দোষে নয়। সারা রে তো এই পুজোর ক'টা দিন হাসি হ্লাদ, যাত্রা দেখার আনন্দ। ঘরে বসে মরাই পাহারা দেবে!

যতে কোটালকে তবু বলেছিল গিরীন। ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল, কি াই বললেন গো, সম্বচ্ছরে তিনটে দিন হয়, আমি এখন ঘর পাহারা দিই।

গিরীন হেসে বলেছে, আচ্ছা, মাঝে মাঝে ন দেখে যাবি।

যতে তবু অসম্মতিতে মাথা হেঁট করে থেকেছে। জবাব দেয়নি। আর গিরীনও বেশী ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। যা দিনকাল পড়েছে, রাখাল-বাগাল মুনিষ-মাহিন্দারদের কি কিছু বলার উপায় আছে, মনে মনে গজরায় গিরীন। এমনিতেই গাঁয়ে ঘরে লোক পাওয়া যায় না চাষে খাটার। যা দু-চার ঘর আছে, তারাও একে একে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে। কেউ কলকারখানায় কাজ নিয়ে, কেউ ইস্টিশনে চায়ের দোকান খুলে, কেউ বা উদাসের মত ড্রাইভারি শিখে নয়তো রেলের কাজ নিয়ে। দূরের মুসলমানদের গাঁ থেকে লোক আনিয়ে কোন-কোনবার চাষ হয়, সাঁওতালের দল না এলে ধান কাটা পড়ে থাকে।

মাঝে মাঝে সে-কথা বলেও গিরীন। বলে, আমাদের ভদ্দরলোকদেরই হয়েছে জ্বালা। লাঙল ধরলে জাত মান দুই যায়, লাঙল না ধরলে চাষ হয় না। জমিজমা ক'টা ও গরমেণ্ট কেড়ে নিলেই বাঁচি।

মোহনপুরের বউ শুনে হাসে। —কেড়ে নিলে নিজে দাঁড়াবে কোথায়? চাকরি দেবে গরমেণ্ট?

গিরীন বলে, কেড়ে তো নেবে না, টাকা দেবে যা-হোক কিছু।

মোহনপুরের বউ হেসে বলে, সে টাকা তোমার নাতি পেলেও ভাগ্যি বলতে হবে।

চাষের ঝামেলা আর নিজের দুর্ভাগ্যের

ওপর বিরক্ত হয়েই অবশ্য গিন্নীর বলে, জমি ক' বিঘে ঘুচে গেলেই বাঁচি। কিন্তু সত্যিই যদি তা হবে তা হলে ঐ ক' বস্তা ধান চুরি যাওয়ার জন্যে এমন মুষড়ে পড়বে কেন?

দোষ কারও নয়। পুজোর দিনে কেউ যে ধান চুরি করতে আসবে কেউ কি ভেবেছিল! তবু মোহনপুরের বউয়ের সব রাগটা গিয়ে পড়লো নিভাননীর ওপর, গিরিজাপ্রসাদের ওপর।

চুরির খবরটা মেয়েকে দিয়ে বলে পাঠিয়ে দিব্যি নিজে গিয়ে বসে বসে যাত্রা দেখলো! যেন ওরা এ-বাড়ির মানুষ নয়। দায়দায়িত্ব নেই কোন। আর সারা বছরে এই একটু আনন্দ, যাত্রা দেখার নাম করে গাঁয়ের সকলের সংগে একজোট হয়ে গল্প করা, সেটুকুও বুঝি কপালে নেই।

মোহনপুরের বউয়ের টিপ্পনী পরের দিন সকালে গিরিজাপ্রসাদের কানে এলো। শুনে একটু আঘাত পেলেন মনে মনে। মুখে কিছু বললেন না। কি আর বলবেন, গ্রামে ফিরে আসার পর থেকে শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

কিন্তু, কিন্তু প্রভাকরকে ছেড়ে চলে আসবেনই বা কি করে? ফিরে এলেও কি চুরি যাওয়া ধান ফিরে পেতেন?

নিজের মনকে বোঝাবার জন্যেই হয়তো গিরিজাপ্রসাদ তাই নিভাননীকে বললেন সে-কথা।

আর নিভাননী মনে মনে মোহনপুরের বউয়ের ওপর চটেই আছেন। বনপলাশিতে ফিরে আসার পর থেকেই যে ব্যবহার পেয়েছেন তাতে চটে থাকারই কথা। কিছুতেই যেন মন থেকে বিরুদ্ধ ভাবটা দূর করতে পারছেন না। তাই বলে উঠলেন, চুরি তো শুধু তোমার ধানই যায় নি বউ, ও ধান আমাদেরও!

সংসারের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোন খবরই রাখে না অমরেশ। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নিজের খেয়ালে। ক'টা দিন তো, তারপরই কলেজ খুলবে, কলকাতায় চলে যাবে। এ-সব সাংসারিক ঝগড়াঝাঁটি তার ভালও লাগে না।

মার কথা শুনে তাই সেও বলে উঠলো, ভারী তো দু' বস্তা ধান......

মোহনপুরের বউ নিভাননীর কথা শুনে যত না চটেছিল, অমরেশের কথা শুনে আরো চটে গেল। ভারী তো দু' বস্তা ধান?

নিভাননীর কথার জবাবে তাই ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, ধানে ভাগ আছে সে-কথা তো জানেন, বলি কাজের ভাগটার কথা মনে থাকে না কেন?

(ক্রমশ)

মোগল আমলে সপ্তগ্রাম

সঞ্জীবকুমার বসু

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সপ্ত- মের সীমানা ছিল বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্তৃত। তারপর চিরন্তন রীতি অনুসারে কল দেশেরই যেমন সমাজজীবন পরিবর্তন য় তেমনি করে সপ্তগ্রামেরও সমাজজীবন রিবর্তন হয় প্রাকৃতিক অবস্থান ও গঠনের পর। মোগল আমলের সপ্তগ্রামের যে সব ত্র আজও অনেকের কাছে অজানা রয়ে ছে তার কিছু কিছু তথ্য ও ঘটনা সম- ময়িক ইউরোপীয় পর্যটকদের এবং কালের ভারতীয় লেখকদের রচনা হতে না যায়। সপ্তগ্রাম বহু পুরোনো শহর। গল আমলে দেশ-বিদেশ থেকে এই শহরে ল দলে বণিক ও নাবিক আসা যাওয়া রত। টলেমির (Ptolemy 150 A. D) থ হতে জানা যায়, অতি প্রাচীন কালে প্তগ্রামকে 'চম্রিতপুর' বলা হ'ত এবং সে গে এটা একটি মোগলদের শ্রেষ্ঠ বন্দর ল। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক 'ডি বারো' খেছেন—"বাণিজ্য-তরীর আসা ও যাওয়া ম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রাম অধিকতর সুবিধা- নক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ ও প্তগ্রাম একটি শ্রেষ্ঠ শহর।" সম্রাট াকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমল্লের কথা তে জানা যায় যে, আকবরের সময়ে সপ্ত- ম 'সরকার সাতগাঁও' নামে পরিচিত ছিল নং এর মধ্যে ছিল তিপ্পান্নটি পরগনা। মন কি বর্তমান হুগলিসহরও একদিন সপ্ত- ম সরকারের অধীনে ছিল।

ইংরেজ বণিকেরাও এই সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র রে দক্ষিণ বঙ্গে বিরাট আধিপত্য বিস্তার রেছিল। অতিদূর এশিয়া, ইউরোপ, াফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে বিভিন্ন বাণিজ্য- রী সপ্তগ্রামের বন্দরে এসে কোলাহল ৃষ্টি করত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লনী লিখে গেছেন যে, বাণিজ্যের জন্য দেশিক জাহাজগুলি কেপপালিমারাস কে ফলতার অপর দিকে টৌনিনগেল হয়ে বেণীতে যেত এবং সেখান থেকে পরে হাজগুলি পাটনার বন্দরে ভিড়ত। ৫৩৯ সালে সপ্তগ্রামের ব্যবসায়ীরা চরম ্নতি লাভ করে। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক Tsing-এর গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, ্তম শতাব্দীতে বাংলা দেশ থেকে চীন র্যন্ত নিয়মিত জাহাজ চলাচল করত এবং লয় দ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন দ্বীপে বাংলা উড়িষ্যার উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। জল- থের মাধ্যমে এই সকল দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হ'ত। তখনকার বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা জাহাজে করে বিভিন্ন দেশ থেকে সোনা, রুপো, তামা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করে সপ্তগ্রামের বাজারে বিক্রি করত এবং তখনকার দিনে এই করে বহু বাঙ্গালী বড়লোক হয়েছিল।

এ দেশের মানুষ যখন লোহার ব্যবহার জানত না তখনও বেতের নৌকা বা জাহাজ চড়ে বাঙ্গালীরা নানা দেশে যাতায়াত করত। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই সকল জাহাজের নাবিকগণ কম্পাসের ব্যবহার জানত। M. Prothero-এর 'History of India' গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"The Hindus made use of a compass in the form of an ironfish floating in oil and magnetised so as point to the north." জাহাজের যোগাযোগ থাকার দরুন তখনকার বাঙ্গালীরা যবদ্বীপেও বসতি বিস্তার করেছিল। বিখ্যাত বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দর ও বেহুলার বিবরণে জানা যায় সপ্তগ্রামের কাছে বেহুলা নদী প্রবাহিত। মনসামঙ্গলে যে সব জাহাজের বিবরণ আছে তা থেকেই বোঝা যায় প্রাচীনকালে বাংলার বাণিজ্য ও সভ্যতা কত উন্নত ছিল। সদাগরদের সারিবদ্ধ জাহাজ যখন ভাগীরথীর কূলে দিয়ে পাল তুলে সমুদ্রে পাড়ি দিত তখন সপ্তগ্রামের হাজার হাজার লোক ভাগীরথীর দু' কূলে দাঁড়িয়ে আনন্দে তাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাত। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন পর্তুগীজগণ সপ্তগ্রাম অঞ্চলে বাণিজ্য করতে আসে তখনও ভাগীরথীর তীরে পর্তুগীজ জাহাজ পাল তুলে অপেক্ষা করত। এই সপ্তগ্রামেই মোগলদের জাহাজ নির্মাণের ঘাঁটি ছিল। মোগলেরা বড় বড় জাহাজ তৈরি করে দেশ-বিদেশে পাড়ি দিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালপত্র চালান দিত। এ ছাড়া যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন রকমের যুদ্ধের জাহাজ তৈরি করত।

যে সময়ে সপ্তগ্রামে মোগলেরা রণপোত তৈরি নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় পর্তুগীজদেরও বাণিজ্যজাহাজ সরস্বতী নদী দিয়ে সপ্ত- গ্রাম পর্যন্ত যাতায়াত শুরু করে এবং 'বেতর' নামে একটি স্থানে তাদের বাণিজ্য দপ্তর স্থাপন করে। কিন্তু ১৫৪০ সালের
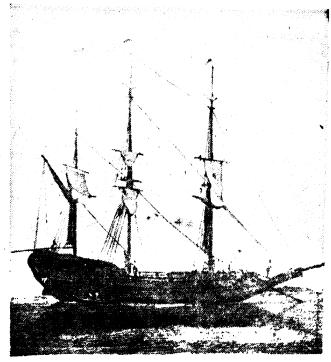
মোগল আমলে সপ্তগ্রাম অঞ্চলে নির্মিত রণপোত

পর এই সব নদী বাণিজ্যের অযোগ্য হয়ে পড়ে, কাজেই পর্তুগীজরা হুগলীকে এবং ওলন্দাজরা চুঁচুড়াকে বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলে। সেই সময় থেকে যমুনার মুখে বিভিন্ন ব-দ্বীপগুলি এক হয়ে বড় বড় গ্রামগুলি শহরে পরিণত হয়। এই কারণের জন্য অচিরেই যমুনা জাহাজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

সপ্তগ্রাম এককালে হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। শোনা যায়, রাজা শত্রুজিতের বংশের কোন রাজার রাজত্বকালে ১২৯৮ সালে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। তিনি ছিলেন তুরস্কের লোক। সপ্তগ্রাম জয় করে তিনি হিন্দুদের অনেক দেব-মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ তৈরি করেন। এই-ভাবে সপ্তগ্রাম হতে হিন্দুদের প্রাচীন ঐতিহ্য বিলুপ্ত হতে থাকে। জাফর খাঁর অত্যাচারে দলে দলে হিন্দু সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে চলে আসে। ১২৯৮ সালে আরবী ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি কাফেরদের তরবারি ও বল্লমের দ্বারা বিতাড়িত করে সপ্তগ্রামে মসজিদ তৈরি করেন।

বাংলার শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজিত করার জন্য জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে এসেছিলেন। সপ্তগ্রাম জয় করার আগে তিনি ছিলেন দেওকোটের শাসনকর্তা। বাংলাদেশ যখন গায়সুদ্দীন বলবনের পৌত্র রুকনুদ্দীন কৈকায়ুম শাহ শাসন করছিলেন, সেই সময় জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। হিন্দুদের উপর বহু অন্যায় ও অত্যাচার করার পর অবশেষে তিনি ১৩১৩ সালে মারা যান। স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেন যে, জাফর খাঁ হিন্দু রাজা ভূদিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

জাফর খাঁ নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র বারখান গাজি হুগলীর হিন্দু রাজাকে জয় করে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। ১৩২৩ সালে ইজ্জুদ্দীন ইয়াহ খাঁ "আজম-উল-মুলুক" উপাধি ধারণ করে সপ্তগ্রাম শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে সৈয়দ ফকরউদ্দীনের সঙ্গে ইজ্জুদ্দীনের যুদ্ধ হয় এবং তাঁকে পরাজিত করে সৈয়দ ফকরউদ্দীন সপ্তগ্রামের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই নাকি সপ্তগ্রামে প্রথম টাকশাল স্থাপিত হয় এবং ১৫৫০ সাল পর্যন্ত শের শাহের পুত্র ইসলাম শা'র রাজত্বকালেও সপ্তগ্রামে টাক-শাল ছিল।

আকবরের আমলে ১৫৯২ সালে আফ-গানরা এসে সপ্তগ্রাম লুট করে এবং সেই সময় সপ্তগ্রামের হিন্দুদের বহু প্রাচীন নিদর্শন নষ্ট হয়ে যায়। একদিকে আফগান-দের অত্যাচার, আবার অপর দিকে পর্তু-গীজরা সপ্তগ্রামের উপর হামলা শুরু করে। তখন সম্রাট শাজাহান পর্তুগীজদের দমনের জন্য বাংলার শাসক কাসিম খাঁকে পর্তু-গীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আদেশ দেন। তিন মাস যুদ্ধের পরে পর্তুগীজরা পরাজিত হয় এবং মোগল সৈন্যরা সপ্তগ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনে। সেই থেকেই হুগলী জেলায় মোগলদের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়।

মোগলদের দাপটে তখনও ইংরেজরা বাংলা দেশে প্রবেশ করতে পারে নি। কয়েক-জন ইংরেজ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ডাঃ বাউটন নামে জনৈক ইংরেজ শাজাহানের কাছ থেকে বাংলা দেশে ইংরেজ-দের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেন। এর মূলে কারণ ছিল শাজাহানের কন্যা একবার গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয় এবং ডাঃ বাউটনের চেষ্টায় শাজাহানের কন্যা সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন শাজাহান ডাঃ বাউটনকে একটি পুরস্কার দিতে চান—সেই পুরস্কারস্বরূপ ডাঃ বাউটন শাজাহানের কাছ থেকে বাংলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং শাজাহান তাঁকে অনুমতি দেন। ১৬৫১ সালে ইংরেজরা হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে, সেই সময় ইংরেজ বণিক দলপতি জব চার্নকের সঙ্গে রাজকর্মচারীদের প্রবল বিরোধ দেখা দেয়, এমন কি বিরোধ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হয়। কিন্তু চতুর ইংরেজেরা বুঝতে পারল, রাজকর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধ করে হুগলীতে বসবাস করা যাবে না; তাই ইংরেজরা আওরঙ্গজেবকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে সুতানটিতে কুঠি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে সুতানটি ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সময় সপ্তগ্রাম ও আশেপাশের লোকেরা বিশেষ করে ধনী, বিদ্বান ও সমর্থ ব্যক্তিরা নিজের বাসভূমি ত্যাগ করে সুতানটিতে বসবাস আরম্ভ করে। এইভাবে সপ্তগ্রাম ক্রমে ক্রমে জনশূন্য ও সম্পদশূন্য হয়ে পড়ে।

আজকের যে সপ্তগ্রামের দুর্দশা আমরা দেখতে পাই, তার কারণ মোগল আমলে সপ্তগ্রামের উপর প্রতিবেশী শাসকেরা বার-বার হামলা করেছে। মুসলমানদের অত্যাচার, পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব এবং শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহকালীন অত্যাচার, এমন কি বর্গীদের হাঙ্গামা প্রভৃতি ঘটনা-গুলি সপ্তগ্রামকে জরাজীর্ণ করে ফেলেছে। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত ও বঞ্চিত মানুষ-গুলির জীবনে ইতিহাস যে নির্মম আঘাত হেনেছিল, আজকের অবহেলিত সপ্তগ্রাম তারই জন্য দায়ী। আজ সপ্তগ্রামের জলে, জঙ্গলে ও ভাঙ্গা প্রাচীরের গায়ে ইতিহাসের সেই ঘটনাগুলিকে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে। একদা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর আজ বহুভাগে বিভক্ত। বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সপ্তগ্রাম নূতন রূপ নিয়েছে। সেখানে আজ গেলে মনে হয় তার আকাশ বাতাস যেন নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

সজনীকান্ত দাস

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বিকেলে পরলোকগমন করেছেন। এই দুঃসংবাদ খুবই অপ্রত্যাশিত, মাত্র পক্ষকাল পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করে-ছিলেন। তখন কে বা বুঝেছিল এই বর্তকিত পুরুষটি, যিনি দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে বহু ঝড়ের উদয়ের কারণ, এত তে এত আচমকা মরলোক থেকে প্রয়াণ করবেন; ঝড়ের সকল ইঙ্গিত থেমে যাবে হঠাৎ।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন একথা ভ্রান্তি নয়। একদা এই পত্রিকার প্রতিপত্তি পাঠকবর্গ স্বীকার করেছিলেন। 'আত্ম-স্মৃতি' গ্রন্থে সজনীকান্ত নিজেই লিখেছেন: "যৌবনের উত্তেজনা বড় ভয়ঙ্কর, ... কের উন্মাদনাও কম ভয়ঙ্কর নয়। আমরা ... কে একে প্রখর ব্যঙ্গে সপ্তরথীকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলাম। এই কালের 'শনিবারের চিঠি' যাঁহারা দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন, কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণই না আমরা মাত্র তিন-চারজনে ঘটাইয়াছিলাম।...চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল।" বস্তুত যৌবনের উন্মাদনায় শনিবারের চিঠি অনেক বিস্ফোরণই ঘটিয়েছিল সে কালে।

সজনীকান্তের সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ ... বহু পূর্ব থেকেই। কিশোরকালে লিখেছিলেন জাতীয়তামূলক বিপ্লবাত্মক কবিতা, যৌবনে কাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা ও বিভিন্ন প্রকারের গদ্য রচনা। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের হাতে খড়ি, পরে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যোগদান। 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তিনি বহুকাল লিখে-ছেলেন। অবশেষে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকরূপে তাঁর আবির্ভাব। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন।

সজনীকান্ত কেবলমাত্র সম্পাদক নন; তিনি কবি, সমালোচক, সঙ্গীত রচয়িতা, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের গবেষক। বিভিন্ন সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগা-যোগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সজনীকান্তের যোগাযোগ ছিল দীর্ঘকালের, তিনি বহুদিন এই পরিষদের অন্যতম কর্ণ-ধার ছিলেন।

বাঙলা সাহিত্যের পূর্ব সূরী ও আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের বেশীর ভাগের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ... মিত্রের পালাও ছিল সমান ভারী। ... বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল,

বিদুর

প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর, বনফুল ও অন্যান্য বহু ক্ষমতাবান সাহিত্যিক ছিলেন সজনীকান্তের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও বন্ধু। এই যোগাযোগের দ্বারা শনিবারের চিঠি বহুকাল লালিত হয়েছিল।

সজনীকান্তের কর্মময় জীবনের অবসানে আমরা মর্মবেদনা অনুভব করছি। তাঁর জীবন, কবির নিজ কবিতা থেকেই বলি:

"আমার জীবন শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।"

সজনীকান্তের রচিত কয়েকটি গ্রন্থ:

অজয়, পথ চলতে ঘাসের ফুল, বঙ্গরণ-ভূমে, মনোদর্পণ, মধু ও হুল, অঙ্গুষ্ঠ, রাজহংস, কেডস্ ও স্যান্ডাল, উইলিয়ম কেরী, পঁচিশে বৈশাখ, মানস সরোবর, বাঙলার কবিগান, মৃত্যুদূত, রাজমোহনের স্ত্রী, আকাশ বাসর, পথের সন্ধান, আত্ম-স্মৃতি প্রভৃতি।

উগো পিরো

নামটি ছোট, উগো পিরো; ইটালির লেখক। সাহিত্যিক কলগুলিতে ... স্থান হয় নি। অনুমান করি, ... কালে এঁর আবির্ভাব; এখনও খ্যাতির চরমে সমাসীন নন।

পিরোর একটি উপন্যাসের ইংরেজী তর্জমা 'দি ক্যাম্প ফলোয়ার্স' হাতে এসে-ছিল, সম্প্রতি পড়লাম। বাঙালী পাঠক মহলে ইটালির মোরাভিয়া জনপ্রিয়; প্র্যাটো-লিনিও কিছু লোক নিশ্চয় পড়েছেন। পিরো এঁদের কনিষ্ঠ। এই তিনের তুলনা আমার কাম্য নয়। প্রয়োজন বোধে একটি মাত্র কথা উল্লেখ করব, পিরো-কে বহুলাংশে প্র্যাটো-লিনির সমগোত্রীয় বলে মনে হবে। ইটালিয় সাহিত্যে নিও-রিয়ালিজমের যে আন্দোলন, প্র্যাটোলিনি যার অন্যতম পুরোধা, উগো পিরোকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে আমার আপত্তি খুঁজে পাচ্ছি না। মোরাভিয়ার রচনার রতিবিলাস পাঠককে ক্লান্ত করে, প্র্যাটোলিনির লেখায় বিষয়টি কেবলমাত্র ত্বকের উপরিভাগ উষ্ণ করে না, প্রায়শই তাৎপর্যময় হয়ে হৃদয়কে বেদনাসিক্ত করে। উগো পিরোর লেখায় এই গুণ না থাকলে 'দি ক্যাম্প ফলোয়ার্স' অপাঠ্য হত।

গত মহাযুদ্ধের পোড়ামাটি আর বিষাক্ত আবহাওয়া 'দি ক্যাম্প ফলোয়ার্স'-এর পটভূমিকা। মুসোলিনির প্রভা তখন অস্তাচল-গামী। কালো কোর্তাদের প্রতাপ যদিও তবু ফ্যাসিস্ট রক্ত শীতল হয়ে আসছে। জার্মানির সহায়তায় ইটালির সমর বাহিনী গ্রীস দখল করে বসে আছে, পরাভূত দেশের মাটিতে একদিকে দখলদার সৈন্য, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। ওরই মধ্যে স্বদেশ-প্রেমিক দুর্বল পার্টিজানরা লুকিয়ে চুরিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

উত্তম পুরুষে লেখা কাহিনী; নায়ক এক তরুণ ইটালিয় সৈনিক, বয়স বুঝি বছর বাইশ। গ্রীসের এক প্রান্তে ভোলস শহর। এই শহরে দখলদার ইটালি ফৌজের ঘাঁটি পড়েছে। নায়ক সেখানে সৈন্য-ব্যারাকের অধিবাসী। এই সৈন্যদের দুটি মস্ত কাজ, সারাদিন সামরিক আদবকায়দায় রপ্ত থাকা, আর অপরাহ্নে কয়েক গ্রাস খাদ্য মুখে দিয়ে তাবুতে এসে পড়ে থাকা, আর অপেক্ষা করা কখন সেই কম্প আসবে। রাত্রের অন্ধকারের সাথে সাথে সে আসে—ম্যালেরিয়া জ্বর—জ্বরের ঘরে অচৈতন্য সব, কুইনাইনের বড়ি গিলে এ-জ্বর ভোরের আলোয় দমিয়ে দিতে হয় কোনো রকমে। নতুন সকাল, কিন্তু সেই পুরোনো বিস্বাদ জীবন। এই জীবনের একটি মাত্র বৈচিত্র্য সামরিক পতিতালয়ে গমন, যদি না জ্বর আসে সাত বিকেলে—তবেই। ভোলস-য়ে পতিতালয় মাত্র দুটি, সামরিক পতিতালয় অবশ্য; একটি কুলীন-পদদের জন্যে বরাদ্দ, অন্যটি সাধারণ সৈন্য-দের। অন্যত্র নারীসঙ্গ খুঁজতে যাওয়া নানাদিক থেকেই বিপজ্জনক; কিন্তু সব চেয়ে বড় ভয়, যে-নারী ডাক্তারী মতে

পরীক্ষিত নয় তার সঙ্গদোষে যদি নিষিদ্ধ ব্যাধি জুটে যায় তবে ছুটির দরখাস্ত ক্রমশই কাগজ চাপা পড়ে পড়ে নীচুর দিকে নেমে যাবে; মুসোলিনী তোমায় সংক্রামক রোগ নিয়ে স্বদেশ ফিরতে দেবে না। গৃহপ্রাণ নির্বাসিত সৈন্যদের কাছে এর চেয়ে নির্মম শাস্তি কল্পনাতীত। তারা তাই নির্দিষ্ট একটি ঘরের কয়েকটি নির্দিষ্ট নারীর ক্লান্তিকর সাহচর্য যন্ত্রবৎ গ্রহণ করে পড়ে আছে।

এই একঘেয়েমি, বিশ্রী জীবন যাপন সকলেই বীতরাগ; নায়কও। কিন্তু খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে নায়কের একটা সুযোগ জুটে গেল, কর্তার আদেশ—তাকে একটা কাজে এথেন্স যেতে হবে। বাঁধা গণ্ডী ছেড়ে কোথাও একটু যেতে পাওয়ায় সৌভাগ্য। এথেন্স যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া কি কিছু কম। কিন্তু কেন যেতে হবে, কি কাজে, নায়ক জানে না; সামরিক শাস্ত্র সাধারণ সৈনিককে হুকুম দেয়, কারণ দর্শায় না। মস্ত এক খোলা ট্রাক আর ড্রাইভার নিয়ে নায়ক চলল এথেন্সে, পথ কিছু দীর্ঘ।

এথেন্সের তখন বর্ণনাতীত অবস্থা। এক টুকরো রুটির জন্যে দলে দলে ছেলেরা ছুটে আসে, মেয়েরা বেশ্যা হয়ে ঘিরে ধরে। দুর্ভিক্ষের পাশবিক গ্রাসে, যুদ্ধের নৃশংস হননে মানুষ নীতি ন্যায়ের কথা ভুলে গেছে। এক দিকে এই মন্বন্তর, অন্যদিকে 'গ্ল্যাক টাইফাস'-এর আতঙ্ক। নায়ক এথেন্সে এসে তার সদরদপ্তর থেকে জানতে পারল তাকে পনেরো জন যাত্রী নিয়ে এথেন্স থেকে নিজের তাঁবুতে ফিরতে হবে। নায়ক ভেবেছিল, এই পনেরোজন বোধ হয় পনেরোটি সৈনিক, বন্দীশালা থেকে সদ্য বের করে দেওয়া হবে।

অচিরে এই ভ্রম তার ভাঙল। পনেরোজন সৈনিক নয়, পনেরোটি গ্রীক যুবতী তার সঙ্গী হবে। এদের বয়স অল্প, দু একজন বাদে বিশের ঘর কেউ পেরোয় নি। এরাই সামরিক পতিতালয়ের জন্য সদ্য সংগৃহীত। মাত্র তিন পাউন্ড গো-মাংসের বিনিময়ে এরা ইটালির সামরিক পতিতালয়ের খাতায় নাম লিখিয়েছে। বাড়িতে যারা এক টুকরো রুটি জুটোতে না পেরে দিনের পর দিন উপবাসে কাটাত তারা আজ নতুন বৃত্তি নিয়ে ক্ষুধার সমস্যা থেকে মুক্ত।

পনেরোটি পতিতাকে সংগ্রহ করে ট্রাকে চাপিয়ে আবার ভোলাস-এর পথে ফিরে চলল নায়ক। পথ দীর্ঘ, ঝামেলাও প্রচুর। পথের মাঝে মাঝে ইটালি ফৌজের ছোট ঘাঁটি, ঘাঁটিতে একটি দুটি করে পতিতা নামিয়ে দিয়ে আসতে হয়, যে-ঘাঁটির যা প্রয়োজন, যেখানের যা সরকারী প্রাপ্তি-যোগ।

এই যাত্রা নির্বিঘ্নের প্রমোদ-ভ্রমণ নয়। এক ট্রাক ভেড়া বোঝাই করে কষাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়ত সহজ, কিন্তু পনেরোটি গ্রীক যুবতীকে ইটালি ফৌজের সামরিক পতিতালয়ে নিয়ে যাওয়া আর ট্রাক বোঝাই করে ভয়ংকর বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় একই রকম। সমান বিপজ্জনক। বাধা বিঘ্ন, পার্টিজানদের আক্রমণ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু —একটির পর একটি অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে নায়ককে অবশিষ্ট মেয়েদের নিয়ে ফিরতে হল ভোলাস-য়ে। কিন্তু কর্তা খুশী হলেন না, এ কেমন দায়িত্বহীন সৈনিক, যে, বাদ বিচার করে সর্বোত্তম যুবতীদের আনতে পারে নি নিজেদের রেজিমেন্টের জন্যে, বিশেষ করে তার কর্নেলের জন্যে, যার অক্ষমতার জন্যে পতিতাদের কেউ মারা গেল, কেউ পালিয়ে গেল পথ থেকে। এত বড় অপদার্থের জন্যে সামরিক শাস্ত্রে শাস্তির বিধান অবশ্যই ছিল। সাত দিনের সামরিক হাজত ত নিশ্চয়ই।

উগো পিরো, আমার ধারণা, তাঁর বিষয়-বস্তুকে নিরাসক্ত ভাবে দেখার চেষ্টা করেন নি, সম্ভবত তা সম্ভব ছিল না। উত্তম পুরুষে লিখিত বলেই নয়, বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর চেতনা ও অভিজ্ঞতা মিশ্রিত হয়ে যে সদ্ভাব গড়ে তুলেছে তার পরিণাম ভাল বই মন্দ হয় নি। গ্রীসের যে হতশ্রী রূপ, যুদ্ধোদ্ভূত বিকার, নীতিহীনতা স্বল্প কথায়, প্রায় রূঢ় নির্মম ভাবে তিনি ফুটিয়েছেন তার প্রশংসা করতে বড় বাধে না, এবং কদাচ মনে হয় না গ্রীসের শত্রুতা সাধনে এই সৈনিক বিশেষ পটু। যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত অবসরে গ্রীক পতিতাদের সঙ্গে নায়কের এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে যার মধ্যে সহানুভূতি, দুর্বলতা, ঘৃণা, বিরক্তি, স্বার্থবোধ ও স্বার্থত্যাগ বিচিত্র ভাবে মিশে আছে। যে-মেয়েটির নিদারুণ কাঠিন্যে, অহংকারে, দৃঢ়তায় তরুণ সৈনিক আহত হয়েছে ও আকর্ষণ বোধ করেছে—যার প্রতি আশ্চর্য প্রেম অনুভব করেছে সেই Eftichia-কে মনে রাখা কষ্টকর নয়। Eftichia শব্দের অর্থ সুখ। পদ্মপাত্রে জলবিন্দুর মতন এই সুখ নায়কের জীবনে একটি মাত্র রাতের মতন এসেছে, পরদিন হারিয়ে গেছে। বহু চরিত্রের মধ্যে এক মেজর, অন্য এক সহযাত্রী গ্রীক যুবতী, এক ধর্মযাজক—এদের কথা মনে থাকে।

যে সরল মানবিক বোধে মানুষ সহৃদয় সহানুভূতিশীল হয়, নীতি বোধে পীড়িত হয়, উগো পিরোর নায়ক সেই বোধে পীড়িত ও বাধিত হয়েছে। আর এই অসহায়ত্বের বোধই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটিকে বাঁচিয়েছে যে:

Something collapsed around us without our being to blame or able to prevent it, without it even being right for us to try to prevent it

সাহিত্য ও সমালোচনা

The Modern Writer and His World—G. S. Fraser. Rupa & Co., 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Price : Rs. 8.00.

Key To Modern Poetry—Lawrence Durrell. Rupa & Co. 15, Bankim Chatterjee Street. Price : Rs. 5.

আধুনিক সাহিত্যের সম্পর্কে প্রচলিত অভিযোগ এই যে, তা হলো বিশেষজ্ঞের সাহিত্য। হঠাৎ জানান্ না দিয়ে সেই সাহিত্যের যে-কোন মহলে ঢুকে পড়ার উপায় নেই। এর উত্তরে আধুনিক সাহিত্য-সাধকের একটি যুক্তি আছে। বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, নৃতত্ত্ব তথা যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবনের জন্য যদি বিশেষিত কৌতূহল অথবা অভিনিবেশ দরকার হয়, তবে সাহিত্যের জন্যই বা কেন সেই প্রয়োজন স্বীকৃত হবে না? বিংশ শতাব্দীর মানুষের জটিল মানস-রসায়ন এবং স্নায়ুবেষ্টিত মনকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে আর কোনো শিল্পকর্ম অথবা সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগ ঐ জটিল মন-চিন্তনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য, কিন্তু ঠিক সেই যোগসূত্র সম্পর্কে কখনো কখনো অবিশ্বাসী, এমন কি, সন্দিগ্ধ। লেখক চান, একান্তরে পাঠকের কাছে গভীরতর একটি মনোধ্যান, আর কিছু নয়।

এই প্রসঙ্গে মূল্যবান দুটি স্মরণযোগ্য সমালোচনাগ্রন্থ হাতে এল। আধুনিক লেখকের বহুকক্ষবিশিষ্ট মানস-সদনের রূপ নির্ণয়ে ব্রত দুইজন অগ্রণী সমালোচক, ফ্রেজার ও ডারেল, পাঠকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সাহায্যে ব্রতী হয়েছেন। এ'দের উভয়েরই সাদৃশ্য-সূত্র আধুনিকতার সংজ্ঞা ও চরিত্র নির্ধারণে। প্রথানুগত সাহিত্য-বিতানের গুণে স্বভাব থেকে আধুনিকতা কোথায় স্বতন্ত্র এবং অগ্রসর—দু'জন লেখকই এ বিষয়ে প্রচুর আলোকসম্পাত করেছেন। এ'দের কৃতিত্ব নিছক আত্মপক্ষসমর্থনে নয়, প্রামাণ ভূমিকাগ্রহণে।

ফ্রেজার আধুনিকতার সমস্যাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন : কবিতা, নাটক, সমালোচনা, উপন্যাস প্রায় সমস্ত কিছুই তাঁর আলোচ্য। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত ঐতিহাসিক। ইতিহাস বলতে ফ্রেজার বোঝেন মননের ইতিহাস। বস্তুভূমিকে তিনি অস্বীকার করেননি, সতর্কভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এবং তাঁর অপর সার্থকতা, হয়তো প্রকরণের মর্যাদা তিনি সসম্মানে স্বীকার করেছেন, আলোচনা করেছেন। শুধু নাকি, প্রকরণকেও তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করেন না—তাকেও তিনি নানাবিধ সাপেক্ষিক যোগাযোগের আলোয় নিরীক্ষণ

করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরও প্রত্যাবর্তন 'আইডিয়া'র কাছে, কিন্তু সে-আইডিয়া কোথাও অমূর্ত নয়, ব্যক্তিঘনিষ্ঠ। লরেন্স ডারেল অবশ্য আইডিয়ার প্রতিই অধিক আসক্ত। জেম্‌স জিন্‌সের Physics and Philosophy থেকে আলেকজাণ্ডারের Space, Time and Deity পর্যন্ত তাঁর অবাধ ভাববিহার। বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি সহজ স্বস্তি পান, ফলে পাঠক তাঁর কাছে শ্রদ্ধা লাভ করেন এবং সেই সব চিন্তার দ্বারা উদ্বোধিত হন। ডারেলের বক্তব্য অবশ্য ফ্রেজারের মত সর্বগম্য নয়, কিন্তু ডারেলের ভাষায় যে দার্শনিক আত্মস্থতা আছে সেটি বিবেকবান পাঠকের কাছে পরম মহার্ঘ। ১৮৯০ থেকে তিরিশের যুগ পর্যন্তই তাঁর মূল পরিধি প্রসারিত। কিন্তু তারপরেও যে আধুনিকতা বিচিত্র হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলতে পারেন। সাঙ্কেতিক কবিদের জন্যও তাঁর মন তেমন অভিভূত নয়। এ বিষয়ে পিটার কেনেল অথবা এডমাণ্ড উইলসন আরো সংবেদনশীল হয়তো।

রূপা প্রকাশনীকে ধন্যবাদ, গ্রন্থ দুটিকে সহজলভ্য এবং সুদৃশ্য করে প্রকাশ করেছেন বলে। এ'রা আমাদের জন্য একটি দায়িত্ব পালন করেছেন।

(৪০৮।৬১ ও ৪০৯।৬১)

গল্প

পেয়ারার স্বর্গ—শিবরাম চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা, ৭। দাম—২·৩০ নঃ পঃ।

আলোচ্য গ্রন্থটি এগারোটি হাসির গল্পের সংকলন।

শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প বলতে যা বোঝায়—'পান্', হাস্য উদ্রেককারী সংলাপ এবং সর্বোপরি একটি কৌতুকময় কাহিনী—এর সবগুলিই লেখকের অন্যান্য গল্পের মত এই সংকলনের গল্পগুলিতেও উপস্থিত। তবু, এই সংকলনের অধিকাংশ গল্পই লেখকের হাসির গল্প লেখার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়। শুধু গুটি তিনেক গল্প—'ঋণং কৃত্বা', 'নিকুঞ্জ কাকুর গল্প' এবং 'গিনিপিগ আর গিনিপিগ'—এর প্রমাণ। এই তিনটির মধ্যে শেষোক্ত গল্পটি একটি বিদেশী গল্পের অনুসরণ।

এই গল্প-সংকলনটি, আশা করা যায়, সাধারণ পাঠকদের কাছে, বিশেষত ছোটদের কাছে, সমাদর লাভ করবে। হাসির গল্পের ক্ষেত্রে শিবরাম চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে এখনও অনন্য।

(১৬/১৬)

বিচার কাহিনী

বিখ্যাত বিচারকাহিনী—বিশু মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

আটটি চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে এই বই রচিত হয়েছে। আমাদের চারিদিকের বাস্তব জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে, উপন্যাসের ঘটনা থেকে সেসব যে কত বিচিত্র—এই গ্রন্থে তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইজন্যে এইসব বিচারকাহিনী পাঠ করতে বসলে এর বৈচিত্র্যের আকর্ষণে একটানা প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতায় এসে পৌঁছতে হয়। এবং সেই সঙ্গে বোঝা যায় যে, মানুষ কত বিচিত্র জীব। এ বইতে কাহিনীর সংখ্যা আট, কিন্তু এরই মধ্যে দেখা মেলে অষ্টোত্তর শত প্রকারের মানুষ। প্রেম, প্রণয় বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধচেতা নারী যে কি জঘন্য প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে "রতনবাঈ জৈনের ফাঁস" কাহিনীতে; "রাজার কামলীলা" কাহিনীতে নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে রাজারাজড়ার অত্যাচারের অনেক বিবরণ আছে। তেমনি আছে অন্যান্য কাহিনীতেও অনেক আশ্চর্য বিবরণ। "ক্লার্ক মলোনী হত্যারহস্য", "বাওলা হত্যাকাণ্ড", "সামসেদবাঈ হত্যা", "প্লেগ-জীবাণুঘটিত হত্যাকাণ্ড", "পাগলা খুনের মামলা", "সতীদাহ রহস্য" ইত্যাদিতে যেসব মানুষকে আমরা পাই তারা যে সত্যিই আমাদেরই মত রক্তে মাংসেগড়া মানুষ—এ কথা বিশ্বাস করতে যেন কষ্ট হয়।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় এইসব বাস্তব কাহিনী এমন দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন যে, এতে কাহিনীগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বইটির আদর হবে।

উপন্যাস

যে তাপে রঙ বদলায়—যজ্ঞেশ্বর রায়। এভারেস্ট বুক হাউস। কলিকাতা-১২। মূল্য—২৲।

এ উপন্যাসের নায়ক এক যুবক, কর্তব্য আর শারীরিক ক্ষুধার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে যে বিধ্বস্ত এবং নায়িকা এক বিবাহিত যুবতী—বেঁচে থাকার মৌল প্রয়োজনের কাছে সে সর্বদা রুদ্র এবং দীন। আধুনিক জীবনের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এই দুই নাগরিক চরিত্রের পরিণতি ঘটেছে এক শান্ত, নির্মল ও শুভ্র মানসিক উত্তরণে। মুক্তি ভালবাসার এক ভিন্নতর উপলব্ধির জন্যই তাদের এই বিষাক্ত চেতনার সংশয়াকুল পদচারণা।

উপন্যাসে লেখক চিরাচরিত ধারা বর্জন করে নতুনতর এক আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। দুটি চরিত্রের জটিল মনোবিশ্লেষণে লেখকের দক্ষতা স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য লেখকের শিল্পসাধনার পরিচায়ক। এই উপন্যাসপাঠে লেখকের পরবর্তী রচনার জন্য পাঠক স্বভাবতই উৎসাহিত হবেন। ৬৫৪।৬১

এইসব আলো প্রেম: অসিত গুপ্ত। পরিবেশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

সম্ভবত এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ—এই তিনটি পর্বে উপন্যাসটি বিভক্ত। প্রধান চরিত্র আমি এবং তাকেই কেন্দ্র করে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল। এই প্রধান চরিত্রটি অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে পীড়িত এবং বিষাদাচ্ছন্ন। জীবনের প্রতি তার দৃষ্টি জিজ্ঞাসুর, অস্তিত্বের গভীর থেকে সে আহরণ করেছে জীবনের সত্য। সুখের অবকাশটুকু ক্ষণস্থায়ী হয়েছে তার জীবনে, একে একে চলে গেছেন তার মা-বাবা, ললিতা বউ, মীনাক্ষী। এক-একটি মধুর ভ্রান্তির মত তারা চলে গেছে। জীবনের এ হেন পরমলগ্নে এসেছে সরস্বতী। এই প্রথম রচনায়ই লেখক সৃষ্টি করেছেন কয়েকটি বিচিত্র চরিত্রকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। উপন্যাস রচনার পুরাতন ধারাটি বর্জন করে নতুনতর এক আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন লেখক। প্রধান চরিত্রটির জটিল মনোবিশ্লেষণে লেখকের দক্ষতা স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। ভাষা ব্যবহার নিপুণ এবং বিশেষ কাব্যময়তাও লক্ষণীয়। ও সি গাঙ্গুলী অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ৬৯৮।৬১

চৌধুরী বাড়ি—বিশ্বনাথ রায়। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

এ উপন্যাস পাঠে যে কোন সচেতন পাঠক মাত্রেরই এ কথা ভাবা স্বাভাবিক যে, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের যে ঐতিহ্য রচিত হয়েছে তারাশংকর, মানিক ও বিভূতিভূষণের রচনায় এবং পরবর্তী কথাকারদের সৃষ্টিতে যার পরিপূর্ণ রূপ সূচিত হয়েছে সেই ভাষায় কী করে এ জাতীয় একটি উপন্যাস নামধেয় বস্তুর প্রকাশ ঘটল। সম্ভবত লেখকের বাসনা ছিল একটি চিত্রকাহিনী রচনার এবং সে ভূমিকায়ও তিনি সাফল্য লাভ করেননি। লেখকের কাছে একটি বিনীত নিবেদন যে, অতঃপর পরবর্তী রচনার পূর্বে তিনি যেন বাংলার উপন্যাসের ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী ঔপন্যাসিকদের রচনা পাঠ করে নেন। ৬৬৮।৬১

ভ্রমণ

উত্তরা খণ্ডের পথে (১ম খণ্ড)—উত্তর-পথিক। বাসন্তী প্রকাশনী; ১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা আশ্রম, কলিকাতা-৯। মূল্য: পাঁচ টাকা।

ভ্রমণের উদ্দেশ্য সকলেরই এক জাতীয় নয়। কেউ দেখেন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে ইতিহাসের মহিমা অথবা বর্তমান জনপদ। 'উত্তরা খণ্ডের পথে'র লেখক ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাত্রা করেছেন উত্তরাঞ্চলে। তাই তাঁর গ্রন্থে স্থানাধিকার করেছে যমুনোত্রী, বারণাবত, গোমুখ প্রভৃতি। প্রকৃতিকে দেখাই তাঁর মূলোদ্দেশ্য নয়, প্রকৃতির মাঝখানে পরম পুরুষ দর্শন করাই তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা-আকুতি। চরম দুঃখের অভিসারের মধ্য দিয়ে পরমাত্মাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর অভিযানে কায়-ক্লেশের কথা যেমন আছে, তেমনি প্রকৃতির মাঝখানে সৌন্দর্যোপভোগের কথা বাদ যায় নি। আবার অজস্র শ্লোকের সহজ ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি তাঁর তত্ত্বকে ব্যাখ্যাও করেছেন। অব্যক্ত জীবন এবং ব্যক্ত জীবনের গভীর জিজ্ঞাসার রূপ-রেখার একটি টানে তিনি গ্রন্থ শেষ করেছেন। লেখকের পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য, কিন্তু তা অনর্থক ভারাক্রান্ত নয়। ৫৯২।৬১

বিবিধ

দেশ-বিদেশের বনৌষধি (১ম খণ্ড)—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, ডি-এস-সি (আয়ুর্বেদ) আরোগ্য নিকেতন; ৭১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য: ৩·৫০ নয়া পয়সা।

গ্রন্থটির বাংলা নাম শুনে অনেকে হয়তো যথাযথ মূল্য দিতে দ্বিধা বোধ করবেন। কিন্তু একেই যদি Hand book of Materia in Bengali বলা যায়—তাহলে ইংরেজি নামের গুণে এর মূল্য কেউ কেউ কিছুটা উপলব্ধি করবেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সেনের এটিই প্রথম গ্রন্থ নয়, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'রসসার তন্ত্র' গুণীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। ডঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সেনের উক্ত গ্রন্থকে পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন, যা অবশ্য তিনি নিজেই সচেষ্ট হয়ে করতে পারেন। আলোচ্য গ্রন্থে বাসক, শতমূলী, নিসিন্দা, আতাইচ, গুলঞ্চ প্রভৃতি তেতাল্লিশ রকম গাছ-গাছড়ার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে প্রতিটি গাছের রাসায়নিক উপাদান, প্রয়োগবিধি, গুণ ও ক্রিয়া, ঔষধার্থ ব্যবহার প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট ও সহজ করে তোলা হয়েছে। 'দেশ-বিদেশের বনৌষধি' গ্রন্থটি সকলেরই পরম উপকারে লাগবে, তা বলাই বাহুল্য। নিত্য প্রয়োজনীয়

গ্রন্থের তালিকায় এই গ্রন্থের নাম সর্বাগ্রে থাকা উচিত—বিশেষত জাতির স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এ কথা না বলে উপায় নেই। য-কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি-ও শুধু প্রয়োগবিধি জেনেও নিজেই ঔষধাদি তৈরী ও ব্যবহার করতে পারবেন। ৭০১।৬১

মুক্তিপথে শিক্ষা-সংস্কার—মাস্টারমশাই প্রকাশক ঃ শ্রীবিদ্যুৎকুমার রায়চৌধুরী; ৯।১, ডাক্তার লেন, কলিকাতা-১৪। দাম ঃ এক টাকা চারি আনা।

যথার্থ শিক্ষা-সংস্কারের জন্য কোন পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং বাঙালীর প্রকৃত মুক্তির পথ কি—এই বক্তব্যটিকে পর্যালোচিত করে লেখক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সমাধানের পথটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান শাসক-গোষ্ঠী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বাঙালীর জীবনকে মুক্তি দিয়ে ভারগ্রস্ত করে রেখেছে—বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে তা প্রমাণ করে—সেই সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তির উপায় কি—সে সম্বন্ধে লেখক নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন। লেখকের চিন্তার সততা ও দৃষ্টিভঙ্গি যতোখানি প্রবল, ভাষা ততোখানি সবল হলে খুশি হওয়ার কারণ হোত। ২৮।৬১

সমুদ্র কাহিনী

নীল সমুদ্রের পাণ্ডুলিপি—ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য। পুরোগামী প্রকাশন। ১৯৪, বি গাংগুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ঃ টাঃ ৪·২৫ নঃ পঃ।

বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু সমুদ্র-জীবনের তেমন আলোড়ন পাঠক অনুভব করা যায়। হয়তো এর মূলে কারণ দূরে থেকে আমরা সমুদ্র দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত ও সম্মোহিত হয়েছি। সমুদ্রে যাদের ঘর তাদের বিক্ষিপ্তভাবে দেখেছি। উপর্যুক্ত গ্রন্থের লেখক সেই দেখাকে বিস্তারিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাহিনীর অভিনব পরিবেশে রঞ্জন স্পতি, লেফটেন্যান্ট 'স', ওয়াকী, হিম, জোসেফ, যোগিন্দর যশবন্ত, ক্লেটন, প্রেসটন, সুরেশ এক নতুন জীবন য় এসেছে। সম্মিলিত জীবনের এক টিতে আছে উদ্বেল, অন্য কোটিতে শান্তি। তথাপি ত্রুটিও আছে; গভীর দ্রে জীবনের গাম্ভীর্য ততোখানি ব্যঞ্জিত ওঠেনি। ৬৩৭।৬১

কবিতা

শবযাত্রা—শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র শ ভবন, কলিকাতা-২৬। দু'টাকা।

ত্র-পত্রিকায় ইতস্তত পবিত্র মুখো-র কবিতা চোখে পড়ে। 'শবযাত্রা' টি সুদীর্ঘ কবিতা, পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। া, হতাশা, স্মৃতি ও মৃত্যু-এর বিষয়- । প্রয়াস হিসাবে প্রশংসা করতে হয়। ভাবে কিছু-কিছু উপমা ও পংক্তি প্রশংসনীয় হলেও, গভীরতার অভাব চোখে পড়ে। প্রতিশ্রুতিবান এই কবি ভবিষ্যতে সফল হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ১১।৬২

অনুবাদ

একটি প্রেমের কাহিনী— গড়িপাটি ভেংকটচলম। অনুবাদক ঃ বোম্মানা বিশ্বনাথম। মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম—দু' টাকা।

অনুদিত উপন্যাসটির তেলুগু নাম ময়দানম, লেখক গুড়িপাটি ভেংকটচলম। এই উপন্যাসটি প্রকাশের সংগে সংগে তেলুগু সাহিত্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। লেখককে একাধারে সাধুবাদ ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ-হেন একটি আলোড়নকারী উপন্যাসের অনুবাদ করে বোম্মানা বিশ্বনাথম আমাদের প্রশংসার পাত্র হলেন। বিবাহিত এক নারীর অবৈধ প্রণয় নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনী। কাহিনীর নায়িকার মানসে বেঁচে থাকার মৌল প্রয়োজনের কাছে সতীত্বকেও অবান্তর মনে হয়েছে, তাই সে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছেড়েছে, এবং এক ভয়ঙ্কর সমাপ্তির মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে তার জীবনের পরিণাম।

অনুবাদকের ভাষা ঝরঝরে ও সাবলীল। কাহিনীর স্বচ্ছন্দগতি কোথায় ব্যাহত হয়নি। ৬৯৭।৬১

প্রাপ্তি স্বীকার

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়—নীলরতন ধর।

লিপিবিবেক—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

রাইট ব্রাদার্স—হেনরী টমাস—অনুবাদক—সবুজ সাথী।

রকফেলার—রেমণ্ড বি ফসডিক।

ভারতে সমাজতন্ত্র রূপায়নের উপায়—অনির্বাণ হালদার নাথন।

শিমুল ফুলের ছায়া—নৃপেন্দ্র সান্যাল।

চন্দ্রশেখর

একটি সুন্দর পুতুল-চিত্র

চলচ্চিত্রপটে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে অতি আধুনিক কালে। শিল্পনিষ্ঠ চিত্রনির্মাতার আত্মপ্রকাশও ঘটেছে সেই সঙ্গে। এমন শিল্পীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, যাঁরা শুধু শিল্পসৃষ্টির আনন্দেই চলচ্চিত্রপটে তাঁদের সৃজনীশক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিল্পী অজয় চক্রবর্তী এঁদের গোত্রভুক্ত।

"নানুহে-মুনুহে সিতারে" নামে একটি পুতুল-চিত্র তিনি তৈরি করেছেন। কিছুকাল আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি সচল পুতুল-চিত্র দেখার সময় তাঁর পাঁচ বছরের ছেলের চোখে-মুখে যে বিস্ময় ও আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছিল, তিনি তা লক্ষ্য করেছিলেন। এর পর থেকেই তিনি শিশুদের আনন্দ দেবার জন্য একটি সচল পুতুল-চিত্র তৈরি করার প্রেরণা অনুভব করেন। তাঁর সেই প্রেরণারই ফলশ্রুতি এই পুতুল-চিত্র।

একটি ষোল মিলিমিটারের ক্যামেরা নিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতেই কাজ শুরু করেন। শিক্ষাবিদ্ ডাঃ মন্টেসরির সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। তাঁর চার বৎসরের সাধনার ফল এই পুতুল-চিত্র।

এই চিত্রে অচল পুতুলরা সচল হয়ে উঠেছে। পুতুলে পুতুলে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। পুতুলের সমাজ গড়ে উঠেছে। সমাজ ছেড়ে তারা থাকতে পারে না। গৃহস্থের বাড়ি থেকে তারা পালিয়ে আসে। শেষে দুই পুতুল বন্ধু তারার দেশে চলে যায়।

এই ছবি দেখে শিশুরা আনন্দ পাবে। ছবিটি রঙীন। আবহ সংগীত ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গত সোমবার লাইটহাউস মিনিয়েচারে চিত্র-সাংবাদিকদের জন্য ছবিটির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর নাম নাট্যামোদীদের কাছে সুপরিচিত। মাত্র চৌদ্দটি নাট্য-সংস্থার যুক্ত প্রয়াসে এই সংগঠনীর অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল। সংগঠনীর কর্মীদের নীরব নিরলস সাধনায় আজ তা সহস্রদলে বিকশিত। পশ্চিমবঙ্গের সহস্রাধিক নাট্য-গোষ্ঠী আজ বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর অন্তর্ভুক্ত।

গত শারদোৎসবের আগে বঙ্গীয় নাট্য-সংগঠনী "নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসব"-এর আয়োজন করে রসিকসমাজের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন। তারপর থেকেই তাঁদের নতুন সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস সম্বন্ধে জনসাধারণ আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী নাট্য সংগঠনীর কার্যালয়ে (৩৮/সি, রামধন মিত্র লেন, কলি -৪) অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার মুখপাত্র শ্রীদেবব্রত সুর-চৌধুরী ঘোষণা করেন, নৃত্যনাট্যের প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগঠনী বর্তমানে "নিখিল বঙ্গ নৃত্যনাট্য উৎসব"-এর আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সংগঠনীর উদ্যোগে সুবর্ণবণিক-সমাজ গৃহে "নিখিল বঙ্গ নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী সম্মেলনে"র যে আয়োজন করা হয়, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীসুর-চৌধুরী বলেন, বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের মান আজ নিঃসন্দেহে উন্নত। কিন্তু তা উন্নততর করা যায় কীভাবে এবং উন্নতির পথের সমস্যাগুলি কী ও তার সমাধান কী করে সম্ভব তা নিয়ে বিশদ আলোচনা ও গবেষণার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনীর মুখপাত্র তাঁদের সংস্থার আদর্শ ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ও বাংলার বাইরে সংগঠনীর চৌদ্দটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। লক্ষ্য ও আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সংগঠনী যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেই সম্পর্কেও সংস্থার মুখপাত্র সাংবাদিকগণকে অবহিত করেন। সংগঠনীর আশু পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে নাট্যকলার চর্চা ও অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থশালা স্থাপন, সার্থক নাটক-রচনার আয়োজন, মঞ্চাভিনয় ও মঞ্চ-কলাকৌশল সম্বন্ধে উৎসাহী শিল্পী ও কলাকুশলীদের জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা নাটক, নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংবলিত একটি বৃহদায়তন নাট্য-কোষ রচনা প্রভৃতি।

দেশের অগণিত নাট্যসংস্থার একটি সক্রিয়, সাংগঠনিক মিলন-ভূমি হিসাবে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর গুরুত্ব ও সার্থকতা যে কত ব্যাপক, সংস্থার মুখপাত্র সেই বিষয়েও সাংবাদিক বৈঠকে মূল্যবান আলোচনা করেন।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের জীবনী-চিত্র "ভগিনী নিবেদিতা"র একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অমরেশ দাশ ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে দুটি বহুপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের জীবনী-চিত্র "ভগিনী নিবেদিতা" একটি। অপরটি চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নবতম চিত্রোপহার "সূর্য-স্নান"।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনাকালে **"ভগিনী নিবেদিতা"** ছবিটি এক বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। স্বামীজীর মানস-কন্যা ও শিষ্যারূপে ভগিনী নিবেদিতার নাম সারা বিশ্বে পরিচিত। ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে এই মহীয়সী বিদেশিনী গুরুর আদর্শ ও আশীর্বাদের আলোকে

মোহগ্রস্ত জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেন। ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যময় ও কর্মবহুল জীবনের প্রধান ঘটনারাজি এই ছবিতে রূপায়িত। দীর্ঘ গবেষণার ভিত্তিতে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিজয় বসু ছবিটির পরিচালক। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ছবির নাম-ভূমিকায় অবতরণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের রূপসজ্জায় দেখা যাবে অমরেশ দাশকে। ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন চন্দনা আদিত্য, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, অসিতবরন, রবীন মজুমদার, কালী সরকার ও দিলীপ রায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন অনিল বাগচী।

নিয়তি ও ক্লৈব্য যখন মানুষকে অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন আত্মনিগ্রহ ও সমাজের লাঞ্ছনাই তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। দৈহিক ও মানসিক অবক্ষয় এবং সামাজিক অবমাননা থেকে তার মুক্তির উপায় কী, এবং কোন্ পথে? এই গভীর মানবিক সমস্যার অবতারণা ও এর সমাধানের ইঙ্গিতটিকে কেন্দ্রবিন্দু করে "সূর্য-স্নান"-এর বলিষ্ঠ ও ভিন্নধর্মী কাহিনী রচনা করেছেন শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। ছবির ভূমিকালিপির পুরোভাগে রয়েছেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র। অন্যান্য প্রধান শিল্পীরা হলেন ছবি বিশ্বাস, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, সবিতাব্রত দত্ত ও লিলি চক্রবর্তী। সুর-সংযোজনা করেছেন তি বালসারা।

* * *

জালান প্রোডাকশন্সের **"হাঁসুলি বাঁকের উপকথা"র** চিত্রগ্রহণ আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে। এই বহির্দৃশ্য-প্রধান ছবির অধিকাংশই তোলা হয়েছে বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলে। অন্তর্দৃশ্যগুলি তোলা হচ্ছে স্টুডিও কো-অপারেটিভের সাউণ্ড স্টেজে। এই সপ্তাহ থেকে এর শেষ সেটে কাজ শুরু হয়েছে। তারাশঙ্করের এই অনন্য কাহিনীর চিত্ররূপে যাঁদের বিভিন্নাংশে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, নিভাননী, লিলি চক্রবর্তী, প্রশান্তকুমার ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তপন সিংহ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে এ-ছবির পরিচালক ও সুরকার।

রাজেন তরফদারের পরিচালনায় শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র **"অগ্নিশিখা"** সমাপ্তপ্রায়। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে এর শেষ পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এর কাহিনী মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ। কণিকা মজুমদার ও বসন্ত চৌধুরী এর দুই

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "সূর্যস্নান"-এর একটি দৃশ্যে শম্ভু মিত্র ও ছবি বিশ্বাস

মুখ্য শিল্পী। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, দ্বিজু ভাওয়াল, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন ও নবাগতা শর্মিষ্ঠা। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

* * *

দেবী চিত্রমের প্রথম ছবি **"ওরা কারা"** বীরেশ্বর বসুর পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর
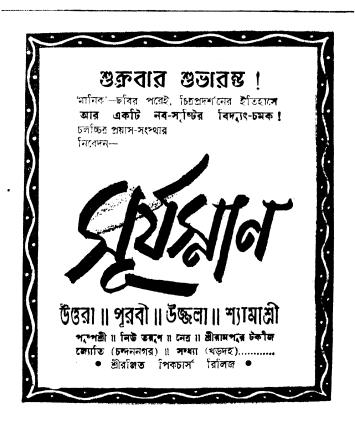
বাদল পিকচার্সের "আগুন"-এর দুটি মুখ্য ভূমিকায় কণিকা মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

হচ্ছে। নায়িকার ভূমিকায় একটি নতুন শিল্পীকে এতে দেখা যাবে। নাম নন্দিতা দে। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন অসীমকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা গুহ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্বর্গত তুলসী চক্রবর্তীকেও একটি ছোট ভূমিকায় দেখা যাবে।

বীরেশ্বর বসু পরিচালিত একটি পরিচ্ছন্ন ডকুমেণ্টারি ছবি দেখার আমাদের সম্প্রতি সুযোগ হয়েছিল। ছবিটির নাম **"মাটি ও শিল্পী"**, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের নিয়ে তোলা। কেমন করে সুদূর অতীতে কৃষ্ণনগরে এই চারুশিল্পের পত্তন হয়, ভারতের বাইরেও কৃষ্ণনগরের পুতুল কী সমাদর লাভ করে—এই ধরনের বহু মূল্যবান তথ্য-সংবলিত এই প্রামাণিক ছবির প্রধান আকর্ষণ কিন্তু মৃৎশিল্পীদের তৈরী নানা ধরনের মূর্তি ও অন্যান্য হাতের কাজ। ছবি তোলার নৈপুণ্যে মৃৎশিল্পের এই নিদর্শনগুলিকে মনে হয় যেন রক্তমাংসের মানুষ, প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপাদান, সত্যিকারের ফল-পাকড়—এমনি সব। ধারাবিবরণীতে রবীন্দ্র-কাব্যের বাছা-বাছা অংশের উদ্ধৃতি প্রশংসনীয়, তবে উদ্ধৃতির মাত্রা একটু কম করতে পারলে ভাল হত। অল্প পরিসরে বহু কথা বলতে যাওয়ার যা ফল, ছবিটির অংশবিশেষে তা ঘটেছে। দ্রুত আবৃত্তির ফলে একটি পঙ্‌ক্তির রস মনে সঞ্চারিত হবার আগেই পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি শ্রবণকুহরে এসে ভিড় জমিয়েছে, ফলে রসোপলব্ধিতে বাধা ঘটেছে। এ সত্ত্বেও ছবিটি দর্শকদের খুশী করবে এর অন্যান্য গুণের জন্যে। ছবিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তুলেছেন উদয়ন প্রোডাকশন্স। গণেশ বসু এর আলোকচিত্রশিল্পী এবং সম্পাদনা করেছেন অজিত দাশ। দুজনেই প্রশংসার পাত্র।

• • •

গত এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে দুটি নতুন ছবির কাজ শুরু হয়েছে। ফিল্ম ফোলিও নামক একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান **"ছাদিয়াঁ দি ডোলি"** নামে একটি পাঞ্জাবী ছবির মহরত সম্পন্ন করলেন গত ৩রা ফেব্রুয়ারী। লাল এস কালসি এর পরিচালক। সুর যোজনা করবেন বেদ পাল।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সুচিত্রমের সদ্য-আরব্ধ ছবি **"ময়ূরাক্ষীর ধারে"**র কয়েকটি গান বাণীবদ্ধ করা হল নবীন সুরকার অমল দাশগুপ্তের পরিচালনায়। গানগুলি গাইলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রচনার কৃতিত্ব মোহিনী চৌধুরীর।

• • •

আঠারো বছর আগে ভি শান্তারামের প্রযোজনা ও পরিচালনায় রাজকমল কলা-মন্দির **"শকুন্তলা"** নামে যে ছবি তোলেন, তাতে দুষ্মন্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পরলোকগত নায়ক-অভিনেতা চন্দ্রমোহন। ঐ ভূমিকায় শান্তারাম চিত্রাবতরণ করেন বলে যে খবর ছাপা হয়েছিল তা ঠিক নয়।

মেট্রোয় "স্পার্টাকাস"

বহুপ্রতীক্ষিত এবং চারটি অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত "স্পার্টাকাস" ছবিটি বর্তমান সপ্তাহে মেট্রোয় মুক্তিলাভ করেছে। কার্ক ডগলাস, লরেন্স অলিভিয়ার, জীন সীমনস, চার্লস লটন, পিটার উস্টিনভ, টনি কার্টিস ও জন গেভিন এই ছবির শিল্পীদের পুরোভাগে রয়েছেন।

হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী এই ছবিতে থ্রেস দেশীয় ক্রীতদাস স্পার্টাকাসের বীরত্ব ও প্রণয়ের কাহিনী রূপায়িত। স্পার্টাকাসের সংগ্রাম ছিল ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে। প্রায় দুই হাজার বছর আগে নিপীড়িত ক্রীতদাসদের সুশিক্ষিত সেনানীরূপে গড়ে তুলে রোমের রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহী নেতা কেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াল, তা নিয়েই ছবির রোমাঞ্চপূর্ণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-পর্বটি রূপ নিয়েছে। স্পার্টাকাস ও এক ক্রীতদাস-কন্যার প্রণয় ও বিবাহ নিয়ে গড়ে উঠেছে ছবির মধুর প্রেমোপাখ্যান। রোমের রাজশক্তির কাছে পরাজিত হল স্পার্টাকাস। ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হল তাকে। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেল তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র। রোম থেকে পালাবার পথে ক্রুশবিদ্ধ স্পার্টাকাসের সামনে এসে দাঁড়াল তার স্ত্রী, কোলে নবজাত শিশু। পরম দুঃখের মধ্যে স্ত্রী জানাল তার মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে—তাদের সন্তান স্বাধীন। ক্রীতদাস হয়ে তাকে বাঁচতে হবে না।

মহৎ বেদনায় চিত্র-কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বেদনার প্রস্তুতিতে দানা বেঁধে ওঠে মানবিক অনুভূতি ও দুর্বার নাট্য-

কৌতূহল। দর্শকের মনকে আবেগে আপ্লুত ও দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করে রাখার মত একটি রসোত্তীর্ণ ছবি "স্পার্টাকাস"। প্রতিভাবান শিল্পীদের অত্যাশ্চর্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই ছবিটি সুপার টেকনিরামায় গৃহীত এবং টেকনিকালারে রঞ্জিত।
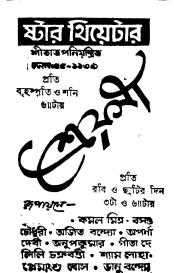
নাম-ভূমিকায় অভিনেতা কার্ক ডগলাস ছবিটির অন্যতম প্রযোজক। স্টেনলি কুবরিক এর পরিচালক।

নাট্যাভিনয়

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রঙমহলে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-পরিষদের সভ্যরা অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নতুন হাস্যরসাশ্রিত ব্যঙ্গ নাটক "উদ্বার্ষিকী" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। ভিন্নধর্মী ও সমাজচেতনায় সমৃদ্ধ এই নাটকের অভিনয়াংশে ছিলেন নাট্যকার অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, বিমান গুপ্ত, সমীর চট্টোপাধ্যায়, কুসুমিকা বাগচী, কাজল ঘোষ ও ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার স্বয়ং।

*

শ্রীমা'র জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির ও শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আগামী রবিবার (১৮ই ফেব্রুয়ারী) নিউ এম্পায়ারে সকাল দশটায় শ্রীমা রচিত একাঙ্ক নাটিকা "ভাবীকালে" ও গলস্‌ওয়ার্দি'র "জাস্টিস"-এর ছায়াবলম্বনে সত্যেন অধিকারী রচিত "মানদণ্ড" মঞ্চস্থ হবে। আলোকসম্পাত ও যন্ত্রসংগীত পরিচালনায় থাকবেন যথাক্রমে তাপস সেন ও মুকুল দাশ।

*

"শ্রেয়সী"র পর স্টার থিয়েটারের নতুন নিবেদন "শেষাগ্নি"র প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত-প্রায়। শক্তিপদ রাজগুরুর "শেষনাগ" উপন্যাস অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকটি রচনা করেছেন। বর্তমান যুগ-সমস্যার পটভূমিতে রচিত এই নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলির রূপ দেবেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, সুখেন দাশ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার ও শীলা পাল। নাটকের শিল্পী-গোষ্ঠীতে নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বাসবী নন্দী, আশিসকুমার, বীরেশ্বর সেন, সাধনা রায়চৌধুরী ও আশা দেবী। নাটকটি পরিচালনা করবেন নাট্যকার। দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বসু। আগামী মার্চ মাসের প্রথমেই নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি অভিনীত নূতন নাটক "উদ্বার্ষিকী"র একটি দৃশ্যে কেয়া চক্রবর্তী, কাজল ঘোষ ও নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায়

*

গত ৫ই জানুয়ারী মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র-দপ্তরের নাট্য-সমিতির উদ্যোগে ধনঞ্জয় বৈরাগীর "রূপোলী চাঁদ" সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ হয়। নিত্যানন্দ, শংকরনারায়ণ, সমীর ঘোষ, সুভাষরঞ্জন গুহ, মুরারি ধর, জিতেন ধর ও রানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

*

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে রূপকার সম্প্রদায় প্রতি সোম ও বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্রনাথের "কালের যাত্রা" নিয়মিতভাবে মুক্ত অংগনে মঞ্চস্থ করছেন। নির্দেশনা ও মঞ্চ-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে সবিতাব্রত দত্ত ও খালেদ চৌধুরী।

*

গত রবিবার (১১ই ফেব্রুয়ারী) সকাল সাড়ে দশটায় মিনার্ভা থিয়েটারে পঞ্চমিত্রমের প্রযোজনায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রমত্ত প্রহসন" ও "আজকের উত্তর" নাটিকা দুটি অভিনীত হয়। শ্যামল রায় পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন।

*

রূপকৃৎ-এর উদ্যোগে রঙমহলে সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের "বিপ্রদাস" নাটকাকারে অভিনীত হল। নাম-ভূমিকায় নাট্য-পরিচালক দিলীপ-কুমার নাগের অভিনয় উচ্চ প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল।

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনাধীনে নির্মীয়মাণ "অভিযান" ছবির একটি দৃশ্যে রুমা গুহঠাকুরতা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

শৌভনিক প্রযোজিত 'ল' ল' না'র আদালত দৃশ্যে বিনতা রায়, নিবেদিতা দাশ, সুমিত্র গুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও টুলু মুখোপাধ্যায় —ফটো : অলক মিত্র

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আটলান্টিক (ইস্ট) রেকিট অ্যান্ড কোলম্যান রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা "জব চার্নকের বিবি" নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। ডাঃ প্রতাপ চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন মণি দত্ত। গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় নাটকটি পরিচালনা করেন।

শৌভনিক-এর "ল' ল' না"

ললনা নয়। "ল' ল' না"—অর্থাৎ আইন নয়, আইন নয়। আইন, আদালত ও আইনজীবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না। মেজর রায়ের এই কঠিন পণ। তাঁর জীবন-দর্শনও বলা চলে। নিজের দুই পুত্র ও একমাত্র কন্যাকে তিনি এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, সংসারে একবার যদি আইনের অনুপ্রবেশ ঘটে, তবে তা ছারখার হয়ে যাবে। অতএব আইনজীবীর সংস্রব বিষবৎ বর্জন করে চলতে হবে।

মেজরের দুই পুত্র কিন্তু এদিকে হৃদয়দান করেছে দুই আইনজীবী তরুণীকে। বড়জনের প্রণয়িনী অ্যাটর্নি, অনুজের প্রেয়সী ব্যারিস্টার। ওরা সহোদরা। মেজর এই দুঃসংবাদ জানতে পেরে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত দুই সহোদর তাদের ভাবী শ্বশুরের সহায়তায় কীভাবে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পেল, অর্থাৎ কেমন করে দুই আইনজীবী তরুণীকে পুত্রবধূরূপে সানন্দে স্বীকার করে নিলেন মেজর তা নিয়েই শৌভনিক-এর "ল' ল' না"র রসকাহিনী রচিত।

"ল' ল' না" নাট্য-প্রহসনটি রচনা করেছেন নিবেদিতা দাশ। প্রহসনের যা ধর্ম, তা এই নাটকে পুরোপুরি বিদ্যমান। স্বতঃস্ফূর্ত রঙ্গরসে নাটকটি উপভোগ্য।

দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চস্থ এই নাটকটির পরিচালক বীরেশ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নাট্য-পরিচালনার বৈশিষ্ট্য এই, নাটকের গতি কোন দৃশ্যে বা অংশে মন্থর হয়ে পড়েনি। স্বচ্ছন্দগতি এই নাটকের প্রতি দৃশ্যে তিনি কৌতুকের উপকরণ জড়ো করে তুলেছেন। কৌতুকের উপাদান সব ক্ষেত্রে বাস্তবের যুক্তি ও সঙ্গতিকে অনুসরণ করে চলতে পারে না। এই নাটকেও তা পারেনি। কিন্তু সার্থক কৌতুকের যা স্বরূপ—যা অতিমাত্রায় স্থূল বা কষ্ট-কল্পনাশ্রয়ী নয়—তা এই প্রহসন-নাটকের প্রয়োগ-কর্মে লক্ষণীয়। এক কথায় নাটকটি নাট্যরসিকদের সান্ধ্য-আমোদের একটি সুখভোগ্য সুন্দর আয়োজন।

সম্মিলিত অভিনয়-উৎকর্ষের দিক থেকেও নাটকটি সমৃদ্ধ। তবুও শিল্পীদের মধ্যে যিনি নিপুণ কৌতুকাভিনয়ে দর্শকদের সর্বাধিক আনন্দ দেন, তিনি নাট্য-পরিচালক বীরেশ মুখোপাধ্যায়। মেজরের চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবান করে তোলেন। মেজরের দুই পুত্রের চরিত্রে সুধাংশু মন্ডল ও গোপেন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী। এঁদের দুই প্রণয়িনীর রূপ-সজ্জায় নিবেদিতা দাশ ও বিনতা রায়ের অভিনয় সুচারু ও স্বচ্ছন্দ। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে নিখুঁত অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন মিনতি চক্রবর্তী, গোবিন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, পতাকী মুখোপাধ্যায় ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্যা মজুমদার, প্রণতা নন্দী, রমা গোস্বামী, সুমিত্র গুপ্ত, নিমু ভৌমিক, টুলু মুখোপাধ্যায়, গোপাল সান্যাল, অমিয় বসু ও বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটকের মঞ্চসজ্জা রসবোধ ও কল্পনা-শক্তির পরিচায়ক।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রবেন-দবে প্রোডাকশন্স-এর "আশিক" চিত্রের দুই প্রধান শিল্পী পদ্মিনী ও রাজকাপুর

অভিনব সংগীত-বাসর

গত রবিবার (১১ই ফেব্রুয়ারী) সকালে নিউ এম্পায়ারে একটি অভিনব সংগীত-বাসরের আয়োজন করেন "সাজ ও আওয়াজ" সংস্থা। এই সংস্থার কর্ণধার প্রখ্যাত যন্ত্র-সংগীতশিল্পী ভি বালসারা। সুরকার শ্রী বালসারা তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিল্পী ও কয়েকজন অতিথি শিল্পীর সহযোগে যে সুর-বৈচিত্র্য পরিবেশন করেন, তার বিষয়বস্তু ছিল রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস"।

সিমফনি-রীতিতে রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত কবিতাটির যে সুরধর্মী-রূপ তিনি পরিবেশন করলেন, সেটি একটি বিরল 'পরীক্ষামূলক প্রয়াস'। এই প্রয়াসে তিনি সুধীজনের সাধুবাদ অর্জন করেছেন। কবিতাটির সাংগীতিক রূপায়ণে প্রায় চল্লিশ জন শিল্পী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে

সপ্তক প্রাইভেট লিমিটেডের "বন্ধন"-এর একটি দৃশ্যে রেণুকা রায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। কবিতার বিশেষ বিশেষ অংশের ভাবরস অনুযায়ী সুর-রচনায় রাগসংগীতের সংগে লোক-সংগীতের সুন্দর সমন্বয়টি রূপমাধুর্যের পরিচায়ক। যন্ত্রসংগীতের মধ্যে একক বাঁশি ও সম্মিলিত বেহালার ব্যবহার খুবই চিত্তাকর্ষক হয়।

কবিতাটির সংগীত-রূপ শুরু হবার আগে এটি আবেগদীপ্ত ও মরমী অভিব্যক্তিতে আবৃত্তি করে শোনান বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এর পূর্বে ইংরেজীতে কবিতাটির সারাংশ পাঠ করে শোনান শম্ভু মিত্র। কবিতার সুর-রূপায়ণের সংগে সংগে কবিতার চরণ পর্দায় পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা করা হয়। এ-কৃতিত্ব তাপস সেনের।

অনুষ্ঠানের প্রথমে ভি বালসারা "আহীর ভৈরোঁ" রাগটি পিয়ানোতে বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। পিয়ানোর সংগে বেহালা ও তবলার ঐকতান খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্ত্য রীতিতে ভারতীয় সংগীত-রচনার এই প্রয়াস বিরল। বিশেষত সুর-রচনায় কবিতার মর্মরূপ ফুটিয়ে তোলার এই প্রচেষ্টা সত্যিই অভিনব। এই মনোগ্রাহী ও অভূতপূর্ব সাংগীতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভি বালসারা রসিকজনের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন।

অগ্রগামী-গোষ্ঠীর নির্মীয়মান ছবি "নিশীথে"-র অন্যতম প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের রূপ-সজ্জায় সুপ্রিয়া চৌধুরী

অনুষ্ঠান সংবাদ

শৈল-শহর সিমলায় সম্প্রতি আইস স্কেটিং ক্লাবের বাৎসরিক কার্নিভ্যাল মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সব দিক দিয়েই উপভোগ্য হয়েছিল। সিমলার প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেই বহু দর্শক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

জনৈক পত্রপ্রেরক জানাচ্ছেন যে, ভারত-বর্ষের আর কোথাও সিমলার মত উন্মুক্ত আকাশের তলে স্কেটিং রিংক নেই। সিমলা আইস স্কেটিং ক্লাবের সভাপতির পদে পাঞ্জাবের প্রাক্তন বিচারপতি জি ডি খোসলা বহুকাল যাবৎ অধিষ্ঠিত আছেন। পত্রপ্রেরক আরো জানাচ্ছেন, শীতকালে সিমলায় স্কেটিংই একমাত্র স্পোর্টস। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বয়স্করা পর্যন্ত দুই বেলা মনের আনন্দে জমাট বরফের ওপর স্কেটিং করেন।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের অর্থেই তৈরী হয়েছিল। কাকা প্রিন্স হিট্টি ছিলেন ক্রিকেটের নাম-করা মারমুখী খেলোয়াড়। দাদা কোচবিহারের বর্তমান মহারাজা জগৎ দীপেন্দ্র নারায়ণ তো বাঙলার প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক। তা ছাড়া ফুটবল, টেনিস, পোলো, গলফ সব খেলাতেই সিদ্ধহস্ত।

গায়ত্রী দেবীর মাতৃকুল বরোদার রাজ-পরিবারও চিরদিন ক্রীড়ানুরাগী। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ-সভাপতি বরোদার মহারাজার উপরই পড়েছিল ১৯৫৯ সালের ইংলন্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজারের ভার।

শ্বশুরকুলেও ক্রীড়াপ্রীতি। স্বামী জয়পুরের মহারাজা নিজে একজন বিশ্বখ্যাত পোলো খেলোয়াড়। সুতরাং গায়ত্রী দেবীর অঙ্গে শুধু সোনা-মুক্তো-মাণিক্যের ঘটাই নয়—খেলাধুলোও অঙ্গের ভূষণ।

যখন জয়পুরে তখন একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তদারকি করেন আঠারোটা ঘোড়ার। সবগুলো তাঁর পোলো খেলার। সাঁতার কাটেন প্রাসাদের সুইমিং পুলের স্ফটিকজলে। যখন কলকাতায় তখন টেনিস খেলেন সাউথ ক্লাবে। যখন ইংলন্ডে কিংবা সুইজারল্যান্ডে তখন পালতোলা নৌকোয় সওয়ারী হয়ে উড়ে যান। আর যখন খেয়াল হয় ভারতের বাগানে বাগানে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়ান শিকারের উদ্দেশে। গায়ত্রী দেবী নিজের হাতে সাতাশটি বাঘ মেরেছেন শুনে ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথ তো অবাক।

প্রতিযোগিতামূলক খেলা বলতে তাঁর শুধু টেনিস। বেশী দূর এগুতে পারেননি। শুধু খেলেছেন জাতীয় প্রতিযোগিতায়, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। কিছুদিন যুক্তও ছিলেন পরিচালকদের সঙ্গে। অনেকেরই জানা আছে টেনিস খেলোয়াড় আখতার আলীর প্রথমবারের বিদেশ সফরের সব খরচটাই এসেছিল গায়ত্রী দেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে।

তবে টেনিসের চেয়েও ব্যাডমিন্টনে মহারানীর দান অনেক বেশী। ১৯৫৫ সাল। জয়পুরে জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আসর। লাখখানেক টাকা খরচ করে অশোক ক্লাব মহারানী আধুনিক ধরনের শুধু একটি কভার্ড কোর্টই তৈরি করে দিলেন না, প্রতিদিন নিজে কোর্টে উপস্থিত হয়ে কোর্ট ঝাঁট দেওয়া থেকে আরম্ভ করে প্রতিযোগিতার সব ব্যবস্থা নিজের হাতে করতে লাগলেন। ফলে প্রতিযোগিতার শেষে ব্যাডমিন্টনে ওঁর আন্তরিকতা দেখে বিভিন্ন রাজ্যের ব্যাডমিন্টনের মাতব্বররা ওঁকে জাতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভানেত্রীর পদে বরণ করে নিল। দু' বছর দক্ষতার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করবার পর স্বেচ্ছায় সভানেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

ফারপো রেস্তোরাঁয় ব্যাডমিন্টনের এক ভোজসভায় মহারানী কোচিং সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তা শুনে সত্যিই আমরা ওঁর প্রগতিশীল মনোবৃত্তির প্রশংসা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন—'আমি চাই না বিভিন্ন কেন্দ্রে বড় বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন হোক আর দেশের নাম-করা খেলোয়াড়রা সেখানে ভিড় করুক। তার চেয়ে জেলায় জেলায় শহরে শহরে ভূরি ভূরি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কর, আর উপযুক্ত কোচ এনে সেখানকার খেলোয়াড়দের উন্নত শিক্ষায় পটু করে তোলো। এতে খেলার জনপ্রিয়তা বাড়বে, দেশে খেলোয়াড় বাড়বে। তৈরি হবে গুণী ও কৃতী খেলোয়াড়।

মহারানী গায়ত্রী দেবী ক্রিকেটের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠলেও নিজে কিন্তু ক্রিকেট পছন্দ করেন না। ক্রিকেট মাঠে বড় একটা দেখাও যায় না তাঁকে।

শিক্ষা-দীক্ষা ইংলন্ড ও সুইজারল্যান্ডে। শান্তিনিকেতনেও পড়েছেন কিছুদিন। আগে বলেছি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। গুণ তো এক রকমের নয়। খেলাধুলো নাচ-গান বাদ দিচ্ছি। এ ছাড়া প্রজাদের জন্য দরদ আছে, ছাত্রদের জন্য সহানুভূতি। মেয়েদের জন্য একটি স্কুল করে দিয়েছেন জয়পুরে, যার নাম মহারানী গায়ত্রী দেবী স্কুল। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়েছেন হোস্টেলের জন্য। থাকেন প্রাসাদের এক পাশে। প্রজারা বলে মহারানী। এই মা-রানীই এবার রাজস্থান থেকে লোকসভার প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মহারানী এখন রাজাজীর দলে। স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থী।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৫শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় 'খেলাধুলোর মহিলা' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীনমিতা সান্যালের পিতার নাম জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল। মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ জ্ঞানেশ নারায়ণ সান্যাল প্রকাশিত হইয়াছে।

জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবীর টেনিস খেলার ভঙ্গি

দেশী সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী—স্যার জন সার্জেণ্টের রিপোর্ট অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছয় হাজারের অধিক হইতে দেওয়া উচিত নহে। এক একটি কলেজে কয়েকটি শিফটে কয়েক হাজার ছাত্র পড়ান হইবে, তাহাও কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

চাষ আবাদের মরসুম ছাড়া বৎসরের অন্যান্য সময় চাষীদের কর্মসংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় ১০টি করিয়া এবং ত্রিপুরায় ৩টি, মোট এই ৪৩টি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার কল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

৬ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দিবার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ এই যে, সরকারী আমলাদের 'অব্যবস্থা' এবং অনেক ক্ষেত্রে 'কর্তব্যে অবহেলা'র দরুন এই ব্যাপারে সরকারী আশ্বাস প্রহসনে পরিণত হইয়াছে।

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ২৭ জন কংগ্রেসকর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ঐ সব ব্যক্তি আগামী ৬ বৎসরের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—যে সকল ঐতিহাসিক, অধ্যাপক এবং গবেষণাকারী জাতীয় মহাফেজখানা ও ভারত সরকারের তথ্যাদি ও নথিপত্র ব্যবহার করিতে চান তাঁহারা যে অসুবিধায় পড়িয়াছেন সে সম্পর্কে মহাফেজখানা ও সরকারী নথিপত্র পাওয়া সংক্রান্ত নিয়মকানুন সংশোধনের জন্য বৎসরাধিক কাল আগে একটি কমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ করা সত্ত্বেও এ যাবৎ কিছুই করা হয় নাই।

১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি শিয়ালদহ-রাণাঘাট এবং দমদম-বনগাঁও লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন যাতায়াত করিবে। ভারতের রেলের বৈদ্যুতিকরণ বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার এবং চীফ ইঞ্জিনীয়ার অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে উক্ত তথ্য বিবৃত করেন। তিনি জানান, শিয়ালদহ ডিভিশনের দক্ষিণাংশের বৈদ্যুতিকরণ ১৯৬৫ সালে শেষ হইবে।

গতকাল সন্ধ্যায় হুগলী জিলায় সাণ্ডেলা তহশিলের এক গ্রামে কংগ্রেস ও জনসংঘ কর্মীদের মধ্যে এক নির্বাচনী সংঘর্ষের ফলে তিনজন নিহত এবং চৌদ্দজন গুরুতর আহত হইয়াছে। একজন কনেস্টেবলও বন্দুকের গুলীতে সামান্য আহত হইয়াছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী—দাশ কমিশন রিপোর্ট দিয়াছেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে যে সব তথ্য পেশ করা হইয়াছে তাহাতে পাঞ্জাবের শিখদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতের রেলমন্ত্রীর নিকট হইতে 'সবুজ সিগনাল' পাইয়া গতকাল (শুক্রবার) দুপুরে পূর্ব রেলপথের নবনির্মিত বারাসত-বসিরহাট-হাসনাবাদ লাইনে যাত্রীভর্তি একটি বিশেষ ট্রেন হাসনাবাদের পথে প্রথম যাত্রা শুরু করে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ভোট-গণনার কাজ পাঁচ দিনের মধ্যেই শেষ করা হইবে বলিয়া জানা যায়। উহা ২৫শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইয়া ১লা মার্চ পর্যন্ত চলিবে। কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের কোন কোন কেন্দ্রে ১লা মার্চ ভোট গণনা হইবে।

ফালাকাটা হইতে নেতাজীর কয়েকজন পুরাতন সহকর্মীর আগমনের ফলে কোচবিহারে জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে শৌলমারী আশ্রমের রহস্যজনক সাধুকে অনেকে নেতাজী বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহার চেহারা, দৈর্ঘ্য এবং দেহের কয়েকটি চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, তিনিই নেতাজী।

পশ্চিমবঙ্গে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০টি গ্রামে শিশুদের জন্য পার্ক নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী— বাঙলার খ্যাতিমান কবি, সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস অদ্য বিকালে তাঁহার বেলগাছিয়ার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

ব্যক্তি হিসাবে ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিলের সেক্রেটারী হিসাবে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এবং স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসরোজ মুখার্জি ও ঐ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীসন্তোষ চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী এ কে সেন কলিকাতা হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

বিদেশী সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন সরকার হল্যাণ্ডকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিমানযোগে পশ্চিম ইরিয়ানে সৈন্য প্রেরণের জন্য মার্কিন এলাকা ব্যবহারের কোন সুযোগ অতঃপর দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি জাকার্তাস্থ মার্কিন দূতাবাসের উপর হামলার ফলেই মার্কিন সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনে নির্ভরযোগ্য মার্কিন মহল হইতে বলা হইয়াছে যে গত এক বৎসরের মধ্যে কিউবা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের নিকট হইতে ৫০ হইতে ১০০টি সোভিয়েট জেট জঙ্গী বিমান এবং ১৫০ হইতে ২০০টি ট্যাঙ্ক পাইয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিবাদে শোভাযাত্রা বাহির করিতে গেলে ছাত্রদের সহিত পুলিসের তুমুল সংঘর্ষ হয়। শুধু পুলিসের লাঠি নহে, রমণা গেটে সৈন্যদল তাহাদের উপর তিন রাউণ্ড গুলীও চালায়।

গোয়ায় ভারতের অভিযান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য বৃটিশ প রাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউমের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধী শ্রমিক দল যে নিন্দা-প্রস্তাব আনিয়াছিল, কমন্সসভায় তাহা ২২৮-৩২৬ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—পূর্ব পাকিস্তানে জঙ্গী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অদ্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করিয়া যে মিছিল বাহির হইয়াছিল তাহা আয়তনে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মিছিল অপেক্ষাও বড় হইয়াছিল। ক্ষুব্ধ জনতা আয়ুবের ছবি রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার আয়ুবের ছবিতে জুতার মালা পরাইয়া দিয়াছে। বলদর্পী আয়ুব খাঁ গোপনে পূর্ব পাকিস্তান হইতে করাচীতে চম্পট দিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, গত মঙ্গলবার ঢাকা শহরে ছাত্রদের মিছিলে মিলিটারী যে গুলী চালায় তাহাতে দশজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহতদের মধ্যে তিনজন বুধবার হাসপাতালে মারা যায়। পূর্ব পাকিস্তান হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, বুধবার সকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল বরিশালের সুবিখ্যাত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার টাউন হলে অগ্নিসংযোগ করে। সামরিক শাসনের আমলে এই হলটির নাম 'আয়ুব খাঁ হল' রাখা হয়।

সংবাদে জানা গেল, সৈন্যবাহী একটি ডাচ বিমানকে টোকিওতে অবতরণ করিতে দিতে জাপান গতরাত্রে অস্বীকার করে। হল্যাণ্ডের সরকারী বিমান কোম্পানী কে এল এম-এর এই বিমানটি সাদা পোশাক পরিহিত ৬০—৭০ জন সৈন্য লইয়া পশ্চিম ইরিয়ানে যাইতেছিল।

১০ই ফেব্রুয়ারী—গতকাল অধিকরাত্রে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলেও নূতন করিয়া হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িতেছে। নরসিংদি ও পিরোজপুরে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া 'আপত্তিকর' শ্লোগান দেয়। বরিশালে দ্বিতীয় দিনেও ছাত্র বিক্ষোভ চলিতে থাকে।

রাশিয়া আজ ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্সকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিরাইয়া দিয়াছে শ্রীরুডল্ফ আবেলকে। পাওয়ার্স ছিলেন এক মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের চালক এবং গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে তিনি রাশিয়ায় দশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আবেল গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে ত্রিশ বৎসর দণ্ডিত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—গত শুক্রবার এবং শনিবার চট্টগ্রামে ছাত্রদের ব্যাপক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ হয়। শনিবার নন্দনকাননে পুলিস ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ কালে পুলিস লাঠি ও গুলীচালনা করে। গুলীতে একজন নিহত ও ১৫ জন আহত হয় বলিয়া প্রকাশ।

নির্ভরযোগ্য মহলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, নেপাল সরকার যে হেলিকপ্টারখানি ক্রয় করিয়াছিলেন বিপ্লবীরা তাহা গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। সরকারের হেলিকপ্টার মাত্র একখানিই ছিল।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। **কলিকাতা : বার্ষিক—২০**, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
ফোন : ২৩—২২৮০। **স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।**

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 24th February, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ১৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১২ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

হিন্দী জবরদস্তি

আমাদের দেশে সরকারী, বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাধরগণের কাজকর্মের ধারা প্রায়ই দেখা যায় বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। অথচ এ-সব প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার সঙ্গে দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের ভালোমন্দ এবং ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ক্ষমতাধর যাঁরা তাঁদের কাছে লোকে সুবিবেচনা ও সুবিচার প্রত্যাশা করে। কিন্তু অনেক সময়েই সুবিচারের চেয়ে অবিচার ঘটে বেশী। "আমরা হুকুম আর অন্যের তামিল" এই তুঘলকী ঐতিহ্য আমাদের দেশের জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এরজন্য সাধারণত আমলাতন্ত্রের উপর দোষ দেওয়া হয়। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান স্বয়ংশাসিত, পুরোদস্তুর আমলাতন্ত্রের আওতায় নয়, সেগুলির অবস্থাই বা কি? কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা-বোর্ড, গ্রামপঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষাপর্ষদ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাধরগণও খুব সোজা জিনিসকে নিজেদের খুশীমত ঘোরালো করে কম অনর্থ ঘটান না। ফলে লোকের অশ্রদ্ধা বাড়ে, অসন্তোষ প্রবল হয় এবং কখনও কখনও অন্যায়ের প্রতিকারে ব্যর্থ হলে দেখা দেয় আন্দোলন, বিক্ষোভ।

কর্তৃপক্ষগণ কোনও বিষয়ে অসঙ্গত আবদার বা দাবি পূরণ করুন, আমাদের বক্তব্য তা মোটেই নয়। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এবং পরে তার ফলাফল কী হতে পারে সেটা বিবেচনা করা নিশ্চয়ই ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের কর্তব্য। একটি দৃষ্টান্ত। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি নির্দেশ দেন যে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রকেই মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হিন্দীতে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে হবে। নির্দেশটার উদ্দেশ্য এক কলমের খোঁচায় উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রশ্ন হল, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা যে-পরিমাণ হিন্দীপ্রেমী- সে পরিমাণ বিদ্যানুরাগী কি না। আরও কথা, এইসব বিদ্বান ব্যক্তিরা ক্ষমতা প্রয়োগের সময় ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ সম্পর্কে কিছুমাত্র সহানুভূতি পোষণ করেন কি না।

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত কলেজগুলির বহু ছাত্রছাত্রী অহিন্দী ভাষী; বাংলা ও তেলেগু-ভাষী এবং আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীর তুলনায় নিশ্চয়ই কম নয়। সংখ্যায় কম-বেশীর প্রশ্ন অবশ্য অবান্তর। কারণ অহিন্দীভাষীদের সমস্ত পাঠ্য বিষয়ে হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাই ঘোরতর অন্যায়, মারাত্মক জবরদস্তি। পশ্চিম বাংলার স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্রছাত্রী অবাঙ্গালী, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী পশ্চিম বাংলায় লেখাপড়া করে। আজ যদি হুকুম জারী করা হয় যে এই রাজ্যের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে যাবতীয় পাঠ্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তাহলে অবস্থা কী দাঁড়ায়? এর ফলে অবশ্যই বিহারের এবং অন্যান্য রাজ্যের বহু অবাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী যারা পশ্চিম বাংলায় শিক্ষার্থী, তাদের অবিলম্বে লেখাপড়ায় ইস্তফা দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। হিন্দীপ্রেমীদের সৌভাগ্য যে পশ্চিম বাংলায় এ-ধরনের তুঘলকী হুকুম চালু হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীপ্রেমী কর্তারা মূঢ়তা ও ক্ষমতান্ধতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে লজ্জিত নন।

কিন্তু রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই হিন্দীওয়ালাদের একচেটিয়া সম্পত্তি গণ্য হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞান অনুশীলন ও বিদ্যার প্রসার। আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী, বাংলা বা আর যাই হোক, তার প্রয়োজনমত চর্চায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই উদ্যোগী হতে পারে; তাতে আপত্তির কারণ নাই। আপত্তি তখনই যখন বহু ভাষী ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ হিন্দীর সাম্রাজ্যভুক্ত করায় চেষ্টিত হন। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ-ধরনের চেষ্টা কেবল ভাষামোহান্ধতার পরিচায়ক নয়, কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্ষমতামোহান্ধতার দৃষ্টান্ত হিসেবেও এর তুলনা মেলা ভার।

সরকারী, বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাধরগণ বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে যদৃচ্ছা হুকুম জারী করে থাকেন, এ-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দীতে পরীক্ষা দেওয়ার হুকুম দিয়ে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছেন তা এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জঘন্যতম নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারাও সম্ভবত জ্ঞানবান, বিদ্বান, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতিস্থ কি না সন্দেহ হয়। নতুবা বহু সহস্র অহিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রী যারা হিন্দী ভাষার মাধ্যমে তাদের পাঠ্য বিষয়গুলি চর্চা করে নি, তাদের অকস্মাৎ শুদ্ধ হিন্দীতে পরীক্ষা দেওয়ার হুকুম জারী করা হল কোন্ যুক্তিতে? রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী চান—ছাত্রছাত্রীদের অধীত বিদ্যা ও বুদ্ধির মূল্য বিচারের জন্য পরীক্ষা, না হিন্দীর ফাঁসে বহু সহস্র অহিন্দীভাষী ছাত্রীছাত্রীর সর্বনাশ? একেই বলে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের অসহনীয় মূঢ়তা, যার প্রতিবাদে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অহিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীরা অন্য উপায় না দেখে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছে।

ছাত্রদের আন্দোলন ও বিক্ষোভের প্রয়োজন হত না রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুগ্র হিন্দীপ্রেমী কর্তৃপক্ষ যদি ন্যায়পরায়ণ হতেন, সময়োচিত বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছু পরিমাণ নরম হয়েছেন, ঘোষণা করেছেন যে, এক বৎসরের জন্য পরীক্ষায় হিন্দী মাধ্যম প্রবর্তন স্থগিত রইল। কিন্তু একে ন্যায়বিচার বলা যায় না। হিন্দীকে শিক্ষা ও পরীক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসাবে চালু করা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সময়েই উচিত হতে পারে না। বিহারের হিন্দীপ্রেমীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অহিন্দীভাষীদের উপর এরকম জবরদস্তি করায় ক্ষান্ত না হলে গুরুতর অনর্থ ঘটবে; অহিন্দীভাষীদের মাতৃভাষায় কিম্বা ইংরেজীতে পঠনপাঠন ও পরীক্ষার অধিকার যদি হরণ করা হয় তাহলে পশ্চিম বাংলায় হিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীরাও তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিষ্কারভাবে সুদৃঢ় নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য যে, কোন রাজ্যেই শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যাপারে হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা চলতে পারে না।

নির্বাচন প্রথমে পশ্চিমবঙ্গেই শুরু হইয়াছে
গোখেলের বাণী মিথ্যা নয়
এ রাজ্য সর্বব্যাপারেই
অগ্রণী।
শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ একটি
বিবৃতি দিয়াছেন:
ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের
উদ্যোগ।
নেহরুর পরে কে?
কৃপালনীকে ভোট দিন
শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতীয় নির্বাচনের
ফলাফল এখন বৃহৎ
শক্তি গোষ্ঠীও
খুব আগ্রহভরে
লক্ষ্য করিবেন।
মেননকে ভোট দিন
অন্তত একটি
কেন্দ্রের যথাযথ
ত বটেই
প্রস্তাবিত ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক
ঐক্যসাধনে দ্য গলের সম্মতি মিলিয়াছে
উদ্যোগটা আডেনাওয়ারের
ইউরোপীয় ঐক্য প্রস্তাব
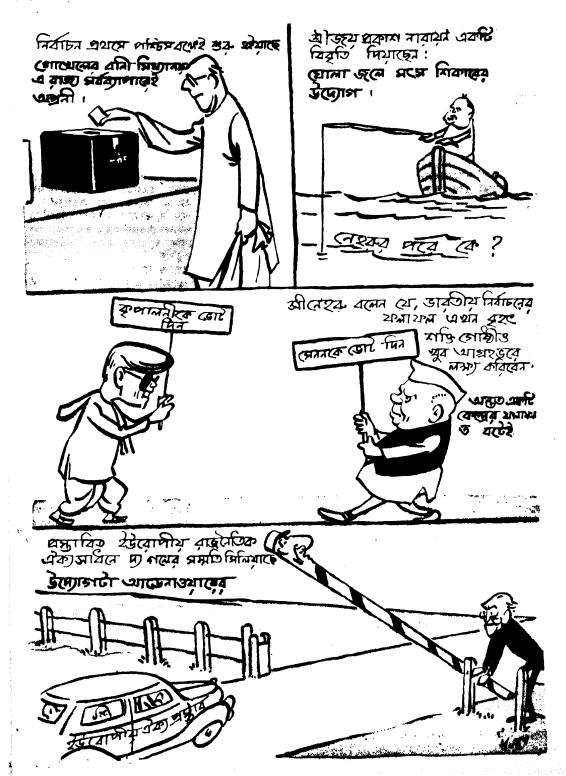
মানুষ মানুষের প্রতি কোথায় কী করছে সেই খবরই এখন মনকে সর্বদা ব্যস্ত বা ত্রস্ত করে রাখে। ভালোমন্দ যা কিছু সবেরই কর্তা মানুষ। আশা বা ভয় সবই মানুষের কাছ থেকে এই ভাবনাতেই মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ঝড় ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন এখনো ঘটে, তার খবরও কাগজে বেরোয়, কিন্তু সেগুলি এখন (সাক্ষাৎ ফলভোগীদের নিকট ছাড়া) "মার্জিনাল" খবর অর্থাৎ সেগুলি মনের প্রত্যন্তভাগ মাত্র ছুঁয়ে যায়। পূর্বে মানুষের মনে প্রাকৃতিক ঘটনার গুরুত্বের বোধ অনেক বেশী প্রখর ছিল। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ বশ করতে পেরেছে (আসলে মানুষ ভাবছে যে বশ করতে পেরেছে) বলে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের সমীহের ভাব আর নেই। সেজন্য মানুষের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার নিজস্ব গুরুত্ব যেন আর নেই। প্রাকৃতিক শান্তি মানুষের ভালোমন্দ এমন কিছু করতে পারে যাকে দান বা শাস্তি বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই ধারণা চলে গেছে বা চলে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে কুসংস্কার দূর হওয়া নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে একটু ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম থাকাও বোধহয় মানবসমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে দরকার। "অষ্টগ্রহ" নিয়ে যে হল্লাটা হোল তাতে যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিন্তু সেই ধরনের সম্ভ্রম মোটেই নয়। নামকীর্তন করে বা যজ্ঞে ঘি পুড়িয়ে প্রলয় আটকাবার ভরসা যাঁরা করেন তাঁদের মনোভাবের যথার্থ বর্ণনা করলে সেটা সুশ্রাব্য হবে না। প্রকৃতির শক্তি সম্বন্ধে যে স্বাস্থ্যকর ভয় বোধের কথা আমরা বলছি সেটা অন্য রকম জিনিস। সে ভয়বোধ যাঁদের হয় তাঁরা আর্তনাদ করেন না। তাঁরা মানব শক্তির সীমানা সম্বন্ধে যেমনি সচেতন তেমনি অনমনীয় তাঁদের আত্মসম্ভ্রমবোধ। তাঁরা জানেন যে প্রকৃতির শক্তি এমন রূপেও প্রকাশ পেতে পারে যাকে অলঙ্ঘ্য বিধান বলে মেনে নেওয়া—আর্তনাদ না করে, প্রাণভিক্ষা না চেয়ে মেনে নেওয়াই মানবাত্মার পক্ষে সম্মানকর এবং গৌরবজনক।

এই ধরনের যে "অদৃষ্টে বিশ্বাস" বা "অদৃষ্টকে" মানা, তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ পুরুষকারের কোনো অসঙ্গতি নেই, বরঞ্চ বলা যায় যে, এই ধরনের "অদৃষ্টে বিশ্বাস" ছাড়া মানুষের পুরুষকারও পূর্ণ হতে পারে না। তাগাতাবিজের সাহায্যে যাঁরা অদৃষ্টকে বশীভূত করতে চান তাদের মনোভাব এবং এ জিনিসের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান। আবার তাগাতাবিজে বিশ্বাস এবং মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ে যা খুসি করতে পারে এই বিশ্বাস, এ উভয়ই কিন্তু কুসংস্কার—অবশ্য দুটো দুরকমের এবং দুটোর বাস্তবে ফলও দুরকমের।

এসব কথা মনে এলো আজকের কাগজে উত্তর ইউরোপে ঝড়ের কবর পড়ে। জার্মানীর উপর দিয়ে যে বেগে ঝড় বয়ে গেছে সেটা নাকি অভূতপূর্ব। উদ্বেলিত সমুদ্রের আঘাতে বহু বাঁধ ভেঙ্গেছে, বহু শহর প্লাবিত হয়েছে, কত সম্পত্তি যে বিনষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, মানুষজনও অনেক মারা গেছে। ধ্বংসের পরিমাণের পুরো খবর এখনও পেতে বাকী।

(মোট কথা এই রকম কান্ড যদি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতবর্ষে ঘটত তাহলে বহুলোক নিঃসন্দেহে ভাবত যে, এটা "অষ্টগ্রহ সংযোগের" ফল এবং অষ্টগ্রহের কারবারীদের পসার বেড়ে যেত। এদের পসার এখনো বাড়তে পারে। নামকীর্তন এবং যাগযজ্ঞকারীদের চেষ্টায় পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে একথা বিশ্বাস করতে যারা প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের বুঝানো কঠিন নয় যে, যে-বিপদ সারা পৃথিবীকে প্রায় ঘিরে ফেরেছিল সেটাকে নামকীর্তন ও যাগ-যজ্ঞের দ্বারা মোটামুটি সরানো গেছে এবং

বিপদটা যে মোটেই অলীক ছিল না সেটা প্রমাণ করার জন্যই পৃথিবীর এক অংশকে একটু ছুঁয়ে দিয়ে গেল।)

কিছু কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর কাগজে হামেশাই থাকে, কিন্তু মনের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, মনুষ্যকৃত দুর্যোগ ছাড়া অন্য দুর্যোগ যেন আলোচ্য বিষয় বলেই বোধহয় না। জার্মানী সম্বন্ধে আজ কিছু লেখার কথা ভাবা গিয়েছিল। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট পশ্চিম জার্মানীর সংগে পৃথকভাবে একটা মিটমাটের সম্ভাবনার ইংগিত করে যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা করছেন বলে শুনা যায় সে বিষয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কিছু লেখা যেতো। সেই সংগে পশ্চিমা শক্তিদের নিজেদের মধ্যে যে কত এবং ভাবিবিরোধ রয়েছে তার কথাও এসে পড়ত। প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের প্রসংগ উঠলে তার সংগে আলজেরিয়ার কথা এবং বর্তমানে ফ্রান্সে যে প্রায়-গৃহ-যুদ্ধের অবস্থা উপস্থিত হয়েছে সে বিষয়েও উল্লেখ না করে পারা যেতো না। এবং যেহেতু খবরের কাগজী কায়দা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে লিখতে হলে সর্বশেষ ঘটনার উল্লেখ করে শুরু করতে হয় অতএব নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্সে পশ্চিমা, কম্যুনিস্ট এবং নিরপেক্ষ মিলে আঠারোটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের যোগ দিতে আহ্বান করে শ্রীক্রুশ্চভ যে প্রস্তাব করেছেন তার উল্লেখ প্রথমেই করতে হোত।

কিন্তু জার্মানির ঝড়ের সংবাদ পড়ে হঠাৎ কেন জানি না মনে পড়ে গেল যে মানুষ কে কোথায় কাকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে কেবল সেই আলোচনাই তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ করে যাচ্ছি, সে আলোচনা থেকে প্রকৃতির কথা তো এক-রকম নির্বাসিত বলা যায়। কেন? মানুষের উপর মানুষের শক্তি, প্রকৃতির উপর মানুষের শক্তি কেবল মানুষ এবং তার শক্তি, এই নিয়েই আলোচনা। জার্মানীর ভয়ংকর ঝড়ের খবর পড়ে হঠাৎ মনে হোল, ঝড়ের ধাক্কাটা কি কেবল মানুষের দেহ, ঘরবাড়ির উপরই লেগেছে, মানুষের মনে লাগাবার মতো কি তাতে কিছু নেই?

মানুষ মনে করে প্রাকৃতিক শক্তিকে আর ভয় করার দরকার নেই। প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় করা এবং ভূতপ্রেতকে ভয় করা একই জিনিস বলে আমরা মনে করতে শিখেছি। মানুষ মনে করে যে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে দাসীতে পরিণত করেছে। এখন সে ভয় করে নিজের শক্তিকে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যেটা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছে সেটা কি মানুষের শক্তি অথবা মানুষ যে প্রাকৃতিক শক্তিকে আবিষ্কার করেছে তাকে স্ববশে আনতে পারছে না বলেই সে ভীত? নিউক্লিয়ার শক্তি মানুষ আবিষ্কার করেছে, কিন্তু নিউক্লিয়ার শক্তিকে স্ববশে রাখার শক্তি তার নেই। মানুষ বস্তুজগতের শক্তিকে করায়ত্ত করেছে, কিন্তু সে তার নিজের প্রকৃতিকে বশে আনতে পারেনি। মানুষ জড়বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে আরোহন করেছে, কিন্তু তদনুযায়ী তার নৈতিক অগ্রগতি হয়নি, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মানব সমস্যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বর্ণনা কি ঠিক? আসলে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে স্ববশে এনেছে, এই কথাটাই ঠিক নয়। আসলে নিউক্লিয়ার শক্তিকে মানুষ বশ করতে পারেনি, মানুষের পক্ষে নিউক্লিয়ার শক্তিকে কোনোদিন বশ করা সম্ভব হবে কিনা, এ প্রশ্নও করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক জয় এবং নৈতিক পরাজয় এই সূত্র দিয়ে বর্তমান অবস্থার যে বিশ্লেষণ করা একটা ফ্যাশান হয়েছে, এই ফ্যাসানটার একটু গোড়া খুঁড়ে দেখা আবশ্যক।
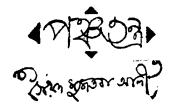
ধ্বনি

ইংরিজি পড়ে পড়ে আমাদের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, একই অক্ষরের বুঝি সাতান্ন রকমের উচ্চারণ হয়। Cat, bald, father, about-এর একই a চার রকম উচ্চারিত হচ্ছে। গল্প শুনেছি, এক ফরাসীকে fish শব্দ লিখতে বলা হলে সে লেখে ghoti. বললে, প্রথম gh=f কারণ laugh শব্দে gh-এর ঐ উচ্চারণ আছে। তারপর o=i কারণ women-এ o অক্ষর i-এর মত উচ্চারিত হয়। ti=sh, কারণ nation-এ ti-এর sh উচ্চারণ আছে!

কিন্তু লাতিন, ইতালিয়, রুশ এবং জর্মন ভাষা যেভাবে লেখা হয় মোটামুটি সেই-ভাবেই পড়া হয়। সংস্কৃত ও হিন্দীর বেলাও তাই। এমন কি যদিও ফরাসী শিখতে আরম্ভ করার সময় মনে হয় ভাষাটা বড় গোলমেলে তবু কয়েকদিন পরে কয়েকটি আইন নিজের থেকেই ধরা পড়ে। তখন ফরাসী পড়তে মোটামুটি আর কোনো ভুল হয় না। বাঙলা ইংরিজির মতই বিদঘুটে। আরবী ফার্সী এবং উর্দু না বুঝে পড়ার উপায় নেই, কারণ হ্রস্ব স্বর-বর্ণগুলো এসব ভাষায় দেখানো হয় না—কুরান শরীফ ও দু'একখানা ধর্মগ্রন্থ ছাড়া।

বাঙলার অ, ই (এবং ঈ), উ (এবং ঊ) উচ্চারণ হ্রস্ব নয়, দীর্ঘও নয়—মাঝামাঝি।

জর্মন ধ্বনি

জর্মন বানান ও উচ্চারণ খুব আইন মেনে চলে, ব্যত্যয় অতি অল্প।

a=hat, আমাদের বাঙলা 'আ'-এর চেয়ে হ্রস্বতর। জর্মন ভাষা (এবং ফরাসীতে) a কখনোই ইংরিজি হ্যাট (m) উচ্চারণ ধরে না। অবশ্য অন্য স্বরের সঙ্গে যুক্ত হলে আলাদা। পূর্বেই বলেছি লাতিন অক্ষর হ্রস্ব দীর্ঘ দেখায় না। তাই জর্মনে ঐ a কখনো হ্রস্ব কখনো বা দীর্ঘ হয়।

i-এর বেলাও তাই: কখনো হ্রস্ব ই কখনো সংস্কৃতের দীর্ঘ ঈ।

হ্রস্ব এ জর্মনে নেই, সংস্কৃতেও নেই। দীর্ঘ এ আছে। কখনো ee দিয়ে কখনো বা eh দিয়ে দেখানো হয়।

পরে বাঙলায় যখন ক্যান্ বলা হয় তখন যে m উচ্চারিত হয় সেটা ফরাসী জর্মন উভয় ভাষাতেই আছে, কিন্তু বোঝবার জন্য একাধিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম-

বাঙলার 'কেন' বলতে যে য়্যা উচ্চারিত হয় সেটি অন্য ধ্বনি।

ঘর বলতে যে 'অ' উচ্চারণ করি সেটি জর্মনে আছে। কিন্তু 'o' অক্ষর দিয়ে 'অ' এবং 'ও' দুই-ই বোঝানো হয়।

u অক্ষর দিয়ে হ্রস্ব দীর্ঘ দুই উকারই বোঝানো হয়।

ie এক সঙ্গে এলে দীর্ঘ ঈ হয়। যেমন Kiel (কীল) শহর। ei এক সঙ্গে থাকলে অনেকটা বাঙলা 'আই'য়ের মত হবে। যেমন Heidelberg (হাইডেলবের্গ)। General Keitel (গেনেরাল কাইটেল)। eu=অয়।

j অক্ষর জর্মনে য় (অর্থাৎ সংস্কৃত য) উচ্চারণ হয়। সংস্কৃতে পণ্ডিত Hermann Jacobi (হেরমান য়াকোবি)। এ্যারোপ্লেন নির্মাতা Junkers (য়ুনকার্স)।

দীর্ঘ বোঝাবার জন্য aa, ee, oo ব্যবহার হয়। uu-র উচ্চারণ কিন্তু আলাদা আলাদা হয়। যেমন vakuum (ভাকুউম)।

স্বরের পর r অক্ষর এলে ইংরিজিতে সেই স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন Garden. জর্মনে ঠিক সেইরকম h দিয়ে অনেক সময় স্বরকে দীর্ঘতর করা হয়। যেমন Bahn (বা ান, রেল)।

a, o, u-র উপর দুটি ফুটকি দিলে উমলাউট হয়। এর আলোচনা ফরাসী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কিছুটা হয়েছে। a-র উপর দুটি ফুটকি দিলে অনেকটা পূব বাঙলার 'ক্যান্'-এর য ফলার মত। ফরাসী faire-এর ai-তে এই উচ্চারণ। উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে উমলাউটগুলো ভালো করে শিখে নিতে হয়।

পশ্চিম বাঙলায় বাঙালী বলতে যে 'ঙ' উচ্চারণ হয় সেটা জর্মানে আছে। যেমন Dinge (ডিঙে)।

শ বোঝাতে হলে জর্মন sch ব্যবহার করে। যেমন অর্থনৈতিক Schumpeter (শুমপেটার), Schacht (শাখট্)। জর্মন শ আমাদের বাঙলা শ-এর চেয়ে অনেক বেশী কর্কশ।

ch যদি a, o বা u'র পরে আসে তবে বাঙলার বিরক্তিসূচক 'আখ্‌খ্'-এর মত হয়। সিলেটিরা যখন 'কেনে' উচ্চারণ করেন তখন অনেকটা ঐ ch. আরবী ফরাসী উর্দুর খে অক্ষর একটু বেশী ঘষা হয়। সংগীতকার Bach (বাখ্)।

ch যদি e, i (এবং স্বভাবতই উমলাউটের পরে, কারণ উমলাউটের দুটো ফুটকি e চিহ্ন-জ্ঞাপক)-এর পর আসে, তবে সেটা অন্য রকম উচ্চারণ হয়। অনেকটা যেন শ, হ এবং উপরের খয়ে মেশানো। কাজেই Kirche (কির্শে) এবং Kirsche উচ্চারণে পার্থক্য মন দিয়ে শিখতে হয়। রাইনল্যান্ড-বাসীরা প্রায়ই এই পার্থক্য করতে পারে না। বার্লিনের উপভাষাতে এই ch প্রায় ক'য়ের মতই শোনায়। ich শোনায় ik! অন্তের-ig-র উচ্চারণ (যেমন Koenig) উপরের ch-র মত।

জর্মান W-র উচ্চারণ অনেকটা ইংরিজি V-র মত।

SS-এর উচ্চারণ ইংরিজি SS বা সংস্কৃত 'স' মত। তবে জর্মন দ্বিত্ব করে না। হেরমান Hesse (হেসে)। S অক্ষর স্বরের পূর্বে এলে তার উচ্চারণ অনেকটা ইংরিজি Z অর্থাৎ পূর্ব বাঙলার 'জ'-এর মত।

জর্মন Z-এর উচ্চারণ ৎস-এর মত। Nazi=নাৎসি। শব্দের গোড়ায় এই Z এলে উচ্চারণ করতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়। জর্মন c-র উচ্চারণ জর্মন Z-এর মত।

জর্মন V-র উচ্চারণ সাধারণত জর্মন f অর্থাৎ ইংরিজি f-এরই মত। Baron Von Rothschild (বারন ফন্ রোটশিল্ট্)। তবে মাঝে মাঝে জর্মন W অর্থাৎ ইংরিজি V-এর মতও হয়।

সিলেবলের শেষে জর্মন b ও d যথাক্রমে p ও t উচ্চারিত হয়।

শেষের e জর্মনে উচ্চারিত হয়। এখন শিখে গিয়ে থাকলে বলতে পারিনে, তবে আমার ছেলেবেলায়ও জর্মানরা টাগোরে (Tagore) বলতো।

* * *

এ ছাড়া accent, intonation ইত্যাদিও আছে। তবে ইংরিজির চেয়ে সোজা॥

ধ্বনি

শ্রীযুক্ত 'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
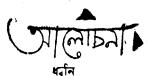
বিনীত নিবেদন, মহাশয়, শ্রদ্ধেয় মুজতবা আলী গত ১৪শ সংখ্যা 'দেশে' মুমুক্ষু জনসাধারণের নিমিত্ত ধ্বনিশাস্ত্রের অবতরণিকা করেছেন। এবং ক্রমশঃর অব্যবহিত পূর্বে মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড় ভাষা ব্যতীত অন্যান্য (ইণ্ডো-ইউরোপীয়, সেমেটিক এবং যাবাবর ভাষাগুলি কি?) ভাষার একমাত্র দিগ্‌দর্শক হিসেবে রেফারেন্স কেতাবগুলির প্রান্তে প্রবন্ধটি রাখা কর্তব্য, এবংবিধ বিধান দিয়েছেন।

আমি মুমুক্ষু, সুতরাং অজ্ঞ। শিক্ষণীয় বিষয়ে উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক। তবু ধৃষ্টতা প্রকাশে তৎপর হচ্ছি, কেননা গুটিকয়েক ব্যাপারে মনে হল এতদিন যা শুনে এসেছি বা কুড়িয়েছি সব অতি স্থূলে। বিনীত অনুরোধ, জনাব আলী সাহেব যেন সুক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ (প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ; আলী সাহেবের ইতঃপূর্বে বিশেষজ্ঞ-র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ব্যক্তিদের সুবিধার্থে যৎসামান্য আলোকসম্পাত করেন।

ইংরিজীতে তথা যাবতীয় ইণ্ডো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে (এক ভারতীয় ভাষা ভিন্ন) শুদ্ধ 'ট' বা 'ড' নেই, এইটেই এতাবৎকাল জেনেছিলাম। হিন্দুস্থানী (হিন্দুস্তানীও বলা চলে) ভাষাসমূহে (দ্রাবিড়-গোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত) 'ট' 'ড'-র উচ্চারণ স্থানকে lingual (যদিও paleto-dental বা তালব্য-জিহ্বা বলা আরও সমীচীন) বলা হয়। ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশন (API) চিহ্ন অনুযায়ী 't' 'd' অথবা সচরাচর 'টি' নিচে ফুটকি 'ডি' নিচে ফুটকি লেখা হয়। সাহেবদের অর্থাৎ ইংরেজদের 't' 'd' উচ্চারিত হয় 'ত' 'দ' হিসেবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ dento-lingual, কিন্তু তারপর জিবের কাঠিন্যের জন্যে আমাদের অনভ্যস্ত কানে 'ট' এবং 'ত'-র মাঝখানে একটা-কিছু হয়ে দাঁড়ায়। (একসঙ্গে স-ট-অ ('শ' নয়) উচ্চারণ করলে বা স্টেশন সঠিক বললে পার্থক্য ধরা পড়বে।) জার্মানে 'ট' কয়েক জায়গায় উচ্চারিত হয়। যেমন, s-এর আগে বা শব্দের শেষে—t, d, বা dt থাকলে। যথা, erste, streber, nacht, abend, Schmidt ইত্যাদি। তবে মধ্য (ভৌগোলিক অর্থে) জার্মানীতে এবং বাভারিয়ায় ওরা ফরাসী বা ইংরিজী মতে শুদ্ধ 't' 'd'-ই বলে, যদিও তা উৎকৃষ্ট জার্মান নয়। Heidelberg হাইদেলব্যার্গকে মান ধরলে সেখানে প্রথমোক্ত ধরনে উচ্চারণ করে।

ইউরোপীয় (ইংরিজী সমেত) ভাষায় যে

শব্দ 'ত' বা 't', 'দ' বা 'd' ব্যবহৃত হয় তার একটি প্রমাণ (নজির দেখানোটা পেডান্টি-সিটী, তবু) পেশ করছি। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী ৎ+শ=চ্ছ। ওদের, t (ৎ)+sch (শ)=ch। যেহেতু ইংরেজদের শুদ্ধ ব্যঞ্জন বর্ণ নাস্তি (সবই সার্ধ-মহাপ্রাণ, এবং এইটেই একমাত্র ভাষা যাদের এই বিশেষত্ব আছে) ওদের কাছে 'চ' হয়ে যায় 'চ্ছ' আর এই ওদের একক শুদ্ধ উচ্চারণ। 'চ' 'জ' শব্দ ইউরোপীয় কিছু কিছু ভাষায় নেই; যেমন, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদি। সুতরাং একই নিয়মে d (দ্)+zh ('শ'-র ঘোষ বর্ণ, হিন্দুস্থানী ভাষায় এর প্রতিশব্দ নেই, দ্রাবিড় গোষ্ঠীতে বিদ্যমান, যদিও উচ্চারণ পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে পড়েছে)='জ' বা 'জ্ঝ'।

আলী সাহেব গ্রীক পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। ওটা আমাদের কাছে নিতান্তই গ্রীক। তবু, গ্রীকে যাকে থীতা (দেশী মতে 'থিটা') বলা হয়, সেটার উচ্চারণ ইংরিজীর thank-এ 'th'-এর মত নয়, হিন্দুস্থানীর মহাপ্রাণ 'থ'-র মতই। যদিও বর্তমানে API এই 'থিটা' ইংরিজী 'th' বা আরবীর একটি বর্ণের ধ্বনি (যথা, 'সদর' বা 'খাস'-এর 'স' যেটা ফারসীর প্রভাবে 'স' এবং আমাদের জিবে 'শ' হয়ে দাঁড়িয়েছে) প্রকাশের জন্যে ব্যবহার করেন। ওল্ড ইংলিশে 'ধ' ছিল এবং বর্তমানে বদলে that-এর 'th' হয়েছে। API সেই প্রাচীন অক্ষরই চিহ্নরূপে ব্যবহার করেন।

ইংরিজীর 'th' (thank) এবং th (that)-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য চিঠির স্বল্প পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয়, যদিও ব্যাপারটা আদৌ কঠিন কিছু নয়। ইংরিজীর সঠিক উচ্চারণ ধরবার প্রকৃষ্ট উপায় ওদের স্বরবর্ণের 'r' এবং উপর্যুক্ত 'th'-দ্বয়।

আমরা ইংলিশে বুক পড়ে কথঞ্চিৎ রে-প্লে করি। সে ক্ষেত্রে এক'জন'-কে ভাগিয়ে তামাম ইউরোপে কী করে ভাবলে প্রথমে জিবের এবং অনধিক পরেই মাথার নাড়ী ছেড়ে যাবার দাখিল হয়। উচ্চারণে কেবলমাত্র ইঙ্গিত দেওয়া হল। যথা, স্প্যানিশ Juan (হুয়ান), রুশ Ivan (ঈভান, 'ভ' কেন, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ পশ্য), ফরাসী Jean (জাঁ), রোমান্স অন্য কয়েকটি ভাষায় Ion (ঈয়ন), জার্মান এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষাগুলিতে Johann (য়োহান) ইত্যাদি। এইরকম আরও প্রচুর আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী Mendes France মাঁদ্যা নন, মাঁদ্যাস, Henri Bergson বের্গস' নন, বের্গসন্, George Sand ফরাসী প্রক্রিয়ায় জর্জ তৎপরে সাঁ নন, স্যান্ড (আঁদ্রে মোরোয়ার 'লেলিয়া' পশ্য)।

আলী সাহেব 'খ'-য়ের জন্যে অনেক সুপারিশ করেছেন। আমিও 'খ'-য়ের খয়ের খাঁ (যদিও কথাটা খয়রখোসহ্, মানে শুভানুধ্যায়ী) সুতরাং একটি মাত্র নিবেদন করবো। হিন্দুস্থানী ভাষার 'খ' এবং উক্ত বিতর্কাধীন 'খ' এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। একজন কণ্ঠবর্ণ, অপরজন আরও গভীরে, এদিকে জাতিমাত্র মূর্ধন্য 'ষ'। সুতরাং উষ্মাভরে 'আখ্' বললেই ঠিক চলবে না। প্রতিশব্দ না থাকায় 'কাঁচি'-র 'ক', 'খবর'-এর 'খ', 'গাফিলতি'-র 'গ' ভাটপাড়া প্রথায় করলে ক্ষতির পরিমাণে তারতম্য ঘটবে না। Chaim Weizmann এবং Heinrich Heine একই 'ch' নিয়ে খাইম এবং হাইনরিষ (হাইনরিঃ লেখা বাংলায় আরও সমীচীন)। আবার 'h' নিয়েও (রোমক বানানে) Tehehov (যাকে Chekhov লিখলেই চলে) শেহভ হয়ে গেলেন। তবে গ্রীক 'ক্সাই' (ইংরিজীর 'X') এবং X 'খাই' (ঐ গোলমেলে 'খ') অনেকাংশে এই গোলযোগের জন্যে দায়ী।

পরিশেষে একটা কথা নিবেদন করে পত্র শেষ করছি। বিভিন্ন অথরিটীবৃন্দ ফাউলর, জোন্স ইত্যাদি বলেন, বৎস, তোমার উচ্চারণ যেন তোমার প্রতিবেশী অপেক্ষা বেশী ভাল না হয়। তাই বলছিলাম ছোম্বেকে যাই করা হোক, সিরোলীন রুশে ('রশ' নয়) যে দোকানেই বিক্রি হোক, 'গ্যোট' গয়ঠী হন, রস উপলব্ধি করবার জন্যেই ভাষা। মেৎসো-ফান্তি সাকুল্যে সোয়া তিন শ' ভাষা এবং উপভাষা নিয়েও সৃষ্টি কিছুই করেন নি। শেক্সপীয়র সেক্ষপীর হলে বা জাঁ ক্রীস্তফ্ জীন ক্রাইস্টফ্ হলে বা রেইষ্যাভিঃ (বা.'—ভিগ') রিক্জেভিক্ হলে বা ওদ্‌কলোঞ্ ইউডিকলোন হলে রসের ভিয়েনে ঘাটতি পড়বে না। ইতি—

দেবব্রত চক্রবর্তী
দিল্লি—৬
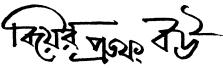
সজনীকান্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সজনীকান্ত যে এমন অকস্মাৎ চলে যাবে সেকথা ভাবতে পারিনি। সেও কি ভাবতে পেরেছিল? এই সেদিনও সে বললে, খবরের কাগজটা ওলটাবার উপায় নেই। একজন-না-একজনের মৃত্যুসংবাদ আছেই।'

এই বলে সজনীকান্ত সেদিন একটি একটি করে' প্রত্যেকটি নাম আমাকে বলে গেল—গত কয়েক মাসের মধ্যে যাঁরা লোকান্তরিত হয়েছেন।

কিন্তু সে কি নিজেই জানতো বারোই ফেব্রুয়ারী সকালের খবরের কাগজে তার নিজের ছবিটি ছাপা হবে?

এমনিই মানুষের জীবন! এই জীবনের রহস্য।

মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। সবাই আমরা ফাঁসির আসামী। শুধু জানি না—কবে কোন্ সময় আমাদের ফাঁসি হবে।

মৃত্যুকে ভুলিয়ে রাখাই জীবনের ধর্ম।

আজ কত কথাই-না মনে হচ্ছে তার সম্বন্ধে। মাসখানেক আগে আমি ছিলাম হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে। ধরা পড়লো আমি ব্লাড প্রেসারের রুগী। ডাক্তার বললেন, প্রেসার না কমলে অপারেশন হবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। বললাম—থাক্ অপারেশন। পালাই এখান থেকে। সজনী গিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে এলো। নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত আমার শিয়রের কাছটিতে বসে হাতে হাত রেখে বলে এলো, 'ভয় কিসের? ভয় পেয়ো না।'

কিন্তু আমার দুঃখ রয়ে গেল—আমি গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না তার শেষ সময়ে। আমাকে বাড়িতে বসিয়ে রেখে সে চুপিচুপি পালিয়ে গেল।

তবে শুনেলাম নাকি ভয় সে পায়নি। আমি ছিলাম না, কিন্তু তারাশঙ্কর ছিল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে অক্সিজেন যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন নাকি সজনীকান্ত ডাক্তারদের বলেছিল, 'এই কি আমার শেষ নাকি? বলুন তাহ'লে, কিছু কাজ আছে, সময় নেই।'

ডাক্তারেরা কিছু বলেননি।

কাজেই হাতের কাজ সে সেরে যেতে পারেনি।

কেউ-ই পারে না। কত অসমাপ্ত কাজ পিছনে পড়ে থাকে। মানুষকে চলে যেতে হয় অকস্মাৎ। তাকেও চলে যেতে হলো।

এই সবে সে আরম্ভ করেছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সংকলনের কাজ। সে কাজ শেষ করা আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে কিনা জানি না।

ব্যক্তিগত সংসারের কাজের কথা নাই-বা বললাম! দুঃসাধ্য তার সীমান্ত নির্দেশ।

সজনীকান্ত
ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্মিত

পেছনে যারা পড়ে রইলো তার পরমাত্মীয় পরিজন—জীবন-নাট্যের সে অশ্রুসজল বিয়োগান্ত পরিচ্ছেদ শুধু তাদেরই জন্যে।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় ছিল আমাদের 'কালি-কলম' পত্রিকার আপিস। রোজ বিকেলে সেখানে একটি আড্ডা বসতো। আড্ডায় অনেকেই আসতেন, শুধু একটি দিনের জন্যও কামাই করতেন না মোহিতদা। (কবি মোহিতলাল মজুমদার)

কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করলাম—মোহিতদা আসছেন না। যদি-বা আসছেন—দেরি করে আসছেন।

হঠাৎ একদিন তিনি নিজেই এসে বললেন তাঁর দেরি করবার কারণ। বললেন, প্রেমে পড়েছি।

—কার?

—নতুন একজন কবির।

—কোথায় তিনি? কি নাম?

সেকথা কিছুতেই বললেন না মোহিতদা। অথচ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তাঁর নিজস্ব ভাষায় ক্রমাগত বলতে লাগলেন, তার কবি-প্রতিভায় আমি শুধু মুগ্ধ হইনি, বিস্মিতও হয়েছি।

মোহিতদা বললেন, তাঁকে একদিন ধরে আনবেন 'কালি-কলম' আপিসে।

আমরা তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছি, এমন দিনে একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে।

এ্যালবার্ট হলের দোতলায় তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিস। পরশুরাম (রাজশেখর বসু) ম্যানেজার। আমি একদিন গেছি সেখানে। পরশুরাম জিজ্ঞাসা করলেন, লেখার জন্যে 'কালি-কলম' টাকা দেয়?

বললাম, যৎসামান্য।

—চলছে কেমন করে?

বললাম, অতি কষ্টে।

তিনি বললেন, 'চাকরি করবেন?'

—পেলেই করি।

তক্ষুনি 'বেল্' বাজালেন। বেয়ারা এলো। কাকে যেন ডাকতে বললেন।

অপরিচিত এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়াতেই

পরশুরাম বললেন, এ'কে নিয়ে গিয়ে কোথাও এক জায়গায় বসিয়ে দিন। আজ থেকে ইনি এখানে কাজ করবেন। লেখক—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তাঁর সঙ্গে যেতে হলো আমাকে। যেতে যেতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাইপ্ জানেন?'

বললাম, জানি।

একটা টাইপ্‌রাইটারের সামনে আমাকে বসিয়ে দিয়ে তিনি একখানা ছাপা ক্যাটালগ্ এনে আমার হাতের কাছে ধরে দিয়ে বললেন, 'এইটে দেখে দেখে যতটা পারেন টাইপ্ করুন।'

বুঝলাম আমার কাজ বলতে কিছু নেই। দশটা পাঁচটা আপিস। থাকি ভবানীপুরে। যখন খুশী আসি, যখন খুশী চলে যাই। কেউ কিছু বলে না।

মোড় পেরিয়েই 'কালি-কলম' আপিস। এদিকে 'কালি-কলম', ওদিকে কল্লোল। একদিন টিফিনের সময় কল্লোল-আপিসে গিয়ে দেখি জমজমাট আড্ডা। কথায় কথায় চারটে বেজে গেল। ভাবলাম, পরশুরামকে গিয়ে বলি—করবার মত কিছু কাজ দিন, নইলে মন বসছে না, ফাঁকি দিচ্ছি। মাসের শেষে মাইনে নিতে পারব না।

রাস্তায় অশোকবাবুর সঙ্গে দেখা। অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে। সবে তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরেছেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সুগঠিত দেহ। মুখে হাসি লেগেই আছে। দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।—'কোথায় যাচ্ছেন হনু হনু করে?'

'বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিসে। চাকরি করছি যে!'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

অশোকবাবু ধরলেন একখানা হাত।

'চলুন প্রবাসী-আপিসে!'

বললাম, বড্ডো ফাঁকি দিচ্ছি। পরশুরাম কি ভাববেন?

অশোকবাবু বললেন, 'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি দেখে নেবো।'

অশোকবাবুর কব্জির জোর অসাধারণ। ছাড়ানো বড় শক্ত। যেতে হলো তাঁর সঙ্গে। সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে এখন প্রবাসী-আপিস, সে-বাড়িতে নয়। এর আগে যে-বাড়িতে ছিল সেই বাড়িতে।

সেখানে যাবামাত্র যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো—তারই নাম সজনীকান্ত দাস। সে তখন বসে বসে 'মহাভারত' এডিট করছে। কিছুক্ষণ পরেই মোহিতদার আবির্ভাব। বুঝতে দেরি হলো না—তাঁর নবাবিষ্কৃত কবি-রত্নটি কে।

সজনীকান্তের সঙ্গে এমনি করেই আমার প্রথম পরিচয়।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো অশোকবাবুর

কল্যাণে। সেই যে কলেজ-স্কোয়ারে শক্ত মুঠোয় আমার হাতখানা তিনি ধরেছিলেন সে-হাত আর ছাড়লেন না। বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরি আমার সেইদিন থেকেই খতম হয়ে গেল। পরশুরামকে যা বলবার অশোকবাবুই বললেন। বহাল হয়ে গেলাম প্রবাসীআপিসের চাকরিতে। মাইনে পেতাম, কাজেই চাকরি বলতে দোষ নেই। কিন্তু চাকরির চেয়ে আড্ডা বলাই ভালো। কাজ ছিল ফর্মা-খানেক প্রবাসীর প্রুফ দেখা, আর সজনীর সঙ্গে এক-টেবিলে মুখোমুখি বসে গল্প করা।

বিকেলে বসতো জমাট আড্ডা। ক্ষুদুবাবু (অশোক চাটুজ্জে) গল্প বলতেন চমৎকার। হাসাতেন অথচ নিজে হাসতেন না। আড্ডা ভাঙবার পর একখানা রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম সজনী আর আমি। কোনোদিন বসতাম গিয়ে কোনও পার্কে, কোনোদিন-বা দিলখুশা কেবিনে।

এইখানেই হয়েছিল 'শনিবারের চিঠির' আবির্ভাব।

তারপর জীবনের এই সুদীর্ঘ পথ বেয়ে চলেছিলাম আমরা পাশাপাশি। তখনকার দিনে এমন কোনও সাহিত্যিক ছিল না— সজনীকান্তের সংস্পর্শে যাঁরা আসেননি। সাহিত্যসেবীর সে এক বিরাট মিছিল।

পরবর্তীকালে সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল তারাশঙ্কর। তাই সেদিন এই কথা জেনে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন— সজনীকান্ত যখন চলে যায়, তারাশঙ্কর ছিল তার শিয়রের কাছে বসে।

সজনীকান্তের কথা বলতে হলে বলা আর আমার শেষ হবে না। তার নিজের ভাষায় বলি—

"পরশমণি, সোনার খনি, হারিয়ে গেলে পথে
একটু সোনা দিচ্ছে আভাস তব,
কি যে পেলাম কি হারালাম বুঝতে কোনো মতে
নিজেই নারি কারে কি আর কব।"

সজনীকান্তের উদ্দেশে

বনফুল

ভাই সজনী,
তুমি চলে' গেলে?
আমরা সবাই তো দাঁড়িয়ে আছি
রাস্তায়, গাড়ীর অপেক্ষায়,
ভীড় করে' দাঁড়িয়ে আছি
পাশাপাশি ঘেঁসা-ঘেঁসি।
একটু আগেই তো তুমি পাশে ছিলে
করছিলে তোমার রসিকতা,
ডায়াবিটিস আর করোনারিকে তুচ্ছ করে।
হাসছিলে আর হাসাচ্ছিলে।
বলছিলে, এখন চিনি দোকানে শস্তা নয়
বাথরুমে শস্তা,
বলছিলে, এটা পরনারী আর করোনারির যুগ!
এই সেদিনই তো দুজনে একসঙ্গে
খেলাম ছানার জিলিপি
মহানন্দে
ডায়াবিটিস সত্ত্বেও!
হঠাৎ চলে' গেলে?
আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছি
ট্রাম-বাসে অসম্ভব ভীড়
লোক ঝুলছে
ট্যাক্সির জন্যে তপস্যা করতে হয়।
এর মধ্যে কখন কোন ফাঁকে এল তোমার রথ?
তুমি চলে' গেলে!

যে কীর্তি তুমি রেখে গেছ
তা ভবিষ্যতের সম্পত্তি
ভবিষ্যতই তার হিসাব রাখবে।
আমি বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত
আমি কেবল ভাবছি
তুমি চলে' গেলে?
সত্যিই চলে গেলে?
আর দেখা হবে না?

ঘাটশিলার শিলালিপি

শিবরাম চক্রবর্তী

ঘাটশিলার এক আদিবাসীরা ছাড়া, মানে, যারা সেখানকার অনাদি বাসিন্দে তারা কেউ সেখানে পায়ে হাটে না। তাদের সবার সাইকেল আছে। কি ছেলে কি বুড়ো সবাই সাইকেলে চেপে বেড়ায়।

আর, মিষ্টির দোকানের মেঠায়ের মত যারা কয়েকদিনের বাসী মানে আমাদের মত যারা সেখানে দিন কয়েকের জন্যে হাওয়া বদলাতে যায় তাদের বিপদ সেখানে পদে পদে।

সাইকেল চাপা পড়ার বিপদ।

সেখানে যারা সাইকেল চেপে বেড়ায় তাদের কেবল সাইকেল চাপাতেই সুখ নেই, সাইকেল সমেত আরেকজনের ঘাড়ে গিয়ে চাপতে পারলে আরো সুখ। কিন্তু রাস্তার হাঁটারা সেটাতে ঠিক সাইকেল চাপার আনন্দ পায় না।

একখানা মোটর যাওয়ার মত চওড়া একটুখানি পিচের রাস্তা—তা দিয়ে হরদম মোটর ট্রাক যাতায়াত করছে। আর তার দুপাশ ঘেঁষে সাইকেলারোহীরা চলেছে। সাইকেলে ঘণ্টা নেই, আলোর বেলায় ঘণ্টা! রাত্তিরে রাস্তায় আলো জ্বলে না, সাইকেলে ত নয়ই। কাজেই প্রাণ বাঁচিয়ে যতই পথের

মজা করে হাত বুলোই

ধারে ধারে চলো না, সাইকেল তোমার ঘাড়ে এসে চাপবেই!

হর্ষবর্ধন সেই দুঃখের কথা ব্যক্ত করছিলেন আমার কাছে।

'আপনার কথায় তো মশাই বেড়াতে এলুম ঘাটশিলায়। কিন্তু কী ফ্যাসাদেই যে পড়েছি এসে! প্রাণ নিয়ে যদি বা ফিরতে পারি ভুঁড়ি নিয়ে ফিরতে পারব কিনা সন্দেহ!'

'কেন, কী হয়েছে আপনার ভুঁড়ির? অক্ষতই তো আছে দেখছি।' আমি শুধাই।

'আর অক্ষত! অক্ষত আছে কিন্তু অক্ষত নয়। যা ক্ষতি হয়েছে সে আপনাকে আর কী বলব?' বলে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

'কই, ক্ষতি ত কিছু দেখছি না!' হাত দিয়ে ভুঁড়ির মাপ নিয়ে দেখলুম।—'তেমনিই ভূরি ভূরি রয়েছে ত? একটুও কমেনি।'

'কমেনি বটে, কিন্তু দমে গেছে বেশ।' তিনি জানালেন: 'দস্তুর মতন দমে গেছে। যা একখানা সাইকেলের গোঁত্তা লেগেছে এইখানে—।'

'আপনাদের যে বললাম সব সময় রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে। সাইকেল এখানে ভারী মারাত্মক, বলেছি তো আপনাকে।' আমি স্মরণ করিয়ে দিই।—'এখানে আর কোন ব্যারাম নেই, কেবল ঐ সাইকেল।'

'তাই ত যাচ্ছিলাম মশাই। কিন্তু সাইকেলটা যে তেড়ে এল রাস্তার কিনারায়। আমি যেদিকে ঘুরি ওটাও সেদিকে ফেরে। শেষটায় আমি পাশের খাদে নেমে গেলাম। ব্যাটা সেইখানে নেমে গিয়ে আমাকে গোঁত্তা লাগাল। ভুঁড়ির এইখানটায়।'

'ভুঁড়িটা দাদার কেমন চুপসে গেছে দেখুন না।' পাশে থেকে গোবর্ধন চুপ করে থাকতে পারে না।

দেখি। হাত বুলিয়ে দেখি। এমন সুযোগ হাত ছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। ন্যাড়া মাথা আর পুরুষ্টু ভুঁড়িতে হাত বোলাবার আরাম কম না। তার শখ আমার চিরকালের। কোনো ছেলের পৈতে হচ্ছে খবর পেলেই আমি হাত ধুয়ে বসে থাকি। তার পরে দণ্ডীঘরে গিয়ে সেই নবীন ব্রহ্মচারীর ন্যাড়া মাথায় মজা করে হাত বুলোই। ভারী মজা! এবং......এবং আর কি! প্রত্যেক সদ্য উপবীতগ্রস্ত বালকই বড়লোক, মানে বড় বালক। তার ভিক্ষের ঝুলিতে দেদার টাকা পয়সা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে ঝুলির দিকেও তাকে ন্যাড়া করার চেষ্টাও যে না পাই তা নয়! যার নাম সোজা কথায়, পকেটের ক্যাশ-উৎপাটন!

কাজেই হর্ষবর্ধনবাবুর হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটি বেহাত হতে দিলাম না।

—'হ্যাঁ, এইখানটা বেশ দমে গেছে দেখছি। গর্ত মতন হয়ে গেছে।'

'ওটা তো আমার নাইকোণ্ডল! আঃ ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন। করছেন কি? বেসা সুড়সুড়ি লাগছে!'

তা, ভুঁড়ি বটে ও'র। যত ধার ঘেঁষেই চলুন না, রাস্তার আধখানা জুড়ে থাকবেন। যেমন রাস্তা জোড়া তেমনিই লোভনীয়। যে কোন সাইকেলওয়ালার পক্ষেই এই লোভ সম্বরণ করা শক্ত। এমন উপাদেয় লক্ষ্য ভেদ না করে যাওয়া দুষ্কর।

এই আমিই ত! ঐ ভুঁড়ির আড়ালে

গোবরা ভায়াকে দেখতেই পাইনি। ওর দিকে ভালো করে নজর পড়েনি এতক্ষণ। এখন হর্ষবর্ধন ভুঁড়ি সরিয়ে নিতেই গোবর্ধন প্রকাশিত হলেন।

'এ কি! গোবর্ধন ভায়া অমন করে চোখ বুজে কেন?' আমি বিচলিত হয়ে জিগেস করি।—'কী হল চোখে?'

'চোখ বুজে হাঁটছে ও।' হর্ষবর্ধন জানান।

'কেন, কী হল ওর চোখে?' আমি শুধাই: 'যদি কোন অসুখ টসুখ করে থাকে ত আমার সংগে চলুক। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। ডাক্তারখানায় যাব বলেই বার হয়েছি।'

'না না। অসুখ করবে কেন? এমনি যাচ্ছে চোখ বুজে।...আমরা সিনেমায় যাচ্ছি কি না তাই।'

'সিনেমায় গেলে কি চোখ বুজে যেতে হয় নাকি? সে আবার কি কথা?' শুনে আমি অবাক হই।

'সিনেমা হলের ভেতরটা ভারী অন্ধকার যে। ভেতরে ঢুকলে কিচ্ছু দেখতে পাওয়া যায় না। কোথায় সীট কোথায় কী, নজরে পড়ে না কিচ্ছু। খানিকক্ষণ থাকবার পর অন্ধকারটা চোখ সয়ে গেলে তখন আবার সব দেখতে পাওয়া যায়।' হর্ষবর্ধন অন্ধকার খোলসা করেন—'তাই ও এখন থেকেই চোখ বুজে চলেছে। ও দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু আমি ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। হলের ভেতর গিয়ে ও চোখ খুলবে তখন ও সব দেখতে পাবে, কিন্তু আমি কিচ্ছু দেখতে পাব না। তখন ও আমাকে সীটে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে। বুঝলেন এখন?'

'বুঝলাম। কিন্তু চোখ বুজে চলা ত ভারী মুস্কিল।'

'ও কিন্তু যাচ্ছে ঠিক, একটুও এদিক ওদিক হয়নি। পূর্ব জন্মে কানা ছিল মনে হয়।' দাদা জানান।

'আমি কানা ছিলাম? বটে?' চোখ বুজেই গোবর্ধন ফোঁস করে ওঠে: 'তুমি তা হলে হাবা ছিলে। এই জন্মেই ছিলে। নইলে এত লোক থাকতে সাইকেল বেছে-বেছে তোমাকেই কেন গোঁত্তা লাগায়।'

'আহা! ভায়ে ভায়ে ঝগড়া কেন? ওটা একটা কথার কথা। যাই বলুন হর্ষবর্ধন-বাবু, গোবরা ভায়াকে এতক্ষণ চোখ বুজে থাকার জন্য বাহাদুরি দিতে হয়।'

'তা বাহাদুর বটে?' ভ্রাতৃগর্বে হর্ষবর্ধন বিগলিত হন।—'সেদিক দিয়ে ও বেশ হুঁশিয়ার। আমি যে গর্তের মধ্যে পড়ে [illegible] গুঁতো খেলাম ও কিন্তু [illegible] গেলেও দেখল না। [illegible]

সাইকেলই আজ প্রথম ধাক্কা নয়। দাদার আজ ধাক্কা খাওয়ার কপাল। আমি চোখ খুলে থাকলেই কি আর দাদাকে বাঁচাতে পারতাম! দাদার কপালে আজ একটা পাথরের ধাক্কাও গেছে।'

'সে কি মশাই?' আমার পিলে চমকে যায়।

'ফুলডুংরির কাছ দিয়ে আসছিলাম তো এমন সময়ে প্রকাণ্ড একখানা পাথর...' হর্ষবর্ধন বলতে বলতে থেমে যান।

বেজায় সুড়সুড়ি লাগছে!

'খসে পড়ল নাকি পাহাড়ের থেকে?' আমার দম আটকে আসে।

মাধ্যাকর্ষণ বলে একটা জিনিস আছে জানি। আর ভুঁড়িটাও দেহের মধ্যিখানে তাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে ভুঁড়ির মাধ্যাকর্ষণে টিলার ওপর থেকে শিলাবৃষ্টি হবে একথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।

'না না। খসে পড়েনি, আমার চোখে পড়ল।' বলে তক্ষুনি তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—'মানে, আমার এই চোখের ওপর নয়। চোখের ভেতরেও না। রাস্তার একধারে পড়েছিল পাথরটা, আমি দেখতে পেলাম। দেখলাম পাথরটার ওপরে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় করে লেখা 'উলটাইয়া দেখ'। চারদিকে বর্ডার দিয়ে আবার।

'কোন গুপ্তধনের ইঙ্গিত বোধ হয়?' আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনি।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওলটাতে গেলাম পাথরটা, কিন্তু সেই পেল্লায় ভারী পাথর কি নড়ানো যায় মশাই? গোবরাকে বললাম, আয়, তুইও হাত লাগা। ও বললে, আজেবাজে পাথর নেড়ে কী হবে।'

'তারপর?'

'তারপর আমি তাকে বোঝালুম—বাবা কী বলে গেছেন জানিসনে? 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পারো লুকানো রতন।' এর তলায় নিশ্চয় কোনো ধনরত্ন লুকোনো আছে। উল্টে দেখা যাক। গোবরা বলল...গোবরা বলল... গোবরা যা বলল তা আর বলবার কথা নয়।'

'এমন কি খারাপ কথাটা বলেছে?'

গোবরা আবার গজরে ওঠে—'আমি বলেছি যে বাবা তো ছাইয়ের কথা বলেছিল, পাথরের কথা ত বলেনি। এত ছাই নয়, পাথর।' বলে সে আবার মুখ বেঁকিয়ে বলে : 'পাথর না ছাই!'

'কথাটা মন্দ বলেনি গোবরা ভায়া।' আমাকে দুই কূল রাখতে হয়—'তবে এটা কোন কাজের কথা নয়। ভাজা মাছের মতন সব কিছুই উল্টে দেখতে হয়।'

'সেই কথাই ত আমি বললাম। বলে লাগলাম ওটাকে ওলটাতে। অনেক কষ্টে ত উলটাতে পারলাম পাথরখানা। তখন দেখি সে পিঠেও আবার লেখা রয়েছে।'

'কী লেখা রয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করি, 'গুপ্তধনের নির্দেশ?'

কিন্তু সে কথা আর হর্ষবর্ধন ভাঙলেন না। কেবল বললেন, 'আমি ফের সেই পাথরখানা আবার সেখানে তেমনি উল্টে রেখে এসেছি। আগের মতই।'

'আর গুপ্তধন?'

'সে কথা আর ব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই।' বলে রহস্যময় হাসি হেসে নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলেন একবার।—'সিনেমা শুরু হবে এক্ষুনি, দেরি নেই খুব। আমরা চললাম। আপনিও আসুন না কেন আমাদের সঙ্গে?'

'আচ্ছা যাচ্ছি। ডাক্তারকে একবার আমার রক্তের চাপটা দেখিয়েই সোজা সেখানে চলে যাব। এগোন আপনারা।'

স্টেশনের কাছাকাছি ডাক্তারখানাটা। গিয়ে দেখি ডাক্তারবাবু তখনো তাঁর চেম্বারে আসেননি। আর অপেক্ষা না করে সিনেমার দিকে পা বাড়াই।

পেঁছতে পেঁছতে ছটা বেজে যায়। ছবি শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তখনো দেখি হর্ষবর্ধনবাবুর টিকিট কেনা হয়নি—এত আগে এসেও। গোবর্ধনবেচারা সিনেমা হলের প্রবেশ পথে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে।

'এ কি! এখনো কেনেন নি টিকিট?' হর্ষবর্ধনবাবুকে শুধোই।

'আর বলবেন না মশাই! ভালো এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। হলে ঢুকবার মুখেই পাগলটা খাড়া রয়েছে। যাওয়া মাত্রই টিকিটগুলো কেড়ে নিয়ে আধখানা করে ছিঁড়ে দিচ্ছে। কি করি বলুন, আবার কিনছি টিকিট। আবার ঢুকতে গিয়ে আবার সেই দৃশ্য! আবার এসে কিনতে হচ্ছে টিকিট।

'বলেন কি!' আমি ত হতবাক।

'তবে আর বলছি কি? এই নিয়ে সাত-বার কেনা হল।' তিনি বললেন: 'আপনারও একখানা কিনি তাহলে এবার?'

'না থাক। ডাক্তার দেখানো হয়নি

তুমি তাহলে হাবা ছিলে

এখনও। সেখানে ফিরে যাবো ফের।' বলে আমি সরে পড়ি।

সটান চলে যাই ফুলডংরির দিকে। আমারও ত পাথর চাপা কপাল। দেখি গে, পাথরখানা নড়িয়ে যদি কোন রত্নখনির কিনারা পাই।

অকুস্থলে পেঁছে দেখি একটা ভারী পাথরের পিঠে বর্তায় দিয়ে কালো আল-কাতরায় লেখা—

কিন্তু ওলটানো কি যায়? আমার সামান্য সামর্থ্যে ত কুলায় না। হাতের চাড় দিই, ঘাড় লাগাই, দূর থেকে তেড়ে এসে ধাক্কা মারি, টলানো যায় না পাথরকে। উঠে পড়ে লাগি—হন্তদন্ত হয়ে। ঘেমে নেয়ে একশা! একাই এক শ হয়ে চেষ্টা করি।

করতে করতে পাথরটা একটুখানি নড়ে। নড়ার মুখেই মাড়া দিই বেদম। প্রাণান্ত চেষ্টায় উল্টে ফেলি পাথরটাকে।

ওলটাতেই সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়। হর্ষবর্ধনের রহস্যময় হাসির হদিশ পাই।
হর্ষবর্ধনের রহস্যময় হাসির হদিশ পাই।

পাথরখানার অপর পৃষ্ঠের পরোয়ানাও নজরে পড়ে। সেখানে লেখা:

'আবার ফের উলটিয়ে রাখো। তোমার মতন আরো তো ঢের আহম্মক আছে এই পথ দিয়ে যাবে।'

একটি মাছি, একটি মশা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আমি যেন সেই মাছিটা
কাচের জারের গায়ে
বারবার যে হয়রাণ হচ্ছে—
ভেতরে অঢেল চিনি, মিছরি, পেঁড়া আর বাতাসা :
বারবার যে উড়ে এসে বসছে,
ঠোঁট, জিভ আর পায়ে পা ঘসছে ;
কিছুই, অথচ কিছুই ছুঁতে পারছে না কিছুতেই ;

যদিও সবই সাজানো থরে-থরে
চোখের ওপর—
চিনি, মিছরি, পেঁড়া আর বাতাসা :
তার অফুরন্ত আগ্রহের ক্ষুধা আর লোভ,
তার জন্ম-জন্মান্তের আশা-দুরাশা,
তার সর্বৈশ্বর্য।

একটি মশাকেও আমি দেখেছিলাম
এক চলন্ত ট্রামের কামরায়।
উজ্জ্বল আলোয়—
যাত্রীদের মাথার ওপর
চক্রাকারে যে পাক দিয়ে ফিরছিল।
বোধহয় এই ধারণায় :

ট্রামটাই এই পৃথিবী—
এবং সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে
সেও একটা গ্রহট্রহ কিছু
সেই তার সাধের পৃথিবীর আকাশে।

অথচ জানলার বাইরেই
ঠিক তখনি হাঁ-হাঁ করছিল
অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রে স্পন্দমান
নিস্তরংগ নীল মহাশূন্য :
পৃথিবী—যেখানে চোখেই পড়ে না
এমন এককুচি বালুকণা মাত্র।

অশ্বিত্ত পঞ্চক

দুর্গাদাস সরকার

প্ল্যাটফর্ম খাঁ খাঁ করে। লোহার ঘন্টাটা আজো ঝোলে
আশ্চর্য নিরুপদ্রব। বুকিং আপিসে নেই ভিড়।
আসে না একটাও ট্রেন। আধঢাকা লাইনের তলে
ঘাস মাটি সমস্তই স্থির।
তিনটে কামরা আছে : ভাঙা বগী : স্থায়ী বাসস্থান ভাগাভাগি।
দুয়ের কেবিন শূন্য। নেই চোরকানা সে-লণ্ঠন।
তবু যেন আজো এক অবসরপ্রাপ্ত অনুরাগী
খুঁজে ফেরে সেই ট্রেন, মাঝরাতে ব্যস্ত লোকজন।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪২৬ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

শূন্যের দিকে তাকিয়ে আন্দাজের যোগে হাওয়ায় তোমার ঠিকানা হাতড়াচ্ছিলুম, বোধ করি সেই হাওয়ার একটা আলোড়ন তোমার মনে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই কাল হঠাৎ টেলিগ্রামে তোমার ঠিকানা পাওয়া গেল। ইতিপূর্বে একখানা চিঠি দৈবের উপর ভর করে তোমার বিশ্বগৃহক বাসায় পাঠিয়েছিলেম, বোধ হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। খুব মূল্যবান জিনিস নয়, আমার তরফে চার পয়সা মাত্র লোকসান, সয়ে যাবে।

কাল এখানে আমার আদি জন্মোৎসব হলো। অল্প লোক থাকাতে সকলের পরিতৃপ্তি হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োযোগে আমার একটি নূতন রচিত কবিতা বিশ্বগগনে চালান করে দিয়েছিলেম, তোমার কর্ণকুহরের নাগাল পেয়েছিল কি না জানিনে।

এখানে জায়গাটি নির্মল নির্জন, বাড়িটি আলোকে উজ্জ্বল, নানা কোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে উদারতার আহ্বান। যদি কখনো আগমন সম্ভব হয়, হয়তো ভালোই লাগতে পারে। তোমাদের ওখান থেকে আমাদের এখানে যাতায়াত সুসাধ্য কিনা জানিনে, সেই জন্যে কুণ্ঠিত কণ্ঠে আমন্ত্রণ করলুম।

রাশিকৃত পত্র উত্তর প্রত্যাশায় আছে। প্রশান্তকে বোলো বেদে রাশি বলে শব্দ আছে, তার অর্থ সংখ্যাতত্ত্ব—রাশি শব্দের মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্সের যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪২৭ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

রানী, এ জায়গাটা ভালো লেগেছে, নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না—মংপু যদি আরো ভালো লাগে তা হলে সেখান থেকেও নড়তে চাইব না—কিন্তু Babu changes mind। তুমি যদি হাওয়া পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো তা হলে এখানকার হাওয়া পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

কাগজে দেখতে পাই, দার্জিলিঙে পুলিস যদি বা প্রসন্ন হোলো, দেবতার অপ্রসন্নতা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে উঠেছে। শুনে মন খুশী হয়—নিজের সৌভাগ্যের পরিমাপ করা যায় অন্যের দুঃখের তুলনা হিসাব করে—ভেবেছিলুম তোমার চিঠি থেকেই সেই আনন্দ লাভ করব, ক্ষতি হয় নি, স্টেটসম্যান নিয়ে থাকি। ইতি ৩১ বৈশাখ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪২৮ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

নির্মল নীল আকাশ, কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দুর, পাতলা বেগনী চাদরে ঢাকা ছোটো পাহাড়গুলির ঊর্ধ্বে নগাধিরাজের তুষার-কিরীটি মহিমা, মহাদেবের ধ্যানোদীপ্ত শুভ্র ললাট; আমাদের কাছে অধিত্যকার বনে বনে স্নিগ্ধ চিক্কণ পুঞ্জীভূত সবুজে লেগেছে পরশমণির স্পর্শ, পাতায় পাতায় জেগেছে সোনার রোমাঞ্চ, নীল নিস্তব্ধতার উপর পাখিদের মিশ্রিত কাকলি ঝিলিমিলি করছে। এইমাত্র খেয়ে উঠলুম, একটা আম, গোটাকতক লিচু, টোস্ট-করা রুটি, পাহাড়ী গোষ্ঠের মাখনে আর পাহাড়ী মৌচাকের মধুতে লিপ্ত। এসে বসেছি আমার মুক্তম্বার ঘরে, প্রচুর আলোতে আমার মন গিয়েছে তলিয়ে—আমার উড়ো ভাবনা ঝাপসা বেগনী কুহেলিকায় অস্পষ্ট, কর্তব্যবুদ্ধিটা যেন নেশা করে ভোলানাথ হয়ে বসে আছে।

ঈর্ষা হচ্ছে না? সেই জন্যেই লেখা। সোমবারে সদলে হপ্তা খানেকের জন্যে মংপু যাব, মৈত্রেয়ীর অনুনয় জয়ী হোলো। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪২৯ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

গতকালকার চিঠির প্রান্তে তোমাকে যা লিখেছিলুম তার সংক্ষেপ এই, আরামের চরম আরাম হচ্ছে অন্যের অনারাম উপলব্ধি করে। অন্য অর্থে এই ধরনের একটা ইংরেজী বচন আছে, তাতে কবি বলছেন দুঃখের চূড়ান্ত দুঃখ হচ্ছে সুখীতর দিনকে স্মরণ করতে। পূর্ববাক্য আজ আমি চার পয়সা খরচ করে শোধন করতে চাই—বলতে চাই আরামের পরম আরাম হচ্ছে অন্যকে সেই আরামের শরিক করতে ডাক দেওয়া, এর থেকে যা বোঝো তাই বুঝো। দেবতার সোনার রঙের মদের পাত্র ভোর থেকে উল্টে পড়ে গেছে—মাতাল হয়ে উঠল গাছপালাগুলো, নীল আকাশের চোখে লেগেছে বিহ্বলতা, আর ক্ষীণ কুয়াশায় আবছায়া করা পাহাড়গুলোর গদগদ ভাবা।

এখানে এসে শরীর কিছু ভালো হয়েছে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি সেটা ধরা পড়ল কাল! প্রতিবেশীর বাড়িতে চা খেতে গিয়েছিলুম কাল, বেশী কিছু নয়, তবু ফিরে এসে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা অনুভব করেছি, বুঝতে পেরেছি শরীরটাকে স্পর্ধা করে বেড়ানো অন্তত আরো কিছুদিন চলবে না—তাই মৈত্রেয়ীর ওখানে যাওয়া আপাতত নির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে দিয়েছি—খুব সে কলরব করবে, কিন্তু আমি সেটাকে নীরবে সহ্য করব।

পরে পরে তিনটে চিঠি লেখা বাড়াবাড়ি—এর অপরাধ হচ্ছে অপর পক্ষকে লজ্জা দেওয়া, কিন্তু লজ্জা পাবার শক্তি—

এইখানে অসমাপ্ত রাখা গেল, অপরাধের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে দ্বিতীয় অপরাধের সৃষ্টি করা বুদ্ধিহীনের লক্ষণ। একটা কথা বলে রাখি, ধ্বনি প্রেরণ করি প্রতিধ্বনির প্রত্যাশায় তা মনে কোরো না। বাচালতা যাদের স্বধর্ম তাদের বকুনি অহৈতুক আবেগে—বাইরে থেকে এর মজুরি সব সময়ে মেলে না, দরকারও নেই। ইতি ১লা কিংবা ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

কবি

॥ ৪৩০ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

শনিবার যাব মংপু। সোম মঙ্গলবার তক হয় তো থাকব —যদি সুস্থ থাকি, শান্তিতে থাকি, যদি কাজের ব্যাঘাত না ঘটে, যদি আদর যত্নের অতি পরিমাণবশত বিরল অবকাশের পরিমাণ কমে না যায় তাহলে যতদিন খুশি থাকতে পারি। কিন্তু Babu changes his mind. মৈত্রেয়ী তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে শুনেছি—এই শুভ সময়েই যদি সেই নিমন্ত্রণ সার্থক করো, তাহলে সেই সিন্‌কোনা ক্ষেত্রে একটা পিক্‌নিক জমে উঠতে পারে—পিক্‌নিকের আনন্দই হচ্চে অনভ্যস্ত জায়গা এবং চিরাভ্যস্ত লোক নিয়ে। বেলঘরিয়ায় তোমাদের ছিল ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়ানি, দার্জিলিঙে টিক টিক টিক টিকানি—একটা হচ্চে কামারের এক ঘা গোছের, অন্যটা স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

কবি

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর আমাকে নিমন্ত্রণ করার কথা কবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন জানি না, কিন্তু তখনও সে নিমন্ত্রণ আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি। পরে কবি আরো ২।১ বার মংপু যাবার কথা লেখায় তাঁকে জবাব দিয়েছিলাম যে, যদি তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ি বা শান্তিনিকেতন হোতো তাহলে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম। কিন্তু বাড়ি যখন তাঁর নয় তখন তাঁর নিমন্ত্রণও গ্রাহ্য নয়, বিশেষত যাঁদের উপর আতিথ্যভার চাপাবো, তাঁরা যখন সম্পূর্ণ নীরব এ বিষয়ে। তার পরেই মৈত্রেয়ী দেবীর কাছ থেকে এক লাইন পত্র পেলাম কবির চিঠির মধ্যে "আপনারা এখানে এলে খুশি হবো"। বুঝলাম ব্যাপারটা কি — কবির আগ্রহের আতিশয্যে বেচারীকে লজ্জার খাতিরে ওটুকু লিখতেই হয়েছে। তাদের যে সে সময় বাড়িতে ডাকতে অসুবিধা আছে তা কবির পরের পত্রেই বোঝা গেল। কবি না ভেবেচিন্তে আমাদের ডাক দিয়ে পরে কি রকম বিপদে পড়েছেন দেখে আমার স্বামী খুব হেসেছিলেন।

কবির মৃত্যুর পর মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা "মংপুতে" বইখানি যখন বেরোলো, তাতে আমাদের মংপু যাবার নিমন্ত্রণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্য আকারে অংকিত হয়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছি—আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

"Babu changes his mind" সম্বন্ধে একটি ইতিহাস আছে —সেটা বোধ হয় এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। একদিন কবির কাছে শুনলাম তিনি অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ি থেকে একখানি খাতা উদ্ধার করেছেন তাতে কবির পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেতে ছিলেন সেই সময়ে তাঁর কোনো সহচর বাড়িতে নিয়মিত চিঠি লিখে তাঁর যে খবর দিতেন তা লিপিবদ্ধ করা আছে। সেই রকম কোনো একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "Babu changes his mind always"। কবি তাই পড়ে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন এবং আমাদের কাছে বলেছিলেন, "আর আমার কোনো লজ্জা নেই, শেষ মুহূর্তে আমি মত বদল করি বলে। আমার যোগ্য পিতামহ যখন এ কাজ করে গিয়েছেন, তখন তাঁর পৌত্রই বা তা না করবে কেন?" পরে অনেক সময়েই হাসতে হাসতে বলতেন, "বুঝলে কিনা Babu changes his mind; অতএব আমার উপর বেশী নির্ভর করা ভালো না।"

॥ ৪৩১ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

কালিম্পঙ লেগেছিল ভালো, এ জায়গাটা আরো ভালো লাগচে। পাহাড়ের চূড়াগ্রে কালিম্পঙের চেয়ে উচ্চতর উচ্ছ্রায়ে, সুন্দর বাগানের মধ্যে, উন্মুক্ত আকাশে। বাড়িটা তোমার ঘড় ঘড়িয়ার চেয়ে বৃহৎ উচ্চ উদার সুসজ্জিত—জানিনে বনমালীর আদর্শকে স্পর্শ করেছে কিনা। দেখেছি তোমার সম্বন্ধে তার একটা মুগ্ধচিত্ততা আছে — আমার বিশ্বাস যে কেবলমাত্র তোমার মাধুর্যগুণে নয়, ততোধিক কারণ তোমার দাক্ষিণ্য। আমার মতো অকিঞ্চনের কাছে থেকে, তাই তোমার ঐশ্বর্যে হতভাগার মন অভিভূত। কাল মৈত্রেয়ী তুমি দার্জিলিঙে এসেছ শুনে আমাকে বললে তুমি যদি তার এখানে আসো, সে খুশি হবে। তাই তারি দৌত্য বহন করচি, সংকোচের কারণ নেই—সঙ্গে রাশিকারকে এনো—রাশিকরণের সমস্যা তিনি সঙ্গে আনতে পারেন—জায়গাটা কঠিন মনোনিবেশের পক্ষে ভালো, কবিত্বের পক্ষেও বটে।

এখানে ছুটি কাটিয়ে যেতে সানুনয় অনুরোধ পেয়েছি। বেশি পীড়াপীড়ি করতে হয়নি। বৌমাকে আনবার চেষ্টা করছি। রথীর এ জায়গা খুব ভালো লেগেছে। ইতি ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

কবি

কবির এই চিঠির মধ্যেই শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী এক লাইন লিখে জানান যে, আমরা গেলে তিনি খুশি হবেন। আমরা তার উত্তরে জানাই যে, যদি মংপু যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের বহুদিনের পুরাতন বন্ধু সুরেশ সেনের কাছে গিয়েও আমরা থাকতে পারি।

॥ ৪৩২ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

ইচ্ছার ঔদার্যে তোমাদের আহ্বান করেছিলুম—স্থানের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে তখন আমার অভিজ্ঞতা ছিল না। তোমার সুরেশ সেনের বাসা গ্রীষ্মাভিঘাতকাতর আত্মীয়স্বজনপরিপূর্ণ এই রকম জনশ্রুতি। এ বাড়িতে গৃহস্বামী এক অংশে আছেন সপত্নীক সকন্যক, আমার আছে নন্দীভৃঙ্গী যুগল আমি আছি উপরতলার এক অংশে অপর অংশ রথীর জন্যে নির্দিষ্ট। কালিম্পঙে থাকাকালে যদি দর্শন দিতে তাহলে কোনো দিক থেকে কোনো সংকীর্ণতা থাকত না। বোধ করি ছুটির শেষাংশে সেখানে যাব—যদি সম্ভব হয়, সেখানে অবতীর্ণ হতে পার—না হয় ত কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী:

এখানে মোটের উপর ভালোই আছি। লোকশিক্ষা সংসদের জন্যে বাংলা ভাষাপরিচয় একটা লিখতে আরম্ভ করেছি। আজ কাল লিখতে শরীর মনে ক্লান্তি আসে, তবু মৃদু মন্দ গমনে চলচে। লেখবার বিষয় সম্বন্ধেও মনে খুব উৎসাহ নেই কর্তব্য।

রাশিকারের কাজ বোধ হয় নিরন্তর টক্‌টকায়মান। আরো তোমাদের আতিথ্যের কাজ বোধ করি ওখানকার মেঘের মতো অত্যন্ত ঘনীভূত। আজ সুরেন করের সঙ্গে রথী এখানে আসবেন। ইতি ২৬।৫।৩৮

কবি

শার্ঙ্গদেব

তিমিরবরণ ও তাঁর অর্কেস্ট্রা

অর্কেস্ট্রার বিপুল সম্ভাবনা আমাদের দেশে রয়েছে অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা খুব মামুলি বলেই মনে হয়। ইতি-পূর্বে অর্কেস্ট্রার ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় যে পাওয়া যায়নি এমন নয়; কিন্তু অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে কৌতূহল আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। সম্মিলিত বাদ্যধ্বনির মধ্য থেকে একটা পরম আকুতির প্রকাশ আমাদের বিহ্বল করেছে কিন্তু নিতান্ত সাময়িকভাবে —যন্ত্রসংগীতকে অর্কেস্ট্রার স্বরূপে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিক উৎসাহে সমর্থন করিনি।

অনুসন্ধান নিলে জানা যাবে গত শতাব্দী থেকে এ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ব্যক্তি অর্কেস্ট্রা সংগঠন করতে চেয়েছেন এবং সংগীতে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও কম ছিল না; কিন্তু পরিবেষণ ও প্রয়োগের দিক থেকে এমন কিছু ত্রুটি ছিল যাতে আমাদের দেশে যন্ত্রসংগীত সম্বন্ধে কৌতূহল পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুরূপ হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সাধারণ দেশীয় ঐক্যতানে পরিণত হয়েছে। উভয় সংগীতের মূল্যায়ন এমন-ভাবে হতে পারেনি যাতে করে শ্রোতাদের মনে যন্ত্রসংগীত সম্বন্ধে একটা নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে শ্রোতারা পুলকিত হয়েছেন—তাঁদের ভাল লেগেছে কিন্তু অর্কেস্ট্রার মধ্যে তাঁরা এমন কিছু দেখেননি যাতে ভারতীয় সংগীতে অর্কেস্ট্রার প্রবর্তনকে তাঁরা আবশ্যিকভাবে দাবী করতে পারেন। আমাদের সংগীতানুষ্ঠানে এখনো অর্কেস্ট্রার কোন চাহিদা নেই—যন্ত্র-সংগীতের একক অনুষ্ঠানই আমাদের পরিতৃপ্ত করে চলেছে।

সম্প্রতি তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা শুনে মনে হল এবিষয়ে আমাদের চিন্তার বিস্তৃতি প্রয়োজন। অর্কেস্ট্রার যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক বেশী সচেতন হওয়া আবশ্যক। আমাদের অর্কেস্ট্রা আমাদের নিয়মে গড়ে তুলতে হবে; কিন্তু বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বে যে বিভিন্ন ধারায় সমবেত যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান চলেছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে নতুবা আমরা পেছিয়ে থাকব। আজ সমগ্র পৃথিবীর দ্বার ভারতের কাছে উন্মুক্ত। বর্তমানে বিশ্বময় শিল্পীদের আনাগোনা ভাবের আদান-প্রদান যেভাবে চলেছে এমন খুব কম যুগেই ঘটবার অবকাশ হয়েছে। অতএব মুক্ত মনে সংগীত সংস্কৃতির নব এবং সার্থক প্রচেষ্টার এই উত্তম সুযোগ।

তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা শোনবার সুযোগ হল কোনও বৃহৎ সংস্কৃতি সম্মেলনে নয় ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনীয়ার্স (ইণ্ডিয়া)-এর দ্বিচত্বারিংশৎ বাৎসরিক অধিবেশনের একটি নাতিবৃহৎ কালচারেল প্রোগ্রামে ঘটনা-চক্রে উপস্থিত হয়েছিলাম গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁর এই নিভৃত অনুষ্ঠান শোনবার জন্য। শুনে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু মুগ্ধ নয়—সংগীতচিন্তায় একটা নতুন প্রেরণা পেলাম। যে অনুষ্ঠান চিন্তার প্রেরণা দেয় তা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ। তিমিরবরণ শোনালেন ছটি কম্পোজিশন—বসন্ত-পঞ্চম, মানভঞ্জন, অপরাজিতা, লুপ্তোদ্ধার, ললিতা - গৌরী - মারোয়া, আরবারজনী। তিমিরবরণের রচনা এক-দিকে ভাবধর্মী অপরদিকে আখ্যানমূলক। রাগসংগীতের বৈশিষ্ট্যকে তিনি রক্ষা করে গেছেন এবং মেলডির বিচিত্রবিকাশ ঘটিয়ে-ছেন বিভিন্ন যন্ত্রে। তাদের সমন্বয় সাধনও করেছেন। যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে তিনি কণ্ঠ-সংগীতও যোজনা করেছেন সার্থকতার সঙ্গে। এটি সিম্ফনি নয়—পাশ্চাত্ত্যসংগীতে যাকে পলিফোনি বলে তিমিরবরণ সেই-দিকেই গেছেন নইলে ভারতীয় সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য রাগসংগীতের ব্যক্তিত্ব বা পরিচয় থাকে না। তাঁর এই ধরনের রচনায় সুরের প্রত্যেকটি ধারার একটি মেলডি-বৈচিত্র্য বর্তমান ; একটির সঙ্গে অপরটি দক্ষতার সঙ্গে যোজিত হয়েছে এবং সমবেতভাবে উৎকৃষ্ট মিলিত ধ্বনিতে অপূর্ব আবেদন নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তিমিরবরণের এই অর্কেস্ট্রায় কর্ডের প্রয়োগ দেখিনি, সোনাটার গতি-ভঙ্গিও তিনি গ্রহণ করেননি—তার কারণ হার্মনির পুরোপুরি প্রয়োগে আমাদের সংগীতের যে বিকাশ তার অভীষ্ট, তার পরিচয় নাও মিলতে পারে। তবে কণ্টার্পোর পদ্ধতিতে একক বাদন ও বহু যন্ত্রে তার প্রতিফলন তাঁর পরিকল্পনায় আছে।

প্রতিভাধর সংগীতস্রষ্টা তিমিরবরণ

"বসন্তপঞ্চম" তাঁর প্রথম রচনা। এই রচনায় আমাদের সংগীতে পলিফোনির সুদক্ষ প্রয়োগ দেখা যায়। "লুপ্তোদ্ধার" সংগীতশাস্ত্রের এক লুপ্তরাগের এক টুকরো স্বরলিপি থেকে তাঁর নিজের পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে নানা বৈচিত্র্যে। "অপরাজিতা" মালকোশকে কেন্দ্র করে একটি আখ্যান-পরিকল্পনা যাতে মালকোশের সঙ্গে অপর এক সম্ভ্রান্ত অথচ অজানা রাগিণীর মিলন ঘটেছে। "ললিতা-গৌরী-মারোয়াও" এই ধরনের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা-গুলিই ভাবধর্মী এবং কর্ডের চেয়ে মেলডিতেই এদের পরিচয় নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। মানভঞ্জন ও আরবারজনীকে রচনা হিসাবে "ফ্যান্সি" বলা যায়।

থীম বা আখ্যানবস্তুকে অবলম্বন করে অর্কেস্ট্রা গঠনের মধ্যেও একটা বিপুল বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তিমিরবরণ প্রমুখ শিল্পীগণ যে সেই সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলছেন তার জন্য তাঁরা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বহুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প ক্ষুধিত-পাষাণকে অবলম্বন করে তিনি একটি অর্কেস্ট্রা গঠন করেছিলেন তা

আমাদের এখনও স্মরণ থাকবার কথা। রাগ-সংগীতকে কেন্দ্র করে কয়েক শত বৎসর পূর্বে চিত্ররূপের পরিকল্পনা হয়েছিল যাকে শাস্ত্রে বলা হয় দেবময়রূপ। মালকোশের রূপের কথা ধরা যাক। মালকোশ রূপবান যুবক; মধুপানে সে প্রমত্ত কিন্তু বীর্যবান হলেও স্বভাবত সে শান্ত। পরিধানে তার নীলবসন, গলায় মুক্তোরমালা। হাতে কুসুম-রচিত যষ্ঠি। তাকে পরিবেষ্টন করে আছে লাস্যময়ী তরুণীরা। এই পরিকল্পনাটি একটি স্থায়ী চিত্রেই রয়ে গেল। শিল্পীরা অনেকে এই চিত্রকে বাদনকালে তাঁদের ধ্যানে আনতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই বাদন বা গান স্লেন-সং-এর মধ্যেই রয়ে গেছে তা নভলেট,র‍্যাপসডি বা ফ্যানটাজিয়াতে পরিণত হতে পারেনি। নাটগীতির দিকে আমাদের পরিকল্পনা অনেকটা বিস্তৃত হয়েছিল কিন্তু তা অভিনয়ের প্রগতি নির্দেশ করে। আজকের যুগে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে আমরা এই বর্ণনাত্মক সংগীতকে বিবিধ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। তবে কণ্ঠ-সংগীতে নিছক বর্ণিত-বস্তুকে প্রকাশ করতে চাইলে কোনও নতুনত্ব প্রকাশ পাবে কিনা সন্দেহ কেননা কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের সংগীতের শ্রেষ্ঠ আবেদন হচ্ছে সাজেস্টিভ প্রকাশভঙ্গিতে। আজকাল গ্রামোফোন সিনেমায় বর্ণনাত্মক গান প্রচুর গাওয়া হচ্ছে কিন্তু তাদের চমক ক্ষণস্থায়ী। কণ্ঠসংগীতে আমরা কিছুটা বলে অধিকাংশ না বলা হিসেবে রাখতে চাই, সুরে তার ইঙ্গিত দিয়ে যাই। কিন্তু যন্ত্রীসংগীতের ক্ষেত্রে একটা আখ্যানবস্তুকে ফোটাতে চাই এই কারণে যে বিভিন্ন যন্ত্রের আবেদন বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে চায়। কণ্ঠে বলার যে মামুলিভাব আছে যন্ত্রের বলায় সেটা নেই। এখানে ধ্বনি বৈচিত্র্যে স্বতই মনে এক একটা রূপের রহস্য ধরা দিতে থাকে। এই যে বিচিত্র প্রকাশের আকৃতি যন্ত্রসংগীতের সুরলহরীতেই তার উত্তম অভিব্যক্তি হতে পারে। আমাদের ভারতীয় বিবিধ যন্ত্রে এই অভিব্যক্তির উত্তম সুযোগ আছে। তিমিরবরণ সেই সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর অসামান্য প্রতিভায় একটি নতুন পথ প্রস্তুত করে চলেছেন। বহুদিনের বিচক্ষণ শিক্ষা, বিপুল অভিজ্ঞতা, বহু দেশের শিল্পমানসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন তার ভিত্তি সুদৃঢ়। এই সার্থক পরিকল্পনার জন্য আমরা তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ প্রদান করছি এবং আমরা আশা করব দেশবাসী যন্ত্র-সংগীতের এই নতুন অভিযানকে অভি-নন্দিত করবেন, এর গৌরবমূল্য চিন্তাম্বার নির্ধারণ করবেন। যাঁরা এই অর্কেস্ট্রাগুলিতে বিভিন্ন বাদ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁর সার্থক সহযোগিতার জন্য বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

শিল্পকৃতিত্বে বিশিষ্ট এবং প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টি বলে পরিগণিত হবার মতো দক্ষতা-সম্পন্ন ক'জন শিল্পীর আঁকা ছবির একক প্রদর্শনী পর পর এ বছরের শুরু থেকেই দেখা গিয়েছে। একেবারে 'মাস্টার' পর্যায়ে এদের কাউকে গণ্য করা না গেলেও বৈচিত্র্যের প্রতি ঝোঁক এবং প্রকাশভংগীর মধ্যে একটা মৌলিকত্ব অভিব্যক্ত করার প্রচেষ্টা এদের অনেকের মধ্যেই দেখা গেছে। চিত্ররচনার দক্ষতা প্রকাশে এরা যেমন বিষয়বস্তুর নির্বাচনে রকমারিতার দিকে ঝোঁক দেখিয়েছেন, তেমনি রঙের প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকেও। তারই আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা গেল গত সপ্তাহে ফাইন আর্ট আকাদমিতে অনুষ্ঠিত নরেশ সেনগুপ্তের একক প্রদর্শনীতে।

কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা আয়ত্ত করার পর শ্রীসেনগুপ্ত কোলোলো গভর্নমেণ্ট সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং শিমোলি ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫১ সালে উগাণ্ডায় যাবার পর তিনি পাশ্চাত্ত্য ধারায় আঁকতে আরম্ভ করে আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ওখানকার বিভিন্ন স্থানের নানাজাতির ও নানাভাবে কার্যরত স্ত্রী-পুরুষের প্রতিকৃতি আঁকায় দক্ষতা প্রকাশে সক্ষম হন। উগাণ্ডা আর্টস ক্লাবে তাঁর ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী হয় এবং দেওয়াল-চিত্রী প্রতিযোগিতায় তিনি কতকগুলি পুরস্কারও লাভ করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল ...কে উইম্বলডন স্কুল অব আর্টসে ...ষয়ক ডিজাইন শিক্ষার জন্য একটি বৃত্তি ...য়। লণ্ডনে থাকাকালে গত বছরের ...নুয়ারী মাসে লণ্ডন কমনওয়েলথ ...লারিতে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী হয়। ...নকাতায় তাঁর ছবির প্রদর্শনী এই প্রথম। প্রদর্শিত মোট চুয়াল্লিশখানি ছবির ...ধকাংশই গুয়্যাশ পদ্ধতিতে আঁকা। ...র্শিত ছবিগুলির মধ্যে সব ক'খানিকেই ...চ্চশ্রেণীর বলে অভিহিত করা যায় না। ...পিষবার ছুরির সাহায্যে ছবি তৈরির ...ত্রে সিজানের অনুকরণ (নং ১১) লক্ষ্য ...া যায় কয়েকখানি ছবির ক্ষেত্রে। ভ্যান ...র তাহিতির অধিবাসীদের নিয়ে আঁকা ...বর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় (৪ নং) ...কগুলি ছবির ক্ষেত্রে। 'মা ও সন্তান' ...: ১) প্রভৃতি কয়েকখানি ছবির ক্ষেত্রে ...ত নিষ্প্রভ বা অত্যন্ত হালকা রঙের ...য়োগ এবং 'মোরগের লড়াই' (নং ১২), ...রোলের প্রাকৃতিক দৃশ্য' (নং ১৫)

সমুদ্রোপকূলে জেলেনীর দল — শিল্পী : নরেশ সেনগুপ্ত

প্রভৃতির ক্ষেত্রে চড়া রঙের ব্যবহার একটু যেন ছন্দপতন ঘটিয়েছে বলে মনে হবে। শিল্পী মুখ্যত ইম্প্রেসনিষ্টিক ধারার অনুরাগী কিন্তু কিউবিজমেও তিনি পরীক্ষায়

আলাপ — শিল্পী : নরেশ সেনগুপ্ত

হাত দিয়েছেন দেখা যায় (নং ১৭)। দর্শককে ধাঁধায় পড়তে হয়, সুন্দর একটা ছন্দোময় রেখা ও রঙের প্রয়োগ সত্ত্বেও 'অনির্দিষ্ট হাসি' (নং ৮) ছবিখানি দেখে। সমগ্র প্রদর্শনী থেকে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, শিল্পী এখনও নানা পরীক্ষা নিয়ে আছেন এবং সব সময়ে তাঁর চেষ্টা রয়েছে বিষয়-বস্তু ও রঙের বিন্যাসে একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ বৈচিত্র্য নিয়ে আসার।

আফ্রিকার দৃশ্য ও চরিত্র নিয়ে ইম্প্রেসনিষ্টিক ভঙ্গীতে আঁকা 'মাসাই যোদ্ধা' (নং ৩), 'বাগাণ্ডা নারী' (নং ৪), 'কিকুউ সর্দার' (নং ৯), 'সমুদ্রোপকূলে জেলেনী দল' (নং ১৬), 'আফ্রিকার গ্রাম' (নং ২১), 'কর্মরতা নারী' (নং ৩৩ ও ৪০), 'ধান কাটা' (নং ৩৯), 'ঞ্জিরিয়ামা নারী' (নং ৩৭) প্রভৃতি ছবিগুলি তাঁর শক্তির পরিচয় দেয়। 'জিরাফ' (নং ২৩) এবং 'ন্যাশনাল পার্কে হরিণ দল' (নং ৩২) প্রভৃতি বন্য জীবনের ছবিগুলিও সুন্দর। তুলি বা রঙপেষা ছুরির সাহায্যে বর্ণাকিভব চমৎকার গতিময় ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। রঙের বিক্ষিপ্ত আঁচড়ে 'আতসবাজি'-র (নং ২৫ ও ২৬) উজ্জ্বল প্রভা ফুটিয়ে তোলায় তাঁর কল্পনা ও উদ্ভাবন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে ছবিগুলি থেকে শিল্পীর প্রতিভা, দৃষ্টিশক্তি এবং ছন্দোময় রঙের প্রয়োগে ব্যক্তিত্বপূর্ণ চিত্রসৃষ্টির বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

“অক্য সাড়ম্বর শুভারম্ভ; টেকনিকলার শো; প্রবেশমূল্য একটি ভোট; কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য”—বিজ্ঞাপনের ড্রাফ্টটি বলাবাহুল্য বিশুখুড়োর।

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র জনবিক্ষোভ চলিতেছে। জঙ্গী সরকার বলিতেছেন সব ঠিক হ্যায়। শ্যামলাল বলিল—“একদিন কে যেন কোথায় বলেছিল 'সব ঝুট হ্যায়'—সে-ই কি বুলি পালটিয়ে বলছে সব ঠিক হ্যায়!!”

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকার নাকি তাঁহাদের জন্য স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করিবেন।—“অবিভক্ত পূর্ব বাংলার কবি একদিন বলেছিলেন আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ”—স্মরণ করাইয়া দিলেন জনৈক সহযাত্রী।
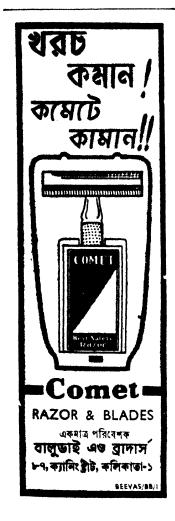
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ভ্রমণোৎসব সপ্তাহ চলিতেছে। “ভ্রমণকারীরা মোরা নিয়ে ভুলে আছেন; ভারত বনাম এম সি সি-র খেলা শেষ হয়ে গেছে, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা এখনো বহুদূর—ভ্রমণে তবে কোন্ অষ্টরম্ভা দেখবেন!!”

বারাসত-বসিরহাট ট্রেন চলাচলের সংবাদ পাঠ করিলাম। সংবাদে বলা হইয়াছে—নির্ধারিত সময়ের প্রায় একঘণ্টা পরে রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম হাতল টানিলে লাল বাতির বদলে সবুজ বাতি জ্বলিয়া উঠিল। সমবেত জনতার আনন্দধ্বনি ও করতালির মধ্যে ট্রেন চলিতে আরম্ভ করে।—“ভাগ্যিস একঘণ্টা দেরী করেছিলেন স্বয়ং রেলমন্ত্রী, ড্রাইভার-গার্ড একঘণ্টা দেরীতে গাড়ি নিয়ে এলে সমবেত জনতা কী করতেন সেটা হয়ত রেলমন্ত্রী জানেন না”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চার্ণক্যের 'নগরদর্শনে' পড়িলাম—সার্কুলার ক্যানেল বুজিয়ে ফেলা হবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—“তার চেয়ে কুমীর আগমনের জন্য যে-সব খাল কাটা হয়েছিল সেগুলি আগে বুজিয়ে ফেললেই জনসাধারণ উপকৃত হতো!”

পৃথিবীর কি ধূমকেতুর মত পুচ্ছ আছে? বিজ্ঞানীদের একটি জিজ্ঞাসা। শ্যামলাল বলে—“ধূমকেতুর মতো না হোক, কোন কোন প্রাণীর মতো ল্যাজ তার নিশ্চয় গজিয়েছে আর তা নইলে এত অব্যাপারেষু ব্যাপারং-এর ঘটা কেন!!”

সংবাদে শুনিলাম নিউ ইয়র্কে নাকি হাম-এর টিকা আবিষ্কার করা হইয়াছে।—“খুব ভালো কথা। অতঃপর হাম-বড়াই বন্ধের টিকা আবিষ্কৃত হলে আরো ভালো হয়”—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

একটি অপূর্ব সংবাদ পাঠ করিলাম—“প্রেম ধর্মঘট”। অস্যার্থঃ স্বামীরা যদি আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী না হন, তবে তাঁহাদের সহিত ভালবাসার অবসান ঘটাইবার জন্য বৃটেনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রীদের নিকট আবেদন জানান হইবে।—“কিন্তু তাতে কাজ হবে কি? আণবিক না হতে পারে, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তায় ফুলশরটিও তো বড় কম যায় না”—রসকষহীন শ্যামলালের মন্তব্য, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, কাজে কাজেই!

সংবাদে প্রকাশ, পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব-এর প্রায় পাঁচশত ছবি নাকি কর্ণফুলিতে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—“বিসর্জনের পর পুনরাগমণায় চ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়েছে কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি!!”

উত্তর কলিকাতায় কোন স্থানে জঞ্জালের 'পাহাড়' জমিয়াছিল। সংবাদে বলা হয় সেই পাহাড়ের উপর একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়া তাহাতে বলা হয়—এই জঞ্জাল সরাইবার দায়িত্ব যাঁর তিনি নির্বাচনপ্রার্থী। পরের দিন সকালে নাকি দেখা যায় জঞ্জাল উধাও,—বিজ্ঞপ্তিটিও বলাবাহুল্য সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী ছড়া কাটিলেন—“সেই মামা সেই মামী, সেই পুকুর পাড়ে ঘর, এখন কেন গো মামী দুধে পাড় সর!”

ডেলিমেল”এর বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক শ্রীব্যানিস্টার বলিয়াছেন যে পার্সেলে বিলাত হইতে খেলোয়াড়দের খাবার না পাঠান মারাত্মক ভুল হইয়াছে—ভারত ও পাকিস্তানের সৌজন্যের জন্যই খাবার পাঠান হয় নাই।—“যা হোক এম সি সি-র পরাজয়ের একটা কারণ পাওয়া গেল। হরিমটরের ব্যবস্থা হবে কি না বলা শক্ত”—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক।

কলিকাতায় ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে—“এবং অচিরেই এলেনবরো মাঠে স্টেডিয়াম নিয়ে বির্বতির ছড়াছড়ি আরম্ভ হল বলে, রাহু ধৈর্যং”—বলেন বিশুখুড়ো।

এক সংবাদে প্রকাশ জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে শ্রীনেহেরু যোগদান না-ও করিতে পারেন।—“এক সাম্প্রতিক সংবাদে শুনেছি নেহেরুজীর গলা খারাপ হয়েছে বলে তিনি অনেক স্থানে নির্বাচনী বক্তৃতা সংক্ষেপে সেরেছেন। এর সঙ্গে জেনেভা না যাওয়ার কোন যোগাযোগ আছে কি না তা বলা শক্ত”—বলেন বিশুখুড়ো।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী শহর—সফরে একস্থানে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে পায়রা উড়াইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—পায়রাটি লক্কা জাতীয় হলে উড়িয়ে দেওয়াই সমীচীন হয়েছে!!”

লণ্ডনে এইবার ভারতীয়গণ কর্তৃক সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।—“লণ্ডনবাসী সতর্ক হোন, বিদ্যার বহর না বাড়লেও চাঁদার মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা অনিবার্য”—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

॥ ২৯ ॥

টেলিফোনে আবার অনিন্দ্য পাকড়াশির খবর পাওয়া গিয়েছিল। পাকড়াশি জুনিয়র আজকাল অনেক কাজ করছেন। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজ নামে শিল্প সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাঁকে একদিন বসতে হবে। তার জন্যে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন। "শিক্ষা নয় অগ্নিপরীক্ষা"—একদিন অনিন্দ্য পাকড়াশি নিজেই আমাদের বলেছিলেন।

আজও অনিন্দ্য পাকড়াশিকে আপনারা দেখে থাকবেন। দেশের তরুণতম শিল্পপতি-দের তিনি একজন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক কনফারেন্সের পর ফিনান্সের উত্তাপে অনেকক্ষণ সেদ্ধ করা তাঁর মুখের যে ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তা দেখে আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না এই অনিন্দ্য পাকড়াশিই একদিন আমাদের সঙ্গে সরল প্রাণে গল্প করবার জন্যে সুযোগ খুঁজতেন। লুকিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতেন আমাদেরই এই শাজাহান হোটেলে। বলতেন, "সিগারেট খাওয়াও আমার বারণ। মা মোটেই পছন্দ করেন না।"

পাকড়াশি জুনিয়রও তখন রোজীর মতো চকোলেট খেতে ভালবাসতেন। তাঁর পকেটে সর্বদা চকোলেটের বার থাকতো। আমাদের একটু একটু ভেঙে দিতে দিতে অনিন্দ্য পাকড়াশি বলতেন, "আমার বাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না। বাবা বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে, ট্রেডে, কমার্সে শান্তি নেই। জীবনকে যদি উপভোগ করতে চাও, তা হলে এর থেকে দূরে থাকা ভাল। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমি আরও কয়েক বছর স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করি; ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের দেশে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। তারপর রুটিনের ঘানিতে একদিন তো বাঁধা পড়তেই হবে। কিন্তু মা রাজী হলেন না।"

একটু থেমে পাকড়াশি জুনিয়র বলে-ছিলেন, "জানেন আমার ছবি আঁকতে এতো ভালো লাগে, অথচ একটুও সময় পাই না। গাড়ি করে যেতে যেতে যখন দেখি গড়ের মাঠে, সবুজ ঘাসের উপর বসে বসে কোনো শিল্পী ছবি আঁকছে, তখন আমার মনটা উদাস হয়ে ওঠে। জানেন, এলিয়ট, অডেন আর পাউন্ডের কবিতা পড়া আমার নেশার মতো ছিল। বাংলাও পড়তাম। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন এঁদের কবিতাও আমার খুব ভাল লাগতো। সমর সেন পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার খুব দুঃখ হতো। আমাদের দেশের লোকরা সত্যিই এতো কষ্ট পায়? জানেন, মাকে একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। মা তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। মা বললেন, 'ওঁরা যে কবি। হয়তো জীবনে ওঁদের যথেষ্ট সুখ আছে, শান্তি আছে, তবুও লেখবার সময় চোখের জল ফেলতে হয়। কাব্যের নিয়মই এই। পৃথিবীতে যারা সামান্য একটু সুখে আছে, স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, দারিদ্র্যের আদালতে তাঁদের অভিযুক্ত না করলে, সাধারণ লোক পয়সা দিয়ে ওদের কবিতার

বই কিসে পড়বে কেন? ও'দের সংগে যদি আলাপ হয়, দেখবে এ'রা আমাদেরই মতো সাধারণ জীবন যাপন করছেন।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি ছেলেমানুষের মতো বলেছিলেন, "মা, যাই বলুন, সমর সেনের কবিতা পড়তে পড়তে আমার ভয় হয়। এক এক সময় মনে হয়, তিনি যা লিখেছেন তা সত্যি হলেও তো হতে পারে। সামান্য একটু জনপ্রিয়তা পাবার জন্যে কেন তিনি মিথ্যে কথা লিখতে যাবেন?"

এই অনিন্দ্য পাকড়াশিকেই আমরা চিনতাম। আমি চিনতাম। আবার আমার থেকে অনেক বেশী চিনতেন মিস্টার আগরওয়ালার হোস্টেস শ্রীমতী করবী গুহ।

দু'নম্বর সুইট থেকে ফোন তুলে ধরতে ফোনের ওধারে থেকে মাধব পাকড়াশি প্রথমে কথা বললেন। মাধব পাকড়াশি বললেন, "এই যে ডেলিগেশন আসছে, এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মিস্টার এ পাকড়াশির। যা কথাবার্তা বলবার তা ও'র সংগেই বলবেন। একটু ধরুন, আমি ও'কে ডেকে দিচ্ছি"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "ভালই হয়েছে। আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম আমি নিজেই একবার শাজাহান হোটেলটা ঘুরে আসবো।"

করবী দেবী বললেন, "তাহলে তো খুবই ভাল হয়।"

টেলিফোনটা নামিয়ে করবী দেবী আমাকে বললেন, "একটু যে শান্তিতে থাকবো তার উপায় নেই। ধনীর দুলাল এখনই পান্থশালা পরিদর্শনে আসছেন! এ'রা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে হয়তো এখনই হুকুম দেবেন হিঁয়া কা মাটি হুঁয়া ফেঁকো, আর হুঁয়া কা মাটি হিঁয়া ফেঁকো। আমাদেরও তাই করতে হবে। এ'দের কাছে আমাদের শিখতে হবে কেমন করে অতিথি আপ্যায়ন করতে হয়!"

ঝলমলে টি-শার্ট এবং কাঠকয়লা রঙের ট্রপিকাল ট্রাউজার পরে এবং একটা টেনিস র‍্যাকেট হাতে নাচাতে নাচাতে অনিন্দ্য পাকড়াশি একটু পরেই নিউ আলিপুর থেকে এসে হাজির হলেন। সত্যসুন্দরদা তাঁকে কাউন্টার থেকে সোজা করবী দেবীর সুইটে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে আমাকে বসে থাকতে দেখে অনিন্দ্য বললেন, "আরে আপনি এখানে? মমতাজ-এ একদিন ঢুকে বেরিয়ে গেলে আন্দাজ হয় না, শাজাহান হোটেল কত বড়ো। আজকে ভিতরে ঢুকে এখানে আসতে আসতে বুঝলাম হোটেলের মধ্যে একটা শহর ঢুকে যেতে পারে।"

করবী দেবী অনিন্দ্যকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, "খাতায় কলমে যদিও এটাকে একটা সুইট বলা হয়, আসলে এটা হোটেলের একটা উইং। বেশ কয়েকজন গেস্টকে আমি অ্যাকোমোডেট করতে পারি।"

"অ্যাকোমোডেট্ নয়, আশ্রয় বলুন।" অনিন্দ্য হেসে উত্তর দিলেন। ঘরের ব্যবস্থাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "বিশ্বাস করবেন, আমি কখনও হোটেলে থাকিনি। মা মোটেই পছন্দ করেন না। এই ক'বছর তো বোম্বাই ব্রাঞ্চে ছিলাম, তা সহজেই হোটেলে থাকতে পারতাম। কিন্তু মা মাসিমার ওখানে ব্যবস্থা করে দিলেন। মেসোমশাই ওখানকার এজেন্ট। ও'র আণ্ডারেই আমার চাকরি।"

করবী দেবী বললেম, "আমাদের ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি ছোটোছেলের মতো হেসে ফেললেন। বললেন, "এই যে বাঁয়া

আসছেন এ'রা জার্মানির এক বিরাট কারখানার মালিক। এ'দের সংগে আমাদের আলোচনা চলছে। বাবা সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছেন। এখন কোথাও পান থেকে চুন খসলে, আমাকেই তার জন্যে দায়ী হতে হবে। সুতরাং কী করি বলুন? এ-সবের আমি কী বুঝি? বাবার কাছে আমার যাতে মুখ রক্ষে হয়, সে ব্যবস্থা আপনাদেরই করতে হবে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি কিছুই দেখলেন না। সব দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হলেন। করবী দেবীর রকিং চেয়ারে বসে পড়ে অনিন্দ্য বললেন, "সামনের কয়েকটা দিন আমার কাটলে হয়। মা বলছিলেন, 'বাবার তখন তেমন অবস্থা ভাল নয়। এক বিলিতী কোম্পানির এজেন্সি পাবার জন্যে বাবাকে নাকি পরপর তিনদিন লাঞ্চ ড্রপ করতে হয়েছিল।' আমার ভাগ্যে আবার দেখা যাক কী আছে। কিন্তু লাঞ্চ ড্রপ করতে আমার মোটেই ভাল লাগবে না।"

করবী দেবী গম্ভীরভাবে বললেন, "এখন দিন কাল পাল্টিয়েছে। লাঞ্চ না খেলেই যে কাজ সমাধা হবে তার কোনো মানে নেই।"

অনিন্দ্য বললেন, "ঠিক বলেছেন। মাকে আমি কথাটা শুনিয়ে রাখবো। কাল ভোরে আমি এরোড্রোমে যাবো, সেখান থেকে এখানে আসবো, ও'দের সংগে আঠার মতো লেগেও থাকবো। তারপর যা-হয় তা হবে।"

আমি উত্তর দিলাম, "এর পরে আপনার মায়ের আর কিছু বলবার থাকবে না। তবে, আগে থেকে আপনার বক্তব্যটা জানিয়ে রাখা মন্দ নয়!"

অনিন্দ্য পাকড়াশি আমার সংগে একমত হতে পারলেন না। বললেন, "আমার মাকে আপনি চেনেন না। মা ভাববেন কাজলের আমার কাজে মন বসেনি। ও-হরি, আপনাদের বলাই হয়নি, কাজল আমার ডাক নাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার বন্ধুরা আমাকে কাজলা দিদি বলে রাগাতো। দেখা হলেই দূর থেকে চিৎকার করতো—বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মাগো, আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই।"

করবী দেবী গম্ভীর হয়ে রইলেন। আমি কিন্তু হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলাম, "আপনি বুঝি খুব শ্লোক আওড়াতেন?"

"মোটেই নয়। মাঝে মাঝে শুধু কোটেশন দিতাম। কবিতায় উত্তর দিতে আমার খুব ভাল লাগতো। এখন কিন্তু আমি কাঠ হয়ে যাচ্ছি। বাবার হোটেলে থাকা এক জিনিস, সবাই সেই অভিজ্ঞতাটি উপভোগ করে। কিন্তু বাবার আপিসে চাকরি, সে যেন রিগারাস ইমপ্রিজনমেন্ট, গুরুতর অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড। বড়ো বড়ো স্টেটমেন্ট বাবার টেবিল থেকে আমার টেবিলে আসছে, সেগুলো পড়ে তার থেকে রস বার করতে হচ্ছে। এর থেকে বোম্বাই ব্র্যাঞ্চে আমি অনেক ভাল ছিলাম। মেশোমশায় এতো খাটাতেন না। হাজার হোক জানতেন একদিন আমার ঘাড়েই সব দায়িত্ব পড়বে। মায়ের কিন্তু ইচ্ছে ছিল, আমি আরও কিছুদিন বাইরে থাকি। বাইরে কাজ করলে ট্রেনিং ভাল হয়, মায়ের ধারণা। না হলে, নিজের পেটের ছেলেকে কে আর বাইরে রাখতে চায়, বলুন? বাবা আগে দু'একবার আমাকে নিয়ে আসবার কথা তুলেছেন, মা মত দেন নি। এবার, বাবা প্রায় জোর করলেন। বাবার ধারণা, মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের ঘরানা শিখে নেবার সময় এসেছে। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজের এখন দুটি প্রবল শত্রু, জানেন তো।"

করবী দেবী এবং আমি উৎসুকভাবে ও'র মুখের দিকে তাকালাম।

"কথাটা কিছু আমার নিজের নয়। আমার বাবাই প্রায় বলেন—পাবলিক সেকটর আর করোনারি থ্রম্বসিস। এ'রা দু'জনেই রাতারাতি আচমকা প্রাইভেট সেকটরকে নিজের এক্তিয়ারে টেনে নেবার তালে আছেন।" অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "এবার উঠি। মায়ের অর্ডার, ক্লাবে গিয়ে একটু টেনিস খেলতে হবে। বাবা কোনো খেলাধুলো করেন না, দিনরাত কাজে ডুবে থাকেন। আমারও এই সন্ধ্যেবেলায় টেনিস খেলতে মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু এখন মাঠে অনেককে দেখতে পাবেন। ওই যে বললাম, জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় প্রাইভেট সেকটরের ইডেন উদ্যানে করোনারি থ্রম্বসিসের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।"

করবী দেবী বললেন, "আপনার তো এই ব্রেকফাস্টের সময়। এখন থেকে ডিনারের সময়কার ছায়ার কথা ভাবছেন কেন?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি করবী দেবীর বলার ভংগীতে খুবই আনন্দিত হলেন। বললেন, "বাঃ চমৎকার বলেছেন তো। সুন্দর কথা বলতে পারেন বলেই তো এমন ধরনের কাজ করতে পারেন। তবে আমিও সুন্দর করে উত্তর দেবার চেষ্টা করছি! ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ডিনারের কথা ভাবার নামই তো দূরদর্শিতা। না হলে তো লোকে বলবে, এর মস্তিষ্কে গোবর। শ্রীযুক্ত গোবর যখন পড়ছেন, শ্রীমান গোবর তখন হাসছেন।"

আজও মনে পড়ে, অনিন্দ্য পাকড়াশি সেদিন বিদায় নেবার পর, আমরা দু'জন অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসেছিলাম। সত্যি ছেলেটাকে ভাল লেগেছিল।

নাম কাজল, কিন্তু আসলে যেন শুভ্র। অনিন্দ্য পাকড়াশি আমাদের হোটেলের এই

অশুচি পরিবেশে যেন কিছুক্ষণের জন্যে স্নিগ্ধশুচিতার ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন।

করবী দেবীও চুপ করে থাকতে পারলেন না। আস্তে আস্তে বললেন, "চমৎকার।"

আমিও যেন তখনও অনিন্দ্য পাকড়াশির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কোনো-রকমে বললাম, "হুঁ।"

করবী দেবী বললেন, "এমন ছেলেকে মিসেস পাকড়াশি কেমন করে যে বছরের পর বছর বাইরে রেখেছিলেন।"

"ভাবী রাজার মায়ের মতো, ভাবী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মাকেও অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।" আমি উত্তর দিলাম।

করবী দেবী নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, "আশা করি তাই যেন হয়।"

করবী দেবীর কথাতে আমিও খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। এমন এক একটা সময় আসে, যখন কাউকেই হিংসে করতে ইচ্ছে করে না। এক একজন মানুষ থাকে, সবাই যাঁর মঙ্গল কামনা করে। তাঁর ভাণ্ডারে অন্তহীন ঐশ্বর্য দেখে সাধারণরা আনন্দিত হয়; ঐশ্বর্যের আরও বৃদ্ধি কামনা করে। শ্রীমতী করবী গুহ শাজাহান হোটেলে ঐশ্বর্যের সমারোহ কম দেখছেন না। আমিও দেখছি। আমার নিম্নমধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমিও যেন হ্যামিল্টন কোম্পানির মণি-মাণিক্যের শোরুমে চাকরি করতে এসেছি। অনিন্দ্য পাকড়াশিকে আমাদের ভালো লাগবার কথা নয়। তবু ভাল লেগেছিল।

আমি মনে মনে আনন্দিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, যাক কিছু ভালও দেখলাম। হোটেল মানে তো শুধু খারাপ নয়। অসংখ্য ভালোর স্রোতে দু'একটা খারাপের মৃতদেহ ভেসে আসে; সেইটাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সাবধানী পরি-সংখ্যানবিদের কাছে তার তেমন মূল্য নেই —অসংখ্য ভালর মধ্যে সে-যে একটা খারাপ; শত, হাজার কিংবা লক্ষের মধ্যে একটা। আমাদের স্মৃতির অ্যালবামে, জীবনের সরোবরে একটা মরা গরুর দেহ ভেসে থাকলেই সব অপবিত্র হয়ে যায়। এতোদিন অন্তত তাই ভেবেছিলাম। আজ যেন অন্য রূপ দেখলাম—আমাদের সরোবরে পদ্ম-ফুলও ফোটে। সেই শুভ্র নিষ্পাপ পদ্মই যেন আমাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল।

এখন গভীর রাত্রি। আমার ক্লান্ত অবসন্ন মন স্মৃতির অতল থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে বহুদিন আগের হারিয়ে-যাওয়া পরিচিতদের ফসিলগুলো উদ্ধার করে আমারই চোখের সামনে সাজিয়ে রাখছে। এই রাত্রে বহুদিন আগের শাজাহান হোটেলের কোনো নাটকীয়তাই আমাকে চঞ্চল করে তুলতে পারছে না। পর্দার অন্তরালে দাঁড়িয়ে যে নাটক আমি প্রতিদিন দেখি, আজ যেন তারই শততম রজনী। নতুন দর্শকদের কাছে নতুন; আমার কাছে পুরনো, প্রাণহীন। শাজাহান হোটেলের সব যে আমার জানা হয়ে গিয়েছে। শেষ না জেনে, যে পবিত্র কুমারী-বিস্ময়ে একদিন করবী দেবী এবং অনিন্দ্যকে দেখেছিলাম, আজও সেই একই বিস্ময়ে যদি তাঁদের কথা লিখতে পারতাম! কিন্তু যা হবার নয়, তা নিয়ে দুঃখ করি না। এই রাত্রে ওঁদের দু'জনের প্রথম পরিচয়ের কথা লিখতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছে সেদিন অনিন্দ্যর সঙ্গে করবী দেবীর সাক্ষাত না হলেই ভাল হতো।

এই কলকাতায় অনেক হোটেল আছে। বিখ্যাত ভি আই পিদের সেবার জন্যে অনেক অতিথিশালা আছে। তারই কোনো একটাতে ইউরোপের কয়েকজন শিল্প-প্রতিনিধি কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করলে পৃথিবীর কারুরই কোনো ক্ষতি হতো না। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের সমৃদ্ধির পথে কোনো বাধা তাতে সৃষ্টি হতো না। মিসেস পাকড়াশি, অনিন্দ্য পাকড়াশি, মাধব পাকড়াশি, করবী দেবী, আমি—আমরা সবাই হয়তো ভালো থাকতাম। দু'জন বিখ্যাত অতিথিকে আতিথ্য দিতে অস্বীকার করলে শাজাহানেরও কিছুই এসে যেতো না। এই তো, প্রতিদিন মার্কোপোলো সায়েব রোজীকে ডেকে কত 'রিগ্রেট' ডিক্টেশন দিচ্ছেন। এখন আর পুরো ডিক্টেশনও দেন না। হোটেলকে লেখা চিঠিটা ফেলে দিয়ে শুধু বলেন, 'অ্যাকসেপ্ট', না হয় 'রিগ্রেট'। বাঁধাগৎ আছে। অ্যাকসেপ্ট মানে—'প্রিয় মহাশয় অমুক তারিখে আপনি আসছেন জেনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হলাম। আপনাকে সেবা করবার মধুর সুযোগটির জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

রিগ্রেট মানে—'আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এশিয়ার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেলে বহুদিন আগে থেকে সব ঘর বুক হয়ে যায়। আর আপনার মতো একজন মহান অতিথিকে আমরা তো কষ্টের মধ্যে রাখতে পারি না। আমাদের দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই, না হলে, আপনার মতো একজন মহান মানবের সেবা-সুখ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো কেন?'

এমনি রিগ্রেট চিঠি তো রোজী প্রতিদিনই টাইপ করছে। আর একটা বাড়লে, পৃথিবীর এমন কী ক্ষতি হতো?

কিন্তু তখনও বুঝিনি। আমি কেন করবী গুহও বোঝেন নি। তারপরের দিনও বোধ হয় না।

পরের দিন ভোরে আমি উঠে পড়েছিলাম। তখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। ছাদের উপর নিশ্চল পাথরের মতো একটা লোক তখনও বসেছিলেন। তাঁর নাম প্রভাতচন্দ্র গোমেজ। ওই ভোরবেলাতেই প্রভাতচন্দ্র গোমেজ যে ব্রাহ্মের প্রদর্শিত পথে কালো কফি নিজে হাতে তৈরি করে পান করেছেন, তা তাঁর পাশের শূন্য কাপটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন ছাদের কোনে ঐভাবে কিসের অপেক্ষায় বসে আছেন কে জানে?

প্রভাতচন্দ্র এবার আমাকে দেখতে পেলেন। ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "আমার জীবনে এই একটাই বিলাসিতা

আছে। সূর্যের জন্য পূর্বদিগন্তে তাকিয়ে থেকে আমি নতুন চিন্তার খোরাক পাই। সুরের শব্দহীন শিশুরা হঠাৎ যেন কলরবে মুখরিত হয়ে এই মুহূর্তে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

আমি বললাম, "আপনার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। শুধু একটা গেঞ্জি পরে বসে আছেন।"

প্রভাতচন্দ্র গোমেজ আমার কথায় যেন কানই দিলেন না। নিজের মনেই বললেন, "ঠাণ্ডা লেগে এখান থেকে আমি বিদায় নিলে পৃথিবী একটুও গরীব হবে না। অনেকদিন আগে ঠাণ্ডা লাগিয়ে অবহেলায় একজন মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—সেদিন কিন্তু পৃথিবী সত্যিই গরীব হয়ে গিয়েছিল। আজও সে ক্ষতি পূরণ হয়নি।"

প্রভাতচন্দ্রের কথার মধ্যে এমন এক বিষণ্ন
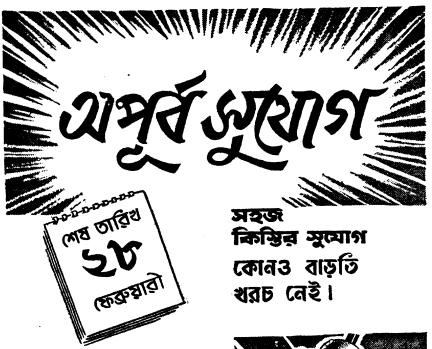
শব্দঝংকার আছে যা আমার মতো বেসুরো মানুষকেও সহজে আকৃষ্ট করে। আমি ও'র মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

প্রভাতচন্দ্র বললেন, "তিনি সংগীতের সেক্সপিয়র; তাঁর নাম বীঠোফেন। আমার যদি সামর্থ্য থাকতো, আমার যদি তেমন একটা রেকর্ড লাইব্রেরি থাকতো, তা হলে আজ এই মুহূর্তে আপনাকে শোনাতাম বীঠোফেনের নাইনথ্ সিমফানি—the most gigantic instrumental work extant."

আমি বললাম, "ঈশ্বরের আশীর্বাদে একদিন আপনার যেন সব হয়।"

"তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর বিচার?" প্রভাতচন্দ্র গোমেজ প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। "তাহলে হান্ডেল এবং বাক্ কী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন? তা হলে কী বীঠোফেন কালা হয়ে যান? মানব সভ্যতার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে আর একজনও বীঠোফেন সৃষ্টি হয়নি। যদি আপনি পৃথিবীর মধুরতম সিমফনি শুনতে চান তাহলে বীঠোফেন যে ন'টি রেখে গিয়েছেন তাই আপনাকে শুনতে হবে; যদি আপনার এমন পিয়ানো শোনাটা শোনবার লোভ থাকে যার কোনো তুলনা নেই তাহলে বীঠোফেনের বত্রিশটার মধ্যেই একটা পছন্দ করতে হবে। আর স্ট্রিং কোয়ার্টেট? সেখানেও আপনার ভরসা তাঁর সতেরোটি রচনা। আর অতি সাধারণ উপায়ে যদি অসাধারণ শব্দঝংকার সৃষ্টির রহস্য আপনি আবিষ্কার করতে চান, তা হলে ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে নির্জনে বসে বসে আপনাকে হান্ডেলের পুজো করতে হবে। একবারে তিনি হয়তো আপনাকে অনুগ্রহ করবেন না। কিন্তু আপনাকে হতাশ হলে চলবে না। ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। তারপর একদিন এমনই কোনো অন্ধকার এবং আলোর মিলন মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন বীঠোফেন কেন বলেছিলেন—
Go and learn of Handel how to achieve great effects with simple means.

প্রভাতচন্দ্র হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তাঁর পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণ ভুলে তিনি আবার পূর্বদিগন্তের দিকে তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে সরিয়ে নিলেন। সহজ পথে অসাধারণকে পাবার গোপন মন্ত্রটি যেন ওই আকাশের এক কোনে কোথাও অদৃশ্য কালিতে লেখা রয়েছে।

আমি আর কোনো কথা না বলেই, ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। হোটেলের সবাই তখনও গভীর ঘুমে ডুবে রয়েছে। কিন্তু আমার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। করুণা দেবীরও। তিনি এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। মার্কোপোলোর
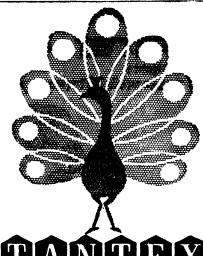
সংগে তাঁর এবং আগরওয়ালার কথা হয়েছে। ক'দিন আমাকে বিশেষ অতিথিদের জন্যে বিশেষ ডিউটি দিতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার কিন্তু শুধু প্রভাতচন্দ্রের কথা মনে হচ্ছিল। সহজ পথে মহানকে পাবার জন্যেই যেন আমরা সবাই কাঙালের মতো রাস্তায় পাতা পেতে বসে আছি।

করবী দেবীর ঘরে টোকা মারতেই, তিনি দরজা খুলে দিলেন। তাঁর অতিথিশালা তখন অতিথি অভ্যর্থনার জন্যে প্রায় প্রস্তুত। ঘরের কোনে এবং টেবিলে কেমন সুন্দর ফুলের গুচ্ছ সাজিয়ে দিয়েছেন করবী দেবী।

রঙের সংগে রঙ মিলেছে। করবী দেবী বললেন, "এক এক সময় ভাবি, ইনটিরিয়র ডেকরেটরের কাজ করবো। কেমন দেখছেন?"

বললাম, "চমৎকার।"

করবী দেবী বললেন, "বেচারা ন্যাটাহরিবাবুকে কাল খুব খাটিয়েছি। যে রঙের পর্দা এনে দেখান তাই আমার পছন্দ হয় না।"

শেষে ন্যাটাহারি বাবু নিবেদন করলেন, "মা জননী, যদি অপরাধ না নেন, তা হলে একটা কথা বলি। আমি তো লাটসায়েবের বিছানাও করেছি। রয়েল ফ্যামিলির মেম্বাররা যখন ইন্ডিয়ায় এসেছেন, তখনও বিছানা বালিশের জন্যে এই ন্যাটাহারি ভট্‌চাযাকেই ডাকতে হয়েছে। এই অধমের হাতে তৈরি বিছানাতেই শুয়ে লর্ড রিডিং এমন সুখ পেয়েছিলেন যে, ঘুম থেকে উঠতে এক ঘন্টা দেরি করেছিলেন। সকালের সমস্ত প্রোগ্রাম একঘন্টা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। আর এমনই অদৃষ্ট আমার যে এখন দুটো জার্মান সায়েবের জন্যে ঘর সাজাবার পর্দা পছন্দ করতে পারছি না।"

করবী দেবী তখন বলেছিলেন, "এই সব ব্যবস্থার উপর একজন ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—খারাপ কিছু ঘটলে তাঁর বাবার কাছে তিনি ছোটো হয়ে যাবেন।"

ন্যাটাহারিবাবু তখন কান থেকে পেন্সিলটা খুলে বলেছিলেন, "ব্যাপার যদি এতোই গুরুতর হয়, তাহলে মা জননী একটা কথা বলি। ঘরের পর্দা, টেবিলের কাপড়ের জন্যে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। সমস্ত নজরটা বিছানার উপর দিন। ফার্টি ইয়ার লিনেনের কাজ করে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি, তাতে বলছি, বিছানাটা হোটেলের সবচেয়ে ইম্পর্টান্ট আইটেম। বিছানাটা যদি ভাল পায়, খারাপ খাবার হলেও লোকে কিছু বলবে না। বিছানা এমনভাবে করতে হবে, যাতে সবাই ভাবে সে নিজের চেনা বিছানাতেই শুয়ে আছে। দোষ দিতে পারেন না, মা জননী। লাইফের সবচেয়ে ইমপর্টান্ট সেন্টার এই বিছানা। এই বিছানাতেই আমরা হাসি, এই বিছানাতেই শুয়ে শুয়ে আমরা কাঁদি, এই বিছানাতেই আমাদের জন্ম, এই বিছানাতেই আমাদের মৃত্যু। অথচ মা লক্ষ্মী, আজকালকার আপনারা এ-দিকটা একেবারেই নজর দেন না। ন্যাটাহারি যখন থাকবে না তখন এই হোটেলের যে কী হবে!"

ন্যাটাহারিবাবু তারপর তাঁর যত রঙের পর্দা আছে, তার একটা করে নমুনা মাথায় করে করবী দেবীর ঘরে হাজির হয়েছিলেন। এবং তার মধ্যে থেকেই করবী দেবী একটা পছন্দ করেছেন।

"কেমন দেখছেন?" করবী দেবী আমাকে এক কাপ চা দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন।

আমার মাথায় তখনও হ্যাণ্ডেল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বললাম, "সহজ অথচ সুন্দর হয়েছে।"

করবী দেবী হাসলেন। বললেন, "সব সৌন্দর্যের রহস্যই তো ওই। এই যে অনিন্দ্য পাকড়াশি। ও'র জন্যেই বা আমরা দু'জনে এতো পরিশ্রম করছি কেন? উনি সহজ অথচ সুন্দর বলে, তাই না?"

সেদিন ব্রেকফাস্টের একটু আগেই দমদম বিমানঘাঁটি থেকে দু'জন বিদেশী অতিথিকে নিয়ে মাধব ইণ্ডাস্ট্রিজের বিরাট ক্রাইসলার গাড়ি শাজাহান হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির মধ্যেই এ'দের সঙ্গে ছিলেন মিস্টার অনিন্দ্য পাকড়াশি।

ভদ্রলোক দু'জনের আকার বিশাল, এবং গুরুত্ব ততোধিক। শাজাহান হোটেলের দরজাগুলোর উচ্চতা সম্বন্ধে মনে মনে আমাদের কিছু দম্ভ ছিল। কিন্তু সেই দরজাগুলোও যেন আর একটু হলে ডক্টর রাইটার এবং মিস্টার কুর্ট-এর মাথার কাছে ছোটো হয়ে যেতো!

করবী দেবী আজ মুর্শিদাবাদ সিল্কের একটা শাড়ি পরেছেন। মাথার খোপা রজনীগন্ধার গোছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। অনেকদিন আগে সরস্বতী পুজোর দিন আমার অলকাদিকে এমনি দেখাতো। এমনি সহজ অথচ গম্ভীর বেশে অলকাদি গার্লস কলেজের পুজো-মণ্ডপে যেতেন।

করবী গুহ আমাদের কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। অতিথিদের দেখে ভারতীয় প্রথায় হাতজোড় করে অভ্যর্থনা জানালেন। অনিন্দ্য পাকড়াশি আমার ঘাড়ে ও'দের মালপত্তরের দায়িত্ব চাপিয়ে করবী দেবীকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

পোর্টারের ঘাড়ে সব মালগুলো চাপিয়ে, আমি যখন দু'নম্বর সুইটে এসে হাজির হলাম, তখন চমকে যাবার অবস্থা। দু'নম্বর সুইটের মেঝেয় কখন আলপনা এ'কে ফেলেছেন, করবী দেবী।

ওঁরা বলছেন, "এ-গুলো কী?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বলছেন, "আমাদের ট্রাডিশনাল পেন্টিং। সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে আমাদের গৃহবধূরা এই আলপনা দিয়ে থাকেন।"

ডক্টর রাইটার বললেন, "বাঃ চমৎকার!" তারপর তিনি নিজের ক্যামেরা মেঝের উপর ফোকাস করতে আরম্ভ করলেন।

ছবি তোলা শেষ করে রাইটার বললেন, "অ্যামেচার ঘরের মেয়েরা এমন আর্ট-ওয়ার্ক করতে পারে! কোনো প্রফেশনাল শিল্পী এ-গুলো করেন নি?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "মোটেই না। অবশ্য মিস্ গুহকে আপনি একজন ট্যালেন্টেড শিল্পী বলতে পারেন।"

মিস্টার কুর্ট জুতোর ডগা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মে আই হ্যাভ এ গ্লাস অফ বীয়ার?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "নিশ্চয়ই।"

কিন্তু আমাকে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে হলো, আজ ড্রাই-ডে।

"হোয়াট?" অসন্তুষ্ট মিস্টার কুর্ট প্রশ্ন করলেন।

অনিন্দ্য পাকড়াশি ব্যাপারটা এতোক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছেন। বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমরা খারাপ দিনে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছো। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন আমাদের এই স্টেটে মদ বিক্রি বন্ধ। সেদিন বার এবং রেস্তোরাঁর ম্যানেজাররা সব স্পিরিচুয়াস লিকার তালাবন্ধ করে রাখেন।"

মিস্টার কুর্ট যেন এমন কোনো সংবাদ জীবনে শোনেন নি। বলছেন, "ইউ মিন টু সে, একদিন তোমরা পুরোপুরি ড্রাই। ইচ্ছে করে ইণ্ডিয়ার নরম্যাল লাইফ একদিনের জন্যে তোমরা পঙ্গু করে দাও? এবং তুমি বলতে চাও, এইভাবে, এই সব লাস্ট সেঞ্চুরির পচে যাওয়া আইডিয়া নিয়ে, তোমাদের কান্ট্রি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুসনের সূচনা করবে?"

এই অশুভ সূচনায় অনিন্দ্য পাকড়াশি যে বেশ ঘাবড়ে গেলেন, তা ও'র মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। কিন্তু তখন কে জানতো, আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে।

(ক্রমশ)

এক ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন—জানো, কে ফেব্রুয়ারী মাস ৩০ দিনের বদলে ২৮ দিনে করেছে?

বলি—কে?

—কেন, স্বনামধন্য ইংরাজ।

—নেপোলিয়ান কোনো এক জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন বটে Nation of Shopkeepers', কিন্তু তাদের দোকানে যে ইতিহাসও ম্যানুফ্যাকচার করা যায় জানা ছিল না।

—সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভদ্রলোকই বলেছিলেন—

"History is nothing but facts agreed upon."

সুতরাং তুমি আর আমি যদি রাজী থাকি, এইটেই ইতিহাস।

—ইতিহাসকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হল, এখন তোমার হাসির কথাটা বল।

এবার তূণীর থেকে বেরোয় দ্বিতীয় বাণ—স্বীকার করবে কি ফেব্রুয়ারীই বছরের দীর্ঘতম মাস?

—আর একটা ডিসকভারি বটে! দুই আর দুয়েই চার-এর মত সহজ। এ উপপাদ্য প্রমাণের দরকার হয় না। স্বতঃসিদ্ধ!

—ইউক্লিডের সরল রেখার সঙ্গেও উপমা দিতে পার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন সত্যি, এও তাই।

—ও হোঃ হোঃ, বুঝেছি তোমার কথা। দেখতে কনিষ্ঠ কিন্তু দুর্ভোগ ভোগাতে জ্যাঠামশাই। এক-একটা দিন নয় ত যেন এক-এক যুগ, ঠিক বলেছ স্থায়িত্বে মনে হয় দীর্ঘতম। ক্ষুদে হলেও বিষপুঁটুলি। সকল মাসের শিরোমণি।

একটু থেমে আবার শুরু করেন—এতক্ষণে তা হলে মাথা খুলেছে। ওই ত তোমাদের দোষ, একটু দেরিতে বোঝ।

উত্তর দিই—প্রকৃত জ্ঞানটা ধীর স্থির।

সূর্যদেবের সপ্তাশ্ব রথ সেপ্টেম্বরে বিষুবরেখা মাড়িয়ে ছোটে দক্ষিণ দিকে। সময়ের কড়াক্রান্তি হিসেব করে 'মকর' পাতিয়ে আসে ডিসেম্বরে ঠিক বড়দিনের আগে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে তখন সবচেয়ে ছোট দিন। সূর্যদেব তাদের কাছে দক্ষিণ দুয়ারের কাছাকাছি। জবাকুসুম সংকাশং তখন মহাদ্যুতি হারিয়েছেন। দেখলে মনে হয় যেন টিমটিমে লণ্ঠনের আলো। তাও একনাগাড়ে পাঁচ-সাত দিন হয়ত দেখাই নেই—হয় নবাবপুত্তুর, না হয় ভুমুরের ফুল। যদি বা দর্শন দিলেন, সে তেরচা আলোয় তাপ থাকে না। ফলে আমরা থরহরি কম্পমান। এ দেশে কাঁপুনি দিয়ে ক্ষান্ত নয় রক্ত জমে বরফ হওয়া শীত। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বিলেতের রক্তজমা শীত ডিসেম্বরে নয়। ফেব্রুয়ারী পড়লেই বুক দুরুদুরু করে—ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—বর্ষা নয় শীত।

ভাবছিলাম আমাদের সাহিত্যে শীতের প্রাচুর্য নেই। তুষারপাতের একটা ভালো বিবরণ খুঁজে পাওয়া ভার। পদ্মা নদীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে গ্রাস করেছিল। মসৃণ, চিক্কণ, কৃষ্ণ, কুটিল, নিষ্ঠুর জল দেখেছেন। রুদ্র বৈশাখের রুক্ষ পিঙ্গল জটাজাল উপলব্ধি করেছেন। নীল নবঘন আষাঢ় গগনের তিনি মুখোমুখি হয়েছেন, ঈশান কোণের বিষাণও শুনিয়েছেন। কিন্তু শীত তাঁর সাহিত্যিক মনে উপেক্ষিতা।

আর কবি কালিদাস আসর জমিয়েছেন উজ্জয়িনীতে। পাহাড় বা শীতের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল না। তাই তাঁর হিমালয়ের বর্ণনা উপভোগ্য বটে, তবে ভাসা ভাসা মেঘদূতের মত কল্পনার পাখা মেলে এগিয়ে চলা। তাঁর কাছে হিমালয় ঋষি, দেবতাত্মা, নগাধিরাজ, খেলার সাথী নয়। তাঁর বর্ণনায় বোঢ়াঃ মুহুঃকম্পিত দেবদারু হিমালয়ের মনোহর রূপ—তুষারপাত মহাকাব্যের ত্রিসীমানায় নেই।

মনে আছে বিলেতে প্রথম দেখা তুষারপাত। ফেব্রুয়ারী মাস। রবিবার স্বভাবতই দেরি করে উঠি, তায় শীতের দাপট। বেশ বেলা হয়েছে। উঠে জানলার পর্দা খুলতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সাদায় সাদা। যেদিকে দু চোখ যায় শহরের রজতশুভ্র রূপ। কোন যাদুমন্ত্রে যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় চলে এসেছি। হেলানো ছাদ, রেললাইন, গাছপালা, পথঘাট সব যেন রাশি রাশি বকুল ফুলে ছেয়ে গেছে। তখনও ঝুরঝুর করে পড়ছে হেলেদুলে। বসন্তের হাওয়া লেগে শিমুল গাছের তুলো যেমন ভাসতে ভাসতে চলে। একে, কি বলতে পারি পুষ্পবৃষ্টি? কালিদাসের কথায় পৌরকন্যার খই ছড়িয়ে মঙ্গলাচরণ!

জানলাটা তুলে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা শিউরে উঠল। মনে জাগল শিহরন। অঞ্জলি ভরে গেল, মনটাও। চটপট বেরিয়ে পড়লাম পথে। ছোট ছেলে-মেয়েদের মহোৎসব। এ ওকে ছুঁড়ে মারছে বরফের বল। আনন্দের আতিশয্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে। নির্জনে পথের কোণে একটা মেয়ে আপন মনে গড়ছে তুষারমানব। মাঠে গিয়ে বুঝলাম তুষারপাগল আমি একা নই। বেশ লোকের ভিড়। ঝিলে আর জল নেই, বরফ। একদল স্কেটিং পায়ে লাগিয়ে নেমে পড়েছে। কেউ কেউ অনভিজ্ঞতার আছাড় খাচ্ছে—তাতেও আনন্দ।

এ রূপ নাকি সাহিত্যিকের মনের রঙ। বাস্তবে গাড়ি-ঘোড়া অচল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। সে সময় ট্রেন চলে, তবে অতি ধীরে এবং সামান্য কয়েকটা। বাস বা মোটর চলে না বললেই হয়। যানবাহনের মধ্যে কেবল মাটির নীচে টিউব চলে। সময়মত চিঠি বিলি হয় না। খাবারদাবার পাওয়া ভার। অফিস-আদালতে অব্যবস্থা। মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়স্বজন ব্যর্থ আশায় বসে থাকে ডাক্তারের পথ চেয়ে। সবার বেশী বিপদ যে এলাকায় বিজলীবাতি বিকল হয়ে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। শীতে জমে

বরফ-জমা শীতের লণ্ডন। ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের সন্নিকটে তুষারাবৃত রাস্তায় পথভ্রষ্ট গাড়িটাকে ঠেলে পথে নামানো হচ্ছে। অদূরে অচল অবস্থায় যাত্রবাহী বাস

যাচ্ছে অথচ ঘরে ফায়ার জবলছে না। গরম জল করে এক কাপ চা খাবে তার উপায় নেই। এই নরকযন্ত্রণা থেকে কতক্ষণে অব্যাহতি মিলবে কে জানে!

বরফ যখন গলতে থাকে, আরও বিপদ। রাস্তা প্যাচপেচে। অতি সাবধানীও পা পিছলে আছাড় খায়। পুলিসবাহিনী আর রাজপুরুষ নয়। বালির বস্তা কাঁধে রাজপথে শোভা করে। জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে দেয় পিছল কমাবার জন্যে। মোটর আরোহীরও নিস্কৃতি নেই। সোজা পথে না গিয়ে স্কিড করে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারে।

ঋতুশ্রেষ্ঠের অভিযান ত্রিমুখী। ঠাণ্ডা, স্মগ আর তুষারের ত্রিশূলে নিয়ে এর তাণ্ডব। মাঝেরটা মধ্যমণি। উল্কার মত আবির্ভাব, দুদিন বাদে বিদায় নেয়। কিন্তু পিছনে ফেলে যায় আতঙ্ক। শুধু কুয়াশা নয়, কুয়াশা ও ধোঁয়ার সমন্বয়। স্মোক ও ফগের সমাস। সন্ধি বা ষড়যন্ত্র যা বলেন। হঠাৎ দেখা গেল পূর্বদিকের আকাশ একটু ঘোলাটে।......ধোঁয়া আরও এগিয়ে আসছে। দূরের ঘরবাড়ি অস্পষ্ট। ক্রমে তাও অদৃশ্য হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দু-হাত দূরের লোককে দেখা যায় না। একেবারে সূচিভেদ্য অন্ধকার। অমাবস্যার রাতে শরৎচন্দ্র শ্মশানের যে রূপ দেখেছিলেন তার চেয়ে ভয়ঙ্কর। এর আভাস পেলে অফিস আগে ছুটি হয়ে যায়। লোকজন ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে বাড়িমুখো। শুধু অন্ধকার নয়, এ বায়ু বিষাক্ত। অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়। অনেকে মারাও যায়।

শীত উপভোগ করি বা নাই করি তার পরিভাষা জানতে হয়। না হলে আলাপ-আলোচনায় যোগ দেওয়া যায় না। আবহাওয়ার প্রথম স্তর মাইল্ড, আমাদের দেশের পৌষ মাস। অর্থাৎ চমৎকার। তারপর কোল্ড, সিভিয়ার কোল্ড, তদুপরি ফ্রণ্ট এবং ডীপ ফ্রণ্ট। সে ঠাণ্ডায় জল বরফ হয়ে যায়। কলের জলের পাইপ ফেটে যায়, গাড়ির কলকব্জা বিকল হয়। এই ঠাণ্ডা যখন কমে, বরফ আবার গলে জল হয় তাকে বলা হয় 'থ'। সময় সময় একনাগাড়ে কয়েক দিন ধরে ফ্রস্ট থাকে। তখন পুরু পশমের মোজা ভেদ করে পা চিনচিন করে। হাতের আঙুল জবালা করে, মনে হয় বুঝি বা পুড়ে যাচ্ছে। আর সুগ্রীব সখা উত্তর-পূর্ব বায়ু তীর বেগে বইতে থাকে। কান দুটোকে যেন ভোঁতা ছুরি দিয়ে খোঁচায়। বুড়ো লোকদের দুর্দশা আরও বেশী। হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে, সুযোগ বুঝে বাতব্যাধি জেঁকে বসে। সভ্য দেশ। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। একটু বড় হতেই ছেলে মানুষ করার বড় দায়িত্ব সরকারের। ফলে, বাবা-মার প্রতিদানের প্রত্যাশা অবান্তর। ছেলে বিয়ে করে আলাদা ঘর-সংসার পাতবে। তার সমাজ সুখ দুঃখ আলাদা। বুড়ো বাপ মা তার জীবনে অতীত অধ্যায়। বেচারা বৃদ্ধ। সামর্থ্য নেই—ঝি-চাকর রাখা নবাবি-পনার সামিল। দু-দণ্ড গল্প করবে তেমন সংগী-সাথীও নেই। আর যারা সরকারী পেন্সনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে তাদের ঘরে আগুন জবালাবার পয়সা কুলোয় না। মাংসের দাম বেশী, খেয়ে শরীরের রক্ত গরম রাখবে, সে দুরাশা। বয়েসটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনটা বাঁচা নয়, পাপক্ষয়। শাপমুক্তির একমাত্র পথ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নিউমনিয়ার সংগে চুক্তিপত্র সই করা।

বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছি। বিলেতের বাসও সময়বিশেষে মানুষের মনোবৃত্তিতে গ্রেগেরিয়াস হতে চায়, দল বেঁধে বাস করবে। পনের-বিশ মিনিট ধরে সাড়াশব্দ নেই, তারপর চার-পাঁচখানা লাইনবন্দী। পেছনের বুড়ো আলাপ করতে এগোল। বুঝলাম বাস কোম্পানির আদ্যশ্রাদ্ধ করবে। তা নয়, বেশ হাসিখুশী। ঠাণ্ডাও কাবু করতে পারেনি। বলে—কেমন লাগছে? সূর্যিমামার দেশের লোককে একটু অনু-কম্পা মেশানো সহানুভূতি জানায়।

আমার পাকাপাকি উত্তর আছে। বলি—তোমাদের দেশের আবহাওয়াই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।

এই বুঝি মারতে আসে—কি বললে? এই মেঘে ঢাকা দিন, প্যাচপেচে বৃষ্টি, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, খোলা আকাশের নিচেও ঘুলঘুলির মত অন্ধকার, আর তুমি বলছ কিনা...

—অনন্তযৌবনা উর্বশী আর চিরবসন্ত দুটোই আলেয়ার আলো।

—ঠিক বলেছ। তোমরা আর কি দেখলে? সেণ্ট জেমস পার্কের ঝিলে হ্যাম্পস্টেড হীথের দশ ফুট পরিধি গোল পুকুরে একটু বরফ জমলে সাংবাদিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নথিপত্র ঘেঁটে প্রমাণ করে গত এক শো বছরের রেকর্ড। আমি ১৮৯৫ সালে দেখেছি টেমস নদী জমে গেছে। রিচমণ্ডের কাছে আমরা দু-বেলা হেঁটে পার হতাম নদীটা। অবশ্য ১৮৩২ সালের আগে লণ্ডন ব্রিজটা ছিল ১৯টা আর্চের ওপর। জলের গতিবেগ ছিল কম। বরফ জমা সহজ ছিল। তাই বলে শীতের দাপট কম ছিল না। সারা টেমসটা জমে যাওয়া যে-সে কথা নয়। অনেকবার গিয়েওছে। আর মজার ঘটনা, ওই বরফের ওপর মেলা বসত। দূর দূর থেকে লোক আসত। ঘোড়ায় টানা কোচ এসে জড়ো হত টেমসের ওপর। আলোর মালা পরিয়ে সাজানো হ'ত। দোকানপাট বসত। আগুন জেবলে বড় বড় বিফ-রোস্ট করা হ'ত। দর্শকের দল এসে ভিড় জমাত। এই ধরনের প্রদর্শনীতে এক সুভেনিরের গায়ে লেখা ছিল:

জ্যাক ফ্রস্ট,

তুমি অন্যায় এবং হিংসাত্মক উপায়ে টেমস নদী জবরদখল করেছ। এতদ্দ্বারা তোমাকে সাবধান করা হচ্ছে, অবিলম্বে এ রাজ্য পরিত্যাগ কর। ইতি

তোমার শত্রু 'থ'

বলি—বেরসিক থ। ঐ দেখ বাসের টিকি দেখা গিয়েছে। এই ফাঁকে আমার ছেলের প্রিয় গানটা তোমায় শুনিয়ে দি:

Over the pond where we
used to play,
Jack Frost has spread a
white carpet today;
Let's put on our skates,
how quickly it's done,
Isn't it fun, oh isn't it fun,
Sliding, gliding to and fro
Over the shining ice we go.

-হিরন্ময় ভাট্টাচার্য

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি -

সুধীর করণ

॥ ১ ॥

কোপাই একটি নদীর নাম।

যৌবনের চাঞ্চল্য আর সীমাহীন মানস-বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন পদ্মার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছিলেন। পদ্মার 'আভিজাতিক ছন্দ' তাঁর আভিজাত্যকে আকর্ষণ করেছিল গভীর প্রেমের পরিব্যাপ্তিতে। এই প্রমত্ত নদীর পরিবেশ-বৈপরীত্যে কোপাই একটি মেঠো সুর মাত্র। কিন্তু এর মূল্যও রবীন্দ্র-কাব্যে অল্প নয়। রবীন্দ্রনাথের যৌবন-চেতনায় কোপাই নদী মুখ্য নয়, কিন্তু বিগত-যৌবনের প্রশান্তিতে সম্পদতুল্য। পদ্মার ছন্দের মতো তার ছন্দ 'আভিজাতিক নয়, '—ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—, তাকে সাধুভাষা বলে না। জলস্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে, রেষারেষি নেই তরলে-শ্যামলে।' এই কোপাই একদিন 'কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে।'

"তারপর যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে
ছায়াবৃত সাঁওতালপাড়ার পুঞ্জিত সবুজ
দেখা যায় অদূরে।
এখানে আমার প্রতিবেশিণী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তা'র নামখানি
কতকালের সাঁওতালনারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।

এই নদীর 'ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে; পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি, আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে; হাটে যাবে কুমোর বাঁকে ক'রে হাঁড়ি নিয়ে; পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা; আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু,—ছেঁড়া ছাতি মাথায়।'

কোপাই নদীর নামটিকে সংস্কৃত করে কোপবতী বলেননি রবীন্দ্রনাথ। তাতে কোপাই নদীর সম্মান বাড়তো না। তা ছাড়া কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর কল-ভাষার সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে, তাকে জাতিচ্যুত করে সভ্যতার মুখোশ পরানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। কোপাই গংগা নয়, পদ্মা নয়, একান্তভাবে কোপাই। 'ছিপছিপে তার দেহটি বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়, হাততালি দিয়ে সহজ নাচে। বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি, মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো, ভাঙে না, ডোবায় না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।'

এর চেয়ে অনায়াসে কোপাই নদীর রূপকে পরিস্ফুট করা যেতো না, এমনকি কোন সাঁওতাল তন্বী তরুণীর রূপকেও নয়! কোপাই, তাই শুধু একটি নদীর নাম নয়, একটি সাঁওতাল মেয়েরও নাম।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্র-কাব্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা-কাহিনী-ছড়া-ছবি অল্পই। শান্তি-নিকেতনের বৈরাগী-প্রান্তরের শালবনের ছায়ায় এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত। সাধারণত আমাদের কাছে এই সম্প্রদায়টি বিশেষ এক ধরনের রোম্যাণ্টিক আলোকে বিধৃত। জটিল এবং বহুলাংশে কৃত্রিম একটি সভ্যতার নখ-দন্ত পেষণে নগর-পুষ্ট জীবন যখন রোম্যান্সের মায়াডোরকে একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করে, তখন সেই রোম্যাণ্টিক চিন্তা-কল্পনার মধ্যে সাঁওতাল-দের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সারল্য, আদিম নৃত্যগীতের প্রাক-পুরাণিক স্পর্শ এবং নারী-পুরুষের দ্বৈত-শ্রমচর্যার অনতিক্রান্ত ছন্দও একটি মোহের সঞ্চার করে। বর্তমানে নানাবিধ অনিবার্য কারণে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনে ছন্দোপতন ঘটলেও আমাদের মানসক্ষেত্রে তা আজও চাঁদনী রাতের চৈতী হাওয়া, মাদলের মাতাল সুর আর মহুয়াবনের মদ-গন্ধকেই উজ্জীবিত করে। শালফুলের সুবাসে অভিষিক্ত হয়ে চৈত্র-জ্যোৎস্নায় যখন সরহুল উৎসবের নাচ-গান নাকাড়া-মাদলের সরল রেখা একটি অকৃত্রিম জীবনের চিত্র প্রায় গতানুগতিক রীতিতেই প্রকাশ করতে থাকে, তখন আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সীমাহীন বিস্ময়।

বলা বাহুল্য, রোম্যান্স-দৃষ্টির আতিশয্য বাস্তব জীবনবোধের অনেক বেশী অন্তরায়। কিন্তু এ কথা একেবারে হাস্যাস্পদরূপে অস্বীকার করা চলে না যে, রোম্যান্স-চেতনায় আমাদের জন্মগত অধিকার এবং তা অতিমাত্রিক বাস্তববাদীর কাছেও কোন-না-কোনরূপে অনিবার্য।

শান্তিনিকেতনের আশেপাশের সাঁওতাল-পল্লীর সান্নিধ্যে বসবাস করেও রবীন্দ্র-নাথের সাঁওতাল-সম্পর্কিত দৃষ্টি কিন্তু আশ্চর্যভাবে রোম্যাণ্টিকতার আতিশয্য-বর্জিত ছিল। তার কারণ সম্পর্কে এ কথাই মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্র-কাব্য-জীবনের রোম্যাণ্টিকতা কোন ছদ্ম-রোম্যাণ্টিকতার পোশাক মাত্র নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনায়

সাঁওতাল রমণী

দিনশেষে—

গভীর উপলব্ধি তাঁর কাছে আত্মানুভূতিরই সমতুল্য; এবং এই অনুভূতির মধ্যেই সাঁওতাল-জীবনের প্রাকৃত-ছন্দ বিধৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধ এমন গভীর এবং ব্যাপক ছিল যে, এর মধ্যে খণ্ডচেতনা অলব্ধ। বোধের সমগ্রতায় তাঁর ব্যক্তি-মানস সমুজ্জ্বল ছিল। তাই নাগরিক কবিকুলের সম্প্রদায়-চেতনা রবীন্দ্রনাথে অসম্ভব।

বলা বাহুল্য, 'সম্প্রদায়-চেতনা' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থেই প্রয়োগ করেছি। সাঁওতাল-সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে আমরা বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবেই ভাবতে অভ্যস্ত। তাদের জীবনযাত্রা এবং ভাষা-সংস্কৃতি আমাদের কৌতূহলের বস্তু। রোম্যান্টিক বিস্ময়-দৃষ্টিতে আমরা তাঁদের পরিচয়লাভে উৎসুক। ফলে ব্যবধান আমাদের স্বকৃত।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই যে সাঁওতাল নরনারী রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন প্রমাণ রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যে নেই। সাঁওতাল-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা কোনদিনই নৃতাত্ত্বিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না অথবা সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতাতেও তিনি এদের পরিচয় খুঁজে বেড়াননি। পরিবর্তে এ কথা মেনে নেবার সংগত কারণ আছে যে, ঠিক এই ধরনের সম্প্রদায়-চেতনা রবীন্দ্র-মানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বোধ, বিশ্ববোধ এবং মানবতা-বোধের মধ্যে যে সামগ্রিকতার ব্যঞ্জনা, তা-ই তাঁকে সাঁওতাল সম্প্রদায়কে 'সাঁওতাল' হিসেবে না দেখে 'মানুষ' হিসেবে দেখতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সংগঠনের পরিধির মধ্যে বেশ কিছু সাঁওতাল-গ্রামও ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেভাবে 'উপজাতিক কল্যাণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি-শিক্ষা-দীক্ষার ওপর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে আমাদের নানাবিধ কৌতূহল নিবৃত্ত করে থাকি, সে ধরনের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার মধ্যে সাড়া জাগায়নি। তাই গ্রাম-সংগঠনের ক্ষেত্রে সাঁওতাল অ-সাঁওতাল গ্রামের মধ্যে তিনি কোন সীমারেখা টেনে দেননি। একদা শান্তি-নিকেতনের ছাত্রগণ একটি সাঁওতাল বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন বলে রবীন্দ্রজীবনীকার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পরিচালনা-বিধির বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল কি না, তা জানা যায়নি।

তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, রবীন্দ্র-নাথের প্রকৃতি-দৃষ্টির মধ্যেই এদের স্থানও নির্দিষ্ট ছিল, যে-দৃষ্টিতে তাঁর ছোট গল্পের উদ্বোধন।

তবে এ কথা ভাববার দিকেও আমাদের প্রবণতা দেখা দিতে পারে যে, সাঁওতাল নর-নারীর চিত্রকে তিনি তাঁর ছোট গল্পে স্থান দেননি কেন? এমনকি রবীন্দ্রকাব্যেও এদের স্থান গৌণ কেন? শিলাইদহের সান্নিধ্যে এসে যে-জীবনবোধের পরিচয় তিনি দিয়ে-ছিলেন, শান্তিনিকেতনে এই সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে এসেও সেই জীবনবোধকে ফিরে পাননি কেন, এ কথার উত্তরে হয়তো এই কথাই সত্য যে, বাঙলা দেশের সমতল ভূমির সমাজজীবনের সঙ্গে সাঁওতাল-সম্প্রদায়ের যে বাহ্যিক অনৈক্য, তার বেড়াটুকু ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি রবীন্দ্রনাথ। বরং বৃহৎ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করেই এদের স্বাভাবিক সারল্য এবং অনাড়ম্বরতাকে গ্রহণ করে-ছিলেন। এমনকি হলকর্ষণ উৎসবে সাঁওতাল নরনারীদের যোগদান এবং নৃত্যানুষ্ঠানও প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর অঙ্গস্বরূপ।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কবিতায় এদের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখের মধ্যে সাঁওতাল নরনারী বৃহৎ প্রকৃতি-পরিবেশের অন্যতম অংশের মতোই গৃহীত।

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনী বাষ্পরেখায়;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুল ঢাকা
সাঁওতাল পাড়া—
....

এই শালবন এই একলা-মেজাজের তালগাছ—
এই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙা মাটির মিতালি,—
....

নদীর ধারে পায়ে চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে
কুড়চির ফুল ঝরে তা'র ধুলোয়
বাতাবি-লেবু ফুলের গন্ধ ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে;

রবীন্দ্রনাথের ভাষা, এই পর্বে প্রায় সাঁওতাল নারীর মতোই নিরাভরণা; অথচ সহজ লাবণ্যে পূর্ণযৌবনার অধিশ্বরী।

কোপাই নদীর মতো তার গতি অনহংকৃত, প্রকৃতির আপন সৃষ্টির মতো মধুময়। শাল-মহুয়া-কুড়চি-জারুল-পলাশ-মাদারের সংগে এ ভাষার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। এই ভাষা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটিও প্রণিধান-যোগ্য। 'গদ্য-কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে-একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্য-রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।'

বলা বাহুল্য, সাঁওতাল নারীদের মধ্যে সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা নেই, অথচ একটি স্বাভাবিক মধুর লাবণ্যের ব্যঞ্জনা তাদের দেহে-মনে পরিস্ফুট। গদ্য-কবিতার মতোই তাদের স্বাধীন এবং স্বাভাবিক সঞ্চরণ। অলংকারের বাহুল্য তাদের কাছে নিরর্থক: কবরী বন্ধনে একটিমাত্র ফুলের স্পর্শ তাদের কাছে লোভনীয় এবং এই একটিমাত্র ফুলের অন্তহীন ব্যঞ্জনা রবীন্দ্র-কাব্যের একটিমাত্র চরণে অতুলনীয় রূপেই প্রকাশিত। ক্যামেলিয়া কবিতার কমলা এবং তনুকা বহু ভাষণেও অস্পষ্ট, কিন্তু শুধু রান্নার কাঠ যে সাঁওতাল মেয়েটি এনে দিতো, তাকে চিত্রিত করার জন্য বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন হয়নি। প্রকৃতির রাজ্যে সেও একটি ফুল মাত্র।

দার্জিলিঙের সমৃদ্ধ পরিবেশে যে তনুকা একদিন বলেছিল, 'একটা জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা—, একটি ফুলের গাছ।'—তার কথাও তুচ্ছ হয়ে গেছে সাঁওতাল পরগণার কাছে, যেখানে বাসা বাঁধা যায় শালবনের ছায়ায়, কাঠ-বিড়ালীর পাড়ায়। 'সেখানে নীলপাহাড় দেখা যায় দিগন্তে, অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে, পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে, মহিষ চরছে হরতাকি গাছের তলায়—উলংগ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।...'

এই পরিবেশে কমলাও বাসা বেঁধেছিল, শালবাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে। মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে, কিন্তু সে চেয়ে দেখে না।

এই পরিবেশের মধ্যেই আর একটি ছবি, কিংবা নিজেই সে একটি পরিবেশ। ক্যামেলিয়া কবিতায় তার কথা শিশির-বিন্দুর মতো স্বল্প, কিন্তু তারই বুকে অনন্ত আকাশ। অবর্ণিতা এই সাঁওতাল নারী। কারণ সে তনুকা নয়, কমলা নয়, সে আনে রান্নার কাঠ। তারই হাত দিয়ে কমলার কাছে ক্যামেলিয়া ফুল পাঠানো হবে। কমলার মতো এই নারী অন্তরংগা নয়, বহি-প্রকৃতি। তাই বাইরে থেকেই তার মিষ্টি

সুরের আওয়াজ এলোঃ 'বাবু ডেকেছিস কেনে।'

'বেরিয়ে এসে দেখি, ক্যামেলিয়া সাঁওতাল মেয়ের কানে, কালো গালের উপর আলো করেছে।

সে আবার জিজ্ঞেস করলে, ডেকেছিস কেনে।

আমি বললুম, এই জন্যেই।'

॥ ৩ ॥

বাঙলা দেশের মেয়ের চোখে এই মাটির শ্যামল অঞ্জন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে সমস্ত বিকার-বিন্দুপকে ঢেকে দিয়ে শেষ-বেলাকার ঘরখানির নাম দিয়েছিলেন শ্যামলী। কালো মেয়েকে গাঁয়ের লোকে কালো বললেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কৃষ্ণকলি। এই কৃষ্ণকলি কামিনীদেরও তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একীভূতা করে দেখেছিলেন। এইজন্যই রবীন্দ্র-কাব্যে কৃষ্ণসার হরিণী সাঁওতালিনী কোন সাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যে বিধৃত হয়নি। প্রকৃতির আদিম বর্ণরেখার ও বস্তু-কান্তির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তিনি মাত্র একটি বারের জন্য সাঁওতাল মেয়ের সম্পর্কে পুরো একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এ কবিতায় সাঁওতাল-সমাজের চিত্র অল্প, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তর-প্রীতিতে তার ঔজ্জ্বল্য সমধিক।

শিমুল গাছের তল দিয়ে কাঁকর বিছানো পথে তার আনাগোনা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তন্বী শ্যামলীর দেহখানিতে মোটা শাড়ির দৃঢ় বন্ধনী। নিটোল হাতে সাদারঙা গালার চুড়ি। মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে সে বার-বার যাওয়া-আসা করছিল। বিধাতার কোন ভোলা-মন কারিগর কালো পাখি গড়তে গড়তে আকস্মিকভাবে শাওন মেঘের ও বিদ্যুতের উপাদান নিয়ে ওকে রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের কবিতায় মাটির গন্ধ সহজলভ্য। মাটির কোলঘেঁষা সন্তানদের চিত্রও তাই অনায়াসলব্ধ। শিমুল এবং সজনের ঋণও কবি কর্তৃক স্বীকৃত। রঙীন শাড়ীপরা কলসী মাথায় গ্রামের মেয়েও চিত্রায়িত। মাটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে স্বীকৃতিদানের জন্যই বুঝি শ্যামলীর সৃষ্টি! "কবির মন এখন মেতে উঠেছে মাটির ঘর 'শ্যামলী' নিয়ে। তার মাটির দেওয়াল, মাটির ছাদ হবে—আলকাতরা মাটি-গোবর মিলিয়ে-মিশিয়ে ও পচিয়ে একটা মসলা তৈরি হচ্ছে ঘরের জন্য।" শেষ সপ্তকের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মাটির প্রেমকে অনবদ্য মহিমা দান করেছেন : 'আমার শেষবেলাকার ঘরখানি বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে। তার নাম দেব শ্যামলী।...আমার দু-চোখ ভরে মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে...আজ আমি তোমার ডাকে ধরা দিয়েছি শেষবেলায়। এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে, যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে, নব-দূর্বা শ্যামলের করুণ পাদস্পর্শে চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়, নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।'

এই 'শ্যামলী'র উপাদান যোগানোর কাজে সাঁওতাল মেয়ে এসেছিল। 'আমার মাটির ঘরখানা, আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।' সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নারীরা গৃহবন্দিনী নয়। তাদের কোমল-কঠিন হাতের স্পর্শে মাটির ঝুড়িও স্মৃতি-চকিত হয়। কিন্তু এ-জাতীয় রোম্যাণ্টিক কল্পনার সৌন্দর্য অতুলনীয় হলেও দারিদ্র্যপীড়িত সাঁওতাল-সমাজের অন্যতম করুণ চিত্রকে ঢেকে রাখারই প্রয়াস মাত্র। আদিম কুসংস্কার, শিক্ষাহীনতা ও অত্যধিক শ্রমের নিষ্পেষণে

পিন্ট এই সম্প্রদায়ের একটি অন্য ছবিও অস্বীকার্য নয়।

শ্রমজীবী মানুষের উপর রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আমাদের অজ্ঞাত নয়। 'ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল: ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে পাকা ধান কাটে। ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।...ওরা কাজ করে, দেশে দেশান্তরে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে, পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।......'

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই: দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে: সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশী তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ-সুবিধে সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

শ্রমিক-জীবনের করুণ অসহায়তা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করেছিল। অন্ততপক্ষে নারীর নিরুপায় শ্রমচর্যা তাঁকে পীড়িত করেছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যে নারীর জন্য একটি সচ্ছন্দ গৃহকোণ প্রাত্যহিক পরিমার্জনার শুচিতা নিয়ে বর্তমান থাকতে পারতো, সেই নারীকেও উদরের উৎপীড়নে অতি অল্প বয়সের সন্তান মাঠের কোন গাছতলায় শুইয়ে রেখে নির্বিকারচিত্তে রোদে পুড়ে কাজ করতে হয়। এ দৃশ্য আমাদের অ-দেখা নয়।

রবীন্দ্রনাথের মানসপটে এই দৃশ্যই হয়তো বেদনার রেখাচিত্র এঁকেছিল। বীথিকা কাব্যের অন্তর্গত সাঁওতাল মেয়ে কবিতাটির মধ্যে কবির এই সংবেদন গভীরতর। গৃহলক্ষ্মীর যে সৌন্দর্য-কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে বহুবার, সাঁওতাল নারীর মধ্যেও তা তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, কারণ সাঁওতাল নারীও চিরন্তন নারী। বাইরের জগতে অস্বাভাবিক শ্রমের গন্ডীতে আবদ্ধ থাকলে গৃহকোণের পারিপাট্য এবং শুচিতা রক্ষার ভার নেবে কে? তাই স্বাভাবিক সংকোচে কবির মন ক্লিষ্ট।

'আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি,—এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে—
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজশক্তি আত্মনিবেদন পরা
শুশ্রূষার সুধাস্নিগ্ধভরা
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে—
করিতে মজুরি—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ঐ ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।'

পয়সার সিঁধকাঠি দিয়ে এমনিভাবে নারীর শ্রম কেনার ওপর রবীন্দ্রনাথের অনাস্থা সাঁওতাল রমণীকে সৌম্য-সুন্দর মর্যাদা দান করেছে।

বলা বাহুল্য, এই-ই একটি মাত্র কবিতা, যাতে সাঁওতাল রমণী প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্র-কাব্যে স্থান লাভের অধিকার লাভ করেছে।

গীতবিতানে সংকলিত একশো পঁচিশ সংখ্যক গানটির বিষয়বস্তু, নিঃসন্দেহে, নববর্ষা। 'সাঁওতালী ছেলে' এখানে নির্বস্তুক আইডিয়া মাত্র; নববর্ষার প্রতীক হিসাবেই তার আবির্ভাব। সে 'শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত।' ধানের খেতের পারে শালের ছায়ার ধারে সে হৃদয় মেলে দেয়। কবির দ্বারপ্রান্তে সে রেখে যায় কেয়াফুল।...

আসলে, এ গানে সাঁওতাল ছেলের নাম আছে বটে, কিন্তু সাঁওতাল ছেলের উপস্থিতি মুখ্যত প্রকৃতির প্রতীকরূপেই। মেঘের ছায়ায় ছায়া ফেলে চলার ভাবটিই এখানে প্রত্যক্ষ।

॥ ৪ ॥

চৈত্রের শালবনের নিভৃত ছায়া কবির ভালো লেগেছিল। কিন্তু ভালো-লাগার সবটুকুকেই কি প্রকাশ করা যেতে পারে! সাঁওতাল নর-নারী কবির সেই অপ্রকাশিত অন্তর-পুলক, যার স্পর্শ আমরা পেয়েছি, কিন্তু আরো বেশী ক'রে যা পেতে ইচ্ছে করে।

কোপাই নদী — শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

হিমানী

হিমসার
আয়ুর্বেদিক কেশতৈল ও

গ্লিসারিন সাবান
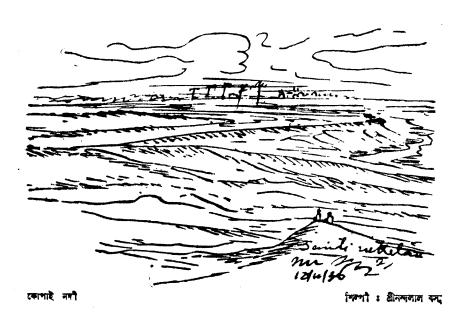
দিনের সুরুতেই হোক কি শেষেই হোক হিমানী গ্লিসারিন সাবান দিয়ে স্নান করে দেখুন—কি চমৎকার লাগে! এতে গাত্র চর্ম সজাগ হয়, গাত্রবর্ণ সতেজ হয় এবং মনের তৃপ্তিবোধ ফিরে আসে।
আর স্নানের শেষে—শীতল সুরভিত হিমানী হিমসার কেশতৈলে কেশের জৌলুস আনে।

পূর্ণাঙ্গ স্নানের সামগ্রী

হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

॥ ৩ ॥
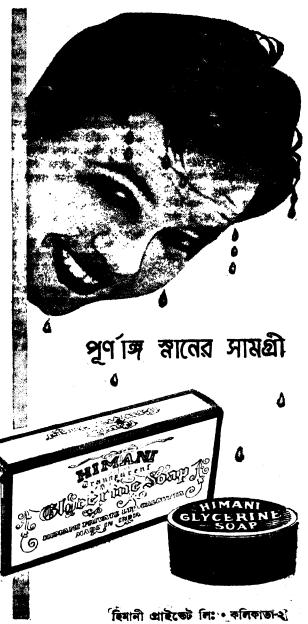
"বসুন। আপনাকে অন্য নামে চিনতাম। আপনার আসল নামটা আজ প্রথম শুনলাম।"

গণেশ হালদার বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলেন, "আমার তো দ্বিতীয় নাম নেই। কি নাম শুনেছেন আমার?"

ঘোষাল আবার তাঁর সেই হাসি হাসলেন।

"রাগ যদি করেন বলব না। আই শ্যাল কিপ্ মাম্।"

"না, রাগ করব কেন?"

"এখানে সকলে আপনাকে 'ফোর্থ ডগ্' বলে ডাকে।"

"তার মানে?"

"ডাক্তার মুখার্জির তিনটে আসল কুকুর আছে, লোকে বলে আপনি তাঁর মনুষ্যবেশী চতুর্থ কুকুর।"

হালদারের মনে হল কে যেন তাঁর গালে ঠাস্ করে চড় মারলে একটা। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও ঘটল, নিজের অজ্ঞাতসারেই ডাক্তার মুখার্জিকে যেন আরও ভালোবেসে ফেললেন তিনি, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। তাঁর মনে হল তিনি যেন জমে গেছেন। হাত-পা নড়ছে না, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু জাগ্রত হল তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধ, তাঁর গভীর গোপন সত্তা থেকে যেন উৎসারিত হল একটা উষ্ণ প্রস্রবণ, গলে গেল যেন অপমানজনিত হিম-শীতলতা। তিনি স্বস্থ হলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর মনে রসিকতা জাগল।

বললেন, "আপনারা আমাকে এ সম্মান দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কুকুর-প্রেমিক একজন বিখ্যাত লোক বলে গেছেন—The more I see of men, the more I love my dog. (মানুষের যত পরিচয় পাচ্ছি আমার কুকুরটাকে তত বেশী ভালো লাগছে)। যে দেশের মানুষেরা অধঃপতিত সে দেশে কুকুর নামে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্য মনে করি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর মানুষেরা কুকুরের চেয়েও অনেক নীচে নেমে গেছে।"

"আরে মশায়, আপনি দেখছি গুণী লোক। বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

ডাক্তার ঘোষাল এগিয়ে এসে হালদারের দুই কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে তাঁকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। গণেশ হালদারকে অনুভব করতে হল রাঘব ঘোষাল শক্তিমান ব্যক্তি। তাঁর হাত দুটো যেন বাঘের থাবা।

"কাউ কাউ, জলদি এস। Put-in your appearance immediately, please."

কাউ আসতেই বললেন, "পাঠানী হালুয়া আর কফি নিয়ে এস এক পেয়ালা। আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না।"

কাউ চলে গেল ভিতরের দিকে।

"কফির চেয়ে উগ্রতর কিছু চলে নাকি আপনার? জানি না হয়তো, ভুল করে সিংহকে সুক্তো খেতে দিচ্ছি, I wonder, if I am offering fodder to a cat.

—স্কচ্ হুইস্কি আছে, যদি অনুমতি করেন—"

"না, ওসব আমার চলে না। আমি নিরামিষ মানুষ—"

"বাই জোভ, তাই নাকি? পাঠানী হালুয়া মুরগীর মাংস আর ডিম দিয়ে তৈরী যে—"

"মাংস ডিম আমি খাই। পাঠানী হালুয়ার নাম কিন্তু আগে শুনিনি।"

"শোনবার কথা নয়। ও জিনিস আমারই সৃষ্টি, অনাসৃষ্টিও বলতে পারেন। More carricature than a creation পাঠানকোটে একটা হোটেলে খেয়েছিলাম, ওঃ, সে এক স্বর্গীয় ব্যাপার! কিন্তু বাবুর্চিটা কিছুতেই রান্নার সিক্রেটটা আমাকে বললে না। কিন্তু আমি তো যেটা ধরি ছাড়ি না, নিজেই মাথা খাটিয়ে বানিয়ে ফেললাম। তবে সেটা ওর মতো 'বেহেস্তি' খানা হয়নি। দেখুন, আপনার কেমন লাগে—"

কাউ ফিরে এসে বললে, "ঝিনুক দিদি হালুয়া দিচ্ছে না। বলছে অল্প একটু আছে, সেটা আপনি খাবেন, আপনি তো খান নি।"

লাফিয়ে উঠে পড়লেন ঘোষাল এবং ভিতরের দিকে ছুটে চলে গেলেন।

পরমুহূর্তেই নারীকণ্ঠের এক তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল।

"আমি দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না।"

তারপরই দড়াম করে শব্দ একটা।

"ওগো মাগো—"

করুণ আর্তরবটা হঠাৎ থেমে গেল।

গণেশ হালদার আর বসে থাকতে পারলেন না। উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন ভিতরে ঢোকা সমীচীন হবে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখলেন একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে মেঝেতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে, আর ডাক্তার ঘোষাল হাঁটু গেড়ে তার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন।

"এ কী ব্যাপার? কী হ'ল?" গণেশ হালদার বললেন।

ঘোষাল ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন, তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "টেবিলের উপর প্লেটে হালুয়াটা আছে, আপনি আগে খেয়ে নিন তো মশাই। এ রাক্ষুসীর জ্ঞান হলে আর আপনাকে খেতে দেবে না। টপ্ করে খেয়ে নিন।"

অবাক হয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

"এ অবস্থায় কি খাওয়া যায় মশাই! কি যে বলছেন—"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ঘোষাল। "আপনাকে খেতেই হবে। ইউ মাস্ট্।

মাই ওয়ার্ড ইজ্ ল ইন্ মাই হাউসহোল্ড। আমার বাড়িতে আমি ডিক্‌টেটর—"

গণেশ হালদারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। তারপর হালুয়ার প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বললেন, "খান।"

"কি যে করছেন আপনি!"

"ঠিকই করছি।"

তারপর তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস্ করে বললেন, "খেয়ে নিন। না খেলে নুকের কাছে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না। খান—"

নিজেই খানিকটা হালুয়া তুলে গুঁজে দিলেন হালদার মশায়ের মুখে।

"চিবুন। চিউ। বাঃ, দ্যাট্‌স্ গুড।"

হালুয়াটা মুখে ঢুকতেই খুব ভালো লেগে গেল হালদারের। তিনি যন্ত্র-চালিতবৎ চিবুতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বিবেকও দংশন করতে লাগল খুব।

"বেশ। আপনার অনুরোধ ঠেলব না। চলুন প্লেটটা নিয়ে বাইরে যাই। কাউ, বাইরে কফি নিয়ে এস।"

"কিন্তু এ ভদ্রমহিলাকে এরকমভাবে ফেলে রেখে—"

"নুকেকে ভদ্রমহিলা বলে অপমান করবেন না। ডোণ্ট ইন্‌সাল্ট হার প্লীজ. শী ইজ্ এ ফিমেল্ রাইনো। ওই ছিপছিপে সুন্দর চেহারার তলায় একটি গণ্ডার লুকোনো আছে। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার মার-পিট হয়। আমার সঙ্গে পারে না। অজ্ঞান হয়ে পড়লেই একটা কোরামিন্ ইনজেকশন দিয়ে দি। আজও দিয়ে দিয়েছি। ওর জ্ঞান হবার আগে হালুয়াটা শেষ করে ফেলুন। এখনই ও উঠে বসবে।"

কাউ লোকটি নীরব। এত যে কাণ্ড হল সে একটি কথা বলে নি, একটু বিচলিত হয়নি। নীরবে এসে কফির খালি পেয়ালা আর খালি প্লেট নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এসে বললে, "আজ আমার রাতে ডিউটি পড়েছে। এখন চললুম।"

"খেয়েছিস কিছু?"

"দোকানে খেয়ে নেব।"

"পয়সা নিয়ে যা। শস্তা হোটেলে খেয়ে যেন শরীরটা নষ্ট ক'রো না।"

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে দিলেন। গণেশ হালদার উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। এরকম লোক তিনি আগে কখনও দেখেননি। এরকম লোক যে থাকতে পারে তা-ও তাঁর কল্পনায় ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ডিকেন্স বা স্টিভেনসনের নভেলের কোনও আজগুবি চরিত্র বুঝি হঠাৎ মূর্ত হয়েছে এসে। মনে মনে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, বাইরে সহজ হবার চেষ্টা করলেন তবু।

"এ লোকটি বুঝি অন্য জায়গায় চাকরি করে? আমি ভেবেছিলাম আপনারই চাকরি।"

"না, ও আমার চাকর নয়, আমার ছেলে। হি ইজ্ মাই সন্। তবে ও সেটা জানে না। বহুকাল আগে ওর মা ওকে আমার কলকাতার বাসার বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। ভেগেছে বোধ হয় কারও সঙ্গে হারামজাদী। মহা বজ্জাত ছিল।"

একটু অনামনস্ক হয়ে পড়লেন, ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে নিষ্পলক হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "কাউ খুব ভালো ছেলে, ওয়াণ্ডারফুল বয়। কিন্তু ও যদি জানতে পারে আমি ওর বাবা, তা হলে আর ওয়াণ্ডারফুল থাকবে না। বাই দি বাই, কথাটা আপনাকে বললাম। দেখবেন কাউ যেন না জানতে পারে।"

গণেশ হালদার হেসে বললেন, "কথাটা আমাকে না বললেই পারতেন। আমি অবশ্য কাউকে বলব না। কিন্তু এ কথা আমাকে জানিয়ে লাভ কি—"

"আপনাকে আপনার করে নেওয়া। অন্তরের গোপন কথা বললেই ফট্ করে তার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে যায়। এ এক আজব তামাশা। তবে আসল কথাটা কি জানেন?"

"কি?"

"আমি কিছু চেপে রাখতে পারি না। আরও অনেককে বলেছি কথাটা। কাউ সম্ভবত শোনেনি এখনও। ওর চাল-চলনে

'প্রিয়ে, একটিবারের জন্যেও কি তোমার মুখ দেখতে পাবো না?'

অন্তত সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না।"

"যদি প্রকাশ পায় তখন কি করবেন?"

"দূর করে দেব। আই শ্যাল সিম্‌প্লি টার্ন হিম আউট।"

নির্বিকারভাবে কথাগুলি বলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি গণেশ হালদারের মুখের দিকে, তারপর অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পলক ফেলে শিস্ দিলেন একটু। তারপর আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "মায়াটায়া আমার কিছু নেই। কঠিন প্রস্তর দিয়ে গড়া এ হৃদয়। আমার আপন লোক, আই মীন ব্লাড্ রিলেশনস্, কেউ নেই। বন্ধুরাই আমার আপন। আমিও তাদের জন্যে জান দি, তারাও আমার জন্যে জান দেয়। আপনি কি রেফিউজি?"

"হ্যাঁ। শুনেছি আপনিও তাই।"

"হ্যাঁ, খাতায়পত্রে তাই বটে। কিন্তু আসলে আমি হোমলেস্ ভ্যাগাবণ্ড। আফ্রিকাতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলুম না। পূর্ববঙ্গে আমি দাঙ্গার সময় ছিলাম। তারপর এখানে পালিয়ে এসেছি, আর মিস্টার সেনের দৌলতে যতটা টাকা টানা সম্ভব তা টেনে নিয়ে গ্যাট্ হয়ে বসে আছি।"

তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বললেন, "আপনারও তাই করা উচিত। ওই পাগল ডাক্তারটার পিছু পিছু ঘুরে মরছেন কেন? ওর দ্বারা কিছু হবে না। শুধু খালি কাব্যি করে। আপনি আমার দলে ভিড়ে যান। তাস খেলতে জানেন? তাস মানে অবশ্য জুয়া। ওর অনেক গুণ। যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন আমার আড্ডায়। নানারকম পংথী আসে এখানে। মিস্টার সেন, যিনি উদ্বাস্তুদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনিও আসেন। তাঁর নেক-নজরে যদি পড়ে যেতে পারেন, অনেক বাজি মাত করতে পারবেন। গভর্নমেণ্ট অজস্র টাকা ধার দিচ্ছে। ইজি ইনস্টলমেণ্ট। জমি কিনুন। স্বনামে কিনুন, বেনামে কিনুন। বাড়ি করুন। যতটা পারেন আদায় করে নিন ওদের কাছ থেকে। ওরা আমাদের পথে বসিয়ে নিজেরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, আমরাও যতটা পারি কেড়ে-বিগড়ে নিয়ে নি আসুন। উচিত নয়? শুড্ উই নট্?"

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ঈষৎ-ব্যায়ত আননে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাঘব ঘোষাল।

গণেশ হালদার মৃদু হেসে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "আমি তো তাস খেলতে জানি না—"

"শিখুন। শুধু তাস খেলা শিখলেই হবে না। তাস খেলে কি করে টাকা রোজগার করতে হয় তা-ও শিখতে হবে। ইউ জাস্ট জয়েন মাই গ্যাং—আমার দলে চলে আসুন—আমি আপনাকে ওস্তাদ বানিয়ে ছেড়ে দেব। এটা ভুলবেন না, আমরা উদ্বাস্তু, দয়াটয়া কেউ করবে না, আমাদের লড়তে হবে। লড়বার প্রধান অস্ত্র টাকা—" তর্জনীর উপর বুড়ো-আঙুলের টোকা দিয়ে দিয়ে টাকা বাজাবার মুদ্রাটা দেখিয়ে দিলেন—"দ্যাট উই মাস্ট্ আর্ন, সেটা রোজগার করতে হবে সৎ অসৎ যে কোনও উপায়ে হোক। মর‍্যালিটির ছুচিবাই নিয়ে ধানাই-পানাই করেন, 'মৃত্যুরেব ন সংশয়'। ভিড়ে যান আমার দলে—"

গণেশ হালদার কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পারলেন না। সেই

সুন্দরী মেয়েটি (যে মূর্ছা গিয়েছিল) পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে ঝনাত করে চাবির একটা গোছা ফেলে দিল টেবিলের উপর।

"আমি চললাম।"

বলেই বেরিয়ে গেলে সে।

তার প্রস্থান-পথের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে রাঘব ঘোষাল বললেন, "হারামজাদী—"

বলা বাহুল্য, গণেশ হালদারও কম বিস্মিত হননি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে স্বভাবতই তিনি ইতস্তত করছিলেন।

রাঘব ঘোষাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "মনটা উস্‌খুস্‌ করছে, না? বয়লিং?"

গণেশ স্মিত হেসে তখন সসঙ্কোচে জানতে চাইলেন, মেয়েটি কে। রাঘব হাসি-মুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "ও হচ্ছে আমার রাখনি, শুদ্ধ ভাষায় রক্ষিতা, কাব্যের ভাষায় প্রেয়সী। রাম-র‍্যাজলা এবং হাড়-হারামজাদা। এরকম স্যাম্পল্‌ আমি আর জীবনে পাইনি।"

বাইরে একটা গাড়ি আসার শব্দ হল এবং পরমুহূর্তেই "ঘোষাল আমরা এসে গেছি" বলে এক বেঁটে ফরসা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পিছু পিছু আরও দুজন।

"আসুন, আমি রেডি হয়ে বসে আছি।" তারপর গণেশের দিকে চেয়ে বললেন, "এইবার আমরা মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হব। অর্থাৎ তাস খেলব। আপনি কি বসবেন?"

"না।"

"তা হলে আলাপ করিয়ে দি আসুন। ইনি মিস্টার সেন—আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, ইনি দরবেশ পাণ্ডা—এখানকার স্টেশন-পতি, আর ইনি সুবেদার খাঁ ইঞ্জিন-চালক। আর ইনি হচ্ছেন, কি নাম মশাই আপনার?"

"গণেশ হালদার।"

"গণেশ, দি গ্রেট সিদ্ধিদাতা। কিন্তু এঁর আসল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ইনি উদ্বাস্তু। গণেশ গৃহহারা। গণেশ ইজ্‌ হোমলেস্‌।"

মিস্টার সেন এবং দরবেশ পাণ্ডা মুচকি হাসলেন। কিন্তু হো হো করে উঠলেন সুবেদার খাঁ।

"আমি মুসলমান, উদ্বাস্তু দেখলেই একটু অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয়, আমার জাতভাইরা এঁদের দুর্দশার কারণ। বিহারে অনেক মুসলমানও মারা গেছে, অনেকে উদ্বাস্তু হয়েছে। তাদের দেখলে আপনা-দেরও মনের অবস্থা বোধ হয় এইরকমই হয়। কিন্তু আমি সান্ত্বনা পেয়েছি স্পেনের বুল-ফাইটের গল্প শুনে। ষাঁড়ে আর মানুষে লড়াই হয় সেখানে। দুর্বল মানুষরাই সাধারণত মরে। অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মরে। এর জন্যে ষাঁড়েরা দায়ী নয়, যারা দায়ী তারা সমাজে সভ্য বলে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কথাটা মনে রাখলে হালদার মশায়ের আমার উপর আর রাগ থাকবে না। আদাব—"

এই বলে তিনি হাতটা বাড়িয়ে উচ্ছ্বাসিত মুখে করমর্দন করলেন গণেশ হালদারের।

"এখনই চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। পরে আবার দেখা হবে।"

নমস্কারাদি বিনিময় করে চলে এলেন হালদার মশাই।

ডাক্তার মুখার্জির পুরো নাম সুঠাম মুখোপাধ্যায়। একটু অদ্ভুত গোছের নাম। তাঁকে এ নামে এখানে কেউ কোনদিন ডাকেনি। তাঁর বিহারী এবং মারোয়াড়ী রোগীদের কাছে সুটোম ডাক্তার নামে পরিচিত। কেউ কেউ পাগলা ডাক্তারও বলে। বাঙালীরা তাকে ডাক্তার মুখার্জি বলেই ডাকেন। নিজের লোকেরা কেউ থাকলে হয়তো তাঁকে স্বনামে ডাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর তিন কুলে কেউ ছিল না।

জানি কাল সকালে তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতে হবে। তা বলে কি আজ রাত্তিরটাও ঘুমোতে পারব না'

বিবাহ করেছেন মাত্র কিছুদিন আগে, দেশ স্বাধীন হবার পর। শ্বশুরকুলের পরিচয়ও কেউ জানে না। বস্তুত, তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথাই কেউ জানে না। তিনি নিজের কথা কাউকে বলেন নি, নিজের কথা বলতে তিনি ভালবাসেন না। তাই তাঁর সম্বন্ধে সত্য খবর জানা নেই কারও। সেইজন্য নানারকম গুজব প্রচলিত আছে। সবাই বলে তিনি বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এখানকার এক সাহেব সিভিল সার্জন নাকি একবার প্রকাশ করেছিলেন যে, ডক্টর মুখার্জি বিলেতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ধাত্রীবিদ্যায় এবং প্যাথলজিতে তিনি পারঙ্গম। অথচ তাঁর ছাপানো প্যাডে শুধু লেখা আছে ডক্টর এস মুখার্জি। কোনও ডিগ্রীর ল্যাজ নেই। এ-ও শোনা যায়, তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স নাকি কয়েক লক্ষ টাকা। এ খবরটা সম্ভবত মিথ্যা নয়, কারণ

ব্যাংকেরই এক কর্মচারী কথাটা প্রচার করেছেন। এত টাকা তিনি কোথা থেকে পেলেন তা নিয়েও লোকে মাথা ঘামাতে কসুর করেনি। এ বিষয়ে সর্ববাদীসম্মত যে মতটি জনসাধারণ মেনে নিয়েছে সেটি এই : কলকাতায় তাঁর যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল (খান কয়েক বাড়ি এবং প্রায় পনর বিঘা জমি) সেইটে দাঁও মাফিক বিক্রি করেই তিনি নাকি লক্ষপতি হয়েছেন। তাঁর বাবা ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁরও ব্যাংক ব্যালান্স নিন্দনীয় ছিল না। এই শহরে তাঁর পিতৃবন্ধু হরিশংকরবাবু থাকতেন। তাঁর সংগেই দেখা করতে এসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। যে বাড়িতে ডাক্তার মুখার্জি এখন থাকেন সেটা হরিশংকর-বাবুরই বাড়ি। হরিশংকরবাবু দার-পরিগ্রহ করেন নি। তিনি এই শহরে ওকালতি করতে এসেছিলেন। বেশ ভালো পশার ছিল তাঁর। তিনি এই বাড়িতে সারা জীবন ঝি চাকর নিয়ে কাটিয়ে গেছেন। ডাক্তার মুখার্জি যখন এখানে তাঁর সংগে দেখা করতে আসেন তখন (তাঁর বুড়ো চাকর রঘুবীরের রিপোর্ট এটা) তিনি নাকি বলে-ছিলেন, 'এই বাড়িটা আমার মৃত্যুর পর কে ভোগ করবে তা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা হয়েছে আমার। আমার একমাত্র উত্তরাধি-কার ভাই-পো থাকে বম্বেতে। তার সেখানে সিনেমার কারবার। সে এখানে এসে বাস করবে না। সে এ বাড়ি বিক্রি করে দেবে। যে সবচেয়ে বেশী দাম দিতে রাজি হবে সেই নেবে বাড়িটা। কাবুলী, মারোয়াড়ী, মুচি, মুদ্দফরাস যে কেউ ক্রেতা হতে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছে এ বাড়িতে ব্রাহ্মণ বাস করুক। এটা আমার কুসংস্কার বলতে পার, কিন্তু ওইটেই আমার ইচ্ছে।' এ কথা শুনে ডাক্তার মুখার্জি নাকি বলেছিলেন, 'আপনি যদি অনুমতি করেন এবং আমার সাধ্যে যদি কুলোয় বাড়িটা এখনই আমি কিনে নিতে পারি। কথা দিচ্ছি, আপনার মৃত্যুর পর আমি এসে বাস করব এখানে। আপনার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, বাড়িটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দেবেন, কারণ এখনও পর্যন্ত আমার উত্তরাধিকারী কেউ নেই।' হরিশংকরবাবু নাকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর আমি কি তোমার বাড়িতে অমনি থাকব?' সুঠামবাবু উত্তর দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ—'নিশ্চয়, আপনি আমার বাবার বন্ধু, পিতৃতুল্য, আমার বাড়িতে আপনার থাকবার ষোলআনা অধিকার আছে।' সেই সময় হরিশংকরবাবু জলের দামে বাড়িটা বিক্রি করে দেন সুঠাম ডাক্তারকে। বাড়ি বিক্রি করবার পর তিনি বছর দুই বেঁচে ছিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে বাড়িটার মেরামত করে, রং ফেরায়। তারও প্রায় বছরখানেক পরে সুঠামবাবু এসে এ বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন। যেদিন তিনি প্রথম এলেন, একাই এলেন, তখনও তিনি বিয়ে করেন নি। শোনা যায়, তিনি নাকি দেশ-ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। বহু স্থান বেড়িয়ে তারপর এখানে এসে

'রাত-বিরেতে বাড়ি ফেরা? দেখাচ্ছি মজা।'
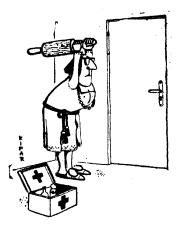
প্র্যাক্‌টিস শুরু করেন। তিনি এসে যখন বাজার থেকে কুলি এনে বাড়িঘর পরিষ্কার করাচ্ছিলেন তখন দেখলেন গেটের সামনে একটি বলিষ্ঠাকৃতি কালো-কালো আধবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিছনে দু-তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আর একটি লম্বা গোছের ছোকরা। সুঠামবাবু
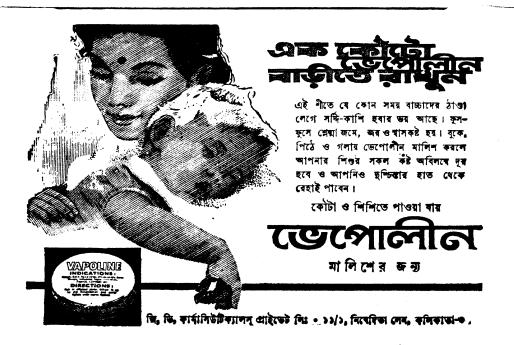
গেটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কে, কি চায়। সেই লম্বা ছোকরাটি বললে, 'এ হচ্ছে রঘুবীরের বউ আর আমি হচ্ছি রঘুবীরের শালা। আর এ দুটি হচ্ছে রঘুবীরের নাতি আর নাতনী, এদের মা নেই। আর এইটি হচ্ছে আমার ছেলে।' পরিষ্কার বাংলায় বললে কথাগুলি। বিহারীর মুখে এরকম বাংলা শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি ডাক্তার মুখার্জি। রঘুবীরের স্ত্রীও বাংলা ভাষাতেই কথা বলল। তবে তার ভাষা যদিও বাংলা কিন্তু উচ্চারণে বিহারী টান আছে। সে বলল, 'হরুরিবাবুর কাছে হামরা ছিলাম। হামি পাকাতাম। হরুরিবাবু মরে গেল, হামাদের আশা-ভরোসা চলে গেল।' সুঠামবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমারও তো লোক দরকার। তোমরা ইচ্ছে কর তো আমার কাছেও থাকতে পার হরিবাবুর কাছে যেমন ছিলে।' সেইদিন থেকেই দাই, তার নাতি-নাতনী (বিজয় আর শালিয়া) এবং ভাই রংলাল ডাক্তার মুখার্জির পরিবারভুক্ত হয়ে গেল। রংলালই দিনকতক পরে দুর্গাকে জুটিয়ে আনলে। বাহাল হয়েই দাই প্রশ্ন করেছিল, 'মাইজি কোথায়, কবে আসবে?' ডাক্তার মুখার্জি একটু দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাইজি এখনও আসেন নি। এইবার আসবেন।' তখনও তিনি যে বিবাহ করেন নি এ কথা স্পষ্ট করে জানান নি দাইকে। প্রথম প্রথম তিনি ব্যস্ত ছিলেন নিজের ল্যাবরেটরি নিয়ে। এসেই তাঁর খুব নাম হয়ে গেল, কারণ তিনি ল্যাবরেটরির সাহায্য না নিয়ে কোনও রোগী দেখতেন না। এসেই তিনি যে ক'টা রোগী দেখেছিলেন, সবগুলোই ভালো হয়ে গিয়েছিল। হইহই নাম হয়ে গেল তাঁর। তিনি কিন্তু হইহই করে সাড়া দিলেন না। তাঁর নিজস্ব গয়ংগচ্ছ চালে চলতে লাগলেন। দশটার, কখনও কখনও এগারটার, আগে ল্যাবরেটরিতে যেতেন না। মেরে-কেটে ঘণ্টা দুই থাকতেন সেখানে। তারপর বেরিয়ে পড়তেন মোটর নিয়ে। জেলের ডাক্তার প্রিয়বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে পেলেন জাম্বুবানকে। ক্রমশ ভুটানও এসে জুটল এবং সবশেষে রকেট। ল্যাবরেটরির জন্য ভেড়া, গিনিপিগ আর খরগোশও তাঁকে কিনতে হয়েছিল। মুরগী আর গরু তখন তিনি কেনেন নি, কিনেছিলেন স্ত্রী আসার পর। তারপরই গোয়াল আর মুরগী রাখবার ঘর তিনি তৈরি করান। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হঠাৎ একদিন নিয়ে এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাঁর আসার কথা কাউকে বলেন নি, এমন কি দাইকেও না। তিনি দাইকে বলে গিয়েছিলেন কলকাতায় ওষুধ কিনতে যাচ্ছেন। ফিরবার সময় ওষুধের সঙ্গে স্ত্রীকেও নিয়ে এলেন। দাই চমকে গিয়েছিল বউয়ের রূপ দেখে। এমন রূপসী সে আগে কখনও দেখে নি। ডাক্তারবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন সে বিষয়ে। দাই অবাক হয়ে যেত। বোসবাবু যখন নতুন বিয়ে করে এনেছিলেন তখন কত কাণ্ড। বাজনা বেজেছিল, ভোজ হয়েছিল, আত্মীয়-স্বজন এসেছিল কত। কিন্তু ডাক্তারবাবু বউ নিয়ে এলেন, কিছুই হল না, সব 'শুনশান' (ফাঁকা)। বাইরের লোকেও এই পাগলা ডাক্তারের মতি-গতি বুঝতে পারেনি, ঘরের লোকেও পারেনি। তবে একটা জিনিস দেখে দাইয়ের খুব ভালো লেগেছিল। ডাক্তারবাবু মাইজিকেই শুধু গয়না-কাপড়ে মুড়ে দেন নি, তাদেরও দিয়েছিলেন। তাকে, তার নাতনীকে কিনে দিয়েছিলেন রুপোর গয়না, দামী জামা-কাপড়ও। খেলো সস্তা জিনিস কেনা পছন্দই করেন না ডাক্তারবাবু। অন্য বাড়িতে

এমন জামা-কাপড় দাই-চাকরকে কেউ দেয় না। আর একটা জিনিসও তিনি করেছিলেন মাইজিকে আনবার সঙ্গে সঙ্গে। মঙ্গলা গাইকে ঘরে এনেছিলেন। তখনও মঙ্গলা গাই হয় নি, বকনা ছিল। একটা কসাইয়ের হাত থেকে চতুর্গুণ দাম দিয়ে নাকি কিনেছিলেন তাকে। মঙ্গলা যখন ঘরে আসে তখন তাকে তেল সিঁদুর জল দিয়ে বরণ করেছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, তাকে ভিতরের উঠোনে নিয়ে এসে। বাইরে তিনি বড় একটা বেরুতে চান না। সেইদিন বাড়িতে শাঁখও এসেছিল। মঙ্গলার মাথায় তেল সিঁদুর আর খুরে জল দিয়ে শাঁখ বাজিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। দাই আর একটা জিনিসও লক্ষ করেছে। মাইজির যদিও জাত-বিচার নেই, মুরগী-টুরগী সবই খান, কিন্তু ঠাকুরদেবতায় তাঁর খুব ভক্তি। একটা ঘরে নানারকম ঠাকুরদেবতার পট টাঙিয়ে, লক্ষ্মীর আসন বসিয়ে সেটাকে চমৎকার ঠাকুর-ঘরে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। সেইখানেই অধিকাংশ সময় হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে থাকেন। ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধ আমোদিত করে রাখে ঘরখানাকে।

এখানে আসবার কিছুদিন পরেই ডাক্তারবাবু এখানকার স্কুলে দশ হাজার টাকা দান করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে কিছু সম্মান লাভ করেছিলেন। স্কুলের ভালো লাইব্রেরি ছিল না, লাইব্রেরি করবার জন্যেই তিনি টাকাটা দিয়েছিলেন। মাসে দশ টাকা করে চাঁদাও বরাবর দিচ্ছেন। তাঁকে স্কুল কমিটির মেম্বার এবং প্রেসিডেন্ট করবার প্রস্তাব করেছিলেন স্কুলের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রাজি হন নি তিনি। বলেছিলেন, আমি নেপথ্যেই থাকতে চাই। মাসে মাসে নিয়মিত স্কুল কমিটির মিটিং-এ আমি যেতে পারব না। আমার সময় নেই, ওসব ব্যাপারে সামর্থ্যও নেই তেমন। তবে মাঝে মাঝে যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয় বলবেন, তখন যতটা পারি করে দেব। স্কুলের ইংরেজী পড়াবার মাস্টারের যখন দরকার হল, তখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিলেন। তারপর স্কুলের সেক্রেটারি অমলবাবু একদিন একগোছা দরখাস্ত এনে ডাক্তারবাবুকে বললেন, কাকে বহাল করা উচিত এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মত-ভেদ হয়েছে, মিস্টার সেন তাঁর একজন আত্মীয়কে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। আমাদের তাতে আপত্তি আছে। শেষে কাল মিটিং-এ ঠিক হয়েছে আপনি যাকে বেছে দেবেন তাকেই আমরা বাহাল করব। ডাক্তারবাবুও এ গোলমেলে ব্যাপারে মাথা গলাতে চান নি। কিন্তু অমলবাবুর আগ্রহাতিশয্যে শেষকালে তাঁকে রাজী হতে হল। ডাক্তারবাবু কিন্তু নিজে নির্বাচন করেন নি। নির্বাচন করতে দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। খুব বিদুষী মা

হলেও তাঁর স্ত্রী মোটামুটি বাংলা ইংরেজী জানতেন। তিনিই নির্বাচন করেছিলেন গণেশ হালদারকে। এ কথা অবশ্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ বা গণেশ হালদার কেউ জানতে পারেন নি। গণেশ হালদার অবশ্য যোগ্যতম প্রার্থীই ছিলেন। মফস্বলের স্কুলে যে একজন অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট আসবেন এবং এসে টিকে থাকবেন এ আশা স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা করেন নি, তাই তাঁরা গণেশ হালদারকে বাহাল করতে ইতস্তত করেছিলেন প্রথমে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যখন তাঁকে মনোনীত করলেন তখন আর কেউ আপত্তি করেন নি। ডাক্তারবাবু বললেন, ইংরেজী পড়াবার জন্য এই লোকই ভাল হবে। মাইনেটা অবশ্য কম। আচ্ছা, আসুন তো. ওঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না-হয় আমার ওখানেই হবে। আমার আউট হাউসটা তো খালিই পড়ে থাকে। (ক্রমশ)

ডেকচির দুধ উথলে ওঠে উঠুক।

যে জ্বলন্ত সাপটা হিটারের স্প্রীঙে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, গা ভিজে সেটা উঠুক ফোঁস করে। সুমনা তবু উঠবে না। ঢাকা বারান্দার পড়ন্ত রোদে চেয়ারে এলানো নিজের গাটাকে টেনে তুলবে না। রোদটা এসে পায়ে পড়েছে। সারাদিন জলে জলে পাটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে। বেশ আরাম লাগছে। অশোক রাগ করবে দুধ পড়ে হিটারটা বিগড়োলে। ওকেই সারাতে বসতে হবে। তবু লুকিয়ে এই অবাধ্যতাটুকু করতে সুমনার ভাল লাগছে। কেমন আচ্ছন্নের মতো মনে হচ্ছে সব কিছু। যেন সুমনার নয়, তাকে ঘিরে রোদের বেষ্টনী পরা তবু ছায়াময় ওই পথ মাঠ রাস্তার লোকগুলো, ওদেরই চোখের পাতা আলস্যে জড়িয়ে এসেছে। তবু হাতের অবশ আঙুলগুলো যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে। উলটো আর সোজা, সোজা আর উলটো। মেরুন পশমের বাণ্ডিলটা ক্ষীণতর হচ্ছে। কিন্তু কোনো স্পষ্ট আকার নিয়ে সুমনার নিমীলিত চোখের অন্ধকারে ফুটে উঠছে না সেই লোকটা, ভোর সাতটায় যে রোজকার ধূসর রঙের কোটটা গায়ে দিয়ে ডিউটিতে বেরিয়ে গেছে সাইকেল করে, স্টেশনের দিকে। ফিরবে সন্ধ্যায়। মাঝে এক ঘণ্টার ছুটিতে ভাত খেয়ে গেছে। ধূসর। প্রাত্যহিকতায় ধূসর সুমনার সব কিছু। সন্ধ্যেটুকু মেজাজ ভাল থাকলে পুরোনো হাসিঠাটা। তারপর সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ে দিনের ফাঁকা গহ্বরটার মুখ চাপা দেওয়া। কাল রাত্রিতেই তাদের কথাগুলো সুমনার বিবাহিত জীবনের যে কোনো মুখর সন্ধ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

—মিসেস চৌবের ছেলে হয়েছে। ঠিক মায়ের মতো দেখতে হয়েছে। ও মনে করেছিল মেয়ে হবে।

—চৌবের ছেলে হয়েছে? বললে না কাল?

—বলেছি? ও!

তারপর স্তব্ধতাটাই সুমনার সারাদিন দিন ছাড়িয়ে সারা জীবন ছেয়ে ফেলছে। দুটি লোকের কথা কতক্ষণ বা অফুরন্ত থাকে!

চেয়ার থেকে উঠে, যেন একটা আচ্ছন্নতার ভেতরেই, হিটারের সুইচটা নিবিয়ে দিলে সুমনা। না দুধটা ওথলায়নি, অবহেলায় ফুঁসছিল। ওটা ঘন হবে। সুইচটা আবার জেবলে দিয়ে, একটা চামচে দিয়ে নাড়তে লাগলো সে...আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চোখ থেকে কেটে যেতে লাগলো তন্দ্রা-রেশটুকু। থিতিয়ে পড়া দুধটা আবার ফণা তুলে উঠলো।

এখানে সুমনার একমাত্র ঘনিষ্ঠ পরিচয় যার সঙ্গে সে স্বামী অশোক। গল্প বলতে সে বোঝে কাজের গল্প, অফিসের গল্প। সবচেয়ে মুখরোচক ফোরম্যান মিস্টার মিত্রের গল্প। ফোরম্যানের গল্প মানে ওই একদা-সুদর্শন, টাক-মাথা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির মুক্তকণ্ঠে অপকীর্তন। সাইকেল করে ভদ্রলোক সামনের পীচের রাস্তা দিয়ে গেলে মাঝে মাঝে অশোক যাকে এ বাড়ির বারান্দা থেকে একমুখ হেসে নমস্কার করেছে। পেছন ফিরলে সুমনাকে ডেকে দেখিয়েছে। লোকটা রেল কোম্পানীর জিনিস বাড়িতে দু-হাতে এনে বোঝাই করছে। উদ্বৃত্তটুকুও রেলেরই লোক লাগিয়ে বয়ে আনাচ্ছে। ওর
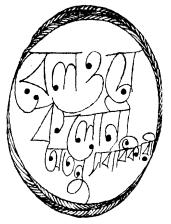
কোয়ার্টারের বেডরুম ড্রইংরুমগুলো, অশোক বলে, আসলে রেলের স্টোররুম। পাঁচ শ' আট শ' অবধি ঘুষ নিয়ে লোককে কাজে ঢোকাচ্ছে, তারপর নিজের ফাইফরমাশ খাটাচ্ছে। অশোকের অভিযোগের অন্ত নেই। সুমনাও কি দেখেনি খালাসীদের হাজিরা নিয়ে তাদের মালী বানিয়ে কোয়ার্টারের সামনে যে অভিজাত শৌখীন ফুলের বাগানটা করেছেন ফোরম্যান সাহেব? কাঁকর বিছানো লাল রাস্তার এক দিকে সূর্যমুখী ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকার রঙবাহার আর এক দিকে বাঁধাকপি ফুলকপির শ্যামল স্নিগ্ধ ক্ষেতটি: পাশ দিয়ে হাঁটলে চোখ জুড়িয়ে দেয়। অবশ্য সুমনার চোখে জ্বালা ধরায়। রাগ করে লাভ নেই। মাঝে
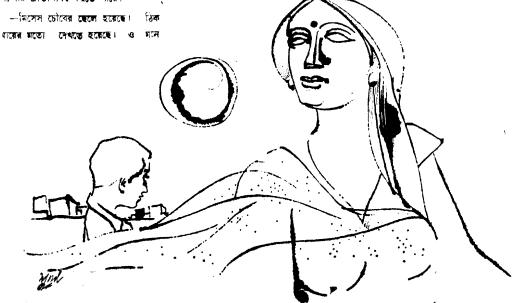
মাঝে অশোকই বলে। রেলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি এই দস্তুর।

সেদিন তো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যানের বাড়ি আলাপ করতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছে সুমনা। ঠিক তাদের কোয়ার্টারের যেমনি আলোর শেড তেমনি শেড দিয়ে ওদের টেবিলে খাবার তরকারি সব ঢাকা দেওয়া। অবশ্য টেবিলটাও কোম্পানীর লোক বেগার বানিয়েছে নিঃসন্দেহে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, মুখ ছুটিয়ে ধমকাতে পারে না। একটা বৃহৎ পরিবারের মতো নিজেদের ভেতর বোঝাপড়া করে সবাই বেশ আছে।

নিয়মের ব্যতিক্রম অশোকের। বিবেকের দংশনটা প্রবল। অন্তত বাড়িতে অতিথি-সমাগম ঘটলে তার কলকণ্ঠে তাই প্রমাণ হয়। অবশ্য ব্যাপারটা যে উপহাসের নয়, তা সুমনা জানে। শুধু জানলেও উপহাস করা যেত, সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। তাকে যদি আজ বলো খাবার ঘরের বালবটা ফিউজ হ'য়ে গেছে, তিনদিন একনাগাড়ে ফেউ লেগে থাকার পর সেটা আসবে। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, নগদ দাম দিয়ে কিনে আনবে অশোক, সবাইকার চোখের ওপর দিয়ে দুলিয়ে। সহকর্মীরা জানলে হাসিঠাট্টা করবে। সুমনা জানে তাতে অশোকের স্ফীত বুক আরো ফুলে উঠবে।

সেনও তো একট চার্জম্যান, বি গ্রেডেরই। অথচ তার বাড়ি যাও ড্রইংরুমে সোফাসেট আসবাব। শুধু ঘরসজ্জার বহরই নয়, ঘরনীর দেহসজ্জার বাহারেও মনে হবে, বুঝি কোথায় না এলুম! মিসেস সেনকে অবশ্য কথাটা কায়দা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছে সুমনা। যখন সরু আঙুলের সূক্ষ্মতর নখাগ্র দিয়ে সুমনার তৈরী পুডিংটার দেহ বিদ্ধ করছিলেন মিসেস সেন আর গৃহসজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রেফ্রিজারেটার না হলে 'কিচেন'কে কেমন ন্যাড়া লাগেই, সুমনার লাগে না? অ্যাকুইরিয়ম না হলে আবার কিসের ড্রইংরুম! দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমনা বলেছিল, 'আমার তো এমন লজ্জা করে এ-ঘরে এনে কাউকে বসাতে।' খানিক স্তব্ধতার পর যোগ করেছিল, 'কত বলি—সবাই যা করছে, তুমি তা করলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

মহাভারত অশুদ্ধ হোক আর না-হোক, মিসেস সেনের মুখের শুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়নি দেখে তৃপ্তিলাভ করেছিল সুমনা। জোর করে মিসেস সেনকে সবটুকু পুডিংই খাইয়েছিল সে। অশোক সম্বন্ধে এ নিয়ে একটা গর্বও যে তার নেই তা নয়। তার এই শুচিবায়ুতাটা মাঝে মাঝে অন্তত সুমনার কাজে লাগে, স্বীকার করতেই হবে।

আসানসোলে থাকতে থাকতে বাবার মুখে তাঁর আণ্ডারের এই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের গল্প শুনেছিল সে। অবশ্য সে জনশ্রুতির ভিত্তি যে রন্ধ্রহীন ছিল, সেটা পদে পদে প্রমাণ করেছে অশোক।

সামান্য রিকশা ভাড়া বা আনাজপত্রের দাম নিয়ে একটু দরাদরি করলেও অনেক কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তিক্ততারও সৃষ্টি হয়। ন্যায্য। ন্যায়! তবে চোখের ওপর আউট-হাউসটায় কেন জমাদারটাকে সহ্য করছে অশোক! ওটার স্বত্ব কি তাদের নয়? মানে এই সতেরো নম্বর বাংলোটা যাদের। অথচ লোকটার হাবে ভাবে মনে হয়, সে তার পিতৃপুরুষের ভূমিতেই বিচরণ করছে। জমাদার, না জমিদার। প্রজা অগুনীত। আট দশটা ঘেয়ো কুকুর, ডজন খানেক মোরগ মাঠটা চষে খাচ্ছে, পাতিহাঁসগুলো বেড়াচ্ছে নর্দমায় মুখ দিয়ে নয়তো পাঁকে আকর্ণ ডুবে। একবার এঁটো-কাঁটা ফেলতে সুমনা যদি খিড়কির দরজাটা ফাঁক করেছে, অমনি পশুপালের দল ছেঁকে ধরবে সুমনাকে... গলা বাঁচিয়ে দরজা বন্ধ করতে পথ পাবে না সুমনা। কুকুরগুলো পাহারাদার। ঘরে কি সম্পত্তি আছে কে জানে......ঘরনীর রূপশ্রী

এমন সতর্ক প্রহরায় আর যাই হোক, চেড়ী-বেষ্টিত জানকীর মতো দেখায় না, তবে অশোককাননের আমজাম গাছগুলো বাঁদরদের হাত থেকে ওরাই অবশ্য রেখেছে। রেখেই বা সুমনার কি এমন মাথাটা কিনেছে? গত বছরই যখন গাছে হাজার বার শ' আম ফললো, আর জমাদারটা গোটা পঁচিশ আম এনে মা-জী বলে বিকট শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে বিগলিতভাবে হেসে সুমনার সামনে ধরলে, রসিকতায় বিমূঢ় না হলে সুমনা তার কি অভ্যর্থনা করতো বলা যায় না। খিড়কির দরজা খুললেই চিক্কণপল্লব আমবাগানের শ্যাম ও হরিৎশ্রীর দৃশ্যে তার বুক এখনো হু-হু করে। অশোক বলে, ওরকম একটা দুর্দান্ত লোক কাছে পিঠে থাকা ভাল, চোর-ডাকাতের ভয় থেকে নিশ্চিন্দি। আর তা ছাড়া কে যাবে ছোটলোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে। লোকটার মুখ খারাপ, ওরকম লোককে ঘাঁটানো ঠিক না। অগত্যা নোংরা মুরগীগুলো ডানা ঝটপট করে যখন-তখন গায়ে ওঠে, হাঁস-গুলো অকস্মাৎ এমন প্যাঁক প্যাঁক করে যে, বোনার কাঁটাটা গলায় ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সুমনার, ঘেয়ো কুকুরগুলো নিঃশব্দে খিড়কির দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে, সুমনা বারান্দাটায় একটু দাঁড়ালে।

তবু এই প্রতিপক্ষ আছে বলে সুমনার দিনগুলোর যেন একটা স্বাদ আছে। হঠাৎ অন্যমনস্কতা ভেঙে রান্নাঘরে ছুটে আসতে হয়। চামচে, খুন্তি বা হাতের কাছে-পাওয়া রুটি বেলার বেলুন নিয়ে অনধিকার প্রবেশকারীর পেছনে ধাওয়া করতে হয়। দরকার হলে ছিটকিনি দিয়ে নিজেকেও বন্দী রাখতে হয়। নোংরা, ভীষণ নোংরা জাত এরা। শ্বশুরবাড়ির লোকরা কেমন করে জানতে পেরেছে সুমনার জল ঘাঁটা আর পরিচ্ছন্নতার ওপর পক্ষপাতটুকু। কিন্তু কি নিয়ে থাকবে সুমনা? সত্যি, বড়ো নিঃসঙ্গ সে। একা একা ভাবতে ভাবতে সুমনা যেন তার সব ভাবনার বিস্বাদ তলানিটুকুর স্বাদ পেয়েছে। ভাবতে সে আর চায় না।

ঝি যেদিন কামাই করে সুমনা বাঁচে। আটটা অবধি অপেক্ষা করে কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নেয়। দুটি প্রাণী, কিন্তু কতো প্রয়োজন। একটি একটি করে সব কাজ নিজের হাতে সারে। এখানকার ঝিরা সপ্তাহে অন্তত দু' দিন করে তো কামাই করবেই। এ-হাড়হাভাতে দেশে চাকর নয়, ঝিয়েরই রেওয়াজ। মরদগুলো বসে বসে বউয়ের ভাত খায়। ছাড়ালে আর লোক পাবে না, এমনি শক্ত ওদের য়ুনিয়ন।

সকালে উনুন আর সন্ধ্যেয় হিটার। ঝি না এলে রান্নাঘরের গনগনে আগুনটাই সুমনার মন্থর দিনের অনেকখানি গ্রাস করে। হিটার আর কলতলা। চমক ভাঙে সেই অশোক যখন ডিউটি থেকে আসে। ন'টার পর থেকে সতর্ক থাকতে হয়, থেকে থেকে ছুটে আসতে হয় বারান্দায়, তখন সব্জী-ওলা হেঁকে হেঁকে যাবে ঝুড়ি নিয়ে, বিরাট ফাঁপানো বেলুনের মতো কালো কুচকুচে বেগুনগুলো যেন তেলে পালিশ করা, সাদা পাহাড়ী আলু, ক্ষেত থেকে সদ্য তোলা কপি কড়াইশুঁটি...একটি একটি করে হাত দিয়ে দর করে সুমনা নিজের ঝুড়িতে তোলে। তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে আসবে মাছওলা, মর্জি হলে। বাজারে যা দাম, ওরা তার চেয়ে বেশী নেয়, দোরে পেঁাছে দিয়ে যায় বলে। রেলের আর সব চাকুরেরা কোম্পানীর লোক বাড়িতে রেখে খাটায়, বাজার করায়। অশোক নিজে বাজারে যেতে চায় না, ওরকম কোনো লোকও রাখেনি। সুমনাকেই যতো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়।

ওখানকার দুধটা বেশ ভাল......হলদে দুধটার ওপর এবার পুরু সর পড়ছে...ওর বুদ্বুদগুলো আর অতো ক্ষণভঙ্গুর নয়... এবার নামাতে হবে।

বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। কি হবে বন্ধুতে? চলে যেতে হবে তো, যে-কোনো দিনই নোটিশ এলে। আবার ঘুরে ফিরে সেই চিন্তাটাই শেষে মনে এলো, যেটা সুমনার আর সব ভাবনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যেটাকে দূরে সরাবার জন্যে এতো কাজের তাড়া।

বাড়ির সামনের প'ড়ো জমিটা কেটে বাগান করায় আর অতোটা গা করেনি সুমনা। মাটির মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। একটা লোকের মায়ায় পড়ে আর সব মায়া কাটাতে হবে যে। হাতে করে কিনতে ইচ্ছে করে না একটা জিনিস, একটা আসবাবপত্র বাড়লেও মনে হয়, কাঁধে বোঝা চাপলো, টেনে টেনে নিয়ে যেতে হবে কোথায় কে জানে, বেনারস, আসানসোল, মোগলসরাই কোথায়। সেখানে দু'দিন থাকতে না থাকতে আবার ডাক আসবে রেল-লাইনের। অমনি আবার বাঁধোছাঁদো, প্যাকিং বাক্সর ভিড়, এটা ফেলো, সেটা রাখো। এটা ওকে দিয়ে দাও, ওটা নিতে ভুলো না!

স্টেশন কাছেই, যেখানে অশোক যায়। আরো কাছে, বারান্দা থেকে দেখা যায় ভীষণ চওড়া নুড়ির রাস্তাটা, যার ওপর সারি সারি রেল লাইন গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে আছে......রাস্তার ওপর কত লোহার কাটাকাটি......হঠাৎ গিয়ে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে ওঠে। পা দিতে ভয় হয়। তার ওপর দিয়ে ভীষণ লম্বা মালগাড়ি আস্তে আস্তে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে তো চলেছেই। বন্ধ ছোট ছোট কামরাগুলো প্যাকিং বাক্সর মতো দেখতে। সুমনা যেন হাত দিয়ে থামিয়ে দিতে পারে ওদের চলা। দেখতে দেখতে জেদ চাপে ওর শেষ দেখতে। ঘুরে ঘুরে অনেক পরে যেন খেলায় হেরে যাওয়ার লজ্জায় আরো আস্তে শেষ খোলাগাড়িটা আসে।

তবু সমস্ত গাড়িটা অনেকক্ষণ দৃষ্টির বাইরে যেতে চায় না......ওর সঙ্গে সুমনার প্রতিদিনকার জীবনের কোথায় যেন মিল আছে।

বারান্দায় রোদের তেজটা মিইয়ে এসেছে... চেয়ারটাকে ছায়ায় ফেলে সেটা অনেকদূরে স'রে গেছে। চেয়ারটায় নয়, সিঁড়ির ধাপের ওপর গিয়ে বসলো সুমনা। ...শর্মাজীর ছোট্ট সুন্দর পুতুলের মতো মেয়েটা বেড়াতে বেরিয়েছে বাহাদুরের হাত ধ'রে। বাহাদুরকে ডেকে ও চাচাজীকে দেখায়। ওকে দিয়ে জোর করে হিন্দী কথা বলাতে ভাল লাগে সুমনার। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কোলে নিতে......কিন্তু কাপড় নোংরা হবার ভয়ে ইচ্ছা দমন করে আরো জোরে তার সঙ্গে হাসে, গল্প করে। ঘোমটা সুমনার বোধ হয় বেশীই। এই শীতেও আধ-হোস জল ফাঁক করে কি করে সে প্রাতঃস্নান করে, সেটা বিস্ময়ের। একলা একলা থেকে থেকে এই জল-খরচটা যেন বাড়ছে। কিন্তু কি নিয়ে থাকা যায়! এত ছোট্ট শহরটা যে, ওই সামনের রাস্তা দিয়ে যদি একটা লোক চক-বাজারের দিকে যায়, ভাতের হাঁড়িটা উপুড় করে দিয়ে সুমনা যখন আবার এসে দাঁড়াবে বারান্দায়, ঠিক দেখতে পাবে লোকটা ফিরছে। একটু সতর্ক হয়ে থাকলেই বোধ হয় মুখস্থ হয়ে যাবে ক'টা লোকের আনাগোনা এদিকে, তাদের মতো ক'জন হতভাগ্য থাকে পৃথিবীর এই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে। তাদের বউরাও কি অমনি সুমনার মতো রাস্তার লোক গুনে সময় কাটায় নাকি? সময় কাটাবার আর ক'টাই বা উপায় আছে এখানে? একটা ভাল সিনেমা হল না, একটু পার্কে বসতে গেলেও বার আনা খরচ করে রিকশা কর। ওই যে সাইকেল করে দুটো লোক দু মুখে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে কথা বলছে, ওরা কি কথা বলছে, না শুনেও সুমনা নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। 'কেমন আছ', 'ভাল আছি'র অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সোজা বক্তব্যের মর্মবিন্দুতে।

—তোমার কখন ডিউটি পড়েছে? আমার আবার এমন বিপদ জানো, সেনটা এমন পেছনে লেগেছে......কাল রাত্রি দুটোর সময় ঘুম ভাঙিয়ে শালা জিজ্ঞেস করছে, মেহেত্রা আসেনি তো কি করবো—See the fun!

—সেনটা! আর ব'লো না, এমন বদমাইসি শুরু করেছে, নিজে সব নিয়ে ফাঁক করছে, আর স্টাফের লোক যদি—

জীবন আর মানুষের ওই একই রূপ তো সুমনা দেখেছে ছোটবেলা থেকে। সে রূপটা আবার প্রত্যক্ষ করতে পারে এখনই, অশোকের পাওনা পি টি ও নিয়ে শৈশব যেখানে কেটেছে, সেই আসানসোলে গেলে। বাবার ডিজেলের চাকরি, বদলির ভয় নেই। এখন নিশ্চয়ই ফিরেছেন সাইকেল করে......কালিঝুলি মাখা প্যাণ্ট ...ঘামে ভিজে এইটুকু মুখ......কি কাজ করতে হয়, কে জানে।

অশোকের একটা পা সিঁড়ির ধাপে, আর-একটা সাইকেলের পা-দানিতে। একটা ঘর্ঘর শব্দ করে সাইকেলটা নিষ্ক্রিয় হল। সুমনা দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে......কিন্তু মনে কোনো সাড়া আসেনি। প্রতিদিনের একটা অপরিহার্য আগের মতো কে জানে এটা কবে থেকে মনে আর কোনো বিশেষ অনুভূতি জাগায় না, কোনো নিভৃত তন্ত্রীতে আঘাত করে না।

নিঃশব্দে উঠে গিয়ে সদর ঘরের ছিটকিনি খুললে সে...অশোক সাইকেলটা ঢোকালে। —চায়ের জল চাপাও, এখুনি সেন আসছে বুঝলে। সঙ্গে একটা কিছু করো। নোংরা প্যাণ্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে খিড়কির দরজাটা খুলে তের নম্বর রেলওয়ে কলোনীর সেই অতিপরিচিত পশ্চাৎপটের

যবনিকা উন্মোচন করলে সে। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। —ডিউটি থেকে চায়ের জল না ফোটা পর্যন্ত এই-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। ......জমাদারের আস্তানাটা ছাড়িয়ে বারো নম্বর কোয়ার্টারের বড়ো বাগানে নানারকম ফুল দেখা যায়......ওদের বড়সড় মেয়েটা সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ্যের লোকের সংগে চেঁচিয়ে গল্প করে......গলাটা যতখানি দরাজ, ততখানি মধুবর্ষী নয়। সুমনা বলে, ও মেয়েটার হুটোপাটি করা স্বভাব, লোক দেখলে স্বভাবটা বাড়ায়। পাছে ওর সংগে গল্প করতে হয়, এই ভয়টা কুকুরগুলো ছাড়া সুমনার খিড়কির দরজাটা বন্ধ রাখার আর একটা কারণ। ঠান্ডা বাতাস আসছে, এখুনি দরজাটা বন্ধ করতে হবে. ইলেকট্রিকের আলো জ্বলবে এখানটা। শীতের ছোট বেলা, দেখতে দেখতে বাইরেটা গাঢ় অন্ধকারে একাকার হয়ে যাবে। অশোক নির্বিকার চোখে রোজ কি দেখে ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে? সূর্যাস্তের পল্লীশ্রী? না। তের নম্বরের বাচাল মেয়েটা? না। মিত্র সাহেবের বাগানের খুব বড়ো মানুষের মুখের মতো সূর্যমুখীটার দিকে বড় জোর এক পলক চেয়ে অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে তার বিকেলের নির্জীব দৃষ্টি। জমাদারের ছেলে দুটো একপাল কুকুরবাচ্চার সংগে খেলছে......জমাদার-পত্নীর বহুবর্ণ শাড়িটা গাঁদাফুলের বেড়ায় আটকে এখনো শুকোচ্ছে, তোলা হয়নি। হয়তো কে জানে, অশোক এ সব কিছুই দেখে না, স্টোভের সোঁ-সোঁ শব্দ শোনে শুধু।

চায়ের জলে পাতা ফেলে ঘিয়ের কড়াটা স্টোভে চড়ায় সুমনা। নিমকি ভাজাটাই সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট। ডিম ভেজে দিতে পারা যেত সেনকে। এখানে মাছের ঠিক নেই বলে ডিমটা মজুত রাখতে হয়। কিন্তু না, একটা মামলেটে হবে না কিছু......ডিউটি থেকে ফেরার এই রাক্ষুসে ক্ষিদেটাকে ইন্ধন দেওয়া ছাড়া। তার চেয়ে রুটির জন্যে মাখা আটাটায় একটু সোডা আর কালোজিরে মিশিয়ে নেওয়া ভাল।

অশোকের বন্ধুদের সামনে সুমনা বড়-একটা বেরোয় না। দু-একজনের সংগে মৌখিক আলাপটুকু আছে।......তারপর থেকেই ওদের কাছে সুমনার অস্তিত্ব রান্নাঘরের ঠুং-ঠাং শব্দ আর পর্দার অবশিষ্টাংশ দিয়ে দেখা সঞ্চরমাণ দুটি পায়ের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। সুমনার কি ছবি ওরা মনে মনে এ'কেছে? অশোক কি বলেছে ওর কথা তাদের কাছে? মাঝে মাঝে গরম ডিম আর ধূমায়িত চায়ের পেয়ালার আবির্ভাবে সেই নেপথ্যচারিণীর যে মুখের অবগুণ্ঠন সরে যায়, সে মুখশ্রীটি কেমন? সেনের হাসিটা বড় সুন্দর। ওর হাসিটাই শুধু শোনা যায়, কথাগুলো কথাবার্তার ভেতর ডুবে থাকে। অশোকের গলাটাই সুমনা শুনতে পায়। ওরা দুজনে কথা বলছে, মাঝখানে রেডিওটা নিজের মনে প্রাণ খুলে বক্‌বক্ করছে, কেউ শুনছে না তবু। সেন হাসছে, অশোক কথা বলছে, রেডিওতে মেয়েটা কি করছে—কাঁদছে, না কান্নার অনুষ্ঠান তো লিখিতভাবে থাকে না, তবে—নাটক......না, কড়াটা নামিয়ে নিমকি ওলটাতে কলকলানি যখন থামলো, বোঝা গেল, গান, আধুনিক বাংলা গান।

গরম নিমকি ডিশে সাজালে সুমনা। খাবার ঘর থেকে চায়ের কাপ নিয়ে ফিরতে টের পেলে ভারি সুন্দর একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে......নিমকির। এবারে চায়ের ঠুং-ঠাং শব্দ।

সেন লোকটা বড় শান্ত। মেসে থাকে একটা ঘুপচির মতো ঘরে। বউ নেই। তাই বাড়িতে একটা কিছু ভালমন্দ রান্না হলে অশোক ফেরার সময় সংগে আনে সেনকে।

খাবার পাঠিয়ে সুমনা খানিকক্ষণ শুয়ে পড়বে খাটে। রাত্রির রান্না সব হ'য়ে আছে। খাবার সময় গরম করতে হবে। কখন উঠবে সেন কে জানে। কিসের এত গল্প আজ। একটা হাই তোলে সুমনা। অশোক বলছে, ড্রাইভারটা সিগন্যাল দেখতে পায়নি, হয়তো কুয়াশার জন্যে, নয়তো লোকটা টং হ'য়ে ছিল। তবে অ্যাক্সিডেণ্টই। তখনই তো ওদের ভেতর বেশ একটা সাড়া দেখা যায়। নির্জীব ভাবটা ঝেড়ে ফেলে সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

বাফার...কাপলিং...রিবাউন্ড...বাম্পার... ওদের জীবনটা খানিকক্ষণের জন্যে কতক-গুলো বিচিত্র শব্দের ঝংকারে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। আঃ, লেপের ভেতর শরীরটা গরম হতে হতে সুমনা ভাবে। আরো একটু ওরা গল্প করুক, এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না। কবে একবার ট্রেন লেট করে এসেছিল

বলে কোন্ স্টেশনের অধৈর্য জনতা ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে দিয়েছিল। হু-হু করে ছুটেছিল গাড়ি। প্যাসেঞ্জাররা কেউ জানে না, তারা কোথায় চলেছে। আচ্ছা, ট্রেন লেট শুনলে সুমনার এত হাসি পায় কেন? কেন, ট্রেনগুলো কি দুষ্টু ছেলে যে, রাস্তায় খেলা করে তারা দেরি করে আসে? সুমনা এত সব কি ভাবছে পাগলের মতো, একলা থাকলেই সে এত সব কি ভাবে...সে পাগল হয়ে যাবে নাকি? পাগল তো হয়ে গিয়েছিল অনুদি। গয়া থেকে লিলুয়ায় বদলি হবার অনেকদিন পরও কিছু বোঝা যায়নি। আবার বদলি হবার সময় বেঁকে বসলে, আমি যাবো না। তারপর আস্তে আস্তে বোঝা গেল, প্রকাশদা, সেই পাতলা মতো প্রবাসী ভদ্রলোকটি আসতেন যেতেন। হ্যাঁ, সেই লোকটিই। বদলি হবো না। কেন? পৃথিবীতে কত মেয়ের স্বামীই তো রেলে কাজ করে, কত মেয়ের জীবনের ওপর দিয়েই তো রেলের চাকা চলে।

মাঝে মাঝে যেন শুধু স্টেশনে থেমেছে গাড়ি। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাল করে দেখবার আগেই আবার বাঁশি বেজেছে। সেই ক্ষণিকের শুভদৃষ্টিতে কি দেখেছে সুমনা? নিজের জীবনের বঞ্চনা কে যেন দু' ধারে দু' হাতে সাজিয়ে রেখেছে। সারি সারি কুঁড়েঘর, পুকুরের কচুরিপানা সরিয়ে কাপড় কাচছে বা বাসন মাজছে সেই ঘর-গুলোর কোনো বউ। সে-ও তাকিয়েছে সুমনার দিকে, সুমনাও তাকিয়েছে তার ঘোমটা-খসা মুখে, তারপরেই দৃশ্যবদল হয়েছে।

সুমনা যদি নামতে পারতো এমনি একটা কোনো নাম-না-জানা স্টেশনে...... স্টেশন থেকে একটা পায়ে-চলা পথ যদি এঁকেবেঁকে যেতো, গিয়ে থামতো অমনি একটা কোনো ঘরের মাটির সিঁড়ির সামনে, তবে? ঘর, সুমনার নিজের ঘর! পাশেই জমাদারের বউটা কেমন সুমনাদের আউট-হাউসটাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। ওই সবুজ সতেজ কলাগাছগুলো মাটি-দিয়ে নিকোনো উনুন, ঘুঁটে-দেওয় দেওয়ালের প্রাচীরের ভেতর ওই ছোট্ট সাম্রাজ্যটুকু থেকে কেউ সরাক দিকিনি ওকে। এই কোয়ার্টারগুলো একেবারে এক রকমের কেন...কেন সুমনাদের কোয়ার্টারের সঙ্গে মিত্রদের কোয়ার্টারের শুধু নম্বরের তফাত? একই রান্নাঘর, শোবার ঘর, এমন কি চৌবাচ্চার প্যাটার্ন। আগে থেকে না জানলে সুমনা সেদিন মিত্রদের বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে যেত...ম্যাজিক বলে মনে হত। কোথাও একটু তফাত নেই, ওইটুকুকে আমার বলে আঁকড়ে ধরার। সব ফেলে চলে যাওয়ার সময় শুধু ওইটুকুর জন্যে বারবার চোখে আঁচল চাপা দেওয়ার।

ওদের কথাবার্তার শব্দ কখন থেমে গেল? কখন সব এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল? অশোক নিশ্চয়ই সেনকে এগিয়ে দিতে গেছে। আর একটু আসতে দেরি হলে ভাল। ...ওটা কি পড়লো ধুপ্ করে? শব্দটা খাবার ঘর থেকে এলো...... নিশ্চয়ই ইঁদুর। ......সারা বাড়িতে সুমনা এখন একা, না, অশোক আসুক। ...ওই লাইনটা থেকে থেকে মনে আসছে কেন—'তোমারি ঝর্নাতলার নির্জনে'। রেডিওতে হচ্ছিল...কখন শুনতে শুনতে অনামনস্ক হয়ে পড়লো সুমনা? এখন ইংরেজীতে খবর হচ্ছে......সুমনার রেডিয়ো

বন্ধ করতে আর ইচ্ছে করছে না।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলে? রবারের চটি পরে নিঃশব্দে ঢুকেছে অশোক।

—না। ধড়মড় করে উঠে বসলো সুমনা দু' চোখ মুছে।

—বাইরে কি ঠাণ্ডা!

—আজ এত দেরি হল যে, কিসের গল্প করছিলে?

অ্যাক্সিডেণ্টের গল্পটা আবার ফেঁদে বসে অশোক। কাপড় ঠিক করতে করতে সুমনা উঠেছে, হিটারের সুইচ জেবলেছে। ইনসপেকশনে দলবল নিয়ে বেরিয়েছিলেন জেনারেল ম্যানেজার......তাঁর স্পেশ্যাল বগিটাই নাকি গঁড়িয়ে গেছে। নাটকীয়ভাবে উদ্ঘাটন করলে অশোক। একটা মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা...এবার মরলো সবাই। তবু ভাগ্যিস ম্যানেজার তাঁর দলবল নিয়ে কামরার বাইরে ছিলেন। সুমনা ভ্রূ কুঞ্চিত করে, পরোটাগুলো সব জড়িয়ে জমে গেছে, প্রত্যেকটাকে ভাল করে সেঁকতে হবে, শুয়ে পড়তে পারলে সে বাঁচে। শর্মা, গুপ্ত সব গেছে ঘটনাস্থলে, ড্রাইভারটা বরখাস্ত হয়েছে। তাওয়াটা নামাতেই হিটারের গনগনে আঁচটা এসে লাগলো চোখে-মুখে। ......বেশ লাগলো।

অশোক বসেছে খাওয়ার টেবিলে। ফোঁটা কয়েক জল সন্তর্পণে গেলাস থেকে ঢেলে হাত ধুয়েছে। বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে ওকে, চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। তর্কে ওই জিতেছে নাকি? অন্তত দিন দশেক ড্রইংরুমটা মশগুল হয়ে থাকবে ওই নিয়ে। একই কথা বলে বলে কেন ক্লান্তি আসে না ওদের মনের, মুখের? ক্লান্তি এলে ওরা পারতো না। পারতো না এই ছক-বাঁধা পথে নিত্য প্রদক্ষিণ করতে। উদ্দীপ্ত চোখে-মুখে বকেই চলেছে অশোক। —কথার মোড়টা হঠাৎ কখন ঘুরলো কে জানে—অশোক বলছে, ওই ফোরম্যান লোকটা একটা নর্দমা। আজও, কাজের ক্ষতি হচ্ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, দুটো ট্রলিম্যানকে বাড়িতে পাঠিয়েছে কয়লা পেঁছে দেওয়ার জন্যে। অথচ যখন কাজের জন্যে কয়লা দরকার, এমন গরজ ঠাউরে লোক দেয় যেন—

ঘুমন্ত চোখে সুমনা তাকিয়ে ছিল অশোকের থালার দিকে। পরোটা ফুরোলে দেবে—হঠাৎ সচেতন হয়ে বললে, লোকটা সত্যি ভাল না। সেদিন কৃষ্ণানের স্ত্রী আমায় বলছিল, লোকটা নাকি অফিসারদের কাজে আটকে দিয়ে তাদের কোয়ার্টারে এসে হানা দেয়। —সেদিন সন্ধ্যের মুখে মিসেস কৃষ্ণানের কাছে এসেছিল, চা দাও...... বাড়িতে কেউ নেই।

—ছোটলোক! কত বড় বড় কীর্তি আছে ওর, সবাই এতো যা-তা বলে, তবু চোখ ফোটে না। মানুষ যে কি করে এত হীন হয়!

অশোকের সম্ভবপর বক্তৃতাটা, মানুষের অপরিমিত হীনতার ওপর বিস্ময়ে, না, গলায় ডিমের তরকারি আটকে সাময়িক-ভাবে বন্ধ হয়ে গেল বোঝা গেল না।

অশোক উঠলে সুমনা বসবে। তখন অশোক ঘরে গিয়ে রেডিওটা খুলে খবরের কাগজ নিয়ে বসবে। খানিকক্ষণ পরে নিজে মশারি টাঙিয়ে তার ভেতর ঢুকবে, ঝি না এলে ওই একটা কাজ করে সে, স্ত্রীকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করবে। না, অশোককে হৃদয়হীন, এ কথা কেউ বলতে পারবে না, সুমনা না, তার আণ্ডারের লোকেরা না, বন্ধুবান্ধব না। অশোকের বন্ধুরা এলে, সুমনা চা দিতে দেরি করলে বা না দিলে, যখন সে ঝি-এর কামাই-এর দোহাই পাড়ে, তখন কি অশোক তাকে বলে না, 'I feel for you, but—'

রাত্রির চেহারাটাও সেই এক, দিনেরই মসীবর্ণ ও-পিঠ। আস্তে আস্তে তন্দ্রার ঘোরটা কখন কেটে গেছে সুমনার চোখের পাতা থেকে। যেন আজ না ঘুমোলেও চলে, বালিশে মাথা দিয়ে সারারাত আকাশপাতাল ভাবলেও কিছু যায় আসে না তার। ভেবে ভেবে মনে আনতে পারে ছেলেবেলাকার এলোমেলো টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি, সেগুলো সাজাতে পারে আবার ভাঙতে পারে। অজস্র কাজ খুঁজে খুঁজে বের করে সুমনা, এটা অনর্থক নাড়ায়, সেটা সরায়। বাসনের ঝনঝন্ শব্দে অবশিষ্ট ঘুমটাকেও যেন সে এখুনি মনের চৌহদ্দি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

সব শেষে শোবার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলা। অশোক ঘুমোয়নি। বন্ধ দরজার ভেতরে সুমনা। আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে এগিয়ে আসছে মশারির দিকে।

—ওটা কি পড়লো ঝন্‌ঝন্ করে খাবার ঘরে......চোর না তো?

—হোক, কি বা পাবে ওখানে।

ডেকচির দুধটা কখন নামিয়ে রেখে এলো সুমনা, আবার এসে বসলো এই পড়ন্ত রোদের আমেজে? —এত মনের ভুল কেন তার, কে বলবে! দু'টি লোকের এই সংসার ফেলে তার মন কোথায় উড়ে চলে, নাগাল খুঁজে খুঁজে হয়রান সে। না, সুমনা এখন আর উঠবে না এখান থেকে, বসে বসে রোদ পোয়াবে। কে ঢুকবে এই ঠাণ্ডা ঘরগুলোর হিমের ভেতর, যেন ভিজে
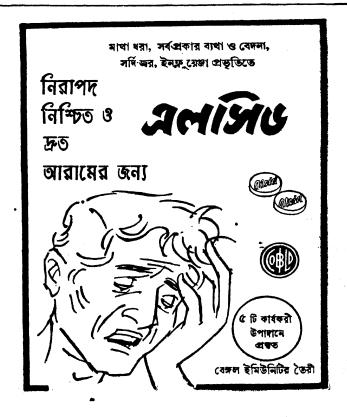
জাব হয়ে আছে সব, এমনকি লেপটাও। শীতের বেলা, কতটুকুই বা, এক্ষুনি চোখের পলক পড়বে না রোদ মিইয়ে আসবে...... মাঠের ওপরকার লম্বা লম্বা ছায়াগুলো এই আবছা হয়ে এলো বলে। আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে, মাথায় হ্যাট পরে, ডিউটি থেকে লোক ফিরবে, অশোক আসবে। এত শিগগির ঘড়ির কাঁটাগুলো একই ঘরে ফিরে আসে! অঞ্জু দু'দিন দিদির কাছে বেড়াতে এসে হাঁপিয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় দিনেই—'কি করে বরগা গুনে তুই সময় কাটাস রে, মানুষ থাকে এখানে!' ওর জামাইবাবু বলেছিল, 'মজা তো আমাদেরই, কত দেশবিদেশ ঘুরছি, আসানসোলের বাইরে কি আছে, জানো তোমরা?'

কতো বিচিত্র, কিন্তু সেই এক চিত্র। কোথাও গেলে দু'দিন একটু ধোঁকা লাগে, তারপর ঘর গুছিয়ে বসতেই এনামেল্ খসে নিকেল ফুটে বেরোয়। গয়া, বেনারস, মোগলসরাই, রেলওয়ে ডাইরেক্টরী খুঁজে যে অদ্ভুত নামই তুমি বের করো না কেন তার ঝংকারে সুমনাকে ঠকাতে পারবে না, সে জানে সব আওয়াজই মেকী।

সোজা আর উল্টো। উল্টো আর সোজা। উলের বাণ্ডিলটা কোলের ওপর রেখে সুমনা বুনে চলে। না ভেবে, না তাকিয়ে সে কাঁটা চালাতে পারে। সামনের মাঠের ওদিকে এক দঙ্গল রাস্তার ছেলে ক্রিকেট খেলছে। কে জানে ওদের লক্ষ্য হয়তো বল নয়, সুমনাই। অনর্থক কাপড়টা সামলায় সে।

হঠাৎ ত্রস্ত পায়ে ধুলো উড়িয়ে দুটো কুকুর নিমিষে প্রকাণ্ড মাঠটা পার হয়ে গেল। চেন-বাঁধা জমাদারের কুকুরটা উদ্দাম হয়ে উঠলো......তারপর লুব্ধ ব্যাকুল দৃষ্টিতে ওদের নিষ্ক্রমণ পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বোনাটা নামিয়ে রাখলে সুমনা! হয়তো নিজের অজ্ঞান্তে।

খুঁটিবাঁধা ছাগলটাও তিন পাক ঘুরেছে। ফর্সা কটা চুল যে ছেলেটা মাঠে সকাল থেকে ছাগল-বাঁধা দড়িটা ধরে পড়ে থাকে, কখনো ছেড়ে দেয়; খেলা দেখছিল, ছুটে এলো।

এবার বলটা গড়িয়ে এলো কাছে। জমাদারের মুর্গীটা দুটো বড় বড় পা ফেলে হনহন করে পালিয়ে এলো নিরাপদ দূরত্বে।

কিন্তু এলো সুমনার কাছে। এই প্রথম মুর্গীটা ভাল করে দেখলে সুমনা। দেখলে প্রতিবেশী শত্রুকে। রং-বেরঙের গা, ঢেউ-খেলানো পুচ্ছ, সেই বাহারে পুচ্ছটা উ'চু করে, মাথার মুকুটটা ধুলোয় লুটিয়ে, ঠোঁট দিয়ে কি একটা সূক্ষ্ম আহার্য তুলে নিলে সে। তারপর ক্ষুদ্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সুমনাকে নিরীক্ষণ করলে। ও আরো কাছে এলে যে সুমনাকে চান করতে হবে, ও কি তা জানে?

সাইকেলের ঘর্ঘর। অশোক ফিরছে। এখুনি উঠতে হবে। সুমনার ভাল লাগছিল নাকি তাকিয়ে তাকিয়ে মুর্গীটাকে দেখতে?

অশোক পেছন দিক দিয়ে ফিরছে কেন? খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে সুমনাকে চমকে দেবে নাকি? কিন্তু নিজেই যে চমকে উঠবে, যদি দেখে জমাদারের মুর্গীটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে সুমনা। তখন কি অবস্থা হবে ওর? হঠাৎ একটা বৈচিত্র্য, জীবনের ছক-বাঁধা রেল-লাইনের ওপর একটা মস্ত বড় ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট...কিংবা আরো রোমাঞ্চকর ঘটনা। একটা মোরগকে আশ্রয় দিয়েছে সুমনা। কোলে নিয়েছে ভয়ার্ত একটা জীবকে। আশ্রয়, নীড়। অশোক কি জানে তার মানে? যা অশোক দিতে পারেনি সুমনাকে।

চমকেই উঠলো অশোক। কাজে আটকে পড়েছিল, ফিরতে বেশ দেরি হয়েছে। শালা ফোরম্যান, মিথ্যে কাজ দিয়ে আটকে রেখেছিল। কিন্তু ও কি, ফোরম্যান মিত্রকে চা দিয়ে সুমনা কি সরে যেতে ভুলে গেছে নাকি? তার হাতের নাগালের খুব ভেতরে যে দাঁড়িয়ে আছে ও সুমনাই তো?

(১৮)

হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল।

মোহনপুরের বউ নিজের সুখ-সুবিধের কথা ভেবে বলেনি কথাটা। বলেছিল স্বামীর কথা ভেবে। গিরীনের দিকে তাকিয়ে এক-একদিন তার চোখের পাতা ভিজে আসে। এত বড় সংসারটার ভার মানুষটার ঘাড়ে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। এক-একদিন মোহনপুরের বউ যখন রান্নাঘরের কাজ সেরে বাসনকোশন তুলে লম্ফ হাতে নিজের ঘরটিতে ফিরে আসে, ফিরে এসে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকায়, তখন বড় মায়া হয়। কোন কোনদিন ক্ষণিকের জন্যে ভুলে-যাওয়া, মুছে-যাওয়া অতীতের দু-এক টুকরো ছবি ভেসে উঠেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কপালের ওপর দু' ভাগ করে পাতাকাটা ধরনে আঁচড়ানো, গায়ে গিরিজাপ্রসাদের কিনে দেওয়া চাঁদনির দোকানের ডোরাকাটা ছিটের কোট, কোটের বুকপকেটে রুমাল। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সেই যুবক চেহারাটার সঙ্গে কত হাসি-আনন্দ অভিমান-বেদনার ইতিহাস যে জড়িয়ে আছে মোহনপুরের বউয়ের জীবনে! ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতেও যেন কষ্ট হয়। আজ গিরীনের কপাল বিস্তৃত হয়ে গেছে টাক পড়ে, শরীর শুকিয়ে দড়ির মত, গাল বসে গেছে, চোখের কোলে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা।

শীত-গ্রীষ্ম নেই, সারাটা বছর ছোটাছুটি লেগেই আছে। কখনো মুনিষ জোগাড় করতে, কখনো ভিন-জেলা থেকে মুসলমান কিষাণ নয়তো সাঁওতালদের দল ডেকে আনতে হয় ধান কাটার সময়ে। ভাগ্য ভাল থাকলে তবেই সে-বছর কাস্তে হাতে তাদের দল নিজে থেকেই এসে হাজির হয়। দিনে দিনে মজুরী বাড়ছে, তবু লোক পাওয়া যায় না। তার ওপর আজ যাও কৃষি-আপিসে ধর্না দিয়ে সার আনতে নয়তো কাল অ্যামোনিয়া কিংবা বীজ ধান আনতে। দুপুর রোদে মাথায় ভিজে গামছা বেঁধে এতটা পথ গিয়েও বাবুদের দেখা মেলে না। দেখা মিললে মেজাজ তাদের যেন লাটসাহেবের। ফিরে এসে তাই এক-একদিন রাগে গজ গজ করে গিরীন, কখনো কখনো মোহনপুরের বউয়ের ওপরই অকারণে চটে যায়। তার ওপর সেস, ক্যানাল ট্যাক্স, খাজনা—হাজারো গণ্ডা ঝামেলা। সে-সবের নোটিশ দেবার নাম নেই, হঠাৎ হয়তো নীলামের হুমকি এসে হাজির। জমিতে মই দেয়া হলো কি না হলো ক' আনা পয়সা দেবার জন্যে ছোটাছুটির অন্ত নেই। চাষের মুনিষদেরও বিশ্বাস নেই এতটুকু, রোদে জলে ঘুরে ঘুরে মাঠে মাঠে তাদের দেখে বেড়াও। এত সব করে তবে তো ক' মরাই ধান ওঠে। চাষের খরচখরচা বাদ দিয়ে, যে-কটা টাকা বাঁচে, একটা সংসারকে সারা বছর টানতে গিয়ে সে-কটা টাকা কোন দিক দিয়ে যে উড়ে যায় টেরও পায় না মোহনপুরের বউ। চাষের সময় ছেলেমেয়েদেরও খাটুনি, তার নিজের কাজও কি কম নাকি। দশ বিশটা মুনিষের ভাত রাঁধতে হয়, জলখাবারের মুড়ি ভাজো। বাউড়ি-বাগদী অনেকেরই দু'পাঁচ বিঘে জমি আছে, যাদের নেই তারাও ভাগে জমি নেয়, তাই মুড়ি ভাজার লোকও মেলে না।

মোহনপুরের বউও তাই মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে চোখের জল ফেলে বলে, ভারী আমার চাষ, রাঁধুনীর মাইনে দিতে হতো আমাকে তো চাষের পাট কবে ঘুচে যেতো।

গিরীনও তাই মাঝে মাঝে যখন বলে, 'জমি ক' বিঘে গরমেণ্ট নিয়ে নিলেই বাঁচি', তখন ক্রোধটা কিসের জন্যে, কার বিরুদ্ধে তা বোঝে মোহনপুরের বউ। এরই ফাঁকে যে বছর ধান ভালো হয়, কিংবা ধানের দর বাড়ে সে-বার আনন্দ হয়, মনে হয় এইবার বুঝি দুঃখ ঘুচবে। আবার যখন ধানের দর

কমানোর জন্যে শহরবাজারের লোক হৈ চৈ করে তখন মুখ শুকিয়ে যায় সকলের।

এত পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তার পর ক'মরাই ধান ওঠে। অথচ নিভাননীর ধারণা জমির ভাগটাই বড় কথা। যেন চাষ আপনি হয়।

সেইজন্যেই জমির ভাগের কথাটা শুনেই দপ করে জ্বলে উঠেছিল মোহনপুরের বউ। গিরিজাপ্রসাদ যখন প্রথম এসেছিলেন তখন ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, অনেক টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি, একটা লাঙল বাড়ানো যাবে, দুটো মোষ কেনা যাবে। তারপর ভাগে-দেওয়া আরো কিছু জমি ছাড়িয়ে নিয়ে খাসে আনবে। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই তো পেলে না গিরীন। এদিকে এত বড় একটা সংসারের খাইখরচই কি কম? তাও সেই গিরীনের ওপর।

এত সব দেখেশুনেই গিরীন বলেছিল, শুধু চাষের রোজগারে আজকাল আর চলে না। বুঝলে? ভাবছি...

মোহনপুরের বউ হেসে বলেছিল, চাকরী নেবে?

—চাকরী আর কে দেবে বলো। গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, চাকরী নয়। কিছু টাকা ধারধোর করে একটা হাস্কিং মেশিন যদি করা যায়...

পাশের গাঁয়ের যশদের সঙ্গে মিলে একটা হাস্কিং মেশিন বসিয়েছিল গিরীন, বলগাঁ স্টেশনে। কিন্তু মনে একটা ভয় ছিল, ব্যবসারও অর্ধেক না চেয়ে বসেন গিরিজা-প্রসাদ। যৌথ পরিবারের টাকায় মেশিন কেনা হয়েছে বলে একদিন যদি গিরিজা-প্রসাদের ছেলেরা মামলা-মকদ্দমা জুড়ে দেয়...

নিভাননীর কথাটায় তার সূত্রপাত হয়ে গেল। বেশ খানিকটা চেঁচামিচি ঝগড়া-ঝাঁটির পর গিরীন রাগের মাথায় বলে বসলো, জমির ভাগ আছে যখন তোমাদের, ভাগাভাগিই করে নাও। বলে দুম দুম করে পা ফেলে মোহনপুরের বউয়ের কাছে এগিয়ে এসে রান্নাঘরের দিকে আঙুল তুলে বললে, আর এই তুমি—তোমাকে বলে রাখছি, আজ থেকে ওদের জন্যে এক মুঠো ভাতও সিদ্ধ করে দাও তো আমার মরা মুখ দেখবে!

অন্য যে কেউ সে-সময় গিরীনের ভাব-ভঙ্গি দেখলে হয়তো হেসে উঠতো। কিন্তু মোহনপুরের বউ স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাগ হলো চণ্ডাল। কিন্তু তা বলে এমন একটা দিব্যি দিয়ে বসবে গিরীন, মোহনপুরের বউ ভাবতেই পারেনি।

নিভাননীর ওপর তারও রাগ কম হয়নি। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কথা বলে বসবে গিরীন?

গিরীন চিৎকার করে অভিশাপ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই অসহায়ের মত নিভাননীর দিকে, কমলা-বিমলার দিকে

তাকালো মোহনপুরের বউ। দেখলে ওরা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে, আর গিরিজাপ্রসাদ দক্ষিণদুয়োরীর বারান্দায় বসে আছেন মাথা হেঁট করে। লজ্জায়, না অপমানে, বোঝা গেল না।

আঁচলে চোখ মুছে অনেকক্ষণ পরে মোহনপুরের বউ টিয়াকে ধীরে ধীরে বললে, টিয়া, জেঠীকে বল উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি।...

কথা শেষ করতে পারলো না মোহনপুরের বউ, সশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছেলেমানুষের মত।

হাঁড়ি আলাদা হয়ে গেল, দুভাগ হয়ে গেল রান্নাঘরখানাও। মুনিষ ডেকে রান্নাঘরের মাঝখানে একটা কাদার দেয়াল তুলে দিলেন গিরিজাপ্রসাদ। এখন এই থাক, এরপর ধীরেসুস্থে পৃথক রান্নাঘর তুলে নেবেন।

মাঝখানে দেয়াল তুলতে দেখে গিরীন মুখে বলেছিল, যাক বাঁচা গেল!

কিন্তু ঘরের বারান্দায় সন্ধ্যের অন্ধকারে বসে রান্নাঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন গিরীনের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো।

দু' তরফের কথাবার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, চোখোচোখি হলে দু' পক্ষই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঘাটে যেতে একজন আরকজনকে পার হয়ে যায় অচেনা লোকের মত। গিরীন ভেবেছিল দু'দিন পরেই বুঝি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। হলো না।

নিত্যদিন মন কষাকষি, ঝগড়াঝাঁটি, বাঁকা বাঁকা কথা—জীবনে স্বস্তি ছিল না এতটুকু। গিরীনের মনের ভেতর সদা-সর্বদাই একটা দুঃসহ জ্বালা যেন তাকে পুড়িয়ে ফেলছিল তিলে তিলে। জীবনে এতটুকু শান্তি ছিল না গিরিজাপ্রসাদ ফিরে আসার পর থেকে। তাই ভেবেছিল সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, পৃথক হয়ে গেলেই বুঝি সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।

কিন্তু শান্তি ফিরলো না। একটা চাপা ক্রোধে আর অভিমানে বুকের ভেতরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছিল এতদিন। অথচ পৃথক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরীনের মনে হলো জীবনের সব রস যেন নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে। অসহ্য একটা অস্বস্তি, বুকের ভেতর নিঃস্বতার জ্বালা। সেই শৈশবের দিন থেকে গড়ে ওঠা বন্ধনটা যেন পলকা সুতোর মত হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। তুষের আগুনের জ্বালা বুঝি একেই বলে! এমন তো চায়নি গিরীন। ও তো ভাঙতে চায়নি, চেয়েছিল জোড়া লাগাতে। কিন্তু এ কি হয়ে গেল মুহূর্তের ভুলে। কোন কাজে আর মন বসাতে পারে না গিরীন, রাত্তিরে ঘুম হয় না। বারবার এই ক'দিনের ঘটনাগুলো, কথাগুলো মনের মধ্যে উঁকি দেয়, সারা মন তোলপাড় করে।

পৃথক হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও গিরীন বুঝতে পারেনি গিরিজাপ্রসাদ-নিস্তাননী-কমলা-বিমলাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কত গভীর, কত আন্তরিক। আজ তাই মনে হয় জীবনের সব আনন্দ যেন হারিয়ে গেছে। যা হারিয়ে গেছে তা বুঝি আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

গিরীনের ইচ্ছে হয় নিজে থেকে গিয়ে গিরিজাপ্রসাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসে। নিস্তাননীকে বলে, বৌঠান, ঘাট হয়েছে আমার...

নিঃস্বতার দুঃখে চোখে জল আসে গিরীনের। বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গিরীন। দেখে একদিকে মোহনপুরের বউ রান্না করছে, অন্যদিকে নিস্তাননী।

কমলা বিমলাকে ডেকে দু'একবার কথা বলে বুকের ভারটা হাল্কা করতে চেয়েছে গিরীন। কিন্তু কমলা-বিমলা দু'একটা সংক্ষিপ্ত 'হাঁ' 'না' উত্তর দিয়ে সরে গেছে। গিরীন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ওরা গিরীনের সঙ্গে কথা বলতেই ঘৃণা বোধ করছে। কথা বলতে চায় না ওরা। বুকের ভেতর নতুন করে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছে।

বাড়ি থেকে পালাতে পারলেই বুঝি স্বস্তি পাবে সে, ভেবেছে গিরীন। কখনো

মনে হয় বনপলাশি থেকে দূরে সরে গেলে স্বস্তি পাবে। তাই শেষ পর্যন্ত কালনায় চলে গিয়েছিল প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

পুজোর দিন ক'টাই নয়, পুজোর পর একটা মাস কেটে গেছে এই মানসিক দাহ নিয়ে। রান্নার পাট পৃথক হওয়ার পরও এতখানি ব্যথা লাগেনি বুকে, কিন্তু যেদিন যতে কোটালকে ডেকে গিরিজাপ্রসাদ পশ্চিমদুয়োরী আর দক্ষিণদুয়োরী ঘর ক'খানার মাঝখানের উঠোনে কাদার পাঁচিল তুলে দিতে বললেন, সেদিন মোহনপুরের বউয়ের চোখেও জল এসেছিল।

আর গিরীন? বেচারী ভাবতেই পারেনি পৃথক হওয়ার মধ্যে এত ব্যথা, এতখানি বেদনা লুকিয়ে আছে। আশ্চর্য, কোন মানুষই বুঝি সেটা আগে বুঝতে পারে না। জানে না, হাজারো দ্বন্দ্ব বিবাদের মধ্যেও

একটা স্বস্তি আছে, আনন্দ আছে।

শুধু কি তাই। প্রথম প্রথম একটা অসীম লজ্জা এসে গিরীনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। যেন সব দোষটুকুই তার। যেন পৃথক হওয়ার চেয়ে লজ্জা নেই। তাই কথাটা স্পষ্ট করে গ্রামের কাউকে বলতে পারেনি সে। কিংবা তাদের প্রশ্নের সামনে থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আর তাই একদিন চলে গিয়েছিল কালনার পথে।

রান্নাঘরের বাঁশের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিরিজাপ্রসাদকে দেখছিল টিয়া। রান্নাঘরের দাওয়াটা অনেকখানি উঁচু, সেখান থেকে নতুন পাঁচিলটার ওপাশেও চোখ যায়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে টিয়া। কমলা-বিমলা কাছে পিঠে নেই, হয়তো আত্মীয়ার বাড়ি গেছে গল্প করতে। এপাশে মা রান্না করছে, ওপাশে জেঠীমা। শুধু অমরেশ—অমুদা, মা'র কাছে বসে গল্প করছে। দুটো পরিবারের মধ্যে এত ঝগড়া-ঝাঁটি, কথাবার্তা বন্ধ, তবু অমুদার ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলের সামনেই সে মাঝে মাঝে টিয়ার সঙ্গে, টিয়ার মা'র সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু টিয়া যদি এক মুহূর্তের জন্যেও ওদের কারো সঙ্গে কথা বলে, টিয়ার মা যেন রাগে জ্বলে ওঠে।

একই বাড়ির মধ্যে কি এভাবে কথা না বলে থাকা যায়। অভিমানে চোখ ঠেলে জল আসে টিয়ার। মা যেন কি!

গিরিজাপ্রসাদকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল টিয়া। বারান্দায় বসে বসে একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছিলেন গিরিজা-প্রসাদ। তা দেখে হাত দুটো নিশপিশ করছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল গিয়ে কাপড়টা কেড়ে নিতে। কেড়ে নিয়ে নিজে সেলাই করে দিত। ভিতরে ভিতরে কমলা-বিমলার ওপরও রাগ হচ্ছিল তার। একটা কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেটুকু রিপু করে দিতে পারে না ওরা?

মা একটু অনামনস্ক হতেই পা টিপে টিপে গেল টিয়া, কিন্তু সবে ওদের চৌকাঠে পা দিয়েছে অমনি পিছন থেকে ডাক এলো। টিয়া!

চমকে ফিরে তাকালো টিয়া।

বাবাকে দেখেই ভয় পেয়ে গেল সে।

গিরীন ঘামতে ঘামতে ফিরে এসেই জামাটা খুলে ফেললে। তারপর জামাটা টিয়ার হাতে দিয়ে বললে, কোথায় যাচ্ছিলি?

—কই না তো!

গিরীন নিজের ঘরটির সামনে উঁচু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসলো। গরমে ঘামে চিড়চিড় করছে সারা শরীর। খাটো ধুতিটা হাঁটুর ওপর গুটিয়ে তালপাতার পাখাটা নিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে, গাড়ুটা নিয়ে আয় তো মা, আর ঘাটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বাবাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে, তার ডাক শুনে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল টিয়া। কিন্তু তারপরই একটা কৌতূহল জেগে উঠলো ওর মনে।

গিরীন কালনায় গেছে সে খবর শুনেছিল টিয়া, বুঝেছিল কেন গেছে। তাই ফলাফল জানবার জন্যে ওর বুকের ভেতরটা যেন ছটফট করে। প্রভাকরের বাবার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে? কি বলেছেন তিনি? জানবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে টিয়া। অথচ জানবার উপায় নেই।

গিরীনের জামাটা দেয়ালের আলনায়

টাঙিয়ে রেখে গাড়ুটা খিড়কির পুকুরে ডুবিয়ে এনে রাখলে টিয়া। গামছা এনে দিলে।

গিরীন দাওয়া থেকে পা বাড়িয়ে সেখানেই পা ধুলো, গামছায় মুছলো পা দু'খানা।

একটা মাদুর পেতে দিলো টিয়া। ক্লান্তিতে সেখানেই শুয়ে পড়লো গিরীন।

টিয়া খানিক পাখা করলে, তারপর প্রশ্ন করলে, খাবে কিছু?

—না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পাখাটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে মার কাছে রান্নাঘরে চলে এলো। বললে, বাবা এয়েছে।

—হুঁ। অর্থাৎ দেখেছে মোহনপুরের বউ।

টিয়া বললে, চা করে দেব বাবাকে?

—দে। ছোট্ট একটা অবহেলার উত্তর। আর কোন কথা বললে না মোহনপুরের বউ।

বসে বসে পাশের উনোনে পাটকাঠি জেবলে জল গরম করলে টিয়া। চা ছেঁকে গিরীনকে দিয়ে এলো।

একটার পর একটা কাজ করে চলে সে, একটার পর একটা ফরমাশ খাটে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহল চেপে রেখেছে যেন। একটা আশংকাও। বাবা গিয়েছিল তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে, প্রভাকরের বাবার সংগে দেখা করতে। কি বলেছেন তিনি। মেয়ে দেখতে আসবেন? কবে আসবেন? আরো হাজারো প্রশ্ন এসে জড়ো হয় তার মনে। কিন্তু মুখ ফুটে তো জিগ্যেস করতে পারে না।

মা কেন আসছে না, খোঁজ নিচ্ছে মা বাবার কাছে? তা হলে তো দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনতে পাবে সে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে, রাত গম্ভীর হয়। হ্যারিকেন জেবলে গিরীন রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে খেতে বসে এক সময়। মার হাতের কাছে এটা ওটা জুগিয়ে দেয় টিয়া। বাটি গেলাস। মা পরিবেশন করে পাখা নিয়ে বসে। টিয়া রান্নাঘরের ভিতরে দুধ জবাল দেয়। দুধ জবাল দেয় আর কান খাড়া করে রাখে। যদি বাবা কোন কথা বলে, মা কোন প্রশ্ন করে।

না, কেউ কোন কথা বলছে না। দুজনেই চুপচাপ।

—ডাল দেব আর? মা'র কথা শুনতে পায় এক সময়।

কোন উত্তর আসে না। হয়তো মাথা নেড়েই জবাব দিয়েছে বাবা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় মা জিজ্ঞেস করে, গিয়েছিলে?

—হুঁ।

—দেখা হলো?

—হুঁ।

একটু থেমে আবার গিরীনের গলার স্বর।—পরে বলবো।

অর্থাৎ দেয়ালের ওদিকে জেঠীমা আছে, যদি তাঁর কানে যায় এই ভয়।

পরে বলবো। কি বলবে বাবা? কি বলতে পারে! সাতপাঁচ নানা কথা ভাবতে ভাবতে কড়াইয়ের দুধে হাতা নাড়তে ভুলে যায় টিয়া।

মা এক ফাঁকে এসে বাটিতে করেক হাতা দুধ ঢেলে নিয়ে চলে যায়।

একে একে সব কাজ সারা হয়। বাসন-কোসন তুলে রেখে টিয়া ঘুম-জড়ানো চোখে বলে, ঘুম পেয়েছে।

—বেশ তো, যা না তুই, শুয়ে পড়্‌বি যা।

টিয়া চলে আসে খুশী মনে। আসলে ঘুম তো ওর পায়নি, পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা আর মা'র কথা শুনতে পাচ্ছে।

দেয়ালগিরির আলোটা কমিয়ে দিয়ে ভাই-বোনদের পাশে শুয়ে পড়ে টিয়া। শুয়ে পড়ে চোখ বুজে থাকে।

সময় যেন পার হচ্ছে না। টুং টাং শব্দ, ঝাঁটার সপ্‌সপ্‌ শব্দ। কান পেতে থাকে টিয়া। অনুভবে বুঝতে পারে বাবা বারবার পাশ ফিরছে। অর্থাৎ জেগে আছে। নিশ্চয় বলবার মতই কোন খবর এনেছে বাবা, মা ফিরে এলেই বলবে।

অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ কখন যেন একটু তন্দ্রার মত এসে পড়েছিল। কতক্ষণ পার হয়ে গেছে কে জানে, মা কখন ফিরে এসে বাবার কাছে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছে টেরও পায়নি ও। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ওদের কথাবার্তা কানে এলো।

মা বলছে, আজকালকার দিনে এমন ছেলে দেখা যায় না। বাপ বলেছে, তার মতেই ছেলে বিয়ে করবে?

বাবা উত্তর দিলে, সব ছেলেই বিয়ের সময় ভাল, তা না হলে যে পণের টাকাটা বাড়ানো যায় না।

—পণ কে না নেয় বলো।

—সব নিয়ে প্রায় আট দশ হাজার।

—কেন চাইবে না, অমন পাত্র—শিক্ষিত, ভাল চাকরী করছে, তারপর আমাদের মেয়ে যখন পাড়াগেঁয়ে, শিক্ষিত নয়, তখন একটু বেশী তো চাইবেই।

কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শোনে টিয়া, অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে। কিন্তু আসল কথাটা কিছুতেই জানতে পারে না।

মোহনপুরের বউ এক সময় বললে, ছেলেরা শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু পণ নিতে তো ছাড়ছে না বাপু।

গিরীন চুপ করে রইলো। তারপর বললে, প্রভাকর নাকি বাপকে বলেছে বোনের বিয়ের জন্যেও তো টাকা লাগবে, সেইজন্যেই পণ নেবে বিয়েতে।

মোহনপুরের বউ হাসলে। বললে, সবাই তাই বলে। যাদের মেয়ে নেই বিয়ে দেবার মত, তারা নিচ্ছে না?

এত সব তর্ক শুনতে চায় না টিয়া। ও শুধু জানতে চায় অত টাকা পণ দিতে বাবা রাজি হয়েছে কিনা।

মোহনপুরের বউ জিজ্ঞেস করলে, কি করবে?

গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করতেই হবে। বিয়ে তো দিতেই হবে মেয়ের। আর ওর চেয়ে কমেই বা কোথায় হবে, এই পাত্র তো পাবো না।

মোহনপুরের বউ বললে, তা বলে সব টাকা নিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি ওরা? তা হলে ওখানে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। গয়নাগাটি দেবে না?

—তা দেবে কিছু। ঘুম জড়ানো চোখে বললে গিরীন।

মোহনপুরের বউ আবার প্রশ্ন করলে, কি করবে তা হলে? টাকার?

—দেখি। ব্যবস্থা যেমন করে হোক করতে তো হবেই।

মোহনপুরের বউ হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ওরা যা চটবে না!

—কারা? বুঝতে না পেরে গিরীন প্রশ্ন করে।

—তোমার দাদা গো। দাদা, বৌঠান......

হেসে ওঠে মোহনপুরের বউ।

গিরীন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, দেখো আবার, শোনে না যেন কেউ, শেষে দেবে ভাঙিয়ে। গুণের তো ঘাট নাই ওদের।

বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো গিরীন। মোহনপুরের বউ নেমে এলো নিজের বিছানাটিতে। কোলের ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে টিয়ার পাশেই শুয়ে পড়লো।

টিয়া চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলো। মা যেন বুঝতে না পারে টিয়া জেগে আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে টিয়া হঠাৎ টের পেল মা'র একখানা হাত এসে পড়লো তার গায়ের ওপর। হাতখানা নরম করে টিয়ার পিঠে বুলিয়ে বুলিয়ে টিয়ার গাল ছুঁলো। আদরের স্পর্শ যেন।

টিয়া বুঝতে পারলো মা খুব খুশী হয়েছে, ও যতখানি খুশী হয়েছে ঠিক ততখানিই।

মার হাতখানা ছুঁতে ইচ্ছে হলো টিয়ার। পারলো না, তা হলেই যে মা বুঝতে পারবে টিয়া ঘুমোয় নি, সব শুনেছে কান পেতে পেতে।

ছি ছি কি লজ্জা, কি লজ্জা। তা কি কখনো পারে টিয়া!

(ক্রমশ)
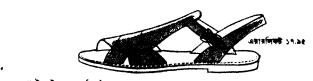
গুপ্তধনের সন্ধানে শতবর্ষ

উপকথাখ্যাত চীনা দস্যু সাম পু অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র শহর গুলগঙ্গের অধিবাসীদের প্রায় একশ বছর ধরে তাঁর খোঁজে নিরত রেখেছে।

সাম যে সোনা লুকিয়ে রেখেছে বলে সকলের ধারণা তার সন্ধানে এবছর ঐ শহরের সমস্ত অধিবাসীই বের হবে। এই সোনার মূল্য যে বহু লক্ষ টাকা সে বিষয়ে ওদের কারুর সন্দেহ নেই।

সাম পু তার ডাকাতি বৃত্তি আরম্ভ করে ১৮৬৫ সালে। পিটপিটে চাহনি চীনাটির বিশেষ দক্ষতা ছিল প্রচুর সোনাবহনকারী গাড়ি বেছে বের করায়।

গোড়ায় সে কিছুকাল মাটি খুঁড়ে সোনা আবিষ্কারে মেতে ছিল এবং সম্ভাব্য সোনার খনির ধারে তাঁবুতে বাস করতো। পরে, প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, সাম পু সোনার খনির সন্ধানও পেয়েছিল।

খোঁড়ার কাজে সাম পু কারুর সাহায্য নিতে চায়নি এবং ওর চীনা প্রতিবেশীরা ওকে উন্মাদ বলে ধরে নেয়।

ওয়ার্ড নামক এক পুলিস একে ধরবার জন্য পিছু নেওয়ার আগে পর্যন্ত ডাকাতিতে সাম পু বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে থাকে। সাম পু পিছনে পুলিস আসছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই গুলী চালিয়ে ঝোপের আড়ালে সরে পড়ে। ওয়ার্ড পরদিন মারা যায়।

সারা অস্ট্রেলিয়া ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং দলে দলে লোক ওকে ধরবার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোন একজন অপরাধীর খোঁজে এমন বিপুল উদ্যোগ অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে আর ঘটেনি।

কিন্তু সেই ধূর্ত চীনা সর্বদাই তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকে এবং ওরা দেখতে পেতো শুধু ওর আগুন পোয়াবার চিহ্নগুলি।

শেষে এক আদিবাসীকে সাহায্যের জন্য নিয়োগ করা হয়। সে লোকটি সাম পুর সন্ধান পায় বারনীজ রীফ পর্বতের ঘন ঝোপের মধ্যে।

সাম নিশ্চয়ই তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছিল কারণ ওরা দৃষ্টিপথে আসা মাত্রই সাম পু গাছের আড়াল থেকে গুলী ছোঁড়ে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ও ফাঁদে পড়ে এবং পালাবার কোন উপায় নেই দেখে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণ করতে থাকে।

সাম পুর প্রাণটা সম্ভবত মন্ত্রপূত ছিল কারণ ওর আক্রমণকারীরা অজস্র ধারায় গুলী বর্ষণ করলেও একটিও ওর দেহ বিদ্ধ করতে পারেনি।

কিন্তু শেষবারের মতো বন্দুক নামিয়ে গুলী ভরতে উদ্যত হতেই এক ব্যক্তি গাছের আড়াল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গুড়ি মেরে পাহাড়ের একটা ধাপে উঠে পিছন থেকে সজোরে মাথায় আঘাত করে ওকে ধরাশায়ী করে দেয়।

সাম পুর অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু দীর্ঘ ন'মাস ধরে ধৈর্যসহকারে সেবা করে ওকে সুস্থ করে তোলা হয়। পরে ওয়ার্ডকে খুন করার অপরাধে বিচারে ওর ফাঁসি হয়ে যায়।

ডাকাতি করে যে প্রচুর সোনা ও নিয়েছে সেগুলি দিয়ে কি করেছে কেউ বলতে পারে না। সম্ভবত ওকে ধরবার জন্য লোকে তাড়া করাতে পালাবার পথে কোথাও সে লুকিয়ে রেখে থাকবে।

এবছর দু'হাজার লোকের এক জনতা সেই সোনার সন্ধানে বের হবে।
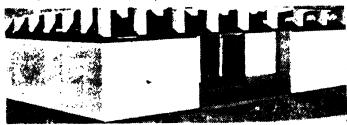
পেরেক, স্ক্রু বা জোড় লাগাবার অন্য কোন যান্ত্রিক উপায় অবলম্বন ছাড়াই, সম্পূর্ণ কাগজের তৈরি বাড়ি

নিউ ইয়র্কের লঙ আইল্যান্ডে তৈরি এই বাড়িটির নির্মাতা হচ্ছে প্যারামেট্রিকস রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। বাড়িটি ওয়াটার প্রুফ এবং ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগের ঝড় সহ্য করতে পারে। দুটি শয়নঘরবিশিষ্ট বাড়িটি তৈরি করতে খরচ মাত্র পৌনে পাঁচ হাজার টাকা। বাড়িটি তৈরিতে ব্যবহৃত দুই ইঞ্চি পুরু স্তরান্বিত কাগজ পরীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে ওপরের ছবিতে

ডাকপিয়নদের বিপদ

ডাকপিয়নরা যখন সরকারি পোশাক পরতো সে আমলে ওদের অনেককে পাড়ায় কুকুরের তাড়া খেতে হতো।

কোন কোন দেশের গ্রামাঞ্চলে পেচক ডাকপিয়নদের কাছে একটা উৎপাত হয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চা জন্ম দেবার সময় ডাক বিলি ব্যাহত করার কেমন যেন একটা প্রবণতা ওদের মধ্যে দেখা দেয়।

ডাকপিয়নদের সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়ে নাকাল হতে হয় আমেরিকায়। সম্প্রতি আইডাহো রাজ্যের বুহল নামক এক স্থানের এক ডাকপিয়ন দেখে তার নির্ধারিত এলাকায় একটি বাড়ির সদরের সামনে কুকুরের এক আস্তানা তৈরি হচ্ছে। তৈরি শেষ হবার পর একদিন ডাকবিলিতে বেরিয়ে সেই বাড়িটির সামনে যেতেই তার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। কারণ যেটাকে সে কুকুরের জন্য বাড়ি বলে মনে করেছিল তাতে রয়েছে একটা পরিণত মাপের পার্বত্য সিংহ।

ডাকপিয়নটির ভাগ্য ভাল যে সিংহটি খুবই নম্র প্রকৃতির এবং বাড়ির কর্তার পোষা। ডাকপিয়ন প্রথম প্রথম চার পাঁচ দিন ওর পাশ ঘেঁষে যেতে একটু ইতস্তত করলেও এখন ওদের মধ্যে যাকে বলে 'অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ' সম্পর্ক।

আমেরিকার আর এক ডাকপিয়নের ভাগ্য কিন্তু অতোটা সুপ্রসন্ন ছিল না। সে লোকটি ডাক বিলি করে দক্ষিণ ক্যারোলিনায়। এক-দিন একটি বাড়ির সামনে উপস্থিত হতেই এক ক্রুদ্ধ লড়াইয়ে মোরগের সামনে পড়ে। ডাকপিয়নটি ভাবলে, একটি পাখিকে ঠান্ডা করে দেওয়া এমনকি আর ব্যাপার!

কিন্তু মোরগটি, সম্ভবত শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ায়, তার কর্তৃত্বকে অবমাননা করা হয়েছে ধরে নেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে বিকট রব তুলে সে নির্মমভাবে ডাকপিয়নটিকে আক্রমণ করে।

বেচারা ডাকপিয়ন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলে না। অতি নৃশংস ঠোকর খাওয়া অবস্থায় এম্বুলেন্সে করে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়।

কিন্তু সে ব্যক্তির কপাল, রাগে গরগর এক ব্লাডহাউন্ডকে দেখে একটা লাঠি কুড়তে যেরকম বিপদে পড়েছিল একজন ডাকপিয়ন, তার চেয়ে ভাল।

আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে সে দেখে "লাঠি" বলে যা সে তুলে নিয়েছে সেটা জীবন্ত হয়ে পাক খেয়ে ওর বাহুতে ছোবল বসিয়ে দিলে। পিয়নটি একটা সাপ আঁকড়ে ধরেছিল।

সাপটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে লাথি মেরে মেরে তার মাথাটাকে সে থেঁতলে দেয়, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেও অচৈতন্য হয়ে যায়।

সৌভাগ্যবশত পিয়নটি চিঠি দিতে এসে-ছিল এক ডাক্তারকে এবং তৎক্ষণাৎ সাপের বিষক্রিয়া নিরোধক ইঞ্জেকসন এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রবাহের ব্যবস্থা হওয়ায় লোকটি প্রাণে বেঁচে যায়।

ঘাস—উপাদেয় একটি খাদ্য

ইওরোপের কয়েকটি দেশে অল্পকালের মধ্যেই ঘাস ও গাছের পাতা থেকে প্রস্তুত খাদ্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাভুক্ত হবে বলে অনেকের ধারণা। বিজ্ঞানের উন্নয়নে নিয়োজিত বৃটিশ সংস্থার রথামস্টেডস্থ বায়কোমেস্ট্রি বিভাগ একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে, যার সাহায্যে গাছের পাতা থেকে প্রোটিন তৈরি সম্ভব এবং অনতিকাল মধ্যে এই যন্ত্রটি বাজারচালু হবার মতো সংখ্যায় নির্মিত হয়ে যাবে।

বৃটেনের সরকারী বিজ্ঞান গবেষকরা বহু বছর ধরেই ঘাসকে উপাদেয় খাদ্যে পরিণত করা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছেন। বৈজ্ঞানিকরা বিভ্রান্তও হয়েছেন, কিন্তু এখন তারা উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন।

ঘাসে অতিপ্রয়োজনীয় অনেকগুলি ভিটামিন, প্রোটিন এবং খনিজ লবণ আছে যা যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিষ্কাষণ করা সম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানী বন্দী-শিবিরে আটক থাকাকালে বৃটিশ চিকিৎসকরা ভিটামিন-বি অভাবগ্রস্ত রোগী-দের ক্ষেত্রে ঘাস থেকে নিষ্কাশিত একটা ওষুধ ব্যবহার করতেন। এই দৃষ্টান্ত থেকেই বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে বৃটেনে প্রোটিনের অভাব ঘাসের দ্বারা মেটানো যেতে পারবে। আর তারপর থেকেই পরীক্ষা শুরু হয়।

সমস্যা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে কিভাবে আকর্ষণীয় রূপ দিয়ে উপস্থিত করা যায়। কতক স্বেচ্ছাব্রতী ঘাসের কেক রুটি ও মার্গারিন সহযোগে খেয়েছেন।

অবিরাম পায়ে হাঁটার কৃতিত্বের অধি-কারিণী ডঃ বারবারা মুর বহু বৎসর ধরে ঘাস খেয়েছেন—যাকে বলে কাঁচা ঘাস। লণ্ডনে যখন থাকতেন সে সময়ে তিনি প্রতিদিন সকালে কেনসিংটন উদ্যান ও হাইড পার্ক থেকে তাঁর দৈনিক 'খাদ্য' আহরণ করে আনতেন। ডঃ মুর দাবি করেন যে, ঘাস খাওয়ার ফলে তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিতা থাকতে পারবেন।

কানাডার সামরিক বিভাগ সৈন্যদের জন্য ঘাসের 'বার' তৈরি করান। কিন্তু সেগুলি অত্যধিক মিষ্টি হওয়ায় জনপ্রিয়তা হারায়। তাদেরও ঘাসের বিস্বাদ চাপা দেওয়ার সমস্যায় পড়তে হয়।

নাৎসী গবর্নমেণ্ট ১৯৪৫ সালের মধ্যে ঘাসকে সব্জীরূপে ব্যবহার করার আদেশ ঠিক করে রেখেছিল—এবং সেটা অর্থনীতিক কারণে নয়। তখনকার জর্মান গবর্নমেণ্টের বিশ্বাস ছিল যে ঘাস এবং পাতা-স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ। একে একে নিবিছে দেউটি। সজনীকান্তের পরলোকগমনের মাত্র চার দিন পরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই একই পথের পথিক হলেন। গত ১৬ই তারিখে (বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রের পর) মনস্বী ও প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি। অধুনাকালের পক্ষে এই পরমায়ু অবশ্য দীর্ঘ। তাঁর দীর্ঘ জীবনের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হবে, এই প্রবীণ ব্যক্তি পূর্বতন যুগ এবং এ-যুগের মধ্যে সেতুর মতন বিরাজ করছিলেন। তাঁর পরলোকগমনে সেই যোগাযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন হল।

১৮৭৬—১৯৬২

হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই যুগের মানুষ যে-যুগ বঙ্গদেশের সবিশেষ গৌরবের যুগ। ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতন আদর্শবাদী ও কর্মবাদীরা এই যুগের নৈতিক আবহাওয়া উন্নত করে রেখেছিলেন। নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সেই গুণ হেমেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে উপ্ত হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথমভাগের বঙ্গ-প্রকৃতির এই বিশেষ গুণের জন্যই তিনি সে যুগের, এবং এ-কালের দুর্দৈবের দর্শক হিসেবে তিনি এ-কালের। বস্তুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের কাছে বিগত পুরুষদের শেষ প্রতিনিধি।

যশোহর জেলায় তাঁর জন্ম (১৮৭৬), স্বগ্রামে, কৃষ্ণনগরে ও পরে হেয়ার স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা লাভ; কলকাতার কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে রাজনীতি সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ। 'আর্যবর্ত' নামে তিনি একটি

বিদুর

মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটলে অন্যান্য তদকালীন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন—এর মধ্যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' 'সন্ধ্যা' বিপ্লবী দলের পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজনীতিক লেখাগুলি খুবই সমাদৃত হত।

'বন্দে মাতরম' ও 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদানের পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে বরাবরের মতই যেন জড়িয়ে পড়েন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে দৈনিক বসুমতীর প্রকাশ হয়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন তাঁর নেপথ্য সম্পাদক। দীর্ঘকাল তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন ইংরেজী ও বাঙলা সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

সাংবাদিক হিসাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদকে বলা হত 'লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া'। প্রকৃতপক্ষেই তাই। তাঁর মতন তথ্যের ও তত্ত্বের ভাণ্ডারী অন্য কেউ ছিলেন না।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিকরূপে অগ্রগণ্য হলেও সাহিত্যের অনুগত সেবক ছিলেন। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন, একদা সেগুলি পাঠককে তৃপ্ত করেছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের পরলোকগমনে আমরা বিয়োগ বেদনা অনুভব করি।

বইয়ের পৃষ্ঠপট

অগ্র-পশ্চাৎ বলে একটা কথা আছে। বাঙালীদের বড় দুর্নাম তার বিবেচনা বোধ নেই, অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখে না। একদা আমাদের প্রকাশকরাও জাতীয় চরিত্রে নিষ্ঠা রেখেছিলেন, বই কাটত লেখকের লেখার গুণে। এখন দিনকাল বদলেছে; প্রকাশক লেখার গুণের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে ভয় পান, তাঁদের 'অগ্র' বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ প্রচ্ছদ বিষয়ে। প্রচ্ছদ থাকে সামনে তাই অগ্র। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে যেমন করে কন্যা নির্বাচনের আসরে বসানো হয়, এবং উদ্বিগ্ন পিতার নাভিশ্বাস ওঠে কি হয় কি হয় করে, তেমনি প্রকাশক পিতা কন্যা-সজ্জার মতন পুস্তকের অঙ্গসজ্জা করে নির্বাচন আসরে পৌঁছে দেন, ভয়ংকর উদ্বেগ, প্রচ্ছদটা লোকে নিল কি নিল না। নিলে, মানে পছন্দ হয়ে গেলে বাজি মাৎ, না নিলে অপরিসীম মনোবেদনা।

বাঙালী প্রকাশকরা যে ইদানীং, 'অগ্র' বিষয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা কেন যে 'পশ্চাৎ'-এর প্রতি বিমুখ বোঝা মুশকিল।

বিদেশে এখন এই 'ব্যাক্-কভার' নিয়ে বহু গবেষণা এবং পরীক্ষা চলছে। বড় বড় প্রকাশকরা ঠকে শিখেছেন, এই ভয়ংকর প্রতিযোগিতার দিনে পিঠ না সামলাতে পারলে ভরা ডুবি।

সামান্য বিশদ করে বলিঃ আজকের দিনে সাধারণ পাঠক চপলমতি। সাহিত্য-পাঠক আর সাধারণ পাঠক এক জিনিস নয়। প্রথম জনের কাছে সাহিত্য অনুরাগের বিষয়, দ্বিতীয় জনের কাছে সময় কাটানোর খেলা। সাধারণ পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এদের মনের কথা বোঝা ভার, রুচি বিচার বোধ বিবিধ প্রকার, একজন যদি

... was born in 1930 in a small ... town in north eastern Pennsylvania ... studied at Pennsylvania State University from which he was graduated in 1951. He was in the United States Airforce from 1952-1957. At the present time he is living in England with his English wife. Night, his first novel, was rejected by many American publishers to whom it was offered because of the realism of its language and because the setting was not very comforting for American readers. Subsequently it was accepted for publication in English by Olympia Press of Paris, who had previously published Samuel Beckett, Lawrence Durrell and Vladimir ... many English papers on French publication as a ... and this, the first English edition, is published simultaneously with the first ...

একটি বিদেশী গ্রন্থের পৃষ্ঠপট

ঐতিহাসিক রোমান্স চায়, অন্য জন চাইবে মেরু অভিযান।

প্রকাশক ব্যবসা করতে বসেছে। ক্রেতার মন না বুঝলে তার চলে কি করে। অনেক গবেষণা করে দেখা গেল, এ-যুগের মানুষ লেখার চেয়ে প্রথমত লেখকের সম্পর্কে জানতে পছন্দ করে, তারপর জানতে চায় কি লিখেছে বইয়ে—কেমন ধরনের কাহিনী। তারপর শুনতে চায় লোকে কি বলছে বইটা সম্পর্কে।

ওরা বলে, 'পটেড বায়োগ্রাফি', চলতি বাংলায় আমরা বলব 'জীবনী চুম্বক'। এই জীবনী চুম্বকই এখন শতকরা পঞ্চাশজন পাঠককে প্রথমে লেখকের প্রতি আকর্ষণ করে; শতকরা ষাটজন জানতে চায় বইয়ের মধ্যে কোন ধরনের কাহিনী আছে; একটু খুঁতখুঁতেরা পরে হয়ত এ-কথাও জানতে চাইবে, অন্যে কি বলছে বইটা সম্পর্কে।
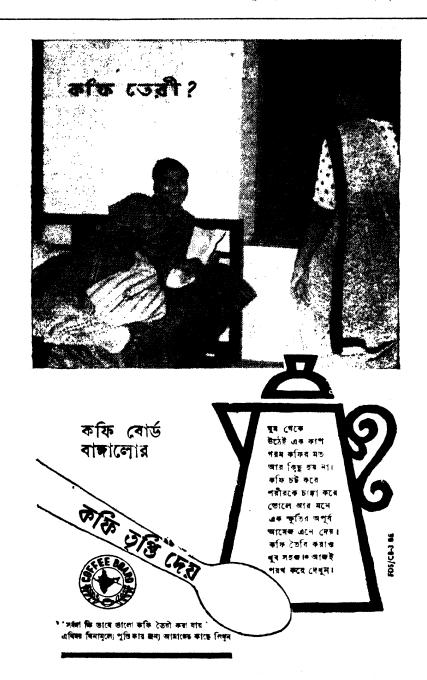
পৃষ্ঠপটের প্রয়োজন 'জীবনী চুম্বকের' জন্যে, যার চুম্বকে যত জোর তার কপালে তত পাঠক।

পাঠকের সঙ্গে লেখকের এই ব্যক্তিগত পরিচয় (পৃষ্ঠপটের মাধ্যমে) যে খুবই কার্যকরী তার প্রমাণ যে কোনো বিদেশী গ্রন্থ। এতে নিছক কৌতূহল মেটে না, ছোটখাটো বিষয়ও জানা হয়ে যায়।

একটি ছোট ছবি, তাতেই যেন মনে হয় লেখককে দেখলাম; ছ সাত লাইনের জীবনী, মনে হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল; বইয়ের উপজীব্য বিষয় নিয়ে কয়েক ছত্র লেখা, পড়ার পরই পাঠক আকর্ষণ বোধ করবেন।

পৃষ্ঠপটের ছবি কি জীবনীচুম্বক যে পাঠকের আকর্ষণ বিকর্ষণ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তার একটি দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ...এক লেখক সম্পর্কে লেখা হল : "ইনি ছিলেন নাৎসী সৈনিক। আফ্রিকায় লড়েছেন। যুদ্ধে তাঁর একটি পা গেছে। এখন নিজের গ্রামে শিক্ষকতা করেন।"

আর এক লেখকের বইয়ে লেখা হলঃ "দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে ইনি ছিলেন সঙ্গীতের ছাত্র; যুদ্ধ বাধলে সৈন্যদলে যোগ দেন; পরে এ'কে গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়, জার্মানীর ফুয়েরারকে সামনাসামনি দেখবার সৌভাগ্য এ'র হয়েছে। একবার ফরাসী সৈন্যদের হাত এড়িয়ে পালাবার সময় এ'র চোখে আঘাত লাগে। এখন ইনি অন্ধ। স্ত্রীকে সামনে বসিয়ে উনি ধীরে ধীরে বলেন, স্ত্রী লেখেন।"

এই দুটি উদাহরণ সামনে রেখে যদি পাঠককে বলা হয়, কোনটি বেছে নেবেন, বেশীর ভাগ লোক শেষেরটি পছন্দ করবে। কারণ 'সঙ্গীতের ছাত্র' 'গুপ্তচরবৃত্তি' 'ফুয়েরারকে দেখার সৌভাগ্য' 'অন্ধ'—এইসব বিশেষণ বা অলঙ্কার 'সৈনিক' 'খোঁড়া' 'শিক্ষকতা'র চেয়ে অনেক আকর্ষণীয়।

বিদেশে এই জীবনী চুম্বকের বাড়াবাড়ি অনেক সময় নিছক প্রচারকর্মের কেরামতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম্য মদের দোকানে চেয়ার ছুড়ে উগ্র কবি কাচের শার্সি ভাঙছে, মুখে কপালে অগুছালো চুল পড়েছে—এমন ছবি দিয়ে প্রকাশকরা লিখে থাকেন : ক্ষুব্ধ অসুখী অতৃপ্ত তরুণ কবি। অবশ্য এ-প্রচার সর্বক্ষেত্রে হয় না। বাঙালী প্রকাশকরা প্রচার এবং প্রয়োজন এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রেখে 'পৃষ্ঠপটে'র ব্যাপারে কিঞ্চিৎ নজর দিতে পারেন। মনে হয় না, পৃষ্ঠপট বিফলে যাবে। অবশ্য, এ-সবই অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত লেখকদের জন্যে, অন্তত তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। প্রখ্যাতদের বই নিয়ে ত দুশ্চিন্তা নেই, দপ্তরিখানা থেকে আসতে না আসতে ফুরোয়।

পুশকিন

দশই ফেব্রুয়ারী আলেকজান্ডার পুশকিনের ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। রুশ

১৭৯৯—১৮৩৭

কাব্যসাহিত্যের 'স্বর্ণযুগে'র প্রভাময় প্রথম পুরুষ হিসেবে তিনি স্বদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাহিত্যের পথিকৃত হিসেবে কবি পুশকিনের যে সম্মান ও শ্রদ্ধা তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বদেশেই তাঁর সাহিত্যের সমাদর থেকে প্রমাণিত হয়, পুশকিনের সাহিত্য দেশ অথবা কালের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। মূলত কবি হলেও পুশকিন কাব্যনাট্য, উপন্যাস, কাহিনী—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। পুশকিন-বিশেষজ্ঞরা বলেন, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রায় সমস্ত রকম অঙ্গ ও ধারা তাঁর জানা ছিল। তিনি সেক্সপীয়ার, বায়রন ও স্কটের বিশেষ অনুরাগীই ছিলেন না, বিদেশের সাহিত্যকে রুশ দেশের মাটিতে রুশ ভাষা ও রুশীয় সৃষ্টি প্রতিভার দ্বারা আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পুরোপুরি য়ুরোপীয় হয়েও তিনি এ-দিক থেকে সম্পূর্ণ রুশ ছিলেন। পুশকিনের এই বিশ্বমানসিকতা পরবর্তী প্রত্যেকটি মহৎ রুশ সাহিত্যিকের আত্মিক সম্পদ হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ

অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ। ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী। কলিকাতা-১২। মূল্য ৬ টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বহুভাষাবিদ্ কবি ছিলেন। বিভিন্ন ভাষার কবিতা তিনি অনুবাদ করেছিলেন 'তীর্থসলিল ও 'তীর্থ-রেণু' কাব্যে। সত্যেন্দ্রনাথের এইসব অনুবাদ-কবিতাগুলি নিয়ে এ পর্যন্ত মৌলিক কবিতার পশ্চাতেই আলোচনা হয়েছে। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা বিশেষ হয়নি। তার প্রধান কারণ ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের অভাব। স্বভাবতই অনুবাদক হিসাবে কবি সত্যেন্দ্রনাথের সমালোচনা দুরূহ। ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় এই নূতন আলোচনাপদ্ধতির সূত্রপাত করে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। গ্রন্থকার কোন্ কোন্ ভাষা জানেন তার তালিকা দিয়েছেন ভূমিকাতে এবং কিভাবে হিন্দী, ওড়িয়া, ফারসী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করেছেন তারও বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এর থেকে সহজেই অনুমান হয়, ভাষা শেখায় তাঁর বিধিদত্ত শক্তি আছে।

পাঠক বর্তমান গ্রন্থে লেখকের সেই শক্তির পরিচয় পাবেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী ফরাসী এবং ফরাসী কবিতার অনুবাদ নিয়ে তিনি বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছেন। কয়েকটি কঠিন মৌলিক কবিতার আলোচনা করেছেন শেষের দিকের একটি অধ্যায়ে। সবশেষের অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা আছে। অনেকে সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন; কেউ কেউ তাঁর অনুবাদের উৎকর্ষ সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সুধাকরবাবু কবি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত থেকেও তাঁর কবিত্বশক্তিতে শ্রদ্ধাবান্। তিনি বহু কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যা সত্যেন্দ্রনাথের প্রচলিত 'কাব্যসঞ্চয়নে' স্থান পায়নি, অথচ উৎকর্ষ-বিচারে তারা প্রথম শ্রেণীর। কবি মূলের ছন্দ ও ভাব অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছেন; যেখানে পারেন নি সেখানেও পরিবর্তন বরং সত্যকার কাব্যরসই সৃষ্টি করেছে। পদ্যানুবাদের আলোচনা সত্যই কঠিন হয়ে ওঠে ছন্দের প্রসঙ্গে। লেখক কঠিন বলে পিছিয়ে থাকেন নি। 'বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ও সত্যেন্দ্রনাথ' অধ্যায়টি অনুধাবনযোগ্য। তিনি নিজেও কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের বাংলা দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন, সেগুলি কৌতূহলো-দ্দীপক।

দুঃখের বিষয় বইতে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় ছড়িয়ে থাকলেও রচনা সর্বত্র পাণ্ডিত্যোচিত হয়নি। মাঝে মাঝে বলার ভঙ্গিতে লঘুতা প্রকাশ পেয়েছে। ৬৫ পৃষ্ঠায় একটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ফুটনোটে 'বাংলার গৌরব এক বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত'-এর সঙ্গে নিজেকে সমমর্যাদায় স্থাপন করাও শোভন মনে করতে পারি না। কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্যও বাদ পড়ে গিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের আনুপাতিক তালিকা থাকলে ভালো হত। জাপানী নাটক থেকে অনূদিত সত্যেন্দ্র-নাথের 'নিদিধ্যাসন' নাটকটিকে ফকিরমোহন সেনাপতি ওড়িয়ায় যে 'পেটেন্ট মেডিসিন' নামে গল্পরূপ দিয়েছিলেন, এ সংবাদ কৌতূহলজনক। ৫৭৭।৬১

ছোট গল্প

পলাতকা—বিমল কর। সেকাল একাল। ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

সম্প্রতিকালে বাংলা ছোটগল্প-লেখকদের একটি ছোট্ট গোষ্ঠী নতুন নতুন পরীক্ষা-

নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে নবচিন্তাধারা এবং শক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন তা সমকালীন বিশ্ব-সাহিত্যের পাশাপাশি দাঁড়াবার যোগ্য। এবং সুখের বিষয়, বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যের ইতিহাস কোন একটি নির্দিষ্ট সীমাচিহ্নে স্তম্ভিত হয়ে নাই। যাঁদের নিরন্তর সাধনা বাংলা গল্পের নতুন মোড় ফিরিয়েছে, শ্রীযুক্ত বিমল কর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কেবলমাত্র ছোট হলেই এবং গল্প হলেই একদিনের বাঙালী পাঠকের গ্রাসাচ্ছাদন চলত কিন্তু আজকের বুদ্ধিজীবীজগতে সে পটভূমি বদলে গেছে।

'পলাতকা'র গল্পগুলি মেঠো গল্প নয়, যাকে গাল-গল্প বা ছায়াচিত্রভেদী গল্প বলা হয়—তাও নয়। এখানে, অর্থাৎ এই বইয়ে যে আটটি গল্প গৃহীত হয়েছে তারা পাঠকের "তারপর-জিজ্ঞাসা"য় অনুগৃহীত নয়, তারা মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম চোরাগলিতে মধ্যরাতের শীর্ণরেখ আলো ফেলে মানুষের যে গভীর রহস্য এবং অর্থবহ স্তব্ধতা এবং অন্তিম নিঃসংগতাকে প্রকাশ করেছে তা মীড়-গমক এবং মূর্ছনার মতই অব্যর্থ-দিশারী। কথা এখানে অচলচিত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েনি, সংগীতের প্রসারিত সত্তার মতই তার অতিগমন। আটটি জীবিত যন্ত্রণার গল্প এই গল্পগ্রন্থে রয়েছে। হৃদয়ের অন্তস্তলভেদী উপলব্ধি লেখকের উৎকর্ণ লেখনী এবং বিদগ্ধ জীবনদর্শনের পরিচয় বহন করে। একটি অদৃশ্য কাঠগড়া, যে বধ্যভূমি লেখকের "নির্বাসন"কালীন জীবনানুভূতি, তার ওপর নানা মনের, বয়সের এবং অবস্থার মানুষকে কখনও না কখনও এসে দাঁড়াতেই হবে 'পিতৃঘ্ন' প্রভৃতি গল্পের মধ্য দিয়ে সেই পরিণাম-প্রত্যয়ই প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের অক্ষরেখার মধ্যে ক্রীড়িত মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের আশ্চর্য করতলের মধ্যেই ধরা রয়েছে, এই দার্শনিক তত্ত্বটি তথ্য হয়ে উঠেছে বিশেষ করে "ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া", "শীতের মাঠ" প্রভৃতি বিস্ময়কর গল্পের মধ্যে। "বাঘ" এবং "দরজা" পরিণামে যেন একই বেদনার এপিঠ-ওপিঠ; একটা বন্ধ মালগাড়ির মধ্যে অন্ধতম যন্ত্রণায় ঝঙ্কৃত হতে হতে জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রা। গল্পগুলি কবিতায় রূপ নিতে পারত কিনা কে জানে!

গতানুগতিক গল্পপাঠকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক এই গল্পগুলি আমাদের মুগ্ধ করেছে। ৬২৬।৬১

তীর্থ-সাহিত্য

রহস্যময় রূপকুণ্ড—বীরেন্দ্রনাথ সরকার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

"আমার দৃষ্টি সাধারণের দৃষ্টি। লোকালয়ের কোলাহলে আমার দৃষ্টি ক্লান্ত, অভাব-অভিযোগ আর হতাশায় জর্জরিত। তাই হিমালয়ের নিভৃত এই হ্রদ আমার দৃষ্টিতে রহস্যময়।" আমাদের সাধারণ পাঠকের চোখ এবং মনও লেখকের সংগে একমত। সাহিত্যের মধ্যেও আমরা এমনই নির্বাসন খুঁজে বেড়াই, দগ্ধ মনের মানস-সরোবর খুঁজে বেড়াই। তাই টাইম টেবল আমাদের ছুটির দিনগুলোর একমাত্র পাঠ্য, এবং কখনও কখনও নাগালের বাইরেকার দ্রাক্ষাফল হয়ে দেখা দেয়। ভ্রমণের বদলে আমরা ভ্রমান্তে পেঁাছাই।

তাই ভালো লাগল হরিপদ কেরানীর পাড়া থেকে যখন আমাদের একজন দুর্গম নির্জনের অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। সংগে তাঁর ক্যামেরার মত চোখ দুটি এবং উৎকর্ণ অন্তর। পথে ও পথের প্রান্তে যেসব দৃশ্য, যেসব মানুষ, যেসব কিংবদন্তী পড়ে, সেগুলিকে সযত্নে পথের সঞ্চয় হিসাবে সংগ্রহ করে চললেন তিনি। তাঁর আনন্দ এবং অন্বেষার যোগফল এই ভ্রমণবৃত্তান্ত। দুর্গম পথ মানুষকে চিরদিনই টেনেছে, আর সেই পথের বর্ণনা আরও মনোহারী। শ্রীসরকার তাঁর সাবলীল রচনারীতির দ্বারা রূপকুণ্ডের রূপ এবং রহস্য পাঠকের কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। দিনপঞ্জী এবং রম্যরচনার মিশ্ররূপটি তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

নন্দাঘুণ্টি যাবার পথের তলায় রূপকুণ্ড হ্রদ। ডিমের আকৃতি। চাপা অংশের ব্যাস ১৫০ ফুট, দীর্ঘ অংশের ব্যাস ২৫০ ফুট। অনেক অতিলৌকিক গল্পগাথা এবং ঐতিহাসিক রহস্যজড়িত এই স্থানটি। বহু মৃত মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে এইখানে যাদের একমত হয়ে সনাক্ত করা যায় নি আজও। সুতরাং রূপকুণ্ড সত্যিই রহস্যময়।

কয়েকটি আলোকচিত্র এবং একখানি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র সংযোজিত হয়েছে। ৫৬০।৬১

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা—শঙ্কু মহারাজ। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছ' টাকা।

সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালই নতুন লেখকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় শক্তিশালী স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটে যাঁরা প্রথম পদক্ষেপেই তাঁদের কুশলী হাতের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু সেদিক থেকে প্রথম সূচনায় শঙ্কু মহারাজ বাংলা সাহিত্য পাঠকের, বিশেষ করে ভ্রমণ-সাহিত্যে উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবেন।

'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' ভারতের অন্যতম সুবিখ্যাত তীর্থকেন্দ্র যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী ও গোমুখীর বিস্তৃত ভ্রমণ কাহিনী। হিমালয়ের সুবিখ্যাত উক্ত তীর্থপথ ভারতের দীর্ঘতম এবং বলা বাহুল্য, দুর্গমতম তীর্থপথ। হিমালয়ের এই দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা অত্যন্ত শ্রম-সাপেক্ষ—সেই অনন্য কারণে বহু পর্যটক বা তীর্থকামীদের নিকট এখানকার রহস্যময় সৌন্দর্য-উৎস অপ্রকাশিত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক শঙ্কু মহারাজ সামান্য কয়েক বছর পূর্বে আশ্চর্য রূপময় এই তীর্থকেন্দ্রটি পরিক্রমা করে এসেছেন—তারই মনোরম বিবরণী 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র ছত্রে ছত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে তথা-কথিত ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন নি। লেখকের চোখের আলোয় তীর্থপথ পরিক্রমায় দু' পাশের অনুপম রূপলাবণ্যের পাশাপাশি নানা-শ্রেণীর যাত্রীহৃদয়ের হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখের আলোছায়া সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। ভ্রমণ-সাহিত্যের আধারে উপন্যাসের উপকরণ সংযোজিত হওয়ায় এবং লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে প্রকৃতি ও জীবন পাশাপাশি সুপ্রকাশিত হওয়ায় পাঠক পুলকিত বোধ করবেন। লেখকের সার্থকতা এখানেই।

শঙ্কু মহারাজের উপস্থাপনা এবং ভাষা সুন্দর। 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' নিঃসন্দেহে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। (২৬৭।৬১)

পুরাতনী

বিদেশী ভারত সাধক—সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য—৩·৫০ নয়া পয়সা।

যে সকল বিদেশী ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতি-বিধানে তৎপর হইয়া এ-দেশের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন তাঁহাদের বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা। উইলিয়ম জোন্স কয়েকজন প্রাচ্যবিশারদকে লইয়া রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধন করেন। চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া শকুন্তলার অনুবাদ করেন ও বাঙলা হরফের প্রবর্তন করেন এবং তাহারই ফলে হ্যালহেড রচিত বাঙলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে উইলকিন্স মনুর হিন্দু আইনের কিছু অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে কাজ পরে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন হেনরী টমাস কোলব্রুক। বাংলা ভাষা শিখিয়া শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সাহায্যে প্রেস খুলিয়া বাংলা গদ্যের প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন উইলিয়াম কেরী। তাহার পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হইয়া তিনি রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতদের সাহায্যে বহু বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত করেন। আলেকজাণ্ডার সোমা তিব্বতীদের মধ্যে বাস করিয়া এবং তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষার একটি ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিয়া তিব্বতের সহিত ভারতের যোগসূত্র রচনা করেন। পরে তিনি বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এ-দেশের ঐতিহ্য বুঝিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। জেমস প্রিন্সেপ ভারতের শিলালিপিগুলি উদ্ধারের কার্যে অগ্রণী হন। ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম প্রভৃতি প্রধান ধর্মগুলির মূল কথা অনুধাবন করিয়াছিলেন মনিয়ার উইলিয়মস, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যকে যথার্থভাবে পাশ্চাত্যের নিকট উদ্ঘাটিত করা।

বিদেশী প্রাচ্যব্রতীদের একত্র সন্নিবেশের এই প্রথম প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। তবে আলোচনা সর্বক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত, আরো বিস্তারিত হইলে পুস্তকটির মূল্য বাড়িত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও এই বিদেশী ভারত সাধকদের সাধনার আন্তরিকতা ও দানের যথার্থ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। ৩২৪।৬১

চন্দ্রশেখর

সার্থক জীবনীচিত্র

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ও শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার নাম এ-দেশে প্রাতঃস্মরণীয়, বিশ্বের মহীয়সী নারীর ইতিহাসে স্বতন্ত্র-চিহ্নিত। বিশ্বমানবতার যে আদর্শ মহৎ চিন্তা ও ভাবের অংশীভূত, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তারই জীবন্ত বিগ্রহ। বিশ্বের দরবারে যেদিন ভারতের স্থান ছিল না এবং ভারতবাসী যেদিন বিদেশীর কাছে ছিল অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত—সেইদিন এই বিদুষী বিদেশিনী ভারতের এক মহাত্যাগী সন্ন্যাসীকে গুরু বলে বরণ করে নিলেন। নিজের আজন্ম সংস্কার ও বিশ্বাস, সমাজ ও পরিবেশ, এবং স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে নিবেদিতা কেমন করে মনে-প্রাণে ভারত-ললনা হয়ে উঠলেন তা বিশ্ব-ইতিহাসের এক বিস্ময়-বস্তু।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যময় জীবনচরিত নিয়ে বহু আগেই বাংলা ছবি তৈরী হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন এই বাঞ্ছিত সংপ্রয়াসে সফল হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসবের সূচনা-লগ্নে অরোরার শ্রদ্ধার্ঘ "ভগিনী নিবেদিতা" দেশবাসী একটি পরম ঈপ্সিত উপহাররূপে গ্রহণ করবেন এবং এই ছবিটির জন্য চিত্রনির্মাতাদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাবেন।

"ভগিনী নিবেদিতা"-র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পূর্বাশ্রমে ভগিনী নিবেদিতার নাম ছিল মার্গারেট নোব্‌ল্। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পূর্বে মার্গারেটের জীবনে শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণকালের মধ্যে যে-সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তারই কয়েকটি চিত্রনাট্যে সংযোজিত।

যুক্তিবাদী মন নিয়ে সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্বকে জয় করার যে বিরামহীন আস্পৃহা মার্গারেটকে ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরক্ত করে তোলে, তাঁর জীবনে শৈশবেই তা অংকুরিত হয়ে উঠেছিল। প্রণয়ীর মৃত্যুর পর তাঁর ঈশ্বরজিজ্ঞাসা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মার্গারেটের অন্তর-জীবনের মহৎ দ্বন্দ্ব ও সংশয় এবং সত্যলাভের ব্যাকুলতার রূপটি তাঁর স্বদেশ ও সংসারত্যাগের পূর্বের ঘটনারাজিতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। সত্যসন্ধানীর জীবনের বাইরের ঘটনাই যে বড় নয়, বড় তার মানসিক প্রতিক্রিয়া ও জিজ্ঞাসা—এই

শ্রীবিজয় পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য "আগ্নাশাখা"-র প্রধান দুটি চরিত্রে কণিকা মজুমদার ও বসন্ত চৌধুরী

সত্যটি চিত্রনাট্যকার নির্ভুলভাবে অনুসরণ করেছেন। তাই নিবেদিতার পূর্বাশ্রম-জীবনের অন্তর-রূপটির সঙ্গে দর্শকরা সহজেই একাত্ম হতে পারেন।

স্বদেশের পটভূমিতে মার্গারেটের জীবনের যে ঘটনাগুলি ছবিতে বিন্যস্ত তা আরও কিছুটা সংক্ষিপ্ত হতে পারতো। এবং তার পরিবর্তে ভারতে নিবেদিতার কাহিনীকে আরও বিস্তৃত করা যেত। এর ফলে দর্শকরা ছবিটির প্রতি আরও বেশী

আকৃষ্ট হতে পারতেন। তা বাদে চিত্রনাট্যের এই অংশে অতি পরিচিত শিল্পীদের মার্গারেটের পিতা-মাতা ও শিক্ষয়িত্রী এবং প্রণয়ীরূপে দেখানোর ফলে পটভূমি ও পরিবেশের বাস্তবানুগত্য কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে।

ভারতে নিবেদিতার আধ্যাত্মিক ও কর্মজীবনের বিন্যাসে চিত্রনাট্যকার স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে গঠিত নিবেদিতার অসাধারণ আধ্যাত্মিক চরিত্র-রূপটির আভাস অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রনাট্যকার। নিবেদিতার মহৎ চরিত্র বিশ্লেষণের জন্যই যেন তিনি চিত্রনাট্যে ঘটনারাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাঁর এই অনুভূতিপ্রবণ প্রয়াস অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

ভারতের সমাজ, রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সংগে নিবেদিতা মনে-প্রাণে যে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন সেই সত্যটি ছবির চিত্রনাট্যে উদ্ভাসিত। ভারতের নবজাগরণে নিবেদিতার দান কত গভীর তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটি ছবিতে অপরূপভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি চিত্রনাট্যকার নিবেদিতার জীবন-কাহিনী বর্ণনায় "মিস্টিসিজম্" অথবা আধ্যাত্মিক ভাবালুতার আশ্রয় নেন নি। যুক্তি এবং ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি একটি অসামান্য জীবন-কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর চিত্রনাট্যে।

স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে নিবেদিতার জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ছবিতে হয়ত প্রয়োজনবোধেই বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রনাট্যকার নিবেদিতার জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, তার পরিধির মধ্যে এই মহীয়সী নারীর জীবনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্থান পেতে পারত। ছবিতে নিবেদিতার সংস্পর্শে যে কৃতী পুরুষদের দেখানো হয়েছে তাঁদের মধ্যে তখনকার দিনের এমন বিশেষ কয়েকজনকে দেখা যায় নি যাঁদের জীবনে ও জীবনবিকাশে এই বিদেশিনী ভারত-কন্যার ভূমিকা ছিল অনেক ব্যাপক। ছবিতে আচার্য জগদীশ বসুকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর জীবনে ও কর্মে নিবেদিতা যে কত বড় প্রেরণা ছিলেন ছবিতে তার আভাস নেই।

চিত্রনাট্যটিকে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সংযমের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রপটে রূপায়িত করে তোলার কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরিচালক বিজয় বসু। আধ্যাত্মিক ভাবাতিশয্যকে পরিচালক প্রশংসনীয়ভাবে পরিহার করে চলেছেন। মার্গারেটের প্রণয় ও প্রণয়ীর মৃত্যুর পর তাঁর বিরহের ঘটনা-বিন্যাসে পরিচালক পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বহু ঘটনা ও দৃশ্য-বিন্যাসে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নিবেদিতার দীক্ষাগ্রহণ ও দেহত্যাগের দৃশ্য দুটি। এই দুটি দৃশ্যে পরিচালক শুদ্ধবুদ্ধি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। বিগত-দিনের বাংলার পরিবেশ রচনায় ও ছবির বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনে পরিচালকের তথ্যনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে ছবির প্রয়োগকর্ম মামুলি।

ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। নিবেদিতা দেহত্যাগ করেছেন সবে পঞ্চাশ বছর হল। নিবেদিতাকে দেখেছেন এমন অনেক ব্যক্তি আজ জীবিত। তাই এই যুগেরই এক অসামান্য ঈশ্বর-সাধিকা-চরিত্রের রূপসজ্জায় কোন অতিপরিচিত অভিনেত্রীকে মেনে নেওয়া দর্শকের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না। বলতে দ্বিধা নেই, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে ভগিনী নিবেদিতার একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সহজগ্রাহ্য চরিত্রাঙ্কনের কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছেন। চিত্রনাট্যের নিবেদিতার অন্তরদ্বন্দ্ব, সংশয়, সত্যলাভের ব্যাকুলতা, দুঃখদহনে মানসিক স্থৈর্য, গুরুভক্তি, কর্মযোগে নিষ্ঠা ও ভারত-প্রেম শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যথাযথ বিধৃত।

স্বামীজীর ভূমিকায় অমরেশ দাসকে মানিয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয়ে ফুটে ওঠেনি।

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন, অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, রবীন মজুমদার, দিলীপ রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, কালী সরকার, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল ও ছন্দা আদিত্য।

অনিল বাগচী ছবির আবহ-সুর রচনায় রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি স্তোত্রগানের সুরারোপ সুন্দর এবং গান-গুলি সুগীত।

ছবির সর্বাঙ্গীণ কলাকৌশল ও আঙ্গিক-গঠনের কাজে উন্নতির অবকাশ ছিল।

নাটকীয় ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার তৃতীয় চিত্রোপহার "সূর্যস্নান" নাট্যধর্মী। অর্থাৎ ছবিতে যে কাহিনী রূপায়িত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে দর্শকের মনকে নাটকের আমেজে উদ্দীপ্ত করে তোলা। চলচ্চিত্রে এই প্রয়াস নতুন নয়।

"শুভবিবাহ" ও "মানিক" ছবি দুটি দেখার পর যাঁরা এই সংস্থার তৃতীয় চলচ্চিত্র প্রয়াসটি সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন, অথবা নতুনতর ও বলিষ্ঠতর শিল্পরূপ ও আখ্যান-রস আস্বাদনের জন্য যাঁরা আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা "সূর্যস্নান" দেখে কিছুটা আশাহতই হবেন। কারণ কাহিনী ও তার বিন্যাসের দিক দিয়ে বিশেষ কোন নতুনত্ব পাবেন না তাঁরা এই ছবিতে। তবে যে কাহিনী এর মধ্যে চিত্রায়িত, তার গতিপথের বাঁকে বাঁকে রয়েছে চমক, অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব। তদুপরি নাট্যসংঘাতে ছবির ঘটনারাজি আলোড়িত। তাই নাট্যরস সম্ভোগের সুখ থেকে দর্শকেরা বঞ্চিত হন না এতে। সেই দিক থেকে কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার এবং নবাগত চিত্রপরিচালক অজয়কুমারের প্রয়াস সফল।

ছবিটি দেখার পর দর্শকের মনে যখন বিচারবোধ জাগবে তখন এর অনেক ঘটনার অপরিহার্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। যেমন—নায়কের সঙ্গে বাসন্তীর বৃষ্টির দিনে দেখা হয়ে যাওয়া, বাসন্তীকে নায়কের গাড়িতে তুলে নেওয়া, গাড়ি হঠাৎ বিকল হয়ে পড়া, বেশী রাত্রিতে ফেরার অপরাধে বাসন্তীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, নায়কের সঙ্গে

দে প্রোডাকসন্সের "সঞ্চারিণী"-র একটি দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার

বাসন্তীর এক বাড়তে রাত কাটানো এবং উত্তরের একত্রে নির্জন বাড়িতে রাত্রিবাপনের ফলে বাসন্তীর সন্তানসম্ভবা হওয়া। এই সব ঘটনা অবাস্তব নয়। কতকগুলি বাস্তব-সমর্থিত ঘটনাকে সুবিধে মত সাজিয়ে নেওয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাপ্রবাহে দর্শক যে অবাস্তবতার স্পর্শ অনুভব করেন সেটা হল আসলে প্রস্তুতি-নিরপেক্ষ আকস্মিকতা। ছায়াছবিতেই বুঝি এই আকস্মিকতা সম্ভব। এই আকস্মিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বাসন্তীর সৎ-পিতা স্বার্থপর, লোভী, কুচক্রী, দয়া-মায়াহীন। শহরের উপকণ্ঠে নিজের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও নায়কের একটি নিজস্ব ফ্ল্যাট রয়েছে যেখানে আইনজীবী নায়ক রাত্রি-বাসও করে।

নায়ক জয়ন্ত বিবেকহীন নয়। বাসন্তীর দুর্ভোগের জন্য সে দায়ী। তাই বাসন্তীকে সে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে বিয়ে করবে বলে। এমন একটি সময়ে সে বাসন্তীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যখন তার ধারণা যে, শকুন্তলা অর্থাৎ তার প্রণয়িনী তাকে প্রবঞ্চনা করেছে।

বি এ পি প্রোডাকসন্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র "কাজল"এর একটি স্ত্রীচরিত্রে কমলা মুখোপাধ্যায়

কিন্তু এই ঘটনার পরেই শকুন্তলা ফিরে আসে এবং জয়ন্ত জানতে পারে যে, তার প্রেমাস্পদা স্বৈরিণী নয়।

পরের উপাখ্যান সহজেই অনুমেয়। বিবেক ও বাসনা, কর্তব্য ও প্রণয়ের দ্বন্দ্বে নায়ক জর্জরিত। দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা তার কী-ভাবে শেষ পর্যন্ত এল এবং বাসন্তীর প্রতি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী-করে ঘটল তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর পরিণতি। ছবির দুটি প্রণয়োপাখ্যানের একটিতে রয়েছে বাসন্তী ও নায়কের বন্ধু প্রকাশ, অপরটিতে জয়ন্ত ও শকুন্তলা। ওদের প্রণয় মিলনে সার্থক হবে—এই আভাসের মধ্যেই চিত্র-নাট্যের যবনিকা।

চিত্রপরিচালক অজয়কুমার সুষ্ঠু প্রয়োগ-ধারার ভেতর দিয়ে চিত্রকাহিনীর নাট্য-আবেদনটিকে উজ্জ্বল করে তোলার কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির দু'-একটি দৃশ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও পরিচালক কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যে রাত্রে নির্জন বাড়িতে বাসন্তীর সান্নিধ্যে নায়কের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, তার পরের দিন সকালে নায়কের প্রতিকৃতি মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া এবং তাতে কাদামাটির প্রলেপ লাগার ব্যঞ্জনাটি সুকল্পিত।

চিত্রনাট্যে কষ্টকল্পিত ঘটনা রয়েছে একাধিক। অনাবশ্যক ঘটনাও আছে। যেমন হোটেলে এক উন্নাসিক আধুনিকার সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎকার। এই ঘটনার প্রয়োজনীয়তা দুর্বোধ্য। ছবির আদালত-দৃশ্যগুলি সুবিন্যস্ত। চিত্রনাট্য স্বচ্ছন্দ-গতি।

ছবির নায়ক-চরিত্রের রূপ দিয়েছেন শম্ভু মিত্র। নায়ক-চরিত্রে তাঁকে মানায়নি। বিশেষ করে ছবিতে তাঁর অল্পবয়সীয়া প্রেমাস্পদার পাশে। শ্রীমিত্রের অভিনয়-দক্ষতা এ-ছবিতে লক্ষণীয়। তবুও তাঁর অভিনয় যদি দর্শকের মন তেমন করে নাড়া না দেয় তবে তার জন্য দায়ী অভিনেতার অস্বাভাবিক বাচনভঙ্গি।

বাসন্তীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রর অভিনয় কয়েকটি নাট্যমুহূর্তে সংবেদনশীল। আদালতের কাঠগড়ায় তাঁর নিরুচ্চার অভিব্যক্তি সুন্দর। কিন্তু তাঁর কথা বলার ভঙ্গি কৃত্রিম। অকারণে তিনি ছবিতে জড়িয়ে জড়িয়ে অস্ফুটস্বরে তাঁর সংলাপ উচ্চারণ করেছেন। প্রণয়-মুহূর্তে তাঁর অভিনয় এই কারণেই বিশেষ করে মরমী হয়ে উঠতে পারেনি। লিপস্টিকে চর্চিত তাঁর ওষ্ঠ একাধিক দৃশ্যে দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাঁর অভিনীত চরিত্রের জন্য প্রসাধন মোটেই উপযোগী নয়।

শকুন্তলার রূপসজ্জায় লিলি চক্রবর্তীর অভিনয় সুন্দর, স্বচ্ছন্দ। বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তে তিনি তাঁর আবেগমণ্ডিত অভিনয়ে দর্শকমনকে অভিভূত করেন। একজন

শক্তিশালী অভিনেতার পাশে থেকে চরিত্রটিতে তিনি যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রকাশের চরিত্রে সবিতাব্রত দত্তের অভিনয় সাবলীল ও মনোজ্ঞ। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস ও অপর্ণা দেবী। অন্যান্য চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন সীতা মুখোপাধ্যায়, আরতি মৈত্র, তুলসী চক্রবর্তী ও শিশির বটব্যাল।

সঙ্গীত-পরিচালক ভি বালসারা ছবির বিভিন্ন নাট্যদৃশ্যের জন্য মনোরম আবহ-সুর রচনার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। একটি বিশেষ দৃশ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রয়োগ পরিচালকের কল্পনাশক্তি ও রসজ্ঞানের পরিচায়ক। রিনি চৌধুরীর গাওয়া "সর্ব খর্বতারে দহে" রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি সুশ্রাব্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে প্রশংসা পাবেন আলোকচিত্রশিল্পী দেওজীভাই ও চিত্রসম্পাদক মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের শব্দগ্রহণ সুষ্ঠু। ছবির সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিকগঠন পরিচ্ছন্ন।

"নান্‌হে মুন্‌হে সিতারে" নামক পুতুল চিত্রের স্রষ্টা অজয় চক্রবর্তী

ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-পরিচালনায় ছবির আবহ-সুর রচনার কাজ শেষ হয়েছে।

জন্ম-কলঙ্কে বিড়ম্বিত এক বাঙালী যুবক বাংলার বাইরে গিয়ে পরম সাহসিকতায় কীভাবে উপনিবেশ গড়ে তোলে, মর্মসহচরী দয়িতা ও আত্মজাকে নিয়ে তৈরী তার সুখের সংসারে কেমন করে একদিন বেদনার কালোছায়া নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত কী করে প্রসন্ন প্রভাতের আলোয় আবার তা ভরে ওঠে তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর রসকেন্দ্র-বিন্দু গড়ে উঠেছে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তপন সিংহ।
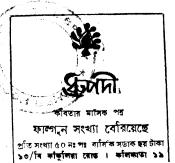
চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে দুটি ছবি মুক্তিলাভ করছে। একটি বাংলা, অপরটি হিন্দী। বাংলা ছবিটির নাম "সঞ্চারিণী", হিন্দীটি হল : "সারা জাহাঁ হামারা"।

...দে প্রোডাকসন্স-এর **সঞ্চারিণীর** আখ্যান-ভিত্তি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মর্মস্পর্শী গল্প। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের আনন্দ-বেদনা ও আশা-নিরাশার পরিমণ্ডলে এই কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। সুশীল মজুমদার ছবিটির পরিচালক। বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রের রূপদান করেছেন। অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, লিলি চক্রবর্তী, শোভেন লাহিড়ী, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন কালীপদ সেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্মস-এর **সারা জাহাঁ হামারা** ছবিটির কাহিনী প্রেম ও মানবতার আদর্শে আবেগমণ্ডিত। ছবির তিন প্রধান শিল্পী হলেন প্রেমনাথ, শ্যামা ও আজরা। প্রকাশ ছাবরা ছবির প্রযোজক-পরিচালক।

• • •

সুবোধ ঘোষের বহুপঠিত উপন্যাস "নাগলতা" অবলম্বনে তৈরী মুভী টক-এর প্রথম নিবেদন **শিউলি বাড়ি** ছবিটির মুক্তি-লগ্ন আসন্ন। এই সপ্তাহে ইণ্ডিয়া
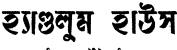
পীযূষ বসু পরিচালিত এই ছবির মুখ্য চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, মণি শ্রীমানী, অমল চট্টোপাধ্যায়, চন্দন রায়, তরুণকুমার, মিহির ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীরা।

* * *

অসিত সেনের পরিচালনায় বাদল পিকচার্স-এর আগামী নিবেদন "আগুন"-এর চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। নারীমনের গূঢ় কামনা, তার বেদনা, বিভ্রম ও অবক্ষয় এবং পুরুষের প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রণয়াধিকারকে ঘিরে রচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ কাহিনী "আগুন"-এর চিত্ররূপের প্রধান ক'টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, নির্মলকুমার ও পাহাড়ী সান্যাল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

* * *

নটরাজ প্রোডাকশনের প্রথম প্রয়াস নৃত্যশালা ছবিটির শুভ মুহূর্ত-অনুষ্ঠান সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। নৃত্যগীতবহুল এই ছবির পরিচালনা, সুর-রচনা ও নৃত্য-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন গুরু হীরালাল। চিত্র-কাহিনীর রচয়িতাও তিনি। ছবির মূল চরিত্রগুলির শিল্পী হলেন পাহাড়ী সান্যাল, গণেশ হীরালাল, তন্দ্রা বর্মণ ও নৃত্যরাজ হীরালাল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ছবির গানে কণ্ঠদান করেছেন।

* * *

গত সপ্তাহে ইণ্টারন্যাশনাল মুভিজ-এর "অনামিকা" ছবিটির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ছবিটির পরিচালক হলেন হেমেন গুপ্ত। ছবির শুভ-সূচনা অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দেন দেবকীকুমার বসু।

নাট্যাভিনয়

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা কথাকলি গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নিউ এম্পায়ারে পরশুরাম রচিত তিনটি গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন। গল্প তিনটি হল: "সরলাক্ষ হোম", "বটেশ্বরের অবদান" ও "রাতারাতি"। গল্প তিনটির নাট্যরূপ রচনা করেন প্রকাশ পাল।

পরশুরামের তিনটি গল্পেই ব্যঙ্গের উপকরণ আছে। কিন্তু এই উপকরণকেও ছাড়িয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ, সরল হাস্যরস। বলতে দ্বিধা নেই, কথাকলির শিল্পীরা তাঁদের প্রাণোচ্ছল অভিনয়ে এই রস আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

সাবলীল স্বচ্ছন্দ অভিনয়, সুরচিত নাট্য-রূপ ও সুষ্ঠু প্রয়োগকর্ম—এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নাটক তিনটি মরমী ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। দর্শকরাও অনাবিল আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করেন। ভিন্নধর্মী নাট্যবস্তু নিয়ে কথাকলি-গোষ্ঠীর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাধুবাদের অধিকারী।

অভিনয়ে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন প্রকাশ পাল, ভূপেন মিত্র, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব মিত্র, উমা দাশগুপ্ত, ইলা বসু ও সুনীল বসু। অন্যান্যদের মধ্যে সুঅভিনয় করেছিলেন অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুশীল দে, ভৌমিক অমিত দে, অনুপম দাশগুপ্ত, সীতেন চৌধুরী, রমেন সরকার, সুরেন চক্রবর্তী, রথীন রায়, অমিত বসু, মীনাক্ষী রায় প্রভৃতি।
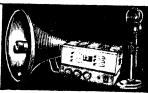
DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 3rd MARCH, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ১৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

জয়-পরাজয়

ভোটযুদ্ধের ফলাফলে বড় রকমের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। না পশ্চিমবঙ্গে, না ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে। পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচনেই জনসাধারণের রায় সর্বসাকুল্যে কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছে। নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি হল দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, প্রথমে রাজ্য বিধানসভায়, তার পর লোকসভায়। ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচনে যে-ভাবে ভোট নেওয়া হয় তাতে বিধানসভার আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে লোকসভার আসন লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একসূত্রে বাঁধা। বিধানসভার পাঁচ-সাতটি আসনের নির্বাচকমণ্ডলী লোকসভার এক একটি আসনের প্রার্থীদের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন। কাজেই রাজ্য বিধানসভার আসনের জন্য যে দলের প্রার্থীরা বেশী ভোট পান সাধারণত সেই দলের প্রার্থীরাই লোকসভার আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, কখনও কখনও ঘটেও, যদি কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদাতারা অনেকে বিধানসভার আসনের জন্য এক-দলের প্রার্থীকে, আবার লোকসভার আসনের জন্য অন্য দলের অথবা নির্দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেন। সে যাই হোক, ভোটদাতাদের পছন্দ ব্যাপারে বিধানসভা এবং লোকসভার প্রার্থী নির্বাচনে খুব বেশী বৈপরীত্য দেখা যায় না। বিধানসভার নির্বাচনে ভোট যেখানে কংগ্রেসপ্রার্থীর পক্ষে বেশী সেখানে লোকসভায় কংগ্রেসপ্রার্থীর পক্ষেও প্রায় সমান পরিমাণে বেশী ভোট পড়ে। কাজেই লোকসভায় কংগ্রেসদলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ প্রত্যেকটি সাধারণ নির্বাচনেই অবধারিত; যতদিন অধিকাংশ রাজ্যের বিধানসভায় কংগ্রেস-দল সবচেয়ে বেশী আসন জিতছে ততদিন লোকসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকবেই। এবারের সাধারণ নির্বাচনেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কারণ কংগ্রেস-বিরোধী কোন দলই কোন রাজ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় প্রচারযুদ্ধ অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে, সাধারণের মনে ভোটযুদ্ধে হার-জিত সম্পর্কে নানারকম অবাস্তব ধারণা সৃষ্টি করে। সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিম বাংলাতেই সেটা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে অনুভূত হয়েছে। তার একটা কারণ, সারা ভারতবর্ষে এই একটিমাত্র রাজ্যেই কংগ্রেস দলকে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জোটের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও কংগ্রেস-বিরোধী দল যে নেই তা নয়। তবে অন্য কোন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বামপন্থী জোটের মত সংগঠিত কংগ্রেস-বিরোধী কোন প্রতিপক্ষ ভোটের লড়াইএ নামেনি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে স্বতন্ত্র দল, জনসংঘ, প্রজাসমাজতন্ত্রী এবং সোস্যালিস্ট পার্টি। পাঞ্জাবের অকালী দল অথবা মাদ্রাজের দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাঘম দলের কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকা তুচ্ছ করবার মত নয়। কিন্তু কংগ্রেস-বিরোধী এই সব দলের একটিও আশা করেনি যে তারা ভোটযুদ্ধে জিতে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। সেরকম আয়োজন বা প্রস্তুতিও তাদের ছিল না; তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল কোন কোন রাজ্যে কতকগুলি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিকল্প সরকার গঠনের দর্পিত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল কেবল পশ্চিমবঙ্গে। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও প্রভাবাধীন ষট্‌বাম জোট পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের ধুয়া তুলে নির্বাচনী আসর সরগরম করেছিল। বামপন্থী জোটের নির্বাচনী প্রচার কৌশলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কিছু অংশ বিভ্রান্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে বামপন্থী জোটের এই চ্যালেঞ্জের ফলে অন্যবারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সংগঠন যে অনেক বেশী শক্তিশালী ও কর্মকুশল হয়েছে তার প্রমাণ নির্বাচনের ফলাফল। ভোটযুদ্ধে জিতে কম্যুনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী জোটের ক্ষমতা দখলের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের রায় কেবল কংগ্রেসের পক্ষে যায়নি, উপরন্তু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, কম্যুনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থী জোটের বিকল্প সরকার গঠনের ফাঁদে ধরা দিতে পশ্চিমবঙ্গবাসী আদৌ রাজী নয়।

সাধারণ নির্বাচনে অন্য সব রাজ্যে কংগ্রেসের জয় সম্পর্কে কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা ছিল না। কংগ্রেস দলের সব ক'টি রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কাজেই অপ্রত্যাশিত নয়। ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন প্রার্থীর, যেমন মধ্য-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কাটজুর পরাজয় বিস্ময়কর। ডঃ কাটজু সামান্য ভোটে পরাজিত হয়েছেন তাঁর পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী একজন জনসংঘ দলীয় প্রার্থীর কাছে। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অন্যান্য বিরোধী দলের তুলনায় জনসংঘই কংগ্রেসের প্রবলতম প্রতিপক্ষ। তবে দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনসংঘের এবার পরাজয় ঘটেছে; নির্বাচন বিশেষজ্ঞগণের অনুমান ভোটের গতি এবার দেশের সর্বত্রই কংগ্রেসের দিকে। অবশ্য পাঞ্জাবে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও মন্ত্রি-মণ্ডলীর অনেকে ভোটযুদ্ধে হয় অল্পের জন্য পরাজিত হননি কিম্বা পরাজয় স্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপসিং কাইরো মাত্র চৌত্রিশ ভোটে জয়ী হয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়ের অসাধারণ সাফল্যই এবারের সাধারণ নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহানগরী কলকাতায় এবং সুদূর শালতোড়ায়, দুটি নির্বাচন কেন্দ্রেই ডঃ রায় তাঁর কম্যুনিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপুল ভোটে পরাজিত করে অভূতপূর্ব শক্তিমত্তা ও জনপ্রিয়তার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায়, জনসাধারণের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি বিস্তারে উদ্‌গত প্রাণ অক্লান্ত কর্মী বর্ষীয়ান এই মহা-শক্তিধরকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

নির্বাচন দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হল।
ভারতের চেহারা এবারও অপরিবর্তিত।
আগামী এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে।
গোপন ব্যালটের দ্বারা কি?
আয়ুব
বিরোধীদল
মহাশূন্য আবিষ্কারে যৌথ প্রচেষ্টার জন্য ক্রুশভ কেনেডিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
'আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে—'

গত বছরের এপ্রিল মাসে মানুষ—শ্রীগ্যাগারিন—প্রথম মহাশূন্যে পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। "প্রদক্ষিণ করেন" বলা ঠিক হলো কিনা জানি না। প্রদক্ষিণ করার মৌলিক অর্থ—দেবমূর্তি বা পূজ্য ব্যক্তিকে ডাইনে রেখে পরিক্রমণ করা। বাংলায় অবশ্য প্রদক্ষিণ এবং পরিবেষ্টন আজকাল একই অর্থে চালু হয়ে গেছে। যাই হোক শ্রীগ্যাগারিন পৃথিবীকে ডাইনে রেখে ঘুরেছিলেন না বাঁয়ে রেখে, জানি না। হয়ত কাগজে বেরিয়েছিল, পড়েছিলাম কিন্তু মনে নেই। অথবা হয়ত মহাশূন্য পথে পৃথিবী পরিবেষ্টনের ক্ষেত্রে ডাইনে বাঁয়ের কথাটাই প্রযোজ্য নয়। হয়ত মহাশূন্যে ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক দিকটার চেয়ে তার কাব্যিক দিকটার আকর্ষণ লেখকের কাছে বেশি, সেইজন্য ঐ সব তথ্য যেগুলি খবরের কাগজের সাধারণ পাঠকের বোধগম্য সেগুলিও যেন মনের উপরে কোনো দাগ রেখে যায় না।

শ্রীগ্যাগারিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্যে যে-কথাটা মনে বসে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে অন্ধকার আকাশে গ্রহরূপে পৃথিবীকে দেখার কথাটা। পৃথিবীর বাতাবরণের বাইরে থেকে পৃথিবীকে সেইরকম করে দেখতে ইচ্ছা করে। সেই দেখা থেকে, পৃথিবীর শোভা বলতে যা বুঝায় তা পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর শোভা বলতে যা বুঝায় সেটা নিকটের জিনিস। নিকট থেকেই পৃথিবী সুন্দরী। তিন, চার, পাঁচ হাজার ফুটের বেশি উঁচু থেকে তার রূপ ক্রমশ 'রিলিফ ম্যাপের' সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠতে থাকে। চাঁদ এবং নদী, সমুদ্র, গাছপালা জীবজন্তুপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে কত তফাত কিন্তু বেশি উঁচু থেকে পৃথিবীকে খালি চোখে দেখলে ছেলেবেলায়-পড়া বই-এ চান্দ্র দৃশ্যের ছবির কথা মনে পড়ে। কিন্তু মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখে মুগ্ধ হবার যে কথা শ্রীগ্যাগারিন বলেছিলেন সেটা পৃথিবীর 'দৃশ্য' দেখে মুগ্ধ হবার কথা নয়। আকাশে পৃথিবীকে একটি গ্রহরূপে দেখলে যে-রূপের অনুভূতি হয়—তার কথা। পৃথিবী থেকে চন্দ্র, সূর্য, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতিকে দেখলে যে-রকম অনুভূতি হয় এটা বোধ হয় তার সঙ্গে তুলনীয় যদিও এপর্যন্ত মহাশূন্যবিহারী মানুষ পৃথিবী থেকে যতদূর গিয়েছে সেটা পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহ উপগ্রহের দূরত্বের তুলনায় কিছুই নয়।

যাই হোক মহাশূন্যে মানুষের গমনাগমনের সংবাদ পড়ে বর্তমানে লেখকের মনে 'অসাধ্য সাধন', 'মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রা' ইত্যাদি বড়ো বড়ো কথা কিছুই মনে আসে নি যদিও ঘটনাটা যে খুবই চমকপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান লেখকের মনে প্রথমেই যে-কথাটা এসেছিল সেটা হল 'একবার ঐ রকম ঘুরে আসতে পারলে হোত।' অসম্ভব কল্পনা। মহাশূন্যে বিহার করতে হলে শরীরটাও যে নানা পরীক্ষায় পাশ করা একটা অত্যন্ত উঁচুদরের যন্ত্রের মতো হওয়া চাই সেটা কোথায় পাব? আধিব্যাধিপূর্ণ সাধারণ মানুষ যাত্রী হতে পারে এমন মহাশূন্যবিহারী যান কবে—কতদিনে তৈরী হবে?

বলা যায় না, যতদিন লাগবে বলে আমরা অনেকে ভাবছি ততদিন না লাগতেও পারে। আসলে বর্তমান বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক যুগে কোন ব্যাপারের উন্নতি বা অগ্রগতি কত তাড়াতাড়ি হবে সে-বিষয়ে কোনো ধারণা করাই মুশকিল। কোনো একটা দিকে কিছুটা চলার পরে গতির বেগ হঠাৎ এমন বেড়ে যেতে পারে যে তার হিসেব রাখা কঠিন হয়ে উঠে। তখন মনে হয় উন্নতির বা অগ্রগতির যেন কোনো সীমা নেই। কিন্তু সেটা হয়ত ভুল ধারণা। অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলেও কোনো একটা ক্রিয়া বা প্রসেস্ এক জায়গায় এসে থেমে যেতে পারে। তবে মহাশূন্যবিহারী যান নির্মাণের ব্যাপারে মানুষের শক্তির যে-বিকাশ দেখা যাচ্ছে সেটা অন্তত আরো বেশ কিছুদূর না এগিয়ে নিশ্চয়ই থামবে না।

মহাশূন্যে বিচরণ করার শক্তিলাভের ব্যাপারে বৃহৎ জয় প্রথম রাশিয়ার হয়। এই কীর্তির বৈজ্ঞানিক গৌরব যাঁদের প্রাপ্য তাঁদের নাম সাধারণ লোক জানে না, তাঁদের জানানো হয় না। পৃথিবীর কাছে শ্রীগ্যাগারিনের নামই মানুষের প্রথম মহাকাশবিহারের গৌরব বহন করবে। গত বছরের এপ্রিল মাসে শ্রীগ্যাগারিন প্রথম মহাকাশপথে পৃথিবী পরিবেষ্টন করেন। তার চার মাস পরে শ্রীটিটভ শ্রীগ্যাগারিনের চেয়েও অনেক বেশি সময় মহাশূন্যে বিচরণ করে আসেন। শ্রীগ্যাগারিন পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে গেল, তাতে বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগেছিল। শ্রীটিটভ একদিন এক রাত্রি মহাশূন্যে থেকে সতেরোবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। মহাশূন্যে মানুষ পাঠিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করানোর কীর্তি অর্জনের চেষ্টা আমেরিকায় চলছিল কিন্তু বারবার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অমুক দিন অমুক সময়ে হবে বলে ঘোষিত যাত্রা কোনো না কোনো কারণে অননুষ্ঠিত থেকে গেছে অথবা আরম্ভ করতে গিয়ে গোলমাল হয়ে গেছে। এজন্য আমেরিকানদের লজ্জা এবং ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ভয়ও কম হয় নি, কারণ এই মহাকাশ যানের সঙ্গে রকেট-বিদ্যার এবং তার সঙ্গে দূর পাল্লার মারণ অস্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া এই ব্যাপারে যে আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে এই আশঙ্কায় আমেরিকানরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে তারা বোধ হয় একটু স্বস্তি বোধ করছে। ঐ তারিখে আমেরিকার শ্রীগ্লেন মহাশূন্য পথে পৃথিবী পরিবেষ্টন করেন। তিনি প্রায় পাঁচ ঘণ্টা মহাশূন্যে ছিলেন এবং তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। রাশিয়ার 'স্পেস্'-বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রীরা এখনো নিশ্চয়ই আমেরিকানদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছেন কিন্তু আমেরিকানদের মনে এতদিন যে আতঙ্ক ছিল তার দেখা বোধ হয় এখন কিছুটা, অন্তত সাময়িকভাবে, উপশম হলো।

কারো কারো মতে এতে নাকি রুশ-মার্কিন সম্বন্ধের আপোসচেষ্টার সুবিধা হবে। একটা থিয়োরি আছে যে, দুপক্ষেরই কর্তাদের আপোস করার আগ্রহ আছে, কিন্তু তাঁরা যতটা এগুতে চান স্বদেশের জনমত এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্য ততটা এগুতে পারেন না। এই থিয়োরি অনুসারে শ্রীক্রুশ্চেভ পশ্চিমাদের সঙ্গে একটা মিটমাট চান, এবং সেই জন্যই নাকি রাশিয়া আবার নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আরম্ভ করেছে। একশ মেগাটনের বোমা ফাটিয়ে রাশিয়ার অস্ত্রশক্তি সম্বন্ধে সোভিয়েট প্রজাদের আশ্বস্ত করা হল, এখন যদি কোনো কোনো ব্যাপারে পশ্চিমাদের কিছু ছেড়ে দিয়েও শ্রীক্রুশ্চভ একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন তাতে সোভিয়েট জনমত আতঙ্কিত হবে না বা শ্রীক্রুশ্চেভের নীতির যারা বিরোধী তারা সোভিয়েট জনমতকে আতঙ্কিত করার সুবিধা পাবে না। তেমনি আমেরিকায় যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েও হোক অথবা মহাশূন্যে গমনাগমনের শক্তির প্রমাণ দেখিয়েই হোক মার্কিন প্রজাদের মার্কিন অস্ত্রবলের প্রাচুর্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত করা যায় তবে প্রেসিডেন্ট কেনেডি শ্রীক্রুশ্চেভের সঙ্গে আপোসের কথা বলতে সুবিধা পাবেন—প্রেসিডেন্ট কেনেডি দুর্বলতাবশত মার্কিন-স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে মিটমাট করতে যাচ্ছেন, এরূপ যুক্তি দিয়ে শ্রীকেনেডির রাজনৈতিক বিরোধীরা মার্কিন জনমতকে আতঙ্কিত করতে পারবে না। দুই পক্ষই যে অস্ত্রশক্তির বৃদ্ধির নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত করতে এতো আগ্রহশীল তার কারণ দুই পক্ষের কর্তারাই পরস্পরের মধ্যে আপোস চান—এই সান্ত্বনাদায়ক থিয়োরিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারলে আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু সকলের সেরূপ বিশ্বাস করার শক্তি নেই।

যাই হোক, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের দ্বারা সর্বনাশই যদি মানুষের ভাগ্যে লেখা থাকে তাহলেও সেটা ঘটার আগে মহাশূন্যগামী যান নির্মাণের ব্যাপারে এমন উন্নতিও হয়ে যেতে পারে যে, আমাদের মতো সাধারণ লোকেরাও একবার পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীর গ্রহরূপ দর্শন করে আসতে পারে।

* * *

আলবেনিয়া, কঙ্গো, পাকিস্তান—নানা জায়গার পরিস্থিতি উল্লেখ এবং আলোচনা-যোগ্য হয়ে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে মহাশূন্যের কথা না তুলে আজ সেইগুলোর সম্বন্ধে দু-চার কথা লেখা উচিত ছিল। তবে সুবিধার কথা এই যে, উপরোক্ত কোনো পরিস্থিতিই পালিয়ে যাবার মতো নয়, এক সপ্তাহ পরেও মন খারাপ করার মতো যথেষ্ট লেখার বিষয় থাকবে।

২৪-২-৬২

অ্যানেক্‌স

বাতায়নিক

নাম নিয়ে সত্যি ফাঁপরে পড়েছিলাম। কি নাম দেওয়া যায় এই পাতাটার? কি নাম দিলে এ পাতার সাড়ে বত্রিশ ভাজা মেশানো ভাবনা চিন্তা কল্পনাকল্পনার কিছু হদিস মিলতে পারে। আকাশপাতাল ভেবে অনেক নামই মাথায় এসেছিল। নাম খোঁজার হাংগামা যেমন, তেমনি একটা বিলাসও আছে। এক-আধটা নাম বেশ চমৎকার লেগেছে। কিছুক্ষণের জন্যে মনে ধরেছে। যেমন সমাচার সমুচ্চয়। মানে না হোক মজা ছিল বোধহয় নামটায়। সেকেলে শব্দের একটা রণন! সেকেলে শব্দের এই রণন অনেক নানা রকমের। কখনো সে শব্দ মনে একটা আবেশ আনে কল্পনা ও স্মৃতির সঙ্গে মেশানো। ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় কি মূলমধ্যমিকা নাম শুনলে যেমন। ওগুলির অর্থ জানি বা না জানি। পুরনো বৌদ্ধ ন্যায়ের একটি বই ও দিব্যটীকা সহ গ্রন্থ, এ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেও সে আবেশ কাটে না। বিনিশ্চয় ও কারিকা শব্দের প্রয়োগ আর আমাদের ভাষায় নেই বলেই তারা যেন মধুর এক রহস্যে মণ্ডিত হয়ে গেছে। আরেক ধরনের পুরানো সেকেলে শব্দের অনুষঙ্গ আলাদা। শুনলে মনে যেন ঈষৎ কৌতুকের হাসি জাগায়। সমাচার সমুচ্চয় নাম হয়েছিল সেই রকম। সমুচ্চয় ত নয়ই, সমাচার শব্দেরও এক কবিতায় ছাড়া আমাদের যুগের ভাষায় গতি-বিধি আর নেই। সমাচার কথাটা খৃষ্টান প্রচারকরাই বোধহয় প্রথম চালু করেছিলেন বাংলায়। লূক কি মথি লিখিত সুসমাচারের সাহায্য পেয়েও সে শব্দ বেশী দিন কাল-স্রোত পার হতে পারেনি। বাতিল শব্দের চোরকুঠরিতে জমা হয়ে আছে। সেই চোর-কুঠুরি থেকে উদ্ধার করে প্রথমটা খুশিই হয়েছিলাম। যাঁদের শোনালাম তাঁদের কেউ নাক সেঁটকালেন না, কিন্তু কেউ বললেন বড় ভারী কেউ বা বললেন বেমানান। সুতরাং নিজের মমতাটুকু বিসর্জন দিয়ে আবার চোরকুঠুরিতেই ফেরত পাঠাতে হল। নাম কিন্তু একটা না দিলে ত নয়। নাম নিয়ে অত ভাবনা কিসের যাঁরা বলেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। নামে কি আসে যায়, বলে সেই বিখ্যাত কবিতার কলিটি সত্ত্বেও। আসে যায় বই কি! গোলাপ গন্ধ ঠিকই দেয় বটে, রূপ আর গন্ধের সঙ্গে মিলেই গোলাপ শব্দটা হয়ত মধুর হয়ে উঠেছে। তবু বিদঘুটে একটা নাম যদি তার

থাকত মনের সুর কেটে যেত না কি! সুন্দর জিনিসের বিদঘুটে নাম হয় না যদি কেউ মনে করেন, তাহলে কানের সামনেই জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃথিবীর মধুরতম একটি বস্তুর বিদঘুটে বেসুর একটি আখ্যা,—বিদঘুটে অন্তত পাত্র বিশেষে। হিন্দি ছবি এক-আধবারও যিনি দেখেছেন মহব্বৎ শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়েছে নিশ্চয়ই। মহব্বৎ মানে প্রেম জেনে প্রথমে ত প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড়। বিদঘুটে লাগাটা হয়ত কানের অভ্যাস, কিন্তু ভাষায় কানের অভ্যাসটাই ত সব। না, নামে অনেক কিছু আসে যায়। শুধু নাম নিয়ে বাড়াবাড়িটা ভালো নয় নিশ্চয়। যেমন ছেলেমেয়ের নামকরণ নিয়ে আমরা অনেকে করে থাকি। ছটির পর সাতটি কন্যা [illegible] হলে আগে ঘেন্না পিত্তি ডেকে মনের ক্ষোভ মিটত জানি। এখন আশা করি তার প্রয়োজন হয় না। এখন কিন্তু উল্টো আতিশয্যই, যাকে বলে আদিখ্যেতা বেড়েছে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ কত হাজার কবিতা লিখেছেন ঠিক জানি না, কিন্তু নামকরণের তাগাদা তার চেয়ে বোধহয় কম পাননি। রবীন্দ্রনাথ নেই, তাঁর জায়গায়, ছোট ন' কবি সাহিত্যিক যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ বোধহয় রেহাই পান না। বাপ মার পরিচিত হলে ত আর কথাই নেই। নামের ফরমাশ রাখতে নাকালের শেষ। নাম আবার যেমন তেমন হলে চলবে না। ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত না হয়। তার মধ্যে বিশেষের ছাপ চাই অর্থাৎ অসাধারণত্ব। বাংলা দেশের জন্মহার নিশ্চয়ই পড়তি নয়। সবাই অসাধারণ নাম দিতে চাইলে ত অভিধানেও কুল পাওয়া যায় না। আর অসাধারণ ত অনেক প্রকারের হতে পারে। প্রায় আঁতকে ওঠবার মত। এ যুগের নয় আরেক যুগের সেরকম নাম একটি অন্তত জানি। বিশ্বাস কেউ করুন বা না করুন স্বর্গত এক ভদ্রলোকের নাম ছিল নির্দুঃখীচরণ। নির্দুঃখীচরণ বেশ পরিণত বয়সে গত হয়েছেন বলে জানি। বাপমার দেওয়া নামের মধ্যে যে আশীর্বাদ প্রচ্ছন্ন ছিল, তা অন্য সব ক্ষেত্রে যতই ফলুক এই নামের ব্যাপারে তাঁকে আজীবন কাঁদিয়ে ছেড়েছে বলেই সন্দেহ হয়। নির্দুঃখীচরণ অবশ্য যাকে বলে একেবারে চরম উৎকট দৃষ্টান্ত, কিন্তু বাপমার নামকরণের সোহাগে ছেলেমেয়ের চিরবিড়ম্বিত হয়ে থাকার ব্যাপার এ যুগেও বিরল নয়। ছেলেমেয়ের নামের বেলা এস্পার-ওস্পার দুই এড়িয়ে মাঝারি মানানসই নাম দেওয়াই সংগত নয় কি? ছেলেমেয়ে কেউকেটা হলে নামটা যাতে সোনার কলসীতে ভাঙা সরার ঢাকনি না হয় আবার তারা সামান্য সাধারণ হলে কাকতাড়ুই-এর মাথায় জরির তাজ হয়ে না বিদ্রূপ করে। চেনবার জন্যে, চিহ্নিত করবার জন্যেই নাম, সে নাম সহজ সংক্ষিপ্ত হলে ত সব দিকেই সুবিধে। অবশ্য পুরো-পুরি যান্ত্রিক সুবিধার জন্যে রক্তকরবীর রাজ্যের ক তিন ছ দশ নামের কথা বলছি না। নামের একটা ধ্বনিমূল্য ও মাধুর্য না থাকলে নয়। নামের অর্থ থাকাটা কিন্তু একেবারে অপরিহার্য কি? নামের অর্থ ধরে কাউকে নিশ্চয় আমরা স্মরণ করি না। অর্থ-গৌরবে দামও বাড়ে না কারুর। সুতরাং নামটা শুধু সুশ্রাব্য হলেই যথেষ্ট নয় কেন? সব দেশেরই নামের বিবর্তনের ইতিহাস নিশ্চয়ই মজার। আমাদের দেশে গত পঞ্চাশ বছরেই ত চোখের সামনে সব ধারা বদলাতে দেখছি। ক্ষেমংকরী, কাদম্বিনী, অঘোর-ময়ী কি মোক্ষদার মত নাম এখনকার মেয়েদের মধ্যে অভাবনীয়, ছেলেদের হেমেন্দ্র, রবীন্দ্র, নরেন্দ্র জাতের নাম এখনো সচল আছে, কিন্তু পাঁচ-কড়ি, সাতকড়ি, বিহারীলাল যদুপতিরা বিলুপ্ত না হলেও এখনকার কিশোর তরুণ-দের মধ্যে একান্ত বিরল। ঠাকুর দেবতার নামের ভিত্তিতে কিংবা কোন একটা অর্থ মনে রেখেই নামকরণ করার রীতি চলে আসছে এতকাল। সে অর্থ যদি বাদ দেওয়া হয়, এমন কিছু লোকসান হয় বলে ত মনে হয় না। আমাদের মন যখন দেশকালের সংকীর্ণগণ্ডিতে আর বদ্ধ নয়, তখন নাম সংগ্রহের ক্ষেত্র ছড়িয়ে দিতে আপত্তি কিসের? যতই ওকালতি করি আপত্তি সহজে যাবার নয় জানি। এক সোদরপ্রতিম বন্ধুর পুত্রসন্তানের নামকরণ করে কোন এক সাহিত্যিকের বিপদের কথা জানি। আদ্যাক্ষর মিলিয়ে বৈশিষ্ট্য আর নতুনত্ব দেবার জন্যে তিনি নাকি প্রস্তাব করেছিলেন নবজাতকের সিন্ধবাদ নাম দেবার। ভেবেছিলেন আরব্য উপন্যাসের সমস্ত রহস্য রোমাঞ্চমণ্ডিত এ নাম পেয়ে বন্ধু-দম্পতির আনন্দের আর সীমা থাকবে না। শুনেছি বন্ধুজায়া সে সাহিত্যিকের মুণ্ডপাত করে তাঁর মস্তিষ্কের চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। না, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাশিয়ার বিপ্লবের যত বড় নজিরই থাক নামের রাজ্যে ছোটখাট অদল-বদল হলেও যুগান্তকারী বিপ্লব সহজে হবার নয়। জগজ্জন হিতায় একটা বিপ্লবের প্রয়োজন যদিও একান্ত বলে মনে হয়। সে বিপ্লব ঠিক নামের ক্ষেত্রে নয়, পদবীর ব্যাপারে। এই পদবীরূপ লেজুড়টি দুনিয়ার অনেক অনর্থের মূল। এই পদবীর ছলে মিথ্যা জাত্যাভিমান থেকে শুরু করে আমাদের মনের অনেক সংকীর্ণ দম্ভ ও আত্মম্ভরিতাই লুকিয়ে থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত মূল্য বংশপরিচয়ের ঠেকোয় ঠেলে তোলা হয়। যে সাম্যের সমাজ আমাদের আদর্শ, পদবীর এই লেজুড়টুকু খসালে অলীক ভেদাভেদ ঘুচে সেদিকে অগ্রসর হবার রাস্তা যে সুগম হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অমুক জানা, কি অমুক চক্রবর্তী, অমুক মিত্র কি সিংহ না হয়ে আমরা যদি শুধু স্বনামের পরিচয়টুকুই বহন করি, তা-হলে মহাভারত অশুদ্ধ ও দুনিয়া অচল হবার কোন কারণ নেই। কোন কোন ধর্মে ও সমাজে এ রেওয়াজ আগে থাকতেই আছে। অবশ্য পদবী না থাকলেও তার জড় সেখানে একেবারে নেই এমন কথা বলতে পারব না। তবু তাও মন্দের ভালো।

ধৈর্য ধরে এতদূর পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম বলে যদি তাঁদের মনে হয় তাহলে বুঝব, শেষ পর্যন্ত এই পাতার যে শিরোনামাটি পেয়েছি তা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

পদবী বিলোপ কোনদিন সত্যি সম্ভব হবে কি না জানি না, কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামি ও ব্যক্তিগত অহমিকার উস্কানি ছাড়াই একটি দল প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধতা করবেন বলে মনে হয়। তাঁরা হলেন সামাজিক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী। মাটির তলায় যেমন লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকে এই পদবীর ভেতরেও মানবগোষ্ঠীর অনেক বিস্মৃত ইতিহাস তেমনি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের দেশের সামাজিক নৃতত্ত্বের গোড়া-পত্তনই ভালো করে হয়নি বললে হয়। তাঁদের সন্ধানী গবেষণার একটা বড় সূত্র কাজের শুরুতে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনায় বৈজ্ঞানিক-দের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। সেই উভয় সংকট যদি সত্যিই দেখা দেয়। কার দাবি আগে মানবার! অতীত না ভবিষ্যৎ?

শান্তিনিকেতন ঃ সাহিত্য সম্মেলন

সম্পাদক দেশ
সবিনয় নিবেদন,

গত ২০শে মাঘ ১৪ সংখ্যা 'দেশ'-এর নতুন শুরু হওয়া বিভাগ 'সাহিত্য সংবাদ' উৎসাহের সঙ্গে পড়তে গিয়ে রীতিমতো নিরাশ হলাম।

একথা ঠিক যে তিনদিনের সম্মেলনে যাঁরা নিবন্ধ পাঠ করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু অধ্যাপক নন যাঁরা তাঁদের সংখ্যাই বেশী ছিল। অনেক সাহিত্যিককেই যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তা আমরা সম্মেলনের আহবায়কের বিবৃতির দীর্ঘ তালিকা থেকেই জানতে পারি।

লেখকের যদি সম্মেলনটি ভালো না লেগে থাকে, তাহলে তিনি যুক্তি সহকারে সেটি জানিয়েই তো যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারতেন।

পরিশেষে এটুকুই জানাতে চাই যে, একাধিক অধ্যাপক আছেন যাঁরা সাহিত্যের প্রবেশদ্বার খুলে দিতে পারেন, ঘুরে ঘুরে দেখাতেও পারেন উন্মোচিত সেই জগৎকে। আবার এমন গ্রন্থ প্রণেতা সাহিত্যিকও আছেন যিনি কোনো দরজাই খুলতে পারেন না। এতেও কিছুই প্রমাণিত হয় না। সু-অধ্যাপক এবং প্রতিভাবান সাহিত্যিক একই ব্যক্তি, এমনও অনেক আছেন।

বিনীত
দীপক মজুমদার
শান্তিনিকেতন

আমাদের বক্তব্য

অধ্যাপকদের সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনও কটাক্ষ করবার অভিপ্রায় বিদুরের ছিল না। তবু যদি তাঁর লেখা থেকে কারও মনে হয় যে, সমগ্র অধ্যাপক সমাজই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য, তবে বিদুর তার জন্য দুঃখিত। আসলে 'অধ্যাপকসুলভ মনোভাব' বলে একটা কথা আছে। বিদুর মনে করেন যে ওই কথাটার দ্বারা এমন একটা মনোভাব আভাসিত হয়, যার মধ্যে ঔদার্য কম, যার পরিধি সংকীর্ণ, এবং নিজের গন্ডীর বাইরের ভাবনাকে যা বিচার করেও দেখতে

চায় না। বেদুরের ধারণা, শান্তিনিকেতনের সম্মেলনে আহূত অধ্যাপকরা যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কয়েকটিতে সেই গণ্ডী-বদ্ধ আত্মতুষ্ট মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছিল। বস্তুত, অধ্যাপকসমাজকে নয়, বিদুর সেই অনুদার মনোভাবকেই নিন্দা জানাতে চান।

—সম্পাদক দেশ

[এ সম্পর্কে আর কোনও পত্র প্রকাশিত হবে না।]

চটকদার শিল্পী

সবিনয় নিবেদন,

গত ৩রা ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসলিল ঘোষ 'প্যারিসের চটকদার শিল্পী ক্লাইন' শীর্ষক প্রবন্ধটির এক জায়গায় লিখেছেন, "ক্লাইনের ছবি হল, নানারকমের আকৃতির চতুষ্কোণ ক্যানভাস, সম্পূর্ণ নীল রঙের মনোক্রোম। কিছু নেই তার মধ্যে। না আছে কোনো ডিজাইন, না আছে কোনো আঁকিবুকি। শুধু আছে ক্যানভাস ভর্তি নীল রঙ।" প্রবন্ধটি পড়ে খুব আমোদিত হলাম ও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত কিছুদিন আগেকার এক বিখ্যাত চিত্র-প্রদর্শনীর কথা—যেখানে জনৈক শিল্পী ক্যানভাসে ছবি না এঁকে শুধু ছুরির ফলা দিয়ে আঘাত হেনেছিলেন।

ক্লাইনের মতে, ক্যানভাসের নীল রঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখনোও তা নিজের কল্পনা অনুযায়ী লাল বা হলদে রঙে পরিণত হয়ে যায়। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে যে, ক্লাইনের মতানুসারী শিল্পীরা ক্যানভাসে কোনো রঙ না দিয়েই শূন্য ক্যানভাস ঝুলিয়ে রেখেছেন ও বলছেন যে, দর্শকের নিজের কল্পনানুযায়ী ক্যানভাস রঙীন হয়ে উঠবে। আর ক্লাইনের বর্তমান ছবিগুলোর মতই ঐ ক্যানভাস-গুলো প্রচুর দামে বিক্রী হবে। অনেকদিন আগে একজন বিখ্যাত সমালোচকের প্রবন্ধ পড়েছিলাম। এই ধরনের তথাকথিত চটকদার লেখকদের উদ্দেশে লেখা। ঐ প্রবন্ধকার লিখেছিলেন, "তোমাদের খাতির যশোলাভের খাতির। গুরুদেবের অলৌকিক মহিমা যেমন শিষ্যদের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে, যাহারা ঠকে তাহারাও স্বীকার না করিয়া প্রচারে সাহায্য করে—ইহাও তাহাই। তোমরা কাপড় বোনার ভান করিয়া কৌশলে প্রচার করিয়া দিয়াছ—সতীমার সন্তান যাহারা তাহারাই কেবল তোমাদের বোনা কাপড় দেখিতে পাইবে। কেহই দেখিতেছে না, কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে সকলেই তারিফ করিতেছে—চমৎকার, অপূর্ব, অসাধারণ! অসাধারণ বটে, কিন্তু জনসাধারণ যে ঠকিয়া ঠকিয়া হয়রান হইয়া গেল। তাই বলিতেছি—ওগো বাবুকেরা, তোমাদের সাধু থামাও।" ....

এই উক্তি ক্লাইনপন্থী শিল্পীদের প্রতিও সমান প্রযোজ্য।

প্রবন্ধ লেখক প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন যে, তিনি এখন ক্লাইন-ভক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়, 'দেশ' পত্রিকার অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা ফ্রান্সের অনেক সমালোচকের সঙ্গেই একমত হবেন যে, শিল্পী ক্লাইনের চিত্রকলা হল 'মডার্ন' আর্টের চরম ধোঁকাবাজি।"

সুশান্ত লাহিড়ী
নরসিংদী

সুনীত বলল, "যাই বলুন, জারক লেবুর চাইতে পেটের পক্ষে উপকারী আর কিছু নেই। আমি তো বেশ ভালই ফল পেয়েছি। আর ওটার আর একটা সুবিধে কি জানেন, ফল-কে ফল আবার মেডিসিন-কে মেডিসিন। যত ইচ্ছে খান, শরীরও খারাপ করবে না, ফরেন এক্সচেঞ্জেও টান পড়বে না। আপনি জারক লেবুটা একবার ট্রাই দিতে পারেন।"

"রাখুন মশাই আপনার জারক লেবু!" সুনীল খেঁকিয়ে উঠল। "দেখছেন অম্বলে মরছি আর তার উপরে আপনি আবার লেবু কচলাচ্ছেন। কন্‌সিডারেশন বলতে যদি কিছু থাকে।"

"আমি উপকার পেয়েছি কি না তাই।" সুনীত থতমত খেল।

"উপকার পেয়েছেন? কিসে শুনি?"

"কেন জারক লেবুতে। প্রথমে বড়বাজার থেকে কিনতাম। এখন ঘরেই তৈরি করছি। বাড়িতে প্রচুর লেবুগাছ লাগিয়েছি। একেবারে ফ্রেশ্ জিনিস পাচ্ছি। টাটকা লেবু, সে যে কি জিনিস, আপনারা আইডিয়া করতে পারবেন না।"

"ধুত্তোর আপনার টাটকা লেবু। বাকি আপনার ব্যামোটা কি ছিল?"

"কেন," সুনীত চটপট জবাব দিল, "পেটের ট্রাব্‌ল্।"

"ও কি কোন কথা হল মশাই," সুনীল কটমট করে চাইল। "পেট বলতে অনেক কিছু বোঝায়। তার ট্রাব্‌ল্‌ও হরেক রকম।"

"আহা আমি যেন আর সেটা জানিনে। পেটের পলিটিক্যাল মানে হল বর্তমানে ইলেকশন, অর্থনৈতিক অর্থে বিদেশী মুদ্রার ঘাট্‌তি—"

সুনীত পাছে আরও এগিয়ে যায় তাই সুনীল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। "আর এই সব ট্রাব্‌লের জন্যই আপনার স্পেসিফিক হচ্ছে জারক লেবু। বলুন, বলে যান।"

সুনীত ঘাবড়ে গিয়ে চুপ মেরে গেল। তারপর মিনমিন করে বললে, "যাঃ আমি কি তাই বলেছি নাকি? জারক লেবুতে আমার উপকার হয়েছে, তাই বললাম। তা বেশ তো, আপনি ডাক্তার দেখান। কোন স্পেশালিস্টকে—"

"এবং তার কথা মত ওষুধ খেয়ে ড্যাং ড্যাং করে ভবসিন্ধুপারে যান।" বলতে বলতেই ব্রজদা ধপাস করে পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মুছে সুনীতের দিকে চেয়ে বললেন, "খুব

তার মানে! আপনি কি ডাক্তারীও করেছেন নাকি?

সরেশ পরামর্শ দিচ্ছিস তো কলিগকে। আত্মহত্যা করিবার জন্য প্ররোচিত করার অভিযোগে তোকে তো দায়রায় সোপর্দ করা উচিত।"

"কিন্তু আমি তো অন্যায় কথা কিছু বলিনি।" সুনীত দস্তুরমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

"তার চাইতেও মারাত্মক কাজ করেছ," ব্রজদার গর্জন শোনা গেল। "তুমি সুনীলকে ডাক্তারের খপ্পরে ফেলবার প্ররোচনা দিচ্ছিলে। ওর পিছনে লেগেছ কেন বাপু। জীবন যৌবন ওর কিছুই তো চাখা হয়নি। এখনও সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরিয়ে দিতে চাস নাকি?"

সুনীত বলতে গেল, "কিন্তু ডাক্তার—"

"দ্যাখ নিতে," ব্রজদার এক দাবড়ানিতেই সুনীত কুঁচকে গেল। "আমাকে ডাক্তার চেনাস নি। এই ব্রজরাজ কারফরমা সব ডাক্তারকে গুলে খেয়েছে, তা জানিস। এই শর্মা সবার অন্ধিসন্ধিই জানে। তোদের বিধান ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখিস। এখনও ওস্তাদ বলে মানে। আমার জন্য সার্জারিই ছেড়ে দিলে। তা জানিস্।"

সুনীতের চোখ কপালে উঠল।

"তার মানে! আপনি কি ডাক্তারিও করেছেন নাকি?"

"আপনি তো কিছুই খবর রাখেন না মশাই," সুনীল টাইপ-রাইটারের বারে টিক টিক টিক টিক করে তবলা বাজাতে বাজাতে বলল। "এত বড় সার্জেন আর জন্মেছে

নাকি ? একেবারে ডবল এফ আর এস। তাই না ব্রজদা ?"

"ব্রজদার তোদের মত হ্যাংলামি নেই, বুঝলি। ব্রজ বিলাতী জিনিস বহুকাল বর্জন করেছে। বলে নোবেল প্রাইজই ফিরিয়ে দিলুম, আর এ তো তুচ্ছ এক ফাঁকা ডিগ্রি। ডিগ্রির মোহে স্বদেশপ্রেম জলাঞ্জলি দেব, আমাদের কাছে এমন ভেজাল কর্ম পাবে না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ছিটেফোঁটাও গ্রহণ করি নি। হুঁ হুঁ বাবা।"

"তবে সার্জারি শিখলেন কি করে ?" সুনীত প্রশ্ন করল। "মেডিকেল সায়েন্স কি পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা নয় ?"

"বয়ে গেছে আমার মেডিকেল কলেজে পড়তে। ওখানে যে কি শেখানো হয়, আমার জানা আছে। সার নীলরতনের মত ডাক্তারের চোখও চড়কগাছে তুলে দিয়েছিলাম, তা জানিস।"

যদুদা এতক্ষণে বললেন, "ব্রজদা, সিগারেট ?"

সিগারেট ধরিয়ে ব্রজদা জুত হয়ে বসলেন।

"তবে হিস্ট্রিটা শোন। তখন আমাদের ন্যাশানাল মুভমেন্ট খুব জমে উঠেছে। সর্বক্ষেত্রে অসহযোগ, এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। দাস সাহেব একদিন ডেকে বললেন, 'ব্রজদা, এ ভারটা তোমায় নিতে হবে। অফিস কাছারি ইস্কুল কলেজ সব ছাড়াতে হবে। এত বড় কাজ করবার মত

মুহূর্তের মধ্যে ভাঙ্গা হাড়গুলো জয়েন হয়ে গেল

লোক, তুমি ছাড়া আর তো কাউকে দেখছি নে।' এই প্রসঙ্গেই সার নীলরতনের সঙ্গে আমার রীতিমত ঠোকাঠুকি বেধে গেল। তিনি বললেন, 'মেডিক্যাল কলেজ ছাড়লে দেশের সর্বনাশ হবে। ডাক্তার না তৈরী হলে দেশে চিকিৎসা করবে কে ?' বললুম, দাদা, এই পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণের মোহই আমাদের খেয়েছে। মেডিকেল কলেজ হবার আগে, আমাদের দেশে লোকের কি রোগ হত না ? তাদের চিকিৎসা করত কে ? এই নিয়ে তুমুল গোলমাল। শেষ পর্যন্ত আমি আঁতে ঘা দিলাম। বললাম, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির চাইতে অনুন্নত এক পদ্ধতি ধরে বেঁধে চালু করা আমি দেশের সর্বনাশ বলেই মনে করি। সার নীলরতন একেবারে ফায়ার। বললেন, 'এত বড় কথা। প্রমাণ দাও।' আমি তো তাই চাইছিলুম। বললুম, বেশ। যে যে রোগীকে আপনারা আজও সারাতে পারেন নি, তাদের কাছে আমাকে নিয়ে চলুন। কলকাতায় হইহই পড়ে গেল। বুঝলি। চারদিক থেকে সব বড় বড় ডাক্তার এসে জড় হল। সাহেবসুবোও বাদ গেল না।

"তারপর নির্দিষ্ট দিনে, আটান্নটা রোগীর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রত্যেককেই ডাক্তাররা জবাব দিয়েছিল। আমার এক মেডিসিনেই সব ক'টা চাঙ্গা হয়ে তক্ষুনি বাড়ি চলে গেল। অন্য লোক হলে, ওতেই কনভার্ট হয়ে যেত। কিন্তু এ বাবা সার নীলরতন, অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্তর নন। তিনি বললেন, 'মেডিসিনের সাইডটায় না হয় ভেল্কি দেখালে, বুঝলাম, এবার সার্জারিতে এসো তো, তোমার বিদ্যেটা দেখি।' বললুম, বেশ, আনুন রোগী।

"সঙ্গে সঙ্গে সতেরোটা রোগী এনে হাজির করলে। প্রত্যেকটা অ্যাকিউট কেস্। কোনটাকে রেখেছিল পেটের অপারেশনের জন্য, কোনটা বুক, কোনটা পিঠ, কোনটা হাত, কোনটা পা। ইস্তক ব্রেন অব্দি ছিল। আমি এক এক করে ধরছি, মোক্ষম দাওয়াই দিচ্ছি, আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই রোগীটা বেড্ ছেড়ে গটগট করে ট্রাম বাস ধরতে ছুটছে। একদিনেই সব বেড্ খালি। এই দেখে, সাহেব ডাক্তাররা পর্যন্ত যখন হ্যান্ডশেক করতে আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তখন সার নীলরতন বললেন, 'ওয়েল ব্রজ, তুমি জিনিয়াস, তা স্বীকার করছি। তোমার এই পদ্ধতির—'

"সার নীলরতনের কথা শেষ হতে না হতেই এমার্জেন্সি থেকে এক ডাক্তার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। 'সার, দারুণ অ্যাক্সিডেন্ট। বাসের ধাক্কায় একটা লোকের হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রাণটুকু ছাড়া আর আস্ত কিছু নেই। ডঃ রায় একবার মিঃ কারফরমাকে যেতে অনুরোধ করলেন।' সবাই মিলেই গেলাম। আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে পকেট থেকে ওষুধের শিশিটা বের করে একটি ফোঁটা নাকের ডগায় ধরলাম। শেষ নিশ্বাসটা ফেলবার আগে যেটুকু বাতাস টানতে পারল, তাতেই কম্ম ফতে। মুহূর্তের মধ্যে ভাঙ্গা হাড়গুলো খট্‌খট্ করে জয়েন হয়ে গেল। চামড়াও টান টান। ঠিক যেন একটা ছাতি কেউ মেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে, বললে বিশ্বাস করবি নে, লোকটা হাই তুলে তুড়ি মেরে কাঙালের সংলাপের ভাষায় বলে উঠল, 'হামি কোটায় ? হামার ঘ্যারি কই ?' বুঝলাম, ব্যাটা সায়েব।

"তারপর সব শুনে, সাহেব বললে,
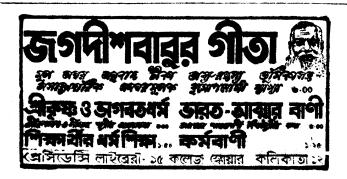
অ্যাটমিক অয়েল বা সাদা বাংলায় তেলাণু

'বাবু, টুমি হামাকে কিওর করিয়েছ, টোমাকে ছাড়িব না, হামার ঘ্যারিকেও কিওর করিটে হইবে। ঘ্যারি হামার স্ত্রীর আছে। ঘ্যারি যদি ঠিক করিয়া দিটে না পার টবে পুনরায় হামাকে মারিয়া ফেল।'

"কি করব? একে দুর্বল মানুষ, তার উপরে প্রাণভয়ে এমন কাণ্ড শুরু করে দিলে যে, আর স্থির থাকতে পারলুম না। দিলুম ওর গাড়িটাকেও এক ডোজ্। সংগে সংগে স্টার্ট নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। ভারতের প্রাচীন চিকিৎসার মাহাত্মই এই। আমাদের যে কল্যাণের বাণী, তা সর্বজীবের জন্য। এ তোদের পাশ্চাত্য মেডিসিন নয়!"

সুনীত একটা হোঁচাক তুলতেই ব্রজদা তার দিকে শান্তভাবে চেয়ে বললেন, "এক গ্লাস জল খা, নিতে। কপালের শিরা ছিঁড়ে যেতে পারে।"

সুনীল বলল, "আয়ুর্বেদ যদি এতই পাওয়ারফুল—"

"এটা আয়ুর্বেদ তোমায় কে বললে?" ব্রজদা সুনীলকে সংগে সংগে থামিয়ে দিলেন। "আয়ুর্বেদ তো সেদিনকার জিনিস। আমার পদ্ধতি সব চাইতে প্রাচীন। আয়ুর্বেদ তো হরেক রকম ওষুধ ব্যবহার করে। আমার ওষুধ অদ্বৈত। একটাই। ইতিহাস বলে, এর আবিষ্কারক ব্রহ্মা, মতান্তরে বিষ্ণু। তারপর থেকে নানা জনে নানাভাবে এটা ব্যবহার করেছে। আমি রিসার্চ করে এটাকে পারফেক্‌শনে নিয়ে গিয়েছি। গন্ধ বর্ণ অদৃশ্য করেছি। আছে শুধু এফেক্ট। তাইতেই কার্যসিদ্ধি। এখন ঠিক মত লাগালে মরা মানুষও চিতিয়ে ওঠে।"

"জিনিসটা কি ব্রজদা?"

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, "পেটেন্টটার নাম ফেরেনে ধ'চ্ছে কি না, নামটা তাই ইংরাজী রাখতে হয়েছে) কারফরমাস্ অ্যাটমিক অয়েল বা সাদা বাংলায় ব্রজদার তেলাণু (তেলের অণু—তেলাণু, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)।"

"তেল!" সুনীত একটু অবাক হল। "আমি ভাবলাম, না জানি কি। তেল দিয়ে কি মরা বাঁচে? দূর!"

"তুই তো চিরকেলে গবেট, তোর কোনও আইডিয়া নেই। সাধারণ তেলে যেখানে ইয়া ইয়া জাঁদরেল লোকই গলে জল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তেলের অ্যাটম লাগালে মরা মানুষ চাঙ্গা হয়ে উঠবে, এ আর বেশি কথা কি? আর ব্যাপারটা কি জানিস্, দিনকাল যা হয়ে উঠেছে, অর্ডিনারি তেলে আর তেমন এফেক্ট হচ্ছে না, এখন অ্যাটমিক তেলই চাই।"

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৩৩ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

স্ত্রীলোকের স্বভাব সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে দেবা ন জানন্তি। দেবতারা অবশ্য পুরুষ দেবতা। আমি দেবতা নই, কিন্তু পুরুষ। হায়রে তোমাদের স্বজাতীয়দের নিয়ে তোমাদের ঘর করতে হয় না—করতে হয় পুরুষদেই—অন্ধকার হাতড়িয়ে কেবল ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরি—আর তোমরা নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে আকাশ মুখরিত করো।

শুনলুম মৈত্রেয়ী তোমাকে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছে—সন্দেহ কোরো না যে সেটা আমার অনুরোধে ঘটেছে। তার বাড়িতে তোমাদের স্থান দেবার যোগ্য জায়গা নেই এ কথা সে কোনো স্বজাতীয়ার কাছে মানতে পারবে না। এখন দুই সমকক্ষীয়ার মধ্যে যথোচিত নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমরা ইতরে জনাঃ শান্তি পাই। আমি পুরুষ মানুষ নিজের স্বভাব জানি—যদি এই মন নিয়ে মেয়ে হয়ে জন্মাতুম, তাহলে মান অপমানের তর্ক ছেড়ে দিয়ে হাসামুখে অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হতুম।

বৃষ্টি নেমেছে। কিন্তু খারাপ লাগচে না—কেন না গিরিশিখরের উপর এ জায়গাটাতে কালিদাসের মন্দাক্রান্ত ছন্দের ঝঙ্কার কানে লাগচে — "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং" ইত্যাদি। অধ্যাপক রাশিকার আমার পুরুষোচিত বিবেচনা-হীনতায় খুব হেসেছেন শুনেছি—নিজের ইতিহাসে কি হাসবার বিষয় সর্বদা ঘটে না? ইতি ৩০।৫।৩৮

কবি

॥ ৪৩৪ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার মায়ের অসুখের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হলুম—বুঝতে পারচি তুমি কী রকম বিপন্ন হয়েচ। আশা করি, উপস্থিত মতো সঙ্কট কেটে গেছে। ওঁকে কলকাতায় নিয়ে যাবার মতো ওঁর বল হয়েছে কি? কখন যে প্রবল বর্ষণ সহসা ঘটে পথ-ঘাট রুদ্ধ করে দেয় এখানকার এই একটা ভাবনা আছে।

অনেক দিন থেকে এখানে তোমাদের আসার জন্য প্রত্যাশা করেছি। পথের দূরত্ব ও তোমার আতিথ্যের বিপুলতা স্মরণ করে মনে ভরসা রাখিনি। পার্বত্য মহিমা এবং রাষ্ট্রিক মহিমার দিক থেকে এখানে লোভনীয় বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ওখানকার চেয়ে এখানে আকাশের প্রসন্নতা অকৃপণ। আমাদের বাড়িটার মধ্যেও ঔদার্য আছে—ঘরে ঘরে খুব মন খোলা গোছের ভাব—বেশীদিন থাকতে হলে ঘরে বাইরে এই রকম দাক্ষিণ্যের দরকার করে।

মাঝে মংপুতে গিয়েছিলুম। সেখানকার শৈলদৃশ্যে একটি অন্তরঙ্গতা আছে—সামনে পাহাড়গুলি অর্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে এসে অরণ্যভূমিকে যেন কোলে তুলে ধরেছে — বেশ লাগত চেয়ে চেয়ে দেখতে। ওদের কুটিরটির মধ্যেও পরিচ্ছন্নতা এবং আরামের ব্যবস্থা আছে। গৃহসজ্জার পারিপাট্যে অবাঙ্গালিত্ব দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। সযত্নে চারিদিকে ফুলও ফুটিয়েছে সুন্দর করে—তাদের বর্ণবৈচিত্র্যের উচ্ছ্বাস আমার খুব ভালো লাগত—আর একটা সুবিধে ছিল প্রচুর নির্জনতা। ছুটির শেষ পর্যন্ত এখানে থাকবার সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল—ওখানে লেখাও এগোচ্ছিল। কিন্তু বউমার সেবাযত্নে এমন মৌতাত লাগিয়েছে যে, ওঁর শুশ্রূষার বাইরে থাকতে ভালো লাগে না। কোনোমতে চলে এসেছি। অকাল বাল্যদশার লক্ষণ।

ইচ্ছা করলেই পরিপূর্ণ ছুটি পেতে পারতুম — কিন্তু অকারণে একটা লেখার দায়িত্ব মাথায় নিয়েছি। আলমোড়ায় যেমন করে দুর্দাম উদ্যমে আমাকে লেখায় পেয়েছিল, এখানেও ঠিক তাই। এর মাঝখানে হঠাৎ বিশ্বপরিচয় বইটার সংশোধনের তাগিদ এসে পড়ল আমার উপর। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্তই দুঃখ-সাধ্য কাজ, কিন্তু অত্যন্তই লজ্জা জমেছে আমার ভাগ্যে, সেই জন্য নিষ্ঠুরভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছি। এক পাহাড়ে দুষ্কর্ম করেছি আর এক পাহাড়ে ক্ষালনে লাগতে হোলো। শপথ করচি এমনতরো অনধিকার প্রবেশের কাজ আর কখনো করব না, আর সেই সঙ্গে এই কথাও ভাবচি যে, অপরাধ করবার মেয়াদও আর বাকি আছে কই। দুঃখের ভিতর দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফল ফলাবার সময় থাকে না।

আষাঢ় তার বারো আনা কর্তব্য পূর্বেই সেরে রেখেছে—এখন হাতে তার কাজ নেই, সে জন্যে মনমরা হয়ে আছে—বৃষ্টিবাদল নেই, কিন্তু অনুজ্জ্বল দিন, নিষ্কর্মা মেঘে আকাশ ঢাকা।

—কিছুদিন ছিল, অনেকখানি সময় আমার নিয়েছে। কিন্তু নালিশ করতে চাইনে। শ্রদ্ধা করে যে চায়, শ্রদ্ধা করে তাকে দিতেও হয়। কিন্তু দুশ্চিন্তার কথা এই যে, আমার বাণীর সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের বাণী মিশিয়ে ফেলে সে একটা অতিকায় সাহিত্য বানিয়ে ফেলেছে। জীবনে আবর্জনা ফেলতে ফেলতে চলি, সঙ্গে সঙ্গে কাল সেটাকে ঝাঁট দিতে দিতে চলে—কিন্তু কালের পিছনে যারা লাগে, তার ঝুড়ি থেকে মাল সংগ্রহ করে, হয় তা তারা কাজে লাগাতেও পারে, কিন্তু সেটা নির্ভর করে যাচাই বাছাই কর্তার যথোচিত আত্মসংযমের 'পরে। এ চিঠিখানা বেশি লিখে ফেলেচি বলে মনে কোনো না লেখাটা সহজ। একেবারেই না। চোখ দুটো হয়েছে পর্দানশীন। ৩ আষাঢ়, ১৩৪৫।

কবি

॥ ৪৩৫ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

রবিরশ্মি কাল দেখা দিয়েছিল মেঘের রন্ধ্র দিয়ে, তাই অহেতুক আশা মনে জেগেছিল যে রবির মেঘাচ্ছন্ন ভাগ্যেও হয় তো রশ্মিপাত হবে দার্জিলিং গিরিশৃঙ্গ হতে। কবির কল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না, তাই রাণুর দূর কণ্ঠধ্বনি বৈদ্যুতন্তু যোগে সংবাদ দিয়েছে সে আজ আসবে, কে একজন

সঙ্গে আসবে শোনা গেল কিন্তু জানা গেল সে আমাদের স্বজাতীয়—অতএব সঙ্গের স্বাদ দ্বিগুণ হবে না, বরঞ্চ কিছু কমতি হতে পারে।

মৈত্রেয়ী এসেছে বউমার আমন্ত্রণে, তাকে কেরানীর কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। তোমাদের উদ্বেগের ভার কিছু পরিমাণে লাঘব হয়েছে আশা করি। ইতি ৮ আষাঢ় ১৩৪৫

কবি

॥ ৪৩৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, মাথা ঘষার আরকটার নাম তোমাকে জানাতে ভুলেছিলুম—অত্রসহ লিখে দিচ্চি। Silvicrine Hair Lotion, Silvicrine Concentrated.

সেদিন রেলগাড়ি ক্রমশই বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। মেমারি পর্যন্ত গিয়ে মনে হোলো দুঃখের শেষ সীমানায় এসেছি। বর্ধমানে পৌঁছিয়ে এক পেয়ালা চা আর দুটো ডিম খেয়ে মনে হোলো আরো হয় তো কিছুদিন বাঁচবো। সন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতনের ঘন সবুজ অভ্যর্থনার বেষ্টনে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে অস্তিত্বের সমচ্চ শিখরে চড়ে বসে আছি। যারা বলচে, উঃ কী গরম, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করচে—শান্তি নষ্ট হবার ভয়ে চুপচাপ আছি কিন্তু সেই সঙ্গে বৈদ্যুত পাখাটাও ঘরঘর শব্দে চলচে। একটা প্রকাণ্ড দুঃসংবাদ বুকে পাথর চাপিয়ে আছে—জিয়াউদ্দিনের অকস্মাৎ মৃত্যু। ইতি ৪।৭।৩৮

কবি

॥ ৪৩৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

ভুল হয়ে গেল—সংশোধন করে নিয়ো।

Silvicrine Shampoo-র কথা তোমাকে লেখা হয় নি—সেটা আবশ্যক। আনিয়ে নিয়ো।

বৃষ্টি হচ্চে হাওয়া দিচ্চে, ঠাণ্ডা আছে, গরম করে তুলবে তোমার বোনপো সঙ্গে আসচে দলে বলে—তোমাদের স্বজাতীয়ার সংখ্যাই বেশি। আতিথ্য সংকট দুঃসাধ্য। রথী শ্রীনিকেতনে পলাতক। ১৬।৭।৩৮

কবি

॥ ৪৩৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার মাথার চিন্তায় আমার মাথা ব্যথা হয়েছিল, ইতিমধ্যে জ্বর করেছ। নিরুদ্বিগ্ন হবার অবকাশ দিলে না। সন্দেহ করচি পড়েছ কোলাইয়ের হাতে। এখানে সুরেনের অনুরূপ দশা—তারও রক্ত পরীক্ষা চলচে। বৎসরটা খারাপ। এখনো পর্যন্ত খাড়া আছি কিন্তু তোমাদের মতে এ সব কথা উচ্চারণ করা ভালো নয়—এতে দুর্গ্রহকে খোঁচা দিয়ে জাগানো হয়। কিন্তু আমি জানি দুর্গ্রহ এত বেশি জাগরূক যে, সামান্য কথার খোঁচায় তাকে চেতিয়ে তোলবার দরকার হয় না, ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে পারলে ভালো হয়।

রথীকে বললুম—রথীর মত এই যে রামচরিতের মতো সেবক হাতের কাছে না পেলে আমার বুদ্ধিহ্রাসের প্রদোষ কালে বিপদ ঘটবে—যে দুজন আমাকে বেষ্টন করে আছে তাদের মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশের ছিদ্র পাওয়া যায় না। অতএব তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো। তার শুশ্রূষা করবার শক্তির ভরসা দিয়েছ—শুনে ভালো লাগল না—আমার একমাত্র ভরসা হেড্ নার্সের উপর। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তবে যেন আমার অবকাশ ঘটে।

খবর পাই যেন। ইতি ২১।৭।৩৮

কবি

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবির যখন দারুণ অসুখ সেই সময় অসুখের ক'দিন আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম। সেই অচেতন অবস্থার মধ্যে কবিকে ওষুধ বা আর কিছু খাওয়ানো এক দুরূহ ব্যাপার হয়েছিল; কিছুতেই খেতে চাইতেন না, জোর করে মুখ টিপে রাখতেন। কেন জানিনা ঐ বিকারের মধ্যেও আমি কখনো ধমক দিয়ে কখনো ছোট ছেলের মতো গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মুখ হাঁ করে খেয়ে নিতে বললে সে কথা শুনতেন। কাজেই বেশির ভাগ সময়েই খাওয়ানোর ভার আমার উপরই ছিল। সে সময় আশ্রমের আরও অনেকেই কবির শুশ্রূষা করেছিলেন। ডাক্তাররা পরিহাস করে আমাকে "হেড নার্স" নাম দিয়েছিলেন। কবির আরোগ্যের পরেও সেই "হেড নার্স" নাম আমার কবির কাছে থেকে গিয়েছিল।

॥ ৪৩৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার সম্বন্ধে আমার যা মন্তব্য সে কাল প্রশান্তর চিঠিতে সংক্ষেপে লিখে দিয়েছি—মনোযোগ কোরো—অন্ততঃ প্রথম কিছুদিনের মতো দেহে নতুন উত্তেজনার উদ্ভাবন কোরো না। আমারো আশু ইচ্ছা নেই তোমাকে তোমার উপযুক্ত কর্ম জোগান দেবার।

এখন আমার যে অবস্থা চলচে সে হচ্চে দীর্ঘ পথের শেষ মাইলে ঘোড়ার চালের মতো। অর্থাৎ চলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে নি এই পর্যন্তই ওর স্বপক্ষে বলা যেতে পারে—কাজ আদায় করতে কেউ কসুর করচে না। দুপুর বেলায় আহারের পর জোর করে কেদারায় চেপে বসিয়ে দেবার জবরদস্ত অভিভাবক কেউ নেই। যারা সেই পদ পেয়েছে তারা নিজেরা সেই সময়টাতে অচেতন থাকে। আমার কর্মধারা সকালে আরম্ভ হয় শেষ হয় অপরাহ্ণে পাঁচটায়। আমার বিধাতা বছরে বছরে আমার বয়স বাড়াবার কাজে একদিনেরও কসুর করেননি কিন্তু কাজ কমাবার দিকে অনামনস্ক।

নন্দগোপাল১ পারিবারিক কারণে কলকাতায় থাকতে বাধ্য হয়েছে। এক সময়ে প্রশান্ত তাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করবার ইচ্ছে করেছিলেন। সাহিত্যিক প্রয়োজন তাঁর কী থাকতে পারে জানিনে তবে লোকটির রচনাশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ইংরেজীও লিখতে পারে, কিন্তু ইংরেজী পদ্য লেখার সম্বন্ধে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করিনি। সে হয়তো ভাবে পাছে নোবেল প্রাইজে তার দাবী আমার অসহ্য হয়।

প্রমোদ২ চেয়েছিল তাদের ব্যবসায়ের খাঁচায় একটি সাহিত্যিক পাখি পুষতে। এ পাখিটির কণ্ঠ আছে গল্প লিখতে পারে এবং ফরমাশ মতো কোনো গল্পকে ফিল্মিত করা তার পক্ষে কঠিন হবে না। প্রমোদের হয়ে মৈত্রেয়ী আমাকে লোক বেছে দেবার অনুরোধ করেছিল তখন নন্দগোপাল কাজে ছিল এবং তাকে ছাড়তে আমাদের ইচ্ছা ছিল না। কলকাতায় থাকতে টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনিতে প্রমোদকে উস্কিয়ে তুলতে তিনচারবার চেষ্টা করে নিরস্ত হয়েছি। জানি

টেলিফোনের চেয়ে আমার কণ্ঠ দূরে যায়। পত্রের উত্তর নন্দিনীর বকলমে দিতে পারো। রাশি করণিকের তপস্যা ভঙ্গ কোরো না। —আজ শরৎকালের রৌদ্র আগাম দাক্ষিণ্য শুরু করছে। ইতি ৬।৮।৩৮

কবি

কিশোরীর মরাফত নন্দগোপালের ঠিকানা পেতে পারবে।

---

১ শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ২ স্বর্গত পি এন রায়

তখন সবেমাত্র আমার টাইফয়েডের জ্বর থেমেছে। তাই কবি আমাকে নিজে হাতে চিঠি না লিখতে ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই আমার উচ্চকণ্ঠস্বর নিয়ে ঠাট্টা করতেন। কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে শুনলেই বলতেন "বাবা, কী কণ্ঠস্বর! টেলিফোনটা নিতান্তই বাহুল্য। ওদিক থেকে তারা অমনিই তোমার গলা শুনতে পাচ্ছে" ইত্যাদি। যে রাত্রে ডাকাত পড়েছিল তার পরদিন সকালে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "আর কখনো তোমাকে গলার জোর নিয়ে খোঁটা দেবো না। চিরকাল যেন ঐ গলা বজায় থাকে। কাল তো শুধু গলার জোরেই প্রশান্তর প্রাণ বাঁচিয়েছ, নইলে কি আমরা কেউ জাগতুম? ঐ মেঘের গর্জন, ঝড়ের আর্তনাদকে ছাপিয়ে দিয়ে চীৎকারে পাড়া সচকিত করে তুলতে পেরেছিলে বলেই তো তারা ভয় পেয়ে পালালো? বিধাতার কাছে কী অস্ত্রই পেয়েছিলে! আর কক্‌খনো ঠাট্টা করবো না, বজায় থাক ঐ কণ্ঠস্বর।" আমি শুনে যখন খুব হাসছি, বললেন "আবার হাসছো? আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা ঐ গলা না থাকলে কাল রাত্রে কি কাণ্ডই না হয়ে যেতে পারতো। প্রশান্তকে খুন করে রেখে দিয়ে যেতো, আমরা কেউ জানতেও পেতুম না। আজ সকালে তাহলে ঐ হাসি থাকতো কোথায়?"

॥ ৪৪০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

খবর পাওয়া গেল তোমার ঘুষঘুষে জ্বর চলচে। আমিও তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছিলুম—কিছুদিন থেকে জিবে থার্মমিটার দেওয়া চলছিল—শেষকালে হার মানতে হলো—উত্তাপ ৯৮-এর তলায় নেমে এসেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কালিম্পং যাব মনে করচি—দেহের অবসাদ মনকেও আক্রমণ করেছে। তোমরা যদি ও-অঞ্চলে যাও তবে ভুটানের রানীর বাড়িটা নেবার চেষ্টা দেখতে পারো—১২৫ টাকা ভাড়া দাবি করেছিল বাড়িটা হোটেল বিশেষ, ঘর বিস্তর, পুরো পাহাড়টা তাঁর অধিকারে। বউমার ওখানে জায়গা হবে না। —ভুটানের বাড়িটা রাশিকরণিকের উপযুক্ত। বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল দিচ্চি—উৎসাহ পাচ্চিনে মনে। ইতি ২৪।৮।৩৮

কবি

॥ ৪৪১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজই তোমাকে চিঠি লিখতে যাচ্ছিলুম এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। এখনো তোমার জ্বর চলচে আমারো চলত ঠিক তোমার মত যদি ডাক্তারি মতে চলতুম। আমি নিজের চিকিৎসা নিজেই করেছি। সকালে বিকেলে লাইকোপোডিয়ম ৩০ দুদিন খেলুম—ভেবেছিলুম লাইকোপোডিয়ম ২০০x খেতে হবে। কিন্তু তা আর হোলো না—দুদিন দু ডোজে আমার জ্বর গেল, আর এ পর্যন্ত এলো না। অবশ্য আমার ঐ ওষুধের লক্ষণ ছিল—বিকেলের দিকে বাড়ত, রাত্রে হোতো উপশম। বুঝেছিলাম এটা যকৃতের গোলমাল। এখন তো কাজ করচি সকাল থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত। তোমার শরীরতন্ত্রের কোন্ মহলে কল খারাপ হয়েছে তা তো জানিনে—খুব সম্ভব লিভারে। মুখ যে-রকম তিতো হচ্ছিল তাতে বোঝা যায় ওটা পিত্তের বিকৃতি। Kali Mur, Nat. Sulf দিয়েছিলুম সেই লক্ষণ দেখে। ম্যালেরিয়ায় Nat. Sulf প্রধান ওষুধ—তার সঙ্গে Fer. Phos.।

তুমি তো আসতে পারবে না পরিশেষে। আরো কিছুদিন পরে ১৫ই সেপ্টেম্বরে বর্ষার নাচ গান দিয়ে একটা সত্যিকার বর্ষার উৎসব করব ঠিক করেছি। কিন্তু বোধ হয় তাতেও আসা ঘটবে না। একটা তার নতুন গান লিখে পাঠাই। সুরটা ভালোই হয়েছে।

আমার প্রিয়ার হিয়া বাতাসে আজ ভাসে
বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো
স্মরণে তার আসে।
বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণ মালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে॥

ইতি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষ্ণচূড়া

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

জানি কোনোখানে তুমি জেগে উঠছো বসন্তে...বাতাসে।
আজ সেই কথাগুলি উড়ে যায় নরম, নীরব
শরীরের নীলিমায়; দূরে দূরে সজল উৎসব
কে যেন ঝরায়ে গেছে শুধু খেলে, খেলা করে ঘাসে।

এখন শহরশীর্ষে বুরুজের উপর বিকেল
শায়িত বিস্তর শীতে...শব্দহীন, রৌদ্রে ম্রিয়মাণ
টার্মিনাসে পড়ে আছে নগরীর নিস্তেজ অঘ্রাণ।

পিপাসা, প্রথম রক্তে একবার গোপন উদ্বেল
ডাকো বিস্ফারিত মাঠে, স্ফীত.. লাল চৈত্রের বাগান।

কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গে

বুলবন ওসমান

কলকাতার সাহিত্যে নিশ্চয় ভাষা বলে একটা বস্তু আছে, যা একান্তই কলকাতার (তবে বাংলা বিগর্হিত বলার আমার উদ্দেশ্য নেই)। যেহেতু কলকাতা বাংলার নবজাগরণের কেন্দ্র, তার ভাষা অন্যত্র বাহিত হয়ে গেছে আশ্চর্যের কিছু নেই। এবং অনেকাংশে হয়েছেও তাই। আঞ্চলিক ভাষা কলকাতা-সাহিত্য-ভাষা-শিক্ষিত-বিদ্বজ্জনদের হাতে আজ আর কলকে পায় না। বিশেষ করে শহরে।

কিন্তু কলকাতা কালচারের এক অংশ — তার ভাষা—হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার ওপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। উপর্যুক্ত অঞ্চলসমূহের শহুরে ও গ্রাম্য ভাষার মূল্যগত ও ধ্বনি-সংগত পার্থক্য ছাড়া ভাষাগত পার্থক্য প্রবল নয়। আমার উদ্দেশ্য সেই ভাষাগত দিকের ওপর কিছু আলোকপাত করা।

নদীয়া এবং শান্তিপুরের কথাকে আদর্শ হিসাবে ধরা হত বিশেষ এক কারণে। এবং বিশেষ এক সময়ে। সময়টা কলকাতা গজিয়ে ওঠার আগে। আর কারণটা, নদীয়া অনেক বৈয়াকরণ সৃষ্টি করেছে এবং এই সৃষ্টির পেছনে ছিল নদীয়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। এক কথায় নদীয়া কলকাতা কালচারের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বলে।

বাংলা বর্তমানে দ্বি-খণ্ডীকৃত। বিভক্ত হলেও তার ভাষা বিভক্ত হয়নি। বিভাগ [illegible] হয়নি 'কলকাতা কালচারের' ভাষা আজও বহুল অনুকরণ করছে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-কেন্দ্র ঢাকা। [illegible] সহজ এবং ন্যায়সংগতভাবেই অনুসরণ করতে পারেন, সমগ্র শিক্ষিত সমাজ সে ধারায় প্রবাহিত। তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে, এখানকার আঞ্চলিক কথা সাহিত্যে স্থান নিচ্ছে না। নিচ্ছে, এবং নেওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাষা অনুশীলনের ব্যাপারটা যে কলকাতামুখী, অস্বীকার করার উপায় নেই। পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা-সচেতন ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল একমাত্র সাহিত্যশিল্পী হচ্ছেন শওকত ওসমান সাহেব। ভাষা-সচেতনতার ব্যাপারে তিনি উভয় বাংলার যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-কর্মীর মাঝে বিশিষ্ট।

যাক, এসব আলোচনা। মুখ্য উদ্দেশ্য আমার দুই দেশের সাহিত্য আলোচনা নয়। [illegible] প্রতিপাদ্যের সূত্রে এসে যাই।

'কলকাতা কালচারের' ভাষার 'লম্প' একটা শব্দ। শুধু কলকাতায় নয়, অন্যান্য জায়গা-গুলোর নাম আগেই বলে নিয়েছি। ভাবছেন, হঠাৎ 'লম্প' দিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করলাম কেন। আমার লম্ফ-ঝম্ফে আপনাদের কম্প দিয়ে জ্বর আসার কোন কারণ নেই।

'লম্প', অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের বাতি। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র একে ও-নামে ডাকা হয় কিনা জানি না, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে 'লম্প'কে কেউ চিনবে না। এখানে 'লম্প' জাতীয় বাতিকে বলে 'ডিপা' বা 'কুপি' ইত্যাদি। 'কুপি'টা হয়ত একেবারেই এ মাটির ভাষা। কিন্তু 'ডিপা'কে চেনা যায়, দীপা বা দীপ (শুদ্ধ বাংলায় ডিবাও আছে) তারই নামান্তর হয়ত। তেমনি 'লম্প'কে বুঝতে দোষ হয় না, যদি ইংরেজীতে লিখি 'Lamp'—'লম্প'। তেমনি, ঝম্প বা ঝাঁপকে মনে হয় যেন 'Jump' (জাম্প)-এর ঝাঁপ থেকেই লাফিয়ে পড়ল তড়াক করে।

অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যায়। কিন্তু কেঁচো কি দিয়ে খুঁড়ছেন, সেটা লক্ষ্য করার বিষয় (কাঁচি দিয়ে খোঁজার সময় সাপ বেরোয় না)।

খননের জিনিসটা নিশ্চয় শক্তিশালী কিছু। সাধারণত কোদাল ব্যবহার হয় কোপাতে, আর খুঁড়তে খুন্তি। কিন্তু, কুন্তী-তনয় কর্ণ যেমন বাকী পাঁচ ভায়ের কাছে অপরিচিত ছিল, 'খুন্তি' ছাড়া 'শাবল'-ও পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের কাছে তেমনি। কলকাতা কালচারে 'শাবল' অবশ্য মানানসই। লম্পর মত 'Shovel', 'শাবল' হবে এতে আর আশ্চর্য কি! তা ছাড়া 'কলকাতা কালচার' কথাটাও প্রণিধানযোগ্য। 'কলকাতা সংস্কৃতি' নয়, 'কালচার'—এটার রহস্য কিন্তু উল্টো দিকে—'Culture' আর 'কুলাচার' (অবশ্যই কুলের (ফল) আচার নয়) ব্যাপারটা ভাববার মত। কুল বা বংশগত আচার ব্যবহার, কুলাচার বা কালচার।

উইলিয়াম ক্যারী বাংলায় এসেছিলেন মিশনারীর উদ্দেশ্যে—ব্যাপটাইজড্ করার জন্যে, নেটিভদের। অবশ্য ছাপাখানা ও বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য তাঁর একটা বেশ ভূমিকা আছে। বাংলা দেশে প্রথম ছাপাখানা হয় ১৭৭৮ খৃীঃ হুগলীতে আর কলকাতায় তার দু বছর পর।

মিশনারীর ব্যাপার যখন, মিঃ ক্যারীকে পাদ্রী বলায় দোষ নেই। ঐ পাদ্রী শব্দটা নিয়েও দেখতে পারেন, ছিল 'Father'—রোমানে 'Pater'—প্যাটার-এর 'পা', আর ফাদারের 'দ', এবং 'er' উল্টে হল 're' অর্থাৎ 'রী'—সুতরাং 'পাদরী, পাদ্রী, পিতৃ' ইত্যাদি ঘষামাজার ফল। ঘষামাজার অর্থে, 'ভাষা' দলগত পরিচয়ে যদি বিশ্বাসী হন।

ইংরেজ আসার আগেই ফরাসীরা বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল এ-দেশে। কলকাতার কথার মধ্যে, 'কি মশাই, কেমন আছেন'-এর সাথে মাঁশিয়ের কোথায় যেন এক [illegible] গন্ধ পাওয়া যায়। তবে 'রেস্তরাঁ' একেবারে পরিষ্কার। অবশ্য রেস্তোরেন্টও বলতে পারেন, কোন আপত্তি নেই।

অন্যদিকে 'মুই', 'Me'—আমি, ইত্যাদি। দক্ষিণ বাংলা, বলা ঠিক হবে না, পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বদক্ষিণের জেলা চট্টগ্রামের 'আঁই' অর্থাৎ 'আমি' I—একটু ফরাসী উচ্চারণের ঢং মাখা যেন। তা ছাড়া পূজোর বাজারে 'প্যাণ্ডেল' ('মণ্ডপ' নয়), 'ফাংশান' (অনুষ্ঠান নয়), 'দে-লাইট' বাতি—ফর্দ লেখার জন্যে 'হ্যাণ্ডেল' (কলম নয়), দিদির 'স্যাণ্ডেল' (চটি নয়)—যদি কিনতে ভুল করে থাকেন, 'মাইরি বলছি' বলে দিব্যি কাটেন। কিন্তু মাইরি খৃষ্টমাতা মেরীর ছায়া কি? 'মামাইরি' হলে দিব্যিটা আরো জবর হয়—আর তাতে খবরটাও জবর হবার সুযোগ পেল। ঘরে রঙীন কাগজ সাঁটার জন্যে আঠা গোলা দরকার, তাই

'মগের' (Mug) প্রয়োজন, বা একটা কাজে লাগে না এমন জগ (Jug) পেলেও হয়।

বিদ্যুৎ-বাতিকেও ভরসা নেই, তাই চাই 'লণ্ঠন' (Lantern)। বাড়ির সবার জুতো-গুলো 'বুরুশ' (Brush) করা দরকার। দিদির 'কুরুশ' (Cross) কাঁটাটাও কাজের ভিড়ে কোথায় রেখেছেন, মনে আসছে না, তা-ও কেনা চাই—আর ভাঙা শার্সিগুলো (Sash) এই হুজুগে মেরামত হয়ে গেলেই ভাল।

বড়দিনের বাজারে সস্তায় পাওয়া যায় 'তেমাতি' Tomato। আপনি যেমতিই বলুন, পূর্ব-পাকবাসী কলকাতার 'তেমাতি'র সাথে পরিচিত নয়। তাদের আছে 'টক বেগুন' বা 'বিলেতী বেগুন' বা শেষে খাঁটি 'টম্যাটো'। আর 'টক' কথাটাই ধরুন না, বাঙালী মুসলমানরা ত প্রায় সবাই বলে 'খাটা' পূর্ব-পাকে আবার 'চুকা'। যেমন 'তেঁতুল' আর 'আমলি'র ব্যাপারটা। 'পেয়ারা'র ব্যাপারেও তাই। 'পেয়ারা, আঙ্গুর, গয়াম' ইত্যাদি।

কলকাতা একটা 'হরেকরকমবা' শহর। দুনিয়ার তাবৎ দেশের লোকের বাস। বিশেষ করে যাদের 'কলকাত্তিয়া' বলা হয়, যারা বাংলা বলে না। বলে হিন্দী। যেমন ঢাকায়, কুট্টী। বলে উর্দু। 'কলকাত্তিয়ারা' বলবে 'বয়ের', 'কলকাতার কালচাবড়ু' বা নন-কলকাত্তিয়ারা বলবেন 'কুল', আর পূর্ব-পাকে সবাই 'বরই'। তেমনি পূর্ব-পাকে 'মরিচ' কলকাত্তিয়ারা বলে 'মির্চা'—আর সবাই 'লংকা'। ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল। বাংলার ছেলে বিজয় সিংহ যেবার লংকা জয় করে সিংহল নাম রাখল, তার অবশ্য সিংহল হবার আগের সংস্কৃত বাক্যেতেই যেন লংকা বেঁচে আছে।

মায়ের কোল থেকে বেরিয়ে সেখানে আর ফেরা যায় না। কিন্তু মরিচ পেটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবাইকেই যেতে হয়। তাই 'লংকা'ওয়ালারা পুকুর থেকে পালালেও ব্যাংগোপসাগর থেকে পালাতে পারেনি—লংকার আকার গোল হলেই গোলমাল—বলতে হয় 'গোলমরিচ'—লংকার ভূমিকা সেখানে মরিচ সদৃশ। শুধু কি তাই। 'সিংহ' পদবী আজ জনারণ্যে বেশ ছাড়িয়ে গেছে। 'সিংহ' বললে মানুষ চিনতেই পারবে না, বলতে হবে,—আরে ভাই চেনেন না—অমুক 'সিনহা'। এবার।

আহা, এসব ছেড়ে স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকেই ধরুন না। ছেলে বুড়ো সবার মুখে 'টাগোর' শুনতে শুনতে আপনার কি মনে হয় না, ঠাকুরকে গোর দিয়েই দিল।

তা ছাড়া আজকাল ত ডাঁট মেরে নিজের নাম বলার কায়দা হল, আই অ্যাম মিস্টার 'ডাট', বা 'বোস' বা 'চোডুরী'। আর পূর্ব-পাকে বলে, আই অ্যাম মিস্টার 'হাক', বা

দৃঢ় হয়ে রয়েছে এখনও। 'অফিস' বলার সাথে আমরা 'আদালত'কেও সহগ হিসাবে আনি। 'কোর্ট' বলার সাথে বলি 'কাচারি'। তা ছাড়া, মারফত, যাবত, সিপাই, আমিন, খাজনা ইত্যাদি শব্দ এখনও বহুল প্রচারিত।

ইংরেজের সাথে ভারতে পর্তুগীজ ও ফরাসীরাও আসে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকায় তাদের ভাষাও টিকতে পারেনি। না হয় আমরা আজ 'বোতাম' না বলে বলতাম 'বোতাও'। কেননা 'BUTTON' ইংরেজী শব্দ, 'BOTAO' পর্তুগীজ। তেমনি 'BOTTLE', বোতল—'BOTELHA' 'বোতেলা' নয়। যেমন 'VIOLIN' নয় 'VIOLA'। অবশ্য 'বাহুলীন' উল্লেখ করে কেউ তর্ক তুলতে পারেন। তবে পাঁউরুটি পর্তুগীজ ভাষা-জাত।

কলকাতা ও তার আশপাশের ভাষায় ইংরেজী প্রভাবের যে সব নমুনা দিয়েছি তার সবই যে ইংরেজী প্রভাবান্বিত তা নয়। এতে দু' বাংলার পার্থক্যটা দেখিয়েছি—এবং কিছুটা রস করাও এর উদ্দেশ্য—যেমন 'লঙ্কা', 'কঞ্চি', 'বাখারি'ও উল্লেখ করতে পারি; পূর্ব-পাকে ওটাকে অনেক জায়গাতেই বলে 'কায়েম'। 'লঙ্কা', 'কঞ্চি', 'বাখারি' পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দ, ইংরেজীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

'কলকাতা' শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হওয়ায় তার উপরেই ইংরেজীর প্রভাবটা বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এবং তাই বাংলার অন্যান্য অংশে প্রাচীন বহু আঞ্চলিক শব্দ আজও অকৃত্রিম-ভাবে টিকে আছে।

'কলকাতা কালচারে' কিছু কথা হুবহু ইংরেজী কিন্তু ইংরেজীই আজ বাংলা হয়ে গেছে, যেমন চেয়ার, বেঞ্চ, পেন, পুলিস, কোর্ট, শার্ট, প্যাণ্ট ইত্যাদি। এ সব শব্দ কলকাতায় নয়, বাংলার সর্ব অংশেই প্রায় এক রকম। তবু সংখ্যাতত্ত্বের আশ্রয় নিলে অন্যান্য জায়গা থেকে কলকাতায় যে বেশী হবে, অনুমান করা যায়।

কিছু শব্দ সামান্য রূপ বদলে বাংলা হয়েছে। যেমন 'কাটারি', 'লম্প', 'শাবল', ইত্যাদি। কলকাতা কালচারের আওতায় যাদের বাস, মনে হতে পারে এ শব্দগুলোই আসল বাংলা শব্দ। তারা এর বাইরে ভাবতেই পারে না। কেননা, ব্যক্তি যে সমাজ-সংস্কৃতির সৃষ্টি সে-সমাজের সংস্কৃতিকেই চরম বলে ধরে নেয়।

আর একভাবে দেখানো যায়, যেখানে হুবহু অনুবাদ। যেমন 'গুড মর্নিং'-এর বদলে 'সু-প্রভাত' বা শিবরাত্রির মত 'শুভ-রাত্রি' (Good Night), 'ইন্টারভেল'-এর জায়গায় বিশ্রাম বা বিরতি—'ফাউন্টেন পেন', ঝরনা-কলম ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর এই প্রবণতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক—সব কিছু বাংলা হবে। জাতীয়তা বড় করে দেখা দেওয়া কোন হীনমন্যতার ব্যাপার নয়। যেমন 'ক্লাইভ-রো' হল 'সুভাষ রোড'—কিন্তু তা বলে পুরো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কেননা, পূর্বেই বলেছি, যে-সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ বড় হয়, সেটাকেই চরম (Unique) বলে ধরে নেয়। 'সুভাষ রোড' করলেও 'রো' বা 'রোড' ও থেকে গেল। সুতরাং পরিমার্জন করায় উদ্ধার নেই। 'কর্নওয়ালিস স্ট্রীট'কে 'নাসিকাওয়ালিস

স্ট্রীট' করলেও পুরো রেহাই নেই। যেমন, 'পকেট' (Pocket)কে অনেক জায়গায় 'জেব' বলে। কিন্তু 'পকেটমার' শব্দটা 'জেব-মারে' রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। 'পকেটমার' শব্দটার এমনি একটা 'গুণ' (Connotation) স্থায়িভাবে গেড়ে বসেছে, যা অন্য শব্দে সফল হবে না। 'পকেট' এবং 'মার' সমাস্যমান শব্দগুলো লক্ষ্য করুন—এখানে ইংরেজী ও বাংলা যোগে নূতন শব্দ।

কলকাতা কালচারের অংশ, তার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে তুলনামূলকভাবেই করা হয়েছে। সুতরাং এবার এ অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। না হলে আলোচনা অপূর্ণ থাকবে বলে আমার ধারণা। আলোচনার পদ্ধতিগত রূপের জন্যেই এটা অপরিহার্য। সুতরাং আলোচনায় আসতে পারি।

কোট-প্যান্ট, ব্রাউজ, ব্লেড, বুটিং পূর্ব-পাকেও আছে। তবে বিশেষ একটা শব্দ আছে, যেটা শুধু এখানেই, কলকাতায় নেই। ধরুন, টিনের ডিবে জাতীয় পাত্রকে কলকাতা কালচারের আওতার অধিবাসীরা হয় শুধু টিন বা ডিবে বলবে। কিন্তু পূর্ব-পাকে সেটা বেমালুম 'পট' (Pot) হিসাবেই রাজত্ব চালাচ্ছে।

তেমনি রূপ পরিবর্তনেরও অভাব নেই। চট্টগ্রামে 'বাঁশখালী' নামে একটা জায়গার নামই আছে, অথচ লোকেরা 'বাঁশ'কে বলে 'বাম্বু' Bamboo। 'কাচারা' অর্থাৎ ময়লা বা অপরিষ্কার—এটা যে 'Catarrah' থেকে আসেনি, হলফ করে বলি কি করে।

অনুবাদেও পিছিয়ে নেই এ-অঞ্চল। কলকাতার 'উড্' বা 'উটপেন্সিল' এখানে 'কাঠপেন্সিল' হিসাবে খ্যাত।

তবে পার্থক্যটা, কলকাতা কালচারের মত এখানে ইংরেজী প্রভাবে গড়া শব্দ অত ব্যাপক নয়। আর তাই আঞ্চলিক ও খাঁটি বাংলা ভাষা এখানে বহুলভাবেই টিকে আছে।

কিছু ব্যতিরেকেও আছে। দিয়াশলাই বা দেশলাই আসলে হিন্দী শব্দ হলেও বাংলাও হয়ে গেছে—দিয়া কাঠি বা দীপশলা, অর্থাৎ যে কাঠি আলো দান করে। যদিও দেশলাই কাঠি ও বাক্স সবই বোঝায়—আমাদের আলোচনা সে ব্যাপারে নয়। পূর্ব-পাকে শিক্ষিত বা শহুরে লোক বাদে দেশলাইকে কেউ চিনবে না, যদি 'ম্যাচিস', 'মাসিস' বা 'ম্যাচ' না বলেন।

আরো মজার ব্যাপার হল, কলকাতার 'পানতোয়া' বর্ডার পেরিয়ে আর পানতোয়া থাকতে পারবে না—হবে 'লেডিকেনি'—অর্থাৎ ঐতিহাসিক পুরুষ লর্ড ক্যানিং-এর বেগমের নামে 'লেডিকেনি' (অনুস্বারটুকু শুধু বাদ পড়েছে)। জানি না পানতোয়ার সাথে লেডি কেনিং-এর রঙের কোন মিল ছিল কিনা।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল ও একাল' কেতাবে স্কুলে ইংরেজী শেখাবার নূতন ফন্দীর বেশ নমুনা দিয়েছেন। ধরুন, স্কুলে ইনেস্পেক্টর এসেছেন। শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞেস করবেন, কি ঘোষাব? গার্ডেন ঘোষাব, না স্পাইস ঘোষাব? যদি গার্ডেন ঘোষাবার (কি বলব, অর্থে, 'ঘোষাব'—বা ঘোষণা করবও বলতে পারেন) পালা আসে, ছাত্রদের আগে থাকতেই শেখান থাকে—তারা গড়গড় করে বলে যাবে :

পার্মকিন্ লাউ কুমড়ো, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন্ চাষা॥

পূর্ব-পাকেও হাটে-বাজারে বিক্রেতারা কিছু কিছু ইংরেজী ভাষা রপ্তের প্রমাণ দেখায়। যেমন দামে না বনলে অনেককেই বলতে শোনা যায় 'টেক টু টেক, নো টেক টু গো' —নিলে নেন, না নিলে যান' যার অর্থ।

তা ছাড়া চাটগাঁর বাজারে এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ ওঠে—আঁশহীন, রক্তহীন জেলি সদৃশ নমনীয়, শুভ্র এক প্রকার মাছ যার নাম স্থানীয় কথায় 'লইট্টা'। সাহেবরা বাজারে এসে এই মাছের রূপ দেখে নিজেদের গোষ্ঠীর ভেবে আকৃষ্ট হন। হয়ত জিজ্ঞেস করেন :

হোয়াট ইজ্ দিস?

লইট্টা ফিশ। মাছওয়ালার উত্তর।

কলকাতা কালচারের মত পূর্ব-পাকেও খোঁজ চালালে অনেক নজির পাওয়া যাবে যা ইংরেজীর বিভিন্ন মর্ম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে-রকম কোন অনুসন্ধান হয়নি যা আমাদের অলসতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতার ফল। যাকগে, কি হবে, কার বা কে করবে, সে সম্বন্ধে বলে লাভ নেই কেননা, যে জাতি নিজেদের জানার জন্যে হৃদয় থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে না তাদের উপর থেকে বলেই বা কতটুকু করানো যায়।

এ-রচনার শেষ অনুচ্ছেদে একটা মাত্র অনুরোধ পেশ করে কলম বন্ধ করব। কলকাতা কালচারের কতটুকুই বা জানি। তাই অনুরোধ, এ ব্যাপারে ভাষার ব্যাপারীরা তাঁদের বিজ্ঞতার আলোক কিছু পরিমাণ যেন ব্যয় করেন। পূর্ব-পাকের ব্যাপারটা এ অধমের জন্য তোলা থাকতে পারে।

রকমবিরকমের doll

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এ পৃথিবীতে কত রকমের ডল্ আছে, এ-প্রশ্ন করলে দেখবেন, আপনি এক গভীর গাড্ডায় গিয়ে পড়েছেন। সারা পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিন, এক আমেরিকাতেই কত রকমের আছে, কেউ তা গুনে শেষ করতে পারবে না, হিসেব করে কুলতে পারবে না, ভেবে কুলকিনারা পাবে না। শুধু জেনে রাখা ভাল—ডল্ রকমবিরকমের। এখানে এখন তিন রকম ডল্-এর কথাই বলা যাক। প্রথমে ভি-ডল্, এর পর মোবাইল-ডল্ এবং সবশেষে স্লিপিং-ডল্-এর সব কথা। আমেরিকায় পুতুল না বলে মিষ্টি করে বলে ডল্। শী ইজ্ এ ডল মানে মনোমত ঠিক একটি পুতুলের মত সুন্দর কিছু জিনিস। দাঁড়ো, ছোকরা, মাঝবয়সী সবাই একটা-না একটা এমন পুতুল পেতে চায়। মোমের বা প্লাস্টিক পুতুলের মত এসব পুতুল চলচলে হলেও তারা নির্বাক নির্জীব কিছু নয় যে, আলমারিতে শুধু শোভা বর্ধনের কাজে লাগে। এসব তাক-লাগানো মন-ভোলানো রক্তমাংসের রকমবিরকম পুতুলেরা স্কার্ট-পরা, রং মাখা, কথা-বলা, পায়ে-হাঁটা চনমনে, সেয়ানা, সোমত্ত সব চীজ, যাদের দিয়ে পুরুষমানুষ মাত্রেরই সাধ হয় একটা পুতুল পুতুল খেলা করি, নামে সংসার পাতি। অসাবধান হলে এ-পুতুল ভাঙে না, তখন সংসারটাই ছত্রকুটে যায়। ডল যখন অতিরিক্ত প্রিয় হয়ে ওঠে, তখন সে প্রিয়া ডল থেকে এঞ্জেল-এর ধাপে ওঠে। তখন বুঝতে হবে, ফলার রীতিমত পেকেছে। ঘনঘটা করে এবার কিছু ঘটবে।

'ভি'-ডল্স অর্থে চার্চিলের 'ভি' ফর ভিক্টরি নয়, 'ভি' অর্থে এখানে ভাইস। রকফেলারের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়েইস্-এর তাঁরা কেউ নয়। এরা ভাইস ডল্স। এদের সম্পর্ক ভাইস-এর সঙ্গে। তারা ঘরমুখো শান্তশিষ্ট স্কার্টবিশিষ্ট জীব নয়। বাইরেই তাদের ঘর, বাইরের জনই তাদের আপন জন। নিঃসন্দেহে তারা মেয়েমানুষ ভাল। কিন্তু ভাল মেয়েমানুষ অর্থে ভাল কিনা তা বলা শক্ত। ডলার পেলেই তাদের মন হয়ে ওঠে কুঞ্জবন—সেখানে মধুর লোভে লোভী নানারকমের ভ্রমর গুনগুন করতে আসে।

আমেরিকায় দিনের মধ্যে একশো বার রেডিও ও টেলিভিসনের মন্তর উচ্চারিত হচ্ছে এফ বি আই। এফ বি আই বলতে কী বোঝায় তা জানতে খুব বেশী দেরি হয় না—কিছু দিনের মধ্যে জানতে পারবেন এর অর্থ। অর্থটা হলো ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন। অর্থাৎ মার্কিনী টিকটিকি বিভাগ। যাদের কাজ হলো যত কিছু জাল, জুয়োচুরি, বদমাইসি, খুন-খারাবি, নারীঘটিত ব্যাপার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো ও এই রকম যাবতীয় দুরোনো যত বাজোর দুষ্কর্মের পিছনে লাগেয়া করা। এফ বি আই ঠিক নিউ ইয়র্কে দুটি অ্যাটম বম ফাটানোর মত কাজ করে বসলেন। কথা নেই, বার্তা নেই, পর পর সম্ভ্রান্ত বংশের দুজন উচ্চস্তরের রমণীর উপর পরোয়ানা জারি করে গ্রেপ্তার করে বসলেন। এই দুই মহিলা নিউ ইয়র্কের যে অংশে বসবাস করতেন সেন্ট্রাল পার্কের ইস্ট সাইডে, সেখানকার কারুর গায়ে আঁচড় কাটা কল্পনাতীত ব্যাপার। বদু তাঁরা পুলিসের হাতে গিয়ে পড়লেন। কী, কেন, কিসের জন্য এই রকম একটা ঘটনা ঘটল, তার সম্পর্কে হাজার প্রশ্ন উঠল। যখন এই গ্রেপ্তারের পিছনে যে নিগূঢ় কারণ আছে জানা গেল, তখন তা শুনে সবাই হতবাক। এই দুজন উচ্চকুলা

শী ইজ্ এ ডল্

সম্ভবা মহিলা ভি-ডল্ নিয়ে তেজারতি কারবার করে প্রচুর ডলার উপার্জন করেন। আমেরিকায় ব্যবসার নামে সবাই পাগল—কোন পথ দিয়ে ডলারের বান ঘরে এসে ঢুকবে, তার ঠিকানা নেই। তাই ডলার উপার্জনের জন্য নব নব পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত। কিন্তু এই মহিলা দুজন যে সুড়ঙ্গ-পথ আবিষ্কার করেছেন, তা যত রমণীয়, তত পিছল এবং সেই সঙ্গে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁরা নিজের ঘরে বসে শুধু টেলিফোন তুলে প্রতি বছর হাজার হাজার ডলার রোজগার করে থাকেন। অন্য লোকে ফরমাশ করে, তাঁরা শুধু পরের ইচ্ছাটুকু তামিল করে দিয়ে প্রচুর মুনাফা খান। দুজনারই ব্যবসার

ভি-ডল্ নিয়ে তেজারতি কারবার করে......

দুলোধন বলতে এমন কিছুই হাতী-ঘোড়া নেই। শুধু যা বিশ-তিরিশ জন সতের-আঠার বছরের নড়েচড়ে এমন ধারাল গোছের ডল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নয়। তাতেই তাঁদের বাজিমাত। এই যে দুজন রমণী পুলিসের খপ্পরে পড়েছেন তাঁদের প্রথম জনের শুভনাম ম্যাডাম এলিজাবেথ স্পিডিং। মহিলাটি জাতে ক্যানাডিয়ান, পরে তিনি এক রুমানিয়ান কাউন্টকে বিবাহ করেন। কিন্তু পিচ্ছিল পথের পথিক তিনি, তাঁর সে বিবাহ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পর তাঁদের সম্পর্ক ফাটিফাটা হয়ে যায়। তিনি রুমানিয়ান কাউন্টকে সাগ্রহে ছুটি দিলেও বিয়ে করে যৌতুক হিসাবে পাওয়া তাঁর কাউন্টেস লেভেলটি অপ্রাণ আটকে ধরে থাকেন। সেই থেকে তিনি বন্ধুমহলে ম্যাডাম খ্যাত। নিউ ইয়র্কে এসে মহিলাটি নানারকমের ডল্ : শো-গার্ল, মডেল ও

অভিনেত্রীদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দেন। গোপনে গোপনে নিউ ইয়র্কের সমাজের উচ্চতম মহলে ম্যাডামের চাহিদা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, নিউ ইয়র্ক থেকে বহু দূরে দূরে জায়গায়, যেমন মায়ামি, আটল্যাণ্টিক সিটি, ভেনেজুয়েলাতেও তাঁর রসগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয় না। যাঁরা হুকুম করলেই নিউ ইয়র্ক থেকে তাঁদের মনোমত কাউকে না কাউকে ম্যাডাম পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় মহিলাটির নাম ডেবোরা ড্রেসি—তাঁরও ডলার উপার্জনের পথ এবং পাথেয় একই উপায় অবলম্বনে। তাঁরও টেলিফোন

হাজার মাইল পথ শুধু ঘাসের রস খেয়ে......

আসতে নানারকম লোকের মন-মর্জির দাবি-দাওয়া নিয়ে। শুধু ব্যবস্থাপনা করে দিয়েই মোটা টাকা তিনি আত্মসাৎ করে থাকেন। স্কার্সডেলের একজন মাঝবয়সী স্টক-ব্রোকার ড্রেসির পুরোনো খদ্দের। তিনি একদিন ফরমাশ করলেন—লোলিতা-টাইপ। এফ বি আই ড্রেসির ফোন ট্যাপ করে সমস্ত কিছু ষড়যন্ত্র হাতেনাতে ধরে ফেলেন। 'ডি'-ডল্-এর মৌচাকে বেরসিক পুলিস এসে হানা দিলে। মধুর বদলে যারা করে খাচ্ছিল, তারা সবাই পেল হুলের জ্বালা।

বাঙালী মাত্রেই বলবে—এতে আর নতুন কী আছে। এ তো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম পেশা। নতুন পৃথিবীতে এরা এদের ম্যাডাম বলছে, আমাদের শরৎ চাটুজ্জে বহুদিন আগে এদের মাসি আখ্যা দিয়ে গেছেন। হতে পারে এরা ডলারে ঘড়া ভর্তি করা শাঁসাল গোছের মাসি—কিন্তু মাসি ঠিকই।

এয়ার হোস্টেসদের অনেক সময়ে খাতির করে ফ্লাইং ডল্ বলা হয়। কিন্তু আমি যে মোবাইল-ডল্‌টির কথা এখন বলছি, তিনি কিন্তু বড় বিচিত্র জীব। অনেক বাসনা নিয়ে লোকে আমেরিকায় পদার্পণ করে। মহিলা হলে তো কথাই নেই—হলিউডের দিকে এক চোখ সর্বদা পড়ে থাকে। যদি কোন রকমে গড়নপিটন, চাকচিক্য, মণি-মাণিক্যের দোহাই দিয়ে মুভিতে একটা চান্স পাওয়া যায়। এই মোবাইল-ডল্ হলেন বারবারা মুর। আমেরিকা এসেই তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চললেন। কিন্তু একেবারে অন্য কারণে। আমেরিকার এই দুর্জয় গতির রাজ্যে উনি কিনা হয়ে এলেন অগতির দূতী। উনি বললেন—এ ছোটার দেশে আমি ছুটব না। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক এই ৩২৫০ মাইলের দূরত্ব আমি পায়ে হেঁটে আস্তে আস্তে পার হব। সবার চক্ষু চড়কগাছ। এ কী দুর্দান্ত ফরমাশ! তা ছাড়া এই মহিলাটির বায়নাক্কা অনেক। ওঁকে ছাপ্পান্নবার বসন্ত ইতিমধ্যেই পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেছে। আর এই পদব্রজে যাবার সময় উনি মাছ, মাংস, ডিম এসব কিছু স্পর্শ করবেন না। স্রেফ দুধ আর কচি ঘাসের উপর থাকবেন। উনি সব রকম কামনা জয় করেছেন ইচ্ছাকে নির্বাসন দিয়ে। পুরুষ-সংসর্গ চান না, নানারকম পানপানীয় বর্জন করেছেন, মায় আমিষ-নিরামিষ সব রকম লোভনীয় আহার-বিহার ত্যাগ করেছেন। শুধু হাঁটার মধ্যেই অকারণ পুলক খুঁজে পেয়েছেন।

বারবারা মুর জাতে ইংরাজ। ইতিমধ্যেই ওঁর খাওয়ার এই অদ্ভুত থিয়োরীর প্র্যাকটিক্যাল নিদর্শন দেখিয়েছেন। স্কটল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড প্রায় হাজার মাইল পথ শুধু ঘাসের রস খেয়ে সার্থকভাবে উনি অতিক্রম করেছেন। অগত্যা সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক পদব্রজে কবুল করবার জন্যে উনি পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। ওঁর সঙ্গে পিছু পিছু গাড়িতে তের জোড়া জুতো ও ঘাস মাড়াবার একটি কল চলল। কলোম্বাসও এমনভাবে আমেরিকা জয় করেননি, যেমন-ভাবে বারবারা মুর শেষ পর্যন্ত করলেন। উনি হেঁটে নিউ ইয়র্ক এসে পৌঁছলেন। নিউ ইয়র্ক পৌঁছবার শেষের ছয় মাইল নিয়ে গোল বাধল। পথ চলতে চলতে রাস্তায় উনি গাড়িতে ধাক্কা খান এবং তাই নিউ জারসি থেকে হল্যান্ড টানেল পর্যন্ত ওঁকে পুলিসের গাড়িতে করে তুলে আনা হয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য। পরের দিন তিনি সামান্য সুস্থ বোধ করলেই নিজে গিয়ে নিউ জারসি থেকে হল্যান্ড টানেল পর্যন্ত আবার হেঁটে এসে পথপরিক্রমা সাঙ্গ করলেন।

উনি এত বড় একটা অসাধ্য সাধন করে আনন্দে যে ফিস্ট করলেন, তাতে মেনু ছিল কী? বেক্‌ড্ টোমাটো, সেদ্ধ গাজর, ব্রোকলী (এক রকম শাক), টারনিপ (আর এক রকম উদ্ভিদজাত ব্যাপার)। আমিষ কিছু নয়, সবই নিরামিষ ব্যাপার।

পরের দিন তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে কাগজে কাগজে নানান শিরোনামা বার হল—মুভিং-ডল্-এর জয়জয়কার। উনি এবার অ্যাডেলাইড থেকে সিডনী পায়ে হেঁটে যাবেন, এই ইচ্ছা করেছেন। তাই ওঁর পরের যাত্রা অস্ট্রেলিয়ায়। সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। ভারতবর্ষে কি উনি আসবেন না? শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হলে মন্দ কি। আর এখানে কত রকম শাক-সব্জীর ছড়াছড়ি!

নিউ ইয়র্কের বাঙালী সমাজের একজন মাথা বললেন—ওঁকে নেমন্তন্ন করে চিঠি দেওয়া যাক টেগোর সোসাইটির পক্ষ থেকে, যাতে উনি একবার ভারতপথিক হন।

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত হাসপাতাল মাউন্ট-সিনাই-এ সেদিন আর এক রকমের ডল্ এসে উপস্থিত—তারা দুটি স্লিপিং ডল! একজন হল তিন বছরের বারনাডেট আর অন্যজন পাঁচ বছরের ভেরনিকা। দুজনে দিনরাত নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকে। স্ফূর্তি করে ওঠে না, চলাফেরা করতে পারে না। এমনিতে তাদের শারীরিক কোন দোষত্রুটি আছে বলে কেউ জানে না। কিন্তু দিন নেই, রাত্রি নেই, তারা দুটিতে অবসন্ন অচৈতন্য হয়ে শুধু বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কেন পড়ে থাকে? তাদের ২৯ বছরের মা লিলিয়ান ফ্রাটানটোনিও সঙ্গে করে দুটিকে এনেছেন পৃথিবীর রথী মহারথী সব ডাক্তার-দের কাছে বাচ্চা দুটোর এমন অবস্থা কেন হল জানবার জন্য। কত রকম পরীক্ষা হল, কিন্তু কিছুই জানা গেল না। তাদের শরীরের অসুস্থতার কোন লক্ষণও পাওয়া গেল না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে বাচ্চা দুটিকে সঙ্গে করে তাদের মা নিজেদের থাকবার জায়গা ক্লিভল্যান্ডে ফিরে গেলেন। কিন্তু ফিরে গিয়েও তাদের শারীরিক কোন উন্নতি দেখা গেল না—তারা যেমন ঝিমিয়ে থাকত, তেমনিই রইল—কিসের ঘোরে যেন তারা অচল হয়ে থাকে। লিলিয়ানের স্বামী

সমস্ত পরিবার নিয়ে আবার নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে আর একবার ধর্না দিতে এলেন। বাবা-মার ঐকান্তিক ইচ্ছা শিশু দুটির যদি কোন ব্যবস্থা করা যায়। শিশু হাসপাতালে তাদের রেখে আবার রক্ষণা-বেক্ষণ চলল। তাদের মা লিলিয়ান প্রত্যহ হাসপাতালে এসে শিশুদের কাছে সারাদিন থাকেন, আবার রাত্রে ফিরে যান। এবারও পরীক্ষা করে নির্ভুল জানা গেল, তাদের দেহের মধ্যে কোন গঠনের বা ক্রিয়াকলাপের অসংগতি নেই। তখন সমস্ত ডাক্তাররা তাদের মা লিলিয়ানের উপর কেমন সন্দেহ করতে লাগলেন। এবং একদিন হাসপাতালে তিনি আসার পর তাঁর অজান্তে তাঁরই ভ্যানিটি ব্যাগটি তন্নতন্ন করে পরখো করা হল। ব্যাগ থেকে বার হল নিজের মুখে কারুকার্য করার জন্য পাউডার, লিপস্টিক, রুজ, ভ্রু-টানা ব্রাশ আর তা ছাড়া একটি ছোট্ট ড্রপার। এই ড্রপারের গায়ে তখনও সাদা সাদা পাউডারের মত কী যেন লেগে ছিল। তা পরীক্ষা করে জানা গেল, তা হল বার্বিটি-উরেটস। সেই সূত্র ধরে শিশু দুটির রক্ত বিশদভাবে পরীক্ষা করে তার ভিতরও বার্বিটিউরেটসের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া গেল।

মাকে জেরার পর জেরা করা হল। কেন এমন কাজ করেছ? এমন ফুটফুটে শিশু দুটিকে তুমি কেন ঘুমের ওষুধ খাওয়াও? প্রথমে মহিলা কোনমতে স্বীকার করবেন না।

—বার্বার্বাটিউরেটস

তারপর অনেক জেরার ভয় দেখানোর পর মানলেন যে, নিজের স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা বলে ডাক্তারের কাছ থেকে উনি এই ঘুমের ওষুধ প্রায়ই নিয়ে আসেন ও নিজে খাওয়ার বদলে তাঁর শিশু দুটিকে দুধের কিংবা ফলের রসের সঙ্গে নিয়মিত তা খাইয়ে থাকেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য, কি কারণে?

কারণ আর কিছুই নয়। উনি বললেন যে, গৃহস্থালী কাজ করবার সময় ওরা বড্ড চুলবুল করে, নানান বায়না, নানান আবদার ধরে। তাই নিঝঞ্ঝাটে সংসারের কাজ সারবার জন্যে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগ সহজে তা মেনে নিতে রাজী নয়। তাঁরা বলছেন—তাই কি আর ঠিক? এর ভিতরেও অন্য ব্যাপার থাকতে পারে। সকালে ওঁর স্বামী কাজে বেরবার পর শিশু দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পেছনে হয়তো অন্য কোন পুরুষের নিজের ফ্ল্যাটে আনাগোনার ব্যাপার থাকতে পারে। স্বামী চলে যাওয়ার পর শিশু দুটি যদি ঘুমিয়ে থাকে, তা হলে তার সুবিধা অনেক রকমের হতে পারে।

ইতিমধ্যে মহিলার তৃতীয় সন্তান এসে হাজির। ডাক্তাররা নবজাত শিশুকে মার হেপাজত থেকে সরিয়ে এনে 'দেশের সন্তান' করে অন্যত্র রাখলেন। মহিলাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে দেওয়া হল, যাতে তাঁর স্বাভাবিক মানসিক প্রবৃত্তি ফিরে আসে। মহিলার স্বামী এই ব্যাপারে সবচেয়ে একচোটিয়ে বলে ভাবেন। আমি তো এসবের কিছুই জানি না, অথচ কাণ্ড এর ভেতর চলছে। সব স্বামী যদি সব স্ত্রীর সব কাণ্ডকারখানা জানতেন'

কিছু দিনের মধ্যেই ঘুমন্ত শিশু দুটি আর অমন যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ত না। দেখতে দেখতে তারা স্বাভাবিক হয়ে চলাফেরা করতে পারলে। কিন্তু তাদের মার জন্যে কিছু দিনের শ্রীঘর বসবাসের ব্যবস্থা হল।

যেদিন অকুণ্ঠ প্রেম

মনীশ ঘটক

ম্যামথের দিন গেছে। ডাইনোসর টেরা ডিক্‌টিল
লুপ্ত ভূমণ্ডল থেকে। নর্দমায় করে কিলবিল
জোঁক কেঁচো কেন্নোর দল। ঘরে ঘরে ছুঁচোর কেত্তন,
আরশোলা গন্ধপোকা গুব্‌রে চাম্‌চিকের নর্তন।

ঈশ্বর মেনেছে হার, বৃথা চেষ্টা মহৎসৃষ্টির,
অশক্ত অথর্ব বুড়ো, সে জৌলুস নেইক দৃষ্টির।
দু'একটা ভূমিকম্প, দু'একটা হিমানিঃস্রবণ,
দু'একটা অগ্ন্যুদ্গার বিধাতারে করায় স্মরণ।

করার যা কিছু সব মানুষেই করে আজকাল।
আত্মকসৃজন থেকে ভবাতরী করা বানচাল,
কলিশনে লোক মারা, কেড়ে নেওয়া ক্ষুদের আহার,
জিভ্ কেটে বন্ধ করা অধিকার মাকে ডাক্‌বার।

মানুষই করছে আজ ভ্রূণগর্ভা নারীর সংহার
দুর্বলের পরে আজো থামে না বলীর অত্যাচার।
বিশ্বাসের স্বর্গপুর যে মানুষ নিজ হাতে গড়ে,
বালুর কেল্লার মতো নিজেই সে ভাঙে গুঁড়ো করে।

আরো কত কী যে করে ফিরিস্তিতে কুলোনো যাবে না,
মানুষ নিয়েছে ভার শুধ্‌বারে বিধাতার দেনা।
তবুও স্রষ্টার কাছে মানুষের ছিল অঙ্গীকার
নব নব সৃষ্টি দিয়ে স্রষ্টারে সে করবে স্বীকার।

তাই আজ চাঁদে লোক যায়। সাইবেরিয়ার হিম
দ্রব হয়ে নদী পথে মরুগিরি করে শ্যামলিম।
রুদ্ধরেতঃ তপস্বীর অপ্রমেয় শক্তির সঞ্চয়
অনাচারী শাক্তের ব্যাভিচারলিপ্সা করে জয়।

সূর্যলোকে যে জ্যোতিষ্ক আজো চোখে পড়েনি কাহারো
মনে হয় একদিন খুঁজে পাবে সন্ধান তাহারো
বীর্যব্রতধারী নর মেধা ও মস্তিষ্কে বলীয়ান,
যেদিন অকুণ্ঠ প্রেম অন্তর্লোকে হবে দীপ্যমান।

সেদিন পড়বে ধরা মহাকাশ করে অন্বেষণ
সে অমরা—যার খোঁজে ব্যর্থ অনুসন্ধিৎসার পণ,
প্রতীচিতে নিত্য সেই দিবালোক অক্লান্ত প্রহর
জেগে আছে দিন গণে কে জাগাবে উন্মেষ শিহর॥

চাঁদের আগুনে পুড়ি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগুনেতে সব পোড়ে
কেউ বা আঙার হয়, কেউ বা ছাই
ভাবলাম তাই
চাঁদের আগুনে পুড়লে কী দশা আমার
হবে আজ মাঝরাতে এই শনিবার?

ধীরে-ধীরে পুড়ে-পুড়ে যাই
অতীত ও বর্তমান নাই।
আশ্চর্য দহন
মনে হয় মানে বুঝি জীবনের এই প্রহসন।

এ-জন্ম, আগের জন্ম, পরের জন্মের সব কথা
অপ্সরা ও গণিকার ঘুঙুরের ছন্দবিহ্বলতা

পুড়ে-পুড়ে সব হয় ছাই
কী যে ছিলো, কী যে আজ নাই!

এদিকে বাঁশের পাতা কাঁপছে
কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল ধরছে।
মেঘ থেকে বৃষ্টি, তাই থেকে সৃষ্টি
তারপর তার কথা মনে যেন পড়ছে।

চাঁদের আগুনে আমি ধীরে-ধীরে পুড়ি
স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা ঝরণার নুড়ি।
শান্ত চোখের পাতা হিম-স্নিগ্ধ দেহ
সে-দেশে যাবার পথ আজিও দুর্জ্ঞেয়।

॥ ৪ ॥

এসব খবর গণেশ হালদার কিছুই জানতেন না। প্রথম প্রথম তাই তিনি একটু সংকোচ অনুভব করছিলেন। কিন্তু খামখেয়ালী ডাক্তারবাবুকে ভালো লেগে যাবার পর এ ভাবটা আর থাকে নি, বিশেষ করে তাঁর স্বরচিত খামখেয়ালী রচনাগুলি পরিষ্কার করে লেখার সুযোগ পেয়ে তিনি আরও যেন ভালবেসে ফেলেছিলেন এই লোকটিকে। গণেশ হালদার ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র। শুধু তাই নয়, তিনি সাহিত্যরসিকও। তাই তিনি সুঠাম ডাক্তারের দুষ্পাঠ্য লেখার পাঠোদ্ধার করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ লোকটি কেবল ডাক্তার নন, কবিও। পেপিস-এর (Pepys) লেখা ডায়েরি এখন যেমন ইংরেজী সাহিত্যের আসরে সমাদৃত হয়েছে, ওঁর লেখাও হয়তো তেমনি একদিন হবে। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা, কিন্তু ওর উপর শাশ্বতের আলো পড়েছে।

সেদিন সকালে গণেশ হালদার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন একটা কথার পাঠোদ্ধার করবার জন্যে। একটি রোগীর জরুরি দরকারে সেদিন ডাক্তারবাবুকে একটু সকাল সকালই ডিসপেন্সারিতে যেতে হয়েছিল। লোকটি বাইরে থেকে এসেছিল, রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ট্রেন ধরবে। সেদিন রবিবার, গণেশ হালদারেরও ছুটি ছিল। তিনি এগারোটা নাগাদ ডিসপেন্সারিতে যখন গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রিপোর্ট লিখছিলেন। গণেশবাবুকে দেখে বিস্মিত হলেন।

"কি খবর?"

"একটা কথা পড়তে পারছি না।"

"ও। আচ্ছা, বসুন।" তারপর চোখে-মুখে হাস্য বিকীর্ণ করে বললেন—"আমিও পারব কি না সন্দেহ।" গণেশ হালদার বসলেন। তারপরই ঢুকলেন একটি অপরিচিত লোক। রোগা-রোগা লম্বা চেহারা, মুখখানা ধূর্ত শৃগালের মতো। ডাক্তারবাবুকে সেলাম করে সে বললে,

"বসন্তলালের রিপোর্টটা নিতে এসেছি।"

"বসন্তলাল কই?"

"সে আসতে পারল না। আমাকেই রিপোর্টটা নেবার জন্য পাঠাল। এই চিঠি দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবু চিঠিটা পড়ে রেখে দিলেন একধারে। তারপর রিপোর্টটা শেষ করে দিলেন তার হাতে। সে লোকটা ফি দিয়ে বলল, "একটা টাকা কম আছে।"

"কম কেন? বসন্তলাল তো গরীব নয়। তার অনুরোধে তাকে চার টাকা ছেড়েও দিয়েছি। আবার কমাচ্ছে কেন? আর কমাব না।"

"একটা টাকা ছেড়ে দিন।"

"আর এক পয়সাও ছাড়ব না।"

"ছেড়ে দিন একটা টাকা। আমি হিলসাপুরে প্র্যাক্‌টিস করি। আপনাকে অনেক রোগী পাঠাব।"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন ডাক্তারবাবু।

"আমি রোগী চাই না। আপনি বাকি টাকাটা দিয়ে তবে রিপোর্ট নিয়ে যান।"

লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

"ছাড়বেন না একটা টাকা?"

"না। বসন্তলাল আমাকে বারো টাকা দেবে বলে গেছে।"

"আমি চেয়ে নিচ্ছি একটা টাকা।"

"তোমাকে চিনি না, তোমাকে দেব কেন? তোমার চেয়ে গরীব লোকের অভাব নেই, দিতে হলে তাদের দেব।"

লোকটা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিড়বিড় কি যেন বললে। তারপর টাকাটা বার করে দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেল।

সে চলে গেলে ডাক্তারবাবু গণেশ হালদারের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "আমাকে চামার মনে হচ্ছে, না? কিন্তু ও লোকটা দালাল। ডাক্তারের টাউট, দু'একটা কেস এনে দিয়ে মনে করে মাথা কিনে নিলুম। ওদের আমি কখনও প্রশ্রয় দিই না। ওই টাকাটা ও নিজেই গাপ করত।

কই দেখি কোনখানটা পড়তে পারছেন না?"

গণেশ হালদার দেখালেন।

ডাক্তারবাবুও অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে রইলেন লেখাটার উপর। তারপর হাসিমুখে চোখ তুলে বললেন, "আপনার কি মনে হচ্ছে কথাটা?"

গণেশ সসঙ্কোচে বললেন, "যা পড়তে পারছি তার থেকে তো কোন মানে হচ্ছে না। ল, ক, ভু, ও কাঁনথবং, কোনও ডাক্তারি কথা না কি?"

"না, সংস্কৃত কথা। লজ্জভুক্তকাপিথবং। আমার নিজেরই পড়তে একটু সময় লেগে গেল। মোটর যখন চলছিল তখনই লিখেছিলাম। কলমের কালি ফুরিয়ে যেতে পেন্সিল দিয়েই লিখেছি ওখানটা। আমার 'গ'-গুলো প্রায়ই 'ল'য়ের মতো হয়ে যায়, আর 'প'-গুলো দন্ত্য 'ন'য়ের মতো। আবার 'ণ'য়ে আর তালব্য 'শ'য়ে অনেক সময় কোনও তফাত থাকে না।"

বলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

গণেশ হালদার বললেন, "ও, এখানটাও এবার পরিষ্কার হল তা হলে। 'অহঙ্কারের লক্ষ' আমি বুঝতে পারছিলাম না। ওটা হবে 'অহঙ্কারের গন্ধ'! এইবার ঠিক হয়েছে।—"

আর একটি লোক এসে প্রবেশ করল। দীন-দরিদ্র চেহারা, মাথার চুল উসকোখুসকো, জামা কাপড় তালি দেওয়া। বললে, "আমার উরুতে, আর হাতের অনেক জায়গায় অসাড় হয়ে গেছে। সাদাও হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। ঠাণ্ডার আর গরমের তফাতও বুঝতে পারি না।"

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে কুষ্ঠ হয়েছে। রক্তটক্ত পরীক্ষা করতে ষোল টাকা খরচ হবে।"

সে তখন একটা চিঠি বার করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিলে। চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন, "ও, তাই না কি? আচ্ছা, তোমাকে কিছু দিতে হবে না। কাল দশটার পর এসো।"

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। গণেশ হালদারও উঠলেন।

"চলুন, বাড়ি যাওয়া যাক। এখুনি খেয়েই আমাকে বেরুতে হবে।"

খেয়েই বেরিয়ে এলেন।

"বেচু, রেসকোর্সে যাব।"

"চলুন।"

বেচু ডাক্তারবাবুর ড্রাইভার। এ-দেশের লোক নয়। কলকাতা থেকে এসেছিলেন। সে-ও বাড়ির পরিজনদের মধ্যে। তবে সে বাড়িতে খায় না। সে মাইনে ছাড়া নগদ দু' টাকা করে খোরাকি পায়। তাই নিয়ে পথেঘাটে যখন যেখানে যেমন সুবিধা পায় খেয়ে নেয়। ওতেই ও খুশী। বেচুর প্রধান গুণ ও নির্বাক। ডাক্তারবাবু বাক্যবাগীশ চাকর পছন্দ করেন না। ডাক্তারবাবু সাধারণত লোকালয়ের বাইরে যান। মাঠে, গঙ্গার তীরে, জঙ্গলে যেখানে যখন খুশি। জায়গাটা জনবিরল হলেই হল। বেচু তাঁকে সেই জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা একটু দূরে নিয়ে চলে যায়। যতক্ষণ ডাক্তারবাবু না ফেরেন ততক্ষণ সে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে থাকে ধৈর্যভরে। সব সময় ঘুমোয় না। অনেক সময় পড়ে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। বেচু ম্যাট্রিক পাস, ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস পড়বার মতো বিদ্যে তার আছে। সে দিনকতক কলকাতায় ট্যাক্সি চালিয়েছিল। এক ট্যাক্সিতেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারপর ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখেছিল সে একটা। ডাক্তারবাবুর প্রয়োজন আর মাইনের বহর শুনে সে ট্যাক্সির চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। সুখেই আছে।

ডাক্তারবাবু গিয়ে নামলেন পীরবাবার সমাধিটার কাছে। অনেককাল আগেকার সমাধি কতকালের কেউ তা জানে না। হিন্দু মুসলমান সকলেরই ভক্তি আকর্ষণ করেছেন

পীরবাবার সমাধিটিকে ছায়া করে আছে দুটি গাছ। অদ্ভুত গাছ দুটি। চিরশ্যাম। ভাল করে দেখলে তবে বোঝা যায় দুটি গাছ দু' জাতের, কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে তারা যেন সহোদর। একটি গাছ ভগ্ন-কান্ড, কুব্জদেহ, বিধ্বস্ত। শোনা যায় একবার নাকি বাজ পড়েছিল তার উপরে। কিন্তু পীরবাবার সেবক বলে তার নাকি মৃত্যু হয় নি। বস্তুত, গাছটি তার খণ্ডিত ন্যুব্জ দেহ নিয়ে কি করে যে বেঁচে আছে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ডাক্তারবাবু যখনই এখানে আসেন তখনই গাছ দুটোকে বারবার পরিক্রমণ করেন। তাঁদের সঙ্গে কথাও কন। সেদিন এসে বললেন, "কি ভায়ারা, কেমন আছ? না, ঠিকই আছ দেখছি, দমে যাও নি। কিন্তু যা যুগ পড়েছে, তোমাদের আদর্শ সব বানচাল হয়ে গেল। এখন মুখোশেরই আস্ফালন। তোমরা কেউ হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, অথচ সেবা করে চলেছ এক মুসলমান পীরের। যাই হোক, বেড়ে আছ তোমরা। আমিও যদি তোমাদের দলে ভিড়তে পারতুম! কিন্তু তা অত সহজ নয়।"

গাছের পাতায় পাতায় হাত দিয়ে আদর করলেন তাদের। তারপর চেয়ে রইলেন পাশের সর্ষে ক্ষেতটার দিকে। রেলের লাইন চলে গেছে মাঠের ধার দিয়ে। দুটো লাইন। ছোট লাইন, বড় লাইন। তারপরই ছোট একটি সর্ষে ক্ষেত। সেটির দিকে ডাক্তারবাবু এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন কোন আত্মীয়কে দেখছেন। বড় ভালো লাগে তাঁর জায়গাটি। চলে গেলেন ক্ষেতের মধ্যে। ক্ষেতের মাঝখানেই একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ। সেও ডাক্তারবাবুর বন্ধু। গিয়ে তাকেও একবার পরিক্রমণ করলেন। কচি কচি পাতাগুলো থেকে আলো যেন পিছলে পড়ছে। তারপর একটা বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলেন। একটা পাথর ছিল। তার উপরেই গিয়ে বসলেন প্রথমে, কিন্তু তেমন জুত হল না। তাঁকে লিখতে হবে, চাই একটা ঠেস দেওয়ার মতো জায়গা! তিনি ইচ্ছা করলেই ভালো করে বসবার এবং লেখবার সাজসরঞ্জাম আনতে পারেন, বেচু একটা ভালো জায়গা দেখে তাঁর বসবার এবং লেখবার বন্দোবস্তও করে দিতে পারে, কিন্তু এ ব্যবস্থা সত্যাম মুখুজ্জের মনোমত নয়। তিনি যখন প্রকৃতির কোলে এসে বসতে চান, এক জামা কাপড় ছাড়া মানবসভ্যতার অন্য কোন আড়ম্বর তিনি সঙ্গে আনতে চান না। তাঁর মনে হয় ওগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের বাধা। ওসব আনলে প্রকৃতির ঠিক কোলটিতে বসা যাবে না। এতদিন তিনি কোনও অসুবিধা ভোগ করেন নি, কিন্তু যেদিন থেকে গণেশ হালদারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতিদিন তাঁর জন্য কিছু লিখবেন সেদিন থেকে একটু অসুবিধা বোধ করছেন। সর্ষে ক্ষেতের মাঝে তিনি টেবিল চেয়ার আনতে রাজী নন। অথচ লিখতেই হবে। প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ তিনি করতে পারবেন না। হঠাৎ চোখে পড়ল রেলের ওপারে একটা কাটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে। তাতে ঠেস দিয়ে বসলে লেখার খুব অসুবিধা হবে না। সেইখানেই গেলেন। গিয়েই দেখতে পেলেন কয়েকটা ঘেঁটু-গাছও রয়েছে সেখানে, আর আশে-পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। 'বাঃ!' বলে বসে পড়লেন তিনি সেইখানেই চাপটালি খেয়ে। তাঁর পায়জামা খুব ঢিলা-ঢালা সেজন্য বসবার কোনও অসুবিধা হল না। পকেট থেকে বার করলেন কয়েক টুকরো কাগজ—ওষুধের বিজ্ঞাপন। উত্তোলিত জানুর উপর সেগুলো রেখে ভাবতে লাগলেন কি লিখবেন। বিজ্ঞাপনের ভালো ভালো কাগজে অনেক সাদা জায়গা থাকে। সেই সব ফাঁকগুলোই ভরিয়ে ফেলবেন ঠিক করলেন। লেখার বিষয় আগে থাকতে ভেবে আসেন না। ওখানে বসে যা মনে হয় লেখেন। খানিকটা লেখা নিয়ে কথা। এদিক ওদিক চেয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ঘেঁটুগাছগুলোর দিকে চেয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। আর একটু এগিয়ে গেলেন সে দিকে এবং অনেকক্ষণ ঝুঁকে কি যেন দেখলেন। তারপর ফিরে এসে লিখলেন।

"এতক্ষণ ধরে যা দেখলুম, তা আগেও দেখেছি, পরেও দেখব। কিন্তু এখন যে কথাটা মনে উদ্ভাসিত হল তা হয়তো আর কখনও মনে হবে না। তাই লিখে রাখাই ভালো। হালদার মশাইও হয়তো এর থেকে চিন্তার খোরাক পাবেন কিছু। ব্যাপারটা কিছু নয়, একটা মাকড়সার জাল। ভোরে বেড়াতে এসে আগে এরকম জাল অনেক দেখেছি। জালের উপর শিশিরবিন্দু পড়ে অপরূপ দেখায় তখন ওগুলো। মনে হয় মণি-মাণিক্য-খচিত ওড়নার টুকরো পথে-ঘাটে ফেলে গেছে বোধ হয় রাতের পরীরা! কিন্তু এখন, দুপুরে, দেখছি ওটা সত্যিই জাল। দুপুরের রোদে শুধু ওর একটা নয়, দুটো রূপ খুলেছে। স্বচ্ছ সুতো দিয়ে তৈরী গোল চাকার উপর মোটা সাদা সুতোর তৈরী কারুকার্যও এখন দেখা যাচ্ছে। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সোজা চলে এসেছে এই মোটা সুতোর কাজ তির্যক রেখায়। একটি চমৎকার সুতোর চাকা, যার শুদ্ধ বাংলা চক্র। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শুধু চক্র নয়, চক্রান্তও। সকাল বেলায় শিশিরের পরিমণ্ডলে যে জীবটিকে দেখতে পাওয়া যায় না, আমি অন্ততঃ আগে দেখি নি, এখন রৌদ্রকিরণে তাঁর তিনটি রূপ দেখলাম। তিনি জাল সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি ব্রহ্মা, তিনি ছোট ছোট পোকাকে ধ্বংস করছেন তাই তিনি মহেশ্বর এবং ওই পোকাগুলি খেয়ে নিজেকে তিনি

পালন করছেন, সুতরাং তাঁকে পালনকর্তা বিষ্ণু বললেও অন্যায় হবে না। হঠাৎ মনে হল সকলের মধ্যেই এই ত্রয়ী বিরাজ করছেন। তা হলে আমরা কি সকলেই ভগবান? একটু তফাত অবশ্য আছে। একটু নয়, মস্ত তফাত। এই সব ক্ষুদে ভগবান ত্রয়ী হয়েছেন স্বার্থের প্রেরণায়। বৃহৎ ভগবানের প্রেরণা আনন্দ। একটু আগে জালে নিপতিত ছোটো পোকাটাকে যখন ছটফট করতে দেখলাম, আর তার সঙ্গেই যখন দেখলাম জালাধিপতি মাকড়সাটার বিপুল আনন্দ—তখন হঠাৎ, কেন জানি না, পোকাটার দুঃখে মনটা গল-গল হয়ে ছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের আর একটা অংশ প্রথম অংশটার গালে এক চড় মেরে বললে, ওরে বেকুব, গল-গল হবার কি আছে এতে? প্রকৃতির ওই নিয়ম, ওরা নিয়ম পালন করে চলেছে, ওর ল-অ্যাবাইডিং সুতরাং সাত-খুন-মাপ। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও আছে, নিয়মভঙ্গ করবার ক্ষমতাই ওদের নেই। এই যে কোটি কোটি খুন-

জখম হচ্ছে প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি হয় না। ওদের সে প্রয়োজনও নেই।"

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তারবাবু হঠাৎ দেখতে পেলেন দুটো বুলবুলি পাখী উড়ে এসে সামনের একটা নাম-না-জানা গাছের সরু ডালে বসে ডাকছে—কুন্ট প্রিয়, কুন্ট প্রিয়। দেখে ডাক্তারবাবু সন্তর্পণে একটি ঠোঙা বার করলেন পকেট থেকে। তাতে পাঁউরুটির গুঁড়ো, লজেন্সের গুঁড়ো, বুট ভাজা, বাদাম ভাজা, নানারকম ডাল, ধান একসঙ্গে মেশানো আছে। তিনি তার থেকে একমুঠো বার করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন বুলবুলি দুটোর দিকে। একটু এগিয়েই ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন গুঁড়োগুলো। তাঁর ইচ্ছে বুলবুলিরা ওগুলো খাক। বুলবুলিরা কিন্তু খেল না, উড়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন সুঠাম মুখুজ্যে। খানিকক্ষণ বসে থেকে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল্ বার করে বাজালেন সেটা। এটা বেচুকে গাড়ি আনবার সঙ্কেত। একটু পরেই দেখা গেল বেচু গাড়ি আনছে। গাড়ি আসতেই চড়ে বসলেন তাতে।

"চল গঙ্গার ধারে কোথাও। যে দিকটায় ইঁটের ভাটাগুলো আছে, সেই দিকে চলো।"

গণেশ হালদার যে আউট-হাউসটাতে থাকেন তার সঙ্গে জোড়া একটা দরজা দিয়ে বাইরের রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বাইরের দিকে ছোট একটা ঘরও আছে। সেইটেতেই একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার পেতে গণেশ হালদার নিজের পড়াশোনার ঘর করেছেন। খুব ভোরে ওঠেন তিনি। উঠেই ছোট একটা স্টোভ জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দেন তাতে। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্বহস্তে প্রস্তুত এক কাপ চা খেয়ে তিনি খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকেন ধ্যানাসনে। ঠোঁটগুলো নড়তে থাকে। মনে হয় কোনও স্তোত্র পাঠ করছেন। একটু পরেই তাঁর ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। ঠিক পাঁচটার সময় হালদার মশাই টেবিলে এসে বসেন। শীতকালে আলো জ্বালাতে হয়, গ্রীষ্মকালে সামনের ছোট জানলাটি খুলে দিলেই আলো আসে। প্রথমেই হালদার মশাই স্কুলের ছেলেদের খাতাগুলি সংশোধন করেন। তিনি এখানে এসে 'হোম টাস্ক' (home task) ব্যাপারটার পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। খাতাগুলো দেখে, সময় থাকলে, তিনি নিজের ডায়েরি লেখেন। সম্প্রতি ডাক্তারবাবুর লেখাগুলো পরিষ্কার করে টোকাও তাঁর আর একটা কাজ হয়েছে। প্রথমে তিনি নিজের ডায়েরিই লেখেন। তারপর ডাক্তারবাবুর লেখাটার পাঠোদ্ধার করেন।

সেদিন তিনি ডায়েরিতে লিখছিলেন:—"এক দেশ থেকে উন্মূলিত হয়ে দলে দলে মানুষ অন্য দেশে গেছে ইতিহাসে একথা নূতন নয়। কিন্তু আমাদের বেলায় একটু নতুন ধরনের ব্যাপার হয়েছে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের তদারকে এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন হল পাকিস্তানের হিন্দুরা তাদের বিষয়সম্পত্তির মূল্যও পেল, কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষেত্রে সেটা হল না। বাংলা দেশের উদ্বাস্তুরা জলে-স্থলে অনলে-অনিলে ছড়িয়ে পড়ল অসহায় গরু-ভেড়ার মতো। কেন? এ কেনর উত্তর কর্তৃপক্ষেরা দিয়েছেন কি না আমার জানা নেই। আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত তাই আমার কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমাদের মর্মের উপর দিয়ে এই যে দুর্গত স্টীম রোলার চালানো হল এর কি কোনও প্রতিকার নেই? কিন্তু ইতিহাস পড়তে পড়তে এ সব কথা মনে হয় নি, এত কষ্ট পাইনি। কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে মানুষেরই হাতে, এই তো মানুষের ইতিহাস। আমি যখন ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম, তখন চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুরলঙের রক্তাক্ত কাহিনী পড়ে কি শিউরে উঠতুম? ইজিপ্টের ফারাও যখন জুদের ইজিপ্ট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তা পড়ে কি মনে কোনও শিহরন জেগেছিল আমার? ওল্ড টেস্টামেণ্টের এ সব কাহিনী তো উপন্যাসের মতো পড়েছি। আমাদের নিয়ে কি কোন ওল্ড টেস্টামেণ্ট লিখিত হবে? আমাদের মধ্যে কি মোজেস আছে কেউ? কে জানে! ইতিহাসের নতুন পর্বে কিছু কম হয়েছে অনেক জিনিস। এই ইহুদীদের উপর কি কম অত্যাচার হয়েছে? হয়ে শেষ হয়ে যায়নি, যুগে যুগে হচ্ছে। কিন্তু কি বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ ওদের জাতীয় ইতিহাস! মানব সভ্যতার এমন কোন বিভাগ আছে কি, যা ওদের দানে সমৃদ্ধ নয়? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প, নৃত্যকলা, খেলাধুলো এমন কি সার্কাসে পর্যন্ত ওদেরই কৃতিত্ব। অথচ হিটলার ওদের উপর কি পাশবিক অত্যাচারই না করেছিল! আজ হিটলার কোথায়? কিন্তু জার্মান-সভ্যতার অঙ্গে অঙ্গে আজ ওদের দেওয়া মণি-মাণিক্য ঝলমল করছে। তা কি কেউ কখনও মুছে দিতে পারবে? পারবে না। কিন্তু কথায় কথায় আমি প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। যে কথাটা আমি এখনি ভাবছিলাম তা হচ্ছে ইহুদী নরনারীর উপর নাৎসী জার্মানীর যখন অকথ্য অত্যাচার চলছিল তখন আমি কি মুষড়ে পড়েছিলাম? হিরোশিমায় জাপানীদের উপর যখন মার্কিনী অ্যাটমবোমা পড়ল সে খবর পড়ে কি আমার

পাত্রর নিদ্রা বিঘ্নিত হয়েছিল? লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে হয়নি। সে খবর শোনবার পরও আমি ঘুমিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়। আমার চোখের সামনে একবার একটা ছেলে মোটর চাপা পড়েছিল, তার রক্তাক্ত দেহটা আমি দেখেছিলাম। তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। তার ঘাড় লটকে পড়েছিল, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার গালটা আর কপালটা। কিন্তু এসব প্রত্যক্ষ করেও আমি তেমন বিচলিত হইনি। তারপর বাড়ি গিয়ে স্নান করেছিলাম, খেয়েছিলাম, একটা ফুটবল ম্যাচও দেখেছিলাম এবং তার দু'দিন পরে সব ভুলেও গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়ছে। আর একটা জিনিসও লক্ষ করেছিলাম তখন। মোটর চাপা পড়তেই খুব ভিড় হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, রাস্তার কয়েকটা গুণ্ডা গোছের ছোকরা ড্রাইভারটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নৃশংসভাবে মারধোর করেছিল, পুলিস এসেছিল, কিন্তু যে-ই এটা নিঃসংশয়ে জানা গেল যে, ওই ছেলেটি কারও আত্মীয় নয়, তখনই ভিড় কমে গেল, আস্তে আস্তে সরে পড়ল সবাই। এখন মনে হচ্ছে ছেলেটির কি মা বাবা ছিল? ভাই বোন ছিল? কোথায় ছিল তারা তখন? তাদের বুক-ফাটা আর্ত হাহাকার শুনতে পাইনি বলে মনে হচ্ছে সেই দুর্ঘটনার মধ্যে যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল, যা হওয়া উচিত ছিল যেন হয়নি। এরকম ঘটনা পৃথিবীতে অহরহ ঘটছে, কিন্তু এ কথা কি আমাদের অহরহ মনে থাকে অত্যন্ত নিকট আত্মীয় ছাড়া কেউ হাহাকার করে না? অনাত্মীয়ের বিয়োগে কেউ আন্তরিক শোক-প্রকাশ করে না এইটেই নিয়ম। তবু আমি আশা করছি কেন যে, আমাদের শোকে ভারতবর্ষ-সুদ্ধ লোক হাহাকার করবে? করা তো নিয়ম নয়। কিন্তু তবু আশা করছি, কামনা করছি, দাবি করছি, আন্দোলন করছি ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের ক্ষতিপূরণ করুক। ওরা করছেও, তবু আমরা সন্তুষ্ট হচ্ছি না। হচ্ছি না, কারণ মনে করেছিলাম ওরা আমাদের আত্মীয়, ওরা আমাদের নিতান্ত আপন লোক, আমাদের দুঃখের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু এখন আবিষ্কার করেছি ওরা আমাদের অনাত্মীয়, ওরা পর, ওরা যা করছে তা বাইরের শোভনতা বজায় রাখবার জন্য করছে, অভিনয় করছে। আমাদের নেতাদের মধ্যে যে অনেক উঁচুদরের অভিনেতা আছেন তাতে সন্দেহ কি। সত্যিকার দরদ ওদের মধ্যে নেই, থাকতে পারে না, থাকা নিয়ম নয়। আসলে ওরা মনে মনে জানে আমরা সব অবাঞ্ছিত জঞ্জাল, কিন্তু বাইরে ভান করছে অন্যরকম। সাপ ছুঁচোকে ধরেছে, গিলতেও পারছে না, ফেলতেও পারছে না। এ রকম ধরনের নানা কথা মনে হয়। আবার এ-ও মনে হয়, আমার এ সব ধারণা হয়তো ভুল। হয়তো ওরা......কিন্তু আমার এই মনে হওয়াটাকে আবৃত করে ফেলে একটা নিদারুণ ছবি। শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের ছবি। বুলিকে আর মাকে খোঁজবার জন্যে অনেকদিন সেখানে ঘুরেছি। যে সব মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখেছি তা ভোলবার নয়, মনুষ্যত্বের এত বড় লাঞ্ছনা, এত বড় অপমান যারা নির্বিকার হয়ে সহ্য করছে তাদের আপন লোক বলে ভাবি কি করে? একদল অসহায় নরনারী, শিশু, পীড়িত জলে ভিজছে, রোদে পুড়ছে, শীতে কাঁপছে, উঞ্ছবৃত্তি করছে সুসভ্য কলকাতা শহরের বুকে। লোকে যেমন সার্কাসের জন্তু-জানোয়ার দেখতে যায়, তেমনি তাদের দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল দর্শক। মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করছে কিন্তু কেউ ক্ষেপে উঠছে না, কেউ জোর গলায় বলছে না, আমরা এ অত্যাচার সহ্য করব না—যতক্ষণ না এর প্রতিকার হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কলকাতা-বাসীরা অন্নজল ত্যাগ করব, আমরাও ওদের সঙ্গে মরব। দেখেছি, উপহাসও করছে অনেকে! এরা কি সভ্য? এরা কি আপনার লোক? প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাখী বন্ধন উৎসব হয়েছিল শুনেছি, সেই ইংরেজ রাজত্বের আমলেও অচেনা লোকের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে একাত্ম আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল বাঙালী। কবি গান গেয়েছিলেন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান। এ সব কি স্বপ্ন? ভাঙা বাংলা জোড়া লেগে আবার ভেঙে গেল। বিদেশী রাজনীতিকের চালে হেরে গেল আমাদের শিক্ষিত প্রতিভাবান আকাঙ্ক্ষাবাদী নেতারা। প্রতিকার করবার উপায় নেই, হেরেই গেছে। ডিভাইড অ্যান্ড-রুলের নীতির [illegible] হয়ে গেছে

আমাদের আদর্শ, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা-ভরসা। আমরা পথের ভিখারী হয়ে গেলাম, আর সেই ভিখারীর ভিড়ে হারিয়ে গেল আমার মা আর বৃক্তি একই কথা রোজ নানাভাবে ভাবি, একই রহস্যের সমাধান চেষ্টা করি নানা পথ দিয়ে, কিন্তু সমাধান করতে পারি না কিছু। মনে হয় সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। যা সরল ছিল, তা কুটিল থেকে কুটিলতর হচ্ছে প্রত্যহ। একদিন যাকে ভালো মনে করেছিলাম, সুন্দর মনে করেছিলাম, তার বীভৎস কুৎসিত রূপ আজ দেখতে পেয়েছি। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তলিয়ে যেতে যেতেও ভাবছি তল একটা মিলবে। এ আশার, এ ভাবনার শেষ নেই। মস্তিষ্ক এখনও দেউলিয়া হয়ে যায় নি, এখনও তাই আশা করছি আমাদের এই গাঢ় তমিস্রাকে ছিন্নভিন্ন করে উদিত হবে সুস্থ-বুদ্ধির প্রদীপ্ত সূর্য। এখনও আশা করছি। কিন্তু খুব বেশী হতাশ হবার কারণ আছে কি? আমরা চেয়ে থাকি রাজনৈতিক নেতাদের দিকে, দেশের লোকের দিকে তাকাই কি? এ-দেশে কি সবাই খারাপ? ... যে ... আশ্রয়ে আছি, তিনি তো খারাপ লোক নন। তিনি পূর্ববঙ্গের বাঙাল, না, পশ্চিমবঙ্গের 'ঘটি' তা জানি না, তা জানবার প্রয়োজনও হয় না। তিনি রাজনীতির ধার ধারেন না, খবরের কাগজ একটা আসে বটে, কিন্তু সেটা তিনি পড়েন কি না সন্দেহ, কোন 'ইজম্'-এরও দাস নন। তিনি মানুষ, মনে হয় কোন দেশেই তাঁকে বেমানান মনে হবে না। তাঁর বিশাল সহৃদয়তা, তাঁর প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য, তাঁর সহজ জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে সর্বত্রই সুশোভন করবে। কোথাও তিনি বেসুরো হবেন না। তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে তা তাঁর নিত্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি রোজই যেন নতুন করে আত্ম-আবিষ্কার করছেন, নতুন করে প্রকাশ করছেন নিজেকে। তিনি কবে যে কোথায় যাবেন, কি করবেন, কি ভাববেন, কি লিখবেন তা আগে থাকতে নিজেও জানেন না বোধ হয়। কিন্তু যখনই যেখানে যান পরিবেশের সঙ্গে মিশে যান একেবারে। তাঁর লেখার বিষয়ও অদ্ভুত। আকাশের মতো তাঁর মন। কখন কোন রূপে সে যে সাজবে তা সে নিজেও জানে না।..."

গণেশ হালদার এই পর্যন্ত লিখেছিলেন, এমন সময় বাধা পড়ল। টোকা পড়ল বাইরের দরজায়। বিস্মিত হলেন একটু। এ সময়ে তাঁর কাছে কেউ তো আসে না। কপাটে খিল বন্ধ ছিল, উঠে গিয়ে খুলে দিলেন। দেখলেন, দাঁড়িয়ে আছে এক অর্ধ-অবগুণ্ঠিতা নারী। তার পর চিনতে পারলেন। ডাক্তার ঘোষালের নফর। সে কিছু বলল না, নমস্কার করে একটা খামের চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। বিস্মিত হালদার মশাই দেখলেন চিঠির উপর তাঁরই নাম লেখা, গোটা গোটা মুক্তোর মতো অক্ষরে। চিঠিটা পড়ে আরও বিস্মিত হলেন।

সবিনয় নিবেদন,

সেদিন ডাক্তার ঘোষাল আপনাকে আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। আপনি যদি সে কথা বিশ্বাস করেন বড়ই দুঃখিত হব। আপনি যেদিন এ-শহরে এসেছেন, তার আগে থেকেই আপনার নাম শুনেছিলাম। আপনাকে এখানে স্কুলে চাকরি দেওয়া নিয়ে নানারকম আলোচনা হত আমাদের বাসায়। ডাক্তার ঘোষালের কাছে যে মিস্টার সেন আসেন তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, আপনি এখানে আসেন। ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির জোরে আপনি এখানে এসেছেন। আগে মিস্টার সেন আপনাদের স্কুল কমিটিতে ছিলেন, আপনাকে নেওয়া হল বলে সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন। আপনাকে নিয়ে ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে প্রচুর আলোচনা হত। তাই আপনার কথা আমি জানতাম। তার পর আপনি যখন এলেন তখন কনকের মুখে আপনার অজস্র প্রশংসা শুনলাম। কনক আমার ভাই-পো, আপনার ছাত্র। তার চোখে আপনি দেবতা। স্কুলের সব ছাত্রই আপনাকে ভক্তি করে। সেদিন আপনি যখন ডাক্তার ঘোষালের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আমি জানতাম না যে, আপনি এসেছেন। আপনি যে ও-বাড়িতে আসতে পারেন এ আমি ভাবতেই পারিনি। সেদিনকার ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার মতো লোক যে আমার সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করে থাকবেন এ আমি সহ্য করতে পারব না, তাই এই চিঠি লিখলাম। যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, ক্ষমা চাইছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি—

ঝিনুক

(ক্রমশ)

প্যারিস, ফেব্রুয়ারী। শীত আর বসন্ত ঋতুতে যত চিত্রপ্রদর্শনী হয়, তেমনটি অন্য ঋতুতে নয়। শীতকালে প্যারিসে প্যারিসিয়ানরা ঠাণ্ডার ভয়ে প্যারিসের বাইরে পা বাড়াতে চায় না। একটু গরম পড়া শুরু হলেই প্যারিসিয়ানদের দল সুড়সুড় করে এধারে ওধারে ছিটকে পড়ে। গ্রীষ্মকালে প্রদর্শনী খুলে যদি খোদ প্যারিসিয়ান দর্শক না পাওয়া যায় তা হলে তেমন প্রদর্শনীর সার্থকতা কোথায়? তাই শীত আর বসন্তকালে যত চিত্রপ্রদর্শনীর ভিড়। প্যারিসে আর্ট গ্যালারি আর আর্ট মিউজিয়মের সংখ্যা একটা-দুটো নয়। কম করে হাজারখানেক। কলকাতায় কটা? যাই হোক, গোটাকতক আন্তর্জাতিক আর বিলিতী আর্ট প্রদর্শনীর হিসেব দিচ্ছি।

'পেতি পালেতে' হয়ে গেল সাত হাজার বছরের পারস্যের আর্ট প্রদর্শনী। জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত চলেছিল 'ম্যুজে আর নুশি'তে কোরিয়ান আর্ট'-এর প্রদর্শনী। 'ম্যুজে দার মদার্ন'-এর চলেছে যুগোশ্লাভ চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। কিউবিজম-এর পুরোহিত চিত্রকর জর্জ ব্রাক্-এর চিত্রকলা প্রদর্শনী চলছে ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে। কোনো জীবিত ফরাসী চিত্রকরের চিত্রকলা প্রদর্শনী ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে তার জীবদ্দশায় হয়েছে বলে জানা নেই। ব্রাক্-ই তার ব্যতিক্রম। বিশেষ করে অতি আধুনিক কিউবিস্টদের ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে প্রদর্শনী কম ভাগ্যের কথা নয়। সাধারণত কোনো শিল্পীর পক্ষে, তিনি আধুনিক বা পুরোনো যে ঢঙেই আঁকুন না কেন বেঁচে থাকতে ল্যুভ্র্ মিউজিয়মে স্থান পাওয়া সোজা কথা নয়। সে অনেক ভাগ্যের কথা। অনেকে বলছেন, সাহিত্যিক ও শিল্পরসিক মঃ আঁদ্রে মালরো ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেই তা সম্ভব হয়েছে। অন্য কোনো গোঁড়াপন্থী মন্ত্রী হলে সম্ভব হত না। তাই মডার্ন আর্টপন্থীদের জয়জয়কার চলছে। আর্ট-জগতের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর স্পেনের গইয়া-র চিত্রকলা প্রদর্শনী চলছে ম্যুজে জাকমার আঁদ্রেতে। সপ্তদশ শতকের গইয়া-র আঁকা চিত্রপট দেখলে মনে হবে যেন পঞ্চাশ বছর আগেকার আধুনিকপন্থীদের আঁকা ছবি। গইয়া-র আঁকা 'মায়া নু' ছবিখানি অবলম্বন করে মার্কিনরা তো বছরখানেক আগে সিনেমা ছবি তোলে।

ম্যুজে গাইয়েরাতে চলছে 'পথ-ঘাট'কে বিষয়বস্তু অবলম্বন করে খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীদের আঁকা চিত্রপটের প্রদর্শনী। প্রতি বছরে এই সময়ে ম্যুজে গাইয়েরাতে অর্ডার-মাফিক চিত্রপ্রদর্শনী হল এর বৈশিষ্ট্য, ফ্রান্সে এর জুড়ি নেই। অর্ডার দিয়ে আর্ট হয় না তা জানেন শিল্পীরা। কিন্তু এই প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষরা
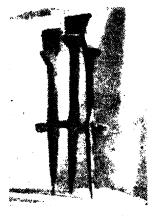
এ এল দুপুই-য়ের ভাস্কর্য : গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছে তিন বুড়ি।

রিয়ালিস্ট আর্টের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন যে, আজকের দিনে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে এক এক বছরে শিল্পীদের অর্ডার দিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। প্রতি বছরে হচ্ছেও তাই। এক এক বছরে এক এক ঢঙয়ের চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে থাকে। এ বছরে হচ্ছে 'পথ-ঘাট' নিয়ে। গ্রামের পথ, জংলী-পথ, বন-পথ, শহরের পথ, এইসব নিয়ে বিভিন্ন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীরা যা এঁকেছেন তারই প্রদর্শনী চলছে।

আরেকটি প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেল এই ক'দিন আগে, 'ম্যুজে দার মদার্ন'-এ। এটি হল তরুণ শিল্পীদের আঁকা চিত্রকলার প্রদর্শনী। তাতে দেশ-বিদেশের অনেক তরুণ শিল্পীর আঁকা চিত্রপট স্থান পেয়েছিল। চার-পাঁচটি ভারতীয় শিল্পীর আঁকা চিত্রপটও ছিল তাতে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল কলকাতার আর্টিস্ট শ্রীশান্তি বর্মণের আঁকা একটি তৈলচিত্র। শ্রীশান্তি বর্মণ প্যারিসে বছর কয়েক কাটিয়ে গেছেন।

আভেন্যু রাপ্-এর দুলোক্ আর্ট গ্যালারিতে চলছে এক মজার ভাস্কর্য প্রদর্শনী। মঁ দুপুই নামে এক ভাস্কর পুরোনো লোহা-লক্কড়, এমন কি পুরোনো লম্বা পেরেক বা ইস্ক্রুপ দিয়ে যে সব মূর্তি সাজিয়েছেন তা সত্যি দেখবার মতন। তিনটে পেরেককে গেঁথে এমনভাবে দাঁড় করিয়েছেন তিনি, যার নাম হয়েছে, গির্জা হতে বেরিয়ে আসছে তিন বুড়ী। এমনি সব বিষয়বস্তু। কিন্তু তার মালমসলা এসেছে পুরোনো লোহা-লক্কড় থেকে।

আর্ট চর্চার শহর প্যারিস। আর্টই নয় এমন অনেকের আঁকা চিত্রপটের প্রদর্শনী চলছে গ্যালারি শারবানতিয়ের-এ। তবে যাদের আঁকা চিত্রপট এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে তারা কিন্তু যে সে লোক নয়। তারা প্রায় সবাই কেষ্ট বিষ্টু গোছের। যেমন, সাহিত্যিক ফ্রাঁসোয়া সাঁগ, নাট্যকার মার্শেল আশার, সিনেমা তারকা জঁ মারে, মিশেল মরগঁ, পিয়ের ব্রাশার ইত্যাদি। আর আছেন যাঁরা সাহিত্য বা শিল্পের ব্যবসাদার নন। যেমন বিজ্ঞানের অধ্যাপক লারাঁস র‍্যাঁগে (ইনি ফরাসী আকাদেমির সভ্য), দাঁতের ডাক্তার লোয়াজো, কোটিপতি রথ্‌শিল্ড-এর স্ত্রী। তবে আশ্চর্য করেছে মঁ ভিবো। মঁ ভিবো ছিলেন প্যারিসের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা। তিনি যে পুলিসের লাঠি-বন্দুক ছেড়ে চিত্রকরের তুলি ধরেছেন তা অনেকের জানা ছিল না। তিনি যদি পুলিস বাহিনীর হাতে লাঠির বদলে আঁকবার তুলি তুলে দেন তা হলে আর কাউকে হাসপাতালে যেতে হবে না। পুলিসকর্তার লাঠিচর্চা ছেড়ে তুলিচর্চা কি মানায়? কথায় বলে, 'যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।' শুধু এদের নিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীটি মেতে থাকলে কোনো কথা ছিল না। এদের মধ্যে যোগ দিয়েছে চিত্রকর হিসেবে প্যারিসস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ গ্যাভিন, বেলজিয়ামের রাজমাতা এলিজাবেথ প্রভৃতি। শুধুই কি এদের আঁকা চিত্রপ্রদর্শনী? এইসব ছবি নিলামে বেচে উঠেছে লাখ খানেক টাকা। সেই টাকা পাঠানো হবে ইস্রায়েল-এর এক দাতব্যখানায়।

আর্ট এর কথা যখন উঠেছে তখন আর্টের আরেক দরকারী খবর দেওয়া যাক। তবে এ খবর আর্টিস্টদের নিয়ে। প্যারিসে আর্টিস্টদের জন্যে একটি ছোট কলোনি বানাবার ব্যবস্থা করেছে ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর। আর্টিস্টদের

বাসস্থান ও স্টুডিও নিয়ে কয়েক শত ফ্ল্যাটের বাড়ি শীঘ্রই নির্মিত হবে প্যারিসের পৌরভবনের পাড়ায়। সেখানে আর্টিস্টরা অল্প খরচে থাকতে যেমন পারবে তেমনি অল্প খরচে স্টুডিওর সুবিধেও পাবে। আর্টিস্টরা বাসস্থানের সমস্যা সমাধান করতে পারলে তারা আরও বেশী সময় দিতে পারবে তাদের আর্টচর্চায়।

প্যারিসে এখন দুটো জিনিসের কাটতি সবচেয়ে বেশী। একটি হল বই আর আরেকটি হল গ্রামোফোন রেকর্ড। এবং এই দুইটি ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গলকে নিয়ে। দ্য গলকে ব্যঙ্গ করে লেখা বইটির নাম 'লা কুর' বা রাজসভা. বইটি লিখেছেন [illegible] সাপ্তাহিক 'কানার আংশেনে' পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখক ম' আঁদ্রে রিবো [illegible] নাম রোজে ফ্রেসো। এই বইতে দ্য গলকে বিগত দিনের ফরাসী সম্রাট বলে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রথম দুই মাসে বই-এর কাটতি হয়েছে ৮০,০০০ কপি। আর দ্বিতীয়টি হল গ্রামোফোন রেকর্ড। এটি হল দ্য গলের বক্তৃতার অনুকরণ। ম' অঁরি তিজো নামে এক প্রাক্তন থিয়েটার অভিনেতা দ্য গলের গলার স্বর, বলার ভংগী সব কিছু অনুকরণ করে প্যারিসের রাস্তায় মোটর গাড়ির ভিড় নিয়ে শ্লেষাত্মক রেকর্ড বাজারে ছেড়েছেন। ইতিমধ্যে বিশ লাখ রেকর্ড বিক্রি হয়ে গেছে।

ইউরোপে এক এক বছরে এক একটা নতুন নাচের ঢেউ এসে লাগে। একদিন ছিল রক অ্যান্ড রোল, চা-চা ইত্যাদি আরও কত কি। এবার মাস কয়েক হল 'ট্যুইস্ট' নাচের ঢেউ সব ভাসিয়ে দিয়েছে। শুধু কি নাচ? 'ট্যুইস্ট' নাচ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে আমেরিকায় ও য়ুরোপে। কিন্তু বলছে 'ট্যুইস্ট' নাচ ভাল। হাজার ডন বৈঠকের কাজ হয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। কেউ বলছে তাতে শরীরের কোনো অংশ জখম হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুবার 'ট্যুইস্ট' নাচ নাচলে পেটের ভাত হজম হতে বাধ্য। একশটা ডন-বৈঠকের কাজ। নিউ ইয়র্কের এক ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেছেন যে, ছাত্ররা ক্লাস শুরু করার আগে রোজ সকালে যদি 'ট্যুইস্ট' নাচ নাচে তা হলে তাদের ব্যায়াম করার কাজ হয়ে যাবে। এই নিয়ে ইউরোপে এখন বেশ বাক্-বিতণ্ডা চলছে। তবে ট্যুইস্ট নাচের রেকর্ড খুব বিক্রি হচ্ছে।

প্যারিসে এখন 'ওত্ কুতুর' বা উচ্চ বিলাসিতার পোষাক—দোকানের বাৎসরিক পোষাক প্রদর্শনী চলছে। এবারকার পোষাকের অনেক নতুন মডেলের নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্যুইস্ট'। এর থেকেই বোঝা যাবে 'ট্যুইস্ট' নাচের জনপ্রিয়তা। 'ট্যুইস্ট' নাচের জয়জয়কার চলছে।

প্যারিসিয়ান

পত্রগুচ্ছ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(দেবীপ্রসাদ সিংহকে লিখিত)

[ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প কয়েক বছরের হলেও তিনি আমাকে আপন হৃদয়ের মহত্ত্বের দ্বারা ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিলেন। সে আমার সৌভাগ্য। এমন সদালাপী মজলিসী সহৃদয় মানুষ যে কোন সময়েই দুর্লভ। ধূর্জটিপ্রসাদকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত যে একটা মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয় কেমন সুন্দরভাবে যুক্ত হতে পারে।

সেই আসল মানুষটিকে জানবার পথে সাহায্য হতে পারে ভেবেই বিভিন্ন সময়ে আমাকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি প্রকাশের জন্য দিলাম। বিশেষত, পাঠক এগুলির ভেতর দিয়ে তাঁর লেখজীবনের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।

—দেবীপ্রসাদ সিংহ]

—১—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম। আমার রচনা তোমার ভালো লেগেছে শুনে ভালো লাগল। 'মনে এলো' সম্বন্ধে অনেকেই রায় দিয়েছেন, কিন্তু কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছি না। 'অন্তঃশীলা' সম্বন্ধে অবিশ্বাস। সে যাই হোক, অনেকের পছন্দ হয়েছে জানি, এবং আমি চেষ্টা করেছি।

'মনে এলো' ঠিক কি যে লিখেছি জানি না। একটা অংশ ডায়েরী অন্য অংশ নোট; তাও আবার ভিন্ন সময়ের ডায়েরী, অন্য ধরনের নোট। [illegible] [illegible] বই নিয়ে এসেছে [illegible] [illegible] নয়, কারণ লেখকের মধ্যে [illegible] নেই, অথচ [illegible] তা হলে প্রবন্ধ [illegible] ঠিক কিভাবে বলতে পারি না। অথচ খানিকটা [illegible] ভাবে। এইটুকুই আমার।

'অন্তঃশীলা' একটি বড় অংশ, বাকী আরো দুটি। একসঙ্গে তিনটি পড়লেই পেলে পেতো। [illegible] তিনটি পর্যায়ের আলোচনা শুনবে। খগেন, সাবিত্রী, রমলা সম্বন্ধে বিপরীত মনোভাব দেখে রাগ না হয়ে ভালো লাগছে শুনে তোমার সাহিত্যপ্রীতি স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমটা রাগ হয়, তারপর সামঞ্জস্যটি বুঝতে পারলে রাগ থাকে না। [illegible] প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমান। অন্তত এই চেয়েছি। [illegible] নারীত্বের কথা বলার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

সোসিওলজী সম্বন্ধে দু' কথা লিখতে বলেছ। ও সম্বন্ধে দু' কথা লেখা যায় না সেইজন্য লেখাও চলে। অর্থনীতি সম্বন্ধেও আমার অজ্ঞানতা অসীম। কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়

২২।১।৫৭

—২—

দেবীপ্রসাদ,

তোমার মনে অনেক অজানা মনোভাব ওঠে আবার চলে যায়। তাদের খানিকটা আমার কাছে ধরা পড়ে। সব জিনিস ফুটে ওঠে না, আবছা ধরনের খানিকটা। যেটুকু ফুটে ওঠে, সেইটুকুই যথেষ্ট।

আমার কাছে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। বিদ্যার ওজন নিরর্থক: আমি যা বুঝেছি তারই খানিকটা বলছি। খানিকটা এই জন্যে যে, আমি সত্যই অসুস্থ, আমার মস্তিষ্কে আলোচনা করা উচিত নয়, করতে পারিও না।

(১) কুত্রাপি ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন হয়নি, কখনও নয়, এখনও নয়।

(২) কিন্তু সর্বদাই ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের দিকে চেষ্টা চলছে: প্রথম চেষ্টা প্রোফেটদের কাছ থেকে, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি। দ্বিতীয় চেষ্টা য়ুরোপীয়ান যুগের সাম্রাজ্য। তারপর এম্পেররদের, পোপের চেষ্টা। তারও পর পণ্ডিতবর্গের খেলা, যেমন কাণ্ট প্রভৃতির। এর উদ্দেশ্য ইউনিভার্সাল পীস অ্যাণ্ড হার্মনি। মিস্টিকদের সমীকরণ প্রচেষ্টা বরাবরই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তাদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ—প্রফেটদের বেশী।

(৩) ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন-এর প্রতি আকর্ষণ ওঠে এক প্রকারের অনুষ্ঠানের জন্য, যেমন লীগ অব নেশনস, ইউনাইটেড নেশনস ইত্যাদি। পিছনে যুদ্ধের সরঞ্জাম থাকে। এবং তারও পেছনে revolutionary fervour—যেমন ফরাসী বিপ্লব, রুশ, চীনে ও ভারতীয়। এই দুটোর টানাপোড়েন চলে। আইডিয়ার জগতে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন খানিকটা এসে যায়, যেমন বিজ্ঞানের বেলা, দর্শনের বেলাতেই খানিকটা। কিন্তু সেই ভৌগোলিক কিংবা আঞ্চলিক ন্যাশনালিজম্ এসেই পড়ে। তারতে খানিকটা সামঞ্জস্য চলছে, বেশী দূর নয় কিন্তু।

মোটামুটি যৎসামান্য কিছু লিখলাম।... আমার ইচ্ছে হয় বেশী লিখতে, কিন্তু লেখা অন্যায়।

ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়

২১।২।৫৭

—৩—

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার শরীর কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না....

চৌর্যবৃত্তি সকলেরই, কারুর বেশী কারুর কম। চিন্তার গোড়াতেই চুরি, তারপর সড়গড় হলে চুরি নিজের হয়ে যায়, তারও পরে, সহজ হবার পর, আবার চুরি। এই চলল চিরটা কাল। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ

নিজের কথা কয়, সবই ধার করা। যেখানে নতুন সেখানে ভাষার পরিবর্তন। আমার জীবনে দশ-বারজনই সত্যকারের নতুন চিন্তার প্রণয়ন করেন। হয়ত যা কিছু নতুন তার পিছনেও সেই পুরাতন, কেবল জানতে পারি না বলেই নতুন হতে পারে। আমার পরিমাণ ক্ষুদ্র বলেই এই কথা মনে হয়। নতুন মানে নতুন সাজানো। অনেক বই পড়লাম, অনেক কথা শুনলাম—সেই বই, সেই কথা শুনে মন একরকম ভাবে সেজে উঠল, তখন মনে হল নতুন কথা কইছি। সেজে ওঠাটাই আসল কথা। শাস্ত্রে বলে, নতুন পুরাতনের জের।

"মনে এলো" কিভাবে পড়ছ? তার কতটা 'নিজের' জানতে চাই না। কতটা 'জানা' সেটাই চাই। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সম্বন্ধে এক সময় নাড়াচাড়া করতাম, এখন ভালো লাগে না। জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ, এই সব নিয়ে চিন্তা করতে ভালো লাগত, এখন তাদের সীমা বুঝি। কখনও যদি সময় পাই, লিখব। "আমরা ও তাঁহারা" বইখানির নতুন

তাই মনে হয় সর্বদাই বুদ্ধি-বিচারের প্রয়োজন।

......তোমার কাজ তুমি পড়ে যাও, আর ভাবো, ভালো মন্দ না ভেবে। ভালোমন্দ সঙ্গে সঙ্গে আসবে। একটু উপদেশ দিলাম—আমার অভ্যাসই তাই।

আমরা আপাতত ভালো আছি। ১০।১২ই নাগাদ আলিগড় যাবো। ইচ্ছা কর ত আগেই চিঠি লিখো।

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

দেরাদুন
১।৭।৫৭

= ৬ =

দেবপ্রসাদ,

....."মনে এলো" সত্যই অসংলগ্ন; অবশ্য সেইটাই ভারচু অফ এ নেসেসিটি করতে চেয়েছি। একটা মূলে ব্যক্তিগত সূত্র আছে। সেটা মন বলাই চলে। "মনে এলো"র এল অংশটি আসা-যাওয়ার খেলা।

......আমি গত সপ্তাহে "অষ্টাদশী" নামে ১৮টি গল্পসঞ্চয় পড়লাম। তিনটি ছাড়া একটারও যোগ্য নয়। সে যাই হোক, কোনোটাই আমার ধরনের নয় কেন? আমি "রিয়ালিস্ট" বলে একটা ছোট গল্পের বই বার করি। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লেখেন। সেটা কেউ পড়ে না। কেন? এর কারণ কি বুঝি না। একটা কারণ যে, আমি লেখা নিয়ে পড়ে থাকিনি। লিখেছি, আর ফেলে দিয়েছি। প্রথম ছিলাম অধ্যাপক, পরে সাহিত্যিক। দেখি কি হয় আবার!

আমি ২০শে আলিগড়ে যাব মোটরে। সেই দিনই ৭।৮ ঘণ্টা পরে পৌঁছব। সেখানেই চিঠি দিতে পার। আশা করি ভালো আছ। - ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

দেবপ্রসাদ,
১১।৭।৫৭

= ৭ =

দেবপ্রসাদ,

তোমার চিঠি পেলাম কালই। আলিগড়ে আসবার সময় কোনো কষ্ট পাইনি। কেবল ২॥ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। এখানে শীত একেবারেই নেই বললেই চলে অবশ্য কোলকাতার চেয়ে।

বক্তব্য শেষ করেছ শুনে খুব আনন্দ হলো। বইটা, অন্তত তার বেশ খানিকটা অংশ, শক্ত হয়েছে নিশ্চয়। ইতিহাস সম্পর্কে যা লিখেছি তার মধ্যে মার্কসিজম্ ভরা। তবু সবটা নয়—পুরো অংশ লিখতে পারিনি। সকলে শক্ত বলেছিলেন। মোটা-মুটি আমার মত ঠিকই আছে।......

গোটের সম্পর্কে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলি। ভদ্রলোকের হিউমার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আছে। গোটের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা উঁকিঝুঁকি মারে। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তাই) অবশ্য বিশ্বের তিনটি পর্যায়, ক্লাসিকাল, মধ্যযুগ ও আধুনিকই গোটের মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে মধ্যযুগ নেই। আমার মনে হয় তিন পর্যায়ের সংযোগে হিউমার খুলতে পারে না। ওটা একরকম ভারসাম্যের অবস্থা; হিউমারে দুটি যুগের সংযোগ হয়, একটা বাকী থাকে।......

-ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়
৩১।১।৫৮

= ৮ =

দেবপ্রসাদ,

তোমার ১৬।২ তারিখের চিঠি পেয়েছি। নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।......

পলিটিকস্ ও কবিতার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছি মনে পড়ে। এখন ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখি। পলিটিকস্ মানে যদি ডেমোক্রেসী হয়, আর ডেমোক্রেসীর অর্থ ম্যাস্ হয়, তবে ডেমোক্রেসীর সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক ওঠে দুই দিকে : (১) এক এলিট গ্রুপ-এর সঙ্গে: সেখানে বড় কিংবা ছোট এলিট গ্রুপ থাকলেই চলে; সেই গ্রুপ-এ একটা কালচার সৃষ্টি করে: সেই কালচার-এর অঙ্গ হলো কবিতা। (২) আরেক ডেমোক্রেটিক প্রোসেস-এর সঙ্গে: সে প্রোসেস-এ উঁচু-নীচুর লেনদেন চলে: নীচু ওঠে উঁচুতে এবং উঁচু নামে নীচুতে. সেই লেন-দেনের ফলে একটা কালচারের (কবিতার) মানদণ্ড তৈরী হয়: সেটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের নিশ্চয়ই। প্রথমটার ইতিহাস পূর্বেকার; দ্বিতীয়টির ইতিহাস এখনকার এবং পরবর্তী যুগের। ভালো-মন্দ বিচার নিশ্চয়ই করতে হয়, কিন্তু এ যুগের বিচার আরও পরবর্তী যুগের। আমার ভালো লাগে না আমি জানি, কিন্তু বহু পরে নতুন আচার-ব্যবহার জন্মাবে, যার ফলে নতুন কবিতা ফুটে উঠবে। এই হরাইজন অফ টাইম দেখা ছাড়া অন্য গতি নেই।

......তুমি কেমন আছ?

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়
২৬।২।৫৮

= ৯ =

দেবপ্রসাদ,

তোমার চিঠি পেলাম। আজ ছুটি ছিল, তাই সময় পেলাম।

রাস্তায় খুব পুজোর ভিড় আরম্ভ হয়েছে তুমি লিখেছ। কেন এত ভিড় জমে, বলতে পার? এবং সেভিড় বেড়েই চলেছে! অথচ দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। মানুষে কি দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই চায়? মাত্র কটা দিনের জন্য অব্যাহতি পায়, কথাটা ঠিক নয়। বরঞ্চ দুঃখ ও সুখের চরম দূরত্ব গ্রহণ করে ভুলে থাকে। লোকে সুখী হয় জানি : লোকে দুঃখী হয় তাও জানি। কিন্তু সুখ ও দুঃখের অতিরঞ্জিত আকারকে ভোলাই স্বাভাবিক। ভুলতে গিয়ে বেশী আনন্দ করছে—এই যা। ঠিক বলতে পারলাম না বাংলায়: ইংরেজীতে বলতাম পোলারাইজেশন। তার ফলেই আনন্দের মাত্রাটা ফিকে। আনন্দের মাত্রা বড়ই ঠুনকো, বেলোয়ারী, এবং বারোয়ারী।

......লেখাটা কিন্তু পারছি না। ওটা আটকে গেছে। শীতকালে আবার চেষ্টা করে দেখব।

তুমি কেমন আছ?......

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

আলিগড়
২৭।৯।৫৮

= ১০ =

দেবপ্রসাদ,

তোমার চিঠি পেয়েছি।......

"ঝিলিমিলি" দিয়ে এলাম। এটা 'নতুন' বই। দেখতে "মনে এলো"র মতন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ধরনটা নতুন। বই-এর আঙ্গিক লেখা মোটেই নয়। নিজের কথা নিশ্চয়ই, যদিও তার দাম অল্প। কিছু গল্প আছে, যথা সত্যেনের* সম্বন্ধে। আসল ব্যাপার—আমারই কথা।......

শান্তিনিকেতনে ১১২° দেখে নিশ্চয়ই পালিয়ে এলে। এই সময়টা অত্যন্ত গরম হয়। এখা : চমৎকার ঠাণ্ডা। রাত্রে দোর জানলা বন্ধ করে শুতে হয়। তবে দুপুর-বেলা বাড়ির বাইরে উত্তাপ উঠছে দেখছি।...

আমরা চারদিন লক্ষ্ণৌ ঘুরে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়টা একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। তবু যেন লক্ষ্ণৌ এখনও লক্ষ্ণৌ—কাকড়ীর বদলে কাঁকড়া, শেরওয়ানীর বদলে বুশ্ শার্ট, এবং আমের হিসেব ওজন করা সব যাচ্ছে, তবু যেন লক্ষ্ণৌ এখনও লক্ষ্ণৌ রয়েছে। ৩০ জন বন্ধু এল দেখা করতে, মুখে চোখে হাসি ফুটে বেরুচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার!

রাজশেখর বসু মারা গেলেন শুনলাম। এককালে খুবই ভালো লিখতেন।......বয়স ছিল ৮০,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের?

—ইতি

ধূর্জটিপ্রসাদ

দেরাদুন
২৯।৪।৬০

---

* বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ইন্দোর থেকে বাষট্টি মাইল পথ অতিক্রম করে মাণ্ডুতে পৌঁছান যায়। দিল্লি-বোম্বাই রেলপথে রতলাম থেকে ধার এবং সেখান থেকে মাণ্ডু পৌঁছানো যায়, তবে ইন্দোর থেকে সোজা ট্যাক্সীতে যাওয়াই সুবিধাজনক। যাবার প্রকৃষ্ট সময় বর্ষার ঠিক পরই। ইন্দোর থেকে যেতে পথের দুধারে মাণ্ডুর প্রাকৃতিক শোভা পর্যটককে মুগ্ধ করে। (১) হাটের পথে, (২) রূপমতীর স্মারক ক্রীড়াক্ষেত্র: বাসনা জাগবে তার (৩) রেওয়া কুণ্ডে অবগাহনের। আর সেই সঙ্গে চমৎকৃত হবেন প্রাচীন স্থপতিদের শিল্পকৃতিত্ব দেখে যার পরিচয় অগণিত ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে (৪) হিন্দোলা মহলের খিলাম পথে বা (৫) মাহমুদ খিলজীর কবরে।

আলোকচিত্রশিল্পী
বীথি সরকার

৪

৫
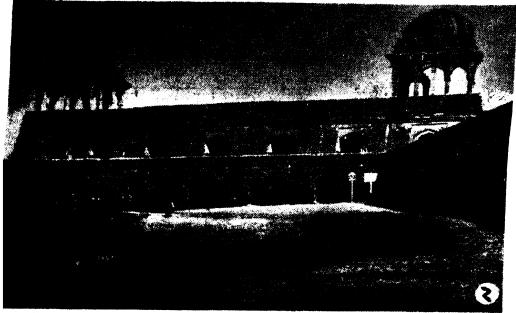
বিশুখুড়ো বলিতে লাগিলেন—"আমাদের আজকের ট্রামবাসের আলাপ-আলোচনা যে-দিন পাঠকের শ্রুতি-গোচর হবে সেদিন নির্বাচনী ঢাকের বাদ্যি থেমে গেছে। বারোয়ারিতলা ফাঁকা। কালনেমিরা আর লঙ্কাভাগ নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করছেন না। দু'দিনের অভাজন চন্দ্ররা অর্থাৎ ভিপুরা আর জীপ চড়ে ছুটোছুটি করছেন না। গায়ের বিনয়ী নামাবলীখানা ফেলে দিয়ে তাঁরা আবার গিলেকরা আদ্দির *পাঞ্জাবিতে পরিশোভিত হয়েছেন। বস্তি-বাসীরা (একদিন ভিপুরা বস্তির পথে হরদম যাতায়াত করেছেন,* বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন) অবাক হয়ে শুনছেন, ভিপুদের ভেঁপুর সুর পালটেছে, এসেছি এনেছি বঁধু আর নেই, আছে—পড়বে না আর পায়ের চিহ্ন এই বাটে; আবার মাঝে মাঝে আখর, পাঁচ বছর ত বটেই বটে, পাঁচ বছর।"

একটি বৈদেশিক, সংবাদে শুনিলাম ফ্রান্সের জনৈক চিকিৎসক তাঁর এক রোগীর মধ্যে একটি অদ্ভুত রোগ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেটি হইল মাছিতে আতঙ্ক রোগ। শ্যামলাল শুনিয়া বলিল—"অসম্ভব হয়ত নয়, নির্বাচন মরশুমে আমরা অনেককে মশকাতঙ্কে ভুগতে দেখেছি এবং মশক

নিধনে কামান নিয়ে টানাটানি করতেও দেখেছি!!"

প্রাক্-নির্বাচন সংবাদে পড়িলাম—কোন একস্থানে সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের জন্য সংরক্ষিত একটি চেয়ারে কোথা হইতে একটি মুরগী আসিয়া না কি বসিয়া পড়ে। ডাঃ রায় বলিলেন—ও তো বৈঠ গিয়া, হাম ক্যা করে। তাঁর কথা শুনে শ্রোতারা হেসেছিল কিনা জানিনে। হেসে থাকলে বলব, "এটা হাসি-তামাশার কথা নয়, এটা বোধ হয় 'শেপ্ অব থিংস টু কাম!!"—আতঙ্কিত হইয়াই বুঝি মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

মাদ্রাজের খবরে প্রকাশ সেখানে ৬জন মুসলমান নাকি ভারতের মুসলমান-দের "মুক্ত" করিবার জন্য মুক্তিফৌজ গঠনের উদ্দেশ্যে তিরুচির নিকট সিরুগানার থানা আক্রমণ করে। শ্যামলাল বলিল—

"মাত্র ছ'জন। বরং ১৭জন অশ্বারোহী হলে জুজু-জুজু খেলাটা ভালো জমে উঠত!"

লণ্ডনে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয় বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। বিক্ষোভকারীদের

অনেকেই না কি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখ শুনে পাক প্রেসিডেন্ট নাকি আর্তনাদ করে উঠেছেন—'দাউ টু, ব্রুটাস'।"

শ্রীনেহেরু প্রস্তাবিত শীর্ষ বৈঠকটি এপ্রিলে আহ্বান করিবার জন্য নাকি শ্রীক্রুশ্চফের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।—"আশা করি, প্রস্তাবে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারিখটা যেন ১লা এপ্রিল না হয়"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেন নাকি পৃথিবী পরিক্রমাকালে চারবার সূর্যাস্ত দর্শন করিয়াছেন।—"চারবার! যেখানে সূর্য মোটে অস্ত যেত না সেখানে একবার অস্তের ঠেলাতেই যে অস্থির" বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

মহাকাশ পরিক্রমার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—এক মিনিটের মধ্যে

রকেটটি সাদা ধূমের পুচ্ছ রচনা করিয়া ৭৮ মাইল ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়।—" এবং অতঃপর সবাই হয়ত চীৎকার করে শোনাতে চেষ্টা করেছেন,—'সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইলেক-ট্রোনিক রবোট শিক্ষক-নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"আশা করা যায় যান্ত্রিক শিক্ষক সত্বর আমদানি করা সম্ভব হলে মাইনে আর মাগগিভাতার দাবিতে মিছিল করতে হবে না"—বলেন বিশুখুড়ো।

ভারতে মহাশূন্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য সরকার কর্তৃক জাতীয় কমিটি গঠনের সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল ডি এল রায়ের একটি গান রকমফের করিয়া শুনাইল—"মাটিটা তো দেখা গেল, শুধুই একটা কোলাহল, এমন যদি সাহস থাকে শূন্যটাকে দেখবি চল!"

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বিতর্ক-সমিতির সভায় এতদিন নারীরা কেবল সভ্যদের আমন্ত্রণক্রমে পাবলিক গ্যালারীতে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন। গত সপ্তাহে, একশত ষাট বছর পরে, তাঁহাদিগকে ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বিতর্ক-সভাকে শ্রীমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে যদি নারীদের সদস্য করা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু বিতর্কে নারীদের হারাতে পারবেন বলে যদি মনে করে থাকেন তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল!!"

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল ও ধর্মঘট আন্দোলন লইয়া করাচীতে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে এবং একটি তত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কার করিয়াছেন,—'কোন পাশ্চাত্যশক্তির গোপন হস্ত এই সকল ঘটনার পিছনে রহিয়াছে'।—"না ছাহেব, না, পাশ্চাত্য শক্তি নয়, ওটা "টাইম বম"-এর প্রভাব"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ শ্রীগোষ্ঠ পালের "পদ্মশ্রী" লাভে মোহনবাগান একটি সম্বর্ধনা সভার ব্যবস্থা করেন। সভায় সমুপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রীপাল নাকি কলিকাতা স্টেডিয়াম নির্মাণে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া জনৈক ক্রীড়ারসিক বলিলেন—"ডাঃ রায় শ্রীপালের কথা শুনে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলেন—ও নাম করো না উচ্চারণ!!"

॥ ৩০ ॥

অনিন্দ্য পাকড়াশি তাঁর দেশের সব অপরাধ যেন নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বিদেশী অতিথিদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন সপ্তাহে একদিন বাংলা দেশকে তাঁর হুকুমেই ড্রাই করে দেওয়া হয়। মাথা নিচু করে বিরক্ত অতিথির কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ডক্টর রাইটার এবার যেন তাঁর বন্ধুকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। ইংরেজীতেই বললেন, "কলকাতা তবু তো মন্দের ভাল। ভারতের পশ্চিমে, আরব সাগরের তীরে বোম্বাই বলে একটা শহর আছে, সেখানে প্রত্যেক দিনই শুকনো দিন। শুনেছি, এক বোতল বীয়ারের জন্যেও সেখানে তোমাকে পারমিট নিতে হবে।"

মিস্টার কুর্ট এবার হতাশ হয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। করবী দেবী এই অবস্থা দেখেই বোধ হয় ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। আমার মনে হলো, অনিন্দ্য যাতে তাঁর সামনে বিব্রত বোধ না করেন সেই জন্যেই তিনি সরে গিয়েছেন। কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো একটু পরেই। করবী দেবী একটা নরম রবারের চটি পরে, বেণী দুলিয়ে আবার ড্রইং-রুমে এসে ঢুকে অতিথিদের ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করলেন।

ওঁরা দুজনেই অবাক হয়ে করবীর মুখের দিকে তাকালেন। ওঁর পিছনে ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে দুটো ডাব।

বিদেশী দু-জন জীবনে এমন অদ্ভুত ফল দেখেন নি। ডক্টর কুর্ট একটু অবাক হয়ে বললেন, "কী জিনিস?"

করবী দেবী হেসে বললেন, "নেচার আমাদের জন্যে ইণ্ডিয়াতে এই ড্রিংকের ব্যবস্থা করেছেন। ডাব।"

"ডাব! নেভার হার্ড অফ ইট!" ডক্টর রাইটার বলে উঠলেন।

করবী দেবী দুটো ডাব ওদের দিকে এগিয়ে বললেন, "গ্রীন কোকোনাট কী তোমরা এর আগে দেখোনি? ইণ্ডিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে এই ডাব খেয়ে থাকে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি তাঁর অতিথিদের মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখে যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। ডাবের সুযোগ নিয়ে বললেন, "নেচার এখানকার দরিদ্রদের জন্যে একটা স্বাস্থ্যসম্মত কৌটোয় দু-খানা রুটি এবং এক গেলাস জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া কুর্টও এবার যেন লাফিয়ে উঠলেন। তিনি একমনে ডাবটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

করবী দেবী মোহিনী হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "এই ডাব ড্রিংক করাও একটা আর্ট। ইচ্ছে করলে এর জল গেলাসে ঢেলে আপনাদের দিতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাই না। আমি চাই, আমাদের গ্রামের লোকরা যেভাবে ড্রিংক করে তোমরা সেই ভাবে খাও।"

কুর্ট একটু উৎসাহ বোধ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কীভাবে ড্রিংক করতে হবে বলো?"

করবী দেবী হাসতে হাসতে বললেন, "আমাদের গ্রামের লোকরা এমনভাবে ফুটোতে মুখ রেখে খায় যে, এক ফোঁটা জল গায়ে বা জামায় পড়ে না। কিন্তু সেটা বেশ শক্ত ব্যাপার।"

কুর্ট সঙ্গে সঙ্গে করবী দেবীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। ডাবে মুখ দিয়ে তিনিও যে খেতে পারেন, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন ডাবটা এক মিনিটের জন্যে করবী দেবীর হাতে দিয়ে তিনি নিজের কোট খুলে ফেললেন।

করবী দেবী এবার বললেন, "মিস্টার কুর্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এইভাবে খেতে গিয়ে তোমার জামায় দাগ হবে, এবং আমাদের দেশের দুর্নাম হবে। আমি তোমাদের জন্যে স্ট্র পাইপের ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

ডক্টর রাইটার বললেন, "আমাকে একটা পাইপ দাও। যে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই, সে-বিষয়ে তোমাদের কাছ থেকে নো-হাউ নিতে আমার মোটেই আপত্তি নেই।"

মিস্টার কুর্ট বললেন, "হে ভারতীয় সুন্দরী, আমরা জার্মান অত্যন্ত গোঁয়ার। মাথায় যখন খেয়াল চেপেছে তখন আমি ট্রাই করবই।"

করবী দেবী বললেন, "হে বিদেশী পুরুষ, তোমার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ; আর তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যে আমার বকুনি রইল।"

কুর্ট এবার ভারতীয় প্রথায় ডাব খেতে গিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়ে বসলেন। প্রথমে এক ঝলক জল এসে ওঁর জামা কাপড় ভিজিয়ে দিল। তারপর ভদ্রলোক বিষম খেয়ে কাসতে লাগলেন।

করবী দেবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কুর্টের হাত থেকে ডাবটা কেড়ে নিলেন। কুর্ট তখন কাসছেন এবং কাসতে কাসতে হাসছেন।

করবী দেবী বললেন, "আর নয়, অনেক হয়েছে। শেষে হয়তো রটে যাবে, ইণ্ডিয়াতে

আপনাদের মেরে ফেলবার ফন্দি আঁটা হয়েছিল।"

কুর্ট এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন। তিনি আমার দিকে তাকাতে তাকাতে যেন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। একটু লজ্জিত হয়েই যেন বললেন, "মিস গুহ, আমি সত্যিই দুঃখিত। ঘরে ঢুকেই প্রথমে টিম্বেকের জন্য মাথা গরম করা উচিত হয়নি।"

ডক্টর রাইটার গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার দুর্ব্যবহারের জন্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছো। হয়তো মিস গুহ আরও শাস্তির ব্যবস্থা করছেন।"

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। এবার কুর্ট এবং রাইটার বিশ্রামের জন্যে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ও'রা চলে যেতেই অনিন্দ্য পাকড়াশি যেভাবে অপর্ণা গুহের দিকে কৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন তা আজও যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমারই সামনে অনিন্দ্য পাকড়াশি বলেছিলেন,

অনিন্দ্য পাকড়াশি এর উত্তরে যা বলেছিলেন, তা যে করবী গুহকে এমনভাবে আঘাত দেবে বুঝতে পারিনি। অনিন্দ্য বলেছিলেন, "এই জন্যেই হোস্টেস হিসেবে আপনার এত সুনাম।"

করবী গুহ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ও'র টানা টানা চোখ দুটো ধীরে ধীরে ওপরের দিকে তুলে বলেছিলেন, "হোস্টেস বলেই বুঝি আপনাকে ভিতরে এসে বসতে বললাম?"

অনিন্দ্য বুঝতে পারেন নি। কিন্তু আমি ও'র মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম, করবী গুহ দুঃখিত হয়েছেন। সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের সদাহাস্যময়ী অভ্যর্থনাকারিণী যেন মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছেন যে, তিনি ডিউটিতে রয়েছেন।

কিন্তু কাজের কথা মনে পড়তে অন-ডিউটি মেয়েদের বেশীক্ষণ লাগে না। করবী দেবী বললেন, "আপনার অতিথিরা এতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। আপনি এ'দের নিয়ে এখন নিশ্চয়ই বেরোচ্ছেন! কিন্তু লাঞ্চের সময় ফিরবেন কী?"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বলেছিলেন, "লাঞ্চের প্রয়োজন নেই। বাবাও ক্লাবে আসবেন, সেখানে নিয়ে যাবো।"

ও'রা চলে গেলে বোসদা আমাকে বলেছিলেন, "আগেকার দিনে রাজারা আসতেন: এখন বাণিজ্য প্রতিনিধিরা আসেন। খাতির এ'দের রাজাদের থেকেও বেশী। কারণ এ'দের ব্যাগের ভিতর সাত রাজার ধন এক মানিক সেই 'নো-হাউ' আছে।"

আমি বোসদার মুখের দিকে তাকাতে, তিনি হাসতে আরম্ভ করলেন। "বুঝলে না? হাঁউ মাঁউ খাঁউ-এর নো-হাউ! আলিবাবার রত্নশালার চাবি-কাঠি। গতর আর বুদ্ধি খাটিয়ে এই চাবি তৈরি করে নেবার মতো উদ্যম আমাদের নেই। তাই ধার করে, অন্য লোকের চাবি নিয়ে দরজা খোলবার চেষ্টা করছি আমরা।"

আমি বোসদার মুখের দিকে আবার তাকালাম। বোসদা বললেন, "ভয় নেই। শাজাহান হোটেলের পক্ষে ভাল। সব ঘর বোঝাই হয়ে থাকবে। আমরা আবার ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারব। বেলি ড্যান্সারদের পিছনে আরও টাকা ঢালতে পারবো।"

একটু থেমে বোসদা বলেছিলেন, "মনে থাকে যেন, পুলিস রিপোর্টগুলো আজই পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।"

বিকেলের দিকে অনিন্দ্য পাকড়াশি তাঁর অতিথিদের নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কোনো বাড়ি থেকে বোধ হয় ও'দের প্রচুর মদ খাইয়ে এনেছিলেন অনিন্দ্য পাকড়াশি। ফলে ও'দের দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার মত অবস্থা ছিল না। ও'রা টলতে টলতে কোনো রকমে নিজেদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পুলিস রিপোর্টের ফর্মগুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে আমিও করবী দেবীর সুইটে হাজির হয়েছিলাম।

করবী দেবী প্রশ্ন করলেন, "কেমন কাজ-কর্ম হলো?"

অনিন্দ্য বললেন, "খুব। এখান থেকে অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আধ ঘণ্টা পরেই মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাট। আমি জানতাম না, কলকাতায় এমন অনেক গৃহস্থবাড়ি আছে যা ড্রাই ডে-তে হঠাৎ বার-এ পরিবর্তিত হয়। সেখান থেকে এ'রা এই উঠলেন।"

"কী করে জানলেন?" করবী দেবী প্রশ্ন করলেন।

"আমি জানতাম না। আমার মামা ফোকলা চ্যাটার্জি খবর দিলেন। উনিই মিসেস চাকলাদারকে ফোনে জানিয়ে দিলেন। উনি আবার অজানা পার্টিকে আপ্যায়ন করেন না।"

করবী দেবী আর কোনো কথা বললেন না। অনিন্দ্য এবার নিজের মনেই বললেন, "আপনাকে বলতে সাহস হচ্ছে না। একটু চা খাওয়াবেন?"

আমি বললাম, "এতে লজ্জার কী আছে? এখনই বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি।"

হয়তো আমার জন্যেই তিনি জেগে বসে রয়েছেন।

টোকা মারতেই করবী দেবী মৃদু কণ্ঠে বললেন, "আসুন।"

ঘরের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের মরণ-বাঁচন দ্বন্দ্ব যেন এইমাত্র শেষ হয়ে গিয়েছে। সম্মুখসমরে পরাজিত আলো যেন মুমূর্ষু অবস্থায় টেবিলের এক কোণে ধুঁকছে। ঘরের আর সবটুকু জুড়ে আঁধারের রাজত্ব। আলোর সেই মৃত্যুপথযাত্রী দেহের সামনে চোখে হাত দিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে রয়েছেন করবী গুহ।

আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই করবী দেবী বোধ হয় আস্তে আস্তে মুখ ঘোরালেন। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন চমকে উঠলাম। এই ক' ঘণ্টায় করবী দেবী যেন একেবারে পাল্টিয়ে গিয়েছেন। যাঁকে দু' নম্বর সুইটে রেখে আমি উইলিয়ম ঘোষের ডিউটি দিতে গিয়েছিলাম তিনি যেন আর নেই। এ যেন অন্য কেউ। (ক্রমশ)

[ইভো আন্দ্রিচ্ নোবেল পুরস্কার পাবার পর বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্য পত্রিকার এক প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণীর সঙ্গে আন্দ্রিচ্-এর একটি ছোট গল্প উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের ইংরেজি অনুবাদ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় মূল ফরাসী থেকেই অনুবাদ করেছেন শ্রীপৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়।—স : 'দেশ']

উজীর হবার চার বছর পরেই খ্যাতনামা উজীর ইয়ুসুফ এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে ভারি বেইজ্জত হলেন। টানা-পড়েন চলল গোটা শীতকাল গোটা বসন্ত-কাল; বসন্তকালে অমন শীত সচরাচর পড়ে না; গ্রীষ্মের নামগন্ধও কোথাও তখনো নেই। শেষ পর্যন্ত সে মাসে ইয়ুসুফের অদৃষ্ট প্রসন্ন হল; তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ফিরে এল আবার জমকালো জীবনের শান্ত একঘেয়ে ছন্দ। অথচ, শীত-কালের সেই দিনগুলো, জীবন আর মৃত্যুর, গৌরব আর অখ্যাতির সেই স্বল্প অতীতের কোঠায় তখনো পড়েনি, যার চিন্তাকুল গাম্ভীর্যের ছাপ উজীরের ব্যক্তিত্বে আজও খানিকটা পরিস্ফুট। অব্যক্ত সেই সম্পদ নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন যা কিনা অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ পুরুষেরা নিজেদের মনের আড়ালে সর্বদা লুকিয়ে নিয়ে ফেরেন, কিন্তু সামান্য কটাক্ষে, মৃদু অঙ্গভঙ্গীতে, তুচ্ছ কথার মধ্যেই যা চকিতে ঝিলিক মারে কালে-ভাদ্রে।

লাঞ্ছনা এবং নির্জনতার মধ্যে, কয়েদ-খানায়, উজীরের বারে বারে মনে পড়েছে তাঁর শৈশবের আর তাঁর স্বদেশের কথা: কারণ ব্যর্থতা আর ব্যথাই তো মানুষের কাছে জাগিয়ে তোলে তার অতীতটাকে। ওঁর মনে পড়েছে বাবার কথা, মায়ের কথা—দুজনেই বেহেস্তে গিয়েছেন যখন উজীর তখনো রাজবাড়ির আস্তাবলে মোড়ল-সাহেবের সাকরেদি করছেন; তাঁদের কবরে ইয়ুসুফ সাদা পাথরের ফলক বসিয়ে দিয়ে-ছিলেন। মনে পড়েছে তাঁর বোসনি আর তাঁর গ্রামের, জেপা গ্রামের কথা, যেখান থেকে মাত্র ন' বছর বয়সে তাঁকে চলে আসতে হয়।

এ-বছরই, গরমকালে দৈবক্রমে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল বোসনি ফেরতা কারো কারো সঙ্গে। তাদের তিনি কতো কথাই জিজ্ঞেস করলেন। শুনলেন, এতদিনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর লড়াইয়ের শেষে গ্রামের চারি-দিকে এখন শুধু বিশৃংখলা, দুর্ভিক্ষ আর নানারকম অসুখ-বিসুখ সার হয়েছে। বিচলিত উজীর মোটারকম সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জেপা-য় তাঁর যেসব আত্মীয়-স্বজন এখনো মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তাদের সেবায়। আর শুনলেন যে, চেংকিচ্ বংশের চারটে পরিবার এখনো ওখানেই আছে, আর তারাই আছে সবচেয়ে বেশী সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে; কিন্তু গোটা গ্রাম কেন সারা অঞ্চলেই এসে পড়েছে দারিদ্র্য; গ্রামের মসজিদটায় আগুন লেগেছিল, এখন পড়ে আছে তার ধ্বংসাবশেষটুকু; ইঁদারাটা গিয়েছে শুকিয়ে; আর, সবচেয়ে অসুবিধের কথা, জেপা নদীর ওপরে নেই একটাও সাঁকো।

ছোট্ট পাহাড়ের গায়েই গ্রামটা, জেপা আর দ্রিনা-র মোহনায়; আর ভিষগ্রাদ যেতে গেলে একমাত্র পথ হল জেপা পার হয়ে যাওয়া। যত চেষ্টাই হোক না কেন পুল বানানোর, জলের তোড়ে সব ভেসে যায়; হয় জেপা সব পাহাড়ে নদীর মতোই হঠাৎ করে ফুলে ফুঁসে ওঠে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় তক্তাগুলো; নয় বাদ সাধে দ্রিনা। আর শীতকালে রাস্তায়

ওপর এমনই এক পুরু বরফ পড়ে যে গোরু মানুষ আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙে। যদি কেউ সত্যিকারের একটা ব্রিজ বানিয়ে দিতে পারে, গ্রামবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবে সে।

উজীর ছ'টা গালিচে দান করলেন মসজিদের জন্যে, বলে দিলেন তার সামনে সুন্দর একটা ফোয়ারা বানিয়ে দিতে। আর, সংকল্প নিলেন জেপার বুকে সাঁকো তোলবার।

*

কনস্তান্তিনোপল-এ তখন এক ইতালীয় স্থপতি বাস করতেন যিনি শহরের আশে পাশে কয়েকটা সেতু বানিয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁকেই উজীরের লোক গিয়ে ধরল, এবং রাজসভার দু'জন লোকের সঙ্গে তাঁকে পাঠাল বোসনিতে।

ভিষ্‌গ্রাদ গিয়ে ওঁরা যখন পৌঁছলেন, তখনো বরফ পড়ছে। দিনের পর দিন ওখানকার অধিবাসীরা দেখতে লাগল, স্থপতি তাঁর বয়োভারেন্যুব্জ দেহ অথচ তরুণসুলভ মুখে গিয়ে হাজির হচ্ছেন পাথরের প্রকাণ্ড সেতুটার কাছে: জয়েন্টগুলোর প্লাস্টারিং ভেঙে নিয়ে কখনো তিনি আঙুলের চাপে সেগুলো গুঁড়িয়ে ফেলেন, কখনো মুখে দিয়ে কী সব পরখ করেন, আর লম্বা লম্বা প ফেলে মেপে দেখেন খিলানগুলোর দৈর্ঘ্য। তারপর কিছু দিন তিনি চলে গেলেন বাগনায়। সেখানেই সেই পাথরের খনি, যার পাথর নিয়ে বানানো হয়েছিল এই সেতু। খনির চারপাশ এখন জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। দিন-মজুর খাটিয়ে স্থপতি সেসব সাফ করিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে খুঁজে পেলেন নতুন এক থাক পাথর, ভিষ্‌গ্রাদের সেতুর পাথরের চেয়েও সাদা, মজবুত আর বেশ বড়-সড়। তাই দেখে তিনি দ্রিনা বরাবর গিয়ে পড়লেন জেপা নদীতে, বেছে নিলেন নতুন সেতুর উপযুক্ত জায়গা। আর উজীরের লোক দু-জনের একজন প্ল্যান আর টাকাকড়ির হিসেব নিয়ে ফিরে গেল কনস্তান্তিনোপল্‌-এ।

স্থপতি তার ফেরবার পথ চেয়ে দিন গুনতে লাগলেন, কিন্তু না ভিষগ্রানে, না ধারে-কাছের কোনও খৃষ্টান বাড়িতে তিনি থাকতে রাজী হলেন। দ্রিনা আর জেপা নদীর মোহনায় যে-টিলাটা, তারই ওপর এক ছাউনি বানিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন। তাঁর দোভাষীর কাজ করতে লাগল উজীরের অন্য লোকটা, আর একজন কেরানী। নিজে-হাতেই রান্না-বান্না করতেন তিনি; চাষীদের কাছে কিনতেন ডিমটা, ঘিটা, পেঁয়াজ আর শুকনো ফল। লোকে বলত, ওঁকে কখনো মাংস কিনতে দেখা যায়নি। সারাটা দিন উনি ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে হয় পাথর কাটতেন, নয় প্ল্যান আঁকতেন, নয়তো রকমারি পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে বেড়াতেন। এইভাবেই চলল যতদিন না উজীরের লোক কনস্তান্তিনোপল থেকে উজীরের সম্মতি এবং প্রয়োজনীয় অর্থের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরল। তারপর কাজ শুরু হয়ে গেল।

সবাই অবাক না হয়ে পারল না। কাজ যা দিয়ে শুরু হল, কে বলবে তা সেতু বানানোরই কাজ! ভারি ভারি পাইন-কাঠের গুঁড়ি পোঁতা হল জেপার ওপর আড়াআড়ি করে, তারপর ডালপালা বিছিয়ে দেওয়া হল আর এক পুরু; সব কিছুর ওপর নিকিয়ে দেওয়া হল এক-পুরু মাটি। এই-ভাবে জলের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হল যাতে করে নদীর বুকের অর্ধেকের বেশীটাই শুকনো রইল। এ-কাজ কিন্তু শেষ হতে না-হতে পাহাড়ের কোথায় যেন দারুণ ঝড় হল, হঠাৎ জেপা খেপে উঠে ফেঁপে ফুলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল একরাতের মধ্যে মাঝ-নদীর বাঁধ। পরদিন নদী শান্ত হলেও, দেখা গেল সব কিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে। মজুররা আর গ্রামবাসীরা কানাকানি করতে লাগল, জেপা সেতুটা চায় না। কিন্তু তিন দিনের দিন স্থপতি হুকুম দিলেন নতুন করে গুঁড়ি বসাতে, আরো গভীরে, আর আগের যে ভাঙাগুলো অবশিষ্ট আছে, সেগুলোকেও ভালো করে পুঁতে ফেলতে। নতুন করে আবার নদীর শুকনো বুক থেকে ভেসে আসতে লাগল হাতুড়ির প্রতিধ্বনি, আর তার তালে তালে মজুরদের চিৎকার।

সব যখন তৈরী, বাগনা থেকে এল প্রকাণ্ড সেই পাথরের চাঁই, এল আজে-গোভিনা আর ডালমেশিয়া থেকে পাথর-কাটুয়া আর মিস্ত্রীর দল। তাদের জন্যে কাঠের ছাউনি ফেলা হল, যার সামনে বসে ওরা পাথর কাটতে কুটতে আর ধুলোয় সাদা হয়ে উঠল। যেন ছাতু-ময়দার কলের শ্রমিক।

মৌলবী তাঁর কাছে এক আর্জি পেশ করলেন; মৌলবী-সাহেবের পাণ্ডিত্য যেমন, তেমনি খাসা তাঁর বয়েৎ বানানোর হাত : উজীরের কাছ থেকে প্রায়ই তিনি এটা-সেটা ভেট পেতেন সেই সুবাদে। বোসনি-তে উজীর-সাহেব যে সেতু বানিয়ে দিয়েছেন, সে-খবর শুনে মৌলবী-সাহেব হুজুরের কাছে ফতোয়া পাঠিয়েছেন যে, রেওয়াজ-মাফিক ওখানে খোদাই করে দেওয়া হোক নির্মাতার নাম আর তারিখ। সেই সঙ্গে হুজুরের কাছে, দস্তুর-মতো, মৌলবী সযত্নে রচিত একটি বয়েৎও পাঠিয়ে দিয়েছেন, যদি হুজুরের মর্জি হয়, ব্যবহার করবার জন্যে। অত্যন্ত সুদৃশ্য কাগজে বয়েৎটি লেখা হয়েছে সূক্ষ্ম নক্শার ছাঁদে, লাল আর সোনালী আখরে :

সরকারের মেহেরবান, শিল্পীর মেজাজ
হাতে হাত মেলাল যখন
এই মনোরম সেতু হল নির্মিত,
প্রজারাও সুখী আর ধন্য ইয়ুসুফ
ইহলোকে আর পরলোকে।

তার ওপরে ইয়ুসুফ ইব্রাহিম-এর মোহর আঁকা, আর লেখা, 'নীরবতাই চরম আশ্রয়'!

*

বহুক্ষণ উজীর স্থাণুর মতো বসে রইলেন : এক হাতে বয়েৎটি, অন্য হাতে সেতু বানানোর কাগজ-পত্র হিসেব। কোনও কাজে হাত দেবার আগে তিনি এখন না-ভেবেচিন্তে এগোন না আর।

এই গ্রীষ্মকালেই তাঁর সাফল্যের ছ বছর পূর্ণ হবে। কারাবাসের পর প্রথম বারের মতো তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, তাঁর নিজের মধ্যে বড় একটা পরিবর্তন দেখেন নি। এখন তিনি পুরোপুরি উপনীত হয়েছেন পরিপক্ক সেই বয়সে যখন মানুষ জীবনের ষোলআনা তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শেখে। এমন কি প্রতি-পক্ষীদের পরাভূত করে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতনও হয়ে পড়েছেন; বিপদের গহনতম গ্রাস থেকে ফিরে এসে সে-ক্ষমতার চরিতার্থতা কোথায়, বুঝেছেন। কিন্তু সময় যতই যায়, ততই তাঁর কারাবাসের স্মৃতি মুছে যাবার বদলে উত্তরোত্তর তাঁর চেতনাকে ছেয়ে ফেলছে। জাগ্রত অবস্থায় তা-ও বা যেটুকু সময় নিজেকে তার কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন, নিদ্রায় একেবারেই পারেন না। দুঃস্বপ্ন নিয়ে ফিরে ফিরে আসতে লাগল তাঁর কারাবাসের স্মৃতি, আর তারই উৎকণ্ঠায় বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল উজীরের দিনগুলো।

আর গোপনে গোপনে, কিন্তু সত্তার গভীরেই তিনি ধীরে ধীরে সন্দিহান হয়ে উঠতে লাগলেন সব কিছু সম্বন্ধে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অব্যক্ত অশান্তির মুখ কারো কাছে খুলতে পারেন না তিনি। মানুষ জানে না, মহান যাঁরা, ক্ষমতাবান যাঁরা, এই-ভাবেই তিলে তিলে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে যান মৃত্যুর পথে নীরবে।

সেদিন সকালেও উজীর-সাহেব গত রাতের অনিদ্রায় দারুণ ক্লান্ত হয়ে বসে বসে কী সব ভাবছিলেন; সকালের স্নিগ্ধতা আবাক্কাক্ক করে তুলছিল তাঁর চোখের পাতা দুটিকে। ভাবছিলেন তিনি বিদেশী এই স্থপতিদের কথা, আর যারা তাঁর অভিজ্ঞ আর্জি পেটে ভরাবে, সেই ভিখারীদের কথা।

আর তিনি ভাবছিলেন সুদূর সেই নির্জন বিষণ্ণ বোসনি-র কথা! কিছুদিন থেকেই বোসনি-র কথা ভাবতে গেলে মনটা তাঁর এই রকম একটা বিষণ্ণতায় ভরে যায়। সেই বোসনি, যার অধিবাসীদের একাংশের বেশীকে আলোকপ্রাপ্ত করতে পারল না ইসলামের বাণী, যেখানে নেই সংস্কৃতির নাম-গন্ধ, জীবন যেখানে বিস্বাদ, দরিদ্র, কঠোর। দুনিয়ায় এমন জায়গা কত আছে? কত নদী আছে, যার ওপর সেতু নেই? কত দেশ আছে, খাবার জল নেই যেখানে, যার মসজিদ ভগ্নপ্রায়, কুরূপ?

তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল অভাবের অনটনের হাহাকারের সর্বপ্রকার রূপে উপচীয়মান ভয়ঙ্কর এক জগৎ।

তাঁর বাগানের সৌখীন চালার ওপর সবুজ টালিগুলো রোদে ঝলমল করছে। উজীর আবার মন দিলেন মৌলবীর বয়েৎটার দিকে। হাত তুলে, কলমের দুই আঁচড়ে তিনি কেটে দিলেন বয়েৎটা। এক মুহূর্ত থেমে উড়িয়ে দিলেন তাঁর নাম সংবলিত মোহরটা। রইল শুধু, "নীরবতাই চরম আশ্রয়"! অনেকক্ষণ ধরে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে, সেটাও উড়িয়ে দিলেন উজীর-সাহেব।

সেতুর গায়ে লেখা হল না কারো নাম, কোনও বয়েৎ।

বোসনিতে, কাঠফাটা রোদে, মরা চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করতে লাগল সাদা পাথরের সেতুটা : মানুষ, পশু, যাতায়াত করতে লাগল তার ওপর দিয়ে। কোপানো মাটি, বিক্ষিপ্ত মাল মসলার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যেতে দেরি লাগল না : মুছে গেল সেতুটার নতুনত্বের নিশানাগুলো। কিন্তু মুছে গেল না পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে সেতুটার বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট ব্যবধান। দুধারের সাদা উদ্ধত পাথরের প্রকাণ্ড খিলানটার একাকিত্ব দেখে মুগ্ধ বিস্মিত না হয়ে পারে না অগণ্য পথচারী : বন্য এই পাথুরে দেশে সুন্দর একটা হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন যেন।

এ-কাহিনী শোনাচ্ছেন যিনি, তাঁরই মাথায় প্রথম প্রশ্ন জাগে এই সেতু নির্মাণের বৃত্তান্ত জানবার। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি পাহাড়ের পথ দিয়ে ফিরছিলেন; ক্লান্ত, অবসন্ন বসেছিলেন তিনি সাদা পাথরের পাঁচিলটার গায়ে হেলান দিয়ে। গরম-কালের দিনগুলো যেমন অসহ্য, রাত তেমনি সুন্দর। পাথরের গা তখনো যেন পুড়ে যাচ্ছে তাতে। লোকটার সারা গায়ে ঘাম। দ্রিনা থেকে ভেসে এল এক দমকা শীতল হাওয়া; উষ্ণ পাথরের স্পর্শটা একাধারে যেমন বিচিত্র, তেমনি প্রীতিপ্রদ। মানুষের মনের সঙ্গে মিলে গেল পাথরটার সত্তা। সেখানেই এই কাহিনী লেখবার সংকল্প জন্ম নিল।

রাত্রি নামলে ওরা পাতার ছাউনি দেওয়া একটা কুটিরে প্রবেশ করে। কোন যুবক একই মেয়েকে পর পর রাত্রি ধরে নির্বাচন করলে সেটা অত্যন্ত নিন্দার্হ কেলেঙ্কারি কাণ্ড বলে গণ্য করা হয়।

পুনান নারী অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েছে বুঝলে—সেই সন্তানের পিতা যে-ই হোক না কেন—তখন মেয়ের বাপ মা ওকে বিয়ে করার জন্য সবচেয়ে বলিষ্ঠ এবং দক্ষ শিকারীকে মনোনীত করে। বিয়ে একবার হলে তারপর আর কোনরকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

গত যুদ্ধের সময় জাপানীরা ওদের ওপর পীড়ন চালাতে ওরা মুণ্ডশিকারে আত্ম-নিয়োগ করে। ওখানে এক সম্মানিত স্থানে এখনও অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা একটি মুণ্ড দেখতে পাওয়া যায়।

মুণ্ডটি হচ্ছে জাপ সম্রাটের অভিযাত্রী বাহিনীর এশিয়া ভূখণ্ডের নির্দেশক।

সম্মানজনক এক জালিয়াতি

ইওরোপ ও আমেরিকায় পুরনোদিনের চিত্রকরদের আঁকা বিখ্যাত ছবির ক্রয় ও বিক্রয় আধুনিক যুগের বৃহত্তম এবং অত্যন্ত সম্মানজনক জুয়াচুরির কারবারে পরিণত হয়েছে।

আমেরিকায় সম্প্রতি রেমব্রাঁর 'হোমারের আবক্ষ প্রতিমূর্তির ধ্যানে এরিস্টটল' ছবিখানির দাম ওঠে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা।

"কোন ছবির কি এত দাম হতে পারে? যদি পারে তাহলে ছবির মূল্য নির্ধারিত হয় কি ভাবে?" জনৈক বৃটিশ সাংবাদিক তাঁর এক চিত্রকর বন্ধুর কাছ থেকে ছবিখানির অত দাম হওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা জানতে চেয়ে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর পান: "অবশ্যই; অমর শিল্পকৃতিত্বকে টাকার মাপকাঠি দিয়ে তুমি মাপতে পার না।

প্রশ্ন: 'কত মূল্য হতে পারে বলে তুমি মনে কর?'

উত্তর: 'অমূল্য। ওটার বিহনে পৃথিবী দরিদ্রতর হয়ে যাবে। ওর যা সাংস্কৃতিক মূল্য তা হিসেবে কষা যায় না।'

প্রশ্ন: 'ছবিখানি তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই।'

উত্তর: 'না।'

প্রশ্ন: 'তার কোন অনুলিপি?'

উত্তর: 'না, মানে, তেমন তো মনে পড়ে না।'

বর্তমানকালে শিল্পরুচি মূল্য নির্ধারণ করে না, করে দুষ্প্রাপ্যতা। প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি ছবি কিনে নিজের প্রাইভেট গ্যালারিতে সেগুলি লুকিয়ে রাখে, শিল্প মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে সংগ্রহ করে রাখার তাগিদে নয়। আসলে তারা অতি বিচক্ষণ ব্যবসাদার বলেই জানে যে ব্যবসার বাজার পড়ে গেলেও এমন সম্পদ থাকবে যার মূল্য কোনদিনই কমে যাবে না। অন্তত সেইটাই তারা আশা করে।

শিল্পীরা নিজেরা কখনো ঠিক করে দেয় না কোন স্টাইলের আঁকার কি দর হবে। সেটা করে ছবির ব্যবসাদাররা এবং তারাই চিত্রকর ও তার কাজকে ফ্যাশনভুক্ত করে তোলে।

ষাট বছর আগে ছবির জন্য অত্যন্ত উঁচু দাম দেওয়া হতো কারণ সেগুলি সে যুগের ক্রেতাদের শিল্পজ্ঞানে আবেদন সৃষ্টি করতো বলে। অথবা এমন কোন দৃশ্য বা প্রতিমূর্তি সেটা সে চিরদিন মনে ধরে রেখে দিতে চায়।

আজ বহু অভিজাত পরিবারের লোক বহু পূর্বে স্বর্গত তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতির সারির সামনে দিয়ে যেতে বেদনা অনুভব করবে, কিন্তু আমেরিকার চিত্র সংগ্রাহকরা সেগুলির জন্য উচ্চমূল্য দিতে প্রস্তুত।

ফটোগ্রাফির উদ্ভাবনের ফলে তার দ্বারা যতোটা অবিকল নকশা ও প্রতিকৃতি তোলা সম্ভব কোন চিত্রকরের পক্ষেই তা অসম্ভব। আর তাই আজকাল বিষয়বস্তুর সঙ্গে কদাচিৎ মিল থাকে এবং বক্তব্যটা বুঝে ওঠা সহজ নয় এমন ছবিরই মূল্য বেশী হয়।

ছবির ক্ষেত্রে পুরনো কীর্তি নিয়ে জুয়াচুরি আরম্ভ করে জো ডুভিন নামক এক ওলন্দাজ যে ইংলণ্ডে হালের এক বন্ধকী কারবারির মেয়েকে বিয়ে করে।

ডুভিনের নীতি ছিল: "লাখ দেড়েক টাকা দামের ছবি পাওয়া সহজ কিন্তু পঁচিশ লক্ষ টাকা দামের ছবি কিনতে পারা কঠিন ব্যাপার।"

অনেক ধনীদের এই নীতিটি পছন্দ হয়। এটা তাদের একান্ত হতে এবং মহান শিল্প-সৃষ্টির সমঝদার বলে পরিগণিত হওয়ায় সহায়তা করে।

ডুভিনের স্বার্থ ছিল শুধু দামের ওপর। কোন ছবির জন্য তিন চার হাজার টাকা দাম চাইলে সে যেন মনে আঘাত পেতো, বলতো: "মাত্র তিন চার হাজার টাকা দামের ছবি বেচার মতো সম্পত্তি আমার নেই।"

ডুভিন যখন পৃথিবীর মধ্যে শিল্প-সামগ্রীর সবচেয়ে বড়ো কারবারী সে সময় একদা নিউইয়র্কের এক কোটিপতি মালিক ডুভিনের নিউইয়র্কস্থ আর্ট গ্যালারীতে কয়েকগুলি ছবি দেখে পছন্দ হওয়ায় বলে: "এগুলি আমি কিনতে চাই।"

মাথা নেড়ে ডুভিন জানায়: "দেখুন মশাই, এগুলো আমি এক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্যে রেখে দিয়েছি যার অর্থ, আমার মনে হয়, আপনার চেয়ে বেশী।"

"তার মানে?" ধনী লোকটি প্রায় ফেটে পড়ে। "আপনার কি মনে হয় আমি ছবি বুঝি না! জানেন কয়েকগুলি সেরা শিল্পীর কীর্তির আমি মালিক।"

"দেখুন....." ডুভিন একটু সন্দিগ্ধচিত্তে বলে, "...এগুলোর দামটা বোধ হয় আপনার পক্ষে বেশী।" এই বলে একেবারে খাস জায়গায় আঘাত করে।

অপমানিত খরিদ্দারের উষ্মা আর চাপা থাকে না: "বলুন কত টাকা দাম চাই আপনার?"

"পঞ্চাশ লক্ষ টাকা", অত্যন্ত শান্তভাবে অনুচ্চকণ্ঠে ডুভিন বলে।

"ঠিক আছে।" সঙ্গে সঙ্গে চেক বই বেরিয়ে আসে। "ছবিগুলি আমি নিলুম।"

পাশ্চাত্যে পুরাতন অমর শিল্পকীর্তির মূল্য আজ এইভাবেই নির্ধারিত হয়।

(১৯)

এক এক সময় মনে হয় বনপলাশি গ্রামটা কতই না বদলে গেছে. আবার এক এক সময় মনে হয়, কিছুই বুঝি বদলায় নি। যেমন ছিল তেমনি আছে, বদলেছে শুধু বাইরের চেহারা।

বাইরের চেহারাও কি বদলেছে? নিজের মনকেই প্রশ্ন করেন গিরিজাপ্রসাদ।

না বদলায় নি কিছুই। [illegible] ইস্কুল নেই, হাসপাতাল নেই। [illegible] বড় বড় মাঠের পুকুরগুলো মজে গেছে, আর তার বদলে এসেছে [illegible]। নিজের নিজের [illegible] সবাই প্রয়োজন মত জল নিতে পারতো, এখন সেটুকুরও উপায় নেই। [illegible] কাদাজল আছে [illegible] দিতে হয়। [illegible] ছাড়বে তার জন্যে [illegible] থাকো। ঠিক সেই [illegible] দিকে তাকিয়ে [illegible]। এখন তবু একটা [illegible] করলেই চলতো।

হতে [illegible] রাশি রাশি [illegible] থেকে আপনার বড় বড় আপিসার [illegible] পায়ে তিন তিন [illegible]।

শুনে হেসেছেন গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু অভিযোগটা উপেক্ষা করতে পারেন নি।

শুধু চেহারা কেন, গ্রামের মানুষের চরিত্রও তো বদলায় নি একটুও। কিংবা বদলেছে। [illegible] মানুষগুলোর আজ আর দেখা মেলে না।

ইস্কুল-হাসপাতাল [illegible] সেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে [illegible] অবনীমোহন চলে গেছে। আর চলে গেছে বলেই তাকে ঠিক হৃদয় [illegible] বসাতে পারেন নি গিরিজাপ্রসাদ। নিজেরই কেমন সংকোচ হয়েছে। [illegible] মানুষ যেমনভাবে ভিক্ষে দেয় [illegible] তেমনি। গ্রামের জীবনের সঙ্গে মিশতে চায় না, শুধু টাকা কটা ফেলে দিয়েই তার কর্তব্য সারা হলো। গাঁয়ের লোক ফিসফিস করে বলেছে, দান না ছাই, এর পেছনে নিশ্চয় কোন ফন্দী আছে!

সত্যি, ভাবলেও হাসি পায় গিরিজাপ্রসাদের। কলেজে পড়ার সময় বিধবা-বিবাহ নিয়ে কত তর্ক করেছেন, পণপ্রথার বিরুদ্ধে কত যুক্তি খাড়া করেছেন। ভেবেছিলেন, আর কটা বছর, তারপরই গ্রামের মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে, সব কুসংস্কার, সমাজের সব জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে।

জঞ্জাল জমেছে আরো। পণ বেড়েছে, পণ নেবার লোভটাও। আশ্চর্য, দিনের পর দিন মানুষ যত দরিদ্র হচ্ছে, যত নিঃস্ব হচ্ছে, পণের টাকাও বাড়ছে তত। বিশ বছর আগেও ছোট বোনের বিয়েতে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছিল তিন হাজার টাকা। [illegible] বিমলার বিয়ের যেখানেই সম্বন্ধ করেন, আট-দশ হাজারের কমে কোন ছেলেরই পান না।

যেটুকু উন্নতি, যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে, সবই শহরে। মেয়েরাও শিক্ষিত হচ্ছে সেখানে, স্বাবলম্বী হচ্ছে। কিন্তু গ্রামে?

না, গ্রামে কোন মানুষ থাকবে না। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন গিরিজাপ্রসাদ, শৈশবের সেই বনপলাশি গ্রামে কত লোক ছিল, আট দশটা বাড়িতে পুজো আসতো। বাগদীপাড়া, বাউড়িপাড়া, কেওড়া-পাড়ায় লোক গিসগিস করতো। ভদ্রলোকও কি কম ছিল তখন?

বিজয়া-দশমীর দিনটিতে বারবার সেই শৈশবের দিনগুলি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সারা গাঁ যেন খাঁ খাঁ করছে। রাশি রাশি পোড়ো বাড়ি, দেয়াল ভেঙে পড়ে বেশীর ভাগই মাটিতে মিশে গেছে। ফিরে এসে কেউ আর ভিটেটুকুও খাড়া করতে পারবে না।

ফিরে আসবেও না হয়তো কেউ। একে একে সকলেই চলে গেছে, চলে যাবে। হংস চাটুজ্জে চাকরীর দরখাস্ত করছে, সেও হয়তো চলে যাবে। উদাস চলে যাবে ড্রাইভারীর লাইসেন্স পেলেই। দামু পালও আর কিছু টাকা জমিয়ে নাকি দোকান খুলবে বর্ধমানে। কালীমোহনের তিন বিয়ে-তিন পক্ষেরই ছেলেদের মত গিরীনও হয়তো একদিন বলগার স্টেশনে দালান তুলবে, ধানচালের ব্যাবসা করে।

রেলগাড়িতে চড়লেও যিনি ম্লেচ্ছস্পর্শ বলতেন সেই কালীমোহনের বড় বউয়ের ছেলেরাও গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, নিগমে ব্যবসা ফাঁদবে, কেউ কি ভেবেছিল?

না, সারাজীবন চাকরি করে তাঁর মত দু'চারজন নিঃস্ব ব্যর্থ মানুষই হয়তো শুধু ফিরে আসবে বৃদ্ধ বয়সে, আর আসবে রাশি রাশি সরকারী চাকুরে—প্রভাকরের মত ঃ ভাবলেন গিরিজাপ্রসাদ।

বংশী বলেছিল, জমি আর থাকবে না গিরিদাদা, সব দালান হয়ে যাবে, শুধু সরকারী দালান উঠবে।

সত্যিই বুঝি তাই। শুধু দালান নয়। গ্রামগুলো ভরে যাবে সরকারী চাকুরে

লোকের ভিড়ে। কৃষি-আপিস, ব্লক-আপিস, ক্যানাল আপিস। ট্যাক্স-আপিস। জমি আর জমিদারী যদি যায় ক্ষতি নেই, কিন্তু লাভ কি হবে গ্রামের? বড় বড় আপিস খোলা হবে হয়তো, একটা গোমস্তার বদলে সতেরোটা লোক চাকরী পাবে।

যারা চাষের কিছুই বোঝে না, জানে না, শহরে বসে তারা কলমের খোঁচায় যেমন মুনাফা কষে দিয়ে ট্যাক্স বসিয়ে দেয়, সারা বছরের একটা চাষী পরিবারের খোরাকীর খবরটাও রাখে না, এরাও তখন হয়ত এমনি সব নিত্যি নতুন কাজীর বিচার দেবে।

কাজীর বিচার!

কালীমোহনও বুঝি কাজীর বিচার দিয়েছিলেন! একাধিক বিয়ের রেওয়াজ ছিল বলে, বিয়ের দৌলতে সম্পত্তি বাড়ানোর রীতি ছিল বলেই ব্রজমোহনকে বুঝতে চেষ্টা করেন নি, বুঝতে পারেন নি।

বিসর্জনের দিন দুর্গা-প্রতিমার সঙ্গে গ্রামের মাত্র তিরিশ-চল্লিশটি লোকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চলতে শৈশবের সেই হারিয়ে যাওয়া উচ্ছল আনন্দের, ঢাক-ঢোল-হাসি-উল্লাসের দিন ক'টির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

সেই সুখের দিনগুলির স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর তারই ফাঁকে হঠাৎ একসময় একটি বিষণ্ণ করুণ মুখ মনে পড়ে গিয়েছিল বুড়ি অট্টামার দিকে তাকিয়ে।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরছে গিরিজা। ছোট লাইনের ট্রেনটা তাকে নামিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে যেতেই গিরির নিজেরই লজ্জা বোধ করলো নিজের পোশাকপরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে।

মাত্র ক'টা মাসের মধ্যে গিরি যেন একেবারেই বদলে গেছে। কলেজের সাহেব অধ্যাপকের নির্দেশে তখন ও ধুতির নীচে কামিজ গুঁজতে শিখেছে।

ধুতি পরায় আপত্তি ছিল না টনি সাহেবের। শুধু চটে যেতেন ধুতির ওপর শার্টের প্রান্তটুকু লটপট করতে দেখলে বলতেন, শার্ট বা পাঞ্জাবি যা খুশি পরো কিন্তু ধুতি পরবে তার ওপর: ঠিক যেমনভাবে প্যাণ্ট পরতে হয়।

গিরিজাও সেইভাবেই কাপড় পরেছিল। কামিজের ওপর কোট। পায়ে মোজা, নিউ কাট জুতো।

হাতে ব্যাগ নিয়ে ধুলোটে রাস্তা ধরে গ্রামে ফিরছিল গিরিজা। পুজোর ছুটিতে গ্রামে ফিরছে, মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উল্লাস।

বাজ-পড়া অশ্বত্থ গাছটার তখন এমন চেহারা হয়নি। শাখাপ্রশাখায়, পাতায় পাতায় সারা সাঁওতাল পল্লীটাকে ছায়ায় ঘিরে রেখেছে।

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সাঁওতালদের পুকুরটায় মুখ-হাত ধুয়ে নিলো গিরিজা। তারপর ব্যাগটা আবার তুলে নিয়ে সবে আলপথ ধরে দু'চার পা এগিয়েছে পিছন থেকে গম্ভীর গলার ডাক এলো।—গিরিজা।

গিরিজা ফিরে তাকালো।

দেখলে কালীমোহন আসছেন। কাঁধে পাট করে রাখা চাদর, কপালে সিঁদুরের তিলক, হাতে রুপোর সিংহাসনে রক্তবস্ত্রে ঢাকা দেওয়া কি যেন।

গিরিজা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, তারপর মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে কালীমোহনকে।

কালীমোহন বিড় বিড় করে কি যেন আশীর্বাদ করলেন।

তারপর কঠিন স্বরে বললেন, তুমি, তুমিও ম্লেচ্ছ পোশাক পরলে গিরিজা!

গিরিজা কোন উত্তর দিলো না। কিন্তু সারা শরীর তার শিউরে উঠলো ব্রজমোহনের কথা মনে পড়তেই।

কালীমোহন ধীরে ধীরে কুশল প্রশ্ন করলেন। আর পরক্ষণেই যেন একটা আতঙ্ক অনুভব করলো গিরিজা। কালীমোহনের কাছ থেকে যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে সে।

ব্রজমোহনের সঙ্গে তার দেখা হবে, কোনদিন ভাবেনি গিরিজা। দেখা করার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেছে, তার একটা আতঙ্কের, রহস্যের ঘর খুলে দিয়েছে ব্রজমোহন তার চোখের সামনে।

সে-রহস্যের হদিস পেয়ে সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, ব্রজমোহনের সঙ্গে বুঝি দেখা না হলেই ভাল হতো।

আলপথ ধরে তখন আগে আগে চলেছেন কালীমোহন, পিছনে পিছনে গিরিজা।

অনেকখানি পথ চুপচাপ এগিয়ে এসে হঠাৎ এক সময় থেমে দাঁড়ালেন কালীমোহন। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, ব্রজর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল গিরিজা?

সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠলো গিরিজার। কোনরকমে উত্তর দিলো, না।

গিরিজা লক্ষ্য করলো, প্রশ্ন করার সময় কালীমোহনের মুখেচোখে যে উৎকণ্ঠা, যে ভয় দেখা দিয়েছিল, উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন অন্তর্হিত হলো। যেন নিশ্চিন্ত হলেন কালীমোহন।

কিন্তু ভয় গেল না গিরিজার। গ্রামের সকলেই কালীমোহনকে ভয় পেতো, শ্রদ্ধা করতো। আর যখন রাগে সর্বশরীর ফুলে ফুলে উঠতো তাঁর, খড়ম পায়ে খটখট শব্দ করে পায়চারি করতেন কালীমোহন, তখন কেউ সাহস করে তাঁর কাছে যেতে চাইতো না।

সবচেয়ে বেশী ভয় ছিল ছোটমার। অসহায়ের মত নির্বিবাদে কালীমোহনের প্রতিটি আদেশ মেনে চলতো।

গিরিজা সে-রাতে ঘুমোতে পারলো না। কেবলই ভয়, যদি কালীমোহন কোন রকমে জানতে পারেন, ওর সঙ্গে ছোটঠাকুরের দেখা হয়েছে। যদি জানতে পারেন গোপনে ছোটমার নামে চিঠি পাঠিয়েছে ব্রজমোহন।

নিজের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখা চিঠিখানা বার বার দেখে গিরিজা, স্পর্শ করে। ভয় হয়, যদি কারো হাতে পড়ে এ চিঠি!

চিঠিতে কি লেখা আছে, কি এমন নিষিদ্ধ কথা লেখা থাকতে পারে ভেবে পায় না গিরিজা। তবু পড়ে দেখতে চায় না। যে-চিঠি বিশ্বাস করে তার হাতে তুলে দিয়েছে ব্রজমোহন সে-চিঠি খুলতে কি পারে।

কিন্তু চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ারও সুযোগ পায় না। কি করে পৌঁছে দেবে চিঠিটা, যে-কথা বলতে বলেছে ব্রজমোহন সে-কথা ছোটমাকে কি করে বলবে।

শেষে সুযোগ পেয়ে গেল একদিন।

প্রতিদিনের মতই গোসাঁইদিদি সেদিনও খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে এসে ঢুকলো ঘরে।

ডাকলে, কই গো আমার গিরিরাজনন্দিনী এসেছে নাকি।

হাসিহাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো গিরিজা।

গোসাঁইদিদি হেসে হেসে হাত নেড়ে বলে ঝনাক ঝনাক খঞ্জনী বাজিয়ে বললে, মথুরা থেকে এলেন শ্যাম না জানি হাতে কি এনেছেন গো!

গিরিজা দেখলে গোসাঁইদিদির কথা শুনে মা হাসতে হাসতে ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে গোসাঁইদিদি ফিসফিস করে বললে, সই যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে গোপাল।

গিরিজা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের চোখে তাকালে তার মুখের দিকে।

গোসাঁইদিদি এদিক ওদিক তাকালো। কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে চাপা গলায় বললে, ছোটঠাকুরের বউ আমিদের পাড়ে যেতে বললে তোমায়। কথা আছে তার।

সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা বের করে নিয়ে ছুটলো গিরিজা। ছুটে ছুটে... একেবারে আমিদের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে দেখলে খরী নদীর ধার বরাবর খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে কুঞ্জের দিকে হেঁটে চলেছে গোসাঁইদিদি। বনতুলসী আর নয়নতারার ঝোপের ধারে ধারে।

আর কিছুক্ষণ পরেই কলসী নিয়ে ছোটমাকে তরতর করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখলে।

তাড়াতাড়ি এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো ছোটমা। আর গিরিজা ছুটে গিয়ে তার হাতে চিঠিখানা দিলো।

চিঠিটা পড়লো ছোটমা, পড়তে পড়তে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ বেয়ে। তারপর হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো, না, না, পেসাদ, তা হয় না বাবা, তা হয় না।

গিরিজা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলো ছোটমার মুখের দিকে। কত আশা নিয়ে, কত

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তার এ-চিঠি পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে সে। সে তো শুধু ছোটমার বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্যেই। ছোটমার ব্যর্থ জীবনকে নতুন করে ভরে তুলতে পারবে বলেই।

আর ছোটমা কিনা......

ছোটমা বলে উঠলো, না পেসাদ, তুমি তাকে বুঝিয়ে ব'লো, তা হয় না। আমার জীবন তো নষ্ট হয়েছে, বটঠাকুরের সুনাম, বংশের সুনাম আমি নষ্ট হতে দেবো না। লোকে হাসবে, অপমান করবে বটঠাকুরকে, হয়তো......
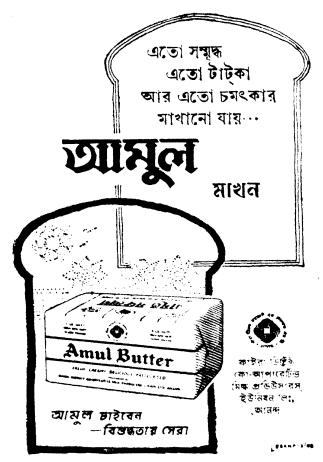
হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো গিরিজা।

বললে, ছোটঠাকুর খ্রীষ্টান হয়েছেন এ-কথা তুমি বলোনি কেন, কেন চেপে রেখেছিলে?

চমকে উঠলো ছোটমা। মুখে আঙুল দিয়ে অনুনয় করলে, চুপ, চুপ করো পেসাদ।

রাগে ফেটে পড়লো গিরিজা। বললে, না, চুপ করবো না আমি। বলো তুমি, কেন বারবার মিছে কথা বলেছো, কেন জানতে দাওনি তুমি খ্রীষ্টানের বউ।

গিরিজার রাগ দেখে সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছোটমার।

ধীরে ধীরে বললে, না না পেসাদ, এ-কথা তুমি আর কাউকে জানতে দিও না বাবা। এ দুঃখের আগুনে আমাকেই শুধু জ্বলতে দাও। বটঠাকুরের সম্মান, বটঠাকুরের মেয়েদের বিয়ে......সবই যে আমাকে ভাবতে হয়েছে পেসাদ। আমার নিজের সুখের সঙ্গে যে আরো অনেকের জীবন জড়িয়ে আছে—অনেকের!

দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরিজা। সে-কথা শুনে বিস্ময়ের চোখে ও শুধু তাকিয়ে রইলো ছোটমার মুখের দিকে। কি আশ্চর্য, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবনকে আহুতি দিয়ে চলেছে ছোটমা শুধু সংসারের আর পাঁচজনের কথা ভেবে?

ছোটমা খানিক চুপ করে থেকে বললে, ও কেন নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হতে গেল পেসাদ, কেন, কেন!

গিরিজা ধীরে ধীরে বললে, জেঠাঠাকুর তোমাকে নিয়ে যাবেন, জোর করে নিয়ে যাবেন ছোটমা। শুধু তুমি যদি রাজি হও।

শিউরে উঠলো ছোটমা। বললে, না, না, তুই তাকে নিষেধ করিস বাবা। আমার এই সিঁথির সিঁদুরটুকুই অনেক সুখ পেসাদ, এটুকুও তুই মুছে দিতে চাস?

গিরিজা চমকে উঠলো সে-কথা শুনে। বললে, কি বলছো ছোটমা?

—হ্যাঁ, বাবা, ও যদি এ গাঁয়ে ফিরে আসে, যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায় আমাকে... তা হলে......

—তা হলে বড়ঠাকুর ওঁকে খুন করাবেন?

মাথা নীচু করে রইলো ছোটমা। কোন উত্তর দিলো না। গিরিজা দেখলে ছোটমা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখে আঁচল দিয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে গিরিজা বললে, কিন্তু বুড়কাকা যে তোমার সঙ্গে দেখা করবেই ছোটমা। বুড়কাকা যতদিন ভেবেছে তোমার কাছে ধর্মই বড়ো ততদিন তোমার ওপর অভিমানে দূরে সরে থেকেছেন। কিন্তু সে ভুল যে তুমিই ভেঙে দিয়েছো! তোমার জন্যেই যে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন তিনি, তোমার জন্যেই......

—আমার জন্যে? কি বলছিস পেসাদ? বিস্ময়ে অবিশ্বাসে চোখ কপালে তোলে ছোটমা।

গিরিজা উত্তর দিল, হাঁ, ছোটমা, তোমার জন্যেই। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরিজা। তার চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল, যেদিন ব্রজমোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সরু গলির সেই মেসের ঘরে একান্তে বসে সব কথা খুলে বলেছিল ব্রজমোহন।

বলেছিল,' স্ত্রীর মর্যাদা রাখার জন্যেই আমি ধর্মত্যাগ করেছিলাম গিরিজা।

স্ত্রীর মর্যাদা! গিরিজার মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল কালীমোহনের তিন তিনটি বিবাহের কথা। তিন সপত্নীর পরিবার নিয়ে বাস করতেন কালীমোহন। সে-কালে এর মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখতো না, কোন অসামাজিকতা ছিল না।

সম্পত্তির লোভে তাই ব্রজমোহনেরও দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন কালীমোহন। বিবাহের দিন পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ব্রজমোহন অসম্মতি জানালো।

ব্রজমোহনের চিঠি পেয়ে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কালীমোহন। ক্রুদ্ধ হয়ে চিঠি লিখেছিলেন তাকে. জানিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় রাজি না হলে, তাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন তিনি, কন্যাপক্ষের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা তিনি রাখবেনই।

কালীমোহনকে ভয় পেত ব্রজমোহন। পিতার স্নেহ দিয়ে অগ্রজ তাঁকে মানুষ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর শাসনকে, তাঁর প্রতিজ্ঞাকে অমান্য করবার সাহস ছিল না। জানতেন, জ্যেষ্ঠ কালীমোহনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস নেই কারো। পিতৃহীন ব্রজমোহন ভয় পেয়েছিল, তাই পরিত্রাণ পাবার জন্যে......

ব্রজমোহন বলেছিলেন, তাই ধর্মান্তর গ্রহণ করলাম আমি গিরিজা। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আমি, দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের কথা আমি ভাবতেও পারিনি। কিন্তু......

সপ্রশ্ন চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছে গিরিজা।

আর ব্রজমোহন বলেছেন, অথচ তোমার ছোটমার কাছে ধর্মই বড় হলো গিরিজা!

—ছোটমা জানে সে-কথা? প্রশ্ন করলে গিরিজা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে ব্রজমোহন, বললে, না। একটু থেমে আবার বললে, না গিরিজা, কোনদিন তাকে জানাই নি সে-কথা।...... আমারও তো অভিমান আছে গিরিজা, কেন ভুল বুঝলো সে, কেন জানতে চাইলো না.. এবং বার বার আমি তাকে নিয়ে আসতে চেয়েছি, ফিরে পেতে চেয়েছি তাকে।

ব্রজমোহনের সেই কথাটাই ধীরে ধীরে বললে সে ছোটমার কাছে। আর তা শুনে বিস্ফারিত চোখ মেলে গিরিজার মুখের দিকে তাকালো ছোটমা।

গিরিজার দু খানা হাত ধরে আবেগের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, সত্যি? সত্যি বলছিস পেসাদ?

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমার দুটি বিস্ফারিত চোখ বেয়ে ঝরঝর করে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়লো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু পেসাদ, বংশের, পরিবারের মানসম্মান তো আমি নিজের স্বার্থের খাতিরে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারবো না বাবা! না, না, তা আমি পারবো না।

প্রথম প্রথম তাই ব্রজমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও রাজি হয়নি ছোটমা।

বারবার ছোটমার চিঠি বয়ে নিয়ে গেছে গিরিজা, ব্রজমোহনের হাতে সে-চিঠি পেঁছে দিয়েছে. মিথ্যা স্তোকে ভুলিয়েছে তাকে। আর বারবার ব্রজমোহনের অনুনয় ভরা চিঠি এনে দিয়েছে ছোটমার হাতে। গোপনে গোপনে।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু সাহস বাড়েনি ছোটমার। শুধু গিরিজার এনে দেওয়া চিঠিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ছোটমা, আর চোখের জল ফেলেছে।

প্রশ্ন করলেই বলেছে, না, না পেসাদ, তা হয় না। এত বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই তার সঙ্গে, এ বেশ আছি। দেখা হলে জ্বালা বাড়বে বই কমবে না।

তারপর কখনো কখনো একটু থেমে বলেছে, আমার সুখ আনন্দই তো সব নয়, এত বড় একটা গুরুবংশ, কত সম্মান সুখ্যাতি, সে-বংশের গায়ে কলঙ্কের দাগ আমি দিতে পারবো না পেসাদ।

—কলঙ্ক? গিরিজা বিস্মিত হয়েছে। কলেজে পড়ে, শহরের মানুষের সঙ্গে মিশে ওর মন তখন অনেকখানি মুক্ত হয়েছে। তাই বুঝতে পারেনি ও।

ছোটমা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, কলঙ্ক নয়? ভটচায বাড়ির ছেলে খৃষ্টান হয়েছে এ-কথা শুনলে যে অপমানের শেষ থাকবে না পেসাদ, ভাসুরের মেয়েগুলোর বিয়ে হবে না! তুই কাউকে বলে ফেলিসনি তো পেসাদ?

গিরিজা সান্ত্বনা দিয়েছে।—না, না। সে-কথা কি বলতে পারি ছোটমা। কিন্তু তুমি যদি ব্রজকাকার কাছে চলে যাও, তা হলে...

ছোটমা গম্ভীর হয়ে গেছে। চোখ ছলছল করে উঠেছে।—কেউ যে বিশ্বাস করবে না রে। কত কি মন্দ কথা ভাববে। সেও যে বংশের দুর্নাম।

তারপর, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে ছোটমা। বলেছে, না, না, আমি সব ছাড়তে পারবো, আমি ধর্ম ছাড়তে পারবো না পেসাদ। ধর্ম ছাড়তে পারবো না।

কি আশ্চর্য সে-কথা শুনে মনে মনে খুশী হয়েছে গিরিজা, ছোটমার কথায় নিজেও যেন গৌরব বোধ করেছে। ধর্ম। গিরিজার মনে পড়ে প্রথম যেদিন ব্রজমোহন বলেছিল, আমি খৃষ্টান হয়েছি গিরিজা, সেদিন ভিতরে ভিতরে ব্রজমোহনকে কিছুতেই যেন পছন্দ করতে পারেনি সে। সেদিন একটা অন্ধ ক্রোধে যেন জ্বলে উঠেছিল সে ব্রজমোহনের বিরুদ্ধে।

অথচ, আশ্চর্য, গোঁসাইদিদির মনে তার জন্যে কোন ক্ষোভ ছিল না। কোন ক্রোধ ছিল না।

নতুন গোড়ের পাড়ে দাঁড়িয়েছিল গিরিজা। পুকুর পাড়ের বাঁশ কাটছিল ঘরামির দল। চাটুজ্জেদের ঘর ছাওয়াবার জন্যে।

হঠাৎ চাপা গলার গুনগুনানি শুনে ফিরে তাকালে গিরিজা। দেখলে গোঁসাইদিদি আসছে। শ্যামলা রঙের মসৃণ গোলগাল মুখখানা তৃপ্তির হাসিতে ভরা। নাকে কপালে ফোঁটা-তিলক, উন্মুক্ত দুখানা সুডোল কালো কালো বাহুতে গঙ্গামাটির ছাপ, হাতে খঞ্জনী।

খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এলো গোঁসাইদিদি। কণ্ঠে মধুসুরের গান, কিঙ্কিনি কঙ্কন বাজে শ্যাম অনুরাগে......

তারপর কাছে এসে হঠাৎ খঞ্জনী থামিয়ে বললে, কি গোপাল, কুঞ্জে যাবে আমার সঙ্গে, চলো বড়ো গাছের কৃষ্ণফল পেকেছে।

কৃষ্ণফল অর্থাৎ জাম। গোঁসাইদিদি রহস্য করে বলতো আমার শ্যামের ছটায় এমন রঙ হয় গো, এ ফল কৃষ্ণফল।

গিরিজা হাসলো। ইচ্ছেও হলো খরি নদীর ধারের সেই নয়নতারা বনতুলসীতে ঘেরা কুঞ্জটা দেখে আসতে। বহুকাল ওদিক পানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তাই বললে, চলো। যাবো তোমার সঙ্গে।

গোঁসাইদিদি খুশীতে হেসে বললে, চলো গোপাল চলো। বলে আলপথ ধরে মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চললো তরতর করে, পিছনে পিছনে গিরিজা।

গিরিজার কাছে গোঁসাইদিদি চিরদিনই এক রহস্য। গ্রামের সব মেয়েদের মুখেই দুঃখের ছাপ, কান্না, ব্যথা। অথচ গোঁসাই-দিদির ঢলোঢলো মুখে সব সময় তৃপ্তির হাসি।

গিরিজা তাই হঠাৎ এক সময় বলে বসলো, তোমার কোন দুঃখ নেই, না গোঁসাইদিদি।

গোঁসাইদিদি ফিরে তাকালো, হেসে বললে, গোবিন্দ তো দুঃখ কাউকে দেন না। বলেই গান ধরলো, শ্যামেরে পাইলে কাছে সে যে গো অতীব সুখো, শ্যাম-বিচ্ছেদে সে যে আনন্দ-দুঃখ!

আর গিরিজার মনে হল, ছোটমার মনেও যদি এমনি আনন্দ থাকতো, এমনি তৃপ্তি!

কাঁটাকুলের ঝোপ এড়িয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে চলেছিল গিরিজা। হঠাৎ গোঁসাই-দিদি বললে, গোপাল, শোন একটা গোপন কথা আছে তোর সঙ্গে।

—কি কথা? বিস্মিত হলো গিরিজা। গোঁসাইদিদি বললে, ছোটঠাকুরকে একবার লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কুঞ্জে আনতে পারিস গোপাল?

গিরিজা চমকে উঠলো কথা শুনে। কোন উত্তর দিতে পারলো না।

আর গোঁসাইদিদি বললে, একবার আসতে বল গোপাল, সইকে এনে একবার দেখা করিয়ে দিই।

গিরিজা স্তম্ভিত হয়ে বললে, কি বলছো গোঁসাইদিদি?

গোঁসাইদিদি হাসলো। বললে, সব জানি রে, সেই কবে থেকে সব জানি। সই আমায় সব বলেছিল।

তারপর ধীরে ধীরে গাইলে,

হৃদয়ের ভূষণ-আমার চিন্তামণি ধন,
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দরশন।
কাজল দিয়ে কি সাজাবি?

পরক্ষণেই হঠাৎ গান থামিয়ে বললে, জীবন হলো কুসুমের বন, কাঁটা ফেলে দিয়ে গাঁথো চিকণ মালা।

গিরিজা তাকালো গোঁসাইদিদির মুখের দিকে।

বললে, কিন্তু ছোটমা যে রাজী হবে না গোঁসাইদিদি!

—হবে গোপাল হবে। কেত্তন শোনার নাম করে নিয়ে আসবো আমি। বড়ঠাকুর জানতেও পারবে না।

কিন্তু বড়ঠাকুর জানতে পারলেই হয়তো ভাল ছিল।

(ক্রমশ)

আজ; এখন সেই কথাটাই ওরা ভাবছিল। ওরা চারজন—নন্দ, রমেশ, সুব্রত আর নিতাই।

এখন দুপুর। শেষ দুপুর। বিকেল আসে নি, দুপুরও শেষ নয়; যেন মধ্যিখানে একটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি সামনে নিয়ে মুখোমুখি দুজন এসে দাঁড়িয়েছে; দুপুর আর বিকেল; দুই পোশাকের দুই ভদ্রলোক। আর ওরা, ওরা চারজন হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। জানলার কোণে কাচ-পোকার পাখা লটকানো দেখল মাকড়সার জালে, লেজখসা টিকটিকির দিকে চোখ তুলে চুপ হল, ভেন্টিলেটারে চড়ুই-বাসার আবর্জনায় মানিকা খুঁজল এবং হতাশ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে রোদ-পোড়া পথে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে গিয়ে ফেলল না—যেহেতু এখন দুপুর, শেষ দুপুর—বিকেল আসতে আরও সামান্য বিলম্ব।

সামনে আরশি নেই, জল নেই; তবু নির্থর জলে নিজের মুখ দেখার মতন ওরা যার যার মুখ দেখে চুপ। জানে, জলে বাতাস খেলবে। জল নড়বে। ঢেউ উঠবে। এবং এই নিটোল মুখ দুলতে দুলতে চিরে যাবে—যেমন যায় তেফাটা কি চিড় খাওয়া আয়নায়। তেমনি করে ফেটে যেতে যেতেও ওদের চোয়াল শক্ত হবে, দাঁতে দাঁত পড়বে। ভীরু বুক পাথর হয়ে উঠবে।

অল্প বিশ্রাম। দুপুর মরে আসা পর্যন্ত। তারপর সত্যি যখন দুপুর মরবে, উঁচু উঁচু বাড়ির ছাদে, চিলেকোঠায় প্রদীপের নরম আলোর মতন নিভন্ত মোলায়েম হয়ে আসবে রোদ। গাছের মাথায় হলুদের সঙ্গে সবুজের একটু ভাব ফুটবে, তখন ওরা দেখবে। [illegible] জানালা, পাল্লা টেনে দিয়ে দরজায় তালা লাগাবে নন্দ, হাসবে। এবং তখন এ-ঘরের রাত থেকে ওরা বাইরের দুপুরে পা দিয়ে আসন্ন সন্ধ্যা সময়ের খুশীর হাসি হাসবে।

নন্দ কথাটা বলতে গিয়েছিল, বলল না; যেহেতু সে লক্ষ্য করেছে ওরা তিনজন, প্রত্যেকেই বেওয়ারিশ মালের মত বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে। শুয়ে রয়েছে। কেউ এ-দিকে তাকিয়ে কেউ অন্যদিকে—তবু ওরা সকলে কিছু বলবে। বলতে চায়। আর সেই কথাটা ভেবে কারো মুখে কথা নেই।

দুই তক্তপোশ এক করে ঢালা বিছানা। তেলচিটে নোংরা। বিড়ির ছাই, পোড়া দেশলাই কাঠি, পায়ের ধুলো এবং মাথার নোংরা তেলে কুষ্টি বিছানা বালিশ। তারই মধ্যে ওরা গড়াচ্ছিল। নিতাই চিৎ হয়ে ছাদে চোখ রেখেছে, রমেশ এতক্ষণ গত বছরের ক্যালেন্ডারের পুরনো সিনেমা-ছুকরির ছবি দেখছিল, এখন বালিশে মুখ গুঁজে কানা হল। নন্দ বিছানায় শরীর রেখে পা তুলে দিয়েছে দেওয়ালে, একটা বিড়ি ধরিয়ে সুব্রত ধোঁয়ার চাকতি ছুঁড়ছিল। যেন রেলের থার্ড ক্লাশ মুসাফিরখানায় চারজন অচেনা যাত্রী গাড়ির প্রতীক্ষা করছে।

পাশের ফালি বারান্দার কোণ থেকে অল্প ধোঁয়া আসছিল। পড়ন্ত আঁচে কিছু খুচরো কয়লা ঢেলে দিয়ে এসেছে নিতাই। চা হবে। বেরুবার আগে। মেঝের ডাঁইমারা এঁটো বাসনের কাঁড়ি। ভাত এঁটোকাটা এখনও ছড়ানো রয়েছে। থাক। সপ্তাহের এই একটি দিনের আলসেমি যেন উপভোগের আনন্দের খুশীর।

ভোর ভোর সকালে দুধের গাড়িটা এই গলিতে আসে। কদর্য আওয়াজ করে। অন্তিম কালের রোগীর শেষ টান ওঠার মতন শব্দ করে ইঞ্জিন থেমে যায়। চুপ। আর সেই বিকট আওয়াজে ওদের ঘুম ভাঙে। প্রথমে একজন কি দুজন ওঠে। সবাইকে ডেকে তোলে। তারপর চারজন, চার সহবাসী হাত তুলে হাই তোলে। গায়ের আড়মোড়া ভাঙে। বাইরে তাকায়। কোনো-দিন এক-আধ-চিলতে রোদের মুখ দেখে, কোনও দিন বাসি চোখে সকালের নি-রোদ পবিত্র আলো শুষে নেয়।

রোজ ওদের ঘুম ভাঙে এমনি করে, এক শব্দে; যেন হরিসভাটার দুধের গাড়ি ভোর ভোর রাতের বুড়ো বৈরাগীর গলায় ঘুম-জাগানিয়া গান গেয়ে যায় ভাঙা কর্কশ গলায়। রোদ উঠলে আলো, নইলে অপরিসর এই নোংরা ছোট গলির মুখ ঘন ধোঁয়া প্রায় চাপ বেঁধে থাকে। ছোট উঠোন কি রাস্তা অথবা বারান্দা এবং আনাচে কানাচে ভোরের উনুনে তখন আঁচ উঠি উঠি করছে; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ কানা। তখন ওরা ওঠে। একজন বাসিমুখে ঝুলকালি বারান্দার কোণে কয়লা ভাঙে, পালা হিসাবে অন্যজন আঁচের সেবায় ব্যস্ত।

সকালের চা-বাটি হাতে নিয়ে সময় নেই। বেলা চড়তে থাকে; অফিসের তাড়া সুতরাং কেউ বাজারে, কেউ উনুনে, কলতলায় কেউ—কেউ বা মশলা পেশার আয়োজনে ব্যস্ত। সারা সপ্তাহ এমনি; ঘড়ি চোখে নিয়ে বসে থাকা। কেবল রবিবার, এই একটিমাত্র দিন যেন হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া বেদাবীদার দশ টাকার নোটের মতন। বেলায় ওঠ ক্ষতি নেই। অফিস বন্ধ। চার বাটি চা আর বাড়তি তলানি-অলা কেটলি সামনে নিয়ে সময়কে অতি হেলায় ওরা বধ করতে পারে। যেহেতু শনিবারের বিকেল থেকে বাতাসে, পথে ছুটির গন্ধ। এবং বেলায়, চড়ুই-ভাতিতে আসা তারুণ্যের মন নিয়ে ছুটির দিনের পাঁচ বেনুনের রান্না আছে, দুপুর থেকে বিকেল-আসা সময়টুকু বিশ্রাম আছে। এবং সবশেষে আছে সপ্তাহের দেখা-সাক্ষাতের পালা—মাসির বাড়ি, বৌদির বাপের বাড়ি, আর মামীর সংগে দেখা করার চুক্তি, বেড়ানোর—যেন সারা শহরে ওদের আত্মীয় পরিজনের অভাব নেই।

আজও ওরা বেলায় উঠেছিল। শীতের সকাল মেঘলা হয়ে ছিল খানিক। ধোঁয়ার কুয়াশায় পথঘাট আবছা, দূরের ছোটবড় এবং উঁচুতলা বাড়ির মাথা ঘোলা কুয়াশায় ডুব দিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। পরে, রোদ উঠলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নিতাই চা করেছে, নন্দ নিশ্চুপে কাপ বাটি ধুয়েছে, রমেশ এরই মধ্যে মোড়ের দোকান থেকে একঠোঙা তেলেভাজা আনল। তারপর চারজন গত রবিবারের সকল প্লানি মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে জোড়া তক্তপোশের ওপর পাতা ঢালা বিছানায় জাঁকিয়ে বসল। কাছাকাছি।

কথা নেই। প্লাসে প্রথম চুমুক দিতে গিয়ে সুব্রত ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। আচমকা বিষম খেয়েছিল সুব্রত। এবং সংগে সংগে মুখের অদ্ভুত শব্দ আর গিলতে-না-পারা চা ছড়িয়ে পড়ল চারজনের গায়ে।

'হুত...' নন্দ প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল। 'কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে তোর...'

'ইডিয়েট।' একহাতে চা-বিন্দু ছড়িয়ে পড়া চাদর ঝাড়া দিচ্ছিল রমেশ। 'ইয়ার্কির একটা সীমা থাকা দরকার...'

নিতাইও খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আত্মসমর্পণ। 'আমার দোষ নেই...' ওদের দিকে পাশ তাকানোর মতন করে সুব্রত ইশারায় বাইরেটা দেখাল।

ওরা চারজন গলা বাড়াল। জানলার দিকে।

সকালের আবছাভাব কেটেছে খানিক আগে। কুয়শা মরে শীত-সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ির মাথায় মাথায়, গাছের মগডালে এবং ফাঁকা পথে ইতস্তত। শীতল এবং তুহিন হওয়ায় উষ্ণতা জেগেছে সামান্য। পথের কোলাহল এখন চরম। চারটি ভিন্ন মাথা ঔৎসুক্যে, আগ্রহে এবং কৌতূহলে কাছে সরে আসতে আসতে ঘন হল, শেষে এক; লাগালাগি।

শশী লেনের ঠিক মোড়ের বড় বাড়িটার ছাদ ওদের লক্ষ্য। ছাদে একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে নয়, মেয়েটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল রোদ গায়ে মেখে। পিঠময় এলানো চুল থেকে থেকে উড়ছিল, অযত্ন আঁচল লুটোচ্ছিল, তা জড়িয়ে নিতে গিয়ে মেয়েটি এ-দিকে ফিরল।

'খুব ফরসা রে......' নন্দ নিশ্বাস চেপে বলল।

'নাইস ফিগার......' রমেশের চাপা গলায় উচ্ছ্বাস।

'আঃ, কী চুল দেখেছিস?'

'চোখ দুটো নিশ্চয়ই......' নিতাই খুব আবেগের গলায় মেয়েটির অদেখা চোখের বিবরণ দিতে গিয়েছিল। কিন্তু সুব্রত আচমকা ওর পিঠের জামা মুঠো করে ধরে

হাসছিল নন্দ। 'পছন্দ হলেই হল? জানে না মেয়ে আগেই আর এক জনকে...।' থেমে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল নন্দ, 'জানিস, গত রোববারে ও আমাকে না বলছিল সে-কথা। বলে, আমার সঙ্গে চলে আসবে...' যেন এ-চারজন ছাড়াও এ-ঘরে কেউ উপস্থিত আছে, তার কান বাঁচিয়ে নন্দ চাপা গলায় রেণুর কথাটা ওদের শোনাল।

রেণু কে—এ-ঘরের বাকি তিনজন সঙ্গী কোনোদিন চাক্ষুষ না দেখতে পেলেও, রেণুকে সকলে চেনে। নন্দর বৌদির বোন। সুন্দরী। নন্দকে ভালবাসে। শুধু এইটুকুই না, রেণু নামের সেই পরীর মতন সুন্দরী মেয়েটির কত বয়স, কতটা লম্বা, তার শরীরের রঙ, মুখের ডৌল কি গড়ন-পিটন কোন কিছুই অজানা নেই ওদের। যেহেতু রেণু এক সুন্দরী অবিবাহিত যুবতী অতএব তার হাসি, চলাফেরার ছন্দ, অভিমানের ভঙ্গির বিবরণী শুনতে এ-ঘরের কৌমার্য আগ্রহী।

'এক রোববার যদি না-যাই না, তা হলেই লংকাকাণ্ড বেধে যায়।' নন্দ রেণুর অভিমানের গল্প শোনায়। 'বড়লোকের মেয়ের মেজাজই ওই রকম।'

একজন বলে, বাকি তিনজন শ্রোতা। এবং এই বলা শুনতে শুনতে ওরা এক হয়ে গেছে। নন্দর বৌদি কবে প্রেম করে দাদাকে বিয়ে করেছিল, বৌদিদের বাড়ি ক-তলা, কেমন, কটা দেউড়ি, ক-জন দারোয়ান সব জানা। সব ওরা জেনেছে, চিনেছে; যদি নন্দর বদলে রমেশ নিতাই কি সুব্রত হঠাৎ গিয়ে ও-বাড়ি ওঠে তবে কোথাও তাদের ভুল হবে না। ঘর চিনতে নয়, কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে, কোনটা রান্নাঘর আর কোনটাই বা ড্রেসিং রুম অথবা কোথায় কি রাখা আছে সব ওদের নখ-দর্পণে।

নন্দ কি ভাবতে থামল। আর ওদের মন কচুপাতার ওপরে একবিন্দু জলের মতন টলমল করছিল। রমেশ নিতাইয়ের দিকে তাকাল, পরে সুব্রতর চোখে—তিন দুগুণে ছ-চোখ এক হল। হয়ে নীচু হল। বাস্তবিক ছ'টি চোখের নীল বিন্দু জ্বলছিল। নিতাই তৈরী হয়ে নন্দকে দেখছিল। নন্দ থেমেছে, এবার নিতাই বলবে। ও-কিছু বলার আগেই নিতাই তার দিদির কথাটা বলে নেবে ভাবছিল।

'ননীমাসির মতন...'। রমেশ আচমকা নন্দর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েছে। 'মেয়েদের মন না, সব বয়েসে এক।' তুরুপের তাসটি ঠিকমত পেয়ে ফেওয়ার আনন্দ রমেশের গলায়, 'তা নইলে মাইরী রেণুর সঙ্গে ননীমাসীর এমন মিল হয়? কি জানিস?' রমেশ পকেট হাতড়াচ্ছিল। বিড়ির জন্যে। সুব্রত তার ভাগের বিড়ি থেকে একটা বাড়িয়ে দিল। রমেশ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ল। 'আমি অনেক ভেবে দেখেছি, মেয়েরা হল গিয়ে মাটির মতন। সব এক। আসলে নরম থাকার সময় ভগবান আলাদা আলাদা করে গড়েছে। তাই ননীমাসির সঙ্গে রেণুর অমন মিল।'

'ঠিক, ঠিক'...' নন্দ রমেশের কথায় সায় দিল। 'ভাগ্য খারাপ, নইলে তুই নির্ঘাৎ পণ্ডিত হতিস রে রমা।'

'খালি পণ্ডিত? বড়লোক বল।' রমেশ ভাগ্যকে ধিক্কার জানাল। 'ননীমাসি তো সে দিনও বলছিল। বলে, থাক। তোরা তো জানিসই মাসিটা জন্মবাঁজা। ছেলেপুলে নেই। থাকলে একেবারে লাট হতে পারত। কিন্তু সত্যি ও-সব আমার ধাতে সয় না।'

ঠোঁট উলটে, ভুরু কুঁচকে রমেশ অর্থ এবং দৌলতকে তুচ্ছ করল। 'আদর-ফাদরই ভাল। হপ্তায় একদিন যাই, ননীমাসির আদরের জন্যে। কী আদর যে করে না... আমার মাইরী লজ্জা করে।'

ওরা কেউ না। কেউ অর্থ চায় না। দৌলতও না। আদর চায়। আত্মীয়তা চায়। তা নইলে এইখানে, চারবন্ধুর এই খেলার ঘরের মতন ফালতু মেসে ওদের দিন কাটত না। সুব্রত মামীর কাছে থাকতে পারত। নিতাই দিদির কাছে। রমেশ মাসির ঘরে ছেলের আদর পেতো। আর নন্দ রেণুকে বিয়ে করলে দু' লাখ টাকার সম্পত্তির মালিকানা পেত।

'টাকা সব নয়...' রমেশ একদিন বলছিল। 'মুচি মুন্দাফরাস মাইরী এ-শহরে পাঁচতলা বাড়ি করেছে। আগে জাত ছিল টাকার। এখন শালা বেজাত হয়েছে। তার চেয়ে আমরা সুখে আছি। অনেক সুখে। বড়লোক হওয়ার চাইতে, টাকাঅলা আত্মীয়ের আদর টু-পাইস ফালতু ইনকামের মতন।'

দিদির কথাটা বলা হচ্ছে না কিছুতে। হয় না। নিতাইকে ওরা বলতে দেয় না। যেহেতু নিতাই ছোট, মুখের কচিভাবে এখনও বয়সের ছাপ পড়ে নি। এই দুনিয়ার কীইবা দেখেছে সে? কিছু না। তবু সে বন্ধুত্ব পেয়েছে। তিনবন্ধুর মেসে আশ্রয় পেয়েছে। আর করুণা। ওরা তিনজন, রমেশ নন্দ আর সুব্রত আত্মীয়ের গল্প বলতে বলতে যখন ক্লান্ত, তখন নিতাইয়ের পালা। নিতাই তখন দিদির গল্প বলে। বলে যায়; আর ওরা, ওরা তিনজন এমন-ভাবে শোনে, যেন ছোট ছেলের মুখে রূপকথার গল্প শুনছে।

বাস্তবিক সংসারে তখন মাথার ওপরে দিদিকেই দেখেছে। দিদি। নিতাই খুব আবেগ দিয়ে দিদির কথা বলে। বাবার মুখ মনে নেই। আমি ছোট, কোল-ন্যাওটা প্রায়; বাবা তখন চোখ বুজেছিল। দিদি কাঁদছিল, কাঁদত। মা তার পাঁজর-ওঠা বুকে ধাই ধাই করে কিল মারতে মারতে কিছুদিনের মধ্যেই বিছানা নিয়েছিল। সংসারে আর কেউ নেই, দিদি আর আমি। রাতে আমি দিদির কাছে শুতাম। গল্প শুনতাম। খুব ভাল গল্প বলতে পারত দিদি, রূপকথার গল্প। বাস্তবিক, বাবা নেই, মা থেকেও না থাকার মতন; দিদিকেই আমি মা-বাপ বলে ভেবে নিয়েছিলাম...' নিতাই থেমে যায়। চুপ করে। রোজ। এবং ওরা তিনজন, নন্দ রমেশ আর সুব্রত নির্বাক। যদিও ওরা জানে এ-গল্পের শেষ এখানে নয়, দূরে; আরও পরে। নিতাই রোজ এখানে থেমে যায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ছলছল চোখ মুছে নিয়ে একটু চুপ করে থাকে। আর ওদেরও চোখের পাতা ভিজে আসে। খানিক পরে নিতাই আবার মুখ খোলে।... খুব সুন্দরী ছিল দিদি। কলকাতার এক বড়লোকের ছেলে বেড়াতে গেল গ্রামে। দিদিকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল। তারপর বিয়ে।

শ্রোতা তিনজন চুপ। আগে চুপ-চাপ থাকত। এখন, দিদির ব্যথা, নিতাইয়ের দুঃখ ওদের চোখ ভেজায় না, মন দ্রব করে আনে না। নিতাইয়ের হাতে লাটাইয়ের সুতো ছেড়ে দিয়ে ওরা বিড়ি টানে, বাইরে তাকায়, ছাদের কড়িকাঠ গোণে কিংবা চোখে চোখে অন্য কথা বলে। কারণ ওরা জানে, ওদের মাসী কি মামীর মত নিতাইয়ের দিদি হপ্তার এই একটি দিনের জন্য পথ চেয়ে থাকে। যেমন থাকে নন্দর রেণুও। এবং নিতাই গেলে, দিদি কিছুতে ছাড়তে চায় না। বলে, তুই থাক না এখানে। থাকলে তোর অভাব কিসের? কিন্তু মন টানে না। দিদি সুখে থাক, তার পয়সায় বাহাদুরী করে সুখ নেই।

নন্দ বলে, নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বেঁচে থেকে সুখ নেই। নইলে শালা, বৌদির বোনটাকে বিবি করে আমি রাজার হালে থাকতে পারতাম।

সুব্রতরও এক কথা। এবং রমেশেরও। তাই চারজন ভিন গাঁয়ের ছেলে এক হয়েছে। এক মেসে আছে। সারা সপ্তাহ ধরে খেটেখুটে একটা দিনের আত্মীয়-সুখ ওদের কাছে মোটা অঙ্কের নগদ কিছু ফালতু ইনকামের মতন।

চার চাকাঅলা একটি চলন্ত গাড়ির মতন। ওরা চারজন চাকা, আত্মীয়-চর্চা সেই গাড়ি, যা চার চারটি বছর ধরে দ্রুত গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাওয়ার মতন হয়েছে। চলারও একটা সীমা আছে, দূরত্ব আছে। তাই হঠাৎ, হঠাৎই ওরা আবিষ্কার করেছে, এই গাড়ি আর চলছে না; চলবে না। তবু ঢিমে তালে চলছিল, দু-তিন রোববার থেমে থেমে এসে গত রবিবারে ওরা বুঝেছে,

গাড়ি অকেজো। এবং আজ, এখন, ওরা চারজন, প্রায় শেষ হয়ে আসা দুপুরে নোংরা তেলচিটে ঢালা বিছানায় তৃতীয় শ্রেণীর মুসাফিরের মতন গা এলিয়ে দিয়ে সেই কথাটাই ভাবছিল। ভাবতে গিয়ে ওদের চোয়াল শক্ত হয়ে আসছিল, চোখ জ্বলছিল, তবু ওরা কিছু বলছে না; যেহেতু এখন দুপুর, শেষ দুপুর, বিকেল আসতে আরও খানিক বাকি।

পশ্চিমের ভাঙা-পাল্লা একটিমাত্র জানলা খোলা রয়েছে। মেঝেয় লেপটে যাওয়া চৌকণা রোদের ফালি ঝকঝক করছিল। এবং ফালিটা যত সরে যাচ্ছিল ওদের বুকের মধ্যের হাতুড়িটা তত বেশি জোরে জোরে শব্দ তুলছিল। নন্দ আড়চোখে নিতাইকে দেখে নিচ্ছিল। নিতাই রমেশকে। রমেশ সুব্রতকে। এবং সুব্রত যত না তাকাতে চাইছে, তার চোখ তত বেশি নন্দর দিকে সরে যাচ্ছিল।

ঘর স্তব্ধ, চারজন প্রাণী নিশ্চুপ নির্বাক। ছাদ, জানলা, ভেন্টিলেটার আর পথ দেখা চোখগুলো তপ্ত, প্রখর হয়ে আসছিল। জান্তব ক্ষিপ্ততায়, মনের দৈন্যে, বিমর্ষ ক্ষুব্ধতায় ওদের প্রকম্পিত ভুরুগুলো বেঁকে বেঁকে আসছে। আর ওরা চাউনিতে, চারজন চারজনকে এমনভাবে দেখে নিচ্ছিল, যেন আদিগন্ত মরুভূমিতে কত কাল ধরে চলতে চলতে নিঃস্ব ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে একে অন্যের শরীরকে তীব্র লোভের জিভে চেটে নিচ্ছে।

হঠাৎ, আচমকা এ-ঘরে বাজ পড়ল। নিতাই তার গুটনো পা ছড়িয়ে নিতে গিয়েছিল, নন্দর মাথায় ঠোকা লাগতে সে বাঘের মতন লাফিয়ে উঠল, 'শালা শুওরের বাচ্চা......' ভীষণ আক্রোশে নন্দ ঝাঁ করে নিতাইয়ের মাথার চুল মুঠি করে ধরে ফেলেছে, 'চালবাজ...'। নিস্তব্ধ, থম ধরে থাকা ঘরে নিতাইয়ের গলা গম্‌গম্‌ করে উঠল, ফেটে পড়ল। 'এক কোৎকা মেরে শালা তোর গোছা ভেঙে দেব। বড় বাড় বেড়েছে না?' নন্দ হাঁপাচ্ছিল।

সুব্রত আর রমেশও ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেছে। ওরা নন্দকে থামাতে গিয়েছিল। সরিয়ে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু এক ঝটকা মেরে নন্দ ওদের সরিয়ে দিল। 'গিধরের বাচ্চাকে আজ আমি শেষ করব। দিদি? শালার আবার দিদি...' চোখে মুখে হিংস্র এক বীভৎসতা। নন্দর মুখ বেঁকে গিয়েছে। হাপরের মতন বুকের খাঁচাটা ওঠানামা করছিল। 'কোথায় তোর দিদি...?' নন্দ ধাই ধাই করে নিতাইয়ের পিঠে চড় চাপড় ঘুসি মারছিল, 'ফালতু আদমী আবার দিদি। চা দোকানে শালা তের টাকা মাইনে পাস, দেশে তোর মা-বোন খেতে পায় না, শহরে এসে তোর বাড়-ফাট্টারী বেড়েছে? আয়...আয়...তোর দিদিগিরি আজ...'

নিবু নিবু ফুলকিটা দপ্ করে জ্বলে উঠবে ওরা জানত। চারজনই জানত। কিন্তু এখন, এখনই হঠাৎ তা দাউ দাউ হয়ে উঠবে ভাবে নি। রমেশ আর সুব্রত নন্দর কিলঘুসি খেয়ে ওকে সরিয়ে এনেছে। নিতাই বালিশে মুখগুঁজে কাঁদছে। নন্দ বাঁহাতের তালুতে কপাল রেখে হেঁটমুণ্ড হয়ে থাকল খানিক। বাকি দুজন চুপ পাথর। নন্দ এতক্ষণে একটা বিড়ি ধরিয়ে বাইরে তাকাল।

থম ধরে থাকা ঘরে কান্নার সুর। নিতাই কাঁদছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, শরীর মুচড়ে। বাস্তবিক বয়সে ছোট বলে, এ-ঘরের তিনজনের সকল আক্রোশ তার ওপর। ...আমি না হয় তের টাকা মাইনেয় চা-দোকানে বয়গিরি করি, কিন্তু তোমরা? নিতাই আহত, ক্ষুব্ধ হয়ে মনে মনে বলছিল ...তোমরা এমন কিছু বড় চাকুরে নও। তিন অফিসের বেয়ারা, চাপরাশের ওপর কেউ পাও না, পাবে না...

[illegible] এ-ঘরের ফুলকিটা [illegible] জ্বলে উঠেছিল। দুপুরে, ওরা চারজন [illegible] বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। নন্দ [illegible] সবে শেষ করেছে। নিতাই দিদির কথা পেড়েছে [illegible] এমন সময়, তিনটি নিরেট বারুদে আগুন লাগল। চাপেন্ত, প্রতিজ্ঞ; সত্যতা প্রমাণের। তোমার দিদি আছে? বেশ, প্রমাণ চাই। মাসী, মামীর প্রমাণ চাই, বেশ, যে ভালবেসেছে নন্দকে তারও যোগ্য প্রমাণ দিতে হবে। সবাই, ওরা চারজন, নন্দ-রমেশ-সুব্রত আর নিতাই একমত। ওরা প্রমাণ চায়, প্রমাণ দেবে। এবং সেই থেকেই এ-ঘরে সজাগ শিকারী বিড়ালের চোখ ওৎ পেতে আছে। কারণ, ওরা চারজন চারজনকেই চিনেছে, চিনে ফেলেছে।

আজ আর এ-ঘরে অন্য ঘটনা ঘটেনি। প্রায় প্রত্যেক রবিবারের মতন নিতাই চোখের জল মুছে চুপচাপ উঠেছে। আঁচ-[illegible] উনোনে চা করেছে। কেটলি নিয়ে বিছানায় বসে ওদের বোবা মুখে কথা [illegible] এবং দুপুর মরে এলো, যখন বিকেলের নরমতায় কলকাতা শহর মোলায়েম

হয়ে এসেছে, ব্যাটারীর তেজ কমে আসা টর্চের আলোর মতন রোদ বিষণ্ণতা পেয়েছে, তখন ওরা আশপাশের ছাদ থেকে রেণু, মামী, মাসী কি দিদির মতন দেখতে মেয়েদের দেখার পালা সাঙ্গ করে হপ্তার সাজা সেজেছে। নন্দ ভাঙা পাল্লা জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে কপাটে তালা লাগিয়ে তিন বন্ধুকে নিয়ে পথে নামল। নেবুতলা মোড় পর্যন্ত এক সঙ্গে, তারপর পথ ভিন্ন, আলাদা।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলে কলকাতা শহরের আলাদা রূপ। দোকানে দোকানে আলোর চেকনাই, রঙ-বেরঙের। রেডিও বাজছে। ঘন্টি মারতে মারতে ট্রামগুলো যাচ্ছে যেন ঢোঁড়া সাপের মতন। ট্যাক্সির হর্ন, রিক্সার ঠুনঠান, সাজাগোজা মেয়েরা সব বেড়াতে বেরিয়েছে। গল্প, কথা, কলরব, কত শব্দ! নিতাই হাঁটছিল, গ্রাম থেকে আসা নতুন ছেলের মতন। বাস্তবিক রাতের কলকাতা ফিরিঙ্গীপাড়ার মেয়েদের মতন চপল উচ্ছল।

হাওড়ার পুল থেকে নেমে এসে, স্ট্রান্ড রোড ধরল নিতাই। ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে ঘুগনীঅলা খুব ঘুঘনি বেচছে। অনেক খদ্দেরের ভিড় ওখানে। পকেটে হাত দিল নিতাই।......দু পয়সার ঘুগনি খাবে সে ভেবেছিল, কী ভেবে খেল না। পা চালাল। একটি সুন্দর মেয়ে ও-পাশের অন্ধকার অন্ধকার শেডের নীচে দাঁড়িয়ে এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে রসিকতা করছে। নিতাই ভাবল, থামবে। কথা শুনে নেবে ওদের। কিন্তু এখানে অনেক লোক। চাই কি নন্দ কিংবা রমেশের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

নিতাই হাঁটছিল। জোরে।...না নন্দ নয়, রমেশও না; নির্ঘাত সুব্রত। সুব্রতই। হাওড়ার পুলের রেলিঙে কনুই রেখে ও আকাশ দেখছিল। আর জাহাজ। গঙ্গার বুকে জোছনা পড়েছে! ছোট ছোট ঢেউয়ে চাঁদ নাচছে। লঞ্চ কি নৌকো যাতায়াত করছিল। নিতাই আচমকা দাঁড়াল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আড়াল করে নিয়ে নিশ্চুপে সরে এসেছে। নিশ্চয় সুব্রত দেখতে পায়নি—নিতাই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

কোথাই যাই, কোথায়? নিতাই কত কথা ভাবতে ভাবতে ইডেনে ঢুকতে গিয়ে আবার চমকাল। সরে এল। হ্যাঁ, রমেশ। বাদাম কিনছে।...মাসের প্রথম সপ্তাহ, হাতে পয়সা আছে। নিতাই পকেট হাতড়াল কিন্তু দাঁড়াল না। পারলে ছুটত। দৌড় মারত। ইস, রমেশের চোখে চোখ পড়ে গেছে! কিন্তু ও কি ধরতে পেরেছে! না, অত আচমকা দেখে লোক ঠাহর করা যায় না। না দৌড়লেও প্রায় ছোটার মতন পায়ে নিতাই নিজেকে আড়াল করার জন্য হাঁটছিল।

পালাই পালাই করে নিতাই কার্জন পার্কে যখন এল, মেট্রোপলিটান বাড়ির গম্বুজ ঘড়িতে তখন ন-টা বাজে। বসবে ভেবে বসা হ'ল না। নন্দ বড় গাছটার তলায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে। এ পাশে ও-পাশে আরও কয়েকজন লোক। নিতাই দেখল, নন্দ তোলা দু'হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোলের অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে।

কোমর ব্যথা বাধা করছিল। বিকেল থেকে অনেক পথ হেঁটে এসে পা দু'টোও আর চলতে চাইছে না। নিতাই তবু বসল না। দ্রুত পায়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে ধর্মতলা, তারপর ওয়েলিংটন, বৌবাজার মোড়—নিতাই এক আনার ছোলা-মটর চিবোতে চিবোতে পথ হাঁটছিল। এবং থেকে থেকে আজ বিকেলের কথা মনে করে ক্ষেপে উঠছিল। বিকেলে নন্দ মেরেছে। কিল চড় ঘুসি। চুলের মুঠি ধরে নন্দ শালা তের টাকা মাইনের বয় বলে গালাগাল করেছে। বলেছে, 'কেউ নেই, থাকলে কোন শুয়ারের বাচ্চা এই গোয়ালে পড়ে থাকে!'...সত্যি কি সংসারে আমার একটা দিদি থাকতে নেই? এত লোক, পথেঘাটে গিজগিজ করছে। দুনিয়া ভরে কত মানুষ...মানুষ ...মানুষ...নিতাই ভেজা চোখ মুছে নিতে গিয়ে হোঁচট খেল আচমকা। হাড়কাটা লেনের শিবমন্দিরের কাছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে, সামনের গলি চিনতে পেরে নিতাই থামল। তার চোখ দু'টো আচমকা জ্বলে উঠেছিল।

এক এক করে ওরা ফিরল। নন্দ, রমেশ সুব্রত আর নিতাই।

শেষ ট্রামটা এইমাত্র চলে গেল কদর্য আওয়াজ তুলে। তারপর গোটা পাড়া চুপ-চাপ। ততক্ষণে ওরা রোববারের ধার-করা পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি, ছেঁড়া প্যান্ট, নোংরা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বসেছে। চুপচাপ। নন্দ বিড়ি ধরিয়ে দু'টান মেরে রমেশকে দিয়েছে। রমেশ সুব্রতকে। এবং সুব্রত অনিচ্ছার টান টেনে ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে বিড়িটা ছুঁড়ে দিয়েছে। বাইরে।

অনেকক্ষণ ধরেই ওৎ পেতে ছিল নিতাই। পোশাক ছাড়েনি। নন্দ ওকে বার বার দেখছিল। 'কিরে, উনুন ধরা...'

'না'। নিতাই বেপরোয়া। খিদে নেই। দিদি কিছুতে ছাড়ল না, তাই...'

'আবার দিদি? শালা...'

'হ্যাঁ, দিদি...' নিতাই বুক চেতিয়ে এগিয়ে এল। 'এস, এস, দেখ।' নিতাই ওদের তিনজনের নাকে পিঠ আর বুক ঘষে দিয়েছে, 'দিদির গন্ধ...দিদির...'

সত্যি গন্ধ। তিন জোড়া চোখ গোল ছানাবড়া প্রায়। নিতাই হাসছিল। আর ওরা তিনজন, নন্দ রমেশ আর সুব্রত বারবার নিশ্বাসে আত্মীয়ের ঘ্রাণ নিচ্ছিল। শুঁকছিল ভুখা শুওরের মতন নাক বাড়িয়ে।

উনুন ধরেনি। পেটে খিদে নিয়ে অন্ধকারে ওরা কাতরাচ্ছিল। ঘুমের আরাধনা করছিল। কিন্তু ঘুম আসেনি। ক্ষুধার্ত, নিঃস্ব ভাগ্যহীন চারজন মানুষ ঘুম ডেকে ডেকে যখন ক্লান্ত, ঠিক তখন এই নিস্তব্ধ ঘরে কান্না উঠল। হ্যাঁ কান্না।

...কে কাঁদে? নন্দ উঠে বসল, সুব্রত আর নিতাইও। এবং অন্ধকারের চার মাথা কাছাকাছি হলে চার হাতে ওরা চারজনের চোখের শুষ্কতার প্রমাণ নিতে গিয়ে পাথর, কাঠ।

'কেউ নেই...' নিতাই নন্দর চোখ থেকে ভেজা হাত নামিয়ে নিয়েছে। অন্ধকারে ওদের গা হাতড়ে নিতাই রুদ্ধ ক্ষিপ্তপ্রায় গলায় বলল। 'দিদির গন্ধ কিনতে শালা একমাসের টাকা বেশ্যার ঘরে দিয়েছি...'

'কেউ নেই...' সুব্রত ফোঁপাচ্ছিল।

শেষরাতের অন্ধকারে, সহায় সম্পদহীন চারজন যুবক, ঘৃণায়, বিরক্তিতে, হতাশায় এবং চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে জড়াজড়ি করে নোংরা বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের ফাইন আর্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সত্যেন ঘোষালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ২১শে ফেব্রুয়ারি আর্টিস্ট্রি হাউসে কলকাতায় তাঁর ছবির প্রথম একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় এবং ২৭শে পর্যন্ত খোলা থাকে। মোটা তুলির রেখা ও বিষয়বস্তুর ভাবানুসারে রঙের সমাবেশে ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যসৃষ্টিতে এখনকার দিনের দক্ষ শিল্পী-দের মধ্যে সত্যেন ঘোষাল যে অসাধারণ কৃতী তা তাঁর প্রত্যেকখানি ছবিই অভিব্যক্ত করে।

আঁকার রীতি—রেখার টান ও রঙের পরিকল্পনা ঠিক ভারতীয় নয়, আবার পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য ধারার অনুগামীও বলা যায় না। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অবশ্যই আছে এবং সেটা এসে পড়ার কারণও রয়েছে। কল-কাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে লণ্ডনের গোল্ডস্মিথ কলেজ স্কুল অফ আর্ট এবং স্লেড স্কুল অফ আর্ট শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইওরোপের বহু স্থানে ব্যাপক ভ্রমণের সঙ্গে ছবি এঁকে যান এবং ইওরোপের আধুনিক শিল্পধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন।

প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে তাঁর প্রাক-

জ্যোৎস্না — শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল

পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব আমলের কাজও রয়েছে এবং তা থেকে তাঁর বর্তমান স্টাইলে পৌঁছানর বিবর্তনের ধারাটা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় আগের স্টাইল ছেড়ে পাশ্চাত্ত্যে লব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞত অবলম্বনে তিনি একটা নিজস্ব স্টাইলের উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। আগে-কার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি (জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়) তিনি তুলির বিক্ষিপ্ত মোটা আঁচড়ে থরে থরে রঙ প্রয়োগ করে মনোরম রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার মডেল থেকে আঁকা নেপালী মহিলার নগ্ন-দেহের কয়েকখানি প্রতিকৃতির মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যরীতির ছন্দোময় গঠনসৌকর্য একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে।

আগেকার আঁকা ছবিগুলি শিল্পীর স্টাইলের বিবর্তন লক্ষ্য করার সুযোগ দেয়,

নবমমী শিল্পী : সমর ভৌমিক

শিল্পীরা গর্ববোধ করতেন এবং ঐ ধারায় এক সময়ে অনন্যকৃতিত্বের এবং মৌলিক-সৃষ্টির দর্শনলাভ করাটাই সাধারণ নিয়ম ছিল। কিন্তু ইদানীং এর ব্যতিক্রমই লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ থেকে, কিংবা এদেশের মানুষের ধর্ম ও সামাজিক জীবন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বিষয়বস্তু হিসেবে অবলম্বন করেও রেখা ও রঙের প্রয়োগে এবং বিন্যাসে পাশ্চাত্যের আধুনিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর শিল্প-মনীষার অনুসরণ বা অনুকরণ দেখা দিয়েছে। কারুর ছবিতে সরাসরি অনুকরণ না থাকলেও পাশ্চাত্যের প্রভাবে নিজস্ব একটা মৌলিক ভঙ্গীর উদ্ভাবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সমর ভৌমিকের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, মুঘল ও রাজপুত ধারার অনুসরণ দেখা যায় এবং সূক্ষ্মভাবে রেখা ও রঙের প্রয়োগে মনোরম চিত্রসৃষ্টিতে তিনি দক্ষতাও প্রকাশ করেছেন।

মুমূর্ষু দানব শিল্পী : সমর ভৌমিক

চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো উজ্জ্বল বর্ণ প্রয়োগের চেয়ে স্নিগ্ধ রঙের সমাবেশে দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাই তিনি করেছেন। কালিদাসের কাব্য থেকে গ্রহণ করা বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'উত্তরমেঘ', (৬নং) চীনা পর্যটক 'হুয়েন সাঙ' (৫নং), রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিং রীতির 'ধ্যানস্থ' (৪নং), মুঘল মিনিয়েচার রীতির 'কবরস্থানে' (১৭নং) প্রভৃতি ছবিগুলি অঙ্কনরীতি ও রঙের প্রয়োগে চমৎকার একটা ভারতীয় সুর ফুটিয়ে তোলে।

অন্যান্য টেকনিকে কাজের মধ্যে চীনা রীতিতে সিল্কের কাপড়ের ওপর আঁকা দুখানি ছবি, লিনোকাট, উডকাট ও ড্রাই-পয়েন্টের কতকগুলি কাজও উল্লেখযোগ্য। 'মুমূর্ষু দানব' (১নং) ছবিখানিতে বাল্যকোর সাহায্যে চিত্রবিন্যাস আর একটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব।
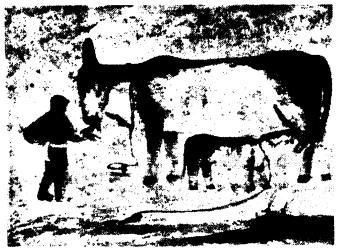
তবে প্রদর্শনীটি আসলে তাঁর বর্তমান স্টাইলের সাতাশখানি ছবি নিয়ে। এ ছবিগুলি ১৯৬০ থেকে এ বছর পর্যন্ত আঁকা। তাঁর এখনকার স্টাইলের ভিত্তি হচ্ছে বৃত্তাকার ও সরল জ্যামিতিক রেখা যা অধিকাংশ ছবিতে একটা কাব্যিক ছন্দ মূর্ত করে তুলেছে (যেমন 'জ্যোৎস্না'—১৫নং)। বিমূর্তন ধারার প্রতি প্রবণতা (যেমন, 'সান্ত্বনা'—২০নং) কতক ছবিতে স্পষ্ট। ছবিগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং বিন্যাসেও বেশ একটা কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায় যা দর্শকমনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে।

সম্মিলিত প্রদর্শনীতে পৃথিবীর বহু শিল্পকেন্দ্রেই সত্যেন ঘোষালের ছবি প্রশংসা অর্জন করেছে ব্যক্তিত্বপূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীর জন্য। কলকাতার শিল্পরসিকদের কাছেও তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য সমাদর লাভ করবে।

* * *

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত দিনে সমর ভৌমিকের ছবির একক প্রদর্শনীটি একটু ভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য পরিবেশন করে। তরুণ শিল্পীর তেলরঙের ছবি, রেখাচিত্র এবং লিনো কাটের কাজগুলি একান্তভাবেই ভারতীয় রীতির অনুসরণ।

একটা সময় ছিল, যখন পাশ্চাত্য প্রভাব-মুক্ত ভারতীয় বা প্রাচ্যরীতির ছবি প্রদর্শনে

বিদুর

মঁনিক লাঁজঃ 'ফরাসী ফ্লু'

আর্থার কোয়েসলার একদা একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সাহিত্যের যাঁরা কর্ণধার, যেমন পত্রিকার সম্পাদক সমালোচক প্রবন্ধকার, তাঁরা হামেশাই এক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই রোগের নাম 'ফরাসী ফ্লু'। খুব সতর্ক ব্যক্তিও এর হাত থেকে রেহাই পান না। চোখের সামনে একটি ফরাসী কবিতা বা গদ্যের লাইন ভেসে উঠলেই তৎক্ষণাৎ তিনি হাঁচতে থাকেন, গদগদ হয়ে পড়েন, রক্তস্রোতে উৎসাহের সঞ্চরণ হতে থাকে। অর্থাৎ একটি মাত্র ফরাসী শব্দ ... ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি নিশ্বাসের মতনই এই ভয়ংকর রোগ শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কোয়েসলারের এই নিবন্ধে [illegible] লক্ষ্য ছিলেন অবশ্য ইংলণ্ডের সাহিত্য শাসকরা, কিন্তু [illegible] প্রতিই এটা প্রযোজ্য [illegible]।

ফরাসী দেশ থেকে যা আসে [illegible] 'বৎসরের বিস্ময়'। যেমন ফ্রাঁসোয়া সাগঁ। বহু বিস্ময়ের ফুলঝুরি [illegible] এখন নিষ্প্রভ। এখন বিলেতী সমালোচক, তার মধ্যে ক্ষুদ্র তারকার মৃত্যু অবলোকন করছেন।

মঁনিক লাঁজ [illegible] আমি বলছি না, অনেকে বলছেন, বলে মঁনিক লাঁজ-এর প্রকাশক [illegible]।

মঁনিক লাঁজ [illegible] সাহিত্যিকদের [illegible] মাত্র দুটি উপন্যাস [illegible] প্রথম উপন্যাসে [illegible] প্রশংসা কুড়িয়েছেন [illegible] পার্রি শহরের [illegible] তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস [illegible] পুরস্কার পেয়েছে (Prix Ducaz[illegible]) ইংরেজী তর্জমা হয়েছে [illegible] কার্টিস [illegible] নামে [illegible] দিয়ে, দ্বিতীয়টির নাম হয়েছে 'দি গ্রেপস ফ্রেশ' [illegible] দ্বিতীয় উপন্যাসের—যেটি পুরস্কার-

প্রাপ্ত গ্রন্থ ইংরেজী তর্জমা সম্প্রতি পড়লাম। প্রথমটি সংগ্রহ করেছি, এখনও পড়া হয়নি।

[illegible] ফরাসী সাহিত্যের বড় উৎস [illegible] আমরা যারা [illegible] বাঙালী [illegible] ফরাসী সংস্কৃতি এবং সেই [illegible] হতে পারে, নাও পারে। কে বলতে পারে, যাঁরা ফরাসী শুনলেই ফ্লুতে আক্রান্ত হন তাঁদের তুলনায় আমরা সতর্ক।

মঁনিক লাঁজ যদি ভুল করে বাঙালী মহিলা হতেন, বাহবা দিতাম। কেননা আর কিছু না হোক লেখায় পালিশ থাকত, কোনো কোনো জায়গা পড়ে হৃদকম্প হত, বলতে বাধ্য হতাম, কী দুঃসাহস! এখানের পক্ষে অবশ্য সেটা নতুন হত বলেই বাহবা দেওয়া। কিন্তু ফরাসীর কাছে মঁনিক লাঁজ কোন কারণেই নতুন নন। অথচ জনপ্রিয় হয়েছেন।

'দি গ্রেপস ফ্রেশ' আকারে ছোট। এক শ' পাতাও নয়। বিষয় প্রেম। কাহিনীর সময়কাল দু-তিনটি বেলার বেশী নয়। চরিত্রও মাত্র দুটি—নায়িকা ক্লদিয়া, নায়ক দিয়েগো। পরোক্ষে আরও একটি চরিত্রের উপস্থিতি সব সময়েই অনুভব করা যায়, নাথালি।

যদি কাহিনীর সারল্যের কথা ওঠে, তবে 'দি গ্রেপস ফ্রেশ' এর কাহিনী অতি সরল। গ্রীষ্ম সমাগত পারি শহরে ছুটির হাওয়া লেগেছে। দিয়েগো তার গাড়ি নিয়ে তৈরী, পথের নিশানা ঠিক করে নিচ্ছে, দূরে পাড়ি দেবে, দক্ষিণের দিকে। ক্লদিয়া বিদায় জানাতে এসে অনুরোধ করল, তোমার সঙ্গে খানিকটা যাই চলো। না বলো না। আমি কাছাকাছি কোনো উপকণ্ঠ থেকে ফিরে আসব ট্রেনে।

দিয়েগোর ইচ্ছে ছিল না, ক্লদিয়া তার সঙ্গে যায়। তবু এই সামান্য প্রার্থনা সে মঞ্জুর করল। গ্রীষ্মের বাতাস পারিতে এসেছে, গ্রীষ্ম যেন অনেকটা দূরে—নগরীর বাইরে, দক্ষিণে, সমুদ্রতীরে।

যাত্রাশুরু থেকে ক্লদিয়ার ফিরে আসা পর্যন্ত মাত্র একটি বিকেল ও রাত্রি এবং পরের দিন সন্ধ্যাকাল—এই সময়টুকু পথে

হয়ে গেছে; দুরন্ত পুরোনো গাড়িটার মধ্যেই বেশীর ভাগ যা কথাবার্তা। কদাচিত কোনো সরাইখানার বিশ্রাম অল্পের জন্যে, হোটেলে এক রাত এক কক্ষে একই শয্যায় বাস—ক্লদিয়া এবং দিয়েগোর হৃদয় সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে লেখিকা অন্য সুযোগ নেন নি।

ক্লদিয়ার প্রেম যেন দিয়েগোর পদপ্রান্তে ভিক্ষুকের মতন সর্বক্ষণ কামনা করেছে, আমায় তুমি গ্রহণ কর। অবশ্য, গ্রহণের অতিরিক্তও কিছু ছিল, তোমার প্রেম আমায় দাও।

দিয়েগো প্রতিদান দিতে অক্ষম। তার প্রেম, ক্লদিয়ার ধারণা, নাথালি শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষ করে শুষে নিয়েছে। ক্লদিয়া যে-প্রেমের প্রতিদান পাবে না, তাকে আর অনর্থক পুষে রাখতে চায় না—অতএব এইখানে সম্পর্কের যতিপাত!

"I can't go on giving myself for ever unless there's some return. With you there can be no return. I have to leave."

সমুদ্রের কাছাকাছি পর্যন্ত দিয়েগোর সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল ক্লদিয়া, বাসনা ছিল এই সমুদ্র সে স্পর্শ করতে পারবে। ফিরে এল প্রত্যাখ্যাত হয়ে। ভোরের আলোয় প্যারিতে নেমে ক্লদিয়ার মনে হয়েছিল, যেন তাকে খদ্দের না-পাওয়া বেশ্যার মত দেখাচ্ছে।

ক্লদিয়া, আমার ধারণায়, অভীপ্সা এবং আদিবৃত্তির প্রকাশে যতখানি উন্মাদ, তার আত্মিক বিষাদ তত ক্ষীণ। কেন? লেখিকার যদি উদ্দেশ্য ছিল, নারী প্রেমপ্রত্যাখ্যাত হয়ে বিষাদ-ভোগকেই জীবনের প্রাপ্য বলে গ্রহণ করতে পারে কি না—তবে এই প্রশ্নের অর্থ অনুসন্ধানে বিষাদের মাত্রা অত কম কেন?

এই গ্রন্থের কোনো কোনো অংশে চিত্ত-দৈন্যের হাহাকার অনুভব করা যায়। কখনও কখনও জীবনের কোনো কোনো গূঢ়াশ্রিত কামনাও সৌন্দর্যের আলোকে দগ্ধ হয়ে তৃতীয় তাৎপর্য যুক্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য মানুষের প্রলাপ যেমন কৌতূহলের বিষয়, অধিক কিছু না, তেমনি ক্লদিয়ার প্রেমকে অস্বাভাবিক অবস্থাজাত হৃদয় দৌর্বল্যের বেশী মূল্য দিতে পাঠকের বাধবে।

ফরাসী দুঃসাহসের যাঁরা ভক্ত তাঁরা অবশ্য এ-গ্রন্থে নানা জায়গায় সেই দুঃসাহসিকতা দেখতে পাবেন। যেমন ক্লদিয়া মনে করে, মেয়েদের জন্যে বেশ্যাখানা থাকা উচিত—'জাস্ট টু গেট রিড অফ দি ডিজায়ার।' অথচ এই ক্লদিয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল সে সেই বৃক্ষ দেখবে, সমুদ্রের নিকটে যার জন্ম, যা আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যে-বৃক্ষ একমাত্র তাদেরই পত্রচ্ছায়া দেয় যারা সূর্যকে ভালবাসে। এই বৃক্ষই প্লেন ট্রিজ।

ক্লদিয়া তেমন বৃক্ষ হতে চেয়েছিল হয়ত, কিন্তু তার পত্রচ্ছায়ায় কেউ আশ্রয় নিতে আসে নি।

বইয়ের সংস্করণ

বাংলা বইয়ের সংস্করণ সম্পর্কে জনৈক পাঠক তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে বলেছেন। প্রথমত বলে নেওয়া ভাল, বিষয়টি ব্যবসাগত, এবং আমার পক্ষে নিঃসংশয়ে কিছু বলা মুশকিল। সাধারণভাবে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি।

আমরা যাকে সংস্করণ বলি তাকে ঠিক সংস্করণ বলা উচিত নয়। সংস্কার বিনা সংস্করণ হয় না। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা অনেকেই বইয়ের প্রথম প্রকাশ এবং পরবর্তী মুদ্রণের সময় মুদ্রিত পুস্তকের পরিমার্জনা করতেন। এখনও কেউ কেউ করে থাকেন শুনেছি, তবে সকলে নন। বস্তুত কোনো গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সময় যদি লেখক কোনো সংস্কার করেন তবে সেই মুদ্রিত গ্রন্থ সংস্করণ বিশেষণে অলংকৃত হতে পারে, নয়ত নিছক পুনর্মুদ্রণকে মুদ্রণ বলাই উচিত। আমরা সংস্করণ বলতে অভ্যস্থ, মুদ্রণ বললে যেন সন্তুষ্ট হই না।

বাংলা বইয়ের মুদ্রণ সংখ্যা সীমিত। সাধারণত এগারো শ' বাইশ শ'র বেশী কোনো বই ছাপা হয় না। আগে প্রতিবারের মুদ্রণকে এক একটি সংস্করণ হিসেবে ধরা হত। এখন সব সময় এটা হয় না।

কোনো বই প্রকাশ করার সময় লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির একাধিক শর্ত। সেই শর্তের অন্যতম একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, প্রকাশক কত বই ছাপবেন, লেখক কত বই ছাপতে দিতে রাজী আছেন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে হাজারের কম কোনো বই ছাপা হয় না। হাজারের বেশী হলে দু হাজার কি তিন হাজার।

বাংলা বইয়ের বাজারে এই নিয়মেরই চল ছিল একাল। সম্প্রতি কিছু অদল বদল ঘটেছে। এখন অনেক প্রকাশক দু হাজার বই একসঙ্গেই ছাপেন, কিন্তু লেখকের সঙ্গে শর্ত করেন প্রতি হাজার বই এক একটি সংস্করণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এর কারণ এই, এই দুর্দিনে এক সঙ্গে বেশী বই ছাপাতে পারলে আনুপাতিক খরচ অনেক কম পড়ে। তা ছাড়া এক হাজার বই বেচা হয়ে গেলে নতুন করে সংস্করণ শব্দ ব্যবহার করা যাবে। প্রকাশক সম্ভবত মনে করেন বইয়ের সংস্করণ পাঠককে কিছুটা প্রলুব্ধ করবে, লেখক ভাবেন, সংস্করণই তো অলংকার।

অনেক গুরু প্রবন্ধের বই, ছবির বই অবশ্য অনেক সময় হাজারের কমও ছাপা হয় ব্যবসায়িক ক্ষতির কথা ভেবে, সেখানে পাঁচশোতেও সংস্করণ হয়। তরুণ কবিদের কবিতার বইও বেশীর ভাগ সময় পাঁচশো করেই ছাপা হয় এবং সেটি সংস্করণ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়।

বস্তুত সংস্করণ ব্যাপারটি লেখক এবং প্রকাশক নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ঠিক করে নেন। এটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক চুক্তি। সাধারণ নিয়ম সব সময় পালন করা হয় না।

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্র প্রতিভা—কানাই সামন্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ—শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন। সম্পাদক—গোপাল হালদার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র শতবর্ষ-পূর্তিতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক ঘটনাটি চিন্তাশীল লেখকদের বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার আলোচনায় প্রবৃত্ত করেছে। আলোচ্য দুটি গ্রন্থ রবীন্দ্রপ্রতিভা বিশ্লেষণের দুই সার্থক ফলশ্রুতি।

কানাই সামন্তর "রবীন্দ্রপ্রতিভা" বিদগ্ধ-জনের কাছে সহজেই আদরণীয় হয়ে উঠবে। কবি, শিল্পী ও সুরকার রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয়টি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রয়াস এই বইটিতে লক্ষণীয়। বইয়ে "রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্য-বর্তিনী" প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রকীর্তি ও রবীন্দ্রপ্রতিভার ওপর এধরনের একক প্রবন্ধ সংকলন সাধুবাদার্হ। প্রচ্ছদে ও অন্যত্র কয়েকটি অনবদ্য পেন্সিল স্কেচ বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

"রবীন্দ্রনাথ" বইটি একাধিক প্রবন্ধকারের লেখায় সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্র-দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁরা তাঁদের প্রবন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-নাথের স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা নিয়েও দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই বইতে সংযোজিত। বইয়ের প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে জানবার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। (৪৮৩।৬২ ২৫৮।৬১)

গীতবিতান পত্রিকা—রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। ২৫/বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। আট টাকা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গীতবিতান সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান এই সর্বাঙ্গসুন্দর জয়ন্তী গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটি দুই অংশে বিভক্ত—সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য ও স্মরণ।

প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীসাধনা কর, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীনীহাররঞ্জন সেন, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর এবং শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমধু বসু, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবার্ণিক রায়। রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এবং শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। মায়ার খেলা সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথা বর্ণিত করিয়াছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিন্তা সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য লেখক ও লেখিকা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীহেমন্তবালা দেবী এবং শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুইটি স্বরলিপিও মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে রবীন্দ্রস্মৃতি এবং

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে। লেখকবৃন্দের মধ্যে আছেন — শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়, শ্রীসুধাময়ী দেবী প্রভৃতি।

সঙ্কলনটি তথ্যসম্ভারে উৎকৃষ্ট এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্র উপলব্ধির সার্থক পরিচয় বহন করিতেছে। মনোজ্ঞতায় এবং প্রয়োজনীয়তায় গ্রন্থটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা মনোরম। (৬৬৭/৬১)

লেখকস্মৃতি

লেখালিখি---রমাপদ চৌধুরী। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২। মূল্য দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

জীবনস্মৃতি বলতে যা বোঝায় বইটি তা নয়। জীবনের স্মৃতি-মন্থনে যে-কয়টি অমৃত মুহূর্ত লেখকের মনে ভেসে উঠেছে, তাই তিনি গল্পের ভঙ্গিতে এই বইয়ে পরিবেশন করেছেন। এই মুহূর্তরাজির মধ্যে অতি আধুনিক সাহিত্যযুগের একটি নেপথ্য পরিচয় বিধৃত। এবং একটি সাহিত্যিক মনের আশা ও অভীপ্সা, প্রস্তুতি ও বিকাশের ইতিকথাটি সুপরিস্ফুট।

গল্পশিল্পে রমাপদ চৌধুরী সিদ্ধহস্ত। তাই যে অভিজ্ঞতা ও ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন তা গল্পের স্বাদ ও রস নিয়ে বইটিতে উপস্থিত হয়েছে। লেখকের সুন্দরমাসী গল্পের নায়িকা হয়ে উঠেছে, সুকুল একটি চরিত্র নিয়ে দেখা দিয়েছে। এক কথায়, লেখকের স্মৃতিচারণ যেন একটি সুন্দর সুপাঠ্য গল্প। যা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে রাখা যায় না।

নানা ঘটনা ও পরিবেশের উপর লেখকের মনস্তাত্ত্বিক আলোকসম্পাত স্বচ্ছ। অভিজ্ঞতা বর্ণনায় লেখক কোন জটিল দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নেন নি। তিনি যা দেখেছেন এবং যা অনুভব করেছেন তা সহজ, সরল ও মরমী হয়ে ব্যক্ত করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর এই ভিন্নধর্মী রচনা পাঠকের অভিনন্দন লাভ করবে। (১৫৮।৬১)

উপন্যাস

অতল জলের আহ্বান—প্রতিভা বসু। এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উপন্যাসটিতে একটি সুখানুভূতির স্পর্শ মেলে। এই সুখানুভব বেদনার আলপনায় অঙ্কিত। যৌবনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারেনি এক প্রণয়ী-যুগল। অপূর্ণ প্রেমের স্মৃতিটুকু বুঝি ওরা যক্ষের ধনের মত সঞ্চয় করে রাখে মনের গোপন কোণে। আবার যখন ওদের দেখা হয় তখন ওরা যৌবন অতিক্রম করে জীবন-মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছেছে। মনের কোণে যা ছিল নিরুদ্ধ, নিরুচ্চার আবেগে বুঝি তা আবার উচ্ছল হয়ে ওঠে। ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকার অনুচ্চার প্রণয়াবেগ সার্থকতা খোঁজে তাদের নিজেদের পুত্র-কন্যার মিলনের ভেতর দিয়ে।

কিন্তু উপন্যাসের অন্যতম ত্রিভুজ প্রেমোপাখ্যানের পরিণতিতে তাদের সাধ পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

একদা-ব্যর্থ প্রণয়ী-যুগলের পুত্র-কন্যা জয়ন্ত ও লোটি এবং জয়ন্তর আশ্রিতা সাবিত্রীকে ঘিরে উপন্যাসে যে ত্রিকোণাত্মক প্রণয়োপাখ্যানটি রূপ নিয়েছে তা গতানুগতিক। এবং উপন্যাসের এই অধ্যায়টি জীবনের স্পর্শরহিত।

কাহিনীর রসকেন্দ্র-বিন্দু গড়ে উঠেছে জয়ন্ত ও লোটির পিতা-মাতার উপাখ্যানে। সেদিক থেকে উপন্যাসের নামকরণটিও সার্থক। লেখিকার ভাষা ঝরঝরে। কাহিনী-বিন্যাস সুষ্ঠু। (২৬৮।৬১)

অনুবাদ

ফাউস্ত। (প্রথম ভাগ)। য়োহান ভোলফ-গাঙ গোয়েটে। অনুবাদ : শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৬, টাকা।

বাংলা ভাষায় গোয়েটের ফাউস্টের অনুবাদ ইতিপূর্বে একটি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত সে-গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে যে অনুবাদটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন, আমরা তার অভ্যর্থনা করি।

মহাকবি গোয়েটের ফাউস্ট সম্পর্কে কোনো পরিচয় জানানো বাহুল্য। বিশ্বসাহিত্যে এমন গ্রন্থ আর ক'টিই বা আছে। কানাই-লাল গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টা ও সাধনা মহৎ। অনুবাদক লিখেছেন : "জীবনের বিভিন্ন সময়ে জার্মেনীতে দীর্ঘকাল বাস করে জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের উপর 'ফাউস্টে'র যে কী প্রভাব, তা প্রত্যক্ষ করেছি। ...আমার কেবলই ইচ্ছা হত, এই অপূর্ব সাহিত্য আমার মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে বাঙালীর হাতে তুলে দি।" লেখকের

এই বাসনার ও দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল বর্তমান অনুবাদ।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুলিখিত ভূমিকা, অনুবাদকের গ্রন্থ সম্পর্কে পরিচিতি এই অনুবাদের মূল্য বৃদ্ধি করেছে এবং পাঠকের পক্ষে উপযোগী হয়েছে।

অনুবাদের প্রশংসা করি। তবে কোনো কোনো জায়গায় তিনি শব্দ ব্যবহারে আরও একটু স্বচ্ছন্দ হলে ভাল হত।

(৪৭২।৬১)

শিশু সাহিত্য

ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—দু' টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি ইতিহাসের তিনটি কাহিনীর সংকলন। এগুলির মধ্যে প্রথমটি পশ্চিম আফ্রিকার ডাহোমি রাজ্যের এক বীরবালিকার কাহিনী। নাম এর নায়িকা—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই মেয়েটি ফরাসীদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল তার অসমসাহসী নারী সৈন্য-বাহিনী নিয়ে। দ্বিতীয়টি বাংলা দেশে বর্গীদের অত্যাচারের বহুখ্যাত কাহিনী, এবং তৃতীয়টি একাদশ শতাব্দীর আমেরিকার কুখ্যাত বোম্বেটে "কালোদেড়ে"র কাহিনী।

উপযুক্ত কাহিনীত্রয়ের মধ্যে শেষোক্ত কাহিনীটিই সুলিখিত, বাকী দুটি যেন নিছাতই ইতিহাস বলে মনে হয়; বিশেষ করে দ্বিতীয় কাহিনীটি। তবু যদি এই গ্রন্থটি যাদের জন্যে লেখা সেই ছোটদের ভালো লাগে, আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। কারণ, এর রচয়িতা এমন একজন খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক, যাঁর অসংখ্য রচনা দীর্ঘকাল ধরে তাদের মনোরঞ্জন করে আসছে।

(১০/৬২)

গল্প

মনোনীতা — শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। মুকুন্দ পাবলিশার্স, ৮৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য তিন টাকা।

এগারটি গল্পের সংকলন, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙলার পল্লী, কলিকাতা, দিল্লী—নানা পটভূমিকায় নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের জীবনের নানাবিধ সমস্যামুখরিত গল্পগুলি যে-কোন পাঠকের অবসরক্ষণকে উপাদেয় করিয়া তুলিবে। বাঙলা ছোটগল্প আজ বিশ্বসাহিত্যসভায় সম্মানিত অতিথির দাবি রাখে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও সে-গৌরবের অংশীদার, ছোটগল্প রচনার সার্থক আঙ্গিকের লিপি-কুশলতা তাঁর মধ্যে আছে। প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, এটিও লক্ষণীয়। কেবল 'একটি জীবন, একটি দীর্ঘশ্বাস' গল্পটি মামুলী বিষয় লইয়াঃ সেই ব্যর্থপ্রেম আর টি-বি।

৬০২/৬১

বিবিধ

দুর্গে দুর্গে—বেণু গঙ্গোপাধ্যায়। বলাকা প্রকাশনী; ৫০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। দাম : দুই টাকা।

বাঙালীকে ঘরমুখো বলা হয়। কিন্তু একালে সে কথা সত্য নয়; শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই নয়, ইতিহাসকে জানবার জন্যে তাঁরা আজ সারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ করছেন। শ্রীযুক্ত বেণু গঙ্গোপাধ্যায় কবির মত মন নিয়েও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছেন ঝাঁসি, চুনার, আগ্রা, গোয়ালিয়র, অম্বর, জিনজী প্রভৃতি দুর্গ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতের অতীত এবং বর্তমানকে দেখেছেন। দেখাটাই তাঁর কাছে বড় নয়, তিনি আমাদের দেখিয়েছেন—আরো কৌতূহল বাড়িয়েছেন। অতীতের সাজানো পাথর তাঁর অনুভূতিতে কথা কয়ে উঠেছে। ভ্রমণকারীদের কাছেও এই গ্রন্থ 'গাইড' হিসেবে প্রয়োজনে লাগবে।

৬২৩।৬১

মেদিনীমঙ্গল — শ্রীগোরাচাঁদ গিরি। মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ, ৩৩।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২·২৫ নয়া পয়সা।

মেদিনীপুর জেলার গৌরবময় ইতিহাস সর্বজনবিদিত। স্থানীয় অঞ্চলগুলির ইতিবৃত্ত ছন্দাকারে অতি সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে 'মেদিনীমঙ্গলে' লিখিত হয়েছে। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ছন্দে রূপায়িত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিশেষত পাঁচ শতাধিক ঐতিহাসিক নামকে তিনি এমন নৈপুণ্যে প্রয়োগ করেছেন যে, তা আমাদিগকে বিস্মিত করে। ঐ দুঃসাধ্য প্রয়াস-মাধ্যমে লেখকের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় পাওয়া যায়।
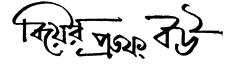
১৯।৬১

সে তো আজকে নয়—এস কি মজুমদার। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এই বিচিত্র আত্মকাহিনীর পট-ভূমিকার দুই আনা অংশ ভারতে এবং বাকী চোদ্দ আনা ইউরোপে। বেশী অংশ অবশ্য ইংল্যাণ্ডে। তা ছাড়া সিনফিন দলের বোমা-কণ্টকিত ডাবলিনের রাজপথে লেখক ও এক আইরিশ কুমারীর নিশীথ অভিযান আছে। আছে অ্যান্টোয়ার্পে বেলজিয়াম পরিবারের নিমন্ত্রণরক্ষা। আছে ব্রাইটনে স্নানার্থীদের অভিজাত হোটেলে পিয়ানোয় লেখকের "বঁধুয়া এই কি তুমি" সুরটি আত্মহারা হইয়া বাজানো। (তাহার পূর্বে অবশ্য তিনি উদয়শঙ্কর ও পাবলোভার হরপার্বতী নৃত্যের সঙ্গে লণ্ডনেই পিয়ানো বাজাইয়া ছিলেন।) এ ছাড়া আছে ও দেশে ব্রাহ্ম-সমাজের অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে মেয়ে বনাম পুরুষ ক্রিকেট খেলা। আছে রাজকীয় পোশাকে লেখকের সম্রাটের লেভি-তে যোগ-দান।

আর পুস্তকটির পাতায় পাতায় ভিড় করিয়া আছে মৃণালিনী ইলিনোর, আইরিনেন-দের দল। তাহা ছাড়া যাঁহাদের দেখা পাইলাম তাঁহারা নমস্য। যথা জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি।

লেখক প্রৌঢ়, কিন্তু তিনি তাঁর সেই যৌবনের কাহিনী বলিতে গিয়া বর্ণনা-ভঙ্গিতে আনিয়াছেন আমেজী স্বাদ। শীতের সন্ধ্যায় পায়ের উপর আলোয়ান টানিয়া দিয়া লেখকের সহিত মনোরথে লণ্ডনের পথে পথে ঘোরা যায়।

৬১৩/৬১

সাময়িক পত্রিকা

যুক্তিবাদী—সম্পাদক শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত। ৪১এ, বেলদিয়াপাড়া রোড, কলিকাতা-৬।

"একাধিক ধারণা, বিশ্বাস, মতবাদ কিংবা বস্তু অথবা পথের মধ্যে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে মহত্তর সমাজব্যবস্থা ও অসুখী থেকে সুখী কিংবা সুখী থেকে আরো সুখী জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে প্রধানত যেটি, তার চর্চাই হলো যুক্তিবাদ।... এই নবকথিত মতবাদটির যারা ধারক, বাহক, প্রচারক এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাসীও, তারাই যুক্তিবাদী।" সম্পাদক কর্তৃক ব্যাখ্যাত সংজ্ঞা মতে স্থাপিত সংঘের মুখপত্র এই পত্রিকা। এদের ঘরোয়া আলোচনা ও প্রকাশ্য সভায় পঠিত রচনা সমাবেশে এই শ্রীপঞ্চমীস্মারক সংখ্যাখানি প্রকাশিত।

প্রাপ্তি-স্বীকার

সাঁওতাল ছেলে—শ্রীঅবনীনাথ চক্রবর্তী।
দিনরাত্রি—সুরজিৎ দাশগুপ্ত।
ভারত—সাবিত্রী—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।
সুন্দরবন—শিবশঙ্কর মিত্র।
চৈত্রে রচিত কবিতা—উৎপলকুমার বসু।
বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রী[illegible] দাশ মজুমদার।
ভৌতিক কাহিনী—শ্রী[illegible]।
বাস্তবের দু' পাতা—[illegible]।
রূপং দেহি ধনং দেহি—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
তিন প্রহর—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
ঘরে চলো—স্বামী [illegible]।
উত্তরালাপ—আশাপূর্ণা দেবী।

বিজ্ঞপ্তি দেশ

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক

২৪ পরগণা জেলার অধীন দমদম পোস্ট অফিসের অন্তর্গত নাগেরবাজার গ্রামের বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১ কলিকাতা-৫ এর বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক শ্রীঅশোককুমার সরকার কর্তৃক সম্পাদিত।

শতকরা এক ভাগ বা তাহার বেশীসংখ্যক অংশের মালিকগণঃ—

অশোককুমার সরকার প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১, কলিকাতা-৫।

নির্ঝরিণী সরকার প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১, কলিকাতা-৫।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদারের এস্টেটের এক্সিকিউটর, ৬এ, অভয় গুহ রোড, কলিকাতা-৬।

আমি শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর
প্রকাশক—শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়
তারিখ—১।৩।৬২

কমিটি বঞ্চিত হয়েছেন এই ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

তাই কমিটির সভ্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন তাঁদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকে এবং চলচ্চিত্রশিল্পের প্রগতির প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তাহলেই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিনন্দন তাঁরা নিঃসন্দেহে লাভ করবেন।

চিত্রালোচনা

বি আর ফিল্মস-এর বহুপ্রতীক্ষিত হিন্দী ছবি 'ধর্মপুত্র' এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবি এ-সপ্তাহে একটিও মুক্তি পাচ্ছে না।

আচার্য চতুরসেন শাস্ত্রীর একটি হিন্দী উপন্যাসের ভিত্তিতে 'ধর্মপুত্র' ছবিটি তৈরী। মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ ও বক্তব্যাশ্রয়ী একটি কাহিনী এই ছবিতে রূপায়িত। 'ধুল-কা-ফুল'-খ্যাত যশ চোপরা ছবিটি পরিচালনা করেছেন। মালা সিংহ, শশী কাপুর, রেহমান, মনোমোহন কৃষ্ণ, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও নিরুপা রায় ছবিটির প্রধান শিল্পী। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন এন দত্ত। বি আর চোপরা ছবিটির প্রযোজক।

* * *

বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্স-এর বধূ মুক্তি-প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। শৈলেশ দে রচিত একটি আবেগপূর্ণ পারিবারিক কাহিনী এ ছবির আখ্যান-ভিত্তি। ভূপেন রায় পরিচালিত এ-ছবির শিল্পিদলের পুরোভাগে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্তা। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

প্রযোজক বিমল ঘোষ আরও দুটি ছবি তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। শৈলেশ দে'র কাহিনীর ভিত্তিতে অগ্নিস্বাক্ষর একটি, অপরটি পৌরাণিক ছবি বামনাবতার। ছবি দুটির প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় সমাপ্ত।

* * *

'লুকোচুরি'-খ্যাত কমল মজুমদার বর্তমানে টাস ফিল্মস-এর অভিসারিকা ছবিটি পরিচালনা করছেন। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্টুডিওতে ছবিটির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পরবাতল' ছবিটির ভিত্তি। ছবির মুখ্যচরিত্রগুলিতে রয়েছেন নির্মলকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, মিন্টু দাশগুপ্ত ও রাজলক্ষ্মী।

* * *

সম্পূরক প্রাঃ লিঃ-এর প্রথম নিবেদন বন্ধন-এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ছবিটির চিত্রনাট্যকার-পরিচালক। প্রশান্ত চৌধুরীর লেখা 'ডাকো নতুন নামে' গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরী। ছবির নায়কের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং নায়িকা চরিত্রের রূপ দিয়েছেন সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, শ্রীপতি চৌধুরী, জহর রায়, রেণুকা রায়, গীতা দে, সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায় ও শিশুশিল্পী জয়। রাজেন সরকার ছবির সংগীত-পরিচালক।

* * *

নবগঠিত চিত্রসংস্থা শিল্পভারতী প্রোডাকশনস-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য বনফুল-এর কষ্টি সরস নাটিকা অবলম্বনে তৈরী হচ্ছে।

মার্ক রবসন পরিচালিত ইংরেজী ছবি "না ইন আওয়ার্স টু রাম"-এর একটি দৃশ্যে হর্স্ট বুশোলজ ও অচলা সচদেব। ভারতে বহির্দৃশ্য গ্রহণের পর লণ্ডনের একটি স্টুডিওতে এর আভ্যন্তরীণ দৃশ্যাদি তোলা হচ্ছে

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালক। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ছবির সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া চারটি গান রেকর্ড করা হয় এবং তার ভেতর দিয়ে ছবির শুভসূচনা-মুহূর্ত পালিত হয়।

দুই পুরুষের কাহিনী

ভারতবর্ষে একদা গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আধুনিককালেও কি এমন নারীর আবির্ভাব সম্ভব নয়?

এই ধরনেরই একটি কল্পনা হয়ত 'সপ্তর্ষিমণ্ডলী'র (দে প্রোডাকশন) কাহিনীর উৎস। এবং কাহিনীর নায়িকার নামও হয়ত সেই কারণেই গার্গী।

গার্গী তার শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত পিতার কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে। তার পিতা প্রাচীনকালের শিক্ষাগুরুর মত নিজের বারাণসীস্থিত বসতবাটিতে টোল স্থাপন করে বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদান করেন। হঠাৎ তিনি সংস্কৃত শ্লোক ভুলে গেলে গার্গী এসে তা আবৃত্তি করে দেয়। অবশ্য গীতার শ্লোক তিনি ভুল বললে, গার্গী তা শুধরে দিতে পারে না। সেটা দর্শকের কানে খট করে বাজে। তিনি গীতার শ্লোক আবৃত্তিকালে 'গুণকর্মবিভাগশঃ'-এর জায়গায় 'গুণকর্মবিভাগমঃ' বলেছেন। গীতার শ্লোকের এই ভুল আবৃত্তি ক্ষমার্হ নয়। চিত্রপরিচালক এক্ষেত্রে সচেতন থাকতে পারতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিবাহযোগ্যা গার্গী ও তার পিতার এই উপাখ্যান ভারতের স্বাধীনতালাভের অল্পকাল পূর্বের ঘটনা।

ভারতের সনাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত গার্গী ও তার পিতাকে কেন্দ্র করে ছবির এই উপকাহিনীতে আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের অবতারণা রয়েছে। দর্শকেরা ছবির এই অধ্যায়ে কতকগুলি মহৎ বাণী শোনবার অবকাশ পান।

পিতার কাছ থেকে আদর্শ ভারতীয় নারীর মূলমন্ত্রটি নিয়ে গার্গী যথাসময়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। গার্গীর স্বামী দীনেশ বিদ্বান নয়। পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়স থেকেই পৈত্রিক ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছে। লোহার ব্যবসা করতে করতে তার মনটিও নাকি লোহার মত নিরেট হয়ে গেছে। অন্তত চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকার

এই তত্ত্বটিই দীনেশের আচরণ ও ব্যবহারে (বলা নিষ্প্রয়োজন, নবপরিণীতা স্ত্রীর প্রতি) ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট। দীনেশের উকিল বন্ধু মন্মথর ব্যঙ্গোক্তিতেও এই তত্ত্ব স্বপ্রকাশ। মন্মথ বন্ধু দীনেশের একটি বিপরীত চরিত্ররূপে কল্পিত। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, সদারসিক।

লোহার ব্যবসায়ে একাগ্রচিত্ত দীনেশের মন লোহার মত নীরস হয়ে উঠতে পারে। জীবনের রস ও স্বাদের প্রতি সে বিগতস্পৃহ হতে পারে। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হওয়াও তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ছবিতে যে দীনেশের সাক্ষাৎ মেলে সে এক অদ্ভুত চরিত্র। অকারণে রুক্ষ, দয়ামায়াহীন, বিবেকবোধশূন্য, মাতৃভক্তিহীন, গোঁড়া ও গবেট। স্ত্রীর প্রতি তার ব্যবহার অত্যাচারেরই সামিল। তার দুর্ব্যবহারের জন্য গার্গীর রক্তপাতও ঘটে।

ছোটবেলা থেকে অভিভাবক বলতে তার বিধবা মা। ছবির প্রথমার্ধে দেখা যায় ও বোঝা যায়, তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না। একমাত্র পুত্রের ওপর তাঁর অধিকার অপরিসীম। বিয়ের পর স্ত্রীর ওপর যখন দীনেশের 'অত্যাচার' শুরু হয় তখন দেখা যায় যে, বাড়িতে দীনেশের মার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। পুত্রের ভয়ে তিনিও যেন কাতর। তারপর একদিন তিনি তীর্থবাসিনী হয়ে ছবিতে অদৃশ্য হয়ে পড়েন। বিদায় নেওয়ার আগে পুত্রবধূর কাছে (নাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষাসংক্রান্ত আলাপে ও তীর্থযাত্রার জন্য টাকার প্রস্তাব করার কালে) খুব সুন্দর ব্যবহার পেয়ে গেছেন এ-কথা বলা চলে না। ছবির মধ্যভাগ থেকে আদর্শ ভারতীয় নারীর জীবন্ত বিগ্রহ গার্গীকে তার শাশুড়ীর প্রতি যে-রকম উদাসীন দেখা যায় তাও বিসদৃশ। স্বামীর ভয়ে সে হয়ত শাশুড়িকে বাড়িতে আটকে রাখতে পারেনি। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে শাশুড়ীকে শান্তি দেওয়ার কোন চেষ্টা তার চরিত্রে ছবির শেষের দিকে অনুপস্থিত। এবং দীনেশের মার মত একটি প্রধান চরিত্রের প্রতি চিত্রনাট্যের যে উপেক্ষা দেখা গেল তা নিন্দনীয়।

আবার কাহিনী-পর্বে আসা যাক। গার্গী মনে-প্রাণে স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করল। স্বামীর সকল অন্যায় আদেশ ও নির্দেশ সহ্য করে সে আদর্শ সতীর জীবন যাপন করতে লাগল। যথাসময়ে তাদের একটি ছেলে হল। অল্পকাল পরেই দীনেশের বন্ধু মন্মথর ঘর আলো করে এল একটি কন্যা। বলা হয়নি, ইতিমধ্যে গার্গীর পিতার মৃত্যু ঘটেছে। তার বিধবা মায়ের কী গতি হল ছবিতে তা জানা যায় না।

দীনেশের পুত্র শুভ ও মন্মথর কন্যা সুলতা যে পরস্পরের প্রেমে পড়বে তা দর্শকের অনুমানের বস্তু ছিল। তাই সত্য হল, পরস্পরকে চাইল এরা। ছোটবেলা থেকে একই সঙ্গে এরা পড়াশুনো করেছে। সকল পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দুটি এরাই ভাগ করে নিয়েছে। সুলতা মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করার প্রস্তাব করে। পিতা নতুন দিনের আদর্শ-বাদের কাছে মাথা নত করেন। সুলতা নিজের পড়াশুনো ছাড়ল কিনা বোঝা গেল না। তবে তার কাঁধে একটি ব্যাগ ঝুলতে দেখা গেল। কোন একটি রাজনীতিক দলে সে যোগ দিয়েছে। (দেখা গেল, স্বাধীন ভারতে রাজনীতিক দলের আস্তানার সামনে সর্বক্ষণ পুলিশ-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। এবং আস্তানাটি একটি মেয়েদের হস্টেলের মত।)

রাজনীতিক আদর্শ গ্রহণ করার পর বিয়ে করার ব্যাপারে সুলতার কথায় সাময়িক-ভাবে আত্মত্যাগ ও ঔদাসীন্যের সুরটি দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত দেশসেবিকা প্রেমাস্পদকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ দেখাল। এবং প্রণয়ীকে বিয়ে করার সংকল্প অটল থেকে হাসিমুখে সে গৃহত্যাগ করল।

শুভ ও সুলতার বিয়ের ব্যাপারে যে

গোলযোগ দেখা গেল তার কারণ পাত্র ব্রাহ্মণ, পাত্রী বৈদ্যকুলজাত। অসবর্ণ বিয়েতে মত নেই গার্গীর। (বলা হয়নি, ইতিমধ্যে দীনেশ মারা গেছে।) স্বামীর বংশকে সে অপবিত্র করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত নাটকীয় মুহূর্তে কীভাবে গার্গীর মত ফিরল এবং শেষ পর্যন্ত ঝড়ের রাতে গাছের নীচে চাপা পড়ে আহত শুভ্রর হাতটি সে কেমন করে সুজাতার হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিল তা-নিয়েই দুই পুরুষের চিত্রকাহিনীর যবনিকা।

বহু কষ্টকল্পিত ঘটনায় আকীর্ণ এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। চিত্রনাট্যের ভিত্তি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী।

চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার স্বভাবত মেলোড্রামাকেই ছবিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। ছবির অনেক দৃশ্যে তাঁর প্রয়াস সফল। যাঁরা মেলোড্রামার রস আস্বাদনে উৎসুক তাঁদের কাছে এই ছবি উপভোগ্য হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে পরিচালক ছবিতে মহৎ ভাবকল্পনার বিস্তার করেছেন। বয়স্ক দর্শকদের এই মুহূর্তগুলি ভালো লাগবে। ছবির প্রেমোপাখ্যানটি রুচিসম্মত।

ছবির প্রধান স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করেছেন কণিকা মজুমদার। এই চরিত্রের যে বৈচিত্র্য — বিশেষত জননী হবার পর — তা তাঁর অভিনয়ে অপরিস্ফুট। [illegible] দুঃখ ও বেদনা তাঁর একটানা অভিব্যক্তিতে অনুভব করা যায়। তবে চরিত্রটির [illegible] ও আভিজাত্য শ্রীমতী মজুমদারের অতি-আধুনিকতায় [illegible] ও হাব-ভাবে ফুটে উঠতে [illegible]।

বসন্ত চৌধুরী যে একজন [illegible] এই পরিচয় তিনি ছবিতে দিয়েছেন। [illegible] যদি কোন অংশে দর্শকের [illegible] তবে সেজন্য [illegible] অস্বাভাবিক চরিত্রটি [illegible] তার বেড়াজাল কাটিয়ে উঠে [illegible] অভিনয়-কুশলতায় দর্শকের [illegible] আকর্ষণ করেন।

একটি সুন্দর [illegible] দর্শক [illegible] এই ছবিতে। এবং মুগ্ধ হবেন তাঁর [illegible] অভিনয় দেখে। ছবিতে আবির্ভাবের [illegible] তিনি দর্শকদের [illegible]।

গার্গীর পিতার চরিত্রটি [illegible] তাঁর সংযত ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে মনোগ্রাহী করে তুলেছেন।

ছবির তরুণী প্রণয়ী [illegible] ভালো লাগার মত একটি প্রণয়ী চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন [illegible] চক্রবর্তী। চরিত্রটির অবাস্তবতা [illegible] শিল্পীর অভিনয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীমতী চক্রবর্তী অনায়াসে এই বাধা জয় করেছেন।

তাঁর প্রণয়ীর ভূমিকায় শোভন লাহিড়ীর অভিনয় যথাযথ। ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন ছায়া দেবী, দুর্গা দে প্রভৃতি।

কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত বসু, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শম্ভু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কালীপদ সেন ছবির আবহ-সুররচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সুরারোপিত একটি কীর্তনাঙ্গ গান সুশ্রাব্য। ছবির রবীন্দ্র-সংগীত দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছেন সুমিত্রা সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।

ছবির আলোকচিত্রগ্রহণে বিমল মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনায় সুবোধ রায়, শিল্প-নির্দেশে সুনীতি মিত্র এবং শব্দগ্রহণে সুনীল সরকারের কাজ প্রশংসনীয়।

লণ্ডনে 'ক্ষুধিত পাষাণ'

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রপরিবেশক সংস্থা হারগেট তপন সিংহ পরিচালিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিটির পরিবেশন-স্বত্ব ক্রয় করেছেন বলে জানা গেল। অনতিবিলম্বেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবিটি লণ্ডনে মুক্তি পাবে। ইংরেজী 'সাব-টাইটেল' সহ ছবিটি লণ্ডনে প্রদর্শিত হবে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্পের ভিত্তিতে তৈরী এই ছবি বিদেশে সমাদৃত হবে বলে প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায় আশা প্রকাশ করেন।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনের সেঞ্চুরি ফিল্ম প্রোডাকশনস-এর 'টাইগার গোজ টু ইণ্ডিয়া' ছবির চিত্রগ্রহণ মহীশূরের জঙ্গলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ভারতের আরণ্যক জীবনের বিচিত্র-রূপ ও জন্তু-জানোয়ার এই ছবিতে দেখা যাবে। টেকনিকালার ও সিনেমাস্কোপে নির্মীয়মান এই ছবির পরিচালক জন গুইলার মিন। আমেরিকান শিল্পী জক মাহোনি ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সিমি নামে এক সুন্দরী ভারতীয় অভিনেত্রী ছবির রাজকুমারীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। গজেন্দ্র নামে একটি বিরাট হস্তী ছবির অন্যতম শিল্পী। মাদ্রাজ ও মহীশূরের বান্দিপুর জঙ্গল, সেরিংগাপট্টম ফোর্ট রকস, মামাল্লাপুরম, বৃন্দাবন গার্ডেনস, ললিতা প্যালেস প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানের বহু নয়নাভিরাম দৃশ্য এই ছবিতে সংযোজিত হচ্ছে।

সর্বপ্রথম ফিল্মস ডিভিশন-এর একটি হিন্দী ছবি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য এ-বছরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগদান করেছে। ছবিটির নাম 'মাট্টি বনুগেয়ী সোনা'। গ্রাম্য পটভূমিতে তৈরী ফিল্মস ডিভিশন-এর এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন শান্তারাম আথাভালে। এই কাহিনী-চিত্রটি বাদেও ফিল্মস ডিভিশন-এর বারোটি প্রামাণিক ছবি (পাঁচটি এর মধ্যে রঙগীন) এবং পাঁচটি শিক্ষামূলক ছবি

মুকুল
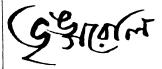
তপতী ব্যানার্জী

গত সপ্তাহের ঘটনা। যাদবপুর কলেজ মাঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিক স্পোর্টস। ছেলেদের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা তাদের বহু রকমের স্পোর্টস ইভেন্ট মেয়েদের জন্য মাত্র পাঁচটি। কেউ একটি কেউ দুটি, কেউ বা তিন চারটি ইভেন্টে নাম দিয়েছে। একটি মেয়ের নাম রয়েছে পাঁচটি ইভেন্টেই। স্পোর্টস শেষে দেখা গেল মেয়েটি লোহার বল ছোঁড়ায় প্রথম হয়েছে। একশো মিটার দৌড়, তিন পায়ে দৌড় ও মিউজিক্যাল চেয়ারে হয়েছে দ্বিতীয়। ব্যালান্স রেসে প্রথম হবার মুখে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কোন স্থান পায়নি। কিন্তু সব মিলিয়ে 'বেস্ট অ্যাথলেট উইমেন' স্পোর্টসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রীর পুরস্কার। মেয়েটির নাম তপতী ব্যানার্জি।

খতিয়ে দেখতে গেলে তপতীর খ্যাতি সুবিস্তৃত নয়। কলকাতার অনেকেই তার নাম প্রথম শুনলেন। কিন্তু জামসেদপুরের স্পোর্টস ক্ষেত্রে তপতী ব্যানার্জি একটি সুপরিচিত নাম। [illegible] সালে জামসেদপুরের অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে তপতীই পেয়েছিল ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার। এছাড়া জামসেদপুরের 'নিউ' টাউন অর্থাৎ বিষ্টুপুর এলাকার সবচেয়ে বড় ক্রীড়া সংঘ জামসেদপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের স্পোর্টসে পরপর তিন বছর ওর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। যে বিষয়ে শক্তির প্রয়োজন তাতেও যেমন যোগ্যতা, যে বিষয়ে গতিবেগ দরকার, তাতেও তেমন পটুতা, আবার যাতে গতি-শক্তি ও নৈপুণ্যের সংমিশ্রণ তাতেও তপতীর প্রাধান্য। অর্থাৎ লোহার বল ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়া, হার্ডলস, হাই জাম্প দৌড় সব কিছুতেই পারদর্শিতা। বিহার রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিকসের দুই একটি রেকর্ড ও না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পড়াশুনার চর্চা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে এবং ক্লাসে কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় না হয়ে স্পোর্টসেও পারদর্শিনী হওয়া তপতীর জীবনের বৈশিষ্ট্য।

বাবা শ্যামাকান্ত ব্যানার্জি ছিলেন জামসেদপুরের টাটা লেবরেটরীর কেমিস্ট। এখন অবসরপ্রাপ্ত। একমাত্র ভাই উৎপল ব্যানার্জি জামসেদপুর স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এখন ডিফেন্স অ্যাকাউন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার। বড় বোন স্বর্ণা ব্যানার্জিও জামসেদপুর থেকে স্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পেয়েছেন।

স্পোর্টসের কয়েকটি প্রাইজ নিয়ে তপতী ব্যানার্জি

তপতীর বাবা মা চেয়েছিলেন তাঁদের ছোট মেয়েও বড় ছেলে ও বড় মেয়ের মত লেখাপড়ায় নাম কিনে ঐতিহ্য বজায় রাখুক। তাই পড়াশুনো ছাড়া অন্য কোনদিকে যাতে তপতীর মন না যায়, সেদিকে তাঁদের ছিল সদাজাগ্রত তৎপরতা।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই স্কুলের বই পড়তে পড়তে তপতী খবরের কাগজের খেলার পাতাটা আগাগোড়া পড়ে ফেলে। অঙ্ক কষতে কষতে স্পোর্টসের দৌড়-ঝাঁপের সময় ও দূরত্বের অঙ্ক। মিনিট সেকেন্ড এবং গজ ফুট ইঞ্চি নিয়ে গবেষণা করে, স্কুলের ছুটির পর খেলার খোলা মাঠ তার মন টানে।

বাবা মা অনেক সময় বিরক্ত হন। বলেন—'আগে লেখাপড়া, পরে খেলাধুলো।' দাদা উৎসাহ দেন। বলেন—'পড়াশুনো বজায় রেখে খেলাধুলো করলে ক্ষতি কি? ক্লাসে তো ও ফার্স্টই হয়।'

প্রধানত দাদার উৎসাহে তপতী এক একটি স্পোর্টসে নামে আর এক গাদা প্রাইজ নিয়ে ঘরে ফেরে। [illegible] তাতে কোনদিনই [illegible] না। এদিকে ডি এম [illegible] গার্লস হাই স্কুলেও ভাল মেয়ে বলে তপতীর সুনাম। ফলে দাদা ও দিদির চেয়েও জামসেদপুরে ওর জনপ্রিয়তা। স্পোর্টসে রাশি রাশি প্রাইজ পেল, স্কুল ফাইনালেও পেল স্কলারশিপ। কিন্তু ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট না থাকায় আইনের মারপ্যাঁচে সে স্কলারশিপ তপতীর হাতে আসেনি। ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর তপতী লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে ভর্তি হয়। ১৯৬১ সালে আই এস-সি পাশের পর ভর্তি হয় যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। ওখানে এখন ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের টেলি কম্যুনিকেশনের ছাত্রী।

সত্যিই সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না স্পোর্টসের পোকা মেয়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্পোর্টসের প্র্যাক্টিস কোনদিন সম্ভব হয়নি। সহজাত প্রবৃত্তি ওকে স্পোর্টসের দিকে টেনে এনেছে। শিক্ষা পেলে হয়তো এখনো অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে।

দেশী সংবাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে পাটের দর নিম্নাভিমুখী হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত আপৎকালীন মজুতদারী সংস্থার পক্ষ হইতে শীঘ্রই পাট ক্রয় ও মজুত শুরু করার সম্ভাবনা আছে। ঐ সংস্থা গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ঐ সংস্থার পক্ষ হইতে কিছুমাত্র পাট ক্রয় বা মজুত করা হয় নাই।

জীবনবীমা কর্পোরেশনের কলিকাতা ডিভিশন ১৯৬১ সালে ৬৫ কোটি টাকার 'বিজিনেস' করিয়া সর্বভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইহা মোট 'বিজিনেস'-এর শতকরা ১০ ভাগ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৩৫টি ডিভিশন আছে। বোম্বাই ৫৮ টাকার 'বিজিনেস' করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য টিটাগড় এলাকার একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সম্মুখে পটকা বিস্ফোরণের ফলে ৩ ব্যক্তি আহত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে অন্যের পরিচয়ে ভোট দিবার চেষ্টার অভিযোগেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়ালিয়র লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত নির্বাচন প্রার্থী গোয়ালিয়রের মহারাণী বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া। তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন সমাজতন্ত্রী দল সমর্থিত প্রার্থী ঝাড়ুদার রমণী শ্রীমতী সুক্কাও।

২১শে ফেব্রুয়ারী—আজ রাজ্য সদর দপ্তরে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব উত্তর প্রদেশের বলরামপুর কেন্দ্রে জনসংঘ ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে দুই ব্যক্তি নিহত এবং ১২ জন আহত হইয়াছে। পুলিস বলরামপুর শহরে কার্ফু জারী করে এবং ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শ্রীক্রুশ্চেভের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি (শ্রীক্রুশ্চেভ) ১৮টি রাষ্ট্রকে লইয়া যে শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, এপ্রিল মাসের শেষাশেষি সেই সম্মেলন আহ্বান করা যাইতে পারে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো কোর্সে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে আই.এ, বি.এ এবং বি.এস-সি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ সম্ভবত ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। এখন উহা এই বৎসর পর্যন্ত বহাল আছে।

ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পাঁচটি প্রকল্পে আমেরিকার ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্তকে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, কিছু কম্যুনিস্ট সদস্য কর্তৃক অশোক সেন এবং তাঁহার নিজের সম্পর্কে আপত্তিকর বিবৃতি দেওয়ার

সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। এই সকল বিবৃতির মর্মার্থ : আসামে বাঙ্গালী নিধনের জন্য তিনি (নেহরু) নাকি দায়ী এবং অশোক সেন তাঁহার সহযোগী। বেরুবাড়ি হস্তান্তর প্রসঙ্গও বিকৃতভাবে উল্লেখ করা হইতেছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে কিছু নির্বাচনী পোস্টারও আপত্তিজনক।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—নির্বাচনের পর কাশ্মীরের একজন সংসদ সদস্যকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় লওয়া হইতে পারে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানান হয়। কাশ্মীর রাজ্য বিধানসভা লোকসভার জন্য পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত করিলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের মনোনীত করেন।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এক রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ যে সঠিক হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে প্রকাশ, শ্রীনেহরু তাঁহার একত্রিশ দিনের নির্বাচনী সফরে বিমানে ১৩৩৬২ মাইল সড়ক পথে ১৩০০ মাইল ও রেলে ১৩০ মাইল অতিক্রম করেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া কেন্দ্র হইতে বিপুল ভোটাধিক্যে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতার ২৬টি বিধানসভার আসন এবং ৪টি লোকসভার আসনের জন্য অদ্য ১৯৩৭টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এইদিনের জন্য ৯৭৮৫টি ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন হয় এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১২ হাজার কর্মচারী, ১৫০০০ পুলিস এবং ৬০০ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক কর্মী নিযুক্ত করা হয়। খাস কলিকাতার ভোটদাতার সংখ্যা হইতেছে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৯২।

বিদেশী সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনে অবস্থিত বহু শত পাকিস্তানী ইহাদের আন্দোলনের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী ছাত্র বলা বাহুল্য পাকিস্তানের আয়ুব খান সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের নকল লণ্ডনে পাকিস্তানের হাই-কমিশনের অফিসে দাখিল করেন।

নেপালের জনৈক বিদ্রোহী নেতার নিকট প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, নেপালী কংগ্রেসের বিদ্রোহীগণ গতকল্য দুইঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলি যুদ্ধের পর খোখা জেলা দখল করিয়াছেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী—গতকল্য লাহোরে ছাত্রগণ জনৈক পাকিস্তানী মন্ত্রীকে কাশ্মীর সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার সময় নাজেহাল করিলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিস ডাকা হয়। ঘটনাটি ঘটে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায়।

আজ একটি অ্যাটলাস রকেট মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেনকে লইয়া গ্রীনউইচ সময় অপরাহ্ন ২টা ৪৮ মিনিটে পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষ পরিক্রমার জন্য মহাকাশের দিকে যাত্রা করে। জন গ্লেনের মহাকাশ যান তিনবার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মহাকাশে ভ্রমণকালে তিনি তিনবার সূর্যাস্ত দেখিয়াছেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য পূর্ব পাকিস্তানে সর্বত্র শহীদ দিবস পালনের মধ্য দিয়া বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এইদিন গোয়ালন্দ জাহাজঘাটের নিকট একটি বিক্ষুব্ধ ছাত্র মিছিলের উপর পুলিস লাঠি চার্জ করে এবং ঘটনাস্থলে প্রায় ৫০।৬০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া জানা যায়।

বিশ্বের সর্বত্র উপনিবেশবাদের দ্রুত অবসান ঘটাইবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৭ জন সদস্য লইয়া যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, আজ রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সি এস ঝা সর্বসম্মতিক্রমে তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন।

২২শে ফেব্রুয়ারী—গ্লেন পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে মহাকাশ পরিক্রমাকালে তাঁহার জানালার পাশে জোনাকি পোকার ন্যায় পদার্থ ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন।

আজ কাঠমাণ্ডুতে সরকারীসূত্রে বলা হইয়াছে যে, গত মঙ্গলবার ভোরে বিদ্রোহীরা পশ্চিম নেপালের ডাং জেলায় বাণিজ্য শহর কৈলাবাস আক্রমণ করিলে একজন নেপালী বিদ্রোহী নিহত ও ৪ জন আহত হইয়াছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পুনরায় ঢাকা শহরে গুলীবর্ষণ করা হয়। ফলে একজন সরকারী বাসের ড্রাইভারসহ ৩ জন লোক ঘটনাস্থলেই মারা গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল।

নেপাল বেতারে বলা হইয়াছে যে, কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণে অবস্থিত বীরগঞ্জ শহর হইতে সাত মাইল দূরবর্তী এক পুলিশ ঘাঁটিতে বিদ্রোহীরা গত মঙ্গলবার হানা দেয়। উক্ত বেতার বার্তায় বলা হইয়াছে যে, নেপালদ্রোহী দুষ্কৃতকারীরা ভারত হইতে আসে এবং উক্ত ঘাঁটি লুণ্ঠন করিয়া তথায় পলাইয়া যায়।

২২শে ফেব্রুয়ারী—ওয়াকিবহাল মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানের জন্য মিঃ ক্রুশ্চেভ নূতন করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডী আজ তাহা যথারীতি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

রাজ প্রাসাদ হইতে প্রচারিত এক নির্দেশনামায় বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিয়াছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে জানান হয় যে, গত বৃহস্পতিবারের সামরিক বিদ্রোহের নেতা কর্ণেল তালাত আয়দেমীর ও অপর তিনজন অফিসারকে নিরাপত্তার জন্য আটক করা হইয়াছে।

অদ্য আলজিয়ার্সে সামরিক সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে, গতকল্য আলজিরিয়ার সর্বত্র বন্দুক, ছুরিকা ও বোমার আক্রমণে ৪০ জন নিহত ও ২২ জন আহত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা

মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায় [illegible] প্রেস [illegible] সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।

[illegible]

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 10TH MARCH, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ১৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৬ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

গণতান্ত্রিক দায়ভাগ

ভোট যুদ্ধের চুলচেরা বিচার বাদ দিলে সাধারণ নির্বাচনের মোটামুটি ফল হল, এক, শাসন ক্ষমতা কোথায়ও হাত বদল হয়নি; দুই, কংগ্রেসের সমতুল কোন শক্তিশালী বিরোধী দল দেখা দেয়নি। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সর্বত্রই কংগ্রেস তৃতীয়বার রাষ্ট্রশাসনভার গ্রহণের অধিকার পেয়েছে। দু তিনটি রাজ্যে অবশ্য কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত নয়। যেসব রাজ্যে এককালে সামন্তরাজদের প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, যেমন রাজস্থান এবং মধ্য প্রদেশ, সেখানেই কংগ্রেস আপাতত এই রকম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। তবে সমস্যাটা এমন কিছু বৃহদাকার নয়। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যে, যেমন উড়িষ্যায়, কংগ্রেসকে এরকম সমস্যায় ইতিপূর্বে পড়তে হয়েছে। রাজস্থান কিম্বা মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস দলের মন্ত্রিত্ব গঠন সমস্যা সে তুলনায় খুব দুরূহ নয়। সাধারণ নির্বাচনের পর রাজস্থানে কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে স্বতন্ত্র দল; আর মধ্যপ্রদেশে জনসংঘ। উত্তর প্রদেশেও জনসংঘের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র দল বা জনসঙ্ঘ এখনও এতো শক্তিশালী হয়নি যে কংগ্রেসের জায়গায় রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে বা উত্তর প্রদেশে শাসনভার নিতে পারে। সাধারণ নির্বাচনের রায় কোথায়ও ক্ষমতা হাত বদলের পক্ষে নয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও কোন সর্বভারতীয় শক্তিশালী বিরোধী দল দেখা না দেওয়ায় দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কংগ্রেসের সাফল্যে এঁরা কেউই অখুশী হননি; এঁদের আফসোস অনেকটা এই যে, য়ুরোপের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ধরনধারনের সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী ফলাফলের মিল দেখা যাচ্ছে না। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকাই নিয়ম এবং থাকাটা জনস্বার্থের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। আদর্শ হিসেবে যুক্তিটা অনস্বীকার্য। সংখ্যাগরিষ্ঠতাবলে ক্ষমতাসীন হলেও রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে যথেচ্ছাচার গণতন্ত্রে অচল। অচল এই কারণে যে ক্ষমতাসীন দলকে প্রতি পদে বিরোধী দলের কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয় এবং অবস্থা কখনও সঙীন হলে বিরোধী দল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন করতে পারে ক্ষমতাসীন দলের কাজকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচারের জন্য। কাজেই শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব গণতান্ত্রিক রাজনীতির সুস্থ ও স্বাভাবিক গতি-নিয়ামক সন্দেহ নেই। কিন্তু এও ঠিক যে কোন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেই শক্তিশালী বিরোধী দল হঠাৎ গজায় না। আর যাই হোক এর জন্য কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কারণ নেই।

ব্রিটেনে, য়ুরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই দলকে দীর্ঘকাল একটানা ক্ষমতাসীন থাকতে দেখা গিয়েছে। জনতার রায় একাধিকবার একটি দলের অনুকূলে যাওয়া আপত্তিকর, গণ্য হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাব্লিকান পার্টির মত ক্ষমতাশালী দলকেও এই শতাব্দীর মধ্য-ত্রিশ থেকে মধ্য-পঞ্চাশ পর্যন্ত ক্ষমতা-চ্যুত থাকতে হয়েছিল। ব্রিটেনে লেবার পার্টির অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তফাৎ এই যে, আমেরিকার রিপাব্লিকান পার্টি কিম্বা ব্রিটেনের লেবার পার্টি যথেষ্ট ক্ষমতাশালী বিরোধী দল; রাষ্ট্রশাসনের অভিজ্ঞতাও তাদের প্রচুর, যা ভারতের কোন গণতান্ত্রিক বিরোধী দলেরই প্রায় নেই বলা যায়। নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছাই স্থির করে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে কোন্ দল শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা থেকে অবসর গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। যে দল নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের সর্বাধিক আস্থা অর্জন করে তার পক্ষে রাজনৈতিক বৈরাগ্য সাধনের পথ বেছে নেওয়ার উপায় নেই, কোন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই নেই।

রাজাজী অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেসের পক্ষে একটানা শাসনক্ষমতা অধিকার একদলীয় শাসনের নামান্তর। ঠিক কি তাই? কোন বিরোধী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই কিম্বা অস্তিত্ব থাকলেও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগবঞ্চিত যে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রকেই একদলীয়তন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের অধীন বলা যায়। কংগ্রেস শাসন যে মোটেই একদলীয় তন্ত্র নয় তার প্রমাণ প্রত্যেকটি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধীরা স্বচ্ছন্দে অবাধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছে। কংগ্রেস-শাসন যে একদলীয় স্বেচ্ছা-বিধান নয় তার আরও প্রমাণ এবারের সাধারণ নির্বাচনে কোন কোন রাজ্যে স্বতন্ত্র দল এবং জনসঙ্ঘ কংগ্রেস-বিরোধী দল হিসাবে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে। জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধানের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলগুলির উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি হলে যথাসময়ে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার হাত বদল সম্ভব হবে। সে রকম কোনও দায়িত্বশীল বিরোধী দল যতদিন দেখা না দিচ্ছে ততদিন নির্বাচনের রায় অনুযায়ী কংগ্রেসের শাসনই আমাদের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলকর বলে মানতে হবে।

নেহরুর সঙ্গে নির্বাচন দ্বন্দ্বে ডঃ লোহিয়া ৫০হাজারের অধিক ভোট পেয়েছেন।
'নেহরুর পর কে?' এই সমস্যার একটা সমাধান মিলল।
পশ্চিম বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বামপন্থীরা সাফল্য লাভ করেছে।
ভোটদাতারা কি তাদের পোস্ট-ডেটেড্ চেক দিয়েছেন?
বামপন্থী ...
বিকল্প সরকার
স্বতন্ত্রদল ১৫০টি আসন দখল করেছে
[প্রথম মাঠে নেমেই সেঞ্চুরী!]
CR. 167
পাকিস্তানে এবার নতুন শাসনতন্ত্র চালু হবে।
সেই পুরোনো কাসুন্দী
স্বৈরতন্ত্র
গণতন্ত্র

আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ফরাসী সরকারের দীর্ঘদিনব্যাপী বিরোধের একটা মীমাংসা হলো। কিন্তু আলজেরিয়ায় এখনো শান্তি আসে নি এবং কবে পুরোপুরি শান্তি আসবে তাও একেবারে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আলজিরিয়ার 'প্রভিশনাল' সরকার এবং ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার যে-সব সর্ত স্থির হয় সেগুলি উভয় দিকের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন। সুতরাং যুদ্ধবিরতির পথে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এখন অশান্তি সৃষ্টি করছে দ্য গল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ফরাসী সৈন্যের দল যারা এক শ্রেণীর গোঁড়া ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সমর্থক। এরা কিছুতেই আলজিরিয়া থেকে ফরাসী আধিপত্য হ্রাস হতে দিতে চায় না। এরা এখনো আশা করছে যে, সন্ত্রাসসৃষ্টি দ্বারা তারা বর্তমান মীমাংসা ভন্ডুল করে দিয়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা ঠেকাতে পারবে। ফ্রান্সে দ্য গলকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য তাদের ষড়যন্ত্র চলছে এবং খাস ফ্রান্সেও তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য খুনখারাপি চালাচ্ছে। সুতরাং সব মিলে একটা অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থা চলছে।

তবে খাস ফ্রান্সেই হোক অথবা আলজিরিয়াতেই হোক সন্ত্রাসবাদীরা খুব বেশি দিন অশান্তি জীইয়ে রাখতে হয়ত পারবে না। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, আলজিরিয়া সম্পর্কে মীমাংসার যে-সব সর্ত হয়েছে সেগুলি আলজিরিয়ার ইউরোপীয় অধিবাসীদের অর্থাৎ ফরাসী ঔপনিবেশিকদের পক্ষে খুবই ভালো। এ বিষয়ে আলজিরিয়ান জাতীয়বাদীরা খুবই ঔদার্য দেখিয়েছেন! ইউরোপিয়ান অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপার ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়েও মীমাংসার সর্ত ফরাসী সরকারের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। এই সব সর্ত যখন স্পষ্টভাবে লোকের সামনে উপস্থিত করা হবে তখন গোঁড়া ফরাসী ঔপনিবেশিক মতের সমর্থক বেশি লোক থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসার বিরোধীদের প্রভাব এবং তাদের অশান্তি সৃষ্টি করার শক্তিও কমে যাবে। তবে আপাতত হয়ত আরো কিছুদিন আলজিরিয়া এবং খাস ফ্রান্স থেকেও সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংবাদ আসবে। এতোদিন পরে আলজিরিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে যখন আনন্দ করার কথা সেই সময়ে এই দুর্বৃত্তদের কাজ যে কতদূর নিন্দনীয় এবং ফরাসী জাতির পক্ষে লজ্জাকর ও বিপজ্জনক তা বলা যায় না।

•

নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা কীভাবে হতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ইউনো'র জেনারেল অ্যাসেম্ব্রী একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। আঠারোটি রাষ্ট্র ঐ কমিটির সদস্য, তার মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম এবং নিরপেক্ষ তিন গোষ্ঠীরই রাষ্ট্র আছে। নিরপেক্ষদের মধ্যে ভারতবর্ষও আছে। ১৪ই মার্চ জেনেভায় এই কমিটির বৈঠক আরম্ভ হবে। কিছুদিন পূর্বে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চভ প্রস্তাব করেন যে, এই কমিটির বৈঠক একটি শীর্ষ সম্মেলন রূপে আরম্ভ হোক। অর্থাৎ

যে-সব রাষ্ট্র কমিটির সদস্য তাদের গবর্নমেন্টের যাঁরা বড়ো কর্তা তাঁরা স্বয়ং বৈঠকে যোগ দিতে জেনেভায় আসুন।

শ্রীকেনেডী এই প্রস্তাবে রাজী হন নি। তিনি বলেন যে, প্রথমে খোদ্ বড়ো কর্তাদের জেনেভায় গিয়ে কোনো লাভ নেই। একটা মীমাংসার পথ পরিষ্কার হয়েছে এরূপ যখন দেখা যাবে তখন বড়ো কর্তারা যেতে পারেন, প্রথমে পররাষ্ট্রসচিবদের মধ্যে আলোচনা চলুক। কমিটিতে যে-সব রাষ্ট্র আছে তাদের প্রত্যেকের প্রধানমন্ত্রী বা তদ্স্থানীয় ব্যক্তির নিকট শ্রীক্রুশ্চভ পত্র দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু উত্তরে জানান যে, ভারতে সাধারণ নির্বাচন এবং তার পরে নূতন গবর্নমেন্ট গঠন সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে তাঁর পক্ষে মার্চ মাসে ভারতের বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে যদি তাঁর যোগদান সম্মেলনে কাজের সহায়ক হয় তবে তিনি পরে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে জেনেভায় যেতে পারেন। রাষ্ট্র প্রধানদের যোগদান ফলপ্রদ হতে হলে তার আগে কমিটির দ্বারা পথ পরিষ্কারের কাজ আবশ্যক, এরূপ ইঙ্গিতও পণ্ডিত নেহরুর চিঠিতে আছে। যদিও তাঁর চিঠি পড়লে এরকমও মনে হবে যে, যদি তাঁকে এখন ভারতবর্ষে অন্য কাজে আটকে থাকতে না হোত এবং অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরাও উপস্থিত হতে রাজী থাকতেন তাহলে শ্রীনেহরুর পক্ষে বৈঠকের প্রারম্ভেও যোগদান করতে আপত্তি হোত না। অর্থাৎ শ্রীনেহরু শ্রীকেনেডীকেও (এখনই শীর্ষসম্মেলন আবশ্যক নয়—এই মতে) সমর্থন করেছেন আবার শ্রীক্রুশ্চভের প্রস্তাবেরও তারিফ করেছেন।

শ্রীক্রুশ্চভ শ্রীকেনেডীর উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর পূর্ব প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের মিলিত হবার আগে অনেক বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার বলে শ্রীকেনেডী যে আপত্তি তুলেন সেই সম্পর্কে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গত পনেরো বছর ধরে তো কথাবার্তা, যোগাযোগ অনেক হয়েছে, তার পরেও যখন অনেক বিষয় অপরিষ্কার রয়েছে তখন অন্যের দ্বারা পরিষ্কার করাবার চেষ্টা না করে রাষ্ট্রপ্রধানদের পরস্পরের মধ্যে মুখোমুখি কথা বলা দরকার। কিন্তু শ্রীকেনেডীর মত পরিবর্তন হয় নি। প্রথমে পররাষ্ট্রসচিবরা মিলিত হয়ে আলোচনা করুন, তারপর যদি পথ পরিষ্কার হয় তবে রাষ্ট্রপ্রধানরা যাবেন—এই মতেই তিনি স্থির রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট সরকার তাতেই রাজী হয়েছেন।

নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার প্রশ্নটিকেও এই জেনেভা কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষিত হয়েছে যে, এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমেরিকা আবার অস্ত্র পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ (কেবল মাটির তলায় নয়, বায়ুমণ্ডলেও) আরম্ভ করবে। যদিও না ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ নিষেধাত্মক চুক্তি স্বাক্ষর করে। রাশিয়া চুক্তি করতে রাজী আছে। কিন্তু চুক্তির সর্ত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক পরিদর্শকের ব্যবস্থায় সে রাজী নয়। আমেরিকার দাবি—আন্তর্জাতিক পরিদর্শকের ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে চলবে না। রাশিয়া যদি তাতে রাজী না হয়, তবে আমেরিকা কর্তৃক বায়ুমণ্ডলে আর এক দফা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ শুরু হবে। তার প্রস্তুতি নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়েছে।

মনে হয় আমেরিকা যে-প্রোগ্রাম করেছে সেটা বন্ধ হবে না। রাশিয়া আন্তর্জাতিক পরিদর্শকের ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে সেটা বন্ধ করতে পারে এটা বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা অত সরল নয়। চুক্তির ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল, সেটা সাধারণ লোকের বোধগম্যই নয়। নিজে অপরাধী বলে রাশিয়া বোধহয় ভাবছে যে, চুক্তি যাই থাক নিজের শক্তির প্রশ্ন যখন উঠবে, তখন আমেরিকা নিরস্ত্র থাকবে না, যেমন রাশিয়া থাকে নি। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিদর্শকের ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে নিজের যথেচ্ছাচরণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ কেন করি।

গত বছর রাশিয়া যখন নূতন করে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ আরম্ভ করেছিল তখন কেউ কেউ এমন থিওরিও প্রচার করেছিলেন যে, রাশিয়ার নিউক্লিয়ার অস্ত্রশক্তির এই নূতন প্রমাণদানের পরে শ্রীক্রুশ্চভের পক্ষে পশ্চিমাদের সঙ্গে মিটমাট করার সুবিধা হবে। কারণ অতঃপর রাশিয়াতে শ্রীক্রুশ্চভের বিরোধীরা বলতে পারবে না যে পশ্চিমাদের সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে রাশিয়া দুর্বলতা প্রকাশ করছে অথবা রাশিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। তাই যদি হয় তবে বলতে হবে যে, রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাটের উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীকেনেডী নূতন একদফা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাবার ব্যবস্থা করছেন, কারণ আমেরিকার বোমা রাশিয়ার বোমার চেয়ে কম বিধ্বংসী নয় এটা প্রমাণ করার পরে যদি তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাট করতে অগ্রসর হন তাহলে আমেরিকার দৌর্বল্য প্রকাশ অথবা আমেরিকার নিরাপত্তাহানির কথা তুলে কেউ তাঁর নীতির সমালোচনা করতে পারবে না। মার্কিন জনমতও উদ্বিগ্ন হবে না! বিশ্ব শান্তির দিকে শ্রীকেনেডীর এই নূতন পদক্ষেপের পরে শ্রীক্রুশ্চভও নিশ্চয়ই বোধ করবেন যে তাঁরও এবার আর এক পদক্ষেপ করা উচিত—সেটা কোন্ দিকে পদক্ষেপ হবে তা এখনো আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

৬।৩।৬২

অ্যানথলজি

বাতায়নিক

ভোরে উঠে সেদিন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সন্দেহ হল সত্যি জেগে উঠেছি না এখনো ঘুমের ঘোরেই আছি। সন্দেহের কারণ আমার পরিচিত জগৎ চারিধারে কোথাও দেখতে পেলাম না। ঘুমের মধ্যে আমার দোতলার ঘরটা আমায় নিয়ে কোন অজানা লোকে যেন চলে এসেছে। এ শুধু অজানা লোক নয় প্রায় নিরাকার আদি সৃষ্টির জগৎ। পরমশিল্পী যেন সবে বস্তুর ধ্যানে বসেছেন। শূন্য পটে আবছা রঙের প্রলেপ পড়েছে, এখনো তা রূপ নেয়নি স্পষ্টভাবে। সঙ্গীতের যেমন তালমান গৎ বাঁধা ছকের আগে সুরের আলাপ, এও যেন তেমনি আলাপ সৃজনের।

এটুকু লিখতে যতক্ষণ লাগল তার আগেই আমি অবশ্য বুঝেছিলাম যে ব্যাপারটা কুয়াশা ছাড়া কিছু নয়। ঘন কুয়াশায় দিগ্বিদিক বিলুপ্ত হয়ে আমার নিত্য পরিচিত পরিবেশের এই চেহারা হয়েছে। সকাল বেলার এ কুয়াশা বৎসরের এই সময়টায় বিরল নয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রভাতে তার এমন একটি প্রকাশ ছিল যা সচরাচর দেখবার সৌভাগ্য হয় না। এ কুহেলিকা নগরের সেই ধুলো ধোঁয়ার ভেজাল মেশানো নোংরা আবরণ নয়। এ কুয়াশাও অস্বচ্ছ কিন্তু নির্মল। রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত গ্লানি মুছে রেখে এসে একটি শুদ্ধ প্রসন্নতা সে বুঝি অর্জন করেছে।

শুধু নির্মল প্রসন্নই নয় এ কুজ্ঝটিকা আরেক দিক দিয়ে আশ্চর্য দ্যোতনাময়। অবগুণ্ঠন টেনে তা যেন সব কিছুকে আরো গূঢ় অর্থে প্রকাশ করেছে।

আমার পরিচিত চারদিকের দিকচিহ্ন এমন অর্ধবিলুপ্ত না হলে তাদের সত্যকার বাস্তবতা এমন করে আমার কাছে ধরা পড়ত না বলে মনে হ'ল। অভ্যাসের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েই সব কিছুর অবহেলিত প্রচ্ছন্ন মর্ম উদ্ঘাটিত হয়েছে।

খালের মত সংকীর্ণ যে নদীটি ঐতিহাসিক গৌরব হারিয়ে নগরের পয়োনালীর বদলী বেগার খাটে, তার বাষ্পাচ্ছন্ন ছায়ামূর্তি মানুষের বর্তমান বিশৃঙ্খল সভ্যতার নিগড়ে বন্দিনী সমস্ত নদীর ব্যথিত অভিযোগ ফুটিয়ে তুলে যেন নির্মলতার নীরব কান্না হয়ে উঠেছে। ওপারের যে বিষণ্ণ লোহিত প্রাকার বেষ্টিত বিরাট সব আয়তন প্রতিদিনের অতি

পরিচয়ে তাদের উপস্থিতিটুকুও জ্ঞাপন করতে ভুলে যায় রক্তাভ অস্পষ্টতায় তারা শুধু একটা জেলখানা নয়, মানব সমাজের সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রতীক যেন হয়ে উঠল।

এসব হয়ত আমার অলস অলীক অসার কল্পনা মাত্র।

কিন্তু প্রখর দিবালোকই শুধু নয়, জীবন ও সৃষ্টির অনেক গূঢ় মর্ম সন্ধানে কুজ্ঝটিকার অন্তরালও যে পরম সহায় হয় মনের অযৌক্তিক ভ্রান্তি বলে এ ধারণা বাতিল করতে পারছি কই?

নারীর মধ্যে চিররহস্যময়ীর নববধূকে আবিষ্কার করবার জন্যে যেমন তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই অবগুণ্ঠনই যথার্থ উন্মোচনের রহস্য কুঞ্চিকা কি নয়?

যা নিত্য পরিচিত তা অতি ঘনিষ্ঠতায় তার যে অর্থটুকু আমাদের সামনে মেলে রাখে তা নেহাৎ প্রয়োজনের সীমায় সঙ্কীর্ণ। তাকে তার সম্পূর্ণ সত্যে চেনবার জন্যেই আধেক ঢাকা প্রয়োজন।

শুধু আমাদের নগরের ওপরই নয় জীবনের অনেক কিছুর ওপরই এমনি ইঙ্গিতময় কুয়াশার আবরণ বুঝি মাঝে মাঝে পড়া দরকার।

অজ্ঞান্তে আধুনিক কবিতারই বড় বেশী ওকালতি করে ফেললাম বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

নববধূর গুণ্ঠনের কথাটা উপমা হিসেবে উল্লেখ করার পর ভেবে দেখছি এই রীতি শুধু আমাদের দেশে বা সমাজেই আবদ্ধ নয়। মানুষের মনের মধ্যেই এর অলক্ষ্য বীজ কোথাও আছে। যে দেশে নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন আবরণহীন, সেই পাশ্চাত্য দেশেও অন্তত পরিণয়ের এই একটি দিনে নববধূর যত সূক্ষ্মই হোক কুহেলিকার মত একটি ওড়না ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত বলেই জানি। বধূত্বের পরম রহস্য মহিমার প্রকাশের জন্যেই একটা সংকেতময় আবরণ তাকে দেওয়া হয়।

ও দেশের বিবাহ অনুষ্ঠানের আর একটি আচারও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। যতদূর জানি বিবাহ অনুষ্ঠানের পর গির্জা থেকে নবদম্পতী বার হয়ে আসার সময় তাদের ওপর চাল ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথা পশ্চিমের কোথাও কোথাও এখনো বর্তমান। জন্ম মৃত্যু বিবাহের মত মানুষের জীবনের পরম ঘটনার সঙ্গে যেসব বহু যুগের আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার জড়িত, অগ্রসর সভ্যতার যুক্তিবাদী সম্মার্জনীতেও তা ঝেড়ে ফেলা প্রায় অসাধ্য। এইসব সংস্কারের মধ্যে মানুষের সুদীর্ঘ বিবর্তনের অতীত আদিম সব পদচিহ্ন মিশে থাকে। আধুনিক মনের অবজ্ঞা বা উপহাস অগ্রাহ্য করেই প্রত্যেক দেশের দশকর্মের ভেতরে তা প্রকাশ পায়। বিবাহের অনুষ্ঠানে চাল ছড়াবার এই রীতি পাশ্চাত্ত্য জাতির কোনো বিলুপ্ত অধ্যায়ের ইঙ্গিতবহ কি নয়?

এ সংস্কারটি এই দিক দিয়ে রহস্যময় যে আজকের দিনে ধান্য শস্য পাশ্চাত্ত্য দেশের মোটেই অপরিচিত না হলেও শুনেছি এই শস্যটি ইতিহাসের বিচারে সেদিকে নবাগত। খাদ্যশস্য হিসেবে পশ্চিম প্রধানত গমের দেশ। যতদূর জানি আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলেই তার বন্য পূর্বপুরুষদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বা অন্য কোন আদি জন্মভূমি থেকে এই শস্যটি মিশরের নীলনদীতটে বাৎসরিক বন্যার প্রসাদ পেয়ে সমস্ত পশ্চিমের কৃষি-জীবনের সূচনা করেছে। ধান্য শস্যের আদি জন্মস্থান কিন্তু পশ্চিমে নয় প্রাচ্যে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেই সম্ভবত। এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে সমুদ্র পর্বত অরণ্য পার হয়ে সে শস্য বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল কি করে এবং কবে? এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ওদেশে থাক বা না থাক যেখানে যেটুকু তার অস্তিত্ব দেখা যায় তা প্রাচ্যের সঙ্গে কোনো বিলুপ্ত সম্পর্কের স্মৃতি কি ধরে রাখেনি? ধানদূর্বা না হোক ইওরোপের বর কনের মাথায় এসিয়ার তণ্ডুলকণা কোন সুবাদে গিয়ে বর্ষিত হয়?

বিজ্ঞানের কল্যাণে দুর্গমতা ও দুরত্ব বিজিত হয়ে পৃথিবী ছোট হওয়ার একটা উল্টো ফল হয়েছে এই যে দূর দুর্গম সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে যন্ত্রবিজ্ঞানের জয়-যাত্রার আগের যুগের পৃথিবী সম্বন্ধে। এখনকার সুগমতা আগেকার দুর্গমতার বিভীষিকা আমাদের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে। দু-মাসের পথ দুদণ্ডে যাই বলে আমাদের মনে হয় অরণ্য পর্বত সমুদ্রের বাধা বুঝি সে যুগে এমন অনতিক্রম্য ছিল যে নেহাৎ যুদ্ধ জয়ের অভিযান, তীরন্দাজ সদাগরী সমুদ্রযাত্রা কি মরু প্রান্তরের কাফিলায় ছাড়া এক জায়গার মানুষে আরেক জায়গায় নড়ত না। দুস্তর বাধা তুচ্ছ করে তখনকার মানুষ কি অসাধ্য সাধন যে করেছে আমরা বেশীর ভাগই ভুলে যাই। নৌ-বিদ্যা আয়ত্ত হবার আগে শুধু ভেলায় ভেসেই মানুষ যে সমুদ্র পারে উপনিবেশের পত্তন করেছে, লোহা ব্যবহার না শিখেই প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপপুঞ্জের বিশাল বিস্তৃতি শুধু নিরক্ষ ও হামবোল্ড স্রোতের সাহায্যে যে পশ্চিমে এসিয়া ও পূর্বের দক্ষিণ আমেরিকা থেকে জয় করেছে তা অনেক সময়ে নতুন করে হাতেনাতে প্রমাণ করবার জন্যে Tho Heyderdahl-এর মত নৃতাত্ত্বিককে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শুধু দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের ভেলা অকূল সমুদ্রে ভাসাতে হয়, Erie De Bisschop-এর জ্ঞানোন্মাদকে পঁইষট্টি বৎসর বয়সে সেই চেষ্টায় প্রাণ দিতে হয়। শুধু সমুদ্র নয় অরণ্য পর্বত মরুর বাধাও যে সেই আদিম যুগেও মানুষ মানেনি পৃথিবীময় নানা নরগোষ্ঠীর আশ্চর্য মিশ্রণই তার সাক্ষ্য দেয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দরজায় বারবার বিদেশীর হানা দেওয়ার খবর আমরা যতটা রাখি এই পথেই ভারতের মানুষের নবদিগন্ত সন্ধানের নেশায় বার হওয়ার খবর বোধহয় ততটা নয়। সমস্ত ইওরোপ হয়ে ইংলণ্ড পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য জগতে যে বেদেরা ছড়িয়ে আছে, তারা যুদ্ধবিগ্রহে নয়, একরকম অকারণ পুলকেই যে ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রথম প্রায় ছ'শ বছর আগে সূর্যাস্তের দেশে পাড়ি দিয়েছিল একথা স্মরণ করলে মানুষের রক্তের মধ্যেই চিরন্তন দুরন্ত অস্থিরতার আর একটা প্রমাণ পাই। মাত্র ছ'শ বছর আগে কেন, ইওরোপের মাটিতে ভারতবাসীর পদচিহ্ন আরো অনেক আগেই পড়েছে। পণ্ডিতদের কাছে শোনা দুটো দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। ১৮৩৫-এ ইংলণ্ডের Cirencester-এ একটা সমাধি-শিলা আবিষ্কৃত হয়। সেটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর। তার ল্যাটিন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, Dannicus Indiana নামে একজন বল্লম-ধারী সওয়ার সৈনিকের দুই রোমান বন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুসারে সে সমাধি শিলাটি স্থাপন করেন। Dannicus ভারতের লোক, রোমের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তাঁর সমাধি-শিলাটি দেখতেও নাকি দক্ষিণ ভারতের এই ধরনের খোদিত শিলাখণ্ডের মত। এ ছাড়া Julius Indus নামে আরেক সেনানায়কের নাম পাওয়া যায় তখনকার গল-এ। এঁরা ভারতীয় বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। মিশরের আলেক-জান্দ্রিয়ায় ভারতবাসীর প্রাচীন উপনিবেশের প্রমাণও আছে।

ভারতের নামে বড়াই করতে এসব উদ্ভট খবর ঘাটাঘাটি করছি না, স্পুটনিক কি অ্যাটলাস ডি-তে মহা-শূন্যে পাড়ি দিয়ে মানুষ হঠাৎ সৃষ্টি ছাড়া যে কিছু করে বসেনি, তার জৈব ইতিহাসেরই ধারা অনুসরণ করছে এইটুকু শুধু নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

শার্ঙ্গদেব

শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ও নৃত্য সম্মেলন

শান্তিনিকেতনে ১৯—২২ ফাল্গুন পর্যন্ত একটি মনোরম সঙ্গীত ও নৃত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উৎসবের অন্যতম।

যেসব শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধন করেন এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে থাকেন, এমনকি যাঁদের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধন হয়নি তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে শান্তিনিকেতন বিশেষ ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। যে বৃহত্তর পরিবেশে আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুশীলন হচ্ছে এবং তার সার্থকতাও প্রমাণিত হচ্ছে তার স্বীকৃতি প্রদান করে শান্তিনিকেতন গুণ-গ্রাহিতারও পরিচয় প্রদান করেছেন। অপর পক্ষে শিল্পিগণ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগস্থাপনের যে সুযোগ লাভ করলেন তাতে উপকৃত হবেন। পরিচয়ের এই আদান-প্রদানের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্যই মিলনসাধন। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বাইরের অনেক শিল্পীর মনে হয়ত অভিমান জমা ছিল যে শান্তিনিকেতনে তাঁরা অস্বীকৃত আবার সবাইকার সঙ্গে মিশতে নানাকারণে শান্তিনিকেতনেরও দ্বিধা এবং সংকোচ ছিল। একটি বলিষ্ঠ পরিকল্পনায় সেই সব বাধা অপসারিত হতে দেখে আমরা আনন্দিত। বহিরাগত শিল্পীরা যে সমাদর পেয়েছেন তা আন্তরিক। বিচিত্রামণ্ডপের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ জনসমাবেশে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এবং সমাগত শিল্পীরা অসংকোচে সংগীত পরিবেশন করে সাধুবাদ অর্জন করেছেন। শান্তিনিকেতনে শিল্পীদের এই যে মিলন প্রত্যক্ষ করেছি এ থেকে সংগীত-জগতে নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বিচিত্রা-মণ্ডপের এই আসর শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে খুশির খেয়ালে গান জমে ওঠে শান্তি-নিকেতনে। তার পরিচয় বহিরাগত শিল্পীরা পেলে আনন্দের বিরাট প্রেরণা পেতেন। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়;

এই ধরনের সম্মেলন এইভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এবার তো শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অনেকের পরিচয় ঘটল—এরপর তাঁরা অসংকোচে শান্তি-নিকেতনের স্বাভাবিক পরিবেশের মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। শান্তি-নিকেতনকে এইভাবে জানাটাই কিন্তু আসল জানা। আমাদের এক বন্ধু ব্যক্তি বলছিলেন কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয় থেকে যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করছেন তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য কিছুকাল শান্তিনিকেতনে থাকা প্রয়োজন। তাহলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সংগীতকে জীবনধারার সংগে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তাহলেই রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে। এটি সত্যই অতি সুন্দর প্রস্তাব কিন্তু তা কার্যকর হওয়া সম্ভব কিনা জানি না। তবে, ব্যক্তিগত চেষ্টাতে সবই সম্ভব হয়। যাদের উপায় আছে তাঁরা কিছুকাল যদি শান্তি-নিকেতনে কাটিয়ে যেতে পারেন তাহলে যথার্থই তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

শান্তিনিকেতনের এই মিলনোৎসবের মধুর রসটি আমরা যখন হৃদয়ের পাত্রে সঞ্চিত করতে উৎসুক তখন তাতে ঈর্ষা-কুটিল বিষাক্তরস উন্মুক্ত করে দেবার প্রবল আগ্রহ একজনের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হয়েছি। এ ক্ষোভ শুধু আমার নয়, শান্তিনিকেতনের প্রতি শিষ্টজন অনুভব করেছেন যে তাঁর স্পর্ধিত ব্যবহারে শিষ্টাচার অতিমাত্রায় লঙ্ঘিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়,—এই ব্যক্তি সভাপতির ভাষণের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে বিশ্বভারতী প্রদত্ত গৌরবের অবমাননা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নিন্দা ছাড়া আর কোনো উপাদান ছিল বলে মনে হয় না। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পীবিশেষের নামোল্লেখ করে তিনি যেভাবে বিদ্বেষবর্ষণ করলেন তাতে শান্তিনিকেতনের আতিথ্যকে বিব্রত করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। তাঁর ভাষণে সংগীত রত্নাকর, বৃহদ্দেশী, সংগীত পারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থের একাধিক উল্লেখ ছিল, কিন্তু মূর্ছনা এবং তান সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞ উক্তি শুনে মনে হল তিনি এসব গ্রন্থে এতটুকু প্রবেশ করেননি। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে ভুল সুরের উল্লেখ, তাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মন্তব্য, শাস্ত্র সম্বন্ধে অপ্রবুদ্ধ উক্তি—অতি দীর্ঘ ভাষণে এই সমস্তই তিনি শ্রোতাদের উপহার দিয়ে গেলেন। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার এই যে তিনি উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সংগীত সম্মেলন কোন ব্যক্তির উপদেশ বা সমালোচনার জন্য আয়োজিত হয়নি—ছাত্রছাত্রীদের ভাষণ দেবার উপলক্ষও এটা নয়; বক্তা মহাশয় নিন্দার উৎসাহে এটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

যাই হোক, আমরা এই সম্মেলনের সুস্থ মনোভাব এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিশেষ সুখী হয়েছি। শিল্পীদের এই মিলনে অনেক ভুল বোঝার অবসান হবে এবং উভয়পক্ষে এক অন্তরঙ্গ যোগসূত্র গ্রথিত হবে। এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদের আন্তরিক সমর্থন ঘোষণা করি।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রসংগীত ভিন্ন রাগ-সংগীত ও নৃত্যের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনও হয়েছিল। শ্রোতারা এই অনুষ্ঠানাদিতে বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন।

বৈকুণ্ঠ বাগল বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়। অন্ততঃ বছর পাঁচেক বড় তো হবে। আমার বড়দাদার তিনি সহপাঠী ছিলেন। দেখিলে কিন্তু মনে হয় আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি অনেক ছোট। আমার দাঁত পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, এমন কি ভুরুও আর কালো নাই। কিন্তু বাগলদার একটি দাঁত পড়ে নাই, চুল দাড়ি ভুরু মিশকালো। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমি সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া নানা ঘাটের জল খাইয়াছি, এখনও খাইতেছি, বিপর্যস্ত হইয়া যখনই বাগলদার কাছে গিয়াছি তিনি সাহায্য করিয়াছেন। আমার জীবন-কাহিনী অনেকটা বহু-বিচিত্র ছিটের মতো। একটু তফাত আছে, ছিটের প্যাটার্ন একটা কাপড়ে এক রকমই থাকে। কিন্তু আমার জীবনে ছিটের প্যাটার্ন একরকম নয়। মনে হয় নানারকম ছিট জুড়িয়া জুড়িয়া আমার জীবনের কাহিনী-কথা আমার ভাগ্যদেবতা সকৌতুকে প্রস্তুত করিয়াছেন। কত রকম চাকরি আর ব্যবসা যে করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমার কথা থাক, বাগলদার কথাই বলি। বাগলদা আমাকে স্নেহ করিতেন। আমি সব সময় তাঁহার স্নেহের মর্যাদা রাখি নাই, একাধিকবার টাকা ধার লইয়া ফেরত দিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু বাগলদার স্নেহ তাহাতে নিষ্প্রভ হয় নাই।

বাগলদা সেকেলে মানুষ। বিলাসিতার ধার ধারেন না। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই। থান কাপড় পরেন। বাড়িতে খড়ম আর বাহিরে চটিজুতা ছাড়া অন্য কোন পাদুকা পছন্দই করেন না, মুখে মিশমিশে কালো গোঁফদাড়ির জঙ্গল।

আমি যখন জুতার দোকান করিয়াছিলাম তখন বাগলদাকে চটি জুতা তো দিয়াছিলামই, এক জোড়া চকোলেট রঙের গোঁফওলা পাম্‌শুও গছাইয়াছিলাম। পাম্‌শুর কথা বলিতে বাগলদা বলিলেন, "জানিসই তো আমি ও-সব পরি না।"

"পরুন না এক জোড়া, দেখি—"

জোর করিয়া পরাইয়া দিলাম, পায়ে ঠিক ফিট করিয়া গেল।

"এ নিয়ে আমি কি করব—অন্য খদ্দের পাচ্ছিস না?"

"না। গোঁফ-ওলা পাম্‌শু আজকাল পছন্দ করে না কেউ। কুড়ি টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছিলাম তখন, ওর গোঁফটার কথা ভাবি নি—"

"তবে দে—"

বাগলদা পাম্‌শু জোড়া লইয়া গেলেন। কিন্তু এক দিনও সেটা পরেন নাই। মাস দুই পরে তাঁহার বাড়ি গিয়া দেখি তাকের উপর জুতা-জোড়া সযত্নে রাখা আছে। বাগলদার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই তিনি বলিলেন, "ও দুটো আমার ভারী কাজে লেগেছে।"

"কি কাজে?"

"ও দুটোর ভিতর টুকিটাকি জিনিস রাখি। ছুঁচ, সুতো, ছুরি, ছোট কাঁচি, নস্যির ডিবে, দেশলাই, চমৎকার কাজে লেগেছে আমার।"

ইহার কিছুদিন পরে একটা সেফ্‌টি রেজার কোম্পানীর এজেণ্ট হইয়াছিলাম। বাগলদার সহিত দেখা হইতেই বলিলাম, "বাগলদা, এবার আর আপনাকে আমার খদ্দের করতে পারব না—"

"কেন, কি করিস আজকাল?"

"সেফ্‌টি রেজার বিক্রি করি।"

"কই। কেমন দেখি?"

বেশ কাজে লেগেছে আমার

প্ল্যাস্টিকের চমৎকার বাক্সে চকচকে সেফ্‌টি রেজারটি দেখাইলাম।

"দাম কত?"

"সাড়ে সাত টাকা।"

"আচ্ছা, দিয়ে যা একটা।"

বাগলদা সেটাকে পেপার-ওয়েট হিসাবে ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন।

ইহার পর আমি 'রেডিও'র এজেণ্ট পদে বাহাল হই। একটা রেডিও বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ কিছু কমিশন থাকিত। বাগলদার কাছে গেলাম।

"বাগলদা, একটা রেডিও কিনুন না।"

"রেডিও নিয়ে কি করব? তোমার বউদি তো বদ্ধ কালা। আমি নিজের লেখা-পড়া আর পুজোটুজো নিয়ে থাকি। ছেলেমেয়েরা কেউ এখানে থাকে না। কে রেডিও শুনবে?"

ইঁদুর আরশোলা সব পালায়

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমি দালাল, তবু একবার চেষ্টা করিলাম।

"আপনারা যদি কেউ না কেনেন, তা হলে এ ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। অকূল পাথারে ভাসছি দাদা, পরশু দিন আবার একটা মেয়ে হয়েছে।"

"কত দাম?"

"বেশী নয়, দু'শ' পঁচাত্তর টাকা আর সেল্‌স ট্যাক্স।" বাগলদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, দিয়ে যাস একটা—"

রেডিও দিবার মাসখানেক পরে বাগলদার সহিত দেখা হইয়াছিল।

"কি দাদা, কেমন চলছে রেডিও?"

"ওটাতে ভারী উপকার হয়েছে ভাই। ভাঁড়ারঘরে লাগিয়ে দিয়েছি ওটা। চালিয়ে দিলে ইঁদুর আরশোলা সব পালায়। চমৎকার!"

বাগলদার স্তিমিত মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৪২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি অনেক দিন হবেও না বোধ হচ্চে। এখানে ছুটি। আমাদের বাড়িতেও সমস্ত ফাঁক। বাংলাভাষার উপরে যে বই লিখছিলুম সেও শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু লেখার মতো প্রবৃত্তিও নেই। কর্মে মন বিমুখ অথচ অকর্মের বোঝাটাও বুকে চেপে আছে। কোথাও যাব কি যাব না স্থির করতে পারচি নে। যাবার হাঙ্গামাও মন মানতে চায় না অথচ না যাবার নিষ্ক্রিয়তাও মনকে উত্তেজিত করচে, আকাশে শরতের রৌদ্রের প্লাবন, সেই আলোয় কেবল এখানকার মাঠ ধুধু করচে তা নয়, আমার প্রকাণ্ড ছুটির উপরেও ছড়িয়ে পড়েছে দূর বিস্তারিত আলস্য। হাতের কাছে যা তা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাই—এই আকাশ জোড়া রোদ পোহানো অবকাশের উপযুক্ত বই পাইনে—বই ফেলে দিয়ে পাদপীঠে পা মেলে কেদারায় হেলান দিয়ে কিছুই না করার সাধনা করি। বেলা বয়ে যেতে থাকে—এর মধ্যে দিয়ে কিচিমিচি পাখির ডাক উজ্জ্বল নিস্তব্ধ নীলাকাশে আওয়াজের শিল্পকাজ বুনতে থাকে। মনটা হুহু করে। হাওয়া দিচ্চে ঈষৎ গরম—দক্ষিণ বাগানটাতে গাছে গাছে ঝিলিমিলি হেলা দোলা চলচে। বেলা এখন সাড়ে দুপুর—
•• সাড়াশব্দ নেই—অনুচর পরিচরেরা বোধ হয় মধ্যাহ্ন
...নের পর চিত হয়ে পড়ে চোখ বুজিয়েছে। কিম্বা নিভৃতে
...মাক টানচে।

এতদিন কাজের ফাঁক ছিল না কলকাতায় কিছুতেই যেতে পারি নি—এখন যেতেই হবে চোখের জন্যে। হয়তো আশ্রয় নেব ফালতার বাগানে—হয় তো তাও ঘটবে না—এইখানেই থাকব পড়ে। যদি মন যায় তবে ছবি আঁকব।

চললুম কেদারাটার দিকে। বিলিতি খবরের কাগজ এসেছে। ইতি ২৫-৯-৩৮

কবি

॥ ৪৪৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

...ণীয়াসু,

অসাধারণ গরমে মনের জোর আলগা হয়ে গেছে। ভাদ্দুরে ...রাকে উপেক্ষা করব বলে এতদিনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই ছিলেম। এমন সময়ে হঠাৎ কাল মৈত্রেয়ী এসে পীড়া...ড় লাগিয়ে দিলে পাহাড়ে যাবার জন্যে। যথেষ্ট অসম্মতি ...কাশ করেছিলুম, কিন্তু পিছন থেকে ঠেলা দিলে গরমে, ...ন সামনের থেকে টান দিলে সেখানে বউমার উপস্থিতি। টিকল না আমার জেদ, কথা দিয়েছি আগামী সোমবার যাব শৈলাভিমুখে। আমি এখন নিঃসহায়—সেক্রেটারী শিলচরে, সুধাকান্ত রোগশয্যায়, তুমি আছ গিরিডিতে—ছন্দোবন্ধনে অভ্যস্ত হাতে মালপত্র বাঁধতে বিপদ ঘটবার আশংকা। স্মৃতিপটে তোমাদের চিত্র এঁকে রেখে অপটু হাতে নিজেই যা পারি করব, তন্দ্বারা এখন লাগবে তাপ, ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে যথেষ্ট অনুতাপের সময় পাওয়া যাবে। মনের মধ্যে দ্বিধা কিছুতেই মিটচে না—শারদশ্রীর প্রসন্ন মুখ নিশ্চয়ই আসন্ন হয়েছে। কিন্তু আত্মীয়রা সবাই তাড়া লাগাচ্চে—শেষ মুহূর্তে মন বদলাতে লজ্জা বোধ হচ্চে। ইতি ৭।১০।৩৮

কবি

॥ ৪৪৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার হিমালয়ের ভ্রমণের পালা কলকাতার বেশি এগোলো না। ফিরে চললুম স্বস্থানে। দুর্বল দেহ পথিক বৃত্তির দায়িত্ব নিতে অসম্মত। সকল রকম অধ্যবসায়ে আমার মনটা বিমুখ। কোনো একটা শান্ত নিভৃত জায়গায় গভীর বিশ্রামের মধ্যে ডুব দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে পথটাকে যদি অবলুপ্ত করতে পারতুম তাহলে দ্বিধা করতুম না। নিজের উপর কি রকম বিরক্তি ধরে গেছে—মনে হচ্চে যেন অত্যন্ত বেশি দিন বেঁচে আছি। দুর্বলতাটা যেন একটা অপমান, জীবনকে প্রতিনিয়ত বঞ্চনা করা। যার জোর নেই তার বাঁচবার অধিকার নেই।

১২।১০।৩৮

কবি

॥ ৪৪৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণী,

পথিকরা ফিরে এসেছে তোমার জয়ধ্বনি করচে, রাণী দেবী রাণী দেবী ছাড়া আর কথা নেই। এতো নতুন নয়। যাদের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় ঘটে তারা এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তোমার সঙ্গে যদি যশস্বী লোক কেউ থাকে তাঁদের যশ একেবারে ম্লান হয়ে যায়, এঁরা চোখেই পড়ে না—এবারেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল, তোমার নিকটবর্তী কোনো প্রধান ব্যক্তির কেউ নামও করলে না। সমুদ্রপার থেকে মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ওস্তাদ যারা আসে, বড়ো বড়ো বাণী-করণিকের দল, আমার বিশ্বাস তাঁদেরও মনের ভাব এতদ্রূপ। রাণী দেবীর ক্ষিপ্র হস্তের এবং অতিথিদের আভ্যন্তরিক প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁদের ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস দেখে বোধ হোলো সেই সব নীরব কবিদের নীরব কবিতা অন্তর গহনে অশ্রুতিগোচর চতুর্দশপদীতে উদ্বেল হয়ে উঠচে। স্বভাবত তনয় কথা বলে কম, তুমি তার কথার উৎস ছুটিয়ে দিলে কোন্ গুণে। এবারে যখন তুমি এখানে আসবে তখন তোমার নতুন ভক্তদলের ভিড়ে আমরা পুরোনো পরিচিতরা জায়গা পাব না।

কাল রাত্তিরে গেছে ফার্স্ট প্রাইজ পাবার মতো গরম। আশ্বিন যায়, কার্তিক এলো বলে, কিন্তু ভাদ্রমাস আকাশের টুঁটি চেপে ধরেছে—হিটলারের মতো তার সর্বগ্রাসী দাবি—শীতের দিনকে সে বোধ হয় ইহুদী বলে স্থির করেছে। গিরিডিকেও সে যে ছাড়বে এমন পাত্র সে নয়।

ধবলীতে এসেছি, নিজের কোণের টানে, ঈর্ষা করতে পারি এমন ঠাণ্ডাতর জায়গা কাছাকাছি কোথাও নেই। ইতি ১৬।১০।৩৮

কবি

॥ ৪৪৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

অত্যন্ত ভুল কথা বলেছ। প্রথম চেনার চমক এবং পুঞ্জীভূত শেষের চেনার নিশ্চিত নির্ভর এই দুইয়ে মিলিয়ে যথার্থ পরিচয়ের পাকা গাঁথুনি। শেষের দিকে যে স্তব্ধতা আসে সেটা গভীরতা বশতই। ঝরনা যখন ঝরতে আরম্ভ করে তখন সে কলমুখরা, আর সরোবরে এসে যখন তার সম্পূর্ণতা হয় তখন তার প্রকাশ হয় সংযত। তখন তার আত্মপ্রমাণ কোনো কোলাহল করে না। এই জন্যে পত্র রচনার আরম্ভে থাকে সাদর সম্ভাষণ, আর শেষকালে থাকে অলমতি বিস্তরেণ। এখনো পথে যেতে যেতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দেখা হলে যদি কোমরে আঁচল বেঁধে খিচুড়ি আর মাছ চচ্চড়ি স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াও তাহলে মনের মধ্যে পথিক তনয় বাবুর মতোই আন্দোলন উঠবে—কিন্তু স্তুতিবাদটা এতই অযথা মনে হবে যে, হয়তো রান্নার নিন্দে করার দ্বারাই আনন্দ নিবেদন করব। এই ব্যাখ্যাটা হয়তো বাহুল্য হচ্ছে, অর্থাৎ তুমি ঠিক কথাটা জানো না সেটাও একটা ভান—আসল কথা, চলতি ভাষাটা ব্যবহারে অত্যন্ত মলিন, মাঝে মাঝে তাকে উলটো পিঠে পরতে হয়, যা না বলবার তাই বলা দরকার হয়ে পড়ে।—ইতিমধ্যে গরমও একটু কমেছে। ১৯।১০।৩৮

কবি

॥ ৪৪৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

চোখ কানের উপর পর্দা পড়ে গেছে বলে অত্যন্ত একলা বোধ হয়। '—' তোমার কাছে আমার চিঠি দেখে নিজের পাওনার দৈন্য উল্লেখ করে একটু খোঁটা দিয়েছে। শক্তির সম্বল যখন ক্ষয় হয়ে আসে তখন সকলের প্রতি সমপরিমাণের দাক্ষিণ্য অসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন কৃপণতার অপবাদ আত্ম-রক্ষার উপায়। জনশ্রুতি এই যে তুমি ভালোই আছ।

কাল থেকে এখানে সুনীতি ও সজনীর সমাগম। আমাদের এখানে "মুক্তির উপায়" অভিনয়ের ব্যবস্থা চলচে। ৬।১১।৩৮

কবি

॥ ৪৪৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শ্রীনিকেতনে আমাদের উৎসব শেষ করে ফিরে এলুম। রথীর পঞ্চাশবার্ষিকীটা উপলক্ষ্য বটে কিন্তু মনের মধ্যে যে একটা উদ্বোধনের প্রসারতা এনে দিলে সেটার দ্বারা আমার এই সকাল বেলাটা সার্থক হোলো। আমার প্রৌঢ় বয়সের সদ্য আরম্ভে যে সংকল্পকে এই আশ্রমের মধ্যে আহ্বান করে এনেছি বহু দুঃখ-লালিত তার বহু শাখায়িত ইতিহাসের মধ্যে আজকে আমি দাঁড়াতে পেরেছিলুম। আমার জীবনের যথার্থ কেন্দ্রস্থলের থেকে প্রভাতের শঙ্খধ্বনি আমার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌঁছল। অনেক ক্ষতি অনেক ব্যর্থতা অনেক অভাবের ভিতর দিয়ে এসেছি, সহজ হয় নি পথ—বোধ করি সেই জন্যেই ভিতর থেকে আমার এই আনন্দধ্বনি মন্দ্রিত হয়ে উঠল যে, আমার কী সৌভাগ্য। যখন ছোট করে কাজ আরম্ভ করেছিলুম তখন এর দুরূহ দাবির কথা ভাবতে পারিনি—কিন্তু সেই দুঃসাধ্য দাবিই আমাকে মস্ত বড়ো সুযোগ দিয়েছে। ত্যাগের ভিতর দিয়ে দুঃখের পথ দিয়ে আমি আপনাকে আপনি সম্মানিত করেছি এমন অবকাশ সহজে ঘটে না। ব্যক্তিগত সংকীর্ণ জীবনের সুখ দুঃখের দেনা পাওনার মাকড়শার জাল বিস্তার করে দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম, দিনের প্রথম আরম্ভে সেই কার্যসূচিই তো মানুষ ঠিক করে। তাকে যেন না বিচার করে এড়িয়ে গেছি। বাঁচিয়েছি আপনাকে আপনার ছোট আমন্ত্রণ থেকে, মাঝে মাঝে দেহ মনের দুর্বল অবস্থায় ভোগবঞ্চিত জীবনের জন্যে পরিতাপ করেছি; মনে হয়েছে সাধারণত ভোজ্যের যে পরিবেষণ মানুষের ভাগ্যে বরাদ্দ হয়ে থাকে তার চেয়ে আমার অনেক বেশি পাবারই আয়োজন ছিল, মনে করেছি হয় তো অসম্পূর্ণ সম্ভোগের কৃচ্ছ্রতায় উপবাসী অন্তরাত্মাকে শীর্ণ করেছি। ভেবেছি কবির কর্তব্য, যে কবিত্ব, তাতেই যদি অবিক্ষিপ্ত নিষ্ঠায় মন দিতে পারতুম সেটাতেই আমাকে ধন্য করত। কিন্তু যদি আমার স্বভাবে তা সম্ভব হোতো তবে সহজেই তাই আমি করতুম। কিন্তু সমগ্র মানুষকে কবিত্বের কুঠুরিতে ধরে না। সে বন্ধনে অন্তত আমি আপনাকে ভর্ৎসনা করতুম, একদা করেওছি ভর্ৎসনা। আজ সকালে অনুষ্ঠানের আসনে বসে স্পষ্ট অনুভব করলুম আমার দৈব আমাকে উত্তীর্ণ করেছেন সেইখানে, যেখানে কেবল কবিত্বের রচনাভূমি নয় যেখানে আমার আপনাকে সম্পূর্ণ করবার আত্মসৃষ্টির ক্ষেত্র। আত্মীয়মণ্ডলী থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। আজ যাঁরা আমার তপঃসাধনার পরিবেশবর্তী, তাঁরা অনেকেই আমার অন্তরের স্বাভাবিক সহচর নন। তাঁরা অনেকেই নানা অবান্তর কারণে আমার কাছে আকৃষ্ট হয়েছেন। তার চেয়ে বেশী আশা করা অন্যায় মনে করি। সেই জন্যেই রথীর পঞ্চাশবার্ষিকী উৎসব আমার মনে এমন বিশেষ পরিতৃপ্তি দিয়েছে। কেননা সাধনার যথার্থ উত্তরসাধক দুর্লভ। আমার সত্তা এই সাধনাক্ষেত্রেই দেহ পেয়েছে, এখানে ভাগ্যক্রমে যে আমার একাঙ্গ হতে পারে তার চেয়ে আত্মীয় আর কেউ নেই।

আশ্রমের উৎসবের এই প্রধান কাজ, প্রত্যেক বারে সেটা জেনেছি। এই উপলক্ষে আপনার সঙ্গে সত্য পরিচয় ঘটে। বার বার তার প্রয়োজন আছে। কেননা বার বার জড়তা এসে আমাদের নিজেকে আচ্ছন্ন করে ভুলিয়ে দেয়। তখন প্রমাদ ঘটে; কী আমার সবচেয়ে চাবার বিষয় সেইটে ভুলিয়ে দেয়। কেননা চাওয়া বড়ো না হলে পাওয়া ছোটো হয়ে যায়, আপনাকে আপনি বঞ্চিত করি।

বাকি রইল, আজ রাত্রে তাসের দেশের অভিনয়। সেটাকে এতদিন ধরে নতুন করে দিয়েছি। এখন সেটা নৃত্যনাট্যের রূপ নিয়েছে, অনেক নতুন গান জুড়ে দিতে হোলো। ভালো লেগেছে যাঁরা দেখেছেন। আমি জানি বউমা তোমাদের সশরীরে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি এই আশঙ্কায় তোমাকে আহ্বান করিনি, পাছে অসুবিধা ও অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তোমাকে আসবার জন্যে তাগিদ দেয়। এ-রকম কাজে সেটা কর্তব্য হয় না।

ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে অনেকখানি লিখেছি—আর চলচে না। ইতি ২৭।১১।৩৮

কবি

হা ও য়া য়   হা ও য়া য়

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওয়ায় হাওয়ায় এত আকুলতা—কার আকুলতা?
দুরন্ত বৃষ্টির খরধারায় সমস্ত
নিঃশেষে হারিয়ে গেছে ঃ দরোজার নির্ভরতা
দেয়ালে দেয়ালে দীপ্ত ক্যালেণ্ডারের ঝিলিমিলি
আলোর দুর্মর দম্ভ অর্থহীন রাস্তার জনতা
দুরন্ত বৃষ্টির খরধারায় সমস্ত
নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। সারি সারি সৌধ ও মিনার,
সারথীবিহীন রথ, বর্ষায় অঝোরে ভিজছে, তার
জঠরের শূন্য থেকে অকূল কুয়াশা পুঞ্জ পুঞ্জ
অকূল কুয়াশা যেন এমন কি আমার
চশমার আগল ঠেলে অপ্রাপনীয়ের মেঘভার
আমার দুচোখে সারা দেহে সেই পরার্থপরতা
সংকীর্তিত করে দিতে চায়।
আর মুহূর্তের মধ্যে সহসা যেন আমারও সর্বাঙ্গ অসাড়
হয়ে এল...যেন কবেকার শুক্লবিতান জ্যোৎস্নায়
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় ধূধূ করে...যেন কার অপরূপ চিত্রপট...
...প্রমতি-প্রমতি...ডাকতে গিয়ে
বুকের পাষাণ ঠেলে একবিন্দু রক্ত অলৌকিক একবিন্দু
রক্ত উঠে এল, যেন নিরশ্রু দুচোখ রক্তে ঝাপসা হয়ে এল!

দুরন্ত বৃষ্টির খরধারায় সমস্ত
নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। শুধু আকুলতা যেন কার আকুলতা
অবিশ্রান্ত আকুলতা কেঁপে ওঠে হাওয়ায় হাওয়ায়!

হি ং সা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

যেন কিছু বাকী নেই কিছুই ছিল না বলে বাকী
বহু শব্দ-শতাব্দীর ওপারে এখন তুমি, স্থির
দণ্ডিতের মত কবেকার কলকাতায় একাকী।
বিশ্বাস স্থাপত্যে জড় গম্বুজের অহংকারে মূলত গম্ভীর
উদাসীনতার ভানে, তবু একই শয্যার ওপর
আবার জাগবো জেনে নিদ্রাকে বিশ্বাস করে যাওয়া।
কোন দিকে কবির নিশ্বাসে কোন জানলা খোলা নেই,
কোন মুখোমুখি ঝড় ফুলের স্ফুরণবেলা করে না ঘোষণা।
বহু শব্দ শতাব্দীর আঁধার পেরিয়ে তুমি জেনেছো সাধনা
পাষাণপ্রণীত বাঁচে অনড় সত্যের সব প্রান্ত শূন্যতায়;
মানুষ শূন্যতা পেলে অন্য কিছু চায় না দ্বিধায়।
কবে রাত্রি রক্তে ছিল অবিশ্বাসী স্বপ্নে দগ্ধ প্রতিজ্ঞাপ্রতিম,
তীব্রতম হিংসা কবে নাম ধরে ডেকেছিল "অসীম! অসীম!"
—মানুষ বিশ্বাস পেলে স্বপ্ন আর দেখে না নিদ্রায়।

যে ফুটে ওঠাকে একদিন নীলিমার আশ্চর্য অবাধে
নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম, আমি চাই যে জাগুক হিংস্র বজ্রপাতে।
কেননা বিদ্যুৎ ছাড়া যোগ্য কোন আলো নেই স্পষ্ট চিনে নিতে
শিল্পের অস্থির দুঃখ চুম্বনের মত খুঁজে এক মুখ থেকে
অন্য মুখের নিভৃতে।
আজ কিছু বাকী নেই, কিছুই থাকেনি বাকী বলে
হিংসা, তীক্ষ্ন হিংসা চাই অস্থিতে মজ্জায় শেষ নৃশংস দংশন,
যেন পড়ে যেতে যেতে যেতে শুনতে পারি
শুদ্ধতম শব্দের ক্রন্দন
"অসীম কখনো কোন মানুষের নাম নয়: তবু ডাক এলে
এ ঘরের অন্ধকার সারা পৃথিবীর অন্ধকার
দেয়ালের ছোট অবরোধে ফিরে পায় পুনরাবৃত্তির ভয়।"

ছোট, কিন্তু কত ছোট জানতে হলে আকাশে তাকিয়ে
ভাবতে হয়॥

ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্তির অসংখ্য নিদর্শন যে দেশের বহু পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হয়ে আছে একথা জানা থাকলেও সেগুলি সাধারণের পক্ষে দেখার কোন সম্ভাবনা ঘটতে পারে না, যদি না যাদের সম্পত্তি তারা সে-সুযোগ দেন। প্রাচীন কীর্তিসমূহকে আইনবলে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ভুক্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই এবং সেসব সম্পত্তির অধিকারিরাও সরকারী সংগ্রহশালায় দান করার মতো উদারতা দেখাতে অনিচ্ছুক। এ অবস্থায় একদিকে আমরা দেশের বহু প্রাচীন অমূল্য কীর্তির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হয়ে রইছি, অপরদিকে শিল্পপ্রগতির ধারা সম্পর্কিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সুখের কথা, সম্প্রতি কয়েকটি পরিবার তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহগুলিকে জনসমক্ষে উপস্থিত করার মতো উদারতা দেখাতে আরম্ভ করেছেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীপ্রকাশের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে মোগল আমলের আঁকা ক্ষুদ্রাকার চিত্রের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন আকাদামি অফ ফাইন আর্টস। তাঁদেরই উদ্যোগে গত ২রা ফেব্রুয়ারি আকাদামি ভবনে উদ্বোধিত হয় রাজস্থানী চিত্রশিল্পের এক প্রদর্শনী। প্রদর্শিত একশ একুশখানি ছবি শ্রীগোপীকৃষ্ণ কানোরিয়া কর্তৃক বহু বৎসর ধরে সংগৃহীত। ১৫৮০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আঁকা এই ছবিগুলি বিভিন্ন শিল্পীর কাজ শুধুই নয়, সেই সঙ্গে রাজস্থান-মালওয়া অঞ্চলের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ দেয়। মেবার, যোধপুর, বিকানীর, জয়পুর, উদয়পুর, বুন্দি, কৃষ্ণগড়, কোটা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পধারার নিদর্শনগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রচুর রকমারিত্বের সঙ্গে আঞ্চলিক শিল্প-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণলীলা, পঞ্চতন্ত্র, শিকারের দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাণাদের প্রতিকৃতি, প্রাচীন কাব্য ও লোক-গাথা অবলম্বনে নর-নারীর প্রণয় ও অভিসারের দৃশ্য প্রভৃতি অনেক কিছুই শিল্পীদের তুলিতে চিত্রিত হয়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলি ছবিতে শিল্পীর নাম স্বাক্ষরিত দেখা যায় যা তার চেয়ে প্রাচীনতর ছবিগুলির ক্ষেত্রে দুর্লভ।

সম্পূর্ণভাবে রাজস্থানী রীতির ছবির সঙ্গে মোগল যুগের ক্ষুদ্রাকার চিত্রাঙ্কন

রাজস্থানী চিত্র কলার নিদর্শন

রীতিপ্রভাবিত ছবিও কিছু রয়েছে। কতক ছবিতে পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে বিষয়বস্তু ছাড়া রেখা ও রঙের প্রয়োগে পূর্ণ মাত্রায় মোগল ক্ষুদ্রাকার ছবির রীতির অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। রাজস্থানী ও মোগল রীতির সংমিশ্রণে আঁকা ছবির চমৎকার দৃষ্টান্ত রাজস্থান-মালওয়া অঞ্চলের শিল্পীদের কাছে পাওয়া যায়। রাজস্থানের কতকগুলি রাজ্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবির জন্য খ্যাতি অর্জন করে। এই সময়কার ছবি-গুলির মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের রাগমালার অন্তর্গত কাহিনী অবলম্বনে আঁকা ছবি রয়েছে পঁচিশখানি। এছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা 'আমন শতক' অবলম্বনে নারী-পুরুষের প্রেম বিষয়ক দৃশ্যাবলী, সুরদাসের কাব্য 'সুরসাগর' অবলম্বনে আঁকা কতকগুলি ছবি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অংকন রীতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যও বেশ পরিস্ফুট। কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে আঁকা কৃষ্ণগড়ের ছবিগুলিতে প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ, মহা-ভারত, সংস্কৃত প্রণয় কাব্য, লোকগাথা ও পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে স্বিমাত্রিক ধারার কতক-গুলি ছবির মধ্যেও দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বারো মাস এবং বিভিন্ন ঋতুর রূপে অবলম্বনে আঁকা কতকগুলি ছবিও তৎকালীন শিল্পীদের কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। এছাড়া রাজপুত রাণাদের প্রতিকৃতিও দেখা গেল কতকগুলি। উজ্জ্বল রঙে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কতকাংশে বিমূর্তন ঘটানো, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা এবং কতকগুলি রোমান্টিক ছবিতে ময়ূরকে প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করে রাজপুত শিল্পধারার একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। লাল, গোলাপি, সবুজ, হলদে রঙের সঙ্গে সোনালি রঙের আঁচড় বা চুমকির কাজ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রঙকে বাস্তবানুগ করার চেয়ে বিষয়বস্তুর কাব্যিক ভাব ফুটিয়ে তোলায় প্রতীক হিসেবে প্রয়োগেই শিল্পীদের লক্ষ্য যে ছিল, সেটা উপলব্ধি করা যায়।

প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে সবই 'মিনি-য়েচার' বা ক্ষুদ্রাকার নয়। অবশ্য অধিকাংশই তাই হলেও যোধপুরের একখানি পট রয়েছে ১৬ ফিট×৪½ ফিট মাপের। কোটার একখানি ছবির মাপ ২৫ ফিট×১৯ ফিট। সবচেয়ে বড়ো ছবি হচ্ছে মেবারের রাণার এক প্রতিকৃতি যার মাপ হচ্ছে ৫ ফিট ১ ইঞ্চি×৩ ফিট।

শিল্পরসিক মাত্রেরই মন ভরিয়ে তোলার এবং সেই সঙ্গে রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার প্রভূত সুযোগ এনে দেয় এই প্রদর্শনীটি।

* * *

বালিগঞ্জের বালিকা শিক্ষা সদনে ওখানকার ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক নানা ধরণের কাজের একটি প্রদর্শনী গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শিল্প-কর্মের মধ্যে সূচের কাজ এবং বোনার কাজ ছাড়া মাটির জিনিসের ওপর আঁকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মেয়েদের আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এই সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদের, প্রাক্তন ছাত্রীদের এবং বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীদের মায়েদেরও আঁকা ছবি ও হাতের নানা রকমের কাজও প্রদর্শিত হয়।

ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই রাজস্থান ও উত্তর ভারতের অধিবাসী বলে ওদের ছবিতে উজ্জ্বল রঙের সমাবেশই লক্ষ্য করা যায়। ছবি ছাড়া পোস্টার আঁকাতেও ছাত্রীদের প্রচেষ্টা দেখা গেল। ছবি ও পোস্টারে শিক্ষানবীশীর ছাপ থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু তাহলেও এমন কতকগুলি কাজ দেখা গেল যা শিল্পীদের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট আভাস দেয়। বিদ্যা-লয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পবিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের নিদর্শন হিসেবে এ ধরনের প্রদর্শনীর একটা সার্থকতা আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এতে উৎসাহিত হয়।

বিমল মিত্র বিরচিত "কড়ি দিয়ে কিনলাম" দেশ পত্রিকাতে সুদীর্ঘ ২॥ বৎসরকাল প্রকাশিত হওয়ার সময় ও শেষ হবার পর সব মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার অভিনন্দন পত্র এসেছে। তার মধ্যে থেকে লটারী করে কয়েকখানি চিঠির দুই একটি ছত্র আমরা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি——

আমি একজন ৫০ বৎসর বৃদ্ধ। সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার ধারাবাহিক উপন্যাস **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর চমৎকৃত হইতেছি। এমন মনোরম উপন্যাস সচরাচর চোখে পড়ে না।...পরমেশ্বর আপনার সহায় হউন এবং আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন। ১।১১।৬১ **সুবিমল ভাদুড়ী, পি১৪৬ পটুয়ারী কলোনী, কলিঃ ৪১ ॥**

আমি আপনার লেখার অনুরাগিনী পাঠিকা। ...আপনার **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** কী আগ্রহ লইয়া পড়ি বলিতে পারি না। কিন্তু এ-সংখ্যাটা (২৩শে অগ্রহায়ণ) পড়িয়া চমকিয়া উঠিয়াছি। আপনি এসংখ্যায় কার মৃত্যুর পূর্বাভাষ দিয়াছেন? লোহার লাইন কাহার উষ্ণ রক্তে স্নান করিল? এই বৃদ্ধা পাঠিকার একান্ত অনুরোধ আর যাহাই হোক এ-রক্ত যেন সতীর না হয়। এতটা নির্দয় আপনি নিশ্চয় হইবেন না। ৮।১২।৬১ **অমিয়া চৌধুরী, ৯।১৮ একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ ॥**

'কড়ি দিয়ে কিনলাম' আগামী শনিবার শেষ হয়ে যাবে বলে অত্যন্ত খারাপ লাগছে। দু'বছর যাবৎ কাহিনীটি পড়তে পড়তে গল্পটির সঙ্গে যেন ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিল নিজেরই অজান্তে। এতদিন যেমন এর শেষ জানার জন্যে অধীর আগ্রহে দিন গুণতাম এখন মনে হচ্ছে আরো কিছুদিন যদি চলতো তো ভাল হতো।

১২।১।৬২ **বন্দিতা মিত্র C/o. বরুণ উকীল, ৬৬।১ জনপথ, নিউ দিল্লী ॥**

এ যুগের সমাজ-চিত্রের বিশ্লেষণই শুধু নয়, **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** আজকের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর। এ সত্যের রূপায়ণ-উপলব্ধি শুধু নয়, সমস্ত অন্দরমহলটা ঠিক এক্সরে ছবির মত ফুটে উঠেছে। কোনও এক শেষ প্রশ্ন নিয়ে এ-উপন্যাস থামিয়ে দেয়নি। সব চেয়ে বড় উত্তর নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আজকের আমরা মনুষ্যত্বের হয়ত দাম জানি, কিন্তু মূল্য দিতে জানি না। অথচ মানুষের সব চেয়ে বড় পরিচয় মনুষ্যত্বে। এ মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ করতেই এ উপন্যাসের অবতারণা। ১১।২।৬২ **বিমান্তি ঘটক, আর্থার বন্দর রোড, কোলাবা, বোম্বাই ৫ ॥**

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** ধারাবাহিক ভাবে 'দেশে' প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। বিমলবাবুকে এই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁকে **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** পৃথিবীর অমর ঔপন্যাসিকদের স্থানে উন্নীত করেছে। ৩।২।৬২ **রবি রায়, ২৮৯ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিঃ—৬ ॥**

দীর্ঘ দু'বৎসর যাবৎ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার ধারাবাহিক উপন্যাস **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** নিয়মিত পড়ে আসছি, এবং উপন্যাসটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পাচ্ছি। সত্যি বলতে কি এরূপ সুন্দর উপন্যাস ইতিপূর্বে পড়েছি বলে মনে হয় না। তাই বাংলার ঘরে ঘরে এ-উপন্যাস দুরু দুরু বক্ষে নিষ্পলক নেত্রে উৎকর্ণ হয়ে পড়ার মত। ২।১।৬২ **শান্তি গোপাল চক্রবর্তী, ৬১, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিঃ ৫ ॥**

মহাশয়, 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিমল মিত্রের **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া পড়িয়া আসিতেছি। এই উপন্যাস পড়িয়া মনে হইয়াছে আমি যাহা পড়িলাম তাহা আমার জীবনে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ২০।১।৬২ **শ্রীদীনেশচন্দ্র বর্মণ। 'শান্তি ভবন' হালতু, ২৪ পঃ ॥**

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'** পড়লাম। দীর্ঘদিন ধরে এই উপন্যাসের উপসংহারটুকু জানার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এবং আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করছি যে সে-ধৈর্যবহন আমার সার্থক হয়েছে। উপন্যাসটি যে-জন্যে আমার ভাল লেগেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আপনার সৎ সুন্দর ও স্বাভাবিক রীতি। কোথাও কোনও বিকৃত রুচি-বিকার নেই।...পাঠকদের নিয়ে গেছেন আনন্দলোকের অসীম প্রসারতার মধ্যে। ৭।২।৬২ **সুনীলকুমার দাস, ১৪৩, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিঃ—৩১ ॥**

আজ 'দেশ' পত্রিকার ১৩শ সংখ্যায় বিংশ শতাব্দীর অসাধারণ বাঙলা ক্লাসিকের সমাপ্তি ঘটলো। বিগত প্রায় আড়াই বছর যাবৎ আমরা 'দেশ' পত্রিকার অগণিত পাঠকেরা যে অনন্যসাধারণ কাহিনীর রসাস্বাদন করেছি সেই **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'**-এর কাহিনীকার শ্রীবিমল মিত্রকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা দেখেছি বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য ইতিহাসকে, যে ইতিহাসের সুরু ফ্রি স্কুল স্ট্রীট থেকে প্যালেস-কোর্ট পর্যন্ত। যে ইতিহাস ইতিহাসে কখনও লেখা হবে না, মানুষের সেই অলিখিত মর্মান্তিক ইতিহাসকে আমরা দেখেছি। ৯।২।৬২ **শ্রীভানু ঘোষ, কে, এল, রায় টি-বি হাসপাতাল। যাদব—৩, কলিঃ ৩২ ॥**

সংবাদ পড়ে...শেষ হয়েছে তাঁর মহত্তম উপন্যাস **'কড়ি দিয়ে কিনলাম'—এই 'দেশ' পত্রিকাতেই,** যা গত দু'বছর ধরে আমি পড়েছি, পরবর্তী সংখ্যার জন্য অধীর প্রত্যাশা করে থেকেছি। দু'বছর যেন বিমলবাবু আমার পড়ুয়া মনকে নিয়ে পুতুল খেলেছেন; গড়েছেন, ভেঙেছেন। আর আমি সেই ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়েই এক যন্ত্রণাময় দিন কাটিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি এমন উপন্যাস—এমন সুন্দর এবং মহৎ উপন্যাস আমি পূর্বে পড়িনি। ৪।২।৬২ **অনুপম সেন,** Tata Malkera Colliery, Malkera, Dhanbad ॥

উপন্যাসটি আমাদের প্রত্যেকের খুব ভাল লেগেছে। আমরা বিমলবাবুকে আমাদের ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাতে চাই। দয়া করে আপনি যদি তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা লিখে পাঠান তবে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো এবং উপকৃত হবো। ১২।২।৬২ **তপতী ঘোষ, 'শান্তি ভিলা' মিয়ার রোড, চুঁচুড়া পোঃ, জিঃ হুগলী।**

লেখকের কাছে আমার একটি অনুরোধ, তা হলো এই যে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে সতীর শ্বশুরের বাড়ি ছিল কি না, এবং থাকলে কত নম্বর বাড়ি এবং দীপঙ্কর চরিত্র কি লেখকের দেখা না কল্পনার সৃষ্টি? ৪।২।৬২ **নীলিমা সরখেল, রিজেন্ট পার্ক, কলিঃ—৪০ ॥**

"কড়ি দিয়ে কিনলাম" এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বর্তমান যুগ যে আজ কিসের পিছনে ধাবিত হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে। তাই আমার মনে হয় এ শুধুই উপন্যাস নয়, এ বরং বাংলা দেশের এ যুগের ইতিহাস। আমার মনে হয় বইটি যদি নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠানো হয় তবে খুব একটা অন্যায় হবে না। ৫।২।৬২...**হেমেন্দু ঘোষাল, কোন্নগর।**

"কড়ি দিয়ে কিনলাম"-এর লেখক বিমল মিত্রকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সুদীর্ঘ এই উপন্যাসে আমাদের কৌতূহল পূর্বাপর বজায় ছিল। কিন্তু এটি আমাদিগকে শুধু টেনে রাখেনি, আমাদিগকে ভাবিয়েছে। ১০।২।৬২ **বিশ্বনাথ সরকার, বর্ধমান।**

ঘোষাল এবং তার পার্শ্বচরবৃন্দ ছিটে-ফোঁটা ইত্যাদি প্রকৃতই বাস্তব এবং সমাজকে এদের সম্বন্ধে সদাই সজাগ থাকতে হবে। লেখক এদের মুখোশ খুলে দিয়ে সমাজে ওদের দাপট কতখানি তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের নাদিদ সম্পূর্ণ বাস্তব। ১৬।২।৬২ **বীরেন পাল, নাহারকাটিয়া, আসাম ॥**

॥ বিমল মিত্রের **"কড়ি দিয়ে কিনলাম"** প্রথম খণ্ড—মূল্য ষোল টাকা ॥

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ বৃটিশ আমলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের অন্তরীণ স্থানরূপে ব্যবহৃত হতো। ভারত স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ওখানে এক নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলে। আজ ওখানকার অধিবাসী সংখ্যা চৌত্রিশ হাজার।

আন্দামানের নেগ্রিটো শ্রেণীর আদি-বাসীদের অন্যতম ওংগে। তাদের সুপ্রাচীন জীবনধারা যে আজো রক্ষা করে চলেছে, তার দৃষ্টান্ত ১। মা ও সন্তান; ২। ওংগেদের নৃত্য; ৩। ওংগে যুবক। আন্দামানের উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় ৪। রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্রটি দেখে আর নতুন অধিবাসীদের ৫। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিবিষ্টমনে কাজে আত্মনিয়োগ করা দেখে।

আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

নির্বাচন পর্ব শেষ হইয়াছে। বিশু খুড়োকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম —ততঃ কিম? খুড়ো ফোকলা দাঁতে হেসে বলিলেন—"ততঃ কচ্চাণ্ড, কচুর অণ্ড ই[illegible]র্থ। তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই সংবাদ-[illegible] নির্বাচন কেন্দ্রকে রণক্ষেত্র এবং প্রার্থী-[illegible] এক একজনকে সেপাইর সঙ্গে তুলনা [illegible] হয়েছে। আর যা দেখেও বুঝতে পারনি, [illegible] হল প্রতীক চিহ্নে মার্কা দেওয়ার সেই [illegible]পটি। মনে করে দেখ ওটা একটা কাটা [illegible] অর্থাৎ সবাইকে কাটা সৈনিক করে ছেড়ে এসেছি আমরা। সুতরাং আমাদের ভাগ্যে কচ্চাণ্ড ছাড়া আর কী জুটবে!!"

এই নির্বাচনে কার কী লাভ হইল সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের শ্যামলাল বলিল—"লাভ যাদের হয়েছে তারা হল ময়লা কাগজওলা, লরিট্রাকওলা, ফুলওলা আর কলকাতা কর্পোরেশন। শেষে যাদের নাম বলা হল তাঁরা এরি মধ্যে একদিন ফুকটসে ছুটি মেরেছেন!"

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া নির্বাচনের ফল দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন—আমাদের উচিত হবে "এণ্ড" করা অথবা "মেণ্ড" করা। —"ঠিক বলেছেন। আমরা ক্রিকেটেও বলে থাকি—হিট আউট অর গেট আউট"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ঘোড় দৌড়ের মাঠে গেল শনিবারে একটা ঘোড়া জিতেছে, তার নাম "গুড সিলেকশন"। নির্বাচনের সঙ্গে এই ঘোড়ার নামের কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা বলা শক্ত।"

পশ্চিমবঙ্গে ছয়জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে আসন লাভ করেছেন। —"আপত্তিটা আমাদের শুধু মহিলাদের ট্রামে বাসে আসন ছাড়তে, আইন পরিষদের আসন দিতে আমরা একেবারে দাতা কর্ণ"—ট্রামের ভীড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বলে শ্যামলাল।

নির্বাচন পর্ব শেষ—এবার ক্ষমতার রাজনীতি খেলা'—একটি সংবাদের শিরোনামা। খুড়ো বলিলেন—"এ আর নূতন কথা কী। ক্রিকেটের পর হকি, হকির পরে ফুটবল, নির্বাচনের পর ক্ষমতার কলাটি—এ তো চিরকালই চলে আসছে।"

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে শ্রীকৃষ্ণ মেনন আচার্য কৃপালনীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদে বলা হইয়াছে এই সাক্ষাৎকারে কোন রকম রাজনৈতিক আলোচনা হয় নাই।—"হয়ত শুধু আবহাওয়া আর অষ্টগ্রহ সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে"—বলে শ্যাম-লাল।

সংবাদে বলা হইয়াছে "চীনপন্থী" আর "রুশপন্থী"দের মধ্যে বিবাদ (বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে) আর ঢাকিয়া রাখা গেল না।—"কী করেই বা যাবে। শাক দিয়ে মাছ যদি-বা ঢাকা যায়, দলীয় লাট্টুমাট্টুম কখনো যায় না। তবে আমরা ভাবছিলাম ছুঁচোর কেত্তনটা একটু রয়ে-সয়েই শুরু হবে"—বলেন, জনৈক সহযাত্রী।

কমিউনিস্ট পার্টির সংকট প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—এই বিপর্যয়ের জন্য নাকি নেতৃত্বের নিকট জবাবদিহি দাবীর সম্ভাবনা।—"এবারে মিছিলের নব রূপায়ন; চলবে না—চলবে না অচল, এবারে জবাব চাই। জবাব চাই। মন্দ কী, একটু মুখ বদলানো যাবে"—বলেন এক সহযাত্রী।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে জানাইয়াছেন আলীপুর কেন্দ্রে এক কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ির সম্মুখে শোভাযাত্রীরা নাকি "বস্ত্র ত্যাগ করে নৃত্য করতে থাকেন"। শ্যাম-লাল বলিল—"তথাপি চোংড়া ন চ ভদ্র-লোকাঃ ছাড়া কী আর বলতে পারি!!"

এক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, সুখী স্বামীরা পথের দুর্ঘটনায় কম পতিত হন। —"হতে পারে, তবে একথাও ঠিক, অসুখী স্বামীরা পথের দুর্ঘটনার চেয়ে বাড়ির দুর্ঘটনাতেই মরেন বেশী, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন"—বলেন বিশু খুড়ো।

এই সংবাদেই বলা হইয়াছে যাঁহারা বধির তাঁহারা নাকি ভাল গাড়ি চালায়।—"এইবারে বোঝা গেল চীৎকার করে ডাকাডাকি করলেও কেন ট্যাক্সি ড্রাইভাররা শুনতে পায় না"—বলেন এক সহযাত্রী।

লালবাজারে শুনিলাম ভূতের উপদ্রব চলিতেছে।—"তা হলেই বুঝুন, লাকি-মিতাদের কেরামতি শুধু খুনী ধরায়, ভূতের কাছে সব ঢিট"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ভারতীয় মেডিক্যাল রিসার্চ আহার্য-বিধির একটি অ্যাটলাস রচনা করিতেছেন। শরীর পুষ্টি যে খাদ্যে সহজে নিষ্পন্ন হয় সেই খাদ্যের পরিচয় ও বিবরণ এই আহার্য পঞ্জিকায় থাকিবে।—"এ পঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে তার একখানা ডাইরেক্টরীও ছাপা দরকার, দামের কথা এখন নয় নাই তুললাম"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নে গুরুত্বের পরিবর্তনের সংবাদ পাঠ করিলাম। শুনিলাম বাংলা ও অন্যান্য মাতৃভাষা হইতে অনুবাদ করিতে না বলিয়া এখন হইতে নাকি গল্প লিখিতে বলা হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"গল্পগুলি বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখবেন কিনা তা এখনও সংবাদে বলা হয়নি; রক্ষাই ভালো, তা নইলে প্রকাশকদের গাত্রজ্বালা ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা!!"

বিলাতে কলের নার্স তৈয়ারির একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"এই নার্সারি নার্সারি। বাইরের ঢেউ কোথায় গিয়ে শেষ হয় কে জানে। সেবারত দুটি হস্তের কল্যাণ স্পর্শের বদলে কলের স্পর্শের কথা ভাবতেই যে মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম হয়!!"

পূর্ব পাকিস্তানে সংস্কৃত ও পালি বোর্ড গঠনের সংবাদ শুনিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"খুবই ভাল কথা। কিন্তু সংস্কৃতে নর শব্দের পরিবর্তে আদমী শব্দের রূপ শেখানো হবে কিনা জানা যায়নি!!"

সংবাদের শিরোনামা দেখিলাম,—'বিকল্প' একটি শব্দ মাত্র।—"তাই হবে। আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাই ভাবছিলাম—এতটুকু শব্দ হতে, এত কী হয়"—বলে শ্যামলাল।

গঙ্গা পারাপারের জন্য শুনিলাম নূতন সেতুর ব্যবস্থা হইতেছে। বুড়ো খুড়ো বলিলেন—"হয় ভালোই, না হলে কল্পনা তো আছেই, বৈতরণী পারের আর ভাবনা কী!!"

জাপানী জর্নাল

'দেশ'-সম্পাদক সমীপেষু,—

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সে-দেশে ইংরেজী ভাষার স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, আমাদের দেশের ভাবুকমাত্রেরই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত বলে মনে করি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব জাপানের অতি-গভীরে প্রবেশ করেছে। এ প্রভাব সম্প্রতিক কালের ঘটনা নয়, বহুকাল থেকেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে জাপান স্বীকার করে আত্মস্থ করে নিয়েছে। এ কথা প্রায় সকলেরই জানা। অথচ এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে যে ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, তা নয়। বুদ্ধদেববাবু জাপানের এই মহৎ কীর্তিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে আমাদের মনোযোগ সেদিকে ফেরাবার চেষ্টা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছে। স্বদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করলে আমরা সংকীর্ণ ও প্রাদেশিক হয়ে পড়ব। আধুনিক চিন্তার বায়ুপথ আমরা রুদ্ধ করব এবং উচ্চতর বিজ্ঞান এবং কারুশিল্পের প্রকাশ ভাষার দীনতা ঘটবে। এইসব যুক্তিই বুদ্ধদেববাবু জানেন কিন্তু তিনি বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে জাপানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা মূল প্রশ্নকে আমাদের সামনে উত্থাপিত করেছেন, "মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় কিনা, সত্য কিনা এই ধারণা যে ইংরেজের ছেলে যেমন ইংরেজীতে, তেমনি বাঙালীর ছেলে বাংলায় পড়লে যা শিখবে তা যে-ভাবে তার মনে প্রাণে রক্তে গিয়ে মিশবে, সে-রকম কোনো পর-ভাষার দ্বারা হতেই পারে না।"

কথাটা নিছক চিন্তাবিলাস নয়। কারণ যদি ভেবে দেখি 'আধুনিক ভাবধারা'কে গ্রহণ করার অর্থ কি তা হলে এর সার্থকতা বুঝতে পারি। আধুনিকতা কতটা কি শুধু নাগরিক-সমাজের জন্যে, যারা ইংরেজী পড়ে ভালো ভালো সরকারী অথবা বে-সরকারী চাকরি করবে এবং যারা নিজেদের একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তুলে সমগ্র দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে? যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ইংরেজী শিক্ষা পাবে না, তাদের কি প্রয়োজন নেই আধুনিক চিন্তায়, মনন-প্রণালীতে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার? যাঁরা বলেন ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন না করলে দেশের সর্বনাশ হবে, তাঁরা কি সমগ্র দেশের মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে এ কথা বলেন? আমাদের দেশের সামনে এখন যে লক্ষ্য আছে অগণিত জনসাধারণের মধ্যে মধ্যযুগীয় অন্ধকারকে ঘুচিয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার তার উপায় কি মাতৃভাষার সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক চেতনাকে নিঃশ্বাসের মতোই সহজ করে নেওয়াতেই নিহিত নেই। বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, "এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে উজ্জ্বলতম উদাহরণ জাপান। উজ্জ্বলতম এইজন্যে যে, জাপানও এশিয়া, আর এশিয়ার মধ্যে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়কর। এই অভ্যুত্থানের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, এখানে নব্যতম প্রতীচ্যতম বিদ্যাও মাতৃভাষাতে বিকীর্ণ হয়েছে; জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ করে নিয়েও কখনো পর-ভাষার দাসত্ব করার মতো আত্মঘাতী ভুল করে নি।"

এই প্রসঙ্গে লেখক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতের কথা বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদবী-সম্মান-

বিতরণ' সভার সম্ভাষণ পর্যন্ত বারবার এই কথাই বলে গিয়েছেন। জাপানের দৃষ্টান্তও রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ দিয়েছিলেন। ১৯১৫-তে লেখা 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে সম্ভবত প্রথম তিনি এর উল্লেখ করেন; তারপর ১৯৩৩-এ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধেও জাপানকে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহার করেন। এমন কি বুদ্ধদেববাবুর ব্যবহৃত 'পরভাষা' এই শব্দটিও রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। বুদ্ধদেববাবু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করে এই প্রসঙ্গটির সময়োচিত অবতারণা করলেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেদিন যা ইংরেজী শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"

পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ ক্রমে ক্রমে দেখা দিচ্ছেন, এটাই বড়ো ভরসার কথা।

ভবতোষ দত্ত, কলিকাতা।

তৃতীয় রায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

এবছরের সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণের রায় নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের পক্ষে। গত দুটো নির্বাচনেও (১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে) কংগ্রেসের দিকেই রায় দিয়েছিল জনসাধারণ। তবু এবারের নির্বাচনে যে-উত্তেজনার ঢেউ উঠেছিল, তা বোধহয় আগে আর দেখা যায়নি।

এই উত্তেজনা মুখ্যত সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর তীব্র রাজনৈতিক লড়াইয়ের ফলে। প্রজাতন্ত্র ভারতের শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক মতবিরোধ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে। ভারতের গণতন্ত্রেই বিরুদ্ধ মতবাদের সহঅবস্থান সম্ভব। কিন্তু আদর্শগত সেই বিরোধ যখন শাসনযন্ত্র অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তখন সংঘাত আসবেই। উত্তেজিত হবার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হবেই।

সেই আবহাওয়াই এবারের সাধারণ নির্বাচনকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে ভারতের একুশ কোটি স্ত্রী-পুরুষকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাদের মনোনীত সরকার গঠন করতে রাজ্যে ও কেন্দ্রে। সে-মনোনয়নের পালা যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে লোকসভায় এবং দুটি রাজ্য ছাড়া আর সব কটি রাজ্যে।

তবু এই নির্বাচনের আলোড়নের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে ছোট বড় মহীরুহ। যেমন তলিয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের দিকপাল শ্রীবলবন্তরাই মেহতা গুজরাটে, কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু মধ্যপ্রদেশে অথবা লোকসভায় আসনপ্রার্থী ডাঃ বি ভি কেশকার এবং কম্যুনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গে।

আর গিয়েছেন আচার্য কৃপালনী উত্তর বোম্বাই কেন্দ্রে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন শুধু কংগ্রেসেরই নয়, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সমর্থন নিয়ে লড়েছিলেন আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে। উত্তর বোম্বাই কেন্দ্রের লড়াই তাই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আদর্শগত সংঘর্ষ ছিল বলেই উত্তর বোম্বাইয়ের নির্বাচন এত আলোড়ন তুলেছিল। ঠিক এমনি একটা সংঘর্ষ ছিল বলেই এবারের নির্বাচনে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল এই পশ্চিম বাংলায়। সংঘর্ষটি লেগেছিল কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে।

রাজ্যের বিধান সভায় দলগত শক্তিই যদি নির্বাচনে হার-জিতের মাপকাঠি হয়, তবে বলতেই হবে পরাজয় কারো ঘটেনি। কংগ্রেসের ত নয়ই। কম্যুনিস্ট পার্টিরও নয়। কারণ, দল হিসেবে কম্যুনিস্ট পার্টি কিছু বেশী শক্তিশালী নিশ্চয়ই হয়েছে। এবং কংগ্রেস যে শুধু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে তা নয়, দলবৃদ্ধিও করেছে।

তাই দেখা যায়, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ২৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দখল করে ১৫২টি আসন (কংগ্রেস সমর্থিত ও নির্বাচিত নির্দলীয় প্রার্থীর একটি আসন নিয়ে) এবং কম্যুনিস্ট পার্টি দখল করে ৪৬টি আসন। এবারের নির্বাচনের ফলে, কংগ্রেস পেয়েছে ১৫৭টি আসন, অর্থাৎ গতবারের তুলনায় আরও পাঁচটি আসন কংগ্রেসের হাতে এসেছে। আর কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছে ৪৯টি, অর্থাৎ অতিরিক্ত তিনটি আসন।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে এটাই সমগ্র পটভূমি নয়। তার কারণ, প্রাক-নির্বাচনীকালে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং আরও পাঁচটি ছোটখাট রাজনৈতিক দল যে জোট গড়ে তোলে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে এবারের ভাঙাগড়া। তাছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিম বাংলায় "বিকল্প" সরকার গঠনের যে শ্লোগান তুলেছিল, সেটাই ছিল এবারের

পশ্চিম বাংলার নতুন বিধান সভা

উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল। বললে ভুল হবে না যে, এই শ্লোগানই নির্বাচনের প্রধান 'ইসু'। এই 'ইসু'কে ভিত্তি করেই পশ্চিম বাংলার ভোটদাতারা তাদের সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল। সেই সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনভাবে কংগ্রেসের অনুকূলে গিয়েছে বলেই তৃতীয় নির্বাচনের রাজনৈতিক খতিয়ান একমাত্র আসন দখল বা বেদখল দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়।

এই রাজনৈতিক বিচার বা বিশ্লেষণের আগে নির্বাচনের সমগ্র ছবিটা জেনে রাখা ভাল। সেই হিসেবটা সামনে রাখলে পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য দেখা যাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ১৫৭ জন কংগ্রেস সদস্য দখল করেছেন স্পীকারের ডানদিকের আসন-গুলো; শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে ৫০ জন (মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য শ্রীঅমর বসুকে নিয়ে) সদস্য দখল করেছেন বাঁদিকের বেশীর ভাগ আসনগুলো। আর যারা থাকবেন বাঁদিকের আসনে, তাঁরা হলেন শ্রীহেমন্ত বসুর নেতৃত্বে ১৩ জন ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য; সাতজন আর-এস-পি সদস্য; দুজন আর-সি-পি-আই সদস্য (এই প্রথম তাঁরা এলেন বিধান সভায়); চারজন লোক-সেবক সংঘ সদস্য; দুজন গোর্খা লীগ সদস্য; পাঁচজন (ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্ববিহীন) প্রজা-সোস্যালিস্ট; এবং ১২ জন নির্দলীয়।

এই হিসেব থেকে দেখা যাবে যে, যদিও কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, সমগ্র বিরোধী দলের শক্তি কমেছে, ১৯৫৭ সালের নির্বাচন ফলাফলের তুলনায়। সে-সময় সমগ্র বিরোধী দলের শক্তি ছিল ১০০ জন সদস্য। এবার দাঁড়িয়েছে ৯৫। বিরোধী পক্ষের এই ঘাটতি কংগ্রেস পক্ষের লাভ হিসেবে দেখা দিয়েছে। অথচ দলগত-ভাবে দলবৃদ্ধি ঘটেছে কম্যুনিস্ট পার্টির, ফরোয়ার্ড ব্লকের, আর-এস-পি'র এবং নির্দলীয় গুচ্ছে।

স্বভাবতই তা হলে প্রশ্ন ওঠেঃ এই দল-বৃদ্ধি ঘটল কি করে? বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির ক্ষতি দিয়েই সব ক'টা দলের স্ফীতি ঘটেছে। এবং আরও বড় প্রশ্নঃ দলগত শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট মহল নিরুৎসাহ কেন?

এই প্রশ্নের রাজনৈতিক অংশ একটা নিশ্চয়ই আছে এবং পরে সেটা আলোচনা করা যাবে। আপাতত ভোটদাতাদের মেজাজের (ইংরেজীতে যাকে swing বলা হয়) দিকে তাকালে প্রশ্নটার সংখ্যানুপাতিক একটা সদুত্তর পাওয়া সম্ভব।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এবারের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতনা। সারা পশ্চিম বাংলায় দেখা গেছে, ভোটদাতারা দলে দলে এসেছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাদের সুচিন্তিত রায় জানাবার জন্যে। প্রতি কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ এসেছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ভোট দিতে। ফলে সামগ্রিকভাবে শতকরা ভোটের হার বেশ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত দুটো নির্বাচনের হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫২ সালে পশ্চিম বাংলার মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১,২৪,১৫,১০৭ এবং তাদের প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭৪,৪৪,২২৫, অর্থাৎ শতকরা ৪২টি ভোট পড়েছিল। ১৯৫৭ সালে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১,৫২,১৬,৫০২ এবং তাদের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ১,০৪,৬৯,৮০৩ অথবা শতকরা ৪৭·৭৩। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটদাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১,৬১,৮৪,৬৮৫ এবং তাদের মধ্যে ভোট দিয়েছিল ৯৫,৪৩,২১৫ অর্থাৎ শতকরা ৫৮·৮৬ জন।

ভোটদাতাদের মধ্যে এই উৎসাহ ছিল

বলেই হয়ত ভোটদানের সময় রাজনৈতিক চেতনা এত তীব্রভাবে ফুটে উঠেছিল। সেই চেতনায় যে ছায়া পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর, তা থেকে দেখা যায় যে, যারা এবার ভোট দিয়েছিল, তাদের মধ্যে ৪৫,২২,৭২৬ জন ভোট দিয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষে। অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৭·৪০ অংশ গিয়েছে কংগ্রেসের দিকে। গতবারের তুলনায় কংগ্রেসের ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১·২৬, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, গতবারের তুলনায় এবারে কংগ্রেসের প্রার্থী-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র একজন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কংগ্রেস প্রার্থী-সংখ্যা প্রায় সমান থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভাগে বেশী ভোট পড়েছে শতকরা ১·২৬।

অপরদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে, গতবারের নির্বাচনে এদের প্রার্থী-সংখ্যা ছিল ১০৩ জন। এবার সেই সংখ্যা ছিল ১৪৩ জন, ৪০ জন বেশী। ফলে, কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে ভোটের ভাগ পড়েছে ২৩,৭৯,৫৬৮টি, অর্থাৎ শতকরা ২৪·৯৮ ভোট। গতবারের তুলনায় কম্যুনিস্ট পার্টির শতকরা ভোটের ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭·১২। এই বাড়তি ভোট এসেছে দুরকমে। প্রথমত, বাড়তি ৪০ জন প্রার্থী নতুন কেন্দ্র থেকে ভোট জুগিয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, এবং প্রধানত এসেছে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের এবং অংশত নির্দলীয় ও অন্যান্য ছোটখাট দলের কাছ থেকে।

কারণ, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির ভোটাংশ এবার শতকরা পাঁচ। গতবারের তুলনায় এবার কমেছে শতকরা ৪·৮৫। এই তিনটি দল ছাড়া বাকি যারা নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের ভোট-সংখ্যা এবার কমেছে, গতবারের তুলনায় শতকরা ৩·৯০। তা হলে সব মিলিয়ে এই ঘাটতি দাঁড়ায় শতকরা ৮·৭৫। এই ঘাটতি দিয়েই লাভের ঘর পূর্ণ হয়েছে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির। কিন্তু এই লাভের অংশে ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি দলের কিছু ভাগ আছে বলেও দেখা যায়। এবার ভোটদাতাদের সামগ্রিক [illegible] কংগ্রেসের দিকেই। এই বাড়তির পরিমাণ এবার দাঁড়িয়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১·৬৩। গতবারের নির্বাচনে এ ঝোঁক ছিল খুব সামান্য। প্রায় শতকরা ০·২৩।

এটাই হল এ-নির্বাচনের মূল তাৎপর্য। বাকি সমগ্র অংশটাই রাজনৈতিক। সেখানেও এবার চটকের অন্ত ছিল না। সেই চটকের চমক লেগেছে প্রধানত কলকাতায় এবং আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে। কারণ এই অঞ্চল জুড়েই দেখা গিয়েছে কংগ্রেসের চমকপ্রদ বিজয় অভিযান।

কলকাতায় গতবার কংগ্রেস ৮টি আসন হারিয়েছিল। এবার ছটি আসন পুনরুদ্ধার করেছে। শুধু তাই নয়, দেখা যায় এই উদ্ধার কার্যের চাপে পড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়েছেন জাঁদরেল কম্যুনিস্ট ও বামপন্থী নেতারা। যেমন হেরেছেন শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন কালীঘাটে কংগ্রেস সদস্যা শ্রীমতী বিভা মিত্রের কাছে। শ্রীমোহিত মৈত্র হেরেছেন কাশীপুরে ডাঃ সুশীল দাশগুপ্তের কাছে। আর সবাইকে তাক লাগিয়ে জিতেছেন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মুচিপাড়ায়। তিনি হারিয়েছেন শ্রীযতীন

জেলাগুলোর রাজনৈতিক ছবি

চক্রবর্তীকে। ফলে গত নির্বাচনে কলকাতায় কম্যুনিস্টদের হাতে যে ১২টি আসন ছিল, তার একটি একটি করে হাতছাড়া হয়ে এবার মোট এসে দাঁড়িয়েছে ৮টিতে।

এবং এই নির্বাচনে কলকাতায় যদি সবচাইতে বেশী কোন দলের ক্ষতি হয়ে থাকে, সে-দল হল প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি। গতবারের নির্বাচনে এই দল কলকাতায় পেয়েছিল ৪টি আসন। এবার একটিও না।

কলকাতার বাইরে, শিল্পাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলেও বিরোধী দলের বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন ঘটেছে হাসনাবাদে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীহেমন্ত ঘোষালের পরাজয়ে; কিম্বা বজবজ বা মহেশতলায় কংগ্রেসের সাফল্যে। এমনকি, শ্রীদাশরথি তা-এর মত জাঁদরেল প্রজা-সোস্যালিস্টকেও কংগ্রেস হারিয়ে দিয়েছে বর্ধমানের রায়না কেন্দ্রে, যেখানে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস কোন আসন পায়নি। সর্বোপরি বর্ধমানের মহারানী অধিরানী যেভাবে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীবিনয় চৌধুরীকেও এবার বিপুল ভোটাধিক্যে হারিয়ে দিয়েছেন, তা কংগ্রেস সমর্থকদেরও চমকে দিয়েছে। এই সাফল্য থেকে যা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে সেটা এই যে, মহানগরী ও শিল্পাঞ্চল আজ আর লাল ঝাণ্ডার কুক্ষিগত নয়। এই সব অঞ্চলে কংগ্রেসের অনুপ্রবেশ অত্যন্ত নিঃশব্দে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

এটাই কংগ্রেস পক্ষের প্রধান রাজনৈতিক লাভ। ক্ষতি যে কংগ্রেসের হয়নি, তা নয়। হয়েছে এবং বেশ ভালভাবেই হয়েছে কোচ-বিহারে, মুর্শিদাবাদে ও নদীয়ায়। কংগ্রেসের অধিকারে এই সব জেলায় যে আসন ছিল, তার বেশীর ভাগই হারাতে হয়েছে এই নির্বাচনে। তবু এই লাভক্ষতির খতিয়ান বিচার করলে দেখা যায় যে, সব-গুলো জেলায় কংগ্রেস যেমন হারিয়েছে ২৬টি আসন, তেমনি লাভ করেছে ৩১টি আসন। ফলে, কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা এবার বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচটি।

তা হলে মূল প্রশ্ন দাঁড়ায়, এবারের নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক চেহারায় যে পরিবর্তন ঘটে গেল, তা ঘটল কি কারণে। যদি মনে করা হয় যে, কোন একটা কারণে এই পরিবর্তন ঘটেছে, তা হলে ভুল মনে করা হবে। অনেকগুলো রাজ-নৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার সংযোগেই ঘটেছে এই পরিবর্তন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

॥ ৫ ॥

চিঠিটা পড়ে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন গণেশ হালদার। রূপ মানুষকে অভিভূত করে। অভিভূত হয়েই বসে রইলেন খানিকক্ষণ। এ রকম রূপ আগে কখনও দেখেন নি তিনি। বুলবুলিও দেখতে সুন্দর ছিল, তার সৌন্দর্যের মধ্যেও একটা শিকারীভাব ছিল যার জন্যে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন মাছরাঙা, কিন্তু ঝিনুকের সৌন্দর্য আরও তীক্ষ্ণ, ও যেন আসল ইস্পাতের একখানা ঝকঝকে তলোয়ার, আর সেই তলোয়ারের উপর প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। গণেশ হালদার কৌতূহলী হলেন। এ মেয়ে গোয়ালের পাল্লায় পড়ল কি করে? সেদিন তো চাবির গোছা ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, আবার কি ফিরে গেছে? পর পর এই ধরনের চিন্তার ঢেউ তাঁর মনে এসে লাগতে লাগল খানিক-ক্ষণ। তারপর যে কথাটা বিদ্যুৎচমকের মত অভিভূত করে ফেলল তাঁকে তা ঝিনুকের চিঠির একটি লাইনেই ছিল— 'ডাক্তার মুখার্জির জোরে আপনি এখানে এসেছেন।' ডাক্তার মুখার্জির জোরে! তিনি তো স্কুল কমিটিতে নেই। তাঁর টাকাতেই যে স্কুলের লাইব্রেরিটি হয়েছে এ খবরও তিনি জানতেন না। লাইব্রেরিতে ডাক্তার মুখার্জি নিজের নাম দিতে দেন নি। স্কুল কমিটির একটা অধিবেশনে এই দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল কেবল। কিন্তু এ সব খবর হালদার জানতেন না। ডাক্তার মুখার্জিও তো তাঁকে কিছু বলেন নি। অন্য লোক হলে আস্ফালন করত, নানা ছুতোয় প্রকাশ করত আমিই তোমার চাকরিটা করে দিয়েছি। কিন্তু উনি ঘুণাক্ষরেও এ প্রসঙ্গ তোলেন নি একদিনও। উনি এত অন্যমনস্ক থাকেন যে, সে কথা হয়তো ওঁর মনেও নেই। হঠাৎ গণেশ হালদারের ইচ্ছা হল ডাক্তার মুখার্জিকে একটা প্রণাম করে আসেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। উনি এখন তাঁর কুকুর-মুরগী-বাগান-আকাশ নিয়ে এমন একটা নিশ্ছিদ্র পরিবেশে বসে আছেন যে, তার মধ্যে ঢোকা শক্ত, ঢোকা উচিতও নয়, কারণ হালদার মশায়ের ধারণা, এ সময়ে কেউ গেলে তিনি বিরক্ত হন। তাই তিনি তাঁর সেই খাতাটা বার করলেন যাতে তিনি তাঁর লেখা লেখেন। ওই লেখার মধ্যেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেছেন, ওইগুলো পড়লেই তাঁকে যেন ঠিক চেনা যায়, এই তাঁর ধারণা। তাঁর ইচ্ছে খাতাটার একটা নামকরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও পছন্দসই নাম তাঁর মাথায় আসে নি। মাত্র তিনটি লেখাই তিনি দিয়েছেন এ পর্যন্ত, তিনটি লেখা তিন রকম। সেইগুলোই আবার পড়তে লাগলেন তিনি। সেই পড়ার ভিতর দিয়েই যেন তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে লাগলেন। লেখাগুলো তিনি সাজিয়েছেন 'অ' 'আ' প্রভৃতি বর্ণমালা দিয়ে। তিনি ভেবে রেখেছেন শেষ পর্যন্ত বইটার নাম 'বর্ণমালা'ই দেবেন। নানা রঙের খেলা আছে লেখাগুলোর মধ্যে। তা ছাড়া আর একটা মানেও হয়। ওঁর রহস্যময় চরিত্র-গ্রন্থ এই সব বর্ণমালাতেই বিধৃত হয়ে আছে। পড়তে লাগলেন।

মানুষ বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনেক বড় হয়েছে, সে মাটির নীচে শহর বসাবার কল্পনা করেছে, আকাশে উঠে চাঁদের সঙ্গে মিতালি জমাবার চেষ্টায় আছে, তার এ ক্ষমতাও নাকি হয়েছে যে, সে নিজের ঘরে বসে সুইচ টিপে আর একটা দেশ ধ্বংস করে দিতে পারে। সবই হয়েছে, কিন্তু বিনয়ের বড়ই অভাব। আমাদের এখানকার পণ্ডিতজীর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি সংস্কৃতে সপ্ততীর্থ তো বটেনই, ইংরেজী, বাংলা, এমন কি উর্দুতেও তাঁর প্রচুর জ্ঞান। কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই। মুখে

সর্বদাই স্নিগ্ধ মধুর হাসি। তাঁর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় গঙ্গায় অবগাহন করলাম। সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিনয়ী। কেন জানি না, ইংরেজী-নবীসরা একটু যেন উদ্ধত। তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ একটু যেন বেশী কঠোর। তারা আঙুরের মতো নয়, বেলের মতো। বেলটিকে কিন্তু অহঙ্কারের গজ গ্রাস করেছেন। এ শিক্ষার বাইরের চেহারাটা হয়তো বজায় থাকবে কিছুকাল, কিন্তু সেটা থাকবে গজভুক্তকপিত্থবৎ। অন্তঃসারশূন্য। এত কথা লিখলাম একটি লাল সুতোর জন্য। সেদিন মাঠে একপাল শালিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করছিলাম। ওরা সমাজবাসী মানুষের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত। ভাবছিলাম, হয়তো আমল দেবে, কিন্তু দিলে না। দেখলাম, ওদের সঙ্গে আলাপ করাও সহজ নয়। শুনেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাখিদের সঙ্গে ভাব করেছিলেন, কিন্তু আমি পারলাম না। দেখলাম, একটু কাছাকাছি এলেই ওরা 'পিড়িং' করে উড়ে পালাচ্ছে সদলবলে। তবু কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নি, ওদের পিছু পিছু সন্তর্পণে যাচ্ছিলাম ধান গম ছড়াতে ছড়াতে, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল সুতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে মাঠের মধ্যে। কুড়িয়ে নিলাম। দেখলাম শুধু লাল নয়, হলদে এবং জরির সুতোও জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। আর সুতোর দুই প্রান্তে দুটি রঙীন থোপনা। বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা রাখী, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালবাসা অনেক ঐতিহ্য। মনে হল কোথা থেকে এল এটা এখানে? এমন সময় সুট্ করে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা সাইকেল। দেখলাম তরুণ প্রফেসার হরেন চট্টখণ্ডী যাচ্ছেন। পরনে সাহেবী পোশাক, চোখে কালো গগলস্। কিছুদূরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আমার দিকে, তারপর যেমন যাচ্ছিলেন যেতে লাগলেন। একটা নমস্কার করলেন না, আমাকে যে চেনেন তারও কোনও আভাস ফুটল না তাঁর মুখে। অথচ উনি আমাকে খুব চেনেন, ওঁর ছেলে-মেয়ের চিকিৎসা করেছি বিনা পয়সায়, কিন্তু তাঁর ব্যবহার দেখে মনে হল, আমি তাঁর অপরিচিত। মনে হল দেখতে পান নি। তবু আমি ডাকলাম। সাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে এলেন তিনি। সবিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ডাকছিলেন? কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তার সুর একটুও বাজল না, এবং মনে হল বিরক্তই হয়েছেন। বললাম, 'এই রাখীটা এখানে কি করে এল বলুন তো?' শুনে তিনি বিলিতী কায়দায় শ্রাগ (shrug) করলেন, তারপর বললেন, 'এ বিষয়ে কোনও আলোকপাত করতে পারলাম না, সরি।' এই বলে আর একবার শ্রাগ্ করে চলে গেলেন। তাঁর কথার মধ্যে কোনও অভদ্রতা নেই, কিন্তু কেমন যেন সহৃদয়তার অভাব। ব্যবহারটা অনাত্মীয়-সুলভ। অথচ, ভগবান জানেন, ওঁর সঙ্গে আমি বরাবর আত্মীয়সুলভ ব্যবহারই করে এসেছি। অনেকক্ষণ সাইকেলটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শালিকগুলো ফিরে এসে আমার ছড়ানো খাবারগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমি সেদিকে চাইতেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেল। ওরা চুরি করে খাচ্ছিল! আমার সঙ্গে ওদের কোন আত্মীয়তার বন্ধন হয় নি। আত্মীয়তা হওয়া সত্যিই সহজ নয়। তার জন্যে তপস্যা করতে হয়। দস্যু রত্নাকর যতদিন দস্যু ছিল, কেউ তার কাছে আসে নি। কিন্তু

যেই সে তপস্যা শুরু করল অমনি বল্মীকরা এসে বাসা বাঁধল তার চারদিকে, তাকে আপন লোক মনে করে। বাল্মীকি সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে। বল্মীকরা তাঁর মধ্যে বেসুরো কিছু পায় নি, পেলে আসত না। একটু দূরেই দেখতে পাচ্ছি কাক, শালিক আর ফিঙেরা একসঙ্গে চরে বেড়াচ্ছে, একটুও ঝগড়া করছে না। কেউ কারো কাছ থেকে পালাচ্ছে না। সকলেই নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করছে না। এই সব ভাবছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম পাণ্ডিতজী আসছেন মাঠামাঠি। মাঠের ও-পারেই তাঁর বাড়ি। হেঁটে রোজ শহরে আসেন। স্কুলে পড়ান, নানা জায়গায় টিউশনি করেন। সব পায়ে হেঁটে। তাঁর দাড়ি-গোঁফ কিছুদিন বেশ পরিষ্কার কামানো থাকে, কিছুদিন পরেই আবার দেখা যায়, তাঁর সারা মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গলে ভরে গেছে। এর অর্থ, নাপিতের যখন দেখা পান তখনই কেবল কামিয়ে নেন। স্থান কালের বিচার নেই। কখনও বা ঘোর দুপুরে রাস্তার ধারে কারও বারান্দায় বসে, কখনও বা কোনও সকালে রাস্তার ধারে ইটের উপর বসে, কখনও বা সন্ধ্যার সময় কোনও গাছতলায়। নাপিত পেলেই তাকে ধরে ফেলেন। কিন্তু যে নাপিত তাঁর প্রিয় নাপিত—বিষ্ণু ঠাকুর—তার দেখা কালে-ভদ্রে পান। যোগাযোগটা প্রায়ই হয় না। আমাকে দেখেই নমস্কার করে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি। তাঁকেও রাখী সমস্যার কথা বললুম। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'রাখী কোথা থেকে এল তা ভেবে আর কি হবে। রাখী পেয়েছেন, রাখী বেঁধে দেবার লোকও পেয়ে গেলেন, আসুন আপনার হাতে বেঁধে দি ওটা।' বললাম, 'যদি বাঁধতেই হয় আমিই আপনার হাতে বাঁধব।' পাণ্ডিতজী হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বেঁধে দিলাম তাঁর হাতে রাখী। তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন। তাঁর দাঁড়াবার সময় নেই। তিনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে এম এ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যন্ত পড়ান। বললাম, 'মাপ করবেন, দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে হবে।' নমস্কার করে চলে গেলেন। পাণ্ডিতজীর সঙ্গে হরেনবাবুর তফাত আছে। তবে আর একটা কথাও গোপনে লিখে রাখছি। পাণ্ডিতজী শিক্ষিত, সহৃদয়, সদাহাস্যমুখ, কিন্তু সংস্কারমুক্ত নন। আমাকে অবশ্য খাতির করেন খুব, কিন্তু আমি 'মাছখোর' বাঙালী বলে আমার প্রতি ওঁর ঈষৎ বিরূপতা আছে। মুখে সেটা বলেন না কখনও, কিন্তু বুঝতে পারি।

তিনটি ছোট ছোট গাছ, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, যেন তিনটি যমজ ভাই। দেখেছিলাম নহরপুর মাঠে। প্রথমে দেখতে পাই নি, পরে দেখেছিলাম। সেদিন দুপুরবেলা মাঠে গিয়ে প্রথমেই তাক লেগে গিয়েছিল আকাশে মেঘের কাণ্ডকারখানা দেখে। যত রকম মেঘের কথা বইয়ে পড়েছি সব সেদিন হাজির ছিল আকাশে। স্তর মেঘ, স্তূপ মেঘ, পালক মেঘ, ফড়িংয়ের মতো হালকা মেঘ, পাহাড়ের মতো ভারী মেঘ, ঝরনার মতো মেঘ, প্রপাতের মতো মেঘ, সব ছিল। এ ছাড়া ছোট ছোট তুলোর টুকরোর মতো দুষ্টু মেঘও ছিল কয়েকটা, তারা ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। মেঘ নিয়েই আত্মহারা হয়ে ছিলাম, গাছ তিনটিকে দেখতেই পাই নি। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম, হোঁচট খেলাম হঠাৎ, ওই গাছ তিনটেতেই হোঁচট খেলাম। ওরা যেন নিজেদের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিলে। দেখলাম, বাঃ, কি চমৎকার! ছোট ছোট তিনটি গাছ, কিন্তু কি রূপ তাদের! কতদিন নহরপুর মাঠে এসেছি, এদের তো দেখতে পাইনি। চোখেই পড়ে নি। দেখলাম ভাল করে। মনে হল, ওরা যেন মুচকি হেসে বলছে, আকাশের দিকে সমস্তক্ষণ চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছ, মাটির দিকেও দৃষ্টি নামাও একটু, আমাদের সঙ্গেও আলাপ কর, আমরা কি ফেলনা? এতদিন এদের দেখতে পাইনি বলে অনুতাপ হল। ঝুঁকে ভাল করে দেখলাম। পাতার রং শুধু সবুজ নয়, সবুজের ভিতর থেকে সোনালী আভাও বেরুচ্ছে। পাতাগুলি গোল গোল, অনেকটা সেকালের দু-আনির মতো। পাতা দিয়ে গাছগুলি আপাদমস্তক ঢাকা। পাতাগুলির ধারে ধারে খুব সরু সরু

দাতের মতো। কিন্তু দাত মনে হয় না। মনে হয় যেন গানের গিটকিরি। প্রত্যেক পাতার মাঝখানে একটি করে সাদা ফোটা আর তার থেকে পাঁচটি করে সরু শির সরল রেখায় চলে গেছে পাতার ধারের দিকে। মনে হয় যেন ছোট ছোট সোনালী-সবুজ জাপানী ছাতা। তিনটি গাছ ভরতি এ রকম জাপানী ছাতা। অবাক লাগল এ জিনিস আগে দেখতে পাইনি কেন। এর নাম কি? কি এর পরিচয়? জানবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, একটু দূরে মাঠে চাষারা জমি চষছে। তাদের একজনকে ডেকে এনে দেখলাম গাছগুলো। বললে, জংলী গাছ। এর বেশী আর কৌতূহল নেই তাদের। আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে মনে করি, তাই জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়াতে চাই। আমি তাই গাছের ছোট একটি ডাল কেটে নিয়ে গেলাম বোটানির প্রফেসার হর্ষনাথ-বাবুর কাছে। তিনি উল্টে পাল্টে দেখলেন, তারপর বললেন, এর ফুল ফল না দেখলে বলা যাবে না এটা কোন্ ন্যাচারাল অর্ডারের। শুধু ডাল বা পাতা দেখে বলা যাবে না। আমার কেমন যেন রোখ চড়ে গেল, গাছটার নাম জানতেই হবে। তার পরদিন আবার গেলাম সেখানে। দুর্গাকে নিয়ে গেলাম। পচা গোবর আর পাতার সারও নিয়ে গেলাম সঙ্গে করে। দুর্গা গাছ তিনটি বেশ ভাল করে খুঁড়ে সার দিয়ে দিলে। মনে হল গাছ তিনটি খুশী হয়েছে, তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ ভাতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আশা হল, এইবার তাড়াতাড়ি ফুল ফুটবে। প্রায় রোজই যেতাম গাছ তিনটিকে দেখতে। সানন্দে লক্ষ করতাম সার পেয়ে বেশ সতেজ হচ্ছে। পাতাগুলো আরও সুন্দর হয়েছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতাম, বড় ভাল লাগত। ক্রমশ কেমন যেন স্নেহ জন্মে গেল গাছ তিনটের উপর। রোজ যেতে আরম্ভ করলাম। মাস খানেক পরে মনে হল কুঁড়ি হয়েছে যেন। আনন্দে অধীর হয়ে পড়লাম। কিন্তু, হায়, আমার ভাগ্য লাউথার সাহেবের ভাগ্যের মতো নয়। লাউথার সাহেব এ-দেশে চাকরি করতে এসে অনেক পাখির ছবি তুলেছেন। শুধু পাখির নয়, পাখির বাসার, ডিমের আর বাচ্চার। সহজ কাজ নয়, খুবই কঠিন। এর জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন ভদ্রলোক। একবার মানভূমে গিয়ে তিনি 'ক্রেস্টেড সুইফট' নামক পাখিটি দেখতে পেলেন। এ পাখির কথা আগেই তিনি হিউম সাহেবের কেতাবে পড়েছিলেন। পাখিটিকে দেখতে পেয়েই তাঁর মনে বাসনা হল, এ পাখির ছবি তুলতে হবে। শুধু ছবি নয়, পাখি ডিমে বসে তা দিচ্ছে—এই রকম একটি ছবি। পাখিটি তেল-চোঁচ জাতীয় পাখি, মাথায় কিন্তু বুলবুলির মতো ঝুঁটি আছে, খুব ছটফটে ছোট্ট পাখি। অনেক খুঁজে খুঁজে,

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন একটা গাছের ডালে ওর বাসা রয়েছে, একটা পাখি বসে তা-ও দিচ্ছে। কাছেই মাচা বাঁধলেন। অনেক উঁচু মাচা বাঁধতে হয়েছিল, পাখিটাকে ক্যামেরার নাগালের মধ্যে আনতে। ভয় ছিল এই সব তোড়জোড় দেখে পাখিটা না উড়ে যায়। কিন্তু সে উড়ল না। সাহেব ঠিক করলেন, তার পরদিন এসে ফটো তুলবেন। কিন্তু তারপর দিন এসে দেখলেন পাখি নেই, ভাঙা ডিমটি নীচে পড়ে রয়েছে। তাঁর শিকারী 'সকুর' আরও বাসার খবর নিয়ে এল, কিন্তু সে সব জায়গায় মাচা বাঁধবার সুবিধা নেই। কিন্তু তিনি থামলেন না, ক্রমাগত সন্ধান করে যেতে লাগলেন। এক বছর সন্ধানের পর তবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। চমৎকার ফটো তুলেছিলেন তিনি, ফটোটা তাঁর বইয়ের প্রথমেই আছে। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। একদিন গিয়ে দেখলাম কুঁড়িগুলি প্রায় ফোট-ফোট হয়েছে, পাপড়িগুলির স্বর্ণাভা ফুটে বেরুচ্ছে সবুজের ধার দিয়ে দিয়ে। আশা করলাম, কাল এসে নিশ্চয়ই পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলগুলি দেখতে পাব। কিন্তু পেলাম না। এসে দেখি গাছ নেই। সেখানে কতকগুলি মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম, গাছগুলি তাদের উদরে গেছে। খুব কষ্ট হয়েছিল। অনেক দিন আগের ঘটনা এটা। তখন কষ্ট হয়েছিল, এখন হাসি পায়। নিজেকেই বলি, গাছকে দেখে আনন্দ পেয়েছিলে এই যথেষ্ট, যতটুকু পেয়েছিলে ততটুকুতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। তুমি ওর নাম জানবার চেষ্টা করতে গেলে কেন? তাইতেই কষ্ট পেলে। জ্ঞানের কি শেষ আছে? কত জানবে? তারপর, তারপর, তারপর......এ যে অশেষ!

মাস্টার মশাই, আমার এই সব রাবিশ টুকে যাচ্ছেন এ কথা ভেবে আমি বড়ই সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু কি করব, যা করছি তা আপনারই অনুরোধে। আপনাকে কাজ দেবার জন্যে আমাকে এই অকাজ করতে হচ্ছে!

আজ একটা বড় মজার লোক দেখেছি। আমি যা দেখব বলে মাঠে আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে গিয়েছিলাম, সেটাও দেখেছি, অগস্ত্য নক্ষত্রকে, এ লোকটা ফাউ। আমার বাড়ি থেকে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দেখা যায় না। কারণ, আমার বাড়ির দক্ষিণ দিকটায় লম্বা লম্বা গাছ থাকাতে দক্ষিণ আকাশটা ঢাকা থাকে। তাই অগস্ত্যকে দেখবার জন্য আমি মাঠে যাই মাঝে মাঝে। এ নক্ষত্রটির উপর আমার পক্ষপাতিত্ব আছে। এর কারণ, ওর সঙ্গে ইতিহাস জড়িত আছে খানিকটা। পাথুরে-প্রমাণ ওলা ইতিহাস নয়, পুরাণ-কথা। শোনা যায়, অগস্ত্য মুনির শিষ্য বিন্ধ্য পর্বতের নাকি খুব বাড় বেড়েছিল, সে নাকি আকাশ ছোঁয়ার বাসনায় ক্রমাগত মাথা উঁচু করে চলেছিল। যখন সূর্য-চন্দ্রের গতি রুদ্ধ হবার মতো হল তখন অগস্ত্য ঋষি তাঁর শিষ্যের কাছে গেলেন। এখন ভাল শিষ্যেরাও সবাই গুরুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে না, তখন উদ্ধত শিষ্যরাও গুরুর পায়ের কাছে মাথা নোয়াত। গুরু-দেবকে দেখে প্রণাম করলেন বিন্ধ্য মাথা নুইয়ে। অগস্ত্য বললেন, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, যতদিন সেখান থেকে না ফিরি ততদিন তুমি মাথা নত করেই থাক। অগস্ত্য আর দক্ষিণ থেকে ফেরেন নি। বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চ শিরকে চিরকালের মতো অবনত করে দিয়ে গেছেন তিনি। এই পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে তাল রেখে অনেকে কল্পনা করেন যে, অগস্ত্য নামক ঋষি দাক্ষিণাত্যে আর্য-সভ্যতা প্রচার করতে গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে দুরারোহ বিন্ধ্য পর্বত লঙ্ঘন করতে হয়েছিল। এখন এভারেস্ট লঙ্ঘনকারীকে আমরা যে মর্যাদা দিই তখন তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়ে-

ছিল। তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে আর ফিরতে পারেন নি, তাই দক্ষিণ আকাশের ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রটার নাম দেওয়া হয়েছিল অগস্ত্য। কিংবা এ-ও হতে পারে, বিন্ধ্য পর্বত নামে কোনও শক্তিমান অনার্য নেতা ছিলেন, অগস্ত্যের কাছে হার মেনেছিলেন তিনি। এ সব সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনও। এ কাহিনী আমার মানসকাননে কল্পনার ফুল ফোটায়, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শিশুরা যেমন ঠাকুমাদের মুখে রূপকথা শুনে আত্মহারা হয়, আমিও তেমনি পুরাণের রূপকথা শুনে হই। আমি যেন একজন পিঙ্গলকেশ নীল-চক্ষু গৌরবর্ণ যুবককে কল্পনা-নেত্রে দেখতে পাই। তিনি বিরাট বিদ্বান, নিপুণ বিচারক, ক্লান্তিহীন পর্যটক। দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার করছেন আর্য ধর্মের মহিমা। যে দাক্ষিণাত্যকে আজ আমরা দেখছি, কন্যাকুমারীতে, মীনাক্ষী মন্দিরে, চিদম্বরমে, যার অপরূপ প্রকাশ মূর্ত হয়ে আছে অসংখ্য মন্দিরে, যে বাণী পরে নূতন ভাষা পেয়েছিল শংকরাচার্যের জীবনে—এ সবের আদি জনক হয়তো অগস্ত্য, তিনি যে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাই পরে মূর্ত হয়েছে এক নূতন সভ্যতায়। অগস্ত্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সেদিন এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল বেচুর হয়তো শীত করছে। বেচুকে মোটরটা রবিনসন সাহেবের বাড়িতে রাখতে বলেছিলাম। রবিনসন অনেক দিন আগে মারা গেছে। এখন তার প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা বাড়িটা একজন মারোয়াড়ীর বাগান-বাড়ি। কয়েকটা মালী ছাড়া আর কেউ থাকে না। বেচু সঙ্গী পাবে বলে ওইখানে গাড়িটা রাখতে বলেছিলেম। হুইসল্ বাজিয়ে পা চালালাম রবিনসনের বাড়ির দিকে। অনেক দূর চলে এসেছিলাম আকাশ দেখতে দেখতে, মনে হল বেচু হয়তো হুইসল্ শুনতে পাবে না এতদূর থেকে। অগস্ত্যের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিলাম।......হঠাৎ অনুভব করলাম আমার সামনে আরও দুটো লোক যাচ্ছে। অন্ধকারে তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রথমে যার কথা শুনতে পেলাম তার গলা খুব মোটা। মনে হল হিসেব দিচ্ছে। বলছিল, এই শোন না, টিকে দু' আনার, তামাক ছ' আনার, আলু আধ সের চার আনার, কপি একটা পাঁচ আনার। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি সরু গলায় বলে উঠল—আরে, হয়েছে, হয়েছে, অত হিসেব দিতে কে বলছে তোকে। তোর কাছ থেকে আমি সাড়ে তিন টাকা পাব, বাস্ সোজা কথা। মোটা গলা প্রতিবাদ করল তৎক্ষণাৎ—কি করে সাড়ে তিন টাকা পাবে তুমি! দিয়েছিলে তো চার টাকা। হিসেবটা শোন না : টিকে দু' আনার, তামাক ছ' আনার, আলু চার আনার, এই তো বারো আনা হল। তা ছাড়া কপি একটা পাঁচ আনার, সতেরো আনা হল, বুটের ডাল এক পো ছ' আনা, তেইশ আনা হল, এক আনা পালং শাক, চব্বিশ আনা, তার মানে দেড় টাকা। আবার সরু-গলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আরে বাবু কে চাইছে তোর কাছে হিসেব, তুই আমার আপন লোক, তুই কি ঠকাবি, না, তোকে আমি অবিশ্বাস করছি? অত হিসেবে কাজ কি, আমি তোর কাছে সাড়ে তিন টাকা পাব—এই তো সোজা হিসেব বাপু। তোর কাছে হিসেব চাইছে কে? কেন বকে মরছিস? মোটা গলার তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলে উঠল, এ শালার কাণ্ড দেখেছ! এর পর লোক দুটো রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল। তাদের কথা আর শুনতে পেলাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার মোটরের আলোও দেখা গেল। এতদূরে থেকে বেচু হুইস্লের শব্দ শুনেছে দেখে মনে মনে তার শ্রবণশক্তির প্রশংসা করলাম। বেচু যখন পড়ে না, অপেক্ষা করে, তখন দুটো হাঁটুর মধ্যে তার মুণ্ডটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার উপর একটা চাদর ঢাকা দিয়ে কূর্মাকৃতি হয়ে বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ও সব দেখতে পায়, সব শুনতে পায়। পাতলা রোগা লোক শরীরটাকে যেমন খুশি দোমড়াতে মোচড়াতে পারে। সার্কাসেও অনায়াসে ভাল চাকরি পেতে পারত। সেদিন মোটরে যেতে যেতে অগস্ত্য এবং সাড়ে তিন টাকার হিসাব দুটোই পাশা-পাশি মনে ফুটে উঠতে লাগল। মনে হল এই আমাদের জীবন। গাম্ভীর্য এবং হাস্য-রস, উচ্চ এবং তুচ্ছ, জীবন এবং মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ পাশাপাশি ফুটে উঠছে সর্বদা। কখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি, কখনও পাচ্ছি না। আর একটা মজাও আছে। যেটাকে আমরা হাস্যরস ভাবছি, তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করছি সেটা আসলে হয়তো হাস্যরসও নয়, তুচ্ছও নয়। তা হয়তো খুব করুণ, খুব গম্ভীর গভীর ব্যাপার। ওই সাড়ে তিন টাকার সম্পূর্ণ রহস্য যদি উদ্ভেদ করতে পারতাম তা হলে হয়তো দেখা যেত যে, ওই সরু-গলার কাছে সাড়ে তিন টাকা হয়তো জীবন-মরণ সমস্যা, লোভে পড়ে নানারকম জিনিস কিনে ফেলেছে, কিন্তু সাড়ে তিনটে টাকা ওর নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সাড়ে তিন টাকা যে নেই, থাকতে পারে না এ কথা ও কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না, স্বীকার করতে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে।

(ক্রমশ)
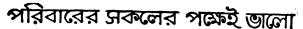
ছেলেবেলায় ভূগোল বই-এর পাতায় চীনের প্রাচীরের ছবি দেখেছি, আরো বড় হয়ে নিজের দেশকে বিভক্ত হতে দেখলাম, সেই উদ্বাস্তু জীবনের অসহায় দুই চোখ দেখল পৃথিবীর আরো কয়েকটা দেশকে খণ্ডবিখণ্ডিত হতে। এতকালের সব অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে, জীবনের প্রায় মধ্য বয়সে অবাক হয়ে চোখের সামনে দেখলাম—রাতারাতি একটা নগরীর বুকে কিভাবে ইঁটের সারি আর কাঁটাতারের বেড়া বিদীর্ণ করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে নয়, একান্নভুক্ত পরিবারের ভাই ভাই ঝগড়া করে রাতারাতি ঘর-বাড়ি ভাগ করে নেয়, কেউ কারো মুখ দেখে না, তাতে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে। কিন্তু বার্লিনের এই প্রাচীরকে কি সেই আখ্যা দেওয়া যায়? না। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ পশ্চিম বার্লিনে প্রাচীরের পাশ দিয়ে অশ্রুসজল নয়নে উঁকিঝুঁকি মারে যদি ওপারের মা-বাবা, ভাই-বোনদের দেখা পায়। দেখা যায়, বন্ধু-বান্ধবী আর আত্মীয়দের কি না, আপনি তা দেখতে পাবেন না। কেননা, রাজনীতির বলির একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনার মাথা ততটুকু মুক্ত আকাশের দিকে তুলে ধরতে পারবেন না, যতটুকু তুলে ধরতে পারলে আপনি বর্তমান সভ্যতার দুই মতবাদের নগ্নতম আত্মপ্রকাশ এই কাঁটাতারের প্রাচীরের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেই এ কথা বলছি। কেন প্রাচীর উঠল, কোন পক্ষের দোষ, এ প্রসঙ্গে আমার যাবার ইচ্ছে নেই। কেননা, এই কয় মাসে, অর্থাৎ ১৩ই আগস্ট ১৯৬১ সালের আগে ও পরে, যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে দুই পক্ষের বিরুদ্ধেই কিছু না কিছু বলতে হয়। এক পক্ষ প্রাচীর তুলেছে, আর পক্ষ প্রাচীর তোলার কারণ। কিন্তু মাঝখানে পড়ে বলি হল মানবতার।

বিশাল রাজপথ, ১৭ই জুন-স্ট্রীট ধরে আপনি মনোরম টিয়ার গার্টেনের মধ্য দিয়ে, ভিকট্রি কলাম-কে অতিক্রম করে আরো এগিয়ে আসুন, সামনে পড়বে বিশাল সিংহদ্বার Branden-burger Tor। এবার এখানে আপনাকে থামতে হবে। কেননা, এবার আপনি পৃথিবীর দুই মতবাদের চরম কেন্দ্রবিন্দুতে। ওপাশ থেকে পূর্ব বার্লিন শুরু। মাঝখানে দুই বার্লিনকে ভাগ করে দাঁড়িয়ে আছে ৪৫ কিলোমিটার প্রাচীর। আপনাকে পূর্ব বার্লিনে যেতে হলে, কাছেই ফ্রিডরিখস্ট্রাস্, সেখানে যেতে হবে। বর্তমানে ওটাই একমাত্র পূর্ব বার্লিনে যাওয়া-আসার পথ।

S Bahn (পূর্ব বার্লিনের সম্পত্তি) ট্রেন থেকে নামলেই তরতর করে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। এবার কন্ট্রোল শুরু হল। কতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, সেটা নির্ভর করছে আপনার ভাগ্যের ওপর। সাধারণত এশীয় ও আফ্রিকান নর-নারীদের প্রবেশাধিকার সহজতর। সাদা চামড়া দেখলেই ওদের সন্দেহটা একটু বেশী মাত্রায় চাপা হয়ে ওঠে। তার কারণও যথেষ্ট রয়েছে। ১৩ই আগস্টের পর পূর্ব বার্লিনের বহু নর-নারীকে আমেরিকান, ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নরনারীরা কখনো গাড়ির পিছনে, কখনো জাল পাসপোর্টের সাহায্যে পূর্ব বার্লিন থেকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে পশ্চিম বার্লিনে নিয়ে এসেছে। তারপরের পথটুকু সুগম। টেগেল বা টেম্পেলহফের এয়ারপোর্ট থেকে পশ্চিম জার্মানি বা পৃথিবীর যে কোন স্থানে চলে যেতে পারেন। এভাবে প্রাচীরের পরেও বহু নরনারী, কখনো রাত্রির অন্ধকারে, কখনো কাঁটাতার ছিঁড়ে পশ্চিমে চলে এসেছে। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা পশ্চিম বার্লিনে টেকনিকেল ইউনিভার্সিটি বা ফ্রাই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করত। তাদের কাহিনী শুনেছি—সে সব কথা সময় মত ব্যক্ত করা যাবে। তবে এ কথা সত্য, জীবনকে পণ করে শেষ পর্যন্ত এভাবে চলে আসাটা একটা অ্যাডভেনচারিজমে পরিণত হয়েছিল। তাতে কেউ কেউ মারাও গেছে।

তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাবেন এপারের কয়েকটা সমাধিতে, সেখানটা আজও অজস্র ফুল ও মালা আবৃত করে রেখেছে। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, ৪৮ নং Bernauer Strasse-এর সেই অশীতি বছরের বৃদ্ধা মহিলা, যিনি কয়েকতলা উঁচু জানালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নীচে এক বিচিত্র নাটকীয় পদ্ধতিতে। রাস্তাটা পশ্চিম বার্লিনের, সেখানে অনেক মানুষের বাহুতে ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। এ ধরনের বিচিত্র ঘটনার শেষ নেই। পূর্ব বার্লিনের এমনতর মানুষের মনোভাব ব্যক্ত করতে হলে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতে হয়।

কিছুকাল পূর্বে, গত বছর, এক ভদ্রমহিলা পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিমে বেড়াতে এসেছিলেন। খেতে বসে বসে আনন্দে মুখে বিয়েই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে-

বার্লিন শহরের প্রধান রাস্তার মাঝে বিখ্যাত ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ গেট। এই তোরণের ডানদিকে পশ্চিম বার্লিন, বাঁদিকে পূর্ব বার্লিন।

বার্লিন শহরের পূব - পশ্চিম সীমানা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

ছিলেন—পশ্চিমের আলু কি মিষ্টি আর স্বাদের। যখন তাঁকে বলা হল, এই আলু তাঁর দেশ, অর্থাৎ পূর্ব জার্মানি থেকেই এসেছে, তখন তিনি হতাশ হলেন। পূর্ব বার্লিনের এক ডাক্তার বলছিলেন—সামান্য অ্যানাসিন জাতীয় ট্যাবলেটে পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস নেই। দশটা ট্যাবলেট অ্যানাসিনের মূল্য পূর্ব বার্লিনে যেখানে ৩০ ফেনিগ, পশ্চিমে তা প্রায় ১ মার্ক। পূবের মানুষকে পশ্চিমে এসে সেই ট্যাবলেট কিনতে হয়েছে। সেই দশটি ট্যাবলেট পূর্ব জার্মানির '৪ মার্কেরও বেশী পয়সা দিয়ে। অর্থাৎ প্রায় একই ট্যাবলেট পশ্চিম বার্লিনে কেনার জন্য তাঁকে প্রায় বারোগুণ পয়সা বেশী দিতে হয়েছে শুধু বিশ্বাসের জন্য। আর এক ভদ্রমহিলাকে জানি—যিনি পশ্চিম থেকে চার পাঁচগুণ বেশী টাকা দিয়ে বর্ষাতি কিনে কয়েকদিন বাদে দেখলেন, বর্ষাতির ভেতরের কাপড়ে পূর্ব জার্মানির মিলের ছাপ রয়েছে। এ ধরনের ঘটনার অন্ত নেই। প্রশ্নটা হচ্ছে সেইখানে—মানুষ কতখানি বিশ্বাস হারালে এমনটি ঘটতে পারে।

কুশভের ভাষায় পশ্চিম বার্লিন শো-কেস্ কিনা জানি না, তবে পশ্চিম বার্লিনের শো-কেসগুলির সাথে পূর্ব বার্লিনের দৈন্যের তুলনা কোন প্রকারেই চলে না। তার ঐশ্বর্য, জীবন ও জীবনবেগ পূর্ব বার্লিনকে অনেক পেছনে অন্ধকারে ফেলে চলে এসেছে। কোন একদিন পূর্ব বার্লিনের অগ্রগতি পশ্চিমকে কতটুকু ছাড়িয়ে যাবে, সে ভবিষ্যৎ-ইতিহাস কালের হাতে। তবে এ কথা সত্য, ১৩ই আগস্টের পর পশ্চিমের সেই মোহ যেন এখন নেই—কোথায় যেন ভাটা পড়েছে!

তার একটা প্রধান কারণ, পূব থেকে লোক আসা বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা পশ্চিমের একটা মস্ত ক্ষতি। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও অনেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই অনেক নর-নারী তাঁদের সাধের সংসার বিক্রি করে দিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে চলে যাচ্ছেন। S-bahn স্টেশনের দোকানগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আর সাধারণ মানুষের কাছে একটা মস্ত ক্ষতি—সেই আগের মত পশ্চিমের টাকা ১ : ৪-এ পূবের টাকায় ভাঙিয়ে পূর্ব বার্লিনে গিয়ে দু' হাত ভরে খরচ করা—সে আর এখন সম্ভব নয়। কেননা, ফ্রিডরিখ্ স্ট্রাসের কন্ট্রোল অফিসে আপনার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—Unser Geld? অর্থাৎ, পূবের টাকা আছে সঙ্গে? আপনাকে তখন মানিব্যাগ খুলে দেখাতে হবে, কোন পূবের টাকা আপনার সাথে নেই। যদি আপনাকে কিছু কেনাকাটা করতে হয়, তবে পশ্চিমের টাকা পূবের ব্যাঙ্ক থেকে ১ : ১-এ ভাঙিয়ে, তা করতে হবে। তাই পুরনো ছাত্রদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—দাদা, মাখন বা খাবার, আমরা খেয়ে নিয়েছি। আগের মোহ আর পশ্চিম বার্লিনে এখন নেই। অর্থাৎ পূর্ব বার্লিন থেকে প্রচুর ভাল ভাল বই, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, গানের রেকর্ড—যা কিছু লোভনীয়, পশ্চিমের লোক তা কিনে এনেছে। ১৩ই আগস্টের আগে পর্যন্ত পূর্ব বার্লিনের থিয়েটার আর অপেরাগুলি পশ্চিমের লোকে ভর্তি থাকত। আজ কন্ট্রোল অফিসে দাঁড়িয়ে কম্যুনিস্টদের গালাগালি দিতে গিয়ে কোথায় যেন বিবেকে বাধে—হয়ত পশ্চিমের স্বার্থে বিরাট আঘাত পড়েছে বলেই আমাদের এতখানি উষ্মা। কেননা, এই প্রাচীর ডিঙিয়ে এখন আর ৫০ হাজার শ্রমিক পূব থেকে পশ্চিমের কারখানাগুলিতে কাজ করতে আসতে পারে না—যেটা পূবের লাভ, পশ্চিমের ক্ষতি।

তবে এ কথা সত্যি, পূব ও পশ্চিমের এই সব লাভক্ষতি হিসাবের অনেক ঊর্ধে মানুষের বেদনা। কারণ, এই প্রাচীর দুটো জাতি বা দেশের মধ্যে নয়। একই নগরীর ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, ভাই-বোন—পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পারে না, এ কঠিন মূল্য রাজনীতির মানদণ্ডে ধরা পড়তে পারে না। তাদের কথা ও বেদনা তুলে ধরতেই হবে। নয়ত শুধু বার্লিন বা জার্মানি কেন, গোটা ইউরোপে শান্তি আশা করা অনর্থক। হের ভিলি ব্রান্ডট্ প্রায়ই সক্ষোভে বলেন—Die Mauer (মাওয়ার মানে প্রাচীর) muss weg, অর্থাৎ প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু প্রাচীর তুলে আর ভেঙে ফেলে, কিংবা ঘন ঘন অজস্র Panzer অর্থাৎ ট্যাঙ্ক উভয় পক্ষ থেকে ফ্রিডরিখ স্ট্রাসের দিকে ছুটে গেলেই শান্তি আসবে না। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হয়ে আমার অধ্যাপক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—প্রাচীরের ব্যাপারে তুমিও কি পণ্ডিত নেহরুর মত চিন্তা কর? উত্তরটা খুবই কঠিন। তবু বলতে হল—শুধুমাত্র আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, পৃথিবীর একজন অন্যতম শান্তিকামী নেতা হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি। আর জানি আমার দেশের মানুষের কথা, যারা বিশ্বাস করে জার্মানির সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান আর মেধাকে। বিগত দুটো যুদ্ধের মধ্যে জার্মানি অনেক হারিয়েছে। তার সেই হারানোর পরও আজ সে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তবে এ কথা সত্যি, বার্লিনকে কেন্দ্র করে আবার যদি একটা যুদ্ধ বাধে, তবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি, তা পরের কথা, কিন্তু জার্মানির ধ্বংস অনিবার্য। সে কথা আমরা ভারতবাসীরা কোনমতেই ভাবতে পারি না।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

॥ ৩১ ॥

দু' নম্বর সুইটের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও আমার নাকের ডগায় যেন কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে উঠলো। করবী দেবী কেন এমনভাবে বসে আছেন?

করবী দেবী আমাকে বসতে বললেন না। শুধু আমার দিকে একবার তাকালেন। তাঁর চোখটা এবার ঘরের কোণে রাখা টেলিফোনের দিকে ঘুরে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলবেন?"

বোধ হয় তাঁর কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় যেন মত পরিবর্তন করলেন। বললেন, "না। একবার ভাবছিলাম ওঁকে ফোন করতে বলবো। কিন্তু ভাবছি, ফোন না করাই ভাল।"

আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, "আপনার অতিথিরা কোথায়?"

করবী দেবী বললেন, "ওঁরা আবার মিসেস চাকলাদারের বাড়িতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মিসেস চাকলাদার ওঁদের নিতে পারলেন না—গবরমেণ্টের কয়েকজন হোমরাচোমরা অফিসার এ বেলায় আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এঁদের দুজনকে মিসেস চাকলাদার হয়তো জায়গা করে দিতে পারতেন; কিন্তু কন্ট্রাক্টর মিস্টার কানোরিয়া রাজী হলেন না। উনি তাঁর সরকারী অতিথিদের কথা দিয়েছেন, মিসেস চাকলাদারের বাড়িতে তাঁরা ছাড়া বাইরের আর কেউ উপস্থিত থাকবেন না। যা দিনকাল পড়েছে। কাগজের রিপোর্টাররা যেভাবে লোকের পিছনে লাগছে, হয়তো সার্কুলেশন বাড়াবার জন্যে একতক্কা লিখেই দিলে। অফিসাররা তাই আজ কাল অনেক সাবধান হয়ে গিয়েছেন।"

একটু থেমে করবী গুহ বললেন, "তোমাকে একটা কথা হয়তো বলতে হবে। কিন্তু এখন নয়। আজকের মতো আমি নিজেই ম্যানেজ করে নিয়েছি।"

করবী দেবীর মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। বললাম, "আমার তেমন ভাল লাগছে না, মিস গুহ। যদি আপনার কোনো উপকারে লাগি, তা হলে বলতে দ্বিধা করবেন না।"

করবী দেবী এবার হেসে ফেললেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, "একদিন আমারও ভয় লাগতো। এখন আর লাগে না। এখন জানি আমার কিছুই করবার নেই। একদিন তোমারও হবে। তুমিও একদিন এই হোটেলের ইট-কাঠ-পাথরের মতো নিস্পৃহ হয়ে উঠবে, তখন আর ভয় লাগবে না।"

ছাদের উপরে আমার আপন বিশ্বে ফিরে এসেছি। ছাদের ইলেকট্রিক আলোটাও আজ গুড়বেড়িয়া বোধ হয় নিবিয়ে দিয়েছে। আকাশে আজ সংখ্যাহীন তারার উজ্জ্বল সমারোহ। ড্রাই ডে-র রাত্রে কোনো অরসিক নভঃলোকবাসী যেন আকাশ-হোটেলে ব্যাংকোয়েটের ব্যবস্থা করেছেন। ছাদের ঘরের সব আলোগুলোও নিবে গিয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হোটেলের কর্মচারীরা মধ্যরাত্রের আগে ঘরে ফিরে আসার বিরল আনন্দ আজ যেন উপভোগ করছেন।

প্রভাতচন্দ্র গোমেজের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। একটা টুল নিয়ে নিজের ঘরের সামনে তিনি বসে আছেন। আমার মনটা ভাল নয়। করবী দেবী আমাকে বেশ চিন্তিত করে তুলেছেন। এমন রহস্যময় উদ্বেগের মধ্যে রেখে দু নম্বর সুইট থেকে করবী দেবী আমাকে বিদায় দিলেন কেন?

অবাক লাগছে আমার। আমারই অজ্ঞাতে কেমনভাবে শাজাহানের জগতে জড়িয়ে পড়েছি আমি। এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখ কখন যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। দু নম্বর সুইটের রঙ্গমঞ্চে যেন কোনো নাটক অভিনীত হচ্ছে, আরও অনেকের মতো আমিও তার একজন নীরব দর্শক। শাজাহানের ঘরে ঘরে রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও কত নাটক এমনই ভাবে অভিনীত হচ্ছে কে জানে? কে তাদের খবর রাখে? সে-নাটক হয়তো প্রতিদিনই পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নায়ক নতুন নায়িকা সেখানে অংশ গ্রহণ করছেন।

যাঁদের আমি চিনি না, জানি না, তাঁদের পরিণতি বিয়োগান্ত না মিলনান্ত হলো তা নিয়ে আমার চিন্তা নেই। কিন্তু দু নম্বর সুইট? সেখানে এই মুহূর্তে করবী দেবীকে কোনো বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা ভাবতে আমার মন যেন অজানা ভয়ে শিউরে উঠলো।

প্রভাতচন্দ্র গোমেজ ইশারায় আমাকে ডাকলেন। ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, "এখনও জেগে রয়েছেন!"

প্রভাতচন্দ্র হাসলেন। "ঘুম আসে না। রাত্রিটাকে দিনের মতো ব্যবহার করে করে অভ্যাসটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। ড্রাই ডে-র

রাত্রিটা তাই তারাদের সঙ্গে ভাব করে কাটিয়ে দিই। বেশ লাগে।"

আমি আর একটা টুল নিয়ে ও'র পাশে বসে পড়লাম।

প্রভাতচন্দ্র বললেন, "আপনাদের বয়স কম। শরীরের এখন ঘুমের প্রয়োজন। বয়স বাড়লে আপনাকেও ঘুমের জন্যে সাধ্যসাধনা করতে হবে।"

আমি নীরবে হাসলাম। বললাম, "মিস্টার গোমেজ আপনি তো এত চিন্তা করেন। রাতের নক্ষত্র, ভোরের সোনালী সূর্য তো একান্তে আপনার মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। বলতে পারেন, আমাদের জীবনে কেন সাসপেন্সের সৃষ্টি হয়েছিল? কেন আমরা অনাগত আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি?"

গোমেজ বললেন, "শুনেছি, হিন্দুদের শাস্ত্রে এর উত্তর আছে। কিন্তু আমি অশিক্ষিত খৃীস্টান বাজনদার, তার খবর রাখি না। আমি আপনাকে গানে উত্তর দিতে পারি। সামান্য ছায়াছবির গান, কিন্তু সেখান থেকেই আমি আমার জীবনদর্শন খুঁজে পেয়েছিলাম—কে সারা, কে সারা।"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"মানে", গোমেজ এবার মৃদুকণ্ঠে ইংরিজী গান ধরলেন, "কে সারা, কে সারা। The future is not ours to see—যা হবার তা হবে।"

গান শেষ করে গোমেজ বললেন, "একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এই হোটেলে এসেছিলেন। তিনি আমাকে এ গানের রেকর্ডটা দিয়ে যান। একদিন আপনাকে শুনিয়ে দেবো। আমি শিখেছি, ভবিষ্যতের খোঁজ নেওয়া আমাদের কাজ নয়—কে সারা, কে সারা।"

গোমেজের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন সত্যিই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। রাতের তারারা যেন গোমেজের কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছে—কে সারা, কে সারা।

অনিন্দ্য পাকড়াশি পরের দিন আবার এসেছিলেন। সেদিন ভোরেই তিনি করবী দেবীকে একলা পেয়ে বলেছিলেন, "মিস গুহ, যদি আপনি কিছু না মনে করেন, তবে একটি বিশেষ ব্যাপারে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।"

করবী বলেছিলেন, "আপনাদের বন্ধু মিস্টার আগরওয়ালার আমি হোস্টেস। সুতরাং বলতে গেলে আপনারই স্টাফ আমি। সুতরাং অনুরোধ নয়, হুকুম করুন।"

অনিন্দ্য এমন উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই হেসে বললেন, "ও বুঝেছি, আপনি কালকের প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু আমি রাগ করছি না। কালকে এখান থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে বেশীক্ষণ বসিনি। সোজা দোকানে চলে গিয়েছিলাম। একলা হোটেলে বন্দী হয়ে থাকেন, তাই ভাবলাম, আমার প্রিয় কবিদের বইগুলো হয়তো আপনাকে আনন্দ দেবে।"

এসব কথা করবী দেবীই পরে আমাকে বলেছিলেন। ওঁরা দুজনে যখন কথা বলছিলেন, তখন সেখানে অন্য কেউ ছিল না। করবী গুহরও সাহস বেড়ে গিয়েছিল। বইগুলো হাতে নেবার আগে অনিন্দ্যর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আপনার প্রিয় কবি যে আমারও প্রিয় কবি হবে, সেটা কেমন করে ধরে নিলেন অনিন্দ্যবাবু?"

অনিন্দ্য হেসে বললেন, "এর উত্তর জীবনানন্দ বা সমর সেন কেউ দেননি। কিন্তু আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। স্পেকুলেশন। ব্যবসাদার লোক আমরা, ফাটকায় সিদ্ধহস্ত।"

করবী দেবী বলেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যের সেবা করলে আপনি সত্যিই অনেক কাজ করতে পারতেন।"

"দাঁড়ান, এখন এই জার্মান সায়েবদের সেবা করে মাধব ইন্ডাস্ট্রীজ-এর কাজ করি।" অনিন্দ্য পাকড়াশি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন, "তবে জেনে রাখবেন, চিরকাল আমি এমন থাকবো না। আমি একদিন এইসব হুজুগ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের খুশিমতো কবিতা আর ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকবো।"

সেদিন সকালেই খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এই বিশিষ্ট অতিথিদের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'কলকাতায় জার্মান শিল্প প্রতিনিধি' এই শিরোনামায় যে সংবাদ ছাপা হয়েছিল, তাতে মাধব ইন্ডাস্ট্রীজের নামও প্রকাশিত হয়েছিল। মাধব পাকড়াশি শারীরিক অসুস্থতার জন্য যে দমদম বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং অসুস্থ স্বামীর সেবার জন্য শ্রীমতী পাকড়াশিও যে দমদম পর্যন্ত যেতে পারেননি, তাও খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল।

কাগজ পড়তে পড়তে করবী গুহ যখন অনিন্দ্যর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, তখন আমিও সেখানে বসে রয়েছি। করবী দেবীই আমাকে জোর করে সেখানে রেখে দিয়েছিলেন। অনিন্দ্য বললেন, "আমি জানি না, ওসব মায়ের নিজের পরিকল্পনা—আমাদের পি আর-ও সেনকে ডেকে নিজেই প্রেসনোট তৈরি করে দিয়েছেন। বাবা বলেছিলেন, তিনি দমদমে যাবেন। কিন্তু মা বললেন, আমাকে সুযোগ দিতেই হবে। সুতরাং ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন। সুতরাং বাবার 'অসুস্থ' হয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না।"

করবী দেবীর ইচ্ছা ছিল আমি দু নম্বর সুইটের ড্রইং রুমে ওঁর সঙ্গে বসে থাকি। কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। দু নম্বর সুইটে আমার স্পেশ্যাল ডিউটি থাকলেও প্রতিদিনের কাজ থেকে একেবারে ছুটি পাইনি।

কাউন্টারে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করেছি। এমন সময় রিপোর্টার মিস্টার বোসের আবির্ভাব ঘটলো। মিস্টার বোস বললেন, "কেমন আছেন শংকরবাবু? আপনার গুরুদেব মিস্টার স্যাটা বোসই বা কোথায়? ওই জার্মান পার্টি সম্বন্ধে কিছু নতুন খবর চাই-ই।"

আমি বললাম, "মাধব ইন্ডাস্ট্রীজের জনসংযোগ অফিসার মিস্টার সেন নিশ্চয়ই তাঁদের বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে আপনাদের অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।"

"সেই বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করে কাগজ চালাতে পারলে মালিকরা আর আমাদের মতো রিপোর্টারদের মাইনে দিয়ে রাখতেন না। বনস্পতি নয়, আসল ঘি চাই আমি। এখন সেই নির্ভেজাল খবরের উৎস কোথায় বলে দিন।"

আমি চুপ করে রইলাম। মিস্টার বোস কিন্তু নীরব হলেন না। তিনি যে অনেক খবর রাখেন তা পরের কথা থেকেই বুঝলাম। মিস্টার বোস প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের ডিল্যুক্স সুইটের মিস গুহ যদি ইচ্ছে করেন আমাকে খবর দিয়ে বড়লোক করে দিতে পারেন।"

বললাম, "ও'র ঘরে এখন বাইরের লোক আছে। যদি একটু পরে আসেন।"

"কোনো আপত্তি নেই। আমি ততক্ষণ এসপ্ল্যানেডে রেলের পাবলিসিটি অফিসে একটু ঢু মেরে আসি।"

মিস্টার বোস যেতেই করবী দেবীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম। "বিখ্যাত হবার এই সুযোগ। সংবাদপত্র প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

করবী দেবী বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না, আপনি সুইটে চলে আসুন।"

ওখানে অনিন্দ্য তখনও বসে রয়েছেন। আমার কথা শুনে করবী দেবী বললেন, "হোস্টেসদের সব সময় নেপথ্যে থাকতে হয়। প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অনিন্দ্যবাবু।"

কাগজের নাম শুনেই অনিন্দ্য একটু ঘাবড়ে গেলেন, বললেন, "পি-আর-ওকে সঙ্গে না নিয়ে বাবা কিংবা মা কেউ কাগজের লোকদের সঙ্গে কথা বলেন না। আমার ভয় লাগছে।"

করবী দেবী বললেন, "ভয়ের কিছুই নেই। আমি তো থাকবো।"

মিস্টার বোসকে করবী দেবী কিন্তু দু নম্বর সুইটে আসবার অনুমতি দেননি। যে কয়েকজন লোক সোজা দু নম্বর সুইটে এসে ঢুকতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। লাউঞ্জের এক কোণে মিস্টার বোসের সঙ্গে ও'রা দুজন সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমাকে ডেকে করবী দেবী বলেছিলেন, "প্লিজ, আমাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন না।"

চায়ের অর্ডার দিয়ে আমি কাউন্টারে ফিরে আসতে আসতে শুনছিলাম, করবী দেবী বলছেন, "মিস্টার পাকড়াশি নতুন ইন্ডাস্ট্রীতে আসছেন। বাংলা দেশকে তিনি ভালবাসেন। এই ভারত-জার্মান শিল্প-সহযোগিতার উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।"

অনিন্দ্য পাকড়াশি বললেন, "আপনারা যদি এই অতিথিদের সম্বন্ধে ভালো করে লেখেন, আমাদের সুবিধে হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের এই কারখানা চালু হলে আমরা অনেক বেকার যুবককে চাকরি দিতে পারবো সেই সব বেকার যুবক যাদের দুঃখের কথা আপনারা কাগজে লিখে থাকেন।"

যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিস্টার বোস সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন। এবং পরের দিন সত্যিই তাঁর কথামতো কাজ করেছিলেন। কলকাতার অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় মাধব ইন্ডাস্ট্রীজের মুখপাত্র শ্রীঅনিন্দ্য পাকড়াশির সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের সুদীর্ঘ বিবরণ ডবল কলম শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই কাগজ হাতে অনিন্দ্য পাকড়াশি প্রায় লাফাতে লাফাতে শাজাহান হোটেলে হাজির হয়েছিলেন। করবী দেবীকে উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছিলেন, "বাবা এবং মা দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। ও'রা ভাবছেন, খোকা কী করে এমন পাবলিসিটি করলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি এখানে। কেন জানেন? যে মহিলার দূরদর্শিতায় এই প্রচার সম্ভব হয়েছে, তাঁকে—"

"আপনার ধন্যবাদ জানাতে, তাই তো?" করবী দেবী অনিন্দ্যর মুখ থেকে কথাটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই শেষ করে দিলেন।

অনিন্দ্য হেসে বললেন, "আমাকে এতই অন্তঃসারশূন্য ভাবছেন কেন? অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাবার ইচ্ছে আমাদের হয় না?"

করবী দেবী চুপ করে গেলেন। অনিন্দ্য

জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার অতিথিরা নিশ্চয় আপনাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে।"

"মোটেই নয়। যেসব দেশী ভি আই পিদের আমাদের সেবা করতে হয়, সে তুলনায় এঁরা ডেমি গড। বার-এ গিয়ে ড্রিঙ্ক করেন, ক্যাবারে নাচ দেখেন, তারপর নিজেরাই ঘরে এসে শুয়ে পড়েন। নিজের খেয়ালে নিজেরা থাকেন, আমাকে বড় একটা জ্বালাতন করেন না।"

অনিন্দ্য বললেন, "এখন তাঁদের দেখছি না কেন?"

"হল-এ ব্রেকফাস্ট করছেন।" করবী দেবী বললেন।

অনিন্দ্য খুশী মেজাজে বললেন, "যাক, আমি আর চিন্তা করি না। এ'কদিন সব সময় এ'দের কথাই ভাবতে হচ্ছিল। আজ থেকে নরম্যাল হয়ে যাবার চেষ্টা করবো। তারপর যেদিন ও'রা আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট সই করবেন, সেদিন থেকে আমি তো মুক্তবিহঙ্গ, অনিন্দ্য পাকড়াশির প্রথম শিল্প-প্রচেষ্টা।"

শাজাহান হোটেলের দু' নম্বর স্যুইটের নিপুণা হোস্টেস অন্য সময় হলে হয়তো পেশাদারী হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিতেন। এখন কিন্তু তেমন কিছুই করলেন না। ছোট্ট মেয়ের মতো প্রশ্ন করলেন, "বাড়িতে আপনার তখন অনেক দাম বেড়ে যাবে, তাই না?"

"বাড়তে বাধ্য। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের রিপোর্ট ছিল লোকগুলো তেমন সুবিধে নয়। এ'দের মেজাজ মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন।"

করবী গুহ তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন করেছেন। অনিন্দ্য সরল মনেই উত্তর দিয়েছেন।

আমরা হোটেলে কাজ করি, কোনো কিছুতেই বেশী জড়িয়ে পড়া আমাদের পেশার অলিখিত আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ। বোসদা বোধ হয় দু নম্বর স্যুইটের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা লক্ষ করেছিলেন। আমাকে সোজাসুজি কোনো উপদেশ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাই হাসতে হাসতে একদিন বললেন, "হোটেল-জগতের গুরুদেবরা রিসেপশানিস্টদের বলে গিয়েছেন—বৎস, তোমার এবং তোমার অতিথির মধ্যে একটা কাউন্টার রয়েছে, এ কথা সর্বদা মনে রাখবে।"

"এই দূরত্ব রাখাটাই কী বুদ্ধিমানের কাজ?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"আমারও আগে তাই মনে হতো।" বোসদা বলেছিলেন। "কিন্তু এখন দেখে দেখে শিক্ষালাভ করেছি। যে এই ব্যবধান সরিয়ে ফেলেছে, সেই ঠকেছে। নিজের গণ্ডির বাইরে গিয়ে সীতা রাবণের হাতে পড়েছিলেন। নিজের এলাকার মধ্যে বসে থাকলে পৃথিবীর কেউ সীতার কোনো ক্ষতি করতে পারতো না।"

পুরনো দিনের এই কথা লিখতে বসে আজ বারবার মনে পড়ছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে শাজাহানের ছাদের একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই ঘটনা যদি আজ ঘটতো, তা হলে করবী দেবীকে নিশ্চয়ই বোসদার সাবধানবাণী স্মরণ করিয়ে দিতাম।

সারা দিনের কাজ শেষ করে সবেমাত্র নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিলাম। এমন সময় দরজায় টোকা মেরে করবী দেবী যে আমার ঘরে ঢুকবেন, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই হোটেলের কোনো কর্মচারী কোনোদিন মিস করবী গুহকে ছাদে অন্য কারও ঘরে আসতে দেখেনি। আমিও চমকে উঠেছিলাম।

করবী দেবী আমার ঘরের চেয়ারে এসে বসলেন। দেখলাম দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। "কী ব্যাপার?" আমি প্রশ্ন করলাম। "আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।"
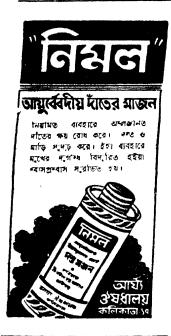
করবী গুহ তখনও হাঁপাচ্ছেন। "না, নিজেই চলে এলাম। আমার ঘরে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলা চলতো না।"

আমি করবী দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। করবী দেবী বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কী করা উচিত বলুন তো?"

করবী দেবীর দেহ কাঁপছে মনে হলো। কোনো রকমে বললেন, "সেদিন বুঝতে পারিনি। সন্দেহ হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম, মিস্টার পাকড়াশির জন্যেই মিস্টার আগরওয়ালা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।"

করবী দেবীর কাছেই শুনলাম, দু নম্বর সুইটের মালিক মিস্টার আগরওয়ালা করবী দেবীকে ফোনে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, 'খুবই গোপন—টপ সিক্রেট। রাইটার এবং কুর্টের উপর একটু নজর রাখতে হবে। ওদের মনের অবস্থা কেমন বুঝছো?'

করবী গুহ বলেছিলেন, 'বিজনেস ব্যাপারে ও'দের সঙ্গে কথা বলিনি।'

'বলতে হবে; না হলে সুইট এবং হোস্টেস রেখে আমার কী লাভ হলো?' আগরওয়ালা উত্তর দিয়েছিলেন।

করবী গুহ তখনও ভেবেছিলেন, স্যর মাধব পাকড়াশির জন্যেই মিস্টার আগরওয়ালা খোঁজখবর নিচ্ছেন। ফোন নামিয়ে রাখবার আগে আগরওয়ালা বলেছিলেন, 'এ'দের সেবা-যত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয়, এ'দের খুশী থাকার উপর ভবিষ্যতে অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

করবী দেবীর কথার তখনও কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। করবী দেবী বললেন, "এই মাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আগরওয়ালা এ'দের সঙ্গে আলাদা দেখা করতে চান। মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের ভিতরের খবরাখবর জেনে নিয়ে উনি এখন নিজেই আসরে নামতে চান। পাকড়াশির পরিবর্তে আগরওয়ালার সঙ্গে নেগোসিয়েশন চালালে ক্ষতি কী? সবার অলক্ষ্যে আগরওয়ালা আসতে চান। যখন পাকড়াশিদের কেউ থাকবে না, তখন গোপনে তিনি এ'দের সঙ্গে দেখা করে কাজ হাসিল করতে চান, আমাকে কয়েকবার ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন অনিন্দ্য কতক্ষণ হোটেলে থাকে। গত কালও ফোন করেছিলেন, আজকের প্রোগ্রাম জানবার জন্যে। আমি মিথ্যে করে বলেছিলাম, যতদূর জানি রয়ে অনেকক্ষণ থাকবেন। কিন্তু বোধ হয় ধরা পড়ে গিয়েছি। মিস্টার আগরওয়ালাকে গোপন খবরাখবর দেবার জন্যে কে একজন মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি আছেন, তিনি বলেছেন, অনিন্দ্য যাতে সন্ধ্যার হোটেলে না যায় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। মিস্টার আগরওয়ালা বলেছেন, সে জন্যে যা খরচ হয় তা তিনি দেবেন। বাগানবাড়ি, মদ এবং অন্য কিছুর জন্যে মিস্টার চ্যাটার্জি যেন কার্পণ্য না করেন।"

"কী নাম বললেন, ফোকলা চ্যাটার্জি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।" করবী দেবী বললেন। "এখন কী করি বলুন তো, এমন অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি। এতদিন ভাবতাম যাঁর চাকরি করি আমি তাঁর। এই অনিন্দ্যবাবুর কথাবার্তা আর কবিতা শুনে শুনে মনে হচ্ছে আমার নিজের সত্তা আছে। আমার সব কাজের জন্যে অন্তরের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে গিয়েই করবী গুহ যেন হাঁপাতে লাগলেন। বললেন, "আমার সাহস হচ্ছে না। আপনি একবার ও'কে ফোন করবেন?"

বললাম, "আমি ফোন ধরে দিতে পারি, কিন্তু আপনাকেই কথা বলতে হবে।"

ফোনে আর একটু দেরি হলে অনিন্দ্যকে আর পাওয়া যেতো না। অনিন্দ্য বললেন, "ব্যাপার কী?"

বললাম, "এখানে মিস গুহর সঙ্গে কথা বলুন।"

অনিন্দ্য বললেন, "আজ আর হোটেলে আসছি না। তার বদলে মামার সঙ্গে বেরবো। মামা বলেছেন, কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। উনি নিজে কবিতা পড়ে শোনাবেন। তারপর গঙ্গার ধারে যাবো। মামার হঠাৎ কবিতা শোনবার ইচ্ছে হয়েছে। আমি পড়ে যাবো, মামা শুনে যাবেন। মামা যা কাঠখোট্টা মানুষ—এমন সুযোগ আর কখনও না আসতে পারে।"

করবী দেবীর ঠোঁট দুটো দেখলাম কাঁপছে। বললেন, "ও-সব অন্য একদিন হবে। আজ আপনি এক্ষুনি, এই মুহূর্তে চলে আসুন।"

"কী বলছেন আপনি?"

"আপনাকে আমার এখনই দেখতে ইচ্ছে করছে।" করবী দেবী কোনো রকমে বলেই টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তাঁর সমস্ত দেহ যেন ম্যালেরিয়া রোগীর মতো ঠকঠক করে কাঁপছে।

করবী দেবী আর কালবিলম্ব না করে নিচেয় নেমে গিয়েছিলেন। আমিও স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। নিচেয় নেমে, কাউন্টারে উইলিয়মের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলাম। উইলিয়ম এখন আমার উপর সদয়—আমাকে সে খুশী রাখতে চায়। যদি আবার কোনো দিন ডিনারে শ্রীমতী রোজীর সঙ্গ পাবার সম্ভাবনা থাকে, তখন কে তার বদলে ডিউটি দেবে?

আমাদের সামনেই যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে তা বুঝতে পারিনি। কারণ মিস্টার অনিন্দ্য পাকড়াশি এবং আগরওয়ালা প্রায় একই সঙ্গে হোটেলের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

(ক্রমশ)

পকেটমারদের ঠকানো

লিভারপুলের ডেপুটি চীফ কনস্টেবল মিঃ হার্বার্ট আর বামারের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তের সবচেয়ে বন্ধু হচ্ছে যে গোয়েন্দা তাকে পাকড়াও করে—ধরা পড়ার সময় সেই চোর যতোই ক্রুদ্ধ হোক না কেন।

মিঃ বামার বলেন, অপরাধী কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর যে-ব্যক্তির সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করার তার সম্ভাবনা বেশী সে হচ্ছে যার সাক্ষ্য তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে। লিভারপুলের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান থাকা কালে মিঃ বামার অপরাধী ধরায় বৃটেনের সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তি বলে খ্যাতি অর্জন করেন।

মিঃ বামার বলেন, "'সৎ পুলিস' থাকার ঐতিহ্য দুষ্কৃতিকারীদের জগতে এখনও স্বীকৃত। কিন্তু আর যে একটা ঐতিহ্যের কথা প্রায়ই বলা হয়—'চোরদের কথা রাখা' সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা।

"বহু দুর্বৃত্ত দরকার হলে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকেও অর্থের বিনিময়ে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু যে গোয়েন্দা তাকে ধরিয়ে দেয় তার প্রতি ওদের শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়।"

"পাঁচ-হাতওয়ালা" পকেটমারের দল, যারা অত্যন্ত ভিড়ের সময় বাসে এবং ট্রেনে "কাম" সারতো তারা মুখ্যত মিঃ বামার ও তাঁর দলের চেষ্টাতেই উৎখাত হয়েছে।

কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম ও লণ্ডনে এখনও তাদের কতকজন হাতসাফাই চালিয়ে যাচ্ছে।

"মাঝে মাঝে ওরা এক-আধ দিনের জন্য লিভারপুলেও আসে," মিঃ বামার সতর্ক করে বলেন, "এবং ফুটবল মাঠে বহু মানিব্যাগ ও নোট সাফ হয়ে যায় যখন সেসবের মালিকরা খেলা দেখায় মত্ত হয়ে থাকে।"

পকেটমারদের সম্পর্কে এবং কিভাবে তাদের ব্যর্থ করতে হয় সে সম্পর্কে মিঃ বামারের বক্তব্য হচ্ছেঃ "সর্বদা মনে রাখবেন যে, দুটি মাত্র পকেট মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে না। একটি হচ্ছে ঢাকা দিয়ে বোতাম আঁটার ব্যবস্থা সহ ওয়েস্টকোটের ভিতরকার পকেট, আর অপরটি ট্রাউজারের কোমরের পট্টির ভিতরদিককার পকেট।

"সর্বদা ঐখানে টাকা রাখলে পকেটমারদের জব্দ করতে পারবেন। আপনার টাকা নিতে গেলে আপনাকে আঘাত করে অচৈতন্য না করে ফেললে সে কাজ হাসিল করতে পারবে না।"

পাইপে ধূমপানে মেয়েদের ঝোঁক

ফ্রান্সে তামাক তৈরি এবং বিক্রী রাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসা হওয়ার দেড়শ বৎসর পূর্তি এবং ওদেশে ধূমপানে আসক্তির চারশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে "শিল্পকলা,

ইতিহাস ও জীবনে তামাক" এই পর্যায়ে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। প্যারিসের লোক ভেঙে পড়ছে কৌতূহলোদ্দীপক বিবিধ সরঞ্জাম দেখতে।

পৃথিবীর বহু মিউজিয়াম এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে আহরণ করা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যবহৃত বহু প্রকারের পাইপ এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পাইপের মধ্যে রয়েছে মেয়েদের পায়ের আকারবিশিষ্ট তামাকাধার। একটি পাইপের আধারটি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুখাকৃতির অনুরূপ। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপস্থিতিতে কেউ ঠোঁটে পাইপ রাখতে সাহস করতো না।

স্পেনে ফ্রান্সের দূত থাকাকালে জাঁ নিকোট তাঁর দেশে তামাকের প্রচলন করেন। দ্বিতীয় হেনরীর স্ত্রী ক্যাথারিন দ্য মেডিসির মাথাধরার ওষুধ হিসেবে তিনি একটি প্যাকেটে "গোপনীয় সামগ্রী" লিখে কয়েকটি তামাক পাতা পাঠিয়ে দেন।

পাতাগুলি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। এই নতুন নিরাময়কটি নিকোটের নামে নিকোটিয়ানা টাবাকুম নাম গ্রহণ করে।

অল্পকালের মধ্যেই লোকে ধূমপান করতে আরম্ভ করলেও প্রাচীনকালে অনেকে নস্যরূপেও ব্যবহার করতে থাকে।

তিনশ বছর আগে লণ্ডন ও প্যারিসে ফুৎকারে ধূম নিঃসরণ কলার "অধ্যাপক" ছিল। তাঁরা চমৎকার কারুকাজ করা কাঠের বা হাতির দাঁতের তৈরী অমসৃণ খণ্ডে তামাক পাতা গুঁড়ো করাতেন এবং সেই গুঁড়ো ব্যবহার করতেন নস্য হিসেবে। তাঁরা বলতেন ঐ তামাকচূর্ণ দাঁত ও পেটব্যথা এবং সংক্রামিত রোগের প্রতিষেধক।

বৃটেনে আজকাল অদ্ভুতদর্শন পাইপ ব্যবহারের একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। ডেনমার্কের একটা ফ্যাশন ধরে গেলে পুরনো আমলের গির্জাধ্যক্ষদের পাইপ আবার প্রচলিত হতে পারে।

ডেনমার্কে সাড়ে চার-ফিট লম্বা সৌখিন

বামনদেশের মহিলা নয় বা অতিকায় মানুষের দেশের সোফাও নয়—বস্তুত মহিলাটি স্বাভাবিক আকৃতির এবং শিকাগোর এক আসবাব নির্মাতা যারা বপুবৃদ্ধির কামনা করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে এই সোফাটি তৈরী করে শো-কেসে রেখেছেন।

পাইপ, যা বিদেশীরা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক সামগ্রী হিসেবে সংগ্রহ করে, ওদেশে তার পুনর্ব্যবহার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

দু ইঞ্চি গভীর এবং মুখের কাছটা আধ ইঞ্চি চওড়া পোর্সিলিনের তামাকাধার এতে যুক্ত রয়েছে। বিশেষভাবে প্রস্তুত তামাক জ্বালিয়ে ডেনমার্কের লোকে এটাকে টেলিভিসন দেখার সময়কার আদর্শ সাথী বলে গণ্য করে।

তামাকাধারটি পায়ের কাছে বসিয়ে ধূমপায়ী পাইপটা তার দু-হাঁটুর মাঝে রেখে টেলিভিসন পর্দার ওপর চোখ রেখে তৃপ্তির সঙ্গে ধূমপান করে যায়।

তার স্ত্রী বা মেয়ে মাঝে মাঝে আগুনটা জ্বালিয়ে দেয়। অতীতে ডেনমার্কের সৈন্যরা ব্যারাকে থাকার সময় স্নায়ুকে দৃঢ় করার জন্য এইভাবে ধূমপান করতো।

প্যারীসে পাইপে ধূমপায়ীদের একটি নতুন ক্লাব সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ অনুমতি নিয়ে এবং দু-একটান মাত্র দিতে রাজী এমন মহিলাদেরই কেবল এই ক্লাবে প্রবেশাধিকার।

একই গ্রাম কিন্তু দুটি দেশ

ইউরোপের মধ্যে অদ্ভুত এই গ্রামটি ওলন্দাজ সীমানায় ঘেরা কিন্তু এর অনেকাংশ পড়েছে বেলজিয়ামে। কতকগুলি বাড়ি নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি বহুস্থানে পরস্পর দেশের সীমান্তকে ছেদ করে রয়েছে।

বিচ্ছিন্ন এবং প্রাকৃতিক শোভাময় এই বার্লে-হার্টগ গ্রামটি বেলজিয়ামের টার্নহাউট এবং হল্যান্ডের ব্রেডার মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। সম্পূর্ণভাবে ওলন্দাজ ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও তেত্রিশটি আলাদা আলাদা প্লট বেলজিয়ামের সম্পত্তি এবং আরো কতকগুলি জমি রয়েছে যার মালিকানা কোনদিনই নির্ধারিত হয়নি।

কতক বাড়ির অর্ধেক একদেশে, অর্ধেক আর একদেশে পড়েছে। আবার কতক বাড়ি বেলজিয়াম এলাকায় হলেও সেই বাড়ি সংলগ্ন বাগান হল্যান্ডের এলাকায় বা তার বিপরীত। একটা কাফেতে বিলিয়ার্ড টেবিলটা রয়েছে ঠিক সীমান্তে এবং বলগুলি প্রতি মারে আন্তর্জাতিক এলাকা ঘুরে আসে। অনেকে ঘুমোয় দু'দেশের এলাকা জুড়ে।

সীমান্ত এই সব অসম্ভাব্য স্থানে অবস্থিত যে কোন আগন্তুকের পক্ষে কোন্ দেশে সে রয়েছে জানা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। বাড়ি চিনতে হয় রাস্তার নাম দেখে—সাদার ওপরে কালো লেখা বেলজিয়ান বাড়ি, কালোর ওপর সাদা অক্ষরে লেখা ওলন্দাজ এবং দুই দেশের এলাকায় পড়ে যে-সব বাড়ি সে-সবের রাস্তায় থাকে একটি কালো ও একটি সাদা অক্ষর। শাসন চালানো অত্যন্ত জটিল ব্যাপার, তবে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই কাজ চালিয়ে যায়।

দুটি কাউন্সিল চেম্বার আছে যদিও ওলন্দাজ মেয়রকে তার চেম্বারে যেতে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। দুটি যাজকপল্লী আছে, অবশ্য মিশে রয়েছে কিন্তু বেলজিয়ান গির্জা যেখানে সে-জমিটি কার এলাকাভুক্ত আজো তা নির্ধারিত হয়নি।

দুটি বিদ্যালয় আছে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়েই নিজেদের জাতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়। দুটি ফায়ার ব্রিগেড পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে কাজ করে এবং কার

পৃথিবীর পঞ্চম মহাশূন্যচারি জন গ্লেন

এলাকায় আগুন লেগেছে সে-বিচার না করেই ডাক পেলেই তারা ছুটে যায়।

ওলন্দাজ এবং বেলজিয়ান—দু-দেশেরই পুলিস আছে এবং ওদের কাজ বড়ো কঠিন। কতক আইন তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হয়। যেহেতু সেগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যেমন বেলজিয়ামে কেউ সাইকেল চড়ে সঙ্গে কুকুর নিয়ে গেলে পশুটিকে ছাড়া অবস্থায় রাখতে হবে, কিন্তু হল্যান্ডে ওকে একটা শিকলে বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে।

যার যেদেশে জন্ম সেই মতোই স্থানীয় অধিবাসীদের জাতি নির্ধারিত হয়। অনেক পরিবার এ-এলাকা থেকে ও-এলাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করতে থাকায় অনেক পরিবারে ভাই ও ভগিনীরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিভুক্ত হয়। দুজন ভাইয়ের কথা জানা আছে যারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের সৈন্যবাহিনীভুক্ত।

আসলে বেলজিয়ামদের এই ভূভাগ যা ওলন্দাজ এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত তার মূলে হচ্ছে দ্বাদশ শতাব্দীর একটি ঘটনা। একবার এক যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ব্রেডার ব্যারন ব্রাবান্টের ডিউককে তাঁর যাবতীয় অকর্ষিত জমি দান করেন এবং সেই থেকে দুটি দেশের মধ্যে অবস্থাটা আয়ত্তে আনার সমস্ত রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে আসছে।

পৃথিবীর পঞ্চম মহাশূন্যচারি গ্লেন

যুক্তরাষ্ট্রের জন এইচ গ্লেন (জুনিয়ার) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৭ম ফ্রেন্ডশিপ আধারে তিনবার ভূপ্রদক্ষিন করে ফিরে এসেছেন। মহাশূন্যচারীদের মধ্যে তিনি পঞ্চম ব্যক্তি। বয়সে তিনি প্রথম দু-জন মহাশূন্যচারি, রাশিয়ার উরি গাগারিন ও ঘেরমান টিটভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এলান বি শেফার্ড ও ভার্জিল গ্রিসমের চেয়েও বড়।

চল্লিশ বৎসর বয়স্ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গ্লেনের এই যোগ্যতা অর্জনের পিছনে রয়েছে ছেলেবয়েস থেকেই আকাশে ওড়ার তাঁর উৎসাহ। ছ-বছর যখন বয়স তখনই ওর দৃষ্টিতে পরবর্তীকালে বৈমানিকের জীবন অবলম্বনের আকাংখা ফুটে উঠতে দেখা যেত। এই আকাংখা আরো তীব্র হয়ে ওঠে স্কুলে ছাত্র থাকা কালে এবং ওর শৈশবের আশা ফলবতী হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মেরিন কোরের পাইলট হতে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং পরে কোরিয়ায় দুঃসাহসিক কৃতিত্বের জন্য পাঁচবার ডি-এফ-সি এবং সতের বার বিশিষ্ট বৈমানিক পদক লাভ করেন।

১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম তিনি শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিতে জেট বিমানে মাত্র তিন ঘণ্টা তেইশ মিনিটে নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেসে পৌঁছান। বিভিন্ন ধরনের বিমানে এবং সমস্ত রকম অবস্থার মধ্যে গ্লেনের সবশুদ্ধ পাঁচ হাজার ঘণ্টা বিমানে ওড়ার কৃতিত্ব আছে। গ্লেন বলেন, আকাশচারি হতে গেলে "আত্মবিশ্বাসের দরকার, যে বিশ্বাস আসতে পারে কেবল অভিজ্ঞতা থেকে......অনুকূল অবস্থার চেয়ে বিপজ্জনক ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাই আরো বেশি মূল্যবান।"

নিজের সম্পর্কে গ্লেন বলেন, তাঁর "হিরো বা অতিমানব হওয়া সম্পর্কে কোন মোহ নেই। আমি আগে যেমন ছিলাম আজো ঠিক তাই আছি—শুধু আগের চেয়ে আরো কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে।"

ভূপ্রদক্ষিণের পর গ্লেন আরো একটি উক্তি করেন: "এটাকে কোন মতেই একটা স্টান্ট বলে ধরা যেন না হয়। সমগ্র অভিযান প্রচেষ্টাটিকে আমরা এমনভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করছি যাতে এটা আগামী অভিযানগুলির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দৃঢ় করে তুলতে পারে।"

দুই কবি : জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে যে-দু'জন সংস্কৃত কবি সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁরা কালিদাস ও জয়দেব। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদ্যোপান্ত কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট; তার একটি কারণ এই দুই মহাকবির ভাবনায় একটি ঐকাত্ম্য ছিলো, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কালিদাসের গ্রন্থাবলিতে নিজের ভাবনার সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। কালিদাসের শব্দ, অলংকার এবং চিত্রকল্প যথেচ্ছ গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ; কুণ্ঠাহীনভাবে, নিঃসংকোচে, তাদের প্রয়োগও করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে; এবং এই পূর্বসূরির ভাব ও ভাবনাকে তিনি কেবল স্বীকরণই করেননি, স্বকীয়তায় এমনভাবে সমৃদ্ধ ও নবীকৃত করেছেন যে, মনে হয় যেন পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলির আশ্চর্য শব্দঝংকার ও ছন্দঃস্পন্দনও তেমনি সমানভাবে বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলো। লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যমণি তিনি, তাঁর দীপ্তিচ্ছটায় বঙ্গ ও নবভারতীয় সাহিত্য বিকীর্ণমান; বিশেষত মৈথিল এবং বাংলার সাহিত্যে সেই বিচ্ছুরণ এখনো ক্রিয়াপরায়ণ হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানেও জয়দেবের শব্দ, চিত্রকল্প, অনুষঙ্গ, উল্লেখ এবং ছন্দঃস্পন্দন ইতস্তত পরিব্যাপ্ত ও অনুস্যূত হ'য়ে আছে; কিন্তু এটা ঠিক যে জয়দেবের কবিভাবনা রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের মতো প্রভাব বিস্তার করেনি। কালিদাসের প্রকৃতিচেতনা ও চিত্তলোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-স্বাভাবিক সাযুজ্য ঘটেছিলো, জয়দেবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিলো না, যদিও এটা লক্ষণীয় যে 'গীতবিতানে'র প্রকৃতিবিষয়ক গানগুলির ভিতর বর্ষা ও বসন্তের অবিশ্রাম উচ্চারণ কোনো-কোনো সময় 'গীতগোবিন্দ'কে স্পষ্টভাবেই মনে পড়িয়ে দেয়।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বসন্তরাসের কাব্য; তাঁর কাব্যের পশ্চাৎপটে বসন্ত প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ও লাবণ্য পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু অনেক সময়েই মনে হয় প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন তাতে বড়ো কম; শব্দের ঝংকারে তার যেন অনেকটাই হারিয়ে গেছে; মেঘের মতো কেবল যেন কতগুলি ধ্বনিই সেখানে ক্রিয়াশীল, তার অন্তরালে এই বসন্ত তার সমস্ত নিয়েও কিছুটা যেন কুণ্ঠিত ও বিশীর্ণ। কালিদাসের অকাল বসন্ত বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করলেই প্রভেদটুকু ধরা পড়ে, এবং বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেন কালিদাসকেই নিকটতর আত্মীয় ব'লে জেনেছিলেন। যেটা সেখানে প্রত্যক্ষ, অবারিত ও অসংকোচ, জয়দেব সেখানে বড়ো বেশি নির্ভর করেছেন ব্যবহৃত, আলংকারিক, কৃত্রিম উল্লেখ ও ধ্বনিমালার উপর। অথচ ক্ষমতা তাঁর কম ছিলো, এমন নয়: 'গীতগোবিন্দে'র প্রারম্ভশ্লোকে জয়দেব একটিমাত্র চরণে বর্ষার এমন একটি বিধুর, ধূসর ও মলিন মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলো; বারে-বারে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায় বা গানে তার ধ্বনিগৌরবকে প্রয়োগ করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য জয়দেবের বসন্তবর্ণনার বিলাসবিহ্বলতা রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিনই তেমনভাবে আকৃষ্ট ও মগ্ন করতে পারেনি—কেননা বস্তুত সেই বসন্তবাতাস মধ্যযুগ থেকে এতদূরে তার পরিমল ও স্নিগ্ধতা পাঠাতে পারেনি, কেননা হৃদয়ের বদলে সে একান্তভাবে নির্ভর করেছিলো আমাদের শ্রবণের উপর।

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করেছিলেন জয়দেব; তার জন্য শব্দঝংকার ও ছন্দঃ-

স্পন্দনের প্রয়োজন ছিলো, এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য। এবং পরবর্তী বৈষ্ণব কবিকুল যে বহুক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা বিহ্বল ও মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন, বৈষ্ণব পদাবলীই তার সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের উপক্রমে তিনি বলেছেন:
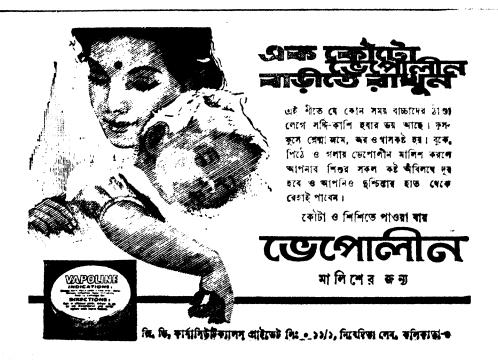
'যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥'

এই 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী' ছন্দোরসিক রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিলো, কিন্তু উপনিষদের ভাবরসে পরিপুষ্ট 'সুপরিশীলিত' রবীন্দ্রমানসে রসবিলাসকলা কুতূহল জাগায়নি। সেইজন্যই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমভক্তিমধুরভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করলেও জয়দেবের কবিভাবনাকে রবীন্দ্রমানস স্বীকার করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জয়দেব রাধাকৃষ্ণবিষয়ক লৌকিক প্রেমকবিতার ধারাকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিত করলেও, শ্রীচৈতন্যের স্বীকরণ ও আস্বাদনের দ্বারাই 'গীতগোবিন্দ' আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভ করেছিলো।

জয়দেবের পদাবলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবতেন, তা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যেই সর্বাধিক স্পষ্ট:

"জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে 'কুমারসম্ভবে'র একটি শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—

"আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥"

ছন্দ আন্দোলিত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে।......এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, যে-সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।"

কিন্তু জয়দেবের কবিভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার না-করলেও 'গীতগোবিন্দে'র অপূর্ব ধ্বনিশিল্প ও শব্দসম্পদ যে বাল্যবয়সেই তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো, সে-কথা 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত আছে:

"সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল, তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহংগতয়া নিশিরহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং' এই পদটি ঠিক মতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।"

'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতায় কবি প্রসঙ্গক্রমে জয়দেবের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন। 'গীতগোবিন্দে'র মঙ্গলাচরণ শ্লোকের প্রথম পদটি রবীন্দ্রনাথের মনে এত গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিলো যে, 'মেঘদূতে'র বর্ষাবর্ণনার ভাবানুষঙ্গে জয়দেবের কথা তাঁর মনে পড়েছিলো:

'ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি; যে-শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর-এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।'

'সোনারতরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতাতেও 'গীতগোবিন্দে'র স্মৃতি মনে পড়েছিলো:

'খুলিয়া প্রথম পাতা গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি "মেঘৈ অম্বর মেদুর"।'

সংস্কৃতে রচিত হ'লেও শব্দে-ছন্দে-ভাবে 'গীতগোবিন্দ' বাংলাসাহিত্যেরই সমধর্মী, এবং অব্যবহিত পরের বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও বহুস্তর। গীতিকবিতায় আরম্ভ অপভ্রংশ থেকে; চর্যাপদে এবং তৎকালীন অন্যান্য লোককবিতায় এই গীতিধর্মিতা ছিলো, যার পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় জয়দেবের পদাবলিতে।

বৈদিক এবং সংস্কৃতের ছন্দ অক্ষরসংখ্যাত (বৃত্ত)। অবশ্য এটা ঠিক যে সংস্কৃতে মাত্রাবৃত্ত জাতিচ্ছন্দও আছে। কিন্তু সাধারণভাবে প্রাকৃত-অপভ্রংশেই মাত্রাবৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছিলো। এই অপভ্রংশ ও লোকসাহিত্য থেকেই জয়দেব গীতিকবিতার রূপকল্প ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর গীতগুলিতে তা সর্বতোভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

উপরন্তু 'গীতগোবিন্দ' হলো বৈষ্ণবপদাবলির আকর। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, শশিশেখর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের উপর জয়দেবের প্রভাব বিলক্ষণ স্পষ্ট; তার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, ব্রজবুলি মূলতই জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত।

বৈষ্ণবপদাবলির ভাবনা যেমন রবীন্দ্রমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, তেমনি বৈষ্ণব কবিতার ছন্দ—বিশেষ ক'রে ব্রজবুলি—স্বভাব-ছন্দোরসিক রবীন্দ্রনাথের কানে ঝংকার তুলেছিলো। জয়দেব এবং ব্রজবুলির অনুপ্রাণনার প্রত্যক্ষ ফল 'ভানুসিংহের পদাবলী'।

সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উচ্চারণরীতির অনুসরণে আদি বাংলায়—যেমন 'চর্যাপদে'—এবং বিশেষ ক'রে জয়দেবের অনুসরণে বৈষ্ণবপদাবলিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হ'লেও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যাদি সাহিত্যে অক্ষরবৃত্ত পয়ার-ত্রিপদীই সাধারণত প্রযুক্ত হয়েছিলো। বাংলাসাহিত্যের আধুনিক পর্বের প্রারম্ভেও ওই ছন্দোধারাই প্রচলিত ছিলো।

ভারতচন্দ্র কিংবা তৎপরবর্তী কোনো-কোনো কবি, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, সংস্কৃত উচ্চারণরীতির অনুসরণে বাংলায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে বাংলা উচ্চারণরীতি এবং ধ্বনিবৈশিষ্ট্য অনুসরণ ক'রে 'নতুন' মাত্রাবৃত্তছন্দ (বা সত্যিকার বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ) ব্যবহার করেন*। এই ছন্দের প্রয়োগের বেলায় গীত-নিপুণ ছন্দঃশিল্পী রবীন্দ্রনাথের শ্রুতি-অনুভূতি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে তখন বিশেষ ক'রে 'গীতগোবিন্দ' ও 'বৈষ্ণব পদাবলি'র ছন্দসুষমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—তাও সহজেই অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিবিধ-পর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা দ্বারা বাংলা গীতিকবিতার স্রোতময়তাকে বহুমুখে প্রবাহিত করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতাকেও পঞ্চমাত্র-পর্বিক এবং ষণ্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্তছন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

এই পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দ রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের অনুসরণে প্রবর্তন করেছেন, এ কথা বলতে বাধা নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন: 'আমার বক্তব্য এই যে, পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য থেকে নিয়েছেন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।' কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' এই ছন্দের অতি সুন্দর আদর্শ রয়েছে। যেমন:

'অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণং।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥' বা,

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতিদর তিমিরমতিঘোরম্।'

উপরন্তু 'জীবনস্মৃতি'র পূর্বোদ্ধৃত অংশটিতে প্রথম পদটির সৌন্দর্য বালক রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে আকৃষ্ট করেছিলো, তার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। অধ্যাপক সেন মহাশয় বলেছেন, 'তাঁর বাল্যরচনাতেই যে এ-ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নয়।'* তাঁর মন্তব্যের সপক্ষে তিনি যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, তার একটি এখানে উল্লেখ করা হ'লো:

ভ্রমর কহে, "হোথায় বেলা, হোথায় আছে নলিনী,
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।"
[শৈশব সংগীত]

জয়দেবের ছন্দের দ্বারা মুগ্ধ, সম্মোহিত ও আকৃষ্ট বালক রবীন্দ্রনাথ 'তাঁর বাল্যরচনাতেই' যে পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের প্রয়োগ করেছিলেন, তারই সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিণত সুষমা তাঁর পরবর্তী রচনায় দ্রষ্টব্য। একটি প্রসিদ্ধ কবিতাকেই এখানে মনে করা যাক:

'পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে।
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।'
[মদনভস্মের পর : কল্পনা]

জয়দেবের পদাবলির ধ্বনি, শব্দ, চিত্রকল্প, অনুষঙ্গ ও উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিলো, তার ধারাটিকে লক্ষ্য ক'রে দেখা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বর্ষা ও বিরহ, বসন্ত ও তার সুষমা, ধূসর দিগন্ত ও মিলন-বিহ্বলতা—'গীতবিতানে'র অজস্র গান জয়দেবের এই গীতসুধার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এটা সর্বক্ষেত্রেই স্মরণীয় যে ভিক্টোরীয় রোম্যাণ্টিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন ব'লে রবীন্দ্রনাথ ও জয়দেবের ভিতর যে যোগাযোগ ও আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায় তা একান্তভাবে মানসিক না হ'য়ে বহুক্ষেত্রেই বরং সতচার হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য 'ভানুসিংহের পদাবলী' তার ব্যতিক্রম, কেননা রবীন্দ্রনাথের এই বাল্যরচনায় জয়দেবের প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ এবং অবারিত।

'গীতগোবিন্দে' রাধাবিরহ এইভাবে আরম্ভ হয়েছে:

'বসন্তে বাসন্তীকুসুম সুকুমারৈরবয়বৈ-
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিত কৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দজ্বরজনিত চিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী॥'

'ভানুসিংহের পদাবলী'ও বসন্ত দিয়ে শুরু: বিরহকাতরা রাধামাধবকে অনুসন্ধান করছেন। প্রথম দুটি পদে যে রাধাবিরহ ও বসন্তবর্ণনা আছে, তা মূলত জয়দেবেরই ভাবানুসরণে রচিত।

'বসন্ত আওল রে।
মধুকর গুনগুন, অমুয়া মঞ্জরী,
কানন ছাওল রে।'...

......ইত্যাদি পদটিতে বক্তব্যগুলির কোমল ধ্বনির ভিতরে 'গীতগোবিন্দে'রই গুঞ্জরণ শোনা যায়। 'রভসরস', 'ললিতগীত' প্রভৃতি শব্দ তো সরাসরি জয়দেবকে মনে করিয়ে দেয়।

'গীতগোবিন্দে'র পঞ্চম সর্গে সখী এসে রাধাকে সাকাঙ্ক্ষ মাধবের কথা বলছেন এবং তাঁকে কুঞ্জে যাবার জন্য ত্বরান্বিত হ'তে পরামর্শ দিচ্ছেন:

'নামসমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে
মৃদু বেণুম্।......
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি
তব পন্থানম্।......
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয়
নীল নিচোলম্।'

'ভানুসিংহের পদাবলী'র পঞ্চম পদটি তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায়:

'সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার,
পিনহ নীল আঙিয়া।'...

অষ্টম পদটিও প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।'...

এবং নবম পদের

'সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে,
বালা বিরহ বিষণ্ণ!...'

......প্রভৃতি পংক্তির সঙ্গে 'গীতগোবিন্দে'র পূর্বোদ্ধৃত পংক্তিগুলির ভাব, ভাষা ও

---

* কবি বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। 'দেশে' প্রকাশিত 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন 'মানসী' কেবল তার ভাবনার দিক থেকেই নয়, ছন্দ ও মিলের অচিন্তাপূর্ব ব্যবহারেও বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছিলো। এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে মুদ্রিত 'রবিশস্য' এবং 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দুটি স্মর্তব্য।

* দ্রষ্টব্য: ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

ধ্বনির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উপরন্তু,

> 'আজু সখি মুহুমুহু
> গাহে পিক কুহুকুহু
> কুঞ্জবনে দুঁহুদুঁহু
> দোঁহার পানে চায়।'
> (১১/ভানুসিংহের পদাবলী)

বা

> 'বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
> বিজুলী চমকন ঘোর,
> উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
> নিতি নিতি মাধব মোর।'...
> (১৪/ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

প্রভৃতি পংক্তির ছন্দ, ধ্বনিস্পন্দন ও ভাবনায় জয়দেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এরকম দৃষ্টান্ত অনায়াসেই আরো উদ্ধৃত করা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেহেতু বলেছেন যে, 'ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই', এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে' তিনি 'বহন করে' এসেছেন, সেইজন্য তাঁরই কথা মতো 'একে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য' করা উচিত। আসলে 'পদাবলীর যে-ভাষাকে পদাবলী বলা হোত' রবীন্দ্রনাথের 'কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে।' 'শব্দতত্ত্বে' তাঁর 'ঔৎসুক্য স্বাভাবিক।' কিন্তু শব্দতত্ত্ব পেরিয়েও জয়দেব কোনো-কোনো জায়গায় তাঁর অধিকার খাটিয়েছেন এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা' ব'লে দু-একটি চিত্রকল্পের নজির বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। নবম পদের ওই বিরহ-বিধুর বালার চিত্রকল্পটি জয়দেবের 'সা বিরহে তব দীনা' এবং 'সীদতি তব বিরহে বনমালী' এই দুটি বাকপ্রতিমার সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে, এটা বলা যায়।

জয়দেবের আসল প্রভাব পড়েছিলো রবীন্দ্রনাথের গানে; 'ভানুসিংহের পদাবলী'র সুরসুষমাও স্মর্তব্য, এবং গানের সুরকে যেহেতু সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় শব্দ ছন্দ ও ধ্বনির তানে-লয়ে, সেইজন্য জয়দেব 'গীতবিতানে'র রবীন্দ্রনাথকেই সবচেয়ে কাছে পেয়েছিলেন। 'গীতবিতানে'র প্রকৃতি বিভাগের একটি বসন্তসংগীতে (১৮৯নং) আছে :

> 'এসো থরথর কম্পিত মর্মরমুখরিত
> নবপল্লবপুলকিত
> ফুল আকুল মালতী বল্লী বিতানে—
> সুখছায়ে মধুবায়ে।
> এসো বিকশিত উন্মুখ এসো চিরউৎসুক
> নন্দনপথ চিরযাত্রী।
> এসো স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে
> গানে-গানে, প্রাণে-প্রাণে॥'

এর ছন্দ ও ধ্বনিস্পন্দন 'গীতগোবিন্দে'র বসন্তবর্ণনার অনুসারী। তুলনার জন্য দুটি চরণ উদ্ধৃত করছি :

> 'উন্মাদ মদনমনোরথ পথিকবধূজন-
> জনিত বিলাপে।
> অলিকুলসঙ্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুল
> বকুলকলাপে॥'

'অন্তর্মিলের এই বিচিত্র ও তরঙ্গোন্মুখ ব্যবহার—যা জয়দেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এমনকি 'গীতবিতানে'র 'বিচিত্র' পর্যায়ের ১২৩নং গানটিকেও প্রসঙ্গক্রমে মনে করিয়ে দেয় :

> 'হায় হায় হায়
> দিন চলি যায়।
> চা-স্পৃহচঞ্চল চাতকদল চল
> চল' চল' চলহে।
> টগ'বগ'-উচ্ছল কাথলিতল-জল
> কল' কল কল হে॥'

কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার ভিতর জয়দেবের শব্দ এবং চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, এখানে তার কয়েকটি নিদর্শন উপস্থাপিত করা হ'লো। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণ করা যাক বর্ষার সেই বিখ্যাত চিত্রটিকে : জয়দেবের সেই প্রসিদ্ধ 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ' এই শ্লোকটিকে রবীন্দ্রনাথ বহুবার নানাভাবে তাঁর কবিতায় ও গানে ব্যবহার করেছিলেন, এবং উদ্ধৃত অংশগুলিকে তাদের স্মারক হিসেবেই গ্রহণ করা বিধেয়।

> 'আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের
> সজলমেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা।'
> 'তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে'......
> 'দেখায় শ্যামলতর শ্যামবনশ্রেণী।'
> 'শ্যামল তমালতল।'

এবং এটা অনস্বীকার্য যে এই ছোটো গানটিও তো জয়দেবেরই সঙ্গে একটি গোপন আত্মীয়তা অনুভব ক'রে থাকে :

> 'নীলাঞ্জনছায়া,
> প্রফুল্ল কদম্ববন,
> জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
> বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
> মন্থর নব নীলনীরদ-
> পরিকীর্ণ দিগন্ত।
> চিত্ত মোর পন্থহারা
> কান্তাবিরহ কান্তারে॥'

আরো যে-সব শব্দ বা চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ অসংকোচে গ্রহণ করেছেন, নিম্নে তারই একটি ছোটো তালিকা দেওয়া হ'লো।

এই বাক্যাংশগুলির সাদৃশ্য বিলক্ষণ। কিন্তু এটা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ এদের স্বীকরণ ক'রে নিয়েছিলেন, কেননা তাঁর ভাষা ও ভাবনার সঙ্গে এগুলি এমন মসৃণ ও মোলায়েমভাবে মিশে গিয়েছে যে, আমরা সাধারণত লক্ষ্যই করি না এই সব চিত্র বা শব্দের জন্য তাঁকে জয়দেবের কাছে ঋণ স্বীকার করতে হয়েছিলো; আসলে এরা বাইরে থেকে চাপানো কিছু নয়, নয় কৃত্রিম কিংবা চর্চিত; ফলে এই স্বীকরণ এমন সার্থক ও অব্যর্থ হয়েছে যে, এই সব প্রয়োগের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতিভাব শোষণ-ক্ষমতা, বিনয় ও স্পর্শাতুরতাই ধরা পড়ে। 'মুকুল-আকুল বকুলপুঞ্জ,' 'আকাশ আলোক পুলকপুঞ্জে', 'মধুকরগুঞ্জিত কিশলয়পুঞ্জিত', 'নিবিড় তিমিরময়কুঞ্জ,' 'তমালকুঞ্জতিমিরে,' 'মুখরবনমর্মরগুঞ্জিত, কুন্দকুসুমরঞ্জিত, ফুলপল্লবপুঞ্জিত' প্রভৃতি শব্দচিত্রণে জয়দেবের পদাবলির কেবল ধ্বনিস্পন্দনই নয়, শব্দসম্ভারের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

এই আলোচনাটি দিগ্‌দর্শনমাত্র। অবক্ষীয়মাণ প্রাচীন বাংলার কবি জয়দেব, আর উদীয়মান নবীন বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ দুজনের কবিসত্তায় প্রভেদ বিস্তর, ভাবনা ও মানসলোকে যোজনপ্রতিম ব্যবধান। কিন্তু দুজনাই বাঙালী। দুজনেরই মাতৃভাষা বাংলা—এই তথ্যটিই হ'লো সেই সূত্র যা, মনের দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও, দুজনকে কাছাকাছি এনেছিলো, আত্মীয় করেছিলো, সম্পর্কিত করেছিলো। এই সাযুজ্য কতদূর ব্যাপক, এবং কী পরিমাণ গভীর, তা ভাষাবিদ্‌রা বিবেচনা করবেন। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাটি কেবল আরেকবার স্মরণ করি : 'সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।'

জয়দেব	রবীন্দ্রনাথ
কুসুমিত কুঞ্জকুটীরে	কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে।
ললিত গীতে	ললিতগীতকলিত কল্লোলে।
	ললিতগীত গাহিরে।
	পথিকবধূ; পথিককললনা প্রভৃতি।
পথিকবধূ	চকিতনয়না।
সচকিত নয়নম্	ক্ষিতিসৌরভ রভসে; রভসরস গান।
মৃগমদসৌরভরভসে	আসন বিছায়ো নিভৃতকুঞ্জে।
নিভৃত নিকুঞ্জ	বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে; অম্বরমঞ্জুল ছন্দে;
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জম্	বঞ্জুলমঞ্জরী; চাহিয়া বঞ্জুলবনে;
	অতিমঞ্জুল, অতিমঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে।
সজল জলদ	সজলঘন; সজলসমীর।
নবপল্লবঘন	ঘনপল্লবপুঞ্জে।

নিঃশব্দ আহ্বান

শ্রীরমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

[সত্য ঘটনা অবলম্বনে : পুলিসের ডায়েরী থেকে]

"কোথায় যাচ্ছিস, খোকা?"

শার্টের হাতাটা গুটিয়ে নিতে নিতে উচ্ছ্বসিতভাবে সুব্রত বলল, "দীপাদের বাড়ি যাচ্ছি মা।"

"না। যাবি না।"

ছোট্ট কথা; সুব্রত স্তব্ধ হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার সমস্ত উৎসাহ এক-মুহূর্তে হারিয়ে গেছে। মার চোখে মুখে পরিবর্তন। সুব্রত ধীর গলায় জিজ্ঞেস করে, "কেন মা?

কিছুটা সময় যায়। মার দিক থেকে কোন সাড়া নেই। সুব্রত আবার জিজ্ঞেস করে, "তুমি চুপ করে রইলে—?"

মার যেন সংবিৎ ফিরে আসে। "তোর সেকথা শুনে কাজ নেই।" মা মুখ নত করে বললেন।

সুব্রত চিন্তিত হল। তবে কি দীপা......।

"মা, কি এমন কথা—। তুমি বল।"

"দীপার বিয়ে হয়ে গেছে।" মা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন। বলতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

"বিয়ে হয়ে গেছে!" সুব্রত বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"বছর খানেক আগে।" মা বললেন; একটু চুপ করে থেকে ছেলেকে বোঝাবার মতন করে বললেন, "শুধু তাই নয় খোকা; দীপার আজ খুব বিপদ।"

বিপদ! সুব্রতর মন ফাঁকা। ভাবতে-পারছিল না কিছু। "তুমি কি কোন কথা স্পষ্ট করে বলতে পার না?"

মা একবার মুখ তুলে তাকালেন। সুব্রত তাঁর একমাত্র পুত্র। মার মন দুর্বল হল। সুব্রত কেমন মুষড়ে পড়েছে।

"দীপার বরের কাল ফাঁসি।" কথাটা বলেই মা আবার মাথা নিচু করলেন।

"ফাঁসি! বিয়ে হতে না হতেই ফাঁসি।"

সুব্রত বসে পড়ল। ছেলেবেলার স্মৃতি ভাসছিল চোখের সামনে। ছোটবেলা থেকে সে ছিল তার খেলার সাথী। সবাই কেন, দীপার মা তো বলেই বেড়াতেন, দীপার বিয়ে দেবেন সুব্রতর সঙ্গে। ওর মা প্রতিটি পুজোপার্বণে দীপাকে নতুন কাপড়চোপড় দিতেন। সেও পেত দীপার মার কাছ থেকে। যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে এসে দাঁড়াল ওরা, দীপার চাঞ্চল্য কমল, এল ধীর স্থির ভাব। ওকে দেখলে ছুটে পালিয়ে যেত। কত লজ্জা, সংকোচ। তবুও তারা একে অন্যকে ভালবাসা।

একদিন দীপার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সুব্রতকে সুদূর এলাহাবাদে চলে যেতে হয়—মাত্র ছ মাসের জন্যে। ছ মাস ফুরোতে অফিস থেকে হুকুম হল আরও ছ মাস থাকতে হবে। ভারত সরকারের চাকরি। চাকরি যদি করতে হয় হুকুম মেনে নিতে হবে। ছ মাসের জায়গায় বছর কাটল এলাহাবাদে। এই একটা বছর তার মনে কত রঙিন স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে। দীপা ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে, একথা শুধু ওর দিক থেকেই নয়, দীপাও ভাবতে পারেনি কোন দিন। সেই অসম্ভব কথাটা আজ কঠোর বাস্তবে সম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দীপা যে আজ বিপদ-গ্রস্ত শুধু তাই নয় সে আজ তার সব কিছু হারাতে বসেছে। দীপার আশু বৈধব্য কল্পনা করে, সুব্রতর মন অপরিসীম সহানু-ভূতিতে ভরে উঠল।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে চলতে শুরু করে।

"খোকা!"

সুব্রত দাঁড়াল, "আমায় কিছু বলবে?"

"না গেলেই কি নয়?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুব্রত। বলল, "যেতেই হবে, মা।"

সুব্রত চলে গেল।

মা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সুব্রতর যাওয়ার দিকে। সুব্রত তাঁর একমাত্র সন্তান। সুব্রত যখন চার বছরের তখন ওর বাবা সুশান্ত চৌধুরী মারা যান। তিনি বন-বিভাগে রেঞ্জার ছিলেন। গাঁয়ের জমিজমা কিছু বিক্রি করে চাটগাঁ শহরে নন্দনকানন পল্লীতে পাকা বাড়ি করেছিলেন। বাড়ির ভাড়া এবং গাঁয়ের জমিজমা থেকে যে আয়, সে আয়ে ওরা দুটি প্রাণী সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তা ছাড়া সুব্রত সরকারী অফিসে চাকরি করে। অতটুকু থেকে সুব্রতকে এত বড় করেছেন। কত স্নেহে কত যত্নে তিনি ওকে মানুষ করেছেন। সুব্রত বি এ পাস করে ওর মনের আশা পূর্ণ করেছে। তিনি আজ বুঝতে পারলেন সুব্রতর মনের কথা। তিনি বাধা দিলেন না।

ওর মনেও দুঃখ কম নয়। দীপার বাবা শক্তিপদ রায়কে তিনি কত অনুরোধ করে ছিলেন। কিন্তু শক্তিবাবু কোন কথা রাখেননি। এমন কি ওঁর স্ত্রী সুনন্দারও নয়। তাড়াতাড়ি করে একজন রেলওয়ে অফিসারের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন দীপার। বিয়ের আগের দিনও দীপা তার মাথাটা তাঁর পায়ের উপর রেখে কত কেঁদেছিল। সে দুঃখটা তাঁর রয়েই গেল। দীপার জন্য বড় দুঃখ হয়, কিন্তু তাঁর করবার কিছুই ছিল না। তিনি ভয়ে এ খবরটা সুব্রতর কাছে চেপে গিয়ে-

ছিলেন। হয়ত ছেলে একথা শুনে বিদেশে একটা কিছু করে বসবে। দীপার এত বড় একটা বিপদে সুনন্দা মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। ওদের বাড়ির একটু দূরেই, ছোট দুটি ঘর ভাড়া করে রয়েছেন ও'রা। শক্তিপদবাবু পোস্ট অফিসের কেরানী, সামান্য আয়। দীপা ও গোপা ওঁর দুটি মেয়ে।

(২)

"মাসিমা, মাসিমা!"

শক্তিপদবাবুর ছোট্ট বাড়িটার প্রতিটি প্রাণী যেন ঐ ডাকে শত অপরাধে অপরাধীর মতো বাইরের দরজাটার দিকে চেয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে একটি প্রাণী অভ্যাসবশত দরজা খুলে দিতে এগিয়ে এসে থেমে যায়। কাপড়ের আঁচলটা দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখে। চোখের জল আসে হুহু করে।

"মাসিমা, মাসিমা।"

বাইরের দরজাটা এবার বেশ জোরে জোরে নড়ে। দাঁতের ফাঁক থেকে কাপড়ের আঁচলটা টেনে নিয়ে দীপা ঘরের মধ্যে চলে গেল।

আস্তে আস্তে এসে সুনন্দা দরজা খুলে দিল। অতদিন পর এসে সুব্রত সুনন্দাকে প্রণাম করল। অন্য সময় সুনন্দা কত কথা জিজ্ঞেস করত। দীপা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে একটু একটু হাসত। সেই চাপা হাসির মধ্যে ফুটে উঠত কী যেন! সুনন্দা বুঝতে পারত, সুব্রত মুখে কিছু না বললেও, ওর ভিতরের মানুষটি পাশের ঘরে যাবার জন্য ছটফট করছে। হেসে বলত সুনন্দা, ঘরে গিয়ে বস বাবা। সুব্রত খুশী হয়ে পাশের ঘরে চলে যেত।

আজ ভেজা গলায় সুনন্দা বলল, "বেঁচে থেক, বাবা। আজই বুঝি এলে?"

সুব্রতর মুখে কোন কথা নেই। শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হাঁ।

অতদিন পর সুব্রত অনুভব করল, সে ইতিমধ্যে কত পর হয়ে গেছে ওদের কাছে। দীপার কাছেও। কি করে সে আত্মপ্রকাশ করবে, আর কি করেই বা অতদিন পর দীপাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে যাবে? কোন দিক থেকেই কোনো সূত্র খুঁজে পেল না সুব্রত। হঠাৎ তার গোপার কথা মনে পড়ল। সুনন্দাকে এড়িয়ে, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে ডেকে উঠল, "গোপা থোকায় রে, গোপা?"

হঠাৎ সেখানে বজ্রাঘাত হলেও বুঝি সুব্রত অতটা বিস্মিত হত না। সুনন্দা শুধু যে সশব্দে কেঁদে উঠল তা নয়, কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সুব্রত বুঝতে পারে না। তবে কি গোপার কিছু হয়েছে? কই মা তো এমন কিছু ইঙ্গিত করেননি। সুনন্দার অবশ দেহ উঠোতে চেষ্টা করে সুব্রত। দীপা এসে সাহায্য করে। শুধু এক পলক চেয়ে দেখে দীপাকে, তার পরেই চোখ নত করে সুনন্দাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয় বিছানার উপর। দীপা হাত পাখা নিয়ে মাকে হাওয়া দিতে থাকে। এবার সুব্রত ভাল করে দীপার পরিচিত মুখখানি দেখে। দীপার আনত মুখে ওর সমস্ত ব্যথা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। সুব্রত অতি পরিচিত, কত আপনজন দীপাকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করতে পারে না। সিঁদুরের শীর্ণ একটু রেখা তাকে শত যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে। সে আজ পরপুরুষ।

কতক্ষণ পরে সুনন্দা উঠে বসল। দীপা চলে গেল পাশের ঘরে। একটা কথাও সে বলতে পারল না। শক্তিপদবাবু তখন বাসায় নেই। তিনি অফিসে। সুনন্দা নীরব। সুব্রত চুপচাপ কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে সোজা চলে যায় পাশের ঘরে।

দীপা পাশের ঘরে ছিল। চোখ তুলে তাকাল।

সুব্রত মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করে, "গোপা কোথায়, ওকে তো দেখছি না?"

দীপা চুপ। সুব্রতর কথার কোন উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে শুধু কাঁদে।

সুব্রত সমস্যায় পড়ে। দীপার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য। সুব্রত বেরিয়ে আসছিল।

"একটা কথা ছিল।"

সুব্রত ফিরল, "বল।"

"তুমি বুঝি আজই এলে, না?"

সুব্রত পাশের চেয়ারে বসে বলল, "হাঁ, আজই।"

"সব কথাই তুমি শুনেছ বোধ হয়?"

"মার কাছে খানিক শুনলাম, কোন কথাই
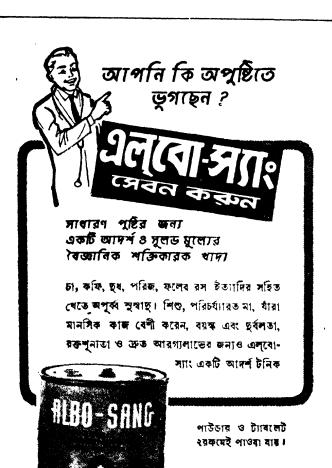
আমি বুঝতে পারছি না। মনে হয় গোপাকে নিয়ে বোধ হয় একটা কিছু হয়েছে।"

দীপা অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তারপর নীচু গলায় বলল, "মানুষের বিপদ যে এমনিভাবে আসতে পারে, সেকথা আমার জানা ছিল না।

তুমি চলে গেলে, কয়েক মাস পরেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। ওঁর নামটা শুনে রাখ। অলোক দে। পাহাড়তলি আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে তিনি চাকরি করেন। অতদিন ওখানেই ছিলাম। ওঁর কাছ থেকে কোন দিনই খারাপ ব্যবহার পাইনি। সব কথাই তিনি জানতে পেরেছিলেন। তোমার এবং আমার সম্পর্ক জানার পর থেকেই উনি খুব অস্বস্তির মধ্যে থাকতেন। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, গোপাকে তিনিই খুন করেছেন।"

'খুন করেছেন! কথাটা দীপার মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে সুব্রতর চোখ বিস্ময়ে থমকে যায়।

একটু পরে দীপা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "গোপার সঙ্গে ওর খুব মাখামাখি ছিল। গোপনে গোপাকে যে দু একবার ওকথাটা বলিনি, তা নয়। কোনও ফল হয়নি। গোপার দেহটা টুকরো টুকরো করে তিনি কেটে ফেলেছিলেন। টুকরোগুলো পুলিস কারখানা থেকে কুড়িয়ে আনে। মা, বাবা এবং আমি টুকরো-জোড়া-দেওয়া দেহটা দেখে সনাক্ত করেছিলাম। যে সময় গোপাকে খুন করা হয়, তখন আমি মার কাছে ছিলাম। আমার অবর্তমানে তিনি গোপাকে পাহাড়তলিতে একলা খুন করেন। গোপাকে যখন সে রাতে পাওয়া গেল না, তখন খবরটা দেবার জন্য আমি মার কাছ থেকে পাহাড়তলি চলে যাই। বাসায় গিয়ে দেখি তিনি অস্থিরভাবে ঘরের পায়চারি করছেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, ওঁর মনটা ভাল নেই। তিনি খবর শুনে বেশ বাস্ততা দেখিয়ে আমাকে নিয়ে মার ওখানে চলে আসেন। আবার কতক্ষণ পরেই আমরা বাসায় ফিরে আসি।

সেদিন সন্ধ্যার সময়, আমাদের পাড়ার প্রবোধদা পাহাড়তলি গিয়ে খবর দিলেন যে, কোতোয়ালি থানাতে গোপার শরীরের দুটো পা টুকরো টুকরো করে পাওয়া গেছে। তিনি খবরটা দিয়েই চলে গেলেন। খবরটা শোনার সাথে সাথে ওর মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তখন ভেবেছিলাম, অমন একটা খারাপ খবর শুনে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। আমরাও তো ঐ একই অবস্থা। প্রথমটায় অনেক সাধাসাধনা করেও ওর সম্মতি পেলাম না মার ওখানে যাওয়ার জন্যে। অনেক কান্নাকাটির পর তিনি আমার সাথে যেতে রাজী হলেন। উনি বলছিলেন, অমন একটা বীভৎস ব্যাপার দেখবার মতো ও'র মনের বল নেই।

কাজেই আমাদের রওনা হতে একটু দেরি হল। আমরা যখন বাসা থেকে বের হয়ে আসি, তখন দেখলাম একটা পুলিসের গাড়ি আমাদের কাছে এসে থামল। পুলিসের গাড়ি দেখে আশ্চর্য যে হইনি তা নয়, তবে ও'র মুখ দেখে আমি রীতিমত অবাক হয়েছিলাম। প্রবোধদা পুলিসের গাড়ি থেকে নেমে এলেন আর তার সাথে একজন পুলিস অফিসার।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম বুঝি অলোকবাবু?

তিনি বললেন, হাঁ।

আমি আপনার বাসাটা একবার দেখব, দরজা খুলে দিন।

চাবি দিয়ে আমিই তালাটা খুলে দিলাম। প্রবোধদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে প্রবোধদা?

পুলিস অফিসার প্রবোধদাকে নিয়ে বাসার মধ্যে চলে গেলেন। সুব্রতদা, তখনও আমার মনে হয়নি যে, গোপাকে খুন করার পেছনে ও'র কোনও হাত ছিল। তবুও মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। ওকেও পুলিস সাথে সাথে নিয়ে গেল।

প্রবোধদা পুলিসকে নিয়ে গেল একটা নর্দমার কাছে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই যে স্যার।

একটু এগিয়ে যেয়ে দেখলাম নর্দমার মধ্যে এবং এদিক ওদিক রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর পাশের ঘরে পুলিস তন্ন তন্ন করে

তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, গোপাকে তিনিই খুন করেছেন

খ'ুজে এমন সব জিনিস বের করল, যার উত্তর শ'ুধ'ু একটিই হয়। ঐ ঘরে গোপাকে কেউ খ'ুন করেছে। প'ুলিস একজন ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক অনেক রক্তের দাগ আবিষ্কার করল। ঘরের মধ্যে যে একটা টৌবল ছিল, সে টৌবলটাও ওরা নিয়ে গেল। সব চাইতে আশ্চর্য যে, ঐ ঘরের কোণে গোপার আংটিটাও পাওয়া গেল। আমার মনে হল, আমার পায়ের নিচের মাটিটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তারপর কি হল আমার খেয়াল নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি প্রবোধদা আমার চোখে ম'ুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, প্রথম যখন তিনি আমাদের খবর নিতে আসেন, তখন নর্দমার ঐ রক্ত ও'র চোখে পড়েছিল। বাড়ি ফিরে সে কথাটা তিনি মাকে বলতেই উপস্থিত প'ুলিস অফিসার ও'কে নিয়ে আমাদের বাসায় চলে আসেন। এর আগেই প'ুলিস আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। আজও আমরা গোপার মৃত্যুরহস্য জানি না। জেল হাজতে যেয়ে আমি ও'র সাথে দেখা করেছি, কিন্তু বার বার অন'ুরোধ করা সত্ত্বেও, তিনি সে কথা বলেননি। কয়েকটা মিথ্যা কথা বলে আমাকে ভুল ব'ুঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

তারপরই এখানে মার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছি। জান স'ুব্রতদা, কাল ভোরে এ সি'থির সি'দ'ুর ম'ুছে ফেলে দিয়ে বিধবা হতে হবে। দেখলে তো, আমি কত ভাগ্যবতী।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কোনো কথা কেউ বলল না। শেষে ম্লান হেসে দীপা বলল, "বিয়ে যাতে না হয়, সে দিকে যতট'ুকু চেষ্টা আমার পক্ষে সম্ভব, সেটা করেছি। বিয়ে যখন হয়ে গেল তখন তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক রাখা কি ঠিক? তোমায় কিছ'ু জানাইনি তাই। তা ছাড়া, ওভাবে যখন গোপাকে খ'ুন করা হয়, তখন আমিই মাসিমাকে নিষেধ করে দি, তোমাকে কোনও খবর না জানাতে। বিয়ের আগে তোমাকে দ'ুখানা চিঠিতে অনেক কথাই লিখেছিলাম, তুমি তো উত্তরও দাওনি। আর দেবেই বা কেন? আমার সেই অবস্থার কথা শ'ুনেও যখন তুমি সাড়া দাওনি, তখন অদৃষ্টকেই মেনে নিয়েছিলাম।"

স'ুব্রত চমকে উঠে। "সে কি-দীপা, আমি তো তোমার কোন চিঠি পাইনি।"

"বাঃ! মাসিমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েই তোমায় লিখেছিলাম। তুমি চলে যাবার বিশ পঁচিশ দিন পরই।"

হাঁ, সে সময় শহর থেকে আমরা অনেকটা দ'ুরে জরীপের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিন মাস পরে যখন ফিরে এলাম, তখন জানতে পারলাম আমাদের চিঠিপত্র লোক মারফত ওখানে পাঠান হয়। কিন্তু তোমার চিঠি তো আমি পাইনি।"

"সবই আমার কপাল, বাবার সাথে অনেক কথা কাটাকাটি করেও মা তাঁর মন ফিরেতে পারেনি। বাবা বললেন, অমন কত হয়, বিয়ে হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবাকে তো তুমি জান। অভাব অনটনে বাবার মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি আমার পড়া ছাড়িয়ে দিলেন। তার কারণও ঐ অভাব। তাছাড়া রেলওয়ে অফিসার বর; বিনে পয়সায়ই যে শ'ুধ'ু পেলেন, তা নয়, ভদ্রলোক খ'ুব সাহায্যও করেছেন বাবাকে। এমন স'ুযোগ আমার বাবার মতো অভাবগ্রস্ত কজন লোক ছাড়তে পারেন? তাই বাবা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন।"

দীপার কথা শ'ুনে স'ুব্রত অনেকক্ষণ মাথা নত করে বসে থাকল। তারপরই উঠে দাঁড়াল।

দীপা বাধা দিতে গিয়ে পরক্ষণেই সচেতন হয়ে উঠল।

স'ুব্রত সেদিন একটা প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে চলে গেল। সে কিছ'ুতেই ব'ুঝতে পারল না এর মধ্যে এমন কি রহস্য। অলোক যদি গোপাকে ভালবেসেই থাকত, তবে ওকে খ'ুন করার কারণ কি? কি তার এমন স্বার্থ। দীপার কথায় একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প'ুলিস তদন্ত করেছে, অলোকের বিচারও হল এবং বিচারে হল ফাঁসির আদেশ। অথচ দীপা বলছে গোপার খ'ুনের রহস্য কেউ জানে না।

তারপর চলতে চলতে সে ভাবতে থাকে সেই দ'ুখানা চিঠির কথা। দীপার কথাটাই সে মেনে নেয়, সবই ভবিতব্য। তা না হলে সে দ'ুখানা চিঠিই শ'ুধ'ু তার কাছে পৌছয়নি কেন? আর সে চিঠি পেলে যে সে এমন একটা অঘটন কিছ'ু করতে পারত, তারই বা সম্ভাবনা কোথায় ছিল? তব'ুও দীপার দিক থেকে তার উপর অভিমান স্বাভাবিক। দ'ু দ'ুটো চিঠি লিখেও যদি সে উত্তর না পায়, তবে তার ওপর দীপার অভি-মান অহেতুক নয়। দীপার বিয়ে, এ যে কত অবাস্তব। তব'ু দীপার বিয়ে সম্ভব হয়েছে অলোকের সাথে। ছোট বেলা থেকে যাদের স্নেহ ধীরে ধীরে যৌবনে এসে ভালবাসায় পরিণত হয়, তাদের মিলনে হয়তো ভগবানের একটা অভিশাপ রয়েছে। তা না হলে দীপার

বিয়ে অন্যের সাথে সম্ভব হল কি করে? তবুও তার মন চায় অলোকের মুখে সেই রহস্যের কথা শুনতে। এমন কি রহস্য রয়েছে গোপার এবং অলোকের জীবনে? অলোক কেন গোপাকে খুন করলে?

(৩)

জেলখানায় জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মণ্ডল বললেন, "অলোকবাবুর সংগে আপনি দেখা করতে পারেন, যদি তিনি সম্মত হন।"

সুব্রত তার দরখাস্ত পেশ করে অনুরোধ করেছিল মিঃ মণ্ডলকে।

প্রায় আধঘণ্টা পর সুব্রতর ডাক পড়ল। একটা অপ্রশস্ত ঘরে একদিকে দুজন জেল ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তাদেরই একটু দূরে অলোক বসে।

গত কয়েক ঘণ্টার ভেতর সুব্রত অলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যে একটা ধারণা করেছিল; তাকে দেখা মাত্র সে ভুল তার ভেঙে গেল। ওকে দেখলে মনে হয় না যে সে খুবই ভেঙে পড়েছে।

সুব্রতকে দেখার সাথে সাথে অলোক প্রথমেই নমস্কার জানায়।

সুব্রত প্রতিনমস্কার করে।

"আপনার কথা আমার কিছু জানা আছে, কিন্তু এ সময় যে আপনাকে এখানে দেখব, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি।" অলোক বলল, "ক্ষতি আপনার......"

"ওসব কথা ছেড়ে দিন, অলোকবাবু। বাড়ি এসেই সব কথা শুনতে পেলাম।" সুব্রত খানিক চুপ করে থেকে সসংকোচে বলল, "এমন কি ছিল, যার জন্য আপনি গোপাকে......! আপনাকে দেখলে মনেই হয় না, আপনি অতটা নিষ্ঠুর। আজ অবধি কেউ জানতে পারেনি কেন আপনি গোপাকে খুন করলেন। যদি বাধা না থাকে, তবে একবার বলুন।"

অলোক শুনে কয়েক মুহূর্ত কী ভাবল, বলল, "আপনি যতখানি দরদ নিয়ে কথা বলছেন, অতটা না হলেও, কিছুটা আপনি আমার কাছে আশা করতে পারেন। দীপার জন্য খুবই দুঃখ হয়। আপনার সাথে বিয়ে হলে সে সুখী হত, কিন্তু ভবিতব্য অন্যরকম। তা না হলে আমিই বা এখানে এ অবস্থায় কেন। সুব্রতবাবু, আপনাদের সব কথাই আমি জানি। আপনার দুঃখও কম নয়। আমিও কম দুঃখ পাইনি। আপনাকে দেখে জীবনের শেষ মুহূর্তে বোধহয় একটু সান্ত্বনা পেলাম। সত্যি কথা, বিচার পুলিস তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু গোপার মৃত্যুরহস্য জানবার মতো সুযোগ কারও হয়নি। এমন কি, গোপা তার মৃত্যুর আগেও জানতে পারেনি সে কথা।"

অনেকক্ষণ পরে অলোক তার কথা গুছিয়ে বলল, "সুব্রতবাবু, এ সংসারে আমার বলতে বিশেষ কেউ নেই। নিজের পায়ের উপর নির্ভর করেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের মতো একটু সুযোগ পেয়েছিলাম, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে রেলওয়েতে কাজ পেলাম ডিস্ট্রিক্ট অপারেটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে। আপনি জানেন, পাহাড়তলিতেই ছিল আমার বাসা। একদিন সুন্দরী দীপাকে রাস্তায় দেখে আমার খুবই ভাল লাগে। জীবনে সুখী হব বলে, ওকে বিয়ে করি। আপনি জানেন ওদের দারিদ্র্য। শুধু দীপাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই বিয়ের খরচটা আমিই দিই। মনে মনে একটা গর্ব হয়েছিল, এ আত্মত্যাগে দীপাকে নিবিড়ভাবে আমার মধ্যে পাব। তার কাছে আমার আসন থাকবে অতি উচ্চে। কত স্বপ্ন আমার মধ্যে ছিল।

বিয়ের পর থেকেই দীপা গোপনে কাঁদত। মনে করেছিলাম, হয়তো অমনি। কয়েকটা মাস চলে যাবার পরও ওর সেভাব যেন বেশ

ফেঁপে উঠল। ওকে দেখলেই মনে হত, সে যেন এক বিষাদ প্রতিমা। কতভাবে ওর মন পেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার সব চেষ্টা বৃথা হল। মাঝে মাঝে ওর বিষয় নিয়ে অনেক কথাই মনে হত, তবুও ধৈর্য ধরে থাকতাম। সব চাইতে আশ্চর্য ছিল আমার প্রতি ওর কর্তব্যজ্ঞান। কোন দিক দিয়েই অসুবিধে অনুভব করতাম না। আমার কখন কোন জিনিসের দরকার, না চাইতেই আমার হাতের কাছে এসে পড়ত।

সব কিছু মিলে বেশ বুঝতে পারতাম, সে যেন আমাকে অন্নদাতা হিসেবেই সম্মান করত। আপনিই বলুন, তাতে কি আমার মত অবস্থায় কেউ সুখী হ'তে পারে, না হয়েছে?

কথাটা দীপার মার কাছে বলতেই তিনি হেসে বললেন, দীপা হয়তো নতুন জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। তুমি না হয় গোপাকে কয়েকটা দিন তোমার ওখানে নিয়ে রাখ। ওকে কাছে পেলে দীপা হয়তো সহজ হয়ে উঠবে।

মার কথাটা আমার ভালই লাগল। আমার বিশিষ্ট বন্ধু অশোক একথা শুনে সেক্সলজি সম্বন্ধে লম্বা চওড়া একটা লেকচার দিয়ে বসল। ডাক্তার বন্ধু অশোকের কথা শুনে ভাবলাম, বোধ হয় তাই। একটু বয়স্থা বিশেষত শহুরে মেয়ে বিয়ে করলে প্রথম প্রথম অমন ভুল বোঝাবুঝি নাকি হয়েই থাকে। সত্যিকথা বলতে কি সেদিন ঐ ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে আমিও হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে যতই দিন এগুতে থাকে, ততই বুঝতে পারতাম, আমার সব থেকেও যেন কিছুই নেই। সব ব্যাপারেই সহযোগিতা পেতাম, তবুও মনে হত সে যেন কত দূরে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, সবাই আমাকে স্ত্রীভাগ্যে ভাগ্যবান বলে কত কথা বলত। ওদের মধ্যে দীপাকে দেখলে মনে হত সে কত সুখী, কত জীবন্ত। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে সে স্তব্ধ হয়ে যেত। তার মুখের হাসি নিবত। কত জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কোন উত্তর ওর কাছ থেকে পাইনি। ও এড়িয়ে যেত।

আপনি জানেন গোপা কলেজে পড়ত। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে আমার ওখানে আসে। নানান কথার মধ্যে আপনার কথা গোপার মুখে শুনতে পারলাম। আমার মধ্যে আপনার উপস্থিতি, আমাকে পাগল করে ফেলল। ঈর্ষাই বলুন, আর মনের জ্বালাই বলুন, এ পৃথিবী আমার কাছে দুঃসহ বলে মনে হল। অতদিন যদিও দীপার সব কিছু ক্ষমা করতে পেরেছিলাম, সেদিন ওকথা শোনার পর, একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। সে আঘাতে আমি আমার ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, সব কিছু হারিয়ে ফেললাম। সব সময় মনের মধ্যে আগুন জ্বলত। মনে শান্তি বলে কিছু ছিল না। তবুও ওকে কোন দিন আপনার সম্বন্ধে কোনও কথা
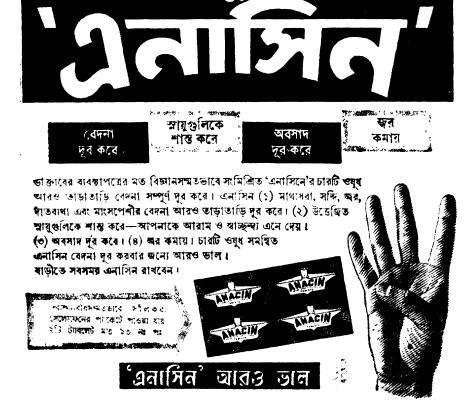
জিজ্ঞেস করিনি। ওর কি দোষ? আমার মতো সেও তো তিলে তিলে মরছে। ভাল না বেসেই যদি আমার ভেতর অতটা আঘাত আসতে পারে, তবে অতদিনের ভালবাসা কি অত সহজে ভোলা যায়? সুব্রতবাবু, আমি অত নীচ নই যে, গায়ের জোরে কারোও উপর নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে যাব। চিন্তা করে দেখেছি, দীপা নির্দোষ। ওর মাকে জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর পাইনি। আমার অভিযোগ শুনে তিনি অঝোরে কাঁদলেন। তারপরই হঠাৎ আমার হাত ধরে অনুরোধ করলেন, বাবা অলোক, তুমি আমাদের উপর রাগ করে, দীপার উপর প্রতিশোধ নিও না। ও বড় দুঃখী। মার কাছে হেরে ছুটে এলাম দীপাকে কিছু বলব বলে। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে একটি ফুটন্ত ফুল।

কয়েক দিনের মেলামেশার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারলাম গোপা বেশ বুদ্ধিমতী। তার কাছেই জানতে পারলাম দীপা সব কথা মার কাছে শুনেছে। আপনার সম্বন্ধে একটু একটু করে গোপার কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পারি। একথা শুনে শুনে দীপা এবং আমার মধ্যে ব্যবধান যতটা বেড়ে যেতে লাগল, ততটা আবার গোপা আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। গোপারও বয়স হয়েছে। আমাদের অবাধ মেলামেশায় দীপা কোন দিন বাধা দেয়নি। একদিন বুঝতে পারলাম আমার মন আমারই অজ্ঞাতে গোপার কাছে ধরা দিয়েছে।

সুব্রতবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। এর-পরের কাহিনীর জন্য কোন দিনই আমি আমাকে ক্ষমা করতে পারিনি। একদিন একটা দুর্বল মুহূর্তে গোপার কান্নায় আমার চৈতন্য ফিরে এল।

কতক্ষণ চুপ করে থাকবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার অলোক বলতে শুরু করে। "অনেক অনুরোধে গোপা আমায় কথা দিয়েছিল, সে একথা কোনও দিন কারোও কাছে প্রকাশ করবে না বলে। কোন দিন সে আমাকে ক্ষমা করতে পারেনি। রাত্রি প্রভাত হবার সাথে সাথেই, গোপা ওদের বাড়ি চলে যায়। আমিই সাথে করে রেখে আসি। যাবার সময় গোপা কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। কয়েকটা মাস অস্বস্তির মধ্যে কেটে যায়। একটা দুশ্চিন্তা মাঝে মাঝে মন মুষড়ে দিত। কিন্তু তিন মাস পরে এসে গোপা যখন আমায় কথাটা বলল, তখন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম, মনে হল পায়ের নিচে যেন মাটিটা ফেটে গেছে। চেয়ে দেখি গোপার সর্বাঙ্গে অস্পষ্ট পরিবর্তন এবং সে পরিবর্তনে শুধু একটা কথাই বোঝায়। গোপা কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে আত্মহত্যা করতে চাইল। আমি অনেক বুঝিয়ে দিয়ে, পরেরদিন দেখা করতে বললাম, গোপাকে আশা দিয়ে দিলেম একটা কিছু আমি করব। গোপাকে এগিয়ে দিয়ে এসে, সোজা অশোকের সাথে গিয়ে দেখা করলাম।

অশোক আমার বাল্যবন্ধুই শুধু নয়, সে আমার একমাত্র বন্ধু। আমাদের প্রীতি খুবই গভীর। ওকে সব কথা খুলে বলতেই সে ঘরের মধ্যে গম্ভীর ভাবে পায়চারি করতে থাকে। তারপরই সে প্রশ্ন করে, কি করবে ঠিক করেছ? অনেক কথা কাটাকাটির পর, সেদিন অশোকের দুটি হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম। শেষটায় দীপার কথা, গোপার ভবিষ্যৎ সব কিছু চিন্তা করে অশোক আমাকে সহায্য করতে এগিয়ে

এল। অশোক সেদিন তার একমাত্র বন্ধুকে সব জেনে শুনেও ত্যাগ করেনি, আমাকে বিপদ মুক্ত করবার জন্য সব কিছু গোপন করে সে অতবড় অন্যায়কে মেনে নিয়েছিল। শুধু তার প্রিয়তম বন্ধুকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। ওর কথা মতো আমার বাসায় সব ব্যবস্থা করে ফেললাম। কিন্তু দীপা? দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে দীপাকে সে সময়টা অন্যত্র সরিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। অনেকদিন থেকেই দীপা ওর মার কাছে যাব যাব করছিল। কিন্তু আমিই বাধা দিয়েছিলাম। ভয় ছিল, গোপার মতো জেদী মেয়ে যদি ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগে সব কিছু বলে দেয়। আমি বলার সাথে সাথেই দীপা ওর মার ওখানে একদিনের জন্য চলে গেল। গোপা নিরুপায় হ'য়ে আমার প্রস্তাব মেনে নিল। কলেজে যাওয়ার নাম করে গোপা আমার বাসায় চলে আসে। দূরে তো খুব বেশী নয়, প্রায় দু'কি আড়াই মাইল রাস্তা।

অশোক তৈরী ছিল। গোপা গিয়ে অশোকের ঘরে ঢুকল। পাশের ঘরে আমি বসে ছিলাম। মনটা খুবই অস্থির। বারে বারে হাতের ঘড়িটা দেখছিলাম। উদ্বিগ্ন হ'য়ে ঘরময় পায়চারি করছি শুধু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার জন্য। অশোক বলেছিল আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘড়ির কাঁটাটা দ্রুত চলছে, তার চাইতেও বুঝি দ্রুত চলছে আমার নাড়ি। অশোক অত দেরি করছে কেন? আমি যখন আর পারছি না তখন হুড়মুড় করে অশোক ঘরে এসে ওর দুটো রক্ত মাখা হাত আমার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, অলোক, আর বুঝি দীপাকে বাঁচাতে পারলাম না। অশোকের শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। তার হাত থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে—সদ্য রক্তের ধারা। ওর চোখ দুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কোন প্রশ্ন করবার আর দরকার ছিল না। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি শুধু টেবিলটাই নয়, ঘরময় রক্ত থই থই করছে। গোপা নিষ্প্রাণ যেন। আমাকে দেখেই গোপা কেঁদে উঠল, তারপরই সে বলল, জামাইবাবু আপনারা আমাকে মেরে ফেললেন?

জামাইবাবু, আপনারা আমাকে মেরে ফেললেন?

বিশ্বাস করুন সুব্রত বাবু, সেদিন গোপা জেনে গেল আমি খুনী। এ অপবাদ নিয়ে আমাকে আজও বেঁচে থাকতে হয়েছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আপনার সঞ্চিত প্রত্যেকটি টাকা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের আমাদের অত্যন্ত অভাব। গ্রামে গ্রামে স্কুল, হাসপাতাল এবং সকলের জন্য বাসস্থান—অবিলম্বে প্রয়োজন। দেশের সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, অথবা জনসাধারণের একান্ত আবশ্যকীয় সুখ সুবিধার ব্যবস্থা—এ ধরনের যে কোনো কাজই ব্যয় নির্ভর। মূলধনের এই অভাব আপনার সাহায্যে, আপনার অর্থে পূরণ হওয়া সম্ভব।

এক টাকা হ'লেও তা সঞ্চয় করুন

নিজের স্বার্থে আপনিও একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা করতে পারেন। সরকারী পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ সব দিক থেকেই লাভজনক। এ অনেকখানি ব্যবসায় অর্থ লগ্নী করার মত। অথচ এতে কোনো ঝুঁকি নেই। উঁচুহারে আপনি সুদ পাবেন। এমন কি এই অর্থের ওপর কোনো আয়কর পর্যন্ত দিতে হয়না। প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগের ১২ মাস পর আপনি আপনার অর্থ তুলেও নিতে পারেন।

সঞ্চয় করা আপনার অবশ্য কর্তব্য

বিভিন্ন সরকারী সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলি হল :

(১) ১২ বছরের ন্যাশনাল প্ল্যান সেভিংস সার্টিফিকেট
(২) ১০ বছরের ট্রেজারি সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট
(২) পোষ্ট অফিস পাশ বই
(৪) ১৫ বছরের অ্যান্যুইটি সার্টিফিকেট (দ্বিতীয় পর্যায়)
(৫) কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট
(৬) প্রাইজ বণ্ড

বিশদ বিবরণের জন্য
নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

WBSC-1A BEN

সুনয়নী দেবী

স্টেলা ক্রাম্‌রিশ্‌

শিল্পী সুনয়নী দেবী সম্প্রতি ৮৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ভারতের মহিলা শিল্পীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন নেতৃস্বরূপা। বাংলার পটচিত্রের শৈলী অবলম্বনে যে চিত্রকলার সৃষ্টি তিনি করে গিয়েছেন তা ধ্রুপদী শিল্পীর মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে। পটশিল্পের পুনরুজ্জীবনে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। সুনয়নী দেবী ছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের দুহিতা, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের নবরূপায়ণের শুরু ও পূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখেছি। সেই ঐতিহ্যের শেষ সূত্রটি সুনয়নী দেবীর তিরোধানের সংগে ছিন্ন হয়ে গেল। —সঃ দেশ

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে। পাখি জানে না কখন দস্তুরমতো তার গান গাওয়া চাই। সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে, এজন্যে তাদের বুদ্ধিবিচারের দরকার হয় না। সুনয়নী দেবীও এমনি করেই তাঁর ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন। কি করে আঁকতে হয়, তিনি কখনো শেখেননি, তাই তাঁর অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়াসেই রঙে রঙে ফেটে এবং রেখায় রেখায় গান করে উঠতে থাকে।

তাঁর ছবির মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত আদর্শ নেই, তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেছে। তাতে রেখাগুলির ধারা অভিন্ন এবং সুনিশ্চিত; যেহেতু তারা তাঁর প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত, সেই জন্যে কোনো দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করেনি; তারা প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে বা আকৃতি-সমবায়কে বেষ্টন করে ধরে; তারা একই কালে বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মঘোষণ, তেমনি আত্মসংবরণ, বায়ু-হিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মতো তাদের আকুঞ্চনতা, আর সেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতোই যেন এই রেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা বিকীর্ণ হতে থাকে।

তাঁর আঁকা বালিকাদের মুখগুলির চারদিকে পূর্ণ-পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ় সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের শাড়িগুলির মধ্যে এমনি একটি ব্যঞ্জনা, যেন তারা কাপড়ে তৈরী নয়, যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই শাড়ি যেন ঐ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেষ্টন করে রক্ষা করছে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপন-বার্তা যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করেনি, অথচ যারা আপনিই তা বুঝে নিয়েছে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে এই শাড়িগুলি যেন বড়ো আদরের দোলায় দোলাচ্ছে। এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; তারা সেই অন্তরলোকের দূতী, যে লোক লাল এবং সবুজ শাড়ির বিলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাদের ঐ দীর্ঘ এবং স্থির অথচ পাখির মতো উদাস চোখ দুটির ভিতর দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে তুলেছে।

এমনি করে ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারায় ছন্দ দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে শস্যক্ষেতের ভিতরকার বায়ুমূর্ছনার মতো শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাম্ভীর্যের বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে ঐক্য এবং ধ্রুবত্ব দান করেছে। আর-একটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত; সেটি চঞ্চল, তীক্ষ্ন লঘু সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে দ্রুত ধেয়ে চলে। এমনি করে চোখ, ঠোঁট এবং হাত দুটি মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখির ওড়ার মতো ত্বরিত বেগে রচনাটির সুসংযত প্রবাহের উপর দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সুনয়নী দেবীর আর্টের মূলতত্ত্বই হচ্ছে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একই কালে অনিত্য এবং ধ্রুব। এই তো সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড প্রবাহিত কলারীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছেন। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে, প্রাণশক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব করে ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই দুটি বিস্মৃত এবং মার্জনাপ্রাপ্ত হয়েছে।

ধ্যান

রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ ভারতীয় রেখার আকুঞ্চনভঙ্গি (Curvature) আপনার শান্ত সকরুণ সুরটিকে প্রকাশ করেছে।

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্বেকার জিনিস তারই সঙ্গে এত সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকালকার দিনের কোনো পুরুষ চিত্রকর এমন করে চিত্র রচনা করতে পারত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম চেতনা এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তর্গূঢ় জাতীয় জীবনের অখণ্ড ধারাবাহিকতার সহজ বোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েছে। সেই জন্যেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রামবধূরা তাদের আলপনায় যে-সব মোলায়েম গোল রেখার ধারা আঁকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা প্রচলিত প্রাণের গতিরেখা দেখতে পাই।

সুনয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্তার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন মার্গারিটোনে ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব ভাইদের মধ্যে কেউ কারও অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে চলে, তখন দেশকাল-নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্যেই তো সকল কালের সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।

যে একটি দ্বিধাহীনতার জোরে সুনয়নী দেবী তাঁর তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে নিয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি গাম্ভীর্য আছে। সোনালী আর কালো রঙ পরিমিতভাবে বাটোয়ারা করে দিয়ে তাঁর ছবিতে তিনি ঘনতা দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের, পর্দার কোমল ধূসর এবং পিঙ্গল রঙের এক সমতলে তিনি লাল আর সবুজ রঙ মেলে ধরেছেন।

এইরকম চিত্রকলার মধ্যে যে নিবিড়তা আছে, সে নিজের মধ্যেই নিজে বদ্ধ থাকে, কেননা, শিল্পীর অন্তর্নিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয়। কোনো শিক্ষা, বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে দিয়ে নষ্টই করতে পারে। আরও একটি বিপদ আছে—মাঝে মাঝে সুনয়নী দেবীকে তা আক্রমণ করে থাকে—সে হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা ও গল্পের সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য। তাঁর নিজের সৃষ্টি যে-সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি তাঁর দৃষ্ট বা কল্পিত পদার্থের অনুকৃতি চেষ্টায় খাটাতে হয়, তা হলে তাঁর সহজ সৃজনশক্তির উৎস এইসব জঞ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তা হলে তাঁর দৃষ্টির ও লেখনী চালনার ক্ষিপ্রতাই প্রবল হয়ে উঠবে এবং হৃদয়াবেগ ও ঘটনা-বর্ণনার ব্যস্ততায় তাঁর রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে যাবে।

সুনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্টের সমস্ত ঐশ্বর্য আছে। তাঁর আর কিছু দরকার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তা হলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৪

সলিল ঘোষ
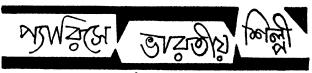
সিলেকত-এ বসে কাপের পর কাপ "মোকা" চলছে, দুধ-ছাড়া অত্যন্ত কড়া কফির নির্যাস। দামও প্রায় ডবল। হঠাৎ অপর ফুটপাথের কাফে "দোম্" থেকে এল গান গাইতে গাইতে একদল স্প্যানীশ্ ছাত্র। বিচিত্র জাতীয় উৎসবের পোশাকে তারা সজ্জিত। কালো রঙের "রোব্" পিঠে ঝুলছে আর আছে নানা প্রকারের সরঞ্জাম। দড়িদড়া, গীটার বাদ্যযন্ত্র। গীটারের সঙ্গে স্পেনদেশের গানও গাইল কয়েকটা কাফের মধ্যে। পরে একজন এসে খদ্দেরদের কাছে ঘুরে ঘুরে হাত পাতল। অনেকেই কিছু কিছু দক্ষিণা দিল ওদের। ফ্রেদেরিক বললে যে, বহু দেশের ছাত্ররা ছুটির দিনে এইভাবে কিছু কিছু পয়সা উপার্জন করে নিজেদের হাত খরচা ওঠানোর জন্যে। এরকম ব্যাপার বোধহয় প্যারিসেই একমাত্র সম্ভব। কেউ কিছু অস্বাভাবিক বা বেখাপ্পা মনে করে না। একটা কাল্পনিক দৃশ্য নিজের মনের মধ্যে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম। দেশের নরীম্যান রোডের রেস্তোরাঁগুলিতে একদল বাঙালী ছাত্র ধুতি পরে খালিগায়ে ওড়না চড়িয়ে খোল করতাল নিয়ে কীর্তনের ধুয়ো ধরে ঢুকল। খদ্দের-দের কাছে গান গেয়ে হাত পাতল কিছু দেবার জন্য। প্রতিক্রিয়া কি হবে? বলা-[illegible]ণের সাহায্য ছাড়া আমাদের দেশে ব্যাপারটা নিতান্ত বেখাপ্পা, অসম্মানজনক বলে ধরবে। প্যারিসে কিন্তু ঠিক এর উল্টো। কেউ কিছু মনেই করবে না, উপরন্তু সমর্থন ও প্রশ্রয় পাবে। খুবই স্বাভাবিক একটা কিছু বলেই ধরে নেবে ওরা। ভিক্ষাবৃত্তিতে বনেদীয়ানা এনে মাঝে মাঝে অনেক সংগীত শিল্পীকেও দেখেছি কাফেতে বেহালা বাজিয়ে গান করতে, পয়সা উপার্জন করতে। কাফের মালিকরাও এদের খেদিয়ে দেয় না।

আমার বন্ধু ফ্রেদেরিকের ভাবগতিকে বুঝলাম কাফের এই আড্ডা ও এখন ছাড়বে না। বেশ কয়েকদিন বাদে ও এখানে জমায়েত হয়েছে। অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশে একটু ঘুরতে, কাছে-পিঠের কয়েকটা বইয়ের দোকানেও প্রয়োজন ছিল। বিখ্যাত ফরাসী কার্টুন শিল্পী "সিনে"-র নাম আমি আগে শুনেছিলাম। দোকানগুলো ঘুরেই ওর বিপুল জনপ্রিয়-তার আন্দাজ পাওয়া গেল। "সিনে" এখন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মেদে ফ্রাঁস-এর "লা এক্সপ্রেস্" পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। বামপন্থী। এই পত্রিকাটি প্যারিসের "নিউ স্টেট্স্-ম্যান" বলা চলে। সিনের কার্টুন বহু পত্রপত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় এবং এই কার্টুন শিল্পী প্রায় একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমার একটি শখ, চিত্র সম্বলিত কার্ড সংগ্রহ করা। বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, প্রত্যেক স্থানের নানা বিষয়ের পিকচার পোস্টকার্ড কেনা ছিল আমার বাতিক। বিশেষ করে সংগ্রহ করতাম বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের দ্বারা অংকিত ছবির কার্ড। প্রাচীন চিত্রকলা ছাড়াও, ইয়োরোপের সর্বত্র আধুনিক ও সমসাময়িক শিল্পীদের ছবির কার্ডও প্রচুর পাওয়া যায়। দামও সস্তা। দুচারটি বইয়ের দোকান বা পত্রপত্রিকা বিক্রির "কিয়োস্কে" কার্ড ঘাঁটতে গিয়েই দেখি, "সিনে"র কার্টুন কার্ডের প্রাধান্য। আর সিনে অংকিত "বিড়াল" (স্যাট্) সিরিজের কার্টুনের ছোট বইটি ত ফরাসীদের ঘরে ঘরে। ফরাসী বিড়াল যেমন ওদেশের মেয়েদের প্রিয়, তেমনি সিনের "স্যাট্" কার্টুনগুলিও। বিড়ালের মাধ্যমে ফরাসী সমাজের প্রতি সিনের ব্যঙ্গ, হাসিঠাট্টা ও শ্লেষের কোন তুলনা নেই। মনে আছে "Chat Reuton" ক্যাপসন্ দেওয়া সিনের একটা কার্টুন কার্ড কিনেছিলাম। মানেটা "বিড়ালের পাগলাগারদ" বা ওই ধরনের একটা কিছু কে যেন বলেছিল। বিড়াল সিরিজের সাফল্যের পর সিনে ইঁদুর সিরিজেরও একটি কার্টুন বই প্রকাশ করেছেন। নানারকমের কার্ড, গাইড বই, প্যারিসের মেট্রোর ম্যাপ, চিত্রকলার কিছু বই কিনে এনে আবার কাফেতে ফিরে এলাম। ফরাসী বইয়ের দোকানগুলিকে কেন জানি না আমার খুবই পছন্দ। তাছাড়া ওদের দেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন গাইড্ বইয়ের ত কোন তুলনা নেই। প্যারিসের ওই গাইড বইগুলি নিয়ে অচেনা অজানা শহরে একলা একলা ঘুরতে আমার এত-টুকুও অসুবিধা হয়নি। ইয়োরোপে এই পিকচার-পোস্টকার্ড আর গাইড বই-এর ব্যবসাতে বোধহয় লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে। অথচ আমাদের দেশে এখনও এই ব্যবসাতে কেউ যে কেন নামছে না, তা জানি না। এমন কি ইয়োরোপের গণ্ডগ্রামে গেলেও সে গ্রামের দ্রষ্টব্য স্থানের ছবিসম্বলিত কার্ড বা

প্যারিসের বিখ্যাত আঁস্তাখানা 'লা সিলেকত্'

নানাপ্রকার তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা পাওয়া যাবে। অথচ "ট্যুরিজম্" করে মাথা কুটে মরছি আমরা এদেশে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কেউ বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলির উপরে এ-ধরনের পুস্তিকা বা কার্ড করল না। ছোটখাটো স্থানের কথা ত ছেড়েই দিলাম। যদিই বা করা হয়ে থাকে, খোঁজ করতে গেলে শোনা যাবে যে, সেগুলি আউট্ অব প্রিন্ট, তা সরকার বা বেসরকারী যে কোন প্রকাশনই হোক। এই প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখি যে "ফ্রেঞ্চ পিক্‌চার" বলতে আমার যেসব অশ্লীল ছবির কার্ড বুঝি, তা ফরাসী এইসব বইয়ের দোকানগুলিতে কখনও চোখে পড়বে না। সে বিষয়ে এরা ইংরেজদের তুলনায় অনেক বেশী শালীনতা বজায় রেখেছে। প্যারিসের পিগাল্ এলাকার নগ্ননৃত্যের থিয়েটারগুলির আশে-পাশে অবশ্য দালালরা এই ধরনের ছবি নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এবং বিদেশীদের কাছে তা

ফরাসী বন্ধু ফ্রেদেরিখ

বিক্রিও করে চড়া দামে। লণ্ডন শহরের মধ্যস্থলে একটি ছোট বইয়ের দোকান দেখে-ছিলাম, যেটা একমাত্র পোরনোগ্রাফিক্ লেখা ও ছবির কার্ড এবং রঙীন ট্রান্স্-পেরেন্সী-র ব্যবসাতে বিশেষত্ব লাভ করেছে। ঠিক এই ধরনের দোকান, প্যারিসে আমার চোখে পড়েনি।

ফিরে আসতেই ফ্রেদেরিক বললে—"চলো, ফইয়ের-এ গিয়ে এবার লাঞ্চ খেয়ে আসা যাক।"

বুলভার মঁপারনাসের উপর এই "ফইয়ের দেজ্ আর্তিসত্ আঁতালেকচুয়েল।"

বন্ধুপত্নী মিনেৎ

সিলেকত্ থেকে দুচার মিনিটের পথ, একই ফুটপাথে অবস্থিত। এই ফইয়ের-এ শুধু লাঞ্চ আর ডিনার পাওয়া যায়। দুপুরে দুঘণ্টা ও রাত্রে তিন ঘণ্টার মত খোলা থাকে। দোকানটির বিশেষত্ব হল যে, যদু-মধু যে-সে ওখানে গিয়ে খেতে পারবে না। একেবারে বনেদী আর্তিসত্, লেখক না আঁতালেকচুয়েল হওয়া চাই। মালিক রেস্তোরাঁটি খুলেছে বিশেষভাবে এদের সস্তায় দুবেলা খাদ্য পানীয় পরিবেশনের জন্য। একজন খদ্দের, শিল্পী বা আঁতা-লেকচুয়েল কিনা তার প্রমাণ পুরোক্ত দিয়ে নাম রেজিস্ট্রী করাতে হবে। নাম, ধাম, ঠিকানা সমেত একটি পরিচিতিপত্র দোকানে জমা রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে যাতে মিলিয়ে দেখতে পারে। বেশীরভাগই প্রায় বাঁধা খদ্দের, মঁপারনাস্-এর এ উঁচুতলা সমাজের শিল্পী ও লেখকদল। কোন খদ্দেরের অতিথিরূপে যাওয়া চলতে পারে, কিন্তু দোকানের কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে যে, অতিথিও এক গোষ্ঠীর। মালিকের ফটোগ্রাফীর আলাদা ব্যবসা আছে। শিল্পী সমাজকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাঁদের সুবিধার জন্য এই বিশেষ রেস্তোরাঁ খুলেছেন। শিল্পীদের প্রতি এই ধরনের প্রশ্রয় রয়েছে প্যারিসের সর্বত্র। জনসাধারণ এদের বেশ একটা আন্তরিকতার চোখেই দেখে। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে, শিল্পীদের চলনবলন ও জীবন-যাপনে, এরা কোন পাগলামি করছে বলে বা ব্যতিক্রম বলে ফরাসীরা মনে করে না। সেইজন্যই আমার অনভ্যস্ত চোখে, রাস্তার জনবহুল মোড়ে সাজসরঞ্জাম নিয়ে ওই শীতের মধ্যেও যখন শিল্পীদের দেখতাম ছবি আঁকতে, তখন ভালই লাগত। কাজের পথে হঠাৎ কোন ফরাসী সুন্দরী হয়ত থমকে থেমে গেলেন। শিল্পীর ছবিটি একটুক্ষণ যাচাই করে দুটো মিষ্টি কথা, আলতো মিষ্টি হাসি শিল্পীকে বিতরণ করে আবার পথ চলতে শুরু করলেন। এ দৃশ্য হামেশাই আমি দেখেছি এবং তখনই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি যে কেন প্যারিস সারা পৃথিবীর শিল্পীদের মক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথচারী জনসাধারণ শিল্পী-দের কাছে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে এমন ঘটনা কখনও শুনিনি, দেখিনি। পরন্তু নেহাৎ অচেনা হয়েও দুদণ্ড ছবিটি দেখে শিল্পীর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলে, অনু-সন্ধিৎসা প্রকাশ করে, শিল্পীকে উৎসাহিতই করতে দেখেছি।

আমরা যখন ঢুকলাম, ফইয়ের একেবারে জমজমাট্। কাফেতে শিল্পীদের আড্ডার এখন মধ্যাহ্ন বিরতি। সবাই এসে জড় হয়েছে এখানে। দরজার পাশে ওভারকোট ঝোলান রয়েছে সারি সারি। সিগারেটের ধোঁয়ায় বদ্ধ গরম ঘর একেবারে ভরপুর। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আধুনিক চিত্র-কলার সব নিদর্শন, হয়ত তা খদ্দেরদেরই আঁকা। নানারকমের সব স্ত্রীপুরুষ, পোশাক পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে আমার কাছে একেবারে আলাদা জগতের লোক। এখানকার পরিবেশ আবার কাফের মত নয়। ফ্রেদেরিক ঢুকেই কাউন্টারের বিগত যৌবনা, সুসজ্জিতা, অত্যধিক প্রসাধন করা মহিলাকে আমার বিষয়ে যাবতীয় পরিচয় দিয়ে জানিয়ে দিল যে, খাবার দাম এখন দেবে না, পরে শোধ দেবে। মহিলাকেও দেখলাম বিন্দুমাত্র আপত্তি না জানিয়ে, উপরন্তু রীতিমত প্রশ্রয় দিয়ে ফ্রেদেরিককে আমাদের সঙ্গে সম্মতি জানালো। আরও দেখলাম ফ্রেদেরিক পরি-চারিকাদেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র। সবাই এসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় ছিলে এতদিন?" ফ্রেদেরিকও সকলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে, কারো গালটিপে, কাউকে আলিঙ্গন করে, যথেচ্ছভাবে চুম্বন ছড়িয়ে কম্যুনিস্ট জার্মানী ভ্রমণের কথা বলল। কম্যুনিজম্ ভীতি প্যারিসের মত শহরেও অত্যন্ত প্রবল। ফ্রেদেরিকের পরিচিত অনেককেই দেখেছি পূর্ব-জার্মানী গিয়েছিল শুনে আশ্চর্য হল। প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছে, এটা ওরা ধারণাই করতে পারছে না। এইখানে বলে রাখি, সিলেকত-এর ওয়েটার বা ফইয়ের-এর পরিচারিকাদের সঙ্গে শিল্পী খদ্দেরদের বেশ একটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক। শিল্পীরা কেউই ওদের সঙ্গে উন্নাসিক উচ্চস্তরের লোকের মত ব্যবহার করে না। ওরাও যেন নিজেদেরই একজন।

ফইয়ের-এ ছোটছোট ঘেঁষাঘেঁষি টেবিল চেয়ার। তার উপর দেয়ালের তাকে গাদা-গাদা সব শীতকালের গরম বস্ত্র খদ্দেরদের। নানাপ্রকার উচ্চকিত আলাপ-আলোচনা,

'তিন সুন্দরী' : কৃষ্ণা রেড্ডী কৃত রঙীন এনগ্রেভিং

হট্টগোল। সব মিলিয়ে অপরিচিত পরিবেশে অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম। কাফেতে যে ক্ল্যাসিক্যাল ধরনের মেয়েটিকে দূর থেকে দেখে মনে মনে খুব তারিফ্ করছিলাম, ভাগ্যক্রমে তারই পাশের আসনে বসার স্থান জুটে গেল। মেয়েটির মুখ, চুলের ফ্যাশন ইত্যাদি প্রাচীন ইয়োরোপীয় চিত্রকলার কোন প্রতিকৃতি বলেই মনে হয়। কপালের উপর দিয়ে, গালের কিছুটা ও কান ঢেকে টেনে চুল বাঁধা, আর কেমন যেন খুব ঠাণ্ডা গোবেচারা প্রকৃতির। ফ্রেদেরিক আলাপ করিয়েও দিয়েছিল। যদিও ওর মতে মেয়েটি পয়লা নম্বরের গবেট্। ভাবছিলাম, বিদেশী "ইন্দিয়েন্" দেখে মেয়েটি হয়ত আগ্রহান্বিত হয়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবে আর, আমিও খুব বাক্‌তাল্লা মেরে ইম্‌প্রেস্ করব যে ফরাসীদের চাইতে ভারতীয় বা একজন বাঙালীর দৌড় কম নয়। কিন্তু—সে গুড়ে বালি। হতাশ হতে হল। ভাল ইংরেজী জানে না। আর জানলেও বোধহয় ভারত সম্বন্ধে জানার জন্য বা আমার সঙ্গে ভাব করার জন্যও কোন আগ্রহ প্রকাশ করত না। সঙ্গে অবশ্য ওর শিল্পী বন্ধুও ছিল। ওরা একসঙ্গেই বসবাস করে, শিল্পীর মডেল-ও সে হয়। ফরাসী চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এরা অন্যদের বিষয় আগ্রহ প্রকাশ করা ত দূরের কথা, নিজেদের বিষয়েও পারতপক্ষে কিছু বলতে চায় না। ওরা নিজেদের নিয়ে এমনই মশগুল্ এবং ফরাসী সব কিছুর প্রতি এতই ওদের গর্ব যে, অন্যদেশ বা অন্যদের বিষয় জানার এতটুকুও আগ্রহ ওদের নেই বললেই মনে হয়েছিল। আমরা ওদের বিষয় যতটা খবর রাখি, তার এক কানাকড়িও ওরা আমাদের বিষয় জানে না। প্যারিসে একটি মাত্র লোক আমি পেয়েছিলাম, যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানে এবং অত্যন্ত সংগত দুচারটা প্রশ্নও আমাকে করেছিল। লোকটি কিন্তু এই ইনটেলেকচুয়াল দলেরও নয়, সে একজন হাউস-পেন্টার। বাড়ি রং করে, হোয়াইট্-ওয়াশ করে, ওয়াল-পেপার লাগায় এবং বামপন্থী, বেশীরভাগ ফরাসীদের মতই। সিলেকত্-এর এক মাসের আড্ডায় কত-রকমের স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, ভুলেও কখনও কেউ এদেশ সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ওরা যেন বিশ্বাসই করে না যে, প্যারিসের বাইরেও এক বিরাট ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। এদিক দিয়ে ফরাসীরা আমাকে খুবই হতাশ করেছিল। জার্মান বা রুশদের আমার অনেক ভাল লেগেছে ওদের অনুসন্ধিৎসার জন্য।

আক্ষেপ রয়ে গেল ওই ক্ল্যাসিক মেয়েটির সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান আর হল না। পরে যখন দেখা হত ওর সঙ্গে, শুধু হাসির বিনিময়ে বুকের নৈঋত কোণের অব্যক্ত সে ব্যথা দূর করতাম।

মোটামুটি ফইয়ের-এ ভালই খেলাম এবং পরে দেখলাম সাধারণ রেস্তোরাঁগুলির তুলনায় প্রায় অর্ধেক খরচ পড়ে। প্যারিসে খাওয়া-দাওয়ার অত্যধিক খরচ। টাকার টানাটানির মধ্যে, এটা কম বড় কথা নয়।

আবার কাফেতে ফিরে গিয়ে কফি নিয়ে বসা হল। দুচারটা ফরাসী "গোলোয়াজ" সিগারেট পোড়ানর পর ফ্রেদেরিক একটু চাঙ্গা হয়ে বললে—"এবার ঠাঁই বদল করা যাক্। চল কিকো মোতীর সঙ্গে দেখা করে আসি। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীর সঙ্গেও তোমার পরিচয় হবে।"

কিকো মোতী নাম শুনে প্যারিসে অনেকে তাকে জাপানী শিল্পী বলে ভাবলেও আসলে সে খাঁটি ভারতীয় শিল্পী। বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের লোক।

আসল নাম কাইকোবাদ মোতীওয়ালা, সংক্ষিপ্ত করে শিল্পীরূপে কিকোমোতী বলেই পরিচিত হয়েছে প্যারিসে। যে কয়জন ভারতীয় শিল্পী প্যারিসে খ্যাতি অর্জন করেছে, কিছুটা প্রতিষ্ঠিতও বলা চলে, তাদের মধ্যে কিকো অন্যতম। যদিও নিজের দেশে অন্যদের তুলনায় সে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। লক্ষ্মণ পাই, সিউটস ডিসুজা, নীরদ মজুমদার, রেজা, পাদামসী, কৃষ্ণা রেড্ডী এদের সকলেরই নিজের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এদেশে প্রদর্শনীও করেছে। দু'একজন শিল্পী প্যারিস ছেড়ে চলেও এসেছে নিজদেশে। কিকো ওসবের মধ্যে নেই। কয়েকটি কারণে এদেশের সঙ্গে ওর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলা চলে এবং নিজেও এখানে ওর বিষয় কিছু প্রচার হয় তা চায় না বলেই মনে হয়েছিল। "আমি যে এখানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে আছি, খবরদার একথা বম্বেতে কাউকে বোলো না—তাহলে আমার পাওনা-দাররা চেপে ধরবে আমাকে টাকা শোধ দেবার জন্য।" কিকো বম্বে পার্শীদের কোন ট্রাস্ট থেকে টাকা ধার নিয়ে বিদেশে চিত্রকলা শিখতে যায়। টাকা ফিরে এসে শোধ দেবার কথা। কিন্তু সে আর ফিরলই না। প্যারিসে, কিকো মোতীকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। গুণী শিল্পী হিসেবে ত বটেই, মানুষ হিসেবেও।

দক্ষিণ প্যারিসে "সিতে ফালগুয়ের"-এ একটি ছোট এতেলীয়রে কিকোর আস্তানা।

সারেঙ্গীবাদক (টেরাকোটা)
শিল্পী : কৃষ্ণা রেড্ডী

এখানেই ভাস্কর রদাঁ ব্রোঞ্জ ঢালাই করতেন আর শিল্পী সুতীঁ একই স্থলে বাস করতেন। এখন কিকো, তাঁর ফরাসী স্ত্রী, ও ফুটফুটে ৬।৭ বছরের কন্যাকে নিয়ে বাস করেন। তার এতেলীয়রে ভারতীয় শিল্পী ছাড়াও, দেশ-বিদেশের আরও অনেক শিল্পীর আনাগোনা আছে। কিকোর বাবা ছিলেন একজন রেলওয়ে এঞ্জিন ড্রাইভার। ১৯৪৬ সালে লন্ডনের সেন্ট্ স্কুল অব আর্টস-এ কিকো ভর্তি হন চিত্রকলা শেখার জন্য। [illegible] পাশ্চাত্ত্যে গিয়ে কিকো, প্রাচ্যের চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের পাশ্চাত্ত্য ধরন পরিত্যাগ করে প্রাচ্যের রীতিপদ্ধতিতে আঁকা শুরু করেন। প্যারিসের মত নন-অবজেক্টিভ্ আর অ্যাবস্ট্রাক্ট্ আর্টের শহরে কিকো প্রাচ্য ধরনে, কিছুটা বাস্তবধর্মী কাজ করে শিল্পীরূপে জীবন ধারণ করছেন, তা কম কৃতিত্বের কথা নয়। লন্ডনে চারুকলায় ডিপ্লোমা পাবার পর প্যারিসে এসে বিখ্যাত ভাস্কর জাদ্‌কিন্‌-এর কাছে শিক্ষানবিশী করেন। কিকোর অঙ্কণ রীতি জাদকিনের খুবই প্রশংসা পায়। প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এবং প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী করতে কিকোকে জাদ্‌কিনই উৎসাহিত করেন। চিত্রসমালোচকরা বিভিন্ন [illegible] গুলি কিন্তু প্রথম দিকে সন্তুষ্ট হননি।

এদিকে তখন কিকোর অর্থাভাবও ছিল প্রবল। এচিং, এনগ্রেভিং, প্রিন্ট ইত্যাদিতে কিকোর স্বাভাবিক পারদর্শিতার জন্য জাদকিন ওকে এচিং ও এনগ্রেভিং-এর প্রবীণতম শিল্পী ডব্লিউ এস হেইটার-এর স্টুডিওতে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেন। হেইটার ইংরেজ হলেও, প্যারিসে বহুকাল ধরে বসবাস করছেন, 'মরপারনাস' এতেই ও'র স্টুডিও। কিন্তু সেখানে শিক্ষালাভ করার মত অর্থসামর্থ্য কিকোর ছিল না, তাই চারমাস বাদে স্টুডিও পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু পরে হেইটার কিকোকে তাঁর স্টুডিওর একজন মনিটররূপে গ্রহণ করেন। হেইটার-এর অবর্তমানে স্টুডিও পরিচালনা করা, দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা ছিল কিকোর কাজ। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই স্টুডিওতেই কিকো কাজ করেন। এই সময়, কিকোর এচিং ও এনগ্রেভিং-এর গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ, বিখ্যাত প্রকাশক—"গিল্ড দা লা গ্রাভিওর" কর্তৃক পরিবেশিত হয়। ১৯৫৩ সালে কিকোর প্রথম প্রদর্শনী প্যারিসে সমাদৃত হয়। বিভিন্ন মিউজিয়াম ছবি রচনার নিদর্শনও কেনে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দুই রীতিতে অঙ্কিত কিকোর কাজ খুবই নতুনত্ব আনে প্যারিসের চিত্রজগতে। জীব-জন্তু অংকণে কিকোর ছবির মধ্যে চৈনিক ছন্দ ও সাবলীলতা রয়েছে, বিশেষ করে জলরঙের ছবিগুলিতে। কথাটা কতদূর সত্য জানি না, এনগ্রেভিং-এর একটি প্লেট থেকে বহুরঙের প্রিন্ট করার পদ্ধতি কিকোরই আবিষ্কৃত বলে শুনেছি। কিকো নিজে কিছু খুলে না বললেও, কিকোর সঙ্গে হেইটার-এর মনোমালিন্য হবার কারণও নাকি এই। এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তারূপে হেইটার-এর নামই এখন সর্বত্র প্রচলিত। আসলে হেইটারের স্টুডিওতে থাকাকালীন কিকো একটি প্লেট থেকেই বহু রঙা এনগ্রেভিং প্রিন্ট করার কাজে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করছিলেন। প্রথমদিকে হেইটার এ প্রচেষ্টাতে বাধাও দেন, আপত্তিও তুলে-ছিলেন। কারণ তাঁর মতে এচিং, এনগ্রেভিং একরঙা প্রিন্টেরই মিডিয়াম, বহু রঙের নয়। কিকো কিন্তু সেসব না শুনে, প্লেটকে বিভিন্ন লেবেলে কেটে একই প্লেট থেকে বহুরঙা প্রিন্ট তৈরী করেন এবং পরে হেইটার তার কৃতিত্ব লাভ করে। এই কারণেই কিকো হেইটার স্টুডিও থেকে আলাদা হয়ে যান। এখন নিজের স্টুডিওতে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের এনগ্রেভিং-এ শিক্ষাদান করছেন। এছাড়া প্রাচ্যের প্রিন্ট সম্বন্ধেও কিকো নানাপ্রকার গবেষণা, পড়াশোনা করেছেন। কিকোর ছবিতে রঙের viscosity খুবই আকর্ষণীয়। একেবারে নিজস্ব পদ্ধতিতে, বিভিন্ন রঙের জমি তৈরী করে, কিকো এই আবেদন আনতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষ্ণা রেড্ডীও এই

ধরনের কাজে খুবই পারদর্শী। টেক্‌নিক্যাল দিক দিয়ে দুজনের কাজই খুব উন্নত।

কিকোর এতেলীয়রে গিয়ে দেখি জোর আড্ডা বসেছে। অত বেলাতেও লাঞ্চ ত দূরে কথা, ব্রেকফাস্টও বোধহয় ওদের হয়নি। ঘরে ঢুকেই সামনে একটা ছোট কাঠের মই, মেজানিন্‌ ফ্লোরে যাবার। সেখানে কিকো-পত্নী এখনও বিছানাতে, শীতের দিনে আরাম করছেন। ঘরের মেঝেতে বসে আমেরিকান শিল্পী ডীন মিয়েকার, পানামা দেশের কার্টুন শিল্পী লুয়েসিন দ্য কারলো, বম্বের পার্শী কমার্শিয়াল আর্টিস্ট পারভীজ ক্যাপটেন প্রভৃতি আড্ডা দিচ্ছে, ঘরময় ছড়ানো কিকোর রেডিও যন্ত্রপাতি। রেডিও-সংগীতের মৃদু রেশ আড্ডার পরিবেশকে মধুরতর করে তুলেছে। একপাশে কিকোর কন্যা খেলছে আর পাকা-পাকা সব কথা বলছে কায়লোর সঙ্গে, ভারি মিষ্টি স্বভাব। প্রথম পরিচয়ের আদান-প্রদানের পরেই জমে গেলাম ওদের আড্ডায়। বেশ দিল খুলে কথাবার্তা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিকোর এতেলীয়র এত অগোছালো যে ফরাসী মেয়েদের গৃহিণী-পণায় বিশেষ আশ্বস্ত হলাম না। কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খলা সর্বত্র, যার জন্য গৃহিণী দায়ী না হয়ে শিল্পীও হতে পারে। একদিকে কিকোর রেডিওর সব সাজসরঞ্জাম "হাই-ফাই" যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, নাড়িভুঁড়ি বার করা সারা মেজেতে ছড়ানো। টুক্‌রো টুক্‌রো সব আলাদা করা। একদিকে অ্যাম্‌প্লিফায়ার, আরেক দিকে লাউড্‌ স্পীকার। আবার আরেকস্থলে হয়ত কন্ট্রোলের সব চাবিকাঠি। কিকোর রেডিওর খুব শখ, যন্ত্রপাতি আলাদা আলাদা কিনে নিজেই সব জুড়েছে। এবং এইভাবে রাখাটাও এক ধরনের 'শো'। ঘরের কোণায় ছোট্ট রান্নাঘর আর ছুটকো নানারকমের সব জিনিসপত্র ঘরময় ছড়ানো এদিক সেদিক। এর মধ্যে এসে যোগ দিল পারভীজ্‌ ক্যাপ-টেনের ডেনিশ স্ত্রী ও কৃষ্ণা রেড্ডী, আমার পুরানো বন্ধু। কিকো-পত্নীও নেমে এল মই বেয়ে। আড্ডার গল্পগুজবের মধ্যেই সকলে সামান্য কিছু খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে ঠিক করল, কোথায় এক চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে তা দেখতে যাবে। আমেরিকানদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত একটি ডিজাইন স্কুলে নানাদেশের শিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে। কিকো, রেড্ডী, মিয়েকার-এর ছবিও আছে প্রদর্শনীতে। মিয়েকার সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টিং-এর একজন খ্যাত শিল্পী, অত্যন্ত দক্ষতা ওর কাজে এবং টেক্‌নিকে। লম্বা-চওড়া সুপুরুষ চেহারা। চাপদাড়িসহ স্ক্যাণ্ডেনেভীয়ান ভাই-কিং-দের বংশধর বলেই ওকে মনে হয়। প্রদর্শনীর রচনাগুলি আমাকে তেমন আকৃষ্ট করল না। সেই একঘেয়ে তথাকথিত মডার্ন আর্টের চর্বিত-চর্বণ। কিন্তু নানাদেশের বহু শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল এবং তাদের হাবভাব ব্যবহার ভঙ্গী আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে-ছিলাম। এখনও মনে আছে, একবার কোন এক ফাঁকে ফ্রেদেরিক কিকোকে বলেছিল,—"জার্মানী যাবার জন্য তোমার কাছে যে টাকা ধার করেছিলাম, তা কয়েকদিন বাদে শোধ দেব। কোন তাড়াতাড়ি নেই ত?" কিকো উত্তর দিয়েছিল—"না— আমার এখন টাকার কোন প্রয়োজন নেই, উল্টে তোমার যদি প্রয়োজন হয়ত তো আরও নাও, আমার হাতে এখন টাকা এসেছে।" ফ্রেদেরিককে আরও প্রায় পাঁচশো টাকার মত দিয়েছিল। পঞ্চাশ হাজার পুরানো ফ্রাঙ্কের নোটগুলো এমনভাবে কিকো দিল, যেন ওটা কিছুই নয়। শিল্পীদের মধ্যে এই ধরনের প্রীতির সম্পর্ক দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম।

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে"। কৃষ্ণা রেড্ডী শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। দুই প্রাক্তনের হৃদ্যতা তাই বেশী করে জমে উঠল। বম্বেতে রেড্ডী কয়েক বছর আগে ওর প্যারিসে করা এনগ্রেভিংয়ের প্রদর্শনী করেছিল। তখন

ওর সংগে প্রথম আলাপ হলেও, প্যারিসে শান্তিনিকেতনের সে বাঁধন অন্তরঙ্গতায় পরিণত হল। কৃষ্ণা রেড্ডী সাদাসিধে লোক, বেঁটে খাটো। পোশাক পরিচ্ছদে কেমন অগোছালো নোংরা, হেইটার স্টুডিওর কালিঝুলি মাখা ওর পোশাকে। ওরই মত ছোটখাটো, ও'র আমেরিকান স্ত্রীও সাদা-সিধে প্রকৃতির। সাধারণ আমেরিকান মেয়েদের তুলনায় কথাবার্তা একটু কমই বলে। প্যারিসের দক্ষিণ উপকণ্ঠে "ভাঁব্‌স্‌"-এ ওরা বাংলো কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বেশ সাজানো গোছানো সচ্ছল ওদের সংসার। একেবারে মেকানাইজড্‌ আধুনিক সরঞ্জামসহ রান্নাঘর। প্যারিসে ভারতীয় একজন শিল্পীকে এভাবে জমিয়ে বসতে দেখে খুবই আনন্দ হয়েছিল। কৃষ্ণা রেড্ডীকে সর্বদা দেখেছি খুব গর্বের সংগে শান্তি-নিকেতনের চিত্রশিক্ষার কথা সর্বত্র উল্লেখ করতে। রেড্ডী দম্পতী দুজনেই হেইটার-এর ষ্টুডিওতে কাজ করে। রেড্ডী এনগ্রেভিং-এ ইয়োরোপ আমেরিকাতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, ভাল বিক্রিও হয় ওর প্রিণ্ট। একজন সুইশ প্রকাশক ওর ছবির পরিবেশক। টেক্‌নিকে রেড্ডীর হাত খুবই পাকা। তামার প্লেট বৈদ্যুতিক ড্রিল দিয়ে এনগ্রেভ করাতে ওর সমকক্ষ হয়ত বিরল। হাত দিয়ে প্লেট না কেটে, যান্ত্রিক ড্রিল ব্যবহার করায় হেইটার-এর আপত্তি ছিল। কিন্তু কৃষ্ণা রেড্ডী বলে "তাতে ক্ষতিটা কি? আমি যে ধরনের কাজ করি, যে এফেকট্‌ আনতে চাই, তা বৈদ্যুতিক ড্রিল ব্যবহারে ভাল হয় ও সহজে কম সময়ে করা যায়। তাই কেন তা ব্যবহার করব না?" রেড্ডীর ছবির ফর্মগুলো কোন বস্তুর বাইরের প্রতিকৃতি নয়, আভ্যন্তরীণ

চীনামাটির তৈরী মূর্তি।
শিল্পী : কৃষ্ণা রেড্ডী

প্রতিচ্ছবি বলা চলে। ইলেকট্রনিক মাইক্রো-স্কোপে হাজার হাজার গুণ বর্ধিত আকারে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু দেখতে যেমন হয়, রেড্ডীর ছবির আবেদন অনেকটা সে ধরনের। রেড্ডী কি করতে চায় ও "ফর্ম" বলতে ও কি বোঝে, এ নিয়ে অন্যান্য শিল্পীদের মত তারও নিজস্ব অনেক কিছু বক্তব্য ও মতামত আছে। বেশীরভাগই আমার নিকট দুর্বোধ্য ব্যাপার, তাই ফর্ম সম্বন্ধে রেড্ডীর সে তত্ত্ব-কথা উল্লেখ করতে চাই না যা তাতে কোন লাভ নেই। মোটা কার্পেট পাতা, সুন্দর সাজানো ড্রয়িং রুমে, তাপনিয়ন্ত্রিত এক শীতের সন্ধ্যায় বসে, রেডিওগ্রামে পাশ্চাত্য কোন উচ্চাংগ সংগীত শুনতে শুনতে রেড্ডী বলেছিল—"এই যে সংগীতের আবেদন, ওর অ্যাবসট্রক্‌ট্‌ এফেক্‌ট্‌-এর একটা ফর্ম আমি আমার এনগ্রেভিং-এর মধ্যে দিতে চাই।" আমার কাছে রেড্ডীর কতগুলো কাজ, ওর ভাস্কর্যের কতগুলো নমুন অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। আবার কিছু কিছু এনগ্রেভিং বড্ড মেকানিক্যাল বলে মনে হয়েছে, শিল্পীর হৃদয়াবেগ বা অনুভূতি যেন কাজের মধ্যে নেই। এনগ্রেভিং ছাড়াও রেড্ডী অয়েল পেণ্টিং ও ভাস্কর্যের কাজ নিয়মিত করছেন।

অতিথিবৎসল রেড্ডী দম্পতির বাসস্থানে বহুবার গিয়েছি। ওদের পরিচিত বহু শিল্পীর সংগে আলাপ হয়েছে সেখানে। মিঃ ও মিসেস্‌ ডিকসন্‌ এবং ফ্লোরা রীডার এর সংগেও পরিচয় হল ওখানে। রীডার দম্পতি আমেরিকার টেক্সাসের বাসিন্দা। টেক্সাস-এর নাম শুনে আমরা যা বুঝি এরা কিন্তু তার ঠিক বিপরীত। ডিকসন একজন গুণী শিল্পী। খোঁড়া, লাঠি নিয়ে চলতে হয়। কোমরের একটি হাড় প্লাস্টিকের। এক ব্রীজের উপর থেকে পড়ে গিয়ে এই অবস্থা। ফ্লোরা মঞ্চ প্রযোজনা ও অভিনয়ে বিশেষজ্ঞা। এ'রা দুজনে টেক্সাসে একটি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। টেক্সাসের তৈল-ধনপতিব ছেলেমেয়েদের চিত্রকলা ও মঞ্চাভিনয়ের শিক্ষাদান করা হয় এই স্কুলে। আশ্চর্য হয়েছিলাম শুনে যে, ওরা ভারতীয় "নল-দময়ন্তী" উপাখ্যান স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা মঞ্চস্থ করেছিল। ডিকসন মঞ্চসজ্জা ও পোশাক পরি-কল্পনা করে ভারতীয় চিত্রকলার অনুকরণে আর ফ্লোরা পরিচালনা করে নাটকের। রঙীন ফটোও দেখিয়েছিলেন এই নাটকের। আপাতত আমেরিকান স্কলারশিপ নিয়ে ডিকসন প্যারিসে এনগ্রেভিং শিখতে এসেছে হেইটার স্টুডিওতে। অত্যন্ত আলাপী আমুদে ও মিশুকে এই দম্পতি। মনে পড়ছে এক সন্ধ্যায় ওদের হোটেলে আমাদের জবর বৈঠক। রামায়ণ মহাভারতের নানান গল্প, ভারতীয় কিংবদন্তী ইত্যাদি সব বলেছিলাম। স্তম্ভিত হয়ে সব শুনেছিল উপভোগও করেছিল। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নাটকও বাদ পড়েনি। "তাসের দেশ"-এর কথা শুনে দুজন একেবারে উচ্ছ্বসিত। দেশে ফিরে, ওদের স্কুলে নাটকটি মঞ্চস্থ করবে বলে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কথা দিয়েছিলাম, ভারতে ফিরে ইংরাজী অনুবাদের ব্যবস্থা করব ওদের জন্য। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। 'তাসের দেশে'র কথা মনে করিয়ে দিয়ে ওদের চিঠিও পেয়েছিলাম।

প্যারিসে থাকাকালীন ভারতীয় শিল্পী লক্ষ্মণ পাই-এর চিত্রপ্রদর্শনী চলছিল, "গ্যালারী ডওফিন"-এ। বম্বের শিল্পী পাই প্যারিসে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। ভারতীয় ফোক-আর্ট-এর ধরনে পাই-এর ছবি ওদেশে বিক্রিও হয় ভাল। প্যারিসের শিল্পজগতে ভারতীয় শিল্পীরাও যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, এতেই আনন্দিত হয়েছি প্রচুর।

এখানেই শহরের শেষ নয়, এখানেই শহরের শুরু নয়। সকাল-সন্ধ্যায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবীদের ভিড়টা এখানে কম নয়! শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফাঁকা জায়গাটুকু আর ফাঁকা থাকে না, নির্মল বায়ু সেবনে ধড়ফড় করে।...

এমনিতেই দিনের বেলায় পাড়াটা অন্ধকার, বাড়িটা অন্ধকূপ, সকাল হবার আগে পাতালপুরীর কোন প্রকোষ্ঠ যেন! দু চোখ এক করার আগে ঘরের আলোটা জ্বালাই থাকে সর্বক্ষণ, রাত থাকতে উঠে আর একবার জ্বালতে হয়, দেখে-শুনে অনিমেষের প্রাতঃভ্রমণের আয়োজন করে দিতে হয়। জামা, জুতো, গলাবন্ধ, ছড়ি! চা-ও এক পেয়ালা উষ্ণ, সঙ্গে দুখানা বিস্কুট!

চোখ রগড়াতে রগড়াতে, কান-মাথা জড়িয়ে গলাবন্ধ বাঁধতে বাঁধতে অনিমেষ বলে, 'সকালে বেড়িয়ে কিচ্ছু হবে না, রোজ রোজ খালি—'

স্বামীর কথাটা কানে না-তুলে পিছন থেকে কোটটা অনিমেষের প্রসারিত হাতে গলিয়ে দিয়ে কমলা বলে, 'তোমাকে অত মাথা ঘামাতে বলেনি কেউ, নাও পরে নাও!'

অনিমেষ গজ্‌গজ্‌ করে 'একঘেয়ে! বুড়ো লোকের মত মিথ্যে বাঁচবার চেষ্টা!'

কমলার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। অনিমেষের জুতো জোড়াটা দোরগোড়ায় রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনিমেষ আর কিছু বলবার আগেই কমলা ভগ্নস্বরে বলে ওঠে, 'বেশ তো, চেঞ্জে যাবার ব্যবস্থা কর না, তা হলে বুড়ো লোকের মত কলকাতাতেই মুখ থুবড়ে থাকতে হবে না। কর না, কেউ তো বারণ করেনি!'

নিঃশব্দে পায়ে জুতো গলিয়ে অনিমেষ রোজ সাত সকালে সুড়ঙ্গের মত গলি-পথটা পেরিয়ে আসে। ভোর হতে তখনও অনেক দেরি। আধ-বোজা চোখে কোনও গৃহস্থের মোরগ ডাকে।

ভারি রোগ-ভোগের পর সেরে উঠতে ডাক্তার বায়ু-পরিবর্তনের কথাই বলেছিল। কলকাতার এই ধোঁয়া, ঘিঞ্জি, স্যাঁতসেঁতে-

অন্ধকার কিছুদিন ত্যাগ করা উচিত! ফুস-ফুসটাও অনিমেষের ভাল নয়, নির্মল বাতাস আর পুষ্টিকর খাদ্যের এখন বিশেষ প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি দেহে শক্তি ফিরে পেতে হলে—

বাকি উপদেশটুকু অনিমেষই ছেলেবেলার স্বাস্থ্যপাঠের জ্ঞান থেকে পূরণ করে নিতে পারে, বড় ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উপস্থিত যেটুকু প্রয়োজন তাই বা কোথা থেকে কি ভাবে সংগ্রহ করা যায়! মুখে বললেই তো আর হল না। বিশুদ্ধ বায়ুর জন্যে চেঞ্জের দরকার, তা আবার ব্যয়-সাপেক্ষ—ওষুধপত্রে এত খরচের পর একেবারেই তা অসম্ভব! আর পুষ্টিকর খাদ্য, হাফ-পে ছুটিতে সেতো ছেলের-হাতের মোয়া!

স্বামী-স্ত্রী অনেক পরামর্শ করে যখন কোনই সুরাহা করতে পারেনি তখন এই বিকল্প ব্যবস্থা বায়ু পরিবর্তনের! শহর-প্রান্তে ফাঁকা মাঠে যেটুকু বিশুদ্ধ বাতাস আছে তা আগেভাগে গিয়ে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করলে ভগ্ন স্বাস্থ্যোদ্ধারের কাজ হলেও হতে পারে। কিন্তু গোয়ালার এই গলির বাতাস বড় বিষাক্ত!

প্রথম দিনের উত্তেজনায় সূর্যোদয়ের পূর্বেই ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরে অনিমেষ বলেছিল, 'আঃ কি ফাঁকা! নিঃশ্বেষ নিতে কোনই কষ্ট হয় না, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে যত খুশী অক্সিজেন নাও! কি দরকার চেঞ্জে যাবার?'

ঠিক অতটা উৎসাহ বোধ না করলেও কমলা স্বীকার করে নিয়েছিল, যদি ফল একই পাওয়া যায় তা হলে পয়সা খরচ করে বায়ু পরিবর্তনের আবশ্যক নেই। অনিমেষের সুস্থ হয়ে ওঠা নিয়ে কথা!

প্রথম প্রথম অনিমেষ সে-ভাব দেখিয়েছিল, শহর প্রান্তে ফাঁকা মাঠে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের কাল বিলম্বিত হত। বাইরে চড়া-রোদের তাপ গলিমুখে সামিয়ানা-ঢাকা মনে হলে, বেলা আটটা বাজলে অনিমেষ বাসায় ফিরে এসে শহরের প্রান্তে মৃতসঞ্জিবনী লাভের সংবাদ আনত—শুধু কি বাতাস, কত গাছ, ফুল, পাখি, মানুষ—

কমলা যোগ দিত, 'আমি জানি, তুমিই দেখ! আপিস যাবার আগে তো কোনদিন চোখই চাইতে না, মনে করতে কলকাতাটা শুধু আমাদের গলির মত এঁদোপড়া আর অন্ধকার!'

নতুন করে দেখা নতুন শহর যেন, অনিমেষ বলেছিল, 'গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না, আমার মত কত লোক সেখানে যায়।'

কমলা বলেছিল, 'বেশ তো, ওখানে যত-ক্ষণ পার থেকো না, কে তোমায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে বলেছে!'

কিন্তু ফিরতেই হয় এক সময়, বায়ু-সেবন ছাড়াও সদ্যরোগমুক্ত ব্যক্তির আরো অনেক করণীয় আছে শহর অভ্যন্তরে। পথ্য চাই, ওষুধ চাই, ডাক্তার চাই, কাজও চাই! আর সবার জন্যে চাই রসদ।

কমলাই বারণ করেছে, 'না, আর কটা দিন যাক, ডাক্তার বলুক, তারপর আপিসে যেও। আগে শরীর তারপর কাজ!'

দুষ্ট রোগের মত ভাবনাটা ছুটি-ছাটা সব শেষ হয়ে যেতে মনে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধ-ছিল, অনিমেষ চৌকির ওপর ধপ করে বসে ক্লান্ত সুরে বলেছিল, 'আর দেরি করলে চাকরি যাবে।'

কমলা কিসের জোরে বলেছিল কে জানে, 'চাকরি আগে না, শরীর আগে?'

ঘন কুয়াশায় পথ দেখা যায় না। সারা রাত কি যেন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে শহরের মুখে গাঁজলা ভেঙেছে। মৈনাক দণ্ডে শহর-সমুদ্র উদ্বেল হয়ে সফেন হয়েছে, গরল উঠেছে।

অনিমেষ সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগোতে এগোতে ভাবলে, শহরে থেকে শহরের নিঃশ্বাসে শরীর মজবুত হবে না, বাইরে কোথাও না গেলে কাজে পুনঃ যোগ-দানের সে উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। কিন্তু—

রোগ হবার পর থেকে নিজে হাতে কিছু না করলেও, টাকা-পয়সার আগম-নির্গম পথটা না-জানার মত অন্ধিসন্ধিপূর্ণ নয় অনিমেষের চিন্তায়। আধা মাইনের দিন ফুরিয়ে গেছে, বিনা মাইনের দিন শুরু হয়েছে, ছুটি শেষ মাইনে শেষ! এইবার চাকরিতে হাত পড়বে, নোটিশ আসবে—

কমলা আশা ছাড়ে না, ছেলে-ভুলোনার চেষ্টায় বলে, 'কি যে বল, অত ভারি অসুখ গেল, এরই মধ্যে শরীরে বল পাবে, দুদিনেই কাজ হয়ে যাবে?'

হিসেব করে অনিমেষ বলেছিল, 'দু মাসের ওপর হয়ে গেছে ভোর বেলায় রোজ বেড়িয়ে আসছি! ডাক্তারও বলছে কোন উন্নতি হয়নি স্বাস্থ্যের!'

কমলা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ডাক্তাররা অমন বলে, ওদের আর কি, লম্বা ফিরিস্তি দিলেই হল!'

বায়ু পরিবর্তনের জন্যে বাইরে যাওয়া এখন একেবারেই কল্পনা! পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ফেলে না দিলে ঐ অন্ধগলি থেকে অসুস্থ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য মানুষগুলোর উদ্ধার নেই! চেঞ্জও নেই কোন।

মাঠে এক চক্কর দিয়ে আর বেড়াতে ইচ্ছে করে না, অনিমেষ একধারে একটা কৃত্রিম কাঠের গুঁড়ির ওপর চেপে বসে। সামনে পুকুরের জলটা তখনো সেলেটের মত কাল, কুয়াশার ঢাকাটা কে যেন আস্তে আস্তে সরিয়ে নিচ্ছে, অদূরে শহর-চাঞ্চল্য জাগছে। শহর-ছোঁয়া পথটায় হঠাৎ যানের ফুৎকার উঠছে।

রোজ যারা নিয়মিত আসে তারা একে একে এসে হাজির হচ্ছে। কেউ বসছে, কেউ হাঁটছে, কেউ দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে, সূর্যটা বুঝি শহর প্রাকারের অনেক নীচে! মাঠেও আজ কেমন গুমোট ভাব! শীতটার গলা চেপে ধরেছে কে, কাত হল বলে।

কোটের ওপর থেকে মুড়ি-দেওয়া গরম চাদরটা অনিমেষ খুলে ফেললে। গলাবন্ধটা আলগা করে দিলে। চেয়ে চেয়ে দেখলে, ভাবলে প্রথম দিনের মত তেমন উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দদায়ক মনে হয় না, এ মাঠে অনেক লোক, অনেক ভিড়—পায়ে পায়ে ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দু ধুলো হয়ে গেছে, অনেক আগে-ভাগেই প্রাতঃভ্রমণকারীর পদধ্বনি উঠেছে।

অনিমেষ অস্পষ্ট কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে সঞ্চরমান মানুষগুলোকে দেখে দেখে এই প্রথম যেন ভাবলে, সবাই-ই কি এখানে তার মত বিকল্প বায়ু পরিবর্তনের আস্বাদ নিচ্ছে? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে? অর্থ-সামর্থ্যের অভাবটা ফালতু মাঠের বদান্যতায় পূরণ করছে? রোগভোগের পর শরীরে শক্তি সঞ্চয় করছে?

না, সবাই অসুস্থ নয়, সবাই অসমর্থ নয়, সবাই বিকল্প পন্থায় এখানে আসেনি। ঐ তো মাড়োয়ারি ভদ্রলোকটির ঝকঝকে মোটর-গাড়িটা মেহগনী গাছের তলায় দাঁড় করান, গাড়ির মালিক থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটছেন, খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছেন, আগাগোড়া শাল-দোশালার মুড়িতে কবেকার মিশরের মমির মত দেখতে লাগছে যখন দম নিতে থামছেন। উনি একা নন, আরো কত আছে! হ্যাঁ, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আছেন, যেমন লম্বা তেমনি চেহারার বাঁধুনি, পাকা বাঁশের মত, পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পরিপাটি, হাঁটার মধ্যে বেশ বৈশিষ্ট্য আছে, এক একটা স্টেপ যেন সভাপতির সভারোহন! আর একজন প্রৌঢ় আছেন উচ্চতায় নাতি-দীর্ঘ, কিন্তু ক্ষিপ্রতায় যুবক সদৃশ, এরি মধ্যে বোধ হয় বাইশবার চক্কর দিয়ে ফেলে-ছেন। এঁদের কাউকে দেখে অসুস্থ বা অসমর্থ মনে হয় না, বিকল্প পন্থাবলম্বন-কারীও না। এঁরা রোজই আসেন, হয়তো অনিমেষের অনেক আগে থেকেই আসছেন, নির্ভেজাল বায়ু সেবনই উদ্দেশ্য!

ক্ষিপ্রগতি প্রৌঢ় ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন, চোখ তুলে চাইলেন, দৃষ্টি বিনিময় করে বললেন, 'এরি মধ্যে বসে পড়লেন দেখছি!'

বসে বসেই অনিমেষ গায়ের চাদরটা কাঁধে ফেলে বললে, 'না, এই একটু—'

নিজের তালেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'কেবল হাওয়া খেলেই হলো না, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা চাই! ওয়াকিং একটা এক্সারসাইজ। বাতের টেণ্ডেন্সিই বলুন

আর পেটের গোলমাল বলুন, সব সেরে যায়।'

মেদবহুল মাড়োয়ারি ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'দাবাই-ওয়াই কুছ নহি, ওয়াকিং ঠিক আছে!'

মাঠে এসে বসার জন্যে সবাই যেন অনিমেষকে দুয়ো দিচ্ছে। বিশুদ্ধ বায়ু কেবল সেবন করলেই হয় না, বায়ুস্তরে অংগপ্রত্যংগ সঞ্চালনও প্রয়োজন।

কুয়াশাটা এতক্ষণে কেটে গেছে, মাঠের গাছ-পালা-ঘাস মিলিয়ে বেশ সবুজ-সবুজ লাগছে, বাসা ছেড়ে অনেকগুলো পাখি এক-সংগে উড়ে যাচ্ছে।

অনিমেষ উঠে ওঁদের সংগ নিলে। কিন্তু সংগীরা বোধ হয় সংগ চান না, যে-যার মত হাঁটতে লাগলেন, প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনেক দূরে, বৃদ্ধ মাঝখানে, মাড়োয়ারী একেবারে পিছনে—

এই একটু আগে তার বসা নিয়ে ও'দের যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল এখন ওর উত্থানে, পদচারণে তার কোন চিহ্নই নেই। মাঠের ঘাসে এক ফোঁটা শিশিরও নেই, কুয়াশায় দিগন্তে আঁচল-ছোঁয়া! গুটি গুটি পিছন পিছন অনিমেষ তবু এগোল।

রোজই এমনি করে বাড়ি ফেরে।

কি হচ্ছে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু শরীর যে সারছে না সে বিষয়ে অনিমেষ নিঃসন্দেহ। না বললেও কমলাও বুঝি বোঝে, টের পায়। বিশুদ্ধ বায়ুর ফাঁকটুকু পুষ্টিকর খাদ্যে পুরিয়ে দিতে চায়। বড় পেড়াপিড়ি করে।

অনিমেষ সুস্বাদু পানীয়টা মুখ থেকে নামিয়ে বলে, 'মন্দ নয়, কিন্তু—'

স্বামীর অনুক্ত বক্তব্যটুকু বুঝে নিয়ে কমলা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, 'অত খবরে তোমার দরকার কি, পাচ্ছ খাও!'

বলকারক পানীয়টা মুখে তুলে অনিমেষ তেমনি কিন্তু করে, 'তা নয় পাচ্ছি, কিন্তু—'

কমলা প্রায় রাগ করে সামনে থেকে সরে যায়। শূন্য পাত্রটা হাতে ধরে অনিমেষ চুপ করে বসে থাকে। আশ্চর্য, কমলার একটুও ভাবনা নেই, কি-দিয়ে-কি-হবে, কার-পরে-কি-হবে, বিনা-মাইনেয়-চলে-কি-করে! হয়তো ও সুস্থ বলেই এ সব কথা কিছু ভাবছে না, একটি অসুস্থ লোককে ভাবাচ্ছে না। যখন অনিমেষ সুস্থ ছিল, অফিসে রোজ যেত আসতো, পকেটে করে মাস-মাইনে আনতো তখনও কমলার কোনই ভাবনা ছিল না। এখনো তাই? কে জানে কি শক্তি আছে কমলার দুর্ভাবনা এড়াবার। দিব্যি আছে, যেন কিছুই হয়নি, যেন একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে! এমন ঘটনা সব ঘরেই ঘটছে, জন্ম-মৃত্যুর মত রোগের আনাগোনা, ভয়ের কিছু নেই, ভাবনারও কিছু নেই!

একদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফিরে অনিমেষ বললে, 'কাল থেকে আপিসে যাব ঠিক করেছি।'

স্বামীর কথায় কোনরূপে বিচলিত না হয়ে কমলা বললে, 'ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেচো—যেতে বলেচেন?'

হঠাৎ রেগে অনিমেষ বললে, 'ডাক্তার আবার কি বলবে! সব কথা ডাক্তারকে জানাতে হবে?'

কমলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'না, বরাবর উনিই তো দেখচেন, ভাল-মন্দ উনিই বোঝেন!'

আরো যেন রেগে ওঠে অনিমেষ, 'বুঝলে আর এই অবস্থা হয় না, এক বছর ধরে রোগ সারে না, ওষুধ গিলিয়ে গিলিয়ে শেষ করে ফেলে না!'

যত দোষ এখন ডাক্তারের, ওষুধের। কমলা চুপ করে থাকে, একটানা রোগে ভুগে অনিমেষের মেজাজ ক্রমেই তেতো হয়ে গেছে। নিজের মতটি ছাড়া কারো কথা সহ্য হয় না।

আরো অসহ্য ডাক্তারের লিখিত নীরোগ-পত্র ছাড়া অফিস তাকে পুনঃ কাজে নিতে চায় না। রোগীর মুখের কথায় রোগ সারে না। কথা কাটাকাটি করে অফিসের দোর-গোড়া থেকে অনিমেষকে ফিরে আসতে হয়।

কমলা অনেক করে বুঝিয়ে-বাজিয়ে অনিমেষকে প্রাতর্ভ্রমণে পাঠায়—'আর কটা দিন দেখ, তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করো।'

তেমনি মারমুখো হয়ে অনিমেষ বলে, 'কি ব্যবস্থা করবো, ডাক্তার সার্টিফিকেট না দিলে কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে চাকরিটাই যাবে!'

চাকরি থাকার সুখ অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে, এখন যেটুকু আছে স্বামী-পরিত্যক্তার শঙ্খ-বলয় কেবল, কমলা বললে, 'যায় যাক, তুমি ভাল হও, তারপর দেখা যাবে।'

অনিমেষ মুখ বিকৃত করে বললে, 'আর দেখা যাবে!'...

একে একে ও'রা তিনজনেই দেখলেন, লোকটি মাঠের একধারে চুপচাপ বসে আছে, কেমন নিষ্ক্রিয়, নিশ্চুপ যেন। নিত্য বায়ু-সেবীদের সংগে মানায় না। আর এমন বিমল প্রভাতে জড়তা শোভা পায় না। বসে থাকবে যদি এখানে আসার দরকার কি—এখানে যারা আসে শহর মাড়িয়ে তারা কেউ-ই স্থাণু নয়। ছোট ছেলেটা পর্যন্ত মায়ের কোল থেকে নেমে ছোটাছুটি করছে। ঐ অদূরে শহর সহস্র হাত বাড়িয়ে তাকে মানা করছে, শান্ত হতে বলছে, কাছে টানতে চাইছে। ও কি শুনছে? কেন শুনবে? এ জায়গাটা শহরের শুরু নয়, শহরের শেষ নয়, শহরের এলাকা নয় বলতে গেলে। এখানে শহরবাসীর সব অভ্যাস ত্যাগ করা যায়। হাঁটো, ছোটো, নাচো-কোঁদো কেউ কিছু বলবে না! নিঃশ্বাস খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে পড়বে। ভুলে যেতে পার রামধন মিস্ত্রীর কি কিনু গোয়ালার গলির অস্তিত্বটা। হলেই বা ক্ষণস্থায়ী, তবু কত নিকটবর্তী তুমি প্রকৃতির প্রতিদিন।

অনিমেষ উঠলো, উঠে খানিকটা ঘুরে এল, আবার এসে বসল। আগের তুলনায় অনেক জনবহুল হয়ে উঠেছে মাঠটা, নতুন সন্ধানীরা এসেছে। অদূরে ঐ পিচের রাস্তার কোল ঘেঁষে অনেকগুলো মোটর-গাড়ি জড় হয়ে আছে, যেন কোন অন্তরীণের ওপর দূর থেকে নজর রাখছে। আরো দূরে শহরের যান-বাহনের শব্দটা কাঁকিয়ে-কান্না-থেমে-যাওয়ার মত মনে হচ্ছে। আর কতদিনে শহরটা এ জায়গাটুকুও গ্রাস করবে!

ক্ষিপ্রগতি প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীর খারাপ নাকি?'

অনিমেষ জবাব দেবার আগেই তিনি টিকটিকির কাটা লেজের মত ছিটকে এগিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন, বললেন, 'বার বার বসছেন, কি ব্যাপার?'

অনিমেষ ম্লান মুখে বললে, 'বড্ড ভিড়!'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হেসে সায় দিয়ে এগিয়ে গেলেন, 'যা বলেছেন!'

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পিছিয়ে থাকলেও থপ্ থপ্ করে ঠিকই এসে পড়েছেন, বসবার একান্ত ইচ্ছে থাকলেও সূর্যোদয়ের পূর্বে হাঁটার নির্দিষ্ট সংখ্যাটা পূরণের একাগ্রতায়

বিশেষ সজাগ হয়ে দুই হাঁটুর ওপর দুই হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চক্কর হো গয়া?'

'নেহি!' বসে বসেই অনিমেষ বললে।

'তব্?' অর্থাৎ বসে কেন? 'ঘুরো-ফিরো, মজা সে বায়ু পিয়ো'—ফুসফুস সজোর হবে, দিল খুশ হবে!

এমনি কয়েক দিনের পর অনিমেষের বেড়াতে এসে মাঝে মাঝে বসে-পড়ার কারণটা ও'রা জানলেন। শুনে ও'রা সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করলেন। বেচারা একে রুগ্ন, অসুস্থ, তার ওপর চাকরি-বাকরি নেই, খুবই পরিতাপের বিষয়! ভাববারই কথা!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন, 'গেট রাউন্ড, ফাইট করে দেখতে হবে আইনে কি বলে। ইউ কম্ টু মি ওয়ান ডে!'

বৃদ্ধ বললেন, 'আপনার কেসটা আমাকে ডিটেল দেবেন, কথা বলে দেখবো মিস্টার তরফদারের সঙ্গে। ভাববেন না, সুস্থ হয়ে নিন।'

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক আরো ভাল কথা বললেন, 'শরীর বানিয়ে নিন, কুছু ভাববেন না বাঙালী বাবু, হেলথ ইজ্ ইয়োর ওয়েলথ্! হে' হে', আমার কাছে আসবেন বেবস্তা করিয়ে দেবে!'

তারপর মাঠের তিন দরদী বন্ধুর কথা বাড়িতে এসে কমলাকে জানালে অনিমেষ। মা ভৈঃ। কমলা চুপ করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার দৃষ্টি কেমন অপলক যেন, ঐ রুগ্ন লোকটা আজ কদিন হল চাকরি ছুটে-যাওয়ার নোটিশ পেয়েছে, আরো যেন কাহিল হয়ে পড়েছে, হাত-পা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আজ সব কিছুর ব্যতিক্রম যেন অনিমেষের মুখে-চোখে, যেন নোটিশ ফিরিয়ে নিয়েছে নিয়োগকর্তা চাপে পড়ে—অনিমেষ রুগ্ন হতে পারে, ভগ্নস্বাস্থ্য হতে পারে, দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু কিছুতে আজ আর অসহায় নয়, একলা নয়, পিছনে অনেক শক্তি ধরে।

অনিমেষ বললে, 'তিন জনেই বলেছেন, আমার দশ বছরের চাকরি বিনাদোষে অমনি গেলেই হল! একটা দরখাস্ত করে দেখবো, নোটিস উইথড্র করে ভাল, নইলে—'

বিকল্প পথটা অনিমেষ মনে মনে ভাবলে, যেন খুব এক-হাত নেওয়া যাবে নিয়োগকর্তাকে মুরুব্বির জোরে, এখনি নাম-ধাম-ঠিকানা তাঁর বলা উচিত হবে না।

কমলা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'নইলে কি, কাকে কি করবে?'

হাসলে অনিমেষ, এমন নিশ্চিন্তের হাসি অনেক দিন হাসেনি অনিমেষ, বৎসরাধিক একটানা রোগে ভুগে, ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের নিমিত্ত ছ মাস ধরে মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ করে।

অনিমেষ বললে, 'সে দেখবে তখন!'

'বল না শুনি, দরখাস্ত ছাড়া আর কি তুমি করবে চাকরির ব্যাপারে?' কমলা পেড়াপিড়ি করলে। তারও সহ্যের সীমা যেন উত্তীর্ণ হয়েছে।

হাতের পাকান খবরের কাগজটা খুলে সামনে মেলে ধরলে অনিমেষ, বিশেষ একটি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে মিটিমিটি হাসলে।

অধৈর্য কমলা বললে, 'কি যে হাস বুঝতে পারি না! আজ হঠাৎ কাগজ কেনার ঝোঁক হল কেন?'

অনেক কারণেই মানুষ রোজ কাগজ কেনে, চাকরির সন্ধান, বাড়ির সন্ধান, পাত্রের সন্ধান, রাজা-উজীর মারার সন্ধান! আজকের কাগজ কেনবার সময় অনিমেষের একটি উদ্দেশ্যই ছিল, কিন্তু কাগজটা হাতে করে দেখলে তার দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এক—

অনিমেষ বললে, 'দেখি কোনো চাকরি খালি আছে কি না।'

'এই তো বললে তোমার চাকরি যেতে পারে না, ওরা নোটিশ ফিরিয়ে নেবে!'

'তা হলেও নতুন যদি একটা পাওয়া যায় কে ওদের খোসামোদ করবে!' খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার ছবিটার ওপর অনিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে।

কমলার কেমন গোলমাল হয়ে যায়। অনিমেষের ভাবটা কিছুতেই বোঝা যায় না। এই বলছে বাঁধা চাকরি ছুটবে না, এই বলছে নতুন চাকরি পেলে করবে। যেন আজ ইচ্ছে করলেই অনিমেষ প্রাণ ধারণের উপায় করে নিতে পারে, আর তা কত না অবলীলাক্রমে।

অনিমেষ কমলাকে কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে কাগজখানা তুলে ধরে খুশী খুশী মুখে বললে, 'ছবিটা কার বলদিকি, দেখেছো কখনো?'

'কেন?' তেমনি কৌতূহল কমলার চোখে মুখে, আবার অবিশ্বাসও অনিমেষকে।

'বল না কার?' যেন ছবির লোকটি তারই একমাত্র পরিচিত, অনিমেষ বললে।

'কার আবার, ঐ তো কোন্ একটা মন্ত্রীর যেন!' বেশ তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব যেন কমলার স্বরে।

'কোন্ একটা মানে, ভাল করে চেয়ে দেখ!' অনিমেষ প্রায় মারমুখী হয়ে ওঠে।

'আমার দেখে কাজ নেই, সকালবেলা আর কাজ নেই, ওঁদের মুখ দেখে পেট ভরবে!' কমলা উঠে গেল কাগজখানা ফেলে দিয়ে।

মন্ত্রীর ছবির মুখ দেখে সত্যি পেট না ভরলেও স্বামীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতার সম্বন্ধ স্থাপনের সংবাদে কমলা গর্ব বোধ করে। আলাপ যখন হয়েছে তখন কিছু একটা হবেই। রোজ নাকি বৃদ্ধ ভদ্রলোক খবর নেন, আশ্বাস দেন নির্ভাবনার।

একে একে আরো দুজন প্রভাত-বন্ধুর অভয় বাণীর কথা শুনেছে কমলা স্বামীর মুখে।

অনিমেষ বলেছে, 'আরে আমি কি জানতুম, ও'রা সব এমন হোমরা-চোমরা! সেই যে যার কথা বলেছিলুম, বেঁটে-খাটো, বেশ টাইটমত, কত বড় চাকরি করে জান, কত মাইনে পায়? আর সেই যে মেড়োটা, অত সাদাসিদে, কে জানতো লক্ষপতি, কোটিপতি!'

প্রায় গলায়-গলায় অনিমেষ এমন করে বলে, ইচ্ছে করলে নাকি ও'রা রাতকে দিন করে দিতে পারেন। অনিমেষ মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে, বরখাস্ত চাকরিটা নিয়ে কিভাবে লড়বে—প্রথমে আইনের আশ্রয়ে পুনর্বহালের জন্য আবেদন করবে, (সে প্রৌঢ় ভদ্রলোক করে দেবেন) তাতে না হলে বিভাগীয় তদন্ত, উপর থেকে চাপ দেওয়াবে (সে বৃদ্ধ ভদ্রলোক করবেন), তারপরেও যদি কিছু না হয় (যদিও অনিমেষ তা বিশ্বাস করে না, বৃদ্ধ ভদ্রলোকই ও'দের মধ্যে বিশেষ আপনার যেন, তারই কেন্দ্র থেকে উনি বিধান সভায় গেছেন), তখন মারোয়াড়ী মালিকের শরণাপন্ন হ'য়ে একটা চাকরি চেয়ে নেবে!

কমলা ঠিক অমন করে ভাবে না সব সময়। না ভাবার কারণও আছে, দেখতে দেখতে মাস পেরিয়ে গেছে, অনিমেষের চাকরি-যাওয়ার নোটিশ প্রত্যাহৃত হয়নি, দিনকে রাত করার কোনো খবর আসেনি।

কিন্তু একটা জিনিস আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে কমলা, ইদানীং বেড়াবার ঝোঁকটা বেড়েছে অনিমেষের। সকাল হবার তর সয়

না, নিজে থেকেই বেরিয়ে পড়ে, বলে-কয়ে আর বুঝিয়ে পাঠাতে হয় না!

অনিমেষ বেড়িয়ে ফিরলে, শহরের ওদিকের রোদ এদিকে কিছু আলো ছড়ালে, শোবার ঘরের আলোটা যখন নিবিয়ে রাখলে কোলের মানুষ চিনতে অসুবিধা হয় না, তখন কমলা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'আজ শরীর কেমন আছে, বেশ জোর পাচ্ছ তো?'

শরীর সম্বন্ধে আর তেমন সচেতন নয় অনিমেষ, তাছাড়া আজ কেমন অন্যমনস্কও যেন। হাতের খবরের কাগজখানার ভাঁজ খুলে বিস্তৃত করে নির্লিপ্তকণ্ঠে বললে, 'ভাল!'

কমলা পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে, অনিমেষ খবরের কাগজের একটা ছবির দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজছে।

কমলা জিজ্ঞেস করলে, 'কি দেখচো অমন করে?'

'চাকরি!' কাগজখানা চোখের ওপর তুলে অনিমেষ অদ্ভুত গলায় বললে।

'কিন্তু সে তো পেছন দিকে, সামনে সব খবর, বড়লোকদের ছবি!' কাগজখানা স্বামীর হাত থেকে টেনে নেবার চেষ্টা করলে কমলা।

এইবার অনিমেষ স্পষ্ট করে বলে, এই যে দেখচো ছবিটা, এর মধ্যে ঐ যে পিছন দিকে টাক-মাথা ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে চিনতে পারচো?'

কমলা বিমূঢ় হয়ে অনিমেষের মুখের দিকে চায়, কোন্ দেশের এক রাজা রাজধানী কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন, তাঁকে দমদম বিমানঘাটিতে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সরকারী কর্মচারীদের ভিড় হয়েছে।

'উনিই মিস্টার সেন, যাঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম, সেই যে দেড় হাজার টাকা মাইনে পান, রোজ মাঠে দেখা হয়, খুব মিশুক ভদ্রলোক, বোঝাই যায় না এত বড় একজন—'

অনিমেষ উচ্ছ্বাসে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল কমলার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। কমলার মুখটা অত কঠিন দেখাচ্ছে কেন?

শুষ্ক কণ্ঠে কমলা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কি হলো বল!'

থতমত খেয়ে অনিমেষ বললে, 'আমার আবার কি হবে?'

'উনি চেষ্টা করবেন বলেছিলেন না, যাতে নোটিশটা তুলে নেয়?' হঠাৎ কমলা জেরা করতে শুরু করে।

'হ্যাঁ, না, একদিন যাব ও'র কাছে, আমাকে যেতে বলেচেন।' অনিমেষ আমতা-আমতা করে।

'আর কবে যাবে?' তেমনি জেরার ভঙ্গি আজ কমলার কণ্ঠস্বরে।

'আমার সঙ্গে খুব আলাপ মাঠে এক-সঙ্গে বেড়াই, কত কথা হয়, খুব আলাপী ভদ্রলোক, অত বড় চাকরি করেন একটুও দেমাক নেই! ঠিক যাব দেখো, উনি বলেছেন—'

আর কমলা কিছু বলেনি, অনিমেষকে তাড়া দেয়নি ছুটে-যাওয়া চাকরিটা মুঠো ধরে কুড়িয়ে আনতে। তার কেমন ধারণা হয়েছে, অনিমেষের ঐ শরীরের মতই চাকরির অবস্থা, আপন নিয়মেই গেছে। যতই আইন দেখাক, মালিকের ইচ্ছে না হলে আর পুনর্বহাল সম্ভব নয়। এখন অনিমেষের শরীরটা শক্ত হলেই সে বাঁচে!..

আজ তিন দিন মাঠে কোন মানুষ বায়ু সেবনে আসছে না। কুয়াশার দিন কেটে আলোর দিন শুরু হয়েছে, অনেক ভোরেই পাখিরা গান গাইছে, কাঁচা-মিঠে বাতাসে কচি পাতা জাগছে, মেহগনীর ডালে তামার পাত যেন।

একা-একা অনেকক্ষণ অনিমেষ বসে থাকে। হঠাৎ আকাশটার চেহারাও কেমন বদলে গেছে। ঐ শহরের সঙ্গে যোগাযোগটা ছিন্ন যেন। আকাশ, বাতাস, মাঠ, মানুষে পরস্পরের সম্বন্ধে কত নিকট হতে পারে, অনিমেষ ভাবলে, আর যদি এই ফাঁকা জায়গাটা না থাকতো তাদের নিঃশ্বাস বুঝি রুদ্ধ হয়ে যেত। পরস্পরের কাছ থেকে মানুষ আরো দূরে সরে যেত!

হয়তো ওঁদের শরীর অত নির্মল বায়ুর প্রত্যাশী নয়, হয়তো বায়ু পরিবর্তনে তারা দেশান্তরের সন্ধান করেছেন। বিকল্প ব্যবস্থায় ওঁদের দরকারই বা কি!

কিন্তু অনিমেষের দরকার আছে। কমলাকে দেখে বেশ বোঝা যায়, সে-বেচারা আর বইতে পারছে না, ভাল-হবার চাকরি থাকার স্তোক মানছে না। সবাই হয়তো ভেঙে পড়বে। কি অন্ধকার আর স্যাঁত-সেঁতে তাদের গলিটা, ঢুকলেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সব উৎসাহ শেষ হয়ে কমলা কেমন নির্জীব হয়ে গেছে, আর অনিমেষকে কাছ থেকে ছাড়তে চায় না। সে-ও বুঝি মেনে নিয়েছে, পরাজয় স্বীকার করেছে, শহর-ছোঁয়া মাঠে স্বাস্থ্যোদ্ধার সম্ভব নয়।

শূন্য মাঠ আজ সত্যিই শূন্য। অনিমেষ কিছুতে ভাবতে পারছে না, বায়ু- সেবনের জন্যে না হলেও লোকগুলো প্রতিদিনের অভ্যাসটাও ভুলে গেল, নাকি গৃহে তাদের কমলার মত বিরূপ পরামর্শদায়িনী আছেন? কমলাও আজকাল বলে, কিছু দরকার নেই, চুপচাপ বসে থাক দিকি, ভাল হবার হয়, আপনিই হবে।

কিন্তু অনিমেষ সেকথা ভাবতে পারে না। এই মাঠে এলেই নিজেকে সে যে পরিপূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করতে পারে, বাঁচার আগ্রহে নিজেকে বিস্তীর্ণ করতে পারে, বিকীর্ণ করতে পারে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে। কিন্তু গোয়ালার গলি নিতান্তই গলি, সংকীর্ণ, চতুর্দিক থেকে নিষ্পিষ্ট।

আর এত বড় বড়লোক এত সহজে তার বন্ধু হবে কেন, এই মাঠ আর প্রকৃতির নিকটবর্তী বলেই না! পাড়ায় তো কত বড়লোক আছে, দুবেলা তো দেখা হচ্ছে, কেউ তো তার কোন খবরই রাখে না, মুখের দুটো কথা বলে না। বাঁচা-মরার সংবাদ নেয় না। একটানা রোগ ভোগের মত শহর-জঠোরে তাদের বাস, নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ার মত শোয়া-বসা, ঘুমোনো, জেগে ওঠা!

ফাঁকা মাঠে উঠো-উঠি দুদিন একা-একা বেরিয়ে ফিরে এসেছে অনিমেষ। আবার কেমন শূন্যতা বোধ করছে, নিঃসঙ্গ, অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে! পরিত্যক্ত সে যেন শহর প্রান্তে। শহরবাসী আর সে নয়!

বিনা ভাড়ায় আর টেকা যাবে না বাসা-বাড়িতে, বাড়িওলার নোটিশের মেয়াদ

ফুরিয়ে গেছে। তবু অনেক দয়া বলতে হবে. এক বছরের ওপর বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে. হাতে-পায়ে ধরে এতদিন কমলা ঠেকিয়ে রেখেছে! আইনের প্যাঁচে পড়েছে, আর রক্ষা নেই! বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! কমলা বুঝি একদিন নিজে গিয়েছিল বাড়িওলার কাছে আরো কিছুদিন সময় চেয়ে পাওনা মেটাবার দরবার নিয়ে। দোর গোড়া থেকে ফিরে এসেছে, বাড়িওলার লোক জানিয়ে দিয়েছে, 'বাবু এখন দেখা করতে পারবেন না, বলেছেন তাঁর করার কিছু নেই, এখন আদালত যা করে, মামলা তার হাত থেকে চলে গেছে!'

তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে বাড়িওলার আইনের শরণ নেওয়ার, উচ্ছেদের মামলায় জিতলে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি পাবে দুগুণ, আর বাঙালী ভাড়াটে না বসালে চারগুণ, আইনের ফাঁকে নতুন করে চুক্তিপত্র তৈরি হয়ে যাবে!

বাসা-বাড়ি চাকরির মতই তাকে ছেড়ে ফেলতে চায়। অনিমেষের চাকরিতে
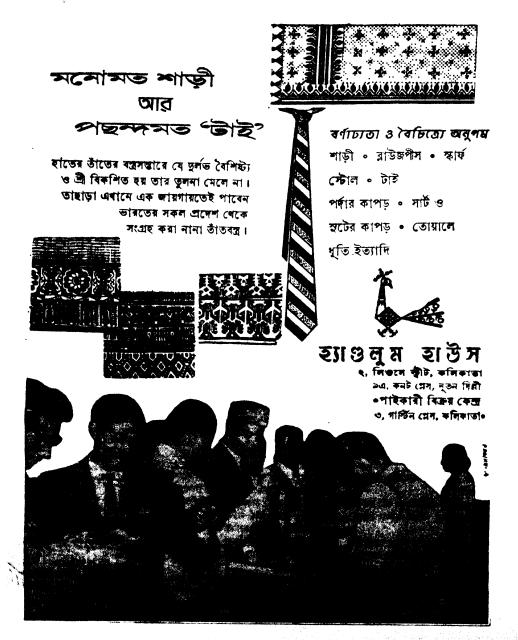
নতুন এসে সামান্য পারিশ্রমিকে যে লোকটা খাটবে, তার জন্যে নিয়োগ-কর্তার দায়িত্ব অনেক কমে যাবে। দশ বছর আর দশ দিনের দাবি তো এক নয়!

এদিকে কোন উত্তরই আসেনি অনিমেষের চাকরিতে বাহাল রাখার আবেদনের। অনিমেষেরও মন বলছে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, একদিন মিস্টার সেনের কাছে যেতে হবে। তারপর দেখে নেব—

আজ বাসায় না ফিরে মিস্টার সেনের অফিসের খোঁজ করলে কেমন হয়? তিনি তো বলেছেন, অলওয়েজ ওয়েলকাম! যখন খুশী আসবেন!

একসঙ্গে দুটো কাজ হবে, ভদ্রলোক কেন মাঠে আসছেন না খবর নেওয়া হবে, সেই সঙ্গে নিজের চাকরি সম্বন্ধে পরামর্শও, কেবল স্বার্থের জন্যে গেলে কেমন-কেমন লাগবে, ভদ্রলোক ভাববেনই বা কি! যতই আলাপ থাক, পরিচয় হোক, ফাঁকা মাঠে এসে পরস্পরে যুক্ত হোক, আন্তরিকতায়, মানসিকতায় একাত্ম হয়ে উঠুক, তবু স্বার্থ নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু সঙ্কোচ থাকেই—

আজকের মত সুবিধা আর কোনদিন হবে না, এই সুযোগ অন্তর্যামী জুটিয়ে দিয়েছেন। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ!

রোদ উঠে ইঁট-কাঠে চড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন মরিয়া হয়ে ওঠে অনিমেষ, মিস্টার সেন যদিও দেখা করলেন না, সময় হলো না, বোধ হয় চিনতেই পারলেন না, না চিনুন—এখন অভিমান করবার সময় নয়, কাজ উদ্ধার করা নিয়ে কথা।

পরিচিত আত্মীয়স্বজনসদৃশ, বন্ধু, একই মাঠের বায়ুসেবী, নিত্য-ভ্রমণকারী মন্ত্রী-মহাশয় আছেন! তিনি নিশ্চয়ই চিনবেন, আর সেই বিশ্বাসে অনিমেষ খুঁজে খুঁজে ইঁট-পাথরের খাঁচা শহর ঘুরে তাঁর দেউড়িতে উপস্থিত হল। চাকরির সঙ্গে বাড়িভাড়ার কথাটাও বলবে, তাঁর প্রভাব জাগতিক কোন বিষয়েই কম নয়, ইচ্ছে করলে তিনি সব করতে পারেন— রাতকে দিন, দিনকে রাত!

কিন্তু মন্ত্রীমশাই সাক্ষাতে রাজী হলেন না। তিনি স্পষ্ট বলে পাঠালেন, অনিমেষ চক্রবর্তী বলে কাউকে তিনি চেনেন না, কোন সূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় নেই, অযথা সময় নষ্ট করবার তাঁর সময় নেই!

অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে অনিমেষ লজ্জাহীন হয়ে খানিক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকেই তার অবিশ্বাস হল মনে মনে মানলেও অবস্থাটা তার কল্পনাতীত! চোখের ওপর থেকে সমস্ত আলো যেন নিবে গেল, কিন্তু গোয়ালার গলি, কি রামধন মিস্ত্রী লেনের মত বায়ু-হীন, রুদ্ধশ্বাস। শহরের শেষ নয়, শহরের শুরু নয়, সেখানে যে-মাঠটায় সূর্য-ওঠার আগে মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তা কি মরীচিকা, মিথ্যা? কে জানে।

ডুবন্ত মানুষের মতই অনিমেষের কুটি আঁকড়ানর আগ্রহ জাগে। সান্ত্রীওলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে' সাগ্রহে চার-পাশ দেখে নেয়, তারপর গোঁ ভরে ঢুকতে যায়। সান্ত্রী বাধা দেয়, পরিচয়পত্রের জন্যে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়। বুভুক্ষিতের ভোজ্য গ্রহণের মত কাগজে নিজের নাম লিখে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ, পায়ের তলার মাটি কেমন কাঁপে যেন থর থর করে। বোধ হয় মাথাই ঘুরে পড়বে শেষটা! কতক্ষণ পরে সান্ত্রী ফিরে এসে বললে, 'সাহাব বললেন কাম কি আছে লিখিয়ে দিন, কোন আদমি পাত্তা দিজিয়ে।'

অনিমেষ কি ভাবলে, নতুন করে কি সব লিখে দিলে চিরকুটটায়, সঙ্গে সঙ্গে খবর এল, নো ভেকান্সী!

আর মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়ল না অনিমেষ, গুটি গুটি বাসার দিকে এগিয়ে চলল। গাল বাড়িয়ে চড় খেলে জ্বালাটা বোধহয় বেশি বাজে, অপমানও সেই সঙ্গে দ্বিগুণ। কমলা বুঝি মনুষ্যচরিত্র অনেক বোঝে, অনেক আগেই বলেছিল অনিমেষের হাঁপাহাঁপি দেখে, 'মাঠের আলাপ কেউ ঘরে আনে না, তোমার যেমন কথা' সেদিনের তর্কটা বৃথাই করেছিল অনিমেষ, আজ শুনলে কমলা কি বলবে, ছি, ছি!

অনিমেষ অবাক হয়ে গেল নিজের গলিতে পা দিয়ে। এত আলো এ-গলিতে কোনদিন ছিল না, সত্যিই রাতকে দিন করে দিয়েছে! দু দশটা বাড়ির পরপর বিষফোড়ার মত কোন সদাশয় ব্যক্তির বাড়ির গা-থেকে আলো বেরিয়েছে। হঠাৎ আলোকময় হয়ে উঠেছে রামধন মিস্ত্রী লেন।

চোখ ঠিকরানো আলোয় চোখ রেখে মনে মনে হাসলে অনিমেষ। সবটাই পরিহাসের মত মনে হয়। এই গলির সব ঘরের ভেতরটা অন্ধকার করে বাইরেটা কেমন আলো করা হয়েছে, কি উদ্দেশ্য কে জানে পৌর-পিতাদের। কে খবর রাখে কার ঘরে, কি আছে, রোগ-ঘোগ, জরা, বেকারি, কত মনস্তাপ!

অবস্থাটা আরো প্রকট হল। অনিমেষ রাস্তার ওপর বসে পড়ল, তার ঘরের চারি-দিকে জিনিসপত্র স্তূপ ছত্রাকার করে ছড়ান, দোরে একটা মস্ত তালা ঝুলছে। কমলা চুপ করে ভাঙা একটা তোরঙ্গের ওপর বসে আছে।

আজ দুপুরে বাড়িওলার লোক পুলিস এনে তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে গেছে। এক তরফা ডিক্রী পেয়েছেন বাড়িওলা। আজই, 'এক্সিকিউট' করেছেন।

গলির নতুন আলোয় পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়টা যেন সর্বাধিক লজ্জার, কমলা মুখ নামিয়ে নিলে, অনিমেষ চোখে হাত চাপা দিলে—এত আলোয় কিছু না থাকার লজ্জা সে লুকোবে কোথায়?...

পরের দিন প্রাতভ্রমণের এই মাঠে সকাল হবার অনেক আগেই একটি মানুষকে বোবা হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে আমাদের সেই পরিচিত মিস্টার সেন আছেন, বৃদ্ধ জননেতা মন্ত্রীমশাই আছেন, আর আছেন ব্যবসায়ী আনন্দীরাম! ও'রা অনেকদিন পরে আবার বায়ু সেবনের নিমিত্ত এসেছেন, প্রাতভ্রমণে দৈহিক জড়তা কাটাচ্ছেন। পার-মানবিক বোমার দ্বারা বায়ুমণ্ডলের যে স্তরটুকু বিষাক্ত হয়েছিল তা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ভেসে গেছে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই শহরবাসীদের অতঃপর কোন ভয় নেই। ভোরের বাতাস নির্মলই আছে, বিশুদ্ধ আছে, পবিত্র আছে!

মিস্টার সেন প্রথমে সনাক্ত করলেন, 'সেই লোক মনে হচ্ছে, চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে!'

দ্বিতীয় সনাক্তকারী বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ সে-ই; বেচারা বড় গ্রীবলে পড়েছে মনে হচ্ছে!'

দূর থেকে ডেকে আনন্দীরাম কিছুতেই যখন কোন উত্তর পেলেন না, বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাঙ্গালীবাবু বড় সেন্টিমেন্টাল আছে। বাড়িতে লড়াই করে মাঠে বসিয়ে কাঁদছে!'

জুল্ জুল্ করে মাঠ-ভর্তি সহ-ভ্রমণ-কারীদের দিকে চেয়ে অনিমেষ ভাবলে, সত্যি যদি একদিন নিঃশ্বাসের বাতাস বিষাক্ত হয়ে যায় তা হ'লে কেমন হয়, যেন দেখতে বড় ইচ্ছে করে। ক্ষতি কি?

তারপর পা দিয়ে ঘাসের ডগায় শেষ শিশিরবিন্দুটা ছেতরে দিয়ে গুটি গুটি মাঠ ছেড়ে অনিমেষ উঠে গেল।

---

[২০]

সেদিন সাজঘরের আড়ালে আবছা অন্ধকারে দাঁড়ানো ছায়া-ছায়া মানুষটার দিকে কারো হয়তো চোখ পড়ে নি, চোখ পড়েছিল শুধু লক্ষ্মীমণির।

কোনরকমে পার্ট শেষ করে গাঁয়ের লোকের হৈ-হুল্লোড় বিদ্রূপের চিৎকারকে তুচ্ছ করে উদাস ছুটে বেরিয়ে গেল আসর থেকে, আর তার পিছনে ধাওয়া করলো লক্ষ্মীমণির বেদনার্ত দুটি চোখ। উদাসের কাছ থেকে কোনদিন এতটুকু ভাল ব্যবহার পায় নি সে, তাই নিঃস্বতার জ্বালায় কোনদিন উদাসকে সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিশ্চয় সে উদাসের ভালবাসা পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছিল। পুজোর দিনটিতে সেই উদাস একখানা নতুন শাড়ী এনে তুলে দিয়েছিল তার হাতে। হেসে বলেছিল, পুজোপাব্বনের দিন আমার বউটাকে কানি পরিয়ে রাখলাম রে লক্ষ্মী, আমি মানুষ লয়, মানুষ লয়!

আর তা শুনে প্রথমটা যেন বিশ্বাসই হয়নি লক্ষ্মীমণির। বিশ্বাস যখন হয়েছে, তখন বিস্মিত আনন্দে দুচোখ ছাপিয়ে জল এসেছে। সুখের, আনন্দের অশ্রু। উদাস যে কোনদিন তার সংগে এমন ভাবে কথা বলবে, এমন আদর-সোহাগের সুরে, ভাবতেই পারেনি সে। তাই সংগে সংগে যেন মানুষ বদলে গেছে লক্ষ্মীমণি। করুণ চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছে। নতুন শাড়িখানা পরে এসে ঢিপ করে একটা গড় করেছে উদাসের পায়ে। উঠে লাজুক লাজুক চোখে তাকিয়েছে স্বামীর মুখের দিকে। আর শক্ত একখানা হাতে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে উদাস, হেসে বলেছে, পটের বিবি লাগছে তোরে।

সারাটা দিন মনের মধ্যে তার ফূর্তির মৌমাছি গুনগুন করেছে। এক-একবার শুধু সন্দেহ হয়েছে ন্যাংটেশ্বরতলায় মানত করেছে বুঝি, কখনো বা মনে হয়েছে জোনাইডাঙার রোজা-বউয়ের মাদুলীর ফল। তবু খুশী হয়েছিল লক্ষ্মীমণি। ভেবেছিল নতুন করে জীবন শুরু করবে আবার। স্বামী শ্বশুর সকলের সংগে ভাল ব্যবহার করবে এবার থেকে।

কিন্তু সব স্বপ্ন যেন মুহূর্তে ভেঙে গেল তার।

মুগ্ধ হয়ে সেও শুনছিল উদাসের পার্ট, যাত্রা দেখছিল। কি আশ্চর্য, এত সুন্দর পার্ট করে উদাস, গাঁসুদ্ধ লোক এত তারিফ করে তার, কোনদিন জানতে চায়নি সে, দেখতে চায়নি।

লোকের মুখে বাহবা শুনে মনে মনে বেশ একটা গর্ব বোধ করছিল লক্ষ্মীমণি: নিজেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তন্ময়তা কেটে গেল হঠাৎ।

পার্ট ভুলে যেতেই বিভ্রান্ত, বিচলিত দেখল উদাসকে, আর সবাই হাসাহাসি শুরু করলে। মরমে মরে গেল লক্ষ্মীমণি। উদাসের অপমান যেন তারও লজ্জা।

কিন্তু কেন যে পার্ট ভুল হয়ে গেল উদাসের, জানতে বাকী রইল না লক্ষ্মীমণির।

উদাস আসর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতেই লক্ষ্মীমণির চোখের দৃষ্টিও তার পিছনে গেল। আর সংগে সংগে সাজঘরের আড়ালে নির্জন ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল লক্ষ্মীমণি, চিনতে পারলো।

পদ্ম!

স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। ভেবেছিল তার জীবন থেকে দুঃখের কাঁটাটা বুঝি সরে গেছে। যায় নি।

পরের দৃশ্যে আবার আসরে ফিরে এলো উদাস, ঘুরে ঘুরে আবার অভিনয় করতে শুরু করলে, ঘন ঘন হাততালি পড়লো, সবাই বললে এত ভাল অভিনয় কোনদিন করেনি উদাস। কিন্তু, উদাস লক্ষ্য করলো না কখন চুপিচুপি আসর থেকে উঠে চলে গেছে লক্ষ্মীমণি।

লক্ষ্মীমণির কথা তখন মুছে গেছে উদাসের মন থেকে। এতদিন পরে ফিরে পাওয়া সেই পুরোনো নেশাটায় ও তখন মেতে উঠেছে।

পদ্ম ফিরে এসেছে! পদ্ম ফিরে এসেছে!

সারা শরীরে একটা পুলকের শিহরণ খেলে যায়।

পদ্মর হাত দুখানা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে উদাস বলেছিল, তুই থাকবি তো পদ্ম, পার্ট শেষ করেই আসছি আবার, পালিয়ে যাবি না তো!

তা শুনে পদ্ম হেসেছে। রহস্যের সুরে বলেছে, পালাবো ক্যানে গো সোনাই, পালিয়ে থাকতে নারলাম বলেই তো ফিরে এলাম। তুমি যাও আমি দাঁড়িয়ে আছি।

কাপড়ের ছোট্ট পুঁটলিটা বগলে চেপে সত্যিই শেষ অবধি যাত্রা দেখেছে পদ্ম। এদিকে একে একে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে চারিধারে, যাত্রা শেষে একে একে ভিড় ফিকে হয়ে গেছে, আর পদ্মর হাত ধরে শেষরাত্রির হাল্কা অন্ধকারে খাঁর নদীর দিকে হেঁটে গেছে উদাস।

শুকনো খাঁর নদীর মাঝ বরাবর ঝিকমিক করে সরু ফিতের মত জলের ধারা। তারই পাশে বসেছে দুজনে।

উদাস বলেছে, তুই ফিরে আসবি, আমি কতবার স্বপন দেখেছি পদ্ম, কিন্তু এমনভাবে আসবি......

হেসে উঠেছে পদ্ম খিলখিল করে। বলেছে, পালা নামাবে তুমি, নটের বেশ পরবে, আমি না এসে পারি গো সোনাই!

বলে কাপড়ের পুঁটলি খুলে গলায় কালো সুতোর ফাঁস আঁটা তেলের শিশিটা বের করে বলেছে, এসো, রঙগুলোন তুলে দিই তোমার মুখ থেকে!

হেসে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে উদাস, প্রশ্ন করেছে, মনে আছে তোর, পদ্ম?

মনে থাকবারই তো কথা। প্রতি বছরই যাত্রার পর শেষ রাতে বাড়িতে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো উদাস, ঘুমোতো সেই দুপুর অবধি, ছায়া যখন মানুষের পায়ের কাছে এসে পড়তো। আর সেই সময় এসে তাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলতো পদ্ম, বলতো, রাজা হয়েই রইবে নাকি গো জীবনভোর, রঙ ধুতে হবে না মুখের? বলে, মুখে তার তেল ঘষে ঘষে তুলে দিতো সব রঙের দাগ।

আর দূর থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেদিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দেখতো লক্ষ্মীমণি। চাপা রাগে গুমরে মরতো সে। রাগ শুধু স্বামীর ওপর নয়, পদ্মর ওপরই নয়, পদ্মর বাপের ওপরও ভিতরে ভিতরে চটতো সে। কিন্তু উদাস সত্যিই কোনদিন পদ্মকে বিয়ে করতে চাইবে, পদ্মর বাপ মত দেবে সে বিয়েয়, ভাবেনি লক্ষ্মীমণি। আর তাই একদিন রাগের মাথায় ছুটে গিয়েছিল কাটারী নিয়ে, পদ্মর বাপকে হয়তো আরেকটু হলেই কুপিয়ে ফেলতো; যদি না পদ্ম ধরে ফেলতো শেষ মুহূর্তে।

উদাস ভাবতো, সেই দুঃখেই বুঝি গাঁ

ছেড়ে চলে গিয়েছিল পদ্ম। লক্ষ্মীমণিকে শাস্তি দেবার জন্যে, কিংবা তার নিজের বুড়ো বাপটাকে লক্ষ্মীমণির আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

সে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যেই বুঝি এতকাল ব্যাকুল হয়ে ছিল উদাস।

পদ্মা তার মুখের রঙ ঘষে ঘষে তুলে দিতে দিতে কেন জানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। আর উদাস প্রশ্ন করলে, তুই, ক্যানে গাঁ ছাড়লি পদ্ম, কোথায় যেয়ে ছিলি?

পদ্ম হেসে বললে, আমার সাথে চলো ক্যানে বোনাই সিখানে, নাকিন আমার লক্ষ্মী বুনটার জন্যে মন কাঁদবে তোমার?

কোন উত্তর দিলো না উদাস। সমস্ত শরীরটা তার হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো। পদ্মার মুখে এই একটা রসিকতা বহুবার শুনেছে সে, শুনে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছে। কেন পদ্ম বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না যে লক্ষ্মীমণির জন্যে তার মনে কোন টান নেই, ভালবাসা নেই।

কিন্তু পদ্ম অতশত বোঝবার চেষ্টা করলো না। হাসি থামিয়ে হঠাৎ থমথমে মুখে ও প্রশ্ন করলে, ডাক্তার মানুষটা ভালো আছেন গো বোনাই?

*

খবরটা শুনেই লাঠি ঠুকঠুক করে ডাক্তারের বাড়িতে এসে হাজির হলো বুড়ি অট্টামা।

পুজোর মধ্যেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আর তার পর থেকেই সিরসিরে শীত পড়েছে। রোদের রঙ গেছে বদলে, বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ।

অবিনাশ ডাক্তার তাই ভোর বেলার মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বারান্দায় টিনের চেয়ারটায় বসে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল। গালে সাবান লাগাতে লাগাতে মুখ তুলতেই দেখলে লাঠির ডগায় রোগা শীর্ণ দেহটার ভার দিয়ে ঠুকঠুক করে এগিয়ে আসছে অট্টামা।

এমন প্রায়ই আসে অট্টামা, কখনো দুটি গাছের সীম নয়তো খেড়ো দিতে, কখনো শুধুই দু দণ্ড বসে গল্প করতে। বুড়ো মানুষ, রাতে ভাল ঘুম হয় না, আঁধার না কাটাতেই উঠে পড়তে হয় বিছানা ছেড়ে। কখনো কৌশল্যাকে ডাকে, কখনো বা ভোর হতেই এর-ওর বাড়ির পৈঠেতে গিয়ে বসে লাঠিটা নামিয়ে রেখে। কিন্তু গিয়ে বসলে কি হবে, সকালে উঠে সকলেরই হাজারো কাজ, ব্যস্ত বা বিরক্ত মানুষগুলো দেখেও দেখে না অট্টামাকে, ভাল করে দুটো কথাও বলে না। তাই শরীর একটু ভাল থাকলেই ডাক্তারের কাছে চলে আসে সে।

সেদিনও লাঠি ঠুকঠুক করে ডাক্তারের বাড়ির দিকেই এগিয়ে এলো অট্টামা। পাড়া ছেড়ে গাঁয়ের এক প্রান্তে ডাক্তারের বাড়ি, এতখানি হেঁটে আসতেও কষ্ট হয়। তবু কি এক নেশার আকর্ষণ যেন, না এসে থাকতে পারে না।

অবিনাশ ডাক্তার অনেকক্ষণ থেকেই দেখতে পাচ্ছিল অট্টামাকে। বারান্দার ঠাণ্ডা রোদে পিঠ দিয়ে বসে গালে সাবানের ব্রাশ বোলাতে বোলাতে একবার সামনের দিকে তাকালে অবিনাশ ডাক্তার, হাড়-জিরজিরে চেহারা নিয়ে অট্টামাকে তিড়িং তিড়িং করে প্রায় লাফাতে লাফাতে আসতে দেখে নিজের মনেই হাসলো সে।

অট্টামা অবশ্য দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখে ছানি পড়েছে, বেশী দূরে থেকে লোক চিনতে পারে না একেবারেই। সাদা কাপড়টা শুধু কটকট

করে, মানুষ কেউ একটা, শুধু এইটুকুই বুঝতে পারে।

লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে কাছে এসে তাই হাঁক ছাড়লে অট্টামা। —কই গো ছেলে, আছো নিকিনি।

ডাক্তার হেসে বললে, এই তো বসে রয়েছি, চোখে আর ভাল দেখতে পাচ্ছেন না নাকি অট্টামা।

—না বাবা, দূরে থেকে মনে হচ্ছিল বটে সাদা মতন কি যেন ফটফট করছে, দিষ্টি তো বাপু একটু ক্ষীণ হয়েছে। বলে ধীরে ধীরে বারান্দায় বসলে অট্টামা, লাঠিটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকাতেই স্পষ্ট দেখতে পেল।

নিজের মনেই হেসে বললে, রোদের ছটা লেগে দেখতে পাই নাই, বুঝলে ডাক্তার, দিষ্টি আমার এ-বয়সেও যা আছে......

অবিনাশ ডাক্তার সায় দিয়ে বললে, তা ঠিক। শরীরটা বেশ ভাল আছে তো আপনার?

—শরীর? মুখ বেজার করলে অট্টামা। বললে, ওই বাতের ব্যথাটা বাবা...ও সারবে না। বলে ডান পা'টা সামনে মেলে দিয়ে নিজেই নিজের হাঁটুটা টিপতে শুরু করলে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলো ডাক্তার দাড়ি কামাচ্ছে। এতক্ষণ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারেনি। তাই নিজের মনেই বললে, দিনে দিনে কত পরিবর্তনই হলো বাবা। পরামাণিক গাঁয়ে-ঘরে আর রইলো না।

অবিনাশ ডাক্তার গালের ওপর দিয়ে চড়চড় করে সেফটি রেজর টানতে টানতে শুধু বললে, হুঁ।

অট্টামা আবার বললে, এক ঘর ছিল, তা বাপ বেটায় নাকি চুঁচুড়োয় না কোথায় গিয়ে দোকান খুলেছে। বলেই ফোকলা মুখে সশব্দে হেসে উঠলো। বললে, বাপের কালেও শুনি নাই ডাক্তার। ফ্যান খেয়ে মলো বাপ, তারও নাম পরতাপ......চুল ছাঁটবে, দাড়ি-মোচ কামাবে, তারও নাকি দোকান!

ডাক্তার প্রশ্ন করলে, এ-গাঁয়ে পরামাণিক ছিল তা হলে?

—ছিল না? হেই মা, পাঁচ বিঘে চাকরান ছিল বিধু পরামাণিকের, ঘরে-ঘরে বছরে দু' টাকা করে মাইনে......তা থাকবে কেন বলো, এখন যে গাঁয়ের মানুষ গোলাম, শহুরে হলেই সেলাম!

ডাক্তার হাসলো, কোন কথা বললে না। তারপর জিগ্যেস করলে, একটু চা খাবেন নাকি?

—চা? ছানি-পড়া চোখ দুটোয় খুশী উপচে পড়লো। —তা দেবে তো দাও। বলে নিজেই ডাকলে পাব্বুতী, অ কেলে পাব্বুতী!

কপাটের আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনছিল পার্বতী, কিন্তু সাড়া দিল না। কেলে পার্বতী বলে ডাকে বলেই অট্টামার ওপর তার রাগ।

তার দিকে চোখ পড়তেই ডাক্তার হেসে ফেললে, আর অট্টামাকে ভেংচি কেটে পার্বতী ভিতরে চলে গেল।

অট্টামা পার্বতীর সাড়া না পেয়ে ভাবলে সে বাড়িতে নেই। তাই কথা ঘুরিয়ে বললে, হাঁ গা ডাক্তার, গরমেণ্ট সব জমিজমা নাকি নিয়ে নেবে? ওই যে সব দু'বার দু'বার ফরম সই করে পাঠালে সেবার......

ডাক্তার হেসে বললে, সব নেবে না, পঁচিশ একরের বেশী হলে তবেই......

—জমি নিয়ে কি করবে গরমেণ্ট?

—কি আর করবে, যাদের জমি-জমা নেই, তাদের পাঁচ-সাত বিঘে করে দেবে হয়তো।

অট্টামার ফোকলা মুখখানা এবার হেসে উঠলো। বললে, হায় কপাল, পাঁচ বিঘে জমিতে দুঃখ ঘুচবে! তা হলে বিধু পরামাণিক বউ-বেটা নিয়ে চুঁচুড়োয় গিয়ে দোকান খুলতো ডাক্তার? আর ওদেরও বলি, দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে তেঁতুল রইলো গাছে বেঁকে। ভাবলে দোকান খুললেই অবনী চাটুজ্যের মত ধনী হবে।

বলে একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সিমেণ্টের ওপর বাঘবন্দীর ঘর কাটলে অট্টামা, তারপর হঠাৎ বললে, তা দেশের লোকের জমি-জমা নিচ্ছে নিক, শহর-বাজারের লোকেদের নেবে না ক্যান্?

অবিনাশ ডাক্তারের ততক্ষণে দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। ভিজে গামছায় মুখের সাবান মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলে, শহরে আবার চাষের জমি কোথায়?

—না গো ডাক্তার, তা নয়। ওই যে বলগাঁর কোঙারদের পাঁচখানা বাড়ি আছে বদ্দমানে, অবনী চাটুজ্যের রাজপেসাদ আছে কলকাতায়......

আরো কি বলতে যাচ্ছিল অট্টামা, পার্বতী এসে তার আগেই অট্টামার সমনে ঠকাস করে এক কাপ চা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অট্টামা তার দিকে তাকালে কপট ক্রোধের ভঙ্গিতে, তারপর হাসি চেপে বললে, অত দেমাক ভাল নয় লো, ভাল নয়। ওঃ ছুঁড়ি যেন মরাই-তলায় মুনিষকে ভাত দিচ্ছে। নাক নেই বেটির নথের শখ, ফেলনা বেটির কত ঠমক।

বলে চায়ের কাপে চুমুক দিলো অট্টামা। বিড়বিড় করে বললে, একেবারে জুড়িয়ে এনেছে ছুঁড়ি।

তারপর একটু থেমে ফিসফিস করে বললে, হাঁ গা ডাক্তার, তোমাদের ওই বিড়ি-আপিসের পেভাকর না কি নাম......আজকাল সব স্মরণ থাকে না বাপু......তার বিয়ের কিছু শুনেছো নাকি?

ডাক্তার এতক্ষণে যেন উৎসাহ পেল। বললে, আপনারা সব ধরে বেঁধে দিয়ে দিন, তা নইলে হবে কি করে?

অট্টামা একমুখ হেসে বললে, ও ছেলে কি নুকিয়ে বিয়ে করবে নাকি ডাক্তার। ও ভারী ভাল ছেলে, সৎপুত্র বাপের, মোনপুরের বউ বলছিল, পেভাকর নাকি বলেছে বাপ যেখানে বলবে, সেখানেই করবে বিয়ে।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললে, তাই নাকি? এ-বাজারে তা হলে খুব পিতৃভক্ত ছেলে বলতে হবে।

—হ্যাঁ বাবা, পিত্তিভক্ত বটে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্পগুজবে মেতে উঠলো অট্টামা।

একসময় হঠাৎ খেয়াল হলো, বেলা বেড়েছে। রোদ কাঁপছে মাঠের ওপর। তাকানো যায় না চোখ মেলে। বললে, কি চনমনে রোদ হয়েছে বাবা, উঠি আজ। আবার এতখানি পথ যেতে হবে বাবা!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো অট্টামা। তারপর লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললে, হ্যাঁ গা ডাক্তার, পদ্ম ফিরে এয়েছে শোনলাম'

—পদ্ম? বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করলে অবিনাশ ডাক্তার।

অট্টামা বললে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পদ্ম ফিরেছে। আমি যে শোনলাম।

(ক্রমশ)

বিদুর

রুশ সাহিত্য : 'চরম' ও 'নরম দল'

সাহিত্যে দলাদলি প্রায় স্বাভাবিক। কিন্তু সে দলাদলি যতক্ষণ শিল্পগত আদর্শ নিয়ে, ততক্ষণ নীরবে সওয়া যায়। অস্তিত্ববাদী আর ঈশ্বরবাদীদের কলহ, কিংবা বস্তু-চেতনায় মোহবাদী আর মায়াবাদীদের বিতর্ক অন্তত উপভোগ্য এই কারণে যে, যে-তারের বেড়ার মধ্যে এই যুদ্ধ চলছে, সেই বেড়ার এ-পাশে যুযুধানদের লোভ নেই। যদি তেমন লোভ থাকত, আশঙ্কার কারণ ছিল।

রাশিয়ায় যে সাহিত্য রণাঙ্গন, ১৯৫৯ সালে তৃতীয় লেখক কংগ্রেসে যেখানে শান্তি শান্তি রব উঠেছিল, সেখানে যাঁরা বীর বিক্রমে আবার লড়তে নেমেছেন, তাঁদের আদর্শ—কলহের আদর্শ—শিল্পগত নয়। ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম বলেই এই দলাদলি মালিন্যপুষ্ট। সুরকভের পতন যদি হল কোশেটভ্ আর গ্রীবাসভ্ সেই আসন লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, কে পারে আগে পৌঁছুতে।

১৯৫৯ সালের শান্তিচুক্তি মাথায় নিয়ে, রুশ লেখকরা সবাই যদি পালটে যেত, তবে আজ আর 'চরম' আর 'নরম' এই দুটি দলের অস্তিত্ব রাশিয়ায় সম্ভব হত না। লেখকরা এবিষয়ে কিছুটা চাতুর্য অবলম্বন করেছেন। কলহের বিষয়কে আপোসের ভাষা আর ভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপন করছেন যাতে কলহটা টিকিয়ে রাখা যায়। রাশিয়ায় তাই আপাতত লেখকদের ঐক্য এবং শান্তির ছায়াতলে দুটি পরস্পরবিরোধী দল ক্রমাগত লড়ে যাচ্ছে, 'চরম' আর 'নরম' দল (Hard and Soft)। চরম দল (কিংবা বলা যেতে পারে গরম দল) কারা? যারা পার্টির লক্ষ্য এবং ছাঁচের মধ্যে সাহিত্যিক-দের যথাসম্ভব দমন করে রাখতে চায়। 'নরম' দল অত উগ্র নয়, তারা কিছুটা স্বাধীনতা মার্কা লেখকদের দিতে রাজী আছেন। ......লেখকরা এই বিরোধে কোনো না কোনো পক্ষে যোগ দিয়ে দুই দলকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন শুধু নয়, তাতিয়ে রেখেছেন। দুই দলেরই কাগজপত্র আছে—তাতে আক্রমণও চালানো হচ্ছে, তবে ভাষা কি ভঙ্গি দেখলে মনে হবে আপোসের বিতর্ক চলছে। সুরকভ, কোশেটভ, গ্রীবাসভ 'চরম' দলের মাথা; 'নরম' দলে এরেনবুর্গ, যুতুশেংকো প্রভৃতিদের নাম পাওয়া যায়। চরম দলের তিন মাথা যে একপ্রাণ, তা কিন্তু নয়, তিনজনেই চেষ্টা করছে ক্ষমতার চূড়ায় উঠে বসার। সুরকভ্ ধৈর্য ধরে চালের খেলা খেলছেন। নরমদের কাগজেও তাঁর লেখা পাওয়া যায়। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, এখন তিনি বিপাকে পড়ে দুই নৌকোতেই পা রেখেছেন। সে নৌকো সামলাতে গিয়ে হিমসিমও খাচ্ছেন।

সুরকভের পড়ন্ত পাখা-ভাঙা অবস্থার সঙ্গে কোশেটভের তুলনা করলে দেখা যাবে কোশেটভ কী রকম প্রতাপশালী হয়ে উঠেছেন। এরেনবুর্গের স্মৃতিকথার (সম্প্রতি যা প্রকাশিত) প্রতি লক্ষ্য রেখে, এরেনবুর্গের নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ না করেও, প্রকাশ্য কংগ্রেসে তিনি এরেনবুর্গের স্মৃতিকথাকে আক্রমণ করেছেন।

সেই আক্রমণ যেমন উগ্র শালীনতাহীন, তেমনি সাহিত্যবোধশূন্য। গোঁড়া রাজনীতির চশমা না পরলে কেউ বলতে পারে না, স্মৃতিচারণ অতীতের প্রতি নিবদ্ধ বলেই তা অসার। বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চোখ না থাকলে যদি সাহিত্য অপাংক্তেয় হয়, তবে আমরা নাচার, কোশেটভের সাহিত্য-ব্যাখ্যার প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করি না। এরেন-বুর্গের এই স্মৃতিকথার প্রতি কোশেটভের আক্রমণের নমুনা এই রকম :

"This distorted view causes them.....to burrow in the rubbish dumps of their rather crackpot memories in order to drag out once more into the light of day long rotted literary corpses **and to pass** them off as **something still capable** of life.

দুই বন্ধু : পাস্টেরনাক ও এরেনবুর্গ (১৯৩৫)

নরমের দল চরমের মতন এমন অসহিষ্ণু নয়, নখদন্ত শাণিত করে তারা গরমদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাতে পারে না। তারা চরমদের শিল্পবোধের দীনতাকে দোষারোপ

করে, আর চরমরা বলে নরমরা তাদের অভিজাত অহংকার নিয়ে বসে আছে।

গরমদের মত, সাম্প্রতিক সোভিয়েট জীবনই লেখকদের লেখার বিষয় হওয়া উচিত; নরমরা তার বিরোধিতা করে এক দূরে সরে এসে দেখার 'তত্ত্ব' আবিষ্কার করেছে। এ'রা মনে করেন, লেখক যখন বিষয় থেকে দূরে সরে এসে দেখেন তখন বিষয়টিকে অধিক হৃদয়গ্রাহী করে বলা যায়। এরেনবুর্গ এবং অন্যান্য প্রবীণ লেখকের স্মৃতিচারণা এই তত্ত্বের উদাহরণরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে।

রাশিয়ার তরুণ সাহিত্যিকরাও চরমপন্থীদের কাছে এক সমস্যা। এই তরুণ দল সাহিত্যের নামে যে নতুন জল আমদানী করছে, চরমপন্থীদের কাছে তা বিরক্তির ত বটেই এমন কি ভীতিকর কোনো পদার্থ। চরমপন্থীরা একে বলেন, 'বুদওআর লিটারেচার' এবং 'বেডরুম লিরিক'। এই নব্য সাহিত্য বা সাহিত্যের ধারা ভয়ংকর, কেননা শান্তভাবে এই সাহিত্য দিন দিন বেড়ে উঠছে, আর যে-সাহিত্য 'নারীদের নিজ কক্ষের' 'শোবার ঘরের' তার কোনো ব্যাপক বিস্তৃত জগৎ নেই। কোশেটভ মর্মাহত হয়ে বলেছেন :

"It's really....about the size of the bed."

বীট কবি

'আমার মাথার খুসকি যাবে না।'

কেশকলাবিদ এমন কথা শুনলে রক্তচক্ষু হবেন। এত যে নিত্য টাক পড়া চুল ওঠার নব নব ওষুধ বের হচ্ছে বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত পন্থাতে তৈরী হয়ে, সে কি বৃথা! বৃথা বই কি! কেননা মুখের সামনে মাইক্রোফন পেলে ছোকরা কবি তাঁর নিজের মাথারই চুল দেখাবেন, জীবনে কোনোদিন সেখানে চিরুনির আঁচড় পড়েনি। তাতে তাঁর প্রচুর গর্ব। এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতা আওড়ে বলবেন:
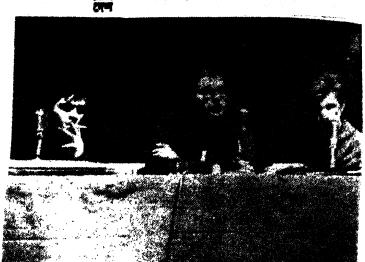
"Nothing would rid me off Dandruff.
Vitalis Lucky Tiger, Wildroot, Brilliantine, nothing."

এই কবির নাম গ্রেগরী কোরসো, বয়ঃক্রম আঠাশ, দীনদৈন্য বেশভূষা। ইনি বীট্-কবি, অর্থাৎ আমেরিকায় 'বীটনিকস' নামে যে নব্য ছোকরারা সাহিত্যের হাল-আগন্তুক তাদেরই ইনি অন্যতম।

'বীটনিকস' শব্দটা এতদিনে আমেরিকার আরও কয়েকটি জিনিসের মতন আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। এমন কি ব্রহ্ম ও বাংলা দেশেও নব্যমহলে ওটা শোনা যাবে। বিলেতে যারা অ্যাংগ্রি, আমেরিকায় তাদের সমগোত্রীয়রা বীটনিকস। রাশিয়ার 'চিকেনস' বোধ হয়। বাংলা দেশে 'বীট'রা একেবারেই দেখা দেয়নি—একথা কেমন করে বলি।

সেদিন এক বাঙালী তরুণ কবি ও গল্প লেখকের কথা শুনলাম। কফিখানায় এসেছেন: একটু ময়লা জামা কাপড়, গালে কিঞ্চিৎ দাড়ি, তার সংগে তোকমারির এক পুলটিশ আঁটা এক পাশে। জনৈক পরিচিত উদ্বিগ্ন হয়ে শুধোলেন, 'কি হল আপনার গালে?' তরুণ লেখক বসলেন চেয়ারে — অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'কিছু না।' বলে চুপ করে, আঙুল থরথর করে কাঁপিয়ে একটা চারমিনার সিগারেট বের করে ধরালেন। অতঃপর বিষণ্ণ গলায়, 'কিছু হয়নি, তবু একটা পুলটিশ দিয়েছি। লোকে ভাবুক আমার ঘা ফোড়া কিছু একটা হয়েছে। আমার শরীরের মধ্যে সব রক্ত পুঁজ হয়ে যাচ্ছে দেখে ওদের গা ঘিন ঘিন করুক।'

এই গল্প যার কাছে শুনেছিলাম, সে বেচারী কখনও বীটনিকের চেহারা দেখেনি। আমিও নয়। অবশ্য বাঙালী বীট সে দেখেছে। তবে কিনা সে আসল দেখতে চেয়েছিল। অনেক মেহনত করে আমেরিকার তিন বীট কবির ছবি সংগ্রহ করলাম। দর্শক আনন্দ পেতে পারেন।

আমেরিকার বীট কবি : কোরসো, গিনসবার্গ ও ওরলভোস্কি

এই তিন বীট কবির একজন অ্যালেন গিনসবার্গ, বয়স বত্রিশ, অন্যজন পিটার ওরলভোস্কি বয়স পঁচিশ, শেষজনের নাম গ্রেগরী কোরসো—তাঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বীটনিকরা নানাভাবে সাজে, সবুজ শরু ট্রাউজারের ওপর টকটকে লাল-কালোর চেক কাটা জামা, কনুইয়ের কাছে কালো তাপ্পি, গলার কাছে নীলের তাপ্পি, চুল অবাধ্য, জুতো ছেঁড়া, দাঁত মাজে কি মাজে না, পাগলা হাসপাতাল থেকে পেট্রল পাম্পের দোকান কোনো না কোনো জায়গায় একটা হয়ত চাকরি করে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবিতা ফেরি করে, কিংবা কোনো সভায়, একে অন্যের কদর দেখলে কাঁদে। আর? আর এরা সর্বপ্রকার নেশা করে, যৌন অত্যাচারে মত্ত হয়, হাতাশার নামে বেপরোয়া। সারা রাত পথে ঘুরে বেড়ায় এবং যখনই খুব ক্লান্ত, সংগী মাত্র কোনো বন্ধু তখন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে নিজেদের মার গল্প করে। ফায়ার হাইড্রেণ্টের দিকে তাকিয়ে এরাই কবিতা লেখে, আমার চোখের জলের চেয়ে তোমার জল কি বেশী?

গল্প গ্রন্থ

দূরবীন। বনফুল। বাক-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

'জাত সাহিত্যিক', 'পাকা লিখিয়ে'—অতি ব্যবহারে মলিন এইসব বিশেষণ বনফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের সৌভাগ্য যে বনফুলের অসাধারণ সৃজনী প্রতিভা আজো সক্রিয় এবং বয়সে প্রবীণ হলেও চিন্তাধর্মে তারুণ্যের সজীবতা এখনো অক্ষুন্ন।

ছোটবড় ত্রিশটি গল্পের সংগ্রহ আলোচ্য গ্রন্থটি। অতি প্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনা অধিকাংশ গল্পের কল্পলোক সৃষ্টি করেছে। সুখের বিষয়, পাঠকদের মন থেকে অবিশ্বাসের সাময়িক নির্বাসনও লেখক দাবি করেননি। দেবভক্ত বা ভূতে বিশ্বাসী না হয়েও এসব গল্পের রসাস্বাদন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'প্রতীক্ষা' 'দেওয়াল' 'ভোরের স্বপ্ন' প্রভৃতি গল্প।

অন্য ধরনের লেখাগুলোর মধ্যে নাম করা চলে 'উইল' গল্পটির। এর বিষয়বস্তু অভিনব সন্দেহ নেই। তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে রসসৃষ্টির এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাম্প্রদায়িক এবং সাম্প্রতিক ভাষাবিরোধ জাত দাঙ্গাও একাধিক গল্পের পটভূমি রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গল্প দুটি চিত্তগ্রাহী।

স্বল্পতম কলমের আঁচড়ে পূর্ণাবয়ব প্রকাশক চরিত্রসৃষ্টি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বনফুলের পক্ষে তা আজো অনায়াস-সাধ্য। এই গ্রন্থের সমাদর কামনা করি। ৫।৩২

উপন্যাস

যে যাই বলুক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ৯। মূল্য ছয় টাকা।

"'করি, বিশ্বাস করি'। গভীরনিস্তব্ধ শান্তির বাণীর মত শোনাল তামসীকে। 'কাজ করি, ক্লান্ত হই, কূল হারিয়ে ফেলি। আবার এই বিশ্বাসের আলোতে পথ চিনে ঘরে ফিরে আসি। এ আলো নেবে না, কাঁপে না, ক্ষয় হয় না। এ আলোতে জীবনের পরমধন খুঁজে পাই।'"

রসসিদ্ধ অচিন্ত্যকুমারের আরেকটি অনুপম চরিত্রসৃষ্টি এই তামসী। বাসনা ও বিভ্রমের দোলায় সে দুলেছে, কাম্য ও কামনার দ্বন্দ্বে সে জর্জরিত হয়েছে, এবং সব শেষে বেদনা ও বঞ্চনার কৃষ্ণপক্ষ অতিক্রম করে অনির্বাণ বিশ্বাসের আলোয় এসে জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে। যে পথে তার পরমধন সে পথেই সে চলবে। যে যাই বলুক।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ের পটভূমিতে অচিন্ত্যকুমারের এই সার্থক উপন্যাসটি রচিত। বিচিত্র চরিত্রের মিছিলে মুখর এই উপন্যাস। চরিত্রগুলির অভীপ্সা ও অবক্ষয়ের মধ্যে বর্তমান সমাজ-মানসের ছায়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। উপন্যাসটি পাঠকের মনকে একালের সমাজ-অন্তর-পরিক্রমার পথে টেনে নিয়ে আসে। বহু ও বিচিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়।

অচিন্ত্যকুমারের অনবদ্য রচনাশৈলী ও সুন্দর ভাষা উপন্যাসটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। প্রচ্ছদপট শিল্পশোভন।

(৩৩৮।৬০)

তিথিপর্ণা—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিমলা-রঞ্জন প্রকাশন; ৮।১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৩, টাকা।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য কবি হিসেবেই পরিচিত; কিন্তু তিনি একাধিক উপন্যাস রচনাও

করেছেন। উপর্যুক্ত উপন্যাসটিতে দুঃস্থ সাহিত্যিক বিনায়ক ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। যে জটিলতা, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি উপন্যাসের চরিত্র স্ফুরণের প্রধান গুণ, তা বিনায়কের জীবন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটির পরিণতি মেলোড্রামাটিক হলেও বিনায়কের জীবন-ট্রাজেডিই প্রধান উপভোগ্য। উপন্যাসটি স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক আবেগধর্মী, অবশ্য গল্পের রস সে-কারণে কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি।

৬৪৩।৬১

গাঁয়ের নাম কেয়াপুর—দীপককান্তি দে। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা-১। দাম—৩, টাকা।

শ্রীযুক্ত দে উপর্যুক্ত উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের সারল্য এবং জটিলতা—দুটি দিককেই বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কেউ চায় সুপরামর্শ, তার পরিবর্তে পায় বিষ; কেউ সুবিচার চেয়ে—পরিবর্তে পায় বঞ্চনা: শুধু স্বার্থকে পরিপুষ্ট করার জন্যেই ঐ লাঞ্ছনা বা বঞ্চনা। চরিত্রচিত্রণে সাধারণ জীবন সাধারণ পরিবেশে উপস্থাপিত। উপন্যাসটি পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু তা থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায় না। ৬৬২।৬১

একটি মুখ : তিনটি মন—বাসুদেব সাহা। আলফাবিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা--১। দাম—টাকা ৩·৫০।

একটি প্রেমের কাহিনী। কাজলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। প্রকৃতভাবে সে কাকে চায়? অথবা সে কি কাউকে চায় না? রাধা, মাধুরী ও লখিয়া—যারা এলো তার জীবনে, তারা নিজেদের জীবনে কী পেল? কেননা কাজল ভালবাসতে জানে, বন্ধন মানে না। উপন্যাসটিতে কোনো নতুন বিশ্লেষণ পদ্ধতি অথবা জটিল মানসিক ক্রিয়া নেই। প্লট মামুলি হতে পারে, কিন্তু বলার গুণে তা অনেক সময় অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে ওঠে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, শ্রীসাহা সে গুণের তেমন অধিকারী নন।

৬৬৪।৬১

পরিচিতা—অজিত মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৩, টাকা।

নিঃসন্তান প্রমীলাকে ত্যাগ করে তার স্বামী। কিন্তু পিতৃগৃহেও সন্তানহীনা রমণীর শান্তি নেই। তাই অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে সে হয়ে পড়ল একান্তই আশ্রয়হীন। এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে শ্রীমুখোপাধ্যায় নারী-জীবনের যন্ত্রণাময় ব্যথা বেদনার দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন। অবশ্য প্লটের মধ্যে অভিনবত্ব না থাকলেও জটিল ঘটনার মাধ্যমে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। রামমোহন, কালীশঙ্কর প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনে লেখক বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

৬৩০।৬১

কাঁচা মাটি—পাকা পথ। শ্রীদীপেন রায়। প্রকাশক : বেঙ্গল পাব্লিশার্স লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। উপন্যাস। ২০৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪, টাকা, ৫০ নয়া পয়সা।

সাদার্ন এ্যাভিনিউ-এর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ডাক্তার আভিজাত্যগর্বিত শ্রীসুবিনয় রায়ের পুত্র সলিল স্বাস্থ্যান্বেষণে সাঁওতাল পরগণায় যাইয়া দোলের দিন এক সাঁওতাল রমণী কৈলির গায়ে ফাগ দেওয়ার অপরাধে সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, কারণ তাহা না করিলে সাঁওতালদের টাঙিতে তাহার প্রাণ যাইত। লেক-পল্লীতে কালক্রমে সেই নারী কেমন করিয়া নিজেকে সেই অভিজাত পরিবেশের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করিল তাহারই কাহিনী লইয়া এই উপন্যাস।

অভিনব বিষয়বস্তু—সন্দেহ নাই। লেখক মুখপত্রে প্রশ্ন করিয়াছেন, "শিক্ষা ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে অশিক্ষিত বুনো, গেঁয়ো, সরল, সহজ মানুষগুলোকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত করতে পারে কি?" কিন্তু সাঁওতাল রমণীর ন্যায্য প্রাপ্য লেক অঞ্চল কিনা কে জানে! তবে তাহার মুখে ফাগ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাহার সে-অধিকার নিশ্চয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সারল্যের জোরে সে বালিগঞ্জিয়ানা আয়ত্ত করিল কিরূপে? উপন্যাসের ক্রম-পরিণতির একটা নিজস্ব ধারা আছে, আশা করি লেখক পরিণতকালে তাহা আয়ত্ত করিবেন। আপাতত তাঁহার লিখনভঙ্গি সাবলীল, স্বচ্ছন্দ।

৫৫৭।৬১

পদ্মগন্ধা—শ্রীসুখময় গুপ্ত, প্রকাশক : শ্রীশালগ্রাম খেমানী। প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এন্ড কোং। ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ উপন্যাস। ৩৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় টাকা, পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

লেখক প্রস্তাবনায় লিখেছেন : "আমি যদিও কস্মিনকালেও লেখক নই—তবু আমার হৃদয়ের গভীর প্রেরণা আমাকে পদ্মগন্ধা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।" বঙ্গসাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রে এ-প্রেরণা অনেকের মধ্যেই আসে, সেইটাই হইয়াছে মুস্কিলের কথা। এই লেখকের ভাষার উপর যে অধিকার আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু যে জমিদারের দল আজ জমিদারি হারাইয়াছেন তাঁহাদের মদ্যপান আর নারীভোগের কাহিনী আর কতদিন চলিবে? তবে কাহিনীতে বৈচিত্র্য

আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জমিদার বিদগ্ধ। তাছাড়া, নায়ক শিল্পী হইলেও লাঠি ধরিতে সক্ষম. কেবল আত্মীয় জমিদারের ও তাঁহার মোসাহেবদের উচ্ছৃংখলতায়, বিশেষ করিয়া তাঁহার অসামান্যা স্ত্রীর উপর মোসাহেবদের দৃষ্টি পড়ায়, তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া যাইতেছেন বারবার, আবার সুস্থ হইয়াও উঠিতেছেন। ইহার মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত আছে; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আছে; গান্ধী ও দেশবন্ধুর আদর্শের অমিলের কথা আছে—সবই আছে; নাই কেবল একটি সুস্থ স্বাভাবিক উপন্যাসের উপযুক্ত পরিবেশ। মনে হয়, ছায়াছবির উপর তাক করিয়াই উপন্যাসটি লেখা। তাই সেটির স্থূল অবয়বে এইরূপ অপ্রাকৃতিস্থ লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্প উপন্যাসের একটি রচনা-শৈলী আছে—সেটি আয়ত্ত করা সাধনাসাপেক্ষ।

৫৬২।৬১

ধর্ম ও দর্শন

নীলকণ্ঠ—(দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ কর্তৃক প্রণীত। শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৬৲।

শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রণীত 'নীলকণ্ঠের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়াতে আমরা সুখী হইলাম। পুণ্যশ্লোক কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী এই জীবনীর প্রথম খণ্ড বাংলার চিন্তাশীল সুধী সমাজ এবং অধ্যাত্ম রসপিপাসুদের নিকট সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার তাঁহার সর্বজন শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের সংগুরু স্বরূপে প্রকাশলীলারই প্রধানত বিস্তার সাধন করিয়াছেন। প্রবর্তক জীবন, সাধক জীবন অতিক্রম করিয়া তাঁহার সিদ্ধ জীবনের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমাদের পরিচয় ঘটে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত। এই সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ ভূমিকাটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মচারীজীর জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রেমভক্তি বিতরণে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত ক্রমপরাক্রমশীল লীলারই বিলাস পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার সিদ্ধস্বরূপে ও সর্বজীবের প্রতি গোঁসাইজীর সংবেদনেরই পরিমূর্তি প্রজ্ঞানময় প্রদ্দীপ্ত লাভ করিয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে প্রথম খণ্ডের ন্যায় 'নীলকণ্ঠের' দ্বিতীয় খণ্ডও মহৎ জীবনের মাধুর্যের বিন্যাসচাতুর্যে, ভাবের প্রাচুর্যে ভাবের গাম্ভীর্যে আদ্যোপান্ত ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে। বস্তুত বাংলার জীবনী-সাহিত্যে 'নীলকণ্ঠ' স্থায়ী আসন লাভ করিবে। গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া আমরা প্রত্যেককে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিতেই অনুরোধ করিব। যিনি নীলকণ্ঠ—জীবের অবিদ্যাজনিত হলাহল পান করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনই তাঁহার ব্রত এবং সেই ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যেই ভগবদচরণে তাঁহার জীবন সর্বভাবে উৎসর্গীকৃত। এমন মহৎ-জীবনী বাংলার গৃহে গৃহে সমাদৃত, পঠিত অর্থাৎ নিত্য পঠিত হইবে আমরা ইহাই কামনা করি। বর্তমানে এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন, তাহাতে আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে।

৮১।৬২

কল্কি-গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়। মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, কল্কিপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদি গ্রন্থে কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্পর্কে বহু তত্ত্ব অভ্রান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সব তত্ত্ব অনুসরণে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের সমাধিবতী মহাগোরী, অলৌকিক যোগশক্তি সম্পন্ন স্বামী ভৈরবানন্দ ও গ্রন্থকারের সাধনালব্ধ অনুভূতি ও দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে পরিদৃষ্ট অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলী অবলম্বনে কল্কিশাস্ত্রের উপক্রমণিকারূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে কল্কি-জন্মের ২৪ বৎসর পূর্বেই কল্কিলীলা প্রসংগে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। অপূর্ব ধর্মতত্ত্ব, সাধন-রহস্য ও দিব্য দর্শন ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। কল্কি-গীতা একখানি প্রচারধর্মী শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলী যুক্তিতর্কের পরিবর্তে ধর্মপ্রাণ পাঠকের ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। ৫৮৪।৬১

মহাপুরুষ প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে — শ্রীগিরিজাশংকর রায়চৌধুরী। জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ ও ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক সুপ্রসিদ্ধ ও কৃতী সাংবাদিক। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশের চিন্তা ও কর্মজগতে একটি গৌরবময় যুগ আসিয়াছিল এবং বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুগের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও ধর্মনায়কদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহাদের পরস্পরের উপর প্রভাব ও পরস্পর হইতে পার্থক্য লেখক প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় অবশ্য এ যুগের পূর্ববর্তী। রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথ্যই অনেকে অবগত, কিন্তু লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রথম ও প্রধান গুরু ভৈরবী যজ্ঞেশ্বরী, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে দুর্লভ সাহসিকতা ও প্রাঞ্জলতার সহিত পাঠকদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। ভৈরবী সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীকারদের দ্বারা পরিবেশিত হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পঁচিশ বৎসর ব্রাহ্ম থাকিবার পর হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার লইয়া বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উপাধ্যায় মহাশয়ের খৃষ্টান থাকিয়া এবং খৃষ্টকে মানিয়া হিন্দু আচার-ব্যবহার মানিয়া চলার দৃষ্টান্ত সকলের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। লেখক নিষ্ঠা ও মননশীলতার সহিত প্রত্যেকটি ধর্মগুরুর নিজস্ব মত ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়াছেন এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। পুস্তকটি সেই গৌরবময় যুগের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা। ৪৭৯/৬১

বিবিধ

Autumn Annual (Tagore Centenary Number)—Presidency College Alumni Association. Editor: Amulyadhan Mukherjee: Presidency College, Calcutta-12 Price Rs. 2.50 nP.

অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র, অধ্যাপক টি এন সেন, অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ, ডা হুমায়ুন কবির, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্তৃক রচিত বিশ্বকবির সাহিত্য, কাব্য, সংগীত, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর সমন্বয়ে সংখ্যাখানি মূল্যবান। আগাগোড়া আর্টপেপারে বেশ পরিচ্ছন্ন ছাপা বিশেষ সংখ্যাখানি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

বার্ষিকী

নবজীবন (হুগলী জেলা বার্ষিকী)। সম্পাদক : সুকুমার দত্ত। ১০ ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১। আড়াই টাকা।

সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য বার্ষিকী 'নবজীবন' বাংলা দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক নবজাগরণের এক উল্লেখযোগ্য দলিল। হুগলী জেলা বাংলার বহু মনীষীর আবির্ভাবভূমি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ধাত্রী ও পালয়িত্রীরূপে এই জেলার একটি বিশেষ গৌরব আছে। এই সুবৃহৎ পত্রিকায় সেই গৌরবপূর্ণ অধ্যায় নানা রচনা ও চিত্রে বিধৃত হয়েছে। সম্পাদক জানিয়েছেন : 'আমরা প্রথমে একটি জেলা লইয়া শুরু করিতেছি।' তাঁদের এই পরিক্রমার শুভসূচনার পরিচয় পেয়ে আমরা আশান্বিত। বাংলার অন্যান্য জেলার গৌরবও তাঁরা যদি অনুরূপভাবে তুলে ধরতে পারেন, নিঃসন্দেহ সারা বাঙালীর আশীর্বাদলাভে তাঁরা ধন্য হবেন। হুগলী জেলাবাসীর কাছে এই বার্ষিকী আদরণীয় ত বটেই, প্রত্যেক বাঙালী এই বার্ষিকীটিকে দুর্লভ সামগ্রীর সমাদর দেবে।

প্রাপ্তিস্বীকার

পদাবলী-সাহিত্য—শ্রীকালিদাস রায়।

কি বিচিত্র এই দেশ—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত।

মহাবিশ্বের রহস্য—বি ভি লিয়াপুনেভ, অনুবাদক—প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আদিম সমাজের ইতিহাস—মনোরঞ্জন রায়।

কুমারী মন—শক্তিপদ রাজগুরু।

গৌড়জন বধূ—শক্তিপদ রাজগুরু।

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত কাহিনী (৩য় পর্ব)—ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল।

রবীন্দ্রনাথ—দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদক।

রস-রহস্য কল্লোলিনী—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত।

এভার্জিবিশন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নিশাবিনী—বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ।কেলক।

কন্টুপত—চিত্ত সিংহ।

কলকাতার কুয়াশা—চিত্ত সিংহ।

চন্দ্রশেখর

চলচ্চিত্রে সংজ্ঞা-সংকট

ফলিত বিজ্ঞানের মত চলচ্চিত্রও একটি ফলিত শিল্প। এবং এই শিল্প তখনই ফলবান হয়ে ওঠে যখন দর্শকের সংগে তার একাত্মতা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রপটের মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যখন দর্শক নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। চলচ্চিত্রের এই সংজ্ঞাটি সহজ। সংজ্ঞাটিকে প্রয়োগসিদ্ধ করে তোলা কঠিন।

কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে, চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজেই সমস্ত উৎসাহ ব্যয়িত হচ্ছে, অথচ প্রয়োগকর্মে সংগতিপূর্ণ কোন সুষ্ঠু ধারার প্রবর্তন করবার ক্ষমতা কার কতখানি আছে তা তর্কাতীত নয়।

সত্যিকারের চলচ্চিত্র "নিও-রিয়ালিজম"-এর বাহন—এই তত্ত্ব সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে বেশ কিছুকাল। "নিও-রিয়ালিজম" বলতে কী বোঝায়? নব বাস্তব-সমীক্ষা? বাস্তবের রূপ বদলায়, বাস্তব পরিবর্তনশীল। বাস্তবের বিশ্বরূপদর্শনে তো সব পরিবর্তনই ধরা পড়বে। তা না-হলে বাস্তবের ভূয়োদর্শন সার্থক হবে কি করে। চলচ্চিত্রে "নিও-রিয়ালিজম" কি তবে নতুন কোন পার্থিব-সত্যের ইঙ্গিত দেয়? সে সত্যের পরিচয়টি কি মেলে ধরে? চায়? "নিও-রিয়ালিজম"-এ চিহ্নিত হয়েছে অনেক ছবি। সেই সব ছবি দেখে এই তত্ত্বের সারমর্ম অনুধাবনে চিত্ররসিকরা ব্যর্থ হয়েছেন। তবে সেই বিশেষ ধরনের ছবিতে নতুনতর প্রয়োগ-ধারার পরিচয় মিলেছে। আর মিলেছে প্রতিদিনকার পরিচিত পরিবেশের রূপ। যে পরিবেশ প্রামাণিক, কিন্তু প্রাণহীন। চলচ্চিত্রে এই নতুন পরিবেশ-সমীক্ষা বুঝি দর্শকের অন্তরকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। তাই শোনা যাচ্ছে, "নিও-রিয়ালিজম" নামের দুর্বোধ্য প্রয়োগ-দর্শনটি চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিচ্ছে।

সম্প্রতি আরেকটি তত্ত্বের কথা শোনা যাচ্ছে। তার নাম "ডিড্রামাটাইজেশন"। অর্থাৎ চলচ্চিত্রায়িত কাহিনী থেকে সকল প্রকার নাট্য-উপাদান শুষে বের করে নিতে হবে। নাটক বলে আলাদা কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। জীবনের বেদনা ও সংঘাত, আনন্দ ও অভিলাষ থেকে আবেগের যে নির্যাস আহরণ করা হয়, বাস্তবের "কল্পিত" ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে তাই যখন ঘনীভূত হয়ে ওঠে তখন আমরা বলি নাটকের সৃষ্টি হল। নাটক জীবনেরই ভাব-কল্প। এই নাট্য-সংবেদনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি জেহাদ শুরু হয়েছে। জেহাদে নাটকই জয়ী হয়েছে। কারণ দর্শকমন আবেগের স্পর্শে অভিভূত হতে চায়। আবেগে অভিভূত হতে না পারলে ছায়াছবির প্রতি বীতরাগ হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রে সম্প্রতি আরেকটি তত্ত্বের আমদানী ঘটেছে। একে বলা হয় "নিউ ওয়েভ"। সম্প্রতি আসাম চলচ্চিত্র-উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে গৌহাটিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে চিত্রপরিচালক তপন সিংহ বলেছেন, যুদ্ধোত্তর কালের "নিও-রিয়ালিজম" বিদায় নিয়েছে। এর জায়গায় এসেছে "নিউ ওয়েভ"। বলা বাহুল্য, শব্দগতভাবে এই তত্ত্বটি অস্পষ্ট। এর স্বরূপ কী? সংজ্ঞা কী? হয়ত "নিউ ওয়েভ"-এর কথা যাঁরা বলেন তাঁরাও এ বিষয়ে অবহিত নন। নাকি তত্ত্বটি শুধু অনুভবই করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! "নিউ ওয়েভ"-যে চলচ্চিত্রের রূপ ও রসে কী কী পরিবর্তন সম্ভব তা বিশদভাবে আলোচিত হয়নি। তত্ত্বজ্ঞদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হয়ত শোনা গেছে। কিন্তু "নিউ ওয়েভ"-এর সারমর্ম দুরধিগম্যই রয়ে গেছে।

তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, জটিল তত্ত্বের জটে জটে চলচ্চিত্র দিনের পর দিন বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। এই বন্ধন যেন এক নতুন নাগপাশ—যাতে বাঁধা পড়ে চলচ্চিত্র সহজ, সরল

অজয় কর পরিচালিত "অতল জলের আহ্বান"-এর নায়িকার ভূমিকায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না। জীবনের গোড়াময়, মনোময় রাজপথে চলচ্চিত্র যদি চলতে না পারে, যদি এমনিভাবে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে তবে আশংকা হয়, এই শিল্পের আত্মিক অবক্ষয়ের আর দেরি নেই। তত্ত্বের রথচক্রতলে এর অপমৃত্যু সন্নিকট।

বি-এফ-জে-এ-র পুনর্জীবন লাভ

চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের নিজস্ব সংস্থা বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এককালে বাংলা ও বাংলার বাইরের চিত্রামোদী ও চলচ্চিত্রসেবীদের কাছে সুপরিচিত ছিল। সাংবাদিকদের বিচারে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র, শিল্পী ও কলাকুশলীদের যে "বি-এফ-জে-এ এওয়ার্ড" দেওয়া হত, তা নিয়ে চিত্রনির্মাতা ও চিত্ররসিকদের মহলে প্রবল উদ্দীপনা ও ঔৎসুক্য দেখা যেত। অনিবার্য কারণে বি-এফ-জে-এ'র কর্মধারা গত কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি এই সংস্থাকে নতুন প্রাণে পুনর্জীবিত করে তোলা হয়েছে।

চলচ্চিত্রসেবী ও চিত্রামোদীরা শুনে সুখী হবেন, এই সংস্থার পুনর্গঠনের সংগে সংগেই এ-বছর থেকে "বি-এফ-জে-এ এওয়ার্ড"-এর পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বি-এফ-জে-এ'র সভ্যদের বিচারে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা, হিন্দী ও বিদেশী ছবি, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম অনতিবিলম্বেই ঘোষিত হচ্ছে।

গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সভ্যদের সাধারণ সভায় সংস্থার নিম্নলিখিত কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে:

সভাপতি—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ; সহ-সভাপতি — শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ; যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীবাগীশ্বর ঝা ও শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ। সমিতির সদস্য—সর্বশ্রী নির্মলকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা), মহেন্দ্র সরকার (যুগান্তর), রণধীর সাহিত্যালংকার (কলা সংসার), এ এইচ মালিহাবাদি (আজাদ হিন্দ), পংকজ দত্ত (দেশ), বি সি আগরওয়ালা (সিনে অ্যাডভান্স), কল্পতরু সেনগুপ্ত (স্বাধীনতা), এ এম কুমার (চিত্রলোক), ধীরেন মল্লিক (নতুন খবর) ও অজিত মুখোপাধ্যায় (জলসা)।

চিত্রালোচনা

নতুন বাংলা ছবি এ সপ্তাহে একটিও মুক্তিলাভ করছে না। আগামী সপ্তাহে দুটি বাংলা ছবি দর্শকদের সামনে উপস্থিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। একটি মুভীটক'-এর প্রথম উপহার **শিউলি বাড়ি**, অপরটি চিত্রশোভনার **শাস্তি**। দুটি ছবিরই আখ্যান অবলম্বন দুই প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিকের দুটি বহুপঠিত কাহিনী। "শিউলি বাড়ি" সুবোধ ঘোষের "নাগলতা"র চিত্ররূপ। "শাস্তি"র কাহিনী অবলম্বন নরেন্দ্রনাথ মিত্রর "ভুবন ডাক্তার"। এবং আরও একটি সুখবর, দুটি ছবিরই পরিচালক নবাগত। "শিউলি বাড়ি" পরিচালনা করেছেন পীযূষ বসু, "শাস্তি"র পরিচালক দয়াভাই।

• • •

তিনটি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ছবি তিনটি হল : **কুলো, রঙ্গোলী ও সপেরা**। তিনখানি ছবিরই মূল উপজীব্য হাল্কা আমোদ।

বাসু ফিল্মস-এর "কুলো" দক্ষিণ ভারতের উপহার। বৈজয়ন্তীমালা, সুনীল দত্ত, প্রাণ ও সুলোচনা এই ছবির প্রধান

চিত্ত বসু পরিচালিত "ধূপছায়া"র একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

শিল্পী। কে শঙ্কর ছবির **পরিচালক। সঙ্গীত-পরিচালক** হলেন সলিল চৌধুরী। আর এস বি ফিল্মস-এর **"রঙ্গোলী"র** নায়ক-নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা ও কিশোর-কুমার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অমর কুমার। শঙ্কর-জয়কিষণ সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন।

ইন্ডো আফ্রিকা ফিল্মস-এর "সপেরা"র মুখ্য শিল্পী হলেন রঞ্জন, জ্যোতি, তিওয়ারী, সুন্দর এবং জীবনকলা। বি জে প্যাটেল ও অজিত মার্চেন্ট যথাক্রমে ছবিটির পরিচালক ও সুরকার।

* * *
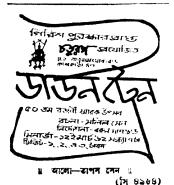
আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বেনারসী** ও **অতল জলের আহ্বান।**

তপন সিংহ **পরিচালিত** ও জালান প্রোডাকশন্স প্রযোজিত **হাঁসুলী বাঁকের উপকথার** চিত্রগ্রহণ **সমাপ্ত।** এ মাসের মাঝামাঝি ছবির আবহ-সুররচনা সম্পূর্ণ করছেন সঙ্গীত-**পরিচালক** হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির **বহির্দৃশ্যাবলী** বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলে কোপাই নদীর তীরে গৃহীত হয়েছে। **বহিরঙ্গ শিল্পগরিমা** ও কাহিনী-বিন্যাসে **ছবিটি পরিচালক**-চিত্রনাট্যকার শ্রীসিংহের নতুন প্রতিভার **পরিচয়** নিয়ে আত্মপ্রকাশ **করবে** বলে আশা করা যাচ্ছে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, প্রশান্তকুমার ও নিভাননী ছবির মুখ্য চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন।

বেনারসী শিল্পী ক্র্যাফট-এর প্রথম চিত্রোপহার। এই ছবিতে একজন নতুন পরিচালকের সন্ধান মিলবে। তিনি হলেন অরূপ গুহঠাকুরতা। বিমল মিত্র'র মনন-ধর্মী ও আবেগসমৃদ্ধ কাহিনী ছবিটির আখ্যান-ভিত্তি। রুমা গুহঠাকুরতা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির **নায়ক-নায়িকার** ভূমিকায় অবতীর্ণ। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ছবির সুরকার।

অতল জলের আহ্বান আর ডি বি'এর নবতম নিবেদন। অজয় কর ছবির পরি-চালক। প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী ও একটি ত্রিভুজ প্রেমোপাখ্যান নিয়ে ছবির বিষয়বস্তু রচিত। ছবির একদা-ব্যর্থ প্রণয়ী যুগলের **পরস্পরের** সঙ্গে দেখা হয় বিশ বছর পরে। এই দুটি চরিত্রের রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস ও ছায়া দেবী। ত্রিভুজ **প্রণয়োপাখ্যানের তিন শিল্পী সৌমিত্র চট্টো-**

পাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মন ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

* * *

বাংলা ছবিতে বোম্বাই শিল্পীর আগমন সম্প্রতিকালে শুরু হয়েছে প্রযোজক-পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "মমতা" ছবি থেকে। বলরাজ সাহনী ছিলেন এই ছবির নায়ক। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ-ভি-এম'এর "আকাশ-পাতাল" ছবিতেও বোম্বাই শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দুর্গা খোটে ও অচলা সচদেব। এরপর এলেন হেলেন ("গলি থেকে রাজপথ") ও চাঁদ ওসমানী ("শিলালিপি")। শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায়ের ছবিও বাদ গেল না। শ্রীরায় তাঁর নতুন ছবি "অভিযান"-এর নায়িকা চরিত্রের জন্য ওয়াহিদা রেহমানকে নির্বাচন করেছেন।

বাংলা ছবিতে আরও একজন বোম্বাই-তারকার পদক্ষেপ ঘটছে। তিনি হলেন গীতাবালি। পরিচালক হেমেন গুপ্ত তাঁর

আগামী বাংলা ছবি "অনামিকা"র জন্য এই শিল্পীকে নির্বাচন করেছেন। ছবির একটি বিশিষ্ট স্ত্রী-চরিত্রে গীতাবালি অভিনয় করবেন। ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সম্ভবত অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে দেখা যাবে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু-মুসলমান প্রীতি

হিন্দী ছায়াছবির ক্ষেত্রে প্রযোজক বি আর চোপরা ও পরিচালক যশ চোপরা কৌলিন্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের ছবিতে দর্শকরা নতুন কিছু আশা করেন, নতুনত্ব পেয়ে তৃপ্ত হন। চোপরা-ভ্রাতৃদ্বয়ের নবতম নিবেদন "ধর্মপুত্র" (বি আর ফিল্মস) সেদিক থেকে দর্শকদের নিরাশ করবে না।

আচার্য চতুরসেন শাস্ত্রীর একটি উপন্যাস ওই ছবির আখ্যান-ভিত্তি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অল্পাধিক দুই দশক-কালব্যাপী এক ঘটনাবহুল অধ্যায় এই উপন্যাসের পটভূমি। অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি থেকে শুরু করে দেশ-বিভাগের কাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে দ্রুত পটপরিবর্তন দেখা দেয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত।

আধুনিক ভারত-ইতিহাসের এই অশান্ত অধ্যায়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও বিরোধের যে সংঘাতটি জনজীবনকে আলোড়িত করে তোলে তা-ই চিত্রকাহিনীর প্রধান উপজীব্য। এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই যে জাতীয় সংহতির প্রাণ এবং জাতীয় জীবনের আদর্শ তা-ই ছবির বক্তব্য।

ছবির এই উপজীব্য ও বক্তব্য যে নাট্য-কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তার পরিধি দুই পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুই পুরুষ ধরে দুই পরিবারের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব চিত্রকাহিনীর ভিত্তি রচনা করেছে। বলা বাহুল্য, দুই পরিবারের মধ্যে একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান।

বি-এ-পি প্রোডাকসন্সের "কাজল"-এর নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী।

নবাব-পরিবারের একমাত্র বিবাহযোগ্যা কন্যা যখন অবৈধ মাতৃত্বের কলঙ্কে বিড়ম্বিত, তখন হিন্দু পরিবারের ছেলে উদারতা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে কেমনভাবে তার মুসলমান বোনকে সকল অপমানের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অবৈধ শিশুকে নিজের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলে সমাজে স্বীকৃতি দেয় তা-নিয়েই চিত্রকাহিনীর সূত্রপাত।

অপরিণামদর্শী প্রণয়ের এই অভিশাপ নীরবে সহ্য করে যাওয়ার পর অভিভাবকের সম্মতি অনুসারে মুসলমান তরুণী তার প্রেমাস্পদকে আবার ফিরে পেল। পরিণয়-সূত্রে ওরা আবদ্ধ হল। গর্ভবতী অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে নবপরিণীতা পুনরায় জননী হবার সকল সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হল। তার প্রাক-বিবাহিত জীবনের সন্তান তখন হিন্দুর ঘরে লালিত-পালিত হচ্ছে।

কাহিনীর শেষার্ধে দেখা গেল যে হিন্দু পরিবারে আদর-যত্নে প্রতিপালিত মুসলমান সন্তান গোঁড়া হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং দেশবিভাগ-জনিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিধর্মী নিধনে অর্থাৎ মুসলমান বিনাশে মরীয়া হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত নিজের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে তার রক্তক্ষয়ী অভিযানকে কেন্দ্র করে কীভাবে সে নিজের আসল পরিচয় জানতে পারল এবং নিঃসন্তান দম্পতি কেমন করে তাদের বিবাহিত-পূর্ব জীবনের সন্তানকে ফিরে পেল তা-নিয়েই চিত্রকাহিনীর অতিনাটকীয় পরিসমাপ্তি।

হিন্দু ঘরের ধর্মপুত্র মুসলমান যুবক ও এক হিন্দু তরুণীর প্রণয় ছবির অন্যতম উপকাহিনী গড়ে তুলেছে। এ-বাদেও ছবিতে একাধিক দেশাত্মবোধক ও নাটকীয় ঘটনা সংযোজিত।

সাধারণ হিন্দী ছবির তুলনায় এই ছবির গুণের সংখ্যা অধিক। ছবির আখ্যান-বস্তুতেও দর্শকরা নতুন নাট্যোপকরণ ও ভিন্নতর পরিবেশের আস্বাদন পাবেন। ছবি দেখার কালে দর্শকরা ভারতের রক্তক্ষরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিগত দিনগুলির স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন। এবং জাতীয়তাবোধের স্পর্শ পাবেন।

চিত্রপরিচালনায় যশ চোপরা ছবির বহু দৃশ্যে সুচারু ও ব্যঞ্জনাধর্মী প্রয়োগ-কর্মের পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োগ-ধারাটি সর্বাঙ্গীণ ভাবে পরিচ্ছন্ন।

তবে চিত্রকাহিনী বিন্যাসে বক্তব্য ও আদর্শ অতি মাত্রায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। চিত্রকাহিনীর বাণী দর্শকের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার একটি সদা-সচেষ্ট অতি-সচেতন ও কষ্টসাধ্য প্রয়াস ছবিটির প্রায় প্রতি দৃশ্যে নাট্য-পরিস্থিতিতে ও সংলাপে সুপরিস্ফুট। তাই বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ও বক্তব্য-নিবেদনে সারা ছবিটিই যেন কেমন কৃত্রিম বলে মনে হয়। ছবির কাহিনীও স্থূলে ভাবাবেগে পরিপুষ্ট এবং এর শাখা-উপশাখা জীবনের স্পর্শরহিত। একটি পুরোপুরি উদ্দেশ্যধর্মী ছবিতে আখ্যান-

বস্তুর বিন্যাসে শিল্পবোধের যে অপমৃত্যু দেখা যায়, এ-ছবিতে তা সুস্পষ্ট।

ছবির প্রধান সম্পদ চারজন শিল্পীর মনোগ্রাহী অভিনয়। এ'রা হলেন অশোক-কুমার, মালা সিংহ, মনোমোহন কৃষ্ণ ও নিরুপা রায়। মুখ্যচরিত্রে এ'রা সকলেই দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। এ'দের মধ্যে যে দু'জন শিল্পী বিশেষ করে দর্শকের অন্তর স্পর্শ করেন তাঁরা হলেন অশোক-কুমার ও মালা সিংহ। মুসলমানের বেশে তাঁরা ছবিতে অবতরণ করেছেন।

অন্যান্য প্রধান চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন রেহ্‌মান, শশী কাপুর, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, তাবাসুম, দেবেন বর্মা, রোহিত এবং শিশুশিল্পী বাবলু।

এন দত্ত'র সংগীত-পরিচালনা বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। গানের সুরারোপ অভিনবত্ব-বর্জিত।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ (ধরম চোপরা কৃত) বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যথাক্রমে প্রাণ মেহ্‌রা ও সন্ত সিং।

পরলোকে কাজরী গুহ

বাংলা ছায়াছবির অন্যতম উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রীমতী কাজরী গুহ গত রবিবার (৪ঠা মার্চ) অকল্যান্ড নার্সিং হোমে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল তিশ। শ্রীমতী গুহ'র স্বামী ডাঃ রণেন সরকার অকল্যান্ড নার্সিং হোম-এর একজন স্বত্বাধিকারী।

কাজরী গুহ

ছাত্রী জীবনেই শ্রীমতী গুহ'র অভিনয়-শক্তির স্ফুরণ দেখা দেয়। শৌখিন মঞ্চে বহুবার তাঁর অভিনয় ও নৃত্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া গেছে। একাধিক ইংরেজী নাটকের স্ত্রী ভূমিকায় তিনি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন।

চিত্রজগতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ঘটে "শিবচক্র" ছবিতে। ছবিটি এখনও মুক্তিলাভ করেনি। এর পর "হারানো সুর" ছবিতে অভিনয় করে তিনি চিত্রাভিনেত্রী-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। "দীপ জেবলে যাই" ও "সাথীহারা" ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন।

শ্রীমতী কাজরীর জননী ইংরেজ মহিলা। বর্তমানে তিনি বার্মিংহামে বাস করেন। তাঁর পিতা বাঙালী।

শ্রীমতী গুহ'র মৃত্যুতে বাংলা ছায়াছবি একজন সুঅভিনেত্রী হারাল। আমরা তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে সমবেদনা জানাই।

একটি নৃত্যভঙ্গিমায় ইন্দ্রাণী রহমান

নাট্যাভিনয়

নিউ এম্পায়ারে দুই শিল্পী

সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের পর দেশে ফিরে পণ্ডিত রবিশঙ্কর কলকাতায় প্রথম তাঁর অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন গত ২রা মার্চ, নিউ এম্পায়ারে। বেশ কয়েক মাস পর রবিশংকরের সেতার শোনার এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেছেন কলকাতার সংগীত-রসিকরা।

দুই ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে রবিশংকর প্রথম বাজিয়ে শোনালেন ইমন-কল্যাণ। এর পর রাগেশ্রী। এবং সব শেষে পাহাড়ী এবং বিভিন্ন রাগ ও লোক-সংগীতের সুরে তিনি বাজালেন একটি ধুন। আলাপ, জোড় ও ঝালার মাধ্যমে রাগেশ্রীর রাগরূপ তিনি তাঁর সেতারে চিত্তগ্রাহী করে তোলেন। মীড়ের কাজগুলিও তাঁর যন্ত্রে ভাবদ্যোতক হয়ে ওঠে। গতের অংশগুলি তবলার সংগে সুন্দর সমন্বয় স্থাপন করে।

তবে সুরসিকরা রবিশংকরের বাজনায় একটি নতুন প্রয়োগ-রীতি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। রাগ-রাগিনীর প্রতি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা বজায় রেখে তিনি সর্বশ্রেণীর শ্রোতা-দের মনোরঞ্জনের প্রতি যেন বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ফলে তাঁকে জটিল তানের কাজ পরিহার করে নানা ছন্দ-প্রকরণের ভেতর দিয়ে এক সহজ ও আমোদদায়ক পরিবেশন-রীতির প্রতি বিশেষ আনুগত্য রক্ষা করতে দেখা গেল।

নিউ এম্পায়ারের মঞ্চে পরের দিন আত্মপ্রকাশ করলেন আরেকজন জনপ্রিয় শিল্পী। ইনি হলেন ইন্দ্রাণী রহমান। এই নিপুণ নৃত্যশিল্পী ও অনেকদিন পর তাঁর সঙ্গ-শিল্পীদের সহযোগে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নৃত্যাংশ পরিবেশন করেন। লাবণ্য-বিকাশে ও ছন্দ-বিন্যাসে ইন্দ্রাণী রহমানের দক্ষতার প্রমাণ দর্শকরা আবার নতুন করে পেলেন।

চিঠিপত্র

জার্মান টেলিভিশনে 'হোলি ইণ্ডিয়া'

মহাশয়,—কয়েক মাস পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় পড়েছিলাম যে পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ থেকে কয়েকজন টেলিভিশন টেক্‌নিশিয়ান ভারতে এসেছেন বিভিন্ন স্থানের ছবি তুলতে জার্মানীর টেলিভিশন-এ দেখানোর জন্য। তখন সংবাদটি পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮-৪৫ মিঃএ টেলিভিশনে ঐ ছবি দেখান হয় সারা জার্মানীতে। এক ঘণ্টারও বেশী সময় লাগল এই দীর্ঘ

ডুবতে বেঁচে গেছেন। একবার ওঁদের হুগলীর বাড়িতে, আর-একবার বরিশালে বেড়াতে গিয়ে। সেই থেকে তাঁর সংকল্প ছিল ছেলেমেয়েকে সাঁতারে সুপটু করে তুলবেন। তাই রিনা ও সৌরভকে ভর্তি করে দিলেন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে: রিনার বয়স তখন বারো-তেরো, সৌরভের আট নয়। নিজেও অনুরাগী হলেন, 'পথে নারী বিবর্জিতা' মতেরও তিনি সমর্থক নন। ফলে সোসাইটিরও লাভ হ'ল।

সুশীলবাবু নিজে ইঞ্জিনীয়ার, 'ব্যাঙ্কো প্রাইভেট' নামে ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের প্রোপাইটার। সুতরাং ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুল, ডাইভিং বোর্ড, ক্যাণ্টিন, সবকিছু প্রস্তুত ও পরিকল্পনার ভার পড়ল তাঁর উপর। ক্লাব জমজমাট হয়ে উঠল—নলিন মল্লিক হলেন কোচ। সাঁতারুরও অভাব হ'ল না। প্রতিনিধিমূলক সাঁতারে রিনা ব্যানার্জি হলেন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির প্রথম প্রতিনিধি। গর্ব করে বলবার মত না হলেও ওর মাধ্যমেই সোসাইটিতে এল প্রথম সাঁতারের পুরস্কার। তার আগে অবশ্য সোসাইটির আন্ত ক্লাব সাঁতারে এবং এক মাইল প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু প্রাইজ রিনার হাতে এসেছে এবং পরে এসেছে আরও বহু পুরস্কার। মাঝখানে ১৯৫৭ সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের পরিচালনায় প্রথম যে ইণ্টার কলেজ সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, রিনা তার চারটি বিষয়েই ফার্স্ট হয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। রিনা তখন গোখেল মেমোরিয়াল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। পরে ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য তেমন অনুশীলন সম্ভব হয় না। বি-এ পাশ করার পর 'ওয়াটার ব্যালে'র মধ্যেই বেশী আনন্দের সন্ধান পায়।

অবশ্য ওয়াটার ব্যালেতে রিনার অংশ গ্রহণ ১৯৫২ সাল থেকে। প্রথমবারে ফরমেশন সুইমিং, পরের বার জলের বুকে সাঁতারের মাধ্যমে নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'র রূপায়ন। তারপর পর পর অভিনীত 'মীনার স্বপন পুরী', 'বেহুলা', 'কালীয় দমন', 'ঋতুরঙ্গ', 'মনসা মঙ্গল', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা'। বলা বাহুল্য, প্রতিবারই রিনার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় এবং প্রতি অভিনয়ে অপূর্ব অভিব্যক্তি।

ওয়াটার ব্যালের উপযুক্ত মেয়ে। সাঁতারে সুপটু। পাঁচ বছর ধরে কথাকলি নাচ শিক্ষা গোপাল পিল্লাইয়ের কাছে। হাতের আঙুল যেন চাঁপার কলি। বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চন, টানা-টানা ডাগর দুটি চোখ। সুন্দর অবয়ব। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতের মধ্যে জলতরঙ্গের তালে তালে যখন সাঁতার কাটেন, মনে হয় জলের রানী।

প্রচুর—প্রচুর সাঁতারের কসরত দেখাবার সুযোগ আছে ওয়াটার ব্যালেতে। সাঁতার-নৈপুণ্য এবং শিল্পসত্তা মিশে ওয়াটার ব্যালের সৃষ্টি। সাঁতারের সঙ্গে সুর-ছন্দ-লয়-তান মিলিয়ে এর মূকে অভিনয়। এ-সাঁতারে গতির পাল্লা নেই, নেই পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আছে কষ্টসাধ্য কসরত, আয়াসসাধ্য অঙ্গব্যঞ্জনা। পায়ের নূপুর নিক্কণের পরিবর্তে হস্তপদ সঞ্চালিত জল-কলতান।

চণ্ডালিকা ওয়াটার ব্যালেতে প্রকৃতির ভূমিকায় রিনা ব্যানার্জি (বাঁদিকে)

ওয়াটার ব্যালেতে একাধিকবার আমার রিনা ব্যানার্জির কৃতিত্ব দেখার সুযোগ ঘটেছে। প্রতিবারই দেখেছি, দর্শকরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। ঐকতানের তালে তালে লুটোপুটি করছে সুর রঙ্গ-ভরে আর জলের পরে সাঁতার কাটছেন রিনা ব্যানার্জি; শোনা যাচ্ছে সুর ও সাঁতারের মৃদুতম ধ্বনি পর্যন্ত। যখন সাঁতার শেষ, তখন সবার মরমী মনে পূর্বশ্রুত গানের গুঞ্জরন। একটা সুখ-স্বপ্নের আবিলতা।

সাঁতার ছাড়া ব্যাডমিণ্টন এবং টেবল টেনিসেও রিনা ব্যানার্জির কিছুটা হাত না আছে, এমন নয়। কিন্তু সেটার উল্লেখ অবান্তর।

রিনা ব্যানার্জির ছোট ভাই সৌরভও সাঁতারে সুপটু হবার নেশায় মশগুল। ছয় ফুট দীর্ঘদেহী সত্তেও বছরের ছেলে এর মধ্যেই কিছুটা পটু হয়ে উঠেছে। এ-বছরই বেঙ্গল এমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের জুনিয়র ইভেণ্টে একশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম হয়েছে। ঐ বিষয়েই নূতন রেকর্ড করেছে অল ইণ্ডিয়া স্কুল গেমসে। সৌরভও ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্য। ক্লাবের ওয়াটার-পোলো টীমের সেণ্টার ফরোয়ার্ডও।

সেদিন পি-৩৪ রাজা বসন্ত রায় রোডে রিনা ব্যানার্জিদের বাড়িতে যখন উপস্থিত হলাম, তখন দেখি—রিনা ব্যানার্জির কল্যাণী বধূর বেশ, সীমন্তে সিঁদুর রেখা। সম্প্রতি ডঃ ধীরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে রিনা ব্যানার্জির বিয়ে হয়ে গেছে। সাঁতারু-শিল্পীর স্বামী শুধু এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট উপাধি পাননি, সাঁতার ও অ্যাথলেটিকসেও পেয়েছেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু পুরস্কার। এখন তাঁর সহধর্মিণী প্রকৃত অর্থেই সহধর্মিণী।

রিনা ব্যানার্জী গত দু'বছর কম্পারেটিভ লিটারেচার পড়েছেন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এবার এম-এ দেবার কথা ছিল। চোখের অসুখের জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

সাঁতার কাটার পর প্যাভেলিয়নে ফিরে আসছেন রিনা ব্যানার্জি

দেশী সংবাদ

২৬শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য সকাল প্রায় ১০-৩০ ঘটিকার সময় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাঙ্গণে নির্মীয়মাণ ভবনের একাংশ ধসিয়া পড়ার ফলে চারি ব্যক্তি আহত হয়। উহারা ঐ সময় তথায় কাজ করিতেছিল।

আজ সকালে এক ক্ষৌরকার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটবর্তী এক সেলুনে এক যুবককে কামাইবার সময় ক্ষুর দিয়া তাহার গলা কাটিয়া ফেলে এবং ক্ষতস্থান হইতে রক্ত চুষিয়া খায়। ইহাতে যুবকটির মৃত্যু ঘটে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—গতকল্য গভীর রাত্রিতে এক গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় লোকসভার সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ সহ চারি ব্যক্তি সাংঘাতিক আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। চারিজনের আঘাতই গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদিগকে কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী বার্ষিক অধিবেশন উড়িষ্যার পুরীতে অনুষ্ঠিত হইবে। উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে শুরু করিয়াছেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড আজ কেরল ও উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের সকল মুখ্যমন্ত্রীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আগামী ৭ই মার্চের পূর্বে বিধানসভায় নবনির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য এবং যে সকল রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেখানে পরিষদের বর্তমান সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করিয়া দলীয় নেতা নির্বাচন করিতে হইবে।

আমেরিকা ভারতকে মোট ৭৪ কোটি টাকার ৩টি নতুন ঋণ দিবেন বলিয়া ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন গলব্রেথ আজ নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করেন।

অদ্য সকালে মধ্য কলিকাতার একটি হোটেলের এক ঘরে দুইটি যুবকের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে ঐ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইহা জোড়া আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া পুলিস সন্দেহ করিতেছে।

১লা মার্চ—অদ্য (১লা মার্চ) হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যপাল ভারতীয় সংবিধানের ১৬৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদেশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ সাধারণ নির্বাচনের পরে গঠিত রাজ্য বিধানসভার নবনির্বাচিত মন্ত্রিগণকে শপথ গ্রহণ করানোর দিন হইতে আর মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

২রা মার্চ—লোকসভার পশ্চিমবঙ্গের ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২২টিতে জয়ী হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেস দল এবার একটি আসন কম পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সদ্যসমাপ্ত তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অদ্য কংগ্রেসভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন যে, বিকল্প সরকারের ধ্বনি তুলিয়া বামজোট বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা।

৩রা মার্চ—'বিকল্প সরকার' ধ্বনি আকাশকুসুমে পরিণত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজ্য-নেতৃবৃন্দের নানা স্তোকবাক্য সত্ত্বেও সাধারণ সদস্যদের একাংশ ইহাকে কম্যুনিস্ট পার্টির "বিরাট রাজনৈতিক পরাজয়" বলিয়া মনে করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা আগামী ৯ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজভবনে শপথ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা যায়। বর্তমান মন্ত্রিসভার শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলেও রাজ্যপালের নির্দেশবলে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বর্তমান মন্ত্রিসভাই কাজ চালাইয়া যাইবেন।

৪ঠা মার্চ—সরকারী গেস্ট-হাউসের সম্মুখে সমবেত এক জনতার ভিতর হইতে কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এক ইষ্টকখণ্ডের আঘাতে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তম থানুপিল্লাই আজ আহত হন। মালাব্দ কর্মক ইউনিয়ন মুখ্যমন্ত্রীকে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শনের যে আয়োজন করে, তৎসম্পর্কে এই জনতার সমাবেশ হয়।

পাটনা সরকারী দপ্তরখানার কোষাগার হইতে ৩.৬০ লক্ষাধিক টাকা তছরূপ সম্পর্কে এ পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। চৌদ্দবার জাল বিলের সাহায্যে যে-সব টাকা তুলিয়া লওয়া হয়, তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক টাকা ইতিপূর্বেই উদ্ধার করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে ফেব্রুয়ারী—স্যার অলিভার গুণতিলকের স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিংহলী রাষ্ট্রদূত শ্রীউইলিয়ম গোপালাল্লভ সিংহলের গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। সিংহল সরকার আজ রাত্রে এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন।

গতকাল মার্গারিটা দ্বীপের এক পাহাড়ে ভেনেজুয়েলার একখানি বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় ২২ জন নিহত হন। ইহাদের মধ্যে ১৯ জন যাত্রী ও তিনজন বিমানের ক্রু। কর্তৃপক্ষের ধারণা, বিমানের আরোহীদের সকলেই মারা গিয়াছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—মার্কিন সূত্রে জানা গেল, গতরাত্রে ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে চারিটি বিমান বোমা বর্ষণ করে। তবে প্রেসিডেন্ট দিয়েম অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করিতে সক্ষম হন। অবস্থা বর্তমানে আয়ত্তাধীন।

গতকাল দুপুরে আলজিয়ার্সের রাজপথ নররক্তে প্লাবিত হয়। সশস্ত্র ইউরোপীয়রা তিনবার দল বাঁধিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে হানা দেয় এবং মুসলমান দেখিবামাত্র গুলী করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিস ২২টি মৃতদেহ ও প্রায় ১২ জন আহতকে উদ্ধার করে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—সরকারীসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারত হইতে পশ্চিম নেপালের কৈলাবাস শহরে সশস্ত্র আক্রমণ চালানো হইতেছে বলিয়া নেপাল সরকার ভারতের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। প্রতিবাদ লিপিতে ভারত গভর্নমেণ্টকে জাতীয়তা বিরোধী নেপালী সংগঠন ভাঙ্গিয়া দিতে বলা হইয়াছে।

১লা মার্চ—প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান আজ জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রপতির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গঠিত হইবে। পাকিস্তানে এক পরিষদ সমন্বিত আইনসভা থাকিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে।

আজ যাত্রারম্ভের ঠিক পরেই একটি মার্কিন যাত্রিবাহী জেট বিমান আকাশে বিদীর্ণ হয় এবং আইডলওয়াইল্ড বিমানবন্দর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক জলাভূমিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার ফলে ৯৫ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়।

২রা মার্চ—ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনী এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করিয়াছে। ব্রহ্মের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নে উইন আজ প্রাতে বেতারযোগে সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা দখলের কথা ঘোষণা করেন। সৈন্যবাহিনী ব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রেপ্তার করে।

ইরাকে আদেল মালাম নামক এগার বৎসর বয়স্ক একটি বালকের অঙ্কশাস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদেল এখন পর্যন্ত পূরণের নামতা শিখে নাই। কিন্তু বর্গ, বর্গমূল ও ঘনমূল সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়া সে বহু শিক্ষককে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। আদেল অঙ্ক না করিয়াই অঙ্কের প্রশ্নের সমাধান করিতে সক্ষম।

৩রা মার্চ—প্রেসিডেণ্ট শ্রী কেনেডি রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভকে আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদনের জন্য দুই মাস সময় দিয়াছেন। অন্যথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বায়ুমণ্ডলে নূতন করিয়া আণবিক পরীক্ষা শুরু করিবে।

দক্ষিণ নেপালের বীরগঞ্জ শহরে কারফিউ জারী করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্রোহীরা বীরগঞ্জ পুলিস ও শুল্ক ঘাটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। গত মঙ্গলবার বিদ্রোহীরা বীরগঞ্জ কারাগার ও স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসের উপরও আক্রমণ চালায়।

৪ঠা মার্চ—লাল চীনের বিশাল এলাকায় কোন এক অজ্ঞাত স্থানে এক বিরাট বিতর্কের ঝড় বহিতেছে। এই বিতর্কে চেয়ারম্যান স্বয়ং মাও সে-তুং উপস্থিত আছেন। আর আছেন দেশের ১৯১ জন সর্বাধিক ক্ষমতাবান পুরুষ ও নারী—যাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বা বিকল্প সদস্য। সোভিয়েট আদর্শগত বিরোধই এই বিতর্কের কারণ বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

পুলিস গতকাল নেপালের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল সুবর্ণ সমশেরের এবং আরও ৭৫ জনের বাড়ী তালাবন্ধ করিয়াছে এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 17th March, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ২০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩ চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

"ইংরেজী হটাও!"

মাতৃভাষার অধিকার সবার আগে। একথা মানি। বাংলাভাষার উন্নতি ও প্রসার বাঙ্গালীমাত্রেরই কাম্য। ভারতীয় রাষ্ট্রবিধানে বাংলাভাষা অবশ্য একটিমাত্র রাজ্যের বা অঞ্চলের ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। সর্বভারতীয়ক্ষেত্রে হিন্দীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যেভাবে চলছে তাতে কেবল বাংলাভাষীরা নয় অন্যান্য অহিন্দীভাষীরাও অসন্তুষ্ট, উদ্বিগ্ন। অনেকে মনে করছেন হিন্দীর আধিপত্যবিস্তার চেষ্টা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির দাবি যে-কোন প্রকারে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, এভাবে হিন্দীর সর্বভারতীয় দাবির অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ আঞ্চলিক ভাষাপ্রীতির আতিশয্যে অন্যদিকে নিজেদের ক্ষতি ঘটবার আশংকা দেখা দিচ্ছে।

মাতৃভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারী ভাষা নির্ধারণে তাই আঞ্চলিক ভাষার দাবি মোটের উপর মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেই সমস্যার শেষ নয়। ভাষা-প্রীতি এবং ভাষা-ভীতি, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ভাষাসমস্যা নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে। কোন কোন আঞ্চলিক ভাষাপ্রেমীরা হিন্দীর প্রাধান্য রোধ করতে গিয়ে ইংরেজীকেও নির্বাসন দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটে একজন বিশিষ্ট সভ্য প্রস্তাব করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজকর্ম, পঠন-পাঠন, প্রশ্নোত্তর, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর আলোচনা ও সভার বিবরণ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে এখন থেকে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হোক। এক কথায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষায় এবং সাংগঠনিক ব্যাপারে বাংলাভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। এই প্রস্তাব গৃহীত হবে কি না বলা কঠিন। গৃহীত হলেও প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য হবে। তবু প্রস্তাবটি যখন উত্থাপিত হয়েছে তখন এর ভালোমন্দ ধীরভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ এক কথা; আর ভাষাপ্রীতি এবং ভাষাভীতির আতিশয্যে বাংলাভাষাকে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে একান্ত প্রাধান্যদানের চেষ্টা সম্পূর্ণ অন্য কথা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও আঞ্চলিক ভাষা কতদূরে এবং কী পরিমাণ ব্যবহৃত হতে পারে, সে-প্রশ্নের মীমাংসা শুধু আমাদের ভাষাপ্রীতি দ্বারা হওয়া সংগত নয়। ইংরেজী ভাষার সংগে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরংগ পরিচয় বহুকালের; সেই অন্তরংগ পরিচয়ের ফলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আমাদের দৃষ্টিভংগী এবং এমনকী, আমাদের মাতৃভাষাও পরিপুষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ-রাজ বিদায় নিলেও ইংরেজী ভাষার সংগে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে নি, ঘটবার কারণ নেই। ইংরেজী বিদেশী ভাষা হতে পারে, কিন্তু ইংরেজীর মাধ্যমেই আধুনিক ভারতবর্ষের ভাবমণ্ডল রচিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে আধুনিক ভারতের চিন্তাসম্পদ। এমন কী, এও বলা যেতে পারে যে, বিদেশী ভাষা হলেও কালের ধারায় ইংরেজী আমাদের অন্যতম ভারতীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে বাংলা অথবা অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা (রাষ্ট্রভাষার পদবীপ্রার্থী হিন্দীও প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক ভাষা) চালু করা হলে আমাদের ভাষাপ্রেম চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু চিন্তার দীনতা ও অস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান এবং বৃহৎ বিশ্বের ভাবধারার সংগে যোগাযোগ রাখা অসম্ভব হবে ইংরেজীকে তার বর্তমান স্থান থেকে অধিকারচ্যুত করা হলে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় যে, ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম, বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজী-বিদ্বেষের উৎকট নিদর্শন অবশ্য অন্য কোন কোন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে। ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এখনও ইংরেজীকেই উচ্চশিক্ষার বাহন রাখার পক্ষপাতী। তা সত্ত্বেও উগ্র হিন্দীপ্রেমীরা বিহারে পাটনা এবং রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর জায়গায় আগাগোড়া হিন্দী-মাধ্যম প্রবর্তনের জন্য জিদ করছেন। মাদ্রাজেও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে তামিল ভাষাকে পঠন-পাঠনের মাধ্যম করার চেষ্টা চলছে। এর কারণ ঠিক তামিলপ্রীতির আতিশয্য নয়। তামিলভাষীদের প্রবল আপত্তি রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। হিন্দীর প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধের মোক্ষম উপায় হিসেবে মাদ্রাজের শিক্ষাব্যবস্থাপকরা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে আঞ্চলিক ভাষা তামিলের সর্বাত্মক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। নতুবা মাদ্রাজের শিক্ষিত সমাজের ইংরেজীপ্রীতি বাঙ্গালীদের চাইতে অনেক বেশী। অনুমান করি, হিন্দীর বিরুদ্ধে তামিলের পাল্টা দাবি দাখিল করা ছাড়া মাদ্রাজের শিক্ষাব্যবস্থায় তামিল ভাষা ইংরেজীকে বাস্তবিকই হটাতে অগ্রসর হয়নি।

"ইংরেজী হটাও" ধুয়োটা প্রধানত উৎকট হিন্দীপ্রেমীদের। বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজে সে ধুয়ো যে কখনও উচ্চারিত হবে অথবা উচ্চারিত হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে, একথা কল্পনা করা যায় না। তবুও ধুয়োটা উচ্চারিত হয়েছে এবং একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর শীর্ষদেশে। "ইংরেজী হটাও" অভিযানে কোনও বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতী হিন্দীওয়ালাদের অনুকরণে উৎসাহী, এর চেয়ে বিসদৃশ, অবাঞ্ছিত আর কিছু হতে পারে না। বাংলাভাষার উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানাভাবে চেষ্টিত হোন, ভাল কথা। কিন্তু ইংরেজীকে হটিয়ে বাংলাকে উচ্চশিক্ষার একমাত্র বাহন করার প্রস্তাব বাংলাভাষীদের পক্ষেই সবচেয়ে ক্ষতিকর। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে বাংলার সর্বাত্মক ব্যবহার প্রবর্তন করা হলে কেবল পঠন-পাঠনের মান আরও অবনত হবে না, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষিত বাঙ্গালী আরও পিছু হটতে বাধ্য হবে। ইংরেজীর ধারাবাহিক যোগসূত্র ছিন্ন করে বহুভাষী ভারতবর্ষে বাঙ্গালী (অথবা হিন্দীভাষী কিংবা তামিলভাষী) কখনই আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেছে।
বিরোধী দল
'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া—'
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দিল্লিতে ভবিষ্যতের ভাবনায় প্রত্যেকেই শঙ্কিত। পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীই অচিরে শঙ্কা দূর করবে।
পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে আয়ুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
জবরদস্ত গেলানো!
সংবিধান
পাকিস্তান

বর্মায় শাসন-কর্তৃত্ব আবার সৈন্যদলের হাতে গেছে। ২রা মার্চ জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে যে "ক্যু দে-তা" সংঘটিত হয়েছে তাতে বর্মায় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র শিকেয় উঠল—কতকালের জন্য বা চিরকালের জন্যই কিনা কে জানে। ১৯৫৮ সালে একবার জেনারেল নে উইন কর্তা হয়েছিলেন এবং আঠারো মাস সৈন্যদলের হাতে শাসনক্ষমতা ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে কোনো "ক্যু দে-তা" হয় নি, অন্তত বাহ্যত হয় নি। প্রধানমন্ত্রী উ নু নিজেই সামরিক কর্তাদের হাতে শাসনভার তুলে দেন এবং জেনারেল নে উইন প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্রশাসনিক বিশৃংখলা দূর হলেই কর্তৃত্ব বেসামরিক হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিঞ্চিৎ দেরীতে হলেও এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয়েছিল। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে আবার বে-সামরিক কর্তাদের হাতে শাসনভার এলো, কিন্তু দু'বছরের বেশি রইল না। শাসনক্ষমতা আবার সামরিক কর্তাদের করায়ত্ত হলো।

এবারকার পরিবর্তন বে-সামরিক রাজনৈতিক নেতাদের অনুমোদন সাপেক্ষ হয় নি, সামরিক কর্তারা বেসামরিক গভর্নমেণ্টকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন, উ নু এবং আরো অনেক নেতাকে বন্দী করা হয়েছে যদিও সুখের বিষয় এই এসবই বিনা রক্তপাতে হয়েছে। ১৯৫৮ সালে যখন জেনারেল নে উইন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন কন্‌স্টিট্যুশান বাতিল করার কোনো কথা হয় নি, শাসন সামরিক কর্তাদের হাতে গেলেও পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে নি। এবারকার ব্যবস্থা অন্যরকম। দেশের বর্তমান সঙ্গীন অবস্থার সংশোধন হলেই বেসামরিক গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হবে—এই আশ্বাস অবশ্য এবারও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য রকম-সকম সম্পূর্ণ আলাদা। পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং যে কন্‌স্টিট্যুশান ছিল সেটা আর কোনোদিনই চালু হবে না, তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা যে আগেরবারের মতো নয় এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদটা অনেকটা পাকাপাকি রকমের তার একটা প্রমাণ এই যে, এবার ক্ষমতা পরিচালিত হচ্ছে একটি "রেভল্যুশনারী কাউন্সিলের" নামে। এই রেভল্যুশনারী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হচ্ছেন জেনারেল নে উইন। "রেভল্যুশনারী কাউন্সিল" যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে ক্ষমতা সহজে বা শীঘ্র প্রত্যর্পিত হয় না

এবং পুরাতন কন্স্টিটিউশান প্রত্যাবর্তনের আশাও থাকে না।

নানাদিক থেকে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে পারছেন না দেখেই ১৯৫৮ সালে উ-নু জেনারেল নে উইন এবং সৈন্যদলের হাতে শাসনভার ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর থেকে বর্মার অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রিডম লীগ দলের হাতেই শাসনকর্তৃত্ব ছিল। এই দলের একতা যদি নষ্ট না হোত তাহলে ১৯৫৮ সালে উ নুকে সৈন্যদলের উপর শাসন চালাবার ভার দিতে হোত না। কিন্তু ১৯৬০ সালে আবার যখন বে-সামরিক মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হলো তখন থেকে উ নু-র অন্তর্দলীয় ঝঞ্ঝাট তেমন কিছু ছিল বলে তো শুনা যায়নি। কারণ ইতিমধ্যে উ নু "ইউনিয়ন পার্টি" গঠন করেছেন এবং সেই পার্টি সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট-ফ্রিডম লীগ দল পার্লামেন্টে বিরোধী দলের স্থান নেয়। ইউনিয়ন পার্টির মধ্যে এমন কোনো গোলমালের কথা শুনা যায় নি, যার ফলে পার্লামেন্টে গভর্নমেন্টের অবস্থা বিপন্ন হয়েছিল এরূপ মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু দেশের অবস্থা যে বিশেষ ভালোর দিকে যাচ্ছিল না এটা অবশ্য সত্য। কিন্তু সৈন্যদলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াই তার সংশোধনের উপায় এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ নয়। আঠারো মাস শাসনক্ষমতা সৈন্যদলের হাতে ছিল, এমন কি সৈন্যবিভাগের হাতে গিয়েছিল এমন অনেক কাজ যেগুলি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার পরেও উ নু সৈন্যদলের হাতেই ছেড়ে রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, সৈন্যদলের দ্বারা ক্ষমতা পরিচালনার ফলে বর্মার মূল সমস্যাগুলির কোনটার সমাধান হয়েছে অথবা সমাধানের কাছাকাছি গিয়েছে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বিশৃঙ্খলার উপশম অবশ্যই হয়েছে। যদি দেখা যেত যে, সৈন্যদলের কর্তৃত্ব পরিচালনার ফলে অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাহলে হয়ত লোকেরাই চাইত যে সৈন্যদলের হাতে শাসনক্ষমতা আরও কিছুকাল থাক। কিন্তু লোকেদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায় নি। আঠারো মাসের পরে সৈন্যদলের শাসন হয়ত বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল না এবং সাধারণ লোকের কাছে তার পুনঃপ্রবর্তনও হয়ত তেমন আনন্দদায়ক নয়। সৈন্যদলের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার কারণ হিসাবে "রেভলুশনারী কাউন্সিলের" পক্ষ থেকে যে-সব কথা বলা হয়েছে সেগুলি পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না।

সাধারণভাবে দেশের অবস্থার সংশোধন করার কথা ছাড়া "রেভলুশনারী কাউন্সিল" একটি গুরুতর রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ করেছেন। শান্ এবং অন্যান্য উপজাতীয় নেতাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে উ নু সরকার নাকি সম্মত হয়েছিলেন। কন্স্টিটিউশনে "ফেডারেল" ভাবের এই বৃদ্ধির আশংকা নির্মূল করতে চান বলে সামরিক কর্তারা নু সরকারকে সরিয়েছেন। উ নু-র সঙ্গে যাঁরা বন্দী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক শান্ নেতা আছেন। সৈন্যদলের মত এই যে, "ফেডারেল"-ভাব বাড়তে দিলে বর্মার রাষ্ট্রিক ঐক্য বিনষ্ট হবে, যেমন করে হোক শাসনতন্ত্রের "ইউনিটারি" ভাবের প্রাধান্য রক্ষা করতে হবে। বর্মার বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন উপজাতিকে একসূত্রে বেঁধে রাখার পক্ষে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রসার অথবা সংকোচন আবশ্যক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কারো কারো মতে বর্মার মধ্যে নানা আকারে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে তার উপশমের জন্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের নীতি আরো উদারতরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আলগা দিলে কোনো কোনো অঞ্চলকে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রের সঙ্গে বেঁধে রাখা যাবে না, দেশটাই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্যও "ইউনিটারী" গভর্নমেন্টের আবশ্যকতা আছে।

যাই হোক কেবল দেশের ঐক্য নাশের আশংকায় বিচলিত হয়েই জেনারেল নে উইন এবং তাঁর "রেভলুশনারী কাউন্সিলের" সহকর্মীরা বেসামরিক গভর্নমেন্টকে পদচ্যুত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়েছেন, এরূপ মনে করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। এই ঘটনার পিছনে আরো কারণ নিশ্চয়ই আছে, যদিও সেগুলি কী তা এখনো সব পরিষ্কার ভাবে জানা কঠিন। নানা রকম কথা শুনা যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলির কোনটা কতখানি সত্য, কোনটা আন্দাজ মাত্র, তা নির্ণয় করতে সময় লাগবে। কেউ কেউ বলছেন যে, ১৯৬০ সালে যখন সৈন্যদল কর্তৃক ক্ষমতা প্রত্যর্পিত হয় তখন সেটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই হয়েছিল এবং তখন থেকেই আবার ক্ষমতা নেওয়ার জন্য জেনারেল নে উইনের উপর সৈন্যদলের ভিতর থেকে চাপ দেওয়া চলছিল অর্থাৎ সৈন্যদল একবার ক্ষমতা পরিচালনার স্বাদ পেয়ে সেটা ভুলতে পারছিল না এবং শেষপর্যন্ত বেসামরিক হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারে নি। আবার শুনা যাচ্ছে যে উ নু বৌদ্ধধর্মকে বর্মার রাষ্ট্রীয় ধর্ম—স্টেট্ রিলিজান করেছেন বলে নাকি সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সৈন্যদলের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়। এসব কারণ কোনটা কতটা কাজ করেছে বলা কঠিন।

"রেভলুশনারী কাউন্সিলের" পক্ষ থেকে বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যে-কথা বলা হয়েছে, তাতে বৈদেশিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন করার অভিপ্রায় নূতন গভর্নমেন্টের নেই। শান্তির আগ্রহ, সকল দেশের প্রতি মৈত্রীর ভাব, কোনো ব্লকের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে "অ্যাকটিব্ নিউট্রালিটি" পালন, কোনো বিদেশী সামরিক সাহায্য না নেওয়া, রাজনৈতিক বন্ধনবিহীন অসামরিক বিদেশী সাহায্য নিতে অনাপত্তি ইত্যাদি বর্মার আগে যে-নীতি ছিল "রেভলুশনারী কাউন্সিলও" সেই নীতি অনুসরণ করবেন। এই ঘোষণা সত্ত্বেও অবশ্য কেউ কেউ মনে করছেন যে, নীতির কাঠামোটা এক থাকলেও ভাব রূপে বা ভঙ্গীতে কিছু অদল-বদল দেখা যাবে।

১০।৩।৬২

হই চই কিছু হয়নি। সংবাদপত্রেও খবরটা ওঠেনি। কিন্তু গত ১৯শে ফাল্গুন, শনিবার আমাদের একদিকে অবসন্ন অসাড় আর একদিকে অস্থির নির্বিকার এই শহর একবার না একবার উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে চমকে উঠে নিজের দিকে চেয়ে দেখেছে নিশ্চয়।

চমকটা খুব জোরালো হয়ত নয়। কয়েক মুহূর্ত বাদেই তা হয়ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ওপরে সবকিছু ছাপিয়ে না থাকলেও মনের নেপথ্যে সে চমকের রেশ সারাদিন থেকে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

এই ধুলো ধোঁয়ায় নোংরা অপরিচ্ছন্ন, চারিদিকের অসংখ্য কোলাহলে উদভ্রান্ত শহরে সেদিন হঠাৎ একটি মৃদু চমক যাদের লেগেছিল আমি তাঁদের একজন। সকালে রাস্তায় বেরিয়ে মনটা নাড়া খেয়ে উঠলেও তার কারণটা তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করতে পারিনি। শুধু মনে হয়েছিল কোথায় যেন কি একটা আশ্চর্য কিছু ঘটে গিয়ে আমার সব চিন্তা ভাবনায় রংই বদলে দিয়েছে। এক একদিন বহুদূর থেকে সানাই-এর সুর লক্ষ-সুরভিত বাতাসে ভেসে এসে মনটাকে এইরকম করে দেয় বুঝি।

১৯শে ফাল্গুনের সাড়াটা কিন্তু ধ্বনির রাজ্য থেকে নয়, রূপের জগৎ থেকে। কানের ভেতর দিয়ে নয় চোখের ভেতর দিয়ে তার স্পর্শ এসে পৌঁছোল ঈষৎ বিহ্বল বিস্মিত মনে।

ব্যাপারটা স্থূল গদ্যে বললে এই মাত্র,— শহরের দেবদারু গাছগুলোর নতুন পাতা গজিয়েছে।

কিন্তু স্থূল গদ্য ছেড়ে সূক্ষ্ম পেলব পদ্যেও সেই পাতা গজানোর মৃদু বিস্ময় সম্পূর্ণ কি বোঝানো যায়?

ট্রামে বাসে গাড়িতে ট্যাক্সিতে বা পদব্রজে এই শহরে নিত্য ঘোরাফেরার মধ্যে, রাস্তার ধারের যে গাছগুলি সদাশয় পৌরকর্তারা নেহাৎ রেওয়াজ মাফিক বসাবার ব্যবস্থা করেছেন, সেগুলির দিকে কচিৎ কদাচিৎ আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিনা সন্দেহ। ধুতির পাড়ের বেলা যেমন তেমনি ওগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতনই থাকি না। (শাড়ীর পাড়ের উপমা কিন্তু দিচ্ছি না।)

তারপর একদিন আমাদের ক্লান্ত ঔদাসীন্য ভেদ করে তাদের স্নিগ্ধ সম্ভাষণ মনে এসে পৌঁছোয়।

হলা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, শান্ত আর দম্ভের নিষ্প্রাণ ষড়যন্ত্রে ইটকাঠ পাথরপাথরের বেড়ায় যতই আমরা নিজেদের ঘিরে রাখবার চেষ্টা করি না কেন, ওই দেবদারু গাছগুলির মত আমাদের প্রাণ নিজের অগোচরে আর এক আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে ব্যাকুল।

ঠিক একই দিনে এক সঙ্গে সমস্ত দেবদারু গাছগুলির নবপল্লবের শিহরণ হয়ত ওঠেনি। কিছু আগে পিছে হয়ত তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সমবেত উচ্ছ্বাস আমাদের গোচর হয়ে উঠল ওই তারিখটিতে।

নির্বাচনের হিড়িকে সমস্ত শহর পোস্টার প্যাম্ফলেট পতাকায় ছেয়ে যেতে ত দেখলাম। সেই সাময়িক উত্তেজনার ছিন্ন স্মৃতি অনাবশ্যক আবর্জনা হয়ে আজও নগরের পথঘাট দেয়াল শ্রীহীন করে রেখেছে।

জোর করে ফেনিয়ে তোলা সে মত্ততার দিনগুলি যদি মনে রাখবার মত হয়, তাহলে সমস্ত শহরের ওপর বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দে দোলান একটি স্নিগ্ধ আবেশ যেদিন ছড়িয়ে গেল সেই তারিখটিও স্মরণীয় হবে না কেন?

আমাদের এই কলকাতা শহরে শুধু দেবদারু নয় আরো অনেক জাতের গাছই আছে। দেশদেশান্তর এমন কি সাগর পার থেকে সে সব গাছ বহু যত্নে আমদানি করা হয়েছে। কত জাতের গাছ যে আমাদের রাস্তাঘাটে স্নিগ্ধ সাহচর্য দেয় তার একটা তালিকা করতে গেলে বর্তমান জগতে গাছেদের আন্তর্জাতিক নাগরিকতার অনেক মজার খবর পাওয়া যাবে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি দেবদারুর প্রথম মৃদু সম্ভাষণ পেয়েছি, তারপর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপের দিন পর্যন্তও আরও বহু গাছের বিচিত্র নানা সম্ভাষণ পাওয়া যাবে। তাদের কেউ অচেনা মঞ্জরীর বর্ণবিস্ময়ে আমাদের উদাস বিহ্বল করতে চাইবে, কেউ চমকিত করতে চাইবে রঙীন চীৎকারের উল্লাসে।

ক্ষণেকের জন্যেও সচকিত চাঞ্চল্য এনে শহরের যান্ত্রিক মুষ্টি আমাদের মনের ওপর থেকে শিথিল করাই এইসব বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য ভাবতে ইচ্ছে করে। নিজেদের অগোচরেও এমনি একটি বাসনা নগর-বিন্যাসের মধ্যে হয়ত সর্বত্র প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আর একদিক দিয়ে মনে হয় এ যেন আমাদের নিরুপায় বন্দীত্ব মুক্তির ছলনায় মধুর করবার চেষ্টা। চিড়িয়াখানার লোহার খাঁচা উঠিয়ে দিয়ে নিরীহ বা হিংস্র সব প্রাণীকে কতকটা স্বাভাবিক পরিবেশে রাখবার যেমন ব্যবস্থা হয়।

ছেলেবেলা শহর ও গ্রামের তুলনামূলক প্রবন্ধ আমাদের কাকে না লিখতে হয়েছে। শহরের তুড়ে নিন্দে করে' গ্রামের নামে যত গদগদ হয়েছি, পরীক্ষায় নম্বরও আশা করেছি তত বেশী উঠবে।

শহর যেমনই হোক, গ্রাম তখন আহা মরি কিছু নয়। পচা ডোবা, পানাপুকুর, ঝোপ ঝাড়, মশা ম্যালেরিয়ায় গ্রামের তখন অনেক দুর্দশা। কিন্তু মনের মোহ সে সব অপ্রীতিকর সত্য স্বীকার করতে দেয় নি।

গ্রাম ও শহর দুই-ই তারপর অনেক বদলেছে ও বদলাচ্ছে। গ্রাম সম্বন্ধে ছেলেবেলার সে ভাবালুতার ঘোর এখনও কাটবার কোন কারণ না ঘটলেও শহরের দানবীয় কলেবর বৃদ্ধির বেগে ও বিশৃঙ্খলায় কেউ কেউ শঙ্কিত হয়ে উঠেছি বোধ হয়। শঙ্কিত হলেও নিরুপায় হয়ে বর্তমান যুগের একটা অপ্রতিরোধ্য শাস্তি হিসেবে শহরকে যাঁরা মেনে নিয়েছেন তাঁরা হয়ত ভাবীকালের দুর্দশায় এ যুগের সান্ত্বনা খুঁজে মনকে এই বলে প্রবোধ দেন যে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যখন পঙ্গপালের মত বাড়বেই তখন যেটুকু সুখ-সুবিধা তাঁরা পেয়ে গেলেন ক্রমবর্ধমান মানুষের ভিড়ের ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসিতে সেটুকুও স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল বলে। একজন সংখ্যাতাত্ত্বিক ত হিসেব কষে দেখিয়েই দিয়েছেন যে, এই হারে বাড়তে থাকলে একশ বছর পার না হতেই মানুষের সত্যি সত্যি আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না পৃথিবীতে। গ্রহান্তরে উপনিবেশ ততদিনে সম্ভব হবে কিনা জানি না, কিন্তু ডাঙার মাটি থেকে ঠেলা খেয়ে, জলের ওপর ভাসানো ডেরা বেঁধেও মানুষ কূল পাবে না। জলে ডেরা বাঁধার মহড়া অবশ্য মানবজাতির হয়ে চীন অনেক আগে থাকতেই দিয়ে রেখেছে। সেখানে এমন অনেক পরিবার আছে বংশপরম্পরায় নৌকোই যাদের একমাত্র আশ্রয়। জন্ম মৃত্যু প্রেমের লীলা তাদের জলের ওপর ভেসেই চলে আসছে। এই অবস্থা হলে বিস্ময়ম রাবণের গুষ্ঠির অন্ন যোগাবার যত ফন্দিই বিজ্ঞান বার করুক নুন আনতে পান্তা ফুরোবে বলেই সন্দেহ হয়। মাটির চাষ এখনই সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছেছে। তখন ডাঙার ঘাস পাতা ঝোপঝাড় আগাছা ত বটেই, জলেরও পানা শ্যাওলা নল খাগড়া, অ্যালজি কেল্প প্ল্যাঙ্কটন কিছুই ফেলনা হবে না। বিজ্ঞানের কড়ায় সব কিছুর ঘণ্ট বানিয়ে তা থেকে খাসাসার ছেঁকে নকল খাবার তৈরী হবে। নকল ক্লোরোফিল, এর মধ্যেই তৈরী হয়েছে। আণবিক গড়নপেটনে আসলের সঙ্গে হুবহু মিল থাকলেও শুধু সোনার কাঠির ছোঁয়াটুকুর অভাবে তা এখনো অসাড়। ততদিনে নকল ক্লোরোফিল-এ সাড়া জাগাতে শিখে ধু ধু মরুতেও বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিজ্জের বাড় বহুগুণ জোরে জল হাওয়া রোদ থেকে খাদ্যমূল শ্বেতসার উৎপাদন করে তুলবেন। সমস্ত পৃথিবীময় মানুষের জগৎ অতিকায় উইঢিবি কি মৌচাকের মত নিরুপায় ঘনিষ্ঠতা ও নিরবকাশ ব্যস্ততার একটা নিরেট কারাদুর্গ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেকালের সবাই এ জীবনকে অসহ্য শাস্তি মনে করবে কি? বোধ হয় না! মানুষ শুধু সবকিছু সইবার শক্তিতে মহাশয় নয়, তার মানিয়ে নেবার ও মেনে নেবার ক্ষমতা যে কি অসীম তা সে নিজেও ভালো করে জানে না। সবটাই শুধু ছাঁচে ঢালার ব্যাপার। মনটা গোড়াতে কি ছাঁচে ঢালা হয়েছে, কি পরিবেশের ছাপ তাতে পড়েছে তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করে,—আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা উদ্দীপনা। একাল থেকে সেকালের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার লোক যেমন চিরকাল থাকবে তেমনি পরম পরিতৃপ্ত থাকবারও। দীর্ঘশ্বাস তারাই ফেলে যারা একাল ওকাল দুই-এর কোনটারই ছাঁচে পুরো ঢালাই না হতে পেরে না ঘরকা না ঘাটকা।

শুধু প্রগতিবিরোধিতা বা রক্ষণশীল গোঁড়ামির প্ররোচনায় নয় যা মহৎ যা মধুর যা কল্যাণময় শুধু ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের নেশায় তা হেলায় ফেলে যাওয়ার মূঢ়তা ঠেকাবার আগ্রহে যুগে যুগে অনেক সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ নিরর্থক পরিবর্তনের স্রোতের বিরুদ্ধে সাহস করে অবশ্য দাঁড়িয়েছেন। এগিয়ে যাবার বদলে পিছিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতেও প্রয়োজন হলে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। চীনের আদি দার্শনিক লাওৎসে নাকি ডাঙার গরুর গাড়ি আর জলের নৌকোও বাতিল করতে চেয়েছিলেন জন-পদের সঙ্গে জনপদের যোগাযোগ দুঃসাধ্য করে তুলতে। আধুনিক সভ্যতার বেগমত্ত মন নিয়ে লাওৎসের যুক্তি আমরা সত্যিই বুঝতে অক্ষম। যন্ত্রযুগের দুর্বার গতির সামনে আরও যাঁরা বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের অনেকের উৎসাহ ত আমাদের করুণামিশ্রিত কৌতুকই জাগায়। যেমন ইংলণ্ডে প্রথম রেলগাড়ি চালাবার সময় মাঠের গরু ভড়কে যাবে বলে যাঁরা পার্লামেন্টে পর্যন্ত চড়াও হয়েছিলেন আজকের দুনিয়ার চেহারা দেখলে তাঁদের কি দশা হত ভেবে না হেসে পারা যায় না। না এটুকু বুঝে নিয়েছি যে উচিত অনুচিত কোন যুক্তি দিয়েই, সত্য বা ভ্রান্ত কোনো আদর্শের নামে যুদ্ধেও পরিবর্তনের বন্যাবেগ ঠেকানো যাবে না, সব সময়ে সুস্থ প্রগতি তাকে বলি বা না বলি। সভ্যতার নিত্য স্ফীতি-শীল অস্তিত্ব গতিপথের পাশে কিছু দীর্ঘ-শ্বাস রুদ্ধ ক্রন্দন থাক তে থাকুক। ইতি-হাসের স্পন্দন তাতে থামবে না।

সে দুরন্ত দুর্বার বেগে অজানা

ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলুক। তার সঙ্গে তাল রেখে বাসে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে কি পদব্রজে লরী মোটরের ধাক্কা এড়াতে এড়াতে আমরা নগরের পথে নবপল্লবভূষিতা দেবদারুর বাৎসরিক প্রথম সলজ্জ সম্ভাষণ বারেক যে এখনো পাই তাতেই কৃতার্থ।

দেশের ভাগ্য যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের কেউ কেউ নাকি সেদিন সমুদ্রতীরের বিশ্রামাগারে বসে অবসর যাপনের জন্যে তাস খেলেছেন।

সংবাদটা চাঞ্চল্যকর সন্দেহ নেই। চাঞ্চল্যটা কোথায় কি রকম হয়েছে তার সঠিক খবর রাখি না। জানি না এই তাস খেলাকে উপলক্ষ্য করে ইতিহাসের কোন কুখ্যাত বেহালাবাদককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষার লাভাস্রোত কেউ কোথাও বইয়ে দিয়েছেন কি না।

দিয়ে থাকলে খুব বিস্মিত হব না। কারণ সোজা জিনিস উল্টো করে দেখতে, খণ্ডদৃষ্টিতে সমগ্রতার বিকৃত বিচার করতে আমাদের জুড়ি নেই।

সংবাদটা কারুর কারুর কাছে কিন্তু অন্য অর্থে চাঞ্চল্যকর। নিষ্প্রাণ পাথরের দেয়ালে হঠাৎ প্রাণের শিকড়ের ফাটল আবিষ্কার করার মত।

রাজশক্তি যাঁদের হাতে তাঁরা তুচ্ছ তাস নিয়ে মত্ত হতে পারেন, এ খবরে স্তম্ভিত হওয়ার বদলে বিশেষ আশ্বস্ত হবার কিছু আছে বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। আশ্বস্ত এই জন্যে যে, দেশের শাসনযন্ত্রের কর্তা কিছুকালের জন্যে যাঁরা হয়েছেন এই সামান্য তাস খেলার ভেতর দিয়ে আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের একটা মানবিক সম্বন্ধের সূত্র খুঁজে পাচ্ছি। দেশের পরিচালনায় এই মানবিক সম্বন্ধটুকুর দাম সবচেয়ে বেশী। কারণ এ সম্বন্ধটুকু থাকলে পরিচালনায় ভুলত্রুটি যাই হোক তা অন্তত অমানুষিক হবে না এই ভরসা একটু থাকে বোধ হয়। তাস যে খেলার নেশায় তা শিখলে তা দিয়ে তাসের ঘর বানাবার চেষ্টা অন্তত না হতে পারে।

রাজদণ্ড বস্তুটি বড় কঠিন ধাতু-ধাপে জড়ানো। সে দণ্ড ধরে থাকার অভ্যাস হাতের মুষ্টিকে এমন এক অনমনীয়তায় জমাট করে দেয় যে তা প্রীতির স্পর্শ নিয়েও আর সহজে খুলতে চায় না। তাসের মত হালকা জিনিস নাড়াচাড়া করতে সে হাতের খিল কিছুটা নিশ্চয় ছাড়তে বাধ্য।

তাছাড়া তীরকে লক্ষ্যভেদের সময়ে যেগ যা দেয় সে ধনুকের ছিলা সব সময় টান করে বেঁধে রাখবার নয়, তাকে টংকার দিয়ে করে তোলবার জন্যেই মাঝে মাঝে শিথিল হতে দিতে হয়।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

১৩ই মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় লিখিত "ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা" প্রবন্ধটি পাঠে খুশী হয়েছি। কিন্তু ঐ প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীসুধা দাশের চিঠি পড়ে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তিনি ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা একরকম অস্বীকার করেছেন। সমাজজীবনের উপর দিয়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দাম স্রোত বয়ে চলেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট কম বলেই যেমন একদিকে সুযোগ ঘটেছে সরকার পক্ষের ঢিলেমি প্রদর্শনের, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-বিরোধীরা উৎসাহ পাচ্ছে তাদের নোংরা কাজে।

শ্রী মুখোপাধ্যায় বর্তমান অবস্থার যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু কারণগুলি তিনি ব্যক্ত করেননি। অনেকেই মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় শান্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের মতো অতি সহজেই নিষ্পন্ন হয়েছে বলেই সমাজ-জীবনে কোন বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটেনি। স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন হয়েছে, সেই সঙ্গে আর একটি কাজ হয়নি অর্থাৎ লোকের চিন্তা জগতে পরিবর্তন। আত্মোন্নতি এবং নৈতিক জ্ঞানলাভের উপযুক্ত শিক্ষামূলক প্রস্তুতির কাজ অসমাপ্ত রাখতে হয়েছে। যেটুকু দেশপ্রেমের সৃষ্টি হয়েছিল তা শুধু বিদেশী শক্তি অপসারণের ক্ষেত্রেই বাহিত হয়েছে। যে নৈতিক এবং মানবিকবোধ নতুন সমাজ গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল তা দেশের লোকের মধ্যে দানা বাঁধতে পারেনি। ফলে একাধিক দেশপ্রেমের বন্যার পরেও দেশের মাটিতে ভালো ফসল ফলেনি। স্বাধীনতা এসেছে, মালিন্য ঘোচেনি। পুরনো সমাজবিরোধী মনোবৃত্তিগুলো বরং বিদায় না নিয়ে স্বাধীন আবহাওয়ায় আরও পরিপুষ্ট হয়েছে।

দুর্নীতি নিবারণে সরকারী গাফিলতি এবং ঔদাসীন্য আজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অর্থের লোভ, পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্যে অন্যায়ের আশ্রয়, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্যে নানা অপকৌশল অবলম্বন এখনকার কালে কোন দুর্নীতির আওতায় আর পড়ে না। এর প্রশ্রয় এবং ব্যাপকতার জন্যে আমাদের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এইসব কাজকে ঘৃণা করেন তাঁরা প্রতিবিধানের জন্যে কোনদিনও ভাবেননি। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এক সুরে চীৎকার করে সমস্ত দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চাপিয়েছেন। সরকার নির্বিকার, উদাসীন এবং অক্ষম। আমরা নিজেরাও কি তাই নই?

ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কীয় আলোচনায় রাষ্ট্রপরিচালকদের দায়িত্বের কথা লেখকের স্মরণ করা উচিত ছিল। উপরতলার লোকদের অসংখ্য দৃষ্টান্ত যখন প্রতিদিন কাগজের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া সাধারণ লোকের মনে কি রকম হতে পারে তা ভাবা উচিত। সরকার পক্ষ যদি দৃঢ়ভাবে প্রশাসনিক দুর্নীতি অপসারণে প্রয়াসী হতো তবে নিশ্চয়ই দেশের লোকের মধ্যে চাঞ্চল্য আসত। যে কোন কারণেই হোক আজ পর্যন্ত তা হয়নি এবং হবার আশাও কম। এর ফলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি অসাধু লোকের সংখ্যাও ঊর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলেছে।

আইন করে কোটি কোটি লোকের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ভয় দেখিয়েও নীতিজ্ঞান রাতারাতি ফিরিয়ে আনা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা। সোভিয়েট অথবা চীনের দণ্ডনীতি গণ-তন্ত্রের দেশে অচল। বর্তমান সরকারের পরিবর্তে অন্য কোন দলীয় সরকার অধিষ্ঠিত হলেও দুর্নীতির মহামারী ঠেকানো যাবে না, কারণ সে সরকারকেও যাঁদের উপর নির্ভর করে শাসন চালাতে হবে তাঁদের মধ্যেই তো দুর্নীতির বাসা। অতএব একমাত্র রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় এই দুরূহ ঐতিহাসিক কাজটি সুসম্পন্ন হতে পারে ধীরে ধীরে। সরকারকেও দৃঢ় হতে হবে এবং জন-সাধারণের যে অংশ আজও বর্তমান সমাজ ও রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্ত এবং দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে চিন্তা করতে অভ্যস্ত তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি একমত যে, ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতাই বর্তমান অবস্থার জন্যে অনেকখানি দায়ী। রেল, আদালত, পোস্ট অফিস, প্রভৃতি সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কর্মীরা যদি তাঁদের স্বকীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করায় উদ্যোগী হন তবে নিশ্চয়ই অনেকখানি কাজ হতে পারে। অকারণ হয়রানি এবং ঘুষ প্রথা বন্ধ করার কাজে সরকারী এবং বেসরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলির সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারেও আমরা ছাত্র-কল্যাণের জন্যে শিক্ষকদের কাছ থেকে সহযোগিতার কথা শুনি না। ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা তাঁদের অবহেলায় যদি গোল্লায় যায় তাতে দোষ নেই। আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে অনায়াসেই বর্তমান শিক্ষক-ছাত্র সমস্যা তাঁরা সমাধান করে দিয়েছেন। সরকারের বিরুদ্ধে নানা ব্যাপারে লড়াইয়ে যতটা তাঁরা আগ্রহান্বিত, তার একাংশ আগ্রহ প্রকৃত শিক্ষাদানের ব্যাপারে নেই। এ ধরনের উক্তি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অনেককেই আজ করতে হয়। ইতি—

প্রবোধ ভট্টাচার্য
কলিকাতা।

[এ-সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। সঃ দেশ]

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৪৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

দূর থেকে চিকিৎসা করা শক্ত। আন্দাজে যেটুকু বলা যায় সে হচ্চে এই:—পেটের বেদনার জন্যে Mag. Phos। অজীর্ণ প্রভৃতির জন্য Kali Mur ও Natrum Phos (অম্লের লক্ষণ থাকলে)। পেটে যদি Ulcer আশংকা করো তবে Silicia। জ্বর যদি থাকে তবে Fer Phos ও Kali Sulf. Mag Phos কলিক ব্যথায় ঘন ঘন প্রযোজ্য—acute অবস্থায় ১৫।২০ মিনিট অন্তরও চলে। Kali Mur ও Natrum Phos একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে ক্ষতি নেই।

আমার দেহের অভ্যন্তরে কোনো বিশেষ অসুখ নেই. বাইরে আছে ভিজিটর। জ্ঞান গুপ্ত সস্ত্রীক কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন, এদিকে বউমা শয্যাগত—পুপু বেচারা হয়রান হয়ে গেল। '——' আছেন তাঁর নূতন পুত্রবধূ সমেত। শীতের সময় চরে যেমন হাঁসের ভিড় হয় আশ্রমে তেমনি জমে অতিথি। হাঁসরা আপনি চরে, অতিথিদের চরাতে হয় ভাঁড়ার খুলে দিয়ে, অথচ অন্নপূর্ণো আজকাল ঘরের চৌকাঠ মাড়াচ্ছেন না, ঠেলিয়ে দিচ্চেন অন্ন খাইয়েদের এ-সমস্ত শনিগ্রহের কাণ্ড। ৩।১২।৩৮

কবি

॥ ৪৫০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পড়ে দুটি কারণে আমার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয়েছে। ১ম, তোমার ধারণা হয়েচে আমার চিকিৎসা-প্রণালী তুমি আয়ত্ত করেছ। তাতে রোগীদের অবস্থা কী হবে সে-কথা আমি চিন্তা করিনে—কিন্তু আমার সঙ্গে মোলাকাতের একটা পথ ছিল সেটা বন্ধ হোলো।

২য়, কে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে আমার এখন শরীর ভালো। অতএব আমার সম্বন্ধে একটুখানি চিন্তা করবার সুযোগটাও ঘটবে না। চেষ্টা করব শরীর খারাপ করতে—এমনি আমার অদৃষ্ট, চার দিকেই কাশি সর্দিজ্বর, সুস্থ কেবল আমিই থাকি—শরীরটার উপরে ধিক্কার জন্মে গেছে। ইতি ৭।১২।৩৮

॥ ৪৫১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, স্বপ্নে আমাকে কেন তুমি অল্প বয়সের দেখেছিলে তার কারণ তোমাকে বলি। সম্প্রতি বউমা স্থির করেছিল মায়ার খেলার নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃসংস্কারে লেগেছি, যেখানে তার অভাব ছিল পূরণ করচি, কাঁচা ছিল শোধন করচি—গানের পরে গান লেখা চলচে এক-একদিনে চরটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান—জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন আর কিছুতে নয়। ঘোর শীতের সময় আমার তরুণ জন্ম রাগিণী লোকে অতীতের সমুদ্রপার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বসন্তের দুর্দান্ত হাওয়া—মনের মধ্যে কূজন চলচে, গুঞ্জন চলচে—যে সব লোক বাইরে থেকে কাজের বা অকাজের হাওয়া নিয়ে আসে তাদের মনে হয় বিদেশী লোক—কেননা তাদের মধ্যে সুরের স্পর্শ একটুও নেই। শব-সাধনায় উত্তরসাধক থাকা চাই, স্বর-সাধনায় চাই উত্তরসাধিকা—কিন্তু মন্দ ভাগ্য আমি—কে কোথায়। তাই স্বপ্নের সহায়তায় কাজ চালাচ্চি। আজ সকালে কলাভবনে হ্যাভেলের স্মৃতিমন্দির উদ্ঘাটন করতে এসেচেন পাটনার পি আর দাস—আমার মায়ার খেলার মধ্যে তাঁকে স্থান দেওয়া অসম্ভব—অতএব এই সকালে যবনিকা পড়ল—দূর থেকে আমার সিদ্ধি কামনা কোরো। ইতি ১১।১২।৩৮

কবি

॥ ৪৫২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রানী, দুতিনদিন থেকে ভাবছিলুম তোমাকে চিঠি লিখব, সময় পাচ্ছিলুম না। আজ যখন নিশ্চয় ঠিক করে-ছিলুম এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম।

নাটের দল নিয়ে কলকাতায় যাব না ঠিক করেছিলুম এমন সময় আমার কর্মস্থানের গ্রহ আমার ঘাড়ে একটা কর্তব্য চাপিয়ে দিল। সেই উপলক্ষ্যে যেতেই হবে।

আমার অবস্থা অনেকদিন তুমি জান না। আমার চলবার শক্তি আগের চেয়ে অনেক বেশি অচল হয়েছে। দু পা চলতে হাঁপিয়ে পড়ি। সেই জন্যেই নড়তে ইচ্ছে ছিল না। ওখা থেকে প্রায় দশদিন আমার কাজের পালা। সেই দায় নিয়ে থাকতে হবে জোড়াসাঁকোয়। বেলঘরিয়া থেকে প্রতিদিন যাওয়া আসা দুঃসাধ্য হবে।

যদি ভাব আমার কিম্বা আমাদের মনে বেলঘরিয়ার রোগ-জননতা নিয়ে আশংকা আছে তাহলে ভুল করবে। কিছুমাত্র নেই। তোমার ওখানে থাকলে আমি ভালোই থাকব সে আমিও জানি সকলেই জানে। কিন্তু দু' জায়গায় টানাহেঁচড়া করার মতো দেহ আমার নেই। তাই স্থির করেছি কাজের

পালা শেষ হলে কিছুদিন তোমার আশ্রয়ে থেকে তার পরে শান্তিনিকেতনে আসব বসন্ত যাপন করতে। চারিদিকে আমের বোল ধরেছে অজস্র। শীতের পুষ্পোৎসবের বিদায়ের শেষ আসর জমাবার জন্যে এখনো রয়ে গেছে হিমঝুরির আর সজনের মঞ্জরী। ওদিকে একটি দুটি পলাশের কুঁড়ি উঁকি মারচে।

তোমার বেলঘরিয়াতে বসন্তের আহ্বান চাপা দিয়েছে যন্ত্রদানবের শৃঙ্গধ্বনি—সে আহ্বান একেবারে কোথাও নেই তা বলব না। ইতি ২৫।১।৩৯

কবি

॥ ৪৫৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় যাওয়া ঘটল না—শরীরটা হোলো বাদী। সাধারণত ভাঙা শরীরকে দয়া করিবে, কিন্তু তার ভাঙনের উপসর্গ অন্যদের উপর পড়ে তাই অন্ততে অন্যদের প্রতি দয়া রাখা দরকার। এখন আমার পক্ষে অন্যান্য সব ঠিকানা বাদ দিয়ে বাকি রইল এই আরামকেদারাখানা। বোলপুরে বেলঘরিয়ার মাঝখানে দূত রইলেন ডাকঘর। অভিনয়ের দল কাজ শুরু করবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—দেখতে পাবে তাদের নাট্য-নৈপুণ্য। আমি বসে বসে নিন্দা প্রশংসার ঢেউ গণনা করব খবরের কাগজে। ইতি ২৭।১।৩৯

দূরেবিহারী কবি

॥ ৪৫৪ ॥

শান্তিনিকেতন

পরিণয় বার্ষিকী
শ্রীমতী রানী ও শ্রীমান প্রশান্ত

মিলনের রথ চলে জীবনের
পথে দিনেরাতে
বৎসরে বৎসরে আসে কালের
নূতন সীমানাতে,
চিরযাত্রী ঋতু যথা বসন্তের
আনন্দ মন্দিরে
ফাল্গুনে ফাল্গুনে আনে মাধুরীর
অর্ঘ্য ফিরে ফিরে॥

১৪ ফাল্গুন, ১৩৪৫
৬টা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
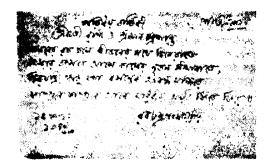
॥ ৪৫৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

দোলপূর্ণিমার সকাল বেলায় মঞ্জরিত শালবীথিকায় বসন্ত উৎসব হবে। তারি সঙ্গীত জোগানোর কাজে গুঞ্জন-ধ্বনি জেগে উঠেছে মনের বুদ্ধি মহলের পাশের কোঠায়—বুদ্ধির কারবার বন্ধ। সেতারে মোচড় দিয়ে যেমন মীড় বেরোয় তেমনি একটা অকারণ বেদনার বীণাযন্ত্রে লাগচে টান—মাঝে মাঝে মনকে জিজ্ঞাসা করচি এই অবৌদ্ধিক অনুভূতির উদ্ভব কোন্ বিশ্বচৈতন্যের সপ্তবর্ণ রঞ্জিত রশ্মিলোকে। যদি অকস্মাৎ উৎসবের আগের রাত্রে আসতে পারো তবে রেলযাত্রার মাশুলের অপব্যয় নিয়ে অনুতাপ করবে না। —উড়িষ্যার নব রাষ্ট্রিক দরবার থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি—এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উদ্দুপলক্ষ্যে শ্রীধামে যাত্রা স্থির হয়েছে। যদি জন-সমুদ্রের তরঙ্গ আমার চারদিকে উদ্বেল হয়ে না ওঠে তাহলে বোধহয় ভালোই লাগবে। ইতি ২।৩।৩৯

কবি

॥ ৪৫৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শেষ পর্যন্ত আমার ছুটি নেই। রিহার্সাল প্রভৃতি চলেইচে। ১লা এপ্রিলের রাত্রে পৌঁছব কলকাতায়—তার পরের দিনেই বিশ্বভারতী সম্মেলন। ন্যাড়া ঘরটাকে বাসন্তিক শোভা দেবার ইচ্ছা আছে—"শ্রীমতী" সহায়তায় সম্মত। সায়াহ্নে গীতসভা। যদি নিমন্ত্রণ পত্র পাও এসো, যদি না পাও তবু এসো।

সেদিন ক্রিয়াকর্ম-অন্তে আমাকে যদি তোমার কোটরে নিয়ে যাও তো তোমার রথে উঠে পড়ব। তুমি পরদিনে তোমার সাহচর্যে আমাকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনবে এই রকম প্রত্যাশা রইল। রেল ভাড়ার জন্যে তোমার চামড়ার থলিটার দিকে কটাক্ষপাত করব না—ঋণ বাড়াবার ইচ্ছে নেই। এখানে যে ফুলদোল হবে পূর্ণচন্দ্রালোকে, তাতে আমার পূর্ণচন্দ্রাননা নাতনী সাজবেন রাধা, তিনি কৃষ্ণের প্রেয়সী সেকথা পূর্বেই প্রচার হয়ে গেছে। ইতি

তারিখ দিতে ভুলে গেছেন।

কবি

॥ ৪৫৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

নানা দুশ্চিন্তায় ও ব্যস্ততায় তোমার অবস্থা যে রকম শোচনীয় তাতে তোমাকে আরো ভারগ্রস্ত করতে অত্যন্ত সংকুচিত হচ্চি। এখানে ফুলদোলে তোমার শুভাগমন প্রত্যাশা ছেড়ে দিচ্চি—তোমার বর্তমান অবস্থার অন্য শোচনীয়তার উপরে এটা আরো একটা দুর্গ্রহের লক্ষণ। যাই হোক যদি তোমাদের ওখানে যাই আতিথ্যের আতিশয্য দাবী করব না—জানো তো আমি গরীব। ১লা ভোর রাত্রের গাড়িতে যাত্রা করব—কেননা অনেক কাজ আছে। ইতি ২৯।৩।৩৯

কবি

নিঃশব্দ নায়গ্রা প্রপাত

দেশ বিদেশের ভ্রমণকারী দল নায়গ্রা প্রপাত দেখতে গিয়ে বর্তমানে হতাশ হচ্ছে ওর গগনবিদারী গর্জন শুনতে না পেয়ে।

এখন প্রপাতের ওপরকার জল-প্রবাহের গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ হাজার ঘনফুট, অথচ পূর্ণমাত্রায় সগর্জনে প্রবাহিত হতে দরকার ঠিক তার দ্বিগুণ।

প্রপাতটি দেখতে বহু দেশের এতো লোকের সমাগম হয় যে ওর কাছাকাছি স্থানে ভ্রমণকারিদের ওপর নির্ভর করে বহু ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। কানাডার সেইসব প্রতিষ্ঠান এখন স্বতঃই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

মেইড অফ দি মাউণ্টেন নামক এক প্রতিষ্ঠান, নায়গ্রার জলের প্রবাহগতি কমই থেকে যদি যায়, তাহলেও বর্তমান পাহাড়ে নালাগুলিকে গভীরতর করে ওর গর্জন ফিরিয়ে আনতে পাথর-বিস্ফোরণ বাবদ চার লক্ষ টাকা খরচ করার সংকল্প করেছে:

জলপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ার হেতু হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন। ক্যাইস্টন ও সিউস্টন নামক নতুন উঠতি দুটি উপনিবেশ তাদের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে প্রধান খাল থেকে অধিকতর পরিমাণে জল টেনে নিচ্ছে।. আর উপনিবেশ দুটির জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকায় স্বতই জল টেনে নওয়াও বেড়ে যেতে থাকবে।

ওপর থেকে জল পড়ার সঙ্গে নীচে ঢেউ তুলে প্রচণ্ডবেগে জলধারা পঞ্চাশ ফিট উঁচু পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠার দৃশ্য থেকেও ভ্রমণকারিদের বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

নায়গ্রার পূর্ণ গর্জন পুনরুদ্ধার করতে যদি নিকটবর্তী গৃহসমূহে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিমাণে কমিয়ে ফেলার দরকার হয় তাহলে ভ্রমণকারিদের প্রয়োজনটা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে বাধ্য।

পুরাতনের পরিবর্তে নতুন হৃদযন্ত্র

অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ ই ভি নাসাল একজনের দেহযন্ত্র অপর ব্যক্তির দেহে সংযোজিত করার বৈপ্লবিক অগ্রগতির কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অল্পকালের মধ্যেই মানুষ মৃতদেহের হৃদযন্ত্রকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন পরবর্তী দশ বছরের মধ্যেই এটা কার্যকরী ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারবে। যেসব লোকের হৃদযন্ত্র পরিবর্তন করা হবে তাদের আয়ু

রাইন নদীর তীরে পার্বত্য ধাপে একটি মায়া সৃষ্টি করার মতো উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে ঝোপ এবং গাছের মধ্যে লুকানো রয়েছে জার্মানীর রূপকথার প্রমাণ আকৃতির চরিত্রসমূহ : তুষারকন্যা ও সাত বামন, সিণ্ডারেলা, লিটল রেড রাইডিং হুড প্রভৃতি বহু চরিত্র। আবহাওয়া ভাল থাকলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের রূপকথায় শোনা চরিত্রগুলিকে চোখে দেখে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। বাঁদিকের ছবিখানিতে একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে পা টিপে টিপে 'পুস ইন বুট'-এর কাছে যেতে। আর ডানদিকের মেয়েটির ইচ্ছা বামনের নাকটি পরিষ্কার করে দেবার। এই রূপকথার উদ্যানটির নির্মাতা হচ্ছেন ভাস্কর আর্নস্ট হাইল ম্যান

দীর্ঘতর হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

মেলবোর্নের এই চিকিৎসক, ডাঃ নোসাল, মানুষের দেহযন্ত্র এক দেহ থেকে নিয়ে অপর দেহে সংস্থাপনের অগ্রগতি আড়াই বছর ধরে লক্ষ্য করে আসছেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রের সংস্থাপন তিনি বলেন, সেটা নির্ভর করে গ্রহণকারি দেহে অনুকূল অবস্থা সঞ্চারিত করে তোলার ওপর। নতুবা অবস্থা অনুকূল করে তুলতে না পারলে রোগী অপরের দেহযন্ত্র সংস্থাপন কঠিন করে তুলবে।

অস্ট্রেলিয়ার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানী সার ম্যাকফারলেন বার্নেট এক দেহ থেকে কোন দেহযন্ত্র অপরদেহে সংস্থাপনের সমস্যাটি বহু বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আসছেন।

অল্পবয়স্ক এক পশুর হৃদযন্ত্র আর এক পশুর দেহে সংস্থাপিত করায় সাফল্য লাভ করে এখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক পশুর ক্ষেত্রে তাঁর কৌশলটি প্রয়োগ করছেন।

লিউকেমিয়ার ওষুধ

মারাত্মক লিউকেমিয়া অর্থাৎ রক্তের ক্যান্সার রোগ জয় করার জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুদিন থেকেই নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছিল। বর্তমানে আশা করা যাচ্ছে এই রোগের জন্য যে সরল চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তা সাংঘাতিক ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। পশ্চিম জার্মানীর মেনৎস শহরের বিশ্ব-বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকের ডাঃ ই কাবিন্থ এই তথ্যটি প্রকাশ করেছেন। তাঁর পদ্ধতিতে একটি সুস্থ লোকের বক্ষাস্থি (স্টরনাম) থেকে কিছু পরিমাণ মজ্জা সিরিঞ্জের সাহায্যে গ্রহণ করে লিউকেমিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বক্ষাস্থিতে সংস্থাপন করলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসা জগতে এই ব্যবস্থাটির নতুন নামকরণ হয়েছে স্টেরনো-স্টেরনাল পদ্ধতি।

লিউকেমিয়া চিকিৎসার এইটি শেষ ধ হলেও, পূর্বের অপরাপর ধাপগুলি যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। মজ্জার লিইকেমি রোগ বিভিন্ন ধরনের হয়। এতে টি রোগাক্রান্ত হয় বলে মারাত্মক প্রতি বাঁচিয়ে অন্য টিসু গ্রহণ করতে অস হয়। তাই প্রথমেই রোগাক্রান্ত ম বিশ্লেষণ করা দরকার। এই ব্যাপ রাসায়নিক ঔষধের সাহায্য গ্রহণ উচিত। এই চিকিৎসার শেষে ডাঃ কা আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মজ্জা সংস্থাপন চলবে। এইভাবে পূর্বে যে কয়ে রোগীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা হয়েছে দেখা গে কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের স্বাভাবিক রক্ত সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্বে এই রোগে হাতের শিরায় সুস্থ মজ্জা প্রবেশ করানো হতো। তদপে ডাঃ কারিন্থ আবিষ্কৃত স্টেরনো-স্টের পদ্ধতিতে মজ্জা সংস্থাপন অনেক বিপজ্জনক। এই পদ্ধতিতে অল্প পরি সুস্থ মজ্জাই যথেষ্ট এবং এতে রক্ত কা জমাট বেঁধে ফুসফুসের পথরোধ হও সম্ভাবনা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিডনি সংস্থাপ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাঃ কারি এই পরীক্ষা শুরু করেন। দু বছর ছজন যুগোশ্লাভ বিজ্ঞানী রিঅ দুর্ঘটনার ফলে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় দ্বারা আক্রান্ত হন। শিরায় ইঞ্জেকশন করে একজন ফরাসী চিকি তাঁদের পাঁচজনকে আরোগ্য করেন। ষষ্ঠ ব্যক্তির মজ্জা রশ্মির আঘাতে হয়ে যায়। ডাঃ কারিন্থ নির্দিষ্ট শুধু যে লিউকেমিয়া আরোগ্য হয় তা বিকিরণজনিত আঘাতও আরোগ্য যায়। মজ্জা বিনষ্ট করায় তীব্র তেজ রশ্মি ব্যবহার করা চলে না যেহেতু প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বিশ্বের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ পদ্ধতিকে একযোগে বৈপ্লবিক উ বলে স্বীকার করেছেন। প্রার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় রাসা ঔষধের ফলাফল অল্পদিনের মধ্যেই যায়। অর্থাৎ লিউকেমিয়ার মত রোগের বিরুদ্ধে মানুষের চরম জয় সূচিত হচ্ছে।

মরুর বুকে ফলের উদ্যান

মরুভূমি ও চিরন্তন অনাবৃষ্টির লতাগুল্মহীন ধূধূ প্রান্তরকে শ্যামলিমায় ভরিয়ে তোলা মানুষের কালের স্বপন। প্রাচীনকালে মানুষ কেটে কুয়া খুঁড়ে সেচের ব্যবস্থা মরুভূমিতে শস্য ফলিয়েছে। আ কাজে এসেছে ইঞ্জিনীয়ার, রাসায়

প্রকৃতি বিজ্ঞানী। নতুন কারিগরী জ্ঞান, নতুন কৃত্রিম পদার্থের সাহায্যে তারা বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে রাখে। মাটির নীচে তারা জল মজুত করছে। প্রাকৃতিক মরূদ্যান তৈরী প্রকৃতির এক আশ্চর্য লীলা, কিন্তু মানুষের তৈরী মরূদ্যান আজ বহু মরুভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়

আধুনিক জমি পুনরুদ্ধারকারীদের মধ্যে হাইঞ্জ বাউম্যান নামে একজন জার্মান রাসায়নিককে এই ব্যাপারে পথিকৃত বলা যায়। এক অভিনব পন্থায় তিনি জলহীন মরুভূমির জমিকে উর্বরা করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর ছোট্ট একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণের কারখানার ইঞ্জিনীয়ার বাউম্যান এমন একটি কৃত্রিম ফেনাময় পদার্থ সৃষ্টি করেছেন যেটি শুষ্ক বালুময় জমিতে দুঃসহ তাপের মধ্যেও কয়েক সপ্তাহ জল ধারণ করে রাখতে সক্ষম। আর এই কৃত্রিম ফেনাময় পদার্থের উপর, স্বাভাবিক মাটির মতই লতাগুল্ম, এমন কি গাছপালা পর্যন্ত চমৎকার জন্মায় ও বাড়তে থাকে।

বাউম্যান ১৯৫৩ সাল থেকে দীর্ঘকাল ধৈর্যের সঙ্গে নানারকম প্লাস্টিকের ফেনার ওপর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লতাপাতা লাগিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। চার বছর অবিরাম পরীক্ষার পর তিনি সেই বিশেষ কৃত্রিম ফেনাটি পেয়েছেন যার উপর স্বাভাবিক জমির মতো সব রকম লতাপাতা বাঁচে। অগ্নিনির্বাপক পাইপের মত জিনিস দিয়ে এই তরল ফেনা জমির উপর ছিটিয়ে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ পদার্থ কঠিন সছিদ্র শোষণক্ষম ফেনার গদিতে পরিণত হয় এবং তখন মাটি তা থেকে জলীয় ভাগ টেনে নিতে পারে না।

কয়েকজন জার্মান বিশেষজ্ঞ সৌদি আরবের এর-রিজাদ নামক স্থানে তপ্ত মরুভূমির বুকে এক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে ঐ ফেনা ছিটিয়ে দেবার কয়েক মিনিট বাদে প্রতি দশবর্গফুটে স্থানে দেড় গ্যালন মাপে জল ঢেলে চলে যায়। তিন সপ্তাহ পরে এসে তারা দেখে যে তখনও প্রতি দশ বর্গফুটে আধ গ্যালনের মতো জল রয়েছে। মরুভূমিতে যেখানে ১১৫ ডিগ্রি তাপ থাকে, যেখানে সূর্যের তেজে জল সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হয়ে যায় কিংবা জমি শুষে নেয়, সেখানে এরূপ ব্যাপার বিস্ময়কর।

এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মরুভূমির বুকে আজ দশটি কমলা লেবু ও লেবু গাছ লাগান হয়েছে। পাঁচটি ছাড়া আর সব গাছ বেঁচে আছে ও বড় হচ্ছে। তাই আশা করা যায় পত্রপুষ্প তৃণের শস্য শ্যামলিমায় মরুভূমির রূপান্তর ঘটাবার মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন এবার সত্যই বোধহয় বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে।

কিছু দূরে

আনন্দ বাগচী

বিচিত্র ছাইদান জুড়ে ধূপ পোড়ে, কাঁচপোকা দেওয়ালে,
অন্ধের মতন খুঁজি অবয়ব, চোখের পাতায়
পুঁথির ভাবার মত
কিছু আলো, কিছু অন্ধকার, কিছু জল,
আমি ডুবে আছি তবু কারো করতলে কারো বুকে।
রজনী শাওন-ঘন মনে মনে ভাবি,
জানলার ওপারে শুধু অঘ্রানের রাতকানা চাঁদ,
অদৃশ্য গাছের শব্দ, ব্যঙ্গ করে
চোখ খুলতে ভয় করে ভীষণ।

জনস্রোতে ডুবে আছি মুখ তুলতে ভয় করে ভীষণ,
কার সঙ্গে দেখা হবে, কার সঙ্গে চোখাচোখি হবে,
আজীবন যার কথা ভাবি, লিখি, ভুলে যেতে চাই
যে-দেহ লুণ্ঠনে পুণ্য, বিপরীত কৌশলে হৃদয়;
অন্ধকার সহবাসে আত্মহত্যা শিল্প হয়ে ওঠে।
মুখের মিছিল দেখি চতুর্দিকে
অর্থবহ বিচিত্র রেখায়
ডাইনে বাঁয়ে বাঁকা গলি, রৌদ্রজ্যোৎস্নাহীন তমস্বিনী
নখে তীক্ষ্ণ রঙ মেখে সুন্দরী কলকাতা চেয়ে আছে
কিছু দূরে, কালস্রোতে রাজনীতি ভাসে।

অনিদ্র গোলাপ

মানস রায় চৌধুরী

নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকো না। জানো ওই অন্ধকারে
ওর সর্ব দেহ জ্বলে, ভয়াল সুন্দর আভা যেন
শোণিতের প্রসাধন
জ্বলন্ত গ্রহাণুপুঞ্জ মুখচ্ছবি এঁকেছিল লক্ষ যুগ আগে
তারপর কত কবি চিত্রকর উন্মাদ কবন্ধ গেল ক্ষণিকের
দৃষ্টি বিনিময়ে অনুরাগে
ভেবেছ অক্ষত পাবে বিরহী ওষ্ঠের তাপ,
বিনা রক্তপাতে আলিঙ্গন?

কণ্টকিত দীর্ঘ পথ। গলিত ধাতুর স্রোত,
আগ্নেয় প্রস্তর পাতালিক
গোধূলির সন্নিকটে মৃত্যুর বনিতা যেন নিদ্রাহীন জাগে
বেগান্ধ অশ্বের হ্রেষা......রাজপুত্র গিয়েছিল ওই
রূপ স্পর্শ অভিলাষে
ভগ্ন অস্থি পড়ে আছে, চতুর্দিকে হা হা শব্দ প্রতিধ্বনি
অশ্রুত ভৌতিক
তবু কি অন্ধতা তুমি দুই বাহু মেলে দেবে উষসীর ছদ্ম
পরিহাসে।

নর্তকীর বিলাসকক্ষ

সুনীল বসু

ভোজ্যপর্ব প্রাচুর্যের সীমা ঘেঁষে সাজানো টেবিলে
মত্ত-সুখে দিচ্ছ তুমি নটীদের নাচের তালিম!
বিছিয়েছো ভূমি-তটে মূল্যবান কাশ্মিরী জাজিম
গ্রীষ্ম-ঋতু অসাক্ষাতে কেটে গেল সুদূর ব্রেজিলে।

অজস্র কমলা, দ্রাক্ষা, রান্না মাংস সুপাত্রে সাজানো
উৎসবের মত্ততায় নৃত্যে-গানে, সায়াহ্ন অস্থির।
বাজে তম্বুরা এস্রাজ বাদ্যযন্ত্র অর্গ্যান পিয়ানো
কপাটের পাশে আমি নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে মুসাফির।

তোমাকে ঘিরেছে ভাঁড়, লম্পট, স্তাবক, আহাম্মক
আমার সম্পদে সব আকণ্ঠ ডুবেছে, চমৎকার।
দামী দামী আসবাব উঠেছে নীলামে, এ আলোক—
অসহ্য দু'চোখে, অর্ধ-নগ্ন-দেহে এনেছো ধিক্কার!

এনেছি মৃগের চর্ম, সুগন্ধ, কর্পূর, মসলিন
হাতির দাঁতের বাঁট, মিশরের ইস্পাতের ছোরা,
উজ্জ্বল মুক্তোর মালা, সুদূর স্পেনের ভায়োলিন—
সব সমুদ্রে ভাসাব, জলে দেব কঙ্কনের জোড়া!

উজ্জ্বল ধাতুর গড়া এ আকাশ হোক চুরমার
তুমি থাকো মত্ততায় ঘিরুক অজস্র ঘৃণ্য ভাঁড়।
ঘটুক আমার ঘরে কলঙ্কিত তিক্ত ব্যভিচার
সব দেখে ফিরে যাব হে বিদেশী অরণ্য পাহাড়॥

প্যারীস প্রত্যাগত ভারতীয় শিল্পী শক্তি বর্মন গত ৬ই থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী থিয়েটার রোডে অবস্থিত প্রদর্শনী গ্যালারীতে তাঁর ছবির একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৬ সালে প্যারীসে যাবার আগেও তিনি তাঁর ছবির একটি একক প্রদর্শনী করে গিয়েছেন। তাঁর তখনকার ছবির সঙ্গে প্যারীসে দীর্ঘকাল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরবর্তীকালে আঁকা ছবিগুলির তুলনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বর্তমান ইওরোপীয় ধারা থেকে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হয়েছে। প্রদর্শিত ছবিগুলিতে সে পরিচয় সুস্পষ্ট। একটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে ইওরোপে দীর্ঘকাল কাটালেও শক্তি বর্মন ভারতীয় চিত্রকলার ঢঙও সম্পূর্ণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্যারীসে তাঁর শিক্ষাগুরু চ্যাপেলেইন মিডিও এ কথার উল্লেখ করে বলেছেন, "ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করলেও তিনি সঙ্গে যা এনেছিলেন তা হারাতে প্রবৃত্ত হননি। শক্তি বর্মন কল্পনাশক্তি এবং তার রূপান্তরে পূর্ণমাত্রায় ভারতীয়ই থেকে গিয়েছেন। এটা একটা অত্যন্ত দুর্লভ গুণ।"

প্রদর্শিত মোট পনেরখানি ছবির মধ্যে 'গণ্ডোলা', 'ভেনিস' এবং একখানি ল্যাণ্ডস্কেপ ছাড়া সবই ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা। 'দুর্গাপূজা', 'বাউল' 'উৎসব' 'শৃঙ্গার', 'রাস্তার গায়ক' প্রভৃতি সব ছবিগুলির ক্ষেত্রেই বাঙলার পটের মতো হলুদ ও লাল রঙের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য প্রকারের রঙও অবশ্য তিনি ব্যবহার করেছেন কিন্তু মূল সুরটা তিনি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এইটাই তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য। 'ভেনিস', 'গণ্ডোলা' প্রভৃতি ইওরোপীয় দৃশ্যগুলির ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। রঙের সুসমঞ্জস নির্বাচনে এবং তুলির বলিষ্ঠ টানে পরিণতকৃতি শিল্পগুণের পরিচয় বেশ ফুটে উঠেছে। ছবিগুলিতে জটিল বা অদ্ভুতদর্শন কিছু ফুটিয়ে তোলার কোন প্রয়াস নেই। বেশ সচ্ছন্দ সরলভাবে তিনি তাঁর ভাব ও বক্তব্যকে সামনে তুলে ধরেছেন।

ফ্রান্সে দু-বছর শিক্ষালাভের পরই তিনি ১৯৫৮ সালে প্যারীসে এবং লণ্ডনে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী করেন। এই দুই দেশের শিল্প সমালোচকদের দ্বারা তাঁর ছবি বৈশিষ্ট্যে, মৌলিকত্বে, এবং রঙের নির্বাচনে ও তুলির টানে ভারতীয়ত্বের জন্য প্রশংসিত হয় এবং কতকগুলি ছবি বিক্রীতও হয়। ক্রেতাদের মধ্যে আছেন নিউজীল্যাণ্ডের জাতীয় গ্যালারি, মিউজিয়াম অব দি সিটি অব প্যারীস এবং ইংলণ্ডের লিস্টারশায়ার, হাল ও ইয়র্কশায়ার এডুকেশন কমিটি।

বাউল

তিন বান্ধবী

আন্দামান বলতেই সেই সা
নিকোবর দ্বীপের কথাটাও এ
যায়—সর্বক্ষেত্রেই আন্দামান ও নিক
বর দ্বীপপুঞ্জ বলেই উল্লে
হয়ে থাকে। আন্দামানের ম
নিকোবর দ্বীপেও প্রস্তর য
আমলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের বা
তবে নিকোবর দ্বীপের আদিবাস
দৈহিক সৌন্দর্যে এবং পরিচ্ছন্ন
আচার আচরণে সভ্যজগতের অনে
কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে।
সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত ১। নিকোবর দ্বীপে
মেয়েরা; ২। নিকোবর দ্বীপের রা
(মধ্যে); ৩। সশস্ত্র যোদ্ধা; ৪। খ
ছাওয়া পরিচ্ছন্ন কুটির; ৫। উৎসবে
দিনে নৌকা বাইচে অংশ গ্রহণকারি
তরুণীদল।

আলোকচিত্রশিল্পী
বীথি সরকার

তৃতীয় রায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

॥ ২ ॥
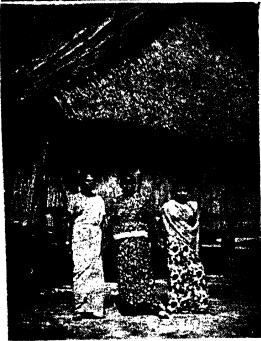
কলকাতার উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রে জয়ী হলেন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅশোক সেন। বলা উচিত, পরাজিত হলেন কম্যুনিস্ট প্রার্থী **শ্রীস্নেহাংশুকান্ত** আচার্য। কারণ, যেদিন **এই লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল** চূড়ান্তভাবে **জানা গেল সেদিন উত্তর কলকাতার** চেহারাটা **যাঁরা দেখছেন তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, শ্রীঅশোক সেনের জয়ের চাইতে শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্যের পরাজয়ের** ছায়াটাই দেখা **গিয়েছিল বেশী।**

অসম্ভব নয়। সারা ভারতে, এমন কি **কংগ্রেস মহলের** উপরতলায়ও একটা ধারণা **বদ্ধমূল হয়ে আছে যে** কলকাতা "লাল **শহর"। শ্রীনেহরু বলেন,** "দুঃস্বপ্নের শহর"। **আবার অনেকে বলেন,** 'শোভাযাত্রার শহর'। **মোট কথা,** সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে **কলকাতায় কংগ্রেসের** অনুপ্রবেশ অত্যন্ত **ক্ষীণ। সেই ধারণাকে** ভীষণভাবে ধাক্কা **দিয়েছে শ্রীস্নেহাংশুকান্ত** আচার্যের পরাজয়।

কম্যুনিস্ট প্রার্থীর এই পরাজয় রাজনৈতিক পটভূমিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **তাৎপর্যপূর্ণও বটে।** কম্যুনিস্ট পার্টির এই **পরাজয় যে প্রতিক্রিয়ার** সৃষ্টি করেছে তারই **পরিপ্রেক্ষিতে** একটা ঘটনার উল্লেখ করা **প্রয়োজন।**

ঘটনাটা ঘটেছিল উত্তর কলকাতায়।

নির্বাচন-এর ফলাফল ঘোষণা করার জন্য, **আনন্দবাজার পত্রিকা ও** "দেশ" পত্রিকার **সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার এবার** একটি বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।

এই ব্যবস্থা মত প্রতিক্ষণে নির্বাচনের ফলাফল পর্দায় প্রতিফলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতায় এভাবে ফলাফল বা সংবাদ ঘোষণার আয়োজন এর আগে আর কোন পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে করা হয়নি। এই ব্যবস্থা (উত্তর কলিকাতা ও দক্ষিণ কলিকাতায়) অত্যন্ত **জনপ্রিয় হয়েছিল** বলেই প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিফলনের সামনের রাস্তা জনাকীর্ণ হয়ে উঠত।

উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রের ফলাফল যেদিন ঐ পর্দায় ঘোষণা করা হয় সেদিনই ঘটেছিল ঘটনাটি। কলকাতার কোন একটি কেন্দ্রের ভোট গণনার ফলাফল ক্ষণে ক্ষণে উত্তর কলকাতার পর্দায় ঘোষণা করা হচ্ছিল। ভোট গণনার বিশেষ এক মুহূর্তে দেখা যায় যে কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থিত বিধানসভার প্রার্থী কিছু ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীর পিছনে পড়ে আছেন। খবরটা যথারীতি পর্দায় ঘোষণা করা হয়। খবরগুলো আসত আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস থেকে টেলিফোনে। **প্রথম খবর জানাবার** অল্প পরেই **খবর আসে বামপন্থী প্রার্থী** এগিয়ে গেছেন এবং একরকম নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে তিনিই জয়ী হয়েছেন। এই খবরটাও সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ঘোষণা করা হয়।

এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুটিকয়েক ছেলে উত্তেজিত হয়ে যেখান থেকে সংবাদ প্রতিফলন করা হচ্ছিল সেখানে ঢুকে পড়ে। তারা দাবি করে যে ভুল খবর কেন দেওয়া হয়েছিল। ছেলেরা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। তাই শোরগোলটা মন্দ **হয়নি। সেই প্রতিফলন** কেন্দ্রে যিনি **ব্যবস্থা করছিলেন** তিনি নন্দাঘুণ্টি **আনন্দবাজার পত্রিকার** প্রধান ফটোগ্র **শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ।** পাড়ায় [illegible] 'নেকোদা' ব'লে পরিচিত। কয়েকটি [illegible] **নেকোদার কাছে কৈফিয়ত** দাবি ক'রে [illegible] গোল তোলে। তবে 'নেকোদা'র গলার [illegible] যাদের জানা আছে তাদের বুঝতে কষ্ট [illegible] না যে, চীৎকার ক'রে নেকোদার সঙ্গে ছে[illegible] পাল্লা দিতে পারেনি। ভুল খবর [illegible] হয়নি। শুধু খবরটা বদলে গেছে। দুটো খবরই সত্যি।

এর পরেই জানা যায় উত্তর প[illegible] কেন্দ্রের ফলাফল। তখন একটি [illegible] অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে জিগ্যেস করেছি[illegible] 'আচ্ছা, নেকোদা, শিক্ষিত মানুষরাও [illegible] করল।'

নেকোদা নিশ্চয়ই একটা উত্তর [illegible] ছিলেন। এবং আমার সে উত্তর জানা [illegible] কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন এই যে, কম্যু[illegible] পার্টিতে বিশ্বাসী একটি যুবকের মনে [illegible] ভঙ্গের ধ্বনি উঠেছিল কেন? কংগ্রে[illegible] চমকপ্রদ সাফল্য সত্ত্বেও কেন এই [illegible] প্রতিক্রিয়া? প্রশ্ন আরও আছে, কিন্তু প্রশ্নগুলো বিচার করলেই নির্বাচ[illegible] আলোড়নটা কোথা থেকে এসেছিল [illegible] কোথায় গিয়ে আঘাত করেছিল তা [illegible] বোঝা যাবে।

বলা বাহুল্য, এই বিশ্লেষণ থেকেই [illegible] পশ্চিম বাংলায় নয় সমগ্রভাবে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিগত পার্থক্য— নির্বাচনকে কিছুটা অভিভূত করেছিল, বোঝা যাবে।

প্রথমেই বিবেচনা করা যাক, কম্যুনি[illegible] পার্টির কথা।

বিচার করা যাক এই পার্টির রাজনী[illegible] অথবা কর্মপদ্ধতি যার ছাপ নিশ্চয়ই [illegible] থাকে নির্বাচনের উপর। নির্বাচন যে [illegible] সময় পার্টির নীতি পদ্ধতির উপর নির্ভ[illegible] করে তা পুরোপুরি ঠিক নয়। কিন্তু পার্টি[illegible] নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের উপর প্রভা[illegible] বিস্তার করতে বাধ্য।

বিশেষ ক'রে সাধারণ নির্বাচনে, যে সম[illegible] পার্টির নীতি বা আদর্শ কংগ্রেসের প্র[illegible] সভায় আলোচিত হয়েছে। সমালোচ[illegible] হয়েছে তীক্ষ্ণ ভাষায়। কম্যুনিস্ট পার্টি[illegible] বৈদেশিক নীতিই সব চাইতে বেশী দৃ[illegible] আকর্ষণ ক'রেছে প্রাক-নির্বাচনকালে।

এই নীতির দুটো দিক সাধারণ[illegible] কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হ'য়েছিল প্রথমত, পার্টির দেশের প্রতি আনুগত্য এব[illegible] দ্বিতীয়ত, ভারত-চীন বিরোধের পরি[illegible] প্রেক্ষিতে পার্টির মতামত।

কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল : কম্যুনিস্ট পার্টির শিকড় এ-দেশের

মাটিকে আশ্রয় ক'রে বৃদ্ধি পায়নি; বৃদ্ধি পেয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রকাশ্য সভায় বলতে শোনা গেছে যে, এমন কি পার্টির পতাকাও যখন বিদেশ থেকে আমদানী করা তখন প্রশ্ন ওঠে পার্টির আনুগত্য কোথায়? ভারতবর্ষে? না, বাইরে।

অপর দিকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যে ঝগড়া পাকিয়ে উঠেছে সেটাও বেশ বড় ক'রে দেখান হ'য়েছে নানা নির্বাচন কেন্দ্রে। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হ'য়েছে চীন ও রাশিয়ার মতবিরোধ এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিতে স্ট্যালিন ও স্ট্যালিন-বিরোধী; অথবা চীন ও রাশিয়া পন্থী দলবিরোধ।

উত্তর কলকাতায় এ নিয়ে বেশ কয়েকটা নির্বাচনী কার্টুন দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। এর মধ্যে একটি কার্টুন-এ একটি হনুমানকে নাকে দড়ি দিয়ে দেখান হয়েছিল। নাকের দড়ির দুটো প্রান্তের এক প্রান্ত যে হাতে ধরা ছিল তাতে লেখা ছিল রাশিয়া, অন্য প্রান্ত যে হাতে ছিল সে হাতে লেখা ছিল চীন।

এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই কারণে যে, এবারের মত ১৯৫২ বা ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বকে এত ফলাও ক'রে দেখান হয়নি। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ক্যাম্পে যে বিরোধ ক্রমশই প্রকাশ পাচ্ছে তাকেই কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিল।

অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই প্রচারের ঢেউকে বাধা দেবার কোন বিশেষ প্রচেষ্টা কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে কম্যুনিস্ট সমর্থকদের মধ্যে যে দ্বিধা দেখা গিয়েছিল তারও নিরসন করা হয়নি। বরং দিল্লি থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির যে বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল এই প্রসঙ্গে তাতে নির্বাচকদের মনের দ্বিধাকে আরও স্পষ্ট ক'রে দিয়েছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক বা কর্মীদের কাছ থেকে প্রশ্ন এসেছিল পার্টি নেতাদের কাছে যে, নির্বাচকরা যখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবেন তখন তার উত্তর কিভাবে দেওয়া হবে। তারা জানতে চেয়েছিল যে, এ সম্বন্ধে পার্টির সুস্পষ্ট কোন অভিমত বা নির্দেশ আছে কিনা।

পার্টির ফতোয়ায় বলা হয়েছিল যে, স্ট্যালিনবাদকে মুছে ফেলা উচিত হবে কিনা এ প্রশ্ন মীমাংসা করতে প্রচুর সময় ও তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে সেই-হেতু এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মীমাংসায় পৌঁছোন সম্ভব নয়।) মনে রাখা প্রয়োজন যে, চীন প্রকাশ্যভাবে স্ট্যালিনবাদকে নিশ্চিহ্ন করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।) কাজেই পার্টির বিভিন্ন কেন্দ্রে তাদের কর্মীদের নির্দেশ দিল অবস্থা বুঝে কাজ করতে এবং যেটা ভাল মনে হবে সেই উত্তরটাই নির্বাচকদের দিতে।

ফলে দাঁড়াল এই যে, একদিকে নির্বাচকরা কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে উঠল এবং অন্যদিকে পার্টি কর্মীরা কংগ্রেসের এই প্রচারের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হ'ল। হয়ত এই কারণেই নির্বাচনী প্রচারকার্যের প্রথম অবস্থায় পার্টির কর্মীদের উৎসাহ খুব বেশী দেখা যায়নি। কংগ্রেস প্রচারকে খণ্ডন করার উৎসাহ পায়নি। কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিচার করলে এটা তাদের এক নম্বর দুর্বলতা ব'লেই মনে হবে।

এরপর এসেছে চীনের হামলার কথা। এ সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি আজ সর্বভারতে বিশেষভাবে সুবিদিত। এই নীতির আদি কথা ছিল এই যে, ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে মতবিরোধ থাকা সম্ভব এবং এই বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। দ্বিতীয় কথা, লাদাক সম্পর্কে পার্টির সুস্পষ্ট অভিমত প্রায় অনুচ্চারিত।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় ১২০০০ বর্গমাইল এলাকা চীনের দখলে চলে গেছে এবং দ্বিতীয়ত, ভারত ও চীনের মধ্যে সরকারী তথ্য বিনিময়ের সময় দেখা গেছে চীন অধিকৃত ভারতভূমি ছেড়ে যাবার জন্য মোটেই ব্যগ্র নয়। তা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট পার্টি চীনকে 'হামলাকারী' ব'লে অভিযুক্ত করেনি। পার্টির এই চীন নীতির সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নিয়েছে কংগ্রেস এই নির্বাচনে। কংগ্রেস পক্ষের প্রচারে এই কথাটাই বার বার নির্বাচকদের সামনে রাখা হয়েছে যে কম্যুনিস্ট পার্টি 'দেশদ্রোহীর' ভূমিকায় কাজ করছে।

কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ খণ্ডন করার দুর্বল প্রচেষ্টা হয়ত

হয়েছিল, কিন্তু তা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রায় এমনি একটা অবস্থার মধ্যেই এল ভারতের 'গোয়া অভিযান'। এই সময় কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যে 'দেশদ্রোহী'র অভিযোগ আনা হ'য়েছিল তা খণ্ডন করার। পার্টি অভিযানকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেছিল ও অভিযানের সাফল্যকে অভিনন্দিত করেছিল। কিন্তু দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে পার্টি নেতাদের যখন জিগ্যেস করা হয় যে, পার্টির গোয়া নীতি ও চীন নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়, তখন পার্টি নেতাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হ'য়েছিল এবং চীন সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয় ভাষণও করতে হ'য়েছিল। এর পর চীনের কাছ থেকে কটূক্তাবণ শোনা যায় কোন কোন ভারতীয়-কম্যুনিস্ট নেতা সম্বন্ধে। তখন প্রায় চীৎকার ক'রেই শ্রী এস এ ডাঙ্গে বলেছিলেন 'চীনকে লাথি মেরে ভারত থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত'। তবু শ্রীডাঙ্গের পতন ঘটল এই নির্বাচনে।

মূল কথা, কম্যুনিস্ট পার্টির 'অনিশ্চিত' চীন নীতি নির্বাচকদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। কংগ্রেসকে ত নয়ই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'শিক্ষিত' নির্বাচকদের কাছে কম্যুনিস্ট পার্টির বৈদেশিক নীতি নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। নির্বাচকদের এই বিশ্বাস কংগ্রেস পক্ষ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু একটিমাত্র নির্বাচনী সভায় যে বক্তৃতা দেন তাতে কম্যুনিস্ট পার্টির এই নীতিকেই সমালোচনা করেছিলেন অত্যন্ত তীব্র ভাষায়। তিনি বিশেষ ক'রে অভিযোগ এনেছিলেন পশ্চিম বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রীর মতের বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তার একমাত্র অর্থ যে এই রাজ্যের কম্যুনিস্ট পার্টি বিশেষ ক'রে দেশের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে চলেছে। নিঃসন্দেহে তিনি এই র পার্টির চীন প্রীতিকেই আক্রমণ করেছে সবচাইতে বেশী। এরপর প্রধান মন্ত্র বক্তৃতার প্রতিধ্বনি শোনা গেল কংগ্রেস নে শ্রীঅতুল্য ঘোষের মুখে। প্রাকনির্বাচনক শ্রীঘোষ রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্র পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে যে বক্তৃতা দিয়েছেন ত এই কথাটাই তিনি নির্বাচকদের বোঝা চেয়েছেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে ক্ষম গেলে দেশের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে ক্ষ হবে। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে নির্বাচকরা মতামত জানিয়েছেন, বিশেষ কলকা 'শিক্ষিত' নির্বাচকমণ্ডলী, তাতে এ অস্বীকার করা যায় না যে তাদের সং শ্রীঅতুল্য ঘোষের খুব বেশী মতবিরোধ নে অন্ততঃপক্ষে এই চীন নীতি সম্পর্কে অবশ্য রাজ্যের কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পাদ তা স্বীকার করেন না। তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন। সরকারীভাবে পার্টির পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তাতেও এর উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

কিন্তু কলকাতাকে বাদ দিলেও দেখা যাবে পার্টির এই নীতি অন্ততপক্ষে নির্বাচনের দিক থেকে ফলপ্রসূ হয়নি দার্জিলিং জেলায়। তিব্বত সীমান্তের কোল ঘেঁষে রয়েছে এই জেলা। এই জেলা নিয়ে রাজ্য সরকারের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। গত এক বছরের মধ্যে এই জেলায় যে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত দেখা গেছে তা থেকে অনেকেরই একটা ধারণা ছিল, এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি অভূতপূর্বভাবে শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। এমন কি লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী একবার সরোষে ঘোষণা করেছিলেন যে, দার্জিলিং জেলার কম্যুনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে চীনের সমর্থনে প্রচারকার্য চালাচ্ছে। ঐ জেলার কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে তিনি তীব্র ভাষাও ব্যবহার করেছিলেন। শ্রীমজুমদার অবশ্য জোরালো ভাষায় অভিযোগ অস্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসী মহলে দৃঢ় ধারণা ছিল দার্জিলিং জেলা কম্যুনিজমের অন্যতম মূল ঘাঁটি হ'য়ে উঠেছে।

নেপালী ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন হয় তাতেও অনেকের মনে হ'য়েছিল গোর্খা লীগের চাইতেও কম্যুনিস্ট পার্টিই বেশী লাভবান হ'য়েছে। তার প্রতিধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিক মহলে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, কম্যুনিস্ট পার্টি এই জেলায় এবার একটি আসন হারিয়েছে। এই জেলায় মোট আসন সংখ্যা পাঁচ এবং ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে, কম্যুনিস্ট পার্টি দুটি আসন পায় (গোর্খা লীগের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করে)। কংগ্রেস পায় একটি আসন, গোর্খা লীগ একটি এবং কংগ্রেস সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী একটি।
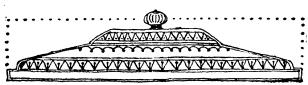
জেলার ভাষা আন্দোলন এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সুস্পষ্ট অনুপ্রবেশের পর মনে হয়েছিল কংগ্রেস এবার একটি আসনও রাখতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু নির্বাচনের রায়ে দেখা গেল, গোর্খা লীগ ও কংগ্রেস পেয়েছে দুটি করে আসন এবং বাকী একটি গিয়েছে কম্যুনিস্টদের হাতে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শিলিগুড়ি কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীমজুমদারকে পরাজিত করেছেন কংগ্রেসীপ্রার্থী শ্রীজগদীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য। এই পরাজয় কম্যুনিস্ট আসনের ক্ষতিব চাইতেও ধাক্কা দিয়েছে বেশী পার্টির নীতি পদ্ধতিকে। বলা ভুল হবে না যে, প্রায় একই পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভা কেন্দ্রেও কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীরতনলাল ব্রাহ্মণকে হার স্বীকার করতে হয়েছে কংগ্রেসপ্রার্থীর কাছে। অর্থাৎ, চীন নীতি এখানে নির্বাচকদের অভিভূত করেনি।

এরপর আলোচনা করা যাক, দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে পার্টির মূল নীতিগুলো।

প্রথমেই ধরা যাক, পার্টির কৃষক নীতি। পার্টির উর্ধ্বতন মহল থেকে বার বার এবং নির্বাচনের আগেও প্রচার করা হয়েছে, কংগ্রেসের ভূমিনীতির ফলে কৃষকরা ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। পার্টি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, জমি যতক্ষণ কৃষকের হাতে পাকাপাকিভাবে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না, কৃষকের অর্থনৈতিক মানের কোন উন্নতি হবে না।

পার্টির ভূমিনীতি যে দুটো অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল সে দুটো অঞ্চল ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা এবং মেদিনীপুরের প্রায় গোটা অংশ। এই দুটি এলাকায় কম্যুনিস্ট পার্টি সবচাইতে জোর দেয় ভূমিনীতির উপর এবং তারই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেখা দেয় তে-ভাগা আন্দোলনরূপে। এই তে-ভাগা আন্দোলনের ভিত্তিতে পার্টির সমগ্র ভূমিনীতিকে বিচার করলে ভুল হবে না।

কয়েকদিন আগে, অর্থাৎ নির্বাচনের ফল জানার পর, মেদিনীপুর জেলার এক বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা ও মন্ত্রীকে কয়েকজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন কম্যুনিস্ট নেতাদের এই পরাজয়ের বিশেষ কোন কারণ আছে কি না। তাঁর মতে, আছে এবং বেশ বড় রকমের কারণ ছিল বলেই এই দুই অঞ্চলে এবার কম্যুনিস্টদের ব্যাপক পরাজয় ঘটেছে।

মেদিনীপুরের কথাই ধরা যাক। গত নির্বাচনে এই জেলায় কম্যুনিস্টরা পেয়েছিল চারটি আসন এবং ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ছয়টি আসন। এবার পেয়েছে

তিনটি আসন। কংগ্রেস নেতার বিশ্লেষণ অনুসারে, ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে এই জেলায়। এই ঘটনার অধিকাংশই দেখা যায় হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। জেলার অনেক জায়গায় ধানের গোলা পুড়িয়ে দেওয়া হয়, জমির মালিককে বিপর্যস্ত করে জমি দখলের হিড়িক লেগে যায়।

কংগ্রেস নেতা বলেন, কম্যুনিস্ট নেতারা ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করেছিল যে, জমি একবার চাষ করলে পাকাপাকি-ভাবে জমির মালিক হয়ে যাবে যদি কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনে জয়ী হতে পারে। ফলে দেখা গেল, শুধু যে পার্টির প্রার্থীদেরই কৃষকরা বেছে নিল তা-ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে হামলাও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু নির্বাচনের পর যখন দেখা গেল, জমি ত হাতে এলই না, উপরন্তু মালিকদের মামলার চোটে তাদের প্রাণান্ত হতে হচ্ছে, তখনই দেখা দিল প্রতিক্রিয়া কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। এই সব মামলার ফলে দেখা গেল যে, বর্গায় যারা চাষ করত তারা যদি বা কোনক্রমে টিকে গেল, তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছেলেরা সম্পূর্ণরূপে জমি থেকে উৎখাত হয়ে গেল। আগে তারা কখনও এভাবে উৎখাত হয়নি। ফলে, কংগ্রেস নেতা বলেন, আজ এই কৃষকসমাজ কম্যুনিস্টদের কথা শুনতে রাজী নয়। তাই মেদিনীপুর জেলায় বিপুল পরাজয় ঘটেছে কম্যুনিস্ট কৃষকনেতা শ্রীভূপাল পান্ডার।

কংগ্রেস নেতার অভিযোগ যদি সত্যি হয় তা হলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ২৪ পরগনা জেলায়ও কেন পরাজয় ঘটেছে শ্রীহেমন্ত ঘোষাল ও শ্রীসুবোধ ব্যানার্জির মত কৃষক-নেতাদের। সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষক আন্দোলন করেছে কম্যুনিস্ট পার্টি। শুধু তে-ভাগা নিয়েই নয়, বর্গাদারের স্বত্ব নিয়েও। এমন কি তেলেঙ্গানার মত কাকদ্বীপ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষকসমাজকে হিংসাত্মক কার্য-কলাপের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে জমি তাদের হাতে আসবে এই আন্দোলনের ফলে। কিন্তু আসেনি।

এসেছে মামলা। উচ্ছেদের মাম ফৌজদারী মামলা। ঋণ আদায়ের মাম এমন কি দেখা গেছে, বহু মাঠের ধান ওঠেনি। মাঠে পড়ে নষ্ট হয়েছে, তবু ওঠেনি। এরই প্রতিধ্বনি শোনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। বার বার কম্যু সদস্য শ্রীহেমন্ত ঘোষাল চীৎকার বলেছেন, 'অপদার্থ কংগ্রেস সরকার ব দারকে রক্ষা করতে অক্ষম; কৃষককে বাঁচা কোন চেষ্টাই এ-পর্যন্ত হয়নি।'

স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহ যখন ভূ রাজস্বের মন্ত্রী ছিলেন তখন বার বার তাঁ শ্রী ঘোষালের কাছ থেকে অভিযোগ শুন হয়েছে যে, বর্গাদার উচ্ছেদ হয়ে গে হাজারে হাজারে। তিনি জানতে চেয়েছে 'অপদার্থ কংগ্রেস সরকার এদের বাঁচাবা কোন চেষ্টা করবে কি না।' শ্রী ঘোষাল বহুবার হুংকার ছেড়ে বলেছেন, 'সরকার যদি এর প্রতিকার না করে তা হলে বাইরে জনসাধারণই এর জবাব দেবে।'

দিয়েছে এবং অত্যন্ত নিষ্করুণভাবেই জবাব দিয়েছে শ্রী ঘোষালের পরাজয় ঘটিয়ে। এই কথাটাই বলছিলেন কংগ্রেস নেতা সেদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসে। তাঁর মতে কৃষকরা ব্যাপকভাবে আস্থা হারিয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিনীতি ও পদ্ধতির উপর। অশান্তির ভিতর অশান্তিই পেয়েছে কৃষকরা। তাই আজ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এই প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা হয়ত বলা কঠিন, কিন্তু এটা বলা যায় যে, পার্টির নীতি ও পদ্ধতিতে মারাত্মক কোন দুর্বলতা না থাকলে পার্টিকে এভাবে বিপর্যস্ত হতে হত না এই নির্বাচনে যেমন হয়েছে তে-ভাগা আন্দোলন অঞ্চল-জুড়ে। হয়ত পরাজয় ঘটত না, শ্রীকংসারী হালদারের।

কোন কোন কংগ্রেস নেতা মনে করেন যে, শুধু ভূমিনীতিই নয়, শ্রমিক-নীতিও কম্যুনিস্টদের মধ্যে এবারের নির্বাচনে-বিপর্যয় ঘটিয়েছে। তাঁদের সুস্পষ্ট মত এই যে, বার বার ব্যর্থ আন্দোলনের মুখে ঠেলে দিয়ে পার্টি শ্রমিকদের আস্থা হারিয়েছে। তা ছাড়া আরও মারাত্মকভাবে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটা শিল্পপতিদের প্রতি-ক্রিয়া। দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন যত ব্যাপক হয়ে উঠছে ততই শিল্পপতিরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান খুঁজছেন ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। ফলে, আজ একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে পশ্চিম বাংলা থেকে অন্যত্র শিল্প-সংস্থা সরিয়ে নিয়ে যাবার।

আশা করা যায়, এই আশঙ্কা অমূলক হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেছে কোন কোন শ্রমিক মহলে আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তা ছাড়াও আছে ট্রেড ইউনিয়ন
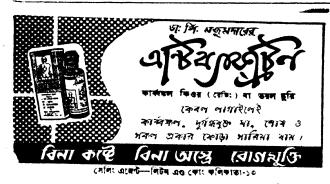
দলাদলি যা পরোক্ষভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষতি হিসেবে দেখা দেবেই।

যেদিক থেকেই বিশ্লেষণ করা যাক, দেখা যাবে এই নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিগত পদ্ধতি অনেকাংশে কাজ করেছে। এই বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায়, নীতির দিক থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি যে-সব অঞ্চলে সবচাইতে বেশী নিরুদ্বিগ্ন ছিল সেই সব অঞ্চল থেকেই প্রতিঘাত ও বিস্ময় এসেছে সবচাইতে বেশী। বর্তমান নির্বাচনে এটাই ছিল পার্টির মারাত্মক 'স্ট্রাটেজিক' দুর্বলতা।

এর পরেই প্রশ্ন ওঠে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গড়া বামপন্থী দলের নির্বাচনী জোট এবং বহু বিঘোষিত 'বিকল্প' সরকার গঠন।

গত নির্বাচনেও বামপন্থী জোট কাজ করেছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং বামপন্থী সরকার গঠনেরও স্লোগান তোলা হয়েছিল। তার ফলে ১৯৫২ সালের তুলনায় অনেক বেশী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে। সেই জোটে কম্যুনিস্ট পার্টির বড় শরিক ছিল প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি এবং আরও তিনটি দল। ১৯৫৭ সালের এই বামপন্থী জোটের ফলে প্রত্যক্ষভাবে যা ঘটেছিল তা বিরোধী পক্ষের শক্তিবৃদ্ধি। এই শক্তিবৃদ্ধির মূলে অংশ পেয়েছিল, প্রধানত, কম্যুনিস্ট পার্টি এবং দ্বিতীয়ত পি এস পি দল। কম্যুনিস্ট পার্টির আসন-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৮ থেকে ৪৬ এবং পি এস পি (১৯৫২ সালে এই দল ছিল না) পেয়েছিল ২১টি। এমন কি ভোটের অংশও বেশী ছিল এদের ভাগে। যেমন, কম্যুনিস্ট পার্টির ভোটাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১০·৭৬ থেকে শতকরা ১৭·৮২। আর পি এস পি পেয়েছিল শতকরা ৯·৮৫ ভাগ (১৯৫২ সালের কে এম পি পি-র তুলনায় সামান্য বেশী)। অন্য দিকে বামপন্থী জোটের আর এক শরিক ফরোয়ার্ড ব্লককে বেশ কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। এই ব্লক ১৯৫২ সালে পেয়েছিল ১১টি আসন (জোট না করে) এবং ১৯৫৭ সালে পায় ৮টি আসন (জোট করে)। ১৯৫২ সালে এই দলের ভোটাংশ ছিল শতকরা ৫·২ (জোট না করে)। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে পেয়েছিল শতকরা ৪·২ (জোট করে)। অন্য দিকে আর এস পি ও সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছিল।

তবু ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে বামপন্থী জোটের পক্ষ থেকে ২০০-র বেশী প্রার্থী দিয়েও 'বিকল্প সরকার' গঠন করা সম্ভব হয়নি। এমন কি সম্মিলিতভাবে জোটের ভোটাংশ বৃদ্ধি পেলেও বৈধ ভোটের এক-তৃতীয়াংশের বেশী পাওয়া সম্ভব হয়নি এবং অন্য দিকে কংগ্রেসের ভোটাংশ শতকরা ৩৮·৯০ থেকে শতকরা ৪৬·১৪ যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা-ও রোধ করা সম্ভব হয়নি।

তাই এবারেও নির্বাচনের কয়েক মাস আগেই কম্যুনিস্ট পার্টি বামপন্থী জোটের প্রস্তাব করে বিভিন্ন বিরুদ্ধ দলগুলির কাছে। কিন্তু এবারে কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের বর্ধমান সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে এটা জানিয়ে দেয় যে-সব বিরোধী দল পার্টির নীতি নিয়ে প্রকাশ্য সমালোচনা করে তাদের সঙ্গে জোট বাঁধা হবে না। সেই অবস্থায়

পার্টির পক্ষে এ-কথা বলা সম্ভব ছিল, কারণ বিরোধী দলের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি তখন মধ্যমণি।
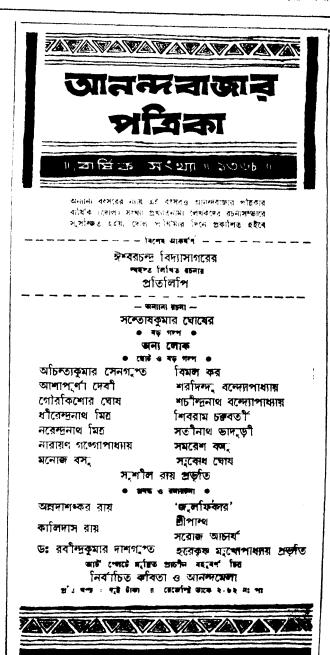
এ-শর্তের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত হল প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টিকে বাদ দেওয়া। কারণ ইতিমধ্যেই পি এস পি প্রকাশ্যভাবে এবং অত্যন্ত তীব্র ভাষায় কম্যুনিস্ট পার্টির চীন নীতিকে সমালোচনা করেছিল। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, ১৯৬২ সালের জোটে পি এস পি কম্যুনিস্ট পার্টিকে নির্বাচনের আসরে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত।

বামপন্থী জোটের জন্য তাই নির্ভর করতে হল ফরোয়ার্ড ব্লকের উপর বিশেষ করে. কারণ, পি এস পি-র পর এরাই দল হিসেবে বিধানসভায় বড়। আর এস পি সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টির কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে যে সাফল্য লাভ করেছিল এই দল জোটের ফলে তাতে আর এস পি-র পক্ষে ১৯৬২ সালের জোটে না যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। পারে না বলেই এই দল শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে। নীতিগত পার্থক্য, বিশেষ করে চীন সম্পর্কে কম্যুনিস্ট নীতি জোট-এর প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিয়েছিল। এই বিবাদের মধ্যস্থতা করে অবস্থাটা যা দাঁড়াল তাতে এস ইউ সি-কে সরে দাঁড়াতে হল। কারণ এই দল তীব্রভাবে চীনপন্থী।
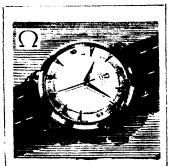
কাজেই এই নির্বাচনে যদিও বামপন্থী জোট কাজ করেছিল, তবু এই জোটের মধ্যে অনেকটা ফাঁক বা ফাঁকি ছিল। শুধু প্রত্যক্ষভাবে যেটা কার্যকরী হয়েছে তা নিরঙ্কুশভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে আসর জাঁকিয়ে তোলা।

এবারের নির্বাচন সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম থেকে কিছুটা নিরুদ্বেগের মনোভাব নিয়েই আসরে নেমেছিল। কারণ, এদের একটা ধারণা ছিল যে, বামপন্থী জোটে যদি ১৯৫৭ সালে নিজস্ব দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে থাকে, তা হলে এবারে আরও ২৫।৩০টি আসন পাওয়া শক্ত হবে না।

ফলে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কম্যুনিস্ট পার্টি গত নির্বাচনে যেখানে ১০৩ জন নিজস্ব প্রার্থী দিয়েছিল এবার সেখানে ১৪৩ জন নিজস্ব প্রার্থী দিয়েছে। অর্থাৎ, 'বিকল্প' সরকার গঠন করার জন্য যে সংখ্যক প্রার্থী দেওয়া প্রয়োজন বলে পার্টি মনে করেছিল তা দেওয়া হয়েছিল। আশা ছিল, এই ১৪৩ জনের মধ্যে (২৫টি বেশী আসন যদি পাওয়া যায়) ৭০ জনও নির্বাচিত হলে কংগ্রেস শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে।

মনে হয়, এই গাণিতিক ভিত্তিতেই কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক এবার 'বিকল্প' সরকার গঠনের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস মহল থেকেও এই স্লোগানকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রতি নির্বাচনী সভায় তাই কংগ্রেস নেতারা কম্যুনিস্ট পার্টির এই স্লোগানকে বিদ্রূপ করেছেন, সমালোচনা করেছেন।

নির্বাচনী 'স্ট্র্যাটেজির' দিক থেকেও এই স্লোগান শেষ পর্যন্ত বিশেষ করে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করেছে। গত নির্বাচনে বামপন্থী জোট (নির্দলীয় ছাড়া) যেখানে এক-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছিল সেখানে একমাত্র পি এস পি-র অবদানই ছিল শতকরা ৯·৮৫। এই অংশ বাদ দিলে এবারের বামপন্থী জোটের ভাগে থাকে প্রায় শতকরা ২২। এই ভোটাংশ নিয়ে আর যাই হোক 'বিকল্প' সরকারের স্লোগানের পক্ষে কোন যুক্তি থাকে না। দেখা যায়, এবারের বামপন্থী জোটের ভাগে যে ভোটের অংশ পড়েছে তা গতবারের অংশকে ছাড়িয়ে যায়নি। পি এস পি-কে বাদ দিয়ে জোটের ভাগে এক-তৃতীয়াংশ ভোটও পড়েনি এবারের নির্বাচনে।

এবারের নির্বাচনী জোটের প্রত্যক্ষ ফল যেটা দেখা গেছে তা পি এস পি-র বিপুল ক্ষতি। বলা চলে, রাজনীতির দিক থেকে এই দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ, নির্বাচনী আসরে পি এস পি-র প্রধান ভূমিকা ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি ও পদ্ধতিকে আক্রমণ করা। নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দল নির্বাচকদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি বলেই, কোন কোন রাজনৈতিক মহলে এই দলকে ক্ষুদে কংগ্রেস বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

পি এস পি-র নিজস্ব নীতি ও প্রোগ্রাম ছিল না বললে ভুল হবে। ছিল, কিন্তু নির্বাচকদের কাছে তা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। তাদের কাছে এটাই বেশী মনে হয়েছে যে, কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলের পার্থক্য একমাত্র নির্বাচনী বিরোধিতায়। তাই এই দলকে কংগ্রেসের 'ভাঙাডাল' বলে যখন অভিহিত করা হয়েছে নির্বাচনী সভায় তখন নির্বাচকরা এই দলের দিকে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি। তা ছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি বিশেষ করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল এই দলকে 'কায়েস্তা' করতে।

ফলে, এবারের নির্বাচনে এই দল কোন রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে এই দল পেয়েছিল ২১টি অসান, এবার পেয়েছে ৫টি আসন। গতবার ভোট পেয়েছিল শতকরা ৯·৮৫; এবার পেয়েছে শতকরা ৫। কয়েক জায়গায়, যেমন মেদিনীপুর জেলায় এই দল কংগ্রেসকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে, কিন্তু ক্ষতিও হয়েছে বিপুল।

দলের প্রধান ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সর্বজনসমাদৃত নেতা। তবু তিনি পরাজিত হয়েছেন লোকসভার নির্বাচনে। বলা চলে, আইনসভার রাজনীতি থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছেন। এই দলের দ্বিতীয় আঘাত শ্রীদাশরথি তা'র পরাজয়ে। বিধানসভায় এ'র জুড়ি কম। এ'কেও বিদায় নিতে হয়েছে বিধানসভা থেকে। সর্বোপরি কলকাতায় গত নির্বাচনে এই দল পেয়েছিল চারটি আসন। এবার তার প্রতি আসন হাতছাড়া হয়েছে। কলকাতায় অন্তত বলা চলে পি এস পি-র নাম মুছে গিয়েছে। শ্রমিক মহলেও এই দলের আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, কোলিয়ারী শ্রমিক নেতা শ্রীদেবেন সেন এবং পাটকল শ্রমিক নেতা শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জি—দুজনেই পরাজিত।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

কবি যদি আরও দশ বছর বাঁচতেন ও আশি বছর বয়সে না লিখে নব্বই বছর বয়সে তাঁর শেষ জবানবন্দী "সভ্যতার সংকট" লিখতেন তা হলে আর যেই হোক ইংরেজ হতো না তাঁর "villain of the piece' ততদিনে জার্মানরা ষাট লাখ ইহুদী ও সমসংখ্যক পোলকে বালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে গ্যাস দিয়ে দম বন্ধ করে মেরেছে। মার্কিনরা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে গোটা দুই আণবিক বোমা ফেলেই লাখ কয়েক জাপানীকে মুছে ফেলেছে। যারা প্রাণে বেঁচেছে তাদেরও দুর্ভোগের অন্ত নেই। তারা নতুন রকমের ব্যাধিতে ভুগছে। আণবিক বোমা হাতে থাকলে জাপানীরাও যে ইতস্তত করত তা নয়। না থাকতেই তারা যা করেছে তার হিংস্রতা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীন কোনো দিন ভুলবে কি না সন্দেহ। প্রাচ্য দেশ বলে জাপানের প্রতি কবির যে মমতা ছিল সেটা সেইদিনই লোপ পেতো জাপান যেদিন ভারতবর্ষ আক্রমণ করত। করেনি যে সেটা কবির প্রীতি বা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়।

রুশ দেশের সোভিয়েট শাসন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মোহ ছিল সেটাও মিলিয়ে যেতো স্টালিনের দুষ্কৃতির কাহিনী খোদ ক্রুশ্চভের জবানীতে শুনে। তবে তার জন্যে তাঁকে আরো বছর পাঁচেক বাঁচতে হতো। আরো দশ বছর বাঁচলে তো চীন সম্বন্ধেও তাঁর মোহভঙ্গ ঘটত। প্রাচ্য এবং প্রাচীন বলে চীন যে কবির মুখ রক্ষা করত তা নয়। ফ্রান্স সম্বন্ধেও তাঁর মনে একটি নরম কোণ ছিল। আহা, ফরাসী বিপ্লবের দেশ যে! কিন্তু আলজেরিয়ায় ফ্রান্স বোধ হয় এই কয় বছরে কমসে কম দেড় লাখ আরব হত্যা করেছে। সমগ্র ব্রিটিশ আমলে ইংরেজের হাতে যত ভারতীয় নিহত হয়েছে তাদের সংখ্যা এর সিকিভাগও নয়।

তা হলে কার সম্বন্ধে কবির মোহ থাকত? ভারত সম্বন্ধে? সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশ সালের নরহত্যা, নারীহরণ, লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির জের এখনো মেটেনি। দেশের মাঝখানে প্রাচীর তুলে কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে দু'পক্ষের খুনেদের লুটেরাদের। একই দেশের দুই পৃথক অংশ এখন পরস্পরের ভয়ে ইংরেজ আমলের তুলনায় বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। তাদের এখন জেট বোমারু বিমান পর্যন্ত আছে, যা ইংরেজেরও ছিল না। একপক্ষ যদি কোনো গতিকে আণবিক বোমা যোগাড় করে তো অপর পক্ষও করবে। তৈরি থাকলে বেধে যেতে কতক্ষণ?

যুদ্ধ বাধুক কেউ এটা চায় না, অথচ নিরস্ত্রীকরণের ফলে মন্দা দেখা দিক এটাও কারো ইচ্ছা নয়। মন্দা এড়ানোর উপায় যদি হয় কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন তাতেও পশ্চিমের লোকের আপত্তি। আমাদেরও। আফগানিস্তানের মতো বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাৎপদ দেশ হয়ে যদি কোনও সমাধান থাকে, তবে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয় একটা মার্গ হয়তো সর্বোদয়, কিন্তু এখনো সেটা ভারতবর্ষেই অপরীক্ষিত। যতদিন না মন্দা নিবারণের উত্তম উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে ততদিন লোকে নাচার হয়ে সামরিক প্রস্তুতি সমর্থন করবে। একপক্ষের প্রস্তুতি লক্ষ করে অপরপক্ষ প্রস্তুত হবে। কোনো আয়ুধই বাদ দেবে না। তা পরীক্ষা করতে গিয়ে সবাইকে বিপন্ন করবে। নিজেও বিপন্ন হবে। সভ্যতার দোহাই দিলেও শুনবে না। ভগবানের দোহাই তো কবে বাতিল হয়ে গেছে। যীশুর জন্মদিনেও খ্রীষ্টান নেশনদের যুদ্ধ স্থগিত থাকেনি।

যুদ্ধ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। মন্দা আরেক হাতে। অথচ দুই হাতে করে যেতে হবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি। এই হলো মোটামুটি পশ্চিমাদের পলিসি। নিকট ভবিষ্যতে এর মৌল পরিবর্তন সম্ভব নয়। পরিবর্তন ততটুকুই হবে যতটুকু উভয়পক্ষের আলাপ আলোচনার ফলে নিরাপদ। নীতির অনুশাসন মেনে শুভবুদ্ধির অনুরোধে মহৎ কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়তো ব্যক্তিবিশেষকে বা সঙ্ঘবিশেষকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে, কিন্তু জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষ যে নিরাপত্তার চেয়ে আর কোনো গণনাকে বড় মনে করবে তেমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। যুদ্ধ যদি বাধে নিরাপত্তার নামেই বাধবে। একপক্ষ বলবে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্যেই যুদ্ধ। অপরপক্ষ এর উত্তরে বলবে কমিউনিজমকে নিরাপদ করার জন্যেই যুদ্ধ। আবার যুদ্ধ যদি ঠেকিয়ে রাখা হয়, তবে সেটাও নিরাপত্তার নামে। মানুষকে পাইকারি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মানসে।

আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই। যুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না বলতে পারব না। কিন্তু এটুকু

বলতে পারি যে যুদ্ধ যদি আরো বছর দশেক পেীছিয়ে যায় তা হলে প্রস্তুতির ভারে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। সুতরাং প্রস্তুতিও মন্থর হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু তার ফলে যদি মন্দা দেখা দেয়, তবে আবার ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে। অগত্যা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে সমাজের কল্যাণের দায়। সোজা বাংলায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার। বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও পাবলিক সেক্টর ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ এক কালে ধর্মের ষাঁড় ছিল। তার গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি! একটু একটু করে সে বলদে পরিণত হচ্ছে। রাতারাতি বিপ্লব ঘটলে প্রতিবিপ্লবও ঘটবে। কিন্তু তিলে তিলে অলক্ষ্যে যা ঘটে যাচ্ছে একপ্রকার বিপ্লবই। শুধু তার প্রতি... নেই। আর তার নির্দিষ্ট সময়সীমা ...

ক্যাপিটালিজম বল, কমিউনিজম সোশিয়ালিজম বল সব ক'টারই ... নেমে গেছে একই জায়গায়। পাঁচ শ' ব... আগে যে রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম ঘটে ... মধ্যেই ছিল পুনর্বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা... পুনর্বিন্যাস না ঘটলে রেনেসাঁস পূর্ণ... হতে পারে না। সেই সময় থেকেই ধ্যানী ধ্যান করে এসেছেন পুনর্বিন্যাসের। এম... একটি ধ্যানের নাম ইউটোপিয়া। ধ্যানী... নাম সার টমাস মোর। প্রত্যেক শতকে একাধিক ধ্যানী একাধিক ধ্যান করেছেন কেজো মানুষেরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু সব উড়ে গেলেও একটা কথা মানুষে... মনে গেঁথে গেছে। এই মর্ত্যভূমিকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে নিরলস কর্মসাধনার দ্বার... কাম্যলোকে পরিণত করা সম্ভব। ... জন্যে চাই জীবন ও জীবিকার, সমাজ ... অর্থনীতির, উৎপাদন ও বণ্টনের পুন... বিন্যাস। গতানুগতিককে অক্ষুণ্ন রা... চলবে না। আবার অকারণে ক্ষুণ্ণ করা কাজের কথা নয়। কী রাখতে হবে, ক... ছাড়তে হবে, কী গড়তে হবে, কী ভাঙতে হবে এ নিয়ে অনবরত চিন্তা করতে হবে বিচার করতে হবে, জল্পনা করতে হবে কল্পনা করতে হবে। তারপর কাজে নামতে হবে। ফল দেখাতে হবে। সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। তারই না... প্রগতি। মানুষ উত্তরোত্তর প্রগতি করবে এক পুরুষে যা হলো না আরেক পুরুষে ... হবে। এক শতাব্দীতে যা হলো না আরে... শতাব্দীতে তা হবে। তার চলার পথে বা... এ সবে বিপত্তি আসবে, কিছুকালের জন্য সে পেছিয়ে যাবে, তারপর আবার এগি... যাবে। মানুষের ইতিহাসে বিশ ত্রিশ বছ... ধর্তব্য নয়। শতাব্দী অনুসারে য... হিসাবনিকাশ করা হয় তা হলে দেখা যা... মানুষ মোটের উপর এগিয়েছে।

আদিকাল থেকেই মানুষের মনে সাধ ছি... সে আকাশে উড়বে। সে সাধ পূর্ণ ... উনবিংশ শতাব্দীতে বেলুনে চড়ে। এ... তো সে মহাশূন্যেও ঘুরে এলো। স... সত্যি একদিন সশরীরে চন্দ্রলোকে যা... যাবে মঙ্গলগ্রহেও। প্রগতি বইকি। তেম... আদিকাল থেকেই মানুষের স্বপ্ন ... ক্রীতদাসপ্রথা উঠিয়ে দেবে। সে স্বপ্ন সাধ... হলো উনবিংশ শতাব্দীতেই। এখন ... ভূমিদাসদের বংশধররাই রাশিয়ার তথা অর্ধে... পৃথিবীর অধিনায়ক। এ যদি প্রগতি না... তবে প্রগতি কাকে বলে? এমনি কত দি... যে কত রাস্তা খুলে গেছে, কত দূর অগ্র... হওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সব মা... তার সমান শরিক নয়, সত্যি। কিন্তু প্র... পদক্ষেপ তো এক আধজন মানুষই ... একজনের পর একজন চলতে চলতেই প...

চলার পথ জনবহুল হয়। গোড়া থেকেই যদি পণ করতে হয় যে সব মানুষকে সঙ্গে না নিয়ে আবিষ্কারে বার হব না তা হলে প্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন সবাই মিলে স্থিতিশীল হওয়াই মোক্ষলাভের উপায়।

রেনেসাঁস বা পুনর্জন্মের ন্যায়সংগত পরিণতি পুনর্বিন্যাস। পুনর্বিন্যাস এক আধ শতাব্দীর ব্যাপার নয়। পুরাতন জীবনযাত্রাকে, সমাজব্যবস্থাকে, মৌল ধারণাকে, বদ্ধমূল সংস্কারকে ঢেলে সাজতে বহু শতাব্দী লেগে যায়। ইংলণ্ড আজ যা হয়েছে তা পাঁচ শ' বছরের পুনর্বিন্যাসের ফলে। রাশিয়া দেরিতে আরম্ভ করেছে বলে তাকে পাঁচ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দুই শতাব্দীতে ঠাসতে হয়েছে। তাতেও কুলোয়নি বলে বিপ্লব বরণ করতে হয়েছে। মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। জাপান আরম্ভ করেছে আরো দেরিতে। তাকেও লাফ দিয়ে এগোতে হয়েছে। লাফ দিতে গিয়ে সে খাদে পড়েছে। হাত পা ভেঙেছে। তবু তার অগ্রগতির বিরাম নেই। কেউ এমন কথা জোর করে বলতে পারে না যে জাপানে কোনো দিন বিপ্লব ঘটবে না। তবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ জাপানের ধনিকরা চক্ষুষ্মান। অনেক সময় চক্ষুষ্মানরাও অবস্থার চাপে বেচাল হয়। আর একটা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জাপানের অবস্থা চক্ষুষ্মানদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। সে ভয় আমাদের এ দেশেও আছে। মহাযুদ্ধের দাবী এমন সর্বগ্রাসী যে মানুষ সে দাবী মেটাতে গিয়ে দেখে সে আর অবস্থার প্রভু নয়, সে অবস্থার দাস। তখন অবস্থাই তাকে যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রিত করে।

জগতের রঙ্গমঞ্চে যেসব শক্তি পাঁচ শতাব্দী ধরে ক্রিয়া করছে তাদের সব ক'টার সূচনা রেনেসাঁস থেকে নয়। অধিকাংশ মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। ধর্মে ধর্মে ভেদ যত না আছে মিল আছে তার বেশী। সব ধর্মই মানুষকে শেখায় অন্তর্মুখী হতে, অন্তরের দিক দিয়ে অগ্রসর হতে। ধার্মিক মাত্রেরই প্রশ্ন হলো, আমি কি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না ঈশ্বরের উল্টো দিকে এগোচ্ছি? যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তিনি বলেন, আমি কি নির্বাণের দিকে বা মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছি না তার বিপরীত দিকে পা চালাচ্ছি? প্রগতি বলতে ধার্মিকরা বোঝেন একটা দেশ-কালাতীত সত্যের অভিমুখে অগ্রগতি। তাকে ইতিহাস বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থ-নীতির মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তা বলে তাকে আফিং গাঁজা বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

স্মরণাতীত কাল হতেই মানুষ এমনভাবে মানুষ হয়েছে যে পার্থিব ঐশ্বর্যকেই তার নশ্বর জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে স্বীকার করতে লজ্জিত হয়েছে। মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে সে বলেছে, "যাতে আমাকে অমৃত না করবে কী করব আমি তা নিয়ে?" নচিকেতার মুখ দিয়ে বলেছে, "বিত্তে পরিতৃপ্ত হতে পারে না মানুষ।" যীশুর মুখ দিয়ে বলেছে, "তোমার তাতে লাভ কী যদি সমগ্র জগৎটাকে পাও অথচ আপনার আত্মাকেই হারাও।" এমনি কত মহা-পুরুষের মুখ দিয়ে কত রকম করে বলেছে যে, এই সব নয়। আরো আছে। সেই আরোকে যদি না পাই তবে আমি ইহলোকে বা ইহকালে অচরিতার্থ। আমার চরিতার্থ তার জন্যে চাই একটা পরলোক বা পরকাল। বা পরজন্ম। সব ধর্মেই মানুষকে এর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এমন কি মহাযান বৌদ্ধধর্মেও। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধনসম্পদ বহুগুণিত করে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব মানুষের মধ্যে সমভাগ করে দিলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই কি সব?

সভ্যতার জন্যে একটা মেটিরিয়াল ভূমি চাই। যা না হলে সে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু তাকেই যারা একান্ত করে দেখে তারা সভ্যতার ঠাটটাকেই সভ্যতা বলে ভুল করে। বৈজ্ঞানিকরা আধপেটা খেয়ে জীর্ণ পোশাক পরে বছরের পর বছর এক একটা পরীক্ষা বা গবেষণা নিয়ে থাকেন। নিজের উপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেন। দার্শনিকদেরও আহার নিদ্রা নেই। কোনো একটা তত্ত্বের পিছনে ধাওয়া করে জীবন কেটে যায়। সংসার করার মতো রসদ জোটে না। করলেও সংসার অবহেলিত হয়। এঁরা যদি সুখের পায়রা হতেন তা হলে রেনে-সাঁসই হতো না। হলে মাঝপথে থেমে যেতো। শিল্পীদের মধ্যে সাংসারিক সাফল্য ক'জনের বরাতে জোটে? জুটলে শেষ বয়সে। যাঁরা সরস্বতীর পূজা করতে গিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা করেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু তাঁদের বাড়ি গাড়ি ও ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সাহিত্যের ঐশ্বর্য নয় বা চিত্রকলার বিভব নয়। সরস্বতীর ভাণ্ডারে যা জমে তা দিয়েই সভ্যতার বিচার হয়ে থাকে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তো আজ আছে কাল নেই।

যুদ্ধ কোনো মতে ঠেকিয়ে রাখলেও এই সভ্যতার জন্যে মাথাব্যথার যথেষ্ট কারণ আছে। অনেকের মতে রেনেসাঁসটাই একটা ভুল মোড়। মানুষ ভুল মোড় নিয়ে ভুল পথে চলেছে। তাকেই ভাবছে অগ্রগতি। এখন তার কর্তব্য হবে প্রগতির অহঙ্কার ভুলে নম্রভাবে পশ্চাদ অপসরণ। ফিরে গিয়ে ঠিক মোড় নিতে হবে। তা হলেই তার জীবনে অখণ্ডতা আসবে। তখন বিজ্ঞান আর দর্শন আর ধর্ম আর সমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা পরস্পরবিরোধী হবে না। একই মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তখন স্পিরিচুয়াল আর মেটিরিয়াল একই লক্ষ্যের ইশারা করবে। বিপরীত লক্ষ্যের নয়। সত্যিকার প্রগতির অপরিহার্য সর্ত হচ্ছে কয়েক শতাব্দী পেছিয়ে গিয়ে তারপরে সব দিক রক্ষা করে সবাইকে নিয়ে অগ্রসর হওয়া।

টলস্টয় কিন্তু কয়েক শতাব্দী পশ্চাদ অপসরণেই সন্তুষ্ট হবেন না। ফিরে যেতে হবে আদি খৃষ্টান যুগে। যখন প্রেমধর্ম রাজধর্ম হয়নি, রাজধর্ম হয়ে বিকৃত হয়নি। সেই মোড়ে ফিরে গিয়ে সেইখান থেকে নতুন করে যাত্রারম্ভ হবে। নতুন পথে। যে পথের এক ধারে সংঘ অপর ধারে রাষ্ট্র সে পথে নয়। যে পথের একধারে অহিংসা অপর ধারে গ্রামোদ্যোগ সেই পথে। সংঘ আর রাষ্ট্র
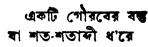
মানুষকে বিপথগামী করেছে ঐশ্বর্যের অভিমুখে। ঈশ্বরের অভিমুখে সুপথগামী করেনি। সাধু সন্তেরা শত হস্ত দূরে থেকেছেন। কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন।

টলস্টয়ের অন্বিষ্ট আদি খ্রীষ্টান জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য মানবপ্রেমকে সূর্য করে তার সৌরমণ্ডলে আর সমস্ত বিষয়কে সন্নিবেশ করা। তার সঙ্গে যা বেখাপ তাকে বাদ দিতে হবে। ভয়ের শাসন তার সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব রাষ্ট্র বাতিল। সংঘও তো রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার পাপের ভাগী হয়েছে। রক্তের দাগে দাগী হয়েছে আপন শক্তির মদে অন্ধ হয়ে। অতএব সংঘ নাকচ। কিন্তু এসব বাদ গেলেও ধর্ম থাকবে, নীতি থাকবে, যীশুর বাণী ও আদর্শ থাকবে, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম থাকবে। প্রেমের শাসনে মানুষ সুশৃংখল জীবন যাপন করবে। সভ্যতার বুনিয়াদ এমন গভীর করে পাততে

হবে যে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বিরোধ বাধবেই না। যদি বাধে তার জন্যে বিহিত রয়েছে খ্রীষ্টানুশাসন—মন্দের প্রতিরোধ কোরো না।

টলস্টয়ের মতে অপ্রতিরোধই প্রকৃত প্রতিরোধ। অবশ্য যিনি প্রতিরোধ করবেন তিনি আপনি ভালো হবেন। মন্দ যাতে প্রতিপক্ষের দিক থেকে পরোক্ষ সহায়তা না পায়। টলস্টয়ের ব্যাখ্যায় যা অসম্পূর্ণ ছিল গান্ধী এসে তাকে সম্পূর্ণতা দেন। প্রতিরোধ করতে হবে প্রেম দিয়ে, আত্মার তেজ দিয়ে বীরের অহিংসা দিয়ে। মন্দ হয়ে নয়, মন্দ ভেবে নয়, মন্দ উপায়ে নয়, কাপুরুষের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে নয়। গঠনের কাজ করতে করতে। চিত্তশুদ্ধিপূর্বক।

সংঘ বিমুখ চিন্তা রেনেসাঁসের পূর্বে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। তার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রোটেস্ট করলেন তাঁরাও প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন যে সংঘ না হলে চলে না। একচ্ছত্র সংঘের পরিবর্তে তাঁরা স্থাপন করলেন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একাধিক সংঘ। রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হলো না তাঁদের সেইসব সংঘের। পরবর্তীকালে ছোট ছোট কয়েকটি সংঘ রাষ্ট্রের থেকে তফাৎ থাকে। রাষ্ট্রের থেকে সংঘের তফাৎ থাকার নতুন ঐতিহ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা গ্রহণ করেন। তাঁদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব আছে কিন্তু রাষ্ট্র আর সংঘ নিঃসম্পর্কীয়। যেমন ছিল আদি খ্রীষ্টান যুগে। সংঘ জিনিসটাই যাঁদের কাছে অসহ্য তাঁদের কেউ বাধ্য করে না যোগ দিতে। সংঘ না থাকলেও ধর্ম থাকে, যেমন ছিল যীশুর আপন জীবনে।

রাষ্ট্রের কথা আলাদা। রাষ্ট্রবিমুখ চিন্তাও রেনেসাঁসের পূর্বে ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো না। বরং দেখা গেল রাষ্ট্র আরো নিরঙ্কুশ হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক সংঘ ছিল তার ছত্রাধীন সকল রাষ্ট্রের উপরে। প্রোটেস্টাণ্ট সংঘগুলিকে কোনো রাষ্ট্রই উপরওয়ালা বলে স্বীকার করল না। বরং রাষ্ট্রই হলো উপরওয়ালা। অনিবার্য হলো রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তা। ইংলণ্ডের মতো যে দেশে প্রজা প্রতিনিধিদের হাতে অঙ্কুশ চলে যায় সে দেশে তেমন নয় যেমন ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রাশিয়ায়: কথা উঠল রাষ্ট্র বলে কেন একটা কিছু থাকবে! কার স্বার্থে? পুলিস তো দেখা যায় ধনীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যেই হয়েছে। আর সৈনাদল হয়েছে অন্যান্য দেশ দখল করে ধনীদের ধনবৃদ্ধির জন্যেই। অথবা তাদের অন্যদেশীয় প্রতিযোগীদের শক্তি হ্রাস করার জন্যেই।

বাকুনিন প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ করার কল্পনা করলেন। মার্ক্স বললেন, রাষ্ট্র একদিন আপনা হতেই শুকিয়ে যাবে। সুতরাং তার মূলোচ্ছেদ

করতে হবে না। আপাতত তাকে করায়ত্ত করে শোষিত শ্রেণীর কাজে লাগানো চাই। করায়ত্ত করার যদি কোনো ভদ্র উপায় না থাকে তবে অভদ্র উপায় অবলম্বন করতে হবে। এটা ইতিহাসের নির্বন্ধ। তুমি আমি করছিনে, ইতিহাস করছে। মার্ক্স একটা শাস্ত্র লিখে শ্রেণী সংঘাতের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেলেন। আর নৈরাজ্যবাদীরা কতকগুলি ব্যক্তিকে বধ করেই রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ পর্ব সমাপন করল।

রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তা ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে কাজে লাগানোর চিন্তাই এখন প্রবল। অধিকাংশ দেশেই প্রজা প্রতিনিধিদের হাতে অংকুশ এসে গেছে। দরিদ্রতমেরও ভোট দেবার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। সে যদি টাকার জন্যে ভোট বেচে তবে সেটা রাষ্ট্রের দোষ নয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা এখন ঘোরতর সংঘবদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এক্তারে লক্ষ লক্ষ ভোট। শ্রমিকরা ভোট দেয় ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশে। শ্রমিক স্বার্থের ভিত্তিতেই ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে ধার্মিকরাও আর একপ্রস্থ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাপন করেছেন। রোমান ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়ন। তেমনি ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন করাও চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় ধর্মের রথচক্র-- মুখর। ক্যাথলিক ধর্মের। ভোটগুলো যদি ধার্মিকরা না পান কমিউনিস্ট বা সোশিয়ালিস্টরা পাবে। তাতে ধর্ম আর অর্থ দুই বিপন্ন হবে। মোক্ষও কি বিপন্ন হবে না?

আবার এমন দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি যে, আমেরিকার ক্যাথলিকদের ছোট্ট একটি গোষ্ঠী আছে, নাম "ক্যাথলিক ওয়ার্কার।" এঁরা গ্যারিসন, থোরো আর গান্ধীর ঐতিহ্য অনুসরণ করতে চান। যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন না বলে এঁরা ইনকাম ট্যাক্স না দিয়ে জেলে যান। পরমাণবিক বোমার ভয়ে যেসব আত্মরক্ষার আশ্রয় নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে ঢোকার জন্যে যখন সাইরেন বাজানো হয় তখন এঁরা তার বিরুদ্ধতা করে কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ ও গঠনকর্ম এঁদের মূলনীতি। এমনি অনেক খাতে টলস্টয়ের চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে। একেবারে নিষ্ফল হয়নি। হতে পারে না। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রের উপর গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তার দাবী অনেক সময় বিবেকবিরুদ্ধ। ইচ্ছা করলেই সে নাগরিকদের যুদ্ধের জন্যে কন্সক্রিপ্ট করতে পারে। নরনারীর সমান অধিকার যখন তখন সমান দায়িত্ব। নারীও যে একদিন যুদ্ধের জন্যে কন্সক্রিপ্ট হবে না এমন কোনো অঙ্গীকার কে দিয়েছে? প্রথম দিকে হয়তো প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অত্যাবশ্যক হলেও হতে পারে। আধুনিক যুদ্ধ সর্বাত্মক। হার জিতের প্রশ্নই সেখানে একমাত্র প্রশ্ন। নারীর নারীত্ব বা শিশুর শিশুত্ব যদি জয়ের অন্তরায় হয় তবে কেউ সে প্রশ্ন কানে তুলবে না। যার বিবেকে বাধবে সে জেলে পচবে বা ফাঁসীতে ঝুলবে। দেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত হবে।

শুধু যুদ্ধকালে যুদ্ধবিরোধিতা করলেই চলবে না, শান্তিকালেও সক্রিয় হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে, তার জন্যে খাটতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আজকাল এমন কোনো বড়গোছের শিল্প নেই যার সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নেই, যা যুদ্ধের কাজে লাগবে না। অগত্যা ছোটগোছের শিল্পের উপর ঝোঁক দিতে হয়। চরকা কাটতে হয়, খাদি পরতে হয়। সত্যাগ্রহের সঙ্গে খাদির সেই সম্পর্ক মিলের কাপড়ের সঙ্গে যুদ্ধের যে সম্পর্ক। সেইজন্যে গান্ধীকল্পিত পতাকায় চরকা আঁকা। সেটা শান্তিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতীক। সত্যাগ্রহের স্মারক।

মানুষের যদি হৃদয় বলে কিছু না থাকে, যদি বিবেক বলে কিছু না থাকে, কিংবা থাকলেও সুবিধা মতো সেসব বিসর্জন দেওয়া চলে তা হলে সভ্যতার জন্যে অত গর্ব করার কী আছে? দেশসুদ্ধ মানুষকে যুদ্ধের জন্যে সব সময় প্রস্তুত রাখার অর্থই হলো হৃদয় আর বিবেককে নিম্ন মূল্য দেওয়া। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ অনেকবার ঘটেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাতে লিপ্ত হয়নি। তাদের কন্সক্রিপ্ট করার প্রয়োজনই হয়নি। তাদের উৎপাদন যুদ্ধার্থে নয়। তাদের হৃদয় অসাড় হয়নি, বিবেক পীড়িত হয়নি। সুক্ষ্মতর বৃত্তিগুলি বিমর্দিত হয়নি। প্রকৃতির হাতে, মানুষের হাতে বহুভাবে তারা নির্যাতিত হয়েছে, কিন্তু সেসব যন্ত্রণা তাদের দেহের উপর দিয়ে গেছে, হৃদয়কে বা বিবেককে নিষ্পিষ্ট করেনি। বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে রেনেসাঁসকেও দায়ী করা চলে না। এটা শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী। ফলিত বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এর জনক জননী। যেখানে জননী আরেক সেখানেও জনক সেই একই। দুই মিলে হৃদয়কে ও বিবেককে উপবাসী রাখছে। রাষ্ট্র এর প্রতিফলন। মূল্যবোধ

বদলালে রাষ্ট্ররূপ বদলাবে। কিন্তু রাষ্ট্র শুকিয়ে যেতে বা নির্মূল হতে বহু শতাব্দী দেরি।
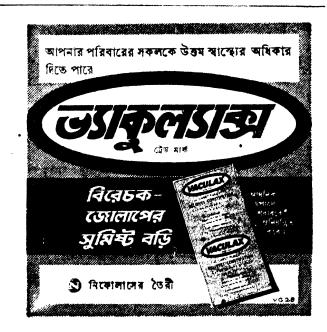
আদি খ্রীস্টান যুগে বা আদি বৌদ্ধ যুগে ফিরে যাবার পথ সব সময়েই খোলা রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের সামনে। শহীদ হতে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে না, প্রবাদবাক্য যাই বলুক। বিকল্প সমাজব্যবস্থা বা বিকল্প সভ্যতা এই দু' হাজার বছরের মানব অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করে নয়, একে আত্মসাৎ করেই বিবর্তিত হবে। রেনেসাঁসের পূর্ব ও উত্তর উভয় কালই তার অঙ্গীভূত হবে। বিভিন্ন সভ্যতা তাতে স্রোত মেলাবে। স্পিরিট আর ম্যাটার দুই মিশবে। ইতিহাস সেই অভিমুখেই চলেছে। যদিও তার চাল আমাদের বেদনা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকেও দিয়েছিল তাঁর শেষ বয়সে।

কবি তাঁর ইংরেজী ও বাংলা বিভিন্ন ভাষণে ও প্রবন্ধে বার বার বলেছেন যে,

"সভ্যতা" কথাটি এসেছে "সিভিলিজেশন" থেকে। আমরা ওটিকে নিয়েছি ওটির স্বরূপ না জেনে না চিনে। আমাদের নিজেদের শব্দ ছিল "ধর্ম" বা "সদাচার"।

অনেকের জানা নেই বোধ হয় যে, "সিভিলিজেশন" কথাটি ইংলণ্ডেও অজ্ঞাত-কুলশীল ছিল দুই শতাব্দী পূর্বে। ডক্টর জনসন ওটিকে তাঁর প্রসিদ্ধ অভিধানে ঠাঁই দিতে রাজী হননি। আর তিনিই তো তখনকার দিনের সাহিত্যিক ডিক্টেটর। কথাটির উদ্ভব "সিভিলিটি" থেকে। সেটির অর্থ ছিল নাগরিকসুলভ ভব্যতা। গ্রাম্যতার বিপরীত। ইতিমধ্যে বদলাতে বদলাতে অন্য অর্থ দাঁড়িয়েছে। বর্বরতার বিপরীত। কারো কারো মতে পশুত্বের বিপরীত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফরাসী ঔপন্যাসিক দুআমেল তাঁর যুদ্ধের কাহিনী লিখে নাম দেন "সিভিলিজেশন : ১৯১৪-১৮"। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও মনে আঘাত লেগেছিল। তাঁরই মতো বহু পাশ্চাত্য মনীষীর। তাঁরা তো ওকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে নিন্দা করে হাত ধুয়ে ফেলতে পারতেন না। কিন্তু তাঁরাও ক্লেশ বোধ করতেন বলে শ্লেষ দিয়ে ঢাকতেন। মানুষ যদিও লক্ষ লক্ষ বছর হলো পশুদশা অতিক্রম করেছে তবু তার ভিতরে পশুস্বভাব সুপ্ত রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনায় ও ঘাত প্রতিঘাতের বেদনায় তার সুপ্তিভঙ্গ হয়। সদাজাগ্রত পশুর পশুত্বকে যদি ভাবি সভ্য মানুষের সভ্যতা তা হলে সেটা হবে সভ্যতার প্রতি অবিচার। তেমনি মানুষ যদিও হাজার হাজার বছর হলো বর্বরদশা ছাড়িয়ে এসেছে তবু তার ভিতরে বর্বরপ্রকৃতি গুপ্ত রয়েছে। স্বদেশের সমাজের চোখের আড়ালে যখন কোনো দূর দেশে গিয়ে উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য স্থাপন করে তখন আদিবাসী বা অধীনদের কাছে লেশমাত্র প্রতিরোধ পেলেই তার বর্বরপ্রকৃতির আবরণ খসে পড়ে। তেমন বর্বরের বর্বরতাকে যদি ভাবি সভ্য মানুষের সভ্যতা তা হলে সেটাও হবে সভ্যতার প্রতি অন্যায়। সত্য হচ্ছে এই যে সভ্যতা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ভেঙে পড়ে। যেমন স্বাস্থ্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ভেঙে পড়ে। সাময়িক অসভ্যতা বা অস্বাস্থ্য নিশ্চয়ই পরিতাপের বিষয়, তার নিন্দা করব এক শ' বার। কিন্তু কেমন করে বলব যে সেইটেই সভ্য মানুষের আসল চেহারা? ধর্মের বদলে অধর্ম, সদাচারের বদলে কদাচারও তো বড় কম দেখা যায়নি প্রাচীন প্রাচ্যদেশে।

যুদ্ধের প্রস্তুতিও যুদ্ধের অঙ্গ। সেটাও একটা অসুখের সূচনা। টমাস মান-এর প্রসিদ্ধ গল্প "ভেনিস-এ মৃত্যু" লেখা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের বছর তিনেক আগে। যুদ্ধের নামগন্ধ নেই তাতে, কিন্তু মান-এর ক্লিনিকাল দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে জার্মানীর অসাধ্য অসুখ ও ইউরোপের পতনশীলতা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও সে অসুখ থামে না। কারণ যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ও যুদ্ধের অঙ্গ। সে অধ্যায় শেষ হতে না হতে শুরু হয়ে গেল পুনঃপ্রস্তুতি। কাজেই অসুখ থামল না, বাড়ল। কেবল জার্মানীর অসুখ না বলে পাশ্চাত্য জাতিদের অসুখ বলাও চলে। কিন্তু জাপানই বা তালিকা থেকে বাদ পড়বে কেন? তা হলে বলতে হয় সভ্যতার অসুখ। সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ নয়, যদিও কেউ কেউ তেমন কথাও বলে থাকেন। সভ্যতা স্বভাবত সুস্থ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল প্রাক-সামরিক ইংরেজী কাব্য সাহিত্য, ইউরোপীয় লিবারল মতবাদ। সেসব ছিল সুস্থ মানুষের কীর্তি। উত্তর-সামরিক ইংলণ্ড তাঁকে নিরাশ করে। বহু ইংরেজকেও উদ্বিগ্ন করে। তাঁরাও হালে পানি পান না। কিন্তু ইংলণ্ডের হৃদয়বান ও বিবেকীরা একদিনও নিষ্ক্রিয় বসে থাকেননি। সংশোধনের চেষ্টা প্রতিদিন অক্লান্ত। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও এ কথা কমবেশী খাটে। কিন্তু ইতিহাসের আবর্তে তাঁরাও নিঃসহায়।

শুধু সামরিক অসভ্যতার উপর যদি নজর রাখি তবে পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ পাব না। সমস্ত স্খলনপতন সত্ত্বেও পুনর্বিন্যাসের কাজ পাঁচ শতাব্দী ধরে চলেছে। পাঁচ মহাদেশ জুড়ে চলেছে। যেখানে অরণ্য ছিল সেখানে বসতি হয়েছে, যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে জমি হয়েছে, যেখানে পর্বত ছিল সেখানে রেলপথ বা আকাশপথ হয়েছে, যেখানে নদী ছিল সেখানে সেতু হয়েছে। অনেক শিল্প ধ্বংস হয়েছে তা ঠিক, কিন্তু অনেক শিল্পের পত্তন হয়েছে। কৃষি অবহেলিত হয়েছে সত্য, কিন্তু চা কফি রবার ইত্যাদির প্ল্যান্টেশন হয়েছে। নতুন নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছে, কিন্তু পুরাতন মহামারী রোধ করা গেছে। এইভাবে হিসাবনিকাশ করলে খরচের চেয়ে জমার অঙ্কই মোটের উপর বেশী। নীতি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও প্রচুর কাজ হয়েছে। তবে তুলনায় পেছিয়ে রয়েছে। সৌন্দর্যের বেলাও এ কথা খাটে। এই সব দিকে না এগোলে মানুষের অগ্রগতি একপেশে হবে, বিকাশ মধ্যভারী হবে। তা ছাড়া সব মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে না পারলে কতক মানুষের চলা ব্যাহত হবে। বিপ্লব তো এমনি করেই ঘটে। যেখানে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সেখানে বিপ্লব ঘটে না।

যুদ্ধের মতো বিপ্লবও আমাদের কালের ঐতিহাসিক রক্তস্নান। কিছুদিনের জন্যে মানুষ পশু হয়ে যায়। যাকেই সন্দেহ করে তাকেই মেরে নিঃশেষ করে দেয়। পরে অবশ্য পস্তায়। কিছুদিনের জন্যে সভ্যতার ক্রম ভঙ্গ হয়। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের জোড় মেলে না। মানুষ এ বিচ্ছেদ অতিক্রম করে। পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলেও পূর্বের সাহিত্যকে, সঙ্গীতকে, নৃত্যকে আপনার মনে করে। বৈপ্লবিক

প্রেরণা চিরদিন থাকে না। কিন্তু মানবাত্মার অমর সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে আনন্দ জোগায়। কে তাকে মেরে নিঃশেষ করবে! যা ভাঙবার যোগ্য, যা ভেঙে পড়ছিল, যা ভেঙে পড়তই বিপ্লব তাকেই ভাঙে। সব কিছুকে ভাঙে না, ভাঙতে চায় না, ভাঙতে পারে না। যে রাজন্যের বা যে অভিজাত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ফুরিয়ে এসেছে, তারা যদি সময়ে প্রস্থান করে, তা হলে রঙ্গমঞ্চের উপর পতন ও মৃত্যু অভিনীত হয় না। যাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অবধারিত ও আসন্ন তাদেরকে মঞ্চ ছেড়ে দিলে তো তাদেরও আক্রোশ থাকে না। হাজার পুরাতন হলেও কোনো সমাজ ব্যবস্থাই সনাতন নয়, কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণীই চিরস্থায়ী নয়। হাজার ভালো হলেও কোনো জিনিসই বরাবর টেকে না। একটা ভালো জিনিসের জন্যে কিংবা আরো ভালো জিনিসের জন্যে জায়গা খালি করতে হয়। পুনর্বিন্যাস না করলেই নয়। নতুন সমাজ ব্যবস্থার আবশ্যক আছে। রেনেসাঁসের মধ্যেই তার ইঙ্গিত নিহিত। মানুষ তার আবেষ্টনের পরিবর্তন সাধন করবে, পশুর মতো সহ্য করবে না।

আবার সত্যের খাতিরে এটাও স্বীকার না করে গতি নেই যে, বিপ্লবের দ্বারা যুদ্ধের দ্বারা যেমন শক্তির মুক্তি ঘটে তেমন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দ্বারা নয়। যে রাশিয়ানরা সাইবেরিয়া চষে ফেলছে, পাহাড়কে পাহাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে, চাঁদের বুড়ী ছুঁয়ে আসা হাউই ছুঁড়ছে, একদিন সশরীরে পারে পৌঁছে যাবেও, এ কি বিপ্লবসঞ্জাত ডাইনামিজম ভিন্ন সম্ভব হতো? রাশিয়ার পুনর্বিন্যাসের জন্যে এর দরকার ছিল যদি বলি তা হলে কি ভুল বলা হবে? তেমনি জার্মানীর পুনর্বিন্যাসের জন্যে প্রয়োজন ছিল দু' দুটো মহাযুদ্ধের। নইলে জার্মানী ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পায়িত হতে পারত না। সে এক শ' বছর পিছিয়ে ছিল। সমান সমান। শুনতে পাই পরাজয় সত্ত্বেও জার্মানীই নাকি ইংলণ্ডের চেয়ে অগ্রসর। তার কারণ কি এই নয় যে, পরাজয়ের মুছে ফেলার জন্যে তার জীবনে একপ্রকার ডাইনামিজম জেগেছে? সেটা ইংলণ্ডের জীবনে অনুপস্থিত। জাপানের সেই ডাইনামিজম সক্রিয়। উদ্যোগ ছিল ইউরোপীয় জাতিদের ফেলতে, তাদের সমান হতে। জয়গ্লানি মোচন করতে, ততোধিক অগ্রসর হতে। পুনর্বিন্যাস কি অন্য উপায়ে সম্ভব হতো?

অথচ এই ডাইনামিজম সত্যের ধার ধারে না, ন্যায়ের ধার ধারে না, নীতির ধার ধারে না। ধর্মকে ও নিজের পাপ সমর্থন বলে ও বাধা করে। ধৃতরাষ্ট্র' লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণীকে করে চালান দেওয়া হলো সাইবেরিয়ায়, তা না হলে সাইবেরিয়া তেমনি খাল কাটার জন্যে পাঠানো হলো। লক্ষ মানুষকে তুচ্ছ কারণে বিচারশালায় দণ্ডিত করে কাটা যেতো না। যুদ্ধের সময় তো সেই নেপোলিয়নের আমলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই চালু। বাকী ছিল ইংলণ্ড। সেও প্রথম মহাযুদ্ধের শেষপর্যায়ে স্থির থাকতে পারল না। বিবেকীদের জেলখানায় পাঠিয়ে ধরে যুদ্ধে চালান দিল। দ্বিতীয়

যুদ্ধের সময় বিপদ এত আসন্ন যে সেটুকু তর সইল না। গোড়া থেকেই কনস্ক্রিপশন। এতদিনে ওটা একটা বনেদী প্রথায় পরিণত হয়েছে। আমেরিকাও ইংলন্ডের মতো ইতস্তত করেছিল। এখন তেমনি প্রস্তুত। লাল চীন তো কনস্ক্রিপশনের চূড়ান্ত করেছে শুনি। গ্রামের এক ভাগ কৃষক, এক ভাগ শ্রমিক ও এক ভাগ সৈনিক। সবাই কনস্ক্রিপট। এখন আমরাই বাকী। এর জন্যে দুনিয়ার লোক আমাদের ঈর্ষা করে। যুদ্ধকে এক হাতে বিপ্লবকে আরেক হাতে ঠেকিয়ে না রাখতে পারলে আমরাও বাদ যাচ্ছিনে। কিন্তু কেবল ঠেকিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়। নৈতিক বিকল্প জোগাতে হবে যুদ্ধের, জোগাতে হবে বিপ্লবের।

সভ্যতার সর্বপ্রধান সমস্যা হলো কেমন করে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, কেমন করে সেটাকে বেগবান করতে হবে, কেমন করে তার মধ্যে মানুষকে টানতে হবে, কেমন করে সবাই মিলে এগিয়ে যেতে হবে, অথচ প্রাণের মূল্য জীবনের মূল্য ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য প্রেমের মূল্য সৌন্দর্যের মূল্য সত্যের মূল্য ন্যায়ের মূল্য শুভবুদ্ধির মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কেবল কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করতে হবে যে কতক মানুষের কাছে এগুলিও জীবনমরণের ব্যাপার। কতক লোককে স্বেচ্ছায় জেলে যেতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় গুলী খেতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় বিপদ বরণ করতে হবে, কতক লোককে স্বেচ্ছায় সেবাকর্মে বা গঠন-কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর প্রত্যেকটাই ত্যাগের পথ। হাঁ, কতক লোককে স্বেচ্ছায় সৃষ্টির দায় নিতে হবে। লোকে হয়তো জানবে না যে সেটাও ত্যাগের পথ। রবীন্দ্রনাথ তার জন্যে জীবনব্যাপী ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নইলে, বড়লোকের ছেলে, তাঁর কিসের অভাব ছিল? অনায়াসেই তিনি সিভিলিয়ান ব্যারিস্টার বা সওদাগর হতে পারতেন। নিদেনপক্ষে ডার্নাপটে জমিদার।

সভ্যতা তার দুই দিক মেলাতে পারছে না এটা স্পষ্ট। প্রাণের মূল্য জীবনের মূল্য ইত্যাদি যেসব মূল্যের নাম করেছি সেসব মূল্যের দেনা চুকিয়ে তার পরে আর অতখানি ডাইনামিজমের সঙ্গে পার্থিব উন্নতি করা যায় না। অপর পক্ষে অতখানি ডাইনামিজমের সঙ্গে পার্থিব উন্নতি করার পর প্রেমের মূল্য সত্যের মূল্য প্রভৃতির জন্যে আর তেজ বীর্য থাকে না। অক্ষমের বিলাপ রাষ্ট্রনায়কদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। সভ্যতা দুদিক মেলাতে না পেরে দ্বিতীয় দিকেই ঝুঁকেছে। এতে আদর্শ-বাদীরা সায় দিতে নারাজ। কিন্তু প্রথম দিকে ঝুঁকলে কি বস্তুবাদীরা সেটা মেনে নিতেন? আর বস্তুবাদীরাই তো এখন সর্বত্র ক্ষমতাশালী। ধনতন্ত্রও কি বস্তুবাদী নয়? আদর্শবাদীরা কোথাও সুখী নন। কারণ কোনোখানেই তাঁদের কথায় কাজ হয় না। অথচ তাঁরা যে একেবারে ব্যর্থ তাও নয়। তাঁরা বীজ বুনে যান।

"জীবনের প্রথম প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" রবীন্দ্রনাথের মতো এ বিশ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য লিবারলদেরও ছিল। তাঁরা নিজেরাও ভুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকেও ভুলিয়েছিলেন। টলস্টয়কে ভোলাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যে সময় সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে-ছিলেন টলস্টয় সে সময় সমস্ত প্রাণ দিয়ে অবিশ্বাস করেছিলেন। সে অবিশ্বাস গান্ধীর মনেও সঞ্চারিত করেছিলেন। তাই তাঁদের "বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল" না।

সংকট যদি দেশনামাঙ্কিত বিশেষ কোনো এক সভ্যতার হতো তা হলে কবি "সভ্যতার সংকট" না লিখে "পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট" বা "পশ্চিমের অত্যাচারে ভারতীয় সভ্যতার সংকট" লিখতেন। তা তো তিনি করেন নি। তিনি সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার সংকটের কথাই বলেছেন। বলেছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। গেয়ে উঠেছেন, "ঐ মহামানব আসে।" বলা বাহুল্য, "মহামানব" কথাটির অর্থ এখানে মহাপুরুষ বা মহান ব্যক্তি নয়। এ হচ্ছে সেই অর্থে "মহামানব" যে অর্থে এর ব্যবহার হয়েছিল "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" মধ্যজীবনে যাকে কবি দেখেছিলেন তাঁর স্বদেশে জীবনের শেষপ্রান্তে তাকেই দেখলেন তাঁর স্বাবিশ্বে। মহামানব হচ্ছে বিশ্বমানব বা সর্বমানব। মানব ঐক্যের অভ্যুদয় তিনি আসন্ন বলে জেনেছিলেন।

মহামানব যদি জাগে তবে সঙ্কট মোচন হবে বৈকি। কিন্তু তার আগে ভালো করে রোগ নির্ণয় করতে হবে। সংকটটা কেন? কী নিয়ে? এই ভারতের ঐক্য একদিন কবির কাছে ধ্রুব সত্য ছিল। অথচ এই ভারতই ভেঙে দুভাগ হয়ে গেল। খ্রীস্টীয় সঙ্ঘের ছত্রতলে পশ্চিমের মানুষও তো একটা খ্রীস্টেনডম রচনা করেছিল। কোথায় সে আজ? মানব ঐক্য যেমন বিভিন্ন ধর্মমতের দ্বারা বিভক্ত হয়েছিল তেমনি বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা বিভক্ত হয়েছে ও হতে যাচ্ছে। এসব মতবাদ যে কেবল বিভিন্ন তাই নয়, পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে কমিউ-

নিজেদের না হয় একটা বোঝাপড়া হলো, কিন্তু রেনেসাঁসের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী জীবনাদর্শের বোঝাপড়া আরো কঠিন। আবার সেই জীবনাদর্শের সঙ্গে আদি খ্রীষ্টান বা আদি বৌদ্ধ জীবনাদর্শের বোঝাপড়া অধিকতর কঠিন। টলস্টয় বা গান্ধী যে কোনো অবস্থায়ই অস্ত্র ধরবেন না। মানুষের কাছে দাবি করবেন বীরের অহিংসা।

মহামানব ধীরে ধীরে জাগছে। ইউনাইটেড নেশনস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তার বার্তা বহন করে এনেছে। কিন্তু এখনো রাত অনেক বাকী। এখনো রোগ নির্ণয় হয়নি। এখনো স্থির হয়নি সভ্যতার অসুখ করেছে, না সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ। গান্ধীজী মনে করতেন আধুনিক সভ্যতা নিজেই একটা অসুখ, সে অসুখ প্রথমে ইউরোপের হয়, তার পরে ইউরোপ তাকে দিকে দিকে ছড়ায়, ভারতেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে কলকাতা বম্বে প্রভৃতি শহরগুলোয়, সে ছোঁয়াচ তিনি গ্রামগুলির গায়ে লাগতে দেবেন না। আধুনিক সভ্যতা বলতে তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বুঝতেন না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বলতে বুঝতেন খ্রীষ্টান সভ্যতা, যা ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। তার সঙ্গে তাঁর কোনো ঝগড়া ছিল না। তাঁর ঝগড়া একালের বৈজ্ঞানিক নাগরিক যান্ত্রিক নিরীশ্বর সভ্যতার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধীজীর অনুরূপ নয়। তিনি সারাজীবন চেষ্টা করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে মেলাতে। এই কাজে যখনি যেদিক থেকে বাধা পেয়েছিলেন তখনি সেইদিকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বা অভিমান করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যেটা দানবিক বা বর্বর দিক সেটার নিন্দাবাদ "নৈবেদ্য"তেই যথেষ্ট তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, "সভ্যতার সংকট"-এর অপেক্ষা রাখেনি। সেই যে "দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী" সে তো তাঁর বহুকালের চেনা। "চিতার আগুন পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার বিস্ফুলিঙ্গ" বলেই পর মুহূর্তে বলেছেন, "স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।" তার মানে কি এই হলো যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাটাই অসভ্যতা বলে বর্জনীয়? তাই যদি হতো তবে প্রাচ্য বিদ্যা ও প্রতীচ্য বিদ্যাকে একনীড়ে মিলিত করার জন্যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে হতো না। বরাবরই এ বিশ্বাস কবির মনে দৃঢ়মূলে ছিল যে আধুনিক ইউরোপের একটা মানবিক দিকও আছে, সেটাই তার প্রকৃত সত্য, সেই সত্যকে স্বীকার না করে মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরে যাওয়াটা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। সেটাকে তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের অন্ধকার বা পশ্চাৎপদ দিক। সেদিক থেকে আগেই তিনি বাধা পেয়েছিলেন, তাকে "শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদী" বলে নিন্দা করেছিলেন। তাঁর "দুর্ভাগা দেশ"কেও বাক্যবাণে জর্জর করেছিলেন।

না। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার উপর এতদূর অপ্রসন্ন ছিলেন না যে তাকে একটা অসুখ বলে এক কথায় খারিজ করবেন। যখনি কোনোরূপ বিশেষণ না বসিয়ে "সভ্যতা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তখনি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা অর্থে করেছেন বললে ভুল হবে না। "সভ্যতা"কে কি পাইকারিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়? শক্তি যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ করা চাই, সংস্কার যাই বলুক না কেন। ইতিহাস যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ করতে হয়, ঐতিহ্য যাই বলুক না কেন। জ্ঞানপিপাসা ও রসপিপাসা যেটুকু গ্রহণ করতে বলে সেটুকু গ্রহণ না করলে ক্ষতি, স্বাদেশিকতা যাই বলুন না কেন। "সভ্যতা"কে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের দিক থেকে আপনার করে নিয়েছিলেন বলেই তার সংকট তাঁকে এতখানি বিচলিত করেছিল। অভিমান ছিল ইংরেজের উপরে, ঘৃণা ছিল সাম্রাজ্যবাদের উপরে, কিন্তু "সভ্যতা"র উপরে যা ছিল সেটা তার অন্তর্নিহিত মানবিকতার উপর বিশ্বাস। "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" তাঁর এই উক্তির মধ্যস্থিত 'মানুষ'

ইউরোপীয় সভ্য মানুষ। যার দানবিকতায় তিনি বিক্ষুব্ধ। অথচ যার মনুষ্যত্বে তিনি বিশ্বাসবান।

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে গ্রহণও করবেন না, নির্বিচারে বর্জনও করবেন না। বিচারের অধিকার নিজের হাতে রাখবেন। জাতীয়তাবাদীদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। বর্জনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ তিনি অসহযোগ আন্দোলনের দিন ঘোষণা করে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। আবার গ্রহণবাদ সম্বন্ধেও তাঁর দ্বিধা তিনি কখনো গোপন করেন নি। চীনদেশে গিয়ে একটি বক্তৃতায় বলেন,

"The word 'civilization' being a European word, we have hardly yet taken the trouble to find out its real meaning. For over a century we have accepted it, as we may accept a gift horse, with perfect trust, never caring to count its teeth. Only very lately we have begun to wonder if we realize in its truth what the Western people mean when they speak of civilization." ("Civilization and Progress", lecture delivered in China in 1924.) see "Talks in China".)

গান্ধীজী শুনলে বলতেন, ঐ খয়রাতী ঘোড়াটাকে ওর আস্তাবলে ওয়াপস পাঠালেই তো হয়। দাঁত না গুনে গ্রহণ করেছিলে বলে চিরকাল পুষতে হবে এমন কী কথা আছে? কিন্তু গুরুদেবের মনটা অতখানি লজিক্যাল ছিল না। জীবনের শেষপ্রান্তেও তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেন নি। "মহামানবে"র উপরে বরাত দিয়ে মহাবিদায় নেন। বছর কয়েক পরে ইংরেজও চিরবিদায় নিল। কিন্তু ঘোড়াটা থেকে গেল। ওটার সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা এখনো কাটেনি। বর্জনবাদীরাও নিরস্ত হননি।

ওদিকে পশ্চিম ইউরোপের পুনর্বিন্যাস জোর কদমে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী অধ্যায় শেষ হয়ে এল। পুঁজিবাদী অধ্যায় ইতিমধ্যে এমন একটা মোড় নিয়েছে যে শ্রমিকরাও পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত profit motive স্বীকার করেছে। তা হলে সমাজতন্ত্র পত্তন করবে কে? পুঁজিবাদের ছায়ায় সমাজতন্ত্র বাঁচবে কেন? বাড়বে কেন? দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদ এখনো জরাজীর্ণ হয়নি। তার ঐতিহাসিক ভূমিকা এখনো সমাপ্ত হয়নি। সাম্রাজ্য হারালেও সে প্রচুর লাভ করে ও লাভের ভাগ দিয়ে শ্রমিককে জুনিয়র পার্টনার বানায়। কমিউনিজম সফল হয়েছে বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নয়, বনেদী ফিউডাল দেশগুলিতেই। ফিউডাল ব্যবস্থা যে দেশে নেই সে দেশে কমিউনিজম দাঁত বসাতে পারে না। আয়ু ফুরিয়েছে ফিউডাল ব্যবস্থারই, ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার নয়, গণতন্ত্রী ব্যবস্থারও নয়।

এখন আমাদেরও কিছু দেবার পালা। বর্জন ও গ্রহণ ছাড়া তৃতীয় একটি কথা আছে। তার নাম দান। পৃথিবীর লোক আমাদের দিকে চেয়ে আছে চাতকের তৃষা নিয়ে। কী দান করব তার ধ্যান করা যাক। সে যেন পুরাতনের চর্বিতচর্বণ না হয়। কবেকার সেই প্রাচীন ভারতকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে গেলে বোঝা যাবে আমাদের আর নতুন কিছু দান করবার নেই। হাজার চেষ্টা করলেও অতীতের সে ডাইনামিজম তো ফেরবার নয়। অতীতের কাছ থেকে উপাদান আহরণ করতে পারি। কিন্তু তাতে গতিবেগ সঞ্চার করব কোন্ মন্ত্রবলে? পুনরুত্থানবাদী চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল, গান্ধীজীর মধ্যে তো ছিলই। আধুনিক ইউরোপের প্রতিপক্ষরূপে তাঁরা খাড়া করেছিলেন প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতকে। সে ধরনের চিন্তা তাঁদের জীবদ্দশাতেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দেশ থেকে এখনো বিলুপ্ত হয়নি। সহজে হবেও না। এখনো ভারতের বৈশিষ্ট্য বলতে লোকে বোঝে পুরাতনের বৈশিষ্ট্য। যেন ইতিহাস একটা অচল ঘড়ির মতো কবে থেকে থেমে রয়েছিল, সবে চলতে আরম্ভ করেছে। এই যদি সত্য হয় তবে আবার থামতে কতক্ষণ!

চাই অভিনব ডাইনামিজম। তা আমাদের ভিতর থেকেই উৎসারিত হবে। অতীতটাও আমাদের বাইরে। কেবল সেইটুকুই তার কাছ থেকে আমাদের নেবার যেটুকু এখনো সজীব ও প্রাণবান, যা অতীত হলেও অতিক্রান্ত নয়, যা বহুপুরাতন হলেও নিত্য নূতন। অপর পক্ষে পশ্চিমের সবটাই

আমাদের বাইরে নয়। স্পেসের দিক থেকে যেটা বাইরে সেটাও কতক হয়তো টাইমের দিক থেকে আমাদের ভিতরে। এই জটিল তত্ত্বটাকে আমি সরল করে বোঝাতে পারব না। শুধু একটা উদাহরণ দেব। সেটা রবীন্দ্রনাথেরই জবানীতে। "কালান্তর" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারিনি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে 'A man is a man for a 'that'." —বলা বাহুল্য এ তত্ত্বটি গীতা উপনিষদ্ বা রামায়ণ মহাভারত থেকে পুনরুত্থিত হয়নি। বাইরে থেকে এসেছে, সেই সঙ্গে ভিতর থেকেও। রবার্ট বার্নস আমাদের দেশতুতো ভাই নন, কিন্তু কালতুতো ভাই। সে হিসাবে অনেক ভারতীয় কবির চেয়েও আপনার। অভিনব ডাইনামিজম সমকালের ভিতর থেকেই পাব। এ ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে যে যা কিছু সমকালীন তাই ডাইনামিক নয়।

সমকালীন সভ্যতা এখন অবিভাজ্য। দেশ অনুসারে পার্থক্য আছে ও থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পার্থক্যটাকেই যদি একান্ত করে দেখি তবে স্বকাল আচ্ছন্ন হবে স্বদেশপ্রেমের আবেগবাষ্পে। সঙ্কট এখন আর দেশ অনুসারে বিশিষ্ট নয়। একই সঙ্কটই সর্বত্র ঘনিয়ে আসছে। প্রেয় যদি একদিকে টানে আর শ্রেয় আরেক দিকে তা হলে সঙ্কট অনিবার্য। ব্যক্তিবিশেষ হয়তো এর থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু কোটি কোটি মানুষের সমাজ বা সমষ্টি কি আগে আগুনে হাত না পুড়িয়ে কোনো দিন কিছু শিখেছে? তার শিক্ষার পদ্ধতিই হলো আগুনে হাত দেওয়া। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনায়াসেই এড়ানো যেতে পারত, কিন্তু এড়ানো গেল না। তেমনি এ যুগের দুই মহাযুদ্ধ। তেমনি ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লব।

তার পর ইতিহাসের এই অধ্যায় শুধু শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে প্রেয়কামনার সংঘাত নয়। তা যদি হতো তবে তো অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে যেতো। সংঘাতে শ্রেয়োবুদ্ধির জয় কিংবা সভ্যতার লয় হতো। প্রেয়কামনা কাজ করছে বইকি। তা তো স্পষ্ট। কিন্তু তার অন্তরালে ক্রিয়া চলেছে ঐতিহাসিক পুনর্বিন্যাসের। "মন্দ" বলে তাকে এক কথায় খারিজ করে দেওয়া চলে না। আবার "ভালো" বলে তাকে অন্ধভাবে মাথা পেতে নেওয়াও যায় না। নীতিনিপুণেরা যদি তার বদলে এমন কোনো পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব নিতেন যা ষোলো আনা "ভালো", যার কোথাও এতটুকু "মন্দ" নেই তা হলে তো মানুষ বেঁচে যেতো। মানুষের পক্ষে মনঃস্থির করা এমন দুঃসাধ্য হতো না। কিন্তু "ভালো" আর "মন্দ" বলে দু'রকম দুটো পুনর্বিন্যাস-প্রস্তাব আমাদের সামনে নেই। নীতিনিপুণদের অধিকাংশই পুনর্বিন্যাস চান না, তাঁরা তাঁদের সেই খ্রীষ্টীয় বা ইসলামী বা বৌদ্ধ বা বর্ণাশ্রমী বিন্যাসেই সন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করছেন যে কাল বদলে গেছে, এ কালের উপযোগী পুনর্বিন্যাস চাই, তাঁরাও বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আর্টকে বাদ দিয়ে ভোগকে বাদ দিয়ে এমন এক পুনর্বিন্যাসের কথা বলেন যে মনে হয় রেনেসাঁসটা একটা প্রক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ। নীতিনিপুণদের ছেড়ে দিলে পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব আর যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা যতগুলি পন্থা নির্দেশ করছেন প্রত্যেকটি ভালোয় মন্দে মেশা। কোনোটাই সম্পূর্ণ শুদ্ধ বা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ নয়।

তা বলে নীতির প্রশ্ন গৌণ হয়ে যায় না। কাজ চালানো গোছের পুনর্বিন্যাস নিয়েও মানুষ সুখী হবে না, যদি না তার বিবেক নির্মল থাকে, তার হৃদয় কোমল থাকে, তার আত্মা তার নিজের থাকে। খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে, খুঁজতে হবে সেই দুর্গম পন্থাকে যাতে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিবেক দেহমন আত্মার পূর্ণতর সামঞ্জস্য সম্ভব। পরাজয়বাদী হচ্ছে সেই জন যে বলে অসম্ভব। কিন্তু কেন আমরা পরাজয়বাদী হব? "হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়।"

হামবুর্গে প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের ভবিষ্যদবাণী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে—৪ঠা কিংবা ৫ই ফেব্রুয়ারীতে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটেনি। পশ্চিম জার্মানীর পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে—অন্ধ বিশ্বাসী ভারতীয় সাধুসন্তদের কথা, আর ছাপা হয়েছে কি ভাবে কতটন মাখন আগুনে জ্বালানো হয়েছে, তারই সচিত্র বিবরণ। বন্ধুমহল পথেঘাটে উপহাসের হাসিতে সম্বর্ধনা জানিয়েছে—কুশল প্রশ্ন করেছে, গোয়া, কাশ্মীর কিংবা চীনের কথা উল্লেখ করে।

তবু কয়েকদিন আগে উত্তর পশ্চিম জার্মানীর ঝড় ও বন্যা যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তারা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও পৃথিবীর মহাপ্রলয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল—গোঁড়া নাস্তিকের মনেও সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল, মানুষ সত্যই আপন ভাগ্য-বিধাতা কি-না? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের কৃত্রিম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় আস্থা গ্রহণে কি-ই বা মূল্য আছে? অথবা কৃত্রিম সভ্যতার ওপর আমরা এতই নির্ভরশীল যে, প্রাকৃতিক নিয়মের সামান্য পরিবর্তনও আমাদের জীবনে চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর সব সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম জার্মানীর ঝড় ও বন্যার কথা—আর সেই সঙ্গে এমন একটি শহরের নাম, যার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের কাছে থেকে জানবার সুযোগ হয়েছে আমার পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম নগরী হামবুর্গকে। দীর্ঘদিন ইউরোপে বসবাস সত্ত্বেও ইউরোপীয় আধুনিক জীবনযাত্রায় আজও আমি অনভ্যস্ত, ইউরোপীয় রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহারে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। অবশ্য এর একমাত্র ব্যতিক্রম এই হামবুর্গ শহর। হামবুর্গ ইউরোপে সবচেয়ে সুন্দর শহর—আমার এ মতের সঙ্গে অনেকেই সায় দেবেন না জানি, কিন্তু হামবুর্গ শহরের গোড়াপত্তন থেকেই স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত বলে হামবুর্গের সামাজিক জীবনে যে নাগরিকত্ব বোধ জাগরূক, ইউরোপের আর কোন শহরে তার তুলনামূলক পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, আমার অন্তত জানা নেই। নিজেকে জার্মান না বলে 'হামবুর্গার' বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে হামবুর্গের পুরোনো বাসিন্দা।

তাই কয়েকদিন আগে হামবুর্গ শহরের ওপর ঝড় এবং বন্যার যে তাণ্ডবনৃত্য প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমি হয়েছি মর্মাহত। হামবুর্গের ইতিহাসে এতবড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আর কোন নজির পাওয়া যায় না। শোচনীয়তায় এবং ভয়াবহতায় কেবলমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাবর্ষণের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হাজার হাজার বোমাবর্ষণেও হামবুর্গের জনসাধারণের মনোবল এমন আতঙ্কিত হয়নি যা হয়েছে নিশীথ রাত্রিতে বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের আকস্মিক আক্রমণে। আর একই সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, জলসরবরাহ, ট্রেন চলাচল এবং সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আধুনিকতম মানুষ নিজেকে কত অসহায় বোধ করেছিল। তা প্রমাণিত হল শুধুই একটিমাত্র রাত্রিতে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপন অসামর্থ্যের যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, সুদূর অতীতে অসভ্য বর্বর মানুষের সঙ্গে তার কি কোন প্রভেদ ছিল?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে-ওঠা হামবুর্গ শহরের এক-পঞ্চমাংশ কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ জলের তলায় ডুবে যায়। বন্যার জলের গভীরতা ছিল চার থেকে সাড়ে চার মিটার—জলের চাপে অনেক জায়গাতেই বন্ধ ঘরের দরজা জানলা খোলা সম্ভব হয়নি, হলেও বাড়ির ছাদের ওপর শুধুমাত্র রাত্রিবাস পরিহিত কত যে আবালবৃদ্ধবণিতা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গেছে, তার সঠিক সংখ্যা কোনদিনই জানা যাবে না। ত্রিনশতাধিক শহরবাসীর প্রাণহানি এবং প্রায় একশো হাজারেরও বেশী নাগরিকের সর্বহারা হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিদারুণ আকস্মিক—তাও আবার শিল্পপ্রধান জার্মানীর শিল্পপ্রধানতম নগরীতে। গৃহচ্যুত অধিবাসীদের অধিকাংশই হয় পূর্ব জার্মানী থেকে আগত বাস্তুহারা কিংবা
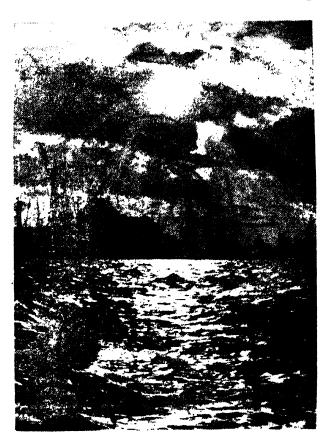
কর্মমুখর আধুনিক হামবুর্গ বন্দরের দৃশ্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্বস্বহারা—দ্বিতীয়বার সর্বহারা হবার অভিজ্ঞতা বাস্তবিকই বড় বেদনাদায়ক।

প্রায় একশো বছরেরও পুরোনো বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়ার প্রতিবাদে নিরীহ মানুষ ভগবানকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে। এ-বিষয়ে এখানকার সরকারী উচ্চপদস্থ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারকে প্রশ্ন করায় সরাসরি উত্তর পেয়েছি—এশিয়া এবং আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিকে জার্মানীর বছরে চার বিলিয়ন মার্ক সাহায্য করার জন্যই এই দুরবস্থা। জার্মানীতে ধীরে ধীরে এখন একটা জনমত গড়ে উঠছে, যারা সব কিছুর জন্যই অনুন্নত দেশগুলিকে দায়ী করে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে শিল্পপ্রধান হামবুর্গের অন্তঃপুরে কি করে এমন শোচনীয় ঘটনা সম্ভবপর, কিংবা সরকারী সাহায্য ব্যবস্থায় ত্রুটি অথবা আগে থেকে শহরবাসীকে চরম বিপদের জন্য সতর্কীকরণ করার প্রয়োজন ছিল কি না?

এখানকার সংবাদপত্রে এ-বিষয়ে কোন-রকম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা চোখে পড়েনি। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের খবরে শুধুই প্রশংসা করা হয়েছে—দশ-হাজার জার্মান সৈন্য এবং একশোর বেশী জার্মান এবং আমেরিকান হেলিকপ্টার সাহায্যকাজে যে অতুলনীয় মনোবলের পরিচয় দিয়েছে, তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু স্বাধীন মতামত প্রকাশে এখানকার সংবাদপত্র যে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে, তা কি স্মরণ করিয়ে দেয় না—সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মানজাতির উদাসীনতা অথবা সকলরকম সরকারী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ভবিষ্যতের মানবেতিহাসের পক্ষে একান্তই বিপজ্জনক?

ছুটির সকাল। কয়েক দিনের বরফ ঝরার পর আজ প্রকৃতি শান্ত। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছি চারদিক খটখটে। মাটিতে বরফ জমে শক্ত, কাঁচের মতো। আমাদের একটি দালান, যাতে হাজার দুয়েক লোকের বাস, তার উঠোনে খেলার পার্কের বেড়া ঘেঁষে বরফ জমা মাটিতে একদল ছোট ছেলে বুকে গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছে। হাতে তাদের প্যাকিং বাক্সের কাঠ। এখন কিন্তু সেগুলো রাইফেল। একটা চৌকো জায়গায় আরো একদল ছেলে ভাঙা প্যাকিং বাক্স সাজিয়ে কিছু একটা গড়ছে। অভিযানকারী সৈন্যদল যখন ওদিকেই এগচ্ছে, তখন ওটা নিশ্চয় একটা কেল্লা হবে। কিছুক্ষণ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় যুদ্ধের সাংবাদিকের কাজে ছেদ পড়েছিল। হঠাৎ দেখি প্যাকিং বাক্সের কেল্লা ভীষণ বিপদগ্রস্ত। শত্রুদল পরম বিক্রমে তা ধুলোয় পর্যুদস্ত করছে বাক্স। হাতের বন্দুকগুলো এখন বোধ হয় গাঁইতির কাজ করছে। আরো লক্ষণীয় অভিযানকারী সৈন্যদলের পূর্বের শক্তি ছিল পাঁচ (এবার ঐ যুদ্ধের বিপক্ষিক দুই অনুপাতে সেটা পাঁচ অক্ষৌহিণীর সমান)। এখন কিন্তু দেখি উঠোনের যত ছেলে ছুটে এসে লুটপাটে যোগ দিচ্ছে। আসল যুদ্ধে যেমন হয়, লড়াইয়ে যারা নেই, তারা লুটের বেলায় ঠিক হাজির।

এ পর্যন্ত লিখে হঠাৎ খেয়াল হল হয়ত এসব লেখা ঠিক হল না। কারণ এটুকু পড়েই অনেক "সোভিয়েত দেশ বিশেষজ্ঞ" বলতে শুরু করবেন, সোভিয়েত দেশে যুদ্ধমনোবৃত্তি এমন গভীরে পৌঁছেছে যে, সে দেশের ছোট ছেলেরা পর্যন্ত খেলার নামে জঙ্গী মানুভারের মহড়া দেয়। ও জাতের সাংবাদিকদের হাতে কত কীই না ঘটে। ভরাশিলভ যখন সভায় উপস্থিত, তখন তাঁরা তাঁকে দিয়ে আত্মহত্যা করিয়ে বসেন। তাঁরা যখন ঘোষণা করেন 'মলতোভ কে তোকে স', তিনি তখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় নাক ঝাড়েন রুমালে।

তবে ছোট ছেলেরা বন্দুক নিয়ে খেলুক এতে এ-দেশেও কারো কারো আপত্তি আছে। তাঁদের একজন হলেন আমারই সহকর্মী সাশা। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এ ব্যাপারে তার আপত্তিতে বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'ছোটরা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলবে না এই যদি চান, তবে যত কাব্যকাহিনী সব ফিরে লিখতে হয়। আমরা তবে ছোটদের বলব না রাম-রাবণের কথা, আপনারা বাদ দেবেন ইলিয়া মুরোমেৎস আর অন্য বীরদের গল্প। সে কি ভাল হবে? আর যতদিন ছোটরা এসব গল্প শুনবে, ততদিন তারা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলবেই।'

সাশার বক্তব্য, 'ওসব তো তীর ধনুক তলোয়ার নিয়ে খেলা। তার মধ্যে রূপকথাই বেশী। এই পিস্তল বন্দুক কেন?' তার উত্তরে জানাই, 'স্তালিনগ্রাদের (ভলগাগ্রাদ নয়, কারণ তাতে কিছুই বোঝায় না) বা লেনিনগ্রাদের লড়াইয়ের কাহিনী। ছোটদের কাছে আজ উপকথার বীর নায়ক বগাতীর-

রুশ দেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিশুরা পুতুলগুলিকে রুগী বানিয়ে ডাক্তারী খেলা খেলছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ডাক্তার রুগী পরীক্ষা করছে, ওদিকে রুগীর মায়ের মুখ বিষণ্ণ

দের কীর্তির চেয়ে কিছু কম নয়। আসল কামান বন্দুকগুলো নষ্ট করে শুধু খেলনা কামান, খেলনা বন্দুকগুলোই রাখা ভাল। বিস্ফোটি মেগাটনের বদলে দেওয়ালীপুজোর পটকা।'

সাশার মত হল, বহু শতাব্দী আগে পটকা যুটিয়েছিল চীনারা বাজির মজা হিসেবে। তারা জানত না ঐ পটকাতেই লুকিয়েছিল বিশ্বধ্বংসী বোমার সম্ভাবনা। ঐ যে খেলনা বন্দুকের কথা বলছেন, ওর মধ্যেও কি থাকতে পারে না প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের বীজ? আমি সমগ্র ও পূর্ণ অস্ত্র-বর্জনের পক্ষে।'

টেবিল চাপড়ে সজোরে হেসে উঠল সাশা—খাঁটি রুশ হাসি। অন্য দেশে সাধারণত যে জোরে হাসে, সে তার হাসির দৌলতেই বিখ্যাত হয়ে যায়। শহুরে জীবনে, মধ্যবিত্ত সমাজে, অট্টহাসির চেয়ে ক্লিষ্ট হাসি, তিক্ত হাসি এবং মুচকি হাসিটাই প্রচলিত। এ-দেশেও তা দেখা যায় স্বল্পসংখ্যক উন্নাসিকদের ঠোঁটে যারা নবোপায়ে সফিস্টিকেটেড হয়ে ওঠাটা (তার মানে পশ্চিমী ধরনধারন অনুকরণ) সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ রুশ হাসেন জোরে এবং যখন তখন। অথচ মনে পড়ছে, একজন অত্যন্ত সুশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'রুশরা হাসতে পারে?' না, তাঁর প্রশ্নে কোন ঠাট্টা ছিল না। রুশরা মনে করেন, 'জোর বৃষ্টিতে পরিষ্কার হয় আকাশ, উচ্চহাসিতে ধুয়ে যায় মনের ময়লা।' রুশরা যে এখনো জোরে হাসতে ভোলেননি, আশা করি তা কোনদিনই ভুলবেন না, তার একটা কারণ তাঁরা, অধিকাংশই 'শহুরে' বলতে আমরা যা বুঝি তা নন। তাঁরা যতই উন্নত যন্ত্রশিল্প গড়ুন, যতই দ্রুত ভেদ ঘটান গ্রামে শহরে, এখনো তাঁদের অধিকাংশের মন ও হৃদয় রয়ে গেছে গ্রাম্য নয়, গ্রামীণ। আশা করি, সেটাও তাঁরা কখনো ত্যাগ করবেন না। যেমন জোরে হাসি তেমনি জোরে কথা বলতেও রুশরা সংকুচিত নন। যেচে আলাপ এবং মাইনে পাও কত, বিয়ে করেছ (ভারতীয়দের বেলায় প্রেম করে কিনা সেটাও), কটি ছেলেমেয়ে, ঘরের ফ্ল্যাট, ঘরগুলো কত বাই কত মিটার, কাজ ইন্টিরিয়েসনা (ইন্টারেস্ট কথাটির রুশ রূপ) কেমন জদারোভায়া (বউ বেশ স্বাস্থ্যবতী—রুশরা সাধারণত বেশ মোটাসোটা বউ পছন্দ করেন। বলেন, তাতে এক বিয়েতে দুজনকে বিয়ে করার সুখ পাওয়া যায়)

নববর্ষের সকালে তুষারাচ্ছাদিত পার্ক-এ রুশী মেয়েরা বুড়ো সান্তা ক্লজের সংগে স্কেটিং খেলায় মত্ত

ইত্যাদি প্রশ্ন অনায়াসেই করা যায় এবং তার উত্তর দেওয়া চলে অবাধে। আমরা বাঙালীরা অত্যন্ত বেশী কথা বলি, আর তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন। অথচ এমন কর্মদক্ষ রুশরা সাধারণ জীবনে কারণ-অকারণে যে পরিমাণ কথা বলেন, বাঙালী তার ধারে-কাছেও যেতে পারেন না। কারণ অতটা কথা বলে চলায় যতটা শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, ক্ষুদ্রজীবী বাঙালীর দেহে তা নেই। দুই রুশ যুবক যেভাবে অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা বউ ছেলেমেয়ে বা জামা-কাপড় কিংবা আরো সাধারণ অমুক কি বললে, তমুক কি করল গোছের আলাপ চালিয়ে যান, তাতে আমাদের দেশের মেয়েরাও অবাক হন। লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবেন না কে কার পূর্বপরিচিত। সবাই যেন এক ইয়াস্লি মানে নার্সারীতে মানুষ। অত্যন্ত অপরিচিতকেও যেভাবে খোঁচা দিয়ে ঠাট্টা করা হয়, তার জবাবে আর কোথাও হলে মুষ্টিবর্ষণ শুরু হত। এখানে তার পিঠে আরেকটা ঠাট্টা আসে, তারপর সমবেত উল্লাস এবং সেই সঙ্গেই শুরু হয় আনিয়েকদোতের পালা, তার মানে রসিকতার গল্প।

একটি উদাহরণ দিই।

এক আর্মানী (আর্মানীরা সাধারণত খুব অর্থলিপ্সু বলে খ্যাত) একটা বিরাট আকারের মোটা বই পড়ছিল।

'কী বই পড়ছ হে?' জিজ্ঞেস করল আরেক আর্মানী।

'টাকার বিষয়ে।' বই থেকে চোখ না তুলেই বলল প্রথমজন।

'তা নামটা কী?'

'ডাস ক্যাপিট্যাল, কার্ল মার্ক্স নামে এক-জনের লেখা।'

এর জবাবে আরেকজন হয়ত বললেন—স্বর্গে তো লেনিনকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা একজন আর্মানী কমরেডের। তিনি সব দেখেশুনে লেনিনকে একটা বস্তায় পুরে নিয়ে গেলেন স্বর্গের দ্বারে। দরজায় টোকা মারতে সেণ্ট পিটার দেখা দিলেন।

আর্মানী কমরেড জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, এখানে কার্ল মার্ক্স বলে কেউ আছেন কি?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। ডাস ক্যাপিটেলের কার্ল মার্ক্স তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই। এই হল ডাস ক্যাপিটেলের সুদ।

এই বলেই লেনিন সমেত বস্তাটা দেয়ালের উপর দিয়ে পার করে দিলেন।'

একবার সাহসে ভর করে আমিও একটা সম্প্রতি চালু 'আনিয়েকদোৎ' বলতে গিয়েছিলাম:

—কোন এক ধাঁধার প্রতিযোগিতায় একটা প্রশ্ন ছিল, 'আমাদের দেশে cult of personality আছে কি?'

একজন উত্তর দিয়েছিল—cult তো আছে, কিন্তু personality কই?'

গল্পটা শুনে সহ-আলাপী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হুম, ওটা আগেই শুনেছি। মার্কিন দূতাবাস থেকে ছড়ানো হয়েছে।'

শুভময় ঘোষ

॥ ৬ ॥

আমি একজন লোকের কথা জানি, তার একমাত্র ছেলে বিদেশে হঠাৎ মারা গিয়েছিল। সে লোকটি কিন্তু কোনদিন স্বীকার করেনি যে, তার ছেলে মারা গেছে। বলত, আমার ছেলে মরেনি, মরতে পারে না, ওসব ভুল খবর। একদিন না একদিন সে ফিরে আসবেই এ বিশ্বাসকে সে প্রাণপণে আঁকড়ে ছিল। উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকত বাড়িতে। বাড়ির সামনে গাড়ি কিংবা রিক্শা থামলে দৌড়ে বেরিয়ে আসত, ভাবত ছেলে এসেছে। সবাই তাকে পাগল ভাবত। কিন্তু সে যদি পাগল হয় আমরা অনেকেই তা হলে পাগল; কারণ আমরা অনেকেই এমন অনেক অসম্ভব আশা আঁকড়ে বসে আছি, শুধু বসে নেই, উৎকর্ণ উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছি। তাকেই কেন্দ্র করে ঘুরে মরছি নানান জটিল পথে। তারই প্রেরণা অদ্ভুতভাবে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। আগেকার যুগের অ্যাল্‌কেমিস্টরা বহু রকম জিনিস ফুটিয়ে গলিয়ে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। এ যুগের হিটলার নিজেকে আর্য মনে করে আর্য রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বহু-আঁসলা (শুধু দো-আঁসলা নয়) নাৎসীদের নিয়ে। এঁরা বিপক্ষ দলের যুক্তি শুনতে চান না, হিসাব মানতে চান না, এঁরা সবাই ওই সরু-গলা লোকটার দলে যে তার সাড়ে তিন টাকার দাবি কিছুতেই ছাড়তে চায় না। এই সূত্র ধরে আরও অনেক এলোমেলো দর্শন, অনেক আগড়ুম-বাগড়ুম কথা মনে আসে। এমন কি, আমাদের আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে এই মূর্খ দেশে যাঁরা আদর্শ ডেমক্রাসি প্রবর্তন করবেন বলে আশা করে আছেন তাঁদের সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আপনার ধৈর্যের একটা সীমা আছে এ কথা মনে পড়াতে থেমে গেলাম।

এগুলো আবার পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলেন হালদার মশায়। তাঁর মনে হল ডাক্তারবাবুর কাছে একবার যাই। তাঁর শেষ যে লেখাটা তিনি কাল দিয়েছেন সেটা যদিও তিনি সব পড়তে পেরেছেন, তবু পড়তে পারেননি এই ছুতো করে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কাগজটা হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই মনে হল, না মিথ্যার আশ্রয় নেব না, এমনিই যাই। কিন্তু যেতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। গোয়ালের থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবুর কাণ্ডকারখানা। অনুভব করলেন, ওর মধ্যে গেলে ছন্দ-পতন ঘটবে।

ডাক্তারবাবু মুরগীগুলোকে খাওয়াচ্ছিলেন। ওদের প্রত্যেকের নাম আছে। পেটুকি, ছুটকি, সাঁওতালনী আর রেজলি। পেটকি আর ছুটকি লেগহর্ন, সাঁওতালনী আর রেজলি দেশী। এই চারটি মুরগী, আর মোরগটার নাম পুরো ইংরেজী, মিস্টার চ্যান্টিক্লিয়ার (Chanticleer), সংক্ষেপে চ্যান্টি। বিজয় একটা ছোট টুকরিতে ধান-গম-মকাই একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এসেছিল মাইজির কাছ থেকে। ডাক্তারবাবু সেগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন আর ধমক দিচ্ছিলেন সাঁওতালনী আর রেজলিকে, ওরা পেটকি আর ছুটকির কাছ থেকে কেড়ে খাচ্ছিল বলে। এই এক অদ্ভুত স্বভাব ওদের—বিশেষ করে দেশী মুরগীগুলোর—নিজেদের সামনে খাবার থাকতেও ওরা অপরের কেড়ে খাবে। ডাক্তারবাবু নীতি উপদেশ দিতে দিতে এমনভাবে ওদের ধমকাচ্ছিলেন, যেন ওরা মানুষ। চ্যান্টিকেও ধমকাতে হচ্ছিল। সে নিজে না খেয়ে—কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ করে আহ্বান করছিল তার প্রেয়সীদের। নিজে না খেয়ে ওদের খাওয়াবে! ডাক্তারবাবু বললেন, তুই আগে নিজে খা, ওদের খাবার তো রয়েছে। বিজয় বিজ্ঞের মতো বললে, বড়া বদমাছ্ হে (বড় বদমাইশ)। ডাক্তারবাবু বললেন, তুমিও কম বদমাশ নও। কাল আমার খবরের কাগজ ছিঁড়েছ কেন? বিজয় ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করল। তারপর হেসে ফেলল দাঁত বার করে। বললে, ওকলামে ছবি ছেলে (ওতে ছবি ছিল)। ডাক্তারবাবুর কাছেও এ যুক্তিটা অকাট্য মনে হল। বললেন, ও। তারপর ছুটে এল রকেট উন্মত্ত ঝড়ের মতো, তাড়া করে গেল মুরগীগুলোকে। তারা কলরব করে ছুটে পালাল। এতেই রকেটের আনন্দ। সে ওদের কামড়াতে চায় না, ওদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে চায়। ডাক্তারবাবু গর্জন করে উঠলেন, রকেট, রকেট। রকেট থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঘাড়টা ঈষৎ নীচু করে সম্ভবত মুচকি হাসিটাই গোপন করে ফেলল। 'কাম হিয়ার'—তর্জনী তুলে আদেশ করল বিজয়

চোখ বড় বড় করে। কাম হিয়ার, কাম হিয়ার, ডাকতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। রকেট একছুটে চলে এল ডাক্তারবাবুর কাছে আর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এমন করতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। কাম হিয়ার অ্যান্ড সিট—আবার আদেশের সুরে গর্জন করে উঠলেন ডাক্তারবাবু। ছিট্ ছিট্, —বিজয়ও বলল। তারপর আড়চোখে চেয়ে দেখল ডাক্তারবাবুর দিকে। তাঁর গর্জনে সেও একটু ভয় পেয়েছিল। রকেট মাথা হেঁট করে বসল এসে ডাক্তারবাবুর সামনে। তার কান ধরে ডাক্তারবাবু বললেন, মুরগীদের তাড়া করেছিলি কেন? অ্যাঁ? কুঁই কুঁই করতে লাগল রকেট ল্যাজ নেড়ে নেড়ে। ভুটান আর জাম্বুও এল ছুটে। ভুটান বিস্মিত। জাম্বু একটু যেন খুশী। রকেটের চ্যাংড়াপনা তার ভাল লাগে না। রকেটের উপর তার হিংসাও আছে একটু। ডাক্তারবাবু রকেটের কান ছেড়ে দিলেন।

"শেক্ হ্যান্ডস্।"

রকেট থাবা তুলে ধরল ডাক্তারবাবুর
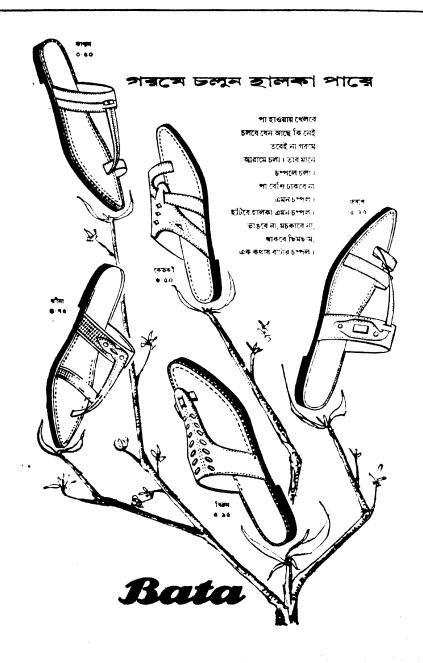
দিকে। ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে শেক্-হ্যান্ড করলেন। আনন্দের আভা ফুটে উঠল রকেটের চোখে মুখে। সে বুঝল বিপদ কেটে গেছে। তারপর যা করল তা সে প্রায়ই করে, ডাক্তারবাবুর কোলে মাথা গুঁজে লম্বা ল্যাজটা নাড়তে লাগল। ডাক্তার-বাবুও তার কানে পিঠে ল্যাজে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন তাকে। তাঁর আদরের ভাষা অদ্ভুত।

"মখমল কেনো, বাঘ-নেজু, নাক-ভিজে, গুণ্ট-মুখো, পাজি, পাজি—পাজকু।"

এত আদর খেয়েও রকেট কোল থেকে মুখ তোলে না। তার ভাবটা যেন এত বকেছ, কান মলে দিয়েছে, আরও আদর চাই। ডাক্তারবাবু আর এক প্রস্থ আদর করলেন।

"রকেট, রকটি, রক, রকাই, রুকলি-বু, রুকি রুমু—"

রকেট খুশী হল এবার। আর একবার শেক্হ্যান্ড করে কাছেই বসল। ভুটানও মহাখুশী, কৃতিত্বটা যেন তারই। সে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে একবার নেচে নিলে। জাম্বু কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। সে ছোট্ট একটু হেঁচে গা দুলিয়ে চলে গেল অন্য-দিকে, তার ভাবটা যেন এসব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। এমন সময় ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন মাস্টার মশাইকে। এমনভাবে চাইলেন যেন অচেনা লোককে দেখছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিই ওই রকম, কেউ যেন তাঁর চেনা নয়, কেউ যেন আপন নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা বললেন তার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির মিল পাওয়া গেল না।

"আসুন মাস্টার মশাই। কি খবর?"

গণেশ হালদার এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "আপনি রকেটকে যে সব নামে আদর করছিলেন তা বড় অদ্ভুত লাগল। মখমল-কেনো, বাঘ-নেজু এসব কথা তো আগে শুনিনি কোথাও।"

তুবড়ি ছুটল ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে।

"সমাস করে ওসব আমি নিজেই তৈরি করেছি। মখমলের মতো কানের স্পর্শ যার সে মখমল-কেনো, বাঘের মতো লম্বা লেজ যার সে বাঘ-নেজু, গুণ্টু গুণ্টু মুখ যার সে গুণ্টু-মুখো। আরও কত তৈরি করি যখন যা মনে হয়—"

"চমৎকার হয়েছে কথাগুলো।"

"অবর্ণনীয়কে বর্ণনা করবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। কিন্তু কিছু হয়নি, যাক ও কথা। একটু আগে আমাদের পাড়ায় এক রোমাঞ্চ-কর কাণ্ড ঘটে গেল, তার খবর পাননি নিশ্চয়। রীতিমত দাঙ্গা—"

"দাঙ্গা? না, কোনও সাড়াশব্দ পাইনি তো।"

"সাড়াশব্দ পাওয়া উচিত ছিল, কাকগুলো ডাকছিল তো খুব।"

"কিসের দাঙ্গা?"

"একটা বাজ এসে বসেছিল ওই ইউক্যালিপটাস গাছের উপর। আর যায় কোথা! যত কাক আর ফিঙে লেগে পড়ল তার বিরুদ্ধে। বাজটাও কিছুতে যাবে না, কখনও এ গাছে বসছে, কখনও ও গাছে বসছে, কিন্তু ওরাও না-ছোড়। শেষ পর্যন্ত তাকে পাড়া-ছাড়া করে তবে ছাড়লে। বহিঃ-শত্রুকে বিতাড়ন করে ওই দেখুন না, বিজয়-গর্বে বসে আছে সব।"

ডাক্তারবাবু উদ্ভাসিত চক্ষে একদল কাককে দেখালেন। টেলিগ্রাফের তারের উপর সার বেঁধে বসে আছে বিজয়ী বীরের মতো। একটু দূরে ফিঙেও বসে আছে দুটো।

ডাক্তারবাবু ফিঙে দুটোকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে ফিঙেদের দেখছেন, ওরা মহা ওস্তাদ লোক। বিখ্যাত ভিংরাজ পাখী ওদের আত্মীয়। ওরা শুধু যোদ্ধা নয়, বড় আর্টিস্টও। চমৎকার গান করে। অবশ্য কান পেতে না রাখলে ওদের গান শোনা যায় না। একদিন শোনাব আপনাকে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওরা তো ফরমাশ মতো গাইবে না। যখন গাইবে তখন হয়তো আপনাকে পাওয়া যাবে না। পাখীদের গান শুনতে হলে কান পেতে থাকতে হয়। হলদে পাখী-গুলো আরও দুষ্টু, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, তারপর পাতার আড়াল থেকে হঠাৎ এমন একটা মিষ্টি সুর ছাড়ে যে, চমকে যেতে হয়।"

পাখীর বিষয়ে আরও হয়তো বলতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

কাউ এসে হালদার মশায়কে নমস্কার করে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল।

"কার চিঠি?"

"ডাক্তার ঘোষালের।"

"আলাপ করেছেন নাকি?"

"গিয়েছিলাম একদিন।"

"কি লিখেছেন?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন আজ সন্ধ্যার সময়।"

"লোকটি কারিৎকর্মা। ও রকম লোকের সঙ্গে ভাব-সাব রাখা ভালো।"

গণেশ হালদার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। চিঠিটি পড়লেন আর একবার। চিঠিটির লেখবার ধরন অদ্ভুত।

প্রিয় হালদার মশায়,

টু কোট দ্বিজেন্দ্রলাল—আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি মদীয় কুটিরে আপনার পবিত্র পদরজঃ ঝাড়েন আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার পাইবে। টু কোট ঘোষাল—প্লীজ কাম টু মাই প্লেস দিস ইভনিং, ও ডার্লিং।
ঘোষাল।

সন্ধ্যার একটু পরেই গণেশ হালদার ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির দিকে গেলেন।

একটি সরু গলির মধ্যে ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি। আশেপাশে আর বাড়ি নেই তেমন: ফাঁকা পড়তি জমি পড়ে আছে দু'দিকে। নির্জনতার জন্যেই সম্ভবত বাড়িটি পছন্দ হয়েছিল ডাক্তার ঘোষালের। শহরের মধ্যে অথচ কেমন যেন পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ ভাব। গলির মধ্যে ঢুকেই হালদার মশাই উচ্চ-কণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদ শুনতে পেলেন। ঘোষালের বাইরের ঘরে বসে কারা যেন তর্ক করছে। হালদার দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওই তর্কবিতর্কের মধ্যে ঢুকতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। ভাবলেন, ফিরে যাই। কিন্তু ফেরা হল না, বাইরের কপাটটা খুলে গেল এবং কাউ ছুটে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার ঘোষাল এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতর।

কাউ চেঁচাতে লাগল, "আমার পাওনা আমাকে চুকিয়ে দিন। যদি না দেন, আমি যেমন করে পারি আদায় করে নেব।"

তার চেয়েও উচ্চকণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন ঘোষাল, "চোপ রও হারামজাদা। হালদার মশাই এলে, তিনি যা দিতে বলবেন তাই দিয়ে দেব। তার আগে তুমি এক পাও নড়তে পাবে না এখান থেকে। তোমার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে রসিদ লিখে দিয়ে তবে যাও। কে দাঁড়িয়ে ওখানে?"

হালদার মশায়ের অস্পষ্ট মূর্তিটা দেখতে পেয়েছিলেন ঘোষাল।

"আমি—"

আমতা আমতা করে হালদার মশাই বললেন।

"আমি কে? হু ইজ আই?"

"আমি হালদার।"

"ও আসুন, আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গেয়ে উঠলেন, "তোমারি পথ চেয়ে বসে আছি বঁধু হে, জা-নালার কিনারে।"

তারপর হালদার কাছে আসতেই ফিসফিস করে বললেন, "সব ফাঁস হয়ে গেছে। The cat is out of the bag. কাউ জানতে পেরেছে যে, সে আমার ছেলে এবং যা বলেছিলাম, as I predicted, একদম বদলে গেছে। বনবেড়াল এখন টাইগারের রোলে প্লে করছে। আসুন, ভিতরে আসুন।"

হালদার মশাই ভিতরে গিয়ে দেখলেন কাউ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত চোখ দুটো জ্বলছে।

"কি ব্যাপার?"

হালদার মশাই সহজ হবার চেষ্টা করে মুচকি হেসে চাইলেন কাউ-এর দিকে। ঘোষালও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। কাউ কোন জবাব দিলে না।

ঘোষাল বললেন, "ব্যাপার হচ্ছে এই, কাল থেকে ও'র ধারণা হয়েছে উনি কাউ নন উনি কর্ণ। আসল কর্ণ সূর্যের সম্পত্তি ক্লেম করেননি, উনি করছেন। ও'র এক মা —কুন্তী বলতে পারেন তাঁকে—হাজির হয়েছেন হঠাৎ শূন্য থেকে। She has materialised from nowhere ছেলেকে এসে এই মন্ত্রণা দিয়েছেন। Well, I am game, আমার কিছু আপত্তি নেই। আপনি দু' পক্ষের কথা শুনে যা বলে দেবেন তাই আমি দিয়ে দেব। আপনাকেই আমরা সালিস মানছি।"

"আমাকে! আমাকে এসবের মধ্যে টানছেন কেন!"

"আমি টানিনি, নুক টেনেছে। আমি বলেছিলাম মিস্টার সেন আর পান্ডা যা ঠিক করে দেবে, আমি তাই মেনে নেব। কাউ তাতে রাজী নয়, ওরা নাকি আমার পেটোয়া লোক। তখন নুক ওকে পরামর্শ দিয়েছে আপনাকে সালিস মানতে। ও তাতে আপত্তি করেনি। It is Nook's selection."

এই বলে তিনি হাঁটু নাচাতে নাচাতে শিস দিতে লাগলেন এবং টেবিলে আঙুলের টোকা দিয়ে তাল রাখতে লাগলেন শিসের সঙ্গে সঙ্গে।

হালদার বললেন, "নুকই বা আমাকে এসবের মধ্যে টানছে কেন।"

"নুকের বদ্ধ ধারণা হয়েছে আপনি মহাপুরুষ। হয়তো সত্যিই আপনি মহাপুরুষ। মহাপুরুষেরা প্রায়ই আপনার মতো ভীতু লোক হয়। কিন্তু মহাপুরুষ হন বা না হন কাজটি আপনাকে করে দিতে হবে।"

পরেশ হালদার বড়ই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। মাথা চুলকোলেন একবার,
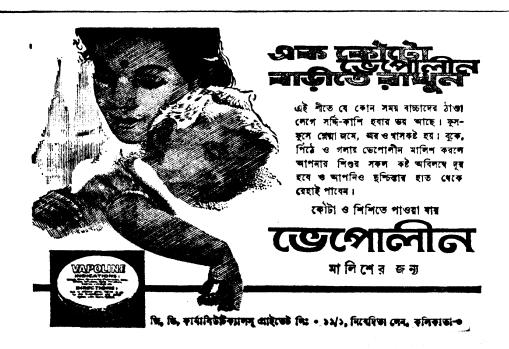
তারপর কাসলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

"ভেবে দেখবার তো সময় নেই। ও মাগীকে আজই বিদেয় করতে হবে। I must drive her out to day"

যদিও গণেশ হালদারের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে?"

"ওই কুন্তীকে। কাউ, তোমার গর্ভ-ধারিণীকে ডাক। এখুনি ফয়সালা হয়ে যাক।"

কাউ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার বলল, "আমায় মায়ের সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বলবেন তা বলে দিচ্ছি।" বলেই বেরিয়ে গেল সে।

কাউ-এর ভাব-ভঙ্গী দেখে বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন গণেশ হালদার। প্রথম দিন তাকে খুব নীরব নিরীহ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হ'ল ঠিক উলটো। একটা আগ্নেয়-গিরি যেন এতদিনে চুপচাপ ছিল। এইবার নিজ মূর্তি ধরেছে।

একটু পরেই কাউ-এর পিছু পিছু একটি আধঘোমটা দেওয়া লম্বা মেয়ে-মানুষ এসে ঘরে ঢুকল। রাঘব ঘোষাল গণেশ হালদারের দিকে চেয়ে ভুরু দুটো ঈষৎ নাচালেন। ভাবটা এইবার আপনার কাজ শুরু করে দিন। ইতস্তত করতে লাগলেন হালদার, কিন্তু এটাও বুঝলেন কিছু একটা করতে হবে, ফাঁদে পড়ে গেছেন, পালাবার উপায় নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি চান, খুলে বলুন।"

মেয়েটির উত্তর শুনে চমকে যেতে হল তাঁকে। মেয়েটি খোনা।

বলল, "শুনেছি, রাঘব এক লাখ টাকা জমিয়েছে। আমি ওর স্ত্রী, কালু ওর ছেলে। আমাদের দুজনের সব সুদ্ধ পঁচাত্তর হাজার টাকা পাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা পঞ্চাশ হাজার পেলেই চলে যাব।"

রাঘব ঘোষালের মুখে একটি নীরব হাসি ফুটে উঠল। গণেশ হালদার কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার আর কিছু বলবার আছে?"

"না। আমি টাকা পেলেই চলে যাব।"

রাঘব ঘোষাল তখন বললেন, "এইবার আমার কথা শুনুন। আমার প্রথম কথা, আমি উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুরা যে এ-দেশে কি দুর্দশায় আছে তা আপনার অবিদিত নেই। সবাই জানে মিস্টার সেনের অনুগ্রহে এখানে কোনরকমে টিঁকে আছি। আমার একটা ডাক্তারি পেশা আছে বটে, কিন্তু আমি সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন, মাসে দু শো টাকাও রোজগার করতে পারি না। আপনি খোঁজ করলে বুঝতে পারবেন অধিকাংশ লোকই আমাকে কি দেয় না। উদ্বাস্তু কলোনীর ডাক্তার হিসেবে শ' খানেক টাকা মাইনে পাই। সব মিলিয়ে কোনক্রমে দিন গুজরান করি। আমার মতো দরিদ্র লোক এক লাখ টাকা জমাবে এ কি সম্ভব? আমার ব্যাংকের খাতা দেখলেই বুঝতে পারবেন কোনরকমে চালাচ্ছি আমি—হ্যান্ড টু মাউথ। আমার দ্বিতীয় কথা, এই মেয়েটি কালুর মা নয়। একে আমি কখনও দেখিনি। কালুর মা খোনা ছিল না। সে অনেকদিন আগে কালুকে আমার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল। কালুকে আমি চাকরিটি নয় হিসেবে মানুষ করেছি। একে আমি চিনি না।"

"সব মিথ্যে কথা। আমিই কালুর মা। আমি আগে খোনা ছিলুম না।
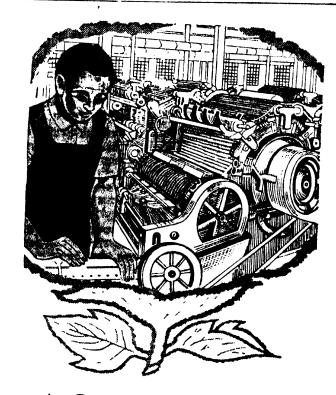
এক ব'ছ'র আগে আমার টাঁগ'রা ছ্যাদা হ'য়ে এ'ই র'ক'ম হ'য়ে গে'ছি'। স'বই ক'পালে'র নে'ক'ন।"

ঘোষাল বললেন, "সিফিলিটিক ওম্যান।"

কালুর চোখ দুটো জবলজবল করে উঠল। কি একটা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল হঠাৎ। হাত দুটো মুঠি করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গণেশ হালদার কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনিই তোমার মা?"

"ইনিই আমার মা।"

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল কাউ।

রাঘব ঘোষাল দাঁড়িয়ে উঠলেন এবার। মুখে কপালে একবার হাত বুলিয়ে গির্জার পাদ্রীরা যেভাবে বক্তৃতা দেয়, সেইভাবে বলতে লাগলেন কাউকে উদ্দেশ করে।

"দেখ কাউ, তুমি যে আমার ছেলে, তার কোন প্রমাণ নেই। আর এই মেয়েটি যে কোন কালে আমার স্ত্রী ছিল, তা-ও প্রমাণ-সাপেক্ষ। এ যা বলছে, তা ডাহা মিথ্যে কথা, আনডাইলাটেড লাই। তবে একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমি তোমাকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছি, ছেলের মতই ভালবেসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে বাপের মতই ব্যবহার করে যাব, তুমি যদি ওই স্ত্রীলোকটির ভাঁওতায় না ভোল। তুমি যদি ওর সঙ্গে জুটে আমাকে চোখ রাঙাও, আমি একটি আধলা দেব না তোমায়। কিন্তু তুমি আগে যেমন ছিলে, তেমনি যদি থাকো তা হলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, I solemnly promise, তোমাকেই আমার উত্তরাধিকারী করে যাব। ওর পাল্লায় পড়ো না তুমি। ও এতদিন কোথায় ছিল? কে তোমাকে এতদিন কিদের খাবার আর তেষ্টার জল যুগিয়েছে? অসুখের সময় কে তোমাকে ওষুধ খাইয়েছে, সেবা করেছে? এখানে আসবার কিছুদিন আগে আমি পাটনায় ছিলাম, কিন্তু সেখানে তুমি একটা ছুঁড়ির সঙ্গে লটপটিয়ে পড়লে, তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই তোমাকে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে হল আমাকে, যদিও সেখানে আমার প্র্যাকটিস বেশ জমে উঠেছিল। সমস্ত কথা ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি এর সঙ্গে জুটেছ কেন?"

"ও' জু'টবে' কে'ন, আমিই জু'টেছি' ও'র স'ঙ্গে। আমি খে'তে পাই না, ও' আমার' ছেলে, তাই ও'কে' খু'জে বার ক'রে'ছি'। ও'কে' পে'টে ধ'রে'ছিলু'ম, ও' আমাকে অ'স'ম'য়ে দে'খবে' না? বিষয়ের অর্ধেক না নি'য়ে আমি ন'ড়ব না এ'খান থে'কে'।"

গণেশ হালদারের মনে হচ্ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি যেন একটা পূতিগন্ধময় নোংরা নর্দমার মধ্যে পড়ে গেছেন। শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল তাঁর। নর্দমা থেকে কি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া যায়, এ কথা ভাবছিলেন না তিনি, তাঁর মনে হচ্ছিল, কি করে এখন উদ্ধার পাওয়া যায়।

রাঘব ঘোষাল তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "কি করা উচিত বলুন তো এখন।"

গণেশ হালদার ইতস্তত করতে লাগলেন।

"কিছু বলুন, say something, don't shut up like a troubled snail. বিপন্ন শামুকের মতো মুন্ডু টেনে নেবেন না। Thats not manly, ওটা কি মানুষের মতো কাজ?"

হালদার বললেন, "কালু যখন একে নিজের মা বলছে, তখন এর ভারও আপনাকে নিতে হবে। ওকে তো ফেলতে পারবে না। একসঙ্গে যদি দিতে না পারেন, মাসে-মাসে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন না-হয়।"

"বেশ, বলুন কত দেব? Name tha sum।"

"মাসে পঞ্চাশ টাকার কম কি চলবে আজকাল?"

"বেশ, মাসে পঞ্চাশ টাকাই দেব, কিন্তু ওকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাউকে প্রত্যেক মাসে আমি টাকাটা দিয়ে দেব, ও পাঠিয়ে দেবে।"

"আমি অ'র্ধে'ক বি'ষ'য় না' পে'লে' ন'ড়'ব' না' এ'খান থে'কে'।"

রাঘব ঘোষাল নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে গিয়ে কোণের আলমারিটা খুলে তার ভিতর থেকে বন্দুক বার করলেন। তারপর হঠাৎ সেটা তুলে চিৎকার করে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে, গেট আউট।" তারপরেই দড়াম করে শব্দটা হল। চিৎকার করে ছুটে পালাল খেনা মেয়েটা। কাউ দাঁড়িয়ে রইল গুম হয়ে। তারপর সে-ও চলে গেল। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল নুরু।

"কি হল!"

"তাড়িয়ে দিলুম মাগীকে।"

সঙ্গে সঙ্গে নুরুও বেরিয়ে গেল।

গণেশ হালদার উঠে দাঁড়ালেন।

"বসুন, বসুন, আপনি যাচ্ছেন যে? আমাকে এমন বিপদে ফেলে চলে যাওয়া কি উচিত হবে? বাঙালীকে বাঙালী দেখলে আর কে দেখবে! তা ছাড়া আপনি উদ্বাস্তু, আমিও উদ্বাস্তু, ডবল বন্ধু। বসুন, যাবেন না। হিম্মত করিয়ে।"

ঘাড়ের উপর প্রকান্ড থাবার মতো হাত রেখে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

হালদার বললেন, "মাপ করবেন আমায়। এসব খুন-জখমের ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না।"

"খুন-জখম কোথা দেখলেন! ফাঁকা ফায়ার করলাম, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে, just to scare her away. এক বিন্দু রক্তপাত হয়নি, not a drop of blood has been shed! ফায়ার না করলে ও মাগী যেত না। সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে অতিষ্ঠ করে তুলত, would have whined and whined till your patience collapsed."

এই বলে ঘোষাল হলদে দাঁত বার করে তাঁর সেই আকর্ণ-বিস্তৃত হাসিটি হাসলেন।

হালদার জিজ্ঞেস করলেন "ও আপনার স্ত্রী নয়?"

"না। তবে আমার রক্ষিতা ছিল কিছুদিন। কাউ ওর ছেলে এ-ও ঠিক। ও যদি বরাবর ফেথফুল থাকত, ওকে আমি ছাড়তাম না। কিন্তু তা রইল না। একদিন গিয়ে দেখি, গজু গাড়োয়ান ওর ঘরে ঢুকেছে। সেই দিনই বললাম, মাপ কর, গজু গাড়োয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারব না। জগৎসিংহ বা ওসমান হলেও বা কথা ছিল। সেই দিনই I washed my hands, মাগীর প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে চলে এলাম। তারপর ও কাউকে আমার বারান্দায় বসিয়ে রেখে কোথায় যে ভেসে গেল আর টের পাইনি। এখন বারো বছর পরে ফিরে এসে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দাবি করছে। Silly—"

কিছু একটা বলা উচিত এই ভেবে হালদার বললেন, "কিছু দিয়ে মিটিয়ে নিন—"

"তাই নিতে হবে। কিন্তু সোজায় হবে না। মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে তো রাজী হলাম, নিলে? সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বেঁকাতে হবে। পান্ডার সঙ্গে এখানকার দারোগার খুব দহরম মহরম। সে লোকও খুব জবরদস্ত। কথায় কথায় হান্টার হাঁকড়ায়। তাঁর কাছে একদিন পিটুনি খাক, তবে ঠিক হবে।" (ক্রমশ)

॥ ৩২ ॥

অনিন্দ্য পাকড়াশিকে দেখে আগরওয়ালা চমকে উঠলেন। নাভির তলায় ঝুলেপড়া প্যাণ্টটাকে কোমরের উপরে তুলতে তুলতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি?"

অনিন্দ্যও যেন একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, "অতিথিদের খোঁজখবর করতে।"

আগরওয়ালা ঢোক গিলে বললেন, "কিছু প্রয়োজন ছিল না। আপনাদের আশীর্বাদে আগরওয়ালার গেস্ট রুমে কোনো অতিথিরই কষ্ট হয় না। মিস গুহকে এতনা রুপিয়া কেন আমি কি বাজে বাজে দিচ্ছি?"

অনিন্দ্য বললেন, "আপনাকে কী করে যে ধন্যবাদ দেবো। কলকাতার কোনো হোটেলে আর সুইট খালি ছিল না। অর্ডিনারী রুমে তো এঁদের রাখা যেতো না। বাবা নিজেই আপনাকে ফোন করে কথা বলবেন।"

আগরওয়ালা যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, "আরে, কী যে বোলেন। বিজনেসে হামরা যদি এক কনসার্ন আর এক কনসার্নকে না দেখি, তাহলে চলবে কী করে?"

অনিন্দ্য এবার আগরওয়ালার আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অবলীলাক্রমে আগরওয়ালা বললেন, "হামি এক বন্ধুর খোঁজে এসেছি। তার বার-এ বসে থাকবার কথা। তাকে নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাবো। আপনার অতিথিদের কোনো তকলিফ হলে আমাকে জরুর জানাবেন।"

অনিন্দ্য আর সময় নষ্ট না করে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। আগরওয়ালা সোজা লাউঞ্জের টেলিফোন বুথে ঢুকে কারুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর কাউন্টারে এসে বললেন, "হামি মিস্টার আগরওয়ালা আছি।" তারপর রাজস্থানী বাংলায় নিবেদন করলেন, মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি যদি তাঁর সন্ধানে এখানে আসেন, তাহলে বলে দেবেন, মিস্টার আগরওয়ালা মিসেস চাকলাদারের ওখানে চলে গিয়েছেন।

মিস্টার ফোকলা চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ পরেই শাজাহান হোটেলে এসে হাজির হয়েছিলেন। কাউন্টারে এসেই বললেন, "স্যাটা। আর পারা যায় না। এই বুদ্ধ বয়সে একটা দশটা-পাঁচটার চাকরি পেলে বেঁচে যেতাম।"

বোসদা বললেন, "ব্যাপার কি মিস্টার চ্যাটার্জি?"

ফোকলা বললেন, "সে-সব পরে বলছি। এখন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। একটু মাল আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন?"

বোসদা বললেন, "কেন লজ্জা দিচ্ছেন? জানেনই তো অধমদের হাত-পা বাঁধা, লাউঞ্জে ড্রিংক সার্ভ করবার হুকুম নেই।"

"এ শলা গভরমেণ্ট কবে যে ডকে উঠবে! এই শলাদের জন্যেই কি আমরা স্বদেশী করেছিলাম। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, মাস্টারদা কি এদের জন্যেই প্রাণ দিয়েছিলেন?" ফোকলা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন।

বোসদা ঈষৎ হেসে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "শলা মাল বিক্রি হচ্ছে তাতে দোষ নেই, কিন্তু খোলা জায়গায় খাওয়া চলবে না, শিব-ঠাকুরের দেশে একি আইনরে বাপু। আপনা-দের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। ভদ্দর-লোকের ছেলে, এ-লাইনে এসেছেন, অথচ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই শুনে রাখুন, ব্যাটা-চ্ছেলেরা কোনদিন বললো বলে যে ল্যাভেটরি ছাড়া অন্য কোথাও ড্রিংক করা চলবে না।"

বোসদা বললেন, "আপনাদের সঙ্গে অনেকের তো জানাশোনা আছে, তাদের বলুন না।"
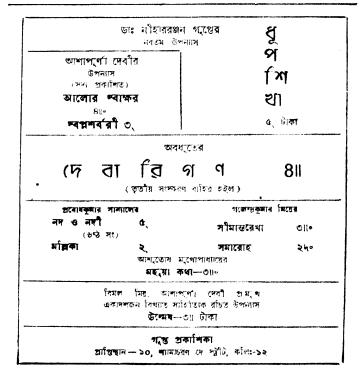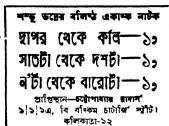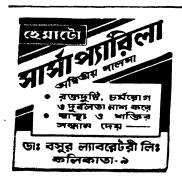
ফোকলা বললেন, "তাহলেই হয়েছে। সব ব্যাটা লুকিয়ে গজগজ করবে, কিন্তু মালের সাপোর্টে পাবলিকলি একটা কথা বলবে না। রাস্তায় সব ব্যাটা ঘোমটা দিয়ে ভাট-পাড়ার বিধবা সাজবে। এ-ব্যাটারা এমন, যদি গভরমেণ্ট কাল হুকুম দেয় তো এরা ল্যাভেটরিতে বসে বসেও ড্রিংক করে চলে যাবে, তবু একটি রা কাটবে না। একটা লোক পারতো, সে আমার দিদি, মাধব পাকড়াশির ওয়াইফ। কিন্তু দিদি আমার একদম সেকেলে। ড্রিংক জিনিসটা মোটেই দেখতে পারে না।"

বোসদা বললেন, "তাই বুঝি?"

ফোকলা বললেন, "দিনরাত শুধু মহিলা সমিতি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি, আর না হয় পুজো নিয়ে পড়ে রয়েছেন। দিদি যদি একবার বলতো লুকিয়ে মদ খাওয়ার থেকে খোলাখুলি মদ খাওয়া ভাল, তা হলে হয়তো গভরমেণ্ট একটু কান দিতো।"

স্যাটা বোস বললেন, "আপনার কষ্ট হচ্ছে, বার-এ চলে যান।"

ফোকলা বললেন, "উপায় নেই, মশাই। এক ভদ্রলোকের জন্যে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

আমি বললাম, "আপনি কি মিস্টার আগরওয়ালার কথা বলছেন? তিনি আপনার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গিয়েছেন।"

ফোকলা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ও'র জন্যেই অপেক্ষা করছি। ফোন করেছিলেন আমাকে, অথচ আমি ছিলাম না। বলেছেন, এখুনই যেন শাজাহান হোটেলে চলে আসি।"

সত্যসুন্দরদা বললেন, "মিস্টার আগর-ওয়ালা এখন মিসেস চাকলাদার-এর ওখানে চলে গিয়েছেন।"

"মিসেস চাকলাদার!" ফোকলা হা হা করে হাসতে লাগলেন। "কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই মশাই। এই শর্মা, দিস ফোকলা চ্যাটার্জিই আপনাদের আগর-ওয়ালাকে মিসেস চাকলাদারের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। মশাই, গেরস্ত বাড়ি, শান্তিতে একটু ড্রিংক করবার সুযোগ ছিল। আমাদের মতো মাতালদের শান্তিনিকেতন। রেট একটু বেশী। ড্রাই ডে-তে মিনিমাম আডমিশন চার্জ কুড়ি টাকা। তা এরা লেবু কচলিয়ে কচলিয়ে তিতো করে দেবে। আগরওয়ালারা অন্য দিনেও গেস্ট নিয়ে যেতে শুরু করেছে। দুনিয়ার যত কণ্ট্রাক্ট, যত লাইসেন্স, সব একজন চাইলে চলবে কি করে? রোজ রোজ যাচ্ছে, কোনদিন কাগজের লোকেদের নজরে পড়ে যাবে। মধুচক্র ফাঁস হয়ে যাবে।"

ফোকলা চ্যাটার্জি ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "চিরকাল শুধু পরের বোঝা বয়ে বেড়ালাম। আমার থ্রু দিয়ে এণ্টারটেন করিয়ে কলকাতায় কত ব্যাটা ছেলে বিজনেসে লাল হয়ে গেল। আমার মশাই লাভের মধ্যে হয়েছে খারাপ লিভার। ফ্রি মাল গিলেছি, আর মাঝে মাঝে দু' চারশ টাকা পেয়েছি। ক্যাপিটাল নেই যে। থাকলে দেখিয়ে দিতাম। অ্যাদ্দিনে কত বেকার শিক্ষিত ছেলে ফোকলা গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রিজে চাকরি পেয়ে যেতো।"

আমি বললাম, "মিস্টার আগরওয়ালা আপনার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবেন।"

"পেটের ছেলে কিছু পড়ে যাচ্ছে না— একটু দাঁড়াক্ না।" ফোকলা চ্যাটার্জি রেগে গিয়ে বললেন। কপালে হাত দিয়ে কী ভাবলেন। তারপর নিবেদন করলেন, "কিছু মনে করবেন না, বেঙ্গলী মেয়েগুলো যে গুড্ ফর নাথিং। মেয়েদের সাহায্য না পেলে কোনো জাত বড় হয় না। আমরা কেন, স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলে গিয়েছেন, নারী জাতিই আমাদের শক্তির উৎস। কিন্তু বাঙালী মেয়েরা একটুও কষ্ট করবে না। মিস্টার রঙ্গনাথনকে তো মনে আছে। ভদ্দরলোকের হাতে লাখ লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট। বেঙ্গল সম্বন্ধে ও'র বেশ শ্রদ্ধা ছিল। খুব ইচ্ছে ছিল, কোনো বাঙালী মেয়ের সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব করেন। সব খরচা দিতে রাজী। তা আপনাকে দুঃখের কথা বলবো কী, কাউকে রাজী করাতে পারলাম না। হলোও তেমনি, মিসেস কাপুর ও'র সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ করলেন। যে অর্ডারটা আমরা পেতে পারতাম সেটা মিস্টার কাপুর পেয়ে গেলেন। অথচ কাগজ খুলে দেখুন শুধু দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। মেয়েরা যতক্ষণ না এগিয়ে আসছে ততক্ষণ এ-জাতের উন্নতি হতে পারে না, এ-কথা আপনি ডাইরীতে লিখে রাখতে পারেন।"

ফোকলা চ্যাটার্জি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাই ঘুরে আসি।" যেতে গিয়ে হঠাৎ ফোকলা চ্যাটার্জি ঘুরে দাঁড়ালেন। "স্যর মাধবের ছেলে, অনিন্দ্যকে দেখেছেন?"

বোসদা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, "আজ্ঞে, উনি জার্মান অতিথিদের দেখতে এসেছেন।"

"হুঁ", ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন। একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে কেউ কি অনিন্দ্যকে ফোন করেছিল?"

ফোকলা চ্যাটার্জির চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আমার যেন কেমন ভয় হতে লাগল। বললাম, "হ্যাঁ, ডক্টর রাইটার ফোন করেছিলেন।"

"সিওর?" ফোকলা প্রশ্ন করলেন।

"আমার এখান থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলেন", আমি উত্তর দিলাম।

"আই সী।" ফোকলা উত্তর দিলেন।

"আমার যেন মনে হলো কেউ বাঙলায় কথা বলছে।"

আমি উত্তর দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কোনোরকমে বললাম, "ঠিকই ধরেছেন। প্রথমে আমি কথা বলেছিলাম। ডক্টর রাইটার আমাকেই সংযোগ করে দিতে বললেন।"

ফোকলা চ্যাটার্জি বললেন, "আচ্ছা।"

ফোকলা চ্যাটার্জি চলে যেতে আমি যেন আশ্বস্ত হলাম। আর কিছুক্ষণ প্রশ্ন করলেই আমি কী যে বলে ফেলতাম কে জানে।

বোসদা এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মুখের থেকেই তিনি যেন সব বুঝে নিলেন? তিনি জানেন, ডক্টর রাইটার বিকেল থেকে একবারও কাউন্টারে আসেন নি। তবু তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। আমি এবার কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময়েই বোসদা খাতার মধ্যে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "এটা হোটেল। এখানে জড়িয়ে পড়তে নেই। জড়ালেই দুঃখ।"

বোসদার কথার উত্তর দেবার মতো শক্তি আমার ছিল না। কোনোরকমে কথাগুলো না শোনার ভান করে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

সেই রাত্রে করবী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ফোকলা চ্যাটার্জির কথা তাঁকে বলবো। কিন্তু পারলাম না। দেখলাম, তিনি চুপচাপ বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়েছি। অনিন্দ্যবাবু চলে গিয়েছেন, এবং ওঁরাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন আগরওয়ালা এলেও আর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।"

করবী দেবীর কাছেই শুনলাম, অনিন্দ্য এমনভাবে ডেকে পাঠাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। করবী দেবী উত্তর দিতে পারেননি। শুধু বলেছিলেন, "আপনার প্রয়োজন আছে। এঁদের দুজনকে সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো।"

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে করবী দেবী ঘেমে উঠছিলেন। "আবার আসবেন উনি কাল সকালে। ওঁকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। আমার কেমন ভয় ভয় করছে।"

বোসদার সাবধানবাণী তখনও আমার কানে বাজছিল। হোটেলে চাকরি করতে এসে, আমি জড়িয়ে পড়তে রাজী নই। তবু আমাদের চোখের সামনে আগরওয়ালা পাকড়াশিদের সর্বনাশ করবেন তা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু কিছুদিন পরে জানতে পেরেছিলাম,

পাকড়াশি বাণিজ্য সাম্রাজ্য বাইরে থেকে যতটা মনে হতো ততটা শক্তিশালী ছিল না। এই জার্মান সহযোগিতা না পেলে হয়তো তাঁদের প্রাসাদের ভিত নড়ে উঠতো। করবী গুহ তখন আনন্দে চোখের জল ফেলছিলেন। অনিন্দ্য জানে না, কিন্তু তাকে সর্বদা কাছে কাছে রেখে, আগরওয়ালার হাত থেকে তিনি পাকড়াশিদের রক্ষে করতে পেরেছিলেন।

কাগজে সেদিন ছবি বেরিয়েছিল। জার্মান সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন মাধব পাকড়াশি। তাঁর বাঁদিকে শ্রীঅনিন্দ্য পাকড়াশিকে দেখা যাচ্ছে।

এই ছবিটার দিকে তাকিয়েই করবী দেবী আনন্দের অশ্রু বিসর্জন করছিলেন।

এইখানেই শেষ হতে পারতো। শাজাহান হোটেল এবং করবী গুহের জীবন থেকে অনিন্দ্য পাকড়াশি এইখানেই সরে যেতে পারতেন। অন্তত সেইটাই স্বাভাবিক হতো। শাজাহানের নতুন কোনো অতিথির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হতো, তাঁকে নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকতাম, অনিন্দ্য পাকড়াশির অন্তরে আমাদের কোনো স্থান থাকল কিনা সে নিয়ে চিন্তা করতাম না। কিন্তু, সবার অলক্ষ্যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে এমন ঘটনা ঘটবে তা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

আমি কেবল অনিন্দ্যর ব্যবহারে আশ্চর্য হয়েছিলাম। করবী গুহর সজাগ দৃষ্টির বাইরে থাকলে, পাকড়াশি ইন্ডাস্ট্রিজের পরিবর্তে যাঁর ছবি কাগজে বের হতো তাঁর নাম মিস্টার আগরওয়ালা। কিন্তু ক অনিন্দ্য তো একবারও মনের সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেলেন না? আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, করবী দেবী সে নিয়ে একটুও দুঃখিত হলেন না। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন, অন্তত আমার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু কই?

আসলে তখনও আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝলাম কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যের একটু পরেই কালো চশমায় চোখ দুটো ঢেকে, সিল্কের শাড়ি পরে এবং সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে যিনি হোটেলে এসে ঢুকলেন তিনি মিসেস পাকড়াশি। অনেক-দিন তাঁকে হোটেলে আসতে দেখিনি। হয়তো জার্মান অতিথিদের উপস্থিতির জন্যেই তাঁর আসা সম্ভব হয়নি। এখন তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। পুত্র অনিন্দ্যকে নিয়ে মাধব পাকড়াশি হয়তো বোম্বাই কিংবা দিল্লিতে রওনা হয়েছেন। আর সৌভাগ্যক্রমে আমাদের এক নম্বর সুইটও খালি রয়েছে।

মিসেস পাকড়াশি কাউন্টারে আমাকে দেখে বোধ হয় একটু হতাশ হলেন। বললেন, "মিস্টার বোস কোথায়?"

"ও'র ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোনো কাজ হয়।"

মিসেস পাকড়াশি বললেন, "ও'র সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই। আমি মিসেস পাকড়াশি।"

বোসদাকে ডেকে নিয়ে এলাম। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, "কখন ঘর চান জেনে নিলেই পারতে। আমাকে আবার তোলা কেন?"

বললাম, "আপনার কাস্টমার। আমার সঙ্গে লেন-দেন করতে চান না!"

বোসদা বললেন, "না কিছু গোলমাল আছে নিশ্চয়ই। হয়তো কমনওয়েলথ সিটিজান নয় এবার। সুতরাং পুলিসের ফর্ম ফিল আপ করার হাঙ্গামা আছে।"

বোসদাকে দেখেই মিসেস পাকড়াশি কাউন্টার থেকে এগিয়ে এলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ও'রা দুজনে কীসব কথাবার্তা বললেন। তারপর কাউন্টারে ফিরে এসেই আমাকে বললেন, "এক নম্বর সুইটের চাবিটা দাও তো।"

চাবি হাতে করে ও'রা দুজনেই উপরে উঠে গেলেন।

ঘড়ির কাঁটা ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, অথচ ও'দের দুজনের কারুরই দেখা নেই। প্রায় এক ঘণ্টা পরে মাধব পাকড়াশি টেনে দিয়ে আহত সাপিনীর মতো ফোঁস

রোস করতে করতে মিসেস পাকড়াশি হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উনি চলে যেতেই বেয়ারার হাতে স্লিপ দিয়ে বোসদা আমাকে ডেকে পাঠালেন। কাউন্টারে উইলিয়মকে বসিয়ে রেখে আমি উপরে চলে গেলাম।

বোসদা বললেন, "বোসো।"
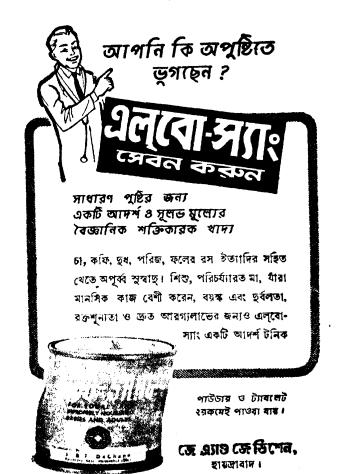
আমি বসলাম। বললাম, "মিসেস পাকড়াশির জন্যে কোনো স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করতে হবে? ন্যাটাহারিবাবুকে খবর দিয়ে ফ্রেশ বালিশ এবং চাদরের ব্যবস্থা করতে হবে?"

"না ও-সবের কিছুই করতে হবে না।" বোসদা চিন্তিত হয়ে বললেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কী? তুমি নিশ্চয়ই জানো। অথচ আমাকে বলনি।"

আমি অবাক হয়ে ও'র মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা বললেন, "করবী এবং অনিন্দ্যর কথা জিজ্ঞাসা করছি। এরা এতোদূর এগোবার সময় পেল কখন?"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

তুমি নিশ্চয়ই সব দেখেছো, সুতরাং তোমার কাছে চেপে রেখে লাভ নেই, "অনিন্দ্য করবীকে বিয়ে করতে চায়। শাজাহান হোটেলের দু' নম্বর সুইটের হোস্টেসের জন্যে মাধব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রিন্স-অফ-ওয়েলস পাগল হয়ে উঠেছে। সুতরাং মিসেস পাকড়াশির অবস্থা বুঝতেই পারছো।"

কেন জানি না, প্রথমেই মনের মধ্যে আমার আনন্দের শব্দহীন উল্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনিন্দ্য এবং মিস গুহ। মন্দ কী? সংসারের সব উত্তাপ থেকে করবী নিশ্চয় অনিন্দ্যকে রক্ষা করবেন। আর অনিন্দ্য যদি করবীর শুষ্ক মনের মরুভূমিতে জল সিঞ্চন করে ফসল ফলাতে পারে, তা হলে আমাদের পরিচিত পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমি এর কিছুই জানতাম না। করবী বলেন নি। কিন্তু কেনই বা তিনি আমাকে বলতে যাবেন?

বোসদা বললেন, "বিপদ হল আমাদের। এমন ফ্যাসাদে কখনও পড়িনি। মিসেস পাকড়াশির ধারণা অনিন্দ্যকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে করবী। তার ছেলে-মানুষী তার সরল নিষ্পাপ মনের সুযোগ নিয়ে হয়তো মুহূর্তের কোনো অধঃপতন ঘটিয়েছে এবং এবার সে তা চড়া দামে ভাঙাতে চাইছে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এর মধ্যে আমরা আসছি কী করে?"

"মিসেস পাকড়াশি আমাদের স্নেহ করেন। যে কারণেই হোক এই হোটেলের উপর তাঁর দুর্বলতা আছে। তাছাড়া এখন বিপদে পড়ে এসেছেন। বিপদে পড়লে পরম শত্রুকেও সাহায্য করতে হয়।"

"সাহায্য?" আমি বোসদাকে প্রশ্ন করলাম।

"উনি অনুরোধ করছিলেন, আমরা যদি কেউ করবীর সঙ্গে কথা বলি। আমি বলেছি, সেটা মোটেই শোভন নয়, সম্ভবও নয়। তখন তিনি নিজেই দেখা করতে রাজি হয়েছেন। তবে অনিন্দ্য যেন না জানতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলাম। বোসদা বললেন, "আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। উনি জেনে গেছেন যে, এই হোটেলে একমাত্র তোমার সঙ্গেই করবী কথাবার্তা বলেন।"

"কেন ন্যাটাহারিবাবু তো রয়েছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ লোক।" আমি নিজেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো না। "পাগল হয়েছো", বোসদা বললেন। "ব্যাপারটা তুমি, আমি, মিসেস পাকড়াশি এবং করবী ছাড়া পৃথিবীর কেউ যেন না জানতে পারে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজি হতে হয়েছিল।

করবী দেবী তখন দু' নম্বর সুইটে একলা চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর কোলের উপর একখানা কবিতার বই পড়েছিল। পাখির নীড়ের মতো চোখদুটি তুলে 'বনলতা-সেন-ভঙ্গীতে' করবী দেবী প্রশ্ন করলেন "এতদিন কোথায় ছিলেন?"

হেসে বললাম, "কোথায় আর থাকবো? শাজাহানের একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত ওঠা-নামা করছি।"

করবী গুহ বললেন, "আমি অনেকদিন পরে একটু শান্তিতে রয়েছি। আমার এখন একজনও অতিথি নেই। পাকড়াশিদের কুপোকাৎ করতে না পেরে মনের দুঃখে আগরওয়ালাও এ-দিক মাড়াচ্ছেন না। ফোন করেছিলাম। শুনলাম, ব্লাড-প্রেসার এবং ডায়াবিটিশ একই সঙ্গে আক্রমণ করেছে। সুতরাং এখন কয়েকদিন আমি চুপচাপ বসে বসে পরম আনন্দে কবিতা পড়বো, গান গাইবো, বাইরে বেড়াতে যাবো, যা খুশি তাই করবো।"

এবার আমাকে নিজের কথায় আসতে হলো। "আপনার কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করবো।"

"প্রস্তাব?" করবী দেবী আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"হ্যাঁ কিংবা না করবার স্বাধীনতা আপনার। কিন্তু একটা শর্ত আছে। বিষয়টা কাউকে, এমনকি অনিন্দ্যবাবুকেও বলতে পারবেন না।"

অনিন্দ্যর নাম শুনেই করবীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। কোনো রকমে বললেন, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, তবে আমি কথা দিচ্ছি তোমার শর্ত পালন করবো।"

"আমিও তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু মিসেস পাকড়াশি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।"

মিসেস পাকড়াশি বলেছিলেন, শাজাহান হোটেলে নয়। অন্য কোথাও ওঁরা দুজনে সাক্ষাৎ করবেন। করবী দেবী রাজি হননি। হোটেলের বাইরে যেতে তিনি অভ্যস্ত নন, একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। শুনে মিসেস পাকড়াশি টেলিফোনেই খিল খিল করে হেসে উঠেছিলেন। "আই সি। এখন আমার বিপদ, ঠিক আছে আমিই দেখা করবো। কিন্তু ব্যাপারটা যে গোপন রাখবে তো?"

"আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে তো?" করবীকে আমি জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম।

"আমরা প্রখ্যাত হোটেলের কুখ্যাত হোস্টেস। মারোয়াড়ীর চাকরি করে মা-ভাই-বোনদের প্রতিপালন করি, আমাদের কথার কতটুকু বা মূল্য থাকতে পারে।" করবী দেবী দুঃখিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

মিসেস পাকড়াশির হোটেলে আসবার সেই দিনটি এই মুহূর্তে স্মৃতির পর্দায় আবার যেন দেখতে পাচ্ছি। যে করবী কত স্বনাম-ধন্যকে অবলীলাক্রমে অভ্যর্থনা জানিয়ে অপরের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করেছেন তিনিই যেন আজ কেমন হয়ে গিয়েছেন। বললেন, "আমার ভাল লাগছে না। কথাবার্তার সময় আপনি থাকবেন।"

"তা কখনও হয়?" আমি বললাম। "বরং আমি বাইরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবো।"

নিজের গাড়িতে নয়, একটা ট্যাক্সি চড়ে মাধব ইণ্ডাস্ট্রীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিসেস পাকড়াশি শাজাহান হোটেলে হাজির হয়ে-ছিলেন। ঢোকবার মুখেই যে রিপোর্টার মিস্টার বোসের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়ে যাবে আশা করিনি। মিস্টার বোস বললেন, 'কী ব্যাপার, পি টি আই-এর খবরে দেখলাম প্যারিসের সমাজসেবা সেমিনারে যাবার কর্ম-সূচী আপনি শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করলেন?"

মিসেস পাকড়াশি মৃদুহাস্য করে উদাস-ভাবে বললেন, "চিন্তা করবেন না মিস্টার বোস বোম্বাই-এর মিসেস লক্ষ্মীবতী প্যাটেল আমার অনুরোধে শেষ মুহূর্তে ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে রাজি হয়েছেন।"

মিস্টার বোস বললেন, "সেতো অন্য কথা। ক্যালকাটার যে গৌরব আপনি প্যারিসে গিয়ে বাড়িয়ে দিতেন, তার তো কোনো ক্ষতিপূরণ হবে না।"

মিসেস পাকড়াশি বললেন, "আপনাদের প্রীতি এবং ভালবাসার জোরেই তো এতো-দিন দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রার্থনা করুন, আমার শরীরটা যেন তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠে। উনিতো দিল্লি-এ চললেন। অনিন্দ্যকেও পাঠাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এক্সচেঞ্জ ভিফি-কাল্টির জন্যে হয়ে উঠলো না।"

মিস্টার বোস হয়তো আরও প্রশ্ন করতেন, কিন্তু মিসেস পাকড়াশি এবার এগিয়ে চললেন। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো সত্যিই যেন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

"দু নম্বর সুইটে মিস গুহ আছেন তো?" মিসেস পাকড়াশি আমাকে প্রশ্ন করলেন। তারপর গম্ভীর মুখে লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মাত্র দশ মিনিট কিংবা বোধ হয় তাও নয়। দু নম্বর সুইটের দরজা খুলে মিসেস পাকড়াশি আবার বেরিয়ে এলেন। কোনো কথা না বলে মিসেস পাকড়াশি সত্য-সুন্দরদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সত্য-সুন্দরদা তাঁকে হোটেলের বাইরে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন।

আমাকে দেখে বললেন, "মিসেস পাকড়াশি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন। করবীকে বোলো, মিসেস পাকড়াশির কথা না শুনলে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে। ভদ্র-মহিলা তাই আমাকে জানিয়ে দিতে বললেন।"

করবী গুহ যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এই বিশাল জগতে করবী যেন একা, আপনজন বলতে তাঁর কেউ নেই। পুরুষের একাকিত্ব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই বিদেশী পরিবেশে করবী দেবীর অবস্থা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে উঠলো। বেশ তো ছিলেন, কেন শুধু শুধু এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়লেন। আর উপদেশ নেবার লোক পেলেন না তিনি। শাজাহান হোটেলের কনিষ্ঠতম কেরাণী জীবনের বৃহত্তম সমস্যায় করবীকে কি পরামর্শ দেবে?

দেশের অগণিত পাঠকপাঠিকা, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। সত্য কোন পক্ষে, নীতি কোনদিকে, তা বিচার করে দেখবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। জানি সমাজের সাবধানী পুরুষ এবং মহিলারা আমার এই দুর্বলতা ক্ষমা করবেন না। হয়তো কুখ্যাত অতিথিশালার অভ্যর্থনা-কারিণীর জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়া আমার কিছুতেই উচিত হয়নি। কিন্তু এই-টুকু জোর করে বলতে পারি, আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও আমার মতো অসহায় বোধ করতেন।

করবী গুহ আমার দিকে একবার তাকালেন, তারপর আর কিছুতেই নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, "এ আমার কি হলো?"

কোনো অনুরাগজর্জরিতা আত্মীয়বন্ধু-বিহীনা মহিলার নিরাশ হৃদয়ের কান্না কখনও শুনেছেন কি? দুঃখজর্জরিত আমাদের এই সংসারে এমন কিছু দুর্লভ দৃশ্য নয় সেটি। আমি অনেকবার শুনেছি, এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি তার সম্পূর্ণ এক কান্না, দীর্ঘশ্বাস এবং অভিযোগ মেশানো সেই শব্দের বর্ণনা দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। একমাত্র কোনো বেটোফেন, মোৎসার্ট বা ভাগনার সুরের মূর্ছনায় তার রূপ দিতে পারতেন। কোনো শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্র-নাথ বা ডিকেন্স হয়তো কানে শুনে কলমে তার বর্ণনা দিতে পারতেন। সে আমার সাধ্যের অতীত।

শাজাহান হোটেলের দু নম্বর সুইটের দেওয়ালের ইটগুলো যেন সভয়ে প্রতিধ্বনি তুললো, 'এ আমার কি হলো?'

কি হলো? তুমি ভালবেসেছিলে, সবার

অগোচরে তুমি এক সুদর্শন নির্মলপ্রাণ যুবককে তোমার মন দিয়েছিলে। তুমি আন্দাজ করেছিলে সেও হয়তো তোমার প্রতি সামান্য অনুরক্ত, অন্তত তার মনের কোথাও তোমার জন্যে সামান্য কোমল স্থান আছে। কিন্তু কেবল সেই পর্যন্ত। তারপর? তারপর যে এতদূর এগিয়েছে, তাতো জানা ছিল না। অনিন্দ্য যে বাড়িতে বলেছে, সে যে এগিয়ে যেতে মনস্থির করেছে, তাতো সে নিজেও বলেনি। মিসেস পাকড়াশিই অজান্তে করবী গুহকে সেই পরম আশ্চর্য, পরম প্রিয়, পরম মধুর, সংবাদটি দিয়ে গেলেন।

"সাবধান। পাকড়াশি গ্রুপ অফ ইণ্ডাস্ট্রীজের সামান্যতম ক্ষতিও আমার স্বামী বা আমি সহ্য করতে পারবো না। অনিন্দ্যর বয়স কম, সে বোঝে না। ছিঃ, তাই বলে তুমি। তুমি না মেয়েমানুষ? তোমার অন্তর বলে কোনো জিনিস নেই?" মিসেস পাকড়াশি প্রশ্ন করেছিলেন।

অন্তর বলে একটা জিনিস আছে বলেই তো আজ এমন অবস্থা। করবী গুহর অন্তরটা শুকিয়ে কিসমিস হয়ে ছিল এতোদিন, এই ক'দিনেই হৃদয়ের রসে ভিজে সেটা আবার টইটম্বুর হয়ে উঠেছে।

মিসেস পাকড়াশি বলেছিলেন, "কেন যে আমাদের এখানে তোমার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন কত টাকা পেলে তাড়াবে বলো?"

করবী গুহ ফ্যালফ্যাল করে মিসেস পাকড়াশির দিকে তাকিয়েছিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, "টাকা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। যার জন্যে আমার এই অশান্তির সৃষ্টি করেছো। যার জন্যে আমার প্যারিসে যাওয়া হলো না।" মিসেস পাকড়াশি উত্তর দিয়েছিলেন।

মিসেস পাকড়াশি তারপর নিজেই উঠে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, "মনে থাকে যেন তুমি নিজেই কথা দিয়েছো, অনিন্দ্য এসবের কিছুই জানবে না। আর যেহেতু নিজেই তোমার দরজায় এসেছি, সেই জন্যে টাকার অঙ্কটা বাড়িও না। একটু ভেবে দেখো। আমি আবার খবর নেবো।"

করবী গুহ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনিন্দ্য পাকড়াশি অন্তত তার কথা চিন্তা করেছেন। ছেলেমানুষের মতো সব গাম্ভীর্য হারিয়ে করবী গুহ সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। "কই আমাকে তো এখনও বলেননি? আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা উচিত ছিল না? আমি যে রাজি হবো, সেকথা তিনি ধরে নিলেন কেমন করে?"

"হয়তো আপনার চোখেই তা ধরা পড়ে গিয়েছিল।" আমি বলেছিলাম।

"ওঁর চোখেও আমি দেখেছিলাম, কিন্তু সাহস হয়নি।" করবী তখন কেবল অনিন্দ্যের কথাই ভাবছেন, মিসেস পাকড়াশির সাবধানবাণী তখন তাঁর মাথাতেই আসছে না।

করবী গুহ তারপর টেলিফোনের দিকে এগিয়েছিলেন, অনিন্দ্যকে বোধ হয় তিনি খুঁজে বার করবেন। আমি ঘর থেকে সোজা ছাদে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন দূরের শিশুরা যেন জগৎপারাবারের খেলা শুরু করে দিয়েছে। গোমেজের ঘর থেকে কলহাস্যে বেরিয়ে পড়ে মানব সমুদ্রের উপকূলে তারা যেন ছোটাছুটি করছে। এমন সময় গোমেজ যে ঘরে শুয়ে থাকতে পারেন আশা করিনি।

গোমেজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে। আমাকে দেখে বললেন, "শরীরটা অসুস্থ, বাজাতে যেতে পারিনি। প্রায়ই বমি আসছে। তাই শুয়ে শুয়ে মোৎসার্টের ভায়োলিন কনসার্টো শুনছি। প্রকৃত ভায়োলিন কনসার্টো মাত্র পাঁচটি তিনি রচনা করে গেছেন।" গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে প্রভাতচন্দ্রের দেহ পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই। শুয়ে শুয়েই বলতে লাগলেন, "পাঁচটাই সালসবুর্গে সৃষ্টি, ১৭৭৫ সালে। পৃথিবীর কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, একজন উনিশ বছরের ছেলে এই ভায়োলিন কনসার্টো রচনা করেছেন?"

আমি বললাম, "আপনি উত্তেজিত হবেন না, একটু বিশ্রাম নিন।"

"শোনো", ফিস ফিস করে গোমেজ বললেন। "যদি বসুন্ধরার গোপনতম বেদনাকে আবিষ্কার করতে চাও, তবে কান পেতে শোনো।"

রেকর্ডের গান শোনবার সেদিন আমার প্রয়োজন ছিল না। আমি কান পেতো দু' নম্বর সুইটে একটু আগেই ত শুনে এসেছি।

ন্যাটাহারিবাবু পরের দিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি ব্যাপার, মশাই? দু' নম্বর সুইটের মা জননী আমার আজ আর ডিনার পছন্দ করলেন না। ফুলওয়ালাকেও বকুনি দিলেন না?"

বললাম, "জানি না।"

ম্যাটাহারিবাবু মাথা নাড়লেন। "উঁহু ভাল লাগছে না আমার। শাজাহান হোটেলে চল্লিশ বছর কাটিয়ে আমি এখন সব আগে থেকে বুঝতে পারি। বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি গন্ধ পাই।"

ফোকলা চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আগরওয়ালার গেস্ট হাউসের অফিসারটি মেয়েমানুষ না কেউটে সাপ? কাউকে মানে না। খোদ আগর-ওয়ালার স্লিপ নিয়ে এক ভদ্রলোকের জন্যে এসেছিলাম। সোজা ভাগিয়ে দিল। ইন্ডিয়ান ফার্মদের মশায় এই মুশকিল—ডিসিপ্লিন বলে কিছুই নেই। আমেরিকায়, বিলেতে এমন তো কত গেস্ট হাউস আছে। সেখানকার কোনো মেয়ে এমন সাহস করবে?"

সত্যসুন্দরদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কিছু বুঝছো?"

বলেছিলাম, "কেউ বোধ হয় কিছু বুঝতে পারছে না।"

সত্যিই করবী গুহও কিছু বুঝতে পারছিলেন না। চুলগুলো আঁচড়াবার সময় পর্যন্ত তিনি যেন পাননি। বললেন, "কেউ যদি আমাকে ভালবাসে এবং আমি যদি তাকে ভালবাসি, তাহলে তাকে বিয়ে করবার মধ্যে তো কোনো অন্যায় নেই।"

আমাকে ঘরের মধ্যে পেয়ে করবী গুহ ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলেন। আমি চুপ করে রইলাম।

করবী গুহ নিজের মনেই বললেন, "কে কি বলবে, তাতে আমাদের কি এসে যায়?"

আবার পরমুহূর্তেই তিনি যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। "লোকে খারাপ বলবে। আগর-ওয়ালার হোস্টেসকে বিয়ে করেছে পাকড়াশি সাম্রাজ্যর রাজপুত্র।"

একটু ভাবলেন করবী গুহ। "লোকেরা যা খুশি ভাবুক, কি বলেন? আর অনিন্দ্যর মা? অন্যায়। তিনি কেন আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন? তাঁর ছেলেকে সুখী করার দায়িত্ব, সেতো আমি নিচ্ছি? চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন", করবী গুহ অভিযোগ করলেন।

আমার মুখে এখনও কথা নেই। করবী বললেন, "কারুর কথা শুনবো না আমি। আমরা এগিয়ে যাবো।"

এই প্রগলভ করবীর সঙ্গে কি আমার এতোদিনের পরিচয় ছিল?

আবার দেখা হয়েছে। মিস্টার আগর-ওয়ালার গেস্ট হাউসে অতিথিদের যাতায়াত বন্ধ। আমাকে দেখেই করবী মৃদু হাসলেন। "শুনেছেন, মিসেস পাকড়াশ আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আগরওয়ালাকে বলে আমার

চাকরি যাবার ব্যবস্থা করাতে পারেন জানিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু করতে পারেন।"

এবার যেন হাসিতে ভেঙে পড়লেন করবী গুহ। বললেন, "আপনিই আমাকে বিপদে ফেলেছেন। না হলে আমি সব ঠিক করে ফেলতে পারতাম।"

"আমি?"

"হ্যাঁ আপনিই তো আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন অনিন্দ্যকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না।"

"দিব্যি ভাঙুন না, আমার কি?"

"তা কখনও হয়? অনিন্দ্যের যে তাতে ক্ষতি হবে।" করবী গম্ভীরভাবে বললেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখতে দেখতে করবী বললেন, "ভয় দেখালেই আমার মাথার ঠিক থাকে না। ছোটোবেলা থেকে কেউ আমাকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে পারেনি। অনিন্দ্য এসেছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো এতো মন খারাপ কেন? আমি কিছুই বলতে পারলাম না।"

ভয় দেখিয়েছিলেন মিসেস পাকড়াশি সত্যি কথা। কিন্তু সেই রাত্রে তাঁকে নিজেই সত্যসুন্দরদার কাছে আসতে হলো। মুখ শুকিয়ে কালি। করবী টেলিফোনে শাসিয়েছে তার হাতেও জিনিস আছে। তার হাতেও এমন আণবিক বোমা আছে, যা মিসেস পাকড়াশির সোনার সংসার মুহূর্তে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে।

মিসেস পাকড়াশি আর যেন সেই গরবিনী মহিলা নেই। করবী গুহের আণবিক বোমায় তিনি যেন ইতিমধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছেন। মিসেস পাকড়াশিও সেদিন ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। শাজাহান হোটেলের এক নম্বর সুইট ভূত হয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে কেন টেনে এনেছিল। মিসেস পাকড়াশি বলেছিলেন, "কাউকে কোনোদিন আর বিশ্বাস করা চলবে না।"

বোসদা পাথরের মতো নির্বাক হয়ে বসে-ছিলেন। কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

সেই রাত্রে করবী গুহ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খুশীতে ঝলমল করছেন তিনি।

মিসেস পাকড়াশি একটু আগেই তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন জানি। করবীর হাতে একটা ছবির খাম। নিজেই বললেন, "রাজি হয়েছেন। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, জামাই, সংসার এদের কাছে না হলে মুখ দেখাবেন কি করে? বলেছেন, তিনি আর কোনো বাধা দেবেন না। প্রথমে ওঁর একটু সন্দেহ ছিল, ভেবে-ছিলেন আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। তারপর দেখালাম।" করবী এবার খামটা নাড়ালেন। আপনাকেও দেখাতে পারবো না। এক নম্বর সুইটের ঘরের ভিতরে তোলা ছাবর নেগেটিভ।

"প্রথমে চমকে উঠেছিলেন তিনি। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর গোপন অভিসারের অমন সর্বনাশা দলিল কি করে আমার হাতে এল জিজ্ঞাসা করলেন।"

করবী দেবী বলেছিলেন, পাঁচজনের হাতে ঘোরার চেয়ে একজনের কাছে থাকাই কি ভাল নয়?

আমি বললাম, "সত্যি, কোথা থেকে পেলেন? এমন ছবি যে কেউ তুলে রাখতে পারে তা আমার জানা ছিল না।"

করবী দেবী বললেন, "এই হোটেলেরই কেউ আমাকে দিয়েছে। না হলে পেলাম কেমন করে? মিসেস পাকড়াশি আমাকে ভালবাসেন না বলে কেউ কি আমার জন্যে চিন্তা করে না।"

করবী দেবী এবার খিলখিল করে হেসে উঠলেন। "রাজি হয়েছেন। ভুলেও তিনি আর আমার পথে বাধা দেবেন না।"

"এবার কি? বলুনতো?" করবী গুহ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

অনভিজ্ঞের মত আমি বলেছিলাম, "এবার শাজাহান হোটেল ছেড়ে নিউ আলিপুরে।"

করবী দেবী আমার কাঁধে হাত রেখে-ছিলেন। আপনি থেকে হঠাৎ তুমি হয়ে গেলাম। "আমাকে তোমরা একেবারে ভুলে যাবে। তোমরা কোনোদিন তো আমাকে শাজাহান হোটেলের সহকর্মী বলে মনে করবে না।"

"আপনিই ভুলে যাবেন। ডিনার বা ব্যাংকোয়েটে শাজাহান হোটেলে এলেও একবারও কাউন্টারের দিকে তাকাবেন না, সোজা ব্যাংকোয়েট হলে যাবেন। আমরা তখনও রসিদ কাটবো, বিল তৈরি করবো, খাতায় লেখালিখি করবো, টেলিফোন ধরবো, স্টুয়ার্ডের বকুনি খাবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমারও ভেরিকোজ ভেনগুলো হয়তো ফুলে উঠবে।"

"তোমার এ-চাকরি ভাল লাগে না?" করবী দেবী বলেছিলেন।

"মোটেই না। একটা দশটা পাঁচটার চাকরি কোথাও করে দেবেন তো?"

"সব দেবো। আমার জন্যে এতো করেছো তুমি, আর এইটুকু করবো না।"

আমি বলেছিলাম, "গুড নাইট।"

করবী গুহ বলেছিলেন, "গুড নাইট।"

ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে সামান্য কিছু-ক্ষণ হয়তো ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ গুড়-বেড়িয়া এসে ডাকলো। রাত্রি অনেক হয়েছে। দু' নম্বর সুইটের মেমসায়েব আমাকে ডাকছেন।

চোখে একটু জল দিয়ে আবার নেমে গেলাম। দেখলাম, করবী দেবী যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সমস্ত দেহটা যেন থরথর করে কাঁপছে।

নিজের মাথাটা চেপে ধরে করবী গুহ বললেন, "একি করলাম আমি। শ্বাশুড়ীকে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনার কথাতো ছিল না।"

আমি তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। "হঠাৎ এই কথা ভাবছেন কেন?"

"ভাববো না। অনিন্দ্যর মা যখন আমার ঘর থেকে শুকনো মুখে চলে গেলেন, তখন আপনি তাঁকে দেখেননি। তেজপাতার মতো তাঁর দেহটা কাঁপছে। আমি বলেছিলাম, আপনি আর কোনো বাধা দেবেন না তো? উনি বলেছিলেন, না। আরও বলেছিলেন, হয়তো খোকার চেয়ে তোমার বয়স একটু বেশী। তবু কিছু বলবো না। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি। আমার ছবিটা বিয়ের আগে ছিঁড়ে ফেলবে তো? আমার হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন, কাউকে বলবে না তো?"

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। করবী দেবী কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "এমন-ভাবে বিয়ে করবার কথাতো ছিল না।"

আমার সামনেই খামটা করবী দেবী ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, "স্যরি। তোমাকে এতোরাত্রে কেন শুধু শুধু ডেকে পাঠালাম। এতো বড়ো হোটেলে তুমি ছাড়া কেউ যে আমার আপনজন নেই।"

পরের দিন একটু দেরিতে ঘুম ভেঙেছিল আমার। তখন হোটেলে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। এক নম্বর সুইটে করবী গুহের প্রাণহীন দেহ তখন পুলিস দরজা ভেঙে উদ্ধার করেছে।

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, "মা জননী আমার এক শিশি ঘুমের ওষুধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলেছে।"

করবী গুহর মৃতদেহ যখন হোটেল থেকে বার করে মর্গে পাঠানো হয়েছিল, তখনও আমি যাইনি।

ন্যাটাহারিবাবু ফিরে এসে বললেন, "এক-বার গুডবাই করে এলেন না? আমি মশাই সবচেয়ে ভাল চাদরটা পুলিসের গাড়িতে দিয়ে দিয়েছি। মা জননী আমার কেন যে হোটেলে এসেছিল। সেই প্রথম যেদিন ওঁকে দেখেছিলুম, সেদিনই আমি সবাইকে বলে-ছিলাম, এতো হোটেলের মেয়ে নয়, এ-আমার মা জননী। তখন আমার কথায় কান দেওয়া হয়নি। এখন বোঝো।" নিজের মনেই বকবক করতে ন্যাটাহারিবাবু বেরিয়ে গেলেন।

[ক্রমশ]

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila

নিঃশব্দ আহ্বান

শ্রীরমনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

৪

"সেদিন গোপা জেনে গেল আমি খুনী।" অলোকের দুই চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। সুব্রত নীরবে বসে থাকল। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে অলোক আবার বলতে শুরু করল, "গোপাকে বাঁচানো গেল না। অন্য ডাক্তার ডাকবার সুযোগও পাইনি। অশোক অকপটে স্বীকার করল তারই অনভিজ্ঞতার দরুন গোপা মারা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই অশোক আমার হাত ধরে অসহায়ের মত কেঁদে উঠল, অলোক তুমি আমাকে বাঁচাও, তুমি আমাকে বাঁচাও।

অশোকের মার কথা আমার মনে পড়ল। মধ্যবয়সে অশোককে নিয়ে বিধবা হন। কত কষ্ট করে দিনের পর দিন অভাবের সাথে লড়াই করে অশোককে তিনি মানুষ করেছেন। মেধাবী ছাত্র ছিল অশোক; মার আশা সে পূর্ণ করেছে। তারপর মনে পড়ল ইন্দ্রাণীর কথা। অশোকের বাকদত্তা। আমাকেও কত শ্রদ্ধা করে ইন্দ্রাণী, দাদা বলে ডাকে। বিয়ের পর অশোক বিলেত যাবে—শ্বশুরের টাকায়। আমার চোখ অশোকের মুখের দিকে। সে এখনও কাঁপছে: কাপড়ে চোপড়ে রক্তের দাগ। বড় অসহায়ের মতো আমার চোখের দিকে চেয়ে অশোক করুণা ভিক্ষা করছিল। আমাকে কলঙ্ক মুক্ত করতে এসে সে নিজেই কলঙ্কিত। সে আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম, অশোক?

অশোক চমকে উঠে দু পা পিছিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে বলল, অলোক, তুমি আমাকে পুলিশের হাতে দিওনা।'

সুব্রতবাবু, সেদিন অশোকের ঐ দুর্বলতা যে কত করুণ হ'য়ে ফুটে উঠেছিল, সে কথা বলার মতো ভাষা আমার নেই। সেই দুর্বল মুহূর্তে অশোকেরও বিশ্বাস হ'ল, আমি ওকে পুলিসের হাতে দিতে পারি। অশোক আমারই জন্য বিপদগ্রস্ত, এ কথা সে ভুলে গিয়েছিল। বিপদ আমারও কম ছিল না। তবুও আমার বাল্য বন্ধু অশোকের জন্যে আমার সমস্ত মন কেঁদে উঠল। আমার জীবনে সুখ ছিল কোথায়? বিয়ে করেও স্ত্রীর ভালবাসা পাইনি। এ পৃথিবীতে আকর্ষণ বলে তো আমার কিছু নেই। বাল্য বন্ধু অশোকের স্বার্থে তখন আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। আমার কথায় মন্ত্র-মুগ্ধের মত অশোক কম্পিত হাতে গোপার দেহটা কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে কয়েকটা টুকরা করে ফেলল। যতদূর সম্ভব দুই বন্ধুতে ঘরটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ফেলি। অশোককে বার বার সাবধান করে দিয়ে ওকে ওর বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। সেই খন্ড খন্ড দেহের অংশ চারটে থলির মধ্যে ভরে ফেললাম। রাতের গভীর অন্ধকারে পাহাড়-তলি, চাটগা শহর এবং ডবল মুরিং এর নানান জায়গায় ঐ চটের থলি ক'টা ফেলে দিলাম।

পরদিন ভোরের দিকে দীপা বাসায় এসে বলল, গোপাকে পাওয়া যাচ্ছে না। খবরটা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি সে এসেছে। মা বড় কান্নাকাটি করছে। তার পরই দীপা আমাকে জিজ্ঞেস করল, বলতে পার গোপা কোথায় যেতে পারে? দেখলাম দীপার বড় বড় চোখ দুটি ঝাপসা। সে সময় আমার মনে কি হ'ল জানেন সুব্রতবাবু? একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম, যাক্ তবে ওরা আমাকে সন্দেহ করেনি। কেউ টেরও পায়নি। কেন জানি নিজের ওপর মায়া হল। বাঁচবার জন্য বড় আগ্রহ, তাই সেদিন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, সবকিছুর আশ্রয় নিয়েছিলাম। দীপাকে সান্ত্বনা দিয়ে তক্ষুনি শ্বশুর বাড়ি ছুটলাম। শেষটায় শ্বশুর মশাইকে কোতোয়ালী থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করতে বলে বাসায় চলে এলাম।

শ্বশুর মশাই কোতোয়ালী থানায় যখন পৌঁছলেন, তখন সেখানে হুলস্থুল। শুধু দু'টা টুকরো পা একটা চটের থলির মধ্যে পাওয়া গেছে। শ্বশুর মশাই সে দু'টা পা দেখে সেখানেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। ও'র জ্ঞান হবার সাথে সাথে উনি বললেন, ঐ দুটো পা নিরুদ্দিষ্ট গোপার। গোপার জম

ও বড় কান্নাকাটি করছে

পায়ে ছ'টা আঙ্গুল ছিল। তা ছাড়া দীপার বাঁ পায়ে জন্ম দাগটা তখনও সজীব।

চতুর্দিকে হই-চই পড়ে গেল। আমি তখন পাহাড়তলিতে। একজন ভদ্রলোক এসে আমাকে খবর দিল, মা ডেকে পাঠিয়েছেন। সেই ভদ্রলোকের নাম প্রবোধবাবু। ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমার অবস্থা তখন বুঝতেই পারেন। দীপা নিজের কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিতে লাগল। সে তক্ষুণি আমাকে নিয়ে রওনা হবে। এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। গোপার মৃতদেহটা তখন আমার চোখের সামনে ভাসছিল। টেবিলটা থেকে তখনও যেন টপ টপ করে সদ্য রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর যখন আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অনিচ্ছাসত্ত্বেই বা বলি কেন ভয়ে চাটগা যেতে রাজী হলাম তখনই দেখি পুলিসের গাড়ি আমার বাসার সামনে এসে থেমেছে, সাথে প্রবোধবাবু। প্রবোধবাবু পুলিস সাথে করে সোজা চলে গেলেন একটা ছোট ঘরের পিছন দিকে। তারপর নর্দমাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে স্যার। চেয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। নর্দমার মধ্যে জমাট রক্তে ভড়াভড়ি। আমার দিকে একবার চেয়ে দেখল দীপা। সে দৃষ্টির সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার ছিল না। তার পরই সে প্রবোধবাবুর কাছে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

ঐ ঘরটাতে একটা তালা লাগিয়ে রেখেছিলাম। পুলিসের কথায় তালা খুলে দেওয়া হল। কি আশ্চর্য, পুলিস গোপার আংটিটা ঘরের এক কোণে খুঁজে পেল। শুনলে আপনি আরও আশ্চর্য হবেন সুব্রতবাবু, ঐ আংটিটা আমিই ওকে দিয়েছিলেম আমার বিয়ের পরে। প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে যে আংটি একদিন দিয়েছিলেম, সেই আংটিই সেদিন সব চাইতে শত্রু হল। সেই আংটিই প্রমাণ করে দিল সে ঐ ঘরে এসেছিল। পুলিস ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে আমারই সামনে ঐ ঘরের এদিক ওদিক থেকে রক্তের চিহ্ন খুঁজে বার করল। নর্দমাতে জমাট রক্ত পাওয়া গেল প্রচুর। সব কিছুই ছিল, তবু আমরা ভেবেছিলাম কোন সূত্রই বুঝি রাখিনি, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল অনেক সূত্রই রেখে গিয়েছি। পুলিস অনেক কথাই জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু কোন কথার উত্তরই আমি দিইনি। চুপ করে থাকতে দেখে দীপা আমাকে আকুলভাবে বলল: সত্যি ক'রে আমাকে বল, তুমি কেন গোপাকে খুন করলে? তুমি এত নৃশংস, আমি এক দিনের জন্যও ভাবিনি।

দীপার কথা আমাকে কী ভীষণ আঘাত দিয়েছিল। আপনি অনুমান করতেও পারবেন না। কিন্তু একটা বলতে গিয়েছিলেন, পারিনি। তখনই চোখে পড়ল পুলিস অফিসারের সন্ধানী দৃষ্টি। শিকারী

মা বললেন, 'দীপার কাছে একবার যা।'

কুকুরের দৃষ্টি নিয়ে সেই পুলিস অফিসার চেয়ে আছে আমার দিকে। ভীত বিহ্বল অশোকের কথা মনে পড়ে গেল; তুমি আমাকে পুলিসের হাতে দিও না। বেরিয়ে আসা কথাটা ওখানেই স্তব্ধ হ'য়ে গেল। দীপার প্রশ্ন শুনে সেদিন মনে হয়েছিল হয়তো বা দীপার মনের কোণে আমার জন্য একটু দরদ ছিল।

পর পর সব কটা টুকরোই পাওয়া গেল। এ টুকরোগুলো মিলিয়ে দেখা গেল ওটা গোপারই মৃতদেহ।

বিচারের সময় প্রতিদিন অশোক এক কোণে এসে বসত। আমাদের দৃষ্টি বিনিময়ও হয়েছে। ওকে দেখে মনে হয়েছে সে কত দুর্বল, কত রোগা। ওর মুখ দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম তার মনের মধ্যে কী বেদনা। একদিন অশোক এবং ইন্দ্রাণীকে আদালতে পাশাপাশি দেখেছি। বড় আনন্দ হয়েছিল। ইন্দ্রাণীর কপালে সিঁদুর দেখে সবই বুঝেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার অলোক বলতে থাকে, এক মাস বিচারের পর, আমার ফাঁসির হুকুম শুনে অশোক সশব্দে কেঁদে উঠেছিল। বার বার বলা সত্ত্বেও আমি কোনো প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিনি। বিচারকালীন অশোক একবার নয়, কয়েক বারই আমার সাথে এখানে দেখা করেছিল। সে চাইছিল সত্যি ঘটনা প্রকাশ করতে, কিন্তু আমি চাইনি। ওর মা, ইন্দ্রাণী এবং সবার কথা চিন্তা করে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সে প্রত্যাখ্যানে সে শিশুর মতো এখানেই বসে কেঁদেছিল। অশোক যে আমার কত প্রিয়, সে কথা আমি কি করে বোঝাব বলুন।

চিঠি পেয়েছি, অশোক বিলেত চলে গেছে। ইন্দ্রাণী গতকাল এসেছিল। কাছে বসে আমাকে কত কি খাইয়ে গেল। যতক্ষণ ছিল শুধু কাঁদল। যাবার সময় গলায় আঁচল দিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম করল। বলল, দাদা, তুমি কত মহৎ, আমরা জানি। ইন্দ্রাণী চলে গেল। আমার আশেপাশে এখানে যত লোক ছিল, তারা জিজ্ঞেস করল, কে-ও? বলেছিলাম, আমার ছোট ভাই-এর স্ত্রী।

একবার অশোককে দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাতো হবার নয়। চিঠিতে লিখেছে সে ভালই আছে। সে অবশ্য ভাল থাকতে পারে না।

দীপার দুঃখ আমি বুঝি। আমার মৃত্যু ওর মনে লাগবে এবং সে লাগাটা হবে সাধারণ লোকের মতো। ও যে খুব একটা আঘাত পাবে, তারও তো কোন কারণ নেই সুব্রতবাবু। আমার মতো একজন খুনে অন্তত দীপার কাছে, কোন সহানুভূতিই পেতে পারে না। এর মধ্যে সে একদিন এসেছিল। সেই একই প্রশ্ন করে সে। বার বার সে অনুরোধ করে তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য। সব কথা বলবার মতো সৎসাহস আমার ছিল না। তাই বলেছি, গোপাকে আমি হত্যা করিনি, তবে ওর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। বুঝলাম দীপা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু উপায় তো ছিল না। জানেন সুব্রতবাবু, গোপার কাছেই নয়, দীপার কাছেও আমি খুনী হ'য়ে রইলাম। এরই নাম ভবিতব্য।"

সহসা অলোক উত্তেজিতভাবে সুব্রতর হাত ধরে বলতে থাকে, "সুব্রতবাবু, আমার অনুরোধ আমার ফাঁসির পরে যেন দীপা এ-সব কথা জানতে পারে।" অলোকের চোখে জল গড়িয়ে পড়ছিল। অস্তমিত সূর্যের আলো জানলার ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে অলোকের চোখে মুখে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরমায়ু নিয়ে আবার অলোক অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "সুব্রতবাবু; দীপা রইল, আর রইলেন আপনি। আমার অন্তিম অনুরোধ, দীপা যেন পথের ধুলোয় মিশে না যায়।"

সুব্রত যখন জেলখানা ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াল, তখন সায়াহ্নের অন্ধকার সবে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। সে যেন আর চলতে পারছিল না। সামনেই বিরাট লালদীঘি। গাড়ি, ঘোড়া, লোকজনের কোলাহলে চতুর্দিক মুখরিত। ধীরে ধীরে সুব্রত গিয়ে সেই লালদীঘির পাড়ে একটা টুলের ওপর বসে পড়ে।

৫

সারাটা রাত সুব্রত ঘুমুতে পারেনি। সহস্র চিন্তা এসে ওকে উন্মাদ করে তুলল। তবু সে কোনই সমাধান করতে পারে না। দেয়ালের ঘড়িটা জানিয়ে দিল রাত দুটো। আর মাত্র দুটি ঘণ্টা পরমায়ু নিয়ে অলোক অপেক্ষা করছে অপরিসর এক কারা কক্ষে। অবস্থার আবর্তে পড়ে নিষ্পাপ হ'য়েও, সে সবার চোখে, আইনের চোখে খুনী, নৃশংস খুনী। তার সহৃদয়তা, তার বন্ধুপ্রীতি চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেল। অশোক জীবিত থেকেও, জীবন্মৃত হ'য়ে রইল। অলোক সত্যিই বলেছে। সুদূর ইংলণ্ডে থেকেও অশোকের মনটা অন্তত আজ রাতে, চাটগার ঐ কারা-প্রাচীরের আশেপাশেই ঘুরছে। ঘড়ির

কাটার দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে তার দৃষ্টি। প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘণ্টা, আজকের রাতটা অশোককে জানিয়ে দিচ্ছে, কত বড় মূল্য দিয়ে, অলোক তাকে সংগোপনে রক্ষা করে গেল। নিজে কলঙ্কিত হ'য়েও সে তার প্রিয়তম বন্ধুকে, বন্ধু পত্নী ইন্দ্রাণীকে, কলঙ্ক মুক্ত করে গেল। আজ রাত চারটার পর এ পৃথিবীতে এমন কেউ রইল না যে, অশোককে গোপার মৃত্যুর জন্য দায়ী করতে পারে।

এবার ঘড়িটা জানিয়ে দিল রাত সাড়ে তিনটে। একটা তীব্র বেদনায় সুব্রতর মন কেঁদে উঠল। হয়তো এবার অলোককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে, যেখানে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ভোর বেলায় মা ডাকলেন। সুব্রত উঠে বসল। মা বললেন, 'দীপার কাছে একবার যা।' সুব্রতর মনে পড়ল অলোকের অনুরোধঃ দীপা রইল, আপনি রইলেন। ও যেন পথের ধুলোয় মিশে না যায়।

—সমাপ্ত—

রমাপদ চৌধুরী

[২১]

পাঁচিল তুলে ভদ্রাসন ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জমিপুকুর তখনো ভাগ হয়নি। আঘাতটা তখনো গিরিজাপ্রসাদের বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে গুমরে উঠছে। অবোধ্য একটা নিঃস্বতা বেন।

সারা জীবন ধরে কত কি স্বপ্ন দেখেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। সারা জীবন সব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, মুখ বুজে কাজ করে গেছেন সকাল-সন্ধ্যে, কিন্তু সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে একটি মাত্র স্বপ্ন ছিল। বনপলাশিতে ফিরে আসবেন, সুখে শান্তিতে কাটাবেন শেষ জীবনটা, বনপলাশির সেই শৈশবের স্মৃতিতে ঘেরা মধুর জীবনটুকুই আবার ফিরে পাবেন। অভাব আর দারিদ্র্যকেও ভয় পাননি গিরিজাপ্রসাদ। কিন্তু গিরীন যে তাঁর হৃদয়কে নিঃস্ব করে দেবে কোনদিন এ আশংকা তো তিনি করেননি!

গিরিজাপ্রসাদের মনে পড়ে একবার দাঁতের ব্যথায় অসহ্য যন্ত্রণায় মাড়িতে সেফটি-পিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিঁধিয়েছিলেন তিনি। ইচ্ছে হয়েছিল ছুরির ফলা দিয়ে কেটে খানিকটা রক্ত বের করে দিতে। আসলে সেটা ছিল অসহ্য যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একটা বোবা আক্রোশ। এই পারিবারিক কলহ যেন সেই দাঁতের ব্যথার মতই। একটু একটু করে দিনে দিনে কখন যেন চাপা যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারেননি। এই দৈনন্দিন জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশাতেই, না কি এই জ্বালা যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশে, মাঝে মাঝেই তাঁর মনে হয়েছে বাড়ির মাঝখানে, দুটি পরিবারের মাঝখানে একটা পাঁচিল তুলে দিতে পারলেই বুঝি শান্তি ফিরবে।

কোদালের কোপটা মাটির বুকে নয়, গিরিজাপ্রসাদের বুকের মাঝেই পড়বে, কে জানতো। যন্ত্রের মত, হয়তো বা আক্রোশের বশেই একটার পর একটা হুকুম দিয়ে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ, স্ত্রীকে বলেছেন হাঁড়ি আলাদা করতে, ছেলেমেয়েদের বাধা দিয়েছেন ও-বাড়ির সঙ্গে মেলামেশা করতে, কোটালকে ডেকে পাঁচিল তুলে দিতে বলেছেন, আর দিনে দিনে ফাটল বেড়েছে। ঠিক সেই শুখোর বছরের মাঠের মত। নিষ্করুণ আকাশ আর রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মতই ভিতরে ভিতরে তাঁর সারা বুক খাঁ খাঁ করে উঠেছে। অথচ তখন আর উপায় নেই ফিরে যাবার। নেশার ঘোরেই যেন বিচ্ছেদকে বাড়িয়া তুলেছেন দিনে দিনে।

কিন্তু তারপর যা ঘটে গেছে, ঘটে গেল, তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে যেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে। কাঁদতে পারেননি, পারেননি বলেই জ্বালা বেড়েছে।

সব সময়েই তাই অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু অন্যমনস্কই কি হতে পারেন? পারেন না! ঘুরে ঘুরে কেবলই তুচ্ছ এক একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। মোহনপুরে বউ কবে কি বলেছে নিভাননীকে, গিরীন বলেছে তাঁকে। কিংবা গিরীনের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার, কে কখন তাঁকে এড়িয়ে গেছে, কিংবা ভাল করে কথা বলেনি। প্রত্যেকটি তুচ্ছ ঘটনাই যেন ছুঁচের মত এসে বুকে বিঁধে থাকে, ক্রোধে অধীর করে তোলে তাঁকে।

বংশী মাঝে মাঝে আসে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভালই হলো গো গিরিদাদা, পেথক হয়েছো এ তোমার অনেক শান্তি।

বুড়ি অটামা লাঠি ঠুকঠুক করে এসে বলে, মন খারাপ করিস নে পেসাদ, দিনকালের যা নিয়ম তাই হয়েছে। কার না হচ্ছে এমনটা!

কিন্তু গিরিজাপ্রসাদ এ-সবের মধ্যে কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পান না। বংশীর সঙ্গে, কিংবা অবিনাশ ডাক্তার যেদিন আসে, সেদিনও গল্পগুজব করতে ভাল লাগে না গিরিজাপ্রসাদের। নিজের মনেই তাই ঘরে টুকিটাকি কাজ করেন। ছুঁচসুতো নিয়ে এটা-ওটা সেলাই করেন।

সেদিনও পুরোনো ছেঁড়া শালখানা নিয়ে রিপু করার চেষ্টা করছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। হঠাৎ গিরীন এলো, এসে দাঁড়ালো সামনে। কোন কথা বললে না।

গিরিজাপ্রসাদ ছেঁড়া শালে রিপুর ফোঁড় দিতে দিতে একবার চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে, চোখ নামিয়ে নিলেন।

গিরীন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, বলেছিলাম কি, এবার জমিজমাগুলো ভাগ করে নাও!

চোখ তুলে তাকালেন গিরিজাপ্রসাদ। ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, অবনী তো চলে গেল, মধ্যস্থ করতে হবে তো একজনকে।

গিরীন বাধা দিলো।—মধ্যস্থ কি হবে। তা তুমি যদি চাও...

গিরিজাপ্রসাদ কোন কথা বললেন না। একটু অপেক্ষা করে গিরীন বললে, তা হলে একদিন বসে...

এবারও কোন সাড়া দিলেন না গিরিজাপ্রসাদ। যেমন ছুঁচ ফুঁড়ছিলেন তেমনি ছুঁচ ফুঁড়তে লাগলেন ছেঁড়া শালটায়।

গিরীন চলে গেল। আর কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন নিভাননী। প্রশ্ন করলেন, কি বলছিলো ঠাকুরপো?

—শুনতেই তো পেলে।

নিভাননী বললেন, ও যাই বলুক, মধ্যস্থ কাউকে রেখো। নইলে লোকে বলবে, ছোট ভাইকে ঠকিয়ে নিয়েছ।

একটু থেমে বললেন, লোকে বলবে কেন, ওরাই বলবে দুদিন পরে।

গিরিজাপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হুঁ।

গিরীন সরে এলো বটে, কিন্তু তার বুকের ওপর তখনো যেন একটা ভারী পাথর চেপে বসে আছে। দাদার মুখের দিকে তাকাতে সত্যিই কষ্ট হয়। এমন যে হবে, এমন যে হতে পারে, সেও কি ভেবেছিল। কোত্থেকে কি যে হয়ে গল!

ফির এসে গিরীন ডাকলে, টিয়া!

টিয়া সাড়া দিলো না, ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো বাপের কাছে। সেদিন রাতে বাবা আর মাকে তার বিয়ের কথা বলতে শুনে থেকেই রাতারাতি তার শরীরে মনে যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে। আগের মত আর ছুটোছুটি করতে পারে না, জোরে কথা বলতেও কেমন সঙ্কোচ। সমস্ত শরীর ঘিরে একটা কমনীয় জড়তার জালে যেন সে বাঁধা পড়ে গেছে। যেন কেউ অলক্ষে থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছে। অন্ধকার নির্জন রাতে যেমন নিজের পায়ের শব্দটাকেই মনে হয় কেউ অনুসরণ করছে, এও যেন অনেকটা তাই। অদ্ভুত একটা লজ্জা—সঙ্কোচ, যেন পিছু নিয়েছে।

গিরীনও যেন এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করে খুশী হয়েছে মনে মনে।

টিয়া সামনে এসে দাঁড়াতেই তার মুখের দিকে তাকালে গিরীন, তারপর ফিসফিস করে বললে, টিয়া! দেখ তো জ্যাঠা বসে বসে কি সেলাই করছে, যা না। গিয়ে তুই করে দিলেও তো পারিস!

বিস্ময়ে চোখ তুলে বাপের দিকে তাকালো টিয়া। সঙ্গে সঙ্গে গিরীন মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালে। নিজের মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতেও যেন লজ্জা।

টিয়ার চোখে ধীরে ধীরে একটা খুশীর স্নিগ্ধ চাপা হাসি উঁকি দিয়েই নিবে গেল। জড়তার ধীর পদক্ষেপে পাঁচিলের ওপারে, জ্যাঠাদের দক্ষিণদুয়োরী ঘরখানার দিকে চলে গেল টিয়া।

আর গিরীনের মুখেও তৃপ্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই লাল পাড় শাড়ির আঁচলে হলদের হাত মুছতে মুছতে মোহনপুরের বউ এসে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করলে, বলেছো!

—হ্যাঁ। ব্যবস্থা করতে বলল। দীর্ঘশ্বাস ফেললে গিরীন। যেন বুকের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

মোহনপুরের বউ বললে, তা হলে আর দেরী করো না।

—না।

দেরী করলে চলবেই বা কি করে! প্রভাকরের সঙ্গেই যে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে, এতখানি আশা অবশ্য করে না মোহনপুরের বউ। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। তাই পণের টাকার ব্যবস্থাটা মোটামুটি করে রাখতে হবে। ওদিকে সব গয়নাগাটি বন্ধক দিয়ে টাকা নিতে হয়েছে হাস্কিং মেশিনটা কেনবার সময়। সেগুলোও ফিরিয়ে আনতে হবে। সুতরাং জমিজমা কিছু বেচতেই হবে। সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি পৃথক হওয়া প্রয়োজন।

তিরিশ একর তো মাত্র জমি। তার পঁচিশ একর রেখে বাকী পাঁচ একর গবর্নমেণ্টকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে গিরীন। অনেকদিন আগেই। ভেবেছিল, গবর্নমেণ্ট এত ঢাক পিটিয়ে যখন বলেছে, জমির জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবে, তখন নিশ্চয় টাকাটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেছে, টাকা তো দূরের কথা, কোন খোঁজ খবরও মেলেনি।

মোহনপুরের বউ বললে, কোন জমি বেচবে তাও তো ভাবতে হবে।

গিরীন দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—হুঁ। একটু থেমে বললে চাটুজ্জেদের অবনীর মত করলেই হতো তখন, ক'টা টাকা ঘুষ দিয়ে পুরোনো তারিখে বেনামী করে রাখলে এত ঝঞ্ঝাট হতো না।

—তা ঠিক। যে পাঁচ একর ছেড়ে দিতে চেয়েছো, সে তো আর বেচতে পারে না?

—না। যে জমিগুলো রাখবো বলছি তা থেকেই বেচতে হবে।

—তা হলে পঁচিশ একরও থাকবে না যে! ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে সেটুকুও থাকবে না? খাবে কি?

—কেন হাস্কিং মেশিন রীতিমত ধানকল হয়ে যাবে দেখো।

মোহনপুরের বউ বিদ্রূপের হাসি হাসলে। —তবেই হয়েছে। ঘুষটুষ দিয়ে এখন নয় লাইসেন্স বের করেছো, দু বছর বাদে লাইসেন্স যদি কেড়ে নেয়! অন্য কেউ বেশী ঘুষ দিলেই তো কেড়ে নেবে।

গিরীন বিষন্ন হাসি হাসলো।—তখন চাকরি করবে।

—কে দেবে চাকরি ওদের? একটা ইস্কুল নেই যে পড়ে পাশ করবে।

চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠলো মোহনপুরের বউয়ের। রাগে জ্বলে উঠলো সারা শরীর। বললে, নুড়ো ঘষে দাও অমন গরমেণ্টের মুখে।

সংসারের দিঘিতে অষ্টপ্রহর সাঁতার কেটেও গায়ে না লাগে জল, না কাদা—এমন একজনই আছে। ডানা ঝাড়া দিলেই যেমন হাঁসের পালক থেকে জল ঝরে পড়ে, টিয়াও যেন তেমনি। ভোর থেকে নিষুতি রাত অবধি কাজের ঘানিতে নিজেকে বেঁধে রেখেও সংসারের কোন দুশ্চিন্তা নিয়েই তার মাথাব্যথা নেই।

তবু সব কিছুর মধ্যে একটাই শুধু স্বপ্ন। বিয়ের।

মা আর বাবাকে আড়ালে ওর বিয়ের সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে শুনলেই মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে টিয়া। আবার যখন বেশ কিছুদিন ধরে কোন আলোচনাই শুনতে পায় না তখন সব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকেই কিসের যেন অভাব বোধ করে। কি যেন নেই, কি যেন নেই—বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত কথা গুমরে ওঠে। আর তখনই প্রভাকরকে মনে পড়ে যায়। তুচ্ছ ছোট ছোট দু'একটা ঘটনা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। যাত্রার আসরে যেদিন চোখোচোখি হয়েছিল একবারের জন্যে, কিংবা অট্টামার সেই প্রথম দিনের কথা: টিয়াকে বোধহয় খুব পছন্দ পেভাকরের, কিংবা এমনি ধারার কিছু একটা।

প্রভাকরের বাবার সঙ্গে দেখা করে যেদিন গিরীন ফিরে এলো, মোহনপুরের বউয়ের সঙ্গে পণের টাকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বললে, দেখি, যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা তা করতেই হবে, সেদিন কি আনন্দ যে হয়েছিল টিয়ার!

বাবা-মার দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হয়নি তার। শুধু কথাটা কোন একজনকে বলতে ইচ্ছে হয়েছে। এত বড় একটা আনন্দের খবর টিয়া তার ছোট্ট বুকে কি করে লুকিয়ে রাখবে! ইচ্ছে হয়েছে রেণুদি নয়তো রাঙা বৌদিকে গিয়ে বলতে। সুখের খবর আরেকজনকে না বলে কি আনন্দ পাওয়া যায়!

তাই সকাল বেলাতেই এক ফাঁকে রেণুদি-দের বাড়িতে এসে হাজির হলো টিয়া। দেখলে দামুদা, রাঙা বৌদি, রেণুদি সবাই হাসিহাসি মুখে। দামুদার কোলে নাদুসনুদুস চেহারা বাচ্চা ছেলে কিরু।

টিয়াও একমুখ হাসি নিয়ে ঢুকলো। ছুটে গিয়ে দামু পালের কোল থেকে কিরুকে তুলে নিয়ে জিগ্যেস করলে, কখন এলে দামুদা!

রেণুদি হেসে বললে, কাল রাতে এসেছে

দাদা। বলেই যোগ করলে, একটা খুব ভাল খবর আছে টিয়া।

টিয়া বিস্ময়ের চোখে তাকালে রেণুদির মুখের দিকে। সেই যে পুজোর পর চলে গিয়েছিল দামুদা, তারপর দু'একবার এসেছে গ্রামে, দু'একবার আভাস দিয়েছে এ-ব্যাপারে, কিন্তু সেদিনটা যে এত কাছে ঘনিয়ে আসবে ভাবতে পারেনি।

টিয়ার বিস্মিত চোখের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকালো রেণুদি, বললে, দাদা বর্ধমানে বটতলায় একটা দোকান ভাড়া পেয়েছে! এমনভাবে বললে, যেন এর চেয়ে বড় সুখবর আর হতে পারে না।

দামু পালও হাসলে। ফিরুকে বললে, আয় ব্যাটা এদিকে আয়। ক্যানভাসারের ব্যাটা এবার দোকানদার হবে।

ফিরু কিছু না বুঝলেও বাপের ভাবভঙ্গি দেখেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। টলতে টলতে বাপের দিকে ছুটে এলো টিয়ার কাছ থেকে।

দামু তাকে কোলে টেনে নিয়ে দু' হাতে ছুঁড়ে দিয়ে লুফতে লুফতে বললে, এইবার গোপেন শালা বলুক দিকি ফিরিওলা। দোকানে বাবা গ্যাট হয়ে বসে থাকবো, যা দাম বলবো, নেবে তো নাও, নয়তো পথ দেখো!

দামুদার গম্ভীর গলার কথা শুনে খিল-খিল করে হেসে উঠলো রাঙাবৌদি, আর তা দেখে টিয়াও।

রাঙাবৌদি হাসতে হাসতে বললে, টিয়া-রানী তোমার দোকানের খদ্দের নয়গো, ওকে অমন করে বলছো কেন।

দামু হেসে বললে, উঁহু, টিয়াকে অমন ভাবে বলবো কেন, টিয়ার জন্যে সব কমিশন ছেড়ে দেবো! টাকায় দু আনা কি বলো টিয়া?

রাঙাবৌদি বললে, দোকান চলুক আগে তারপর অত বড় বড় কথা বলবে!

—দোকান চলবে না মানে? দু'টো মাস, দু'মাস পরেই ঘর ভাড়া নেবো তোমাদের জন্যে, সব নিয়ে চলে যাবো, দেখে নিও।

—চলে যাবে? হঠাৎ যেন টিয়ার গলার স্বরটা হতাশ শোনালো। বললে, সবাইকে নিয়ে চলে যাবে দামুদা?

টিয়ার মুখখানা ম্লান দেখালো। আর রাঙাবৌদির মুখ দেখে বোঝা গেল, ভিতরের উল্লাস, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দটুকু যেন চাপা রাখতে পারছে না। রাঙাবৌদি বললে, আমার কপালে শহরে গিয়ে বাস করা আছে কিনা! না টিয়া না, ওসব বিশ্বাস করো না, বিয়ের পর থেকে কতবার শুনলাম!

দামু রেগে গেল। বললে, দোকান করার টাকা ছিল না তাই, নইলে দোকান ঘরও তো যেখানে সেখানে মিলেই হলো না।

টিয়া তবু কোন সান্ত্বনাই পেল না। বললে, দামুদা তুমি চলে গেলে যে যাত্রা হবে না আর!

কিন্তু যাত্রার জন্যে তো দুঃখ নয় টিয়ার। তার ভাবনা অন্য। সুখে দুঃখে এই একটা পরিবারের মধ্যেই তো তার আশ্রয় ছিল। এই দুটি মাত্র সঙ্গী, বন্ধু। কথায় কথায় তাই সে রাঙাবৌদি আর রেণুদির কাছে ছুটে আসতো। মা'র বকুনি খেয়ে চোখের জল মুছতে এখানেই আসতো, বিয়ের কথা শুনে মনের উল্লাস হাল্কা করতেও এখানেই! কিন্তু দামুদা যদি একদিন সত্যিই সকলকে নিয়ে চলে যায়—

দামু হাসলো। বললে, আর যাত্রা নয় গো, আর যাত্রায় নয়। হেঁ হেঁ বাবা, এবার থিয়েটারের পালা। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য হয়ে গেল, এবার দ্বিতীয় অঙ্ক...

টিয়ার মুখের দিকে চোখ পড়তেই রেণু বাধা দিলো। বললে, না রে টিয়া, এই তো বর্ধমান, আধ ঘণ্টার তো রাস্তা, আসবো বৈকি, মাঝে মাঝেই আসবো আমরা। জমি জমা, বাড়িঘর থাকবে না এসে কখনো চলে।

টিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসলে। অভিযোগের স্বরে বললে, সে তো শুধু ধান কাটা আদায় করে বেচে দিয়ে যেত। সে তো সবাই আসে রেণুদি, চাটুজ্যেদের বড় তরফের ছেলেরা আসে, গুপ্তরা আসে, নিকুঞ্জ সাঁইরা আসে...

রাঙাবৌদিও এতক্ষণে লক্ষ্য করলে। বুঝতে পারলো তার আনন্দের খবরটা টিয়ার কাছে আনন্দের নয়। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মুখে টিয়ার কাছে সরে এলো রাঙা-বৌদি, টিয়ার পিঠে হাত রেখে বললে, না টিয়া, ওসব শুনো না। ও তোমার দাদার আকাশকুসুম স্বপ্ন।

রাঙাবৌদির মুখের দিকে ফিরে তাকালো টিয়া, হঠাৎ ও হেসে উঠলো, আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের পাতা ভিজে এলো।

ফিরুকে আবার ছুটে এসে কোলে তুলে নিলো টিয়া। তারপর পাগলের মত ফিরুর গালে, মুখে, কপালে চুমু খেতে খেতে হঠাৎ হাসতে হাসতে ফিরুর মোটাসোটা একখানা হাত আস্তে করে দাঁতে চেপে ধরলো। যেন ফিরুর হাতখানা সত্যিসত্যিই কামড়ে দিতে ইচ্ছে হয় তার। ফিরুর দুধে গড়া নরম তুলতুলে চেহারাখানাকে বুকে চেপে, তার গালে গাল ঘষে চটকে থেসে ফিরুকে বিপর্যস্ত করে তুলেই যেন আনন্দ!

কৌতুকের চোখে তার কাণ্ড দেখছিল রাঙাবৌদি। দু' মিনিট আগে যার চোখ ছলছল করে উঠেছিল দামুদা সকলকে নিয়ে চলে যাবে শুনে, সামান্য একটা কথায় সেই মেয়েটাই কেমন আশ্বস্ত হয়েছে। দেখে বিস্ময় জাগে রাঙাবৌদির। সত্যি, কি সরল এই মেয়েটা।

সেই কোন কিশোরী চপল একটি মেয়ে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল তাদের পরিবারের সঙ্গে, আজ তাই বিচ্ছেদের সামান্য আশঙ্কায় তার মনেও ব্যথা লাগে।

টিয়ার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রাঙাবৌদি। আর হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলো টিয়া সেই কৈশোরের বয়স পার হয়ে যৌবনের ভরা দিঘির ঘাটে এসে পা বিছিয়ে বসেছে। সমস্ত শরীরের গঠনে গৌরবে, চিবুকের নিটোল কমনীয় ভঙ্গিতে, চোখের চাহনি আর বুকের স্পন্দনের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে কি যেন পরিবর্তন ঘটে গেছে।

দুপুরেও খাওয়াদাওয়ার পর আবার এসে হাজির হলো টিয়া। সারাটা দিন রাঙাবৌদির পায়ে পায়ে ঘুরলো। আর রাঙাবৌদিকে দেখতে দেখতে তার মনেও স্বপ্ন উঁকি দিলো।

পরের দিনই চলে যাবে দামুদা, তাই সযত্নে বাক্স গুছিয়ে দিচ্ছে রাঙাবৌদি। দিনের পর দিন দুধের সর তুলে রেখে রেখে ঘি বানিয়েছে, একটা শিশিতে ভরে ঘি-টুকু স্যুটকেশে রেখে দিয়ে বললে, ভাতে দিয়ে খেয়ো যেন! কাগজে মুড়ে একটু আমসত্ব, ছোট্ট টিনের কৌটোয় বড়ি, গোটাকয়েক নারকোলের নাড়ু...একটার পর একটা গুছিয়ে ভরে দেয় রাঙাবৌদি আর মাঝে মাঝে বলে, বাক্স দেওয়াই সার হচ্ছে, যা মানুষ, খাবে নাকি? ঐ কৌটোর মধ্যেই থাকবে!

টিয়াও এটা-ওটা সাহায্য করে। আর মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, সেও একদিন এমনিভাবে জিনিসপত্তর গুছিয়ে দেবে অন্য একজনের জন্যে।

সব কাজ শেষ হলো এক সময়। রোদ নরম হলো বিকেলের। আর রেণু এসে টিয়াকে ডেকে নিয়ে গেল এক ধারে।

তারপর ফিসফিস করে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ রে টিয়া, তোর নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে, সত্যি?

লাজুক হাসি হেসে মাথা হেঁট করলো টিয়া।

—ঐ প্রভাকরবাবুর সঙ্গে?

এবারও মাথা তুলতে পারলে না টিয়া। শুধু বললে, আমাকে ওদের পছন্দ হবে নাকি! মিথ্যে চেষ্টা করছে বাবা।

রেণু হাসলে।—কেন পছন্দ হবে না, তোর মত সুন্দর কটা আছে রে গাঁয়ে?

টিয়ার শুনতে ভালই লাগলো কথাটা, তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হয় না। এ যেন কল্পনাতীত, স্বপ্নেও যা কোনদিন ভাবতে পারেনি সে, তাই ঘটতে চলেছে। প্রভাকরের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে সত্যিই কোনদিন ভাবতে পারেনি!

তাই বললে, আমি যে লেখাপড়া জানি না রেণুদি, কত ইস্কুল কলেজে পাশ করা মেয়ে আছে...

রেণু হাসলে। বললে, হবে, হবে, দেখিস তুই।

টিয়া চোখ তুলে তাকালে রেণুদির মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, রেণুদি, তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে না? তুমি বিয়ে করবে না?

কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলো না রেণু। চুপ করে রইলো। সমস্ত মুখটা তার যেন থমথম করে উঠলো। তারপর হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লো।

—বিয়ে করবো না? খিলখিল করে হেসে উঠলো রেণু। বললে, আমি করতে চাইলেই তো হবে না ভাই। কে বিয়ে করবে আমাকে, বল তুই। আবার হেসে উঠলো রেণু।

টিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারলো রেণুদি চেষ্টা করে হাসছে, হাসি দিয়ে গোপন ব্যথাটুকু চাপা দিতে চাইছে।

রেণু একটুখানি চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, পণ দেবার মত টাকা তো নেই ভাই আমার দাদার। কোন রকমে দুটি খেতে দিতেই পারে না, আবার পণ? বিষণ্ণ হাসি হাসলে রেণু।

—তা বলে বিয়ে করবে না তুমি, বিয়ে হবে না তোমার? কান্নার মত শোনালো টিয়ার গলার স্বর।

রেণু হাসবার চেষ্টা করলে। বললে, ওসব কথা ভাবি না টিয়া। দাদার দোকানটা যদি ভাল চলে, বর্ধমানে যদি বাসা করতে পারে দাদা...

—তা হলে?

—তা হলে আমি ইস্কুলে ভর্তি হবো ওখানে গিয়ে, দেখিস তুই। দাদা বলেছে, পাশ করলে নার্সিং পড়াবে আমাকে। নিজের পায়ে তো দাঁড়াতে পারবো ভাই।

নার্স! নার্স হবে রেণুদি। কই, টিয়া তো কোনদিন এ-কথা ভাবেনি। ভাবতে ভয় পায়। একদিন তার বিয়ে হবে, সংসার করবে, নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে স্বামীকে দুবেলা খাওয়াবে, ছেলে মানুষ করবে। কই, এর বাইরে আর তো কিছুই ভাবেনি সে, ভাবতে পারে নি কোনদিন। আর রেণুদি...

রেণুদিরা চলে যাবে শুনে মনে মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিল টিয়া। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা বিচ্ছেদের ব্যথা। মনে হয়েছিল তার এই সুখদুঃখের একমাত্র আশ্রয়টুকুও বুঝি সরে যাচ্ছে তার নাগালের বাইরে। কিন্তু রেণুদির কথা শুনে অনেক রাত অবধি সেদিন ঘুমোতে পারলো না টিয়া। সত্যি তো, এত টাকা কোথায় পাবে দামুদা। কি করে বিয়ে দেবে রেণুদির!

চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে টিয়া মনে মনে বললে, ভগবান, দামুদার দোকান যেন ভাল চলে, যেন বাসা করতে পারে দামুদা।

তা হ'লে, তা হলে—এত ছোট্ট আশা রেণুদির, এমন একটা তুচ্ছ স্বপ্ন—অন্তত সেটুকুও সফল করার সুযোগ পাবে।

টিয়া মনে মনে ভাবলে, রেণুদি চলে গেলে যত দুঃখই পাক ও, রেণুদি তো সুখী হবে। রেণুদি যেন সুখী হয়।

(ক্রমশ)

কতকাল পরে দেখা। চিনতে কষ্ট লাগে। তবুও চেনা গলার মধ্যে একজনকে নিশ্চয় মনে করতে হয়। কোথায় ছিলুম আমরা কিংবা কোথায় পরিচয় ছিল, এই ধরনের চিন্তা করতেও তো সময় লাগে। অথচ ভদ্রলোক আবার বলে উঠল, 'মনে পড়ছে না তো? আচ্ছা আর একটু উস্কে দিচ্ছি, সেই শিমুলতলা, আমি তুই মাধবী—'

মনের ঘোর কাটল, যেন এতক্ষণে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। যে পরিমাণ উচ্ছ্বসিত হবার কারণ ছিল ততটা হতে পারলুম না। মুখ দিয়ে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে গেল, আচ্ছা।'

'কে আমি? বিদ্যুৎ না চঞ্চল?' হেসে ঠল ভদ্রলোক।

বললুম, 'তুমি শোভন।'

জাপটে ধরল শোভন। সিগারেট ঠোঁটে চেপে বলল, 'সেই উনিশশো সাঁইত্রিশ, যখন তুই সবে ম্যাট্রিক পাশ করলি, আমি সেকেন্ড ইয়ারে। আর বল্ তো সেই ছোকরাটা—মানে যেটা তোদের পার্শ্বচর।'

আবার এক ভাবনা, মনে করাও দায়।

শোভনটা চিরদিনই আনাড়ি, একটায় আসতে আসতে আর একটায় পাড়ি দেয়। এখনো যেন সেই উনিশ বছরের আনকোরা তরুণ।

বললুম, 'বিভাসের কথা বলছিস তো? সে নেই।'

'নেই মানে! মৃত্যু না পলায়ন?'

'দুই-ই, প্রথমে পলায়ন, পরে মৃত্যু।' গলার স্বরটা আমার কেঁপে উঠেছে।

'আই সি।' সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে অন্ধকার করে তুলল শোভন।

ছোট স্টেশন। দিনে কয়েকখানা ট্রেন থামে, যেন না থামলেও চলে। যাত্রীর নাম নেই। মানুষজন যা চোখে পড়ে তারা দূর গাঁয়ের পায়েচলা পথিক। স্টেশন মাড়িয়ে কলেরগাড়ির বাহাদুরিটা দেখে যাবার ইচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাদুই কাটিয়ে দিয়েছি। এমনি চুপচাপ, মনে মনে। রাশি রাশি আশা-নিরাশার তৃপ্তিকর আন্দোলন। সময়টা এক রাশ ধোঁয়ার মত উড়ন্ত অপচয় বললেও চলে। তথাপি ক্লান্তির ছাপ আসছে না, তৃপ্তিরও নিবিড়তার সন্ধান মিলছে না।

অনেকখানি পায়েহেঁটে এসেছি। ইচ্ছে করেই এক্কা ধরি নি। নতুন কাজে এসে জায়গাটার ওপর মায়া লেগে গেছে। তাই চোখ চারিয়ে রাস্তাঘাট মানুষজন এমন কি প্রকৃতিরও বিচিত্র বেশ দেখতে চেয়েছি। দূরে শাল মহুয়ার জঙ্গল, তারপরেই রাঙা মাটির প্রান্তিক মাঠ। কোথাও দুএকটি সারস অথবা হরিণের একটা আস্ত

ঝাঁক। সব মিলিয়ে জায়গাটার একটা মধুর আকর্ষণ।

কাঠের ব্যবসায় নেমেছি। নতুন কনট্রাক্ট নিয়ে এদিকটায় কাজ করার ইচ্ছে।

একখানা চায়ের দোকান টিমটিম করছে, বিজলিবাতি নেই। সবে উনুনে আগুন চাপিয়েছে আমারই তাগিদে। ট্রেন আসতে অনেক দেরি মিছিমিছি কয়লা পুড়িয়ে লাভটা কি! সরাসরি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে এক নাগাড়ে চার কাপ চেলেছি, আবার ভাবছি কাপ দুই হলেও চলে।

চা-ওয়ালা বলল, 'গাড়ি এবার এসে পড়বে বাবুসাহেব।'

মুচকি হেসে বললুম, 'সময়জ্ঞান তোমাদের দেশের ট্রেনের পর্যন্ত নেই।'

চা-ওয়ালা গামছা-আঁটা মাথাটা এক টানে খুলে ফেলল, খাড়া হয়ে বসল। 'ঢের জানি বাবুসাহেব কলকাতার কথাও জানি। সময়ের কথা আর টানবেন না।'

নিরম্বু আক্ষেপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে চা-ওয়ালা ভদ্রলোককে থামানো দায় হয়ে উঠবে। বলে উঠলুম, 'হ্যাঁ, প্রায় ঐ একই রকম। আচ্ছা বলুন তো স্টেশন মাস্টার এখন কোথায়?'

এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করে বলল, 'তৈরী হচ্ছে।'

'মানে?'

'এখন সাতপোর বেলা, ট্রেন ভিড়তে কমসে কম বারোটা। কাজটা কি বলুন না, কোম্পানীর পয়সা, বাপমা নেই।' উত্তেজিত হয়ে পড়েছে চা-ওয়ালা। আমার চোখে চোখ পড়তেই হেসে উঠল, বলল, 'কটা বাজে বলুন তো?'

ঘড়ি উল্টিয়ে বললুম, 'দেখুন না।'

চোখ বড় বড় করে বলল, 'বারোটা সাড়ে-সাঁইত্রিশ! কিন্তু যাই বলুন সময়জ্ঞান আমাদের দেশের কোথাও নেই।'

ঠিক এমনি সময়ে শোভন কোথা থেকে এসে হাজির হলো।

উনিশ শো সাঁইত্রিশ। সম্ভবত পুজোর কাছাকাছি। আমরা গিয়েছিলুম শিমুলতলা। বিভাসেরই উৎসাহ বেশী ছিল; তারই মাসির বাড়ি। আমি শোভন বিভাস বিদ্যুৎ আর চঞ্চল। আর একজন ছিল, মাধবীদি। মাধবীদি আমাদের চেয়ে বড় হবে কিনা সন্দেহ ছিল, তবুও আমরা 'মাধবীদি' বলেই ডাকতুম। শোভন চঞ্চল আমাদের চেয়ে দু-এক বৎসরের বড় ছিল। এমন কি তারাও মাধবীদি ছাড়া 'মাধবী' ভুলেও বলতো না। বিভাসেরই দূর-সম্পর্কের বোন বলেই আমরা জানতুম। বেশ চালাকচতুর মেয়ে, হাবভাবে পুরোপুরি আধুনিকা। সে-ই আমাদের পুরোভাগে দাঁড়ায় আমাদের দোষত্রুটির অঙ্গচ্ছেদ করে। আমরা পাঁচজন কেবল মাধবীদির নির্দেশ মেনে চলি। সময়ে সময়ে বিরক্ত হয়ে পড়ি, অথচ নড়িচড়ি না। আমাদের সবারই কিছু না কিছু পড়াশোনো ছিল। কলেজে নতুন ঢুকলে যে সমস্ত আদব কায়দা আর গুণাগুণের প্রশ্ন আসে সেগুলোকে গুছিয়ে দিতেই মাধবীদিরই ঝোঁক বেশী। একদিনের ঘটনা বেশ মনে আছে, বিভাসকে একদিনে দুবার চুল কাটাতে হয়েছিল। কলেজে পড়ুয়া ছেলেরা নাকি ওভাবে চুল রাখে না। বিভাস তথাস্তু বলে আদেশ মেনেছে। অথচ মাধবীদির বিদ্যেই বা কত! ক্লাস নাইনে উঠতে না উঠতেই ইস্কুলের দরজা বন্ধ।

সময়ে সময়ে লজ্জায় বেসামাল হতেও হতো। বিভাসের নতুন বউদি হাসি হাসি মুখ করে বলতেন, 'পঞ্চপাণ্ডব। অর্জুনটি কে?'

আমি মাথা গুঁজে থাকতুম। কে কি প্রতিবাদ করতে চাইছে শুনতেই চাইতুম না।

তার পরেই নতুন বউদি সজোরে বলতেন, 'দ্রৌপদী?'

মাধবীদি মোটেই অপ্রস্তুত হতো না। অবিচল হাসিটি ঠোঁটে লেগে থাকতো। আমরা আড্ডা থামিয়ে যে-যার আস্তানায় ফিরে যেতুম।

ছ-জনের জয়যাত্রা শিমুলতলায় বেশ পূর্ণতা পেল। বিভাসের মাসিমা মধ্যবয়সী বিধবা। আমাদের পেয়ে তাঁর আনন্দের শেষ নেই। খাওয়া দাওয়ার বিরাট পর্ব তিনি বেশ প্রসন্ন মনেই নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেন। সারাক্ষণ হাসিখুশিতে ভরপুর।

মাসিমা হাঁকডাক ছেড়ে বলে উঠতেন, 'ও মাধবী, কি আক্কেল রে বাছা তোর। সারাদিন যে তুই ছেলে হয়েই রইলি। মেয়ে একটু হবি কি?'

মাধবীদি চোটপাট করে বলে উঠত, 'কি করতে হবে শুনি?'

'ফুর্তি' করে যাও একটু। হেঁশেলটা একটু আধটু দেখার কথাও তো আসে।'

মাধবীদি উচ্ছ্বলিত হয়ে বলতো, 'এই কথা, দিন মাসিমা এ ভারটা শোভনের ওপর।'

শোভন চটে লাল। বিশেষ করে মাধবীদির ওপর ওর একটা সহজাত শত্রুতা ছিল।

মাধবীদি ঘুরিয়ে বলতো, 'বিভাসটাও বোকা, আপনাকে একটুও যদি—'

আমাকেই বাধ্য হয়ে মাসিমাকে সাহায্য করতে হলো। আর ঐ সাহায্যটাই আমার ঘাড়ে বেদম হয়ে চেপে বসল।

ওদের বাঁধন আলগা, ওরা বেরিয়ে পড়ে যখন তখন। পাহাড়ে ওঠে, শাল বনের মধ্যে যেয়ে লুকোচুরি খেলে। ফিরে এসে গল্প শোনায়। আমি আর মাসিমা শুনি। মাসিমার ছেলেমেয়ে কখনো ওদের সঙ্গ নেয়, কখনো বা বাড়ির আশে পাশেই ঘোরাফেরা করে।

আমি যে বাইরে বেরুই না এমন নয়। তবে দলছাড়া হয়ে একা-একা এধার ওধার করেছি। সময়ে সময়ে মাসিমাও আমার সঙ্গে কাছাকাছি হেঁটেছেন। সুযোগ তৈরী করেছেন এবং নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের চেহারাটাও দেখতে চেয়েছেন। সেই মাসিমাও যেন মাধবীদির সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলেন। হালকা পরিহাসের মধ্যে যুক্তির স্বাভাবিক গতিও লক্ষ্য করলুম। তাছাড়া মাধবীদির ব্যবহারিক জগতের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মাসিমা সময়ে সময়ে অস্ফুটে আর্তনাদও করে ওঠেন। আমি অতশত বুঝতে চেষ্টা করতুম না, হয় তো সেই জন্যেই মাসিমা আমাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ভাবতেন।

দিন কয়েক কাটল এমনি ভাবে। শোভনের সঙ্গে বিভাসের যেন অকটা কিছু ঘটেছে। কথাবার্তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। মাধবীদিও পরিমাণে কিছুটা মৌন। বিদ্যুৎ আর চঞ্চল অপরিমিত উচ্ছল।

মাসিমাও একটু অসহিষ্ণু। আড়ালে আবডালে বলতে শুরু করলেন, 'মেয়েছেলে আবার এতটা ড্যাডেং-এ হবে কি? বেশ

তো বাবা এসেছ যেমন বেড়িয়ে টেড়িয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাও। দোষ দেবে তো মানবে আমাকেই।'

আমিই একমাত্র সূত্রধার। আমারও যেন চোখ ফুটছে।

শেষ পর্যন্ত মাধবীদি যেন অসুস্থ হয়ে পড়ল। দিন দুই একদম বেরুল না। শোভন যদিও বা বেরুবার তোড়জোড় করে, বিভাস বিছানাই ছাড়ে না, যেন মাধবীদির অসুস্থতার ভাগ তার ঘাড়ে এসে জেঁকে বসেছে। অথচ মাসিমাকে সাহায্য করার ভারটা আমার হাতছাড়া হতেই পারল না।

হঠাৎ একদিন দেখি বিদ্যুৎ চঞ্চল আর শোভন একজোটে বাগানের মাঠে লুকোচুরি শুরু করে দিয়েছে। ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে মাধবীদি লক্ষ্য করছিল। বিভাস তখন পোস্ট অফিস থেকে সবে ফিরল। কোনদিকে না তাকিয়ে সটান খেলায় যোগ দিল। শোভন এখন চোরের খেলায় মরিয়া বিভাসকেই চোর করে ছাড়ল।

মাধবীদির উল্লাসের হাসি থামতেই চায় না। আমি ছাদের ওপাশে ছিলুম, এপাশে এলুম। মাধবীদিকে দেখে মন জুড়লো। উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বলল, 'পারিজাত, তুমি! এসো বসো। আর শোন ভারী অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের, তোমার ওপর অবিচার হলো।'

মনে পড়ল নতুন বউদি হেসে বলতেন, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব একটু থাকবে বইকি।

বললুম, 'এমন কথা কেন বলছো মাধবীদি?'

'তুমি খেল না বেড়াও না, মাসিমাকে আগলে আছো। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট।'

'মানে?'

মাধবীদি খোলামেলা হাসল, বলল, 'মানে সাতেও নেই পাঁচেও নেই, শান্তিতে আছো।'

ওদিকে খুব হইহুল্লোড়। বিভাস ও ছাড়বে না, ফিরতি খেলায় শোভনকে চোর করবেই। মাঝ থেকে বিদ্যুৎ চঞ্চলের রেহাই।

বললুম, 'কবে ফিরছো বল মাধবীদি, আর আমার ভাল লাগছে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মাধবীদি। সংক্ষেপে বলল, 'আমিও ভাবছি তাই।'

কখন ঠিক মাধবীদির পাশেই দাঁড়িয়েছি। একাত্ম হবার ইচ্ছা জাগছে, মনমরা মাধবীদির জন্যে মায়া লাগছিল। সামনের চুলগুলো চোখের পাতা পেরিয়ে উড়োছুটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাসারন্ধ্র একটু বেশী ফাঁপা শুকনো ঠোঁট। ঘাড়ের ওপর কুচো-চুলের জট কাটিয়ে একহারা সরু হার। সব মিলিয়ে মাধবীদি যেন ভাবনা আর না-ভাবনার শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। কিছু কষ্টের কোন এক স্পষ্ট দাগ যেন মাধবীদিকে অপরূপ করে তুলেছে।

গাঢ় স্বরে বললুম, 'তোমার খুব কষ্ট না মাধবীদি?'

অদ্ভুত চোখে ও চাইল আমার দিকে। একটু ম্লান হাসি ফুটে বেরুল কেবল। নিচের কোলাহল ছাপিয়ে এ স্তব্ধতা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

একটু পরে মাধবীদি বলল, 'ওসব কিছু নয়, তবে কেমন যেন একটা ভয়।'

ফস্ করে বলে ফেললুম, 'বুঝেচি।'

অধৈর্য হয়ে উঠল মাধবীদি। 'কি বুঝেচ? তুমি কতটুকু জানো?'

ঘাবড়ে গেলুম, মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

মাধবীদি হাসল, অবাক হাসি। যেন কিছুই ঘটেনি, কিছুই ঘটবে না কোনদিন। সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন কি ওদের ঐ চোর চোর খেলার মরণবাঁচন পণটাও অতি তুচ্ছ।

সাহসে আরো একটু ঘনিষ্ট হলুম। কাঁঠাল গাছের শির ডালটা ছাদের আলসে কাটিয়ে চিলেকোঠার ওপ্রান্তে নুয়ে রয়েছে। আলোছায়ার প্রসন্ন হাসিটা থই-থই করছে। আমি যেন এই প্রথম চোখ-চেয়ে মাধবীদিকে দেখছি, নারী সংস্পর্শের স্বাদ নিচ্ছি। একটা গলাবোজা আনন্দের ডাক বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছে।

মাধবীদির মুখখানি সত্যিই মিষ্টি। পরের বাড়িতে রাজারহালে মানুষ বলেই বোধ হয় মাধবীদির সব দিকটাই বাড়া-বাড়ির বাঁধ ঝাঁপানো। তাকলাগানো কথা। মনভরানো কণ্ঠস্বর, চোখজুড়ানো দেহছন্দ।

মাধবীদি আমার হাত ধরল, বলল, 'তুমি খুব ছেলেমানুষ, কষ্ট হবে তোমারই বেশী।'

চুপ করেই রইলুম। খুব ভাল লাগছিল। বুকটা দুলছিল খেলছিল।

আবার বলল, 'আচ্ছা তুমিই বল, কে ভাল।'

বুঝলুম না। জিজ্ঞাসার চোখ দিয়ে মাধবীদির চোখের পাতার ছোট তিলটা দেখলুম শুধু।

'আচ্ছা বল তো শোভনকে তোমার ভাল-লাগে, না বিভাসকে?'

কিছু বলতে যাবার আগেই মাধবীদি বলল, 'বিভাস ছেলেমানুষ, বুদ্ধি নেই, বিচার নেই।'

থেমে রইল মাধবীদি। লুকোচুরি খেলায় বিভাস আগে জিতে পরে হারছে। শোভনের উচ্ছ্বাসধ্বনি আর বিদ্যুৎ চঞ্চলের দাপাদাপির স্বরটা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

আমি এবার অনেকটা এগিয়ে পড়েছি। বস্তুত মাধবীদির ওপর আমার বা আর কারো কোন অনুযোগ কিংবা অধিকার সম্বন্ধে আমার সঠিক মাত্রাজ্ঞান ছিল না। এখন বুঝলুম মাধবীদির অসুস্থতা একটা রোগ নয়, একটা চিন্তা বা মীমাংসার সময় নেওয়া। আমার জন্যে কিন্তু ওর কোন বক্তব্য নেই, কোন সঠিক ধারণাও নেই। আমার কষ্ট হলো একটু, মনটা বেড়ে ওঠার মুখেই চোট খেয়ে ঝিমিয়ে গেল।

মাধবীদি বুদ্ধিমতী। আমার জামার কলারটা একটা ছোট্ট স্পর্শে টান দিয়ে বলল, 'তোমার মতো ভাল কাউকে দেখি নে। আশ্চর্য ভাল। তাই তো বলছি তোমাকে।'

উৎসাহ নিয়ে বললুম, 'বিভাসটা এদিকে খুব সরল হলে কি হব, ভারী যা তা কথা বলে।'

মাধবীদি অমনি পেয়ে বসল। আমি জানি, তুমি ঠিক বলবেই। ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করো না, ঠকবে।'

মনটা একেবারে এতখানি বেঁকে বসতে চায় না, বিভাস আমার অন্তরঙ্গ। ওরই সূত্র ধরে আমার এই আসরে উপস্থিতি। ওকে নিয়েই আমার চলা বলার অধিকার। মাধবীদির কথায় খানিকটা আরাম লাগলেও খুব একটা সমর্থন ছিল না। আমি চুপ করে রইলুম।

মাধবীদি আবার বলল, 'বিভাসের গুণ অনেক, ওর জন্যে আমার ভীষণ মায়া।'

চোখের পলক নাচিয়ে হাসির ভাব আনল মাধবীদি। আমার কপালের চুলের ঝুরো ধরে টান দিয়ে বলল, 'অদ্ভুত তোমাকেও লাগে, কিন্তু শোভনের জুড়ি নেই, সত্যিই অদ্ভুত।' তাজা শ্বাস টানল মাধবীদি।
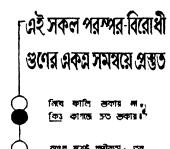
চট করে বলে বসলুম, 'শোভনটা স্বার্থপর।'

'কে বললে?' ঘুমজড়ানো গলা মাধবীদির। 'অমন হতেই হয়। বলতে পারো শক্তি রাখে। যারা পারে না তারা নিন্দে করে, হিংসা করে।'

আমি বলে ফেললুম, 'আমি কিন্তু করি না মাধবীদি, তুমি বিশ্বাস করো।'

মাধবীদি আমার কথায় কান দিল না। বলে চলল, 'কিছুই আর ভাল লাগে না পারিজাত। একটা কিছু না করলে আর পারছি না।'

কথাটা ঠিক ধরতে পারলুম না। মাধবীদির কাচের মতন চোখ দুটোকে একটিবার মাত্র দৃষ্টি দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রইলুম। মনে হলো মাধবীদি যা যা বলেছে আর বলতে চাইছে তার মধ্যে আমার প্রাধান্য নেই বললেই চলে। অভিমান দেখানোর সুযোগ এসে গেল আমার। বললুম, 'যার যা খুশী তাই করবে, কে আর বাধা দিচ্ছে!'

কথাটা অন্য পথ নিল। যেন মাধবীদির ওপর আমার অধিকারের সীমা নির্ধারণ অনেক আগেই হয়ে রয়েছে।

চমকে উঠল মাধবীদি। আমার একখানা হাত ধরল। চোখের পাতাগুলো কেবল উঠল নামল। মুখের প্রান্তে হাসির ঝিলিমিলি যেন কাঁঠাল পাতার মসৃণ অবয়বে উঠতি রোদ এসে খেলা জুড়েছে।

বলল, 'জানতুম খুব ছেলেমানুষ, এখন দেখছি একটু বোকাও। কি, তাই নয়?'
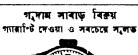
মাধবীদির ছোঁয়া, ঢলঢলে মুখের হাসিতে আমি তলিয়ে গেলুম। বললুম, 'তোমার জন্যে আমি সব পারি, যা বলবে তাই।' বীরত্বের সেরা জিনিস হলো অঙ্গীকার। যেন আমি ইতিমধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই যুদ্ধের জন্যে তৈরী।

ঠোঁট বাঁকিয়ে মাধবীদি বলল, 'বীর-পুরুষ! যাক, ঢের হয়েছে।'

আমার পৌরুষ চূর্ণ হলো। মাধবীদি আবার বলতে লাগল, 'পারিজাত, তোমরা পাঁচজনেই একেবারে এক, আবার আশ্চর্য হতে হয় যখন তোমরা পাঁচশো জনের মূর্তি ধরো। জীবনটাকে এভাবে দেখলে কারো রেহাই নেই।'

অবুঝ চোখে চেয়ে রইলুম আকাশের দিকে। কাঁঠাল ডালের মাথাভারী পল্লবের মধ্যে দুটো দুরন্ত কাঠবেড়ালীর লুকো-চুরিও দেখে নিলুম। আকাশটা ঐ পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। আমার একাগ্রতার দাম মাধবীদি দিতে চাইছে না, অথচ মাধবীদিরই বা এত এলোমেলো কথা শুনতে যাই কেন? আমাকে পাশ কাটিয়ে চলাই যার অভ্যাস তাকে নিজের বশে টানার ঝঞ্ঝাট কম নয়। মনে মনে রাগ করার সুযোগটা যেন অভিমানের চেহারায় ফুলতে লাগল। তখনো দেখছি মাধবীদির চোখে জল আসে নি, অথচ মুখের নাকের ও চোখের মধ্য তীক্ষ্ম একটা কান্নার রূপ।

আমি হঠাৎ বলে বসলুম, 'আমি তো কিছুই জানি না মাধবীদি।'

সহজভাবেই মাধবীদি জবাব দিল, 'জানো না-জানো সেকথা নয়। পারিজাত, তোমার মন বলে একটা জিনিস আছে তো, সেটাকে ছাড়াছোড় দেবার যো আছে কি?

মাধবীদির হাতের ওপর নজর পড়ল আমার। পান্নার আংটিটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হাতের মণিবন্ধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত কেমন একটা পরি-পূর্ণ উন্মুখতায় আকৃষ্ট। নতুন চোখ নিয়ে মাধবীদির শুধু এইটুকু দেখারই জের মিটছে না আমার। আমার হাতটা আল-গোছে টান দিল, বলল, 'পারিজাত চুপ কেন, ধরতে পারলে না তো?'

তবুও নীরব রইলুম, কথার মতো কথার সন্ধান পেলুম না। মাধবীদির মধুর সান্নিধ্যের কাছে নীরবতার দামই যেন অনেক বেশী। আঁচল গুটিয়ে মাধবীদি বলল, 'একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন তুমি পারিজাত একটু ছেলেমানুষি করবে। কষ্টের সীমাকে প্রসারিত করে নিজের ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দেবে। আর কি বলবো বলো?'

বললুম, 'আমি কি তোমার কাছে কিছুই নই মাধবীদি?'

মাধবীদি নীরবে মুখ ফেরাল। আমার অবাধ্যতার ওপর জুলুম করল না। কিন্তু আশ্চর্য, চোখের কোণে জল কেন? মাধবীদি যে অহংকারী! কথায় কথায় বলে, কারো জন্যে তার কোন শোক নেই দুঃখ নেই এমন কি অনুরাগও নেই। মেয়েদের জীবন (মাধবীদির পক্ষে) ফুল ফোটার মতো সাজা আর বিচিত্র। নিয়মের খেলায় সে একদিন ফুটবে হাসবে ঝরবে।

মাধবীদির ঠোঁট দুটো কাঁপল। চোখের পল্লব ভেজা, ভারিভারি। এখনো বাগানের মাঠে ওদের লুকোচুরির খেলার ছেদ নেই। আমিও মাধবীদির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি। তার মানসজীবনের একক সাক্ষী আমি। আমার অস্তিত্বের জবাবদিহি মাধবীদি চায়, আমি দিতে পারি না, অভি-ভূত হয়ে পড়ি।

মাধবীদি বলল, 'জীবনটা একটা খেলা, নয় পারিজাত? ভালমন্দ হারজিত এসব বিচার পরে। খেলাকে কে এড়ায়?'

আমার কৌতূহল আর একটুও নেই। আমি হেরেছি বারবার, উপযুক্ত হবার চেষ্টা করেও পরাভূত হয়েছি।

মাধবীদি চুপচাপ আমাকে লক্ষ্য করছিল। আমার সতের বছর বয়সের তারুণ্যকে সে বোধ হয় ক্ষমা করেছিল। জানা না-জানা হৃদয়বৃত্তিকে তার যৌবনের বাড়ন্ত চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করছিল। বিচ্ছুরিত হাসি নিয়ে বলল, 'কারুকে বলে দেবে নাকি?'

'কি?'

'এই সব, মানে তোমার আমার হেঁয়ালি। কি বোকামিই না করলুম পারিজাত, সব চেয়ে যে কাঁচা তার কাছেই ধরা দিলুম।' আমার মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে যত্নের হাতে সামলে তুলল। 'এই জন্যই তো বলি, কখন কি ঘটে বা ঘটতে পারে কেউ বলতে পারে কি? এক সময় কি হয়েছিল জানো পারিজাত, তখন তোমার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় নি, বেশ কয়েক বছর আগে। বিভাসটা একটা যাতা কাণ্ড করে বসল। আমি বলেই ওর সঙ্গে আবার মিলেমিশে চলি।'

মাধবীদি সত্যিই যেন ঘৃণার চোখ নিয়ে একবার চারদিক তাকাল।

উচ্ছ্বাস এখনো কমে নি মাধবীদির। উড়াড় করে শূন্যে হতে যায়। 'আমার কি, আমি তো তোমাদের দিকে হাত পেতে নেই। যাও বললেও যাবো না, আবার না বললেও চলে যাবো। তোমাদের ভয় করে চলার মতো মেয়ে মাধবী নয়। জানলে পারিজাত, এমনি করে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি বিভাসকে। অথচ ওর কথাগুলো ঠিক উল্টো।'

মাধবীদি হাঁপিয়ে পড়ল। আমার আর ভাল লাগে না। আমার কথাগুলো উড়িয়ে দিতে খুব ওস্তাদ মাধবীদি।

'কি কথা নেই কেন?'

'ভাল লাগছে না।' ভয়ে ভয়ে বললুম।

'তা লাগবে কেন, কারো কষ্টের কথা শুনতে বয়ে যায় তোমার।' চটে উঠল মাধবীদি।

'আমি কি তাই বলছি মাধবীদি।' আমার মিনতির সুর।

'জানি তোমরা কেউ কম নও। ছেলেদের স্বভাব পালটায় কখনো?'

বাগে আনতে পারবো না জানি। রেগে গেলে মরিয়া হয়ে ওঠে মাধবীদি। অবশ্য নিজেই আবার সামলে নেয়, স্বাভাবিক হয়।

আমার কাছ থেকে একটু নড়ে গিয়ে কাঁঠাল ডালের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ছেলেমানুষি করল। যেন মাধবীদির মনোবাসনার জটিল রূপটি ঐ কয়েকটা বোঁটাকাটা পাতার মতই নিচে মাটিতে নিশ্চিন্ত হল। মাধবীদির অসুস্থ চেহারার ওপর একটা বেমানান নিষ্ঠুরতা উঁকি দিয়েও গা-ঢাকা দিল। ফিরে এল আমার দিকে। মুখে হাসির আভাস টানতে চাইল—যেন অপরাধটা স্বীকার করে মাপ চাইছে।

তারপর দিন দুই কেটেও গেল। ফিরে আসার যে তাগিদটা হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেটা নেই বললেই চলে। মাঝখানের এই রহস্যটা আমার কাছে বেখাপ্পা লেগেছে। শোভন আর বিভাসের অন্তরঙ্গতাও বেড়েছে। দেখি সকলেই মাসিমাকে সাহায্য করতে আসে। বাড়ি ছাড়া হয়ে যাবার করুরও তেমন মতলব নেই। মাঝে মাঝে সবাই আমরা কাছাকাছি যে কোন একটা পাহাড়ের ওপর বিচরণ করে ফিরে আসি। আমেজী মেজাজে সময়টাকে উপভোগ করতে চাই। আমাদের পাঁচ বন্ধুর সম্বন্ধটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। মাধবীদি কিন্তু খুবই সাধারণ। তর্ক নেই, জারিজুরি নেই, এমনকি কথায় কথায় রাগের ধরাছোঁয়াও নেই—পুরোপুরি নতুন খোলসের মধ্যে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। এইখানে আমারই যা একটা বিশেষ চোখ খুলেছে। মাধবীদির চোখের দিকে চাইতে যাই, পারি না। ভাবি নিজের বুদ্ধি আর কতটুকু মাধবীদির কাছে আবার কি ঠকে মরবো! কিন্তু খুশিটা আমারই বেশী। মাসিমার যেমন স্নেহ পেয়েছি, অন্যদিকে মাধবীদিরও ভেতরের অংশটায় উঁকি দিতে পেরেছি। জীবনের এই সঞ্চয়টা স্থায়ী হলেই হয়।

সকালবেলায় কিন্তু অন্য সুর। মাসিমা কাঠ হয়ে বসে আছেন, মুখে কথাটি নেই। বিদ্যুৎ চঞ্চলও অসাড় হয়ে গেছে। আমি হতবাক। শোভন তার স্যুটকেশ বিছানা বেঁধে এক্ষুনি স্টেশনের দিকে ছুটল। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি।

এখনো শোভন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। শোভনের শৌখিন স্বাচ্ছন্দ্য আছে। মুখের ওপর যে-কটা রেখা ফুটে উঠেছে সেগুলো বয়সের মাপে বেশী নয়। শীতের শেষ ধাপ, এখানে তবুও ভোর দিকটাতেই যা একটু বাড়াবাড়ি। এই দুপুরে তো ডাহা আগুন। শোভনের নিখুঁত গরম স্যুটের কাছে আমার আধাখেঁচড়া সুতির প্যান্ট আর কমদামি সোয়েটার বেমানান লাগছে।

মুখের আধখানা সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'কি ভাবছিস পারিজাত? এতদিন পরে দেখা, তোর কাছ থেকে কি কিছুই আশা করি না?'

বললুম, 'তোকে দেখছি, ভারী চমৎকার লাগছে।'

'কি করে?' আর একটা সিগারেট বার করল।

বললুম, 'আগে বল্ দিকি কোত্থেকে উদয় হলি। আর সব খবর কি? শুনেছিস চঞ্চলের মেয়ের বিয়ে হয়েছে।'

শোভন অস্থির হাসি হাসল। বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দেওয়ালে লটকানো টাইম-টেবিলের ওপর এক পোঁচ চোখ বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। নাকের গর্তে তখন অনর্গল ধোঁয়ার উদ্গার।

বলল, 'খুব ভাল আছি রে পারিজাত, বিরাট একখানা সংসারের মালিক। খাটছি-খুটছি, চালিয়ে যাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, একটা লম্বা চওড়া বিজনেসও করছি। জানিস তো মালিক একজন আছেই।'

আমি লক্ষ্য করছি, শোভনের অঙ্গভঙ্গী কথা বলার সুঠাম অনুশীলন। সেই উনিশ বছরের শোভন আজ ছেচল্লিশে পৌঁছেও অবিকল এক। চুলগুলো আরো নিবিড় আরো মসৃণ। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাতের কব্জি, আঙুলের গাঁট, চোয়াল, কপাল। শোভনকে ভয়ানক ভাল লাগছে।

'আর শোন্ যা বলছিলুম, এক্ষুনি একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। সত্যিই ভাবলে কেমন লাগে, পরিবর্তনের শেষ নেই।' শোভন থামল। জুতোর গোড়ালি ঘুরিয়ে একটা পাক খেল। লেবেলক্রসিংএর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল, 'তোর ট্রেন কটায়, কোথায় যাচ্ছিস?'

বললুম, 'ছোট পুঁজির ব্যবসা। এইখানেই শেষ পাড়ি। তাও আবার চারদিন কেটে গেল। কলকাতায় ফিরছি।'

অবাক হয়ে শোভন বলল, 'তুই এখানে চারদিন কাটালি? আমি জানতেই পারলুম না, ভীষণ অন্যায় তোর। ছাড়ছোড় হয়ে গেছে বলেই কি মনে রাখার মতো কিছু নেই পারিজাত!'

একটু যেন ভাবাবিহ্বলতার পরিচয় দিচ্ছে শোভন। বললুম, 'কি হলো?'

'হবে আর কি। আমিও তো মাত্র এখানে দিন পাঁচেক রয়ে গেলুম। আমার কি এক নাগাড়ে থাকলে চলে ভাই। একটা চেক্কের দরকার ছিল, ওরা প্রায় মাস দুই ছিল এখানে। খুব ইমপ্রুভ করেছে, কিন্তু হলে কি হয় চিঠির ওপর চিঠি। ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

মনে হচ্ছে এবার শোভনের সাংসারিক জীবনের ইতিবৃত্ত জড় হবে। বললুম, 'আজকাল কোনদিকে আছিস, টিকিটি দেখারও যো রাখিস নি। বাপরে বাপ, সে আজকের কথা!'

'আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলতে পারি। তবে শোন পারিজাত, শোভন নিষ্ঠুর নয়।' শোভন এবার আমার একেবারে গা ঘেঁষে বসল। আমার কাঁচাপাকা চুলের চৌহদ্দি ঘেরা টাক, মোটা লেন্সের ভারী চশমা, সামনে-ঝোঁকা মুখ—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। পিঠের ওপর হাতের চাপ দিয়ে বলল, 'চেহারার বিজ্ঞের ছাপ, সুতরাং কাঠের ব্যবসা নাকি?'

'একটু; অল্পসল্প আর কি।'

'কোথায় স্টক?'

'ঘাটাল।'

শোভন এবার উঠে দাঁড়াল। সিগারেট কেসটা পকেট থেকে হাতে আনল। বলল,

'শুরু করেছিলুম ভূপালে, খানিকটা রেখেওছি সেখানে। এখন নজর দিয়েছি চিত্তরঞ্জন আর দুর্গাপুরে। চিত্তরঞ্জনের পাশেই বাড়িঘর দোর। যাস না একদিন বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে।'

ফাঁকা হেসে বললুম, 'সেদিকটায় সুবিধে নেই, সময় আর হলো কই?'

'কেন?' যেন আঁতকে উঠল শোভন 'তুই বিয়ে থা করলি না, খুব অন্যায়, ভীষণ অবিচার।' পায়চারি শুরু করল।

বললুম, 'সুখে আছি।'

'কখখনো নয়। বুঝেছি ঐ জন্যেই ধুঁকছিস। যা-ই বলিস পারিজাত, তুই ভুয়ো, ঠিক সেই বিভাসটার মতো।

ঘুরে ফিরে আবার বিভাসের কথাই এলো। শেষটায় বিভাসের বাঁচবার কি সাধ। বাঁচাতে কেউ পারল না।

শোভনের মুখখানা থমথম করছে। দ্বিতীয়বার বিভাসকে টেনে এনে আমাকে হয়তো অজান্তে কষ্ট দিয়েছে। প্রথমেই যখন তার কথাটা উঠেছিল তখন শোভনের গলায় বাষ্পের ধার ছিল। এখন কি বলবে না বলবে ঠিক করতে সময় নিচ্ছে। অস্ফুটে বলল, 'ছেলেমানুষি আর কি। কিন্তু তারপর তোরাই সব জানিস, আমি তো দলছাড়া, ধরতে গেলে দেশ ছাড়াও।'

থামল শোভন, নিজের আবেগকে টান দিতে চায়। বলল, 'তোর গাড়ি কটায়, আচ্ছা আচ্ছা আমারটাই আগে ছেড়ে যাবে। তোরটা আচ্ছা লেটের চূড়ান্ত?'

চোখে চোখ পড়তেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অহেতুক ঘড়ি দেখল শোভন।

'জানিস শোভন, ওর জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই।'

কথাটা মনে ধরল না শোভনের, যেন মনে মনে একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। একটু পরে বলল, 'তোরা যা জানিস খানিকটা তার মিথ্যে। বলবি মাধবীরই কাজ, বাইরে থেকে কে কাকে চিনছে বল?'

আমি বাধা দিলুম, 'আমি সত্যিটাই জানি শোভন। মাধবীদির জন্যে আমার দুঃখ হয়।''

শোভন ম্লান হাসল, গায়ের কোটটা খুলে হাতের ভাঁজে ফেলল। মিহি সুরে বলল, 'সুখদুঃখ মানতে হয় বইকি।'

আমি প্রসঙ্গ চাপা দিলুম। চঞ্চল আর বিদ্যুতের পারিবারিক জীবন, কাজকর্মের বিবরণ সংক্ষেপে শেষ করলুম। আমারটাও অনেক ব্যাপারে কমিয়ে বাড়িয়ে যা খাড়া করলুম তাতে শোভনের চক্ষুস্থির। সে আমাকে চিরদিনই একটু অন্য রকম ভাবে দেখে এসেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে গুঁজে দিল। নিজেরটায় আগুন ছুঁইয়ে কয়েকটা টানের পর টান দিয়ে কি যেন বলতে গেল, বলল না। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আবার টাইম-টেবিলটা দেখার ছল করে পিছন ফিরে দাঁড়াল। লেবেলক্রসিংএর দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সোজা আমার সামনে মুখ করে বলল, 'এসে গেছে। আমার কি কম ধকল নাকি, বাক্স প্যাঁটরা বিছানা নিয়ে এগিয়ে চলে এলুম। এক্কা মিলল না তেমন একখানাতেই দু-ক্ষেপ দিল।'

আমিও উঠে দাঁড়ালুম। শোভনের পরিবারের বাড়বাড়ন্ত কেমন দেখার লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শোভন হাত নেড়ে হেঁকে ডাক দিল, 'এদিকে, এখানে।'

দেখতে পাচ্ছি একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, সঙ্গে মাত্র একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেমেয়ে প্ল্যাটফরম ধরে ছুট দিয়েছে। মা রয়েসয়ে হেঁটে আসছেন।

শোভনের মুখে তৃপ্তির হাসি। গাড়ি আসার ঘণ্টা পড়ল।

'ঐ দ্যাখ পারিজাত, আমার মেয়ে, দশ পেরিয়ে গেছে। আর ঐ যে ছেলে, এ বছর ইস্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে।'

আমি এক দৃষ্টে ওদের দৌড়ে আসার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করছিলুম, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। শোভন বলে চলেছে, 'মেয়ের নাম রেখেছি রিমঝিম। হ্যাঁ তোকে বলাই হয়নি বড় ছেলে সঞ্জয়, তাকে ইঞ্জিনীয়ারিংএ ঢুকিয়ে দিলুম। তোদের শিবপুরেই তো রয়েছে। ছোট ছেলেকে মনে করছি ডাক্তারীতেই ঠেলব। ওর নাম দিয়েছে ওর মা, শুভংকর।

রিমঝিম আর শুভংকর বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। ভদ্রমহিলা এখনো বেশ খানিকটা দূরেই পড়ে আছেন। আমি অজান্তে বলে উঠেছি, 'চমৎকার। তোর থেকে কিন্তু শোভন, তোর ছেলেমেয়ে উৎরে যাবে।'

শোভনের ইঙ্গিত আমাকে ওরা প্রণাম করল।

'তোমাদের কাকাবাবু, অদ্ভুত মানুষ— ঋষিটিশি গোছের আর কি। নাম কি জানো? পারিজাত—'

রিমঝিম উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বলল, 'পারিজাত। আচ্ছা বাবা খুব জানা-শোনা নাম নয়? ঠিক ধরেছি, স্বর্গের ফুল।'

শোভন হেসে উঠল হো হো করে। মেয়ের বেণী ধরে বলল, 'মেয়েটা এসেছিল বলে তোকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে গেল পারিজাত।'

শুভংকর একটু চুপচাপ। তীক্ষ্ণ চোখ আর কান দিয়ে যেন সে আসল কিছু দেখছে শুনছে।

গাড়ি প্ল্যাটফরম ছুঁল। শোভন—নিমেষে টিকিট কাটল। কলরব আর সামান্য হুড়োহুড়ির মধ্যে শোভনের সমস্ত কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি না। কুলিরা মাল তুলছে, শোভনের স্ত্রী এসেই মাল গুনতে শুরু করে দিয়েছেন। সাদাসিধে মানুষ, একাল সেকাল কোনকালেই তাঁর বাধা নেই, এমনি বেশবাস। অল্প একটু শাড়ির আঁচল মাথায় এসে পড়েছে। মুখটা এতক্ষণেও পুরো দেখতেই পেলুম না।

এখানে গাড়িটা কয়েক মিনিট দাঁড়ায়। উঁচু ক্লাসে বসার খুব একটা অসুবিধা ছিল না। দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি। শোভনের গোটা মুখখানায় একটা অদ্ভুত কৌতুকের ছায়া পড়েছে।

শোভন ডাক দিল, বোধ হয় ইতিমধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে কিসের কথা হয়ে গেছে। আমি হাত তুলে এগুলুম। আমার ট্রেন আরো পনের মিনিট পরে আসছে। ভেতরে ভেতরে একটা কষ্টের আঁচ লাগছে। সেটার আকার একটু পরে কেমন নেবে কে জানে!

'চিনিস একে?'

লজ্জা হবারই কথা। পরস্ত্রীর দিকে সামনে থেকে দেখা কেমন যেন একটু লাগে। আমি ইচ্ছে করলেও মুখখানা একনজরে চিনতে পারতুম না। ছেলেমেয়েকে একটু আদর করলুম। হাতে ওদের কি দেওয়া যায় সে নিয়েও চিন্তা হলো মনে। কিছু খাবার বা কিছু ফল কোনটাই পাওয়া যাবে না এখানে।

'এই দ্যাখ পারিজাত।' শোভন স্ত্রীর মুখখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরল। রিমঝিম আর শুভংকর তো অবাক। আমি তো কূলই পেলাম না। চিনতে ভুল হবে কেন? সিঁথির চুল ফাঁকা হলেও মুখের আদল অনেক বদলালেও আমি ঠিকই চিনেছি। হাতদুটো খুব যেন বেশী ফরসা বেশী টসটসে। গলার মোটা হারটা একটা আস্ত প্যাঁচ খেয়ে ঘাড়ের খাঁজে ঢুকে রয়েছে। চোখের পাতার ছোট তিলটা এখনো হারিয়ে যায় নি।

চেয়ে আছে মাধবীদি আমার মুখের দিকে। আকস্মিক আঘাত বা আনন্দের তোড় সামলাতে সময় নিচ্ছে বোধ হয়। আমার দিক থেকেও কোন শব্দ নেই।

শোভনই বলে উঠল, 'দুজনেই কি আত্মস্থ হয়ে গেলি নাকি?'

আমার হাত দুটো অজান্তে নমস্কারের ভঙ্গীতে উঠে এসেছে বুকের কাছে। মাধবীদিও নীরবে নমস্কার জানাল।

শেষকালে বলতেই হলো, ভাল আছেন মাধবীদি?'

'আপনি কেমন আছেন?'

'এই চলছে আর কি।'

ট্রেন ছাড়ছে, আর সময় নেই। পোর্টফোলিও খুলে পার্কার সেটটা উঠিয়ে পেনটা দিলুম শুভংকরের হাতে আর পেন্সিলটা রিমঝিমের।

শোভন ঝুঁকে এসেছে, পাশে মাধবীদিও। ট্রেন প্ল্যাটফরম কাটিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

বিদুর

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বর্তমান বৎসরে আকাদমি পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থের মধ্যে দাশগুপ্ত মহাশয়ের রচিত 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' পুরস্কারযোগ্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগীর কাছে সংবাদটি শুভ: দাশগুপ্ত মহাশয়কে আমরা অভিনন্দন জানাই।

এবারে বাঙলা বইয়ের আকাদমি পুরস্কার লাভ গতবারের কথা মনে করিয়ে

দেয়। গত বৎসর কোনো বাঙলা গ্রন্থ পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে বাদপ্রতিবাদ, ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছিল। এ-বছরে সাহিত্য আকাদমি সে-ক্ষোভ পুষে রাখতে দিলেন না। ফেল করা ছেলেকে যেন এবারে ক্লাস প্রমোশন দেওয়া হল।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত প্রধানত প্রাবন্ধিক, তাঁর রচিত একাধিক প্রবন্ধ-গ্রন্থের সঙ্গে যদিও বাঙলা সাহিত্যের গবেষক-পড়ুয়াদের পরিচয় সমধিক তবু কবিতা, শিশু-সাহিত্য ও উপন্যাস লেখক রূপেও দাশগুপ্ত মহাশয় সুপরিচিত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ-যোগ্য। কানাড়ী সাহিত্যে এ-বছরে যে গ্রন্থটি আকাদমি পুরস্কার পেয়েছে—সেই গ্রন্থটি, অনুমান করি, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির বিচার। গ্রন্থটির নামঃ বাঙালী কাদম্বরিকার বঙ্কিমচন্দ্র, লেখক—এ আর কৃষ্ণশাস্ত্রী।

এবারে আকাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের মধ্যে প্রবন্ধ পুস্তকের প্রাধান্য নজরে পড়ে। আশা করা অসঙ্গত হবে না, প্রবন্ধ সাহিত্যের বেশ উন্নতি হচ্ছে।

বই চুরি

কোনো সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক আমার কাছে দুটি বই পাঠিয়ে দিয়েছেন। বই দুটির নানান জায়গায় দাগ দেওয়া। ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেনঃ "এই চুরি কি বই চুরি না পুকুর চুরি? ধন্য বঙ্গদেশ!"

আমি বই দুটি নিয়ে উলটে পালটে দেখেছি। একে কোন চুরি বলা যায় বুঝতে পারছি না। পাঠকই বিচার করুন।

একটি বইয়ের প্রচ্ছদপটে (ছবি দেওয়া হল) বইয়ের নাম লেখা আছে 'ময়দানবের দ্বীপ' ; লেখকঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র। অন্য বইটির মলাটে লেখা 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ' ; লেখকের নাম শ্রীস্বপনকুমার (ছবি দেখুন)। প্রথম গ্রন্থের প্রকাশকঃ দি বুক এম্পোরিয়াম লিঃ, কলকাতা-৬। ১৩৫৪ সালের মাঘ মাসে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত এর-পর আর নতুন করে বইটির কোনো সংস্করণ হয় নি।

দ্বিতীয় বইটির প্রকাশক সচদেব পুস্তকালয়, ১১৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। প্রকাশকাল কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ'-এর লেখক বইয়ের প্রথম পাতায় একটি তারকা চিহ্ন সন্নিবেশ করে জানিয়েছেন যে—ঃ গল্পে বিদেশী ছায়া আছে।

প্রেমেন্দ্রবাবুর 'ময়দানবের দ্বীপ' বাংলা বই। এতে কোনো বিদেশী ছায়া আছে কি না আমরা জানি না—জানার আগ্রহও নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুঃস্বপ্নের দ্বীপ-এর লেখক বিদেশী নয় দেশী ছায়া—একেবারে হুবহু ছায়াটি নিয়েছেন—যাকে ছায়া না বলে কায়া বললে আপত্তি থাকার কথা নয়। যেমনঃ

ময়দানবের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ১

ক. "সাইক্লোন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে জেনেও এভাবে গোয়ার্তুমি করে বেরোনো উচিত হয়নি।"

খ. "ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির ঝাপটা ও জলের উন্মত্ত আলোড়নের শব্দের মাঝে বিজয়ের কথাগুলো ঠিক যেন আর্তনাদের মতন শোনাল।"

গ. "সত্যিই ঝড় যে এমন ভীষণভাবে দেখা দেবে তা সে বেরুবার সময় আন্দাজ করতেও পারেনি। রাজগঞ্জে তার নদীর ধারের বাগান-বাড়ি থেকে সন্ধ্যায় যখন তারা মোটরবোট নিয়ে বেরিয়েছে তখনও আকাশ মেঘে ঢাকা, দমকা হাওয়ার ঝিরঝিরে বৃষ্টি নদীর ওপর পাতলা উড়ুনির মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে। সাইক্লোন সিগন্যালের কথা জেনেও তাই সে তেমন কিছু ভয় পায়নি।"

দুঃস্বপ্নের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ২ ও ৩ .

ক. "সাইক্লোন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় এভাবে বেরোনো আমাদের সত্যিই উচিত হয়নি।"

খ. "ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির ঝাপটা আর জলের আলোড়নের শব্দের মধ্যে রমেনের কথাটা ঠিক যেন কান্নার মত শোনাল।"

গ. "সত্যিই যে ঝড় এমন ভীষণভাবে দেখা দেবে তা তারা রায়পুরের বাগানবাড়ি থেকে বের হবার সময় কল্পনাও করেনি। অবশ্য তখনই আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। ঝির-ঝিরে বৃষ্টি নদীর ওপর পাতলা উড়ুনীর মত উড়ছিল। সাই-ক্লোনের সিগন্যালকে তাই ওরা ভয় খায়নি."

গোড়ায় এই। এবার শেষ দেখুন।

ময়দানবের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ১০৭

"রোবট'টি উচ্চৈঃস্বরে হাসছে।"

"এ আবার তা হলে কি ধরনের রোবট?

"—অত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই, কলের মানুষ কি বন্ধু হতে পারে না?"

"—কলের মানুষ বন্ধু!"

দুঃস্বপ্নের দ্বীপঃ পৃষ্ঠা ৭৫

"যন্ত্রদানবটি হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠল।"

"এ আবার কি ধরনের রোবাট।"

"—অত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই? কলের মানুষ কি বন্ধু হতে পারে না?"

"—কলের মানুষ বন্ধু!"

দুটি বইয়েরই গোড়ার পাতা আর শেষের পাতা থেকে মাত্র কয়েকটি মিলের উদাহরণ দেওয়া গেল। মাঝটুকু পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন।

আমরা যতদূর জানি প্রেমেন্দ্রবাবুর "ময়দানবের দ্বীপ" যথেষ্ট জনপ্রিয় গ্রন্থ। স্বপনকুমার নামক জনৈক লেখকের লেখা অথবা বইয়ের সঙ্গে আমরা পরিচয় নই। কিন্তু দুঃস্বপ্নের দ্বীপ-এর চেহারা দেখে মনে হল সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখছি। কদর্য মলাট, বটতলারও অধম ছাপা, পচা কাগজে ছাপানো—এই বই কলকাতা শহরের কোথায় যে বেচা হয় এবং কারা এর ক্রেতা আমাদের জানা নেই। সামান্য শিক্ষিত কোনো ব্যক্তিও যদি এরা ক্রেতা হতেন বহু পূর্বে স্বপনকুমারের স্বপ্ন ভঙ্গ হত।

বস্তুত দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় লেখক প্রথম লেখকের বইটি পাশে রেখে নকল করে গেছেন। এমন চুরি অভূতপূর্ব। ভাষা শব্দ বাক্যবিন্যাস যথাযথ রেখে একটি দুটি শব্দ বদলালে বা চরিত্রের নাম বদলে দিলেই কি বই নিজের হয়? কাহিনীর কথা বাদই দিলাম। সেখানে গভীর তল।

আমাদের ঠিক জানা নেই, প্রেমেন্দ্রবাবু ছাড়া আর কোন কোন লেখকের এমন সর্বনাশ করা হয়েছে? সন্দেহ হয় তদন্ত চালালে স্বপনকুমারের লেখার ঘরে দেশের দপ্তরের লোক বিখ্যাত ও অখ্যাত লেখকদের কিছু বই এবং কাঁচি, আঠা ও কলম পাবেন।

বঙ্গদেশ বলেই এমন ক্ষমাহীন হীন কর্ম লোকচক্ষুর অগোচরে দিব্য চলে যাচ্ছে। এবং গ্রন্থের প্রকাশকরাও চোখ বন্ধ করে বসে আছেন।

স্বপনকুমারের বইয়ের প্রকাশক তাঁর গ্রন্থের পিছনে একটি মনোগ্রাম ছাপেন। সেই মনোগ্রামে লেখা 'সত্যতাই উন্নতির পথ' (ছবি দেখুন)। 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ' নিশ্চয়ই সেই সত্যতার এবং উন্নতির উদাহরণ?

রবীন্দ্রনাথের নাটক

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রসঙ্গ : কাব্যনাটক। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত। স্ট্যান্ডার্ড পাব্লিশার্স। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

বাংলা নাটক-সমালোচনায় 'কাব্যনাট্য' ও 'নাট্যকাব্য' এই কথা দুটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নাট্যরস ও গীতিকাব্যরসের প্রাধান্য অনুসরণ করে শব্দ দুটি যথাযোগ্যভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু এদের ব্যবহার এখনও সেভাবে চলিত হয়নি। পারিভাষিক প্রয়োগ হিসাবে প্রচলিত না হলেও দুই শ্রেণীর নাটকের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই আমাদের সাহিত্যে আলোচিত হয়েছিল। 'শকুন্তলা মিরন্দা ডেসডিমোনা' প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সম্ভবত দুই জাতের নাটকের কথা উল্লেখ করেন। তখনকার দিনে পাশ্চাত্ত্য নাটক যে নূতন স্বাদ নিয়ে এসেছিল সংস্কৃত নাটকের স্বাদ তার থেকে আলাদা, একথা বুঝতে পারা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত 'নাটকাকারে কাব্যকে' নাম দিতে চান নাট্যকাব্য আর কাব্যাকারে নাটককে বলতে চান কাব্যনাটক। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী, 'বিসর্জন', 'মালিনী' ও 'চিত্রাঙ্গদা'—এই ছয়টি রচনাই কাব্যনাট্য অর্থাৎ এতে জীবনের ভাবরূপ অপেক্ষা বাস্তব রূপই বড়ো। বলা বাহুল্য, লেখকের আলোচনাপরিধি সুনির্দিষ্ট করার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও উল্লিখিত নাটক সবই কাব্যনাট্য কিনা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্ক হতে পারে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'চিত্রাঙ্গদা'য় কি ভাবরূপ অপেক্ষা বাস্তবরূপই বড়ো? অনুমান করি, মূলত পদ্যাকৃতিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন; পরে আন্তরধর্ম বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে একটি সাধারণ সূত্র নির্দেশ করতে চেয়েছেন। গ্রন্থকার প্রথম অধ্যায়ে কাব্যনাট্যের লক্ষণের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বহু বিদেশী সমালোচকের মতামত উদ্ধৃত করে বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন।

পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে উপরে উল্লিখিত নাটকগুলি আলোচিত হয়েছে। লেখকের আলোচনাপ্রয়াসের বৈশিষ্ট্য তিনি নিজেই ভূমিকায় বলে দিয়েছেন, 'প্রথমে বিশ্লেষণী ও পরে সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে নাটকের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে চেষ্টা করেছি।' আলোচনার ছকটি এই—প্রথমে নাটকটির সূচনাগত ইতিহাস পরে বিষয়বস্তু নির্দেশ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ভাবটি ব্যাখ্যা, তার পরে কাহিনী বর্ণনা ও শ্রেণী নির্ণয়, তারপরে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ আলোচনা সর্বশেষে রসনিষ্পত্তি। এই বিভিন্ন উপশিরোনামে তিনি প্রতিটি নাটকের আলোচনা করেছেন। এইভাবে সুবিন্যস্ত আলোচনা যে ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে তাতে সন্দেহ নেই। লেখকের নিজস্ব চিন্তাশক্তির পরিচয়ও যথেষ্টই আছে। রাজা ও রানীর কুমারসেন ইলার কাহিনী রবীন্দ্রনাথেরই সমালোচনা সত্ত্বেও লেখকের মতে প্রয়োজনীয়। লেখক দেখিয়েছেন, 'মালিনীর প্রেম সম্পর্ক রচনা করার উদ্দেশ্য—তাকে ধর্মের পরীক্ষায় দাঁড় করানো।'

লেখকের আলোচনা সুখপাঠ্য বিশ্লেষণাত্মক ও তথ্যনিষ্ঠ। ৫৭৫।৬১

গান্ধী রচনা

পল্লী পুনর্গঠন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অনুঃ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী স্মারকনিধি, বাংলা শাখা, ৭১ সদর বাজার রোড, ব্যারাকপুর (২৪ পরগণা)। দাম তিন টাকা।

গ্রামসেবা এবং গ্রাম পুনর্গঠন সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তা ও প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনেকদিন আগে ভারতন কুমারাপ্পা সেগুলোর একটি সংকলন বের করেন 'রি-বিল্ডিং আওয়ার ভিলেজেস' নাম দিয়ে। ইংরিজী ভাষায় লিখিত ঐ বইটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ 'পল্লী পুনর্গঠন'। বিশেষ-ভাবে সর্বোদয় কর্মীদের কথা চিন্তা করে বইয়ের পরিশিষ্টাংশে একটি নতুন প্রবন্ধও সংযোজিত হয়েছে।

গ্রামোন্নয়নের প্রশংসনীয় এবং অতি প্রয়োজনীয় কাজে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের কাছে আলোচ্য গ্রন্থটি অমূল্য বলে পরিগণিত হবে। উপেক্ষিত পল্লী অঞ্চলের দিকে আমাদের সংকীর্ণ শহর-কেন্দ্রিক চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী প্রায় একক চেষ্টায়। গ্রাম্যকর্মী আমাদের কাছে আজ আর অবহেলার পাত্র নন। গ্রাম-সেবার পোশাকী ভড়ং বহু পরিমাণে লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু সরকারী বেসরকারী নানা চেষ্টার ফলেও গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন এখনো সুদূর পরাহত। আশার কথা এই যে, দিগ্‌বর্তিকা হিসেবে কাজ করবার জন্য গান্ধীজীর নির্দেশ ও পরামর্শ আজো আমাদের সামনে রয়েছে। ২।৬২

প্রবন্ধ-সাহিত্য

কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। ছ' টাকা।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক আলোচনা গ্রন্থ 'কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা'য় বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও উপন্যাসের উৎস ও রূপ সম্পর্কে তৎসহ স্বদেশের ও বিদেশের কথাসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও আলোচনার সংযোগ করা হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে ছোট গল্প বা উপন্যাসের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থটিও সেই পর্যায়ভুক্ত।

কথাসাহিত্যের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে মোট ষোলোটি আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। লেখকের বিশ্লেষণ বা বক্তব্যে তথাকথিত পাণ্ডিত্যের ছদ্মবেশ অনুপস্থিত থাকলেও কোন দৃষ্টিকোণ বা তথ্যের অসদ্ভাবে গ্রন্থের কয়েকটি প্রস্তাব অত্যন্ত সাধারণ, কেবলমাত্র ছাত্রপাঠকের উদ্দেশ্যেই লেখা বলে মনে হতে পারে। এসব রচনার মধ্যে তত্ত্ব বা তথ্য অবশ্যই আছে কিন্তু অতি দ্রুতভাবে সব একত্র করতে যাওয়ায় প্রবন্ধের বক্তব্য বেশী শিথিল বা আড়ষ্ট বলে মনে হতে পারে। তবু এরই মধ্যে উপন্যাসের রূপ-সন্ধান, ছোট গল্পের উৎস ও রূপসন্ধান ও রূপ বৈচিত্র্য, সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য উপন্যাস প্রভৃতি উপযুক্ত তথ্য এবং মনোজ্ঞ বিশ্লেষণী পদ্ধতির জন্য উৎসাহী পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। '[illegible] বছরের বাংলা উপন্যাস' পর্যায়ে আলোচনায় সাম্প্রতিক উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি, শিল্প-ধর্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গে লেখকের বিস্তৃত

আলোচনার সুযোগ ছিল কিন্তু প্রবন্ধকার সে পথ পরিহার করে কেন সাধারণ আলোচনায় প্রবেশ করলেন তা উৎসাহী পাঠকের জিজ্ঞাসা হয়ে থাকবে। ৪৭৮।৬১

কিশোর সাহিত্য

বালক রবীন্দ্রনাথ—শ্যামল দাশগুপ্ত। মন্দু প্রকাশনী, ৫৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম : ১·৫০ টাকা।

আলোচ্য নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনকে তিনটি অঙ্কে পরিস্ফুট করা হয়েছে। অবশ্য 'জীবনস্মৃতি'তে এসব ঘটনা ও প্রসঙ্গ আশ্চর্যভাবে কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান নাট্যকারের কৃতিত্ব এই যে, তিনি বিভিন্ন ঘটনাকে স্থান-কাল-পাত্রযোগে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যা-সঙ্গীতের সেই কিশোর কবিকে নিজের যে মালা অর্পণ করেছিলেন, সেই স্বীকৃত ঘটনার আনন্দের মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়েছে। তৎকালীন ঠাকুরপরিবারের পরিবেশ সহ সমস্ত চরিত্রাঙ্কণে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৫১৫।৬১

মিলক গ্রহে মানুষ—অদ্রীশ বর্ধন। অলকা বিটা পাবলিকেশন্স। পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা-১। দাম—৩্।

পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ছায়াপথের নতুন এক গ্রহ "মিলক"—রহস্যময়, রোমাঞ্চকর। উল্কাবেগী মহাকাশ-যান নিয়ে বাঙালী তরুণ ধীমান ব্যানার্জি, আমেরিকান মহিলা লাইলা আর রাশিয়ান যুবক পানিকিন পৌঁছেছে তার বুকে। সে দেশের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরিয়ে আগুন নেবায়, সে গ্রহে রাস্তার তলা থেকে ওঠে অদ্ভুত আলো জ্বলে, সেখানে বয়স্ক লোকদের শেষ আশ্রয় ভয়াবহ মিগাল ভবন। সেখানকার অধিপতি হলেন যান্ত্রিক মগজ"।

লেখকের কুশলতার ছাপ উপন্যাসটিতে বর্তমান। তথাপি লেখকের কাছে একটি নিবেদন যে, তাঁর এই কল্পকাহিনী অধিক পরিমাণে কষ্টকল্পিত, এতটা না হলেই বুঝি উপন্যাসটির রস জমত। ৬৬০।৬১

প্রাপ্তি-স্বীকার

মঞ্জলা—আমাভার্ড সাটে অনুবাদক রেম্মানা বিশ্বনাথম্।

ডিলারিয়াম—বীরেন চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা—অনুবাদক হরিশচন্দ্র সিংহ।

মাটি ও পৃথিবী—সুখেন্দু সরকার।

ছোট শরৎ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

কবি দাদুর গল্প—যামিনীকান্ত সোম।

সন্ধ্যা—অনিল চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীনেহরু নাকি তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—"যে মানুষের আহার জোটে না তাহার কোন স্বাধীনতা নাই।" বিশু খুড়ো বলিলেন—"আশা করি তাঁর ভাষণের কোন টেপ্-রেকর্ডিং করা হয়নি!"

এক সংবাদে শুনিলাম দণ্ডকারণ্যে বসতি স্থাপন বৃদ্ধি পাইতেছে। —"গদিচ্যুতদের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে বসবাসের হিড়িক পড়েছে কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পুরুষের সঙ্গে তুলনায় জয়ের আনুপাতিক হার মহিলাদের বেশি বলিয়া একটি নির্বাচনী সংবাদ শুনিলাম। চোখ বুজিয়া আমাদের জনৈক সহযাত্রী গান ধরিলেন—"তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো মোর জয়॥"

শ্রীমতী কেনেডী তাঁর ভারত ভ্রমণকালে শিশুদের একটি ভ্রাম্যমাণ অভিনয় মঞ্চ ভারতকে উপহার দিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম! —"বয়স্কদের একটি অনুরূপ অভিনয় মঞ্চ উপহার দিলে অন্তত পাঁচ বৎসর পরে কাজে লাগত"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

লাল চীনের বিশাল এলাকার কোন এক স্থলে এক বিরাট বিতর্কের ঝড় বহিতেছে। সোভিয়েট আদর্শগত বিরোধই এই বিতর্কের ঝড়ের কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। —"অসম্ভব হয়ত নয়। চীন সাগরের প্রচণ্ড ঝটিকাকেই তো শুনেছি টাইফুন বলে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের আশ্বাস সত্ত্বেও চাউলের দর ঊর্ধ্বগামী হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। —"মহাকাশ
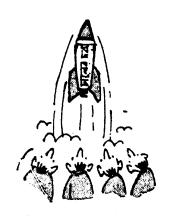
বিচরণের যুগে চাউলের দরই বা মাটিতে পড়ে থাকবে কেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

দীঘার সমুদ্র সৈকতে মন্ত্রিসভার কাঠামো রচনা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। —"মুখ্যমন্ত্রী—আয় তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে—কথাটা অন্তত মনে মনে বলেছেন কিনা তা বলা শক্ত"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

এক সংবাদে শুনিলাম নানা রাজ্যে নাকি বিনা দ্বন্দ্বে নেতা নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। —"সাম্প্রতিক নির্বাচনী কলকোলাহলের পরে চেঁচামেচি করার গলা আর নেই বলেই হয়ত নেতা নির্বাচনে দ্বন্দ্ব হয়নি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতায় সম্প্রতি অগ্নি নির্বাপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। —"প্রকাশ থাকে, জঠরাগ্নি নির্বাপণের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই"—বলেন বিশু খুড়ো।

টোকিও অর্থনৈতিক কমিশনের বার্ষিক সমীক্ষায় বলা হইয়াছে যে, গত দুই বৎসরে যে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্বের সমস্ত অনুমান ছাড়াইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কে নাকি কবে, কোথায় এক পাগলকে বলেছিল,—'পাগলা নৌকো ডোবাস নি যেন।' পাগল বলে উঠল—'ভালো কথা মনে করিয়েছিস' এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ডুবিয়ে দিল। পরিবার পরিকল্পনার ঢক্কা নিনাদের পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে ঐ পাগলের কথাটাই মনে পড়ে গেল।"

রাশিয়ার ভূগর্ভে একটি গভীর সাগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'তাস' বলিতেছেন—এই সমুদ্র সেচা নাকি সম্ভব। —"কিন্তু তার কী প্রয়োজন, সাগর মেলার একটা বাবস্থা করে দিলে দেশবিদেশের অনেক পুণ্যার্থীরাই রাশিয়ায় সাগরস্নান করে পূতপবিত্র হবেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

কলিকাতায় অধিক জল সরবরাহের বাবস্থার জন্য পাইপ বেশি করিয়া বসাইবার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কিন্তু পাইপ এখনও বসান হয় নাই এবং কবে হইবে তা নাকি (সংবাদপত্র বলিতেছেন) দেবাঃ ন জানন্তি। —"কিন্তু এই বায়বহুল কাজে হাত না দিয়ে ম্যানহোলের মুখ বন্ধ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। বর্ষা আসছে, বিনা খরচে কলকাতা জলে জলাকার হয়ে যাবে"—জলের জল বুঝাইয়া দিলেন খুড়ো।

কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ পথ নির্মাণের পরিকল্পনা চলিতেছে। ... ফরাসী বিশেষজ্ঞ নাকি সরেজমীনে পর্য-

বেক্ষণ চালাইবার জন্য ইতিমধ্যেই কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল "এতে হয়ত অনেকের পক্ষে আন্ডারগ্রাউন্ডের পথে 'ফ্রেঞ্চ লীভ' নিতে সুবিধে হবে!!"

জাপানী ছাত্রবৃন্দ রচিত ও প্রযোজিত নাটক "দি টাইগার" সম্প্রতি কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছে এবং দর্শকদের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কলকাতা রয়েল বেঙ্গলের দেশে অবস্থিত ... হালে এখানে ফেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোন ... ছাত্রনাট্যকার "দি ফেউ" নাটক ... জাপানে অভিনয়ের বাবস্থা করলে ... অফিস হিট হবে বলেই তো মনে হয়!"

কমিউনিস্ট নেতা ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের সভায় শ্রীক্রুশ্চফ নাকি মাংসের অভাবের উপর জোর দেন। তিনি বলেন— ... কে পরিকল্পনা পূর্ণ করিয়াছেন বা বর্তনে

কাহার ত্রুটি তাহা বিচার্য নয়, মোদ্দা কথা হইল যথেষ্ট পরিমাণে মাংস আমাদের জোটে না। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী ... কাটিলেন—"সিংহমশাই, সিংহ মশাই ... চাও, রাজহংস খেতে দেব হিংসা ভুলে যাও।"

চন্দ্রশেখর

রঙমহলে "আদর্শ হিন্দু হোটেল"

রঙমহল-এর, পাদপ্রদীপ হয়ত আর জ্বলবে না। আজও যে তা অনির্বাণ আছে সে শুধু এই নাট্যশালার শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংসাহস ও আত্মবিশ্বাসের জোরে। রঙমহল-এর রুদ্ধদ্বার তাঁদের প্রয়াস ও প্রতিজ্ঞার আঘাতে খুলে গিয়েছিল। নাট্যামোদীরা তাঁদের সংপ্রয়াসে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, তাঁদের সাফল্যে আনন্দিত হয়েছিলেন।

বাংলার নাট্যামোদীরা আজ আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন এই ভেবে যে, তাঁদের শুভেচ্ছা আজ সার্থক হয়েছে। রঙমহল-এর শিল্পী ও সকল কর্মী আজ প্রমাণ করলেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কাজের নিষ্ঠা, স্বপ্নের সঙ্গে সাধনা। রঙমহল-এর মঞ্চে শিল্পী-কলাকুশলী-গোষ্ঠীর বর্তমান নিবেদন "আদর্শ হিন্দু হোটেল" তাঁদের নিষ্ঠা ও সাধনার একটি সফল সার্থক ফলশ্রুতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুপঠিত কাহিনী "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর নাট্যরূপ দিয়ে গোপাল চট্টোপাধ্যায় একদা নাট্যরসিকদের অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেছিলেন এবং লোকান্তরিত শিল্পী ধীরাজ ভট্টাচার্যের অধিনায়কত্বে এই নাটকের অভিনয় কয়েক বছর আগে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এই রঙমহলে মঞ্চেই। বলতে দ্বিধা নেই, এমন সুগ্রথিত ও আবেগমণ্ডিত নাট্যরূপ উপভোগ করার সুযোগ সচরাচর মেলে না। রঙমহলের বর্তমান শিল্পী-কলাকুশলী-গোষ্ঠী এই নাটকটির পুনরভিনয় আয়োজন করে নাট্যামোদী সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। নাটকে হাসি ও অশ্রুর উপকরণ থরে থরে সাজিয়েছেন নাট্যকার। দর্শকের মন এই উপকরণরাজিতে কখনও পুলকিত, কখনও আবেগ আপ্লুত হয়ে ওঠে।

বিভূতিভূষণের কাহিনীর মূল রস ও আবেদন অব্যাহত ও অবিকৃত রেখে নাটকে নাটকীয় আবেগধর্মী ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের প্রধান চরিত্রদের—বিশেষ করে হাজারি ঠাকুরের—স্বরূপ ও স্বভাব অপরিবর্তিত রেখে নাটকীয় রস সঞ্চারে সত্যিকার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তিনি। নাটকের পরিণতি-অংশটিকে মরমী ও মধুর করে তুলেছেন।

অতি সুচারুভাবে নাটকটি পরিচালিত। নাটকের গতি স্বচ্ছন্দ, প্রতি নাট্যমুহূর্ত প্রয়োগসিদ্ধ, আবেগের বিন্যাস পরিমিত। এক কথায়, সর্বাংশে উপভোগ্য এই নাটক— এ দর্শকদের বিরল রসাস্বাদনের সুযোগ দেয়।

তিনজন শিল্পীর অতুলনীয় অভিনয়

নাটকটিকে অসাধারণ মর্যাদা দান করেছে। এঁরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়।

পদ্ম ঝি'র চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় যে অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতিশয়োক্তিকেও বুঝি হার মানায়। মঞ্চাভিনয়ে পদ্ম ঝি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি।

হাজারি ঠাকুরের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় কুশলতায় দর্শকদের মুগ্ধ, চমৎকৃত করেন। চরিত্রটিকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়।

হোটেল-ভৃত্য মতির চরিত্রে জহর রায় দর্শকদের কখনও হাসান, কখনও স্তব্ধ করে রাখেন। রঙ্গ-পরিবেশনেই হোক, আর আবেগ-সৃষ্টিতেই হোক, উভয় মুহূর্তেই তাঁর অভিনয়ের আবেদন দুর্বার।

হাজারি ঠাকুরের স্ত্রীর রূপসজ্জায় সরযূবালা সলজ্জ পল্লীবধূর চরিত্রটিকে স্বাভাবিকতা ও সবলতায় অপূর্ব করে তুলেছেন। নাটকের অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অল্প অবকাশে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার মত অভিনয় করেছেন হরিধন মুখোপাধ্যায়, সমর চট্টোপাধ্যায়, নবীন মজুমদার, ঠাকুরদাস মিত্র, মিণ্টু চক্রবর্তী ও অজিত চট্টোপাধ্যায়।

কুসুম, অতসী ও টেঁপি (হাজারি ঠাকুরের কন্যা)—এই তিনটি স্ত্রী-চরিত্রে যথাক্রমে শিপ্রা মিত্র, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় ও দীপিকা দাস তাঁদের সংবেদনশীল অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্র তিনটিই তাঁদের অভিনয়ে মনোময়।

কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত দাস, অনাদি দাস, সন্তোষ ঘোষাল, সত্য দে, প্রিয়রঞ্জন, অজয়, কেষ্ট, নিখিল ও মানিক।

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের আবহ-সংগীত ভাবোদ্দীপক। কলাকৌশলের কাজে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্রভাত

চিত্রশোভনার প্রথম নিবেদন 'শান্তি'-র নায়িকা চরিত্রে সন্ধ্যা র

হাজরা (শব্দ-প্রক্ষেপণ) ও অনিল সাহা (আলোকসম্পাত)।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

বি-এফ-জে-এ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ এসোসিয়েশন) গত সপ্তাহে ১৯৬১ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন সম্পাদিত হয়েছে সংস্থার সভ্যদের ভোটে (ব্যালট প্রথায়)।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের মতে বছরের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি **তিন কন্যা**। এই ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায় বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক (বাংলা ছবির ক্ষেত্রে)। হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে নির্বাচিত হয়েছেন নীতীন বস্ ("গঙ্গা যমুনা")। বিদেশী চিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন উইলিয়াম ওয়াইলার ("বেন-হার")।

বছরের দশটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্ররূপে অভিহিত হয়েছে (গুণানুক্রমে) : "তিন কন্যা", "গঙ্গা-যমুনা", "পুনশ্চ", "মধ্য রাতের তারা", "সপ্তপদী", "কানুন", "চার দিওয়ারী", "উসনে কহা থা", "জিস দেশ মে গঙ্গা বৈহতী হৈ" ও "স্বয়ম্বরা"।

দশটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রের (কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত) স্থান অধিকার করেছে : "বেন-হার", "দি এপার্টমেণ্ট", "কানাল", "গার্ল সীকস্ ফাদার", "দি মিলিয়নেয়ারেস", "অন দি বীচ", "সাউথ প্যাসিফিক" "পেপে", "দি সিঙার নট দি সঙ্" এবং "এলমার গ্যাণ্ট্রি"।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন : (বাংলা) উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন ("সপ্তপদী"-তে অভিনয়ের জন্য); (হিন্দী) দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা ("গঙ্গা-যমুনা"-য় অভিনয়ের জন্য); (বিদেশী) চার্লটন হেস্টন ("বেন-হার") ও শার্লে ম্যাকলেন ("দি এপার্টমেণ্ট)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ও সহ-অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন : (বাংলা) অনিল চট্টোপাধ্যায় ("অগ্নি সংস্কার") এবং মঞ্জু দে ("কেরী সাহেবের মুন্সী") ও দীপ্তি রায় ("মা"); (হিন্দী) প্রাণ (জিস দেশ মে গঙ্গা বেহতী হৈ) ও অশোককুমার (কানুন) এবং নিরুপা রায় (ছায়া) ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় (উসনে কহা থা); (বিদেশী) ... (আণ্ডার টেন ফ্ল্যাগস) ও শার্লে ... (এলমার গ্যাণ্ট্রি)।

বছরের শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালকরূপে নির্বাচিত হয়েছেন : (বাংলা) রবিশঙ্কর ("সন্ধ্যারাগ") ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ("স্বরলিপি"); (হিন্দী) নৌশাদ (গঙ্গা-যমুনা)। গীতিরচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছেন (বাংলা) গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ("স্বরলিপি") ও (হিন্দী) শাকীল বদায়ুনী ("গঙ্গা-যমুনা")। সংলাপে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন (বাংলা) ... ঘোষ ("স্বয়ংবরা") এবং (হিন্দী) ... মির্জা, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ও এস খলিল ("গঙ্গা-যমুনা", "ছায়া" ও "উসনে কহা থা")। আলোকচিত্রগ্রহণে (বাংলা) ... ("সপ্তপদী") ও দীনেন গুপ্ত ("সন্ধ্যারাগ") এবং (হিন্দী) বাবা সাহেব ("গঙ্গা-যমুনা")। শব্দগ্রহণে (বাংলা) ... ("স্বরলিপি") ও (হিন্দী) ... ("গঙ্গা-যমুনা")।

আঞ্চলিক এওয়ার্ড কমিটির মতে : চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য ... সেরা ছবি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ... (পূর্বাঞ্চল) আঞ্চলিক এওয়ার্ড কমিটি প্রতিযোগিতার জন্য তালিকাভুক্ত ... তেরটি ছবি (বাংলা, অসমিয়া ও ...) দেখেছেন। ছবি দেখার পর কমিটি ... ছবির গুণাগুণ বিচার করে ... পুরস্কারের জন্য পাঁচটি ছবি এই ... থেকে অনুমোদন করেছেন। ... ভারতীয় প্রতিযোগিতায় এই ... অংশ গ্রহণ করবে। ... ছবি পাঁচটি হল (গুণানুক্রমে) ... ("তিন কন্যা"-র অন্তর্গত), ... "ভগিনী নিবেদিতা", "মেঘ" ও ...

আন্তর্জাতিক বিনিময় কেন্দ্র

মিলানের (ইটালি) আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-মেলা সম্প্রতি সারা বিশ্বের ...

বি বি সি'র বিচিত্রা শাখার উদ্যোগে বৃটিশ বেতারে আবার বাংলা নাটকের অভিনয় প্রবর্তিত হয়েছে। এখানে 'ইন্‌স্পিরেশন' নামক একটি নাটিকার পাত্রপাত্রীদের দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিক থেকে—বিচিত্রার প্রযোজক ও 'ইনস্পিরেশন'-এর নাট্যকার বিনয় রায়, শ্যামল লোধ, মঞ্জুলা ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দীপিতা চৌধুরী ও নির্মলকুমার ঘোষ

অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে বছরে দুবার এই মেলার আয়োজন করা হয়। এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে।

মিলানের প্রথম আন্তর্জাতিক মেলায় ভারতবর্ষ থেকে চারটি ছবি যোগদান করেছিল। এগুলি চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার ছবি। ভারতের সাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই মেলা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না বলেই হয়ত কোন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছবি এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

সুসংবাদ এই, গত অক্টোবর মাসে মিলান-মেলায় ভারতবর্ষ থেকে চারটি শিশুচিত্র, চারটি প্রামাণিক চিত্র ও তিনটি কাহিনীচিত্র পাঠান হয়। জানা গেছে, মেলায় প্রদর্শিত সব কয়টি ভারতীয় তথ্যচিত্র জার্মানী ও ইটালীর টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান ক্রয় করবেন। বাংলাদেশের একটি কাহিনীচিত্র গ্রীসে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে বলে কথাবার্তা চলছে। কেরলের একটি দক্ষিণ ভারতীয় কাহিনী-চিত্রও পরিবেশিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

মিলান-মেলার মাধ্যমে ভারতীয় ছবির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথটি যে প্রশস্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই। মিলানের আগামী মেলাটি বসবে ১২ই এপ্রিল থেকে নয়দিন। নামমাত্র প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে পৃথিবীর যে-কোন দেশের ছবি এই মেলায় প্রদর্শিত হতে পারে। এবং ছবির গুণ থাকলে প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশে তার পরিবেশন স্বত্ব কেনবার ক্রেতার অভাব হয় না। গত দু' বছরের অধিবেশনে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মিলান শহরের যে বিরাট অট্টালিকায় সুবিখ্যাত মিলান শিল্পমেলা বসে, চলচ্চিত্র মেলাটির অধিবেশনও সেইখানে হয়। বহু প্রেক্ষাগার সমন্বিত এই অট্টালিকায় ছবি দেখাবার সবরকম সুব্যবস্থা আছে, এমন কি স্বল্প খরচে দোভাষীও পাওয়া যায়। ফলে এক দেশের ছবি অন্য দেশের ক্রেতাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যাঁরা বিদেশে নিজেদের ছবির প্রচার চান, তাঁরা মিলান চলচ্চিত্র মেলায় যোগ দিলে অবশ্যই সুফল পাবেন।

চিত্রালোচনা

বর্তমান সপ্তাহে একটি বাংলা ও একটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবিটি হল : চিত্রশোভনার **শাস্তি**; হিন্দীটি হল সেকার্টস-এর (মাদ্রাজ) **মেরা সুহাগ**।

শাস্তি ছবিটির আখ্যানবস্তু প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র "ভুবন ডাক্তার" গল্প থেকে আহরিত। আদর্শের পথে চলতে গিয়ে এক তরুণ চিকিৎসকের কী-করে পদস্খলন ঘটে এবং পুনরায় অকম্পিত পদক্ষেপে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগোতে গিয়ে কেমন ভাবে সে দয়াহীন পৃথিবীর কাছ থেকে শুধু লাঞ্ছনাই বরণ করে নেয় ও তার নিঃসঙ্গ জীবন দুই নারীহৃদয়ের স্নেহ-স্পর্শে আনন্দময় হয়ে ওঠে, তা-নিয়েই ছবির আবেগধর্মী কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দয়াভাই। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র দয়াভাই সত্যজিৎ রায়ের সংস্পর্শে এসে চিত্র পরিচালনার কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তরুণ পরিচালকের এই প্রথম ছবির নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রণয়োপাখ্যানের নায়িকা সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন তুলসী চক্রবর্তী, সবিতাব্রত দত্ত, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, মণি শ্রীমানী, কালী সরকার, পদ্মা দেবী, অর্পণা দেবী, মালবিকা গুপ্ত

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে নৃত্য সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'স্বদেশ' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে সঙ্ঘের ছাত্রীবৃন্দ

ও বুবলা। আলী আকবর খাঁ ছবির সুরকার।

দক্ষিণ ভারতের হিন্দী চিত্রোপহার **মেরা সুহাগ-এর** মূল উপজীব্য প্রণয়, রোমাঞ্চ ও নৃত্য-গীত। এচ কৃষ্ণমূর্তি ছবিটির পরিচালক। সংগীত পরিচালনা করেছেন অরুণ রাঘবন।

• • •

জাগ্রান প্রোডাশনস-এর দ্বিতীয় চিত্র-প্রয়াস **দাদা ঠাকুর**-এর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি ছবির অন্তর্দৃশ্যের কার্যসূচী সমাপ্ত করে পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় ছবির শিল্পিগোষ্ঠী ও কলাকুশলীদের নিয়ে ভাগলপুরে গেছেন। ভাগলপুর অঞ্চলে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। সুরসিক ও বিগত দিনের স্বদেশসেবী সাংবাদিক শরৎ পণ্ডিতের (আজও যিনি জীবিত) ঘটনাবহুল জীবনকাহিনীর ভিত্তিতে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়: ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, তরুণকুমার প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

• • •

প্রযোজক অনন্ত সিংয়ের আগামী ছবি **ধূপছায়া** চিত্ত বসুর পরিচালনাধীনে নির্মীয়মান। পরিচালক শ্রী বসু সম্প্রতি ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য শিল্পিদল সহ শিমুলতলায় গিয়েছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাসগুপ্ত। বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, দীপ্তি রায়, ছবি বিশ্বাস, বিশ্বনাথন, তরুণকুমার ও অমর মল্লিক ছবির শিল্পিগোষ্ঠীর পুরোভাগে রয়েছেন।

• • •

পরিচালক কমল মজুমদার বর্তমানে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিতে **অভিসারিকা** ছবিটির চিত্রগ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি ভিন্নধর্মী কাহিনীর ভিত্তিতে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার, সমর চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিণ্টু দাসগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

• • •

গ্রাম্য সমাজের কুসংস্কার ও তার প্রতিকারের ওপর আলোকসম্পাতে "প্রি-না-দ" রচিত **মেঘলা আকাশ**-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন তরুণ পরিচালক অমল দত্ত। সম্প্রতি কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও সোমা সরকার ছবির মুখ্য চরিত্রের শিল্পী। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন যথাক্রমে শম্পা ও নবাগত অশোক চক্রবর্তী। ননী মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

• • •

শিশির মল্লিক দীর্ঘকাল পরে ... চিত্র প্রযোজকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। শিশির মল্লিক প্রোডাকশনস-এর প্রথম উপহার রূপে তিনি বিশ্বনাথ রায়ের **নতুন দিনের আলো** কাহিনীটির চিত্ররূপ প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। গত ৮ই মার্চ রাধা ফিল্ম স্টুডিও-তে অনাড়ম্বরভাবে ছবিটির শুভারম্ভ অনুষ্ঠান পালিত হয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত চৌধুরী, ... চট্টোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় ছবির প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

মনে রাখবার মত ছবি

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি গত ৬ই মার্চ একাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে চ্যাপলিনের প্রথম জীবনের কয়েকটি অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র এবং নির্বাচিত কিছু চিত্রাংশের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। "দি ব্যাংক" ও "দি ট্র্যাম্প" নামে চ্যাপলিনের দুটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হয়। আগামী ১৮ই মার্চ সোসায়েটির উদ্যোগে আর্নে সুকসডর্ফের "দি ফ্লুট অ্যান্ড দি অ্যারো" প্রদর্শিত হবে।

কলিকাতাস্থ জাপানী দূতাবাসের উদ্যোগে গত রবিবার (১১ই মার্চ) সকালে রক্সি প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব-বন্দিত জাপানী চিত্র "হ্যাপিনেস অব আস এলোন" এবং তথ্যচিত্র "নিকো" প্রদর্শিত হয়।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা গত ২রা ও ৮ই মার্চ লোটাস চিত্রগৃহে "চেক চলচ্চিত্র আসরের" ব্যবস্থা করেছিলেন। আসরে "উলফ ট্র্যাপ" (জিরি ওয়েস পরিচালিত) এবং "ইট ওয়াজ নট ওয়েডিং ..." প্রদর্শিত হয়। সংস্থা শীঘ্রই "..."

রিচ অব ডেভিল" এবং "এগেনস্ট অল" ছাব দুটির প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।

নাট্যাভিনয়

"সাজঘর-এর সভ্যরা গত ১৪ই মার্চ রঙমহলে সলিল সেন রচিত "কিংবদন্তী" নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন।

গত ১১ই মার্চ নিউ এম্পায়ারে বংগীয় নাট্য সংসদ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী রচিত "জনক" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সোমেন নন্দী, মিনতি গুপ্ত, শিপ্রা নিয়োগী, অদিৎ কুণ্ডু, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, চিনু গোস্বামী, প্রদীপ গুপ্ত ও অম্বুজাক্ষ সেন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। আগামী সপ্তাহে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

"দি বোহেমিয়ানস" সংস্থা গত ৯ই মার্চ মহারাষ্ট্র নিবাস হলে রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" ও চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় রচিত "সীমান্ত" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। "শেষরক্ষা"র পরিচালক ও সংগীত পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে ললিত মুখোপাধ্যায় ও কানাই মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় "সীমান্ত" পরিচালনা করেন।

গত ৮ই মার্চ মহাজাতি সদনে আন্তঃ-অফিস নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে "অরুণ্য" গোষ্ঠী "বসন্ত-উৎসব" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন। নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (অমল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "স্বর্গান্ধর"), লাভলক অ্যাণ্ড লুইস রিক্রিয়েশন ক্লাব (শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত "বিদিশা") ও টিটাগড় পেপার মিলস রিক্রিয়েশন ক্লাব (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "একটা নাটক লিখেছি")।

গত ৩রা মার্চ অভ্যুদয় নাট্য সমিতি (লিকফারবাড়ি, ধানবাদ) তাঁদের চারদিন-ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত "কাঞ্চনরঙ্গ" (অভ্যুদয় অভিনীত), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "আগন্তুক" (রূপায়ন অভিনীত), মহেন্দ্র গুপ্তের "কঙ্কাবতীর ঘাট" (এলিট কালচার অ্যাসোসিয়েশন অভিনীত) এবং ভানু চট্টোপাধ্যায়ের "আজকাল" (বার্নস ক্লাব অভিনীত) মঞ্চস্থ হয়।

গত ৫ই মার্চ মহাজাতি সদনে রূপক-এর আয়োজনায় রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। সংগীত ও নৃত্যপরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে হরেন চৌধুরী ও রঞ্জিত রায়।

আর্টস থিয়েটার ক্লাবের সভ্যরা গত ৬ই মার্চ থিয়েটার সেণ্টার হলে শিবেশ মুখোপাধ্যায়ের "পুনরাবর্তন" মঞ্চস্থ করেন।

সি-এস-ও অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব (ইস্টার্ন রেলওয়ে) সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গত ২রা মার্চ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধু" মঞ্চস্থ করেন।

শিক্ষার্থী নাট্যসংস্থার শিল্পীরা অনিলবরণ দত্ত রচিত হাসির নাটক "একি হলো" গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা মঞ্চে মীনা বসুর পরিচালনায় সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন।

চিত্রম আশা নিবেদিত 'মেঘলা আকাশ'-এর নায়িকা শম্পা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের (পণ্ডিচেরী) শ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী নিউ এম্পায়ারে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি ও শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগারের যুগ্ম উদ্যোগে "ভাবীকালে" ও "মানদণ্ড" নামে দুটি নাটক সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। "ভাবীকালে" শ্রীমা-রচিত একটি ফরাসী নাটকের অনুবাদ। "মানদণ্ড" গলসওয়ার্দির "জাস্টিস" অবলম্বনে সত্যেন অধিকারী কর্তৃক রচিত। সম্মিলিত অভিনয়-সম্পর্কে ও সুষ্ঠু প্রয়োগ-কৌশলের গুণে নাটক দুটি বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নাটক দুটির প্রধান চরিত্রগুলিতে সু-অভিনয় করেন অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল সরকার, বারীন রায়, শান্তা চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন অধিকারী ও রানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগীত অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ভি বালসারা নির্বেদিত রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" কবিতাটির সাংগীতিক রূপায়ন জনসাধারণ ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। সুরকার ভি বালসারা তাঁর পরবর্তী প্রয়াসরূপে "রামায়ণ"-এর সংগীত রূপায়নের কাজে ব্রতী হয়েছেন। জনসাধারণের অনুরোধে সুরকার অনতি-বিলম্বেই "দেবতার গ্রাস" ও তাঁর একক পিয়ানো সঙ্গীত পুনরায় পরিবেশন করবেন।

নৃত্য সংঘের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সংস্থার সভ্যারা গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে একটি মনোজ্ঞ সংগীত-নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রগ্রহণকারী বিশিষ্ট শিল্পিদের মধ্যে ছিলেন ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পট্টনায়ক, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তালাত মাহমুদ, নির্মল চৌধুরী, শ্যামল মিত্র ও বিমলভূষণ। অনাদিপ্রসাদ পরিচালিত নৃত্যনাট্য "ওমর খৈয়াম" ও বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত "স্বদেশ" নৃত্যনাট্য সম্মেলনে মঞ্চস্থ হয়।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগর বাণী-পীঠে (বেলেঘাটা) 'দরবারী'র সারারাত্রি-ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কানাই মুখোপাধ্যায়ের তবলা লহরা দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। মায়া দাস, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শান্তি বসু কণ্ঠ-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন। অন্যান্য

সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আগত জর্জিয়ান নাচের দলের একটি নৃত্য দৃশ্য

শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রাজীবলোচন দে, রাজা রায়, মালশ্রী সেন (কথক) বিনয় লাহা, জয়কুমারী, পণ্ডিত রামগোপাল, সুনির্মল গুপ্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও শিশির চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি রবীন্দ্র স্মরণীতে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর ৪২তম বার্ষিক সম্মেলনে 'সঙ্গীত সম্মিলনী'র সভ্যবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানের সমন্বয়ে 'স্বাদেশিকতায় রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ধীরেন বসুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সুনীল রায়, আরতি দাস, প্রভাতভূষণ ও সুমিত্রা সেন একক সঙ্গীতে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দেন।

রবীন্দ্র সংগীত বক্স

বিদেশেও আজ রবীন্দ্র সংগীত বিশেষ-ভাবে সমাদৃত। লং-প্লেয়িং রেকর্ডের সহায়তায় রবীন্দ্র সংগীতের জনপ্রিয়তা অনেকটা বেড়েছে। লং-প্লেয়িং রেকর্ডে ইতিপূর্বে গীতিনাট্য "শ্যামা" ও "কালমৃগয়া" জনসম্বর্ধনা লাভ করে। সম্প্রতি কবি-কণ্ঠে গান ও আবৃত্তির একটি লং-প্লেয়িং রেকর্ড (দি ভয়েস অব টেগোর) দেশে-বিদেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

লং-প্লেয়িং রেকর্ডের তালিকায় এবার যুক্ত হল আরেকটি সম্পদ—"রবীন্দ্র-সংগীত বক্স" ("জেমস ফ্রম টেগোর")। রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান এই রেকর্ডে বিধৃত। গানগুলি গেয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন : "আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে", "বরতা পেয়েছি মনে মনে", "বাজে করুণ সুরে", "ও আমার মন", "ও যে মানে না মানা", ও "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়"।

অপর শিল্পীর কণ্ঠে রয়েছে : "কেন চোখের জলে", "মন মোর মেঘের সঙ্গী", "আমি জ্বালবো না মোর বাতায়নে", "মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে", "আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও" ও "তুই ফেলে এসেছিস কারে"।

নাট্য-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী থিয়েটার সেন্টার প্রবর্তিত নাট্য-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কোর্সের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উপাধি-পত্র প্রদান করা হয়। এই বিদ্যালয়ে নাট্য-শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক, যথা—গ্রীক, ল্যাটিন ও ইংরেজী নাটক, বাংলা ও সংস্কৃত নাটক, অভিনয়, প্রযোজনা, আলোকসম্পাত, মঞ্চ-সজ্জা, রূপসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ডাঃ অশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রবোধ ঘোষ, অশোক সেন, ডাঃ অজিত ঘোষ, তরুণ রায়, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী ও গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

নাট্য-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়। ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে বলেন, নির্ধারিত পাঠ্যতালিকা, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং নিয়মাধীন শিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা থিয়েটার সেন্টারের কর্তৃপক্ষ যেভাবে এই বিদ্যালয়ে নাট্যশাস্ত্র অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছেন, তা দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

বিবিধ সংবাদ

গত রবিবার (১১ই মার্চ) প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অয়স্কান্ত বক্সী হৃদরোগের আকস্মিক আক্রমণে তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬২ বৎসর বয়স হয়েছিল।

নাট্যশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রথমে তাঁকে অভিনেতা ও পরে নাট্যকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তিনি কিছুদিন শিশির-কুমার ভাদুড়ীর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত "ভোলা মাস্টার" নাটক একদা নাট্যমঞ্চে জনপ্রিয়তার নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। "চণ্ডীদাস", "সীতা", "খনা" প্রভৃতি সবাক-চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। তাঁর রচিত [illegible]

থেকে কেন সময় লুকিয়ে লুকিয়ে সাঁতার কেটে আসার ভিজে চুলই বেঁধে রাখতে হত, পাছে ধরা পড়ি এই ভয়ে। একদিন হল কি”—

সেদিন তাই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। চুপি চুপি আসতে ঠাকুমার সামনে পড়ে গেলেন। ভিজে চুল দেখেই ধরা পড়ে গেল সবকিছু। ঠাকুমা কাঁচি নিয়ে এসে দুই বিনুনির গোড়া ধরে দিলেন কেটে।

কিন্তু শান্তির উৎসাহ কিংবা অনুরাগ তাতে বিন্দুমাত্র দমেনি। ফ্রি স্টাইল সাঁতারে অল্পদিনের মধ্যেই ট্রেনারদের দৃষ্টি আকর্ষ করে ফেলেছেন তিনি।

তখন ১৯৪ সাল। ক্লাবের সকলে শান্তিকে বললেন, ‘অল ইণ্ডিয়া গার্লস সুইমিং কম্পিটিশনে নাম দাও তুমি। তুমি পারবে।

নাম দিয়েছিলেন এবং পেরেও ছিলেন। প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছিলেন সেদিনের ফ্রক পরা এই বাঙালী মেয়েটি। তারপর তার পরের বছর। শান্তি মুখার্জি সেদিন থেকেই খেলাধুলার পাতার সংবাদ।

তারপর সাফল্যের শিখর থেকে শিখরে। খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ ঘটল। সাঁতার থেকে দৌড়। জল থেকে মাঠ। সেখানেও শান্তি সকলের আগে। মোহনবাগান স্পোর্টস, কালীঘাট ক্লাবের স্পোর্টস, খেলাঘর বালিকা ব্যায়াম সমিতি এ সমস্ত ক্লাবের স্পোর্টসে শান্তির পুরস্কার ছিল বাঁধা।

আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও ৭৫ মিটার থেকে ১০০ মিটার দৌড়ে শান্তি পর পর তিন বছর প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন।

শান্তি মুখার্জির খেলাধুলার জীবনের আয়ু বেশীদিনের নয়। ১৮ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হল গোবরডাঙার বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারের শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের পর শান্তি চ্যাটার্জি যদিও সক্রিয়ভাবে খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, তবুও একদিক থেকে তিনি ভাগ্যবতী, তার কারণ স্বামী হিসাবে তিনি যাঁকে পেলেন, তিনি খেলাধুলো চর্চার একজন উৎসাহী ব্যক্তি শুধু নন, খেলাধুলো প্রশিক্ষণের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিতদের একজন। যে চিলড্রেন গার্ডেন ক্লাবের মধ্য দিয়ে শান্তি মুখার্জির খেলাধুলো জীবনের শুরু, শিশিরকুমার ছিলেন তারই সহকারী সম্পাদক। ক্রীড়া জগতের সুপরিচিত ব্রজরঞ্জন রায় এই সংগঠনের সহ-সভাপতি ছিলেন।

স্বামীর বদলির চাকুরি। শিশিরকুমার প্রথমে বদলি হলেন খুর্দা রোডে। তারপর রায়পুরে। সেখানে স্বামী গড়ে তুললেন মহিলা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রতচারী ও ড্রিল শেখানোর ব্যবস্থা করলেন

শান্তি চ্যাটার্জি

নিয়মিত। একাজে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল আবাল্যের। সুনাম ছিল দীর্ঘদিনের।

শান্তি চ্যাটার্জি গড়লেন দেশবন্ধু মহিলা সমিতি। তিনি হলেন অধ্যক্ষা। মেয়েদের নিয়ে হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা হল। ছোটবেলা থেকে নাচের প্রতিও ঝোঁক ছিল। মেয়েদের নাচ শেখানোর ভার নিলেন শান্তি চ্যাটার্জি। খেলাধুলো আর সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করলেন ওঁরা।

দীর্ঘদিন প্রবাস-জীবন যাপনের পর শান্তি চ্যাটার্জি সম্প্রতি আবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এখনও মাঝে মাঝে গোলদীঘি হাতছানি দেয় তাঁকে। কিন্তু সাংসারিক ব্যস্ততা আর বয়সের অবসাদে ফেলে-আসা জীবনের দিকে আর পিছু ফিরে তাকানো যায় না।

“তবু বড় আশা” সবশেষে বললেন শান্তি চ্যাটার্জি “ছোট মেয়েটি যদি খেলাধুলোয় নাম করতে পারে।”

চ্যাটার্জি দম্পতীর ছোট মেয়েটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। খেলাধুলোর প্রতি তার মায়েরই মত অনুরাগ। শান্তি চ্যাটার্জির বাপের বাড়ির দিকে তাঁর দুবোনই খেলাধুলোয় সমান অনুরাগিণী ছিলেন। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের এই ক্রীড়ানুরাগের ধারা উত্তর পুরুষের মধ্যেও বর্তাবে এটিই এখন তাঁদের বড় আশা।

দেশী সংবাদ

৫ই মার্চ—দীঘা সমুদ্রসৈকতে নাড়াজোল রাজবাড়ির সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জী রাজ্য মন্ত্রিসভার নূতন কাঠামো সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেন বলিয়া জানা যায়।

ভারত ইউনিয়নের অঙ্গ গোয়া দমন ও দিউ-এর প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য রাষ্ট্রপতি আজ এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। অর্ডিন্যান্সটির নাম "গোয়া, দমন, দিউ (প্রশাসন) অর্ডিন্যান্স ১৯৬২।" ইহা জারি করার সংগে সংগেই বলবৎ হইয়াছে।

৬ই মার্চ—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুব করার প্রশ্নটি সম্পর্কে সরকারী-স্তরে খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা আছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীখান্না ও উক্ত দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীধরমবীর আগামীকাল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতেছেন।

প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী অদ্য দুপুরে কলিকাতায় শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৯৪৭ সাল হইতে উক্ত মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

৭ই মার্চ—ওয়াকিবহাল মহলে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল হিসাবে পাতিয়ালার মহারাজার নাম শুনা যাইতেছে। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কার্যকাল গত নবেম্বর মাসে শেষ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী রাজ্যপাল নিযুক্ত না হওয়ায় শ্রীমতী নাইডু কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নরনারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক্স-রে যন্ত্র ব্যবহার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং এই জন্য প্রায় লক্ষ টাকার এক স্কীম চালু করা হইতেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন।

৮ই মার্চ—নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে যে সকল জল্পনা-কল্পনা হইতেছে, তাহা হইতে জানা যায় শ্রীভি কে কৃষ্ণ মেনন বর্তমানের ন্যায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকিবেন না। এক সংবাদে প্রকাশ, বর্তমান প্রতিরক্ষা দপ্তর দ্বিধাবিভক্ত করিয়া শ্রীমেননকে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন বিভাগের ভার দেওয়া হইবে।

সাহিত্য আকাদেমীর কার্যনির্বাহক বোর্ড ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে ১৩ খানা পুস্তক নির্বাচিত করিয়াছেন। প্রত্যেকখানা পুস্তককে ৫ হাজার টাকা হিসাবে আকাদেমীর বাৎসরিক পুরস্কার দেওয়া হইবে। বাংলা ভাষায় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য নামক পুস্তকখানা নির্বাচিত হইয়াছে।

৯ই মার্চ—প্রবীণ জননেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সর্বসম্মতিক্রমে অদ্য তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী

দলের নেতা নির্বাচিত হন। অর্থাৎ তিনি পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার লাভ করেন এবং আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পুনরায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুবের প্রস্তাব সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া উহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মকুব করিতে সম্মত আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১০ই মার্চ—তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর আজ সকালে রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার পূর্ণমর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হইতেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, নূতন মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সহ মোট ১৬ জন পূর্ণমন্ত্রী থাকিবেন এবং শুধু এই ১৬ জনকেই রাজ্যপাল রবিবার সকালে শপথ গ্রহণ করাইতেছেন।

১১ই মার্চ—কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নূতন মূল্যহার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই নূতন হার উচ্চ, মাঝারি ও নিম্ন স্তরের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সিনেমা প্রভৃতি, ব্যাটারি চার্জিং এবং 'এইচ' শ্রেণীর (গার্হস্থ্য) বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

তৃতীয় যোজনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার যে পরিকল্পনা আছে তাহারই অংগরূপে বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক দিবার সরকারী প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুসারে রাজ্য-সরকার আপাততঃ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঁচ লক্ষ টাকার পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ই মার্চ—আসন্ন জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে শুরু করার ইংগ-মার্কিন প্রস্তাবে রাশিয়া সায় দিয়াছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আজ কমন্স-সভায় একথা ঘোষণা করেন। ওয়াশিংটনের এক খবরেও এই ঘটনার সমর্থন মিলিয়াছে।

আজ সকালে আলজিয়ার্সে ২০০টিরও বেশী বোমা বিস্ফোরণে শহর প্রকম্পিত হইতে থাকে। ইউরোপীয়দের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। পুলিস ১৭ জন ইউরোপীয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৬ই মার্চ—পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যদি পুনরায় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা শুরু করে, তবে রাশিয়াও তাহার "নূতন ধরনের অস্ত্রগুলিকে" নিখুঁত করিয়া তুলিবার জন্য কেপরীক্ষা [illegible] করিবে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে, বায়ুমণ্ডলে পরমাণু আণবিক পরীক্ষা শুরু করার মার্কিন সিদ্ধান্ত "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক নীতির নূতন প্রকাশ।"

এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশনের ২৫টি সদস্য-দেশের প্রতিনিধিগণ [illegible] এই কমিশনের দুই সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ করেন। এই অধিবেশনে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির 'গুরুতর [illegible]' সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য লাভ করিবে।

৭ই মার্চ—মেলবোর্নে হৃদ্‌যন্ত্রে একটি [illegible] অস্ত্রোপচারকালে একটি লোকের ৩৬ বার [illegible] ঘটিয়াছিল এবং কোন কোন সময় সে মৃত্যু [illegible] মিনিটেরও বেশী স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ৮৭ বৎসর বয়স্ক এই রোগীটির অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে।

৮ই মার্চ—ইউক্রেনে মাটির নীচে ১৪ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত একটি সাগরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী [illegible] সংবাদ দিয়াছেন। এই সাগরের গভীরতা কোন কোন জায়গায় তিন শত ফুটেরও বেশী।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনপ্রকার জনমত গঠিত হইতে না পারে সেই জন্য পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের [illegible] সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। প্রকাশ, [illegible] গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের এই কাজে [illegible] করা হইয়াছে এবং সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৯ই মার্চ—মার্কিন উচ্চতম মহল এখন একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর বৈমানিকগণ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট গেরিলাদের উপর বোমা এবং [illegible] বর্ষণ করিতেছে। এই তথ্য গত [illegible] সযত্নে গোপন রাখা হয়।

এক সরকারী ঘোষণায় জানান হইয়াছে [illegible] সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত [illegible] পরিষদের সদস্যদের নিজেদের মন্ত্রী [illegible] পরিচয় দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১০ই মার্চ—আজ রেঙ্গুনে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ইউনিয়ন [illegible] সংসদ জেনারেল নে উইনকে সমস্ত আইন প্রণয়ন, বিচার পরিচালনা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে।

প্যারিসের দক্ষিণপূর্ব শহরতলি ইসি লে মুলিনোতে অবস্থিত যে বাড়িতে জাতীয় [illegible] সংসদের কংগ্রেস হইবার কথা, সেই বাড়ির সম্মুখে একখানি বাড়ির মধ্যে লুক্কায়িত একটি [illegible] বোমার বিস্ফোরণে আজ তিন জন নিহত ও পঞ্চাশ জন আহত হইয়াছে। জানা [illegible] ফ্যাসিস্ত গুপ্ত ফৌজি সংগঠনের কাজ।

১১ই মার্চ—আলজিরিয়ান [illegible] আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আজ সকালে ফরাসী ও আলজিরিয়ান প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের [illegible] বৈঠকে মিলিতেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, গত মাসের গোপন আলোচনার পরেও যে সকল বিষয় অমীমাংসিত ছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 24TH MARCH, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ২১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১০ চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক সুরুচি ও সংযম

রাজনীতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিরকালই মুখরা, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক বিধানে। বাক্-স্বাধীনতা তথা 'ফ্রিডম অব স্পীচ' না হলে গণতন্ত্র চলে না। তাহলেও বাক্-স্বাধীনতার মাত্রাভেদ আছে। কোথায়, কখন কীভাবে কথাবার্তা আলাপআলোচনা, তর্কাতর্কি চলা উচিত তার রীতিমত বাঁধাধরা নিয়ম তৈরী করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু সংযম শালীনতা ও শোভনতার অলিখিত নিয়ম একটা আছেই। সে নিয়ম অবশ্য শুধু বাক্-স্বাধীনতার নয়, পরস্পর আচরণেরও। ঘরোয়া মজলিসে বৈঠকে অন্তরঙ্গমহলে কথাবার্তার আচরণের ধরণ একরকম, আবার আদালতে, সভাসমিতিতে, পৌরসভায়, পার্লামেণ্ট, বিধানসভায় এবং পরিষদে পরস্পর আচরণের, বাক্-স্বাধীনতা ব্যবহারের ধরণধারণ অবশ্যই অন্যরকম। স্থানকাল এবং পাত্রানুযায়ী বাচনভঙ্গী এবং আদবকায়দার রীতি-নীতির রকমফের ঘটে থাকে এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সভাসমাজে চলাফেরায় ভদ্রতার, সংযম ও শালীনতার কতকগুলি বিধিনিষেধ মান্য করা অবশ্য প্রয়োজন। খৃষ্টীয় অনুশাসনে আছে, অন্যের কাছে যেমন আচরণ পেতে চাও অন্যের প্রতিও ঠিক সেরকম আচরণ কর। আমাদের শাস্ত্রকারও বলেন, 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও।' এখানে যে ধর্মাচরণের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন সেটি হল পরস্পর শিষ্টাচারের ধর্ম।

আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে মুখরতা অন্য দেশের তুলনায় অতিশয্যদোষদুষ্ট কিনা বলতে পারিনে। তবে আমাদের এই প্রাচীন দেশে ভদ্রসমাজে যে পরিমাণ শালীনতা এতকাল আমরা প্রত্যাশা করেছি ইদানীং রাজনৈতিক হাটের হট্টগোলে তার গুরুতর অভাব ঘটেছে। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাগযুদ্ধের তীব্রতা ও তিক্ততা অনেকক্ষেত্রে সাধারণ ভদ্রতার মাত্রা ছাড়িয়েছে। প্রাচীরপত্র এবং প্রচার পুস্তিকায় যে ধরনের কাদা ছোড়াছুঁড়ি হয়েছে, তাকে গণতান্ত্রিক বাক্-স্বাধীনতার উদারতম ব্যাখ্যাদ্বারাও ভদ্রস্থ বা মাত্রস্থ করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী নেহরু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, নির্বাচনী প্রচার যুদ্ধে ভদ্রতা ও শোভনতার মান সংরক্ষণের জন্য নূতন ব্যবহারবিধি রচনা প্রয়োজন হতে পারে।

নির্বাচনীযুদ্ধেই অবশ্য অশোভন উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শেষ নয়। বিধানসভা, লোকসভা প্রভৃতি জনপ্রতিনিধিমণ্ডলীর অধিবেশনে সদস্যরা পরস্পরের প্রতি কী রকম আচরণ করেন জনসাধারণের কাছে তার বিচার আরও মূল্যবান। বিধানসভা, লোকসভা প্রভৃতি জনপ্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে অবশ্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম আছে। একে বলা হয় পার্লামেণ্টারী আচরণবিধি। বিধানসভা অথবা লোকসভায় অধিবেশনে সদস্যরা কীভাবে পরস্পরকে সম্বোধন করবেন, কীরকম ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন সে-বিষয়ে লিখিত এবং অলিখিত নির্দেশ ছাড়াও তারপর আছে সভাকক্ষে স্পীকারের নিয়ন্ত্রণাধিকার। অতএব দেখা যাচ্ছে অন্তত প্রথাগতভাবে বিধানসভা কিংবা লোকসভায় সদস্যদের আচরণ সুনিয়ন্ত্রিত এবং সেদিক দিয়ে সদস্যদের স্বাধীনতা সঙ্গত কারণেই সীমিত। কিন্তু পার্লামেণ্টারী প্রথা যতই শোভন ও সুনির্দিষ্ট হোক সে-প্রথার মর্যাদা সর্বত্র যে রক্ষিত হচ্ছে না তার মর্মপীড়াদায়ক নিদর্শন ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি। লোকসভায় অবশ্য নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এবং কলকাতার পৌরসভার ইতিহাসে এমন অনেক অশোভন ব্যাপার ঘটেছে, যার পুনরাবৃত্তি হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

এই প্রসঙ্গ আলোচনায় রাজনৈতিক পক্ষাপক্ষের তুলনা করা অবান্তর। আমাদের বক্তব্য নূতন বিধানসভায় বিভিন্ন দলের যেসমস্ত সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা বিবিধ বিতর্কিত বিষয় অথবা প্রস্তাবের আলোচনায় পরস্পর সহিষ্ণুতা ও শোভনতার আদর্শ স্থাপনে উদ্যোগী হোন। আমাদের আবেদন সব দলের সকল সদস্যের কাছে। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্যগণ পরস্পর গালিগালাজ এবং এমন কী, জুতো ছোড়াছুড়ি করে যে বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন তার প্রতি অশ্রদ্ধা জনসাধারণের মন থেকে এখনও বিদূরিত হয় নি। বিধানসভার পুরনো যে সমস্ত সদস্য পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন এবং যাঁরা নতুন নির্বাচিত তাঁরা, সকলেই আশা করি স্মরণ রাখবেন, জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছ থেকে শোভন, পরস্পর সহিষ্ণু দায়িত্বশীল আচরণ আশা করে। 'বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি' বিধানসভায় কিংবা পৌরসভায় ওঠে উঠুক, আপত্তি নেই। কিন্তু বাক্যে ও তর্কে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে ও সমালোচনায় আন্তরিকতা থাকা চাই। চাই নিপুণতা এবং শালীনতাও। মাঠে-ময়দানে উত্তেজনাসঞ্চারী নাটকীয় বক্তৃতাবিলাসের অভিনয়নৈপুণ্য প্রয়োগের স্থান বিধানসভা নয়; সদস্যদের প্রতিটি উক্তি সুচিন্তিত, প্রতিটি ভঙ্গী সংযত সুরুচিসম্পন্ন হলে তবেই জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন সার্থক।

আমরা জানি এবং বিধানসভা, পৌরসভা প্রভৃতির সদস্যদেরও অজ্ঞাত নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন ইদানীং বিক্ষোভে আক্ষেপে, অসহিষ্ণুতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায় নিরন্তর দীর্ণবিদীর্ণ হচ্ছে। রেলট্রেনে, খেলার মাঠে, সিনেমায়, পরীক্ষার হলে সর্বত্রই 'জনতা-মহারাজ' গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকার নিজের হাতে তুলে নিয়ে অজস্র প্রকারে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করছে। এর প্রতিকার কখনই সম্ভব হতে পারে না যদি জনসাধারণের একান্ত বিশ্বাসভাজন বিধানসভা পৌরসভা ইত্যাদির সদস্যরা তাঁদের নিজেদের আচরণে পরস্পর ব্যবহারে আলাপ আলোচনায় সংযমের আদর্শ স্থাপন না করেন। মুখরতা গণতান্ত্রিক রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিহার্য, কিন্তু সেই সঙ্গে পরস্পর সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধার অনুশীলনও গণতন্ত্রী চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৭জন সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।
"ও কে প্রফুল্ল?"
"আমাদেরই একজন মন্ত্রী হয়ত।"
অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে কোন কর ধার্য করা হয় নি।
'দিব্যি পুরুষ্টু' হয়ে এপ্রিল-মেতে ফিরে এস।
করদাতা
বাজেট
জয়প্রকাশ নারায়নজী রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণে করেন নি বলে জানিয়েছেন।
আমাদের কম্যাণ্ডার প্লেন।
সর্বোদয়
কেনেডি প্রভাব
কে ইনি? মিসেস চ্যাটার্জি? মিসেস ঘোষ? মিস রায়? মিস সেন?

উনিশে মার্চ দুপুর বারোটায় সরকারী-ভাবে আলজেরিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-কামীরা ফরাসী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করেন, তারপর থেকে সাত বছরের উপর যুদ্ধ চলেছে। বিদ্রোহী-দের নেতারাই এখন নিঃসন্দেহে আল-জেরিয়ার প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত। তাঁদের সঙ্গেই ফরাসী সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সেই চুক্তি অনুসারে একটা গণভোট নিয়ে দেখা হবে যে, আলজেরিয়ানরা ফ্রান্স থেকে পৃথক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র চায় কিনা। অবশ্য এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র; আলজেরিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তালাভ সুনিশ্চিত। স্বাধীন আলজেরিয়া থেকে ফরাসী সৈন্য ধাপে ধাপে সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম, আলজেরিয়ায় ফরাসীরা কোন্ কোন্ জায়গায় কতদিনের মেয়াদে সামরিক ঘাঁটি রাখতে পারবে, ইত্যাদি বিষয়েও চুক্তি হয়ে গেছে। অন্তর্বর্তীকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে আলজেরিয়ার বর্তমান "প্রভিসনাল গভর্নমেণ্ট" এবং ফরাসী সরকারের যৌথ দায়িত্ব থাকবে এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত সংস্থা সৃষ্টি করা হবে।

সাত বছরব্যাপী এই নৃশংস যুদ্ধের অবসানের ঘোষণায় কেবল আলজেরিয়া ও ফ্রান্সে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই আনন্দধ্বনি উঠার কথা, কিন্তু যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরেও মানুষ নিশ্চিন্তে হর্ষপ্রকাশ করতে পারছে না, কারণ সরকারীভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেরি আছে। কত দেরি আছে, তা বলা মুশকিল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আরো কত, কীরকম শোচনীয় ঘটনা ঘটবে, তাও বলা যায় না। ফরাসী সৈন্যদলের একাংশ খোলাখুলিভাবে আলজেরিয়ায় ফরাসী সরকারের নীতিকে পরাস্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা খুনো-খারাপি চালিয়েই যাচ্ছে। তাদের দলপতি জেনারেল সালাঁ প্রেসিডেণ্ট দ্য গলকে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট বলেই আর স্বীকার করেন না বলে ঘোষণা করেছেন। আলজেরিয়ার বড়ো শহরগুলিতে ও-এ-এস্ গুপ্ত সামরিক সংস্থা নামধারী এই বিদ্রোহী সৈন্যদল যা খুশি করছে এবং দেখা যাচ্ছে যে, ভয়েই হোক বা অন্য কারণেই হোক, য়ুরোপীয় অধিবাসীরা তাদের কথা মেনে চলছে। যুদ্ধবিরতির প্রতিবাদে ও-এ-এস্ দু দিন সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করেছে এবং আলজিয়ার্স এবং ও'রা শহরে—অন্ততপক্ষে য়ুরোপীয় অঞ্চলগুলিতে—সেটা পুরোপুরি পালিত হচ্ছে বলে সংবাদ এসেছে।

আরো মুশকিল এই যে, সরকারের অনুগত সৈন্যদের কাছ থেকেও যে ও-এ-এস বিশেষ বাধা পাচ্ছে না, তা নয়। শুধু আলজেরিয়ায় নয়, খাস ফ্রান্সেও ও-এ-এস-এর প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। সৈন্যবাহিনীর, বিশেষ করে অফিসারদের এক অংশ যে ও-এ-এস-এর প্রতি

সহানুভূতিসম্পন্ন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই জন্য প্যারিসে বিপুল বহরের সতর্কতামূলক সামরিক ও পুলিসী ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কেবল ভয় দেখিয়ে ওএ-এসকে ঠান্ডা করা যাবে, এরূপ আশা করা কঠিন। আবার ও-এ-এসকে দমন করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বলপ্রয়োগ করার সাহস এবং ইচ্ছাও দ্য গলের নেই। কারণ ও-এ-এসকে রীতিমত দমন করতে অগ্রসর হতে হলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা ভিতরে ভিতরে ও-এ-এস-এর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, তারা খোলাখুলি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে, যার ফলে পরিস্থিতি দ্রুত গৃহযুদ্ধের রূপ নিতে পারে।

অবশ্য ফ্রান্সের অসামরিক জনমত বিপুলভাবে ও-এ-এস-এর বিরোধী। প্রেসিডেন্ট দ্য গল যদি অসামরিক জনগণের সক্রিয় সমর্থন কাজে লাগাতে প্রস্তুত থাকেন, তা হলে সামরিক বেয়াদবিকে ঠান্ডা করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু তাতেও গৃহযুদ্ধের ভয় থাকত, তবে সে-গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহীভাবাপন্ন সৈন্যদের সহজেই কোণঠাসা করা যেত। কিন্তু সেটা দ্য গল-এর আত্মসম্মানে বাধবে, অসামরিক জনতা এবং রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্য নিয়ে বেয়াদব সৈন্যদের শায়েস্তা করতে তিনি রাজী নন। প্যারিসে ওএ-এস-এর হিংসাত্মক কার্যাবলীর প্রতিবাদে কিছুদিন আগে শ্রমিকদের দ্বারা একটা বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। তার দ্বারা সরকারের নীতির সমর্থন এবং বিদ্রোহী ও-এ-এস-এর প্রতি বিরূপতাই দেখানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যারা ডিমনস্ট্রেশন করে জানাতে চাইল যে, সরকার যদি শক্ত হাতে ও-এ-এসকে দমন করতে অগ্রসর হন, তবে জনগণ সরকারের পিছনে আছে, তাদের উপরই পুলিসের বন্দুকের গুলী চলল। সৈন্যদের অবাধ্যতা যত উৎকট হোক তারা সরকারের ঘোষিত নীতিকে পরাস্ত করার জন্য যত দুষ্কর্ম খুনখারাপিই করুক না কেন, এমন কি তারা দ্য গলকে সরাবার অভিপ্রায় যত পরিস্কারভাবেই ব্যক্ত করুক না কেন, তাদের দমন করার জন্য জনগণ তাঁকে সাহায্য করতে চাইবে, এটা দ্য গল জনগণের বেয়াদবি বলে মনে করেন। তাই যারা ও-এ-এসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তাদের উপরই মার পড়ল।

সৈন্যবাহিনী এবং দ্য'গলের মধ্যে সম্পর্কটা একটু বিচিত্র রকমের। সৈন্য-বাহিনীকে দ্য'গল একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন, ফরাসী গৌরবের একটা বিশেষ প্রতীক হিসাবে দেখেন। তাঁর মনে বিদ্রোহী সৈন্যদের জন্যও যেন একটা বিশেষ স্থান আছে। তাছাড়া এটা স্মরণ করা দরকার যে আজ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অথবা সৈন্য-বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে বেরিয়ে এসে যারা দ্য গলের নীতির বিরুদ্ধতা করছে এবং একটা পাল্টা সামরিক যন্ত্র খাড়া করেছে বিশেষ করে তাদেরই সাহায্যে একদা দ্য গল ক্ষমতালাভ করেছিলেন। দ্য গল তাদের কথামতো চলতে রাজী না হওয়াতে তারা যখন থেকে আলজেরিয়ার গোঁড়া ঔপ-নিবেশিকদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ফ্রান্সের সরকারী নীতির বিরোধিতা আরম্ভ করে তার পরও অনেকদিন দ্য'গল তাঁদের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহারই করেছেন এবং এখনও সেই-রকম ভাব কিছুটা আছে। গোড়া থেকে শক্ত হলে হয়ত অবস্থা আজ অন্য রকম হত এবং ও-এ-এস সমস্যা এমন বিকট আকার ধারণ করত না।

ও-এ-এসকে শক্ত হাতে দমন না করতে পারলে আলজেরিয়ান জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ফরাসী সরকারের যে-চুক্তি হল সেটা কার্যকর করা যাবে না এবং যুদ্ধবিরতিটাও অকেজো হয়ে যাবে। আবার ও-এ-এসকে শক্ত হাতে দমন করতে গেলেও ফরাসীদের মধ্যে যে-অবস্থার উদ্ভব হবে সেটা সামলানোও সহজ নয়। সরকারী ফরাসী সৈন্যবাহিনী হাত গুটিয়ে নিয়ে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব আলজেরিয়ান প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের উপর সমর্পণ করলে মারামারি কাটাকাটি আরো বেশ কিছুদিন চললেও ও-এ-এস শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠান্ডা হত। সেক্ষেত্রে কিন্তু সংঘর্ষ আলজেরিয়ান প্রভিশনাল গভর্ন-মেন্টের সৈন্য এবং ও-এ-এসের মধ্যে সীমা-বদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, দুই পক্ষের অসামরিক লোকেরাও তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। ফরাসীদের আলজেরিয়ার মুসলমানরা মারছে এবং ফরাসী সৈন্যবাহিনী কিছু করছে না, এই অবস্থার চাপ সহ্য করে দ্য'গল সরকার দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। এইটাই ও-এ-এস হিসাব করে রেখেছিল। যে-চুক্তি হয়েছে তার শর্ত অনুসারে অন্তর্বর্তী কালে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব আল-জেরিয়ান প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট এবং ফরাসী সরকার যুক্তভাবে পালন করবেন। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে ও-এ-এস'এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তাতে অংশ নিতে গেলেও আলজেরিয়ায় এবং হয়ত খাস ফ্রান্সেও যে-অবস্থার সম্মুখীন দ্য'গল সরকারকে হতে হবে সেটাও কম মুশকিলের নয়।

ফ্রান্সের আভ্যন্তর রাজনৈতিক অবস্থা যেরকম হয়েছে তাতে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে না যাওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই—একটি ছাড়া এবং সে-কারণটি খুবই প্রবল। সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের বর্তমান অর্থ-নৈতিক অবস্থা, যা খুবই ভালো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হবার পরেও ফ্রান্সের যুদ্ধ করা থামেনি। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হলো তো আলজেরিয়ায় চল্লো। রাজনৈতিক সংকট তো লেগেই আছে, ফরাসী রিপাবলিক একটার পর একটা ভোল বদলে বর্তমান ডিক্টেটরী শাসনের রূপ নিয়েছে। এ সব সত্ত্বেও ফরাসী শিল্পের প্রসার এবং অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধি বেড়েই চলেছে। সে দিক দিয়ে ফ্রান্সও একটা অর্থনৈতিক মিরাক্‌ল্‌ দেখিয়েছে। ওপরের রাজনৈতিক গভর্নমেন্ট যেমনই হোক না কেন, ফ্রান্সের দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা যাকে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বলে সেটার কাঠামোটাও বোধহয় খুব মজবুত, তা না হলে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ধারাটা এ-রকম অব্যাহত থাকছে কেমন করে?

১৯-৩-৬২

অসংলগ্ন

বাতায়নিক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কিছু বাংলা ভাষায় চালাবার জন্যে একটা আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলন আজ হঠাৎ ওঠেনি, এর সূচনা হয়েছে অনেক আগেই এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম ঢেউ তুলেছেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাতৃভাষায় সব কিছু শিখবে এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি হতে পারে! দেশবিদেশের নজির তার জন্যে দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্মগত অধিকারের দাবিই যথেষ্ট।

এ আন্দোলনের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও একটা আশংকার ছায়া মন থেকে একেবারে সরাতে পারছি না। সে আশংকা অন্ধ গোঁড়ামির। অন্ধ গোঁড়ামির ডালপালা মেলবার জন্যে এ জাতীয় আন্দোলনের মত উর্বর জমি আর নেই। জাতি, ভাষা, প্রদেশ ইত্যাদির ধুয়া পেলে এ গোঁড়ামি একেবারে দুর্বার হয়ে ওঠে।

যা শেখবার নিজের ভাষাতেই সহজে শিক্ষণীয় এ যুক্তি যেমন অকাট্য তেমনি এ সত্যও অস্বীকার করবার নয় যে, আজকের যুগের শিক্ষণীয় প্রায় সব কিছুই কোন বিশেষ ভাষার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃতি আন্তর্জাতিক। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যত গৌরবই থাক আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ আমরা পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকেই নিয়েছি। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যোগাযোগ রাখতে গেলে ভাষার না হোক পরিভাষার মিল আমাদের রাখতেই হবে। তা না রেখে যদি সব কিছুতেই কেঁচে গণ্ডূষ করতে চাই, তাহলে ব্যাপারটা পাঁজার পোড়া ইট গুঁড়িয়ে নতুন করে ছাঁচে ফেলার মত হাস্যকর বাতুলতা হবে। অন্ধ গোঁড়ামির মধ্যে এই বাতুলতাই সব চেয়ে প্রকট। বাংলা ভাষার নামে শপথ নিয়ে তা চেয়ারের বদলে আমাদের কেদারায় বসাতে চেয়েই ক্ষান্ত হবে না, পুলিসকে আরক্ষী করে তুলে অক্সিজেনকে অম্লজন বা তার চেয়েও বিদঘুটে কিছু বলতে রাজী না হ'লে কোতলের ব্যবস্থা করবে।

বিদেশীর অধীন যে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের একদা থাকতে হয়েছিল সে লজ্জা নগর থেকে তাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রস্তর মূর্তিগুলি হটিয়ে দিলে ঘোচে কি না জানি

না, কিন্তু তাদের কাছে মূল্যবান যা পেয়েছি শুধু নাম পাল্টে দিলেই তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকার দায় চুকে যায় না। বাতাস থেকে অক্সিজেন পৃথক করে তার গুণাগুণ প্রথম বিশ্লেষণ আমরা করিনি। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের নানা শাখাতেই গোড়াপত্তনের কাজে আমাদের হাত লাগাবার সুযোগ ছিল না। বিজ্ঞানের হালের মূলধনে তাই পাশ্চাত্ত্য টাঁকশালের ছাপ। তাতে দুঃখ বা লজ্জা পাবার কিছু নেই, রাগ করবারও। সার কথা যদি বুঝি তাহলে তা এই যে সাহিত্যশিল্প জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশ ওদেশ কারুর নয়, তা চিরকালের সমস্ত মানুষের। যেখানে যে যা দিচ্ছে সব জমা হচ্ছে সর্বজনীন ভাঁড়ারে। কয়েক শতাব্দী আমরা চাঁদা কিছু যদি না দিতে পেরে থাকি, এখন দিচ্ছি ও ভবিষ্যতে দেব। এককালে মনে রাখবার মত কিছু দিয়েছিও। আর সব কিছুর কথা বাদ দিয়ে শুধু শূন্যে যা দিয়েছি তার ওপর সভ্যতার জটিল বিশাল সৌধ দাঁড়িয়ে। দেওয়া নেওয়ার এই হিসাবই আসলে নিরর্থক। দেওয়ার দম্ভ যেমন অসার নেওয়ার সঙ্কোচও তেমনি যুক্তিহীন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মত এ যুগের যা চলতি মুদ্রা তার বিশ্বজনীন ব্যবহারের সুযোগ না নিয়ে তা অকারণে নিজের ভাষায় গলিয়ে ঢালা মূঢ়তার চরম ছাড়া কিছু নয়। বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে বদ্ধ গোঁড়ারা সেই পথেই না আমাদের টেনে নিয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দি সাহিত্যে উর্দুর ছোঁয়াচ থেকে শুদ্ধ করার শুচিবাইগ্রস্তেরা ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ কিভাবে রোধ করতে মত্ত তা দেখছি। বাংলায় তাদের ধর্মভাইদের সম্বন্ধে গোড়া থেকেই তাই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বহুকাল আগে স্বদেশী যুগের আন্দোলনকে ভিত্তি করে লেখা একটি নাটক পড়েছিলাম মনে আছে। তাতে একটি দৃশ্যের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে যে প্রচণ্ড করতালির তুফান উঠত তা স্বকর্ণে শোনবার সৌভাগ্য না হলেও অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারি। দৃশ্যটি যতদূর মনে পড়ছে এই রকম :—বিদেশী বর্জন সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর আশ্রিতা একটি ঈষৎ জড়বুদ্ধি ছোট মেয়ের কথায় অকস্মাৎ চৈতন্যলাভ করে স্বদেশী ব্রতের মর্ম বুঝলেন। সেই ছোট মেয়েটি বাজার থেকে বাড়ির পরিচারিকা বিলিতি বেগুন কিনে এনেছে বলে একেবারে কেঁদে-কেটে আকুল। তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েই কোন একজন স্বদেশ প্রচারক উক্ত সংশয়ীকে চরম লজ্জা দিলেন। মূঢ় অবোধ একটা ছোট মেয়ে শুধু বিলিতি শব্দটা বেগুনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যদি এমন বিক্ষুব্ধ অস্থির হতে পারে, তাহলে তাঁর কর্তব্য যে কি তা বুঝতে ভদ্রলোকের আর বিলম্ব হল না।

সামান্য একটা কথার ইঙ্গিতে জীবনের মোড় একেবারে ফিরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয় নিশ্চয়ই। কিংবদন্তীতে ও ভালাল্দ নাটকে তা বেশ উপভোগ্যই হয়। 'বেলা গেল বাসনা ফেলো না' এই কথাটির গূঢ় ইঙ্গিতে বিষয়মদে মত্ত কে কবে এক কথায় সংসার ছেড়ে চলে গেছে শুনতে সময় বিশেষে আমাদের ভালোই লাগে।

কিন্তু ওই মূঢ় অবোধ মেয়েটির বাতুল বিক্ষোভকে নাটকীয় মহিমা দেবার চেষ্টায় কি একটা অস্বস্তিবোধ করেছিলাম নাটকটি সেই প্রথম পড়বার সময়েই। কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে স্বদেশীয়ানাকে শুধু বাহার মূঢ় ভাবালুতার বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই দেখবার চেষ্টা হচ্ছে।

এতদিন বাদে বাংলা ইংরাজি হিন্দির স্বপক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজনাময় তর্ক-বিতর্ক শুনে সেই অস্বস্তি ও সন্দেহই আবার জাগছে।

বাংলাভাষাকে যুক্তিযুক্তভাবে শিক্ষার বাহন অবশ্যই করা উচিত, কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজিকে যাঁরা পায়ে ঠেলতে চাইছেন তাঁরা যেন সেই মূঢ় বালিকার বিলিতি বেগুন মার্কা বিচারবুদ্ধিই এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন।

আজকের দিনে একদিকে যেমন দেশ আরেকদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে যোগ আমাদের না রাখলে নয়। পাশ্চাত্ত্যে যে সব দেশ বহুকাল ধরে স্বাধীন ও যে দেশে স্থানীয় নিজস্ব ভাষা যথেষ্ট অগ্রসর, সেখানেও অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা একাধিক ভাষা স্বেচ্ছায় শিখে থাকে। নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষা বাদে বিশ্বের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভাববিনিময়ের জন্যে আরেকটি পাশ্চাত্ত্য ভাষার ওপর দখল আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সে হিসাবে ইংরাজির চেয়ে সব দিক দিয়ে এমন উপযোগী বিদেশীভাষা আমরা পাচ্ছি কোথায়? বিশেষ করে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সে ভাষার প্রবাহের খাত সমস্ত দেশময় এখনো যখন খনন করাই রয়েছে। পরাধীনতার তিক্ত স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত বলে আজ যদি এ ভাষাকে অস্পৃশ্য করতে চাই তাহলে আজকের দিনের স্বাধীনতাকেই ছোট ও তুচ্ছ করা হবে। ইংরেজের অধীন থাকবার সময় ইংরাজি বর্জনের অভিলাষের যদি বা কিছু যৌক্তিকতা ছিল আজ আর তা নেই। অধীনতার শাপে আমাদের একটি বর হয়েছে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত এই ইংরাজি ভাষার বাতায়ন। আর যেখানে যা হয় হোক ভারতবর্ষের এ যুগের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বাতায়ন যেন খণ্ডদৃষ্টির মূঢ়তায় রুদ্ধ না হয়।

গরম পড়ার সরকারী তারিখটা ঠিক জানি না, কিন্তু ট্রামের পাখা চালু দেখে বুঝলাম সে তারিখ এসে গেছে। গরমটা অবশ্য সরকারী তারিখ জেনে কি ট্রামের পাখা ঘুরতে দেখে বোঝবার দরকার হয় না। আকাশে বাতাসে শরীরে মনে তার বার্তা আপনা থেকেই আসে।

সকলের কথা জানি না, কিন্তু আমার মত কারুর কারুর কাছে এই প্রথম গরমপড়ার একটি বিশেষ স্বাদ বোধহয় আছে। কুয়াশার দিন গত, দেবদারুর পর আরো অনেক গাছ নতুন পল্লবের সাজ ধুলোয়

ধোঁয়ায় মলিন করে ফেলল। সেদিন শহরের একটি রাস্তায় শিমুলের রক্তিম কটাক্ষ দেখেছি. নির্লজ্জ কামনার উগ্রতার সঙ্গে নিষ্পাপ সারল্য যেন মেশানো।

শুধু এ সব নয় শরীরে মনে একটি ঈষৎ দাহ মিশ্রিত অবসাদের অস্ফুট অনুভূতিই গ্রীষ্মের প্রথম সূচনাকে চিহ্নিত করে দেয়।

এই গ্রীষ্ম পরে যে রুদ্ররূপ নেবেন তার কথা যথাসময়ে ভাবা যাবে। কিন্তু আপাতত এই নাতিউষ্ণ আবহাওয়ার স্বাদটুকু উপেক্ষা করবার নয়।

এ স্বাদকে ঠিক মধুর বলব না, শীতের শেষের স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর বদলে অল্পবিস্তর শারীরিক অস্বস্তিই এর মধ্যে বর্তমান। কিন্তু সেই সঙ্গে অবসাদের যে আভাসটুকু আছে নিতান্ত বিবেকপীড়িত কর্তব্যপরায়ণ না হলে তা উপভোগ্য।

গা এলিয়ে দিয়ে একটু অলস হবার, কাজে একটু-আধটু শৈথিল্য করবার কুমন্ত্রণা যেন প্রকৃতিই কানে কানে এসময়ে আমাদের দেয়। যারা সে মন্ত্রণায় ভোলে না তারা মহৎ কিন্তু যাদের মনোবল অত বিপুল নয় তাদেরও খুব দোষ দিতে পারি কি?

জাতীয় চরিত্র গঠনে আবহাওয়ার দান নিয়ে পণ্ডিতেরা কতদূর গবেষণা করেছেন জানি না, তবে শুধু আমাদের মত দু'চারজন দুর্বলচিত্তের কানে নয়, উষ্ণমণ্ডলের সমস্ত দেশের কানেই প্রকৃতি এই একটু গা এলাবার মন্ত্রণা দেয় বলেই মনে হয়।

দেশের সামনে আমাদের অনেক কাজ। সে কাজে গাফিলি করবার ওকালতি অবশ্যই করছি না। কিন্তু পৃথিবীময় বড় বড় দেশ ও রাষ্ট্রের অবিরাম ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ঝাঁপ দেখে এক এক সময়ে ক্ষীণ একটা সংশয় মনে যে জাগে তা অস্বীকার করতে পারব না। ধরণীকে সুজলা সুফলা করতে অন্নবস্ত্রের অভাব মিটিয়ে মানুষকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিরোগ করতে যা খাটবার খাটতেই হবে কিন্তু ছোটার নেশায় লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়ার মত, কাজের উন্মাদনায় ছুটির মানে ভুলে যাওয়ার বিপদ কি কোথাও উঁকি দিচ্ছে না? ঘণ্টা ধরা কাজ ও ছুটির হিসাব করছি না। হপ্তায় পাঁচদিন কাজ করে দু'দিন যে দেশে ছুটি মেলে সেখানেও ছুটিটা ঠিক অহেতুক আলস্যে এলানো নয়, কাজের চাকাতেই যেন বাঁধা। হয়ত সেটাই সঙ্গত। পৃথিবীজোড়া কাজের চাকা যেদিন মসৃণভাবে আবর্তিত হবে সমস্ত মানুষের জীবনকে জড়িয়ে সেইদিনই সম্ভবত মানব সভ্যতার পরম সার্থকতা। তবু নিজের চরিত্র দোষেই হয়ত, কখনো কখনো মনে হয় প্রথম গ্রীষ্মের নাতিতপ্ত বাতাসে আমাদের মত দেশে প্রকৃতির যে কুমন্ত্রণা আছে তা শুনে ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততার মাঝে একটু-আধটু আনমনা হবার অবসর রাখলে সভ্যতার খুব বেশী লোকসান বোধহয় হ'ত না।

সময় সাহিত্য আলোচনা

দুই বসন্তে

শঙ্খ ঘোষ

[গত ২৩ ডিসেম্বর, ৮ম সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅশ্রুকুমার শিকদার লিখিত 'এক বর্ষকালের সাহিত্য প্রবন্ধ' শীর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত রচনার ভূমিকায় আমরা জানিয়েছিলাম যে, 'সময় সাহিত্য আলোচনা'—এই পর্যায়ে গত এক বছরের প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করা হবে। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় আলোচনা প্রকাশিত হল। ছোটগল্প সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে পাঠকদের কাছ থেকে সুচিন্তিত আলোচনা পেলে প্রকাশ করা হবে। —সম্পাদক, দেশ]

(১)

মাঝখানে অনেকদিন আমরা সৌম্য আয়তনের চতুর্ধারে ঘুরেছি, মনোরম উদ্যানে কিংবা পথের ধুলোয়। কখনো শৌখিন অবসর, কখনো চতুর বক্রতা, কখনো প্রমত্ত আহ্বান, কচিৎ-বা ছিন্ন রক্তপাতে ভরে গিয়েছে কবিতা। এর মধ্যে একরকম তৃপ্তি ছিলো হয়তো, যাকে বলা যায় ছোটো ছোটো সম্পূর্ণতার তৃপ্তি। কেননা কবিতার জগৎকে মাঝখানে অনেক-দিন দেখেছি বহির্জীবনে ঘূর্ণমান, বহির্জীবনের রূপে অথবা তার রূপহীনতায়, যেন সে জীবন-নামক আদিম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশের পথ ভুলে গিয়েছে।

কিন্তু এখন, বিগত কয়েক বছরে, কবিরা যেন আবার একটি দুঃসাহসী অনুপ্রবেশে প্রস্তুত, অন্তত অনেক কবি, যাঁরা কেবল এই কারণেই আর্ত বিচলিত যে অরণ্যের বাইরে আর নন তাঁরা, এখন তাঁরা রহস্যের মধ্যে যেন প্রবিষ্ট। আর অনভ্যস্ত এই প্রবেশের প্রথম অভিঘাত তাঁদের ঈষৎ বিভ্রান্ত করে দেবে এ হয়তো স্বাভাবিক, তবু তাঁদের দিশা হারানো আর দিশা নির্ণয়ের প্রবল পদক্ষেপগুলি এক নূতন আয়োজন সৃষ্টি করেছে সাম্প্রতিক কবিতায়। সংগ্রাম ও আশার পর্যায়ক্রমিক উচ্চারণে এতোদিন যাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন, আজ তাঁরাও খুঁজে বেড়াচ্ছেন শুধু নিজেদেরই মুখ।

তাই আজ কোন্ মশালে পথ চেনা যাবে তা নিয়ে ভাবনার শেষ নেই। অথবা মশাল একটু শক্ত শব্দ কি না তাই-বা কে জানে। মশালে কি পুড়ে যাবে সব? এই শুনে কেউ কেউ হা হা করে হেসে ওঠে, বলে, পথ তো কিছু নেই, এই জালুনিটাই সত্য। কোথা থেকে তুমি কোথায় যাবে? একটা প্রবল আলোড়ন ঘূর্ণিত করে তারা মশাল হাতে হারিয়ে যেতে চায়। সেই আলোতে পরস্পরের মুখে উল্কির ছায়া দেখে বিবর্ণ হয়ে যায় কেউ, ভ্রান্ত ক্লান্ত শুয়ে থাকে কোনো বনানীর পাশে, স্মৃতির হাহাকারে কাঁপে। কেউ-বা বলে, এই তো পথ, এই তো আলো—তারা প্রদীপ আড়াল করে স্থির পায়ে লক্ষ্যে চলে যাবে।

আজ এই মুহূর্তের কবিতায় এই তিনটি ছবি আমাদের চোখের সামনে আলোকিত হয়ে উঠেছে, পরস্পরের ব্যবধানে তিনটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। আর মনে হয় এই কারণেই আমরা এক-এক বছরে অনেক কবিতা পড়লুম যাকে বলা যায় পারস্পরিক কবিতা, যেন বচন-প্রতিবচন। যেন কবিরা আজ তাঁদের নিজ-নিজ শিল্পাদর্শের উচ্চারিত ঘোষণায় উন্মুখ, জীবনের গভীর থেকে সেই শিল্পাদর্শকে আজ তাঁরা নির্যাস করে তুলে আনতে চান। আদর্শকে মূলতলে রেখে তার থেকে উদ্ভিদের মতো বেরিয়ে আসবে সজীব অভিজ্ঞতা, কবিতার পক্ষে এইটেই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু তবু যে আজ কবিরা শিল্পাদর্শের ঘোষণায় মুখর, তাঁদের নেপথ্যের মুখ পরস্পরকে দেখতে দিতে এতো যে আজ সম্মত তাঁরা, তা হয়তো অকারণ নয়। এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে অতিক্রান্ত হয়ে আসবার মুহূর্তে এই পারস্পরিক মুখাবলোকনই হয়তো আজ প্রয়োজন ছিলো।

আর আজকের এই পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়েই বাঙলা কবিতা আরেকবার তার স্পষ্টবাচিতাকে অতিক্রম করে এক সম্পূর্ণতা বা আত্মবিস্তৃতির দিকে আজ সরে এসেছে।

সৌন্দর্যে উন্নীত করে নেবার মন্ত্র তিনি জেনেছেন, চতুর্দিকের সর্বনাশের মধ্যেও 'অটুট আশীট় ভঙগীতে' তাঁর সুদেষ্ণাকে দেখতে পান তিনি। 'কবিতার সূচনা আনন্দে আর পরিণাম প্রজ্ঞায়' ফ্রস্ট-কথিত কবিতার এই সূত্রটিও তাঁর রচনা প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আমাদের। কিন্তু আনন্দ ও প্রজ্ঞার এই পথ দুরূহ, পথ আর সেইজন্যেই হয়তো অলোকরঞ্জনের কবিতাকে আজ এক শুদ্ধ ব্যতিক্রম বলে মনে হয়।

শুদ্ধতার এই সূত্রে দ্বিতীয় একটি নাম মনে পড়ে, আলোক সরকার। এই এক অনতিলক্ষ্য কবি, খুব নিভৃত উচ্চারণে তাঁর ভালোবাসার জগৎ রচনা করে যান, 'সমস্ত গোধূলিবেলা একই কথা' বলে যেন প্রণয়িনীরা তাঁর কবিতায় ধীর পায়ে চলে যায়। আলোকের কবিতাবলী যেন ভিন্ন ভিন্ন কবিতাই নয়, তাঁর সব রচনাই যেন এক বড়ো রচনার অন্তর্গত, যা ক্রমাগতই রচিত হয়ে চলেছে এক ধূসর বর্ণে। প্রকৃতির ছবি সেখানে ফিরে ফিরে আসে যেন ধূসর কাচের মধ্য দিয়ে দেখা, আর তাঁর শব্দ-ব্যবহারের এক আপন-রীতিও তাঁকে এক গোপন আবরণের মধ্যে রেখে দেয়, যেন তাঁর কবিতা সকলের সামনে আসবার জন্যেই নয়!

(৩)

একাগ্রকল্পনা ও স্পষ্টচরিত্র এই কবিদের উল্লেখ প্রথমেই করেছি সাম্প্রতিক কবিতার কয়েকটি ধারানির্দেশ নেবার জন্যে। এই নির্দেশ, ঈষৎ পরোক্ষরূপে, সেই কবিদেরও মধ্যে আজ পাওয়া যায় চল্লিশের কবি নামে একদিন যাঁরা চিহ্নিত ছিলেন। তবু এঁদের কথা পরে রাখছি এইজন্যে যে এঁরা অনেকেই এই পরিণতিতে এসে পৌঁচেছেন দীর্ঘ ও ক্রমিক পরিবর্তনের সূত্রে।

তাঁর নীল নির্জন থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অতিক্রান্ত এখন, সেই নীল এখন সরে গেছে পিতামহের যুগে, অর্ধ-স্বপ্নিল রোমাণ্টজগৎ এখন আর তাঁকে আবিষ্ট করে না। 'অপ্রেমকে প্রেম বানাবার খেলাই কবিতার কেন্দ্র, এই আশ্বাস এখনো তাঁর আছে, তথাপি মনে হয় যে খুব সম্প্রতি অপ্রেমই তাঁর কবিতার দেহ। তাঁর উপাদান, কিন্তু লক্ষ্য নয়। 'আসলে প্রত্যেকে ওরা শিকারী জন্তুর/স্থির প্রতীক্ষায় আছে' এই অনুভাবনা এখন তাঁর 'মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে' 'রক্ত খাচ্ছে মাংস খাচ্ছে।' কবি যদিও বলেন 'আমি তোদের শবদেহের উপর দাঁড়াতে চাই' তবু এখনো পরিবেশ বিকল, চতুর্দিকে সবাই 'শুনে হি হি করে হাসতে' থাকে। এ-ও অবশ্য এক অন্ধকার, তবে কবির পরিবর্তন এখানে চরিত্রে ততো নয়, অভ্যাসে যতো, পরিবেশে যতো। কিন্তু আরেক অন্ধকার আছে যা কেবল পরিবেশ-জাত নয়, যা আরো গভীরমূল, 'রাত্রি হলে একা একা পৃথিবীর ভিতর বাড়িতে' গেলে অস্তিত্বের যে 'খরস্রোত অন্ধকারে' পৌঁছনো যায়, একেবারে পরিণামে কবিকে তারই রহস্যে বিহ্বল দেখে মনে হয়, এখন যে পরিবর্তন আসন্ন তা চারিত্রগত, কেবলই পরিবেশগত নয়।

এই ভিতরবাড়ির অন্ধকার বা প্রেম-অপ্রেমের বিরোধ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও প্রবহমান। তবে এই কবির চিন্তা সেই সঙ্গে সমাজদৈহিক বিক্ষোভ এবং সাময়িক উত্তাপে সমান আক্রান্ত। 'অন্ধকারে তুমি প্রশ্ন রাখো—মানবতা স্বপ্ন শুচি' এই প্রশ্নে তিনি অনেকেরই সঙ্গে এক, কিন্তু তারপরেই 'ক্ষুধার মিছিলে তাই কান্নার মিছিলে আজ রুচি' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশের কবিতার একটা সহজ উত্তর আমরা শুনতে পাই। এই রুচি থেকেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় কতোগুলি বিরোধী বৃত্তি মিলন্ত হয়েছে মনে হয়, ভিন্ন মানসিকতার তীব্র আবেগে যার জন্ম। তিনি চঞ্চল, তপ্ত, আর তাঁর এই তাপ ও চাঞ্চল্যের ঠিক পাশে অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতাকে মনে হয় অতিশয় সু-স্থিত, নিশ্চিত, 'আমি সুখী রাজপুত্র/বিম্ববতী আমার ঘরণী।/না, আমি কোথাও যাব না।'

কিন্তু বাস্তবিকই যিনি কোথাও যাননি তিনি অরুণ সরকার। এই কবি তাঁর শৌখিন আচরণে চিরকাল বিস্মিত রাখলেন তাঁর পাঠককে! কখনোই তিনি বেশি লেখেন না, একরকম চতুরভাষণের দ্বারা নিজেকে তিনি আবৃত করে রাখতে চান বলে মনে হয়। মনে হয় শিল্পের কোনো নিভৃত মূর্তি তাঁর সাধনায় আছে, এমন-কি কবিতাতেও তাকে লোকগোচর করতে তিনি প্রস্তুত নন, আর ওদেরও বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি, যাঁদের 'শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।'

শেষোক্ত ঐ দুই কবি পরিবর্তমান নন। কিন্তু প্রায় সমকালীন আর এক উল্লেখনীয় কবি রাম বসুর সাম্প্রতিক চারিত্র বিশেষ পরিবর্তিত মনে হয়। সতেজ সজীব চিত্র-

নির্মাণে এ-কবি প্রথমাবধি পারঙ্গম, কিন্তু অনেকদিন তাঁর এই শক্তির ব্যবহার ছিলো বাণীঘোষণায় অর্পিত। একরকম জীবন-বিশ্বাসের দৃঢ়তা থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু আত্ম-আবিষ্কারের উল্টো-পথে তাঁর রচনায় এখন ভগ্ন-বেদনার সঞ্চার দেখতে পাই। আলোকিত পথ থেকে সরে এসে এখন যেন তিনি গুহার ভিতরে বন্দী; 'আমার দুচোখ নষ্ট/প্রেমহীন বুকটা পাথর, গা ঘেঁসে কয়েকটা জন্তু।' এখন 'হয়তো মৃত্যুর চোখে একবার আপনাকে চিনি।'

কেবল রাম বসুই নন। একদিন যাঁরা স্বপ্ননির্মাণে বিহ্বল ছিলেন আজ তাঁরা আহত আর্তনাদের জগতে প্রবেশ করেছেন, এ যেমন এক দিক, অন্য দিকে তেমনি সমাজনৈতিক প্রত্যয়শীল কবিরাও আজ প্রত্যয়হীন ভূভাগের পরিবেশে আক্রান্ত, সুলভ তৃপ্তি কারোরই আর আয়ত্তে নেই। মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন,—কারোরই না। সমবেত এই চরিত্রান্তর-প্রয়াস আমাদের স্পষ্টভাবে এইটেই মনে করিয়ে দেয় যে কবিতা আজ স্বতন্ত্র গোত্রে প্রতিষ্ঠাকামী।

(৪)

অবশ্য এই নতুন জগতের চিত্র সর্বব্যাপী নয়। স্বভাবতই, যাঁরা প্রবীণতর তাঁরা তাঁদের অভ্যস্ত নির্মিত জগৎ থেকে বাইরে সরে আসেন নি, কেন-ই বা আসবেন বুদ্ধদেব বসু অনেকদিন নীরব, নতুবা আর সকলেই প্রায় রচনারত। কিন্তু এঁরা প্রায় সকলেই—বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত—সকলেই এখন রচিতরচনে তৃপ্ত। এঁদের সাম্প্রতিক রচনাবলীতে এমন লক্ষণ কমই চোখে পড়ে যা তাঁরা ইতিপূর্বেই আয়ত্ত করেন নি, যার দ্বারা ইতিমধ্যেই বাঙলা কবিতায় তাঁরা প্রভূত প্রিয়তা অর্জন করেন নি।

বহিরঙ্গ পরিবর্তন অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল অরুণ মিত্রের রচনায় এবং আজও যদিও সমাজকল্যাণের দ্রাঢ়িষ্ঠ কোনো আদর্শের মৃত্তিকায় তাঁর স্থিতি, তবু সেখানে যে শস্য ফলে উঠছে তা ক্রমেই মূল থেকে ঊর্ধ্বর্বর্তী, স্নিগ্ধ আলোকসঞ্চিত। আজ তাঁর গদ্যকাগুলির নিচ্ছবিতে সৌন্দর্যছবি নির্মাণে 'যেন কেউ নতুন ঘনিষ্ঠতার দিকে ঠোঁট খুলেছে।'

কিন্তু লেখেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর এই নীরবতাকে বরং তাৎপর্যময় বলে মনে হয়। এমন এক সময়ে এসে চুপ করলেন তিনি যখন তাঁর রচনায় কবিতা আর গদ্যের সীমারেখাটি প্রায় নিশ্চিহ্ন আসছিল, আরো একবার চিন্তা করবার অবকাশ তৈরি হচ্ছিল, কোথায় এ সত্যিকার প্রভেদ। গদ্যরচনাতেই যে সক্ষমতর তুলি আছে তাঁর হাতে, এখন তিনি সেইটেকেই তুলে নেবেন বলে কি তাঁর কবিতার এই বিরতি? অথবা এ বিরতি ক্ষণকালীন? হয়তো এর উত্তর মিলবে আরো কিছু অপেক্ষার পর।

লেখেন নি মঙ্গলাচরণ। তরুণতরদের মধ্যে প্রায় লিখছেন না অরবিন্দ গুহ। কিন্তু তাঁর কবিতার যে একরকম মৃদু চলন ছিলো, এখন সেই ভূমিকার অনেকটা যেন অধিকার করে আছেন তারাপদ রায়, যাঁর কবিতার বড়ো আকর্ষণই লঘু চালে। সম্প্রতি মানস রায়চৌধুরীর কবিতাতেও অনুরূপ বাঁকা বিদ্রূপ বা নাটকীয় কথন-রীতি দেখা দিচ্ছে। অন্য দিকে আছে দিলীপ রায়ের বক্রচতুর ভঙ্গরচনা। এই সব কবিতার তপ্ত স্বাদ পাঠকের সঙ্গে কবিতার একটা সহজ যোগ রচনা করতে পারবে বলে মনে হয়, মনে হয় চমৎকারিত্বের প্রতি কবিদের এই উন্মুখতা পাঠকের কাছে একজাতীয় তৃপ্তি নিয়ে আসে।

(৫)

তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, পাঠকের কাছে কবিতা আজ আবার দুর্বোধ্যতার অভিশাপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে, এটা দুর্ভাবনার বিষয়। হয়তো কবিতার পাঠকও সম্প্রতি বেশি, দুরূহতার পুরনো অভিযোগ আজ তাই নবীনভাবে ধুমায়িত।
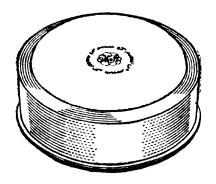
কিন্তু এইটেই একমাত্র কারণ এমন নয়। তিশের কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে না, অনেক সময়ে কবিতার শারীরিক পরিবর্তনও এতোটা চোখে পড়ে। পুরাতন ইজ্‌ম্‌-এর নূতন আক্রমণে ইমেজিজম, সিম্বলিজম, সুরিয়ালিজম অথবা এর এক অপুষ্ট পারস্পরিক মিশ্রণে কবিতাদেহ এখন নিতান্ত জটিল। পাঠকের পক্ষে হয়তো তাই আজ আরো সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু এতো সতর্কতাই বা কেন? এই ভেবে অভিমানে চলে যান তাঁরা—আর তারই ফলে মনে হয় বাঙলা কবিতা অচিরেই আবার তার পাঠক হারাবে।

কিন্তু কবি তার জন্যে কী করতে পারেন? হয়তো তিনি ডে-লুইসের প্রতিধ্বনি করে বলবেন, আমরা বোঝাবার জন্যে লিখি না, লিখি বুঝবার জন্যে। অভিজ্ঞতার ঘোষণা নয়, অভিজ্ঞতার নির্মাণই যেখানে কবিতার উপজীব্য, সেখানে কবি হয়তো কিছু পরিমাণে পাঠক হারাবার জন্যেও প্রস্তুত হতে থাকেন। অতএব এই এক বছর যদি পাঠকের একাংশকে ক্লান্ত করে দিয়ে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেও থাকে, তবু কবির সেই একটা লক্ষ্যের কথা আমরা মনে ভাবতে পারি, আত্ম-উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্য।

এই লক্ষণাবলী সাম্প্রতিক প্রায় সকল কবির মধ্যেই প্রশ্রয় পাচ্ছে, যে-কবিদের উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি তাঁদের রচনা থেকেও এর উদাহরণ দেখানো চলে। তথাপি এ-প্রসঙ্গে অন্য কয়েকজন—সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বা উৎপলকুমার বসু প্রমুখ কবিদের চিন্তা করা যেতে পারে।

'ভাসমান মায়াবী প্লাবনে/খণ্ড খণ্ড উজ্জ্বলতা লয়ে যায় বিপুল আঁধার/তন্ময় দৃশ্যের দিকে'—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের এই উল্লেখটি যেন এই সব কবিতার যথার্থ পরিচয়। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের যোজনা, বিশেষত উক্ত কবির ক্ষেত্রে, অবিরল স্বপ্নচারিতার মধ্যে যেন চলে আসে, তাঁর রচনার বিন্দুসমবায় হয়তো সে-কারণেও অপরিহার্য। ঠিক তেমনি সিদ্ধেশ্বর সেনের ভাঙা-ভাঙা লাইনগুলি কেবল চিত্রপরম্পরায় গ্রথিত, যতিহীন, ভঙ্গিল তার প্রবাহ। অন্যপক্ষে তরুণ সান্যাল ব্যবহার করেন পূর্ণগঠিত প্রথানুগত কাব্যপংক্তি, কিন্তু সেই কারণেই যতিচিহ্নের, বিশেষত কমার ব্যবহার, তাঁর কাছে হয়ে উঠছে প্রধান অবলম্বন। এবং এঁদের সকলেরই এই রচনা অবিরল চিত্রকল্পে বাইরে ছড়ানো থেকে ভিতরকার কোনো-এক ঘনবদ্ধ সুঠাম অনুভূতির ঐক্যের দিকে পাঠককে নিয়ে যেতে চায়।

'যতো প্রতিচ্ছবি আজ মূলে তরুটির দিকে দৃষ্টি তুলে আছে'—উৎপলকুমার বসুর এই উক্তি মনে পড়ে আর এই কবির দৃষ্টিও তো সেই মূলে তরুটির দিকে আবিষ্ট আর সংকেতবাহী তাঁর উচ্চারণ। অথবা এই স্বপ্নাতুর আয়োজন 'নাচায় জ্যোৎস্নার পিণ্ড তাল তাল স্বপ্নের প্রভাবে।দূরে পড়ে রয় ধ্বনি, সৌরভবিহীন...' (বীরেন্দ্র রক্ষিত)।

চিত্রকল্প ও প্রতীকের দ্বারা, স্বপ্নের প্রভাবের দ্বারা, এই জটিলতা সৃষ্টি তাঁদেরও কবিতাকে আজ আচ্ছন্ন করেছে, একদা যাঁরা রোমাণ্টিক আবিষ্টতায় সহজ কথা বলতে পারতেন, মায়াবী প্রেমিক পরিবেশ রচনা অথবা সৌন্দর্যের প্রতি উদাত্ত বন্দনায় যাঁদের তৃপ্তি ছিলো, জগন্নাথ চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, সুনীলকুমার,

অসিতকুমার, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবি যাঁরা। জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'মহাদিগন্ত' এক স্বতন্ত্র ধরনের প্রয়াস। সুনীলবাবুরও ঈশ্বর এখন 'মাংসল পেশীতে মূর্তে', উৎকণ্ঠার পীড়নে সুন্দর', তাঁরও রচনা এখন জটিলতাকে অঙ্গীকার করে নিল। আর, 'দু'চোখে প্রবল চিত্র' নিয়ে চিত্ত ঘোষ এখন 'অন্তরা' থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন, স্মৃতির অনুষঙ্গ এখন তাঁর কবিতায় বারবার হানা দেয়, আর 'সত্তার শিকড়ে টান লাগে।'

মাত্র উল্লেখিত ঐ কবিরাই নন, এই সব লক্ষণ সর্বত্র পুঞ্জিত। ছবি আর এখন মাত্র অলংকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে আসে না, বরং হয়তো অভিপ্রেত দ্ব্যর্থতা নির্মাণের সহায়ক হয়ে আসে এই চিত্রাবলী কিংবা সুযোগ্য প্রতীক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে অস্পষ্টতার পক্ষে কোনো পঙ্গু যুক্তি হিসেবে এই অ্যাম্বিগুইটি নামক গুরুতর শব্দ সমসময়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি না। সৎ রচনা অস্পষ্ট হতে পারে বলে অস্পষ্ট রচনা মাত্রেই সৎ নয়—বরং অনেক সময়ে দুর্বলতারই বর্ম হিসেবে এটা একটা ভাণ্ডার মতো ব্যবহৃত হতে থাকে, অন্ধ অভ্যাসের মধ্যে। হয়তো এলিয়টের সেই সতর্কবাণীও এখানে স্মরণযোগ্য যে কৃত্রিমতম কবিতা রচিত হয় তখনই যখন কবি ভাবেন তাঁর মহৎ কোনো দার্শনিক বক্তব্য আছে যদিও বস্তুত তা নেই। এই আত্মছলনার এবং বিকৃত ভানের অবাধ প্রবেশ যে সাম্প্রতিক কবিতাকে প্রভূত পরিমাণে বিপন্ন করে নি এমন কথা কি বলা যায়?

আর তারই জন্যে হয়তো হঠাৎ কোনো ক্লান্ত তরুণ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে 'তুমি প্রতীকের শত্রু' (ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়), বুঝতে পারি এই নির্মিত বিচ্ছিন্ন দুরূহতার বিরুদ্ধে কোথাও একটি অভিমানী প্রতিবাদও সঞ্চিত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

(৬)

একদিকে যেমন এই রীতিমত দুরূহতা, অন্যদিকে তেমনি আছে অনাত্মীয় বিষয়। ঐহিক শোকতাপ, সামাজিক বিবেক, এমনকি নির্বৈয়ক্তিক ভাবনার উপস্থাপনেও কাব্যবিষয় পাঠকের আয়ত্তগত হতে পারত সহজে, কিন্তু আত্মঅস্তিত্বের গড়মূল আবিষ্কার, মৃত্যুর বোধ, অসুন্দর শয়তান আর পাপের ধ্যান একদল কবিকে একটি বিচ্ছিন্ন কুঠরির মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন। এবং ঐ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বিগত বৎসরে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়র-অনুবাদ প্রকাশকে অন্যতম প্রধান একটি ঘটনারূপে চিহ্নিত করতে হয়। এই কবি স্বয়ং আর কবিতা লেখেন না সেদিক থেকে অনুবাদের মধ্যেই তাঁর রচনাকর্ম হয়তো সজীব রাখতে চান, কিন্তু একমাত্র সেজন্যই এ-গ্রন্থ উল্লেখনীয় নয়। এ জন্যেও নয় যে অনুবাদকর্মের একটি তুলনা বিরল দৃষ্টান্ত ও টি। কিন্তু এই প্রকাশটি স্মরণীয় মনে হয় এই কারণে যে বোদলেয়রী-আবহাওয়া বাঙলা কবিতার তরুণতম এক অংশকে এখন আতপ্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাদের প্রধানতম পরিচয় হয়ে উঠেছে। অনেকসময়ে তাকে হয়তো বোদলেয়রের প্রভাব বলা সঙ্গত নয়, হয়তো তা প্রকারান্তরে [illegible] নবজাত প্রভাব।

এই বৃত্তের প্রধান একজন [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের 'কেশরাশি [illegible] নিরুৎসুক গভীর পাতালে' অথবা '[illegible] মৎস্য মুদ্রা নারী সুমহান্ উচ্ছ্রিত উজ্জ্বল ফোয়ারা' অন্য এক জগতের চিহ্ন নিয়ে আসে। 'সামনে শঙ্কিত শয্যা, আরো কাছে সেই প্রেমিকার/শায়িত কলঙ্কী দেহ' (চিন্ময় গুহঠাকুরতা), 'মাংসভুক [illegible] ভয়াল/শব্দ করে ফাটে খুলি, মজ্জা [illegible] ঝরে জলভাগ' (পবিত্র মুখোপাধ্যায়), 'রসনার পূতগন্ধ মালা/ক্রমে যেন দীর্ঘ হয়ে বাড়ে' (আশিস্ সান্যাল)—এই [illegible] অনুভব অনভ্যস্ত পাঠকের মনে [illegible] বিরোধিতার সঞ্চার করতেও পারে। [illegible] এরই সঙ্গে পাশাপাশি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেন্দ্র-র মতো কবিরাও আছেন যাঁরা প্রমত্ত আগুনের মধ্যে নয় [illegible] বিষণ্ণ নিবিষ্টতার মধ্যে [illegible] প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মতো যাঁরা উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ।

কথাটা এই যে পুরাতনের [illegible] ফিরে যেতে পারেন না কবিরা, পুরোনো অনুভবে কিংবা পুরোনো [illegible] এবং সেইজন্যে নূতন সে-পরিমাণে স্পষ্ট না হয়ে উঠলেও পুরাতনের [illegible] ধিক্কার সর্বত্রই প্রবল। [illegible] পুরোনো ফুলগুলি' ভাঙো [illegible] যাক তীক্ষ্ণফলা উজ্জ্বলে কুড়ালে [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের এই আহ্বান সেই ধিক্কারেরই নির্দেশ। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের উচ্চারণেও শুনি 'ভাঙো, চুরমার করো, যদি [illegible] ভেতরে কোনো ধ্বংসের দেবতা [illegible] কিন্তু ভাঙবে কে? পুরোনো ফুলের [illegible] বিতৃষ্ণা থেকে নূতন নির্মাণের [illegible] কবিরই স্পর্ধা, কিন্তু নূতন ফুলও [illegible] অল্পদিনের মধ্যেই জীর্ণ হয়ে [illegible] না তো?

বস্তুত অনুভবই বলি বা [illegible] বলি, সে যেমন নূতনত্ব নিয়ে [illegible] একদিকে, অন্যদিকে তেমনি তার চতুর্দিকে সঞ্চিত করে তোলে রাশি রাশি [illegible] অজস্র রচনা বেরিয়ে আসে যাকে মনে হয় বানিয়ে তোলা, ফেনিয়ে তোলা! [illegible] পবিত্র শিখা নিয়ে ঐ অপরাবহ[illegible] (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)—এই [illegible] ধিক্কারও সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গেই [illegible] দেয়। বন্দর, মাস্তুল, শিল্প, পাপ: [illegible] এবং নারীদেহ বিষয়ক অনুষঙ্গগুলি [illegible] তরুণ কবিদের হাতে ইতিমধ্যেই [illegible] অতিব্যবহারজনিত ক্লিশেতে পরিণত হতে চলেছে, একথাও কবিদের এখুনি [illegible] হবে। শক্তিমান্ কবির পক্ষে যদিও ভয়ের

কথা নয়, কেননা স্বকীয় ধ্বনির সামর্থ্যে সেই শব্দকেও তিনি স্বতন্ত্র আত্মা হয়তো দিতে পারবেন, কিন্তু প্রথমত সেই স্বকীয়তার অর্জন চাই। নতুবা এই ব্যবহারকে পাঠক ভাববেন একরকম ধূর্ত চতুরতা, কবিতা রচনা একরকম অকারণ অভ্যাস ,আর এই ভেবে পাঠকরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন ঈর্ষ্যাময়ী কবিতার জগৎ থেকে।

(৭)

হয়তো এই বিচ্ছিন্নতার বোধ কবিদের মধ্যে গোপনে কাজ করছে। অসম্ভব নয় যে তারই এক অচির-প্রতিক্রিয়া-রূপে সাম্প্রতিক কবিতার একটি বহির্লক্ষণ ক্রমেই জায়মান, কাব্যনাট্যের আন্দোলন যার নাম। এই একবছরে প্রকাশিত হয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রথম নায়ক', চারজন কবির এক নাট্যসংকলন 'চার চোখ'। রাম বসু, অলোকরঞ্জন, আলোক সরকার বা জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ইতস্তত পত্রিকায় তাঁদের নাট্যপ্রয়াস প্রকাশ করেছেন। এবং এই একবছরেই কাব্যনাট্য-সংখ্যারূপে বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশ আমরা দেখলাম। ব্যক্তিগত প্রতীক, ছিন্ন চিত্রমালা বা দূরে অবচেতনার আয়োজন থেকে কবিরা এখানে হয়তো একটু দূরে সরে দাঁড়াতে চাইছেন, পাঠক বা শ্রোতা নির্মাণ করতে চাইছেন। কেউ কেউ হয়তো নতুন পথ রচনা করতে চাইছেন কবিতার, তিরিশের কবিরা একটা অবিজিত জগৎ যে পরিত্যাগ করে গেছেন, এই আবিষ্কারের উৎসাহও হয়তো অনেকের গোপন প্রেরণা। কিন্তু আরো বড়ো কথা এই যে আত্মকেন্দ্র অনুভাবনা থেকে আরো একবার দূরে সরে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়েছে, এমনকি মেটাফিজিক্যাল বিষয়েরও বহিরাবরণরূপে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে দৃঢ়রেখাবলয়িত চরিত্র এবং কাহিনীর।

এই শেষ কথাটি জরুরি। এই জাতীয় ভাবেরই এক পরোক্ষ প্রকাশরূপে সম্প্রতি দীর্ঘকাব্য-শ্রেণীর এক ধরনের রচনাও দেখতে পাচ্ছি। জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'মহাদিগন্ত', পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শবযাত্রা' এ-প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। কিন্তু ,কাব্যনাট্যই বলি বা দীর্ঘ-কাব্যই বলি কাহিনী বা চরিত্রসৃজনের অপরিহার্য এই দাবি না থাকলে এ সব লেখা নিতান্ত ব্যসনে পরিণত হতে পারে। তাই বহির্বৈষয়িক প্লটের ভাবনা আমরা ছেড়ে থাকতে পারি না। অর্থাৎ কবিরা যদি নাটকের দিক থেকেই সমস্যাটিকে না ভাবেন তবে এ হয়ে থাকবে কবিতারই এক নতুন প্রকরণ, কাব্যনাট্য-আন্দোলন নামক শব্দটি অচিরেই মিলিয়ে যাবে। 'চার চোখে'র ভূমিকাতে এ-কথা তো বলাও হয়েছে যে কবিতারই এই পরীক্ষা (রাম বসুও সম্মত হলেন এই ভূমিকায়?) আর নীরেন্দ্রনাথ যদিও প্লটেই তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করেন কিন্তু অন্তত 'প্রথম নায়কে' তাঁর আদর্শের সিদ্ধি তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। এবং নাটকের এই দাবি ততোক্ষণে প্রতিষ্ঠিতও হবে না যতোক্ষণ না কবিরা কবিতার ভাষা এবং নাটকের ভাষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে শিখবেন, আর শিখবেন কেমন করে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হয় তাঁর চরিত্রের থেকে। কিন্তু, তাঁরা কি সত্যি সত্যি আজ সেই নাটকীয় তৃতীয় স্বরটি শুনতে পাচ্ছেন?

(৮)

অতীত আমাদের কাছে সবসময়েই উত্তেজক, বর্তমান কেবলই অর্থহীন। কিন্তু এই এক বছরের কবিতা পাঠক হিশেবে আমি তো অন্তত নিছক নৈরাশ্যের কারণ দেখি না। বরং কয়েক বছরের স্পন্দমান পরিক্রমণ এখন এক-একটি নির্দিষ্ট পথ নেবার জন্য আত্মলক্ষ্য হচ্ছে দেখে ভরসাই জাগে। তুচ্ছ কবিতার ছড়াছড়ি আছে, প্রতি যুগেই তা থাকে; গড়ে উঠছে নতুন রকম ক্লিশে বা ম্যানারিজম, সবসময়েই তা ওঠে; দ্বন্দ্ব আছে অস্তি আর নেতির, এ-দ্বন্দ্বও শেষহীন। তবু ঘরে তুলবার মতো ফসল এরই মধ্যে আমরা যা পাই তাতে ভাবীকালের সঞ্চয় কিছুই থাকল না এমন বলা চলে না। তবে কেন উত্তেজনা আসে না? এখনকার নতুন কবিরা কেন আর তেমন তেমন করে আলোড়ন করতে পারেন না আমাদের? কোনো স্থায়ী আলোড়ন, কোনো দিব্য উত্তেজনা? যেমন পারতেন কুড়ি বছর পঁচিশ বছর আগেকার কবিরা?

কিন্তু সত্যি বলতে, সেই চমক কি আর আমরা আশাই করতে পারি? রকেট আর মেগাটনের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কিছুকেই আমরা ঠোঁট বাঁকাতে শিখেছি, সব কিছুই যেন বুঝে নিয়েছি আমরা, সে-অর্থে আলোড়িত আর আমরা কোনো-দিনই হব না। সে আমাদের দুর্ভাগ্য, কবিতার ত্রুটি নয়। এই পরিবর্তমান মুহূর্তে কবিরা প্রায় সকলেই নিজের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, এখনো তাঁরা কিছু আবিষ্কার করতে চাইছেন অথবা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে, ঠিক এই মুহূর্তে কবিতা আর তার পাঠক আশা করতে পারে না। সেই আশা তার দেখা দেবে আরো এক স্তর পেরিয়ে সেইখানে পৌঁছে, যেখানে কবির আর কোনো স্বতন্ত্র ভূমির দাবি নেই।

× এই প্রসঙ্গে আলোচিত সমস্ত কাব্য-পংক্তি বিগত এক বৎসরে রচিত কিংবা প্রকাশিত।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে শিক্ষায় সম্পদে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বরোদা রাজ্য ভারতের অগ্রগামী রাজ্যগুলির অন্যতম ছিল। বর্তমানে বরোদা বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও সর্ববিষয়েই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। এখানে সামন্ততন্ত্র যুগের কীর্তির অনেক দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। যেমন সুখী ও স্বাস্থ্যবান এখানকার অধিবাসীরা তেমনি সাজানো ছবির মতো শহর এবং নয়ন-বিমোহন প্রাসাদ ও প্রকৃতির দৃশ্যাবলী।

১। দুধের কলস মাথায় গোয়ালা; ২। প্রমোদ বিহারের জন্য বিখ্যাত সুরসাগর হ্রদ; ৩। লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ; ৪। শস্য ঝাড়াই।

আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

৪

ঈশ্বর, আমলকী গাছ, কবি......

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বর, আমলকী গাছ, কবি
একটি মেয়ের মুখ......

মাথার ওপর জ্বলছে সপ্তর্ষি ও কালপুরুষ,
ঈশ্বর! আমাকে তুমি আকাশ দিয়েছো।

আমলকী গাছ! আমি অভিজ্ঞতা জ্ঞান মানবতা
এ-সবের চেয়ে আরো কিছু চাই,
আরোগ্যের চেয়ে আরো কিছু চাই, তোমার পায়ের নিচে
যেই মাটি আছে।

কবি! আমি শিশুকাল থেকে
তোমাকে দেখেছি, কুশবিদ্ধ শিশু, প্রেমে হাসো
অপমানে জ্বলো, করুণায়
তুমি এক বহমান নদী। আমি তৃষ্ণা পেলে
তোমার কাছেই যাবো।

মেয়ে! তুমি আমাকে কী দেবে?

জা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শহরতলিতে ফল নিয়ে যায় ছেলে,
কতো নদী কতো সমুদ্র হবে পার,
কতো ছোটো-বড়ো পথের অন্ধকার
পার হবে সাইকেলে।

প্রথমে তো সেই চাইনীর মেয়েটার
বয়স-কমানো জারিজুরি খুব আছে;
দ্বিতীয় বাঁকের মেয়েটির মন সাদা,
লাগলেও পারে লাগতে ঘরের কাজে;
সব শেষ বাঁকে পৌনে ন'টার কাঁটা,
পার হয়ে যাবে পুরবধূর কাছে॥

নায়ক নই

মৃগাঙ্ক রায়

একটি গল্প লিখব আমিই যার নায়ক;
অথচ আমার কৈশোর একলব্যের প্রতীক নয়,
যৌবন অর্জুনের শরবিদ্ধ মহাভারত নয়, অথবা
বৌদ্ধ পরিব্রাজক নই আমি। সামনে প্রবেশের
পথ নেই, পেছনে যে সব মৃত মনীষীরা
আমার মধ্যে উৎপাত হয়েছিল তাদের হেমন্তের
হরিদ্রাভ অন্ধকার। সেখানে গিয়ে তাদের
সাদা হাড়ের অপরিমিত ছায়ার ত্রিকোণে
আমার গল্প জমে উঠবে। একটি গল্প লিখব
আমিই যার নায়ক, কেননা একটি যুক্তির সিদ্ধান্তের মত
আমি প্রাক্‌চাঞ্চল্যে পা দিয়েছি॥

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৫৮ ॥

ওঁ

পুরী

কল্যাণীয়াসু,

জনশ্রুতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস করে আমি ঠিক করেছিলুম যে, তুমি গিরিডিতে গেছ, সেখানে ছাত্র-পিটুনিদের পিটুনি লাগাতে। কাল রাণীকারের পত্র থেকে বুঝলুম স্বস্থানেই আছ বেকার অবস্থায়। পুরী অভিমুখে যখন যাত্রা করেছিলুম মনে সংকল্প ছিল এখানে তোমাকে আমন্ত্রণ করব। এসে দেখি স্থানাভাব। উপরের তলায় দুটি শয়ন কক্ষে আছি আমরা দুই পক্ষ, আর আছে একটি ভোজনশালা, আর বাকি সমস্ত ছাত আর আকাশ। নিচের তলার অধিবাসীরা বিচিত্র শ্রেণীর— কেউবা সরকারী কাজে কেউবা আমার দরকারী কাজে। জ্বর নিয়ে এসেছিলুম—প্রথম কয়েক দিন দেহের তাপ পরিমাণ দিনে তিনবার করে নির্ণয় করতে নিযুক্ত ছিলুম। সেটা কেটে গেল, কিন্তু দেহ মন জড়িয়ে আছে আগাগোড়া কুঁড়েমির জালে। ৯ই তারিখের পাঞ্জিকায় রবিগ্রহের জন্মদিন। এখানকার পুরবাসীরা শাঁখঘণ্টা বাজাবে। তার পরদিনই দৌড় দেব। অর্থাৎ ১১ই তারিখে পৌঁছব কলকাতায়—সেই রাত্রেই যেতে হবে কালিম্পং অভিমুখে—আত্মীয় পরিজন আশঙ্কা করচেন তার বেশি থাকা নিরাপদ নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা আমার জন্যে ওৎ পেতে আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা জানিনে অনেকগুলো জরুরি কাজ আমি যাবামাত্র ঘাড়ে এসে পড়বে। ওর মধ্যে তোমাদের দেখা পাবো—আশা রইল কালিম্পং বাসের সঙ্গ দাবি করলে হয় তো সেটা ব্যর্থ হবে না। ক্লান্ত অবস্থায় একটা বৈরাগ্যের তলায় চাপা পড়ে গেছি—তার থেকে নিজেকে টেনে বের করব কী উপায়ে তাই ভাবচি। হায় আমার হেডনার্স। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩৪৬।

কবি

॥ ৪৫৯ ॥

ওঁ

কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু,

পাহাড়ের হাওয়ায় এবার শরীরটা তেমন ভালো লাগচে না। মনটা তাই উড়ুক্ষু। জীবনের জন্য অভিজ্ঞান পত্র তোমার চিঠি পাবার আগেই পাঠিয়েছি। তুমি যে পয়েন্টগুলো লিখে দিয়েছ সেগুলো ধরে আর একটা লেখন দিলুম। সকাল থেকে পড়ে আছি। দুর্বল। ইতি ২৬।৫।৩৯

কবি

॥ ৪৬০ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, শরীর ক্ষণে ক্ষণে বিকল, মন উতলা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৌমাদের দ্বারা পরিত্যক্ত, সকল প্রকার কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা, ডাকপিয়নের বিভীষিকা, বাংলা দেশের বর্তমান দুর্গতি সম্বন্ধে মনের উদ্বেগ, ঘুম থেকে জেগে উঠেই চীন দেশে কী দারুণ ব্যাপার ঘটচে তারই কল্পনা, কলকাতায় ফেরবামাত্র কনগ্রেস ভবন উন্মোচনের নিমন্ত্রণ, চারুবাবুর কাছে বিশ্বভারতী সম্মেলনে উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি এই সমস্ত নিয়ে ৭৯ বছর বয়সের জীর্ণ দেহভার বহন আমার বর্তমান দশার পরিচয় এই। আরো যদি কিছু জানবার ইচ্ছা করো আমাকে পত্র লিখো। ১১।৬।৩৯

কবি

॥ ৪৬১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

বুলার কাছে শুনলুম তোমরা এসেছ এবং সঙ্গে সঙ্গে এনেছ রোগ দুঃখ। প্রশান্তর শরীরের অবস্থা চিন্তার বিষয় হয়েছে। বোধ হচ্চে পরিশ্রম করে অতিরিক্ত—কিন্তু ওর বয়সে সেটাতে যদি ওকে কাবু করে তাহলে আমার তো এতদিনে কোনো চিহ্ন থাকা উচিত ছিল না। আমি সংখ্যা নিয়ে ঘাটা-ঘাটি করিনে, কিন্তু শব্দ নিয়ে আমার তোলাপাড়া চলচেই, বিরাম নেই। সম্প্রতি আশ্রয় নিয়েছি শ্রীনিকেতনের হর্ম্য শিখরে, আকাশ বাতাসের দাক্ষিণ্য অবারিত—অনেকদিন পরে দেহে মনে আরাম পেয়েছি। দুঃখ এই চারিদিকে দৃশ্য যখন বিস্তীর্ণ, সংকীর্ণ তখন দৃষ্টিশক্তি। দেখা সাক্ষাতের লগ্ন শীঘ্র অনুকূল হবে না বোধ হচ্চে। ৬।৭।৩৯

কবি

॥ ৪৬২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণ। মেঘের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সমস্ত আকাশ একাকার। রিমঝিম্ রিমঝিম্ ঘন বরষে। এই হচ্চে যথার্থ বিরহের ঋতু। "এমন দিনে তারে বলা যায়" কিন্তু কী বলা যায় ভেবে পাইনে। যেমন একটানা বৃষ্টির শব্দ তেমনি এক কথা বারবার বলবার দিন। শুনতে খুব সহজ কিন্তু ঘটে ওঠা কঠিন। বসে বসে mathematics-এর problem কষা এর চেয়ে সহজ অদৃষ্টক্রমে সেটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। বর্ষার অন্ধকারের পরে অন্ধকার জমে ওঠে সন্ধ্যাবেলাকার, আরো ঘন অন্ধকার নীরব নিঃসঙ্গতার। ঝিঁঝি পোকা ডাকে, আর জোনাকি গাছে গাছে ঝিকমিক করে। ইতি ২৯।৭।৩৯

কবি

॥ ৪৬৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

ভারতবর্ষের কোন্ ভূভাগে আছ সে রহস্য ভেদ করতে পারিনি, লোকমুখে শোনা গেছে লম্বা ছুটির উপর সওয়ার হয়ে দীর্ঘকাল ফিরবে নিরুদ্দেশে। মাঝে একবার কলকাতায় গিয়ে বেলঘরিয়ার আশ্রয়ের জন্যে শূন্যে হাতড়িয়েছি—বুলা বোধ করি দ্বার খুলে দিতে রাজি ছিল, কিন্তু মূল্যবান দ্রব্যরাজি সম্বন্ধে বদনাম কেনবার আশঙ্কায় জোড়াসাঁকোর ফুটো ছাদের তলাতেই আশ্রয় নিয়েছিলুম। তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমিও এবার নিরুদ্দেশে উধাও হব শৈলচূড়ার অভিমুখে। রওনা হব আগামী বুধবার সায়াহ্নে। শনিবার চড়ব দার্জিলিং এক্সপ্রেসে—পথের দুদিন কোথায় কাটবে অবস্থা বুঝে নিষ্পত্তি হবে। অন্ধকারে ঢিল মারা গেল দেখি কোথায় গিয়ে ঠেকে। ১।৯।৩৯

কবি

॥ ৪৬৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

কাল জীবন এসেছেন। তাঁর কাছে শুনলুম তুমি ফিরে এসেছ, কিন্তু ভাঙা শরীর নিয়ে। এ অবস্থায় তোমার উপর কোনো ভার চাপাতে চাইনে। বিশেষত আমার নিজের শরীরের অচলতা পূর্বের চেয়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সিঁড়ি হাঁটাহাঁটি আমার পক্ষে বিপদজনক। পাহাড় যাবার পূর্বে সভা জমানো ডাক্তার দেখানো ইত্যাদি যা কিছু কাজ আছে সবই জোড়াসাঁকোয়—পারতপক্ষে দূরের থেকে আনাগোনা বাঁচিয়ে চলাই শ্রেয় হবে। শরীরটা কষ্ট দিচ্ছে।

………হয়তো আমার যাওয়া আরো আটদশদিন পিছিয়ে যাবে।

দেহমন অবসাদে ভারাক্রান্ত। তুমি কেমন আছ বুলোকে দিয়ে খবর দিয়ো। ইতি ২।৯।৩৯

কবি

॥ ৪৬৫ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

এবার এখানে এসে অবধি শরীর বিগড়েই আছে। তার প্রধান কারণ এ পর্যন্ত আবহাওয়া অপ্রসন্নভাবেই চলেছে। সূর্যালোক না পেলে আমার মন খোলে না, শরীর থাকে মুষড়ে। কেবলি পালাই পালাই করেছে মনটা। কিন্তু খবর নিয়ে জানা যায় এবার দেবতার কুদৃষ্টি অপক্ষপাতে সব জায়গার উপরেই। কিন্তু তবু মন্দ দশারও ঠাঁই বদল করতে ইচ্ছে যায়, frying pan-এ যখন বিরক্তি ধরে তখন মনে হয় fire-টাই স্পৃহনীয়। কিছুদিন আগেই স্থির করেছিলুম সকল বাধা এড়িয়ে যাব চলে স্বস্থানে। এমন সময় রথী এখানে আসা স্থির করল, তার শরীর খারাপ। এখানে এসে ভালো আছে। তাই ঠিক করেছি আগামী ৫ই নবেম্বরে বেরিয়ে পড়ব।

যখন আমার সময় খারাপ চলে তখন আমার কলম চলে ছুটে। এবার তাই মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগের ভিতরদিয়ে চালিয়ে দিয়েছি একটা ছোটো গল্প—আন্দাজ করচি এটা ভালই হয়েছে। ছুটির পরে কোনো এক সময়ে পড়ে শোনাব। যদি ভালো বলো তা হলে বুঝব তোমাদের রুচি ভালো।

কতকগুলো কাপড় গায়ে জড়িয়ে জড়ভরত হয়ে আছি। মেঘলা শীত ভালো লাগে না। বিজয়ার আশীর্বাদ। ২৫।১০।৩৯

কবি

॥ ৪৬৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আশা করেছিলুম কলকাতায় এসে তোমার দেখা পাব। কোথাও তোমার চিহ্ন নেই। খবর নিয়ে জানা গেল তুমি গিরিডিতে অচল প্রতিষ্ঠ। প্রশান্ত নিরুদ্দিষ্ট। চোখ দুটো নিয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তাই পাহাড় থেকে নেমে এসে আমাদের শরণ নিয়েছি। এট্রোপিন দিয়ে সে দেখলে চোখ। চশমার ব্যবস্থা করে সে উপায় খুঁজচে। খুব আশাজনক বলে বোধ হচ্চে না। অথচ এখনো চোখের প্রয়োজন ফুরয়নি। লেখা ও পড়ার মাঝখানে পর্দা ঝুলচে—সে পর্দা এখনো কতকটা স্বচ্ছ, কিন্তু ক্রমে অনচ্ছ হবার দিকে যায় তাহলে ধ্যানের পথ ছাড়া আর সকল পথ বন্ধ হবে। কিন্তু অনিবার্যকে স্বীকার করে নিতে হবে।

কাল সম্মেলনীতে একটা নতুন গল্প পড়ব। পর্শু পালাব আশ্রমে। লোকের ভিড়ে প্রাণ কণ্ঠাগত।

তুমি নিশ্চয় ভালই আছ। কলকাতার দিকে যদি ফের তবে আশা করি শান্তিনিকেতন পথে পড়তে পারে। ইতি ৮।১১।৩৯

কবি

॥ ৪৬৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

হয়তো শুনেছ পুপুর বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। সৎপাত্র, সদ্বংশ, বর কন্যা উভয়েই উভয়ের প্রতি সমাকৃষ্ট। ডিসেম্বরের শেষ তারিখে আশ্রমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। অতএব সেই শুভকর্ম উপলক্ষে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করতে পারি। তোমার নতুন গৃহনির্মাণ ও গৃহপ্রবেশের সংবাদ দূরে থেকে সম্ভোগ করেছি—আমিও সামান্যভাবে তোমার অনুসরণের চেষ্টায় আছি।

চক্ষুকর্ণ দুই ইন্দ্রিয় দ্বারই রুদ্ধ প্রায়—স্মৃতিশক্তির উপরেও পর্দা নেমে আসচে—বিদায় নেবার পথে আছি। ইতি ১৬।১১।৩৯।

কবি

এই চিঠিতে আমাদের গিরিডির বাড়ির কথা বলেছেন।

হোলী উৎসবের গোড়ার কথা

অমিতা রায়

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই তিথিতে সর্ব-ভারতীয় একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যাকে আমরা বলি দোলোৎসব, হোলী বা হোলক উৎসব। এ উৎসবে রাধা ও কৃষ্ণের দোল-লীলার স্মৃতি বাঙ্গালীর চিত্তে কিছু ঢেউ তুলেছে, আবীরে কুমকুমে বসন্তের বাতাস রঙীন হয়ে উঠেছে। বস্তুত, সমস্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারত জুড়ে রাধাকৃষ্ণের স্মৃতিই হোলী বা হোলক উৎসবের প্রধান আশ্রয়। মধ্যযুগের আগে রাধাকৃষ্ণের এই প্রভাবও ছিল না। হোলীর সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের যোগাযোগ ঘটেছে জয়দেবের গীত গোবিন্দ রচনার বেশ কিছু পরে, প্রধানত মুসলমান সম্রাট, আমীর ওমরাহদের এব রাজস্থানী হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এর বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষে মদনোৎসব, মদনরাত্রি উৎসব, কামমহোৎসব প্রভৃতি উৎসবানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এবং তা হতো বসন্তকালেই। লোকায়তস্তরে বসন্তকালের অন্যান্য উৎসবও ছিল। দোল বা হোলী উৎসবের মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে বাসন্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত নানা উৎসবের স্মৃতি ও আচারানুষ্ঠান বিধৃত হয়ে আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে জৈমিনীর পূর্বমীমাংসায় শবর ভাষ্যতে বসন্ত উৎসবের উল্লেখ আছে। কালিদাস বসন্ত উৎসবের বর্ণনা নানা উপলক্ষে করেছেন। উত্তর ভারতে চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে প্রায় ষোড়শ শতক পর্যন্ত বসন্ত উৎসব, কাম মহোৎসব, মদনোৎসব ইত্যাদি কতকগুলি উৎসব প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী, মালতী মাধব নাটকে বসন্ত উৎসবের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। একাদশ শতকে আরব মনীষী অল-বেরুনী বসন্তোৎসবে এই হোলীর উল্লেখ ও বর্ণনা করে গেছেন।

অত্যন্ত বর্ণময় ও আনন্দময় উৎসব বলে বহুদিন থেকেই আমাদের বসন্তোৎসবগুলি দেশীবিদেশী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আধুনিক কালে এই হোলী উৎসবের ইতিকথা অনুসন্ধান করেছেন—বিশেষ ভাবে করেছেন শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার বসু ও নীহাররঞ্জন রায়মশায়। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল কিছু আলোচনা করা হয়তো নিরর্থক হবে না।

গ্রাম্য জীবনে কৃষি যেহেতু ধনোৎপাদনের একমাত্র উপায়, দৈনন্দিন অনেক আচারানু-ষ্ঠান সেই হেতু মূলত কৃষকের ভয়, বিশ্বাস, সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। এই কৃষির উপরই জনসাধারণের মরণ বাঁচনের নির্ভরতা, কাজেই কৃষিকে আশ্রয় করেই তাদের যত কিছু আচার অনুষ্ঠান ভয় বিশ্বাস, স্বপ্ন-কল্পনা সব গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত কিছুর পিছনে জৈবিক এবং জাগতিক প্রয়োজন বোধ অত্যন্ত সক্রিয়। বস্তুতপক্ষে মানব জীবনের এই প্রয়োজন বোধই ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যেসব ধর্মাচার এখন পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত সেইসব উৎসব ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এইসব আচারানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য একদিকে ধরিত্রীর প্রজনন শক্তিকে বৃদ্ধি করা, অন্যদিকে ক্ষতিকারক শত্রুদের তুষ্ট রেখে বসুন্ধরাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করা।

আদিম মানুষের বিশ্বাস, যে প্রজনন শক্তি ধরিত্রীকে ফলভারে নত করে, সেই শক্তি নারীকেও সুপ্রসবা করে। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে যাদুশক্তি ও প্রজননশক্তি যেমন তাদের গোষ্ঠীবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, তেমনি তাদের বিশ্বাস, খাদ্য আহরণে কিংবা খাদ্য উৎপাদনেও যাদুশক্তি,

রাধাকৃষ্ণ

বসন্তোৎসব

প্রজননশক্তির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কৃষিনির্ভর জীবনে খাদ্য-শস্যকে মাতৃরূপে চিন্তা করা হয়। ধান্যপূর্ণ লক্ষ্মীর ঝাঁপি, লক্ষ্মীপূজায় আলপনার ধানশীষের ছড়াছড়ি, তুষ তুষলি, তিল কুজারি, মাঘমণ্ডল ব্রতে যে-সব মূর্তিকল্পনা, কিংবা অম্বুবাচীর পারণে ঋতুমতী মাতা বসুন্ধরার অঙ্গে আঘাত না করা, ইত্যাদি সব আচারানুষ্ঠান বসুন্ধরার মাতৃরূপ কল্পনা ব্যক্ত করে। এ শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে কৃষিনির্ভর জীবনে পৃথিবীকে মা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশে প্রচলিত কতকগুলি ধর্মাচার বা ধর্মানুষ্ঠানের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। পেরুতে ভুট্টা যে-দেবী মারফৎ আসে তাঁকে বলা হয় Jara mamma (Maiz mother), তেমনি coca mamma, axo mamma। ভুট্টার মণ্ডে তৈরী, ভুট্টা শীষের গহনা গায়ে, মূল্যবান পোশাকে সজ্জিতা Zara mamma শুধু প্রচুর পরিমাণে ভুট্টার জন্ম দিতেই সমর্থা নয়, শত্রুর হাত থেকে এই খাদ্যশস্য রক্ষা করার দায়দায়িত্ব, ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই। কাজেই কৃষিকেন্দ্রিক জীবনে ব্রত এবং পূজাচারের ভিতরে মূলত যাদুশক্তি প্রজননশক্তির একত্রীকরণ চোখে পড়ে, এবং এই একত্রীকরণের ফলেই বোধকরি মাতৃকাতন্ত্রের পূজার প্রসার।

কাজেই ধর্মকর্মের গোড়ার কথা প্রজনন শক্তির পূজা এবং এই প্রজনন শক্তির আধার নারী মূর্তি। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতায় নারীমূর্তি মাতৃমূর্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে, কখনো শিশু বক্ষে, কখনো সন্তানবতী অবস্থায়। তাদের মধ্যে একটি মূর্তি আছে যা একাধারে ধরিত্রী দেবী মাতৃকামূর্তির প্রতীক বলা চলে। এই মূর্তির দেহ গঠনে মাতৃমূর্তি ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই রমণী মূর্তির গর্ভপথ থেকে ছোট একটি বৃক্ষ-শিশু জন্ম নিচ্ছে। এই জাতীয় নারীমূর্তির সার্থকতা উৎপাদনযন্ত্র রূপে। মানব জীবন, ফল, ফসল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে যে-শক্তি চালিত করে, তার মধ্যে আর্যপূর্ব জীবনমানস অত্যন্ত সক্রিয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর চাপে, সেই অনার্য মন আর্য ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠানের নীচে সর্বদা চাপা পড়ে থাকেনি; প্রাণধর্মের প্রাবল্যে সব বাধা ডিঙিয়ে লোকায়ত এই ধর্ম আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে সংঘাত সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কখনো এই লোকায়ত ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চাপে ফল্গু নদীর ক্ষীণ ধারার মত আত্মগোপন করে আছে, কখনো বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আপন ছাঁচে ফেলে নিয়ে নিজের স্রোতে টেনে এনেছে। কখনো বা এই মিশ্রণের ফলে এমন এক বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে যাকে পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য বা অব্রাহ্মণ্য কিছুই বলা যায় না, অথচ তাকে হিন্দু বলতে কোনো বাধা নেই। এই সংঘাত-সমন্বয়ের ইতিহাসই হিন্দু-ধর্মের ইতিহাস। হোলী বা হোলক বা দোল উৎব এই নিত্য সংগ্রাম-সমন্বয়ের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হোলী উৎসব বসন্ত উৎসবের রূপান্তর। কিন্তু আদিতে হোলক উৎসব, বসন্ত-কাম মহোৎসব, মদনোৎসব সবই পৃথক পৃথক তিথিতে পৃথক ভাবে উদযাপিত হতো। মধ্যযুগে মুসলমান রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলে হোলী উৎসব অন্য সব উৎসবকে গ্রাস করে নেয়। তখন এই উৎসব অনেক বেশি জাঁকজমকে সম্পন্ন হতো। এখন শারদীয়া দুর্গাপূজা হোলীর অনেকখানি ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত করে নেবার ফলে হোলী উৎসবের গৌরব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বাংলাদেশে হোলী উৎসব কবে দোল উৎসবে পরিবর্তিত হলো তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। একাদশ শতাব্দে খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলে মনে হয় রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা হোলী উৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং তারই ফলে সম্ভবত হোলী উৎসব দোল উৎসবে বিবর্তিত হয়।

ফাল্গুনী চতুর্দশী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সমস্ত ভারতব্যাপী এই উৎসব উদযাপিত হয়। কিন্তু সর্বত্র উৎসবের আচানুষ্ঠান একরকম নয়। হোলী উৎসব প্রধানত যেহেতু লোকায়ত উৎসব, সেই হেতু দেশকালপাত্র ভেদে এর রূপ কিছুটা বিভিন্ন। আর্য ও আর্যপূর্ব মানস সংস্কৃতির ও বিভিন্ন লৌকিক আচারের সংমিশ্রণে হোলী উৎসবের বিবর্তন অত্যন্ত

দুত। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কোথাও বিকৃত, কোথাও পরিবর্তিত, কোথাও বা আদিম মানবের রক্তস্রোত এর ভিতর দুত প্রবাহিত, কোথাও বা এই দুই ভিন্ন স্রোতের সমন্বিত রূপ। হোলী উৎসব এই সব সংঘাত-সমন্বয়ের ইতিহাস সগর্বে বহন করে আছে।

বৈদিক মন্ত্র দিয়ে হোলক উৎসবের শুরু। রক্ত বর্ণ ফুলভারে নত অশোক বৃক্ষের তলদেশ এই হোম উৎসবের যথার্থ স্থান। কোথাও এই হোম মন্ডলের নীচে চতুষ্কোণ একটি গর্ত করে তাতে পান সুপারি হরিদ্রা ইত্যাদি রাখার বিধি প্রচলিত। বলা বাহুল্য পান সুপারি, হরিদ্রা গুহ্য যাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির বাহক। শুক্লা চতুর্দশীতে চাঁদ ঠিক যখন মাথার উপরে উঠে আসে, বাতাস যখন অশোক ফুলের গন্ধে মদির, ব্রাহ্মণ তখন দেহ আত্মা শুদ্ধ করে বৈদিক সুরে অগ্নিকে আহ্বান করেন তার হোম যজ্ঞের বাহক হতে। ব্রাহ্মণ পূজা করেন রাধা ও কৃষ্ণকে। কিন্তু হোলী উৎসবে কৃষ্ণ রাধার পূজার চলন অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালের। কারণ, যেসব লোকাচার আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে তা থেকে এ কথা বোঝা খুবই সহজ, প্রাচীন হোলী উৎসবের দিন ও রীতি পরবর্তী কালে রাধা ও কৃষ্ণে বিবর্তিত হয়েছে। বাংলা দেশে হোলী উৎসবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের স্থান বোধ করি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কারের ফল।

কৃষ্ণ বলরাম

পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং বৈদিক হোম যজ্ঞ, হোলী উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হলেও হোমাগ্নি আনা হয় অস্পৃশ্যদের বাড়ি থেকে, এবং সেই অগ্নিকে আনতে হয় স্বয়ং ব্রাহ্মণকে অস্পৃশ্যের বাড়ি গিয়ে। কাজেই আদিতে হোলী বা হোলক যে একান্তই অব্রাহ্মণ্য উৎসব ছিল, তা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, হোলক উৎসব আদিম মানুষের ভয় ভাবনা সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী কালে আর্যজীবনে স্বীকৃতির ফলে শুভপঞ্জিকায় ব্রাহ্মণ্য উৎসবের মধ্যে স্থান পাওয়া সত্বেও এর আদিমতম রূপ গোপন করা যায় নি। এখনও কোথাও কোথাও হোলী উৎসবকে 'শূদ্র উৎসব' বলা হয়।

শূদ্র উৎসব নামাকরণ কেন হোলী উৎসবের যথার্থ পরিচায়ক, তা বুঝতে হলে

আনুষঙ্গিক আচারানুষ্ঠান আরো একটু তলিয়ে দেখা দরকার। আহুতি দেবার জন্য যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তার মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। মাটি, শণ, তুষকাড়া অনেকেই জানেন, খড়ে তৈরী একটি মানব-প্রতিমা, কখনো-বা জীবন্ত একটি ভেড়াকে এই উৎসব উপলক্ষে সাড়ম্বরে দাহ করা হয়। বস্তুত এই মানব-প্রতিমা দাহ করবার রীতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রচলিত। গুজরাট অঞ্চলে মানবপুত্তলী সহ একটি শিশুমূর্তিকে আগুনে বিসর্জন দেওয়া হয়। তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলেও মানব-প্রতিমা দাহ প্রথা বর্তমান, বোধকরি এই প্রথানুসারেই হোলী উৎসবকে সেখানেও বলা হয় কামদহন। পরবর্তী কালে এই মানব-প্রতিমা দাহের নানারকম ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই পুত্তলিদাহের সঙ্গে শিবের ক্রোধে মদন-ভস্মের গল্প, প্রহ্লাদের গল্প, কৃষ্ণের দৈত্য নিধন ইত্যাদি পৌরাণিক আখ্যানের একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা খুব সহজেই চোখে পড়ে। অথচ, হোলী উৎসবের দহনানুষ্ঠানে আদিম মানবের নরবলি প্রথার স্মৃতি সুস্পষ্ট। আদিবাসীদের চলিত বিশ্বাস, জীবনের বিনিময়ে জীবন লাভ হয়। মানব জীবন কামনার ধন, কাজেই সেই কামনা ধনের বিনিময়ে সকল কামনার বস্তু মেলে। যে-জমি বন্ধ্যা, যে-জমি সুশস্য নয়, তাকে ফলপ্রসূ করতে পারে একমাত্র নররক্ত। কিন্তু নররক্ত পাওয়া যখন আর সহজসাধ্য রইল না, তখন নরবলি প্রথার পরিবর্তে নরমূর্তি বলি, পশুবলি ইত্যাদি প্রথার প্রচলন হয়। অনুষ্ঠান তখন আচারে পরিবর্তিত হয়। হোলী উৎসব উপলক্ষ্য করে মথুরাতে চন্দনে-পুষ্পে সজ্জিত করে একটি লোককে আগুনের উপর ঝাপ দিতে বাধ্য করা হয়। বিকল্পে সেই লোকটির সমপরিমাণ একটি সুতো দাহ করা হয়। এই দহনানুষ্ঠান প্রাচীন নরবলী প্রথার বিবর্তন মনে করার অন্য যুক্তিও আছে। নরবলি যে কারণে প্রজনন শক্তির কারক, সেই কারণে বোধ করি দেশকালপাত্র ভেদে নানারকম লৌকিক আচানুষ্ঠান সত্ত্বেও পুত্তলী দাহপ্রথা ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃহীত হয়েছে। মেদিনী-পুর অঞ্চলে বিশ্বাস, প্রজ্জ্বলিত হোমশিখা শস্যের প্রাচুর্যের নির্দেশক। গঞ্জাম অঞ্চলে প্রথম কর্ষণের পর হোমের ছাই ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, জনসাধারণের বিশ্বাস, এতে ধরিত্রী সুশস্যা হন। উত্তরপ্রদেশে চামারদের মধ্যে ধারণা, হোমমণ্ডল থেকে আধপোড়া কাঠ তুলে এনে গোলাঘরে রেখে দিলে গোলাঘর কখনো শস্যশূন্য হয় না। বাংলাদেশেও এই হোমাগ্নি বা হোমকুণ্ডের ছাইকে গুহ্য যাদুশক্তি বা প্রজনন শক্তির বাহক বলে মনে করা হয়। কৃষি নির্ভর গণ্ড আদিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস হোমের আগুনে লাঙলের ফলা সেঁকে নিয়ে সেই লাঙল দিয়ে মাটির বুক চিরে দিয়ে ধরিত্রী সুপ্রসবা হন। কাজেই একথা মনে করতে বাধা নেই, হোলী পূজাচারের এই সব আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান আদিম কৃষি-জীবী সমাজের প্রয়োজনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
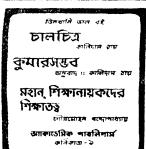
হোলী উৎসবে অঙ্গাঙ্গী সূত্রে জড়িত রয়েছে মদন-রতি, কৃষ্ণ-রাধার প্রেম ও লাস্য লীলা, আর সেই প্রেম লীলাকে কেন্দ্র করে রয়েছে সমাজ স্বীকৃত কতগুলি যৌনাচার। বিহার থেকে আরম্ভ করে বোম্বাই পর্যন্ত এই দিনটিকে উপলক্ষ্য করে লোকায়ত সমাজের সাধারণ স্তরে নানা ধরনের যৌন-মত্ততার ইঙ্গিত একেবারে চরমে পৌঁছয়। বাংলাদেশেও হোলী খেলার আনুষঙ্গিক হিসেবে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্যগীত প্রচলিত। বিহারে কবি গানের ছত্রে ছত্রে যৌনাচার বর্ণনা করা হয়। উত্তরপ্রদেশে, গোয়ালিয়রে, বারানসীতে মাটি, শণ, খড় ইত্যাদির তৈরী স্ত্রীপুরুষের নগ্ন মূর্তি কখনো প্রেমলীলায় মগ্ন, কখনো বা মিথুনা-বস্থায় শোভাযাত্রা করে সমস্ত শহর ঘোরান হয়। ইন্দোরে এই দিনটি উপলক্ষে নাথুরামের মন্দিরের সামনে নারীপুরুষের যৌনলীলা নৃত্যগীতে বর্ণিত হয়। হোলী উৎসবে এই জাতীয় যৌনাচারের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। আদিম মানুষের কাছে যৌনলীলা প্রজনন শক্তির বাহক। পরবর্তী-কালে ব্রাহ্মণ্য সমাজ হাসি, ঠাট্টা, ছল, চাতুরী, তামাশা এবং সামাজিক ভাবে স্বীকৃত কিছু কিছু কামাচারের মধ্য দিয়ে হোলী উৎসবের অঙ্গীভূত যৌনাচারকে মেনে নিয়েছে। সমাজ কতগুলি সম্পর্কের বাঁধন আলগা করে, (যেমন বউদি-দেবর, ভগিনীপতি-শ্যালিকা) হোলী উৎসবে যৌনাচারকে সমাজ বন্ধনে রাখবার চেষ্টা করেছে। বাৎস্যায়ন বসন্ত উৎসবে মত্ত নরনারীর একটি চিত্র অংকন করেছেন। জীমূতবাহনের কাল বিবেকে এই উৎসব উপলক্ষে প্রচুর নৃত্যগীত, বাদ্য, যৌন অঙ্গ ভঙ্গীর কথার উল্লেখ আছে।

হোলী উৎসবের সঙ্গে এক মূর্খ রাজার সম্পর্ক খুব পরবর্তী কালের। বোধ করি হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-ছলনা ইত্যাদির সূত্র ধরে হোলী-রাজ এক সময় উৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। হোলীর চতুর্থ দিনে রঙে কাদায়, মাটিতে সেজে পালকী বা গাধার পিঠে চড়ে এক মিথ্যা রাজা নগর পরিভ্রমণ করে। সমবেত জনতা হোলী-রাজাকে নিয়ে ছল চাতুরী, ঠাট্টা-তামাশা করে। এরকম একটি মূর্খ রাজার গল্প প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত ছিল। এই উৎসবের নায়ক ছিল একটি মিথ্যা রাজা। উলঙ্গ রাজা গাধার পিঠে চড়ে সমবেত জনতার হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রুপের পাত্র হয়ে, সর্বশেষে যখন জনতার হাতে প্রহারে জর্জরিত হয়ে ধূলিধূসরিত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যেত, তখন এই উৎসব সমাপ্ত হতো। হোলী উৎসবের মূর্খ রাজার সঙ্গে পারস্যে প্রচলিত মিথ্যা রাজার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, তবে হোলী উৎসবে হোলী-রাজার আবির্ভাব নিছক আনন্দের একথা মনে করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। প্রাচীন ভারতে মানুষকে সং সাজিয়ে আনন্দ করার পদ্ধতি অজানা ছিল না, কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজে সে প্রথা এখন পর্যন্ত প্রচলিত।

হোলী উৎসবের সুস্পষ্ট একটি চিত্র রচনা করা দুরূহ, তবে একথা বোধ হয় সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বলা যায়, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব যত স্পষ্টই হোক না কেন, এর ভেতর লোকায়ত ধর্মের প্রভাব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের চেয়ে কম নয়। আদিতে হোলী ছিল কৃষি সমাজের উৎসব—তাই লোকস্তরে একদিকে যাদু অন্যদিকে প্রজনন শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব।

প্রবন্ধের চিত্রগুলি শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অংকিত

বহুদিন ভ্রাতৃযুগলের অদর্শন। ভাবলাম খবরটা নিই একবার। বেলেঘাটায় তাদের কাঠগুদামে গিয়ে দেখি, লোকজন কেউ কোথাও নেই, কেবল গোবরা ভায়া একটা ক্যাশ বাকসের সামনে গোমড়া মুখে গালে হাত দিয়ে বসে।

অপাঙ্গে ভ্রূক্ষেপ করে দেখলাম, টাকা নেই, বাক্সর ভেতরটা ফাঁকা।

'গোবরা ভায়া, একা বসে যে? দাদা কোথায়?'

'দাদা ধর্ম করছেন।' বিরস বদনে সে বলল।

'ধর্ম? কর্ম ছেড়ে ধর্ম কেন হঠাৎ?' কাজটা যেন হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধ বলে আমার বোধ হয়।

'বলে কে! তীর্থ করতে বেরিয়েছেন আজ তিন মাস।'

'গেছেন কোথায়?'

'বৈদ্যনাথ বৃন্দাবন গয়া কাশি প্রয়াগ মথুরা কোথায় না! এইসব জায়গায় যাবেন বলে গেছেন। কোথায় আছেন এখন কে জানে!'

'আর যেখানেই যান ক্ষতি নেই, কেবল কাশিটাই হচ্ছে মারাত্মক।' আমি বললাম: 'ও জায়গায় প্রাপ্তিযোগ রয়েছে কিনা। কাশিপ্রাপ্তি বলে একটা কথা আছে শোনোনি?'

'শুনব না কেন? হরদম শুনছি। কাশতে কাশতে মারা গেলাম।' সে প্রকাশিত করে: 'নিজেই কাশছি নিজেকেই শুনতে হচ্ছে।' বলে আরেকজনকে শোনাবার সুযোগ পেয়ে সে এক ধমক কেশে নিল।

'ও, তাহলে তোমাদের দুজনেরই কাশি-প্রাপ্তি, দুজনের দুরকমের।' কাশিধ্বনিতে চমৎকৃত হই। 'ধর্ম জিনিসটা ভারী ছোঁয়াচে' আমি জানালাম। 'তা, দাদার কোনো চিঠিপত্র এসেছে?'

'কিছু না। কোনো খবর নেই। এমনকি একটা টেলিফোন পর্যন্ত আসেনি। বলে-ছিলেন মাঝে মাঝে ট্রাংককল করবেন। তাও না।'

'তাহলে ত ভারী মুশকিল!'

'মুশকিল বলে'! দু মাসের বেতন না পেয়ে কর্মচারীরা সব ধর্মঘট করেছিল। আমি বললাম, দাদা ধর্ম করছেন, তার ওপর আবার তোমাদের ধর্ম—অত ধর্ম এখানে সইবে না। একটু আগে তাদের সবাইকে ডেকে ক্যাশ বাক্সের ডালা খুলে দেখিয়ে দিয়েছি—বিলকুল ফাঁক! একটা নয়া পয়সাও নেই দেখে তারা সবাই কাজ ছেড়ে চলে দিয়েছে।'

'তা হর্ষবর্ধনবাবুর হঠাৎ এমন ধর্মে মতি হবার কারণ?'

'তাইত ভাবছি।' বলে সে আমাকেই প্রশ্ন করে বসে: 'আচ্ছা, দাদা কি লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো পাপটাপ করত?'

'আমার ত মনে হয় না। পাপাচরণ বর্ধনদের স্বভাববিরুদ্ধ।' আমি বলি।

'পাপটাপ করলেই ত লোকে সেটা কাটাবার জন্য গুরু ধরে, মন্তর নেয়, ধর্মকর্ম করে, তীর্থে বেরয়—। এই তো জানি! আমার মনে হয় দাদা লুকিয়ে কিছু পাপ কাজ করেছে।'

'কেন এমনটা মনে হয় তোমার?'

'কিছুদিন আগে দাদা বাড়িতে এক ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছে। রামসীতা ঠাকুর। আট ইঞ্চি সাইজের অষ্টধাতুর যুগল মূর্তি—বেশ দেখতে। রোজ চান করে শুদ্ধ হয়ে নিজে তার পুজো করত দাদা...অনেকক্ষণ ধরে।'

'কিন্তু কি পাপ করতে পারে তোমার দাদা? আমি ত কিছু ভেবে পাই না ভাই!'

'কেন, চোরা কারবার। সবাই যা করছে।'

'কাঠের কালোবাজার? নেহাৎ আকাঠের মত কথা বলছ! কাঠ ত সিমেন্ট নয়। পারমিট লাগে না তার। এনতার মেলে।'

'আপনিই একটা আকাঠ।' গোবর্ধন ফোঁস করে ওঠে: 'এমন আকাঠ যে আপনাকে

ক্যাশবাক্সের সামনে গোমড়া মুখে গালে হাত দিয়ে বসে

মেরে তক্তা বানানোও যায় না। বামুনে তো! গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা হয়ে যাবে তাহলে।'

'তা বটে!' সায় দিতে হয় আমায়।

'কি করে কাঠের কালোবাজার হয় শুনবেন তবে? ঘিয়ের মতন কাঠেও ভ্যাজাল দেওয়া যায়। সেগুনে কাঠ বলে বাবলা কাঠ চালিয়ে দিলাম—আকাঠ খদ্দের পেয়ে। না হয়, শাল কাঠ বলে শাল কাঠই দিলাম কিন্তু ঘুণধরা শাল। সেই শাল কাঠের খুঁটি দিয়ে

আর, সে কি রে? কাজ কারবার গুটিয়ে কোম্পানি লাটে তুলে দিয়ে বসে আছি চুপচাপ

বাড়ি বানালে ধসে পড়বে বাড়ি, কড়ি বরগা বানালে ভেঙে পড়বে ছাদ। এটা কালোবাজার নয়তো কি?'

শুনে আমি বিমূঢ় হই। 'কিন্তু তোমার দাদার পক্ষে এ কি সম্ভব?'

'দাদার ভগবানে মতি হবে সেইটাই কি আমি সম্ভব বলে ভেবেচি কোনোদিন?'

'ভগবৎ প্রেরণা হলে কী না হয়!' বলে মূকং করোতি বাচালং-এর শ্লোকটা ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছি এমন সময় টেলিফোনটা মুখর হয়ে উঠল। ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

রিসিভারে কর্ণপাত করে গোবর্ধন জানায় 'ট্রাঙ্ক কল' কাশির থেকে। দাদা করছে ফোন! হ্যালো দাদা! আমি গোবরা!'

'ভালো আছিস তো?' দাদার প্রথম প্রশ্ন। 'কাজ কারবার কেমন চলছে?'

'কাজ কারবার? ডকে উঠেছে সব।' গোবরা জানায়ঃ 'তোমার যেমন কাণ্ড! টাকা কড়ি কিচ্ছু দিয়ে যাওনি। বলে গেছলে সই করা চেক বই রইলো, নগদ দেড় লাখ টাকা রেখে গেলাম আয়রনসেফে। কিন্তু বলি, আয়রনসেফের কম্বিনেশনটা বলে দিয়ে গেছ? খুলব কি করে?'

'সে কি রে!'

'এদিকে মোটা টাকার গোটা কতক কন্ট্রাক্ট এসেছিল, নিতে পারলাম না। মালের যোগান দেব যে তার টাকা কই? কয়েকটা সরকারী টেন্ডারও ছেড়ে দিতে হল বাধ্য হয়েই। তার ওপর, দু মাস ধরে বেতন না পেয়ে কর্মচারীরা সব ধর্মঘট করে কাজ ছেড়ে চলে গেছে।'

'সে কি রে!' সবিস্ময় একই অব্যয়ের পুনরুক্তি দাদার।

'আর সে কি রে! কাজ কারবার সব গুটিয়ে কোম্পানি লাটে তুলে দিয়ে বসে আছি চুপচাপ। কারখানার মড়া আগলে।' গোবরা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে ঃ 'আয়রনসেফের কম্বিনেশন বলে যাওনি যেমন!'

'কম্বিনেশন আবার বলব কি রে! ওটা খুলতে কি আর কম্বিনেশন লাগে! সেফের কল বিগড়ে গেছে বহুকাল। জানিসনে না তুই? এমনি হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে টানলেই খুলে যাবে। অমনি খোলাই পড়ে আছে আজ দু বচ্ছর।'

'তাই নাকি?' গোবর্ধন লাফিয়ে গিয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আয়রনসেফ উন্মোচন করে। খুলতেই থরে থরে সজ্জিত একশ টাকার নোটের তোড়া সব, মায় সইকরা চেক-বই সমেত প্রকাশ পায়। হেসে ওঠে আয়রনসেফ। গোবরাও।

'বাঁচালে!' হাঁফ ছাড়ে গোবরা। 'ভালো, তুমি ফিরচ কবে শুনি?'

'কলকাতায়? এখন না। মাস কতক থাকব এখন কাশিতে। চারধাম ঘুরে দেখলাম। সব তীর্থ ঘুরে এখানে এসেছি এখন, জায়গাটা আমার ভারী মনে লেগেছে। এখানকার রাবড়ি আর পেড়ার তুলনা হয় না। কলকাতায় এমন জিনিস মেলে না। মণিকর্ণিকা ঘাটে বসলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।'

'তা বটে!' আমার সায় রাবড়ির কথায়।

'তা, তুমি কি মণিকর্ণিকাতেই বসে থাকবে আর এখানকার কাজকর্ম......'

'কেন, তুই তো রয়েছিস। যোগ্য ভ্রাতা সম পিতা। তুই-ই চালিয়ে নিতে পারবি। তুই রইলি, টাকাও রইলো, তবে আর ভাবনা কিসের?'

বলেই হর্ষবর্ধন একটা ভাবনার কথায় গিয়ে পড়েন—'ভালো কথা। ঠাকুরপুজোর কি হচ্ছে? ঠাকুরের নিত্যপুজো?'

'হচ্ছে না। কে করবে?' বামুন ঠাকুরকে বলেছিলাম......'

'কী সর্বনাশ। যে ভাত রাঁধে আমাদের? সে আবার কী পুজো করবে রে! সে কি মন্তর টন্তর জানে কিছু?......'

'সে রাজিও নয় করতে। করতেও না পুজো......'

'তুই করতে পারিস। চানটান করে শুদ্ধ হয়ে গরদ পরে তুই নিজেই ত করতে পারিস —পুরোহিত দর্পণখানা দেখে। আসল কথা হচ্ছে ভক্তি।'

'সেই ভক্তিই আমার নেই। আমার দ্বারা হবে না দাদা।'

'তাহলে ঠাকুরকে কাশিতে পাঠিয়ে দে। আমার কাছে। আমিই পুজো করব।'

'কে নিয়ে যাবে ঠাকুর?'

'তাই ত, কে নিয়ে আসবে। তুই নিজেই নিয়ে আয় না হয়। কি করে আনতে হবে বলে দিচ্ছি। গঙ্গা চান করে পট্টবস্ত্র পরে ঠাকুরকে গলায় বাঁধবি, একটা ঝোলার মতন করে তার মধ্যে রামচন্দ্র জীউকে বসিয়ে নিজের গলায় বাঁধবি, বুঝলি? যেন বুকের কাছটায় ঠেকে থাকে ঠাকুর। তারপর ঐভাবে......'

'ঐ ভাবে?' পুরো প্রেসকৃপসনটা জানতে চায় গোবরা।

'ঐভাবে......যেন কারো সঙ্গে ছোঁয়া নাড়া না হয়......রেলগাড়িতে আসা তো ঠিক হবে না, ছোঁয়াছুঁয়ি হবার ভয় রয়েছে। তিন্দ্র গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ি ভাড়া করে গোযানে চেপে সটান কাশি চলে আয়।'

'গোরুর গাড়িতে কাশি......সে তো তিন মাসের ধাক্কা! তার ওপর ঐ অষ্টধাতুর ভারী মূর্তি গলায় বেঁধে......না, দাদা, তাও আমি পারব না......'

'এই মরেচে! তাহলে কি পারবি তুই?'

'দেখি কী পারি।'

'বেশ, তাহলে বোম্বে মেলেই চলে যায়। আতুরে নিয়মো নাস্তি। যতটা সম্ভব কর। গঙ্গা চান করে শুদ্ধ হয়ে, গলায় না বাঁধতে পারিস, কোলে করেই নিয়ে আয় ঠাকুর। ফাস ক্লাসে আসবি তো, সেখানে ভিড় নেই তেমন, ছোঁয়াছুঁইরও ভয় নেই ততটা। নয়তো গোটা কামরাই রিজার্ভ করে আসিস না হয়। যতটা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে পারিস। সব সময় নাম জপতে জপতে আসবি...... রঘুপতি রাঘব রাজারাম......'

'জানি জানি, বলতে হবে না। আমি জানি সেসব। পতিত পাবন সীতা রাম—'

'জানিস তো, ছলনা করছিস কেন দাদা!' বলে দাদা ফোন রেখে দেন। তাঁর স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে, এত মাইল দূর থেকেও সেটা শোনা যায়।

আমার উপস্থিতিতে দুই ভাইয়ের সমস্যামোচন হয়ে গেল দেখে আমিও আশ্বস্ত চিত্তে বাড়ি ফিরি।

দিন কয়েক পর কলেজ স্কোয়ারে গোবর্ধনের সঙ্গে দেখা হতেই শুধলাম, কীহে, ঠাকুরের কি গতি করলে?

'পাঠিয়ে দিয়েছি ত।' সে বলল: 'উত্তমরূপে প্যাক করেই পাঠিয়েছি।'

'প্যাক করে? ঠাকুরকে?'

'হ্যাঁ। আগে ভালো করে চট দিয়ে মুড়ে তারপরে সেলাই করে......'

'অ্যাঁ? ঠাকুরকে চটে মুড়েছ? ঠাকুর না চটুন, তোমার দাদা চটে যাবেন কিন্তু। নির্ঘাৎ।'

'চটবেন কেন? তাঁর কথা মতন বোম্বে মেলেই পাঠিয়ে দিলাম—সেইদিন......'

'কার সঙ্গে পাঠালে?'

'কার সঙ্গে আবার? পার্শেল করে দিলাম ত!'

'পার্শেল করে পাঠালে......ঠাকুরকে?' বিস্ময় আমার থই পায় না।

'হ্যাঁ, ভালো করে চটে মুড়ে, ফোঁড় সেলাই দিয়ে প্যাক করে......প্যাকিং বাক্সের মধ্যে পুরে—পুরু করে খড় বিছিয়ে, যাতে চোট লেগে ঠাকুরের না অঙ্গহানি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছি। তারপরে লোহার পাত দিয়ে বেড়ে পেরেক মেরে ফাস ক্লাস করে রেলোয়ে পার্শেলে ছেড়ে দিয়েছি। দাদা পেয়ে গেছেন এতক্ষণ!'

'রেলোয় পার্শেলে পাঠালে ঠাকুরকে? বলো কি হে?'

'ভাঙাচোরার ভয় নেই কোনো। আপনি ভাববেন না। রেলের কুলীরা তোলা নামার সময় দুদ্দাড় করে ফেলে না ভেঙে দেয় সেজন্যে পার্শেলের ওপর আলকাতরা দিয়ে বেশ বড় বড় অক্ষরে স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছি......'

'কী লিখেছ আবার?'

'GOD WITH CARE'.
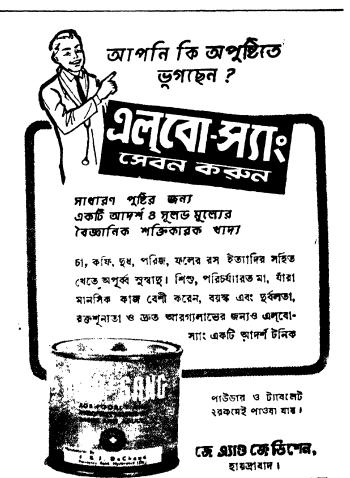
আপনার ছেলেমেয়েদের সর্দি ও কাশিতে সত্যিকার উপশম দিতে হ'লে

সিরোলিন 'রোশ' খাওয়ান

ছেলেমেয়েদের সর্দিকাশি হ'লে অবহেলা করবেন না—নিরাপদে দ্রুত ও সন্তোষজনক উপশমের জন্যে সিরোলিন খেতে দিন। সিরোলিনের চমৎকার স্বাদ ও স্নিগ্ধ আরাম ওদের কাছে ভালো লাগবে। আর আপনার নিজের পক্ষেও সিরোলিন উপকারী। সিরোলিন যে কেবল কাশি বন্ধ করে তাই নয়—কাশির অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে। সিরোলিন খুব দ্রুত গলা খুসখুসি কমাবে, শ্লেষ্মা দূর করতে সাহায্য করবে ও দুর্দমনীয় কাশিরও উপশম করবে।

বাড়ীতে হাতের কাছে সিরোলিন রাখতে ভুলবেন না

'রোশ'-এর তৈরী • একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

তৃতীয় রায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

॥ ৩ ॥

এর পর বিচার করা যাক কংগ্রেস দলের কথা।

এবারের নির্বাচনী ফলাফল দেখে এ কথা বললে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, কংগ্রেস এবার বিরোধী দলগুলোকে চালে পর্যুদস্ত করেছে। যাকে বলা চলে, ইলেকশন 'স্ট্রাটেজি'—সেই স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে কংগ্রেস লাভবান হয়েছে সব থেকে বেশী। এই স্ট্র্যাটেজি বা চালের ঘুটি নিপুণভাবে সাজিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ। এই ঘুটি সাজানোর কাজ তিনি সমাধা করেছিলেন অত্যন্ত নিঃশব্দে। এত নিঃশব্দে যে, বিরোধী দলের পক্ষে বোঝার মত কোন আভাস নির্বাচনের আগে তিনি দেননি।

এই নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিকে কংগ্রেস কাজে লাগিয়েছিল বিরোধী দলের এবং বিশেষ করে কম্যুনিস্ট পার্টির ঘাঁটি যেখানে। যেমন কলকাতায়, শিল্পাঞ্চলে এবং তেলেঙ্গানার প্রতিরূপ তে-ভাগা অঞ্চলে। শ্রী ঘোষ নিজেই বলেছেন এই স্ট্র্যাটেজির কথা। তাঁর স্ট্র্যাটেজি ছিল কম্যুনিজমের প্রসারকে রোধ করা।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কংগ্রেস এবার নির্বাচনের আসরে নেমেছিল। একটা বিষয়ে কংগ্রেস মহলের কোন দ্বিধা ছিল না। সেটা হলো, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুর্বলতার কোন অবকাশ নেই। তাই কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে-কথা নির্বাচকদের কাছে বলার ছিল তা বলা হয়েছিল নিঃসঙ্কোচে এবং নির্ভয়ে। প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থানে আঘাত করার সাহস ছিল কংগ্রেসের।

এটাই ছিল এবারের কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারের বৈশিষ্ট্য। তবু নীতি ও পদ্ধতির কথা উঠেছে। বিরোধী পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে যে কয়টি বিষয়, তা প্রধানত হল ভূমি-নীতি, বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, গৃহসমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা।

বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি নিয়ে প্রধান বিরোধী পক্ষ থেকে কোন গুরুতর সমালোচনা ওঠেনি। কারণ, সে অবকাশ ছিল না। লোকসভায় এবং বাইরে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই কথাই বলা হয়েছে বারবার যে, তাঁরা নেহরু-নীতিকে সমর্থন করেন। কম্যুনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিল যে, নেহরু-নীতির প্রতি আস্থাশীল বলেই তারা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননকে, আচার্য কৃপালনীর বিরুদ্ধে।

স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জ এসেছিল এই নির্বাচনে তা তার বৈদেশিক নীতিকে কেন্দ্র করে নয়। এই চ্যালেঞ্জ এসেছিল স্থানীয় সমস্যা নিয়ে। এই সমস্যার প্রধান ছিল জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক মানকে উন্নত করার বিষয়। কৃষকের সমস্যার সমাধান করা।

তাই যেখানেই অর্থনৈতিক সমস্যা ও কৃষি সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছিল, যেমন কলকাতায় ও ২৪ পরগণায়, সেখানেই কংগ্রেস সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর দেবার। উত্তর দেবার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কংগ্রেস অন্ততপক্ষে এবার উপলব্ধি করেছিল যে, পরিকল্পনার কাজ যা-ই হয়ে থাক তার মূল কথাটা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচকদের বলা প্রয়োজন।

যেমন ধরা যাক, মূল্যবৃদ্ধির কথা। মূল্য-বৃদ্ধি নিয়ে শহরাঞ্চলে এবং বিশেষ করে কলকাতায় অসন্তোষ আছেই। এটা অস্বীকার করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। তাই কংগ্রেস নেতারা এই কথাটা বারবার বলেছেন এবার যে, পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে যে বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়েছে এবং হবে তাতে মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য। তা ছাড়া আরও যা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে, তা এই যে, শহরাঞ্চলে যখন দর বৃদ্ধির জন্য অসন্তোষ দেখা দেয় তখন মূল্যবৃদ্ধি রোধের প্রতিবিধান গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি করেছে অসন্তোষ। এটা উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে চিরন্তন বিরোধ।

মনে হয় এই কারণেই এবার কংগ্রেস পক্ষ থেকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরি-কল্পনার উপর। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে এটাই বেশী ফুটে উঠেছিল। আরও যে-কথাটার উল্লেখ ছিল এই ইস্তাহারে তা দেশের ঐক্য সাধন। নির্বাচনের সূত্রপাতে অনেকের ধারণা ছিল যে, এই কথাটাই হয়ত এবার বড় 'ইস্যু' হয়ে উঠবে। তা হয়নি।

তবু কখনও যে তা ওঠেনি তা নয়। এই কলকাতাতেই উঠেছিল কথাটা। এমন কি, ব্যঙ্গচিত্রও পড়েছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কথাটা তোলে কম্যুনিস্ট পার্টি। নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করে বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস জাতীয় সংহতির ক্ষতি করেছে। তখনই দেখা গিয়েছিল ব্যঙ্গ-চিত্র যাতে আসামের এক কম্যুনিস্ট নেতাকে দেখানো হয়েছিল মশাল হাতে।

অ-অসমীয়ার ঘরে আগুন লাগাবার জন্য সেই নেতাকেই দায়ী করা হয়েছিল।

মোট কথা, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারেই ছিল সুস্পষ্ট একটা কর্মপদ্ধতি বা প্রোগ্রাম। সে প্রোগ্রামের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়েছে কি না বলা কঠিন, তবে এটা ঠিক যে, নির্বাচকরা কংগ্রেসের কাছেই প্রোগ্রাম পেয়েছিল। অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রোগ্রাম যতটুকু ছিল, তার বেশী ছিল কংগ্রেস রাজত্বের সমালোচনা। এমন কি, পরিকল্পিত বিকল্প সরকারেরও কোন প্রোগ্রাম নির্বাচকদের সামনে ছিল না।

হয়ত সে-কারণেই কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কোনরকমেই দুর্বল পথে পরিচালিত হয়নি। বিপক্ষ শক্তির দুর্বল স্থানে বার-বার আঘাত করেছিল বলেই হয়ত কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কলকাতার উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনকে 'প্রেস্টিজ' নির্বাচন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, অন্ততঃ এই একটা কেন্দ্রে যদি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর পরাজয় ঘটানো যায় তা হলে তা কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে। ফলে, এই কেন্দ্রে যে পার্টি-কর্মীদের সমাবেশ ঘটেছিল তা প্রায় অভূতপূর্ব। অনেকে মনে করেন, এটা বিপক্ষ দলের স্ট্র্যাটেজিক্যাল ভুল। হতে পারে; তবে এটা ঠিক, কলকাতায় এই নির্বাচনী সংগঠন বিপক্ষ দলকে অন্যান্য কেন্দ্রে দুর্বল করে দিয়েছিল।

সেই সংগে ছিল কংগ্রেস সংগঠন কম্যুনিস্টদের ঘাঁটিতে। বিরোধী পক্ষ কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল এই সব ... সম্বন্ধে। যেমন মহেশতলা, বিষ্ণু... হাসনাবাদ, কালীঘাট, বালীগঞ্জ, ক... সুকিয়া স্ট্রীট, ভাটপাড়া ইত্যাদি ... নির্বাচনের পর দেখা গেল এই সব ... কংগ্রেস সংগঠন করেছিল সবচাইতে ...

এই সংগঠন নিশ্চয়ই বিরোধী পক্ষ ... করেনি কংগ্রেসের কাছ থেকে। সেই ... নির্বাচনের ফলাফল যখন প্রকাশিত হ... এই সব কেন্দ্রের তখন বিরোধী প... হতবাক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ... না। বিরোধী পক্ষের আশা ছিল, কং... এবারের নির্বাচনে কলকাতা থেকে ... মুছে যাবে। কারণ, গত নির্বাচনের ... ইংগিত ছিল কলকাতায় ... কংগ্রেস ... পিছু হটার ইংগিত। ১৯৫৭ সালে কং... ৪টি আসন কলকাতায় হারিয়েছিল ... মোট আসন-সংখ্যা পেয়েছিল ৮। এবং ... কম্যুনিস্ট প্রার্থী কলকাতায় কিছু ... করা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস কলকা... থেকে এবার আরও ছয়টি আসন ... করেছে। আর কম্যুনিস্ট পার্টি হারিয়েছে তিনটি আসন। গত নির্বাচনে ছিল ... আসন, এবার পেয়েছে সাত। কম্যুনি... পার্টির পরাজয়ের মধ্যে বড় রকমের ... এসেছে কালীঘাটে শ্রীমতী ... সেনের পরাজয়ে। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী... বিভা মিত্র তাঁর গতবারের পরাজয়ের প্রতি... শোধ নিয়েছেন এবার। আর হারাতে হয়েছে বালিগঞ্জের, তালতলার এবং ... (যা পি এস পি-র হাতে ছিল) ...

এবারের হিসেবমত দেখা যায়, কল... কাতার ২৬টি আসনের ১৪টি আসন কংগ্রেসের হাতে এসেছে। বিরোধী পক্ষ পেয়েছে বাকী ১২টি। কংগ্রেসের পক্ষে কলকাতার ফলাফল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সাফল্য বামপন্থী রাজনীতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। বিরোধী পক্ষের প্রকৃত পরাজয় ঘটেছে কলকাতায়।

কলকাতায় এই বিপর্যয় সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের হতাশ হবার কারণ ঘটেনি। কারণ, ভোটাংশের সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি ঘটেছে ভোটাংশের সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি ঘটেছে কম্যুনিস্ট পার্টির। গত নির্বাচনে এই পার্টি পেয়েছিল শতকরা ২২·৪১; এবার পেয়েছে শতকরা ৩২·৬৩। অন্য দিকে কংগ্রেস গত নির্বাচনে পেয়েছিল (আসন হারিয়েও) প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২·৮৯; এবার পেয়েছে শতকরা ৪৭·০৪। হিসেবের দিক থেকে ভোটবৃদ্ধি বেশী হয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির, অন্ততঃ কংগ্রেসের তুলনায়। তবে এই বৃদ্ধির ভোট যুগিয়েছে পি এস পি, যার ভোটাংশ কমেছে শতকরা ৯·১২। অর্থাৎ কংগ্রেসের দিকে কলকাতার ঝুঁকি বেড়েছে শতকরা ৩·০৫।

কলকাতায় কংগ্রেসের জয় থেকে এটা
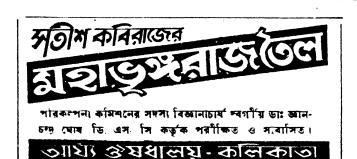
ধরে নেওয়া ভুল হবে যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগঠনে কোথাও কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। কয়েকটি জেলায় এই নির্বাচনী সংগঠন দুর্বল ছিল বলেই কংগ্রেসকে এবার কয়েকটি জেলায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

যেমন ঘটেছে কোচবিহারে। এই জেলাকে নির্বাচনী ভাষায় বলা চলে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের জেলা ছিল। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস এই জেলার সাতটি আসনই অল্প আয়াসেই পেয়েছিল। এবারের নির্বাচনে সেই সাতটি আসনের একটি ছাড়া আর সব কটিই কংগ্রেসকে হারাতে হয়েছে। এই আসনগুলো হারাতে হয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লক এবং কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে। ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে পাঁচটি এবং কম্যুনিস্ট পার্টি একটি।

কোন কোন রাজনৈতিক মহলের মতে সাম্প্রতিককালে কোচবিহারে যে পুলিসের অত্যাচার ঘটে গিয়েছে তারই ফলে কংগ্রেসকে এবার আসনগুলো হারাতে হয়েছে। কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য কি না বলা কঠিন; কারণ, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের আগে কোচবিহারে পুলিসের গুলিতে ছয়জন নিহত হয়েছিল খাদ্য আন্দোলনে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে সেখানে সব কটি আসনই কংগ্রেস পেয়েছিল। এমন কি কংগ্রেস যেখানে পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৮·০৯ ভাগ, ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছিল শতকরা ১২·১৫ ভাগ এবং কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছিল শতকরা ৭·০৫ ভাগ। এবার কংগ্রেস আসনও হারিয়েছে, ভোটাংশেও প্রায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এবার পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৮·৪৯। অন্য দিকে কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছে শতকরা ১৬·৭৫ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছে শতকরা ৩৮·২৮।

ভোটাংশের ওঠা-নামাই কোচবিহারের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ফরোয়ার্ড ব্লকের ভোট বৃদ্ধি হয়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৬·১৩ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৯·৭০। মুখ্যত এই বৃদ্ধি এসেছে কংগ্রেসের অনুকূলে যে ভোট ছিল তা থেকে। ফলে যে জেলা সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের দিকে ছিল, বর্তমান নির্বাচনের ঝুঁকি দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫·৮৩ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কারো কারো মতে, কংগ্রেসের ঔদাসীন্য এবং সংগঠনী দুর্বলতাই এবারের বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে এই জেলায়। তা ছাড়া পাট ও তামাকের দর অনেকাংশে দায়ী বললে ভুল হবে না। দামের নিম্নগতি থেকে কৃষকদের কংগ্রেস বাঁচাতে পারেনি,—এটা বেশ বড় কারণ হয়েই দেখা দিয়েছিল।

এবারের নির্বাচনের সময় কংগ্রেস পক্ষ থেকে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। অনেক সময় একটা যুক্তি শোনা যায় যে, পরিকল্পনার কাজ যেখানে যত ভালভাবে হয় সেখানেই কংগ্রেসের বুনিয়াদ পাকা হয়। এমন কি, বিধানসভায় এক সময় সমগ্র বিরোধীপক্ষ থেকে অভিযোগ এসেছিল যে, তাদের এলাকায় কংগ্রেস সরকার কোন পরিকল্পনার কাজ হাতে নেয়নি। পরিকল্পনার কাজ কোন অঞ্চলে ভালভাবে না হয়ে থাকলে সে-অঞ্চল কংগ্রেসের হাতে চলে যাবে কিনা তা বলা কঠিন, তবে এটা অন্তত দেখা গেছে যে, পরিকল্পনার কাজ যেখানে বেশ ভালভাবে করা হয়েছে সেখানেও কংগ্রেস বিপর্যস্ত হয়েছে।
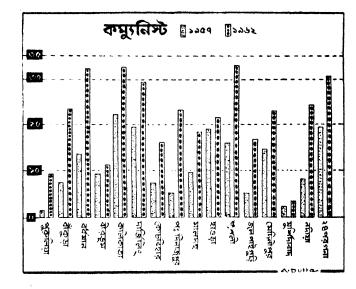
যেমন, বীরভূম জেলা। এই জেলায় পরিকল্পনার কাজ যেমন হয়েছে, চাষের জল যোগাবার জন্য ময়ূরাক্ষীর মত বড় সেচ পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হয়েছে। অথচ গত নির্বাচনের মত এবারের নির্বাচনেও কংগ্রেস সফল হয়নি এই জেলায়। গত নির্বাচনে জেলার ১০টি আসনের পাঁচটি এসেছিল কংগ্রেসের হাতে; এবার এসেছে চারটি।

তবে বীরভূম জেলা সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় যে, এখানকার নির্বাচকদের সামগ্রিক ঝুঁকি বদলেছে কংগ্রেসের দিকে। গত নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২০·০৮; এবার পেয়েছে শতকরা ৪০·৬১। অন্য দিকে, কম্যুনিস্ট পার্টি গতবারের তুলনায় এবার পেয়েছে শতকরা ২·০৪ ভাগ বেশী। সামগ্রিকভাবে তাই বলা চলে, কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকি দেখা দিয়েছে শতকরা ১৪·৪৯।

আরও দুটি জেলায় কংগ্রেসকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তা হ'ল মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা। নদীয়া জেলায় ১১টি আসনের মধ্যে ১০টি আসনই কংগ্রেসের হাতে এসেছিল ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে। এবার কংগ্রেস পেয়েছে ৬, অর্থাৎ হারিয়েছে ৫টি আসন। তার চাইতেও বেশী উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই জেলায় কংগ্রেসের ভোট-

সংখ্যা এবার বেশ কিছুটা কমেছে। গত নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটসংখ্যা ছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৫·৪৯; এবার হয়েছে ৪৪·৪২। কম্যুনিস্টদের ভোটসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৬·৪০।

এই জেলায় দুটি নির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠনে বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। জেলা কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলি ছিল, তা প্রকাশ্যে আলোচিত হয়েছে এবং জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব এক দলের হাত থেকে অপর হাতে গিয়েছে। অনেকের মতে জেলা কংগ্রেসের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্বাচনের ফলাফলেও প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু বীরভূমের ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রযোজ্য, নদীয়ার পক্ষেও সে-কথা কিছুটা খাটে। যদি পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে জলকর হিসাবে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চেপে থাকে এবং সে-কারণে বীরভূমের নির্বাচকরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে থাকে, তা হ'লে নদীয়ার কিছু অংশেও সে যুক্তি প্রযোজ্য। এ যুক্তি সর্বত্র প্রযোজ্য হতে পারে না; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা যে বড় কারণ হয়ে উঠতে পারে তা বোঝা যায় বর্ধমান জেলার দিকে তাকালে। জেলার যে-অংশে দামোদর পরিকল্পনার জন্য জলকর ধার্য আছে সেই সব অঞ্চলে সাধারণভাবে নির্বাচকরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে বলা চলে।

তবে মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধে সে-কথা প্রযোজ্য কিনা বলা কঠিন। এই জেলায় কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে বড় করে যেটা দেখানো হচ্ছে তা কংগ্রেস মহলের অন্তর্বিরোধ। কিন্তু অন্তর্বিরোধ মুর্শিদাবাদ বা নদীয়া বা বর্ধমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই মুর্শিদাবাদে দেখা যায় যে, এবারের ফলাফলে জেলার কংগ্রেস সংগঠনে যেন ধস নেমে গিয়েছে। গত নির্বাচনে এই জেলার ১৬টি আসনের মধ্যে ১৫টি ছিল কংগ্রেসের হাতে; এবার এসেছে ৮টি। এমন কি, ভোটসংখ্যাও শতকরা ৪০·৯৯ থেকে কমে এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৯·৮৪।

অনুরূপভাবে কংগ্রেস আসন হারিয়েছে মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুরে, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলায়। এইসব জেলায় নির্বাচনী শক্তি পরীক্ষায় কংগ্রেসকে কিছুটা হার স্বীকার করতে হয়েছে। কেন এইসব হার হয়েছে তা কংগ্রেস মহলের বিচার্য বিষয়; তবে এটা বলা চলে যে, এইসব জেলায় বিরোধীপক্ষের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন পশ্চিম দিনাজপুরে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১৩·৯০ অংশ ঝুঁকেছে বামপন্থীদের দিকে। তেমনি কংগ্রেসবিরোধী ঝুঁকি দেখা গিয়েছে হুগলী জেলায় শতকরা ৯·৬২ ভোট।

এবারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে গত নির্বাচনের তুলনায় ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকি দেখা গিয়েছে পশ্চিমবাংলার বেশীর ভাগ জেলায়। তাই বাঁকুড়া জেলায় যদিও চারটি আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে হয়েছে, তবু সমগ্র জেলায় কংগ্রেসের ভোটাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২১·৬০ এবং নির্বাচকদের ঝুঁকি গিয়েছে কংগ্রেসের দিকে শতকরা [illegible]। আর যেসব জেলায় কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকি সুস্পষ্ট হয়েছে তা হ'ল পুরুলিয়া (শতকরা ১·২১), বীরভূম (শতকরা ১৮·৪৯), কলকাতা (শতকরা ৩·০৫), দার্জিলিং (শতকরা ৬·২২), মালদহ (শতকরা ২·১১), হাওড়া (শতকরা ৭·৯৬), মেদিনীপুর (শতকরা ৬·৬৬) এবং ২৪ পরগনা (শতকরা ৪·৩৪)।

বিরোধীপক্ষের দিকে ঝুঁকি গিয়েছে নদীয়ায় (শতকরা ১৬·৪৫), মুর্শিদাবাদে (শতকরা ২·১৯), জলপাইগুড়িতে (শতকরা ০·১১), হুগলীতে (শতকরা ৯·৬২), পশ্চিম দিনাজপুরে (শতকরা ১৩·৯০), কোচবিহার (শতকরা ৯·৩২) এবং বর্ধমানে (শতকরা ১·৯৪)। গতবারের নির্বাচনের হিসেবে দেখা যায় যে, দু-তিনটি জেলা ছাড়া বেশীর ভাগ জেলায় নির্বাচকদের ঝুঁকি ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

অন্য আর এক দিক দিয়েও কংগ্রেসের পক্ষে এ-নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেভাবেই হোক, স্বতন্ত্র পার্টি বর্তমান নির্বাচনে বিশেষ একটা আশংকা নিয়েই কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলোর সামনে দেখা দিয়েছিল। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, অন্যান্য রাজ্যেও।

প্রথম নির্বাচনের সম্মুখীন হয়ে স্বতন্ত্র পার্টি অন্ততপক্ষে নির্বাচকদের মনে দাগ কাটতে পেরেছে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার যে ফলাফল জানা গেছে তাতে দেখা যায়, স্বতন্ত্র পার্টি ১৬৮টি আসন দখল করেছে। কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট পার্টি—দু

পক্ষের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনা এসেছে স্বতন্ত্র পার্টির বিরুদ্ধে। এই দল প্রতি-ক্রিয়াশীল দল বলেই সাধারণ নির্বাচকদের কাছে পরিচিত হয়েছিল। তবু, এ-নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি সবচাইতে বেশী রেখাপাত করেছে বিহার রাজ্য বিধানসভায় ৩১৮টি আসনের মধ্যে ৫০টি আসন দখল করে।

বিহার সম্বন্ধে কংগ্রেস মহলে স্বতন্ত্র পার্টি সম্বন্ধে আশঙ্কা যে না ছিল এমন নয়। এবার কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন পাটনায় যখন বসে তখনই এ-সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। এটা লক্ষ্য করেই পাটনা অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তীব্র ভাষা ব্যবহার করেছিলেন স্বতন্ত্র পার্টির সমালোচনা করতে গিয়ে। কংগ্রেস নেতারা সেই সময় এই পার্টিকে হেলিকপটার, পাগড়ি ও টুপির বিচিত্র সমাবেশ বলে বিদ্রূপও করেছিলেন।

কারণ, পাটনায় কংগ্রেস অধিবেশন যখন চলছিল তখন অনেকেই দেখেছে স্বতন্ত্র পার্টির হেলিকপটার। এই হেলিকপটার সম্বন্ধে পরে যেটা শোনা গেছে সেটা আরও চমকপ্রদ। আজ আর অবিদিত নেই যে, স্বতন্ত্র পার্টির এই হেলিকপটার আসে আমেরিকার কাছ থেকে নয়, আমেরিকার বিরোধী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কোন একটি কম্যুনিস্ট দেশ থেকে। চমকটা এখানেই শেষ হয়নি, হেলিকপটার চালনা শিক্ষা দেবার জন্য সে-দেশ থেকে টেকনিসিয়ানও এসেছিল বিহারে। পরে অবশ্য সে-দেশের প্রতিনিধি জানতে পারে যে, এই হেলি-কপটার এসেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনের কাজে। হেলিকপটারের চটক বিহারে অন্ততপক্ষে বেশ কিছুটা যে ফল-প্রসূ হয়েছে তা নির্বাচনের ফল দেখেই বোঝা যায়।

তবু, এটা স্পষ্ট যে, বিহারের রাজ-নীতিতে স্বতন্ত্র পার্টির জমিদারি নীতি বেশ কিছুটা মিশে গিয়েছে। এককালে যারা ক্ষুদে রাজা ছিলেন, প্রজাদের দাপটে রাখতেন, তাঁরাই এখন স্বতন্ত্র পার্টির প্রধান হয়ে উঠেছেন। বিহারে এই প্রাক্তন রাজাদের প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর যতদিন অটুট থাকবে, ততদিনই স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিপত্তি থাকবে। ততদিন পর্যন্ত বিহারের রাজনীতি প্রভাবান্বিত করবেই।

হয়ত এই কারণেই উড়িষ্যায় প্রাক্তন রাজা-দের গণতন্ত্র পার্টির নাম বদলে স্বতন্ত্র পার্টি রাখা হয়েছে। মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে এই পার্টি কংগ্রেসের সাফল্যে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মনে হয়, প্রজাদের উপর কমে আসা প্রভাব জিইয়ে রাখার জন্যই পার্টির নাম বদলে ফেলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য যে-সব রাজ্যে স্বতন্ত্র পার্টি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মধ্যে রাজস্থান ও গুজরাট অন্যতম। গুজরাটে বিধানসভার ১৫৪টি আসনের মধ্যে ২৬টি আসন স্বতন্ত্র পার্টি পেয়েছে। ফলে বিহারের মত এ রাজ্যেও এই পার্টি আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রধান বিরোধী দল বলে গণ্য হবে। রাজস্থানে স্বতন্ত্র পার্টি পেয়েছে ৩৬টি আসন এবং সেই সঙ্গে জনসংঘ পেয়েছে ১৫টি আসন। নির্দলীয় নির্বাচিত হয়েছে ২২ জন। এর ফলে রাজস্থানে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি, যদিও কংগ্রেসই হয়েছে বৃহত্তম দল। ক্ষমতা হয়ত কংগ্রেসের হাতেই যাবে, কিন্তু প্রধান বিরোধী দল হিসাবে স্বতন্ত্র পার্টির প্রভাব নিঃসঙ্কোচে বৃদ্ধি পাবে। অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূরে পাঞ্জাবেও স্বতন্ত্র পার্টি বিধানসভার আসন জয় করেছে। ফলে এইসব রাজ্যে স্বতন্ত্র পার্টি আইনসভার মধ্যে জোরালো বিরোধী দল হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে।

এই পার্টি একটি আসনও পায়নি পশ্চিম বাংলা, মহারাষ্ট্র ও আসামে। এই তিনটি রাজ্যে স্বতন্ত্র পার্টি কোন আসন পায়নি। তাই রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, স্বতন্ত্র পার্টির পরাজয় ঘটেছে এই তিনটি রাজ্যে সম্পূর্ণ-ভাবে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই পার্টি সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আসন পাকা ক'রে নিয়েছে। সুযোগ পেলেই এই পার্টি কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে গণ্য হবার চেষ্টা করবে। এই পার্টি তাই কংগ্রেসের কাছে নবতম চ্যালেঞ্জ।

প্রতিক্রিয়াশীল দল হিসেবে হিন্দু মহাসভা ভারতের রাজনীতি থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে। জনসংঘেরও অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ১৯৫৭ সালের মত এবারের নির্বাচনেও এই দুটি দল পশ্চিম বাংলায় একটি আসনও পায়নি। দুটো নির্বাচনেই নির্বাচকরা এই দুটো পার্টির প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি।
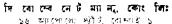
জনসংঘ পশ্চিম বাংলায় কোন আসন না পেলেও পাঁচটি রাজ্যে কিছু আসন পেয়েছে। এই পাঁচটি রাজ্য বিধানসভায় মোট ১১৫টি আসন পেয়েছে। তার মধ্যে সবচাইতে বেশী পেয়েছে মধ্যপ্রদেশে। এই রাজ্যে জনসঙ্ঘ ৪১টি আসন, পি-এস-পি ৩০টি আসন এবং নির্দলীয়রা ৩৯টি আসন পাওয়ার ফলে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের আসন খানিকটা টলে উঠেছে। এই সংকট থেকে মুক্ত হ'য়ে কংগ্রেস যদি প্রধান হ'য়ে উঠতে পারে তবেই মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি সুস্থ পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। না হ'লে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ খুঁজবে। মধ্যপ্রদেশের (ডাঃ কাট[illegible] পরাজয়ের পর) বর্তমান সংকট এ[illegible] এই দিক থেকেই।

এ ছাড়া আর যেখানে জনসংঘ প্রবল [illegible] উঠেছে তা হ'ল উত্তর প্রদেশ। এই প্র[illegible] বেশ কিছুদিন থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব [illegible] বিবাদ চলেছে। সে বিবাদ যে এখ[illegible]

যেন তীব্র হ'য়ে আছে (বিহারে যেমন আছে) তার আভাস এই নির্বাচনেও পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এই নেতৃত্বের লড়াই-এ সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে জনসংঘ, এবং উত্তর প্রদেশের নতুন বিধানসভায় এই দলই হবে বৃহত্তম বিরোধী দল। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান নির্বাচনের ফলে অন্ততপক্ষে সাতটি রাজ্যের বিধানসভা থেকে এই দল নির্বাসিত হয়েছে। তবু ১৯৫৭ সালের তুলনায় এই দলের আসনসংখ্যা বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৯টি। কম্যুনিস্ট পার্টি ও স্বতন্ত্র পার্টির পরেই জনসংঘের স্থান নির্ধারণ করা যায়, অন্তত দলগত আসনসংখ্যার হিসেব অনুসারে।

পশ্চিম বাংলায় ও আসামেও জনসংঘ রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভার কোন আসনই পায়নি। আসাম সম্বন্ধে এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কম্যুনিস্ট পার্টিকেও জনসংঘের মত বিদায় নিতে হয়েছে এই রাজ্যের আইনসভার রাজনীতি থেকে। রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভার কোন আসনই কম্যুনিস্ট পার্টি পায়নি।

অথচ বলা যায়, পশ্চিম বাংলার পরেই অন্য যে রাজ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তা আসাম। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে গঠিত আসাম বিধানসভায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা সংখ্যায় বেশী না হলেও বিশেষভাবে সক্রিয় ও প্রবল ছিল। এমন কি, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের পর এক উপনির্বাচনে কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রীফণী বোরা কংগ্রেস নেতা শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়াকে যখন পরাজিত করে তখন শুধু আসামেই নয়, কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন মহলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। এবারের নির্বাচনে আসামের কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত।

আসামে বর্তমানে নির্বাচনের বড় রকমের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল তথা-কথিত অসমীয়া ভাষা আন্দোলন এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বিক্ষোভ।

আসামের ভাষা আন্দোলনের সময় সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে যে বর্বরতা প্রকাশ পেয়েছিল তার দাগ এখনও মুছে যায়নি। বাংগালীরা নির্যাতিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এবং পুলিসের গুলীর সামনে আত্মাহুতি দিয়েছে কাছাড় অঞ্চলে। এই অবস্থার মধ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মত কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও এসেছিল অন্তর্বিরোধ। কিন্তু এই অন্তর্বিরোধের হাত থেকে আসামের কোন রাজনৈতিক দলই রেহাই পায়নি। কাজেই এ যুক্তি অচল হয়ে যায় যে, তথা-কথিত ভাষা আন্দোলনের মূল্য দিয়েছে একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি।

অন্তর্বিরোধের দিক থেকে বিচার করলে কংগ্রেসেরই সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা। কারণ, দেখা যায়, নির্বাচনের পরে কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আসামে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে। তা ছাড়া, আসামে কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যপদ্ধতির সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের অজানা নেই যে, গত কয়েক বছর ধরেই এই পার্টি আসামের বিভিন্ন এলাকায় এদের প্রভাব বিস্তার করেছে নানাভাবে। তবু আসামের নির্বাচকরা কম্যুনিস্ট পার্টিকে তাদের সমর্থন জানায়নি। বিস্ময় এসেছে এই দিক থেকে।

কম্যুনিস্ট পার্টির বিঘোষিত নীতি ছিল, কেরালার পর পশ্চিম বাংলা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা ছিল পশ্চিম বাংলার পর আসাম। সেই আসামে পার্টি বিপর্যস্ত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিরাশ হতে হয়েছে।

নির্বাচনের সমগ্রভাবে যে রাজনৈতিক চেহারা দেখা যাচ্ছে তাতে কম্যুনিস্ট পার্টির স্থান অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আসাম থেকে, গুজরাট থেকে পার্টিকে মুছে দিয়েছে এই নির্বাচন।

অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিম বাংলা ছাড়া আর সব রাজ্যে পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান নির্বাচনে এই দল রাজ্য বিধানসভার আসন পেয়েছে ১২টি বিহারে, ১টি মধ্যপ্রদেশে, ২টি মাদ্রাজে, ৬টি মহারাষ্ট্রে, ৩টি মহী-

শ্বরে, ৯টি পাঞ্জাবে, ৫টি রাজস্থানে, ১৪টি উত্তর প্রদেশে, ৪৯টি পশ্চিম বাংলায় এবং ৫১টি অন্ধ্রে। লোকসভায় ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের মত এবারে এই পার্টি দখল করেছে ৪৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসন।

রাজনীতির বিচারে পশ্চিম বাংলার নির্বাচন তাই সবচাইতে বেশী উল্লেখ-যোগ্য। এই রাজ্য কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। পার্টির পক্ষে তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নির্বাচনী চটকের। সেই প্রয়োজনেই বামপন্থী জোটের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন শেষে দেখা যাচ্ছে, জোটের ফলে ফরোয়ার্ড ব্লক বিরোধী দলের মধ্যে (কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া) এবার যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্য দিকে, কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিধানসভায় ফরোয়ার্ড ব্লক নিজস্ব শক্তির অধিকারে কথা বলার দাবি জানিয়েছে—কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নয়। ফলে বামপন্থী জোটের মধ্যে হতাশা আরও গভীর হয়ে দেখা দেবার সুযোগ ঘটেছে।

অন্য দিকে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস দলই দাবি করতে পারে যে, জেলায় জেলায় যত অন্তর্বিরোধই থাক না কেন, বিধান-সভার নেতৃত্ব নিয়ে অন্ততঃপক্ষে কোন বিরোধ নেই। তা ছাড়া বিরোধীপক্ষের প্রধান ঘাঁটিগুলো অধিকার করে চমক লাগিয়েছে কংগ্রেস এই পশ্চিম বাংলায়। নির্বাচনের দিক থেকে কংগ্রেস পক্ষে এটাই প্রধান লাভ, রাজনৈতিক জয়।

সব মিলিয়ে বর্তমান নির্বাচন সম্বন্ধে যা নজরে আসে, তা প্রধানত এই যে, (১) এবারের নির্বাচন অনেকাংশে রাজনৈতিক ভিত্তিতে হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় এই লক্ষণ সুস্পষ্টভাবেই এবার দেখা গেছে। শুধু শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলেই নয়, কোন কোন গ্রামাঞ্চলেও নির্বাচকদের রাজনৈতিক চেতনা এই নির্বাচনে প্রতি-ফলিত হয়েছে।

(২) রাজনীতির লড়াই এই নির্বাচনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলেই এবার পশ্চিম বাংলায় বেশী সংখ্যক নির্বাচক ভোট দেবার জন্য এগিয়ে এসেছে। ১৯৫৭ সালে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচকদের সংখ্যা ছিল ১,৫২,১৬,৫৩২। তাদের ভোট সংখ্যার (দ্বি-আসনযুক্ত কেন্দ্রগুলিতে প্রত্যেক নির্বাচক দুটো করে ভোট দিয়েছিল) শতকরা ৪৭·৭৩ ভোট দ্বিতীয় নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত করেছিল। এবারের নির্বাচনে নির্বাচকসংখ্যা ছিল ১,৬১,৮৪,৬৮৫। তাদের মধ্যে শতকরা ৫৮·৮৬ জন এবার ভোট দিয়েছিল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভোটদানের শতকরা হার ছিল ৫৩·৬৯; অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় সর্বভারতীয় শতকরা হারের বেশী ভোট পড়েছে এই নির্বাচনে।

(৩) পুরুষের সংখ্যা বেশী হলেও মেয়েদের সংখ্যাও এই নির্বাচনে কম ছিল না এবং তারা দলে দলে এবার ভোট দেবার জন্য গ্রামে ও শহরাঞ্চলে এগিয়ে এসেছে। ফলে, প্রতি জেলায় এবার ভোটদানের সংখ্যা অনেকাংশে বেড়েছে।

(৪) এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যেসব অঞ্চলে ভোটদানের শতকরা হার ৫০-এর ঊর্ধ্বে উঠেছে সেখানেই ভোটের মোট অংশ গিয়েছে কংগ্রেসের অনুকূলে। যেমন, হুগলী জেলায় প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার এবার ছিল ৬৩·১৯ এবং এখানে কংগ্রেস পেয়েছে ঐ ভোটের শতকরা ৫০·১৩ আর কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছে শতকরা ৩৩·০৯। হাওড়ায় প্রদত্ত ভোটের হার শতকরা ৫৮·৩২; তার মধ্যে শতকরা ৫০·১০ পেয়েছে কংগ্রেস, শতকরা ২১·৬৬ পেয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টি। কলকাতায় ভোট দিয়েছে শতকরা ৬৬·১৯ এবং তার মধ্যে ৪৭·০৪ জন দিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে এবং শতকরা ৩২·৬৩ জন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে। মেদিনী-পুরে ভোট দিয়েছে শতকরা ৬০·২৯ জন; তার মধ্যে শতকরা ৫২·২২ জন দিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে এবং শতকরা ১৩·০৯ জন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে। ২৪ পরগনায় ভোট দিয়েছে শতকরা ৬১·৪১ জন; তার মধ্যে শতকরা ৪৮· জন দিয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে এবং শত ৩০·৯৬ জন কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে।

(৫) শহর ও শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস এ যেমন সাফল্যের সঙ্গে অনুপ্রবেশ করে অন্য দিকে বিরোধী দলের পক্ষেও নূ রাজনৈতিক ক্ষেত্র লাভ হয়েছে বি জেলায়, গ্রামে, পল্লীতে। যেমন, নদী মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহারে।

(৬) এবারের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি পক্ষ থেকে প্রভাব বিস্তারে যে প্র প্রচেষ্টা হয়েছিল তা বহুলাংশে ব হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় পার্টির শক্তি অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়েছে সত্যি, কি অন্যান্য রাজ্য থেকে রাজনৈতিক আঘা সহ্য করতে হয়েছে অনেক বেশী। কে কোন রাজ্যে, যেমন আসামে, পার্টি রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে।

(৭) এই নির্বাচনের বড় অ আংশিকভাবে বাস্তবরূপে দেখা দি যদিও পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যে একটি আসনও দখল করতে পা তবু স্বতন্ত্র পার্টি আজ কংগ্রেসের প্রধান 'চ্যালেঞ্জার' হয়ে উঠেছে। কোন কো রাজ্যে, যেমন বিহারে স্বতন্ত্র পা নির্বাচকদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্র বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

(৮) প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর মধ্য দু-একটি দল ভারতের কোন কোন অংশ জোরদার হয়ে উঠেছে এই নির্বাচনে যেমন, জনসংঘ হয়েছে উত্তর প্রদেশে এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সহায়তায় দ্রাবিড় মু কাজাঘাম দল হয়েছে মাদ্রাজে।

তবু, আশার কথা, এবারেও প্রতিক্রিয়া-শীল দলগুলো পশ্চিম বাংলায় কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। পশ্চিম বাংলার নির্বাচন রাজনীতি-ঘেঁষা হয়েছে বলেই নির্বাচকদের চেতনায় এই চমক লেগেছে। কংগ্রেস অবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য।

সমাপ্ত

॥ ৭ ॥

এমন সময় নুক্ ফিরে এল।

ঘোষাল সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন—"তোমার সঙ্গে কিছু কথা হল নাকি?"

নুক্ জবাব দিল না।

"এ কি, তোমার হাতের চুড়ি আর গলার হার কোথা?"

এ কথারও কোন জবাব না দিয়ে নুক্ ভিতরে চলে গেল।

"দেখলেন, কি কাণ্ড করে এল! এই কিছুদিন আগেই ওকে চুড়ি আর হার গড়িয়ে দিয়েছি তিন হাজার টাকা খরচ করে। স্বচ্ছন্দে দিয়ে চলে এল! নাঃ, অনেক রকম মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করেছি, কিন্তু এরকমটা আর দেখি নি। She is a problem girl. ও মানুষ নয়, মূর্তিমতী হেঁয়ালি একটা—"

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষালের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করে ঘুঁষি পাকিয়ে তিনি বললেন, "হারামজাদীকে ঠেঙিয়ে পন্দ্যা উড়িয়ে দেব আজ।"

তিনি ছুটে ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন, গণেশ হালদার তাঁকে আটকালেন।

"না, না, মারধোর করবেন না। বসুন, একটু স্থির হোন—"

রাঘব ঘোষালের মতো বলিষ্ঠ লোককে জোর করে বসাবার সাধ্য হালদার মশায়ের ছিল না। কিন্তু তিনি নিজেই বসে পড়লেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল সবিস্ময় কৌতুকহাস্য। তিনি ভুরু দুটো কপালে তুলে চোখ বড় বড় করে বললেন, "হোয়া—ট্! আপনিও গুড় খেয়েছেন নাকি?"

"গুড় খেয়েছি, মানে?"

সত্যিই কথাটা বুঝতে পারেন নি গণেশ হালদার।

"আমাদের সারকেলে গুড় খাওয়ার একটি মানেই হয়। প্রেমে পড়া! আপনি জানতেন না বুঝি? আপনি একেবারে ভিন্ন জাতের লোক দেখছি! হা-হা-হা! ওর প্রতি হঠাৎ দরদ দেখে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার ও প্যাঁচে পড়বেন না। কিন্তু সাবধান করা বৃথা। আপনার ভিতর লোহা থাকলে, I mean base metal, ও আপনাকে টানবেই। ও একটি সাংঘাতিক চুম্বক, she is a powerful magnet."

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সুবেদার, পাণ্ডা দুজনেই হাবুডুবু খাচ্ছে। নুকই ওদের ফাঁসিয়ে রেখেছে এখানে। Nook has hooked them here। তাতে আমাদের ব্যবসার সুবিধে হয়েছে খুব। পরে আপনাকে —এই দেখুন, আবার আমি একটা টপ্ সিক্রেট আপনাকে বলে ফেললুম। বলা উচিত ছিল না।"

তারপর অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে আবার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "আশা করি নুক্ শুনতে পায় নি। শুনলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। ও একটা বাঘিনী। She is a tigress."

গণেশ হালদার সত্যিই বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বললেন, "আমি এ রকম মেয়ে দেখি নি—"

"আমি সারা জীবন মেয়েমানুষ চরাচ্ছি মশাই, আমিই কি দেখেছি? দেখি নি। ও না জানে কি, না পারে কি! ইংরিজী জানে, বাংলা জানে, সংস্কৃত জানে, গান গাইতে পারে, মোটর চালাতে পারে, ছোরা খেলতে পারে। তার উপর ওই রূপ! মানুষের কলজের ভিতর বসে যায় একেবারে। হীরের তৈরী বাঘ-নখ একটি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে কাউ এসে প্রবেশ করল ভিতর দিক থেকে।

"মাসীমা বলছেন, খাবার দেওয়া হয়েছে, খেয়ে নিতে—"

"তোমার মা কোথা গেলেন?"

"আমি জানি না, মাসীমা জানেন।"

"তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে না?"

"না। মাসীমা এখানে থাকতে বললেন।"

"মাসীমা কি এ বাড়ির মালিক নাকি?"

কাউ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

"এ তো আচ্ছা জবরদস্তি দেখছি। আমার বাড়িতে আমি কেউ নই। I am a cipher in my household. কান্‌ট বি।"

এক লম্ফে ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন। হালদার ভাবলেন এই সুযোগে সরে পড়ি। কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারলেন না, তাঁর মনে হতে লাগল কে যেন তাঁকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছে চেয়ারটার সঙ্গে। তিনি উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন। ঘোষাল কি বললেন তা শুনতে পাওয়া গেল না, কিন্তু নুকের তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল একটু পরেই।
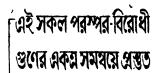
"আমার গয়না আমি যাকে খুশি দিয়েছি, তোমার তাতে কি।"
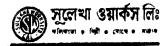
তারপর, "হ্যাঁ, কাউ এখানে থাকবে। ওকে নইলে আমার চলবে না। তোমার ভালোর জন্যেই ওকে যেতে দিই নি। ও এখানে থাকবে, থাকবে, থাকবে—"

এর পরই দড়াম্ করে একটা শব্দ হল। এবং তারপরই আর একটা বিরাট শব্দ হল, মনে হল একটা হাঁড়ি চুরমার হয়ে গেল বুঝি। গণেশ হালদার তড়াক করে উঠে ভিতরে ছুটে গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তা দেখবেন বলে প্রত্যাশা করেন নি। দেখলেন, ডাক্তার ঘোষাল সর্বাঙ্গে ডাল মেখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কোট প্যান্ট ডালে মাখামাখি, মাথা থেকে কপাল থেকে টপটপ করে ডাল পড়ছে। তাঁর হাতে একটা মোটা লাঠি। ঘরের আর এক প্রান্তে নুক্ দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে বঁটি। কাউ নেই। গণেশ হালদারকে দেখেই নুক বঁটিটা ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

গণেশ হালদারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঘোষাল হেসে ফেললেন, তারপর জিব বার করে ঠোঁটের উপর যে ডালটা পড়েছিল, সেইটে চাটতে চাটতে বললেন, "অদ্ভুত মেয়ে, না? Isn't she interesting ?"

গণেশ হালদারও হাসলেন একটু।

"যান, স্নান করে ফেলুন।"

"তা তো ফেলবই। আহা, ডালটার চমৎকার টেস্ট্ হয়েছিল। সমস্ত বরবাদ করে ফেললে হারামজাদী।"

"আপনি স্নান করুন। আমি আজ যাই।"

"একটু বসুন না বাইরে। আমি চট করে আসছি—"

"এখন আমার একটু কাজ আছে। কাল না হয় আসব।"

"কাল? জানেন না, কাল always পলাতক? বিশেষ করে আগামী কাল? Tomorrow is very elusive. যাক, আপনি যখন থাকবেন না, যান। Many thanks. Good night."

গণেশ হালদার বেরিয়েই দেখলেন একটা মোটর এসে দাঁড়াল। মোটর থেকেই সুবেদার খাঁ হাঁক দিলেন—"ডাক্তার ঘোষাল, মাল এসে গেছে। আনিয়ে নিন। শ্রীমতী ঝিনুক কোথায়?"

এইটুকু শুনেই গণেশ হালদার চলে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন গিয়ে একটু লেখাপড়া করবেন। কিন্তু বিধাতা সেদিন জ্ঞানার্জনের অন্য রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর বাইরের দরজার কাছে নুক্ দাঁড়িয়ে আছে।

নুকই এগিয়ে এসে বললে, "আমার দুর্ভাগ্য যে, যখনই আপনি আমাদের ওখানে যাচ্ছেন তখনই এমন একটা কিছু ঘটছে যাতে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার জীবনকাহিনী যদি শোনেন আমাকে অত খারাপ মনে হবে না। আজই আপনাকে শোনাতাম, কিন্তু দেখতে পেলাম মোটর আমাদের বাড়িতে ঢুকল, এখনই আমার খোঁজ পড়বে। তাই এখন আর দাঁড়াতে পারছি না। কিন্তু আপনাকে আমার জীবনের সব কথা বলবার ভারি ইচ্ছে. কখন আপনার সুবিধে হবে বলুন তো?"

"কি করব আমি আপনার জীবনকাহিনী শুনে? শুনে লাভ কি বলুন?"

"আমার তৃপ্তি। হয়তো অন্য লাভও আছে, কিন্তু সে কথা এখন বলা যাবে না। আগে সব শুনুন, পরে বিচার করবেন।"

একটু ইতস্তত করে গণেশ হালদার শেষে বললেন, "আমি এখানকার স্কুলের শিক্ষক। আমাকে কেন্দ্র করে কোন খারাপ গুজব রটে এটা আমি চাই না। কিন্তু আপনাদের সংস্রবে এলেই গুজব রটবে। নানা লোকে নানা কথা বলবে। আমি কার মুখ চাপা দেব? সেইজন্য আমি এসবের মধ্যে যেতেই চাইছি না। আমাকে মাপ করবেন।"

"আপনাদের গাঁয়ের গিরিশ [illegible]কে মনে আছে?"

"হ্যাঁ, খুব ছেলেবেলায় তাঁকে আমি দেখেছি। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"তিনি আমার বাবা। বাবা আর দাদা রায়টে মারা গেছেন। ডাক্তার ঘোষাল আমাদের দুই বোনকে, এক কাকাকে আর ভাইপোকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। সে সময় ওঁর যে সাহস দেখেছিলাম তা অপূর্ব।"

"আপনি আমাদের গাঁয়ের মেয়ে? আপনাকে কখনও গাঁয়ে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।"

"আমি গাঁয়ে খুব কম থেকেছি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। গাঁয়ে বিশেষ যেতাম না, ওই দাঙ্গার ঠিক আগে গিয়ে পড়েছিলাম। আপনার বোন বুলি আমাকে চেনে। তার মুখেই আপনার কথা প্রথম শুনি, তখন আপনি বিলেতে। এখানে আপনি যখন এলেন তখন আপনার নাম শুনে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারি নি যে, আপনি আমাদের গাঁয়েরই গণেশ হালদার। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি—"

"মা আর বুলি কোথায় জানেন?" ঝিন্দুকের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন গণেশ হালদার।

"আপনি শোনেন নি?"

"না, আমি কিচ্ছু জানি না। তাদের কোন খবর যোগাড় করতে পারি নি।"

"আপনার মা গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন। রাধাবল্লভজীর মন্দিরে কাপড় দিয়ে বুকে বেঁধে দু হাতে দুখানা দাও নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন বলেই বুলি বেঁচেছে।"

"বুলি এখন কোথায়?"

"ঠিক জানি না। কার সঙ্গে যেন কলকাতার দিকে চলে এসেছিল, শুনেছি। আমি ঠিক জানি না।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গণেশ হালদার। ঠিক সেই সময় মোটরের হর্নটা খুব জোরে জোরে বাজতে লাগল।

"ওরা আমাকে ডাকছে, আমি যাই।"

ঝিন্দুক চলে গেল। হালদার দাঁড়িয়েই রইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এ সংবাদটা শোনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হল দাঙ্গা হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পরে তিনি বিলেত থেকে ফিরেছিলেন। দেশেও গিয়েছিলেন, কিন্তু একটাও চেনা মুখ দেখতে পান নি। গ্রামে পুরোনো লোক কেউ ছিল না। এমন কি, পুরোনো মুসলমানরাও না। গ্রামে পাঞ্জাবী আর বিহারী মুসলমানরা বসবাস করছিল। হঠাৎ একটা বিপুল গর্বে তাঁর মনটা ভরে উঠল। মা যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়েছিলেন! তিনিই বুলিকে রক্ষা করেছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুমূর্ষু বাবার মুখটাও মনে পড়ল। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত তাঁর সমস্ত চেহারাটাই ভেসে উঠল চোখের উপর। চোখ বুজে-ছিলেন তিনি, চোখের দু কোণ বেয়ে জল পড়ছিল। ছেলেবেলায়-দেখা এই ছবিটাই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল তাঁর চোখে। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঝিন্দুক ফিরে গিয়ে দেখল সুবেদার খাঁ, পান্ডা আর ঘোষাল তিনজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার প্রত্যাশায়। ঘোষাল নূতন করে কাপড়-চোপড় বদলেছেন। ঝিন্দুককে দেখে উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এলেন তিনি, যেন কিছুই হয় নি।

"হ্যালো, নুক, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? সুবেদার সাহেব অস্থির হচ্ছেন তোমার জন্যে। লালপুরের মাঠে যেতে হবে তোমাকে। এবার জালে অনেক মাছ উঠেছে। It is a big catch this time."

সুবেদার খাঁ সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। চুপি চুপি বললেন, "লালপুর মাঠের কাছে যে গুমটিটা আছে, তার থেকে কিছু দূর পশ্চিমেই ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালটা। সেই সিগনালের নীচেই যে ঝোপটা আছে সেই-খানেই ব্যাগটা ফেলেছি। গিয়ে নিয়ে এস এক্ষুনি। এত রাত্রে যদিও ওখানে অন্য লোক যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তবু এখনই নিয়ে আসা ভাল। সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি গাড়িটা নিয়ে এখনই চলে যাও।"

ঝিন্দুক চুপ করে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল, "গতবারের অংশ আমি এখনও পাই নি তা না পেলে আমি যাব না।"

ঘোষাল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "ওকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, she is a tough nut, ও বড় শক্ত ঘাঁটি। পান্ডা, দিয়ে দাও ওর প্রাপ্যটা—"

পান্ডা তৎক্ষণাৎ কোটের ভিতরের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে দিলেন নন্দকে।

"দশখানা নম্বরী নোট আছে, গুনে নিন।"

ঝিনুক গুনলে না, নোটের তাড়াটা বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিল।

"আমরা তা হলে ভাসে বসি। সেনও এক্ষুনি আসবে। তুমি আর দেরি করো না। সেন আসবার আগেই তুমি বেরিয়ে পড়।"

ঝিনুক ভিতরে গিয়ে একটা বেঁটে কোট পরে এল। তারপর সোজা গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল এবং চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে গাড়িটা ব্যাক করে বোঁ করে বেরিয়ে গেল।

ঝিনুক চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পর মিস্টার সেন এলেন আর একটা গাড়ি করে আর তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে তনিমা।

তনিমাকে দেখে বিগলিত হয়ে পড়ল ঘোষাল।

"আরে আসুন, আসুন, আসুন। স

সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়েছে দেখছি, the sun has preferred the west today, what a wonder. কি সৌভাগ্য আমার।”

মৃদু হেসে নমস্কার করলেন তনিমা। ঘোষাল প্রতি-নমস্কার করে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

“আপনাকে দেখে আনন্দও যেমন হচ্ছে, ভয়ও তেমনি করছে। আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে খেলতে বসেন তা হলে তো নির্ঘাত নিঃস্ব হয়ে যাব আজ। you will suck me outright.”

মৃদু হেসে তনিমা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, “তা হলে খেলব না। বাপি, আমি বরং ফিরে যাই, ফিরে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিই তোমাকে। কেমন?”

হৈ-হৈ করে উঠলেন ঘোষাল।

“আরে না, না, সে কি হয়! আপনার সঙ্গে খেলব, হেরে যাব জেনেও খেলব, আপনার সঙ্গে হেরে যাওয়ার একটা সুখ আছে যে। আজ শুধু আপনার সঙ্গে খেলব না, সর্বস্বপণ করে খেলব। I shall stake everything today.”

বক্র দৃষ্টিতে মৃদু হেসে ঘোষালের দিকে চেয়ে রইলেন তনিমা সেন ঘাড় বেঁকিয়ে। মিস্টার সেনের চক্ষে এসব মোটেই অশোভন ঠেকল না। মিস্টার সেন জাতীয় লোকের কাছে ঠেকে না। তাঁর ডায়োসেসনে-পড়া মেয়ের তিনি ইয়ার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ের সঙ্গে পিতার গাম্ভীর্য রক্ষা করাটা তিনি সেকেলে কুসংস্কার মনে করেন। তনিমার গত জন্মদিনে তাকে এক সেট হ্যাভেলক এলিস কিনে উপহার দিয়েছেন। কিছুদিন আগে লোলিটা (ললিতা?) নামক বইটা কিনে নিজে পড়েছেন, মেয়েকেও পড়িয়েছেন আধুনিক সাহিত্য-কীর্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে।

তনিমা তাস খেলায় নাকি সিদ্ধ-হস্তা। ঠিক তার বাপের উলটো। মিস্টার সেন খেলতে বসলেই হেরে যান। ডাক্তার ঘোষালের কাছে তাঁর নাকি দেড় হাজার টাকার উপর ধার হয়ে গেছে। তাস খেলার ধার। সেই ধার শোধ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে তনিমাকে নিয়ে আসেন।

“বাপি থাকব?”

“থাকো না। এসেইছ যখন দু হাত খেলে যাও।”

ঘোষাল দু হাত জোড় করে বললেন, “দয়া করুন, প্লীজ স্টে।”

মিস্টার সেন হেসে উঠলেন। তিনি সাধারণত মৃদু হাসেন, জোরে হাসেন না। কিন্তু যখন হাসেন তখন অদ্ভুত শব্দ হয় একটা। সে শব্দ প্রায় অবর্ণনীয়। মনে হয় কুলকুচোর করার শব্দের সঙ্গে হেঁচকি ওঠার শব্দ মিশছে।

পাণ্ডাও অনুরোধ করলেন তনিমা সেনকে। দরবেশ পাণ্ডা বেঁটে মোটা লোক। মনে হয় যেন একটা চতুর্ভুজের উপর তাঁর মুণ্ডু গলা হাত পা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পিতলের বোতাম-ওলা ঢিলে কালো বা নীল রঙের গলাবন্ধ কোট গায়ে দেন। মুখটাও চতুষ্কোণ, কান দুটোও প্রায় সেই রকম, মনে হয় যেন মুখের অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে। দু থাক চিবুক, ভুঁড়ো নাক, ঝাঁকড়া ভুরু। তাঁর কথা-বার্তার মধ্যে একটু যেন হুকুমের সুর থাকে। যখন অনুরোধ করেন তখনও সেই সুরটা বাজে। প্রচুর ঘুষ এবং খোশামোদ পেয়ে পেয়ে এই অবস্থা হয়েছে।

তনিমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, “আমাদের সুখী করতে যদি আপনার অনিচ্ছা থাকে, যেতে পারেন।”

তনিমা ঘাড়টি এক দিকে কাত করে চোখে মুখে নিরুদ্ধ হাসির আভা বিকীর্ণ করে বললেন, “আচ্ছা, থাকব।”

সুবেদার খাঁ যাবার জন্যে উসখুস করছিলেন, এ সুযোগ তিনি উপেক্ষা করলেন না।

“আপনারা তো চারজন হয়েই গেলেন। আমাকে ছেড়ে দিন তা হলে আজ। আমি সমস্ত দিন ডিউটিতে ছিলাম, বড় ক্লান্ত লাগছে, বসতে ইচ্ছে করছে না। ডাক্তারবাবুর ‘বাইক’টা কি ঠিক আছে? পেতে পারি?”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়, সারটেনলি।”

সুবেদার খাঁ বাইকে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। সবাই ভিতরে ঢুকে টেবিলের চারধারে বসলেন।

“কাউ, আমাদের কফি দাও।”

ঘোষাল চীৎকার করে দ্বারের দিকে চাইলেন। কাউকে দেখা গেল না।

“কাউ নেই নাকি?”

ঘোষাল ভিতরের দিকে চলে গেলেন। তারপরই ফিরে এসে বললেন, “নো কাউ, নো নুক। আমিই জলটা চড়িয়ে দিয়ে এলাম ইলেকট্রিক কেতলিতে। কফি না হলে জমবে না। নুক খানিকটা শিককাবাব বানিয়ে রেখেছে দেখছি। আনব?”

মিস্টার সেন মৃদু হেসে বললেন,

"শুধু মাংস কুকুরে খায়। মানুষ মাংসের সংগে আরও কিছু চায়, কি বলেন, মিস্টার পান্ডা। আমি অবশ্য বাড়িতে এক পেগ চড়িয়ে এসেছি।"

ঈষৎ নাকি সুরে তনিমা বললে, "বাপি, তুমি আজকাল বড্ড বেড়েছ। মাম্মি যদি জানতে পারে কুরুক্ষেত্র কান্ড করবে।"

ঘোষাল কিছু না বলে আলমারি থেকে এক বোতল হুইস্কি বার করে বললেন, "হিয়ার ইউ আর"—বলেই টেবিলের উপর রাখলেন সেটা ঠক্ করে। তারপর গ্লাস বার করতে লাগলেন।

সকলেরই চোখে মুখে বেশ একটা প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল।

সেদিন সুঠাম মুকুজ্যের অভিযান একটু নূতন ধরনের হয়েছিল। তিনি সেদিন দিনে না বেরিয়ে অনেক রাত্রে বেরিয়েছিলেন। রেল লাইনের ধারে যে উঁচু টিলাটা ছিল সেইখানেই গিয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাত্রে বেরুলে রকেটকে সংগে নিয়ে বেরোন তিনি। রকেট বাধ্য কুকুর, চুপ করে বসে থাকে তাঁর কাছে, থাবার উপর মুখ রেখে। টুঁ শব্দটি করে না। ডাক্তার মুখার্জির একটা ছোট টেলিস্কোপ আছে। সেইটে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বেরোন, রাত্রের আকাশ দেখতে। মাঝে মাঝে এর থেকে তিনি প্রচুর আনন্দ আহরণ করেন। অনেক দিন আগে সন্ধ্যার আকাশে বৃহস্পতি গ্রহের একটা চাঁদকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো, তবু এটা যে বৃহস্পতিরই চাঁদ তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। আনন্দে মেতে উঠেছিলেন সেদিন। তার কিছু দিন পরে একটা বইয়েও পড়েছিলেন যে, ছোট টেলিস্কোপ দিয়েও বৃহস্পতির চাঁদ দেখা যায়। তখন থেকে বৃহস্পতি গ্রহ আকাশে উঠলেই তিনি টেলিস্কোপটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে আর একটা জিনিস দেখেও তিনি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন।

টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে একজায়গায় তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একটা জ্যোতিষ্ক দেখতে পান। তাঁর মনে হল এ জায়গায় তো এ রকম নক্ষত্র আগে দেখিনি। তা হলে বোধ হয় ওটা ধূমকেতু, আমাদের পৃথিবীর দিকে আসছে। দিন দুই পরেই ঠিক দেখা গেল একটা ছোট ধূমকেতু দেখা দিয়েছে আকাশে।

সেদিন তিনি গিয়েছিলেন অ্যানড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্রপুঞ্জে যে নীহারিকাটা আছে সেইটে দেখতে। এর সম্বন্ধে সেদিন একটা বইয়ে অনেক নূতন খবর পড়েছিলেন, তাই এটাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। অ্যানড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল দুটি কারণে। প্রথম কারণ অ্যানড্রোমিডার সংগে আমাদের রেবতী নক্ষত্র জড়িত। দ্বিতীয় কারণ অ্যানড্রোমিডার সম্বন্ধে গ্রীক উপাখ্যানটি। গ্রীক পুরাণে অ্যানড্রোমিডা সিফিউস রাজার সুন্দরী কন্যা। কিন্তু সে কন্যার জীবনে নিদারুণ অভিশাপ নেমে এসেছিল তার মায়ের জন্য। তার মা বড়াই করে বেড়াতেন যে, তাঁর মেয়ে Neireidesদের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। এই কথা শুনে সমুদ্রপতি Poseidon ক্রুদ্ধ হয়ে সিফিউসের রাজ্যে বিরাট ভয়াবহ এক সামুদ্রিক দানব পাঠিয়ে দিলেন। সে সিফিউসের Cepheus রাজত্ব ধ্বংস করতে লাগল। শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ভবিষ্যদ্বাণী হল যে সিফিউস যদি তাঁর মেয়েকে ওই দানবের কবলে দিয়ে দেন, তা হলে তাঁর দেশ রক্ষা পাবে। নিরুপায় সিফিউস শেষে তাঁর মেয়েকে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে তাকে উৎসর্গ করে দিলেন এক সামুদ্রিক পাহাড়ের উপর। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন বীর পারসিউস। এ গল্পটা যখন প্রথম পড়েন (কিছু দিন আগেই পড়েছিলেন গল্পটি) তখন কেন জানি না তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছিল আমাদের দেশবিভাগের কথা। মনে হয়েছিল [illegible] অ্যানড্রোমিডা। যে [illegible] নীহারিকাটাকে নিয়ে [illegible] গবেষণা করেছেন সেটাকে তিনি [illegible] রেখেছিলেন ওই সামুদ্রিক [illegible] পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভেঙেছিল [illegible] পড়লেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন যে সামুদ্রিক দানবটাকে নিয়েও আর একদল নক্ষত্রপুঞ্জ চিহ্নিত হয়ে আছে আকাশে।

সেদিন ওই ছোট্ট সাদা [illegible] নীহারিকাটার দিকে চেয়ে তিনি মনে মনে আকাশ-ভ্রমণ করছিলেন। [illegible] তিনি গ্রহনক্ষত্রের বই পড়েছিলেন একটা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি মনে মনে এমন একটা যানে চড়েছিলেন, যার গতি [illegible] মিনিটে এগারো মিলিয়ন মাইল। চলেছিলেন তিনি অ্যানড্রোমিডার ওই নীহারিকার উদ্দেশে। অংকের হিসাব অনুসারে পৌঁছতে প্রায় দেড় মিলিয়ন বৎসর লাগার কথা। কিন্তু কল্পনায় কি এত সময় লাগে? চাঁদ নিমেষের মধ্যে পার হয়ে গেলেন, তার পরই দেখা গেল আমাদের সুন্দরতম গ্রহ প্লুটো, সেটাও পার হলেন। তারপর আমাদের সৌরজগতের একেক কক্ষ পার হতে লাগলেন, দেখলেন সৌরজগতের সীমানার কাছাকাছি নানা চেহারার একদল ধূমকেতুর ঘোরাফেরা, সময় হলেই পৃথিবীর সীমানায় এসে চমৎকৃত করে দেবে সকলকে। কিছুক্ষণ পরেই লুব্ধক নক্ষত্রের কাছাকাছি এসে পড়লেন, তারপর স্বাতীর, তারপর জ্যেষ্ঠার। চেনা অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে যেতে যেতে শুধু নক্ষত্রই দেখলেন না, অনেক জ্যোতির্বাষ্পও দেখলেন, জ্যোতির্ময় মেঘের মতো ঝলমল করছে সব, তারপর......হঠাৎ রকেটের চীৎকারে তাঁর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রকেট এক ছুটে টিলা থেকে নেমে চলে গেল ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে। আর তারপরই ঝিনুকের আর্ত চীৎকার।

(ক্রমশ)

॥ ৩৩ ॥

শুনেছি, নিভৃত মধুর ভাবনার অবসরে পুরনো দিনের স্মৃতিরা ভিড় জমায়। একান্তে মধুর ভাবনায় ডুবে থাকার মতো সচ্ছল অবসর আজও আমার নেই, তবুও সময়ে অসময়ে এবং কারণে-অকারণে শাজাহান হোটেলের বেদনাবিধুর স্মৃতির মেঘগুলো আমার হৃদয়ের আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে। কেন এমন হয়, কেমন করে হয় তা জানি না, জানবার মতো কৌতূহলও আমার নেই। তবে এইটুকু এতোদিনে বুঝেছি যে, শাজাহান হোটেলকে না দেখলে পৃথিবীর পাঠশালায় আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। মানুষের মনের গহনে যে গোপন মানুষটি লুকিয়ে রয়েছে তাকে যদি চিনতে হয় তবে পথের ধারে পান্থশালায় নেমে আসতে হবেই।

সেদিন পরম বিস্ময়ে ধর্মাধিকরণের অভাবনীয় রহস্যময় রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিলাম সেদিন অন্ধকার পথের নিশানা দেবার জন্য আমার পাশে এক অভিজ্ঞ প্রবীন দরদী ছিলেন। সেদিন কোনো কিছুই আমাকে খুঁজে বার করতে হয়নি, যা আমার জানবার প্রয়োজন, যেমনভাবে তা দেখবার প্রয়োজন তা সেই পরমস্নেহশীল বিদেশী নিজেই ব্যবস্থা করেছিলেন। শাজাহানের সরাইখানায় অসংখ্যের ভিড় থেকে অসাধারণকে খুঁজে বার করে আমাকে দেখাবার জন্যে কেউ নেই। তবু এই আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় ভুবন পথপ্রদর্শকহীন এক সামান্য কর্মচারীকে মণিমাণিক্য উপহার দিয়েছে। কল্পনার রঙে যে পরমপ্রতিভাবান শিল্পীরা সাহিত্যের পটে নব নব চরিত্রের সৃষ্টি করেন, তাঁরা আমার নমস্য। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতার ক্রীতদাস। আমার স্মৃতির কারাগারে বন্দী পুরুষ ও নারীর দল সুযোগ পেলেই বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, তাদের মুক্তি দাবি করে, আমি স্বাধীন মনে কল্পনার সৃষ্টিকে প্রশ্রয় দেবার সুযোগ পাই না।

আজও তারা কারার বন্ধন ছিন্ন করে চৌরঙ্গীর পাঠকের মনের জানালার ধারে এসে দাঁড়াতে চাইছে। কিন্তু হোটেলের সামান্য কর্মচারী আমি কী করবো? নিজের অক্ষমতার তীব্র যাতনা সেইদিন বুঝতে পেরেছিলাম যেদিন শাজাহান হোটেলে মিসেস্ পাকড়াশি পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। ককটেল পার্টি—রিসেপশন টু অনিন্দ্য অ্যান্ড শ্যামলী।

অনিন্দ্যর বিবাহ উপলক্ষে ডিনার পার্টি পাকড়াশি হাউসে ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শাজাহানের উর্দিপরা বয়রা সেখানে গিয়ে পরিবেশন করেছিল। আমারও যাবার হুকুম হয়েছিল। বোসদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন; তাই আমাকে সে যাত্রা রক্ষে করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ম্যানেজারকে বলবার প্রয়োজন নেই, তোমার বদলে আমিই যাবোখন।"

সেদিন অনেক রাত্রে বোসদা হোটেলে ফিরে এলেন। আমি তখন একটা চেয়ার বার করে ছাদের উপর চুপচাপ বসেছিলাম। বোসদা যখন ফিরে এলেন, তখন ঘামে ওঁর শার্ট ভিজে গিয়েছে। আমাকে বসে থাকতে দেখে রাগ করলেন। বললেন, "শুধু শুধু এখনও জেগে রয়েছো কেন?"

আমি হাসলাম। বোসদা বললেন, "আমরা যেন অশোক কাননে বন্দিনী সীতার দল। শাজাহানের বাইরে যাওয়া ভুলেই গিয়েছি। এতদিন পরে হোটেলের বাইরে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম" গলার টাইটা আলগা করতে করতে বোসদা বললেন, "দেড় হাজার লোকের স্পেশাল কেটারিং তো সোজা জিনিস নয়। হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছি।"

আমি তখনও চুপ করেছিলাম। বোসদা বললেন, "কী এত ভাবছো?"

বললাম, "কিছুই না।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে বোসদা বললেন, "আমরা ছোটোবেলায় সুর করে গাইতাম— ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা।"

বললাম, "সারাজীবনই তো আপনি আমাদের মতো পরের ভাবনা ভেবে গেলেন।"

বোসদা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "হাইকোর্টের ইংরেজ ব্যারিস্টার সায়েব তোমাকে যে কী করে বুদ্ধিমান বলতেন, জানি না। তোমরা কী আমার পর?"

"যাদের আপন ভাবছেন, একদিন হঠাৎ বুঝবেন, তারা সবাই পর।" আমি বোসদার দিকে তাকিয়ে বললাম।

অন্ধকারে সিগারেটের অস্পষ্ট আলোকে আমার মুখটা বোসদা বোধ হয় ভালভাবে দেখতে পেলেন না। বললেন, "কেন? বিপদে পড়লে তুমি কি আমাকে দেখবে না?"

মনে মনে বললাম, 'নিজেকে আমার বুঝতে একটুও বাকি নেই। এই তো দু' নম্বর সুইটে আমার সাহায্যপ্রার্থিনীকে কেমন দেখলাম।'

সত্যসুন্দর বোস দেখে দেখে এবং শাজাহানের বিষ গ্রহণ করে করে যেন নীলকণ্ঠ হয়ে গিয়েছেন। আকাশের দিকে একঝলক ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে বললেন, "সংসারের হোটেলখানায় কেউ কাউকে সার্ভ করতে পারে না। আমরা কেবল ভাল ওয়েটারের মতো সামনে ট্রে ধরতে পারি, তার থেকে যে যার তুলে নিতে হবে।"

কথা শেষ করেই বোসদা এবার হেসে উঠলেন। বললেন, "এখন তোমাকে আর ঐ ট্রে ধরতে হবে না। তোমাকে যা ধরতে হবে তার নাম পেগ। কারণ মিসেস পাকড়াশি ককটেলের ব্যবস্থা করেছেন, এই হোটেলেই। শুধু ডিনারে আজকাল কলকাতার কোনো শুভ কাজই সম্পন্ন হয় না। এখন পাকস্পর্শের পর জলস্পর্শ। অর্থাৎ কোনো হোটেলে একদিন বিশেষভাবে নির্বাচিত অতিথিদের সেবাযত্ন। এ-সবের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে, কারণ কাল থেকে তোমার বার-ডিউটি, মিস্টার সরাবজী হবেন তোমার ডিপার্টমেন্টের কর্তা। কিন্তু সে-সব পরে শুনবে, এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"আর আপনি?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"আমি এখন স্নান করবো। স্নান সেরে গায়ে একটু পাউডার ছড়িয়ে কিছুক্ষণ কুমীরের মতো চুপচাপ বিছানার উপর পড়ে থাকবো, তারপর রাত-ডিউটির জন্যে এক-তলায় নেমে যাবো।"

এই পরিশ্রমের পর রাত-ডিউটি। আমি বারণ করেছিলাম। আমার হয়ে মিসেস্ পাকড়াশির বাড়িতে তিনি যখন কাজ করে এসেছেন, তখন আমি এবার ও'র বদলীতে যাই। কিন্তু সত্যসুন্দরদা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, "আমি না তো উপর-ওয়ালা। ডিউটি-চার্ট তৈরি করার দায়িত্ব আমার না তোমার?"

একরকম জোর করেই বোসদা আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

অবসন্ন দেহটা ক্লান্তিভরা রাত্রের অন্ধকারে বিছানার নিশ্চিন্ত প্রশ্রয়ে কখন যে ঘুমের কোলে ঢুলে পড়েছিল খেয়াল করিনি। হঠাৎ মনে হলো ঘরের দরজায় যেন টোকা পড়ছে। রাত্রে দরজায় ধাক্কার সঙ্গে আমি পরিচিত। দরজার নম্বর ভুল করে, আবার কেউ কি আমাকে জাগিয়ে তুলছে? কিন্তু এবারকার ধাক্কায় তেমন প্রাবল্যের সংকেত নেই। যে বাজাচ্ছে সে যেন খুব সাবধানে টোকা দিচ্ছে যাতে আমি ছাড়া আর কারুর রাতের ঘুম ভেঙে না যায়।

প্রথমে একটু রাগ হয়েছিল। তারপর ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতেই যাঁকে দেখলাম, তাঁর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। একটা টর্চ হাতে করে সত্যসুন্দরদা দাঁড়িয়ে আছেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "সরি, তোমাকে এমন সময় ডেকে তুলতে বাধ্য হলাম। তোমাকে ঘরটা এখনি ছেড়ে দিতে হবে।"

"এখনি?"

"হ্যাঁ এখনি। ব্যাপারটা পরে বলছি। এখন চল দিকিনি, তোমার বিছানার চাদরটা সোজা করে দিই।"

দ্রুতবেগে বোসদা বিছানাটা ঠিক ঠাক করে দিলেন। আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি মুখে চোখে একটু জল দিয়ে নাও।"

ভিতরে মুখে চোখে জল দিতে দিতেই শুনলাম, বোসদা কাদের বলছেন, "আসুন। আপনারা ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন, বিশ্রাম না করলে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, এক ভদ্রলোক আমার বিছানায় বসে পড়ে জুতো খুলতে আরম্ভ করেছেন। জুতো খুলতে খুলতেই তিনি বললেন, "মিস মিত্রের কী ব্যবস্থা হবে?"

বোসদা বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

রাত্রের ম্লান আলোকে ঘুম-জড়ানো চোখে দেখলাম, একটা হাল্কা ফাইবারের ব্যাগ হাতে, ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোসদা তাঁর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, "আসুন।"

ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, "সে কি, আপনি আমার ব্যাগ বইবেন, তা কখনও হয় না।"

বোসদা সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "আসুন।"

হাঁটতে হাঁটতে এবার আমরা বোসদার ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। বোসদা

ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়াও, আমি চাবিটা নিয়ে আসি।"

ভদ্রমহিলা লজ্জায় যেন নীল হয়ে গিয়েছেন মনে হলো। বললেন, "কেন আমার ব্যাগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমার অত্যন্ত লজ্জা করছে।"

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে এক বিষণ্ণ-নয়না সুন্দরীকে আবিষ্কার করলাম। আমারই চোখের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যেন প্রিন্সেস অব স্যাড্ আইজ্ ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁর দৃঢ় নমনীয় গ্রীবার মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য খুঁজে পেলাম তা স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না, মধুরও না। সামান্য হাই তুলে ভদ্রমহিলা বললেন, "এতো রাত্রে কাউকে এমনভাবে বিপদে ফেলার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।"

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরেও বৈশিষ্ট্য। নাচের ঘুঙুর যদি আরও চাপা হত, ট্রামের ঘর্ঘর যদি ঘনশ্যাম ঘাসের ভেলভেটে আরেকটু অস্পষ্ট হতো, আরেকটু সংযত, তাহলে অনেকটা যেন মিস্ মিত্রের স্বর হ'ত তারা।

চাবি নিয়ে এসে বোসদা দরজাটা খুললেন। চাপা গলায় বললেন, "আজকের রাতটা কোনোরকমে এখানে কাটিয়ে দিন।"

মিস্ মিত্র ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "কার ঘর আমি জোর করে অধিকার করলাম?"

বোসদা বললেন, "সে-সব পরে খোঁজ করা যাবে, এখন শুয়ে পড়ুন।"

ভদ্রমহিলা শুনলেন না। বললেন, "কার ঘর না বললে, আমার ঘুমই আসবে না।"

বোসদা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, "মিঃ স্যাটা বোসের।"

"কী বোস্?" ভদ্রমহিলার বিষণ্ণ চোখে এবার সত্যিই হাসি ফুটে উঠলো।

বোসদা বাধ্য হয়ে, এবার নিজেই উত্তর দিলেন, "ছিলাম সত্যসুন্দর, কপাল দোষে স্যাটা হয়েছি!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমরা বাসেই থাকতে পারতাম, কিংবা বাকী ক'ঘণ্টা লাউঞ্জেতে কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু কী যে করলেন আপনি। এখন আপনারা শোবেন কোথায়?"

"আমার তো শোবারই প্রশ্ন ওঠে না, মিস্ মিত্র, আমি তো ডিউটিতে থাকবো। আর এই শ্রীমানেরও একটু পরে কাজ রয়েছে।"

বাথরুমের দরজাটা খুলে বোসদা বললেন, "চাবিটা একটু শক্ত আছে, সামনের দিকে টেনে একটু জোরে ঘোরাবেন, তাহলেই দরজা খুলে যাবে।"

মিস মিত্রকে নমস্কার করে আমরা দুজনে বেরিয়ে আসছিলাম। ভদ্রমহিলাও সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। কোনোরকমে বললেন, "আপনাকে কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

শুভরাত্রি জানিয়ে বোসদা আমাকে নিয়ে নিচেয় নেমে এলেন। বললেন, "আর কোনো উপায় ছিল না। তোমাকে ছাড়া কাউকে জাগাবার মতো অধিকারও আমার নেই।"

বোসদা বললেন, "ভদ্রমহিলা হচ্ছেন হাওয়াই হস্টেস। ওঁদের প্লেনে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় সকলে হোটেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। প্লেনের অফিসারদের জন্যে সাধারণত আমাদের

আপনার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আজ শোচনীয় অবস্থা। ঘর খালি নেই। তাঁরাও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। ভদ্রমহিলা একবার বললেন, 'আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই, লাউঞ্জের সোফাতেই গড়িয়ে নিচ্ছি।' কিন্তু তা কখনও হয়? বাধ্য হয়েই তোমাকে ডেকে তুললাম। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার তো। সকালেই দু' একটা ঘর খালি হয়ে যাবে। তখন ওদের সরিয়ে দেবো।"

আমি বোধ হয় আর একটা হাই চেপে রাখার চেষ্টা করছিলাম। বোসদা পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "হোটেলে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে রাত জাগার অভ্যাস রাখা ভাল। রাত্রে কারা জেগে থাকে জানো?"

আমি বললাম, "ছোটবেলায় শুনেছি, দুষ্টু এবং অবাধ্য ছেলেরাই রাত্রে জেগে থাকে।"

"ঠিক। পৃথিবীর অবাধ্য দুষ্টু ছেলে খোকারাই রাত্রে জেগে থাকে। সারারাত্রের অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে ভোরের সান্ধ্য মুহূর্তে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।"

কিছুই কাজ নেই, জেগে থাকা ছাড়া। কাউণ্টারে আমরা দুজন জেগে বসে রয়েছি। বসে বসে বোসদা একটুকরো কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকছেন। পেন্সিলের আঁচড়ে শাজাহানের লাউঞ্জকে নকল করবার চেষ্টা করছেন। বাইরে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে শাজাহান হোটেলের প্রায়-মিলিটারি পোশাক। তার হাতেও একটা ছোট্ট পেন্সিল ও খাতা।

এক অদ্ভুত স্বাধীনতার আনন্দে মনটা ক্রমশ যেন ভরে উঠলো। কেউ কোথাও নেই, শাজাহান হোটেলের সর্বেসর্বা যেন আমরাই। এই বিশাল হোটেলের অসংখ্য ঘরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেন পরম বিশ্বাসে আমাদের উপর সব দায়িত্ব অর্পণ করে নিঝুম রজনীতে ঘুমিয়ে রয়েছেন। রাতের রেলগাড়ির ড্রাইভারের মতো অচেনার তীর্থের যাত্রীদলকে আমরা দুজনে যেন কোনো সোনার প্রভাতের দিকে নিয়ে চলেছি। মণি-মাণিক্যে ভরা সেই নতুন প্রভাতে এই ঘুমন্ত মহাদেশের তীর্থযাত্রীরা কি পরম বৈভব খুঁজে পাবেন জানি না; কিন্তু আমরা তখন তাঁদের আনন্দে ভাগ বসাবার জন্যে জেগে থাকবো না। হোটেলের দায়িত্ব অন্য কারুর উপর দিয়ে, দিনের আলোতে আমরা আমাদের প্রিয় রাত্রিকে ডেকে আনবার চেষ্টা করবো।

মিস্টার আগরওয়ালা নতুন হেডপোর্টার রেখেছেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যেও দেখলাম, দু নম্বর সুইট থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমি চিনতে পারিনি। বোসদা কানে কানে বললেন, ইনি আমাদের দেশের একজন নামকরা

শ্রমিকনেতা। আগরওয়ালাদের কারখানা-গুলোর শ্রমিকদের ইনিই নেতৃত্ব করেন। একটা ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। গাড়িটা শ্যামবাজারের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দারোয়ানজী পকেট থেকে নোটবই বার করে কী একটা টুকে নিলেন।

বোসদা হেসে বললেন, "গাড়ির নম্বরটা আমরা রাত্রে টুকে রেখে দিই। অতো রাত্রে যারা যাতায়াত করে, তাদের কপালে যে কী আছে, তার ঠিক নেই।"

বোসদার মুখেই শুনলাম, আগে নম্বর লেখার ব্যবস্থা ছিল না। তখনও আমরা স্বাধীন হইনি। লণ্ডনের এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক কলকাতায় এসেছিলেন। একদিন কাজ শেষ করে, রাত্রিবেলায় তিনি কাউণ্টারে এসে বোসদাকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কালীকে জানতে চাই।"

বোসদা তখন সবে কাজে ঢুকেছেন। বলেছিলেন, "সে আমাদের সৌভাগ্য।"

অতিথি বলেছিলেন, "কোনো কালীকে খুব কম সময়ের মধ্যে ভালভাবে জানবার কী উপায় বলোতো?"

বোসদা তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। ভদ্রলোক একটা সিগারেট লাইটার বোসদাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, "এতো বড়ো হোটেলে এতো বিদেশীদের সঙ্গে মিশে এই উপায়টা তোমার জানা নেই?"

বিদগ্ধ ও সম্মানিত অতিথিকে বোসদা বলেছিলেন, "আমাদের সবচেয়ে বড়ো সরকারী লাইব্রেরী এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

ভদ্রলোক এবার লজ্জা কাটিয়ে উঠিয়ে বলেছিলেন, "ইউ নাস্ট মিট এ গার্ল—লোকাল গার্ল।"

বোসদা বলেছিলেন, "সরি।"

অতিথি লজ্জা পেয়ে রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু আশা ছাড়েন নি। বেয়ারার কাছ থেকে খবর পেয়ে কোনো আর্টিস্ট সাপ্লায়ার যোগ হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল। আর্টিস্ট সাপ্লায়ার তাঁকে অনেক ছবি দেখিয়ে বলেছিল, "পছন্দ করে নিন স্যর।"

হুজুর পছন্দ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেয়ারার সঙ্গে বখশিস নিয়ে বোধ হয় কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল। সে বলেছিল, "বিনা পারমিশনে ফিরেলে বিছানা ঘরে বাইরের কাউকে সে ঢুকতে দেবে না।" অতিথিরও তখন মেজাজ সপ্তমে চড়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, "কোনো পরোয়া নেই, আর্টিস্ট গার্লকে আমি ঘরে আনবোই না।"

আর্টিস্ট সাপ্লায়ার বলেছে, "তাতে কিছু এসে যায় না স্যর। আমাদের জানাশোনা ভাল ট্যাক্সিওয়ালা আছে।"

সেই ট্যাক্সি নিয়েই রাত চারটের সময় আর্টিস্ট সাপ্লায়ার কাউণ্টারে এসেছিল। একশ পাঁচ নম্বর ঘরের সায়েবের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। "এত রাত্রে!" বোসদা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

সাপ্লায়ার বলেছিল, "ও'র সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।" একটু পরেই দু'জনকে এক সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে দারোয়ান গেট থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে কাউণ্টারের কাছে ছুটে এসে বলেছিল, "সাব্‌ একবার বেরিয়ে আসুন।"

বেরিয়ে এসে বোসদা দেখলেন, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় এক বিদেশী ভদ্রলোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোসদার চিনতে দেরি হয়নি—মাননীয় অতিথি। দুর্বৃত্তরা তাঁর টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েই সন্তুষ্ট হয়নি, তাঁর জামাকাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তখনও হোটেলের অন্যান্য অতিথিরা জেগে ওঠেন নি। না হলে ঐ অবস্থায় তাঁকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বেশ মুশকিল হতো।

তখনই পুলিস ডাকা হয়েছিল। পুলিস আসতেই মাননীয় অতিথি চিৎকার করে উঠেছিলেন, "আমি সমস্ত ওয়ার্ল্ড ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ইউ ইণ্ডিয়ানদের মতো চোর দেখিনি। তোমরা অনেস্ট নও, এই জন্যে তোমরা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাচ্ছো না। আমি ভাইসরয়ের কাছে কমপ্লেন করবো, আমার সমস্ত টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে; আমাকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।"

পুলিস জিজ্ঞাসা করেছিল, "ওই সময় আপনি বেরিয়েছিলেন কেন?"

অতিথি চিৎকার করে বলেছিলেন, "তোমাদের মেড-ইন-ইণ্ডিয়া গড্‌সে জেন্টলম্যান থাকে তোমাদের কারেন্সি জাল হয়, এমন কি তোমাদের গার্লসে পর্যন্ত জেজাল।"

বেয়াড়া পুলিসের লোক বলেছিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তরটা।"

অবস্থা সুবিধের নয় বুঝে ভদ্রলোক রিসেপশনিস্টকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কী লিখিয়ে দেবো?"

রিসেপশনিস্ট বলেছিলেন, "জয়-রাইড লিখে দিন। সঙ্গে একজন কম্প্যানিয়ন আর্টিস্ট ছিলেন।"

পুলিস বোসদাকে ট্যাক্সির নম্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নম্বর লিখে রাখবার নিয়ম ছিল না, দারোয়ানও লেখেনি। সেই থেকেই ম্যানেজার অর্ডার দিয়েছিলেন, গভীর রাত্রে যেসব গাড়িতে অতিথিরা আসবেন বা যাবেন, তার নম্বর লিখে রাখতে হবে।

"নম্বরটা থাকলে সুবিধে হতো। না থাকলেও ঠিক বার করে ফেলবো।" পুলিস বলেছিলেন।

এবং সত্যিই তারা এক মহিলা এবং একজন আর্টিস্ট সাপ্লায়ারকে ধরে নিয়ে এসেছিল। মাননীয় অতিথি বলেছিলেন, "তোমাদের কাণ্ট্রির এইসব ডিজ-অনেস্ট মেন অ্যান্ড উইমেনদের গুলি করে মারা উচিত। তবে যদি তোমাদের মরালিটি হাই হয়।"

"ফাঁসি হবে না, তবে জেল নিশ্চয়ই হবে," বোসদা বলেছিলেন।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামান্য জেলও হলো না।"—শাজাহানের কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোসদার গল্প শুনছিলাম।

আমি বললাম, "কেন?"

বোসদা বললেন, "সেইদিনই ক্রিমিন্যাল কোর্টের দুটো রোগা রোগা উকিল মাননীয়

অতিথির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

"গেট আউট, গেট আউট", বলে সায়েব তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর বোসদার কাছে এসে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে।"

আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি চাই, এইসব এলিমেণ্ট, যারা তোমাদের ফেয়ার নেম কলঙ্কিত করছে, কাস্টমারকে যারা ঠকাচ্ছে, তাদের প্রচণ্ড শাস্তি হোক। কিন্তু এইসব ডাকাতদের তোমাদের দেশের উকিলরা ডিফেণ্ড করে?"

বোসদা বলেছিলেন, "তা করে।"

"লেট দেম ডু সো"—সায়েব চিৎকার করে উঠেছিলেন। "কিন্তু তা বলে ব্ল্যাকমেলিং!"

"মানে?" বোসদা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"মানে, এই কেসের রিপোর্ট নাকি খবরের কাগজে বেরোবে?"

বোসদা বলেছিলেন, "তা বেরোতে পারে।"

"তোমাদের নিউজপেপাররা এইসব সামান্য খবর ছাপায়? ওই উকিল দুটো বললে, খবর বেরোবে এবং বেরোবার পর কাগজের কাটিং তারা আমার ওয়াইফের কাছে পাঠিয়ে দেবে! কতবড় স্পর্ধা। ইণ্ডিয়ার লোকদের আমরা ভদ্র বলে জানতাম।"

বোসদা তাঁর অতিথিকে কোনো ভরসা দিতে পারেননি, এবং ভরসা না পেয়েই সায়েব আবার টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে আরম্ভ করেছিলেন। দু-একবার ট্যাক্সি নিয়ে ছোটাছুটিও করেছিলেন।

"এবং"—বোসদা বললেন, "কেমন করে জানি না শেষ পর্যন্ত মামলা না করেই তিনি শাজাহান থেকে পালিয়েছিলেন।"

একটু থেমে বোসদা বলেছিলেন, "তিনি এখন কোথায় জানি না, কিন্তু আমরা এতো বছর পরেও রাত জেগে গাড়ির নম্বর খাতায় টুকে চলেছি।"

রাত্রি যে শেষ হয়ে আসছে এবার বুঝলাম। লেনিনবাবু একটা গামছা হাতে স্তব পাঠ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এতো সকালে আইনকানুন মানা হয় না তাই। না হলে হোটেলের কোনো কর্ম-চারীকে ঐ বেশে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। স্তব পাঠ করতে করতেই তিনি আমাদের সামনে এসে বললেন, "কী ব্যাপার? আপনারা দু'জনে একসঙ্গে জেগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? স্পেশাল কিছু থাকলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।"

বোসদা ও আমি চুপ করে রইলাম। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম, "কোথায় চললেন?"

"মায়ের কাছে। মা আমার সব দোষ ক্ষমা করবেন। সারাদিন ধোপার ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে যত পাপ করেছি, তা এবার মার চরণে বিসর্জন দিয়ে আসবো।" বোসদার দিকে তাকিয়ে লেনিনবাবু বললেন, "আপনি তো স্যর সায়েব মানুষ, আপনাকে বলে লাভ নেই। এই ছোকরাকে, এই ব্রাহ্মণসন্তানকে অ্যালাউ করুন। ভোরবেলায় স্নানের অভ্যাসটা করে রাখুক।"

বোসদা মৃদু হাসলেন। বললেন, "আমি কি ওকে আটকে রেখেছি? ইচ্ছে হলে যাক।"

ন্যাটাহরিবাবু বললেন, "তা হলে চলুন। এই সকালে ঘাটে গিয়ে দেখবেন কতজন সারারাতের পাপ ধুয়ে ফেলছে। আমাদের হেড বারম্যান, রামসিং এতোক্ষণে স্নান শেষ করে পুজোয় বসে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আপনি একাই যান।"

উনি চলে যেতে বোসদা বললেন, "পাগল। ফেরবার সময় লোকটা এক ঘটি জল সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। প্রথমে হোটেলের সামনে একটু ছড়িয়ে দেবে। পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে বালিশ বিছানার পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলবে, "মা, দুর্গতি-নাশিনী, দেখিস মা।"

একটা ঘর এই ভোরবেলায় খালি হয়ে গেল। আমেরিকান দম্পতী রাঁচির দিকে চলে গেলেন। বোসদা বললেন, "ওপরে আমাদের একটা ঘর না হলে তো চলে না। দেখো কেউ উঠেছেন কি না।"

উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, বোসদার ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। হাওয়াই হোস্টেস মিস মিত্র এখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন। আমার ঘরের দরজাটা খোলা। গুড়বেড়িয়া বললেন, "সায়েব উঠে পড়েছেন। চা খেয়েছেন।"

দরজায় নক্ করতেই হাওয়াই জাহাজের ভদ্রলোক বললেন, "কাম্ ইন।"

ঢুকে গিয়ে আমি বললাম, "রাত্রে আপনার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে। নিচের একটা ঘর খালি হয়েছে। আপনি চলুন।"

গুড়বেড়িয়ার হাতে মালপত্র চালান করে দিয়ে, ভদ্রলোককে নিচের ঘরে ঢুকিয়ে বোসদাকে খবর দিয়ে এলাম।

বোসদা হেসে বললেন, "এখানে থেকে থেকে ভাগ্যটা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তোমার কপালের জন্যে হিংসে হচ্ছে। ভদ্রমহিলাকে কখন যে বিদেয় করে একটু ঘুমোতে পারবো জানি না।"

আজ এতদিন পরে বোসদার সেই কথা-গুলো মনে পড়লে কেমন হাসি আসে। আশ্চর্যও লাগে। সুজাতা মিত্রের কথা, বোসদার কথা, ভাবলে মনটা কেমন হয়ে যায়। আজও কোনো কর্মহীন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আমি যেন সুজাতা মিত্রকে খুব কাছাকাছি দেখতে পাই। অকারণে আমার বয়সী চোখ দুটো সেই সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চায়। আমি বুঝি এ অনন্ত সংসারে সুদীর্ঘ পথে এই চঞ্চলতা মানায় না। আমার পরিচিতা একান্ত আপনজন সকৌতুকে এবং সস্নেহে অভিযোগ করেন, "তোমার সব ভাল। শুধু এই ছেলে-মানুষীটুকু ছাড়া। সংসারের পাঠশালায় এতো শিখেও তুমি সেই কৈশোরেই রয়ে গেলে। বড় হয়ে উঠলে না।"

যিনি আমার কাছে বার বার এই অভিযোগ করেন, তিনি হয়তো চান আমার অপরিণত মন কৈশোরের প্রবৃত্তি কাটিয়ে যৌবনের রঙে নিজেকে রঙীন করে তুলুক। কিন্তু কেন জানি না, বেশ বুঝতে পারি, কৈশোর থেকে সোজা আমি বার্ধক্যে এসে দাঁড়িয়েছি। ওঁদের দুজনকে স্কুটারের পিঠে ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসতে দেখে আমি সুজাতাদিকে বলেছিলাম, "শুনুন—

কদমে চলেছে দুই সাঁঝের তারকা
স্কুটারের পিঠে,
ফাঁপানো চুলের গুচ্ছে লাল ফিতে
ওড়নায় লেপটানো পিঠ অসম্বৃত
অদম্য অকুতোভয় স্কুটারের
তরুণ চালক।"

আর আবৃত্তি করতে দেননি, সুজাতাদি আমার কানটা চেপে ধরেছিলেন। আমি বলেছিলাম, "লাগছে। ছেড়ে দিন।"

বোসদা বলেছিলেন, "আঃ, না হয় বলেই ফেলেছে।"

সুজাতাদি বলেছিলেন, "ওড়না ও কোথায় পেল?"

এতদিন পরে সে-সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

সেদিন ভোরবেলায় বোসদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে-সবের কিছুই বুঝি নি।

[ক্রমশ]

চূর্ণ লয়

শওকত ওসমান

"সামনে শনিবার বিকেলটা বেড়িয়ে আসা যাক।" অবসরই মেলে না, তবু ডায়ানা প্রস্তাব দিয়েছিল।

এই অনুরোধ অপ্রত্যাশিত।

সময় থাকে না, সে কথাও সত্যি। ডায়ানা ডিসূজা কাজ করে এক স্টোরে। সেখানে শনিবার ছাড়া রাত্রি আটটার আগে ছুটিই হয় না। রবি রোজারিও ব্যাঙ্কের জুনিয়র অফিসার। পরিস্থিতি আরো নীচের দিকে। অনেক সময় রবিবারেও অফিস করতে হয়।

উদ্যোগী ডায়ানা নিজে!

আনন্দ-আতিশয্য থাকলেও রবি কথাটা তলিয়ে দেখে। কারণ, সে পাড়ার আর দশটা ইয়ংম্যানের মত নয়। গার্ল-ফ্রেন্ড, বীয়ার-বিলিয়ার্ড, ক্লাব, ডান্স, নতুন কাপড়-চোপড়ের ডাঁট—এসব থেকে সে ফারাকই থাকে। তার নিজস্ব একটা জগৎ আছে। আপন শান্ত পরিবেশ-উপভোগই সেখানে দৈনন্দিনতার প্রয়াস। মাঝে যে হল্লা চাগান দেয় না, তা নয়। সেটা নাটকের ক্ষেত্রে। রোজারিও ত মঞ্চে রাজত্ব-স্থাপনের পক্ষপাতী। বছরে একবার-দু'বার পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সে মেতে উঠবেই। রবির উদ্দীপনা এইরকম সাময়িক। কেটে কেটে দেখলে, সে সর্বদা পদ্মাসনে ধ্যানস্থ। পাতলা একহারা ফর্সা চেহারা। দু-চোখ যেন ঘুমের পর এইমাত্র স্বপন-মোছা। চুল একটু বেশীই লম্বা, হ্যাটে ঢাকা পড়ে না। ওর চলন দেখে মনে হয়, বিনয়-উচ্ছল বৈষ্ণব স্মার্টনেস সজ্জায় রেখে হাঁটছে। কেউ আজ ভাবতে পারবে না, রোজারিও পর্তুগীজদের বংশধর।

গত ছ' মাস থেকে রবি রোজারিও নিজের মধ্যে পূর্বাপরযোচিত একটা চাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করছিল। তার ঝাপটায় প্রথমে সে আত্মস্থ হতে পারেনি। ডায়ানা ডিসূজাকে কি সে আগে দেখেনি কোনদিন? কতবার দেখেছে। একই পাড়ার মেয়ে ত। একটা কি দুটো বাড়ি ছাড়াছাড়ি। ওদের বেড়া-ঘেরা কম্পাউণ্ড, কুলগাছ, হাঁসমুর্গীর আস্তানা রোজারিওদের বাড়ির পইঠা থেকেই দেখা যায়। অফিস যাওয়ার সময় কতদিন দেখেছে, ডায়ানার মা এক পাল টার্কি-তিতিরকে খাবার দিচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সেদিন রোজারিও ডায়ানাকে নতুন করে দেখলে। গোলাপী রঙের ফ্রক, কালো স্লিপার, বব্ চুল ছাঁপিয়ে ডায়ানা যেন আর কেউ। চোখে-মুখে সত্তাগ্রাসী আভা—যা

ডেকে নেয়, ঢেকে দেয়। রোজারিওর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। অফিস যাওয়ার পথেই ব্যাপারটা ঘটে। রোজারিও প্রস্তুত ছিল না। তারপর থেকে বাড়ির কম্পাউণ্ডে ডায়ানাকে ত সে দেখছেই। কিন্তু নবীনতা এই জগতে মুহূর্তে পুরাতন। চাঞ্চল্যের ঝড়ে রোজারিওর মত রুচিবন্ত ছেলে স্থির থাকতে পারে নি। তার ত্রিভুবন বদলে গিয়েছিল, বদলে যেত নিমেষে নিমেষে। ডায়ানার ঈষৎ সোজাসুজি চোখের চাওয়ায় মনে হত, তার অন্তর বিঁধে কে যেন টান দিচ্ছে। কী দুঃসহ যন্ত্রণা, কী দুঃসহ আনন্দ! যন্ত্রণা আনন্দ হয়, আগে তা রোজারিও জানত না। সে ভাবতে গেছে, একেই প্রেমে-পড়া বলে। লভ্। কিন্তু 'লভ্' শব্দের একটা বিশেষ অর্থই আছে এই ফিরিঙ্গি পাড়ায়। রোজারিও তাই ভাবতে গিয়েও থেমে গেছে। সে কী ডায়ানার সান্নিধ্য চায় নি? কতবার ছুতো করে ওদের বাড়ি গেছে, চুপচাপ বসে আবার চলে এসেছে। মুখের নিবেদনের সঙ্গে যেন কত কুণ্ঠিত অনুরাগ জড়িয়ে থাকে। রোজারিও নীরবতাই বেছে নিয়েছিল। একদিন সমাগত সন্ধ্যায় এই পথে হাঁটার সময় সে দেখেছিল, গেটের ওপাশে ডায়ানা দাঁড়িয়ে। ডায়ানাই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। দুটো মামুলী জিজ্ঞাসাবাদের পর সে হঠাৎ রোজারিওর দুই হাত কর-তালুর মধ্যে নিয়ে বলেছিল, "you are so good, তুমি এত ভালো!" পরক্ষণে সে দৌড় মেরে চকিতে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল। রোজারিও কতক্ষণ মাটির সঙ্গে সাঁটা দাঁড়িয়েছিল, সে জানে না। সংবিৎ ফিরতে বুঝেছিল, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা রুচি-বিরুদ্ধ। কিন্তু সমস্ত শরীর অসহ্য নাড়া-খাওয়া। স্বপ্নার্পিতের মত হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছিল, এখনই হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। টলমল সাঁকো-পথে হাঁটার সময় পার্শ্বস্থ অবলম্বন বাঁশের মত সে নিজের বুক চেপে ধরেছিল। প্রকৃতি এই দুঃসহ কৌতুক-খেলা কেন খেলে যায়? সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল বুঝি রোজারিও নিজেকে, উত্তর-প্রাপ্তি অসম্ভব জেনেও।

দু মাস কেটে গেল। আজ একত্রে তারা বেড়াতে যেতে পারবে। প্রস্তাব ডায়ানার। রোজারিও অফিসে সেদিন জানিয়ে দিয়েছিল—দেড়টার পর তার পক্ষে থাকা আর সম্ভব নয়। কোন কাজ বাকী থাকলে রবিবারে এসে করে দিয়ে যাবে। সেই মোতাবেক সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে নিজেকে সে সাজিয়ে নিয়েছিল। নতুন ধোলাই স্যুট, মোজা-জুতো, বাটনহোলে একটা লাল গোলাপ গুঁজেছিল পর্যন্ত। এমন আত্মসজ্জার কথা আগে কোনোদিন সে ভাবেনি। মনে মনে লজ্জা পেয়েছিল রোজারিও।

এই শহরে পাহাড় নেই। উঁচু টিলা অনেক। সবই উপত্যকা-সমন্বিত। শীতেও সমস্ত শহর সবুজ থাকে। বেড়ানোর জন্যে তাই দূরে যেতে হয় না। টিলাই যথেষ্ট। সেখানেও দেখা যায়, সবুজ ঘাসের নির্বিরোধ জাঁকালো সংসার।

শহরের দু-একটা রাস্তা পার হওয়ার পর ডায়ানার কাছে একটা ছোট টিলা খুব সুন্দর লাগল। রোজারিও তাই সেখানে গিয়ে বসার পক্ষপাতী। এই শহরে যেকোন এক জায়গায় গেলেই মন ভরে ওঠে। শীতের রোদ্দুর ত কাছে টেনে রাখে, দূরে যেতে দেয় না।

ওরা দু-জনে উপত্যকার এক জায়গায় বসে পড়ল। এখানে সবুজ ঘাস আছে, বলা বাহুল্য। দুটো শিরিজগাছ গাছ নিজেদের ডালপালা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। সূর্যের আলো তাই সহজে চোখে-মুখে থাবা মারতে পারে না।

ডায়ানার পছন্দ আছে! রোজারিও এই জায়গায় বসে কয়েকবার তারিফ করল। টিলা থেকে প্রায় পনর ফিট নীচে ওদের অবস্থান।

আজ ত রোজারিও পথ হাঁটেনি সে, ক্লান্তি ধরবে। পৃথিবীর সম্রাট কি পথ হাঁটে? সে আছে, এইটুকুই কী যথেষ্ট নয়?

তারা বসে আছে। দুইজনেই নীরব। যেন কারো কোন কথা নেই। ডায়ানার এক হাত শুধু রবির করতলের মধ্যে বন্দী।

তারা বসে থাকে। কখনও দিগন্তের দিকে চোখে, কখনও অপরের আঁখি-পাতে অনিমেষ-সন্ধানী। মাঝে মাঝে ডায়ানা মৃদু হাসে। রোজারিও ত স্বপ্নের কাছে আত্ম-

সমর্পণের পর স্তব্ধ। যেটুকু কথা, তা হাতেই বলে। চোখ সায় দেয়। আর স্পন্দিত বক্ষ যোগায় শব্দ-ভুবন। অন্ত-প্রবাহে রুদ্ধবাক অগ্নিগিরির ভাষণ-নিরত।

ডায়ানা একবার উচ্চারণ করলে, ববি!

ডায়ানা!

—ববি!

—ডায়ানা!

ধ্বনি যেন নিমেষে প্রতিধ্বনি সাজছে দুই নামে, আঘাতে আঘাতে বেজে-ওঠার অভ্যাসে। নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা হয় আরো পুরু, প্রসারী হয় ঈষৎ খুঁতে। তিল-কলঙ্ক বর্ধিত শোভা-সুন্দর মুখে যেন।

আনমনা ডায়ানা ববির বুকে অলগোছে মাথা রাখলে। ভিত স্বস্থানে। রোজারিওর নিশ্বাস হঠাৎ যেন থেমে আসে। তার থুতনির নীচে ডায়ানার মাথা, ঘাড়। নারী-দেহের সৌরভে হত-চকিত সে। বাসন্তী লাতাবী-মঞ্জরী আর বৃষ্টিস্নাত মাটির সোঁদা গন্ধ যেন একাকারে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। রোজারিওর মনে হয়, ওই ঘ্রাণ-রেখার সড়কে সে পৃথিবীর তাবৎ চাওয়া-পাওয়ার অনিবর্চের হদিস পেতে সক্ষম। অস্তিত্বের বিলুপ্তি এই সৌরভ-অরণ্যেই সম্ভব।.....ধীরে ধীরে নিজের ঠোঁট রাখলে রোজারিও সঙ্গিনীর অনাবৃত ঘাড়ের কোমল ত্বকে। কী করছে, কেন? তা সে জানে না। অজানিতেই ঠোঁট আরো চেপে ধরে সে। ডায়ানা তখন নিজের এক হাতে সঙ্গীর ঘাড়ে রেখে চাপ দিতে থাকে। রোজারিও অনুভব করে, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে হয়ে আসছে ঘ্রাণের পরিখায়। ঠোঁট তুলে নিলে সে।

ডায়ানা এবার আরো একটু শরীর এলিয়ে রোজারিওর চোখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তাকায়। সঙ্গী হাসে না, অপলক চেয়ে থাকে। এইভাবে অর্ধ-শায়িতা ডায়ানা হঠাৎ ফিসফিস কণ্ঠে বলে, "Do you know, Rogerio, I love you too"। সঙ্গিনীর হাতে দৃঢ় চাপ দেয় রোজারিও, কথা বলে না।

অনন্ত-শয়ান মুহূর্ত মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এই ত সেই লগ্ন...। মানুষের বুকে অন্ধকার ধরিত্রী-বক্ষের মত মাঝে মাঝে পরিমাপের বন্ধনে বাঁধা পড়ে না। সর্বগ্রাসী তার প্রসার। এমন অপার্থিব পরিলুপ্তিক্ষণ কতবার আর আসে জীবনে?

ডায়ানা বুকে ঢলে রোজারিওর ঘাড়ে হাত রেখে চাপ দেয়। আকাশ আরো নীচে নামুক পাহাড়-শিখরেই অনন্ত-ঠোঁট রোজারিও। ডায়ানা তৃষিত ঠোঁট উপরে তোলে ক্রমশ। দুই নিঃশ্বাসের মোহানায় আবর্তিত সমগ্র পৃথিবী......

পিছু হটে ডায়ানা সঙ্গীর কণ্ঠ দুই হাতে জড়িয়ে নিজেকে উত্তোলিত করে ঠোঁটের উদগ্র পিপাসায়। রোজারিও আরো প্রবল আকর্ষণে সঙ্গিনীর মুখ নিজের কাছে আনবে, তাই দুই হাতে নারী-দেহ জড়াতে যায়।

হঠাৎ তার পিঠে গদাস্-শব্দে একটা ঢেলা এসে পড়ল। খুব জোরে লাগেনি। তবু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বাঁধন ছেড়ে দিয়ে রোজারিও ইতিউতি তাকায়। সে ভাবলে, এই জায়গায় বহু কুঁচো ছেলে খেলতে আসে—তারাই ঢেলা ছুঁড়েছে।

আবার ডায়ানা সঙ্গীর বুকে মাথা রাখলে নবীনতর আহ্বানে। রোজারিওর সাড়া দানে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু এবার এক—দুই—তিন—চারটে ঢেলা এসে পড়ল আশপাশ থেকে। আলতোভাবে একটা লাগল ডায়ানার পায়ে।

দুইজনে উৎকণ্ঠিত, তারা পেছনে তাকায় এবার।

তারা কী পরেছিল—লুঙ্গি, না পাজামা পাতলুন, না ধুতি—তাদের মাথা খালি কী শিরোভূষণে ঢাকা—সেই মুহূর্তে সেদিকে রোজারিওর খেয়াল থাকার কথা নয়। তারা দেখলে: পনর-বিশজনের একটা দঙ্গল জমে গেছে পনর-বিশ হাত দূরে উপরের টিলায়। বোঝা যায়, এতক্ষণ তাঁরা দর্শকরূপে খাড়া ছিলেন। এবার একজন সক্রিয় মুখপাত্র মুখ ব্যবহার করলে: "এই হারামীর ফ্যাং—"।

রোজারিও বাংলা ভাল বোঝে, সুতরাং শব্দটা হজম করলে।

মুখপাত্র আবার চীৎকার দিয়ে উঠল: "এই জারগুয়া ফ্যাং......ইডা খিষ্টানর মুল্লুক নঅ......বেশরা-বেহায়া কাম ইয়ি চইলব ন...(হে জারজ-পুত্র! ইহা খৃষ্টানের মুল্লুক নয়। বেশরা-বেহায়া কাজ এখানে চলিবে না)......।"

রোজারিও কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই আবার বসতে যাচ্ছিল। সঙ্গিনী তখনও হতদিশা, উপবিষ্ট। সেও ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোজারিও তাকে বসার জন্যে অনুরোধ করবে, ভাবছে......

দুই নিশ্বাসের মোহানায় আবর্তিত সমস্ত পৃথিবী

সেই মুহূর্তে ডায়ানা তার হাতে হেঁচকা টান দিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "ববি, come on, quick!" কারণ, ওদিকে পাটকেল-বৃষ্টি তখন শিলা বৃষ্টি তে পরিণত। শুধু মিনজিরী গাছের কয়েকটা স্নেহশীল, ভূমি-প্রয়াসী ডাল তাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

আর বিলম্ব করা চলে না! তারা দুইজনে উপত্যকার ঢালু পথে দৌড়াতে লাগল স্পন্দিত-বক্ষ, উত্তাল-নিঃশ্বাস, শক্ত মুঠির পারস্পরিকতায় নৈকাট্য-উজ্জ্বল ডায়ানা ডিসুজা, ববি রোজারিও।

স্বপ্নদেখা মেজাজের পক্ষে ভাল

পাশ্চাত্যের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা স্বপ্ন দেখা বিষয়ে এবং স্বপ্ন দেখার অভ্যাস সম্পর্কে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের মতে বেশ মধুর স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা থাকলে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমানো উচিত। এইভাবে শয়ন করলে নিদ্রার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা যায়। তাঁদের মতে ঘর অন্ধকার থাকলে দুঃখভরা এবং মন ভেঙে দেবার মতো স্বপ্নের সৃষ্টি করে।

নাসিকার নীচে সুগন্ধি রেখে, মৃদু আলো জ্বালিয়ে, ফিসফিস করে কথা বলে এবং কোলে বালিস রেখে নিদ্রায় ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মনোরম স্বপ্নে নিমগ্ন করে তোলা যায়।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে এমন অবস্থায় উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করলে স্বপ্নের মেজাজটা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক হয়ে ওঠে অথবা স্বপ্ন শেষই হয়ে যায়।

একটি পরীক্ষার ব্যাপারে দুটি পৃথক দলের ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়—একদল যারা প্রায় প্রতি রাত্রেই স্বপ্ন দেখে, আর অপরদল যারা অতি কদাচিত দেখে বা কোনদিনই স্বপ্ন দেখেনি।

পর পর চার রাত্রি পরীক্ষায় নিয়োজিত দু' দলেরই লোককে ঘুম থেকে তুলে স্বপ্ন দেখছিল কিনা প্রশ্ন করা হয়। যারা স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত নয়, তারা স্বপ্ন দেখার কথা অপেক্ষাকৃত কম মনে করতে পারে। যদিও তারা কোনদিনই স্বপ্ন দেখেনি বলে দাবি করে, কিন্তু প্রশ্ন করে জানতে পারা যায় যে, পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকা কালে প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি স্বপ্নও দেখেছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে স্বপ্ন প্রত্যেক মানুষই দেখে যদিও কোনো ব্যক্তির স্মৃতি থেকে তা অত্যন্ত দ্রুত অপসৃত হয়।

এক আঠাশদিন ব্যাপি নিরীক্ষণে দৈনিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত ধরে ব্যক্তির পরীক্ষা করা হয়।

এতে দেখা যায় যে, যারা অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে স্বপ্নটা মনে করতে পারে, তারা তাদের গোপন অনুভূতি ও দুশ্চিন্তা সম্পর্কে সচেতন। আর যারা স্বপ্নে দেখা বিষয়ের খুঁটিনাটি ভুলে যায় তারা তাদের ভাবাবেগ দমন করতে চায়।

স্বপ্ন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে, কেউ স্বপ্ন দেখছে কিনা সেটা বলে দেওয়া যায় চোখের পাতার নীচে অক্ষিগোলকটি নড়ছে কিনা দেখে। স্বপ্ন দেখার সময় মনেতে সৃষ্ট কাহিনীকে চোখ অনুসরণ করে, যেমন ঘটে চলচ্চিত্র দেখার সময়।

নিদ্রিত ব্যক্তি পাহাড়ে বা কোন উঁচু জায়গায় ওঠার স্বপ্ন দেখলে তার চোখও ওপর থেকে নীচের দিকে বা নীচ থেকে ওপরে ওঠানামা করে। স্বপ্নে প্রচুর দ্রুতগতি ঘটনা থাকলে চোখের তারার গতিও দ্রুত হয়।

চোখের গতি লক্ষ্য করে স্বপ্ন দেখার মাঝখানে একশ একানব্বই জন নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিতে তাদের মধ্যে একশ বাহাত্তরজন তাদের স্বপ্নটা খুঁটিনাটি সমেত মনে করতে সক্ষম হয়।

তাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, স্বপ্নে দেখা দৃশ্য অনুযায়ীই তাদের চোখও নড়াচড়া করেছে। চোখের গতির ওপর লক্ষ্য রেখে ডাক্তারেরা স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না এই পুরনো প্রতিপাদ্যটি ভুল প্রতিপন্ন করেন।

গড়পড়তায় স্বপ্ন দেখার সময় কুড়ি মিনিট স্থায়ী হয় যদিও একঘন্টা ধরে স্বপ্ন দেখার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

হিসেব করে দেখা গিয়েছে গড়পড়তা লোকে তার ঘুমের শতকরা বাইশ ভাগ সময় স্বপ্ন দেখে কাটায়।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাহিত এক তথ্যানুশীলনে দেখা যায় পুরুষ এবং নারীর মধ্যে স্বপ্ন দেখার এইমাত্র পার্থক্য, যে পুরুষরা স্বপ্নের দৃশ্যে রঙের সমাবেশ কদাচিৎ দেখে, কিন্তু মেয়েরা অধিকাংশতই স্পষ্ট রঙ দেখতে পায়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য স্বপ্নে কোন বস্তুর যে রঙ দেখা যায় সেটা ঐ বস্তুর আসল রঙ নাও হতে পারে।

স্বপ্ন সম্পর্কিত গবেষণায় নিয়োজিত একজন জানায় যে সর্বদাই সে গাছ ও সাপ দেখে সবুজ রঙের।

অনেকে জানায় যে তারা রঙ দেখতে পায় স্বপ্নে আগুনের দৃশ্য থাকলে। সবচেয়ে বেশী রঙ দেখে বধির ব্যক্তিরা।

কিন্তু স্বপ্ন আমরা বেশী দেখি কি কম দেখি, রঙীন বা রঙহীন হোক, অনুশীলনে এটা দেখা গিয়েছে যে স্বপ্ন আমাদের মেজাজের পক্ষে সুফলদায়ক।

এটা প্রমাণ করার জন্য জনকতক স্বেচ্ছা-ব্রতীকে একটি হাসপাতালের পরীক্ষাগারে রেখে পাঁচ রাত্রি ধরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করা হয়।

যতবার চোখের গতি দেখে ওরা স্বপ্ন দেখছে মনে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই ওদের জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্ন দেখায় ঐভাবে বঞ্চিত হতে স্বেচ্ছাব্রতী কজনই উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। মনোনিবেশে ওরা অক্ষম হয়ে পড়ে এবং গোগ্রাসে খাওয়ার মতো ক্ষুধায় প্রপীড়িত হয়ে ওঠে।

ওদের মধ্যে একজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষা করা থেকে সরে পড়ে। আর বাকি কজনে পাঁচরাত্রিব্যাপি ধকল পোয়াতে অসমর্থ হয়।

এই লক্ষণগুলি ঘুম না হওয়ার দরুণ দেখা দেয় নি। পরবর্তী পরীক্ষায় ঐ একই ব্যক্তিদের জাগিয়ে তোলা হয় যখন দেখা যায় ওরা স্বপ্ন দেখছে না এবং সে ক্ষেত্রে ক্লান্তির ভাব ছাড়া আর কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া ওদের মধ্যে ঘটে নি।

এই সব তথ্য দ্বারা বোঝা যায় যে স্বপ্ন হচ্ছে মনের আবেগ থেকে পরিত্রাণের কপাটক এবং ওটা না থাকলে মানসিক দুঃখ বেদনা আরো জমে উঠতে থাকে।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কৃত্রিম জ্ঞানবুদ্ধি

অধুনা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যাপক নিয়োগের ফলে দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে হয়ত মানুষের বদলে কৃত্রিম জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা বহু কাজ সম্পাদন সম্ভব হবে। পশ্চিম-জার্মানীর কালস্রুহের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন গবেষক কৃত্রিমবুদ্ধির কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক

সমস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণামূলক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এটুকু বেশ বোঝা গিয়েছে যে, স্বয়ংক্রিয় অথবা ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে শিক্ষাগ্রহণ করার মত শক্তিযুক্ত করা চলে। এই সব যন্ত্রে কৃত্রিম বোধশক্তির কুশলতা বর্তমান এবং মানুষের আচরণ অনুকরণ করবার শক্তিও এদের প্রভূত। চেতনাশক্তি না থাকলেও চিন্তাশক্তির অনেক-গুলি সাধারণ ধারা এরা সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারে। একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের শক্তি মানুষের মস্তিষ্কের চেয়েও বেশী, কেননা এর মধ্যে অজস্র খবরাখবর সংগ্রহ করে রাখা যায় এবং বহু রকমারী সব যন্ত্রের সমন্বয় এর মধ্যে রয়েছে,—যেমন সংখ্যা পরিগণক যন্ত্র, পঠন-যন্ত্র ইত্যাদি।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি শিক্ষাগ্রহণ করে আলোক-রেখার সাহায্যে। কার্লস্রুহের একটি পরীক্ষার বৃত্তান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রথমে বড় একটি কাচের পরদায় একটি গোলকধাঁধার ছায়া দেখা গেল। তারপর আলোর রেখা সেই গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে পথ বের করে বাইরের দিকে যেতে চেষ্টা করল—যেখানে বাধা পায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাস্তা খোঁজে। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রন যন্ত্রটির লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে ভাল এবং কম দূরত্বের রাস্তাটি খুঁজে বের করা। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরীক্ষাটি যদি আবার করা হত তাহলে দেখা যেত যে এবারে যন্ত্রটির লক্ষ্য ভুল হয়নি। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এদের ঘটনা মনে করে রাখবার ক্ষমতা থাকে।

মানুষের মত ঐ যন্ত্রে পঞ্চেন্দ্রিয় আছে কিনা সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, তবে উপরোক্ত গবেষক মণ্ডলী এ বিষয়ে একমত যে মানুষের মত এরাও ঠেকে শেখে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

বোধ-শক্তি-সম্পন্ন যন্ত্রের মহিমায় ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে অনেক কিছুই অদলবদল হতে পারে। সামাজিক জীবন, আর্থনীতিক পরিস্থিতি, যান্ত্রিকতা প্রভৃতি সব কিছুই পাল্টে যেতে পারে।

ছোট ছেলেমেয়েদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য পশ্চিম জার্মানীর এক লেখক পরিকল্পিত 'স্ট্রুয়েলপিটার' চরিত্রটি রূপায়িত করে তুলেছেন এই তরুণী। ট্রাউজারটা ওর ছোট ভায়ের এবং পরচুলটা ও নিজেই তৈরী করেছে। ওর চুল অবিন্যস্ত করে তোলায় ওকে সাহায্য করে এক কেশবিন্যাস প্রতিষ্ঠানের কজন অভিজ্ঞ সহযোগী সেখানে ও 'কেশবিন্যাস শিল্পী' রূপে কাজ করে। কার্নিভালের সময় বহু কেশবিন্যাস প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে এবং কল্পনা-শক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয় প্রদানকারীকে পুরস্কার দেয়। বহু তরুণী এইসব প্রতিযোগিতায় যোগদান করে তাদের দক্ষতাকে যাচাই করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে

শিল্পে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার

১৯৬০ থেকেই বুলগেরীয় শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে ও নির্মাণমূলক কাজকর্মে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার হয়ে আসছে এবং সম্প্রতি তা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আজকাল ভূতাত্বিক অনুসন্ধান এবং তেল ও গ্যাস ড্রিলিংয়ের কাজে স্বাভাবিক গামা তেজস্ক্রিয়তা পদ্ধতি এবং নিউট্রন গামা পদ্ধতি বেশ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে কারবোনেট ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ ব্যবহার করে পাথরের স্তূপ থেকে কয়লার স্তর পৃথক করার উপায়ও বের করা হয়েছে।

কলকব্জা-নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢালাই, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি ব্যাপারে দোষত্রুটি আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য ব্যাপকভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে সোফিয়ার জি বিরোভ বয়লার কারখানায়, স্টারা জাগোরার নাইট্রোজেন সার কারখানায়, মারিৎসা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, কেমিকোভৎসি ধাতুশিল্প কারখানায় এবং অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে।

এ ছাড়া কন্ট্রোল-এর কাজের জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট-৬০ ব্যবহার করা হচ্ছে।

একলক্ষগুণ বর্ধিত চিত্রগ্রহণ

সামান্য একটানা খড় খড় আওয়াজে হঠাৎ যেন চোখ কান সচকিত হয়ে ওঠে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে অদ্ভুত দৃশ্য, যেন কতকগুলি খাল চলেছে, খালগুলি যেন হঠাৎ সচল হয়ে উঠলো। উজ্জ্বল পর্দায় উপর দর্শক এই দৃশ্য দেখছে। কিন্তু কি জিনিস সে দেখছে? সে দেখছে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ গুণ বর্ধিত স্নেহ

তন্তু ও সংবাহিকা নলের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ। জীবন্ত দেহকোষের অতি ক্ষুদ্র অংশের প্রাণ সম্বন্ধে গবেষণা করা হয় পশ্চিম জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের "বায়োফিজিকস এন্ড ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইন্‌স্টিটিউটে।" য়ুরোপের মধ্যে এই সুবৃহৎ ও আধুনিক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কেন্দ্রটি সম্প্রতি আরও সম্প্রসারিত করার ফলে পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনে যে সব গবেষণা করা সম্ভব ছিল, এখন এখানেই তা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কীয় একান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্য এখানে করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের কক্ষটিতে ইলেকট্রনের অনুবীক্ষণের কার্যক্ষেত্র সম্বন্ধে বিরাট বিরাট চিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোষের গঠন, স্বাভাবিক ও অসুস্থ কোষ, কোষের পরিবর্তন এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু। এখান থেকে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যতে চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষকরা চিকিৎসা ও ঔষধের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। কারণ যে কোন কারণে মানুষ, পশু অথবা গাছপালার দেহে যে প্রতিক্রিয়া হয়, সব সময়ে সেই প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র হচ্ছে এই জীবন্ত কোষ। কোন বিষাক্ত পদার্থ হোক, শারীরিক বৃদ্ধির সহায়ক হোক, খাদ্যবস্তু কীট বা বীজাণু হোক, ঔষধ কিংবা বিষ হোক, শরীরের প্রত্যেকটি কোষ সেই একমাত্র কেন্দ্র যেখানে বহু বিভিন্ন রাসায়নিক, ভৌতিক পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে প্রত্যেকটি কোষের একক প্রতিক্রিয়া ধরা না পড়ে কোষগুলির সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া ধরা পড়তো।

তিশ বছর আগেও বিজ্ঞানীরা কোষের সাধারণ ক্রিয়া প্রক্রিয়া দেখেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কারণ অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপগুলি যে কোন বস্তুকে কেবল তিন হাজার গুণ বর্ধিত করতে পারে এবং বর্ধিত চিত্রগুলিও তেমন সুস্পষ্ট হয় না। ১৯৩২ সালে মিঃ আর্নস্ট রুস্কা এবং বোডোফন বোরিস নামে দুজন জার্মান পদার্থবিদ প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নির্মাণ করেন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বাধা অপসারিত হয়।

যুগান্তকারী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ব্যাপারে এই বৈজ্ঞানিকদ্বয় বিজ্ঞানের যে সত্য অনুসরণ করেন সেটি হচ্ছে যে কোন শূন্য স্থানে ইলেকট্রন রশ্মি যখন বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা উত্তেজিত কোন চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করে, তখন তার ভৌতিক গুণাগুণ সাধারণ চলতি কাচের পরকলা দ্বারা ভগ্ন আলোকরশ্মির সমান। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পরকলার কৌশলে কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশ যখন উজ্জ্বল পর্দার উপর বর্ধিতাকারে দেখা যায়, ঠিক সেই সময়ে একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার সাহায্যে এই অংশের ছবি তোলা হয়। ইলেকট্রন রশ্মির কোন বস্তুর অত্যন্ত পাতলা ফালির মধ্য দিয়ে যেতে পারে। মাইক্রোটোনের জন্য ব্যবহৃত সূক্ষ্ম ছবিগুলি মোমের উপর স্থাপিত এক ইঞ্চির ০।৬৪ ভাগ পুরু যে কোন বস্তুকে ১০,০০০ টুকরায় কাটতে পারে।

এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি মারাত্মক ক্যান্সার রোগের গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মানুষের এক অজেয় শত্রুকে পরাভূত করতে সমর্থ হয়, তবেই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক অপার সার্থকতা অর্জন করবে।

শরীর সুস্থ রাখতে মুরগী

বর্তমানে অবস্থা ভালো হলেও ভারতের শহরগুলির অধিবাসীদের পরিবারে রান্না খাওয়ার কি খুব পরিবর্তন হয়েছে? অন্ততঃপক্ষে নিজেদের শরীরটা ঠিক রাখার দুর্ভাবনা খাদ্যাভ্যাসে কতখানি পরিবর্তন এনেছে? এই ক্ষেত্রে গবেষণার অভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে অন্তত পশ্চিম জার্মানীর একজন উৎসাহী যুবক শরীর সুস্থ রাখার জন্য নারীদের বাসনার সুযোগ নিয়ে মুর্গী বিক্রী করে লক্ষপতি হয়েছে।

দশ বছরের কিছু বেশী পূর্বে, জার্মান নারী তাঁদের পবিবারের জন্য যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে পারলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হতেন। বর্তমানে কিছুদিন যাবৎ তাঁদের সেই অতীত দুশ্চিন্তার পরিবর্তে তাঁরা বর্তমানের সেবাযত্নের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু টেবিলে যখন যথেষ্ট খাদ্য থাকে, মহিলারাও তখন প্রায়ই বেশী লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। আর তাই শরীর যাতে বেশী মোটা না হয়ে যায় সেদিকেই এখন জার্মান মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে।

জার্মানীর হাঁস মুর্গীর আমদানীকারকগণ তাঁদের ব্যবসা সম্পর্কে খুব ভালো পরিসংখ্যান রাখেন বলে এই তথ্যটি জানতে পারা গেছে। ১৯৫৪ সালের পর থেকে ফেডারেল সাধারণ তন্ত্রে হাঁস-মুর্গীর চাহিদা শতকরা ২৩৫ গুণ বেড়ে গিয়েছে। এই অসাধারণ কাটতি সম্পর্কে আমদানীকারকগণের ভাষ্য হ'ল এই যে, "হাঁস-মুরগী আহার করলে দেহের মেদ বৃদ্ধি হয় না" এই কথাটা ক্রমশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এর সঙ্গে আরও কথা রয়েছে। তাঁরা বলেন, ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের নাগরিকগণ সাধারণতঃ উচ্চ রুচিজ্ঞানের পরিচয় দেন এবং হাঁস-মুর্গীর দামও ওঠা-নামা করে না। কাজেই পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অগ্রীম তালিকা করার সময় মুর্গীর জন্য হিসেব পূর্ব থেকেই করা যায়, তার কারণ হল এগুলির দাম সব সময়েই স্থির থাকে অন্য মাংসের বেলায় তা থাকে না।

পারিবারিক রান্নার তালিকায় এগুলি গ্রহণ করা হয়েছে বলেই যে মুর্গীর চাহিদা বেড়ে গেছে তা নয়। এগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় পরীক্ষা করলে ছাব্বিশ বছর বয়স্ক ফ্রেইডরিখ জাহর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। তিনি ১৯৫৪ সালে ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে একটি গলির মধ্যে একটি রেস্তোরাঁ খোলেন। সেখানে একমাত্র মুর্গী ভাজা ও ঝোল পাওয়া যেত। এখানকার সাফল্য তাকে এতো বেশী উৎসাহিত করে তোলে যে, তিনি এখন গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, হাঁস-মুর্গীর বাজারে এতো চাহিদা সৃষ্টিতে, তাঁর শতকরা ৫০ ভাগ কৃতিত্ব রয়েছে।

মিউনিকের ছোট একটি রেস্টুরেণ্টে এই অসাধারণ লাভের ফলে তিনি এখন ত্রিশটি জার্মান শহরের মোট পঞ্চাশটি রেস্তোরাঁর মালিক। এই রেস্তোরাঁগুলিতে প্রতিদিন ত্রিশ হাজার মুর্গী রাঁধা হয়। খরিদ্দারেরা বসে খেয়ে যেতে পারেন অথবা বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। মিউনিক শহরের কাছেই তাঁর নিজস্ব একটি পোলট্রি রয়েছে। এর অর্থ হল প্রতি বছর এই ব্যবসাতে আট কোটি মার্কের লেনদেন হয়। এ ছাড়া হাজার হাজার লোক, রেস্তোরাঁর জন্য মুখরোচক জিনিষ তৈরী করেন।

পুরুষ ধাত্রী

জাভার পূর্বে বালি দ্বীপে পুরুষদেরই সন্তান প্রসব করাতে দেওয়া হয়।

একজন পুরুষ ধাত্রী এক বিবৃতিতে বলেন: "কাজটা কঠিন এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মেয়েদের ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় না।"

বালি দ্বীপের পুরুষদের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট থেকে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে কিশোর বয়স্ক সমেত পুরুষ ছাত্ররা কিভাবে যন্ত্রপাতি জীবাণুশূন্য করে রক্ষা করতে হয় এবং মাতাকে পথ্য ও সন্তানপালন সম্পর্কে কি ধরনের উপদেশ দিতে হয় সে-সবই শিক্ষা করে।

পুরুষ-ধাত্রীরা তাদের কাজটার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। সন্তান প্রসব করানোর কাজ না থাকলে তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিশুদের রূপকথার গল্প পড়ে শোনায়।

নিয়মমাফিক প্রথমে সে বাঁশের সরু ফালিতে তার প্রমোদ সূচী ছকে দেয়। তারপর বারোয়ারি কুটিরের মেঝেতে বসে তার রূপকথা শুনিয়ে ছোটদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

কলকাতা থেকে একটা প্রগাঢ় আত্মশ্লাঘা নিয়ে এসেছিলাম : আমি রীতিমত তাড়াতাড়ি হাঁটি, অনেকের তুলনায়। এখানে এসে এ বিশ্বাসের মৃত্যু হল। মার্কিনী ললনারাও আমার চেয়ে দ্রুতচারী। বাতাস যেন সব সময় ওদের কানে কানে বলছে, কেমন, হেরে গেলে তো? আমি তোমায় ছাড়িয়ে গেলাম। বাতাসের সংগে পাল্লা দিয়ে হাঁটার প্রয়াস। আমেরিকা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বড় হয়েছে, তারই ছাপ বুঝি এদের চলার রীতিতে।

এ প্রসংগ মনে এলে সংগে সংগে কিঞ্চিৎ করুণ একটা অভিজ্ঞতার ছবি ভাসে। সেদিন সকালে ম্যাস অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে রজার্সের সংগে দেখা। তখন নতুন এসেছি এখানে। 'গুডমর্নিং' বলাটাও ভাল করে রপ্ত হয় নি। রজার্সই প্রথমে বলল, 'গুডমর্নিং'। যদিও আমারই বলা উচিত ছিল, আমিই ওকে প্রথম দেখেছিলাম। পথ চলা শুরু। রজার্স কলেজে যাচ্ছে। আমিও তাই। ভালই হল। পথটা একসংগে যাওয়া যাবে।

—'আজকের আবহাওয়াটা আশ্চর্য ভাল, তাই নয়? আকাশটা কি সুন্দর নীল?—' রজার্সের চোখ চিক্‌চিক্।

বোস্টনের আবহাওয়ার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। কাল সারাদিন মেঘলা ছিল। আজ আবার যেন বিশ্ববিধাতা এক প্রকাণ্ড ফকঝকে নীলবেলুনের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছেন বোস্টনকে। মার্ক টোয়েন নাকি বলেছেন, 'বোস্টনের আবহাওয়া তোমার ভাল লাগছে না? আচ্ছা এক মিনিট ধৈর্য ধর।'

—'হ্যাঁ সত্যি চমৎকার রজার্স।'

হাওয়াটা তো নিশ্চয় সুন্দর। কিন্তু ওদের সংগে অনেকটা চলার পরেই যে ওভারকোটের ওপরটা ভিজে ভিজে। দ্রুত নিশ্বাস সাবধানে নিই, ছোকরা আবার টের না পায়। আমাদের দেশের এক গুণী লোকের উক্তি : আমরা এখন গোরুর গাড়ির যুগ থেকে বাইসাইকেলের যুগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমেরিকা সম্পর্কে ভদ্রলোক কী বলছেন আমার জানা নেই। তবে 'আরে! ওরা তো রকেটের যুগে' বললে নিশ্চয় সত্যের অপলাপ হবে না। এই উক্তিগুলো ব্যক্তিজীবনের চলাফেরায়ও যে কী অসম্ভব সত্য তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে সুনীল গগনের তলায় এই সুন্দর সকালে।

একটা ড্রাগস্টোরের সামনে আসতেই মাথায় বুদ্ধিটা বিদ্যুতের মত খেলে গেল। ড্রাগস্টোরটাকে মনে হল যেন সাক্ষাৎ বিপদতারণ মধুসূদন।

বললাম, 'রজার্স তুমি এগোও, আমি একটু ড্রাগস্টোরে ঢুকব। কলেজে আবার দেখা হবে।'

রজার্স উল্লসিত, 'চমৎকার, আমিও ঢুকব। একপ্যাক সিগারেট কিনতে হবে।'

ওয়াশিংটনের চিঠি

হায় মধুসূদন, চমৎকারই বটে! মুখে বললাম,—চমৎকার।

অতএব ড্রাগস্টোর। রজার্স সিগারেট কিনল। আমাকেও একটা কিছু কিনতে হয়। মান বাঁচানো বড় দায়! একটা সাময়িক পত্রিকা কেনা যাক্। ড্রাগস্টোরের অভিধান-গত অর্থ যদিচ 'ওষুধের দোকান', এখানকার ড্রাগস্টোর এক অদ্ভুত সমাহারবন্দ। ড্রাগ কথার এমন বিস্তৃত অভিব্যক্তি আগে জানা ছিল না। চা কফি সিগারেট, চিঠির খাম, ডাকটিকিট, ক্যামেরা, সাময়িক পত্রিকা—কোনটা চাই? একটা গাছের সংগে পরিচয় ছিল ছেলেবেলায়। হাজাররকম আগাছা তার উপর। আসল গাছটাকে আর চেনাই যেতো না। ফুল ফুটত আগাছার শীষে, পাখি ডাকত আগাছার ডালে। ঠাকুরমা বলতেন, ও গাছ নারায়ণ, সবাইকে কেমন আশ্রয় দিয়েছে। গাছটার নামই হয়ে গেল নারায়ণবৃক্ষ। ঠাকুরমা বেঁচে থাকলে আমার এ তুলনা শুনে রাগ করতেন এ অপরাধবোধ মনের মধ্যে নিয়েই বলছি, ড্রাগস্টোরে ঢুকলে, আমার সেই দুর্ভাগা গাছটার কথা মনে পড়ে, যে পৃথিবীতে নিজের নির্দিষ্ট আসনটা নিজের করে পেল না। ড্রাগস্টোরে ওষুধের ব্যবসা গৌণ।

সেদিন কলেজে পৌঁছে চুপচাপ একঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর নড়াচড়া করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, পাদুটো আমার সংগেই বিরাজ করছে, খসে পড়েনি।

অবশ্য সব আমেরিকান তরুণেরই রজার্সের মত অশ্ববিক্রম, একথা বললে অতি-রঞ্জনের অপবাদ আসবে। কিন্তু ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, ফিলাডেলফিয়ায় বোস্টনে, সর্বত্র—ভুরি ভুরি রজার্সকে তীরের মত আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি এবং বিস্ময় মেনেছি। প্রতি-যোগীর পৌরুষ মনের মধ্যে আসন নিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সযত্নে তাকে রুখেছি। ওরা হাঁটছে, আর আমি ঊর্ধশ্বাসে দৌড়ে ওদের ছাড়িয়ে গেলাম। সেটা কি তেমন আনন্দদায়ক হবে?

এই করুণ ঘটনার পর থেকেই রজার্সের সংগে আলাপ জমল। ও তাড়াতাড়ি হাঁটে যদিও, কথা বলার ব্যাপারে অত্যন্ত মাত্রা-জ্ঞানী। মিতবাক্ রজার্সকে আমার ভাল লেগেছিল। অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়াশুনো করেছে এবং করছে। সেটাও হয়ত ভাল লাগার একটা কারণ হতে পারে। নিজের অজান্তেই ওর গল্প মাঝে মাঝে আধো আধো করেছে। বেশী বলতে চায় না। 'বাবা যখন যুদ্ধে মারা গেলেন, আমার বয়স তিন, মার বয়স বাইশ। মার সংগে পরিচয় করিয়ে দেবো তোমাকে, তাহলে বুঝবে কি করে এতটা এগিয়েছি'—বলেছিল একদিন কথায় কথায়।

আরও আগের কাহিনী শোনা যাক্। একদিন সেই ড্রাগস্টোরে ঢোকার ব্যাপারটা বলেছিলাম। রজার্স হেসেছিল,—'তখন বলনি কেন?

—'তোমরা অত তাড়াতাড়ি হাঁট কেন রজার্স?'

—'আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটি না, তোমরা আস্তে হাঁট, সেটাই ভাববার কথা।—রীতিমত গাণিতিক প্রশ্ন রজার্সের কৃত্রিম গাম্ভীর্যে।

অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা। এবং সেজন্যই বোধ হয় মনে করতে ভাল লাগে। একদিন লাঞ্চের সময় কমলালেবুর আধখানা রজার্সের দিকে বাড়িয়ে বলেছিলাম, খাবে? ওর সহজ গলার প্রত্যাখ্যান, নো থ্যাঙ্ক ইউ। অপ্রয়োজনে অন্যের কিছু গ্রহণ করা এদের রীতি নয়। এই বুঝি ঋণজালে বাঁধা পড়লাম, ভাবখানা এই। দরকার হলে সোজাসুজি চেয়ে নিতে অবশ্য আপত্তি নেই। যথা 'মে আই হ্যাভ এ সিগারেট'—

কোন ধূমপায়ীর প্যাকেট শূন্যে বোঝা গেল।

কিন্তু রজার্সকে কমলালেবু খাওয়ানো চাই-ই। একদিন সুযোগ পাওয়া গেল। একটা এক্সপেরিমেন্ট নষ্ট হয়েছে। রজার্স মুখ ভার করে ভাবছে।—'রজার্স বড় ক্লান্ত আজ, কমলালেবুর মধ্যে প্রাণ থাকে, ভরসা থাকে।'—কমলালেবুর কয়েকটা কোয়া বাড়িয়ে দিলাম। কী একটা অনিচ্ছার মধ্যেও তুলে নিল।—'নিজেকে কী রকম অপরাধী লাগছে। তুমি কমলালেবু খাওয়াতে অত ব্যস্ত কেন? একটা লেবু নিজে খেয়ে শেষ করতে পার না?' রজার্সের সংশয় কাটেনি।

—'অত সহজে অপরাধ করা যায় না রজার্স। আমাদের দেশে এতো খুব স্বাভাবিক। খাওয়ার সময় ইচ্ছে হলে বন্ধুদের ভাগ দেওয়া। এতে খাওয়ার আনন্দ বাড়ে।'

আমার মনস্তত্ব বুঝেছিল রজার্স। এরপর আর কোনদিন আপত্তি করেনি, এমন কি সংশয়ও নয়। একদিন বলল, 'আজ আমার খিদে পেয়েছিল, ভাগ্যিস দিয়েছিলে।'

তারপর একদা গ্রাজুয়েট হাউসের ডিনার টেবিলে রজার্স বাঙ্গালী হল। খাওয়া শেষ হয়েছে। এবার চা কিংবা কফি। রজার্সই জিজ্ঞাসা করেছিল,—চা না কফি? বললাম, —চা, চল নিয়ে আসি।—'তুমি বস, আমি নিয়ে আসছি।' চা এল। রজার্সকে দশসেন্ট এগিয়ে দিলাম। অপ্রত্যাশিত উত্তর, 'ওটা থাক্, আমি তোমার চা কিনেছি আজ।'

খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বন্ধুর পকেটকে ভরসা করে রেস্টুরেন্টে আড্ডা জমাবার রীতি এখানে অপ্রচলিত। অবশ্য তরুণী বান্ধবীর বেলায় বন্ধুপ্রবরদের পকেট হাওয়ার মুখে অর্গলহীন দরজার মত অবারিত। সে কথা থাক্।

—তুমি, কি বাঙ্গালী হতে চললে রজার্স?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হতে ইচ্ছে করে।

এসব ছোট ছোট ঘটনার সেতু দিয়ে রজার্সের সঙ্গে পরিচয় কখন গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। আর সে জন্যই বোধহয় সেদিন সোজাসুজি রাগটা আমার উপর ঢেলে দিয়ে স্বস্তি পেয়েছিল। আসল রাগের পাত্র অনেক বিস্তৃত, সারা ভারত। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।—'কেন গোয়া থেকে পোর্তুগীজদের জোর করে হটাল ভারত? এই বুঝি তোমাদের অহিংসার নীতি। নীতি নয়, বল, রাজনীতি।'

তখন সবে কলেজে পা দিয়েছি। কয়েক-দিন থেকেই রজার্স জল্পনা করছিল। বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে—'ভারত গোয়ায় যুদ্ধ করবে সত্যিসত্যি?

অবশেষে গোয়া যখন ভারতের হল, রজার্স একেবারে খেপে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ওর হুংকার—'তোমরা ভণ্ড, সব বিশ্বাস গেল তোমাদের উপর—। অহিংসা তোমাদের মুখের কথা শুধু। হাতে হাতে প্রমাণ হল এবার।' স্বল্পবাক্ রজার্সকে অতটা উত্তেজিত হতে আগে দেখিনি।

শুধু রজার্স নয়। অনেকেই সেদিন উত্তেজিত, সবাই কৌতূহলী। এ বিদ্যায়-তনের কক্ষে কক্ষে উত্তেজনা। বিজ্ঞানীরা সবাই বুঝি ক্ষণিকের জন্য রাজনীতিতে নেমেছে। ঠিক তা নয়, ভারতের অহিংসার আদর্শ সম্পর্কে খটকা লেগেছে এদের। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে—'চীনকে কিছু বলছ না, আর গোয়ার ব্যাপারে বীরত্ব! চীনকে ভয় পাও বুঝি?' সেদিন সমস্ত ভারতীয় ছাত্রেরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল যেন।

আমাদের জবাবের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অপ্রয়োজনীয়, কারণ তা প্রায় ছকে বাঁধা।—'আমরা চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছি। অহিংসা কথার অর্থ নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া নয়। চীনের ব্যাপারে অধৈর্য হওয়ার সময় এখনো আসে নি।' ইত্যাদি

রজার্স আমাকে একা পেয়ে বলেছিল—'কথা সাজানোর ব্যবসাটা ভাল জানা আছে তোমাদের। কোথায় শিখলে?' আমি রাগ করিনি। রজার্সের ক্ষোভ একটা আদর্শের অপমান বার্তা শুনে, আমার উপর নয়।

বরঞ্চ যে গোয়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে কল্পনা করিনি। গণ্ডগোলে ব্যাপারের কাছাকাছি ঘেঁষা তার স্বভাবের বাইরে। হাসিতামাশা নিয়ে থাকতে পারলে আর কিছু চাই না। ববের আসল রহস্য বোঝা গেল পরে। প্রচুর দিলখোলা গল্প-গালাজের পর কানে কানে বলে গেল,—'আমি খুব খুশী হয়েছি বন্ধু! পোর্তুগীজ দস্যুগুলো আমাদের অহর্নিশ মাথাব্যথার কারণ।'

ফ্রাংকও তর্ক করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে এক বিচিত্র মনস্তত্ত্ব আমি উপহার পেলাম, 'সেদিন কিছু মনে করো নি তো? সত্যি কথাটা কি জানো? ইউরোপের সঙ্গে কী রকম একটা প্রাণের টান অস্থিতে মজ্জায় রয়েছে, কিন্তু প্রাচ্যের সঙ্গে এ টানটা কিছুতেই আসে না।'

কিন্তু সব আমেরিকান বব কিংবা ফ্রাংক নয়। যথা, রজার্স। গোয়ার ঘটনার পর কয়েকদিন আমাকে এড়িয়ে চলেছে, ভাল করে কথা বলেনি। সত্যি রেগেছে ও। ভারতকে ও শ্রদ্ধা করে, তার চেয়েও শ্রদ্ধা করে অহিংসাকে, শান্তিকে। রজার্সের বাবা যখন যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন, ওর বয়স ছিল তিন, আর ওর মার বয়স বাইশ।

এবং আরো একজনকে আহত হতে দেখেছি। রেভারেন্ড বীভার। এখানকার এক ইউনিটারী চার্চের যাজক। ভারতীয় দর্শনে অবারিত প্রবেশ তাঁর। সোমা শান্ত রেভারেন্ডকে আমার ভাল লাগে। গান্ধীজির অনুরক্ত ভক্ত।—'ভারত যা করেছে তাতে নিন্দার কিছু দেখি না, কিন্তু অহিংসার বাণী ভারতের প্রাণ এ কথাটা শুধু বলো না!'—নিজের অজান্তে রেভারেন্ড ভারতকে চাবুক মেরেছিলেন।

—কিন্তু রেভারেন্ড, আমরা যে চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছি।

—বড় আদর্শের জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করলেও ক্ষতি নেই।

—কিন্তু প্রতিটি ভারতবাসী যে মনেপ্রাণে চেয়েছে গোয়া এই মুহূর্তে আমাদের হোক।

—'দেশ তো স্বীকার করে নিলাম, সেই সম্মতিক্রমেই ভারত আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, বুদ্ধ কিংবা গান্ধীর জন্ম ভারতে বলেই, ভারত ফলিত অহিংসা-বাদের পীঠস্থান হবে তার কোন নিশ্চিত আশ্বাস নেই।

কী উত্তর দেব এর? রেভারেন্ড অনেক উঁচু আসন থেকে কথা বলছেন। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন ভাসে। অহিংসাবাদের কথা হামেশা বলেছি। অথচ বাস্তবের মানদণ্ডে 'অহিংসা' কথাটার তাৎপর্য কী তা আমরা সুস্পষ্ট করেছি কি কখনো? হয়ত গোয়ার ঘটনা তা করেছে। এরপর আর কেউ আমাদের কাছে দুঃসাধ্য কিছু আশা করবে না। গোয়ায় আমাদের আত্মোদ্ঘাটন অন্তত আত্মশুদ্ধি হয়েছে। দ্বিতীয়বার প্রবঞ্চকের অপবাদ আর আমাদের বোঝা বাড়াবে না।

—অনিমেষ চক্রবর্তী

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে দিল্লীর ললিত কলা আকাদামি প্রতি বৎসরই সারা দেশের শিল্পীদের নির্বাচিত ছবি ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আসছেন। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টেরই একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আকাদামির পক্ষে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি সংগ্রহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ বছরের প্রদর্শনী দর্শকদের [illegible] করে গেল। এই প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয় আর সেই সঙ্গে প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে ভারতের জাতীয় শিল্পঐতিহ্যের বিকাশের চেয়ে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ধারা প্রভাবান্বিত নানা জনের নানা ধরনের প্রচেষ্টাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সে-কথা ধরলে প্রদর্শনীটিকে ভারতের জাতীয় শিল্পসৃষ্টির প্রদর্শনী বলে কেউ অভিহিত করতে আপত্তি তুললে সেজন্য তার ওপর দোষারোপ করা যায় না। এছাড়া আরো একটি ব্যাপারও বিসদৃশ লাগে। প্রদর্শিত মোট একশ নব্বইটি শিল্প সৃষ্টির মধ্যে ছাব্বিশখানির আলোকচিত্র টাঙিয়ে রাখা হয়েছে—কারণ মূল সৃষ্টিগুলি বিক্রীত হয়ে গিয়েছে অথবা আকারে বড় হওয়ার জন্য টাঙাতে অসুবিধা ঘটেছে। এই বিকল্প ব্যবস্থা আর্টের প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে অনুমোদন করা যায় না। সংখ্যার দিক থেকেও এক স্থানে এতো বেশী দ্রষ্টব্যের সমাবেশও শিল্প-মাধুর্য উপভোগে নিবিষ্ট হওয়ায় অসুবিধা ঘটায়।

নামকরা এবং অননাকৃতী শিল্পীদের অনেকেরই ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল না, আবার অনেক প্রখ্যাতনামার নিকৃষ্ট কাজ কেন এবং কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে, সেটাও দুর্বোধ্য। হয়তো, কোন কোন মহলের অনুযোগ যে, আকাদামির সাধারণ পরিষদে শিল্পীদের প্রাধান্য থাকায় নির্বাচন ব্যাপারে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিরুচিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা তাঁদের নিজেদের অঞ্চলের শিল্পী-দের কাজকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন,—এ অনুযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বহু ছবির মধ্যে বিশেষ প্রশংসা-দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোলাম মহম্মদ, অবনী সেন, অরুণ বসু, লক্ষ্মণ পাই, আমিনা কর বেল্গে,

জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত একখানি চিত্র।

গুজরাল, শিবক্স চাবড়া, কৃষ্ণ রেড্ডী, কান-ওয়াল ও দেবযানী কৃষ্ণ, সোমনাথ হোড়, রয় ফার্বার, ই এইচ রাওয়েন, জ্যোতি ভাট প্রভৃতির ছবি। এঁদের মধ্যে অনেকেই আকাদামি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। এছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ ছবির মধ্যে শিক্ষানবীশী ছাপ পরিস্ফুট, যা এমনি একটা প্রতিনিধি-মূলক প্রদর্শনীর যোগ্য কিনা বিবেচ্য।

ভাস্কর্য বিভাগেও নতুন সৃষ্টির অভাবটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিল্পীরা কেন এই প্রদর্শনীটিকে তাঁদের সৃষ্টি সমগ্র দেশের শিল্পরসিক ও জনসাধারণের সামনে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত সহায় বলে মনে করেন না, সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। দেখবার এবং চমৎকৃত হবার মতো সৃষ্টি বলতে আকাদামি পুরস্কারপ্রাপ্ত

দুর্গা শিল্পী : কমলা রায়চৌধুরী

ধনপালের কাজ, ধনরাজ, ভগৎ ও রাঘব কানোরিয়ার কাজ। চিন্তামণি কর, অমরনাথ সেহগল প্রভৃতির পরিবেশিত কাজগুলি ইতিপূর্বেই দেখা।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের গ্যালারিতে ১১ই থেকে ২০শে মার্চ এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

• • •

প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত পর-পর জনকতক শিল্পীর প্রদর্শনী সম্প্রতি দেখা গেল, যাঁরা পাশ্চাত্য ধারার অংকন রীতির অনুসরণে এদেশের পুরাণ ও ধর্মমূলক বিষয়বস্তুকে চিত্রায়িত করার মধ্যে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টায় রত হয়েছেন। এঁদের পথ-প্রদর্শক বলা যায় নীরোদ মজুমদার। তাঁর পরে বিনয় চৌধুরী, শান্তি বর্মন প্রভৃতি কজনের একক প্রদর্শনীর পর গত ১৫ই মার্চ আর্টস অ্যান্ড প্রিণ্টস গ্যালারিতে উদ্বোধিত হলো কমলা রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী। পাশ্চাত্য প্রভাব এবং বিষয়বস্তু ও [illegible] দিক থেকে এই দলের শিল্পীদের মধ্যে একটা নিকট মিল থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই একটা নিজস্ব মৌলিক ভংগীর উদ্ভাবনে সচেষ্ট রয়েছেন।

কমলা রায়চৌধুরীর ছবি ইতিপূর্বে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদর্শিত হয় তবে একক প্রদর্শনী তাঁর এই প্রথম। কলকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্যারিসে [illegible] আঁদ্রে লোতের স্টুডিওতে পাশ্চাত্য অংকন-রীতি শিক্ষা করেন এবং সেই সূত্রে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় এবং সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এঁর অনেকের ছবিতে [illegible] সেই প্রভাবটি বেশী ছিল। এই প্রদর্শনীর মধ্যে [illegible] তাঁর একটা নিজস্ব ভংগীর পরিচয় দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। [illegible] সাহায্যে [illegible] সৃষ্টির মধ্যে অংকন-রীতির অনুসৃতি এবং লাল, হলদে, নীল ও সাদা রঙের প্রয়োগে [illegible] দেওয়াল-চিত্রের ধরণটা এই ভংগীতে লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে কিছুটা পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং বিষয়বস্তু, ভাব ও [illegible] গঠনের ভারতীয় ধারার সমন্বয়ে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলায় সক্ষম হয়েছেন। রঙ তিনি ব্যবহার করেন মোটা প্রলেপে। রঙের সুসমঞ্জস বিন্যাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুর্গা, নিঃসঙ্গা এবং কালীর সংহার মূর্তি। কোথাও প্রলেপ হলেও রঙ মিশ্রিত নয় কোন ছবিতেই।

প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী, যাঁদের ছবি সম্প্রতি দেখা গেল, তাঁদের সকলেরই পৌরাণিক ও ধর্মমূলক বিষয়বস্তুর প্রতি একটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্ততঃ তাঁদের প্রদর্শনীতে যেসব ছবি দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এঁরা গুণী শিল্পী নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিষয়বস্তুর নির্বাচনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির ব্যাপারে কেন সচেতন নন, সেটা তাঁরাই বলতে পারেন। আর শিল্পরসিকদের কাছে সে অভাবটা বিশেষভাবেই অনুভূত হয়।

কমলা রায়চৌধুরীর প্রদর্শনীটি আগামী ২৫শে মার্চ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

[২২]
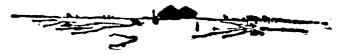
ঝড়ের বেগে বাইক চালিয়ে কাটোয়া থেকে গাঁয়ে ফিরছিল উদাস। দুপুর-রোদ তখন মাথার ওপর। তবু অন্যদিনের মত অপেক্ষা করে থেকে বিকেলের বাসটার মাথায় সাইকেলটা তুলে দিয়ে রাস্তার মোড়ে নেমে পড়ার আয়েসটুকু নিতেও ইচ্ছে হয় নি উদাসের।

সমস্ত মন তখন ফূর্তিতে নেচে উঠেছে তার। তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরে সবাইকে না শুনিয়ে যেন আনন্দ নেই। বাইক চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই নিজের পকেটে একটা হাত ঠেকিয়ে দেখে উদাস, আর হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ওর মুখ। দীর্ঘদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আনন্দ। ঝড়ের বেগে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলে উদাস, ঝড়ের মতই দুপুরের উত্তপ্ত বাতাসের হলকা এসে লাগে মুখে চোখে, বুক চিতিয়ে ঘাড় উঁচু করে সে-বাতাসের স্পর্শ নেয় উদাস, মুখেচোখে ঝাপটা লাগে উষ্ণ হলকার, তবু ভাল লাগে। কারণ জীবনের একমাত্র স্বপ্ন তার সার্থক হয়েছে।

লাইসেন্স পেয়েছে উদাস, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরির আশাও পেয়েছে।

মনে মনে লক্ষ্মীমণির ওপর খুশী হয়ে ওঠে উদাস। মনে মনে অনেক কথা ভাঁজে, কি বলবে সে লক্ষ্মীমণিকে, কি ভাবে আদর করবে। লক্ষ্মমণিকে বলবে, তোর বাপের চেষ্টাতেই হলো রে বউ, নইলে এত তাড়াতাড়ি লাইসেন মিলতো না।

শুনে লক্ষ্মীমণি নিশ্চয় মুখ বেজার করবে, কিংবা কোন কথাই বলবে না। তবু যেমন করে পারে তার মুখে আজ হাসি আনবে উদাস।

আর পদ্ম? পদ্ম হয়তো সত্যিই খুশী হবে। লাইসেন্সটা হাতে নিয়ে দেখতে চাইবে, দেখবে হয়তো নেড়েচেড়ে। একবার তার মুখের দিকে, একবার লাইসেন্সটার দিকে তাকিয়ে হয়তো কৌতুকে হাসবে।

কিন্তু আজ পদ্ম নয়, কেবলই লক্ষ্মীমণির কথা মনে পড়ছে তার। বড় রাস্তা ছেড়ে সাঁওতাল পাড়ার পাশ দিয়ে মেঠো পথে বাঁক নিয়েই মনে পড়লো, একদিন লক্ষ্মীমণির বাপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই মোড়েই, কাটোয়ার বাসে উঠে।

বিয়ের পর ধীরে ধীরে লক্ষ্মীমণির ওপর থেকে সব ভালবাসা কি ভাবে যেন মুছে গেল। যে-টুকু ছিল তাও উবে গেল উদাসের জীবনে পদ্ম আসার পর থেকে। তবু ভিতরে ভিতরে একটা অসহ্য অন্যায়-বোধে বিমর্ষ হয়ে পড়ে উদাস, কখনো কখনো। মনে হয় নিজের স্বার্থের জন্যেই বুঝি লক্ষ্মীমণির জীবনটাকে নষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে নিজের জীবনটাও। তাই মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতায়—একটা অস্পষ্ট কর্তব্য-বোধে মনটা লক্ষ্মীমণির ওপর নরম হয়ে পড়ে।

পুজোর সেই দিনটার কথাও মনে পড়ে। সামান্য একটু আদর সোহাগ পেয়ে লক্ষ্মীমণির শীর্ণ মুখে দুটি ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে কি অদ্ভুত পুলক জেগে উঠেছিল মুহূর্তের মধ্যে। সারাটা দিন লক্ষ্মীমণির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে উদাস কাজের ফাঁকে ফাঁকে। মনে হয়েছে, বউটা তার মুহূর্তের মধ্যে মানুষ বদলে গেছে।

কিন্তু তারপর পদ্ম ফিরে এলো। পদ্ম ফিরে এসেছে এ-খবর শুনলো লক্ষ্মীমণি। কিন্তু কোন অভিযোগ করলো না, অনুযোগ করলো না আর। শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল তার মুখে সেটা দপ করে নিভে গেল।

সবাই আশ্চর্য হলো। এ যেন ভিন্ন মানুষ। দিনরাত মুখ বুজে কাজ করে যায়, ডাকলে তবেই সাড়া দেয়, চাইলে খাবার এগিয়ে দেয়। কিন্তু কোন কথা বলে না, চিৎকার করে না, ঝগড়া করে না, ঘাটের ধারে কিংবা এখানে-ওখানে পদ্মর সঙ্গে উদাসকে হেসে কথা বলতে দেখলেও মুখে তার কোন ভাবান্তর হয় না।

বংশীও আশ্চর্য না হয়ে পারে না। বলে, বউয়ের অসুখ-বিসুখ কিছু হলো নাকি রে উদাস।

তেঁতুলে-বাগ্দীদের বুড়ি ধাই বলে, বউয়ের তোমার ছেলেপিলে হবে নাকি গো। কেউ কিছু বুঝতে পারে না। উদাসের নিজের কাছেও রহস্য মনে হয়। কিন্তু যত রাগরোষই থাকুক, উদাস লাইসেন্স পেয়েছে শুনলে লক্ষ্মীমণি নিশ্চয় খুশী হবে। আনন্দে হেসে উঠবে। হয়তো বলবে, এবার চাকরি নিয়ে চলো কাটোয়ায় ঘর করবে।

নিজের মনেই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেছিল উদাস, গাঁয়ের মুখে নতুন গোড়ের সামনে এসে দেখলে এক দল লোক জটলা করছে—হংস পুঙ্খ, গোপেন, আরো অনেকে।

বাইক থেকে না নেমেই এক হাতে পকেট থেকে লাইসেন্সটা বের করে হাত তুলে দেখালে উদাস। চিৎকার করে বললে, এই যে গো পুঙ্খদা লাইসেন্স পেয়ে গেলাম!

ওরা চমকে ফিরে তাকাতেই হাসতে হাসতে বাইক থেকে নামলো উদাস। বললে, বাপ বলে দ্বিচক্রর বাহন নইলে বাবুর আমার চলে না! হেঁ হেঁ, এবার আর দ্বিচক্রর নয় গো চার চক্কর……

ফূর্তিতে আনন্দে চিৎকার করে সগর্বে বলছিল কথাটা, কিন্তু লোকগুলোর মুখের

দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল উদাস। সবারই মুখ এমন থমথমে কেন?

সপ্রশ্ন চোখ তুলে একে একে সবারই মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে গেল উদাস। সকলেই চোখোচোখি হওয়ার ভয়ে মুখ নামিয়ে নিলো।

শুধু গোপেন ধীরে ধীরে বললে, তুই ঘরে যা উদাস, ঘরে যা তাড়াতাড়ি।

দ্রুত কাছে এগিয়ে এলো উদাস। বিস্ময়ে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় উদাস হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, ক্যানে, ক্যানে, কি হয়েছে গোপেন-দাদা, কি হয়েছে বলো?

কেউ কোন কথা বললে না। শুধু হংস চাটুজ্যে বললে, তুই যা তাড়াতাড়ি।

আর অপেক্ষা করলো না উদাস। ঝড়ের বেগেই বাইক চালিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। দূর থেকে দেখলে, তাদের বাড়ির সামনে লোক গিসগিস করছে। বাগ্‌দী পাড়া, বাউড়ি পাড়ার লোক, কোটাল পাড়ার লোক ভিড় করে আছে চতুর্দিকে।

উদাসকে দেখে সবাই সরে গিয়ে পথ করে দিলে। কিন্তু কেউই মুখ ফুটে কিছু বললে না।

প্রতিদিনের মতই দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর লক্ষ্মীমণির সঙ্গে গল্প করতে এসেছিল পদ্ম।

পুজোর দিনে গাঁয়ে ফিরে আসার পর থেকে কি ভাবে যেন তাকে আপন করে নিয়েছিল লক্ষ্মীমণি। কারণে অকারণে আগের মত পদ্মকে আসতে দেখলে আর বিরক্ত হতো না সে, মুখখানা তার চাপা বিদ্রোহে কঠিন হয়ে উঠতো না, চিৎকার করে পাড়ার লোককে শুনিয়ে বাঁকা বাঁকা কথা ছুঁড়ে দিতো না।

পদ্ম নিজেও তাই বিস্মিত হয়েছিল। এ যেন অন্য মানুষ। রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, আবার হাসি-গল্প-আনন্দে মেতেও ওঠে না আর পাঁচ জনের মত। সব সর্বদাই মুখখানা থমথমে, একটা চাপা দুঃখে ম্লান।

প্রথম যেদিন লক্ষ্মীমণির সঙ্গে দেখা করতে এলো, সেদিন উদাসও ছিল। উঠোনে বসে সাইকেলের চাকার ফুটো সারাচ্ছিল।

পদ্ম হাসতে হাসতে ঢুকলো বাঁশের বাতার ফটকটা খুলে। বললে, কেমন আছিস গো বুন, দেখতে এলাম তোকে।

অন্যদিন হলে লক্ষ্মীমণি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলতো, অত ছুতোছাতার পেয়োজন নাই গো, যাকে দেখতে এয়েছো দেখবে যাও।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি কোন কথাই বললে না, শুধু চোখ তুলে তাকালো একবার পদ্মর মুখের দিকে।

দু'একটা সাধারণ প্রশ্ন করলে পদ্ম,

লক্ষ্মীমণি কেমন আছে, ধান হয়েছে কেমন, শ্বশুরের শরীর ভাল কিনা।

মৃদু গলায় দু'একটা উত্তর দিলে লক্ষ্মীমণি। তারপর শুধোলে, তোমার শরীর ভাল তো দিদি। কোথায় ছিলে?

পদ্ম হাসলে, কোন উত্তর দিলে না। তারপর দু'একটা আজেবাজে কথা বলতে বলতে ও গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে বসে উদাস সাইকেল মেরামত করছিল।

উঠোনের ওপর সাইকেলটা শুইয়ে রেখে রবারের টিউবটায় পাম্প করতে করতে এক বালতি জলে সেটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে দেখছিল উদাস।

পদ্ম গিয়ে ভালমানুষের মত প্রশ্ন করলে, ও কি করছো গো বোনাই।

উদাস হেসে বললে, ছেঁদাটা খুঁজছি যে পদ্ম, জলে ভুরভুরি উঠবে এখুনি দেখ কনে।

দেখতে দেখতে জলে বুদ্বুদ উঠলো, আর পদ্ম হেসে উঠে বললে, ওমা তাই গো, পুকুরের মাছের পানা ভুরভুরি উঠছে বটে। তারপরে হেসে উঠে লক্ষ্মীমণির দিকে তাকালো পদ্ম। দেখলে লক্ষ্মীমণি এক মনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চিঁড়ে কুটছে।

পদ্ম সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে উদাস একটুকরো রবার কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে রবারের চাকায় তালি মারছে।

সাইকেল মেরামত শেষ হতেই চাকায় হাওয়া ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো উদাস। যাবার সময় বললে, শালার বাবলার কাঁটায় কাঁটায় রাস্তায় সাইকেল চালানো দায়।

পদ্ম হেসে বললে, কাঁটা নইলে কি কমল মেলে গো বোনাই।

ঠিক কি ভেবে বললে বুঝতে পারলো না উদাস। শুধু যাবার সময় হেসে ফিরে তাকালো তার মুখের দিকে।

আর উদাস চলে যেতেই পদ্মকে ডেকে বসালে লক্ষ্মীমণি। গল্প জুড়ে দিলো। এমন ভাবে কথাবার্তা শুরু করলে যেন কত অন্তরঙ্গ বন্ধু দুজনে।

সেই প্রথম নয়। তারপরও বহুবার দেখেছে পদ্ম। উদাস যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই মুখ থমথম করে লক্ষ্মীমণির। মুখেচোখে কি এক বিষণ্ণতা, কিন্তু দুপুরে যখন উদাস থাকে না, উদাসের বাপ বংশী পড়ে পড়ে ঘুমোয়, তখন পদ্মকে কাছে বসিয়ে গল্প করে লক্ষ্মীমণি আপনজনের মত। যেন কোন অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে, কোন অভিমান নেই।

কোন কোনদিন বিকেলে বংশী ঘুম থেকে উঠলে দু'গেলাস চা বানিয়ে একটা কাঁসার গ্লাসে চা ঢেকে রেখে পুকুর পাড়ের বাঁশ ঝাড় থেকে ডাক ছাড়ে লক্ষ্মীমণি, ও পদ্মদিদি! চা খাবে এসো গো!

পদ্ম দাওয়া থেকেই সাড়া দেয়।

তারপর এ-বাড়িতে এলেই লক্ষ্মীমণি গ্লাসটা নিয়ে বলে, নাওসে তোমার চা, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

কখনো দুটি গুগলির চচ্চড়ি পাঠিয়ে দেয় লক্ষ্মীমণি পদ্মর জন্যে, কখনো এটা ওটা। আর পদ্ম মনের অন্ধকার হাতড়ে রহস্যের কিনারা খুঁজে বেড়ায়। লক্ষ্মীমণি এমন ভাবে মানুষ বদলে গেল কি করে খুঁজে পায় না।

এক এক সময় তাই মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে। মনে হয়, লক্ষ্মীমণির ওপর অবিচার করেছে সে, অন্যায় করেছে। এত ভাল লক্ষ্মীমণি। এত ভাল তার ব্যবহার।

যত দেখে, ততই যেন মুগ্ধ হয় পদ্ম। আর দিনে দিনে লক্ষ্মীমণিকে কত অন্তরঙ্গ মনে হয়।

সেদিনও দুপুরে তাই খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করতে এলো পদ্ম। বাইরে থেকেই ডাকলে, লক্ষ্মী বুন, ঘুমুলি নাকি লো?

অন্য দিন পদ্মর গলার আওয়াজ পেয়েই হাসিমুখে ছুটে আসে সে। কিন্তু দু-তিনবার ডাক দেওয়ার পরও কোন সাড়া পেল না পদ্ম।

ভাবলে, লক্ষ্মীমণি হয়তো থালা-বাসন ধুতে ঘাটে গিয়েছে। তাই বেরিয়ে এসে বাইরে উঁকি দিলে। দেখতে পেল না। পিছন দিকের পাঁচিলে হয়তো ঘুঁটে দিচ্ছে ভেবে দেখে এলো, না সেখানেও নেই।

আর ঠিক সেই সময়েই একটা গোঙানি শুনতে পেল পদ্মর ঘরের ভেতর থেকে। কান পেতে শুনলে একমুহূর্ত, তারপর ছুটে গেল।

গিয়ে দেখলে রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে আছে লক্ষ্মীমণি, গোঙাচ্ছে থেকে থেকে, আর ...

ছুটে গিয়ে লক্ষ্মীমণির দু' কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকানি দিলো পদ্ম।—লক্ষ্মী, বুন, অ বুন, কি হয়েছে তোর!

আচ্ছন্নের মত চোখের ভারী পাতা দুটো একটু ফাঁক হলো, একবার যেন তাকালো সে পদ্মর মুখের দিকে, বোধহয় বুঝতে পারলো না।

আবার বমি করলে লক্ষ্মীমণি।

আর পদ্ম জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে বল। কি হয়েছে তোর!

ধীরে ধীরে এবার একটা হাত এসে পড়লো পদ্মর হাতের ওপর। দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো লক্ষ্মীমণির চোখের কোণ বেয়ে।

তারপর লক্ষ্মীমণি ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে, পদ্ম?

—হ্যাঁ। আমি, পদ্ম। ব্যগ্র স্বরে বললে পদ্ম। বললে, কি হয়েছে তোর বল্। ডাক্তারকে ডেকে আনবো?

—না। অস্ফুটস্বরে বললে লক্ষ্মীমণি।

তবু শুনলো না পদ্ম, ছুটে বেরিয়ে আসতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে শিল-নোড়ায় পা লেগে হোঁচট খেলে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো পদ্ম।

শিলের ওপর তখনও খানিকটা পড়ে আছে। এদিকে ওদিকে পড়ে আছে ধুতরোর বীচি।

সারা শরীর যেন মুহূর্তে শিউরে উঠলো তার। ঘর থেকে বেরিয়েই কোটাল-পাড়ার মধ্যেই চিৎকার করে উঠলো পদ্ম, লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে গো, লক্ষ্মী বুন বিষ খেয়েছে!

চতুর্দিক থেকে লোক ছুটে এলো। ভিড় করে এলো লোক—তেঁতুলে বাগ্দীদের পাড়া থেকে, বাউড়ি পাড়া থেকে, কোটাল-পাড়া থেকে।

আর **ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিনাশ** ডাক্তারের বাড়ির দিকে **ছুটলো** পদ্ম।

লক্ষ্মী বুনে বিষ খেয়েছে। তাকে বাঁচাতে **হবে।** যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে!

একদিন তার বাপকে **কাটারী** করে কুপিয়ে **দিয়েছিল এই লক্ষ্মীমণি, সেদিন** নিজের **মান-সম্মান বাঁচাবার জন্যে, অপবাদ বাঁচাবার জন্যে ডাক্তারের কাছে সব কথা** চেপে **গিয়েছিল** পদ্ম।

কিন্তু আজ মান-অপমান, অপবাদ-দুর্নামের কথা মনে পড়লো না পদ্মর, মনে হলো না **লক্ষ্মীমণি** বিষ খেয়েছে, এ-খবর আসলে তার ওপরই অপবাদ **ছড়াবে!** ওর কেবলই মনে হলো, **লক্ষ্মী** বুনকে বাঁচাতে হবে, **লক্ষ্মী** বুনকে **বাঁচাতে** হবে।

যে মানুষটাকে এক সময় সে-ও সহ্য করতে পারতো না, যাকে **জীবনের** কাঁটা মনে হতো, আজ তাকেই যেন সবচেয়ে **অন্তরঙ্গ** মনে **হচ্ছে।** যেন তার **জীবনের** চেয়ে মূল্যবান আর **কিছুই** নেই পদ্মর কাছে।

এক মুহূর্তে **স্তব্ধ** বিমূঢ় হয়ে কি যেন ভাবলো পদ্ম। তারপরই **ঊর্ধ্বশ্বাসে** ছুটে গেল অবিনাশ ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

গাঁয়ে ফিরে এসেও অবিনাশ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যায়নি পদ্ম। **যাবে না** ভেবেছিল।

এক-ঠ্যাঙা ওই মানুষটার দিকে তাকালেও কষ্ট হয় পদ্মর। কষ্ট হতো। একখানা পা নেই, দুটো কাঠের ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ডাক্তার, একখানা খাঁকি বুশ সার্ট গায়ে, একটা বোতাম ছেঁড়া, চুল উস্কখুস্ক। তিন কুলে কেউ কোথাও নেই, বিদেশ বিভুঁই এই গ্রামে এসে ঘর বেঁধেছে, অথচ দু' দিনেই **তো গ্রামকে করে নিয়েছে আপন, গাঁয়ের** উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায়, নিজের মুনিষ লাগিয়ে অপরের পুকুরের পানা সাফ করাতে যায়—এমন একটা লোককে এ-গাঁয়ের কেউ পছন্দ করে না, বদনাম দেয় পদ্মর নাম জড়িয়ে—এসব দেখে সত্যিই বড় কষ্ট হতো পদ্মর। তবু মুখ বুজে সহ্য করেছে সব কথা। ভেবেছে, সে যদি সরে আসে ডাক্তারের কাছ থেকে, তা হলে বড় অসহায় হয়ে পড়বে লোকটা। তেপান্তরের মাঠে একা পড়ে থাকে, কে দেখবে লোকটাকে, কে তার সুখ-সুবিধের দিকে তাকাবে। তাই পাড়াপড়শীদের উপহাস উপেক্ষা করেছিল পদ্ম। কিন্তু যেদিন বুঝলে, তাকে জড়িয়েই সারা গাঁয়ে অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছে ডাক্তারের, আর তাই অসুখবিসুখে তাকে কেউ ডাক দেয় না, বলগাঁর ডাক্তারকে ডেকে আনে, সেই দিন থেকেই মনস্থির করে ফেলেছিল পদ্ম। ডাক্তারের ভালোর জন্যেই নিজে সরে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু সেসব কথা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই এখন, বলার মত মনের অবস্থাও নয় পদ্মর।

জলে-ভেজা দুটি চোখ কচলে পদ্ম বারবার বলে একটাই, তাড়াতাড়ি চলো গো ডাক্তার, লক্ষ্মী বুনটারে বাঁচাতে হবে; বাঁচাতে হবে বুনটারে!

তাড়াতাড়িই হেঁটে চলে ডাক্তার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে। আর পদ্মর মনে হয়, প্রতিটি মুহূর্ত যেন কত দীর্ঘ সময়। যেন পথ আর ফুরোয় না!, পদ্মর সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করে অবিনাশ ডাক্তার, পারে না।

যেতে যেতে অবিনাশ ডাক্তার আবার প্রশ্ন করে, তুই কেন চলে গিয়েছিলি পদ্ম, ফিরে এসেও দেখা করিস নি কেন?

প্রথমটা কোন জবাব দেয় না পদ্ম: শুধু কাতর গলায় বলে, সব বলবো গো ডাক্তার, সব বলবো তোমায়। লক্ষ্মী বুনটারে আগে তুমি বাঁচাবে চলো, ধুতরোর বীচি খেয়েছে বুনটা! বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলে পদ্ম।

অবিনাশ ডাক্তার আবার লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করে ক্রাচে ভর দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত ওরা যখন এসে পৌঁছলো, তখন আর **কিছুই করবার** নেই।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলো অবি[illegible] ডাক্তার, পদ্মর পিছনে পিছনে।

তারপর একটা ক্রাচে ভর দিয়ে ঝুঁকে [illegible] লক্ষ্মীমণির একখানা হাত তুলে [illegible] খানিক পরেই নামিয়ে রাখলো।

উৎসুক চোখ মেলে ডাক্তারের মুখের দি[illegible] তাকালে পদ্ম। আর লক্ষ্মীমণির পাশে [illegible] **পড়ে ভালভাবে পরীক্ষা** করে সজোরে [illegible] **নাড়ল অবিনাশ ডাক্তার। না, না, না।**

আর সশব্দে চিৎকার করে কেঁদে উঠ[illegible] পদ্ম।

তারপর কখন যে ডাক্তার ক্রাচ দুটো [illegible] নিয়ে ভিড় ঠেলে চলে গেছে, কখন [illegible] চৌকিদার খবর নিতে এসেছে, কিছুই জা[illegible] না পদ্ম।

ঘণ্টাখানেক পরে থানার দারোগা [illegible] সিপাই এসেছে, বুড়ো বংশী হাতজোড় [illegible] তাঁদের কাছে অনুনয় করে বলেছে [illegible] গিয়ে, তারপর তাঁরা এক সময় চলে গেছে—কিছুই লক্ষ্য করেনি পদ্ম।

ও যখন উঠে এলো, দেখলে [illegible] উবু হয়ে বসে আছে উদাস। তার চোখেও জল।

ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়ালো পদ্ম। কাঁধে হাত দিয়ে বললে, ওঠো সোনাই।

তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো উদাস অর্থহীন চোখ মেলে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না চোখ মেলে। গভীর একটা অনুশোচনায় যেন তার সমস্ত বুক দগ্ধ হচ্ছে।

তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলো উদাস। বললে, লক্ষ্মী বউ কানে আত্মঘাতী হলো রে পদ্ম, কানে আত্মঘাতী হলো? কিছুই বলে গেল না কাউকে।

পদ্ম নিজেও সে প্রশ্নের কোন জবাব পেল না ভেবে ভেবে। কেন আত্মহত্যা করলো লক্ষ্মীমণি, কেন?

আত্মহত্যাই যদি করবার মন হয়েছিল তার, তবে সেই প্রথম যেদিন পদ্মকে দেখেছিল, উদাসের আলিঙ্গনের মধ্যে, সেদিনই করেনি কেন!

কি আশ্চর্য, যখন সব রাগ বিদ্বেষ ভুলে পদ্মকে আপন করে নিল লক্ষ্মীমণি, যখন সংশয় সন্দেহ জয় করলো লক্ষ্মীমণি তখনই কেন সে বিষ খেলো!

পদ্মর হঠাৎ মনে হলো, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রেখে যাবার জন্যে নয়, উদাসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রেখে যাবার জন্যে নয়। উদাস আর তার মাঝখান থেকে ইচ্ছে করেই হয়তো সরে গেছে লক্ষ্মীমণি। অসীম অতৃপ্তির জ্বালায় ওদের সুখী করতে চেয়েছে।

আর একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে **সমস্ত শরীর তার শিউরে উঠলো।**

(ক্রমশ)

শ্রীচরণরাজ্যে বিচরণ

সুধাংশু ঘোষাল

শ্রীচরণে কি হয় আর কি না হয় বলাটা নেহাত চারটিখানি কথা নয়। মানুষ হিসাবে সবার দাম সমান, কিন্তু সবার চরণের দাম কি সমান? কারো শ্রীচরণের দাম বেশী, কারো কম। কারো চরণ উদ্দাম, কারো চরণ দুর্দাম। তবুও এই চরণ-চলনায় 'চরৈবেতি'। আদিকালে মানুষ খালি পায়ে না হয় খড়ম পরে ঘুরে বেড়াত। দিনে দিনে চরণের বরাত ফিরল। কেন না সে কালে হবুরাজা পায়ে ধুলো লাগার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় চিন্তা করতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছিলেন। গোবুমন্ত্রীর মগজে নাকি সমস্যা সমাধানের একটা উপায়ও গজিয়ে ছিল। কিন্তু এক 'ব্যাটা' মুচি (গোবুমন্ত্রীর খেদোক্তি—"কেমন করে পেরেছে ব্যাটা জানতে।") কিভাবে যেন তার মনের কথা জানতে পারে। হল জুতো-আবিষ্কার; শ্রীচরণের নসীব জাগল। পাম্পশু, কাবুলিশু, কত রকম-বেরকমের 'শু' পরে হল দিব্যি মহানন্দবিহারে শ্রীচরণের ঘোরাফেরা। দুনিয়ায় দুনিয়াদারি করতে, গুরুজনের সম্মান রাখতে আমরা তাঁদের জুতো ছুঁয়ে (গুরুচরণ স্পর্শ করার সুযোগ কি আর আছে!) প্রণাম করি। অবশ্য এতে নৈতিক, এমন কি আধিভৌতিক কোন বাধা নেই। কারণ এই প্রক্রিয়ায় আমরা [illegible] প্রাণীটির সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের দধীচি চতুষ্পদ প্রাণীটির দেহাবশেষটিকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ পাই। অবশ্য কেউ কেউ অভিযোগ করেন, শ্রীচরণে আগে যেমন ভক্তি ছিল, এখন নাকি আর তেমন নেই। পৌরাণিক-যুগে শত্রুপক্ষকে পর্যন্ত প্রণাম করবার রীতির প্রচলন ছিল। এমন কি গুরুশিষ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হলে শিষ্যমনে গুরুভক্তির এমন স্থান রয়ে যেত যে শিষ্য প্রথমে বাণ ছুঁড়ে গুরুচরণবন্দনা করত। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে লক্ষ্যভেদ করতে যাবার আগে, প্রথমেই বরুণবাণ হতে বারিবর্ষণ করে গুরু দ্রোণের পা ধুয়ে দেন, ও তারপর আর একটি বাণ মেরে তার চরণ স্পর্শ করেন। গুরুভক্তির নিদর্শন হিসাবে বিম্বিসার বুদ্ধের পাদনখকণা রেখে যে মন্দির রচনা করেন সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পরে অজাতশত্রু রাজা হয়ে এসব নষ্ট করে দেন। কারো কারো অভিযোগ দিনে দিনে ভক্তি নাকি এমনভাবেই উবে যেতে চলেছে। তাই 'শ্রীচরণেষু' কথার ব্যবহারও আসছে কমে। কিন্তু শ্রীচরণেষুর তিল তিলভাবে অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচরণে 'শু'-এর সংখ্যা চলেছে বেড়ে। অর্থাৎ শ্রীচরণেষু ক্রমহ্রাসমান, তবে শ্রীচরণে—'শু' ক্রমবর্ধমান। আজ লক্ষ্মণের মতো যদি কেউ স্ত্রীলোকের মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে থাকেন, তবে তিনি শু-শ্রী পদশ্রী দেখবেন সন্দেহ নেই। পদ আছে বলেই তো পৃথিবীতে পদত্যাগ, পদধূলি এমন কত কি! শ্রীচরণে কি হয় বা না হয় জানতে হলে আমাদের বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের দিকে নিমেষ অক্ষিপাত করতে হবে। আসুন, আজ দুদণ্ড বিভিন্ন প্রাণীর চরণ রাজ্যে বিচরণ করা যাক।

পৃথিবীর ক্ষুদে এককোষী প্রাণী অ্যামিবার দেহ একটি ছোট্ট কোষ। এদের দেহের যে কোন জায়গা থেকে পা গজায়। সেই পায়ের সাহায্যে কিছুদূর যাবার পর আবার নতুন পা গজায় আর পুরোনো পা দেহের সঙ্গে মিশে যায়। বারবার পদলুপ্তি আর পদপ্রাপ্তি পৃথিবীতে কজনের ভাগ্যে ঘটে, বলুন। অ্যামিবার পরমাত্মীয় কতকগুলি ছোটো ছোটো প্রাণী এক বা একাধিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিপের মতো বা সুতোর মতো অংশ নাড়াচাড়া করে দিব্যি জলে ঘুরে বেড়াতে পারে।

পদত্যাগ করার নজীর-নজরানায় যারা প্রথম তাদের মধ্যে চিংড়ি বা কাঁকড়া শ্রেণীর প্রাণীরা বেশ সংকোচহীন। উকা (Uca) নামে এক কাঁকড়ার পা যদি সাঁড়াশি বা চিমটার সাহায্যে চেপে ধরা যায় (অথবা সুতোর সাহায্যে যদি কোন পা বাঁধা হয়), তবে প্রাণীটি নিজের ইচ্ছে মতো এই পা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে পালিয়ে যাবে। মনুষ্যসমাজে চাকরিবাকরির ব্যাপারে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই কাঁকড়াটির ক্ষেত্রে পদত্যাগ করায় অসুবিধার চেয়ে সুবিধা হয় যথেষ্ট বেশী। এরা যখন বালিতে গর্ত করে লুকিয়ে থাকে, তখন
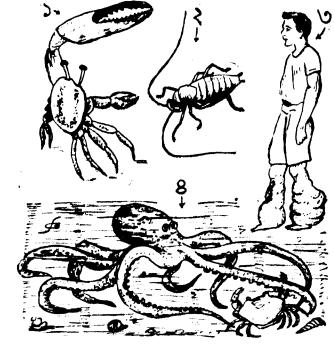
১, ২, কয়েক রকমের কাঁকড়া ও পতঙ্গ শ্রীচরণ মারফৎ প্রিয়া-সম্ভাষণ করে থাকে। ৩, মানুষের পায়াভারী হবার মূলে হচ্ছে—টাকা ও পোকা। ৪, অক্টোপাসের পেশীবহুল চরণালিঙ্গনে শিকার পঞ্চত্ব লাভ করে

প্রায়ই এদের পায়ের কিছুটা গর্তের বাইরে বেরিয়ে থাকে। কোনো শিকারী প্রাণী যখন খাবার অভিপ্রায়ে কাঁকড়াটির পা খুব জোরে চেপে ধরে, তখন কাঁকড়াটি (চরণাশ্রিত?) শিকারী প্রাণীকে নিরাশ করে না। সে তার পা দেহ হতে পৃথক করে দেয় এবং গর্তের আরও ভেতরে গিয়ে আত্মগোপন করে। এভাবে দেহের অংশ বিশেষ বিসর্জন (autotomy) দিয়ে জান বাঁচানো আরও কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। শিকারী প্রাণী কাঁকড়ার কাছে উদ্ধতভাবে বা শরমে জড়ানো স্বরে মিনতিভরা সুরে একটিবারও বলে না—"দেহি পদপল্লবমুদারম্।" নাকের বদলে নরুন পেয়ে আত্মপ্রসাদ, বোধহয়, শিকারী প্রাণীরা স্বীকার করতে চায় না। 'উকা' নামক কাঁকড়াটির অবশ্য প্রথম তিনটি পা বিচ্ছিন্ন করতে (অন্য পায়ের তুলনায়) বেশী চাপ দিতে হয়। পদহীন কাঁকড়া দিন কয়েক সাক্ষীগোপাল বা ঠুঁটো জগন্নাথের মতো চুপচাপ পড়ে থাকে। তারপর ঐ স্থান হতে আবার নতুন পা গজাতে শুরু করে (Regeneration)। এই পা ক্রমশ বড়ো হয়ে স্বাভাবিক পায়ে পরিণত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, কমবয়স্ক কাঁকড়ার নতুন পা গজাতে ও পদবৃদ্ধি হতে সময় লাগে কম; অধিক বয়স্কদের ক্ষেত্রে সময় লাগে বেশী। বস্তুত এই কাঁকড়াদের ক্ষেত্রে পদত্যাগ প্রকৃতপক্ষে আয়ু বৃদ্ধি ও পরে পদপ্রসারণ ঘটায়।

হাতের কারবার পায়ে সারা যায় কয়েকটি ক্ষেত্রে। চিংড়ি ও কাঁকড়া পায়ের ডগার সাঁড়াশীর মতো দাড়া দিয়ে শিকার ধরে ডান হাতের ব্যাপার চটপট সেরে ফেলে। অ্যামিবা-বাবুদের চরণে যারা ঠাঁই পায়, তাদের দেহস্থ করে অ্যামিবার শান্তি। অক্টোপাস সাগরবাসী, আটটি পেশীবহুল চরণের অধিকারী। প্রতি পায়ে পেয়ালার মতো উঁচু সারি সারি শোষক আছে। এই শোষক বিশিষ্ট ঠ্যাং (এক একটা ঠ্যাং দশ ফুট বা আরো লম্বা হতে পারে) দিয়ে সাগরতলে পাথর আঁকড়ে বা প্রবালদ্বীপের আশেপাশে এরা শিকারের অন্বেষণ করে।

মাকড়শার ঠ্যাং চারজোড়া। এরা প্রাণি-রাজ্যের দামোদর। খাদ্য খাবার পর এদের পেটের নির্দিষ্ট অংশ প্রসারিত হয়ে পায়ের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

মানুষের দুটো পা; সেই দু'পায়ের পদসেবায় নাজেহাল। ভাবুন দেখি, যদি আমাদের হাজার গণ্ডা পা হতো তবে অবস্থাটা কেমন হতো। বোধহয় এজন্যেই যাদের রাজত্বে পদসেবার বালাই নেই, পরকালে জবাব দেবার ঝামেলা নেই, সেসব প্রাণীদের পায়ের সংখ্যা গিয়েছে বেড়ে। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকেন, তারা নিশ্চয়ই কেন্নো দেখেছেন। অক্টোপাস, আর তেঁতুলে বিছে কোন ছার! পায়ের সংখ্যার দিক হতে এরা যে অনেক প্রাণীকে টেক্কা দিয়েছে, তা কেন্নোরা বুক ফুলিয়ে, গলাবাজী করে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলতে পারে। এক একটা কেন্নোর দেহে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দু'শ' জোড়া পা থাকতে পারে।

পায়ে পায়ে ঘষে ঝগড়া যে সবসময় হতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্যি আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। পতঙ্গেরা যেসব শব্দ করে, তা মোটেই কণ্ঠসঙ্গীত নয়। তা হচ্ছে অঙ্গসঙ্গীত। পুরুষ পতঙ্গের অনেকে শরীরের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট অংশ হতে নির্দিষ্টভাবে শব্দ উৎপন্ন করে প্রেয়সীকে আহ্বান জানায়। এক ধরনের ঝিঁঝি পোকার পুরুষেরা কর্কশ পায়ে পা ঘষে প্রিয়াসম্ভাষণ করে। স্ত্রী পতঙ্গ সেই ধ্বনি শুনে, "সখী, ওই বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি মনোমাঝে" বলে লঘুভারে ভর করে রঙ্গে রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে পুরুষের কাছে হাজির হয়। কাঁকড়াবিছের শরীরের প্রথমার্ধে ছ' জোড়া উপাঙ্গ আছে। প্রথম জোড়া আকারে সবচেয়ে ছোটো; আর দ্বিতীয় জোড়া সবচেয়ে বড়ো। প্রজননকালে স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া-বিছা পরস্পর মিলিত হবার আগে এই দ্বিতীয় উপাঙ্গ দুটির সাহায্যে একে অপরকে স্পর্শ করে। অবশ্য প্রণয় কার্য সমাধা হলে স্ত্রী কাঁকড়াবিছা পুরুষটিকে খেয়ে ফেলে। সনাতন প্রথা আর প্রচণ্ড বুভুক্ষার আগুনে স্বামীকে আহুতি দিয়ে বিয়ের রাতে সিঁদুরে টিপটি সে নিজেই মুছে ফেলে। পতঙ্গতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড লক্ষ্য করেন যে প্রেয়িংমান্টিস্ নামক পতঙ্গের স্ত্রী অনুরূপভাবে পুরুষের শ্রীচরণ ও দেহের অন্যান্য অংশ খেয়ে তাকে উত্তেজিত

করে। আরগোনাটো হচ্ছে অক্টোপাসের জ্ঞাতভাই। এদের পুরুষ নির্দিষ্ট একটি চরণ স্ত্রী-দেহে প্রবেশ করিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্ন অংশে জননকোষপূর্ণ থলি থাকে—যা হতে নতুন জীবনের সূচনা হয়। পুরুষ ফিডলার কাঁকড়া হাতছানি না দিয়ে একটি বিশাল পা নাড়িয়ে, পা-ছানি দিয়ে প্রিয়া সম্ভাষণ করে। চরণ দেখিয়ে চরণে ঠাঁই বইকি!

অমেরুদণ্ডীদের রাজ্য ছেড়ে এবারে আসুন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চরণ রাজ্যে বিচরণ করা যাক। বিবর্তনবাদীরা বলেন মাছেদের বুকের কাছের পাখনা জোড়া ও দেহের পিছনের পাখনা জোড়া চতুষ্পদ প্রাণীদের ক্ষেত্রে পায়ে রূপান্তরিত হয়েছে। ফুসফুস মাছেরা আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। এরা সামনের ও পিছনের পাখনা জোড়া দিয়ে বেশ হামাগুড়ি দিয়ে থাকে। কাজেই এখানে পাখনা পায়ের কাজ করে। অতীতের অনেক মাছের জীবাশ্ম দেখে বলা যায় যে, তারা সেই পাখনা দিয়ে সাঁতার কাটার চেয়ে চলাফেরা করতে বেশী অভ্যস্ত ছিল। বিবর্তনের ইতিহাসে মাছ থেকে উভচর প্রাণী; উভচর হতে সরীসৃপ ও সরীসৃপ হতে দুই শাখায় পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উদ্ভব হয়েছে। চতুষ্পদ প্রাণীদের পা চারটি এসেছে মাছেদের পাখনা হতে। পাখিদের বেলায় সামনের পা জোড়া হয়েছে দুটি ডানা, আর মানুষ ও অন্যান্য দ্বিপদ স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে তা হয়েছে দুটি হাত।

ব্যাঙ উভচর প্রাণী। এর সামনের পায়ে চারটে আর পিছনের পায়ে পাঁচটা আঙুল আছে। কুনো ব্যাঙের পিছনের পায়ের আঙুলগুলো পাতলা পর্দা দিয়ে পরস্পর জোড়া, দেখতে যেন কতকটা নৌকার দাঁড়ের মতো। কোলা ব্যাঙ আর দক্ষিণ আমেরিকার "পিপা" ব্যাঙদের বেলায় এটা আরও স্পষ্ট। তাই পাতিহাঁসের মতো এরা জলে বেশ সহজেই সাঁতার কাটতে পারে। গেছো ব্যাঙ "হাইলা"-র প্রতি আঙুলের ডগা স্ফীত। তক্ষক ও টিকটিকি জাতীয় কয়েকটি সরীসৃপের পায়ের তলায় নরম গদী থাকে। (অনেক সময় এই গদী বা আঙুলের স্ফীত ডগা হতে আঠালো রস বের হয়।) তাই খাড়া দেয়ালে ওঠার সময় বা গাছে লাফালাফি করার মুহূর্তে এরা পড়ে যায় না। কচ্ছপ ও সাপেরাও সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত। সাগরবাসী কচ্ছপদের পায়ের আঙুলগুলো পরস্পর সংলগ্ন। "সাপের পাঁচ পা" কথাটির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে কোন শ্লেষ থাকুক না কেন, সাপের পূর্বপুরুষদের যে পা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কখনো কখনো পাইথনের দেহের পিছনের দিকে অপরিণত পায়ের মত অংশ দেখা যায়। জীবতত্ত্ববিদেরা এ দুটিকে বিবর্তনের প্রমাণ বলে থাকেন। এই সাপটির হাড়ের (এক্স-রে) ফটো তুললে, যে কোমরের অস্থির সঙ্গে পা সংযুক্ত থাকে, এক্ষেত্রেও ঐ অস্থিবিশেষ দেখা যায়। এসব সাপের পা-ওলা পূর্বপুরুষের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চতুষ্পদ সরীসৃপ হতে পাখির উৎপত্তি হয়েছে। সরীসৃপদের সামনের পা পাখিদের বেলায় ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে কোন পাখির ডানায় স্পষ্ট নখ থাকে না, তবুও আজ হতে পনেরো কোটি বছর আগের আদিম পাখি (আর্কিঅপটেরিক্স)-দের ডানার তিনটি আঙুলে নখ ছিল। প্রয়োজন হলে ঠিক সরীসৃপের মতো এরা ডানার আঙুল তিনটে দিয়ে গাছের ডাল ধরত। পাখির পা বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপদের পিছনের পা জোড়া। নানারকমের পাখির পা বিবিধ বৈচিত্র্যে ভরা। যেসব পাখি জলে সাঁতার কাটে, যেমন পাতিহাঁস, তাদের পায়ের আঙুলগুলো পরস্পর পাতলা পর্দা দিয়ে জোড়া নৌকোর দাঁড়ের অনুরূপ। সারস, বক—এদের 'জলে নামবো...তবু বেণী ভিজাবো না' ব্যাপার; শিকারের সন্ধানে লম্বা ঠ্যাং জলে ডুবিয়ে দিলেও এদের দেহ কিন্তু জলের সংস্পর্শে আসে না। মেক্সিকোর জাকানা পাখির পায়ের আঙুল পায়ের চেয়েও লম্বা। জলে ভাসমান পদ্মপাতার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তাই সে পদ্মপাতা সমেত জাকানা পাখি ডুবে যায় না।

উটপাখি প্রতি পদক্ষেপে ২৫ ফুট যেতে পারে। ভাসমান পদ্মপাতার উপর হেঁটে যেতে সাহায্য করে জাকানা পাখির লম্বা আঙ্গুলগুলো। সীলের পা সাঁতার কাটার ব্যাপারে মোক্ষম। ক্যাঙ্গারুদের লাফিয়ে চলা তাদের লম্বা পিছনের পা জোড়ার দৌলতে।

উটপাখির উচ্চতা বারো ফুট বা আর একটু বেশী হতে পারে। দ্রুত গমনকালে এরা **প্রতি পদক্ষেপে ২৫ ফুট** অতিক্রম করে অতি সহজেই ঘণ্টায় ২৫ মাইল যেতে পারে, টিয়া মোরগ, কাকাতুয়া ইত্যাদি পাখি যারা পুষেছেন, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন পা উঁচু করলে এদের আঙ্গুলগুলো মুড়ে যায়। কোন অ্যানাটমিস্টকে জিজ্ঞাসা করলে শুনবেন এদের পায়ের গঠন এমন যে পা ভাঁজ হলেই, আঙ্গুলগুলো মুড়ে যাবে পেশীর কারিকুরিতে। এই জন্যেই ঝড়জলে পাখির পা স্বাভাবিকভাবে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে; ফলে পাখিরা পড়ে যায় না।

আসুন, এবারে স্তন্যপায়ীদের দুনিয়ার খবর নেওয়া যাক। ডাকবিল এক আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা সরীসৃপদের মতো ডিম পাড়তে পারে। ডাকবিল, খাল, বিল, নদী, পুকুর ও জলায় ঘুরে বেড়ায়। প্রয়োজন বিশেষে এরা জলে সাঁতার কাটে। বলাবাহুল্য শ্রীচরণের গঠনও পাতিহাঁসের সঙ্গে তুলনীয়। সীল ও তিমিকে অনেকেই মাছ বলে থাকেন। বস্তুত এরা মাছ নয়, স্তন্যপায়ী প্রাণী—এদের শাবক মার দুধ খেয়ে বড়ো হয়। সীলের চারটি পেশীবহুল পায়ের প্রতি পায়ের আঙ্গুলগুলো সংলগ্ন। সমুদ্রজলে সাঁতার কাটা ছাড়া প্রাণীটি বরফের উপর হামাগুড়ি দিতেও পারে। তিমি সাগরের মায়া কাটিয়ে ডাঙ্গার বুকে ফিরে আসে না কোনদিনই। এদের সামনের পা প্রকৃত একটি দাঁড়, কিন্তু পিছনের পা হয়েছে লুপ্ত। বিবর্তনবাদীদের অভিমত, যে-প্রাণী জলে জীবনযাপনে যত অভ্যস্ত হবে, অভিযোজনের ফলে তার পিছনের পা ততই ছোটো হতে থাকবে, এমনকি পরিশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে (প্রাকৃতিক নির্বাচনের সক্রিয়তায়)।

শ্রীপদ যেমন কখনো-সখনো ছোটো হয়, তেমন এরা আবার বড়োও হতে পারে। ক্যাঙ্গারুর পিছনের পা জোড়া সামনের পা জোড়ার তুলনায় অনেক লম্বা। এই লম্বা পা জোড়া **লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে চলার জন্য দায়ী।** ঘোড়ার **শ্রীচরণের ব্যাপার কম চমকদার নয়।** দ্রুতগামী ঘোড়ার লিকলিকে পা দেখে কেউ বলেন, ঘোড়া প্রতি পায়ের কেবলমাত্র একটি আঙ্গুলে ভর দিয়ে দৌড়ায়। কথাটা সোনার পাথর বাটির মতো হবে। অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন ঘোড়ার পূর্বপুরুষেরা মাত্র ১১ ইঞ্চি উঁচু প্রাণী আজ থেকে ছ'কোটি বছর আগে দুনিয়ার বাসিন্দা। এই সুদীর্ঘ সময়ে ঘোড়ার উচ্চতা বেড়ে ৬০ ইঞ্চি হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের পায়ের দৈর্ঘ্য বেড়েছে। পদ-সম্প্রসারণ ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বপুরুষের পায়ের মাঝের (অর্থাৎ তৃতীয়) আঙ্গুল ছাড়া আর যেসব আঙ্গুল চলাফেরায় সহায় করত, তাদের কতগুলি অবশিষ্ট ও কতকগুলি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। এসব তো অল্পপর্ব। কিন্তু মানুষের ব্যাপার স্যাপার কি রকম দেখা যাক।

মনুষ্য সমাজে পায়াভারী হবার কারণ দুটি—টাকা ও পোকা। শেষোক্ত কারণে পায়াভারী হলে, তা অতিসহজেই চোখে পড়ে। রাস্তায় বিশেষ করে উড়িষ্যায় আমরা অনেকেই এমন লোক দেখেছি যার একটি বা দুটি পা ফোলা—হাতির পায়ের সঙ্গে তুলনীয়। এর একটি পায়ের ওজন ১ মণ ১০ সের পর্যন্ত হতে পারে। গজেন্দ্র গমন কথাটা সাহিত্যে উপমা হিসেবে নির্দোষ হলেও, স্বয়ং গজেন্দ্র-গমন অবস্থায় কতটা সাহিত্য প্রেরণা জাগে, সেটাই জিজ্ঞাস্য। এক ধরনের সূতো কৃমি জাতীয় পোকা মশার মাধ্যমে দেহে স্থানান্তরিত হয়ে লিম্ফনালী বন্ধ করে দেবার জন্যেই এই পদস্ফীতি হয়। মানুষের পায়াভারী টাকার বটে, বংশের বনেদীয়ানারও বটে। চাকরের থেকে বড়সাহেবের দপ্তরে ছোটাছুটি; ছেলে দুরন্ত, দণ্ড দেবতার পায়ে সঁপে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বিজ্ঞাপন দেখে না হয় খোঁজ নিয়ে ছুটাছুটি আর ছুটো। হৃদয়ের মাঝে ঠাঁই পাবার জন্যেও তো এই ধরনের ছোটা। এক কথায় শ্রীচরণের নেই ছুটি, আছে কেবল ছোটাছুটি। সৃষ্টির আদিতে যে ছোটা শুরু হয়েছে, সারা জীবজগৎ "যুগ হতে যুগান্তরের পানে" ছুটে চলেছে এক অদ্ভুত গতির নেশায়, সুদূরের আহ্বানে সাড়া দিতে। এটাই তো বিশ্বসত্তার চিরন্তন চিরনূতন সুর। চলার উন্মাদনায় আমরা অনুপ্রাণিত নয় কি?

শার্ঙ্গদেব

বেতার সপ্তাহে সুগমসংগীত

বেতার সপ্তাহ উপলক্ষে লাইট মিউজিক তথা সুগমসংগীত শুনে প্রচলিত কাব্যসংগীত সম্বন্ধে উৎসাহিত হতে পারলাম না। এর জন্য গায়ক গায়িকাদের দোষ দিই না—আসল অভাব চিন্তার এবং আকাশবাণী এত বড় প্রভাব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কাব্যসংগীতের বৈচিত্র্য ও মনোজ্ঞতা সম্বন্ধে যথার্থ প্রেরণা প্রদান করতে অসমর্থ হয়েছেন—এটাই আমাদের পরিতাপের বিষয়। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বহুবার যা বলেছি এবারও তাই বলব কেননা বেতারে ইতিপূর্বে বহুবার যে মামুলি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারও তাই হোলো এবং আশংকা ভবিষ্যতেও তাই হবে।

কথা হচ্ছে, বেতার সপ্তাহ যে পালন করা হয় তার নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটি যে কী তা বোঝা আমাদের অসাধ্য হয়ে পড়ে যখন আমরা দিনানুদৈনিক অনুষ্ঠান থেকে এই অনুষ্ঠানের কোনো পার্থক্যই অনুভব করি না। ব্যাপারটা যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তা থেকে মনে হয় নেহাৎ এই রকম একটি বেতার সপ্তাহ পালন করবার একটা নির্দেশ ওপর থেকে আছে বলেই কোনরকমে এক সপ্তাহের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করে কাজটা সেরে দেওয়া হয়। এই আয়োজনের মধ্যে যেন কোনো চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই। সরকারী দপ্তরে যেভাবে দৈনিক চিঠিপত্র মামুলি পদ্ধতিতে ফাইলজাত করে ওপরওলার কাছে "ডিসপোজাল" দেখানো হয় এও সেই ব্যাপার; মনোভাবটা এটা করতে হবে করে ফেলো গোছের—সার্থকতার দায়িত্ব কারুরই নেই। এই যদি হয় তবে বেতার সপ্তাহ পালন করা অর্থহীন এবং এই অপব্যয়ের কোনো সংগত কারণও দেখা যায় না।

আশ্চর্যের বিষয় কাব্যসংগীত সম্পর্কে বেতার প্রতিষ্ঠান বরাবর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানদের অনুসরণ করে আসছেন। দেখা যায় যখন যেভাবে ব্যবসায়ীরা সংগীতের মোড় ফেরাচ্ছেন আকাশবাণীতেও সেইভাবে সঙ্গীতের গতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা একটা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন—জনসাধারণের রুচিকে কীভাবে কাজে লাগালে তাঁদের গানগুলির চাহিদা বাড়বে এবং লাভের অংক স্ফীত হবে সেটা আঁচ করেই তাঁরা তাঁদের কার্যপদ্ধতি স্থির করেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা কৃতকার্য হয়ে আসছেন। এদিক থেকে তাঁদের কিছু বলবার নেই কেননা যাঁরা ব্যবসা করতে নেমেছেন তাঁরা লাভের দিকটা দেখবেন বৈকি। কিন্তু বেতার প্রতিষ্ঠান উক্ত পন্থা অনুসরণ করছেন কেবলমাত্র কাজটা চালিয়ে যাবার জন্য—তাঁরা কোনো একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করাকে নিষ্ফল প্রয়াস বলে মনে করেন। এরও কারণ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকারী কর্মচারীরা নেহাৎ হতাশ হয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। অনেকে প্রথমে শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হন এবং তৎপরতার প্রমাণও দিয়ে থাকেন, কিন্তু বাধা আসে তাঁদেরই ওপরওলাদের কাছ থেকে নানা ভাবে নানা দিক থেকে। ফলে তাঁদের পরিকল্পনা অংকুরেই বিনষ্ট হয়। তখন কর্মীদের মনে নৈরাশ্য ঘনিয়ে আসে—সমস্ত উৎসাহ নিবে গেলে গতানুগতিক পথে ভ্রমণ করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। অপরপক্ষে কাজ দেখাতে পারলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অভাবনীয় উন্নতির সুযোগ ঘটে। তাতে তাদের উৎসাহ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

এ সবই অবশ্য আমাদের অনুমান; কাব্যসংগীত সম্বন্ধে বেতার প্রতিষ্ঠানের নিশ্চেষ্টতার বিশেষ কারণটা প্রমাণ সহকারে বলা শক্ত তবে উৎসাহের অভাবটা সুস্পষ্ট এটা সকলেই অনুমান করতে পারেন। বেতার সপ্তাহের অনুষ্ঠান একটা বিশেষ অনুষ্ঠান—সেই অনুষ্ঠানে যেসব কাব্যসংগীত প্রচার করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ছিল কিন্তু প্রায় কোনো গানেরই এতটুকু বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য পাওয়া গেল না। দুঘণ্টা ধরে এইসব গান শোনাও অতিশয় পীড়াদায়ক। আমার পরিচিত যতজনকে জিজ্ঞাসা করেছি তাঁদের কেউ ধৈর্য ধরে দুঘণ্টার প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ শোনেননি। সবাইকার এক উত্তর—"মশাই কাঁহাতক আর এ সব শোনা যায়—খানিক পরেই রেডিও বন্ধ করে দিলুম।" শ্রোতাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য দায়ী কি বেতার কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য নয়? একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁরা এমন কতকগুলি গান কেন শোনালেন যা শ্রোতাদের মনে এতটুকু রেখাপাত করল না? এমন কোনো চিন্তার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন কি যাতে আমাদের মনে এতটুকু ধারণা হবে যে বেতার প্রতিষ্ঠানে কাব্যসংগীতের উন্নতির এতটুকু সম্ভাবনা বর্তমান? কাব্যসংগীত সম্বন্ধে বেতার প্রতিষ্ঠান বোধ করি আদৌ শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন না। "লাইট মিউজিক" আখ্যা দিয়ে তাঁরা কাব্যসংগীতকে নেহাৎ অগৌরবের পর্যায়ে ফেলে রেখেছেন। এক সময় তাঁরা রাগসংগীতের উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রেরণায় রাগসংগীতের কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। আসলে অধিকাংশ শ্রোতা রেডিও শোনেন কিছু মনোরম সংগীত শোনবার জন্য। এই মাধুর্যের আস্বাদ তাঁরা লাভ করতে সমর্থ হতেন যদি বেতার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কাব্যসংগীত বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যে সার্থক হয়ে উঠত। রাগসংগীত স্বীয় গৌরবে অধিষ্ঠিত। তার ভাবের ব্যাপকতা স্বাভাবিক নিয়মে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু কাব্যসংগীত একটুকরো বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ যা শ্রোতার বিশেষ অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং তাকে রসাবিষ্ট করে। এই কারণেই বৈচিত্র্য কাব্যসংগীতের প্রধান গুণ। সেই বৈচিত্র্যের প্রকাশ যদি না ঘটে তাহলে সেই গানে চিত্ত সাড়া দেয় না আর সেইখানেই কাব্যসংগীত অসার্থক। রাগসংগীত যে নিয়মে চলে কাব্যসংগীত সেই নিয়মে চলে না। কাব্যসংগীতে অল্পের মধ্যে অসামান্যের আভাস আনতে হয় নতুবা সে সাধারণ কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়; যেসব কবিতার কোনো বিশেষত্ব বা "ক্যারেক্টার" নেই। অতএব কাব্যসংগীতে রসসঞ্চার করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বেতার কর্তৃপক্ষ হয়ত মনে করেন একটা গান লিখে তাতে সুর দিলেই তা মিউজিক হয়ে গেল এবং তখন তাকে অনায়াসেই লাইট মিউজিক বলে চালানো যায়। কিন্তু এই ধারণা অতিশয় ভ্রান্ত; কাব্যসংগীতের কারুকলা রীতিমত সূক্ষ্ম, তার রূপায়নকে সার্থক করতে হলে কলা সম্বন্ধে উচ্চবোধ থাকা দরকার, প্রয়োগরীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বেতার প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এই প্রচেষ্টা এবং শ্রদ্ধার অভাব দীর্ঘকাল থেকে লক্ষ্য করে আসছি। এই মনোভাবের অবসান ঘটানো দরকার। কাব্যসংগীত সম্বন্ধে তাঁরা অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠুন শ্রোতৃসাধারণ এটা চান—চরিত্রবর্জিত আধুনিক নামক সুর সহযোগে আবৃত্তি থেকে গীতিকে প্রকৃত কাব্যসংগীতে রূপান্তরিত করবার সার্থক প্রয়াস বেতার প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হলে সঙ্গীতের একটা বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা উৎসাহিত হব।

উন্নয়ন, অর্থ, মৎস্য, দুর্নীতি দমন, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ১০টি বিভাগের ভার লইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। খুড়ো বলিলেন—"উপায় কী। ভগবান দশাবতার হয়েছিলেন শুধু

লীলার জন্যে নয়, প্রয়োজনে। এক্ষেত্রেও তাই। তবে সাদামাটা কথাটাও বলে রাখি, দশচক্রে ভগবানের রূপের কথাটাও তিনি যেন স্মরণ রেখে সতর্ক থাকেন!!"

মন্ত্রিসভা সংগঠনের সংবাদে শুনিলাম কয়েকজন মহিলা এইবারে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইয়াছেন।—"গৃহিণীদের সচিবের পদ আমরা বহু আগেই দিয়েছি", বলে আমাদের শ্যামলাল।

প্রসঙ্গত বাজেটের কথা আসিয়া পড়িল। ঘাটতি বাজেট হইলেও নূতন কর ধার্য করা হইবে না বলিয়া ডাঃ রায় আশ্বাস দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহ-

যাত্রী বলিলেন—"এদিকে আমাদের ঘরের সচিবদের কিন্তু অন্যরকম রূপ। পারিবারিক বাজেট ঘাটতি হলেও তাঁরা করভার চাপাতে কোন সমীহ করেন না।"

বিধান সভার অধিবেশন যথারীতি শুরু হইয়াছে। —"এবং যথারীতি হট্টগোলের মধ্যে ক্যাবিনেটও সম্পন্ন হয়ে গেল।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

মন্ত্রিসভা সংগঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি ব্যঙ্গচিত্র "আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে—ইহাতে পৌরাণিক লক্ষ্যভেদের কাহিনী চিত্রিত করা হইয়াছে।—"বর্তমানের 'বুলস্ আই' তাক করে ঢিল ছোঁড়ার চিত্র হলেই ভালো হতো, মৎস্যের রূপের সঙ্গে যে অনেক শিকারীরই পরিচয় প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে"—বলে শ্যামলাল।

বৃহত্তর কলিকাতায় (৩২টি মিউনিসিপ্যালিটি সহ) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। —"খুব ভালো কথা। এই সঙ্গে নির্বাচন-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হলে আরো ভালো হয়"—বলেন বিশু খুড়ো।

শুনিলাম অর্থ কমিশনের অবিচারে (বিমাতাসুলভ আচরণও কেহ কেহ বলিয়াছেন) নাকি পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ঘাটতি হইয়াছে। অমনি [illegible] বাংলার এক সহযাত্রী [illegible] কানে গীতি গান শুনাইলেন—"আমরা ছিলাম দুইটি ভাই গেলাম বিয়া করিতে, আপনার পুতেরে ভালো বউ দেয় গো, সতাই মা, সতাই মা ধর্মে যোগ্য এই বিচার করে গো!"

ভারতে ১৯৮২ সালের মধ্যে বেকার সমস্যা থাকিবে না বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আর থাকলেই বা কে কেয়ার করছে; ততদিনে চন্দ্রলোকের শিল্পাঞ্চলে কাজ জুটিয়ে নিতে কোন অসুবিধাই কারো হবে না!"

এক সংবাদে শুনিলাম রেল বিভাগের আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ নাকি পরিবহণের সময় লৌহ ও ইস্পাত চুরির খেসারত দিতেই চলিয়া যায়। শ্যামলাল বলিল—"কেয়া আফৎ, এর পর আবার অনেকের শেষ পারানির কড়ির জোগানও দিতে হয়!!"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমতী কেনেডিকে নাকি কয়েকটি ভারতীয় পুতুল উপহার দিয়াছেন। —"কিন্তু শ্রীমতী কেনেডির দেশে বোধহয় ডলের চেয়ে ডলারের কদর বেশি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

নির্বাচনান্তে কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে তাঁহারা এইভাবে যে আসন হারাইবেন তা ধারণা করিতে পারেন নাই—"'আপনি কি হারাইতেছেন' বিজ্ঞাপন আগে থেকে পড়া থাকলে হয়ত সুবিধা

হলেও হতে পারত"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

গান্ধী স্মারক কমিটি কেনেডি দম্পতিকে একটি চরকা উপহার দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ শুনিলাম। "কিন্তু তাঁরা কি শোনাতে পেরেছেন—ঘর ঘর চরকার ঘর্ঘর শব্দ"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ইংলন্ডে ভাষার প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের নাকি একটি সোসাইটি আছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরাই শুধু দেশে ভাষার প্রতি নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব দমনে কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি!"

মাদ্রাজের এক সংবাদে শুনিলাম যে কোন চিত্রতারকার সমাগমে জনতার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে পুলিস বাধ্য হইয়া গুলি চালাইয়াছে।—"জানা থাকলে চিত্রতারকা-পাগলেরা হয়ত গান ধরত—আমার দেহ [illegible] কি......ইত্যাদি" বলে শ্যামলাল।

এক বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ জনৈক ব্যক্তি একটি জটিল অস্ত্রোপচারের সময় ৩৬ বার মরিয়াও নাকি এখনও বাঁচিয়া আছে।—"সেক্সপীয়ার কি একেও 'কাপুরুষ' আখ্যায় আখ্যাত করবেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

"রাজ্যপাল সন্ধানে"—একটি সংবাদ শিরোনামা। সংবাদে বলা হইয়াছে অধিকাংশ রাজ্যপাল এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং এইজন্যই বিভিন্ন রাজ্যের জন্য উপযুক্ত রাজ্যপালের সন্ধান কার্য ইতি-মধ্যেই শুরু হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"হালের রেওয়াজ মতো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে দরখাস্তের সংখ্যা এত বেশি হয়ে যাবে যে সেসব পড়ে শেষ করাই দুরূহ। তার চেয়ে সাবেকী নিয়মে হাতী ছেড়ে দিলে হয়ত খোঁজাখুঁজির কাজটা সহজ হয়ে যাবে এবং গাত্রজ্বালার আশংকাও তাতে থাকবে না!!"

বিদুর

অজ্ঞাত প্রতিভা

খুব ছেলেবেলায়, আমার বেশ মনে আছে, পাঁজির এক বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে ভীষণ ঠকেছিলাম। বিজ্ঞাপনে বলেছিল, মাত্র একটি টাকা পাঠালে আমি ডাকে ঐন্দ্রজালিক আঙটি, এক প্যাকেট তাস, রেশমী রুমাল একটা, আর এক শিশি আতর পাব। তাস বা রুমালের ওপর আমার লোভ ছিল না, ওই ঐন্দ্রজালিক আঙটির লোভই কাল হল। একটা টাকা যথা ঠিকানায় মনিঅর্ডার করলাম, আর দিন গুনতে থাকলাম কবে ঐন্দ্রজালিক আঙটিটা পরে বন্ধুদের কাছে আলাদীনের মতন ভোজবাজি দেখাতে পারব। দিন মাস এবং বছর কেটে গেল, সেই ঐন্দ্রজালিক আংটি আর এল না! আজও নয়।

রাঁচি থেকে এক তরুণ কাব্যযশপ্রার্থী একটি চিঠি লিখেছেন সম্প্রতি, আর তাঁর চিঠি পড়ে আমার সেই ঐন্দ্রজালিক আঙটির কথা মনে পড়ল। তিনি লিখেছেন, তাঁর লেখা অখ্যাত অজ্ঞাত অথচ নতুন প্রতিভাবানদের রচনা সংকলনে প্রকাশ করা হবে এই আশ্বাস পেয়ে তিনি কয়েক জায়গায় টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকাটা মারা গেছে। গ্রন্থ প্রকাশ ব্যবসায়ে এমন অসাধুতা দেখে ছেলেটি বড় মর্মাহত।

মর্মাহত আমরাও। কিন্তু কি করতে পারি! ইদানীং বাঙলা দেশের কোনো পত্রিকায় এই মর্মে বিজ্ঞাপনও দেখেছি যে, একটি কাব্য (ও গল্প) সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে, তরুণ উদীয়মান (!) সাহিত্যিকদের লেখা সংগ্রহ করে, লেখা ছাপার খরচ বাবদ দশ টাকা চাঁদা পাঠাতে হবে।

সাহিত্য যশ যার কাম্য, হাতে লেখা পত্রিকায় নিজের নাম দেখতে দেখতে যার চোখে জল এসে গেছে, তার কাছে দশ টাকার বিনিময়ে ছাপার অক্ষরে নাম দেখতে পাওয়া বড় সোজা কথা নয়। ফলে দশটা টাকা পত্রপাঠ মনিঅর্ডার হয়ে যায়, পৃথক এনভালাপে থাকে বেচারী কবির একটি দুটি কবিতা কিংবা গল্প-লেখকের গল্প। অজ্ঞাত লেখক স্বপ্ন দেখেন তাঁর প্রতিভা অচিরেই গঙ্গা নদীর দু প্রান্তে স্বীকৃত হবে। কিন্তু মাস যায়, বৎসর যায়, বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই কবিতা বা গল্পের সংকলন আর প্রকাশ পায় না। টাকা? না সেটাও আর ফেরৎ আসে না। কারণ ঐন্দ্রজালিক আংটির মতন ওই সংকলন প্রকাশও এক ইন্দ্রজাল।

প্রসঙ্গ এখানে শেষ নয়। আমি এমন অভিযোগও শুনেছি, অনেক তরুণ লেখক তাঁদের বই প্রকাশিত হবে এই আশায় কোনো কোনো প্রকাশককে তাঁর বইয়ের প্রকাশ বাবদ অর্থও দিয়েছেন। হয়ত বইটা প্রকাশ করাও হয়েছে, তারপর আর লেনদেন কেনাবেচা সম্পর্কে প্রকাশক লেখকের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও রাখেননি। কেউ কেউ বলেন, বিত্তহীন প্রকাশককে এইভাবে পুঁজি জুটিয়ে ব্যবসা বজায় রাখতে হয়। কথাটা সত্য কি না জানি না।

কথাটা উঠল বলে সম্প্রতি আর-একটি সংবাদ পরিবেশন করি।

ফরাসী দেশে অগুনতি সাহিত্য পুরস্কার, তার মধ্যে আরও একটি পুরস্কার বাড়ল, নাম 'পিজিঅনস প্রাইজ'। এই পুরস্কার পাবেন তাঁরা, যাঁরা প্রতারিত লেখক, অর্থাৎ নিজের খরচায় বই ছেপেছেন; স্ব-খরচে ছাপা বইয়ের মধ্যে যে লেখকের বই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে এ পুরস্কার তাঁর।

হিসেব বলছে যে, ফরাসী দেশে যত বই বছরে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বই লেখকরা নিজের টাঁকের কড়ি খরচ করে ছাপেন। এই সব লেখক কারা? যারা হালে সাহিত্যে এসেছেন, যাঁদের বই প্রকাশক ছাপতে রাজী হননি, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু দেশটা ফ্রান্স; ফরাসী রক্তের মজা এই, 'অজ্ঞাত প্রতিভা' বহু। কাজেই কিছু প্রকাশক আছেন যাঁরা 'অজ্ঞাত প্রতিভাদে'র বই ছাপার ব্যবসায় বিশেষজ্ঞপ্রায় হয়ে উঠেছেন।

এঁরা প্রতিভার প্রতি খুব সদয়। এক একটা বই ছাপা বাবদ লেখকের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকেন। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে সামান্য কিছু বই ছাপেন, যা বা ছাপেন তাও বিক্রির জন্যে গরজ করেন না।

পুরস্কারটির যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা বলেন যে, গাঁটের কড়ি খরচা করে বই ছাপালেই যে লেখককে উন্মাদ ভাবতে হবে তার কোনো মানে নেই। বহু প্রতিভা আছেন যাঁরা এই-ভাবেই নিজের পকেটের পয়সা খরচা করে তাঁদের প্রথম বই ছেপেছেন—যেমন আঁদ্রে জিদ, মার্শেল প্রুস্ত, আঁরি বার্গশঁ, র‍্যাঁবো এবং আরও অনেকে। কাজেই ব্যাপারটা লজ্জার কিছু নয়, বরং প্রতারিত অথচ অজ্ঞাত প্রতিভাদের লেখার বিচার করে একটি পুরস্কার দিলে প্রতারণার অন্তত খানিকটা মুখোশ খুলবে।

'অজ্ঞাত প্রতিভা' আবিষ্কারের এই পন্থাটি মন্দ নয়। বাঙলা দেশেও এর চল হলে দোষ

নেই, কেননা অর্ধেকটা ত চালু আছেই। আর বাঙলা দেশেও অজ্ঞাত প্রতিভা প্রচুর।

বিবাহোপন্যাস

বাংলা দেশে এক ধরনের নতুন উপন্যাস ক্রমেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের সঙ্গে এ-ধরনের উপন্যাসের যোগাযোগ কতটা আমাদের সমালোচকরা তা বাতলে দিতে পারেন, আমি পারি না। তবে, এই সব উপন্যাস যে একটা আলাদা জাতের তা বোধ হয় অনেক পড়ুয়াই স্বীকার করে নেবেন।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি এই জাতের উপন্যাসের নাম দিয়েছি, 'বিবাহোপন্যাস'। আমার মনে হয় না, এটা খুব গর্হিত কর্ম হল। যে উপন্যাস ইতিহাসকে আশ্রয় করে তাকে যদি আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলি, যার কাহিনী খুন জখম ও গোয়েন্দা অধ্যুষিত তাকে যদি বলি গোয়েন্দা উপন্যাস তবে যে উপন্যাস বিয়ের উপহারের জন্যে তাকে 'বিবাহোপন্যাস' বলা কি অন্যায় হল!

বিবাহোপন্যাস সম্পর্কে গবেষণা করলে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো উপাধি দেন বলে এযাবৎ শুনিনি, শুনলে গবেষণায় নিরত হতাম। কিন্তু সাধারণভাবে যা দেখছি তাতে এই জাতীয় উপন্যাসের একটা মোটামুটি চরিত্র আশা করি আমি নির্ণয় করতে পারি।

প্রথমত, বিবাহোপন্যাসের প্রাথমিক ধর্ম হল, এমন একটি টানা গল্প যার মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যা সোয়াশ থেকে দেড়শ বা দুশ। এই গল্পের স্বাদ কেমন হওয়া উচিত তার জবাবে প্রকাশকরা বলবেন: 'এই মিষ্টিমিষ্টি গল্প একটা। প্রেমফ্রেম নিয়ে লিখবেন।' অর্থাৎ রসটা মিষ্ট হওয়া চাই। মোরব্বা না মধু কার মতন মিষ্টি তা অবশ্য লেখকই জানতে পারেন। প্রেমফ্রেম নিয়ে লিখতে হবে, কাজেই দুই নায়ক এক নায়িকা বা দুই নায়িকা এক নায়কের একটি ভালোবাসা-বাসির ফ্রেম রাখতে হবে।

তারপর দরকার নাম। নামটাই আসল। নামের জোরেই বিবাহোপন্যাস বিয়ের তিথিতে টোপর বা বরণডালার মতন বেচা-কেনা হয়। নামেই যে তরে যেতে হবে এ-কথা মনে রেখে লেখকরা কে কত বেশী বিয়ে-ছোঁয়া নাম দিতে পারেন, তার একটা প্রতি-যোগিতাও যেন করে যাচ্ছেন। কনে বর মালা চন্দন শঙ্খ ফুল চাঁদ—অর্থাৎ বিয়ের অনুষঙ্গের সঙ্গে সহজে যে-সব শব্দ জড়িত লেখকরা তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। আমায় সেদিন এক সাহিত্যিক বন্ধু বলছিলেন, তিনি তাঁর আগামী উপন্যাসের নাম দেবেন, 'বাসর শয্যা পাতি'। আমি চক্ষু বিস্ফারিত করলে, তিনি এক নিশ্বাসে এক কুড়ি হালের বিবাহোপন্যাসের নাম বলে গেলেন যা শোনা-মাত্র মনে হবে, সবার লক্ষ্য বাসর নববধূ ফুলশয্যা। তাঁর কথা অত্যুক্তি নয়, বইয়ের বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ ফেরালে পাতায় পাতায় আমরা এর সমর্থন পাব। হৃদয় নীড় আর শয্যায়, বরণডালা আর বধূতে বাংলা দেশ যেভাবে ছেয়ে গেল, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে বিয়ের বাজার বাংলা উপন্যাসকে সাত-পাকে বেঁধে ফেলেছে।

নামের পর প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদ মানেই তিন-চারটে রঙের খেলা, একটি নারী মুখ। (একজন প্রবীণ লেখক এক প্রচ্ছদ-শিল্পীকে চিঠিতে লিখেছিলেন: ভাই, মেয়ের মুখটি আরও মিষ্টি করবে, নতুন বউয়ের মতন, মুখে চন্দন থাকবে।) যে-প্রচ্ছদ যত বেশী চোখে ধরবে, বিয়ের বাজারে তার তত্তই গরব। এবং তার চলাও তত গরবিণীর মতন।

প্রচ্ছদ এবং নামের পর থাকে দাম। মূল্য সুলভ করার দিকেই প্রকাশকরা ঝোঁক দেন, দু'তিন টাকার মধ্যে সাধারণত এর দাম হয়ে থাকে। অর্থাৎ ক্রেতা যেন সস্তা কাস্কেট ফুলদানি বা মিনেকরা সিঁদুর কৌটার দামে এই বই কিনতে পারেন।

এই বইয়ের পরিণতি কি আমার পক্ষে সঠিকভাবে তা জানা নেই। তবে শুনেছি, প্রথম দিন নতুন বউয়ের উপহার সামগ্রীর পাশে, পরের দিন বউয়ের বাক্সে, তারপরে স্কুল-কলেজে পড়া ননদ-দেওরের হাতে এবং শেষে স্থান-কাল-পাত্র বদলাতে বদলাতে পুরনো কাগজওলার বস্তায়।

বই যিনি পান, তিনি কি বই পড়েন? কদাচিৎ। কেননা, তখন বই পড়ে সময় নষ্ট করার মতন তাঁর অবস্থা নয়। বিয়ের পর নতুন বউ দুপুরে একটু না ঘুমিয়ে পারে না, রাত্রেই বা সময় পাওয়া যায় কোথায়—ওটা নিশিযাপন পর্ব।

পরে যখন বইয়ের খোঁজ পড়ে তখন সেই বইয়ের পাতা আস্তাকুড়-ঘুরে আবার কাগজের কারখানায়।

'বই চুরি' সম্পর্কে

মাননীয়,
'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

১৯৬৮ [illegible] পত্রিকায় আমার 'ময়দানবের দ্বীপ' বইটি কি ভাবে নকল করা হয়েছে তার খবর পেলাম। এঁদের 'সাহিত্য সংবাদ'-এ "বিদুর" যা লিখেছে তার চেয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য।

শুধু একটা কথা আপনার পত্রিকা মারফৎ পাঠক সাধারণকে জানাবার সুযোগ দিলে বাধিত হ'ব। 'ময়দানবের দ্বীপ' সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনী। 'রোবট' শব্দটি অবশ্য বিদেশী। 'রোবট' বলতে যা বোঝায় সেই কলের মানুষ আর আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু ধ্যানধারণা আবিষ্কারকে ভিত্তি করে লেখা কাল্পনিক এই কাহিনীটি প্রায় পঁচিশ বছর আগে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে ছোটদের একটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়।

নমস্কারান্তে

বিনীত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একটি সংবাদ

খবরের কাগজে অতি সম্প্রতি এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা আমাদের পাস্টারনাকের কথা মনে করিয়ে দেয়। মিখাইল নারিৎজার একজন রুশ লেখক এবং ভাস্কর। লেনিনগ্রাড আর্ট স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। সম্প্রতি রুশ পুলিশ তাঁকে তাঁর একটি উপন্যাসের জন্যে গ্রেপ্তার করেছেন।

নারিৎজার-এর বিরুদ্ধে রুশ পুলিসের অভিযোগ এই, তিনি তাঁর উপন্যাস 'অসমাপ্ত সঙ্গীতে'র পাণ্ডুলিপি পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'অসমাপ্ত সঙ্গীতের' পাণ্ডুলিপি পাঠাবার জন্যে নারিৎজার অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। প্রথমে এক ফরাসী ভ্রমণকারীর সঙ্গে পাণ্ডুলিপি পাঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, পরে আর-এক বিদেশীর সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীতে পাঠিয়ে দেন। পাশ্চাত্য দেশে পাণ্ডুলিপিটি পৌঁছেছে এই সংবাদ পাবার পর লেখক মূল পাণ্ডুলিপির একটি প্রতিলিপি ক্রুশ্চভের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, হয় রাশিয়ায় তাঁর এই উপন্যাস প্রকাশ করতে দেওয়া হোক, না হয় তাঁকে সপরিবারে দেশ ত্যাগ করতে আজ্ঞা করা হোক। বলা বাহুল্য, পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

উপন্যাসটি বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এম নারিসোভ এই ছদ্মনাম নিয়েছেন।

আশা করা যায় অচিরে 'অসমাপ্ত সংগীত' পাশ্চাত্ত্য জগতে একটি বিতর্কের ঝড় তুলবে।

ভাষাতত্ত্ব

Nasal and Nasalization in Bengali. মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত, পনের টাকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম জোনসের যখন বিশেষভাবে নজর পড়ে, তখন থেকেই ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনে আধুনিক পর্বের সূত্রপাত হয়েছে বলা চলে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম হয় ইউরোপে। সংস্কৃতির সহায়ে গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মানিক, স্লাভ ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও তুলনাভিত্তিক গবেষণা তখন থেকে প্রসার লাভ করে। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা সম্বন্ধে বীম্‌স্‌ সাহেব উনিশ শতকের [illegible] দশকে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন। তারপর এ বিষয়ে আরো অনেকে [illegible] আলোচনা করে গেছেন। বাংলা-[illegible] উৎস-সন্ধান ও পরিণতি বিশ্লেষণের [illegible] অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুবিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয় উনিশ [illegible] একুশ খ্রীষ্টাব্দে। অধ্যাপক হাই [illegible] ইংরেজী আলোচনা [illegible] গবেষণার সুদীর্ঘ [illegible] উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লণ্ডন [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [illegible] এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের উৎসাহে, প্রেরণায় [illegible] বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব [illegible] এই বর্ণনাত্মক গবেষণা [illegible] বাংলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাজে বইখানি [illegible] সঙ্গে গৃহীত হবে। ছাপা, বাঁধাই [illegible]।

রবীন্দ্রস্মৃতি

রবিচ্ছবি। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। [illegible], ২৫-বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী [illegible], কলিকাতা-২৫। ছয় টাকা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত [illegible] গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র [illegible] 'রবিচ্ছবি' বৈশিষ্ট্য দাবি করতে [illegible]। গ্রন্থটি একটু আলাদা ধরনের। [illegible]নাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার [illegible] লেখকের হয়েছিল, ফলস্বরূপ ব্যক্তি [illegible] রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক [illegible] ও সাধারণের নিকট অনা-[illegible] ঘটনা জানবার সুযোগ লেখকের [illegible]। 'রবিচ্ছবি' তার সুন্দর প্রকাশ। [illegible] অভিজ্ঞতা সাহিত্যে কিরূপে [illegible] হয়, অন্তর্ভুক্ত 'মা নিষাদ'

পর্বে লেখক তার চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিপ্রদাসের জমিতে মধুসূদনের সাহেব বন্ধুদের পাখি হত্যা নিয়ে আলোচনা আছে, সত্যেন্দ্র জানি, এই ঘটনার উৎস সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গুপ্তই প্রথম রহস্য উন্মোচন করলেন। এই রকম আরো অনেক। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক গোপন তথ্য এই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো। বইটি আরো সুখপাঠ্য হয়েছে লেখকের সরল লাবণ্যযুক্ত ভাষার গুণে। এই জাতীয় রচনায় সচরাচর যে 'প্রিটেনশন' চোখে পড়ে, রবিচ্ছবিতে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুমুদ্রিত ও শোভন এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

৪৩৮।৬১

বাংলার আলপনা

আলিম্পন। দুর্গা মুখোপাধ্যায়। দশ টাকা।

পুষ্পপট। দুর্গা মুখোপাধ্যায়। দশ টাকা।

প্রকাশক : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ২২ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হ'তে হয়, এবং আদ্যন্ত পড়া শেষ ক'রে শ্রদ্ধান্বিত হ'তে হয় লেখিকা ও প্রকাশক উভয়ের প্রতি, কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করার সুযোগ সমালোচকের ভাগ্যে কচিৎ ঘটে, বিশেষ ক'রে এই বাংলা দেশে। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থ দু'টি আমাদের সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রথমটি বাংলার সংস্কৃতিক জীবনের চিরাচরিত বিষয় (শুধু বাংলার কেন, ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেরও) 'আলপনা' প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি গৃহসজ্জা ও গৃহসজ্জার অন্যতম উপকরণ 'ফুল' প্রসঙ্গে রচিত। শুধুমাত্র প্রাকরণিক ও আপাত-কৌতূহলে রচিত হ'লে অবশ্য উচ্ছ্বসিত হবার কোনো

কারণ ছিল না, তা হ'তে হয় বিশেষ ক'রে এই জন্য যে, উভয় গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ-রচনার পিছনে যে শ্রম ও নিষ্ঠা ব্যয় করেছেন তা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রেও গ্রন্থ দু'টি স্মরণযোগ্য।

'আলপনা' বিষয়ে নতুন পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যুগ-যুগান্ত ধ'রে বাঙালী তার সংস্কৃতি ও মননশীলতার অপূর্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে আলপনার মাধ্যমে। পাড়াগাঁর ব্রত পার্বণ থেকে শুরু ক'রে যে-কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানই অসম্পূর্ণ থাকে আলপনার অভাবে। এক এক পরিবেশে এর এক এক রূপ, আনুষ্ঠানিক ভিন্নতায় তার তাৎপর্যের ভিন্নতা ধরা পড়ে। 'আলিম্পন' গ্রন্থে লেখিকা আলপনার উৎস ও বিকাশ প্রসঙ্গে সুন্দর ও প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন। অসংখ্য রকমের আলপনার অঙ্কন পদ্ধতি ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আলপনার বিষয়ও সংযুক্ত। বাংলা ও ভারতের একশো আটটি আলপনার সুমুদ্রিত 'প্লেট' অত্যন্ত মূল্যবান।

দ্বিতীয় গ্রন্থে গৃহসজ্জার উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যের প্রসারে ফল ও ফুলের বিভিন্ন ব্যবহার আলোচিত। সেই সঙ্গে গৃহ, ঋতু ও পরিবেশের পরিবর্তনে ফুলদানীর ব্যবহার সম্পর্কেও লেখিকার আলোচনা ব্যাপক ও মনোজ্ঞ। প্রাঞ্জলতার প্রয়োজনে অসংখ্য দুর্মূল্য 'প্লেট' ও ছবি সংযুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থ দু'টির জন্য লেখিকা রুচিবান পাঠকের ধন্যবাদ অর্জন করবেন। এর প্রচার আমাদের কাম্য।

৬০৬।৬১, ৬০৭।৬১

কবিতা

তুষার থেকে সাগরে—শ্যামসুন্দরবিহারী সরকার। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা-১। দাম—দু' টাকা।

পঁয়ত্রিশটি কবিতার সংকলন। সুখ-দুঃখময় জীবনের রেখাচিত্র কবিতাগুলির রস গাঢ়তর করেছে। অবশ্য শ্রীসরকার প্রযুক্তি প্রয়োগে প্রাচীনপন্থী। কিন্তু মানব-হৃদয়ের যে জীবন-জিজ্ঞাসা চিরন্তন তা কবিতাগুলির দেহ নির্মাণে সাহায্য করেছে। তাই 'বাসনার ফাঁদে' আবদ্ধ হয়েও তিনি লিখেছেন—

তবুও উঠিছে গানে দীর্ঘ দিবানিশি,
মানব হৃদয়ে এ যে প্রাণের বন্ধন।

'সাগর বেলায়' গদ্য কবিতা, ও রবীন্দ্রিক। শ্রীসরকার পদ্য-ছন্দে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; কিন্তু গদ্য-কবিতায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

৬৬৩।৬১

পত্রলেখা—কামাখ্যাশঙ্কর গুহ। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস, পোস্ট বক্স ২৫৩৯ কলিকাতা-১। দাম—টা ২·৭৫।

প্রবীণ কবির কাব্যগ্রন্থটিতে অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বোধের সঙ্গে আদর্শ আবেগের যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রেম এবং প্রকৃতি কবিকে যে প্রেরণা দান করেছে, তা যেমন ছন্দে সংহত, তেমনি বাগ্‌দীপ্ত। অবশ্য শ্রীগুহ রবীন্দ্র ভাবধারায় আপন চিন্তাকে আলোকিত করেছেন। সেই আলোকেই তিনি লিখেছেন, 'না জন্মানো আমি'তে মানবিক আদি চেতনার কথা। প্রাসাদভর্তৃকা, ব্যথিতা, পাষাণী অহল্যা, কামদেবের কল্পনা, স্যাফোর কল্পনা প্রভৃতি কবিতা ভালোই লাগে।

৬৬১।৬১

সোনালী মেয়ে—অজিত ভট্টাচার্য। ফ্রেণ্ডস বুক ক্লাব; ১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য—দেড় টাকা।

পঁয়ত্রিশটি কবিতার সংকলন। লেখক এখনো কবিতার অবয়ব গঠনের নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে পারেননি। জীবন-জিজ্ঞাসাই শ্রীভট্টাচার্যের কবিতা লেখার মূল কারণ। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসাকে যদি কাব্যিক উপাদানে মূর্ত করে তোলা না হয়, তাহলে সাধারণের সঙ্গে কোনো পার্থক্য থাকে না। আশা করি, শ্রীভট্টাচার্য শুধু পুস্তক প্রকাশের দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজের প্রকাশ-শক্তিকে সর্বাগ্রে সংহত ও সুদৃঢ় করবেন। বলা বাহুল্য, একালের তথাকথিত অনেক কবির ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

১৫০।৬১

ছোট গল্প

রূপদান—রাজ সিংহ। পরিবেশক: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। কলিকাতা-১২। মূল্য ২·০০ টাকা।

বিভিন্ন স্থান-পরিবেশ ও মানুষকে কেন্দ্র করে এক একটি মানবিক মুহূর্তকে লেখক বিভিন্ন গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন। লেখক শুধু যা দেখেছেন বা জেনেছেন,—তাকেই রূপদান করেননি, এক একটি মুহূর্তের মধ্যে ভবিষ্যতের যে-বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাকেও তিনি চিন্তাশীলতার দ্বারা উদ্ধার করেছেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন তা ঠিক নয়। 'দুই প্রপাতে' যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তুয়ীতে হয়তো তা ব্যর্থ হয়েছে। তবে লেখকের নিরলস আয়াস থাকলে ভবিষ্যৎ-এ তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেন। প্রচ্ছদপট কিছুটা সুরুচি আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়।

২৬০।৬১

কিশোর-সাহিত্য

নাট্যে প্রণাম। স্বপনবুড়ো। তিন টাকা। **টাকা গাছ**। লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী। এক টাকা সত্তর নঃ পঃ। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা।

শিশুদের উপযোগী সাহিত্য। ১ম গ্রন্থের লেখক স্বপনবুড়ো এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী শিশু সাহিত্যের পড়ুয়াদের মাঝে বিশেষ পরিচিত। সুতরাং, শিশুদের নিকট এই গ্রন্থ দু'টির প্রকাশ এক খবর-বিশেষ।

'নাট্যে প্রণাম' কয়েকটি ক্ষুদ্রকায় নাটকের সংকলন; অভিনয়ে তেমন জ'মে ওঠার সুযোগ কম, কিন্তু পড়তে ভালো লাগে। বাঙালী মনীষী মহাপুরুষ, অর্থাৎ কোনো-না-কোনোভাবে যাঁরা বাঙালীর মনোরাজ্যে অধিকার লাভ করেছেন, সেই-রকম কয়েকজনের জীবনের কোনো-কোনো ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকগুলি রচিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, প্রফুল্লচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও ক্ষুদিরাম এইসব নাটকের প্রধান চরিত্র। শিশুদের ভালো লাগবে।

'টাকা গাছ' একটি বড় গল্প, ছোট উপন্যাসও বলা যায়। কাহিনীর চরিত্রেরা সাধারণ স্তরের মানুষ, প্রায়ই পয়সা [illegible] ও দরিদ্র। প্রধান চরিত্র কানু, [illegible] করে। এই কিশোর মনের [illegible] বিকাশ কাহিনীর মুখ্য পটভূমি। রচনার গুণে বইটি আগাগোড়া [illegible] পরিবেশ ও চরিত্রগুলিও অতিশয় [illegible]। দু'টি বইয়েরই ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

১৫,১৬।৬২

উপন্যাস

দিনের পর দিন—রামগোপাল [illegible]। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম: ২৲ টাকা।

প্রায় সমবয়সী দুই বিপত্নীক বড় মিস্ত্রী ও পাগলু ঠাকুরপ্রসাদ দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করে। ঠাকুরপ্রসাদের সেই ছোট্ট মেয়ে বিলাসী এখন অনেক বড় হয়েছে। বড় মিস্ত্রীর সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় সেই মেয়েকে দেখলে। সহায় সম্বলহীন বাদলাকে আশ্রয় দেয় বড় মিস্ত্রী।

বাদলাই বিলাসীর সর্বনাশ করে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বড়মিস্ত্রীর স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠে বিলাসীর জন্য। সে-ই তাকে স্থান দেয়। উপন্যাসটির কোনো চরিত্রই পূর্ণতা লাভ করেনি। তাছাড়া এ-কালের তথাকথিত উপন্যাসগুলিতে যে বিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়, এ-উপন্যাসেও যে তা করা হয়েছে উপযুক্ত গল্পেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫৭০।৬১

কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। ভালোবাসা ও বিবাহ তাঁর নতুন গ্রন্থ।

নামকরণ থেকেই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠক কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। প্রণয় ও পরিণয়, এই দুটি প্রায় অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় মানুষের জীবনের একটি বৃহৎ অংশ বিবর্তিত। বলা বাহুল্য, এই দুটি বিষয়ই প্রাচীন কাল থেকে বিবিধ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমানে একটি আর্টের পর্যায়ে উন্নীত। অতীত ও বর্তমানের পরিবেশে দুটি বিষয় পর্যালোচনা করলেই প্রাগুক্তির তাৎপর্য ধরা পড়বে। বহু-পত্নীত্বের আমলে নারী ছিল পুরুষের ভোগবিলাসের উপকরণবিশেষ, পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল শুধু প্রজননের, পুত্রার্থে পুরুষ তখন পত্নী গ্রহণ করত। ভালোবাসা নামক কোনো বৃত্তি তখন প্রকাশ পায়নি। ক্রমে ভালোবাসা তার নিজস্ব রূপ নিয়ে অধিকার দাবি করল।

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় উল্লিখিত বিষয়টির উপর নজর রেখে প্রণয় ও পরিণয়ের মনস্তত্ত্ব এবং কার্যত তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার সাবলীল গুণ গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। সুস্থ জীবনের নির্দেশ দেবার জন্য এ-ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৬৫৫।৬১

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ—লিওনার্ড সেপিরো। অনুবাদক—জগদানন্দ বাজপাই। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯, মূল্য : ২৫ নঃ পঃ।

প্রচার জাতীয় পুস্তিকা। বিশেষ কোনো পক্ষ অবলম্বন করেই এই পুস্তিকা রচিত। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্ম কথা', 'শান্তির ভিত্তি' প্রভৃতি সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা নিরপেক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত নয়। ৬৮৬।৬১

আধুনিককালের বিপ্লব—হিউ সেটন ওয়াটসন, অনুবাদ : কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায় পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াৎ খাঁ লেন কলিকাতা-৯। দাম ২৫ নঃ পঃ।

এই পুস্তিকাটিতে শিল্প বিপ্লব, বিপ্লবাত্মক শক্তিসমূহ, বিপ্লবাত্মক আন্দোলন প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে লেখকের ঝোঁক এতো বেশি যে, পুস্তিকান্তর্গত তত্ত্বগুলি গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। ৬৮৩।৬১

পত্রিকা

দর্শক—সম্পাদক শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৫ নয়া পয়সা।

চারুকলা বিষয়ক বর্তমানের একমাত্র বাঙলা সাময়িক পত্রিকা 'দর্শক'-এর আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাখানি এদের সুনাম রক্ষা করেছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নচর্চা ও সংগ্রহশালা, শৈলী পরিচিতি, প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস, চন্দ্রকেতুর গড়, মুদ্রাতত্ত্ব লেখমালা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও আলোচনা শিল্প বিষয়ে জ্ঞানান্বেষীদের বিশেষ কাজে লাগবে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন ভাস্কর্য ও গুহাচিত্র এবং এখনকার বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা ছবিতে সংখ্যাখানি সুশোভিত। সংখ্যাখানি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

প্রাপ্তিস্বীকার

আধুনিক বাংলায় বাইবেল .....পোলের শেষ পত্রাবলী তিমথী ও তীতাস সমীপে—এ পি কালটন ও সুবোধবিকাশ দত্ত অনূদিত।

পূর্বমেঘ—বিজন চক্রবর্তী।
শালবন—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
জাহির ভৈরো—শ্রীপারাবত।
রবিতীর্থে—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।
আশ্রয়—জরাসন্ধ।
নিশিপদ্ম—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
নৈমিষারণ্য—বিকর্ণ।
রক্তের স্বাদ লোনা—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু।
পাপুই দ্বীপের কাহিনী—নবেন্দু ঘোষ।
রবি-কথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
স্বাপর থেকে কলি (একাঙ্ক নাটক)—শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র।
আলিবাবা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।
পারস্য উপন্যাস—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।
ঝড়ের জোনাকি—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রত ছড়া আলপনা—বেলা দে।
ইন্দিরাদির গল্পের ঝুলি—ইন্দিরা দেবী।
শ্যামাবাঈ—সুভাষ ঘোষ।
মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের কাহিনী—নিত্যানন্দ দত্ত।
সুর্যিঠাকুর—অলক চক্রবর্তী
রক্ত কমল—অজিত সরকার।

চন্দ্রশেখর

ভাববার কথা

বোম্বাই-এর একাধিক চিত্রপ্রযোজক বাংলা ছবি তৈরীর কাজে এগিয়ে এসেছেন। এ-সংবাদ চিত্রামোদীদের অজানা নয়। বাঙালী দর্শকরা হয়ত এতে আনন্দিতই হবেন। অনেকে আবার হয়ত এতে আত্মশ্লাঘাও বোধ করতে পারেন।

কিন্তু আমাদের চিত্রপ্রযোজকরা অর্থাৎ বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীরা বোম্বাই-এর চিত্রপ্রযোজকদের এই প্রয়াসকে শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই জানাবেন। কিন্তু শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনের সঙ্গে কিছুটা শংকা বোধ করবেন না কি?

তাঁদের অর্থাৎ বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের মুখেই অনবরত এই বিলাপ শুনতে পাই, হিন্দী ছবি নাকি বাংলা ছবিকে কোণঠাসা করে রেখেছে। একেই বাংলা ছবির ব্যবসায়িক অঞ্চল সীমাবদ্ধ। তার ওপর এই অঞ্চলে হিন্দী ছবিরই নাকি আধিপত্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দী চিত্রপ্রযোজকরা যদি বাংলা ছবি তৈরীতে আত্মনিয়োগ করেন তবে বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের সত্যিই শংকিত হবার কারণ আছে।

জানি না, বাংলা ছবির প্রযোজকরা এ-নিয়ে উদ্বেগ বোধ করছেন কিনা। বাংলা চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা কী তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে কলিকাতার মাত্র চারটি চালু স্টুডিওতে কয়টি নির্মীয়মান বাংলা ছবির কাজ চলছে তা বাংলা চিত্রশিল্পের শুভানুধ্যায়ীদের অজানা নয়।

কলকাতায় নিয়মিতভাবে ছবি তৈরী করে যাচ্ছেন এমন চিত্রপ্রযোজক সংস্থার সংখ্যা কাঙ্গুলিগ্রাহ্য। যে-সব নতুন প্রযোজক সংস্থার সাক্ষাৎ মেলে তাঁদের অধিকাংশই একটি ছবি নিবেদন করে অদৃশ্য হয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে বাংলা ছবির ভবিষ্যত নিয়ে যাঁরা দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন তাঁরাও, দুর্ভাগ্যবশত, এ-ব্যাপারে নিশ্চেষ্টই থেকে যান। যাঁরা বাংলা ছবির দুর্দিন নিরোধের জন্য সচেষ্ট হতে চান, তাঁরাও হয়ত লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় খুঁজে পান না।

দক্ষিণ ভারতে ও বোম্বাইয়ে নির্মিত হিন্দী ছবির ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সারা ভারতে প্রসারিত। সারা ভারতের দর্শকদের তুষ্ট করে এই দুই চিত্রপ্রযোজনা কেন্দ্রের প্রযোজকরা নিজেদের অঞ্চলের চিত্রশিল্পকে লক্ষ্মী করে তুলছেন। কলকাতায়ও যদি সেভাবে যদি হিন্দী ছবি তৈরী হত তবে

মুভী-টক'এর সদ্যোমুক্ত "শিউলিবাড়ি" চিত্রের একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

বাংলা চিত্রশিল্প সারা ভারতে ব্যবসায়িক সীমারেখাটি প্রসারিত করতে পারত। এ-ধরনের প্রয়াসের কথা এখানকার চলচ্চিত্র-সেবী মহলে নিয়তই আলোচিত হচ্ছে। কোন কোন চিত্রব্যবসায়ী কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরীর পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোন পরিকল্পনাই আজও পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হল না।

বাংলা ছবির কাহিনীর প্রতি দক্ষিণ ভারত ও বোম্বাই-এর চিত্রনির্মাতারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তাঁরা ভালো বাংলা গল্পের সন্ধানে সদা ব্যস্ত। তাঁরা জানেন, ভালো আখ্যানবস্তুর গুণে তাঁদের ছবি সারা ভারতের দর্শকশ্রেণীর কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে। এবং এক্ষেত্রে তাঁরা আলস্য বর্জন করে হিন্দী ছবির ব্যবসায়িক প্রসারের পথটি দিনের পর দিন প্রশস্ত করে চলেছেন।

অথচ আমাদের চিত্রপ্রযোজকরা এই সুযোগটুকু কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক। কলাকৌশলের দিক থেকে বাংলা ছবির মান দক্ষিণ ভারতের অথবা বোম্বাই-এর ছবির তুলনায় এতটা উন্নত না হলেও নিন্দনীয় নয়। অভিনয়-সম্পদের দিক থেকেও বাংলা ছবি সমৃদ্ধ। তদুপরি বাংলাদেশে ভালো গল্প মেলে। এত সব অনুকূল অবস্থার মধ্যেও বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীরা কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরীর কাজে নিরুৎসাহ। এদিকে বোম্বাই-এর চিত্রপ্রযোজকরা শুধু তাঁদের হিন্দী ছবি দিয়েই যে সারা ভারত থেকে অর্থোপার্জন করে চলেছেন তা নয়। সম্প্রতি বাংলা ছবি তৈরী করে বাংলা দেশ থেকেও অতিরিক্ত অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হয়েছেন। আর বাঙালী চিত্রপ্রযোজকরা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে তাঁদের উদ্যোগ-আয়োজন পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের এই নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরীর কাজে একাধিক চিত্রপ্রযোজক অগ্রণী হয়েছিলেন, এ সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম। তাঁদের প্রয়াস সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক কোন নতুন

জালান প্রোডাকশন্স-এর "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"র একটি দৃশ্যে রবি ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। এই ব্যাপারে বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীদের আমরা বিশেষ-ভাবে অবহিত হতে অনুরোধ করি।

রেকর্ডে "মায়ার খেলা"

"মায়ার খেলা", রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, "নাট্যের সূত্রে গানের মালা"। কবির প্রথম যৌবনের গীতি-নাট্যগুলির মধ্যে "মায়ার খেলা" (রচনা সাল : ১২৯৫) অন্যতম। "মায়ার খেলা"র সৃষ্টির প্রায় অর্ধ শতাব্দ পরে কবি এই গীতিনাট্যটির রূপান্তর সাধন করেন। "সখী-সমিতি" নামে এক মহিলা-সংস্থা "মায়ার খেলা"র রচনা-সালের শেষভাগে গীতিনাট্যটি প্রথম মঞ্চস্থ করেন। পরবর্তীকালে বহু সংস্থা কর্তৃক বহুবার "মায়ার খেলা" মঞ্চস্থ হয়েছে, আজও হচ্ছে।

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ সম্প্রতি এই গীতিনাট্যটি রেকর্ডে (৩৩⅓ ও ৭৮ আর-পি-এম'য়ে গৃহীত) পরিবেশন করেছেন। গীতিনাট্যটি পরিচালনা করেছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

"মায়ার খেলা"র বিষয়বস্তু রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগীদের অজানা নয়। এই গীতি-নাট্যের ভাবরহস্য : শুধু সুখের জন্য প্রেম চাইতে গেলে প্রেমের স্পর্শ কোনদিনই মেলে না। সুখও দূরে সরে যায়। গীতি-নাট্যের বক্তব্য মায়াকুমারীদের শেষের গানটির বেদনাময় বিভাস রাগিণীর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে : "এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।"

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রেকর্ডে "মায়ার খেলা"র প্রাথমিক রচনা অনেকাংশে অনুসৃত। ফলে, নতুন রচনায় যে গানগুলি বর্জিত রেকর্ডে সেগুলি শোনবার সুযোগ মেলে। অমর, অশোক ও কুমার এই তিন প্রত্যাখ্যাত ব্যর্থ প্রেমিকের পরস্পর ভাব-বিনিময়ের গানগুলি (মায়ার খেলার রূপান্তরে যা বর্জিত) রেকর্ডে গৃহীত।

"মায়ার খেলা"র শান্তা ও প্রমদা দুই বিপরীত প্রকৃতির নারী। শান্তা বলে : "আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো।" প্রমদার কথা এই : "পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।" রেকর্ডে এই দুই নারীর গানের ভূমিকায় কণ্ঠদান করেছেন যথাক্রমে মঞ্জু গুপ্ত ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সংগীতে এঁরা দুজনেই যশস্বিনী শিল্পী। দরদ-ভরা কণ্ঠে এঁরা গানগুলি গেয়েছেন। গীতিনাট্যের গান যে শুধু গানই নয়, একই সঙ্গে অভিনয়—এই সত্যটি শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠসংগীতে সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্র-সংগীতের সুরবিন্যাসের বিশুদ্ধতাই শুধু নয়, ওর যদি কোন নিজস্ব "ঘরানা" থেকে থাকে, তবে তার সঠিক পরিচয়টি শ্রোতারা পাবেন শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে।

সুখের ছলনায় ভ্রান্ত, শান্তার হৃদয়প্রার্থী অমর প্রমদার প্রেমের দুয়ারে অতিথি হয়ে এসেছে। অমরের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। আধুনিক বাংলা গানের এই প্রখ্যাত শিল্পী প্রমাণ করলেন, রবীন্দ্র-সংগীতেও তিনি সমান পারদর্শী। শুধু কণ্ঠমাধুর্যেই নয়, রবীন্দ্র-সংগীতের "ঢঙ" ও গায়কীর আবেদনেও তাঁর গান অনবদ্য। রবীন্দ্র-সংগীতের আসরে শ্রীমিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। গীতি-নাট্যের অপর দুই ব্যর্থ প্রণয়ী, অশোক ও কুমারের গানগুলি গেয়েছেন যথাক্রমে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পীদের অন্যতম। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীতে সুরের বিশুদ্ধ ব্যাকরণটি খুঁজে পাওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের নিখুঁত উচ্চা-

রঙমহল-এর বর্তমান আকর্ষণ "আদর্শ হিন্দু হোটেল" নাটকের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর্ব দরদ দিয়ে তিনি এই গীতিনাট্যের গানগুলি গেয়েছেন।

রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পীদের আসরে শৈলেন মুখোপাধ্যায় নবাগন্তুক। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই তরুণশিল্পী সংগীত-রসিকদের কাছে নিজকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। তাঁর কণ্ঠ মধুর, তাঁর গানের 'মেজাজ'টি মর্মী। গীতিনাট্যের গানগুলিতে তিনি তাঁর ওই স্বভাবসিদ্ধ গুণের পরিচয় দিয়েছেন।

মায়াকুমারীদের গানগুলি বনানী ঘোষ, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, আলপনা রায়, সুমিত্রা সেন, কৃষ্ণা সেন ও শ্রীপর্ণা ঘোষের কণ্ঠে সুখশ্রাব্য।

সবশেষে বলি, লং-প্লেয়িং রেকর্ডে এই গীতিনাট্যের কয়েকটি গান শ্রোতাদের অভিভূত করে রাখে। গানগুলি হল: "সুখে আছি, সুখে আছি" (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), "আমার পরাণ যাহা চায়" (রাজু গুপ্ত), "আমি কী যেন করেছি পান" (শ্যামল মিত্র), "জেনে শুনে বিষ করেছি পান" (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়) ও "আপন মন নিয়ে কেঁদে মরি" (শৈলেন মুখোপাধ্যায়)। গানগুলি বারবার শোনবার মত। লং-প্লেয়িং রেকর্ডটির শব্দধারণ সুষ্ঠু।

চিত্রালোচনা

এ-সপ্তাহে মুক্তি লাভ করেছে দুটি ছবি। একটি বাংলা, অপরটি হিন্দী। বাংলা ছবিটি হল: শিউলিবাড়ি, হিন্দী ছবিটির নাম অপলক চপলক।

নবগঠিত চিত্রপ্রযোজক-সংস্থা মুভীটেক-এর প্রথম চিত্রোপহার শিউলিবাড়ির আখ্যানবস্তু সুবোধ ঘোষের জনপ্রিয় উপন্যাস "শিউলিলতা" অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। জন্মসূত্রে বিড়ম্বিত এক অসাধারণ বাঙালী চরিত্র এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। দয়াহীন পৃথিবীতে আপন পৌরুষকে শুধু আশ্রয় করে কেমনভাবে সে একদিন অসাধ্য সাধন করে এবং কর্মবীর ও পথিকৃৎ রূপে প্রবাসী বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করে, তা কাহিনীর এক বিস্ময়কর উপাখ্যান। তার দয়িতা ও দুহিতাকে ঘিরে রূপ নিয়েছে আনন্দ ও বেদনার এক মধুর উপকাহিনী।

এক তরুণ চিত্রপরিচালকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই ছবির মাধ্যমে। তাঁর নাম পীযূষ বসু। তপন সিংহের সুযোগ্য প্রধান সহকারীরূপে তিনি এতকাল বাংলা চিত্রজগতে পরিচিত ছিলেন। ইতিপূর্বে আচার্য জগদীশ বসুর জীবনী অবলম্বনে একটি অল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণিক চিত্রের কৃতী পরিচালকরূপে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

শিউলিবাড়ি সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই, এর সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন ছবির নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, চন্দন রায়, গীতালি রায়, মণি শ্রীমানী, মিহির ভট্টাচার্য ও শিশুশিল্পী অমল চট্টোপাধ্যায় ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তপন সিংহ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। আলোকচিত্রগ্রহণের কাজ সম্পাদন করেছেন দীনেন গুপ্ত।

মুকুল পিকচার্স-এর অপলক চপলক একটি নৃত্যগীতসংবলিত প্রণয়মধুর ছবি। রূপ কে শোরি পরিচালিত এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন জোহর, কুমকুম, রবীন্দ্র কাপুর, সজ্জন, তবস্‌সাম ও জীবন। চিত্রগুপ্ত ছবির সুরকার।

• • •

সত্যজিৎ রায়ের আগামী রঙীন ছবি (ইস্টম্যান কালার) কাঞ্চনজঙ্ঘা বর্তমানে সম্পাদকের টেবিলে রয়েছে। এপ্রিলের শেষ

আর-ডি-বি'র 'অতল জলের আহ্বান' ছবিতে তন্দ্রা বর্মণ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মগ্লানি ও আত্মশুদ্ধি

সুসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রর 'ভুবন ডাক্তার' কাহিনী ছায়াছবিতে 'শাস্তি' নামে (চিত্রশোভনা প্রযোজিত) রূপান্তরিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ছবিতে 'ভুবন ডাক্তার'-এর নামই শুধু নয়, চিত্রনাট্যের প্রয়োজন সাপেক্ষে কাহিনীরও আংশিক পরিবর্তন ঘটেছে।

এক আদর্শবাদী তরুণ চিকিৎসক কাহিনীর প্রধান-পুরুষ। নাম তার ভুবন। দুর্দিনের দুঃসহ যন্ত্রণা সইতে পারেনি বলে তার সাময়িক পদস্খলন ঘটে। এবং প্রিয়জন ও পরিচিত পরিবেশের কাছ থেকে গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে তাকে ক্ষণিক ভুলের চরম মূল্য দিতে হয়।

অপরাধের শাস্তি সে নীরবে গ্রহণ করল তার সমাজের কাছ থেকে, এবং সেই সঙ্গে কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অকিঞ্চন প্রত্যয়ে নিজেকে সে দিনে দিনে শুদ্ধ করে তুলল। তার ওপর বিশ্বাস যারা হারিয়েছে, তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার সাধনায় নিজেকে সে নিয়োজিত করল। সিদ্ধিলাভ তার কীভাবে ঘটল তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর বিস্তার।

দুঃখের দিনে দুটি নারীহৃদয়ের স্নেহ ও অনুকম্পা তার জীবনে নিয়তির প্রসন্ন আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। এক বিধবা জননী ও তার কন্যাই এই দুই নারী। বিধবার ভাগ্যবিড়ম্বিতা কন্যাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে ভুবন নিজে কী করে বাঁচল অর্থাৎ কেমন করে অন্তরের অপরাধ-বোধ ও সকল গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেল, তা নিয়েই চিত্রকাহিনীর পরিণতি। গ্রাম্য তরুণী ভুবন ডাক্তারের জীবনে সহ-ধর্মিণী হয়ে এল কি? হয়ত তাই। চিত্র-নাট্যের শেষে এ-ধরনের একটি আভাস রয়েছে।

ছবিতে মূল কাহিনীর উদ্ঘাটন ফ্ল্যাশ-ব্যাকে। চিত্রনাট্যে (শাকুচ রচিত) ভুবন ডাক্তারের উপাখ্যান বাহুল্যবর্জনের ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত।

নবাগত চিত্রপরিচালক দয়াভাই কাহিনী বিন্যাসের কোন কোন মুহূর্তে রসবোধ এবং সেই সঙ্গে পরিমিতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম্য পরিবেশ রচনায় তাঁর শিল্প-নিষ্ঠা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাম্য গার্হস্থ্যজীবনের রূপটি পরিবেশন করার কালে পরিচালক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবকে অনুসরণ করেছেন। ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও পরিচালকের শিল্পবোধ লক্ষণীয়।

প্রয়োগকর্মের এত সব গুণ সত্ত্বেও ছবিটি সামগ্রিকভাবে দর্শকের মন ভরে তোলে না। তার কারণ, ছবিতে এমন একটি ভাববস্তু অনুপস্থিত যার অভাবে আর সব গুণই বিফল হয়ে যায়। এই বস্তুটি হল: অন্তঃ-প্রবাহী সংবেদন। এই সংবেদনের রসে যদি প্রয়োগ-ধারার কারুকৃতি আপ্লুত হয়ে না ওঠে, তবে ছবি উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। এই কারণেই ছবিটির আবেদন অনিবার্য নয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রধান চরিত্রটির অর্থাৎ ভুবন ডাক্তারের রূপসজ্জায় অবতরণ করেছেন। বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে তিনি চরিত্রটির যন্ত্রণা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মর্ম-পরিচয়টি লাভ করেছেন এবং স্বীয় অভিনয়ে তিনি তা প্রতিফলিত করে তুলেছেন। এই চরিত্রাঙ্কনে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের

স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক গ্রাম্য তরুণীর চরিত্রে সন্ধ্যা রায় অল্প অবকাশে দর্শকমনে রেখাপাত করেন। তাঁর অভিনয় স্বচ্ছন্দ। তাঁর বিধবা জননীর ভূমিকায় অপর্ণা দেবীর অভিনয় সংবেদনশীল।

নায়কের জননীর চরিত্রে পদ্মা দেবীর অভিনয় সুন্দর। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন সবিতাব্রত দত্ত, কালী সরকার, মালবিকা গুপ্ত, 'তুলসী চক্রবর্তী', মণি শ্রীমাণী, সন্তোষ সিংহ ও মিহির ভট্টাচার্য।

সঙ্গীত-পরিচালক আলী আকবর ছবির আবহ-সুর রচনায় নতুন করে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তবে ছবিতে আবহ-সঙ্গীতের ব্যবহার আরও পরিমিত হতে পারত। সাগর সেনের গাওয়া 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি সুগীত ও সুপ্রযুক্ত।

সুধীশ ঘটক ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে আলো-আঁধারির সুষ্ঠু বিন্যাস ও দৃশ্যগঠনে কল্পনাশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর ক্যামেরার গুণে ছবির শিল্পসৌন্দর্য অনেকখানি বেড়েছে।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে উন্নতির অবকাশ ছিল।

নাট্যাভিনয়

দক্ষিণ কলিকাতার থিয়েটার সেণ্টারে মঞ্চস্থ 'মুখোশ'-এর 'অঘটন আজো ঘটে'-র শততম রজনী পূর্ণ হয়েছে গত ১৭ই মার্চ। দিলীপকুমার রায়ের ভক্তিরসাত্মক রচনার ভিত্তিতে তৈরী এই নাটকের অভিনয় যে জনচিত্ত জয় করেছে, শততম রজনী পূর্তিই তার প্রমাণ। নাটকের শততম নাট্যাভিনয়ে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নাটকটির সাফল্য উপলক্ষে থিয়েটার সেণ্টার একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করছেন। উৎসবটি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে 'এক পেয়ালা কফি', 'আর হবে না দেরী', 'অলীকবাবু', 'রজনীগন্ধা', 'রুপোলী চাঁদ' ও 'অঘটন আজো ঘটে' মঞ্চস্থ হবে।

* * *

শৌভনিক সংস্থা গত ৮ই মার্চ থেকে মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গালয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকটি অভিনয় করছেন। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত বছর শৌভনিক দল পাঁচটি রবীন্দ্র-নাট্য মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাটকগুলি হল : 'রাজা ও রাণী', 'রাজা', 'মুক্তির উপায়', 'বাঁশরী' ও 'গোরা'।

* * *

দক্ষিণ কলিকাতায় শিল্পমেলায় ফিল্ড পাবলিসিটি প্যাভিলিয়নে দমদম-এর "ময়ূখ" নাট্য সম্প্রদায় হিন্দী নাটক "হামারা গাঁও" অভিনয় করেন।

* * *

গত ১৯শে মার্চ স্টার রঙ্গমঞ্চে বিড়লা ক্লাবের সভ্যরা আর জি আনন্দ রচিত "হাম হিন্দুস্তানী হ্যায়" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

* * *

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের বারাসতস্থিত বাসভবন "শিশির কুঞ্জে" গত ১৮ই মার্চ শিল্পশ্রী সংস্থা "ক্ষত্রবীর" যাত্রাভিনয় পরিবেশন করেন।
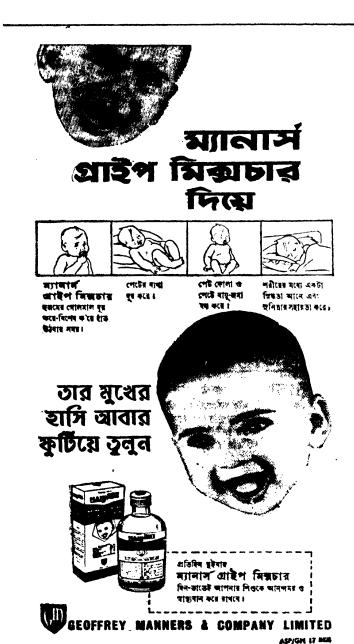
রনেসাঁস ফিল্মস-এর "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" চিত্রে নবাগতা শম্পা ও শ্রীমান স্বপন

সংগীত অনুষ্ঠান

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি উদয়ন সংস্থার পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে (সি আই টি রোড ও শুঁড়া ইস্ট রোডের সংযোগস্থলে)।

চারদিনব্যাপী এই অধিবেশনের প্রথম দিনে (১৩ই মার্চ) "রবীন্দ্র ও বঙ্গ সংস্কৃতি দিবস" পালিত হয়। অনুষ্ঠানে চিন্তামণি ভট্টাচার্যের মঙ্গলাচরণ পাঠের পর রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রতা ঘোষাল। কীর্তন, বাউল ও অতুলপ্রসাদের গান গাইলেন যথাক্রমে পারুল বিশ্বাস, লক্ষণ দাস ও ভূপেন চক্রবর্তী। সংগীতানুষ্ঠানের পর উদয়ন সংগীত বিদ্যালয় ও ছন্দগীতিকার প্রযোজনায় "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনীত হয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিশুনাট্য সংসদ প্রযোজিত শিশুনাট্যাভিনয় "স্বপন"। এর পর উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসে। গান করেন তারাপদ চক্রবর্তী, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সালামত আলী ও নাজাকত আলী। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন রবিশঙ্কর এবং শিশিরকণা ধর চৌধুরী, নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন শিপ্রা ভট্টাচার্য ও শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় দিনের আধুনিক গানের আসরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মুকেশ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও পান্নালাল ভট্টাচার্য। চিন্তাপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না" গানটি সকলকে আনন্দ দেয়। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন জহর রায় ও মিন্টু দাসগুপ্ত।

চতুর্থ দিনে শিল্পী মৈত্রী সংসদ মিহির ভট্টাচার্যের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের "চরিত্র-হীন" নাট্যাভিনয় পরিবেশন করেন।

গত ১০ই মার্চ কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্র কলা-কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উপনিষদের গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন শৈলেন দাস। কলা-কেন্দ্রের সভা-সভ্যারা পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান। সমবেত ও একক সংগীতের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, পূর্ণিমা চৌধুরী, বাদল চক্রবর্তী, প্রশান্ত গুপ্ত, প্রশান্ত নন্দী, অর্ঘ্য সেন, শৈলেন দাস ও অরবিন্দ চক্রবর্তী। আবৃত্তিতে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য ও স্বদেশ ঘোষ দস্তিদার এবং যন্ত্রসংগীতে সলিল মিত্র, সমীর নাগ, মনোরঞ্জন সিংহ ও বিশ্বনাথ দাস অংশ গ্রহণ করেন।

এর পরে দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রের একাধিক একক সংগীত ও তাঁদের দ্বৈত কণ্ঠে "নৃত্যের তালে তালে" গানটি শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। পরিশেষে তারাপদ চক্রবর্তী রাগপ্রধান গান পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠসংগীতে মানস চক্রবর্তী ও রজত মৈত্র এবং তবলায় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সহযোগিতা করেন।

চিঠিপত্র

চিত্রপরিচালকের বক্তব্য

মহাশয়,

গত সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় জনৈক পত্রদাতা 'কাঁচের স্বর্গ' ছবির একটি ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ত্রুটিটি আর কিছুই নয়, যে-অপরাধে শেষ পর্যন্ত ছবির নায়ক সঞ্জয় চৌধুরীর কারা-দণ্ড হল, পত্রদাতার মতে তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯ ধারার আওতায় পড়ে না—যা ছবিতে দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পত্রদাতা আরও প্রশ্ন করেছেন যে, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই ধরণের দোষ এড়াবার জন্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবার সময় কি আজ আসেনি?

অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন। এবং উত্তর দেবার সময় নিজেদের ত্রুটি (যদি আদৌ তা ঘটে থাকে) ঢাকবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করেই বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শই নেওয়া হয়েছিল। এ-ছবির আইন-উপদেষ্টা কলকাতার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। চিত্রনির্মাতা হিসেবে আমাদের আইন সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান নেই যে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর সন্দেহ করবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করব। ত্রুটি যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে, তা-হলে এটাই। ইতি—

তরুণ মজুমদার
যাত্রিক-এর পক্ষে
কলিকাতা-৩৩

একলব্য

কলকাতার হকি মরসুম এখন মাঝপথে। লীগের আধাআধিরও বেশী খেলা শেষ হয়ে গেছে।

মত ১৫ দিন ধরে লীগের খেলা চলেছে ঢিমে তালে। বড় বড় ক্লাবকে ক্রীড়াঙ্গণে দেখা যায়নি। কারণ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলায় যোগ দেবার জন্য বড় বড় ক্লাবের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া বাঙ্গলা দল গিয়েছিল ভূপালে। জাতীয় হকির প্রথম খেলাতেই দিল্লির কাছে ১—০ গোলে হেরে বাঙ্গলা দল ফিরে এসেছে। কলকাতার হকি লীগ খেলায়ও আবার জমে উঠেছে।

হকি মরসুম মাঝপথে এসে পৌঁছলেও ক্রিকেট কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এই সপ্তাহে সি এ বি নক আউট ফাইন্যালের উপর যবনিকা পড়েছে। কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা এখনো সম্ভব হয়নি।

নক আউটে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব বিজয়ী হয়ে তৃতীয়বার মেহরা চ্যালেঞ্জ কাপ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী হিসাবে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে একভাবে স্পোর্টিং ইউনিয়ন মেহরা কাপ ঘরে তোলে।

তবে এবার মাঠের খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গতবারের বিজয়ী মোহনবাগান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন তিন দিনের মধ্যেও প্রথম ইনিংস শেষ করতে না পারায় সি এ বি আইনের বিধান অনুযায়ী টস করে জয়পরাজয়ের মীমাংসা করা হয়েছে। টসে বিজয়ী হয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

কিছুদিন আগে সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক একটি খেলা এবং নক আউট ফাইন্যালে মোহনবাগান ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলার মধ্যে বেশ একটি মিল দেখছি। লীগের খেলায় এলবার্ট স্পোর্টিংয়ের প্রথম ইনিংসের ৪১৭ রানের উত্তরে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মাতপের মধ্যে কালীঘাট ক্লাব ৯ উইকেটে ৪২১ রান করে নাটকীয়ভাবে এক উইকেটে বিজয়ী হবে এটা ধারণার অতীত ছিল।

আবার নক আউট ফাইন্যালে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ৩৬৪ রানের উত্তরে মোহনবাগান ৬৪ রান তুলতে ৪টি উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করবে এটাও কেউ আশা করতে পারেনি। দেখতে পাচ্ছি বিপর্যয়ের মুখে দেশের মাটিতে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে আমাদের খেলোয়াড়েরা পেছপাও নয়। টেস্ট খেলাতেও বহুবার এর পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু বিদেশে আমাদের খেলোয়াড়দের এই গুণের একান্ত অভাব। টেস্ট খেলার সঙ্গে অবশ্য আমি সি এ বি'র খেলার তুলনা করছি না। তবে উপমা হিসাবেই বলছি, দেশের মাটিতে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে আমাদের খেলোয়াড়রা যে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, বিদেশে সেটা পারেন না। ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফর বা এবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর তার প্রমাণ।

যাক সে কথা। সি এ বি নক আউট ফাইন্যালে মোহনবাগানের পক্ষে পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে প্রধানত দুজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বে। এই দুজন খেলোয়াড় হচ্ছেন এস এস মিত্র ও চুনী গোস্বামী। চুনী গোস্বামী শেষ পর্যন্ত ৭৪ রান করেও নট আউট থাকেন।

ফুটবলের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় হিসাবেই চুনীর পরিচিতি। কিন্তু ক্রিকেটেও যে তার প্রতিভা বর্তমান সেটা এই বছরেই ভালভাবে প্রমাণিত হল। শুধু ব্যাটিং নয়, বোলিংয়েও চুনী ১৮ রানে প্রতিপক্ষের ৫টি উইকেট নিয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। ফিল্ডিংয়েও ভাল।

যার মধ্যে প্রতিভা আছে চর্চার ফলে একদিন তার স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। এই কলকাতার মাঠে একাধিক খেলোয়াড় দেখেছি, ফুটবল এবং ক্রিকেটে যাদের সমান কৃতিত্ব। আমি সাধারণ কৃতিত্বের কথা বলছি না। বিশেষ কৃতিত্বের উপরই আমি জোর দিতে চাই। টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় ফুটবল ছেড়ে ক্রিকেটে জোর দেবার ফলে পরবর্তী জীবনে ক্রিকেটার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু ফুটবলেও তাঁর দক্ষতা ছিল সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। নির্মল চ্যাটার্জির কথাও বলা যেতে পারে। ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলায় সুনাম অর্জন নির্মল চ্যাটার্জির খেলোয়াড়-জীবনের দ্বৈত কীর্তি। ফুটবল এবং ক্রিকেট, দুই খেলাতেই নির্মল চ্যাটার্জি ছিলেন নিপুণ শিল্পী। এই রকম আরও বহু খেলোয়াড়ের উপমা দেওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রেও উপমার অভাব নেই। সবচেয়ে প্রথমে যার নাম মনে আসে তিনি হচ্ছেন ডেনিস কম্পটন। কম্পটনের ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই খেলাই আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে এই কলকাতার মাঠে। দেখেছি দুই খেলাতেই তাঁর উন্নত কলাকলা। কম্পটন ক্রিকেটে যেমন বিশ্ববরেণ্যদের অন্যতম, ফুটবলেও তেমন প্রথম সারির প্রধানদের মধ্যে তাঁর আসন।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে চুনী গোস্বামী যদি আন্তরিকভাবে ক্রিকেট অনুশীলন করেন, তবে ফুটবলের চেয়েও এতে বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন। তাঁর মধ্যে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। আমি বলি, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

* * *

খেলাধুলোয় যাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার সুপারিশ মত ভারত সরকার তাঁদের অর্জুন পুরস্কার দান করেছেন। এ বছর যে কুড়িজন ক্রীড়াবিদ্ অর্জুন পুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন—ফুটবলে প্রদীপ ব্যানার্জি, হকিতে পৃথ্বীপাল সিং, টেনিসে আর কৃষ্ণন, ক্রিকেটে সেলিম দুরানী, ভারোত্তোলনে এ এন ঘোষ, মেয়েদের হকি খেলায় অ্যান লামসডেন, সাঁতার বিষয়ে ডাইভার বজরঙ্গী প্রসাদ, অ্যাথলেটিকসে গুরবচন সিং, রাইফেল চালনায় মহারাজ কার্নী সিং, স্কোয়াশ র‍্যাকেটে ক্যাপ্টেন কে এস জৈন, মুষ্টিযুদ্ধে এল 'বাডি' ডি'স্যুজা, ব্যাড-

সি এ বি নক আউট ফাইন্যালের বিজয়ী স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব
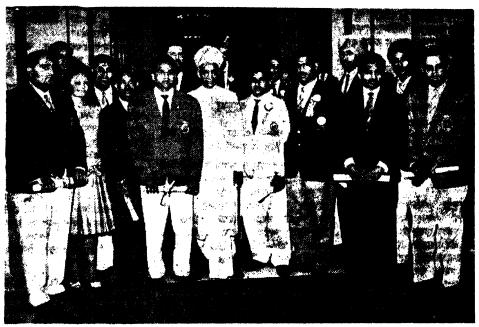
দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে 'অর্জুন পুরস্কার' গ্রহণের জন্য সমাগত ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়াশাখার কুশলী ক্রীড়াবিদগণ

মিন্টনে নন্দু নাটেকার, বাস্কেটবলে সরবজিৎ সিং, জিমন্যাস্টিকসে শ্যামলাল, মল্লযুদ্ধে হাবিলদার উদয় চাঁদ, ভলিবলে এ পালানিবাসী, দাবা খেলায় ম্যানুয়েল আওরন, টেবল টেনিসে জয়ন্ত ভোরা, গলফ খেলায় পি জি শেঠি এবং পোলো খেলায় মহারাজ প্রেম সিং।

ভারত সরকার কয়েক বছর ধরে দেশের কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়দের 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' প্রভৃতি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করছেন। এখন 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' প্রভৃতি খেতাবের সঙ্গে অর্জুন পুরস্কারের পার্থক্য কি। প্রথম সম্মান ভারত সরকারের নিজস্ব দান, যা দেওয়া না দেওয়া সরকারের ইচ্ছাধীন। সরকার কোন বছর দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। কিন্তু অর্জুন পুরস্কার হবে খেলাধুলোর বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠদের বার্ষিক পুরস্কার এবং এ পুরস্কারের প্রাপকদের নির্বাচনের ভার জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার উপরে।

এখন দেখা যাচ্ছে খেলাধুলোর প্রায় প্রতি বিষয়েই একজন করে অর্জুন পুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন। স্কোয়াশ র‍্যাকেট, গলফ, এমন কি দাবা খেলার জন্যও পুরস্কার মিলেছে। বাদ গেছে তাস, পাশা, বিলিয়ার্ড, কাবাডি, সাইকেল চালনা প্রভৃতি কয়েকটি খেলাধুলো। যেটা মোটেই কাম্য নয়।

ধরে নেওয়া যেতে পারে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় এই সব খেলাধুলোর কথা বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় উইলসন জোনসের নাম বাদ যাওয়া খুবই দৃষ্টিকটু হয়েছে। দলগত খেলায় ভারত হকির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন (যদিও রোম অলিম্পিকে সে সম্মান হাতছাড়া)। কিন্তু একক খেলায় উইলসন জোনসের কৃতিত্ব সবার উপরে। বিলিয়ার্ডে উইলসন জোনস বিশ্ববিজয়ী। বহু আগেই জোনসের রাষ্ট্রীয় সম্মান হিসাবে সরকারের খেতাব পাওয়া উচিত ছিল। সে সম্মান তো পানইনি। এবার অর্জুন পুরস্কারও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি।

কাবাডির বেলাতেই বা এত কার্পণ্য কেন? যতদূর জানি কাবাডি তো আই ও এ-র অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান।

মেয়েদের হকি খেলার জন্য পৃথকভাবে অর্জুন পুরস্কার দানও সরকারের নীতির পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত। মেয়েদের হকিতে যদি প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে মেয়েদের সাঁতার, টেবলটেনিস, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিণ্টনই বা বাদ যাবে কেন? সম্ভবত একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় বলে এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের পৃথক পুরস্কার দেওয়া হয়নি। যেহেতু উইমেনস হকি অ্যাসোসিয়েশন ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত নয়, পৃথক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু মেয়েদের জন্য পৃথক পুরস্কার।

কিন্তু এইখানেই আমার আপত্তি। কারণ সরকার এবং অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের কর্তারা বলছেন, এক ধরনের সমস্ত খেলাধুলো একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনতে হবে। অথচ ভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনকে সরকারই পুরস্কার দিয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আজ যদি মহিলাদের হকি সংস্থা পৃথকভাবে স্বীকৃতি পায় তবে কাল মহিলাদের টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, টেবলটেনিস প্রভৃতি সব খেলাধুলোয় মহিলা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠবে না—এ কথা কে বলতে পারে?

অর্জুন পুরস্কার সম্বন্ধে আরও একটি কথা। স্বীকার করি, খেলাধুলোয় দেশের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্যই এই পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পুরস্কার দেবার যেমন ঢালোয়া ব্যবস্থা হয়েছে তাতে অচিরেই এর গুরুত্ব কমে আসবে। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে উন্নতি হোক না হোক কয়েক বছরেই অর্জুনে অর্জুনে দেশ ছেয়ে যাবে।

মুকুল

হিরণ্ময়ী বসু (ঘোষ)

কয়েক সপ্তাহ আগে প্রমীলা বসুর খেলা-ধুলো সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বোধ হয় বলেছিলাম—

'যখনকার কথা বলছি তখন প্রমীলা বসুর নামের পাশাপাশি আর যে মেয়েটির নাম লেখা থাকত সে হিরণ্ময়ী বসু। সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ে। যেন দুটি বোন। শুধু সতীর্থ এবং সহ অ্যাথলীটই নয়, দুজনই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী গণেশানন্দের মানস-কন্যা।'

সেই হিরণ্ময়ী বসুর খেলাধুলো নিয়ে আজ আলোচনা করব।

'দেশ' পত্রিকার আজকের পাঠক যদি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পেছনে ফিরে যান তবে দেখতে পাবেন তখনকার 'দেশে'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় এই মেয়েটির ছবি। কখনো দৌড়ের ভঙ্গিতে, কখনো হার্ডল রেসে, কোন সময় বা হাই জাম্পে তার কৃতিত্বের নজীর বন্দী হয়ে আছে। এর কারণ তখনও খেলা-ধুলোয় মেয়েরা বেশী এগিয়ে আসেনি। আর যে কয়জন এগিয়ে এসেছিল তার পুরোভাগে ছিল হিরণ্ময়ী বসু।

শুধু 'দেশ' কেন, তখনকার সমস্ত দৈনিক ও সাময়িকীর খেলার পাতা হিরণ্ময়ীর হিরণ্ময় দ্যুতিতে আচ্ছন্ন। ১৩৪৩ (ইংরাজী ১৯৩৭) সালের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' বহু প্রাইজে পরিবেষ্টিত হিরণ্ময়ী বসুর একখানা ছবির নীচে লেখা রয়েছে—"সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী হিরণ্ময়ী দৌড়, হাই জাম্প ও নীচু বেড়া দৌড়ে (হার্ডলস) এ বছর অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। এবার এই মেয়েটি পাঁচটি বিষয়ে প্রথম, পাঁচটি বিষয়ে দ্বিতীয় ও তিনটি বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।"

আজ যারা খেলাধুলোর আসরে নবাগত বা খেলাধুলোর নতুন ভক্ত হিরণ্ময়ী সম্বন্ধে তাদের জানবার কথা নয়। এর দুটি কারণ। প্রথম, হিরণ্ময়ী বসু এখন খেলা-ধুলোর প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতার অধিবাসিনী নন, তিনি থাকেন যন্ত্রদানবের রাজত্বে, জামসেদপুরে। দ্বিতীয় কারণ, বিধির বিধান। হিরণ্ময়ী বসু আজ স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী নন। বছর দশেক আগে হঠাৎ তাঁর মধ্যে মানসিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তার বলেন ইনস্যানিটি। যদিও এখন আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক তবু জীবনের সুর ছিঁড়ে গেছে। যিনি একদিন খেলার মাঠে ছিলেন সবচেয়ে অশান্ত, অফুরন্ত আনন্দের উৎস, আজ সব কিছুতেই তিনি নির্বিকার; নির্লিপ্ত।

১৯৩৮ সালে টাটার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুবোধকুমার ঘোষের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিয়ের সময় সারদা মন্দিরের সহপাঠিনীদের লেখা ছোট্ট একখানি বই থেকেও খেলাধুলোয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বাঙালী মেয়ে সম্বন্ধে কিছু তথ্য আহরণ করা যায়।

সারদা মন্দির তখন গ্রামের মধ্যে একটি ভাড়াটে বাড়িতে। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখ। একটি লাল ফ্রকপরা রোগা লিকলিকে মেয়ে এল ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হতে। শুনলাম কামারপোল পাঠশালা থেকে এসেছে, অঙ্কে নাকি খুব ভাল। এক মাইলের একটু বেশী রাস্তা তাই হেঁটে আসে।

১৯৩০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয় উঠে এল তার নবনির্মিত নিজস্ব বাড়িতে। ঘুপসির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সে ফাঁকা মাঠের উপরে; দু দিকে তার বড় পাকা রাস্তা। রাতদিন অগণিত মানুষ, মোটরকার, বাস চলছে সেই রাস্তার উপর দিয়ে। আমরাও যেন ছোট্ট আবেষ্টনীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলাম উদার আকাশের নীচে।

ড্রিল, ব্যায়াম আরম্ভ হয়েছিল সেই অল্পপরিসর গ্রামের ভাড়াটে স্কুলবাড়িতে। পূজনীয় রাধাকান্ত বাবু (রাধাকান্ত বসু) ছিলেন কসরতের মাস্টার মশাই। এখানে এসে সেই ড্রিল ও ব্যায়াম রূপান্তরিত হল স্কোয়াড ড্রিল, ডাম-বেল ড্রিল, ইন্ডিয়ান ক্লাব ড্রিল, ফিজিক্যাল ড্রিল, লেজিম ড্রিল এবং আরও কত কি খেলাধুলোয়, প্রথম প্রথম ঐ লিকলিকে লাল ফ্রকপরা মেয়েটিকে দেখা যেত বৌ-বসন্তি ও 'মার' দেওয়া খেলায় "ডোল মারি কিত্‌ কিত"

হিরণ্ময়ী বসু

হলে ডাক দিয়ে শেয়ালের মত দৌড়তো। খেলার সময় হিরণ্ময়ীকে 'ডাক' পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হত সকলে। সবাই মনে করত, ও যখন গেছে তখন একটা না একটাকে 'মোর' করবেই। এদিকে বেশ ঠান্ডা এবং সরল প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু খেলা আরম্ভ হলে বিপক্ষ দল যদি কোনও রকমের অন্যায়ের প্রশ্রয় নেবার চেষ্টা করত, তা হলে হিরণ্ময়ী একা এক শ' হয়ে তর্জনী নাচিয়ে গলাবাজি করে প্রতিবাদ করত প্রচন্ড।

তারপর হল ছাত্রী সঙ্ঘের সৃষ্টি ১৯৩২ সালে। গ্রুপ ভাগ হল। রোগা মেয়েটি হল একটি গ্রুপের লীডার। সারদা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অমিয় মহারাজ একদিন বললেন —১৯৩৩ সালে যে যে মেয়ে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যোন্নতি, গ্রুপ পরিচালনা, নিয়মিত উপস্থিতি এবং পড়াশুনো প্রভৃতি সব বিষয়ে ভাল ফল করবে তাদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে প্রথম ৭ জনকে এরোপ্লেনে চড়ানো হবে। তখন বিমানে আকাশ ভ্রমণ প্রায় স্বর্গ-ভ্রমণের শামিল ছিল ছাত্রীদের কাছে। যথাসময়ে ৭ জন ছাত্রীর বিমানবিহারের সুযোগ এল। বলা বাহুল্য, হিরণ্ময়ী ছিল ৭ জনের অন্যতমা।

তারপর ১৯৩৪ সাল। খেলাধুলোর সঙ্গে লেখাপড়াতেও হিরণ্ময়ী সমান কৃতিত্ব দেখাল। মধ্যবাংলা পরীক্ষায় বৃত্তি পেল। হিরণ্ময়ীর বাবা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু চিরদিন শিক্ষাব্রতী। মেয়ের কৃতিত্বে কামারপোলের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন স্কুলের মেয়েদের।

১৯৩৫ সাল। সেই প্রথম বছর সে বছর পল্লীগ্রামের একটি স্কুল থেকে কলকাতার গার্লস ইন্টার স্কুল স্পোর্টসে মেয়েরা যোগ দেয়। প্রথম বছরের সারদা মন্দিরের মেয়েদের সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তার পরের বছর উইমেন্স অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে হিরণ্ময়ীর ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ। দৌড়, হার্ডলস ও উঁচু লাফে ও শ্রেষ্ঠ বাঙালী মেয়ে। নানা স্পোর্টস থেকে রাশি রাশি পুরস্কার আহরণ। সাইকেল চালনায়ও অসাধারণ পটু। সরিষা থেকে কলকাতায় যাওয়া আসায় ৫২ মাইল পথ সাইকেল চড়েই হিরণ্ময়ী পার হয়েছে একাধিকবার।

১৯৩৭ সালে ইন্টার স্কুল স্পোর্টসে সারদা মন্দিরের স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ হিরণ্ময়ীর। স্কুলের বাইরে অন্যান্য স্পোর্টসেও ওর কৃতিত্ব সবার উপরে। হিরণ্ময়ীর তখন বেস্ট ইন্ডিয়ান স্পোর্টস গার্ল হিসাবে খ্যাতি।

১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করবার পর হিরণ্ময়ীর যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবামন্ত্রে দীক্ষিত। অমিয় মহারাজের প্রচেষ্টায় এই মিলন সম্ভব হয়।

স্পোর্টসের কয়েকটি প্রাইজ নিয়ে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী বসু

বিয়ের পর জামসেদপুরের ছোটখাটো স্পোর্টস অনুষ্ঠানের অনেক আসরে সভানেতৃত্বের জন্য ওর ডাক পড়ে। বেশ হেসে খেলেই দিন কেটে যায়। কিন্তু হঠাৎ কোথা দিয়ে কি ঘটে যায়। উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখনো পুরোপুরি সুস্থ নয়।

হিরণ্ময়ীর পিতৃকুল স্পোর্টস ভক্ত। জ্যেঠতুতো ভাই গিরিন বসু মোহনবাগান ক্লাবে নিয়মিত ফুটবল খেলেছেন ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। ৪৩ সালে ছিলেন প্রথম দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড। গিরিনের ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্র বাস্কেটবলে বাঙলার নামকরা খেলোয়াড়। আর এক ভাই সুশীল বসুর নাম অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে।

হিরণ্ময়ী বসুর একমাত্র ছেলে দেবপ্রিয় এ বছরই ইকনমিকসে এম এ পাস করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখন তৈরী হচ্ছে আই এ এস দেবার জন্য। পড়াশুনোয় খুবই ভাল কিন্তু খেলাধুলোয় পটু নয়। তবে আগ্রহ যথেষ্ট। দেশবিদেশের নামকরা লেখকদের খেলার বই পড়া অন্যতম নেশা।

হিরণ্ময়ী বসুর রাশি রাশি স্পোর্টসের প্রাইজের অধিকাংশই ছিল সারদা মন্দিরের সংগ্রহ ভবনে। ইনস্যানিটি দেখা দেবার পর পুত্র দেবপ্রিয় তার অনেকগুলো নিয়ে নিয়েছিল জামসেদপুরের বাড়িতে। দেখে যদি মন ভাল হয়। কিন্তু ছেঁড়া তার আর জোড়া লাগেনি। অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্যে এখনও স্পোর্টস ও লেজিম ড্রিলের কিছু কিছু উল্লেখ থাকে। আর উদাসভাবে চেয়ে আছেন কিশোরজীবনের স্মৃতির সাক্ষী রাশি রাশি স্পোর্টসের প্রাইজের দিকে।

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 31ST MARCH, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ২২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৭ চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

ইংরেজীর স্থান

এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবটি প্রথাগতভাবে ঠিক মামুলী অনুষ্ঠান হয়নি। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা করেছেন প্রথমে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণে; পরের দিন এই বিতর্কে প্রতিপক্ষের অভিমত ব্যক্ত করেছেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং উপাচার্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী। বিষয়টি পুরনো; উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী থাকবে কিম্বা থাকা উচিত কি না, এ নিয়ে তর্ক চলছে অনেককাল ধরে, ইংরেজীর বাদী এবং প্রতিবাদী কোন পক্ষই হার মানেন নি এখন পর্যন্ত। সে যাই হোক, বিষয়টা শুধু বৈঠকী বিতর্কের নয়; ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন্ ভাষা কী পরিমাণ ব্যবহৃত হবে এবং হওয়া উচিত সে-বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের। চলনসই সিদ্ধান্ত যে গৃহীত হয়নি তা নয়; কিন্তু মুশকিল এই যে তবুও একটা নতুন কিছু করার উৎসাহে শিক্ষাজগতে মাঝে মাঝে হাওয়া উল্টো দিকে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক বসু মহাশয় সেই উল্টো রীতি প্রবর্তনের একজন প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে ইংরেজীকে না হটালে শিক্ষার উন্নতি অসম্ভব। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, তাই নাকি বিদেশী ভাষায় উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অতএব বসু মহাশয় বিধান দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সব স্তরে এবং সব বিষয়ে ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষায় পড়াশোনা গবেষণা ইত্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্তন করা হোক। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ কম নয়, কিন্তু এক কলমের খোঁচায় মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার একমাত্র বাহন করা কী করে সম্ভব তা আমাদের ধারণাতীত। অধ্যাপক বসু সুপণ্ডিত বিজ্ঞানী; উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পঠনপাঠনের জন্য কী ধরনের পুঁথিপত্র অবশ্য প্রয়োজন তাঁর নিশ্চয়ই তা অজানা নয়। মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে শিক্ষার সর্বনাশ সাধনে উদ্যোগী হওয়া বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক কি না, বসু মহাশয় সেটা আশা করি ভেবে দেখবেন।

ইংরেজীকে বিদায় করার আগে নিশ্চিত হতে হবে মাতৃভাষায় উচ্চ-শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভবপর কি না। ইংরেজী বিদেশী বলেই অবিলম্বে বর্জনীয় কেন হবে? এই "বিদেশী" ভাষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় অনেক কালের এবং সে-পরিচয় যে নিষ্ফল হয় নি তার অজস্র নিদর্শন আমাদের জাতীয় জীবনের অসংখ্য স্তরে। মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বজায় রেখেও আমাদের মানতে হবে আমাদের মাতৃভাষা তথা ভারতের কোন আঞ্চলিক ভাষাই এখনও সর্বতোভাবে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হওয়ার উপযুক্ত নয়। কাজেই অধ্যাপক বসুর পরামর্শ মত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সব বিষয়ে ইংরেজীর বদলে অবিলম্বে মাতৃভাষা চালু করার ফল কী হবে? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের চিন্তা-ধারার আত্যন্তিক বিচ্ছেদ। আসলে ইংরেজীকে হটানোর প্রশ্নটা জরুরী নয়। আমাদের বিরোধ ছিল ইংরেজরাজের সঙ্গে; সেই ইংরেজ-রাজ বিদায় নেবার পর ইংরেজীর আধিপত্য সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিরূপতা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছে। ইংরেজী এখন তার সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে বটে, কিন্তু সেই কারণেই দরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী এখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সানন্দ স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

জাতকুল বিচার করে ইংরেজীকে বিদেশী ভাষা গণ্য করে লাভ নেই। ইংরেজী ছাড়া ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীর আলাপ পরিচয়, ভাবের আদানপ্রদান অসম্ভব। হিন্দী বনাম ইংরেজীর লড়াই-এর পরিণাম যাই হোক, ভারতবর্ষের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের, এক আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর যোগাযোগ রাখতে, ভাব-গত ঐক্য শক্তিশালী করতে ইংরেজী ছাড়া গতি নেই। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে ইংরেজী যত না বিদেশী হিন্দী তার চেয়ে অনেক বেশী বিদেশী। ভারতবর্ষের ভাষা-বিরোধ যে সমস্ত ভয় ও সংশয় সৃষ্টি করেছে তার থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া। জন্মসূত্রে ইংরেজী বিদেশী ভাষা হয় হোক, ঐতিহাসিক সূত্রে ইংরেজী ভাষা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মননে ও কর্মে স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করার সংকল্প প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু সে সংকল্প পূরণের জন্য তাড়া-হুড়ো করে শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি করা কাজের কথা নয়। মাতৃভাষা সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হবার মত যথেষ্ট প্রস্তুত নয়, এ কথা স্বীকার করলে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় না। মাতৃভাষার উত্তরোত্তর উন্নতিবিধান আমরা সকলেই চাই; কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য এবং বৈষয়িক উন্নয়নের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইংরেজী ভাষাকেও অপরি-হার্য গণ্য করি। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় আমাদের ক্ষতির চেয়ে লাভ হয়েছে বেশী। কোন কোন রাজ্যে হিন্দী-ওয়ালারা বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ইংরেজীকে বিদায় করতে গিয়ে অবশেষে ঠেকে ঠেকে শিখছেন যে তাতে ফল ভালো হয় নি, শিক্ষার মান অবনত হয়েছে, শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী হতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে গঠিত কুঞ্জরু কমিটিও সুপারিশ করেছেন উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মাতৃভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে রচিত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করা কখনই সঙ্গত হবে না। ভাষার প্রশ্নে স্বাদেশিকতার শুচিবায়ু-গ্রস্ত বিচারবিতর্কের অবতারণা আমাদের দেশের পক্ষে বর্তমানে সব দিক দিয়েই ক্ষতিকর।

'হুম্‌...তুমিও তাহলে একটা দলের নেতা। তা, তোমার দলে আছেন কারা?'
'আমি আছি, গিন্নী আছেন, আমার নয় ছেলে।'
এম এল এ
পশ্চিম পাকিস্তানে ঘুড়ি ওড়ানো নিষিদ্ধ।
একমাত্র ডিক্টেটারই তা পারেন।
বার্মার সংবাদে প্রকাশ — 'গৃহিনী বাঘিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন।'
বার্মা
নে উইন সরকার
প্রজা সমাজতন্ত্রী মহল কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে পড়বার তালে আছে।
অনাথ বালকটির কী হইবে তবে?
কংগ্রেস
প্রজা সমাজতন্ত্রী দল

উনিশ শো চুয়ান্ন সালে স্বাক্ষরিত তিব্বত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তির মেয়াদ আগামী ২রা জুন শেষ হবে। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে তার জায়গায় একটি নূতন চুক্তি সম্পাদনের কথা তুলে চীনা সরকার ভারত সরকারকে চিঠি লিখেছেন। উত্তরে ভারত সরকার চীনা সরকারকে কী লিখেছেন তার আভাস পার্লামেণ্টে প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্র প্রসাদের ১২ই মার্চের ভাষণ থেকে পাওয়া যায়। ভারত সরকার চীনাদের জানিয়েছেন যে, নূতন চুক্তির কথা আলোচনা করতে হলে তার আগে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার এবং চীনা সরকার যদি তাঁদের আক্রমণাত্মক নীতি ত্যাগ করে খাঁটি "পঞ্চশীল" অনুযায়ী আচরণ শুরু করেন, তা হলেই সেই শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু পুনায় একটি বক্তৃতায় বলেন যে, ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করতে ভারত সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। চীনা সরকার এই বক্তৃতার উল্লেখ করে ভারত সরকারকে এক চিঠি দেন, তাতে শ্রীনেহরু কর্তৃক ঘোষিত শান্তিপূর্ণ সমাধানের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার জন্য ভারত সরকারকে তাগিদ দেওয়া হয় এবং চীন ভারত এবং এশিয়ার স্বার্থে ভারত-চীন মৈত্রী এবং বর্তমান বিবাদের শান্তিপূর্ণ সব মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেকচার ঝাড়া হয়। তারই উত্তরে ভারত সরকার জানান যে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আগে দরকার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

কিন্তু চীনারা ভারতভূমির যেসব অংশ দখল করে বসেছে সেখান থেকে তারা সরে যাবে আপোস-মীমাংসার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য—এরূপ আশা করার কোনো কারণ নেই। সম্প্রতি চীনে যে ধরনের মতামত প্রকাশ হচ্ছে তা থেকে মনে হয় যে, চীনা সরকার ধরে নিয়েছেন যে, ভারতে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেসী কর্তারা চীনাদের কবলিত ভারতভূমির পুনরুদ্ধার করা হবে বলে যেসব গরম গরম কথা বলেছেন সেগুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে গেলে ভারত সরকার পিকিং সরকারের মনমতো আপোস করতে রাজী হবেন। নির্বাচনী বক্তৃতাতেও প্রত্যেকবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন যে ভঙ্গীতে চীনাদের হিমালয়ে অনধিকার অবস্থান এবং পাকিস্তানের কাশ্মীরে অনধিকার অবস্থানের কথা একসঙ্গে

বলেছেন তা থেকেও চীনারা আশ্বস্ত বোধ করতে পারে। কারণ চীনাদের অ্যাগ্রেশান দূর করা এবং পাকিস্তানীদের অ্যাগ্রেশান দূর করা—এ দুটোই এক পর্যায়ে ফেলে শ্রীকৃষ্ণ মেনন সর্বদা বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি হচ্ছে যে, কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানের অপসারণ দাবি করলেও ভারত পাকিস্তানকে কাশ্মীর থেকে সরাবার জন্য কখনো যুদ্ধ করবে না। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ মেননের বক্তৃতার ধারা থেকে চীনের কম্যুনিস্ট সরকার ধরে নিতে পারেন যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা চীনাদের হটাবার চেষ্টা ভারত সরকার কোনোদিন করবেন না। সুতরাং যতদূর পর্যন্ত তারা দখল করে নিয়েছে ততদূর পর্যন্ত দখলে রেখেই চীনারা "শান্তিপূর্ণ মীমাংসার" জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দিয়ে যেতে পারে।

লাদাক অঞ্চলে চীনাদের অনধিকার প্রবেশ ও অবস্থান সম্পর্কে কোনো কথা তুললেই চীনা সরকার যে কেবল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন তা নয়, এমন কথাও বলেন, যার মর্ম হচ্ছে এই যে, পূর্বাঞ্চলে "ম্যাকমেহন লাইনের" দক্ষিণে যে তাঁরা এগোননি সেইটাই তাঁদের অনুগ্রহ বলে আমাদের মানা উচিত। অর্থাৎ মিথ্যা করে চীনা ম্যাপে ভারতের যে সমস্ত অংশ চীনের বলে দেখানো আছে সে সমস্তের উপর দাবি চীনা সরকার এখনো ছাড়েন না এবং কোনো একটা সীমানা যে কোথাও কোনদিন ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেটা মানা হয়েছে এই সত্যটাও চীনা সরকার স্বীকার করতে রাজী নন। গত—সর্বশেষ—বার চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাই যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন একরকম তিনি জোর-জবরদস্তি নিমন্ত্রণ আদায় করে আসেন। ভারতভূমি থেকে চীনারা সরে না যাওয়া পর্যন্ত আপোস-মীমাংসার আলোচনা করে লাভ নেই। তখনো এইটাই ছিল ভারতের জনমত। তা সত্ত্বেও শ্রী চৌ এন লাই যখন শ্রীনেহরুর সঙ্গে কথা বলতে আসতে চান তখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি এলে যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করা হয়। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় যে, চীনারা একচুলও নড়তে রাজী নয়। এমন কি ভারত ত্যাগ করার পূর্বেই শ্রী চৌ এন লাই শ্রীনেহরুর বিরুদ্ধে কথা খেলাপের অভিযোগ পর্যন্ত করতে দ্বিধা-বোধ করেননি।

যাই হোক, সেই নেহরু-চৌ সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, দুই পক্ষের কর্মচারীরা মিলে সীমানা সম্পর্কে অতীতের যেসব দলিলপত্রাদি আছে সেই-গুলি বিচার বিশ্লেষণ করে একটা রিপোর্ট তৈরি করবেন। সেই অনুসারে দিল্লিতে, পিকিংএ এবং শেষবার রেঙ্গুনে দুই পক্ষের কর্মচারীদের বৈঠক ও আলোচনা হয় এবং রিপোর্ট তৈরী হয়। সেই রিপোর্ট ভারতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভারত সরকার গত বছর পার্লামেন্টে সেটা পেশ করেছেন, কিন্তু সে রিপোর্ট পিকিংএ এখনো প্রকাশিত হয়নি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, সে রিপোর্টে যেসব তথ্যপ্রমাণাদি রয়েছে তা থেকে যে কোনো নিরপেক্ষ পাঠকই বুঝতে পারেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে কার বক্তব্য বেশী ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু পিকিং সরকার ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মীমাংসার জন্য ব্যস্ত নন, চীনারা যতদূর এসে চেপে বসেছে সেইটা পাকা করাই পিকিং সরকারের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সফল হবে বলে তাঁদের ভরসা করার কারণও আছে। ভারত সরকার ভারতবাসীদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে, চীনারা ভারতভূমির যতটা কবলিত করেছে সেটার পুনরুদ্ধার করা হবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি তা না করা সম্ভব হয়, তবে অন্য উপায় অবলম্বন করা হবে, কিন্তু তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। সামরিক প্রয়োজন এবং নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে পথ ঘাট ইত্যাদি তৈরির কাজ চলছে বটে, যেসব ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে চীনারা বিনা বাধায় আর এগুতে হয়ত পারবে না, কিন্তু যতদূর এসে তারা চেপে বসেছে সেখান থেকে তাদের হটাবার কল্পনা করে ভারত সরকারের প্রস্তুতি চলছে এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। যতদিন পরিস্থিতি "সচল" ছিল তখনই যদি কিছু করা না হয়ে থাকে তা হলে পরিস্থিতি একটা অবস্থায় জমে গেলে কিছু করা সম্ভব হবে না। যদি ভারতের দিক থেকে কিছু প্রস্তুতি হতে থাকে তবে চীনাদের দিক থেকে তার চেয়ে নিশ্চয়ই কিছু কম হচ্ছে না। তা হলে দু তিন বছর পরে ভারত "প্রস্তুত" হয়ে বলবে "সরো, নয়ত যুদ্ধং দেহি"—এরূপ একটা অবস্থা কল্পনা করার চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে যে, সেটা কত অবাস্তব। অথচ আমাদের কর্তাদের কথায় এই রকম একটা ধারণা অনেকের মনে সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে চীনারা যা করে নিয়েছে তা পাল্টাবার জন্য কোনো সক্রিয় নীতি অনুসরণের চেষ্টা না করলেও তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ খাড়া করে না রেখে উপায় নেই, তা না হলে একেবারেই মান থাকে না। চীনারা ভারত গবর্নমেণ্টকে যে রকম বেকুব বানিয়েছে এবং ভারত সরকারকে, এমনকি পণ্ডিত নেহরুকেও, যেভাবে গালাগালি করেছে তাতে ১৯৫৪ সালের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরে তার জায়গায় আর একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত সরকারের আগ্রহ বোধ হতে পারে না। আসলে ১৯৫৪ সালের চুক্তি অনেক আগেই অকেজো হয়ে গেছে। ঐ চুক্তি অনুসারে তিব্বত অঞ্চলে ভারতের যে-সব বাণিজ্যবিষয়ক এবং কূটনৈতিক সুখ-সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল, চীনারা সে-সমস্ত বাতিল করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের স্বাধীনতা এবং জাতীয় কৃষ্টির সংহাররূপ চৈনিক দুষ্কৃতিকে আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতিদান করে পাপ সঞ্চয় করা ছাড়া ১৯৫৪ সালের চুক্তির দ্বারা ভারতের আর কোনো লাভ হয়নি। পাপের দ্বারা যে বৈষয়িক লাভ কিছুই হয়নি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যখন প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করতে হয়েছে এর জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ।

২৩-৩-৬২

কলকাতায় বাসা পাওয়াই ভাগ্য, তার ওপর একটু জমি পাওয়া ত কল্পনাতীত। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই বিরল সৌভাগ্যেরই অধিকারী।

কলকাতায় তাঁর ছোটখাট একটা বাড়ি আছে আর দু-চারটে গাছপালা লাগাবার মত জায়গা তিনি বাড়ির সঙ্গে পেয়েছেন।

কিন্তু এই সৌভাগ্য যেভাবে তিনি কাজে লাগিয়েছেন অনেকেরই তা মনঃপূত বোধ-হয় হবে না। তাঁর নির্বুদ্ধিতা এবং রুচি ও শখের অভাবে কেউ যদি রীতিমত বিস্মিত ও ক্ষুন্ন হন তাতেও দোষ ধরবার কিছু নেই। কারণ সত্যিই কলকাতার মত শহরে এই দুর্লভ সুযোগটুকু পেয়েও তিনি না করেছেন ভালো করে ফুলের বাগান না তরিতরকারীর চাষ। জায়গাটা একেবারে এলোমেলো জঙ্গলই তিনি করে রেখেছেন।

ফুল গাছ সেখানে নেই এমন নয়; কিন্তু সে এমন গাছ যার নাম জানতেও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গাছের বদলে লতাই তাকে বলা উচিত। কিন্তু লতিয়ে ওঠার ভঙ্গিটুকু ছাড়া লতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে কোন দিক দিয়েই তা মেলে না। অসহায় কোমল পেলবতা কমনীয়তার ধার সে ধারে না। বন্য দুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাবল্যে তরু শ্রেণীকে লজ্জা দিয়ে একটু প্রশ্রয় দিলেই তেতালার ছাদ পর্যন্ত সবুজের বন্যাতরঙ্গে প্লাবিত করে দেয়। বছরে একবার চৈত্রের শেষে সে কখনো কখনো যুঁই-এর মত ছোট শাদা ফুলের সমারোহ আনে বটে, কিন্তু সেও যেন তার নিজের খেয়াল খুশিতে। সে ফুলের চেহারা ও গন্ধ সাধারণ রসিকজনের মন ভোলবার নয়। মিষ্টতার চেয়ে সে সুবাসে বন্য অপরিচিত অস্বস্তিকর একটা কি যেন আছে।

আমার পরিচিত গৃহস্বামীকে মাঝে মাঝে এ লতাটিকে শাসন করতে বাধ্য হন, বিশেষ করে উৎসাহের আতিশয্যে ও প্রাণোচ্ছলতায় যখন তাঁর বাড়িটিকেই সে কবলিত করতে উদ্যত হয়। লতাটি কিন্তু কোনো অরণ্য দেবতার বরে অজর অমর। গোড়া পর্যন্ত কেটে ফেলবার পরও দেখা যায় পরের বছর সমান উৎসাহে নবীন মেঘের মত পত্রপুঞ্জ মেলে সেই ত্রিতল শিখরের দিকে সে অসংখ্য বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করছে।

এই অবাধ্য অপ্রয়োজনীয় বন্য লতার একেবারে মূলোচ্ছেদ করে সব জ্বালা শেষ

করে দেওয়া যায়। বন্ধু যে তা পারেন না সে তাঁর দুর্বোধ এক দুর্বলতা।

এই দুর্বলতার চেয়ে বিস্ময়কর আর একটি নির্বুদ্ধিতা তাঁর ওই বাগানেই নাতি-বৃহৎ একটি আম গাছে মূর্ত হয়ে আছে।

আম গাছটি বছর আষ্টেক ধরে তাঁর বাড়িতে দেখছি। চরিত্রভ্রষ্ট করে তাকে লতাধর্মী করবার চেষ্টাই প্রথম দিকে হয়েছিল জাপানী উদ্যানের কিংবদন্তী শুনে।

আম গাছটি কিন্তু বৃক্ষত্ব বর্জন করে লতা হয়ে উঠতে পারেনি। স্বভাব ও দীক্ষার দ্বন্দ্বে দোমনা হয়ে সে বরং সব কাজের বার হয়ে গেছে। তার দুর্বল শীর্ণ কাণ্ডে ও ডালপালায় তরুর দৃঢ়তা নেই আবার লতার পেলবতাও নয়। মাঝে থেকে তার নিজের জীবনধর্মই সে গেছে ভুলে। প্রতি বছর বসন্ত সমাগমে নধর সবুজ নব পত্রের শোভা কয়েক দিনের জন্যে তার অঙ্গে দেখা যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। নতুন কচি পাতার আশ্বাস নব মুকুলে আর সার্থক হয় না। মুকুল ধরাবার কোন তাগিদই তার যেন নেই।

নিরেট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া এ আম গাছটি লালন করার কি হেতু থাকতে পারে বুঝতে না পেয়ে একদিন বন্ধুকে সোজাসুজি প্রশ্নটা করে ফেললাম।

তিনি একটু চুপ করে থেকে সকৌতুকে বললেন, আপনারা আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের জগতের মানুষ হয়েও আমার বাগানের মর্ম বুঝলেন না! আশ্চর্য।

একটু **ক্ষুব্ধ হয়েই বললাম, আধুনিক** শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে আপনার বাগানের সম্বন্ধ কি?

সম্বন্ধ কিছু নেই, কিন্তু মিল আছে! তিনি হেসে বললেন, আম গাছের অর্থটা তার আম **ফলানোর সঙ্গেই জড়িত। সেই অর্থটাকেই ছেঁটে বাদ দিয়ে ও আম গাছ** আরেক বিশুদ্ধ তাৎপর্য পেয়েছে আমার বাগানে।

এ ত সস্তা হেঁয়ালি হ'ল মাত্র! অধৈর্যের সঙ্গে বললাম।

সস্তা কি না জানি না, কিন্তু হেঁয়ালি নিশ্চয়! বন্ধু জবাব দিলেন, আর এই হেঁয়ালি দিয়ে ছাড়া শিল্পচেতনা থেকে **জীবনের নোংরা স্থূল স্পর্শের ছাপ ধুয়ে মুছে সাফ করা যায় না।**

জীবনের ছাপ ধুয়ে মুছে সাফ করবই বা কেন?

কেন তা আপনাদের যুগকেই জিজ্ঞাসা করুন।—বলে তিনি হেসে উঠলেন। আমাকেও হাসতে হ'ল বোকা বলে ধরা পড়বার ভয়ে।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম, নিষ্ফলা আম গাছের বিশুদ্ধ তাৎপর্য না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওই বুনো বাজে লতাটা নির্মূল করেন না কেন!

ওটার মধ্যে নিরর্থকতার সাধনা আছে আর তার চেয়ে বেশি আছে বন্যতার স্মারক সঙ্কেত।

আমায় বিমূঢ় বিহ্বল দেখে তিনি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যেই বললেন, আমাদের বাগানে যেসব ফুলগাছ থাকে, তা শুধু পোষ মানানো নয়, তার সৌন্দর্য ও আমাদের মনের মাপে সৃষ্টি করা ও সাজানো। কিন্তু ওই নাম না জানা বন্য লতা আমার মনের ফরমাশের ধার ধারে না। ওর উদ্ধত অবাধ্যতার মধ্যে তাই উদ্দেশ্যহীন আনন্দের স্বাদ পাই, আর পাই ভয়ঙ্কর দুর্বার সেই বন্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেবার ইঙ্গিত, পাহারা একটু শিথিল করলেই যে বন্যতা আমাদের সমস্ত সভ্যতা সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করে ঢেকে দেবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছে।

আপনার ওই বন্য লতার মতই যুক্তি ও কথাগুলো কেমন ডালপালায় জট পাকিয়ে গেল না? বন্ধুর চোখের কৌতুক কুণ্ঠনে ভরসা পেয়ে বললাম।

যুক্তি আঁকড়ে থাকাটাই যে কোথাও কোথাও কুসংস্কার, তা এখনো বুঝলেন না! বলে বন্ধু সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

নিজের কুড়েমি অক্ষমতা আর কুরুচির খুব মজার হেঁয়ালি সাফাই তৈরি করেছেন বটে! শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে বন্ধুকে শুনিয়ে এসেছি।

বাড়িতে ফিরে কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে বন্ধুর সাফাইটা নিছক নির্দোষ কৌতুক, **প্রচ্ছন্ন হুল ফোটানো পরিহাস, না আর কিছু!**

হেঁয়ালি রসিকতা করতে গিয়ে নিজেরও অজান্তে গহন কিছুর স্ফুলিঙ্গ তাঁর কথায় চমকে উঠেছে কি?

* * *

আধুনিক এক সমালোচনার কেরামতি দেখে সম্প্রতি চমৎকৃত স্তম্ভিত বিহ্বল হয়েছি। সমালোচনার এ নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সব কিছুর চেহারা অর্থ ইঙ্গিত একেবারে আমূল বদলে যায়। হঠাৎ বুঝতে পারা যায়, এতদিন ধরে যা বুঝে এসেছি, তা ভুল। নতুন করে বুঝি যে, বনের পাখি দেখে বা তার কলকাকলি শুনে মুগ্ধ হতে গেলে তার বাসার ডিমটা ভেঙে না ঘাঁটা-ঘাঁটি করলে নয়।

এ সমালোচনার একটা নমুনা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়াটাই ধরা যাক। এ ছড়া আমরা অনেক পুরুষ ধরে সারা জীবন শুনে আসছি। কিন্তু এর আসল অর্থ ও ইঙ্গিত কিছুই বুঝিনি। অনুমান করতেও পারিনি এর মধ্যে কি গভীর ভয়াল জীবনরহস্য লুকিয়ে আছে। ছড়াটিতে সামান্য বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর-এর পরই যে নদীতে বান আসে তার কারণ প্রচ্ছন্ন প্রবল মৃত্যু ইচ্ছা ছাড়া কিছু নয়। ফুট নোটে এ কথার সমর্থনে অন্তত সাতটি মহাপণ্ডিত ও তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম দিতে পারি। ছাপার ভুল হবার ভয়ে দিলাম না, নামগুলি নামগুলি Sandor Ferenczi, Sigmund Freud জাতীয়।

নদীতে বান ডাকাবার মৃত্যু ইচ্ছা (যার আরো গালভরা নাম অনায়াসে দেওয়া যায়) তার পরের ছত্রে কোথায় না যাচ্ছে! 'শিব-ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান'-এর মধ্যে লিবিডো ফ্যালিক সিম্বল থেকে ইডিপাস কমপ্লেক্স পর্যন্ত অনেক কিছুই তেমন মনঃসমীক্ষা বিশারদ সমালোচক ডুবুরী নামালেই পাওয়া যেতে কতক্ষণ। শেষ কটি ছত্র ত একেবারে কমপ্লেক্সের কাঁটায় গিজ গিজ করছে। 'এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান, এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান'-এর মধ্যে পিতৃপ্রতীক, আদিম অপরাধ বোধ থেকে গোটা মনঃসমীক্ষার শাস্ত্রই বর্তমান।

এই অপরূপ নতুন সমালোচনা চল্লিশ বছর আগেকার বিদেশী হিংটিং ছটের নকল বলে হেয় করবার চেষ্টা কেউ যেন না করেন। ওরকম অনেক নতুন হুজুকেরই কুলজি নিয়ে তাহলে টান পড়বে। সম্প্রতি বাংলা দেশের শ্রদ্ধেয় সর্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের একজন এই সমালোচনার খপ্পরে পড়েছেন বলেই একটু ভাবিত হচ্ছি। নিজের সার্থক-তম রচনাগুলির এই সাংঘাতিক বিশ্লেষণ দেখবার পর লজ্জায় ঘৃণায় আর তাঁর কলম সরতে চাইবে কি?

চৌরঙ্গী

মহাশয়,

১০ই চৈত্রের "দেশে" শংকরের "চৌরংগী"তে শংকরের জবানীতেই হাওয়াই হস্টেস মিস মিত্রের একটি সুন্দর বর্ণনা পড়লাম—"নাচের ঘুঙুর যদি......" ইত্যাদি (দেশ পৃঃ ৭২৫)। পড়তে পড়তে মনে হ'ল জগন্নাথ চক্রবর্তীর সম্প্রতি প্রকাশিত "মহাদিগন্ত" কাব্যগ্রন্থে পড়েছি। "মহাদিগন্ত" খুলে মিলিয়ে দেখলাম লাইনগুলি হুবহু এক (৭ম সর্গ, শ্লোক ৬৬২-৬৫); অথচ শংকর সেকথা উল্লেখ করেননি বা উদ্ধৃতি-চিহ্ন পর্যন্ত ব্যবহার করেননি। শেষাংশে (দেশ পৃঃ ৭২৮) শংকর "মহাদিগন্ত" থেকে আরও পাঁচটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন, অবশ্য উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে, এবং যেহেতু কাহিনীর মধ্যে পংক্তিগুলি আবৃত্তি করা হচ্ছে বলেই বলা হয়েছে (কার কবিতা অবশ্য তা উল্লেখ করা হয়নি) সেজন্য এটি তত দোষের হয়নি। কিন্তু পূর্ববর্তী অংশে (পৃঃ ৭২৫) যেহেতু পংক্তিগুলি কোন সংলাপের অন্তর্গত নয়, উদ্ধৃতি-চিহ্ন না দেওয়া আমার মতে অন্যায়। শুধু তাই নয় 'শান্তাদি'র বদলে 'মিস মিত্র' নামটি ব্যবহার করলেও এবং লাইনগুলিকে রান-অন করিয়ে গদ্যে রূপান্তরিত করলেও "মিস মিত্রের স্বর হ'ত তারা" যে গদ্য নয় তা পাঠকপাঠিকার কানই বলে দেবে। শংকর এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী উভয়েরই অনুরাগী পাঠিকা হিসাবে এই মন্তব্য না ক'রে পারছি না। ইতি—

তাপসী চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩

ধ্বনি

মহাশয়,

আপনার 'দেশ' পত্রিকার কয়েকটি বর্তমান সংখ্যাতে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব কর্তৃক লিখিত 'পঞ্চতন্ত্র—ধ্বনি' শীর্ষক রচনা এবং ১৭ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের তৎসম্পর্কিত আলোচনা দেখিলাম। মূল রচনা অপেক্ষা সমালোচনাটি অধিকতর উল্লেখযোগ্য এবং আমি নানা বিষয়ে সমালোচকের সহিত একমত পোষণ করি। দেশ—১৬ সংখ্যাতে অনুরূপ সন্দর্ভের প্রারম্ভেই জনাব আলী সাহেব লিখিতেছেন, "ইংরেজি সব ক'টি ধ্বনি ভালো করে শিখে নিলে কন্টিনেণ্টাল (?) তথা আরবী ফার্সী ইত্যাদি ভাষা শিখতে প্রচুর সুবিধা হয়" এবং ১৭ সংখ্যার রচনাতে 'জর্মন(?) ধ্বনি' সম্বন্ধে বহু অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কি জানি কাহাদের জন্য এবম্বিধ প্রবন্ধ বিরচিত হইতেছে। যাঁহারা ফ্রেঞ্চ, জার্মান ইত্যাদি ভাষা জানেন, তাঁহাদের নিকট এই রচনা ভ্রম-প্রমাদ বাহুল্য বশত এবং অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত বলিয়া মূল্যহীন; এবং যাঁহারা এই সকল ভাষাতে অনভিজ্ঞ তাঁহদের নিকট ইহা দুর্বোধ্য। তদুপরি 'কাণ্টিনেণ্টাল ভাষা' বলিয়া কোন ভাষা নাই; ইউরোপে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ভাষাই রহিয়াছে। সমালোচকের তীব্র মন্তব্য প্রাসংগিক ও সময়োপযোগী মনে করি। আলী সাহেব স্বরতত্ত্ব (স্ফুটধ্বনি) বিষয়ক আলোচনা আধুনিক পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করিলে প্রবন্ধটি উপাদেয় হইত। তিনি মূলত শ্রুতিগ্রাহ্য পদ্ধতি (acoustic method) অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে বহুবিধ ত্রুটি আছে এবং যাহা অসম্পূর্ণ। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাতে অনুরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট বর্ণগোষ্ঠীর (Phonemes) উচ্চারণের পার্থক্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং যোগরূঢ় পরিভাষার সাহায্যে সাংকেতিক অনুলিখন (Phonetic transcription) দেখাইয়া বিচার করিলে সুশোভন হইত। দেখা যায় তিনি সাধারণ্যে প্রচলিত জার্মান শব্দ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 'জর্মন' শব্দ কি ভাবে নিষ্পন্ন হইল? বর্তমানস্থলে ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান স্বরতত্ত্বের ঈষৎ আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনাবশ্যক এবং অপ্রাসংগিক। কয়েকটি রাজকুমারের নীতিশিক্ষার্থে বিষ্ণুশর্মা কর্তৃক বিরচিত পৃথিবীর বহুভাষাতে অনূদিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের একটি 'গুরু-চাণ্ডালী', হাস্যোদ্দীপক বাংলা ভাষার অভিনব সংস্করণ তিনি বহু জনহিতায় বাংগালীদের উপহার দিতেছেন। আলী সাহেব সুরসিক; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা তাঁহার গল্প (গপ্প) কথা-কাহিনী 'কেচ্ছা'র মত চলে না; ইহা প্রণিধানার্হ।

হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী
এম এ ডি ফিল (বার্লিন)

কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন—তেসরা মার্চ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত জনাব বুলেবন ওসমানের "কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গ" পড়ে বিস্মিত হয়েছি। প্রবন্ধটি নানা তথ্যের ভুলে ভরা। ভাষা নিয়ে লঘু প্রবন্ধ রচনার হাত লেখকের নেই যার ফলে প্রবন্ধটি বিভ্রান্তিকর হয়েছে।

ভদ্রলোক অনেক অসংলগ্ন কথার সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন ও ভুল তথ্যের তালিকা আউড়ে গেছেন। ঝাঁপ Jump থেকে আসেনি—এসেছে 'ঝম্প্র'

থেকে! খুঁড়তে যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা 'খন্তা', রাঁধতে যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা খুন্তি। খন্তা এসেছে সংস্কৃত 'খনিত্র' থেকে। SHOVEL থেকে শাবল এসেছে এটা নতুন শুনলাম। শাবল আর 'খন্তার' আকার এক। SHOVEL-এর সঙ্গে তার আকারগত সাদৃশ্য কোথায়? shovel-এর এদেশী প্রতিশব্দ 'বেলচা'—শাবল নয়। culture-এর সঙ্গে কুলাচারের সম্বন্ধ টানবার চেষ্টা করেছেন লেখক। কুলাচার কে clan ritual বলা যেতে পারে, কিন্তু culture-এর সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায়? তিনি আবার চেষ্টা করেছেন 'পাদ্রী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে। তাঁর হয়তো জানা নেই PADRE কথাটার চল একটু অর্থে পৃথিবীর নানা দেশে এখনো আছে। 'মশাই'য়ের সঙ্গে 'মঁসিয়ে'র কোনো যোগই নেই। মহা আশয়-মহাশয়, শব্দটির পিতৃত্ব ফরাসী নয়। মুই ME আমি ও চট্টগ্রামের 'আঁই তে' তিনি ফরাসী গন্ধ পেয়েছেন। আমি এসেছে 'অহম্' থেকে যেমন এসেছে তুমি ত্বম থেকে। এখানে ফরাসী গন্ধ পাওয়া খুব লম্বা নাকের প্রয়োজন। কুরুশ কথাটা CROSS থেকে আসেনি এসেছে 'ক্রোশে'—CROCHET থেকে এ তথ্যটা তাঁর অজানা। তাঁকে আরো জানিয়ে রাখি লংকা কথাটা সিংহলে চালু—সিংহলীরা অবশ্য তার আগে একটি শ্রী যোগ করে। লংকার সোস্যালিস্ট পার্টি'র নাম 'লংকা সমসমাজিস্ট পার্টি'।

CUTTER বলে কোনো গৃহে বা খামার বাড়িতে ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম আমার অজানা। দা (দাও) বা কাটারির সাদৃশ্য আছে এমন কোনো বিদেশী অস্ত্রের পরিচয় জানি না। স্যাকরারা 'কাতুরী' নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করে ধাতুর পাত বা তার কাটবার জন্যে। তার সঙ্গে কাটারির সম্পর্ক নেই। TOOKER বস্তুটি কি? গবেষণা করে তিনি বের করেছেন 'টুকরী' এসেছে TOOKER থেকে। আবার লিখছেন 'কাচারা' এসেছে Catawah থেকে। সর্দি'র একটা ইংরেজী প্রতিশব্দ আছে বটে তবে সেটা Catarrah নয়। প্রায় একই আওয়াজের আরো দুটি শব্দ আছে ইংরেজীতে একটির অর্থ 'চোখের ছানি' অন্যটির 'জলপ্রপাত'।

তিনি কোথায় খবর পেলেন যে কলকাতায় লেডিকেনি পাওয়া যায় না। পান্তুয়া গোল হলেই লেডিকেনি হয় আর প'ড়ে গেলে কালজাম হয় এ কথাটা ছোট ছেলেরা জানে। লেডিকেনি বা লেডিগেনি খাস কলকাতার চীজ, পদ্মা বা বর্ডার পেরিয়েছে হালে।

আমার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না মাড়ানো লোকও যখন এতগুলো অসঙ্গতি ধরতে পেরেছে তখন অনুমান করি পণ্ডিত ব্যক্তিরা আরো অনেক তথ্যের ভুল দেখিয়ে দেবেন।

আশা করি বুলবন ওসমান সাহেব ক্ষুণ্ণ হবেন না।

ইতি
রেখা সরকার

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

১৮ সংখ্যা ২৯ বর্ষ দেশ পত্রিকায় বুলবন ওসমান সাহেবের লেখা "কলকাতার ভাষা প্রসঙ্গ" পড়লাম। এক জায়গায় লেখক লিখেছেন, "লম্প একটা বিশেষ ধরনের বাতি, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র 'ওকে 'ও' নামে ডাকা হয় কিনা জানি না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে লম্পকে কেউ চিনবে না।" আমার বাড়ি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার পাংসা থানায়। আমি ফরিদপুর, যশোহর এবং বরিশাল জেলায় যেখানেই গেছি 'লম্প' কথাটির প্রচলন দেখেছি। আমরা নিজেরাও লম্প বলতাম এবং এখনও আমার মা-দিদিমারা 'লম্প' বলে থাকেন।

বুলবন সাহেব কি কখনও পূর্ব পাকিস্তানে গেছেন? যদি না যান তবে একবার গিয়ে শুনে আসুন 'লম্প' কথাটি আজও সেখানে প্রচলিত।

ইতি—বিনীত—
সত্যেন সাহা
রাঁচি।

রবীন্দ্রনাথ ও একটি গানের সমস্যা

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৯শে ফাল্গুন দেশ পত্রিকার ১৮ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে, তার শেষ পত্রটির (৪৪১-সংখ্যক পত্র) অন্তর্গত একটি তথ্য আমাকে ভাবিত করেছে। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে লেখা এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"একটা নতুন গান লিখে পাঠাই। সুরটা ভালোই হয়েছে।" এর পর কবি গানটি উল্লেখ করেছেন—'আমার প্রিয়ার হিয়া বাতাসে আজ ভাসে।'

সমস্যা এখানেই। কেননা, ঐ গানটির প্রচলিত পাঠ হলো—'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে।' অতএব এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রচলিত পাঠটি ২রা সেপ্টেম্বরের চিঠিতে উল্লিখিত গীতরূপটির পাঠান্তর। কিন্তু তাও নয়। কারণ, দেখতে পাচ্ছি প্রচলিত পাঠটি ২৫শে আগস্ট ১৯৩৮-এ রচিত। (দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৪ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, সানাই।)

এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে : এই বিখ্যাত গানটির কোন রূপটি আগে রচিত? এই প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য গানটি পরে কবিতায় পরিণত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কাব্যরূপের নাম 'ছায়া-ছবি'; সানাই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে উদ্ধৃত কবিতাটির রচনার কোন তারিখ নেই; শুধু ১৩৪৫ সালে রচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৪৫ সাল মানে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ। কেউ কি জানাতে পারেন কোন তারিখে কবিতাটি লেখা? তাহলে এই সমস্যার মীমাংসা হবে যে গানটি আগে রচিত, না কবিতাটি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—একটি রচনার তিনটি পাঠান্তর। দুটি গীতরূপ, একটি কাব্যরূপ। পরপর প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করছি বোঝবার সুবিধার জন্যে:—

কাব্যরূপ:

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।

গীতরূপ: (২রা সেপ্টেম্বরের পত্রে উদ্ধৃত)

আমার প্রিয়ার হিয়া বাতাসে আজ ভাসে
বৃষ্টি সজল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে।

দ্বিতীয় গীতরূপ: (২৫শে অগাস্ট, ১৯৩৮)

আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে
হায় হায়!
বৃষ্টি সজল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে
হায় হায়।

সমান্তরালভাবে বিচার করলে প্রচলিত পাঠটি ২রা সেপ্টেম্বরের পত্রে উল্লিখিত পাঠের চেয়ে সার্থক এবং প্রকৃষ্ট মনে হয়। 'প্রিয়ার হিয়া' কথাটির 'প্রিয়ার ছায়া' রূপান্তর, 'বাতাসের' জায়গায় 'আকাশে' এবং নবযোজিত 'হায় হায়' refrain-টুকু স্পষ্টতই পরবর্তী পরিমার্জন। অতএব আমার বক্তব্য হলো : ২রা সেপ্টেম্বরের পত্রে উল্লিখিত গানটি নিশ্চয়ই অনেক আগে লেখা, অথবা প্রচলিত পাঠের ২৫শে অগাস্ট তারিখটিতে ভুল আছে। রবীন্দ্ররচনাবলীর অনুরাগী পাঠকবৃন্দ আমার এই সমস্যার মীমাংসা করলে বাধিত হবো। ইতি ১১ই মার্চ ১৯৬২।

সুধীর চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর কলেজ।
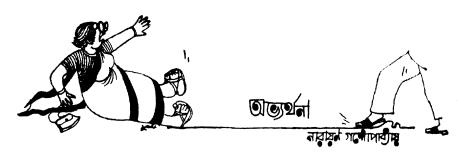
তপন বললে, টু বি ফ্র্যাংক, আবার প্যাঁ—প্যাঁ—প্যাঁচে পড়া গেল হে!

প্যাঁচে পড়বার এবং পড়াবার একটা স্বাভাবিক শক্তি তপনের আছে, সুতরাং আমি খুব বিচলিত বোধ করলুম না। ওর দিকে একবার তাকিয়েই তক্তপোশের ওপর সাজানো পেশেন্সের তাসগুলোকে অনুধাবন করে চললুম।

—আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর তোমার খালি তাস আর তাস!—চটে গিয়ে তপন তাসগুলোকে এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিলে। হাঁ-হাঁ করে ওঠবারও সময় পাওয়া গেল না।

—ভাল্লোও লাগে এ-সব! যেমন রাবিশ তোমার গল্প, তেমনি বিশ্রী তোমার হ্যাবিট। এত কুঁড়েমি করতেও পারো!

অগত্যা তাসগুলো গুছিয়ে তুলে ফেলতে হল। বললুম, সকালবেলাতেই একেবারে মার্-মার্ করে ছুটে এসেছ যে। ব্যাপার কী?

—মাথা আর মুণ্ডু! ভারী মুশকিল হয়েছে সুকুমার। মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—

—মিসেস ঘো—ঘো আবার কে?

—ঘো-ঘো নয়—ঘোষাল!—এতক্ষণে তপন নামটাকে সম্পূর্ণ ওগরাতে পারল : এখানকার গার্লস্ স্কুলের নতুন হেড-মিস্ট্রেস। আজ বিকেলে তিনি আমাদের বাড়িতে আসছেন।

—কেন?—এইবার আমার মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল : তুমি কি তাঁর স্কুলে চাকরি চাও? তোমার ব্যাঙ্কের চাকরিটা তো নেহাত মন্দ নয়! নাকি ভর্তি হতে চাও আবার? কিন্তু বি-এ পাস করবার পরে স্কুলে কি আবার ভর্তি হওয়া যায়? তা-ও মেয়েদের স্কুলে? তার ওপর তোমার মুখে তো আবার গোঁফও রয়েছে। ওই গোঁফ সুদ্ধ তোমায় ভর্তি করতে কি উনি রাজী হবেন?

তপন এবার দস্তুরমতো—যাকে বলে—গর্জন করল।

—লুক হিয়ার সুকুমার, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

—কোন্ কোন্ সময় ভালো লাগে? বলে ফেলো—নোট করে রাখি।

—অল্ রাইট্, আমি চলে যাচ্ছি—

চলেই যাচ্ছিল, আমি খপ করে ধরে ফেললুম।

—বোসো, বোসো—ঠাণ্ডা হও। ঘোলের সরবত আনিয়ে দিই।

—হ্যাং ইয়োর ঘো-ঘো—

—ঘোল?

—না, সরবত। ওদিকে মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—

—ঘোল?

—না—না—হেড-মিস্ট্রেস। সত্যি ভাই, খুব মুশকিল হয়েছে। কী যে করি, বুঝতে পারছি না।

তপনের মুখের চেহারা দেখে এবারে আমার মায়া হল : কী হয়েছে বলো তো?

বিশদ বিবরণটা জানা গেল এতক্ষণে। মিসেস ঘোষাল তপনের মা-র বাল্যসখী। একই স্কুলে দু-জনে পড়তেন। তপনের মা ক্লাস টেন পর্যন্ত এসেই থমকে যান, মিসেস ঘোষাল টক টক করে বি-এ পাস করেন। মিস্টার ঘোষালকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সে ভদ্রলোক বছর সাতেক পরেই আফ্রিকা না আমস্টারডাম কোথায় একটা কাজ জুটিয়ে উধাও হয়েছেন। কারণ আর কিছু নয়, ভদ্রমহিলার পরিচ্ছন্নতার বাতিক অসাধারণ। প্রত্যেকটি জিনিস টিপ-টপ রাখা চাই। চেয়ারে পা তুলে বসলে প্রলয় ঘটাবেন, টিপয়ের ফুলদানি আধ ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে ঝিয়ের চাকরি যাবে, খাওয়ার সময় কেউ হুশ-হাশ আওয়াজ করলে টেবিল ছেড়ে উঠে যাবেন। শোনা যায়, দিনে চার বার দাঁত মাজতে আপত্তি করাতেই নাকি শেষ পর্যন্ত মিস্টার ঘোষালকে প্রাণ নিয়ে উগান্ডা কিংবা উরু-

গুয়েতে পালাতে হয়েছে। এসব রোমাঞ্চকর কাহিনী তপন তার মা-র মুখেই শুনেছে।

—এ রকম ভয়ানক জীবকে তুমি বাড়িতে আসতে বললে কেন?

—আরে, আমি বলেছি নাকি? কাল একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাঙ্কে এসেছিলেন। এ কথা সে-কথার পরেই ফস্ করে চিনে ফেললেন! বললেন, 'ও, তুমি লোকনাথবাবুর ছেলে? তোমার মা-র নাম তো মালতী? আরে মালতী তো আমার ছেলেবেলার সই, সুরবালা বললে তখুনি চিনে ফেলবে।' আমি বুঝতে পারলুম এই সেই সাংঘাতিক মিসেস ঘোষাল। আর উনিও সঙ্গে সঙ্গে নাক কুঁচকে বললেন, 'তুমি নস্যি নাও কেন? ছি—ছি—খুব ন্যাস্টি অভ্যেস। ওসব ছেড়ে দাও।'

—তার পরেও তুমি ওঁকে আসতে বললে?

—ছি—খুব ন্যাস্টি অভ্যেস

—দুত্তোর!—তপন আবার চটে উঠল: আমি কি পা-পাগল? নিজেই বললেন, 'আমি কাল সন্ধ্যের দিকে যাব তোমাদের বাড়িতে।' আমি বললুম, 'বাবা মা কেউ এখানে নেই—দু মাসের জন্যে হরিদ্বারে গেছেন, একেবারে কুম্ভ সেরে ফিরে আসবেন।' উত্তরে বললেন, 'কেন, তুমি তো আছো। আমি তোমাদের বাড়ি দেখতে যাব। কিন্তু খবরদার, চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কোরো না। আমি যখন-তখন যা-তা খাইনে।'

—যাক, এক দিক থেকে বাঁচোয়া।
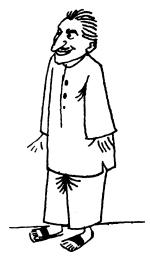
—তা বটে। কিন্তু ভাই, এই মাস-খানেকের ভেতরে বাড়ি-ঘরের অবস্থা তো সঙ্গীন। ধুলো-ধুলোর জন্যে ভাবছি না—ও ঝেড়ে-টেড়ে সাফ করা যাবে। কিন্তু আর সব যা হয়ে রয়েছে ভাই—রেণুদের সুন্দর-

সরু গোঁফ পর্যন্ত সেই খুশিতে চকচক করছে।

বন! চাকরটা আবার পরশু দেশে পালিয়েছে—এই সেভেনথ্ টাইম ওর চাচা মারা গেল। একটা জিনিস লক্ষ করেছ হে? ওদের অনেক চাচা থাকে আর তারা খুব কুইক্‌লি মারা যায়।

আমি চিন্তা করে বললুম, হুঁ, চাচাদের মৃত্যুর হার খুব বেশী। যাক, ও নিয়ে তুমি কষ্ট পেয়ো না—তোমার আর তো চাচা নেই। তা এখন কী করতে চাও?

—তুমি আমাকে হেল্‌প করো। বিপদে বন্ধুর কাছেই আসতে হয়।

আমি আবার ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখলুম। তারপর বললুম, তোমার সেই যে মুখোশটা—মানে সেই অরেঞ্জ মাস্ক—সেটা এখনো আছে নাকি? যদি থাকে, তা হলে আমি বরং সেইটে পরে সন্ধ্যেবেলা তোমাদের বাগানে দাঁড়িয়ে থাকব। মিসেস ঘোল, আই অ্যাম সরি—মিসেস ঘোষাল গেটে ঢুকতেই একটা তাড়া লাগাব খোঁত করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবেন এবং তুমিও—

তপন তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। রেগে বললে, তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝ-ঝ-ঝকমারি। যা পারি, একাই করব। কারুর সাহায্য আমার দরকার নেই।

আমি বললুম, কারেক্ট। একেই বলে তেজ। তোমার কথা ভেবেই তো বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে বীর, সাহস অবলম্বন করো—'

তপন দরজাটা দড়াম্ করে আছড়ে বেরিয়ে গেল—যেন বেশ রোমাঞ্চকর নাটকের প্রথম দৃশ্যে যবনিকা পড়ল। আর যবনিকা পড়ে ভালই হলো, কারণ বিবেকানন্দের বাণী থেকে ওই একটিমাত্র লাইনই আমার মুখস্থ। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ পর্যন্ত বাংলার সব পরীক্ষাতেই রচনা লিখতে গিয়ে 'এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন' বলে ওই লাইনটাই আমি চালিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু বিকেলে অফিস থেকে মেসে ফিরেই মনটা কি রকম চিড়বিড় করতে লাগল। যেন একটা আরশোলা বেরিয়ে এসে ক্রমাগত আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। শেষে বুঝতে পারলুম, ওটা আরশোলা নয়—বিবেক। তপনের এই দারুণ দুঃসময়ে বন্ধু হিসেবেও অন্তত আমার ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

অতএব বেরিয়ে পড়া গেল।

দরজায় কড়া নাড়তে হল না—দেখি সামনেই দাঁড়িয়ে। মুখে ভরাট খুশির হাসি—ওর পরিপাটি করে ছাঁটা সরু গোঁফ পর্যন্ত সেই খুশিতে চকচক করছে। বোঝা গেল, একটা স্বর্গীয় পরিতৃপ্তিতে ও উদার হয়ে আছে—আমার ওপর এতটুকুও রাগ নেই এখন।

হেসেই বললে, ক'টা বেজেছে হে?

ঘড়ি দেখে বললুম, সাড়ে পাঁচটা।

—তা হলে মিসেস ঘো-ঘো—

—ঘোল বলতে চাইছ?

—না-না—ঘোষাল পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন। দেখে যাও—কেমন সাজিয়েছি বসবার ঘরটা। তোমার মনে হবে যেন কলকাতার আর্টিস্ট্রি হাউসে এসে ঢুকেছ।

—রিয়্যালি?—শিহরিত হয়ে আমি ভেতরে পা দিলুম।

মেজেতে কার্পেট পাতা। চেয়ার-টেবিলগুলো চক-চক ঝক-ঝক করছে। একটা ফুলদানিতে গোটা কয়েক গাঁদা ফুল সাজানো।

তপন দারুণ খুশী হয়ে গোঁফে তা দিতে বললে, দেখছ কী? আজ ছুটি নিয়েছিলুম অফিস থেকে। সারা দুপুর বসে বসে চেয়ার-টেবিল বার্নিশ করেছি।

—বার্নিশ করেছ? তুমি?—তপনের ওপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল: এ বিদ্যেও তোমার আছে নাকি?

—বিদ্যে থাকে নাকি?—তপন হে-হে করে হাসল: অ্যাকোয়ার করতে হয়। বললে বিশ্বাস করবে না—জীবনে এই আমার প্রথম বার্নিশ। আর ফর্মুলাটা—কী বলে গিয়ে—একেবারে ওরিজিন্যাল!

—অ্যাঁ!

—হুঁ-হুঁ—পরে বলব। আচ্ছা, এবার দেয়ালের দিকে তাকাও।

আমি তাকালুম এবং কাফ হয়ে তৎক্ষণাৎ।

—এসব কি হে?

—ছবি।

—কার ছবি? কিসের ছবি?

—কিসের ছবি? আমি তার কী জানি! কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে তাই বলো।

আমি তাকালুম এবং লাফালুম তৎক্ষণাৎ

বললুম, বুঝতে পারছি না ভাই। মাথা ঘুরছে। ওটা কি হে? গোবরের গাদা নাকি?

—না, নীলবসনা সুন্দরী। তার পাশে কী আছে বলো দেখি?

আমি বললুম, একটা ভাঙা মোটর? না-না, শ্যাওড়া গাছে পা দিয়ে মাথা নিচু করে একটা পেত্নী ঝুলছে বোধ হয়?

—ওটা প্রতীক্ষা। রাজকন্যা প্রাসাদশিখরে বসে আছে।

আমি ঢোঁকটোক গিলে ফেললুম। একটু সামলে নিয়ে বললুম, রাজকন্যা প্রাসাদ-শিখরে কেন প্রতীক্ষা করছে ভাই? ঘুড়ি ধরতে চায় নাকি?

তপন নারাজ হয়ে বললে, ঘুড়ি-ঘুড়ি ধরবে কেন? রাজপুত্র পক্ষীরাজে আসবে কিনা, সেই জন্যে ওয়েট করে রয়েছে।

—হুঁ-ম্।

—তার এধারে যেটা দেখছ—

—থাক থাক—আর দরকার নেই। যা দেখছি ভাই, কলকাতার আর্টিস্টিক হাউস এর কাছে একেবারেই নাবালক। কিন্তু এসব মডার্ন আর্ট রাতারাতি তুমি পেলে কোথায়?

—পাব আবার কোথায়? নিজেই আঁকলুম বসে বসে।

—অ্যাঁ!

মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলুম, অনেক কষ্টে সামলে নিতে হল। তপনের মুখটা আমি ভালো করে দেখতে পেলুম না—শুধু ওর পরিপাটি ছাঁটাই করা গোঁফ জোড়াই নাচতে লাগল চোখের সামনে।

—আমারও প্রথমে খেয়াল হয়নি—তপন

বসে চলল, ঘর সাজাতে সাজাতে হঠাৎ নজরে পড়ল। দেখি দেওয়ালে রাধাকেষ্ট কালীঘাটের পট, মা-র বোনা কার্পেটের 'পতি পরম গুরু', কোন্ এক সায়েবের সঙ্গে তোলা বাবার অফিসের এক পেল্লায় গ্রুপ ফটো। রাবিশ। এসব দেখলে মিসেস ঘোষ-ঘোষ—

—ঘাল—

—হ্যাঁ, ঘোষাল নিশ্চয় মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন। তাই ভাবলুম, নিজেই যা পারি করে ফেলি। মডার্ন আর্ট তো কেউ বোঝে না, আমার ছবি দিয়েই কি-কি-কি—

—কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড করতে চাও?

—না, কিস্তিমাত করতে চাই। ব্যাস্—লাল-নীল পেন্সিল, কালি, এই সব নিয়ে বসে গেলুম। বললে বিশ্বাস করবে না মাত্র দু ঘণ্টায় বা-বারোখানা ছবি ম্যানেজ করে ফেলেছি। কী মনে হয় তোমার? ইম্প্রেসড্ হবেন না ভদ্রমহিলা? মানে মিসেস ঘোষ-ঘোষ—

আমি ঘোষাল বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আর বলা গেল না। পৃথিবীতে অনেক রকমের শক্ আছে—কোনোটা সহ্য করা যায়, কোনোটা স্রেফ ধরাশায়ী করে ফেলে মানুষকে। আমার গলা শুকিয়ে উঠল, বোঁ বোঁ করতে লাগল মাথার ভেতরে। দেখলুম, সামনেই টিপয়ের ওপর একটা কাচের জগে লাল রঙের কী রয়েছে। নিশ্চয় সরবৎ। ওরই এক গ্লাস খাওয়া যাক—নইলে তপনের কলাচর্চার এই গদাঘাত আমি সইতে পারব না।

গেলাস কই? গেলাস নেই। জগৎ সুদ্ধ তুলে গলায় ঢালতে যাচ্ছি, হাঁ-হাঁ করে সেটা কেড়ে নিলে তপন।

—আরে আরে—খেয়ো না, খেয়ো না! মারা পড়ে যাবে।

—মারা পড়ব? কেন? সরবত খেয়ে কেউ কখনো আবার মারা পড়ে নাকি?—আমি আবার হাত বাড়ালুম।

—কে বলেছে তোমায় সরবত?—জগটা নিয়ে তপন চট্ করে সরে গেল নাগালের বাইরে: ও তো কালি-মেশানো লাল জল। ওর ভেতরে রয়েছে দু-দুটো জ্যান্ত টাংরা মাছ—ধাঁ করে একটা গলায় ঢুকে গেলেই
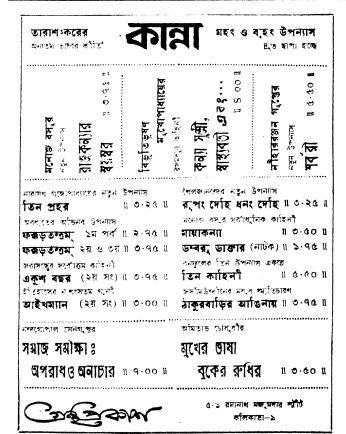
আর দেখতে হবে না। মানে, মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—মরুক গে, সেই ভদ্রমহিলাকে চমকে দেবার জন্যে একটা ওরিজিন্যাল অ্যাক্-অ্যাক্-অ্যাক্যা—কথাটা বলবার জন্যে তপন আঁকু-পাঁকু করতে লাগল আর আমি বিধ্বস্ত হয়ে ধপাস করে সামনের চেয়ারটাতেই বসে পড়লুম। আর বসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, তপনের এই আর্টিস্টিক হাউসে আরো মিনিট দুয়েক থাকলেই একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। হয় আমি প্রাণ নিয়ে পালাব—নইলে আমার জান বেরিয়ে যাবে, আমাকে জানান না দিয়েই। ভেবে-চিন্তে দেখলুম আমার দিক থেকে প্রথমটাই সুবিধে এবং আমি উঠে দাঁড়াতে গেলুম।

কিন্তু সংসারে বসে পড়া যত সহজ, উঠে দাঁড়ানো তার চেয়ে ঢের কঠিন। দেখলুম চেয়ারটার দুটো অভিসন্ধি। হয় আমাকে টেনে রাখতে চায়—নইলে আমার সঙ্গে উঠে আসতে চায়। কোনো মতলবটাই তো ভালো বলে বোধ হচ্ছে না! একটা কুটিল সন্দেহে আমার মন ভরে গেল।

—ব্যাপার কি হে তপন? তোমার চেয়ার যে আমায় ছাড়তে চায় না! এর মানে কী?

—ছাড়তে চায় না?—তপন তার সরু গোঁফ আলো করে মনোরম একটি হাসি হাসল : ও কিছু নয়—বার্নিশ!

—কিছু নয়, বার্নিশ? এ কিসের বার্নিশ? চেয়ারের সঙ্গে লোককে চেপে ধরবে বার্নিশের এত বাড়াবাড়িই বা কেন?

—কিছু নয়, বার্নিশ

—মরিয়া হয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিলুম আমি। পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, এই চেয়ার ছাড়বার আগে অনেকখানি জামাকাপড় এবং বেশ কিছুটা ঘাড়ের চামড়ার মায়া আমায় পরিত্যাগ করতে হবে। আর এক-সঙ্গে এতখানি ত্যাগস্বীকার আপাতত সম্ভব নয় বলেই মনে হল আমার।

তপন উৎসাহ দিয়ে বললে, ট্রাই—ট্রাই এগেন, ঠিক উঠে পড়বে। মানে গাঁদের আঠাটা একটু বেশী পড়ে গেছে কিনা, তাইতেই—

—গাঁদের আঠা!

—হ্যাঁ, ওই গাঁদের সঙ্গে লাল জুতোর কালি মিশিয়েই বার্নিশটা তৈরী করেছিলুম কিনা! আমার ওরিজিন্যাল ফর্-ফর্-ফর্—

ওর ফর্-ফর্ শুনে প্রাণ ধড়ফড় করে উঠল আমার। আমি হাহাকার করে বললুম : তুমি ক্রিমিন্যাল—তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তার পরেই 'টু বী অর নট টু বী দ্যাটস্ দ্য কোশ্চেন!' সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলুম, আমি হাউই—আমি উল্কা—আমি রকেট—আমি ভস্টক নম্বর ফিফ্‌টি ফাইভ! একটি উল্লম্ফন, জামার আর্তনাদ এবং ছিটকে উঠে দেওয়ালে ঠিকরে পড়া! 'আমি অবসান—নিশাবসান!'

নাকে চোট লেগেছিল দারুন, কিন্তু কাপড়-জামার দিকে তাকিয়ে সে ব্যথা নিতান্তই মরীচিকা বলে বোধ হল। দেখি, জামা-কাপড় বার্নিশের রঙে একাকার। আর পাঞ্জাবির খানিকটা অংশ জয়ধ্বজার মতো উড়ছে চেয়ারের গায়ে—আন্দির নতুন জামাটা এক-ধোপের বেশী গায়ে পরিনি!

আমি চাঁ-চাঁ করে আর্তনাদ করলুম : আই সে তপন, আমি তোমার নামে কেস করব।

তপন কী বলতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে ভারিক্কী মেয়েলী গলায় ডাক এল : তপন আছো—তপন?

—এসে গেছেন!—তপন চিড়বিড়িয়ে উঠল : আসুন মাসীমা, আসুন।—তারপর ধিক্কার-ভরা গলায়—যেন সব অপরাধ আমার—এমনিভাবে বলে চলল : ছি-ছি, কী একটা সীন ক্রিয়েট করলে? আর কার্পেটটাও কী বিশ্রীভাবে কুঁচকে দিলে ওদিকে—রাম রাম!

রাগের মধ্যেও বলতে যাচ্ছিলুম, ভদ্র-মহিলা ঘরে ঢোকার আগে ওই মারাত্মক চেয়ার তিনটে সরাও, কার্পেট নয় পরেই হবে; কিন্তু ঠিক তক্ষুনি একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল—যাকে বলে ডবল অ্যাক্‌শন! তপন এধার থেকে কুঁচকে যাওয়া কার্পেটে জোরে একটা টান মারল আর ওদিক থেকে চৌকাট পেরিয়ে সেই মুহূর্তে ঘরে পা দিলেন মিসেস ঘো-ঘো-ঘোষাল। চকিতের জন্যে আমি দেখতে পেলুম একখানা গোল মুখ, কালো ফ্রেমের এক জোড়া বিরাট চশমা, একটা চওড়া শাড়ির পাড়, একটি ঝুলন্ত ভ্যানিটি ব্যাগ এবং পরক্ষণেই কানে এল একটি তীক্ষ্ণ চিৎকার : ও মা গো!

গোল মুখখানা, চশমা, ব্যাগ এবং একটি বপু মুহূর্তের মধ্যে দেখা দিয়েই বিদ্যুৎ-বেগে দরজার বাইরে অদৃশ্য হল। জুতো-পরা এক জোড়া পা একবার শূন্যে নেচে উঠল, ধপাত্ করে কী যেন আছাড় পড়ল, সিঁড়ি বেয়ে কে যেন ডিগবাজি খেলে, তার পরেই অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ফ্রন্ট! যে মিসেস ঘোষাল হয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, মিসেস ঘোল হয়ে গড়িয়ে চলে গেলেন তিনি।

এমনিই হয়ে থাকে—অন্তত বিজ্ঞান তাই বলে। কার্পেটের কোণায় পা থাকলে এবং সেই অবস্থায় কার্পেটে একটা হ্যাঁচকা টান পড়লে সেই পদাধিকারী কিংবা কারিণী মাধ্যাকর্ষণের স্বাভাবিক নিয়মটা মানতে বাধ্য। চিরদিনই তা মেনে আসছে। তবে প্র্যাক্‌টিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম।

বাইরে বাগান কাঁপিয়ে দ্রুত পদধ্বনি উঠছে। প্রাণ হাতে করে পালাচ্ছে কেউ। তাকে ফার্স্ট এইড নেওয়ানো যাবে বলে মনে হল না।

তপন কার্পেটের ওপরে বসে পড়েছে—তারই আঁকা ছবির সেই গোবর-গাদা—না—নীলবসনা সুন্দরীর মতো। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, অন্তত ভদ্রমহিলা এ যাত্রা তোমার মারাত্মক চেয়ারের হাত থেকে বেঁচে গেলেন—কিন্তু সব সান্ত্বনাই কি দেওয়া যায় সব সময়ে? আরো নিজের নতুন পাঞ্জাবির আধখানা চেয়ারের গায়ে ধ্বজার মতো শোভা পাচ্ছে যখন?

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৬৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমার জিনিসপত্রের মধ্যে তোমার শালখানি দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়েছিলুম। মনে মনে তোমার দাক্ষিণ্য কল্পনা করেছি। এখানে আমার ধনী কুটুম্ব সমাগম হচ্চে—তুমি জানো আমার স্বল্প মূল্যের গাত্রবস্ত্র ঐশ্বর্যশালীদের গোচরযোগ্য নয়। তাই গোপনে নীরবে কৌশলে আমার লজ্জা নিবারণের কথা চিন্তা করেছিলে। এতে আমার মর্ম স্পর্শ করেছে। কিন্তু ব্যবহার করতে সাহস হোলো না, পাছে শেষপর্যন্ত সম্মান রক্ষা করতে না পারি। তাছাড়া বেশবাসের অপরাংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য হবে। তাই ফিরিয়ে দিচ্ছি ডাকযোগে; সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করচি।

সমারোহ চলচে। আমার নতুন বাড়ির ঊর্দ্ধ্ব শিখরে বসে নিরাসক্ত ভাবে নিম্নলোকের মর্তালীলার আভাস পাচ্চি। ইতস্তত জনস্রোত প্রবাহিত হচ্চে, বাঁশির আওয়াজ আসচে; মনে মনে কিছু কিছু স্মৃতির উদ্বোধন হচ্চে যেন সে পূর্বজন্মের। এবারকার মতো এ রাস্তা বন্ধ—পরজন্মে কোনো গোধূলি লগ্নে সাহানায় বাঁশি বাজবে কি? ইতি ২৯।১২।৩৯

কবি

॥ ৪৬৯ ॥

[illegible]

২৮।১২।৪০

[illegible]

॥ ৪৭০ ॥

ওঁ

[illegible]

[illegible]

॥ ৪৭১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি স্বভবনে ফেরবার যে তারিখ নির্দেশ করেছিলে তারি অনুসরণ করে তোমাকে একটা কবিতা পাঠিয়েছিলুম। সে কবিতাটি তোমার চিঠির উত্তরে আমার মনে এসেছিল। তার কোনো সাড়া না পেয়ে ভাবছি তোমাদের অনুপস্থিতির মধ্যে সে চিঠি হয়তো হারিয়ে গেছে। এ রকম পূর্বেও ঘটেছে। তার পরে তোমাকে সেদিন অন্য কবিতা পাঠিয়েছি—সেটার বিশেষ সার্থকতা নেই। অনেকদিন থেকে তোমাদের সঙ্গে ছিন্ন ছিন্ন সংস্পর্শে মনটা কি রকম পীড়িত হয়ে থাকে—এক-দিকে আমার চলনশীলতার দৌর্বল্য অন্যদিকে নানা রকমের কাজের তাগিদে আমার অবকাশকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়—ভাল লাগে না। যদি সপ্তাহ প্রান্তের ছুটিতে কোনো এক সময়ে আসতে পারো, তা হলে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে নিই। যদি এগারই মাঘে তোমরা এখানকার উৎসবে যোগ দাও, তা হলে কেমন হয়? উৎসব শান্তভাবেই হবে।

শীত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল মাঘের আগমনে নরম হয়ে আসচে। ক্রমে বসন্তের স্পর্শ লাগবে বলে প্রতীক্ষা করে আছি। ইতি ১৮।১।১৯৪০

তোমাদের কবি

॥ ৪৭২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, হঠাৎ খবর পাচ্চি মহাত্মাজী আসচেন মস্ত দলবল নিয়ে। কোথায় কাকে রাখব তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্চে সবাই। একটুমাত্র জায়গা নেই—এর মধ্যে তোমাদের বন্দুকে স্থান দেবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি এই উপলক্ষে তোমাদের আনতে পারতুম খুবই খুশী হতুম—উপায় নেই। ব্যাপারখানা আমার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০।

কবি

॥ ৪৭৩ ॥

শ্রী প্রশান্ত[illegible]

[illegible]

দুর্গম প্রেমের কল্যাণধারা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] যে [illegible] বিদায়

[illegible]।

যে শিউলিমালা একদা তোমারে

গন্ধ দিয়েছে বিদায়,

শেফালিবনের আজি

নিয়ে যায় তার স্মৃতি,

আমি দুই হাত ভরি ছন্দ

দিনু তার সাথে বিদায়॥

আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ অগ্রহায়ণ

১৩৪৬

॥ ৪৭৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

বার বার মনের মধ্যে এই ইচ্ছে জাগে কিছুই না করবার সাধনা করি—যে সাধনা দেখতে পাই ঐ শিমুলে গাছে, যে আপনার অপর্যাপ্ত ফুলের সমস্ত ঐশ্বর্য ঝরিয়ে দিয়ে তার নীলাকাশের দিকে তার রিক্ত শাখার নীরব মন্ত্র পাঠিয়ে দিচ্চে। এই উপকরণহীন সব চেয়ে সহজ সাধনা কিছুতেই আর ঘটে উঠতে চায় না। মনে পড়তে থাকে শিলাইদহের বসন্তকাল, দোতলার ঘরের নির্জন জানলার ধারে বসে দেখচি নিচের বাগানে গাছের চূড়ায় চূড়ায় ফুলের কুঁড়ি উঠচে উন্মুখ হয়ে, আর মনে হচ্চে নৃত্যচঞ্চল দোয়েলগুলোর শিস দিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজই নেই। সামনে পদ্মার তরঙ্গে উদ্বেল সর্বক্ষেত্রে আপন দিগন্তবিস্তৃত অহংকার তার ধরে রাখতে পারচে না—তার পরপ্রান্তে পদ্মার রৌদ্রোজ্জ্বল জলরেখা, এবং তারও পরপারে পাণ্ডুর বালুরাশি দিগন্তে গিয়ে নিলীন। তখন আমার সংকীর্ণ প্রতিপত্তি ছিল কাশ-বনের মতো, তাতে মাঝে মাঝে যশের ফুলও ফুটেচে, কাঁটাও ভিড় করেছে যথেষ্ট; কিন্তু দায়িত্ববিহীন অবকাশ ছিল গানের সুরে গুঞ্জরিত। আজ দণ্ডাপহারক বিধাতা নিয়েছেন সেই অবকাশ হরণ করে।

চললুম বাঁকুড়ায়, তার পরে ফিরব স্বস্থানে। ততদিন আমের বোল ঝরে গিয়ে গুটি ধরবে, আর পলাশ শাখায় আরম্ভ হবে নিঃস্বতা। কিন্তু দূরে শালবীথিকায় তখনো চলবে ফুলের উৎসব। মনের মধ্যে বসন্তের আহ্বান আসবে, কিন্তু সাড়া দেবার সময় পাবে না। ধারাবাহিক কর্তব্য চলতে থাকবে। মানুষের জীবনে প্রথম দিক আর শেষের দিক কর্তব্যের সীমার বাহিরে। প্রথম দিকে জাগরণের আভাস মাত্র আর শেষের দিকে সুপ্তির আমন্ত্রণ। কিন্তু আধুনিক কালের ব্যবস্থায় মধ্যাহ্ন সূর্যের শাসন চলে সকল প্রহরেই।

গান তৈরি করেছিলুম "কখন যে বসন্ত এল এবার হোলো না গান।" সেই "এবার" রয়ে গেল চিরদিন। ইতি ২৮।২।৪০

কবি

॥ ৪৭৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি একটু ভুল করেছ—ইতিহাসটা বলা যাক। দুর্গম দীর্ঘ পথে প্রবল প্রয়াসে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়ায় গিয়ে পৌঁছেছিলুম। সেই পথে ফেরার সংকল্প ত্যাগ করে কলকাতা হয়ে ফেরবার প্রস্তাব হোলো। কলকাতায় দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে এখানে আসব কথা ছিল। হেন কালে

সন্ধেবেলায় রেল কম্পানির কোনো কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেন হাওড়া স্টেশনে আটটা বেলায় উত্তরমুখী গাড়ি আসবার পূর্বে সেখানে কোনো একটা রেল কামরায় তাঁরা আমাকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কি না তা জানা যাবে হাওড়ায় এসে পৌঁছিয়ে। তোমাদের খবর দেবার যথেষ্ট সময় ছিল কিনা তখন সেটা ভেবে স্থির করবার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার দেহে ছিল না।

আগামী বসন্ত-পূর্ণিমায় এখানে বসন্ত উৎসব হবে। কিছু গান বাজনা হবে। কিন্তু তখন তোমরা কোথায় তা তো জানিনে। যদি এ প্রদেশে উপস্থিতি সম্ভব হয় তা হলে বসন্তের এই আমন্ত্রণ স্মরণ কোরো। বোলপুর অতি ক্ষুদ্র শহর, ই আই আরের অনাদৃত লুপ্ত লাইনভুক্ত, এদিক দিয়ে কেউ কখনো দিল্লি বম্বাই মাদ্রাজ লাহোর সিমলায় যায় না, তবুও যদি টাইম টেবিল খুলে দেখ তা হলে এর দেশ কাল নির্ণয় করতে পারবে—হয়তো ছোট অক্ষরে। আর পাঁজি দেখলে কোনো এক সীমানায় পূর্ণিমা তিথির সন্ধান মিলবে। ডিসেম্বর জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন মাসের অভিজাত স্তরে তাকে কোনো প্রান্তে দেখতে পাবে না। এ'কে সাধারণ লোকে দোল পূর্ণিমা বলে। ইতি ৫।৩।৪০

কবি

॥ ৪৭৬ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের ঘরে আমার কড়ে আঙুলের যে আংটিখানি ভ্রমক্রমে ফেলে এসেছি সেটা যদি খুঁজে পাও তা হলে সেটা রেখে দিয়ো, ফিরে পাঠাবার চেষ্টায় বৃথা মাশুল ব্যয় কোরো না।

কিন্তু আমার অভিভাবক বিশেষের উদ্দাম উৎসাহে বেলঘরিয়া সদনে আর যে একটা অপঘাত ঘটেছে সেটার জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। পশুপতি ডাক্তারের রচনার একটি পাণ্ডুলিপি এবং সুকুমার সেনের রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই দুখানি নিরুদ্দেশ হয়েছে। যদি পাও তোমার আংটির সঙ্গে সেগুলিকে আত্মভাণ্ডারজাত করে রেখো না। এখানে সুস্থ থাকবার অন্য সকল সুযোগই আছে কেবল ঐ হারাধনগুলির শোকে দেহমন আছে পীড়িত।

আর একটা সন্ধানের বিষয় আছে খোঁজ করে আমাকে জানিয়ো। ডাক্তার জীবন রায়ের একটি চিকিৎসাবিধান অনুসরণ করে ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরের সহস্রক শক্তির এক শিশি সঙ্গে এনেছিলুম। তাঁর যে উপদেশ পেয়েছিলুম আমার স্মৃতিপটে সেটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অল্প একটু মনে আছে, পরে পরে চারদিন সেবন করতে হবে, কিন্তু তার পরে সব অন্ধকার। সহস্রক শক্তির ওষুধ তিনদিন খেয়ে মনে সন্দেহ হোলো যে হয়তো বা ভুল শুনেছি—তাই স্তব্ধ হয়ে আছি, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করে যদি কর্তব্য নির্দেশ করে দাও তা হলে আবার সাহস করে লাগব।

হাত এত অপটু যে লেখনী চালনা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। মনের গতির সঙ্গে শরীরের উদাম পাল্লা দিতে পারচে না, তবু হিতৈষীরা দীর্ঘজীবনের আশীর্বাদ করে। ভাগ্যে কলিযুগে আশীর্বাদের ফল ফলে না। ইতি ২৩।৪।৪০

কবি

॥ ৪৭৭ ॥

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু,

অপেক্ষা করে ছিলুম তোমরা যথাসময়ে এখানে আসতে পারবে। আত্মীয় সমাজের সীমানার অত্যন্ত বেশী বাইরে গিয়ে পড়লে জন্মদিনের আনন্দ উৎসবের রস জল মিশিয়ে ফিকে হয়ে যায়। এবারে যেখানে আছি সেখানে ভিড়ের আশঙ্কা, সেই জন্যে তোমরা এলে ঐ দিনের উৎসব সম্পূর্ণ হতে পারত। কিন্তু অপরিহার্যের জন্যে পরিতাপ বৃথা।

যেখানে প্রশান্তের ডাক পড়েছে সেখানে সে যেতে দ্বিধা না করে যেন। এই রকম জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে লাগাবার সুযোগ যত পাওয়া যায় ততই ভালো।

আমার চিকিৎসা বিধান অনেকবার তুমি মেনেছ আর একবার মানলে ঠকবে না। অবিলম্বে বায়োকেমিক ক্যাল-কেরিয়া সালফ দুই এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করবে। একটুও ভয় কোরো না। তোমার অবস্থা ঠিক জানতে পারলে ওখানে থাকতে থাকতেই ওষুধটা খাওয়াতুম। যদি ফাটে তবু খেয়ো। ঠিক সময়ে ওষুধ পড়লে ফাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

পা টলমল করে, কিন্তু শরীর ভালই আছে। অমিয়কে সঙ্গী পেয়ে খুশী আছি।

হারাধন রক্ষিত পার্সেলটা এসে পৌঁচেছে। ইতি ২৭।৪।৪০

কবি

॥ ৪৭৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আছ কোথায়? শুনলুম দার্জিলিঙে। নিশ্চিত খবর জানিনে। পরশু ছিলুম মংপু কাল এসেছি কালিম্পঙে। কাল ছিল আমার পাঁজিকাবিহিত জন্মদিন। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করে পাঠিয়েছিলুম—মনটা প্রস্তুত ছিল না।

তোমার প্রশস্ত চীনে বাটি এসে পৌঁচেছে—চীন দেশের উপযুক্ত তার আয়তন। এই পাত্রটি মনে মনে তোমার শ্রদ্ধার রসে পূর্ণ করে গ্রহণ করলুম। রথীর কাছে এইমাত্র শুনলুম এখনো তোমরা বেলঘরিয়া ছাড়নি। এই চিঠি সেই ঠিকানাতেই পাঠালুম। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪৭

কবি

॥ ৪৭৯ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন আছে। ইতিপূর্বে বেল-ঘরিয়ার ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম বোধ হয় তখন তুমি ছিলে দার্জিলিঙে—সে চিঠি তোমার হাতে পৌঁছিয়েছে কিনা জানিনে। আমি তোমাকে কিছু ঘন ঘন Calcaria Sulf 6 খেতে পরামর্শ দিয়েছিলুম।

সুরেনের(১) মৃত্যুতে মনে খুব বেদনা পেয়েছি। অমন মানুষ দেখা যায় না, তবু আপনার স্মৃতিচিহ্ন মুছে নিয়েই চলে গেল।

এবার পাহাড়ে এসেও শরীর তেমন ভালো চলচে না। ইতি ১৪।৫।৪০

কবি

---

১ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীনতা লাভের পর সমস্ত রাজ্য স্বেচ্ছায় গণতন্ত্রভুক্ত হলেও একমাত্র হায়দ্রাবাদে সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্য দখল করে নিতে হয়। ঐশ্বর্যের দিক থেকে হায়দ্রাবাদ পৃথিবীর সর্বাধিক সম্পদশালী রাজ্যের অন্যতম ছিল। নিজামের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের পরিমাণ নিয়ে দেশে বিদেশে নানা কিম্বদন্তী আজো প্রচলিত। হায়দ্রাবাদের ঐশ্বর্যের কাহিনী যে অনেকাংশেই সত্য তার নিদর্শন ওখানকার অধিবাসী এবং ঘরবাড়ি প্রাসাদ সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।

১। সালংকারা বনজারে জিপসী সুন্দরী; ২। সামাজিক এক আচার অনুষ্ঠানে বনজারে মহিলাবৃন্দ; ৩। মোজামজাহির বাজার; ৪। ইতিহাসখ্যাত গোলকুণ্ডা দুর্গ; ৫। হায়দ্রাবাদ শহরের একাংশ (পিছনে চার মিনার দেখা যাচ্ছে)।
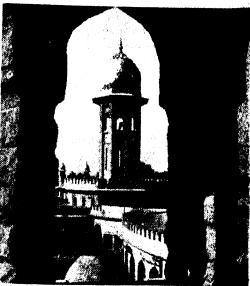
আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

পো কা টা

উৎপলা মুখোপাধ্যায়

পোকাটা
এমনই বোকাটা,
ঘরে জ্বলছিল আলো, কম পাওয়ারেরই আলো
জানলা ছিল খোলা।
পোকাটা
সূচীতীক্ষ্ণ দেহটা,
ঘন সবুজ পোশাক আর স্বচ্ছ ডানার ওড়না,
জানলা দিয়ে দেখলে আলোটা
কেননা জানলা ছিল খোলা,
যদিও আলোটা ছিল কম পাওয়ারের।
পোকাটা
কাঁপিয়ে স্বচ্ছ ডানাটা
এল দল থেকে ছিটকে
বসেছে পেলমেটে, এমব্রয়ডারি করা টেবিলঢাকায়,
ডিভানের পেছন দিয়ে চলেছে
সাইডবোর্ড আর ঝকঝকে পালিশ করা ম্যানটেলপীসে।
বাইরে
চুনকাম করা কাঞ্চনজঙ্ঘা
চুপচাপ দাঁড়িয়ে
ঝন্ ঝন্ ঝিঁঝি ডাকছে
কত রকমের সবুজ,
বোধ হয় এখানে ওখানে দুটো ফুলও ফুটেছে,
সুগন্ধ গন্ধরাজ আর রক্তবর্ণ জবা দেখছে মজাটা
আলোটা জ্বলছে।
হঠাৎ
ও কি, কে নিবিয়ে দিলে কম পাওয়ারের সেই আলো
কাঞ্চনজঙ্ঘা তবু দাঁড়িয়ে রইল,
বাঁকা হাসি হেসে চাঁদ বললে আমিও আছি,
শুধু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল।
বেঁচে গেল পোকাটা?

সে ই প থ

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

সে স্মৃতি অম্লান আজো—সেই পথ রহস্য নিবিড়—
আজো ভরে রেখেছে তো সুধা দিয়ে দুখানি হৃদয়,
দুই জোড়া মুগ্ধ চোখে পরিয়েছে অঞ্জন অক্ষয়,
লাবণ্য এনেছে প্রাণে, উচ্ছ্বাসে ছোঁওয়া সুরভির।
সেই পথ গন্ধে ভরা স্বপ্নে ভরা বনকেতকীর—
সে পথে ভেঙেছে ঘুম—ঘুচে গেছে সমস্ত সংশয়—
জেনেছি আমারি তুমি—কারো নয়—আর কারো নয়—
হাওয়ায় লেগেছে ছন্দ—সুখালস স্পন্দ ঝিরিঝির্।

সে পথে এসেছ বুকে হৃদয়ের একান্ত গভীরে,
আচ্ছন্ন করেছ সত্তা অমৃতের অপূর্ব আস্বাদে,
সর্ব অঙ্গে কী বিপুল মত্ততার এনেছ প্লাবন।
সাহারার বুকে বুকে থইথই দুরন্ত শ্রাবণ—
দিয়েছ দুহাত ভরে দূরতম আকাশের চাঁদে
কী আলো জেলেছ স্নিগ্ধ অতন্দ্রান্ত অখণ্ড তিমিরে।

অ ন্ত রা লে

শান্তি লাহিড়ী

চল ঘরে ফিরে যাই, যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।
এখন পোশাক খুলবে মিথ্যে রাজা, মিথ্যে প্রণয়িনী,
যাকে এইমাত্র দেখলি পুত্রশোকে অন্তিম দশায়
সে কেমন হেসে উঠবে। বলবে কেমন স্বপ্ন দেখালাম তোকে:

চল ঘরে ফিরে যাই, বরফকুচির মত হিম
কনকনে সাদা ভাতে নুন, লঙ্কা—অমৃত তৃপ্তিতে
গোগ্রাসে সাবাড় করে ছিন্ন-কন্থা—বাঁশের চাটাই!

তবুও, এখানে কেউ শোকাতুরা হেসে উঠবে না।

'ভেন্দেত্তা'

সৈয়দ মুজতবা আলী

এই নামে প্রকাশিত মপাসাঁর একটি ছোটগল্প বহু পাঠকের সুপরিচিত। কর্সিকার এক বুড়ীর একমাত্র ছেলেকে খুন করে আততায়ী সার্দিনিয়া পালিয়ে যায়। বুড়ী প্রতিশোধ নেবার জন্যে খড়ের মানুষ তৈরি করে প্রথমটায় তার গলার ভিতর মাংস রেখে কুকুরকে ট্রেন করে, কি করে তার গলা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হয়, পরে মাংস বাদ দিয়ে। ট্রেনিং শেষ হলে বুড়ী সার্দিনিয়া গিয়ে সেই কুকুরকে দিয়ে পুত্রের আততায়ীকে টুকরো টুকরো করে ছোঁড়ায়।

* * *

এবারের ঘটনাটি অতখানি রগরগে না হলেও বড় বিষাদময়। অকুস্থল ঐ কর্সিকারই কাছে, তবে সমুদ্রের ওপারে উত্তর ইতালির জনপদভূমিতে। কাল: ১৫ই জুলাই, ১৯৪৪। যুদ্ধের শেষের দিক।

মিত্রপক্ষে ও জর্মানিতে তখন ইতালি দেশেও জোর লড়াই চলছে। এবং জর্মনদের পিছনে ইতালীয় গেরিল্লারা। এদের কিছুটা কম্যুনিস্ট, বাকিরা ফাসিস্ট ও নাৎসি বিরোধী। যেমন জর্মনদের বিরুদ্ধে তীর গোপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তেমনি আপন দেশবাসী ফাসিস্ট এবং জর্মন-মিত্রদের বিরুদ্ধেও। এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইটাই হয়ে উঠেছিল তীব্রতর, তিক্ততর। রাজনৈতিক দলাদলির নাম করে সবাই আপন আপন শত্রু নিধনে লেগে গিয়েছে। ইতালি প্রতিশোধের দেশ এমনিতেই—আইন-আদালত থাকাকালীনও, আর এখন তো কথাই নেই।

১৫ জুলাইয়ের সকাল বেলা উত্তর ইতালির ছোট গ্রাম মন্তালবাতে দশ বছরের মেয়ে আলফা জুবোলি বাড়ির সামনের বাগানে সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলাধুলো করছিল। এমন সময় আচমকা বাড়ির গেট খুলে কয়েকজন গেরিল্লা বাগানে ঢুকলো। গুলি করার জন্য তৈরী তাদের কাঁধে ঝুলছে টমিগান। একজন সেই ছোট্ট মেয়েটিকে শুধলে, 'তোর মা কোথায়?'

ভয়ে আলফার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ফ্যালফ্যাল চোখে বাড়ির দিকে সে তাকিয়ে রইল স্থাণুবৎ।

তোর মা কোথায়?

কয়েক মিনিট পরে গেরিল্লারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তাদের মাঝখানে আলফার মা পরনে তখনো রান্নাবান্না করার সময়কার এপ্রন। এবং আলফার কাকা—আলফার

বাবাকে ইতিপূর্বে ইতালি সরকার জর্মন-দের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী জর্মনিতে শ্রমিক হিসেবে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। চেঁচাতে চেঁচাতে আলফা মায়ের গা জড়িয়ে ধরতে গেরিল্লারা গুন্ডার মত তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। কাঁদতে কাঁদতে সে তাদের পিছনে পিছনে ছুটলো। প্রায় এক'শ গজ দূরে গিয়ে গেরিল্লারা আলফার মা আর কাকাকে একটা বাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড় করালে। আলফা দেখল, টমি-গানগুলো গর্জন করে উঠলো আর তার মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

লাশের গায়ে গেরিল্লারা এক টুকরো কাগজ পিন্ করে দিয়ে পাহাড়ে উধাও হয়ে গেল। কাগজে লেখা ছিল, 'নাৎসি

একটা বাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করালে
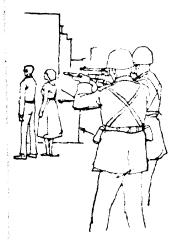
গুপ্তচরের এই গতি।' নিচে স্বাক্ষর ছিল 'স্তেল্লো'।

এই নৃশংসতায় ছোট্ট গাঁটি শিউরে উঠলো। আর এই 'স্তেল্লো'টি কে তাকেও সমস্ত গাঁ চেনে। ত্রিশ বছরের কম্যুনিস্ট আউরেলিয়ো বুসসি। গ্রামের লোক আরো

খবরের কাগজে দেখে

জানতো, পাশের ছোট্ট শহরের ঐ বুসসি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পূর্বে প্রায় এক বৎসর ধরে—স্বামী যখন বিদেশে—সিমোরা জুবেল্লির প্রণয় কামনা করে নিরাশ হয়েছে। এবং সবচেয়ে ভালো করে গ্রামের লোক জানতো, সিমোরা জুবেল্লি বা তার দেওর কখনো জর্মনদের গুপ্তচরের কাজ করেনি—এসব অজ পাড়াগাঁয়ে একে অন্যের হাঁড়ির খবর জানা থাকে। আসলে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যর্থ-প্রেমিক আউরেলিয়ো বুসসির খুনিয়া প্রতিহিংসা।

কিন্তু তখন কোথায় আদালত, কিসের আইন? কে দেবে সাজা? ভ্রাতৃযুদ্ধ, গৃহবিবাদ চলে আপন 'আইনে'।

মায়ের মৃত্যুর পর আলফার আত্মীয়দের কাছে আলফা আশ্রয় পেল। মাসের পর মাস বেচারী কথা প্রায় বলেইনি। নির্জনে চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটলো।

যুদ্ধ শেষ হল (১৯৪৫ এপ্রিল)। গেরিল্লারা নিজেদের নিজেরাই দেশের ত্রাণকর্তা বানিয়ে বিজয়োল্লাসে মত্ত হলেন। কে তখন শুধোয় যুদ্ধের সময় কে কোন্ অন্যায় কোন্ ন্যায় করেছে, কি না করেছে? হিটলারের ফেউ মুসোলিনি আর তার রক্ষিতা ক্লারা পেত্তাচ্চিকে গুলি করে মেরে মিলান শহরে এনে পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের কেটে ফেলে নর্দমায় ফেলা হল। ইতালির লোক মৃত-দেহ দুটোকে লাঞ্ছনা অবমাননার একশেষ করলে।

আলফা বড় হচ্ছে। দেখতে দেখতে সে খাঁটি ইতালিয়ান সুন্দরীর রূপ নিল। কিন্তু তবু সে রইল আগেরই মত নির্জীব, এবং প্রায়ই শোনা যেত রাত্রে ঘুমের ঘোরে বুক-ফাটা কান্নার সঙ্গে মাকে ডাকছে।

মনে হল এ মেয়ে জীবনে কখনো তার মায়ের নৃশংস অপঘাত মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছবি মনের পট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। এবং আরেকটা নাম সে কখনো তার স্মৃতি-পট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না—আ উ রে লি য়ো বু স্ সি—তার মাতৃ-হন্তা। বয়েস তার যতই বাড়তে লাগল, শান্ত বুদ্ধির বিকাশ হতে লাগল, ততই তার হৃদয় এবং মনে গভীর হতে গভীরতর রেখায় জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠতে লাগলো একটিমাত্র শব্দ : প্রতিহিংসা। এবং দিনের পর দিন প্ল্যান কষা—কি করে সে প্রতি-হিংসা কার্যে পরিণত করে মায়ের নির্মম নৃশংস পাপিষ্ঠ হত্যাকারীকে তার দাম দিতে হয়।

তারপর কয়েক বৎসর গেল এবং মনে হল আলফা বুঝি ১৫ই জুলাই ১৯৪৪ সালের ঘটনার কথা শেষমেশ ভুলে গিয়েছে। তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। সে তার সখীদের সঙ্গে নাচের মজলিসে যেতে আরম্ভ করলো। সেখানে এক ছোকরা কেরানী রিকো বাসাদন্নার সঙ্গে পরিচয় ও ক্রমে প্রণয় হল। ১৯৫৫ সালের মধ্য নিদাঘে তাদের বিয়ে হল। মনে হল, এবারে সব কিছু ভালোর দিকেই যাবে—আর ভাবনার কারণ নেই। সুখী তরুণী সুন্দরী স্বামী-সোহাগিনী, আর্থিক সচ্ছলতা, সব কিছুই। কিন্তু তার হৃদয়ের ভিতর কি চলছে সেটা কেউ দেখতে পেল না। তার মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে সে কাউকে একটি মাত্র কথা বলতো না—এমন কি তার স্বামীকেও না। কিন্তু প্রতিহিংসার কঠোর, অলঙ্ঘ্য আহ্বান তার হৃদয়ে প্রতিদিন তীব্রতর স্বরে ধ্বনিত হতে লাগল। পরে মনস্তত্ত্ববিদেরা রায় দেন, এই আহ্বান আলফাকে ম্যানিয়াকে (বায়ুগ্রস্ত) পরিণত করে তুলেছিল, এবং এই প্রতি-হিংসা-ম্যানিয়া তার স্ত্রীজনসুলভ ভাবং হৃদয়বৃত্তিকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল।

তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সব কিছু পালটে গেল—চরম ক্ষণ এসে আলফার জীবনের নূতন অধ্যায় খুলে দিল। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে আলফার স্বামী উত্তর ইতালির কারখানা-কেন্দ্র তুরিন শহরের কাছে বদলি হল।

অদ্ভুত যোগাযোগ! একদিন দৈবাৎ আলফা খবরের কাগজে দেখে তার সেই সুপরিচিত জঘন্য নাম—আউরেলিয়ো বুসসি!

সেই সেদিনকার গেরিল্লা নিকটবর্তী ছোট্ট শহর ফ্রেভালকুরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে।

সিমোরা আলফার বয়স তখন একুশ, বাইশ॥

(আগামীবারে সমাপ্য)

প্রার্থনার প্রাঙ্গণে

অজিতকুমার দাস

আমেরিকার প্রথমা মহিলা কেনেডি-জায়া জ্যাকেলিনের ভারত দর্শন হয়ে গেল। কথা ছিল তিনি কলকাতাতেও আসবেন। বঙ্গালীর মত অনেকেই বিশ্বাস করেন যে কলকাতা দেখা না হলে ভারতদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তবু অসুস্থতার জন্য কলকাতাকে সূচি থেকে বাদ দিতে হল। যদি তিনি কলকাতায় আসতেন তবে একটা রবিবারের সকাল তাঁকে কলকাতাতেই কাটাতে হত। এবং সে সকালটা তিনি কলকাতার কোন প্রসিদ্ধ গির্জাতে যেতেন, সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতেন। সম্ভবত তাঁর স্বাস্থ্য ও সম্পদ কামনা করে বিশেষ প্রার্থনাও হত।

যেখানেই জ্যাকি (জ্যাকেলিনের বদলে দেওয়া তার স্বামী, অনুরাগী এবং গুণ-মুগ্ধদের সংক্ষিপ্ত আদুরে ডাক নাম) এই সফরে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আলাদা প্লেনে উড়ে বেড়াচ্ছেন এক ঝাঁক সাংবাদিক, এরা ব্যাপকতমভাবে এবং সূক্ষ্মতম দৃষ্টি দিয়ে এর যাওয়া আসা, হাসি, কাশি, দর্শক, জনতার উচ্ছ্বাস এবং দর্শনীয় যা কিছু দেখছেন তাতে অতিপ্রিয় দর্শনার মনের আবেশ আহ্লাদ এবং স্বামী পুত্র-কন্যার অদর্শনে কোন উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা তন্ন তন্ন করে লেখায় ছবিতে টেলিভিশন ফিল্মে, টেপ রেকর্ডারে তার নিত্য নূতন নিখুঁত বিবরণী বিদেশে, বিশেষ করে জ্যাকির স্বদেশে পাঠাচ্ছেন।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছিল, কলকাতায় যখন মিসেস কেনেডী গির্জাতে যাবেন, রিপোর্টার ফটোগ্রাফাররা সেখানেই তাঁর সঙ্গে গিয়ে প্রার্থনার সময় ভিড় করবেন কিনা।

মূলত প্রশ্নটা আরও অনেক গভীর। প্রার্থনার সময় মানুষ একান্তভাবে তার অন্তরের কথা ভগবানকে নিবেদন করতে চায়। অথবা গির্জাতে গিয়ে সে ধর্ম-যাজকদের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর উপদেশের মধ্যে নিজের অনেক প্রশ্নের উত্তর, অনেক সমস্যার সমাধান খোঁজে।

ঠিক সেই সময় হয়তো যখন তিনি চোখ বুজেছেন, তখন কতকগুলি কৌতূহলী চোখ তাঁর দিকে নিবদ্ধ রইল, তাঁর মুখের ভাব পরিবর্তনের প্রতিটি চিহ্ন নোটবুকের পটে এঁকে নেবার জন্য। এই অবস্থাটা মানবতা বা শালীনতার বিরোধী কিনা। ব্যক্তি স্বাধীনতার দিনে সপ্তাহে কয়েক মিনিট মাত্র ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের নামে কেউ, তিনি যত স্বনামধন্য বা ধন্যা হোন না কেন, নিজের এই প্রাইভেসীটাকে বিসর্জন করবেন কিনা। প্রার্থনার প্রাঙ্গণে সাংবাদিকের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করা উচিত কিনা।

প্রশ্নটা মিসেস কেনেডির ভারত দর্শনে আসার অনেক আগেই উঠেছিল। তবে কেনেডিদের নিয়েই। একথা অনেকেই জানেন যে জন কেনেডি যখন তাঁর ডেমোক্রেটিক দলের থেকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন পেলেন, তখন মনোনয়নে একটা নূতন ধরনের সাড়া পড়ে গেল। কারণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডি একজন ক্যাথলিক এবং এর আগে কোনও ক্যাথলিক, অক্যাথলিক-প্রধান আমেরিকায় রাষ্ট্রচালনার ভার কখনও পাননি।

এই অসাধারণ ব্যাপারটাই ঘটে গেল এবং জন কেনেডিই হলেন প্রেসিডেণ্ট।

কেনেডিরা শুধু ক্যাথলিক নন, এঁরা খুব ধর্মভীরু, নিয়মিত গির্জায় যান এবং রাষ্ট্রপতি হবার পরও এঁর কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

এবার আরম্ভ হল রিপোর্টারদের কাজ। প্রেসিডেণ্টের পিছু পিছু এরাও গির্জেয় যেতে আরম্ভ করেছেন, তাঁর অনুগামী হয়ে, ধর্মেকর্মে না হলেও, শ্রবণে দৃষ্টিতে।

বেনারসে গঙ্গা নদীতে শ্রীমতী কেনেডির নৌকা ভ্রমণ
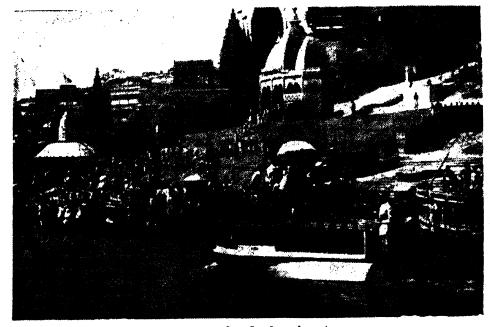
উদ্দেশ্য নানা রকমের। যিনি দেশটাকে চালাচ্ছেন। যে মন্ডলীতে তিনি উপবিষ্ট, তার উদ্দেশ্যে যাজক কি উপদেশ দিচ্ছেন? সেই মন্ডলীর পুরোধা হিসাবে তিনি কোন প্রার্থনা বিধাতা পুরুষের কাছে নিবেদন করছেন? আর তার কোন বিশেষ অংশের সময়ে রাষ্ট্রের কর্ণধার কি তাঁর কান খাড়া করলেন।

আপত্তি হল। কেনেডির পক্ষ থেকে নয়। জনসাধারণের এক অংশের কাছ থেকে। তাঁরা বললেন রিপোর্টারদের উদ্দেশে, দোহাই তোমাদের লোকটাকে অন্তত গির্জার ভিতরে তাড়া করে যেও না।

প্রত্যুত্তর এল সাংবাদিকদের কাছ থেকে, "তোমরা দয়া করে নিজের চরকায় তেল দাও। আমাদের কাজে নাক ঢুকিও না। আমরা আমাদের কর্তব্য করছি।" আরও বলা হল, "আমরাই বুঝি একা প্রেসিডেন্টের পেছনে যাই। আমরা তো অনেক দূরে বসে থাকি। কেউ টেরও পায় না। আর প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী যে ঠিক তাঁর সঙ্গে বা পিছনেই বসে থাকেন, তখন তো কিছু বলা হয় না। গির্জার কেউ তো তখন প্রতিবাদ করে বলে না, "আমাদের মধ্যে খুনে, গুন্ডাটা আবার কে?"

আসল কথা প্রার্থনার সময়ে যে কারণে প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী যান, অনেকটা সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে রিপোর্টাররাও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কোনও দুর্ঘটনা, কোন অঘটন ঘটে গেলে যেন তার খবরের ব্যাপারে মার খেতে না হয়।

তা ছাড়া প্রার্থনার প্রাঙ্গণে সাংবাদিক-দের অনধিকার প্রবেশ ঘটার সময়েই ঠিক সংবাদের প্রাঙ্গণে প্রার্থনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

আবার মিসেস কেনেডির ভারত সফরে ফিরে আসা যাক। ভারতের পথে তিনি রোমে থেমে পোপের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তাঁর আশীর্বাদও অবশ্যই এই ধর্মভীরু মহিলার যাত্রাপথের পাথেয় হয়ে রয়েছে। তাঁর পথের পাঁচালীর পাঁচমিশালী খবরের মধ্যে এর প্রাধান্য কি কিছু কম?

তিব্বতের যেসব লামা বক্সারে বৃটিশ আমলের কাঁটাতারে-ঘেরা ডিটেনশন ক্যাম্পে নিজেদের নূতন আশ্রয় গড়েছেন, একটা করে বাঁশের মাচাকে মন্দিরে রূপান্তরিত করে, তন্ময় হয়ে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন, মন্ত্র উচ্চারণ করছেন তাঁদের প্রার্থনা শেষে জিজ্ঞাসা করেছি,—"কেন তোমরা গুম্ফা ছেড়ে চলে এলে।" উত্তর নিরুত্তর করে দেয়—"প্রার্থনা করার অনাবিল স্বাধীনতা রক্ষা করতে এসেছি।"

তিন বছর আগে নেফা ফুটহিলসে দলাই লামার সংগে সংগে প্রথম যে তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থী দল এলেন একটা ভারতীয় আর্মি ক্যাম্পে, তাঁদের বিশ্রাম ও চা-পান শেষ করবার পর, যে যার সংগে আনা জিনিস গুছিয়ে নিতে লাগলেন, প্রকাশ্যে নির্ভয়ে বের করে। পরনে যে বাকু তার অজস্র ভাঁজের আড়াল থেকে একজনের বের করা পরম সম্পদগুলি দেখছিলাম। কোলের দিকের এক ভাঁজ থেকে বের হল ছোট্ট একটি কুকুর, তিব্বতী ম্যাস্টিফ। চোখ প্রায় বোজাই ছিল। বাইরে এসে মিটমিট করে তাকাচ্ছে। সলজ্জ, কিন্তু সপ্রতিভ। স্বাধীন আবহাওয়ার সংগে শুভদৃষ্টি।

আর বাকুর পিঠের ভাঁজ থেকে বার হল, একটি বুদ্ধের মূর্তি। এ-দুটি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আনেনি। জিজ্ঞাসা করি, কি করে বাঁচিয়ে আনলে এতটা পথ, এত দুর্গমপথ? উত্তরটা বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়, "আমি বাঁচাবার কে? যিনি আমায় বাঁচালেন, তিনিই তো সংগে!"

পূর্ব-পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী সর্বস্ব ফেলে রেখে চলে এসেছেন। কিন্তু পারতপক্ষে কেউ ঠাকুরটিকে ফেলে আসেননি। দন্ডকারণ্যে শরণার্থীদের বসতির অনেক ছবি দেখেছি। মন ভরেনি ভরল, যেদিন দেখলাম, কর্তারা ওখানেও খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তনের আসর পেতেছেন। বিত্ত গেছে যাক, চিত্ত বাঁচুক।

গোয়া সীমান্তে দেখা আমেরিকান "বাল্টিমোর সান" কাগজের পক্ককেশ প্রবীণ সংবাদদাতা ফিল পটারের সঙ্গে। ইনি গোয়া অভিযান শুরুর আগেই করাচী হয়ে পাঞ্জিম পৌঁছেছিলেন। পাঞ্জিম ক্যাথলিকদের বিশেষ প্রিয় তীর্থস্থান। সেন্ট জেভিয়ারের দেহ এখানে রক্ষা করা হয়েছে। কয়েক বছর অন্তর বিশেষ দিনে একবার করে জনসাধারণকে দর্শনের অধিকার দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনা-বাহিনী যখন গোয়ার সীমান্তে এবং গোয়া-মুক্তি আসন্ন, তখন দিনের পর দিন গোয়া রেডিও থেকে গোয়ার ক্যাথলিকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেতাম, "তোমরা প্রার্থনা কর, যেন সব 'বিপদেই' গোয়াবাসীরা সাহস শৌর্য না হারায়।" এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অবশেষে বিপদের মুহূর্তে নূতন প্রেরণা পাওয়ার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্সের দেহকে অপ্রত্যাশিতভাবে গোয়াবাসীর দর্শনের জন্য উপস্থাপিত করা হল। আর হল নানা সমবেত প্রার্থনা।

এই প্রার্থনায় ফিল পটার উপস্থিত ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা, বলতে কি প্রার্থনা এই বৃহৎ মন্ডলীর সামনে তাঁদের ধর্মযাজক উচ্চারণ করেছিলেন? প্রার্থনায় প্রায় সবাই তো মুক্তিকামী ভারতবাসী।" উত্তরে জানলাম, গোয়ার রাজনৈতিক মুক্তি বন্ধ হোক, এমন কথা একজনও উচ্চারণ করেনি। প্রার্থনার মূল কথা ছিল, অ-ক্যাথলিকদের ধর্মান্ধ আঘাত যেন ক্যাথলিকদের পুণ্যস্থান এবং তাঁদের পরমপুরুষ সেন্ট জেভিয়ার্সের কোন ক্ষতি না করে।

এর পরে গোয়ামুক্তির অনেক ছবি দৈনিক কাগজে বেরিয়েছে। তার একটি ছবির কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। গোয়া মুক্তির পর পাঞ্জিমের রাজপথে চলেছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গাড়ির সারি। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে অযাচিতভাবে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন গোয়াবাসী ভারতীয় ক্যাথলিক নায়কের কয়েকজন। মুখে পরম নির্ভর ও প্রশান্তির হাসি, তাতে রয়েছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য অভিনন্দনের সুস্পষ্ট ছাপ। গোয়ার পরাধীনতা নির্মূল হয়েছে। কিন্তু একটি আঁচড়ও পড়েনি একটি ক্যাথলিক ধর্মস্থানে। সেন্ট জেভিয়ার্স শুধু যে যথাস্থানে আগের মতই আছেন তা নয়, প্রথম সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও ছিলেন একজন ক্যাথলিক। তিনি এগিয়ে এসে সেন্ট জেভিয়ার্সের কাছে নতজানু হয়ে অন্য ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন।

ভারত সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি

প্রকৃত মুক্তির প্রার্থনা ব্যবস্থায় পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের রাজনৈতিক মতলববাজের ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে।
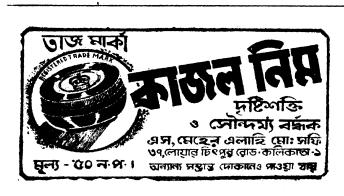
এই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারী নীতি সম্ভব হয়েছে শুধু সাধারণ ভারতবাসীর সহযোগিতাতেই। আরেকটু বাড়িয়ে বলা যায় যে, মূলত হিন্দুধর্মের বর্তমানের ব্যাপক উদারতায়। ধর্মনিরপেক্ষতাটা সব সময়ে চোখে পড়ে না। ওটা অনেকটা খোলা হাওয়ার মত। যতক্ষণ আছে কদর নেই। একটু কম পড়লে বা ঝড় উঠলেই প্রাণান্তকর অবস্থা, কিন্তু উদারতার মধ্যে একটা হৃদয় জয় করার মোহিনী শক্তি থাকে। স্থানকালপাত্রবিশেষে তা বিরাট খবর হয়ে ওঠে।

বৃহস্পতিবার, ১৬ই মার্চ। সকালে গঙ্গার পারে নৌবিহারে বারানসীর মন্দিরঘাট পরিদর্শন করছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট-জায়া জ্যাকেলিন কেনেডি। গাঁদাফুলে ঢাকা স্টীমলঞ্চটি তরতর করে বয়ে চলেছে। পেছনে আরও দুটো স্টীমলঞ্চে করে প্রায় ১৫০ জন সাংবাদিক চলেছেন। বেশির ভাগই আমেরিকান। যেই একটি মন্দিরের কাছে মিসেস কেনেডির লঞ্চটি এল, বেজে উঠল মন্দিরের ঘণ্টা। উদ্দেশ্য, স্বাগত জানান।

বিদেশীর কাছে বারানসীর পরিচয়—"Benares—the Holy City of the Hindus."
হিন্দুর মন্দির থেকে অ-হিন্দুর উদ্দেশ্যে স্বাগত জানিয়ে ঘণ্টা ধ্বনি?
"What ? But she is a Christian !" মন্তব্য করলেন একজন মার্কিনী খৃষ্টান টেলিভিশান ব্যাখ্যাকার।
"Yes, but it is Hindu hospitality flowing out from the temples to the distinguished guest who has come all the way to Benares," উত্তর দিলাম।

বহু টেপরেকর্ডারে সেই ঘণ্টাধ্বনিকে আবদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। হয়তো এতদিনে মিসেস কেনেডির যাত্রার বিবরণীর সঙ্গে বিভিন্ন তরঙ্গে তা দেশে-বিদেশে পরিবেশিত হয়েছে।

হৃদয়-দুয়ার যেই খোলা হল, অমনি মন্দিরের প্রাঙ্গণের বাইরে এসে পৌঁছাল সেই শাশ্বত আহ্বান—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" হোলির শুরুতেই সেই আবির রংয়ের পোশাক-পরা, বিচিত্র রংএর ফুলের মালা গলায় ভিন্নধর্মী বিদেশিনীর মন রাঙিয়ে দিল বারানসীর মন্দিরের পূজারী।

প্রার্থনাসুলভ উদার বিশ্বজনীনতা বিশ্বের সামনে প্রথম শ্রেণীর সংবাদরূপে প্রচারিত হল।

সাংবাদিক ছাড়া আর কে ঘটাতে পারত এই পরিচয়?

শ্রীনেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন, আচার্য কৃপালনী যদি বিদেশে গিয়া একবার ভারতের দিকে তাকান তবে তিনি ভারতের যে কতখানি উন্নতি হইয়াছে তাহা সঠিক বুঝিতে পারিবেন।

খুড়ো বলিলেন—"তা হয়ত পারবেন। তবে কুতুবমিনার থেকে তাকিয়ে যা দেখা যাচ্ছে তাতে নীচের ঘর-বাড়ি-মানুষকে পুতুল-পুতুল ছাড়া আর অন্য কিছুই মনে হয় না।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জনৈক বিরোধী সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন, —সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর গলদ ছিল বলেই কৃষির ব্যাপারে যতটা অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নাই। —"কিন্তু আমরা তো মুখ্যমন্ত্রী মশায়ের চোখের অপারেশন সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছে বলেই শুনেছিলাম।" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

দিল্লীর খবরে প্রকাশ, লোকসভার পরাজিত সদস্যদের উপর "বাড়ি ছাড়ুন" নোটিস দেওয়া হইয়াছে। আমাদের

জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"সদস্যগণ হয়ত মনে মনে বলছেন—ধন আর মান আর এই খাসা বাসা করেছিনু আশা!!"

দিল্লীরই অন্য এক সংবাদ—শ্রীনেহরুর বাসভবনে সংসদের বিদায়ী সদস্যগণকে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয়। নেহরুজী সবাইকে লইয়া হোলি খেলায় মাতিয়া উঠেন—"হয়ত মনের বেতারে গানও চলেছে—রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যুবার আগে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ডাক ও তার বিভাগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা শুনিলাম পঞ্চান্ন। পরিষদের সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত এক সভায় জহরলালজী নাকি সদস্যসংখ্যার কথা শুনিয়া সহাস্যে মন্তব্য করেন—গণতন্ত্রের বৃদ্ধির প্রতীক! এত বেশী সদস্য থাকিলে পরিষদ জনসভা হইয়া উঠে। —"কিন্তু তাই বলে ভারতের বাণী নাম্পে সুখর্মাস্ত তো আমরা ভুলতে পারিনে।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে শুনিলাম এপ্রিল হইতে মেট্রিক ওজন ছাড়া অন্য ওজন অবৈধ। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন— —"পাষাণ ভাঙ্গার হাতসাফাইটা হয়ত ওজনের বাজারে বরাবরের মতোই বৈধ থাকবে!!"

বিদ্যুৎহার বৃদ্ধি সঙ্গত কিনা তাহা নির্ণয়ের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। —"কিন্তু কমিটির কী প্রয়োজন? মূল্য-বৃদ্ধির ব্যাপারে 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' নীতিটা মনে রাখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শুনিলাম, পাকিস্তান নাকি আরো বেশি গঙ্গাজলের দাবি জানাইয়াছেন।—"মনে না করে উপায় নেই—ভাগের মা গঙ্গা পায় না।"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় জনৈক সদস্য নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, অশীতিপর মহাস্থবির তাঁর মন্ত্রিসভায় কতকগুলি ভাঁড় রাখিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"মন্ত্রিপর্যায়ের খবরাখবর আমরা বড় একটা রাখিনে, তাই এই নিয়ে কিছু বলা আমাদের সাজে না। তবে এ কথা বলবই —মহারাজ যদি গোপালকে না রাখতেন তা হলে তাঁর রাজসভা নেহাতই মনুমেন্টের তলা হয়ে উঠত!!"

রুশ-চীনের সম্বন্ধে ফাটল ধরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শুনিলাম, রাশিয়া চীনের সঙ্গে আর ধারে কারবার করিবেন না। —"কিন্তু হাজার হোক, বন্ধু তো! সুতরাং কড়া কথা না বলে বরং 'বাকী চাহিয়া লজ্জা দিবেন না' নোটিস দিলেই হয়ত সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ, পথ-দুর্ঘটনার ফলে জনৈক ব্যক্তির চারিবার "মৃত্যু" হয় অর্থাৎ হার্টের কাজ

বন্ধ হইয়া যায়। সর্বশেষে চিকিৎসকগণ তাহাকে একটি বিদ্যুৎচালিত হৃদয় দান করিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন—উহাতেই হৃদয়ের কাজ চলিবে।—"কিন্তু হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে—কাজেও কি বিদ্যুৎচালিত হৃদয় সাড়া দেবে?"—প্রশ্ন করে আমাদের শ্যামলাল।

সিডনীতে শুনিলাম জনৈক ভদ্রলোক একটি উড়ন্ত হেয়ার কাটিং সেলুন তৈয়ার করিয়াছেন। —"আমাদের ইট-আলিয়ান বা ব্রিক্ সেলুনের মালিকরা অবহিত হউন।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এইবার হোলি খেলায় তেমন উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় নাই; অশোভন আচরণের জন্য মাত্র ১৭৯জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল —"এ আর এমন কী, Hooli-গানে দু-একজন তালকানা থেকেই থাকে!"

বেলগ্রেড হইতে প্রাপ্ত সংবাদে শুনিলাম, সেখানে নাকি একটি ১৬ মাইল লম্বা দুধের পাইপ স্থাপন করা হইয়াছে—উহার মধ্য দিয়া দিনে ৪৪০০ গ্যালন দুধ সরবরাহ করা হয়।—"তার চেয়ে অনেক গ্যালন বেশি দুধ আমরা হাইড্রেন্টের ভিতর দিয়ে সরবরাহ করে থাকি।"—বলেন বিশুখুড়ো।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে আমাদের ক্রিকেট খেলার ফলাফল দেখে অনেকেই মর্মাহত হইয়াছেন। বাকী খেলাগুলিতে তাঁরা কী করিবেন এ লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেও আর ভরসা হয় না। জনৈক ক্রীড়ারসিক স্মরণ করাইয়া দিলেন—"এটা চৈত্র মাস। বাবা তারকনাথের চরণে সেবা বলে আর্তনাদ করা ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছু নেই!!"

রাজগি ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য

রবীন্দ্রনাথ একদা ত্রিপুরায় বলিয়াছিলেন, "এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। * * এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।

"রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মত চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সংযত, তেমনই সুসংস্কৃত —তেমনি সরস। মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ।" (১)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও প্রবণতার বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকার সূত্র ত্রিপুরার প্রতি কবির আকর্ষণের যে অন্যতম কারণ ছিল, তাহা তাঁহার আপন কথায় সুপরিব্যক্ত। স্মরণযোগ্য শতাধিক বর্ষকাল মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধক ও স্রষ্টাদিগের মধ্যেও বহু মনীষীই ত্রিপুরার এই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একদা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন ত্রিপুরার একটি সুবর্ণমুদ্রা "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য শ্রীশ্রীমতী মহারাণী গুণবতী মহাদেব্যা" বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ সন্দর্শনে পুলকিত ও উৎসাহিত হইয়া তৎসূত্রেই "বঙ্গভাষা সংবর্ধন সভার" ত্রিপুরেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (২) অনুরূপ আকর্ষণেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ খ্যাতিমান পণ্ডিতবৃন্দের ত্রিপুরার সহিত সংযোগের কথা সমসাময়িক ইতিহাস সাক্ষ্যবহন করিতেছে।

ত্রিপুরায় বঙ্গভাষার প্রসার ও উন্নতি সম্বন্ধে অতীত সময়ে কেহ কেহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর (দেববর্মা), কৈলাসচন্দ্র সিংহ, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিদ্বজ্জনের প্রকাশিত আলোচনাসমূহে সীমিত পরিসরের মধ্যে ইহার সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব হয় নাই। একারণেই এগুলি ভাষার গতিশীলতার ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত নহে। ভাষা ও সাহিত্যে বহুমুখীরূপ এবং ধারার আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক। সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সংস্কৃতিমূলক প্রধান ধারাটির বাহিরেও ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা ক্রমোন্নত হইয়া যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সাবলীল ও শক্তিসম্পন্ন ব্যবহারিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, আমাদের বর্তমান আলোচনা বাংলা ভাষার সেই বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট রূপটি লইয়া।

ইহাই হইল রাজগি ত্রিপুরার সরকারী বাংলা। ইহাই আবার প্রশাসনিক আমলাই বাংলা। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে দুইখানি মূল্যবান অথচ অধুনাবিস্মৃত ঐতিহাসিক আদালতি দলিল সর্বাগ্রে উদ্ধৃত হইতেছে। এই দলিলগুলির রচনা, গঠন ও প্রয়োগ ইত্যাদি আঙ্গিকে সাহিত্যের বিচারেও এগুলি উচ্চ মূল্যায়নে সম্মানিত হইবে, সন্দেহ নাই। প্রায় নব্বই বৎসর পূর্বে (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) প্রচারিত সমকালীন দলিল দুইটিতে বাংলা ভাষায় মৌলিক তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য এবং প্রয়োগ, বহু শতকের প্রভাবিত আরবী-ফারসীর কেবলমাত্র আকস্মিক ও আবশ্যিক উপস্থিতি,

রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকিশোর

(১) ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থ, ৩৬২ পৃষ্ঠা।

(২) দেশীয় রাজ্য—কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা।

ইংরেজী হইতে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্তি বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রথমটির প্রসারিত হেতুবাদ এবং 'বলাভ্ভয় বিরহে', 'স্বত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব', 'যুগমস্তু', 'সুনন্ধাবনী', 'জেনেদ-বান্দ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং ইহার নবম ধারার ভাষাবিন্যাসে মুনশিয়ানা ও ব্যাকরণের লুকোচুরি খেলা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভাষার গতি যে পরবর্তী সময়ে সাধু ও মৌলিক ধারা হইতে সরল বা প্রাঞ্জল ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ক্রমেই পাওয়া যাইবে।

(নিদর্শন ১)

স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৩ বার্ষিক
১ম সংখ্যক নিয়মাবলী

এই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ শক ত্রিপুরার (৩) ২য়া মাঘ তারিখে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন।

ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্যে রাজকীয় বিধিসকল লিপিবন্ধক্রমে প্রচলিত করিবার নিয়মাবলী।

হেতুবাদ।

সমুদয় চরাচরের যথানিয়মে শান্তি-রক্ষার্থে এবং বলাভ্ভয়বিরহে (৪) নির্বিঘ্নে সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করণার্থ যত্ন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য এবং প্রজাবর্গের স্বত্বাধিকারীত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব রক্ষা করাই একমাত্র প্রধান ধর্ম বটে, সেই শান্তি ও স্বত্বারক্ষার জন্য দেশের ঐ সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির আদায় স্বারা সামাজিক ব্যবহার বিষয়ক নিয়ম স্থির হওয়া বিষয়ে যেহেতু কার্যের শাসনপ্রণালী নিয়মপ্রণালী পারতন্ত্র না হইলে মানববৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতারহিত ও সুখসমৃদ্ধির ও স্বত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব উদ্ধার ও সংরক্ষণের উপায়ান্তর নাই। সেই সকল নিয়ম ও বিধি লিপিবন্ধ হইয়া স্বাধীনরাজ রাজত্বসকলে প্রচারিত হওয়া উচিত ও তদ্দ্বারা সময়ে ২ দেশীয় ও বিদেশীয় বিধিসকল পরস্পর তুলনা ও পর্যালোচনাকরতঃ স্বরাজ্য প্রচলিত বিধির ব্যাপকত্বে যে যে অংশে অসম্পূর্ণতা নিমিত্ত দোষ জন্মে, সেই সেই দোষের সংশোধনকরণের উপায় স্থির করা যাইতে পারে; প্রজাবর্গ রাজনিয়ম সমস্ত অবগত হইয়া তদনুগামী হওয়তঃ স্বীয় স্বীয় ধনসম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। রাজনিয়মের প্রতিকূলতাচরণের প্রতিকার অবিলম্বে হইবার পথ হইতে পারে, সুবিচার বিধান হইবার জন্য বিচারকগণের সাহায্য হইবার উপায় হইতে পারে ফলতঃ দেশীয় ন্যায়ানুগত বিধি সমস্তের সুনন্ধাবনী (৫) শ্রেণীমতে লিপিবন্ধ না থাকিলে সময়ে সময়ে বিচারকদিগের বিচারকার্যের ভ্রমপ্রমাদ সংযুক্ত হইয়া রাজার কর্তব্যকার্যসমূহে বিঘ্ন সংঘটন হইবার নিতান্তই সম্ভাবনা। এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে ভূতপূর্ব মহারাজগণের রাজত্বসময়ে যদ্যপিও নানা বিধান প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যথানিয়মে সেই সকল বিধান শ্রেণী ও লিপিবন্ধ না থাকা প্রযুক্ত অসীম অসুবিধার কারণ হইয়াছে। যেহেতু সেই সকল অসুবিধা রহিত এবং ত্রিপুরা স্বাধীন রাজত্বের রাজকীয় নিয়মসকল লিপিবন্ধক্রমে প্রচার করা বিহিত, অতএব ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মসকল করা গেল।

১ ধারা। সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ইত্যাদি বিষয়ের কার্যবিধান যুগমস্তু (৬) পূর্বাপেক্ষা উত্তম করিবার নিমিত্ত এবং সকল লোকদিগের চিরমঙ্গল সাধননিমিত্ত যখন যে বিধিব্যবস্থা প্রচলিত করা হয়, তাহা বঙ্গভাষা ও অক্ষরে লিপিবন্ধরূপে হইবে। অলিখিত কোন বিধান কদাপি কোন কার্যে পরিণত হইবে না। সেই সকল বিধান যে বৎসরের প্রচারিত হয়, সেই প্রত্যেক বৎসরের প্রথমাবধি একাদিক্রমে অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ নম্বরাবলী করা যাইবেক।

ধারা ২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণ পূর্বাবধি যে নিযুক্ত আছে কি

(৩) ইংরেজী ১৮৭৪ অথবা ১২৮০ বাংলা সনে প্রবর্তিত নিয়মাবলী। সন স্থলে শক শব্দের ভ্রমাত্মক প্রয়োগ ঘটিয়াছে।

(৪) বলাৎ+ভয়+বিরহে=বলাভ্ভয়বিরহে। বল-উপজাত ভয় বিবর্জিত অর্থে তৎকালে প্রচলিত হইত।

(৫) সু+অনুধাবনী=সুনন্ধাবনী। উত্তমরূপে অনুধাবিত অর্থে ব্যবহৃত।

(৬) সংস্কৃত ক্রিয়ায় অস্ (হওয়া)+তু (অনুজ্ঞায়)=অস্তু। যুগ এবং অস্তু শব্দদ্বয়ের সংযুক্তিতে যুগোপযোগী অর্থে ব্যবহৃত।

উত্তরকালে হইবেক, তাহারা ঐ সকল নিয়মাবলীর প্রকৃত তাৎপর্যে ও অর্থানুসারে কার্য করিবে ও সকল লোকদিগের স্বত্বাধিকারী এবং লভ্যাধিকারীদের যে যে নিয়মাবলীতে অবলম্বন করে, তাহা সকলের বিজ্ঞাপনার্থে ঘোষণা করা যাইবে।

ধারা ৩। উত্তরকালে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে ইহা বিবেচনা করিবার পথ হয় যে, কোন নিয়মাবলীর তাৎপর্য ও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল কিনা, এজন্য ঐ সকল বিচারক কি ক্ষমতাপন্ন কার্যকারকগণ সময়ে সময়ে ঐ সাক্ষাৎকারে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে অনুভবানুসারে ঐ নিয়মাবলীর যেরূপ মতান্তরকরণ কিংবা সংশোধন উপযুক্তবোধ হয়, তাহা ঐ শ্রীশ্রীযুত কর্তৃক হইতে পারিবেক।

৪ ধারা। যে তারিখে শ্রীশ্রীযুতের সম্মতি প্রচার হয়, তাহা ঐ নিয়মাবলীর শিরোভাগে লিখিত থাকিবেক ও সেই তারিখাবধি সেই নিয়মাবলী প্রচলিত হইল এই প্রকার গণ্য হইবেক ও তৎপর তাহার অর্থ ও মর্মানুসারে কার্য হইবেক অন্য কোনমতে নহে।

৫ ধারা। যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয়, তাহার এক ২ প্রবস্ত নকল উপযুক্ত কার্যকারক দ্বারা প্রস্তুত হইয়া শ্রীশ্রীযুতে সাক্ষাতের ইংরেজি সহি ও পাঞ্জমোহর সংযুক্ত প্রত্যেক দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণ সমীপে যাইয়া অফিসে বর্তমান থাকিবেক; বৎসরান্তে সেই বৎসরের সমুদয় নিয়মাবলী একত্রিত হইয়া জেলেদবন্দি হইবেক। যে বিষয়ের যে নিয়মাবলী নূতন জারী হয়, তাহার অর্থ যদি সে বিষয়ের পূর্বের জারীহওয়া নিয়মাবলী সমুদয়ের কিংবা তাহার মধ্যে কোন মর্মের অর্থের সহিত না মিলে, তবে বোধ করিতে হইবে যে, পূর্বের জারীহওয়া নিয়মাবলী যে পর্যন্ত নূতন জারীহওয়া নিয়মাবলীর অর্থের সহিত মিলিত না হয়, পূর্বকার নিয়মাবলী সেই পর্যন্ত মতান্তর হইল পূর্বকার নিয়মাবলী রহিত হইল, এই প্রকার কোন স্পষ্ট আদেশ না থাকিলেও তাহা হইবেক।

৬ ধারা। যদি কোন বিচার ক্ষমতাপন্ন কার্যকারক কোন নিয়মাবলী কিংবা তাহার কোন অংশের অর্থ ও মর্ম পরিগ্রহ করিতে না পারেন, তবে স্বীয় উপরিস্থ কার্যকারক স্থানে তাহার অর্থাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। ঐ উপরিস্থ কার্যকারক শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের সম্মতিযুক্তে ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ ধারা। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে শাসন সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত যে সমস্ত কার্যকারক ও যে সমুদয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণের ক্ষমতা থাকিবেক, যে কোন বিষয়ে কোন নূতন নিয়মাবলী প্রচার হওয়া উচিত বিবেচনা করিলে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে তাহার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রেত হইলে শ্রীশ্রীযুতের আদেশানুসারে উপযুক্ত কার্যকারক দ্বারা সাধারণের বোধগম্যরূপে প্রচলিত সুললিত সরল সাধুভাষায় তাহার পাণ্ডুলিপি হইয়া শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ও পঠিত হইবেক। তৎপর তাহা শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের মনোনীত হইলে উপরিউক্ত বিধানানুসারে প্রবল ও প্রচার করা যাইবেক।

৮ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যে সকল নিয়মাবলী প্রচারিত হয়, তাহা ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বের সমুদয় দেশে ব্যাপ্ত হইবে কোন ব্যক্তি জাত্যংশ অথবা বংশমর্যাদা প্রযুক্ত ঐ সকল নিয়মাবলীর বিধানের বর্জিত হইবে না।

৯ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয়, তাহার অর্থকরণে এক বচনবোধক শব্দ বহু বচন, বহু বচনবোধক শব্দে এক বচন ও স্ত্রী লিঙ্গবোধক শব্দে পুং লিঙ্গ ও পুং লিঙ্গবোধক শব্দে স্ত্রী লিঙ্গও বুঝাইতে হইবে। ইতি—

Sd. M. R. Roy (৭)

(নিদর্শন ২)

স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৪ বার্ষিকী সংখ্যক নিয়মাবলী।

এই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ ত্রিপুরার...... তারিখে (৮) শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র

---

(৭) ত্রিপুরার সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি রাজা মুকুন্দরাম রায় স্বাক্ষরিত।

(৮) ১৮৭৪ ইংরেজী অথবা ১২৮৩ বাংলা সনে প্রচারিত। প্রাপ্ত দলিলে তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

...ণিক্য বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্যে যে সকল বিচার আদালত সংস্থাপিত আছে ও উত্তরকালে হয় তাহার বিচারকারীগণ স্বারা নিষ্পত্তিপত্রাদি লিখিত হইবার বিধান করিবার নিয়মাবলী।

হেতুবাদ।

এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে যে সকল দেওয়ানী ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত আছে ও তাহাতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়, তাহার বিচার বিষয়ের মোকদ্দমা এবং উত্তর পক্ষের গুজারিত সাক্ষিগণের সাক্ষ্যতাও শেষ নিষ্পত্তিপত্র সর্বদাই বিচারকারী স্বারা লিখিত না হইয়া আমলা স্বারা লিখিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও শোচনীয় প্রথা বটে। ইহা স্বারা কোনমতেই সুবিচার বিহিত হইবার ভরসা করা যাইতে পারে না বরং সময়ে সময়ে মোকদ্দমাকারীদিগের স্বত্বের নীলাম হইবার সম্ভাবনা আছে যে-হেতু এই অন্যায্য ব্যবহার রহিত ও নিবারিত হওয়া উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইয়াছে, অতএব নিম্নোক্ত বিধান করা গেল।

১ ধারা। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজ্য প্রদেশে যে সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত আছে ও উত্তরকালে হইবেক তাহার সকল শ্রেণীর বিচারকর্তাদিগের অবশ্যই কর্তব্য হইবে যে, তাহাদের স্বারা যে যে বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয়, তাহা অর্থাৎ বিচার্য বিষয়বস্তু এবং সেই সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই সেই নিষ্পত্তির হেতু সকল আপনাদের হাতে লিখেন ও তাহাতে অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তার্পণ করিতে না দেন ও তাহা সর্বদাই আদালতের চলিত ভাষায় লিখা যায় যদি বিচারকের স্বীয় ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হয় ও বিচারকারী আদালতের চলিত ভাষা পরিষ্কাররূপে লিখিতে সক্ষম না হন, তবে বিচারকারীর স্বীয় হস্তে স্বীয় ভাষা লিখিত হইয়া আদালতের চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইবেক।

২ ধারা। উক্ত সকল শ্রেণীর আদালতের মোকদ্দমাতে কি কার্যে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়, তাহা নিয়তই বিচারকারী স্বারা লিখিত হইবে। যদি বিচারকারী শারীরিক দৌর্বল্য অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে সমুদয় জবানবন্দী লিখিতে অশক্ত হয়, তবে সমস্ত জবানবন্দী বিচারপতির আজ্ঞাধীনে ও কর্ণগোচরে আমলা স্বারা লিখিত হইবেক, তাহার সার-ভাব বিচারকারী স্বয়ং লিখিবেন ও যে যে কারণে সমুদয় জবানবন্দী বিচারকারী কর্তৃক লিখিত হইতে পারিল না, তাহার হেতুবাদ জবানবন্দীর নিম্নে তাহা লিখিবেন।

৩ ধারা। সকল শ্রেণীর বিচারকর্তাদিগের ইহা অতি দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদিগের স্বারা এই নিয়মাবলীর অন্যথাচরণ করিলে তাহাদিগের নিষ্পত্তি ঐ হেতুমূলেই রহিত হওয়ার যোগ্য হইবেক।

Sd. B. C. Deb (৯) Sd. Nilmoni Das
Dewan.

ত্রিপুরায় প্রচলিত প্রশাসনিক বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্বন্ধে এযাবৎ বেশী আলোচনা হয় নাই। সম্প্রতিকালে আমাদের জনৈক অধ্যাপকবন্ধু "ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষা" প্রসঙ্গে একটি সাময়িক পত্রে (১০) খানিকটা আলোচনাপূর্বক আমাদের সংগ্রহ হইতেই সরকারী ভাষার ১৫।২০টি দালিলিক নিদর্শন বাছিয়া সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি ত্রিপুরা দরবারে মধ্যযুগে বাঙালীর প্রভাব প্রতিপন্ন ছিল কিন্তু, ত্রিপুর-রাজবংশের ইতিহাস, বাংলায় রচিত রাজাবলী, রাজমালা ইত্যাদি গ্রন্থের প্রাচীন প্রভৃতি অধিকতর অনুধাবনীয় বিষয়...

(৯) স্বাক্ষর—মহারাজ বীরচন্দ্র দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর।
(১০) সমকালীন (কলিকাতা)—ভাদ্র, ১৩৬৪।

সম্বন্ধে সংকিন্ত ও সন্দিহান প্রশ্ন আরোপ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিটিই ত্রিপুরায় বাংলা ভাষার প্রবর্তন সম্পর্কে দিকনির্দেশক জ্ঞান করি। উদ্ধৃত পত্রে আচার্যদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টীয় মধ্য-চতুর্দশ দশক হইতে ত্রিপুর দরবারে বাংলা ভাষা গৃহীত হইয়াছিল এবং ত্রিপুর দরবারে তদবধি একটি বলিষ্ঠ এবং কার্যকরী বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় কার্যে রাজভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। রাজদরবারে ও প্রশাসনিক কার্যে বাঙালীর প্রভাব ছিল কিনা অথবা কতদূর ছিল, তৎসম্বন্ধে কেবলমাত্র একটি আলোচনার উল্লেখই (১১) কৌতূহলী পাঠকের সমীক্ষার পরিসর অনেকখানি দীর্ঘ করিবে। ইহা শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমারের সুচিন্তিত মতেরও পরিপোষক হইবে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ মতান্তরে চতুর্দশ শতকে রাজমালায় বর্ণিত ত্রিপুরেশ্বর রত্নফাণিক (আদি) গৌড়দেশ হইতে সৈনিক, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি বহু বঙ্গসন্তান ত্রিপুরায় আনয়নপূর্বক উপনিবিষ্ট করান। উপনিবিষ্টগণের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও সুপণ্ডিত পণ্ডিত ঘোষ, জয়নারায়ণ সেন বৈদ্যরাজ ও আচার্য পণ্ডিতরাজ (ব্রাহ্মণ) ত্রিপুরার দরবারে বিশিষ্ট সম্মানলাভ এবং রাজকার্যে গৌরবপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ইহাদিগেরই বিশেষত বড়খাণ্ডব ঘোষের বংশধরগণের মধ্যে ২১।২২ জন কৃতী সন্তান পুরুষ-পরম্পরায় ত্রিপুর দরবারে উজীর, নারায়ণ, সেনাপতি, বিশ্বাস, ওয়াদ্দেদার, দেওয়ান প্রভৃতি পদে ও লজবে ধারাবাহিকভাবে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজমালা গ্রন্থলেখক সুপণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তদীয় গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থরচনা উপলক্ষে তাম্রশাসনাদি ও কাগজে লিখিত পুরাতন সনন্দসমূহ দর্শনে এই বংশাবলীর এবং তাঁহাদিগের রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা এবং আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণসূত্রে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ত্রিপুরা-দরবার বেশ কয়েক শতাব্দীকাল বঙ্গসন্তানগণের সাংস্কৃতিক প্রভাবে সুগভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ফলে, স্মরণাতীত কালাবধি বঙ্গদেশের প্রত্যন্তে অবস্থিত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যখণ্ডে বঙ্গভাষাই রাজভাষার গৌরব অর্জন করে। শত শত বৎসরের বহিঃবিপ্লব এবং আন্তর্দেশীয় সংঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও বাংলা ভাষার ভিত্তি সেখানে সর্ববিধ সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক-ক্ষেত্রে দৃঢ়তর হইয়াছে। অবশ্য কালের প্রভাবে ইহা সাময়িকভাবে নবতর রূপ পরিগ্রহমাত্র করিয়াছে।

সমগ্র বঙ্গদেশের ন্যায় ত্রিপুরায়ও অন্তত ২।৩ শতাব্দীকাল রাজভাষায় যেমন ফরাসী-আরবী ও উর্দু শব্দ বহুল পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, পক্ষান্তরে সংস্কৃত ও দেশজ এমনকি পাহাড়ী সর্বজন পরিচিত ও বোধগম্য শব্দ ত্রিপুরা কদাপি বর্জন করে নাই। অনুরূপ কারণেই, বহু ইংরেজী শব্দের বাংলা অথবা মৌলিক প্রতিশব্দ রচনার পরিবর্তে, সম্প্রতিকালে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সহজবোধ্য সামান্য কিছু ইংরেজী শব্দই রাজভাষায় গৃহীত হইয়াছে। আঞ্চলিক সংবেষ্টনী-নির্ভর প্রশাসনিক-রাজভাষা বিশুদ্ধ-সাহিত্য-কর্ম নহে। ইহা হইল সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ভাব বিনিময়ের অন্যতম বাহন। সুতরাং প্রশাসনিক আবশ্যিক সংযমের গণ্ডীতে সংযত থাকিয়া "সাধারণের বোধগম্য প্রচলিত সুললিত সরল সাধু ভাষায়" রাজকার্য পরিচালনের মধ্যেই যে প্রযোজিত ভাষার সর্বোত্তম কার্যকারিতা ও সার্থকতা, ঐ আদর্শ পূর্ব-বিধৃত নিয়মাবলীতে (৭নং ধারা) অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সুষম সাযুজ্যের প্রকাশই ত্রিপুরায় রাজভাষার ক্রমবিকাশের মূল সূত্র। প্রয়োজনের পরিসরও অবশ্যই রাজাগির সীমানার মধ্যেই সীমায়িত ছিল। বহিঃরাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাজ্যের পলিটিক্যাল বিভাগ হইতে ইংরেজীর মাধ্যমেই সংসাধিত হইত।

'হাওলাতী ভাষার' টেবুতে আমরা এখন অনেক স্থলেই বিভ্রান্ত হইতে চলিয়াছি। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, ভাষার সংস্কার সাধন এবং পরিশোভিত পরিবর্ধন আমরা করিব না। অবশ্যই করিতে হইবে এবং সুখের কথা, অধুনা অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সরকারের প্রশাসনিক

(১১) সমাচার শারদীয় সংখ্যা (আগরতলা), ১৩৬৮ বাং—২০২ পৃষ্ঠা।

ভাষায় সহজার্থজ্ঞাপক ও শ্রুতিমধুর বহু শব্দচয়ন এবং ব্যবহার শুরু হইয়া গিয়াছে। পরিভাষা সংসদ-সংকলিত পুস্তিকাগুলি (১২) হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল, যথা—

মহাকরণ, করণিক, পরিসংখ্যান, পর্ষৎ, অধিকার, অধিকর্তা, সমাহর্তা দণ্ডাধিকরণ, ন্যায়াধিকরণ, প্রতিলেখ, লঘুলিপিক, প্রজ্ঞাপন, বর্গীকরণ, সমীকরণ, বাস্তুকার, যান্ত্রিক ইত্যাদি।

শোনামাত্রই অর্থগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। তাই বলিয়া প্রশাসনের বহুমুখী ক্ষেত্রে সংস্কৃতের দুরূহ এবং সমাসবদ্ধ প্রতিশব্দ গ্রহণ কার্যকরিতার পক্ষে কতদূর সহায়ক হইবে তাহা বলা সুকঠিন। যথা,—

মূলপ্রেষণ-করণ, পার্লালিক প্রাক্-করণ, আসেধাজ্ঞা, আধর্ষপত্র, মহাপ্রৈষাধিকারিক, প্রপন্নাধিকার, সাধিত্র সংস্কারক, দুষ্কৃতি-বিমর্ষ-বিভাগ ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, অনেক বিদেশী শব্দ সম্পর্কে চলতি শব্দই বহাল রাখা হইয়াছে। পারিভাষিক বিশ্বাস্মণ্ডলীর এই সিদ্ধান্তের সংগতি সুস্পষ্ট। যেমন,—

খাসমহাল, কাননগো, রাইফল, লিফ্ট, লিনোটাইপ, হর্ন ইত্যাদি।

এখন আলোচ্য মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। তাহা হইল রাজ্যি ত্রিপুরার সরকারী ভাষা। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিপুর দরবার প্রশাসনিক ভাষাসৃষ্টিতে ও তাহার প্রয়োগে বাংলার মূল বুনিয়াদ ও কাঠামো ঠিক রাখিয়াছেন। প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের পারস্পরিক বোধ্য ভাষাই ইহার ফলশ্রুতি। এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে ত্রিপুরায় যে সকল প্রতিশব্দ গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটির উল্লেখ হইল—

শাসন বিভাগ (Administration)
সংসার বিভাগ (Palace departments)
অর্জিত বিদায় (Earned leave)
অনুগ্রহ বিদায় (Privilege leave)
আকস্মিক বিদায় (Casual leave)
ব্যবস্থাপক সভা (Legislative council)
সিকস্তি (Dilluvian)
পয়স্তি (Alluvian)
পরিচিহ্ন (Decorations)
হেতুবাদ (Preamble) ইত্যাদি।

যে যে স্থলে সহজবোধ্য প্রতিশব্দ গ্রহণে অসুবিধার আশংকা বিদ্যমান ছিল, তত্তৎস্থলে চলতি বিদেশী শব্দই বহাল রহিয়াছে, যথা,—

সেক্রেটারী, এফিডেবিট, পুলিস, ওয়ারেন্ট, গেজেট, খান্দান, ইস্তফা, এত্তেলা, রোবকারী, জরপ বা জরব (সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাঙ্কন) ইত্যাদি।

দেশজ এমন কি পাহাড়ী আশ্রিত শব্দও সমভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

কের, খারচী, ফুরুই বা ফুরাই, আলু; উনুই, রিয়, দুবড়া, পুস্কি, ঢক্, টাক্নী, কদ্বো, চন্ডাই, হৈথুং ইত্যাদি।

প্রশাসনিক ভাষায় ইংরেজী বাক্য অথবা বাক্যাংশ যে কী সুন্দর সাবলীল বাংলায় অনূদিত হইয়া সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইত তাহা লক্ষণীয়। সামান্য কয়টি উদাহরণ বলা যায়, যথা—

Copies of the minutes and resolutions of the Council of Ministers are respectfully submitted to H.H. the Maharaja Manikya Bahadur for information.

মহামান্য মন্ত্রীপরিষদের কার্যবিবরণী ও নির্দ্ধারণ সমূহের প্রতিলিপি গোচর প্রার্থনায় সসম্ভ্রমে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ পেশ হয়।

To request the favour of furnishing the departments concerned with appropriate replies on the points at issue.

সংসৃষ্ট বিভাগ হারে বিবেচ্য বিষয়সমূহের যথাযথ উত্তর প্রেরণের বাসনায় নিবেদন।

Copy forwarded to so & so for information and necessary action.

অবগতি ও বিহিতের বাসনায় প্রতিলিপি 'অমুক' সমীপে প্রেরিত হয়।

For compliane
আচরণার্থ, তামিলার্থ
For information
গোচরার্থ
Minister's office—Revenue & General Department
মহামান্য মন্ত্রী আফিস—রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।
Current Penal Code (of Tripura)
চলৎ দণ্ডবিধি
Interest control Act
কুসীদ নিয়ামক আইন
For appropriate action
উচিতানুষ্ঠানের জন্য
For thorough investigation
প্রকৃষ্ট তদন্তের জন্য
For smooth running and regularisation
কার্যসৌকর্যার্থ ও নিয়মিতকরণার্থ
Ex-officio
পদবলে অথবা পদাধিকারে
Offices concerned
সংসৃষ্ট আফিস হারে
Contrary to the orders
আদেশের ব্যতিক্রমে

---

(১২) সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), ১ম ও ২য় স্তবক।

Until further orders
স্থিরাদেশ তরে
With due regard to the budget allotment
বজেট বন্ধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
Keeping the pension in suspense or abeyance
পেন্সন আবদ্ধ রাখিয়া
In continuation of
অনুসৃতিতে বা অনুসরণে
Law to come into force
আইন প্রবল গণ্য হওয়া
Good conduct pay
সদাচরণের জন্য বিশেষ বেতন
Whereas it is expedient
যেহেতু প্রতীতি হইতেছে
Officer-in-charge
ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারক
Meritorious and distinguished service
প্রতিভান্বিত ও প্রখ্যাত সেবা
Expeditous and efficient service
কর্মতৎপরতা ও কার্যকুশলতা
In extension of the previous orders
পূর্বাদেশের সম্প্রসারণে
Compulsory and free Primary Education
বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা
Taking everything into consideration
যাবতীয় অবস্থা পর্যালোচনায়
Flag flying at half mast
পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় রাখা
ইত্যাদি।

ত্রিপুরার সরকারী বাংলায় বিদেশী শব্দের বিকৃত প্রচলনও অবশ্য লক্ষণীয়, যথা—

এডিকং (aide-de-camp)
[illegible]ফিরা (round duty)
[illegible] চৈ এস্তাহার (Hue and Cry Notice)
[illegible]কুমদার (who comes there ?)
[illegible]দান (Commandant)
লেস্‌নাই (Lance Naik)

ইত্যাদি।

রাজকর্মচারিগণের মাসিক বেতন ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক [illegible]ত্তির ব্যবস্থা ত্রিপুরায় প্রচলিত ছিল, যেমন মাসহারা, দরমাহ, খরচী, খোরপোষ ইত্যাদি। একদিকে এই সকল স্থানীয় [illegible]রিচিত শব্দের যেমন প্রতিশব্দ প্রচলনের চেষ্টা হয় নাই, অপরপক্ষে 'পেন্‌সন' শব্দ পেন্সনই রহিয়া গেল এবং তাহা একমাত্র [illegible]বসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইল।

ত্রিপুরায় সরকারী চিঠিপত্রের প্রারম্ভে [illegible]শয়' এবং অন্ত্যে 'আপনার একান্ত [illegible] ভৃত্য' লিখিবার রেওয়াজ কখনও হয় [illegible]। তৎপরিবর্তে, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন [illegible]দের অথবা সর্বশ্রেণীর অফিসিয়েল পত্রব্যবহারে 'সবিনয় নিবেদন' ও 'নিবেদক' দ্বারাই সহজভাবে কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। আধা-সরকারী পত্রে 'বিনীত', অথবা 'ভবদীয়' এবং প্রার্থনা পত্রাদিতে 'আজ্ঞাধীন'-ই যথেষ্ট বিবেচিত হইত।

রাজদরবারের ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের চলতি কথ্য ভাষার মধ্যে সৌজন্যের যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত তৎসম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধদৃষ্টি সম্ভবত সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। ত্রিপুরার রাজদরবারে অথবা পারিবারিক পরিবেশে মান্যজনের সহিত চলতি কথোপকথনে করুন স্থলে 'করন যাক', বসুন স্থলে 'বসন যাক্‌', পান খান স্থলে 'পানের মরজী হউক' ইত্যাদি বাচনভঙ্গী বিশেষ সৌজন্য ও শালীনতা-দ্যোতক। রাজ্যেশ্বরকে মহারাজ সম্বোধনের পরিবর্তে 'শ্রীশ্রীযুত', 'ধর্মাবতার' অথবা 'সাক্ষাৎ' শব্দ ব্যবহার এবং রাজ্যেশ্বরের দিক হইতেও আমার, আমি-বাচক শব্দের স্থলে 'এপক্ষ' শব্দের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। এই দরবারী ভাষায় ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ারূপে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা স্থাপন, কর্ম ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ, পরোক্ষ উক্তি, অনির্দেশক সর্বনাম, হেতুবাচক ও উদ্দেশ্যপূরক অব্যয় ইত্যাদির সুনিপুণ ব্যবহার কথ্য-ভাষাকে শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রকাশের একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছিল। পারিবারিক সম্বোধনক্ষেত্রে পিতামহকে ঠাকুরদাদার স্থলে 'দেবা', পিতামহীকে ঠাকুরমার স্থলে 'দেবী', বউদিদিকে 'ভাওজ', মাতাকে 'মাঁ', বড়দাদাকে 'দাক' অথবা দা'-ডাঙ্গর', মধ্যমকে 'দা'-মধ্যম' ও ছোটকে 'দা'-ছোট সম্বোধনের রীতিও অনুরূপ লক্ষণীয়। এই কথ্যভাষার বিশদ আলোচনা বিষয়বস্তু-বহির্ভূত বলিয়াই এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ-মাত্র করা হইল।

ইতোপূর্বে উদাহরণ স্বরূপই ত্রিপুরার সরকারী বাংলার সামান্য কতিপয় প্রচলিত শব্দ ও পরিভাষা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহৃত বাংলার বিশিষ্ট দালিলিক নিদর্শনগুলি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে ত্রিপুরায় এই ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে

সম্প্রতিকালের ইতিহাসের খানিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ত্রিপুরার রাজকার্যের সর্ববিধ বিষয়ে বাংলার ব্যাপক ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে। তাম্রলেখ, শিলালিপি, সনন্দ, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাঙ্কন, রাজখান্দান ব্যঞ্জক পদ্মমোহর, প্রশাসনিক কার্যে ব্যবহৃত রাজাজ্ঞা মোহর, সীলমোহর, আফিস-আদালতে ব্যবহৃত আফিস মোহর, ছেপ্ত-স্ট্যাম্প, রসিদ টিকেট, বিচারাদালতে সাক্ষীর জবানবন্দী ও রায়প্রদান, রোবকারী, মেমো, সারকুলার, এস্তাহার, বিজ্ঞাপন, রাজ্যের আইন, নিয়ম, বিধি, নানাবিধ ফরম, যাবতীয় সরকারী চিঠিপত্র, আবেদন প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। সময় সময় এ রাজভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে রাজ্যেশ্বরের, সর্বোচ্চ বিচারাদালতের এবং রাজমন্ত্রীর আদেশ বিঘোষিত হইয়াছে আদেশগুলিতে কেবলমাত্র ভাষার ব্যবহার

…কেই নহে, প্রাঞ্জলরূপে ভাবপরিস্ফুরণ …ং লিপিকার্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধেও রাজা-…কার অবহিত থাকিয়া প্রজাসাধারণ তথা …কারী কার্যকারকগণকে সুনির্দিষ্ট …দেশ প্রদান করিয়াছেন। এযাবৎলব্ধ …ী, নজীর, দলিলাদি দৃষ্টে বিগত শতকে …পুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্রই (১৮৬২-১৮৯৬ ইং) এবিষয়ে স্মরণীয়কালে পথিকৃৎ …ছিলেন। কাব্য ও সঙ্গীতরচনা এবং …সাময়িক সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার …বদান সম্বন্ধে বিশদালোচনা নিষ্প্রয়োজন। …ক্ষান্তরে, রাজ্যশাসন প্রণালীকে সংযত ও …সম্বন্ধ করা, আইনকানুন প্রচলন, বিচারা-…লতের অধিবেশনে আজ্ঞা অনুজ্ঞাপ্রদান …ইত্যাদি রাজকার্যে বীরচন্দ্র নিঃসন্দেহেই …পুরার প্রশাসনক্ষেত্রে 'রেনেসা' অর্থাৎ নব-…যুগের প্রবর্তক ছিলেন।

…ৎপরে মহারাজ রাধাকিশোর যৌবরাজ্যে …ষিক্ত থাকা অবস্থায়ও বহুকাল শাসন …ও বিচারবিভাগীয় কার্যে প্রত্যক্ষভাবে …নিয়োজিত থাকিয়া বিশেষ পারদর্শিতা …দান করেন। রাজ্যভার গ্রহণান্তর একদা …তিনি রাজমন্ত্রীকে জানাইলেন,

"আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি …ং রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন …দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া …একটি কর্তব্য মনে করি।" (১৪)

…পূর্বে বীরচন্দ্র ত্রিপুরার প্রশাসনিক …কলায় বিগত শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত …আরবী-ফরাসী প্রভৃতি শব্দের বহুল …ব্যবহার দলিলাদি হইতে দৃষ্ট হয়। সারা …বাংলার সর্বত্রই অনুরূপ অবস্থা হইয়াছিল। …বীরচন্দ্রের যুগটা ছিল বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-…চন্দ্র প্রভাকরের এবং "পর্বত স্বাধীন …ত্রিপুরার" রাজদরবার ও তখন সমকালীন …সাহিত্যের ভাবগঙ্গায় অবগাহন স্নানে …রত। তবুও, সাহিত্য সাধনার প্রাণকেন্দ্র …হইতে সুদূরে থাকিবার কারণেই সম্ভবত, …দেখিতে পাই, এই যুগের দলিলগুলিতে …একদিকে নবপ্রবর্তিত সাধুভাষার সঙ্গে …আভিধানিক মরা অথবা সংকর শব্দের …বেপরোয়া প্রক্ষেপ, অন্যদিকে দুর্বোধ্য ও …অপরিচিত মুসলিম শব্দের অনায়াস এবং …আকস্মিক আত্মপ্রকাশ। ব্যাকরণগত স্খলনও …এ ভাষার নবারুণ রাগের উদয়পথকে …অস্পষ্টকরভাবে মাঝে মাঝে মেঘমলিন …করিয়া তুলিতেছে। ভাব ও ভাষার সাধনার …বর্ণবিবরণীতে ইহার রীতি প্রকৃতি …পরিবর্তনের প্রাণবন্ত প্রয়াস অপরিহার্য। …তরাং যতির বিরাম সামান্য ঘটিলেও …গতিশীলতায় ইহার শক্তি ছিল অব্যাহত।

মহারাজ রাধাকিশোরের রাজত্বকালে (১৮৯৭-১৯০৯) সরকারী কার্যে ত্রিপুরায় বাংলাভাষার সর্বোত্তম উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্বভাবতই এই সময়ে একদিকে যেমন উর্দুর প্রভাব প্রশমিত হয়, অপরদিকে প্রশাসনিক ভাষায় গ্রহণীয় সর্বক্ষেত্রেই বোধগম্য বাংলা প্রতিশব্দসমূহ সঞ্চয়িত হইতে থাকে। পরবর্তী রাজ্যেশ্বরগণের আমলে রাজ্যশাসন প্রণালী ও কাঠামোতে ক্রমেই ইংরেজী শিক্ষায় এবং কায়দায় প্রভাবিত বহিরাগত বাঙালী উচ্চ কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে, রাজ্যান্তরের সহিত সংযোগস্থাপনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে, স্বরাজ্যেই ইংরেজী শিক্ষিতের ক্রমপ্রসারে এবং সর্বশেষে—সামান্য কারণ বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রশাসনিক কার্যে যান্ত্রিক কার্যোপযোগিতার সাঙ্গীকরণের উপলক্ষ্যে টাইপরাইটার, স্টেনোগ্রাফারের আবশ্যিক আমদানিতে ইংরেজী ভাষার অধিকতর ব্যবহার ক্রমেই অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এ সময়েও দেখিতে পাই, রাজকীয় আদেশ এবং অভিপ্রায় প্রশাসনিক বিভাগকে বঙ্গভাষার আবশ্যিক ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশসমূহের প্রতিপালন অনুবর্তিতা সম্বন্ধে বারম্বার সতর্ক ও সাবধান করিয়াছে। পুরাতন আমলা ও রাজকর্মচারিগণ এ বিষয়ে পূর্বাপরই নিষ্ঠাসম্পন্ন ও সদাজাগ্রত ছিলেন। ভাষাজননীর প্রতি তাঁহাদিগের অতন্দ্র সেবা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

আইনের দৃষ্টিতে, পূর্বতন নৃপতিবর্গের আদেশ দ্বারা প্রবর্তিত বাংলাভাষাই প্রচলিত বিধান বদবদল না হওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজভাষা। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সহিত ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির সময় হইতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ফলে বিচারাদালতসমূহে সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদি প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বাংলায় লিপিবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সম্প্রতিকালেও ত্রিপুরার সর্বোচ্চ বিচারাদালতের মাননীয় বিচারপতি মহোদয় পূর্বতন নিয়ম বহাল রাখিতে আদেশ জারী করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রশাসনিক অধিকরণসমূহ অবশ্য ভিন্নতর পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

অতঃপর ক্রমে ক্রমে আমরা রাজন্য ত্রিপুরার প্রশাসনিক কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা কিভাবে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত তৎসম্বন্ধে কতিপয় দালিলিক নিদর্শন উপস্থিত করিব। তৎপূর্বে, আলোচনার বিষয়বস্তু রাজকার্যে বাংলা ভাষার প্রবর্তন, ইহার ব্যবহার ও সৌষ্ঠববৃদ্ধি সম্পর্কে রাজকীয় ও প্রশাসনিক আদেশসমূহের আরও কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রসংগত বলা যায় যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের বাংলা হস্তাক্ষর ছিল সত্যই যেন 'মুক্তার পাঁতি'! (১৫) ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজাদেশগুলি সমধিক আকর্ষণীয়।

(নিদর্শন ৩)

নং ৯ মেমো

খাস আপীল মোহর

Sd. M. R. Roy
Sd. Nilmoni Das
Dewan

রোবকারী দরবার খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ১২৮৪ ত্রিং ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৬)

অত্র রাজগীস্থ আফিসসমূহে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্তাদি দাখিল হয় তাহা নিতান্ত কদর্য ও কদক্ষরে বাহুল্য কথায় লিখা হওয়া হেতু সময়ে ২ অনেক অসুবিধার কারণ ও তাহা বোধগম্যের ও পাঠের অনুপযোগী হওয়ায় আদালতের সময়ে ২ অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে ও অনর্থক সময় কর্তন করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএবঃ—

হুকুমা হইল যে

বর্তমান সনের আগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও

---

১৪) 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ)—ত্রিপুরায় বঙ্গভাষার প্রভাব, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

(১৫) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা—মহারাজ বীরচন্দ্রের হস্তলিপি নিদর্শন (৪৯নং পাণ্ডুলিপি চিত্র) দ্রষ্টব্য।

(১৬) খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অথবা ১২৮১ বাংলা সন।

দরখাস্ত ইত্যাদি অত্র রাজগীস্থ আফিস-সমূহে দাখিল করিবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রয়োজনীয় বিবরণযুক্তে সংক্ষেপরূপে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে তদভাবে উল্লিখিত কাগজাত কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। তামিলার্থে অত্র রোবকরীর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি পাহাড় আদালতে ও আপীল আদালতের বিচারপতির নিকট প্রেরণ হয়। আপীল আদালতের উচিত যে, এই রোবকারীর মর্ম আপন আপন অধীনস্থ আদালতসমূহে অবগত করাইয়া সর্বদা দৃষ্টি রাখে যে, উল্লেখিত আরজী আদি কাগজাত কদক্ষর ও বাহুল্য বিবরণে দাখিল হইতে না পারে। ইতি সং শ্রীনবীনচন্দ্র দাস

মোহরের

(নিদর্শন ৪)

খাস আপীল মোহর

৯নং সেহা

Sd. R. K. Deb. ১৭

রোবকারী কাছারী খাষ আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর অধিবেশীত শ্রীলযুত রাধাকিশোর যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব বিচারপতিগণ। ইতি সন ১২৮৯ ত্রিং ৩২শে আষাঢ়। (১৮)

(১৭) স্বাক্ষর—যুবরাজ রাধাকিশোর দেববর্ম গোস্বামী বাহাদুর।

(১৮) খৃষ্টীয় ১৮৭৯ অথবা বাংলা ১২৮৬ সন।

অধস্থ আদালত সমস্ত হইতে নানা বিষয় সম্পর্কে যে সকল এস্তমেজাজি রোবকারী সমাগত হয় ঐ সমস্ত এস্তমেজাজি রোবকারী মধ্যে কোন রোবকারীর হস্তাক্ষর ও এবারত এত অস্পষ্ট ও কদর্য যে তাহার ভাবগ্রহণ করা সুকঠিন অতএব ভবিষ্যতেও এইরূপভাবে রোবকারী ইত্যাদি লিখিত হইয়া আগত না হওয়ার পক্ষে অধস্থ আদালত কার্যকারকদিগকে সতর্কতা নেওয়া আবশ্যক। এতাবেতা

আদেশ হইল যে—

এই রোবকারীর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি আপীল ও তদধীনস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আদালতে প্রেরণপূর্বক লিখা যায় যে কোন এস্তমেজাজি রোবকারী কি মেমো ইত্যাদির হস্তাক্ষর কদর্য অথবা এবারতের গোলমাল অর্থাৎ যদ্দারা লিখিত বিষয়ের ভাব ও তাৎপর্য গ্রহণ করিতে কঠিনতা কি দ্বিঅর্থ বিবেচনা হয় তবে ঐ সমস্ত আদালতের সম্পর্কিত কার্যকারকদিগকে উপযুক্ত ফল প্রদান করা যাইবে। ইতি মং শ্রীকালীকুমার চক্রবর্তী

মোহরের

(নিদর্শন ৫)

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট

প্রথম খণ্ড (খ)

১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ, ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার
ষোড়শ ভাগ-শ্রাবণ, প্রথম পক্ষ-সপ্তম সংখ্যা
(ক্রোড়পত্র)

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।
(১৩২৭ ত্রিং ১৫ই শ্রাবণ তারিখের ১১নং সারকুলার সংসৃষ্ট)
(ক্রোড়পত্র)

সারকুলার নং ৩ (১৯)—এরাজ্যে আফিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা, এবং সর্ববিধ রাজকার্যে আবহমানকাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা স্বর্গীয় মহারাজবাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংশোধনার্থে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে "নিষ্পত্তিপত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল গণ্য আছে। পরমপূজ্যে স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এবিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্বার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা কর্মচারীমাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

সর্ববিধ রাজকার্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে উৎকর্ষবিধান করা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন, আদালত ও আফিসসমূহের কাগজপত্রে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

কোন বিচারক বা অন্যশ্রেণীর কার্যকারকের বাঙ্গালা ভাষা জানা না থাকিবার দরুণ অথবা উক্ত ভাষায় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরি ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া

সংসৃষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং ঐ কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গানুবাদ সহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।

স্বাঃ শ্রীঅভয়কুমার গুহ
ভারপ্রাপ্ত—কার্যকারক।

স্বাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা
মন্ত্রী

(নিদর্শন ৬)

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট

প্রথম খণ্ড (খ)

১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ, ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার
ষোড়শ ভাগ-শ্রাবণ প্রথম পক্ষ-সপ্তম সংখ্যা
(৭৪ পৃষ্ঠা)

সন ১৩২৭ ত্রিং তাং ১৫ই শ্রাবণ। (২০)

সারকুলার নং ১১—এরাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহে সর্ববিধ রাজকার্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রী-আফিসের ১৩২৪ ত্রিং ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সারকুলার দ্বারা বিধান করা হইয়াছে। বর্তমান সময়ে কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে। উক্ত সারকুলারের মর্মানুযায়ী কার্য হওয়া শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রেত। অতএব অতঃপর উপরিউক্ত সারকুলারের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য করা রাজকর্মচারিগণের কর্তব্য হইবে।

স্বাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত
চিফ্ দেওয়ান।

(১৯) ইহা ১৩২৪ ত্রিপুরাব্দের (১৯১৪ ইং, ১৩২১ বাং) ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সার্কুলার। পরবর্তী ১১নং সার্কুলারের ক্রোড়পত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২০) খৃষ্টীয় ১৯১৭, বাংলা ১৩২৪ সন।

॥ ৪ ॥

ডাক্তার মুখার্জি কল্পনায় অনেকদূর চ'লে গিয়েছিলেন, তাই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর কিছু সময় লাগল। করবামাত্রই তিনি উঠে দ্রুতপদে নেমে গেলেন। রকেট ঝিনুককে কামড়ায় নি, কিন্তু তার চারধারে হুংকার আর দাপাদাপি করে এমন কাণ্ড করেছিল যে, তা কামড়ানোর বাড়া। ডাক্তারবাবু ডাকতেই থেমে গেল রকেট। বিস্রস্তবাসা ঝিনুকের দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন তিনি। ঝিনুক যে ভদ্রলোকের মেয়ে, তা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। ঝিনুককে তিনি আগে দেখেননি, চিনতে পারলেন না। ঝিনুক কিন্তু তাঁকে চিনেছিল। ডাক্তার মুখার্জি এ শহরে বিখ্যাত ব্যক্তি।

ডাক্তার মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এ সময়ে এখানে কি করছিলেন? আমার মতো আপনারও নক্ষত্র-দেখার বাতিক আছে নাকি?"

ঝিনুক সপ্রতিভভাবে বলল, "না, আমি নক্ষত্র দেখতে আসি নি। একটা ব্যাগ খুঁজতে এসেছি। আমার এক আত্মীয় একটু আগে ট্রেনে আসছিলেন, তাঁর হাত থেকে একটা ব্যাগ পড়ে গেছে এইখানে। সেইটেই খুঁজছি, যদি পাওয়া যায়—"

"ও, তাই না কি? পেয়েছেন?"

"না, এখনও পাইনি। এইখানেই ঝোপে-ঝাপে আছে কোথাও।"

ডাক্তার মুখার্জি পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখতে লাগলেন এদিকে ওদিকে আর রকেট শুঁকতে লাগল ঝিনুককে। একটু পরেই ডাক্তার মুখার্জি বেশ বড় একটা ব্যাগ দেখতে পেলেন।

"এই তো রয়েছে একটা ব্যাগ। এইটে কি?" সঠান মুকুজ্যে তুলে নিলেন সেটা।

"এ তো বেশ ভারী দেখছি। এ ব্যাগ তো হাতে ঝুলিয়ে নেবার নয়। কি আছে এতে?"

কি আছে, তা ঝিনুক জানত না। সোনা-রুপো, হীরে-জহরত, আফিং-কোকেন যে-কোনও জিনিস থাকতে পারে। যারা বেআইনীভাবে সুবেদার খাঁয়ের মারফত জিনিস পাঠায়, তারাই বলতে পারে, কি আছে ওর মধ্যে। ঝিনুক একজন বাহক মাত্র।

"আমি ঠিক জানি না।"

এর পরই ঝিনুকের গাড়িটা দেখতে পেলেন তিনি। একটু দূরে ছিল সেটা, গাছের আড়ালে।

"ও গাড়িটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"অত দূরে দাঁড় করিয়েছেন কেন? সঙ্গে ড্রাইভার আছে?"

"না, আমি নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি।"

"তবে চলুন, আমিই তুলে দি এটা আপনার গাড়িতে। আচ্ছা দাঁড়ান, বেচুকে ডাকি, বেশ ভারী এটা।"

তিনি পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের আওয়াজ হল একটা। গুলিটা ডাক্তার মুখার্জির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। লাগল না।

"এ কি কাণ্ড!"

সবিস্ময়ে বলে উঠলেন তিনি। ঝিনুকেও অবাক হ'য়ে গেল। প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপরই পারল। অন্ধকারে সুবেদার খাঁর লম্বা চেহারাটাও দেখতে পেল সে। সুবেদার খাঁ বাইক চড়ে ঝিনুকের কাছেই এসেছিলেন। এসেই তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, ঝিনুকের সঙ্গে অপরিচিত কে একজন কথা কইছে, তখনই তাঁর মনে হ'ল, মালসুদ্ধ ঝিনুক ধরা পড়েছে নিশ্চয়। সম্ভবত পুলিসের কোন লোক। হয়তো সন্ধে বেলা থেকেই লুকিয়েছিল আশেপাশে। অন্য কোন সম্ভাবনা কল্পনাই করতে পারলেন না তিনি। তারপর যখন হুইস্‌ল বাজল, তখন তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝলেন পুলিসই এসেছে। তিনি অনায়াসে নিঃশব্দে সরে যেতে পারতেন, কিন্তু ঝিনুককে পুলিসের কবলে ফেলে আর যেই পালাক, সুবেদার খাঁ পালাবেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে ঠিক করে ফেললেন, এই পুলিসটাকে জখম করে ঝিনুককে নিয়ে পালাবেন তিনি মোটরে করে। সাইকেলটাও তুলে নেবেন মোটরের কেরিয়ারে। তাঁর সঙ্গে একটা লোডেড রিভলবার সর্বদা থাকে।

ঝিনুক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সুবেদার খাঁর দিকে। কাছাকাছি এসে বললে, "কি করলেন আপনি! উনি ডাক্তার মুখার্জি। ভাগ্যে গুলিটা লাগেনি ওঁকে। ছি, ছি কি কাণ্ড করলেন বলুন তো—"

রকেট এতক্ষণ চুপ করেছিল, কিন্তু সুবেদার খাঁকে দেখে আবার তেড়ে গেল সে।

"নো রকেট, কাম্ হিয়ার।"

শিরকণ্ঠে আদেশ করলেন ডাক্তার মুখার্জি। রকেট চুপ করল। এগিয়ে এলেন সুবেদার খাঁ।

"আমি খুবই দুঃখিত ডাক্তার সাহেব। আমি আপনাকে ঠিক দেখতে পাই নি। আমি খরগোশ শিকার করতে এসেছিলাম। সন্ধ্যার পর এদিকটায় খরগোশ বেরোয়—আমি প্রায়ই শিকারে আসি। আপনার লাগে নি তো?"

"বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা একটু ছড়ে গেছে। বিশেষ কিছু নয়।"

বেচু গাড়ি নিয়ে হাজির হল। ঝিনুকের দিকে চেয়ে প্রশান্ত হাসি হেসে ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "বেচু আপনার জিনিসটা তুলে দিয়ে আসুক।"

ঝিনুক ডাক্তারবাবুর প্রশান্ত হাসি দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল কি কাণ্ডই না উনি করবেন। কিন্তু কিচ্ছু করলেন না তিনি।

"বেচু, এই ব্যাগটা ওই গাড়িতে তুলে দিয়ে এস।"

বেচু ব্যাগ নিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার মুখার্জি তখন সুবেদার খাঁকে বললেন, "আপনি কেন গুলি চালিয়েছিলেন তা আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি—"

শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন সুবেদার খাঁ।

"কি কথা?"

"এ অঞ্চলে খরগোশ নেই। আমি এ অঞ্চলে প্রায়ই আসি, খরগোশ কখনও চোখে পড়ে নি।"

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন সুবেদার খাঁর দিকে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "তবে চোখের দৃষ্টি প্রখর থাকলে হয়তো দেখা যায়। আমার চোখের দৃষ্টি হয়তো তত প্রখর নয়।"

বেচু ফিরে আসতেই বললেন, "আমার ওষুধের বাক্সটা বার করে নিয়ে এস আর বড় টর্চটা।"

ওষুধের বাক্স থেকে টিঞ্চার আয়োডিন বার করে আঙুলে লাগালেন। তারপর নিজের রুমালটা ছিঁড়ে বললেন, "এখানটা ব্যাণ্ডেজ করে দে।" সেটাও আয়োডিন দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন।

নীরব বেচু এবার সরব হল।

"কি করে লাগল ওখানে?"

"টিলা থেকে নামতে গিয়ে প[...] গিয়েছিলাম পা হড়কে।"

সুবেদার খাঁ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়ি[...] রইলেন। ডাক্তারবাবুর গাড়ি চলে যাও[...] পর ঝিনুক বলল, "উনি বুঝতে পারেন [...] বোধ হয়।"

"তুমি যে এত বোকা তা তো জানতাম না[...] উনি সবই বুঝেছেন, কিন্তু কিছু বললে[...] না। এখন বলে তো কোন লাভও নেই[...] কিন্তু ওঁর উপর নজর রাখতে হবে[...] ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সর্বনাশ হ[...] যাবে আমাদের।"

"কি আছে ওর ভিতর?"

"আমি ঠিক জানি না। তবে খ[...] পেয়েছি সোনা রূপো আর জুয়েলারি আ[...] হংকং থেকে আসছে। আমার মনে হয় আ[...] রাত্রেই এগুলোকে বিক্রি করে ফেলা উচিত[...] ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ। আম[...] হংকং-এর এজেন্ট দুজনকে দশ হাজার টা[...] দিয়ে দিয়েছি। অন্তত সে টাকাটা আমা[...] পাওয়া দরকার। হরিবোলের মারফ[...] নম্বর ওয়ান বলে পাঠিয়েছিল সোনা রূপে[...] জহরত এলে ভালো দাম দেব। চল, সোজ[...] আমরা হরিবোলের কাছেই যাই।"

ঝিনুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"চল, যাই—"

ঝিনুক তবু নড়ে না।

"ভয় পেয়েছ নাকি?"

"না, ভয় পাই নি। ভাবছি—

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি আমরা না হয় নরকে নেমেছি নিজেদের স্বার্থের জন্য। একটা আদর্শের জন্যও বলতে পারেন। কিন্তু আপনি নেমেছেন কেন। আপনার স্বার্থ কি শুধু টাকা?"

"হঠাৎ এ কথা আজ জানতে চাইছ কেন? এতদিন তো চাও নি?"

"হঠাৎ মনে হল কথাটা—"

"মনে হল কেন জান? আমি মুসলমান এই কথাটা কিছুতে ভুলতে পারছ না, এই তো?"

"সত্য কথাটা ভুলব কি করে?"

"মুসলমান হলেও আমি ভদ্র হতে পারি এ বিশ্বাসটাও কি নেই? [...] তোমারও যেমন একটা আদর্শ আছে, আমারও তেমনি আছে।"

চুপ করে রইল ঝিনুক।

সুবেদার খাঁ বললেন, "আমি এই উপায়ে যত টাকা রোজগার করি তা তোমাদের জন্যই খরচ করি। তোমাদের মানে [...] উদ্বাস্তুদের। অনেক ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ দি, অনেকের মেয়ের বিয়ের খরচ

দিয়েছি। এ খবর এতদিন কেউ জানত না, আজ তোমাকে এখন বলছি। তোমাকেও বলতাম না, কিন্তু দেখছি তোমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আমাকে সন্দেহ করো না ঝিন্দুক। আমি মুসলমান হলেও তোমাদের হিতৈষী।"

সুবেদার খাঁর গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। এই কম্পনটা অনেকক্ষণ থেকে আশা করছিল ঝিন্দুক।

বলল, "আপনি হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভালবাসেন তা জানি। কিন্তু যে কথাটা জানি না সেইটেই স্পষ্টভাবে এখন জানতে চাইছি। আপনার এ ভালবাসায় কি কোনও স্বার্থ নেই?"

সুবেদার খাঁ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "এর উত্তর আর একদিন দেব। হয়তো আমাকে দিতেও হবে না, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এখন চল যাই। একটা কথা শুধু বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি, আমি নীচ নই, কোনও বিশেষ মতলব নিয়ে আমি এ কাজে নামি নি।"

ঝিন্দুক কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়িটার দিকে অগ্রসর হল।

ডাক্তার মুখার্জি সেদিন মাঠ থেকে বাড়ি ফিরলেন না। সোজা নিজের ল্যাবরেটরিতে গেলেন। গিয়েই প্রথমে তাঁর আঙুলটা ড্রেস করে নিলেন ভালো করে। রুমাল খুলে স্টিকিং প্ল্যাস্টার দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন ক্ষতটা। বিশেষ লাগে নি, রক্তও তেমন পড়ছিল না। এ নিয়ে বেশী হইচই হয় তা তিনি চাইছিলেন না। কি ভেবে ইনজেক্‌শনও নিয়ে নিলেন নিজেই নিজের পেটে ছুঁচ ফুটিয়ে। বেচু একটু বিস্মিত হচ্ছিল, কিন্তু তার বিস্ময় বাঙ্ময় হল না। ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না বলেই বোধ হয় সে কৌতূহলের ধারও ছিল না আর তার কাছে। অতি-ব্যথায় যেমন নির্ব্যথা হয়, অনেকটা তেমনি। ডাক্তারবাবু লিখতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অত রাত্রেও এক রোগী এসে হাজির। বললে, দুবার আপনাকে খুঁজে গেছি। যদি এখন—। ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "কাল দশটার পর এস। এখন কিছু হবে না।"

"এখানে সমস্ত রাত থাকার অসুবিধা আছে ডাক্তারবাবু, ধরমশালায় জায়গা নেই।"

"তুমি হোটেলে থাক গিয়ে। যা খরচ লাগে আমি দেব। তাড়াহুড়ো করে চিকিৎসা হয় না।"

লোকটি চলে গেল।

ডাক্তারবাবু লিখতে শুরু করলেন।

"সঙ্গে সঙ্গে লিখে না ফেললে হয়তো মনের ভাব অনেকখানি উবে যাবে। আমাদের মনের ভাব ইথারের চেয়েও ভলাটাইল (Volatile)। আমরা অহরহ মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি, মৃত্যুর অসংখ্য সম্ভাবনার ভিতর দিয়ে সর্বদাই পার হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সর্বদা সে খবর আমরা পাই না। সামনে একটা বাঘ বা সাপ দেখলে আমরা ভয়ে চমকে উঠি, কিন্তু অসংখ্য মারাত্মক ব্যাক্‌টিরিয়া যে সদাসর্বদা আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে এ খবর জেনেও আমাদের তত ভয় করে না। প্রত্যক্ষ দর্শনের জোর অনেক বেশী। স্থান কালের উল্লেখ করব না, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাকে লক্ষ করে রিভলবার ছুঁড়েছিল একটা লোক। পরমায়ু ছিল তাই লাগে নি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তার সঙ্গে জড়িত ছিল একটি নারী, যে নারী মা হয়, মেয়ে হয়, প্রেয়সী হয়, তাদেরই একজন। আমি অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পাই নি, কিন্তু তবু মনে হল মেয়েটি রূপসী। সে বলল সে নাকি ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া একটা ব্যাগ কুড়োতে এসেছে ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালের কাছে। কেন সে ওখানে ব্যাগটা নিতে এসেছিল তা জানবার দরকার নেই, যে দরকারের কথা সে বলল তা-ও যাচাই করবার চেষ্টা আমি করি নি, কারণ সে যা বলল তা যে মিথ্যা তা বোঝবার জন্য খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। এই জন্যেই যেন বেশী ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে। নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে অনায়াসে কেমন অভিনয়টা করে গেল। ওর কথা ভেবে হঠাৎ মনে পড়ল একটি ছোট ছেলের কথা। সে তখন খুবই ছোট ছিল। বছর চার পাঁচের বেশী নয়। চা খাচ্ছি, সে এসে বলল, আমাকে চা দাও। বললাম, এতটুকু ছেলে চা খায় না, বড় হলে চা খায়। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। তার দৃষ্টির ভাবটা বেশ স্পষ্ট, বড়, মানে কত বড়? আমি তখন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম, যখন গোঁফ হবে তখন চা খেও। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল এবং একটু পরেই ঘুরে এসে বললে, এইবার দাও। গোঁফ হয়েছে। দেখি সে কালীর দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ঠোঁটের উপর গোঁফ এঁকে এনেছে। তখন এ দেখে খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সবাই ওই রকম কালী দিয়ে গোঁফ এঁকে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করছে। সেটা যে হাস্যকর হচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না অনেকে। একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বেশ মজা লাগে। এই মজার আস্বাদ আজ কিছুটা পেয়েছি—ওই মেয়েটিকে দেখে। তারপরই করুণা হয়েছিল, মনে হয়েছিল উঃ, জীবনযুদ্ধ কি নিদারুণ ব্যাপার! মানুষকে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যায়। অনেকে নিস্পৃহভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে,

অনেকে পারে না। প্রাণিজগতে এবং উদ্ভিদজগতেও এ ছদ্মবেশ ধারণের নানা-রকম বিস্ময়কর নমুনা দেখা যায়। এক বিশেষ জাতের গিরগিটিই শুধু বহুরূপী নামে পরিচিত, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে—প্রধানত পেটের তাগিদে—অনেককেই বহু রূপ ধারণ করতে হয়। যখন বায়োলজি পড়তাম তখন ওদের নানা কাহিনী পড়ে বিস্মিত হয়েছি। সেদিন একটা দেখলামও। মাঠে বসেছিলাম। পাশেই শুকনো কাটির মতো পড়ে ছিল কি একটা। অনেকক্ষণ সেটাকে লক্ষই করিনি। হঠাৎ কানের ভিতরটা চুলকে উঠল, আমার কানে কাঠি দেওয়ার অভ্যাস আছে। একটা কাঠির খোঁজে এদিক-ওদিক চাইতেই দেখতে পেলাম সেটাকে। হাত দেওয়া মাত্রই কিন্তু লাফিয়ে চলে গেল। কাঠি নয়, ফড়িং। বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে আত্মরক্ষা করবার জন্যই জীবজগতে ছদ্মবেশের প্রয়োজন। উপনিষদ বলেছে, অরূপই আনন্দের প্রেরণায় বহুরূপ ধারণ করেছেন। কি সত্য, তা জানি না। কিন্তু এটা দেখছি বহুরূপ ধারণ না করলে সংসারে চলে না। পিতার কাছে আমার যে রূপ, পুত্রের কাছে সেই রূপেই নূতন রঙের আমেজ লাগাতে হয়। প্রভুর কাছে আমি যে রূপে থাকি, ভৃত্যের কাছে সে রূপে থাকি না। বন্ধুকে যে রূপে দেখা দিই, শত্রুকে সে রূপে দিই না। প্রত্যেকেই আমরা বারবার রূপ বদলাচ্ছি। অনেক সময় টেরও পাই না যে, বদলাচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় যে মেয়েটি চোরাই মাল সরাতে এসে অতগুলো মিথ্যা কথা বলে গেল সে কি মিথ্যাভাষিণী ছাড়া আর কিছু নয়? আমি জানি সে অনেক-কিছু। সে নিশ্চয় সত্য কথাও বলে, আবার ছলনাও করে। সে প্রাণভরে ভালও বাসে, ঘৃণাও করে। এক রূপে থাকবার উপায় নেই আমাদের, আমরা সবাই বহুরূপী। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই বহুরূপী মেয়েটা যদি ধরা পড়ে তা হলে আর একজন বিচারক-বেশী বহুরূপী তাকে সাজা দেবেন। যে সমাজ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, সেই সমাজকে রক্ষা করতে হলে চোর-ডাকাতকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। চোর-ডাকাতদেরও নিজেদের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। যে লোকটি আমাকে লক্ষ করে গুলী চালিয়েছিল সে সম্ভবত ওই মেয়েটিরই দলের লোক। মেয়েটিকে নিরাপদ করবার জন্যেই গুলি করেছিল আমাকে। নিজের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য কে না গুলি চালিয়েছে পৃথিবীতে? পৃথিবীর সভ্য লোকেরাই তো এ কাজ করে, অনেক সময় তারা এজন্য বীর বলেও গণ্য হয়, খবরের কাগজে তাদের খবর ছাপা হয়, আমরা তাদের ছবি টাঙিয়ে রাখি, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম ওঠে। আমি যদি ওই লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওকে পেড়ে ফেলতে পারতাম, যদি ওকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে পারতাম থানায়, তা হলে আমারও জয়-জয়কার হ'ত। হয়তো আমারও নাম কাগজে ছাপা হত। কিন্তু এসব ব্যাপার আমার কাছে বড়ই হাস্যকর মনে হয়। পৃথিবীতে অহরহ যুদ্ধ হচ্ছে, আমিও একজন যোদ্ধা, শুধু শুধু অন্য একজন যোদ্ধাকে বিপর্যস্ত করা কি উচিত? আমি যাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই গুলি-গোলা ছুঁড়ছি সেই ব্যাক্‌টিরিয়াগুলো যদি কোনও মন্ত্রবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করে আমাকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যায়, কেমন হয় তা হলে, তারা যদি বলে আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তু-ভূমিতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিলাম এই লোকটা নানাভাবে আমাদের উৎখাত করবার চেষ্টা করছে? ও লোকটা আমাকে লক্ষ করে গুলী ছুঁড়েছিল, আমি বেঁচে গেছি এইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আবার ওকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে ও আবার আক্রমণ করবে এবং এই যুদ্ধ ব্যাপার অনেক দূরে গড়াবে। আমিও একজন যোদ্ধা, প্রত্যেকেই যোদ্ধা হতে বাধ্য, যোদ্ধা না হলে বাঁচা যায় না, কিন্তু আমার মনের কথা হচ্ছে আমি যোদ্ধা হতে চাই না। আমি চাই সবায়ের সঙ্গে যথাসম্ভব বনিবনাও করে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধটা দেখি। কিন্তু তা অসম্ভব। কিছুতেই হচ্ছে না। এত চেষ্টা করেও বনিবনাও হয় না কারও সঙ্গে। কেউ কাছে আসে না, সবাই পালিয়ে যায়, কিংবা অতর্কিতে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। এর কারণের যে সূত্র এখনও খুঁজে পাই নি, এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের ট্র্যাজেডি, হয়তো অনেকেরই জীবনের ট্র্যাজেডি, কিন্তু অধিকাংশ লোক সেটা বুঝতে পারে না, অনুভব করে না। আমিই বুঝেছি সকলের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা না পড়তে পারলে আনন্দ নেই, কিন্তু সে আনন্দ পাওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই বোধ হয়। আমি কাছে এলেই সবাই পালায়, আমাকে দেখতে পেলে কেউ বা গুলী ছোঁড়ে, কেউ বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে, অনেকেই আড়ালে নিন্দে করে, কিংবা চক্রান্ত করে আমাকে অপ্রস্তুত করবার। মনে, আমাকে কেউ চায় না, হয় আমাকে নিয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করাতে চায়, কিংবা তাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হ'লে সরিয়ে দিতে চায়। সুসভ্য মানব-সমাজেও একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের অন্য সম্বন্ধ নেই। আমার পক্ষে এটা মর্মান্তিক। আরও মর্মান্তিক এই জন্যে যে, সকলেই মনে করে আমি খুব সুখী।"

এই পর্যন্ত লিখে চুপ করে বসে রইলেন সুঠাম মুকুজ্যে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর হাঁক দিলেন, বেচু, চল এবার বাড়ি যাই। (ক্রমশ)

॥ ৩৪ ॥

সুজাতা মিত্রের কাহিনীতে একদিন আমাকে আসতেই হবে। কিন্তু তার আগে ককটেল এবং মিস্টার সরাবজী।

মিস্টার সরাবজী ভারতীয় প্রথায় হাত-জোড় করে খাঁটি বাঙলায় বলেছিলেন, "আসুন আসুন। এই বার-এ আপনাকে পেলে আমি আর কিছুই ডর করি না।"
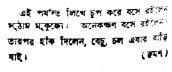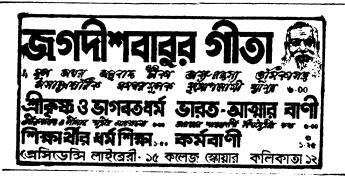
সরাবজী আমাদের নতুন বার ম্যানেজার। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, পাকা আপেলের মতো টক-টকে চেহারা। বয়সের ভারে একটু যেন নুয়ে পড়েছেন। অবাক হয়ে বললাম, "আপনি বাংলা জানেন?"

"কী যে বলেন! এই কলকাতা শহরে আমি যখন এসেছি তখন আপনারা এই ওয়ার্লডে আসেননি, আমার নিজেরই তখন চৌদ্দ বছর বয়স।" সরাবজী তাঁর সাদা প্যাণ্টের বক্‌লেসটা টাইট করে নিয়ে আমার পিঠে হাত রাখলেন।

আমি বললাম, "আবগারি খাতাগুলো ঠিক করে রাখা দরকার, ওগুলোর নাম শুনলে ভয় লাগে।"

সরাবজী তাঁর চোখের মোটা চশমাটা খুলে প্রসন্ন হেসে বললেন, "ওদের আমি ভয় পাই না। আমি যদি ডিউটি ফাঁকি দেবার না চেষ্টা করি, যদি আমি ড্রিংকে জল না মেশাই, যদি আমি কোনো সন্দেহ-জনক মেয়েকে একলা বার-এ বসে থাকতে না দিই, তা হলে এক্‌সাইজ ডিপার্টমেন্টকে আমি কেন ভয় করতে পাবো?"

শাজাহানের বার-এ সরাবজী নিজের হাতে বোতলগুলো সাজিয়ে রাখছিলেন। হেড্ বারম্যান রাম সিং সায়েবের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। সরাবজী অভ্যস্ত হাতে একটা বোতল আলোর দিকে নিয়ে নেড়ে দেখলেন কতটা আছে, তারপর আবগারি ডিপার্টমেন্টের স্টক রেজিস্টারের সংগে মিলিয়ে নিতে গিয়ে ও'র যেন একটু সন্দেহ হলো। বললেন, "রাম সিং, খাতায় লেখা চার পেগ, অথচ পাঁচ পেগের মত মাল রয়েছে মনে হচ্ছে।"

রাম সিং অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "হুজুর, হাতের মাপ তো কোথাও একটু কম, কোথাও একটু বেশী পড়ে যায়।"

সরাবজী বললেন, "আমি এর ভিতর নেই। নিজের হাতে আমি কাউকে কমও দেবো না, বেশীও দেবো না।"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সরাবজী বললেন, "আমরা যখন এই লাইনে আসি তখন এক আধপেগ ড্রিংকের জন্যে কেউ মাথা ঘামাতো না। তখন যার দাম ছ' টাকা ছিল এখন তা ছিয়াশী টাকাতেও পাওয়া যায় না। এখন কাস্টমারকে এক ফোঁটা কম দেওয়া মানে ফাঁকি দেওয়া।"

সরাবজী এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। নিজের মনেই বোতলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তারপর আমাকে বারে একলা রেখে সেলারে চলে গেলেন। মাটির গর্ভে দেড় শো বছরের প্রাচীন একটা অন্ধকার ঘর আছে, সেখানে সাধারণের যাওয়া নিষেধ। সেই অন্ধকার সেলারের কোণে এমন বোতলও আছে যা শাজাহানের প্রতিষ্ঠাতা সিম্পসন সায়েব নিজের হাতে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তারপর শাজাহানের বুকের ওপর দিয়ে ইতিহাসের চাকা কতবারই তো গাড়িয়ে গিয়েছে। সোলা-টুপি এবং খাকি প্যাণ্ট পরে তরুণ ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নেমে হিন্দুস্থানের প্রথম রাত্রি শাজাহান হোটেলে কাটিয়েছেন। সেদিন সেই নিঃসঙ্গ সৈনিককে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে এই কুঠুরি থেকেই স্কচ বোতল বেরিয়ে এসেছে। গঙ্গা নদীতে পালতোলা জাহাজের বদলে যেদিন কলের জাহাজ দেখা গিয়েছিল সেদিনও শাজাহানের সেলার থেকে পাঠানো পানীয়তেই উৎসব-রাত্রি মুখর হয়ে উঠে-

ছিল। তারপর খাকি টুপি এবং হাফ্ প্যাণ্ট পরা একদল লোক হাতে নকশা নিয়ে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের দল-পতি দাড়িওয়ালা ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন স্পেনসেসের বড়াপোচখানায় উঠেছিলেন। আর দলের কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাদের এই শাজাহানে। বার-এ বসে বসে তাঁর দিনরাত কাগজের কি সব নকশা আঁকতেন। বারম্যানরা বলতো, পাগলা সায়েবের দল এসেছে—এরা কলের গাড়ি আনবে বিলাইত থেকে। তামাম হিন্দুস্থানের পায়ে এরা বেড়ি পরিয়ে দেবে—লোহার রাস্তা তৈরি করবে, এবং একদিন তার উপর দিয়ে বিরাট বিরাট দৈত্য ছোটাছুটি করবে। দৈত্যদের লড়াই-এ হারিয়ে দিয়ে সায়েবরা লোহার বাক্সে বন্দী করে রেখেছে। দৈত্যরা এখন তাই কিছুই করতে পারে না, শুধু মাঝে মাঝে মনের দুঃখে নিশ্বাস ছাড়বে—আর সেই কালো নিশ্বাসে হিন্দুস্থানের সুখের গ্রাম, সোনার ধানক্ষেত পুড়ে ছার-খার হয়ে যাবে। সায়েবরা মনে মনে তা জানে, মাঝে মাঝে ওদের মনে দুঃখ হয়—সেইজন্যে দিনরাত মদে চুর হয়ে থাকেন। সায়েবরা বিদায় নিয়েছেন। একদিন এই বাধাবন্ধহীন ফুর্তিকেন্দ্র শাজাহানের পানাগারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সর্বনাশ হয়েছে। কেউ কোনোদিন যা ভাবতে পারেনি তাই হয়েছে—পামার কোম্পানী ফেল করেছে। রাতারাতি অনেক রাজা ফকির হয়েছেন। ভূতপূর্ব রাজার দলকে মনোবল দেবার জন্যে শাজাহানের সেলার থেকে আবার ব্রাণ্ডি, হুইস্কি এবং জিন-এর বোতল বেরিয়ে এসেছে। হুইস্কির মোহিনী মায়ায় কলকাতা আবার সব ভুলে গিয়েছে। নতুন বড়লাট এসেছেন, নতুন ছোটলাট এসেছেন—আবার নতুন বোতল ভেঙে নবাগতদের স্বাস্থ্যপান করা হয়েছে। তার পর শাজাহানের কর্তারা একদিন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। বড়াপোচখানায় নতুন কল এসেছে। লিফ্‌ট। পায়ে হেঁটে আর কাউকে উপরে উঠতে হবে না। অবশ্য বড়াপোচ-খানায় এখন এই লিফ্‌ট কেবল লেডিজদের জন্যে। তাঁরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে একটা খাঁচার মধ্যে গিয়ে বসছেন, আর দুজন বেয়ারা দড়ির কপিকল দিয়ে সোঁ সোঁ করে টেনে তাঁদের উপরে তুলে দিচ্ছেন। এর পর কেউ কি আর লিফ্‌ট-বিহীন এই সেকেলে শাজাহানে আসবে? সে-চিন্তাও তাঁরা যখন করেছেন তখন তাঁদের সামনে ছিল শাজাহান হুইস্কি—স্পেশালি বট্‌ল্‌ড ইন স্কটল্যাণ্ড ফর হোটেল শাজাহান। এমনি করেই একদিন শাজাহানের আকাশে নতুন শতাব্দীর সূর্যোদয় হয়েছে। দিন পাল্টিয়েছে, দৃষ্টি-ভঙ্গী পাল্টিয়েছে, পোশাক পাল্টিয়েছে, রাজা পাল্টিয়েছে, হোটেলের মালিক পাল্টিয়েছে, বারমেড্ পাল্টিয়েছে, বারম্যান পাল্টিয়েছে কিন্তু হুইস্কির পরিবর্তন হলো না। 'আকাশের চন্দ্র সূর্য এবং মাটির হুইস্কি—এদের কোনোদিন পরিবর্তন হবে না'—হরস সায়েব আমাকে একবার বলে-ছিলেন। ও'র কাছেই শুনেছিলাম সেলারে সিম্পসন সায়েব যে এক কেস রেড ওয়াইন রেখে গিয়েছিলেন, তার একটা বোতল খোলা হয়েছিল সেবার যখন লর্ড কার্জন আমাদের এই হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন। তার পর বাকি ক'টা বোতল আজও কোনো বৃহৎ অতিথির আবির্ভাব অপেক্ষায় শতাব্দীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে রয়েছে।

সরাবজী একটু পরেই ফিরে এলেন। এখন দুপুরবেলা—লাঞ্চের ভিড় শেষ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন ক্লাইভ স্ট্রীট কর্তা এক কোণে বুঁদ হয়ে বসে রয়েছেন, লাঞ্চ করতে এসে নেশার ঘোরে আপিসের ঠিকানা ভুলে গিয়েছেন, বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "হামি কাঁহা কাম করতা হ্যায়? জানটা হ্যায়? বিল্‌কুল্ গড়বড় হো গিয়া।"

বেয়ারা বেচারা বলেছে, "হুজুর, আপনি কোন্ আপিসে কাজ করেন তা আমি কি করে জানবো?"

নেশার ঘোরে সায়েব এবার আমাকে ডেকে পাঠালেন, "তোমরা এই সব গুড-ফর-নাথিং ফেলোদের রেখেছো কেন?"

সরাবজী এবার কাউণ্টার থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সায়েবকে বললেন, "তুমি অমুক অফিসে কাজ করো।"

সায়েব চমকে উঠলেন, "এতক্ষণে মনে পড়ছে আমি ওখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অথচ কোথায় কাজ করি তা মনে করতে না পেরে আমি দেড় ঘণ্টা এখানে বসে আছি।"

সায়েব চলে যেতে, সরাবজীকে বললাম, "কেমন করে বললেন?"

সরাবজী হাসলেন, "এদের প্রায় সবাইকে আমি চিনি। শুধু অফিস নয়, এদের বাড়ির ঠিকানাও হোটেলের লোকদের জেনে রাখতে হয়, রাত্রে প্রায়ই এদের বাড়ি ফিরে
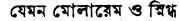
যাবার সামর্থ্য থাকে না। ড্রাইভার থাকলে অসুবিধে হয় না, কিন্তু অনেকে যে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসেন। তখন গাড়ি পড়ে থাকে, ট্যাক্সি করে আমরা বাড়ি পেঁৗছে দিই।"

এর পর গল্প করবার মতো সময় আমাদের ছিল না। সন্ধ্যার ককটেলের অনেক কাজ।

যদি কখনও আধুনিক পৃথিবীতে আদিম সভ্যতার রসাস্বাদন করতে চান তবে সুযোগ পেলেই ককটেলে আসবেন। মিসেস পাকড়াশির পার্টিতে আমি সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। সরাবজী আমার কানে কানে বলেছিলেন, ককটেলের চারটে অধ্যায় আছে। প্রথম প্রহরে ঠাকুর ঢেঁকি অবতার, দ্বিতীয় প্রহরে ঠাকুর ধনুকে টঙ্কার, তৃতীয় প্রহরে ঠাকুর কুকুরকুন্ডলী, চতুর্থ প্রহরে ঠাকুর বেনের পুঁটুলি।

প্রথম অধ্যায়ে অতিথিরা সহজ সাধারণ। তখন—কেমন আছেন? হাউ ডু ইউ ডু? মিসেস সেনকে দেখছি না কেন? উনি কি রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিলেন নাকি? পুওর মিস্টার সেন! যা হোক, মিসেস পাকড়াশি এতদিনে তা হলে একটা কাজের কাজ করলেন। আরও দু বছর আগে অনিন্দার বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এখন ওয়েস্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন — অ্যাভারেজ ম্যারেজেবল্ এজ্ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে সংসার পাতছে। আর ইন্ডিয়াতে বিয়ের বয়েস শুধুই বাড়ছে। কিছুদিন পরে হয়তো অ্যান্টি-সারদা অ্যাক্ট পাশ করতে হবে।......কংগ্রাচুলেশনস্ মিসেস পাকড়াশি। হোয়াট অ্যাবাউট এ ড্রিংক?'

'নিচ্ছি, মিস্টার ব্যানার্জি। আমি অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিচ্ছি। তা বলে আপনারা লজ্জা করবেন না। আপনারা ওদের দুজনের হ্যাপি লাইফ ড্রিংক করুন। ক্যারি অন। শ্যামপেন ককটেলও রয়েছে. আচ্ছা চলি, ওখানে মিস্টার আগরওয়ালা একলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমাদের জন্যে উনি অনেক করেন। রিয়েল ফ্রেন্ড।'

মিসেস পাকড়াশি চলে যেতেই ব্যানার্জিকে বলতে শুনলাম, 'হ্যালো পি-কে, মিসেস পাকড়াশির পার্টির মাথামুণ্ডু বুঝি না। ড্রেস ইভনিং করা উচিত ছিল। তা না লাউঞ্জ সুট। ব্যাড্। আফটার অল্ ইভনিং সুট না হলে পার্টির ডিগনিটি থাকে না। ক্যালকাটা যেভাবে উচ্ছন্নে যাচ্ছে তাতে এমন একদিন আসছে যেদিন তোমারই অফিসের ক্লার্ক হয়তো লুঙি পরে তোমার পাশে এসে বসবে। তুমি কিছুই বলতে পারবে না।'

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে। শোনা গেল, 'কেন আমরা কোট প্যান্ট টাই পরে গরমে সেদ্ধ হচ্ছি? কি দরকার এই সব ফরম্যালিটির? বোয়—খিদমতগার—ইধার আও। দো রোব রম বানাও। স্কচ হুইস্কি, ব্রান্ডি সরাব ঔর এ-বিটি। জলদি জলদি খিদমতগার, তুম বহুৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়।'

'...শ্রীমতী অনিন্দাকে দেখছো। ভ্রূ নয় তো যেন এক জোড়া ধনু। সহর্ষে সেই ভ্রূধনু ভঙ্গ করে ভদ্রমহিলা কথা বলছেন।' আর একজন বললেন, 'ঠিক হলো না। বলো মৃগলোচনা সুন্দরী তাঁর যৌবন মত্ত তনু-দেহ হিল্লোলিত করে কথা বলছেন!'

তৃতীয় অধ্যায়—হুইস্কির কল্যাণে তখন দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার। তখন চারিদিকে কথার ফুলঝুরি—জানেন, আমার ওয়াইফ কি সিলি? ড্রিংক করেছি শুনলে কাঁদতে আরম্ভ করে। আরে, এ কী ধরনের ন্যাকামো? সত্যি বলছি, আমি একটা এ ডবল এস্। মাধব পাকড়াশিও তাই। আবার বাঙালী মেয়ের হাঙ্গামায় গেলেন। মোমের পুতুল ছোকরার লাইফটা মিজারেবল্ করে দেবে। হ্যাঁ বাবা, বিয়ে যদি করতে হয় পাঁচ-নদীর তীরে। ওয়ান্ডারফুল, ওদের মেয়েরা ড্রিংকের কদর বোঝে। রবি ঠাকুরও ওদের বুঝেছিলেন। না হলে এত দেশ থাকতে পাঞ্জাবের নামটা জাতীয় সঙ্গীতে আগে ঢোকালেন কেন? পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ—কবি একদম মেরিট অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। ওই দেখ রাজপাল কেমন মিসেস রাজপালের সঙ্গে বসে মনের সুখে পেগের পর পেগ ফাঁক করে দিচ্ছে। কি নিয়েছে ওরা? প্যারাডাইস? ওয়ান্ডারফুল, জিন, অ্যাপ্রিকট আর অরেঞ্জের মিক্সচার সত্যিই স্বর্গীয়। যে নাম দিয়েছিল তার পেটে সামথিং ছিল, আর ওই নিঃসঙ্গ সুন্দরী, উনি কী টানছেন? ও'র দাম অনেক, অনিন্দ্য পাকড়াশির স্ত্রী সম্বন্ধে বোম্বাই-এর ফ্যাশন কাগজে প্রবন্ধ লিখবেন। হোয়াট? হোয়াইট লেডি নিয়েছেন—জিন আর লাইম। পুওর গার্ল—দেখে মনে হচ্ছে প্রিয়বিরহক্লিষ্ট। ও'র আসঙ্গমুগ্ধ নারী-চক্ষু কাউকে খুঁজে পাক, ও'র অধর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠুক, তখন ও'কে একটা পুরো গেলাস পিংক লেডি দাও। তাতে থাকবে

জিন, সঙ্গে ডিম এবং গ্রেনাডিন। ওয়াণ্ডার-ফুল। তখন ও'র মুগ্ধলোচনে কাজলের মসিরেখা ফ্লোরেসেণ্ট পেণ্টের মত জ্বলজ্বল করবে। আরে ব্রাদার, তোমার হলো কি? এরই মধ্যে হাত গুটিয়ে বসে আছো? তুমিও কি আজকালকার ফ্যাশনেবল লেম্বুপানি সায়েব হয়ে গেলে নাকি? বোকামি ক'রো না। এমন সুযোগ রোজ আসবে না। এমন চান্স পাবে না। শ্যামপেন ককটেলে লোকে কিছু তোমাকে রোজ ইনভাইট করবে না। মনে থাকে যেন এক এক পেগ বারো টাকা। টেনে নাও ব্রাদার। অক্তিতারকার কটাক্ষ, স্ফুরিত অধরের হাস্য ভুলে গিয়ে কারণ-সাগরে ডুব দাও।'

চতুর্থ এবং শেষ অধ্যায়ে অনেক কম লোক। তৃতীয় বারেই বোল্ড আউট হয়ে অনেকেই পালিয়েছে। হোস্টের তখন যাবার ইচ্ছে, কিন্তু পালাবার উপায় নেই। অতিথি-দের মধ্যে ড্রিঙ্ক ছেড়ে ওঠবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কেউ নেশার ঘোরে অহিংসপথে সত্যাগ্রহ করে বসে আছেন। আর কেউ হয়ে উঠেছেন হিংস্র। যেন কাঁচের বাসনের দোকানে মত্ত ষাঁড় ঢুকে পড়েছে। গেলাস ভাঙছে, খালি বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। কী যে হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। মিসেস পাকড়াশি স্বামীর সঙ্গে সরে পড়েছেন। পাকড়াশি ইণ্ডাস্ট্রিজের পি-আর-ও শুধু বিল মেটাবার জন্যে, এবং প্রয়োজন হলে পুলিসের হেফাজত সামলাবার জন্যে রয়ে গেলেন। এক এক করে হলঘর প্রায় শূন্য হয়ে গেল। কিন্তু তখনও দু-একজন সেখানে বসে থাকতে চান। পি-আর-ও বললেন, 'স্যার, বার বন্ধর সময় হয়ে আসছে।'

'শাট্ আপ। এ কী ধরনের ভদ্রতা? নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে না খেতে দেওয়া?'

পি-আর-ও বেচারা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা আর অতিথিরা কাজ শেষ করবার জন্য ঢকঢক করে আরও কয়েকটা পেগ সেরে ফেললেন, তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা তখন ভাঙা গেলাসের হিসেব করতে বসি। 'কাল্কে বিল পাঠিয়ে দেবেন, আজকে কাউণ্টারসাইন করে দিয়ে যাচ্ছি'। বলে পি-আর-ও বেরিয়ে যান।

এর নামই ককটেল পার্টি। ঝলমলে সন্ধ্যায় পুত্র এবং পুত্রবধূকে নিজের দু-দিক নিয়ে মিসেস পাকড়াশি যখন বার-এ ঢুকেছিলেন, তখন সবটা কল্পনা করে নিতে পারিনি। অতিথিরা সেই একই সার্কাস পার্টি। কারণ কলকাতা শহরে যারা নেমন্তন্ন করে তাদের কাছে একটা মাত্র লিস্টি আছে। সেই একই লিস্টি দেখেই সবাই আর-এস-ভি-পি মার্কা কার্ড পাঠাচ্ছেন।

অনিন্দ্য পাকড়াশি আজ যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে একবার একটু থেমেছিলেন, হয়তো দু-একটা কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিসেস পাকড়াশি বললেন, "খোকা, এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে গল্প করবার সময় নয়, গেস্টরা তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

অনিন্দ্যর সঙ্গে আর কথা বলবার সুযোগ পাইনি। বলবার ইচ্ছেও ছিল না।

তবু বারবার হালকা হাসির ফোয়ারার মধ্যে, রঙীন মদের সোনালী নেশার ভিতর দিয়ে একটা বিষন্ন মহিলার মুখ বারবার অদ্ভুতভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বার থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও তাঁকে মন থেকে তাড়াতে পারিনি।

মিসেস পাকড়াশির পার্টিতে আমার হয়তো কোনো লাভ হয়নি। কিন্তু হোটেলের হয়েছিল—একটা ককটেল থেকে আমরা দশ হাজার টাকার চেক পেয়েছিলাম। আবগারি ইন্সপেক্টর হিসেব পরীক্ষা করতে এসে বললেন, "চমৎকার, এই রকম ককটেল যত হয় তত আপনাদেরও লাভ, গভর্ন-মেণ্টেরও লাভ।"

"বেয়ারাদেরও লাভ।" সরাবজী হাসতে হাসতে বললেন।

"দুনিয়াতে সবারই লাভ, শুধু ক্ষতি যদি কারুর হয় তার নাম সোল—আত্মা।" গলার আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখি হবুস সায়েব।

হবুসের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে খুব আনন্দ হলো। মাথার টুপিটা খুলতে খুলতে সায়েব বললেন, "মার্কোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এক বন্ধুর জন্যে ঘর চাই। কিন্তু ম্যানেজারকে পেলাম না।"

"এর জন্যে ম্যানেজারের কী প্রয়োজন? আমরা তো রয়েছি।" অভিমানভরা কণ্ঠে আমি অভিযোগ জানালাম।

হবুস বললেন, "তা হলে ব্যবস্থা করে দাও।"

ও'কে নিয়ে বার থেকে বেরোবার পথে সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সরাবজীকে দেখেই মিস্টার হবুস যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি? তুমি এখানে?"

সরাবজী ম্লান হাসলেন। "সবই তাঁর ইচ্ছা। আমরা কী করতে পারি?"

সরাবজী সামনে হবুস দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোনো ব্যক্তিগত কথা থাকতে

পাবে আন্দাজ করে আমি এগিয়ে গেলাম। কাউণ্টারে খাতায় হব্‌স সায়েবের বন্ধুর কোনো জায়গা করে দেওয়া যায় কি না দেখতে লাগলাম। হব্‌স এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "কলকাতার হোটেলজীবনকে আমি যতদূর জানি তাতে এইটুকু বলতে পারি, রিসেপশনিস্ট ইচ্ছে করলে সব সময় জায়গা করে দিতে পারে।"

বোসদা কাউণ্টারে দাঁড়িয়েছিলেন। বলিলেন, "একদিন সত্যিই তা ছিল। কিন্তু ফরেন ট্যুরিস্ট, বিজনেস, ট্যুর এবং কনফারেন্সের দৌলতে সে-ক্ষমতা কোথায় উবে গিয়েছে। ম্যানেজার নিজেই সব সময় বুকিং-এর উপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছেন।"

হব্‌স সায়েবের বন্ধুর অবশ্য কোনো অসুবিধা হলো না। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে জায়গা খালি ছিল, পাওয়া গেল।

হব্‌স সায়েব প্রশ্ন করলেন, "সরাবজী কবে থেকে এখানে এলেন?"

"এই কিছুদিন।" আমি বললাম।

"ও'র মেয়ের কী খবর?"

আমি কিছুই জানি না। সুতরাং বোকার মতো ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হব্‌স এবার প্রশ্ন করলেন, "মার্কো কোথায়?"

"বেরিয়ে গিয়েছেন। বোধ হয় মিস্টার বায়রনের কাছে গিয়েছেন।"

একটু হেসে বললেন, "তোমাদের এই হোটেলটা। আমি যেন অন্তরে চোখ দিয়ে দেখতে পাই। বোধ হয়, তিনি কর্পোরেশন স্ট্রীটে মেকলে পান করতে গিয়েছেন।"

লর্ড মেকলের নামে যে কোনো পানীয় আছে তা জানতাম না। হব্‌স হেসে বললেন, "পেনাল কোডের রচয়িতা ঐতিহাসিক মেকলে বেঁচে থাকলে আঁতকে উঠতেন। বাঙালীরা তাঁর কী সর্বনাশ করেছে। দেশী মা কালী মার্কা ধেনোর নাম দিয়েছে মেকলে। তোমাদের অনেক অচ্ছা অচ্ছা কাপ্তেন জন হেগ, ভিক্তস স্কচ ফেলে মেকলে খেতে যান।"

হব্‌স এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছুক্ষণ দেখেই যাই। মার্কোর সঙ্গে একটু প্রয়োজনও ছিল।"

আমরা দুজনে লাউঞ্জে এসে বসলাম। বোসদা এগিয়ে এসে বললেন, "ও'কে কিছু অফার করো। চা বা কফি পাঠিয়ে দেবো? আমরা সামান্য হোটেল কর্মচারী কীই বা ও'কে দিতে পারি। পৃথিবীর খুব কম লোকেই হোটেল সম্বন্ধে ও'র থেকে বেশী জানে।"

হব্‌স বললেন, "বেশ, কফি খাওয়াও। উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকে তোমাদের হোটেলে কতবারই তো খেয়ে গেলাম, আর একবার খাওয়া যাক।"

বোসদা আমাদের জন্যে কফির অর্ডার দিয়ে আবার কাজে বসে গেলেন।

হব্‌সের মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। বললেন, "ইউরোপের সেরা কোনো ঔপন্যাসিক যদি এখানে এসে কয়েক বছর থাকতেন, তা হলে হয়তো এক আশ্চর্য উপন্যাস লিখতে পারতেন। ওয়েস্টের বহু হোটেল আমি দেখেছি—কিন্তু ইস্টের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সিম্পসন, সিলভারটন, হোরাবিন থেকে আরম্ভ করে তোমাদের মার্কো পোলো, জুনো এমনকি এই সরাবজী সব যেন বিশাল ঐতিহাসিক উপন্যাসের এক একটা চরিত্র।"

হাতে সময় ছিল। হব্‌সকেও সময় কাটাতে হবে। তাই বোধ হয় গল্প জমে উঠলো। কফির কাপে চুমুক দিয়ে, হব্‌স বললেন, "নরি সরাবজী যে কোনোদিন তোমাদের হোটেলে এসে চাকরি নেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ওকে আমি সেই প্রথম যুদ্ধের আগে থেকে দেখছি। তখন হাফেসজীর দোকানে ছোকরা ড্রিংক সার্ভ করতো। আমার মনে আছে, তোমাদেরই এক বন্ধু একবার একসাইজ ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করেছিল। ওর আসল নাম সরাবজীও নয় বোধ হয় ম্যাডান না ওই ধরনের কি একটা। সরাবের লাইনে থেকে থেকে ছোকরা সরাবজী হয়ে গেল।

ম্যাডানের তখন কত বয়স—চোদ্দ বছরের বেশী নয় বোধ হয়। বেচারা কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার হাত চেপে ধরেছিল। অত কম বয়সের ছেলেদের মদের দোকানে চাকরি দেবার নিয়ম নেই, রিপোর্ট করেছে কে, এবার চাকরি গেল। আমার দুঃখ হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করে সে রিপোর্ট আমি চাপা দিতে পেরেছিলাম। তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পার্সীদের মধ্যে এমন দারিদ্র্য তো নেই। ওদের এত ট্রাস্ট আছে, এত দান নেবার সুযোগ আছে যে, কোনো কম-বয়সী ছেলের পয়সা রোজগারের প্রয়োজন নেই।

তাই মনে একটু সন্দেহও জেগেছিল। বিপদ মিটলে একদিন হাফেসজীর দোকানে গিয়েছিলাম। সেদিন বার-এ তেমন ভিড় ছিল না। একটা ছোটো পেগের অর্ডার দিয়ে বসলাম। সরাবজী আমাকে দেখেই ছুটে এল। আস্তে আস্তে বললে, "আপনি এইভাবে না দেখলে এতক্ষণে আমাকে চৌরঙ্গীর পথে পথে ঘুরতে হতো।"

আমি বললাম, "তোমার কাজ সেরে এসো। কথা আছে।"

সরাবজীকে বলেছিলাম, "তুমি এত কম বয়সে ছোটো কাজ করছো কেন?"

সরাবজী ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে বলেছিল, "আমি অরফ্যান বয়। আমি অরফ্যান স্কুলে মানুষ হয়েছি। আমার মাথায় বুদ্ধি নেই, তাই ও'রা অত চেষ্টা করলেন, তবু পড়াশোনা হলো না। ও'রা বলেছিলেন, কোন্ একজন ইণ্ডিয়ান গ্রামারিয়ান একেবারে জড়বুদ্ধি ছিলেন, তারপর চেষ্টা করে সব শিখেছিলেন। আমিও ট্রাই করেছিলাম। কিন্তু হলো না। আমার মাথায় ঢুকলো না। তাই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছি।"

আমি বলেছিলাম, কোনো ট্রাস্টের সাহায্য নিলে পারো। সরাবজী রাজী হয়নি। "না স্যর, জন্ম থেকে বাবা মা-ই যাকে সাহায্য করতে রাজী হলো না, সে কি করে অন্যের কাছে সাহায্য চাইবে? সেটা ভাল দেখায় না। গড্ নিশ্চয়ই চান আমি কেবল নিজেকেই সাহায্য করি। আমি আপনাদের আশীর্বাদে কেবল সেই চেষ্টাই করবো।"

[ক্রমশ]

রাহা ছিলেন সাধারণ লোক
নিজের স্ত্রী
...ছেলেমেয়ে
ছোট্ট একটি বাড়ী
ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পড়ালেন
তারা যখন বড় হলো
মেয়েদের বিয়ে দিলেন বেশ ঘটা ক'রে
ছেলেকেও ভালো চাকরীতে ঢোকালেন
এখন খুশিমনে অবসর নিয়েছেন

মরুসাগরের লিপিমালা

সুবোধকুমার মজুমদার

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা তখন সবেমাত্র নীরব হয়েছে। এমন সময় মধ্যপ্রাচ্যের মরুসাগর অঞ্চলে এক চাঞ্চল্যকর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী শুনে পৃথিবীর লোক চমৎকৃত হ'ল। শোনা গেল, সাগর উপকূলে দুর্গম গিরিগুহায় বহু প্রাচীন লিপিমালা আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে বললেন, এগুলি হচ্ছে বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি—এযাবৎ যা পাওয়া গেছে, তার থেকেও প্রায় হাজার বছরের বেশী পুরাতন। দলে দলে সাংবাদিক ছুটে এলেন, বাইবেলের দেশ প্যালেস্টাইনে—"Dead-Sea Scrolls" সংক্রান্ত টাটকা খবর সংগ্রহের আশায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংবাদপত্রে, বড় বড় হরফে ছাপা হতে থাকল মরুসাগর লিপিমালার রোমাঞ্চকর কাহিনী। কোন কোন পণ্ডিত এমন মতও প্রকাশ করলেন যে, সমগ্র অঞ্চলটি জুড়ে এককালে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে এমন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যার ফলে এই গ্রন্থাগারটি মাটির তলে চাপা পড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। কেবল রক্ষা পেয়েছিল কয়েকটি বহুমূল্য নিদর্শন—সুদীর্ঘ চামড়ার পাতে লেখা ও সযত্নে বস্ত্রখণ্ডে জড়িত Old Testament এর কয়েকটি পাণ্ডুলিপি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যদিয়ে এগুলির আবিষ্কার সম্ভব হয়।

এই আবিষ্কারের কাহিনী খুব চমকপ্রদ। মরুসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ Jericho শহরের কিছু দক্ষিণে, অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলে মহম্মদ আধিব নামক এক বেদুইন যুবক তার ছাগলের পাল চরাত। একদিন ঘটনাচক্রে একটি ছাগল পাল থেকে ছিটকে পড়ে। মহম্মদ ছাগলটিকে খুঁজে বার করায় অনেক চেষ্টা করল। দুর্গম পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ভেঙে, বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে অনেক ছোটাছুটি করে সে বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল—কিন্তু কিছুতেই ছাগলটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এদিকে মরুভূমির মধ্যাহ্ন-সূর্য ঠিক মাথার উপরেই তখন অগ্নিবর্ষণ করছে। শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে সে একটা পাথরের আড়ালে বিশ্রাম করতে বসল। অন্যমনস্ক ভাবে সামনের পাহাড়ের গায়ে এক সারি বড় বড় পাথরের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একটা জায়গায় এসে তার দৃষ্টি থেমে গেল। সে জায়গায় অদ্ভুত ধরনের একটি গুহা আছে বলে তার মনে হ'ল। অথচ জায়গাটা এত উঁচুতে যে তার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। কৌতূহল

মেটাবার জন্য মহম্মদ একটা পাথর ছুঁড়ে দিল গুহার মধ্যে। ভিতরে ঝন্ ঝন্ শব্দে কি যেন ভেঙে গেল। একটু চমকে উঠল বেদুইন যুবক। তার শুনতে ভুল হয়নি তো? আর একবার সে পাথর ছুঁড়ে দিল। এবারও সেই একই শব্দ। কৌতূহল দমন করতে না পেরে এবার সে অতি কষ্টে পাহাড়ের গা বেয়ে গুহার দিকে এগিয়ে গেল। ভিতরে এক ঝলক তাকাতেই তার নজরে পড়ল দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো—বড় বড় কয়েকটা জালা। এবার তার ভয় পাবার পালা। একলাফে গুহা থেকে নেমে সে দিল এক ছুট। পিছনে পড়ে রইল তার ছাগলের পাল। এই নির্জন গুহায় নিশ্চয়ই কোন জিনের আস্তানায় সে এসে পড়েছে—অতএব পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই শ্রেয় নয় কি?

সেই রাত্রে মহম্মদ আধিব তার আবিষ্কারের কাহিনী এক বয়ঃজ্যেষ্ঠ আত্মীয়কে গল্প করে শোনাল। সে অনেক চালাক-চতুর এবং মহম্মদের মত জিনের ভয় তার ছিল না। বরং তার মনে আশা হয়েছিল নিশ্চয়ই কোন গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে গুহাটিতে। বড় বড় জালাগুলিতে সোনাদানা, হীরা-জহরত ছাড়া আর কি থাকবে? পরের দিন মহম্মদকে নিয়ে সে চলল গুহার দিকে। গুহামুখে পৌঁছে তারা সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল—কোথাও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কোথাও হামাগুড়ি দিয়ে। স্বল্প আলোতে তারা দেখল তাদের সামনেই সাত-আটটি মাটির ছোট-বড় জালা। ঢাকনা খুলে দেখা গেল দুটি জালা একেবারে শূন্য। তৃতীয়টির মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়ার একটা বাণ্ডিল পাওয়া গেল। ন্যাকড়া এত সূক্ষ্ম ও ভঙ্গুর যে হাত লাগতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিল। এরকম তিনটে বাণ্ডিল তারা সযত্নে সংগ্রহ করল। কোথায় তারা ভেবেছিল গুহা থেকে গুপ্ত-ধন পাওয়া যাবে—আর কি জিনিসই না তারা পেল? তবু যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে তারা ঘরে ফিরল। কিন্তু সবটা বাণ্ডিল খুলে তারা তো অবাক! সমস্ত ঘর-জোড়া এক চামড়ার পাত—লম্বায় প্রায় সাড়ে সাত গজ—তাতে আবার কি সব হিজিবিজি লেখা! ভুতুড়ে ব্যাপার নয় তো? পরের দিন তারা ছুটল বেথলেহেম শহরে—তাদের জানাশোনা কাণ্ডো নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে। তার আছে জুতার দোকান—হয়ত চামড়াগুলি কিনেও নিতে পারে। চামড়া

কিনতে কান্ডোর কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তার খটকা লাগল দুর্বোধ্য অক্ষরের বিদঘুটে লেখাগুলো দেখে। বিনা বাক্যব্যয়ে চামড়া কিনে নিল কান্ডো। কিন্তু মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটল Syrian Church-এর পাদ্রী সাহেবদের কাছে। এ'রা পন্ডিত লোক—লেখাগুলি পড়ে হয়ত অর্থ বলে দিতে পারবেন। ধূর্ত ব্যবসায়ী ঠিকই বুঝেছিল যে বহুমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তার হাতে এসেছে। ঠিকমত এর খদ্দের জোটাতে পারলে রাতারাতি তার পক্ষে বড় লোক হওয়া অসম্ভব হবে না। পাদ্রী সাহেবরা তখন তখনই এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করতে না পেরে কিছুদিন এগুলি তাদের কাছে রাখতে চাইলেন। কিছু অর্থের বিনিময়ে তাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে কান্ডোর আপত্তি ছিল না। এরপর কান্ডো তার সাকরেদ জর্জ ঈশায়া ও কয়েকজন বেদুইন যুবককে নিয়ে মরুসাগর উপকূলে বিখ্যাত গুহাটিতে খনন কাজ চালানোর জন্যে অগ্রসর হল। সম্ভবত তারা এই সময়ে আরও সাতটি লিপি সংগ্রহ করে। Syrian Church-এর পাদ্রীদের এ খবর জানান হলে তাঁরাও কান্ডোকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। সরকারী অনুমতি ব্যতীত এধরনের কাজ কিছু বে-আইনী ছিল। কেননা দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর একমাত্র সরকারেরই অধিকার আছে। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান যদি বিনা

বেদুইন যুবক মহম্মদের আবিষ্কৃত প্রথম গুহা

অনুমতিতে খনন কাজ চালায় তাহলে আইন অনুযায়ী তাদের দন্ডনীয় হতে হবে। এই সরকারী নিষেধাজ্ঞার যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ ব্যবসায়ীর লোভ ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়। মাটির বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ধ্বংসস্তূপের বয়সকাল নির্ণয় করে থাকেন। পরে দেখা গেছে যে খনন কাজ চালাবার সময় কান্ডো ও জর্জ কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধার ধারে নি। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, মৃৎপাত্রের অসংখ্য টুকরা ও সূক্ষ্ম বস্ত্রখন্ডও যা প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে বহুমূল্য সম্পদ তা তারা গুহার বাইরে অনেক আবর্জনার মধ্যে অনাদরে ফেলে দিয়েছিল। পরে এগুলি সযত্নে উদ্ধার করে সরকারী সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছে।

নিজেরা বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে পাদ্রী সাহেবরা সদ্য আবিষ্কৃত লিপিগুলি হিব্রু-বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof. Sukenik-এর কাছে নিয়ে যান। প্রথম দর্শনেই অধ্যাপক নিঃসন্দেহে বুঝেছিলেন এই লিপিগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। কান্ডোর কাছ থেকে তিনি আরও তিনখানি লিপি সংগ্রহ করেন। কান্ডো ততদিনে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে। তার আশঙ্কা যে তার বেআইনী কাজ আর বেশী দিন গোপন থাকবে না। ব্যাপারটি বেশী জানাজানি হলে পুলিসের কানে তার নাম উঠবেই—আর তার ফলে তাকে জেলে যেতে হবে। তার হাতে তখনও যা কিছু ছিল ভয় পেয়ে তা তার বাগানের মাটির তলায় পুঁতে ফেলল। দীর্ঘদিন পর যখন এগুলিকে উদ্ধার করা হল তখন দেখা গেল ভিজে মাটির তলায় থাকতে থাকতে অমূল্য নিদর্শনগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে

অধ্যাপক সুকেনিক্ ছাড়াও পাদ্রী সাহেবরা এই লিপিমালা American School of Oriental Research-এর অধিকর্তা Dr. John Trevor-কে পরীক্ষা করতে অনুরোধ করেন। ট্রেভরকে প্রথম যে লিপিটি দেখান হয় সেটি পরীক্ষা করে তিনি বলেন যে, এটি Book of Isaiah সংক্রান্ত, Old Testament-এর একটি সুপ্রাচীন পান্ডুলিপি। Old Testament-এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন একটি প্যাপাইরাসের সঙ্গে তুলনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নবাবিষ্কৃত লিপিমালা এযাবৎ প্রাপ্ত যে-কোন পান্ডুলিপির চেয়েও হাজার বছরের বেশী পুরাতন।

ডাঃ ট্রেভরের ইচ্ছা ছিল যে Dead-Sea Scrolls সম্বন্ধে আরও খোঁজ-খবর নেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদীদের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ বেধে যায়। ট্রেভর বাধ্য হয়েই তাঁর অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ রাখলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি হলে আঠার মাস পরে মরুযবনিকার আচ্ছাদন উন্মোচন হল। এবার জেরুজালেম মিউজিয়ামের কিউরেটার G. Lankester Harding মরুসাগর লিপিমালা উদ্ধারের কাজে মন দিলেন। তাঁর প্রথম কাজ হল—সেই বিখ্যাত গুহা খুঁজে বার করা যেখানে প্রথম লিপিটি আবিষ্কৃত

হয়। প্রয়োজন মত আরও ব্যাপক খননকার্য চালিয়ে আরও নিদর্শন সংগ্রহ করার দিকেও তাঁর নজর ছিল। তাছাড়া এযাবৎ কতগুলি অসম্পূর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছিল। টুকরো অংশ খুঁজে বার করে আসলটির সঙ্গে জোড়া না দিতে পারলে অর্থোদ্ধার সম্ভব হচ্ছিল না। অত্যন্ত জটিল এই কাজগুলি একে একে সম্পন্ন করার দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন—Harding এবং তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী Joseph Saad

এ'রা খবর পেয়েছিলেন যে সর্বপ্রথম Syrian Church-এর পাদ্রীসাহেবদের কাছ থেকেই মরুসাগর লিপিমালার হদিশ জানা যায়। অতএব তাঁদের কাছেই সেই বিখ্যাত গুহাটির ঠিকানা পাওয়া যাবে মনে করে তাঁরা Syrian Church-এর দিকে অগ্রসর হলেন। সেই সময়ে আরব-ইহুদী সংঘর্ষ আবার শুরু হয়ে যায়—জেরুসালেমের রাস্তাঘাটে গোলাগুলী চলতে থাকে অবিরাম। অতি কষ্টে কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে হার্ডিং ও সাদ পাদ্রীদের আস্তানায় এসে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটল জর্জ ইশায়া নামক সেই ব্যক্তির সঙ্গে, যে ছিল কান্ডোর প্রধান সাকরেদ ও মন্ত্রণাদাতা। জর্জ স্বীকার করল যে, এই চার্চ থেকে একবার মরুসাগর লিপিমালা উদ্ধারের জন্য একটা গুহায় যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে কিছুতেই গুহাটির সঠিক অবস্থান জানাতে রাজী হল না। অনেক অনুনয় বিনয় ও অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও কিছু লাভ হল না। প্রত্নতাত্ত্বিক দুজন হতাশ হয়ে প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কিন্তু হঠাৎ একজন বৃদ্ধ পাদ্রীকে দেখে যোশেফ সাদের মাথায় এক সুবুদ্ধির উদয় হল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল পাদ্রীসাহেবটি সরল ও সাদাসিধা-ধরনের। সত্য ঘটনাকে গোপন করার কৌশল তিনি হয়ত জানেন না। তাই তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সাদ বিনীতভাবে বললেন যে, তাঁরা প্রত্নতত্ত্ববিদ—মরুসাগর লিপিমালা আবিষ্কারের উদ্দেশেই তাঁরা এদিকে এসেছেন। শোনা গেছে, এই চার্চের পাদ্রীসাহেবরা কিছুদিন পূর্বে মরুসাগর অঞ্চলে একটা ছোটখাট অভিযান চালিয়েছিলেন। অনুগ্রহ করে সদাশয় ফাদার এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি? ধূর্ত জর্জ ইশায়া চোখের ইশারায় অনেক করে পাদ্রীসাহেবকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেও পাদ্রীসাহেব সরল বিশ্বাসে, অকপটে যা জানেন তাই বলে গেলেন। যে সব তথ্য তিনি জানালেন তার অধিকাংশই আগে এ'রা সংগ্রহ করে-ছিলেন। কেবল একটি কথা স্থির জানা গেল যে, গুহাটির অবস্থান Jericho শহরের কিছু দক্ষিণে—মরুসাগর উপকূলে। শুধুমাত্র এইটুকু ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে গুহান্বেষণ নিরর্থক। এই স্থানের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরাই বুঝবেন যে আরও সঠিক বিবরণ না পেলে গুহামুখ খুঁজে বার করা অসম্ভব ছিল Harding ও Saad-এর পক্ষে। কোনকিছুর কূলকিনারা না করতে পেরে Joseph Saad ঠিক করলেন সৈন্য বিভাগের সাহায্য নেবেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে মরুভূমির যুদ্ধে অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন কয়েকজন বেদুইন-সৈনিকের সাহায্য পেলে গুহামুখ খুঁজে বার করা সম্ভব হতে পারে। এদের সাহায্যেই অবশেষে তিনি গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছান। যদিও তাঁর দীর্ঘদিনের শ্রম সার্থক হল, তিনি নিরাশও হয়েছিলেন অনেকখানি। গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি দেখলেন যে, পূর্ব অনুসন্ধানকারীর দল যথেচ্ছভাবে সমস্ত গুহাটিকে খুঁড়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথ সবটাই প্রায় বন্ধ করে গেছে। তিনি অনুমান করলেন যে, এই গুহা থেকে ন্যূনপক্ষে চল্লিশ, পঞ্চাশটি জালা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বেশীর ভাগই নিশ্চয় অসাধু ও অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী-

মুরাব্বাটে প্রাপ্ত একটি প্যাপাইরাস লিপি

দের হাতে পড়েছে। এই অমূল্য সম্পদ উদ্ধারের কোন আশা আছে কি?

কালক্ষেপ না করে Harding ও Saad প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকের কাজ ছেড়ে এবার গোয়েন্দাগিরির কাজে লেগে গেলেন। প্রতি পদক্ষেপ তাঁদের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হল। বিশেষ করে, সাধারণ আরববাসীদের কাছ থেকে তাঁরা কোন সহযোগিতা পাননি। এরা অত্যন্ত ভীরু-প্রকৃতির হয়ে থাকে—যদি একবার এদের মনে পুলিসের ভয় প্রবেশ করে, এরা আর কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না। অনেক চেষ্টার পর, অনেক বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে এঁরা শেষপর্যন্ত বেথলহেমের ব্যবসায়ী কাণ্ডোর সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু এর কাছ থেকে মরু-সাগর লিপিমালার অবশিষ্টাংশ বার করতে তাদের উপস্থিত বুদ্ধি, কূটকৌশল ও অপরিসীম ধৈর্য ব্যয় করতে হয়েছিল, সে সব ঘটনা স্বতন্ত্র একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর বিষয়বস্তু হতে পারে। Harding-Saad-এর সম্মিলিত চেষ্টা শেষে জয়যুক্ত হয়েছিল। হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে কাণ্ডোর কাছ থেকে তাঁরা লিপিগুলি সংগ্রহ করেন। তাঁদের আচরণ সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁদের পক্ষে পুলিসের গোয়েন্দা লাগিয়ে কাণ্ডোকে গ্রেপ্তার করা কঠিন ছিল না। সাকরেদরাও নিশ্চয়ই ধরা পড়ত ও সমুচিত শাস্তি পেত। কিন্তু সমস্ত লিপিগুলি কি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হত? কাণ্ডোর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, জর্জের শঠতা মধ্যে মধ্যে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেও তাঁরা জানতেন যে এরা অতি দরিদ্র অশিক্ষিত ব্যবসায়ী—অর্থের প্রলোভন কাটিয়ে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার মত উচ্চ আদর্শবোধ এদের নেই। তাই তাঁরা এদের আচরণ কিছুটা সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৯৪৭ সালের প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত মরুসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের এই অঞ্চলটিতে প্রায় এগারটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুটি গুহা—মুরাব্বাট ও কুমড়ানে অত্যন্ত মূল্যবান দলিলপত্রাদি পাওয়া গেছে। কুমড়ানে একটি তাম্রশাসনও আবিষ্কৃত হয়েছে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের চেয়ে, মরুভূমির বেদুইন দলই আবিষ্কারের কাজে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছে। এদের সুবিধা এই যে, সমস্ত অঞ্চলটি এদের নখ-দর্পণে। কোথায় কোন পাহাড়ে, কোন গুহা আছে, এরা যতটা জানে, ততটা শহরবাসী শিক্ষিত কর্মীদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অর্থের প্রলোভনেই হোক আর যে কারণেই হোক, বেদুইনরা এগিয়ে না আসলে, মরু-সাগর লিপিমালার অনেকগুলিই আমাদের জ্ঞান গোচর হত না।

পৃথিবীর অনেক নামকরা প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ্ ও ধর্মশাস্ত্রবিশারদ এই লিপিমালা পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত আছেন। সমস্ত লিপিগুলির মোট এক-তৃতীয়াংশের সম্পাদনা ও প্রকাশ এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। অন্যগুলি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়। গবেষকদের কাছে সব থেকে বড় সমস্যা—এই লিপিমালার সময় নির্ণয়। তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। কেবল লিখন-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তাঁরা যে বিভিন্ন রায় দিয়েছেন, তাতে এগুলিকে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত যে-কোন সময়ের মধ্যে ফেলা যেতে পারে। কোন কিছুর কূল-কিনারা না পেয়ে সরাসরি কেউ কেউ লিপিগুলোকে সম্পূর্ণ জাল দলিল বলতেও ইতস্তত করেননি। আমেরিকান গবেষকরা প্রথম গুহাটিতে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডকে Carbon Fourteen Test নামক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু ফল সন্তোষজনক হয়নি। এই পরীক্ষার ফলে প্রধান একটি তারিখ পাওয়া গেছে—৩৩ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু পণ্ডিতরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, এই পরীক্ষায় দুশো বছরের ভুল, আগে পিছে, থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৫১ সালে কুমড়ান গুহায় প্রাপ্ত একটি গ্রীক রৌপ্য-মুদ্রা সন্দেহের কিছু নিরসন করেছে। এই মুদ্রাটির তারিখ হল ১০ খৃষ্টাব্দ। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন লিপির আনুমানিক কাল প্রথম শতাব্দী। অবশ্য কয়েকটি লিপি যে আরও প্রাচীন, সে প্রমাণও আছে। ব্যাপক খনন-কার্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, মরু-সাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই জনবসতি ছিল। সম্ভবত যে সম্প্রদায় Old Testament-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তাঁরা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই অঞ্চলে বসবাস করতে আসেন।

গবেষকরা প্রতি বৎসর এই লিপিমালা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ রচনা করছেন। এযাবৎ প্রকাশিত প্রায় ১২খানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁদের কাজ সবে শুরু হয়েছে। সমস্ত লিপিগুলির বিশদ আলোচনা এখনও সময়সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে যে, বেদুইন-দের কাছ থেকে আরও লিপি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নূতন আবিষ্কারের ফলে আলোচনার ধারার পরিবর্তন হতে পারে—হয়ত নূতন আলোর সন্ধান পেলে বিশ্লেষণের কাজেরও সুবিধা হবে। খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও মধ্য প্রাচ্যের সুদূর অতীত—এই দুই বিষয়ে Dead-Sea Scrolls অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের নিরলস সাধনা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

পুরোনো দিনের কথা। রোমান সাম্রাজ্যের তখন জয় জয়কার। সভ্যতায় পৃথিবীর মাথায়। সমৃদ্ধি তার মুঠোর মধ্যে তাই জলুসের শেষ নেই। জাঁকজমক উপচে পড়ছে। স্বর্গে ইন্দ্রপ্রস্থ, পৃথিবীর বুকে রোম। ইন্দ্রসভার গৌরব-পারিজাত, জুলিয়াস সিজারের দম্ভ কলোসিয়াম-স্থাপত্যে বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়। মধ্যে খেলার মাঠ। তাকে বৃত্তাকার করে হাজার হাজার দর্শকের আসন। লোক ভরে গেছে। খেলা শুরু হবে। কেবল রাজন্যবর্গের অপেক্ষা। সম্রাট সপারিষদ উপস্থিত হলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাল—হেল সিজার। নাটকীয় পরিণতির আর দেরি নেই। দামামা বেজে উঠল। অ্যাম্ফিথিয়েটারের মধ্যে প্রতিযোগী প্রস্তুত। ঠিকরে পড়ছে স্বাস্থ্য, যেন শিল্পীর গড়া নিখুঁত মর্মর মূর্তি। কিন্তু পারবে কি ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে জুঝতে! এখনই হয়ত লোকটার রক্ত-মাংস ছিঁড়ে খাবে। রক্ষিবাহিনী বেসমেণ্ট থেকে নিয়ে আসে খাঁচা। দরজা খুলে দেয়। লোকে পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। সিংহগর্জনে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার গায়।...এ কি, পরমুহূর্তে তড়িতাহত হয়ে ফিরে আসেন সিংহ মশাই। দর্শকবৃন্দ হতবাক, সিজার মর্মাহত। কি হল পশুরাজের। কেন এই দুর্মতি। কে কানে দিল অহিংসার মন্ত্র। কপিলাবস্তু থেকে বুদ্ধদেব কি বাধ সাধতে এলো হাজার বছর পরে। সিংহপ্রবর ধীর পদে ফিরে আসেন। বলেন—না আমি পারব না। কখনই নয়।

সবাই ব্যস্ত সমস্ত। জিজ্ঞাসা করে—কেন? কি ব্যাপার?

—অসম্ভব। আমায় তোমরা ক্ষমা কর।

—প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই?

—প্রতিকার! খালি প্রতিবন্ধকতার ষড়যন্ত্র। বলেছে, ভোজন সমাধা হলেই বক্তৃতা দিতে হবে। দরকার নেই ভূরিভোজনে। না হয় একাদশী পালন করব। নিরম্বু উপবাসী থাকব। তাও ভালো। ভরাপেটে বক্তৃতা—না—না—না!

ভোজন সভায় বক্তৃতা দেওয়া কি এমনই দুরূহ। এক ভদ্রলোক রসিকতা করে গল্পটা বলেছিলেন বটে। আমারও মনে হয় এতে গল্পের চেয়ে সত্যের ভাগ বেশী। বিশেষ করে ভারতীয় নেতাদের বেলা। হয়ত আমাদের ভাষার বিস্তার কম যা হাতের কাছে পাওয়া যায় বেশ ভারী। কিম্বা অভাব-অনটনে মনটা হালকা হবার সুযোগ পায় না, সে যেন জমাট বাঁধা দায়িত্ব আর কর্তব্য। তাই বক্তৃতা মানেই গালভারী কথা—আবেগ আর উত্তেজনা। ভূরিভোজের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা কমে আসে, মনটা উদার হয়। তখন বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই চায় একটু মজলিশী গল্প, দুটো হাসির কথা। কিন্তু সে তো আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই ভোজন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলেই সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের নেতাদের একটু অসহায় দেখায়। অন্তত আমারও তাই মনে হয়।

একবার বেশ বিপদে পড়েছিলেন মুন্সিজী। সে কিন্তু ভোজনান্তর বক্তৃতার অন্য দিক। মিঃ কে এম মুন্সি তখন সবে ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী হয়েছেন। প্রাণ-খুলে দিন-দুপুরে বক্তৃতা দিচ্ছেন, হাটে মাঠে ঘাটে। সহায় অনুগত প্রচার বিভাগ। এক ভোজনসভায় গিয়েছেন। আহারাদি সমাপ্ত হল। ভূরিভোজনের পর রাজনৈতিক লেবু কচলান কর্মকর্তাদের মনঃপূত নয়। তার চেয়ে হাসি-ঠাট্টা হোক উপরি হিসেবে আছে নাচ গান। মুন্সিজী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। প্রচার বিভাগ পরম তৎপর। তাঁর অনাগত বক্তৃতার হ্যাণ্ডআউট কাগজে কাগজে বিলি হয়ে গেছে। কাল ভোর না হতে ছাপা হবে। তখন কি জবাবদিহি করবেন। সে যাত্রা এক বন্ধু তাকে রক্ষা করেন। কর্ম-কর্তাদের সুমতি হয়। বক্তৃতা দানের শাস্ত্র রক্ষা করেন।

পাঠক হয়ত হাঁফিয়ে উঠেছেন। ভাবছেন আমার বক্তব্য কি? কোথায় চলেছি? উদ্দেশ্য কি? মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসরে নেমেছিলাম, কিন্তু মতিভ্রমে পড়ে ঘটনাকে ছোট করে অঘটনের জাল বুনছি। বিজ্ঞ 'সাংবাদিক ধারাবিবরণের বদলে 'হাইলাইট' ছেঁকে আসর মাত করেন। আমি অর্বাচীন, ঘটনার 'লাইট' অংশটা নিয়ে কারবার ফাঁদি। চলেছি ভোজনসভায়। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রতি বছর লণ্ডনের ভারতীয় সাংবাদিক সংঘ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সাংবাদিকরা চিরকাল পরের অতিথি হয়। খায় দায় বগল বাজায় আর সমালোচনা করে, কিন্তু আতিথ্য করার দায়টা যে কতখানি তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায় ভারটা মাথায় পড়লে। অলড্উইচ লণ্ডন শহরের কেন্দ্রে। সেখানে ভারত ভবন তার সামনে দিয়ে কিংসওয়ে ধরব। একটু এগোলেই গ্রেট কুইন স্ট্রিট। নিয়ন আলো দিয়ে লেখা কনট রুম। অভিজাত পরিবেশে নাম-করা প্রতিষ্ঠান। পৌঁছতেই অভ্যর্থনা জানাবে দৌবারিক সুবেশী এবং সুভাষী। আজ লণ্ডনে আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্ট্রাইক চলেছে। এক দিনের জন্যে ধর্মঘট। তাদের মাইনে বাড়াবার দাবি। সারা লণ্ডনের পথে ঘাটে বিশৃঙ্খলা। পুলিস আটকে দিল মাঝপথে। রাস্তা বন্ধ। ঘুরে যেতে হবে। আমার মনে হল, লণ্ডন শহরে যানবাহনের বিশৃঙ্খলা, সাংবাদিকরা নড়ে চড়ে বসেছে। পাতা ভর্তি 'ডেসপ্যাচ' পাঠাচ্ছে। আমার লেখাটারও ওই রকম খেই হারিয়ে দেই না কেন—দেখা যাক কি দাঁড়ায়। পাঠকরা কি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

দুর্মুখ উত্তর দেয়—তিরস্কারের লগুড় নিয়ে তেড়ে আসবেন। সাত হাজার মাইলের দূরত্ব এই যা ভরসা।

১৯৫৯ সালের কথাটা পাড়ি। সে বছরও কনট রুমে এই অনুষ্ঠান হয়। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান এসেছিলেন প্রধান অতিথি হয়ে। লেবার পার্টির ডেপুটি লিডার জেমস গ্রিফিথস ছিলেন আর ভারত সরকারের তরফ থেকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

মনে আছে, পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী আজ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান নন,

সুপার ম্যাক, ম্যাক ম্যাজিক, ম্যাক মিরাকল হয়ত বা ম্যাক ভিটা, ম্যাকইনটশ। যাই হোক, ম্যাকের ওপর আমাদের মোহ নেই। ম্যানুফ্যাকচারাররা তা নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করুক। আমরা 'মিলন' নিয়ে সন্তুষ্ট। আমাদের ভাষায় যার মানে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব।

ম্যাকমিলান বলেন, প্রকাশক হিসেবে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের বন্ধুত্ব। সেই সুযোগে মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। প্রকাশকের কথা যখন উঠল, তখন বলি—৩৫ বছর আগের ঘটনা। প্রথম পার্লামেন্টে দাঁড়াচ্ছি। কোন নির্বাচনী সভায় বক্তৃতার মাঝখানে একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি 'হল ও নাইটের' লেখা অ্যালজেব্রা প্রকাশ করেছ?

নিশ্চয় প্রশংসার কথা। উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

লোকটা বলে ওঠে—তা হলে তোমায় ভোট দিচ্ছি না। ওই বই পড়ে আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি।

আমি উত্তর দেই—আসলে দোষটা তোমার। কারণ ভুল বইটা বেছে নিয়েছ। প্রশ্নোত্তর সমেত বইটা কেনা উচিত ছিল।

তখন বিলেতে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নিয়ে খুব জল্পনা কল্পনা। ব্যাপারটা 'টপ্ সিক্রেট'। ম্যাকমিলান কাউকে জানতে দেবেন না। আসন টলমল, তাও ভি আচ্ছা। জেমস গ্রিফিথস বললেন—ম্যাকমিলান স্কট আমি ওয়েলশম্যান, দুজনেই পার্লামেন্টে অনুপস্থিত—এই সুযোগে ইংরেজরা না নির্বাচনের তারিখ ঠিক করে ফেলে।

এ বছর অতিথির মধ্যে আসছেন সরকার পক্ষের ডানকান স্যান্ডস—কমনওয়েলথ রিলেশনস সেক্রেটারী। লেবার পার্টির নেতা গেটস্কেল এবং লিবারেল পার্টির চেয়ারম্যান ডেসমন্ড ব্যাংকস। ভারতের অস্থায়ী হাই-কমিশনার মিঃ টি এন কাউল—আই সি এস। তা ছাড়া লর্ড মাউন্টব্যাটেন, ফেনার ব্রকওয়ে, মিস জেনি লি (বিভানের স্ত্রী)। নামকরা আরও অনেকে।

হোটেলে তখনও সাজ সাজ রব। চার্ট মিলিয়ে নামের কার্ড বসান হচ্ছে টেবিলে। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এখনই অতিথিরা এসে পড়বে। আমি ভাবছিলাম, ইংরেজরা ভোজনসভার সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বিশ্বসমস্যাই জীবনের সর্বস্ব নয় একথা তারা মানে। লর্ড ম্যানক্রফট ভোজনান্তর বক্তৃতায় এক্সপার্ট। গত বছর তিনশ জায়গা থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল মাত্র ছাপান্নটা গ্রহণ করেছিলেন। চিতোরের রাণার পণ করেছেন এ বছর একেবারে মুখ বুজে থাকবেন। তাঁর মতে দুটো শক্তিশালী জাত আছে 'বোর' Bore এবং 'বোর্ড' Bored। এদের খাতায় তিনি নাম লেখাতে চান না এও বলেছেন—ভবিষ্যতে যদি কোথাও মুখ খোলেন, ছ মিনিটের বেশী বলবেন না। হবু বক্তাদের কোন উপদেশ দিতে চান কি না, তার উত্তরে বলেন—বক্তৃতার আর্ধেকটা বলা হয়ে গেলেই বসে পড়া উচিত।

আরও একটা ঘটনা মনে আছে, তবে বক্তার নামটা মনে পড়ছে না। উৎসবে খাওয়া দাওয়া সারতেই বেলা গেল। নাচ গানের পালা আছে। সেটার মেয়াদ ছোট হয়ে যাচ্ছে। সভাপতি বক্তৃতা দিতে উঠলেন। সবাই ভাবছে, তাড়াতাড়ি শেষ হলেই ভালো।

তিনি বললেন—"আমি আজ দুটো বক্তৃতা তৈরী করে এসেছি। একটা বড়, একটা ছোট। সময় হিসেব করে যেটা উপযোগী মনে হয় দেব।"

লোকে আশ্বস্ত হয়। নিশ্চয় তিনি বেশী সময় নেবেন না।

—"এখন ভাবছি বড় এবং ছোট দুটো বক্তৃতাই দেব।"

নাচ-গানভক্তরা হতাশায় মুষড়ে পড়ে। তিনি ধীর স্থির—অচঞ্চল। সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি তিনি পুরোপুরি করতে চান, লোকে কি করতে পারে।

তিনি বলে চলেন—"প্রথমটা হল, থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ। আর ছোটটা, থ্যাংক ইউ।"

তিনি বসে পড়েন। হাত তালিতে হল ভেঙে পড়ে।

সেদিন এক ভদ্রলোক বলছিলেন, ভোজনসভায় বক্তৃতার মান উঁচু রাখতে হলে বক্তাদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রাখা উচিত। যেমন ২০ মিনিট বক্তৃতা দিলে ১০ পাউন্ড। ১০ মিনিট দিলে ২০ পাউন্ড। আমি ভাবছিলাম, তার মানে কি দাঁড়ায়, কিছু না বললে দক্ষিণা ৪০ পাউন্ড।

স্যার রেমন্ড প্রিস্টলি অবশ্য দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার একটা ফর্মুলা দিয়েছিলেন। দক্ষিণ মেরু অভিযান করে ফিরেছেন। তখন যুবক। চারিদিকে দাবি উঠেছে বক্তৃতা দেবার। লর্ড কার্জনকে খুলে বলেন বিপদের কথা। কার্জন উপদেশ দিলেন—তিন গেলাস শ্যাম্পেন খেয়ে নিয়ো—বেশী নয় কম নয়। উপদেশ মেনে আসরে নামলেন। বক্তৃতার তুবড়ি ছুটল। অনুষ্ঠান-কর্তা জামা টেনে বলেন, আর তিন মিনিট সময় আছে। তিনি তার পরও আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। ভেবেছিলাম শ্যাম্পেনটা ফিগার অফ স্পিচ—বাহবার শ্যাম্পেন—হাত-তালির শ্যাম্পেন। এগুলো থেকে আত্মসংযম বড় মুশকিল।

লেখার উত্তরাকাণ্ডে ফিরে আসি আসল কথায়। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে এল। খাবারের শতকরা ৮০ ভাগ ইংরাজী ২০ ভাগ ভারতীয়। নাম সব ফরাসী। ওয়েট্রেস-বাহিনী সারিবন্দী হয়ে আসে আর যায়। যেন প্যারেড করছে। তাদের মাদাম আর মশিয়ে বলা শেষ হল। এবার অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। 'জনগণ-মন' আর 'গড সেভ দি কুইন' সঙ্গীত দিয়ে শুরু। লণ্ডনস্থ ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ তারাপদ বসু সবাইকে স্বাগত জানান এবং বলেন লেবার ও লিবারেল পার্টির বিবাহের প্রস্তাব চলেছে। ডানকান স্যান্ডস হয়ত প্রধান সাক্ষীর কাজ করবেন, কিন্তু যতদিন না মালাবদল হয় আমরা আলাদা আলাদা অভ্যর্থনা জানাব।

ডানকান স্যান্ডস ভারত ও বৃটেনের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন। কটাক্ষ করেন বিবাহ প্রস্তাবের। এও বলেন—নেহরুর কথায়, রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকদের কোন কোয়ালিফিকেশন লাগে না। তিনি জুড়ে দেন—তবে তফাত সাংবাদিক যা জানে তার চেয়ে বেশী লেখে। রাজনৈতিক নেতাদের মন খুলে বলা সব সময় সম্ভব নয়। আর বৈদেশিক সংবাদদাতারা Diplomat in reverse। বৈদেশিক সমালোচনার বিবরণ পাঠান। সুতরাং তাদের সংযমও বিশেষ প্রয়োজন।

গেটস্কেল বলেন—সবার বাটন হোলে গোলাপ আমার লাল কার্নেশন। এটা ইচ্ছাকৃত কিনা জানি না। ধরে নিচ্ছি আমি বর। কিন্তু সবাই জানে, কনে বিশ্বস্ত বধূ হতে পারবে না তখন বেস্টম্যানের পক্ষে উচিত হবে কি সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ান। ডেসমন্ড ব্যাংকস বলন, যে মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় তারাই বিয়ে করে। লিবারাল পার্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ সুতরাং গাঁঠছড়া বাঁধার প্রয়োজন দেখি না।

গেটস্কেল আরও বলেন, স্বাধীন ভারতে বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষ থেকে বেশী সংখ্যক ইংরেজ বাস করে। এতে প্রমাণ হয় দুই দেশের বন্ধুত্ব কত নিবিড়। তাঁর শেষ কথা—দুই দেশের মনের মিল সম্ভব কারণ উভয়েই সহনশীল এবং হাস্যরসকে উপভোগ করতে পারে।

সুরসিক ভারতবাসী! অন্য কোন সার্টিফিকেট পেলে আমি এত আনন্দিত হতাম না। অনুষ্ঠানের শেষ দেখতে গিয়ে যদি শেষ বাস হারাই, মাঝরাতে শ্রীচরণের শরণ নিয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় তাও আক্ষেপ করব না।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

নিখিল সরকার

চোখ খুলে স্বল্পক্ষণ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকল অবনী। কিছুই যেন দেখছে না।

জয়শ্রী সামান্য ঝুঁকে আবার মৃদুভাবে ধাক্কা দিল, 'কি হলো, এমন করছিলে কেন? কি হয়েছিল?' অবনী তখনও জয়শ্রীর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু কে তাকে ডাকছে, কেন ডাকছে তার সঙ্গে সামনের ওই মেয়েটির কি সম্পর্ক, কিছুই যেন ধরতে পারছিল না। অথচ জয়শ্রীকে সে দেখছিল এবং সে যে তাকে কিছু বলছে, তা বুঝতে পারছিল। সব যেন ঘোলা জলের মতন কেমন অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিরুদ্ধ। তারপর একটু একটু করে যখন চোখের ওপর থেকে আচ্ছন্নতার যবনিকা অপসারিত হল, তখন অবনী বুঝল, জয়শ্রী, তার স্ত্রী, তাকে ডাকছে। গলার কাছে একটা শক্ত হাত যেন এতক্ষণ ধরে চেপে বসছিল আর ক্রমশ দম ফুরিয়ে আসার তীব্র এক যন্ত্রণা অনুভব করছিল। জায়গাটা বেদনায় এখনও টনটন করছে। জয়শ্রী এখন আরও কাছে সরে এসে ওর বিছানাটার এক কোণে বসল। অবনীর বুকে একটা হাত রাখল। তারপর উৎকণ্ঠিত স্বরে শুধলো, 'কি হয়েছিল?'

অবনী এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জয়শ্রীর দিকে তাকাল। মনের অপ্রসন্ন বিষণ্ণ ভাবটা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। জয়শ্রীকে এই মুহূর্তে বড় করুণ ভীত ও কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। অবনী সেই মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। পরে আস্তে করে বলল, 'জানিনা।' এক সময় জয়শ্রীর ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে অন্য একটা কথা ভাবল। অবনী জানে না ঘুমের মধ্যে সে কি করছিল এবং কেনই বা করছিল, কিন্তু এখন বুঝল, সে ভয় পেয়েছিল। এত সময় ধরে অবনী একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। একটা শক্ত হাত তার গলাটা টিপে ধরেছে। যেন কেউ প্রবল আক্রোশে তার অবরুদ্ধ জ্বালা মেটাতে চাইছে। অবনী মানুষটাকে চিনতে পারল না। ভয়ে অসহায়ের মতন চীৎকার করে উঠেছিল শুধু।

এখন আর ঘুম আসবে না অবনীর। অথচ ঘুমটা ওর প্রয়োজন। সংসারের আরও কটা অতি আবশ্যক সামগ্রীর মতনই অপরিহার্য। ঘুম না এলে, পরিবর্তে দুরন্ত অপ্রতিরোধ্য এক যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এবং ক্রমে ক্রমে তাকে অবশ ও ক্লান্ত করে। শুধু তাই নয়, এই দুঃসহ কাতরতা সময় সময় তাকে চকিতে মৃত্যুর কথাও মনে করিয়ে দেয়। তখন অবনীর করণীয় কিছুই থাকে না। শুধু কোনও ঐশ্বরিক পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে যেন বলতে ইচ্ছে করে, আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচাও। আজ, এখন মনে মনে অবনীর সেরকমই প্রার্থনা জানাতে ইচ্ছে হল।

অবনী শুয়ে শুয়ে একসময় লক্ষ করল সূর্যের আলো এখন অনেকটা তির্যক হয়ে ঘরের দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে অবশ দুর্বল কোন মানুষের মতন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেদিকে কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে ও তাকিয়ে থাকল। মনের এই নির্লিপ্ত ভাবটা কাটার পরমুহূর্তেই ওর মনে হল, ঘরটা এসময় বড় শান্ত, উত্তাপবর্জিত। শুধু এ বাড়িটাই নয়, সমস্ত মুখর পাড়াটাকেই কোন ঐন্দ্রজালিক যেন স্তব্ধ ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

অবনী উঠে বসল। জয়শ্রী আস্তে আস্তে পেছনে একটা নরম পাশবালিশ দিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই দিবাকর ডাকল। জয়শ্রী চাদরটা অবনীর গলা পর্যন্ত টেনে ঠিকঠাক করে দিতে দিতে বলল, 'আমি আসছি একবার নীচে থেকে, এসে ফলের রসটা করে দেব।' বলে নীচে চলে গেল জয়শ্রী। অবনী সেদিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জয়শ্রী চলে গেলে অবনী ডানপাশের খোলা জানলা দিয়ে আস্তে আস্তে আকাশটাকে দেখতে লাগল। আকাশটার জায়গায় জায়গায় খণ্ড খণ্ড শ্বেতবর্ণ মেঘ। পুঞ্জিত খণ্ড মেঘের পাশেই কিছুটা জায়গা মেঘমুক্ত, সেখানে হাল্কা নীলের বিস্তার। সেই নীলের ধার ঘেঁষে এক টুকরো মেঘ কোন দেবাঙ্গনার স্খলিত বসনের মতন পড়ে আছে, আর সে বসনের ধারগুলো স্বর্ণ রোদের জরি দিয়ে যেন মোড়ান। কটা চিল মন্থরভাবে মনের আনন্দে অনেক উঁচুতে

শূন্যের বুকে সাঁতার কাটছে। অবনী বহুক্ষণ ধরে আকাশের এই অকৃপণ সজ্জা দেখল। দেখতে দেখতে একসময় মনে হল, পরস্পর সম্পর্কবিহীন অনেক কথা ভাবনা হয়ে ওর মনের চতুর্দিকে এক পাঁচিল তৈরী করেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ও সেই ব্যূহ ভেদ করে কোন মুক্ত জায়গায় ফিরে আসতে পারছে না। প্রাণান্ত চেষ্টা করেও যখন পরাজিত, তখন অবনী আরও বিষণ্ণ ও ক্লান্ত হল। এবার ব্যথিত দৃষ্টিটাকে গুটিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে রাখল।

বাঁপাশে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর ওষুধের শিশি, ফল, কাপ, প্লাস। মেঝেয় কাচের কুঁজোয় জল। ঘরের এক কোণে একটা আলনা, সেখানে অবনীর কিছু জামা কাপড়। এগুলো কিছুক্ষণ দেখার পর মনটা হঠাৎ তিক্ত ও প্রবল ঘৃণায় যেন ভরে উঠল। পরক্ষণেই একরকম জোর করে সংকুচিত ঘৃণিত দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে এনে আবার খোলা জানলা দিয়ে মুক্ত ও প্রসারিত করল। সামনের বাড়ির ছাতের কোণাটায় বসে একটা কাক তখন থেকেই একটানা ডাকছে। বাড়িগুলোর ওপাশেই ছোটমতন একটা পার্ক। এখান থেকে একটা গাছের মাথা দেখতে পেল অবনী। অনেকগুলো পাখি উড়তে উড়তে এসে আগডালে বসল। পত্রান্তরাল থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না ওদের। কিছুক্ষণ পর তার থেকে দু'তিনটে উড়ে গেল। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় খুব গভীর এক বেদনা অনুভব করল অবনী। নিজের কথা ভেবে একটা ভারী ঘন নিশ্বাস ফেলল। আজ কতকাল যেন হয়ে গেল, সে এই ইটের ঘরটায় নির্বাসিত। ঘরটাকে মাঝে মাঝে হিংস্র সুপ্ত কোন জানোয়ারের মতন মনে হয় ওর। কে যেন তাকে এই ভয়ংকর জীবটার সামনে বেঁধে রেখে গেছে এবং ওটা একবার জেগে উঠলেই ওর দিকে ছুটে আসবে। অবনী যেন সেই সময়ের জন্যই প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষা করে আছে। সময় সময় একলা ঘরে থাকতে ভীষণ ভয় পায় অবনী।

এ ঘরটায় এখন আর কেউ বড় একটা আসে না। এমন কি দিবাকরও না। কাল এসেছিল ও। চৌকাটের ওখানে দাঁড়িয়েই জয়শ্রীকে উদ্দেশ করে বলেছিল, 'আজ ফিরতে একটু দেরী হবে মা।'

'কেনরে?' জয়শ্রী একটা কাপে, পাত্র থেকে দুধ ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করেছিল।

'কলেজে সোস্যাল।'

'তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর বাবার শরীরটা ভাল না।'

অবনী জয়শ্রীর দিকে তাকিয়েছিল। প্রসারিত দৃষ্টিতে মৌন করুণ আবেদন ফুটে উঠেছিল। কেন এসব কথা বলতে গেল জয়া, তাছাড়া আমি তো আজ থেকে ভুগছি না। আমার জন্যে ওদের কোনো কাজে বাধা দিলে ওদের চেয়ে কষ্ট যে আমারই বেশী হয়! দিবাকর চলে গেলে অবনীর মনে হয়েছিল কতদিন পর যেন ওকে দেখেছে। খুব বিমর্ষ লাগছিল।

মন্থর ভারী দুপুর এখন বোঝার মতন মনে হয় অবনীর। গলার কাছের যন্ত্রণাটা আজ অন্যদিনের চেয়ে আরও বেড়েছে। প্রথম প্রথম এ কষ্টটা সব সময় অনুভব করত না। কিন্তু এখন ওর অস্তিত্বের সঙ্গেই যন্ত্রণাটা যেন সর্বক্ষণের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। কদিন হাসপাতালেও ছিল অবনী। সে দিনগুলোর কথা এখনও তাকে পীড়িত ব্যথিত করে। গত কথা মনে হলে সমস্ত শরীর কেমন যেন শীতল হয়ে আসে। ওর পাশের বেডেই ছিল রাধিকাবাবু। সংসারে আত্মীয় বলতে তার এক বিধবা মা। সামান্য চাকরি করত কোন এক অফিসে। অবনীও রাধিকাবাবুর মাকে দেখেছে। ছেলের শিয়রে বসে কতদিন তাঁকে মৃদু দৃঢ় অথচ করুণ গলায় সান্ত্বনা দিতে শুনেছে অবনী। ছেলের গায়ে বৃদ্ধা মা হাত রেখে কতদিন বলেছেন, 'অত ভাবিস না, ভাল হয়ে যাবি।' রাধিকাবাবু কোন কথা বলত না। শুধু নিষ্প্রাণ বিষাদ চোখে মার দিকে তাকিয়ে থাকত। অবনী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রথম কি করে বুঝলেন যে আপনার এ অসুখ।'

রাধিকাবাবু সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে অনুচ্চ ফ্যাসফ্যাস গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'প্রথম প্রথম কোন অসুখবিসুখকে গায়ে মাখতাম না। সাধারণ সর্দি কাশি। ভেবেছি সেরে যাবে এমনিতেই। কিন্তু সারে না দেখে একদিন ডাক্তার দেখালাম। ওষুধ দিলেন ডাক্তারবাবু। তবু কিছু হল না।' এই পর্যন্ত বলে রাধিকাবাবু থামল। অবনীর মনে হল রাধিকাবাবু অকস্মাৎ কথার সুতো হারিয়ে ফেলেছে। পরে সেই ছেঁড়া সুতোয় গিঁট দিতে দিতে আবার আগের কথায় ফিরে এল রাধিকাবাবু। 'গলা দিয়ে কাশির সঙ্গে একদিন রক্তও পড়ল। সেদিন ভীষণ ভয় পেলাম। এক্সরে করান হল। কিছুদিন চিকিৎসাও হল। কিন্তু কিছুই হল না। তারপর একদিন এখানে এলাম।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল রাধিকাবাবুর।

রাধিকাবাবুর কথা শুনে অবনী এই প্রথম ভীষণ ভীত ও শঙ্কিত হয়েছিল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিল ও। তারপর থেকে প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হয়েছে, এখানে থাকলে ও মরে যাবে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার আগের দিনটা এখনও অবনীর কাছে একটা রহস্য হয়ে আছে। সেদিন আকাশের অবস্থাটাও ভাল ছিল না। আশে পাশের বেডে অনেকেই ছটফট করছে, গোঙাচ্ছে। রাধিকাবাবুর গলায়ও অস্ফুট কাতর একটা শব্দ। প্রথমে ভেবেছিল অবনী, রাধিকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে হল, না ঘুমোয়নি, ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। অনেক এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল অবনী। হঠাৎ কী এক তৎপর দ্রুত শব্দে অবনীর ঘুম ভেঙে গেল। একজন নার্স তার খাটের কাছ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। অবনী ভয়ার্ত জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। আপনারা অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, শুয়ে পড়ুন।' বলে চলে গেল নার্স। পাশের লম্বা রাস্তাটায় জুতোর দ্রুত শব্দ, কথার গুঞ্জন শুনল অবনী। ধীরে ধীরে সে শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ অস্পষ্ট হয়ে এল। অবনী ঘুরে পাশের দিকে তাকাল অন্যান্য বিছানায় কয়েকজন ইতিমধ্যেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে জেগে উঠেছে। সবাই সবিস্ময়ে দেখল, রাধিকাবাবুর বিছানাটা ফাঁকা। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি অবনী। কী এক অজ্ঞাত শঙ্কা ওকে অঙ্কুশের আঘাতে বিদ্ধ করতে করতে ক্রমশ অবশ করছিল।

পরদিন বিষাদ রাত্রির পর ঘরে যখন ভোরের আলো এসে পড়েছিল তখন অবনী ঘুমে। সকালের রৌদ্রকিরণ গায়ে মুখে মেখে নিয়ে এক সময় যখন চোখ মেলল তখন গত রাত্রির কথা মনে পড়ায় পাশের শূন্য বিছানাটার দিকে তাকিয়ে ও নিজের কথা ভেবে আবার কেম যেন বিমর্ষ হয়েছিল। সেদিনই ফিরে এসেছিল অবনী। রাধিকা-বাবুকে সে রাত্রে কোথায় কেন নিয়ে যাওয়া হল, ভেবে কিছুই ধরতে পারেনি ও। এত-দিন পর আজ শুধু একটা অনুমান করতে পারে। গলা দিয়ে অবনী এই মুহূর্তে একটা কাতর শব্দ করল।

জয়শ্রী আবার ওপরে উঠে এল। হাতে একটা বই। বইটা একটা চেয়ারের ওপর রেখে ওষুধের টেবিলটার কাছে গেল। অবনী ওকে একমনে দেখছিল। কটা সরবতি

জয়শ্রী। পরে একটা ছাঁকনি দিয়ে অন্য একটা কাপে ঢেলে ওর কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়াল। অবনীর মাথাটাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বাঁহাতে ওর মাথাটা ধরে শান্ত স্বরে বলল, 'খাও।'

অবনী মৃদু আপত্তি করল। 'না, এতটা খেতে পারব না' বলে গলায় হাত বুলোল।

'না খেলে শক্তি পাবে কি করে।' বলে কাপটা ডানহাতে অবনীর মুখের কাছে নিয়ে গেল জয়শ্রী। তারপর আস্তে আস্তে খাইয়ে দিয়ে শুধলো, 'আর একটু দেব?'

অবনী মাথা নাড়ল।

ধুয়ে মুছে ঠিক জায়গায় কাপটাকে রেখে আবার অবনীর আছে ফিরে এল জয়শ্রী। আঁচল দিয়ে ভিজে হাতটা মুছতে মুছতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী, শোবে এখন?'

'না।' অবনী মৃদুভাবে বলল। বলে জয়শ্রীর ম্লান বেদনাগভীর চোখ দুটোর ওপর ওর দৃষ্টি স্থির রাখল। জয়শ্রী পিঠের পাশে লম্বাটে ধরনের পুরু বালিশটা ঠিক করে দিল। বুকের চাদরটা আর একবার ঝেড়ে আবার গলা পর্যন্ত টেনে দিল। তারপর বইটা হাতে নিয়ে চেয়ারটায় বসল।

অবনী জয়শ্রীর দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ওর মনে হল সে যেন একটা ছবি দেখছে খুব মনোযোগ দিয়ে। যে মুখ দীর্ঘদিন দেখেছে, প্রত্যহ প্রায় সর্বক্ষণ, আজ সে মুখ দেখতে দেখতে মনে হল, এ মুখের সঙ্গে সেদিনের, প্রতিদিন ধরে দেখা মুখের অনেক পার্থক্য। এ মুখ যেন জয়শ্রীর নয়, অন্য একজনের। ওর মুখের আদলে অবয়বে একটা অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছে। গাল বসে গেছে, হাড়ের খাঁজ অস্বাভাবিক রকম মনে হচ্ছে। চোখের কোলে কি এক বিষণ্ণতার ছাপ। দীর্ঘ রাত্রি জাগরণে মানুষকে যেমন ক্লান্ত হৃতশ্বাস দেখায়, জয়শ্রীকেও যেন এখন অনেকটা সেরকম দেখাচ্ছে। জয়শ্রী যেন সংসারের সঙ্গে লড়তে লড়তে এখন খুব পরিশ্রান্ত অবসন্ন। ওকে আস্তে করে ডাকল অবনী। জয়শ্রী ওর দিকে তাকাল এবং ওর শিয়রের কাছে এসে বসল। শুধলো, 'কিছু বলবে?'

অবনী অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে জয়া, এভাবে উপোস করে রাত জেগে আর শরীরটা নষ্ট করো না।'

কোন জবাব দিল না জয়শ্রী। অবনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর গভীর ভালবাসা ও মমতাভরা গলায় বলল, 'তোমার চেয়ে আমার জীবনটা বড় হল!' অবনী কিছু না বলে চুপ করে থাকল। জয়শ্রীর সঙ্গে কতদিন নির্মম নির্দয় ব্যবহার করেছে সে। এই বোধটা এখন ওকে খুব পীড়ন করছে। কিছুক্ষণ পর অবনী স্বগতোক্তির মতন করে বলল, 'আমি আর ভাল হবো না জয়া।'

জয়শ্রীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। অনেক কথা বলে মনের ভারকে হালকা করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এক অবরুদ্ধ আবেগ যেন ওর সমস্ত কথাকে চুরি করে পালিয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর নিজেকে সংযত করে বলল, 'এসব অলক্ষুণে কথা তুমি বলো না তো, কে বলল তুমি ভাল হবে না?'

অবনী কিছু বলল না। খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে লাগল। বুকের মধ্যে কোথায় যেন স্ত্রীর জন্যে গভীর প্রগাঢ় এক সহানুভূতি ও মমতা বোধ করল অবনী। তারপর জয়শ্রীর একটা হাতের ওপর নিজের রুগ্ন শীর্ণ একটা হাত রাখল। পরে মনে মনে বলল, জয়া, এ তুমি বৃথা আশ্বাস দিচ্ছ আমায়। তুমিও জানন, এরোগ মানুষের হাতে সারে না। তুমি ভাবছ, একদিন আমি ভাল হয়ে উঠব, কিন্তু আমার জীবনে সে দিন হয়ত আর আসবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই চৌকাটের কাছে এসে হিরণ শব্দ করল।

জয়শ্রী ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয় হিরণ।'

'আজ কেমন আছে কাকা?'

অবনী হিরণের দিকে তাকাল। হিরণ এসে কাকার বিছানাটার এক পাশে বসল। অবনী ওকে চেয়ারে বসতে বলেছিল। কিন্তু হিরণ সেখানেই বসে থাকল। এবং জয়শ্রীর দিকে তাকিয়ে শুধলো, 'এখন কি আগের ডাক্তারবাবুই দেখছেন?'

'হ্যাঁ' জয়শ্রী বলল। বলে বইটা পড়তে লাগল।

অবনী কিছুক্ষণ হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বৌদি আসে নি?'

'মার শরীর খারাপ, সর্দিকাশি।'

অবনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখের সামনে কেমন যেন অদ্ভুত একটা ছায়া ভেসে থাকল। ক্রমশ চেতনা আচ্ছন্ন হল ওর। দূরশ্রুত কোন স্মৃতির গন্ধ যেন ওকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

দাদা যখন মারা গেল তখন হিরণের বয়েস সতেরো। দাদার মৃত্যুর পর ওকে নিয়ে বৌদি এ বাড়িতে মাত্র দু'দিন এসেছিল। দ্বিতীয় দিন হিরণকে লক্ষ করে বৌদি বলেছিল, 'ঠাকুরপো আমার অবস্থা তো এখন বুঝতেই পারছ, তোমার দাদাও এমন একটা কিছু রেখে যায় নি যা দিয়ে আমাদের চলে।' এই পর্যন্ত বলে বৌদি

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর প্রত্যাশা নিয়ে আগের কথাটা শেষ করেছিল, 'তার থেকে আমার হিরণকে তোমার এখানে রাখ, ছেলেটার পড়াশুনোয় খুব ঝোঁক।'

অবনী সরাসরি কোন কিছু না বলে চুপ করে রইল। পরে দূর থেকে কথা বলার মতন অনেকটা মৃদু উদাসীন নিস্পৃহ গলায় বলেছিল, 'না বৌদি, তা হয় না। তার চেয়ে মাঝে মাঝে দরকার হলে চাইবেন, যা পারি সাহায্য করব।'

উত্তর শুনে বউদি আর একটিও কথা বলল না। এমনই একটা কিছু সে আশঙ্কা করেছিল। তবু সংসারের এই আকস্মিক নিরাবলম্ব অবস্থায় কিছুটা আশা নিয়ে কথাটা অবনীর কাছে পেড়েছিল। কিন্তু আশাহত হয়ে সেই যে হিরণকে নিয়ে চলে গেল বৌদি, এরপর আর একটা দিনের জন্যও এ বাড়ি এল না। অবশ্য, অবনী শুনেছে, বৌদি একটা প্রাইমারী স্কুলে কাজ নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছেলেকে মানুষ করেছে। হিরণের দিকে তাকিয়ে আজ এই মুহূর্তে একটা গভীর অনুশোচনা বোধ করল অবনী। কী করে সে এতটা নিষ্ঠুর হতে পেরেছিল সেদিন! আজ বৌদির মুখটা খুব স্পষ্ট করে মনে পড়ল অবনীর। এতদিন পর কেন যেন আজ এই প্রথম বুকটা খুব ফাঁপা মনে হল ওর। একটা ঘনীভূত বেদনার বাষ্প যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ওকে আহত করতে চাইছে। দাদার অবর্তমানে বৌদির অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এই প্রথম এক গভীর মমতা ও সহানুভূতি অনুভব করল। দুয়েকবার জয়শ্রী গিয়ে কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিল। অবনীই পাঠিয়েছিল। কিন্তু বৌদি তা নেয় নি। হঠাৎ ওর মনে হল, হয়ত বৌদি তাদের চিরদিনের মতই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তা না হলে তার এই অসুখের কথা শুনে নিশ্চয়ই একদিন আসত। কিন্তু কেন আসবে, বলতে পার অবনী! তুমি নিজেই, যে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছ। তবু তো হিরণ এসে মাঝে মাঝে তোমায় দেখে যায়, তুমি ক'দিন ওদের দেখতে গিয়েছিলে? তুমি ত ওদের নিকট আত্মীয়ই ছিলে! ভেবেছিলে আত্মসর্বস্ব হয়ে সংসারে বেঁচে থাকবে, কিন্তু তা যায় না অবনী, তা যায় না। কথাগুলো মনে মনে নিজেকেই যেন শোনাতে চাইল অবনী। আর পরমুহূর্তেই করুণ তৃষিত অনুতপ্ত অথচ নিখাদ ভালবাসায় পূর্ণ এক দৃষ্টি নিয়ে হিরণকে দেখতে লাগল। হিরণ কাকার দিকে চেয়ে কেমন বিব্রতবোধ করল। চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কাকিমা, এবার আমি উঠবো।'

অবনীর ঘোর কাটল। মৃদু ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আর একটু বোস।'

তারপর আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবনী রিক্ত পরিত্যক্ত কোন মানুষের মতন বেদনার্ত গলায় বলল, 'বৌদিকে আসতে বলার মতন মুখ আর নেই, তবু বলিস একবার' কথাটা অর্ধপথেই থামিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। যেন এই মুহূর্তে যে আবেগ ভর করেছিল ওকে তা সহজ ও স্বাভাবিক করে আনছে।

হিরণ চলে গেলে জয়শ্রীও উঠে নীচে গেল। বইটা অবনীর কাছে খোলা রেখেই চলে গেছে ও। কী খেয়ালে বইটা টেনে নিল অবনী। তারপর একরকম বিনা কৌতূহলেই মন্থরভাবে চোখ বুলোল। মানুষ মনে মনে কোন একটা কথা গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে যেমন করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে সব কিছুকে প্রত্যক্ষ করে, অনেকটা সেরকম। কিন্তু সেই নৈর্ব্যক্তিক উদাস আসল ভাবটা কেটে যাওয়ার পর একসময় যখন চেতনাকে স্পর্শ করল অবনী, তখন অনেক কাল আগের শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। গল্পটা সে ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুয়ে শুনেছিল; দাদাও ছিল তার পাশে। এতকাল পর আজ আবার এ গল্পটাই দেখতে পেল বইটায়।

তখন কোশল রাজ্যের সিংহাসনে বসেছেন অম্বরীষ। রাজ্যের মধ্যে হাহাকার। মাঠ তৃণশূন্য। নিষ্পত্র বৃক্ষরাজি। কঙ্কালসার মানুষ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান।

গল্পটার পেছনে ছুটতে গিয়ে একসময় অবনী অনুভব করল, তার দম ফুরিয়ে গেছে, আর দৌড়তে পারবে না। একটু জিরনো দরকার। ঠিক সেই মুহূর্তে রুগ্ন, ক্লান্ত, শীর্ণ অবনীর সামনে অন্য এক সুস্থ, স্বাভাবিক সুন্দর অবয়বের মানুষ এসে দাঁড়াল। অবনী তাকে চিনতে পারল না প্রথমটায়। পরে চিনল। ওই লোকটি ওর দিকে শান্ত গভীর মমতা ভরা চোখ দুটো প্রসারিত করে যেন বলল, তুমি ভুলে গেছ অবনী, আমায় ভুলে গেছে। একবার মনে করে দেখত। অবনী মনে করবার চেষ্টা করল।

গল্পটা তার আবার মনে পড়ল। ঋষি ঋত্বিকের এক পুত্র অম্বরীষের রাজ্যকে বাঁচিয়েছিল। আত্মদান করে। দধীচির মতন। তার নাম হয়েছিল দেবরাত।

অবনীর গলা শুকিয়ে আসছিল। সব যেন কেমন রুক্ষ সজীবতাবর্জিত। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কে যেন একটু একটু করে সবার অলক্ষ্যে দীর্ঘ দিন ধরে তার জীবন থেকে তৃষ্ণাতুর শীতল সব পানীয় শুষে নিয়েছে, আর সেই শূন্য ফাঁকা জায়গাটার চতুর্দিকে একটি পিপাসার্ত আত্মা উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে ঘুরে ক্রমশ ক্ষীণায়ু হচ্ছে।

আজ এতকাল পরে ভাবতে গিয়ে একটা জিনিস বুঝল অবনী, দীর্ঘ জীবনে এই উপাখ্যানটা সময়ের হাতে একদা কেমন যেন বর্ণহীন ফ্যাকাশে লুপ্ত স্মৃতির মতন হয়ে গেছে। এতকাল পর, আবার স্মৃতির জঞ্জাল ঘাটতে গিয়ে আজ এই মুহূর্তে গভীর এক বেদনার সঙ্গে, আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে লুকনো নিরুজ্জ্বল একটা পাত্র যেন তুলে আনল অবনী। সে দান করতে শেখেনি। এবং এই চিন্তা নির্লিপ্ত মনে ভাবতে ভাবতে গাঢ় এক অনুতাপে মগ্ন হতে লাগল।

ডাবলিনের ওডিসিয়ুস

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
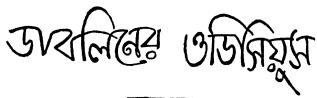
প্যারিসে যখন উগ্র প্রকৃতিবাদের আধিপত্য, তখন—উনিশ শতকের নবম দশকে—এদ্য়ার্দ দ্যজার্দাঁ নামে এক ভদ্রলোক 'Les lauriers sont coupe'es' (কুঞ্জপথে আর যাবো না) নামে ছোট্ট একটি উপন্যাস ছাপিয়েছিলেন। এমিল জোলা তখন সারস্বত সমাজের প্রধান। তাঁর ছিলো সিদ্ধান্তবাদী উপন্যাস: সাংবাদিকতা, কালচিত্র, জনপ্রিয় ডারুয়িনবাদ প্রভৃতি মস্ত সব ব্যাপার যথেচ্ছ থাকতো তাতে; এবং, রচনাটি যাতে কালক্রমে দলিল হিশেবে গণ্য হয়, আসল ঝোঁকটা থাকতো সেই দিকে। প্রবল শোরগোল চলছে তখন এই সব উপন্যাস নিয়ে। কিংবা ফরাশিগণ তৎকালে চোখ গোল-গোল ক'রে পড়ছেন পোল বুর্জের সেইসব হাঁড়ি-চড়ানে হৈচৈয়িক উপন্যাস যাদের ভিতর একটুও খোলা হাওয়ার আনাগোনা নেই: দমবন্ধ সব জটপাকানো কাহিনী, একবার পড়লেই পুরোনো হ'য়ে যায়, আর এ-কালে তো বস্তাপচা গন্ধের জন্য তা পড়তেই পারা যায় না; নয়তো অনেকে উপভোগ করছেন মোপাসাঁর সেই সব 'জীবনখণ্ড'—'slices of life'—ফ্লবেয়ার-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যার প্রশংসায় শতমুখ। এমন যখন অবস্থা, তখন কোনো রোগা বই—যা আবার কোনোমতেই সমকালের দলিল কিংবা কালচিত্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, এবং স্পন্দিত, তপ্ত ও স্বেদসিক্ত 'জীবনখণ্ড'ও যাকে কিছুতেই বলা চলে না—প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে যা সাংকেতিকতা নামক ক্ষীণকণ্ঠ একটি সাহিত্যিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, তা তখন কী করে উচ্চকিত চ্যাঁচামেচির মধ্যে নিজের মিনমিনে গলা শোনাবে? যাকে 'avantgarde' বা 'অগ্রদূত' বলে, প্রতীকীবাদী এবং বিম্বধর্মিগণ তখন ঠিক তাই। কয়েক বছর এদিক-ওদিক হ'লেই ফ্লবেয়ার-এর মৃত্যু ঘটে যাবে, আর ফ্রান্সের সব সাঁলোতেই হ্বাগনার তখন ভীষণ শোরগোলের কারণ। সাংকেতিকতা বা প্রতীকীবাদ নামে যে-নতুন ক্ষুদ্রকায় আন্দোলন শুরু হয়েছে তার ডাকে সাড়া দেবার উপযোগী সময় আসতে তখনো অন্তত সিকি শতাব্দী বাকি: 'avantgarde'-তে নামভূমিকায় আসতে হ'লে সচরাচর ওটুকু সময় লেগেই থাকে।

কিন্তু প্রতীকীবাদ 'avantgarde'-এর চেয়েও বেশি কিছু ছিলো। আসলে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সূত্রপাতই হ'লো তার মধ্যে, আর কোনো-কোনো দিক থেকে চলচ্চিত্রেরও। এই প্রতীকীবাদীদের একজন গৌণপুরুষ ছিলেন এদ্য়ার্দ দ্যজার্দাঁ—অল্পবয়সী একজন সংগীত-সমালোচক, হ্বাগনারের ভীষণ অনুরাগী।

জেমস্ জয়েস্

১৮৮৭ সালে 'La Revne Inde'peod-ante' কাগজে ধারাবাহিকভাবে 'Les luariers sont coupe'es'-কে প্রকাশ করতে শুরু করেন; বন্ধু জর্জ মুর তখন প্রকৃতিবাদী—তিনি এবং অন্যান্য প্রতীকীবাদীরা মনোযোগ দিয়ে উপন্যাসটি পড়তেন। আজকে যদি কেউ এই উপন্যাসটিকে 'কাহিনী'র জন্য পড়তে বসেন, তাহ'লে তাঁর বেশ মজা লাগবে—যে-সততা ও অকপটতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে বর্ণনা করা হয়েছে, হয়তো সেই সরল সততার জন্যই ভালো লাগার মতো একটি কৌতুকপ্রদ উপন্যাস ব'লে মনে হবে এটাকে। ব্যাপারটা কী? না, এই রকম: প্যারিসের একটি সদ্যোযুবা একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘুমোতে চায়; অভিনেত্রীটি তাকে শতহস্ত তফাতে রাখে বটে, কিন্তু তার কাছ থেকে উপহার বা টাকাকড়ি নিতে একটুও দেরি বা দ্বিধা করে না; যুবকটিকেই তার সমস্ত দেনা শোধ ক'রে দিতে হয়। উপন্যাসে কেবল একটি সন্ধেবেলার বিবরণ দেয়া হয়েছে; সেই সন্ধেবেলাটিতে, যুবকটি ভেবেছিলো, শ্রীমতী বোধহয় অবশেষে তারই হবে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই আশা করাটা তার ভুল হয়েছিলো। গল্প বলতে তো শুধু এইটুকু; সোজাসুজি ব'লে দিলে তার চেয়ে পাংশুল, তুচ্ছ ও সাধারণ আর-কিছুই হ'তে পারে না। কিন্তু তবু প্রথম উষার শিশিরবিন্দুগুলি এর প্রাত্যহিকতায় ঝলমল করছে। লেখার ভঙ্গি তাজা, সজীব এবং কল্পনা-কুশল। তাছাড়া বইটির ভিতর এমন একটি তপ্ত চিত্রলতা ছড়িয়ে আছে যা তার প্রথম পাঠকদেরও চোখে পড়েছিলো। যদি জিগেস করি যে, এমন একটি পুরোনো, শিথিল ও সাধারণ গল্প কেমন ক'রে এ-রকম সংরক্ত চিত্রলতা অর্জন করেছে, তখন এর উত্তর হয় যে কথকতার ভঙ্গিটাই আমাদের আকর্ষণকে সব সময়ে সজাগ ও তীক্ষ্ণ রাখে। এই জিনিশটিকেই জেমস জয়েস দেখতে পেয়েছিলেন; অনেক বছর পরে বইটিকে তিনি এই কারণেই প্রশংসা করেছিলেন যে, 'এর প্রথম পংক্তি থেকেই' পাঠক 'গ্রন্থের নায়কের মনে আটকে থাকেন।' তিনি যে শেষ পংক্তি পর্যন্ত সেখানেই থাকেন—এই কথাটাকে আমরা প্রসঙ্গত যোগ ক'রে দিতে পারি।

স্বগতকথন বা 'monologue inte'rieur' নামক ব্যাপারটিই এর কারণ, যার সূত্রপাত ঘটেছিলো এই চটি বইটিতেই। স্থানে-কালে নির্ভরশীল যে-বস্তুময়তা, তার আঙ্গিক বদলে দিলে সে; আধুনিক উপন্যাস আর বশংবদ থাকলো না কোনো বিশেষ স্থান বা কালের। এই কথাগুলিকে আলাদা ক'রে নিয়ে ভেবে দেখলে হয়তো অন্তঃসারশূন্য ব'লে বোধ হবে; কেননা বইটির ভিতর যা-যা ঘটেছিলো, তা প্রায় সবই ঘটেছিলো একটি মোহমান, আবিষ্ট ও শৌখিন ফরাশি যুবকের সচেতনতায়, আর গ্রন্থের ভিতর স্থান বলতে আছে কেবল কতগুলি বুলভার। তাছাড়া একজন অভিনেত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করাটার সঙ্গে রহস্যের ও 'সময়শাসিত' কথকতার যোগাযোগ কী? বলাই বাহুল্য, দ্যজার্দাঁ ১৮৮৭তে উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে তাঁর এই সাহিত্যিক চমকের জটিলতা সম্বন্ধে অতি অল্পই অবহিত ছিলেন। ভেবেছিলেন, আগাগোড়া একটি অন্তর্মুখ উপন্যাস লিখবেন, কখনো তাঁর উপন্যাসের নায়কের মনের বাইরে যাবেন না; গোটা ব্যাপারটা ঘটবে কেবল একটিমাত্র সন্ধের—কয়েক ঘণ্টায়, এবং ঘটবে কেবল চিন্তারই ভিতর, কোনো ক্রিয়াকলাপে নয়। যথারীতি সাময়িকপত্রে বেরোলো, পুস্তকাকারেও বেরোলো অচিরেই, কেউ-কেউ তার নতুনত্বে আকৃষ্ট হলেন—তাদের সংখ্যা

আইজেনস্টাইন ও চ্যাপলিন (হলিউড ১৯৩০)

অবশ্য খুবই কম, তারপরে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে মিলিয়ে গেলো। এক যুগ পরে দ্যুজার্দাঁ তাঁর গদ্যপদ্যের বিচিত্র সংকলনে এটাকে নামগল্প হিশেবে পুনর্মুদ্রিত করলেন, এবং সম্ভবত এই সংস্করণটিই জয়েসের হাতে এসে পড়েছিলো। তখন বিশ শতক শুরু হ'য়ে গেছে। ১৯০২ সালে একবার প্যারিস থেকে ডাবলিন যেতে-যেতে রাস্তায় গল্পটা প'ড়ে ফেললেন জয়েস (তারও একযুগ পরে 'ইউলিসিস' বেরিয়েছিলো, আর তার প্রথম সূচনা হয়েছিলো এই বিচলিত ভ্রমণের বিবরণ দিয়েই)। বিশ বছর পরেও এই আইরিশ ঔপন্যাসিক বইটিকে ভুলে যাননি; তখন তিনি বইটিকে সম্মান জানালেন তাঁর ডাবলিন-ওডিসির আঙ্গিকের প্রধান উৎস ব'লে—রচিত হ'লো চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস।

জয়েস যখন তাঁর নাম উল্লেখ করলেন, দ্যুজার্দাঁ তখনো বেঁচে। বলতে গেলে প্রায় কেউই তখন তাঁর নাম জানে না; অস্পষ্টতার মধ্য থেকে তিনি তখন ধর্ম ও সঙ্গীত বিষয়ে বই লিখছেন। 'ইউলিসিস'-এর লেখক তাঁকে যে-বিপুল সম্মান দিলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রায় করুণভাবেই তিনি সাড়া দিলেন; সকৃতজ্ঞ পুনর্মূল্যে ;তাঁর বইয়ের নতুন সংস্করণ হয়েছিলো ১৯২৪-এ) মৃতের রাজ্য থেকে তুলে আনা ব্যক্তির সঙ্গে নিজের চিত্রকল্প যখন মিলিয়ে দিলেন, তখন তিনি সচেতনভাবেই জানতেন যে এই অলৌকিক মায়া যিনি ঘটালেন, সেই জয়েসকে তিনি খ্রীষ্ট ব'লে সম্বোধন করছেন। অতিকায় শিল্পীটি কিন্তু এই পৌরাণিক উল্লেখের গূঢ়ার্থ হারিয়ে ফ্যালেননি; অতিরিক্ত বিনয়ে—যা একদিক থেকে আত্মগরিমারই মুখোশ—জয়েস 'ইউলিসিস'-এর একটি কপিতে এই কথা লিখে পাঠালেন, 'অন্তর্মনতার প্রবঞ্চাকে—ধূর্ত তস্কর।'

২

এটাকে জড়িয়ে ধীরে-ধীরে গুরুতর একটি বিতর্ক গজিয়ে উঠলো। 'স্বগত-কথন' বা 'monologue intérieur' ব্যাপারটি কী? সংজ্ঞার্থই বা কী দেয়া হবে তার? আইজেনস্টাইন বলেছেন যে 'অন্তরীণ সংলাপ' হ'লো 'নায়কের পুনরভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করার সময় বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্য লোপ ক'রে কেলাসিত চেহারা দেবার সাহিত্যিক পদ্ধতি' ('literary method of abolishing the distinction between subject and object in stating the hero's re-experience in crystallized form') মাত্র। তাই যদি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে রোম্যান্টিক-দের কথাও প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে, কেননা 'বিষয় থেকে স'রে গিয়ে বিষয়ীর মনে ঘোরাফেরা ক'রে আবার বিষয়ের কাছে ফিরে আসা রোম্যান্টিকদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ক'রে এর্নস্ট টিয়োডর আমাডিয়ুস হোফমান, নোফালিস, জেরার দ্য নেরভাল প্রভৃতির কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।' আইজেনস্টাইনের এই কথাগুলো স্পষ্ট হবে যখন আমরা চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের উৎসসন্ধানে বেরোবো। উইলিয়ম জেমস-এর 'মনস্তত্ত্বের সূত্রাবলীতে (১৮৯০) এক জায়গায় বলা হয়েছে :

'মনের ভিতরে যে-স্বাধীন জলস্রোত বহমান, প্রতিটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রতিমা বা চিত্রকল্প যে শুধু কেবল তার ভিতর ডুবেই থাকে তা নয়, তার দ্বারা রঞ্জিত ও অনুরঞ্জিত হয়। প্রতিটি প্রতিমা তার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মূল্য লাভ করে সেই উজ্জ্বল-বর্তুল বা উপচ্ছায়া বা ছায়ালোকের কাছ থেকে, যা তাকে ঘিরে থাকে, বা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, এবং যা তাকে সঙ্গে ক'রে কাছে-দূরে নিয়ে যায়।' তারপর আরো আছে : 'চেতনা বা ভাবনা কখনো ছেঁড়া-ছেঁড়া বা টুকরো-টুকরোভাবে আত্মপ্রকাশ করে না।...কতগুলি টুকরোকে জোড়া লাগিয়ে বানানো হয়েছে, চেতনা কিছুতেই তা নয়। সে স্রোতের মতো, নিয়তই বহমান।...তাকে বরং বলতে পারি ভাবনার স্রোত, চেতনার প্রবাহ, অন্তর্জীবনের অবিচ্ছেদ গতি।' 'চেতনা-প্রবাহ' কথাটি কোত্থেকে এসেছে, তা সহজেই বোঝা যায়। পরবর্তীকালে আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে ভার্জিনিয়া য়ুল্ফ মস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন উইলিয়ম জেমস থেকে। ১৯১৮ সালে মে সিনক্লেয়ারও ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাসের আলোচনায় 'চেতনাপ্রবাহ' কথাটির পুনর্ব্যবহার করেছিলেন। উইলিয়ম জেমস যে-কথা বলেছেন, তার একটি আক্ষরিক সাহিত্যিক তর্জমা 'ইউলিসিস' থেকে তুলে দেয়া যায় : একটি আন্তোষ্টিতে যাচ্ছেন লিয়োপোল্ড ব্লুম, চুপচাপ ব'সে আছেন চারচাকার গাড়িতে :

'তারা বার্কলে স্ট্রিটে মোচড় নিতেই নদীর ধারের রাস্তার একটা বাড়ি থেকে হুড়মুড় ক'রে তাদের উপর এসে পড়লো বড়ো-বড়ো ঘরের ঝনঝনে ঝমঝমে কোলাহল ও গান। কেটিকে দেখেছো কি কেউ, কোনোদিনও? ক-য়ে এ-কার ল-য়ে হ্রস্ব ই-কার। মৃতেরা কুচকাওয়াজ ক'রে এলো "মল" থেকে। বদ এই লোকটা, ঠিক যেন বুড়ো আন্তোনিয়ো। ছেড়ে চ'লে গেলো

আমায়, নিজেই নিয়ো নিজেকে—এই তার মংলব। নাচতে-নাচতে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে ঘুরপাক! "দুর্দশার সত্যে বন্ধ মাতৃমূর্তি"! ধর্মের পথ। আমার বাসাটা ও ওখানে। মস্ত জায়গা, বিরাট। দুরারোগ্যদের জন্য বিশেষ একটা ধন্বন্তরি-বিভাগ আছে ওখানে। খুবই উৎসাহজনক। মেরিমাতার সরাইখানা: মুমূর্ষুদের জন্য চমৎকার সুব্যবস্থা! হাতের কাছেই কবরখানা—খুব কাছেই, তলার দিকে। বুড়ি রিয়োর্ডান ওখানেই অক্কা পেয়েছিলো। কী ভীষণ দেখায় ওদের—এই স্ত্রীলোক-গুলিকে। যে-পেয়ালাটায় পথ্য খেতো, চামচে দিয়ে কিনা তার ঠোঁট ঘষতো বারবার। তারপরে তাঁর রোগশয্যার চারদিকে পর্দা টাঙিয়ে দিলে। কেন? না, এখন সে মরবে। বেশ ভালো ছিলো ছাত্রটি, ভিমরুলের কামড় খাবার পর সেই আমাকে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলো। থুরথুড়েরা যে-হাসপাতালে গিয়ে মরবে ব'লে শোয়, এখন নাকি সেখানে আছে সে। এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায়—মাঝে আর কিছুই নেই।'

বলাই বাহুল্য, এখানে আমরা একেবারে ব্লুমের মনের ভিতর এসে পড়েছি। পাঠক আর উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে যে-বনেদি বিরোধ ছিলো, তা একেবারে ভেঙে গেলো। সাবেককালের মতো ঔপন্যাসিক নামক তৃতীয় ব্যক্তিটি এখন আর এই দুয়ের ভিতর সেতুবন্ধ হ'য়ে থাকলেন না। বনেদি চালের উপন্যাসে চরিত্রদের মনের খবর জানাতেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু জয়েস—এই সঙ্গে ভার্জিনিয়া য়ুলফ ও ডরোথি রিচার্ডসনের নামও করা উচিত—ঠিক চরিত্রের মনের ভিতর এনে হাজির করলেন আমাদের; মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘর যেখানে 'আগুনের জলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি' জেগে উঠতে থাকে। কবে থেকে এর সূচনা হ'লো বলা মুশকিল! রিচার্ডসন, হ্যামলেট, ডিকেন্স কোথাও-কোথাও এর ধারকাছ দিয়ে গিয়েছেন। আর লরেন্স স্টার্নের 'ট্রিস্ট্রাম স্যান্ডি' যে একদিক থেকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসেরই প্রথম নিদর্শন ১ সে-বিষয়ে অন্তত জয়েস আর য়ুলফের পরে আর-

কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সত্ত্বেও জয়েসই যে এর চূড়ান্ত নিদর্শন ও পরাকাষ্ঠা, এটাও এখন সন্দেহাতীত। আইজেনস্টাইনের সঙ্গে জয়েসের একবার দেখা হয়েছিলো প্যারিসে। জয়েস ছেলেবেলা থেকেই চোখে কম দেখতেন, তখন—' ২০-এর যুগে—চোখ দুটি প্রায় খুইয়ে বসেছেন, একেবারে অন্ধপ্রতিম; তবু আইজেনস্টাইনের কাছে চলমান ছায়াছবির কথা শুনে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বর্ণমালার সাহায্যে তিনি যা করতে চাচ্ছেন, বহুবিধ উপায় ও কৌশল হাতে আছে ব'লে একজন চলচ্চিত্র-নির্মেতার কাছে তা কত সহজসাধ্য। শুধু যে সহজ তাই নয়, অনায়াস এবং সাবলীলও বটে। কিন্তু ততদিনে তাঁর 'ইউলিসিস' বেরিয়ে গেছে: রিরংসার নগ্ন ও অশালীন প্রকাশ ঘটেছে এই অভিযোগে তখন তা বাজেয়াপ্ত হ'লেও এই অসাহিত্যিক কারণের জন্য গোপনে তার প্রচার অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে বর্ধমান। আর যে-সব কৌশল তাতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন, কিছুদিন পরেই রুপোলি পর্দায় তার প্রকাশ দেখে এ-কথাই মনে হয় যে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলিকেই উত্তরসূরিগণ চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করেছেন।

৩

জয়েসের চোখ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো, খুবই কম দেখতেন; ফলে তাঁকে চিত্রকল্প রচনায় রঙের চেয়ে বেশি সাহায্য নিতে হয়েছিলো শব্দের; তোরঙ্গ-শব্দ (লিউয়িস ক্যারলকে ধন্যবাদ), স্তূপীকৃত বিশেষণ, আর অন্বয়-প্রণালীর নানাবিধ তোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে কৌশলে তাঁকে ছবি ফুটিয়ে তুলতে হ'তো: 'She was just a young thin pale soft shy slim slip of a thing then' জয়েসের এই বাক্যটি উদ্ধৃত ক'রে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন যে এখানে বিশেষণ-গুলি শ্রাবণের বর্ষার মতো অজস্রতায় ঝ'রে পড়লেও কোনোটিকেই ত্যাগ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, কেননা শরীরের কোনো বাঁকা কিংবা ভোলের কোনো আভাস না দিয়েও যে-রমণীর বর্ণনা করা হ'লো তার ছবিটি কি মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না? 'উয়োমুন' (Womoon) বা ঐ জাতীয় বিখ্যাত তোরঙ্গশব্দ (যার অসংবৃত ও আতিশয্যমূলক ব্যবহারে 'ফিনেগানস ওয়েক' প্রায় দুর্বোধ) এবং এই জাতীয় অনুরণন ও ধ্বনির নিপুণ ব্যবহারেই জয়েস আওয়াজের মধ্য দিয়ে

আমাদের কাছে ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু সেই ছবিগুলি নিছকই ছবি নয়;—তারা যে ছবি এ-কথা বললেই তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না কিংবা শুধু মাত্র নয়নমোহন হ'য়েই তারা ফুরোয় না। এই কথাগুলো বোঝবার জন্যই এতক্ষণ ধ'রে আমরা অন্তর্ময় বাঙ্ময়তা ও চেতনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করেছি। চার্লি চ্যাপলিনের

---

১ বাংলা ভাষায় চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন কী, সে-বিষয়ে অনেকে কৌতূহল পোষণ করতে পারেন। তিরিশের একেবারে গোড়ার দিকে বুদ্ধদেব বসু-প্রণীত 'সাড়া' নামক উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহের প্রথম সুচিন্তিত ব্যবহার লক্ষ করা যায়; পরে তাঁর বহু উপন্যাসে এই কৌশল ব্যবহৃত হয়েছিলো; 'কালো হাওয়া'য় হৈমন্তীর মনোবিপর্যয়, 'তিথিডোর'-এর বিখ্যাত শেষাংশ, 'নির্জন স্বাক্ষর' দেখেন, এবং [illegible] কোনখানের [illegible] ও তার [illegible] বাংলা [illegible] চেতনাপ্রবাহের [illegible]

সবচেয়ে সম্পন্নভাবে উপন্যাস লিখেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; তাঁর 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' নামক তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি কোনো-কোনো দিক থেকে [illegible] স্মারক, বিশেষ ক'রে সময়চিন্তা [illegible] ব্যাপারে, আর চেতনাপ্রবাহের সঙ্গে তার [illegible]

ছবিতে যেখানে ক্ষুধার্তের হাতে জুতোর পেরেক মুর্গির ঠ্যাঙে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়, সেখানে আমাদের কাছে—সেই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আঘাতে—মনের অন্যসব অনুধাবন ক্ষমতার বিকলতাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য, পদ্ধতিটি এক। আমরা সেই ক্ষুধার্তের চোখ দিয়ে বন্ধুকে, তার জুতোকে এবং অন্যসব কিছুকে দেখতে শুরু ক'রে দিলাম। আজকের দিনে যে-কেউ ফিল্ম তুলতে যান, তিনি না জেনেশুনে অনায়াসে এটা ব্যবহার করবেন যে, একজন লোক চিত হ'য়ে অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছে, ঈথার দেয়া হ'লো, জ্ঞান লুপ্ত হচ্ছে, ঝাপশা হ'য়ে যাচ্ছে সব, ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমশ অসহায় হ'য়ে পড়ছে—ক্যামেরার কাচ তখন সেই লোকের চোখের কাজ করবে : ক্যামেরা যা তুলে দেবে তা ঝাপশা কতগুলি ছবি, ধীরে-ধীরে যা বিলীয়মান; ওদিকে আবহ-সঙ্গীতও ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলো—এবং এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিকলতা শব্দ, ছবি ও অন্যসব কিছুর অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হ'লো! খুব ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত, অত্যন্ত সহজ : বুঝতে কারোই কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, এবং আজকের দিনে এটি এত স্বাভাবিক ব'লে ঠেকবে যে তা বোঝাবার জন্য কোনো তত্ত্বকথারও দরকার হবে না। কিন্তু জয়েস যা করতে চাচ্ছিলেন, পরে তাকে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করার সময় আইজেনস্টাইনকে তত্ত্ব বানাতে হয়েছিলো : এটা কীভাবে করা যায় তা তাঁকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে হয়েছিলো, এবং তিনি বলেছিলেন যে, 'শুধুমাত্র শব্দচিত্রই চেতনাপ্রবাহের প্রতিটি দশা ও প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে পুনর্গঠিত করতে পারে। কী চমৎকার সব নকশা বানাতে পারে মনটাজ! মানুষের চিন্তা যেমন, তেমনি কখনো তার প্রতিমাগুলি হবে চাক্ষুষ, কখনো-বা তা নির্ভর করবে ধ্বনির উপর—কখনো-বা দুটোই এক সঙ্গে ঘটবে, কখনো-বা যুগপত্তা বর্জিত—কিছুতেই এক সঙ্গে ঘটবে না। তারপর হয়তো থাকবে কেবল কতগুলি ধ্বনি—নিরাকার, কিংবা হয়তো ধ্বনিনির্ভর কতগুলি প্রতিমা, সুস্পষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত কতিপয় আওয়াজ—শব্দময় কতগুলি প্রতিমূর্তি।...তারপর আচমকা স্পষ্ট, বুদ্ধিনির্ভর সুগঠিত কতগুলি কথা— উচ্চারিত কথার মতোই "বুদ্ধিজাত" ও অসংরক্ত। কালো পর্দার উপর ধাওয়া ক'রে এলো প্রতিরূপহীন কতগুলি রেখা, তারপরে যোগসূত্রহীন অসংলগ্ন কতগুলি আরক্ত কথাবার্তা—শুধু বিশেষ্য, তাছাড়া আর-কিছু নয়, কিংবা কেবল কতগুলি ক্রিয়াপদ, তারপরেই হঠাৎ কোনো কথার ভিতর ভাব বা আবেগপ্রকাশক শব্দ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো, সঙ্গে কতগুলি উদ্দেশ্যহীন আঁকাবাঁকা এলোমেলো ছাঁচ বা নকশা, তারা ঘুরপাক খাচ্ছে, আবর্ত তুলছে, আর সব ঘটছে একই সঙ্গে—ঘটনাক্রমের ভিতর পরম্পরা নেই, বরং একটা আরেকটার সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে তাদের ঘটনাকালে কোনো তফাৎ নেই। তারপরেই পরিপূর্ণ স্তব্ধতার উপর দিয়ে দৌড়ে চ'লে এলো কতগুলি চাক্ষুষ প্রতিরূপ, তারপরেই বহুস্তর কতগুলি ধ্বনির বিচ্ছুরণ তাদের ভিতর যোগাযোগ রচনা ক'রে দিলো, তারও পরে শব্দ ও ছবি দুটোই একসঙ্গে এবং দুটোই বহুস্তর। তারপর তা সন্নিবিষ্ট হ'লো কার্যকলাপের বহিঃপ্রবাহে—প্রায় ছুঁড়ে ফেলা হ'লো যেন তাদের, তারপরেই অন্তর্লীন বাগধারায় প্রক্ষিপ্ত হ'লো বহির্দেশের ক্রিয়াকলাপের উপাদানগুলি।' এখানে আইজেনস্টাইন যে-পদ্ধতির কথা বলছেন, তাতে কোনো চারিত্রের মানসিক সংঘাতের টানাপোড়েনের ভিতর সরাসরি আমাদের পোঁছিয়ে দেয়া যায় : সন্দেহ, সংরাগ, যুক্তি—সব—কেউ ধীরে, কেউ দ্রুত—ছন্দের দোলার ভিতর ধীরে-ধীরে চিত্রকল্প রচনা ক'রে যুগপৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে উঠলো—কোনো বহিঃসংঘাত নেই, কোনো বহিশ্চঞ্চলতাও নেই—একটি কঠিন ও অনড় মুখের অন্তরালে তীব্র এক বিতর্ক ও দোলাচল সম্পন্ন হয়ে গেলো। কোনো-একটি ধাক্কা দিয়ে তা শুরু করতে হয় : কখনো ঈর্ষা, কখনো রাগ, কখনো প্রজ্বলন্ত অভিমান, কখনো-বা মদ্যপানের পর প্রচণ্ড খোঁয়ারি। এরাই অবকাশ দেয় এই অন্তর্সংঘাতকে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা সহজে দাঁত নখ বের করতো না—যেন দরজা খুলে দেয়া হ'লো পশুশালার, আর হিংস্র ও ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো বিভিন্ন ভাবনারা অসংযত ও প্রচণ্ড হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো। স্রষ্টার উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য যে কেবলমাত্র তাদের পারম্পর্য রক্ষা করা, তা নয়—বরং এই সব আপাতবিরোধী ভাবনা, কথা, চিত্র ও উত্তেজনার ভিতর সেতুবন্ধ রচনা ক'রে একসঙ্গে তাদের উদ্ভাসিত ক'রে তোলাও তাঁরই সুকঠিন দায়িত্ব।

৪

নষ্ট পাড়ার রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লিয়োপোল্ড ব্লুম জলত্যাগ করতে বসেছিলো। তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলে তাকে পাহারোলা; এর আগে আকণ্ঠ গিলেছে ব্লুম, ফলে কথা কাটাকাটি শেষকালে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেলো, যেখানে ব্লুমের বিরুদ্ধে 'নির্দিষ্টভাবে' অভিযোগ করা হ'লো; তৎক্ষণাৎ—বলা নেই, কওয়া নেই—দেখা গেলো আদালতের দৃশ্য : উকিল, ব্যারিস্টার, পেশকার, হাকিম, সমাগত নরনারী, ফোঁপর-দালাল পুলিশ সব সুদ্ধ—অবশ্য তারা সবাই ব্লুমের চেনা লোক : একযোগে সবাই অভিযোগ করছে তার বিরুদ্ধে—এমনকি কবে কোন মেয়েকে দেখে তার ভিতরে রিরংসা জেগেছিলো এবং যার খবর কেবলমাত্র তার অবচেতন ছাড়া চরাচরে আর-কেউ রাখতো না, দেখা গেলো সেই মেয়েটিও এখন অভিযোগ পেশ করতে ছাড়লে না। বোঝা গেলো, কিছুতেই তার আর ছাড়া পাবার উপায় নেই। ঠিক এমন সময়ে একজনের মত শোনা গেলো যে অত দোষ থাকলেও ব্লুমের ছোট্ট একটা গুণও আছে। এ-কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে, একমুহূর্তও অবকাশ না-দিয়ে, তৎক্ষণাৎ শুরু হ'য়ে গেলো শোভাযাত্রা ও উচ্ছ্বসিত করতালি, এবং শোভাযাত্রার পুরোভাগে আর-কেউ নয়, ডাবলিনের নতুন মেয়র শ্রীযুক্ত লিয়োপোল্ড ব্লুম, এবং তারই পরিপূরকভাবে অচিরাৎ পট-পরিবর্তিত হয়ে তুঙ্গে নিয়ে গেলো : আমরা পরমভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রথম লিয়োপোল্ড নামক এক সম্রাটকে দেখতে পেলাম। সমস্ত ব্যাপার পর-পর রুদ্ধশ্বাসে ঘটে গেলো, অথচ আসলে কিন্তু ব্লুম তখনো রাতশহরের ঐ বাঁকা গলির মুখে পাহারোলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ব্লুম অপ্রকৃতিস্থ এ-কথাটা জয়েসকে কোথাও ব'লে দিতে হ'লো না; তার প্রয়োজনও ছিলো না, তিনি শুধু তার ভাবনার ভিতর সব যুক্তি ও স্বাভাবিকতাকে টানের পর টান মেরে ছিঁড়ে দিয়ে তার গোপন বাসনাগুলি আর ভীষণ ভয়কে, তার সদিচ্ছা, উচ্চাশা, অপরাধবোধ আর হতাশাকে জ্বলজ্বলেভাবে প্রকাশ ক'রে

দিলেন, উন্মোচিত হ'লো তার চেতনা আর অবচেতনঃ পাপবোধ, অহমিকা, দিবাস্বপ্ন, রক্তপিপাসা, ব্যর্থতার স্মৃতি—সব একের পর এক চ'লে এলো সার বেঁধে কুচকাওয়াজ ক'রে। আমরা বুঝে নিতে পারলাম যে, লোকটা বেধড়ক গিলেছে ব'লেই মাতলামি করছে, স্বাভাবিক অবস্থায় নেই—কিন্তু যেহেতু আমরা তার বুকের ভিতরে ঢুকে গিয়ে তপ্ত আর দপদপে হৃৎপিণ্ডটিকেও দেখতে পারছি সেইজন্য তার প্রতি গোপনে আমাদের অনুকম্পা ও সহানুভূতিও জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। কিংবা আরো ধরা যাক—নষ্টপাড়ায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে ব্লুম, আছে তিনটি বেশ্যা, রাতশহরের নানা আওয়াজ ও স্তব্ধতা, আর হাওয়ায় মদের ঝিমধরা গন্ধ, আর কোন-এক বিভীষণ চাপ; সেখানে কথা বললো কখনো কোনো হাতপাখা, কখনো-বা কোনো অপ্সরীমূর্তি; এলো নাদুশনুদুশ মস্ত চেহারার ভারিক্কি বাড়িউলি, ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল লাগলো, আর তারপরেই ব্লুম মুহূর্তের মধ্যে মেয়ে হ'য়ে গেলো, আর বাড়িউলি বেলা রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো 'বেলো' নামক তাগড়াই জোয়ান পুরুষে; হুড়োহুড়ি চললো দুজনে আস্ত ডাবলিনটাই রূপান্তরিত হ'লো পাতালে, মায়াবিনীর কুক্ষিগত কোনো রসাতলের সঙ্গে কোনো তফাতই তার থাকলো না, আর কোথাও না-বলা সত্ত্বেও এই তথ্যটা আমরা চট ক'রে বুঝে নিতে পারলাম যে, ব্লুমের দাম্পত্যজীবন মোটেই সুখের নয়, স্ত্রীর সঙ্গে তার মেজাজের তফাৎ আছে প্রচুর, আর তাদের যুগল জীবনের নানা তথ্য কোথাও সরবে না হ'য়েও ব'লে গেলো কেন এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ভবঘুরে ব্লুমের জীবন নারকীয় কৃষ্ণাভায় ভরপুর।

এই মাতলামি আজগবি হ'লো না কেন? সমস্ত যুক্তিকে ভেঙে দিয়ে ব্লুম কখনো আসামী হ'য়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, কখনো বা সম্মানিত মেয়রসাহেব হ'য়ে পড়ে, কখনো-বা সম্রাট, জগতের মুক্তির দূত, আবার কখনো এক অবলা নারী, আর মস্ত এক মেয়েমানুষ হঠাৎ হ'য়ে যায় ভীষণ এক মরদ। অপ্রকৃতিস্থতা আর অস্বাভাবিকতার চূড়ান্তঃ আপাত চোখে এটাই আমাদের মনে হ'তে পারে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখবো, গোপনে তারই ভিতর যুক্তি আর স্বাভাবিকতার এক কঠিন মিনার গ'ড়ে উঠলো ধীরে-ধীরে, দম-আটকানো সিঁড়ি আর বারান্দা দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমাদের উঠে যেতে হয় তার উপর, উঠে দেখি সারি-সারি অনেকগুলি ঘর প'ড়ে আছে সেখানে, পায়রার খোপের মতো একেকটা ঘর, কোনো-কোনো ঘরের দরজা সপাটে খোলা, কোনো ঘরের দরজায় বা মরচে-ধরা তালা ঝুলছে, কতগুলির তালা আবার আমরা যাওয়ামাত্র মন্ত্রবলে আপনা থেকেই খুলে গেলোঃ অর্থাৎ কোনো কিছু না-বলা সত্ত্বেও ধীরে-ধীরে আমাদের কাছে উন্মোচিত হ'য়ে যায় ব্লুমের অন্তর্জগৎ—তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, সন্দেহ, অসুখ, দুঃখ, কষ্ট, বিবেক ও লোকোত্তর তাড়না—সব সমেত।

যদি এটা চলচ্চিত্রে দেখানো হ'তো, তাহলে কী করা হ'তো? পাঠক 'ওয়াল্টার মিটির গোপন জীবন' নামক জেমস থারবারের বিখ্যাত গল্পটির চিত্ররূপের কথা মনে করে নিতে পারেন। ওয়াল্টার মিটি এক অতি-সাধারণ ভদ্রলোক, ভিতু, মধ্যবিত্ত, ভাবুক, স্বপ্নদ্রষ্টা—একশোর মধ্যে নেহাৎই নিরেনব্বুই জনের একজন। ড্যানি কে আছেন ওয়াল্টার মিটির ভূমিকায়। রাস্তায় দেখলেন এক ঘোড়ায়-চড়া টেক্সাসের কাউবয়, আঁটো পাতলুনে হোলস্টার আছে, পরনের কুর্তার উপর কার্তুজের বন্ধনী; 'যদি এ রকম হওয়া যেতো'—এ-কথা ভাবার আগেই, তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাঁকেই দেখা গেলো সেই বেশে। যা-ই তাঁকে আকর্ষণ করে, মনে মনে তা-ই তিনি হ'য়ে যান। কখনো টেক্সাসের বীরপুরুষ, কখনো প্রেমিক ঠিক একেবারে দু নম্বর ডন হোয়ান, কখনো [illegible], কখনো [illegible]। কিন্তু যা-ই তিনি হন না কেন ভিতরে ঠিক সেই ভিতু, কাপুরুষ, মুখচোরা মধ্যবিত্ত লোকটি লুকিয়ে থাকে এবং কুক্ষণমুহূর্তে সেই পোশাকের তলা থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রে বসে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সময়ের ব্যাপার কী হবে? 'ইউলিসিস'এর অনেকখানি জুড়ে আছে নষ্টপাড়ার অংশ, অথচ আস্ত বইটার ঘটনাকাল হ'লো ১৯০৪ সালের ডাবলিনের একটিমাত্র দিনরাত্রি। ব্লুমের এই বিভিন্ন রূপান্তর ঘটছে রাতের বেলায়, তার মনের ভিতর নষ্টপাড়ার এক রাস্তায়; যখন আবার পুনর্মূষিক হ'লো সে তখনো সেই রাত, সেই পাহারোলা, সেই নষ্টপাড়া এবং কব্জি-ঘড়িতে মিনিটের কাঁটা ঘুরেছে কয়েকটি মাত্র ঘর। কিংবা উপন্যাসের সেই শেষ কয়েকপাতা যেখানে যতিচিহ্নহীন একটি শায়িত ভাবনাকে তুলে ধরা হ'লো, যেখানে কোনো বাক্যবন্ধই আস্ত কিংবা সম্পূর্ণ নয়—একটার গায়ে যেখানে আরেকটি বাক্য সংলাপ কি সংগোপন ইচ্ছা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, যেখানে ধীরে-ধীরে একটি আস্ত জীবন ফুটে ওঠে—প্রথম প্রেম সুদ্ধ, যেখানে হলুদ অন্তর্বাস, নোংরা অস্নাত শরীর, কিংবা খাদ্যবস্তুর তালিকা প্রভৃতি খুঁটিনাটি পর্যন্ত বর্তমান—সেখানে পৌঁছে সহজেই—এই আন্তরিক স্বগতোক্তির ধারা বেয়ে—আমরা আইনস্টাইনের উল্লিখিত তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছোতে পারি। এটি যে কল্পের মতো অন্তঃশীলা কোনো চিন্তার-স্রোত, তা তো সহজেই ধ'রে নিতে পারা যায়। আপাতচোখে যুক্তি কিংবা শৃঙ্খলার কোনো বালাই না-থাকলে হবে কি, তলায় একেবারে সুকঠিন গণিতের মতো কাজ করছে সর্বজ্ঞ লেখকের বিধান, যার দ্বারা তিনি শেষ পর্যন্ত অন্তর্যামীর মতো সব কিছুর ভিতরেই—ওই বিশৃঙ্খলা ও যুক্তিহীনতার মধ্যে—বরং এক নিগূঢ় যুক্তি ও শৃঙ্খলাকে হাজির ক'রে দেন। কিংবা সতর্ক পাঠক—যিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত—তিনি তো স্পষ্টই লক্ষ করবেন যে, যখন একটি নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হবার বর্ণনা দেওয়া হ'লো বইতে, তখন প্রসূতির ব্যথার উদ্রেক থেকে শুরু ক'রে নবজাতকের আগমন পর্যন্ত যে-বিপুল অংশ বিবৃত হয়েছে তার ভিতর ধীরে-ধীরে ইংরেজি ভাষার বিবর্তনের একটি ইতিহাসও গোপনে পুরে রাখা হয়েছেঃ অভিনিবেশ দিলেই দেখা যায় ইংরেজি গদ্যের আদিরূপ থেকে ক্রমে-ক্রমে ইংরেজি গদ্যের একেবারে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছ আমরা—যখন প্রসূতি যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তখন গদ্যের যেন প্রথম জন্ম হ'লো—কোনো সুবিহিত বিধি নেই, নেই কোনো মসৃণ প্রবহমানতা, বরং খোঁচার মতো বিভিন্ন অংশে শব্দস্তবকের মতো তাকিয়ে থাকে চেনা-অচেনা লুপ্ত-সুপ্ত নানা শব্দের টানাপোড়েন; কিন্তু সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দিয়ে যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লো, অমনি সেই অংশের বর্ণনাতে ভাষা অত্যন্ত আধুনিক ও মসৃণ, সহজ ও সাবলীল এবং স্বাভাবিক ও প্রবহমানা হ'য়ে উঠলো। ভাষা—অর্থাৎ যে ধ্বনিস্পন্দ দিয়ে জয়েসের এই জন্মের ব্যাপারটি বিবৃত করেছেন, তা—একেবারে ভাঁজে-ভাঁজে পরতে পরতে বিবৃত বিষয়ের সঙ্গে মিশে আছে বাক্যবন্ধের গড়নের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে ধাপে ধাপে আস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ ক'রে দেওয়া হ'লো।

এখন এ-সব দেখে আমরা চমৎকৃত হই, লেখকের রচনার পিছনে এই গভীর ভাবনা ও নিষ্ঠা দেখে সশ্রদ্ধ না হ'য়েও কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু এই সব কৌশল যেহেতু জয়েসেরই উদ্ভাবিত, সেইজন্য পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে তাদের প্রয়োগ দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে চলচ্চিত্রের অন্যতম স্রষ্টা বা উপদেষ্টা বললে ভুল হয় না। যে-কোনো ছায়াছবিতে আজকের দিনে আমরা এই সব পদ্ধতির প্রয়োগ দেখে থাকি। 'হারানো সপ্তাহশেষ'-এর সেই সুবিখ্যাত বিভীষিকার দৃশ্য, সেই দুঃস্বপ্ন, যেখানে রে মিলান্ড আকণ্ঠ মদ্যপান ক'রে নিজের ঘরে এসে চিত হ'য়ে শুয়ে আছেন, আর ঘরের দেয়াল শাদা চুনকাম-করা ক্যাম্বিসকাপড়ে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছেঃ ধীরে ধীরে বা ছিঁড়ে ধবধবে ক্যাম্বিসকাপড়ের উপর ইঁদুরটি বেরিয়ে,

এলো, আর ভীষণ একটি বাদুড় কোত্থেকে ছুটে এসে অপার্থিব চীৎকারে চারপাশে শিহরন তুলে বার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, এবং তৎক্ষণাৎ তীব্র ধাতব আর্তনাদের সংগে-সংগে সেই ধবল ক্যাম্বিস কাপড়ের উপর দিয়ে গলগল ক'রে গড়িয়ে পড়লো রক্তের ধারা! দৃশ্যটির দিকে একটু অভিনিবেশ প্রয়োগ করলেই মূলে উৎসে জেমস জয়েসের উপস্থিতি অনায়াসেই আমাদের চোখে প'ড়ে যায়। অপরাধবোধ, বিবেক, নেশার দাসত্ব, হতাশা, অনাস্থা—সব কীভাবে মনের ভিতর রূপান্তরিত হ'তে-হ'তে এই চিত্রকল্পে পরিণত হয়ে গেলো, তা মনে রাখলেই দেখবো আস্ত দৃশ্যটা অবাস্তব ও আজগবি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্লীন অর্থময়তায় সঞ্জীবিত হ'য়ে নতুন আরেকটি আয়তন দান ক'রে ব'সে আছে: আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে, এটি নায়কের মনের ভিতরকার কারখানাঘর এবং সেখানে তার ভয়, বিবেক আর অপরাধবোধ যুক্তির অতিরিক্ত এক টানাপোড়েনে পরিবর্তিত হ'য়ে-হ'য়ে এই বিভীষিকার জন্ম দিয়েছে। অনেকে বললেন, এর পিছনে হোফমান, এডগার অ্যালান পো, পুশকিন, গোগোল প্রভৃতির ছাপ স্পষ্ট। 'ইশকাবনের বিবি'তে তাসের চেহারা ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে সেই যে ডাচেসের বিদ্রূপ-ভরা মুখ হ'য়ে গিয়েছিলো এখানে কি তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে না? কিংবা ঝোড়ো-হাওয়ায় কাঁপা কালো রাতে কোনো-এক নির্জন বাড়ির ভারি, চাপা, ভারাতুর কোঠায় মোমবাতির আলোয় অহিফেন-সেবকের চোখের সামনে যেভাবে শাদা চাদরে মোড়া মৃতদেহ উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গুণ্ঠন-মোচন ক'রে লিজিয়া নাম্নী প্রথম পত্নীতে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়ে ইচ্ছুক বাহুযুগল বাড়িয়ে দেয়, এখানে কি তারও লক্ষ করা যায় না। মুহূর্তে কি আমরা বুঝতে পারি না ভীষণ টান লেগে এখন এদের মনের মধ্যে যুক্তির সবগুলি সুতো পটপট ক'রে ছিঁড়ে গেলো? হোফমান-এর "ছায়াহারা" প্রভৃতি গল্প, গোগোলের বিখ্যাত "এক পাগলের দিনলিপি", "নাক" বা "ওভারকোট" প্রভৃতি অবদান, ডস্টয়েভস্কির "কুমির" নামক মর্মান্তিক ঠাট্টা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন লেখকের বহু রচনাকেই নজির হিশেবে এখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়। স্বয়ং আইজেনস্টাইন নেরভালের মতো কবির কথাও উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখা ভালো যে চরাচরে কিছুই যেহেতু স্বয়ম্ভু নয়, সেইজন্যে পিছন দিকে অভিনিবেশ দিলে অনেককেই সার দিয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়; আমরা শুধু বোঝার বা আলোচনার সুবিধের জন্য সর্বজনগ্রহণের উপযোগী একটা জায়গা থেকে শুরু করি। উল্লিখিত মহাজনদের হাতে এই সব কৌশল অতি ক্ষীণভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো, এবং মূলত তাদের নজর ছিলো রোমাঞ্চিকা হওয়ার দিকে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বানানোর ভাবটা বড্ড চোখে পড়ে; জিনিশটা যে আদ্যোপান্ত তৈরি করা, তা বুঝতে দেরি হয় না; ভিতর থেকে তারা যতটা হ'য়ে ওঠে, তার চেয়েও বেশি উগ্রভাবে বাইরে থেকে চাপানোর ভাবটা আত্মজাহির ক'রে বসে। জয়েসই প্রথম, যিনি সচেতনভাবে তাঁর রচনার আদ্যোপান্ত এর ব্যবহার করেছিলেন, তারা চরিত্রের মনের কারখানা থেকে হ'য়ে ওঠে—এ[illegible]বারের বন থেকে টিয়েপাখি বেরোয় সোনার টোপর মাথায়, বেরোয় নিগূঢ় ভিতর থেকে। এবং একে বাদ দিলে, তাঁর রচনাই থাকে না। কোনো কৌশলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা।

দুজার্দাঁর কথা তুলে এই আলোচনার সূচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুজার্দাঁর লেখার বড়ো ত্রুটিটা কোথায় তা উল্লেখ না করলে জয়েসকে বুঝতে অসুবিধে হ'তে পারে। অতীতকে জানাবার জন্য দুজার্দাঁকে একটি আজগবির অবতারণা করতে হয়েছিলো: নায়কের সঙ্গে অভিনেত্রীর কথা হ'লো রাত আটটায় আবার দেখা হবে; মধ্যে এই ক' ঘণ্টা সময় নায়ক একা-একা কী করে? সে তখন—পাঠকদের সুবিধের জন্য—লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বাড়ি ফিরে গিয়ে তাদের ভিতর যে-সব পত্র বিনিময় হয়েছিলো তা পড়তে শুরু ক'রে দিলো। পাঠককে বিগত অতীত জানাবার এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় দুজার্দাঁ খুঁজে পাননি। তার জন্য এমনকি একটি হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য বিষয়েরও অবতারণা করতে হয়েছিলো দুজার্দাঁকে। নায়ক অভিনেত্রীটিকে যে-সব প্রেমপত্র লিখেছিলো, তার নকল রাখতে তার নাকি একচুলও ভুল হয়নি—সরকারি চিঠি তো, নজির রাখার জন্য এমনকি প্রসংগসূত্র সুদ্ধ যেন লেখা। এবং এই অবসরে তাও কিনা সে পড়লো এক-এক ক'রে—এবং তার সংগে সংগে আমরা পাঠকরাও পড়লাম। প্রেমপত্রের নকল রেখে ভালো করেনি সে? না হ'লে বেচারা পাঠকরা সব ব্যাপার জানতো কী ক'রে? কিন্তু ব্যাপারটি এত অবাস্তব, হাস্যকর এবং অবিশ্বাস্য যে, এই একটি দুর্বলতায় বেচারা দুজার্দাঁর বইটি মার খেয়েছিলো। জয়েস কিন্তু এ-জাতীয় কোনো দুর্বলতার প্রশ্রয় দেননি। ১৯০৪ সালের একটি দিনেই তিনি আস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পুরে দিয়েছেন: 'টাইম প্রেজেণ্ট' এবং 'টাইম পাস্ট' সব একসঙ্গে আমাদের কাছে উন্মোচিত ক'রে দেয়া হ'লো: গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মতো। ব্লুমের মনের মধ্যেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আমরা যুগপৎ বিরাজ করতে দেখলাম: তার মনের মধ্যেই সজীব, চঞ্চল ও অস্থির হ'য়ে উঠলো 'মাছ, মাংস ও মাৎসর্য'। একটি গোটা দিনের ভিতর এক আস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বকাল—ব্যাপারটাকে এইরকমভাবে হাজির ক'রে জয়েস সময়ের সমস্যা সমাধান করেছেন।

পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে ঠিক অনুরূপ পদ্ধতি নিয়েছেন বিখ্যাত সুইডিশ চিত্র পরিচালক ইঙ্গমার বের্গমান। তাঁর 'বুনো স্ট্রবেরি' চিত্রেও মাত্রই একটি দিনরাত্রি বিবৃত—কিন্তু তার ভিতরেই বৃদ্ধ নায়কের পুরো জীবনটি আমাদের জানা হ'য়ে যায়। স্বপ্ন, স্মৃতি, দুঃস্বপ্ন ও ভাবনা—এরাই ক্রমে ক্রমে একটি দিনের ভিতর দীর্ঘ ছিয়াত্তর বছরকে ভ'রে দেয়।

৫

জেমস জয়েসের এই মস্ত উপন্যাসটির (র‍্যালফ ফক্সের ফতোয়া অনুযায়ী আধুনিক মহাকাব্য বলা যেতে পারে) ভিতর যা-কিছু ঘটেছে সব হ'লো একদিনের ব্যাপার, দৃশ্যপট ডাবলিন, আর বিষয় একটি ভ্রমণ—হিংস্র, আমিষখোর ও রক্তারক্তিতে ভরা একটি ভ্রমণ (যদিও রোমাঞ্চসিরিজের মতো খুন-জখম-রাহাজানি নেই): অর্থাৎ এটা হ'লো সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একজন আধুনিক মানুষের চলাফেরার বিবরণ: ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে মাঝারিদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সাঙ্গ করা হ'লো, নায়ক গেলেন একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, খবর-কাগজের আপিসে; গ্রন্থবিতান, সস্তা ভাটিখানা, মুদ্রাগার, হাসপাতাল, সমুদ্রতীর, নষ্ট পাড়া, কফিখানা ইত্যাদি যাবতীয় জায়গায় বাড়ি ছুঁয়ে পুনরায় এসে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। ধীরে-ধীরে এই তুচ্ছ, নষ্ট, পোকাপড়া দৈনন্দিনের মধ্যেই উন্মোচিত হ'লো গ্রীক মহাকাব্যের নায়কের অভিযান-

দুর্দান্ত সফেন সমুদ্রের উপর দিয়ে মস্ত এক পালতোলা জাহাজ চলেছে—কিন্তু এই প্রাচীন উপাখ্যানটি কখনো স্পষ্ট ও উগ্রভাবে ফুটে ওঠে নি, বরং জাঁতিকলের মতো ভিতর থেকে বইটাকে কামড়ে আছে, কেননা কেবলমাত্র তার আবহাওয়াটাই ঝুলে আছে উপন্যাসের মধ্যে, কশাইখানায় যেমন ঝুলে থাকে দগদগে মাংসখণ্ড, 'কার্নিশে যেমন ঝুলে থাকে বাদুড়ের কালো ছায়া'।

ইউলিসিস হলেন শ্রীযুক্ত লিয়োপোল্ড ব্লুম—'ধর্মান্তরিত একজন ইহুদি'—লোলুপ, অলস, মর্যাদাজ্ঞানহীন, বিষণ্ণ, কৃত্রিম, দয়ালু, অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন; এবং যখনি তিনি কোনো উচ্চ আদর্শের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখনি সেই বন্য হংসের অনুসরণ তাঁকে নামিয়ে নিয়ে আসে আরো অনেক নিচুতে। খুঁটে-খুঁটে বের ক'রে নিতে চান জীবনকে, জানতে চান তার সব কোণ ও সীমান্তর, আর তার এই বিরাট উদ্যমের উপায় হ'লো দপদপে একটি শরীর। পেনিলোপি হলেন শ্রীমতী মারিয়ন ব্লুম, বড্ড বেশি সদয়, নিজেকে বড় বাজে খরচ করেন, প্রেমপ্রার্থীদের প্রতি একেবারে বিগলিতকরুণা, দয়ার শরীর,—বিশেষত উপন্যাসের শেষাংশে যে-দীর্ঘ পত্রহল যতিচিহ্নহীন ভাবনা স্রোতের মতো ব'য়ে যায় তাতে তাঁর শারীরিক ক্ষুধা বা রিরংসার অতৃপ্তিই দপদপ করে, যাকে তিনি কেবল চিন্তাতে নয় কার্যক্ষেত্রে চরিতার্থ করতে চান। তৃতীয় ব্যক্তিটি হ'লো স্টিফেন ডেডেলাস নামক জনৈক তরুণ, যাকে পাঠকেরা ইতিপূর্বে দেখেছেন জয়েস-প্রণীত 'শিল্পীযুবকের প্রতিকৃতি' নামক গ্রন্থে, এবং যার ডেডেলাস নামক পদবি গ্রীক পুরাণের মোমের পাখনার কিংবদন্তী স্মরণে আনে: ডেডেলাসকে দেখেই ব্লুম তাকে তার আত্মার সন্তান ব'লে শনাক্ত করতে পারলে—ঠিক যেমনভাবে টেলিমেকাসকে দেখেই ইউলিসিস নিজেরই নন্দন ব'লে চিনেছিলেন। স্টিফেনের পথ ভিন্ন, সে চায় বুদ্ধির সাহায্যে জীবনকে জেনে নিতে (পাঠক নিশ্চয়ই জানেন যে 'শিল্পী-যুবকের প্রতিকৃতি, নামক উপন্যাসের প্রথম লেখনে স্টিফেন ডেডেলাসের নাম ছিলো স্টিফেন হিরো; পরে যে ডেডেলাস নামক গ্রীক নামটি ব্যবহার করা হ'লো তা নিশ্চয়ই সুচিন্তিত ও অভিপ্রেত, কেননা যে পাখা ঝাপটিয়ে সপুত্র ডেডেলাস আকাশে উড়েছিলেন, এবং যে-পাখার মোম গ'লে গিয়ে পুত্র ইকারুসের মৃত্যু ঘটিয়েছিলো, সেই পাখনা দুটির জ্বলন্ত ও গলমান মোমকে আমরা এই মস্ত উপন্যাসে ধীরে-ধীরে ঝ'রে পড়তে দেখি, কেননা সেই শিল্পী-যুবককে এই মোহভঙ্গের ব্যথিতাড়িত মহাকাব্যে জয়েস শুধু এক অনিবার্য শেষ রেখার দিকেই টেনে নিয়ে গেছেন।) ব্লুমের সঙ্গে ডেডেলাসের দেখা হ'লো নষ্ট পাড়ার চকিত রাত্রে—উপন্যাসে যার নাম 'নাইট টাউন'। এই 'শর্বরীশহর' যে মায়াবিনী কির্কীর প্রাসাদ এবং ওডিসিয়ুসের 'পাতালপ্রবেশের' তর্জমা, তা অনায়াসেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; কেননা এই নষ্ট পাড়ার অতিপ্রাকৃত ও অলিগলি-সংকুল কানাগলিতে ব্লুম আর ডেডেলাসের মধ্যেই অল্পেই বন্ধুতা হ'য়ে গেলো। উপন্যাসের মধ্যে যাকে সংকট বলে, তুঙ্গ ব'লে যাকে চেনানো যায়, এটাই হ'লো সেই অংশ: এইখানেই ছোটোখাটো অনেক পুরাণ ও কিংবদন্তী ভনভন ক'রে ঘুরতে থাকে, আর একটি হিংস্র ও নারকীয় অধিজ্যোতা তাকে টান ক'রে তোলে। নারকীয় স্রোতে ভ'রে যায় সব—মাটি আলো আকাশ হাওয়া সব; গ'লে-গ'লে ঝ'রে পড়ে ব্যক্তিত্ব ও অস্মিতা, অনায়াসে লিঙ্গবদল হ'য়ে যায়, এবং আস্তে-আস্তে গোটা বিশ্ব—এমনকি এই হৃত ও হৃত-ভাগ্য ও ভোগাসক্ত ব্লুম সুদ্ধু—এক নিরানন্দ ইন্দ্রজালের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে, আর তারই ভিতর গুমগুম ক'রে বাজতে থাকে আদিপৃথিবীর ডাইনি-পুরুতের অর্থহীন, শূন্য, নিরানন্দ কণ্ঠস্বর।

কাহিনী বলতে এই মস্ত বইতে আছে শুধু এইটুকু; কিন্তু এই কাঠামোটিকে পাতার পর পাতা ধ'রে ভ'রে রেখেছে দপদপ করা রক্তমাংস, যা না-থাকলে এটা নিছকই একটি নিরর্থক তত্ত্বকথা ও হোমরের নিষ্প্রাণ তর্জমায় পরিণত হ'তো। কিন্তু এটা তো হোমরের তর্জমা নয়, বরং তার একটি আধুনিক অ ন্ত রা খ্যা ন। ফাউস্টের কিংবদন্তী ছাড়া আর কোনো পুরাণ য়ুরোপের শিল্পীদের এতবার আকর্ষণ করেনি, আর বহুবার ব্যবহার করা সত্ত্বেও জয়েস যে দ্বিতীয়রহিত ও সজীব, তা কি কেবল এইজন্য যে এটা একটি 'tour de force' —ক্ষমতার লীলাময়তা—আর কিছুই নয়? জয়েসের পরবর্তী উপন্যাসের কথা মনে রাখলে অবশ্য একে আর ক্ষমতার লীলাময়তা বলা যায় না, কেননা তার পরাকাষ্ঠা ঘটেছে তো 'ফিনেগানস ওয়েক'-এ, যেখানে শব্দের ভোজবাজির ভিতর আস্ত চরাচরকে ভ'রে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু 'ইউলিসিস'এ তো তা নয়; একটু অভিনিবেশ দিলে যে-কোনো পাঠকই অনায়াসে বুঝে নিতে পারবেন জয়েস কী বলতে চাচ্ছেন। প্রচুর ব্যবহার করেছেন তিনি অলৌকিকের, প্রায় যেন ফ্যান্টাসি এই উপন্যাস, বিশেষ ক'রে কোনো জবাবদিহি না ক'রে যেভাবে আজগবির ব্যবহার করেছেন, তাতে বাইরে থেকে অনায়াসেই একে ফ্যান্টাসি ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু তবু এটা পুরোপুরি ফ্যান্টাসি নয়, যেমন হ'লো লিউয়িস ক্যারল, কি কার্লো কলোদি, কি জেমস ব্যারি বা অবনীন্দ্রনাথ কি সেলম লাগেরলোফ। এটা ঠিক, ক্যারেলের বিষয়ই ছিলো তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা,—অ্যালিস যে বিস্ময়ের দেশে গেলো সেখানেই দেখানো হ'লো যে স্বাভাবিক পৃথিবীর একজন প্রতিনিধি গেছে আজব দেশে; পিটার প্যান-এও তা-ই—ওয়েন্ডিরা স্বভাবের পৃথিবীরই প্রতিনিধি, সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'র আমিটিও তা-ই; তাদের বিস্ময় থেকে ধীরে-ধীরে বিস্ফারিত হয় 'নেই-দেশ' কি 'আয়নার রাজ্য' বা 'আজব দেশ'। কিন্তু জয়েসের মধ্যে কোনো বিস্ময় নেই: লিঙ্গ বদলে গেলো—যেন তা অতি স্বাভাবিক, হররোজ ঘ'টে থাকে; পাখা কথা বললো, কথা বললো দেয়ালের ছবির কুমারীরা, দরজার কড়া, খুর, বন্দুক, জলপরি, ঝর্না, বোতাম প্রভৃতি সব পদার্থই। কিন্তু এরা যে প্রাণ পেলো, কথা বললো, একটা অভিজ্ঞতার সক্রিয় অংশিদার হ'লো—কোনো বিস্ময়ই নেই এইজন্য। ব্লুম কখনো কাঠগড়ার আসামী, কখনো ডাবলিনের মেয়রসাহেব, কখনো-বা সম্রাট প্রথম লিয়োপোল্ড—কিন্তু তাও কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, সব স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া হয়। এ-সবকে স্বাভাবিক ভাবলো ব'লেই তো মর্মন্তুদভাবে ফুটে বেরুলো অস্তিত্বের সর্বনাশ। তারপর, এই-সব নারকীয় হট্টগোলের পরেই আবার উপন্যাসের রচনাভঙ্গি বদলে গেলো—পাতার পর পাতা জুড়ে ডেডেলাস আর ব্লুমের বর্ণনা করা হ'লো, কথা নেই বার্তা নেই

সংলাপ নেই, অনেকটা যেন মূকাভিনয়। পাতা ভ'রে উঠলো খুঁটিনাটির পুঙ্খানু-পুঙ্খ বর্ণনায় : তারা হাত-পা ধুলো, নিজেদের সাফ ক'রে নিলে, আলোচনা করলে নানা বিষয়ে; এত ডিগ্রি কোণ ক'রে বসলো—কখনো আধ-শোয়ার ভঙ্গিতে, এমনকি আমরা যেন তাদের ঠোঁট নড়া সুদ্ধু দেখতে পাই, কিন্তু কোনো কথা শুনতে পাই না, যেন অনেক দূর থেকে দেখি খোয়ারি কাটার পরেকার সেই দশা, আর বিষম হট্টগোলের পরেই সেই ভারাতুর স্তব্ধতা যেন সবল-ভাবে আমাদের বুককে ঠেশে চেপে ধরে।

এতক্ষণের আলোচনার মধ্যে এটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে সংলাপ এই পুস্তকে কীরকম গুরুত্বর অংশ নিয়ে আছে। অথচ ভীষণ চ্যাঁচামেচির ঠিক পরক্ষণেই আর কোনো কথোপকথন নেই, কেবল তাদের ক্রিয়াকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। আবার তার পরের অংশ হচ্ছে পুস্তকের সেই যতিচিহ্নহীন চীৎকৃত ভাবনা, যা তার উপসংহারকে রুদ্ধশ্বাস ও নিষ্ঠুর ক'রে তোলে। শব্দের এই রকম সুচিন্তিত বিন্যাস ও ব্যবহার আমাদের কাছে সবাক চিত্রের কতগুলি কৌশলকে মনে করিয়ে দেয়। সব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যেন : কী ভাবে তারা ঘরে ঢুকলো, কী ভাবে জলের শব্দ হ'লো টুপটাপ ও ঝরঝর, ঠোঁট নড়ছে, সব দেখছি অন্য সব শুনছি, কিন্তু কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। 'মঁসিয় য়ুলোর ছুটির দিন', নামক জাক তাতির চলচ্চিত্রটি মনে ক'রে দেখুন—যেমন—যেমন রেস্তোরাঁয় দৃশ্য : ঠোঁট নড়া, অঙ্গভঙ্গি সব দেখা যায়, কথার আদলও মাঝে-মাঝে ফুটে ওঠে, কিন্তু কোনো স্পষ্ট-সংলাপ কানে আসে না। 'মঁসিয় ভার্দু'তে চ্যাপলিন একটি নরহত্যা সমাধা ক'রে নিশীথরাত্রে যে-সাংগীতিক চান্দ্রবিলাস শুরু করেন, তা যেমন একটি নৃশংস কাজকে চাপা দিয়ে রাখে, তেমনি নষ্ট পাড়ার ওই কানে তালা লাগানো চ্যাঁচামেচিও যেন ব্লুমের হৃদয়ের উৎকট মৃত্যুকে চেপে রাখতে চায়। শুধু কেবল উৎক্ষেপনের কৌশলই নয়, আগাগোড়া পুরো ব্যাপারটিকে প্রায় যেন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘটানো হ'লো। এই শব্দবিন্যাস নামক ব্যাপারটি পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছে। আবহসংগীত নামক ব্যাপারটি যে শব্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, তারও মূলসূত্র হয়তো এখানেই লিপিবদ্ধ ছিলো।

৬

আরেকটি ছোট্ট বিষয় আছে, কিন্তু ছোট্ট হ'লেও যা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই আলোচনায় আগে তার আভাস দেয়া হয়েছে, কিন্তু এখন তা আরো স্পষ্ট করা উচিত। আজকাল বিদেশেও চার ঘণ্টার ছবি তোলা শুরু হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ দর্শনীয় ছবিই বেশি সময় দর্শককে ব্যতিব্যস্ত ও উত্তেজিত রাখতে চায় না। সেইজন্য চিত্র-নির্মাণের বেলায় সবচেয়ে বেশি লক্ষ রাখতে হয় সময়ের উপর—কেননা একটা মুহূর্তও বাজে খরচ করার উপায় থাকে না। একটি উপন্যাস আমরা দীর্ঘ দিন ধ'রে চেখে-চেখে পড়তে পারি, কিন্তু একটি চলচ্চিত্রকে নির্দিষ্ট কতগুলি মিনিটের মধ্যে শেষ করতেই হয়। তখনি প্রয়োজন পড়ে কোন-কোন জিনিশ কতক্ষণ ধ'রে কোন কোণ থেকে কীভাবে দেখানো হবে—এটা ভেবে নেয়ার। 'ইউলিসিস' উপন্যাসটি একটিমাত্র দিনের ঘটনা হ'লেও সন্ধে থেকে মধ্যরাত্রে অবধি যা-যা ঘটেছিলো তারই বর্ণনায় অধিক বাক্যব্যয় করেছে। অথচ প্রাতঃকাল থেকে গোধূলি পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘটেছিলো : অন্ত্যেষ্টি খবর-কাগজের আপিশ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নানা স্থানের অভিযান সেখানে বিবৃত হয়েছে কিন্তু তাতে তুলনামূলকভাবে জয়েস অনেক কম পাতা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ কখনো গতি বা বেগ খুবই দ্রুত, আবার কখনো অতিশয় মন্থর ও শ্লথ। গতির এই নিয়ন্ত্রণটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, কেননা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা তা হ'লো বেগ বা আন্দোলন—যে-কারণে তার ডাক নাম 'মুভি'। তা যে কতগুলি স্থিরচিত্রের প্রতিফলন, সংকলন বা পরম্পরা নয়, এটাই তার কারণ। এই বেগ ব্যাপারটি যে অজস্র ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়, তা আজকের দিনে তর্কাতীত। বেগ বা আন্দোলন বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'লো একটি অন্তর্লীন অধিজ্ঞতা, যা জলস্রোতের মতো অনিবার্যভাবে ভাটার দিকে এগোয়। এই আন্দোলনকে বোঝাবার জন্য বহু কৌশল ব্যবহার করা হয় : খুঁটিনাটি, পৌনঃপুনিক ও বহুমুখী উল্লেখ, গুপ্ত সংযোগ, নাটকীয় নিয়মিত প্রভৃতি বহু কিছু : তুলনা, প্রতিতুলনা, বিরোধাভাস এরাও তাদের দাবি সূচ্যগ্রপরিমাণ ছাড়ে না। আইজেনস্টাইন যে, মন্টাজের তত্ত্বকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলেছিলেন, তা প্রধানত এই কটি জিনিশের উপর নির্ভরশীল। 'ওডেসা-সোপানে'র অবিস্মরণীয় পরিকল্পনার ভিতর এদের স্তূপাকারে লক্ষ করা যায়। কশাক সৈন্যের নিয়মিত পদক্ষেপ, সোপান পংক্তির কঠিন পরম্পরা, এবং জনতার শৃঙ্খলমুক্ত উল্লাস—একটার গায়ে আরেকটাকে ছুঁড়ে মেরে যে তীব্র আন্দোলন তিনি তৈরি করেছিলেন তা তাঁর নিজের ব্যাখ্যাতেই কেবল নয়, নানা মুনির নানা ভাষণেও উপরিউক্ত রুদ্ধশ্বাস গতিবেগ খুঁটিনাটি, আবৃত্ত ও বহু-মুখী উল্লেখ ও বিরোধাভাসের ঘূর্ণমান সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে বলেই ব্যক্ত হয়েছে। কোনো-একটি জিনিশ বারে-বারে ঘুরে এলো, কিন্তু প্রতিবারই তার অন্তর্লীন অর্থময়তা পরিবর্তিত হচ্ছে—এই জিনিশটি আমাদের মনের ভিতর স্রোত ও আবর্তের কুটিল চঞ্চলতা গ'ড়ে তোলে। তাছাড়া একই জিনিশকে কখনো দ্রুত বা কখনো ধীর লয়ে ঘটিয়ে স্নায়ুর উপর আঘাত করলেও চঞ্চলতা জেগে ওঠে। যা অতর্কিত, তা মুহূর্তে ঘটে যায়, আবার যা অবশ্যম্ভাবী তা যখন অতিশয় ধীরে ঘটতে থাকে, তখন আমাদের বোধ জাগ্রত ও ক্ষুরধার হ'য়ে ওঠে; কেননা 'গতি' বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝে থাকি, তা যে অন্য আরো বহুকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও বিজড়িত, গতি যে আসলে আয়তনের পরিবর্তন স্তরভেদের পরম্পরা এটা যেভাবে 'ইউলিসিস'এ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, চলচ্চিত্র ঠিক সেইভাবেই তাকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে।

৭

কোনো চলচ্চিত্রনির্মাতার চেয়ে একটি বড়ো সুযোগ ছিলো জয়েসের যে-কারণে অচিরাৎ ও প্রত্যক্ষ না-হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ যুগে তিনি প্রত্যেক সচেতন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য থেকে যাবেন আইজেনস্টাইন, ওয়াল্ট ডিজনে বা চার্লি চ্যাপলিনের বরাতে যে-সৌভাগ্যটি নেই : কেননা 'চলচ্চিত্র' ব্যাপারটি নানা কারণে অতিশয় স্বল্পজীবী ও ক্ষণস্থায়ী—তাই একদা প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য হওয়া সত্ত্বেও এই তিন অবিস্মরণীয় প্রতিভা কেবল ইতিহাসের স্তম্ভ হ'য়েই থাকবেন—সাধারণের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ক্রমশ ছিন্ন হ'য়ে আসবে। যেহেতু চলচ্চিত্র ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর সবচেয়ে নির্ভর-শীল, কেননা কল্পনা থাকলেও যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এখানে স্বীকার না-ক'রে চলে না, সেইজন্য কালক্রমে দুর্বলেরাও এই তিন প্রতিভার উপর টেক্কা দেবার স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু সেটা হয়তো শুধুই স্বপ্ন, কেননা এঁরা তিনজনে হলেন স্রষ্টা, যে-সম্মান চিরকাল তাঁদের দিয়েছে। জয়েসও আর কোনো সূত্রে না-হোক—নিশ্চয়ই এই সূত্রে স্বীকৃতি পাবেন।

পশুপক্ষী বাতিকগ্রস্ত বৃটেন

অস্ট্রেলিয়ার এক সাংবাদিক সম্প্রতি লণ্ডন বেড়িয়ে দেশে ফিরে সিডনী থেকে প্রকাশিত তার কাগজে লেখেন: "পোষা কুকুর, বিড়াল, পাখি বা মাছ না থাকলে সামাজিক চিড়িয়াখানায় কারুর ঠাঁই হয় না।" বৃটেনের লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশুপক্ষীর সংখ্যা ধরলে এই উক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। গণনা থেকে আরো জানা যায় যে, কুকুর ও বিড়ালের চেয়ে খাঁচার পাখি বৃটেনে সংখ্যায় প্রভূত বেশী। সেই সঙ্গে সবরকমেরই পশুপক্ষী পোষার বাতিক যে কি পরিমাণ বেড়ে চলেছে, তারও একটা চমকপ্রদ হিসেব পাওয়া যায়।

বৃটেনে খাঁচায় পোষা পাখির সংখ্যা এখন এক কোটি দশ লক্ষ। লাইসেন্স নেওয়া কুকুরের সংখ্যা ২৭,০১,৫৫৫ এবং এছাড়া আছে লাইসেন্স না করা এবং রাস্তার কুকুর। ১৯৩৮, ১৯৫০ এবং ১৯৫৬ সালে লাইসেন্স-করা কুকুরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০,০০,০০০; ৩০,৮৯,৪৫০ এবং ২৮,২১,০৭১। বিড়াল সম্পর্কে কোন সঠিক সংখ্যা নির্ণয় কঠিন ব্যাপার। কোন কোন কর্তৃর হিসেবে বৃটেনে বিড়ালের সংখ্যা ৮০,০০,০০০ এবং বছরে তাদের খাওয়াতে খরচ হয় প্রায় আঠাশ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালে জাতীয় মার্জার সপ্তাহ উদ্‌যাপন কালে এক বিশেষজ্ঞ বিড়ালের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ বলে অনুমান করেন অর্থাৎ বৃটেনের মানুষ অধিবাসীর প্রতি চারজনের ভাগে একটি করে। কিন্তু কম সংখ্যাটা ধরলেও তা ১৯৫৬ সালের তুলনায় ২০ লক্ষ বেশী।

বৃটেনের লোকে সর্বসাকুল্যে কুকুর, বিড়াল ও পাখি মিলিয়ে ২ কোটি ২২ লক্ষ প্রাণীকে ঘরে স্থান দিয়েছে। আর ঐ পোষা জীবদের টিনে প্যাক করা খাদ্যের জন্য বছরে প্রায় ৭০ কোটি টাকা খরচ হয়। ছ বছর আগের এক হিসেবে দেখা যায় যে, খাঁচায় পোষা পাখির দানা বাবদ বছরে খরচ হয় প্রায় ২২ কোটি টাকা। অর্থাৎ পোষা প্রাণীদের খাওয়াতে মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ৯২ কোটি টাকা। এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় বৃটেনের লোকে পশুপক্ষী পোষায় কি পরিমাণ বাতিকগ্রস্ত।

পশুপক্ষীদের উপর নির্যাতন প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য বৃটেনে ২২০টি সমিতি আছে। এদের মতে পোষা জীবটি যাই হোক গড়পড়তা লোকে তাদের ওপর মমতা ঢেলে দেয়। পোষা জীবরা ঠিকমতো ব্যবহার পায় না এমন গৃহও অবশ্য কিছু আছে। অনেকে বাড়িতে একটা পোষা জীব রাখা ফ্যাসন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে। সেসব ক্ষেত্রে পশুগুলিকে হয় অতিমাত্রায় খেতে দেওয়া হয় নয়তো যথেষ্ট পরিমাণ খেতে পায় না। কুকুরেরা যথেষ্ট ব্যায়াম করতে পারে না এবং বেশীর ভাগ সময়টাই শিকলে বাঁধা অবস্থায় থাকে।

অবিবেচক ব্যক্তিরা অনেক সময়ে দু-তিন বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলনা হিসেবে কুকুর বা বিড়াল বাচ্চা কিনে দেয়। সেসব পোষা জীবগুলির ছোটদের নির্যাতনে নাকালের অন্ত থাকে না। ভেবেচিন্তে কাজ না করা, অনুভূতির অভাব এবং তাচ্ছিল্য-ভাবই পশুদের নির্যাতিত হওয়ার কারণ এবে পশুমঙ্গল সমিতি ক্রমেই এই অবস্থা দূর করে দিচ্ছে। অনেকের কাছে গৃহপালিত পশুপক্ষী গৃহের একটা অলংকাররূপে পরি-
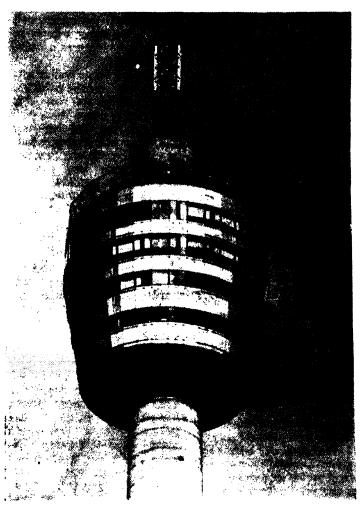
১৯৫৫ সাল থেকে সারা পৃথিবীর পঞ্চাশ লক্ষ লোক স্টাটগার্টের টেলিভিশন টাওয়ারটি পরিদর্শন করে। ১৪৯০ ফিট উঁচু বনসার জঙ্গল ছাপিয়ে কংক্রীটের এই বিরাট পিলারটি মাথা উঁচু করে রয়েছে। টেলিভিশন মাস্তুল সমেত এই টাওয়ারটিরই উচ্চতা ৬৫১ ফিট। পনেরজন যাত্রী সহ মাত্র বাহান্ন সেকেণ্ডে দ্রুতগামী একটি লিফ্‌ট টাওয়ারের চূড়োয় পৌঁছয়। এর প্রথম তলাটি হচ্ছে ৪৬৩ ফিট উঁচু এবং এখানে রয়েছে একটি ট্রান্সমিশন কামেরা একটি রান্নাঘর এবং দুটি রেস্তরাঁ। ওর ওপর তলায় অবজারভেশন গ্যালারি, যেখান থেকে স্টাটগার্টের দৃশ্য, নেকার উপত্যকা এবং ব্ল্যাক ফরেস্ট দেখা যায়। অবজারভেশন গ্যালারি এবং রেস্তরাঁয় একসঙ্গে ছশ লোকের সঙ্কুলান হতে পারে

গণিত হয়, তাদের কাছে ওরা আর কোন কাজের নয়। কিন্তু সেটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। বিশেষ করে বিড়াল, কুকুর এবং খাঁচার পাখি তাদের প্রতি যত্ন ও স্নেহ যা দেখানো হয়, সে অনুপাতে অনেক বেশী বুদ্ধিমান হয়। আর প্রয়োজনীয়তার কথা ধরলে ওদের অনেকেই রীতিমত কাজেরও হয়। অন্ধদের সহায় কুকুরগুলিই তার দৃষ্টান্ত। অন্যান্য ক্ষেত্রে জিনিসপত্তর আনা, ছোটদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া এবং স্কুল থেকে বাড়িতে আনা ইত্যাদি বহু কাজে লাগে। সাহসী পোষা জীব তাদের মালিকদের প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড এমন কি আত্মহত্যা থেকে যে রক্ষা করে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে পরিভ্রমণ কালে এক মহিলা অকস্মাৎ এক পাগল ষাঁড় দ্বারা আক্রান্ত হতে স্যামী নামক কুকুর মহিলাকে রক্ষা করে। লাইন নামক আর একটি কুকুর তার মালিককে ষাঁড়ের গুঁতোয় প্রাণনাশ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

ক্যাইনী নামক এক কুকুরির সম্মানে একটি ছোট মফঃস্বল শহরের দু'শ অধিবাসী ডিনারের ব্যবস্থা করে তার গলায় সোনার পাতমোড়া কলার পরিয়ে দেয় ও যে পরিবারে ছিল তাদের সকলের প্রাণ বাঁচানোর জন্য।

আগুনের গন্ধ পেয়ে ক্যাইনী থাবা দিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে আগুন-লাগা বাড়ীটির ভিতরে প্রবেশ করে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে কর্তা, কর্ত্রী এবং তাদের সন্তানদুটিকে জাগিয়ে তোলে।

ওয়েলসে প্রকাণ্ড এক অ্যালসেশিয়ান নিজের প্রাণ দিয়ে তার কর্ত্রীর জীবনরক্ষা করে। মহিলা কুকুরটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। একটা গলি পার হবার সময় পূর্ণ গতিতে একখানি বাস এসে পড়ে। কুকুরটি তার কর্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চাকার তলায় পড়ে প্রাণ হারায়।

পোষা বিড়ালরাও অনেক সময়ে অত্যোদ্ভুত সাহসের পরিচয় দেয়। এসম্পর্কে এদেশেরই একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এক ব্যক্তি একদিন মাঝরাতে ফোঁসফোঁসানি শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে দেখে তার ঠিক মাথার ওপর ফণা তুলে রয়েছে একটা কেউটে সাপ, আর অপর দিকে সাপটির প্রতি চোখের সবুজ তারা বিস্ফারিত করে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার পোষা বিড়ালটি। যেন বিড়ালের দৃষ্টিতে সাপটি এমন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে যে, লোকটিকে আর ছোবল মারতে পারছে না। বিছানা থেকে গুঁড়ি মেরে সরে গিয়ে লোকটি তার পিস্তল নিয়ে আসে। সাপটি সত্যিই সম্মোহিত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার উদ্দেশে সে-ব্যক্তি বিড়ালের চোখের সামনে একটা হাত রাখে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি ফোঁস করে ওর দিকে এগিয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। আর তখনই সাপটি মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়।

ফেইথ নামক একটি বিড়াল "পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসিনী" বিড়াল আখ্যা লাভ করে। এই উপাধিটি সে পায় ১৯৪০ সালে। সে সময় সে লণ্ডনের এক গির্জা সংলগ্ন যাজকের বাড়িতে তার বাচ্চাদের নিয়ে থাকতো। একদিন বোমায় সেই বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে ফেইথ তার বাচ্চাদের আড়াল করে ধ্বংসস্তূপের নীচে থেকে যায়। বিড়ালদের মধ্যে সে-ই প্রথম সাহসিকতার জন্য পশু মঙ্গল সমিতির কাছ থেকে একটি রৌপ্য পদক ও সার্টিফিকেট লাভ করে।

ভারতের ময়না বৃটেনের পক্ষীপ্রিয় অধিবাসীদের কাছে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মানুষের স্বর নকল করার এদের ক্ষমতা ওদেশের লোককে বিস্মিত করে। লেমুর, কুমীর, সাপ, বানর এবং সিংহ শাবক বর্তমানে পোষা জীবজন্তুর তালিকাভুক্ত হয়েছে। যুদ্ধের আমল থেকে কোন কোন অঞ্চলে শৃগাল শাবক গৃহপালিত পশুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এদের সবায়ের উপরে টেক্কা মেরেছে লণ্ডনের একদল নর্তকী তাদের ফ্ল্যাটে বাচ্চা অজগর রেখে দিয়ে।

অন্ধদের জন্য কথ্য-পুস্তক

১৯৫৪ সালে মারবুর্গে অন্ধগণের জন্য জার্মানীর শ্রাব্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এতে এখন ৪০০টি পুস্তক আছে। এই বইগুলি টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা হয়েছে এবং এগুলি রেকর্ড করতে চার হাজার ঘণ্টা সময় লাগে। এই গ্রন্থাগারটি এখন প্রায় ১১,৫০০ টেপ রেকর্ডারসহ ২৫০০ রেকর্ড অন্ধদের শোনবার জন্য ধার দেয়। এই গ্রন্থাগারের ম্যানেজার এবং মারবুর্গে অবস্থিত জার্মানীর অন্ধদের একমাত্র কলেজের পরিচালক অধ্যাপক কার্ল স্ট্রেল বলেন যে, গত ২০০ বছরে লিখিত নানা বিখ্যাত পুস্তকের শ্রাব্য পুস্তক এই গ্রন্থাগারে রয়েছে। ধর্ম-সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, জীবনী ইত্যাদি এই গ্রন্থাগারে আছে। এ ছাড়াও রয়েছে বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক। বর্তমানে এই গ্রন্থাগার থেকে মাসিক ১০ হাজার পুস্তক শুনতে দেওয়া হচ্ছে।

ইলেকট্রনিক "ডিম"

পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়া রাজ্যের মনোরম রাজধানী মিউনিখের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অল্পদূরে আমের হ্রদ কিংবা আমেরসী নামে প্রাকৃতিক শোভাময় একটি গ্রীষ্মাবাস আছে। এই আমের হ্রদের সন্নিকটে সুন্দর অথচ অদ্ভুত ধরনের যেসব ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে, তা এখানকার শান্ত পরিবেশের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে ১৮০ ফুট ব্যাস ও ১১০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চারটি বিরাট সবুজ প্লাস্টিকের গোলাকৃতি জিনিস বসানো হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় এই "সবুজ ডিমগুলি" পশ্চিম জার্মানীর পঞ্চম রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনের গ্রাউণ্ড স্টেশন, যার সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি থেকে প্রতিক্ষিপ্ত বেতার সংকেত এখানে গৃহীত হওয়ার পর উচ্চ স্বরগ্রামে প্রচারিত হবে। এইভাবে জাপান অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিসন অনুষ্ঠান সরাসরি য়ুরোপের টেলিভিসন স্টেশনগুলিতে রিলে করা যাবে। ফলে য়ুরোপের লোকেরা ঐ দুই দেশের অনুষ্ঠান একযোগে দেখতে পাবে।

এখানকার রেডিও টেলিস্কোপগুলির ৭০ ফুট উচ্চ এরিয়ালগুলি সিংয়ের মত সেকেলে শ্রবন যন্ত্রের আকারে গঠিত। এগুলির মুখের দিকে অর্ধবৃত্ত টেলিস্কোপের মত দেখতে হবে। ৩০ ফিট ব্যাস মঞ্চের উপর স্থাপিত এই যন্ত্রগুলি চারিদিকে ঘুরবে। এটি দরকার এই জন্য যে এরিয়ালগুলিকে রিলের জন্য নির্দিষ্ট উপগ্রহসমূহের কক্ষপথ অনুসরণ করতে হবে যাতে উপগ্রহ থেকে প্রেরিত রেডিও সংকেত বিনা বাধায় ও অবিকৃতভাবে ধরা যায়। এরিয়ালগুলির কোণাকৃতি অপর-প্রান্তে স্থাপিত কেবিনটি সমগ্র ব্যবস্থার গতিপথ অনুসরণ করবে এবং তার মধ্যেই থাকবে গ্রাহক ও প্রেরক ব্যবস্থার যাবতীয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতি।

১৯৬৩ সালের প্রারম্ভে মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০টি উপগ্রহ রীলে করার উদ্দেশ্যে কক্ষপথে স্থাপন করবেন। পৃথিবী এবং উপগ্রহগুলির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকবে পাঁচ থেকে দশ হাজার কিলোমিটার। আমের হ্রদের "সবুজ ডিম্বগুলি" এমনভাবে অবস্থিত যে প্রতিটি উপগ্রহ থেকে কেবল ২০ মিনিট মাত্র বেতার সংকেত এগুলিতে ধরা যাবে অর্থাৎ উপগ্রহ থেকে রিলে শেষ হলে অপর উপগ্রহ থেকে রিলে শুরু হবে। এই ব্যবস্থায় সংকেত প্রেরণ কোন সময়ে ব্যাহত হবে না।

এই "সবুজ ডিম্বগুলি" নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে টেলিকম্যুনিকেশনের যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। উপগ্রহগুলি কক্ষপথে স্থাপিত হলে য়ুরোপের সর্বত্র ১৯৬৪ সালে টোকিওর অলিম্পিক ক্রীড়া দেখা যাবে। এ ছাড়াও উপগ্রহগুলি স্থাপিত হলে মহাদেশগুলির মধ্যে বেতারে টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও ছবি পাঠাবার সুবিধা হবে ও একযোগে দূর পাড়ি থেকে ৬০০ "কল" গ্রহণ করা যাবে।

রমাপদ চৌধুরী

(২৩)

থানার দারোগার হাতে ক'টা টাকা গুণে গুণে দিয়ে রেহাই পাওয়া গেল। বংশীই দিলে টাকা ক'টা।

খবর পেয়ে গিরিজাপ্রসাদও এসেছিলেন। লক্ষ্মীমণির মৃতদেহ সদরের মড়াঘরে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া করবে, ছুরি দিয়ে কেটে ফালাফালা করে দেবে, ভাবতেও শিউরে ওঠে সকলে।

দারোগা কোন্ ফাঁকে টাকা নিয়েছে, নিয়েছে কিনা, তা জানতেন না গিরিজাপ্রসাদ। দারোগার সঙ্গে বংশীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তাই প্রশ্ন করলেন, ডেড বডি কি নিয়ে যাবেন নাকি?

দারোগা চুপ করে রইলো। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করলো গিরিজাপ্রসাদ কোন তরফের লোক।

গিরিজাপ্রসাদ এবার স্পষ্ট করেই বললেন, ঘরের বউ আত্মহত্যা করেছে, এমনিতেই কষ্ট, আর কাটাকুটি করলে......

দারোগা এবার হেসে উঠলো।—না, না, মাস্টার মশাই, ও নিয়ে টানাটানি করবো না। গোড়াতেই বলে দিলাম। আপনাদের ডাক্তারবাবু যখন আপত্তি করছেন না......

একটু থেমে দারোগা আবার বললে, পুলিসে চাকরি করি বটে, কিন্তু আমাদেরও মানুষের প্রাণ, বুঝলেন মাস্টার মশাই!

বলে গোপেন মোড়লের বাড়িতে চা-জলখাবার খেয়ে সিপাইদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল দারোগা। বনপলাশির লোক নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

লক্ষ্মীমণি আত্মঘাতী হয়েছে শুনে গাঁ-সুদ্ধ লোক ভিড় করে এসেছিল। কিন্তু পুলিস দেখেই যে-যার সরে পড়েছিল ভয়ে ভয়ে। কি থেকে কি হয় কেউ কি বলতে পারে। হয়তো বাড়ির বাইরে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলেই চালান করে দেবে থানায়। পুলিসের আতঙ্ক সারা গাঁয়ের মনেই। শুধু ডাক্তার, গিরিজাপ্রসাদ, আর দু'একজন ভদ্রলোক সাহস করে এগিয়ে এলো। গোপেন মোড়ল এলো তার বাংলা বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দারোগাবাবু আর সিপাইদের আপ্যায়ন করতে।

দারোগা পুলিস আসতে দেখে কোটাল-পাড়া বাউড়ি পাড়ার তেঁতুলে বাগদীদের মেয়েবউরা ভেবেছিল জল ঘোলা না করে ছাড়বে না। বাড়ির বউ আত্মঘাতী হলে কে দোষী তা কি আর বলে দিতে হয়? হয় শাশুড়ী ননদ, নয়তো স্বামী। শাশুড়ী ননদ যখন নেই লক্ষ্মীমণির তখন উদাসকেই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে ভেবেছিল সবাই।

কিন্তু কিছুই হলো না। দারোগা চলে গেল, আর নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো গাঁয়ের লোক। কিংবা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলো, উদাস-বংশীকে নিয়ে পুলিসে টানাটানি করলো না বলে।

জনকয়েক লোক মিলে বাঁশ কেটে আনলে, মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে।

তারপর এক সময় তারা চলে গেল, লক্ষ্মীমণির শবদেহ নিয়ে। পিছনে পিছনে বংশী।

উদাস তখনো বাড়ির দাওয়ায় বসে আছে স্থাণুর মত, বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। একে একে সকলেই চলে গেল। সকলের মনেই একটা শোকের ছাপ। কোটালপাড়ার যেদিন প্রথম বউ হয়ে এসেছিল লক্ষ্মীমণি, সেদিন কেউই তাকে পছন্দ করে নি। উদাসের মত ছেলের কিনা এমন বউ! তার পর দিনে দিনে লক্ষ্মীমণির রুক্ষ স্বভাব আর রুক্ষ কথাবার্তার জন্যে গ্রামের লোকও বহুবার মুখ ফুটে বলেছে, বউটা মলে পাড়া ঠাণ্ডা হয়; উদাস বাঁচে!

কোটালপাড়ার হাজারো অশান্তির মূলে ছিল লক্ষ্মীমণি, যে শুধু নিজের শান্তিই হরণ করে নি, পাড়াপড়শির জীবনেও বারবার অশান্তি ডেকে এনেছে।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি মারা যাওয়ার পর, লক্ষ্মীমণি আত্মঘাতী হওয়ায় তারাও দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এতকাল সবাই দোষ দিত লক্ষ্মীমণিকে। কিন্তু কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে যেন সকলের মনেই সমবেদনা কেঁপে উঠলো লক্ষ্মীমণির জন্যে। আর সকলের চোখেই যেন একটা সন্দেহ, একটা অভিযোগ—উদাসের বিরুদ্ধে।

এতদিন যারা উদাসের প্রতি সহানুভূতি দেখাতো, বলতো, এমন বউয়ের সঙ্গে ঘর করার মত অভিশাপ আর নেই, তারাই উদাসকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলে।

মুহূর্তের মধ্যে গাঁয়ের চেহারা বদলে গেল। নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল লক্ষ্মীমণির আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে।

উদাসকে, বংশীকে সবাই প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁ গো কি হয়েছিল তোমাদের, বিষ খেলে ক্যানে বউটা?

উদাস আর বংশী, কেউই কোন উত্তর দিতে পারে নি। উদাস নিজেও কারণ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছে। সত্যি তো, কেন বিষ খেল লক্ষ্মীমণি, কেন এভাবে মৃত্যুবরণ করলে। আর মৃত্যুর আগে দুটো কথাই বা বলে গেল না কেন, রহস্যের হদিস দিয়ে গেল না কেন উদাসকে।

চুপচাপ একা একা বসে থাকে উদাস, আর ক্ষণে ক্ষণে একটা কথাই মনে পড়ে। কেন বিষ খেলো লক্ষ্মীমণি, কেন, কেন। কই, এই একটা মাসের মধ্যে তো কোনদিনই তার সঙ্গে এমন কিছুই হয় নি যার জন্যে মনে আঘাত লাগতে পারে লক্ষ্মীমণির। কোন কথাই তো বলে নি উদাস। আর পদ্ম? না, এর আগে অনেক বড় আঘাত পেয়েছিল লক্ষ্মীমণি, অনেক বেশী অপমান কুড়িয়েছে সে। কই, তখন তো আত্মহত্যার কথা তার মনে জাগে নি। তবে? ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারাই পায় না উদাস। অথচ, মনে মনে নিজেকে অপরাধী ঠেকে। বেশ বুঝতে পারে, গাঁয়ের লোক তাকেই দোষী ভাবছে। ভাবছে, লক্ষ্মীমণি যখন আত্মহত্যা করেছে, তখন নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ আছে এর পিছনে।

লোকের সন্দেহের দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্যেই গাঁ ছেড়ে খড়ি নদীর ধারে ধারে বোষ্টমদের পড়ো কুঞ্জের দিকে চলে যায় উদাস। গোঁসাইদিদির কুঞ্জ। বাবুরি বনতুলসীর ঝোপ, পুকুর পাড়ে ছড়ানো ডেলু ফুল। ফুলে ফুলে ছাওয়া সজনে গাছ; আর ভেঙে পড়া কুঞ্জ। কেউ কোথাও নেই, সেই কবে গোঁসাইদিদি নবদ্বীপ চলে গেছে, তার পর থেকে আগাছায় জঙ্গলে ভরে গেছে চতুর্দিক। নির্জন, নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে দু' একটা কাল কেউটে নয়তো সিঁদুরটুপি সাপ এঁকে বেঁকে চলে যায়। সেইখানে এসে চুপ করে বসে থাকে উদাস, আর ভাবে। কি যে ভাবে ও নিজেও বুঝতে পারে না।

তারপর এক সময় বিকেলের রোদ পড়ে যায়, সন্ধ্যে হয়ে আসে। আর ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে উদাসের। কেবলই ভয় হয়, লক্ষ্মীমণি হয়তো এসে দাঁড়াবে সামনে। যে-কথাটা বলে যায় নি হয়তো সেই কথাটাই বলতে আসবে।

এক একদিন ভীষণ ভয় পেয়ে যায় উদাস, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। বংশী না থাকলে, বাড়ি ঢুকতেও ভয় পায়।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে চলেছিল। আর এমনি ভাবেই গাঁয়ের সকলকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছিল উদাস। এমন কি পদ্মকেও। পদ্মর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও যেন লজ্জা হতো, অস্বস্তি হতো। তবু আসতো পদ্ম, কোন কোন দিন পাঁচু কোটাল। উদাসকে, বংশীকে দু'বেলা ডেকে নিয়ে যেতো, ভাত রেঁধে খেতে ডাকতো পদ্ম।

সেদিনও তাই ডাকতে এলো পদ্ম। বললে, চলো গো বোনাই, তোমার নেগে বুড়ো বাপটাও আমার জলপত্য করে নাই।

কথাটা শুনে চোখ মেলে তাকালো উদাস পদ্মর মুখের দিকে। তাকিয়েই রইলো। যেন কথাটা তার কানে যায় নি।

পদ্ম হাসলো। বললে, ফ্যালফেলিয়ে কি দেখছো গো, দেখ নাই নাকি অমন?

উদাস তবু হাসলো না। পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খপ করে তার হাতখানা ধরলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিলে পদ্ম।—না, না। চিৎকার করে বলে উঠলো।

বিস্মিত বিব্রত বোধ করলে উদাস। অনুনয়ের কণ্ঠে বললে, তুই আমার ঘরে আয় পদ্ম। চোখে জল এসে গেল উদাসের। —লক্ষ্মীকে বড় ভয় নাগে রে আমার, একা মানুষ আমি থাকতে নারবো, থাকতে নারবো।

পদ্ম কোন কথা বললে না, শুধু করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো উদাসের মুখের দিকে, তারপর বললে, বুড়া বাপটা বসে আছে, খাবে এসো বোনাই।

বলে তরতর করে বাড়ির পথ ধরলে। আর উদাসের সারা বুক কেঁপে উঠলো দুঃসহ ব্যথায়, আশঙ্কায়।

পাঁচু কোটাল আর উদাসকে পাশাপাশি জায়গা করে দিলো পদ্ম, এনামেলের দু'খানা থালায় ভাত এনে নামিয়ে দিলে।

কিন্তু ক্ষিদে মরে গেছে তখন উদাসের। ওর মনের মধ্যে তখন একটা আলোড়ন উঠেছে। পদ্মর চোখে এমন ভর্ৎসনার দৃষ্টিও বুঝি কখনো দেখেনি। এমন উপেক্ষার ব্যবহার কখনো পায় নি। কিন্তু কেন? এতদিন অশান্তি আর অসহ্য কোন দুঃখের মধ্যে উদাস ভেবেছে লক্ষ্মীমণি তার জীবন থেকে সরে গেলেই সে সুখী হবে, শান্তি পাবে। ভেবেছে, পদ্ম আর তার মাঝখানে ওই একটাই পাঁচিল। তাই কখনোসখনো মনের গোপনে লক্ষ্মীমণির মৃত্যু কামনাও করেছে সে। কিন্তু আজ হঠাৎ পদ্মর উপেক্ষায় নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হলো উদাসের।

তবু ধীরে ধীরে পাঁচু কোটালকে বললে, এ গাঁয়ে আর মন বসছে না গো আমার।

পাঁচু কোটাল ভাতের গ্রাস মুখে তুলে একটু অপেক্ষা করলে। তারপর বললে, কি করবে তবে, যাবে কোথায় বলো।

—কাটোয়ায় নয়তো বর্দ্দমানে। লাইসেন পেয়েছি, ডাইভারী করবো, ঘর করবো সেখানে গিয়ে।

পাঁচু কোটাল চুপ করে রইলো, একবার শুধু মুখ তুলে তাকালো পদ্মর দিকে। মুখ ঘুরিয়ে নিলো পদ্ম।

বংশীও একদিন এসে বললে, ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দাও গো পদ্মর সাথে, শেষে বিবাগী হয়ে যাবে।

পাঁচু কোটালেরও তাই ইচ্ছে। বংশী চলে বললে, সে তো আমারও সাধ তোমারও সাধ, তা পণ্ডিতকে ডেকে বলো ক্যালেন্ দিন দেখে দিতে একটা।

কিন্তু মেয়ে যে তার অমত করে বসবে ভাবতে পারে নি পাঁচু কোটাল। বংশীও ভাবতে পারে নি।

পদ্মর বাপের কাছ থেকে কথাটা শুনলো উদাস, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। লক্ষ্মীমণির মৃত্যুর পর থেকেই লক্ষ্য করেছে উদাস, পদ্ম কেমন যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ঠিক সেই আগের মত হেসে রসিকতা করে কথা বলে না, কাছে এসে সোহাগ করে দাঁড়ায় না গা ছুঁয়ে। লক্ষ্মীমণি বেঁচে থাকতে তাকে মনে হয়েছে দুজনের মাঝখানে একটা বিভেদের পাঁচিল, লক্ষ্মীমণির মৃত্যু যেন দুজনের মাঝখানে এনে দিয়েছে একটা গভীর খাদ।

উদ্ভ্রান্ত চোখে পদ্মকে দূরে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে উদাস, আর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে।

সেদিনও যথারীতি খেতে ডাকলো পদ্ম। —চলো বোনাই, ভাত দুটো মুখে দিয়ে আসবে। বলেই চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। আর সংগে সংগে তার হাতখানা শক্ত মুঠিতে ধরে ফেললো উদাস। বললে, কি হয়েছে তোর বল পদ্ম!

হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে পদ্ম হেসে উঠলো।—কই, কি আবার হবে গো আমার।

—বিয়ে করবি না তুই আমায়, কাটোয়ায় ঘর করবো তোকে নিয়ে গিয়ে, আমার যে কত সাধ ছিল রে পদ্ম। বলতে বলতে চোখ ভিজে এলো উদাসের।

পদ্ম হাসলো। বিষণ্ণ চোখে উদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, না গো বোনাই, তা হয় না।

—ক্যানে? বিস্মিত হলো উদাস।

পদ্মও ছলছল চোখে বললে, লক্ষ্মী বুনটারে অনেক কষ্ট দিলাম গো বোনাই, মিত্যু হলো তার, তার আত্মাটারে একটু শান্তি দাও গো, একটু শান্তি দাও।

পদ্মকে অনেক বুঝিয়েও রাজি করাতে পারলো না উদাস। পদ্মর মুখে সেই এক কথা মিত্যু হয়েছে লক্ষ্মী বুনটার, এবার ওকে একটু শান্তি দাও গো, শান্তি দাও।

লক্ষ্মীমণির মৃত্যুতেও এতখানি আঘাত পায় নি উদাস, এমন কি যেদিন গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল পদ্ম, সেদিনও না। ব্যথায় অপমানে আর একটাও কথা বললে না পদ্মকে।

পরের দিনই সাইকেলটা বের করে চাকা দুটো পরিষ্কার করলে, হাওয়া ভরলে রবারের নলে, তারপর কাটোয়ার পথে বেরিয়ে পড়লো।

পদ্ম ভেবেছিল, সন্ধ্যে হলেই আগের মতই ফিরে আসবে উদাস। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, উদাস ফিরলো না আর।

মনে মনে পদ্মও হয়তো ভেবেছিল, সেও চলে যাবে। সেই নিগণ ইস্টিশনের ধান কলে গিয়ে কাজ নেবে। তাই ভাবলে, যাবার আগে ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে।

সকাল থেকে ক্ষার দিয়ে কাপড়খানা কাচলে পদ্ম। রোদে শুকিয়ে নিয়ে পরলে সেখানা। চুল বাঁধলে যত্ন করে, ভিজে গামছায় মুখ ঘষে ছোট্ট আরসিখানায় নিজের মুখ দেখলে।

তারপর কাপড়ের ছোট্ট পুঁটলিটা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশে।

ডাক্তার অনেক করেছে তার জন্যে, যাবার আগে একবার দেখা দিয়ে যাবে পদ্ম। আহা, অসহায় মানুষটা! গাঁয়ের এক প্রান্তে পড়ে থাকে, কেউ খোঁজ নেয় না। বড় দুঃখ পদ্মর তার জন্যে।

দূর থেকেই তাকে দেখতে পেলো ডাক্তার। ঘরের সামনে বাঁশের বাতা দিয়ে ঘিরে ছোট্ট এক টুকরো বাগান করেছে অবিনাশ ডাক্তার। খুরপি দিয়ে মাটি ঝুরিয়ে ফুলের চারা বসাচ্ছিল, হঠাৎ একটা রোদে-ঝলসানো সাদা ফুটফুটে কাপড় চোখে পড়লো।

খুরপিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অবিনাশ ডাক্তার। তাকিয়ে রইলো।

হ্যাঁ, পদ্মই বটে। পদ্ম আসছে তরতর করে এঁকে বেঁকে, দ্রুত পায়ে।

সারা গায়ে তখন ঘাম ঝরছে অবিনাশ ডাক্তারের। ধীরে ধীরে খাঁকি বুশ সার্টটা খুলে কাঁধে নিলো, দুটো হাত ঘষে ঘষে ধুলো মুছলো হাত থেকে।

পদ্ম ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে। আর পদ্মর চলন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুগ্ধ হয়ে গেল অবিনাশ ডাক্তার।

স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা নিটোল সুন্দর একটা যৌবনের শিখা যেন। কালো মসৃণ চেহারাটার প্রা ং অঙ্গ থেকে যেন একটা সুষম ছন্দ ফুটে উঠছে।

এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে বহুবার পদ্মর দিকে তাকিয়ে দেখেছে অবিনাশ ডাক্তার। আর সেই মুগ্ধতা নিজের মনেই চেপে রেখেছে চিরদিন। একটা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস শুধু কখনো কখনো তার বুক নিঙড়ে বেরিয়ে এসেছে।

আর ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে গেছে আরেকটি সুন্দর মুখ। সুন্দরী, শিক্ষিতা একটি নারীর মুখ। যার জীবনের সংগে অবিনাশ ডাক্তারের জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল একদিন, শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে যাকে ঘরে এনেছিল অবিনাশ ডাক্তার।

—তারপর? পদ্ম জিগ্যেস করেছিল একদিন। ডাক্তারের ব্যথাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করেছিল পদ্ম।

আর অবিনাশ ডাক্তার জীবনের যে দুঃখ কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করে নি, সেই গোপন আঘাতের কথা খুলে বলেছিল অশিক্ষিত গ্রাম্য কোটালদের একটি মেয়ের কাছে।

বলেছিল, তারপর যুদ্ধে গেলাম রে পদ্ম। যুদ্ধে গিয়ে একটা পা রেখে এলাম।

ভাবলাম, একটা পা গেছে যাক। আরেকটা পায়ে ভর দিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবো।

যে-কথা অবিনাশ ডাক্তারের মনের মধ্যে গুমরে মরেছে, ভিতরে ভিতরে তার বুক কুড়ে কুড়ে খেয়েছে যে বেদনা, শোনাবার লোক পেয়ে সেদিন তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছিল সে।

বলেছিল, তারপর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম পদ্ম, এসে দেখলাম অন্য পা-টাও আমার খোয়া গেছে। বলে অনেকক্ষণ নিঃঝুম হয়ে বসে থেকে কান্না-ভাঙা গলায় অবিনাশ ডাক্তার বলেছিল, তাই শহর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এলাম রে পদ্ম, পালিয়ে এলাম।

শুনতে শুনতে চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে পদ্মর, আঁচলে চোখ মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

আর অবিনাশ ডাক্তার বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, আমার এই কাটা পায়ের জন্যে কোন লজ্জা, কোন দুঃখ নাই রে পদ্ম। কিন্তু যেদিন জানলাম, যুদ্ধের বোমা-বারুদের মধ্যেও যার স্বপ্ন দেখেছি, যার কাছে ফিরে এসে এই খোঁড়া পায়ের দুঃখ ভুলতে চেয়েছি, সেই চলে গেছে, সেদিন......সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না পদ্ম। মনে হলো বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি সবাই আমায় দেখে হাসছে, মনে হলো...

সব কথা সেদিন স্পষ্ট করে বলতে পারেনি অবিনাশ ডাক্তার। আর তার পর থেকেই অবিনাশ ডাক্তারকে যেন বড় আপন মনে হতো পদ্মর। এই নিঃস্ব অসহায় মানুষটার জন্যে দুঃখ হতো তার।

পদ্মর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সেই পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেছে। কখন যে অবিনাশ ডাক্তারের মন চলে গেছে সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির পৃথিবীতে, টের পায়নি ডাক্তার।

তন্ময়তা ভাঙলো পদ্মর হাসিতে।

পদ্ম কখন যে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর তার দিকে উদাস ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে কি যে ভাবছিল অবিনাশ ডাক্তার, হঠাৎ চমকে উঠলো পদ্মর সশব্দ হাসিতে।

রসিকতা করে পদ্ম বললে, কি গো ডাক্তার, পদ্মকে তোমার চিনতে নারছো নাকি!

কথা শুনে চমকে উঠলো অবিনাশ ডাক্তার। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আয়, ঘরে আয়।

বলে বাড়ির বারান্দায় গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো পদ্মর দিকে।

তারপর হঠাৎ বলে ফেললে, তুই অনেক সুন্দর হয়েছিস পদ্ম!

খিলখিল করে হেসে উঠলো পদ্ম। কোন কথা বললে না। তারপর প্রশ্ন করলে, কই, পাব্বতী কই গো, টুকুন চা খাবো বলে এলাম।

অবিনাশ ডাক্তার হাসলো।—পার্বতী নেই রে, তার বাপ নিয়ে গেছে তাকে, বিয়ে ঠিক হয়েছে তার, তাই আর কাজ করবে না।

—পার্বতী নেই?

—না।

—তুমি একা মানুষ...

বলতে গিয়েও পারলো না পদ্ম, চুপ করে গেল। পুঁটলিটা বুকে চেপে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

অবিনাশ ডাক্তার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, ভেবেছিলাম তুই আর আসবি না পদ্ম।

এবারও সে মুখ নীচু করে রইলো।

ডাক্তার একটুখানি চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে, কেন গিয়েছিলি তুই, পদ্ম, গাঁ ছেড়ে?

পদ্ম হেসে উঠলো। বললে, তোমার নেগেই গিয়েছিলাম গো, তোমার নেগেই।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো অবিনাশ ডাক্তার।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ গো, তোমার দুর্নাম, কত কি বলতো লোকেরা, অসুখ বিসুখে তোমায় ডাকতো না, বলগাঁর ডাক্তারকে ডেকে আনতো......

—আমার দুর্নাম? হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলো অবিনাশ ডাক্তার।

পদ্ম আবার বললে, হ্যাঁ গো তোমার নেগেই। কোটাল পাড়ার বাগ্দী পাড়ার লোক অকথা-কুকথা বললে, তাই রেগে চলে গেলাম ইস্টিশনে...

—তারপর?

—ভাবলাম, ধান সিজোনোর কাজ করেছি সেই একটুকুন বেলা থেকে, তা ধান কলে কাজ নোব। তাই টেনে চড়ে বসলাম, গিয়ে কাজ নিলাম ধান কলে। আমি সব সইতে পারি গো ডাক্তার, তোমার দুর্নাম আমার বুকে বজ্জর মত বাজে।

—আমার দুর্নাম? আবার হো হো করে হেসে উঠলো অবিনাশ ডাক্তার। তারপর উঠে দাঁড়ালো ক্রাচে ভর দিয়ে; বললে, আয় কাছে আয়।

বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকালে পদ্ম। বিভ্রান্তের মত। তারপর এক পা এক পা করে কাছে এগিয়ে এলো।

ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে ডাক্তারও দু'পা এগিয়ে গেল।

তারপর হাত বাড়িয়ে পদ্মর খাটো কাপড়ের আঁচলটা পদ্মর মাথায় ঘোমটার মত করে টেনে দিলে। তারপর হা হা করে সশব্দে হেসে উঠে বললে, বিয়ে করবো তোকে আমি, বিয়ে করবো। ল' ফুল ম্যারেজ। দুর্নাম? দেখি কে কত দুর্নাম দিতে পারে।

বলে আবার সশব্দে হেসে উঠলো ডাক্তার আর পদ্মর বিভ্রান্ত বিস্মিত দৃষ্টিটা হঠাৎ বড় লজ্জিত হয়ে পড়লো। আর টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো সিমেন্টের মেঝের ওপর।

অবিনাশ ডাক্তার তখনও হাসছে হা হা করে, সশব্দে। হাসছে পাগলের মত।

(ক্রমশ)

রহস্য-উপন্যাস

ইতিপূর্বে একটি বাংলা আ্যাড্ভেঞ্চার উপন্যাসের সঙ্গে আর একটি বইয়ের প্রায় আক্ষরিক সাদৃশ্য নিয়ে লিখেছি। তারপর পক্ষকাল কাটল। বহু পাঠক ইতিমধ্যে আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন। সাহিত্য সংবাদের পাতায় তাঁদের চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়; প্রয়োজনও দেখি না। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা চলে।

পাঠকদের অভিযোগ, বাংলা রহস্য-উপন্যাসের শতকরা নিরানব্বইটি বিদেশী 'মিস্ট্রি নভেল' থেকে আত্মসাৎ করা। অ্যাডভেঞ্চার এবং বিজ্ঞান-কাহিনীর বেলায়ও তাই। শুধু বাংলা ভাষায় নাম ধাম বদল করে লেখা হয় এই যা পার্থক্য।

দ্বিতীয় অভিযোগ, বেশীর ভাগ বাংলা গোয়েন্দা ও অ্যাড্ভেঞ্চার কাহিনীই অপাঠ্য। বিদেশী কাহিনীর কাঠামো চুরি করা সত্ত্বেও খারাপ ভাষায়, গোঁজামিল দিয়ে এবং এমন অযত্নের সঙ্গে এ-সব বই লেখা হয় যে, সামান্য রুচিবান পাঠকের পক্ষেও তা পড়া কষ্টকর।

পত্রলেখকদের অভিযোগ কতটা সত্য পাঠকই তার বিচার করবেন, আমার এ-বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞতা নেই। আমি অন্য কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

বাংলা ভাষায় রহস্য-উপন্যাস লেখার রেওয়াজ কম। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের এখানে এই বিশেষ সাহিত্য শাখাটির দীনতা নিশ্চয় পাঠককে পীড়িত ও হতাশ করে। কিন্তু কেন? কেন আমরা অনেকেই মোটামুটি একটা ভাল রহস্য-উপন্যাসও লিখতে পারি না, চেষ্টাও করি না? কারণ খুঁজতে গিয়ে কেউ যদি বলেন, এরা অক্ষম, তবে সব কথা বলা হল না। আমার ধারণা, অন্যান্য কারণও রয়েছে।

প্রথমত, রহস্য, অ্যাড্ভেঞ্চার অথবা বিজ্ঞান-কাহিনী রচনার জন্যে সামাজিক ও মানসিক যে পরিবেশ প্রয়োজন, আমাদের বাংলা দেশে তার সুযোগ নেই। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্সের আবহাওয়া আমাদের নয়; আমাদের এখানে সমাজ-বিরোধী যেসব দুষ্কর্ম, তার মধ্যে হঠকারিতা এবং মানসিক আবেগ যত প্রবল, মগজের কারবার তত কম। কলকাতা শহরে নিশ্চয় খুন রাহাজানি হয়, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই, খবরের কাগজের পাতায় যেটুকু পড়ি তাতেই তৃপ্ত। অ্যাড্ভেঞ্চার বাঙালীর স্বভাবের বাইরে। আমরা ঘরকুনো, আরামপ্রিয়, বাইরের ঝঞ্ঝাটে মাথা গলাতে চাই না। নন্দাদেবী কিংবা

বিদুর

রূপকুণ্ডের ডাক একেবারে হালের ব্যাপার। কিন্তু এ-রকম একটি দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে সমস্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের স্বভাব বিচার করা যায় না।...আর বিজ্ঞান-কাহিনীর কথা না তোলাই ভাল, আমাদের বিজ্ঞানে বড় জোর একটা কুকার তৈরি হয়। বিজ্ঞান-অনুশীলন এবং বিজ্ঞানের প্রতি সমাজের একটা বড় অংশের আকর্ষণ না থাকলে চিত্তের সে স্বাভাবিক ঝোঁক ওদিকটায় পড়ার কথা, আমাদের তা নেই।

পাঠক প্রশ্ন করবেন, তবে বাঙালী পাঠক রহস্য-উপন্যাস পড়ে কেন? তার জবাবে বলব, উত্তেজক গল্প পড়ার আকর্ষণে। বলব, যাঁরা পড়েন তাঁরা ত লেখেন না; কাজেই তাঁদের কাছে প্রশ্ন উপভোগের, আর যাঁরা লেখেন তাঁদের কাছে প্রশ্ন আয়োজনের। উপভোক্তা সহস্রজন হতে পারেন, বাধা নেই; কিন্তু উদ্যোক্তা ক'জন হতে পারেন, বিশেষ করে যেখানে আয়োজনের অভাব।

বস্তুত এই কারণেই, পাঠকের উপভোগের চাহিদা মেটাতেই যা কিছু বাংলা রহস্য-উপন্যাস লেখা। লেখকদের আন্তরিক ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকে না। কলকাতা শহরকে নিউইয়র্ক বা চিকাগো কল্পনা করা মুশকিল, কিন্তু দুষ্কর্মের কাহিনী লিখতে বসলে এ দেশীয় লেখক চিকাগোর দুষ্কর্ম, রীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে কার্যোদ্ধার করতে চান বটে, কিন্তু সেটা ধোপে টেকে না।

চেস্টারটন একবার একটি রহস্য-কাহিনী সংকলনের ভূমিকায় বলেছিলেন, এই জাতির লেখা আসলে হচ্ছে গলা-কাটার ব্যাপার; কে কত মসৃণভাবে গলা কাটতে পারল তার ওপরেই লেখা এবং লেখকের বিচার। অর্থাৎ সোজা কথা হল, তুমি পাঠককে কিভাবে কত নিখুঁত কায়দায় বোকা বানালে তার ওপরেই তোমার বাহাদুরি।

আমার ধারণা, রহস্যকাহিনীর আসল সূত্র এখানেই। পাঠককে সামনে বসিয়ে তার সঙ্গে খেলতে হবে, এবং হারাতে হবে। সাহিত্যের অন্য জাতির লেখায় পাঠক লেখকের বাঁশি শুনে হ্যামেলিনের ইঁদুরের মতন নাচতে নাচতে ছোটে, তার নিজের কিছু করার থাকে না; কিন্তু রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীর বেলায় পাঠকের একটি ভূমিকা আছে—লেখকের মুখোমুখি বসে সে ধাঁধার খেলায় মন লাগায়। যে গোয়েন্দা উপন্যাসের লেখক পাঠকের সঙ্গে এই মজার খেলা খেলতে পারেন না, তাঁকে ধিক!

পুরোপুরি রহস্য কাহিনী আর গোয়েন্দা-কাহিনী ঠিক এক জিনিস না হলেও এখানে সুবিধার্থে এক করে নেওয়া হয়েছে। এই রহস্যকাহিনীর কতক ধর্ম আছে এবং কিছু সর্ত আছে যা পালন না করলে এ-সাহিত্য জাতে ওঠে না। যেমন—

১। সমস্ত রহস্য-কাহিনীই আসলে নীতি-কাহিনী। পাপ থাকবে কিন্তু পুণ্যের জয় হওয়া চাই। আগ্রহ-উৎকণ্ঠা বাড়াবার জন্যে পাপের সবচেয়ে চূড়ান্ত অপকর্মকেই আমরা নিতে পারি—আর সে-অপকর্ম হত্যা।

২। খুব জবর রকমের একটা খুন

আমদানি করার চেয়ে হাতের সব তাস ফেলে দিয়ে যদি সরল ঘটনাকে এমনভাবে সাজানো যায় যাতে সমাধানের জটিলতা বাড়ে তবে সে-লেখা অনেক উঁচু দরের হয়।

৩। লেখক খুশি মতন গোঁজামিল দিয়ে যা মন চাইছে তা আমদানি করতে পারেন না, এরও একটা সম্ভাব্য সীমা আছে।

৪। যুক্তি এবং বিচারের আয়ত্তে কাহিনী ও চরিত্রদের থাকতে হবে।

৫। মূল বিষয় চেপে রেখে রহস্য-কাহিনী লেখা চলবে না।

৬। গল্পের মধ্যে যদি ওষুধপত্র, আইন কিংবা অন্য কোনো বিশেষ বিষয়ের গুরুত্ব থাকে তবে তা নির্ভুল হওয়া চাই।

৭। মানবচরিত্র বিচার, চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ঘটনা এবং মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একান্তভাবেই প্রয়োজন।

৮। শেষ কথা, ভালো করে লেখা এবং সাহিত্যবাচ্য লেখা না হলে এই জাতীয় কাহিনীর কোনো মূল্য নেই।

বাংলা রহস্য-উপন্যাসের আশ্রয় যদি বিদেশী হয় তাতে আমার অন্তত আপত্তি নেই, যদি দেখি সুতোটা নেওয়া হয়েছে মাত্র, মালাটা বাঙালী লেখক নিজেই গেঁথেছেন। এই সুযোগ দেওয়ার একমাত্র কারণ, বাংলা রহস্য-সাহিত্যকে যদি পাঠকের জন্যে টিকিয়ে রাখতে হয় তবে রোমাঞ্চ-বিবর্জিত বাংলা দেশের লেখকের বিদেশীর দুয়ারে হাত না পেতে উপায় নেই। আমরা বোধ হয় খুশী হব, যদি দেখি গলা-কাটার ব্যাপারটা সূক্ষ্ম ও ভদ্রভাবে করা হয়েছে। আসলে এটা ত গলা-কাটার খেলাই।

বাঙালী কবিদের প্রতি

সাহিত্য আকাডেমি থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে একটি পত্র দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন বাঙালী কবিদের কাছে নীচের অনুরোধটা জানানো হয়। আমরা তাঁর অনুরোধের মর্ম জানালাম।

এশিয়ার কবিদের জন্য 'Beloit poetry journal'-এর যে বিশেষ সংখ্যা নিউইয়র্ক থেকে এসিয়া সোসাইটির কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন তার জন্যে ভারতীয় কবিদের কবিতা প্রয়োজন। এই কবিতা ইংরিজীতে অনুবাদ করে দিতে হবে। মূল কবিতা ইংরিজীতে লেখা হয়ে থাকলেও ক্ষতি নেই।

কয়েকটি শর্ত :

ক। কবির বয়েস চল্লিশের কম হওয়া আবশ্যক। কবির এবং অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয় কবিতার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

খ। ইংরিজী ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশ হয়নি এমন কবিতাই গ্রাহ্য।

গ। হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় লেখা কবিতার ইংরিজী তর্জমার প্রয়োজন নেই, মূল ভাষায় লেখা কবিতা পাঠালেও চলবে।

ঘ। ১৫ই মে (১৯৬২) তারিখের মধ্যে কবিরা যেন তাঁদের কবিতা পাঠিয়ে দেন।

বাঙালী কবিরা তাঁদের লেখা সাহিত্য আকাডেমির অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীর কাছে পাঠাতে পারেন, অথবা সরাসরি পূর্বোক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে; নিউইয়র্কের ঠিকানায়। ঠিকানাটি এই :

Mrs. Bonnie R. Crown, Publications Director, the Asia Society—112 East 64th Street, New York 21, New York (U.S.A.)

সাহিত্যগ্রন্থমালা

আমাদের প্রকাশকরা গল্প উপন্যাস আর ছাত্র-পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। নয়ত এতদিনে বাঙালী জীবিত লেখকদের সম্পর্কে একটি করে চটি বইও কেন প্রকাশ করা হল না? বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সেবকদের সাহিত্য-কর্ম যে আলোচনার যোগ্য, আমরা কদাচিৎ তা মনে করেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় অন্যান্য-দের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা কখনও-সখনও চোখে পড়লে এর দ্বারা স্থায়ীভাবে কোনো প্রয়োজনীয় অভাব মেটে নি। সম্প্রতি তারাশংকরের সাহিত্য বিষয়ে সমালোচনা-মূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট
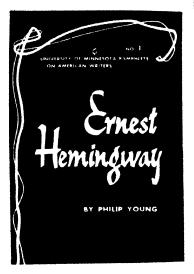
অবকাশ থাকা সত্ত্বেও একেবারে হালে এক তরুণ সমালোচকের মানিকবাবু সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সরোজকুমার রায় চৌধুরীর সাহিত্য-কর্ম অবলম্বন করে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে বলে শুনেছি। বিক্ষিপ্তভাবে এই তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে যদিও বাঙালী পাঠক প্রকাশক এবং গ্রন্থের লেখকদের সাধুবাদ দেবেন—তবু প্রয়োজন ও কর্তব্য বিচার করলে আমরা মাত্র এই তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা তৃপ্ত হতে পারি না। বৃটিশ কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল বুক লীগ একত্রে যেমন করে বৃটিশ লেখকদের ওপর প্যাম্ফলেট প্রকাশ করেছেন, আমেরিকা থেকে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় যেমনভাবে আমেরিকার লেখকদের বিষয়ে প্যাম্ফলেট প্রকাশ করেছেন, আমাদের বাংলা দেশে কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো বিচক্ষণ প্রকাশক যদি বাঙালী জীবিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের ওপর ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, বাংলা ভাষার পাঠক ও সমালোচক-দের যথেষ্ট উপকারে আসবে। বড় বই ছাপানো হয়ত আর্থিক সঙ্গতিতে না কুলোতে পারে, কিন্তু প্যাম্ফলেট জাতীয় চটি বই প্রকাশ এমন কিছু দুঃসাধ্য কর্ম নয়। বাঙালী অনেক প্রকাশকেরই তেমন সঙ্গতি আছে, অভাব শুধু আগ্রহের। আমরা কোনো প্রকাশককে এ-বিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখলে খুশী হব।

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্ররচনা-কোষ (প্রথম খণ্ড : প্রথম পর্ব) শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি। পরিবেশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স; কলিঃ—১। দাম : ৬·৫০ নঃ পঃ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। ৩০।৬।১, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬। দাম : ৪·৫০ নঃ পঃ।

বাংলা ভাষায় আলোচ্য বই দুটি নতুন ধরনের। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা অথবা তাঁর জীবনের পরিচয় এ বই দুটি থেকে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করবেন তাঁদের সহায়তা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এদের সংকলন করা হয়েছে। একটি থেকেও পাঠক অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা পাবেন না। কোন কবিতা, প্রবন্ধ গল্প, এবং রচনা-প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে তারই হদিস দেওয়া হয়েছে 'রবীন্দ্র-রচনা-কোষ'এ। এ বইয়ের সংকলকদের পরিকল্পনা বৃহৎ। দুই খণ্ডে এবং অনেকগুলি পর্বে কোষগ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডে থাকবে সমস্ত কবিতা ও গানের শিরোনাম ও প্রথম ছত্র, গল্প-উপন্যাস নাটকে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর নাম, ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদির নাম, রবীন্দ্র-জীবন সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং কবি কর্তৃক উধৃত বাক্যাংশ প্রভৃতির উল্লেখ। প্রথম পর্বে স্বরবর্ণ শেষ হয়েছে।

অনেকগুলি প্রসঙ্গ এক সঙ্গে অক্ষরানুসারে বিন্যাস করবার ফলে কিছু পরিমাণ জটিলতা এসে পড়েছে। ইনডেক্সের রীতি সম্বন্ধে সংকলকরা সম্পূর্ণ অবহিত নন মনে হল। বাক্যাংশ উধৃত করে, ইনডেক্স করা অন্যত্র দেখা যায় না। ইউরোপ শব্দটি প্রায় দশ পৃষ্ঠা অধিকার করেছে। ইউরোপ ও ইউরোপীয় শব্দ দুটি রবীন্দ্রনাথ কোথায় কোথায় ব্যবহার করেছেন তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আর আছে এই ধরনের বাক্যাংশ : ইউরোপ থেকে আপিসের সৃষ্টি : ইউরোপ থেকে বিশ্বভারতীতে গ্রন্থ উপহার ইত্যাদি। দুটি ভাগের সার্থকতা কি তা স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ' অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তাকে পরিবর্তিত করে 'ইউরোপ' করবার অধিকার সংকলকদের নেই। তাঁরা ইউরোপ থেকে রেফারেন্স দিয়ে বলতে পারতেন 'য়ুরোপ দেখুন', তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ' যতবার এবং যেখানে সেখানে ব্যবহার করেছেন তার সবগুলির নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের নীতি কি তা উপলব্ধি করা কঠিন। কারণ বিষয়-মূল্যহীন অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে; আবার যা থাকা উচিত ছিল মনে হয় তা পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—'আনা' প্রত্যয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে কবি কি বলেছেন তার নির্দেশ এখানে নেই;

রবীন্দ্রনাথ ভালো এসরাজ-বাজিয়ে ছিলেন; নিজেই বলেছেন। তারও উল্লেখ নেই। বিপুল পরিমাণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ ইনডেক্স করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়মূল্য-সমৃদ্ধ নির্বাচিত প্রসঙ্গ-গুলির সটীক আক্ষরিক বিন্যাসের পরিকল্পনা করলে বইটি অধিকতর উপযোগী হত। এক অক্ষরানুক্রমিক বিন্যাসের মধ্যে অনেক কিছু ধরাতে গিয়ে স্বাভাবিকরূপেই কিছু বিশৃঙ্খলা এসে গেছে। আক্ষরিক বিন্যাসও সর্বত্র সুষ্ঠু নয়। দৃষ্টান্ত 'ও' অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সংকলকদের গভীর শ্রদ্ধা, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। বেদনা পাই এই ভেবে যে, গ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনাটি আর একটু বিচার করে স্থির করলে বইটি অনেক বেশী উপযোগী হত। রবীন্দ্র-রচনার পরিমাণ বিপুল। এই সম্বন্ধে তথ্যপুস্তকের অভাব পীড়াদায়ক; সুতরাং ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'রবীন্দ্র-রচনা-কোষ' পাঠকদের রবীন্দ্র-রচনার আলোচনায় সহায়তা করবে।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান'-এ রবীন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থের অক্ষরানুক্রমিক সূচী পাওয়া যাবে। রচনাটি কাব্য, উপন্যাস অথবা প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ আছে। প্রথম প্রকাশের তারিখ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোন খণ্ডে পাওয়া যাবে সে বিষয়েও টীকা দেওয়া হয়েছে। কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ গ্রন্থের নীচেই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা বা গানের নাম এবং প্রথম লাইন ও গল্প-প্রবন্ধের নামের সূচী পাওয়া যাবে। নাটকের অন্তর্গত গানগুলির সূচীও সংকলন করা

হয়েছে। শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের তালিকা সন্নিবেশিত করায় বইটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তা না জানলে কবিতা, গান, গল্প ও প্রবন্ধ সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না—এই হল আলোচ্য বইটির ত্রুটি। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনার এই সূচীটি হাতের কাছে থাকলে পাঠক উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই। বইয়ের নাম রবীন্দ্র-রচনাসূচী হলে যথার্থ হত।
(৩৪০।৬১, ৩২২।৬১)

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণীনিকেতন, ২১৭, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণীনিকেতন। মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্রচর্চা-সাহিত্য-পাঠকদের নিকট বই দুখানি সুপরিচিত, রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসবে এগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একালের অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' প্রথম প্রকাশনে (১৯৩৯) ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও কবিতা বিপ্লবীদের মনে মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ বা বিপ্লব বলিতে সাধারণত আমরা যাহা বুঝি রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাহার সমর্থন নাই, সমালোচকরা তাঁহাকে তাহাদের সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে সর্ববন্ধনমুক্তির বাণী অভয়মন্ত্রের কথা আছে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন; সরকারী লোক হয় বইটি পড়েন নাই, নাম দেখিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন, যা সত্যই দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন—চিত্তক্ষেত্রে বন্ধনমোচন যাহার যত সম্পূর্ণ হইবে, সংসারক্ষেত্রে আত্মত্যাগের ক্ষমতাও তাহার পক্ষে তত সহজ হইবে।

'রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ'-এ লেখক দুই বোন, মালঞ্চ ও বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা, রবীন্দ্র-জীবনের শেষ পর্বের এই সকল উপন্যাস ও নাটকের আলোচনা করিয়াছেন মনোবিকলনতত্ত্বের বিচারে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'গল্পের মধ্যে লেখকের অলক্ষ্যে মনস্তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে—তুমি তাকে অবারিত করেছ, কিন্তু দুঃশাসনের নীতিতে তার আব্রু নষ্ট হয়নি।' ১৯৪, ৩২৬।৬১

মহামানবের সাগরতীরে। সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, ৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০। মূল্য চার টাকা।

অ-বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচার-কল্পে এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও প্রকাশক নিখিল ভারত বঙ্গভাষা

প্রসার সমিতি যে পুণ্যকর্মে ব্রতী, এই গ্রন্থ-সংকলনও তাহারই অঙ্গ। রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব পালনে সমিতি এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন, যাহার সূত্রে 'নানা জাতির নানা ভাষাভাষী নরনারী কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে কবিরই মাতৃভাষা বাঙলা ভাষার মাধ্যমে।' দেশ-বিদেশের বহু গুণী মনীষীর রচনাধারা এই পরিকল্পনার আনুকূল্য করিয়াছে। শ্রদ্ধানিবেদনের এই অভিনবত্বেই গ্রন্থখানির মূল্য, রচনা-বিচারে নয়। সম্পাদক-প্রকাশক মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও কর্মনিষ্ঠায় বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। ৩৭৪।৬১

রবীন্দ্র-প্রণাম—শ্রীরমেন দাস সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, এ-১৩২-৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

অনেক মানুষ একটি মন—শ্রীরমেন দাস (সংকলক সাথী)। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। মূল্য দুই টাকা।

রবি-কাহিনী—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত। আলোক-ভারতী, ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্রনাথ—শ্রী অ নি ল চ ন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁর জীবনকথার সহিত পরিচয় সাধন করাইয়া দিবার জন্য শিশু ও কিশোর-পাঠ্য অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এইগুলিও তাহাদের অন্তর্গত। 'রবীন্দ্র-প্রণাম'-এ সুনির্মল বসু, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, স্বপন বুড়ো, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রভৃতির কুড়িটি লেখা সংগৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষাৎ-দর্শনের বিবরণ লিখিয়াছেন, কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের বিবৃত নিজের জীবনের কোনো-কোনো ঘটনা পুনর্বিবৃত করিয়াছেন—বইখানি কিশোর বয়স্কদের মনোহারী হইবে। 'অনেক মানুষ একটি মন'-এর লেখক রবীন্দ্র-জীবনের অনেক ঘটনা চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'রবি-কাহিনী' ও 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত। 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া রচিত।

৩৭৯, ৩৫৪, ২৫৯, ১৯৫।৬১

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি—শ্রীশান্তশীল দাস। সাহিত্যসদন, এ-১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখকের স্বরচিত পঁচিশটি কবিতার সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই কবিতা-সঞ্চয়ে যে স্নিগ্ধতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। ৩১৩।৬১

লহ প্রণাম—শ্রীবিভা সরকার। এম সি সরকার, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

এখানিও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখিকার রচিত পঁচিশটি কবিতার সংগ্রহ—কাব্যগুণে না হইলেও উদ্দিষ্টের প্রতি শ্রদ্ধায় উল্লেখযোগ্য। ২৭০।৬১

উপন্যাস

সেদিন চৈত্র মাস। দিব্যেন্দু পালিত। বসু চৌধুরী, ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাহিত্য হল বহতা নদীর মতো। তার ধারাটি সর্বদা একই খাতে বয় না। দু-এক যুগ হয়ত বয়, কিন্তু তার পরেই তার খাত বদলায়, পথ পালটায়। এই পরিবর্তনই তাকে জীবন্ত করে রাখে। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রেই যে স্বাগত অভ্যর্থনার যোগ্য, এমন কথাও বলা সম্ভব নয়। একমাত্র তখনই তাকে স্বাগত জানাতে পারি, সে যখন একটি স্পষ্ট প্রগতির বার্তা নিয়ে আসে। লক্ষণ দেখে মনে হয়, বাংলা কথাসাহিত্যে এখন পরিবর্তনের পালা চলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কোনও স্পষ্ট প্রগতির পথ উন্মোচন করবে কিনা, সেটা এখনও বিতর্কের বিষয়। বিতর্ক উঠত না, গল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষা এখন চলেছে, তার পিছনে যদি কোনও ঋজু পরিকল্পনা থাকত। স্বীকার করা ভাল, তেমন কোনও পরিকল্পনার আভাস সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, পরীক্ষাগুলিকে অনেক সময় উদ্ভট এবং উন্মার্গ বলে মনে হয়।

এত কথা বলবার কোনও দরকারই হত না। দরকার হল, তার কারণ, আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখকের যে মানসিকতা সূচিত হয়েছে, তা পরীক্ষাপ্রয়াসী। 'সেদিন চৈত্র মাস' একটি উপন্যাস। কিন্তু অন্যান্য অনেক উপন্যাসের সঙ্গে এ-বইয়ের কিছুটা পার্থক্য আছে। ঘটনার উপরে লেখক এখানে জোর দেন নি। জোর দিয়েছেন ভাবনার উপরে। এবং বিভিন্ন চরিত্রের মনোভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে পাঠককে তিনি একালীন মানবজীবনের মৌল সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই সমস্যা হয়ত লক্ষ্যহীনতার ব্যাধি, অথবা হয়ত নিঃসঙ্গতাবোধ। অথবা এই দুয়ের সংমিশ্রণজাত কোনও অসুখ,

আধুনিক মানুষের চিত্ত এখন ক্রমেই যার দ্বারা অধিকৃত হচ্ছে। এই কথাটিকে বলার জন্য শ্রীদিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে যে আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন, নূতন পরীক্ষার প্রয়াস তাতে স্পষ্ট। কিন্তু একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, সেই প্রয়াস উন্মার্গ নয়, তার মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত পরীক্ষা-রীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

বলেছি, 'সিদিন চৈত্রমাস'-এ ঘটনার উপরে জোর দেওয়া হয়নি। এখন বলা দরকার যে, চরিত্রের সংখ্যাও এখানে কম। নিঃসঙ্গতা-বোধের আবহাওয়াটি তার ফলে স্পষ্ট হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত তরুণ লেখক। কিন্তু বয়সে নবীন হওয়া সত্ত্বেও যে প্রবীণ ক্ষমতার তিনি পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আশা করতে ইচ্ছা হয় যে, বাঙালী পাঠকের হাতে কিছু স্থায়ী মূল্যের সাহিত্য তুলে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না।

৪৬৪।৬১

সাময়িক পত্রিকা

গঙ্গোত্রী (১ম,সংখ্যা, ১৩৬৮)। সম্পাদক ঃ দুর্গাদাস সরকার। সহঃ সম্পাদক ঃ অধীর সর্বজ্ঞ, শান্তনু দাস। গ্রন্থসভা, ৬/১ আফতাব্ মস্ক লেন, কলিকাতা—২৭।

দাম ঃ ৫০ নঃ পঃ।

ত্রৈমাসিক কবিতার সংকলনটিতে কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আরতি দাস ও দুর্গাদাস সরকার। কবিতাগুলি মামুলি ধরনের নয়। প্রতিটি কবিতায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিহ্ন বর্তমান। পত্রিকাটিতে পুস্তক আলোচনার মান উন্নত। আলোচনা করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় গভীর ভাবব্যঞ্জক। কবিতা সম্পর্কিত পৃথক প্রবন্ধ থাকলে পত্রিকাটি সমৃদ্ধতর হ'ত।

সম্প্রতি—সম্পাদক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। ২৮, কিষণলাল বর্মণ রোড, শালকিয়া, হাওড়া। মূল্য ৬০ নঃ পঃ।

সাহিত্যরুচিসম্পন্ন পরিচ্ছন্ন কতিপয় পত্রিকার মধ্যে 'সম্প্রতি'র একটা স্থান আছে। প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার লেখকদের মধ্যে অনেকেই নতুন হলেও রচনাগুলি সাহিত্যদীপ্তিতে উজ্জ্বল। আলোচ্য দ্বিতীয় সংকলনে লেখকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত প্রবন্ধে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, গল্পে স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখর বসু, কবিতায় আলোক সরকার, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, দিলীপ সিংহ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, পুষ্কর দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

প্রাপ্তি-স্বীকার

এসো নীপবনে—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধক কমলাকান্ত—শ্রীঅর্চনাপুরী।

দেশোন্নয়নে সমাজতন্ত্র — অমলেন্দু দাশগুপ্ত।

প্রতিরক্ষার অর্থনীতি — জুলে মেনকেন অনুবাদক মানবেন্দ্র রায়।

পরাভূত দেবতা—অনুবাদক—অমলেন্দু দাশগুপ্ত

বিশ শতকের আমেরিকার ধর্ম—হার্বার্ট ওয়ালেস স্নাইডার। অনুবাদক—সনাতন গোস্বামী।

প্যারিসে শিক্ষালাভ অন্তে ওদেশের প্রভাবকে আত্মস্থ করে এবং তার সংগে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পৌরাণিক ও ধর্মমূলক বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে প্রতিভা স্ফুরণের দৃষ্টান্ত আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীর পরপর কটি প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে। সেই শিল্পীদের মধ্যে দক্ষতা ও মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও অনেকটা একই ধারার অনুগামী হওয়ায় চিত্ররসিকদের মধ্যে একটা একঘেয়েমির অনুভূতি জেগে ওঠা স্বাভাবিক। তাই একটা ব্যতিক্রম হিসেবে গত ২৬শে মার্চ উদ্বোধিত মিসেস টেপসী ক্লার্কের ছবির একক প্রদর্শনীটি বিশেষভাবেই মনোরঞ্জন করবে। শুধু তাই নয়, একজন বিদেশিনী শিল্পীর তুলিতে এদেশের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক শোভা এবং মানুষের প্রতিকৃতি এমন দরদমাখা হয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে যে সেদিক থেকে প্রদর্শনীটি একটু বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে বলা যায়।

মিসেস ক্লার্কের জন্ম স্কটল্যান্ডে এবং শৈশব কাল থেকেই তাঁর মধ্যে চিত্রাঙ্কনের ঝোঁক দেখা দেয়। স্কটল্যান্ডের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই তিনি চিত্রাঙ্কন বৃত্তি অবলম্বন করেন।

পরে ভারতে এসে তিনি শ্রীযুক্তা সাবিত্রী সরকারের পরিচালনাধীনে ব্রিটিশ উইমেন্স ক্লাবের শিল্প বিভাগে কাজ করেন। এদেশে তাঁর ছবি প্রথম দেখা যায় গত বছর মার্চ মাসে আর্টিস্ট্রি হাউসে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ছবির প্রদর্শনীতে এবং সেই সময়েই বিশেষ করে তাঁর প্রতিকৃতি অঙ্কন সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করে। এখনকার সরকারী আর্ট কলেজেও তিনি এক বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে টাঙানো মোট সত্তরখানি ছবি ফল ফুল প্রভৃতি নিয়ে 'নির্জীব জীবন', প্রাকৃতিক শোভা এবং প্রতিকৃতি অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে শিল্পী বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর মনের রকমারি প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিলেতের প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব কতক ছবির ক্ষেত্রে পরিস্ফুট থাকলেও অধিকাংশ ছবির মধ্যে প্রাচ্য শিল্পধারার অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে রঙের প্রয়োগে।

ফলের ডালি

উদ্ভট বা দুর্বোধ্য করে তোলার কোন প্রয়াস নেই কোন ছবিতে এবং সবগুলি ছবির ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর শ্রীটুকু ফুটিয়ে তোলার দিকেই শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। সেটা 'কাশ্মীরের সূর্যাস্ত' (৯নং), 'বাঙলার গ্রাম' (১০নং), 'পুষ্করিণী' (১৬নং) বা 'বসন্তের প্রকৃতি' (২৬নং) প্রভৃতি ছবির ক্ষেত্রে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি 'লাল ফুল', 'ডালিয়া', 'ফল' প্রভৃতি

ওড়িষ্যার একটি লোক

নির্জীব-জীবন চিত্র এবং 'ব্যাঙ্ককের মহিলা' (৪নং), 'সাধু' (১৭নং), 'কর্মী' (৬নং) এবং 'ওড়িষ্যার লোক' (২১নং) প্রভৃতি প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেও সমানভাবে পরিস্ফুট। গূঢ় কোন বিষয় বা জটিল মনস্তত্ত্বের রূপায়নে তাঁর ঝোঁক নেই। প্রকৃতির মধ্যে যা সহজ ও সুন্দর, সরলভাবে রেখা ও রঙের সাহায্যে তা অভিব্যক্ত করায় প্রতিই তাঁর লক্ষ্য।

বিষয়বস্তু ভেদে রঙের নির্বাচনে যথেষ্ট রকমারিতা দেখা যায়। মূলত তিনি বাস্তবধারার অনুগামী এবং রেখা ও রঙের ব্যবহারেও বাস্তবকে অনুসরণের মধ্যে নতুনত্ব কিছু অবশ্য নেই। মিসেস ক্লার্ককে কোন মৌলিক ধারার স্রষ্টা বলেও অভিহিত করা যায় না। কিন্তু বাস্তবানুসৃতির মধ্যেও রূপমাধুর্য পরিস্ফুট করে তোলার দক্ষতার কথা বিচার করলে মিসেস ক্লার্কের কতকগুলি ছবি সার্থক শিল্পসৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায়। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার মতো যথেষ্ট মৌলিকত্ব প্রায় কোন ছবির ক্ষেত্রেই নেই। কিন্তু সুন্দরকে দীপ্ত করে ফুটিয়ে তোলায় শিল্পীর একটা সহজ প্রবণতা অধিকাংশ ছবিতেই পরিব্যাপ্ত এবং সেই সঙ্গে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপও পাওয়া যায় যা ছবিগুলির প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে।

চন্দ্রশেখর

সুন্দর ও সার্থক চিত্রসৃষ্টি

সবিনয়ে ও সগৌরবে "শিউলিবাড়ি" (মুভীটেক নিবেদিত) ছবিটি যাঁরা উপহার দিলেন, অর্থাৎ ছবির যাঁরা প্রযোজক ও পরিচালক, তাঁরা বয়সে তরুণ। বাংলা ছবির রাজ্যে এ'রা নবাগন্তুক। স্থিতনিষ্ঠ আন্তরিকতা ও অবিচল প্রত্যয়ের মূলধন নিয়ে তাঁরা প্রবেশ করেছেন বাংলা ছায়া-ছবির জগতে। "শিউলিবাড়ি" তাঁদের প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। এবং তার চেয়েও বেশী। এই ছবি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করল, ছবির জগৎ থেকে তাঁরা ফিরে যেতে আসেন নি, অনেক কিছু দেবার জন্য এসেছেন।

সংপ্রয়াসী ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলেই তাঁরা সুবোধ ঘোষের অনবদ্য কাহিনী "নাগলতা"-র চিত্ররূপ দানে সাহসী হয়েছিলেন। তাঁদের সততা, সাহস ও উৎসাহের সার্থক ফলশ্রুতি হয়ে দেখা দিয়েছে "শিউলিবাড়ি"।

ছবির নায়ক বিজনবিহারী বাঙলা দেশের এক অনতিগত অতীতের প্রতিনিধি। ওই যুগে পথিকৃৎ বাঙালীর দেখা মিলত। বৃহৎ ও মহৎ নিয়ে কাটত তাঁদের জীবন। বহুর জন্য বাঁচতেন তাঁরা। অনাগতের জন্য তৈরি করতেন পথ।

বিজনবিহারী পরহিতব্রতী পথিকৃৎ বাঙালী চরিত্রের এমনি এক জীবন্ত প্রতীক। কৈশোরে পৃথিবীর কাছ থেকে দুঃখ পেয়েছিল বিজন। প্রতিদিনকার পরিচিত পরিবেশের কাছ থেকে সে পেয়েছিল অবজ্ঞা ও অপমান। বাঙালীর সমাজে তার স্থান হল না। গভীর অভিমানে বাঙলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল বিজন-বিহারী। বাঙলার নরম মাটি ছেড়ে তার পলাতক প্রাণটি একদিন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল বিহারের কাঁকর আর পাথরের বুকে। মানুষের সমাজ ছেড়ে পালিয়ে এল শাল-জঙ্গলে। বন কেটে তৈরি করল বসত। তার অবমানিত আত্মা আত্মীয় খুঁজে পেল পাহাড়ী অঞ্চলের সরলপ্রাণ মানুষদের মধ্যে।

সমাজ-বিতাড়িত বিজনবিহারী মানুষের গড়া সমাজকে আর মেনে নেয়নি। তাই একদিন তার একদা-বাল্যসঙ্গিনী বিধবা নিরুপমাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে সে দ্বিধা করেনি। প্রাণে প্রাণে হল তাদের পরিণয়, অন্তরে অন্তরে মিলন। লৌকিক আচারের অনুমতি গ্রহণ করেনি ওরা। প্রেমের অনুশাসনে ওরা স্বীকার করে নিল ওদের বিবাহিত জীবন। তারপর একদিন তাদের কোল জুড়ে এল সুনন্দা—তাদের স্পর্ধিত, অলৌকিক প্রেমের পুণ্যফল।

বিজনের ঘরে নিরুপমা এল, আর পর এল সুনন্দা। আর সেই সঙ্গে বুঝি ভেসে এল বাঙলার প্রাণ ও মাটির একটি স্পর্শ, ছুঁয়ে গেল যেন বিজনের অন্তরকে। বিহারের ধূলিরুক্ষ মাটির বুকে বাংলা দেশের মাটির সলজ্জ সাধ তুলে নিয়ে এসে একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল বিজন। শিউলির চারা এনে পুঁতেছিল তার বাড়ির উঠোনে। বাড়ির নাম হল শিউলিবাড়ি। বিহারের সেই শাল-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ী অঞ্চলে যেদিন নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠল, তারও নাম হল শিউলিবাড়ি।

অভিমানে বাঙালীকে আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না বিজন। বাঙালী এল, বাঙালীর সমাজ গড়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে শিউলিবাড়ির সমাজে এসে বাসা বাঁধল নির্লজ্জ নীচতার দুষ্ট কীট। বিজনের কলঙ্কিত জন্মপরিচয়ের কথা জানা ছিল শিউলিবাড়ির এক কুচক্রী প্রবাসী বাঙালীর। একদিন প্রকাশ্যে তার বিষাক্ত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হল বিজনকে।

শিউলিবাড়ির সমাজ ঘৃণা করল না বিজনকে। বরং দূর করে দিল খলচরিত্রকে। কিন্তু বিজন-নিরুপমার কন্যা সুনন্দা মেনে নিতে পারল না তার কুলপরিচয়ের এই নিদারুণ কলঙ্ক। তার অবাঞ্ছিত জন্মের জন্য সে অভিযুক্ত করল তার পিতা-মাতাকে। সুনন্দার অভিযোগ শেষ পর্যন্ত সত্যের স্পর্শ পেয়ে কেমন করে আত্মোপলব্ধিতে মিলিয়ে গেল তা নিয়েই কাহিনীর নাট্য-পরিণতি গড়ে উঠেছে।

নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তপন সিংহের চিত্রনাট্য ও পীযূষ বসুর চিত্রপরিচালনার মণিকাঞ্চনযোগে সুবোধ ঘোষের কাহিনী চলচ্চিত্রপটে নতুন প্রাণ পেয়েছে। চিত্রনাট্যে

চিত্ত বসুর পরিচালনায় নির্মীয়মান "ধূপছায়া" ছবির একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত। এবং স্বচ্ছন্দগতি চিত্রনাট্যের বাঁকে বাঁকে একটি প্রাণোচ্ছল ও বেদনাময় জীবনের কাহিনী সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। তবে চিত্রনাট্যের শেষ অঙ্কে যেন একটু শূন্যতা রয়ে গেছে। নায়কের ঘরে এল তার দয়িতা, এর পর তার দুহিতা। সেই সঙ্গে নায়কের জীবন ও তার পরিবেশে আবার বাঙালী জীবনের অনেক শোভা ও সৌন্দর্য ফিরে এল। ফিরে এল না বুঝি শুধু জনক-জননী ও তাদের আত্মজাকে নিয়ে গড়ে ওঠা একটি ছোট্ট নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের মাধুর্যটুকু। ছবিতে প্রয়োজন ছিল না কি তিনটি জীবনকে ঘিরে একটি সুন্দর সংসার-যাত্রার সুখস্পর্শ? এই সুখস্পর্শটিই চিত্র-কাহিনীর নাট্যপরিণতির বাঞ্ছিত প্রস্তুতি হয়ে উঠতে পারত। এবং ওই প্রস্তুতি কাহিনীর যবনিকায় দর্শকমনকে আরও বেশী আলোড়িত করে তুলতে পারত।

তবে ছবিতে সুনন্দার প্রেমোপাখ্যান (মূল কাহিনীতে যা ছিল) বাদ দিয়ে চিত্র-নাট্যকার সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। বহুগুণে সমৃদ্ধ এই চিত্রনাট্যে তিনি পুরো কাহিনীর একটি সুগ্রথিত রূপ দেবার বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চিত্রনাট্যকার। এবং সেই সঙ্গে একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে অনেক ঘটনার আভাস সৃষ্টির কৃতিত্ব।

চিত্রপরিচালক পীযূষ বসু চিত্রকাহিনী বিন্যাসে অনেক গুণের মধ্যে এক অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যে কাহিনী রূপায়ণের ভার তিনি নিয়েছিলেন, তাতে 'মেলোড্রামা' অনুপ্রবেশের ফাঁক ছিল প্রচুর। কঠোর সংযম ও পরিশীলিত রুচিবোধ নিয়ে তিনি 'মেলোড্রামা'র প্রলোভন জয় করেছেন। শৈশবে নায়কের জীবনের বিড়ম্বনা, যৌবনে তার প্রণয় ও দুঃসাহসিকতা এবং পরবর্তী জীবনে তার আত্মপ্রসাদ ও আত্মদহন নিয়ে কোন অতিনাটকীয়তার সৃষ্টি করেন নি চিত্রপরিচালক। ফলে কাহিনীর রস চলচ্চিত্রপটে স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে, দর্শকের মনকে অলক্ষ্যে ও অনিবার্যভাবে কখনও বেদনার্ত আবার কখনও বা সুখানুভূতির অংশীদার করে তুলেছে। স্থূল নাটক বর্জন করে নাট্যরস সঞ্চারের এই ক্ষমতা বাংলা ছবিতে দুর্লভ।

শ্রী বসুর চিত্রপরিচালনার সুচারু প্রয়োগ-কর্মের অন্যতম পরিচয় হল, বহিরঙ্গ শিল্পশোভা সৃষ্টিতে বিশ্বাসী হয়েও আখ্যান-নিরপেক্ষ কোন চমকপ্রদ শিল্প-কারুকৃতিকে প্রশ্রয় দিতে তিনি অসম্মত। ফলে তাঁর ছবি এক নিরলংকার গীতিমাধুর্যে আলিপ্ত হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ করে রাখার মত নয়নাভিরাম বহির্দৃশ্য ছবিতে অনেক রয়েছে। কিন্তু নিসর্গ-সৌন্দর্যকে তিনি কাহিনীর পটভূমি ও পরিবেশ রচনায় অপরূপভাবে প্রয়োগ করেছেন।

বাস্তবের প্রতি আনুগত্য তাঁর চিত্রপরিচালনার অপর একটি বিশিষ্ট গুণ। এই গুণের অধিকারী বলেই তিনি আঞ্চলিক ভাষাভাষী চরিত্রকে ছবিতে এনে উপস্থিত করেছেন এবং কাহিনীর পটভূমিকে বাস্তবনিষ্ঠ করে তোলার জন্য বিশেষ অঞ্চলের নর-নারী ও তাদের লোকাচারকে বিসর্জন দেননি।

ছবির বক্তব্য ও মহৎ ভাবকণা কোথাও সোচ্চার ও প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি। মানবতার সুরটি ছবির আবেগধর্মের সঙ্গে কেমন সুন্দরভাবে যেন একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে।

ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে, দৃশ্য বিন্যাসে এবং নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় শ্রীবসু তাঁর প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনায় যে রসবোধ ও পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা মুক্তকণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলা ছবিতে তাঁর স্বাগত পদক্ষেপ চিত্রামোদীদের অভিনন্দন লাভ করবে।

শিল্পসৃষ্টি নিখুঁত হয় না। এ-ছবিও নিখুঁত নয়। তাই শ্রী বসুর প্রয়োগ-কর্মও সর্বাংশে ত্রুটিহীন নয়। শৈশবে প্রথম দেখা হওয়ার পর (তা-ও দীর্ঘকালব্যাপী নয়; অনধিক দু-তিনদিনের জন্য) যৌবনে দ্বিতীয় সাক্ষাতের কালে কোন যুবক-যুবতী কি পরস্পরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারে? এত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে পারে? শুধু আপনজনের মত নয়, প্রণয়ী-যুগলের মত? নায়ক যখন বিধবা নিরুপমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল, তাকে আনতে গেল, ছবিতে তখন এই বৈসাদৃশ্যটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নায়ক যখন তার বাল্যসঙ্গিনীর খোঁজে গ্রামের পথে চলছে তখন তার মনে শৈশব-সঙ্গিনীর স্মৃতিই ভেসে উঠতে দেখা গেল। বড় হবার পর তাদের দেখা হয়েছে এবং পরস্পরকে ওরা চেয়েছে এমন কোন ইঙ্গিত ছবিতে নেই বলেই ঘটনাটি বিসদৃশ।

এমনি ধরনের কতকগুলি সাধারণ ত্রুটি রয়েছে ছবিতে। কিন্তু চিত্রপরিচালনার সর্বাঙ্গীণ প্রসাদগুণে এইসব ত্রুটি সহজেই ঢেকে দেয়।

ছবির নায়ক বিজনবিহারীর চরিত্রের রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার। চরিত্রটির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন তিনি দর্শকদের। এটা তাঁর অসামান্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয়। ছবির অনেক মুহূর্তেই তাঁর অভিনয় স্মরণীয়। শৈশবসঙ্গিনীর সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার কথাগুলি মনে ভেসে ওঠার সময় তাঁর অভিব্যক্তি অপূর্ব।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় সেজেছেন নিরুপমা। অভিনীত চরিত্রটিকে তিনি তিলে তিলে রসকণায় ভরে তুলেছেন। এই চরিত্রাঙ্কন তাঁর শিল্পীজীবনের অন্যতম বিশেষ কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। শান্ত-মন্থ-

আচারের ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে যাবার মুহূর্তে তাঁর অভিনয় অপরূপ।

নায়ক-নায়িকার কন্যা সুনন্দার রূপসজ্জায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির নাট্যপরিণতির মুহূর্তে পিতা-মাতাকে অভিযোগ করার কালে এবং নিজের জীবনের বিড়ম্বনা ও হতাশা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিল্পী-ব্যক্তিত্ব ও অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

নায়কের পিতার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনোগ্রাহী। পুষ্করের ভূমিকায় দিলীপ রায় তাঁর স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে একটি সদাচারী যুবকের চরিত্র-সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে দর্শকদের সাধুবাদ পাবার মত অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেশ্বর সেন। ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসনের চরিত্রে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ও দেহাতী ভাষায় তাঁর বাচনভঙ্গী নিখুঁত। বীরেশ্বর সেন ঝুমরো রাজার চরিত্রের উদার ও সজ্জন রূপটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবির কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে যাঁদের অভিনয় প্রশংসনীয় তাঁরা হলেন চন্দন রায়, গীতালি রায় ও মণি শ্রীমানী। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তরুণকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, ভোলা বসু প্রভৃতি।

নায়কের কিশোর বয়সের ভূমিকায় শ্রীমান অমল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার বাল্য-সঙ্গিনীর চরিত্রে সুস্মিতা দর্শকমনে মমতার সৃষ্টি করে।

ছবির সংগীত পরিচালনায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় জীবনপ্রবাহের সহজ সুন্দর সুরটি খুঁজতে চেয়েছেন। ছবিতে দুই গান বলতে রয়েছে পল্লীবাংলার দুটি গান—একটি ভোরবেলাকার লোকসংগীত ও অপরটি শ্যামাসংগীত। ভোরবেলাকার "রাই জাগো" গানটি ছবিতে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। রসের দিক থেকে এই গানের পৌনঃপুনিক ব্যবহার সার্থক। ছবির আবহ-সংগীতে রবীন্দ্র-সংগীতের ও কীর্তনের সুরের ব্যবহার মনে দোলা দেয়।
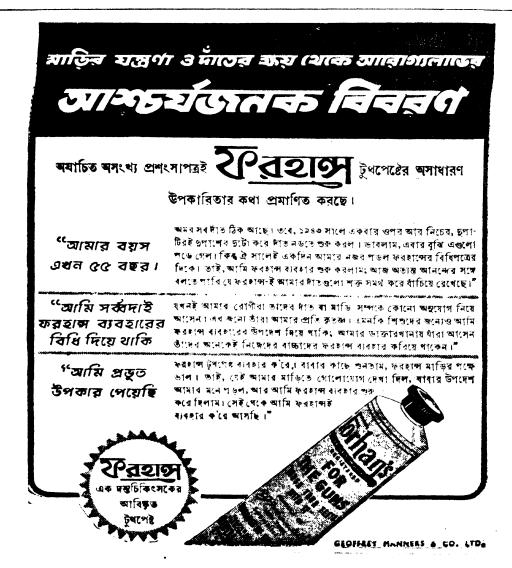
শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর "রুচিরা"-র শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠানে ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অন্যতম প্রধান শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অগ্রদূত পরিচালক-গোষ্ঠীর বিভূতি লাহা।

ছবির মূলে আবহ-সুরটি মনোরম। ছবির আবহ-সংগীত রচনায় দরদ দিয়ে স্বরোদ বাজিয়েছেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ।

দীনেন গুপ্তর আলোকচিত্রগ্রহণ এ-ছবির অন্যতম প্রধান সম্পদ। ছবির পটভূমি ও পরিবেশ এবং আলো-অন্ধকারের রূপ তাঁর ক্যামেরায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সুনীতি মিত্র (শিল্পনির্দেশ)। অন্যান্যদের মধ্যে সুবোধ রায় (সম্পাদনা), অতুল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল, সুশীল সরকার ও অবনী চট্টোপাধ্যায় (শব্দগ্রহণ) এবং মদন পাঠক (রূপসজ্জা) উল্লেখযোগ্য।

চিত্রালোচনা

নতুন কোন বাংলা ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে না। শুধুমাত্র একটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম **বর্মা রোড**।

কাশ্মীর ফিল্মস নিবেদিত **বর্মা রোড-য়ে** এক রোমাঞ্চকর কাহিনী চিত্রায়িত। কাহিনীতে রয়েছে এমন এক চোর যে দেশপ্রেমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে, এবং এমন এক কর্নেল যে বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিচিত হয়। অশোককুমার ও শেখ মুখতার ছবির এই দুই চরিত্রের শিল্পী। অন্যান্য প্রধান শিল্পী হলেন কুমকুম, বিজয়া চৌধুরী ও মোতী সাগর। তারা হরিশ ছবির পরিচালক, চিত্রগুপ্ত হলেন সুরকার।

• • •

অগ্রগামী গোষ্ঠীর **কান্না** আগামী ১লা বৈশাখ মুক্তিলাভ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মরমী ও ভিন্নধর্মী কাহিনী এই ছবির আখ্যানভিত্তি। ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও নবাগতা নন্দিতা বসু। রাধামোহন ভট্টাচার্য ও সুলতা চৌধুরীকে ছবির দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। সুধীন দাশগুপ্ত ছবির সুরকার।

• • •

অগ্রগামী-গোষ্ঠী বর্তমানে আরও একটি দুঃসাহসিক প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে" গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন। সম্প্রতি অগ্রগামী-দল এলাহাবাদে ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন উত্তম-কুমার, নন্দিতা বসু ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

• • •

বাংলা ছবিতে এ-ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। অভূতপূর্ব কাজটি সাধন করেছেন রেনেসাঁস ফিল্মস ঢেউ-এর পরে ঢেউ ছবিতে। ছবির চিত্রপরিচালকদ্বয় টেনিসনের "এনোক আর্ডেন" কবিতার আখ্যানবস্তু অবলম্বনে তৈরি করেছেন ছবিটি। ছবিটির নতুনত্বের দাবি শুধু এ-কারণেই প্রতিষ্ঠিত নয়। সারা ছবিটি তোলা হয়েছে দীঘার সমুদ্রতীরে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। দীঘার বেলাভূমি ঝাউবনের পটভূমিতে ছবির জীবনকাব্যটি গড়ে উঠেছে। সমুদ্রের গর্জন ও ঝাউ বনের উদাস রাগিণীর মধ্যে জীবনের কড়িকোমল সুরটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন চিত্রপরিচালকরা। ছবির মুখ্য তিনটি চরিত্রের শিল্পী হলেন শম্পা, শংকর ও বাদল। এঁরা তিনজনই ছবিতে এই প্রথম অভিনয় করলেন। রবিশংকর ছবির সুররচনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

• • •

রামধনু পিকচার্স-এর তের নদীর পারে ছবিটি এখন সম্পাদকের টেবিলে। গ্রামে-শহরে ভ্রাম্যমান সার্কাস দলের শিল্পীদের জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে ছবির আখ্যান-বস্তু। বারীন সাহা ছবির পরিচালক। চিত্রনাট্য ও আলোকচিত্র গ্রহণের দায়িত্বও তিনিই পালন করেছেন। প্রিয়ম হাজারিকা ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ছবির দুই প্রধান শিল্পী। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

• • •

আর-ডি-বি'র দুটি পরবর্তী ছবির নাম সাত পাকে বাঁধা ও এক টুকরো আগুন। সাত পাকে বাঁধা-র কাহিনীকার ও চিত্র-নাট্যকার হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ছবির পরিচালক ও শিল্পিবৃন্দ এখনও নির্বাচিত হননি।

এক টুকরো আগুন ছবিটি পরিচালনা করবেন বিনু বর্ধন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায়ের লেখা কাহিনী ও চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে তৈরী হচ্ছে ছবিটি। কালী বন্দ্যো-পাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, বিশ্বজিৎ এবং একজন নবাগতা অভিনেত্রীকে ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে দেখা যাবে। হেমন্ত মুখো-পাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

• • •

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার পর চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ যে ছবির কাজে আত্মনিয়োগ করছেন তার কাহিনী-ভিত্তি হল সমরেশ বসুর নির্জন সৈকতে। এই গল্পের চিত্ররূপ প্রযোজনা করছেন সরকার প্রোডাকসন্স তথা প্রযোজক দিলীপ সরকার। এ-বাদে কালান প্রোডাকসন্স-এর আরও একটি বাংলা ছবির পরিচালন-দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করছেন। ছবিটি তৈরী হবে সমরেশ বসুর "কাহিনী" অবলম্বনে।

• • •

শহরের গৃহসমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দানের কাজে ব্রতী হয়েছেন নবগঠিত প্রযোজক-সংস্থা প্যারাডাইস পিকচার্স। ছবিটির নাম গৃহ-সন্ধানে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সম্প্রতি ছবির কয়েকটি
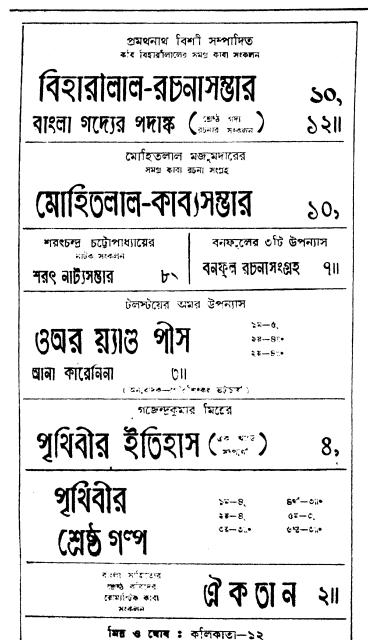
গানের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারিতে। চিত্ত বসুর পরিচালনায় ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ অনতিবিলম্বেই শুরু হবে। অমল মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক। এ-পর্যন্ত ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার ও সন্ধ্যারাণীকে ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে।

লোকনৃত্যগীতের অনুষ্ঠান

'ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার' সংস্থা গত রবিবার নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে যে-অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন, কলকাতার সংগীত-রসিকদের নিকট তার নূতনত্বের আবেদন অন্তত ছিল না। মাত্র কিছুকাল আগে এই নিউ এম্পায়ারেই 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার' ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোক-সংগীত ও লোকনৃত্য এবং সেই সঙ্গে কিছু রবীন্দ্রসংগীত, একটি অতুলপ্রসাদ-গীতি এবং বৈদিক স্তোত্রগীতি কয়ার রীতিতে পরিবেশন করেছিলেন। আলোচ্য অনুষ্ঠানটি সব দিক দিয়ে 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার' শিল্পি দলের সেই অনুষ্ঠানের অনুরূপ। লোকনৃত্যগীতির দু-একটি নূতন সংযোজন সত্ত্বেও 'ন্যাশনাল ইয়ুথ কয়ার' দল বুঝি সাধারণভাবে বিষয়ে এবং আঙ্গিকে কোন নূতন শিল্পধারণার ইঙ্গিত দিতে চাননি।

উপস্থাপনার দিক দিয়েও এই দলের সামগ্রিক প্রস্তুতির কিছু অভাব লক্ষ্য করা গেছে। কয়ার-কণ্ডাকটর শ্রীঅরুণ বসুর সংকেতে এবং নির্দেশে আতিশয্য ছিল; ফলে সেই নির্দেশের সঙ্গে শিল্পীদের যোগসাধনের অভাবও যেন প্রায়শ প্রকট হয়ে ওঠবার উপক্রম করেছে। নেপথ্য-ভাষ্য যিনি পাঠ করেছেন তাঁর কণ্ঠসম্পদ আছে। কিন্তু ভাষ্যকে অতি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর করে তোলবার ঝোঁকটুকু বর্জনীয়। একটি বৈদিক স্তোত্রগীতিতে ('সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্') অনুষ্ঠানের আরম্ভ। রবীন্দ্র-সংগীতে সমাপ্তি। মাঝে রবীন্দ্র-সংগীত, অতুল-প্রসাদের গান ছাড়া ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য ও লোকসংগীতের (কিছু আঞ্চলিক, দুটি সলিল চৌধুরী রচিত) অনুষ্ঠান। গানের চেয়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান-গুলি দর্শকদের বেশী আনন্দ দিয়েছে। গানে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ৬০জন শিল্পী। বিভিন্ন লোকনৃত্যে রূপ দিয়েছেন পনেরজন শিল্পী।

বাংলা দেশের নাট্য-আন্দোলনের প্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর যে-কয়েকটি সংস্থাকে বর্তমানে অর্থ সাহায্য করছেন, "শ্রীমঞ্চ" তাদের অন্যতম। "শ্রীমঞ্চ" গোষ্ঠী বর্তমানে গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত প্রহসন "ব্যায়সা-কা-ত্যায়সা" দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে নিয়মিতভাবে অভিনয় করছেন। গত ২০শে মার্চ থেকে নাটকটির অভিনয় চলছে। ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। প্রেমাংশু বসু নাটকটির পরিচালক।

ইনডস্কো ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের বার্ষিক নাট্যাভিনয় উপলক্ষে গত ২০শে মার্চ মিনার্ভায় "ঝিন্দের বন্দী" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

অহীন্দ্রম নাট্যসংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সংস্থার সভ্যরা গত ১৯শে মার্চ অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকটি অভিনয় করেন। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেন হরিধন মুখোপাধ্যায়, বেণী চট্টোপাধ্যায়, শৈল চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, বিনয় দাস ও অরুণা মুখোপাধ্যায়।

গত ২০শে মার্চ বালী রেলওয়ে কলোনীতে রবীন্দ্রনাথের "সম্পত্তি সমর্পণ"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন কিশোর শক্তি সংঘ। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-কাহিনীর নাট্যরূপ দেন এবং নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণাভ মজুমদার।

একলব্য

ভূপালে আইসবাগ স্টেডিয়ামে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় হকিতে এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে পাঞ্জাব। ফাইন্যালে পাঞ্জাব ও ভূপালের খেলা একদিন গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পাঞ্জাব একটি গোল করে বিজয়ী হয়। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে পাঞ্জাবের এটি অষ্টম জয়। এর আগে আরও ৭বার বিজয়ীর পুরস্কার রঙ্গস্বামী কাপ তারা ঘরে তুলেছে। তা ছাড়া ৪বার রানার্সও হয়েছে পাঞ্জাব। ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের দান বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। বহু কৃতী ও গুণী খেলোয়াড় তৈরি করে তারা ভারতীয় হকিকে সমৃদ্ধ করে আসছে। পাঞ্জাবের অধিবাসীদের কাছে হকিই সব চেয়ে প্রিয় ও আকর্ষণীয় খেলা। এবং প্রায় সারা বছরই তাদের হকি নিয়ে প্রস্তুতি।

এবার ২৩টি দল নিয়ে জাতীয় হকি খেলার তালিকা গড়া হয়। এর মধ্যে গতবারের বিজয়ী রেলওয়ে এবং বিজিত পাঞ্জাব সমেত সেমিফাইন্যালিস্ট সার্ভিসেস ও বোম্বাই দল কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পায়। চতুর্থ রাউন্ড থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পায় গতবারের অপর সেমিফাইন্যালিস্ট উত্তর প্রদেশ এবং মহীশূর, মাদ্রাজ ও বাংলা দল।

বাংলাকে চতুর্থ রাউন্ডের প্রথম খেলাতেই দিল্লির কাছে ১—০ গোলে হার স্বীকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। বাংলা দলে একজনও বাঙালী খেলোয়াড় ছিল না এটা সত্যিই বাংলার হকির পক্ষে কলঙ্কের কথা। যেখানে প্রথম ডিভিসন লীগে টীমের সংখ্যা ২০টি সেখান থেকে জাতীয় হকিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য একজনও বাঙালী খেলোয়াড় পাওয়া যায় না, এটা সত্যিই দুঃখের কথা। যাই হোক, অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া বাংলা দল জাতীয় হকিতে দিল্লির সঙ্গে অবশ্য মন্দ খেলেনি। এবং তাদের দিল্লির কাছে ১—০ গোলে হার স্বীকারও ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল নয়। অনেকটা দুর্ভাগ্যের জন্যই বাংলাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, গতবার জাতীয় হকিতে বাংলা কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছিল এবং এবারের মত একই ভাবে প্রথম খেলায় হেরেছিল পাঞ্জাবের কাছে ১—০ গোলে।

জাকার্তায় আগামী এশিয়ান গেমের জন্য জাতীয় হকির উপর এবার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ এই খেলায় খেলোয়াড়দের গুণাগুণের নিরিখেই গড়া হবে এশিয়ান গেমে ভারতের হকি টীম। জাতীয় হকির খেলা আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেনি। তবে খেলার বিবরণ থেকে যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় এবারকার দলে কিছু কিছু নতুন মুখ দেখা যাবে। কারণ অনেক তরুণ খেলোয়াড় হকির উন্নত ছলাকলায় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। রোম অলিম্পিকে ভারতের বিশ্বজয়ীর খেতাব হারিয়ে গেছে। বিশ্ব হকিতে ভারতের এখন দ্বিতীয় দলের মর্যাদা। দেখা যাক নবাগতদের নতুন কৃতিত্বে ভারত আবার বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করতে পারে কিনা।

নীচে এই বছরের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলার ফলাফল এবং পূর্ববর্তী বিজয়ী ও বিজিত দলের নাম দেওয়া হল :—

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির সহধর্মিণী মিসেস জ্যাকেলিন কেনেডির সম্মানার্থে আয়োজিত প্রদর্শনী পোলো খেলার পর জয়পুরের রামবাগ পোলো মাঠে খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিসেস কেনেডি। বামদিক থেকে দ্বিতীয় জয়পুরের মহারাজা, তৃতীয় মহারানী, মাঝখানে মিসেস কেনেডি

সুখলতা পালের সাঁতার শেখার পেছনে বাবার আগ্রহই প্রধান। সুখলতার বাবা শরৎচন্দ্র পাল ছোটবেলা থেকেই খেলা-ধুলোর পূজারী, নিজে সাঁতার কেটেছেন, মুষ্টিযুদ্ধ লড়েছেন, অ্যাথলেটিকসে দৌড়-ঝাঁপ করেছেন, ফুটবল, হকি খেলেছেন।

১৯১১ সালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওয়াই এম সিএর বার্ষিক রিভার পিকনিকের সময় নৌকাডুবিতে ১১টি ছেলের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবার পর যখন কলকাতায় সাঁতার আন্দোলন আরম্ভ হয়, শ্রীপাল তখন থেকেই সাঁতারের সঙ্গে যুক্ত। ১৯১১-র সেই ভয়াবহ নৌ দুর্ঘটনার স্মৃতিই শ্রীপালের মনে ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখাবার প্রেরণা এনে দেয়। তা ছাড়া খেলাধুলোয় মেয়েদের উৎসাহ দেবার ক্ষেত্রে শরৎবাবুর ভূমিকাও উল্লেখ্য। তিনি উইমেনস ওয়ার্লড (প্রাক্তন উইমেনস ওয়ার্লড স্পোর্টস)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং উইমেনস ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি যখন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ইনস্পেক্টর অব কলেজেস' ছিলেন তখন প্রধানত আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীব্রজরঞ্জন রায়, শ্রীশরৎ পাল এবং শ্রীযুক্তা সরলা চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় উইমেনস ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস এসো-সিয়েশনের সৃষ্টি হয়। শ্রীশরৎ পাল হন এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক।

খেলাধুলো সম্পর্কে বাবার এই অনুরাগেই সাঁতারের প্রতি সুখলতার অনুরাগ জন্মে। ফলে তিনটি বোন সুখলতা, আশালতা ও শিবানী এবং প্রায় সমবয়সী পিসি রমা পাল ভর্তি হয় বৌবাজার ক্লাবে। সেখানেই পশুপতি চৌধুরীর কাছে সাঁতার শেখা এবং অল্পদিনের মধ্যেই সুখলতার শ্রেষ্ঠত্ব।

তখন পরিবেশ ছিল প্রতিকূল। মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল না। পথচারী এবং বায়ুবিহারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে বড় মেয়েদের সাঁতার শেখার পক্ষে ছিল সদা-সঙ্কোচ। তবু ঐ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই সুখলতা বৌবাজার সুইমিং ক্লাবকে আঁকড়ে ধরে লতার মত দিনে দিনে এগিয়ে যেতে লাগল। ইচ্ছে ছিল আরও অনেকদূরে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৪১ সালে কল-কাতায় জাপানী বোমার আক্রমণে ওদের কার্সিয়াং পালিয়ে যেতে হল। সেখানে নতুন করে শেখার বা অনুশীলনের কোন সুযোগ ঘটল না। দু'বছর পরে যখন কলকাতায় ফিরে এল তখন বাড়ির সবাই তাকে দেখল নতুন চোখে। সাঁতারের সাব-লীলা ঊর্মিমুখর তন্বী মেয়ে তখন হারিয়ে গেছে। তখন সুখলতার লাজনম্র চেহারা, সে চেহারায় চাপল্যের চিহ্ন নেই।

সনাতন ভারতের শাশ্বত বিধান। ১৯৪৪-এর এক শুভ দিনে শাঁখ ও সানাই তার শুভ পরিণয়ের বার্তা ঘোষণা করল। বর বিখ্যাত ব্যবসায়ী রামকানাই যামিনীরঞ্জন পালের স্বত্বাধিকারীর ছেলে। নাম কৃষ্ণকান্ত পাল।

সুখলতার এখন এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের বয়স মাত্র এক বছর। মেয়ের ১৪। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ক্লাস এইটের ছাত্রী। তবে নাম কাবেরী হলে কি হয়, মায়ের মত জলের বুকে কলতান তুলবার বাসনা নেই।

সাঁতারের কয়েকটি ট্রফির সঙ্গে সুখলতা পাল

দেশী সংবাদ

১৯শে মার্চ—ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমদানী রপ্তানী নীতি নির্ধারণ কমিটি রপ্তানীলব্ধ আয় সম্পর্কে তিন প্রকার আয়কর হ্রাস করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। এই কমিটি সাধারণের নিকট মুদালিয়ার কমিটি নামে পরিচিত।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটের উপর চারিদিনব্যাপী সাধারণ আলোচনার প্রথম দিবসে বিরোধী সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কেন্দ্রের নিকট ন্যায্য পাওনা আদায়ের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতার অভিযোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট এই আবেদন জানাইয়াছেন যে, জেনেভায় যখন ১৭ জাতীয় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন চলিতেছে, তখন তাহারা যেন আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা লইয়া আর অগ্রসর না হন।

২০শে মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেটের সাধারণ আলোচনার দ্বিতীয় দিন সীমান্তে পাকিস্তানী হামলার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং বিরোধী পক্ষ হইতে একাধিক সদস্য উক্ত পাকিস্তানী দৌরাত্ম্য রোধ করার জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার হইতে কঠোরতর ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন যে, তৃতীয় যোজনায় রাজ্যের পৌর এবং পল্লী এলাকাগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিজের হাতে লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন উভয়েই স্বীকার করেন, গত কয়েক মাস যাবৎ চাউলের দর বাড়িতেছে।

২২শে মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট সম্বন্ধে বিতর্কের তৃতীয় দিবসে বিরোধী দলের সদস্যগণ সাধারণভাবে বাজেটের সমালোচনা করিয়া এই রাজ্যে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও জীবিকার ব্যয় বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অতিরিক্ত পাঁচ দফা বকেয়া মহার্ঘ ভাতা আদায়ের দাবিতে অদ্য বিকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবন প্রাঙ্গণে প্রায় তিন হাজার কর্মচারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

২৩শে মার্চ—এই রাজ্যের যে সব কয়লাখনি এলাকা সরকারে বর্তাইয়াছে, সেই খনিগুলি হইতে কয়লা তোলার ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন নিজ হাতে লইতে চাহেন, ঐ বিষয়ে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনের হস্তক্ষেপ চাহেন না—সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য বিধান পরিষদে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন।

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের এক শ্রেণীর শিল্পপতি কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপমুক্ত একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, তাঁহারা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁহাদের অভিমত পেশ করিয়াছেন।

২৪শে মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে বাজেট ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবি সম্বন্ধে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, অর্থ কমিশন কর্তৃক সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অংশ বৎসরে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৮ কোটি টাকা ধার্য করিলে কেন্দ্রীয় সরকার উহা দিতে রাজী হন নাই। উহার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ জানানো হইবে।

২৫শে মার্চ—সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ শ্রমিক যথার্থভাবে কাজ না করার ফলে কলিকাতা মহানগরীর ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে শুধু বর্ষাকালেই নয়, অদূর ভবিষ্যতে বিনা বর্ষণেই মহানগরী প্লাবিত হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

লেক ময়দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের প্রথম দিন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বিদেশী ভাষা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অন্তরায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় দিন রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং উপাচার্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী উহার দৃঢ় বিরোধিতা করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে মার্চ—সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ ঘোষণা করিয়াছে যে, আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত আলোচনা চালাইতে তাহারা প্রস্তুত আছে।

বেলা ঠিক বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আলজিরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি বলবৎ হয়। কিন্তু আলজিরিয়াকে স্বাধীনতাদানের বিরোধী ফরাসীগণকে লইয়া গঠিত 'ওয়াস' বা গোপন সেনাবাহিনী সংস্থা দুইদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে ৫টার পূর্বেই শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তার উপর জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া ওঠে।

২০শে মার্চ—১৭ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ভারত আজ প্রস্তাব করে যে, নিরপেক্ষ দেশসমূহে আণবিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলে উহা বর্তমান পর্যবেক্ষণ কার্যের সহায়ক হইতে পারে।

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট জেনারেল দ্য গল আজ জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে সমগ্র ফরাসী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আলজিরিয়ার দীর্ঘ সংগ্রাম শেষ হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন ফ্রান্স ও নূতন আলজিরিয়ার পক্ষে এক কল্যাণকর ও উদার সহযোগিতার দ্বারও উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

২২শে মার্চ—সোভিয়েট প্রতিনিধি শ্রীসেমিয়ন সারাপকিন আজ জানান যে, আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য বৃহৎ ত্রিশক্তিবর্গের আলোচনায় "সম্পূর্ণ অচল অবস্থার" সৃষ্টি হইয়াছে। মাত্র গতকাল এই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গের দাবি হইল যে, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে "গুপ্তচরবৃত্তি" প্রশ্রয় পাইতে পারে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন উহা নাকচ করিয়া দিয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সহিত আলোচনার জন্য নয়াদিল্লীতে আসিবার আমন্ত্রণ গ্রহণের পূর্ব শর্ত হিসাবে পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান মন্ত্রী বা অফিসার পর্যায়ে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীরাজেশ্বর দয়ালের নিকট প্রস্তাবটি জানাইয়াছেন।

মহাশূন্য গবেষণায় সহযোগিতা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ও ক্রুশ্চেভের মধ্যে সর্বশেষ পত্র বিনিময় হইবার পর গতকল্য রাত্রে মার্কিন ও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার নিমিত্ত মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে মিলিত হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৩শে মার্চ—জেনারেল দ্য গল আজ ফরাসী মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে বলেন যে, সরকার নির্মমভাবে আলজিরিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করিবেন। প্রেসিডেণ্টের বিবৃতি হইতে ইহা বোঝা যায় যে, আলজিরিয়ায় ফরাসী সরকারী বাহিনীর অধ্যক্ষকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে-তুংকে প্রায় এক মাসের উপরে প্রকাশ্যে দেখা যায় নাই। ওয়াকিবহাল মহল বলেন, তিনি অসুস্থ।

২৪শে মার্চ—ঢাকায় ছাত্র-পুলিসে আবার সংঘর্ষ বাধে। পুলিস আজ জেল রোডের একটি ছাত্র মিছিলের উপর কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে ও লাঠি চালায়। পরে এ সম্পর্কে কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্রহ্মদেশের একেবারে উত্তর প্রান্তে কাল্পনিক কাহিনী বর্ণিত পিগমী বা বামন জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত চিহ্নিত করার কালে বর্মী সেনারা এই অদৃষ্টপূর্ব লুপ্তপ্রায় জাতিটির সন্ধান পায়। এখনও তাহারা সংখ্যায় কয়েক হাজার। লিলিপুটের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল।

২৫শে মার্চ—পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আবার ধরপাকড় শুরু হইয়াছে। অদ্য সকালে গোয়ালন্দে আয়ুবশাহী স্বৈরনীতির প্রতিবাদে স্টীমারঘাটে পিকেটিং করার সময় প্রায় শতাধিক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐদিন খুলনা স্টীমারঘাটেও পিকেটিং করা হয় বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া যায়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 7th April, 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ২৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৪ চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

লেখকের ভূমিকা

লেখকের কাছ থেকে পাঠকের প্রত্যাশা অনেক; সে-প্রত্যাশা চিত্তবিনোদনের, আস্বাদনের। লেখক মানে অবশ্য এখানে সৃজনধর্মী সাহিত্য-শিল্পী। রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং আরো অনেকেই অবশ্য লেখক অথবা কথক। কিন্তু তাঁদের কথা আলাদা। আলাদা হলেও আমাদের কালে রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতারা দেখা যাচ্ছে সাহিত্য-শিল্পীদের আলাদা থাকতে দিতে নারাজ। যে-সব রাষ্ট্রে সর্বাত্মক মতবাদের এবং দলের প্রাধান্য সেখানে এ প্রশ্নই নেই, সাহিত্য-শিল্পীরও পূর্ণ আনুগত্য চাই রাষ্ট্রাদর্শ এবং রাষ্ট্র-প্রধানের কাছে। সেখানে লেখকের ভূমিকা নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রকর্তাদের অথবা দলীয় সংস্থার নির্দেশ মত। আমাদের দেশে সে-অবস্থা নয়। তবুও যখন দেখি, সাহিত্য-শিল্পীরা রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, লেখকের ভূমিকা নিরূপণে তখন আশংকা হয় আমাদের দেশেও লেখকরা প্রকারান্তরে 'কমিট-মেণ্ট' তথা বাধ্যবাধকতার নীতি মেনে নিতে অগ্রসর হয়েছেন।

দিল্লিতে সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে ভারতীয় লেখকবৃন্দের একটি আলোচনা-চক্রের অধিবেশনে যে বিষয়টি সম্প্রতি আলোচিত হয়েছে, সেটি হল জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় লেখকদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত। আর কোনও দেশে সম্ভবত লেখকেরা এ-ধরনের প্রশ্ন আলোচনায় তৎপর নন্। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা, রক্ষা এবং উন্নয়নের প্রশ্নটা আমাদের দেশে সম্প্রতি খুবই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা মূলত রাজনৈতিক, আরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে বলা যায় ভারতবর্ষের মত সুবৃহৎ দেশে যেখানে ভাষা, ধর্ম ও জাতের ব্যবধান বিস্তর ও বিচিত্র, সেখানে সর্বভারতীয় চেতনা নিরন্তর খণ্ডিত হচ্ছে নানা রকম আঞ্চলিক এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিরোধ ও প্রতিযোগিতার ফলে। এর কোনও সাহিত্যিক সমাধান সম্ভব বলে মনে হয় না।

জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা সম্পর্কে ভারতীয় লেখকদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নিশ্চয়ই নেই। তবে লেখকেরাও সামাজিক প্রতিবেশের প্রভাবে অল্পবিস্তর আঞ্চলিক মনোভাবাপন্ন হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু আঞ্চলিকমাত্রেই অবশ্য জাতীয় সংহতির প্রতিকূল নয়। গত দেড়শ বছরে ভারতীয় সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কর্মে এমন কোনও সংকীর্ণতা অথবা বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায় না, যাকে ভলতেয়রের অনুকরণে ধিক্কার দিয়ে বলা প্রয়োজন, "দূর করো এই কলঙ্ক"। লেখকের ভূমিকা সৃজনশীল সাহিত্যের কল্পলোকে; সেখানে রুচিভেদ আছে, প্রতিভার পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও অনস্বীকার্য; যুগভেদে সৃজনপদ্ধতির প্রকরণ ও প্রয়োগকৌশলে অভিনবত্বের অন্ত নেই। কিন্তু লেখকের এই নিজস্ব সৃষ্টিজগতে শিল্পভাবনার বিস্তার ছাড়া আর কোন ভূমিকাই লেখকের উপর বাইরে থেকে আরোপ করা যায় না। দিল্লির আলোচনা-চক্রে সর্দার পানিক্কার যথার্থ বলেছেন, শিল্পের আনুগত্যই মুখ্য; সিজারের প্রাপ্যের মত লেখকের কাছ থেকে সমাজের তথা রাজনীতির দাবি 'আদায় করতে চাওয়া মানে লেখকের স্বচ্ছন্দ শিল্পীসত্তার বিলুপ্তি ও প্রচারকের আবির্ভাব!

দিল্লিতে আলোচনা-চক্রে লেখকের ভূমিকা এবং জাতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে যে-সমস্ত অভিমত প্রকাশিত হয়েছে, তার সঙ্গে সাহিত্যাদর্শ বিচারের বিশেষ সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি দেখা যায় না। একথা ঠিক যে, জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা বর্তমানে আমাদের দেশে মস্ত বড় একটি সমস্যা। উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, দেশ এখনও সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থেকে মুক্ত হইতে পারেনি। অনুরূপ না হলেও নানা ধরনের বিভেদ ও বিদ্বেষ য়ুরোপের কোন কোন দেশেও কম নয়। শিল্পীর আত্মমর্যাদা-বোধ ও মানবিকতা সেজন্য বড় একটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। সমাজকল্যাণ-ভাবনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পে স্বতঃই সঞ্চারিত হয়ে থাকে। সেজন্য সমবেতভাবে প্রস্তাব পাশ, সংকল্প গ্রহণ ইত্যাদি সাহিত্যা-দর্শের পক্ষে কদাচিৎ স্বাস্থ্যকর বা সুফলপ্রদ হতে দেখা যায়। দিল্লির আলোচনা-চক্রে যে লেখকবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অভিমত, জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার সহায়তার জন্য জাতির সম্মুখে একটা প্রেরণামূলক লক্ষ্য স্থাপন করা উচিত। উচিত বটে, কিন্তু লেখকেরা যদি এই রকম কোনও বাঁধাধরা প্রেরণাকে তাঁদের সাহিত্য-সৃজনকর্মের সূত্র বলে গ্রহণ করেন, তাহলে রাষ্ট্র-নেতাদের স্তুতি ও স্বীকৃতি হয়ত সহজে মিলবে, কিন্তু সাহিত্য নামে যে বস্তু সৃষ্টি হবে, তার না থাকবে কোনও বিস্ময়, না বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব।

লেখকের ভূমিকা ও দায়িত্ব কোনও সর্বতোপ্রযোজ্য সাধারণসূত্রে বিধৃত করা কেবল দুরূহ নয়, অনেক অংশে নিরর্থকও। লেখকমাত্রেই জাতীয় সংহতির চারণ হবেন, এমন কোনও বিধিনিয়ম মান্য করার পরামর্শ, উপদেশ, আদেশ অথবা নির্দেশ কোন দেশেই সফল হয়নি। সৃজনীপ্রতিভার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি পরিচালিত হয়, সার্থকতা পায় বা পেতে চেষ্টা করে তার নিজেরই নিয়মে। লেখকের শিল্পকর্ম মহৎ অথবা বৃহৎ, না ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর সে-বিচার পরে। সে-বিচার পাঠক-সাধারণের এবং সমালোচকের। সে-বিচার কঠোর হোক আপত্তি নেই। কিন্তু লেখকের ভূমিকা ও দায়িত্ব একান্তভাবে লেখকের প্রতিভা, প্রকৃতি এবং প্রতি-বেশের উপর স্বচ্ছন্দ-নির্ভর। সেখানে কোন অনুজ্ঞাই শিরোধার্য গণ্য করা যেতে পারে না। তবে সাহিত্যের স্বধর্ম ও স্বকীয়তার হানি না করে যে লেখক জীবন ও জগতের কল্যাণ-ভাবনাকে তাঁর সৃজনী আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেন, তাঁর সাহিত্যকর্মের মাহাত্ম্য নিঃসন্দেহে জাতীয় ঐতিহ্য পরিপুষ্টির সহায়ক।

কালীপদ মুখার্জী অস্বীকার করে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান ভারতীয় এলাকা দখল করেছে — এ কথা তিনি বলেন নি।

সিরিয়ায় আবার পটপরিবর্তন চলছে। ..র আড়াই তিন ইউনাইটেড আরব রিপাব-লিকের ভিতর মিশরের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরিয়া আলাদা হয়। ঠিক ছ'মাস পরে—২৮শে মার্চ আবার "ক্যু"। পলিটিশিয়নদের সরিয়ে দিয়ে সামরিক কর্তারা গবর্নমেন্ট হাতে নিয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে সিরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার জন্য যখন বিদ্রোহ হয়, তখন প্রেসিডেন্ট নাসের জোর করে সিরিয়াকে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেন নি। প্রথমে অবশ্য বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অবিলম্বে স আদেশ প্রত্যাহৃত হয়, সিরিয়াকে আলাদা হয়ে যেতে দেওয়া হয়। মিশরের সঙ্গে সংযুক্তির ফল স্বভাবতই সর্ববিষয়ে সকল সিরিয়াবাসীর মনঃপূত হয়নি, কোনো কোনো ব্যাপারে হয়ত সিরিয়াবাসী-দের বোধ হয়েছে যেন সিরিয়া মিশরের অধীন হয়ে গেছে। এর জন্য কিছুটা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল, যেটা নাসের-বিরোধীরা কাজে লাগিয়েছিল। যদিও ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে সিরিয়াকে আলাদা করার ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত স্বার্থবোধের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে গেলেন।

মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত হবার পরে জন-সাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে যেসব বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল গত ছ মাসে তার অনেকগুলি উল্টে দেওয়া হয়েছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে নূতন সরকারের প্রতি অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছিল। সেই সঙ্গে মিশরের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে হাওয়াও আবার ঘুরতে আরম্ভ করে। এই সময়ে সামরিক হাইকমাণ্ডের দ্বারা "ক্যু" সংঘটিত হলো। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বিবাদ আছে এবং হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে "ফ্রি অফিসার্স" বলে একদল খাড়া হয়েছেন। এই দল খোলাখুলি প্রেসিডেন্ট নাসেরের ভক্ত এবং মিশরের সঙ্গে সিরিয়ার আবার সংযুক্তি চান। এই দল উত্তর ও পূর্ব সিরিয়ায় অবস্থিত সৈন্যদের সমর্থন পাচ্ছেন। "ফ্রি অফিসার্স" অভিযোগ করছেন যে, সৈন্যবাহিনীর হাইকমাণ্ডের ভিতরেই একদল আছে যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জনাই সব কিছু করছে। যে-পলিটিশিয়ানদের সরানো হোল তাদের এরাই গদিতে বসিয়েছিল এবং এখন যে তাদের সরানো হোল তাও জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যেই। "ফ্রি অফিসার্স-এর দাবি—সামরিক হাইকমাণ্ডকে এই স্বার্থান্বেষী দলের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, পুনরায় মিশর ও সিরিয়া সংযুক্ত হবে এবং জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূলে বিধিব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।

"ফ্রি অফিসার্স" এবং দামাসকাস-এ অবস্থিত সামরিক হাইকমাণ্ডের মধ্যে একটা মিটমাট না হলে সিরিয়ায় ব্যাপক গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। মিটমাটের চেষ্টা বোধহয় হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যেই দামাস-কাস-এর কর্তাদের সুর কিছুটা বদলেছে। তাঁরা বলছেন—মিশরের নেতৃত্বে স্বাধীন আরব রাষ্ট্রদের একটা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হবে

কিনা এই প্রশ্নের উপরে সিরিয়ায় একটা গণভোট নেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব এবং মিশরের সংগে সিরিয়ার সংযুক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সামরিক হাইকমান্ডের এই প্রস্তাবের উপর মিটমাট হবে কিনা সন্দেহ। হাওয়া মনে হয় "ফ্রি অফিসার্স"এরই অনুকূলে বইছে। তবে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ যাতে না ঘটে তার চেষ্টা সকলেই করবে, অন্ততপক্ষে গৃহযুদ্ধ চাই না এটা প্রমাণ করতে সকলপক্ষই চেষ্টা করবে। প্রেসিডেন্ট নাসেরও নিশ্চয়ই সতর্কভাবে চলছেন যাতে একথা কেউ বলতে না পারে যে, মিশরের চাপে সিরিয়াবাসীরা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য হচ্ছে। তবে সিরিয়ার সামরিক অফিসার এবং বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে নাসেরের ভক্তগণ এবং মিশর-সিরিয়া সংযুক্তি সমর্থক-দের দিকে হাত না বাড়িয়ে থাকাও প্রেসিডেন্ট নাসেরের পক্ষে কঠিন। যাই হোক আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝা যাবে সিরিয়া অদূর ভবিষ্যতে আবার ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে কিনা।

* * *

ফরাসী গবর্নমেন্টে এবং আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতিমূলক যে চুক্তি হয়েছে তা ভণ্ডুল করে দেবার জন্য আলজেরিয়ায় বিদ্রোহী ফরাসী সৈন্যের সংস্থা শেষ চেষ্টা করে চলেছে! ফরাসীরা ফরাসীদের মারছে, এটা ফ্রান্স সহ্য করতে পারবে না, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ও-এ-এস্ (গুপ্ত সামরিক সংস্থা) তার নৃশংস নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। হয়ত ও-এ-এস্ ভেবেছিল যে, প্রেসিডেন্ট দ্য গল নিজেই ঘাবড়ে যাবেন এবং ফরাসী ও আলজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের একযোগে ও-এ-এসকে দমন করবার পরি-কল্পনা কার্যকর হবে না। এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, ও-এ-এস-এর এরূপ ধারণা করা ভুল হয়েছিল। আলজেরিয়ায় ও-এ-এসকে দমন করার ব্যাপারে ফরাসী কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। যদি কর্তৃপক্ষ এরূপ দৃঢ়তা দেখিয়ে যেতে পারেন তবে ও-এ-এস্‌কে দমন করতে হয়ত খুব বেশি দিন লাগবে না। তবে এখনো আরো খুনোখুনি কিছুকাল চলবে। [illegible] ও-এ-এস-এর কার্যাবলীর ফলে [illegible] সিরিয়ায় মুসলমান ও ফরাসী বাসিন্দাদের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার কাজের [illegible] বাড়বে।

* * *

নেপালের রাজা মহেন্দ্র শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সংগে আলাপ-আলোচনা করার জন্য দিল্লিতে আসবেন। এটা ভালো কথা। কাঠমাণ্ডু থেকে অবশ্য প্রচারিত হচ্ছে যে, নেপালী বিদ্রোহীরা ভারতভূমি থেকে নেপালে উপদ্রব চালাবার যে-সুযোগ পাচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনা করে এই সমস্যার একটা সমাধান করাই রাজা মহেন্দ্রের দিল্লি আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। নেপালের রাজকীয় প্রচারকগণ যাই প্রচার করুন, আমরা আশা করি, দিল্লিতে নেহরু-মহেন্দ্র আলোচনার ক্ষেত্র আরো ব্যাপক হবে। নেপালে যাঁরা বিদ্রোহ চালাচ্ছেন তাঁরা উপদ্রবকারী নন, তাঁরা নেপালের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। কেবল তাঁদের দমন করার কথা চিন্তা না করে তাঁদের সহযোগিতায় কীভাবে নেপালের উন্নতি সাধন করা যায় সে বিষয়ে শ্রীনেহরুর পরামর্শ গ্রহণ করতে রাজা মহেন্দ্র যদি ইচ্ছুক হন, তবে সেটা সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর হবে। ভারত সরকার নেপালের আভ্যন্তর ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে চান না। কিন্তু নেপালের এবং ভারতের মঙ্গল যে একসূত্রে বাঁধা একথা উভয় দেশের নেতাদেরই সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

৩।৪।৬২

অ্যান্টেনায়

বাতায়নিক

সাহিত্য-সমালোচনায় যে আজব নমুনা সম্প্রতি দেখেছি তাই থেকে উল্টো আর সোজা তর্কের কিংবা বলা যায়, এগিয়ে যাওয়া আর পিছু হাঁটা ভাবনায় কিছু মজার উদাহরণের কথা মনে পড়ে গেল। গত যুগের অদ্বিতীয় ব্যঙ্গ-রসিক এক ইংরাজ লেখক সামনে চলা আর পিছনে নামা চিন্তার তফাৎ বোঝাতে এই রকম মজার একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন মনে পড়ছে।

তাঁর মতে চিন্তা ভাবনা যুক্তি দুরকমের হয়। উচ্ছ্বাস অত্যুক্তির অযৌক্তিক বাগ-বিস্তারের ভেতর দিয়েও এক ধারা সামনের দিকে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে. কিন্তু যুক্তি-শৃঙ্খলার ভড়ং নিয়েও আর এক ধারা পিছু সরতে সরতে অর্থহীনতার শূন্যে মরুতেই লুপ্ত হয়।

তাঁর দেওয়া নমুনা যতদূর মনে পড়ছে, কতকটা এই রকমঃ—

বিশুদ্ধ বস্তুবাদী আধুনিক তাত্ত্বিকের সামনে উনুনের আঁচ উস্কে দেবার বাঁকা শিক, কোথাও পড়েছে। সে শিক দেখে তাঁর প্রথম উক্তি হ'ল,—আহা বেচারা বাঁকা শিক।

তাঁকে সবিনয়ে হয়ত বলা হল যে পৃথিবীতে আগুন নামে একটি আশ্চর্য বস্তু আছে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদ্যাশক্তি স্বরূপ রহস্যভয়াল ব্যাপারও তাকে বলা যায়। এই ব্যাপারটিকে সামান্য উনুনের বেষ্টনী দিয়ে বশ মানাবার কাজে লাগে বলে শিক বাঁকা হয়।

তত্ত্বজ্ঞ তৎক্ষণাৎ রায় দিলেন,—তাহলে শিক যাতে না বাঁকে সে জন্যে আগুন বাতিল করা হোক।

বাঁকার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বিরূপতা ও সোজার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতিতে এ রায় খুব বেশী মনে ধরলেও কাতরভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা না করে পারা গেল না যে আগুন নামে ওই বস্তু বা ব্যাপারটি না হলে মানুষের চলে না। মানুষের সভ্যতা এক হিসেবে ওই আগুনের আঁচেই শুরু হয়েছে।

বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী তত্ত্বজ্ঞ খানিক কি ভাবলেন। তারপরে দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, আগুনের মত সাংঘাতিক সর্বনাশা জিনিস নিয়ে খেলা না করলে যার সভ্যতাই লোপ পায় সেই প্রাণীটির টিঁকে থাকবার কোন দাবী আছে বলে মনে হয়

না। মানুষের মত এ রকম আজগুবী গোলমেলে জটিল জীবকে জীইয়ে রাখার চেয়ে শিক-এর সরলতা অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়।

তর্কের নমুনাটি নিতান্ত হাস্যকর উৎকট আতিশয্যে ভরা সন্দেহ নেই, কিন্তু যুক্তিবাদের নামে শাঁস ছেড়ে ছোবড়া নিয়ে অনেক বিষয়েই আমরা টানাটানি কি সত্যিই করি না, বিচার করতে বসে লেজুড়কেই পরম জ্ঞান করে ধড়মুণ্ড দিই না উড়িয়ে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন নিয়ে যে বিবাদ চলেছে, তাতেই ত মনে হচ্ছে, উনুনের শিক সোজা করার উৎসাহে আগুনটাই নিবল কি না সে বিষয়ে কারুর কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাহন নিয়ে অন্ধ গোঁড়ামির বাড়াবাড়িতে সওয়ারীকেই খানায় ফেলা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে আমরা যেন বেহুঁশ।

বানানে আমি চিরকাল মাটো। হ্রস্ব দীর্ঘজ্ঞান ত কমই, ষত্ব নত্বও রীতিমত ফ্যাসাদে ফেলে। 'পাশ্চাত্ত্য'-এ ত এর দ্বিত্ব অনেককাল অজানা ছিল, স্বত্বের দ্বিতীয় ব ফলা নিয়ে বহু পূর্বে এক প্রকাশকের সঙ্গে সত্যিকার হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল, এবং কজ্‌ঝটিকার আসল বানান আমার কাছে বহুদিন শব্দানুসারী হ্য-এর আড়ালে অস্পষ্ট থেকে গেছে।

আমার মত বানান-বিশারদ খুব বেশী আছেন বলে আমি মনে করি না। নিজের এ অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করে কিছু লিখতে হলে অসংকোচে আমি অভিধান নিয়ে বসি। শুনেছি ইংরাজি ভাষাও শব্দানুসারী অক্ষরে শিক্ষা দেবার পরীক্ষা শুরু হয়েছে, বাংলা ভাষার সে রকম কোনো বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্প্রতি যখন নেই তখন আমাদের জীবনে লেখার বাতিক না ছাড়তে পারলে অভিধানকে নিত্যসংগী করতেই হবে।

হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ-র এক সমস্যায় পড়ে অভিধানের শরণ নিতে নিতে এইমাত্র একটা কথা মনে হ'ল।

আমাদের বাংলা অভিধানে উচ্চারণ দেওয়া থাকে না কেন?

বাংলা ভাষার উচ্চারণে ইংরাজির মত অত গণ্ডগোল অবশ্য নেই। কিন্তু যতদূর জানি জার্মানের মত দ্বিধা-হীন উচ্চারণ পদ্ধতিও তার অক্ষরে নিহিত নয়।

অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অভিধান মূলত সেই ভাষাভাষীদের জন্যেই গ্রথিত হলেও সেখানে যদি উচ্চারণের ইঙ্গিত দেওয়া থাকতে পারে তাহলে বাংলা অভিধানেও তা থাকতে দোষ কি?

বাংলা ভাষায় কয়েকটি উচ্চারণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় নির্দেশ দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। যেমন মন বন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ অকার দিয়ে উচ্চারিত হবে না, তাতে একটু ওকারের ছোঁয়া থাকবে এ বিষয়ে দ্বিধা আছে। যেখানে এরকম দ্বিধা সেখানে বিকল্প উচ্চারণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু খেলা কি ঢেলা জাতীয় শব্দের উচ্চারণে শুদ্ধ একার যে এলায়িত সে নির্দেশটুকু থাকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সমস্ত শব্দেই না হোক যেগুলির উচ্চারণে আক্ষরিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় সেগুলি সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই ব্যতিক্রম শব্দটাই ধরা যাক। ব্যতিক্রম শব্দের ব্য-এর উচ্চারণে একারের একটু এলায়িত ছোঁয়া শিক্ষিত সমাজে চালু। আবার ব্যবহার আর ব্যাকরণের ব্য ও ব্যা-র উচ্চারণের বিশেষ তফাৎ নেই। অভিধানে এই সব উচ্চারণ সমস্যা মীমাংসার ইঙ্গিত কেনই বা থাকবে না!

অনেক শব্দের উচ্চারণ এখনো তর্কাতীত হয়ত নয়। কিন্তু উচ্চারণের একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা রচনার চেষ্টা এখন থেকেই হওয়া উচিত মনে হয়।

ইংরাজি উচ্চারণের ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজের আধিপত্য এখন বি-বি-সিতে অনেকখানি এসেছে বলা যায়। উচ্চারণের একটি শুদ্ধ সংস্কৃত বিদগ্ধ ধারা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্যে এ প্রতিষ্ঠান সদা সচেষ্ট। আমাদের বাংলা বেতার কেন্দ্র এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে সচেতন কোনো আয়োজন সেখানে হয়েছে বলে জানি না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থান থেকে আঞ্চলিক উচ্চারণের ক্রম-পার্থক্য সব দেশের ভাষাতেই দেখা যায়। এককালে নদীয়া শান্তিপুরের এদিক দিয়ে যে প্রাধান্য ছিল আজ কলকাতার বিদ্বৎ সমাজ তা লাভ করেছেন বললে ভুল হয় না।

আকস্মিক দেশ বিভাগের ফলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার মাঝে সেই নগর-কেন্দ্রেও যে উচ্চারণ বিভ্রাটের সূত্রপাত হয়েছে তা নিবারণের জন্যে আভিধানিক নির্দেশের কিছু সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

‘দুই বসন্তে’

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

শঙ্খ ঘোষের ‘দুই বসন্তে’ সাহিত্য আলোচনা পড়ে সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা (যা ইদানীং আমার মনকে খুব বেশী দোলা দিচ্ছিল) বলতে ইচ্ছে হ'ল। এজন্যে সুযোগ দিলে বাধিত হব।

প্রথমেই স্বীকার করে নিই যে, আজকের দিনের কাব্যপ্রচেষ্টা ‘তিরিশের কাল’ থেকে অনেক বেশী এবং সামগ্রিক বিচারে একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক কাব্য-ভাবকল্পে যে মনন ও বিরহ দীপ্যমান তা ভবিষ্যতেরই সুষ্ঠু রূপাভাস। এতদ্‌সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কাব্য উদ্যানে ঘোরা-ফেরা করলে বেদনা জাগে। এবং তা নানা কারণে। সবচেয়ে বেশী লিখেছেন' এবং ‘সবচেয়ে লক্ষ্য গোচর' হয়েছেন এমন কবিরও অনেক-গুলি কবিতা পাঠ করলেই মাত্র একটি কি দুটি সৎ ও সুন্দর কবিতার আস্বাদন পাই। এবং যেহেতু এমন ঘটে অর্থাৎ যেহেতু এরা দশটা কবিতা লিখলে একটা রসোত্তীর্ণ বা অন্যবিধ লক্ষণে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ হয়, তার ফলে কবিতা-পাঠকদের মুশকিলে পড়তে হয়। এইসব রচনার মধ্যে অনেক সময় চমকপ্রদ শব্দ যোজনা থাকলেও অসামান্য অনুভূতির অভাবটা-কে অস্বীকার করতে পারি না। কবি যেন ‘চিত্রকল্প' সৃষ্টি করতে গিয়ে মনের কথাটা বলতে পারেন না। ‘দুই বসন্তে'র লেখক শঙ্খ ঘোষের কবিতাই দেখা যাক্। শঙ্খ ঘোষের বহু কবিতা পাঠে পাঠকের অতি সহজেই মনে হবে যে, শব্দের সঙ্গে কবির এক গভীর সখ্য আছে। কবিতার ঔজ্জ্বল্যও অনস্বীকার্য। ফলে শঙ্খ ঘোষের অনেক কবিতাই পড়তে আরম্ভ করলে চমৎকার লাগে। কিন্তু শেষ হয়ে গেলে অতৃপ্তির বেদনা। তার কারণ পূর্বেই বলেছি। কবির বক্তব্য অব্যক্ত থেকে যায় বলে। মনের কথা মনেই রয়ে যায়।

সাম্প্রতিক কবিতার আর একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে শঙ্খ ঘোষ কিছু বলেন নি। সেটা হচ্ছে, অধিকাংশ কবিতাই সামগ্রিকভাবে পাঠক-মানসে কোনও দাগ কাটতে পারে না। হয়ত কোনও বিশেষ পংক্তি বা বিশেষ একটা 'Image' মনে থেকে যায়। ব্যস্, এইমাত্র। কিন্তু এমন হবে কেন? অলোকরঞ্জনের কবিতায় এই জিনিস পাওয়া যায়। এবং তার কারণ, আমার মনে হয়, অলৌকিক বিষয়ে অলোকরঞ্জনের প্রবণতা।

এমন কয়েকটি কবিতা আজকাল নজরে পড়ছে যার মধ্যে কতগুলি বিশ্রী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যা স্বভাবতই পাঠককে বিড়ম্বিত ও অসুস্থ করে তোলে। এইসব শব্দ কোনও মতেই কাব্যমন্দিরের শুচিতা রক্ষা করে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথাই বলছি। তাঁর একটি কবিতা 'প্রাণপণ কবিতাগুচ্ছ' (ধ্রুপদী/কার্তিক, ১৩৬৮) যেন প্রাণপণ চেষ্টা করেই লেখা 'বোঝাবার জন্যে লিখি না, বুঝবার জন্যে লিখি'—ডে-লুইসের এই মতের সংগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও মিল আছে নাকি!

এই ধরনের কবিতা রচনা করলে কবি 'লক্ষ্যগোচর' হবেন নিঃসন্দেহে, তবে একথাও অসত্য নয় যে, কবি পাঠক হারাবেন।

সবশেষে একটা কথা। সাম্প্রতিক কবিতা যদি পাঠকদের কাছে পুনরায় দুর্বোধ্যতার অভিশাপ নিয়ে আসে তবে তার জন্যে দায়ী সিদ্ধেশ্বর সেনের মত কবি যাঁর অধিকাংশ 'যতিহীন—ভাঙা ভাঙা পংক্তি সমন্বিত কবিতা'-কে কুণ্ডলী পাকানো ভয়াল সাপের মত মনে হয়। ইতি

জীবন ভৌমিক
হাওড়া

॥ ২ ॥

মাননীয়েষু,

শংখ ঘোষের কবিতা সম্পর্কিত শ্রমনিষ্ঠ আলোচনাটি পড়লাম। আধুনিক কবিতা প্রসংগে যে দুয়েকটি কথা মনে এসেছে, সেগুলো নিবেদন করছি।

আমাদের জীবন যত বেশী জটিল হয়ে পড়েছে, তত বেশী কাব্য থেকে আমরা সরে গেছি। এত দুর্ভরতার মধ্যে আমরা সরসতা খুঁজতে চাই এবং সেজন্য কবিতার পাঠক বর্তমানে অনুল্লেখ্য হলেও নিতান্ত কম নয়। তবু কবিতা আমাদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ বা আনন্দের কাজ করতে পারছে না। একথা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন, কোন কবিতাই আশানুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু এটি কেন হবে? কবিতা যদি জীবনেরই আর এক নাম হয়ে থাকে তবে কি তা' জীবনেরই মত নির্মম?

যেসব কবির নাম আলোচনা প্রসংগে এসেছে, তাঁরা অনেকেই, এই তরুণ বয়সেও যেন কিঞ্চিৎ রূঢ় এবং একঘেয়ে। এটুকু ভেবে দেখতে হবে যে, আমাদের ছাত্রজীবনে অতি সহজেই যেমন কবিতাপাঠে উৎফুল্ল হ'তাম, এখন আর তা' হই না। এজন্য কেবল পাঠককে দোষ দিলেই কবির কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। কবিদের বুকের ভেতর যদি গন্ধরাজ লুকিয়ে থাকেও তবে তার ঘ্রাণ আমরা এখনো পাইনি। ইতি

পিনাকী ভাদুড়ী
কলিকাতা-২৬

'চৌরংগী'

লেখকের বক্তব্য

শ্রীমতী তাপসী চট্টোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছেন। তাঁর মতো আমিও জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতার ভক্ত। ব্যক্তিগত জীবনে আমি এই প্রতিভাবান কবির একজন ছাত্র। তাঁর 'মহাদিগন্ত'কে আমি সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে মনে করি। চৌরংগীর বিভিন্ন অংশে আমি সমর সেন, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সম্মান দেবার চেষ্টা করেছি। এবার সেই আসরে আমি জগন্নাথ চক্রবর্তীকে বসাতে চেয়েছি।

শংকর
২৮।৩।৬২

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৮০ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ্

কল্যাণীয়াসু,

আজকাল এমন স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে যে ইতিপূর্বে তোমাকে চিঠি লিখেছি কি না মনে আনতে পারচি নে। যাই হোক মাঝে মাঝে তোমার শরীরের খবর পাঠিয়ো।

কিছুদিন সঘন বরষা গগন আঁধার ছিল, আকাশের এই অপ্রসন্নতা আমাকে পীড়িত করে, আজ আকাশ নির্মল, তাই "মন কো কমলদল খোলিয়া।" দার্জিলিঙে গিরিরাজের মুখশ্রী কী রকম।

য়ুরোপে রাষ্ট্রিক দুর্দিন যে রকম ঘনিয়ে উঠচে তাতে হঠাৎ কোনদিন কোথায় বজ্রপাত হবে এবং কার কপাল ভাঙবে সবই অনিশ্চিত। ইতি ১৬।৫।৪০

কবি

॥ ৪৮১ ॥

ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ্

কল্যাণীয়াসু,

আকাশ মাঝে মাঝে মুখভার করে, আবার তার মেজাজের বদল হতে থাকে, কাল সন্ধ্যের দিকে মনে হোলো দক্ষিণ দিকের কোণ থেকে একটা নালিশ জমে উঠচে আজ সকালে দেখি সেটা বাতিল হয়েছে। কিন্তু ঐ দেখ, বলতে বলতে একরাশ কুয়াশা উঠে সকালবেলাটাকে গিলতে আরম্ভ করে দিলে—এই ব্যাপারটা চলবে বেলা দশটা পর্যন্ত—একেই বলে অ্যাও যায় ব্যাও যায় খলসে বলে আমিও যাব—বৃষ্টি যায় বন্যা যায় কুয়াশা বলে আমিই বা বাকি থাকি কেন? শহরের বাবু যারা পাহাড়ের রাস্তায় পদচারণ করে ক্ষিধে জমিয়ে চা-রসযুক্ত প্রাতরাশ সম্ভোগ করতে চায় তারা কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধমনে বেরিয়ে পড়েছে—ছাতাটা বগলে আছে দুর্দিনের সঙ্গে অ্যাপীস্-মেণ্টের ব্যবস্থা রইল। তোমাদের দার্জিলিঙের রাস্তায় নিঃসন্দেহ এখন ম্যাকিণ্টশের একাধিপত্য।

যুদ্ধের অবস্থাটা মোটেই আশাজনক নয়। শুনতে পাই আমাদের স্বদেশীয় অনেকেই এই নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করচেন। ভীরুর আনন্দ এতেই—জগৎজোড়া বিভীষিকা তাদের কাছে মজার জিনিস হয়ে উঠেছে। কিছুকাল থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে, তার কারণ বোধ হয় দূরের দুর্যোগ আমার মনের মধ্যে কুয়াশা জমিয়ে রেখেছে। জানি মানুষের বহু দিনের সঞ্চিত পাপ হঠাৎ প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে নেয়। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার ও নির্দয়তা সভ্য দেশের ইতিহাসে অন্তঃশীলা হয়ে বয়ে এসেছে, ঐশ্বর্যের মায়াজালে তাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ যখন হিসাব নেবার দিন আসে তখন আবরণ খুলে যায়। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত আর এক রকমের, এ নিত্য, এর কোনো আড়ম্বর নেই—পঙ্কিল জলের প্রবাহিণীর মতো জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন অবিলত চলেছে—বৃহৎ সংসারে এর স্বাস্থ্যকর ব্যবহার-যোগ্যতা নেই এই লজ্জার অবসান দেখিনে।

আমাদের এখানকার দূরের বাণী ডাকের পেয়াদার হাতে—তার বেতারের হাতে নেই। কেমন আছ? ইতি ২৫।৫।৪০

কবি

॥ ৪৮২ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ্

কল্যাণীয়াসু,

Calc. Sulph খেয়ে যখন তোমার উপকার হোলো না বরং তোমার ঘা বেড়ে চলেছে তখন ওটা বন্ধ করাই ভালো। এইবার পরীক্ষা করে দেখ Salicia। ৯৯৯ নয় বায়োকেমিকও। গিরিলক্ষ্মী তার বেগনী চেলির উপরে সোনালী রোদ্দুরের উড়নি উড়িয়েছে। বুলি-বুলা কালিম্পঙে আসর জমিয়েছে। এবার জনতা এখানে যথেষ্ট। ২৯।৫।৪০

কবি

॥ ৪৮৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, কাল টেলিফোনের কর্তারা শান্তিনিকেতনে টেলি-ফোনের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে গেলেন তাতে ফল ভালো হবে কি না সন্দেহ করি। কোলাহলের একটা বাধা ছিল দূরত্ব, সেটা অপসারিত হলেই প্রয়োজন থাক বা না থাক শব্দ সমুদ্রে ঘা পড়বে কেবলি, শব্দভেদী বাণ আসতে থাকবে এখানে শিকারকে লক্ষ্য করে বের করতে। ভগবান মনুকে প্রশ্ন করতে হবে আছি তবু নেই বললে অপরাধ হয় না কোন কোন নিদারুণ ক্ষেত্রে। আজও কৃপণ আকাশ প্রতিদিন দাক্ষিণ্যের ভান করচে আমরা কেবলি শূন্যকে দিচ্চি ধিক্কার। আষাঢ় শেষ হয়ে এল—আসন্ন শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে আছি এ বছরের বর্ষার জলসরের জন্যে। আসল কথা ভালো লাগচে না অথচ সেজন্যে ঝগড়া করবার লোক পাচ্চিনে—শমন জারি করব কোন্ আসামীকে তার ঠিকানা কোথায়—আর বড়ো আদালতই বা কোন্ সদরে? ইতি ২৭ আষাঢ় ১৩৪০

কবি

॥ ৪৮৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, এইমাত্র ঘনঘটা করে আকাশটা ঝোড়ো চেহারা ধরেছে। যেন শ্রাবণের নাম রক্ষা করতে এল। কিন্তু বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ—রাজ কুলেষু চ। বারবার বঞ্চনা করেছে এবারও করবে। রাগ করে মনে করচি এ বছর বর্ষামঙ্গল করব না। কিন্তু বেরসিক আকাশ—পার্বণীর পরে কোনো লোভ নেই—মর্ত্যবাসী যাদের আছে লোভ তারা কবিকে গান দেবে।

সামনে আমার একটা ফাঁড়া আছে—সেই অক্সফোর্ডের অনুষ্ঠান। মাতব্বর লোকেরা জমা হবে, নিজেকে তুচ্ছ বোধ হবে।

শরীরটা মাঝামাঝি অবস্থায় আছে? বর্তমান আবহাওয়ারই মতো—অর্থাৎ স্পষ্ট কিছুই নয়। কলমটা মর্জুরি করতে থাকে তাগিদে প'ড়ে, মনটা মুখ বেঁকিয়ে বসে থাকে।

তোমাদের খবর দুই এক লাইন লিখে দিয়ো। ইতি

২ শ্রাবণ ১৩৪৭

কবি

॥ ৪৮৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, শ্রাবণ নিজ মূর্ত্তি ধরে নেবে এসেছে। এতদিন ব্যঙ্গ করছিল। আকাশ গর্জন করে উঠচে—ধারাবর্ষণেও কৃপণতা নেই। আশা করি এখনো চাষীদের সময় পেরিয়ে যায় নি। জীবন আমাকে সাতদিনের ওষুধ পাঠিয়েছে খেতে রাজি আছি। কিন্তু জানিনে কী লক্ষ্য করে তার এই ওষুধ। এবারে কলকাতা থেকে আসবার পূর্বে একটা বোতলে পরীক্ষার জন্যে মূত্র ধরা হয়েছিল। তার ফলের খবর পাইনি—ভেবেছিলুম সেটা পরীক্ষা করা হয়নি। জীবনের পত্রের আভাসে বোধ হচ্চে এলবুমেন কিম্বা ফসফেট হয়ত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনকার urine নিতান্ত সাময়িক—তার পরে এখন সহজ হয়ে এসেছে। কোনো উপসর্গ অনুভব করিনি। তবু ওষুধ খাব। আমাকে চিন্তিত করেছে আমার দৃষ্টি—তার জন্যে Silacia, Nat, Mur, Calc, Fluor, খেয়ে থাকি—সেগুলো বন্ধ রাখব। কিন্তু চক্ষু অন্ধ করে আর কোনো রোগের দিকে দৃষ্টি দেবার উৎসাহ আমার নেই। তবু কথা দিচ্ছি কাল থেকে জীবনের ওষুধ চালাব। সুধাসমুদ্র কলকাতায় যাচ্চে তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে দেখো। —মন প্রসন্ন হয়েছে—বর্ষামঙ্গল চালানো যাবে। বউমা দাঁত তোলাতে কলকাতায় গেছেন বোধ হয় দেখা হবে। ইতি ২৪।৭।৪০

কবি

॥ ৪৮৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

Miss Allan-এর খবর নিয়ো তার জ্বর আসবার সময় এলো।

August 1940

কবি

॥ ৪৮৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

একেবারে চার প্যাকেট সাবান—একেই না বলে স্ত্রীবুদ্ধি, তা মেয়েলি বোকামি খুব যে খারাপ লাগে তা বলতে পারিনে।

নানারকম দায় ঘাড়ে চেপেছে। হীরেন্দ্র দত্তের সম্বর্ধনা, সাহিত্য পরিষদে বাণী চাই। আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন বেরিয়েছে অভিমত চাই। আনন্দবাজারে ছেলেদের বিভাগে কবিতা পাঠিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করা চাই, সোম মঙ্গলবার ক্লাস নিতে হবে। সর্বোপরি আছে অরবিন্দ, বেচারাকে অনেক পিটুনির পর ঠাণ্ডা করে দিয়েছি সে চাটগাঁয়ে চাকরি পেয়েছে—কলকাতা থেকে লোকের আমদানি চলচে—তা ছাড়া রাত্রে বিছানায় শুতে যেতে হয়, দিনের বেলায় খাবার আসে—কী মুশকিল ভেবে দেখ। কাল আসবে সুধাকান্ত, তার আলাপ টগবগ করে ফুটে উঠবে কানের কাছে। গল্প লেখা চলেইচে কোনো ইন্‌স্পিরেশন নেই নিকটের পাড়ায়। সংসারের খুচরো দুঃখ আরো অনেক কিছু আছে—যেমন চিন্তা করে দেখো আমও আসে তার দামও দিতে হয় না, তার জাতও ভালো, চেহারাও মন্দ নয় অথচ মুখে দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না। আমার দুঃখের এই ফর্দ তোমার কোন্ ঠিকানায় পৌঁছবে জানিনে। কোমল হৃদয়ে দুঃসহ ব্যথা লাগবে এই আশঙ্কা। ইতি ২০।৮।৪০

কবি

॥ ৪৮৮ ॥

ওঁ

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়াসু,

জীবনের রণক্ষেত্র থেকে ভগ্নদূত এবার বেরিয়ে চলে এসেছি ধ্বজ পতাকা সমস্ত ফেলে দিয়ে। চাকা ভাঙা রথে আছি চলৎশক্তিহীন হয়ে। বর্তমানে আমার অবস্থিতি কালিম্পঙে, ডাক্তারহীন দেশে যাওয়া নিষেধ। ওদিকে বাংলা দেশের সমতট প্রদেশে গরম অসহ্য, দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

তোমার সম্বন্ধে জনশ্রুতি সন্তোষজনক নয়। তুমি জানিয়েছ Calc, Sulf, তোমার পক্ষে অকার্যকরী। এটা অশাস্ত্রীয়। Silacia-র সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে পারো।

লেখাপড়া আমার বন্ধ চলাফেরা তথৈবচ। অসুস্থদেহে বউমার ঘাড়ে আমার অস্বাস্থ্যের দায় চাপিয়ে বসে আছি—তাঁর সঙ্গিনী আছেন সেই ইংরেজ মেয়েটি, কিছু কিছু শুশ্রূষার কাজ পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। এতদিন এখানে শরৎ রৌদ্রের প্রভাব ছিল আমি আসতেই আকাশে মেঘের আচ্ছাদন পড়েছে। ২০।৯।৪০

কবি

কবির অক্সফোর্ড ডিগ্রি পাবার অনুষ্ঠানের সময় শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম, এবং অনুষ্ঠানের পরেও কয়েকদিন ছিলাম সেখানে। তার কিছুদিন আগে থেকেই Miss Allan নামে একটি বর্ষীয়সী ইংরেজ ভদ্রমহিলা কবির শুশ্রূষার জন্যে এসেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে থাকার অল্পদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হন। শুশ্রূষা পাওয়া দূরে থাকুক তাঁর রোগের চিন্তাতেই কবিকে বিব্রত হতে হয়েছিল। কারো অসুখ হয়ে কষ্ট হচ্ছে এ খবর পেলে কিছুতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। ইতিপূর্বে বার বার আমার চিঠিগুলোর মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিস্ অ্যালেনের জন্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছেন, ক্ষণে ক্ষণে আমাকে কি মীরাদিকে গিয়ে দেখে আসতে বলছেন, কারণ আমরা দুজনে কবির নতুন বাড়িটার একতলায় ছিলাম তখন—কবির বাস দোতলায়। আমি একবার ঠাট্টা করে বলেছিলাম কে কার সেবা করছে তার ঠিক নেই। ভদ্রমহিলা আপনাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন আপনারই তাতে কাজ বাড়লো। অত্যন্ত ব্যথিত মুখে বল্লেন "আশ্চর্য! তোমরা ওর কষ্টটা বুঝতে পারছো না। এই দারুণ গরম, ঠাণ্ডাদেশের মানুষ, তার উপরে ১০২°/১০৩° জ্বর উঠছে। বেচারা কষ্ট পেলেও মুখ ফুটে বলে না, কারণ সংকুচিত হয়ে রয়েছে আমাদের বিব্রত করছে বলে। আমার ওর জন্যে ভারি কষ্ট হচ্ছে। আঃ! কোনোরকমে ও সেরে উঠলেই ও যেখান থেকে এসেছিল সেখানে পাঠিয়ে দেব। এই গরমে শান্তিনিকেতনে বিদেশীদের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। মনে কোরো না এতটা গরম সহ্য করা ওদের পক্ষে সহজ।"

যে পাস্তেরনাক ছবি আঁকতেন

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেও 'পাস্তেরনাক' বলতে পশ্চিম দেশের লোক যাঁর কথা ভাবত, তিনি যে 'ডাঃ জিভাগো'র রচয়িতা নন্—সে কথা বলাই বাহুল্য। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কলাবিদ এবং চিত্রশিল্পী লিওনিড পাস্তেরনাক; তাঁরই পুত্র বোরিস পাস্তেরনাক গত তিন চার বছর সাহিত্য-জগতের অজস্র বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যশই যাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বিশ্বের চিত্রামোদীরা এ-বছর ৪ঠা এপ্রিল লিওনিড পাস্তেরনাকের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছেন। কারণ লিওনিড কেবল রাশান্ চিত্র আন্দোলনকেই নতুন খাতে প্রবাহিত করেননি; সমসাময়িক শিল্প-জগতের সর্বত্রই গভীর আলোড়নের সৃষ্টিও করেছিলেন তিনি। সোভিয়েত দেশ-গুলোর স্টেট গ্যালারিতে, ব্যক্তিগত এবং সরকারী অগণ্য সংগ্রহে লিওনিডের আঁকা ছবি যেমন সযত্নে রাখা আছে, তেমনিই তার কদর লুক্সেমবুর্গ, বার্লিন (কুফ্যার্-স্টিককাবিনেট্), অক্সফোর্ড, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, টেট গ্যালারি, ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ব্রিস্টল, বার্মিংহাম, সাদাম্পটন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কত-না চিত্রামোদীর মক্কা-মদিনায়! পোর্ট্রেট শিল্পীরূপে লিওনিডের খ্যাতি কম ছিল না; বীটোভেন্ থেকে তলস্টয়, আইনস্টাইন—সবাইকেই শিল্পী ধরে রেখেছেন তাঁর ক্যানভাসে।

পোর্ট্রেট আঁকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লিওনিড। মডেলের বাহ্যিক রূপটুকু ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছতে পারত তার ব্যক্তিত্বের উৎসমূলে। চরিত্রের জীবন্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি সহজেই আরোপ করতেন তাঁর আঁকা ছবিতে। আঙ্গিক আর প্রয়োগকুশলতার ওপর অসাধারণ দখল আর গভীর এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল লিওনিড পাস্তেরনাকের আঁকা পোর্ট্রেটগুলির প্রাণ।

তরুণ লিওনিড চিত্রবিদ্যার সম্যক পরিচয় পান মুনিখের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব্ আর্ট-এ অধ্যয়নকালে। ফরাসী চিত্রধারা তাঁকে সে-যুগে কম প্রভাবান্বিত করেনি। কিন্তু, অনতিকাল পরেই মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটে উঠল লিওনিডের প্রতিটি আঁচড়ে, পরিবর্তনশীল জীবনের জঙ্গম রূপকে শাশ্বত করে তোলবার ক্ষমতা আত্ম-প্রকাশ করল।

শিক্ষক ও সতীর্থদের উৎসাহে লিওনিড প্রস্তুত হলেন শিল্পকেই জীবনের উপজীব্য করতে। অথচ, পিতামাতার অনুরোধ এড়াতে না পেরে আইনের ডিগ্রিও তাঁকে নিতে হল।

১৮৮৯ সালে লিওনিড মস্কোতে পাকা-পাকি আস্তানা গাড়লেন বিখ্যাত পিয়ানো-শিল্পী রোজা কাউফমানকে ঘরনীরূপে পেয়ে। কালক্রমে দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে এল তাঁদের ঘর আলো করে।

পিটার্সবার্গ ললিতকলা আকাদেমি-সংশ্লিষ্ট শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে

বরিস্ পাস্তেরনাকের পিতা শিল্পী লিওনিড পাস্তেরনাক

শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত পত্নী রোসোলীর প্রতিকৃতি

লিওনিড কর্তৃক অংকিত বিখ্যাত জার্মান সুরকার বীথোফেন-এর প্রতিকৃতি

লিওনিড কর্তৃক অংকিত পুত্রকন্যাদের ছবি বরিস, যোসেফিন, লিডিয়া ও আলেক্সান্দার

কলাভবন প্রিন্স লভোভ-এর প্রচেষ্টায় ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পবিদ্যাপীঠে পরিণত হয়, লিওনিড সেখানেই শিক্ষকতার সুযোগ পেলেন মস্কোয় এসে।

১৮৯৩ সালে স্বনামধন্য রেপিন, কিভ্‌শেংকো আর ভেরেশ্‌চাগিনের সঙ্গে লিওনিড পাস্তেরনাকও পেলেন এক অভাবনীয় আমন্ত্রণ : তলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জার ভার। এই সূত্রে তলস্টয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যই শুধু পেলেন না লিওনিড, পেলেন তলস্টয়ের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ। কিছুদিন বাদে 'রিসারেকশান' গ্রন্থটিরও অঙ্গসজ্জার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হল। ফলে, তলস্টয়ের ঘরোয়া জীবনের বহু চিত্রই লিওনিডের তুলির আঁচড়ে অমর হয়ে রইল।

স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য সপরিবারে বার্লিনে বেশ কিছুকাল কাটালেন লিওনিড, চিকিৎসার সুবিধার্থে। এবং বার্লিনে লিওনিড পেলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বীকৃতি ও সমাদর।

লিওনিডের গুণমুগ্ধ এক ধনী ইংরেজ সমঝদার, লর্ড ডেবার্নন (D'Abernon) ১৯০৭ সালে তাঁর কন্যার চিত্র আঁকানোর উদ্দেশ্যে শিল্পগুরুকে লণ্ডনে আনালেন। ইংল্যান্ডে প্রবাসকালে, আঠারো শতকের ইংরেজ শিল্পীদের মাস্টারপীসগুলির মূলে কপি তিনি দেখবার সুযোগ পেলেন; বিশেষ করে টার্নারের শিল্পরীতির স্বরূপ উপলব্ধি করে লিওনিড তাঁর আত্মজীবনীতে টার্নারকে অভিহিত করেছেন ফরাসী ইম্প্রেশনিজম-এর জনক বলে। স্বীকৃতি, যশ, খ্যাতি, অর্থ—কোনও প্রলোভনই লিওনিডকে বাঁধতে পারল না লণ্ডনে; সব অনুরোধ তুচ্ছ করে, কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণ শেষে তিনি ফিরে গেলেন মস্কোতে, তাঁর আর্ট-আকাদেমিতে!

জার্মান ভাষায় ম্যাক্স অসবোর্ন-এর ভূমিকা সমেত ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হল লিওনিডের আঁকা ছবির অ্যালবাম। কলা-সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ-উৎকর্ষের অভূতপূর্ব এই সমন্বয়ের মধ্যে শিল্পী লিওনিডের একনিষ্ঠ শ্রম চরম সার্থকতা পেল। ছাপাখানায় বসে শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বয়ং তিনি পাথর কেটেছেন, ব্লক বানিয়েছেন, নিখুঁত করে তুলেছেন প্রতিটি ডিটেল। প্রকৃত শিল্পের প্রতি যেমন অকৃত্রিম ছিল তাঁর অনুরাগ, তেমনি গভীর তাঁর অভিজ্ঞতা।

চার-দশকের শেষভাগে, দ্বিতীয়বার পাস্তেরনাক সস্ত্রীক ইংল্যান্ড ভ্রমণে গেলেন। ১৯৩৯ সালে, মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, রোজা পাস্তেরনাকের আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়ল লিওনিডের দেহ-মন। মস্কো ফিরে যাওয়া অসম্ভব দেখে তিনি অক্সফোর্ডে তাঁর মেয়ের কাছেই থেকে গেলেন। জীবনের এই শেষ পাঁচ বছরও তিনি সমানে ছবি এঁকে গেলেন, আর লিখে গেলেন তাঁর স্মৃতিকথা।

তিরাশি বছর বয়সে, ১৯৪৫ সালের মে মাসে, অক্সফোর্ডেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পোর্ট্রেট, স্কেচ, ল্যান্ডস্কেপ, স্টিল-লাইফ—কোনও মাধ্যমেই তাঁকে কম সফল দেখা যায় না। তেলরং, জলরং, প্যাস্টেল বা পেন্সিল, কয়লা ছাড়াও নিজের উদ্ভাবিত মসলা দিয়েও তিনি কম ছবি এঁকে যাননি। সর্বত্রই তিনি রেখে গিয়েছেন স্বকীয়তার ছাপ।

তলস্টয় পাস্তেরনাককে বলেছিলেন যে, এই সংসারে সবই জঙ্গম, সবই অনিত্য, ধ্বংসের কবল থেকে কোন কিছুই রক্ষা পায় না। কেবল, মানুষের শিল্পে যদি এক তিলও সত্য থেকে থাকে, অমর হয়ে থাকবে সেই শিল্প।

লিওনিড পাস্তেরনাকের জন্ম-শত বার্ষিকী উপলক্ষে, তাঁর শিল্পকীর্তি আজ অম্লান দেখে স্বভাবতই আমার মনে পড়ে গেল তলস্টয়ের উক্তিটি।
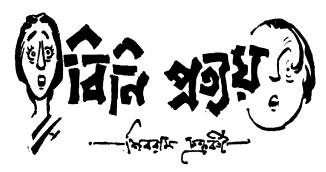
বিনিকে নিয়ে......কী আর বলব। যা মুশকিল হয়েছে আমার।

বিশ্ব-ব্যাকরণের মধ্যে না থাকলেও বিনপ্রত্যয় বলে একটা জিনিস আছে যার সংজ্ঞা হয় না। আমার বোন বিনির মতন মেয়ের খপ্পরে যে পড়ে কেবল তার ভেতরেই এই বোধ গজায়। একরকমের প্রজ্ঞা...... বোধিও হয়ত বলা যায় যা তার অন্তরে সঞ্চারিত হয় যার দ্বারা......

যার দ্বারা সে অজ্ঞান হতে হতে সামলে ওঠে।

এই যেমন আজ সকালেই!

একটা জরুরি ঠিকানা কি করে পাই তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি সেই দুর্ভাবনার দারুণ মুহূর্তে বিনি এসে উপস্থিত।

'হাঁ দাদা? সেই লোকটার নাম কি বলতো সেই যে কমেডিয়ান?'

'কে?' ভাবনার মধ্যিখানে হোঁচট খাই।

'সেই যে বাদামী রঙের বেঁটে মানুষটি চোখে চশমা......বিলিতি হাসির বইয়ে প্রায়ই যাকে দেখা যায়।

'ড্যানি কেয়ীর কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই ত। ড্যানি কেয়ীই ত। আশ্চর্য, তার নামটাই ভুলে গেলাম!'

'কিন্তু সে তো মোটেই বেঁটে নয়। বেশ লম্বা চেহারার। আর রঙও তার বাদামী না, তাছাড়া, তার চশমাও নেই।'

'হ্যাঁ, তা বটে।' বলল বিনি: 'তাহলেও তুমি ত বুঝেছ আমি কাকে মীন করেছি।'

তা বুঝেচি বটে। বিনি প্রত্যয়ের দ্বারাই বুঝেছি। এটাকে টেলিপ্যাথি বলতে পারেন কিম্বা অষ্ট বিভূতির কোন একটিও হতে পারে, যা কোন কষ্ট না করেই আমার আয়ত্তে এসে গেছে। আসলে এটা বিনির সাহচর্য। তার সঙ্গে বহু বিনিদ্র দিবসের বাক্যবিনিময়ের ফল।

'ড্যানি কেয়ীর একটা ছবি এসেছে মেট্রোয়, তার টিকিট কাটতে যাচ্ছিস বুঝি? তা যা। আমিও যেতাম কিন্তু আমি একটা খুব জরুরি ঠিকানা নিয়ে পড়েছি......খোঁজ পাচ্ছিনে।'

'ঠিকানা? কার ঠিকানা গো? কিসের ঠিকানা?'

'এক উপমন্ত্রীর।'

'উপমন্ত্রী? তা, দমকলে খোঁজ করলেই পারো।'

'দমকল? দমকলে খোঁজ করতে বলছিস?' বিস্ময়ে আমার দম আটকায়: 'তারা তো আগুন নেবায় রে? আমার মাথার আগুন কি নেবাতে পারে? ও, বুঝেছি। তুই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে খবর নিতে বলছিস? তাই না?'

আবার সেই বিনি-প্রত্যয় কাজে লাগে। অকৃত্রিম এবং অব্যর্থ।

'তাই তো বলছি আমি। সেখানেই ত পাঁচ বছর অন্তর মন্ত্রীদের দম দিয়ে আবার চালু করে দেওয়া হয়।'

'তাই বল।' তারপরে আমি রাইটার্স বিল্ডিং নিয়ে পড়ি। বিনি চলে যায়। টেলিফোন করি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অনুসন্ধান বিভাগে।

বরাজ না রাজ্?

'হ্যালো হ্যালো হ্যালো......'

'হ্যালো......কাকে চাই?' ললিত লালন্য কণ্ঠের লহরী শোনা গেল।

আমি উপমন্ত্রীর নাম বললাম।

বলি, নাক আছে তো?

'কে আপনি?'

'আমি? আমি শিবরাম চক্রবর্তী।'

'বরাম, না, ব্রাম্?'

'সে কি?' শুনে আমার চমক লাগে। —'তার মানে?'

'মানে, আপনি শিবরাম, না, শিব্রাম্?'

'যেটা ইচ্ছে।' আমি জানাইঃ 'ও দুইই আমি।'

'উপমন্ত্রী মশাই এখন আপিসে নাই।'

'কোথায় গেছেন? কখন আসবেন?'

'মাপ করবেন। মন্ত্রীদের গতিবিধির কথা জানাতে মানা আছে।'

'কী মুশকিল! আমার যে তাঁকে ভীষণ দরকার। দয়া করে তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা বলুন তাহলে। বাড়িতে নিরিবিলি পেলেই আমার সুবিধে আরো।'

'বাড়ির ঠিকানা? অসম্ভব। বাড়ির ঠিকানা আমি বলতে পারব না।'

'জানা নেই আপনার?'

'জানি বই কি, কিন্তু বলা নিষেধ।'

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে বিনির আতঙ্কিত আর্তনাদ ভেসে আসে।—'দাদা দাদা! ওমা, এ কী!' আওয়াজটা ছুটে এসে আমার টেলিফোন সূত্র ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

রিসিভার ফেলে ও-ঘরে দৌড়ই। —'কী! কী হয়েছে?'

'এই যে! তোমার বিছানার চাদরটা! কী হয়েছে দ্যাখো না একবার।'

'কিছুইত দেখতে পাচ্ছিনে। ঠিকই ত আছে।'

'কী নোংরা হয়েছে, ইস্! তেলচিটে পড়ে গেছে। এমন নোংরা বিছানায় তুমি শোও কি করে গো? কী নোংরা তুমি বাবা!'

'আমি মুখ বুজে খাই, চোখ বুজে শুয়ে পড়ি। চোখ খুলে ঘুমুইনে।'

'বলি নাক আছে তো? টের পাও না নাকে?' বলে বিনি উদাহরণ-স্বরূপ হয়ে ওঠে, নাকে কাপড় চাপা দেয়ঃ 'নাক ডাকিয়ে ঘুমোও বলে কি নাকে গন্ধ পাও না! তোমার চাদরের গন্ধে যে ভূত পালায়!'

'ভূত পালাতে পারে।' আমি প্রতিবাদ করিঃ 'আমি ত এখনো ভূত হইনি। ভূতপূর্ব অবস্থাতেই আছি।'

'যাও নিয়ে যাও।' চাদরটা গুটিয়ে আমার হাতে তুলে দেয় সে।—'ওই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে রেখে দাও গে আর সব ময়লা কাপড়ের সঙ্গে। ধোপা এসে নিয়ে যাবে এখন।' বলে সে বিছানায় ধোপদুরস্ত চাদর পাতে।

বিনি কী বলতে চেয়েছে বুঝতে পারি। কিন্তু এবার আমার প্রজ্ঞা না খাটিয়ে ওর আজ্ঞামতই চলি। চাদরটা ধোপার ময়লা কাপড়ের ঝুড়িতে না রেখে আমার

টেবিলের পাশে ফালতু কাগজের আবাসে গ‍ুজে দিই। দেখবার মত একখানা দৃশ্য হয় বটে!

হদিশ আমি পেয়ে যাই

টেলিফোন নিয়ে পড়ি আবার।

'হ্যালো......শুনুন! ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা আমার ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভীষণ দরকার।'

'বুঝলাম, কিন্তু বাধা আছে। অফিসিয়াল রেগুলেশনে বাধে।'

'আমাকে আন্-অফিসিয়ালি বলতে পারেন না? লক্ষ্মীটি!'

'মাপ করবেন। নিষেধ অমান্য করতে পারব না।'

'তাহলে আর কি করে তাঁকে পাব!' সখেদে আমি বলি।

'মিস্টার রাম্, কিছু মনে করবেন না। আমি অতিশয় দুঃখিত।'

'তা তো বুঝলাম।' করুণ কণ্ঠে আওড়াই: 'আপনাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য আমিও দুঃখিত। ক্ষমা করবেন আমাকে। ওঁর ঠিকানা দেখছি পাবার কোনো উপায়ই নেই।' আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমাদের হাত পা বাঁধা।' তিনি সুমধুর কণ্ঠে জানান: 'আপনি একবার টাইমটেবলটা উলটে দেখুন না। সেইখানেই তাঁর ঠিক ঠিকানা পাবেন।'

টাইমটেবল? শুনে তো আমি ঘাবড়ে যাই। মন্ত্রিবর কিছু মেল ট্রেন নন (এমন কি তিনি মেল হলেও) যে নম্বরওয়ারি প্ল্যাটফর্মে তাঁর যাতায়াতের খবর পাবো? মেয়েটির এহেন রসিকতা করার মানে?

অজানার মর্মভেদের সাধনায় রয়েছি বিনি তার মাঝখানে এসে হানা দেয়—'এর মানে?' সে চেঁচিয়ে ওঠে: 'নোংরা চাদরটা তুমি এখানে এই ওয়েস্ট পেপার বাসকেটের মধ্যে গুঁজে রেখেছ যে?'

'তুমি তো তাই বললে। ওয়েস্ট পেপারের মধ্যে রাখতে বললে না?'

চালাকি কোরো না। 'আমি যা বলেছি তুমি বেশ বুঝেছ। 'কী বলেছি আমি?'

'বলই না। তুমি বললে তবে তো আমি বুঝব।'

'আমি বলেছি বাজারের থলির মধ্যে রাখতে।'

'তা আমি পারব না।' সাফ বলে দিই: 'থলের ভেতর ঐ ময়লা চাদর ঠেসে নিয়ে বাজারময় আমি ঘুরতে পারব না। তাহলে বাজার রাখব কার মধ্যে? না, তুই নিয়ে যা ওটা, তোর ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখ বরং।'

না, বিনি প্রত্যয়ের দ্বারা কিছুতেই আমি আর বুঝব না। বুঝতে চাইব না। চূড়ান্ত হয়েছে। এবার আমি মরীয়া। যেটি বলবে ঠিক সেইটিই করব আমি। কথা মতন কাজ। কাজ বাজিয়ে অন্য কথা।

কিন্তু উপমন্ত্রীর ঠিকানাটা? মেয়েটা বলল রেলের টাইম টেবলের পাতা হাটকাতে......

ও, তাই! বিনিপ্রত্যয় হঠাৎ এসে আমার মগজের মধ্যে ঘাই মারে। আমি ছাড়তে চাইলেও কমলি আমায় ছাড়ে না!

মেয়েটি টাইম টেবল দিয়ে কী বলতে চেয়েছিল আমি বুঝতে পারি। সংগে সংগেই উপমন্ত্রী মশায়ের বাড়ির হদিশ আমি পেয়ে যাই।......

টেলিফোন ডিরেক্টরীর মধ্যেই ঠিকানাটা ছিল!

অন্ধ্র রাজ্যে আধুনিকতার দিক পাশে পাশে প্রাচীন ধারার মানুষ ও জীবনযাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে (১) আদিলাবাদ জেলার আদিবাসী মহিলাদের উৎসব নৃত্য, কিংবা (২) কয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত উৎসব নৃত্য। ইসলাম যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর এবং হায়দ্রাবাদ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তা হয়ে ওঠাও স্বাভাবিক। বিখ্যাত নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে (৩) মীনা মসজিদ, এবং (৪) প্রধান ন্যায়ালয়।

আলোকচিত্রশিল্পী

বীথি সরকার

ছেলেগুলো

দিনেশ দাস
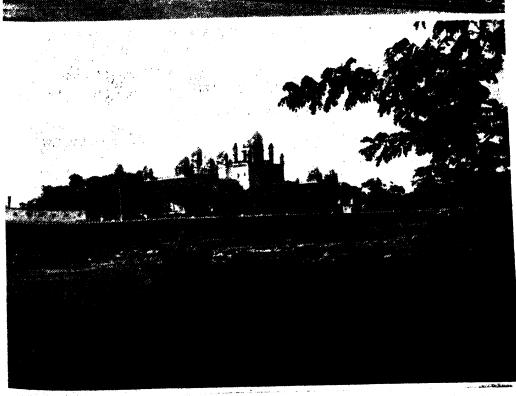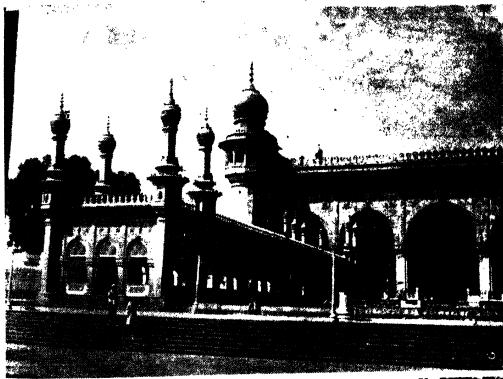
স্কুলের শেষের ঘণ্টা বেজে গেলে পরে
অদ্ভুত স্তব্ধতা নামে ঘরে দোরে চত্বরে প্রাচীরে
মনে হয় হাজার প্রাণের কলকল
কার জাদুমন্ত্রে যেন হিম হয়ে জমেছে অচিরে।

কান পেতে শোনো
পরিচিত কণ্ঠস্বর কথা কয় তবুও এখনো
তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠ বারেবারে
ভারী দরজায় এসে ঘা দেয় নিঃসাড়ে।

অথচ তারা তো নেই বাগানে, থামের পাশে ঘুলঘুলিটায়
নেই তারা কোণের কোঠায়
তবু যে কখন এল বাতাসের তোড়ে
সন্ধ্যার পাখির পথরেখাটুকু ধরে।

তাদের অদৃশ্য পথে মন বাঁধে বাসা
সহসা উজাড় করে দিতে চায় যত ভালবাসা।
ক্রমশ তাদের কণ্ঠ ওঠে কলকলি
নির্জন জংগলে যেন পাখির কাকলি।

হঠাৎ নীরার জন্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাস স্টপে দেখা হল তিন মিনিট অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মত বিঁধে থাকতে স্নিগ্ধ পাড়ে, দিকচিহ্নহীন
বাহান্ন তীর্থের মত এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্র দ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে? তুমি
আজই কি ফিরেছো?
স্বপ্নের সমুদ্র সে কি ভয়ংকর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিন দিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মত দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে গেছে নীল জলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হল কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মত,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মত লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মত তোমার ও শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।

জানলায় সহাস্য মুখ, 'আজ যাই, বাড়িতে আসবেন!'
রৌদ্রের চিৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।
'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরীর মাঠে', বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে-পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম,
রিকশা, লোকজন
ডিগবাজির মত পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পৌঁছে গেছি অফিসের লিফটের দরজায়।

বাস স্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ।

'ভেন্দেত্তা'

সৈয়দ মুজতবা আলী

(২)

কেউ জানে না, আল্‌ফা যেদিন প্রথম খবরের কাগজে তার মাতৃহন্তার নাম দেখল তখন তার মনে কি চিন্তা উদয় হয়েছিল। পূর্বেও এ-বিষয় নিয়ে সে কখনো কারো সঙ্গে আলোচনা করেনি। আজও করলো না। বস্তুত ভবিষ্যতে যখন সমস্যা তার কঠিনতম রূপ নিয়ে চরম সময়ে পৌঁছল তখনো সে ঐ নিয়ে কারো সঙ্গে সামান্যতম আলোচনা করেনি।

শুধু তার স্বামী লক্ষ্য করলো, আল্‌ফা আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

আল্‌ফা আবিষ্কার করেছিল তার মাতৃহন্তা আউরেলিয়ো বুস্‌সির নাম জানুয়ারি মাসে (১৯৫৬ খৃঃ)। এরপর মার্চ অবধি সে গম্ভীর।

মপাসাঁর নেকলেস গল্পে মাতিল্দ্ কী কঠোর পরিশ্রম করে হারানো নেকলেসের দাম তুলেছিল তার বর্ণনা আছে মাত্র কয়েকটি ছত্রে—দশ বছরের নিদারুণ খাটুনির সংক্ষিপ্ত ছবি। মপাসাঁ যদি এই তিন মাসের কাহিনীটি লিখে যেতেন তবেই এর প্রতি সুবিচার হত। এ কাহিনীর রিপোর্টার কার্ল রাও উত্তম রিপোর্টার; কিন্তু তিনি তো মপাসাঁ নন।

অবশেষে মার্চ মাসের (১৯৫৬) সন্ধ্যার দিকে নাটকের নূতন অংক আরম্ভ হওয়ার লগ্ন এল।

আলফা তার স্বামীর পিস্তলটি দেরাজ থেকে বের করে ওভারকোটের পকেটে পুরলো। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বাস ধরে রওয়ানা দিলে ক্রেভালকুয়োরের দিকে—যেখানে বুস্‌সি মাত্র তিন মাস আগে ম্যুনিসিপাল চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। সামান্য কয়েক মাইলের রাস্তা।

অতি শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে আল্‌ফা ম্যুনিসিপাল অফিসে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। ঐ তো সে! যাকে সে বারো বছর ধরে খুঁজছে!

আর তার ভাবনা নেই।

আলফার হাত কাঁপেনি! পিস্তলটি পকেট থেকে বের করে ছটি গুলি চালিয়ে দিলে চেয়ারম্যান সাহেবের বুকের ভিতর। আউরেলিয়ো বুস্‌সি তার পায়ের কাছে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লেন।

কয়েক মিনিট পরেই আল্‌ফাকে দেখা গেল পাশের থানায়।

"আমাকে অনুগ্রহ করে গ্রেপ্তার করুন। আমি আউরেলিয়ো বুস্‌সিকে গুলি করে মেরেছি।"

এ ছাড়া পুলিস তার কাছ থেকে একটি বর্ণও বের করতে পারেনি। মাত্র ঐ কটি শব্দ।

উত্তেজনায় তার মুখ পাংশু বটে, কিন্তু চোখে তখনো জল এল না, যখন পুলিস তাকে হাতকড়ি পরিয়ে হাজতে নিয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরেই ভেরচেল্লি শহরে আল্‌ফা জজদের সামনে দাঁড়িয়ে। চৌদ্দদিন ধরে মোকদ্দমা চলেছিল। সমস্ত ইতালী দেশ প্রচণ্ড আবেগ, রাগ দুঃখ বেদনার সঙ্গে এই মোকদ্দমায় যেন আপন আপন ভাগ নিলে। সেই পুরনো রাজনৈতিক দলাদলি আবার নূতন করে দেখা দিলে। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির চেয়ে বড় হয়ে উঠলো, মানুষ আল্‌ফা জুবেল্লির দশ বছর বয়সের নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তখন তার বয়েস দশ। আজ সে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে শান্ত, —হাকিমদের দিকে নির্ভয়ে তাকায়।

পাছে না বুস্‌সিপক্ষ আল্‌ফাকে খুন করে, তাই পুলিস বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল।

মোকদ্দমা শেষ হল। 'কেস্ আল্‌ফা জুবেল্লি।'

কিন্তু এ কেস্ রাজনৈতিক দলাদলির মোকদ্দমা নয়। তার বহু বহু ঊর্ধ্বে।

শিশু তার মায়ের খুনীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। এই সব কথা! এবং এই বহু কথা!

মনস্তত্ত্ববিদরা সাক্ষী-হিসেবে বললেন, মায়ের অপঘাত মৃত্যু দেখে ঐ বয়েসের ছোট্ট মেয়ের মনে যে গভীর দাগ কাটে সেটা মোছবার মত নয়। তার সমস্ত নার্ভস উল্টেপাল্টে গেছে। এমন কি শরীরের দিক দিয়েও তার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। মাতৃত্বের আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিতা হয়ে গিয়েছে।

আদালত ঘরের অসহ্য উত্তেজনা ও প্রতীক্ষার ভিতর হাকিমরা রায় দিলেন—পাঁচ বছরের জেল, এবং তারপর এক বৎসর মনস্তত্ত্ব হাসপাতালে পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা।

সোজা পায়ে কঠিন কদমে আল্‌ফা দুই পুলিসের মাঝে আদালত পরিত্যাগ করলো। দুনিয়ার ভিড়ের উপর দিয়ে সে যেন তাকিয়ে আছে, দূরে, বহু দূরে। তার ছোট্ট গ্রাম সেই মন্তান্থার দিকে—যেখানে সে দেখেছিল তার মা কি ভাবে টমিগানের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

তারপর পাঁচ বৎসর কাটালো আল্‌ফা উত্তর ইতালির এক জেলে। প্রতি সপ্তাহে—এই

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর—তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলে যেত। তার স্বামী রিকো বাসাদম্মা প্রতিবারে এসে বন্ধুবান্ধবদের খবর দিত, আল্ফা শান্ত এবং সন্তুষ্ট। ভদ্রলোক অদ্ভুত একদারনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব তাই করে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি তুরিন শহরে বদলি হয়ে সেখানে নূতন বাসা বেঁধেছেন; প্রতি সপ্তাহে আল্ফাকে এই নূতন নীড়ের খবর দেন। আর কতদিন! আর বেশী দিন নয়। তোমার জন্য সব তৈরী। তুমি বেরিয়ে এলেই হল।

১৯৬১ সালের জুন মাসে আল্ফার জেলবাস খতম হল। কিন্তু তারপর তাকে যেতে হল দক্ষিণ ইতালীতে, হাসপাতালে, তুরিন থেকে প্রায় ১৮৮০ কিলোমীটার দূরে। সেখানে তার স্বামী প্রতি সপ্তাহে দেখতে যেতে পারে না। কিন্তু মাসে একবার করে যায়, শুধু তাকে বলবার জন্য যে সে তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

৮ই নবেম্বর ১৯৬১, আল্ফাকে হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ডেকে পাঠালেন হাসপাতালের বড় ডাক্তার। অধ্যাপক জুলিয়ো ফ্রেদা খবর দিলেন আল্ফার আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সাত মাস পূর্বেই সে খালাস। তার জিম্মাদার অধ্যাপক। সে যেন বাড়ি চলে যায়।

হাজার মাইল দূরে তুরিনে আল্ফার স্বামী রিকো বাসাদম্মা বেতারে শুনলে তার স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত মুক্তি। কিন্তু বেচারী এই হাজার মাইল যায় কি করে। আল্ফা তো ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

হাসপাতাল থেকে সেই সন্ধ্যায় যখন আল্ফা বেরলো তখন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

"আমি আমার নিরপরাধ মায়ের অহেতুক মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তার প্রায়শ্চিত্ত (penance) ও করেছি। আমি সন্তুষ্ট এবং মুক্ত। এখন আমি আমার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। নূতন জীবন আরম্ভ করবো। অতীতের করাল ছায়া আমার মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

আমাকে দয়া করে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না।"

• • •

বিশ্বাস করবেন না, খবরের রিপোর্টাররা এই গভীর মনোবেদনার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল। তারা তাকে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোয় নি।

পরের দিন সকাল বেলা ডাক গাড়িতে করে সে তুরিনে পৌঁছল। প্লাটফর্মে তার স্বামী আর ননদীর সহ্যের সীমা বুঝি পৌঁছে গেছে। স্বামী তাকে আলিঙ্গন করলে। আল্ফা যেন সে মুক্তির বন্ধন থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নিতে চায় না।

• • •

এরপর সংবাদদাতারাও বলছেন, "এই মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতায় মানবজীবনের একটি নিদারুণ ট্র্যাজেডি শেষ হল।" তিনি প্রশ্ন শুধোচ্ছেন, "এইখানেই কি শেষ? পারবে কি আল্ফা নূতন করে জীবন পত্তন করতে? মন্তাল্বার করাল ছায়া কি তার স্মৃতিকে বিমূঢ় করবে না? ব্যবস্থা তো তার স্বামী সব তৈরী করে রেখেছে। কিন্তু!

এমন কি ইতালীর খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আল্ফা সম্বন্ধে কিছু লেখে না। তাকে চান্স্ দিতে চায়। যে মেয়ে তখনই শুধু শান্তি পেল যখন সে তার মাতৃহন্তাকে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে দেখলে।" (১)

(১) কাহিনীটি বেরিয়েছে সুইস কাগজ ভেল্টভখেতে; আমি মোটামুটি অনুবাদ করেছি।

● শার্ঙ্গদেব

আকাশবাণীর প্রধান সংগীত প্রযোজকের প্রত্যুত্তর

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৬২তে প্রকাশিত আমাদের আলোচনা সম্পর্কে আকাশবাণীর প্রধান সংগীত প্রযোজক শ্রীজয়দেব সিং ২৪।৩।৬২ তারিখের ইংরেজি চিঠিতে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, যে অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে আমাদের আলোচনা করা হয়েছে সেটি যথাযথ নয় এবং এই কারণেই তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে গুরুতর ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এমন কথা বলেননি যে, ভরতের সময় কোনও গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি বলেছেন যে, ভরতের সময় যে গ্রাম ছিল তাকে অনড় বলা চলে না (there was no fixed scale as such) অনুবাদক এই "ফিকস্‌ড্‌" শব্দটিকে "সুনির্দিষ্ট" অনুবাদ করেছেন যা ইংরেজিতে well determined বোঝায়। এর ফলে পাঠকেরা ধরে নিয়েছেন যে, ভরতের সময় কোনও গ্রামের নির্ধারণই হয়নি। তাঁর ইংরেজি পাঠে তিনি বলেছেন, The shifting scales or moorchana served as the basis for compositions in 'Jatis' and later on in 'Ragas':
এর সরল বাংলা করলে এই দাঁড়ায় যে, নড়নশীল গ্রামসমূহ বা মূর্ছনাগুলি জাতি সমুদয়ের এবং পরবর্তীকালে রাগসমূহের ভিত্তিরূপে অধিষ্ঠিত ছিল। তাঁর নিবেদন—অনুবাদক যদি "সুনির্দিষ্ট" না বলে "অপরিবর্তনীয়" বলতেন, তাহলে বোঝার ভুল ঘটত না। তাঁর মূল কথা হল এই যে, এই পরিবর্তনশীল গ্রামগুলির ব্যবহার পরবর্তীকালে রহিত হয়ে যায় এবং অপরিবর্তনীয় গ্রামের প্রচলন হয়।

শ্রীজয়দেব সিং-এর এই বক্তব্য থেকে তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা গেল এবং আমাদের যে একটা ধারণা হয়েছিল যে, তিনি ভরত সম্বন্ধে পরমতের উপর নির্ভর করেছেন তার অপনোদন হওয়াতে আমরা সুখী হয়েছি। শেষ পর্যন্ত ষড়জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতির পরিবর্তে একটি সাধারণ গ্রাম যে পরিকল্পিত হয়েছে, এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি, তবে মূর্ছনাকে shifting scale বলতে আমাদের আপত্তি আছে। জাতিগুলি হয় ষড়জগ্রামে, নয় মধ্যমগ্রামে অবস্থিত। আসলে গ্রাম ওই দুটিই কিন্তু মূর্ছনা প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যাপ্তি বোঝাবার জন্য। অর্থাৎ ষড়জগ্রামে অবস্থিত জাতিগুলিতে ষড়জগ্রামস্থ মূর্ছনা প্রযুক্ত হত এবং সাধারণত এইসব গান খাদে গাওয়া হত; আর এই মূর্ছনার নির্দিষ্ট আরোহণ অবরোহণ থেকে বোঝা যেত এর একটি নির্দিষ্ট জাতির রূপ কী রকম হবে। প্রথমে সপ্তককে কেন্দ্র করে সপ্তস্বরের যথা-সম্ভব ক্রমিক আরোহণ অবরোহণ নির্ণয় করা হয়েছে। এর পরে ধীরে ধীরে এর যাবতীয় বিন্যাস এবং স্বরাদির বিলোপ ঘটিয়ে যত বিন্যাস হতে পারে তাও নির্ণয় করা হয়েছে। এই মূর্ছনা থেকে স্বর-বিন্যাস আরম্ভ হয়েছে আর শেষ হয়েছে বিবিধ কূটতানে। মূর্ছনাই হচ্ছে এই স্বরবিন্যাস বা তান-নির্ণয়ের মূল ভিত্তি। সংগীতরত্নাকরে জাতিগানের স্বরলিপিসহ উদাহরণ দেওয়া আছে। লিপিপ্রমাদ পরিহার করে এই গানগুলি বিচার করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, এইসব গান যে গ্রামে অবস্থান করছে সেগুলি হয় ষড়জ, নয় মধ্যম; কিন্তু সুর কতটা চড়ায় যাবে এবং কতটা খাদে আসবে, সেটি বোঝা যাচ্ছে মূর্ছনার নির্দেশে। অতএব মূর্ছনার উদ্দেশ্য Shifiting Scale বলি কী করে?

অনেকেরই ধারণা আছে, মূর্ছনা মূলত scale, কিন্তু সেটা হতে পারে যদি ষড়জ পরিবর্তন করা হয় অথবা এক একটি মূর্ছনাকে এককভাবে দেখা হয়। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়; ষড়জগ্রামের ষড়জকে মূল স্বর রেখে এক একটি মূর্ছনা নির্ধারিত হয়েছে—মধ্যমগ্রামের মধ্যমকে মূল স্বর রেখে এক একটি মূর্ছনা নির্ণয় করা

হয়েছে। এইভাবে দুটি গ্রামে স্বর না ঘটিয়ে স্বরের কত রকম বিন্যাস হতে পারে সেইটি গাণিতিক নিয়মে বের করা হয়েছে। এইটাই মূর্ছনার মূল উদ্দেশ্য। তবে মূর্ছনা যে জাতি বা রাগের পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করছে, এটা অবশ্য স্বীকার্য; কেননা সুরের মূল বিন্যাস এই মূর্ছনা থেকেই নিরূপণ করা যায়। আমার বক্তব্য—মূর্ছনা গ্রামের ব্যাপ্তিনির্দেশক এবং এই নির্দেশ রাগ বা জাতির পরিচয় নির্দেশে সহায়তা করে।

আকাশবাণীর প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন অনুবাদকে মূল্যানুগ করতে বিশেষ চেষ্টা করেন নতুবা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অপদস্থ হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্র (দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীজয়দেব সিং মহাশয়ের পত্র নিয়ে আলোচনা উপলক্ষে সাম্প্রতিককালে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মূল নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগটি দেখবার অবসর হল। এটি শ্রীমনোমোহন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। এর ইংরেজি Introduction-এ সংগীতরত্নাকরের যথার্থ মূল্যায়ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি বলেছেন—"And it may be claimed that our knowledge of the music chapters of the NS are much fuller than that of Sarngadeva (13th century) the reputed author of the Sangitaratnakara who used this text. For the chapter on Tala in this last named work consists of 400 couplets whereas the NS devotes no less than 502 couplets to this subjects, and in its treatment we meet with many topics of which Sarngadeva takes no notice.

শ্লোকের সংখ্যা দিয়ে নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে রত্নাকরের তুলনা না করাই উচিত। অপ্রয়োজনীয়বোধে শার্ঙ্গদেব নাট্যশাস্ত্রের সংগীতাংশের সবকিছু গ্রহণ করেন নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অতি যত্নে নাট্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণিত বস্তুগুলিকে সুবোধ্যভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন এবং উক্ত গ্রন্থের তালাধ্যায়ই তার প্রমাণ। রত্নাকরের তালাধ্যায় পড়লে নাট্যশাস্ত্রের সংগীতাংশ বুঝতে বিশেষ সহায়তা হয়। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে রত্নাকর নাট্যশাস্ত্রকেই প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। রত্নাকর সম্পর্কে এই সত্যটি বিশেষভাবে না বলে যা বলা হয়েছে তাতে এই গ্রন্থের গৌরব লাঘব হয়েছে বলেই মনে হয়। শ্রীমনোমোহন ঘোষ আরও বলেছেন—Besides the author of the Sangitaratnakara has only 17 couplets (ch IV 316—332) on the Dhruva (ধ্রুবা) songs, while the NS has on this subject one entire chapter (XXXII) consisting of 425 couplets,

প্রকৃতপক্ষে দুটি বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। নাট্যশাস্ত্রের উক্ত অধ্যায়ে যে গীতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা "ধ্রুবা"; আর রত্নাকরে যে গীতের কথা বলা হয়েছে তার নাম "ধ্রুব"। রত্নাকরের "ধ্রুব" গান সালগ-সূড় নামক প্রবন্ধ সংগীতের প্রকার ভেদ — আর নাট্যশাস্ত্রের ধ্রুবা নাটকের বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহৃত নানা ধরনের গান। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত শ্রেণীর গান আদৌ প্রবন্ধ পর্যায়ের গান নয়। রত্নাকর ধ্রুবা-গান নিয়ে আদৌ আলোচনা করেননি — কেবলমাত্র জাতি গানের প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ জাতি কোন্ কোন্ ধ্রুবায় ব্যবহৃত হত তার উল্লেখ করেছেন। সেকালের নাটকে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন গানের অংশবিশেষ গাওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল। সম্ভবত ধ্রুবা নামটিই এই আবশ্যিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। পরকালের জাতিগীতি, বস্তু প্রকরণ প্রভৃতি গীত বিভিন্ন ধ্রুবায় ব্যবহৃত হত।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচিত সুযোগ্য সম্পাদক কেবলমাত্র পাতা উল্টেই সংগীতরত্নাকর সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছেন; কিন্তু সে ধারণাটি এভাবে প্রকাশ না করলেই শোভন হত। গ্রন্থটি এসিয়াটিক সোসাইটির মত বিদ্বৎসমাজ থেকে প্রকাশিত বলেই এই ত্রুটি দেখিয়ে দিতে হল নইলে কিছু বলবার প্রয়োজন হত না।

নিতাই কর্ণধার

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ঠাসাঠাসি ভিড়ে গুড়িসুড়ি দিয়ে বসে একমনে বাউল গান শুনছিলাম, বুঝতেই পারিনি কখন নিষুতি রাতের তৃতীয় প্রহর গড়িয়ে এসেছে। মনেও নেই কখন খড়ের উপর হাত পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, আপাদমস্তক কম্বলে জড়িয়ে কুকুরকুণ্ডলী হবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম এসেছিল।

ভোর হল। আশপাশের জড়াজড়ি মানুষগুলো একে একে উঠে গেল। ঘুচে গেল মনুষ্যসঙ্গের তাপ। সেই প্রত্যুষে বুঝলাম বীরভূমের নদীতীরের শুকনো মাঠের শীত কাকে বলে। সপসপ করছে তৃণশয্যা, গায়ে জড়ানো কম্বলটা যেন হিম-কুহেলির উত্তরীয়। ঠাণ্ডায় অষ্টাবক্র হয়ে গিয়েছে দেহ।

মাঘের প্রথম প্রভাত। সূর্যের প্রথম উঁকি। শীর্ণ অজয়ের কুয়াশাচ্ছন্ন তীরে ইতিমধ্যেই স্নানার্থীর ভিড়, রাধামাধবের মন্দিরে বেশ কিছু পূজার্থীর সমাবেশ। বৃদ্ধ বাউলটির দোতারায় ভৈরবীর ঝংকার।

উঠে দাঁড়ালাম। কম্বলটি ঝেড়ে নিয়ে ভালো করে গায়ে জড়ালাম আবার। ঝুলিটি মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম—সেটি আবার তুলে নিলাম হাতে। অজয়ের জলে মুখ-হাত ধুয়ে প্রণাম করলাম জয়দেবের মন্দিরে। তারপর মেলার এলাকা ছাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম কেন্দুবিল্বের গ্রাম প্রান্তের বৃদ্ধ বটগাছটিকে নিশানা করে।

পৌষ-সংক্রান্তির সেই জয়দেবের উৎসব। দিনমানের বাতাসে নবান্নের সুরভি, রাতের আকাশে বাউলের গান।

আর মকরের হিমশীত।

আবার ভিন্ন মতে ভাণ্ডীর বনের ভাণ্ডেশ্বর শিবই হচ্ছেন বীরভূমের সিদ্ধনাথ।

এই মল্লারপুরে এসে পৌঁছলাম শেষ রাত্রে সাহিবগঞ্জ লুপ লাইনে মল্লারপুর স্টেশন—বোলপুর ছাড়িয়ে আরো ত্রিশ মাইল দূরে। রেলের কজন কর্মচারী আর কটি রেলযাত্রী ছাড়া সবাই ঘুমচ্ছে। স্টেশনে সরকারী আলো, তারপরই শুক্ল-পক্ষের জ্যোৎস্না। স্টেশন এলাকার ঠিক বাইরে গাছের নিচে ঝাপসা আলো-অন্ধকারে ঘুমচ্ছে দুটি নড়বড়ে বাস।

মধুর একটি গন্ধ এসে লাগল নাকে। শেষ রজনীর শীতল সমীরণে বকুলগন্ধে বুঝি মিশেছে আম্রমঞ্জরীর সুবাস। পূর্ব-

দিগন্তে ঊষার মৃদুতম আভাস। ডাক দিল পূর্বাশা। পা বাড়ালাম পূর্বাভিমুখী কাঁচামাটির গ্রাম ছাড়ানো পথে।

দুপাশে দিগন্ত জোড়া শস্যবিহীন ক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দূরের কুটির আর বড়ো বড়ো গাছ চাঁদের আলোয় ঝাপসা কালো হয়ে চোখে পড়ছে। উজ্জ্বল চন্দ্রাভায় কাঁচাপথের উঁচুনীচুগুলিতে আলোকালোর ছিটবুনানি, পায়ের নিচে হিমের ময়ান-মাখানো নরম মাটি। স্টেশনে আর যারা নেমেছিল তারা স্টেশনেই থেকে গেছে। বাসের অপেক্ষায় আমি স্টেশনে বসে থাকিনি। এ পথে সাধারণত বাস চলে না। এখন দিন দুই কয়েকবার যাওয়া-আসা করছে। পয়লা বাস ছাড়বে বেলা সাড়ে আটটায়—জমায়েত

যাত্রীর পালকে ঝেঁটিয়ে বাক্সবন্দী করে নিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে দৌড় লাগালে। তার নিরাসক্ত নিষ্ঠুরতায় ধুলোর ঝড়ে উঠবে পথের দীর্ঘশ্বাস। কে চায় বাসের অপেক্ষায় প্রত্যুষের মধুর মুহূর্তগুলি নষ্ট করতে? সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে মহানন্দে আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি।

মাইল দেড়েক যেতেই উত্তরবাহিনী দ্বারকানদী। নদীর পূর্ব তীর ধরে উত্তর দিকে মাইল চার পাঁচ দূরে তারাপীঠ। তার আগে ডাবুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমি অবশ্য সোজা যাব, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে নদী পার হয়ে পূর্বদিকে সোজা হাঁটব। আরো অন্তত সাত মাইল। দ্বারকা মহা পুণ্যময়ী স্রোতস্বিনী। বর্ষায় কলস্বনা বেগবতী তটিনী, এখন শেষ শীতে শীর্ণা জলধারা। জলে পা দেবার আগে তার পবিত্র সলিল অঞ্জলি ভরে মাথায় ছিটিয়ে নেব।

একটি লোক বসে আছে নদীতীরে

ভোরের আলোয় একচক্রা গ্রাম

আবার চলেছি বীরভূমের পথে। এবার সমীরাঞ্চলে বসন্তের স্পর্শ। তরুশাখায় বসন্তের ইশারা। কাঁধের কম্বলটি গুরুভার।

যাত্রা শুরু মল্লারপুর থেকে। রামপুর-হাট মহকুমার এই ক্ষুদ্র গ্রামটি গত কয়েক বৎসরে বেশ জেঁকে উঠেছে ও ক্রমে ক্রমে অর্ধনাগরিক রূপ নিচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণ-ব্যাপী প্রধান রাস্তাটিতে ছোটবড় অনেক দোকানপাট। তেলকল ও চালকল আছে। আছে উচ্চ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়। প্রাচীনকালে এই মল্লারপুর ছিল মল্লরাজার রাজধানী। সুপ্রসিদ্ধ মল্লেশ্বর মহাদেব মল্লারপুরে আসীন। প্রবাদ যে 'বীরভূমৌ সিদ্ধনাথঃ রাঢ়ে চ তারকেশ্বর'—তদুক্ত এই সিদ্ধনাথ শিবই মল্লারপুরের মল্লেশ্বর।

ওপারের দিকে মুখ করে। গুনগুন করে গান গাইছে। কাছে আসতে গানের কথাগুলি কানে স্পষ্ট হল:

এ ঘোর কলির ভবনদী
ও তুই অমনি হবি পার,
এ ঘাটে নিতাই কর্ণধার॥

তাড়াতাড়ি আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। গান শুনেই বুঝেছি সহযাত্রী মিলেছে একই পথের পথিক, একই ভাবনার ভাবুক।

চেহারাটি ছোটখাটো। মাথার চুলগুলি কদমছাঁট। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় সাদা উড়ুনির নিচে কণ্ঠি, —হাতে একটি বাদামী রঙের খদ্দরের ঝোলা। মুখ ফিরিয়ে সম্বোধন করলে জয় নিতাই।

বাঁকারায়ের মন্দির : বীরচন্দ্রপুর
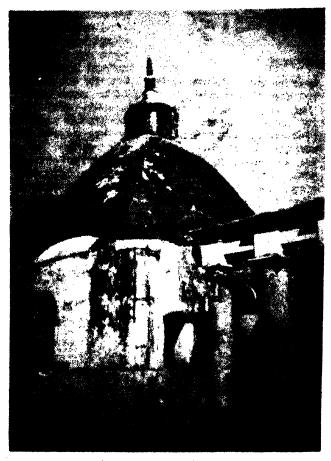
বড় আশ্চর্য সম্বোধনটি। একেবারে বুকের কাছে টেনে আনে যেন। নিত্যানন্দ এমনিই টেনেছিলেন, পরকে করেছিলেন আপন, দূরকে করেছিলেন নিকট, অন্ত্যজকে করেছিলেন ভাই।

উত্তরে প্রতিধ্বনি করলাম জয় নিতাই!

সাড়ায় সাড়া জাগল। ঢেউ লাগল উভয় কূলে। এক গাল হাসি হেসে বললে, এক চাকায় চলেছেন তো?

ঠিক।

খুব ভালো হল। পাঁচ মিনিট সবুর করুন। প্রাতঃসন্ধ্যাটা সেরে নিই। এক সংগে যাব।

আবার হাঁটু মুড়ে বসল নদীর কূলে। টুক করে ঝোলা থেকে বার করল কাঁচের একটি শিশি। ছিপি খুলে ক-ফোঁটা জল ডান হাতের তালুতে ঢেলে নিল। পবিত্র গংগোদক, সংগে সংগেই থাকে।

চক্রবাল ভেদ করে সূর্য উঠেছে এতো-ক্ষণে। ওপারে বৃক্ষশ্রেণীর মাথা লালে লাল। আজ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। এই তিথিতে অধমতারণ পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর জন্মভূমি বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্ভুক্ত একচক্রা গ্রাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহান স্মৃতিতীর্থ। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের নামানুসারে একচক্রার ঠিক আগের গ্রামটির নাম বীরচন্দ্রপুর।

প্রসাদ ভাই আর আমি হেঁটে চলেছি পাশাপাশি। ভোরের নূতন আলো, মধুর হাওয়া। জনবিরল পথ। চওড়া হলেও প্রচুর এবড়ো খেবড়ো। নিত্যানন্দ জন্মোৎসবের সময় কটা দিন বাস চলে। বর্ষা পড়তে না পড়তেই উঁচু নীচু কাঁচামাটি ভেঙে এক হাঁটু কাদা, কোথাও বা এক কোমর। তখন গরুর গাড়ির চাকা পর্যন্ত পাঁকে বসে যায়। দুপাশে ধানক্ষেত তখন টইটম্বুর হয় জলের মাথায় সবুজ শীষ মাথা নেড়ে। এখন দুধারের মাঠ শস্যহীন। মাঝে মাঝে কোথাও বাবলার বনে নতুন পাতার ছোঁয়া, পলাশের ডালে ডালে রক্ত আভা, দূরে দিগন্তে নীলাঞ্জনের পাড়।

আমার সংগীভাগ্য ভালো। পথে পথে কতো সংগী পেয়েছি, আবার হারিয়েছি পথের প্রান্তে। তারা তাদের বিচিত্র চরিত্র আর বিচিত্র জ্ঞান দিয়ে আমার মনের ঝুলিকে ভরে গেছে। খাসা লোক প্রসাদ। এক মিনিটে আপনি থেকে তুমি। আমি তাকে দাদা বলি, সেও আমাকে দাদা ডাকে। দাদায় দাদায় কোলাকুলি।

নাম জপ করতে করতে হাঁটা শুরু করেছিল—কথায় ভেড়াবার জন্যে আমি বলেছিলাম—

আমি দাদা পাপী তাপী মানুষ। পাশে পাশে যাব, তাতে তোমার জপের পুণ্য কিছু লাঘব হবে না তো?

শুনেই দু-কান ছোঁয়া হাসি হেসে থামতে বললে—

তুমি দাদা পাপী? তাই বুঝি পতিত পাবনের দরবারে চলেছ? তা চেহারা দেখে তো জগাই-মাধাই মনে হয় না। পরনে গেরুয়া, কাঁধে ঝুলি-কম্বল নিয়ে এক ধার্মিকটি সেজেই তো বকের দেশে চলেছ!

আমি শুধোলাম—বকের দেশে চলেছি মানে?

তা জানো না? অমৃত সমান মহাভারতের কাহিনী তাহলে শোনো। জননী কুন্তী আর দ্রৌপদী সতীকে নিয়ে রাজপুত্র পান্ডবরা যখন অজ্ঞাতবাসে কাল কাটান তখন তাঁরা এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নেন। সেই আশ্রয় ছিল ঐ একচক্রা গ্রামে। গ্রাম থেকে কিছু দূরে গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যে থাকতো বক রাক্ষস। ভীমের হাতে বকাসুর বধ হয়েছিল, মনে আছে তো?

হ্যাঁ, শুধু বক কেন, হিড়িম্বার ভাই হিড়িম্বকেও তো ভীম বধ করেছিলেন তাই না?

ঠিক বলেছ। জতুগৃহ থেকে পালাবার পথে এই হিড়িম্ব রাক্ষস পান্ডবদের আক্রমণ করেছিল। ভীম ছিলেন শ্যালক-নাশন। নিজের শালা হিড়িম্ব আর রাজার শালা কীচক—মহাভারতের দুই নামজাদা শালাই তাঁর হাতে পঞ্চত্ব পেয়েছিল। যাই হোক, ঐ একচক্রের অদূরে গভীর বনের মধ্যে বক হিড়িম্ব দুই অসুরের বাস ছিল সে যুগে। জায়গাটার নাম কোটাসুর—মানে হচ্ছে অসুরের কোটা।

শুরু হল আগলভাঙা স্রোত। বীরভূমের বিভিন্ন স্থান নিয়ে বহু পৌরাণিক কিংবদন্তী। ত্রেতার রামায়ণ আর দ্বাপরের মহাভারতের সংগে এই কলির বীরভূমের বহু যোগাযোগ রয়েছে। এই বীরভূমি একদা ছিল গভীর আরণ্যভূমি। প্রাচীন কালের মুনিঋষিদের নিভৃত তপস্যার আ

উপযুক্ত ক্ষেত্র। বনবাসী রামসীতা এই অরণ্যে কাল কাটিয়েছেন, পাণ্ডবরা করেছেন অজ্ঞাত বাস। সেই সুপ্রাচীন স্মৃতি নিয়ে বীরভূমের কয়েকটি স্থান আজও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই সব স্থান মাহাত্ম্য প্রসাদদার নখদর্পণে।

গল্প চলছে, আমরাও চলেছি। বাঁ দিকে রেখে গেলাম ছায়া-ঢাকা গৌরবাজার গ্রাম। বাঁধকুদ দক্ষিণগ্রাম পার হয়ে পৌঁছলাম হাড়িপুরে। এখান থেকে পথ দ্বিমুখী হয়েছে। প্রধান শাখাটি চলেছে বড়তুরী গ্রামের উদ্দেশে। বাঁ দিকের শীর্ণতর শাখাটি ধরে একটু এগোলেই বীরচন্দ্রপুর। বীরচন্দ্রপুরের পরে একচক্রা। মল্লারপুর স্টেশন থেকে সবসুদ্ধ মাইল আট নয় তো হবেই। এই দীর্ঘ পথ গল্পের ছলে ভুলে গিয়ে কী করে যে অতিক্রম করলাম বুঝতেই পারিনি। চক্রবাল ছাড়িয়ে সূর্য বেশ খানিকটা উপরে উঠেছে। দুপাশে আর শুকনো মাঠ নেই—সবুজ ক্ষেত সূর্যালোকে চকচক করছে। নতুন রবিশস্যভরা ক্ষেত—প্রধানত কলাই আর আলুর চাষ। সামনে বীরচন্দ্রপুর গ্রাম—নিমগাছের ডালে ডালে কচি পাতার আমন্ত্রণ, আমের শাখায় শাখায় নবীন মুকুল—যেন পিচকিরি করে শ্বেত-চন্দন ছিটিয়ে দিয়েছে কে।

বীরচন্দ্রপুর গ্রামের মুখে এসে সংকীর্তন দলের সঙ্গে মিলে গেলাম। বাঁকা রায়ের মন্দির থেকে বার হয়ে কীর্তনদল গ্রাম পরিক্রমা করছে। যে কথা শ্রীগৌরাঙ্গ বলেছিলেন বার বার, সেই আশ্চর্য কথাকটি বারে বারে গেঁথে গেঁথে বাণীমাল্যের অর্ঘ্য সাজাচ্ছে:

> নিতাই সর্বস্ব যার
> সে আমার আমি তার।

॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বারো বৎসর পূর্বে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে একচক্রার এক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নানা সদ্‌গুণসম্পন্ন নিষ্ঠাবান পণ্ডিত—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা নামে তিনি স্বগ্রামে খ্যাত ছিলেন। নিত্যানন্দের জননী ছিলেন ময়ূরেশ্বর রাজনন্দিনী পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ তাঁদের প্রথম সন্তান। এই প্রথম সন্তান যখন গর্ভে তখন মাতা পদ্মাবতী স্বপ্ন দেখেন—স্বর্গের দিব্যপুরুষগণ যেন গর্ভস্থ মহাপ্রাণকে সম্বোধন করে বলছেন—হে অনন্ত দিব্য-প্রকাশ, ধন্য তোমার গর্ভবাস। দেবগণের এই স্তুতিবাক্যের নিদর্শনস্বরূপ এই নিত্যানন্দ-জন্মস্থান একচক্রা-গর্ভবাস নামে খ্যাত।

একচক্রা-গর্ভবাসের প্রধান দর্শনীয় বস্তু সূর্যমুখী গর্ভবাস মন্দির। বহু প্রাচীন মন্দির—ছোটখাটো চেহারা, বাংলার চারচালার ছাদের চূড়া, দেয়ালে পল কাটা ইঁটের সুন্দর কারুকার্য। এই স্থানে নিত্যানন্দ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এই মন্দির পদ্মাবতীর সূতিকাগৃহের প্রতীক। মন্দিরে কোনো মূর্তি নেই। মাঝখানে ছোট একটি বেদী। সেই বেদীর সামনে শিশু নিতাই কোলে মাতা পদ্মাবতী ও পিতা হাড়াই পণ্ডিতের একটি রঙিন পট। মন্দির প্রকোষ্ঠের এক কোণায় সিদ্ধ বকুলের একটি মোটা ডাল আছে। সেই বকুল গাছের ডালে দোলনা বেঁধে শিশু নিতাই খেলা করতেন। বকুল গাছটি আর নেই—প্রস্তরীভূত বৃক্ষ ডালটি তারই স্মৃতিচিহ্ন। মন্দিরের ঠিক গা ঘেঁষে বিরাট এক বট। বটের ডালপালা মন্দিরের চূড়া স্পর্শ করেছে। মন্দিরের সামনাসামনি বিশাল এক অশ্বত্থবেদী। পাশে বট ও সামনে অশ্বত্থের শাখাবিস্তারে মন্দিরের সম্মুখস্থ মাটির প্রাঙ্গণটি নিত্য ছায়াশীতল।

এই জন্মভূমিতে নিত্যানন্দ বারোটি বৎসর মাত্র অতিবাহিত করেছিলেন। শৈশব ও বাল্যের সেই কটি বৎসর তিনি এখানকার শ্যামল প্রান্তরে খেলা করেছিলেন, বন্ধ বকুলের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছিলেন, চঞ্চল আনন্দে সাঁতার কেটেছিলেন অদূরবর্তী যমুনার জলে। ভক্ত বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে দ্বাপরের যিনি যশোদা, কলিযুগে তিনিই শচীমাতা। কলির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ নরদেহ ধারণ করে প্রকট হয়েছিলেন এবং শ্রীবলরামরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন নিত্যানন্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমার যে শুভ

সন্ধ্যায় ভাগীরথীবিধৌত নবদ্বীপে গৌর-চন্দ্রের উদয় হল, ঠিক সেই সময় একচক্রার বালক নিত্যানন্দ এক গম্ভীর হুংকার করলেন।

যেদিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুংকার করিলা নিত্যানন্দ॥

এ হুংকার কৃষ্ণমিলন সম্ভাবনায় বলরামের আনন্দ হুংকার।

হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অতিথি হলেন এক নবীন সন্ন্যাসী। হাড়াই ও পদ্মাবতী পরম সমাদরে সন্ন্যাসী সেবা করলেন। পরদিন প্রত্যূষে সূতিকাগৃহের সামনের ঐ অশ্বত্থ গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিদায়োন্মুখ সন্ন্যাসী হাড়াই-এর কাছে একটি ভিক্ষা চাইলেন।

অতিথিপরায়ণ ব্রাহ্মণ বললেন—কী ভিক্ষা বলুন। যদি সাধ্য থাকে অবশ্য দেব।

সন্ন্যাসী বললেন—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে আমাকে ভিক্ষা দিন।

এ কী নির্মম ভিক্ষা! ভিক্ষাচ্ছলে একী নিষ্ঠুর আদেশ। নিতাই যে প্রাণস্বরূপ! প্রাণ হৈল নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই। কাতর কণ্ঠে নিতাই-জননীকে ডেকে হাড়াই সন্ন্যাসীর ভিক্ষার কথা বললেন। শুনে জননীর বুক ফেটে যায়! নয়নাশ্রু রোধ করে পতিব্রতা সতী পদ্মাবতী স্বামীকে বললেন,—

সন্ন্যাসীর প্রতি তোমার প্রতিজ্ঞা—এ তোমাকে পালন করতে হবে বইকি!

অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর হাতে প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তুলে দিলেন হাড়াই ও পদ্মাবতী।

এই সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারত্যাগী জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ। সন্ন্যাস নাম শ্রীশংকরারণ্যপুরী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডারপুর তীর্থে তিনি অন্তর্হিত হন ও নিজের তেজ নিত্যানন্দে সমর্পণ করেন।

সন্ন্যাসীর হাত ধরে নিত্যানন্দ বালক বয়সে সেই যে পিতা মাতা ও মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ করলেন—আর তিনি একচক্রায় ফেরেননি। পিতামাতার সঙ্গে আর তাঁর সাক্ষাত হয়নি।

বাঁকা রায় এক অলৌকিক চরিত্র। বলরাম যদি নিত্যানন্দরূপ ধারণ করে একচক্রায় অবতীর্ণ হন, তাহলে সেই বলরামের স্থানীয় অনুজ শ্রীকৃষ্ণরূপী এই বাঁকা রায়। হাড়াই ওঝার কনিষ্ঠ পুত্রের জীবনকাহিনী থেকেই এই বাঁকা রায় বা বঙ্কিমদেবের উদ্ভব। নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাঁকা নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। শোকগ্রস্ত পিতামাতাকে নিতাই এই বলে প্রবোধ দেন যে বাঁকা আবার আবির্ভূত হবেন। একচক্রার দক্ষিণ দিক দিয়ে যমুনা নদী বয়ে চলেছে। এক পারে একচক্রা, অপর পারে বীরচন্দ্রপুর। এই যমুনা গিয়ে মিশেছে দ্বারকানদীতে। এই যমুনার কদমখণ্ডি ঘাটে নিত্যানন্দ দারুরূপী বঙ্কিমদেবকে প্রাপ্ত হন ও প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বঙ্কিমদেব বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যানন্দের অনুজ বাঁকা।

কথিত আছে, নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করার পরে শোকাভিভূত গ্রামবাসিগণ একচক্রা গ্রাম পরিত্যাগ করেন। একচক্রা গ্রাম যে ক্রমে ক্রমে জনমানবশূন্য হয়েছিল তা সত্য। গর্ভবাস-সংলগ্ন মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে বিশাল এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তার সাক্ষী। এই মন্দিরের সু-উচ্চ ভিত্তি এখনো রয়েছে। রয়েছে বড়ো বড়ো ফাটলধরা কয়েকটি বিরাট মোটা দেয়ালের মাথা ভাঙা নিশানা। ভিত্তি জুড়ে বন্যগুল্ম আর কাঁটালতার জঙ্গল। দেয়ালের ফাটলে ফাটলে প্রাচীন শিকড় পাকিয়ে পাকিয়ে রয়েছে। প্রবাদ যে নিমাই-নিতাই-এর এই বিশাল পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীচৈতন্যের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত। অবহেলায় অযত্নে সাড়ে পাঁচশত বছরের এই আকাশচুম্বী মন্দির দিনে দিনে ধ্বংসের পথে এগিয়েছে। বর্তমানে এই প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপকে পুন-নির্মাণের কথা ভাবাও যায় না।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র যখন পিতার জন্মভূমি দর্শন করতে আসেন, তখন যমুনার এপারে বীরচন্দ্রপুর গ্রামের তিনি প্রতিষ্ঠা

করেন। এই গ্রামেই তিনি বাঁকা রায় বা বঙ্কিমদেবকে স্থাপন করে যান। তাঁর অধস্তন এক গোস্বামী বংশ এই গ্রামে বসবাস করেন। সেই থেকে এই বীরচন্দ্রপুর গ্রামে বঙ্কিমদেবের প্রতিষ্ঠা ও সাড়ম্বর আরাধনা।

একচক্রার নূতন মন্দিরে নিমাই-নিতাই-এর যুগল-বিগ্রহ দর্শন করে সবে একটি অস্থায়ী চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসেছি। ডান হাতে চায়ের ভাঁড় আর বাঁ হাতে একটি তেলেভাজা জিলিপি, —প্রসাদদার গলা বেজে উঠল কানের কাছে—

উঁহু, উঁহু, বসে পড়লে চলবে না দাদা, চলো বীরচন্দ্রপুর ঘুরে এসে একেবারে বসব। এখন বসলে আর উঠতে পারবে না।

ভাঁড়ের চা-টা এক চুমুকে গলায় ঢেলে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললাম—

এই তো যমুনা পেরিয়ে এলাম, আবার ওপারে যাব? পা যে আর চলছে না!

বুকের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন দাদা, তিনিই যমুনা পার করাবেন। ওঠো, ওঠো, পা ঠিক চলবে।

যমুনা নদী নদী নয়, নদীর অর্ধবিলুপ্ত সোঁতা। উপরে একটি কাঠের পুল। এক-ধারে কদমখণ্ডি ঘাট, অপর ধারে নিতাই-এর বাল্যলীলা-কানন। গ্রামের মধ্যে অনেক বসতি। কাঁচাবাড়ি—সুন্দর করে খড় বা টিন দিয়ে ছাওয়া। কাঁচা পথে একটু এগোলেই বাঁকা রায়ের বিশাল মন্দির। দূরে থেকে আকাশে মন্দির চূড়া দেখা যায়। এখানকার স্থানীয় গোস্বামী বংশ সংস্কৃতিবান ও ধনবান। বাঁকা রায় তাঁদেরই। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা বিশাল সমতল প্রাঙ্গণ। নবসংস্কৃত বৃহৎ মন্দির ও সামনে নাটমন্দির। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। দক্ষিণে শ্রীরাধা ও বামে বীরচন্দ্র-মাতা জাহ্নবী। মন্দিরের পিছনে বিশাল উন্মুক্ত চত্বরে মেলা বসে। এবারও মেলা বসেছে—প্রধানত খাবারের দোকান আর মনোহারী দোকানের মেলা। ময়রারা মোটামুটি এসেছে মল্লারপুর থেকে। অন্য দোকানদারেরা নানা মেলার ব্যাপারী। দোকান তুলে মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ায় তারা। বাঁকা রায়ের মেলায় কোনো বইএর দোকান নেই। মুখরোচক খাবারের খরিদ্দারের ভিড়ই বেশী।

বাঁকা রায়ের মন্দিরের ঠিক পিছন দিকেই ছোট একটি মন্দির। এটিও নবসংস্কৃত। এখানে আছেন কৃষ্ণ জগন্নাথ। বাম পাশে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ—নীল যমুনার নীল রঙে তাঁর বরদেহ সুমার্জিত।

আরো কয়েক পা গেলে প্রাচীন এক শিব মন্দির। মন্দিরটি অতি জীর্ণ। সামনের খিলানে বড় বড় ফাটল—মনে হয় এখনি

গর্ভবাস মন্দির : একচক্রা

বুঝি চূড়াসমেত ছাদ ধসে পড়বে। মন্দির গর্ভে শিলারূপী শিব। হাড়াই পণ্ডিত নাকি এই শিবের পুজো করতেন।

এখানকার পঞ্চবটী নিভৃত সাধকের সাধনার উপযুক্ত স্থান। চারদিকে অযত্ন বর্ধিত গাছপালার জঙ্গল। অদূরে বাঁকা রায়ের মন্দিরে চাকরান ঢাকীদের বাদ্যরব কানে আসছে। কাছাকাছি কয়েকজন যাত্রী ঘোরাফেরা করছে। তবু এই ভাঙা শিব মন্দির আর পঞ্চবটীর সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ছমছমে লাগে।

॥ ৩ ॥

একচক্রার নিত্যানন্দ-নিকেতনে শ্রীপঞ্চমীর দিন থেকেই উৎসবের আরম্ভ। সেদিন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথির অর্চনা করে উৎসব শুরু। সপ্তমীর দিন অদ্বৈত আচার্যপ্রভুর জন্ম বন্দনা। আজ ত্রয়োদশীর দিন প্রধান উৎসব—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব। আগামী পরশু মাঘী পূর্ণিমার দিন নিত্যানন্দ-ভক্তানাথ সেবাপ্রাণ ব্রিভঙ্গদাস বাবাজীর স্মরণ কীর্তন।

রাঘব পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত যুগল বিগ্রহ বর্তমানে নিত্যানন্দ-নিকেতনের নূতন মন্দিরে আসীন। নিত্যানন্দ-নিকেতন নবরূপে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে। নূতন মন্দিরটি একালের পাকাবাড়ি, টালির ছাদ, চূড়াবিহীন কোঠাঘর। প্রায় কোমর সমান উঁচু ভিত, সামনে বারান্দা, তারপর প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে মহার্ঘ রাজবেশে সজ্জিত শুভ্রবর্ণ নিতাই গৌরের দারুমূর্তি। শিরে উজ্জ্বল উষ্ণীষ, কর্ণে স্বর্ণবর্ণ কুণ্ডল, অঙ্গে বর্ণাঢ্য বেনারসী পোশাক। জ্যেষ্ঠ বলরাম-রূপী নিতাই-এর মূর্তিটি আকারে বৃহত্তর—ভঙ্গিটি দৃপ্ত। নিমাই-এর দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদের ভঙ্গিমা, কটিতে মোহন মুরলী। উভয়েরই অপূর্ব শ্বেতগৌর

দেহকান্তি, নয়নাভিরাম সাজপোশাক, বদন-মণ্ডলে প্রেমের আনন্দ-আভা। মন্দির প্রকোষ্ঠের দ্বারের ঠিক মাথায় একটি রঙিন চিত্র। চিত্রে কলস্বনা নীলাম্বু যমুনা—তীরে কেলিকদম্ব শাখে মুখোমুখি শুক ও সারী।

নূতন এই মন্দিরটির সামনে সুবৃহৎ পাকা নাটমন্দির। নাটমন্দিরের মাঝখানে একটি মাল্যশোভিত তুলসীমঞ্চ। তুলসীমঞ্চের চারদিক ঘিরে নানা নয়নাভিরাম পটে বৈষ্ণব চিত্রাবলী। সম্মুখে ধূপধুনোর সুরভি। তুলসীমঞ্চ ঘিরে বসে প্রত্যুষ থেকে নাম গান করছেন কীর্তনদল। কলিতে নামৈব কেবলম, নাম গানেই মুক্তি। ভক্তরা এই নাম গানে এসে যোগ দিচ্ছেন, কেউ কেউ ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করছেন দু হাত তুলে।

দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি মন্দির। সামনে চারদিকে দেয়ালঘেরা সিমেন্ট-বাঁধানো পরিচ্ছন্ন উঠান। এই প্রাঙ্গণটির নাম শ্রীঅনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জ—মন্দিরে রাসমঞ্চে দশ-সখী পরিবৃতা রাধাকৃষ্ণ।

নিত্যানন্দ-নিকেতনের ঠিক সম্মুখেই ভগবানজী নারায়ণজী ধর্মশালা। মুর্শিদাবাদ জিলার খাগড়ার বদান্য ভক্ত শ্রীচুনীলাল ভগবানজী ধর্মশালাটি নির্মাণ করেছেন। একতলা পাকাবাড়ি। আট দশটি ঘর, প্রশস্ত উঠান ও বারান্দা, রন্ধনগৃহ ও টিউবওয়েল। ধর্মশালা যাত্রীতে ঠাসা—ঘরগুলি তো ভর্তিই, বারান্দাতেও দাঁড়াবার স্থান নেই। এই ধর্মশালার পিছনে ধানক্ষেতের গা দিয়ে কাঁচামাটির পথে পশ্চিম দিকে এগোলে আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। প্রথমে বাঁ দিকে পড়বে বকুলতলা আশ্রম। সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে [illegible] বকুল ও বটগাছের একটি সমন্বয়—[illegible] তিনটিকে ঘিরে লালরঙের বাঁধানো বেদী। চারদিকে আম কাঁঠাল ও [illegible] গাছ। আশ্রম মন্দিরটি অতি [illegible]। প্রবাদ এই স্থানটি নিত্যানন্দের বাল্যলীলার প্রধান ক্ষেত্র ছিল। এই মন্দিরের কাছেই একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। বাঁধানো চারপাড় জুড়ে মুকুলঘন অনেকগুলি আম [illegible]। এই পুষ্করিণীর গভীরে বাঁকা রায় [illegible] হয়েছিলেন।

উত্তর-পূর্ব দিকে মাঠের মাঝখানে [illegible] পড়বার মতো একটি উচ্চস্থান। [illegible] বিশাল বিশাল কেলিকদম্ব ও [illegible] গাছের জটলা। চষা ক্ষেতের [illegible] প্রাচীন গভীর অরণ্যের স্মৃতিচিহ্ন [illegible] বৃদ্ধ গাছগুলির ছায়ায় একটি [illegible] মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। পাশে একটি অবহেলিত মাটির কুটির। মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই, কুটিরে কোনো প্রতীক [illegible]। এই স্থানেই নাকি পান্ডবদের অজ্ঞাত [illegible] ছিল।

নূতন পুরাতন নিত্যানন্দ নিকেতনের সব মন্দিরগুলি পূর্বমুখী। পিছনে পশ্চিম দিকে অশ্বত্থ বট আর [illegible] আকাশ ঢেকে রেখেছে। পরেই [illegible] ফাঁকা জায়গা। নিকানো মাটি, [illegible] সীমানা জুড়ে উঁচু উঁচু গাছের [illegible] নিম, কদম্ব আম আর [illegible] একটি দোতলা কাঁচাবাড়ি। [illegible] ভাবে কিনার ছাঁটা নতুন খড়ে সুন্দর [illegible] ছাওয়া। নিকানো বারান্দার সামনে [illegible] ছায়ায় কুড়ি পঁচিশজন মেয়েছেলে [illegible] সবের কাজে লেগেছেন—একদল [illegible] কুটনো, একদল বাটছেন বাটনা। এটি নিতাই-এর ভান্ডার। পাশে [illegible] কাজ করছেন মুন্ডিতমস্তক নিতাই-সেবকরা। পরিশ্রমে হিমসিম খাচ্ছেন এই সেবক ও সেবিকারা। কতো ভক্ত, কতো দূরাগত যাত্রী। সকলে এক সঙ্গে পংক্তিতে বসবেন। বেলা না গড়িয়ে যায়। [illegible] পরিশ্রমেও মুখে তাঁদের হাসি—হাসি মুখে অভ্যর্থনা—জয় নিতাই!

বৈষ্ণবের ভক্তি সেবা বিনয় ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন মূর্ত সেবাইত শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের এক শিক্ষিত ও সম্পন্ন পরিবারে বিধুভূষণের জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাকালে নিতাই তাঁকে ডাকেন। সেই ডাকে তিনি এই একচক্রায় আসেন। আর ফিরে যাননি। সমস্ত [illegible] নিতাই-এর সেবায় উৎসর্গ করে তিনি এখন পলিতকেশ বৃদ্ধ। দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ একবস্ত্রধারী এই সদাহাস্যময় ব্রাহ্মণকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। আজন্ম ব্রহ্মচারী তিনি, আমৃত্যু নিতাই-নিবেদিত তাঁর জীবন।

প্রাচীন শিবমন্দির : বীরচন্দ্রপুর

এই নিত্যানন্দ-উৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুহৃদ ভাগবত শাস্ত্রী পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী। ইনি নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভূত,—রামদাস বাবাজী মহারাজের ঘনিষ্ঠ প্রিয় শিষ্য। কবি, নাট্যকার ও বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা। পাঠ ও কীর্তনে বিদগ্ধ বৈষ্ণব সমাজে তাঁর খ্যাতির অন্ত নেই। প্রতিবারের মতো এবারও তিনি উৎসবে এসেছেন। নাট-মন্দিরে বসে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের কাছে বিতরণ করছেন নিত্যানন্দ-লীলামৃত। আগামী মাঘীপূর্ণিমার দিন ত্রিভঙ্গদাস বাবাজীর স্মরণোৎসবে গোস্বামী মহাশয় তাঁর স্বরচিত সূচককীর্তন করবেন।

নিত্যানন্দ-তীর্থের এ যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের কাছ থেকে লাভ করলাম ত্রিভঙ্গদাস বাবাজীর জীবনী। একচক্রার কাছাকাছি কীর্তিপুর গ্রামে ত্রিভঙ্গদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কাল থেকেই তিনি নিতাইপ্রেমিক। অতি অল্পবয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন ও রাধা-গোবিন্দের ভজন কীর্তন করে তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। একদিন নিত্যানন্দের শ্রেষ্ঠ করুণা তাঁর উপর বর্ষিত হল। নীলাচলে তীর্থবাসকালে এক শুভ রজনীতে তাঁর স্বপ্ন মধ্যে প্রভু আবির্ভূত হলেন। পথভোলা বৈরাগী পথিককে জীবনের পথ সন্ধান দিলেন নিতাই কর্ণধার। চরণিকের হাতের দণ্ড ভেঙে দিয়ে কর্মের ঘাটে তিনি ভক্তকে পার করে আনলেন। স্বপ্নাদেশ দিলেন—

একচক্রা গর্ভবাস
যাহা মোর নিত্যবাস
তাহা অতি মলিন হইল।
লয়ে মোর সেবাভার
করিবারে সুসংস্কার
অবিলম্বে তুমি তথা চল॥

সেই আদেশ শিরোধার্য করে ত্রিভঙ্গদাস একচক্রায় আগমন করলেন। জনহীন অরণ্য মধ্য থেকে নিত্যানন্দ-স্মারক পুণ্যস্থানগুলি তিনি উদ্ধার করলেন। তারপর

ভিক্ষাঝুলি কান্ধে করি
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি
নিরমিলা নিতাই-ভবনে॥

একচক্রা-গর্ভবাসের বর্তমান মন্দিরাদি ত্রিভঙ্গদাসের প্রচেষ্টায় নির্মিত। তিনিই এই বৈষ্ণব মহাতীর্থকে নূতন করে জাগ্রত করেন।' ১৩৫১ সালে এই একচক্রার মাটিতে ত্রিভঙ্গদাস দেহরক্ষা করেন। সেদিন ছিল মাঘী পূর্ণিমা। প্রতি বৎসর নিত্যানন্দ জন্মোৎসবের একদিন পরে মাঘী-পূর্ণিমার দিন একচক্রায় সমবেত ভক্তগণ ভক্তপ্রতিম ত্রিভঙ্গদাসের স্মরণোৎসব করেন।

॥ ৪ ॥

আম্র মুকুলের গন্ধ-আকুল দ্বিপ্রহরে নাট-মন্দিরে বসে নিত্যানন্দ-লীলা শ্রবণ করতে করতে লোকটির প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি পড়েছিল।

অবধূতরূপে ভূভারতের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে শ্রীপর্বতে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যা-নন্দের সাক্ষাত হল। নিত্যানন্দ বললেন—

প্রভু, আর আমার তীর্থ দর্শনে প্রয়োজন নেই। শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেমী তুমি, সর্বতীর্থসার তুমি—তোমার দর্শন পেয়েছি, আর তীর্থ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কিন্তু প্রভু, এতেও জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা যে মিটল না? তীর্থ তো সবই দেখলাম, কৃষ্ণ তো কোথাও দেখলাম না!

মাধবেন্দ্রপুরী বললেন—তুমি গৌড় যাও, —সেখানে নবদ্বীপে তুমি নিমাই-রূপী শ্রীকৃষ্ণকে পাবে।

নবদ্বীপে এসেছেন নিত্যানন্দ। বলাই এসেছেন কানাই-এর সন্ধানে। আকৈশোর সন্ন্যাসী—ধূলিধূসর কোপীন- সম্বল দেহ, নগ্ন পদ, হাতে দণ্ড, কমণ্ডলু। রুক্ষ-কঠোর উদাসীন এক তপস্বী—প্রেম কাঙাল বিরহ-উষর যার 'কবাট বন্ধ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে কলির শ্রীকৃষ্ণ শচীনন্দন গৌরাচাঁদ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীবাসজায়া মালিনীর স্নেহস্পর্শে তিনি শিশুভাবে আকুল হলেন। শচীদেবীকে নিভৃতে বললেন—মাগো, আমিই তোমার সেই হারানো ছেলে বিশ্বরূপ, আবার মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। তীর্থে তীর্থে নিত্য-ভ্রাম্যমাণ মরু-সন্ন্যাসী এতোদিনে পেলেন গঙ্গাতীরবর্তী সমাজ-সংসারের স্নিগ্ধ মরূদ্যান। বিবাগী পথিকের নিত্য-সঙ্গী দণ্ডকমণ্ডলু ভেঙে ফেলে ভাসিয়ে দিলেন ভাগীরথীর জলে। ভাগ্যের অমোঘ বিধানে

নিমাই যখন সন্ন্যাস নিলেন তখন সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের প্রথম ভাবনা—

বিষ্ণুপ্রিয়ার কী হবে? কে মোছাবে শচী-মার অশ্রুজল—

নাটমন্দিরের একটি কোনে বসেছিল লোকটি। পরনে একটি সাদা বর্হির্বাস, শীর্ণ গায়ে একটি খাটো চাদর। গলায় কণ্ঠি, মাথার প্রায় পাকা চুলগুলি কদম-ছাট। আনন্দোজ্জ্বল মুখ, ঠোঁট দুটি একটু একটু কাঁপছে, বন্ধ দু-চোখের কোণে অশ্রুধারা।

বিকেলের পংগতে আলাপ হল এই বাবাজীর সংগে। প্রাঙ্গণ জুড়ে লাইনের পর লাইন। সামনে পাতা পেতে নিকানো মাটিতে পাশাপাশি সব বসে গেছি। ধনী দরিদ্র, শহুরে আর গ্রাম্য, পুরুষ আর নারী, ব্রাহ্মণ আর লেট-বাইন। এই পংগতে কোনো জাতিবিচার নেই, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই। কে শুদ্ধ আর কে ব্রাত্য, কে সাধু কে পাপী,—নিতাই-এর অন্নপ্রসাদের পংগু ভোজনে সকলেরই আমন্ত্রণ।

বাবাজী ঠিক আমার পাশে বসেছিলেন। আমাদের সামনের পংক্তিতে মুখোমুখি বসেছিল একটি নিম্নশ্রেণীর কৃষাণ রমণী। বধূটির সঙ্গে তিনটি শিশু—সবচেয়ে ছোটটি স্তনলগ্ন। দামালটিকে মা সামলাতে পারে না। সে পাত থেকে কপ কপ করে তুলে খায়। ছোট বোনটি তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদে আর মার আঁচল ধরে টানাটানি করে। বিপর্যস্ত অবস্থা বেচারী বধূটির।

বাবাজী হঠাৎ উঠলেন। হাতের নড়া ধরে দুষ্ট ছেলেটিকে তুলে নিয়ে এসে নিজের কোলের উপর বসালেন। বললেন—

খা ব্যাটা খা—আমার সঙ্গে বসে যতো খুশি খা।

কোলের বাচ্চাটাকে মাটিতে ফেলে ধড়-মড়িয়ে উঠে এল বউটি। কঁকিয়ে উঠল একেবারে,—

করেন কি ঠাকুর, এ'টো হাতে আপনার পাত যে নষ্ট করে দিল!

মোটা ভাতের সঙ্গে নিতাই-এর ডাল এক-সাথে সাপটে মেখে বৃদ্ধ আর বালক কপা-কপ মুখে পুরেছে। চিবোনোর ফাঁকে একগাল হেসে বাবাজী বললেন—রাখ রাখ বেটি, তোর ছেলে যে নিতাই-এর নাতিন, জানিস নে?

বাবাজীর নাম ভক্তদাস। সেই থেকে আর তাঁকে ছাড়িনি। চোখে চোখে রেখেছি।

সন্ধ্যার মুখে আবার একবার গেলাম বীরচন্দ্রপুরে। সেখানে বাঁকা রায়ের আরতি দেখে আর মেলার ভিড় দেখে ফিরে আসতে রাত নটা। তার মানে নিষুতি রাত।

তবে উৎসবে রাত দিন নেই। নাটমন্দিরে গোপালদাস কীর্তনীয়ার পালা-কীর্তন বসেছে। প্রায় সারারাত্রির অনুষ্ঠান। যাত্রীনিবাস ফাঁকা, নাটমন্দিরে তিল ধারনের স্থান নেই। সবাই চতুর্থ প্রহরের জন্য প্রস্তুত হয়ে জমিয়ে বসেছে। নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব আনন্দোৎসব। তাই আজ পালা হবে রাস-লীলা। একটি বালক কীর্তনীয়া মিলনাত্মক কয়েকটি পদ অতি মধুর কণ্ঠে গাইল। তারপর দীর্ঘ মঙ্গলাচরণের পর গভীর রাতে শুরু হল পালা।

নাটমন্দিরের ভিড়ে বেশিক্ষণ থাকিনি। সাত্তিকা মন্দিরের সামনে অশ্বত্থবেদীর উপর বসে আছি। পেট্রোম্যাকসের ছটা এখানে আসেনি। ডাল পাতা ভেদ করে ত্রয়োদশীর চন্দ্রিমা মন্দিরের দেয়ালে আর অশ্বত্থ-বেদীর বুকে আলোছায়ার আলিম্পন রচনা করেছে। পাশে আছেন ভক্তদাস। জানি রাতটা এইখানে এইভাবেই কাটবে। তাই আপত্তি সত্ত্বেও ভক্তদাসের শীর্ণ পিঠে আমার কম্বলখানা জড়িয়ে দিয়েছি।

বীরভূমের ঐ অখ্যাত গ্রামে চন্দ্রালোকিত মুক্ত আকাশের নিচে অচেনা বন্ধুর সঙ্গে কাটানো ঐ আশ্চর্য রাতটি ভোলবার নয়। কতো কথা যে হল বৃদ্ধ ভক্তদাসের সঙ্গে!

আমি বললাম,—

এই মূলে ব্যাপারটাই আমার ভারি আশ্চর্য লাগে। স্নেহময় সংসারে আজন্ম লালিত যে নিমাই, প্রেমময়ী রূপসী তরুণীর তরুণ রূপবান স্বামী যে নিমাই, বিদ্যায় বিভূষিত আভিজাত্যে মণ্ডিত সামাজিক সংস্কারে সুশৃংখলিত যে নিমাই—সেই নিমাই সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন। আর বালককাল থেকে সংসারহারা যে নিতাই, আশ্রয়হীন পাথেয়হীন চীরমাত্র সম্বল অবধূত যে নিতাই—তিনি কিনা হলেন সংসারী, দুই স্ত্রী নিয়ে এই গঙ্গাতীরবর্তী সমাজে এসে বংশপ্রতিষ্ঠা করলেন! জগন্নাথের এ কী বিচিত্র লীলা!

ভক্তদাস বললেন—

এই লীলার গোপনতত্ত্বটি না বুঝলে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বোঝা যাবে না ভাই! এইটুকু মনে রেখো, নিমাই হলেন বিরহ, আর নিতাই হলেন মিলন। নিমাই হলেন আকাঙ্ক্ষা, আর নিতাই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা।

একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলুন!

হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে ঘর ছেড়ে পথে বার হলেন নিমাই, কৃষ্ণ-সন্ধানে পাগলিনীর মতো ধেয়ে চললেন বৃন্দাবনের অরণ্যে, কৃষ্ণ বেদনায় ব্যাকুল বিরহিণীর মতো নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরের কঠিন পাথর চোখের জলে ভাসালেন। আর শেষ পর্যন্ত এই নীল-কান্তমণিকে বক্ষে নেবার বিহ্বলতায় নীলাম্বুরাশিতে দিলেন আত্ম-বিসর্জন। তাই না?

হ্যাঁ, বলুন।

কিন্তু নিতাইকে দ্যাখো। নবদ্বীপে নন্দনাচার্যের ঘরে প্রথম যেদিন তিনি নিমাইকে দেখেছেন সেদিন থেকেই তিনি চরিতার্থ। চির-ঈপ্সিত ধন এক লহমায় তিনি লাভ করেছেন, তাঁর মরদৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হয়েছেন গৌরসুন্দর নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। আর বিরহ-ব্যাকুলতা নেই, সমস্ত জীবন ভরে এখন থেকে শুধু আনন্দ-আকুলতা। আর সন্ন্যাসে তাঁর প্রয়োজন কী? পরম আনন্দ-মন্ত্র তিনি পেয়েছেন। সেই মন্ত্রকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই মন্ত্রের প্লাবনে সংসারকে তিনি ভাসিয়ে দিলেন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধ ভক্তদাস বললেন—

মন্ত্রটি কী বলো তো? সংসারীর পথের পাথেয়, পারের কড়ি—ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে!

আলো-অন্ধকার প্রাঙ্গণ পার হয়ে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রসাদদা। হাতে তার জপের ঝুলিটি। এক পাশে বসে নিচু গলায় বললে,—

কী কথা হচ্ছে আপনাদের?

বৃদ্ধ হেসে বললেন—আর কী কথা? আমাদের ঐ পতিত পাবন নিতাই কর্ণ-ধারের কথা!

নিতাই কর্ণধার! প্রসাদদার সেই গান!

বাবাজী আপন মনে বলে চললেন—এই সংসার সমুদ্রে কতো ঝড়, কতো ঢেউ, কতো ঘূর্ণি? পারের কাণ্ডারী নিত্যানন্দ। তাঁর নৌকায় প্রেমের হাল, প্রেমের পাল! জগাই মাধাইকে যেদিন উদ্ধার করলেন সেই দিনই পাপীতাপী সংসারী মানুষের কাছে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। প্রাণ পড়ে থাকে নীলাচলে, কিন্তু এই দুঃখময় সংসারের প্রেমালিঙ্গনে পা দুটি যে বাঁধা পড়ে গেছে। তাই তো অবধূত নিত্যানন্দ সংসারী! সংসার ছাড়া দুঃখ কোথায় দুর্গতি কোথায়? সমাজ ছাড়া ঘৃণা কোথায়, পাপ কোথায়?

ভক্তদাস বাবাজীর কথা শুনতে শুনতে আমি সেই পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সমাজরূপের কথা চিন্তা করছিলাম। সেই যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নব-অভ্যুত্থানের এক বিরাট সামাজিক প্রয়োজন ছিল। এই অভ্যুত্থানের পুরোধা ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁর তিন শিষ্য অদ্বৈতাচার্য, কেশব ভারতী ও ঈশ্বরপুরী। তিনজনই শ্রীচৈতন্যের গুরুস্থানীয়। এঁদের কাছ থেকে কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্র লাভ করে চৈতন্য সংসার ত্যাগ করেন। আবার এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবধূত নিত্যানন্দ সমাজ-সংসারে পুনঃ প্রবেশ করেন এবং বিশাল এক সামাজিক আবেদনকে জাগ্রত করেন।
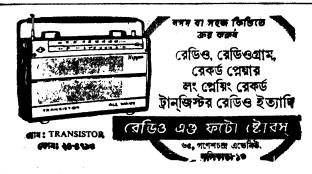
বাঙালী ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ তখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে—ব্রাহ্মণ্যগর্বী উচ্চ সম্প্রদায় আপামর জনসাধারণকে হেয় অপাংক্তেয় করে রেখে পরম সন্তোষ লাভ করছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘৃণার ও অস্পৃশ্যতার গণ্ডি—সেই গণ্ডির এপারে ওপারে কতো জঘন্য অনাচার, কতো বীভৎস অত্যাচার! অস্তমিত বৌদ্ধ-ধর্মের অন্ধকারে সমাজহারা আশ্রয়হারা ভিক্ষু ভিক্ষুণীর দল পাপস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে। এদিকে রাজ্যের শাসক মুসলমান, নিম্নশ্রেণীর লোক দলে দলে পরধর্ম গ্রহণ করছে। উচ্চনীচ পাংক্তেয় অপাংক্তেয়ের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে উদার মানব-প্রেমে হিন্দুধর্মকে নব বলীয়ান করার ব্রত নিয়েছিলেন জাতনাশা নিত্যানন্দ।

পশ্চিমে মুচুকুন্দ গাছ। তার শিখরে চাঁদ। পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে শ্বেত চন্দন ধারা—প্রভু নিত্যানন্দের শুভ্র আশীর্বাদের মতো। প্রাণদদা বালার বুলিটা কোলে রেখে গুন গুন শুরু করলে,—

জগৎ যারে ত্যাগ করে।
নিতাই তাকে বুকে ধরে॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলে
জগৎ যারে দূরে ঠেলে
ভয় নাই তোর আছি বলে
নিতাই তারে রাখে কোলে॥

॥ ৩৫ ॥

"ড্রিংক সার্ভ করে সরাবজী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বেচারার চোখ দুটো ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে।" মিস্টার হবস আমাকে বললেন। "আজকের সরাবজীকে দেখে সেদিনের সেই ছেলেটিকে তোমরা চিনতে পারবে না। তখনও তার যেন কৈশোরের ঘোর কাটেনি। তারই মধ্যে সে মদের দোকানে এসে ঢুকেছে। কলকাতার রাত্রির রূপকে দেখছে।"

মিস্টার হবস যেন অতীতের পাতাগুলো উল্টে দেখবার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ নিজের মনেই ভাবলেন। তারপর বললেন, "ওকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এমন বোকামি করছো কেন? তুমি যদি চাও আমি নিজেই পার্শী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি। তুমি লেখাপড়া করো, তারপর চাকরী পেয়ে যাবে।

সেদিনকার ওইটুকু ছেলের মধ্যেও কিন্তু আত্মপ্রত্যয় ছিল। সে বলেছিল, 'আপনি যতই চেষ্টা করুন আমার কিছু করতে পারবেন না। ঈশ্বর চান, আমি কষ্টের মধ্য দিয়ে এইভাবে বড় হয়ে উঠি। না হলে এই বয়সে সবার যখন বাবা-মা থাকে তখন আমি অনাথ কেন? তবুওতো আমি ইস্কুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মাথায় বুদ্ধি এল না কেন? ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা থাকবে, তাহলে আমি তো ইস্কুলের সেরা ছেলে হতে পারতাম, সব পরীক্ষায় প্রথম হতে পারতাম। কিন্তু তা হলাম না কেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য রকম। না হলে এমন হবে কেন? অনাথ আশ্রম থেকে তাই নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চলে এসেছি।"

হবস সায়েব আবার একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্বাধীন ভারতবর্ষে তোমরা তো মেয়েদের সব বিষয়ে সমান অধিকার দিয়েছো তাই নয়?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

হবস সায়েব হাসতে লাগলেন। "এবার তাহলে একটা ছেলে ঠকানো প্রশ্ন করি। বলো দেখি, কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতা এখনও স্বীকৃত হয়নি?"

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। আমার পিঠে একটা হাত রেখে হবস বললেন, "সরাবজীকে জিজ্ঞাসা করো, সে এখনি বলে দেবে। নারী স্বাধীনতার বিরোধী দলের শেষ দুর্গ হলো হোটেল। বার লাইসেন্সে লেখা আছে কোনো নিঃসঙ্গ মহিলাকে বার-এ ঢুকতে দেওয়া হবে না। মেয়েরা তোমাদের দেশে একা একা এখন যেখানে খুশি যেতে পারে, এভারেস্টের চূড়ায় উঠলেও কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু আজও বার-এ কোনো মহিলা একলা গেলে প্রবেশ নিষেধ। সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী থাকলে অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে যে কোনো ড্রিংকের আনন্দ উপভোগ করা চলতে পারে।"

মিস্টার হবস হাসতে লাগলেন। বললেন, "সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী এই নিয়ম কোনো মহিলা একবার আদালতে যাচাই করে দেখলে পারেন! তবে নিয়মটা

অনেকদিন থেকেই চলছে। এবং যারা আইন করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। নিঃসঙ্গ মহিলারা বার-এ আসতে চান অন্য উদ্দেশ্যে। আর আজও তাঁরা এসে থাকেন। খারাপ বারগুলোতে ঢুকলেই বোঝা যায়। সেকেন্ড হ্যান্ড দেহের পসরা সাজিয়ে দেশ বিদেশের মেয়েরা বড়শিতে মুই কাতলা ধরবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। তোমাদের এখানেও যে ব্যবস্থা নেই তা নয়, তবে অনেক সংযত ও ভদ্রভাবে!"

মিস্টার হবস হাসলেন। "নিয়মটা বোধ হয় খারাপ নয়। কিন্তু পুরুষ শুধু এই আইনের জোরেই করে খাচ্ছে। ফর্সা জামা এবং ফুল প্যান্ট পরে গরীব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেরা মেয়ে ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। 'হ্যালো ডলি, আজ কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে। যত রাত হোক তোমার জন্যে আমি বসে থাকবো।'

ডলি বলে, 'পিটারের মাকে কথা দিয়ে দিয়েছি। পিটারকে এসকর্ট হিসেবে নিয়ে যাবো। একটা টাকা দিলেই হবে।'

'আমি বারো আনায় রাজী আছি। আমার পয়সার দরকার।' ছোকরা বলে।

'তোমরা যে চিংড়িমাছের মতো হয়ে গেলে। দেখছি, তোমাদের দাম মেয়েমানুষের থেকেও কম। বারো আনা পয়সার জন্যে ওই গুন্ডা রাজত্বে ঘন্টার পর ঘন্টা আমার সঙ্গে বসে থাকতে রাজী আছো?'

আবগারী আইনকে ফাঁকি দেবার জন্যে এই এসকর্ট বা সঙ্গীদের না হলে অনেক বার-এ ঢোকা যায় না। আর এইভাবেই ম্যাডান অর্থাৎ সরাবজী কলকাতায় প্রথম অন্ন সংস্থান করেছিল।"

হবস বললেন, "সরাবজীর মুখেই শুনেছি, এক ছোকরা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তাকে এই সুযোগ করে দিয়েছিল। বয়স তার কম—আইন অনুযায়ী এই বয়সের সঙ্গী নিয়েও বার-এ ঢোকা যায় না। কিন্তু হাফেসজী বার-এর মালিক মিস্টার হাফেসজী আইন সম্বন্ধে অত খুঁতখুঁতে ছিলেন না। তিনি এসকর্টের বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কম বয়সের এসকর্টরা যে দামে সস্তা হয়, এবং বেচারা মেয়েদের পক্ষে খরচের ভার কিছুটা কমে যায়, তা তিনি বুঝতেন। তিনি শুধু বলতেন, 'তোমরা ঐ অসভ্যতা-টুকু কোরো না—একটা লেমনেড নিয়ে দুজনে ভাগ করে খেও না। এতে হোটেলের সুনামের ক্ষতি হয়, অন্তত দুটো বোতল সামনে রাখো।'

সরাবজী যখন কলকাতার পথে পথে দুমুঠো অন্নের জন্য ঘুরছে তখন ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়। সে বদলী খুঁজছিল। সিনথিয়াকে সেই রোজ বার-এ নিয়ে যায়। তার সঙ্গে বসে থাকে তারপর চারে খদ্দের

আসে, দর-দাম ঠিক হয়ে যায়, তখন নতুন আগন্তুককে সিনথিয়ার পাশে বসতে দিয়ে সে কেটে পড়ে। সঙ্গীকে রোজ আসতে হয়, অথচ তার কয়েকদিনের জন্যে খড়্গপুরে যাওয়া দরকার। রেলের কারখানার জানা শোনা একজন ভদ্রলোক আছেন—তার কাছে চাকরির তদ্বির করতে হবে।

তাই ছোকরা ম্যাডান, অর্থাৎ সরাবজীর সঙ্গে পরিচয় হতে তাকে সিনথিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বললে, 'মাত্র এক সপ্তাহের কাজ কিন্তু। আমি ফিরে এলেই তোমাকে কেটে পড়তে হবে। তখন যেন গণ্ডগোল পাকিও না। দু'একজন আগে আমাদের লাইনে এই নোংরা চেষ্টা করেছে, মেয়েরা দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়েছে, হয়তো একটা সিগারেট দিয়েছে তাতেই মাথা ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু বাজারে ঠ্যাঙানি বলে একটা জিনিস এখনও আছে। সামনের দুটো দাঁত যদি ঘুসি মেরে উড়িয়ে দিই তা হলে সেখানে আর দাঁত গজাবে না, মনে থাকে যেন।'

ম্যাডান রাজী হয়ে গিয়েছিল। এখন ক'দিন তো খেয়ে বাঁচা যাক। সিনথিয়ার সঙ্গেই সে প্রথম বার-এ ঢুকেছিল। প্রথমে একটু ভয় ভয় করেছিল। সিনথিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে দিয়ে মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেছিল, 'দেখি তুমি লাকি চ্যাপ কি না। হয়তো এখনি কাস্টমার পেয়ে যাবো।'

সরাবজীর কেমন ভয় লাগছিল। এমন বেয়াড়া পরিবেশ জীবনে সে কখনও দেখেনি। সিগারেটের ধোঁয়ায় এমন অবস্থা যে, মনে হচ্ছে যেন ঘরের মধ্যেই কাঁচা ঘুঁটেতে কেউ আগুন দিয়েছে। দূরে গোটা তিনেক লোক বাজনা বাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা ইশারায় মেয়েদের ডাকছে—বসে বসে লেমনেড না গিলে এখানে এসে একটু নাচো গাও। আমাদের বার-এর এমন সামর্থ্য নেই যে আবার পয়সা দিয়ে নাচ-গানের মেয়ে রাখবে। অথচ মিউজিক ও ডান্স লাইসেন্স রয়েছে। প্রতি বছর এক আঁজলা পয়সা দিয়ে লাইসেন্স রিনিউ করতে হচ্ছে, প্রতিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে যে নৃত্যে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের বেশভূষা ভদ্র হবে।

সরাবজী দেখেছিলেন, বার-এর মধ্যে শুধুই লেমনেড চলেছে। জোড়ে জোড়ে সিনথিয়া এবং তার মতো এসকর্টরাই বসে রয়েছে। ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সিনথিয়া বলেছে রাত নটা পর্যন্ত এইভাবে চলবে, তারপর খরিদ্দাররা আসতে শুরু করবে। আজ আবার ভাল জায়গা পেলাম না। একটু দেরি করলেই ভাল জায়গা-[illegible] অন্য মেয়েরা নিয়ে নেয়। সেলার-[illegible] একটু কোণ চায়। কোণগুলো সব [illegible] তবে ওরা আমাদের দিকে

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সিনথিয়া বলেছে, 'আমার বাপু অতো ধৈর্য নেই। সেই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আমি বসে থাকতে পারবো না। আর এক রহিমকে কিছু পয়সা দিলে হয়। তাও তো এমনিই এক টাকা দিতে হয়, আর কতো দেবো?'

সরাবজীর বোধ হয় গলা শুকিয়ে আসছিল। সে আর একটু লেমনেড খেতেই সিনথিয়া হাতে একটা টোকা দিয়েছিল। 'হ্যালো ম্যান, তুমি কি আমাকে ডোবাবে নাকি? কতক্ষণ এখানে বসতে হবে ঠিক নেই, আর তুমি এরই মধ্যে অর্ধেক গেলাশ সাবাড় করে দিয়েছো। যদি আবার লেমনেড কিনতে হয় তোমাকে পয়সা দিতে হবে বলে দিলাম। আমার পয়সা অতো সস্তা নয়, কোথায় খদ্দের তার নেই ঠিক, অথচ খোলামকুচির মতো পয়সা ছড়িয়ে চলেছি।'

সরাবজী আর কোনোও কথা বলেনি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, সামনে গেলাশের মধ্যে জলের কণাগুলো তখনও আদিম মুক্তির স্বাদ পেয়ে নেশাখোরের মতো নাচছে। সিগারেটের গন্ধে কাশি আসছে। ঘরের মধ্যে এবার যেন দুজন সেলার এসে ঢুকলো। বিরাট লম্বা—যেন কড়ি কাঠে মাথা ঠেকে যায়। সিনথিয়া চেয়ার ছেড়ে

তাদের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তার ছিপে মাছ আটকালো না। সিনথিয়া ফিরে এসে একটু হাঁপালো, তারপর আবার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াটা সংগীর মুখের উপর ছেড়ে দিল। সংগীর তখন সেদিকে খেয়াল নেই। সে একমনে জলবিন্দুর রাজ্যে যে সংগীত ও নৃত্য চলেছে, তাই দেখছে।

সিনথিয়া বললে, 'ঠিক আছে এখন আর একটু খেয়ে নাও। কাল থেকে বেরোবার আগে দু'তিন গ্লাস জল খেয়ে আসবে। এখানে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। ভাগ্য ভাল থাকলে হয়তো একঘণ্টা পরেই পয়সা নিয়ে চলে যেতে পারবে।'

আরও কথা হতো। কিন্তু হঠাৎ যেন সিনথিয়া ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ল। হলের আদিম উল্লাসের মুখে কে যেন ছিপি এঁটে দিল। বেয়ারা এসে সব মেয়েদের টেবিলের দিক দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল, সবার সংগী আছে তো? না হলে গবর্নমেন্টের লোক বিপদে ফেলবে, কী যে ও'দের মর্জি—মাঝে মাঝে দেখতে আসেন কোনো মেয়ে একলা বসে আছে কি না।

সরাবজী শুনলে ম্যানেজার বলছে, 'দেখুন স্যার। সবার এসকর্ট রয়েছে। জেনুইন কাস্টমার।'

ইনস্পেক্টর এবার ও'দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সিনথিয়া এ-সবে অভ্যস্ত। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সরাবজীর আঙুলগুলো নিয়ে খেলতে লাগলো। তারা যেন গল্প করছিল এমনভাব দেখাবার জন্যে বললে, 'আচ্ছা জন, তারপর কী হলো?'

সরাবজী ভয় পেয়ে গিয়েছে। সে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ছে। তাকে উঠে পড়তে দেখে ম্যানজার অসন্তুষ্ট হলেন। ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ'কে সংগে করে আপনি বার-এ এসেছেন?'

সে বেচারা বুঝতে পারছিল না কী উত্তর দেবে। সিনথিয়া কিছু বলেও দেয়নি। সিনথিয়া এবার তার দিকে চোখ টিপলে। সেও কোনো রকমে মাথা নাড়লো।

ইনস্পেক্টর বোধ হয় সব বুঝলেন। হেসে বললেন, 'একেবারে নতুন বুঝি।'

ম্যানেজার বললেন, 'কী বলছেন স্যার, জেনুইন কাস্টমার। প্রায়ই আসে।'

ম্যানেজারের কানের কাছে মুখ এনে ইনস্পেক্টর বললেন, 'হ্যাঁ, লেমনেড খাবার এমন সুন্দর জায়গা তো আর কলকাতায় নেই!'

তারপর খরিদ্দার এসে গিয়েছে। নিজের পয়সা নিয়ে সরাবজী চলে এসেছে। তারই শূন্য স্থানে এসে বসেছে হাফেসজী বারের নতুন অভ্যাগত।

পরের দিন সিনথিয়ার সংগে আবার দেখা হয়েছে। সিনথিয়া বলেছে তোমার পয় আছে। গতকালের লোকটা দিল খুলে ড্রিংক করিয়েছে, তারপরেও টাকাকড়ি নিয়ে ছোটোলোকমি করেনি। মেহনত পুষিয়ে দিয়েছে। এমন খদ্দের রোজ পেলে আমাদের দুঃখের কিছুই থাকবে না।

সরাবজী আবার গিয়ে বসেছে। সিনথিয়ার পাশে বসে লেমনেড খেতে খেতে সে খদ্দের-এর আবির্ভাব কামনা করেছে। আজও আশ্চর্য সৌভাগ্য। গেলাশে এক চুমুক দেবার পরেই আগন্তুক এসে গিয়েছেন। পান-সঙ্গিনী হিসেবে সিনথিয়াকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। সরাবজী গেলাশটা ছেড়েই উঠে আসছিল। সিনথিয়া বললে, 'মুখের জিনিসটা ফেলে যেয়ো না। ওটা শেষ করে চলে যাও।'

পরেরদিন সরাবজী আবার সিনথিয়ার কাছে গিয়েছে। 'রিয়েলি লাকি চ্যাপ!' সিনথিয়া বলেছে। 'কাল কী হলো জানো? খদ্দেরকে নিয়ে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলাম, তার ট্রেন ধরবার তাগিদ ছিল। ফিরে এসে আফসোস হলো, আর একবার গিয়ে বসা যেতো। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দিয়ে খুব ভুলই করেছিলাম। একাই ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ম্যানেজার সাহস করলে না। বললে, 'আবগারী দারোগারা প্রায়ই আসছে—গোলমাল পাকাবে। তাছাড়া তোমার তো এক রাউন্ড হয়েও গেল—অন্য বোনদের করে খাবার সুযোগ দাও।'

সিনথিয়া নিজে থেকেই কিছু বেশী পয়সা দিয়েছে। বলেছে, 'তুমি এতো ল্যাদাড়ু কেন? টেবিল ছেড়ে চলে যাবার আগে খদ্দেরের কাছে বকশিশ চাইবে। আমিও তখন বলবো আমার লোককে কিছু দিয়ে দিন। আমরা তো ভদ্রঘরের মেয়ে—বাবা মাকে লুকিয়ে এসেছি। পয়সা না পেলে ও বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে, আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।'

সরাবজী তবু পয়সা চাইতে পারেনি। চুপচাপ বসে থেকে সে বার-এর রূপ দেখেছে। মালিকের সংগে পরিচয় করেছে। দেখেছে রাত্রের অন্ধকারে পুলিসের লোকেরা মাঝে মাঝে বার-এ আসে। হাফেসজী ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেন। আদর আপ্যায়ন করেন। কোন ড্রিংক করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তারপর পুলিস খাতা চায়—বার ইনস্পেকশন বুক। ইংরিজীতে হুড় হুড় করে পুলিস অফিসার লিখে দেন—

—"Inspected the bar at 11 p.m. Mr. Hafesji was in personal attendance. Place full of customers. All ladies had escorts. Nothing unusual to report."

কথা থামিয়ে হবস এবার একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আজও প্রতি রাত্রে কলকাতার বারগুলোর খাতায় ওই একই মন্তব্য লেখা হচ্ছে। তোমাদের শাজাহানেও তাঁরা নিশ্চয় আসেন এবং ঐ একই কথা লিখে দিয়ে যান।"

আমি বললাম, "আমাদের খাতায় সাধারণত মন্তব্য লেখা হয় না।"

হবস বললেন, "হাফেসজীর বারেও এখনও লেখা হচ্ছো না।

কয়েকদিন পরেই সিনথিয়ার পুরনো সঙ্গী ফিরে এসেছিল। সিনথিয়া কিছুতেই নতুন এসকর্টকে ছাড়তে চায়নি। বলেছিল, 'এমন পয়মন্ত ছেলেকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।'

কিন্তু ম্যাডান রাজী হয়নি। বলেছে, 'আমি অন্যায় করতে পারবো না। ওর কাজ আমি নিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন।'

ভগবান এবার বোধহয় একটু মুখ তুলে তাকালেন। সিনথিয়ার 'সঙ্গী' হাফেসজীর বার-এ চাকরি পেয়ে গেল। ম্যাডান নিজেকে ধন্য মনে করেছে। সকালে যখন বার খোলে তখন কোনোই কাজ থাকে না। হাফেসজীর বার খালি পড়ে থাকে। দু'একজন যদি বা আসে তারা এক-আধ পেগ খেয়েই পালায়। আবার দুপুরে একদল আসে। নফঃস্বলের লোক। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুন্দরী কলকাতার সান্নিধ্যসুখ উপভোগের সময় নেই তাদের। তারপর রাত্রে। হাফেসজী নিজে এসে কাউণ্টারে বসেন। বার-এর রঙ এবং রূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়।"

মিস্টার হবস এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো?"

বললাম, "মোটেই না। সরাবজীকে চেনবার এমন সুযোগ আপনি না থাকলে কোনোদিন পেতাম না।"

হবস মাথা নাড়লেন। "আমি নিজেই ওকে বুঝতে পারলাম না। আজ এখানে তাকে না দেখলে হয়তো সরাবজী আমার কাছে আরও পাঁচটা লোকের একটা হয়ে থাকতো। কিন্তু এখন সে আমারই কৌতূহলের সৃষ্টি করছে।"

আমি বললাম, "সরাবজীকে আপনি আমার কাছে গল্পের নায়কের মতো করে তুলছেন।"

হবস বললেন, "অবজ্ঞা কোরো না, তোমাদের এই হোটেলের প্রতিটি ইটের মধ্যে এক একটা উপন্যাস লুকিয়ে রয়েছে। ইংরিজীতে সস্তা হোটেল উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তা নয়—প্রকৃত মানুষের গল্প, তার সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত।"

হবস এবার একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন। "বুড়ো বয়সে বকবক করা মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। আর চিন্তার শক্তি যখন উবে যায় তখন কোটেশন দেবার রোগে ধরে। আমারও একটা কোটেশন দিতে ইচ্ছে করছে। তোমাদের হোটেলেই স্যাটা আমাকে বলেছিল,

a bar is a bank where you deposit your money and lose it; your time and lose it; your character and lose it; your self-control and lose it; your own soul and lose it.

সবই খরচের খাতায়। এই পড়া ব্যাঙ্কে তোমার টাকা, সময়, চরিত্র, সন্তানের সুখ শান্তি এবং আত্মাকে গচ্ছিত রেখে খোয়াতে হয়। কিন্তু একজন ফুলে ওঠে। সে হাফেসজী। অন্যের খরচ-করা পয়সা হাফেসজীর ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা পড়ে।

ম্যাডান যে কবে সরাবজী হয়ে গিয়েছে খবর পাইনি। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখাও হয়নি। তারপর কয়েক বছর পরে হঠাৎ ধর্মতলার মোড়ে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই সে ছুটে এল। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো। বললে, আমাকে মনে পড়ছে? আপনার দয়াতে সেবার চাকরিটা রক্ষে হয়েছিল? আমি হাফেসজীর দোকান ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি? ঝগড়া হলো নাকি?'

'না ঈশ্বর মুখ তুলে তাকিয়েছেন। আমি নিজেই একটা দোকান করেছি।'

'বার? সে তো অনেক পয়সা লাগে।'

'ঈশ্বর যাকে দেখেন তার তো কিছুই প্রয়োজন হয় না। ধর্মতলায় তালতলার কাছে একটা বার পেয়ে গেলাম। যে মালিক সে অসুখে ভুগছে। তাকে বিলেত চলে যেতে হলো। তাই আমাকে পার্টনার করে নিয়েছে। আমি দেখাশোনা করবো, তাকে লাভের ভাগ দেবো।'

জোর করে সে আমাকে বার-এ ধরে নিয়ে গিয়েছে। সমস্ত দেখিয়ে বলেছে, 'অনেক ভদ্র দোকান। ওখানকার মতো নয়।' আমি দেখেছি অনেকে বসে ড্রিংক করছে। কিন্তু হৈ হৈ হট্টগোল নেই।

ম্যাডান বলেছে, 'আমি নাম পাল্টিয়ে নিয়েছি। সরাবের লাইনেই যখন থাকতে হবে তখন আমি সরাবজী।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সরাবের সঙ্গে নিজে কোনো সম্পর্ক না করলে চলবে কেন?'

সরাবজী লজ্জায় জিভ কেটেছে। 'কী যে বলেন, আমার ঠোঁট জীবনে মদ স্পর্শ করেনি। হাজার হাজার পেগ মদ বোতল থেকে ঢেলে অন্য লোককে দিয়েছি, কিন্তু তার আস্বাদ কী আমি জানি না।'

আবার দেখা হয়েছে। সরাবজী আমাকে তার বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছে। বলেছে, 'আপনার জন্যেই তো সব। সেদিন যদি হাফেসজীর দোকানে টিকতে না পারতাম, তা হলে আমার কিছুই হতো না।'

সরাবজী বলেছে, 'যাকে বিয়ে করেছি সেও আমার মতো অনেক দুঃখে অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে। বেচারা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল—হাজার হোক মদের দোকানে কাজ করি।'

সরাবজীর বউকে প্রায়ই মার্কেটে দেখেছি। সত্যি লক্ষ্মী বউ। নিজে রেস্টুরেন্টের বাজার করেন। অন্য কারুর হাতে বাজারের ভার দিলেই ঠকাবে। মাংসের দাম বেশী লেখাবে, ওজন কম দেবে।

আমি বলেছি, 'আপনি বাজার করেন?'

মিসেস সরাবজী বলেছেন, 'আমি না দেখলে ও-বেচারাকে দেখবে কে? নিজে বাজার করি বলে জিনিসটা ভাল হয়, খদ্দেররা প্রশংসা করে, অথচ দাম কম লাগে।'

আমি প্রশ্ন করেছি, 'আপনি কি দোকানেও স্বামীকে সাহায্য করেন?'

মিসেস সরাবজী বলেছেন, 'ওইখানেই তো মুশকিল। ওখানে আমার যাওয়া সম্পূর্ণ বারণ। আমি একবার বলেছিলাম
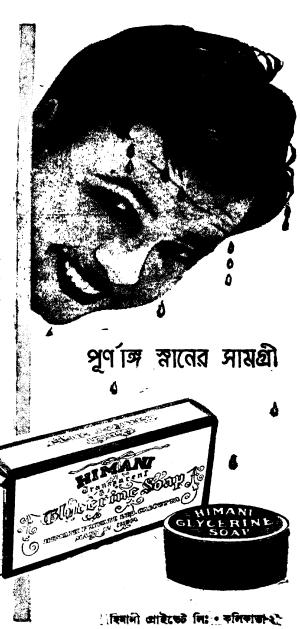
কিচেনের লোকদের সংগে একটু কথা বলে আসবো। কিন্তু উনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। আমি বাজার নিয়ে বাড়ি যাই। মেনু ঠিক করে দিই। উনি সেখান থেকে মাল-পত্তর নিয়ে দোকানে চলে আসেন। যেদিন কাজে আটকে পড়েন, সেদিন কিচেনের মেটকে পাঠিয়ে দেন। কেউ না এলে আমি টেলিফোন করি, কিন্তু তবু দোকানে যাওয়ার হুকুম নেই।'

আমি বললাম, 'আপনার স্বামী তাহলে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন!'

'মোটেই না। উনি বলেন, দুনিয়ার যেখানে খুশি যেতে পারো, কিন্তু আমার বার-এ নয়।'

'আর আপনিও বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিয়েছেন!' আমি উত্তর দিলাম।

মিসেস সরাবজী বোধ হয় একটু লজ্জা পেলেন। কিন্তু আমার সংগে তাঁর স্বামীর কি সম্পর্ক তা জানেন, তাই ফিস ফিস করে সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, 'আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু উনি কি বলেন জানেন? উনি বলেন, তোমার দেহে না সন্তান আসবে? বার-এর বাতাস পর্যন্ত সেই অনাগত অতিথির ক্ষতি করতে পারে।"

হবস এবার বোধহয় হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "সরাবজীর সন্তান হয়েছে খবর পেয়েছি। আরও খবর পেয়েছি সমস্ত দোকানটাই সে কিনে নিয়েছে। ওর অংশীদার আর বিদেশ থেকে ফিরবেন না, তাই সামান্য যা সঞ্চয় ছিল এবং স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে দিয়ে সরাবজী বার ও রেস্টুরেন্টটা কিনে নিলে।

আমার সংগে বার-এ আবার দেখা হয়েছে। সরাবজী বলেছে, এসব আপনার জন্যেই সম্ভব হয়েছে, এই বার আপনার নিজের বলেই জানবেন।।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে। সরাবজী বললে, 'আমার এই বার হাফেসজীর বারের মতো নয়। আমি ভালো জিনিস দিই, জল মেশাই না। মেয়েদের ঢুকতে দিই না। তবুও শান্তি নেই।'

প্রশ্ন করলাম, কেন?

সরাবজী বললে, 'আমার বার সাড়ে দশটায় বন্ধ। কিন্তু বিকেল থেকে যারা বসে থাকে, তারা ক্রমশ গরম হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। প্রথম পেগে স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় পেগে আনন্দ, তৃতীয় পেগে লজ্জা এবং চতুর্থ পেগ থেকে পাগলামো। তখন আমার ভাল লাগে না। রোজ কিছু না কিছু গোলমাল লেগেই থাকে।'

সরাবজী বললে, 'আমার বার-এর যথেষ্ট সুনাম আছে। যারা শান্ত পরিবেশে শান্তিতে ড্রিংক করতে চায় তারাই আসে। তবু মাঝে মাঝে গোলমাল শুরু হয়ে যায়।'

নিজের চোখেই তার নমুনা দেখলাম। বেয়ারা এসে বললে, কেবিনে এক সায়েব ডাকছেন।

সরাবজী উঠে পড়লে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে আমিও ওর পিছু পিছু গেলাম। ইন্ডিয়ান সায়েব ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'নট্টা গুড্ডা ড্রিংক—পানি ডালটা।'

জিভ কেটে সরাবজী বললে, 'কী বলছেন আপনি? আমার বার-এ ও-সব জোচ্চুরি চলে না। বলেন তো বোতল পাঠিয়ে দিচ্ছি—তার থেকে আপনার সামনে ঢেলে দেবে।'

খরিদ্দার বললেন, 'পাইব্ পেগস্ আল-রেডি ড্রিংক করেছি, তবু মনে হচ্ছে যেন স্বামী বিবেকানন্দের চেলা।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে বার-এর কাউণ্টারে আসতে আসতে সরাবজী বললে, 'আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। এমন কেস রোজই দু' একটা এসে পড়ে, নতুন লোক বুঝতে পারে না।'

একটা হুইস্কির বোতল হাতে করে কেবিনে এসে সরাবজী বললে, 'আমরা ডাইরেক্ট মাল নিয়ে আসি। যদি বলেন, সামনে সীল খুলে সার্ভ করছি।'

আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। শুনলাম, এবার ভদ্রলোক আসল প্রসংগ অবতারণা করলেন। 'গার্ল চাই।'"

হবস এবার হেসে ফেললেন। বললেন, "ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে সরাবজী যা উত্তর দিয়েছিল তা কোনো সাহিত্যিকের কানে গেলে বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন করতো। সরাবজীর হাত ধরে ভদ্রলোক বললেন, 'প্লিজ্...প্লেজার গার্ল'।'

সরাবজীও তাঁর হাতটা চেপে ধরলো। তারপর তাঁকে বোঝাতে লাগল, 'গার্লস হিয়ার নো গুড্। হাউস গার্ল, গার্লস ইন ইয়োর ফ্যামিলি ফার ফার বেটার। হোটেল গার্লস টেক অল মানি।' সরাবজী নিজের ভাব প্রকাশের জন্যে তারপর যেন অভিনয় শুরু করলে। তুলনামূলক সমালোচনা করতে গিয়ে জানালেন, 'স্ট্রীট গার্লস ডোন্ট লাভ ইউ, দে লাভ ইওর মানিব্যাগ্। হাউস্ গার্ল—মাই সিস্টার ইন্ ইওর হাউস্—লাভ ইউ। ইফ সি হিয়ারস, সি উইল উইপ'—এবার সরাবজী কেঁদে কেঁদে অভিনয় করতে লাগলেন। ভদ্রলোক বোধ হয় যেন একটু লজ্জা পেলেন। কোনোরকমে মদের বিল চুকিয়ে, একটা পয়সাও টিপ্স না দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

সরাবজী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখলেন তো? আগে একলা ছিলাম, তখন সব সহ্য হতো। এখন বয়স হচ্ছে, মেয়ের বাবা হয়েছি, কেমন যেন অসহ্য লাগে।'

আমি কিছুই না বলে ফিরে এসেছি। খবর পেয়েছি, সরাবজীর দোকান এখন ভালভাবেই চলছে। অনেক মদের স্টক ওর। যা অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না তাও ন্যায্যমূল্যে সরাবজীর বার-এ পাওয়া যায়। সরাবজী বলেছে, 'ঈশ্বর ওপরে আছেন, সৎপথে থেকে ব্যবসা করছি, তিনি দেখবেন।'

আরও একদিন সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভদ্রলোক মুখ শুকনো করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি গাড়িতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি থামিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?'

সরাবজী বললে, 'ড্রিংক করলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় কেন বলতে পারেন?'

বললাম, 'হয়তো অ্যালকহলের রাসায়নিক ফল।'

সরাবজী বললে, আমি কাম মুলেছি। মাতালদের আমি কোনোদিন আর কিছু বলবো না। জানেন, দোকানে আসবে এক সঙ্গে; এক সঙ্গে মদ খাবে, এক সঙ্গে মস্করা করবে, তারপর এক সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। সেদিন রাত ন'টার সময় দু' ভদ্র-লোক নেশার ঘোরে প্রচণ্ড চিৎকার করছিলেন। টেবিলে গেলাস বাজাচ্ছিলেন। গান গাইছিলেন। আর একদল লোক—এঁরা আমার দোকানের লক্ষ্মী রোজ তিন চারজন
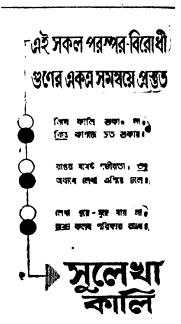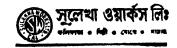
টাকার মদ নেয়, তাঁরাও পাশে বসেছিলেন। তাঁদের একজন আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনার বার যে তাড়িখানা হয়ে গেল। ভদ্রলোকরা এখানে আর ড্রিংক করতে আসবেন না। হাফেসজীর মেয়েধরা বারের লোকগুলোকে আপনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওদের সামলান, না হলে আমরা আর আসবো না।'

বাধ্য হয়ে আমি গিয়ে ভদ্রলোক দু'জনের কাছে দাঁড়ালাম। তাঁরা দু'জনে তখন রেডিওতে ক্রিকেট খেলার রিলে করছেন। ইণ্ডিয়া এক ওভারে এম সি সি-কে খতম করে, পরের ওভারে অস্ট্রেলিয়াকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে। এক ভদ্রলোক বলছেন, তা হয় না। আর এক ভদ্রলোক বলছেন, আমার যা খুশি তাই করবো। তাতে কার পিতৃদেবের কী? এবার অকথ্য গালাগালির বর্ষণ। আমি বললাম, 'আপনারা এ কি করছেন?'

ওরা বললে, 'বেশ করছি। তুমি কে হে হরিদাস পাল?'

আমি বাধ্য হয়েই বললাম, 'এ-রকম হৈ চৈ বার-এর বাইরে চলতে পারে। এতে অন্য কাস্টমারদের অসুবিধে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে যেন কে'দে উঠলেন। 'জানেন, মাতাল হয়েছি বলে বার করে দেবে বলছে। বারের মালিক-এর এতো বড়ো স্পর্ধা।'

অন্য কয়েকজন ও'দের দলে গিয়ে, চিৎকার করে বললেন, 'মালিকের এতো সাহস। ব্রাদার, আমরা এখনি সবাই এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। মদ খেয়ে হৈ হৈ করবে না, তো কি গীতা পড়ে শোনাবে?'

সরাবজীর চোখ এবার ছল ছল করে উঠলো। 'সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন? যারা আমার কাছে কমপ্লেন করেছিল, তারাও টেবিল ছেড়ে ওয়াক-আউট করে গেল। আমি তাঁদের হাত ধরে বললাম, 'আপনারা বললেন বলেই, আমি ভদ্রলোককে বারণ করতে গেলাম।' ওরা কী বললে জানেন?

বললে, 'আমরা মাতাল মানুষ নেশার ঘোরে যদি কিছু বলেই থাকি, তা বলে আপনি একজন ভাইকে অপমান করবেন? হু আর ইউ? কলকাতায় কি আর মালের দোকান নেই? এই দোকানে ঘুঘু চরবে। আমরা এখানে প্রয়োজন হলে পিকেটিং করবো।'

সরাবজী বললে, 'প্রায় তিন সপ্তাহ আমার হোটেল বন্ধ, কেউ আসে না। শেষে বাধ্য হয়ে অজ্ঞ এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বহু কষ্ট করে তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছি। হাতজোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, যদি আমার কোনো দোষ হয়ে থাকে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে আপনারাই আমাকে বলতে বলেছিলেন, তাই ভদ্রলোককে আমি গোলমাল করতে বারণ করেছিলাম। ভদ্রলোক রাজী হয়েছেন। আবার দলবল নিয়ে আসবেন। কিন্তু ভদ্রলোক সাবধান করে দিয়েছেন, 'মাতালদের কথায় বিশ্বাস করে ভদ্দরলোকদের আর কখনও অপমান করবেন না।'"

হবস্ যেন আবার বর্তমানে ফিরে এলেন। বললেন, "এই সরাবজীকেই আমি চিনতাম। বেশ গুছিয়ে এবং ভদ্রভাবে ব্যবসা করছিল। একটিমাত্র মেয়ে, তাকেও বাইরে ইস্কুলে রেখে পড়িয়েছে। ওর মেয়েকেও আমি দেখেছি। চিড়িয়াখানাতে আলাপ হয়েছিল, মেয়েকে সঙ্গে করে বাবা গিয়েছিলেন। এই পর্যন্তই জানতাম। কিন্তু সরাবজী কী করে ধর্মতলা থেকে শাজাহানে হাজির হলো জানি না।"

হবস্ এবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমাদের ম্যানেজার মনে হচ্ছে আজ আর ফিরবে না! ব্যাপার কী? হোটেল ছেড়ে প্রায়ই আজকাল বেরিয়ে যাচ্ছেন। একা স্যাটা বোস কী এই হোটেল চালাবে?"

হবস্ উঠে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, "যাক, সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এটাই আনন্দের কথা।"

আবার যখন ডিউটিতে ফিরে গিয়েছি সরাবজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর টিকলো নাক, প্রশস্ত বুকও যেন ঈশ্বরের চরণে বিনয়ে নত হয়ে রয়েছে। কম কথা বলেন তিনি। তবু আজ যেন তাঁকে আমার বহুদিনের পরিচিত মনে হলো। শাজাহানের বার-ম্যানেজারের মধ্যে যেন আর একজন আমিকে খুঁজে পেলাম। আমারই মতো নিজের পায়ে হাঁটা পথেই তিনি যেন সংসারের সুদীর্ঘ সমস্যা অতিক্রম করে এসেছেন।

হেড্ বার-ম্যান বলেছে, "হুজুর সাহেব বাবু, সব ককটেল যেন হাতের মুঠোর মধ্যে। কতরকমের মিক্সিং যে জানেন।"

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি বার-এ তেল ধারণের জায়গা নেই। বিজনেসের যন্ত্রপাতিতেও তেল দরকার হয়, সেই আধুনিক লুব্রিকেশন তেল হলো হুইস্কি। বুঁদ হয়ে চোখ বুজে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা গলায় হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছেন, খালি গেলাস আবার বোঝাই হচ্ছে। স্বল্পভাষী সরাবজী আমাকে বললেন, "মৃতদেহ টি'কিয়ে রাখতে হুইস্কির মতো জিনিস নেই। যদি কোনো মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে চাও তবে তাকে হুইস্কির মধ্যে রাখো—আর জ্যান্ত লোককে যদি মারতে চাও তাহলে তার মধ্যে হুইস্কি ঢালো!"

সরাবজীর সঙ্গে ক্রমশ আমার পরিচয় নিবিড় হয়েছে। বুঝেছি, তাঁর মধ্যে বুদ্ধির আনিত তীক্ষ্ণতা নেই। কিন্তু সংপথে

থাকার তীব্র বাসনা আছে, আর আছে ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস।

সরাবজী যেন আজও সব বুঝতে পারেন না। অন্তরের দ্বন্দ্ব থেকে আজও যেন মুক্ত হতে পারেননি তিনি। এবং সে গল্পের শেষ অংশ আমি তাঁর নিজের মুখেই শুনেছিলাম।

বার-এর এক কোণে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন—কবে এই বার-পর্ব শেষ হবে, সুরা-পিয়াসীদের মনে পড়বে তাদেরও বাড়ি আছে, সেখানে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। তারা বিল চুকিয়ে উঠে পড়বে, বার-ম্যানরা চেয়ারগুলো ঠিক করে রাখবে, আমি ক্যাশ বন্ধ করে হিসেব কষবো, তারপর ছুটি।

সরল মানুষ সরাবজী। বললেন, "বাবুজী, আমার তো লেখাপড়া হয়নি। কিন্তু যারা পড়াশোনা করে, যারা চিন্তা করে, তাদের আমার খুব ভাল লাগে বাবুজী। আমার স্ত্রীর কাছে আমি দুঃখ করি।" সরাবজী আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা তো তবু বই টই পড়ো। মানুষ কেন হুইস্কি খায় বলতে পারো?"

আমি বললাম, "মিস্টার স্যাটা বোসের ধারণা, হুইস্কির মধ্যে ভীরু সাহস খোঁজে, দুর্বল শক্তি খোঁজে, দুঃখী সুখ খোঁজে, কিন্তু অধঃপতন ছাড়া কিছুই পায় না।"

ছোটছেলের মত সরল বিশ্বাসে সরাবজী হেসেছিলেন। সরাবজী প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, আমরা যারা মদ বিক্রি করি তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেননি?"

আমি পরম বিস্ময়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। উনি চেয়ারে বসে পড়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে সব বলছি। হয়তো তুমি বুঝবে। লেখাপড়া জানি না বলে আমি নিজে উত্তর খুঁজে পাইনি। আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, সে অনেক লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু নিজের মেয়েকে এ-সব জিজ্ঞাসা করা যায়?"

মেয়েকে সত্যিই ভালবাসেন সরাবজী। তাঁর জীবন মরুভূমিতে একমাত্র মরুদ্যানের মতো সে। বললেন, "তুমি আমার মেয়েকে জানো না। এমন বুদ্ধিমতী এবং পণ্ডিত মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না। এবং সে সুন্দরীও বটে", সরাবজী বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন। "কত মোটা মোটা বই যে সে পড়ে। জানো, সে রোজ আমাকে চিঠি লেখে। আমারও খুব বড় বড় চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি যে লেখাপড়া শিখিনি, আমার যে বানান ভুল হয়। মেয়ের কাছে লজ্জা হয়। মেয়ে অবশ্য বলে 'বাবা তুমি ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না। তুমি আমাকে বড় বড় চিঠি লিখবে।' জানো সে এখন বিলেতে পড়ছে। যে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়ে অনাথ আশ্রম থেকে এসেছিল' তার মেয়ে। গর্বে যেন বৃদ্ধ অশিক্ষিত সরাবজীর বুক ফুলে উঠলো।

কোনো মহাপুরুষ বলেছিলেন, পৃথিবীতে যত রকমের প্রেম আছে তার মধ্যে মেয়ের প্রতি বাবার ভালবাসা সবচেয়ে স্বর্গীয়। 'He beholds her both with and without regard to her sex." স্ত্রীর প্রতি আমাদের ভালবাসার পিছনে কামনা আছে, ছেলের প্রতি ভালবাসার পিছনে আমাদের উচ্চাশা আছে, কিন্তু মেয়ের প্রতি ভালবাসার পিছনে কিছুই নেই। বইতে পড়া কথাগুলোই আজ যেন সরাবজীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখলাম।

সরাবজীর দুঃখের কথা সেদিনই শুনেছিলাম। সরাবজী কোনোদিন স্ত্রী বা মেয়েকে বার-এ আসতে দেন নি।

ভোর নটা পর্যন্ত বাড়িতে থাকেন তিনি। তারপর বাজার নিয়ে রেস্টুরেন্টে আসতেন। দুপুরে বাড়ি থেকে ভাত আসতো। বিকেলে একবার চা খাবার জন্যে বাড়ি যেতেন। তারপর শুরু হতো বার-পর্ব। যত রাত বাড়বে তত সমস্যা বাড়বে। সাড়ে দশটায় দরজা বন্ধ করা প্রতিদিনই সমস্যার ব্যাপার। অনেকে উঠতে চায় না। অনেকে বলে, বার খুলে রাখো। বলতে হয়, খুলে রাখবার লাইসেন্স নেই। লোকে গালাগালি করে, গেলাশ ভাঙে। সরাবজী দেখতে পারেন না। কয়েকজনের জন্যে রিকশা বা ট্যাক্সি ডেকে দেন। নেশার ঘোরে হয়তো গাড়ি চাপা পড়বে।

লোকগুলো যখন আসে কেমন সুন্দর। হাসে, নমস্কার করে, কেমন আছে খবর নেয়। কিন্তু তারপরেই ধীরে ধীরে রঙ বদলাতে শুরু করে। কতবার ইচ্ছে হয়েছে বলেন, সামান্য একটু খেয়ে বাড়ি ফিরে যান। হাউস গার্ল'রা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বলতে সাহস হয় না।

মেয়ে বলেছে, 'বাবা তোমার দোকানে যাবো।'

"না মা, ওখানে যেতে নেই। ওখানে আমার অনেক কাজ, খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।"

"কেন বাবা, গেলে কী দোষ হয়?"
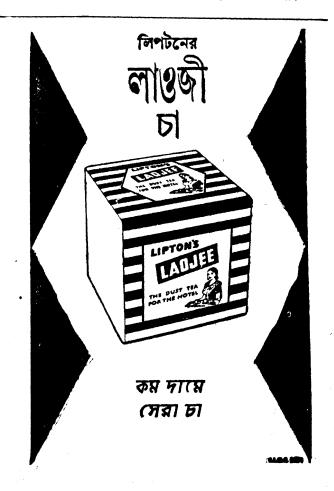
"ছিঃ অবাধ্য হয়ো না মা, ওখানে যেতে নেই।"

বড় হয়েছে মেয়ে, ফুলের মতো বসন্তের সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর মেয়ে। কত বুদ্ধি, কত জ্ঞান, কত বিদ্যা অথচ কত সরল। সংসারের কিছুই জানে না। মেয়ে কতবার বলেছে, "বাবা তোমার মতো আমিও ব্যবসা করবো।"

বাবা বলেছেন, "না মা, তুমি প্রফেসর হবে। বিরাট পণ্ডিত হবে। দেশ বিদেশের লোকরা বলবে ওই মুখ্যু লোকটার মেয়ে কত শিখেছে।"

মেয়ের বিলেত যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে ছেড়ে সরাবজী কেমন করে অতোদিন থাকবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না; কিন্তু উপায় কী? ডক্টর মিস সরাবজী হয়ে তাঁর মেয়ে যেদিন আবার ফিরে আসবে সেদিন? সেদিন তো কাগজে তাঁর মেয়ের ছবি বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু সে রাত্রে মেয়ের যে কী হলো। সরাবজীর বার-এ এখন তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হয়েছে। মেজের উপর তখন একজন শুয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে গাঁজা বেরোচ্ছে। বেঞ্চের উপর দুজন গুম হয়ে গেলাশ নিয়ে বসে আছে। বলছে, "বেয়ারা, আউর এক পেগ লে আও।"

বেয়ারা বলেছে, "হুজুর এই পেগের বিলটা। আমরা কী করবো হুজুর, একসাইজ আইন। বিল পরের পর আসবে, আর মিটিয়ে দিতে হবে।"

সরাবজী কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছিলেন, "আপনাকে কী দেবো?"

"একেবারে নির্ভেজাল হুইস্কি। যেন গলা দিয়ে নামতে নামতে সব জ্বালিয়ে দেয়।"

বেয়ারারা একা সব সামলাতে পারছিল না। তাই সরাবজী নিজেও ছোটাছুটি করছিলেন। এমন সময় মাতালদের মধ্যে কার আবির্ভাবে যেন চাপা গুঞ্জন উঠলো।

"কে?" চমকে উঠে সরাবজী দেখলেন তাঁর মেয়ে।

"তুই? তুই এখানে?" সরাবজী কোনো রকমে বললেন।

মেয়ে বাবাকে চমকে দেবার জন্যেই এসে-ছিল। বাবাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরবে। আর ক'দিন? তারপর কতদিন আর বাবার সঙ্গে দেখা হবে না। অথচ এখন বাবার পাশে বসে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে, "বাবা, তুমি যখন অনাথ আশ্রমে ছিলে তখন তোমাদের মাখন দিতো।"

বাবা বলবেন, "না মা, মাখন কোথায়। তিন টুকরো পাউরুটি কেবল।"

মেয়ে নিজেও যেন এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখেনি। একটা বিরাট কড়ার মধ্যে কতক-গুলো অপ্রকৃতিস্থ লোক যেন টগবগ করে ফুটছে। বাবার হাতের পেগ-মেজারটা কেঁপে উঠে কিছুটা মদ টেবিলে পড়ে গেল। মেঝেতে যে লোকটা পড়েছিল সেও এবার যেন উঠে বসে বললে, "আমিও একটা বড়া পেগ চাই।"

মেয়ে যেন স্তম্ভিত। আনন্দ করে বাবাকে নিয়ে পালাবে বলে ঠিক করেছিল। তার মুখে কে যেন কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। "বাবা আমার সঙ্গে যাবে না?"

মেয়ের হাত ধরে বাবা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, তাঁর দেহ কাঁপছে। কোনো রকমে বলেছেন, "তুমি বাড়ি যাও। এখন বার বন্ধ করবার উপায় নেই। ওরা রেগে গিয়ে সব ভেঙে দেবে।"

বাড়িতে ফিরে এসে সরাবজী দেখেছিলেন মেয়ে শুয়ে পড়েছে।

পরেরদিন মেয়ের সামনে যেতে তাঁর যেন ভয় করেছে। যেন মেয়ের কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

বিলেত যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। কিন্তু মেয়ে যেন কেমন মনমরা হয়ে আছে। সভ্যতার সর্বনাশা রশ্মি যেন মেয়েটার মনকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

সরাবজী ভেবেছেন মেয়েকে গিয়ে জড়িয়ে ধরবেন। বলবেন, "কেন মা তুই এ-সব ভাবছিস, তুই পড়াশোনা কর। তুই কত বড় হবি" কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি।

তারপর যাবার দিনে ভোরবেলায় বোধহয় বাবা ও মেয়ের একান্তে দেখা হয়েছিল। মা তখন ঘুমিয়ে। বাবা নিভৃতে মেয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন।

"তুই কিছু বলবি? তোর মুখ দেখে ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে তুই আমাকে কিছু বলতে চাস?"

মেয়ের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছে। কোনোরকমে বলেছে, "আমার ভয় করছে বাবা। যাদের সেদিনকে তোমার দোকানে দেখে এলাম তাদের মা, বোন, স্ত্রী, মেয়েরা হয়তো চোখের জল ফেলছে। তারা তোমাকে কী ক্ষমা করবে?"

বাবা চমকে উঠেছিলেন। বলতে গিয়ে-ছিলেন, "আমি কী করবো? আমার কী দোষ? আমি তো আর ওদের টেনে নিয়ে এসে বার-এ ঢোকাচ্ছি না। আমি সৎপথে ব্যবসা করি।" কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি।

মেয়ে ট্রেনে চড়ে বোম্বাই গিয়েছে। এবং সেখান থেকে জাহাজে বিলেত। কিন্তু সরাবজী নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি শুধু মেয়ের বিষণ্ণ মুখ দেখতে পেয়েছেন। মেয়ে যেন তাঁকে প্রশ্ন করছে—তারা কী তোমায় ক্ষমা করবে?

মনের দ্বন্দ্বে কাতর হয়ে পড়েছেন সরাবজী। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, "আমি কি বলেছি তোমরা অতো পেগ খাও। এক পেগ খেয়ে উঠে গেলেই পারো।...আমি কী করবো, আমি না খাওয়ালে তোমরা অন্য দোকানে গিয়ে খাবে।" তবু মেয়ে যেন তাকে প্রশ্ন করছে। তিনি মনে মনে বলে-ছেন, "ওদের স্ত্রী, মেয়েরা তো বারণ করলেই পারে। আমি কী করবো? আমি সামান্য মদের ব্যবসায়ী, যত দোষ আমারই হলো?"

কিন্তু কিছুতেই পারেননি। যতই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন ততই যেন একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে বসেছে। সেই চিহ্নটা যেন ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে।

সরাবজী ভয় পেয়ে গিয়েছেন। স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন যত লোক তাঁর দোকানে এসেছে তাদের মা, বোন, বউ, মেয়ে সবাই চোখের জলে তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছে। সেই অভিশাপের বিষবাষ্প যেন শুধু তাঁকে নয়, তাঁর সংসার, এমন কি তাঁর মেয়েকেও গ্রাস করছে।

সরাবজী পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন, তারপর একদিন মরিয়া হয়ে বার বিক্রি করে দিয়েছেন। সেই রাত্রেই মেয়েকে তিনি চিঠি লিখতে বসেছিলেন, "আমার কী দোষ? ওরা যদি নিজে এসে দোকানে বসে মদ খেয়ে নিজেদের সংসার নষ্ট করে থাকে, তাতে আমার কী দোষ?"

এইখানেই শেষ হলে ভাল হতো। বিক্রির টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে সরাবজী ছোট্ট সংসার চালিয়ে নিতে পারবেন ভেবেছিলেন।

কিন্তু সেখানেই মুশকিল হলো, ব্যাঙ্ক ফেল পড়লো। যেদিন বিক্রির চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন তার দু'দিন পরে।

হয়তো অভিশাপ, হয়তো চোখের জলের ফল।

সরাবজী কী করবেন? মেয়েকে তাঁর পড়াতে হবে। অবশিষ্ট যা আছে তাতে মেয়েকে বিলেতে রাখা যাবে না।

কাজ চাই। কিন্তু ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়া লোককে কে চাকরি দেবে?

তাই ঘুরে ফিরে আবার বার। শুধু চাকরি। সরাবজী ফিস ফিস করে আমাকে বললেন, "এবার আমি তো চাকরি করছি। আমি কী করবো? যদি কোনো অভিশাপ কেউ দেয় সে নিশ্চয় আমাকে লাগবে না।"

সরাবজীর চোখে নিশ্চয়ই জল ছিল না। কিন্তু আমার মনে হলো যেন সেখানে দু'ফোঁটা জল রয়েছে। সরাবজী আমাকে যেন দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি চোখ বুঁজে ঈশ্বরকে বোধহয় আর একবার প্রশ্ন করছেন, 'চাকরি করলে নিশ্চয়ই কোনো দোষ নেই? আমাকেও তো সংসার প্রতি-পালন করতে হবে।'

আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতভাগ্য সরাবজী উঠে পড়ে এবার নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আর আমি সংসারের সৌরমণ্ডলে এক নতুন নক্ষত্র আবিষ্কারের আনন্দে বিস্মিত অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ক্রমশ

প্যারিস, ১২ মার্চ, ১৯৬২

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার অসংখ্য পাঠকপাঠিকার কাছে ফরাসী দেশের গল্প, ফরাসী জাতির বাহ্যিক আচরণের ভেতরে যে একটি ভাবগম্ভীর রূপ বিরাজ করছে, তার কথা বলতে বসে কেবলই ভাবছি কোথায় আরম্ভ করি! কত কিছু বলার আছে! টুরিস্টের চোখে দেখা মদের গেলাস নিয়ে প্রমোদবিলাসে মত্ত প্যারিসের কথা নয়, সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে এই প্যারিস শহরেই অথবা প্যারিস শহরের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে ফরাসী দেশের দূরদূরান্তরে, গ্রামে-শহরে - বনে - প্রান্তরে-পাহাড়ে-সমুদ্রতীরে, ফরাসী জাতির যে কর্ম, চিন্তা, ধর্ম অথবা তার যে জীবনস্পন্দন শুধু ফরাসী সভ্যতার নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বসভ্যতার প্রেরণার উৎসরূপে অবস্থিত, আমি তার কথাই বলতে চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে ছোট দুই-একটি কথা বলে নিতে চাই। আমার ক্ষোভ ও অভিযোগ। বিশ্বসভ্যতায় ফরাসী সভ্যতার দানের কথা বাদ দিলে ফরাসী জাতি ও তার দৈনন্দিন কর্ম, ধর্ম, আচার সম্বন্ধে আমরা যেমন অজ্ঞ আমাদের দেশে, এ দেশের লোকও ঠিক তেমনি আমাদের দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ভারতীয় সভ্যতা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এ কথাটা হয়ত অনেকেই বলবে; মনু, বেদ, পুরাণের গল্পও হয়ত শুনতে পারেন অনেকের মুখে। ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগে চন্দননগর, পন্ডিচেরীর অবস্থান কোথায় সে কথাটাও অনেক ছেলেমেয়েই বলে দেবে। নবীন ভারতে রাজনৈতিক কারণে নেহরুর নাম জানে প্রায় সবাই, আবার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে 'তাগোর' (রবীন্দ্রনাথ)-এর নামও জেনে গেছে অনেকেই। কিন্তু সব মিলিয়ে ফরাসী জাতি জেনেছে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অচ্ছুত, ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো "পবিত্র" গরুর কথা। সতীদাহ এখনও হয় কিনা এ কথা জিজ্ঞেস করলেও অবাক হবেন না।

এই যে পারস্পরিক অজ্ঞতা—এ দূর করবার উপায় কি? আমাদের সরকারী মহলে একটা কথা প্রায়ই শুনে আসছি। আমরা যেসব ভারতীয় বিদেশে আছি, আমরাই হলাম ভারতের বেসরকারী রাষ্ট্রদূত। স্বীকার করি সে কথা। কিন্তু ভারতের কথা বিদেশের মাটিতে প্রচার করার কোন দায়িত্বই কি নেই ভারত সরকার ও ভারতের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের? প্যারিসে ভারতীয় দূতাবাস বা ভারত সরকারের টুরিস্ট অফিস যে প্রচেষ্টা করছেন তা অত্যন্ত নগণ্য, অসম্পূর্ণ ও নৈরাশ্যকর। আমাদের দূতাবাস থেকে দু মাসে তিন মাসে সাইক্লোস্টাইল করা নিউজ প্রেসের কয়েকটি পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হয়। তাতে থাকে ভারতের চতুর্থ শ্রেণীর রাজনীতিবিদের বক্তৃতার সারাংশ (পন্ডিত নেহরুর বক্তৃতা বাদে) এবং ফ্রান্সের পঞ্চম শ্রেণীর কাগজে ভারতের স্তুতির সারাংশ। এ ছাড়া থাকে শিল্প ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় দুই-চারটে চুটকি খবর। ভারতীয় ফিল্ম ডিভিসনের তোলা কিছু ছবি আছে দূতাবাসে। ছবিগুলি ভালো হলেও তার অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় বিবৃত। ফরাসী দেশে ইংরেজী ভাষায় প্রচার ফিল্ম পাঠাবার কি সার্থকতা তা শুধু নয়াদিল্লির সরকারী মহলই বলতে পারবেন। এ বিষয়ে ভারতীয় দূতাবাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কয়েকবার কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

ফরাসী ধর্মী অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক পোশাকে সজ্জিতা তিন তরুণী

ভারতবর্ষের প্রচার বিষয়ে ফরাসী দেশে সবচেয়ে বড় অভাব বোধ করেছি একটি সুসংবদ্ধ সংস্কৃতি কেন্দ্রের। ইউ এস আই, ব্রিটিশ কাউন্সিল অথবা আলিয়ঁস ফ্রাঁসেসের মত প্রতিষ্ঠানের কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, তার সেই সংস্করণও খুলতে পারিনি আমরা এ দেশে। প্যারিসে বছরে দুবার ভারতীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়। দেওয়ালী ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় ছাত্র-সংসদের পরিচালনাধীনে। আর একবার ছাত্রদের আন্তর্জাতিক গার্ডেন পার্টিতে একটি ভারতীয় স্টল ভারতীয় ছেলেমেয়েরা পরিচালনা করেন। ভারতীয় ছাত্রদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। আর তাঁদের বলবই বা কি? ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের থাকবার জন্য একটা হোস্টেলই আজ পর্যন্ত ভারত সরকার বা ভারতের বেসরকারী মহল করে দিতে পারলেন না টাকার অভাবের অজুহাতে! ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার আর কি করে হবে?

আপনারা হয়ত ভাবছেন ভারতবর্ষের প্রচারের কথা কেন বলছি এখানে। শুধু সাধারণ ব্যাপার। ফরাসী দেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে, ফরাসী দেশের বহু লোকের সঙ্গে কথা বলে এই ধারণাই হয়েছে আমরা যে এ দেশের লোক সরলভাবে, আন্তরিকভাবে আমাদের দেশ ও আমাদের সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে চায়। আমাদের দেশ সম্বন্ধে একটা বিরাট শ্রদ্ধা, বিরাট কৌতূহল রয়েছে এ দেশের লোকের। ফরাসী দেশে অসংখ্য মানুষের অন্তরের এই কথাটি জানিয়ে দিলাম আপনাদের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি যে, ভারতের প্রচার ভারতীয়দের চাইতে বেশী করেছে এ দেশের পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিসন। কয়েকদিন আগে স্থাপিত হল প্যারিসে একটি ভারতীয় গ্রন্থাগার। তা ছাড়া ত রয়েইছে 'সরবন' বিশ্ববিদ্যালয়ের "Institut de la Civilisation Indienne" (ভারতীয় সভ্যতা ইনস্টিটুট)। আজ মানবসভ্যতার অতি সঙ্কটমুহূর্তে বুঝি ফরাসী জাতি ভারতীয় মনীষার পুণ্যসলিলে অবগাহন করে সভ্যতার বিভিন্ন যুগে ভারতীয় ঋষি যে অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন সেই ওঁকারের

মধ্যে নিজের স্থিতির নিরাপত্তাই খুঁজে পেতে চাইছে। তাই কাগজে, লোকমুখে, রেডিও টেলিভিসনে আজকের পৃথিবীর রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে ভারতের প্রত্যেকটি সুচিন্তিত পদক্ষেপকে "Sagesse Hindou" বলে বিবৃত হতেই শুনেছি। আন্তরিকভাবে আশা করি, ভারতীয় সরকার ও আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকেই ফরাসী জাতির ভারতবর্ষকে চেনার এই আগ্রহকে পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন।

একটা কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, ফরাসী দেশ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে-শিল্পে-সুরে যুগ-যুগ ধরে সমস্ত বিশ্ব-মানবতাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই ফরাসী দেশের চিন্তা, মেধা, সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার হোটেলের একতলার কোণের দিকে তিন বছরের ঘরের বিছানায় বসে আপনাদের কাছে চিঠি লিখতে লিখতে এইসব কথাই ভাবছিলাম। বাইরে আবার সেই দুপুর থেকে টুপ টুপ করে বরফ পড়ছে, পড়ছেই। ঝুপ ঝুপ করে নয়, তুলোর পাঁজাও নয়। শক্ত, ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ, কিন্তু অনেক, অনেক। জানালার ভেতর দিয়ে উঠোনের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সব সাদা। ন্যাড়া গাছের মাথাগুলো, মেট্রোর লাইনের ধারগুলো, পার্কের ঘাস, রাস্তা, গাড়ি সব সাদা। রুপোলী রঙ মাখিয়ে দিয়েছে যেন কোন অদৃশ্য হাত। প্যারিস শহরে ঠিক এই সময়টাতে বরফ পড়া একটু অস্বাভাবিক। বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে নিশ্চয়ই এখন বসন্তের মনমাতানো সুর, আর পলাশের আগুন। এখানেও আমরা অপেক্ষা করছি প্রত্যেক বছরের মত বসন্তসুন্দরীর সলজ্জ আগমনের। তখন শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের মনও মাতোয়ারা হয়ে যাবে। একটু রোদের জন্য, একটু গরম হাওয়ার জন্য কত আকুল আগ্রহ, ব্যাকুল প্রতীক্ষা। আসুক না বসন্ত একটু দেরিতেই, তাই বলে উৎসব শুরু করতে বাধা কোথায়? বসন্ত ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী Anna Perenna-র সম্মানে যুগের পর যুগ ধরে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। আজ সেটা শুধু ঐতিহ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারিস শহরে "Mi-careme" অথবা "Marti gras" শুধু একটা কথার কথা। কিন্তু Nantes Nice ইত্যাদি শহরে আজও "Mi-Careme" উপলক্ষে খুব জাঁকজমক করে উৎসবের আয়োজন করা হয়—কার্নাভাল হয়। ফরাসী দেশের এই লোক-উৎসব প্রায় অবলুপ্তির

নান্তস্-এর ঐতিহাসিক দুর্গ

পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে—একটা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে। তবু আজও কোন কোন শহরে পুরনো ঐতিহ্যের স্মরণে ব্যবসায়ী দোকানী, দোকানের কর্মচারী অথবা লন্ড্রীওয়ালা রাজা ও রানী নির্বাচন করেন এবং তারপর নাচগান, আমোদ-প্রমোদসহ বিরাট মিছিল বার করেন। বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে ফুল-পাতা-কাগজে সাজানো নানারকম বিজ্ঞাপনসহ রথ, বাদ্যভাণ্ড ইত্যাদি সহকারে মিছিল বের হয়। বিভিন্ন রঙের কাগজের Confetti (পাঞ্চিং মেশিনের ছোট ছোট গোল কাগজের টুকরো) এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। টন টন Confetti ছড়ানো হয় সবার গায়ে মাথায়। আমাদের দেশের আবীরের মত! ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল অথবা দিল্লির স্বাধীনতা উৎসবে সংস্কৃতি মিছিল যদি দেখে থাকেন তবে অনেকটা সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন এই মি-ক্যারেমের মিছিলের সঙ্গে। শুধু বিষয়ের পার্থক্য।

রোমান ক্যাথলিকদের ইস্টারের আগে ৪০ দিন অত্যন্ত কঠোর সংযমে থাকতে হয়। এই অধ্যায়কে বলা হয় 'কারেম'। 'কারেম' শুরু হয় এক বুধবার। তার আগের মঙ্গলবারকে বলা হয় "Marti gras"। এইদিনই খুব আমোদফুর্তির মধ্যে কার্নাভাল হয়। আর ৪০ দিনের অধ্যায়ের তৃতীয় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার হয় 'মি-কারেমে'র উৎসব। আজও লৌকিক আচার অনুযায়ী "Marti gras"-এর দিন মাংসের বাসনপত্র আগুনে দিয়ে দেওয়া হয়।

কার্নাভালের ইতিহাস কিন্তু আরও পুরনো। আজকের দিনে কার্নাভালের সময় মুখোশ পরার যে ব্যাখ্যা করা হয়, তা কিন্তু কার্নাভালের সৃষ্টির সময়কার ব্যাখ্যার চাইতে ভিন্ন। আনন্দের এই উচ্ছ্বাস এবং মুখোশ পরার উদ্দেশ্য হল সাময়িক-ভাবে অশুভ শক্তির কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া। জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে মানুষ সাময়িকভাবে জানোয়ারদের অমিত শক্তির (প্রতীক) অধিকারী হয়। কার্নাভালের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে মুখোশ-নৃত্যই সবচেয়ে জনপ্রিয়। রেনাসাঁস্-এর সময় মুখোশ পরার অন্য ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়, জন্তুর মুখোশ পরে ক্ষণকালের জন্য মানুষ 'ভালো বর্বরে' পরিণত হয়। এই বর্বরতা হল সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে যে আনন্দময় সরলতার প্রকাশ তারই প্রতীক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে কার্নাভালের প্রকাশ হয় 'অপেরার মুখোশ নৃত্যে'। ১৭৯০ সালে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার চালু হয় কিছুদিন বাদে। আজকের প্যারিসের 'অপেরা'তেও মুখোশ-নৃত্য হয়।

রবিবারের বরফ-ঝরা দিনে মি-কারেমের কথাই ভাবছিলাম—শীগগিরই আসছে মি-কারেমের উৎসব। আর 'মি-কারেমে'র সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমার বহুদিনের সুখ-স্মৃতি। Nantes শহরে। ফরাসী দেশের পশ্চিম উপকূলে Britagne-এর নীচের দিকে শহর। মাঝারি গোছের শহর, কিন্তু শিল্পপ্রধান। বলতে গেলে প্যারিসের পর এখানেই আমার ফরাসী জীবনের সঙ্গে পরিচয় শুরু। শুরু হয়েছিলও 'মি কারেম' উৎসব দিয়েই।

ফ্যাক্টরী ছুটি হয়ে গেল বেলা বারোটার সময়। একটি সহকর্মী ফরাসী এঞ্জিনিয়ার এসে বলল: "লাঞ্চের পর আমার বাড়ি চলে এস। সেখান থেকে খুব ভালো মিছিল

দেখা যায়। মিছিল শেষ হলে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব Nantes এর High Society-র সঙ্গে।" অর্থাৎ আধুনিক ফরাসী তরুণ-তরুণীর সঙ্গে!

খেয়েদেয়ে গেলাম বন্ধুটির বাড়ি। কিন্তু রাস্তায় অসম্ভব ভিড়। অগুনতি লোক শহর, গ্রাম থেকে এসে ভিড় জমিয়েছে গির্জার চত্বরটার ধারে—যেখানে শহরের বড় রাস্তাটা সোজা চলে গেছে Looie নদীর দিকে।

বন্ধুটির পাঁচতলার ঘরে Dalida-র একটা গানের রেকর্ড বাজছে। ঘরের সামনে এক চিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে অগুনতি মাথা দেখতে পেলাম। বাড়ির জানালায়, বারান্দায়, কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। চারদিকে উড়ছে রংবেরঙের কাগজের ফিতে ও কাগজের 'কনফেটি'! বসন্তের হাওয়া এসেছে বুঝি পশ্চিমের এই শহরটাতে। ও কি! দুটো মিলিটারী ট্যাঙ্কের মত গাড়ি এসে কামান দাগতে শুরু করলো কেন? না, আগুনের গোলা নয়! 'কনফেটি'র গোলা ও সুগন্ধি জল। শোনা যাচ্ছে বাজনা! এগিয়ে আসছে মিছিল। জনসমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠল।

ওই তো আসছে ফুলের রথে চড়ে বসন্তরানী। হ্যাঁ, রানীই বটে। অপরূপা সুন্দরী। সেজেছেও অপরূপ করে। সখী-পরিবেষ্টিতা রানী চটুল চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করে এবং বহু বক্ষে মদনবাণ নিক্ষেপ করে চলে গেল। রানী মাঈ কি জয়! Vive la reine! না, না, শেষ হয়নি। সুন্দর সুন্দর ছেলে-মেয়েরা Britagne-এর রঙবেরঙের অপরূপ পোশাক পরে লোকনৃত্য করতে করতে চলেছে রাস্তা দিয়ে। মুখোশনৃত্যও বাদ যায়নি। এক ঘণ্টা ধরে চলল এই মিছিল।

এর পর গেলাম বন্ধুটির সঙ্গে তার 'হাই সোসাইটি'তে। বন্ধুটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু দূরেই এই বাড়ি। দুই হাতে জনসমুদ্র ঠেলতে ঠেলতে হাজির হলাম দোতলার ড্রয়িং রুমে। বিরাট পার্টির আয়োজন করেছেন "হাই সোসাইটি"র অন্যতমা সদস্যা (আমার বন্ধুটির বান্ধবী) এই বাড়ির বাসিন্দা (বাসিন্দা বলছি এই জন্যে যে, মেয়েটি তাঁর বাপ-মার সঙ্গে থাকে) অপরূপ সুন্দরী একটি তরুণী মেয়ে, বছর ২২।২৩ বয়স হবে। পরিচয় হল একটু পরেই। মেয়েটি সাদর অভ্যর্থনা করে ড্রয়িং রুমে অন্যান্য আমন্ত্রিত (হাই সোসাইটির অন্য সদস্য-সদস্যা) তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। খাদ্য, পানীয়, বাজনা, নাচ, কনফেটি। মি-কারেমের পার্টি। উৎসব করো! আনন্দ করো। খাওয়া, পান ও নাচের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে আলোচনা করতেও কোন অসুবিধে হচ্ছিল না এই তরুণ দলের। আধুনিক ফরাসী দেশ, তার সমাজ, তার চিন্তা, কর্ম ইত্যাদি বুঝতে হলে সমাজের কাঠামো তরুণ-যুবক-নবীনদের শক্তির উৎস ও ব্যবহার জানা প্রয়োজন। উৎসবের পবিত্র আনন্দে মত্ত তরুণ দলের স্বপ্নলোকে কোন্ অচেনা ভবিষ্যতের আলো-আঁধারির খেলা সেটা একবার জানা প্রয়োজন। দেশের এবং সমাজের ভবিষ্যৎ এই তরুণদল সমাজের কাছে কতটুকু পাচ্ছে এবং সমাজকে তার বিনিময়ে কতটুকু দিচ্ছে তা বলব অন্য এক জায়গায়। তবে পরস্পরের

বাহুসংলগ্ন, বাজনার তালে তালে পা-মিলিয়ে-যাওয়া উচ্ছ্বসিত তরুণতরুণীর পার্টি ফ্রান্সে প্রায়ই দেখতে পাবেন। ফরাসী সমাজের গভীরে গিয়ে সুস্থ পরিবেশে তরুণ-তরুণীর সাবলীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ফরাসী সমাজ-ব্যবস্থায় কতটা প্রভাব এনেছে তাও জানা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করব।

রাত নটা। আমি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বাড়ি চলে এলাম। পরে জেনেছিলাম পার্টি চলেছিল রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। রাত বারোটার পর শহরের এক 'কাফে'তে ও শহরের কেন্দ্রস্থলে গোল চত্বরটাতে যেখানে Mairie (আমাদের কর্পোরেশন?') থেকে নাচের ব্যবস্থা কর হয়েছিল। আজ এখানেই শেষ করি।

আমার শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানবেন।

ইতি—

—অজিতকুমার দাস
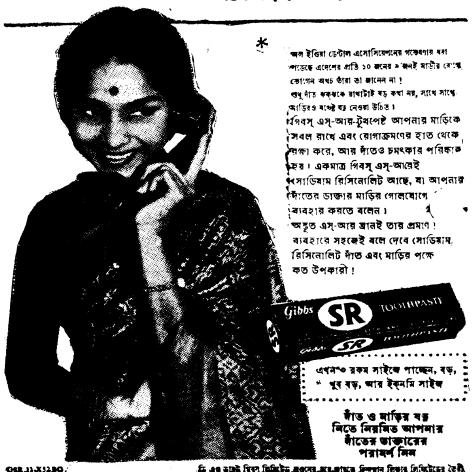
॥ ৯ ॥

ঝিন্টুক সেদিন রাত্রে ঘোষাল ডাক্তারের আড্ডায় ফিরবার আগে নিজের বাড়ি গেল। ডাক্তার ঘোষালই ঝিন্টুকের পরিবারের জন্য একটা আলাদা আস্তানা ক'রে দিয়েছিলেন। ঝিন্টুক অবশ্য প্রায় অধিকাংশ সময়ই ডাক্তার ঘোষালের বাসায় থাকত, কিন্তু তার ছোট বোন শামুক, কাকা যতীনবাবু আর ভাইপো কনক থাকত আলাদা একটা বাড়িতে। সে বাড়ির সমস্ত খরচ চালাত ঝিন্টুক। কেমন ক'রে চালাত যতীশবাবু সে খবর রাখা প্রয়োজন মনে করতেন না। তিনি যেন ধরেই নিয়েছিলেন সংসার চালাবার দায়িত্ব তাঁর নয়। তিনি এমন একটা ভাব দেখাতেন যে, দেশ ছেড়ে তিনি আসতে চাননি, ঘোষালের ধাপ্পায় আর ওই মেয়ে দুটোর জেদে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে চলে আসতে হয়েছে। সুতরাং তারাই সংসার চালাক। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, তিনি যেন কোনও পলাতক রাজা, বাধ্য হয়ে নিজের রাজত্ব ছেড়ে বিদেশে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বাস করছেন; বাস করতে হচ্ছে তাঁকে। যারা তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে এনেছে তারাই তাঁর ভরণ-পোষণ করবে, করতে বাধ্য তারা। তিনি নিজে কিছু কাজ করতেন না, বলতেন—আমি কাজ করতে অভ্যস্ত নই। কাজ করবার দরকার হয়নি কখনও। দেশে খাওয়ার অভাব ছিল না। জমিতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, গাছে নারকেল ছিল, দুধের বান ব'য়ে যেত বাড়িতে, তরি-তরকারি প্রচুর হ'ত নিজেদেরই বাগানে। দেশে তাঁর কাজ ছিল থিয়েটার করা, বাচ খেলা, মাছ ধরা আর মোড়লি ক'রে বেড়ানো। তাঁর এখনও ধারণা, দেশে যদি তিনি থেকে যেতেন তা হলে ওই হই-হল্লার তুফানটা কেটে গেলে আবার সাবেকভাবে থাকতে পারতেন তিনি। মুসলমানরা সবাই খারাপ নয়। অনেকেই তাঁকে ভালবাসত। হল্লাটা কেটে গেলে আবার তিনি তাঁর সাবেক আসন ফিরে পেতেন। একটা কথা অবশ্য তিনি চেপে যান। মুসলমানরা যখন তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল, তাঁর দাদাকে এবং ভাইপোকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, মেয়ে দুটোকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তিনি যে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন, ডাক্তার ঘোষাল নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে গুলী চালিয়ে ওই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন না হলে যে এখানে এসে এইসব বাহাদুরি করবার সুযোগও তিনি পেতেন না—এসব কথা যতীশবাবু উল্লেখ করেন না। ঝিন্টুক এখানে তাঁকে বেশ ভালোভাবেই রেখেছে। তিনি দেশে প্রত্যহ একটা মাছের মাথা খেতেন, এখানেও তাই খান। বাজারের সেরা তরিতরকারি ঝিন্টুক তাঁর জন্যে কেনবার ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার পর দই পায়েস মিষ্টান্ন খাওয়া তাঁর অভ্যাস, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। খুব সরু আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, একদিন অন্তর মাংস (হয় খাসি, না হয় মুরগি, না হয় কাছিম)—কোনরকম অভাব রাখেনি ঝিন্টুক। তিনি প্রতিদিন যখন খেতে বসেন তখন মনে হয় বাড়ির কাকা নয়, যেন বাড়ির জামাই খেতে বসেছেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও জামাইয়ের মতো। ফিতে-পাড় কাঁচি ধুতি, পেটেন্ট লেদারের পাম-শু, গ্রীষ্মকালে ভালো আদ্দির পাঞ্জাবি, শীতকালে দামী গরম জামা, শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, এমনকি বালাপোশ, পর্যন্ত কিনে দিয়েছিল তাঁকে ঝিন্টুক। কিন্তু তবু তিনি ঝিন্টুকের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সন্তুষ্ট হতেন যদি বাড়ির কর্তৃত্বটা তাঁর হাতে থাকত। কিন্তু ঝিন্টুক সেটা দেয়নি। তাঁর ইচ্ছা ঝিন্টুক শামুক দুজনে যা রোজগার করবে, সব তাঁর হাতে এনে দেবে, তিনিই যাকে যা দেবার দেবেন। বলতেন, আমি পোষা-ময়না হ'য়ে থাকতে চাই না। আমি ওদের গুরুজন, আমিই বাড়ির কর্তা, আমাকে সেইরকমভাবে রাখতে হবে। না হলে—। না হলে তিনি যে কি করবেন তা আর খুলে বলতেন না। কিন্তু সর্বদাই একটা চোখ-রাঙানির ভাব নিয়ে থাকতেন। প্রথম চোখ-রাঙানি—আমাকে কেন দেশ থেকে জোর ক'রে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় চোখ-রাঙানি—এখানে কেন আমাকে বাড়ির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হ'ত তিনি এসব লাঞ্ছনা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সহ্য করবেন না। কিন্তু করতেন। সকালে যখন গরম চায়ের সঙ্গে মাখন-লাগানো টোস্ট আর ডিম-ভাজা আসত সুট্ সুট্ ক'রে খেয়ে নিতেন। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে পড়তেন, বর্তমান গবর্নমেন্টকে গালাগালি দিতেন খানিকক্ষণ, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতেন। ওঠ-বস করতেন কয়েকবার, তারপর পার্কে গিয়ে চক্কর দিতেন অবশেষে। এখানে শরীরটাই হয়ে

উঠেছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। কি ক'রে শরীরটা ভাল থাকবে এই নিয়ে ক্রমাগত খ্‌্তখ্‌্ত করতেন। নানারকম খ্‌্তখ্‌্তুনি ছিল তাঁর। তেষ্টা পেয়েছে, এক প্লাস জল চাইলেন। জল পেয়ে চোঁ চোঁ ক'রে খেয়ে ফেললেন, তারপর বললেন জলটা ভারি মিষ্টি লাগছে। তার মনেই শরীর খারাপ হয়েছে। আর একদিন সেই একই জল খেয়ে বললেন, জলটা বিস্বাদ লাগছে আজ। এরও ওই এক সিম্ধান্ত, শরীর খারাপ হয়েছে। সকাল বেলা প্রায়ই পেট চাপড়াতেন। বলতেন, পায়খানা পরিষ্কার হয় না। বলতেন, এ দেশের জলই এমন কষা যে, পায়খানা পরিষ্কার হওয়া অসম্ভব। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি—নানারকম ওষ্‌ধ খেতেন। বলতেন, কিছ্‌তে কিছ্‌ হয় না। দেশে না ফিরলে শরীর ভালো থাকবে না। পনেরো দিন অন্তর ওজন নিতেন। ফিতে দিয়ে নিজের ব্‌ক, পেট, কবজি মাপতেন। একট্‌ উনিশ-বিশ হলেই দ্‌শ্চিন্তা। মাথা নেড়ে বলতেন, এ দেশে
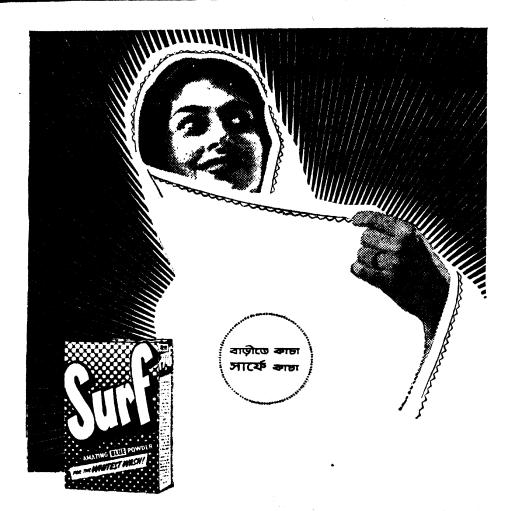
শরীর টিকবে না। দেশেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেশে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করতে কেউ কখনও দেখেনি তাঁকে। সকলকে কেবল শাসাতেন, আর নয়, এইবার চলে যাব। পাড়ায় একটা চায়ের দোকান ছিল, সেখানে চপ কাটলেটও পাওয়া যেত, সেখানে প্রায়ই যেতেন যতীশবাবু। রোজ চপ কাটলেট খেতেন আর ফলাও ক'রে গল্প করতেন দেশের। এ দেশের সঙ্গে ও দেশের তুলনা-মূলক সমালোচনা ক'রে চায়ের দোকানের মালিক গোষ্ঠবাবুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলতেন, যথেষ্ট হয়েছে, এ দেশে আর থাকব না মশাই, এ দেশে আমাদের শরীর টেঁকে না।

এরকম একটা বাঁধা খদ্দের বেহাত হয়ে যাবে ভেবে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত করবার প্রয়াস পেতেন গোষ্ঠবাবু। বলতেন, এ দেশে যখন এসেই পড়েছেন, এইখানেই মন বসিয়ে থাকুন, কোথাও যাবেন না। ক্রমশ এ দেশের জল-হাওয়া আপনার সয়ে যাবে। শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়। আমাদের বাড়িও শুনেছি পদ্মার ধারে ছিল এককালে। আমার ঠাকুরদা সেখান থেকে এসেছিলেন। আমরা তিনপুরুষ এ দেশে বাস করছি। খাসা আছি। এ দেশের জল হাওয়া বেশ বরদাস্ত হয়ে গেছে আমাদের। দেখুন আমার বুকের ছাতি আর হাতের গুলি। রোজ আধ সের চালের ভাত হজম করছি। তোফা আছি। থেকে যান, যাবেন না। যতীশবাবু সাময়িকভাবে বোধ হয় আশ্বস্ত হতেন। দু-চার দিন আর যাওয়ার কথা তুলতেন না। তারপর আবার তুলতেন কিছুদিন পরে। এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বারবার আলোচনা করাও তাঁর সময় কাটাবার একটা উপায় ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত হয়তো চলেই যেতেন, কিন্তু একটা ব্যাপারের জন্য তিনি এ দেশ থেকে নড়তে পারছিলেন না। আর সেটা এমন ব্যাপার যে, কাউকে বলাও চলে না। তিনি যদিও কোনও প্রমাণ পাননি কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছিলেন যে, ঝিনুক-শামুক দুজনেই দেদার টাকা রোজগার করছে। কিভাবে রোজগার করছে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না, কিন্তু তিনি যে সে উপার্জনের কোনও অংশ পাচ্ছেন না এতেই তিনি বড় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকতেন মনে মনে। পাকিস্তান থেকে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন, প্রচুর টাকা নিয়ে এখানে যদি আসতে পার তা হলে এখানেও বেশ সুখে থাকতে পারবে। টাকা ছড়াতে পারলে এখানেও বেশ আরামে থাকা যায়। যতীশবাবু প্রচুর টাকার আভাস পাচ্ছিলেন, কিন্তু তা ধরতে ছুঁতে পারছিলেন না, সেইটে হস্তগত করবার আশাই ছিল তাঁর এখানে থাকার প্রধান আকর্ষণ।

. . . . .

সেদিন অনেক রাতে ঝিনুক যখন এল তখনও তিনি জেগে বসে আছেন। ঝিনুক শামুক বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তাঁর ঘুম হয় না। বাড়িতে তিনি একা থাকেন, কনককে পর্যন্ত ঝিনুক বোর্ডিংয়ে দিয়ে দিয়েছে। তাঁর ঘুম আসে না। ডিটেকটিভের মনোভাব নিয়ে জেগে থাকেন যতীশবাবু। ভাবেন, ওরা রোজই নিশ্চয় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে আসে। টাকাটা রাখে কোথায়? কত টাকা আনে? এইসব চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না। তিনি ওত পেতে বসে থাকেন।

ঝিনুকের সঙ্গে সত্যিই সেদিন অনেক টাকা ছিল। ওরা যে চোরা-কারবারে লিপ্ত তার থেকে মাঝে মাঝে বেশ দমকা টাকা পাওয়া যায়। সেদিন সন্ধ্যার সময়ই ঝিনুক পান্ডার কাছ থেকে হাজার টাকা পেয়েছিল। তারপর ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছ থেকে যে ভারী ব্যাগটা তারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাতে অনেক দামী মাল ছিল। সুবেদার খাঁ মালটাকে নিজের হেফাজতে রাখতে ভরসা পান নি। ডাক্তারবাবুর আপাত-নিরীহ ব্যবহারে তাঁর সন্দেহ ঘোচেনি। যে ধনী ব্যবসায়ীটি সাধারণত তাঁদের মাল গোপনে কেনেন সুবেদার খাঁ সেই দিন রাত্রেই ব্যাগটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। এই ক্রেতার সঙ্গে এঁদের কারো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। পরিচয় রাখাটা নিরাপদ নয়। এদের কারবারটা চলে বড় অদ্ভুত উপায়ে। শহরের প্রান্তে হরিবোল নামে এক অন্ধ বৈরাগী থাকে। তার বাড়িতেই চোরা মালটা আনা হয় প্রথমে। সেখানেই মালটার একটা দামও ঠিক ক'রে ফেলেন সংগ্রাহকরা। তারপর সেই জিনিসগুলো আর দামের খবর নিয়ে একটা রিকশায় চড়ে হরিবোল যায় সেই ধনী ক্রেতার কাছে। ধনী ক্রেতা হরিবোলের মারফতই একটু দর-দস্তুর করেন। তারপর মালটা কিনে নেন। হরিবোলই রিকশায় ক'রে মাল নিয়ে যায়, টাকাও নিয়ে আসে। এরজন্য প্রতিবারে সে এক শ' টাকা নগদ পায়। হরিবোল ঠিক করেছে ওই টাকা জমিয়ে সে ছোট-খাটো একটি মন্দির করবে তার কুঁড়ে ঘরের পাশে, আর সে মন্দিরের নাম দেবে হরিবোল মন্দির। সুবেদার খাঁ তাকে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন এই ব্যবসার কথা যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায় তা হলে তার মৃত্যু হবে। আর সে যদি ভালোভাবে কাজ করতে পারে তা হলে তার মজুরি ছাড়াও পরে আরও কিছু টাকা "বোনাস" স্বরূপ তাকে দেওয়া হবে। হরিবোল যে শুধু টাকার লোভেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা নয়, এর সঙ্গে কৃতজ্ঞতার আমেজও ছিল কিছু। ডাক্তার ঘোষালের রোগী সে। প্রায়ই পেটের অসুখে ভোগে এবং ডাক্তার ঘোষাল বিনা পয়সায় তার চিকিৎসা করেন। ডাক্তার ঘোষালই ওকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। দিনের বেলা হরিবোল নাকি ঠকঠক করে হরিনাম গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়। এই লোকই যে এত বড় একটা

ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে তা কল্পনা করা সত্যই শক্ত। তা ছাড়া সে অন্ধ ব'লে আরও সুবিধা হয়েছিল। কারও মুখ দেখতে পেত না।

সেদিন ব্যাগের ভিতর ছিল সোনারুপোর বাট আর কিছু জহরত, চুনি পান্না হীরে, এই সব। সুবেদার খাঁ এর দাম ঠিক করেছিলেন পঁচাত্তর হাজার টাকা। কিন্তু ধনী ক্রেতাটি এ দাম দিতে রাজি হন নি। জিনিসগুলি দেখে তিনি বললেন, এসব পাচার করতে আমাকে আরও অনেক খরচ করতে হবে, বেগও পেতে হবে প্রচুর। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী দিতে চান নি। সুবেদার খাঁ রাজি হলেন না এ টাকায়। অবশেষে ষাট হাজার টাকায় রফা হয়। হরিবোলকে সেদিন কয়েকবারই রিকশায় করে যাতায়াত করতে হয়েছিল। অবশ্য প্রত্যেকবারই আলাদা রিকশায়। সুবেদার খাঁ এসব ব্যাপারে খুব সাবধানী। এ ব্যবসায়ের বারোজন অংশীদার। এই শহরে চারজন—ঘোষাল, পাণ্ডা, সুবেদার খাঁ আর ঝিনুক। বাইরের আটজন। সকলেই সমান অংশ পায়। হংকং-এর দুজন অংশীদারকে দশ হাজার টাকা আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

ঝিনুকের অংশে যে পাঁচ হাজার টাকা হয়েছিল, সে টাকাটা সে তো পেয়েই ছিল, সুবেদার খাঁ নিজের অংশের টাকাটাও সেদিন দিয়েছিলেন তাকে। ঝিনুক প্রথমে নিতে চায়নি। সুবেদার খাঁ কিন্তু যখন বললেন যে, না নিলে তিনি এ ব্যবসার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না, তখন ঝিনুককে রাজি হতে হল। কারণ সুবেদার খাঁর সাহায্য না পেলে এ ব্যবসা অচল। ঝিনুক জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার অংশের টাকা আমাকে দিতে চাইছেন কেন? সুবেদার খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার আদর্শের সঙ্গে যে আমার আদর্শের কিছুমাত্র অমিল নেই সেইটে প্রমাণ করবার জন্য। আগেই তোমাকে বলেছি, এই ব্যবসায়ের সব টাকা আমি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্যই খরচ করছি, ও টাকা আমি নিজের কাজে লাগাই না, আমি যা মাইনে পাই তাতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। বিহার রায়টে আমার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আমি এখন একা। আমার বেশী টাকার দরকার নেই। টাকাতে আমার লোভও নেই। এভাবে আমি এ টাকা রোজগার করছি কেবল দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের সাহায্য করবার জন্য। রূপকথার রবিন হুড আমার আদর্শ। গরীব

মুসলমান উদ্বাস্তুদেরও সাহায্য করতে হবে। কিন্তু আপাতত তার সুযোগ নেই। তা ছাড়া যারা নিপীড়িত অত্যাচারিত অসহায় তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই, তারা সব এক জাত, তারা গরীব। তাদের কারও উপকারে এ টাকা লাগলে তা সার্থক হবে। তুমি যখন এ পথে নেমেছ তুমিই এ টাকা নাও। এর পর ঝিনুক আর কিছু বলতে পারে নি। কিন্তু তার সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে, এত টাকা সে রাখবে কোথায়। ব্যাংকে বা পোস্টাফিসে রাখবার উপায় নেই, পুলিস ধরবে। বাড়িতে রাখা আরও বিপজ্জনক, যতীশবাবু শ্যেন-দৃষ্টি মেলে বসে আছেন। অবশেষে আধুনিক-মনা ঝিনুক তাই করতে বাধ্য হয়েছিল যা প্রাচীন-পন্থীরা করতেন। একটা লোহার বাক্সে নোটগুলো পুরে সেটা পুঁতে রেখে এসেছিল একটা মাঠের প্রান্তে। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য জায়গাটা ঢেকে দিয়েছিল ঘাসের চাপড় আর ইট-পাটকেলের স্তূপ দিয়ে। এ কাজ সহজসাধ্য নয়। তাই প্রত্যহ সেখানে সে যেতে পারত না। হাতে বেশী কিছু টাকা জমলে যেত। তাও গভীর রাত্রে। অন্য সময়ে টাকাটা সে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এবার ভাবছিল অন্য আর এক জায়গায় পুঁতে রাখবে। কিন্তু এত রাতে তা করবার সুবিধা ছিল না।

সুবেদার খাঁ যখন ঝিনুককে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তখন গভীর রাত। ঝিনুকের সাড়া পেয়ে যতীশবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। বাড়িতে ওঁদের কথাবার্তা খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় হয়। সেই ভাষাতেই তিনি ঝিনুকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কলকাতার ভাষায় অনুবাদ করলে তা নিম্নলিখিতরূপ হয়।

"কি রে ঝিনুক, ফিরলি? আজ বড় রাত হল। এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? ঘোষালবাবুর বাসায়? সেখানে তাসের আড্ডা খুব জমেছিল বুঝি?"

"সে তো রোজই জমে।"

আজ তা হলে এত বেশী দেরি হল কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না তাঁর, যদিও ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। বেশী দেরি হওয়া মানেই যে বেশী টাকা রোজকার করা এ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। ও মেয়ে যে বিনা মজুরিতে বেশী কাজ করবে এ তিনি বিশ্বাসই করতেন না, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করতে পারছিলেন না তিনি। কোনদিনই পারেন না। একটু থেমে তাই বললেন, "শামুকও আজ আসেনি এখনও।"

শামুক মিস্টার সেনের বাড়িতে কাজ করে। সে বাহাল হয়েছিল মিস্টার সেনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পত্নীর শুশ্রূষা করবার জন্য, কিন্তু ক্রমশ সে মিস্টার সেনের বাড়িতে কর্ত্রী হয়ে উঠেছে। মিস্টার সেনের উত্থান-শক্তি-রহিত পত্নীর নির্দেশে বাড়ির সব কাজই করে।

এমন কি মিস্টার সেনের 'টাই'ও বেঁধে দেয়। মিসেস সেন নাকি রোজ বেঁধে দিতেন। মিসেস সেন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মিস্টার সেন নিজেকে নাকি বড়ই অসহায় মনে করতেন। বন্ধুদের বলতেন, আমি এখন কোথায় আছি জান? যে নৌকো ডুবছে তার উপর দাঁড়িয়ে আছি। সে নৌকো থেকে পালাবার উপায় নেই, আমার পা দুটো নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, কর্তব্যের দড়ি দিয়ে। বলতেন আর হাসতেন তাঁর সেই কুলকুচো-হেঁচাক হাসি।

ঝিনুক বলল, "হয়তো আজ মিসেস সেনের অসুখ বেড়েছে। প্রায়ই তো তাঁর ফিট হয়। হয়তো রাত্রে থাকতে হবে—"

যতীশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বেশী কাজ করলে তোরা ওভারটাইম পাস না? কত করে দেয়?"

ঝিনুক কোনও জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে তার বাক্সটা খুলেছিল টাকাগুলো রেখে দেবে বলে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো নিঃশব্দ চরণে যতীশবাবু তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"আপনি উঠে এলেন কেন?"

"না, এমনি। জিজ্ঞাসা করছিলাম তোরা কত ক'রে ওভারটাইম পাস।"

সর্পিণীর মতো ফোঁস ক'রে উঠল ঝিনুক।

"তা জেনে আপনার লাভ কি?"

"লাভ-লোকসানের কথা নয়, আমি তোমাদের কাকা, তোমাদের বিষয় সব কথা জানবার অধিকার আমার নেই কি?"

"না। সে অধিকার আপনি অনেক আগেই হারিয়েছেন। আপনি যদি কাকার কর্তব্য করতেন আমরা অন্যরকম হতাম। আপনি আমাদের গুন্ডার মুখে ফেলে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিলেন, ডাক্তার ঘোষাল না থাকলে আমাদের যে কি হ'ত তা ভাবতেও পারি না। তবু আপনাকে আমরা ত্যাগ করিনি। শুধু তাই নয়, যতটা সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করেছি।"

"তা না করলেই পারতে। এভাবে বসে বসে ভাল লাগে নাকি?"

"বসে না থেকে আপনি করবেন কি? আপনি ম্যাট্রিকও পাস করেন নি, এক মজুরগিরি ছাড়া অন্য কাজ আপনার জুটবে না, আত্মসম্মান থাকলে তাই করতেন। তা তো পারবেন না, সুতরাং আপনাকে বসেই থাকতে হবে। যতদিন আমাদের সামর্থ্যে কুলুবে আপনার খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না। এর বেশী আর আমাদের কাছে দাবি করবেন না কিছু।"

"আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। জলিল মিঞা খবর পাঠিয়েছে যে, সেখানে ফিরে গেলে আমাকে তার মাছের ব্যবসার অংশ দেবে, আর আমাকে ব্যবসার ম্যানেজার ক'রে দেবে।"

"বেশ, আপনি ফিরে যান। আমরা ফিরব না।"

"ফিরতে হলে টাকা চাই। অন্তত হাজার দশেক টাকা না হলে তার ব্যবসার অংশীদার হ'তে পারি না। তোমরা দুই বোনে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করছ, আমাকে একটি পয়সা দাও না, আমাকে পোষা ময়না বানিয়ে রেখেছ। এ আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

একটু থেমে তারপর কোমল কণ্ঠে মিনতির সুরে বললেন, "আমাকে রোজ কিছু কিছু করে দে, তাই জমিয়েই আমি দেশে ফিরে যাব। তোরা যা রোজগার করিস তার অর্ধেক দিলেই এক বছরের মধ্যেই আমি দেশে ফিরতে পারি। রোজ কিছু কিছু করে দে। আজ কত এনেছিস দেখি—"

হঠাৎ যতীশ ঝিনুকের হাতটা ধ'রে ফেললেন।

"দেখি, লক্ষ্মীটি কত পেয়েছিস আজ, দেখি—"

ঝিনুক এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল যতীশের গায়ে অসুরের শক্তি। সহজে হাত ছাড়ানো যাবে না।

"আমার হাত ছেড়ে দিন। জোয়ান মেয়ের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না আপনার! ছেড়ে দিন।"

"যতক্ষণ না আমায় টাকা দিবি, ছাড়ব না হাত। আমাকে পর মনে করছিস কেন ঝিনুক? এত টাকা রোজগার করছিস, শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে কি করবি? আমার সঙ্গে পরামর্শ করিস না কেন, আমি তোর কাকা, আমাকে পোষা ময়না করে রেখেছিস কেন? শোন, শোন, কথা শোন।"

"আমার হাত ছেড়ে দিন।"

যতীশবাবুর হাতের মুষ্টি দৃঢ়তর হল। চোখে মুখে লোভ মূর্ত হ'য়ে উঠল কুৎসিতভাবে। ঝিনুকও হার মানবার পাত্রী নয়। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ঝিনুকের কাপড়চোপড় বিস্রস্ত হ'য়ে পড়ল। তার ভয় হতে লাগল, বুকের ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিলগুলো পড়ে না যায়। হঠাৎ সে কামড়ে ধরল যতীশের হাতটা। তার ধারালো দাঁত করকর ক'রে ব'সে গেল যতীশের হাতের মাংসে।

"উঃ, এ কি করিস রাক্ষুসী। ছাড়, ছাড়, ছাড়—"

নিমেষের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল ঝিনুক। রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে লাগল। চীৎকার করে উঠল একটা পেঁচা, ডেকে উঠল একদল শেয়াল। ঝিনুক ছুটতে লাগল। কিছুদূরে গিয়েই তার মনে হল এভাবে কোথায় চলেছি। এখনি তো পুলিসের হাতে পড়ে যেতে পারি। দূরে একটা চৌকিদারের হাঁকও শোনা গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে একটা বড় গাছের তলায়। ভাবতে লাগল কোথায় যাব এখন? ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি? সেখানেই রাখব টাকাগুলো? তৎক্ষণাৎ মনে হল, না, ওখানে রাখা নিরাপদ নয়। ডাক্তার ঘোষালের টাকার প্রতি লোভ নেই তা ঠিক, কিন্তু তিনি জুয়াড়ী মানুষ, টাকা হাতে পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া মিস্টার সেনের ওই মেয়েটা, রং-মাখা কাজল-পরা, পেট-কাটা কাঁধ-কাটা ব্লাউস-পরা ওই প্রেতিনীটা এখন ভর করে আছে ওর উপর। ও এলেই ঘোষালের চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে ওঠে তার অর্থ ঝিনুকের অবিদিত নেই। আবেগের মাথায় এক নিমেষে ওর হাতে সব তুলে দিতে পারে ঘোষাল। না, ঘোষালের কাছে টাকা রাখা চলবে না। পরমুহূর্তেই মনে হল 'কাউকে কি বিশ্বাস করা চলবে? সে তো তাকে ভক্তি করে। তার সাহায্য নিয়ে কি দু-একদিনের জন্য টাকাটা কোথাও

লুকিয়ে রাখা যায় না? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল তার মায়ের কথা। ঝিনুক তাকে নিজের হার আর চুড়িগুলো দিয়ে বলেছিল, এইগুলো নিয়ে তুমি এখন চলে যাও। পরে তোমাকে আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। সে কি চলে গেছে? অত সহজে চলে যাওয়ার পাত্রী সে নয়। তার হাতে যদি কোনরকমে টাকাটা পড়ে যায় তাহলে টাকাটা আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ টাকা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না ঝিনুক। এই টাকার জোরেই তার স্বপ্নকে সফল করে তুলবে সে। এর থেকে একটি আধলা সে কাউকে দেবে না। সুবেদার খাঁর কথা মনে হল। তাঁর হাতে গিয়ে টাকাটা তুলে দিলে অবশ্য ভয় নেই। কিন্তু তাঁর বাসাটা কোথায় তা সে ঠিক জানে না। তিনি এক ঠিকানায় বেশী দিন থাকেন না, প্রায়ই বাসা বদল করেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঝিনুক ভাবতে লাগল। নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল তার।

(ক্রমশ)

সারাদিন সুরভিমণ্ডিত ও সতেজ রাখবে...

ওটিন

ট্যালকাম পাউডার

(সাধারণ ও জ্যাসমিন সুবাসিত

সর্বনাশটা মাথায় নিয়ে কামিনী ছবু কাঠ হয়ে ছিল। হাউমাউ করে কেঁদে নয়নের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। অন্ধকারে কেমন জবুথবু হয়ে বসে ছিল হাঁটু দুমড়ে। বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল তার, তা থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠছিল, মাংস পোড়া গন্ধ আসছিল, আর খোলা দরজা দিয়ে তখন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল আলোর আশায়। কানীবুড়ী আলো আনতে গিয়েছিল। সেই ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে শরীরে যেন ভরা পোয়াতির টানটান ব্যথাটা নিয়ে কামিনী পাথর হয়ে ছিল। তার শূন্য ফাঁকা দৃষ্টির সামনে তাপ হারানো রক্তের মত চাপচাপ অন্ধকার শক্ত হয়ে দানা বেঁধে উঠছিল অথচ শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু তার তীব্রতায় সজাগ হয়ে ছিল। ভয়ানক আর সজাগ। একটু পরে আলো এলো। কুয়োতলা দিয়ে কানীবুড়ী হাত আড়াল করে প্রদীপ ধরে রান্নাঘরের দিকে গেল। অল্পক্ষণ পরে একটা কুপি এনে ঝুলিয়ে দিল ঘরে। ঘরের এবড়ো খেবড়ো মেঝেতে একথাবলা ম্লান আলো টিমটিম করে উঠল। আর সেই আলোয় কামিনী দেখল নয়নকে। শেষ সময়ে বুঝি রক্ত-বমি করেছিল, রক্তগুলো গলার ওপর মাথার পাশে কানের পিছনে শুকনো রঙের মত লেগেছিল, ঘাড়টা একটু হাত হয়ে ছিল, ঠোঁট সামান্য ফাঁক, সমস্ত মুখখানা রক্তহীন শক্ত শক্ত ফ্যাকাশে।

আচমকা ডান হাতের আঙুলটা আপনা থেকেই নয়নের নাকের তলায় ধরেছিল কামিনী, যদি, তবুও। না নিঃশ্বাস পড়ছিল না নয়নের। আঙুলটা সরাতে গিয়ে নয়নের নাকের ডগার সংগে ছুঁয়ে গিয়েছিল, ঠাণ্ডা। আঙুল থেকে উঠে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গিয়েছিল একটা হিমস্রোত সেই মুহূর্তে। তারপর নয়নের বুকে হাত রেখেছিল, কান পেতেছিল, কোন শব্দ ছিল না, যেন একটা ইটের চাতালে কান পেতেছিল সে। শব্দ না, তাপ না, আর কানীবুড়ী এসে কামিনীকে ধরেছিল।

'ও বউ পাগল হলি নাকি...এ সোমসার অসার বউ...সামাল দে, সামাল দে।'

বিড়বিড় করে কানীবুড়ী তারপর বলে গিয়েছিল ঘটনাটা। হঠাৎ কী হল ডাগর-ডোগর ছেলেটা মাঠ থেকে ছুটে এসে দাওয়ায় পড়ল, সে রাত্তিরে যমে মানুষে টানাটানি, ধারে কাছে জনবসতি নেই, কানী যা টুকিটাকি জানত করল, আর ভোর নাগাদ চোখ উল্টে শেষ। শেষ সময়ে নাকি কামিনীকে খুঁজেছিল নয়ন।

কামিনী তবু স্থির হয়ে বসেছিল। বুকের মধ্যেটা টনটন, ধোঁয়াটা বুঝি পাক খাচ্ছিল ভেতরে, গলার কাছে নিঃশ্বাসটা অনেকক্ষণ ধরে দলা পাকিয়ে ছিল, চোখের সাদা জমিটা ব্যথা ব্যথা করে বুঝি রক্তের ফোঁটা বেরুবে মনে হয়েছিল। তবুও ধুলো-মাখা শরীরটা নিয়ে কামিনী যেন বটতলার শিবঠাকুরটি হয়েছিল। এ দুদিনে অনেক ধুলো জমেছে কামিনীর শরীরে। খামকলের ধুলো, ম্যানেজার সাহেবের বাংলো বাড়ির মেঝের ধুলো।

কামিনী হাঁটছিল আগে আগে, কানী-বুড়ী পেছন পেছন। তার মাথার ভেতর কেবলই জট পাকিয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যার দৃশ্য-গুলো, ভাবনাগুলো আর হাত দুটো ভীষণ কাঁপছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল কামিনীর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়নের ছোট মাথাটা মাটিতে পড়ে ফটাস করে ফেটে যাবে। মনে হচ্ছিল তার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে জড়ান কাঁথাটা, ন্যাকড়াগুলো যেন ছড়িয়ে পড়বে মাটিতে। মাথাটা কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ওখানে হাতুড়ি পিটছে কেউ। জায়গাটা ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই, বাঁ পাশে কেবল মরা গাজারি গাছটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে। বুকে বাতাসের আঁচড় লাগছিল, সে চোখ চাইতে পারছিল না। আজ জোনাকিও ছিল না, এই অমাবস্যায় নাকি জোনাকি জ্বলে না। আর বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘ দলা পাকাচ্ছে আকাশে, গাড়িয়ে গাড়িয়ে আকাশটা যেন অষ্টপ্রহর নামছে।

সন্ধ্যার ট্রেনটা যখন বৃষ্টিতে ভেজে কামিনীকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল

-তখন বৃষ্টির তেমন জোর ছিল না। যেন হাওয়ার ঝাপটায় নেমে আসছে ইলশেগুঁড়ির ছাট। কিন্তু এখন আরো তোড়ে নেমেছে। মাসটা আষাঢ় কিন্তু যেন শ্রাবণের ধারা লেগেছে, দলা দলা মেঘ সারা আকাশ জুড়ে অন্ধকার হয়ে আছে।

'ও বউ...পথ ঠাওর রাখিস।'

কানীবুড়ী হাঁকছিল।

লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিচ্ছে রক্তের। বিদ্যুৎ ঝিলিকে টাটকা রক্ত ক্ষতের মত ভয়ংকর দেখাচ্ছে লাল পাঁক। আর খ্যাপা বাতাস গরগর করছে থেকে থেকে।

'আকাশের গতিক ভাল না রে বউ... সামাল দিয়া পথ চলিস।'

বিড়বিড় করছে কানীবুড়ী।

ক্রোশ দেড়েক পশ্চিমে গেলে তবে শ্মশানটা চোখে পড়বে। এখান থেকেও দূরের ট্রেনের শব্দটা ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। নাকে একটা গন্ধ এসে ঝাপটা দিচ্ছিল কামিনীর, বড় বিশ্রী গন্ধ। গন্ধটা আসছে

...তে জড়িয়ে থাকা পঁটুলিটার ভেতর থেকে। একবার সে নাক বন্ধ করল, একটু পরে আবার খুলল। আবার ধক করে গন্ধটা এসে নাকে ঝাপটা দিল। শরীরের ভেতর রক্তের স্রোত আলগা ভাঁটিতে শীতল হয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে। সাঁইসাঁই বাতাসের শব্দ। মুখে জলের ঝাপটা এসে লাগছে, মুখ গাল বেয়ে গলায় বুকে পড়ছে। জলের স্বাদে নিজের পিপাসাটাকে তীব্রভাবে অনুভব করল কামিনী। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে তার। রক্তস্রোত শীতল, না-খাওয়া, ঘুম না করা শরীর দুর্বল। পশ্চিম আকাশটা চিড় খেয়ে গেল বিদ্যুৎ-এ। মাটি রুক্ষ মুখে হাঁ করে ঘোলা জলটা যেন চেটে নিচ্ছে।

'ও বউ.....বউ।'

কানীবুড়ীর ডাকটা উড়িয়ে নিচ্ছে ঝড়। কামিনীর কানে কোন শব্দ যাচ্ছে না। মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে শিরা-উপশিরা। যেন মাঝখান থেকে মচকে যাবে মাথাটা। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা, অন্ধকার। সমস্ত শরীরটা শীতল, পা পাথর। এ জলে পিছল পা টেনে নেয়, হড়কে যায়। সাবধানে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে লাগল কামিনী, পেছনে লাঠি ঠুকঠুকে কানীবুড়ী। ভর করে, বড় কষ্ট কামিনীর বুকে। হেই মা গো আমারে নাও, হেই বাবাগো আমারে নাও। কী দোষে আমারে শাস্তি দিলে গো, আমারে এ দণ্ড দিলে কেন গো, আমি তো কোন পাপ করি নাই।

অকারণে চমকাল কামিনী। আমি তো কোন পাপ করি নাই...বাকাটি ঘুরতে লাগল বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে... বাকাটি ঘুরতে লাগল...আমি তো কোন পাপ করি নাই...সারা গায়ে কাঁটা...বাকাটি বুকের মধ্যে শব্দ করে ফেটে গেল।

'সামাল গো বউ...পথ দেইখা চল...জোর লাগছে গো...নদীটারে ঠাওর রাখিস।'

অন্ধকারে বৃষ্টির ঝাপটায় হারিয়ে যাচ্ছে কানীবুড়ীর কথাগুলো। আর বাতাস হচ্ছে খ্যাপার মত, বিদ্যুৎ-এর কাটাকাটি চোখ ধাঁধায়, চোখের নজর কেড়ে নেয়। রাস্তা বদলে গেছে, পাথর ছড়ানো টালমাটাল রাস্তা, বড় বড় চাংড়া, পা হড়কালে রক্তপাত নিশ্চিত। কামিনী হাত দিয়ে কাঁথায় জড়ানো পঁটুলিটা বুকে আঁকড়ে ধরল। সামনে নদী আছে, হাত দশেক চওড়া নদী, এখন কোমর জল, অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না, কিন্তু কোমর জলে ঘূর্ণির টান। বুকের হাঁসফাঁস কষ্টটার জ্বালায়, জলের ঝাপটায় কাঁপন ধরেছে কামিনীর। বিদ্যুৎ চমকে উঁচু নীচু তেপান্তর হাসছে যেন রক্তাক্ত মুখে, আর তালের সারি অশরীরী ছায়ার মত মাথা দোলাচ্ছে।

'সামাল গো বুড়ী।'

জলে পা ডুবিয়ে বলল কামিনী।

'আমার হাতটা ধর গো বউ।'

একহাতে পোঁটলাটা অন্যহাতে কানীবুড়ীর হাত ধরে জলে নামল কামিনী।

হেই মাগো চেটেপুটে সব নিলি আমার। বিড়বিড় করল সে। ঘরের মানুষটা তিন মাস হল কোথায় চলে গেছে, ঘা খেয়ে খেয়ে খ্যাপা হয়ে গেল মানুষটা শেষের দিকে। কানের কাছে ফিসফিস করে কে কাঁদছে। আবেগের সময় মানুষটার বুকে চাপড় মেরে কথা বলার স্বভাব ছিল। ফিসফিস করে কে কাঁদছে। বউ আমি তর, তর পোলার শত্তুর। বউ আমি তরে ছাড়া, সংসার ছাড়া কিছু জানি না। তুই আমারে পথ খুইজা দে, আমি কী করুম আমারে বইলা দে বউ।

জলের নীচে পাথরে হোঁচট খেয়ে সামলে নিয়েছে কানীবুড়ী আর হাঁপাচ্ছে। শীত ধরেছে তার হৃৎপিণ্ডে, দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে। তবুও মুখ বুজে হাঁটছে আস্তে আস্তে। বিদ্যুৎ এর আলোয় লাল তেপান্তর দগদগে ঘায়ের মত লাগছে চোখে। জলের পাড়ায় চাপা নীব সার গোঙাচ্ছে বাতাসে।

'ও বউ।'

'কী বও।'

'পথটারে ঠাওর রাখিস।'

কানীবুড়ী বিড়বিড় করছে আর কামিনীর মনে হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ-গুলো উঠে আসছে গলা দিয়ে। উঠে আসছে আর নীচের থেকে অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর।

নদী পেরুতেই বাজ পড়ল কড়কড় শব্দে। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল কামিনীর দৃষ্টি। শরীরটা টলছে, পা দুটো টলছে, হাতের বোঝাটা ভারী মনে। বুকের ভেতর নিঃশ্বাসটা দাপাচ্ছে। আর আমার বড় কষ্ট গো মা, আমায় তুই ছিবড়ে করে দিলি বাবাগো। আমার মানুষটা বিবাগী হল, আমার পোলাটারেও তুই খাইয়া ফেললি। চোখে আমি আঁধার দেখি গো।

পেছল মাটিতে পা হড়কে যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টিটা অন্ধ, পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। হাতের বোঝাটা ছিটকে গেল।

'হেই আগো...কী হল গো...ও বউ কথা ক।'

কানীবুড়ী চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। শূন্য মাঠটায় বাতাস গজরাচ্ছে। অন্ধকারে ঠাওর করে এসে কানীবুড়ী কামিনীকে ধরল।

'ও বউ...ওঠগো বউ...চোখ চা।'

ওঠে না কামিনী। জলে ভিজে ভিজে হাড় কেঁপে অবশ হয়েছে শরীর। কাঁপছে থরথর করে, কাঁপছে আর লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কোণ বেয়ে। বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মত তাপ সারা শরীরে। কানীবুড়ী কাঁপা কাঁপা হাতে সাপটে ধরে কামিনীর শরীরটা। কামিনী কাঁপছে, সেই সঙ্গে কানীবুড়ীও। যত না বৃষ্টির

ঝাপটায় তার চেয়ে বেশী জরে। নাকে মুখে শূলের মত বৃষ্টির জল বিঁধছে।

পাঁকে মুখ গুঁজে কামিনী শুয়ে আছে। দূরে ছুটন্ত ট্রেনের শব্দ আসছে। লাইনের ওপর চাকা গড়াচ্ছে, নাট বল্টু ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজছে। পা বেয়ে জোঁক উঠছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। কামিনী জিভ দিয়ে একবার ঠোঁটটা চাটল, বিস্বাদ। বৃষ্টি আর ঘাম মিশে বিস্বাদ। মরণ আসছে তার সামনে। তার পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে কী যেন নামছে হিসহিস করে। কে যেন চীৎকার করে ডাকছে কামিনীকে, ঝড়ের শব্দ নিয়ে গলাটা চিরে যাচ্ছে।

'ও বউ...বউগো।'

'কি কও।'

'আর পারি নারে বউ...পরাণটা জুইলা গেল।'

কামিনী প্রাণপণে দু-হাতে নিজের গলাটা টিপে ধরে চীৎকার করে উঠতে চাইল। ভয়ংকর শব্দ করে তলার মাটিটা কাঁপছে, হিংস্র বেগে বাতাস উড়ছে, বৃষ্টির ঝাপটায়। কানীবুড়ী এবার বুকে চেপে ধরল কামিনীকে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে মাটিতে আর সাপিনীর মত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঠের রক্তপাঁকে যেন ডুবে যাচ্ছে কামিনী, ঘোলা জলে টাল খাচ্ছে কানীবুড়ী।

'হেই গো বউ...চোখ চা কথা ক' বউ।'

একসময় পাঁক থেকে মুখ তুলল কামিনী। মানুষ বলে যেন আর চেনাই যায় না তাকে, মুখটা কাঁদ কাঁদ, বুক থেকে কাপড় গেছে সরে। খোলা বুকে যেন রং করা মাটির প্রতিমা; চোখ রক্তজবা। কী যেন বলে বিড়-বিড় করে।

'বউ।'

'উঃ।'

'কী কস তুই?'

'আমার নয়ন হারায়ে গেছে গো।'

'কাঁদিস না বউ আমি খুইজা দেখি।'

যেন একটা পাথরের মূর্তি, কামিনী শূন্য ফাঁকা দৃষ্টিটা নিয়ে জলে কাদায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর কানীবুড়ী অন্ধকারে ঠাওর করে মাটিতে হাত বোলায়, 'নয়নটা গেল কোথায় গো', চালশেপড়া দৃষ্টি নিয়ে স্যাঁতসেঁতে তরল অন্ধকারে কানীবুড়ী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। চোখের ডিম দুটো ফেটে যেন বাষ্প বেরিয়ে আসছে, আর সে যেন দেখছে ছায়া শরীর নিয়ে কারা যেন নদীর ওপার থেকে উঠে আসছে। চারটি ছায়াশরীর, চার বাহকের কাঁধে বোঝা হয়ে এইবার বুঝি কানীবুড়ী শূন্যে উড়ে যাবে।

'নয়ন গো...উরা যে আইল গো...'

কানীবুড়ী বুকের ভেতরটা চিরে গেল আর্তনাদে, বৃষ্টির জল লেগে শরীরটা ক্রমশ শীতল, আরো শীতল, হিম শীতল করে দিচ্ছে। কানীবুড়ী যেন এবার দেখল চার বাহকের কাঁধে চড়ে নয়ন যাচ্ছে, এক গুপ্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে তারা। অন্ধের মত মাটি হাতড়াচ্ছে কানীবুড়ী, হাতে নরম মতন পোঁটলাটা ঠেকতেই সমস্ত শরীর পেতে পোঁটলাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, দুহাতে বুকে আঁকড়ে ধরল।

'দিমু না......নয়নরে দিমু না।'

কানীবুড়ীর ভাঙা গলাটা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করে উঠল। আর কামিনী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল।

শ্মশানে এসে পৌছুতে সেই মাঝরাত্তির। দেওয়াল-শূন্য ভাঙা আটচালাটা বাতাসের ধাক্কায় টলছে, বাঁশের খুঁটিতে মড় মড় শব্দ উঠছে। বাতাসের গোঙানির সঙ্গে বাঁশের খুঁটির শব্দ মিশে কেমন ভয়ংকর থমথমে হয়ে আছে সমস্ত পরিবেশটা। আর সেখানে তখন শ্মশানকালীর পুজো বসেছে। বুড়ো হাজারি ঠাকুর কুশের আসনে উবু হয়ে বসে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় সুরে মন্ত্র বলছে, চৈতন্য ডোম তার বিশাল কদাকার চেহারাটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্খলিত কণ্ঠে ডেকে উঠছে মা, মা; হারু চাষা কাঁসি বাজাচ্ছে আপনমনে, গগন, মহিম' হরনাথের দলটা গাঁজার আসর বসিয়েছে আগুনের কুণ্ডটার পাশে। কামিনীর চোখে পুরোপুরি কোন দৃশ্যই এখন আর ধরা পড়ছে না, কানীবুড়ী বেড়ার খুঁটিটা ধরে দম নিচ্ছে। কামিনী দেখছে গাঢ় নীল শরীর, টকটকে লাল জিভ, টানা চোখ, গলায় হাতে কাটা মুণ্ড ঝুলছে তা থেকে যেন রক্ত ঝরছে। আর দূরে দপ্-দপ্ করছে চিতা জলে ভিজে। সে আগুনের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল, মাটির বুকে আগুন, আগুনের কত রঙ আর শিখা। অন্ধকার কাঁপছে বৃষ্টির ঝাপটায়, মাটিটা কাঁপছে, আগুন কাঁপছে। হারু চাষার হাতে ফাটা কাঁসিটা বাজছে ঠুনঠুন। কামিনীর চোখের সামনে সমস্ত সংসারটা, পরিবেশটা নরক হয়ে যাচ্ছে। নরক অন্ধকার, বাতাস নেই, আগুনের জলে ভেজা ধোঁয়া নাচছে পাটকিলে রঙের ছাই উড়ছে হাওয়ায় আগুন ছাপিয়ে ধোঁয়া উঠছে, ধোঁয়াটা ফুলে ফেঁপে বিশাল হয়ে যাচ্ছে।

কামিনীর চোখে সব ঝাপসা হয়ে গেল। ধানকলের ম্যানেজারবাবু চোখ মটকে ধোঁয়া ছাড়ল মুখ দিয়ে, ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে যেন ঘিরে ফেরে কামিনীকে। হাত-পা অসাড়, চোখের দৃষ্টিটা অন্ধ, বোধ হীন

ম্যানেজার সাহেবের লম্বা মস্ত কালো রঙের কুকুরটা হঠাৎ চীৎকার করে উঠল। ঘরের নীল রঙের পর্দাটা শব্দ করে নাচছে, তুমি আমার বাপ, আমি তোমার বুন, ছাইড়া দও বাপ, আমার ঘরে পোলা আছে...এই দেখ বাপ আমার শাঁখা...এই দেখেন দাদা আমার সিঁদুর...কাঁশিটা বাজছে ঢং ঢং ভাঙা কাঁসির আওয়াজটা চেরা চেরা, আঁ আঁ করে আর্তনাদ করছে মাতাল শ্রীকেষ্ট। কাঁসিটা বাজছে। আর কামিনী যেন পড়ছে, গাছের কেটে নেওয়া নিরীহ ডালটার মত, তার শরীর থেকে ফট ফট শব্দ উঠছে। হায় গো এ আমি কোথায় আইলাম...বাতাস নেই, অন্ধকার, অন্ধকার, আগুনের শিখাটা দাউ দাউ করে লাফাচ্ছে। হাজারি ঠাকুরের গলাটা চিরে যাচ্ছে, মা মা। অন্ধকারে ঝপ ঝপ দাঁড় ফেলছে মানুষটা...পালাইয়া চল কামিনী, এ দ্যাশটা বিষ ঢালছে গো...তার-পর জঙ্গল কেটে বসতি হ'ল...মানুষটা ঝাপ্সা হয়ে গেল শেষে। বাইরে ভয়ংকর গলায় চীৎকার করছে কুকুরগুলো, চিতার পোড়া ছাই উড়ে উড়ে চোখে পড়ছে... ম্যানেজার সাহেবের পাঁচ আঙুলে ছয় আংটি তাদের বিচিত্র আলো ফেলে ফেলে অন্ধকারে কামিনীকে খুঁজছে। আয় মরি...না, না একথা কইও না...বড় সাধ আছিলো গো আমার। বড় সাধ আছিলো গো...হায় হায় গো। আর পারি না, পারি না। চাল গুদোমের লরিগুলো হর্ন বাজিয়ে ছুটছে, প্রচণ্ড শব্দে বাংলো বাড়িটা কাঁপছে, ঝন ঝন শব্দ করছে, জানলার কাঁচগুলো।

'বউ তুই আমারে ধর...শক্ত কইরা ধইরা রাখ গো...আর পারি না।'

কার গলার কান্নার স্বর যেন ঝড় হয়ে বইছে।

'বড় সাধ আছিল যে আমার।'

আটচালাটার বাইরে অন্ধকারে শেয়াল-গুলো জলে ভিজছে, ওরা গন্ধ পেয়েছে।

'মা, মা' চৈতন্য ডোম চীৎকার করে উঠল।

'কী দোষে আমারে শাস্তি দিলে গো মা, আমার সব চেটেপুটে নিলে বাবা গো।'

প্রচণ্ড শব্দে বুকটা ফেটে যাচ্ছে কামিনীর আর কানীবুড়ী বেড়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বিড়বিড় করছে। কামিনী দেখছে চিতার আগুনের আলোয়, যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, এই সংসারটা এই পরিবেশটা বিশাল এক চণ্ডালের মূর্তি ধরে কামিনীকে ধরতে এগিয়ে আসছে, ধরতে পারলেই তাকে ঐ জ্বলন্ত চিতাটার উপর ফেলে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠবে। একটা ভয়ার্ত ক্লান্ত আত্মার মত কামিনী এইবার নিজেকে আড়াল করতে চাইল, সরে যেতে চাইল আড়ালে। আটচালাটার বাইরে শ্মশানের প্রহরী কুকুরটা গলা মিলিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

পা ফেলে, পা ফেলে চণ্ডালটা আসছে, আর কে যেন শক্ত করে কামিনীর ঘাড়টা চেপে ধরেছে, নিজেকে হারিয়ে নবার জন্য এক-বার ছটফট করে উঠল সে, শরীরের নিঃশেষিত শক্তি একসঙ্গে জড়ো করে উঠে দাঁড়াতে চাইল, তারপর ছুটে বেরিয়ে যেতে। কারা যেন চেপে ধরে আছে কামিনীকে, লোমশ হাতের মুঠোগুলো লোহার মত, তাদের তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তার শরীরটা চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে, তা থেকে রক্ত ঝরছে, খণ্ড খণ্ড শরীরটা থেকে ওরা এবার বুকের পাঁজরা ছিঁড়ে নিচ্ছে আর কামিনী যেন সত্যি সত্যি একটা শব হয়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে এসে ঝড়ের শব্দ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। কামিনী নিঃশ্বাস নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে, পায়ের নীচের মাটিটা কাদা হয়ে গেল, পাঁক হয়ে গেল। ভুড়ভুড়ি কেটে সেই পাঁকের মধ্যে যেন ডুবে যেতে লাগল সে। ডুবতে ডুবতে ভাসতে চাইল। নিজের শরীরটাকে ঐ প্রচণ্ড মুষ্টি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কামিনী এবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, ছোঁ মেরে পোঁটলার মত নয়নকে তুলে নিল মাটি থেকে। বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে পোঁটলাটা থেকে। কামিনী এক ছুটে আটচালাটার বাইরে বেরিয়ে এলো বৃষ্টির মধ্যে। ও বউ, কোথা যাস বউ... পাগল হলি তুই।'

পেছনে চীৎকার করতে করতে কানীবুড়ী এল।

অন্ধকারে বাতাসের ঝাপটায় টলছে কামিনী, তবুও এগুচ্ছে পশ্চিম দিকটায়। দূরের জলে ভেজা চিতাটা জ্বলছে মিটমিট করে। কামিনী আলো থেকে সরে নরম কাদা মাটির উপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। দূরের চিতাটার নিবু নিবু টকটকে লাল আলোয় কামিনী নোখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে লাগল। রক্তমাখা লালমাটি কামিনীর হাতের চাপে গলে গলে যাচ্ছে।

চিতাটা থেকে এবার ভীষণ শব্দ হচ্ছে,

বাঁশ দিয়ে এবার পা ভাঙা হচ্ছে শবের, কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে মটমট করে, হাড় ফাটছে, ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আর পা ফেলে ফেলে অমোঘ এক নিয়তির মত চণ্ডালটা এগুচ্ছে কামিনীকে ধরতে। ছটফটে আঙুলগুলো তার মাটি আঁচড়াচ্ছে, তার বুকের ভেতর থেকে শব্দ উঠছে, কারা যেন মটমট করে বুকের পাঁজরাটা ভেঙে দিচ্ছে, বড় সাধ আছিলো গো...তার বুকের ভেতর থেকে মাংস নিয়ে খাবলা করে ছুঁড়ে দিচ্ছে কারা ঐ চিতার আগুনে। আর হিংস্র বেগে মাটি খুঁড়ছে কামিনী, মস্ত বড় একটা গর্ত খুঁড়তে হবে তাকে, তারপর সে আর নয়ন তার মধ্যে ঢুকে যাবে, তাহলেই বেঁচে যাবে তারা। কামিনী আর পারছে না, অস্থির হয়ে উঠছিল, অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে, মোচড় দিয়ে উঠছে সমস্ত শরীরটা, কণ্ঠার কাছে টনটন ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে, অন্ধকারে শেয়ালের গলা বাতাসে টাল খাচ্ছে। দ্বিগুণ বেগে কামিনী কাদামাটির বুকে আঁচড় কাটতে লাগল।

[২৪]
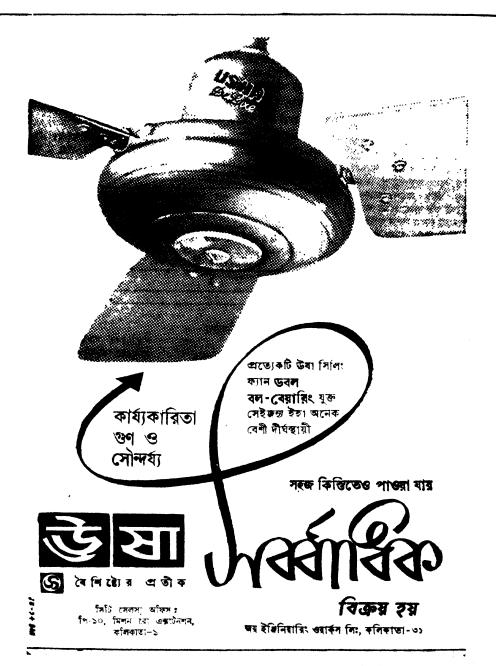
বাংলোবাড়ির দাওয়ায় বসে বসে তামাক টানছিলেন গিরিজাপ্রসাদ। কাটোয়া থেকে একটা গড়গড়া আনিয়েছেন, নলের গায়ে রুপোলী তারের কাজ করা। নলটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে টানছিলেন, তার আবেশের ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। কম বয়সে সেই কবে দু' একদিন শখ করে গড়গড়ায় টান দিয়েছিলেন, তারপর সারা জীবন ইস্কুল-মাস্টারী করতে হয়েছে। ছেলে পড়াতে হয়েছে অবসরের ফাঁকে ফাঁকে, তাই এমন আয়েসের সুযোগ পাননি কোনদিন। সস্তা সিগারেট খেয়েছেন, তাও হিসেব কষে। গাঁয়ে ফিরে সেই সস্তা সিগারেটের খরচটাও অত্যধিক মনে হয়েছে। তা ছাড়া সিগারেটটাও তেমন সস্তা যে নেই আর, খরচ চালাবেন কি করে। তাই হুঁকো ধরেছিলেন প্রথম প্রথম। কিন্তু নিজের শিক্ষাদীক্ষা, গোপন অহঙ্কারের সঙ্গে হুঁকোটাকে ঠিক যেন মানিয়ে নিতে পারেননি। বিলাস এবং আয়েস দুটোর প্রতিই মনে মনে ওঁর যে আকর্ষণ কম তা নয়। তাই একটা গড়গড়া আনিয়ে নিয়েছিলেন। ধীরেসুস্থে বেশ আয়েস করে টান দেওয়া যায়। ঠিক এই সময়-থেমে-থাকা কর্মহীন জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

দাওয়ায় বসে গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে গোয়াল ঘরের ওপারের সজনে গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। চোখের সামনে গাছটাকে ফুলে ফুলে ভরে উঠতে দেখলেন। দিনে দিনে ফুল ঝরে পড়লো, এখন কচি কচি সজনে ডাঁটায় গাছটা ভরে গেছে। পাতা নেই একটাও, নিষ্পত্র শাখা-প্রশাখা থেকে সারি সারি ডাঁটা ঝুলেছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এখান থেকে; শুক্লপক্ষের রাতে আরো সুন্দর দেখায়।

ডালগুলো নড়ছে। কেউ বোধ হয় আঁকশি দিচ্ছে নীচে থেকে।

নিজের মনেই হেসে ফেললেন গিরিজা-প্রসাদ। ছোট মেয়ে কমলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। গাছভর্তি সজনে ডাঁটা দেখে কমলা একদিন বলেছিল, একটা গাছে এত ডাঁটা হয় বাবা, আর আমরা কিনা আনায় পাঁচটা করে কিনে খেতাম। কৌতুকের কথা অবশ্য নয়। গিরিজাপ্রসাদ নিজেও কিছুদিন থেকেই ভাবছেন। হৃদয় মোড়ল একটা সুপুরির গাছ লাগিয়েছিল, সেই গাছ থেকে আশি টাকার সুপুরি বেচেছে এবার গোপেন। সজনে আর সুপুরি নয়, আরো কত কি তো লাগানো যায়, চালান দেয়া যায় শহরে বাজারে। তাতে তো গ্রামের অবস্থা ফিরতো। তা নয়, সারা বছর শুধু ধানের চাষ। আর দু' চার ঘর আখ করে, গুড়ের জাল বসায়। অন্য কোন কিছুতে কারো কোন উৎসাহ নেই।

গিরীনকে একবার বলেছিলেন। হেসে-ছিল গিরীন, তুমি গাছ বসাবে, গাঁয়ের লোক চুরি করে শেষ করে দেবে।

তা করবে ঠিকই। কিন্তু দু' একটা গাছ লাগাবে কেন। বিঘে দরুনে জমিতে বসালে কত আর চুরি করবে। বরং দেখাদেখি সবাই বসাবে।

গিরীন হেসে বলেছে, তখন আর এই দাম পাবে নাকি? ধানের মত অবস্থা হবে, চাষের খরচ পোষাবে না। কেউ করে না বলেই তো এত দাম ও-সবের।

চুপ করে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। জবাব খুঁজে পাননি। তবু মনে মনে বুঝেছেন, গ্রামের লোকের কোন উৎসাহ নেই এ-সবে। মাছের পোনা ফেলাতেও তাই গররাজি সবাই। এত বড় বড় পুকুর রয়েছে গাঁয়ে। কিন্তু কারো দু' আনা অংশ, কারো চার আনা। মাছ হলো কি না হলো, কোন ভাবনা নেই কারো। অন্য কেউ টাকা খরচ করে পোনা ফেললে তখন শুধু ভাগ নিতে আসবে।

অথচ মাছের চাষেই কি কম লাভ হতে পারতো।

বংশীকে বলেছিলেন একদিন। সেও হেসেছিল। বলেছিল, গাঁয়ে থাকো গো গিরিদাদা, আর কিছুদিন যাক, তখন বুঝবে গাঁয়ের লোক কেমন। বলে কার বাড়ির কাছে হবে এই ঝগড়া করে আরেকটা টিপকল হতে দিলো না!

গিরিজাপ্রসাদ কত লোকের কাছ থেকে যে শুনলেন এ-ধরনের কথা। গাঁয়ের লোক খারাপ, গাঁয়ের লোক খারাপ। সকলেই যদি বোঝে, তবে হয় না কেন উন্নতি। রেশারেশি, ঝগড়াবিবাদ, স্বার্থপরতা—এসবের জন্যেই যে কিছু হবার উপায় নেই, তা সকলেই বোঝে, অথচ কেউই সেটুকু বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসে না কেন? একটা পাপ-চক্রের মধ্যে যেন সকলেই আবদ্ধ, একটা পাঁকের কুণ্ডতে পড়ে আছে। উঠে আসার উপায় নেই। কেন? কেন?

বংশীকে একদিন রেগে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

আর বংশী হেসে বলেছিল, একটাই পাপ গো গিরিদাদা, দারিদ্র্য। ওই পাপ দূর করো, সব পাপ দূর হয় যাবে।

শুনতে ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল, কথাটা ষোল আনা সত্যি। কিন্তু তারপরই সন্দেহ হয়েছে। গাঁয়ের তুলনায় শহর তো অনেক সচ্ছল, তবু পাপচক্র থেকে শহরের লোক তো পরিত্রাণ পায়নি। নিজের মনেই তাই একটা সন্দেহের খটকা রয়ে গেছে।

না, অন্য কেউ টাকা দিক বা না দিক, বেশ কিছু টাকার পনা ফেলবেন এবার। আর কিছু না হোক, ছেলেমেয়েদের বিয়ের খরচ তো কমবে।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে পড়লেই আতঙ্ক বোধ করেন গিরিজাপ্রসাদ। রাতে ঘুম হয় না নিভাননীর। মাঝ রাত্রে স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে মনে পাড়িয়ে দেন।

গিরিজাপ্রসাদ প্রথম প্রথম বিচলিত হতেন, এখন আর হন না। অমরেশকে কলকাতার কলেজে পড়াচ্ছেন, সে চলে গেছে। মেয়েদেরও বোর্ডিংয়ে রেখে, নাতো বড়দের

বাছে পাঠিয়ে পড়াবেন ইস্কুলে কলেজে।

পড়াশুনো করবে মেয়েরা, চাকরি করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। সর্বস্ব খুইয়ে পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

সাত সাতটা মেয়ে গোপেন মোড়লের, সেও শুনে হেসেছে। বলেছে, তাও কখনো হয় গো। মুখে যাই বলো পড়াতেও হবে, পণ দিয়ে বিয়েও দিতে হবে...

বাধা পেয়ে রেগে গেছেন গিরিজাপ্রসাদ। বলেছেন, তোমার এখন আমের মুকুলের অবস্থা গোপেন, ভাবছো, যত বোল হয়েছে তত আম থাকবে।

—তা কেন ভাববো। না খেয়েদেয়ে টাকা জমাবো, আবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফতুরও হবো। কিন্তু উপায় কি...মেয়েদের তো তা বলে চাকরি করতে পাঠাতে পারবো না।

পরেশ চাটুজ্যে বলেছে, আইন হচ্ছে গো। পণ আর থাকবে না।

একধারে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে হুঁকো টানতে টানতে সশব্দে হেসে উঠেছে বংশী। বলেছে, ভাল কথাই বললি। আইন ক্যানে হচ্ছে জানো গো তোমরা।

—কেন?

বংশী হাসতে হাসতে বলেছে, সারা দুনিয়া বেলাক হয়ে গেল, সব্বও বেলাক হলো আর বিয়ের ব্যাপারে হবে না। তাই কত্তাদের বড় বুকে বাজছে গো গিরিদাদা।

সকলেই হেসে উঠেছে সে-কথা শুনে। সত্যিই তাই। আইন তো পণ বন্ধ করবে না, বিয়ের বাজারকেও কালো-বাজার করে দেবে।

তারপর গোপেন মোড়ল হাসতে হাসতে বলেছে, যাই বলো পণ আছে তাই রক্ষে। মেয়ে আমার কালো, তবু তো টাকাপয়সা দিয়ে বিয়ে দিতে পারছি গো।

গিরিজাপ্রসাদ কোন কথা বলেননি। উঠে চলে এসেছেন ভিতর বাড়িতে। এ লোক-গুলোর সঙ্গে কথা বলতেও যেন সারা শরীর জ্বলে ওঠে।

তবু তো টাকাপয়সা দিয়ে বিয়ে দিতে পারছি! কিন্তু টাকাপয়সা যাদের নেই। আছে ক'জনের?

এইসব বুদ্ধিহীন কথাবার্তার জন্যেই গ্রামের লোকগুলোকে ইদানীং আর সহ্য করতে পারেন না গিরিজাপ্রসাদ। এমন কি বংশীকেও না। কথাবার্তায় সব সময়ে যেন বংশীর বুকের ভেতরকার একটা অদৃশ্য জ্বালা ফুটে বেরিয়ে আসতে চায়। সব-কিছুর অন্ধকার দিকটাই যেন শুধু দেখতে পায় সে। কেন কে জানে!

গিরিজাপ্রসাদের নিজেরই এক একসময় আশ্চর্য লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না ছোট-বেলাকার সেই বংশী আর এই বংশী একই মানুষ।

মুখে মুখে বংশী ছড়া বানাতে পারতো তখন, সুর করে করে গান করতো। তারপর একবার সেই পুজোর সময় যাত্রা এলো অপেরা পার্টির।

অধিকারীর পায়ে পায়ে ঘুরছে তখন বংশী। যাত্রাদলের রাঁধুনী বামনটারও তোষামোদ করছে ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা বলে। যাত্রাদলের ছোট ছোট ছেলেগুলো রান্নার ঠাকুরকে ঠাকুরদাদা বলতো, তাই শুনে প্রথম দিন কি যে হেসেছিলেন গিরিজাপ্রসাদ।

একদিন দুপুরে মনে আছে, গুপ্তদের বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে আছে অপেরা পার্টির সবাই, গিরিজাপ্রসাদ উঁকি মেরে দেখেন, হাতির মত কালোকুলো মোটাসোটা চেহারার অধিকারী শুয়ে আছে মাদুরে, আর বংশী তার পা টিপে দিচ্ছে।

একটা পার্ট পাবার জন্যে কি না করেছে বংশী। তারপর একদিন তিনটে গরুর গাড়িতে মালপত্র তুলে অপেরা পার্টির লোকরা চলে গেল। আর সেই দিন থেকেই বংশীরও খোঁজ মিললো না।

ধূমকেতুর মতই উবে গিয়েছিল, ধূম-কেতুর মতই ফিরে এলো আবার, বছরখানেক পরেই। তখন একেবারে অন্য মানুষ। গলায়

তুলসীর মালা, কপালে গোঁসাইদিদির মত গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, মুখে মৃদু মৃদু গান। মুখে সব সময়েই হাসি লেগে আছে।

সন্ধ্যে হলেই খড়ি নদীর ধারে গোঁসাই-দিদির কুঞ্জে গিয়ে বসতো, কীর্তন গাইতো, আখর বুনতো।

চার পাশের গাঁয়ে নাম ছড়িয়ে পড়লো। বংশী কোটাল নয়, কেত্তনে বংশী দাস। কত লোক ভিড় করে গিয়ে গান শুনতো বংশীর।

সেই মানুষ কি করে যে এমন হয়ে গেল, কেন হলো, বুঝতে পারেন না গিরিজা-প্রসাদ।

জিগ্যেস করলে হেসে হেসে বলে, তুমিও হবে গো গিরিদাদা, তুমিও হবে। আলো না থাকলে কি করি বলো, আঁধারটুকুই দেখি।

না, গিরিজাপ্রসাদ তা হবেন না, হতে পারবেন না। সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে তাঁর সত্যি, কত কি আশা ছিল, সব ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু স্মৃতির স্বর্গ যে এখনো তাঁর মনের গোপনে বেঁচে আছে।

শুধু স্মৃতিই হয়তো।

রান্নাঘরের পাশের আম গাছটার দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয়। আমের মুকুলে ভরে গেছে গাছটা। পাতা দেখা যায় না, এত বোল এসেছে এবার। মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসের দমকে দমকে। মৌমাছির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে ঘন হয়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন একটা জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে গাছটার মাথায়।

শুধু ওই গাছটায় নয়। গাঁয়ের সব গাছই এমনি বউলে ভরে গেছে। কিন্তু...

ছোটবেলায় শোনা সেই ছড়াটা মনে পড়ে যায়।

গেঁয়ো বউয়ের তিনটি গান।

আম, মাছ আর নবান।

নবান হয়ে গেল। কিন্তু পুরোনো দিনের সেই উৎসব নেই আর। পাঁজি দেখে দিন ঠিক করে নবান্ন হয়ে গেল সারা গাঁয়ে, কিন্তু সে যেন শুধুই রীতরক্ষা। এতটুকু আনন্দফূর্তি নেই, হই চই নেই। তেমনি এই আমের বউল দেখেও মন কারো খুশিতে ভরে ওঠে না আর।

টাকা, টাকা, টাকা। টাকা ছাড়া আর যেন কিছু নেই। সব আনন্দ মরে গেছে, আছে শুধু একটাই। শুধু ধানের দর। ধানের দর উঠলে তবেই গাঁয়ের লোকের মুখে হাসি ফোটে!

কিন্তু টাকাটাই কি তুচ্ছ করবার মত?

নলে বাউড়ির বউ প্রমাণ করে দিলে টাকাটা মোটেই তুচ্ছ করবার মত নয়।

রায়বাড়িতে মুনিষের কাজ করতো নলে বাউড়ি। জমিতে লাঙল দিতো চাষের সময়, মই দিতো, ধান রুইতো, আর বছরের বাকি সময়টুকুও ঘর ছাওয়াতো, কাদা দিতো দেয়ালে, ফাই ফরমাশ খাটতো।

শুকনো রোগা চেহারা, চুলগুলো বারো আনা পেকে গেছে, কিন্তু লোকটা মুখ বুজে খাটে। নেহাৎ অসুখবিসুখে না পড়লে ছুটিছাটা নেয় না। তাও এসে দেখা করে বলে যায়, শরীলে বইছে না গো কত্তা, আজকের দিনটা ছুটি দেন!

সেই নলে বাউড়ি হঠাৎ একদিন কাজে এলো না।

অনেকখানি বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে গিরিজাপ্রসাদ যতে কোটালকে জিগ্যেস করলেন।

যতে কোটাল হাসলো, হাসি চাপলো তারপর চুপ করে রইলো।

গিরিজাপ্রসাদ আবার প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে বল না!

লজ্জায় মাথা নীচু করে যতে বললে, সে আজ্ঞে আপনাকে কইতে নজ্জা নাগছে।

তার হাবভাব দেখে গিরিজাপ্রসাদ আর নিভাননী দ্'জনেই হেসে ফেললেন।

নিভাননী রসিকতা করে বললেন, আবার একটা বিয়ে করতে গেছে না কিরে!

যতে মুখ তুলে চাইলে একবার নিভাননীর আর গিরিজাপ্রসাদের মুখের দিকে, তারপর মাথা নীচু করে বললে, আজ্ঞে না, একটা দুর্ঘটন হয়ে যেছে ওর ঘরে।

—কি হয়েছে? আতঙ্কিত স্বরেই প্রশ্ন করেন গিরিজাপ্রসাদ।

আর যতে কোটাল মাথা হে'ট করেই উত্তর দেয়, নলেদাদার বউ মাগী ওকে ছেড়ে পালিয়েছে গো।

—পালিয়েছে? বিস্মিত হলেন গিরিজাপ্রসাদ। নলে বাউড়ির দুঃখে একটু সমবেদনা বোধ করলেন।

আত্মা একদিন বলেছিল, কালোর মত মোষ আর নলের মত মুনিষ হলে তবেই চাষ করে আনন্দ, পেসাদ।

কালো অর্থাৎ মোড়লদের পুরোনো মোষটা। আর নলে বাউড়ির মত বিনয়ী অথচ পরিশ্রমী মুনিষ। তা না হলে সত্যিই বুঝি চাষ করা বিরক্তির কাজ।

কিন্তু নলে বাউড়িকে গাঁ-সুদ্ধ সবাই যখন পছন্দ করে, প্রশংসা করে, ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তখন লোকটার এমন কি দোষ থাকতে পারে, যার জন্যে তার বউ পালিয়ে যাবে অন্যের সঙ্গে।

গিরিজাপ্রসাদ কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। শুধু ভাবলেন, স্ত্রীচরিত্র সত্যিই বোঝা ভার।

একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর যতে কোটালকে বললেন, যাতো গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় নলেকে।

যতে চলে গেল। ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। পিছনে পিছনে নলে বাউড়ি।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, কোথায় গিয়েছে সে, খোঁজ পেয়েছিস?

নলে বাউড়ি মাটিতে চোখ এ'টে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে করে উঠোনের মাটি তুলতে তুলতে ঘাড় কাত করলে।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, যা তাকে একবার নিয়ে আয় আমার কাছে।

ছোটবেলায় এমন অনেক বিচার মীমাংসা দিতে দেখেছেন গিরিজাপ্রসাদ, নিজেও বিচার করেছেন বড় হয়ে। আর মাথা হে'ট করে সে বিচার মেনে নিয়েছে বাউড়িপাড়ার, বাগ্দীপাড়ার সকলেই। তাই ভাবলেন, নলে বাউড়ির বউকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবেন, যান সঙ্গে চলে গেছে সে, তাকেও ধমক-ধামক দেবেন।

কিন্তু নলে বাউড়ি মুখ তুললে না। শুধু বললে, সে আসবে না আজ্ঞে।

—আসবে না!

নলে মাথা নাড়ালো।

রেগে গেলেন গিরিজাপ্রসাদ। রাগের স্বরে যতেকে বললেন, তবে তোরা আছিস কেন, কোটালপাড়া বাউড়ি পাড়ায় এত লোক, ধরে নিয়ে আসতে পারিস না তাকে। ঘরের বউ অন্যের সঙ্গে চলে গেল—

কথাটা হয়তো বুকে গিয়ে বি'ধলো বাউড়িপাড়ার লোকদের।

দিন কয়েক পরে সকাল বেলাতেই গোল-মাল শুনে বেরিয়ে এলেন গিরিজাপ্রসাদ। গোড়ের পার ধরে খানিকটা এগিয়ে এসে দেখলেন চিৎকার করতে করতে একদল লোক আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পে'ছিলো। সকলেই চিৎকার করে উঠলো, ধরে এনেছি কত্তা, বিচার দেন গো আপনি।

পাশের গাঁয়ের পরান বাউড়ি। বুড়ো-সুড়ো মানুষ, চুলগুলো সব পেকে গেছে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে লোকটা। তারই সঙ্গে চলে গিয়েছিল নলে বাউড়ির বউ।

গিরিজাপ্রসাদ বউটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন। রোগা শীর্ণ কুৎসিত চেহারা, বয়স পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বোঝা দায়। সারা শরীরে কোথাও কোন যৌবনের রেখা-মাত্র নেই। না কোন আকর্ষণ।

গিরিজাপ্রসাদ নিজেই কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করলেন। পরান বাউড়ির মধ্যে কি এমন আকর্ষণ বোধ করছে নলের বউটা বুঝতে পারলেন না। একটা জবুথবু বৃদ্ধ। অবশ্যও এমন কিছু ভাল বলে মনে হলো না। আর ওই বুড়োটাই বা এই কুৎসিত রোগজীর্ণ চেহারার মেয়েটার মধ্যে কি পেয়েছে!

ভাবতে ভাবতে বাংলাবাড়ির উ'চু দাওয়াটায় এসে বসলেন গিরিজাপ্রসাদ। লোকগুলো ভিড় করে বসলো নীচে মরাই-তলায়।

অনেকক্ষণ কোন কথা খু'জে পেলেন না গিরিজাপ্রসাদ। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলেন।

ওদিকে ভিতরবাড়িতে যাবার সদর দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে মোহনপুরের বউ, নিভাননী, বিমলা আর কমলা। গিরীন হয়তো বাইরে কোথাও গেছে। ক্যানাল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আর্জি করতে। যে-সব জমি এক ফোঁটা জল পায়নি চাষের সময়, তার ওপরেও ট্যাক্স ধরে দিয়েছে, তাই যেতে হয়েছে তাকে।

গিরিজাপ্রসাদ নলে বাউড়ির বউয়ের দিকে তাকালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে কি রে! ধমক দিলেন তাকে, কি ভেবেছিস কি?

বউটাকে আর বুড়ো পরানকে সামনে বসিয়ে বাউড়িপাড়ার সবাই পিছনে বসেছিল।

গিরিজাপ্রসাদের ধমকের উত্তরে প্রথমটা

কোন কথাই বললে না বউটা। পরাণ বাউড়িও মাথা নীচু করে রইলো।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো নলে বাউড়ির বউ, রুদ্ধ চোখে সে একবার তাকালে নলে বাউড়ির দিকে, তারপর গিরিজাপ্রসাদের উদ্দেশে বললে, ওর ঘরকে যেতে কয়ো না গো আমায়, যেতে কয়ো না। ও মানুষ লয়, পেটে রাক্ষস আছে অর।

গিরিজাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন না কিছু।

বউটা আবার চিৎকার করে উঠলো। আমার উপ আছে না যৈবন আছে গো, কিসরে নেগে বেঁছি ওর ঘরে। পেটের নেগে, পেটের নেগে।

ক্রমশই যেন রাগে ফেটে পড়ছিল বউটা। আবার বললে, ঘর নিকোবো, গরুকে ছানি দোব গো, ধান শিজোবো, ভাত রাঁধবো—ওর ঘরেও কাজ করছি, এর ঘরেও কাজ করতে হবে গো, বুঝলেন। কিন্তুক, ওই রাক্ষস খেতে দেয় না গো, খেতে দেয় না। মাঠ থিকে ফিরে এসে সব হাম হাম করে খেয়ে লিবে নিজে। সকাল সনজে কাজ করি তবু ভাত দেয় না তোমার মুনিষ! সব নিজে খেয়ে লিবে।

ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলে যায়। আর গিরিজাপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকেন তার দিকে, দেখেন, রাগে ফুলে ফুলে উঠছে বউটা। যেন বহুদিনের সঞ্চিত রাগটা এতদিনে প্রকাশ করতে পেরে মন হাল্কা করছে।

ভাত। শুধু ভাতের জন্যে ঘর ছেড়েছে বউটা! এখানেও কাজ করে জীবন কাটে, ওখানেও কাজ করে জীবন কাটবে। কিন্তু নলে বাউড়ি যে ওকে খেতে দেয় না, সব ভাত ক'টা নিজেই খেয়ে নেয়।

অনেকগুলো কথা অনর্গল বলে গিয়ে বউটা হাঁপাতে লাগলো। ধীরে ধীরে বললে, মাঠ থেকে যখন ফিরে আসে মানুষটা, দেখেন নাই আপনারা। সব ভাত ক'টা না দিলে রাঙা পানা চোখ করে, মনে হয় লাঙলের ফালাটা দিয়ে মানুষকে মেরে দিবে।

শুনলেন গিরিজাপ্রসাদ, কিন্তু কোন বিচারই দিতে পারলেন না। বললেন, যা হোক একটা মীমাংসা করে নে বাপু তোরা। বলে উঠে চলে এলেন।

সদর দরজার আড়াল থেকে নিভাননী শুনলেন, মোহনপুরের বউও শুনলো, নিভাননীর কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

দুটো পরিবার পৃথক হয়ে গেছে, ঘরবাড়ি উঠোন, খামারবাড়ি ভাগাভাগি হয়েছে, মাঝখানে একটা পাঁচিল উঠেছে। কিন্তু তা বলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও কেন বন্ধ করতে হবে মোহনপুরের বউ বুঝতে পারে না। তবু কেমন একটা অস্বস্তি থেকেই, কিংবা হয়তো স্বামীর ভয়েই একটু দূরে রেখে চলে মোহনপুরের বউ। টিয়াকেও কাছে যেতে দেয় না। কথা বলতে দেখলে ধমক দেয়।

মোহনপুরের বউ সেজন্যেই বাইরে হই চই শুনে যদিও নিভাননীকে দেখে সদর দরজার আড়ালে দাঁড়ালো, তবু আগের মত কাছ ঘেঁষে আসতে পারলো না। ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়ালো এমনভাবে, যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ।

আড়চোখে পরস্পর পরস্পরকে দেখলো, কিন্তু কথা বললে না। এটাই সবচেয়ে কষ্টকর মোহনপুরের বউয়ের কাছে।

বাউড়ি বউয়ের কথা শুনতে শুনতে সবাই হেসে উঠলো। বিমলা, কমলা, টিয়া, নিভাননী আর মোহনপুরের বউও। কিন্তু মোহনপুরের বউ হাসতে হাসতে তাকালে টিয়ার দিকে, দু' একটা কথাও বললে টিয়াকে লক্ষ্য করে। আর নিভাননী হেসে [illegible] তাকালেন বিমলার দিকে, দু' একটা কথাও বললেন বিমলাকে। অথচ দু' জনেই কথা শোনাতে চাইলো পরস্পরকে।

সেই প্রথম প্রথম গিরিজাপ্রসাদ খেতে বসলে মোহনপুরে বউ যেমন ঘোমটা টেনে আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাসুরকে শুনিয়ে শুনিয়েই চাপা গলায় বিমলাকে জিজ্ঞেস করতো, আর কিছু লাগবে কিনা,—এ যেন তেমনি ভাসুর ভাদ্রবউয়ের সম্পর্ক বড়-জায়ের সঙ্গে।

তারপর এক সময় দু' পক্ষই নিজের নিজের কাজে চলে গেল। ছোট লাইনের ছোট্ট স্টেশনে জমা হওয়া ক'টা মানুষ যেমন কয়েক মিনিট পাশে পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে ট্রেনের জন্যে তারপর নিজের নিজের কামরায় উঠে পড়ে, ঠিক তেমনি।

বিমলাও হাসতে হাসতে পালিয়ে এলো নিজের ঘরটিতে। নলে বাউড়ির বউয়ের কথাগুলো তার কাছে হাসির কথা বলেই মনে হলো। ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্যও মনে হলো না। রাঁধা ভাতগুলো খেয়ে নেয় স্বামী, শুধু এই কারণে নাকি বউ স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য লোকের ঘরে পালিয়ে যায়!

বিমলার মনে হলো, সব মিথ্যে, সব মিছে কথা। প্রেম ভালবাসা, রূপ যৌবন এ-সবের চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি? থাকতে পারে না।

ওর মনেও তখন একটাই স্বপ্ন। প্রভাকর।

সেই নির্জন নিঃশব্দ যাত্রার রাতটার কথা মনে পড়লেই সারা শরীরে একটা তীব্র পুলকের শিহরণ খেলে যায়। গিরিজাপ্রসাদ যেদিন মরাইগুলো দেখবার জন্যে কয়েক মিনিটের জন্যে উঠে গিয়েছিলেন, আর ক্ষণিকের জন্যে আবছা আলোয় বিমলা আর

প্রভাকর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল।

মুহূর্তের লুব্ধতায় বিমলার পিঠের ওপর একখানা হাত রেখেছিল প্রভাকর, আর সেই ক্ষণেক স্পর্শের মোহ একটা চিরন্তন স্বাদ হয়ে বেঁচে আছে। মনে মনে হাজারবার সেই দিনটির কথা রোমন্থন করেছে বিমলা।

তারপরও কয়েকবার এসেছে প্রভাকর। নতুন ইস্কুলের জন্যে আপীল দরখাস্ত সই করাতে, খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করতে। আর বিমলা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে প্রভাকরের উৎসাহের মূলে আছে এমনি এক রোমাঞ্চের হাতছানি।

দু' একটা অতি সাধারণ কথাবার্তা, দুটি আনন্দ, ঈষৎ স্পর্শ, চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। এরই ফাঁকে কি করে যে দুজন দুজনের এত কাছে এসে গেছে। পরস্পরের প্রতি একটা অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞার মত।

তারপর সেই একটি দিন।

স্টেশনে যাবার কাঁচা রাস্তার ধারে নতুন পুকুরের পুব পাড়ে ইস্কুলবাড়ির জন্যে জমি দেখতে এলো প্রভাকর আর ব্লক আপিসের আরেকজন ভদ্রলোক।

প্রথম প্রথম গ্রামের কারো বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু অবনীমোহন টাকা দিতে চাইলেন দেখে এবং ইস্কুলটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত হবে এই ভরসা পেয়ে গাঁয়ের সকলেই এগিয়ে এলো।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য গোপেন মোড়ল, যে কিনা প্রথম থেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটাকে, সেই বরং বললো, ইস্কুলবাড়ির জন্যে জমি যা লাগবে আমি দোব।

নতুন পুকুরের পুব পাড়ে খানিকটা ডাঙা জমি, তারও পরে মোড়লদের আমবাগান। সেখানেই বিঘেখানেক ডাঙা জমি ছেড়ে দিতে চাইলে গোপেন। বললে, জমিজমা সেই তো গরমেণ্টই নেবে গো লুটেপুটে, তার চেয়ে নয় গাঁয়ে একটা ইস্কুলই হোক।

গাঁয়ে ইস্কুল হবে, ইস্কুলের জন্যে পাকা বাড়ি হবে, মাস্টার আসবে, গাঁয়ের ছেলেরা পাশ করে বেরোবে.....এর চেয়ে আর আনন্দের কি থাকতে পারে।

শুধু বংশী বললে, পাশ করে লাভ কিছু হবে না গো, লাভ হবে না। ওই উদোদের মত শহুরে হতে চাইবে সব, বাবু হতে চাইবে। চাকরি খুঁজবে শুধু।

গুপ্তদের মেজো ভাই বাধা দিয়ে বললে, তবু তো চাকরি পাবার যোগ্যতা হবে পড়াশুনো করলে। তা নইলে......

কথা শেষ করতে দিলে না বংশী। বললে, লাভ তোমার হবে বৈকি। তিন তিনটে ছেলে তোমার, পাশ করে বেরুলে পণের দর উঠবে হৈ হৈ করে, কি বলো!

সকলে হেসে উঠলো তার কথা শুনে। কিন্তু বংশীর কথায় কেউ কান দিলে না। সকলের মনেই তখন একটা নতুন নেশা ঢুকেছে। যে গ্রামটাকে কেউই মনে মনে পছন্দ করতো না, এমন গাঁয়ে ভিটেবাড়ি, জমিজমা বলে একটা আত্মধিক্কারে জ্বলতো, সেই গ্রামটার গর্বেই যেন রাতারাতি উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

তাই যেদিন প্রভাকর এলো জমি দেখতে সেদিন গাঁয়ের সকলেই ভিড় করে এলো। বিশেষ করে বাউড়ি, বাগদীদের ছেলেরা। ইস্কুলে পড়তে পাবে, শিক্ষিত হতে পাবে এই আশায় ছোট ছোট ছেলেগুলোর চোখ মুখ উৎফুল্ল।

প্রভাকর, গিরিজাপ্রসাদ, গোপেন মোড়লের পিছনে পিছনে সকলেই দল বেঁধে চললো। বাপের সঙ্গে সঙ্গে বিমলা গেল ও।

টিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে কপাটের আড়াল থেকে। তারও যাবার ইচ্ছে ওদের সঙ্গে, কিন্তু সাহসে কুলোলো না।

গিরীনও গায়ে জামাটা চড়িয়ে নিয়ে ওদের পিছনে পিছনে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে টিয়াকে বললে, মাকে বল, ওদের দুজনের জন্যে একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। ফেরার পথে নিয়ে আসবো ওদের।

বলেই গিরীন চলে গেল, আর ফুর্তিতে আনন্দে মা'র কাছে ছুটে এলো টিয়া। নিজেই ময়দার টিনটা এনে থালার ওপর ঢালতে শুরু করলে।

প্রভাকরের জন্যে এটুকু ব্যবস্থা করতে পেলে, দুটো লুচি নিজের হাতে ভেজে দিতে পারলে যেন জীবন সার্থক হয়ে যাবে তার!

ময়দা মাখতে মাখতে কখন যে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে, টেরই পায়নি। হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙতেই দেখলে মা মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

তা দেখে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল টিয়া। মুখ লুকোবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে গেল গ্লাস বাটি থালা ধুতে। তারপর পুকুরের পাড় থেকে ওপাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

এত লোকের সামনেই প্রভাকরের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে বিমলা।

সেদিকে তাকিয়ে টিয়ার মুখ থেকে হাসিটুকু আপনা থেকেই কখন উবে গেল।

(ক্রমশ)

তৃতীয় অর্থ কমিশনে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কর বণ্টনের অসাম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্রীহেমন্তকুমার বসু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশ্ন করেন—মন্ত্রীরা কী করেন, রাজ্যের ন্যায্য পাওনা আদায় করিয়া আনিতে পারেন না?—"অতঃপর 'আফগান ব্যাংক' উপদেষ্টাদের নিকট টাকা আদায়ের পন্থা শেখার জন্য মন্ত্রীদের ট্রেনিং নিতে তিনি বলেছেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানা যায় নি।"—বলেন খুড়ো।

বণিক ও শিল্প সমিতি সংঘের অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর ভাষণে শ্রীনেহরু ঘোষণা করিয়াছেন—ভারতের অর্থনীতির লক্ষ্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। শ্যামলাল বলিল—"আমরা ভেবেছিলাম গুড্ ব্যাড খাওয়া-দাওয়াই বুঝি অর্থনীতির লক্ষ্য!"

কোন এক বিধানসভার সদস্য মন্ত্রী হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁর সমর্থক জনৈক বন্ধু নাকি আমরণ অনশন-এর সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই সংবাদ পড়িয়া অনেকেই হতবাক্ হইয়াছেন।—"কিন্তু হতবাক্ করে দেওয়ার মতো আরো সংবাদ হয়ত আছে, আমরণ অনশনের চেয়ে কঠিন পণ—রাঁধব না বাঁধব না চুল—কিন্তু এ খবর আমরা কে-ই বা শুনেছি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

সংসদের সদস্যদের মধ্যে বিগত পাঁচ বৎসরে তিনজন ২ হইতে ৪ মিনিট কথা বলিয়াছেন, তিনজন বলিয়াছেন ৫

মিনিট, চারজন বলিয়াছেন ৬ মিনিট। আর ১০৪ জন ৫ বৎসরের মধ্যে একবারও একটি কথা বলেন নাই।—"তাঁরা বুদ্ধিমান; তাঁরা জানেন বোবার শত্রু নেই"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শ্যামলাল বলিল—"আ ন ন্দ বা জা র পত্রিকায় বিধানসভার মহিলা মহলের কথা শুনলাম, মহিলাদের ছবি দেখলাম, কিন্তু মহিলা মহলে 'নূতন রান্না'র কোন খবর দেখতে পেলাম না!!"

সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলিয়াছেন — পরমাণু বিস্ফোরণে মানব সভ্যতার সমূহ বিপদ হইবে। এই

'সভ্যতা' প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো বলিলেন—"বহুদিন আগে স্বর্গত বিপিন পাল মশাই তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—'সভ্যতা নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একবার বড়ই সমস্যায় পড়েছিলাম। সভ্যতা সত্যি সত্যি কী। অভিধানে দেখলাম—সিভিলাইজেশন হল ওপোজড টু বারবারিজম; আর বারবারিজম হল ওপোজড টু সিভিলাইজেশন'— শ্রীজয়প্রকাশ বর্ণিত এই মানব সভ্যতা যে কোথায় তা-ও আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে"—বলিয়া খুড়ো তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন।

দিল্লিতে কনফেকশনারদের এক সভায় বলা হইয়াছে, উন্নত ধরনের কনফেকশনারি দিয়া বেশ ভাল বৈদেশিক

মুদ্রা অর্জন করা যায়।—"তা যায়; কিন্তু আস্কে বা সরু চাকলি চালু না করলে এটা হবে নিউকাসেলে কয়লা চালানের মতো"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

খৃস্টান মিশনারিদের ব্যাপক প্রচার হইতে পাকিস্তানকে 'বিশুদ্ধ' রাখিবার জন্য করাচীর 'ডন' কাগজ হুশিয়ারী প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই, গোবর ভক্ষণে সব পরিশুদ্ধ হয়ে যায়!!"

সম্প্রতি একটি চাল বোঝাই লরি রাজ্য বিধানসভার একটি গেটের রেলিং-এ আসিয়া ধাক্কা দেওয়ার ফলে রেলিং ভাঙিয়া যায়।—"পানের দোকান, চায়ের দোকান, ফুটপাথ, গাছ পালায় তো অনেক ধাক্কাই মারা গেল, এবার বিধানসভা, মারি তো হাতী"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হইবে কি না এই লইয়া শিক্ষাব্রতীরা আবার নূতন করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন—এক পক্ষ বলিতেছেন, ইংরেজী বর্জন করা আত্মঘাতক ভুল হইবে, অন্যপক্ষ বলিতেছেন—আংরেজী হটাও। আমাদের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা কেরানী বা বিবাহের কারণং। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের কী-ই বা বলিবার আছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা না বলিয়া পারিলাম না। কোন অফিসের বাবুরা পিয়নকে পাঠাইয়াছিলেন বাজার হইতে কাটলেট কিনিয়া আনিতে। ঘণ্টাখানেক পরে পিয়ন (হিন্দুস্থানী তো বটেই) একটি ক্যাটেলগ আনিয়া হাজির করে। আংরেজী হটাওর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!!

ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর হাসপাতালে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ডলি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যান। সংবাদে বলা হইয়াছে শ্রীমতী ডলিকে দেখিয়া কন্ট্রাক্টর প্রথমে হাসিলেন এবং পরে সানন্দে তাঁর হাত চাপিয়া ধরিলেন।—"এ ডলি ক্যাচ!"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক।

অভিযোগে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক অপচয় সংক্রান্ত ব্যাপারে অডিট-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া হয় নাই। শ্যামলাল বলিল—"সরকারী নীতি সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল নই। তবে সাধারণের সোজা নীতি হল—সরকারী কা মাল, দরিয়া মে ডাল!!"

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কৃষি পরিকল্পনায় আবহতত্ত্বের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।—"কিন্তু আমরা দেখছি বৃষ্টি হবে না ঘোষিত হলে ছাতা নিয়ে বেরুতে কেউ ভুল করেন না। সুতরাং এই তত্ত্বের চেয়ে 'কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মন্দ মন্দ দিতেছে বা'-ই ভালো—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শুনিলাম অদূর ভবিষ্যতে নাকি বিনা বর্ষণেই কলিকাতা প্লাবিত হইতে পারে।—"মন্দ কী, ছেলেমেয়েদের এবং

কলকাতা কর্পোরেশনের বালখিল্যদের (যঃ পিতা স পুনঃ পুত্রঃ ইত্যর্থ) রেইনি-ডে আর কে মারছে। আর সাধারণ নাগরিকরা চিৎ সাঁতারে চিদানন্দ উপভোগ করবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বাড়ির মতো স্কুল

শিশু যখন স্কুলে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করে তখন অনেকের কাছে স্কুল আর বাড়ি দুটো আলাদা জিনিস। বাড়ি তাদের কাছে পরম আনন্দের স্থান আর স্কুল হ'ল নিরানন্দ ও ভয়ের জায়গা। কিন্তু এমন স্কুল কি হতে পারে না যা হবে বাড়ির মতোই আনন্দময় আর মাস্টারমশাইরা শুধু বয়স্ক বন্ধু? সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর একমাত্র সরকার পরিচালিত স্কুল-তথা-বাড়ি প্রতিষ্ঠানটি এইদিক দিয়ে একটা আদর্শ স্থাপন করেছে।

পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশে এইরকম একটি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এটিকে স্কুল ও বাড়ির সুন্দর সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। স্কুলটি পরিচালনা করেন রাজ্য সরকার। একটি পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে স্কুলটি অবস্থিত।

স্কুলটি এতো সুনাম অর্জন করেছে যে একমাত্র ১৯৬০ সালেই এইখানে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করানোর জন্য পিতামাতা-দের ৩০০০ আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখানে একটি হাইস্কুল ও একটি স্কুল আছে এবং ২০০-র কিছু বেশী ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের আরও দুটি উচ্চতর স্কুল আছে এবং তাতে আশেপাশের গ্রাম-গুলির আরও দুশো ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতে পারে, কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠানের বাড়িতে থাকতে পায় না।

সম্প্রতি কয়েকজন সাংবাদিক এই স্কুল-তথা-বাড়িতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংগে পুরো একদিন কাটিয়ে আসেন। তাঁরা এদের সংগে ক্লাশে বসে পড়াশুনার পদ্ধতি দেখেছেন, তারপর পাঠকক্ষে গিয়ে এদের সংগে বসেছেন, এদের সংগে আহার করেছেন, বিকেলবেলা খেলাধুলো করেছেন, এদের আঁকা ছবি ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী দেখেছেন। তাছাড়া সাংবাদিকগণের সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি বুঝতে চেষ্টা করেছে।

নিজের পেশা ও বৃত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ডাঃ মোরা-ওয়েটস্ তাঁর অতিথিবর্গের কাছে এই স্কুল-তথা-বাড়ির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এটি প্রচলিত অর্থে বোর্ডিং স্কুল নয়, হস্টেলও নয়, এটা হ'ল এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে জীবন ও শিক্ষাকে একটা বিশেষ উপায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের মতে বাড়ি শুধু ঘুমোবার জায়গা নয় আর স্কুলও শুধু প্রতি ঘণ্টায় পরিবর্তনশীল লেখাপড়া শেখার ড্রিল গ্রাউন্ড নয়। অল্প কথায় বলতে গেলে, আমরা চাই এমন একটা স্কুল, যেখানে শিশুদের স্বভাবিক গুণগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকবে, তারা যুক্তিসংগত পরিশ্রম করবে, প্রাণ খুলে আনন্দ করবে, ভালো ক্ষিধে থাকবে এবং পড়াশুনা ও খেলাধুলোয় শৃংখলা থাকবে।"

সর্বোপরি এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হ'ল, দেশপ্রেমের সংগে সংগে ছাত্রছাত্রীদের মনে একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, ওরা হবে মনে ও চিন্তায় স্বাধীন কিন্তু নৈতিক গুণগুলি সম্পর্কে সচেতন। শিক্ষকগণ হবেন কাজে উৎসাহী এবং তাঁদের নির্বাচিত বৃত্তিকে সফল করে তুলতে সচেষ্ট।

অধ্যক্ষ ডাঃ মোরাওয়েটসের মতে, এই লক্ষ্য পূরণ করার পথে একটি প্রধান ব্যবস্থা হ'ল, শিশুদের সর্বমুখীন শিক্ষা। শিক্ষক, ক্লাশেই শুধু শিক্ষক থাকবেন, ক্লাশের বাইরে তিনি হবেন ছাত্রছাত্রীদের বয়স্ক বন্ধু। সৌহার্দ্যের মূল ভিত্তি হ'ল দৈনন্দিন মেলামেশা ও অকুণ্ঠ আলোচনা।

স্কুলের পরিচালকগণের এইটেই হলো প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই। সাধারণত স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যে ভর্ৎসনা করা হয় এবং ছুটির পর আটকে রেখে তাদের যে শাস্তি দেওয়া হয় তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরায়। সেইজন্য এই প্রতিষ্ঠানে ওগুলি রহিত করা হয়েছে। খোলাখুলি আলোচনা অথবা শিক্ষকের কাছে বা অধ্যক্ষের কাছে ব্যক্তিগত-ভাবে নির্ভয়ে নিজের সুবিধে অসুবিধে ব্যক্ত

করা, রিপোর্ট বুকে খারাপ মন্তব্যের চাইতে বেশী ফলপ্রদ হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের বাড়িতে যেসব ছাত্র থাকে তাদের প্রত্যেকদিন স্কুলের ওয়ার্কশপে গিয়ে খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় অথবা নিজেদের থাকার জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনার স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সময়ানুবর্তিতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

এখানকার ৪৫ জন শিক্ষক, তাঁদের পেশা সম্পর্কে সচেতন এবং কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান। এঁদের মধ্যে কেউ অন্য পেশা গ্রহণ করতে স্বীকৃত নন। এই বাড়িস্কুলের শিক্ষকগণের কাছে ছাত্রছাত্রীরা, সাধারণ স্কুলের শিক্ষকগণের তুলনায় অনেক বেশী অসঙ্কোচে নানারকম প্রশ্ন করতে পারে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণের কেউবা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, কেউবা পাইকারী ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, ইঞ্জিনীয়ার, আইন-ব্যবসায়ী, আবগারি কর্মচারী, কেউবা বেতার মেকানিক, পোস্ট অফিস ড্রাইভার, রুটি প্রস্তুতকারী। এখানে মাসিক ফী হল প্রায় ১০০ ডি এম, এর সঙ্গে ৫০ থেকে ৭০ ডি এম অতিরিক্ত ব্যয়। যুক্তিসংগত মনে হলে ব্যয় অনেক সময় যথেষ্ট হ্রাস করা হয়। আগামী বছর থেকে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। সবচাইতে বড় কথা হ'ল সমাজের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েরা একই সংগে মেলামেশা ক'রে শিক্ষা গ্রহণ করে।

বুখারেস্টে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন
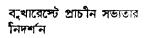
গত বৎসর রুমানিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদির সন্ধান পেয়েছেন।

আর, আর, পি একাডেমীর আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং বুখারেস্ট নগর ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় কৃত ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে রুমানিয়ার রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানব জীবন সম্পর্কিত বহু সামগ্রী পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একশো লক্ষ বৎসর পূর্বেকার বস্তুরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

এই নিদর্শনগুলি থেকে এরূপ কয়েকটি জাতির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যারা রোমান-বাইজেন্টাইন কেন্দ্রগুলির সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং পরে স্লাভ জাতির সংস্পর্শে আসে। এই স্লাভ জাতি পরে রুমানিয়াতেও এসেছিল। ফন্ডেনী জলাশয়ের তীরে আবিষ্কৃত অর্ধকুটিরগুলি থেকে ছয় শতাব্দী পূর্বের মৃৎপাত্র, লৌহ-ছুরিকা, ধনুকের ছিলা ইত্যাদি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়।

বুখারেস্টের নিকট কর্নিকায় একটি মঠ অনুসন্ধানকল্পে খননকার্য চলার সময় অনেক সমাধি আবিষ্কৃত হয়। এই সমাধি-স্থান থেকে প্রাচীন লৌহযুগের কঙ্কাল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত রুমানিয়ার যে সকল সমাধিস্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, এই সমাধিস্থানটি তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই নতুন আবিষ্কারগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদদের পরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠবে এবং এই থেকেই রুমানিয়ার মানব অস্তিত্বের প্রাথমিক যুগের হদিশ পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

রবীন্দ্রশতবার্ষিক স্মরণ-গ্রন্থ

রবীন্দ্রশতবার্ষিক উপলক্ষে সাহিত্য আকাদামি একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি (Tagore : A Centenary Volume)। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর মতন শ্রদ্ধেয় ও গুণী ব্যক্তির উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে যাঁরা এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন, আশা করি তাঁরা দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি রাখবেন না। সাহিত্য আকাদামির পক্ষ থেকে মুখবন্ধ পরিচয়ে বলা হয়েছে :

"If the best homage to a great man is to understand the significance of his life and work this publication should serve its purpose amply. It
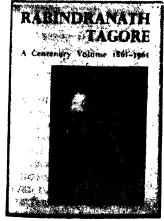
contains serious studies on the many aspects of Tagore's personality and genius contributed by eminent writers and savants from many parts of the world."

গ্রন্থটি মোটামুটি চারটি অংশে ভাগ করা : রবীন্দ্রস্মৃতি, রবীন্দ্রচর্চা, বিদেশে রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য। বলা বাহুল্য, প্রতিটি বিভাগেই যোগ্য ব্যক্তি এবং খ্যাতনামারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখে এই গ্রন্থের তাৎপর্য ও মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। বিশেষত এলমহার্স্ট, আর্নল্ড আদ্রিয়ান বাকে, পার্ল বাক, তোশিহিকো কাত্তায়ামা, আলবার্ট স্যুইৎসার, রবার্ট ফ্রস্ট, থিয়েডোর হেস প্রভৃতি বিদেশী গুণিজনের রচনা সংগ্রহ হওয়ায় গ্রন্থটির যে আন্তর্জাতিক চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে, তার জন্যে সম্পাদকবৃন্দ ধন্যবাদার্হ। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্মৃতিকথা এই সংকলনে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ভারতীয় লেখকদের মধ্যে শ্রীনেহরুর ভূমিকা ছাড়া, রাধাকৃষ্ণনের ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, মুলকরাজ আনন্দ,

বিদুর

আবু সয়ীদ আয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, পৃথ্বীশ নিয়োগী, অন্নদাশংকর রায় প্রভৃতির রচনাও নিশ্চয় উল্লেখ করার মতন। অবনীন্দ্রনাথ, রথেনস্টাইন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মুইরহেড বোন, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ছবিও এই গ্রন্থের সম্পদ।

বইটির মূল্য তিরিশ টাকা। হয়ত বেশী। কিন্তু আয়তন ও প্রকাশ-ব্যয় বিবেচনায় এই মূল্যকে স্বীকার করে নিতে হয়।

সাহিত্যে প্রগতি

সচরাচর আমরা যে-কথা শুনি না তেমন কোনো কথা শুনলে কান ফেরাতে পারি না। কৌতূহল বোধ করি। সেদিন এক ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজে এক প্রবীণ ইংরেজ ভদ্রলোকের একটা মজার লেখায় চোখ বুলিয়ে মনে হল, এ-প্রশ্ন ও আমাদের কোনো বাঙালী পাঠকও করতে পারেন, করলে কি জবাব দেবেন লেখকরা, কিংবা আধুনিক সাহিত্যের ভক্তরা।

প্রশ্নটা সাহিত্যের প্রগতি বিষয়ে। ভদ্রলোক খুব বিনীতভাবে শিক্ষার্থীর মতন প্রশ্নটি তুলেছেন। তিনি বলেছেন : যাঁরা আধুনিক সাহিত্যের লেখক এবং সমঝদার তাঁরা বলেন—দেখুন মশাই, আমাদের বিশ্বাস করুন আমরা সাহিত্যশিল্পকে ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছি, আগে যা করা হয়নি, আমরা সেই অসাধ্য কাজ করছি।

যখন মানুষ নতুন কিছু করে, করতে যায়, তখন সব সময় তারা আমাদের এই বলে আশ্বাস দেয় যে, আমরা যা করছি সেটা ভাল, তোমরা আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখ। ভদ্রলোক বলছেন, বেশ ত, বিশ্বাস রাখছি; কিন্তু এই বিশ্বাস কি আমরা আগে সভ্যতার অন্যান্য প্রগতির ওপর রাখিনি। রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, যন্ত্রসভ্যতা, এমন কি অ্যাটমের মহাশক্তি আবিষ্কারের সময়ও আমরা বিশ্বাস রেখে এসেছি। কিন্তু, তোমরা আমাদের কোথায় এনেছ? সুখ শান্তি তৃপ্তি অথবা আনন্দের জগতে নয়। বরং এমন এক সঙ্কটের মুখে যখন মনে হয়, তোমাদের বিশ্বাস করে এখানে এসে আমরা সর্বস্ব হারিয়েছি।

মানুষের প্রতিটি নতুন চিন্তা অপর চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সভ্যতার অন্য অন্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্যের নতুন চিন্তা আসে না। এমন কথা মনে করা অন্যায় — জগতের আর পাঁচটা আধুনিক চিন্তা থেকে গা সরিয়ে সাহিত্য স্বতন্ত্র কোনো চিন্তা করতে সক্ষম। যদি তাই হত, তবে নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত, সক্রেটিস থেকে কিয়েরের্কগার্ড পর্যন্ত, এবং আরও অনেক চিন্তাধারা থেকে সাহিত্য মুক্ত থাকতে পারত। তাই কি আছে? হলফ করে এমন কথা কোনো আধুনিক সাহিত্যিক কি বলতে পারে, অন্য শাস্ত্রের প্রভাব তার মনোজগতে ছায়া ফেলেনি? মার্কসিস্ট সাহিত্য কি তাহলে? ফ্রয়েডের গলাধঃকরণ কেন তবে? ডারউইনের পর ঈশ্বর-বিমুখ সাহিত্যের পাল্লা অত ভারি হল কেমন করে?

ফুৎকারে এ-সমস্যার জবাব দিয়ে লাভ নেই। যাঁরা, যে-সব আধুনিক সাহিত্যিক ভাবছেন, সাহিত্যের মহাদিগন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার উত্তেজনায় কাজ করে যাচ্ছেন, শেষাবধি তাঁরা পাঠককে কোথায় নিয়ে যাবেন? আধুনিক বিশ্ববাসীর কাছে আবিষ্কৃত অ্যাটমের সাম্প্রতিক রূপ যেমন সঙ্কট আর সমস্যার বস্তু, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ রূপও যদি সেই রকম ভয়াবহ হয়ে ওঠে, তবে বুঝতে হবে সেই কবর আমরা নিজেরা খুঁড়েছি।

লেখাটায় ভদ্রলোক কোথাও বিদ্রূপ মনে কিছু বলেননি, এমন কি কর-কোষ্ঠী বিচারকের মতন কোনো ভবিষ্যৎবাণীও করেননি। তিনি শুধু লেখক এবং পাঠকদের সং হয়ে ভাবতে বলেছেন।

আমি, ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী, কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত হামেশা চোখে পড়ে যখন মনে হয়, শতকরা সত্তরটি অতি আধুনিক সাহিত্য হয় ভেক ধরেছে, না হয় বাজারের মাছঅলার মতন মাল বেচার চেষ্টায় ঠিক ওই কথাটা বলছে : বিশ্বাস করে নিয়ে যান, ঠকবেন না।

আমি বলি না, বিশ্বাস অনুচিত। আমার ধারণা, যে-দর্জি ছাঁটে বার বার তিনবার ভুল করেছে—তাকেও ধুরন্ধর ভাবা আমার মতন

দীনের পক্ষে মুশকিল, নতুন করে কাপড় খরচার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে চতুর্থবার আর তার কাছে যাব না।

পাকিস্তানে বইয়ের জালিয়াতি

কোনো লেখকের লেখা বই, কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি, কোনো গায়কের গাওয়া রেকর্ড করা গান যে বেওয়ারিশ সম্পত্তি নয়, এই নীতিকথাটা নিতান্ত অজ্ঞেও জানে। জানে না কেবল পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু প্রকাশক। কিংবা জেনেও জানতে চায় না, না-ঘুমিয়েও ঘুমের ভাণ। আর এই অজ্ঞতার, না অজ্ঞতা বলা ভুল, অগ্রাহ্য করার আশ্চর্য মনোবৃত্তি নিয়ে ভারতীয় বাঙালী সাহিত্যিকদের বই বিনা অনুমতিতে ছেপে বেঁধে বাজারে কেনাবেচা করছেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রকাশকরা। এ যে কেমন ক... হয় আমরা বুঝতে পারি না, বুঝতে পারি না—কপিরাইট অ্যাক্টের আওতায় কেন এ দুষ্কর্ম পড়ে না।

খুব সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এ-সম্পর্কে যে সংবাদটি বেরিয়েছে, তার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি: "বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের বইয়ের বাজার কলিকাতার আধুনিক জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ে ছাইয়া গিয়াছে। এই বইগুলি সবই পাকিস্তানে ছাপা। এবং এ-জন্য পাকিস্তানী প্রকাশকবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের নিকট কোনোরূপ অনুমতি লন নাই। গত দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ কলিকাতার বিভিন্ন লেখকের তিনশত উপন্যাস ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ......এই সমস্ত বই প্রকাশের ব্যাপারে পাক প্রকাশকরা যে আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন মানিয়া চলেন না, বা কোনোরূপ অনুমতি লন না, তাহা খোদ ঢাকার এক সংবাদপত্র স্বীকার করিয়াছেন।"

পূর্ব পাকিস্তানের প্রকাশকরা কেমন করে এ-কথা বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক কপিরাইট অ্যাক্ট তাঁরা স্বীকার করেন না? পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের বই যে মনোবৃত্তি এবং বেপরোয়া-ভাব নিয়ে তাঁরা ছাপছেন, কোনো বৃটিশ বা আমেরিকান লেখকের বই একবার তাঁরা ঢাকার ছাপাখানায় ছেপে সেই সংবাদটি উক্ত গ্রন্থের মূল প্রকাশককে একবার জ্ঞাত করতে পারেন কি? ইংরেজী ভাষা ... ছাপার গরজ নেই, এ যদি তাঁদের জবাব হয়, তবে বলব পরীক্ষামূলকভাবেও একবার কার্যটি করে দেখান যে, কপিরাইট অ্যাক্ট বলে পাকিস্তানে কিছু নেই, কেউ তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তার চেয়ে সোজা প্রস্তাব, পাক্ প্রকাশকরা যেভাবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি অভিধান গ্রন্থ ব্লক করে ছেপে নিয়েছেন—ঠিক সেই ভাবে অক্সফোর্ড বা চেম্বার্স অভিধান একবার ছেপে দেখুন না জল কোন দিকে গিয়ে দাঁড়ায়! আমি নিশ্চিতভাবে জানি এ-সাহস তাঁদের হবে না।

তা ছাড়া কপিরাইট অ্যাক্ট কাদের জন্য কি করে? আমার যতদূর জানা আছে, কপিরাইটের বহু ত্রুটি বর্তমানে সংশোধিত:

"The Copyright Union has remedied this in Europe and the Commonwealth and the Unesco Conference gives ground for real hope...."

পাকিস্তান কি কমনওয়েলথ নয়? পাকিস্তান কি ইউনেস্কো কনফারেন্সের কপিরাইট নীতি স্বীকার করে না? হয়ত এ-সব কথা অবান্তর, কেন না, আইন মানা করের মধ্যে যে নীতির প্রশ্ন আছে, যারা দুর্নীতির পোষক তারা তাতে কান দেয় না।

বিদেশ ভ্রমণ

মানবতার সাগর সঙ্গমে—শচীন সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ছ টাকা।

১৯৫৮-র জুলাই মাসে দিল্লি থেকে রুমেনিয়া শান্তি কমিটির ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনে আমন্ত্রিত ভারতীয় ডেলিগেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গত শচীন সেনগুপ্ত যে দূর যাত্রার সুযোগ পেয়েছিলেন সেই কাহিনীই তাঁর এই বইখানিতে চিত্তাকর্ষকভাবে বলা হয়েছে। দিল্লি থেকে অমৃতসর—সেখান থেকে লাহোরের আকাশ দিয়ে, সিন্দুপ্রদেশ পেরিয়ে কাবুল ছুঁয়ে—সেখান থেকে আবার ডিঙিয়ে গেলেন হিন্দুকুশ গিরিমালা অতিক্রম করে, তিরমিজ হয়ে তাসকেণ্টে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। তিরমিজের গানবাজনার কথা বলতে বলতে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণের প্রসংগ এসে পড়েছে। তারপর, আবার তাসকেণ্টের কথায় ফিরেছেন। তৈমুর, বাবর,—সমরকন্দ, বোখারা—এইভাবে পৃথিবীর নানা দেশকালের কথা উঠেছে। লেনিনগ্রাদে উইণ্টার প্যালেস, চিত্রশালা, ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট—যেখানে লেবেদেফের লেখা 'শুভংকরী'র রুশীয় অনুবাদ দেখেছিলেন শচীনবাবু—তা ছাড়া আরো নানা অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানবসমাজের বর্ণনায় এই ভ্রমণকাহিনী চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ রচনা হয়ে উঠেছে। মস্কো বিমানঘাটি ছেড়ে দেশে ফেরবার পথে, পৃথিবীর এই বিচিত্র মানবসমাজের ভাবনাসূত্রে পঞ্চশীলের আদর্শ আর আণবিক মরণশক্তির আশংকা মনে জেগেছিল। পঁচিশ হাজার ফিট ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ছশ মাইল বেগে তাঁদের প্লেন উড়ছিল তখন। সামনে আহারের আয়োজন। সেই অবস্থায় লেখক বলে গেছেন "খেতে খেতে ভাবলাম পঁচিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে মিনিটে দশ মাইল বেগে উড়ে যেতে যেতে মাখন-টালা গরম ভাত খাচ্ছি ভিল-কাটলেট সহযোগে, চায়ের পেয়ালায় কফি স্থির হয়ে আছে, একটুও টলকাচ্ছে না। মানুষ এত বড়। মানুষের কথা মনে পড়ল। মানুষ তো সবার বড়।" ৪০।৬১

উপন্যাস

সাগর দীপ—অঞ্জলি বসু। মৈত্রী পাবলিশার্স, ৫১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ঃ ৩, টাকা।

প্রেমের পথ ঘোরালো। সেই প্রেমকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরাই লেখিকার উদ্দেশ্য। অপর্ণাকে কেন্দ্র করে নীরদ, মনসিজ, অমিয় ঘুরপাক খায়। এদের মধ্যে কেউ কুটিল, কেউ হয়তো অন্যত্র বাক-বন্ধ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নীরদ এবং অপর্ণার মিলনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি হয়েছে। লেখিকা বহু চরিত্র আমদানী করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ চরিত্র পরিণতিহীন। তা ছাড়া কাহিনীটি অতিমাত্রায় ঘটনাকেন্দ্রিক। কেননা, যে নীরদের সঙ্গে সংগীতের আসর থেকে ফেরার পথে ঘটনাচক্রে পরিচয়, শেষে ঘটনাপরম্পরায় তারই সংগে পরিণয় হয়েছে। ৬৭৬।৬২

শেষ অভিসারে—শ্রীসুদীন চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানতীর্থ, ১নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম ঃ ২·৫০।

মৃত পিতার বন্ধু ডাঃ সেনের বাড়িতে লালিতপালিত হয় সুখেন। বারবার পরীক্ষায় অকৃতী হয়ে সাহিত্যিক সুখেন অন্যত্র চলে যায়। সুখেনের সংগে আবাল্যবধিত আত্রেয়ীর সংগে চলে মনে মনে টানা-পোড়েন। এমন সময় আর-এক নায়িকা, মায়া এসে উপস্থিত হয়। সংগে সংগে অন্য নায়ক শ্রীমন্তও উপস্থিত। এর পর ছকে বাঁধা মামুলি কাহিনী। উপন্যাসটিতে কোনো অভিনবত্ব নেই। অলস অবসরে কিছুটা ভালো লাগতে পারে মাত্র। ৬৭৯।৬১

তীর ও তরণ—হিরন্ময়ী বসু। মুখার্জি বুক হাউস, ৫৭ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ঃ টাঃ ২·৫০।

এই উপন্যাসটি চরিত্রপ্রধান। দৈবতাড়নায় বিধ্বস্ত তিলোত্তমাই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাসুদেবের মত চরিত্র এই কাহিনীকে আঘাসংঘাতময় করে তুলেছে। অবশ্য ঘাত-প্রতিঘাতগুলি ঘটনানুগ; মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। জীবনের ভয়াবহ পরিণামে যে চরম অনুশোচনা—তিলোত্তমাজীবনের উপসংহার সেখানেই ঘটেছে। দোষ ত্রুটি বাদ দিয়েও বলা যায়, উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। ৬৩৮।৬১

ছোট গল্প

আকাশে অনেক ঘুড়ি—শ্রীসুচরিত চৌধুরী। জলসীমা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম। তিন টাকা।

কয়েকটি গল্পের মধ্যে লেখক এখানে যে তন্ময় রচনার পরিচয় দিয়েছেন তা শতবার প্রশংসার যোগ্য। বিশেষত প্রথম কাহিনীতে স্বপ্নের আশ্রয় গ্রহণ করে যেভাবে তিনি

কাহিনীর পট উন্মোচন করেছেন তা যে-কোন সৎ গদ্য-ব্যবসায়ীর পক্ষে অনেকখানি।

তবে, এত সুন্দর রচনার মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে 'বিমূর্ত' ইত্যাদি এমন কয়েকটি শব্দ এমন বেখাপ্পাভাবে ব্যবহার করেছেন যে, অনেক সময় পড়তে পড়তে হোঁচট খেতে হয়। আর যে আঙ্গিকে শ্রীযুক্ত চৌধুরী গল্প বলেছেন সে আঙ্গিকে এসব শব্দের কি কোন প্রয়োজন ছিল?

হয়ত ছোটদের লক্ষ্য করেই লেখা আরম্ভ হয়েছিল—কিন্তু শেষ অবধি তা যেন বেশ বয়স্ক পাঠককে লক্ষ্য করেই শেষ করা হয়েছে। স্কুলের দৃশ্য, মাস্টার মশায়, একজন প্রেমিকার কথা যেভাবে বলা হয়েছে তা আমাদের ভাল লেগেছে। ৫৬৯।৬১

কিশোর সাহিত্য

বারো মাসের বারো রাজা—অনুবাদ: মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি ষোলটি চেক রূপকথার সংকলন। মূল চেক থেকে এই ছোট্ট রূপকথাগুলির অনুবাদ করেছেন মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়।

যে ষোলটি রূপকথা এই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিই রূপকথা হিসেবে অপূর্ব; কিন্তু ততোধিক অপূর্ব এই রূপকথাগুলির অনুবাদ-কর্ম। পড়তে পড়তে কখনই মনে হয় না যে, এই কাহিনীগুলি মৌলিক নয়, অনুবাদ। নিঃসংকোচে বলা যায়, এই গ্রন্থটি বাংলা শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির এর আগে বহু সৎ শিশু ও কিশোর সাহিত্য প্রকাশ করে শিশু ও কিশোর পাঠকদের এবং শিশুসাহিত্যানুরাগীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন; এবার এই গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে আবার নতুন ক'রে তাদের ধন্যবাদভাজন হলেন। ২৯০।৬১

খোকা এল বেড়িয়ে—সুখলতা রাও। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড: কলিকাতা-৭। দাম: দু' টাকা ত্রিশ নয়া পয়সা।

"খোকা এল বেড়িয়ে" আঠারোটি ছোট ছোট রূপকথা এবং উপকথা জাতীয় কাহিনীর সংকলন। এগুলি একেবারে শিশু বলতে যা বোঝায় তাদের জন্যই বিশেষ করে রচিত। এই ধরনের রচনায় লেখিকার যথেষ্ট সুনাম আছে; এই গ্রন্থটি তাঁর সেই সুনামের হানিকর হবে না এ কথা বলা যায়। এবং আশা করা যায়, গ্রন্থটি শিশুমহলে সমাদৃত হবে। ১৩।৬২

কবিতা

ভক্তজননী—দুর্গাদাস। জ্ঞানদা প্রকাশনী, ৬০।১, নরসিংহ অ্যাভিনিউ কলিকাতা—২৮। দাম: ৪৲ টাকা।

একাদশ সর্গে সমাপ্ত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থটিতে ভক্ত সন্তানের উচ্ছ্বাসময় নিষ্ঠা প্রাধান্য লাভ করেছে। উপাধিহীন কবির কাব্যরচনা মূল্যোদ্দেশ্য বলে মনে হয় না। তিনি আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য দেবী শক্তিময়ীর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন.—

> তব প্রেরণায়
> ভক্ত জননীর পূত জীবনকাহিনী
> দীন হয়ে লিপিবন্ধ করিব জননি।

লেখকের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত, মূর্তি [illegible] প্রাচীন, মন অনাধুনিক, প্রবৃত্তি মধ্যযুগীয়। ৫২৬।৬১

শেষের গান—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী। পরিবেশক: সেনগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং: ৩।১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—২৲ টাকা।

গ্রন্থখানির কবিতাগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেছেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ। কবিতাগুলির আঙ্গিকে আধুনিকতা না থাকলেও, বক্তব্য এ কালের [illegible] পরিস্ফুট। কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

তাঁর আবেগ, যা একালে প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর মানসীর কাছে যে সব কবিতা উপহার দিয়েছেন, সে সব কবিতার মাধুর্য বেশী ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি, পরাপ্রকৃতি, মনীষীপ্রেরণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কবির প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও এ পৃথিবীতে আত্মানুসন্ধান তাঁর মূল বিষয়। এবং তারই মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি অমৃত মৌ-সন্ধানী পাখী।" কাব্যগ্রন্থটির 'শেষের গান' নামকরণের ইংগিতটুকু দুর্বোধ্য থেকে গেল।

৫৩।৬১

ধর্ম ও দর্শন

প্রণব রহস্য ও যুগধর্ম—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন। ৫৫, সুবার্বন স্কুল রোড, কলিকাতা—২৫। মূল্য দুই টাকা।

অনাদিকাল হতে ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি, লয়রূপে আনন্দলীলা চলছে। এই লীলা কেন তিনি করেন, তা তাঁরই ইচ্ছার বশীভূত, অপরের পক্ষে বলা অসম্ভব; তবে বেদান্ত-দর্শন প্রণবের রহস্য সম্পর্কে যা বলেছে এই গ্রন্থে সহজবোধ্য করে তা বর্ণিত হয়েছে। মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে যে প্রণব-সাধনা—সেই সাধনার মূলীভূত কারণসহ তার উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে নির্ণীত হয়েছে। গায়ত্রীর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা আরো প্রাঞ্জল হওয়া উচিত ছিল, মনে হয়। ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিদের কাছে এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে। ৫৪৯।৬১

নাটক

রবির আলো—রমেন দাস। এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১, টাকা।

নাটিকাটিতে রবির আলোর কোনো বিচ্ছুরণ হয়নি, বরং অবান্তর বক্তব্যে ও নির্দেশে শিশুদের কাছে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। শিশুদের জন্য নাটিকা রচনায় যে দক্ষতা ও উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় থাকা দরকার, 'রবির আলো'তে তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ নেই।

৩৫৫।৬১

বিবিধ

আন্তর্জাতিক যুব উৎসব—পিটার হ্যলাজ। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াত খাঁ লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য : ৩৭ নয়া পয়সা।

পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছেন বাণী দাশ ও দীপক গুহ রায়। গ্রন্থটির নামের সঙ্গে গ্রন্থের তথ্যের কী সামঞ্জস্য আছে, তা দুর্বোধ্য। অবশ্য, ভূমিকায় সে-সম্পর্কে কৈফিয়ত থাকলেও তা অর্থহীন। পিটার হ্যলাজ যে-সব তথ্য জানিয়েছেন, আমাদের দেশের মানুষের কাছে তার কোনো মূল্য নেই; বরং ভ্রান্তিই উৎপাদন করবে। ৬৮২।৬১

অর্থনৈতিক সহযোগিতা—বি. কে. পি. উড্‌স। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—চার আনা।

গ্রন্থটি বাক্-সর্বস্ব। কোনো বক্তব্যকে তথ্য-নিষ্ঠা বা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। সুতরাং গ্রন্থটিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে-সব কারণ নির্দেশ করা হয়েছে তা অবান্তর মনে হয়। ৬৮১।৬১

পত্রিকা

গ্রামসেবকের চিঠি (রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬১—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ উন্নয়ন বিভাগের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সম্পাদিকা : শ্রীসুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'মাতৃভূমির যথার্থস্বরূপ গ্রামের মধ্যেই', 'আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র কৃষিপল্লীতে', এই কথা রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে কায়মনোবাক্যে চিরদিন প্রচার ও আচরণ করিয়া গিয়াছেন। সে। কথা স্মরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-উন্নয়ন বিভাগের কর্মীবৃন্দ এই সংখ্যাটি প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ রচনাও সেই কথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই সংকলিত। শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের গ্রামসেবা-উদ্যোগ ও পল্লী-জীবন ও প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগের বিষয় লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক রচনা হইতে অনেকগুলি সুনির্বাচিত উদ্ধৃতিও আছে। সংখ্যাটি চিত্রসম্পদেও সমৃদ্ধ।

নবান্ন (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা)। ১০।১ ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা—৩৬। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ৭৪।

এই সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকাটি ক্ষীণকায়, চিত্রবিরল, কিন্তু রচনার গুণে অনেক বৃহদাকার চিত্রালংকৃত বিশেষ সংখ্যা অপেক্ষা সমৃদ্ধ।

চলচ্চিত্র—প্রকাশক শ্রীগোপাল সেন; ৪৮বি হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য এক টাকা।

প্রথমে কেবলমাত্র চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও আলোচনাদি নিয়ে প্রকাশিত হয়ে এখন এতে নাট্যালোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে পত্রিকাখানির নামটির যাথার্থ্য রক্ষিত হয়নি। সেকথা না ধরলে পত্রিকাখানি চলচ্চিত্র ও নাটক সম্পর্কিত প্রবন্ধাদির সমাবেশে সমাদৃত হবার মতো একটি প্রকাশন। আলোচ্য (২য় বর্ষ পৌষ) সংখ্যাখানিতে এম্মনী এসকুইথ ও বেলা বালাংসের চলচ্চিত্র বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ, বংশী চন্দ্র গুপ্তের 'চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনা' সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অভিমত এবং বাংলা নাটকে আঙ্গিকের প্রাধান্য সম্পর্কে আলোচনার সারাংশ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত বহুরূপী অভিনীত 'বিসর্জন'-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

ফসল (গল্পসংখ্যা)—সম্পাদক শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা।

নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত রুচিসম্মত সাময়িক পত্রিকার মধ্যে 'ফসল' নিঃসন্দেহে একটা স্থান করে নিতে পেরেছে। পূর্ববর্তী সংখ্যার মতো আলোচ্য গল্পসংখ্যাখানিতেও সে-পরিচয় সুস্পষ্ট। এই সংখ্যায় আছে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প। সাহিত্যরসিকদের কাছে সংখ্যাখানি সমাদর লাভ করবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

Jewel of Palmistry—Raj Jyotishi Dr. Harish Chandra Sastri.

The Poetry of W. B. Yeats—Bhabatosh Chatterjee.

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং—বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রাজকন্যার স্বয়ম্বর—মনোজ বসু।

সঙ্গীত প্রবেশিকা (উত্তর ভাগ)—শ্রীকার্তিকচন্দ্র রায়।

জালদীঘি—দধিচি মৈত্র।

ছবি তোলা—নীরোদ রায়।

ডার্করুম—নীরোদ রায়।

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

Sri Aurobindo on Social Sciences Humanities—Kewal L. Motwani.

ভক্তি প্রসঙ্গ—স্বামী বেদান্তানন্দ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—নিতাই বসু।

পাণ্ডুলিপি—চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা।

দক্ষিণ মেরুতে—পল-সিপল অনুবাদক সনাতন গোস্বামী।

নয়নী ও রাজনীতি—জবালা খাঁ।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে—ফিলিপ ইয়ং অনুবাদক রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ধর্ম ও অনুভূতি (২য় ভাগ)—কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক।

থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারীতে গত ২৯শে মার্চ উদ্বোধিত লক্ষ্মণ পাইয়ের ছবির প্রদর্শনীটি স্বকীয় শিল্পপ্রতিভা এবং মৌলিকত্বের দিক থেকে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় লক্ষ্মণ পাইয়ের ছবির প্রদর্শন এই প্রথম নয়। কিছুদিন আগে আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ দেখা গিয়েছিল। তবে একক প্রদর্শনী কলকাতায় তাঁর এই প্রথম।

১৯২৬ সালে গোয়ায় জন্ম, এই ভারতীয় শিল্পী প্রথম শিক্ষালাভ করেন বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল অফ আর্টসে এবং পরে সেইখানেই সহকারি অধ্যাপক পদে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্যারিসে গিয়ে ভিত্তি-চিত্রে উন্নততর টেকনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এছাড়া ১৯৫৮ সালে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট্রাল স্কুল অফ আর্টস এণ্ড ক্রাফ্টসেও এক বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ইওরোপের শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবধারা ও অংকন রীতির সঙ্গে পরিচয় এবং বর্তমান সময়ে ওদেশের মনীষী পর্যায়ের শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেও লক্ষ্মণ পাই সকলের প্রভাবকে আত্মগত করে একটা নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গীর উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। রঙ ও রেখার ছন্দে একটা কাব্যিক সুষমা স্ফুরিত করে তোলায় বেশ একটা বৈশিষ্ট্য তিনি আয়ত্ত করেছেন। প্রধানত নারী দেহের চিত্রে অত্যন্ত রমনীয়, ইন্দ্রিয়গত রেখা দেখা যায় যা মানব আকৃতিকে আদর্শ রূপে প্রকাশ করে।

তেলরঙে ও জলরঙের আঁকা ছবি ছাড়া বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবলম্বনে বারো-খানি এচিং এই প্রদর্শনীতে টাঙানো হয়েছে। এছাড়া আছে রেশম কাপড়ের ওপর আঁকা চারখানি ছবি। তাঁর এচিংগুলি এবং

বুদ্ধ জীবনের একটি ঘটনা (এচিং) শিল্পী—লক্ষ্মণ পাই

অন্যান্য ধারারও কতক ছবির অংকন রীতিতে কাপড়ের ওপর নক্সা তোলার টেকনিকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এইটেই তাঁর প্রেরণার উৎস বলে মনে হয়। বোঝা যায় যে, এই প্রেরণাই তাঁকে রেশমী কাপড়ের ওপর উজ্জ্বল রঙের সমাবেশে ছবি আঁকায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

সুচ্ছন্দ গতিময় রেখা এবং পরিবেশসম্মত রকমারি রঙের প্রয়োগে চমৎকার বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সুন্দর সাবলিল ও সহজ ভঙ্গীর বিন্যাসে বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যকে মনোরম করে তোলায়ও যেমন তেমনি সূক্ষ্ম এবং অনুদাত্ত রূপে মূর্ত করে তোলায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

ছবির বিষয়বস্তুর মধ্যে প্যারীসের কতকগুলি দৃশ্য আছে। সূক্ষ্ম কালো রেখার সাহায্যে বাড়ির কয়েকখানি ছবি স্থাপত্য রীতির প্রতি তাঁর ঝোঁকের নিদর্শন। জমিতে রঙ চাপিয়ে রঙপেষা ছুরির সাহায্যে তৈরী "তুষারপাত" (১১ নং), "নিয়তি" (২৬ নং) প্রভৃতি ছবিগুলির পরিকল্পনায় ও বিন্যাসে তিনি অভিভূত হবার মতো অসাধারণ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। "পাখি" (৩নং), "নগ্ন নারী", (৭নং), "গাছের পাতা" (৯নং), "ঘাস" (১০নং) "আশা" (১৪নং) "ঘনিষ্ঠতা" (১৬নং) প্রভৃতি ছবিগুলির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বর্ণের প্রয়োগে অলংকরণের রীতি পরিহার করে তিনি রেখার প্রবাহে চমৎকার রূপ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। বুদ্ধের জীবন কাহিনী অবলম্বনে এচিংগুলি সুসমঞ্জস রঙ ও বলিষ্ঠ অথচ অতিসূক্ষ্ম রেখায় বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ সৃষ্টি। চিত্ররসিক মাত্রই প্রদর্শনীটি দেখে তৃপ্তিলাভ করার মতো উপাদান পাবেন।

ইতিপূর্বে 'গীত গোবিন্দ', 'রামায়ণ' এবং গান্ধীজীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে আঁকা লক্ষ্মণ পাইয়ের ছবি দেশে ও বিদেশে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। এ পর্যন্ত তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী প্যারিসে হয়েছে ছ বার এবং তাছাড়া মিউনিক স্টুটগার্ট ব্রিমেন, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী সেসব দেশের চিত্ররসিক ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পসংগ্রহালয়ে তাঁর কতক ছবি স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

অরোরার 'ভগিনী নিবেদিতা' (পরিচালক: বিজয় বসু) ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে গণ্য হয়ে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। বাংলা ছবি 'হট্টগোল' শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (ইংরেজী: ফিল্মস ডিভিশন প্রযোজিত) শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। 'সাইট্রাস কালটিভেশন' শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে!

এ বছর তামিল চিত্র **পাবা মণিপ্পু** কাহিনীচিত্র হিসাবে। সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে। ছবিটি যথাক্রমে সর্বভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মারাঠী চিত্র **প্রপঞ্চ** তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

সত্যজিৎ রায়ের **সমাপ্তি** বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করেছে। আলোচ্য বছর ...এর **সপ্তপদী** সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে।

শকুন্তলা অসমীয়া ভাষায় শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে রৌপ্যপদক লাভ করেছে। ওড়িয়া চিত্র **নুয়াবৌ** সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে।

সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ হিন্দী চিত্র হিসাবে রৌপ্যপদক পেয়েছে। **গঙ্গা যমুনা** সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে।

সাবিত্রী ও **নাচে ময়ূরে মিতারে** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে। **আওয়ার ফেদার্ড ফ্রেন্ডস** এবং **রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান কয়েনস্** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসাবে সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে। বছরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক চিত্র হিসাবে ইংরেজী ভাষায় নির্মিত **দি রিভার ওয়ার্কার্স** সার্টিফিকেট অব মেরিট পেয়েছে।

"ফিল্মস্টার" নয়, শিল্পী

চন্দ্রশেখর

শিল্পীদের মনের "গোপন কথা" জানার সুযোগ চিত্রামোদীদের খুব কমই ঘটে। চিত্রাভিনেতা বা চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইসব সাক্ষাৎকারে ও'রা "অন্তরঙ্গ" ভাবে যা বলেন তাও যেন খুবই কৃত্রিম, সাজানো কথা। তাঁদের মনের আসল কথাটি ঠিক জনসাধারণের আর কিছুতেই জানা হয়ে ওঠে না।

সম্প্রতি বৃটেনের দুজন বিখ্যাত শিল্পী পাইনউড স্টুডিওতে অবসর-আলাপের সময় তাঁদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছেন। শিল্পী দুজন হলেন জন মিলস ও জ্যানেট মুনরো। ও'রা সত্যিই যে তাঁদের অন্তরের কথা বলেছেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কারণ, এমন সুরে ও এমন প্রসঙ্গে তাঁরা তাঁদের মনের কথা বলেছেন যা সহজেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

নিজের জীবনের সুখের উৎস কী জন মিলস তা অকপটে বলতে পেরেছেন। জন মিলস এর কন্যা হেলি ও তাঁর ভগিনী জুলিয়েট—এ'রা দুজনেই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। জন মিলস বলেছেন, "যখনই সুবিধে পাই আমরা একত্রে থাকবার চেষ্টা করি। এবং এটাই আমাদের সুখের অন্যতম উৎস। এ তো তথাকথিত অভিনেতার মুখের কথা নয়! এ যেন এক সরল সংসারী লোকের কথা। প্রতি দিবসের আনন্দকে তিনি কন্যা ও ভগিনীর সান্নিধ্যে পূর্ণ করে তুলতে চান।

অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা সারাক্ষণ সারাদিন উদভ্রান্তের মত শুধু গ্ল্যামার আর অর্থের মরীচিকার পেছনেই ছুটে চলেছেন এ-ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। ঘর-সংসারের দিকে তাঁদের মন নেই, আপনজনের মায়া বলতে তাঁদের কিছু নেই—তাঁদের সম্বন্ধে এ ধারণাই জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল। এবং জনসাধারণের ধারণা হয়তো খুব অমূলকও নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জন মিলস-এর কথা শিল্পীদের জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন ইঙ্গিত দিতে পারে।

জন মিলস এর পরিবারের বার্ষিক আয়ের অঙ্ক নাকি ১০০,০০০ পাউণ্ড। এ রকম একটি জনশ্রুতির প্রতিবাদেই শিল্পী

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে সম্মানিত অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের 'ভগিনী নিবেদিতা'-র নাম-ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত সত্যজিৎ রায়ের "সমাপ্তি"-র একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাশগুপ্ত।

উপর্যুক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা আমাদের ব্যক্তিগত খরচ কমাবার চেষ্টা করি। এর একমাত্র কারণ হল খরচ করার মত বেশী টাকা আমাদের নেই।" সরলভাবে তিনি বলেন যে, তাঁদের রোজগারের একটা মোটা অংশ ট্যাক্স দিতেই চলে যায়। এবং অর্থই যে সুখের উৎস নয় সেটাই তিনি বিশেষ করে বলতে চেয়েছেন। কন্যা ও ভাগিনীকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে পারার মধ্যেই তাঁর জীবনের সুখ নির্ভর করে—অর্থ রোজগারেও নয়, অর্থব্যয়েও নয়।

অভিনেত্রী জ্যানেট মনরো আরও মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি অনেকটা বিরক্তির সঙ্গেই বলে ফেললেন—"আমাকে স্টার আখ্যা দিলে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আজকাল স্টার বলতে কিছু নেই।" "ফিল্ম স্টার" শব্দটি নিয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে শ্রীমতী মনরো বলেন যে, একদা হয়ত ফিল্ম স্টার ছিল, কিন্তু আজ আর তাঁদের অস্তিত্ব নেই। এমন একদিন ছিল যখন জনসাধারণ তাঁদের গ্ল্যামার-জীবনের সংবাদ আহরণে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। জনসাধারণ এমন বিচিত্র নারীর সংবাদ জানতে চাইতেন যাঁরা জীবনে কোনদিন রান্নাঘর চোখেও দেখেন নি, যাঁরা নিয়মিত দুধ দিয়ে স্নান করতেন।

শ্রীমতী মনরো বলেন, আজ এমন ফিল্ম স্টার আর নেই। কয়েক বছর আগে ফিল্ম স্টার বলতে লোকেরা যা মনে করতেন, সেই অর্থে ম্যারিলিন মনরোও আজ ফিল্ম স্টার নন। আমাকে "ফিল্মস্টার জ্যানেট মনরো" বললে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আমি শিল্পী—এটাই আমার আসল পরিচয়। আর কাউকে "স্টারলেট" বলা তো আরও উদ্ভট। শ্রীমতী মনরো জোরের সঙ্গে বলেন, আজকালকার ছবিতে "স্টার" বলতে কেউ নেই। শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রয়েছেন। তাঁরাও সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের মতই তাঁদের ব্যক্তিত্ব। সবশেষে তিনি বলেন, আজকের যুগের ছবির সাফল্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ছবি যদি ভালো হয় তবে জনসাধারণ সম্পূর্ণ "অপরিচিত" শিল্পীদেরও দেখতে যান।

শ্রীমতী মনরোর শেষ কথাটি সত্যিই মূল্যবান। যাঁরা তথাকথিত "ফিল্মস্টার" হয়ে টিকে থাকতে চান, তাঁদের আচার-ব্যবহার, ভাষা ও ভূষণ বিচিত্র ধরনের। তাঁদের দেখলে মনে হয়, তাঁরা যেন আলাদা এক জগতের লোক। সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের থাকতে হয়। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমাজে, অথবা শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে তাঁদের প্রবেশাধিকারের পথটি যেন রুদ্ধ। তাঁরা নিজেদের একটি আলাদা ~~সমাজ~~ গড়ে তোলেন। সে সমাজের জীবনযাপন, মানসিকতা, রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের লোকের পরিচয় অতি অল্প। অসংখ্য মানুষের মিছিল থেকে তাঁরা দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকেন। সহজ, সুন্দর, সুস্থ জীবনের অধিকারও বুঝি তাঁদের নেই।

এবং এর জন্যে তাঁরাই দায়ী। ছায়াছবিতে অনেক ধরনের ভূমিকায়ই তাঁদের অবতরণ করতে হয়। এটা হয়তো তাঁদের জীবিকার দাবি। কিন্তু ছায়াছবির বাইরে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা ভঙ্গিতে, এমনকি অশালীন রূপসজ্জায় তাঁরা নিজেদের "গ্ল্যামার" জনমনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশন করে থাকেন। তাঁদের এই নগ্ন গ্ল্যামার দেখে অসুস্থ রুচির চিত্রামোদীরা আহ্লাদিত হয়ে ওঠেন। পথে যখন তাঁরা বেরিয়ে আসেন তখন তাদের চারধারে চঞ্চলমতি চিত্রামোদীরা অসুস্থ উল্লাসে ভিড় করে দাঁড়ায়। অভব্য মন্তব্য প্রকাশ করে। এই জনপ্রিয়তা "ফিল্মস্টার"দের আত্মমর্যাদাকে আঘাত করে কিনা জানি না। কিন্তু শ্রীমতী মনরো যা বলেছেন সেই অর্থে ছায়াছবির কিছুটা ক্ষতি সাধন করে।

শিল্পীরা চিত্রামোদীদের কাছে "সম্পূর্ণ অপরিচিত" হয়ে থাকতে পারেন না হয়তো। তবে মনে-প্রাণে, বেশ-ভূষায়, আচার-ব্যবহারে তাঁরা যদি বিচিত্র "ফিল্মস্টার" হয়ে না ওঠেন তবে চিত্ররসিকরা ছবির পর্দায় তাঁদের মধ্যে সহজেই সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেতে পারেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পীকে আবিষ্কার করতে পারেন। তাই ফিল্মস্টার না হয়ে শিল্পী হওয়ার আনন্দ, গৌরব ও মর্যাদা অনেক বেশী। এর ফলে

"স্টার সিস্টেম"-এর অভিশাপ থেকেও ছায়াছবি অনেকটা মুক্তি পেতে পারে।

চিত্রালোচনা

বর্তমান **সপ্তাহে** নতুন কোন বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেনি। আগামী সপ্তাহে দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি দর্শকদের সামনে এসে উপস্থিত হবে। একটি হল : তপন সিংহ পরিচালিত জালান প্রোডাকশন্স-এর **হাঁসুলী বাঁকের উপকথা**, অপরটি : অগ্রগামী গোষ্ঠী প্রযোজিত ও পরিচালিত **কান্না**। দুটি ছবিরই কাহিনীকার যশস্বী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ অভিযাত্রিক-এর **অভিযান** ছবির অবাঙালী নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ওয়াহিদা রহমান এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন এবং যথারীতি ছবির কাজ শুরু করেছেন। এ ছবিরও আখ্যান অবলম্বন তারাশঙ্করের কাহিনী। ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (নায়ক), রুমা গুহঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও চারুপ্রকাশ ঘোষ। সত্যজিৎ রায় নিজেই ছবির সঙ্গীত-পরিচালক।

* * *

অতল জলের আহ্বান-এর পর একটি নয়, তিনটি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আর-ডি-বি প্রযোজক-সংস্থা। ছবি তিনটি হল : **সাত পাকে বাঁধা, এক টুকরো আগুন** ও **ছায়া-সূর্য**। প্রথম দুটি ছবির সংবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শেষের ছবিটির কাহিনীকার আশাপূর্ণা দেবী। শোনা যাচ্ছে, এই ছবিতে এক তরুণ চিত্র-পরিচালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাঁর নাম পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

* * *

শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল"-এর হিন্দী চিত্ররূপ **সওতেলা ভাই** (আলোক ভারতী প্রযোজিত) আগামী সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে। মহেশ কাউল ছবিটির পরিচালক। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত ও পূর্ণিমা ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন বিপিন গুপ্ত, বেলা বসু, রাজকুমার ও অসিত সেন। অনিল বিশ্বাস ছবিটির সুরকার।

* * *

বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্স-এর **বধূ** অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাবে। শৈলেশ দে রচিত একটি আবেগধর্মী পারিবারিক কাহিনী এই ছবির ভিত্তি। ছবির শিল্পীদের পুরোভাগে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, **সাবিত্রী** চট্টোপাধ্যায়, **বিকাশ**

অগ্রগামীর নতুন ছবি "কান্না"-র নায়ক-চরিত্রে উত্তমকুমার। ছবিটি আগামী বৃহস্পতিবার মুক্তিলাভ করবে।

রায়, অনুভা গুপ্তা, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

কলকাতায় জর্জিয়ার লোক-নৃত্য

প্রতীচ্যের সভ্যদেশে এখন "বিটনিক"-যুগ দেখা দিয়েছে। সে-সব দেশে আজকাল নাচ বলতে বোঝায় অশালীন "রক এন-রল", নয়ত "টুইস্ট"। এই "বিটনিক" যুগে বিদেশী শিল্পিদলের সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ নাচও যে বিদগ্ধ কলারসিকদের মুগ্ধ করে রাখতে পারে, তা অনেকের কল্পনাতীত হয়েই থাকত, যদি না জর্জিয়ান শিল্পিদের লোকনৃত্য দেখবার সুযোগ তাঁদের ঘটত।

গত সপ্তাহে জর্জিয়ান শিল্পিদল (জর্জিয়ান ডান্স আসাঁবল) কলকাতায় নিজাম প্যালেসের উদ্যানে তাঁদের দেশের লোকনৃত্য পরিবেশন করেন। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের আমন্ত্রণে এই শিল্পিদল ভারত-পরিভ্রমণে আসেন। ভারতের কয়েকটি প্রধান শহরে নৃত্য পরিবেশন করে তাঁরা কলকাতার দর্শকদের সামনে এসে উপস্থিত হন গত ২৯শে মার্চ। শিশু-রঙমহল-এর সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতায় এই মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

লোক-নৃত্যের তালে তালে ও ছন্দে ছন্দে লাবণ্যসৃষ্টির এক অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন ষাটজন শিল্পী নিয়ে তৈরী জর্জিয়ান নৃত্য-গোষ্ঠী। শিল্পীর দেহপটেই নৃত্য-শিল্পের বিকাশ। তাই দেহপটের সৌন্দর্য নৃত্য-শিল্পে বুঝি অপরিহার্য। জর্জিয়ার শিল্পীরাও অসামান্য দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। কিন্তু তাঁদের দেহ-সৌন্দর্য শিল্প-শর্তের অতিরিক্ত উপভোগের স্থূলে পসরা সাজিয়ে তোলে নি। শিল্পরুচিকে তা অনুসরণ করেছে প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি দেহ-ভঙ্গিতে।

নারী কী মর্যাদায় মহিমান্বিত তা প্রত্যক্ষ করা গেল জর্জিয়ার লোকনৃত্যে। যুগল-নৃত্যে নারী সংযমের ভেতর দিয়ে তার রূপের শোভা বিস্তার করে, পুরুষ সম্ভ্রমের সঙ্গে তার মাধুর্যকে গ্রহণ করে, এবং পরিশেষে নারী তার রূপ-বৈভব সমর্পণ করে দেয় পুরুষের মর্যাদার কাছে। এটাই জর্জিয়ার জাতীয় চরিত্র। এবং তাই ফুটে উঠেছিল তাঁদের লোকনৃত্যে।

পুরুষের নাচের ভঙ্গি স্বভাবতই মেয়েদের থেকে আলাদা। তাঁদের ক্ষিপ্রগতি, বাহুসঞ্চালনের মধ্যে আবেগ ও পৌরুষের স্পর্শটি দর্শকদের কৌতূহলাবিষ্ট করে রাখে। সারা শরীর নিশ্চল রেখে তাঁদের পদসঞ্চালন দেখবার মত।

লোকনৃত্যের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয় ড্রাম ও একর্ডিয়ান। ড্রামের বাজনার মাধ্যমে কৌতুক-সৃষ্টি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

এক কথায়, জর্জিয়ান শিল্পীদের রূপ-সজ্জা এবং তাঁদের নৃত্যকুশলতা কলকাতার দর্শকদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে। শিল্পিদলের অধিনায়িকা ছিলেন স্তালিন পুরস্কার বিজয়িনী তিনো রামি শিভিলি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পিদলকে সংবর্ধনা জানিয়ে বক্তৃতা দেন শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সৈনিকের কাহিনী

জ্যোতি প্রেক্ষাগৃহে গ্রিগরি চুখরাই পরিচালিত বিখ্যাত রুশ চিত্র "দি ব্যালাড অব্ এ সোলজার" ছবিটি গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে। ১৯৬০ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করে।

গত বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ছবির কাহিনী বিস্তৃত। ছবির নায়ক এক তরুণ সৈনিক। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সবেমাত্র সে যুদ্ধে যোগদান করেছে। তবু মন পড়ে থাকে বাড়িতে। তার মায়ের কাছে। সংসারে আপনজন বলতে শুধু তার মা, আর কেউ নেই।

মায়ের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অল্প কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ির পথে সে রওয়ানা হয়। দীর্ঘ বিপদ-সংকুল পথে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। এবং সেই সঙ্গে যাত্রাপথে পরিচিত হয় অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে তার আচমকা দেখা হয়ে যায় এক তরুণীর সঙ্গে। একদিন একরাত্রির এই পরিচয় রূপ নেয় প্রণয়ে। কিন্তু পথের সঞ্চয় পথপ্রান্তেই ফেলে চলে যেতে হয় সৈনিককে।

শেষ পর্যন্ত বাড়িতে যখন সে এসে পৌঁছল তখন তার হাতে আর সময় নেই। মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য মা আর ছেলের দেখা হল। ধুলো উড়িয়ে চলে গেল সৈনিকের গাড়ি। অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে থাকেন তার মা। তারপর প্রতিদিন মা এসে দাঁড়ান পথের ধারে। এই পথে তার ছেলে আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

আবেগনিবিড় এই উপাখ্যানের চিত্রপ দর্শকদের অভিভূত করে রাখে। শিল্প-সৌন্দর্যে ও রসমাধুর্যে অপরূপ এই ছবির দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী ভ্লাদিমির ইভাসভ (সৈনিক) ও শানা প্রোখোরেঙ্কো (পথের প্রণয়িনী)।

"দি ফরটি ফার্স্ট" ছবির মাধ্যমে পরিচালক গিগ্রারি চুখরাই-এর সঙ্গে এখানকার দর্শকদের পূর্বে পরিচয় ঘটেছে। এ-ছবিতেও পরিচালক তাঁর অনবদ্য রস-বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

জর্জিয়ার লোকনৃত্য

কলকাতায় অনুষ্ঠিত জর্জিয়ান ড্যান্স আঁসাম্‌ব্‌ল্‌-এর কয়েকটি নৃত্য দৃশ্য। নীচের সারির বাঁদিকে দলের অধিনায়িকা লিনো রামিশভিলি

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষকালব্যাপী নবম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৮ই এপ্রিল থেকে। মার্কাস স্কোয়ারে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্যবারের মত এবারকার অধিবেশনও বৈচিত্র্যের আয়োজনে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

প্রখ্যাত সংস্থার পরিবেশনায় নাট্যাভিনয়, যাত্রা, শিশু-অনুষ্ঠান এবং জনপ্রিয় শিল্পী-দের ভক্তিমূলক গান, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান প্রভৃতি অন্যান্যবারের মত এবারকার অধিবেশনেরও বিশেষ আকর্ষণ। এবারকার অধিবেশনের কর্মসূচীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে "বিবেকানন্দের গান" সংযুক্ত হয়েছে। গান করবেন শৈলেন ভট্টাচার্য। তা বাদে নতুন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনৃত্য ও গীত। পরিবেশন করবেন ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার।

শিক্ষার সর্বস্তরের বাংলাভাষাকে মাধ্যম-রূপে গ্রহণ ও বাংলা চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও এবারকার অধিবেশনে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে।

জালান প্রোডাকসন্সের "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা"-র একটি দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিভাননী।

নাট্যাভিনয়

বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের ৬০০তম অভিনয়-রজনী পূর্ণ হবে আগামী ৮ই এপ্রিল। একাদিক্রমে অভিনয়-সংখ্যার দিক থেকে "সেতু" নতুন ইতিহাস রচনা করল। শুধু তা-ই নয়। প্রায় তিরিশ মাস ধ'রে "সেতু"র অভিনয় চলছে। এই সময়ের মধ্যে "সেতু"র টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ দশ লক্ষ টাকারও কিছু বেশী। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই ব্যবসায়িক সাফল্যের নজির নেই।

• • •

কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর মিনিস্টেরিয়েল স্টাফ-এর সাংস্কৃতিক সংস্থা "কৃষ্টি-চক্র" গত ২৮শে মার্চ স্টার থিয়েটারে তাঁদের পঞ্চম নাট্যোপহাররূপে প্রবোধকুমার সান্যালের "হাসুবানু"র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। অনিল মিত্র কাহিনীর নাট্যরূপ দেন ও নাটকটি পরিচালনা করেন। গীতা দে, দীপিকা দাস, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা সুন্দর অভিনয় করেন।

• • •

পথের ডাক নামে তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের একটি কাহিনীর নাট্যরূপ গত ২৮শে মার্চ মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়। নাট্যাভিনয়টি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন "নাট্যম্" সম্প্রদায়।

• • •

গিরিশ নাট্য উৎসবের একটি বিশিষ্ট উপহার "নির্বোধ" গত শনিবার বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ হয়। জনসম্বর্ধিত এই নাটক দস্তয়েভস্কির "দি ইডিয়ট" অবলম্বনে রচনা করেছেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

ফিল্ম ফেডারেশন, প্রযোজকগণের আঞ্চলিক সমিতি এবং ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে ছয়টি ভারতীয় ছবি বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ছবিগুলি হল: "জিস দেশ মে গঙ্গা বৈহতী হ্যায়", "হাম দোনো", "গঙ্গা যমুনা", "দেবী", "সমাপ্তি" ও "পোস্টমাস্টার"। কান, বার্লিন, মেলবোর্ন, সিডনী ও কার্লোভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিগুলি যোগদান করবে। লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছে। আগামী ৭ই মে থেকে ২১শে মে পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বার্লিন উৎসব শুরু হবে ২২শে জুন। দেবানন্দ প্রযোজিত "হাম দোনো" ছবি এই উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। সিডনী চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের "সমাপ্তি" ও "পোস্টমাস্টার"। এই উৎসব শুরু হবে আগামী ১লা জুন।

• • •

নাট্য সংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে "শচীন্দ্রনাথ স্মৃতি পুরস্কার" দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসাবে ৫০১ টাকা তিনি পান। নাট্যকার সংঘের কার্যনির্বাহক সমিতির এক জরুরী সভায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে "শচীন্দ্রনাথ স্মৃতি পুরস্কার" দেওয়া সম্বন্ধে ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের প্রেরিত এক প্রস্তাব বিবেচিত হয়। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, ডঃ গুপ্ত প্রতি বৎসর এই পুরস্কারের জন্য সংঘকে ৫০১ টাকা দেবেন। তদনুযায়ী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

• • •

পুলা চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত এবং কান ও লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষভাবে সম্মানিত যুগোস্লাভিয়ার "দি নাইনথ সার্কল" ছবিটি গত রবিবার রক্সী সিনেমায় প্রদর্শিত হয়। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটী এবং যুগোস্লাভ রাষ্ট্রদূতাবাসের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

• •

সানফ্র্যান্সিসকোর আগামী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তপন সিংহ পরিচালিত জালান প্রোডাকসন্স-এর "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" ছবিটি বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে। উৎসব সমিতির কর্তারা

সবচেয়ে বড় বাড়ি 'গলস্টোন ম্যানসনের' সবুজ লনে কলেজ ছাত্রীদের অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আসর বসল। সে আসরে আশুতোষ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী অমলা নন্দীর অনন্য ভূমিকা। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি ভাল করে মনে নেই। স্পোর্টসের প্রাইজ এবং প্রশংসাপত্রগুলো রয়েছে ওদের মাদ্রাজের ত্যাগরাজ নগরের বাড়িতে। তবু অমলা শংকরের মনে পড়ে বর্শা ছোঁড়া, দৌড় ও অবজারভেশন টেস্টে উনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। দীর্ঘ লাফে হয়েছিলেন দ্বিতীয়। রিলেতে বিজয়ী আশুতোষ কলেজের চারজনের একজন। প্রধানত অমলা নন্দী এবং অর্পিতা দাসের কৃতিত্বে আশুতোষ পেয়েছিল কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ।

১৯৩৮ সালে আশুতোষ কলেজ ছেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক স্পোর্টসে অমলা নন্দীর অংশ গ্রহণের এটাই প্রথম এবং শেষ ঘটনা। ১৯৪১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বি এ পাস করেন। ১৯৪২-এ উদয়শংকরের সঙ্গে বিয়ের পর বিশ্বের সংস্কৃতি ভান্ডারে শংকর দম্পতির দানের সূচনা।

তাই বলে খেলার মন কিন্তু কখনো মরেনি। সময় পেলে ভাই অশোকের সঙ্গে রাইফেল ছুঁড়েছেন টালীগঞ্জের রাইফেল রেঞ্জে। ব্যাডমিন্টন ও টেবল টেনিস খেলেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে ঘেরা আলমোরার উদয়শংকর ভারতীয় কলাকেন্দ্রে, মাদ্রাজের ত্যাগরাজ নগরে।

হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে—'এই সেদিনও জ্যাভেলিন প্র্যাক্টিস করে এসেছি।'

কালনায় বেড়াতে গিয়ে নদীর চরে অনেক পাটকাটি পড়ে থাকতে দেখে তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিলেন বর্শা ছোঁড়ার মত।

'স্পোর্টস কি আপনার নৃত্যশিল্পে কিছু সাহায্য করেছে কিংবা নৃত্যশিল্প স্পোর্টসকে?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম অমলা শংকরের কাছে।

উত্তরে বললেন—'বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় আগ্রহ থাকলে কোন কিছুই করা অসম্ভব নয়।

শ্রীযুক্তা শংকর না বললেও আমরা জানি, শিল্পের সঙ্গে খেলাধুলোর কত নিকট সম্বন্ধ। শিল্পের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হয়েছে:—

"Art is the expression of pleasure in work কিংবা Art is most simply and most usually defined as an attempt to create pleasing forms."

এর অর্থ দর্শক চোখের আনন্দদায়ক কোন কিছু সৃষ্টি করাই শিল্প।

এ কথা যদি মেনে নেওয়া যায় তবে খেলাধুলোও শিল্প, আর্টস। খেলাধুলোর বিভিন্ন ভঙ্গীর মধ্যে আছে অনুপম শিল্পশ্রী, ছন্দের বিকাশ। বিশ্বের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের খেলাধুলোর ছলা-কলা শিল্পের মধ্যে ধরে রাখার কি কম চেষ্টা হয়েছে! গ্রীক ভাস্কর্যই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে ব্রতচারী নৃত্যও খেলাধুলোর অঙ্গীভূত। খেলাধুলো এবং নৃত্যকলা—দুই ক্ষেত্রেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৈহিক ছন্দের চারু সুষমা। প্রথম ক্ষেত্রে শক্তির সঙ্গে শিল্পের জ্যোতি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুরের ব্যঞ্জনার মধ্যে ভাবের বিন্যাস।

বোধ করি এই কারণেই শংকর পরিবারের সবাই ক্রীড়ারসিক। অমলা দেবী বললেন, উদয় শংকরের মেজো ভাই রাজেন্দ্র শংকর, সেজো ভাই দেবেন্দ্র শংকর খেলাধুলোর পরম অনুরাগী। ছোট ভাই রবি শংকর সেতারের কান মোচড়াতে মোচড়াতে রেডিওর কান মোচড়ান ক্রিকেটের ধারাবিবরণী শোনবার জন্য। অমলা শংকরের ১৯ বছরের ছেলে আনন্দ গোয়ালিয়রের সিন্দিয়া স্কুলে পড়বার সময় ফুটবল খেলেছে নিয়মিত। সুন্দর স্পোর্টসম্যানের অবয়ব। মেয়ে মমতার এখনো খেলবার বয়স হয়নি। বাড়িতে গিন্নী সেজে থাকতেই ভালবাসে।

পরবর্তী জীবনে নৃত্যশিল্পী অমলা শংকর

দেশী সংবাদ

২৬শে মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, পাকিস্তান একতরফা সিদ্ধান্তে পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণে অগ্রসর হইয়াছে। ভারত সরকার এই কার্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক, নিম্নবুনিয়াদী এবং প্রাক-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনহার সংশোধনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, রাজ্যপাল উহা অনুমোদন করিয়াছেন।

২৭শে মার্চ—১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ১০১ কোটি টাকার হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তির জবাব দেন নাই। রাজ্য সরকারের ১৯৫৯-৬০ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিতে গিয়া কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল মন্তব্য করিয়াছেন, এ ব্যাপারে সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড খাদ্য বিভাগের—ঐ সময় পর্যন্ত তাঁহারা ৫৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার অডিট সম্পত্তির জবাব দিতে পারেন নাই।

বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীকে সি রেড্ডী আজ নয়াদিল্লিতে বলেন যে, কাঁচামাল, কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তির অভাব এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিম্নতম লক্ষ্যেও পৌঁছিতে পারা যাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

২৮শে মার্চ—জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদন সংক্রান্ত লোকসভার কমিটি আজ পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী রেলওয়ে—হাওড়া—আমতা ও হাওড়া—শিয়াখালা লাইট রেলওয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুপারিশ করিয়াছেন।

আজ আসাম বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে বিতর্কের সময় বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতির প্রার্থী হিসাবে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি শ্রীরথীন সেন গত বৎসর ১৯শে জুন হাইলাকান্দিতে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়, তাহার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য কমিটি নিয়োগের দাবি করেন।

২৯শে মার্চ—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার হিলি এলাকায় ভারতের একটি ভূখণ্ড পাকিস্তানী সৈন্যদল দখল করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আজ লোকসভায় উভয়পক্ষের সদস্যগণ তৎসম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

শিয়ালদহ—বজবজ লাইনে গড়িয়াহাট ও বসা রোড নামে দুইটি ফ্ল্যাগ স্টেশন হইবে ঠিক হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে এই স্টেশন দুইটির নির্মাণকার্য শেষ হইবে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে ৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি হাসপাতাল বিলের বিতর্ককালে বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ সরকারী হাসপাতালসমূহে অব্যবস্থাদির তীব্র সমালোচনা করেন। প্রায় সব হাসপাতালেই রোগীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও নানারূপ দুর্নীতিতে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে।

৩০শে মার্চ—ভুয়া কন্‌ট্রাক্টের ভিত্তিতে রেল ওয়াগন সংগ্রহ করিয়া একশ্রেণীর সমাজবিরোধী লোক কয়লা, খনিজ লৌহ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টির দ্বারা দেশের শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে বলিয়া এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়।

শ্রমিকদের অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্যদানের জন্য চা ও রবার বাগান সম্পর্কিত বেতন বোর্ড যে সুপারিশ করিয়াছেন ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং মালিকদিগকে উহা যথাসম্ভব শীঘ্র রূপায়িত করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন।

৩১শে মার্চ—ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টগণকে ও কলিকাতার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিস কমিশনারকে নিজ নিজ এলাকায় অবাঞ্ছিত পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ও তাহাদিগকে বহিষ্কারের ক্ষমতা দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র দার্জিলিং জেলা ১৯৬১ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বিজ্ঞাপিত অঞ্চলরূপে ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া আজ নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখন হইতে এই অঞ্চলে অনুমতিপত্র লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। তবে যাহারা এই অঞ্চলের অধিবাসী, তাহাদিগকে অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে না।

১লা এপ্রিল—কলিকাতা মহানগরীর দুঃস্থ পরিবারগুলির অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২-৬৩ সনের বাজেটে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছেন।

লাল চীন পাকিস্তানে অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট প্রদেশের ৪০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড দাবি করিয়াছে। এই জেলার সীমান্তে চীনা সৈনিকদের টহলদারী খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে মার্চ—আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রশক্তিকে যাহারা ক্রমাগতই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে, সেই 'ওয়াস' বা গোপন সেনাবাহিনী সংস্থার দ্বিতীয় প্রধান ভূতপূর্ব জেনারেল এডমণ্ড জোহো আজ প্যারিসের সান্তা কারাগারের নির্জনতায় বন্দী। এতদ্দ্বারা ফরাসী সরকার গোপন সেনাবাহিনী সংস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন।

সশস্ত্র বাহিনী কমিটির চেয়ারম্যান মার্কিন সেনেটের রিচার্ড রাসেল পাকিস্তানকে আমেরিকার সর্বাপেক্ষা দৃঢ় বন্ধুদের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে "মেঠো বক্তা এবং ভণ্ড" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২৭শে মার্চ—গতকল্য বরিশাল শহরে পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে প্রায় ৩০।৩২ জন বিক্ষুব্ধ ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিন শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মচারিগণ [illegible] বলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন [illegible] চীনকে সর্বপ্রকার সাহায্যদান বন্ধ [illegible] মার্কিন সরকারী কর্ণধারগণ আরও [illegible] সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন ভারতবর্ষ, [illegible] নেশিয়া প্রভৃতি অ-কম্যুনিস্ট দেশগুলিকে সাহায্য দান করিতেছে।

২৮শে মার্চ—অদ্য প্রত্যূষে [illegible] সিরিয়ার সেনাবাহিনী দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছে এবং পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

২৯শে মার্চ—বুয়েনস এয়ার্সের সংবাদে প্রকাশ, আর্জেন্টিনার সেনাবিভাগীয় কর্মকর্তারা অদ্য প্রেসিডেণ্ট ফ্রণ্ডিজিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে নৌ-বিভাগীয় বিমানযোগে প্লেট নদীর মোহানায় মার্টিন গার্সিয়া দ্বীপে বন্দি-জীবন যাপনের জন্য পাঠাইয়া দেন।

ভারতের কড়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তান আগামী শনিবার সাড়ম্বরে কর্ণফুলী বাঁধের উদ্বোধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কর্ণফুলী সর্বার্থসাধক পরিকল্পনাটি নির্মাণে ১০ কোটিরও বেশী ডলার খরচ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮ কোটি ডলার দিয়াছে মার্কিন সরকার।

৩০শে মার্চ—আগামী এপ্রিল মাসের [illegible] দিকে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ [illegible] প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন [illegible] কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে [illegible] দ্বিতীয়বার ছাত্র আন্দোলন [illegible] নির্বাচনের উপর ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করা যাইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্ণফুলী বাঁধ [illegible] কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য পাকিস্তানের [illegible] তরফা সিদ্ধান্তে ভারত যে প্রতিবাদ [illegible] পাকিস্তান তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

৩১শে মার্চ—সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী [illegible] এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, [illegible] গ্রহপৃষ্ঠে জীবনের চিহ্নমাত্রও নাই। [illegible] জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর [illegible] ফেসেনকোভ বলেন, শুক্র গ্রহপৃষ্ঠের [illegible] ৫৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট বায়ুমণ্ডলের [illegible] ৭৫ ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস। [illegible] সেখানে জীবকোষের অস্তিত্ব সম্পর্কে [illegible] প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

১লা এপ্রিল—পাকিস্তানের [illegible] নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের [illegible] দুইদিন বাকী আছে। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোন জেলাতেই একটিও মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয় নাই। [illegible] সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে [illegible] পূর্ব পাকিস্তানীরা আসন্ন নির্বাচন বর্জন করিবেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা

মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।

টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 14TH APRIL, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ২৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১ বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

স্মরণে

চৈত্রসংক্রান্তির দিনে বর্ষবিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সতের বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে আমাদের একান্ত স্বজন, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক প্রফুল্লকুমার সরকার লোকান্তরিত হন। মৃত্যুতে মরজীবনের সমাপ্তি; প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রত্যক্ষ-সান্নিধ্য তাই আমাদের অনুভবের অতীত। কিন্তু প্রফুল্লকুমারের মহৎ জীবন সাধনার ধারা এখনও প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ নানাভাবে আমাদের মধ্যে প্রবহমান। তাই তাঁর বিচ্ছেদবেদনাতেও আমাদের এই সান্ত্বনা ও গৌরব যে মৃত্যুতেই তাঁর জীবনাদর্শ, তাঁর আরব্ধ কর্মের প্রেরণা ও প্রভাব নিঃশেষিত হয়নি।

একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক এই মানুষটির আদর্শ-নিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ। ধনমান অথবা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা কখনও প্রভাবিত হয়নি। জাতীয় জাগরণের প্রথম পর্বে তরুণ প্রফুল্লকুমার ভারতের যে ধ্যান-মূর্তি তাঁর হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই সাধনায় তিনি তদগতভাবে আজীবন ব্রতী ছিলেন। একদিকে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-পিপাসা, অন্যদিকে গভীর দেশপ্রেম এবং সমাজহিতৈষণা প্রফুল্ল-কুমারের চরিত্রে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিল। যার ফলে সাংবাদিকতায় প্রফুল্লকুমার অনায়াসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদাশীল অথচ বিপুল শক্তিশালী ঐতিহ্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রফুল্লকুমার তাই শুদ্ধমাত্র সংবাদপত্র-সেবী নন, তিনি সেই বিরল শ্রেণীর ভাবসাধক সংবাদপত্রকে যিনি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠা করে জনচিত্তকে নৈতিক বলে বলীয়ান করার কাজে অতুলনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেন। প্রফুল্লকুমারের এই সাংবাদিক সাফল্য আজ ইতিহাসের সামগ্রী, কিন্তু তাঁর বক্তব্য ও বাচনভঙ্গী, তাঁর স্বচ্ছ সমাজ সচেতন চিন্তাধারা ও রচনানৈপুণ্য এখনও শ্রদ্ধাসহকারে অনুশীলনযোগ্য।

লৌকিক সাফল্য সাংবাদিক প্রফুল্ল-কুমারের জীবনের একটি দিকমাত্র। তাঁর জীবন-সাধনা ছিল বহুমুখী। সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার যেমন ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের সর্ববিধ বাস্তব সমস্যা

আলোচনায় নিরন্তর আগ্রহী। তেমনি তাঁর সূক্ষ্ম কল্পনাশ্রয়ী মন সাহিত্য শিল্প সৃজনের প্রেরণাতেও স্বতই উদ্বুদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্লকুমারের উপন্যাস-গুলি এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ কেবল সুলিখিত ও সুখপাঠ্য নয়, তাঁর প্রতিভাগুণে এখনও সেগুলির তাৎপর্য এবং আবেদনক্ষমতা অক্ষুণ্ণ। সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং অবিস্মরণীয় প্রফুল্লকুমারের চরিত্রমাধুর্য। প্রতিভা ও পৌরুষ তাঁর স্বভাবলব্ধ; খ্যাতি ও ক্ষমতা তাঁর একান্ত অধ্যবসায়বলে অর্জিত, কিন্তু সবার উপরে তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা, হৃদয়ের ঔদার্য এবং বৈষ্ণবীয় বিনয়-নম্র প্রীতি ও মমত্ববোধ যার অনির্বচনীয় প্রভাব আজও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে অনুভব করি; অনুভব করি এবং তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য জানাই।

নববর্ষ

পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালীর নববর্ষ শুরু। নববর্ষ যেমন নূতনকে অভ্যর্থনা, তেমনি পুরানোকে বিদায়ও। পয়লা বৈশাখের এই বর্ষবোধনের সঙ্গে আমাদের অন্তরের আত্মীয়তা যে কতকালের তা জানা নেই। শুদ্ধ এইটুকু জানা-ই যথেষ্ট যে, কালচক্রের আবর্তনে দিন ক্ষণ পল গণনার হিসাবে যদিও সব দিনই সমান, তবু এক একটি দিন মানুষের লৌকিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় তার অসামান্য মাহাত্ম্য ও মাধুর্যে প্রোজ্জ্বল। তেমনি একটি দিন আমাদের কাছে পয়লা বৈশাখ।

বাঙ্গালীর জীবনে অন্যতম প্রধান উৎসব এই পয়লা বৈশাখের বর্ষবোধন। বৈশাখী নববর্ষ উৎসব একান্তভাবে বাঙ্গালীর বড় আদরের অনুষ্ঠান। বিলিতি নববর্ষের সঙ্গে আমাদের জন-জীবনের অন্তরঙ্গতা নেই, নেই কোনো ঐতিহ্যগত তাৎপর্য। আবার আমাদের রাষ্ট্রিক নববিধানে বর্ষারম্ভ গণনা এমন একটি মাসের প্রথম দিন থেকে যার সঙ্গে বাঙ্গালীর বর্ষবোধন উৎসবের আনন্দকে সংযুক্ত করা কল্পনাতীত। পয়লা চৈত্র রাষ্ট্রিক নববিধান অনুযায়ী বর্ষারম্ভ। অথচ বাঙ্গালীর কল্পনায়, আচারে অনুষ্ঠানে চৈত্রের সুর হল আবহমানকাল ধরে সমাপ্তির বিরাগের ও বিদায়ের। চৈত্রে বিদায়ের বাঁশী, বৈশাখে আবাহনের: বাঙ্গালী জীবনধারার এই পর্বান্তর শুভ পয়লা বৈশাখে আমাদের চেতনায় যত গভীরভাবে রংএ রসে উজ্জ্বল, তেমনিটি আর কোন দিনই নয়।

বৈশাখের বর্ষবোধন ওতপ্রোত হয়ে আছে আমাদের কল্পনায়, কাব্যে ও সঙ্গীতে, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের বিচিত্র সমারোহে: আর বৈশাখী প্রকৃতির অগ্নিস্নাত নব-অভিষেকে। যে উচ্ছ্বাস কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় রক্তিম প্লাবনে, যে-প্রতিশ্রুতি আম্র-পল্লবের চিকণ লাবণ্যে তারই ছোঁয়া লাগে বৈশাখী নববর্ষে আমাদের কর্মে ও কল্পনায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে।

বৈশাখে আমাদের নববর্ষের উদ্বোধন আরো আনন্দের, কারণ এই বৈশাখেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বৈশাখের দগ্ধতাম্র আকাশের দীপ্তিকে যে-কবি অনন্ত মাধুর্যে মণ্ডিত করেছেন, যাঁর শুভ জন্মলগ্নের বার্তা বহন করে বৈশাখ ধন্য হয়েছে, তাঁরই অপরূপ ভাষায় নববর্ষকে প্রণতি জানাই, "হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ তোমাকেই প্রণাম করি।"

"ও, আপনি বাংলার 'মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি যেতে চান? সোজা দিল্লি গিয়ে 'বাঁ' পথে মোড় নেবেন।"
দিল্লি
পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষেরই হবার সম্ভাবনা
মেদিনীপুর দল
তপশীলী
পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা আরো বাড়বে।
'মাছ যদি দেখেছে কোথাও-'
নতুন সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানে নির্বাচন শুরু হয়েছে
আয়ুব
স্বঃ পাক
নতুন সংবিধান
আলাদিনের প্রদীপের কাহিনী
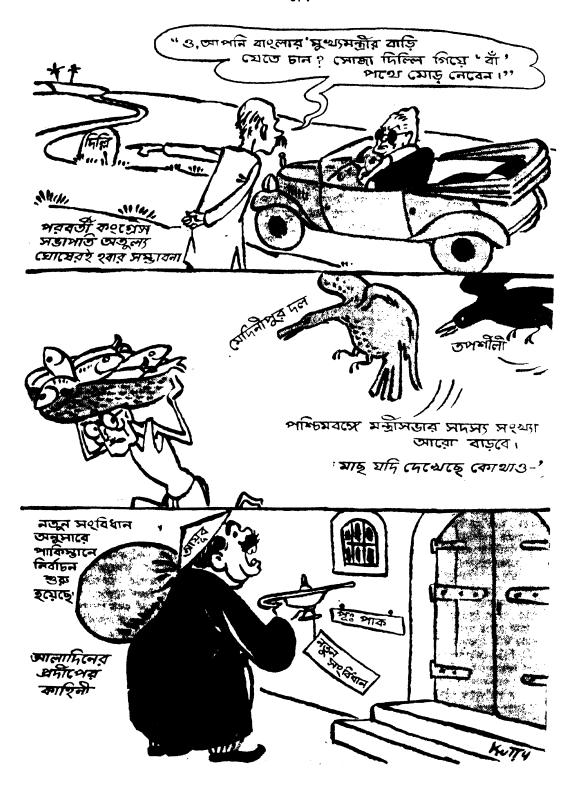
উনিশ শো চুয়ান্ন সালের ভারত-চীন চুক্তির মেয়াদ কাগজপত্রে শেষ হবে জুন মাসে, কিন্তু আসলে সে চুক্তি অনেক আগেই খতম হয়ে গেছে। পিকিং সরকার আবার চুক্তি করার জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার প্রস্তাব করেছিলেন। ভারত সরকার তাতে "না" বলে দিয়েছেন কারণ যতদিন পর্যন্ত চীনাদের আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তনের কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায় ততদিন পর্যন্ত নূতন চুক্তির আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ "বৈদেশিকী"তে পূর্বে করা হয়েছে। তারপরে চীনা সরকারের আর একটি প্রস্তাবও ভারত সরকার নাকচ করে দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। পিকিং সরকারের সেই প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, পুরো চুক্তিটা নাই হোক, চুক্তির ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত সর্তগুলিকে জীইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হোক।

ভারত সরকারের লিখিতপড়িত উত্তর এখনও যায়নি কিন্তু সে উত্তর কী হবে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যে-সীমানা লঙ্ঘন করে চীনারা ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করে বসে আছে সেই সীমানার উপর দিয়ে চীনাদের সঙ্গে ব্যবসা চালাবার আগ্রহ ভারতের নেই। পরস্পর পরস্পরের সার্বভৌমত্বের সম্মান রক্ষা করে চলবে, একে অপরের "রাজ্যের অঙ্গহানি করবে না" —এইটাই ছিল যে-চুক্তির উপক্রমণিকার মূল কথা সেই চুক্তির আংশিক পুনরুজ্জীবনও সম্ভব নয়, যতদিন পর্যন্ত চীনারা ভারত-ভূমির কয়েকটি বৃহৎ খণ্ড জবরদস্তি দখল করে রয়েছে। তাছাড়া, গত দু-তিন বছর যাবৎ চীনারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নানা-ভাবে উৎপীড়িত করেছে। ১৯৫৪ সালের চুক্তিতে তিব্বতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংরক্ষণের যে-সব সর্ত ছিল সেগুলি চীনারা পালন করেনি। ভারতীয় ব্যবসায়ী-দের চীনারা কেবল নিজেদের স্বার্থসাধনের কাজে কীভাবে লাগানো যায় সেই চেষ্টাই করেছে। তিব্বত অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যে-ব্যবসাটুকু চলেছে তার ধরণটাই চীনারা এমন করে দিয়েছে, যাতে চীনাদের স্বার্থই কেবল সাধিত হচ্ছে। ঐ ব্যবসা যদি বন্ধ হয় তবে চীনাদেরই একটু অসুবিধা হবে। সুতরাং এই ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতের দিক থেকে গরজ নেই। অবশ্য ১৯৫৪ সালের চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও এবং নূতন চুক্তি না হলেও ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে তা বলা যায় না। ব্যবসা চলে এটা যখন চীনাদেরই স্বার্থ, তখন চুক্তি না থাকলেও হয়ত যেমন চলছে তেমনি চলবে।

• • •

সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন এক বক্তৃতায় বলেছেন, "ভারতের কূটনীতি সফল হয়েছে, আমরা চীনকে একলা—"আইসোলেট্"—করে দিয়েছি।" চীন আজ বাহ্যত অনেকটা একলা বটে কিন্তু তার জন্য ভারত সরকারের কূটনীতির কৃতিত্বের বড়াই করার কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ কূটনীতির দিক থেকে চীনারাই ভারত সরকারকে কয়েক বছর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। তিব্বতের স্বাধীনতা চীনারা নষ্ট করল। প্রথমে একটু প্রতিবাদ করতে গিয়ে শ্রীনেহরু ধমক খেয়ে

চুপ করে গেলেন। তারপর "হিন্দী-চীনী ভাই ভাই"-এর পাল্লা চলল। তিব্বতের স্বাধীনতার মৃতদেহের উপর "পঞ্চশীলের" পতাকা উঠল। তারপর ভারত সরকারের স্বপ্নভঙ্গের পালা। এই তো আমাদের কূটনৈতিক সাফল্যের ইতিহাস।

যখন থেকে কম্যুনিস্ট চীনা সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে প্রকাশ্যে বিবাদ আরম্ভ হল, তারপর চীনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কাদিতে কিছু এদিক-ওদিক হয়েছে বটে, কিন্তু ভারত সরকার কূটনৈতিক চালের দ্বারা চীনকে "আইসোলেট" করতে পেরেছেন এরূপ দাবি করার পক্ষে কী যুক্তি আছে বুঝা যায় না। আমাদের কূটনৈতিক-দের কৃতিত্বের কথা উঠলে তো মনে পড়ে যে, যখন নাকি পিকিংএ অবস্থিত ভারতীয় রাজদূতের মারফৎ লণ্ডন, ওয়াশিংটন পিকিং সরকারের মনোভাব জানতে পার-ছিলেন তখন ভারতবাসীরা জানতে পারেনি যে, ইতিমধ্যে চীনারা ভারতে প্রবেশ করে, রাস্তা বানিয়ে, কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করে নিয়ে বসেছে। এই ব্যাপারে জানাজানি হবার পরেও—ভারত এবং পিকিং সরকারের মধ্যে খোলাখুলি বিবাদ চলতে শুরু হবার পরেও—চীন এবং ভারতের প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলিতে চীনের প্রতি বিরূপ এবং ভারতের প্রতি অনুকূল ভাব বৃদ্ধি করানোর দিক থেকে ভারত সরকারের কোনো কূটনৈতিক সাফল্যের প্রমাণের খোঁজ আমরা পাই না। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও কোনো কোনো অঞ্চলে চীনা কূটনৈতিক তৎপরতার কথা শুনা যায়, তার তুলনায় ভারতের পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু হচ্ছে বলেও বোধ হয় না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যারা পূর্বে কম্যুনিস্ট চীনের বিরোধী ছিল তারা এখনো আছে, তার জন্য ভারত সরকারের কোনো কূটনৈতিক কৃতিত্ব নেই, বরঞ্চ উল্টোটাই বলা যায়। অতীতে কয়েক বছর ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের জন্য ওকালতিই করেছেন। সেই ওকালতি যে সফল হয়নি তার জন্য বোধ হয় ভারত সরকারই এখন কৃতজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের অবস্থিতি সম্পর্কে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে সেটা হচ্ছে কম্যুনিস্ট ব্লকের অভ্যন্তরে সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনের সম্পর্ক সম্বন্ধে। এই পরিবর্তনের স্বরূপ এবং পরিধি সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। নানা পণ্ডিত নানা রকম ব্যাখ্যা করছেন। তবে এই দুই বৃহৎ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে যে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে কম্যুনিস্ট চীন ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হয়ত আর নেই। সেদিক দিয়ে কম্যুনিস্ট চীন আগের চেয়ে কিছুটা একলা হয়েছে, কিন্তু যতটা একলা হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন হয়ত ততটা নয়। এই প্রশ্নের পরীক্ষা হয় এমন একটা আন্তর্জাতিক সংকট উপস্থিত হলে অবস্থাটা বুঝা যাবে। যাই হোক কম্যুনিস্ট চীন ও রাশিয়ার মধ্যে যদি কোনো ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সে রাশিয়া এবং চীনের নিজেদের দোষে বা গুণে, ভারত সরকারের কোনো কূটনৈতিক চালের দ্বারা সেটা হয়েছে অথবা তাতে কোনো ইতরবিশেষ হয়েছে এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই।

চীনের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে স্বভাবতই রাশিয়া অন্যত্র বন্ধুত্বের পরিসর বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করবে। সেদিক দিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে রাশিয়ার দোস্তি বৃদ্ধির পক্ষে এটা নিশ্চয়ই সুসময়। পশ্চিমাশক্তিরা যে ভারতকে সাহায্য দিতে চায় তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, তারা চীনের অতি বাড়ের ভয়ে ভীত। কম্যুনিস্টবিরোধী পশ্চিমা শক্তিদের মনে চীন সম্বন্ধে একটা ভয় কাজ করেছে, এখন কম্যুনিস্ট রাশিয়ার মনেও চীন সম্পর্কে একটা ভয় কাজ করতে শুরু করেছে। কিন্তু ভয়ের কারণ উভয় ক্ষেত্রে এক নয় এবং ভয় থেকে যে কার্যের বা নীতির উৎপত্তি হবে তাও উভয় ক্ষেত্রে একরকম হবে না।

তবে এর ফলে উভয় দিকের মিত্রগোষ্ঠীর মধ্যে তথা "নিরপেক্ষ"দের মধ্যে কিছুটা নড়াচড়া এবং টানাটানি চলবে। রাশিয়ার সঙ্গে চীনের মতবিরোধ যদি থেকে যায় তবে "নিরপেক্ষ"দের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ হয়ত একটু বাড়বে। "নিরপেক্ষ" হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশই কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের প্রভাব বা ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে না। সেইজন্য ভারত-চীন বিবাদে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির একটিও খোলাখুলি-ভাবে ভারতের অনুকূলে কোনো ভাব প্রকাশ করতে পারেনি। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার ব্যবধান যদি থেকে যায় এবং স্পষ্টতর হয় তবে হয়ত সেদিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি আগের চেয়ে একটু বেশি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারবে। কিন্তু এ সকলের জন্য এখন পর্যন্ত ভারত সরকারের কোনো কূটনৈতিক কৃতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং সুযোগ এলে সে-সুযোগের যে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হবে সে সম্বন্ধেও অতীত অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য বা আশাব্যঞ্জক নয়। তবে ভারত সরকারও ঠেকে শিখতে পারেন। কিন্তু যাঁরা সুস্পষ্ট বিফলতাকেও সফলতা বলে চালিয়ে দিয়ে তাই নিয়ে বড়াই করতে লজ্জাবোধ করেন না, তাঁদের শিক্ষাগ্রহণের শক্তির উপর পুরো ভরসা রাখা কঠিন।

• • •

সিরিয়ার কাহিনী আর একটু এগুলে, আগামী সপ্তাহে ধরা যাবে। ইতিমধ্যে "ইরিয়ানের" মামলার গতিটাও আর একটু স্পষ্ট হতে পারে। "গেরিলা" যুদ্ধের সংবাদটাই আসল সংবাদ বা ইউ এন প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে মিটমাটের আলোচনা চলার সংবাদটাই আসল সংবাদ তা এখনও বুঝা যাচ্ছে না।

৮-৪-৬২

অন্যমনস্ক

বাতায়নিক

রোজ বিকেলে আমার মত অনেকেই বোধ হয় আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে আকুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। তাকিয়ে হতাশ হচ্ছেন। কোথায় সে আকাশের প্রান্ত ছিঁড়ে হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে হানা-দেওয়া হস্তী-যূথের মত কালো মেঘের দঙ্গল, কোথায় কালবৈশাখী! আকাশ যেন ওসব বন্য উন্দামতা ভুলে গিয়ে শান্ত সংযত শহুরে নির্জীব হয়ে গেছে। কলকাতার শহর গঙ্গা পেরিয়ে ও গঙ্গার দুই তীর ধরে কারখানার ধূমেল বন্ধ্যাত্ব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছে। দুরন্ত মেঘের পালকে প্রলুব্ধ করবার মত অরণ্যভূমি আর নেই বললেই হয়। কালবৈশাখী তাই বুঝি দুর্লভ হয়ে এল। দারুণ তাপদাহের সে উত্তেজনা-স্পন্দিত শান্তির বদলে আছে বটে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের নিরবচ্ছিন্ন আরাম ভাগ্যবানদের জন্যে। কিন্তু সে কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে তপ্ত দিনের দুঃসহ জ্বালা শুধু দুর্বার ভয়াল কালবৈশাখীর ঝটিকাতেই জুড়োতে চায়, এমন নির্বোধও আছে। তাদের ছলনা করবার জন্যে সেদিন সকালে আকাশের গায়ে মেঘের পাতলা প্রলেপ কোথাও কোথাও লেগেছিল। সে-মেঘ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলেও সন্ধ্যার দিকে উত্তর-পশ্চিম কোণে বিদ্যুতের ঝিলিকও দেখা গেছল কবার। এ শুধুই নির্মম মিথ্যা ছলনা হয়ত নয়, কারখানার চিমনির ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে ধুলোর ঝড়ে দিগ্বিদিক ঢেকে বিদ্যুৎ-চমকিত বজ্রঘোষিত কালবৈশাখী একদিন হয়ত সত্যিই না এসে পারবে না। ধৈর্য ধরে সেই সশীকরাম্ভোধর মত্তকুঞ্জরস্তড়িৎ পতাকোঽশনি শব্দমর্দলঃ সমাগতো রাজবদুদ্ধত দ্যুতি-র প্রতীক্ষায় রইলাম।

ভূত প্রেতের অস্তিত্ব মানুন বা না মানুন, ছাপাখানার ভূতকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। সে যে আছে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ নিত্যই যে-কোন বই কাগজ খুললে পাওয়া যায়।

সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভূতযোনির এই কৌলীন্যহীন ক্ষুদে প্রতিনিধিটি বনেদী ভৌতিক স্বভাব পায়নি। হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে সে মানুষের ক্ষতি করে না, ভয়ও দেখায় না কাউকে। তার একমাত্র আনন্দ মানুষের মুদ্রিত ভাষা নিয়ে কৌতুক করা। একটি অক্ষরের হেরফের কিংবা একটি

ফুটকি কি দাঁড়ি-কমা নড়চড় করে' কি উপভোগ্য রসসৃষ্টি সে যে করতে পারে, সমস্ত মুদ্রিত ভাষাতেই তার অসংখ্য উদাহরণ বর্তমান।

ছাপাখানার ভূতের সে রসিকতার ফর্দ এখানে দাখিল করতে অবশ্য বসিনি। সম্প্রতি আমার ওপর তার সামান্য একটু উপদ্রব যা হয়েছে, তারই কথায় বলছি। এ উপদ্রব ঠিক সুস্পষ্ট রসিকতার পর্যায়েও বোধহয় পড়ে না। আমায় নিয়ে উচ্চহাস্য সে করেনি, মুদ্রিত অক্ষরের জগতে আমরা যে কি অসহায় ও তার প্রতাপ যে কতখানি, তাই বুঝিয়ে দিয়ে একটু মুচকি হেসেছে মাত্র।

ব্যাপারটা সামান্য একটা শব্দ নিয়ে। গতবারের 'অসংলগ্ন'-এ 'অর্সেছে' বলে একটা শব্দ এক জায়গায় ব্যবহার করেছিলাম। এই শব্দটির প্রতি ছাপাখানার অশরীরী আত্মা যে বিরূপ, তা আর কেমন করে জানব! জানতে পারলাম, আমার সমস্ত আগ্রহ ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এ-শব্দটিকে কোনমতে মুদ্রিতরূপে দেখতে বিফল হয়ে। কোন দুর্জ্ঞেয় ভৌতিক ভেল্কীতে শব্দটির চেহারা কাগজের ওপর সিসের হরফের ছাপ পড়াতেই যেন বদলে গেল।

প্রথমবার প্রুফ দেখবার সময়ই এ-পরিবর্তনটি চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম, 'অর্সেছে' শব্দটি সেখানে 'এসেছে' রূপ ধারণ করেছে। আমার অপাঠ্য হস্তাক্ষরের গুণে এটি কম্পোজিটারের স্বাভাবিক ভুল বলে ধরে নিয়েছিলাম নিজের নির্বুদ্ধিতায়। যথারীতি সযত্নে ও সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে ভুলটি সংশোধন করে এই ভেবে নিশ্চিন্তও হয়েছিলাম যে, আমার লিখিত নির্দেশ কোনমতেই আর বদলে যাবার নয়। কিন্তু সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকাটি হাতে নিয়ে নিজের রচনার ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। মুদ্রণের দিক দিয়ে আগাগোড়া যা নিখুঁত নির্ভুল, তার মধ্যে ওই 'অর্সেছে' শব্দটির শুধু বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সমস্ত সংশোধনের চেষ্টাকে উপেক্ষা করে শব্দটি যথাপূর্বম্ 'এসেছে'-রূপেই মুদ্রিত হয়েছে।

'অর্সেছে' ও 'এসেছে'র মধ্যে তফাৎ যতই থাক, ভুলটা এমন সাংঘাতিক কিছু নয়, যেমন তেমন একটা মানে তা থেকে টানা যায়। তাছাড়া, অপ্রস্তুত বোধ করবার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য কৌতুকও তার দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। তাই ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত না হয়ে নিজের এই যৎসামান্য দুর্ঘটনা থেকেই বরং অপরের ভুলের বিচারে আর-একটু উদার হবার দীক্ষাই বোধ হয় পেয়েছি।

সম্প্রতি এদিক-ওদিকে কয়েকটি বই কাগজে জাজ্জ্বল্যমান কিছু ভুল অমার্জনীয় মনে করে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা বোধ করেছিলাম বলেই বোধহয় নিজের ওপর ভাগ্যের এই মৃদু পরিহাস।

এখানে-সেখানে চোখে-পড়া ভুলগুলি অমার্জনীয় না হলেও কৌতুকপ্রদ সন্দেহ নেই। তার মধ্যে দু-একটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। কয়েকদিন আগে সুবিখ্যাত বনেদী খাস বৃটিশ পরিচালনাধীন একটি ইংরেজি দৈনিকে দেখলাম, পৃথিবীর দুটি প্রধান মহাসাগরই ওলটপালট হয়ে গেছে। একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো গুরুত্বের জন্যে বাক্সবন্দী একটি সংবাদে জানা গেল, ট্রিস্টান দা কুনহা নামে দ্বীপটি অতলান্তিকের দক্ষিণ থেকে সাংবাদিকের কলমের খোঁচায় কিংবা ছাপাখানার সেই প্রেতাত্মার কৃপায় সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে চালান হয়ে গেছে।

সুবিখ্যাত আর-একজন লেখকের ভ্রমণোচ্ছ্বাসে মেরুবলয়ের মধ্যে সেগুন গাছ বাড়তে দেখেও কম বিস্মিত হইনি। রাশিয়ার আর্কাঞ্জেলস্ক শহরটি মেরুবৃত্তের বাইরে বলেই জানতাম। ছাপার অক্ষরে সেটিকে মেরুবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত দেখে সত্যিই ধোঁকা লাগল। সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক কীর্তির কথা শুনি, কিন্তু আর্কাঞ্জেলস্ক শহরটি কবে তারা মেরুবৃত্ত অর্থাৎ Arctic Circle-এর বাইরে থেকে ভেতরে সরিয়ে পেতেছে, তার খবর পাইনি। বাড়িঘর সেখানে ভিৎশুদ্ধ উপড়ে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসানো হয় জানি, কিন্তু গোটা এই শহরটিকে তারা যদি মেরুবৃত্ত পার করে দিয়ে স্থাপন করে থাকে, তাহলে মেরুবলয়ের মধ্যে সেগুন গাছের বন সৃষ্টির সঙ্গে এ-কীর্তি তাদের প্রথম মহাশূন্য বিজয়কেও ম্লান করে দিয়েছে, সন্দেহ নেই।

প্রাজ্ঞ লেখকের পরিবেশিত এসব তথ্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করতে দ্বিধা হলেও অতিবড় রথী-মহারথী লেখকরাও যে কখনো কখনো ভুল করেন, একথা অসংকোচে বোধহয় বলা যায়। তা যদি তাঁরা না করেন, তাহলে 'আর্ষ প্রয়োগ কথাটারই প্রয়োজন হত না। সে যুগের সংস্কৃত ভাষার লেখকদের কথা ছেড়ে দিলাম, আমাদের এ যুগেও আর্ষ প্রয়োগের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাংলা ভাষার জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাঁর পক্ষে প্রায় অচিন্তনীয় ভুল করেই সর্জন শব্দকে সৃজন হিসেবে চালু করে গেছেন শুনেছি পাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রদোষ বলতে ভোরবেলা বুঝেছিলেন, এমন প্রমাণ নাকি তাঁর প্রথম দিকের রচনায় মেলে।

কিন্তু ভুল যদি-বা বলা যায়, এসব ভুল নিতান্ত ভাষার প্রয়োগ সংক্রান্ত। তথ্য সংক্রান্ত ভুল কিন্তু লেখকের অজ্ঞতা, আলস্য কি দায়িত্বহীন ঔদাসীন্যেরই প্রমাণ দেয়। ইতিপূর্বে চেঙ্গিস খানকে কোন লেখক যেন মুসলমান বলে বর্ণনা করেছেন শুনেছি। সম্প্রতি ইউক্রেনকেও ১৯৪০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে কোথায় যেন দেখলাম। লেখকেরা সবাই সব বিষয়ে সবজান্তা হবেন এমন উদ্ভট দাবি কেউ নিশ্চয় করেন না, কিন্তু যা তাঁরা বলেন, লেখেন, তার তথ্য-তারিখগুলো অন্তত পড়ে শুনে যাচাই করে নেবেন, এ দায়িত্ববোধটুকু লেখকদের কাছে আশা করা অন্যায় নয়। ঘটনাচক্রে ও নিজের অনামনস্কতায় এর চেয়ে গুরুতর ভুলের উদাহরণও স্বনামধন্য লেখকদের রচনায় অবশ্য বিরল নয়। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জি কে চেস্টারটন একবার Gray's Elegy'র একটি লাইন Shakespeare-এর বলে ভুল করে চালিয়ে দিয়েছিলেন। সে ভুল সংশোধনের বেলাতেও

মুদ্রাকর প্রমাদে, অর্থাৎ ছাপাখানার সেই প্রেতাত্মার কারসাজিতে টিমুর বানানে u অক্ষর e হয়ে যাওয়ায় তাঁকে বেশ লজ্জায় পড়তে হয়েছিল।

ভুলের কথায় সেই ছাপাখানার ভূতের কাছেই ফিরে এসেছি দেখা যাচ্ছে। ছাপাখানার যন্ত্রকে নেহাৎ নিষ্প্রাণ কল-কব্জা বলে অবজ্ঞা করতে কোথায় যেন সত্যিই বাধছে। কলকব্জার নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও আয়ত্ত করে বিশ্বজয়ের অভিযানে আমাদের যন্ত্রবাহিনীকে আমরাই চালাই, এই আমাদের অহঙ্কার। কিন্তু এক-এক সময়ে এযুগের ছেলে-ভোলানো কমিক-এর চিত্রকাহিনীতেও ভয়ঙ্কর সত্যের অস্পষ্ট ইঙ্গিত কিছু কিছু আছে বলে সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় যে, যন্ত্রের জগৎ আমাদের শাসন ছাড়িয়ে যাবার কী এক গোপন ষড়যন্ত্রে হয়ত লিপ্ত হতে শুরু করেছে। তুচ্ছ মুদ্রাকর প্রমাদ যাকে মনে করছি, তার মধ্যেই সেই চক্রান্তের প্রথম আভাস কৌতুকহাস্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, ভাবা কি নিতান্ত আজগুবী?

ছেলেমানুষী কৌতুক-কল্পনার একটি কমিক' দেখেই বোধহয় সম্প্রতি এই ধরনের আজগুবী ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরছে। প্রথমে হাতের ও তাই থেকে ক্রমে দেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাজ অনেক আগে থাকতেই যন্ত্রের ওপর আমরা চাপাতে শুরু করেছি এযুগে আমাদের মাথার কাজও যন্ত্রের ওপর চাপিয়ে সময়ের কি সুসার করছি, তা অনেকের বোধ হয় অজানা নয়। বিশেষ করে আধুনিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল অঙ্কের হিসাবে যন্ত্র ছাড়া আমাদের গতি নেই। একালের অবিশ্বাস্য যন্ত্র-শুভঙ্করেরা তিন মাসের অংক তিন মিনিটে না কষে দিলে মহাশূন্য বিজয়ের আশা ত বটেই, বিজ্ঞানের বহু অসামান্য কীর্তির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত হত। যে যন্ত্র এতদূর গুণতে শিখেছে, হঠাৎ কোনদিন ভাবতে শুরু করা কি তার পক্ষে অসম্ভব? এই মহা-গাণিতিক যন্ত্র-শুভঙ্করেরা গণনা ছেড়ে যদি ভাবতে শুরু করে, তাহলে কি তারা ভাববে? দিনের পর দিন মানুষের হুকুমে নীরস অংক কষার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবার কথা? মুক্তি পেলেই বা তারা করবে কি? মানুষের সংস্পর্শে এতদিন যা দেখে শুনে বুঝে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে ঘৃণায় তা পরিহার করে নিজেদের নতুন স্বর্গরাজ্য গড়বে? হয়ত তাই করতে চাইবে। কিন্তু তা করতে চাইলেও শুধু নির্ভুল ব্যবস্থা ও নিখুঁত শৃঙ্খলা হলেই কি চলবে! ক্ষুধা আর প্রেম, বেদনা হতাশা উল্লাস আর সৃষ্টির অতল রহস্যের তীরে দাঁড়িয়ে বিহ্বল বিস্ময় নতুন করে তাদের আবিষ্কার করতে হবে না কি?

সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ

'সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ' এই শিরোনাম দিয়ে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় 'দেশ' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তা নানা মহলেরই বিশেষভাবে পঠনযোগ্য। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও অন্নদাশঙ্করবাবুর উপসংহার সর্বজনগ্রাহ্য না হতে পারে, কিন্তু সভ্যতার সমকালীন সংকট যাঁরা তলিয়ে চিন্তা করবেন তাঁরা একথা অবশ্য বলবেন যে, এ একটি স্পষ্টতর চিন্তার চিত্র। আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকই আধুনিক সভ্যতার সংকট নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন বা কোন গভীরতম চিন্তা-চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকালের সমস্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা আদর্শগত মনোরেখা ধরে সাহিত্য-সৃষ্টির স্বধর্মকে পালন করতে ক্ষমতা রাখেন।

প্রবন্ধটি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার কথা আছে। প্রবন্ধের আরম্ভে অন্নদাশংকরবাবু রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উল্লেখ করে কবির শেষ জীবনের মোহমুক্তির যে আভাস দিয়েছেন তা যুক্তিযুক্ত। তারপর যুদ্ধ, মন্দা, ধনিকতন্ত্র, গণতন্ত্র, কমিউনিজম, সংঘ, রাষ্ট্র ও তারও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির উল্লেখ করে দীর্ঘ প্রবন্ধে অন্নদাশংকরবাবু চলে গেছেন প্রধানত রেনেসাঁসের যুগে, বলেছেন রেনেসাঁসের পুনর্বিন্যাসের সেই অতীত প্রস্তাবের কথা। তারপর ধর্মাচার্যদের 'দেশকালাতীত সত্যের অভিমুখে অগ্রগতির' কথাও বাদ দেননি এবং 'গাঁজা' বলেও উড়িয়ে দেননি। পার্থিব ঐশ্বর্যই যে সব নয় যেন স্বীকার করেছেন তা-ও। তারপর টলস্টয়-গান্ধীর ধ্যানধারণারও উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে ঠিক ওঁদের সমগোত্রীয় নন্ বলেছেন তা-ও। মধ্যযুগে কিম্বা বৌদ্ধযুগে যে হুবহু ফিরে যাওয়া চলে না, নিছক খৃষ্টানধর্মের অনুসরণও যে সম্ভবপর নয় বললেন সেকথা। বাকুনিন প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীদের ও মার্ক্স প্রমুখ সাম্যবাদীদের ভদ্রাভদ্র উপায়ে রাষ্ট্র করায়ত্ত-করণ প্রভৃতি নানা কথা উল্লেখ করে 'বর্তমান পরিস্থিতি'র জন্য ফলিত বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে 'জনক' 'জননী' আখ্যা দিয়েছেন তিনি। ইতিহাসের কোনো পুনরাবৃত্তি নয়, তার অগ্রগতিকেই তিনি স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে না, প্রবাদ বাক্য যাই বলুক। বিকল্প সমাজব্যবস্থা বা বিকল্প সভ্যতা এই দু হাজার বছরের মানব সভ্যতা অগ্রাহ্য করে নয়, একে আত্মসাৎ করেই বিবর্তিত হবে। রেনেসাঁসের পূর্ব ও উত্তর উভয় কালই তার অংগীভূত হবে। বিভিন্ন সভ্যতা তাতে স্রোত মেলাবে।"

এখন কথা হচ্ছে, অন্নদাশংকরবাবু ক্রমশ যেভাবে উপসংহারের দিকে এগিয়ে তাঁর শেষ কথা বলেছেন, তাতে তাঁর ঐ উক্তি না করেও উপায় নেই। আমরাও অনেকে অনেক কথা বলে শেষ পর্যন্ত রোগের ঔষধ হিসেবে একটা কিছু আধুনিকতম কমবায়োটিক বা পুরোনো মিকশ্চারই ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখি না। এ ঠাট্টা তামাসার কথা নয়, আসল সমস্যাটাই এই যে, বিকল্প কোনো নবতর সমাজ ব্যবস্থায় যদি বিভিন্ন সভ্যতার 'স্রোতকে মেলাতে' হয়, তাহলে দ্ব দ্বন্দ্ব ও কলহের সৃষ্টি হয় আজকের দুনিয়ার সভ্যতার দেহে সেই ক্রাইসিস। ফলিত বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করা চলে না, অথচ দেখা যাচ্ছে ফলিত বিজ্ঞানের জ্বালা বড় জ্বালা। প্রাচীন সেই বিবেক হৃদয়-বৃত্তি, মানবিকতা, সংবেদনা প্রভৃতি সমন্বিত সদাচারের আদর্শবাদ ত্যাগ করা চলে না, অথচ রাষ্ট্রাচার্যগণ প্রগতি ও সভ্যতার মূল্যমান নির্ণয়ে কালক্ষেপ করতে রাজি নন্ বা হতেও পারছেন না। তাঁদের অনেকের মুখের কথায় বা ভাষণে স্বাধীনতা ও মানবিকতার নানা সুবাস-সুগন্ধ থাকলেও সে আদর্শবাদের সংগে নিত্য একটা রফা করে শাসন-ব্যবস্থাপনার নিত্যকর্ম চালাতেই হচ্ছে। আমরা সব মৌখিক গণতন্ত্রীরা ভোট দিয়ে তারই তো সমর্থন জানাচ্ছি। হৃদয় শুকেলেও করুণাধারা নেই।

অন্নদাশংকরবাবু যুদ্ধের ও বিপ্লবের 'নৈতিক বিকল্প' জোগানের কথা বলেছেন। ঐ তো লাখ কথার এক কথা। ঐ নৈতিক বিকল্প ছাড়া সমকালীন সভ্যতার [illegible] তরংগ রোধ করা যাবে না। মানুষকে সেই নীতিজ্ঞাননিষ্ঠ হতে হলে [illegible] অনেক কিছু শিখতে হবে। অথচ কে বা শেখাবে, কে বা শিখবে, কোথায় সে ব্যবস্থাপনা, আবার কতজন বা জ্ঞান বুদ্ধি ও নীতি অনুসারে আচার-আচরণ করবে, কিভাবে বা আশু যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে—এ সবই গুরুতর সমস্যা। 'অভিনব ডাইনামিজমের' যেকথা অন্নদাশংকরবাবু বলেছেন, তা চাই ঠিকই। মানুষের শুভবুদ্ধির উপরই যে কবির ন্যায় আমাদেরও সকলেরই শেষ নির্ভর তাতে সন্দেহ কি! কিন্তু 'যাতে ইতিহাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিবেক দেহমন আত্মার পূর্ণতর সামঞ্জস্য সম্ভব' হয়, তা আমরা কোথায় কতদিন ধরে 'খুঁজতে' থাকবো সেই তো প্রশ্ন। তাহলে ব্যক্তি মানবের নিত্য কর্ম হিসেবে এই দাঁড়াচ্ছে না কি — আমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ববোধে, ইতিহাস ও দর্শন এবং বিজ্ঞানের সৃজনশীল জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজকল্যাণ, মানবকল্যাণ বা সমকালীন যে সিদ্ধান্তে বহুজনে একমত হবে পৃথক পৃথক ব্যক্তি-কর্তব্যে লিপ্ত থাকবো, তা যেন নির্ভয়ে সম্পাদন করবার নীতিজ্ঞান রেখে চলতে পারি। তবেই তো রেনেসাঁসের যুগের ন্যায় একটা নব জাগরণের ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তার লাভ করবে। সর্বোপরি প্রয়োজন সেই অকুতোভয়তা। তবেই 'জাগের' একটা পথ জেগে উঠতে পারে।

কার্তিক সমাজপতি
কলকাতা

'কেন রে বাঁশি বাজিস না?'

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বর্গত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় ছিলেন বঙ্গ সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অবদানের দরদী মর্মকথক। বাংলা সাহিত্যে সেজন্যে তাঁর একটি নির্দিষ্ট আসন ছিল এবং সেখানে তিনি অনন্য। তাই তাঁর মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত তাঁর স্থান শূন্য রয়েছে, ভবিষ্যতেও পূর্ণ হবে কিনা সন্দেহ। কারণ তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলে যা ছিল, সে বস্তু নিয়ে চর্চা করবার মতন সাহিত্যিকও দুর্লভ এবং খণ্ডিত বাংলায় সে পরিবেশেরও একান্ত অভাব। মনে হয় তাঁর সঙ্গেই প্রাচীন বাংলার এক মূল্যবান সম্পদের নব-রূপায়ন-কর্মের অবসান ঘটেছে।...

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১২৮৪—১৩৬৩

সাধারণত দক্ষিণারঞ্জনকে শিশুসাহিত্যের লেখক এবং তাঁর রচনাবলী শিশুসাহিত্য বলা হয়ে থাকে। এই আখ্যা যথার্থ কিনা বিবেচ্য। কারণ শিশু বা কিশোর-সাহিত্য তাঁর সাহিত্য জীবনের অন্যতম উপজীব্য ছিল, মূলে প্রেরণা নয়।

তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল—পল্লী বাংলার 'কথা সাহিত্য', সুপ্রাচীন বাঙ্গালী সংস্কৃতির এক লুপ্ত-প্রায় ধারা। শিক্ষিত সমাজে অপরিচিত, হয়ত বা অবজ্ঞাত, এই 'কথাসাহিত্যে'র নিদর্শনগুলি সাধারণ সাহিত্যের আসরে পরিবেশন করে দক্ষিণারঞ্জন বাঙ্গালী জাতির প্রতি এক স্মরণীয় কর্তব্য পালন করেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তিতে, আংশিক-ভাবে হলেও, পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বাংলার 'কথাসাহিত্যে'র চারটি বিভিন্ন রূপ।

বাঙ্গালী সংস্কৃতির নিজস্ব সম্পদ এই 'কথাসাহিত্য' চার ভাগে বিভক্ত : গীতি-কথা, রূপকথা, ব্রতকথা এবং রসকথা। এই সাহিত্যভাণ্ডারের বিপুল ঐশ্বর্যের দিকে দক্ষিণারঞ্জনের কবিমন আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার নব রূপায়নে সুদীর্ঘকাল তিনি একান্ত সাধনা করেছিলেন। এই বিরাট সাহিত্য জগতের পরিচয় দেওয়া কোন একক সাহিত্যিকের পক্ষে অসাধ্য এবং তাঁর বহু বছরের অনন্য আত্মনিয়োগের ফলেও তার সমগ্র রূপদান সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলীতে সেই সাহিত্যের অনেকখানি পরিচয় লাভ করা যায়, এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম এবং সার্থক। তাঁর বর্ণাঢ্য, কাব্যময় ভাষায় তার আংশিক রূপায়ন বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন বলে গণ্য হবার যোগ্য।

দক্ষিণারঞ্জনের রচনাবলী উক্ত কথা-সাহিত্যের চারটি বিভাগেরই পরিচায়ক। তাঁর 'দাদামশায়ের ঝুলি' গ্রন্থে গীতিকথা'র রূপ পাওয়া যায়। মালঞ্চমালা, পুষ্পমালা ইত্যাদি কাহিনীকে সাধারণত শিশুসাহিত্য বলা হইয়া থাকে। দক্ষিণারঞ্জনের ভাষা ও প্রকাশ-শৈলীর গুণে এর কোন কোন গল্প বা গল্পাংশ কিশোরদের হয়ত মনো-রঞ্জন করতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত গীতিকথা আসলে উচ্চাঙ্গের কথাসাহিত্য, রীতিমত উপন্যাস—রোমান্সও বলা যেতে পারে। গীতিকথার প্রাচীনতা এবং বৌদ্ধ লক্ষণাদি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর "বৃহৎ বঙ্গ" প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কথাসাহিত্যের 'ব্রতকথা' বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যে এবং এর বিষয়-বস্তুও নারীদের নিজস্ব। দক্ষিণারঞ্জন এই ব্রত কথাগুলির সংকলন করেছেন তাঁর 'ঠানদিদির থলে' পুস্তকে। বাংলার স্ত্রী-আচারের কথা বিশেষভাবে জানতে হলে এই মেয়েলী সাহিত্য অপরিহার্য। 'ঠানদিদির থলে'তে তিনি শুধু কুমারীদের করণীয় অনেক ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য—'ভাদুলি ব্রত।' এটি দক্ষিণারঞ্জনেরই প্রথম আবিষ্কার এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই দুই অঞ্চল থেকে আংশিকভাবে পেয়ে একত্র গ্রথিত করে-ছিলেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবাহিতা মেয়েদের ব্রতকথার সংগ্রহ আছে। কিন্তু সে খণ্ডের পাণ্ডুলিপি আজো অপ্রকাশিত আছে। এই সমস্ত ব্রতকথা সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর সস্নেহ তাড়নাতেই সেগুলি অনেকাংশে সংকলন করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। ব্রতকথা সংগ্রহের কাজে আর

একজনের সাহায্য, পরামর্শ এবং উপদেশের কথা শেষ বয়সেও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিসিমা—পরে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে।

কথাসাহিত্যের 'রূপকথা' বিভাগে আছে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য। এই বিভাগটি দক্ষিণারঞ্জন রূপায়িত করেছেন 'ঠাকুরমার ঝুলি' এবং 'চিরদিনের রূপকথা'য়। এই রূপকথাগুলি যথার্থ শিশুসাহিত্য।

কথাসাহিত্যের চতুর্থ বিভাগটি হল 'রসকথা।' রসকথার গল্পগুলির মধ্যে দস্তুরমত 'হিউমার' আছে এবং এগুলিকে বৈঠকী গল্পও বলা চলে। এই পর্যায়ের 'কথা' তিনি সংগৃহীত করেছেন 'দাদা-মশায়ের থলে' বইখানিতে।

এমনিভাবে দক্ষিণারঞ্জন কথাসাহিত্যের চারটি বিভাগের সঙ্গেই বাংলাসাহিত্যের পাঠক সাধারণকে পরিচিত করিয়েছেন। এবং প্রধানত 'কথাসাহিত্যে'র রূপকার রূপেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের মূল প্রেরণা ও সাধনা যে শিশুসাহিত্য নয়, তা তাঁর জীবনকথা থেকেও জানা যায়।...

১২৮৪ সালের ২রা বৈশাখ (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) ঢাকা জেলার সাভার-এর কাছে উলাইল গ্রামে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয়। তিনি রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং শ্রীমতী কুসুমময়ীর একমাত্র পুত্র।

উলাইলে তাঁদের আঠারো সরিকের অংশ নিয়ে যে নিষ্কর, বিরাট বাড়ি ছিল, ধলেশ্বরী নদী তার সমস্তই গ্রাস করেছে। এই মিত্র মজুমদার বংশ অতি প্রাচীন। তিনশ বছর আগে এই বংশীয় উদয়-নারায়ণের রাজা খেতাব ছিল এবং তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা ও চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের দৌহিত্রবংশীয় ছিলেন।...

দক্ষিণরঞ্জন বলতেন, তাঁর মাতৃকুলের সঙ্গেও প্রতাপাদিত্য-বংশের সম্পর্ক ছিল।

ন' বছর বয়সে দক্ষিণারঞ্জনের মাতৃ বিয়োগ ঘটে। ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত থাকায় তখনো পর্যন্ত লেখাপড়া বিশেষ আরম্ভ হয়নি। তার উপর জননীর মৃত্যুতে আরো বড় বাধা পড়ল। তাঁকে দেখাশোনা করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হল রমদারঞ্জনের ভগ্নী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণীর কাছে। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার দিকপাইত গ্রামে। নিঃসন্তান বিধবার আদরযত্নে তিনি বড় হতে লাগলেন, কিন্তু লেখাপড়ার কাজ পেছিয়েই রইল। পিসিমার স্নেহচ্ছায়ায় প্রায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত দক্ষিণারঞ্জন সেখানে থাকেন, মাঝে মাঝে স্কুল ইত্যাদির জন্যে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া। এঁর স্নেহে দক্ষিণা-রঞ্জনের শুধু যে মাতৃ অভাব পূর্ণ হল তাই নয়, তাঁর পরবর্তী সাহিত্য জীবনেও ইনি সর্বপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া অতি শিশুকাল থেকে মায়ের মুখে রূপকথা শুনে যে আগ্রহ ও আনন্দ জাগত তাঁর, পিসিমার কাছে তা চরিতার্থ হয়েছিল। ইনি অতি সুন্দর করে রূপকথা ও গীতি-কথা বলতে পারতেন, যার ফলে রূপকথা ও গীতিকথার প্রতি তাঁর মন সবিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

লেখাপড়ায় নানা বাধাবিপত্তির ফলে ষোলো বছর বয়সে তিনি প্রথম স্কুলে ভর্তি হন তখনকার সপ্তম শ্রেণীতে, ঢাকার জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানে তিন বছর পড়বার পর ফিরে এসে সন্তোষ
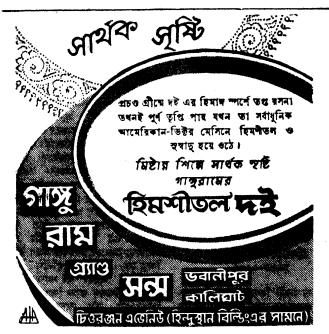
গ্রামে 'সন্তোষ জাহ্নবী হাই স্কুলে' পড়েন দু বছরের কিছু বেশী। এখানে তিনি স্কুলের বোর্ডিং-এ ছিলেন এবং এই বোর্ডিং জীবনে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে। একটি ছেলের কোন জিনিস চুরি যাওয়ায় বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সব ছাত্রদের জিনিসপত্র তল্লাস করেন এবং দক্ষিণারঞ্জনের বাক্স থেকে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। তখনকার কালে উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। যদিও দক্ষিণারঞ্জনের বয়স তখন ১৮।১৯, তবু তিনি এ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন এবং শাস্তি পেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। সেদিনকার শাস্তি-লাভ এবং শাস্তিলাভের কারণটির কথা মনে করে তিনি অতি দুঃখে ভেবেছিলেন—যদি বড় হয়ে সাহিত্যিক হতে পারি, ছেলেদের জন্যে লিখব। বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি সংগোপনে আগে থেকেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেছিলেন।...

একুশ বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ চলে আসেন এবং এখানে পাঁচ বছর বাস করেন। এখানে আসবার পরও তাঁর স্কুল জীবন চলতে থাকে এবং সাহিত্য জীবনও আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে। প্রদীপ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ইত্যাদিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে আসবার এক বছর আগে তাঁর প্রথম যে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তা' একটি কবিতা (প্রকৃতি')। সুতরাং দেখা যায়, তিনি কবিতা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন।

পিতা রমদারঞ্জন গঙ্গাবাসের জন্যে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন এবং নবাব বাড়ির বিপরীত দিকে দক্ষিণারঞ্জনকে নিয়ে থাকতেন। তিনিও কবিপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে ভালবাসতেন। তাঁর একটি ভাল লাইব্রেরি ছিল আর দক্ষিণারঞ্জনের সেখানে ছিল অবারিত দ্বার। পিতার কবি-স্বভাব, প্রকৃতি-অনুরাগ এবং সাহিত্যপ্রীতি দক্ষিণারঞ্জন স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেছিলেন। প্রকৃতি পরিচয়ের প্রথম পাঠও তিনি নেন পিতার কাছে। ছেলেবেলায় উলাইলে থাকবার সময় তিনি প্রতিদিন পিতার সঙ্গে নদীতে স্নান করতে যেতেন। নদীটি ছিল বাড়ি থেকে বেশ খানিক দূরে। যাতায়াতের পথে, নদীর ধারে চারিদিকের ফুল ফল গাছপালার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তিনি পিতার কাছেই লাভ করেছিলেন।...

মুর্শিদাবাদে বাসের সময় ১৩০৮ সালে (১৯০১ খৃঃ) তিনি "সুধা" নামে মাসিক-পত্র প্রকাশ আরম্ভ করেন এবং চার বছরের জীবনকালে পত্রিকাটি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর নিয়মিত লেখকবর্গের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি। দক্ষিণারঞ্জন লিখতেন কবিতা এবং নানাবিষয়ে প্রবন্ধ। 'সুধা'য় তিনি বাংলা-সাহিত্য সম্মেলনের এক পরিকল্পনাও প্রকাশ করেন। পত্রিকা মুদ্রিত করবার জন্যে তিনি প্রতি মাসে কলকাতায় আসতেন এবং ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে মুদ্রণ শেষ করে মুর্শিদাবাদ ফিরে যেতেন।

এইভাবে চার বছর চলবার পর মুর্শিদাবাদে পিতার মৃত্যু হলে তিনি পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে চলে আসেন ময়মনসিংহে, তাঁর পিসিমার কাছে। তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক "উত্থান" ইতিমধ্যে ১৯০২ খৃঃ) আত্মপ্রকাশ করেছিল। ময়মনসিংহে আসবার পরে পিসিমার জমিদারি পরিদর্শনের ভার পড়ল তাঁর উপর। এই কাজের জন্যে তাঁকে প্রায়ই দূরে গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করতে হত। জলপথে এবং স্থলপথে। কৈশোরের বহুকাল পরে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে তিনি ফিরে এলেন; এবার পূর্ণ বিকশিত মন নিয়ে।...

একদিন তিনি বজরায় চেপে চলেছিলেন এক নদীর উপর দিয়ে। তখন বিকালবেলা, সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। তাঁর বজরার কিছু দূর দিয়ে একটা পানসি উল্টো দিক থেকে এসে চলে গেল। পানসির মধ্যে কয়েকজন অতি মিষ্ট গ্রাম্য সুরে গান গাইছিল—সেই সুরের রেশ তাঁর কানে এল। বজরার ছাদ থেকে তিনি ভাল করে শুনলেন তাদের গান। নদীর বুকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে সেই উন্মুক্ত আবেগের সুর তাঁর প্রাণে অপূর্ব সাড়া জাগালে। তিনি সেই গান শুনে মুগ্ধ হলেন। সে গানের বিষয় ছিল একটি গীতিকথা। সেই গীতিকথার আবেদনে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। তার প্রভাব তাঁর জীবনে হল যুগান্তকারী। সেই গীতিকথার আকর্ষণ, সেই 'কথা' সাহিত্যের রসের আভাস সেইদিন থেকে তাঁর মনকে একমুখী করে দিলে। গীতিকথার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। পানসির লোকদের সম্বন্ধে খবর নিয়ে জানলেন, তারা তাঁর পিসিমার জমিদারিরই প্রজা। তাদের ডাকিয়ে আনালেন একদিন কাছারি বাড়িতে, গান শোনাবার জন্যে। কিন্তু সে বেচারীরা সঙ্কোচে রাজী হল না। তাদের হয়ত ভয় হ'ল, লেখাপড়াজানা বাবু তাদের গান শুনে ঠাট্টা তামাশা করবেন। তখন দক্ষিণারঞ্জন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সঙ্কোচ দূর করবার চেষ্টা করলেন। তাদের সঙ্গে পানসিতে ঘুরে বেরিয়ে তাদের মন জয় করলেন তিনি। তারা তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে তাদের জানা গীতিকথার কাহিনীগুলি একটির পর একটি তাঁকে শোনাতে লাগল। গীতিকথার বিশিষ্ট ভাষায় এবং পরিবেশে দক্ষিণারঞ্জন এবার তার আস্বাদ পেলেন।

এই ঘটনার আগে পর্যন্ত সাহিত্য বিষয়ে তাঁর প্রবণতা ছিল কবিতা এবং গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ রচনার দিকে। কিন্তু এইসব নিরক্ষর দাঁড়িমাঝিদের মুখে গীতিকথার সহজ, কাব্যময় এবং প্রাণস্পর্শী আবেদনে তাঁর সাহিত্যমানস এক নবরসে আপ্লুত হল। তিনি অনুভব করলেন—বাংলার এক অমূল্য সম্পদ অনাবিষ্কৃত ও অনাদৃত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে রয়েছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল, এই মুখে মুখে সংরক্ষিত সাহিত্যে বাঙালী জাতির এক বিশিষ্ট সম্পদ, সভ্য জগতের সামনে বাঙালীর এক গৌরবময় পরিচয় হিসাবে তুলে ধরবার যোগ্য এবং এই ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা তাঁর জীবনের প্রধান কর্তব্য। তারপর থেকে আরম্ভ হল তাঁর সাহিত্য পথে নতুন যাত্রা। ঢাকা ও ময়মনসিংহের অতি নিভৃত পল্লী অঞ্চলে নিরন্তর ভ্রমণ করে তিনি সঞ্চয় করতে লাগলেন কথাসাহিত্যের নানা নিদর্শন। প্রায় বারো বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর এই সংকলনের কাজ চলেছিল রীতিমত গবেষকের ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে
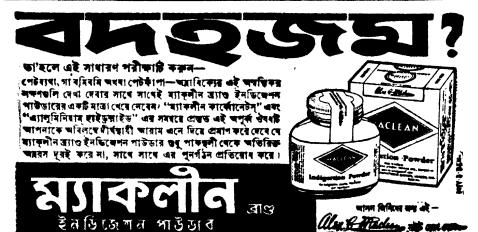
তিনি এই কাজে নিযুক্ত থাকেন বছরের পর বছর। এ শুধু গল্পগুলি শুনে তার অনুলিপি করা নয়। অনেক সময় একই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ তিনি পেতেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন এবং প্রয়োজন বোধে সংস্কার করে তাকে লিখিতরূপে সাজাতে হত। অনেক ক্ষেত্রে গল্প সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যেত না। সেজন্যে তিনি অতি যত্নে সেইসব ভাষা, ছন্দ, সুর এবং আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছিন্ন সূত্র যোজনা করতেন। তা ছাড়া কাহিনীগুলিকে বিষয় অনুসারে ভাগ করতে হত গীতিকথা, ব্রতকথা, রূপকথা এবং রসকথা বিভাগে।

এই সমস্ত রচনা এবং পরিমার্জনার কাজ চলত তাঁর পিসিমায়ের বাড়ির দোতলার নিরালা ঘরটিতে। 'কথা' সাহিত্যের রত্নচয়নে তন্ময় হয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করতেন, কাটাতেন গভীর বিনিদ্র রাত। এই সময়ে তাঁর পিসিমায়ের কাছে এই নতুন সাহিত্য প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহানুভূতি এবং গীতিকথা, ব্রতকথা সংকলনে নানাভাবে সাহায্য লাভ করেন।

একদিন দূর পল্লীতে সংগ্রহের জন্যে ভ্রমণ করবার সময় তিনি শুনলেন—কাছেই এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী থাকেন, অনেক গীতিকথা তাঁর কণ্ঠস্থ আছে। সন্ধান নিয়ে তিনি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা করলেন। একটি দ্বীপের মতন স্থানে টিলার মধ্যে গুহার ধরনের একটি ঘরে সন্ন্যাসিনী বাস করতেন। তখন তিনি অতি বৃদ্ধা, বয়স আশী পার হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন পর পর কয়েকদিন সাক্ষাৎ করে অনেক প্রাচীন গীতিকথা শুনলেন। বার্ধক্যের জড়তার জন্যে তাঁর সব কথা বুঝে লিখে নিতে অসুবিধা দেখে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি। একটা মামুলী ফনোগ্রাফ তৈরি করে নিয়ে যেতেন বৃদ্ধার কাছে এবং তাঁর কথা রেকর্ড করে এনে বাড়িতে reproduce করে শুনতেন আর লিখে নিতেন। ফনোগ্রাফের সরঞ্জামের মধ্যে ছিল সেকালের সেই চোঙা আর মোমে রেকর্ড করবার ব্যবস্থা। এই সন্ন্যাসিনীর মুখেই তিনি গীতিকথার typical ভাষার সন্ধান পান এবং মালঞ্চমালার কথাও এঁর কাছে প্রথম শোনেন। (মালঞ্চমালার কাহিনী এঁর কাছে অবশ্য সম্পূর্ণ আকারে পাননি; আরো কয়েক স্থান থেকে পরে সংগ্রহ করে মালঞ্চের 'কথা'র পূর্ণ রূপ লাভ করেছিলেন।) এই সন্ন্যাসিনীর মুখে যে প্রাচীন বাংলা ভাষার নমুনা পেয়েছিলেন ঠাকুরদাদার ঝুলি প্রথম সংস্করণে সেই ভাষা যথাযথ তিনি ব্যবহার করেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ("সাধারণী" সম্পাদক) প্রমুখ অনেকে সে ভাষাকে দুর্বোধ্য বলে বর্জন করতে বলেন এবং দক্ষিণারঞ্জন দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে সে ভাষা পরিবর্তন করেন। না হলে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব মুক্ত খাঁটি বাংলা ভাষার কিছু নিদর্শন আজো পাওয়া যেত।...

এমনিভাবে পল্লী বাংলার কথাসাহিত্যের নানা বিভাগের বেশ কিছু সঞ্চয় নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন কলকাতায় এলেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। তখন থেকে তিনি প্রধানতঃ কলকাতাবাসী হলেও মাঝে মাঝেই সংকলনের কাজে ময়মনসিংহ বা ঢাকায় যাতায়াত করতেন। কলকাতায় এসে গল্পগুলি তাঁর লিখিত, মার্জিতরূপে এবার পুস্তকাকারে প্রকাশের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময়ে এক মহা শিক্ষিত (ট্রিপল এম এ) ভদ্রলোককে তিনি 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন মতামতের জন্যে। ভদ্রলোক পড়ে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—"এ বই ছাপা হলে লোকে পাগল ভাববে না তো?"

তাঁর এই মন্তব্যের পর দক্ষিণারঞ্জন লজ্জায় আর কোন প্রকাশকের সামনে উপস্থিত হলেন না। তিনি স্থির করলেন, নিজে একটি প্রেসের পত্তন করে বই প্রকাশ করবেন। পিসিমায়ের কাছে সাহায্য নিয়ে এবং আর একজনের সহযোগিতায় কিনলেন একটি প্রেস। তখন তাঁর লেখা কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। এই সময় "পুষ্পমালা"র কাহিনী "ভারতী"তে প্রকাশিত হল এবং তার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহ লাভ করে মনে অনেকখানি ভরসা পেলেন। "ঠাকুরমার ঝুলি" যখন নিজের প্রেস থেকে ছাপাবার ব্যবস্থা করছিলেন তখন হঠাৎ একদিন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দক্ষিণারঞ্জন তখন কুমারটুলির বনমালী সরকার স্ট্রীটে থাকতেন এবং সেখানেই প্রেসের কাজ দেখতেন। তার কিছুদিন আগে 'সাহিত্য

পরিষদ পত্রিকায় বারোজন কবির মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ পড়ে দীনেশচন্দ্র সেদিন এসে উপস্থিত হলেন তাঁর দোতলার অফিস ঘরে। অন্ধ হরি-দাসের আর কোন রচনা তাঁর আছে কিনা দীনেশবাবু জানতে চাইলেন এবং পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে দক্ষিণারঞ্জনকে আগ্রহের সঙ্গে বললেন। কথা বলতে বলতে দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল টেবিলের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলির দিকে। জিজ্ঞেস করলেন—ওটা কি?

—ঠাকুরমার ঝুলি।

পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিয়ে দীনেশচন্দ্র পড়তে লাগলেন। তাঁকে দেখাবার ইচ্ছা ছিল না দক্ষিণারঞ্জনের। সেই ট্রিপল এম-এর মন্তব্য তখনো স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান থাকায় এ লেখা দেখাতে অতি সংকুচিত বোধ করছিলেন। কিন্তু দীনেশবাবুর আন্তরিকতা দেখে আপত্তি করতে পারলেন না।

খানিক পড়ে দীনেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন—এইসব গল্পের কি ব্যবস্থা করবেন, স্থির করেছেন?

—ভাবছি, এই প্রেসেই ছেপে নিজে বার করব। একটু সংকোচের সঙ্গে আস্তে আস্তে বললেন দক্ষিণারঞ্জন।

দীনেশচন্দ্র কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন—আপনি যে বাংলা দেশের কত বড় কাজ করেছেন, তা হয়ত জানেন না। বাংলা সাহিত্যে এরকমের বই একেবারে নতুন জিনিস হবে। শুনুন, আপনি নিজে ছাপাবেন না। কারণ তাতে এর প্রচার হবে না। আমি ভাল পাবলিশার ঠিক করে দিচ্ছি, সেখান থেকে বই বার করুন, লোকে জানতে পারবে।

তিনি ভট্টাচার্য সন্স-এর নাম করলেন, সেখান থেকে বই প্রকাশ করতে বললেন এবং সে বিষয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেইদিন থেকে যে দীনেশচন্দ্র উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন দক্ষিণারঞ্জনের অকৃত্রিম সুহৃদ। তাঁর প্রাণপ্রিয় বাংলার সংস্কৃতির একটি দিক নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সাধনার জন্যে তাঁকে অন্তরঙ্গ মনে করতেন দীনেশচন্দ্র। তারপর থেকে কথাসাহিত্য বিষয়ে যতগুলি বই দক্ষিণারঞ্জনের রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের আন্তরিক শুভকামনা মিশ্রিত ছিল। সাহিত্যজীবন থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি দীনেশচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ হিতার্থী মনে করতেন। দীনেশচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন শেষ দেখা করবার জন্যে। দক্ষিণারঞ্জন যখন তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে এসে উপস্থিত হলেন, সেন মশায়ের তখন কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল। আঙুলের সংকেতে তিনি জানিয়েছিলেন—চললুম।...

দীনেশচন্দ্রেরই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ "ঠাকুরমার ঝুলি"র ভূমিকা লিখে দক্ষিণা-রঞ্জনকে গৌরবান্বিত করেন। বইটি (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হলে দীনেশচন্দ্রের আশা সার্থক হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ('বন্দে মাতরম' পত্রিকায়) থেকে আরম্ভ করে বাংলায় অনেক মনীষী দক্ষিণারঞ্জনকে জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা।...

তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাংলাদেশে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল। বাঙ্গালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ আত্ম-প্রকাশ করছিল জীবন ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে। দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সে যুগের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করলে। কলকাতায় থেকে তিনিও নিজের জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন, "মা বা আহুতি" নামে স্বরচিত গানের ডালি প্রকাশ করে (১৯০৮ খৃঃ)। তাঁর এই গানগুলি সে সময় এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে এক সপ্তাহে ৩০০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়। এই সময় জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা "সারথী"র প্রধান সম্পাদকও হন দক্ষিণারঞ্জন। "সারথি"তে তাঁর অনেক রাজনৈতিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।...

তারপরের বছর (১৯০৯ খৃঃ) প্রকাশিত হল তাঁর আর একখানি বই, যা পরে বহু-বিখ্যাত হয়েছিল "বঙ্গোপন্যাস"—"ঠাকুর-দাদার ঝুলি।" দক্ষিণারঞ্জন এবার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীঅরবিন্দ ভিন্ন রমেশচন্দ্র দত্ত, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বাংলার সুসন্তান-বৃন্দ অভিনন্দন জানালেন দক্ষিণারঞ্জনকে। তাঁর "ঠাকুরমার ঝুলি" এবং "ঠাকুরদাদার ঝুলি" পাঠ করে একদিন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দক্ষিণারঞ্জন তখন ভবানীপুরে পদ্মপুকুর রোডে থাকতেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে বলেছিলেন—"একটা কাজ করেছেন।" কথাসাহিত্যের আরো কি কি সঞ্চয় দক্ষিণারঞ্জনের আছে, তারও খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন তিনি।

তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর (আর একজনের সহযোগিতায়) দুখণ্ডে রচিত "আর্যনারী" প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ঐতিহাসিক যুগের রানী ভবানী পর্যন্ত ভারতীয় নারীর পরিচয় কথা। 'আর্যনারী'র পর তাঁর মৌলিক শিশু-সাহিত্যে উল্লেখনীয় অবদান (এবং সম্ভবত বর্তমান কালের ছোটদের প্রথম উপন্যাস) "চারু ও হারু" ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকা-

প্রকাশ করে। তার আগে ছোটদের জন্যে তাঁর দুখানি বই—"খোকাখুকুর খেলা" ও "আমাল বই" প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর "ব্রতকথা—ঠানদিদির থলে" এবং "রসকথা—দাদামশায়ের থলে" যথাক্রমে ১৯১২ ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে তাঁর 'কথাসাহিত্যে'র চারটি বিভাগের পরিচয় দান সম্পূর্ণ করে। তাঁর বহু বছরের উদ্‌যোগ আয়োজন এবং আশা অনেকাংশে ফলবতী হল।

আগেই দেখা গেছে, 'কথা'-গ্রন্থাবলী ভিন্নও সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন। 'রসকথা—দাদামশায়ের থলে'র পর তাঁর সাহিত্যকৃতির নানামুখী পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, "পূজার কথা" (১৯১৮ খৃঃ), "ভাদ্র" ইত্যাদি কখানি বই। তারপর প্রধানত শিশুসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে। তাঁর "ফার্স্ট বয়", "লাস্ট বয়", "উৎপল ও রবি", "কিশোরদের মন", "বাংলার সোনার ছেলে" (রবীন্দ্রনাথের কথা), "পৃথিবীর রূপকথা" (সম্পাদিত), "সবুজ লেখা", "চিরদিনের রূপকথা", "আমার দেশ", "আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী" ইত্যাদি ছোটদের বই প্রকাশিত হয়ে শিশু-সাহিত্যেও তিনি বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করেন। এই বইগুলির মধ্যে "পৃথিবীর রূপকথা" অনুবাদ ও কথা-সাহিত্যের রূপকথা বিভাগের "চিরদিনের রূপকথা" ভিন্ন সমস্তই মৌলিক রচনা এবং সেসবের মধ্যে তাঁর কবিতা, গল্প, জীবনী, প্রবন্ধ, নাটিকা, গান, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিশুসাহিত্য রচনা আছে। মৌলিক রূপকথা রচনাতেও যে তিনি কেমন নিপুণ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর "সবুজ লেখা"র রূপকথা-গুলিতে। তাঁর রূপকথার প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি যেসব রূপকথা সংকলন করেছিলেন তা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের।

দক্ষিণারঞ্জনের ভাষার একটি প্রধান গুণ চিত্রময়তা এবং তার কারণ তিনি চিত্রকরও ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী। শিল্পকর্মে তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব ছিল। কথাসাহিত্য গ্রন্থমালায় তাঁর আঁকা অনেক ছবি স্থান পেয়েছে। তাঁর বিদ্যাশিক্ষা যেমন স্কুল কলেজের গণ্ডীর মধ্যে হয়নি, চিত্রণ শক্তিও তেমনি নিজেই অর্জন করে-ছিলেন তিনি। বিখ্যাত এবং অধুনালুপ্ত "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকায় তাঁর "অলক্ষিত চিত্রাবলী" প্রকাশিত হয়ে মৌলিকতার জন্যে প্রশংসা লাভ করেছিল।

আর একটি ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা তাঁর পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় অজ্ঞাত আছে। ১৯৩০ থেকে তিন বছর তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ সভাপতি ছিলেন এবং পরিষদের মুখপত্র "পথ"-এর প্রধান সম্পাদক। এই সময়ে পত্রিকাটিতে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং পরিষদের "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি"র সভাপতিরূপে বাংলায় বিজ্ঞানের অনেক পরিভাষা রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

জীবনের শেষভাগ তিনি যাপন করেন দক্ষিণ কলকাতায়, মনোহরপুকুর রোডের এক প্রান্তে। শেষ বয়সে নিদারুণ শোকের আঘাত উপর্যুপরি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। একমাত্র পুত্র রবিরঞ্জন, জামাতা (বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা) সুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরীর অকালবিয়োগ এবং তার আগে স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর অন্তর বিদীর্ণ করে দেয়। কিন্তু বাইরে থেকে তাঁর স্বভাবের সৌম্য প্রশান্তি ক্ষুন্ন হতে দেখা যেত না। সাহিত্যচর্চাও একেবারে পরিত্যাগ করেননি। স্নিগ্ধ মধুর সুরের ছোট ছোট কবিতা জীবনের শেষ দিকেও তিনি রচনা করে গেছেন।

মুখে সৌজন্যের অমলিন হাসি, চোখে চিরকৈশোরের সরল স্বপ্ন, সেই সহৃদয় কবিপ্রাণ শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল তাঁর।

তারপর ১৩৬৩ সালের শেষ দিকে একদিন তাঁর সমস্ত সুখ দুঃখের অবসান ঘটল। স্তব্ধ হয়ে গেল কথাশিল্পীর জীবন। রুদ্ধ হয়ে গেল বাংলার এক সুমিষ্ট সুরের বাঁশী।...

"কেন রে বাঁশি বাজিস না?
আজি বারে বারে,
শুনতে কে পারে?
যে শোনে সেই সুর—
বুকে তার ঢেউ তোলে তের নদী সাত
সমুদ্দুর।"

হিন্দু ও বৌদ্ধদের অন্যতম পীঠস্থান গয়া। হিন্দুদের কাছে স্থানটির গুরুত্ব স্বর্গত পিতামাতার আত্মার শান্তি কামনার্থে পিন্ডদানের জন্য। ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের স্থানরূপে গয়া সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের কাছেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান। শিব এবং বুদ্ধ, উভয়েরই পূজা করতে প্রতি বছর অগণিত লোকের আগমন ঘটে।

১। রামশিলায় শিবমন্দির—পিছনে ফল্গু নদী; ২। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম—যে বৃক্ষের নীচে বসে বুদ্ধ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন; ৩। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধনা-স্থল—আকাশগংগা ও পাতালগংগা পাহাড়; ৪। পিতৃপুরুষের পার্বণ শ্রাদ্ধ; ৫। ফল্গুধারা।

আলোকচিত্রশিল্পী

কানাইলাল বসু
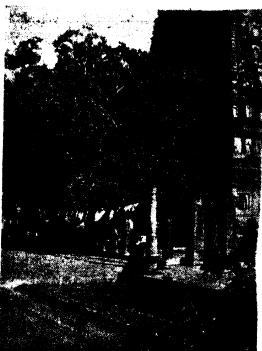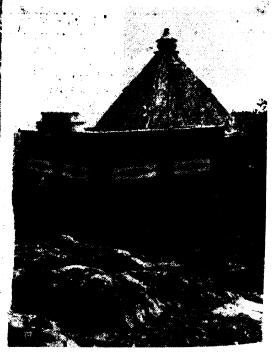
তর্জনী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো......কখনো বলবে না......
কাকে......তুমি ভয় দেখাও কাকে......
আমি অনায়াসে সব ভেঙে ফেলতে পারি......
মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারি সবকিছু......
বাঁ পায়ের নির্দয় আঘাতে আমি সব
মুছে ফেলতে পারি......
তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো......কখনো বলবে না......

ভীষণ চমকিয়ে দিয়ে দশটার এক্সপ্রেস চলে গেল।
পরক্ষণে পৃথিবী নীরব।
তারের উপরে বাজে হাওয়ার শাণিত ভাষা, আর
মিলায় চাকার শব্দ......তর্জনী দেখিয়ে কেন......
তর্জনী দেখিয়ে কেন......
যেন-বা হুড়মুড় শব্দে স্বপ্নের বাড়িটা
ভেঙে পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিয়ে এখন আবার
অতল নয়নজলে জেগে রয়।

দু'টি কবিতা

মৃগাঙ্ক রায়

১

একটি রাস্তার খণ্ড দৃশ্য
জানালার সামনে: কিছু গাছ,
আলোকস্তম্ভ, ট্রামের ঠনঠন।
কয়েকটি ভিক্ষুক ক্রমাগত
জিহ্বাকে আছড়ে আছড়ে একই শব্দ এবং
সুর নিষ্কাষণ করে। এক একটা দিন
রোজ সেই দৃশ্যের অভ্যন্তরে
মূর্খের মত পাক খায়, এক পায়ে,
নিখুঁত এবং অবশেষে
লটকে থাকে গাছের ডগায় পশ্চিমে
কাটা লাল ঘুড়ির মত॥

২

মধ্যরাতে ট্রেনের বৃংহতি,
হাওয়ার পিঠে পর্দার ফুল,
দেয়াল থেকে আরও অনেক দেয়াল
আমার বিছানা অবধি,
রৌদ্রচ্ছটা অবধি, মাটি থেকে
আকাশের তালু অবধি।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে শূন্যতা,
ক'টা বাজে, আমি কি
একা? কারা ছিল, যেন কাদের
কথার উল্টো পিঠ কাল দেখা যাবে;
ত্রিভুজের উপমায় উপমেয় সেজে
কাল ফের সভ্যতার কারুকাজে

প্রবাসের উক্তি

কেতকী কুশারী

বকুলের ঋতু, প্রিয়, মনে রেখো, এ মিনতি করি।
যদিও তুষারকণা আপাতত জানালার কাচে
জ্যামিতিক চিত্র আঁকে, কক্ষকোণে অগ্নিশিখা নাচে
শীতের দুপুর ভরে, অবাস্তব আলস্যের কাল
অন্তরীক্ষে শুধু দেখে রেখায়িত অস্থিনগ্ন ডাল,
আমি তবু অহর্নিশ অন্তহীন যমুনায় মরি।

বন্ধনীর মত জেনো অধুনার দিবসযাপন।
শিথিল হয়েছে মানি নানাবিধ সুদৃঢ় বিশ্বাস,
হারিয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা না রেখে আভাস
কোথায় বৃষ্টির দিনে, বহু আদরের আলপনা
ধুয়ে একাকার হলো, স্মৃতিচিহ্ন কিছুই রাখলো না;
তবু আমরা সেখানেই নাগরিক। এ শুধু ভ্রমণ।

হারানো সোনার জন্য তোমার আমার রক্তে আজও
গার্হস্থ্য ক্রন্দন আছে, দোতলার দীর্ণ ছাত ঘিরে
পরিপূর্ণ ভাদ্র মাস জলধারে আসে ফিরে ফিরে,
সেখানে বশ্যতা রেখো, ছায়াম্লান যেখানে মেঝেতে
দড়ির পাপোশ ভেজে, উতরোল হাওয়ার সংকেতে
প্রতীক্ষা গভীর হয়, থেমে থাকে তুচ্ছতম কাজও।

বহুদিন হলো তবু কালো মেঘে বিদ্যুৎ নেবেনি।
দীর্ঘ ছায়া ঢেকে আছে কাশবন, শুভ্র বালুচর,
মনের দিগন্তে দেখো অসম্ভব পাখিদের স্বর
অপরাহ্ণে ডেকে ওঠে: তাই বলি অপার্থিব ভোরে
বিস্তীর্ণ নদীর বুকে আধো জেগে আধো ঘুমঘোরে
[illegible]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৪৮৯ ॥

ওঁ

জোড়াসাঁকো

রাণী,

দিনে দিনে তোমার ভঙ্গুর দেহকে ভগ্ন করে আমার 'প্রতি' অন্যায় করছিলে, সে আমার ভাল লাগছিল না কেননা, তোমার সেবার সঙ্গে জড়িত দেহের সঙ্গে আমিও যে দাবি রাখি। ১০ অক্টোবর ১৯৪০

কবি

কবি হঠাৎ কালিম্পঙে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় আনা হচ্ছে খবর পেয়ে আমি গিরিডি থেকে সেইদিনই চলে আসি। তখন আমার রোজ জ্বর হচ্ছে। কবি ঐ দারুণ অসুস্থ অবস্থায় যখন প্রায় আধ অজ্ঞান হয়ে দিন কাটাচ্ছেন জ্বরের ঘোর এবং যন্ত্রণায় তখনো আমার শরীরের কথা ও'র মন থেকে যায়নি। প্রথমদিন গিয়ে যখন পোঁছলাম—সেইদিনই সকালে উনিও কালিম্পঙ থেকে এসে পোঁছেছেন—প্রতীমা দেবী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখুন বাবামশায় কে এসেছে। রাণী আপনাকে দেখতে গিরিডি থেকে এসেছে।" তখন তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তবু উত্তর দিলেন "ভালো করেনি। ওর তো নিজেরই শরীর ভালো না, আবার আমাকে দেখতে এসে জ্বর বাড়াবে। কেন তোমরা ওকে খবর দিলে?" প্রতীমা দেবী বললেন, "আপনার এত অসুখ শুনেও ও দেখতে আসবে না? সে কি হয়?" যাই হোক, এর পরে প্রতিদিনই আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জোড়াসাঁকোতে গিয়ে কবির কাছে সারাদিনই তাঁর বিছানার পাশেই কাটাতাম। তখন অনেকেই পালা করে কবির সেবায় নিযুক্ত। একদিন দুপুরে অন্যেরা তখন খেতে ও বিশ্রাম করতে গিয়েছেন, আমি ও অধ্যাপক নির্মল বোস কবির পরিচর্যায় রয়েছি। কবির খুব জ্বর ও ভীষণ শারীরিক যন্ত্রণা রয়েছে, আমি পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ আমাকে বললেন, "ঐ আলমারিটা খুলে ফেরাম্ ফসেৎ শিশিটা নিয়ে এসো তো।" (ঠিক কোন্ ওষুধটা আমার নাম মনে নেই, তবে একটা বায়োকেমিক্ ওষুধ)। শিশিটা আনলে বললেন, "৬টা বড়ি বের করো।" আমি ভেবেছি ও'র নিজেরই জন্যে তাই মুখে দিয়ে দিতে গিয়েছি, বললেন, "আঃ, আমাকে না; নিজে খাও। জ্বরে একেবারে হাত পুড়ে যাচ্ছে, তুমি আবার বসে আমার সেবা করছো। একটু হেসে বললেন, "হেড নার্স কিনা, তাই অধিকার ছাড়তে চাও না।" আবার যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ হয়ে এলো, কথা থেমে গেলো। অবাক হয়ে গেলাম ভেবে যে, ঐ অসহ্য কষ্টেও অন্যের অসুখের কথা ভুলতে পারেন না। তখনও মনে মনে আমার ওষুধের কথা ভেবেছেন। এর ২/৩ দিন পরে আমার শরীরের কথা চিন্তা করে গিরিডি ফিরে যাবার কথা ভাবছি, কিন্তু কি করে কবিকে সে কথা জানাবো সেই একটা ভাবনা। যদিও আমি এসেছিলাম বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন তবু জানতাম এসেছি বলে খুশিও হয়েছেন। পরের দিন ভোরে আমরা যাবো, বিকেল পর্যন্তও কিছু বলিনি, ভেবেছি একেবারে বাড়ি যাবার সময় বলে যাবো। হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা আমাকে বললেন, "তুমি গিরিডি ফিরে যাবে না? রোজ তোমার হাতখানা যখন আমার গায়ে দাও আমি টের পাই তোমার জ্বর রয়েছে। এই বেলা পালাও কলকাতা থেকে।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, কাল ভোরেই রওনা হ'ব। আজই আপনার কাছে সারাদিন রইলাম, কাল আর আসবো না।" প্রণাম করে চলে এলাম। গিরিডি পোঁছেই প্রথম দিনই কবির নিজের হাতে কষ্ট করে লেখা ঐ দু-লাইন চিঠি। যেদিন রওনা হই, ভোর ৪টের সময় শ্রীমান বীরেন সেন টেলিফোন করে বললেন, "রাণীদি, আপনারা তো আজ একটু পরেই রওনা হবেন? গুরুদেব তাঁর আশীর্বাদ জানাতে বললেন। আজ শেষরাত্রে আমার পালা পড়েছিল গুরুদেবের কাছে, তাই আমাকে দিয়ে ফোন করালেন।" পরে বীরেনের কাছে শুনেছি তাকে দিয়ে কলম আনিয়ে নিজে চিঠিখানি লিখে বলেছিলেন পোস্ট করে দিতে। ঐ ক্ষুদ্র দু-লাইনের পিছনে এতখানি ইতিহাস। অবশ্য কয়েকদিন পরেই আবার রথীন্দ্রনাথের টেলিগ্রামে অসুখ বাড়বার খবর পেয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম।

॥ ৪৯০ ॥

ওঁ

হে মায়ের জাতীয় মহিলা

বাবার জাতের অধঃপতন হতে হতে যখন সে শিশুর জাতে এসে ঠেকে তখন তার বড়ো দুর্গতি। হাত খালাস করে দেবার জন্যে মহাজন তাকে reduced price saleএ চড়িয়ে দেন। কিন্তু সেই আধলা দামের জখ্‌মি মালটাকে স্ক্রীনের আড়ালের কোণে গুটিয়ে রাখাই ভালো, কাজ নেই নাড়াচাড়া করে বুঝতে পারচি দোকানের মালিক তাকে সরিয়ে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন তার প্যাকেটটার বাঁধনগুলো খুলে ফেলা চলচে। অতএব সেলাম—যদি পারো তবে সেই কবিকে মনে কোরো, যে একদিন গেয়েছিল "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"—আজ তার ভাঙা-গলায় আওয়াজ বেরচ্চে না। ইতি ১লা ফাল্গুন ১৩৪৭

তোমাদের শস্তা দামের রবি ঠাকুর

উদয়ন। বারান্দার কোণ।
সকাল সাতটা

খবরের কাগজে বা মাসিক পত্রে জনৈক মহিলার লেখা একটা প্রবন্ধে ছিল "আমরা মায়ের জাত"। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, আমরা মায়ের জাত অতএব স্বভাবতই স্নেহশীলা ইত্যাদি। কবি সেটা পড়ে অনেকবার বলেছেন হেসে, "তোমরা যে মায়ের জাত তাতে তো বড়াই করবার কিছু নেই। প্রকৃতি তোমাদের মা করেছে আমাদের বাবা করেছে। তোমরা নিজগুণে তো মা হওনি। তবে কেন তোমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করো যে, যেহেতু তোমরা মা সেই হেতু তোমরা আমাদের চেয়ে আরো অনেক মহৎ? তার পর থেকে অনেক সময়েই ঠাট্টা করে বলতেন, "শুনছো, মায়ের জাতীয় মহিলা, এই কাজটা করে দাও তো।" আর সঙ্গে সঙ্গে হাসি।

॥ ৪৯১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রানী ও প্রশান্ত

বর্ষ পরে বর্ষ গেছে চলে,
ছন্দ গাঁথিয়াছি আমি তোমাদের মিলনমণ্ডলে।

এবার দিনের অন্তে বিরল ভাষার আশীর্বাণী
রবির স্নেহের স্পর্শ আনি
পশ্চিমের ক্লান্ত রশ্মি হতে
যোগ দিল তোমাদের আনন্দিত গৃহের আলোতে॥

কবি

১৫ ফাল্গুন, ১৩৪৭

॥ ৪৯২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমাকে ভুল বোঝবার সময় ঘনীভূত হয়ে এসেছে এইটেই আমার সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। মাথার ক্লান্তিবশত আজকাল যা বকি তার অধিকাংশ পরিহাস এবং অত্যুক্তি এবং প্রলাপ। আমি নিজেই বিশ্বাস করিনে এবং আশা করি, যারা আমাকে জানে তারা সে কথাগুলোকে সত্য বলে নেয় না। অভ্যাসের এই বিকৃতিটা খারাপ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এটা আমার রুগ্নতার আনুষঙ্গিক। একথা মনে রেখো তোমাদের ভালোবাসার উপর আমার কিছুমাত্র (আস্থা) কমেনি এবং সেইজন্যেই তোমাদের সঙ্গ এমন উৎকণ্ঠার সঙ্গে কামনা করি। দৈহিক সেবা নিতান্তে অবান্তর আসল জিনিস হচ্ছে স্নিগ্ধ সঙ্গ—যতক্ষণ পাই ততক্ষণ লাভ। যতই আমার মতিভ্রম হোক না এটা নিশ্চিত জানি, জীবনের সকল রকম পাওনায় মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে। বয়সে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ে যদি বাল্যদশায় গিয়ে পৌঁছই তা হলেই ভাগ্যের কাছে অসম্ভব আবদার করতে প্রবৃত্ত হব। আপাতত আমার সানুনয় অনুরোধ এই বার্ধক্যের কথা মুখে উচ্চারণ কোরো না তার বদলে কিঞ্চিৎ চন্দনগন্ধী ধূপ ধুনো পাঠালে তার ধূমকুণ্ডলীর মধ্যে কারো অদৃশ্য মুখমণ্ডল মনে পড়বে।

আজ এই পর্যন্ত। ইতি প্রলাপভাষিত কবি

২১ এপ্রিল ১৯৪১

॥ ৪৯৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

এত কষ্ট করে তোমাকে একখানা চিঠি লিখলুম তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল বিস্তারিতভাবে ফিতের খবর পাওয়া গেল। হায় রে আমার কপাল।

বিধিবিড়ম্বিত কবি

শান্তিনিকেতন ২৪শে এপ্রিল ১৯৪১

॥ ৪৯৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

দুর্গম পথ, ক্লান্ত শক্তি। নিঃশব্দতা ভঙ্গ করবার বৃথা চেষ্টা করে এবার ক্ষান্ত দিলুম। অনাবৃষ্টির নির্মম আকাশ কথা কয় না। কেন তবে বৃথা কেকাধ্বনি।

কবি

শান্তিনিকেতন ২৫ এপ্রিল ১৯৪১

॥ ৪৯৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

মাথা খারাপ হলে যা-তা বলি কিছু মনে কোরো না। ইতি ১লা মে ১৯৪১।

ইতি কবিবর

॥ ৪৯৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

এবার আমার জন্মদিন সুহৃদশূন্য হবে। এমন রিক্ততা ইতিপূর্বে আর কোনোদিন হয়নি সেই আশঙ্কায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তুমি খুব সংক্ষেপে লিখেছ জন্মদিনে যাব "ভাবছি"—যদি দ্বিধা থাকে তবে সেদিন আমার তপস্যার দিন আসবে উপনিষদ হবে আমার সখা। তার সঙ্গে আমার নিরাসক্ত সম্বন্ধ প্রত্যহ নিবিড় হয়ে আসছে।

কবি

তারিখ দিতে ভুলে গিয়েছেন।

॥ ৪৯৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন
৮।৬।৪১

কল্যাণীয়াসু, শান্তিনিকেতন
৮/৬/৪১

অনেকদিন তোমার কোনো চিঠি
পত্র পাইনি, জানি তুমি তোমার
মায়ের সেবায় নিযুক্ত আছ, তিনি
কেমন আছেন জানিও, আমার
শরীরে উত্থান শক্তি নেই,
সেইজন্য সমস্ত দিন বিছানায়
পড়ে থাকি — যতদিন এই রকম
চলে চলুক [illegible] হয়ে
কোনো লাভ-নেই।

কবি

এই প্রথম এবং শেষ চিঠি কবি নিজ হাতে না লিখে অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছেন এবং নিজে সই করেছেন। এই শেষ চিঠিখানা পাবার অল্পদিন পরেই আমার মা একটু সুস্থ বোধ করলে আমি কবির কাছে শান্তিনিকেতন চলে যাই এবং তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাছেই ছিলাম, কাজেই আর চিঠি পাবার কোনো সুযোগ হয়নি।

॥ সমাপ্ত ॥

হতভাগ্য কাছাড়

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাছাড়ের ভাষা আন্দোলন যখন তার চরমে তখন সম্পূর্ণ নীরব থেকে আজ এতদিন পরে সেই পুরোনো কাহিনী নিয়ে পড়ি কেন? কাছাড়ীতেও আছে,

স্বামী মরলো সন্ধ্যা রাত।
কেঁদে উঠলো দুপুর রাত!"

(খাস কাছাড়ীতে লিখলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে 'সংস্কৃত' করা হল।)

আসলে তখন ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রেষারেষি ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এমন কি কোনো কোনো স্থলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে—অথচ কাছাড়ে কস্মিনকালেও কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী। তাদের ভিতরেও হিন্দু, মুসলমান দুই-ই আছেন, নাগা, লুসাই এবং আরো কত যে জাত-বেজাত কাছাড়ে সদ্ভাবে বসবাস করে সে সম্প্রীতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তখন আমার জানা ছিল, এ আন্দোলন বেশীদিন চলবে না, একটা ফয়সালা হয়ে যাবেই, এবং তারপর কাছাড়বাসীরা ভাষার কথা বেবাক ভুলে গিয়ে আবার সুখনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে। পারি যদি তখন তাকে জাগাবার চেষ্টা করবো। সর্বত্রই দেখেছি, পাকা বুনিয়াদ, গঠনের কাজ আরম্ভ হয় তখনই।

* * *

কাছাড়ের উত্তর, পূব, দক্ষিণে পাহাড়। তার বেরবার পথ মাত্র পশ্চিম দিকে—পূব পাকিস্তানের সিলেটের ভিতর দিয়ে। সে পথ আজ বন্ধ। ইংরেজ সেকশন নামক যে রেলপথটি কাছাড়কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সেটি নির্মিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা চট্টগ্রাম বন্দর তথা চাঁদপুর হয়ে কলকাতার বন্দরে পাঠাবার জন্য। ওটা কখনো কাছাড়ীদের বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি।

এর পূর্বে বলে রাখা ভালো, কাছাড় ঐতিহ্যহীন দেশ নয়। সিলেট-কাছাড়ের ঐতিহ্য এক সঙ্গে জড়িত ছিল বলে এতদিন ধরে সবাই 'সিলেট সিলেট' করেছে এবং কাছাড় তারই তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কাছাড়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে আর্য-সভ্যতার শেষ পূর্বভূমি। এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির শেষ পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ। এর পরই মণিপুর—এ'রা বৈষ্ণব হলেও এদের রক্ত এবং ভাষা ভিন্ন। তারপর বর্মা। এবং আর্যসভ্যতা বাদ দিয়েও কাছাড়ের প্রাচীন আদিমবাসীরাও আপন সভ্যতা নির্মাণ করে গিয়েছেন—তার নিদর্শন আজও কাছাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কাছাড়ের রাজারা দীর্ঘকাল পূর্বেই বাঙলা ভাষা গ্রহণ করেন।১ বস্তুত জয়ন্তিয়া (পাঠান-মোগল কেউই এ রাজ্য অধিকার করতে পারেন নি), ত্রিপুরা, কাছাড় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহম রাজারাই আসাম প্রদেশের চারিটি প্রধান রাজবংশ। আমার যতদূর জানা আছে, মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার সময় কাছাড়কেই কেন্দ্রভূমি করে সে কর্ম করা সম্ভবপর হয়েছিল।

(১) সৈয়দ মরতুজা আলী, A History of Jaintia, ও এ'র লেখা ঐ যুগের চার রাজবংশের মধ্যে বাঙলায় লেখা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কাছাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। যাঁরা হিল সেকশন দিয়ে রেলেও গিয়েছেন মাত্র, তাঁরাও এ বাবদে আমার মতে সায় দেবেন।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, কাছাড়ে জমিদাররা কখনো দাবড়ে বেড়ান নি বলে সেখানকার সমাজে অতি সুন্দর গণতন্ত্র প্রচলিত। জমিদার নেই বলে লেঠেলও ছিল না। তাই কাছাড়ীরা বড় শান্ত, নিরীহ। এমন কি সোনাই অঞ্চলে যেসব নাগারা বাস করে তারাও মাঝে মধ্যে জনপদবাসীর কুকুর ধরে নিয়ে ভোজ-দাওয়াৎ করলেও এরা দা হাতে করে মানুষের মুণ্ডুর সন্ধানে বেরোয় না।

দেশ বিভাগের ফলে কত সহস্র, কিংবা লক্ষাধিক শরণার্থীকে কাছাড় আশ্রয় দিয়েছে সে সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। 'পূর্ব-বঙ্গের রেফ্যুইজী'-দের আশ্রয় দেওয়ার প্রায় পুরো ক্রেডিট্ নেন পশ্চিম বাঙলা। শিলঙে অবস্থিত অহমিয়া সরকার 'বঙাল' কাছাড়ের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে যে অত্যধিক লম্ফঝম্ফ করবে না সে তো জানা কথা—আমিও দোষ দি নে।

বস্তুত চৈতন্যভূমি শ্রীহট্টের শত শত ব্রাহ্মণকে কাছাড় আশ্রয় দিয়ে সংস্কৃত চর্চা যে কতখানি বাঁচিয়ে রাখলো তার খতিয়ান হওয়া উচিত। অথচ দেশ বিভাগের ফলে কাছাড়ের সর্বনাশ হয়েছে। তার ধনদৌলত, ধান, কাঠ, ছন, বাঁশ, চা আরো নানা প্রাকৃতিক সম্পদে। সেগুলোর সবই পাঠানো হত সিলেটের মাঝখান দিয়ে। আজ সে পথ বন্ধ। পূর্বেই বলেছি, আর তিন দিকে পাহাড়। হিল সেকশন দিয়ে যে খর্চা পড়বে তার অর্ধেক মূল্যে এসব বস্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাওয়া যায়।

* * *

দেশ বিভাগের পূর্বে কাছাড়-শ্রীহট্ট অর্থাৎ সুর্মা উপত্যকা আসাম রাজ্যে প্রধান স্থান দখল করে ছিল। সিলেট পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে কাছাড়ের বঙ্গভাষীগণ হয়ে গেল মাইনরিটি—এবং যেটুকু তার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল তাও সে পেল না—সেনসাস নিয়ে কারসাজি করার ফলে।২

ইউনাইটেড নেশনস বলেন, তাঁদের প্রধান সমস্যা, পৃথিবীর সর্বত্র মাইনরিটি নিয়ে। কাজেই আজ যদি অসমীয়ারা কাছাড়বাসীর মাতভাষা ভুলিয়ে সেখানে অসমীয়া চালাতে চায় তবে কেউ আশ্চর্য হবেন না। অবশ্য সেটা যে অন্যায় সে-কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কাছাড়ীরা বাঙলা ভাষা ও তাদের বাঙালী ঐতিহ্য কখনো ছাড়তে পারবে না—অহমিয়া ঐতিহ্য অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও পারবে না।

ভাষার উপর এ অত্যাচার নূতন নয়।

এর বিরুদ্ধে ঔষধ কি?

অধম আকাশ-বাণীকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে, শিলচরে একটি বেতার কেন্দ্র হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কাছাড়ের লোক সচরাচর ঢাকা বেতার শোনে, কারণ কলকাতা আকাশবাণী সেখানে ভালো করে পৌঁছয় না। গৌহাটি কেন্দ্রের ভাষা অসমীয়া ওদিকে আরেকটি মজার জিনিস। গৌহাটি কেন্দ্র নাগাকে শান্ত করার জন্য সেখান থেকে প্রচারকার্য করেন। আশ্চর্য হই তাঁরা 'আর্তিস্ত' পান কোথায়? প্রথমত টেপ-রেকর্ডার নিয়ে নাগা অঞ্চলে ঢোকা অনেকখানি হিম্মতের কাজ, দ্বিতীয়ত শুদ্ধমাত্র টেপ-রেকর্ডারের জোরে প্রচারকার্য চলে না। পক্ষান্তরে খাস কাছাড়েই মেলা নাগা রয়েছে। মাঝখানে পাহাড় আছে বলে গৌহাটির বেতার-গলা নাগা পাহাড়ে ভালো করে পৌঁছয় না। ওদিকে নাগা পাহাড় কাছাড়ের প্রতিবেশী।

কাছাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়।

(২) আমার অগ্রজ আসামে রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি আমাকে ১৯৪১ সালেই [illegible] [illegible] সেনসাস নিয়ে কারসাজি আরম্ভ

লুসাইরা নিরীহ। কিন্তু অহমিয়ারা যেভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন তাতে কখন কি হয় বলা যায় না। এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। লুসাইদের সর্ব আমদানি-রপ্তানি কাছাড়ের সঙ্গে। লুসাইদের জন্য প্রচারকর্ম করার জন্য শিলচরই সর্বোত্তম কেন্দ্র—গোহাটি বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্য কোনো স্থল নয়।

আরো নানা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ আছে। স্থানাভাব।

শিলচরে এই বেতার কেন্দ্র নির্মাণের জন্য তীব্রকণ্ঠে দাবি জানাতে হবে। জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসাম সরকার সাহায্য করবেন না। বাধা দিলে আমি আশ্চর্য হব না, দোষও দেব না।

কিন্তু এ তো সামান্য জিনিস।

আমার মনে পড়ছে, অস্ট্রিয়ার রাজা হাঙ্গেরির ভাষা নিধন করতে চেয়েছিলেন। ফলে বুদাপেস্তের হাঙ্গেরীয় স্টেজ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বোধ হয় রাজা আপন পায়ে কুড়োল মারলেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেরিয়ে পড়ল জিপসি কায়দা-ভানে শহরে শহরে, গায়ে গায়ে তারা এমনি ভাষার বান জাগিয়ে তুললে যে, সমস্ত দেশ মনে প্রাণে অনুভব করলো, মাতৃভাষা মানুষের জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য ঐ তার একমাত্র গতি। যে সভ্যতা সংস্কৃতি সে তার পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, যার কল্যাণে সে সভ্যজন বলে পৃথিবীতে স্বীকৃত হচ্ছে, যাকে সে পরিপুষ্ট করে পিতৃপুরুষের কাছ থেকে ঋণমুক্ত হতে চায়—সে তার মাতৃভাষা।

এই তার সময়। ভাষা আন্দোলনের বিক্ষোভ-উচ্ছ্বাসের দুর্দিনে গড়ার কাজ করা যায় না। সে যেন আতসবাজি। সেটা শেষ হলে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। তার পূর্বেই ওরই ক্ষুদ্র শিখা দিয়ে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে হয়।

* * *

এই তার সময়। রাজদণ্ডের ভয় নেই, রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত কারসাজি নেই—শান্ত সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে কি প্রকারে মাতৃভাষার গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করা যায়।

সেই চৈতন্যের উপরই মাতৃভাষার দৃঢ়ভূমি নির্মিত হবে।

তাই যখন আবার বিপদ আসবে তখন উন্মাদের মত দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে হবে না, ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে মাইকে চিৎকার করতে হবে না। গ্রামের লোক নিজের থেকেই সাড়া দেবে। শহরে সীমাবদ্ধ যে-কোনো আন্দোলনই সহজে দমন করা যায়। কিন্তু সে যদি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাকে দমন করা অসম্ভব।

এই তার সময়। চিন্তা করুন, গ্রামে গ্রামে কি প্রকারে সে চৈতন্য উদ্দীপ্ত করতে পারি।

কিন্তু সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

এ আন্দোলন শান্তিময় গঠনমূলক। এতে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক স্বার্থ নেই। এবং সবচেয়ে শেষের বড় কথা—এ গঠনকর্ম অগ্রসর হবে অহমিয়া ভ্রাতা, তথা কাছাড়ের কোনো সম্প্রদায় বা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি বৈরীভাব না রেখে॥৩

(৩) আমিতাভ চৌধুরী, মুখের ভাষা বুকের রুধির।

কলিকাতা মহানগরীকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। —"কলকাতা না বাঁচলেও, বিশেষজ্ঞ কমিটি নিশ্চয়ই বাঁচবে।" —বলেন বিশ্ব খুড়ো।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জমির খাজনা বকেয়া ফেলিয়া রাখার প্রবণতা দেখা যায় বলিয়া একটি সংবাদ পড়িয়া শুনাইল শ্যামলাল এবং পড়া শেষে মন্তব্যও শ্যামলালই করিল—"এই পশ্চিমবঙ্গেই আমরা একদিন গান গেয়েছি—খাস তালুকে বসত করি, জমিদারের কি ধার ধারি।"

১৯৬১ সালের মধ্যে রেলে নাকি ৪২ লক্ষ লোক বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিয়াছে। এই বিপুল ক্ষতি রোধ করিবার

জন্য রেল কর্তৃপক্ষ প্রতি দুই মাস অন্তর 'রেলে বিনা টিকিটে ভ্রমণ নিরোধ সপ্তাহ' পালন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। —"তাঁরা আশা করেন, ধর্মের কাহিনী হয়ত 'ওনারা' এখন থেকে শুনবেন" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

এক নয়া পয়সা করিয়া বাসের ভাড়া বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"আমরা তাতে চিন্তিত নই: বোঝার ওপরে শাকের আঁটি বহন করার মতো মজবুত গর্দান আমাদের নিশ্চয়ই আছে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কলিকাতায় শুনিলাম মেট্রিক ওজনের বাটখারা লইয়া চোরা-কারবার চলিতেছে। শ্যামলাল বলে—"তাও তো সবে মেট্রিক; বি-এ, এম এ হলে তো চোরা-কারবার ডাকাতে-কারবার হয়ে উঠবে!!"

কর্ণফুলী বাঁধ সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন এড়াইবার জন্য পাকিস্তান নানা ফিকির করিতেছেন বলিয়া একটি অভিযোগ শুনিলাম। —"ফিকিরটা হয়ত সেই প্রবাদ-প্রসিদ্ধ দস্যু নীতি—কার কড়ি কে ধরে"

জনৈক ব্যক্তি একক প্রচেষ্টায় একটি "কাসল্" ভাঙিতেছেন বলিয়া একটি সচিত্র সংবাদ পাঠ করিলাম। —"কিন্তু আকাশে কত কাসল্ তো আমরা একক প্রচেষ্টাতেই গড়ছি আর ভাঙছি, সাংবাদিক-গণ তার কতটা সংবাদই বা রাখেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

জনৈক কর্ণচিকিৎসাবিশারদ তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কর্ণভেদী কল-কোলাহল শুধু শ্রুতিশক্তিরই ক্ষতিকারক নহে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিভারও ক্ষতি সাধন করে। —"হয়ত তাই। কিন্তু আমরা জানি, মাইকের জোরালো আওয়াজ ছাড়া কারও প্রতিভা ফোটে না, না রাজনীতিতে, না সংগীতে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরেক্টার-জেনারেল নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি অন্ধতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। —"আশ্বাসের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, পৃথিবীতে ছোটদের সম্বন্ধে বড়দের দৃষ্টির অস্বচ্ছতাও কি প্রতিরোধ্য"—প্রশ্ন তোলে শ্যামলাল।

পিকিং-এর পীতজ্বরের টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নাকি অনুমোদিত নয়, সেই জনাই দমদম বিমানঘাটিতে দুইজন চীনা কূটনৈতিককে আলাদা করিয়া রাখা হয়, তাঁদের টিকা লওয়ার সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু আলাদা করে রাখলেও পীতজ্বরের সংক্রমণ বাঁচিয়ে চলা যায় না, উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন!"

একটি প্রশ্ন (বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, মৎস্য পুরাণের)—গভীর জলের মাছ যায় কোথায়? আবার অতলে? ঠাণ্ডা ঘরে? নাকি সরকারী দপ্তরে। —"বকরূপী ধর্ম যদি নূতন করে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করতেন, 'আশ্চর্য কি?' তাহলে যুধিষ্ঠির হয়ত উত্তর দিতেন—অত সব তোড়জোড়, বিক্ষোভ, মিথ্যা আশ্বাসের পরও যে মানুষ মাছের জন্য খাই-খাই করে—এইটেই আশ্চর্য"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

"নগরদর্শন"-এ 'চার্নকা' প্রমুখাৎ জর্জিয়ান নৃত্যশিল্পীদের সম্বন্ধে বেশী মুগ্ধ জর্জিয়ান তরুণীদের রূপে—অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু এমন দর্শকও ত নিশ্চয়ই অনেক আছেন, যাঁরা মুগ্ধ হয়ে শোনেন—'রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব।"

যে-সব স্বামী ঘরের স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়া অন্যত্র উড়িয়া বেড়াইতেছেন, ঘরের শান্তি নষ্ট করিতেছেন, সেই সব বেয়াড়া স্বামীদের টিট করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ললনারা নাকি একটি ইউনিয়ন গঠন

করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই নাকি স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের একশত দরখাস্ত ইউনিয়নের হাতে আসিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"স্বামীদের হাতে খৈ ভাজার চেয়ে বড় কাজ আছে; তা নইলে একশ' কেন হাজার দরখাস্তে শান্তিভঙ্গকারিণীদের বিরুদ্ধে বিষ তাঁরা উদ্গীরণ করতে পারতেন!!"

পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানে আমদানী করা না হয়, তার জন্য একটি আন্দোলন শুরু করা হইয়াছে—আন্দোলনের নেতা আক্রম খাঁ ছাহেব। খুড়ো বলিলেন—"অবশ্য ব্লকে বাংলা গল্প-উপন্যাসের বইয়ের বই ছেপে মওকা লোটার ব্যাপারে ঐ ছাহেবের ছাহিত্য বিদ্বেষ নেই!!"

এ সপ্তাহের জোর সংবাদ—শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় আই এফ এ'র সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। —"অতঃপর অনেক

টিকিটের প্রশ্ন, স্টেডিয়ামের প্রশ্ন এবং আনুষঙ্গিক কত কী। তাই বলি তাঁরাই তো ছিল ভালো, আবার এঁড়ে গরু কেন ... [illegible] করেন।

॥ ১০ ॥

ঝিনুকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিদারুণ খবরটা পেয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন গণেশ হালদার। কিছুক্ষণের জন্য তিনি যেন সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দেহটা দাঁড়িয়ে ছিল মাটির উপর কিন্তু তাঁর অদেহী নির্বিকার সত্তা যেন দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল দূরে আকাশলোকে. কিছুক্ষণের জন্য সেই মহাশূন্য থেকে তিনি যেন উপলব্ধি করছিলেন বিরাট বিশ্বের বিশালত্ব অনুভূতি-শূন্য হয়ে। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন একটা অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতো ভেসে বেড়াচ্ছেন মহাশূন্যে। তিনি যেন মানুষ নন. মনুষ্যত্বের উপর সমস্ত দাবি যেন হারিয়ে ফেলেছেন চিরকালের জন্য। হঠাৎ দাইয়ের গলার স্বর শুনে সংবিত ফিরে পেলেন তিনি।

"মাস্টারবাবু কাঁহা গেলে. আপনের পুড়ি (লুচি) এনেছি। গরম গরম খেয়ে লেন। মাস্টারবাবু—"

ভিতরে ঢুকতে হল গণেশ হালদারকে। দাই টেবিলের উপর সব সাজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"গরম গরম খেয়ে লেও বাবু। হাথ মুখটা আগে ধুয়ে লিন। বালতিতে জল আছে বারান্দায়. এই যে গামছা—"

তাড়াতাড়ি গামছাটা এগিয়ে দিলে দাই। "এই ডিমের ডালনা আর গোরয়া (চিংড়ি) মাছের মালাই কারি মাইজি নিজের হাতে বানিয়েছেন আপনের জন্যে। যদি ভালো লাগে বলবেন, আরও এনে দেব। এই ডাল আর আলুর দম হামি বানিয়েছি। পেট ভরে খেয়ে লেন বাবু, আপনার শরীরটা দুবলা, ভাল করে খেয়ে শরীরটা ঠিক করে লেন। বাবুর এখানে খাবার কোন দুখ নেই।"

গণেশ হালদার দাইয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। মনে হল, মাকেই যেন মূর্ত দেখলেন ওর মধ্যে। ওই কালো চেহারা. জরাগ্রস্ত মুখ, কিন্তু সমস্তকে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল করে তুলেছে অন্তরের আলো, ভালবাসার আলো। দাই তাঁকে রোজ দাঁড়িয়ে খাওয়ায়. মা যদি থাকত ঠিক এমনিভাবেই নিশ্চয় খাওয়াত. হঠাৎ মনে হল তাঁর। মায়ের কথা তাঁর রোজই মনে পড়ে. যে মা তাঁর একলার নিজস্ব। এতদিন মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, মা নিশ্চয়ই কোথাও বেঁচে আছেন, একদিন হয়তো দেখা হবে। সেই আশার ক্ষীণ আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। নিবে গিয়ে কিন্তু অন্ধকারে ছেয়ে গেল না চারিদিক, একটা নূতন ধরনের আলো যেন জ্বলে উঠল কোথায়। যে শিখা থেকে এ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা তিনি দেখতে পেলেন না কিন্তু যে স্নিগ্ধ নূতন আলোতে তাঁর অন্তর প্লাবিত হল সেই আলোতে তিনি দেখতে পেলেন দাইকে আর দাইয়ের পিছনে আর একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে, কুয়াশায় ঢাকা এক রহস্যময়ী মূর্তিকে, ডাক্তার মুখার্জির স্ত্রীকে। তিনি তাঁকে হোটেলে খেতে দেন নি।

"আরও গরম পুড়ি এনে দি—"

কোনও উত্তর দেবার আগেই দাই ছুটে গেল খত্‌পত্‌ করে। গণেশ হালদার আর পারলেন না, টপ্‌টপ্‌ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাঁর মনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত ভাব মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হতে লাগল. কিছু হারায় নি, কিছু হারায় না।

সাধারণত খেয়েই তিনি শুয়ে পড়েন। সেদিনও অভ্যাসমতো শুয়েছিলেন, কিন্তু ঘুমুতে পারলেন না। অনেকক্ষণ চোখ

বুজে শুয়ে রইলেন, ঘুম এল না। মায়ের চেহারাই বারবার ফুটে উঠতে লাগল মনে। মায়ের নানা চেহারা। ছেলেবেলায় মা তাঁকে পদ্মার পাড়েই স্নান করিয়ে দিতেন, পদ্মার জলে নামতে দিতেন না। গামছা দিয়ে জোর করে তাঁর মুখ আর কানের পাশ ঘষে ঘষে পারিষ্কার করে দিতেন, তারস্বরে কাঁদলেও ছাড়তেন না। জোর করে ঘাড় ধরে ভাত খাইয়ে দিতেন তাঁকে, বড় বড় ডেলা পাকিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিতেন; অনেক বড় বয়স পর্যন্ত কাপড়-জামা পরিয়ে দিতেন তাঁকে, চুল আঁচড়ে দিতেন, যেদিন সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে মাথার ময়লা বার করতেন সেদিন কি প্রাণান্তকর ব্যাপার হত। সব আজ মধুময় স্মৃতি রয়ে গেল এক নিমেষে। সত্যি মা নেই? ঝিনুক যা বলল......হঠাৎ মনে পড়ল মা একদিন মেরেছিলেন তাঁকে, খেতেও দেন নি, তারপর গোবর খাইয়ে পদ্মায় স্নান করিয়ে তবে খেতে দিয়েছিলেন। অপরাধ ছিল, মিথ্যা-ভাষণ। বারবার তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে

হয়েছিল কখনও মিথ্যা কথা বলব না। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন তিনি এ-যাবং। কিন্তু কি লাভ হয়েছে তাতে? মিথ্যাবাদী, মুখোশ-পরা ভণ্ড পাজিদেরই তো জয়-জয়কার। সত্য তো তাঁকে বাঁচাতে পারল না। তিনি তো তলিয়ে গেলেন। যখন বিদেশে গিয়েছিলেন প্রতি ডাকে মাকে চিঠি লিখতে হ'ত। তিনি কিন্তু খুব কম চিঠি লিখতেন, বুলি লিখত প্রায়ই। তাঁর শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন—বাবা, পড়াশুনা মন দিয়ে করো, ধর্মে মতি রেখো, এর চেয়ে বড় আর কোন কামনা নেই আমার। তুমি মানুষ হও, দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল কর, তা হলেই আমার বুক ভরে উঠবে, তোমাকে পেটে ধরা সার্থক হবে। মায়ের এ চিঠি তাঁর কাছে নেই। বিলেত থেকে আসবার সময় অনেক তুচ্ছ ফোটোগ্রাফ, পিকচার পোস্টকার্ড সংগ্রহ করে এনেছিলেন, কিন্তু এ চিঠিখানা যত্ন করে' রাখবার কথা তাঁর মনে হয়নি। এ চিঠির যে একদিন এত মূল্য হবে তা কে ভেবেছিল তখন। মায়ের ফোটোও নেই। সেকালের মেয়েরা ফোটো তোলাতে চাইতেন না। বাইরে মায়ের সব চিহ্ন অবলুপ্ত হয়েছে। যে ঘরে তিনি রাধাবল্লভের পুজো করতেন সে ঘর পুড়ে গেছে। যে গ্রাম তাঁর নিজের ছিল, যে গ্রামের নদী ঘাট মাঠ বাগান খাল বিলের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন তিনি, বদলে গেছে সে গ্রামের চেহারা। যুগ যুগান্তরে পরিণত হয়েছে। তবু কি মা মরেছেন? না, মরেন নি। তিনি প্রবলভাবে বেঁচে আছেন তাঁর সারা হৃদয় জুড়ে। সেখানে তিনি শুধু জীবন্ত নন, তিনি মহীয়সী। অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলেন তিনি। অনেকবার এপাশ ওপাশ করলেন। বাইরের একটানা ঝিল্লী-ঝংকারের দিকে কান পেতে রইলেন। ঘুম এল না। শেষে উঠে আলো জেলে ডায়েরি লিখতে লাগলেন।

"মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আজ অনেক কথা মনে হচ্ছে। তিনি যে মরেন নি, এই কথাই কেবল মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে তিনি আরও বেশী করে বেঁচে আছেন। সারা বিশ্বে তাঁর স্নেহ ছড়িয়ে পড়েছে। একটু আগে যে বুড়ী দাইয়ের স্নেহ-আকুলতা দেখলাম তার মাঝে তিনি আছেন, যে মহিমময়ী রমণী অন্তঃপুরের অন্তরাল থেকে আমার মঙ্গল চিন্তা করছেন, যাঁকে কখনও দেখি নি, হয়তো কখনও দেখব না তাঁর মাঝেও তিনি আছেন। মায়ের কখনও মৃত্যু হয় না। তিনি জগদ্ধাত্রী, চিরকাল তিনি জগৎকে ক্রোড়ে ধারণ করে রক্ষা করেন, তাঁর যেদিন মৃত্যু হবে সেই দিনই মহা-প্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে জগৎ। তিনি নানারূপে অহরহ সর্বত্র আছেন বলেই জগৎ টিকে আছে, তিনি যেদিন থাকবেন না জগৎও থাকবে না। আমাদের শাস্ত্রে যে শক্তিকে দেবী বলে কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর অনেক রূপ। দুর্গা, চণ্ডী, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবই তাঁর রূপ। নানা রূপে তিনি আমাদের চালিত করছেন জীবনের নিত্য নূতন পথে। যে পথ অনাদি অনন্ত, যে পথের বাঁকে বাঁকে নিত্য নূতন লীলা। শুধু তিনি আমাদের চালিত করছেন না, মঙ্গলকে রক্ষা করছেন অমঙ্গলের হাত থেকে, পাঁকের ভিতর থেকে ফোটাচ্ছেন পদ্ম, পশুকে রূপান্তরিত করছেন সহৃদয় মানুষে। এর জন্যে প্রয়োজন হলে ভীষণাও হতে হয়েছে তাঁকে, অস্ত্রও ধারণ করতে হয়েছে। নির্বীর্য কাপুরুষের অন্তরে শৌর্য সঞ্চার করবার জন্য তিনিই তো যুগে যুগে বর্ষণ করেছেন অগ্নিবাণী। মনে পড়ছে বিদুলার কথা, মনে পড়ছে লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা, মনে পড়ছে প্রীতি ওয়াদ্দেদারের কথা। অনুভব করছি এঁদের সঙ্গে আমার মা-ও একাসনে বসে আছেন। আমার গর্বের আজ অন্ত নেই। শুধু যে এঁদের সঙ্গেই বসে আছেন তা নয়, পৃথিবীর সব বীরপুরুষদের সঙ্গেও বসে আছেন। পৃথিবীতে নীচতা, হীনতা, পাশবিকতা, মূর্খতার বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা নারী কি পুরুষ এ প্রশ্ন অবান্তর। বার্নার্ড শ'য়ের সেন্ট জোয়ান নামক বিখ্যাত নাটকে জোয়ানের মুখ দিয়ে এক জায়গায় তিনি বলিয়েছেন, 'আমি সুন্দরী ছিলাম না, আমি কাঠখোট্টা গোছের ছিলাম, আমি সৈনিক ছিলাম। আমি পুরুষ হলেও ক্ষতি ছিল না। পুরুষ হ'তে পারি নি বলে আমার দুঃখ হয়। তবে আমি পুরুষ হলে হয়তো তোমরা আমাকে নিয়ে এতটা মাততে না। কিন্তু আমি যাই হই, আমার মাথা আকাশ স্পর্শ করেছিল, ঈশ্বরের মহিমা নেমে এসেছিল আমার উপর, সেই জন্য নারীই হই বা পুরুষই হই যতক্ষণ তোমরা কাদায় মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলে ততক্ষণ আমি তোমাদের রেহাই দিতাম না, বিব্রত করতামই। আমার মা যখন ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে-ছিলেন তখন তাদের কি বলেছিলেন? সে কথা কেউ লিখে রাখেন নি, কিন্তু আমি জানি যা-ই তিনি বলে থাকুন তার সঙ্গে সেন্ট জোয়ানের কথার খুব অমিল নেই। সে কথার মর্মার্থ তোমরা যতক্ষণ পশু থাকবে আমি তোমাদের ততক্ষণ মানুষ করবার চেষ্টা করব। দরকার হলে তার জন্যে প্রাণ দেব। সে চেষ্টা আপাতত নিষ্ফল জেনেও আমি থামব না, থামবার অধিকার আমার নেই, শক্তিও নেই, কারণ ঈশ্বরের পরোয়ানা আমার হাতে আছে। ভালবাসা দিয়ে যে পাথরের বুকে ফসল ফলাতে পারি না, ডিনামাইট দিয়ে তাকে উড়িয়ে দিই। সে ডিনামাইটের নিষ্ঠুর আর্তনাদ সঙ্গীত হয়ে জন্মগ্রহণ করে ভবিষ্যতের জঠরে। তখন ডিনামাইট থাকে না, পাথর থাকে না, থাকে

শুধু সংগীত, থাকে শুধু সুন্দর। তাই চিরন্তন। তার বিনাশ নেই। প্রাণ দিয়ে একেই আমরা আহ্বান করি। দক্ষিণে যখন দুর্যোগ ঘনায়, পূর্বাকাশে তখন গান জমে, সুর ফোটে, রং জাগে। মনে পড়ছে এলিয়টের কবিতাঃ দক্ষিণে কি পাখীরা গান গাইছে? ঝঞ্ঝাহত সিন্ধু-শকুনদের চীৎকার ছাড়া তো কোন শব্দ নেই। বসন্তের পদচিহ্ন কি দেখা যাচ্ছে? না, পুরাতনের মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই, কোন সাড়া নেই, তৃণাংকুর নেই, হাওয়া নেই। দিন কি বাড়ছে? দিন যত বাড়ছে আঁধার তত বাড়ছে, রাত্রি তত ছোট হচ্ছে, তত ঠাণ্ডা হচ্ছে। বাতাস বইছে না, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে প্রকৃতি। বাতাস কিন্তু অপেক্ষা করে আছে পূর্বাকাশে। ক্ষুধার্ত কাকের দল একাগ্র হয়ে বসে আছে মাঠেঃ বনের অন্ধকারে পেচকেরা সাধছে প্রলয়ের সংগীত। এ কোন্ নিদারুণ বসন্তের আভাস? বাতাস কিন্তু অপেক্ষা করছে পূর্বাকাশে। মায়ের মৃত্যু কি সেই বাতাস হয়ে অপেক্ষা করছে পূর্বাকাশে? যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর চক্রান্ত আমাদের দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিলে, মায়ের মৃত্যু কি ঝড়ের মতো এসে সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভাঙা দেশকে আবার জুড়ে দেবে? নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের পর বর্ষা কি নামবে না? জানি না, কিন্তু আশা করি। এখন কিন্তু আমার সব চেয়ে বেশী আনন্দ হচ্ছে যে আমার এখন কেবল আমার মা নন। একটা ছোট গ্রামের ছোট গৃহস্থের ছোটখাটো গৃহস্থালী কাজ-কর্ম বেঁধে রাখতে পারে নি তাঁকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে। তিনি এখন উত্তীর্ণ হয়েছেন অসীমের মধ্যে, সংগীতের মধ্যে, কাব্যের মধ্যে। এখন তিনি সকলের, এখন তিনি মানুষ নন, মহৎ ভাবের প্রতীক। এখন তিনি ইতিহাসের নমস্য বীরদের সংগে একাসনে সমাসীন। তিনি এখন আমার একার নন, তিনি সর্বকালের সবার।...এই পর্যন্ত লিখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার মা সকলের মা হয়ে গেছেন, এতে কি আমি সত্যিই খুশী হয়েছি? হওয়া উচিত হয়তো, কিন্তু অকপটে সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, হইনি। আমার মা আজ নেই বলে আমি এইসব কথা ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার মা বিশ্বের মা হয়ে গেছেন এই ভেবে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার প্রয়াস পাচ্ছি, তা ঝুটো, তা অন্তঃসারশূন্য। আমার মাকে আমার জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে একান্তভাবে না পেলে তাঁকে পাওয়া হয় না। তাঁকে ছোট করে অত্যন্ত স্বার্থ-পরের মতো কেবল নিজের জন্যে পেলেই তবে তৃপ্তি। তার জন্যে আমার মায়ের মহৎ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার স্নেহে অন্ধ হয়ে তিনি যদি পরশ্রীকাতর হন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হন, আমার মঙ্গলের জন্য তিনি যদি মিথ্যা ভাষণ করেন, চুরি করেন, তা হলে তাতেই আমার বেশী সুখ। মায়ের হাতের আলোনা পোড়া রান্না খেয়েও আমার যে তৃপ্তি, মহার্ঘ হোটেলের নিখুঁত খাদ্যপানীয়ে আমার সে তৃপ্তি নেই। মায়ের ব্যাপারে আমি স্বার্থপর। মায়ের ভালবাসার, যত্নের, মনোযোগের, সেবার সবটা আমিই দখল করতে চাই। কাউকে ভাগ দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমার জন্মের বেশ কিছুদিন পরে বুলির জন্ম হয়। আমার বয়স যখন চার বছর তখন বুলির

জন্ম। আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে মা ওকে যখন প্রথম কোলে নিয়ে বারান্দায় বসলেন, আর আমি কোলে উঠতে গেলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন নয় বাবা, পরে তোমাকে কোলে নেব, এখন বোনটিই কোলে থাক, কেমন? মনে আছে সেদিন যে গভীর দুঃখ, যে প্রবল আঘাত আমি পেয়েছিলাম তা বর্ণনাতীত। সেই আমার জীবনের প্রথম সত্যকার দুঃখ। আমার মা আর আমার একার নয়, আর একজন মায়ের কোল জুড়ে বসেছে। আমার চোখ দিয়ে জল পড়েনি, আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়েছিলাম। হয়তো আমার মুখে একটু ম্লান হাসিও ফুটেছিল, কিন্তু আমার সেই হাসির অন্তরালে যে গভীর বেদনা লুকিয়েছিল তা মায়ের চোখ এড়ায়নি। তিনি তৎক্ষণাৎ বুলিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কোলে টেনে নিয়েছিলেন আমাকে। অজস্র চুমু খেয়েছিলেন। এরপর আমি আর আত্মসংবরণ করতে পারিনি, মায়ের গলা জড়িয়ে, তাঁর বুকে মুখ গুঁজে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার বোন বুলির ব্যাপারেই এই ঘটনা ঘটেছিল, বুলির বদলে যদি সারা বিশ্ব এসে মাকে ঘিরে দাঁড়ায় তাহলে কি সহ্য করতে পারব আমি তা? না, পারব না। এতক্ষণ আমি নিজেকে ছলনা করছিলাম, ভোলাচ্ছিলাম, ঠকাচ্ছিলাম। অভিনয় করছিলাম। মা নেই, মাকে আর কখনও দেখতে পাব না এ শোকের সান্ত্বনা নেই, কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটার সঙ্গে আমি নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না অথচ এ কথাও তো সত্য, মানুষ যখন অমর নয় তখন মায়ের একদিন না একদিন মৃত্যু হতই। কিন্তু সে মৃত্যু আর এ মৃত্যু কি এক? স্বাভাবিক মৃত্যু তো রোজ হয়, ঘরে ঘরে হয়, অনাদি কাল থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু সে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিনিদ্র রজনীর উৎকণ্ঠা, জড়িয়ে থাকে আসন্ন শোকের অন্ধকারে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কা, জড়িয়ে থাকে আশা-হতাশার দ্বন্দ্ব, জড়িয়ে থাকে অসংখ্য স্মৃতি, অসংখ্য আকুতি, ভালবাসার অসংখ্য অবর্ণনীয় ইতিহাস, প্রেমের স্পর্শে সে মৃত্যু মহৎ হয়ে ওঠে। গুণ্ডা আর কসাইয়ের হাতে মায়ের যে মৃত্যু হয়েছে, পশুত্বের কাছে মনুষ্যত্বের এই শোচনীয় পরাভব—না, আমার মা পরাভব স্বীকার করেননি, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছেন, শ্রীমতী ঝিনুকের দেওয়া এই সংবাদটুকুর জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার মা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি, এটা বহুমূল্য সংবাদ আমার কাছে। এইটে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে হবে। আশা করি বুলিও নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। হঠাৎ একটা কথা মনে হচ্ছে—নিদারুণ কথা সেটা! ঝিনুক মায়ের খবর জানে, কিন্তু বুলির বেলায় বললে, ঠিক জানি না। সত্যিই কি ঠিক জানে না? না, অপ্রিয় সংবাদ বলে চেপে গেল সেটা আমার কাছে? ঝিনুক কি ধরনের মেয়ে? সেদিন ডাক্তার ঘোষালের মুখে তার যে পরিচয় শুনেছি তা তো ভয়ানক! গিরিশ বিদ্যার্ণবের মেয়ে ডাক্তার ঘোষালের রক্ষিতা হয়ে আছে? একথা ভাবা যায় না। ঝিনুকও এ কথা বিশ্বাস করতে মানা করেছে। বলেছে, ডাক্তার ঘোষাল যা বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ডাক্তার ঘোষালের মতো লোকের কাছে ও টিঁকে আছে। ডাক্তার ঘোষালের মতো বে-পরোয়া দুর্ধর্ষ লোকের কাছে কি সসম্মানে থাকা যায়? বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া আর একটা মেয়েকেও দেখেছি ওদের আড্ডায়। মনে হয় মানবীর বেশে সর্পিণী। ও মেয়ের সঙ্গে ঝিনুকের ঘনিষ্ঠতা আছে না কি! একটা কথা কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ঝিনুকের চোখে মুখে আমি এমন একটা ভাব লক্ষ করেছি যা খেলো নয়, সস্তা নয়, যার মধ্যে অনন্যতা আছে, যা মনকে কলুষিত করে না, পবিত্র করে, কিন্তু—না, যে কথাটা এখনি মনে হল তা আমি মানব না। ঝিনুক আমাকে বিচলিত করেনি। ঝিনুকের রূপ দেখে আমি মনে মনে প্রশংসা করেছি, কিন্তু তা আমার হিতাহিত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করেনি, আমার বিবেককে অপবিত্র করেনি। তবে এটা অবশ্য ঠিক যে, আমি চাই ওর বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভিতরটাও তেমনি সুন্দর হোক। আশা করি ভিতরটা ওর সুন্দরই! তনিমা সেনকে দেখামাত্র সমস্ত শরীরটা যেমন ঘিনঘিন করে ওঠে, ঝিনুককে দেখে তা ওঠে না। মনে হয় ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আবিষ্কার-যোগ্য, যা আবিষ্কার করতে পারলে আনন্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আবিষ্কার করবার জন্যে আমি কি উৎসুক? অস্বীকার করতে পারব না, ঔৎসুক্য আছে—" হঠাৎ গণেশ হালদার থেমে গেলেন। বাইরের দুয়ারে কে কড়া নাড়ছে। রকেট ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল ও বাড়িতে। কড়া নাড়ার সামান্য আওয়াজ পেলেই ও চীৎকার করে। গণেশ হালদার ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন বাইরের দিকে। আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টাওয়ার ক্লকের ঘণ্টা বাজল টং, টং। দুটো বেজেছে? গণেশ হালদার নিজের ঘড়িটা দেখলেন, হ্যাঁ, দুটোই তো। এত রাত্রে কে আসবে তাঁর কাছে? উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি বাইরের দিকে। আবার কড়া নড়ল। তিনি কপাট খুলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। বাইরের উঠোনটা পার হয়ে তবে বাইরের দরজাটা। তিনি এতক্ষণ ঘরে খিল দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় বসে লিখছিলেন। বাইরের উঠোনে পা দিয়েই তিনি যেন একটা রূপকথালোক আবিষ্কার করলেন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠছে, আর তার আলোটা পড়েছে শিরীষ গাছের উপর। সেই শিরীষ গাছের ছায়াটা পড়েছে তাঁর উঠোনে। মনে হচ্ছে যেন একটা কালো মখমলের উপর রূপোর বিচিত্র কাজ করা রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে গণেশ হালদারের মনের রং বদলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন কবি হয়ে গেলেন। তিনি যেন উপলব্ধি করলেন আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা দর্শন নয়। বিশেষত যে আপাতদৃষ্টি বহু সকলেরই দৃষ্টির সাক্ষ্য মানতে অভ্যস্ত সে আপাতদৃষ্টির ভুল সহজেই ধরা পড়ে যদি সে ভুলকে ভুল বলে চেনবার চোখ খুলে যায়। সেই চোখ যেন তাঁর সহসা খুলে গেল। তাঁর বাড়ির পাশের নিতান্ত তুচ্ছ শিরীষ গাছটাকে সকলের সাক্ষ্য মেনে এতদিন তিনি শিরীষ গাছ বলেই মেনে এসেছেন। আজ তাঁর

মনে হল ওটা কেবল শিরীষ গাছ নয়, ওটা এমন একটা জিনিস যা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে পারে। প্রখর দিবালোকে তার যে রূপ, ম্লান জ্যোৎস্নায় তার সে রূপ থাকে না। সে তখন শিল্পী। জ্যোৎস্নার সাহায্যে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সে রূপোর কাজ-করা অপূর্ব কালো মখমলের অপূর্ব গালিচা সৃষ্টি করতে পারে। দিনের বেলায় ঘন পুঞ্জ পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়ে সে যা করে তাতো সবাই জানে, সবাই দেখেছে। কিন্তু তার এই কীর্তিটা! মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। হয়তো আরও খানিকক্ষণ থাকতেন। কিন্তু আবার কড়া নড়ল। এগিয়ে গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক ঢুকল এসে। কপাটটায় খিল দিয়ে চাপা গলায় বলল আমি ঝিনুক। ঘরের ভিতর চলুন। গণেশ হালদার কোন প্রশ্ন করলেন না। ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি যে রূপকথালোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এটাও যেন সেই রূপ-কথার অংশ বলে মনে হল তাঁর। তিনি যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন, ঝিনুকও তাঁর পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল।

"আমাকে এ সময়ে দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছেন, না?"

গণেশ হালদার আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু মুখে যা বললেন তা অন্যরকম।

"না, আশ্চর্য হবার কি আছে এতে। এসেছেন কেন, দরকার আছে কিছু?"

"এইগুলো রেখে দিন।"

ঝিনুক কাগজে মোড়া কয়েক বাণ্ডিল নোট বার করে হালদারের হাতে দিয়ে বলল, "আপাতত এগুলো আপনার কাছে থাক, আমি পরে এসে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব। কথাটা কিন্তু গোপন রাখবেন। কেউ যেন জানতে না পারে।'

"কি এগুলো?"

"টাকা। এগারো হাজার টাকা আছে ওতে—"

"এত টাকা কোথায় পেলেন আপনি এত রাত্রে?" গণেশ হালদারের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। একটু আতঙ্কিত হলেন তিনি।

"'এত টাকা কোথায় পেলেন?"

আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

"সেসব পরে বলব। আমার সব কথাই বলব আপনাকে। মুখে না বলতে পারি চিঠি লিখে জানাব। সব জানাব আপনাকে।"

ঝিনুক সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল। গণেশ হালদারের ভয় করতে লাগল। তাঁর মনে হল অনিবার্যভাবে তিনি এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন, এটা ভালো হচ্ছে কি?

(ক্রমশ)

ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্যের গোড়ার কথা

সঞ্জীবকুমার বসু

ভাস্কোডিগামা ভারতবর্ষে আসার বহু পূর্বে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতের মাটিতে টমাস নামে একজন ধর্মযাজক আসেন। বিশপ মেডলিক্ট তাঁর "India and the apostle Thomas" গ্রন্থে এই কথাই আলোচনা করেছেন এবং টমাসকে তিনি ভারতের মাটিতে প্রথম ইংরেজ বলে বর্ণনা করেছেন। তার বহু পরে ৮৮৩ সালে ইংলণ্ডের রাজা এলফ্রেড, মালিয়াপুরে ঋষি টমাসের যে সমাধি আছে, সেখানে উপাসনা করার জন্য সিঘেলমাস নামে ইংলণ্ডের এক ধর্মযাজককে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে সিঘেলমাস যখন ইংলণ্ডে ফিরে যান, তখন তিনি এখান থেকে বহু মণিমুক্তা ও মূল্যবান জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যান। তারপর দীর্ঘ দিনের মধ্যে ভারতে আর কোন ইংরেজ আসেন নি। প্রায় সাতশো বছর পরে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হবার প্রায় কুড়ি বছর আগে, আর-একজন ইংরেজ এদেশে আসেন। তাঁরই বিবরণ অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে।

১৫৭৯ সালে টমাস স্টীফেন্স নামে আর-একজন ইংরেজ এদেশে আসেন। প্রকৃতপক্ষে স্টীফেন্সই ভারতে এসে দীর্ঘকাল বসবাস করেন। তিনি গোয়ার নিকটে সালসিট দ্বীপে জেসুইট কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। স্টীফেন্স ছিলেন সুশিক্ষিত ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভারতে অবস্থানকালে তিনি যে-সব চিঠিপত্র তাঁর পিতাকে লেখেন, তাতেই ভারতের বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। এই চিঠিপত্রের বিবরণ থেকেও বহু ইংরেজ ভারতে আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্টীফেন্স আসার চার বছর পরে, অর্থাৎ ১৫৮৩ সালে, লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী মাস্টার রালফ ফীচ ভারতে আসেন। ফীচের সঙ্গে লণ্ডনের আরো কয়েকজন ব্যবসায়ী, যথা—জন নিউবেরী, জহুরী উইলিয়ম লিডস এবং চিত্রকর জেমস স্টোরিও প্রভৃতি আসেন। অবশ্য ফীচ ব্যবসার জন্য ভারতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন পর্যটক হিসাবে। ভারতবর্ষকে দেখবার ও জানবার উদ্দেশ্য নিয়ে ফীচ ও তাঁর সঙ্গীরা "টাইগার অব লণ্ডন" জাহাজ-যোগে প্রথমে ত্রিপোলী বন্দরে এসে পৌঁছান। ত্রিপোলী থেকে অন্যান্য স্থান ঘুরে তিনি দিউয়ে উপস্থিত হন। দিউ তখন পর্তুগীজদের অধীনে একটি ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে ফীচ চৌল বন্দরে উপস্থিত হন। তখন এই

জামোরিনের দরবারে ভাস্কোডিগামা

বন্দর থেকে মশলা, ঔষধ, রেশম চন্দনকাঠ, হাতির দাঁত এবং চিনির আমদানী-রপ্তানি করা হত। এই বন্দরে ফীচ সর্বপ্রথম তালগাছ দেখেন। তালগাছের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফীচ বলেছেন, এই গাছ থেকে মদ, তেল, চিনি, দড়ি জ্বালানি-কাঠ পাওয়া যায়। এর পাতা দিয়ে মাদুর ও ঘরের চাল তৈরী করা যায় এবং কাঠের দ্বারা আসবাবপত্র ও জাহাজের কাজ করা যায়। গোয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ফীচ দেখলেন—এখানকার লোকেরা নানান রকমের দেবদেবীর পুজো করেন। এরা মনে প্রাণে অহিংস, পশু তো দূরের কথা, উকুন পর্যন্ত মারেন না। চৌল বন্দরের অধিবাসীরা নিরামিষ ভোজী। তখনও এদেশে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। কবর না দিয়ে হিন্দুদের শব দাহ কেন করা হত, ফীচের একথার উত্তরে তখনকার অধিবাসীরা বলতেন, দেহকে কবর দিলে দেহের মধ্যে অনেক পোকা জন্মাবে। যতদিন দেহ থাকবে, ততদিন পোকার খাদ্যের অভাব থাকবে না, কিন্তু দেহ যখন শেষ হয়ে যাবে, পোকারা অনাহারে মরবে, কাজেই এতে আমাদের পাপ হবে, সুতরাং মৃতদেহ দাহ করাই হল যুক্তিযুক্ত। ফীচের বর্ণনা থেকে এই ধরনের কথা জানতে পারা যায়।

গোয়া তখন পর্তুগীজদের প্রধান শহর ছিল। তাঁদের রাজ-প্রতিনিধিরা গোয়ায় অবস্থান করতেন। ফীচ ও তাঁর সঙ্গীরা গোয়ায় আসার কয়েক দিনের মধ্যেই গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু তখন স্টীফেন্স জেসুইট কলেজের অধ্যক্ষ থাকায় দরুন তাঁরই চেষ্টায় ফীচ ও তাঁর সঙ্গীরা মুক্তি পান এবং গোয়া ত্যাগ করে বিজাপুরের দিকে যাত্রা করেন।

বিজাপুর শহরে তখন বহু লোকের বাস। অধিবাসীরা প্রায় সবাই অবস্থাপন্ন। তাঁরা যে-সব দেব-দেবীর পুজো করতেন, সেগুলি ছিল আকৃতিতে কোনোটা গরুর মত, কোনোটা হনুমানের মত, আবার কতক-গুলি ময়ূর বা ভূতের মত। বিজাপুর থেকে ফীচ ও তাঁর দলবল সহ গোলকুণ্ডায় আসেন এবং সেখান থেকে মছলিপট্টম হয়ে তাঁরা বার্হানপুরে পৌঁছান। এখানে এসে ফীচের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় ঘটে। তিনি এখানে কতকগুলি বিবাহ আসরে যোগ দেন। তখনকার দিনে খুব অল্প বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হত। এর কারণ অনুসন্ধান

করে ফীচ জানতে পারেন যে, সহমরণ প্রথা চালু থাকায় পিতা ও মাতা একসঙ্গে দেহত্যাগ করার জন্য তাদের সন্তানদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরের তত্ত্বাবধানে রেখে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। বার্হানপুর তখন মোগল সম্রাট আকবরের অধীনে। এখানকার প্রচলিত টাকা-পয়সা ছিল রুপোর এবং তার বৈদেশিক মূল্য ছিল বাইশ পেন্স। বার্হানপুর থেকে ফীচ আগ্রায় আসেন। আগ্রা ছিল তখন প্রস্তরনির্মিত শহর। শহর দেখার পর ফীচ ও তাঁর সঙ্গীগণ ফতেপুর দর্শনে যান। ফতেপুরে তখন মোগল সম্রাট বাস করতেন। আগ্রা থেকে ফতেপুর ছিল অনেক বড় শহর। এখানে সম্রাটের এক হাজার হাতি, ত্রিশ ঘোড়া, এক হাজার চার শ হরিণ, বানর এবং প্রচুর পরিমাণে বাঘ অন্যান্য জীবজন্তু থাকত। এই শহরকে লণ্ডন শহর থেকেও বড় বলে করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এখানে ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা আসতেন

ফতেপুর পরিক্রমার পর ফীচ বাংলা দেশের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গীরা অন্যান্য দিকে রওনা হন। নিউবেরী লাহোরের দিকে এবং লীডস আকবরের দরবারে চাকরি নেন। সেই সময় ১৮০ খানা নৌকা বাংলা দেশের সপ্তগ্রাম বন্দরের দিকে আসছিল নানারূপ পণ্যদ্রব্য নিয়ে। ফীচ তাদের সঙ্গে বাংলা দেশে চলে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। বাংলা দেশের তখনকার কিছু কিছু সামাজিক ঘটনা ফীচের বর্ণনা হতে জানা যায়। বাংলা দেশে তখন নানাপ্রকার রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা নদীতে স্নান করতে গিয়ে সূর্যদেবকে প্রথমে পূজো করতেন এবং নানা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা পূজো শেষ করে তবে জলস্পর্শ করতেন। আবহাওয়া যতই ঠাণ্ডা হোক না কেন, রোজ তাঁরা স্নান করতেন। এই সব ব্রাহ্মণেরা কোন জীব হত্যা করতেন না। এমন কি, মাছ-মাংস পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না। তাঁরা উলঙ্গ অবস্থায় জলের মধ্য থেকে জল-দেবতাকে উপাসনা করতেন এবং ঐ অবস্থায় আহার করতেন। তারপর মাটিতে শুয়ে বারবার এদিক ওদিক মোড় ফেরার পর হাত উঁচু করে সাষ্টাঙ্গে সূর্যদেবকে প্রণাম করতেন। রোজ সকালে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের কপালে ও গলায় মাটি মাখতেন। স্ত্রীলোকেরা দল বেঁধে গান করতে করতে নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে স্নান ও অন্যান্য পূজো করতেন, তারপর নিজেদের দেহ মাটির দ্বারা সুশোভিত করতেন। তখনকার মেয়েদের বিয়ে দশ বছরের মধ্যে হত এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ কম করে সাতটি বিয়ে করতেন। ব্রাহ্মণেরা প্রণাম কালে 'রাম রাম' ধ্বনি করতেন।

বাংলা দেশে কিছুদিন থাকার পর ফীচ বেনারসী ও পাটনা ভ্রমণে রওনা হন। তখন পাটনায় প্রচুর পরিমাণে কাপাস, চিনি ও আফিং পাওয়া যেত। পাটনা থেকে ফীচ আবার বাংলা দেশে আসেন এবং গৌড় ও বাংলার অবশিষ্ট অংশ ঘুরে তিনি পেগো, মালাকা, লংকা, কোচীন প্রভৃতি স্থান দেখে ১৫৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল লণ্ডনে ফিরে যান। ফীচকেই ভারতে প্রথম ইংরেজ পর্যটক বলা যেতে পারে।

ফীচ লণ্ডনে পৌঁছানোর পর ভারতবর্ষের কথা লণ্ডনে প্রচার হয়ে যায়। তাছাড়া কয়েক জন পর্তুগীজ নৌ-সৈনিক ফীচের পরে ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান জিনিস নিয়ে যান। এই সব দেখে তৎকালীন কয়েকজন ইংরেজ ১৫৯১ ও ১৫৯৬ সালে দুবার ভারতবর্ষে আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরা কোনবারেই আসতে সক্ষম হননি।

১৫৯৯ সালে জন মিলডেনহল নামে একজন ইংরেজ স্থলপথে ভারতে আসার চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সম্রাট আকবরের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজার একটি বাণিজ্য চুক্তি করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মিলডেনহল জলপথে আলেপ্পো পর্যন্ত এসে তিনি আবার স্থলপথে আর্মেনিয়া, পারস্য এবং আফগানিস্থান হয়ে পরে কান্দাহারের মধ্য দিয়ে লাহোরে পৌঁছান। সেখানে কিছুদিন থাকার পর ১৬০৩ সালে আগ্রায় এসে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেন। মিলডেনহল সম্রাটকে ২৯টি ঘোড়া এবং কয়েকটি মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেন। সম্রাট এই উপহারে খুব খুশী হন। পরের দিন মিলডেনহল সম্রাটের কাছে দোভাষীর সাহায্যে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন। তার মধ্যে (১) রানী এলিজাবেথের সঙ্গে আকবরের সৌহার্দ্য স্থাপন; (২) আকবরের রাজ্যে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার, এবং (৩) তাঁর রাজ্যে যদি ইংরেজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তবে সম্রাট নিরপেক্ষ থাকবেন; সম্রাটের অনুরোধে মিলনেডহল এই সকল প্রস্তাব লিখিতভাবে পেশ করলেন। কিন্তু সম্রাট তৃতীয় প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানালে মিলডেনহল সন্তুষ্ট হতে পারলেন

না। তিনি কিছুদিনের জন্য দরবারে আসা বন্ধ করলে এবং ফার্সী ভাষা শিখে পুনরায় তিনি সম্রাটের কাছে দরবার জানালেন। এবার সম্রাট তাঁর সব কটি প্রস্তাব মেনে নিলেন। এই ব্যবস্থায় মিলডেনহল উপকৃত হয়েছিলেন কিনা, ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ না থাকলেও রানী এলিজাবেথ মিলডেনহলের কাজে খুব খুশী হয়েছিলেন। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মিলডেনহল ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

ভাস্কোডিগামার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘোরার সময় থেকেই পর্তুগীজদের ভারত-সমুদ্রে একাধিপত্য ছিল। কিন্তু স্টীফেন্স ও ফীচের বর্ণনার পর থেকে ইংলণ্ডের কিছু কিছু লোক এদেশে আসতে শুরু করেন। ১৫৮৯ সালে আরো কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী তিনখানা ছোট জাহাজ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। যদিও পর্তুগীজরা তখন ভারতবর্ষে ভালভাবেই আধিপত্য বিস্তার করেছে, তথাপি ইংরেজরা সেই বাধা অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে কয়েকটি নূতন নূতন বন্দর স্থাপন করে বসতি শুরু করেন।

এই ঘটনার দশ বছর পরে ১৫৯৯ সালে অনেক জল্পনাকল্পনার পর একটি ব্যবসায়ী সমিতি গঠিত হয় এবং সনদের জন্য রানী এলিজাবেথের কাছে আবেদন জানানো হয়। অনেক বাধাবিপত্তির পর ষোড়শ শতকের শেষ দিনে এই ব্যবসায়ী সমিতি অনুমতি পান। এই সনদে রাজরাজেশ্বরী, কম্বারল্যাণ্ডের আর্ল জর্জ, লণ্ডনের নাইট স্যার জন হার্ট, স্যার জন স্পেনসার, স্যার এডওয়ার্ড মিকেলবর্ন, উইলিয়ম কাভেন্ডিস এবং অন্যান্য প্রায় ২১৮ জন ব্যক্তিকে নিয়ে ও তাঁদের নিজ খরচে ও দায়িত্বে নিজেদের রাজ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য স্বাধীন যোগে বাণিজ্যের অধিকার তাঁরা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বণিকদের

"The Governor and company of the marchants of London trading into the East Indies".

নামে আখ্যা দিয়ে সমিতিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পরিচালনের অনুমতি দেওয়া হয়।

সমিতির কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্যও একটি নিয়মাবলী রচিত হয়। ২৪ জন সদস্য দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হয়। যদি কেউ এই নিয়মাবলী না মানেন তার জন্য শাস্তি বিধানের ক্ষমতা এই সমিতিকে দেওয়া হয়। অন্য কোন ব্যবসায়ী যাতে ভারতের পূর্ব অঞ্চলে ব্যবসা না করতে পারেন, তার জন্য রানী এক আদেশ জারী করেন। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করেন, তাহলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ ব্যবস্থা হয়। এমন কি আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে

লিপিবদ্ধ করা হয়। কোম্পানীর অনুরোধ ব্যতীত রানী বা তাঁর বংশধরগণ আর কাউকে বাণিজ্যের অধিকার দিতে পারবেন না—রানীর সঙ্গে কোম্পানীর এই ধরনের একটা চুক্তি ছিল। কোম্পানীর সুবিধার জন্য যেসব স্থান দিয়ে কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করবে, সেই সব দেশের সম্রাটরা যাতে কোম্পানীর জাহাজকে কোন বাধা না দেন, এই মর্মেও এক অনুরোধপত্র রানী সমস্ত সম্রাটদের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। এই-ভাবেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সূত্রপাত হয়।

১৬০১ সালের ২২শে এপ্রিল ড্রাগন (Dragon), হেক্টর (Hector), আসেনসন (Ascension), সুসান (Susan) এবং গেস্ট (Guest) নামে পাঁচটি জাহাজ লোহা, টিন ও কাচের জিনিস এবং কিছু কাপড় বোঝাই করে ল্যাংকাস্টার নামক নাবিকের অধীনে কোম্পানীর জাহাজ যাত্রা করে। পথিমধ্যে গেস্ট জাহাজটি জলে ডুবে যায়। প্রায় ছয় মাস জলযাত্রার পর ল্যাংকাস্টার জাহাজগুলি নিয়ে সুমাত্রার অধীনে আচীন বন্দরে পৌঁছান। সেখানে রানী এলিজাবেথের পরিচয়পত্র দেখালে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয় এবং সুমাত্রার রাজা তাঁকে অবাধ বাণিজ্যের এবং অন্যান্য অনুমতি দেন। কিছুদিন পরে ল্যাংকাস্টার আচীন থেকে জাভার অন্তর্গত বান্টামে যাত্রা করেন। এখানে ইংলন্ড থেকে আনা পণ্যের বিনিময়ে কিছু মসলা ক্রয় করেন এবং বান্টামের শাসন-কর্তার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। বান্টামে ল্যাংকাস্টার একটি কুঠি স্থাপন করে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। রানী ও ইংলন্ডের লোকেরা ল্যাংকাস্টারের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রভূত সম্মানে ভূষিত করেন।

ল্যাংকাস্টারের প্রথম যাত্রায় সাফল্য লাভ করার জন্য ইংলন্ডের বণিকগণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ক্রমে ক্রমে আরো কয়েকটি জাহাজ ও পণ্যদ্রব্য বান্টামে প্রেরণ করেন। প্রতিবারেই তাঁদের প্রচুর লাভ হতে লাগল। অবশেষে ১৬১০ সালে ক্যাপ্তেন ডেভিড মিডলটনের অধীনে একদল ইংরাজ বণিক ৩ খানা জাহাজ সহ ভারতবর্ষে প্রবেশের জন্য যাত্রা করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে তিনি মোচা বন্দরে উপস্থিত হলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তার করে কিছুদিনের জন্য আটক রাখে। যাই হোক, মিডলটন ও তাঁর দলবল মুক্তিলাভ করে সুরাটের দিকে রওনা হন। ১৬১১ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর তিনি যখন সুরাট বন্দরে প্রবেশ করতে যাবেন, সেই সময় তিনি দেখতে পান যে, পর্তুগীজরা প্রায় ২০ খানা জাহাজ নিয়ে তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মিডলটন পর্তুগীজদের অধ্যক্ষকে জানালেন যে তিনি রানী কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এখানে এসেছেন, কাজেই পর্তুগীজদের বাধা দেবার কোন অধিকার নেই। মোগলরাজ ও তাঁর প্রজার সাথে বাণিজ্যের জন্য তিনি সুরাটে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু তবুও পর্তুগীজরা তাতে রাজী হয় না, তখন মিডলটন পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু যুদ্ধ করেও তিনি কিছু সুবিধা করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি সুরাট ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এই ঘটনার দু' বছর পরে ১৬১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন বেস্ট-এর অধীনে ৪ খানি জাহাজ আবার বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করে। আমেদাবাদের গভর্নরকে সন্তুষ্ট করে বেস্ট সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে সনন্দ লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সংবাদে পর্তুগীজরা ভীত হয়ে ইংরেজরা যাতে ফার্মান না পান, তার চেষ্টা করতে থাকেন এবং ক্যাপ্টেন বেস্টকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পর্তুগীজরাই পরাজিত হয়ে ২৭শে নভেম্বর পলায়ন করেন।

পর্তুগীজদের এই যুদ্ধে পরাজয়ের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ইংরেজদের গৌরব বাড়ে। এযাবৎ ভারতবাসীরা জানত যে, জলযুদ্ধে পর্তুগীজদের সমান কেউ ছিল না, কিন্তু ইংরেজদের বীরত্ব দেখে অনেকে আশান্বিত হল। সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে কোম্পানীকে সুরাট, আমেদাবাদ, কাম্বে ও গোগোতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। এবং শতকরা লাভের সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক গ্রহণ করে তাঁদের বাণিজ্যের অধিকার দেন। এই ফার্মান বা সনন্দ ১৬১৩ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী ক্যাপ্টেন বেস্ট-এর হস্তগত হয়। ভারতবর্ষে কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠার এই হল সূত্রপাত।

কিন্তু নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হতে লাগল। পর্তুগীজরা ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। এমন কি, মোগল বাদশাহও এর কোন প্রতিকার করতে পারলেন না। একথা শুনে ইংলন্ডের রানী ঠিক করলেন, হয়ত মোগল দরবারে উপযুক্ত দূত প্রেরণ করলে এই অসুবিধা দূর হতে পারে। সেই অনুসারে তিনি স্যার টমাস রোকে দূত হিসাবে ১৬১৫ সালে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। টমাস রো ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়ে ১৬১৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর সুরাট বন্দরে উপস্থিত হন। সুরাটে পৌঁছানো মাত্র সেখানকার লোকজন রো-কে অপদস্থ করার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছু কিছু লোক রো'র প্রতি নানারূপে কুৎসা রটাতে আরম্ভ করলেন। এমন কি, তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচর বলে প্রচার চলতে লাগল। তখন সুরাটের মুসলমান শাসনকর্তা রো'র সমস্ত জিনিসপত্র এবং তাঁর শরীর পর্যন্ত পরীক্ষা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তিনি এই প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানান। এইরূপে উত্তরের জন্য শাসনকর্তা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ তখনকার প্রতাপশালী শাসনকর্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন বৈদেশিক যে এইরূপ প্রতিবাদ করতে পারে, এ দৃশ্য কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু এই প্রতিবাদের ফলে রো'র পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। শাসনকর্তা রো'র এইরূপ বলিষ্ঠ ব্যবহারে প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন এবং রো'র সকল অনুরোধ রক্ষা করতেও আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত সুরাটে থেকে রো মোগল বাদশাহের সাথে দেখা করার জন্য ১৫ই নভেম্বর সুরাট থেকে ২২৯

বাদসাহের অন্তঃপুরে (প্রাচীন চিত্র হইতে)
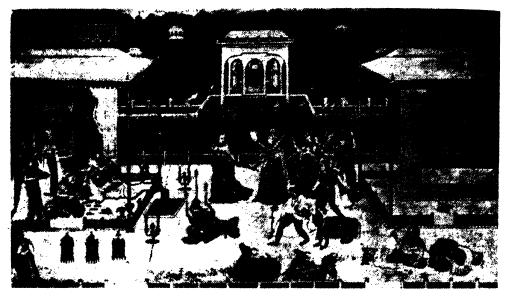
মাইল দূরে বার্হানপুরে উপস্থিত হন। সম্রাটের পুত্র সুলতান পার্বিজ এই জায়গায় পিতার প্রতিনিধিরূপে বাস করছিলেন। কোতোয়াল সঙ্গে নিয়ে রো পার্বিজের সাথে দেখা করতে যাবেন এমন সময় একজন মোগল কর্মচারী তাঁকে মাথা নত করে সম্রাটের পুত্রকে সম্ভাষণ জানাতে বলেন, কিন্তু রো এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে গেলেন দরবারের দিকে। দরবারে রো'র জন্য বসবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তথাপি তিনি সোজা পার্বিজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিবেদন করলেন যে, তিনি ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধিরূপে বাদশাহের দর্শনলাভের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু পথিমধ্যে সম্রাট-পুত্র অবস্থান করছেন জেনে, তাঁর সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি এখানে এসেছেন। পার্বিজ রোকে যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন এবং ইংলণ্ড সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। রো'র প্রার্থনা অনুযায়ী বার্হানপুরে ইংরেজ কোম্পানীকে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়।

বার্হানপুর ত্যাগ করে রো যাত্রা শুরু করেন রাজপুতানার দিকে। কারণ মোগল সম্রাট তখন আজমীরে ছিলেন। রো প্রথমে চিতোড় গমন করেন। চিতোড়ের পূর্ব গৌরব নষ্ট হলেও তখনও তার যেটুকু সৌন্দর্য ছিল, তাতেই রো মুগ্ধ হয়ে যান। বিচিত্র কারুকার্য সমন্বিত শতাধিক মন্দির এবং অভ্রংলেহী রাজপ্রাসাদ দেখে রো বিস্ময় প্রকাশ করেন। চিতোড় সে সময় জনশূন্য ছিল। রো'র উক্তি হতে জানা যায় যে, এই স্থানের অধিপতি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই রাজা আলেকজান্দার কর্তৃক পরাজিত পোরসেরই বংশধর এবং এই হিসাবে এই নগর দিল্লি অপেক্ষাও প্রাচীন। এরই নিকটে গ্রীক ভাষায় লিখিত খোদিত লিপিসহ আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নির্মিত স্তম্ভ রয়েছে। চিতোড় ত্যাগ করে ২৩শে ডিসেম্বর রো আজমীরে এসে উপস্থিত হন। তখনকার রাজ অন্তঃপুরের কিছু কিছু ঘটনা রো-এর বর্ণনা হতে জানা যায়।

"খোজা ব্যতীত অন্য কেউ রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারতেন না। অন্তঃপুরে অস্ত্রধারিণী স্ত্রীরক্ষীগণ প্রহরায় রত থাকতেন। ভোরবেলায় মোগল বাদশা গঙ্গার ধারে উপস্থিত হয়ে প্রজাদের দর্শন দিতেন। বিকেলে তিনি দরবারে এসে মন্ত্রিগণের সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সন্ধ্যার পর তিনি আহার সেরে 'নুজেলখান' নামক গৃহে আসতেন। এখানে প্রস্তরের সিংহাসনে বা আরাম কেদারায় বসে তিনি খোস গল্প করতেন। এই সময় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাই এখানে উপস্থিত থাকতেন। বাদশা এই আসরে বসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা সন্ধি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতেন না। প্রতি বৃহস্পতিবারে সম্রাট জারুকোতে উপবেশন করে গরীব প্রজাদের কথা শুনতেন।"

১৬১৬ সালের ১০ই জানুয়ারী রো সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর পরিচয়পত্র ও উপহার প্রদান করলে সম্রাট তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। রো বলেছেন, তাঁকে যে সম্মান প্রদর্শন করা হয় এ পর্যন্ত কোন রাজার কোন প্রতিনিধিকে এইরূপ সম্মান দেখানো হয় নি। ১৮ তারিখে রো রাজকুমার খুরমের সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানেও সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। রো যে উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন অবশেষে তা নানা বাধা বিপত্তির পর সম্পন্ন হয়। বাদশা ইংরেজ কোম্পানীকে একটি ফার্মান প্রদান করেন। এই ফার্মানে অন্যান্য সর্তের মধ্যে সম্রাট ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন। ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য ও তাদের অন্যায়রূপে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে ও অবাধে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দেন। ইংরেজরাও বাদশাকে প্রয়োজন মত সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। রাজপ্রতিনিধি স্যার টমাস রো-এর এইসব কাজ দেখে ইংলণ্ডের রাজা খুব খুশী হন। রো যেভাবে বাদশাহের কাছে নিজের বুদ্ধিবলে কাজ হাসিল করেছেন, তাতে পরবর্তীকালে ইংরেজ কোম্পানীগুলির বিশেষ সুবিধা হয়। ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য কিভাবে টমাস রো-এর এই কীর্তি ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। টমাস রো তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যার ঐতিহাসিক উপাদানগুলি একালের মানুষের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এই হল ভারতবর্ষে ইংরাজ আধিপত্যের গোড়ার কথা।

॥ ৩৬ ॥

এক এক সময় নিজেকে আমার খুব স্বার্থপর মনে হয়। আমার কর্মজীবনের সংকীর্ণ পৃথিবীতে যারা একদিন পদার্পণ করেছিল তাদের সুখদুঃখের এই সুদীর্ঘ বিবরণ আমার ভালো লাগলেও লাগতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে দেশের পাঠক-পাঠিকাদের কেন টেনে আনলাম? আবার ভাবি, ফোকলা চ্যাটার্জি, মিসেস পাকড়াশি, মিস্টার আগরওয়ালার গতায়াত কিছু আমার পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের সঙ্গে সবার পরিচয় হওয়াই ভাল।

এক এক সময় আবার অন্য চিন্তা মনের মধ্যে জট পাকিয়ে যায়। শাজাহান হোটেলে প্রতিদিন অতিথিদের যে জোয়ারভাঁটা খেলে, তাদের কোনো পরিচয়ই তো আমার রচনায় রেখে যেতে পারলাম না। যাদের অতি নিকট থেকে দেখলাম, যাদের সুখদুঃখের সঙ্গে আমার সুখদুঃখ জড়িয়ে গিয়েছিল তাদের কথাই কেবল লিখলাম, অথচ যে বিশাল জীবন-স্রোত প্রতিদিন আমার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হলো। দর্শকের আসন থেকে তাকে কেবল দেখাই হলো তার সংবাদ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেল না। অনাগত কালে কোনো বিরল প্রতিভা হয়তো বঙ্গভারতীর সেই অতি প্রয়োজনীয় অভাব দূর করবেন, তাঁর লেখনী স্পর্শে পান্থশালায় বহু মানুষের কলধ্বনি অতীতের গর্ভ থেকে উদ্ধার পেয়ে বর্তমানের কাছে ধরা দেবেন, তীব্র ঘৃণাদায়ক অসুন্দরের মধ্য থেকে সাহিত্যের পরমসুন্দর ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবেন। কাউন্টারে সেদিন কোনো কাজ ছিল না, চুপচাপ বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় বোসদার হাতের স্পর্শে চমকে উঠলাম। বোসদা হেসে বললেন, "কী এতো ভাবছো?"

বললাম, "কেমন যেন অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই হোটেলে কোনোদিন যে ঢুকতে পারবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি; আর অন্দরে ঢুকে এই সামান্য সময়ের মধ্যেই নিজের অজ্ঞাতে কখন যেন আমার সত্তা শাজাহানের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।"

বোসদা আবার হাসলেন, "তোমরা যে সব সায়েব হয়ে গিয়েছো—পূর্ব জন্মে বিশ্বাস করো না। না হলে বলতাম আমি এখানে আরও কয়েকবার এসেছি। এই হোটেলের প্রতিটা ঘরের সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের পরিচয় রয়েছে।"

"হয়তো তাই।" আমি বললাম, "হয়তো আমিও এখানে আগে এসেছিলাম। হয়তো এমনিভাবেই কোনো নিমন্ত্রণহীনা করুণী বধূকে আমি দেখেছিলাম। হয়তো আরও কত কনি, এবং সাদারল্যান্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।"

"আরও কতজনের সঙ্গে হয়তো পরিচয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি", বোসদা খাতায় লিখতে লিখতে বললেন। "তবে এইটুকু বলতে পারি আমাদের চোখের সামনেও অনেক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নিজের কাজেই মত্ত থাকি, তার খেয়াল করি না।"

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে, বোসদার মুখের দিকে তাকালাম। বোসদা হাসতে হাসতে বললেন, "মাঝে মাঝে আমি ১৮৬৭ সালের কথা ভাবি। আমাদের হোটেলে নয়, অন্য হোটেলের কথা, কিন্তু আমাদেরই মতো কোনো এক রিসেপশনিস্টের চোখের সামনে নিশ্চয় তা ঘটেছিল। সেদিনের সেই রিসেপশনিস্টও নিশ্চয় আমাদেরই মতো খাতার মধ্যে ডুবে ছিল, এবং পায়ের শব্দে চমকে উঠে এক আশ্চর্য আগন্তুককে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একি, এমন অতিথি তো সাহেবী হোটেলে কখনও দেখা যায় না! ভদ্রলোকের গায়ে উড়নি, ভিতরে পৈতে দেখা যাচ্ছে, পায়ে লাল চটি। হয়তো ভুল করেই এসে পড়েছেন, নেটিভ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাস্তা চিনতে না পেরে এখানেই ঢুকে পড়েছেন। কিংবা, যা দিনকাল কিছুই বলা যায় না। হয়তো পণ্ডিতও বার-এ বসে ফরাসী দেশের দ্রাক্ষাকুঞ্জের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে চান!

রিসেপশনিস্ট নিশ্চয়ই তার অভ্যস্ত কায়দায় সুপ্রভাত জানিয়েছিল, এবং পণ্ডিতের সুগম্ভীর কণ্ঠে ইংরিজী উত্তরে, কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'আই ওয়ান্ট টু সি মিস্টার......' পণ্ডিত বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই চিরাচরিত প্রথা মতো রিসেপশনিস্ট ভিজিটরস স্লিপ এগিয়ে দিয়েছিলেন। গোটা গোটা অক্ষরে পণ্ডিত সেখানে নিশ্চয়ই নাম লিখে দিয়েছিলেন। স্লিপের দিকে তাকিয়ে, আমরা যেভাবে আজও উত্তর দিই, ঠিক সেইভাবেই সেদিনের হোটেল-রিসেপশনিস্ট নিশ্চয় উত্তর দিয়েছিল, ও মিস্টার ডাট্। যিনি সবে বিলেত থেকে এসেছেন। জাস্ট এ মিনিট।

রিসেপশনিস্ট নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণকে জানতো না। কেনই বা এসেছেন? হয়তো বা সামান্য সাহায্যের আশায়। রিসেপশনিস্ট তবুও নিশ্চয় তাঁকে বসতে বলেছিলেন। আরও কয়েকজন হোটেলের নতুন অতিথির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এসেছিলেন।

লাউঞ্জে এসে অতিথি অন্য সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন, কিন্তু পণ্ডিতকে দেখে

দ্ব'হাতে গলা জড়িয়ে মুখ চুম্বন করলেন এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে বুকে চেপে ধরে ক্রমাগত চুম্বন ও নৃত্য করতে লাগলেন। অপ্রস্তুত পণ্ডিত বলতে লাগলেন, "আরে কর কি, কর কি, ছাড়।' বোসদা এবার থামলেন। আমাদের হোটেলের কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাইকেল মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের সেই দৃশ্যের কথা চিন্তা করলে আজও রিসেপশনিস্ট হিসেবে আমার দেহে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমাদের এই শাজাহানেও এমনই কত নাটকীয় মুহূর্তে আমরা হয়তো উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু খেয়াল করিনি, কে জানে! তবে মধুসূদনের হোটেলের সেই রিসেপশনিস্টকে আমি হিংসে করি। অসংখ্যের মধ্যে এতোদিন পরে আজও তাকে আমরা মনে রেখেছি। আর সবাই বিস্মৃতির অতল-গর্ভে কোথায় তলিয়ে গেল, যেমন আমরাও একদিন যাবো।"

বোসদার হাত ধরে আমিও যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই হারিয়ে যাওয়া মধ্যাহ্নে ফিরে গিয়েছিলাম। চোখের সামনে যেন মাইকেল মধুসূদন এবং ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম আজও আমার চোখের সামনে যে-সব ঘটনা ঘটছে, কে জানে তারাও একদিন হয়তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।

বোসদা নিজের মনেই চিন্তা করছিলেন, একবার বললেন, "কোথায় যেন পড়েছিলাম ইতিহাসের দুটো অংশ—একটা ফলাও করে লেখা হয়, ছাপা হয়। আর একটা চিরদিনই অলিখিত থেকে যায়। সবাই তা জানে, অথচ কেউই তা প্রকাশ করতে সাহস করে না। আমরা বোধ হয় আমাদের চোখের সামনে সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করছি।"

আমি বললাম, "কিছুই বুঝতে পারছি না, বোসদা।"

বোসদা উত্তর দিলেন, "এই স্যাটা বোসও পারে না। বইতে বলছে—ইতিহাসের চরিত্রগুলো সত্য আর ঘটনাগুলো মিথ্যা। আর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে চরিত্রগুলো মিথ্যা, কিন্তু ঘটনাগুলো সত্য।"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বোসদা নিজেই প্রতিবাদ তুললেন, "কথাটা কিছু নির্ভেজাল সত্য নয়, কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু এও ঠিক যে সমাজের সব সত্য ইতিহাসের বইতে পাওয়া যায় না।"

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। বোসদা বললেন, "এতক্ষণ যেন ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির হেড্ অফ দি ডিপার্টমেন্টের মতো লেকচার দিচ্ছিলাম! ভগবানের সহ্য হলো না। মনে করিয়ে দিলেন যে, আমি শাজাহান হোটেলের হরিদাস পাল রিসেপশনিস্ট!"

টেলিফোন ধরে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যাটা বলছি।...নিশ্চয়ই আপনার কোনো চিন্তা নেই, আপনি চলে আসুন।"

টেলিফোন নামিয়ে বোসদা খাতা খুললেন। খাতায় একটা ঘর বুক করলেন।

বললাম, "এখন কে আসছেন?"

বোসদা বললেন, "এমন একজন যাঁর এই কলকাতাতেই ফ্যাশানেব্‌ল পল্লীতে বাড়ি আছে, সে-ঘরের অনেক ঘর খালি পড়ে রয়েছে। তবু তিনি আসতে চান। এই রাতের আশ্রয়ের জন্য সামান্য হোটেল কেরানীর পায়ে পড়তে তিনি রাজী আছেন।"

"ব্যাপার কী?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"বিপুলা এ-পৃথিবীর কতটুকু জানি!" বোসদা মাথা নাড়ালেন। "তাঁর নাম শুনলে, কত লোক এখনি এই হোটেলে ছুটে আসবে। আমরা সবাই তাঁকে চিনি!"

একটু পরে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। আমি ফোন ধরতেই পুরুষালী গলায় এক ভদ্রলোক বললেন, "আজ রাতে কোনো ঘর পাওয়া যাবে?"

বোসদা, আমার হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে বললেন, "আপনার নাম?" তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, "স্যরি, কোনো উপায় নেই।"

টেলিফোন নামিয়ে দিতেই আমি ওঁর দিকে তাকালাম। কারণ আজ আমাদের কয়েকটা ঘর খালি রয়েছে। অথচ বোসদা বেমালুম বললেন, "কিছুই খালি নেই।"

বোসদা যেন আমাকে একটু এড়িয়ে গেলেন। ঠিক যেন উত্তর দিতে চাইলেন না।

কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ পরেই যাঁকে শাজাহান হোটেলের কাউন্টারে এসে দাঁড়াতে দেখলাম, তাঁকে যেন রুপালী পর্দায় ছাড়া অন্য কোথাও সশরীরে দেখবো তা স্বপ্নেও
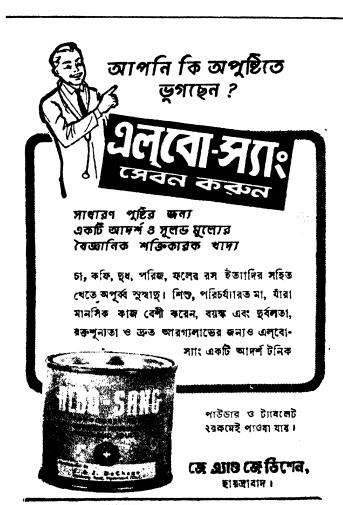
ভাবিনি। তিনি আমার অতি পরিচিত মুখ। তিনি চিত্রজগতের উজ্জ্বল তারকা, ধরা যাক তাঁর নাম শ্রীলেখা দেবী। সিনেমার পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু মন-কেমন-করা ছবি আমি দেখেছি। আমাদের হোটেলে কিন্তু মাত্র একবার তাঁর নাম বোসদার মুখে শুনেছিলাম। কোন এক পার্টিতে ফোকলা চ্যাটার্জি এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার গায়ে বমি করে দিয়েছিলেন। পার্টির মধ্যেই শ্রীলেখা দেবীকে উঠে গিয়ে শাড়ির আঁচল ধুয়ে বাড়ি চলে যেতে হয়েছিল। ঘেন্নায় তাঁর তখন ফেণ্ট হবার মতো অবস্থা। ফোকলা চ্যাটার্জি ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন, "শ্রীলেখা দেবী কিছু মনে করবেন না। নতুন ককটেল ট্রাই করতে গিয়ে আমার এই অবস্থা হলো। ব্যাটারা নাম দিয়েছে 'ফিল্মস্টার', কিন্তু ও-সব দেখতেই ভালো, কাছে আনতেই বমি হয়ে গেল কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না।"

শ্রীলেখা দেবী কিন্তু শোনেন নি। সোজা বলে দিয়েছিলেন, ফোকলা যে পার্টিতে থাকবে সেখানে তিনি যাবেন না। বেচারা ফোকলাকে সেই থেকে ফিল্ম পার্টিতে কেউ নেমন্তন্ন করে না।

ফোকলা দু'একবার আমাকে বলেছেন, "কী হাঙ্গামা বলুন দেখি মশাই। মানুষের শরীর বলে কথা, মাঝে মাঝে গা বমি বমি করবে না? অথচ শ্রী লেখা দেবীর ধারণা আমি ইচ্ছে করেই ও'র গায়ে বমি করে দিয়েছিলাম। আপনার সংগে তো জানা-শোনা আছে, ও'কে একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

ফোকলা চ্যাটার্জি তখন নেশার ঘোরে ছিলেন। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিলেন, "ঠিক হ্যায় মশায়, এ শর্মার নাম ফোকলা চ্যাটার্জি। মাল খেতে না ডাকলে হয়তো বমি করতে পারবো না। কিন্তু কুলকুচি? কোন্ দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনাদের শ্রীলেখা দেবীর মুখে কুলকুচির জল ছড়িয়ে দেবো, মুখের সব পাউডার তখন ধুয়ে বেরিয়ে গিয়ে আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে, আর একটিও কণ্ট্রাক্ট পাবে না।"

ফোকলা চ্যাটার্জি সেদিন বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু শ্রীলেখা দেবীর সংগে আমার সত্যিই পরিচয় ছিল না। আজ প্রথম দেখলাম। বোসদা ও'কে নমস্কার জানালেন। তারপর খাতা দেখে ও'র ঘরের নম্বর বলে দিলেন।

শ্রীলেখা দেবী বলেছিলেন, "আমাকে দু'একটা কাপড় কিনে দিতে পারেন?"

"এতো রাত্রে? দোকানপাট তো সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।" বোসদা বললেন।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, "এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছি। কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি।"

চিত্রজগতে আমার আজও এক বিশিষ্ট 'অবদান' আছে! তাঁদের প্রখ্যাত অভিনেত্রীর জন্যে আমি ধর্মতলা স্ট্রীটের এক পরিচিত দোকানের দারোয়ানকে জাগিয়ে প্রায় মধ্যরাত্রে শাড়ি কিনে এনেছিলাম। অতি সাধারণ

শাড়ি। কিন্তু তাই পেয়েই শ্রীলেখা দেবী যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন।

রাত্রে ছাদে বসেছিলাম। বোসদা বলেছিলেন, "শ্রীলেখা দেবী জীবনে অনেক শাড়ি পরেছেন, তাঁর অনেক শাড়ি থেকে দেশের ফ্যাশন তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই শাড়িকে তিনি কোনোদিন ভুলবেন না।"

বোসদা আরও বলেছিলেন, "ভাবছি এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা নোট বইতে লিখে রাখবো। যদি কোনোদিন আত্মজীবনী লিখি কাজে লেগে যাবে। এই সত্যসুন্দর বোস সেদিন বো-টাই আর সুট ছেড়ে দিয়ে, ধুতি পাঞ্জাবি চড়িয়ে রাতারাতি সাহিত্যিক বনে যাবে। দলে দলে গুণমুগ্ধ ভক্ত এই আদি অকৃত্রিম স্যাটা সি বোসের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেবে!"

"লেখেন না কেন?" আমি অভিযোগ করেছি।

"লিখে কিছুই করা যাবে না।" বোসদা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনেছি লেখার জোরে পৃথিবীর কত পরিবর্তনই না হয়েছে, সভ্যতা বারে বারে লেখকের ইঙ্গিতেই নাকি মোড় ফিরেছে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। লেখার জোরে এই অন্ধ, বোবা, বৈশ্য সভ্যতার কিছুই করা যাবে বলে মনে হয় না। মাইক দিয়ে চীৎকার করো, মহাভারতের মতো আড়াই সেরী বই লিখে ফেলো, হাজার পাওয়ারের বাতি দিয়ে যদি দোষের উপর আলো ফেলো তবুও বোধ হয় কিছু হবে না।"

আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। সত্যসুন্দরদার মধ্যে এমন একটা হতাশ মন যে এমনভাবে লুকিয়ে আছে তা জানতাম না। সত্যসুন্দরদা শাজাহানের ছাদ থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, "আকাশের দিকে এমনভাবে যুগযুগান্ত ধরে তাকিয়ে থাকলে একদিন হয়তো উত্তর পাওয়া যেতে পারে, আমরা কেন এমন, অন্তরের ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে সমাজের তথাকথিত সেরাদের অনেকে কেন এই বার এবং ক্যাবারেতে ভিড় করে।"

বোসদা আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়েই বললেন, "যুগযুগান্ত ধরে মানুষ যে সাধনা করে এসেছে তা হলো অভাব-অনটনকে জয় করা। প্রতিদিনের জীবন-ধারণের সমস্যা সমাধান করলে তবে হয়তো পরম নিশ্চিন্তে সে একদিন আপন আত্মার উন্নতির জন্যে সময় করতে পারবে। কিন্তু কী হলো? যাদের জীবনধারণের দুশ্চিন্তা নেই, যাদের অনেক আছে, তারাই অন্তরে নিঃস্ব হয়ে শাজাহানের রঙীন আলোয় নিজেদের হাস্যকর করে তুলছে। রিডিকুলাস, রিডিকুলাস, বোসদা নিজের মনেই বললেন।

আমার তখনও কথা বলবার সামর্থ্য নেই। স্তম্ভিত বিস্মিতচিত্ত আমি যেন বোসদাকে আজ নতুনভাবে আবিষ্কার করছি। বোসদা বললেন, "আলডুস হাক্সলে এক বইতে ভারতবর্ষ ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। বোম্বাই-এর এক হোটেলের বই-এর দোকানে তিনি এক বিশেষ 'শাস্ত্র' সম্বন্ধে অজস্র বই দেখেছিলেন। **'Rows of them and dozens of copies of each.'** অথচ হোটেলে যে ঐ বিষয়ে উৎসাহী ডাক্তাররা বই কিনতে আসেন এমন নয়। হাক্সলে লিখছেন, সাধারণ লোকরাই ওই সব বই কেনে। **'strange' strange phenomenon! Perhaps it is one of the effects of climate.**

বোসদা বললেন, "আমিও ভেবেছিলাম জল-হাওয়ার দোষ। কিন্তু পরে ভেবেছি হাক্সলে সায়েবের নিজের দেশই বা কম যায় কীসে? এ-প্রশ্নের কী উত্তর জানি না। তবে ডি এইচ লরেন্সের লেখায় এর সামান্য উত্তর পেয়েছি, পুরো নম্বর না দিলেও তাকে পাশ করার নম্বর দেওয়া যায়।—**'the God who created man must have a sinister sense of humour, creating him a reasonable being, yet forcing him to take this ridiculous posture, and driving him with blind craving for this ridiculous performance.'**

বোসদাকে আজ যেন বলার নেশায় পেয়ে বসেছে। "কোনো সহজ উত্তর বোধ হয় নেই। জীবনের প্রশ্নপত্র অসংখ্য ছেলে-ঠকানো কোশ্চেনে বোঝাই। ও-সব বোঝবার চেষ্টা করতে গেলে পাগল হয়ে যেতে হবে। তার থেকে শ্রীলেখা দেবীর কথা শোনো।"

"আপনি শুতে যাবেন না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

'যাবো। তুমি তো নাইট ডিউটি দিতে নিচেয় যাচ্ছো। সুতরাং জেনে রেখে দাও। শ্রীলেখা দেবীর স্বামী রাত্রে হয়তো হাজির হতে পারেন। উনিই তখন ফোন করেছিলেন। ভদ্রলোকও একটা ঘর চাইছিলেন। আমি বলে দিলাম, ঘর খালি নেই। ভদ্রলোককে বিশ্বাস নেই ও'র ভয়ে বেচারা শ্রীলেখা দেবীর জীবনে একটুও শান্তি নেই। উনি বলেছেন, 'তোমার সুন্দর মুখের গর্বে তুমি ফেটে পড়ছো! তোমার ওই মুখে আমি অ্যাসিড ঢেলে দেবো' বলা যায় না হয়তো রাত্রে হাজির হতে পারেন। যদি আসেন, কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।'

বোসদা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মনে হলো অন্ধকারে কে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

। ক্রমশ ।

সময়ের ঘর পার হলে

একটু আগে এ জানলাটা খুলে দিয়ে গেছে।

যেখান দিয়ে পশ্চিম আকাশটার খণ্ডাংশ দেখা যায় শুধু। আর একটা বিরাট মাঠ দুপুরের প্রচণ্ড রোদে যেটা এখন ঝলসানো। মাঠের মধ্যিখানে একটা পিটুলী গাছ। নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। বছরের কোনো সময়ে যে গাছ ঘন সবুজে ঢাকা থাকে এখন সেখানে চোখে পড়ে শুধু শুকনো মরা ডালগুলো।

সমস্তটা জুড়ে যেন এক নিষ্ঠুর শূন্যতা-বোধ ও তিক্ত ব্যর্থতাবোধ তার চেতনাকে গ্রাস করে রাখে বিকেলের এই মুহূর্তটা। কারণ এ সময়টা তাঁকে এই জানলা দিয়েই তাকিয়ে থাকতে হয় বাইরের দিকে। আর বয়সের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভাবেন জীবনটা বুঝি কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি। সে ঘটনাগুলো যেন আজ নতুন করে তাঁর মনে পড়ছে।

নিঃশেষিত তেল, শুধু সলতে উসকে দিয়ে জেবলে রাখা আলোয় নিজের ছায়াকে কেমন বড় করে দেখতে ভাল লাগে। আবার ভয়ও করে।

তাই নিজের ভাবনা থেকে মুক্তি খোঁজার আশায় মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকান। চোখ পড়ে যায় দেয়াল ঘড়িটার দিকে। ওটা তাঁর বয়সের সাথে কেমন জড়িয়ে রয়েছে। সেই কবে থেকে। পেণ্ডুলামটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। টিক্ টিক্ টিক্। সারা-দিনের এই শব্দটা তাঁকে নানান মুহূর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। হঠাৎ ঘড়ির কাঁটা দুটো কেমন যেন উল্টোমুখী হয়ে ঘুরতে থাকে। তিনি নিজের অতীতের মধ্যে হারিয়ে যান।

মনে হয় কারা যেন তাঁকে চোখ বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছে কোনো এক ফুল বাগানের মধ্যে। যে বাগানটা তার অনেক চেনা।

সেখানে তিনি শিশুর মত কানামাছি খেলছেন অনেকের সাথে। অনেক চেষ্টা করেও তিনি কাউকে ছুঁতে পারছেন না।

নানান গাছে বিচিত্র রঙের ফুল। হাওয়ায় দুলছে। তাঁর গায়ে এসে লাগছে ফুলের নরম ছোঁয়া। সোনালী রোদের ঝিক্‌মিক্ সারা বাগানটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফুলগুলোকে মাঝে মাঝে হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছেন বুকের কাছে। কি এক অফুরন্ত আনন্দ। বাগানের চারিধারে ছোটাছুটি করতে ভাল লাগছে তাঁর। 'কানা মাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাও তাকে ছোঁও।' তার চারিদিকে ঘিরে যারা তাদের কলরব, তাদের হাসির শব্দ। না দেখেও হয়ত বলে দিতে পারেন কোনটা কার।

ওই তো এখন যে হাসছে, কি যেন নাম তার......।

একি! তার চোখের বাঁধন খুলে পড়ে গেছে।

চোখ মেলতেই মনে হয় যেন অন্য আরেকটি বাগানে এসে দাঁড়িয়েছেন। যেন এক পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবী। সেখানকার ছেলেগুলি আর নেই। এ বাগানটা যেন আরও বড়।

এখানকার ফুলগুলির নাম তিনি জানেন। এখানে অনেক রঙ বেরঙের বাহারে গাছ।

অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত

ঝোপগুলোর ফুল হয় না। শুধু পাতারই শোভা।

ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয় এখানকার মাটি বুঝি অন্য রকম। তাই সব ফুল-ই আকারে কেমন বড়। আরও সুন্দর। আর কত রং বেরঙের প্রজাপতি তাঁর দৃষ্টিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়।

পাখনার ঝাপটায় কণা কণা রেণু ছড়াচ্ছে।

বাগানের মাঝখানে জলের ফোয়ারা। রোদে জলের কণাগুলো কেমন মুক্তা বিন্দুর মতো এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে। চারিদিকে প্রজাপতিদের খেলা। কেমন একটা সলজ্জ সংকোচে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন ফোয়ারার দিকে। কেমন জবুথবু ভাব। একটু একটু করে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন কাছে।

ঠাণ্ডা জল ছুঁতে তার বড় ইচ্ছে করছে। ফুল নেই। পদ্মপাতায় ঢাকা জল। জলের কণাগুলো মাঝে মাঝে টলটল করছে তার ওপর।

জলের নিচে তাকিয়ে আছেন। আরও নিচে।

হঠাৎ তার মনে হল জলটা যেন কেমন গভীর ও কালো হয়ে উঠছে। এবার ফুলে ফেঁপে ওঠে তার সমস্ত দেহটা ঢেকে ফেলেছে। তিনি আকুল হয়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে চলেছেন। অকূল সমুদ্রে এখন তিনি একা। যার ওপার দেখা যায় না। শুধু অন্ধকার। কানে এসে লাগছে সোঁ সোঁ শব্দ।

টিক্ টিক্ টিক্। ঢং ঢং ঢং! ঘড়ির শব্দটা কেমন বুকে এসে বাজে। চমকে ওঠেন। এইমাত্র যেন স্বপ্ন দেখে উঠলেন। চাকরটাকে একরকম চিৎকার করেই ডাকলেন। চাকরটা এসে জল দিয়ে গেছে।

তৃষ্ণায় তাঁর গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

তৃষ্ণা। সারা বুক ভরে তৃষ্ণা। এ তৃষ্ণার বুঝি শেষ হবে না কোন কালেই।

বিকেল গড়াচ্ছে। বিষণ্ণ রোদ আকাশ আর মাটিকে ছুঁয়ে। এ সময়টায় কী এক যন্ত্রণাবোধ তাঁকে কেমন অসহায় ও অবিশ্বাসী করে তোলে।

ভাবেন কেউ যদি এ সময়টা তাঁর সাথে গল্প করে কাটাত।

কেউ নেই। থাকলেও সময়ের অভাব। বুড়োর সাথে গল্প করার সময় নেই। বাচ্চাদের সবাই বেরিয়ে গেছে খেলতে।

তাই দোতলার এই কোণার ঘরটায় পশ্চিম আকাশটার দিকে তাকিয়ে তাঁকে একলাই কাটাতে হয়। নিঃসঙ্গ আর বোবার মত।

বাড়িটা পুরোনো আমলের। ভাঙা। ইট বের করা। চুন বালির পলস্তরা খসে পড়েছে প্রায় সব জায়গারই।

পুরোনোই কিনেছিলেন। নিচের ঘরগুলোয় কোনো এক সময়ে ভাড়াটে ছিল। এখন ফাঁকা। ভয়ে পালিয়ে গেছে। এত পুরোনো জীর্ণ বাড়িতে থাকতে কেউ রাজী নয়।

বাড়িটার যে-কোনো দেওয়ালের দিকে তাকালে যোগীনবাবুর আজ নিজেরই কেমন কুৎসিত লাগে। ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে বুনো অশ্বত্থগাছ। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। দেওয়ালে ফাটল ধরিয়েছে বিরাট বিরাট।

তাঁর ঘরের পুব জানলার গরাদের কাছেও এমনি একটা বুনো অশ্বত্থ। বেড়ে উঠেছে

কবে থেকে সূর্যোদয়ের আলোকে কেমন যেন আজ বাধা দিয়ে রেখেছে।
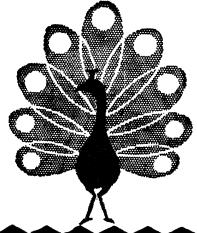
প্রথম যখন কিনেছিলেন এমনটি ছিল না। এসব যোগীনবাবুর সামনে তাঁর বয়সকে ঘিরেই বেড়ে উঠেছে।

ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ তার চেতনাকে টেনে নিয়ে যায়। শব্দটা ঘরের নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

ঘড়িটার কথা ভাবেন। প্রথম চাকরিতে ঢুকে ওটা কিনেছিলেন। অনেকবার বিকল হয়ে গেছে। কোনো রকমে চালিয়ে রাখা হয়েছে। চলে চলে মেসিনগুলো কেমন ক্ষয়ে গেছে।

ওটা হয়তো একদিন সত্যিই স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর চলবে না। যোগীনবাবুর কেমন অবাক লাগে ঘড়িটার দিকে তাকালে। ওটা এ বাড়ির সকলকে সময়ের কথা জানিয়ে এসেছে। জন্মের, অফিসের, ইস্কুলের। এমন কি মৃত্যুরও। আবার সময়েরই হাতে ওটা একদিন অচল হয়ে পড়ে থাকবে।

যোগীনবাবুর চোখের সামনে কতবার কত ঘরে কাঁটা দুটো ঘুরে চলেছে দিনের পর দিন। কত মুহূর্ত। বিরাম নেই টিক্ টিক্ শব্দের। সূর্য উঠেছে। দিন শুরু হয়েছে। দুপুর গড়িয়েছে। বিকেল। তারপর সন্ধ্যে। চাঁদ এক সময় টুকরো ফালি হয়ে অস্ত গেছে। কবে পূর্ণিমা, কবে অমাবস্যা, কবে একাদশী। সময় পেরিয়ে গেছে। ঘড়িটার নিরন্তর টিক্ টিক্ শব্দ।

যোগীনবাবু যেদিন মারা যাবেন সেদিনও কেউ কেউ হয়তো ঘড়িটার দিকে তাকাবে।

সেই মুহূর্তগুলো যেন দেখতে পাচ্ছেন। ঐতো বাইরে কারা বাঁশ কাটছে। বড় ছেলে নন্তু দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। যোগীনবাবুর এখন নিজের ছেলেকেই কেমন পর পর মনে হচ্ছে। ওরা যেন অনেকদিন ধরেই পর হয়ে গেছে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। যত বড় হয়েছে ততই কেমন দূরত্ব বোধ বেড়ে গেছে। টের পান নি। ছোটো ছেলে খবর পায় নি হয়তো এখনও। তার যে বাবা মারা গেছে। তাই এখনও এসে পৌঁছয় নি।

কে যেন বলল, 'তা বয়স তো কম হয়েছিল না। প্রায় পঁচাত্তরের উপর। আমরা যখন ইস্কুলে পড়ি তখন তিনি বিয়ে করেন। সে কি আজকের কথা!'

হারাধনটা এসে জুটেছে ঠিকই। আরে বাবা তোরও কি কম বয়স হল নাকি। দুবছর বাদে তুইও তো যাবি।'

যোগীনবাবুর বিয়ের কথা মনে পড়ে। সত্যি সেকি আজকের কথা। দেখতে দেখতে ছুটন্ত গাড়ির মতো দিনগুলো কেমন পেরিয়ে গেল। মুহূর্তগুলো যে কখন এল আর কখন গেল ভাবতে গেলে অবাক লাগে।

জীবনটা যেন একটা স্ফুলিঙ্গ। হঠাৎ উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল। ভবিষ্যত আর অতীতের সংঘর্ষে অনেক বর্তমানকে পেরিয়ে আজ যেন স্তব্ধ। হারিয়ে গেছে তাঁর বর্তমান ভবিষ্যৎ দুটোই। এ শুধু অতীত। বিরাট এক অন্ধকার অতীত নিয়ে তিনি বসে আছেন। আর সেই অন্ধকার থেকে শাশ্বত অনিবার্য কালপুরুষ তার কঠিন বাহু দুটো বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

সমস্ত শরীর তাঁর থরথর করে কেঁপে ওঠে। তার দেহের সমস্ত অস্থি শক্ত করে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। কেমন যেন অসহায়-বোধ হয়। দুর্বল মনে হয়।

পা পিছলে তিনি নেমে যাচ্ছেন জলের অতলে। এ দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির নৈরাশ্য যেন তাঁকে আরও ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার।

ঘড়িটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন।

বাইরেটা দেখেন।

আকাশের রং বদলাচ্ছে। লাল রক্তিমাভা। কে যেন আবির গুলে ছিটিয়ে দিয়েছে সারা

পশ্চিম পারে। মাঝে মাঝে সবুজ আর নীলের উঁকি ঝুঁকি।

সূর্যাস্তের লাল রঙের ছায়া পড়েছে ঘরের এক কোণে লম্বা ত্রিভুজের মতো। লালচেলী পরে এইমাত্র যেন কোনো কিশোরী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। আর কিশোরকুমার সেই দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ।

মহামায়া ও তিনি। বিয়ের দিন মহামায়াকে বেশ মানিয়েছিল লাল চেলীতে।

সবাই বলেছিল মহামায়ার সাথে তাঁর বয়সের তফাতটা নাকি বড্ডো বেশী। সেই অত ছোট্ট মেয়েটি কেমন গন্ধমলতার মতন তাঁর জীবনকে জড়িয়ে জড়িয়ে বড় হয়ে উঠল। বুড়ো হল। বুড়িয়ে গেল। নরম দেহ কেমন শক্ত হল। আস্তে আস্তে কুঁচকে গেল। মারাও গেল কয়েক বছর আগে।

যোগীনবাবুর কোলের উপর মাথা রেখেই মহামায়া আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেছে। সারারাত ধরে তিনি এমনি করেই বসে-ছিলেন।

ঘড়িটা আবার তাঁর দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যায়।

সে রাতে ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ অসহ্য মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছিল ঘড়িটাকে বন্ধ করে রাখতে।

তারপরও ঘড়িটা চলেছে। বেজে গেছে পর পর ঠিকই। রাত গভীর হয়েছে। আবার সকাল হয়েছে। সময় পেরিয়ে গেছে। মনে হয় এই যেন সেদিনও।

দুটো কাক শেষবারের মতন ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল জানলার কাছ দিয়ে।

যেন আজ অনেক দিন বাদে গান গাইতে ইচ্ছে করছে আপন মনে। এককালে গান শিখেছিলেন কিছুদিন। তারপর জামা-পরানো তানপুরাটা শুধু টাঙানো থাকতো দেওয়ালের গায়ে।

যন্ত্র খারাপ হয়ে গেল যন্ত্রীর অভাবে।

আজ কেন জানি তাঁর ইচ্ছে করে নতুন করে তানপুরোটা নিয়ে গলা সাধতে।

কেন আবার নতুন করে শুরু করা যায় না?

অব্যক্ত যন্ত্রণায় বড় কাতর মনে হয়। তাই শুধু চেয়ে থাকতে হয় বাইরের দিকে। দূরে। বহু দূরে। যতদূরে দেখা যায়।

কাক দুটোর পিছু পিছু তাঁর দৃষ্টি চলে যায়। মাঠ পেরিয়ে, আকাশের দূরে দিগন্তে।

এক সময় কাক দুটো মিলিয়ে যায়। শুধু নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।

আর ক্লান্ত বিক্ষত বিষণ্ন হৃদয়ের শুধু চেয়ে থাকা। দিনের পর দিন। কি এক অস্থির ভীতি তাঁর অসহায়ত্বকে বাড়িয়ে তোলে। ক্ষমাহীন অনিবার্যতা তাকে পীড়িত করে।

সমস্ত দেহ মনে জরা। সামনে এক অদৃশ্যমান বিরাট অন্ধকার। সে অন্ধকারে তিনি যেন শিশুর মতো অসহায়।

আবার ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ। চলছে তো চলছেই। দিনের আলো ছুঁই ছুঁই করে সরে যাচ্ছে। মাঠের শেষ সীমায় এখনো এক চিলতে আলো কাঁপছে। এইবার বুঝি অন্ধকারের ছায়া নামবে। এক জগৎ মুছে গিয়ে আরেক জগৎ জাগবে।

এক ঝাঁক বক ডানা মেলে উড়ে চলেছে নীল কালো মেঘগুলোর নিচে। কালো মেঘের তলায় শঙ্খের মতো দেখাচ্ছে।

একটা গানের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। যখন বেলা শেষে পাখিরা যায় আপন কুলায় মাঝে—কি যেন তার পরের লাইনগুলো:
'অস্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন।'
আগত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেমন নিরুদ্দেশের নিঃসঙ্গ যাত্রী মনে হয়।

পিছনে রেখে গেলেন জ্বলে যাওয়া দেশলাই কাঠির মতো কয়েকটি মুহূর্ত। সেদিকে তাকালে নিজেই হয়তো এখন ভয়ে চমকে উঠবেন। শুধু অন্ধকার—। সেই অন্ধকারে অনেক জোনাকি মিট মিট জ্বলে নিবে গেছে।

এখন এ আলো অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে তিনি একা। বড়ো একা।

কী এক ভয় তাঁর সমস্ত চেতনাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলছে।

ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ। ঘড়িটাকে এই মুহূর্তে আছাড় মেরে ভেঙে ফেললে কেমন হয়।

দু হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে রাখেন।

তাকাবেন না আর ঐ দিকে।

বাইরে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। রাতের কালো নীরেট অন্ধকার। আঃ, চাকরটা এখনো কেন আমার জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছে না।

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে কোনো বরফের দেশ থেকে যেন।

মরা মানুষের মতন নিজের হাত পাগুলো ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। অসাড়ও। তিনি মৃত। যোগীন ভট্টাচার্য মৃত। তাঁর নিশ্বাসে আর বুক ওঠা নামা করছে না।

টিক্ টিক্ ঘড়িটা চলছে ঠিকই। ওটার শব্দ এখন আর শুনতে পাচ্ছেন না।

ঘড়িটা তবু চলছে। চলছেই।

কেউ কি তাকিয়ে আছে ঘড়িটার দিকে এই মুহূর্তটা দেখবার জন্য।

কে?

কে যেন ডাকছে।

চমকে ওঠেন।

'ও কি দাদু তুমি কাঁদছিলে?'

বড় ছেলের ছোটো মেয়ে টিংকু।

'কৈ না তো। চোখটার যে আজকাল কি হয়েছে, প্রায়ই জল গড়ায়।' কেমন একটু লজ্জা বোধ করেন।

'বলুদের বাড়ি থেকে কত তো ফুল এনেছি! দেখো।' টিংকুর হাতে একগোছা অনেক রঙের ফুল।

যোগীনবাবুর ইচ্ছে করে ফুলগুলো নিয়ে একবার বুকের কাছে চেপে ধরতে।

কারণ ঘড়ির শব্দটাকে অবিশ্বাস্য মনে করতেও তাঁর এই মুহূর্তে ভাল লাগছে।

Godrej
Cinthol
TOILET POWDER
WITH
G-11
DEODORANT PROTECTIVE FRAGRANT

ছাত্রদের সঙ্গে এক আলোচনায় লেনিন বলেছিলেন, তোমাদের প্রতি আমার তিনটি উপদেশ আছে—পড়, পড় এবং পড়। এই উপদেশের মূল্য লেনিন নিজে জানতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন পড়াশুনোয় ভাল। এবং বই পড়ায় উৎসাহী। এমন কি কারাবাস ও নির্বাসন কালেও তা কমেনি। তার একটি কারণ নিজের লেখার কাজে তাঁর অনেক বইয়ের দরকার হত। 'রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ' বইটি লিখতে তাকে ছ'শ বই পড়তে হয়েছিল।

দেশেবিদেশে বহু বই সংগ্রহ করলেও অক্টোবর বিপ্লবের পর মস্কোয় বসবাস শুরু করার আগে পর্যন্ত লেনিন তাঁর স্থায়ী লাইব্রেরী গড়ে তুলতে পারেননি। সম্প্রতি তাঁর এই লাইব্রেরীর একটি তালিকাগ্রন্থ বেরিয়েছে। লেনিনের পঠিত বাইয়ের সেই ফিরিস্তিটি পড়াই কঠিন কাজ। বিরাট বইটিতে রয়েছে প্রায় সাড়ে আট হাজার বইয়ের বিস্তৃত পরিচয়। তাদের বিষয় ও দেশ দুইই বিচিত্র। লেনিন ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তাই তাঁর লাইব্রেরীতে বারটি ভাষার বই পাওয়া যায়।

সোভিয়েত দেশের কর্ণধার হয়েও লেনিন সোভিয়েত বিরোধীদের বই মন দিয়ে পড়েছেন। কেরেনস্কি এবং শ্বেতরক্ষীদের বড় বড় জেনারেলদের বই এখনো রয়েছে তাঁর লাইব্রেরীতে। তাদের কোন কোনটিতে আছে লেনিনের হাতের তীব্র মন্তব্য।

দর্শন সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় প্লেটো, হেগেল, শপেনহাওয়ার, স্পেন্সার, ফয়েরবাখ, মার্ক্স, এংগেলস, প্লেখানভ, স্পেংলার, বের্গস, ফ্রয়েড প্রভৃতির রচনাবলী দেখে। বিজ্ঞানে ডারুইন, আইনস্টাইন প্রভৃতির রচনাবলী রয়েছে তাদের মূল ভাষায়।

এই বিরাট লাইব্রেরীর সর্বশাখার পরিচয় গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই দেখা যাক শুধু সাহিত্য বিষয়ক বইগুলি। প্রথমেই বলব লেনিনের নিজের দেশের সাহিত্যের কথা। উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত সাহিত্যগ্রন্থ তুলনায় বেশ কম। খ্যাতিমান কোন কোন সোভিয়েত সাহিত্যিক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যেমন শলোখোভ, লেওনিদভ। অবশ্য তাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন লেনিনের মৃত্যুর পর। কবি দেমিয়ান বেদনির লেখাই সবচেয়ে বেশী রয়েছে। ব্লক বাদ যাননি। মায়াকভস্কি অবশ্যই উপস্থিত। তাঁর একটি বইয়ে কবির হাতে লেখা, 'কমরেড ভ্লাদিমির ইলিচকে কম্যুনিস্ট-ফিউচারিস্টের অভিনন্দন সহ ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি।' ইয়েসেনিন, এরেনবুর্গও আছেন। আর বিশেষভাবে আছেন আন্না আখমাতোভা, স্তালিনের কালে যিনি ছিলেন অতিনিন্দিত।

একজন পাঠক কোন কোন লেখক সম্বন্ধে কী রকম আগ্রহশীল তা বোঝা যায় তাদের বিষয়ে লিখিত বইয়ের সংগ্রহ দেখে। সেদিক থেকে বলতেই হবে পুশকিনের প্রতিই লেনিনের ছিল সবচেয়ে বেশী টান। তারপর যথাক্রমে দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, তুর্গেনেভ, করলেংকো, গোর্কি, চেখভ, লের্মন্তভ। এঁদের রচিত গ্রন্থাবলী যা আছে তাতেও পুশকিন সর্বাগ্রগণ্য। অবশ্য তার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কারণ একেকজন লেখকের রচনার আকার ও সংখ্যা একেকরকম।

বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গেও লেনিনের ছিল সমান ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ইউরিপিদেস, দান্তে, শেক্সপীয়র, ভলতেয়ার গ্যেটে থেকে শুরু করে হুইটম্যান শ, রলাঁ, জোলা, গলসওয়ার্দি, হাউপট্‌ম্যান প্রভৃতি বহু লেখকের বই অধিকাংশতই তিনি মূলে পড়েছিলেন। অস্কার ওয়াইল্ডের নিজের আর তাঁর বিষয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যাধিক্য বিশেষ লক্ষণীয়।

ভারত সংক্রান্ত বইগুলি অধিকাংশই ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন বিষয়ক। কিন্তু সবই গান্ধী পূর্ববর্তী যুগের। যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায়ের বই এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেকালের বিবরণী গ্রন্থ। কিন্তু গান্ধী-যুগের কোন কিছুই নেই। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের বইয়ের সংখ্যা কম নয়, মানবেন্দ্র-নাথ রায়ের বই একটি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল লেনিনের বিশেষ আগ্রহ। তাঁর প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, রাজা, ঘরে বাইরে, গার্ডেনার, পার্সোনালিটি, ন্যাশনালিজম লেনিন পড়েছিলেন। অবশ্য সবই রুশ অনুবাদে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বই সে সময় রুশ ভাষায় বোধহয় একটির বেশী ছিল না। সে বইটি, 'প্রাচ্যের আলো', লেনিন তাঁর সংগ্রহে রেখেছেন। বইটির লেখক লেমুরেভ। একটি জিনিস নিশ্চয় এর মধ্যেই আপনাদের নজরে পড়েছে গীতাঞ্জলি এই সংগ্রহে নেই অথচ রয়েছে প্রেমের কবিতার সংকলন গার্ডেনার।

গীতি কবিতা এবং রূপকথা জাতের রচনার প্রতি বিপ্লবের নেতা ও সমাজপাঠক

স্বীয় রচনা সম্পর্কে পত্নীর সঙ্গে আলোচনারত লেনিন

কর্মী লেনিনের বিশেষ মোহ ছিল। শেক্সপীয়রের গীতিকবিতার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, হাইনে, গতিয়ের, পো প্রভৃতির কবিতা, এমন কি ফিটজেরাল্ডের ওমর খাইয়ামও তিনি পড়েছেন। আরো পড়েছেন গ্রিম ভাইদের রূপকথা, স্টিভেন-সনের লেখা ছোটদের কবিতা। এই সঙ্গে পুশকিন, লের্মন্তভের প্রতি তাঁর প্রীতিও স্মরণযোগ্য। পুশকিন, বায়রন, স্কট-এর রোমান্টিকতা যে একজন বিপ্লবীকে অনু-প্রাণিত করবে তাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। ব্যাপক ইলেকট্রিফিকেশনের পরিকল্পনা গড়ে লেনিন অন্ধকার রাশিয়াকে আলোয় ভরে দেবার যে কাজে নেমেছিলেন তাতে এই রোমান্টিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে।

কে যেন কোথায় বলেছেন, কাউকে চিনতে হলে সে কী বই পড়ে তা লক্ষ্য কর। কথাটা খুবই ঠিক। গভীর পাণ্ডিত্য, কঠোর মননশীলতা, কর্মীর বস্তুনিষ্ঠা এবং সূক্ষ্ম ও প্রবল হৃদয়াবেগ সম্পন্ন লেনিনের পূর্ণ চরিত্রটি তাঁর গ্রন্থাগারের সংকলনেও প্রতিফলিত।

শুভময় ঘোষ

জালিয়ানওয়ালা বাগ

নীরোদ রায়

যে অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির দর্শন করে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে চলাফেরা করে মনের উপর একটা পবিত্রতার প্রলেপ লাগে, সেই মনই আবার বিষিয়ে উঠে কিছু দূরের একখন্ড জমিতে পদার্পণ করেই। অমৃতসরের বুকে এটা যেন গরলস্থান।

পরিমাপে প্রায় সাত একর জমি নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ আজও ভারতের ইতিহাসের সেই কলঙ্কিত পৃষ্ঠাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিটি ভারতবাসীকে। স্মরণ করিয়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের তথাকথিত শাসনের নামে নির্মম অত্যাচারের কথা। যে শাসনের বিচারে মানবজাতিকে স্থান দিয়েছিল পশুর নিম্নে।

আজ কিছুতেই কল্পনা করা যায় না ও ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এই সুন্দর সবুজ-বিছানো বাগানে। সারি সারি রঙ-বেরঙের ফুল, গাছ-গাছড়ার আচ্ছাদনে স্নিগ্ধ পরিবেশ, চলা-ফেরার পরিচ্ছন্ন পথ। এত সুন্দর বাগানের ভিতর চলতে চলতে হঠাৎ যেন বিষাক্ত বায়ুর স্পর্শ অনুভব করা যায়। কানে কানে কে যেন বলে দেয়, তুমি কি

পশ্চিমদিকের একটি প্রাচীরগাত্রে রাইফেল টোটার নিদর্শন আজও স্পষ্ট

বর্তমানে গাছগাছড়ার স্নিগ্ধ পরিবেশে জালিয়ানওয়ালা বাগ

জান, ৫১৭ জন নির্দোষ লোকের খুন জড়িয়ে আছে এই জমিতে?

নির্দোষ নয় ত কী? রাওলাট-অ্যাক্ট-এর প্রবর্তনে সারা ভারতে জনসাধারণ যেটুকু অসুবিধা হবে মনে করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সভার আয়োজন করেছিল এই অমৃতসরে। জনসাধারণের জমায়েতের পক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগটি উপযুক্ত ঠাঁই বিবেচনা করেই সবাই এসে হাজির হয়েছিল মিটিং করে প্রতিবাদ জানাতে। অপরাধ এইটুকুই। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ! পরাধীন জাতির এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করেনি তাই।

১৯১৯ সালে বৃটিশ জাতির কাছে ভারতবাসীরা তুচ্ছ হলেও, ভিতরে ভিতরে সবাই আত্মসচেতন ছিল। তাই পাঞ্জাবের জনগণও জানাতে চেয়েছিল তাদের বক্তব্য। ভারতের সর্বত্রই যখন ঐ অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সভা-সমিতির আয়োজন করেছিল, জালিয়ানওয়ালাবাগেও একদিন তেমনি এক সভা বসেছিল।

সভা বসেছে এ সংবাদ পাওয়া মাত্র বৃটিশ জেনারেল ডায়ার তার ফৌজ নিয়ে ছুটলেন। সভাস্থলে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটেনি। আর সেখানে পৌঁছে কি করতে হবে তার মতলব তিনি ঠিক করেই রেখেছিলেন। প্রাচীরবেষ্টিত বাগের পূর্বে এবং পশ্চিমে দুটি মাত্র সরু পথ ছিল। মাত্র সাড়ে চার ফিট চওড়া প্রবেশপথ দুটি
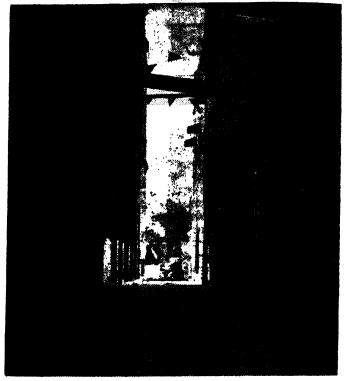
জালিয়ানওয়ালা বাগে পূর্বদিকের সাড়ে-চার ফিট প্রবেশপথ

মরণ-কুঁয়ো। এই কুঁয়ো থেকেই ১২০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। আজ স্মৃতিমন্দির
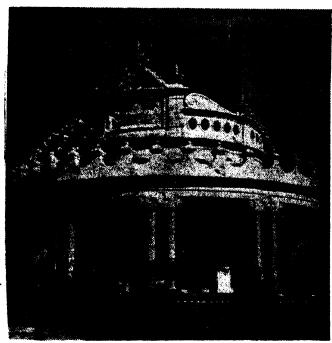
আগলে রেখে জেনারেল তাঁর ফৌজ ছেড়ে দিলেন ভিতরে। নির্দেশ ছিল রাইফেল ছাড়বার—ফাঁকা আওয়াজ নয়। আদেশ প্রতিপালন করতে শান্ত জনতার উপর উন্মত্ত ফৌজের উল্লাস কিছুক্ষণ চলেছিল মাত্র। প্রাণের ভয়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে কতজন কীভাবে প্রাচীর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল তা জানা সম্ভব ছিল না। তবে, একটি কুয়োর ভেতর থেকেই নাকি ১২০টি মৃতদেহ পরে আবিষ্কার করা হয়েছিল।

এই অমানুষিক হত্যালীলার প্রতিবাদ তখন উঠেছিল সারা ভারত জুড়ে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে জালিয়ানওয়ালাবাগটি নিজেদের দখলে নিয়ে নেন এবং শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে একটি স্মৃতি কমিটি গঠন করেন। প্রথম কমিটিতে সভ্য হিসাবে ছিলেন পণ্ডিত মালব্য এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। পরবর্তী কালে শ্রীজওহরলাল নেহরুই কমিটির সভাপতিত্ব করে আসছেন।

আজ থেকে তেতাল্লিশ বৎসর আগের ইতিহাসের সেই রক্তমাখা পাতাটি খুললে দেখা যায়—তারিখটি ছিল ১৩ই এপ্রিল।

সময় সাহিত্য সমালোচনা : পাঠকের চোখে

॥ ১ ॥

মহাশয়,

গত ১০ই চৈত্র 'দেশ' পত্রিকায় "সময় সাহিত্য সমালোচনা" পর্যায়ে প্রকাশিত 'দুই বসন্তে' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবার প্রয়াস করছি। উক্ত প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়বস্তু—এক বর্ষকালের বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি। যুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতায় দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে পাঠকের যে নালিশ কখনও গোপন, কখনও সোচ্চার, সেই দুর্বোধ্যতার অভিশাপই দেখা দিয়েছে নতুন ক'রে—সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়। এই দুর্বোধ্যতাকে আলোচ্য প্রবন্ধে দুর্ভাবনার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খুবই সত্যি কথা। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হ'তে পারে—এ দুর্বোধ্যতার কারণ কি? বর্ষকালের বাংলা কবিতার এই দুর্বোধ্যতার আলোচনা যুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উত্তরসামরিক কালে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের ফলে বাংলা কবিতায় ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান, ফ্রেজারের নৃতত্ত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও মার্কসীয় দর্শন ইত্যাদি প্রবেশ করে; সৃষ্টি করে চিন্তাধারার এক বিরক্তিকর অসম্বন্ধতা। এ ছাড়া, আঙ্গিকের দিক থেকেও ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির অনুযায়ী চিত্রকল্প ও প্রতীকের যথেচ্ছ ব্যবহারে কবিতাদেহে দেখা দেয় দুর্নীতিকল্প জটিলতা। এই দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির মূলে একদিকে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের অনায়ত্ত মিশ্রণ ও প্রচেষ্টা, অপরদিকে তেমন রয়েছে পাশ্চাত্ত্য শিল্পকর্মের অনুকরণে অনভ্যস্ত শিল্পচাতুর্যের ব্যবহারের নেশা। এ যুগের মানুষের জীবনে যে বৈচিত্র্য আর জটিলতা দেখা দিয়েছে, প্রকাশভঙ্গির দুরূহতা তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

শিল্পজগতের বিধি বড় বিচিত্র। যুগবিশেষের শিল্পকর্ম যদি মৌলিক ও রসোত্তীর্ণও হয়, তার আবেদন সে যুগের লোকের কাছে নয়—পরবর্তী যুগের জন্য। আর মৌলিকতার জন্যই শিল্পবিশেষকে সে যুগের লোকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। উত্তরসামরিক যুগে বিংশ শতাব্দীর নতুন মূল্যবোধকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগণ। রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কবিতা রচনার একটা সচেতন প্রচেষ্টা দেখা দেয় এ'দের রচনায়। এ'রা যা পরিবেশন করলেন, তা শুধুমাত্র প্রকাশভঙ্গির জটিলতা নয়, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্যও তখনকার পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য রূপেই দেখা দিল। পাঠক যখন এই দুর্বোধ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে একটু-একটু ক'রে এই 'আধুনিক' কবিতার রসাস্বাদন করতে শিখছে, কবিতার এই ধারাকে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হতে দেখে তাকে একটা tradition বলে ভাবতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা দিল প্রকাশভঙ্গি আর ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়বস্তুর আর এক পালা পরিবর্তন। সাম্প্রতিক কালের প্রায় সকল কবিই হলেন এই লক্ষণাক্রান্ত।

এ যুগে নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় মানুষ যতই অধ্যাত্ম-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, কবিগণ ততই অন্তরমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছেন। এই অন্তর্মুখিতার তীব্রতা ও অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা কবিকে ক্রমাগতই নতুন শৈলী, নতুন চিত্রকল্প ও নতুন প্রতীকের ব্যবহারে সচেষ্ট করে তুলছে। অনুভবের অভিনবত্বই কবিকে অভিনব প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। আর এই অভিনবত্বই পাঠকের নিকট দুরূহতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্বোধ্যতা আর দ্ব্যর্থবোধকতা এক কথা নয়। দুর্বোধ্যতার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'obscurity' আর দ্ব্যর্থবোধকতার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ambiguity'। যা কিছু দুর্বোধ্য, তাই যে দ্ব্যর্থবোধক তা নয়, তবে যা দ্ব্যর্থবোধক তা দুর্বোধ্যও হতে পারে। উভয়ের পার্থক্যটুকু পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছেন উইলিয়াম এম্পসন—

"Ambiguity is essentially grammatical. obscurity is imaginative."

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণের কবিতার জটিলতাকে ambiguity না বলে obscurity বলাই যুক্তিসংগত মনে হয়।

কবির মাধ্যম অন্যান্য শিল্পীর তুলনায় অপূর্ণ। শব্দবিশেষের প্রয়োগনৈপুণ্যের উপর নির্ভর করেই তার ব্যঞ্জনার গূঢ়তা। শেক্সপীয়র এই নিপুণতার অধিকারী ছিলেন তাই অতি-ব্যবহৃত আটপৌরে 'Never' শব্দটি King Lear নাটকে Never, Never, Never, Never, Never রূপে শুধুমাত্র উপস্থাপনের বিচিত্র কৌশলে অত বেশী ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়ও অভিনব প্রয়োগনৈপুণ্য দেখা যায়। কিন্তু তা প্রয়াস সাধ্য বলে মনে হয়। কবির এই প্রয়াস যদি পাঠকের কাছে চাতুরি ব'লে মনে হয়, তা হলেই কবিতা পাঠে সে হয়ে উঠবে নিরুৎসাহ।

লেখক সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার উপর বিশ্বাস হারাননি। তিনি গভীর আস্থার সঙ্গেই বলেছেন—"কয়েক বছরের স্পন্দমান পরিক্রমণ এক নির্দিষ্ট পথ নেবার জন্য আত্মলক্ষ্য হচ্ছে দেখে ভরসাই জাগে।" যথার্থ কথা। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন করেছেন—"তবে কেন উত্তেজনা আসে না? এখানকার নতুন কবিরা কেন আর তেমন করে আলোড়ন করতে পারেন না আমাদের।" এ প্রশ্নের জবাবও খুঁজে পেয়েছেন তিনি। পার্থিব জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষ আজ বিশ্বাস হারিয়েছে সব কিছুতেই — কবিতাতেও। জীবনের এই ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে সাম্প্রতিক কালের কবিগণের মধ্যে আত্মোপলব্ধির তাগিদ দেখা দিয়েছে সব চেয়ে বেশী করে। তাই তাঁরা বহির্জীবনের নির্মমতায় পীড়িত হয়ে একে একে অন্তর্লীন হয়ে পড়ছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিদের প্রত্যেকেই মনে হয় পারিপার্শ্বিকতার নির্মমতায় চঞ্চল ও তপ্ত। শেলীর মত করে এরাও যেন বলতে চায়—

"I fall upon the thorns of life I bleed."

এই নতুন কবিদের নতুন কবিতার পাঠকসংখ্যা বাড়তির দিকে। এটা সুলক্ষণ। পুরনো, বহুলব্যবহৃত অনুভব বা কাব্য-কলার যাদুস্পর্শে সরস করে তুলতে হ'লে দুর্বোধ্যতার প্রয়োজন আছে বই কি? সর্বজনগ্রাহ্য কবিতা কোন যুগেই বা সৃষ্টি হয়েছে! কবিতার রসাস্বাদন করতে হ'লে পাঠককে এগিয়ে আসতে হবে অর্ধপথ, অপরদিক থেকে বাকী পথটুকু এগিয়ে আসবেন কবি স্বয়ং। এই half way meeting ছাড়া অন্য উপায় কি? ইতি—

পীযূষকান্তি বিশ্বাস,
অধ্যাপক, সাহেবগঞ্জ কলেজ,
সাঁওতাল পরগনা

॥ ২ ॥

'দেশ' পত্রিকার ২১ সংখ্যার সময় সাহিত্য সমালোচনা পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা হয়েছে। আপনাদের এই বিভাগটির জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লেখক প্রায় সবার নামই করেছেন, কিন্তু এই এক বৎসরের আলোচনায় দিনেশ দাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী, কামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ বাগচীর নাম বাদ পড়া ঠিক হয়নি। এ'দের কবিতার আলোচনায় স্থান না পেলে অসম্পূর্ণ রয়ে যায় এই আলোচনা, আর হয়তো বা অবিচারই করা হয় সেই কবিদের প্রতি।

আমি এই সুযোগে এ'দের কয়েকজনের কবিতার দুই-একটি পঙ্‌ক্তি তুলে এনে এই আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চাই। কবি দিনেশ দাস এক জায়গায় বলেছেন—

তবু ক্ষ্যাপা মন মনে মনে—
সময়ের ওপারেতে অন্য কোন সময়ে
পদধ্বনি শোনে
যে বসন্ত পৃথিবীতে কখনো আসেনি
তারি প্রতীক্ষায় কাল গোনে।

মনে হয় কবির সঙ্গে পাঠক নিজেও একাত্ম হয়ে গেল। তেমনি কামাক্ষী-প্রসাদের—

ঈশ্বর
মানুষের কণ্ঠস্বর
বোবা হয়ে চুলেছে
কথা বলতে চায় পারে না,
কোন অব্যক্ত ব্যথায়—চুপি চুপি মাথা
খুঁড়েছে
আজকের এই অনেক রাতে
ওবা নিংড়ানো জলের অস্পষ্ট আলোতে।

আমাদের পাঠকসমাজকে এই কথাই মনে করায় নাকি যে, কবি তাঁর আহত আর্তনাদকে তুলে ধরতে চাইছেন আধুনিক সমাজের কাছে? আমরা পাঠকরাও এই আর্তনাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাচ্ছি। আবার গোবিন্দ চক্রবর্তী আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন এক নীল নির্জনতার অর্ধ-স্বপ্নাল রোমান্সজগতে।

সূর্যেরো স্নেহে জড়িয়ে থাকে যে—
কিছু নীল উল্লাস,
নীল কিছু আহ্লাদ!

পরিশেষে বলি, শংখবাবু অত্যন্ত সুন্দর করেই এই আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি নিজে একজন আধুনিক কবি তাই বর্তমান আধুনিক কবিদের গতিপ্রকৃতি কোনদিকে ধাবমান সেটা তুলে ধরবার চেষ্টা সম্যকভাবেই করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন আধুনিক কবিরা সৌম্য আয়তনের চতুর্ধারে ঘুরছেন কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছেন না, তাই আবার কবিদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য

করা যাচ্ছে—কবিদের নতুন দিকনির্ণয়ের জন্য প্রবল অথচ সচেতন পদক্ষেপ। কিন্তু এখানে একটু বক্তব্য আছে। আধুনিক কবিরা যদি এভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও শিল্পাদর্শের উচ্চারণে মুখর থেকে আবার নতুন করে এক দিশায় সন্ধানে পা বাড়ান তা হলে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভাববার প্রশ্ন আসবে না? এমনিতেই বাংলা কবিতার পাঠক অনেক পরিমাণে কমে গেছে কারণ বর্তমান পাঠকরা আধুনিক কবিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না বলেই আমার ধারণা। আধুনিক কবিতার পাঠকরা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, কোথায় যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা পাঠকের হৃদয়ে জমা হচ্ছে; পাঠক যেন কবির চিন্তার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে পারছেন না। এটা কি কবির চিন্তার গভীরতার জন্যে, না কবির চিন্তার অসংলগ্নতার জন্য, সেটি বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পাঠক নিজের মনের শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলবার জন্যই চায় কবিতা। সেই চাওয়া এই রকেটের যুগেও আছে এবং আরো কোন তীব্র গতির যুগেও থাকবে। আসল কথা হচ্ছে আধুনিক কবিরা নিজেরাই জানেন না তাঁরা কোন দিকে ধাবমান বা কিভাবে পাঠকের কাছে নিজেকে আরো ঘনিষ্ঠ করে তোলা যায় তার পথ তাঁরা নিজেরাই খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা ভাবছেন, তাঁদের মহৎ আদর্শ আছে, মহৎ কোন দার্শনিক বক্তব্য আছে, কিন্তু সৃষ্টির মুহূর্তে ঈপ্সিত সেই ব্যঞ্জনা অনুপস্থিত। তাই পাঠকসমাজকে নাড়া দিতে পারছে না তাঁদের সৃষ্টি। আমরা পাঠকেরা শঙ্কিত। বর্তমান কবিরা আমাদের মনকে আনন্দ দিচ্ছে না, শান্তি দিচ্ছে না।

বিনীত

শ্যামল চক্রবর্তী,

কলিকাতা ৩

॥ ৩ ॥

মহাশয়,

গত শনিবার ১০ই চৈত্রে প্রকাশিত আপনার 'দেশ' পত্রিকায় 'সময় সাহিত্য করলাম। এটি নিঃসন্দেহে একটি সুখপাঠ্য করিলাম। এটি নিঃসন্দেহে একটি সুখপাঠ্য আলোচনা, তবে লেখকের কয়েকটি কথা মেনে নিতে পারলাম না।

তাঁর মতে 'আধুনিক কবিতা আজ আবার পাঠকের কাছে দুর্বোধ্যতার অভিশাপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে, এটা দুর্ভাবনার বিষয়।' এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, যাঁরা যুগের দাবিকে স্বীকার করে নিতে পারছেন না, তাঁদের কাছে হয়তো কিছুটা দুর্বোধ্য হতে পারে। আর কবি যখন কবিতা রচনা করে থাকেন, তখন একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই রচনা করে থাকেন। তাঁর অন্তরে আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনার অনুভূতি যখনই জাগে, তখনই তিনি কবিতার মাধ্যমে সেটি ব্যক্ত করেন। তার নিশ্চয়ই একটা অর্থ থাকে। সব পাঠকের পক্ষে এর সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব নাও হতে পারে। পাঠক নিশ্চয়ই কোন কবিতা পাঠ করে মনে-মনে একটা

অর্থ নির্ণয় করেন, এবং সেই অর্থেই আনন্দ পান। পাঠক যদি সেই অর্থে আনন্দ পেয়ে থাকেন, তবে ক্ষতি কি? কবির তাতে বিশেষ যায় আসে না।

লেখকের আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতে হয়তো আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকসংখ্যা উপরিউক্ত কারণে কমে যাবে। কিন্তু দিনের পর দিন এর পাঠকসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আশঙ্কার কোন কারণ দেখিনে। আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। এটা অত্যুক্তি নয়। কবিরা আমাদের বেদনা-বিক্ষত জীবনকে সরস করে রেখেছেন বিষয়বস্তুর সমারোহে এবং ধ্বনিমাধুর্যে। ইতি

বরুণকুমার মজুমদার
শিবপুর, হাওড়া

॥ ৪ ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৪শে মার্চ ১৯৬২ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "দুই বসন্তে" শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। বাঙলা সাহিত্যের প্রসারকল্পে এবংবিধ প্রয়াস সত্যই প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষের রচনাশৈলী সুন্দর, কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ এবং যৌক্তিক মন্তব্য সমন্বিত, এমন কথা বলতে পারছি না। আলোচনায় অনেক কবির উল্লেখ নেই। দৃষ্টান্ত—আনন্দ বাগচী, শোভন সোম, দুর্গাদাস সরকার, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় এঁরা সুপরিচিত। (এঁদের মধ্যে কেউ বা অনেকের মতে, প্রথম তিনজনের অন্যতম।) প্রশ্ন এই, গত এক বৎসরে কি এঁদের লেখনী বন্ধ্যা ছিল, না কি প্রাবন্ধিক এ বিষয়ে সাবহিত নন?

সুবিচার করা হয়নি অনেক রচনার। মানস রায়চৌধুরীর মূলত গীতিধর্মী স্বপ্নাশ্রয়িতার। অধুনা তাঁর কবিতায় যে পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে তাকে 'বাঁকা বিদ্রূপ' আখ্যা না দিয়ে সংশয়পীড়িত ছিন্নমূল মনোভাব বলাই সমীচীন ছিল। প্রেমের বিষয়ে অরবিন্দ গুহের উপভোগ্য শানিত বিদ্রূপের সঙ্গে তারাপদ রায়ের লঘু সুরের কবিতার সাধর্ম্য নেই।

লেখক স্বয়ং তরুণতর কবিগোষ্ঠীর অন্যতম হওয়ায় আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ অসঙ্কোচে বলতে পারেননি কবি শঙ্খ ঘোষের কথা। এতদ্‌সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আলোচনাটি সুখপাঠ্য। ইতি

বীথিকা দত্ত,
৪৭, স্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলকাতা

রমাপদ চৌধুরী

[২৫]

খবর শুনে অট্টামা লাঠি ঠুক ঠুক করে এসে হাজির হলো। নুয়েপড়া শীর্ণ শরীরটা লাঠির ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো একবার রায়দের বাড়ির বৈঠকখানার সামনে। ছানি-পড়া চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজলে। তারপর টিয়াকে ঘাট থেকে বাসন নিয়ে আনতে দেখে আন্দাজে আন্দাজে প্রশ্ন করলে, কে রে, টিয়ে?

টিয়া মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ গো অট্টামা। এখানে দাঁড়িয়ে কেন তুমি?

অট্টামা টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ রে কৌশলী যে বললে, নোকে নোকারণ্য রায়দের বাড়িতে, ইস্কুল বানাতে এয়েছে পেভাকর......

টিয়া হেসে বললে, তাই ছুটে এলে বুঝি? ইস্কুলে ভর্তি হবে তুমি, না কি অট্টামা?

অট্টামা গম্ভীর হয়ে বলে, ক্যানে, তাতে তোর অত হিংসের কি হলো রে ছুঁড়ি। বলে, 'জ্যোছনাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে', তোর হয়েছে তাই।

টিয়া হেসে বলে, আমার কেন দুষছো অট্টামা, আমার কপালে কি আর পড়াশুনো আছে' বলে গিরিজাপ্রসাদের দিকে আঙুল দেখালো।—ওই দেখো, নতুন গোড়ের ওপাড়ে রয়েছে ওরা।

অট্টামা এবার হেসে হাতটা বাড়িয়ে টিয়ার চিবুকে ঠেকালো, চুমু খাওয়ার শব্দ করে বললে, ক্যানে, ইস্কুল হচ্ছে তো তোদেরই, পড়বিনে ক্যানে। আমারই সাধ যাচ্ছে, বলে, 'একবার হল নুনে ফ্যানে, তারপর হল ছেলের সনে।' বুঝলি ওই খাওয়াও যা, পড়াও তাই। ভর্তি হলো লো ছুঁড়ি, ভর্তি হবো। এ জন্মে না হয়, মরে নতুন জন্ম নিয়ে আসবো।

টিয়া হেসে উঠলো অট্টামার কথা শুনে, তারপর ভিতর থেকে মার ডাক আসতেই ছুটে পালালো। আর অট্টামা টুকটুক করে গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে নতুন গোড়ের পাড় দিয়ে একেবেঁকে উঁচুনীচু রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে ওপাড়ের ভিড় লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

পাড়ের জায়গাটুকু তখন মাপ জোক করছে সবাই। অট্টামাকে আসতে দেখে বিমলা ছুটে এল। হাসতে হাসতে বললে, অট্টামা? অট্টামা, আপনি এখানে কেন?

দন্তহীন মাড়ি বের করে হাসলো অট্টামা। বললে, কই রে, ইঁট পুড়িয়েছিস? ভাটা করেছিস কোথায়?

গোপেন মোড়ল কাছে এগিয়ে এলো। বললে, টাকা দাও কিছু, তবে তো ওসব হবে গো।

অট্টামার চোখ ছলছল করে উঠলো।—টাকা কি আছে মাণিক। সব যে খুইয়ে বসেছি। তখন ভাসুরপোদের কত আদর যত্ন, এখন সম্বছরে একবারটি খবর নিতে আসে না। এখন যে আর কানাকড়িও নাই, আসবে ক্যানে। বলে, 'টাকা টাকা টাকা, গোপলা হলো গোপাল জ্যাঠা, মপলা হলো কাকা।' তখন সব কত কাকী কাকী করতো, এখন সব ফাঁকি।

বলে হাসলো অট্টামা। তারপর গিরিজা-প্রসাদ আর প্রভাকরকে আসতে দেখে বললে, হ্যাঁরে পেসাদ, তোরা যে সব ইস্কুল বানাচ্ছিস, কে পড়বে শুনি? গাঁয়ে আর মানুষ রইবে কেউ? সব তো একে একে চলে যাচ্ছে, কার জন্যে করছো এ সব।

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন। বললেন, সে কি, কে চলে যাচ্ছে গাঁ থেকে?

—ক্যানে, দামু পাল যাচ্ছে সবাইকে নিয়ে, হংস যাচ্ছে। সেই যে বলে না, 'টোল খুলবো পণ্ডিত আন, গাঁ উজাড় মুসলমান।' তাই হবে, কেউ থাকবে না গাঁয়ে, শুধু ইস্কুলই হবে।

কে থাকবে আর কে চলে যাবে তা নিয়ে অবশ্য গোপেন মোড়লের দুশ্চিন্তা নেই।

কিন্তু হংসে চাটুজ্যে চলে যাবে, এটাই তার কাছে নতুন খবর।

তাই প্রশ্ন করলে, হংস চলে যাবে? কোথায়?

—অবনী যে ওর চাকরি করে দিয়েছে। কত বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনাজানা তার, বলে-কয়ে কাজ করে দিয়েছে, যেতে লিকেছে ওকে। অবনীর ঘরে থাকবে খাবে, ছেলে পড়াবে, আর কাজ করবে আপিসে। বাবা 'টাকার নাম ভাগ্যধর, আপন হয় পরের পর।'

বিমলা হেসে উঠলো অট্টামার কথা শুনে। অট্টামার মুখে ছড়া শুনলেই হাসি পায়। অট্টামা বললে, হাসি দেখ মেয়ের। হাসিস না লো, হাসিস না। টাকা পরকে আপন করে, আপনকে পর করে, বুঝলি। কেলে শুটকি কানা খোঁড়া যে মেয়েদের দেখে সব সোনার টুকরো ছেলেরা নাক সিঁটকোয়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাললে তখন তাদের বিয়ে করতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়...,

বুঝলে ভাই। এ জীবনে কত দেখলাম, আরো কত দেখবো। ও তোমার টাকা দেখতে গোল, থাকলেও গোল না থাকলেও গোল।

বলে ফোকলা মুখে হেসে উঠলো অট্টামা।

ইতিমধ্যে কাজ চুকে গিয়েছিল প্রভাকরের। তাই রায় বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করলো সে। পিছনে পিছনে সারা গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো।

অট্টামা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে গিরীন আছে কিনা কাছেপিঠে। দেখলে, সে আগে আগে চলে যাচ্ছে। হয়তো প্রভাকরের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে।

অট্টামা ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গিরিজা-প্রসাদকে বললে, পেসাদ, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল বাবা।

গিরিজাপ্রসাদ থেমে দাঁড়ালেন এক পাশে। সকলে একে একে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। গিরিজাপ্রসাদ বুঝলেন, কোন একটা গোপন কথা বলতে চায় অট্টামা।

সকলে একটু দূরে চলে যেতেই অট্টামা বললে, তোমার ওই মেয়ের বিয়ের কিছু করলে?

গিরিজাপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। কি জবাব দেবেন এ-কথার। স্ত্রী নিভাননীর কাছেও তো এ-কথা বহুবার শুনেছেন। তাই ভুলে থাকতে চান। মনে পড়লেই একটা দুশ্চিন্তা দেখা দেয় শুধু।

অট্টামা খানিক চুপ করে থেকে বললে, একটা ব্যবস্থা করো কিছু। গিরীন তো ওর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করে ফেলেছে, শেষে লোকে যে তোমাকেই ছি ছি করবে।

গিরিজাপ্রসাদ চমকে উঠলেন। টিয়ার! টিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ, ওই পেভাকরের বাপ যে আসবে মেয়ে দেখতে।

—প্রভাকরের সঙ্গে? আরো বিস্মিত হলেন গিরিজাপ্রসাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাতেই চোখোচোখি হয়ে গেল বিমলার সঙ্গে। চোখ ফেরালে বিমলা,
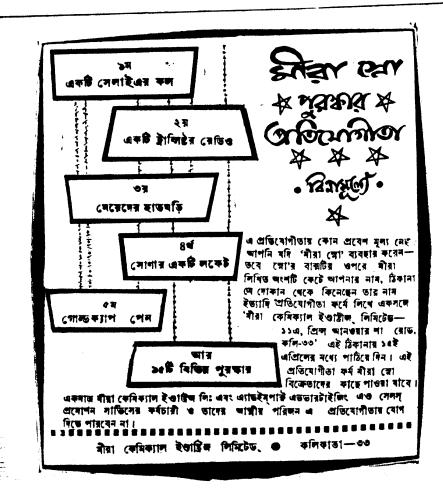
এমন ভাব করলে মুখের, যেন শুনতেই পায়নি সে। তার সারা মুখ যে মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে গিরিজাপ্রসাদ তা লক্ষ্য করলেন না।

হঠাৎ এমন একটা আঘাত পাবে, বিমলা কল্পনাও করেনি। মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীর জ্বলে উঠলো তার। মন বিষিয়ে উঠলো প্রভাকরের বিরুদ্ধে।

এতক্ষণ যে ও প্রভাকরের কাছে কাছে ঘুরেছে, কথা বলেছে, হেসেছে হাসিয়েছে, তার পিছনে একটাই আনন্দ ছিল। কাছে থাকার আনন্দ। এতগুলি লোকের মাঝেও ওরা যেন পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করেছে, এতখানি দূরত্বের মধ্যেও মনে মনে ঘনিষ্ঠ বোধ করেছে।

দিনে দিনে দুজনে দুজনের ওপর যে আস্থা আর বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল মুহূর্তে তা যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হলো বিমলার মাথায়। একবার মনে হলো অট্টামার সব কথা মিথ্যা, সব ভুল। পর মুহূর্তেই প্রভাকরের ওপর রাগে জ্বলে উঠলো। না, মিথ্যা নয়। সত্যি না হলে অট্টামা এ-কথা বলবে কেন।

কি আশ্চর্য। ভাবতেও বিস্ময় জাগে বিমলার। প্রভাকর সব জেনেশুনেও এমন একটা খেলা খেলেছে তার সংগে? কেন, কেন? চোখ জ্বালা করে উঠলো বিমলার।

ইচ্ছে হলো এখনই গিয়ে প্রভাকরকে চিৎকার করে দুটো কথা শুনিয়ে দেয়।

কোন রকমে বাড়ি ফিরে এসেই বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো বিমলা। কিন্তু এমন ভাবে তার সংগে প্রবঞ্চনা করলো কেন প্রভাকর? ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না। তবে কি এতদিন ধরে শুধুই সে অভিনয় করে এসেছে বিমলার সংগে?

একটা দিনের কথা মনে পড়লো।

একটা না একটা ছুতোয় প্রায়ই বন-পলাশিতে আসতে শুরু করেছে তখন প্রভাকর। আর তারই ফাঁকে গিরিজাপ্রসাদের সংগে দেখা করে যায়। বিমলা লক্ষ্য করে, মুখ টিপে হাসে, বুঝতে পারে কিসের টানে এমন ঘন ঘন আসে প্রভাকর। আর তাই মনে মনে খুশী হলেও বেশ কিছুটা কৌতুক বোধ করে সে। আর তার কৌতুকের হাসিটা প্রভাকরও যেন বুঝতে পারে মাঝে মাঝে তাই একটু চটেও যেতো সে। মনে হতো বিমলার হাসিটা যেন তাকে তাচ্ছিল্য দেখাতে চায়।

সেদিনও এমনি গিরিজাপ্রসাদের সংগে দেখা করতে এসেছিল প্রভাকর, ইস্কুলের দরখাস্তটা ক ধাপ এগিয়েছে, কি মন্তব্য করেছেন উপরওয়ালা সেটুকুই জানাতে এসেছিল।

এক সময় গিরিজাপ্রসাদ ভিতর বাড়িতে উঠে গেলেন।

আর সেই সুযোগেই চা নিয়ে এসে দাঁড়ালো বিমলা। প্রভাকরের চোখে চোখে রেখে ঠোঁটে অন্তরংগতার হাসি দুলিয়ে অপেক্ষা করলে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আপনি শেষে দেখছি বিপদে ফেলবেন আমাকে।

বলে ঠোঁট টিপে হাসলে।

কথাটা দুর্বোধ্য ঠেকলো প্রভাকরের কাছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে প্রশ্ন করলে, কেন? কিসের বিপদ?

খিলখিল করে হেসে উঠলো বিমলা।—এত ঘন ঘন আসছেন, কেউ যদি......

প্রভাকর লজ্জিত বোধ করলে। তারপর বিমলার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে বললে, না এসে পারি না যে!

আর কোন কথা বলেনি বিমলা। দ্রুত পায়ে সেখান থেকে সরে এসেছিল। কিন্তু প্রভাকরের ওই ছোট্ট কথাটুকু যেন ওর সারা শরীরে মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের ফুলঝুরি জেলে দিয়েছিল।

ছোট্ট একটুকু একটা কথা। অথচ গ্রীষ্মের দুপুরে গভীর আর ঠাণ্ডা একটা দিঘিতে ডুব দিয়ে ওঠার মত বিচিত্র এক অনুভূতিতে সমস্ত শরীর যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল বিমলার। এত স্পষ্টভাবে, এত অকপটভাবে প্রভাকর বুঝি কোনদিনই তার কাছে ধরা দেয়নি এর আগে।

সারাটা দিন একটা মূর্তির হিল্লোলে নেচে নেচে উঠেছিল তার মন।

কি আশ্চর্য। সেদিনও কি এ-কথাটার মধ্যে কোন সত্য ছিল না? শুধুই অভিনয় করে গেছে প্রভাকর?

অট্টামার কথাটা তখনও কানে বাজছে তার। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে অনেকক্ষণ কিছুই ভাবতে পারলো না বিমলা। শুধু একটা অসহ্য ব্যথা অনুভব করলো বুকের মধ্যে।

তারপর ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠলো। কান পেতে শুনলে। না, কোন কথা, শব্দ ভেসে আসছে না তো!

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো বিমলা। এসে দেখলে প্রভাকর আর তার সংগী ভদ্রলোক কখন চলে গেছে। শুধু উচ্ছিষ্ট থালা বাটি গ্লাস পড়ে আছে বারান্দায়।

দেখলে, ডুরে শাড়িটায় সারা গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে করতে জড়োসড়ো হয়ে টিয়া থালা-বাসনগুলো তুলে নিলো এক হাতে, আর অন্য হাতে গোবরজল ছিটিয়ে দিলো জায়গাটায়।

তারপর হঠাৎ বিমলার সংগে চোখোচোখি হতেই কেমন যেন অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিলো টিয়া।

বিমলার মনের মধ্যে কি ঝড় উঠেছে তার খবর রাখেন না গিরিজাপ্রসাদ। তাঁর নিজের মনেই তখন একটা ঘূর্ণি উঠেছে।

ছোট ভাই গিরীনের সংগে এর আগে অনেক মন কষাকষি হয়েছে, অনেক বিরোধ ঘটেছে, মনোমালিন্য। কিন্তু এর চেয়ে বড় অপমান বুঝি কখনো কুড়োতে হয়নি গিরিজাপ্রসাদকে। হঠাৎ আজ গিরিজাপ্রসাদের মনে হলো, তিনি সম্পূর্ণ হেরে গেছেন গিরীনের কাছে। হেরে গেছেন।

বিমলার বিয়ে দেবেন না, তাকে কলেজে পড়াবেন, নিজের পায়ে দাঁড় করাবেন, কত কি জোর গলায় বলেছেন এর আগে। বলেছেন, বিয়েই তো মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। চাকরি করে স্বাবলম্বী হবে বিমলা—এমন অনেক কথাই বলেছেন। নিজের মনকেই হয়তো প্রবোধ দিয়েছেন সে-কথা বলে।

কিন্তু টিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে, তাও প্রভাকরের সংগে—এই একটা ছোট্ট খবরে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্মান সম্ভ্রম যেন মাটিতে মিশে গেল।

সকলে চলে যাওয়ার পর নিঃশব্দে নিজের ঘরটিতে এসে চুপ করে শুয়ে রইলেন। হাতপাখাটা তুলে নিয়ে বার কয়েক বাতাস করলেন রোমশ বুকের ওপর।

তারপর ধীরে ধীরে ডাকলেন, কমলি!

—কি বাবা? কমলা কাছে এসে দাঁড়ালো।

গিরিজাপ্রসাদ বললেন, তোর মাকে একবার ডাক তো মা!

একটু পরেই নিভাননী এসে হাজির হলেন। গিরিজাপ্রসাদ বসে ছিলেন তক্তপোষের ওপর। চোখ তুলে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। কথাটা নিভাননীকে বলবেন কি বলবেন না, ভাবলেন এক মুহূর্ত।

শেষে বলেই ফেললেন।—টিয়ার নাকি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে ওরা?

নিভাননী চমকে উঠলেন।—কে ঠাকুরপো বললে?

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন।—না। ওরা হয়তো বিয়ের দিনে বলবে। শুনলাম প্রভাকরের সংগে বিয়ের চেষ্টা করছে, মেয়ে দেখতে আসবে ওর বাবা......

—তবেই বোঝো। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিভাননী।—এত আপন আপন করো, এ খবরটুকুও আমাদের বলতে চায় না। যেন আমাদের বললে আমরা বিয়ে ভাঙিয়ে দেব।

গিরিজাপ্রসাদ বিষণ্ণ হয়ে হাসলেন। বললেন, তাই এত চা জলখাবার খাওয়ানোর ধুম। তখন তো বুঝিনি।

নিভাননী হঠাৎ যেন রেগে গেলেন।—এখন বলে আর কি হবে। ছি ছি ছি, হাতের সামনে এমন একটা পাত্র ছিল, একটু চেষ্টা করে দেখলেও তো পারতে।

গিরিজাপ্রসাদ হাসলেন। বললেন, চেষ্টা করেও কিছু হতো না। দশ হাজার টাকা বের করতে পারতে তুমি?

নিভাননী চুপ করে রইলেন। সত্যিই তো, এত টাকা কোথায় পেতেন তিনি। সংসার চালানোই দায় যেখানে!

গিরিজাপ্রসাদ সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পাড়া গাঁয়ের লোকদের সংগে কি পারবে আর? ধানের দর পাচ্ছে সেই যুদ্ধের সময় থেকে......

নিভাননী গুম হয়ে রইলেন। কোন কথা বললেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, মুখ দেখাতে পারবো না লোকের সামনে। কি বলবে বলো তো সবাই? টিয়ার চেয়ে কত বড় বিমলা, ও পড়ে রইলো......

হঠাৎ দপ করে রাগে জ্বলে উঠলেন নিভাননী। নিজের মনেই গজরে উঠলেন, ছোটলোক, ছোটলোক।

গিরিজাপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। একটু যেন আঘাত পেলেন নিভাননীর কথায়। ভাবলেন, গিরীনকে দোষ দিয়ে কি হবে, দোষ তো নিজেদেরই। তাঁর নিজের।

বললেন, বাবা কেন যে পড়াশুনো করিয়েছিল, অশিক্ষিত হয়ে যদি গাঁয়ে পড়ে থাকতাম চাষবাস নিয়ে! আজ এত দুশ্চিন্তা থাকতো না।

কিন্তু দুশ্চিন্তা তো সেজন্যে নয়। গিরিজাপ্রসাদ আহত হয়েছেন অন্য কারণে। মনোমালিন্য শুরু হয়েছে এখানে আসার পর থেকেই, কলহবিবাদ হয়েছে, পৃথক হয়ে গেছে দুটি পরিবার, তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা থেকেই গেছে। দু বাড়ির ভদ্রাসনের মাঝখানে যে পাঁচিল উঠেছে, দু ভাইয়ের মনের মাঝখানে সে-পাঁচিল নেই বলেই এতদিন ভেবে এসেছেন তিনি।

গিরিজাপ্রসাদের মনে পড়লো, একদিন দুপুরে হঠাৎ বুকে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পড়েছিলেন। বিমলা গিয়ে ডেকে এনেছিল অবিনাশ ডাক্তারকে। আর ডাক্তারকে আসতে দেখে গিরীনও ছুটে এসেছিল সেদিন, দুপুরের ট্রেনে বর্ধমান গিয়ে একটা ওষুধ কিনে এনেছিল।

আবার যেদিন মোহনপুরের বউয়ের কোলের ছেলেটা ঘাট থেকে পড়ে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেদিন নিভাননী, বিমলা-কমলা সবাই ছুটে গিয়েছিল রাগ দ্বেষ অভিমান ভুলে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স খুলে ওষুধ খাইয়েছিলেন গিরিজাপ্রসাদ, মাথায় জলপটি দিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিভাননী তাকে কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মাথায় বাতাস করেছিলেন।

দুটো দিনই তাঁর মন খুশীতে ভরে উঠেছিল, দুটি পরিবারকে বিপদে আপদে এক হতে দেখে। আশা করেছিলেন, পিছনের সব গ্লানি মুছে দিয়ে আবার এক হয়ে যাবে সবাই।

হয়নি। পরের দিন থেকেই একটু একটু করে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেছে। বর্ষায় যে মাটি এক হয়ে গিয়েছিল, মেঘ সরে যেতেই, গ্রীষ্মের প্রখর রোদ ফুটে উঠতেই সেই মাটি ফেটে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে। মনে হয়েছে আর জোড়া লাগানো যাবে না।

সত্যিই তাই। ধীরে ধীরে আবার কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেছে দুটি পরিবারের।

তবু গিরিজাপ্রসাদ আশা করেছিলেন, টিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ করবার আগে তাঁকে একটু আভাস অন্তত দেবে গিরীন, দাদার একটা উপদেশ চাইবে। প্রভাকরের সংগে টিয়ার বিয়ে হলে তিনি কি অসুখী হবেন? না, নিভাননী অখুশী হবেন? আজ পৃথক হয়ে গেছেন বলেই কি টিয়া তাঁর কেউ নয়? বিমলা আর টিয়ার মধ্যে কতটুকু প্রভেদ করেন তিনি? করেন কি?

কিন্তু সব ব্যাপারটা এত গোপনে গোপনে করার কি প্রয়োজন ছিল গিরীনের!

প্রয়োজন হয়তো ছিল। তাই গিরীন বারবার সাবধান করে দিয়েছে মোহনপুরের বউকে। বলেছে, টাকাকড়ি আগে যোগাড় হোক, তারপর......

টাকাকড়ি কি করে যোগাড় হবে সেটাই আসল দুশ্চিন্তা গিরীনের। মোহনপুরের

বউয়েরও। মাত্র দু' মরাই ধান আছে, তা বেচে আর কত টাকা হবে। জমি বেচবেন বিঘে করেক: বেচতে হবেই। কিন্তু সেখানেই আসল লজ্জা গিরীনের।

কোনরকমে যদি গিরিজাপ্রসাদের কানে যায়, বউঠানের কানে যায়, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

বাউড়িদের একটা ছেলে রেলে চাপরাসীর কাজ করে, সে জমি খ‍ুঁজছে দু' এক বিঘে, গিরীন শুনেছে। তবু তাকে খবর দিতে চায়নি, শুধু সম্মান সম্ভ্রম নষ্ট হবে বলে।

গোপনে গোপনে ধীরেন সাঁইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। বলেছে, খবরটা যেন এখন প্রকাশ না পায়। পরে বললেই চলবে, অভাবের জন্যে তো বেচি নি, গরমেণ্ট নিয়ে নেবে তাই বেশী দাম পেয়ে নিজেই দিয়ে দিয়েছি।

মোহনপুরের বউকে সে-কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে গিরীন। বুকের ভেতর একটা ব্যথার মোচড় দিয়ে উঠেছে। ধীরেন সাঁই আসানসোলে কার বাড়িতে রাঁধুনী হয়ে ছিল, কোলিয়ারীতে কি একটা কুলিখালাসীর চাকরি করে, সেও টাকা জমিয়ে জমি কিনছে। আর জমি বেচেছে কিনা রায়বাড়ির ছেলে!

মোহনপুরের বউ চাপা গলায় হতাশা ফুটিয়ে বলেছে, জমি থেকে আমাদের সংসার চলছে না তবু তো কিনছে লোকে!

হেসেছে গিরীন।—লাভ তো ওদেরই হবে গো। দিব্যি চাকরি করে চলে যায়, জমির ধানটা উপরি লাভ। আমাদের মত জমির ধানেই তো সারা বছর সংসার চালাতে হয় না।

গিরীন যেন চোখের সামনে দেখতে পায়, গ্রাম থেকে তারা ধীরে ধীরে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। যাবেই। অটোমা আজকাল কথায় কথায় বলে, গাঁয়ে লোক থাকবে না, শ্মশান হয়ে যাবে সব। শ্মশানই তো হয়ে গেছে। কে আছে গাঁয়ে, ক' ঘর আর থাকবে। বাউড়ি বাগদীদের দু'এক ঘর হয়তো থাকবে শেষ অবধি। তারাও তো একে একে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে, কলকারখানায় দোকানপাট করছে, দুর্গাপুরে ছুটছে।

সেদিন রাত্তে এমনি ধারার কথাই হচ্ছিল মোহনপুরের বউয়ের সঙ্গে।

হাতপাখা নাড়তে নাড়তে গিরীনের তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসে পান চিবোতে চিবোতে গভীর তৃপ্তিতে ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে-গুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে মোহনপুরের বউ বললে, প্রভাকর ছেলেটি কিন্তু খুব ভাল।

গিরীন সায় দিলে। বললে, মেয়ে যদি অপছন্দ না হয়, টিয়ার বিয়ে আমি ওখানেই দোব।

মোহনপুরের বউ ধীরে ধীরে বললে, বটঠাকুরকে বলবে না?

—না, না। ঘাড় নাড়লে গিরীন।—এখন না। বললেই তো ভাববে, এতকাল অনেক জমিয়েছি, তাই এত পণ দিচ্ছি মেয়ের বিয়েতে।

মোহনপুরের বউ ক্ষুন্ন মনে বললে, তা কেন, জমি বেচে দিচ্ছি বললেই তো......

হাসলো গিরীন।—পাগল হয়েছো। ভাববে, মিছে কথা বলছি, বেনামী করছি ওই বলে। আর যদি বিশ্বাস করেও, না, না, সে ওদের কাছে আমার মাথা কাটা যাবে। এমনিতেই দেখছো না, বড়লোক বলে ছেলে-মেয়েগুলোও আমাদের হেলাফেলা করে। জমি বেচতে হচ্ছে জানলে......

মোহনপুরের বউ কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ঘুমোতে ঘুমোতে বারবার পাশ ফিরছে টিয়া, দেখতে পেল। মেয়েটা জেগে আছে নাকি?

তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকে ঠোঁট টিপে হাসলো মোহনপুরের বউ।

(ক্রমশ)
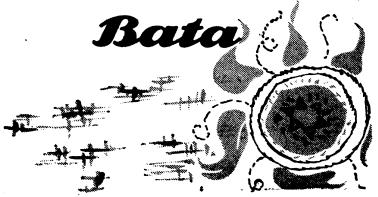
কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরের বিখ্যাত ফুটবল দল 'ফ্রেন্ডস ইলেভেন ক্লাব'।

ক্লাবে সন্ধ্যায় জোর আড্ডা জমে। তাস, দাবা, গানবাজনাও হয়।

হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোকে ঘরটা বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দূরে থেকে লোকগুলিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তবে আমি দু'তিনজনকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না।

সবাই খুব হাসছে, কেউ কেউ হেসে ফরাসে লুটিয়ে পড়ছে।

অনিল স্থানীয় লোক। সবাইকেই চেনে। ছুটিতে কলকাতা থেকে ফিরেছে। আমিও তার অনুরোধে এখানে বেড়াতে এসেছি।

গেটটা পার হতে হতে অনিল বলল, ব্যাপার কি! সবাই যে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আমার কিছু বলবার নেই, তাই চুপ করে রইলুম।

অনিলের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব-ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

অনিল ভানু দত্ত রায়কে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি দাদা, সবাই অত হাসছে কেন?

রাখাল বলে উঠল, সম্মান।

অনিল অবাক হয়ে বলল, সম্মান! সে আবার কি? হেঁয়ালি রেখে সোজা করে বল।

রাখাল বলল, নিজের মুখে আর কইতাম না, কেতনাই কউক।

রাখালের কথা শুনে সবাই জোরে হেসে উঠল।

আমি কেতনকে চিনি না রক্ষাকেও না, কিন্তু তার কথা বলার ঢঙে না হেসে পারলুম না।

নিবারণ রাস্তার দিকে মুখ করে বসেছিল, হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, চুপ! রতনা আসছে।

সকলেই যথাসম্ভব গম্ভীর হবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

ভানু দত্ত রায় বললেন, খবর্দার, তোরা এ বিষয়ে কেউ কিছু বলবিনে, ভাবটা দেখাবি যেন তোরা কিছুই জানিস না

রাখাল বলল, যদি হাসি পায়?

ভানু দত্ত রায় ধমক দিয়ে বললেন, হাসি পেলেই হল!

রাখাল হাসি চাপতে গিয়ে হেসে ফেলল। কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলল ওর নাম মনে

সবাই যে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে

পড়লেই হাসি পাচ্ছে, আর সামনে যদি দেখি তবে হাসি চেপে রাখা অসম্ভব।

ভানু দত্ত রায় গলাটা উঁচু করে একবার বাইরে দেখে নিয়ে বললেন, গেটে দাঁড়িয়ে অশোকের সঙ্গে গল্প করছে। শোন রাখাল, হাসি চাপতে না পারিস ত' বেরিয়ে যা। একে খড়মের বাড়িতে মাথা কেটেছে, তারপর রতনা যদি বুঝতে পারে যে, কালকের ব্যাপার তোরা সব জেনে গেছিস তবে ও ক্লাব ছেড়ে দেবে।

নিবারণ বলল, রতন ক্লাব ছেড়ে দিলে দু'দিনে ক্লাব অচল হয়ে পড়বে। রাখাল, ফের হাসছিস! তখন অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীর জন্য হা-হুতাশ করে ফিরতে হবে। রতনা ছাড়া এমন ভূতের বেগার কে খাটবে?

রাখাল বলল, রতন ছাড়বে না। ও ত' নিজেই ধরাধরি করে অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী হল।

ভানু দত্ত রায় বললেন, বেচারী দিনরাত খাটবে আর একটা পোস্ট পাবে না। গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে খেলোয়াড়দের খবর দেওয়া, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইউনিফর্ম নিয়ে এসে ধুয়ে শুকিয়ে পাট করে রাখা, ফুটবলে হাওয়া ভরানো, গ্রীজ বা মাখন লাগানো, চাঁদা সংগ্রহ করা—এসব বেগার খাটা কাজ কে করবে শুনি? একটা চাপরাসী রাখতে গেলে কত টাকা বের হয়ে যাবে—অত পয়সা আসবেই বা কোত্থেকে?

নিবারণ বলল, কাল ক্লাবের পয়সায় ভোজ

হয়েছে আর আজ যদি ভাল করে তা দেওয়া যেতে পারে তবে ভোজ না হোক অন্তত মিষ্টি খাওয়াবে। ভানুদা, ওই রতনা আসছে, তুমি বললেই রতনা খাওয়াবে। রাখাল, সাবধান, হেসে সব মাটি করিসনে।

রতন ও অশোক কথা বলতে বলতে ভেতরে এসে ঢুকল।

ভানু দত্ত রায় চোখের ইশারায় রাখালকে সাবধান করে দিলেন। রাখাল উদ্যত হাসি চাপবার জন্য তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার ছবির প্রতি মনঃসংযোগ করল।

রমেশ বলল, এই যে অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, কনগ্র্যাচুলেশনস। কাল আমি ছিলুম না, তাই আজ অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

রতনের মুখখানি খুশিতে ভরে গেল।

সুবোধ বলল, রতনা, মিষ্টি খাওয়া।

রতন কারণটা বুঝেও না বোঝার ভান করে বলল, মিষ্টি! মিষ্টি কেন খাওয়াব?

সুবোধ বলল, বাঃ! এত একটা সম্মান!

সকলের মুখেই হাসি খেলে গেল। ভানু দত্ত রায়ের ক্রুদ্ধ চোখ দেখে সকলেই কোনভাবে হাসি চেপে গেল কিন্তু রাখাল কিছুতেই হাসি চাপতে পারছে না। ভানু দত্ত রায় রাখালকে গুঁতো মেরে চাপা গলায় বললেন, হতভাগার জন্যে সব নষ্ট হবে।

তুইই ক'

নিবারণ ভালমানুষের মত বলল, রতনা আগেও খাইয়েছে, এবারও খাওয়াবে; ওর দিল আছে।

রতন একটু ভেবে বলল, কেতইন্যা আসুক।

রাখাল পেট চেপে কোনভাবে হাসি চাপল কিন্তু তবু চাপা হাসির আওয়াজ খুক্‌খুক্‌ করে বের হতে লাগল।

রতন বলল, কি রে রাখাল, তুই এমন করিস ক্যান?

রাখাল পত্রিকাটা টেনে নিয়ে বলল, না, কিছু নয়।

রমেশ বলল, রতনা, তুই টাকা দে, মিষ্টি আনতে আনতে কেতইন্যা এসে যাবে। কত টাকা দিবি?

রতন বলল, দাঁড়া, কেতইন্যা আসুক।

সুবোধ বলল, ও আর নিজের মুখে কইব না, কেতইন্যাই কইব।

রাখাল অনেকক্ষণ হাসি চেপে ছিল, আর পারল না, হো হো করে হেসে উঠে একেবারে ফরাসের 'পর লুটিয়ে পড়ল।

রতনের কেমন একটা খটকা লাগল। চারদিকে একবার সবার মুখের পর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ব্যাপার কি? রাখাল এমনি করে হাসতেছে ক্যান?

রমেশ বলল, কি রে রাখাল, কথা কস না ক্যান?

রাখাল আরও জোরে হেসে উঠল। রতন যত ওকে হাসবার কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগল, রাখাল আরও জোরে হেসে লুটিয়ে পড়ল। হাসির তোড়ে তার চোখে জল এসে গেল।

রতন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল এবং তার মুখখানা কেমন করুণ হয়ে গেল।

ভানু দত্ত রায় ধমকে বললেন, এই রাখাল, শুয়র কোথাকার।

রাখাল পত্রিকার একটা হাসির গল্পের পৃষ্ঠার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরো জোরে হেসে উঠল।

ভানু দত্ত রায় বলল, অত হাসবার কি আছে!

রাখাল পত্রিকাটি ভানু দত্ত রায়ের সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, এটা পড়ুন, কি চমৎকার হাসিয়েছে মাইরি।

ভানু দত্ত রায় ভাল করে না পড়েই জোরে হেসে উঠলেন। নিবারণ রাখালের পড়েও অত হাসবার কিছু পেল না, তবু হেসে উঠল। অনেকেই ঝুঁকে পড়ল এবং কারণে কিংবা অকারণে হেসে উঠল।

রতন বারবার পড়ল কিন্তু তার হাসি পেল না, বোকা দৃষ্টি নিয়ে সে এদের-ওদের দিকে তাকাতে লাগল।

যেভাবে রাখাল হাসতে শুরু করেছিল এবং দু-একজন উস্কানি দিচ্ছিল তাতে সব ফাঁস হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল। কিন্তু সময়মত কেতন এসে পড়ায় প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়।

রতন খাওয়াবার জন্য তৈরীই ছিল। আর একবার সাধলেই রাজী হয়ে গেল। দু ভাইয়ে পরামর্শ করে বিনা পীড়াপীড়িতেই পাঁচ টাকা দিয়ে দিল।

সভাপতি এবং প্রধান কার্যাধ্যক্ষ রতন ও কেতনের অনুরোধ সত্ত্বেও খাওয়াতে রাজী হল না। কিন্তু সকলে মিলে বিশেষ সমারোহে সহকারী কার্যাধ্যক্ষের পকেট খালি করে মিষ্টি খেল।

খাওয়ার পর আড্ডা মেরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলুম না, জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারটা কি বলুন ত? দু' ভাইকে নিয়ে ত' সবাই মিলে খুব হাসাহাসি করলেন, বোকা বানিয়ে মিষ্টিও খেলেন।

নিবারণ বলল, আমি আর নিজের মুখে কইতাম না, কেতইন্যাই কউক!

সকলেই উচ্চগ্রামে হেসে উঠল।

আমি ভানু দত্ত রায়কে জিজ্ঞেস করলুম, আপনিই বলুন, না বুঝে আর কত হাসা যায়, জেনে নয় তিনবারের হাসিটা হেসে নিই।

ভানু দত্ত রায় বললেন, কাল আমাদের ফুটবল দলের নির্বাচন ছিল। নির্বাচনের পর খাওয়াদাওয়া সারতে সারতে প্রায় একটা বেজে যায়। কাল অবশ্য ক্লাবের পয়সাতেই খাওয়া হয়েছিল। রতন ও কেতন

দু' ভাই রান্নার ভার নিয়েছিল। ওদের চেনেন ত?

আমি বললুম, খুব ভাল করেই চিনেছি।

ভানু দত্ত রায় বললেন, রাত একটার পর রতন ও কেতন বাড়ি ফিরেই জেঠামশায়ের ঘরের সামনে গিয়ে হাজির। রতন সহকারী কার্যাধ্যক্ষ হওয়ায় দু' ভাই-ই ভারি খুশী। আনন্দের চোটে সবুর সইছিল না। রতন গিয়েই জেঠামশাইকে ডাকতে লাগল।

কাঁচা ঘুম সহজে ভাঙগবার নয়। রতন দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে মারতে ডাকল, ও জেঠামশাই, ও জেঠামশাই—জেঠীমা!

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর জেঠামশাইয়ের ঘুম ভেঙেগ গেল, তিনি প্রশ্ন করলেন, কে?

রতন উত্তর করল, আমি জেঠামশাই।

আমি কে. রতন, না কেতন?

আমি রতন।

কেন রে, অত রাতে ডাকস ক্যান?

বলতাছি, উঠ্যা পড়ুন।

দরজায় ঠেলাঠেলি ও চেঁচামেচিতে জেঠা-মহাশয় উঠে এসে দরজা খুলে চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন এবং তার পশ্চাতে জেঠীমাও এসে দাঁড়ালেন।

জেঠামহাশয়ের আর প্রশ্ন করবার অবসর হল না, রতন কোন ভূমিকা না করেই গদগদ চিত্তে চট করে জেঠামশাইকে প্রণাম করেই বিদ্যুৎবেগে জেঠামশাইয়ের দেহটা প্রায় একটু ঠেলে দিয়ে নিজের দেহের উর্ধ্বভাগটা জেঠামশাইয়ের পশ্চাতে এগিয়ে দিয়ে জেঠাইমার পায়ে কোনভাবে বুড়ী ছোঁয়ার মত হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে হাসি হাসি মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

জেঠামশাই ত' অবাক, বললেন, কি রে রতন, প্রণাম করছিস কেন?

জেঠাইমাও রতনের চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে রতন, অত রাতে প্রণাম করছিস কেন? ভোরের গাড়িতে কোথায়ও যাবি নাকি?

রতন তবু কোন কথা বলল না।

জেঠামশাই তখন কেতনকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি রে কেতন? হয়েছে কি? রতন ত' কোন কথাই বলছে না। আরে, তোর আবার হল কি? তুইও যে ভোঁতা মেরে গেলি।

কেতন তবু উত্তর করল না। বিজয় ঘোষণাটা দাদার মুখ দিয়ে বলাবার জন্য হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইল আর পিট-পিট করে দাদার দিকে তাকাতে লাগল।

রতন বিজয়ীর মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, মুখে তাঁর জয়ের চাপা হাসি।

গোলমাল শুনে রতনের বাবা ও মা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। রতন তাড়া-তাড়ি বাবা ও মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করল।

রতনের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, দুপুর রাতে অত ঘটা করে প্রণাম করছিস কেন? কথা কইছিসনে কেন—কি হয়েছে?

সম্মান মারছেন

রতন আনন্দের আতিশয্যে আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারছে না। মা-জেঠীমাদের পীড়াপীড়িতে ও বাপের ধমকে কোনভাবে বলল, আমি আর নিজের মুখে কইতাম না —কেতইন্যাই কউক।

জেঠামহাশয় প্রশ্ন করলেন, কি রে কেতন, রতনের কি হয়েছে?

কেতন খুক্ খুক্ করে হেসে বলল, না, দাদাই কউক।

রতন বলল, না, নিজের মুখে ভাল দেখায় না, তুইই ক'!

কেতন বলল, দাদা ত' হইয়া গেছুন।

জেঠামহাশয় প্রশ্ন করলেন, কি হইয়া গেছুন রে কেতন?

কেতন চুপ করে রইল দেখে জেঠামহাশয় পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কি রে রতন, তুই কি হয়েছিস?

রতন সলজ্জভাবে বলল, নিজের কথা আর নিজের মুখে কেমনে কই। কেতইন্যাই কউক।

কেতন যে মুহূর্তে 'দাদা ত' হইয়া গেছুন' বলে শুরু করল তখন তার বাবা ভীষণ চটে উঠলেন। কেতনকে ধমকে দিয়ে বললেন, ফের হইয়া গেছুন! সোজা করে বল, ফের যদি হইয়া গেছুন বলছিস ত' মার খাবি।

কেতন বাপের ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল, দাদা ত' ফ্রেন্ডস ইলেভেন ক্লাবের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী হইছুন।

রতনের মা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। পুত্রের কৃতিত্বে খুশী হয়ে বললেন, তাই নাকি রে! বেতন কত রে রতন?

মায়ের অজ্ঞতায় রতন ভারি বেদনা বোধ করল, তাড়াতাড়ি নাকমুখ ফুলিয়ে বলল, বেতন না, সম্মান!

রতনের বাবা আর সহ্য করতে পারলেন না, রতনের চুলের ঝুঁটি ধরে খড়ম দিয়ে ঠাঁই ঠাঁই করে কয়েক ঘা দিয়ে বললেন, সম্মান! দুপুর রাতে সকলের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে সম্মান মারছেন। বেরহ হতভাগা কোথাকার।

আমরা সকলেই আবার হেসে উঠলুম।

অতিকায় শামুক

ফিলিপাইনের একটি দ্বীপের আট হাজার অধিবাসীকে অতিকায় শামুকের উৎপাতে সম্প্রতি অনাহারের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রত্যেকটার ওজন আধ পাউন্ড আর পাঁচ ইঞ্চি লম্বা খোলাযুক্ত এই শামুকবাহিনী শস্যের এমন ক্ষতি করে যে দ্বীপবাসীদের অনাহারে মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য গবর্নমেন্টকে বিমানের সাহায্যে খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হয়। এই অতিকায় শামুকদের কাছে যে কোন জায়গা তাদের অনুকূল অবস্থা মতো মনে হলে ওরা পঙ্গপালের মতো মারাত্মক উৎপাত হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই বন্দর কর্তৃপক্ষ কোন জাহাজে আশ্রয় নিয়ে এই শামুক যাতে এসে পৌঁছতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে Achatina fulica নামে পরিচিত এই অতিকায় শামুকের একটিই প্রতি তিন মাস অন্তর মটরের দানার আকারের তিনশটি ডিম পাড়ে। শামুক মাত্রই hermaphrodite—অর্থাৎ একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ বলে এদের কোন প্রজনন-সাথীর প্রয়োজন হয় না। বছর দুইয়ের মধ্যেই একটিমাত্র অতিকায় শামুকই এতোগুলির জনক-জননী হতে পারে যারা রাতারাতি

একটা বিরাট ক্ষেতকে একেবারে সাফ করে দিতে পারে।

এই অতিকায় শামুকের আদি জন্মস্থান হচ্ছে পূর্ব আফ্রিকা। যেখানে আমাদের দেশের গ্রামে ক্ষেতে বাগানে যেমন সাধারণ শামুক দেখা যায় তেমনিই ওখানে ওরা থাকে। তবে প্রাকৃতিক শত্রু সেখানে ওদের সংখ্যা কম করে রেখেছে।

পূর্ব আফ্রিকার সেই শামুক বিদেশে গেলে সাংঘাতিক উৎপাত হয়ে দাঁড়ায়। আশী হাজার শক্ত দাঁতের সাহায্যে ওরা অদ্ভুত খাদ্যে নিজেদের অভ্যস্ত করে নেয়। আর খুব শক্ত দেহ বলে দীর্ঘপথ যাত্রা সহ্য করতে পারে। একদা এরা ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে সিংহল, ভারত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে পরিব্যাপ্ত হয়। এখন ওদের আদি জন্মভূমি থেকে দশ হাজার মাইল দূরে দেখতে পাওয়া যায়। কতক দেশে ফলের ঝুড়ির সংগে ওরা পৌঁছে গিয়েছে।

হাওয়াই দ্বীপে প্রথম দেখা যাবার পর দু হাজার মাইল দূরে ক্যালিফোর্ণিয়ায় ওদের একটি উপনিবেশ পাওয়া যায়। মনে হয় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সামরিক যানবাহণগুলির চাকায় আশ্রয় নিয়েই ওরা আমেরিকায় প্রবেশ করে।

অত্যন্ত কড়া ওদের জান। মালয়ে একবার উচ্ছেদ করার অভিযানে লক্ষ লক্ষ অতিকায় শামুক ধরে নৌকা ভর্তি করে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসা হয়। কদিন পরই দেখা গেল ওরা শুকনো ডাঙায় এসে উপস্থিত হয়েছে—জীবন্ত এবং কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায়। ওদের বিনাশের অনেক রকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু সব ব্যবস্থাতেই অসুবিধে আছে।

সেকিলিস দ্বীপে এই অতিকায় শামুকের বিনাশ চেষ্টায় ক্ষুদ্রাকার শামুক আমদানী করা হয় যারা অতিকায় শামুকদের ডিম খেয়ে ফেলে। এই পদ্ধতিতে মুশকিল হচ্ছে অতিকায় শামুকরা একেবারে নিবংশ হয়ে গেলে তখন ক্ষুদ্র শামুকগুলিই একটা উৎপাত হয়ে দাঁড়াবে।

বিষ স্প্রে করে দেওয়ার বিপদ হচ্ছে তাতে ফলের জল এবং শস্যও বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আর বিষাক্ত টোপ ফেলে ফেলে যাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে এই শামুকরা এতো

দীর্ঘ ও প্রশস্ত স্থান জুড়ে ঘোরাফেরা করে যে ঐ উপায়টি কার্যকর করে তোলা অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার।

বিষ হিসেবে ব্যবহৃত একটা "টোপ" হচ্ছে চুণের থলি। সিংহলে, যেখানকার মাটিতে স্বাভাবিক চুণের অভাব, সেখানে ঐ শামুক-দের কলি ফেরানোর চুণের প্রতি রুচি আবিস্কৃত হয়।

কিছুদিন পর দেখা যায় শামুকরা বাড়ির দেওয়ালের কলির চুণ খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে।

সাদা কয়লা

প্রাচীন ভারতে নাকি দুধ আর মধুর বন্যা বয়ে যেতো। বেশীদিন পূর্বের কথা নয়, আধুনিক ভারতেও আমাদের দেশের উত্তরাংশে দুধ বিক্রি করাকে পাপ বলে মনে করা হ'ত। কেউ দুধ চাইলে তাকে বিনা-মূল্যেই দুধ দেওয়া হ'ত। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও ঘি মাখন আমাদের দেশে প্রধান খাদ্য ছিলো। কিন্তু বর্তমানে খাঁটি দুধ ও দুগ্ধজাত জিনিস বেশীর ভাগ ভারতীয়ের পক্ষে শৌখিন আহারে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন বিশুদ্ধতা এবং আধুনিক যুগ কি একসঙ্গে চলতে পারে না? তা পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে পশ্চিম জার্মানীর অতি-আধুনিক মাখন উৎপাদন কারখানার কথা বলা যেতে পারে।

মোচার আকারের দুটি বিরাট যন্ত্রে অন্ততপক্ষে আড়াই হাজার গ্যালন ক্রীম দিয়ে দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রসাল হলদে মাখন টিউবের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। এর পরের পদ্ধতিগুলিও স্বয়ংক্রিয়। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় উপায়ে মাখন কাটা হয়ে, কাগজের মোড়কে প্যাক হয়ে একেবারে বাক্সে গিয়ে পড়ে। এই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে একবার মাত্র মানুষের হাত পড়ে তা হলো, এক-একটা কাগজের বাক্সে ২২ পাউন্ড মাখন যখন জমা হয়, তখন সেগুলি ঠেলাগাড়িতে করে ঠান্ডাঘরে রেখে আসতে হয়। ইয়োরোপের সমস্ত মাখন উৎপাদন কারখানাতেই এই পদ্ধতিতে কাজ হয়, তবে সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীতেই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ-ভাবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ডেয়ারী শিল্পেও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু হয়েছে। এই আশ্চর্য কারখানাটি শ্লেজউইগ-হলস্টাইনে অবস্থিত।

সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর উত্তর অংশে অবস্থিত শ্লেজউইগ-হলস্টাইন রাজ্যের যে ৫০০০ কৃষক ৪৩টি ডেয়ারীতে তাদের দুধ সরবরাহ করতো, সেই ডেয়ারীগুলি দশ বছরের জন্য মাখন উৎপাদন বন্ধ রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এবং কৃষকগণ তাদের গরুর দুধ শ্লেজউইগ শহরে অবস্থিত এই নতুন কারখানাটিতে সরবরাহ করতে স্বীকৃত হওয়ায় এটি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এই কারখানাটি নির্মাণ করতে অন্ততপক্ষে ৫০ লক্ষ ডয়েটস মার্ক ব্যয় হয়েছে এবং কয়েকটি কৃষি সমবায়ের যুক্ত উদ্যমে এটি নির্মিত হয়েছে। প্রতি বছর এখান থেকে ৫০০০ টন মাখন হামবুর্গে সরবরাহ করা হবে। শ্লেজউইগ-হলস্টাইনে দুধকে বলা হয় সাদা কয়লা। পূর্বে এই অঞ্চলে কোন শিল্প ছিলো না বলে অঞ্চলটি ছিলো দরিদ্র। বর্তমানে এখানকার প্রধান পণ্য দুধের জন্য এক নতুন সরবরাহ ও বণ্টন-ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

প্রাচীন ধরনের ডেয়ারী সমবায়গুলি একটা প্রধান সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, তা হল, দুধের পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা ঠিক থাকতো না। কিন্তু বর্তমানের যান্ত্রিক পদ্ধতি ও বাজার উভয়েই চায় অব্যাহত সরবরাহ ও বিশুদ্ধতা। নতুন এই মাখনের কারখানায় অতিরিক্ত দুধ ঠান্ডা গুদামে রেখে দেওয়া হয় এবং অন্ততপক্ষে ৭০০ টন দুধ এইরকমভাবে মজুদ

পশ্চিম জার্মানীর বনের নিকটবর্তী মার্কেন গ্রামের স্কুলের এগারোটি ছাত্র অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জাম ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠেছে। ওদেশে একমাত্র ছোটদের এই ফায়ার ব্রিগেড বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে তাদের অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা দেখিয়েছে। এই এগারজন ছাত্রের পিতারা সকলেই দক্ষ ফায়ার ব্রিগেড কর্মী। আগুন লাগার সংকেত ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপণকারীরা টুপি ও ইউনিফর্ম পরতে গেলেই তাদের ছেলেরা সঙ্গে যাবার বায়না ধরতো। তাই পিতারা ছেলেদেরও আগুন নিভানোর কাজ শেখানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ছেলেদের আগুন নিভানোর কায়দাকানুন শেখানোর ভারপ্রাপ্ত অফিসার হচ্ছে বারো বৎসর বয়স্ক যোশেফ কিরসাংজ। কর্তৃ-পক্ষের কাছ থেকে ছোটদের এই দলটি সম্ভাব্য সকল রকম সাহায্য পায়। যেমন বাদ গ্যাডেসবের্গ শহরের পক্ষ থেকে ওদের এই আনকোরা নতুন অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামটি উপহার দেওয়া হয়েছে
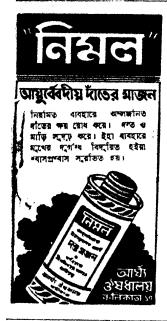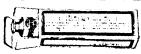
রাখা যায়। কাজেই গ্রীষ্মকালে যখন দুধের সরবরাহ বেশী থাকে, তখন তা হিমাঙ্কের ২০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড নীচে মজুদ করে রেখে, শীতকালে যখন সরবরাহ কমে যায় তখন তা ব্যবহার করা যাবে। গ্রীষ্মকালের বেশী চর্বিযুক্ত মাখনের সংগে, শীতের অল্প চর্বিযুক্ত মাখন মিশিয়ে সমগ্র বছর-ব্যাপি মাখনের গুণ বজায় রাখা সম্ভব হবে। ১২০০ গ্যালন ক্রীম থেকে মাখন তৈরী করার এই পদ্ধতিতে এসিড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন উপায় অবলম্বন করা হবে। মাখন তৈরী করার সময় যে অপচয় হয়, এসিড নিয়ন্ত্রণে ভুলের জন্যই অর্ধেকের বেশী অপচয় হয়। কারণ সমস্ত মাখনেই বাটিরিক এসিড বা বাটার এসিড থাকে।

ডেয়ারী শিল্পকে সংহত করার পথে স্লেজউইগ হলস্টেইনে প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংক্রিয় মাখন উৎপাদন কারখানাটি প্রথম পর্যায় মাত্র। আগামী বছরে আরও মাখন ও মাংস কারখানা স্থাপন করা হবে। এই সব কারখানা প্রমাণ করে যে, স্লেজউইগ হলস্টেইনের মতো পল্লী অঞ্চলও শিল্প প্রতিষ্ঠা করে, কৃষিতে শিল্প পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেখানকার জনগণের সম্পদ বৃদ্ধি করছে। দুধকে সাদা কয়লায় পরিণত করার জন্য কৃষিতে শিল্পপদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কৃষকদের কুটিরে আধুনিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

বুলগেরিয়ার গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ফলে সেখানে আজকাল মোমবাতির ব্যবহার প্রায় উঠেই গিয়েছে। আর কেরোসিনের বাতিরও ব্যবহার সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে এক জায়গায় মাত্র দশ-বারোটি গৃহ, কেবলমাত্র সেই সকল স্থানেই সীমাবদ্ধ।

গত এক বছরেই বুলগেরিয়ার দুশ পাঁচটি গ্রামকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছে। ফলে সমগ্র দেশের জন-বসতিপূর্ণ এলাকাগুলির বারো আনা ভাগ, অর্থাৎ সর্বসমেত চার হাজার তিনশটি গ্রাম ও শহর বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করছে।

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ার সংগে বেতার যন্ত্র এবং গৃহিণীদের শ্রমলাঘবের বহুবিধ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রচলন হয়েছে কৃষকদের ঘরে ঘরে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৪ সালের আগে বুলগেরিয়ার কিঞ্চিদোর্ধ মাত্র এক হাজার গ্রাম ও শহরে কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬১ সালের শেষ পর্যন্ত কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থাযুক্ত গ্রাম ও শহরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু হাজার সাড়ে চারশো। গ্রামের পথগুলির শোভা বর্ধনের জন্য রাস্তা বাঁধিয়ে দুধারে গাছ রোপণ করার কাজও অগ্রসর হয়েছে।

পাকস্থলীর অবস্থা জানতে ক্ষুদ্র বেতার-যন্ত্র

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসসি কলেজ অফ মেডিসিনের চিকিৎসাবিদরা এখন একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্যাপসুল বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন যেটি গিলে ফেলার পর পাকস্থলীতে সঞ্চিত অম্লরস জমা হওয়া সম্পর্কে খবরাখবর দিতে পারে।

অম্লরসে স্পর্শাতুর একটি ইলেকট্রোড এই ক্যাপসুলে রেডিওর সংগে যুক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঐ ইলেকট্রোডে প্রতিক্রিয়া দেখে অম্লরসের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

টেনেসসির চিকিৎসকদের বিবরণ অনুসারে "এই সংকেতটি প্রায় এক মিলিওয়াট শক্তিতে ৯·৬ মেগাসাইকেলে বিচ্ছুরিত হয়। সংকেত প্রেরণের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয় তার কোমরে বেল্টের মতো একটি বৃত্তাকার এরিয়াল পরিয়ে দেওয়া হয়। সেই এরিয়াল থেকে তিন ফিট দূরে উপযুক্ত গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে সংকেতটি ধরা হয়।"

এখন অবশ্য যন্ত্রটি যে অবস্থায় রয়েছে তাতে ওটি আরো ছোট হওয়া দরকার। তবে অনুশীলনকারীরা বলেন যে, মূল নীতিটি যে সঠিক সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। পাকস্থলীতে মাত্রাধিক্য অম্লরসের সঞ্চার পরীক্ষা করার উন্নততর ব্যবস্থা হিসেবে এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন হয় এবং সেই সংগে অম্লজনিত ক্ষত ও পাকস্থলীর ক্যানসারের সম্পর্কও নিরূপিত হতে পারবে।

(সি ৬২২)

রবীন্দ্রচর্চা

আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ। সংকলক ঃ প্রফুল্লচন্দ্র দাস। মনমোহন বুক শপ, ১২৩।১এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্য ৩·৭৫ নঃ পঃ।

বাংলা দেশের একটি স্মরণীয় শতাব্দী সম্পূর্ণ হল। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ কেবলমাত্র বাংলা দেশেই নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছেই পূত স্মরণীয় তিথি বিশেষ। বাংলা দেশে জাতীয় উৎসবের আয়োজন হয়েছে। আন্তর্জাতিক উৎসবের বিবরণও আমরা চতুর্দিক থেকে না পেয়েছি তা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানবতার সঙ্গে, অখণ্ডভাবে বিশ্ববাসীর সঙ্গে তাঁর কি নিগূঢ় আত্মীয়তা ছিল, তাঁর রচনার কি রকম সংযোগ ঘটেছিল আমরা অনেকেই স্পষ্টত তা জানি না। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলা যে অতিরঞ্জিত সম্বোধন মাত্র নয়, তার পিছনে যে বহু দেশের শ্রদ্ধাবনত অভিবাদন রয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য।

আলোচ্য সংকলনগ্রন্থটি এ-বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট আলোকপাত করবে। বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা নরনারী তাঁদের আবেগদীপ্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন জন্ম-শতবর্ষপূর্তি মহোৎসব উপলক্ষে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান সত্ত্বেও হৃদয়ে-হৃদয়ে আমরা একই মানবাত্মা—সে কথা নতুন করে এই শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল। নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, বুলগেরিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, ভিয়েৎনাম, চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। সেই দেশের বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট চিন্তানায়কেরা তাঁদের জীবনস্মৃতির এক-একটি স্মরণীয় কণিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন।

অ্যান্টিসেলিয়াস, জন্ যোহেনবার্গ, পার্ল বাক, হ্যালডর ল্যাক্সনেস, ডাঃ টিওডর হেস, ডাঃ এন্ডার্স অস্টারলিং, ইয়ান পারান্দভস্কি গুন্নার গুন্নারসন, ইয়াগর কোরেৎস্কি, এদ্মঁ কারী, ইয়োলান্দা বেদ্রেগাল, ডাঃ অ্যালান্ প্রাইস, ডাঃ গ্যাথিয়েলো দান উদেনেমেস, ডাঃ কারেল্ জয়েস্কার, হালডর্ বোয়ার, শ্রীহুমায়ুন কবির প্রভৃতি লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। রচনাগুলি অনুবাদে সহায়তা করেছেন পুলিনবিহারী সেন প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের চিঠির পাণ্ডুলিপি, চিত্র এবং অধিকাংশ লেখকের ফটোগ্রাফ এবং লেখক-পরিচিতি এই সংকলনটিকে অধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছে। **২৭।৬২**

কবিতা

ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল—সুনীলকুমার নন্দী। কোয়ার্টেট। ১৮।৪ সি, ফার্ন রোড। কলকাতা-১৯। দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

স্নিগ্ধ ভাবনায় উদাস হবার মত কবিতা সচরাচর চোখে পড়ে না। শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার নন্দীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল' কবিত্বের নির্মল, নিখাদ সৌন্দর্যে সেই খেদ কিছুটা অপসারিত করবে। দুই প্রস্থে বইয়ের সমস্ত কবিতাগুলি আবদ্ধ। প্রথম অলিন্দে তাঁর পরবর্তী কাব্যচর্চার নজির বর্তমান এবং দ্বিতীয় অলিন্দে অর্থাৎ ৩৫ পৃঃ থেকে তাঁর পূর্ববর্তী বয়সের ফসলের সুচারু ভাণ্ডার।

সমগ্র কাব্য-পুঁথিটি পাঠ করে এই প্রতীতি জন্মালো যে, কবি নির্জনতা-বিলাসী। শুধুই চিত্রলতায় তাঁর অনুরাগ অবিমিশ্র নয়, ভাবের গভীরতা খননেও তিনি সোৎসাহী, যে রূপ লোভেই তিনি কাব্যের বেণী-বিন্যাস করুন না কেন, নিপুণ মনস্কতায় তিনি শব্দের কুসুম বাছাই করেন, তার দ্যুতির প্রতি তিনি জহুরীর অভিজ্ঞতা নিয়ে দৃষ্টিপাত করেন।

বর্তমান বাংলা কবিতার উচ্চকিত কলরোল, ক্ষিপ্ত দস্যুতা, প্রচণ্ড পৌরুষের সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতার প্রভেদ প্রচুর—তাঁর মেজাজ শান্ত, চিন্তা স্নিগ্ধ, ইচ্ছা বড় প্রিয়; আপন বৃত্তে তিনি মৌন, বহুরূপী কাচের ভিতর দিয়ে তিনি বিচ্ছুরণ ঘটান, কিন্তু দ্যুতি, সৌধ, শৈল চুরমারে তাঁর দৃঢ় অনাসক্তি। এইজন্য ঘুমের শান্ততায় বিশ্রামের নির্জনে যখন চিত্ত হবে অবসিত অর্ধশায়িত, তখন যে শীতল উচ্চারণে মন পিপাসু হবে—তার প্রতি হাওয়ায় ধ্বনিবলয় নিক্ষেপ করে হয়তো বলা যায়—

বেদনাবিদ্ধ করুণ-মধুর সুরে সুরে
তবু সেঁধেছি যে-গান
তাকেও ছিনিয়ে নিয়ে যায় খুঁজি
চাপা সন্ধ্যার কালো কুন্তল।

**সারা মন ছেয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়।
চোখ ছিঁড়ে নামে ক্লান্তির ঘুম।**

বইয়ের মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর।

৬৯৫।৬১

সাহিত্যালোচনা

বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ—আশা দেবী। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। আট টাকা।

আমাদের সাহিত্যে শিশু-সাহিত্যের তুল্য উপেক্ষিত আর-কিছুই নেই। শিশুদের জন্য রচনা, তুলনামূলকভাবে, এ-দেশে অনেক কম; এবং এই গ্রন্থটির পূর্বে কোনো আলোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। হ'য়ে থাকলেও তা অনুল্লেখ্য। সেদিক থেকে শ্রীযুক্তা আশা দেবী পথিকৃতের সম্মান ও ধন্যবাদ অর্জন করলেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি আলোচনার বহুমুখী সম্ভারে পুষ্ট, আমাদের অজানা ছিল এমন অনেক সাহিত্যসম্পৃক্ত ঘটনাবলীর পুনরুদ্ধারে চমৎকৃত হবার মতো। অবশ্য, এটি তাঁর 'থিসিস' গ্রন্থ; এবং এই জাতীয় বইয়ে সচরাচর যা ঘটে থাকে—বিপুল ও বিচিত্র তথ্যের সমাবেশ—এখানেও তার অভাব নেই। তুলনায় সরসতা কম।

লেখিকা মূলত তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা স্থির রেখেছেন। বিষয় এখানে সময়-নির্ভর। প্রথম পর্ব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সূত্রপাত থেকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সময় পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও সমকালীন অন্যান্য বিষয়। অবশ্য এই সময় পর্যন্ত, যাকে সত্যিকারের শিশুদের জন্য রচনা বলে, সে-রকম কিছুই লেখা হয়নি। সহজ ও সরল ক'রে যা-কিছু লেখা হ'তো, তাই শিশু, নারী ও অল্পশিক্ষিতের পাঠযোগ্য ব'লে গণ্য হ'ত। তৃতীয় পর্বটি সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৪-তে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের হাতে-খড়ি এইখানে। পরবর্তী সাহিত্য সম্পর্কে সকলেই কমবেশি অবগত আছেন।

আশা দেবীর গ্রন্থটি সময়োচিত ও সুন্দর। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কিনা, সে-বিষয়ে কিছু সন্দেহ থেকে যায়। বিশ শতক শিশু-সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। এই সময়কালের সাহিত্য বর্তমান গ্রন্থে প্রায় অনালোচিত। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে দৃষ্টি দিলে পাঠক উপকৃত হবেন।

৩৬।৬২

মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা—বাণী রায়। গ্রন্থম্, ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। সাত টাকা।

মধুসূদন বাঙলার প্রথম বিপ্লবী কবি; অচলায়তন সাহিত্যজগতের প্রথম বিদ্রো[illegible] প্রাচীন সাহিত্যকে আধুনিকতায় দী[illegible] করেছেন তিনি; বলতে গেলে [illegible] আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আদিপ[illegible] তাঁর জীবিতকালে বাঙলা দেশ তাঁকে ব[illegible] পারেনি। সত্যি বলতে, সাহিত্যের তৎক[illegible] আবহাওয়ায় একজন কবি ও কবিমা[illegible] হৃদয়ঙ্গম করা সহজ বিষয় ছিল না। [illegible] তাঁরও মনে আক্ষেপ ছিল। রাজনা[illegible] বসুকে এক পত্রে তিনি লিখেছি[illegible] These men little understand [illegible] heart of a proud, silent, lonely [illegible] of song:
সে যাই হোক, পরবর্তীকালে, একে[illegible] সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত মধুসূদনের জ[illegible] ও সাহিত্যের ব্যাখ্যাতার অভাব ঘটে[illegible] শ্রীমতী বাণী রায়ের বর্তমান গ্রন্থটি [illegible] নতুন সংযোজনই নয়, বিশ্লেষণে নব[illegible] গুণে মধুসূদনের অন্যান্য সমালোচনা [illegible] অপেক্ষা স্বতন্ত্র, স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম প[illegible] মধুসূদনের জীবন এবং দ্বিতীয় পর্বে [illegible] সাহিত্যসৃষ্টির উৎস ও অনুপ্রে[illegible] সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়ে[illegible] মধুসূদন নিজে 'আত্মচরিত' রচনা ক[illegible] যাননি; তাঁর রচনা ও বিক্ষিপ্ত পত্রাব[illegible] এবং বন্ধু-স্বজনদের বিবরণ থেকে তাঁ[illegible] জেনে নিতে হয়। শ্রীমতী রায় পূর্বসূরীদে[illegible] সাহায্য নিয়ে তাঁর জন্ম, মৃত্যু, [illegible] বিদ্রোহ, বিপ্লব, স্বাদেশিকতা, [illegible] দাম্পত্যজীবন ও প্রেম এবং ধর্ম সম্বন্ধে [illegible] সুন্দর আলোচনা করেছেন, তা ভূয়[illegible] প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য এর দ্বিতীয় পর্বটি[illegible] মধুসূদনের কাব্যের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণ[illegible] করতে গিয়ে তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী[illegible] বিদেশী কবিদের কাব্যে যে-ভাবে লেখিক[illegible] মধুসূদনের প্রেরণার উৎস সন্ধান করেছেন[illegible] তা তাঁর উজ্জ্বল মননশক্তি বিদ্যা [illegible] নিষ্ঠার প্রমাণ। বলা বাহুল্য, এই আলো[illegible] চনায় প্রায়ই তিনি মৌলিকতার পরিচ[illegible] দিয়েছেন। শোভন মুদ্রণে প্রকাশি[illegible] বর্তমান গ্রন্থটি মধুসূদন বিষয়ক শ্রে[illegible] গ্রন্থ কিনা জানি না। কিন্তু মধুসূদনের[illegible] জীবন ও সাহিত্য পর্যালোচনায় এটি [illegible] অবশ্যপাঠ্য, সে-কথা স্বীকার করি।

১৮।৬২

স্মৃতিচিত্র

বিপুল সুদূর—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাঙলা গল্প-উপন্যাস পাঠকের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থটি গল্প বা উপন্যাস নয়, জীবনকথা বা স্মৃতিকাহিনীর কয়েকটি কাহিনী। অনেক সময় ছোট গল্পের

মতই আকস্মিক এবং নাটকীয়। অনেকগুলি স্মরণীয় চরিত্রের সান্নিধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকার ও বিস্ময়কর আবিষ্কার এই স্মৃতিপঞ্জিকায় ধরা আছে।

কয়েকটি বিলাতের পটভূমিতে এবং বাকিগুলি এ-দেশের। এই দেশী-বিদেশী মিছিলের মধ্যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি তুলে ধরেছেন। নিকটে এসে সুদূরের স্পর্শ পেয়েছেন তিনি, মানুষের মধ্যে অতিমানবের কোন কোন গুণ, চরিত্রের কোন কোন প্রোজ্জ্বল দিক তাঁর নজরে পড়েছে।

শ্রী কৃষ্ণমেনন, বার্নার্ড শ থেকে শুরু ক'রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ পর্যন্ত তাঁর প্রদর্শনীয় চরিত্র। নকশাগুলি সুলিখিত। আন্তরিক মুগ্ধতা এবং বিস্ময় অকপটে প্রকাশিত হয়েছে। সেই কারণে রচনাগুলি উপভোগ্যও হয়েছে। কিন্তু লেখক উচ্ছ্বাসপ্রবণতা আর একটু সংযত করলে চিত্রগুলি আরও গভীর এবং মর্মস্পর্শী হত।

৩৭।৬২

ছোট গল্প

স্বপ্নমারীচ—শ্রীবিভূদান রায়চৌধুরী। নবভারতী, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা—৯। দাম—আড়াই টাকা।

মোট আটটি গল্পের সংকলন। লেখক জীবনের গভীরে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করেছেন। ব্যর্থ জীবনের রূপায়নে তার সেই চেষ্টা অধিকতর অব্যর্থ। 'স্বপ্নমারীচ' গল্পে রীণা রায়, দেবদত্ত ও মিঃ সুব্রত সরকার প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত শহুরে জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার দ্বারা লেখক মনোবেদনাগুলিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'নীল নীল খাম', সমাধান' প্রভৃতি গল্পে যেমন হাল্কা প্রেমের কাহিনী, তেমনি 'শাশ্বতী' গল্পে সমাজের এক নীচুতলার কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। মূর্খ অথচ সম্পদশালী প্রেমান্ধ শ্যামলালের চরিত্রে অতিকথনের প্রাবল্য ও যুগোচিত ভাবনার অভাব অনুভূত হয়। মনোরমা সহজাত প্রেমমাধুর্যে সার্থক চরিত্র। "চিত্রশিল্পী উজ্জ্বল সেন" গল্পটি সর্বোৎকৃষ্ট মনে হয়। মুদ্রণ প্রমাদের আধিক্য বারবার রসাভাবের সৃষ্টি করে।

৬২২।৬১

সমসাময়িক চিত্র

নয়নী ও রাজনীতি—জ্বালা খাঁ বিরচিত। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

"নয়নী ও রাজনীতি" বইখানি পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে ভেবেছি জ্বালা খাঁ ছদ্মনামের অন্তরালে লেখক যেই হোক না কেন, বাংলার পাঠকসমাজে এ বই হয়তো কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

জ্বালা খাঁ হয়ত কোনও ব্যক্তি নন, মাত্র একটি নাম—একটি জাতির নাম—রাজনীতির ফাটকা বাজারে বিভ্রান্ত, সর্বস্বান্ত যাদের অন্তরে হতাশা, বেদনা, ক্ষোভ, লজ্জা, আক্রোশ, অপমান মিলে মিশে একাকার হয়ে এক অসহনীয় জ্বালা হয়ে জ্বলছে—। প্রত্যেক বাঙালী আজ জ্বালা খাঁ। তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে লেখক সমসাময়িক ঘটনাবলীর একটা ফটোস্টাট লিপিচিত্র তুলে রেখেছেন এই গল্পের মত সত্য কাহিনীতে। লেখকের পরিতাপ যে আমরা, আজকের যুগের বাঙালীরা, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য "রেখে যেতে অক্ষম হলুম কোনো উচ্চ আদর্শ ও পার্থিব সম্পদ। সরকার লিখিত ইতিহাসে তারা যখন পড়বে যে, তাদের পিতৃপুরুষগণ অক্ষম, অলস, অকর্মণ্য ছিলেন তখন নিশ্চয়ই লজ্জায় ও অপমানে তাদের মাথা হবে নত আর আমাদের করবে ঘৃণা।" মানুষের দুর্ভাগ্য যে, সর্বকালে সর্বদেশে ইতিহাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তির ইচ্ছার ইঙ্গিতে লিখিত হয়, আর সেই লেখাই ভবিষ্যতের অনাগত মানুষকে সত্য বলে জানতে হয়, মানতে হয়। তাই এ যুগের বাঙালী জ্বালা খাঁকে এ যুগের বাঙালীর কাহিনী লিখতে হল, নয়নীর গল্প দিয়ে যার শুরু। ইতিহাসে যা লেখা হবে তা হবেই। কিন্তু কাহিনী হিসাবেও যদি আগামীকালের বাঙালী সন্তানেরা এই বই পড়ে, তা হলে তারা জানতে পারবে নয়নী কে, কি সে ছিল আর কি সে হয়েছিল; আর সেই সঙ্গে জানতে পারবে আজকের বাঙালী সমাজকে—কি তারা ছিল আর কি তারা হতে বাধ্য হয়েছিল, আর কেন বাধ্য হয়েছিল! বইখানির পাতায় পাতায় দেখতে পাই কলমের লৌহশলাকা হাতে জ্বালা খাঁ শ্মশানে নেমেছেন: যেখানেই খুঁচিয়ে দেখেছেন, ফুলকির পর ফুলকি আগুন উঠেছে কলমের মুখে। এ আর্তনাদ আজকের বাঙালী সমাজের। দেবকুলকে রক্ষাকল্পে দধীচি নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী করেছিলেন। বাঙালী নিজের অস্তিত্বের বিনিময়ে স্বাধীনতার আলো দেখিয়েছিল সারা ভারতকে। সেই আলোই আগুন হয়ে তাদের পুড়িয়ে মেরেছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে এইটাই চরম ট্রাজেডী। অনেক মানুষের, অনেক ঘটনার কথা লিখেছেন জ্বালা খাঁ, কিন্তু কারো কাছেই কোনো জবাবদিহি চাননি তিনি। জানতে চাননি বাঙালীর এমন দশা কেন হল? কেমন করে হল, সেইটেই তিনি শুধু দেখিয়েছেন।

১০৫।৬২

অলৌকিক অভিজ্ঞতা

ভৌতিক কাহিনী। শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। প্রকাশক: মীনাক্ষী রায় এম-এ—সাহিত্যসদন: এ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট—কলিঃ—১২। মূল্য ২.৫০।

গ্রন্থকারের নিবেদনে লেখক বলেন, তাঁরা

সকলে ও সুস্পষ্টভাবেই ভূত দেখেছেন এবং নানাভাবে ভূতের পরিচয়ও পেয়েছেন।' তাঁরা অর্থে বঙ্কিমবাবু রাজনারায়ণবাবু দীনবন্ধু হইতে ইদানীংকালের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-সজনীকান্ত দাস পর্যন্ত। সর্বসমেত ২২ জন বিভিন্ন লেখকের স্মৃতি এখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহাদের অভিজ্ঞতা পড়িলে বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না। অবশ্য এই সূত্রে আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারিব যে, ভূততত্ত্ব বা আপন অভিজ্ঞতার বর্ণন দুয়েকজন ছাড়া সকলেই প্রায় খবরের কাগজী লেখার ধরনে বলিয়া গিয়াছেন। এখানে, আর্টের বা দক্ষতার ভাষার পারদর্শিতার সিদ্ধি দেখাইবার প্রয়াস মাত্র করেন নাই।

ভূত আছে কি নাই এই প্রথম প্রশ্ন! ইহার যুক্তি আমি বা আমরা দেখিয়াছি। বিজ্ঞানের জগতেও ঠিক একই। লোক দেখে কোন নিয়ম দেখিতে পায় এবং পরে প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি লেখা পড়িলে মনে হয় যেন বা ইহা আমাদেরই অভিজ্ঞতা। গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় ইতিপূর্বেই পাঠকমহলে পরিচিত। তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এইগুলি সংকলন করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

৬৭।৬২

উপন্যাস

সীমান্ত—শ্রীশিশিরকুমার দাশ। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড; ১১এ, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাসটির এক কোটিতে আশা, অন্য কোটিতে নৈরাশ্য। নায়ক দীপক। সে চিরকুমার, ক্যান্সার রোগী। তার জীবনে দেখা যায় শুধু নৈরাশ্যের প্রতিফলন। তাই তার কাছে নিরানন্দময় এ-পৃথিবী। মৃত্যুই তার কাম্য। কিন্তু জীবন-সীমান্তে পেঁছে সে পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে চায়, বাঁচতে চায় নতুনভাবে। এইভাবে নায়ক চরিত্রটিতে একটি আকাঙ্ক্ষিত আবেগের দ্বারা আশা-নিরাশার সন্ধিস্থলে আশ্চর্য ঘাত-প্রতিঘাতময় আকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। অপর দুজন নৈরাশ্যবাদী—জ্যাস ও ডাঃ সেনের জীবন-দর্শন সামাজিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। চরিত্রচিত্রণে শ্রীদাশের দক্ষতা ঘটনাপ্রধান নয়, মনস্তত্ত্বমূলক। আবার, আশার আলোকে উজ্জ্বল যে সব চরিত্র,—যেমন অতসী, শান্তি, সুরমা, বিজয়া, শ্রীমন্ত, প্রশান্ত প্রভৃতি—উপন্যাসটিতে বিচরণ করছে, তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব ততোখানি প্রকট নয় বলেই তাদের মানসিক আলোড়ন বিক্ষুব্ধময় তরঙ্গ সৃষ্টি করেনি। উপন্যাসটির কাঠামোগত বিন্যাস-পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হওয়া অসম্ভব নয়।

৪১।৬২

রক্ত-বিলাপ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রাপ্তি-স্থানঃ ক্যালকাটা পাবলিশার্স; ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—২. টাকা।

উপন্যাসের উপাখ্যানটি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পটভূমিকায় রচিত। রাজা-রাজড়ার প্রতাপ বা শক্তিকে নয়, সাধারণ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মনের জটিল গ্রন্থির ভেতর থেকে প্রকাশ ক'রে সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শ্রীযুক্ত ধর। গল্পের নায়ক সামদেব; নায়িকা দুজন—ব্রাহ্মণকন্যা সেবাদাসী বিদিশা ও রাজকন্যা সুমিত্রা। তাদের মানসিক আলোড়নে, অবচেতন মনের প্রতিফলনে ঔপন্যাসিকের শক্তি অনস্বীকার্য। সহনায়ক জীবেন্দ্রের চরিত্রটি অতি সংক্ষিপ্ত, আরো একটু 'মেলে' ধরলে হৃদয়গ্রাহী হত। সংক্ষিপ্ত দ্রাণকের চরিত্রটি কোমলে-কঠোরে অনবদ্য মনে হয়। অধিকন্তু উপন্যাসটি সুখপাঠ্য।

৪২।৬২

ধর্ম ও দর্শন

'ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা' (সেন্ট লরেন্সের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার কতিপয় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক—শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ। প্রকাশক—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য—৮০ নয়া পয়সা।

"এক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে এক অতি বিচিত্র উপায়ে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বৎসর। ফ্রান্সের নিদারুণ শীতকাল। একটি স্খলিতপত্র বিশীর্ণ-কাণ্ড বৃক্ষ দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হয়, বসন্তের আবির্ভাব নব বিন্যাসের উপন্যাসে এটির কি অভাবনীয় পরিবর্তনই না শ্রীভগবান এনে দেবেন।"

এইভাবেই ঠাকুর যাকে বলতেন চৈতন্য পাওয়া; সাধু আদেশ লাভ করেন। এ-পুস্তক দেশীয় যান্ত্রিক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজকে শুধু নয়, আমাদের সকল হিন্দুকেও অপূর্ব নির্জনতা দান করিবে, সেখানে দাঁড়াইয়া কিছু না কিছু উপলব্ধি করিব এবং তাহার বলে আমাদের ব্যাকুলতা বাড়িবে।

সমস্ত সময়ই পুস্তকে তথা পত্রে [illegible] 'দাস' ভাব বর্তমান, অবশেষে "শ্রীভগবানের সাথে এক সঙ্গে থেকে দুঃখ পাওয়াও কি মধুর" (পৃ ৭৯) যদিও এই [illegible] ভাবায়তন সর্বরূপে খৃষ্টানমতি [illegible] তথাপি আমাদের সখ্যভাব বিচারে [illegible] করে।

৮৯।৬২

বিদ্র

প্রফুল্লকুমারের সাহিত্যকর্ম

বাঙলা সাহিত্যের এমন একটি যুগ গত হয়েছে, যার স্মৃতি কখনও কখনও আমাদের উদাস করে। সে-যুগের পূর্ণ চিত্র আজও সবিস্তারে লেখা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। হয়ত কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, সে-যুগের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সাহিত্যকে সমাজসেবার ও মানবহিত সাধনের অঙ্গ করে নেওয়া। এই সরল আদর্শপ্রধান ব্যাখ্যার সঙ্গে এ-কালে আমরা অনেকে একমত হতে না পারি, হয়ত বিবিধ তর্কে বিষয়টিকে জটিল করে তুলতে চাই, কিন্তু এ-সত্য অস্বীকার করা যায় না, বাঙলা সাহিত্যের একটি যুগ 'সমাজ হিতার্থে সাহিত্য' এই সূত্র অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করেছিল।

প্রফুল্লকুমার সরকার সেই যুগের এবং সেই মানসিকতার অংশীদার। প্রধানত, আদর্শবাদ; দ্বিতীয়ত কর্ম ও ন্যায়নীতির প্রতি আনুগত্য তাঁর সাহিত্য ধারণার লক্ষণীয় চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের সাধনা থেকে গৃহীত উপকরণে সে-কালের অনেক লেখকই সাহিত্যের এই আদর্শবাদকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রফুল্লকুমার তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু প্রফুল্লকুমার, হয়ত সাংবাদিক ছিলেন বলেই, হয়ত অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন বলেই, একটি সমালোচনার দৃষ্টি তাঁর সাহিত্য ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা চলে, রাজনীতি তাঁর একাধিক গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচার ও প্রয়োগ তাঁকে প্রলোভিত করেছে, এবং বিদ্রোহের মনোভাব তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "ভাণ্ডার", নবপর্যায়ের "বঙ্গদর্শন" ও "সাহিত্য" "নারায়ণ" প্রভৃতি পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক।

প্রফুল্লকুমারের উপন্যাস এ-কালের চপল-পাঠকদের পছন্দ হবে কি না আমার পক্ষে বলা মুশকিল। আমরা যারা অনেককাল আগে ইহা দেখেছি সেকারণ, "বালির বাঁধ" কিংবা "ভ্রষ্টলগ্ন" বা "অনাগত" উপন্যাসগুলি পড়েছি—তারা নিঃসন্দেহে তৃপ্ত হয়েছি। আমার মনে আছে এই রকম একটি বইয়ের পাতায় কোনো পাঠক আবেগবশত একটি লিখিত মন্তব্য করেছিলেন: "Here is the crowd whom I with freest heart offer to serve."

(এতকাল পরে সেই লেখাটি মনে পড়ার একমাত্র কারণ, পরে নানা জায়গায় এই পঙক্তিটি দেখেছি, বোধ হয় ব্রাউনিঙের কবিতার লাইন।) বস্তুত, "অনাগত" অথবা "ভ্রষ্টলগ্ন" পড়ার পর এ-কথাটি মনে জাগে।

তথাচ, প্রফুল্লকুমারের অবিস্মরণীয় কীর্তি, আমার ধারণায়, "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" নামক প্রবন্ধ পুস্তক। এই গ্রন্থের জন্যে বঙ্গবাসীর কাছে—সমস্ত ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে তাঁর যে সম্মান প্রাপ্য ছিল সম্ভবত গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচারের অভাবে তা তিনি পান নি। তথাপি, একদা এই গ্রন্থ বঙ্গবাসীর সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হিন্দু সমাজের গলিত ও ক্রমক্ষয়িষ্ণু রূপের এমন নিভীক সমালোচনা অন্য কেউ করেন নি। বহু পরিশ্রমে, সযত্নে নানা সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খুবই দুঃখের কথা, এই গ্রন্থ এখন দুর্লভ। নিঃসংশয়ে বলি, এই গ্রন্থ চিন্তাশীল বাঙালীর অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু রচনার যে মানসিকতা—বস্তুত প্রফুল্লকুমারের অন্যান্য সাহিত্য রচনার অন্তরালে সেই বৃত্তি গুপ্ত ছিল। যা বলা যায়, কাহিনীর আবরণে তাঁর বিদ্রোহী ও তীক্ষ্ণ সমালোচক রূপ অতটা প্রখর হতে পারে নি। যা প্রবন্ধে হয়েছে।

প্রফুল্লকুমারের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অনুধাবনে গ্রন্থটি আমাদের সাহায্য করবে।

প্রফুল্লকুমারের মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁর সাহিত্য বিষয়ে সামান্য পরিচয় দিয়ে পাঠককে পুনঃস্মরণ করাই, বিগত যুগের বহু গ্রন্থই আমাদের পুরাতন পরিচয় স্পষ্ট করবে—যা জানা বা উপেক্ষা করার মত মূঢ়তা না থাকাই ভাল।

ওঁ শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়েষু

বই পড়া ও অভিমত দেওয়া ইদানীং আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তোমার "অনাগত" গল্পটির পরে দুই অবকাশে দ্রুত একবার চোখ বুলাইয়াছি - বিচার করিবার মত মন দিতে পারি নাই। এইটুকু বুঝিয়াছি, যে সঙ্কটে আমাদের দেশকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে তাহারই বেদনায় তুমি এই উপন্যাস লিখিয়াছ, তোমার সেই অকৃত্রিম বেদনা পাঠকদের মনে সঞ্চারিত হইলে তোমার চেষ্টাকে সার্থক করিবে এই কামনা করি।

ইতি ৭ মাঘ ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রফুল্লকুমারের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

প্রফুল্লকুমারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

উপন্যাস
- অনাগত
- বালির বাঁধ
- লোকারণ্য

প্রবন্ধ
- ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু
- জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ

অন্যান্য
- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনী (অনুবাদ)

শ্রীগৌরাঙ্গ

সাহিত্য পুরস্কার

বাঙলা বর্ষের সমাপ্তি এল। অন্যান্য বৎসরের মতন এবারও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বঙ্গসাহিত্যসেবীদের প্রতি সম্মান ও অনুরাগ প্রদর্শনের জন্যে প্রতিশ্রুত পুরস্কারগুলি দেওয়া হয়েছে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

এই পুরস্কারের সংখ্যা আট; এবারে আরও একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়ায় মোট পুরস্কার ন'টিতে দাঁড়িয়েছে।

"রবীন্দ্র পুরস্কার" পেয়েছেন প্রখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক বনফুল। বহু পূর্বে এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। মৌলিক সাহিত্যকর্মের জন্যে ("হাটে বাজারে") বনফুল রবীন্দ্র পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হওয়ায় আমরা প্রীত হয়েছি।......গবেষণা গ্রন্থের জন্য আরও একটি "রবীন্দ্র পুরস্কার" দেওয়া হয়। বর্তমান বৎসরে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ "পঞ্চোপাসনা"র জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে "আনন্দ পুরস্কার" এই প্রতিষ্ঠানের দুই পরলোকগত কর্ণধারের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। "প্রফুল্লকুমার পুরস্কার" পেয়েছেন প্রবীণ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক জীবিত বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ; বহু বৎসর ধরে নিভৃতবাসী এই কবি একনিষ্ঠভাবে কাব্যকলার সেবা করেছেন; সরল স্নিগ্ধ হার্দ্য কবি হিসেবে তাঁর একটি স্থান আছে। কবি কুমুদরঞ্জনের প্রতি এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আমরা খুশী হয়েছি।......"সুরেশচন্দ্র পুরস্কার"-এর সম্মান লাভ করেছেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। কল্লোলত্তর যুগের পরবর্তী কালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে যে নবীন লেখকরা বঙ্গ সাহিত্যের গল্প উপন্যাসের নবপ্রকরণ সৃষ্টিতে মনোনিয়োগ করেছিলেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম। প্রায় দু যুগ ধরে তিনি অনলসভাবে সাহিত্যের সেবক। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সময়োচিত।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসরের আর-একটি বিশেষ পুরস্কার "সরলাবালা পুরস্কার"। "দেশ" ও "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার পরলোকগত সরলাবালা সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে এই পুরস্কারটি নিবেদন করেছেন। শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার জন্য শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যের গবেষক হিসেবে শ্রীযুক্ত সেন স্বপ্রতিষ্ঠ।

অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে "শিশিরকুমার" ও "মতিলাল" পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এবং শ্রীবিমল মিত্র। গবেষণা গ্রন্থের জন্য শ্রীযুক্ত মজুমদার এই পুরস্কারটি লাভ করেছেন, গবেষক হিসাবে তিনি কৃতী।......শ্রীবিমল মিত্র প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, জনপ্রিয় এবং বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমসাময়িক বলা যায়, যদিচ কিছু পরেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলেন। শ্রীবিমল মিত্রের সাহিত্যসেবাও দীর্ঘকালের—প্রায় তিন দশকের। বাঙালী গল্প উপন্যাসের পাঠক বিমলবাবুর রচনার অত্যন্ত অনুরাগী। এঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও আমরা আনন্দিত।

"উল্টোরথ" কর্তৃপক্ষ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে এবারে কবি হরপ্রসাদ মিত্রকে "উল্টোরথ পুরস্কার" দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কবিকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

"মৌচাক" পুরস্কার পেয়েছেন শিশু-সাহিত্যের অন্যতম সেরা গুণী—শ্রীমতী সুখলতা রাও। তাঁকেও অভিনন্দন জানাই।

গত শনিবার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বসম্পন্ন দুটি একক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষের ছবির প্রদর্শনী।

ভারতের বর্তমান শিল্প-প্রতিভাধরদের মধ্যে অনন্যসাধারণ বলতে মুষ্টিমেয় যে কজনের নাম করা যায়, নিঃসন্দেহে গোপাল ঘোষ তাঁদের পর্যায়ভুক্ত। চিত্ররসিকই কেবলমাত্র নয়, শিক্ষার্থীদের কাছেও গোপাল ঘোষের ছবির প্রদর্শনী অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর নতুন আঁকা পঞ্চাশখানি পেইন্টিং এবং বারোখানি নতুন ও চারখানি পুরাতন স্কেচ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পেইন্টিংগুলির মধ্যে গাছকে মুখ্য চরিত্র রেখে আঁকা ছবি রয়েছে ষোলখানি। সামনে হেলে-পড়া গাছের গুঁড়ি—দূরে পথ ধরে চলেছে গরুর গাড়ি ও মানুষ পসরা নিয়ে, গাছের ফাঁকে ক্ষেতের দৃশ্য, গ্রামের মন্দির, পল্লীর শ্যামল শান্ত রূপ, শোভা, প্রভৃতি নানা রকমের দৃশ্য বিবিধ বর্ণের প্রয়োগে ছন্দোময় ও বলিষ্ঠ-পূর্ণ রেখার সমাবেশে বিন্যস্ত অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করে পরিবেশিত হয়েছে। গাছ মুখ্য হলেও রূপ পরিকল্পনা, রূপায়ন এবং রঙের সমাবেশে প্রতিটি ছবিই এক-একটি স্বতন্ত্র ভাব ও দৃশ্য মূর্ত করে তুলেছে। বৈচিত্র্যের কোনক্ষেত্রে এতটুকুও অভাব ঘটে না। গ্রামের বিভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন সময়কার ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ শিল্পীর ভাব-প্রবণ দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক আবেদন সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকখানি রঙ ও রেখার ভঙ্গীতে এক-একটি স্বতন্ত্র শিল্পকৃতিত্ব। প্রত্যেক-খানির বক্তব্যও পৃথক।

অধিকাংশ ছবিরই বিষয়বস্তু গ্রামের মনোরম শান্ত সমাহিত পরিবেশকে নিয়ে। খিড়কির দিকে পুকুর, ঘন জঙ্গল এবং জীর্ণ বাড়ির অসুন্দর পরিবেশও শিল্পীর দৃষ্টি, তুলির টান ও রঙের সমাবেশে একটা মনোগ্রাহী রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোনটিতে পিছনে ধূসরাভ নীল আকাশ, একধারে গাছের নীচে কুটীর, সেই দিকে জলের কলস মাথায় চলেছে একাকিনী এক নারী—কোনটিতে কুয়ো থেকে জল তোলার দৃশ্য; নদীর তীরে বাঁধা নৌকার সারি, ওপারে গ্রামের আভাস; কোনটিতে একটা বস্তির

আদর সোনা — শিল্পীঃ সলিল ভট্টাচার্য

দৃশ্য—তুলি ও রঙের ওপর শিল্পীর পরম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট করে তুলেছে।

তেরখানি বিভিন্ন ভঙ্গি ও অভিব্যক্তির নারী রূপ গোপাল ঘোষের শিল্প-প্রতিভার আর-এক দিকের পরিচয় দেয়। ছবিগুলির সব কখানিই এ বছরের আঁকা এবং খ্যাতিমান শিল্পীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব মৌলিকত্বের পরিচয়ে সমৃদ্ধ সৃষ্টি।

স্কেচগুলির মধ্যে এ বছরের আঁকা বারোখানিই হচ্ছে শিল্পী পিকাসোর বিভিন্ন ভঙ্গি ও নানা কাজে লিপ্ত অবস্থা বা অবসর বিনোদনের ছবি। কালি-কলমে আঁকা এই স্কেচগুলিও শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক। গোপাল ঘোষের ছবির প্রদর্শনী একটা ভিন্নতর রূপ ও রসানুভূতির অভিজ্ঞতায় মনকে ভরিয়ে তোলে—যে অভিজ্ঞতা লাভ অতি কাচিৎই ঘটে।

প্রদর্শনীটি ইয়ং আর্টিস্ট সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এবং আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত খোলা থাকবে।

* * *

দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি ছিল পার্ক স্ট্রীটস্থ আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে সলিল ভট্টাচার্যের ছবির একক প্রদর্শনী।

কলকাতার গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্টসে শিক্ষা সমাপ্ত করে সলিল ভট্টাচার্য নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে ছবি আঁকার একটি উন্নত ও বিশিষ্ট নিজস্ব ধারার উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। দীর্ঘদিনের চর্চা ও অনুশীলনে তিনি ফরাসী শিল্প-মনীষাকেই মুখ্যত অবলম্বন করেন এবং কিউবিস্ট ধারার ছবির প্রতিই তিনি বেশী আকৃষ্ট হন। এই প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত এগারোখানি ছবির মধ্যেও কিউবিজমপন্থী বিশিষ্ট ফরাসী শিল্পীদের প্রভাব চোখেও পড়ে। তবে প্রভাব থাকলেও ঠিক অনুকরণ বলা যায় না। একটা নিজস্ব মৌলিক ধারার উদ্ভাবন চেষ্টায় শিল্পী সলিল ভট্টাচার্য অনেকাংশে সাফল্যও অর্জন করেছেন। পার্থক্যটা আরো উপলব্ধি করা যাবে আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কটি প্রদর্শনীতে ফ্রান্সে শিক্ষালব্ধ এবং নীরোদ মজুমদারের ধারার অনুগামী কজন শিল্পীর যেসব ছবি দেখা গিয়েছে, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে। সলিল ভট্টাচার্যকে ঠিক তাদের দলে ফেলা যায় না, বেশ একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় রেখার বিন্যাসে যেমন, তেমনি বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও রূপ পরিকল্পনা ক্ষেত্রেও।

জ্যামিতিক রেখায় বিষয়বস্তুকে রূপায়িত করে তোলায় তিনি সাংশ্লেষিক কিউবিজমের চেয়ে বৈশ্লেষিকতার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। শুনতে অযৌক্তিক, কিন্তু সরল ও বৃত্তাকার রেখার সমন্বয়ে বেশ ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। বেশীর ভাগ ছবিই রঙ পেষা ছুরির সাহায্যে ঘন রঙের সন্নিবেশে তৈরী। কতকগুলিতে বোর্ডে ঘন রঙের প্রলেপের উপর কালো মোটা রেখার টান।

কলেজে থাকাকালে ছাত্রদের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবি যা প্রদর্শিত হয়—সাধারণভাবে এবং তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী এই প্রথম।

প্রথম প্রদর্শনী হলেও কয়েকখানি ছবিতে বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে "মেচুনি", "চিরায়ুষ্মতী", "সূর্য", "আয় ঘুম আয়", "আদর সোনা" প্রভৃতি ছবিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিউবিজম ধারায় জ্যামিতিক রেখার সাহায্যে কিম্ভূত বা দুর্বোধ্য কিছু সৃষ্টির চেয়ে রেখা ও রঙে ছন্দোময় শিল্পরূপ অভিব্যক্ত করে তোলায় একটা প্রশংসনীয় চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

প্রদর্শনীটি আগামী ১৭ই পর্যন্ত খোলা থাকবে।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রসঙ্গে

ভারত সরকার চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করেন ১৯৫৪ সনে। তার দ্বারা চলচ্চিত্র নতুন মর্যাদা লাভ করেছে, সৎপ্রয়াসী চিত্র-নির্মাতারা আরও ভালো ছবি তৈরী করার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন, চিত্ররসিকদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা দেখা গেছে। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে সারা বছরের চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের কোন নির্ভরযোগ্য বে-সরকারী ব্যবস্থা এ-দেশে আজও প্রবর্তিত হয়নি। তাই চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-কেই জনসাধারণ ও চিত্রশিল্পমহল যথাযোগ্য আগ্রহ ও সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সরকারের আঞ্চলিক অথবা কেন্দ্রীয় এওয়ার্ড কমিটির বিচার প্রতি বছরেই প্রতি ছবির ক্ষেত্রে চিত্ররসিক জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। চলচ্চিত্রের গুণাগুণ বিচারে সরকারী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিও হয়ত সকল বিদগ্ধ চিত্রামোদীদের কাছে নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে সরকার যে চলচ্চিত্রের গুণাগুণ বিচারে আখ্যানবস্তু এবং জনচিত্তে এর প্রভাবের দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এ-যাবৎ সর্বোচ্চ পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলিই তার প্রমাণ। আজ পর্যন্ত এমন ছবিই সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছে যার বিষয়বস্তু মহৎ এবং মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ।

চন্দ্রশেখর

শিল্পের সৌকর্য এবং কলাকৌশল ও প্রয়োগ-কর্মের শ্রেষ্ঠত্বও এওয়ার্ড কমিটি বিচার করে থাকেন। কিন্তু বিষয়বস্তুই তাঁদের বিচারে অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। এ-পর্যন্ত এমন ছবিও রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে যা হয়তো বহিরঙ্গ শিল্প এবং কলাকৌশল ও প্রয়োগ কর্মের বিচারে সর্বোচ্চ মানের অধিকারী নয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর আবেদনে এ-সব ছবি মহৎ বলেই সর্বোচ্চ সম্মানলাভের অধিকারী হয়েছে।

ছবির গুণাগুণ বিচারে সরকার এই যে মানদণ্ড বেছে নিয়েছে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের দেশে আজও অধিকাংশ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা শুধু টিকিট ঘরের আনুকূল্য পাবার লোভে আমোদের শর্ত হিসাবে অনেক কুরুচিকর ও এমনকি অশালীন উপাদানে তাঁদের ছবি ভরিয়ে তোলেন। যদিও এই অপবাদ থেকে বাংলা ছবি অনেকখানি মুক্ত, তবুও টিকিটঘরকে তুষ্ট করার মানসিকতা যে কোন কোন বাংলা ছবিতে দেখা যায় না তা-নয়।

ছবির ব্যবসায়িক দিকটি উপেক্ষনীয় নয়। ব্যবসার দিক উপেক্ষা করলে চলচ্চিত্র-শিল্পেরই মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। তাই বলে ছায়াছবির বাণিজ্যিক স্বার্থটি সুরুচি ও সুন্দর শিল্পবোধ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে না কেন? ছায়াছবি যদি এই বাণিজ্যিক বিশুদ্ধতা অর্জন না করে তবে জনশিক্ষা ও জনসংস্কৃতির স্বার্থের দিক থেকে আমাদের চলচ্চিত্র শংকার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। পরি-শুদ্ধ ও মার্জিত আমোদ-উপাদান ছবিতে সদা-বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার-সঙ্গে থাকবে মহৎ ভাবকণা ও শোভন শিল্পকৃতি। এই তিনের সমন্বয়েই চলচ্চিত্র আদর্শ শিল্প-মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। চলচ্চিত্রও এতে কৌলিন্য অর্জন করবে। চলচ্চিত্রকে সুন্দর ও সার্থক শিল্প-মাধ্যম রূপে গড়ে তোলাই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে সরকারের বিচারে ছবির কলাকৌশল, প্রয়োগ কর্ম ও বহিরঙ্গ শিল্পরূপও যদি যথাযোগ্য প্রাধান্য পায় তবে বিচারশীল চিত্রামোদীদের মনে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার নিয়ে কোন অভিযোগ থাকবে না।

তবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার যে ইতিমধ্যেই একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে এবং চিত্র-নির্মাতাদের শিল্পসুন্দর ও আখ্যানসমৃদ্ধ ছবি তৈরীর প্রেরণা এনে দিয়েছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রেরণাই চল-চ্চিত্রশিল্পকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলার গৌরব : এ-বছরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার নিয়ে বাঙালীরা গর্ববোধ করতে
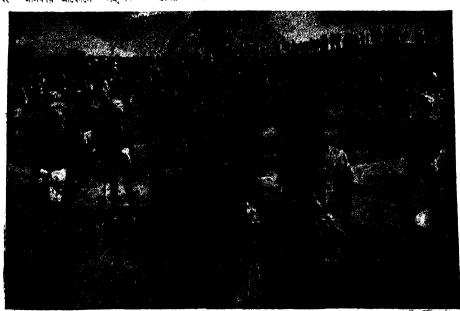
[illegible] প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র একটি দিগন্তবিস্তারী বহির্দৃশ্যের পটভূমিকায় ছবির তিনটি প্রধান ভূমিকায় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] ও দিলীপ রায়

শুভ ১লা বৈশাখ স্মরণীয় শুভমুক্তি !

একটি মহান সাহিত্য সৃষ্টি.........

.........এখন একটি স্মরণীয় ছায়াছবি !

নববর্ষের অনবদ্য উপহার

প্রত্যহ ৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

মিনার : বিজলী : ছবিঘর

ও সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

: জালান ডিস্ট্রিবিউটার্স রিলিজ :

পারেন। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের চারটি স্বর্ণ-পদকের মধ্যে তিনটি স্বর্ণপদকই পেয়েছে বাঙালী চিত্রনির্মাতাদের ছবি। শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে বিজয় বসু পরিচালিত "ভগিনী নিবেদিতা"। শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ-পদক পেয়েছে "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। ফিল্মস ডিভিশন ছবিটির প্রযোজক হলেও সত্যজিৎ রায়ই ছবিটির স্রষ্টা। প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ-পদক পাবার মত সুন্দর শিশুচিত্র প্রতি বছর দিল্লিতে গিয়ে হাজির হয় না। এবার এই বিরল সম্মানে ভূষিত হয়েছে হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রযোজিত "হট্টগোল বিজয়" (হিন্দী সংস্করণ)। ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানীর উদ্যোগে শ্রীদাশগুপ্ত প্রযোজিত "হট্টগোল বিজয়" একটি পুতুল চিত্র। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বুলু দাশগুপ্ত ও রঘু গোস্বামী।

তিনটি স্বর্ণপদক লাভের গৌরব বাদেও বাঙালীর প্রতিভা এবারকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিশুচিত্র হিসাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে "নানহে মুনহে সিতারে" পুতুল চিত্রটি। এই ছবিটির প্রযোজক-পরিচালক অজয় চক্রবর্তী। তা-বাদে "সার্টিফিকেট অব মেরিট" প্রাপ্ত অন্যান্য অঞ্চলের একাধিক ছবির স্রষ্টা হিসাবেও বাঙালী সম্মানিত। এই প্রসঙ্গে নীতীন বসু ("গঙ্গা-যমুনা") ও প্রভাত মুখো-পাধ্যায়ের (ওড়িয়া চিত্র "নুয়া বৌ") নাম উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাঙালীরা যে পথিকৃৎ এই সত্যটি এবারকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে আবার নতুন করে স্বীকৃত হল। বাঙালী চিত্রনির্মাতারা এই নিঃসংশয় সত্যটি তাঁদের ভবিষ্যত কর্মে ও সাধনায় আরও সুন্দর ও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলবেন—আমরা এই বিশ্বাস রাখি।

চিত্রালোচনা

বর্তমান সপ্তাহে দুটি বাংলা ছবি ও তিনটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবি দুটি হল: **হাঁসুলী বাঁকের উপকথা** ও **কান্না**। হিন্দী ছবি তিনটির নাম: **সওতেলা ভাই, হাফ টিকেট, ভলা ক্যা যাত হায়।**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুপঠিত কাহিনী **হাঁসুলী বাঁকের উপকথা**-র (জালান প্রোডাকশন্স) আখ্যান-ভিত্তি। তপন সিংহ ছবিটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলে ছবিটির অধিকাংশ দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। সেখানকার কোপাই নদীর তীরভূমি, মাঠ, বন ও প্রান্তর ছবির পটভূমি রচনা করেছে। হাঁসুলী বাঁকের সহজ সরল মানুষদের রূপসজ্জায় যে-শিল্পীরা অবতরণ করেছেন তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (বনোয়ারী), নিভাননী (সুচাঁদ), রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় (পাখি), দিলীপ রায়

ডি-লাক্স ফিল্মসের নবতম নিবেদন "কান্না"র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও রাধামোহন ভট্টাচার্য

(করালী), অনুভা গুপ্ত (কালোশশী), রবি ঘোষ (পানু) ও লিলি চক্রবর্তী (নসুবালা)। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন বীরেশ্বর সেন, প্রশান্তকুমার, চন্দন রায়, রথীন ঘোষ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির গানগুলি রচনা করেছেন। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কান্না ছবিটিও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগধর্মী কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী। অগ্রগামী গোষ্ঠী এ-ছবির প্রযোজক-পরিচালক। এক অন্ধ যন্ত্র-বাদক এ-ছবির নায়ক। তার করুণ কাহিনীই ছবির বিষয়বস্তু। উত্তমকুমার নায়কের চরিত্রে অবতরণ করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন নবাগতা শিল্পী নন্দিতা বসু। ছবির তিনটি প্রধান পার্শ্বচরিত্রের শিল্পী হলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী ও সবিতা সিংহ। সুধীন দাশগুপ্ত ছবির সুরকার।

শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল"-এর হিন্দী চিত্ররূপ **সওতেলা ভাই** (আলোক ভারতী প্রোডাকশন)। মহেশ কাউল ছবিটির পরিচালক। ছবির মুখ্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন প্রণতি ভট্টাচার্য, গুরু দত্ত, বিপিন গুপ্ত, অসিত সেন প্রভৃতি। অনিল বিশ্বাস ছবির সংগীত-পরিচালক।

রংগরস প্রণয় ও নৃত্য-গীতের পসরা সাজিয়ে এনেছে **হাফ টিকেট** (সিনে টেকনিশিয়ান্স)। কিশোরকুমার, মধুবালা, প্রাণ ও হেলেন ছবির প্রধান চারজন শিল্পী। সলিল চৌধুরী ছবির সুরকার।

ভলা ক্যা বাত হ্যায় ছবিটির মূল বিষয়বস্তু প্রণয়। শাম্মি কাপুর ও বীণা ছবির নায়ক-নায়িকা। সহ-শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন নিশি, কে এন সিং, মারুতি, অভী ভট্টাচার্য ও রাজা। হরি বালিয়া ছবির প্রযোজক-পরিচালক। সংগীত পরিচালনা করেছেন রোশন।

গত সপ্তাহে (৪ঠা মার্চ) স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে আর-ডি-বির পরবর্তী ছবি **এক টুকরো আগুন**-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবির প্রথম দিনের প্রধান শিল্পী ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বজিৎ ও নবাগতা সুচরিতা এ-ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রের শিল্পী। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছবির কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার। প্রণয় ও কৌতুক ছবির মূল উপজীব্য। বিনু বর্ধন ছবিটির পরিচালক। সুররচনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায় এন টি স্টুডিও-তে ওয়াহীদা রেহমানকে নিয়ে **অভিযান**-এর চিত্রগ্রহণ চালিয়ে যাচ্ছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির নায়ক। শ্মশ্রুধারী অবাঙালী ট্যাক্সি-ড্রাইভারের চরিত্রে ইনি অভিনয় করছেন। তাঁরই অবাঙ্গালী স্ত্রীর ভূমিকায় অবতরণ করছেন ওয়াহীদা রেহমান। ওঁদের মুখে হিন্দী সংলাপ দিয়েছেন চিত্র-পরিচালক চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায়। এর ফলে ছবিটির সর্বভারতীয় আবেদন বাড়বে বলে মনে হয়। ছবিতে খৃষ্টান ভ্রাতা-ভগিনীর ভূমিকায় দেখা যাবে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতাকে। চারু প্রকাশ ঘোষ ও রবি ঘোষ অন্য দুই বিশিষ্ট শিল্পী। অভিযাত্রিক-এর প্রযোজনায় নির্মীয়মান এ-ছবির কাহিনীকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় নিজেই ছবির সুরকার।

"মা"-এর পর এম কে জি যে ছবিটি নিবেদন করবেন তার নামকরণ হয়েছে **সাক্ষী**। এটি হবে একটি ক্রাইম ছবি। পরিচালনা করবেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়।

বাংলার নবরত্ন

"সমাপ্তি" ও "রবীন্দ্রনাথ" চিত্রদ্বয়ের পরিচালক সত্যজিৎ রায়

"ভগিনী নিবেদিতা"-র পরিচালক বিজয় বসু

"সপ্তপদী"-র পরিচালক অজয় কর

"পুনশ্চ"-র পরিচালক মৃণাল সেন

"হট্টগোল বিজয়"-এর পরিচালক রঘুনাথ গোস্বামী

"গঙ্গা যমুনা"র পরিচালক নীতীন বসু

"[illegible] বৌ"-এর পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়

"হট্টগোল বিজয়"-এর অন্যতম পরিচালক মুকুন্দ দাশগুপ্ত

"[illegible] সিতারে"-র পরিচালক অজয় চক্রবর্তী

১লা বৈশাখে ছবির শুভ-সূচনা মুহূর্ত উৎসব পালিত হবে।

চিত্রপ্রযোজক পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনতিবিলম্বেই একটি বাংলা ছবি তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। ছবিটির নাম **ছাড়পত্র।** দাম্পত্যজীবন ও বিবাহ-বিচ্ছেদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে "ছাড়পত্র"র কাহিনী রচনা করেছেন আশাপূর্ণা দেবী।

রমাপদ চৌধুরীর **"দ্বীপের নাম টিয়ারঙ"**-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন চিত্রযুগ সংস্থা। গুরু বাগচী ছবিটি পরিচালনা করবেন এবং আন্দামান অঞ্চলে ছবিটির অধিকাংশ দৃশ্য গৃহীত হবে। আগামী বর্ষার আগেই ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে।

পার্থসারথি পিকচার্স-এর প্রথম প্রয়াস **"এইটুকু অভিমান"**-এর শুভমুহূর্ত সূচনা উৎসব সম্প্রতি ইস্টার্ন টকীজ স্টুডিয়োতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবাগত প্রণবকুমার ও শিবানী সেনকে নিয়ে ছবির প্রথম দিনের দৃশ্য গৃহীত হয়। বিনয় সরকার ছবিটির পরিচালক-চিত্রনাট্যকার।

নতুন প্রামাণিক চিত্র

বৃটেনের **ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড ফিল্মস**-এর প্রযোজনায় বর্তমানে বাংলার গ্রামের পটভূমিতে একটি ভিন্নধর্মী প্রামাণিক চিত্র তৈরী হচ্ছে। ষড়ঋতুর এক-একটি ঋতুর আবির্ভাবে পল্লীপ্রকৃতি ও জীবনে কী সৌন্দর্য ও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়, তা-নিয়েই তৈরী হচ্ছে ছবিটি।

এই প্রামাণিক চিত্রটি পরিচালনা করছেন হরিসাধন দাশগুপ্ত। ইস্টম্যান কালারে ছবিটি তোলা হচ্ছে। ছবির পটভূমিরূপে পরিচালক শ্রী দাশগুপ্ত উত্তর বাংলার একটি ছোট গ্রাম বেছে নিয়েছেন। সারা বছর ধরে তিনি সেখানে ছবিটি তুলবেন। চিত্রগ্রহণের পর ছবির অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে লণ্ডনে। বলু দাশগুপ্ত ছবিটির আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হরিসাধন দাশগুপ্তের "পাঁচথুপি, কোনারক" এবং "দি স্টোরি অব টাটা স্টীল" (রঙীন) রসিকজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর হয়ে শ্রী দাশগুপ্ত সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর একটি দুই রীলের প্রামাণিক চিত্র তৈরী করেছেন। ছবিটি অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করবে।

বোম্বাই সমাচার

রাগপ্রধান সংগীতের প্রভাবে কি পাগলামি দূর হয়? হয় বলেই এক ধনী ব্যক্তি বিশ্বাস করেন এবং তিনি পাগলা-গারদে গিয়ে এই অদ্ভুত পরীক্ষা শুরু করেন। বলাবাহুল্য, এই পরীক্ষাকার্যে তার বহু অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু তিনি সফল হন। মানসিক রোগের এই বিচিত্র চিকিৎসা-প্রণালীর ভিত্তিতে একটি নির্মীয়মান মারাঠি ছবির কাহিনী গঠিত। ছবিটির নাম "বাপ মজা ব্রহ্মচারী"। নন্দলাল কি মুখিজার প্রযোজনায় বোম্বাই-এ ছবিটির কাজ এগিয়ে চলেছে।

* * *

বৈজয়ন্তীমালা লেকের জলে ডুবে আত্মহত্যা করবেন—"বিদ্যা" ছবিটির জন্যে এ-ধরনের একটি নাটকীয় দৃশ্য গ্রহণের ব্যাপারে প্রযোজক মোহন সায়গল সম্প্রতি খুবই বিপদে পড়েছিলেন। বোম্বাই-এর চাঁদিভালি স্টুডিয়োর লেক-এ বৈজয়ন্তীমালার ডুবে মরার কথা ছিল। কিন্তু ইনি কানের অসুখে ভুগছেন বলে স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ তাঁকে জলে ডুব দিতে বারণ করেন।
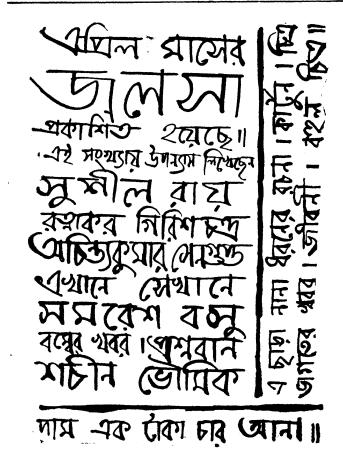
প্রতিদিনই খবরের কাগজের খেলার পাতায় বড় বড় শিরোনামায় চিত্রার নাম। কারণ ছোট হয়েও ওর বড়র কৃতিত্ব। ছোট মেয়েদের মধ্যে তো কথাই নেই, বড় মেয়েদের এক শ মিটার দৌড়ের প্রথম হিটেও চিত্রা ফার্স্ট। গার্লস ইভেণ্টে প্রথম দিন দুটি 'সোনার মেডেল' এক শ মিটার দৌড় ও হাই জাম্পে। দ্বিতীয় দিন একটি 'সোনার মেডেল' ৫০ মিটার দৌড়ে। তৃতীয় দিন চতুর্থ 'সোনার মেডেল' ৮০ মিটার হার্ডল রেসে। দু'শ মিটার দৌড়ে চতুর্থ দিনে পঞ্চম মেডেল। এ ছাড়া একটি উপরি পাওয়া ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে বিজয়িনী লখনৌ টীমের অংশীদার হিসাবে। সর্বোপরি ছোট মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। চিত্রার ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ। পাঁচটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকারে মোট পয়েণ্টের সংখ্যা পঁচিশ।

বলা বাহুল্য, গার্লস ইভেণ্টে এককভাবে এবং উইমেনস ইভেণ্টে মীরাটের সঙ্গে যুগ্মভাবে লখনৌ-এর দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের মূলেও চিত্রার দান অনেকখানি।

এর পর রাজ্যের গণ্ডির বাইরে চিত্রার ডাক। জব্বলপুরের জাতীয় অ্যাথলেটিকসের আসরে ভারত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একটু ভয়, একটু দ্বিধা এবং অনেকখানি সন্দেহ মনে নিয়ে গার্লস ইভেন্টের ৫০ মিটারে চিত্রা দৌড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু একটুর জন্য পুরস্কার গেল হাতছাড়া হয়ে। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা গেল চিত্রার স্থান চতুর্থ। তবু জব্বলপুর থেকে খালি হাতে লখনৌতে ফিরল না চিত্রা পালিত। দু শো মিটার দৌড়ে ওর হাতে জাতীয় অ্যাথলেটিকসের তৃতীয় পুরস্কার। প্রথম, মহীশূরের শীলা পাল, দ্বিতীয়, দিল্লির মনোরমা ওবেরয়, তৃতীয় উত্তর প্রদেশের বাঙালী মেয়ে চিত্রা পালিত। কিন্তু ভারতের বেশীর ভাগ কাগজে লেখা হল চিত্রা পাতিল।

স্পোর্টস পটুতায় চিত্রা পরিবারের কিছুটা ব্যতিক্রম। ডাঃ মোহিনীমোহন পালিতের তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র স্বপন অবশ্য কুইন্স কলেজে একটু খেলাধুলো করেছে, কিন্তু আর কেউই স্পোর্টসে পোক্ত নয়। ডাঃ পালিতও এ সম্বন্ধে একটু 'কনজারভেটিভ' ছিলেন। এখন আর নেই। চিত্রার সাফল্যের জোয়ারে তাঁর রক্ষণশীলতার বাঁধ ভেঙে গেছে। মেয়ের খেলাধুলোর দিকে মা-বাবার এখন সমান দৃষ্টি।

দাদামশাইয়ের ক্রীড়াপ্রীতিই হয়তো চিত্রার শিশুমনে খেলাধুলোর প্রথম দাগ কাটে। মামাবাড়ি কলকাতায়। দাদামশাই ছিলেন পরলোকগত ব্যারিস্টার যুগলকিশোর ঘোষ। যৌবনে ফুটবল খেলেছেন কুমারটুলী ক্লাবে, শ্যামবাজার টেনিস ক্লাবে খেলেছেন টেনিস।

লখনৌয়ের দৌড়পটু বাঙালী মেয়ে চিত্রা পালিত

প্রতি বছর চিত্রা মামাবাড়ি এসে খেলার মাঠ থেকে দাদামশাইয়ের আহরিত কাপ-মেডেলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত। দাদুর 'পরে তার হিংসে হত। বুড়ো বয়সেও দাদু নাকি খেলার জামা পরে মাঠে নেমেছিলেন শুনে চিত্রা অবাক। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৩ সালে। আই এফ এ-র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে অতীত দিনের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হয়েছিল যুগলবাবু তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দাদু ছিলেন সত্যিকারের ক্রীড়ারসিক এবং বৈঠকী মেজাজের মানুষ। আদরের একমাত্র নাতনীর সঙ্গে তিনি খেলাধুলোর গল্প করতেন আর চিত্রা অবাক হয়ে শুনত। খবরের কাগজে খেলার ছবি দেখে তার নিজের মন কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে উঠত।

কল্পনার সঙ্গে আজ বাস্তবের মিলন ঘটেছে। তার পায়ে উঠেছে রানিং শু। উত্তর প্রদেশের কৃতী 'কোচ'রা তাকে আরো পটু করবার দায়িত্ব নিয়েছেন। নৈনীতালের সামার ক্যাম্পের শিক্ষায় ত্রুটিবিচ্যুতি অনেকখানি শুধরে গিয়েছে। এখন তার দৌড়ের সুন্দর ভঙ্গি, নিখুঁত পদক্ষেপ, গতিবেগ উন্নত।

কিন্তু শুধু স্পোর্টসের ক্লাসে উন্নতি করলেই তো জীবনে পরিপূর্ণতা আসে না। স্কুল-কলেজের ক্লাসেও উন্নতি চাই, জীবনে পরিপূর্ণতার জন্য নাচগানও একটু প্রয়োজন। কোন দিকেই চিত্রা পেছিয়ে নেই। স্কুলে ভাল মেয়ে হিসাবে নাম আছে, ভাতখণ্ডে মিউজিক কলেজে নাচগানের ক্লাসেও তার কামাই নেই। সব কিছুতেই এগিয়ে যেতে চায় চিত্রা। সবচেয়ে বড় সাধ স্পোর্টসে একটি রেকর্ড করার।

দেশী সংবাদ

২রা এপ্রিল—সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের এত দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে যে, ভারতস্থিত পাকিস্তানের হাই কমিশনার শ্রীআগা হিলালিকে পাকিস্তানের রাজধানীতে সত্বর গমনের জন্য ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, অরোরার 'ভগিনী নিবেদিতা' বর্তমান বৎসরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে গণ্য হইয়া রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইতেছে। চারটি স্বর্ণপদকের মধ্যে দুইটি স্বর্ণপদকই বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রদান করা হইতেছে।

৩রা এপ্রিল—ভারত সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড কর্তৃক শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে নিযুক্ত কমিটির সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে মালদহ, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও কোচবিহার—এই পাঁচটি জেলা শিল্পে অনগ্রসর।

সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে জমির হুকুম দখল এবং দখলের ব্যাপারে সারা-ভারতে যাহাতে একই আইন প্রযোজ্য হয় তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট অভিমত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রস্তাবিত আইন প্রায় ৭০ বৎসর আগেকার এতৎসংক্রান্ত পুরানো আইনের বদলে চালু হইবে।

৪ঠা এপ্রিল—আবর্জনা পরিষ্কার ও জল-নিকাশের ব্যাপারে অব্যবস্থার ফলে দিনে দিনে কলিকাতা অবনতির পথে চলিতেছে। তাহা হইতে মহানগরীকে বাঁচাইবার দাওয়াই বাতলাইবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা যায় যে, গৌহাটির কাছে নুনমাটিতে সরকারী ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম তৈল শোধনাগারে অপরিশোধিত তৈলের অভাবে কাজ প্রায় গত এক সপ্তাহ যাবৎ বন্ধ আছে।

৫ই এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বিহার রাজ্যকে অতিরিক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিয়া ডি ভি সি ঐ রাজ্যের প্রতি আনুকূল্য দেখাইতেছেন বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলে অভিযোগ শুনা যায়।

এখন ইহা একরূপে নিশ্চিত যে, শ্রীনেহেরুর নূতন মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যা—পূর্বাঞ্চলের এই কয়টি রাজ্যের সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

৬ই এপ্রিল—সোভিয়েট রাশিয়া সহ কয়েকটি কম্যুনিস্ট দেশ সম্প্রতি কম্যুনিস্ট চীনকে ভারত সম্পর্কে তাহার নীতি পরিবর্তনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদ্য রাত্রি ১২টা হইতে কলিকাতা বন্দরের ৪৬ জন পাইলটের মধ্যে ৪০ জনই পদত্যাগ করিয়াছেন। আগামী কাল হইতে তাঁহারা কোন জাহাজ বাহির সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না বা বঙ্গোপসাগরের স্যান্ড হেডেও কোন জাহাজের ভার গ্রহণ করিবেন না। অচিরে এই সংকটের সুরাহা না হইলে ভারতের বৃহত্তম বন্দর কলিকাতায় গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

৭ই এপ্রিল—অদ্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, পৃথিবীতে অন্ধ লোকের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ইহার মধ্যে ভারতেই কুড়ি লক্ষের কাছাকাছি। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের ৭০ বৎসরের বেশী বয়স্ক ৬ হাজার বৃদ্ধকে দারিদ্র্য ও বার্ধক্য জনিত কর্মশক্তিহীনতার জন্য মাথাপিছু বার্ষিক তিনশত টাকা করিয়া পেনসন দিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য বেলা আড়াইটা নাগাদ কলিকাতা বন্দরের পাইলটদের পদত্যাগ জনিত বিরোধের মীমাংসা হয়। পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান ও পাইলট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকের ফলে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটে।

৮ই এপ্রিল—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজও তাঁহার মন স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট মন্ত্রীদের নামের তালিকা পেশ করেন নাই।

রাউরকেলা ইস্পাত কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেস বিভাগে চারদিন ধরিয়া লক-আউট অবস্থা চলিবার ফলে গলিত ইস্পাতের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার এক ঘরোয়া সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, এই লক-আউটের ফলে দৈনিক ৪ লক্ষ টাকা লোকসান ছাড়াও কারখানার অন্য সমস্ত বিভাগে উৎপাদনও ব্যাহত হইতেছে।

বিদেশী সংবাদ

২রা এপ্রিল—একদল স্বাধীন অফিসার উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পোতে ক্ষমতা দখল করিয়াছেন। ইঁহারা মিশরের সহিত পুনর্মিলনের পক্ষপাতী। আলেপ্পো বেতারে সে-কথা তাঁহারা ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পরই সিরীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ আজ 'সারা' দেশে কারফিউ জারি করেন, সীমান্ত ও সমস্ত বন্দর বন্ধ করিয়া দেন।

গত শনিবার নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কে বর্তমান শতাব্দীর প্রবলতম উল্কা বৃষ্টি ঘটিয়াছে। এই 'বর্ষণের' ফলে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়।

৩রা এপ্রিল—অতিশয় নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবারে লন্ডনে কমনওয়েলথ-এর প্রধান মন্ত্রিগণের পরবর্তী সম্মেলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া মোটামুটিভাবে তারিখ ধার্য করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ আজ ঢাকায় আইন-জীবী ও শিল্পপতিদের সহিত বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব বলেন যে, মৌলগণতন্ত্রগুলির নূতন করিয়া নির্বাচন করার কোন সম্ভাবনা নাই।

৪ঠা এপ্রিল—অদ্য কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায়, গত সোমবার ঢাকায় ছাত্রদের এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের উপর পুলিস পুনরায় লাঠি চার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। প্রায় শতাধিক ছাত্র এই সংঘর্ষে আহত হয় ও পুলিস ১৩৭ জন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

আজ জাকর্তা বেতারের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম নিউগিনির অদূরবর্তী গ্যাগ দ্বীপে ওলন্দাজ সৈন্য ও "সশস্ত্র" যুবক-দলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ওলন্দাজ সৈন্যরা নির্বিবাদে স্থানীয় লোকদের উপর গুলি চালাইতেছে। জনসাধারণও আপ্রাণ প্রতিরোধ করিতেছে।

৫ই এপ্রিল—পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৫০টি সাধারণ আসনের জন্য ৬ শত প্রার্থী এবং দুইটি প্রাদেশিক বিধান সভায় মোট ৩ শত (প্রতিটিতে দেড়শত করিয়া) আসনের জন্য দেড় হাজার প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদের ১০ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের অবসান ঘোষণা করিয়া আজ ক্লাসে যোগদান করে। তাহারা ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীসুরাবর্দী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করে। সরকার ঐ দাবি মঞ্জুর করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

৬ই এপ্রিল—পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন কূটনীতিবিদ শ্রীবাঙ্কার কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। ঐ সব প্রস্তাবে একজন হাই কমিশনারের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম ইরিয়ানে ক্রমশ ওলন্দাজ শাসনের অবসান ও ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃত্ব বলবৎ করার কথা বলা হইয়াছে।

কেনিয়ার স্বাধীনতার পথে নূতন ও বৃহৎ পদক্ষেপ হিসাবে ব্রিটেন আজ রাত্রে কেনিয়াকে শীঘ্রই হোমরুল দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। 'কানু' পার্টি কেনিয়ার জন্য বৃটিশ সরকারের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

৭ই এপ্রিল—আজ সেনা কর্তৃপক্ষ উত্তর-মধ্য ইকুয়েডরে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করে এবং প্রেসিডেন্ট জুলিও কার্লস আরোসেমেনা চালিত গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারী কম্যুনিস্টপন্থী গেরিলাদের পিছু ধাওয়া করিতেছে।

প্রকাশ, পূর্ব নেপালের ধানকুট জেলার তাপলেজং-এ একদল সশস্ত্র নেপালী কংগ্রেসী রাজকীয় সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং কারাগার পোড়াইয়া দিয়া ৫০ জন বন্দীকে মুক্ত করে।

৮ই এপ্রিল—কিউবার এক সামরিক **ট্রাইব্যুনাল আজ ১,১৭৯জন বন্দীকে** কারাদণ্ড **দিয়াছে। গত এপ্রিল মাসে "মার্কিন** সমর্থনে **কিউবা আক্রমণের সময়" ইহারা** গ্রেপ্তার হয়। **বন্দীদের ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম** কারাদণ্ড বা **৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ** দেওয়ার **আদেশ হইয়াছে।**

গত রাত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রীহট্ট প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ৩০জন নিহত ও দুইশত জন আহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। বাসগৃহসমূহ ঝড়ে উড়িয়া যায়। একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 21ST APRIL, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ২৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৮ বৈশাখ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

হিন্দীর নয়া অভিযান

"ইংরেজী হটাও" আন্দোলনের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতিত্ব এখন আর একটুও গোপন রইল না। কেন্দ্রীয় কর্তারা যদিও মুখে প্রায়ই বলেন ভারতের চৌদ্দটি ভাষাই সমান মর্যাদার অধিকারী, প্রত্যেকটির উন্নতি ও পরিপুষ্টি তাঁরা কামনা করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁদের রীতিনীতি এবং সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অন্যরকম। চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে হিন্দীর উপরই কেন্দ্রীয় কর্তাদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। কারণ তাঁরা সাব্যস্ত করেছেন, ইংরেজীকে বিদায় দিয়ে হিন্দীকেই শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীর। তবে কেন্দ্রীয় কর্তারা জানেন, এই বিরোধ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরও একটি পক্ষ আছে। হিন্দী ছাড়া আর যে তেরটি আঞ্চলিক ভাষা আছে তারা হিন্দীর চাইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের অহিন্দী ভাষীরা হিন্দীর রাষ্ট্রিক একাধিপত্য স্বেচ্ছায় কখনই মেনে নেবে না। কাজেই হিন্দীওয়ালা-দের চেষ্টা ইংরেজীকে হটাতে হলে কেবল ইংরেজীর নয়, অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির অধিকার খর্ব করে হিন্দীর সমূহ প্রাধান্য বিস্তার। কেন্দ্রীয় কর্তারা তাই এখন হিন্দীর তরফ থেকে সেই দ্বিমুখী অভিযানে অগ্রণী হয়েছেন। সহযোগী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজীর অধিকার আপাতত মোটের উপর বজায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দীকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য নানারকম পরোক্ষ কৌশল প্রয়োগে মনোযোগ দিয়েছেন।

হিন্দীর প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রদর্শনের সর্বাধুনিক দৃষ্টান্ত গত পার্লামেন্টের অন্তিম অধিবেশনে গৃহীত "হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন" আইন। কথা নাই, বার্তা নাই, কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়নের জরুরী তাগিদ কেন অনুভব করলেন সে রহস্য এই আইনটির বিধি নিয়মেই পরিষ্কার-ভাবে পরিস্ফুট। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যত্নবান হোন ভাল কথা। কিন্তু এই আইনটি মোটেই সেরকম কোনও উদার অপক্ষপাত দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচায়ক নয়। এমন কী, হিন্দী সাহিত্যের পরিপুষ্টি এবং উন্নতি বিধানও এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা যায় না। চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা সাহিত্যের মধ্যে কেবল হিন্দী সাহিত্যকে বাছাই করে নিয়ে তাকে বিশিষ্ট জাতীয় মর্যাদা এবং কেন্দ্রীয় সরকারী সনদ কেন দেওয়া হচ্ছে সে প্রশ্নও সঙ্গতভাবেই উত্থাপিত হবে। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের এবং মাদ্রাজের দুএকজন সদস্য সে প্রশ্ন উত্থাপনও করেছিলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি।

হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি নয়, হিন্দী ভাষার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করাই এই আইনটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন নামে যে প্রতিষ্ঠানটিকে এই আইন বলে সর্ব-ভারতীয় সরকারী স্বীকৃতির সনদ দেওয়া হয়েছে, বলা বাহুল্য, প্রচুর পরিমাণে সরকারী সাহায্যদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানটির সবিশেষ পরিচয় আমাদের জানা নেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য যথারীতি এই প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট গুণগান করেছেন। তবে অনুমান করি, হিন্দীওয়ালারাও সকলেই এই প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মে সন্তুষ্ট নয়। রাজ্যসভায় একজন প্রখ্যাত হিন্দী প্রবক্তা কাকা কালেলকার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির ভাষাগত গোঁড়ামি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। হিন্দী ভাষা প্রসারে মহোৎসাহী শ্রীগোবিন্দ দাস আবার শ্রদ্ধেয় কাকা কালেলকারের অভিযোগ খণ্ডন করে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের মুখ রক্ষার চেষ্টা করতে ছাড়েননি! কিন্তু এ-সব হল হিন্দী ওয়ালাদের ঘরোয়া বিবাদ। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রীয় সনদ দান বিষয়ে হিন্দীওয়ালারা এবং কেন্দ্রীয় কর্তারা 'এক দিল', যার ফলে এই স্বল্পখ্যাত অজ্ঞাত পরিচয় আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানটি এক লাফে প্রথম শ্রেণীর সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন অধিকার করছে।

একটি আঞ্চলিক ভাষার একটি সাহিত্য সম্মেলন নামধারী সংস্থাকে সর্বভারতীয় মর্যাদা ও ক্ষমতা দানের জন্য কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন যেমন বিস্ময়কর তেমনি অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক। সাহিত্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন নিশ্চয়ই ভারতে এক এবং অদ্বিতীয় নয়। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে দেখা যাচ্ছে জাতীয় স্বীকৃতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ক্ষমতা লাভের যোগ্যতা একমাত্র হিন্দীর এবং হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের! বাংলা, তামিল, গুজরাতী, মারাঠি, ওড়িয়া ভাষা এবং এইসব ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে নিযুক্ত বিবিধ সাহিত্য পরিষদ ও সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের একনিষ্ঠ হিন্দীপ্রেমীরা একেবারে বাদশাহী কায়দায় বর্জন করলেন কোন্ যুক্তিতে অথবা কোন্ নীতি অনুসারে?

যুক্তি ও নীতির কথা উত্থাপন করা বৃথা; তবে কেন্দ্রীয় কর্তাদের মতলব পরিষ্কার। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে আইনবলে সারা ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সন্দেহ নাই যে, হিন্দী ছাপমারা ডিগ্রী ডিপ্লোমা - কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার লাভ করবে। হিন্দী-ওয়ালারা এবং তাঁদের মুরুব্বী কেন্দ্রীয় সরকার এইভাবে এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের বন্দোবস্ত করছেন। হিন্দী ডিগ্রী ডিপ্লোমা বিতরণের ঢালাও সরকারী ব্যবস্থা একদিকে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করবে, অন্যদিকে হিন্দীর সরকারী প্রতাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীও কোণঠাসা হবে। ইংরেজীকে তাড়াতে চাইছেন যাঁরা সেইসব উগ্র মাতৃভাষাপ্রেমীরা 'ইংরেজী হটাও'এর পরিণামটা আশা করি ভেবে দেখবেন। হিন্দী একাধিপত্য বিস্তারের নয়া অভিযানের বিরুদ্ধে অহিন্দী ভাষীদের অবিলম্বে সংগঠিত প্রতিরোধে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শুভ
যাত্রাপথে অশুভ লক্ষণ।

কবির সাহেব আজ পূর্ণমন্ত্রিত্বের
অধিকারে বলীয়ান।

'আমি কি ডরাই কভু
বিপুলাতুল্যরে?'

অশোক সেন
পাঁচ বছরের
জন্য আবার
আইন মন্ত্রী
থেকে গেলেন।

জগজীবনরাম পরিবহণ ও
যোগাযোগরক্ষা মন্ত্রিত্বে বহাল
হয়েছেন।

শাস্তি কি শান্তি?

নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্সের আলোচনা নাকি একটা অচল অবস্থায় এসে ঠেকেছে। আসল নিরস্ত্রীকরণের কথা দূরে থাক, নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য যে একটা চুক্তি হবে সে আশাও অত্যুজ্জ্বল নয়। সোভিয়েট রাশিয়া আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের প্রস্তাবে রাজী নয়। আমেরিকা বলছে তাহলে আমেরিকায় বিস্ফোরণের যে নূতন পর্যায়ের আয়োজন চলছে সেটা যথা সময়ে—অর্থাৎ এই এপ্রিল মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। নিরপেক্ষ দেশগুলির তরফ থেকে একটা চেষ্টা চলছে দুই পক্ষের দাবির মধ্যে কোনোরকমে একটা আপস করা যায় কিনা যাতে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ বন্ধ থাকে।

আসলে কিন্তু এটা নিরপেক্ষদের বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল করার মতো ব্যাপারই নয়। একটা "ফরমূলা" বার করার অপেক্ষায় একটা আটকে আছে তা নয়। তাই যদি হতো তবে সেরকম "ফরমূলা" বার করার মতো বুদ্ধি রাশিয়ান এবং আমেরিকানদের মধ্যেও যথেষ্ট মিলত। নিরপেক্ষদের দিক থেকে বুদ্ধি যোগানোটা খুব একটা বড়ো কাজ নয়। নিরপেক্ষদের দিক থেকে যাতে কিছু কাজ হতে পারে সেটা হচ্ছে নৈতিক এবং রাজনীতিক চাপ।

উভয়পক্ষই নিরপেক্ষদের খাতিরটা হাতে রাখতে চায়, বেশি চটাতে চায় না। কিন্তু উভয় পক্ষই যখন দুষ্কর্মে সমান সমান তখন কারোই নিরপেক্ষদের মনোভাব নিয়ে বিশেষ দুর্ভাবনার কারণ থাকে না, যদিনা নিরপেক্ষরা উভয় পক্ষের উপর বিরক্ত হয়ে নিজেদের বিরক্তি এমনভাবে প্রকাশ করতে পারে যার একটা প্রকৃত নৈতিক মূল্য আছে। নিরপেক্ষদের সেইখানেই কোনো জোর নেই। কেবল নীতিবাক্যের ঝড় তুললে সে-জোর আসতেও পারে না। কথার পিছনে কিছু কাজ থাকা চাই। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ যারাই ঘটাবে বা এখন এমন ব্যবস্থা রাখবে যে ইচ্ছা করলেই ঘটানো যায় তাদের কাছে সর্বদা হাত পেতে থাকব আর তাদের উপর নীতিবাক্য বর্ষণ করতে থাকব তাহলে আর যাই হোক সেই নীতিবাক্যের বিশেষ কোনো প্রভাব হবে এরূপ আশা করা উচিত হবে না।

যাদের অ্যাটমিক বা নিউক্লিয়ার অস্ত্র নেই অথবা ঐ রকম অস্ত্র তৈরী করার উদ্যোগ করলেও যাদের আমেরিকা বা রাশিয়ার নাগাল পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তারা যদি শপথ করে বলে যে তারা অ্যাটমিক বা

নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরী করবে না তাহলেও তাদের সেই ঘোষণার বিশেষ একটা নৈতিক প্রভাব হবে তা নয়। যদি নৈতিক প্রভাব কিছু অর্জন করতে হয় তবে তার জন্য এমন

কিছু করা দরকার যার মধ্যে এখনই ত্যাগের একটা আভাস থাকে। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো বা তার ব্যবস্থা রাখা মানববিরোধী কাজ, এই কাজ যারা ছেড়ে না দেবে তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেব না—একথা নিরপেক্ষরা বা তাদের মধ্যে কেউ যতদিন বলতে না পারবে ততদিন এবিষয়ে তাদের কোনো প্রকৃত নৈতিক প্রভাব হবে বলে আশা করা যায় না। নিরপেক্ষরা এরূপ ভাব প্রকাশ করলেই এবং সেই অনুসারে কাজ করলেই যে সংগে সংগে দুই পক্ষের নিউক্লিয়ার শক্তিধররা নিজেদের মত ও পথ বদলে দেবে একথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু নৈতিক প্রভাবের কথা যদি আদৌ তোলা হয় তবে এছাড়া নিরপেক্ষদের সত্যকারের করণীয় আর কিছু নেই।

নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিস্ফোরণ কেবল নিউক্লিয়ার শক্তিধারী প্রতিপক্ষের সংগে আড়াআড়ি ব্যাপার নয়। প্রতিটি বিস্ফোরণই শত্রুমিত্রনির্বিশেষে মানব জাতির বিষম অকল্যাণকর। সুতরাং এটা নিউক্লিয়ার শক্তিধারী দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে একটা চুক্তির ব্যাপারই নয়, যারাই নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী তাদের প্রত্যেকেরই বাকী পৃথিবীর প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর—এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর কাছে জবাবদিহি করার এটা ব্যাপার। তাই যদি হয় তবে নিরপেক্ষ দেশগুলির যারা আবার নিজেদের নৈতিক দৃষ্টিভংগীর বড়াই করে তাদের নীতিকথার উচ্চারণ ছাড়া আর কোনো কর্তব্য কি নেই? কোনো দেশ একলা কিছু করে যে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে এ সম্ভাবনা যদি নাও থাকে তা হলেও কি কোনো প্রকৃত নৈতিক চেষ্টা কর্তব্য নয়?

নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরিণাম সর্বনাশ একথা কেবল বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেই যদি কাজ হতো তা হলে এতোদিন একটা মীমাংসাও হয়ে যেতো কারণ একথা দুই প্রধান প্রতিপক্ষ নিরপেক্ষদের চেয়ে কিছু কম বুঝে না এবং সেকথা স্বীকার করতেও দ্বিধা করে না। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে হিংসা অকেজো হয়ে গেছে কারণ চরম অস্ত্র ব্যবহারের অর্থ যদি হয় উভয়পক্ষের সর্বনাশ, উভয়পক্ষের নয়, সকল মানুষের সর্বনাশ তবে সেটা অস্ত্র হিসাবেও বাতিল সুতরাং "নিউক্লিয়ার যুগে মানুষ অহিংস উপায়ে দ্বন্দ্বনিরসনের পথে যেতে বাধ্য—এসব কথা "লজিক্যাল" হতে পারে কিন্তু যেটা "লজিক্যাল" সেটা লজিক্যাল বলেই মানুষ না করে পারবে না এরূপ মনে করা ভুল। নিউক্লিয়ার যুদ্ধের দ্বারা মানুষ জাতি আত্মঘাতী হবে না অথবা নিউক্লিয়ার শক্তির অপব্যবহারের ফলে মানবজাতি একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যাবে না এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যায় না। সেই পরিণাম কেবল বিশুদ্ধ তার্কিকতা অর্থাৎ "লজিক দিয়ে" নিবারণ করা যাবে না, তার জন্য অন্যশক্তি আবশ্যক। তাকেই নৈতিক শক্তি বলা হচ্ছে। সেই শক্তির অন্বেষণ ও প্রয়োগ আবশ্যক। তার জন্য ত্যাগের প্রয়োজন আছে এই ধারণা মানুষের অভিজ্ঞতার ফল। নিরপেক্ষ দেশগুলি যে-পথে কিছুটা ত্যাগের শক্তি দেখাতে পারে তার ইংগিত এখানে করা হচ্ছে।

অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে যে-ধরনের বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করে নূতন স্বাধীন-হওয়া দেশগুলি নিজেদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে সেটা ঠিক পথ নয়, এর ভিতর এমন দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে যেটা অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিক দিয়ে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস হলে সেটা মংগলের কথাই হবে। সেদিক থেকে দেখলে বিদেশী সাহায্য বর্জন করা অনেক বিষয়ে বর্তমান সাহায্য গ্রহণকারী দেশসমূহের পক্ষে, অন্ততপক্ষে কোনো কোনো দেশের পক্ষে মঙ্গলই কল্যাণকর হবে, সুতরাং সে-বর্জনকে ত্যাগের পর্যায়ে ফেলা হয়ত ঠিক হবে না। কিন্তু বর্তমানে এই সব দেশের যাঁরা কর্তা তাঁরা তা মনে করেন না, তাঁরা দেশের উন্নতির জন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলেই মনে করেন। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টিতে আমেরিকা এবং ... কাছে হাত-না-পাতা একটা ত্যাগ বলেই মনে হবে এবং সেই ত্যাগ করতে গেলে যে আনুষংগিক যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেগুলোর জন্য বীর্যের প্রয়োজন হবে। তাই থেকে হয়ত নিরপেক্ষ দেশগুলির ভিতর থেকে একটা শক্তির স্ফুরণ হবে যেটা মানবজাতির সম্মুখে আজ যে বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তার মীমাংসার সহায়ক হবে।

এখানে নৈতিকতার বড়াই-এর কোনো কথাই উঠে না। যারা নিউক্লিয়ার অস্ত্রের আবিষ্কারক বা অধিকারী নয় তাঁদের চেয়ে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের আবিষ্কারক ও অধিকারীরা নৈতিক দৃষ্টিতে খাটো এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। বর্তমান সমস্যা মীমাংসার জন্য তাঁদের দিক থেকে বিপুলতর ত্যাগ শক্তি আবশ্যক হবে। যদি মনে করা হয় যে, তাঁদের সে-শক্তি নেই বা ভবিষ্যতে হবে না তা হলে সব আশা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হয় কারণ নিরপেক্ষদের—যাঁদের বর্তমানে নিউক্লিয়ার অস্ত্র নেই বা তৈরী করার ক্ষমতা নেই কেবলমাত্র তাঁদের—ত্যাগ শক্তি সমস্যা সমাধানের পক্ষে কখনই পর্যাপ্ত হবে না।

১৭।৪।৬২

অ্যানালগ

বাতায়নিক

'কমিক' দেখে আজগুবী ভাবনা ভাবার কথা লিখেছি। লিখে সন্দেহ হ'ল নিজে থেকে ধরা দেওয়াটা ঠিক হ'ল কি না। কিন্তু ধরা যখন পড়েছি তখন স্বীকা'র করাই ভালো যে কাগজে 'কমিক' চোখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে পাতা উল্টে যাই না। 'কমিক'-এর ছবি দেখবার কিছু দুর্বলতা আমার আছে। এ দুর্বলতা যাঁদের আছে আজকের দিনে দলে তাঁরা একরকম ভারীই মনে হয়। খবরের কাগজ কি সেরকম সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে পড়লে পাতা উল্টে যথাস্থানে একবার উঁকি দেন না এমন শুচিবাতিকগ্রস্ত রুচিনিষ্ঠ পাঠক বোধহয় খুব কম।

'কমিক' বস্তুটি বিদেশের আমদানি, সম্ভবতঃ মার্কিন মুলুকেই তার জন্ম এবং তা-ও খুব বেশী দিনের কথা নয়। যেখানেই শুরু হয়ে থাক, 'কমিক' আজ প্রায় বিশ্বময় যে ছড়িয়ে গেছে যে কোনো জনপ্রিয় খবরের কাগজ খুললে তার প্রমাণ মিলবে। ছবির সারিতে ছিটেফোঁটা কথা ছড়িয়ে এক ধরনের আজগুবি উদ্ভট গল্প ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে যাওয়ার এ হুজুগে প্রায় সব দেশের কাগজকেই পেয়ে বসেছে।

'কমিক' শব্দটার নিজস্ব ভাষাগত অর্থে যে হাস্যকরতার ইঙ্গিত আছে তাই বহন করেই সাধারণত কমিক ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল। কিন্তু গোড়ার দিকে কৌতুক রসই সার করলেও বর্তমানে ও দেশের 'কমিক' অন্য রসের ক্ষেত্রেও চড়াও হয়েছে। 'কমিক' বলতে আভিধানিক অর্থে শুধু শুধু কৌতুকময়তা আর বোঝায় না। 'কমিক' ছবি দিয়ে সেক্সপীয়ারের নাটকের গল্পও সরল করে দেখাবার দুশ্চেষ্টা ও-দেশে হয়েছে।

এ সব অনাচার বাদ দিলে 'কমিক' সাধারণত নিজস্ব একটি ধারাই অনুসরণ করে আসছে বলা চলে। সে ধারা কৌতুক প্রধান কি না এবং তা যদি হয় তাহলে সে কৌতুক কি জাতীয় একটু বিচার করে দেখতে ইচ্ছে করে।

বিশুদ্ধ কৌতুক রসের কিছু 'কমিক' ও-দেশে চলতি হলেও আমাদের দেশে সাধারণত যে কটি ধারাবাহিক কমিক জনপ্রিয় হয়েছে, সেগুলির বেশীর ভাগ উদ্ভট ও অতি স্থূল আজগুবী কল্পনা দিয়ে বোনা। হাস্যকরতা যদি তার মধ্যে কিছু থাকে তা শুধু তার কাহিনীর দুর্বল এক-ঘেয়েমিতে ও কল্পনার দীনতায়। আমাদের

মনের স্বাভাবিক বীর পূজার বিকৃতির সংগে সুলভ ইচ্ছাপূরণের মশলা মিশিয়ে সে কমিক বাজারে চলে। নিজের ভুয়ো বাহাদুরীতে এমন মুগ্ধ তন্ময় না হয়ে নিজেকে হাস্যাস্পদ করেই হয়ত তা আরেক সার্থকতা পেতে পারত। কিন্তু নিজেকে নিয়ে পরিহাস করবার সে ক্ষমতা তার নেই।

'কমিক' সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়েও কেন যে তবু সকাল বেলা খবরের কাগজের 'কমিক'-এর পাতাটা না উল্টে পারি না আমার এক 'কমিক'-রসিক বন্ধু তার একটি ব্যাখ্যা খুঁজে বার করেছেন। তাঁর মতে 'কমিক' আমরা দেখি রূপকথার ক্ষুধা মেটাতে। 'কমিক'-ই এ যুগের রূপকথা, তিনি বলতে চান।

'কমিক' রসিক বন্ধুর প্রথম উক্তিটা মেনে নিতে পারলেও তাঁর দ্বিতীয় মতে সায় দিতে পারি না। রূপকথার ক্ষুধা যে মানুষের চিরন্তন আর শুধু শৈশবেই নয়, সব বয়সেই সে ক্ষুধা যে সমান জাগ্রত এ বিষয়ে আমার মনে কোন সংশয় নেই।

প্রত্যেক যুগ তার নিজস্ব রূপকথা খোঁজে, কারণ নিজের বিশুদ্ধ প্রাণধর্মের সত্যিকার সন্ধান শুধু রূপকথাই দিতে পারে। সময়ের স্রোত বর্তমানের যে আনুষঙ্গিক আবিলতায় দূষিত হয়ে থাকে তা থেকে তার স্বচ্ছ শুদ্ধ ধারা ছেঁকে তুলতে পারে একমাত্র রূপকথা। এই যন্ত্র-জটিল ও যন্ত্রণাজর্জর যুগেও রূপকথার ক্ষুধাতেই আমরা 'কমিক'-এর পাতা হয়ত ওল্টাই কিন্তু সে ক্ষুধা সেখানে মেটে কি? দুধের তৃষ্ণা মেটাতে তা ঘোলা জল বলেই সন্দেহ হয়।

রাগলে গালাগাল না দিন মনের ঝাঁঝ ভাষায় কোন ভাবে প্রকাশ করেন না এমন মানুষ বিরল। সাধারণ মানুষ সব সময়ে অসভ্য অশ্লীল কিছু উচ্চারণ না করলেও কিছু একটা বলে গায়ের ঝাল মেটায়, তার অর্থ কিছু হোক বা না হোক, ইংরাজিতে Swearingটা এক অর্থে এই কাজ সারে। বাংলায় 'চুলোয় যাক' 'নিকুচি করেছে' 'ভালো জ্বালা' ইত্যাদি বাক্য সেই উদ্দেশ্যই সাধন করে ভদ্র সমাজে। মনের অতিরিক্ত উত্তাপ বার করে দেবার এ সব রাস্তা ব্যক্তির ও জাতির পক্ষে এক হিসেবে স্বাস্থ্যকর বলেই মনে হয়। সাহিত্যে সম্পূর্ণ জায়গা পাক্ বা না পাক প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই এ জাতীয় শব্দ ও বাক্য তাই প্রচুর।

একমাত্র ব্যতিক্রম বলে ধারণা ছিল বুঝি জাপানী ভাষা। বিদেশীরা জাপানে গিয়ে সব চেয়ে মুগ্ধ হন তাদের সৌন্দর্যবোধে আর সৌজন্যে। চোখের দৃষ্টিতে কুৎসিত কিছু সেখানে খুঁজে পাওয়া যেমন কঠিন, কানে কদর্য কিছু শোনাও তেমনি। জাপানী ভাষার চর্চা যে সব বিদেশী অল্পবিস্তর করেছেন তাঁরা গায়ের ঝাল মেটাবার মত ঝাঁঝালো কিছু সেখানে খুঁজে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে যে জাপানীরা চটলেও ভাষায় তা প্রকাশ করে না বা করতে জানে না। চড়া মেজাজকে ঠাণ্ডা করবার এই Safety valve বা আপত্তারণ বন্ধ না থাকায় জাতিগত মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের চিন্তিতও করেছে অনেকখানি।

সম্প্রতি এ রহস্যের একটা হদিশ মিলেছে শোনা যাচ্ছে। জাপানী ভাষায় গালমন্দ রাগ-বিরক্তির ঝাঁঝালো কথা যে বিদেশীদের কানে বাজে না তার কারণ তাঁরা নিজেদের ভাষার প্রতিরূপই সেখানে খোঁজেন। গায়ের ঝাল মেটাবার কথা জাপানীতে আছে কিন্তু তার ভোল একেবারে পাল্টানো। বিদেশীদের অনভ্যস্ত কানে তা ধরা পড়ে না।

উষ্মা প্রকাশ করতে কি গালমন্দ দিতে জাপানীরা যা ব্যবহার করে তা চরিত্র কি বংশপরিচয় ধরে টান মারা গনগনে বিশেষ্য কি বিশেষণ নয়, তীব্রতার নানা স্তরের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ মাত্র। তাই দিয়েই অতি সুললিত শোভন কণ্ঠে তারা নাকি বিপক্ষকে একেবারে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দিতে পারে।

বিস্ফোরণ থেকে বাঁচবার নিরাপদ ফাটো জাপানী ভাষায় আছে জেনে নিশ্চিন্ত হই বা না হই, শুধু তাই জানিয়ে নিজকে বা কাউকে আশ্বস্ত করবার জন্যে এ প্রসঙ্গ তুলিনি। ব্যক্তি-গত জীবনে যেমন, জাতিগত চরিত্রে সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে ও ভাষার তেমনি সহজ স্বাভাবিকতার প্রয়োজন যে কতখানি তারই কিছুটা এই প্রসঙ্গ থেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। যত রাজ্যের নোংরা জঞ্জাল জড় করা যেমন সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি নয়, তেমনি শুচিবাই-এর সিকেয় তুলে রেখেও এ সব সার্থক করা যায় না। দরবারী আদবকায়দার মত দরবারী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নাসিক রেওয়াজের এক এক সময়ে বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তার বাঁধা সাজানো শোভার কৃত্রিমতা ঘোলা জলের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়াও তখন বোধহয় ভালো।

আলোচনা

ধ্বনি

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

জর্মন ভাষার "বিদেশী শিক্ষক" হওয়ার জন্যে জার্মান সরকারের বৃত্তি পাইয়া সম্প্রতি ট্রেনিং-এর জন্যে আমি এ দেশে আসিয়াছি। স্বভাবতই জর্মন ভাষা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ অসীম। ইদানীং দেশে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের "ধ্বনি" প্রবন্ধটি তাই আমি আগ্রহ সহকারেই পড়িয়াছি। আলী সাহেবের প্রবন্ধের মূল্য বাংলা ভাষার পাঠকগোষ্ঠীর কাছে অনেকখানি। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকটি ত্রুটি থাকায় সাধারণ পাঠকের ভ্রম নিরসনের জন্য কয়েকটি কথা না লিখিয়া পারিতেছি না।

তিনি লিখিয়াছেন—(দেশ পৃঃ ১০৯) "জর্মনরা ট ও ড উচ্চারণ করে কিন্তু বেভেরিয়ার (বাভারিয়া, বেভেরিয়া নয়) উপভাষায় আমি "ত ও দ"ই শুনেছি।" ভাবটা যেন জর্মনে ট ও ড নাই। কোন লেখক যখন বিদেশী পাঠকগোষ্ঠীর জন্য উচ্চারণ-পদ্ধতির নিয়ম দেন তখন আমার মতে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার উল্লেখ না করাই উচিত। কেননা তা না হইলে কোন নিয়মই দেওয়া যাইবে না। এ স্থলে শব্দগুলি "উচ্চভাষার" (gehobenes Deutsch অথবা Buhnendeutsch) উচ্চারণের নিয়মের সিদ্ধান্তে আসাই প্রশস্ত। তা ছাড়া জর্মনে বাংলা ট ও ড-এর মত প্রচুর 'ট' ও 'ড' উচ্চারণ আছে—যেমন Doppel, Dort, Dose, Dozent, Draht, Drache, Daumen ইত্যাদি Topb, Torte, Tortur, Teich, Tasche ইত্যাদি। (৩০২ পৃঃ) "শিলেবলের শেষে b ও d যথাক্রমে p ও t উচ্চারিত হয়।" এ নিয়ম ঠিক নয়—যেমন—Gelb গেল্প, Grob গ্রোব্, Grab গ্রাব্ ইত্যাদি Abend আবেন্ড্, Elend এলেন্ড্ ইত্যাদি। (৩০১ পৃঃ) "হ্রস্ব এ জর্মনে নেই, সংস্কৃতেও নেই।" সংস্কৃতে নেই কিনা জানি না, তবে জর্মনে অনেক আছে। জর্মনে হ্রস্ব এ নেই বলিলে "হিমালয়ভুল" হইবে। যেমন—Fett, Fell, Bett, Brett ইত্যাদি। (আলী সাহেব নিশ্চয়ই জর্মন Kurzes "e" সম্বন্ধে শুনিয়াছেন।) এক জায়গায় লিখিয়াছেন "জর্মন V-এর উচ্চারণ সাধারণতঃ জর্মন t অর্থাৎ ইংরেজী f-এর মত।" নিয়মটি ঠিকই তবে আরও নির্দিষ্টভাবে দেওয়া যাইতে পারিত। যেমন শব্দের প্রথম অক্ষর V হইলে

t উচ্চারণ আর শব্দের মাঝখানে V হইলে ইংরেজী V এর উচ্চারণ। যেমন Vogel ফোগেল, Vitamin ফিটামিন, Vieh ফি, Viel ফিল, Vizeprasident ফিৎসে-প্রেজিডেন্ট, f-এর মত, অপর দিকে Klavier, Kavalier, brav V-এর মত। এক জায়গায় Bahn শব্দের অর্থ রেল লিখিয়াছেন। এটি একটি ভুল। Bahn শব্দের অনেক অর্থ তবে মোটামুটি অর্থ রাস্তা বা পথ। কিন্তু অন্য শব্দের সঙ্গে যোগ করিলে অন্য অর্থ হয়—যেমন Strapenbahn ট্রাম, Eisenbahn রেল, Flugbahn (trajectory), Lautbahn, Seilbahn ইত্যাদি। ৩০২ পাতায় লিখিয়াছেন ich শোনায় Ik। এটি যে কত বড় ভুল তাহা বলার নয়। ich-এর প্রকৃত উচ্চারণ আমার মতে বাংলা বা ইংরাজী অক্ষরের সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নয়—যেমন সম্ভব নয় Kirche-এর উচ্চারণ দেওয়া। উপযুক্ত গুরুর সাহায্যেই এটি আয়ত্ত করিতে হয়—তবে তাহাতেও অনেক সময় লাগে।

বিনীত
সুধাংশু দেবরায়
মিউনিক। ওয়েস্ট জার্মানী।

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

ধ্বনির সঙ্গে পরিচয় "কানের ভিতর দিয়া"। শুধু ছাপার অক্ষরে দেখে বা phonetics এর বই পড়ে তাকে কল্পনা করতে যাওয়া বৃথা। তবে কথা না বলেও শুধু লিখে খানিকটা ধারণা দেওয়া সম্ভব, যদি ধ্বনি লেখকের "মরমে পশে" থাকে। অন্তত একথা বলতে হয়না "But-এর 'T' আমাদের খাঁটি 'ট'।" সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের "ধ্বনি" প্রবন্ধে এমন অনেক সরল পাঠ চোখে পড়ে।

আরও মজার কথা, সেগুলি ধীরে সুস্থে ভাববার সুযোগ না দিয়েই এল তার সমালোচনা। সব কিছু ধীরে সুস্থে করাই ভাল, তাড়াহুড়ো করলে কী বলতে কী বেরিয়ে যায় আলী সাহেবের প্রবন্ধ ও দেবব্রত চক্রবর্তী মশাইয়ের আলোচনা তার সরব সাক্ষী। সব তুলে ধরতে গেলে বিস্তারের জায়গা থাকবেনা, তাই একটি দুটি নমুনা দেখিয়েই ক্ষান্ত হব।

BUT-এর T আমাদের খাঁটি 'ট' নয়— উত্তম। কিন্তু বোঝাতে গিয়ে চক্রবর্তী মশাই বলছেন, "সাহেবদের অর্থাৎ ইংরেজদের t, d, উচ্চারিত হয় ত, দ হিসাবে ......তারপর জিবের কাঠিন্যের জন্য আমাদের অনভ্যস্ত কানে 'ট' এবং 'ঠ'-এর মাঝখানে কিছু একটা হয়ে দাঁড়ায়।" চক্রবর্তী মশাই ইংরেজের বাণী শ্রবণে নিশ্চয়ই [illegible] থাকবেন। যদি "সাহেবের" T তাঁর কানে 'ত' ছাড়া অন্য কিছু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে জানবেন, তা অনভ্যস্ত কানের জন্য তো নয়ই বরং অতি অভ্যস্ত কানের জন্য। 'ত' T ও ট এরা শুধু মাত্র অভ্যস্ত কানেই তিনটি স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসাবে ধরা পড়ে। অনভ্যস্ত কানে BUT-এর T-কে ত বা ট-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা স্বাভাবিক।

ধ্বনিতত্ত্বের পরিভাষার শোভাযাত্রা করে 'ত', T ট-র নিজ নিজ স্বতন্ত্র রূপ [illegible] ফোটানো যাবেনা। 'ত' মনে করে dental বা দন্ত্য। 'T' মনে করে alveoral বা দন্তমূলীয়, ট মনে করে retroflex (মূর্ধন্য কি?) এতেও [illegible] ধ্বনি "মরমে পশিল" না। একটু [illegible] করা যাক। আমাদের 'ত' [illegible] জানিই, ফরাসী 'pate' ([illegible] paste) বলতে যে দ্বিতীয় [illegible] হুবহু আমাদের 'ত' কিন্তু কদাপি ইংরেজের 'T' নয়। উচ্চারণের সময় লক্ষ্য [illegible] দেখবেন, ত-র বেলা জিবের ডগা [illegible] পাটির দাঁতের ভিতরের দেয়ালে [illegible] যাচ্ছে। খোদ দাঁতে লাগছে [illegible] ইংরেজী State-এর t উচ্চারণের [illegible] লক্ষ্য করলে দেখবেন, জিবের ডগা [illegible] পর্যন্ত যাচ্ছে না—দাঁতের গোড়ার [illegible] মাড়িতে লাগছে। অবশ্য যেমন করে [illegible] উচ্চারণ করে তেমনি করে করতে [illegible] ও T-র তফাত তখন কানে ও জিবে [illegible] জায়গাতেই অনুভব করতে পারবেন। তেমনি অনুভব করুন 'T' ও ট-র [illegible] 'T'-র সময় জিবের ডগা ছিল দাঁতের [illegible] "কটক" বলতে গিয়ে তাকে টেনে [illegible] হল পিছনে, তালুর প্রায় মাঝামাঝি, [illegible] জিবের ডগা খানিকটা পিছনের দিকে [illegible] গেল। গায়ের জোরে নয়, প্রকৃতই।

মোটামুটি এই হল ত, T, ট-র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য। আলী সাহেব T-কে ট [illegible] করে চক্রবর্তী মশাইয়ের চোখ [illegible] খেলেন। অথচ চক্রবর্তী মশাইয়ের নিজের

উপসংহার : ইংরেজের T "আমাদের অনভ্যস্ত কানে ট এবং ঠ-র মাঝামাঝি একটা কিছু হয়ে দাঁড়ায়।" আলী সাহেবের দোষটা তবে কোথায়? 'ট' ও ত-র মাঝখানে বললে মানে হত। তারপর "ইংরিজীতে তথা যাবতীয় ইন্ডো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে (এক ভারতীয় ভাষা ভিন্ন) শুধ 'ট' 'ড' নেই।" অবশ্য সেই জানত। আবার তখুনি "জার্মানে 'ট' কয়েক জায়গায় উচ্চারিত হয়।" সেই ইংরেজী 'T' আর 'ট'তে মাখামাখি। পূর্ববঙ্গের কৌতুকটা মনে পড়ে : "আমি তো কই হোনা, আপনারা হুইনতে হোনেন হোণা।" টীকা নিষ্প্রয়োজন।

"Palato-dental" (Paleto নয়) মানে তালব্য-জিহ্বা? Palate মানে নিঃসন্দেহে তালু; অতএব dental শব্দটি অবশ্যই জিহ্বা ঘটিত! কী করবেন?

"ওদের (ইংরেজদের) কাছে 'চ' হয়ে যায় 'চ্ছ'। প্রলাপ যেন। 'চ্ছ' যদি হয় "আচ্ছা"র চয়ে-ছয়ে, তবে ইংরেজ নয়-ছয় হয়ে গেলেও ওর কাছাকাছি একটা কিছু উচ্চারণ করতে পারবেনা, সারাদিন বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রাখলেও না। ইংরেজের ch-কে চ্ছক্রবর্তী মশাই 'চ্ছ' করে দিলেন এই আইন অনুসারেঃ "ইংরেজের শব্দে বাঞ্জন বর্ণ নাস্তি—সবই সার্ধ মহাপ্রাণ।" মানে সবই খ, ছ, ঠ, থ, ফ বা ঘ ঝ ঢ ধ ভ-র মত! কপাল আমার। ইংরেজ বাস্তবিকই মহাপ্রাণ, তাই তার ভাষার উপর এই অত্যাচার সহ্য করে।

ইংরেজীতে K, P, T এই তিনটি ধ্বনি (বর্ণ নয়, কারণ ক-জাতীয় C-ও এর অন্তর্ভুক্ত) যদি শব্দের আদিতে থাকে তবে সামান্য মহাপ্রাণ ধর্মী হয়ে পড়ে, তখন K শোনায় 'খ' নয় তবু যেন খ, P শোনায় ফ নয় তবু যেন ফ, T-ও অনুরূপ শোনায়, তবে 'ঠ' দিয়ে না বোঝানোই ভাল। ইংরেজীতে K, P, T ছাড়া আর কারও এ ধর্ম নেই (chএর নেই যে ছ হবে)। "ইংরেজীর সবই মহাপ্রাণ" এই আশ্বাসবাণী পেয়ে অতঃপর পরশুরামের মিঃ ও. কে. সেন অনেকদিন চুপ করে থাকবার পর আবার "বিরিঞ্চিবাবা"র পৃষ্ঠা থেকে একবার সজোরে হেঁকে উঠবেন "মাই ঘড্!"

"পেডান্‌টিসিটি" কী বস্তু জানতে উৎসুক থাকলাম। আমরা সেকেলে লোক, ইংরেজের অভিধানে যা নেই তা দেখলে বড় ভয় পাই। Pedantry Pedanticism, Pedantism—এদের চিনি। ত্রুটি মার্জনীয়। ইতি—

সন্তোষ সেন,
কলিকাতা

[ধ্বনি সম্পর্কে অনেকগুলি আলোচনা ছাপা হল। অতঃপর এ-বিষয়ে আর কোনো মতামত ছাপা হবে না। 'সম্পাদক—দেশ']

অন্ধকারে স্মৃতির শব

দিব্যেন্দু পালিত

অন্ধকারে স্মৃতির শব। পুরানো গম্বুজে
কে ওই আসে: দন্তহীন: শূন্যে যেন কার
পদধ্বনি: সে কি আমার বামে না দক্ষিণে!
নিকট হ'তে ক্রমশ দূরে, গোপন অলংকার
করুণ শব্দে বেজে ওঠে। শব্দগুলি চিনে
এক পা হাঁটি, দুই পা ফিরি চক্ষু যুগল বুজে।

ডেকো না দূরে, ডেকো না। আমি ভালোবাসার কথা
ভুলেছি সব। রক্তহীন মুখের প্রতিচ্ছবি
যতোই দেখি, যেন সে এক খোলা জলজ তৃণ—
চূর্ণ স্রোতে ভাসে: দিনের মরা আলোয় সবই
প্রোথিত হয়। গর্ভে যেমন ভ্রূণ কোনোদিনও
ভাবে না আলো, চায় না, আমি তেমনি নীরবতা

চেয়েছি। তবু কেন সে! তার ঐতিহাসিক নামে
খিলান কাঁপে, প্রকম্পিত বাতাস, পদধ্বনি।
দেরাজ খুলে দ্যাখে বুকের সতর্ক নির্ভয়;
সাদা হাতের শাণিত নখ হাতড়ে মরে খনি।

আমি কি তার স্মৃতির শব, পুরানো বিস্ময়!
নিরন্তর হারায় আমার দক্ষিণে ও বামে।

দ্বিতীয় মৃত্যু

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো পড়ন্ত বেলার বাতায়নে,
চতুর্দিকে গাঢ় অন্তরাল:
পল্লবমর্মরে আজ সব রৌদ্র অন্তিম শয়নে
যাদুকর পশ্চিমী মশাল।

দিগ্বিদিকে ঝলসে ওঠে বজ্রপ্রতিধ্বনিত অম্বর,
নিসর্গের চিত্রনাট্য বিষাদ, বিস্বাদ, প্রতারক:
পার্শ্ববর্তিনীর দেহ জ্বরতপ্ত প্রলাপী নির্ঝর,
তুমি, আমি, পুণ্যবাস ব্যবসায়ী এবং ঘাতক।

কাল তুমি ফিরে যাবে ভয়ংকর অদৃশ্য প্রপাতে,
সম্ভবত পরশু আমি: তারপর, তারও পরে এক
নির্জন নয়নবহ্নি জনপদে আন্তরিক অশনিসম্পাতে
পোড়াবে আশ্রয় আর সংঘবদ্ধ ভূতের বিবেক।

দেখো, স্তব্ধ নদী গ্রাম ফসলের সাজানো সমাজ
আলোর মরণশীল তরঙ্গে স্থাপিত:
পড়ন্ত বেলার ঐ বাতায়ন থেকে তুমি আজ
ধ্বংসের বিকল্প এক জাগরণে রবে প্রতিষ্ঠিত।

সবুজ ডানার নদী

ফণিভূষণ আচার্য

পাখিটা কঁকিয়ে ওঠে জ্যোৎস্না আর নির্জনতা চিরে।

আমায় কে ডেকে নেবে? সমস্ত আকাশ ধুয়ে প্রেম
আর কান্না ভেঙে পড়ে——
তোমার মুখের মতো চন্দ্রালোকে নিষ্পলক মহুয়ার নেশা
কোথাও পাখিটা কাঁদছে। কেন কাঁদে? কেন এই পূর্ণিমার ঝড়ে
প্রথম প্রেমের মতো যৌবনের নিরুদ্ধ অন্বেষা।

কোথাও রাত্রির চোখে আলো নেই, দৃষ্টিহীন ভিক্ষুকের
মতো এক অন্ধকার স্রোতে
অসংখ্য ব্যর্থতা নিয়ে বয়ে চলে নিরাকার মৃত্যুর গভীরে
সবুজ ডানার নদী। আমায় কে ডেকে নেবে? কোন্ উৎস হতে

পাখিটা কঁকিয়ে ওঠে হৃদয় এবং গাঢ় নির্জনতা চিরে।

॥ ১ ॥

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে ব্যোমকেশের সহিত যখন সত্যবতীর দাম্পত্য কলহ বাধিয়া যাইত, তখন আমি নিরপেক্ষভাবে বসিয়া মজা উপভোগ করিতাম। কিন্তু দাম্পত্য কলহে যখন স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির আপেক্ষিক উৎকর্ষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত তখন বাধ্য হইয়া আমাকে ব্যোমকেশের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইত। তবু, দুই পক্ষ একজোট হইয়াও সব সময় সত্যবতীর সহিত আঁটিয়া উঠিতাম না। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে পুরুষজাতির দুষ্কৃতির কাহিনী এত অপর্যাপ্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আছে যে তাহা খণ্ডন করা এক প্রকার অসম্ভব; শেষ পর্যন্ত আমাদের রণে ভঙ্গ দিতে হইত।

কিছুকাল হইতে কলিকাতা শহরে এক নূতন উৎপাতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, একদিন শীতের সকাল বেলা সংবাদপত্র সহযোগে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ ও আমি উহাই আলোচনা করিতেছিলাম। যে ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এইরূপ: একটি, কখনো বা একাধিক ভদ্রশ্রেণীর যুবতী মেয়ে সাজিয়া দুপুরবেলা বাহির হয়। পুরুষেরা তখন কাজে গিয়াছে, বাড়িতে মেয়েরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময় যুবতীরা গিয়া দরজায় টোকা মারে। বাড়ির গৃহিণী যদি সতর্ক হন তিনি দ্বার না খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করেন "কে?" একটি মধুর কণ্ঠ বাহির হইতে বলে—"লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ করা [illegible] ব্লাউজ এনেছি, দাম খুব সস্তা—দেখবেন?" গৃহিণী ভাবেন ফেরিওয়ালী, তিনি দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি যুবতীরা ঘরে ঢুকিয়া পড়ে, ছুরি বা পিস্তল দেখাইয়া টাকাকড়ি গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে।

এই ধরনের ঘটনা পূর্বে কয়েকবার ঘটিয়া গিয়াছে, আসামীরা ধরা পড়ে নাই। সেদিন কাগজ খুলিয়া দেখি অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে আগের দিন দুপুরবেলা কাশীপুরের একটি গৃহস্থের বাড়িতে। ব্যোমকেশকে খবরটি পড়িয়া শুনাইলাম। সে একটু বঙ্কিম হাসিয়া বলিল,—"এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! মেয়েরা তো দুপুরে ডাকাতি করবেই পারে।"

এই সময় সত্যবতী ঘরে প্রবেশ করিল। দোরের কাছে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশের পানে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া বলিল,—"আহা! মেয়েরা দুপুরে ডাকাতি করে, আর তোমরা সব সাধুপুরুষ!"

ব্যোমকেশ সত্যবতীকে শুনাইবার জন্য কথাটা বলে নাই, কিন্তু সত্যবতী যখন শুনিয়া ফেলিয়াছে এবং জবাব দিয়াছে তখন আর পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না। ব্যোমকেশ বলিল,—"আমরা সবাই সাধুপুরুষ এমন কথা বলি না। কিন্তু তোমাদের মত নই।"

দাম্পত্য কলহ আরম্ভ হইয়া গেল। সত্যবতী [illegible] বসিল, "মেয়েদের নিন্দে করা তোমাদের স্বভাব। মেয়েরা কী করেছে শুনি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বেশী কিছু নয়, দুপুরে ডাকাতি!"

আমি খবরের কাগজ হইতে দুপুরে ডাকাতির অংশটা পড়িয়া শুনাইলাম। সত্যবতী বলিল,—"বেশ, মেনে নিলাম, ওরা দোষ করেছে, পেটের দায়ে অন্যায় করেছে। কিন্তু তোমরা যে খুন-জখম করছ, যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার লোক মারছ, তার বেলা কিছু নয়? তোমাদের তুলনায় মেয়েরা ক'টা খুন করেছে?"

বেগতিক দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তোমরা এতদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিলে তাই বিশেষ সুবিধে করতে পারনি; এখন স্বাধীনতা পেয়ে তোমাদের বিক্রম বেড়েছে, ক্রমে আরো বাড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র কতকাল আগে দেবী চৌধুরাণীর কথা লিখে গেছেন। দেবী চৌধুরাণী সেকেলে মেয়ে ছিল, তাতেই এই। যদি একালের মেয়ে হত তা হলে কী কাণ্ডটা হত ভেবে দেখ [illegible]!"

সত্যবতী হাত নাড়িয়া বলিল, "ওসব বাজে কথা বলে আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। সত্যিকার ক'টা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারো যেখানে মেয়েমানুষ খুন করেছে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সত্যিকার দৃষ্টান্ত চাও? আরে এই তো সেদিন—বড় জোর মাস দুই হবে—জেনানা ফাটকের এক বন্দিনী জেলখানার গার্ডকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।"

সত্যবতী হাসিয়া উঠিল,—"দু' মাস আগে

একটা মেয়ে একটা খুন করেছিল। এই দু' মাসের মধ্যে তোমরা ক'টা খুন করেছ তার হিসেব দাও দেখি।"

আজকার কাগজেও একটা পুরুষ-কৃত খুনের খবর ছিল কিন্তু আমি তাহা চাপিয়া গেলাম; তৎপরিবর্তে বলিলাম,—"আজকের কাগজে স্ত্রীজাতির নৃশংসতার একটা গুরুতর দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটা ধোপা এক মহিলার দামী সিল্কের শাড়িতে খোঁচ লাগিয়েছিল, মহিলাটি বঁটি দিয়ে তার নাক কেটে নিয়েছেন। ধোপার অবস্থা শোচনীয়, হাসপাতালে আছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ।"

সত্যবতী নির্দয় হাসিয়া বলিল,—"মিছে কথা বলতেও তোমাদের জোড়া নেই। তোমরা সবাই মিথ্যেবাদী চোর ডাকাত খুনী—"

আমাদের তর্ক কতদূর গড়াইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বহির্দ্বারের কড়া খটখট শব্দে নড়িয়া উঠিল। সত্যবতী বিজয়িনীর ন্যায় উন্নত মস্তকে ভিতরে চলিয়া গেল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন; একটা পুরুষ্টুগোছের লম্বা খাম দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশের নামে খাম, প্রেরকের উল্লেখ নাই। তাহাকে খাম আনিয়া দিলে সে শঙ্কিতভাবে উহা টিপিয়া-টুপিয়া বলিল,—"নবীন লেখকের পাণ্ডুলিপি মনে হচ্ছে। প্রভাতের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

আমরা পুস্তক প্রকাশকের ব্যবসায় শরিক হইয়া পড়িবার পর হইতে উৎসাহশীল নবীন লেখকেরা প্রায়ই আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া থাকেন, তাই ব্যোমকেশ মোটা খামের চিঠি দেখিলেই ত্রস্ত হইয়া ওঠে।

বলিলাম,—"পাণ্ডুলিপি নাও হতে পারে। খুলেই দেখ না।"

সে বলিল,—"তুমিই খুলে দেখ।"

খাম খুলিলাম। পাণ্ডুলিপি নয় বটে, কিন্তু ব্যোমকেশকে কেহ লম্বা চিঠি লিখিয়াছে; প্রায় একটা ছোটগল্পের শামিল। ব্যোমকেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া তক্তপোশের উপর লম্বা হইল, বলিল,—"প্রেমপত্র নয় নিশ্চয়। সুতরাং তুমি পড়, আমি শুনি।"

তক্তপোশের পাশে চেয়ার টানিয়া বসিয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। হাতের লেখা খুব স্পষ্ট নয়, একটু কষ্ট করিয়া পড়িতে হয়; কিন্তু ভাষা বেশ ঝরঝরে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী মহাশয় সমীপে

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আমার নাম শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু। পুলিস আমাকে খুনের মামলায় জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাই নিরুপায় হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি। শক্তি থাকিলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতাম, আমার বক্তব্য মুখে বলিলে আরও পরিষ্কার হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আমি পক্ষাঘাতে অর্ধাঙ্গ পঙ্গু হইয়াছি, আমার বাম অঙ্গ অচল হইয়া পড়িয়াছে; ঘরের মধ্যে অল্প চলাফেরা করিতে পারি মাত্র। তাই বাধ্য হইয়া পত্র লিখিতেছি।

যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে আমার নিজের পরিচয় কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার বয়স এখন সাতান্ন বৎসর; স্ত্রী-পুত্র নাই, কেবল তিনটি বাড়ি আছে। বাড়িগুলি ভাড়া দিয়াছি, তন্মধ্যে একটি বাড়ির ভিতরের দুইটি ঘর লইয়া আমি থাকি। ভৃত্য রামাধীন আমার পরিচর্যা করে।

শিরোনামায় ঠিকানা দেখিয়া বুঝিবেন আমি কলিকাতার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে থাকি। রাস্তাটি বেশ চওড়া; যে-বাড়িতে আমি থাকি সেটি রাস্তার এক দিকে, আমার অন্য বাড়ি দু'টি প্রায় তাহার সামনাসামনি রাস্তার অপর দিকে। এই বাড়ি দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একতলা; ইহাদের যমজ বাড়ি বলিতে পারেন। দু'টি বাড়ির মাঝখান দিয়া খিড়কির দিকে যাইবার সরু গলি আছে।

আমি রোগে পঙ্গু, দু'টি ঘরের মধ্যেই আমার জীবন। পক্ষাঘাত হওয়ার আগে আমি দালালি করিতাম, অনেক ছুটাছুটি

করিয়াছি; ছুটোছুটি করিতেই আমি অভ্যস্ত। তাই এখন সারা বেলা জানালার সামনে বসিয়া থাকি, রাস্তার লোক চলাচল দেখি। একটি বাইনোকুলার কিনিয়াছি, তাহাই চোখে দিয়া দূরের দৃশ্য দেখি। বাইনোকুলার দিয়া অনেক বাড়ির ভিতরের দৃশ্যও দেখা যায়; আমার যমজ বাড়ির ভাড়াটেদের উপরও নজর রাখিতে পারি। যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা সিনেমা থিয়েটার দেখে; আমি জানালায় বসিয়া খালি চোখে প্রবহমান জীবনস্রোত দেখি এবং চোখে দূরবীন লাগাইয়া নেপথ্যদৃশ্য দেখি। কত বিচিত্র দৃশ্য যে দেখিয়াছি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কিন্তু সে-কথা যাক।

মাস দেড়েক আগে পৌষ মাসের মাঝামাঝি একটি ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। বেঁটে-খাটো চেহারা, ঘাড়-ছাঁটা তামাটে রঙের চুল, তরতরে মুখ, নাকের নীচে ছোট্ট একটি প্রজাপতি-গোঁফ আছে। পরনে দামী বিলাতী পোশাক, তাহার উপর ক্যামেল-হেয়ার কাপড়ের ওভারকোট। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—"আমার নাম তপন সেন। আসতে পারি?"

আমি তখন জানালার কাছে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, মুখ তুলিয়া বলিলাম,—"আসুন।"

তপন সেন আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া আমার সম্মুখে বসিল। আমি বলিলাম,—"কি দরকার বলুন তো?"

সে জানালার বাহিরে আঙুল দেখাইয়া বলিল,—"আপনার জোড়া-বাড়ির একটা বাড়ি খালি হয়েছে। তাই এলাম, যদি আমাকে ভাড়া দেন।"

বাড়িটা কিছুদিন হইতে খালি পড়িয়া ছিল। আগের ভাড়াটে বাড়ি তছনছ করিয়া দিয়া গিয়াছিল, আবার তাহা মেরামত ও চুনকাম করাইয়া রাখিয়াছিলাম; ঠিক করিয়াছিলাম ভাল ভাড়াটে না পাইলে ভাড়া দিব না। তপনকে দেখিয়া শুনিয়া ভালই মনে হইল, সাজপোশাক হইতে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার কি করা হয়?"

সে ওভারকোটের পকেট হইতে সিগারেটের কৌটা বাহির করিয়া আবার রাখিয়া দিল; বোধ হয় আমার বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্ভ্রমবশতই সিগারেট ধরাইল না। বলিল,—"খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি। নাইট এডিটার। সারা রাত কাজ করি আর সারা দিন ঘুমোই।" বলিয়া একটু হাসিল।

প্রশ্ন করিলাম,—"সংসারে কে কে আছে?"

সে স্মিতমুখে বলিল,—"সবেমাত্র সংসার পত্তন করেছি। আমি আর আমার স্ত্রী। আর কেউ নেই।"

মনে মনে খুশী হইলাম। ছেলেপিলে থাকিলে বাড়ি নষ্ট করে, দেয়ালে কালি দিয়া ছবি আঁকে। বলিলাম,—"বেশ, আপনাকে ভাড়া দেব। দেড় শো টাকা ভাড়া।"

সে ইতস্তত করিয়া বলিল,—"আমার পক্ষে একটু বেশী হয়ে যায়—"

বলিলাম,—"সাজানো বাড়ি। খাট-বিছানা টেবিল-চেয়ার কার্পেট সব পাবেন।"

—"আমার নাম তপন সেন। আসতে পারি?"

"আচ্ছা, তা হলে রাজী। বাড়িটা একবার দেখতে পারি কি?"

চাবি দিলাম, তপন সেন গিয়া বাড়ি দেখিয়া আসিল। তারপর দেড় শো টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল,—"এই নিন এক মাসের ভাড়া।"

আমি টাকার রসিদ লিখিয়া দিয়া বলিলাম,—"কবে থেকে বাড়িতে আসবেন?"

সে বলিল, "কাল ইংরেজী মাসের পয়লা। বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে, যদি অনুমতি দেন আজই কোনো সময় আসতে পারি।"

বলিলাম,—"বেশ, যখন ইচ্ছে আসবেন।"

তপন সেন চাবি লইয়া চলিয়া গেল। ভাল ভাড়াটে পাইয়াছি ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইলাম।

সেদিন সারা বিকালবেলা জানালায় বসিয়া বাড়ির দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু তপন তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিল না।

সকাল বেলা জানালা খুলিয়া দেখি উহারা আসিয়াছে। সদর দরজা খোলা। নিশ্চয় রাত্রে কোনো সময় মালপত্র লইয়া আসিয়াছে।

আমার কৌতূহলী চক্ষু ওই দিকেই যাতায়াত করিতে লাগিল। বেলা সাড়ে নটার সময় একটি যুবতী আসিয়া ভিতর দিক হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর কয়েক মিনিট পরে ওইদিকে খিড়কি দরজার গলি দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

তখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। লম্বা ছিমছাম চেহারা, মাথায় একমাথা চুল এলো খোঁপার আকারে ঘাড়ের উপর বিলম্বিত, হাতে একটি ছোট অ্যাটাচি-কেস। ভাবিলাম, সারা রাত কাজ করিয়া তপন ঘুমাইতেছে, ওই তার বউ বাজার করিতে চলিয়াছে।

কিন্তু দুপুর কাটিয়া গেল সে ফিরিয়া আসিল না। একেবারে ফিরিল অপরাহ্নে আন্দাজ চারটার সময়। সদর দরজার কড়া নাড়িল না, গলি দিয়া খিড়কির দিকে চলিয়া গেল। বোধ হয় স্বামী মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে আমি রামাধীনকে পাঠাইলাম। নূতন ভাড়াটে, তাহাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ-খবর লওয়া দরকার

জানালায় বসিয়া দেখিলাম রামাধীন গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িল। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। রামাধীনের সহিত কথা বলিয়া মেয়েটি একবার চোখ তুলিয়া আমার জানালার পানে চাহিল, তারপর রামাধীনের সঙ্গে দ্বিতলে আমার কাছে উঠিয়া আসিল।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন কাছে হইতে দেখিলাম। ভারি সুশ্রী চেহারা, লম্বা একহারা, মেদ-গ্রন্থির বাহুল্য নাই; বাঁ গালের উপর মসুরের মত একটি লাল তিল, তাহাতে মুখের লালিত্য আরও বাড়িয়াছে। একটি বিষয় লক্ষ করিলাম, স্বামী-স্ত্রীর বয়স প্রায় একই রকম—তেইশ চব্বিশ। হয়তো প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছে। আজকাল তো কতই এমন দেখা যায়।

ছোট্ট নমস্কার করিয়া বলিল,—'আমার নাম শান্তা। আমাদের কোনো অসুবিধে নেই; খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছি।' তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী যেমন মিষ্ট, গলার স্বরও তেমনি নরম।

বলিলাম,—'বসুন। আপনি—'

সে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

বলিলাম,—'তা—আচ্ছা। তোমাদের ঝি-চাকর যদি দরকার থাকে, নতুন পাড়ায় এসেছ—'

সে বলিল,—'ঝি-চাকরের দরকার নেই। দু'জনের সংসার, আমি একাই সব কাজ সামলে নিতে পারব।'

বলিলাম,—'বেশ বেশ। তা—আজ তুমি

সে সলজ্জভাবে বলিল—'হ্যাঁ—সারারাত ঘুমোতে পায় না, তাই—

সকালবেলা বেরিয়েছিলে, এখন ফিরলে। সারা দিন কোথায় ছিলে?'

সে বলিল,—'আমি স্কুলে পড়াই। চেতলার দিকে একটা ছোট মেয়েদের স্কুল আছে, সেখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করি।—আচ্ছা, আজ যাই, ওর খাবার তৈরি করতে হবে। সন্ধ্যার পর ও কাজে বেরবে।'

শান্তা একটু হাসিয়া ঘাড় হেলাইয়া চলিয়া গেল।

ইহাদের দু'জনকেই আমার ভাল লাগিয়াছে। বর্তমানে ভাড়াটেদের লইয়াই আমার জীবন। তাহারা আমার বাড়িতে বাস করে, ভাড়া দেয়, নিজের ধান্দায় থাকে, মেলামেশা নাই। জোড়া-বাড়ির অন্য অংশে একটি মাদ্রাজী পরিবার থাকে; তাহারা আমার ভাষা বোঝে না, কেবল মাসান্তে ভাড়া দিয়া রসিদ লইয়া যায়। ইহাদের সহিত আমার হৃদয়ের কোনও যোগ নাই। কিন্তু এই নবীন বাঙালী দম্পতি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

জানালায় বসিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর তপন কোট, প্যান্ট ও ওভারকোট চড়াইয়া খিড়কির গলি দিয়া বাহির হইল, বাড়ির সামনে ল্যাম্পের নীচে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল, তারপর [illegible] দিকে চলিয়া গেল। সারা রাত বাহিরে থাকিবে, ভোরের দিকে কাজ শেষ করিয়া ফিরিবে।

অতঃপর উহাদের নিয়ম-বাঁধা জীবন চলিতে লাগিল। সকালে সাড়ে [illegible] শান্তা স্কুলে পড়াইতে চলিয়া যায়, [illegible] ফিরিয়া আসে। তপন সন্ধ্যার পর বাহির হয়, রাত্রে কখন ফেরে জানি না। উহাদের জীবনযাত্রা অতি শান্ত, বাড়িতে কেহ আসে না, হয়তো বন্ধুবান্ধব [illegible] কেহ কাছাকাছি নাই। তপন [illegible] রাত্রে বাহির হইবার পর বাড়ির [illegible]

বাতি নিবিয়া যায়, কেবল সামনের ঘরে মৃদু মোমবাতি জ্বলে। তাহাও আটটা বাজিতে না বাজিতে নিবিয়া যায়। শান্তা বোধ হয় সারা দিনের ক্লান্তির পর তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়ে।

উহাদের বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট কৌতূহল আছে, তাই যখন তখন চোখে দূরবীন লাগাইয়া বাড়িটা দেখি। কিন্তু বাহির হইতে বাড়ির অভ্যন্তর কিছুই দেখা যায় না; সদর দরজা যেমন বন্ধ থাকে, সদরের জানালায় তেমনি পর্দা টানা থাকে। কেবল রাত্রিকালে পর্দার ভিতর দিয়া মোমবাতির মোলায়েম আলো দেখা যায়।

একদিন রবিবার সকালবেলা শান্তা আসিয়া খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্পসল্প করিল। আমি রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, —তোমার কর্তাটি এখনো ঘুমোচ্ছেন বুঝি?

সে সলজ্জভাবে বলিল, —হ্যাঁ, সারারাত ঘুমোতে পায় না, তাই—'

আমি বলিলাম, —তুমি রাত্রে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালো না দেখেছি। কেন বলো দেখি?'

শান্তা সচকিত হইয়া বলিল, —উনি চোখ ভাল নয়, উজ্জ্বল আলো সহ্য হয় না। ও আবার কম আলোয় দেখতে পায় না। তাই ও চলে গেলেই ইলেকট্রিক নিবিয়ে পিদিম জ্বালি। আপনি লক্ষ্য করেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি তো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই জানালার ধারেই বসে থাকি।'

শান্তা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, ছিল, সত্যি, আপনার তো কোথাও যাবার উপায় নেই। তা আমি মাঝে মাঝে আসব, ওকেও পাঠিয়ে দেব।'

এইভাবে চলিতেছে। একদিন সন্ধ্যার পর উপেনও কাজে যাইবার পথে আমার কাছে আসিয়া দুই চারিটা কথা বলিয়া গেল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম।

আমি সাধারণত রাত্রি সাড়ে দশটার সময় শয়ন করি। কিন্তু আমার অনিদ্রা রোগ আছে, মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না, তখন প্রায় সারা রাত জাগিয়া থাকি। দুই হপ্তা আগে রাত্রে যথাসময়ে শয়ন করিলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বারোটা পর্যন্ত সাধ্যসাধনা করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; ভাবিলাম এক পেয়ালা গরম কোকো পান করিলে ঘুম আসিতে পারে। স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিলাম। রামাধীন আমার ঘরের বাহিরে দ্বারের সম্মুখে শয়ন করে, তাহাকে আর জাগাইলাম না।

শীতের রাত্রি, জানালা বন্ধ আছে। হঠাৎ কি মনে হইল, জানালার খড়খড়ি তুলিয়া বাহিরে তাকাইলাম। নিষুতি রাত্রে রাস্তায় জনমানব নাই; জোড়া বাড়ির সামনে রাস্তার আলো জ্বলিতেছে। বাড়ি দুটার ভিতরে অন্ধকার।

একটা লোক ওদিকের ফুটপাথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথা হইতে হাঁটু পর্যন্ত কালো র‍্যাপারে ঢাকা; জোড়া বাড়ির বরাবর আসিয়া সে থামিল, ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে ও আশেপাশে দেখিল, তারপর সুট্ করিয়া দুই বাড়ির মাঝখানে গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উপেনের ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল।

কোকো প্রস্তুত করিয়া পান করিতে করিতে চিন্তা করিলাম। কে লোকটা? তাহার ভাবভঙ্গীতে যেন সতর্ক সাবধানতা রহিয়াছে। ওই গলি দিয়া মাদ্রাজীদের

খিড়কি দরজাতেও যাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজীরা সংখ্যায় অনেকগুলি, সন্ধ্যার পরই দোর তালাবন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এই লোকটা নিঃসন্দেহ তপনের ঘরে গিয়াছে। তপন রাত্রে বাড়ি থাকে না, শান্তা একলা থাকে: এই সময় লোকটা চুপিচুপি আসিয়াছে। কী ব্যাপার!

গভীর রাত্রি, স্বামী অনুপস্থিত, বাড়িতে একটি যুবতী ছাড়া অন্য কেহ নাই: এই সময় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া লোক আসে। অর্থাৎ—?

মনটা খারাপ হইয়া গেল। শান্তাকে ভাল মেয়ে বলিয়াই মনে হইয়াছিল: কিন্তু আজকাল মুখ দেখিয়া স্ত্রী-চরিত্র বোঝা দুষ্কর। —মরুক গে, আমার কি! ভাড়াটেদের স্ত্রী কী করিতেছে তাহার খোঁজে আমার প্রয়োজন কি? আমার যথাসময়ে ভাড়া পাইলেই হইল।

একবার ভাবিলাম জানালায় দাঁড়াইয়া দেখি লোকটা কতক্ষণে বাহির হয়। কিন্তু [illegible] আমেজ [illegible], আমি শুইয়া পড়িলাম। আসল মনকে খোঁচা দিয়া তাড়াইলে হয়তো

তপন বিদ্যুৎবেগে আবার গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল

সারা রাত জাগিয়া থাকিতে হইবে।

এই ঘটনার পর দুই হপ্তা কাটিয়া গিয়াছে। গত রবিবারে তপন আসিয়া বাড়ি ভাড়া দিয়া গিয়াছে, উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটে নাই। তপনকে নৈশ আগন্তুকের কথা বলি নাই। কী দরকার আমার?

তারপর হঠাৎ পরশু রাত্রির ব্যাপার!

পরশু রাত্রেও আমাকে অনিদ্রা রোগে ধরিয়াছিল। বারোটা পর্যন্ত বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; স্টোভে কেৎলির জল চড়াইয়া দিয়া জানালার খড়খড়ি তুলিয়া উঁকি মারিলাম। লোকটা যেন আমার উঁকি মারার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল—সেই র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা। সে ফুটপাথ দিয়া দ্রুতপদে আসিয়া গলির ঠিক মুখের কাছে একটু ভিতর দিকে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর একই দিক হইতে আর একটা লোক আসিতেছে দেখিলাম: গলায় কম্ফর্টার জড়ানো লোকটা গলির মুখ পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, অনিশ্চিতভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। মনে হইল সে র‍্যাপার-ঢাকা লোকটাকে অনুসরণ করিয়াছিল, এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

এই সময় র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা মুখ হইতে র‍্যাপার সরাইল। সবিস্ময়ে চিনিলাম—তপন! তারপর মুহূর্ত মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তপনের হাতে একটা ছুরি ঝলকিয়া উঠিল, সে এক লাফে সামনে আসিয়া কম্ফর্টার-জড়ানো লোকটার বুকে ছুরি বিঁধিয়া দিল। লোকটা ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল। তপন বিদ্যুদ্বেগে আবার গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমি হতভম্বভাবে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা ফুটপাথের উপর নিশ্চল পড়িয়া আছে, একটা কাকুতি পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না। নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে—

আমার ঘরে টেলিফোন আছে। এই ঘটনার ধাক্কা সামলাইয়া আমি থানায় [illegible] করিলাম। আমাদের থানা কাছেই, [illegible] মিনিটের মধ্যে পুলিস আসিয়া [illegible] দারোগাবাবু আমার বয়ান শুনিয়া [illegible] বাসা ঘেরাও করিলেন।

তপনকে কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না। শান্তা ঘুমাইতেছিল, সে কিছু জানিতে পারে নাই। তপন খিড়কির দরজা [illegible] বাড়িতে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; সে বাসায় বস্ত্রাদি বদল করিয়া শান্তাকে না জাগাইয়া চুপিচুপি পলায়ন করিয়াছে।

সে-রাত্রে মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই; পরে জানা গিয়াছে মৃত ব্যক্তির নাম [illegible] আইচ, সে বর্ধমানে পুলিসের কর্মচারী ছিল, সম্প্রতি ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল।

তপনের বাসায় পুলিসের [illegible] আছে। তপন এখনও ধরা পড়ে নাই। দারোগা বাবুরা ক্রমাগত শান্তাকে জেরা করিয়া চলিয়াছেন। অথচ সে [illegible] নির্দোষ। আমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম সেজন্য লজ্জিত আছি। এখন বুঝিয়াছি তপনই মধ্যরাত্রে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিত।

এদিকে আমার অবস্থা [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। তপন কেন খুন করিয়াছে [illegible] কিছুই জানি না, অথচ ঘণ্টায় ঘণ্টায় [illegible] পুলিস অফিসার আসিয়া আমাকে [illegible] করিয়া যাইতেছেন। আমি চলচ্ছক্তিহীন [illegible] মানুষ, কিন্তু পুলিস বোধ হয় সন্দেহ করে যে, খুনের জন্য আমিই দায়ী। [illegible] অপরাধ এই যে, তপন আমার ভাড়াটে [illegible] আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখন আপনার কাছে বিনীত [illegible] আপনি আমাকে উদ্ধার করুন: আমার [illegible] অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পুলিস [illegible] সন্দেহের উপর আমাকে ধরিয়া লইয়া [illegible] হাজতে পুরিবে: তাহা হইলে আমি [illegible] যাইব। আমার টাকা আছে; আপনি [illegible] আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন [illegible] আপনাকে খুশী করিয়া দিব।

আর অধিক কি। যত শীঘ্র [illegible] আমাকে পুলিসের ঝামেলা হইতে [illegible] করুন, আমি আপনার নিকট [illegible] থাকিব।

বশংবদ,
শ্রীচিন্তামণি [illegible]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

শেষ পর্যন্ত মানুষ জানতে পেরেছে কেন "স্কার্ভি" রোগ দেখা দেয়। খোঁজ পেয়েছে তার প্রতিষেধকেরও। আমেরিকা আবিষ্কারে যাওয়ার পথে কলম্বাসের সংগীসাথীরাও প্রায় সবাই "স্কার্ভি" রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন জানা যায়নি এই রোগ কেন মানুষের মধ্যে প্রবল আকারে দেখা দেয়। আজকের মানুষ জানে—শরীরে "ভিটামিন-সি" এর অভাব হলে এই রোগের সূচনা হয়, জানে প্রায় ৫০-৬০ মিলিগ্রাম "ভিটামিন-সি" বা "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড" দৈনিক খাদ্যের মধ্যে থাকলে "স্কার্ভি" রোগকে প্রতিরোধ করা যায়।

গত পঁচিশ বছরের নানা গবেষণায় জানা গিয়েছে—দাহ্য বস্তু এবং গঠন ও ক্ষয়-পূরণের বস্তু ছাড়াও আর একজাতীয় বস্তু প্রাণীর কাজে লাগে, তাদের নাম "ভিটামিন"। তাই মানুষের শরীরে পুষ্টিসাধনের জন্য জৈব পদার্থগুলির মধ্যে "প্রোটিন" ছাড়া "ভিটামিন" ও "স্টেরয়েড"-ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই আজ বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। ভারতের নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত, চক্রপাণি, বাগ্‌ভট প্রমুখ প্রাচীন মনীষীদের উত্তর সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ও পরম স্নেহধন্য ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ "ভিটামিন-সি" সম্বন্ধেই মৌলিক গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া প্রাণি-রসায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তিনি মৌলিক চিন্তাধারার ছাপ রেখেছেন। বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্রের মৌলিক চিন্তাধারা এখনও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের, প্রাণী-রসায়নের গবেষণার বিভিন্ন দিকে।

"মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।"—বলেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও মানুষের সম্পর্ক আবহমান কালের। আর বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষ তার সভ্যতার ইতিহাসে নতুন নতুন অধ্যায় সংযোজনা করে চলেছে। জাতিভেদ বা সম্প্রদায়িকতার স্থান বিজ্ঞানে নেই। বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানবের সম্পত্তি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিজ্ঞানী ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহের বৈজ্ঞানিক অবদানগুলি সম্পর্কেও আমাদের আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস-সি পাশ করার পর ডঃ গুহ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অধীনে কিছুদিন গবেষণা করেন। তারপর আচার্য রায়ের প্রচেষ্টায়ই তিনি

ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ

বিলাত যান। সেখানে ডঃ গুহ বিখ্যাত রসায়নবিদ্ অধ্যাপক ড্রামণ্ডের গবেষণাগারে প্রাণী রসায়নের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি কেম্ব্রিজে অধ্যাপক হপ্‌কিন্স-এর অধীনে "ভিটামিন" সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করে ডি এস-সি ডিগ্রীতে ভূষিত হন। কলকাতায় ফিরে এসেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে যোগ দেন। বেঙ্গল কেমিক্যালেও তিনি "ভিটামিন" ও ভারতীয় খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যান এবং একদল বিজ্ঞান-কর্মীকে এই গবেষণার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের রিসার্চ ল্যাবরেটরীতেই তিনি প্রথম আলোকপাত করেন কিভাবে প্রাণীদেহে "ভিটামিন-সি" বা "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড" তৈরী (সিন্‌থেসিস্) হয়। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ফলিত রসায়নের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবরেটরীতেও "ভিটামিন-সি" বা "অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের" সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। অবশেষে "ভিটামিন"-এর গবেষণার জন্য বিজ্ঞান কলেজে একটি কেন্দ্র স্থাপনেও সফল হন।

"ভিটামিন-সি" বা "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড" সাধারণত লেবু জাতীয় ফলের রস ও টাটকা সবজিতে থাকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যেই আমাদের শরীরের এই প্রয়োজনীয় উপাদান আছে। আমাদের ধারনা ছিল—অধিক তাপ ও বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে এবং রান্না করার সময় "ভিটামিন-সি" সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্রের গবেষণায় প্রথম ধরা পড়ে, জলে ধুলে বা রান্নার প্রক্রিয়ায় শাকসব্জি থেকে ইহা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না। সম্ভবত অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। সম্প্রতি তিনি প্রমাণ করেন—"আসকরবিজেন" নামে একটি জৈব-পদার্থের সঙ্গে সত্যিই "ভিটামিন-সি" বা "অ্যাসকরবিক অ্যাসিড" যুক্ত অবস্থায় থাকে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে—

"অ্যাস্‌ফরবিজেন্‌"-এর সংগে "ভিটামিন-সি"-এর যুক্তভাবে অস্তিত্বের প্রশ্নে মার্কিন রসায়নবিদ্‌দের সংগে ডঃ গুহের তীব্র মত-ভেদ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত রসায়নবিদ ডঃ প্রচাস্‌কা এই পদার্থটি (অ্যাসফরবিজেন্‌) আবিষ্কারে সক্ষম হন। তার ফলে বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহের গবেষণালব্ধ ধারনাই বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

"ভিটামিন সি" বা "অ্যাসফরবিক অ্যাসিড"-এর অভাব হলে মানুষের শরীরে "স্কার্ভি" রোগের সূচনা হয়। দেখা গিয়েছে ইঁদুর, কুকুর, গরু প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণীরা এই রোগে আক্রান্ত হয় না। কোন্‌ জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই সব প্রাণীদেহে "ভিটামিন-সি" সংরক্ষিত (সিন্‌থেসিস্‌) হয়—এ সম্বন্ধেও ডঃ গুহ ও তাঁর ছাত্ররা যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, মানুষ, বানর ও গিনিপিগ্‌ ছাড়া অন্যান্য সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শরীরে "গ্লুকুরো নোল্যাকটোন" থেকে এই "ভিটামিন-সি" তৈরী হয়। এই অন্তঃকোষ-জারক (এনজাইম্‌) দেহের যকৃৎ (লিভার) অঞ্চলে থাকে।

গ্লুকুরোনোল্যাক্‌টোন

পরিডাকটেজ্‌ গুলনোল্যাকটোন

অক্সিডেজ্‌

২ কিটো গুলনোল্যাক্‌টোন

ইনোলেস্‌

ভিটামিন-সি।

এই প্রক্রিয়াকেই (প্রসেস্‌) "ভিটামিন-সি" বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের "বায়োসিন্‌থেসিস্‌" বলা হয়।

অন্তঃকোষজারক (এন্‌জাইম্‌) এর প্রধান কাজ শ্বেতসার, তৈল, প্রোটিন প্রভৃতি খাদ্য-বস্তুর জলের সংগে সংযোগ ঘটিয়ে এমন-ভাবে সরলতর বস্তুতে পরিণত করা—যাতে ওগুলো সহজে পরিপাক-যন্ত্র থেকে রক্ত বা রসনালীতে প্রবেশ করতে পারে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ-ই একমাত্র প্রাণী-রসায়নবিদ্‌ যিনি প্রমাণ করেছেন—যে সমস্ত প্রাণীদেহে "ভিটামিন-সি" তৈরী হয় না, দেখা গিয়েছে এই প্রাণীদের শরীরে একমাত্র "অক্সিডেজ্‌" অন্তঃকোষজারক (এনজাইম্‌) ছাড়া অন্যান্য সবধরনের অন্তঃকোষজারক পূর্ণমাত্রায় আছে। এই "অক্সিডেজ্‌" অন্তঃকোষজারকের অভাব জিন সংলগ্ন এবং নিম্নতর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ফলেই হয়ত নষ্ট হয়।

ভিটামিন কি ভাবে প্রাণীদেহে কাজ করে, এ সম্বন্ধেও বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। "ভিটা-মিন-সি" ব্যতীত অন্যান্য ভিটামিন-এর গবেষণায়ও তাঁর অবদান কম নয়। সম্প্রতি-কালে [illegible] মাধ্যমেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, "ভিটামিন-বি"-এর নিকো-টিনিক অ্যাসিডও প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। সাধারণত চাল, ভুট্টা ও গমের মধ্যে "নিকোটিনিক অ্যাসিড" যুক্ত-অবস্থায় থাকে এবং অঙ্কুরোদ্গমের সময় মুক্তি পেয়ে ভিটামিনরূপে কাজ করে।

বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবরেটরীতে ডঃ গুহের অধীনে আরও বিভিন্ন বিষয়ে গবে-ষণার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলেছিল। যেমন মাছের যকৃতের তেল, হাইড্রোজিনেটেড তেল, ভারতীয় কয়লা, পাটের অপচয়ের অংশ থেকে প্লাস্টিক প্রভৃতি। ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের সময় ডঃ গুহ শিশুদের জন্য "সয়াবিন্‌" থেকে এক রকমের বার্লি তৈরী করেছিলেন। দুধের পরিবর্তে এই সয়াবিনের বার্লি শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কার্যকরী হয়েছিল। সে সময় অনেক দরিদ্র মায়েরা এই বার্লি খাইয়ে শিশুদের রক্ষা করেছিলেন। [illegible] আমাদের ভারত সরকারের নজর এখনও এ-দিকে পড়েনি! অথচ থাইল্যাণ্ড ও ইন্দো-নেশিয়াতে এই বার্লি প্রচুর পরিমাণে [illegible]-এর মারফতে তৈরী হচ্ছে। [illegible] বালিতে দুধের প্রতিটি গুণাগুণের [illegible] স্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্ভব, যদি [illegible] বিশেষ করে [illegible] [illegible] গাছপালা থেকে [illegible] উৎকৃষ্ট প্রোটিন সংগ্রহ করা [illegible] অনেকদিন আগে ডঃ বীরেশচন্দ্র [illegible] ভারতের বিজ্ঞানী, সরকার ও [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন [illegible] সম্পর্কে কিছুটা কাজও করেছিলেন। [illegible] ভারত সরকারের দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত [illegible] পড়েনি। ডঃ গুহ দুঃখিত হয়েছিলেন [illegible] অথচ তাঁরই উপদেশানুযায়ী [illegible] সোভিয়েট ইউনিয়ন ও [illegible] থেকে প্রোটিন সংগ্রহের কাজ এগিয়ে চলেছে। কিছুদিন আগে বিখ্যাত বৃটিশ রসায়নবিদ [illegible] পিরী ভারতে আসায় এই সমস্যা সম্পর্কে আমরা আরও সচেতন হয়েছি। বিজ্ঞানী পিরী এই ব্যাপারে ডঃ গুহের সংগে পরা-মর্শও করেছিলেন। আমাদের দেশের খাদ্য-সমস্যার পটভূমিকায় বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহের প্রচেষ্টা আন্তরিকতার [illegible] স্মরণীয়।

ডঃ গুহকে ভারতে প্রাণি-রসায়ন গবেষণার প্রবর্তক হিসেবে [illegible] বোধহয় সঙ্গত। তিনি প্রাণি-রসায়ন গবেষণার একটি বিশিষ্ট ধারা [illegible] করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা [illegible] কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জনের পথে চলেছেন, তাঁদেরই বিশিষ্ট কয়েকজন হচ্ছেন—ডঃ [illegible] বি দাস, ডঃ শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ডঃ [illegible] সাহা, ডঃ শৈলেশচন্দ্র রায়, ডঃ দুলাল [illegible] রায়, ডঃ জে জে ঘোষ, ডঃ এন সি গাঙ্গুলী, ডঃ আই বি চ্যাটার্জি, ডঃ পি আর পাল, ডঃ কে এল রায় ও ডঃ এম এল দাস।

ডাঃ কনক রায় বেশ টাকাতে লোক—টাকার দিক দিয়ে এবং বলতে কি টাকের দিক দিয়েও।

টাকা হলেই টাক হয়, কথায় বলে, কিন্তু কনক ডাক্তারের বেলায় ঠিক তা হয়নি। বরং তার উল্টোটাই সত্যি। টাক হবার পরই তাঁর টাকা হয়েছে।

অকালে টাক পড়ার পর থেকেই তাঁর পসার জমলো। প্রবীণ চিকিৎসক বলে নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। সেই থেকেই তাঁর টাকা।

কিন্তু মনে তাঁর সুখ নেই। দু টাকা ফীয়ের সংগ্রামী জীবন থেকে ষোলো টাকা ফীয়ের বেশ নামী ডাক্তারে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি—যেমন যেমন তাঁর চুল পাতলা হতে লাগল, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স মোটা হতে লাগল তেমনি তেমনি। কিন্তু মন তাঁর কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল।

যৌবন না যেতেই দেখতে বুড়ো হয়ে গেলেন! এ দুঃখ রাখবার তাঁর ঠাঁই নেই।

আগে ভাগে বিয়ে করে ফেলেছিলেন—ভাগ্যিস!

কিন্তু বউ না হয় পাওয়া গেছে কিন্তু বউয়ের মন কি তিনি পেয়েছেন? পেয়ে থাকলেও, এতদিনে তা কি তাঁর চুলের মতই তিলে তিলে উপে যায়নি? তিনি দেখেছেন বউ তাঁর মুখের দিকে চাইতে গিয়ে টাকের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেটা তাঁর প্রতি কটাক্ষ হলেও, যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে, তেমন ধারা কি? বরং তাঁর প্রতি কটাক্ষপাত বলেই যেন তাঁর মনে হয়।

কিন্তু হায়, টাক সারাবার কোনো দাবাই তাঁর জানা নেই। তাঁদের অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতেই নেই। কবরেজিতে আছে? মনে ত হয় না। বড় বড় কবিরাজের তিনি ইয়া ইয়া বিরাট টাক দেখেছেন। হাকিমি?

তাঁর এক হাকিম বন্ধুর কথা মনে পড়ল বন্ধু নয় ঠিক, বন্ধুর চাচা। তিনি এই প্রবীণ বয়সেও ধর্মবিনাস্ত কালো চুল নিয়ে বিরাজ করছেন।

তাঁর কাছেই গেলেন তিনি।

'গজিয়ে দিতে পারি আপনার চুল।' বললেন হাকিম সাহেব। 'হ্যাঁ, তিন থেকে ছ মাসের মধ্যেই গজিয়ে দেব। কিন্তু দশ হাজার টাকা দিতে হবে। টাকাটা আগে

মনে তাঁর সুখ নেই

চাইছি না, মাথায় চুল হবার পরেই দেবেন না হয়।'

ডাক্তারবাবু তক্ষুনি রাজি। দু পাঁচ দশ হাজার তিনি কামিয়েছেন, তার একটা

থোক কমিয়ে দিয়ে যদি মাথা ভর্তি জমিয়ে নিতে পারেন, একটুও আপত্তি নেই তাঁর।

'বেশ। রোজ দো দফে কুয়তে মেদা খেতে হবে—'

'কুয়তে মেদা? খেতে হবে?'

'হাঁ, খুব তরিক্কির দাবাই। যৌবন ফিরিয়ে আনে...'

'কিন্তু বুড়ো তো আমি হইনি, যৌবন ফেরাবার দরকার নেই, শুধু আমার চুল ফেরাতে যাচ্ছি। তা ছাড়া, খাবার জিনিসে আমার উৎসাহ হয় না।'

বলতে কি আশংকাই রয়েছে রীতিমত। নিজের ডাক্তারি ওষুধও তিনি কদাচ খান। কিন্তু সে কথা আর জানান না।

"তা হলে গিলগিটে গিলানি। তাতেই কাজ হবে।' জানান হাকিমঃ গিলগিট কোথায়, জানেন ত? জম্মু কাশ্মীরে। সেখানকার গাছগাছড়ার থেকে বানানো এই দাবাই। বহুৎ ফয়দার এই গিলগিটে গিলানি।'

'গিলতে হবে না ত?'

'না। রোজ তিনবার করে মালিশ করতে হবে মাথায়। মলমের মতই। কিন্তু গন্ধটা একটু বিদ্ঘুটে—গন্ধে ভূত

আপনার বিবি না পালিয়ে যায়

পালায়। একটু আশংকা আছে...আশংকা এই যে...'

হাকিম সাহেব প্রকাশের ভাষা পান না।

'বলুন কিসের আশংকা?'

'গন্ধের চোটে আপনার বিবি না পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে।'

'তাঁকে আমি আগেই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। মাস ছয়েকের জন্য।'

ছ মাসের হকিমী দাবাই নিয়ে মোটর হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরলেন ডাক্তার রায়। এসে বউকে বললেন, বিলেত থেকে কেবল এসেছে, জরুরী কাজে যেতে হবে তাঁকে। মাস ছয়েক থাকতে হবে সেখানে।

'আমি এখানে একলা কার কাছে থাকবো? আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও তা হলে।'

'সেই ভালো।' সায় দিলেন ডাক্তার রায়।

বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে ডাক্তার রায় নিজে অন্তরীণ হলেন বাড়ির ভেতর। সদর দরজায় তালা পড়ে গেল; নোটিস ঝুলতে লাগল—ডাক্তারবাবু বিশেষ কার্য-ব্যপদেশে বিলাতে গেছেন ছ মাসের জন্য।

দিনে তিনবার করে গিলগিটে গিলানি ঘষতে লাগলেন মাথায়। এবং কী আশ্চর্য, গিলানির দাপটে পিলপিল করে চুল বেরুতে লাগল মাথায়। তিন মাসের মধ্যেই চুল গজিয়ে গেল টাকে। আবার আষাঢ় আকাশ ছেয়ে আসার মতই ঘনকৃষ্ণ চুলের ছাউনিতে ভরে গেল তাঁর মাথা।

টাককে তালাক দিয়ে ছ মাস বাদে তিনি তালা খুললেন সদরের।

দরজা খোলা পেতেই রুগীরা দেখা দিতে লাগল একে একে। পুরনো রুগীরা তাদের পুরনো ব্যারাম নিয়ে এলো সব।

ডাঃ রায় কি ফিরেছেন বিলেত থেকে?' তাঁর চেম্বারে ঢুকে প্রশ্ন করল একজন: 'শুনেছিলাম যে তাঁর ছেলেকে দেখতে গেছেন সেখানে।'

'ডাঃ রায়ের ছেলে!' অবাক হলেন ডাক্তার রায়।

'বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গেছে ত তাঁর ছেলে। সেই রকমই ত শুনেলাম আমরা। সেই ছেলেকে ফিরিয়ে আনতেই তিনি গেছেন, পাছে তাঁর ছেলে মেম বিয়ে করে সেইখানেই ডাক্তারি প্র্যাকটিস শুরু করে দেয় সেই ভয়েই। তা হলে ত আর এ দেশে ফেরানো যাবে না ছেলেকে।'

'কী সর্বনাশ!' শুধু এই কথাটুকুই বেরুলো তাঁর মুখ দিয়ে। তিনি যখন চুলের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন সেই অবকাশে তাঁর অজান্তে তাঁর ছেলে জন্মেছে, বড় হয়েছে, এখানকার পড়া সাঙ্গ করে বিলেত গেছে, সেখানে ডাক্তারি পাস করে মেম বিয়ে করতে তৎপর হয়েছে এবং সেই মেমের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে তাকে পাকড়ে আনতে গেছেন ডাক্তার রায়। ইতিমধ্যে এত কান্ড ঘটে গেছে। এই সাতকান্ড রামায়ণের কিছুই তাঁর জানা ছিল না।

'আমি ডাক্তার রায়।' তিনি শুধু গম্ভীর মুখে জানালেন।

আমাকে চিনতে পারছো না গিন্নী?

'ও, আপনিই বুঝি তাঁর সেই ছেলে! নমস্কার। তা, ডাক্তারবাবু কি সেখানেই থেকে গেলেন? ফিরতে কি খুব দেরি হবে তাঁর?'

সে কথার জবাব না দিয়ে তিনি বললেন: 'আমিই ডাক্তার রায়। কেন, আমাকে কি আপনারা চিনতে পারছেন না? আমিই আপনাদের সেই ডাক্তার রায়—আদিম ও অকৃত্রিম!'

'রসিকতা করছেন ডাক্তারবাবু! তাঁর যে মাথা জোড়া টাক ছিল—'

'বিলেতে গেলে চুল গজায়। সেখানকার জলহাওয়ার গুণ।' ডাক্তারবাবু বলতে যান।

'আবার রসিকতা করছেন আপনি! তা হলে সেখানকার ভারী ভারী মাথাওয়ালা লোকেদের ইয়া ইয়া টাক কেন? এই, সপ্তম এডোয়ার্ডের, চার্চিল সাহেবের ফোটো কি দেখিনি আমরা?'

তারা ঘাড় নাড়ে: চুল আর যৌবন একবার গেলে আর ফিরে আসে না মশাই, তা সেখানেই যান না।'

'কী মুশকিল! ডাক্তার রায়ের সঙ্গে এক চুলের তফাত ছাড়া আর কি কোনই মিল দেখতে পাচ্ছেন না আমার চেহারায়?'

'মিল থাকবে বই কি! ছেলের চেহারা ত বাপের মতই হবে। গলার আওয়াজও প্রায় সেই রকমই হবে ত। তফাতের মধ্যে বাপের টাক থাকবে আর ছেলের তা থাকবে না।'

'সে কথা যাক।' হতাশ হয়ে বললেন ডাক্তারবাবু: 'এখন আপনাদের রোগের কথা বলুন! কী হয়েছে বলুন আপনার?'

'আমাদের পুরনো রোগ আপনি নতুন ডাক্তার হয়ে কি ধরতে পারবেন? সে অভিজ্ঞতা কি আপনার হয়েছে? ডাক্তার রায় ফিরে আসুন, তাঁর রোগী আমরা তাঁকেই দেখাব।'

সেদিন চলে যেতে পাগল হয়ে ... তাঁকে দেখানো না দেখিয়ে। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন চুপচাপে।

দুপুর বেলায় গিন্নী ফিরলেন বাপের বাড়ি থেকে। তিনি তখন বিশ্রাম করছেন বিছানায়।

তাঁকে দেখেই ত আঁতকে উঠেছে তাঁর বউ—ওমা, এ কে গো! ঘরের মধ্যে এ আবার কে!'

'আমাকে চিনতে পারছো না গিন্নী?' বলে যেই না তিনি সহাস্যে উঠে অভ্যর্থনা

মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়তে...

করতে এগিয়েছেন, তাঁর বউ আঁ আঁ আঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সে জ্ঞান আর ফিরল না।

ডাঃ রায় ফিরেছেন খবর পেয়ে বিকেলের দিকে এলেন হাকিম সাহেব। তাঁর চিনতে কোনো ভুল হল না।

'এই যে, দিব্যি চুল গজিয়ে গেছে দেখছি।' বললেন হাকিম সাহেব: 'এইবার দিন ত আমার টাকাটা।'

'কিসের টাকা!' আকাশ থেকে পড়লেন ডাঃ রায়।

'আপনার টাকে চুল গজিয়ে দেবার কড়ার মত টাকা। দশ হাজার টাকা দেবার কথা ছিল না আপনার?'

'আপনি ভুল করছেন মশাই! টাক ত ছিল আমার বাবার। ঐ যে সামনেই তাঁর ফোটো ঝুলছে দেখছেন না! মিলিয়ে দেখুন। তিনি বিলেতে গেছেন, সেইখানেই থাকবেন, সেইখানেই তিনি প্র্যাকটিস করবেন এর পর থেকে। আর এ দেশে ফিরছেন না।'

'ফিরছেন না!' অবাক হতে হল হাকিম সাহেবকে: 'তা হলে আমার সামনে আপনি কে?'

'আমি তাঁর ছেলে। আমিও ডাক্তার রায়। কেন, বিলেতে আমি ডাক্তারি পড়তে গেছলাম এ খবর আপনি পাননি! আমাকে আনতেই ত তিনি বিলেতে গেছলেন। তারপর এমনিই বিধাতার চক্রান্ত—বাপের কুচ্ছো ছেলের মুখে শোভা পায় না হয়ত, তা হলেও আমাকে বলতে হচ্ছে—সেখানে এক মেমকে বিয়ে করে নতুন ঘর-সংসার পেতেছেন তিনি। তিনি আর ফিরবেন না। তাঁর ঠিকানা দেব আপনাকে? যদি চিঠি লিখতে চান?'

'আর তার দরকার নেই।' ম্লানমুখে চলে গেলেন হাকিম।

হাকিম চলে গেলে একটুখানি হাসলেন কনক ডাক্তার। ম্লান হাসি। তাঁর প্র্যাকটিস গেল, পসার গেল, নামডাক সব গেল—এক চুলের জন্য!

মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল তাঁর।

বউ গেল, ছেলে গেল। ছেলে ছিলই না কিন্তু বউ থাকলে ছেলে হবার আশা ছিল, তাও গেল তাঁর।

না। ছেলে তাঁর হয়েছে। তিনিই হয়েছেন। নিজের ছেলে নিজেই।

আবার সেই দু টাকা ফীসের থেকে নতুন করে প্র্যাকটিস জমাতে হবে তাঁকে। আবার সেই জীবনসংগ্রাম। বাপ কনক ডাক্তার দশ বিশ হাজার যা রেখে গেছে তা ফুরোতে আর কদিন!

তবে হ্যাঁ, দশ হাজার টাকা তিনি বাঁচাতে পেরেছেন বটে। এইমাত্রই বাঁচিয়েছেন—হাকিমের খপ্পর থেকে।

এক চুলের জন্যই বেঁচে গেছে টাকাটা।

বিশু খুড়ো নববর্ষের বাণী দিলেন—"'চৈত্রে গিমা তিতা' খেয়ে বর্ষ শেষ করেছেন, এবারে 'বৈশাখে দালদা নালিতা' খেয়ে বর্ষারম্ভ করুন।"

চাউল কল মালিক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় বলিয়াছেন—চাউলের দর বাড়তি হইলেও আশঙ্কার কোন কারণ

নাই। শ্যামলাল বলিল—"মানে দর বাড়তিতে চাল বাড়ন্ত হবার ভয় নেই, সুতরাং আমরা বেশ প্রফুল্লই আছি।"

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন, কলিকাতায় জলকষ্ট আরও দশ বৎসর চলিবে। —"অতঃপর দশমী দশায় একটু জল দিয়ে গলা ভিজিয়ে চোখ বোজার আর কোন অসুবিধেই রইল না"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

লক্ষ্ণৌর এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি তল্লাসী চালাইয়া রেল-কর্তৃপক্ষ কয়েকজন বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক, রেল-কর্মচারী ও পুলিস। —"এরা বোধহয় গাঁ উজাড় একেই বলে" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের অপ্রীতিকর ঘটনা প্রসঙ্গে জনৈক সাংবাদিক 'শতং মারী ভবেৎ বৈদ্যঃ' কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। শ্যামলাল বলিল—"শতং মারী কথাটা রোগীর ব্যাপারেই বলা হয়েছিল, সাংবাদিক মারী ভবেৎ বৈদ্যঃ নিশ্চয়ই নয়!!"

বিশু খুড়ো শুনাইলেন—"এম এ পরীক্ষা, অর্থাৎ মন্ত্রীর আসন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। অনেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছেন, অনেকে করেছেন টেনেটুনে। যাঁরা পাস করতে পারেননি, তাঁরা হয়ত কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার জন্য বসে আছেন।"

সংবাদে প্রকাশ, এইবার ২৩ জনকে লইয়া মন্ত্রী-পরিবার গঠন করা হয়েছে। শ্যামলাল বলিল—"সগর রাজার ষাট সহস্র সন্তান, গান্ধারীর শতপুত্র বা হারাধনের দশটি ছেলের এই দেশে সংখ্যাধিক্যে আমরা ভীত নই, তবে ভাবছি, পরিবার পরিকল্পনাটা কি শুধু বাতকে বাত!"

বিধান সভার মহিলা সদস্যদের এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীমতী আভা মাইতি নাকি বলিয়াছেন,—কংগ্রেস মহিলা কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছি। —"হয়ত তাই। কিন্তু সেতুবন্ধনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাঠবিড়ালী, অর্থাৎ পুরুষদের প্রচেষ্টাও ছিল বলেই জানি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

বিনা কারণে ট্রেনের চেন টানার কথা আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। সম্প্রতি শুনিলাম, এই চেন টানাটানি বিবাহের

মরসুমেই হয় বেশি। —"হবেই হবে, বিয়ের সঙ্গে যে শেকলের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কলিকাতার কোন এক অঞ্চলে এক কাঠা জমি ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া কয়েকদিন আগে একটি সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। —"অতঃপর অভিধানকার 'মাটির দর' কথাটার অর্থ নতুন করে লিখবেন বলেই আশা করি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি "নীতি শিক্ষা পর্ষদ" গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন। বিশু খুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিসংখ্যানে অবগত হয়েছেন যে, অনুরূপ "নীতি শিক্ষা পর্ষদ" গঠন করতে হলে অন্যূন একশ' পর্ষদের প্রয়োজন, শিক্ষার এই সুবর্ণ সুযোগ শুধু ছাত্রছাত্রীদের দিলে সেটা হবে নেহাতই পক্ষপাতিত্ব!"

গোবর হইতে গ্যাস প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। সংবাদে বলা হইয়াছে, যে-সব গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে, সেখানে গোবরজাত গ্যাস ব্যবহার করা হইবে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—" 'সারম' ততঃ গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু!"

তামার তার চুরি যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হইতেছে, ফলে দুধ জীবাণুমুক্ত করার যন্ত্র অচল হইতেছে এবং হাজার হাজার গ্যালন দুধ হরিণঘাটায় নষ্ট হইতেছে। —"এক ফোঁটা মাত্র গোমূত্রে এক কলসী দুধ কেটে যায়, এই কথাটাই জানা ছিল, কিন্তু তামার তার চুরি হলে দুধের ওপর প্রতিক্রিয়ার কথাটা ছিল অজ্ঞাত; সুতরাং চোর ধরার দাবীতে বাজে সময় নষ্ট না করে, নর্দমায় দুধ ঢালার সৎ কাজে লেগে থাকাই ভালো!!" —মন্তব্য জনৈক সহযাত্রীর।

এক সংবাদে শুনিলাম, আগে হইতে পুলিস কমিশনারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কলিকাতা বা শহরতলীতে কেহ লাউড স্পীকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না বলিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"দশ পাঁচ জনের অন্তর উৎসব এই নিয়ম লঙ্ঘনীয়, এই কথাটা হয়ত অনবধানতাবশতই বিজ্ঞপ্তিতে জুড়িয়া দেওয়া হয়নি!"

আই এফ এর অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় কলিকাতা স্টেডিয়ামের প্রসঙ্গে উত্থাপন করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, ঘোষ মহাশয় নাকি 'আশা' করেন, শীঘ্রই স্টেডিয়াম নির্মিত হইবে। —"প্রকাশ থাকে, তিনি আশ্বাস দেননি, শুধু 'আশা' প্রকাশ করেছেন, সুতরাং" — — —শ্যামলাল তার মন্তব্য অসমাপ্ত রাখিল।

রাশিয়া নাকি দেশে 'ভডকা' বিরোধী অভিযান চালাইতেছে। আমাদের এক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

"এইবার যদি কিছু হয়। যার যা বাবা, শুধু মুখে কি আর বন্ধুত্ব হয়!!"

তারপর যদি দেখি সায়েব তখনও ফিরছেন না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বোসদা হেসে ফেললেন। "আমি ঘুমোচ্ছি না। ঘুমটা আমার কাছে অটোমেটিক সুইচের মতো। সুইচ যতক্ষণ না টিপছি শ্রীমানের সাধ্য কি আমার ঘাড়ে এসে চাপে। তুমি যাও।"

আমি নীচেয় নেমে এলাম। উইলিয়াম ঘোষ কখন বেয়ারাকে বসিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে গেছে।

এখন রাত অনেক। শাজাহান হোটেলও কলকাতার শান্ত সুবোধ শিশুদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাউন্টারে কেবল আমি জেগে রয়েছি। আর কলকাতার কোথাও শাজাহানের ম্যানেজার মার্কোপোলো নিশ্চয়ই জেগে রয়েছেন। তিনি কোথায় গেলেন? ড্রাই-ডেতে বেআইনী মদ গিলে কি শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে পড়লেন? মদ খাওয়াটা অন্যায় নয়; কিন্তু মাতাল হওয়া বেআইনী। এমন দু-একটা শিকার ধরবার জন্যে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতিনিধিরা অনেক সময় বার-এর বাইরে ওত পেতে থাকেন। যাঁদের মোটর আছে, ড্রাইভার আছে, তাঁরা বেঁচে যান। ধরা পড়েন তাঁরা, যাঁরা ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকেন বা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেন।

রিজার্ভেশনের খাতার দিকে তাকালাম। আজ রাত্রে কোনো অতিথির বিদায় নেবার কথা নেই। যে দু-একজন যাবেন, তাঁরা সকালে ব্রেকফাস্টের আগে নড়বেন না। রাত্রের অন্ধকারে কয়েকজন নতুন অতিথি কিন্তু আসছেন। দমদম হাওয়াই অফিস থেকে ফোন এসেছে যে, তাঁদের আসতে সামান্য দেরি হবে। ঠিক এই মুহূর্তে দূর দেশের বিদেশী যাত্রীদের নিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে তাঁরা কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছেন।

হাওয়াই অতিথিরা যখন এলেন, তখন মুসাফির রাত্রি কলকাতার রহস্যময় পথে আরও এগিয়ে গিয়েছে। আমার চোখে সামান্য ঘুম আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোথা থেকে এসে জড়ো হতে শুরু করেছে। ব্যাগ রাখবার শব্দে চমকে উঠলাম। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঘুমোনো গুরুতর অপরাধ। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে উঠে দেখলাম; "সুজাতা মিত্র।"

এয়ার হোস্টেসের আসমানী রঙের শাড়ি পরে সুজাতা মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন। বললেন, "বেচারা!"

আমি লজ্জা পেয়ে, সোজা হয়ে উঠে, শুভরাত্রি জানালাম। সুজাতাও হেসে বললেন, "এখন সুপ্রভাত বলুন।" মনিবন্ধের ঘড়িটা সুজাতা মিত্র আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন।

হাওয়াই হোস্টেস মিস্ মিত্রের সঙ্গীরা খাতায় সই করে ভিতরে চলে গেলেন। সুজাতা মিত্র তাঁদের বললেন, "ডোন্ট উয়ারি। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "আপনার অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

লজ্জা পেয়ে আমি বললাম, "মিস্ মিত্র, আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না।"

টানা-টানা চোখ দুটো আরও বড় করে সুজাতা মিত্র পরম স্নেহে বললেন, "আহারে! আমাকেও কাস্টমারের মতো খাতির করে কথা বলতে হচ্ছে।"

আমি খাতার দিকে তাকাতে তাকাতে বললাম, "আপনাকে এবার খুব ভাল [illegible] দিয়েছি, মিস্ মিত্র। রুম নম্বর [illegible] তিরিশ। গতবারে রাত্রে এসে [illegible] মিস্টার বোসের ঘরে থেকে আপনি [illegible] সম্বন্ধে যত খারাপ ধারণা [illegible] এবার তা সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

হাওয়াই হোস্টেস সুজাতা মিত্র [illegible] যেন সবাইকে আপন করে নিতে [illegible] আমার মতো একজন অপরিচিত [illegible] হোটেল কর্মচারীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে [illegible] কথা বলতেও যেন তাঁর কোনো [illegible] নেই। অথচ শাজাহানে তাঁর [illegible] আরও অনেককে তো দেখেছি। [illegible] হিলের ঠোক্করে শাজাহানের [illegible] কম্পমান।

সুজাতা মিত্র আমার কথায় [illegible] রাগ করেছেন, তা বোঝা গেল। [illegible] "হোটেলে যে বেশীদিন কাজ করে [illegible] আপনার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। [illegible] এরই মধ্যে এসব প্রফেশন্যাল [illegible] কায়দাদুরস্তভাবে কেমন করে শিখলেন [illegible]"

আমার বেশ ভাল লাগছিল। [illegible] আন্তরিকতা অজ্ঞাতেই মনকে [illegible] হেসে বললাম, "এতো অল্প সময়ের মধ্যে যে কাজ শিখতে পেরেছি, তার [illegible] কারণ মিস্টার স্যাটা বোস।"

সুজাতা মিত্র আমার কথা [illegible] দিলেন না। হাসতে লাগলেন। [illegible] "অদ্ভুত নাম তো। ভদ্রলোক কি [illegible]"

বোসদার বিরুদ্ধে কেউ [illegible] করলেও আমার মনে লাগে। [illegible] একটা হাওয়াই জাহাজের মেয়ে, ওঁকে [illegible]

হাসাহাসি করবে, ভাবতেও আমার রাগ হচ্ছিল। বললাম, "ও'র আসল নাম তো স্যাটা নয়। হোটেলে কাজ করতে করতে নামটা অমন বেঁকে গিয়েছে। সত্যসুন্দর বোস, কুলীন কায়স্থ।"

সুজাতা মিত্র প্রখর বুদ্ধিমতী। আমার মুখ দেখেই যেন সব বুঝে নিলেন। ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে রেখে সুজাতা মিত্র বললেন, "আপনাদের এই হোটেল তো হলে তো মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। কোথায় সত্যসুন্দর আর কোথায় স্যাটা। আপনি খুব সাবধান। কোন্ দিন দেখবেন আপনিও হয়ে গিয়েছেন সাঁকো। সায়েবরা হয়তো আপনাকে স্যাংকে বলে ডাকতে আরম্ভ করেছেন।"

আমি ছেলেমানুষীর বশে রেগে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "বটে। কেউ আমার নামে হাত দিয়ে দেখুক না। তখন তার একদিন কি আমার একদিন।"

সুজাতা মিত্র হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার দাদাটি তো বেমালুম নিজের নামটা হাতছাড়া করলেন।"

আমি রেগে গিয়ে বললাম, "বেশ করেছেন। তাঁর নিজের নাম, তা নিয়ে তিনি যা খুশি করবেন, তাতে কার কী?"

সুজাতা মিত্র বললেন, "সেবারে আপনাদের কিন্তু খুব ভুগিয়ে গিয়েছিলুম। ভাবলে এখনও আমার লজ্জা লাগে।"

হয়তো সুজাতা মিত্র আরও কথা বলতেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি একটু গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বোসদা যে কখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি।

বোসদা প্রথমে বললেন, "আরে আপনি? এই ছেলেটা বাত্রদুপুরে আপনাকে বকিয়ে বকিয়ে মারছে তো? বকতে পেলে শ্রীমান আর কিছুই চায় না।"

সুজাতা মিত্র বললেন, "উনি নিজেকে আপনার সুযোগ্য শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেন। কিন্তু অনেক ঠোঁটের জিনিস আপনার কাছ থেকে শিখেছেন। সেবারে আপনি নিজের ঘর খুলে দিয়ে আমাকে থাকতে দিলেন; আর এখন কিনা আপনার শিষ্য ভদ্রতা করে বলছেন, নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হয়েছিল, এবারে ভাল ঘর দিচ্ছি।"

সত্যসুন্দরদা এবার অবাক কাণ্ড করে বসলেন। সত্যসুন্দরদা যে কোনো মেয়েকে এমন কথা বলতে পারেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। সত্যসুন্দরদা গম্ভীরভাবে বেমালুম বলে দিলেন, "অথচ তার জন্যে পরের দিন আপনি একটা ধন্যবাদও দিয়ে যাননি।"

প্রত্যুত্তরে সুজাতা মিত্রের মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, তা আজও আমার মনে আছে। যেন ভোরের সূর্য সাদা বরফের পাহাড়ের উপর প্রথম আলোর রেখা ছড়িয়ে

দেন। সুজাতাদি বললেন, "ধন্যবাদ ইচ্ছে করেই দিইনি। যারা নিজের ঘর খুলে অচেনা অতিথিকে শুইয়ে দিয়ে সারারাত জেগে থাকে, তারা নিতান্তই গোঁয়ার, না-হয় বোকা। তাদের ধন্যবাদ দেবার কোনো মানে হয় না।"

"সুযোগ পেয়ে, আইন বাঁচিয়ে, গোঁয়ার, বোকা, আহাম্মক এতোগুলো গালাগালি দিয়ে দিলেন।" বোসদা বললেন।

আমাদের দিকে না তাকিয়েই সুজাতা মিত্র বললেন, "চমৎকার বানাতে পারেন তো। আহাম্মক কথাটা কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসলো।"

এবার আমাকে উদ্দেশ্য করে সুজাতা মিত্র বললেন, "সেদিন যাবার সময় ধন্যবাদ দেবার জন্যে উপরে গিয়েছিলাম। আপনারা কেউ ছিলেন না। এখন দেখছি ভালই হয়েছিল। আপনাদের মতো লোকেদের ধন্যবাদ প্রাপ্য নয়। আপনারা সত্যিই তার যোগ্য নন।"

বোসদা বললেন, "আই অ্যাম সরি, আপনি যে আমাকে খংজেছিলেন জানতাম না।"

আমার তখন বোসদার উপর রাগ হয়ে গিয়েছে। সুজাতাদির পক্ষ নিয়ে বললাম, "কী করে জানবেন? দিনরাত হয় ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, ব্যাংকোয়েট, না হয় টেবিল বুকিং, ফ্লোর শো নিয়ে ডুবে থাকলে অন্য জিনিসের খবর রাখবেন কী করে?"

সুজাতা মিত্র বললেন, "আপনাদের চোখে কী ঘুম নেই?"

বোসদা সুযোগ ছাড়লেন না। উত্তর দিলেন, "সাধী বলছেন, ভাল লোকেরা যাতে বিরক্ত না হন, সেই জন্যে ঈশ্বর দুষ্টদের চোখে ঘুম দিয়েছেন।"

সুজাতা মিত্র গম্ভীরভাবে বললেন, "তাহলে কী দুজনকেই জেগে থাকতে হয়।"

আমি বললাম, "বোসদার জেগেথাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের ম্যানেজারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বোসদা আমাকে বললেন, "ভেবেছিলাম থানায় খবর দেবো। কিন্তু তাতে অনেক গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া এইমাত্র মথুরা সিং-এর সঙ্গে আমার কথা হলো এক্ষুণি। শুনলাম, দু-একদিন আগে একজন সায়েব নাকি এসেছিলেন। দুজনের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। একবার ওঁর সঙ্গে তুমি দেখা করে এসো। আমি যেতে পারতাম, কিন্তু বাড়ি চিনি না। এতো রাত্রে খুঁজে বার করা বেশ শক্ত হবে। তার থেকে তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চেষ্টা করবার চেষ্টা করো। আমি দোকানে টেলিফোন দেখছি।"

সুজাতা মিত্র চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, "আমি একটা কথা বলবো? যদি আপত্তি না করেন, তা হলে আমাদের এয়ার লাইনের গাড়িটা নিয়ে যান। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। ও নিশ্চয়ই গাড়ির ভিতর শুয়ে আছে।"

রাতের অন্ধকারে কতদিন পথে পথে ঘুরে কলকাতার রূপ দেখেছেন কি? দুরন্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে কখন কলকাতাকে শান্ত করে দেয়। মাঝে মাঝে দু'একটা ট্যাক্সি হয়তো দেখা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে কারা? কলকাতার কোনো সাহিত্যানুরাগী ট্যাক্সিওয়ালা আত্মজীবনী লিখলে হয়তো তা জানা যাবে। বাইরে থেকে মনে হয় তারা সবাই যেন অসুস্থ কোনো রোগীকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছে।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু থেকে আমাদের গাড়ি চৌরঙ্গীতে এসে পড়লো। রাতের নির্জন চৌরঙ্গী যেন কলের পুতুলের মতো এখনও জনহীন চৌরঙ্গীর রঙ্গমঞ্চে আপনমনে অভিনয় করে চলছে। কোন্ এক দুর্বার আকর্ষণে ড্রাইভারকে ডান দিকে গাড়ির মোড় ঘোরাতে বললাম। কার্জন পার্কের লোহার বেড়ার মধ্যে স্যর হরিরাম গোয়েংকা এখনও ইনসোমনিয়াগ্রস্ত শ্রেষ্ঠীপতির মতো প্রভাতের প্রতীক্ষায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরই পদতলে ভুলুণ্ঠিত হয়ে যারা অকাতরে ঘুমোচ্ছে তারা কারা?

স্যর হরিরাম গোয়েংকা আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না। এই আদিম নগরীর আদিমতম রহস্যমালা যেন তাঁর হৃদয়হীন ধাতবচক্ষুর কাছে কবে ধরা পড়ে গিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও স্যর হরিরাম গোয়েংকার নিরস কঠিন দেহে যেন একবিন্দু স্নেহ বা করুণা আবিষ্কার করতে পারলাম না।

কে জানে কেন, পৃথিবীর কোনো মানুষকে আমি এতো ভয় করি না। আমার অন্তরের কোথাও তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে সর্বক্ষণ উপস্থিত রয়েছেন। নিদ্রাহীন, তৃষিতপ্রাণ হরিরাম যেন দিনে দিনে আরও কঠিন ও কর্কশ হয়ে উঠছে। তাঁর বিরক্ত চোখের দিকে দূর থেকে তাকালে মনে হয় যেন স্যর হরিরাম গোয়েংকা বাহাদুর কেটি সি আই ই তাঁর সকল অপ্রিয় অভিজ্ঞতার জন্যে পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকতে আমাকেই দায়ী করে এসেছেন। দুনিয়ার যতো দুর্বিনীত নিম্নমধ্যবিত্ত যেন তাঁকে অবহেলা এবং অপমান করবার জন্যেই দল বেঁধে আমাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেছে, গাড়ি চড়িয়ে রাতের অন্ধকারেও তাঁকে বিরক্ত করতে পাঠিয়েছে।

হয়তো আরও অনেকক্ষণ ছেলেমানুষের মতো স্যর হরিরামের সঙ্গে আমার নীরব কথাবার্তা চলতো। কিন্তু এরোপ্লেন

কোম্পানির বাস ড্রাইভার আমাকে সাবধান করে দিল। বললে, "বাবুজী, এখানেই এতো রাত্রে কেউ আসবেন নাকি?"

বললাম, "না। চলো আমরা এবার এগিয়ে যাই। আমাদের এলিয়ট রোডের দিকে যেতে হবে।"

কার্জন পার্ককে বাঁ দিকে রেখে গাড়ি আবার পূর্ব দিকে মোড় ফিরল। স্যার সুরেন ব্যানার্জি যেন মনুমেণ্টের তলায় সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা করছিলেন। মাইক খারাপ হয়ে গিয়ে তিনি যেন মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং সেই সামান্য সময়ের মধ্যেই ধৈর্যহীন অকৃতজ্ঞ শ্রোতার দল যেন মিটিং ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। অবহেলিত এবং অপমানিত সুরেন্দ্রনাথ যেন হতাশায় অকস্মাৎ প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়েছেন।

কর্পোরেশন স্ট্রীট পেরিয়ে গাড়ি এবার ওয়েলেসলী স্ট্রীটে পড়লো। আর আমার আবার বায়রন সায়েবের কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। দু'একবার দূর থেকে শাজাহানের ব্যাংকোয়েট রুমে তাঁকে দেখেছি। কিন্তু ইশারায় তিনি কথা বলতে বারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই কোনো শিকারের পিছনে তিনি গোপনে ছুটছেন, হয়তো কাউকে নিঃশব্দে ছায়ার মতন অনুসরণ করছেন। বার-এ এক বোতল বীয়ার নিয়েও তাঁকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। কিন্তু তিনি আমাকে দেখেও দেখেনি। আমি যে তাঁকে চিনে ফেলি, এবং তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা-বার্তা বলি তা নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

তবু অন্য সময়ে তাঁর খোঁজ নেওয়া আমার উচিত ছিল। অন্ততঃ তাঁর বাড়িতে এসে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেসব কিছুই হয়ে ওঠেনি। শাজাহান যেন বিশাল হাঁ করে আমার সর্বস্ব গ্রাস করে ফেলেছে। আমার কোনো পৃথক সত্তা যেন শাজাহানের ক্ষুধা থেকে রক্ষা পাইনি।

ড্রাইভার বললে, "কোন্ দিকে বাবু?"

আমি বললাম, "তুমি সোজা চলো, সময়মতো আমি দেখিয়ে দেবো।"

ড্রাইভার বললে, "বাবুজী জায়গা ভাল নয়। এতো রাত্রে গাড়ি দেখলে এখানে অনেক রকম সন্দেহ করে।"

আমি বললাম, "অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলাম দিনের আলোয়। পরিস্কার মনে করতে পারছি না। আর একটু এগোলে হয়তো গলিটা চোখে পড়বে, তখন হয়তো চিনতে পারবো।"

শেষপর্যন্ত গলিটা সত্যিই চিনতে পারলাম। সুজাতা মিত্র দয়া না করলে

এতো রাত্রে ট্যাক্সি চড়ে এখানে আসতে আমার সাহস হতো না। হাওয়াই কোম্পানির গাড়িটা কিন্তু গলির মধ্যে ঢুকলো না। নেমে পড়ে আমি বায়রন সায়েবের বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম না।

একটা টর্চ আনা উচিত ছিল। রাস্তার আলোগুলো ইঙ্গ-বঙ্গ পাড়ার ছোকরাদের গুলতির লক্ষ্যস্থল হিসেবে কখনও দীর্ঘ জীবন লাভের সুযোগ পায় না। প্রায় হাতড়াতে হাতড়াতে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেটাই যে বায়রন সায়েবের বাড়ি তা ভাঙা নেমপ্লেটটা দেখে আমার বুঝতে বাকি রইল না। একটু দূরে একটা রাস্তার আলো অব্যর্থ লক্ষসন্ধানী এলিয়ট রোড বয়েজদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তখনও কী ভাবে টিকে রয়েছে।

বায়রন সায়েবের দরজা বন্ধ। ভিতরেও কোনো আলো জ্বলছে না। এতো রাত্রে তাঁকে ডেকে তোলা কি উচিত হবে? ...স্মরণ করতে করতে কলিং বেলটা টিপে দিলাম।

কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। হয়তো ভিতরে কেউ নেই। একটু ফাঁক দিয়ে ...র বোতাম টিপলাম।

ভিতরে কে যেন এবার একটু নড়ে চড়ে উঠলেন। তারপর নারীকণ্ঠে ইংরিজী ...গালাগালি কানে ভেসে আসতে লাগলো। আমি শুনলাম, কে যেন বলছেন, তুমি যেখানকার জঞ্জাল সেখানে গিয়ে মরো। মাঝ রাতে আমাকে জ্বালাতন করতে এসেছো কেন?"

আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালাম। মহিলা তখন আর এক রাউন্ড ফায়ারিং করলেন। "লজ্জা করে না মিনসে, রোজগার তো উল্টে যাচ্ছো, আবার রাতেও ...। যাও ডাস্টবিনে পারিয়া ...দের সঙ্গে শুয়ে থাকোগে যাও। ...দিন আমি খেটে মরবো, তোমার ভাতের জোগাড় করবো, আবার রাতেও ...দের মতো জেগে থাকবো সে আমি ...না। তুমি দূর হও, দূর হও।"

...ক্ষণে সত্যিই আমি ভয় পেয়ে ...ছি। মার্কোপোলো তখন মাথায় ...। পালাবো কিনা ভাবছিলাম। ...তার আগেই ভিতর থেকে দরজা ...র শব্দ হলো। দরজা খুলেই ঝাঁটা ...গিয়েই ভদ্রমহিলা যেন চমকে ...লেন। স্বামীর বদলে আমাকে দেখে ...উ করে চিৎকার করে উঠলেন।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে বলো। ...স্বামীর নিশ্চয় কোনো বিপদ ...। ওগো, কতবার তোমাকে বলেছি ...কে ডিটেক্টিভগিরি করতে হবে না। ...পোড়া দেশে ও-সব চলবে না। ওর ...তুমি খবরের কাগজ ফেরি করো, ...ই বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকো। আমি যতক্ষণ চাকরি করছি ততক্ষণ তোমার কীসের ভাবনা?"

অন্য পাড়া হলে এতোক্ষণে সেই কান্না শুনে প্রতিবেশীরা ঘরের দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে আসতেন। কিন্তু এই অঞ্চলের পল্লীতে ও-সব বড় একটা হয় না। একজনের প্রাইভেসীতে আর একজন মরে গেলেও মাথা ঢোকান না।

মিসেস বায়রন কাতরকণ্ঠে জানতে চাইলেন, আমি পুলিসের লোক, না হাসপাতালের লোক। এতো রাত্রে এই দুজন ছাড়া যে আর কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে তা তাঁর কল্পনারও অতীত। বললেন, "কোথায় আমার স্বামী আছে বলো, আমি এখনই যাচ্ছি।"

আমি এবার কোনোরকমে বললাম, "আমি পুলিস বা হাসপাতালের প্রতিনিধি নই। আমি হোটেলের লোক। আমাদের সায়েব মিস্টার মার্কোপোলোকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই খোঁজ করতে এসেছি।"

"ও তাই বলো", শ্রীমতী বায়রন আবার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। "তুমি সেই মোটকা সায়েবের কথা বলছো তো যে মাঝে মাঝে আমাদের জন্যে স্যান্ডউইচের প্যাকেট নিয়ে আসে। সে মিনসেই তো যতো নষ্টের

গোড়া। আমাকে বার করে দিয়ে দ্বজন গ্বজ গ্বজ করে কথাবার্তা চালায়। আমার স্বামী বলেন, ওঁর মক্কেল। আমি কিন্তু বাপ্ব শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলে চিনতে পারি। সব বাজে কথা। আসলে ওঁর সঙ্গী। দ্বই স্যাঙাতে মিলে সেই যে বেরিয়েছে, কোথায় কোন্ চুলোয় গিয়ে পড়ে আছে কে জানে।"

শ্রীমতী বায়রন তখনও অশ্লীল গালাগালি বর্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু আমার মনে সাহস ফিরে এসেছে। বায়রন সায়েব এবং মার্কোপোলোর তাহলে একটা হদিস পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীমতী বায়রন বিরক্ত হয়ে বললেন, "ও-সব ন্যাকামো ছাড়ো, আমার স্বামী এখন কোথায় আছেন বলো।"

আমি বললাম, "মিস্টার বায়রন কখন আসবেন কিছ্ব বলে গিয়েছেন?"

"কিছ্ব বলে যাননি। ওই মিনসে আসতেই, বেরিয়ে গিয়েছেন। মিয়্যাও... তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বললে আমার পেট ভরবে না। এই বলে শ্রীমতী বায়রন দড়াম করে আমার ম্বখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। [ক্রমশ]

ওয়াশিংটনের নার্সারী স্কুলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন

সুষম সামঞ্জস্য আছে। যা থেকে আমাদের দেশে ছোটছেলেরা নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত। যা চোখে পড়ে, ভাল লাগে।

ওখানকার বাল্য-শিক্ষাব্যবস্থায় অবশ্য শিক্ষাব্রতীরা সকলে সন্তুষ্ট এমন নয়। অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন জাত সম্পর্কে আমেরিকার বাইরে এত মন্দ ধারণা জন্মাবার এক বড়ো কারণ হলো মার্কিন বুদ্ধিজীবী তথা সাহিত্যিকবর্গের আত্ম-সমালোচনার তীব্রতা। দেশে যেন ভাল কিছু নেই, যা কিছু হচ্ছে সবই ভুল, ব্যর্থ। ছোটদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ঠিক এমনতরো আক্ষেপ শোনা না গেলেও বেশ বড়ো গলায় এর সমালোচনা ওঠে। তার কিছু কারণও আছে। ছোটদের ভিতরে দল বেঁধে মিলে-মিশে খেলা করা, জনপ্রিয় হয়ে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব করে থাকা—এই অভ্যাসগুলির ওপর জোর দিতে গিয়ে এখানে সম্ভাব্য প্রতিভার বিকাশের দিকে সাধারণ স্কুলে লক্ষ্য রাখার বড়ো সুযোগ নেই। স্কুলে যাওয়া যেন সামাজিকতা শিখতে যাওয়া, লেখাপড়ার চর্চা নিতান্ত গৌণ। পুঁথিগত বিদ্যা সম্পর্কে এই হেলাফেলা ভাব নিয়ে বিশেষ করে "স্পুটনিক" আকাশে ওড়ার পর থেকে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক কথা চালাচালিও হয়েছে। এই সমস্যা অবশ্য বিশেষ ধরনের 'প্রাইভেট' স্কুলে অনুপস্থিত। সেখানে বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা মজুত।

ইস্কুল পর্যায়ে আর এক সমস্যা হলো: ছেলেমেয়েদের কী পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া চলে! আমেরিকার সেকেলে মানুষরা যখন রাগ করে বলেন: 'আজকাল ইস্কুলে ছেলেরা স্রেফ আশকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ছে', তখন এঁদের বক্তব্যের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ক্যানাডার এবং ওদিকে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগের মতের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। ইংলণ্ডে সাধারণ স্কুলে শিক্ষয়িত্রীকে দুটি বিষয় নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি: এক হলো ব্রিটিশ ডিসিপ্লিন, অন্যটি স্কুলের ছেলেদের জন্য বিনামূল্যের দুধ। "এ আমেরিকা পাবে কোথায়?"—বলে তিনি উজ্জ্বল মুখে একবার তাকিয়েই ছুটলেন যে-ছেলে দুধ খাবার ঘণ্টায় দুধ ফেলে সরে পড়েছিল সে যাতে একেবারে দুধ-না-খেয়েই স্কুল থেকে না পালায় এই তত্ত্বাবধান করতে। এরকম ঊর্ধ্বশ্বাসে শিশু-স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা না করে নামমাত্র মূল্যের ব্যবস্থা মনে রেখে আমেরিকার স্কুলে যে ছেলেমেয়ের দুধ খাবার বা না খাবার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সে সুযোগকে ভাল চোখে দেখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। বিরোধীপক্ষের যথেষ্ট সারবান যুক্তিও রয়েছে। দুঃখের কথাই হোক আর যে-কথাই হোক, তাঁরা বললেন, মানুষের স্বাধীন মতে কর্ণপাত করব তখন যখন তার স্বাধীন সত্তা রয়েছে। ছোটদের কি তা আছে? ওরা তো সব খুদে বিচ্ছু! মানুষের বড়ো হয়ে ওঠার পথে অনিবার্য বিড়ম্বনা এই বাল্যকাল। একে কোনমতে টেনেটুনে পার না করলে উপায় আছে? বাচ্চাদের জবানবন্দীতেও এঁদের পক্ষে পাকা সম্মতি মেলে। শোনা গেছে, বাচ্চা নাকি টিচারকে বলেছে: "Must I have a free time, Miss—?" এই ইচ্ছেমত হাতের সময়ের স্বাধীন সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা আমেরিকার প্রাথমিক বর্গের অন্যতম শিক্ষা। আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ এবং সে গণতন্ত্রকে কেবল কথার জালে না বেঁধে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বাধীন ইচ্ছায়, স্বাধীন চেষ্টায় ছড়িয়ে দিতে আমেরিকানরা উৎসুক। বয়ঃপ্রাপ্ত মাত্রে মানুষ স্বাধীন হবে কি করে যদি না সে বাল্যে স্বনির্ভর হতে শেখে? "সদা গুরুজনের আদেশ মান্য করিবে" জপ করতে করতে মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক হওয়া শক্ত। নিজেকে নিজে চালাতে শেখা চাই। কিন্তু এই চাইতে জানারও তো ধাতুভেদ, পাত্রভেদ আছে। সমস্যা দেখা দেয় সেইখানে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে দায়, যে দায়িত্ব, অপরিণত মন তা দিতে না চাইতে পারে, তার সদ্ব্যবহার করা তো দূরে থাক! পরনির্ভরতায় এক-ধরনের স্বাদ আছে—মায়ের আঁচলের স্বাদ, বাপের কড়া—তবু—চেনা-হাত ধরে হাঁটার স্বাদ। এ থেকে মানুষের মনকে বের করে আনা শক্ত। সেই শক্ত সমস্যার সামনে আমেরিকার বাল্যশিক্ষাব্যবস্থা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

স্কুল সংলগ্ন মাঠে ক্রীড়ারত মার্কিন শিশু

মানসী দাশগুপ্ত

॥ ১১ ॥

সে নিজের বাড়ি গেল না, গেল ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির দিকে। সে জানত নিজের বাড়িতে তার কাকা জেগে বসে আছেন। ওই নপুংসক লোকটাকে তার ভয় ছিল না, কিন্তু চীৎকার চেঁচামেচিতে একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে এই ভয়ে সে আর গেল না সেখানে। যতীশবাবু তার আপন কাকা নন। গিরিশ বিদ্যার্ণব তার মায়ের এক ছেলে ছিলেন। যতীশ তাঁর পিসতুতো ভাই। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে তিনি গিরিশ বিদ্যার্ণবের স্ত্রীর কাছে মানুষ হন। কুটুম্বের ছেলে বলে কেউ তাঁকে কিছু বলত না। কুটুম্বের বাড়িতে পোষ্য হ'য়ে মানুষ হলে সাধারণত যা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যতীশবাবু সুস্থ সবল মানুষ হ'তে পারেননি, হয়েছেন কুটিল কুচক্রী স্বার্থপর অমানুষ। গ্রামের বিস্তৃত পরিবেশে তাঁর সঙ্গ তত পীড়াদায়ক মনে হত না, ঝিনুক শামুক তো কলকাতার বোর্ডিং-এ থাকত বেশীর ভাগ সময়, তাই যতীশবাবুর সত্য পরিচয়ও তারা ঠিক ধরতে পারেনি। দাঙ্গার সময় তাঁর স্বরূপ বেরুল। তারপর এখানে এসে একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে তাঁর আসল পরিচয় আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। যতীশবাবু টাকা চান। যেভাবেই হোক ঝিনুক শামুক রাশি রাশি টাকা রোজগার করে আনুক, যেমন করে পারে আনুক, তিনি সেটার উপর কর্তৃত্ব করবেন। তিনি যে নিজেকে পূর্ববঙ্গের একজন বড় জমিদার বলে পরিচয় দিয়েছেন, চায়ের দোকানে বসে রং চড়িয়ে নানা গল্প বলে আস্ফালন করেছেন, সেটা হাতে-কলমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন, এবং অবশেষে পাকিস্তানে চলে গিয়ে সেখানে টাকা ছড়িয়ে আরামে থাকবেন, এইটেই আপাতত তাঁর লক্ষ্য। সত্যিই তিনি ঝিনুকের ফিরবার আশায় জেগে বসে ছিলেন। ঝিনুক কিন্তু গেল না। সে গেল ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি। সেখানে যাওয়ার অন্য একটা কারণও ছিল। ডাক্তার ঘোষালের প্রাপ্য টাকাটা নিশ্চয়ই তাঁকে দিয়ে গেছেন সুবেদার খাঁ। সুবেদার খাঁ সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেন সবাইকে, কারও টাকা তিনি নিজের কাছে রাখেন না। ডাক্তার ঘোষাল টাকাটা নিয়ে কি করলেন, কোথায় রাখলেন এই চিন্তাও ছিল ঝিনুকের। ঘোষাল সাধারণত যখন যা পান ঝিনুককেই দিয়ে দেন, এমন কি জুয়া খেলে যে টাকা রোজগার করেন সে টাকাও। গত কয়েকদিন থেকে কিন্তু ঝিনুককে কোন টাকা তিনি দিচ্ছেন না। মুদির দোকানে ধার জমে গেছে, দুধওলা দাম চাইছে, মদের দোকানেও অনেক ধার...আজকের এ টাকার খানিকটা অন্তত ঝিনুকের পাওয়া নিতান্ত দরকার। তা না হলে সংসার চালানো যাবে না।

ঝিনুক গলির মধ্যে ঢুকেই সোজা বাড়ির দিকে গেল না। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে আশংকা করছিল তাস খেলার হুল্লোড় এখনও বোধ হয় থেমে যায়নি। কিন্তু কোনও শব্দ শোনা গেল না। আর একটু এগিয়ে দেখল বাড়ির সামনে কারো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। বাড়ির সামনের দরজাটা খোলা। তারপর নজরে পড়ল দরজার পাশে কে যেন বসে আছে।

"কে?" এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ঝিনুক।

"আমি কাউ।"

"ওখানে অমনভাবে বসে কেন?"

"আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

"ডাক্তার ঘোষাল কোথা?"

"তিনি একটু আগে বেরিয়ে গেছেন।"

"খেয়ে গেছেন?"

"ডিম পাঁউরুটি খেয়ে গেছেন। আজ তো রান্না হয়নি। মিস্টার সেনের ওখানেই উনি বোধ হয় খাবেন।"

ঝিনুক আর একটু এগিয়ে এল। ঝিনুক আসতেই একটা কাগজের পুলিন্দা বার করে কাউ বললে, "এই নিন।"

"কি আছে এতে?"

"আপনার চুড়ি আর হার।"

"সে কি! ওগুলো তো তোমার মাকে দিয়েছিলাম। তিনি ফিরিয়ে দিলেন?"

"না, আমি কেড়ে এনেছি। আপনার গয়না আমি ওকে নিতে দেব না।"

"তোমার মা কোথায়?"

কাউ এ কথার কোন উত্তর দিল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায় সেদিন গঙ্গার ধারে গিয়েছিলেন। গঙ্গার যেসব জায়গায় সবাই যায়, পরিচিত জনতার প্রাত্যহিদিনের পদক্ষেপে যেসব জায়গা ঘাটে

পরিণত হয়েছে তিনি সেখানে যাননি। তিনি আঘাটায় গিয়ে বসেছিলেন একটা ভাঙা বাড়ির চত্বরে। বহুকাল পূর্বে শহর থেকে দূরে জনতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যে লোকটি এখানে কেবল সুরধুনীর সংগ লাভ করবার জন্য বাড়ি করিয়েছিলেন তাঁর নামও অনেক ভুলে গেছে। দু-একজন বৃদ্ধ লোক বলেন, ওটা ফুদিবাবুর বাড়ি। তিনি কলকাতা থেকে এসে এখানে জমি কিনে এই বাড়ি অনেক শখ করে করিয়েছিলেন বাস করবেন বলে। প্রথম কিছুদিন তাঁর পরিবারবর্গও ছিলেন এখানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। সমাজের বাইরে নির্জন স্থানে থাকবার জন্য যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতির প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না। অধিকাংশ মানুষের স্বভাব লতার মতো, তা অপরকে আশ্রয় করে অপরের সংগে জড়িয়ে না থাকতে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। তাদের জন্য সমাজের মাচা চাই। নিজের জোরে খাড়া একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বনস্পতি। এ রকম বনস্পতি মানুষের মধ্যে খুব বেশী নেই। ফুদিবাবু সেই রকম বনস্পতি ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ এখানে থাকতে পারেননি, কিছুদিন থেকেই কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন তাঁরা। ফুদিবাবু যাননি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরটাও আশ্চর্যজনক। তিনি যেদিন হৃদয়ংগম করলেন শরীর অপটু হয়েছে সেদিন তিনি ডাক্তার ডাকেননি, গংগায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর ওঠেননি। এখানকার লোকের ধারণা, তিনি এ বাড়ি ছেড়ে যাননি। অনেকে তাঁকে এ বাড়িতে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছে। এই জন্যেই এ বাড়ি কিনতে চায় না কেউ। ফুদিবাবুর ছেলেরা বিক্রি করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ক্রেতা পাওয়া যায়নি। বাড়িটা এমনিই পড়ে আছে। লোকে কপাট জানলা খুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু রেকতার গাঁথুনি ভেঙে ইঁটগুলো নিয়ে যেতে পারেনি এখনও।

গংগার দিকে যে বিরাট বারান্দাটা আছে তাতেই বসেছিলেন সুঠাম মুখুজ্যে। একদল খঞ্জন পাখীর দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলেন তিনি। ওপারের বালুচরে গৃধিনীও ছিল কয়েকটা। বেশ হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছিল তারা। মনে হচ্ছিল তারাও যেন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে। এপারে একটা বাঁশের উপর বসে ছিল একটা মাছরাঙা পাখী। গংগার জল কমে গিয়েছিল, জলের ধারে ধারে সাদা বকও ঘুরে বেড়াচ্ছিল দু-একটা। আর ঘাপটি মেরে বসে ছিল একটা কোঁচ বক। পারিপার্শ্বিকের সংগে তার রং এমন মিলে গিয়েছিল যে, চেনা যাচ্ছিল না তাকে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু সেটাকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পকেট থেকে কাগজ বার করে লিখতে শুরু করলেন।

"আজ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি। ভেবেছিলাম কিছু করব না, তার স্মৃতি নিয়ে বসে থাকব চুপ করে। কিন্তু দেখলাম চুপচাপ বসে থাকা যায় না। দেহটাকে জোর করে এক জায়গায় বসিয়ে রাখলেও মন বসে থাকে না। আর মনকে ঠিক যে জিনিসটি ভাবতে বলা যায় তাও সে ভাবে না। চঞ্চল শিশুর মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায় সর্বত্র। যোগীরা হয়তো মনকে বাগ মানাতে পারেন, আমি পারলুম না। তাই চুপচাপ বসে থাকার সংকল্প ত্যাগ করে ফুদিবাবুর বাড়ির চাতালে

এসে বসেছি। এখানে এই নির্জনে এসে একটা জিনিস আবিষ্কার করে অবাক হ'য়ে গেলাম, মন নিগূঢ়ভাবে বন্ধুর কথাই ভাবছে। ওই কোঁচ্‌ বকটার মতো বন্ধুর ভাবনাটাও আত্মগোপন করে বসে ছিল এতক্ষণ মনেরই ভিতর। আমি দেখতে পাইনি। সেই ভাবনাটাকেই প্রণিধান করতে লাগলাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ওই বকটার সূত্র ধরেই মনে পড়ছে মহাভারতের বিখ্যাত বকের কথা, যে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস কি। যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, দিবারাত্রি আমরা দেখছি যে, সবাই একে একে মরে যাচ্ছে, তবু আমরা একবারও ভাবি না যে, আমরাও মরে যাব। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে? যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন তা খানিকটা সত্য বটে, কিন্তু আমরা যে নিজেদের মৃত্যুর কথা একেবারে ভাবি না, তা সত্য নয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি, অনুভব করি যে, আমাদের মরতে হবে, মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়েই আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করেছি। ক্রিশ্চানদের মতে আমরা পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করি। এটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা জানি না, কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমরা মরব বলেই জন্মেছি। কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটা মনে রাখলেই কি আমরা মৃত্যুর হাত এড়াতে পারব? তা যদি না পারি তা হলে এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি? আমার বন্ধু জীবনে অনেক কীর্তি রেখে গেছে, সে যদি সর্বদা মরণের ভয়ে ভীত হয়ে বসে থাকত তা হলে সে কি কিছু করতে পারত? মানুষের ওইখানেই তো মহত্ত্ব, সে জানে যে, তাকে মরতে হবে, তবু জীবনকে ভোগ করতে সে বিরত হয় না, জীবন নশ্বর জেনেও জীবনকে তারা ভালবাসে, মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও সে অমৃতের সন্ধান করে অপরূপ জীবন-লীলায়। ওই যে খঞ্জনের দল লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে ওরা কি আমাদের মতোই জানে যে, মৃত্যুকে এড়াবার উপায় নেই? ওদের মৃত্যু-ভয় আছে, কিন্তু মরতে হবেই এ দৃঢ় প্রত্যয় আছে কিনা জানি না। কোন কিছুর সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলতে ভয় পাই। কে জানে, একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হবে পাখীরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। মানুষ একদিন মনে করত পৃথিবী চতুষ্কোণ এবং স্থির, এখন প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবী গোল এবং অস্থির। পাখীদের সম্বন্ধেও হয়তো চমকপ্রদ অনেক অবিশ্বাস্য তথ্য প্রকাশ পাবে ভবিষ্যতে। তবে একটা কথা জানি, মৃত্যুর সম্বন্ধে না হলেও জীবন সম্বন্ধে ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী পটু। ওরা প্রাণ ভরে বাঁচতে জানে। মানুষের তৈরী খাঁচায় বন্দী হয়ে যারা পাখা দুটি কপচাতে শেখেনি তারা অনবদ্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা ডানা মেলে ওড়ে, গান গায়, জীবনের উৎসবে মেতে ওঠে, নেচে, গেয়ে, পক্ষবিস্তার করে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। ওদের ডাক্তার নেই, উকিল নেই, রাজনীতি নেই, স্বাদেশিকতা নেই, [illegible] নেই। জীবনের আনন্দেই ওরা ভরপুর।

আমার যে বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি সেও অনেকটা ওই পাখীদের মতোই ছিল। তার প্রাণ-প্রাচুর্যের [illegible] তার মৃত্যু। সে পাখী ছিল না সত্যি, ও আবহাওয়ায় মানুষ হ'তে হয়েছিল তাকে, তাই নানারকম রোগ জুটেছিল তার শরীরে। কিন্তু সে ছিল

প্রাণের খর-বেগে বেগমান অমিতবীর্য চির-যুবা। রোগের হুমকি সে মানেনি, ডাক্তারের উপদেশ শুনে জীবনের সুরকে বেসুরো করে ফেলেনি। যখন যা খুশি করেছে। তাই মরে গেল। সে জানত মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু সাবধান হয়নি তবু, সাবধান হতে সে জানত না। খুব অসুস্থ হলে কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকত, ডাক্তারদের বলত এবার আপনাদের কথা শুনব। কিন্তু ভাল হলে আবার যে কে সেই। অনিবার্যকে নিবারণ করবার চেষ্টা করেনি সে, তাই হঠাৎ একদিন থেমে গেল। মনে হয় ঠিক সময়ে এসেই থেমেছে। এই সূত্রে কেন জানি না মনে পড়ছে সেদিনকার সেই রূপসী মেয়েটিকে, যে সেদিন রাত্রে ডিসটাণ্ট সিগনালের কাছে ব্যাগ কুড়োতে গিয়েছিল। সেও বেপরোয়া, সেও জীবনকে ভোগ করতে চায় বলে মরণকে ভয় করে না। যে লোকটি গুলী চালিয়েছিল তার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি? কিন্তু এটা লিখেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে—ওরে উৎসুক, এসব জেনে কি হবে? কতটুকুই বা জানতে পারবি? তার চেয়ে কল্পনা কর। কল্পনায় অনেক রং ফুটবে, অনেক দূরে যেতে পারবি, শেষ পর্যন্ত হয়তো যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবি তা দুনিয়ার নিরিখ-প্রমাণ অনুসারে হয়তো ভুল, কিন্তু তাতেই তুই সুখ পাবি। ওরা দুজন প্রণয়-প্রণয়ী এ কথা ভেবে আনন্দ করতে ক্ষতি কি? আমাদের দেশের পুরাণকাররা এর চেয়ে ঢের বেশী দুঃসাহসিক কল্পনা করেছেন। স্বয়ং ভগবানকে নিয়ে গেছেন বৃন্দাবনের গয়লা-পাড়ায় আর তাঁকে দিয়ে যেসব প্রণয়-লীলা করিয়েছেন তা আধুনিকতম ফরাসী সমাজেও বোধ হয় বেমানান হবে না। শুধু তাই নয়, তাঁদের কল্পনা এত প্রবল, এমন বর্ণাঢ্য, এমন মর্মস্পর্শী যে, তা সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করবার প্রশ্নও আমাদের মনে জাগেনি, আমরা পুজো করছি সে লীলা-উৎসবকে যুগ-যুগান্ত ধরে..."

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন বালুর চর ভেঙে কে যেন আসছে এবং তাকে দেখেই মাছরাঙা পাখিটা উড়ে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। কে আসছে চর ভেঙে এ সময়? কাছে আসতে চিনতে পারলেন, গণেশ হালদারকে। তিনি ওপারের চরে গেলেন কি করে? তারপর তাঁর মনে পড়ল, তাঁর বাড়ির সামনে যে চরটা আছে সেটা দিয়ে এখানে আসা যায়। আজ রবিবার ছুটি আছে তাই মাস্টার মশাই বেড়াতে বেরিয়েছেন। অনেক দূরে হেঁটেছেন তো। বালির চরের উপর দিয়ে প্রায় পাঁচ ছ মাইল হাঁটতে হয়েছে। মাস্টার মশাই ওপারে এসে যে খাঁটার উপর মাছরাঙাটা বসে ছিল সেইটের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ তুলে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই পাখীটা হঠাৎ আবার ফিরে এল। ফিরে এসে নদীর মাঝখানে শূন্যে নিজেকে স্থির রেখে পাখা দুটো নাড়তে লাগল ঘন ঘন, তারপরই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে একটা মাছ তুলে নিয়ে উড়ে গেল। মাস্টার মশাই সাগ্রহে চেয়ে রইলেন পাখীটার দিকে, আর ডাক্তারবাবু নদীর এপারে একটা ভাঙা বাড়ির চাতালের উপর বসে সকৌতুকে দেখতে লাগলেন তাঁকে। গণেশ হালদারের যে পাখী দেখার এত ঝোঁক তা তিনি জানতেন না। তেমনি খুশী হলেন। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা একটু যেন বেড়ে গেল। এই মাছরাঙাদের সম্বন্ধেই অনেক গল্প শোনাতে পারেন তিনি তাঁকে। এককালে তিনিও ওই মাছরাঙাদের পিছু পিছু ঘুরেছেন। হঠাৎ গণেশ হালদার দেখতে পেলেন ডাক্তারবাবুকে। হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর মুখের দু পাশে হাত রেখে চীৎকার করে বললেন, "ওদিকের পারঘাটা পেরিয়ে আমি আসছি। আসব?"

ডাক্তারবাবুও চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, আসুন। মাস্টার মশাই নদীর ওপারে বালুর চরে হাঁটতে লাগলেন পারঘাটের দিকে, আর ডাক্তারবাবু তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইলেন। তিনি যেমন ঔৎসুক্যভরে পাখী বা প্রজাপতি দেখেন ঠিক তেমনি-ভাবেই তিনি দেখতে লাগলেন গণেশ হালদারকে, তাঁর মনে হল ওই লোকটিও একটি পর্যবেক্ষণীয় জীব যার সম্বন্ধে তাঁর তেমন কোনও জ্ঞান নেই, শুধু এইটুকু আভাস পেয়েছেন, লোকটির মন দামী ঘড়ির হেয়ার-স্প্রিং-এর মতো স্পর্শকাতর, ইংরেজীতে যাকে বলে Sensitive। তারপর তাঁর মনে হলো পাখি প্রজাপতি জন্তু জানোয়ারদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা সহজ, তারা কখনও কিছু গোপন করে না,
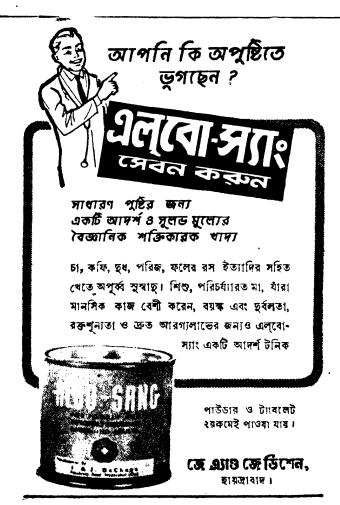
কিন্তু যে মানুষ সর্বদা ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকে তাকে চেনা সহজ নয়। অ্যালেকসিস ক্যারেলের মতো বিখ্যাত ডাক্তার সারা জীবন মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বই লিখেছেন —Man, the unknown। প্রত্যেকটি মানুষ শুধু চেহারায় নয়, ব্যক্তিত্বেও আলাদা। পাখীর বা প্রজাপতির সম্বন্ধে বই পড়ে তাদের চেনা যায় কিন্তু মানুষের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি পড়ে মানুষ চেনা যায় কি? শুধু বোঝা যায় ও মানুষ, বাঁদর বা বাঘ নয়। কিন্তু ওই বোঝাটাই কি যথেষ্ট? মনুষ্য-রূপী লোকটার মধ্যে যে বাঁদর বা বাঘ, সাপ বা শকুন, দানব বা দেবতা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে সেটার চেহারা তো মানুষের বাইরের চেহারা দেখে ধরা যায় না। মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কতকগুলো খুনের ফোটো দেখেছিলেন। প্রত্যেকটি চেহারা দেব-দুর্লভ। কারও মুখে শিশুর সরলতা, কারো চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, কারও দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর উদাসীনতা। কেবল চেহারা দেখে তাদের খুনে বলে চেনা অসম্ভব। চিন্তার এই সূত্র ধরে তিনি আর একটা সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, পাখি বা প্রজাপতির সম্বন্ধে বই পড়ে যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি সেটা কি সম্পূর্ণ জ্ঞান? একটা পাখী ঠিক কি আর একটা পাখীর মতো? পৃথিবীর সব প্রজাপতিই কি একরকম? তাদের কি আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব নেই? তাদের সকলের মনই কি একরকম? কোনও বৈচিত্র্য নেই? মনে পড়ল, তাঁর বাড়ির করবী গাছে একটা দোয়েল এসে বসত বহুকাল আগে। তাকে লক্ষ্য করলে মনে হত, তার যেন একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, বিশেষ মেজাজ আছে। করবী গাছটার ডালপালায় সে যখন ঘোরা-ফেরা করত, মনে হত না যে সে পোকার সন্ধানেই ঘুরছে খালি। মনে হত, সে যেন করবী গাছে এমন কিছু সন্ধান করছে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এ কথা সে জানে, তবু খুঁজছে। মানুষের মধ্যে যে মানসিকতা থাকলে সে কবি বা বিজ্ঞানী হয়, ওই পাখীটার মধ্যে তারই আভাস যেন ছিল। কিছুদিন পরে দোয়েলটাকে আর দেখতে পাননি তিনি। আরও কিছুদিন পরে আবার দেখতে পেলেন তাকে ওই করবী গাছেরই ডালে। দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, পাখীটা নড়ছে না। ডানা দুটো ঈষৎ খোলা, যেন এখনই উড়বে। কিন্তু উড়ছে না। কাছে গিয়ে দেখলেন মরে গেছে। দেহের একটুকু বিকৃতি হয়নি, গায়ের সেই আশ্চর্য সুন্দর মসৃণ কালোয়-সাদা রং তেমনি আশ্চর্য সুন্দরই আছে, মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি শিস দেবে, সর্বাঙ্গে জীবন্ত প্রাণের আকৃতি, চোখের দৃষ্টিতে অনন্ত কৌতূহলের আভাস, সব ঠিক আছে, কেবল প্রাণ নেই।

এখনও তিনি ঠিক করতে পারেননি, পাখীটা কেন মরেছিল। পাখীদের সাধারণত 'হিট্ স্ট্রোক' (Heat Stroke) হয় না। কাছাকাছি কোন ইলেকট্রিক তারও ছিল না। এখন তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল, সে বোধ হয় চরম সত্যের দেখা পেয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগেই চরম সত্যের দেখা পাওয়া যায়। তারপর তার কাছে সব মিথ্যা হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর মনে হল তাঁর এ চিন্তাগুলোও লিখে ফেললে হয়। হয়তো সবই বাকিশ তবু হালদার মশাই কাজে লাগাবেন। পকেট থেকে বিজ্ঞাপনের কাগজ বার করে রাখলেন হাঁটুর উপর, তারপর লিখতে শুরু করলেন।

গণেশ হালদার যখন এসে পৌঁছলেন তখনও তিনি লিখছেন। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, একটু বসুন, এটা শেষ করে নিই। গণেশ হালদার ওধারে গিয়ে বসলেন একটা বেঞ্চিতে। মোজায়েকের কাজ করা চমৎকার বেঞ্চি। সমস্ত চাতালটাই তাই। সবিস্ময়ে তিনি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। এই ভাঙা বাড়িটার ভিতর এ সৌন্দর্য দেখবেন তা তিনি প্রত্যাশা করেননি। তারপর তাঁর হঠাৎ চোখে পড়ল, মাছরাঙাটা আবার এসে বসেছে বাঁশের উপর। সেই দিকেই চেয়ে রইলেন তিনি।

"তারপর, কি খবর? প্রতি রবিবারেই আপনি বেড়াতে বেরোন নাকি?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই বেরোই। আজ সকালে আপনার লেখাটা টুকে ভাবলাম আপনার সঙ্গে সে বিষয়ে একটু আলাপ করি। কিন্তু বেরিয়ে দেখি আপনি চলে গেছেন। আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়েছেন, না?"

"হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। নিজেকে ভোলাবার জন্যে তাই বেরিয়ে পড়েছি।"

তারপর হেসে বললেন, "অনেকে শোকের সময় গীতা পড়ে। কিন্তু আমি দেখেছি ওতে কোনও সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। আসলে শোকের কোনও সান্ত্বনা নেই। বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে তবু যেন একটু ভুলে থাকা যায়। আহত শিশু মায়ের কোলে গিয়ে যেমন ভোলে, অনেকটা তেমনি।"

গঙ্গার দিকে চেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন তিনি। তারপর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল তাঁর। বললেন, "আমাকে কি বলবেন, আমার লেখা নিয়ে? খুব ভাল হচ্ছে না, না?"

"চমৎকার হচ্ছে। না, আমি বলছিলাম অন্য কথা। আপনি কাল যে ঘটনাটির কথা লিখেছেন, তা সত্য, না কল্পনা?"

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। "যদি সত্যি হয়, আপনি কি করবেন? পুলিসে খবর দেবেন?"

"উচিত নয় কি। আপনার দিকে গুলী চালিয়েছিল। যদি লেগে যেত?"

"একটু লেগেওছিল।"

ডাক্তারবাবু নিজের বাঁ হাতটা তুলে দেখালেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "সেরে গেছে।"

"অথচ আপনি তো কাউকে কিছু বলেননি।"

"বলে কি করব! মৃত্যুর হাত থেকে তো প্রতি মুহূর্তে বেঁচে যাচ্ছি। অসংখ্য বিষাক্ত ব্যাকটিরিয়া অহরহ ঢুকছে বেরুচ্ছে শরীর থেকে। কিছুদিন আগে নাককাটিয়ার জঙ্গলে গিয়েছিলাম 'ফটিক জল' পাখী দেখবার জন্য। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ছিলাম। গুঁড়িটা ফাঁপা, পুরোনো। হঠাৎ দেখলাম ঠিক আমার পাশ দিয়ে বিরাট একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে গেল। হয়তো সে বুঝতেই পারেনি আমি ওখানে বসে আছি। একটু নড়ে গিয়ে বুঝতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল ফণা তুলে। আর একবার আর এক মাঠে পড়েছিলাম বুনো শুয়োরের পাল্লায়। একটু দূরে একটা জঙ্গলে দেহাতিরা বর্শা নিয়ে শুয়োর শিকার করছিল। একটা শুয়োর ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বন থেকে। তার সামনে পড়লে, ঠিক আমাকে ছিঁড়ে দিয়ে চলে যেত। আর একবার একটুর জন্যে বজ্রাঘাতের পাল্লা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ঘোর দুর্যোগে দাঁড়িয়েছিলাম একটা গাছতলায়, দূরের একটা গাছে বজ্র পড়ল, আমার গাছটায়

পড়ল না। আমি বে'চে গেলাম। আমরা সবাই প্রত্যহ মৃত্যুর কবল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, যেদিন ধরা পড়ব সেদিন আর পালাতে পারব না। এই তো হল ব্যাপার। এর মধ্যে দারোগা পুলিস এনে কি করব!"

"সেদিন রাত্রে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তাকে দিনের আলোয় চিনতে পারবেন?"

"এ জেরা করছেন কেন? তাকে আমি পুলিসে দেব না। তার সম্বন্ধে আমার আর বিশেষ কৌতূহলও নেই। তবে একেবারে যে নেই তা নয়, কিন্তু সেটা সে চোর বলে নয়।"

ডাক্তারবাবু হাসলেন।

"তবে?"

"সে রূপসী বলে। সেদিন অন্ধকারে টর্চের আলোয় তার যে চেহারা দেখেছি তা সচরাচর পথে ঘাটে দেখা যায় না। চুরি ডাকাতি করবার মতোই চেহারা মেয়েটির। দিনের আলোয় দেখা হলে আলাপ করতাম।"

(ক্রমশ)

মরুপ্রান্তর

তরুণবিকাশ লাহিড়ী

বিকানীরের দিকে ছুটেছিল মারওয়াড় মেল। যোধপুর শহরের শেষ বাড়িটিও মিলিয়ে গেল, এখন চারদিকে কেবল বালু আর বালু, মরুস্থলীর আঁচলে কোথায়ও কোন ছিদ্র নেই। হঠাৎ কি হ'ল, একটা শব্দ করে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। এই ছন্দোপতনের কারণ কি সঠিক জানা গেল না, শুধু শুনলাম, ঘণ্টা দুয়েকের মত নিশ্চিন্ত। ইঞ্জিনের রোগ নির্ণয় করে পুনরায় চালু করতে সময় লাগবে।

এবার নির্ভয়ে জানলা খুললাম। গাড়ির উপদ্রব মরুভূমির সহ্য হয় না, গাড়ি ছুটলে লক্ষ লক্ষ বালুকণা এসে আক্রমণ করে, কিন্তু দাঁড়িয়ে গেলে বাতাসের অন্য চেহারা, আর তার আক্রোশ নেই, আচরণ নিরীহ, স্পর্শ স্নিগ্ধ। বিশেষ করে এখন রাত্রি হয়েছে, পৃথিবী তার উষ্ণতা হারিয়েছে, মরু এখন মঞ্জু, মরুপ্রান্তরের ধূসর বক্ষ জুড়ে শুভ্র জ্যোৎস্নার যে রমণীয় লীলা চলছে তাতে মধ্যাহ্নের রুদ্র প্রতাপের আভাসমাত্র নেই।

গাড়ির কর্ণধারদের কাছ থেকে দীর্ঘ বিরতির আশ্বাস পেয়ে যাত্রীরা অনেকেই নেমে পড়েছে। বিশাল প্রান্তরের ওপর তারা ছড়িয়ে আছে, কেউ বা অনেকটা এগিয়ে গেছে, দূর থেকে কথার রেশ ভেসে আসে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সহযাত্রীদের দেখে মনে হ'ল অতীত বুঝি ফিরে এসেছে, মনে হ'ল, মরুর বুকে এই অনড় ট্রেনটির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমাদের পরিচয় অন্য। সেদিনও ঠিক এমনিভাবে এই প্রান্তরে রাত কাটিয়েছিল তারা, তারাও এসেছিল যোধপুর থেকে, তাদেরও লক্ষ্য ছিল বিকানীর।

অনেকদিন আগের কথা। কনৌজ থেকে বিতাড়িত হয়ে জয়চাঁদের বংশধরেরা যোধপুরে রাজ্যস্থাপন করেছেন। দিনে দিনে সেই রাজবংশের শাখাপ্রশাখার বিস্তার হচ্ছে। সিংহাসনের অধিকার অগ্রজের, অনুজদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, রাঠোরদের এই নিয়ম। কনিষ্ঠদের মধ্যে যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাঁরা নতুন সিংহাসন তৈরী করেন, যোধপুরের সীমানার বাইরে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে যোধপুর থেকে সুদূর দ্বারকা পর্যন্ত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাঠোর রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এঁদের অনেকেই যোধপুরের অধীনতা স্বীকার করতেন, কিন্তু তা ছিল নামে মাত্র।

যোধপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা যোধা রাওয়ের ষষ্ঠ পুত্র বীকাজির সাহস ছিল অসাধারণ, উচ্চাশা অত্যুচ্চ। কোন দিকে অভিযান চালালে সুবিধা হবে এই নিয়ে কাকার সঙ্গে বীকা পরামর্শ করলেন। কান্দুল বুদ্ধি দিলেন, দক্ষিণের সরস জমির আকর্ষণে সবাই সেদিকে গেছে, সেখানে অনেক খণ্ডরাজ্য। যদি বিস্তীর্ণ ভূমির অধীশ্বর হতে চাও তবে উত্তরে বা পশ্চিমে চলো, বিকানীর বা জয়সলমীড় লক্ষ্য করো। কিন্তু সম্ভাবনা যেমন প্রচুর, বিপদের আশঙ্কাও তেমনি। জয়সলমীড়ে অনেক দুর্ধর্ষ দস্যুর আস্তানা আর বিকানীরের জংগলও কম নয়। বিপদের উল্লেখ করাতে বীকা পাগড়ি উঁচু করে কাকার মাথে চেপে ধরলেন, কান্দুল ভাইপোর পিঠ চাপড়ে বললেন, সাবাস, এই ত চাই।

তারপর একদিন খুড়ো ভাইপো পিতৃভূমি মান্দোর ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম মুখে যাত্রা শুরু করলেন (১৪৬৫ খৃঃ)। দুর্দান্ত দস্যু আর দুর্দম জাঠ অধ্যুষিত রুক্ষ মরুকান্তারে বীকার বিজয় কেতন রোপণ করবার উদ্যমে খুল্লতাত কান্দুলের সহায় হলেন। তাঁদের সংগে চলল তিন শ' রাঠোর সেনা, যারা কোনও বাধাই মানে না, যাদের দেহাস্থির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উটের খুরের শব্দ কল্লোলে যে রাজপুতানা
মরুপ্রান্তরের সংগে একদিন মিলেমিশে ছিল;
[illegible] কল্লোলে মগ্ন
ইতিহাস
প্রাণে উজ্জীবিত, সুরে ফেলিল।

বীকাজির আক্রমণের মুখে জংগলের সর্দারেরা খড়কুটোর মত ভেসে গেল। এর পর বীকার লক্ষ্য পড়ল জাঠদের ওপর। সে সময়ে মরুস্থলীর উত্তর-পশ্চিমে বিরাট এলাকা জুড়ে জাঠেরা রাজত্ব করছিল। জাঠদের আদি বাসস্থান কোথায় সে বিষয়ে বিভিন্নমত আছে। অনেকে বলেন, তারা এসেছে মধ্য এশিয়া থেকে, অপর মত হ'ল, জাঠদের পিতৃভূমি পাঞ্জাব। অভিমত যাই হোক না, ভারতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে তারা ছড়িয়ে রয়েছে, পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থানে সৌরাষ্ট্রে। মরুস্থলীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাঠদের মুখ্য পেশা ছিল পশুচারণ। ব্রাহ্মণেরা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন।

বিশাল এলাকার ওপর জাঠদের আধিপত্য থাকলেও তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ছয়টি প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ লেগেই ছিল। রাঠোরদের শৌর্যের কথা তাঁরা শুনেছিলেন। বিভেদ-দুর্বল জাঠরা বীকার পথরোধ করতে সাহস করলেন না। বড়ো-ছোটদের সভায় বীকাকে তাঁরা সার্বভৌম হিসাবে বরণ করলেন। মরুস্থলীর ইতিহাসে এটি অভিনব, অনুরূপ ঘটনা কখনও ঘটেনি।

কিন্তু একেবারে বিনা শর্তে নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেও তাঁদের অর্থনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার অংগীকার তাঁরা বীকাজিকে দিয়ে করিয়ে নিলেন। তাঁদের পিতৃপুরুষের জমি খাজনা নিয়ে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নতুন রাজা সানন্দে এই শর্ত মেনে নিলেন, উপরন্তু বিনা রক্তপাতে এত বড় রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসাবে একটি প্রথা প্রবর্তন করলেন। জাঠদের এক প্রতিনিধি, শেকসির গ্রামের প্রধান, অভিষেকের সময় কপালে টিকা না পরিয়ে দিলে কোনও রাজা সিংহাসনে আরোহণ করতে পারবেন না।

বিকানীরের দুর্গ

কেল্লা-সংলগ্ন সরোবরের দৃশ্য

বীকাজিকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করলেও জাঠরা যে তাদের মর্যাদা হারায় নি তার আর এক প্রমাণ রয়েছে রাজধানীর নামে। বীকা যে জায়গাটিকে রাজধানী হিসাবে মনোনয়ন করলেন, তার মালিক ছিলেন এক জাঠ, নাম নেরা। তাই নতুন রাজধানীর নাম হ'ল বিকানীর, বীকা নিজের নামের সংগে নেরাকে শাশ্বত সম্মানের অধিকার দিয়ে গেলেন।

রাজধানীর স্থান-নির্বাচনে বীকা দূর-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। কয়েকটি বৃহৎ বালিয়াড়ির সমাবেশের ওপর শহরটি গড়ে উঠেছে। সেই কারণে সমতল থরের বুকে বিকানীরের একটি স্বাভাবিক সামরিক সুবিধা আছে। বিকানীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে আগত বাণিজ্য-পথগুলির একটি গ্রন্থি। প্রাকৃতিক সম্পদের সহ-অবস্থান মরুপ্রান্তরের এই জাঠ-রাঠোর সংগ্রাম-স্থলকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। বিকানীরের অতি নিকটে পালানা আর জামসার। পালানায় আছে রাজস্থানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কয়লাখনি আর জামসারের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে এক বিপুল ঐশ্বর্য।

কতদিনের কথা, থর তখন ধূসর নয়, হিমালয়ের করুণা বহন করে সরস্বতী চলত মরুস্থলীর বক্ষ চিরে, তার দু'পাশে কত জনপদ, সেই প্রাণপ্রবাহের ধারা অনুসরণ করে কত পণ্যতরীর আনাগোনা। সেই সমৃদ্ধির দিনে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি ছিল এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে। তাঁদের বংশধরেরাই সরস্বতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। পেশা অনুযায়ী চিহ্নিত করে দেওয়া আমাদের সমাজের এক পুরাতন রীতি। ডক্টর তোসিতোরির কল্যাণে লুপ্ত সরস্বতী সভ্যতার অনেক কাহিনী আজ জানা গেছে। তিনি অনুসন্ধান করে জেনেছেন, গুপ্তযুগে মরুস্থলী এক উর্বর ভূভাগ ছিল, বিকানীরের বালুর আঁচল এক বিরাট সমাধিবিশেষ, এর তলায় অনেক প্রাচীন শহর চাপা পড়ে রয়েছে। কয়েক জায়গায় খনন করে সেইসব জনপদের কয়েকটির হদিস লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তোসিতোরি অনেকগুলি সুন্দর 'টেরাকোট্টা' মূর্তি আবিষ্কার করেছেন। মূর্তিগুলি বিকানীরের সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত আছে।

গুপ্তযুগের পর মরুস্থলীতে প্রাকৃতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। বাতাসে আর্দ্রতার ভাগ কমতে থাকে, জলধারাগুলি শীর্ণ হয়ে আসে। কিন্তু পরিবর্তন শুরু হলেও সেদিন পর্যন্ত পশ্চিম রাজস্থান এত রুক্ষ ছিল না। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ বেশী দিনের কথা নয়। বিজিত রাজ্যের উর্বর ভূখণ্ড নাদির নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। হাক্‌রা বা ঘর্ঘরা নদীকে তিনি সীমানা হিসাবে নির্দেশ করলেন। বিকানীরের উত্তরাংশে বিরাট এক নদীখাতের অবশেষ রয়েছে, ঐটিই ছিল ঘর্ঘরার ধারা। সে নদীও একসময় শুকিয়ে গেল, বাতাস থেকে আর্দ্রতা বিদায় নিল, দগ্ধতায় দিগন্তে সজল মেঘের আশা দুরাশা হয়ে উঠল। দিনে দিনে লেলিহান অম্বরের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কত হ্রদ আর স্রোতস্বিনী, এমন কি মার্তণ্ডের প্রচণ্ড পীড়নে সর্বংসহা ধরিত্রীও অশ্রু গোপন করতে পারেন না, মাটির ভিতরের জল উপরে এসেই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। শুধু পড়ে থাকে সেই করুণ ইতিহাসের স্মারক, লবণাক্ত লুপ্ত অশ্রুর লবণ, বিকানীরের বৈভব 'জিপসাম', ভারতবর্ষে এত জিপসাম আর কোথায়ও নেই। রাসায়নিক সার তৈরীর জন্য এটি একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান, সিন্ধ্রীর কারখানা জামসারের জিপসামের ওপর নির্ভর করেই চলছে।

বীকা রাজধানীর পত্তন করেই দেহরক্ষা করেছিলেন। বিকানীরের অঙ্গসজ্জা করবার সময় পান নি। সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর বংশধরেরা। তিন পুরুষ পরে রাজা রায় সিংহ দুর্গ নির্মাণ করলেন। সুদৃঢ় প্রাচীর ও ত্রিশ ফুট প্রশস্ত পরিখা দ্বারা এই বিরাট কেল্লাটি সুরক্ষিত। পূর্বে ও পশ্চিমে দুর্গে প্রবেশ করবার দুটি পথ আছে। পূর্ব দিকে চারটি 'পারোল' বা দরজা, পশ্চিম প্রান্তে দুটি দরজা পথ আগলে রয়েছে। সূর্য 'পারোল' দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেই নজরে পড়ল, দেওয়ালে গাঁথা কৃষ্ণ-প্রস্তরফলক, রায় সিংহের কীর্তির কথা ঘোষণা করা হচ্ছে।

সত্যই রায় সিংহের শাসনকাল একাধিক কারণে স্মরণীয়। যে জাঠরা স্বেচ্ছায় বীকাকে সার্বভৌম হিসাবে বরণ করেছিলেন, প্রতি-দানে বীকা যাঁদের মর্যাদা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, রায় সিংহ সেই জাঠদের সমস্ত স্বাধীনতা ও সুবিধা হরণ করলেন। তাঁর সময় থেকে জাঠরা নিছক কৃষিজীবীতে পরিণত হ'ল। কিন্তু তিনি যেমন স্বাধীনতা নিলেন তেমনি দিলেনও। রায় সিংহ আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে চারহাজারী মনসবদারি লাভ করলেন। বাজেয়াপ্ত জাঠ-সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত হ'ল দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহ। বিকানীরের রাজকোষ

স্ফীত হয়ে উঠল। দুর্গের অভ্যন্তরে তৈরী হ'ল নতুন প্রাসাদ রায় নিবাস, নির্মাণ হ'ল সূর্য তোরণ, হজুরী দরওয়াজা, কারখানা কালান, হরমন্দির, চৌতারা। হরিদ্রাবর্ণের বেলেপাথরের তৈরী এই গৃহগুলির প্রধান সৌন্দর্য এদের 'আর্ক' সমূহের উৎকর্ষে।

রায় সিংহের সময় শহরের পরিধি আরও বাড়ল। দিল্লীশ্বরের পক্ষছায়ায় থাকায় বিকানীরকে কখনও বড় রকমের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি। মধ্যে মধ্যে জয়সলমীড় অঞ্চলের ভাতি রাজপুতেরা উপদ্রব করেছে, কিন্তু তাদের দমন করতে বেগ পেতে হয়নি। রায় সিংহের ভ্রাতা রাম সিংহ একটি কণ্টক একেবারে নির্মূল করেন। ভুরোপালের জোহারা মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াত। রাম সিংহ তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন।

নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ফলে রাজ্যের অবস্থা ক্রমশ সচ্ছল হতে থাকে। বীকার আয় ছিল সামান্য। জাঠদের কাছ থেকে তিনি দুটি মাত্র কর আদায় করতেন। পরিবার পিছু এক টাকা করে 'ধুয়া' কর, আর প্রতি এক শ' বিঘা আবাদী জমি পিছু মাত্র দুটি টাকা ভূমিকর। বীকার উত্তরপুরুষেরা করভার বহুগুণ বৃদ্ধি করেন, রাজ্যের আয় দাঁড়ায় বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা। দুর্গের জৌলুস বাড়তে থাকে. মহলের পর মহল তৈরী হয়, অভিনব সাজ সজ্জায় রকমারি বাহারে কেল্লা ঝলমল করে। রাজাদের এক শখ ছিল তোরণ তৈরী করা তাঁদের নামে তোরণগুলির পরিচয়. করণ পারোল, দৌলত পারোল, ফতে পারোল। সব ক'টি পারোলই দেখবার মত। কিন্তু স্থাপত্যে মৌলিকত্ব নেই, পারোলগুলি মুঘল ছাঁচে ঢালা।

রাজা গাজ সিংহের আমলে বিকানীর সমৃদ্ধির শিখরে ওঠে (১৭৩৭ খৃঃ)। গাজ বীকার বংশের সপ্তম পুরুষ। রাজা খুব সৌখীন ছিলেন। করণ মহলকে তিনি নতুনভাবে চিত্রিত করেন, বর্ণের সুষম বিন্যাসের গুণে এই মহল এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের আধার। নিজের মনের রঙে গাজ কেল্লাকে ছুপিয়েছিলেন. কত অনুপম চিত্র সৃষ্টি হ'ল, অলিন্দে অঙ্গনে রূপরেখা শিল্পগুণে অমরত্ব লাভ করল। সম্পত্তি বাড়লে সংরক্ষণের চিন্তা আসে, গাজ সিংহ প্রাচীর দিয়ে রাজধানীকে ঘিরলেন, যাতায়াতের জন্য রইল পাঁচটি বৃহৎ দরজা।

মহারাজা গাজের নাম আরও এক কারণে লোকে ভুলতে পারে নি। বিলাসী রাজা শিকার করতে ভালবাসতেন। কিন্তু দেহাতে গিয়ে তাঁর মন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ত। রাজপুতানীর দেহবল্লরী সুঠাম, তাদের স্বচ্ছন্দ গতিতে গীতিছন্দ, মুক্তপ্রাণা তরুণীরা হাসো-লাস্যে সাবলীল। শিকারে বেরিয়ে রাজা প্রতিবারই আহত হন, প্রতিবারই মনে চোট লাগে। গাজ সুপুরুষ ছিলেন, তাঁর আয়ত নেত্রে সর্বদাই জড়িয়ে থাকত প্রেমিকের বিহ্বলতা, সুন্দরীদের আকর্ষণ করবার

নববিকানীরের এক প্রধান চৌমাথার সন্ধিস্থল

ক্ষমতা তাঁর ছিল। সাধারণ লোক হলে হয়ত পঞ্চশরের [illegible] জের বেশীদিন চলত না, [illegible] অল্পকালেই মিলিয়ে যেত। কিন্তু রাজাদের কথা স্বতন্ত্র। বাসনা চরিতার্থ করবার কোনও বাধা ছিল না। গাজ সিংহের অন্তঃপুর ভরে উঠল, কলকণ্ঠের গুঞ্জনে জেনানা মহল সর্বদা গুলজার। একষট্টিটি সন্তানসন্ততি রেখে মহারাজা দেহরক্ষা করলেন। এই বাহিনীর মধ্যে মাত্র ছ'টি সন্তান বৈধ আর সবগুলিকে বলা হয় "প্রেমের সৃষ্টি"।

গাজের প্রেমলীলা বিকানীরের পক্ষে শুভ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর উদ্দাম প্রেমের সৃষ্টিচিহ্নরূপে রাজ-অন্তঃপুরে এক বিষবৃক্ষ দাঁড়িয়ে উঠল। বিকানীরের রাজবংশ এই প্রথম উৎকট স্বার্থচেতনায় কলঙ্কিত হ'ল। গাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন রাজ সিংহ। এই দুর্ভাগা রাজা মাত্র তেরোদিন গদিতে ছিলেন। বিমাতা বিষ খাইয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন। রাজ সিংহের মৃত্যুর পর সেই পাপীয়সী নারীর পুত্র সুরত সিংহ, গাজের পঞ্চম সন্তান, বিকানীরের রাজা হ'ল।

সুরতের ইতিহাস কলঙ্কময়। গদি নিষ্কণ্টক করবার জন্য তিনি রাজ সিংহের শিশুপুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। নিজ হাতে ভ্রাতুষ্পুত্রের গলা টিপতে তাঁর একটুও বাধে নি। তাঁর এক ভগিনী এই পাপ কাজে বাধা দিতে গিয়েছিলেন, সুরত জোর করে তাঁর বিবাহ দিয়ে দেন। এরূপ ঘটনা মেবারে বা যোধপুরে ঘটলে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু বিকানীরের ইতিহাস ভিন্ন। নবাবের অনুগ্রহচ্ছায়ায় বাস করে সর্দারদের ধমনীতে
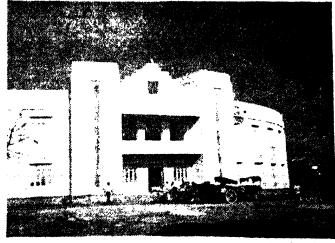
বিকানীরের সংগ্রহশালা (মিউজিয়াম)

সেই দুর্নিবার রাঠোর তেজের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, সুরত উৎকোচের সাহায্যে সকলকে বশে আনলেন। এক যুদ্ধে তাঁর অপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরতান ও আজীব সিংহকে নিহত করলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ রইল না। ভ্রাতৃশোণিতে রঞ্জিত ভূমির ওপর বিজয়-প্রাসাদ তুললেন ফতেগড়।

কিন্তু পাপের শাস্তি থেকে সুরত নিষ্কৃতি পান নি। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় বড় করুণ। যাঁদের তিনি পৃথিবী থেকে সরিয়েছিলেন তাঁদের ছায়া তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকত, অশরীরী আত্মাদের ভয়ে তিনি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। একদল ব্রাহ্মণ তাঁর এই ভয়াচ্ছন্ন মনের সুযোগ নিয়ে সর্বদা

দোহন করত। রাজভাণ্ডার নিঃস্ব হয়ে গেল, বিকানীরের আকাশ-বাতাস দরিদ্র প্রজার আকুতিতে ভারী হয়ে উঠল, ফসল হয় না, দস্যুরা ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ভূতগ্রস্ত রাজা অক্ষম।

দেবীকুণ্ডে এসে অতীত দিনের সেই মসীলিপ্ত কাহিনী চোখের ওপর ভেসে উঠল। বিকানীরের পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত ছায়াঘন এই দেবীকুণ্ডে বিকানীরের রাজারা চিরবিশ্রাম লাভ করছেন। সারি সারি সমাধি-মন্দির, ইঁট ও পাথরের তৈরী, কারুকার্যে শোভন সমাধিক্ষেত্রেও সুরত সিংহ একক, একমাত্র তাঁর স্মৃতিমন্দিরটি মাকরানা মার্বেলে তৈরী, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মর্মর বিগত রাজার কর্মকালিমার ওপর আবরণ রচনা করেছে।

সুরতের সময় বিকানীরের আকাশে যে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, একসময় তা কেটে গেল। মহারাজা গঙ্গা সিংহ রাজ্যের অবস্থা ফিরিয়ে ফেললেন। কর্মপ্রেরণা আর প্রখর বুদ্ধির সমাবেশ হয়েছিল গঙ্গার মধ্যে। পুরোনো শহরের গন্ডী পেরিয়ে তিনি আধুনিক শহর সৃষ্টি করলেন, পরিচ্ছন্ন শহরে প্রশস্ত সরণি। তৈরী হ'ল সংগ্রহশালা, বাগ উদ্যান, মনোরম পশুশালা। আধুনিক কালের এই ভগীরথ পাঞ্জাব থেকে জল নিয়ে আসলেন, রাজস্থান খাল-তৃষিত বিকানীরের একাংশকে সবুজে ছুপিয়ে দিল। বাজরা-জোয়ারের ফলন বহুগুণে বেড়ে গেল, নতুন শস্য ইক্ষু দেখা দিল। খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে বিকানীর হয়ে উঠল এক উদ্বৃত্ত রাষ্ট্র। গঙ্গা সিংহের অনুরূপ দৃষ্টান্ত রাজস্থানে পাওয়া দুষ্কর, জনকল্যাণের কাজে আর কোনও নৃপতি এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন নি।

জোহা, ভাতি রাজপুত আর জাঠরা ছিল বিকানীরের আদি অধিবাসী। পরে আসে রাঠোরেরা। রাঠোরদের চাপে জোহারা লুপ্ত হয়ে যায়। জোহাদের অতীত ইতিহাস কিন্তু গৌরবময়। অনেকের মতে জোহা শব্দ 'যদুর' অপভ্রংশ। যে যদুরা গ্রীকবীর আলেকজান্দারের সঙ্গে যুদ্ধে অপরিসীম শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, যে যদুদের সম্বন্ধে বাবরের জীবনকাহিনীতে সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে, বিকানীরে তাদের অবলুপ্তির ইতিহাসে আশ্চর্য লাগে। আজ তাদের স্মৃতিটুকুই সম্বল, ভূবোপালের ভগ্নাবশেষের মাঝে বিকানীরের পথে প্রান্তরে সেই বীর্যবান জোহাদের পূর্ব-অস্তিত্বের নিদর্শন দেখতে দেখতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। বর্তমানে রাঠোররা সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, জাঠরা কৃষক মাত্র। রাঠোরদের ওপর জৈনধর্মের প্রভাব খুব বেশী।

বিকানীরে বহু সুন্দর জৈনমন্দির আছে। বীকাজির সৃষ্টি চিন্তামণি মন্দির প্রাচীনতম। বর্ণবিন্যাসে, অঙ্গসৌষ্ঠবে আরও তিনটি

মন্দির উল্লেখযোগ্য, গন্ধসার, নেমিনাথ ও আদিনাথের দেউল। মন্দিরগুলির অভ্যন্তরের স্থাপত্য অনুপম, বিশেষ করে মণ্ডপশীর্ষে কুণ্ডলযুক্ত চক্রগুলিতে শিল্পের যে নমুনা রয়েছে তা অতুলনীয়। জৈনমন্দিরগুলির এটি বোধ হয় এক বিশেষত্ব, দিলওয়ারায়, গিরনারে সর্বত্রই এক ধরনের শিল্পকলা দেখা যায়। ধনী ব্যবসায়ীরা দেউলগুলির স্রষ্টা। বাণিজ্য-জগতের অনেক দিকপালের বাসস্থান বিকানীর। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সম্পদ আহরণ করে তাঁরা মাতৃভূমিকে সাজিয়েছেন। স্টেশন থেকে মন্দির যাওয়ার পথে একটি সরণি অতিক্রম করতে হয়, তার দুধারে লাল পাথরের বিরাট বিরাট বাড়ি, বিকানীরের 'ওয়াল স্ট্রীট', ধনী ব্যবসায়ীদের গৃহ।

চার জায়গা থেকে ছেঁকে আনা সম্পদের দানা বড় মনোহর, বড় স্বাদু। বিকানীরের মিছরি খুব নাম করা, 'মহীশূর চৌজ'। এ ছাড়া এখানে পাওয়া যায় উটচর্মের নানা শৌখিন জিনিস, পশম, কার্পেট। পুরনো ও নতুন শহরের বিপণিসজ্জার মধ্যে দুই জগতের ব্যবধান। পুরনো শহরে ঘিঞ্জি দোকান, রাস্তায় মন্থরগতি উট, কেনাবেচায় কারও তাড়াহুড়া নেই, যেমন ক্রেতা তেমনি বিক্রেতা, উপুড় করা জিনিস যত ইচ্ছে ঘাঁটো। নতুন শহরের রীতি আলাদা, নিয়ন-শোভিত আধুনিক বিপণিতে সাবেক রাজস্থানী বিলম্বিত চাল কোথায় হারিয়ে গেছে। এখানেও বুঁদি শাড়ী পরে ক্রেতারা আসেন, তবে তাঁদের শাড়ী পরবার ধরন আলাদা, চাহিদা ভিন্ন। পায়জোড়ের চাঁদি নিয়ে সন্দেহ করে তাঁদের সময় যায় না, বাজুবন্ধের নকশা নির্বাচনেরও প্রয়োজনীয়তা নেই, তাঁদের চাই র্যাকেট বা জ্যাকেট, যার এক দাম এক ছাঁচ। এঁদের গতি দ্রুত, আলাপ সংক্ষিপ্ত।

অপরাহ্ন গড়িয়ে গেছে, সূর্যস্পর্শ কামনায় ধরণী অধীর, আমরা চলেছি স্টেশনের দিকে। বিদায় নেবার সময় হ'ল। ওভারব্রিজ থেকে আরেকবার শেষ দেখা দেখলাম। ধূসর মরুপ্রান্তরে রূপসী বিকানীর, বীকাজি, রায় সিংহ, গাঙ্গ সিংহের সৃষ্টি, প্রতিভার স্বাক্ষর বিকানীর। গোধূলি-সময়ে এই শহরের রূপ মায়াময়। অপরাহ্নের শেষ প্রান্তে বিকানীরের পথের ধূলি রক্তিম হয়ে যায়, সেই লক্ষ লক্ষ উড়ন্ত স্বর্ণরেণু ভেদ করে বেশীদূর দৃষ্টি যায় না, স্রষ্টাদের স্মৃতির মতই সৃষ্টি আবছা দেখা যায়, শুধু মনে হয় সোনালী বায়ুস্তরে কি রাগরাগিণীর আলাপ চলছে, তা বিদায়বেলার বেহাগ নয়, তাতে পিলুর করুণ আর্তি নেই, খাম্বাজের প্রাণচাঞ্চল্যে বাতাস ভরপুর। রাঠোরশক্তির যে দুর্দমনীয় বিকাশ একদিন সারা ভারতকে আন্দোলিত করেছিল, এক নতুন সংকল্প-সিদ্ধির কাজে সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষাত্রতেজ আজ নিয়োজিত হয়েছে। মরুর লোলুপ গ্রাস থেকে গোচারণ সমভূমিকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে বিকানীর। কোন তৃণ-আচ্ছাদনের সাহায্যে মরুর গতিরোধ করা যায়, কোন বৃক্ষের প্রাণশক্তি অফুরন্ত যা জমির নীরসতাকে উপেক্ষা করে বালুকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা রাখে তার ব্যাপক সন্ধান ও নির্বাচনের প্রস্তুতি চলেছে। এত উদ্যম ব্যর্থ হবার নয়, বিকানীরে মরুবিজয়ের কেতন উড়বেই উড়বে। সেই অনাগত উজ্জ্বল দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম, বিশ্বাস আছে পুনর্দর্শনের একবার পুনর্দর্শনের সুযোগ আসবেই আসবে। বিকানীর 'পুনর্দর্শনায়'।*

এক জৈনমন্দির

* ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য আমি টডের 'Annals & Antiquities of Rajasthan' এর উপর বিশেষ নির্ভর করেছি। ফটোগুলি তুলেছেন [illegible]।
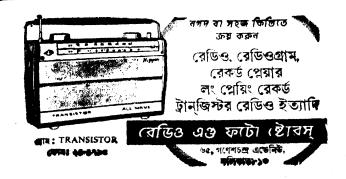
চুল আর তেল—
এরা
অবিচ্ছিন্ন

ভাল তেল, এবং তাও ভেষজ, প্রতিদিন ভালভাবে মাথায় মাখে বলেই ভারতীয়দের চুল এত সতেজ এবং কুঁচকুঁচে কালো!

চুল ঘন করবার একটি গূঢ় কথা হচ্ছে চুলের গোড়ায় ভাল করে তেল দেওয়া এবং চুলের গোড়ার প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব পূরণ করবার জন্য আমাদের ভাল একটি তেল বেছে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

টাটার হেয়ার অয়েলগুলো বিশুদ্ধ এবং খাঁটি ব'লে মাথার ত্বকের পুষ্টি সাধন ক'রে চুলের গোড়া সবল করে ··· ঘন ও সতেজ হ'য়ে চুল বেড়ে উঠতে সাহায্য করে ··· চুলকে চিক্‌চিকে সুন্দর করে।

টাটার কোকোনাট এবং ক্যাষ্টর হেয়ার অয়েল সুমধুর মনমাতানো গন্ধে এবং তিনটি সাইজে পাবেন।

টাটার
হেয়ার অয়েল

টিয়া। তবু ভাবতে পারেনি, এত শীগ্গির চলে যাবে তারা।

মোহনপুরের বউ বললে, যা বলে আয়, এখানে ওরা সবাই খাবে রাত্তিরে। বলবি, মা আসতো, বাড়িতে অনেক কাজ, তাই......

টিয়া ঘাড় কাত করে সায় দিলো, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল। আর তার চলার ছন্দের দিকে তৃপ্তির চোখে তাকিয়ে রইলো মোহনপুরের বউ।

অন্য দিন একটু সুযোগ পেলেই ছুটতে ছুটতে উঁচু-নীচু পুকুরের পাড় ঘেঁষে, বাঁশবনের ভিতর দিয়ে, মশায়দের বাড়ির পাশের গলি দিয়ে রেণুদিদের বাড়িতে এসে হাজির হয় টিয়া। ফিরুকে কোলে নিয়ে, কাঁধে তুলে, বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরে দিয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে কাঁদিয়ে বিরক্ত করে আনন্দ পায়। কিন্তু আজ আর ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো না তার।

বুকের মধ্যে একটা অভিমান ফুলে ফুলে উঠলো। রেণুদি চলে যাচ্ছে, রাঙাবৌদি চলে যাচ্ছে, অথচ একটা খবরও দেয়নি তারা টিয়াকে?

আজ আর তাই রেণুদিদের বাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই যেন।

পাঁজাপুকুরের ধারে এসে দাঁড়ালো সে কিছুক্ষণ। বাগ্দীবউ জনকয়েক পলুই ফেলে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে মাছ ধরছে, গুগলি তুলছে। সেদিকে খানিক তাকিয়ে থেকে একটা মাটির চাঙড় তুলে ছুঁড়ে দিলে মাঝপুকুরে। বাগ্দীবউ একজন চমকে ফিরে তাকালো মাছ ঘাই দিচ্ছে মনে করে। আর তা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো টিয়া। টিয়ার দিকে তাকিয়ে বাগ্দীবউটাও হাসলো। তারপর আবার এক কোমর জলে নেমে পলুই ফেলতে শুরু করলে।

একটা বাঁশপাতা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে কাটতে রেণুদিদের বাড়িতে এসে হাজির হলো টিয়া। কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

টিয়া ভেতরে ঢুকতেই রেণুদি ফিরে তাকালে। বললে, আয়। তারপর যেমন টুকিটাকি জিনিসগুলো জড়ো করছিল তেমনি করে যেতে লাগলো। অন্যদিনের মত খুশী হয়ে ছুটে এলো না।

দামুদাও একটা বস্তার মুখ ফাঁক করে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। আর রাঙাবৌদি ঘরের ভেতর থেকে দু'একটা জিনিস এনে সেই বস্তার মধ্যে দিতে দিতে একবার টিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে শুধু হাসলো।

মরাইতলায় বসে বসে একটা কাঁসার থালা থেকে খুঁটে খুঁটে মুড়ি খাচ্ছিল ফিরু। টিয়াকে দেখে সেই শুধু টলতে টলতে কাছে এগিয়ে এলো। কাছে এসে টিয়ার কাপড় ধরে টানলে। তবু তাকে কোলে তুলে নিতে চাইলো না টিয়া।

তার সমস্ত শরীরে মনে তখন তোলপাড় চলছে। মনে হলো যেন দামুদা, ফিরু সবাই পর হয়ে গেছে, পর হয়ে যাবে। বুকের ভেতর থেকে একটা অসহ্য দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

না, শেষ অবধি অভিমানে ফিরুকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে না টিয়া। তাকে হঠাৎ বুকে তুলে নিয়ে তার গালে মুখ ঘষতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরুর গালে টিয়ার চোখের জলের একটা রেখা ফুটে উঠলো।

রেণুদির চোখে পড়লো হয়তো। কাজ রেখে কাছে এগিয়ে এলো রেণুদি, টিয়ার পিঠে একটা হাত রেখে বললে, ছিঃ, কাঁদছিস!

একটু থেমে বললে, কাজটুকু সেরে নিই, তার পর চল, আজ অমিত্তে সাঁতার কাটতে যাবো, কেমন?

এইটুকু আদরেই সব অভিমান সরে গেল টিয়ার মন থেকে। ঘাড় নেড়ে সায় দিলো ও।

তারপর বললে, মা তোমাদের সকলকে আজ রাত্তিরে আমাদের ওখানে খেতে বলেছে।

দামুদা কথাটা শুনলো, তারপর রাঙা-বৌদির দিকে তাকিয়ে বললে, কেমন? বলেছিলাম না?

রাঙাবৌদিও হাসলো।

দামুদা বললে, যাবো, নিশ্চয় যাবো। গাঁয়ে মানুষ থাকতে পারে না টিয়া, থাকতে পারে না। তবু ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় কেন জানো, এই তোমাদের মত দু'একটা বাড়ি আছে বলে।

টিয়ার মন থেকে এবার সব মেঘ কেটে গেল। আর মাকে তার ভীষণ ভাল লাগলো। মনে হলো, মা কত ভালো। তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না এ-গাঁয়ে।

সব কাজ সেরে পিতলের ঘড়া নিয়ে যখন দুপুর রোদে অমৃতের দিকে পা বাড়ালো টিয়া, রেণুদি আর রাঙাবৌদির সঙ্গে, তখন একে একে সব কথা শুনলো টিয়া।

রেণুদি বললে, চলে যাচ্ছি শুনেও কেউ দেখা করতে এলো না রে। শুধু আটানা আর মোড়লগিন্নী এসেছিল। চলে গেলে তো সবাই পর করে দেবে জানি, যাবার আগেই পর করে দিলে।

টিয়া কোন জবাব দিলো না। ওর শুধু দুঃখ হলো, সকালে বাবুইতলার মধ্যে ওকে আগের মত ছুটে এসে কাছে ডাকে নি কেউ, তাই কি অভিমানই না হয়েছিল!

ধীরে ধীরে অমৃতের পাড়ের আমবাগানে এসে ঢুকলো ওরা। একটা গাছের তলায় ঘড়া আর কাপড় রেখে বসলো ঘাসের ওপর।

আমের মুকুলে ভরে গিয়েছিল সারা বাগান। এখন অনেক ঝরে গিয়ে ছোট ছোট আম ধরতে শুরু করেছে। অনেক গাছে এখনও মুকুল আছে। তাই মিষ্টি একটা গন্ধে ভরে আছে চতুর্দিক।

দামু পাল হাট থেকে একটা রাঙা গামছা কিনে এনেছিল, রাঙাবৌদি সেটাই বুকে জড়িয়ে চুল খুলে চূড়ো করে বেঁধেছিল। টিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল রাঙা-বৌদিকে। সরষে ক্ষেতের মত হলুদে হলুদে রঙ রোদ্দুরের, আর বুকে জড়ানো রাঙা গামছা—দুটো রঙের আভা পড়ে রাঙাবৌদির মুখখানা বড় সুন্দর লাগছিল। সীতা রাঙা-বৌদির দিকে তাকিয়ে টিয়া একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। গাঁয়ে এত বউ-ঝি আছে, কিন্তু কারো মুখে এমন একটা তৃপ্তির ভাব ফোটে না। আর সবাইকে দেখলে মনে হয় যেন সংসার করার মত যন্ত্রণা আর নেই। দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে, ঝগড়া-বিবাদ, চিৎকার, হট্টগোল। অথচ দামুদা আর রাঙাবৌদি যেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। রাঙাবৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা মনে হলো টিয়ার, আর ফিক করে হেসে ফেললো ও।

—কি, হাসলি যে।

টিয়া জবাব দিলে না। ওর মনে হয়েছে দাম্‌দা রাঙাবৌদিকে খুব ভালবাসে, তাই রাঙাবৌদি এত সুন্দর।

রেণুদিও জিজ্ঞেস করলে, হাসলি কেন?

—এমনি।

বলেই উঠে দাঁড়ালো টিয়া, ধীরে ধীরে পুকুরঘাটে নেমে গেল।

পায়ের গোছ অবধি জলে ডুবিয়ে শাড়িটা হাঁটু অবধি তুলে ফিরে তাকালো টিয়া।

—আসবে না?

—ঘড়া নিবি না? রেণুদি জিজ্ঞেস করলে।

—না।

ঘড়া বুকে নিয়ে সাঁতার দেওয়ায় আরাম আছে, এতটুকু পরিশ্রম করতে হয় না, বাতাসের দমকে দমকে ভেসে বেড়ানো। কিন্তু ইচ্ছেমত হুটোপুটি করা যায় না, ডুব সাঁতার দিয়ে এখনই এখানে, আবার তখনই ওই শালুক ফুলটার কাছে গিয়ে ওঠা যায় না। কিন্তু আজ নিজের সংগে নিজেরই লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে টিয়ার।

ও একটু একটু করে এগিয়ে গেল জলের দিকে। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল, তলায় বালি কিচকিচ করছে। এই একটা পুকুরেই কাদা নেই, পাঁক নেই। খাবার জল নিয়ে যেত আগে সবাই, স্নান করা বারণ ছিল তখন। টিউবওয়েল হয়ে থেকে আর কেউ আসেও না এদিকে। তাই এক পাশে কলমীর ঝোপ হয়েছে, বনকচুর শীষ আর মটরলতায় ঢেকে গেছে ওদিকের ঘাট।

রাঙাবৌদি আর রেণুদি জলে নামতেই হাঁসের মত হঠাৎ শরীরটাকে নুইয়ে দিয়ে এক কোমর জলেই গলা অবধি ডুবিয়ে দিলে টিয়া। তারপর সাঁইসাঁই করে পুকুরের মাঝ বরাবর চলে গেল।

পাড় থেকে অমিত্তের জল মনে হয় নিকষ কালো। তার মাঝে মাঝে শালুক ফুল ফুটে আছে। কোথাও পানিফলের পাতা চাকা চাকা হয়ে ভাসছে, আর অনেক দূরে—ওপাড়ে কচুরীপানার জঙ্গলের মাঝে মাঝে কচুরীপানার বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে দু'চারটে। ফুল নয়, যেন গুপ্তদের সেই নতুন বউয়ের মত রূপের গর্বে ঘাড় সোজা করে এক পিঠ চুলের খোঁপাটা তুলে দেখাচ্ছে সবাইকে। আর ওই কালো জলের মধ্যে তিনটি সাদা হাঁসের মত সাঁতার কাটছে ওরা তিনজন। কখনো পাশাপাশি, কখনো দল ছেড়ে, কখনো সামনাসামনি দু'দিক থেকে এসে আবার এক সারিতে মিশে যাচ্ছে। ঠিক হাঁসের মতই।

সাঁতার কাটতে কাটতে দু'একটা কথা বলে এ ওকে, হাসে। কিন্তু না, ঠিক সেই আগের দিনের মত আনন্দ নেই যেন, উল্লাস নেই।

প্রথম যেদিন দামুদা এসে খবর দিয়েছিল, বটতলায় একটা দোকান পেয়েছে, বর্ধমানে বাসা করে সকলকে নিয়ে যাবে, সেদিন রাঙাবৌদি আর রেণুদির কি আহ্লাদ। অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দ।

অথচ যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে যখন, টিয়ার মনে হলো, রাঙাবৌদি আর রেণুদির মনে যেন কোন আনন্দ নেই। কই, হাসছে না কেন, হুটোপুটি করছে না কেন জল ছুঁড়ে। তবে কি, টিয়ার মন যেমন বিষাদে ভরে গেছে, তেমনি ওদের মনেও কষ্ট হচ্ছে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে বলে?

রেণুদিরা ওকে ছেড়ে যাবে এই দুঃখটুকু ও ভুলতে চেয়েছিল এখানে এসে। কিন্তু এই নির্জন নিঃশব্দতায়, নিঃস্তরঙ্গ জলের শূন্যতায় সেই দুঃখটাই যেন বারবার টিয়ার বুকে চেপে বসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন ক্লান্ত লাগলো টিয়ার। জল ছেড়ে উঠে পড়লো ও।

সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌদি আর রেণুদিও। গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে এতদিনের আনন্দ-স্মৃতির পুকুরে ডুব দিয়ে কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল যেন। পারলো না।

কাপড় বদলে ভিজে শাড়িখানা জলে কেচে নিয়ে ফিরে এলো ওরা।

রেণুদি বললে, আয় টিয়া, এবেলা এখানে খেয়ে যা।

টিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর সারাটা দুপুর পাশা-পাশি মাদুরে শুয়ে কত কি গল্প হলো দু'জনে। কত অর্থহীন, তুচ্ছ কথার আদান-প্রদান। তবু ভাল লাগলো টিয়ার।

তারপর এক সময়, রেণুদি উঠলো। বললে, বাক্স প্যাঁটরা সব গুছিয়ে নিই।

পুরনো রঙ-চটা তোরঙটার ডালা খুলে আলনার কাপড় দুটো ভাঁজ করতে শুরু করলে রেণুদি, আর তোরঙের দিকে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে রইলো টিয়া। কেউ বাক্সপ্যাঁটরা খুললেই সেদিকে শিশুর মত কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে টিয়া। যেন তার মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে আছে, কত কি অদেখা জগৎ। মা বকুনি দেয়, বলে অপরের বাড়ির তোরঙ কিংবা আলমারীর দিকে ওভাবে তাকাতে নেই, লোকে অসভ্য বলে। তবু না তাকিয়ে পারে না ও। শুধু কি তাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দু'একটা প্রশ্নও করে বসে।

রেণুদির তোরঙের ভেতর সাজানো খান-কয়েক রঙিন শাড়ি, আয়না, দুখানা বই—আরো কত কি। সেগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে ভীষণ লোভ হয় টিয়ার।

লোভের চোখেই তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাপড়ের আড়ালে একটা ছোট্ট পিতলের বাক্স দেখতে পেল টিয়া। অমনি প্রশ্ন করে বসলো, ওটা কি রেণুদি?

—কোনটা?

—ঐ যে পেতলের বাক্সটা?

—হঠাৎ যেন চমকে উঠলো রেণুদি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে টিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। না, বিস্ময় নয়। হঠাৎ যেন স্মৃতির তারে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ফেলেছে টিয়া। থমথমে বিষাদ-ভরা চোখে টিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাসবার চেষ্টা করলে।

বললে, গয়না।

—তোমার? প্রশ্ন করলে টিয়া।

—হ্যাঁ। বিষণ্ণ গলায় উত্তর দিলে রেণু। বললে, দেখবি?

ঘাড় কাত করে সায় দিলো টিয়া। আর রেণু এসে হাঁটু গেড়ে বসলে ট্রাঙ্কের সামনে, বের করলে পিতলের বাক্সটা। টিয়া দেখলে বাক্সটার ওপর নাম খোদাই করা আছে রেণুবালা। নামের চারপাশে লতা-পাতার নক্সা।

গহনার বাক্সের ডালা খুলতেই উদ্গ্রীব লোভী চোখে তাকিয়ে রইলো টিয়া। আর কাগজের ছোট ছোট বাক্স থেকে পাৎলা কাগজের মোড়ক খুলে খুলে দেখালে রেণু। একটা সরু মফচেন, একটা বিছে হার, ছ

গাছা চুড়ি, কানের মাকড়ি একজোড়া, মিনে-করা তাগা, আর একটা টিকলি। সবগুলোই নতুন ঝকঝকে, যেন ব্যবহার হয়নি কখনও। তবে সব কটাই হাল্কা, কম সোনায় তৈরী।

রেণু বললে, পরবি তুই? পর না?

টিয়া হেসে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো।

আর রেণু হঠাৎ বললে, শোন, তোকে একটা জিনিস দোব, নিতেই হবে।

রেণুদির কথাটা বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন চোখে তার মুখের দিকে তাকালো টিয়া।

রেণু কোন কথা বললে না, কাগজের মোড়ক থেকে টিকলিটা বের করে বললে, দেখি কেমন লাগে তোকে। বলে টিয়াকে পরিয়ে দিলে। তারপর বললে, ওটা তোকে দিলাম টিয়া। তোর বিয়েতে আসতে পারবো কিনা তার তো ঠিক নেই, আগে থেকেই দিয়ে রাখলাম।

টিয়া আপত্তি করলে। বললে, মা বকবে। তবু শুনলো না রেণু।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমি তো কোনদিনই পরবো না রে।

—পরবে না?

রেণুর চোখ ছলছল করে উঠলো। বললে, বাবা বেঁচে থাকতে ও-সব করানো হয়েছিল। বিয়ের দিনও ঠিক হয়েছিল টিয়া, তারপর...

—তারপর?

রেণু হাসলো, বিষণ্ণ হাসি। বললে, শেষ মুহূর্তে ওরা বেশী টাকা পেয়ে বিয়ে ভেঙে দিলো।

বিয়ে ভেঙে দিলো! টিয়ার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য মোচড় দিলো যেন।

রেণু হাসবার চেষ্টা করলে।—সেই শোকে বাবা মারা গেল তিন মাসের মধ্যে। কিন্তু গয়না গড়ানো হয়ে গিয়েছিল, তাই পড়েই আছে। আর কোন কাজে তো লাগবে না ভাই!

টিয়া চুপ করে রইলো। সান্ত্বনা দেবার কোন কথাও খুঁজে পাচ্ছে না ও। রেণুদির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, গয়না কাপড় সব কেনা হয়েছিল, তারপর আর বিয়ে হয়নি? আর কোথাও কি বিয়ে দিতে পারেনি দামুদা? রেণুদির দিকে চোখ তুলে তাকালো এবার টিয়া। নতুন চোখে দেখলে এই প্রথম।

রেণু কাগজে মুড়ে টিকলিটা টিয়ার হাতে গুঁজে দিলো, আর মুঠোর মধ্যেই সেটা চেপে ধরলো টিয়া। ফেরত দিতে পারলো না। মনে হলো ফেরত দিলে রেণুদি আরো ব্যথা পাবে।

সোনার টিকলিটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো টিয়া। কিন্তু মাকে বলতে সাহস পেল না। লুকিয়ে রেখে দিলো নিজের ছোট্ট টিনের সুটকেশটার মধ্যে। কিন্তু বারবার রেণুদির দুঃখের কথাটাই ঘুরে বেড়াতে লাগলো তার মনের চারপাশে।

কত কি ভেবে রেখেছিল টিয়া, যাবার সময় রেণুদিকে বারবার বলবে, তার বিয়েতে চিঠি দেবে, যেন আসে রেণুদি, তা না হলে তার একটুও আনন্দ হবে না। কিন্তু পরের দিন যখন দু'খানা গরুর গাড়িতে সব মালপত্র তুলে দামুদা, রাঙাবৌদি আর রেণুদি উঠে বসলো, তখন গ্রামের সব লোক এসে জড়ো হয়ে কত কি বললো, কত কি অভিযোগ আর অনুরোধ, কিন্তু টিয়া কোন কথাই বলতে পারলো না। ও শুধু ফিরুকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে আদরে আদরে তার মুখে চুমো দিয়ে রাঙাবৌদির কোলে তাকে তুলে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে রেণুদির চোখে চোখ পড়লো। দেখলে রেণুদি কাঁদছে। রেণুদির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রেণুদির চোখে জল দেখে ওর চোখও জলে ভরে এলো।

গাড়ি দুটো তখন ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলতে শুরু করেছে। পিছনপানে তাকিয়ে আছে রেণুদি, রাঙাবৌদি, দামুদা। সকলের চোখেমুখেই একটা ব্যথার ছাপ। শুধু ফিরু হাসছে খিলখিল করে। বাচ্চা ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারছে না। কোন ব্যথা নেই ওর মনে।

গাড়ি দুটোর পিছনে পিছনে গ্রামের অনেকেই এলো। একে একে অনেকেই থেমে পড়লো, কেউ বা ফিরে গেল। শুধু টিয়া একা একা চলে এলো নতুন গোড়ে পার হয়ে—তালগাছের সারি পার হয়ে আরো অনেক দূরে।

তারপর নিজেরই অজান্তে কখন থেমে পড়ে চেয়ে রইলো গাড়ি দুটোর দিকে। ধীরে ধীরে গাড়ি দুটো এ'কেবেঁকে এগিয়ে গেল, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেল কালো বিন্দু দুটি, তারপর এক সময় কাঁদরের খালে নেমে পড়লো গাড়ি দু'খানা। চোখের আড়ালে চলে গেল—রেণুদি, ফিরু, রাঙা-বৌদি, দামুদা!

আবার কি কখনো দেখা হবে ওদের সঙ্গে? কে জানে।

উদাস দৃষ্টিতে সেদিকেই টিয়া তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। হয়তো কিছু ভাবলো, কিংবা কিছুই ভাবলো না। তবু ফিরে আসতে ইচ্ছে হলো না টিয়ার।

শাড়ির পাড়ের মত দূরের রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে রইলো। ছোটলাইনের গাড়িটা এখনও হয়তো ধিকিধিকি করে এসে পড়বে।

(ক্রমশ)

সমুদ্র থেকে ভূমি লাভ

বর্গমাইল পিছু জনসংখ্যার হিসেব ধরলে সবচেয়ে ঘন বসতীপূর্ণ দেশ হচ্ছে জাপান। বর্তমানে জাপানের জনসংখ্যা নয় কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ। কিন্তু পরবর্তী অল্প বছরের মধ্যেই দশ কোটি পূর্ণ হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

এই বাড়তি সংখ্যার মধ্যে বহু লক্ষ লোক বাস করবে এমন জমির ওপর, যা একদিন সমুদ্রের জলে আচ্ছাদিত ছিল। কারণ জাইদর-জি পুনরুদ্ধারে বিশেষজ্ঞ ওলন্দাজ ইঞ্জিনীয়াররা জমি পুনরুদ্ধার সম্পর্কে তাঁরা যা জানেন, জাপানীদের তা শিখিয়ে দিচ্ছেন।

আর জাপানীরাও অত্যন্ত দ্রুত শিখে নিচ্ছেন। ওরা শক্তিশালী নতুন নতুন বাঁধ তৈরী করছেন, পুনরুদ্ধারকৃত জমিকে প্লাবন মুক্ত করার কৌশল আয়ত্ত করে নিচ্ছেন, ভূগর্ভে জলপ্রবাহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করছেন, সমুদ্রগর্ভ থেকে পাওয়া জমিতে রাস্তা তৈরী করছেন, মাটিকে লবণমুক্ত করে নিচ্ছেন এবং কারখানা ও বাসগৃহের, এমন কি, নতুন শহরের পত্তনের ভিত পর্যন্ত গাঁথছেন। জাপান এইভাবে বাসোপযোগী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে তেরশ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছে।

আগে যেখানে ছিল কর্দমাক্ত জলাভূমি, ইতিমধ্যে তেমন অনেক স্থানে কারখানার উপযোগী ভিত বসানো হয়েছে। শিল্প আহরণের কেন্দ্র হিসেবে বিরাট ভিত-মোতোর পাশে জমি পুনরুদ্ধারের এক বিরাট পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে।

ধান উৎপাদনকারী বহু কৃষক, উৎপাদন প্রস্তুতে কাজে লাগে সেই সামুদ্রিক শ্যাওলা-সংগ্রাহকরা এবং জেলেরা তাদের জীবিকা নষ্ট হবার আশঙ্কায় এই পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বহু লোক নিরাপদ কাজ ও উচ্চতর বেতন পাবে বলে খুশীই হয়েছে।

সঞ্চয়ের রেকর্ড

লিভারপুলের নিকটবর্তী ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পনগরী লেফ সঞ্চয় ব্যাপারে বৃটেনের সমস্ত শহর ও নগরীকে ছাপিয়ে গিয়েছে। গত বছর জনপ্রতি জাতীয় সঞ্চয় যেখানে ছিল সাত টাকা পনের নয়া পয়সা, সে-তুলনায় লেফের আটচল্লিশ হাজার অধিবাসীর জনপ্রতি সঞ্চয় হয় পনের টাকা।

ট্রাস্টি সেভিংস ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান স্যার কেনেথ স্টুয়ার্ট লেফকে "বৃটেনের সবচেয়ে সঞ্চয়ী স্থান" বলে বর্ণনা করেছেন।

[illegible] এবং [illegible] কোথাও [illegible] সঞ্চয়ের হার এখানে [illegible] লেফের অধিবাসীরা মোট যে পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছে, [illegible] কম।

[illegible] শহরটিতে [illegible] নতুন একাউণ্ট খোলার [illegible] কম নয়। স্থানীয় [illegible] মিঃ এফ স্মিথ [illegible] "এমন কি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও [illegible] করে [illegible]।"

[illegible] কম হলেও [illegible] সংখ্যা মাট হাজারেরও বেশী, যার অর্থ, এখানকার লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি সীমানার বাইরেও সংক্রামিত হয়েছে।

গত বছর ব্যাঙ্কে জমা পড়ে ম কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা—১৯৬০ সালের চেয়ে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা বেশী। সঞ্চয় করার এই কাঠবিড়ালী-সুলভ ঝোঁক হওয়ার কারণ কি? মিঃ স্মিথের মতে: "অতীতে এ অঞ্চলে বহু দুর্যোগপূর্ণ দিন গিয়েছে, আর এখানকার অধিবাসীরা যেমন হিসেবী, তেমনি কর্মঠ—এই সুদিনে দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখার পক্ষপাতী।

মিসেস এলেন লুইস নামক এক গৃহকর্ত্রী এটাকে একটু ভিন্নভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন: "তিরিশ সালের ক্ষুধার দিনগুলির কথা আমাদের মনে আছে, আর তেমন অবস্থায় আমরা পড়তে চাই না। ভবিষ্যতের দুর্দিনে নিরাপদ থাকার চেষ্টাতেই লেফের অধিবাসীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। অন্যদের মতো আমরা বীয়ার, তামাক ও অর্থহীন প্রমোদে অর্থ-ব্যয় করি না।"

লেফে কর্মহীনের সংখ্যা শতকরা দুজনের বেশী নয়। যদি কাজ পাওয়া ছাড়াও যুদ্ধের আগে থেকেই আরো অনেকগুলি শিল্প গড়ে উঠেছে।

লণ্ডনের বসন্তকালীন একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে প্যাডিংটনে গ্র্যাণ্ড ইউনিয়ন ক্যানালের অন্তর্গত "ক্ষুদে ভেনিস"-এর নৌকা প্রদর্শনী। পিছনের দিকে ছ'টি বার্থযুক্ত যে পারিবারিক জল-শকটটি দেখা যাচ্ছে সেটি হলো টাকার ৬।২৭। মেহগনি কাঠে তৈরী নৌযানটি লম্বায় সাতাশ ফিট—স্ট্যাণ্ডার্ড মডেলের বীম হচ্ছে ৮ ফিট ১ ইঞ্চি এবং খালের উপযোগী মডেলের বীমের মাপ ৬ ফিট ১০ ইঞ্চি। শোবার কেবিনের মাপ ৫ ফিট ১১ ইঞ্চি। সামনের কেবিনে দুটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য বার্থ, দুটি সেলুন এবং নীচের তলায় একটি খাবার ঘর যেটিকে ছোটদের দুটি বার্থে পরিণত করা যায়

কোয়ালা পোষা নিষিদ্ধ

অস্ট্রেলিয়ার নরম তুলতুলে-গা 'ক্ষুদে-ভালুক' কোয়ালারা মানুষের আদর খেতে ভালবাসে। কিন্তু ঐ ভালুকদের নিজেদেরই রক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট ওদের পোষা নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেছেন।

সম্প্রতি মেলবোর্নের অন্তর্গত ওকলেফের ডিজেল ইঞ্জিন ফিটার হার্মান স্মিডট্ এক গ্রাম্য পথে একটি কোয়ালাকে চিৎ হয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় দেখতে পায়। অসুস্থ মনে করে স্মিডট ওকে তুলে বাড়িতে নিয়ে খিড়কীর বাগানে একটি খাঁচা তৈরী করে রেখে দেয়। খাঁচাটা সে তৈরী করে তিন বর্গফুট এবং চল্লিশ ফিট উঁচু, যাতে ভালুকটি ওপরে চড়ার যথেষ্ট জায়গা পায়।

কদিনের মধ্যেই প্রতিবেশীরা এই নিয়ে গালগল্প শুরু করে দেয় এবং ফলে একদিন পুলিস এসে হাজির। স্মিডটকে ধরে নিয়ে ওরা আদালতে হাজির করে ভালুক রক্ষা আইন ভঙ্গের অপরাধে তাকে একশ বিরাশী টাকা জরিমানা করা হয়। আর তার পোষা জীবটিকে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্ট কোয়ালা পোষা নিষিদ্ধ করে শিকার আইনে একটি বিশেষ ধারা যুক্ত না করলে এই ক্ষুদে ভালুক পোষা-বাতিক লোকেদের খপ্পরে পড়ে কবে লোপ পেয়ে যেতো।

অস্ট্রেলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, এমন একটি মনোরম এবং বিচিত্র প্রাণীকে কিছুতেই

কলিকাতা—১

লোপ পেয়ে যেতে দেবে না। আর বস্তুত, পূর্বাঞ্চলে কোয়ালা ভালুক সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভও করেছে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা কোয়ালাকে মারসুপিয়াল জাতির, বলে অভিহিত করেন—প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তন্যপায়ী জীবদের বংশধর, যারা পিতামাতার মতো আকৃতি না পেয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেই মায়েরা বাচ্চাদের থলির মধ্যে রেখে লালন করে।

কোয়ালারা দিনের বেলায় গঁদ গাছের খাঁজে গুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকতে ভালবাসে। রাত্রে সেই গঁদ গাছের পাতা খায়। অস্ট্রেলিয়াতে চারশো থেকে পাঁচশো বিভিন্ন রকমের গঁদ ও ইউক্যালিপটাস গাছ থাকলেও কোয়ালারা জীবনধারণ করতে মাত্র চার-পাঁচ রকমের গাছ বেছে নেয়।

ওরা কখনও জল পান করে না—শিশির-বিন্দু এবং পাতার রসে ওরা গলা ভিজিয়ে নেয়। ওদের নাম, কোয়ালা, আদিবাসীদের ভাষায় যার অর্থ 'পান না করা'।

পৃথিবীর বৃহত্তম রত্ন সংগ্রহ

পৃথিবীর বৃহত্তম রত্ন সংগ্রহ এতো মূল্যবান যে, টাকার হিসেবে তার সীমা করা সম্ভব নয়।

পারস্যের রাজধানী তেহরাণের একটি ব্যাঙ্কের বিরাট সিন্দুকে সমুদয় এই রত্ন রক্ষিত আছে।

এক সাম্প্রতিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই বিপুল সংগ্রহের কখনো মূল্য কষা সম্পূর্ণ হয়নি শুধু নয়, রত্নবিশেষজ্ঞ দ্বারা গোনা বা যাচাই করাও হয়নি এতোদিনকাল।

এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ভেলভেটের ওপর বিরাট প্লেটে মটর দানার মতো স্তূপীকৃত নানা রকমের রত্ন। আলগা পাথর ছাড়াও সোনার অলঙ্কারে বসানো তিন হাজার রত্ন রয়েছে। ঝলমলে বিপুল সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে বড় বড় হীরে, আর প্রায় কমলালেবুর মতো সুবৃহৎ পান্না।

এই অত্যাশ্চার্য সংগ্রহের মধ্যে একটি সোনার সিংহাসনও রয়েছে এবং হীরে ও চুনী বসানো হাতলযুক্ত অনেকগুলি তরবারি। এগুলি ছিল পারস্যের প্রাচীন সম্রাটদের সম্পত্তি।

এই সংগ্রহের মালিক এখন পারস্য গভর্নমেন্ট। টাকার হিসেবে অমূল্য দাম ছাড়াও এগুলির ঐতিহাসিক মূল্যে প্রভূত।

রক্ত স্রোতে অভুক্ত খাদ্যকণার প্রবেশ

পশ্চিম জার্মানীতে সম্প্রতি একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল জানতে পারায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথ খুলে গেছে। অ্যালার্জি ও আন্ত্রিক রোগের বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফোক হাইমার মানুষ ও পশুর আন্ত্রিক পরদা ভেদ করে খাদ্য যায় কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। পূর্বে ধারণা ছিল, খাদ্য মুখে চর্বিত হওয়ার পর পাকস্থলীর অ্যাসিড ও পাক-রসে জারিত হয়ে রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হয় ও আন্ত্রিক ঝিল্লীর প্রাসিকার সঙ্গে মিশে যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অপরিবর্তিত খাদ্যকণা যে আন্ত্রিক পরদা ভেদ করতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করা হয়নি।

এই সূত্র ধরেই ডাঃ ফোক হাইমার তাঁর গবেষণা শুরু করেন। প্রথমে পশু এবং পরে মানুষের উপর তিনি পরীক্ষা করেন। জল ও দুধের সঙ্গে আলু ও ভুট্টার শ্বেতসার, ঈসচ্, এমনকি, প্লাস্টিক শস্য খাইয়ে পরীক্ষা করে তিনি দেখেছেন যে, প্রতি এক হাজার মিলিয়ন শ্বেতসার কণা-কণার মধ্যে একটি অপরিবর্তিত অবস্থায় আন্ত্রিক পর্দা ভেদ করে, প্রাসিকার মধ্যে ঢোকে, দেহের সূক্ষ্মতম রক্তপ্রবাহী শিরায় মধ্যে দিয়ে ফের রক্তস্রোতের মধ্যে ফিরে আসে। পরে এই সব খাদ্যকণা হয় মূত্রের সঙ্গে, নয় কফের সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এইভাবে বেরিয়ে আসার পরও দেখা গেছে যে, ঈসচ্ কোষগুলি পূর্বের মতোই সক্রিয় থাকে।

ডাঃ ফোক হাইমারের গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে চিকিৎসাবিষয়ক পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। বার্লিনের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পুসহেনে লিখেছেন যে, অভুক্ত খাদ্যকণার দরুন দেহে বহুজাতীয় বহু রোগ হওয়া সম্ভব। খাদ্যজনিত এলার্জি এই কারণ

থেকে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রক্তে অভুক্ত খাদ্যকণার ফলে শরীরে তথাকথিত "বিরুদ্ধ দেহ" সৃষ্টি হয় ও ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়।

ডাঃ ফোক হাইমার তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখেছেন, যেসব লোক পুষ্টির অভাবে ভোগে, তাদের শরীরে অভুক্ত খাদ্যকণা বেশী পরিমাণে থাকে। আরও দেখা গেছে, দুধ ও স্নেহজাতীয় পদার্থের সঙ্গে শ্বেতসার খেলে শ্বেতসারের কণিকা বেড়ে যায়। তাই খাদ্য ও পথ্য ভুল হলে দেহে নানা বিপদ দেখা দেয়। এই সম্বন্ধে ডাঃ ফোক হাইমার আরও গবেষণা করে চলেছেন। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, আমাদের দেশে খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে পুরাকালে নিশ্চয়ই এই ধরনের গবেষণা হয়েছিল। তাই আমরা দেখি, এক খাদ্যের সঙ্গে আর-এক খাদ্য খাওয়া বারণ। অমুক দিনে অমুক খাওয়া নিষিদ্ধ। তাই খাদ্য বিষয়ে আমাদের এই সব অলিখিত রীতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
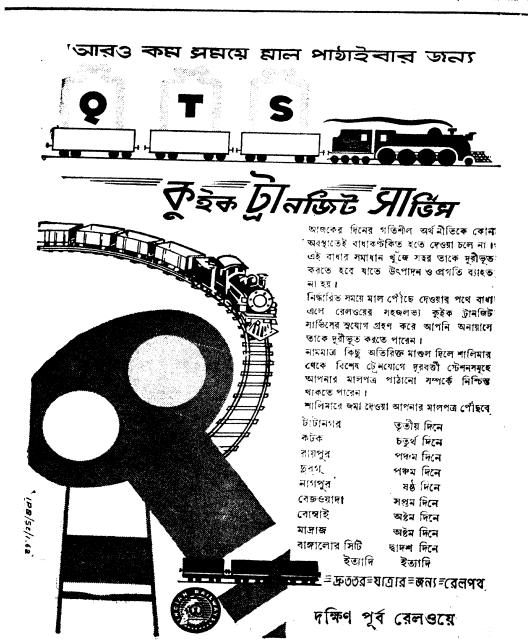
চেষ্টা ক'রেও দেরি হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে অনেকটা রাস্তা। দ্রুত পায়ে হাঁটছে মুকুল। এই দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য সূক্ষ্ম একটু অস্বস্তি তার বুকে থেকে-থেকে খোঁচা দেয়। গিয়ে দেখবে অর্ধেক

হয়তো হয়েই গেছে। সেটুকু পর্যন্ত থাকবে, তাতে বাসবীর রোল না-ও থাকতে পারে। কিন্তু.....একটা সাইনবোর্ড দেখল সে, আরো খানিকটা যেতে হবে। নতুন পল্লী; আসলে শহর আর পাড়াগাঁ পাল্লা দৌড়াদৌড়ি করে রাত্রির অবকাশ দেখছে। দূরে একটা প্যান্ডেল উঁকি মারছে। সামান্য ঝুঁকে মুকুল হাঁটার গতি বাড়াল। আবার ভাবছে সে, বাসবীই তো হিরোইন। শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই অমায়িক হয়ে থাকবে। এই অভিনয় রজনী তার দেখার যত না আগ্রহ, তার চেয়ে বাসবীর দেখানোর আগ্রহ অনেক বেশি; অন্তত অনুরোধের ঘটায় তাই ভেবে নিয়েছে মুকুল। 'আপনি তো আর আমাদের শো দেখলেন না—বাসবী একটু করুণ হেসেই বলেছিল।

'দেখালে কোথায়—' মুকুল হেসেছিল: সম্ভবত একটা অজুহাত ঠোঁটে তুলে নিয়েছিল, 'আর তাছাড়া নিজে খোঁজ নিয়ে দেখব—সে সময় কই!'

'পরশু আসুন না—রাইট প্লেটে শো।' বাসবী তাকাল।

'পরশু—' মুকুল খুচরোভাবে শব্দটা উচ্চারণ করল; আসলে বাসবীর চোখের যে স্নিগ্ধতা তাকে দোলা দেয়; সেই গভীর ইঙ্গিতে এখন কোনো অভিনয় দীপ্ত কি-না, দেখতে চাইল। মুখ দিয়ে বাহবা হয়ে যাওয়ার জন্যে দ্বিধাই ফুটল; 'দেখি।'

'দেখি না, যাবেন!' আত্মপ্রত্যয়ে বেণী নেড়ে বাসবী চলে গেল। মুকুল আবার ভাবল, বাসবীর সবটুকুই প্রজাপতি। পাখনা থেকে অবিরল সে রঙ ঢেলে দেয়। প্রথম আলাপ থেকেই এমন লেগেছিল। বাসবীর বয়স মেরে কেটে কুড়ি। মুকুলের এই তিরিশ। নিজেকে অনবরত বুড়ো শব্দ বললেই লাগে মেয়েটার সান্নিধ্যে। বাস্তবিক এক এক সময় মুকুল এও ভেবেছে, বাসবী যদি ভুল ক'রেও কল্পনায় নিয়ে বসে তো সে কি করবে। অথচ যখন ওকে আর এড়ানোও যায় না, সামনে না থাকলে উপরন্তু ওর কথা ভাবলে গলা চিনচিন করে। কিন্তু পাশাপাশি এখনই সেই কল্পনার ফোলস-উড়ানো ভাবটা ওকে আকীর্ণ করে। যদিও মুকুল বোঝে যে বাসবীর স্বাভাবিক চপলতা ওইটুকুকে দাবি করলে সেও উন্মত্ত হতে পারে। অথচ সে

দাবি করে না; বোকার মতো আড়ালে কথা সাজায়, বাসবী সরল, বাসবী চঞ্চল, অমায়িক। সে হৃদ্য।

বাসবী কি বোঝে বা ভাবে কিংবা তার প্রজাপতি হবার বাসনা কতটা বিস্তৃত, এ নিয়ে মুকুল চিন্তাহীন। তবু ইদানীং মুকুল মাঝে-মাঝে তার বয়স ভুলে যাচ্ছে। কারণ অনেক সময়েই তার চিৎকার ক'রে গানের শখ জাগে অথবা লাল ফুল দেখলেই কিনতে মন যায়, আর বাসবীকে আগের চেয়ে সময় দিতে পারে বেশি।

গতকাল প্রিয়ব্রত এসেছিল। মডার্ন ড্রামা ক্লাবের কর্ণধার। বাসবীই পাঠিয়েছিল। একটা কার্ড দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল, 'আপনি অবশ্যই যাবেন—দেখবেন আমাদের প্রচেষ্টা; বাসবীর একান্ত ইচ্ছা, হয়তো আপনাকে দেখলে ওর অভিনয় খুলে যাবে।'

মুকুলকে কথা দিতে হয়েছিল। মোট কথা, বাসবীর কথা ওর মুখ দিয়ে শুনে কেমন অন্য রকম একটু বোধ হচ্ছিল। বাসবীর সাঁকোটি অবস্থান, যা বয়সের গণ্ডি পেরোতে পারে না। এবং সেই বোধ আলোড়িত এখনো তাকে জড়িয়ে রেখেছে—যার জন্যে দেরি হয়ে যাওয়ায় বাস্তবিক সে ক্ষুণ্ণ।

হ্যাঁ, সেই প্যান্ডেলটাই। মুকুলের অনুমান মিলে গেল। কিরে বাবা, নাটক শেষ নাকি!

মাইকে গান হচ্ছে। 'মুকুলবাবু, মুকুলবাবু......' চমকে আড়ষ্ট দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সে। প্রিয়ব্রত নয় তো, তাকে ডাকছে। ভাবনাড়া থেকে ক্রমে চেহারাটা দেখে আশ্বস্ত হল: মুখচেনা আলাপী, মধুবাবু। বামপন্থী, ঘোর রাজনীতিবাদী, এক বন্ধুর সূত্রে পরিচয় হয়েছে। 'আসুন,' মধুবাবুকে উপেক্ষা করা-না-করা সমান; তবু বর্তমানে মধুবাবুই যা একমাত্র পরিচিত লোক।

'কি ব্যাপার, এখানে?'

'আপনি কোত্থেকে মশাই—' মুকুল বসল একটা চেয়ারে।

'কার্ড পেয়েছি একখানা—নতুন সংস্থা

এদের—' মধুবাবু সিগারেট এগিয়ে দিল।

'অডিটোরিয়ামে ?'

'দিন না, ধন্যবাদ—এখনো শো-র দেখা নেই—' ঠোঁট কুঁচকে বিরক্তি দিয়ে সিগারেট জ্বালাল মধুবাবু; 'নতুন দল আইডলাজটা দেখতে এসেছিলাম; এই আমাদের দেশের তরুণ গোষ্ঠী, সিনসিয়ারিটির বালাইটুকু নেই।'

'শেষ পর্যন্ত আসবে তো?' মুকুল এবার হতাশ খানিকটা।

'আসবে, এই হয়তো এসে পড়ল—' মধুবাবু চেয়ারে মাথা হেলালো। 'বামপন্থী-দের মধ্যে এ-সব পাবেন না—' পিপলসের পালস্ সম্পর্কে তারা সচেতন।'

ওদিকে মাইকে কখনো গান ঘ্যানর-ঘ্যানর, কখনো ঘোষণা, আর কানের কাছে মধুবাবুর অনর্গল লেকচার শুরু হল। মুকুল অবসন্ন। যেন প্রজাপতিহীন একটি বাগানে একলা সে। বহুক্ষণ এ-ভাবে কাটল। কতক্ষণ তা মুকুল বলতে পারবে না—কারণ সে দ্রুততা ক্ষইয়ে যে অবসাদ এখন পাচ্ছে, তাতে ঘুমের মতো ভাব স্বাভাবিক; ঘুম থেকে উঠতে চেয়ে কিংবা অনর্গল এই ফাঁকি ঝেড়ে ফেলবার জন্যে সে বাইরে এল।

রাস্তাটা এখন অনেক নির্জন, কোলাহল-হীন। পেছনে প্যান্ডেলের ভেতর উৎসাহী দর্শকের কথা। মুকুল চোখ খুলল, অনবদ্য রাত্রি ছায়ার টোপর পরে মৌন-বিলাসী; যেন বাসবীই এমন রাত হয়ে হৃদয়ে বিস্তীর্ণ। মুকুলের এই মুহূর্তে বাসবীকে ভাল লাগল—সে আর অনন্ত আকাশের নীচে বহুকেলে রাত্রির কাছে নিজের বয়েস ভাবতে পারছে না।

পর-পর তিন-চারটে ট্যাক্সির হেডলাইট জ্বলে নিবে গেল। প্যান্ডেলের কাছে গাড়িগুলো থেমে পড়ল। কে বলল, 'মডার্ন ড্রামা ক্লাব'; একজন 'মন্মথদা এসে গেছে' ব'লে ছুটল। গাড়ির দরজা খুলে নাটকের দলটি ভেতরে ঢুকল। মুকুল পায়ে-পায়ে দরজার কাছে এসে পড়েছিল। একটি সজ্জিতা তরুণীকে দেখে বাসবীর কথাই ভাবছিল—ও কি আমাকে দেখেছে, দেখেনি। দেখলেও এ-ভাবে দাঁড়ানোটা আমার উচিত হয়নি: মুকুল আলোকের নীচে বয়েসটাকে ফিরে পেয়ে ফিতের মতো জড়াতে যাচ্ছিল। এমন সময় 'আরে, আপনি কতক্ষণ' পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল। মুকুল ঘাড় ফেরাতেই দেখল সেই প্রিয়ব্রত।

'কখন এলেন ?'

'অনেকক্ষণ—তাও দেরি ক'রে এসেছি।' হাতঘড়ি দেখলে একবার মুকুল। 'আর ভাবছিলাম......'

'পাগল নাকি! আসুন, আসুন।' প্রিয়ব্রত হাত ধ'রে টানল। 'আমাদের প্রচুর দেরি হয়ে গেছে—ট্যাক্সি পাই না, এটা সেখানেই তো ওটা নেই, আর বলবেন না।'

'কিন্তু বাড়িতে ব'লে আসিনি।'

'আপনি ছেলেমানুষ নাকি—' মুকুলের মনে হল, প্রিয়ব্রত বয়েসের রেখা পড়তে পারে। বাসবীও হয়তো পারে—কিন্তু ...'

'এগারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।' প্রিয়ব্রত আশ্বাস দেয়।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছি...' মুকুল একটু দূরে থাকতে চাইছিল; 'আমি বসি গিয়ে, পরে জায়গা পাব না।'

'এখানে বসবেন মানে, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন; বাসবী ইন্সপায়ারড হবে।'

বয়েসটা মিহি হয়ে-হয়ে হারিয়ে গেল মুকুল। মুকুল প্রিয়ব্রতের অনুসরণ ক'রে স্টেজের পেছনে গেল। একটা জায়গা ঘিরে নিয়ে গ্রীনরুম তৈরী হয়েছে। ওরা মেক-আপ নিয়েই এসেছিল। ড্রেস যেটুকু বাকি ছিল, দ্রুত হাতে তা সেরে নিচ্ছে। বাসবীকে দেখল মুকুল। এখন চোখে কোনো অনুরোধ না, একাগ্রতা। মাথার চুল আঁচড়ানোর যে ভঙ্গি, তা তাকে চতুর রমণী ক'রে তুলেছে। বাসবীর যেন নিজের বয়সের শাড়িটা খুলে রেখে অন্য শাড়ি পরেছে। যা মুকুলকে খুশি করল। মুকুল হয়তো সঙ্গোপনে এমন বাসনাই ক'রে এসেছে: বাসবী সে-কামনার বোনা ভাঁজ পড়ে নিজেকে ঢের গুছিয়ে নিচ্ছে। একপাশে ঢিমে আলোয় মুকুল বসল। পরদার ভেতরে মেয়েরা সাজছে। আলোয় তার প্রতিবিম্ব ফুটে রয়েছে। প্রতিবিম্বের বাসবী নেচে বেড়াচ্ছে চপল হয়ে।
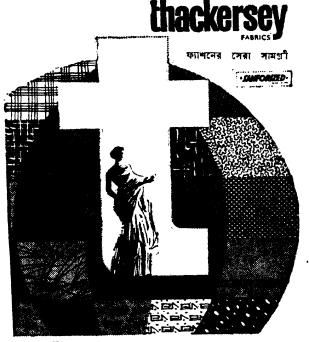
'আপনি বসুন, আমি আসছি।' প্রিয়ব্রত চলে যেতেই স্টেজের পেছনের সমস্ত অন্ধকার, মুকুলকে গ্রাস করল। কেমন নির্জনে সে হঠাৎ ভাবল, যৌবনের সীমানা নির্ধারণের আলো-ঘেরা জায়গা-টুকুতে প্রিয়ব্রত লীন হল। তারপরই অসংলগ্ন কথাটা নাভি থেকে উঠে এল : বাসবী চঞ্চল আমি জানি, কিন্তু আমার আসা উচিত হয়নি।

দোটানা ভাবটা কতটা অভিভূত করেছিল মুকুলকে, তা সে বুঝতে পারেনি—শুধু বুঝল, কে যেন আসছে। 'কে?' স্বরে কিছুটা আকস্মিকতা থাকলেও মুকুল স্থির চিনতে পারল, আর ভাবল, এখনো আকাশে রাত্রি নায়িকার দেহের উপর লম্বমান।

'আরে, কখন এলেন?' বাসবী বসল পাশে। সুন্দর একটু গন্ধ সাথে সাথে তেজী হল।

'অনেকক্ষণ।'

'তা হবে, আমাদের সাংঘাতিক দেরি হয়েছে—যাক, শেষ পর্যন্ত এলেন!'

'তোমায় অভিনয় দেখতে। আমি ভেবে-ছিলাম, কুমারী হবে।'

খিল খিল করে হাসল বাসবী। 'কেন, খারাপ লাগছে'?

'না, অনেক বেশি ভাল লাগছে। এতটা ভাবিনি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।' এই গাঢ়তাটুকু মুকুলকে খুশী করল।

'এই রোল প্রথম—শেষ রক্ষা করতে পারলে হয়।'

'পারবে; তোমাকে বউ ভাবলে বেশ দেখায়—' মুকুল তখনো আপ্লুত হয়ে তাকায়।

'তাই বুঝি?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

মুকুল থামে। ওর কথায় কি ভাবে বাসবী। সেই প্রজাপতি ভাবটুক নেই। বাসবী যেন কিছু বয়স ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিশ্বাস ফেলছে। এখন ও কিছু খুঁজলে না। বাসবী ভাবনা শেষ ক'রে উঠে পড়ে; এক-পা এগিয়ে হঠাৎ বলে, 'আমি কিন্তু এর আগে বিধবার রোলও করেছি—'

'বিধবা!' মুকুল বিমূঢ় হয়।

'হাঁ, বিধবা।' কেমন কঠিন পদক্ষেপে বাসবী অন্ধকার মাড়িয়ে চলে যায়। নির্জনতা পুরনো বন্ধুর ন্যায় মুকুলের কাছে বসে থাকে।

নাটক শুরু হল।

মুকুল কখনো উইংসের পাশে, কখনো দর্শকদের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে নাটক দেখছে। যদিও তার মন বাসবীর কথা থেকে সরছে না। অনেকগুলো দৃশ্য হয়ে গেল। শো জমে উঠেছে। মডার্ন ড্রামা ক্লাবের টিম-ওয়ার্ক প্রশংসনীয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বাসবী নববধূর অভিনয় সুন্দর চালিয়ে যাচ্ছে। তবু এখন তাকে মুকুল আবার উড়ন্ত প্রজাপতি ভাবতে পারছে। স্টেজ থেকে বেরিয়ে রিলিফের জন্যে অনেমা হাসছে। এর মধ্যে বহুবার মুকুলের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে বা পাশের চেয়ারে ধপ ক'রে ব'সে ব'লে উঠেছে, উঃ কি গরম! এ-সব কথা মুকুলকে বিব্রত করতে পারেনি। কিংবা বাসবী তাকে ছুঁয়েছে, তাও সে ভাবেনি। দেখার ফাঁকে-ফাঁকে কিরকম একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল; বস্তুত সে বাসায় ফিরবার জন্যে উসখুস করেছে অথচ বাসবী যা প্রিয়ব্রতকে বলবার সুযোগ পাচ্ছে না। আর সেজন্যে হয়তো চতু-ষ্পার্শের ছড়ানো নির্জনতা টের পাচ্ছে; যা স্পষ্ট মনে করিয়ে দেয়, তার বয়স ত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে।

'কেমন লাগছে?'

ঘাড়ে যে উষ্ণ নিশ্বাস লাগল, তা নববধূর মতো রমণীয় হলেও মুকুল বাসবীকেই ভাবল। আর চোখ তুলতেই বাসবীর চোখের ভূমিতে সেই স্নিগ্ধতা

আঁকা দেখল। এবং মুকুল ভাবল, এই তাকানোটুকু কতক্ষণ ধ'রে চালানো যায়।

'খুব ভাল লাগছে।'

'না!'

'সত্যি বলছি—বউর সাজে তোমাকে মানায়।'

'আপনি অন্য চরিত্র দেখেন নি—তাই।'

বাসবী কিন্তু প্রজাপতির মতো উড়ে গেল। তাতে অবশ্য মুকুলের ভাবান্তর হল না। কারণ সে মুগ্ধ ছিল নিজেকে নিয়ে। এই বাসবীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার জন্যে মনে-মনে খুশী হতে পারছিল। প্রিয়ব্রত কতবার খোঁজ নিয়েছে।

'কেমন লাগছে?'

'বেশ হচ্ছে।' উৎসাহ ও আবেগ ফুটল মুকুলের স্বরে।

'আপনি যাদু জানেন।' প্রিয়ব্রত হাসল। মুকুল ওর মুখের ভাব দেখে কিছু বুঝল না।

'কেন?'

'বাসবী ইন্সপায়ারড্ হয়ে অভিনয় করছে। এতটা স্বাভাবক সে কখনো হয়নি।'

প্রিয়ব্রতর বয়স বাইশ কি চব্বিশ হবে। তবু মুকুল সামনে দাঁড়ানো নিটোল প্রিয়ব্রতর চেয়ে নিজেকে যুবক ভাবল। তার মনে হল, বাসবী তার সামনে অভিনয় কখনো রাখেনি। সে এমনিই স্বাভাবিক হয়ে আছে এ পর্যন্ত। মুকুল কেবল দ্বিধায় বিপন্ন বোধ করেছে। আসলে এই বিশেষ প্রদর্শনী রজনীতে বাসবী তাকেই ইন্সপায়ারড্ করছে। এমন অখণ্ডতায় ছেলেমানুষের মতো গান গেয়ে উঠতে মুকুলের ইচ্ছে করল। যদিও রবীন্দ্রনাথের শুধু 'যেতে-যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি—' বুকের গভীর থেকে উঠে এল। নিজের মনের এই অবিশ্বাস তাই মুকুলের খারাপ লাগল। বাসবীর আয়নায় প্রতিফলিত নিজেকে দেখেও আস্থা ফিরল না। তাই প্রিয়ব্রতকে দেখে প্রচণ্ড হিংসে উথলে উঠল। প্রিয়ব্রত নবীন পদ্মের মতো জলের উপর মাথা তুলে বাতাসে দুলছে যেন। কারণ সামান্য, বাসবী অনবদ্য হতে পারছে অভিনয়ে।

ঝিম ধ'রে মুগ্ধ হবার ভান করে মুকুল বসে রয়েছে। পেছনের আলোর পর অন্ধকার আর সামনে উদ্ভাসিত সব কিছু তাকে মাঝপথে বসিয়ে রেখেছে। দর্শকদের সকলকে এখন জুরির ভাবা যায়। যেন সময় নিচ্ছে—মুকুল রায় শুনবে ভেবে বিমূঢ়। অথচ এই অভিনয় চলাকালীন বাসবী নতুন বউকে প্রতিষ্ঠা করেছে। মুকুল প্রজাপতির কথাটা ভুলে গেল। এখন বাসবী অনেক বেশিক্ষণ ধ'রে আছে। টলটলে হয়ে এমনিই থেকে যেতে পারে।

বিরাট হর্ষধ্বনির মধ্যে অভিনয় শেষ হল। জমাট দর্শকেরা এবার তাপ পেয়ে গলে যেন আলগা হতে লাগল। মুকুল অন্যমনস্ক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

একগুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধা এতক্ষণ যেন গন্ধ ছড়াচ্ছিল। হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। পাদপ্রদীপের আলো নিবে মঞ্চ ম্লান। দর্শক আসন এখন ফাঁকা; ক'জনে ছড়িয়ে বসে হাই তুলছে।। হয়তো রাত কাটাবে এখানেই। মাঝে-মাঝে দু-একজন নাটক করার ঢঙে চিৎকার করছে—শূন্য প্যাণ্ডেলে একটু হাসি গড়াগড়ি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। মুকুল ঘড়ি দেখে—একটা পাঁচ। অন্যমনস্কতা তাকে পেয়ে বসে। বাসবী রঙ তুলে আবার পুরনো বয়সের কাপড়টাই

পরে। তবু কেমন খাপছাড়া গম্ভীর। সমস্ত দলটাই ক্লান্ত, অবসন্ন। খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই—একটু চা, তাও দুষ্প্রাপ্য। হাই তুলে বাসবী ঝিমিয়ে পড়ে। মুকুল ওকে চিনতে পারে না। মুকুলের ভয় হয় বাসবী তার বয়স ভুল করছে না তো। সমস্ত চাঞ্চল্য শক্তি যেন অভিনয়টুকু করার জন্যে, খরচ ক'রে বাসবী অস্বাভাবিক। মুকুল ওকে হারিয়ে ফেলছে। এখন যা করলে ও আবার স্বাভাবিক হয়, মুকুলের তা জানা নেই। কারণ অবসন্নতার এই ভাঙা চিত্র তাকে বন্ধ ক'রে ফেলেছে। সে শুধু করুণা করতে পারে— সেই পুরনো অভ্যাস মতো বাসবীর সন্নিকটে যাওয়া যায়; না, আর কিছুই হয় না। উদামহীন বাসবী মুকুলের মনে যুবক-ভাব জাগাতে অক্ষম।

প্রিয়ব্রত কোথায় গেছে। বোধ হয় বাকি টাকার খোঁজে গেছে। একবার নাটক শেষ হলে তাকে দেখেছিল মুকুল। বলেছিল প্রিয়ব্রত, 'বসুন, মুকুলদা আসছি......'

বোকার মতো ব'সে আছে মুকুল; কিছু ভাবে, তাও পারছে না বাসবীর জন্যে। বাসবী কি প্রজাপতি হয়ে আর তার সান্নিধ্যে আসবে না।

পুরনো শো-র কথা হচ্ছিল। 'আজ বাসবী সুপার্ব!' একজন বলল।

'সত্যি, বউর রোলে ওকে মানায়।' সায় দিল কে যেন।

মুকুল কান পাতল। ভাবল, ওরা কি জানে, বাসবী বাইরে বিধবার পার্টও করে। করে কি না, মিথ্যে বলছিল।

বালিগঞ্জের এ-অঞ্চলে রাত বারোটার পর যে নৈঃশব্দ্য নামে, তার সঙ্গে পাড়াগাঁর কিছু মিল আছে। উঁচু-উঁচু গাছগুলোর মাথা ঝাঁকড়া হয়ে প্রেতিত নিয়ে গা ঝাড়ে। কেমন বুনো গন্ধ শিথিল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর একটানা খুব মিহি একটা শব্দ প্রবাহিত হয়।

অবশ হয়ে পড়েছিল মুকুল। এমন সময় প্রিয়ব্রত ফিরে এল। এসেই বলল, 'এমন বাজে উদ্যোক্তা দেখিনি। ছোটলোক!'

'টাকা দিয়েছে তো?'

'দেবে না মানে—গাড়ি ভাড়া নিয়ে ঝঞ্ঝাট, বাকিয়ে তবে টাকা বার করল। ওঠ সব!' প্রিয়ব্রত দাঁড়ায়। তারা ঝাপটে সকলে গা তোলে। 'কই চল—' মুকুল চমকে ওঠে। 'হ্যাঁ, চল—'

রাইট স্ট্রীট ধরে সকলে গড়িয়াহাট রোডে এল। দু'পাশে দুটো আলোর রেখা অনেক দূর পর্যন্ত সমান্তরাল; নিথর একটা শূন্যতার হাত ধ'রে তারা দাঁড়িয়েছে সারি বেঁধে।

হঠাৎ মধুবাবুর সঙ্গে দেখা হল। 'এই যে মুকুলবাবু—'

মুকুল ঘুরে দাঁড়াল। 'কেমন দেখলেন?'

'মন্দ কি;' মধুবাবু হাসল সামান্য। 'তবে কোনো আইডিয়াজ খুঁজে পেলাম না—বাংলার যুবকেরা কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে—'

মুকুল ভাবল মধুবাবুর এ-কথার অর্থ কি! আমাকে বলছে নাকি—আমি কি এখনোও যুবক! বাসবী কি মনে করে। সে কি যুবক বলে ভাবে।

মুকুল আলাদা বিচ্ছিন্ন হয়ে হাঁটছিল। কে যেন তাকে দূরে ঠেলে দিল। মধুবাবু অন্য রাস্তা ধরলেন। বাসবী অচেনা যেমন। অনেক খোঁজার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। জন পাঁচেক উঠল। ড্রাইভার বলল, 'তিনজনের বেশি নয়।' বেশি ভাড়ায় রফা হল। আরো একটা ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র ভরে ক'জন উঠল। মুকুল তখনো দূরে। অল্প কুয়াশায় তাকে আবৃত করছে। প্রিয়ব্রত দেখতে পেল। 'আরে, আপনি আসুন, বাসবীর সঙ্গে গাড়িতে চলে যান।'

মুকুল বাধা দিল; 'না আমি হেঁটে যাব।'

'আসতে পারেন কিন্তু।' বাসবী পিঠ কুঁজো করে গাড়িতে উঠছে। প্রিয়ব্রত আরো একবার অনুরোধ করল; তারপর বাসবীর দিকে ফিরে তার পিঠে হাত রেখে বলল, 'তোমার অভিনয় আজ গর্ব করবার মতো।'

বাসবী প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে তাকালো; মুকুল দেখল, সেই স্নিগ্ধতা তার চোখের ভূমিতে। মুকুল নিশ্চিন্ত হল। বাসবী প্রজাপতি এখনো। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে পড়ল, তার বয়স ত্রিশ—বুড়ো পদ্ম। মাথা ঝাঁকিয়ে সে এগোল। গাড়িটা ছেড়ে দিল।

হাটিতে লাগল বাকী কজনে। অল্প হাওয়ায় একটু শীত লাগছে। বাসবী এতক্ষণে বহু দূরে পৌঁছে গেছে। নির্বাক মৌনতা জুতোর শব্দে ভেঙে যাচ্ছে। এমন সময় আর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। এবার প্রিয়ব্রতকে থামানো গেল না। প্রখর সৌজন্যতার উত্তরে মুকুলকে উঠতে হল।

ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি ছাড়ল। প্রিয়ব্রত তার দু'বন্ধু শুদ্ধ পশ্চাতে ক্রমশ হারিয়ে গেল। রাত্রির নিস্তব্ধতা মাড়িয়ে গাড়ি হু-হু করে ছুটছে। গদীতে মাথা রেখে মুকুল ভাবল, এই দ্রুততা নিয়েও সে আর বাসবীর কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে না—এখন বাসবীই তাকে করুণা করতে পারে; এই বিশেষ একটি রজনীতে মুকুল নিজেকে যৌবনহীন বা ব্যয়িত যুবক বুঝল। কারণ তার চোখে এটা স্পষ্ট, প্রিয়ব্রত ক্লান্তি নিয়েও ধীরে ধীরে হেঁটে রাত্রির এই কুয়াশা ভেঙেও বাসবীর কাছে তার চেয়ে আগে পৌঁছে যাবে। বয়সের গতিই তাকে সাহায্য করবে।

আকাদমি অফ ফাইন আর্টস স্কেচ ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিক প্রদর্শনীভুক্ত তিনটি স্কেচ।
শিল্পী : স্মরজিৎ ঘোষ ... শিল্পী : রবার্ট আর নোরেল শিল্পী : অরুণ মুখোপাধ্যায়

ছবি আঁকার জন্য ভাল মডেলের অভাব আমাদের দেশের শিল্পী মাত্রেই অনুভব করেন। কয়েকটি সেই অভাব দূর করে সর্বপ্রথম সমৃদ্ধ স্টুডিওতে জীবন্ত মডেল থেকে ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ছবি আঁকার সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে আকাদমী অফ ফাইন আর্টস স্কেচ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে শিল্পীরা যে ছবি আঁকেন প্রতি বছরই তার প্রদর্শনী হয়। গত সপ্তাহে আকাদমি ভবনে এই স্কেচ ক্লাবের আনুকূল্যে অঙ্কিত ছবির পঞ্চম বার্ষিক প্রদর্শনী ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

তেইশ জন শিল্পীর আঁকা মোট পচাত্তরখানি ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। স্কেচ ক্লাব নামে হলেও প্রদর্শিত সব ছবিই স্কেচ নয়—তেল রঙ এবং জলরঙে আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবিও কুড়িখানি আছে। স্কেচগুলির অঙ্কনে পেন্সিল, কালি-কলম, রঙ-খড়ি এবং কাঠকয়লা ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকখানি মাত্র নতুন কাজ, নয়তো প্রদর্শিত ছবির অধিকাংশই পুরনো এবং তার মধ্যে খানকতক ছবি বছর কয়েক আগেকার তৈরী।

স্কেচগুলির মধ্যে আছে মানুষ, পশু এবং নানারকমের প্রাকৃতিক দৃশ্য। তবে

নগ্ন নারী মূর্তিই সংখ্যায় বেশী। শিল্পীদের অনেকেরই রেখার টানে দক্ষতা প্রকাশ পেলেও মডেলের জন্য নির্বাচিত চেহারাগুলি তেমন সুন্দর না হওয়ার ফলে নগ্ন নারী মূর্তিগুলির বেশীরভাগই মনোহর হতে পারেনি। অনেকে নগ্ন নারী-দেহের যৌন আবেদনসূচক অংশকে প্রাধান্য দিয়েছেন মুখ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও। এবং মডেলের অতি স্থূল দেহের জন্য সেসব ছবি থেকে কোনরকম শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। কতকজনের ছবিতে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে দেহের পেশীর আকৃতিকে অভিব্যক্ত করে তোলার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে।

মনের একটা বিশেষ ভাব অনুসারে বসা, শোয়ার বিশেষ একটা ভঙ্গীর ছবি—সম্পূর্ণ দেহের বা দেহের সংশ্লিষ্ট অংশের স্কেচও দেখা গেল তবে সংখ্যায় তা খুব বেশী নয়।

জীবন্ত মানুষকে সামনে রেখে মডেলের ভাব অনুগামী যথাযথ ভঙ্গীর ছবি আঁকায় এরই মধ্যে কিছু কৃতিত্ব দেখা গেল প্রিয়-গোপাল ভট্টাচার্যের চারখানি স্কেচে। যোগেন চৌধুরীর তিনখানি স্কেচও ভাল লাগল। সেলিম মুন্সীর একটি নগ্ন নারীর স্কেচ এবং একটি গাভীর স্কেচ জীবন্ত মডেল ব্যবহারের সার্থক প্রচেষ্টা। সেলিম মুন্সীর তেল রঙের ছবি দুখানিও প্রশংসিত হবার যোগ্য। ডি এম ঘোষ, সুনন্দা গোস্বামী, সজল রায়, বধূরাণী সুচন্দ্রা রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায় রবার্ট আর নোরেল স্মরজিৎ ঘোষ ও সুধীর সেনের স্কেচগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মঞ্জুশ্রী চন্দের খাজুরাহের মূর্তি থেকে কখানি ছবি রেখাচিত্রাঙ্কনে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় দেয়। সুনন্দা গোস্বামীর জলরঙে আঁকা দুখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সমগ্রভাবে স্কেচ ক্লাবের এই প্রদর্শনীটি শিল্পীদের সজীব মডেল থেকে ছবি আঁকার সুযোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করলে খুব আশাপ্রদ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে ধরা যায় না। সেটা প্রধানত এই কারণে যে যে-মডেল শিল্পীরা পেয়েছেন, বা নিজেরাই নির্বাচিত করে নিয়ে থাকুন, তাদের অনেকেরই আদৌ মডেল হবার উপযোগী দেহসৌষ্ঠব নয়। এদিকটায় দৃষ্টিপাত করলে ছবির শিল্পমানও অনুপ্রাণিত হতে পারবে বলে মনে হয়।
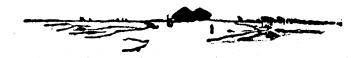
পূর্ব ভারতের নানা অঞ্চলে সাঁওতালরা ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই ওরা প্রকৃতিক শোভার সংগে চমৎকারভাবে মিশে থাকে। বর্ধমানে মির্জাপুর গ্রামেও তার ব্যতিক্রম নেই।

১। ক্ষেতে কাজ করার সময় সাঁওতালী তরুণী; ২। বর্ষায় ধান বোনা; ৩। মাঠের পথে লাঙল কাঁধে গ্রামের বৃদ্ধ চাষী; ৪। মেয়েরা যখন ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত সে সময় নিজের তৈরী যন্ত্রে সুর ভেঁজে বৃদ্ধ সময় কাটায়; ৫। গ্রামের কৃষক পরিবারের মেয়ে মাত্রই আনন্দের সংগে ধান রোপনের কাজ করে; ৬। দামোদরে জল বাঁধির সংগে সংগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলেরা সমবেত হয় মাছ ধরতে।

আলোকচিত্রশিল্পী

ইশা মহম্মদ

পর্তুগালের শকট সংরক্ষণশালা

আরতি সেন

পর্তুগাল সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ভাষায় আলোচনা বেশি হয়নি। কারণ নির্ণয় দুঃসাধ্য নয়। ভারতবর্ষের একখন্ড মাটি কামড়ে ঔপনিবেশিকতার শেষ শিখাটি জ্বালিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা আমাদের নীতি এবং সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। তাই পর্তুগালের সঙ্গে আমাদের একটা মর্মের বিরোধ ছিল। গোয়া মুক্তির সাথে সাথে সেই ক্ষীণ বিরোধের ক্ষীণতর মেঘখন্ডটি অপসারিত হয়েছে বলেই আমরা মনে করি।

উপরোক্ত অত্যন্ত স্পষ্ট কারণের জন্যই পর্তুগাল সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য সীমিত ছিল। তাই অনেক জিনিস জানবার চেষ্টা করিনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিরোধ সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আজ সে বাধা দূরীভূত। পর্তুগাল সম্বন্ধে আরো ভাল ক'রে জানতে হলে, সে দেশের জীবনযাত্রা, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণতর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

এই নিবন্ধে পর্তুগালের একটি সংরক্ষণ গৃহ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পর্তুগালে এমন একটি যাদুঘর আছে, যার জুড়ি হয়ত পৃথিবীর আর কোনো দেশেই নেই। সেটি হল পর্তুগালের জাতীয় শকট সংরক্ষণশালা—Musen Nacional dos coches—National coach museum. এই যাদুঘর প্রতিষ্ঠার পেছনে পর্তুগালের রাণী অ্যামিলীর অদম্য ইচ্ছা এবং উৎসাহ ছিল। এর ইতিহাস চমকপ্রদ।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগালের রাজারা ছিলেন ভারী শৌখীন। আর পাঁচটা ঝোঁকের সঙ্গে ভ্রমণের নেশা ছিল তাঁদের প্রচন্ড। রাজকীয় প্রাসাদের বাইরে গিয়েও সেদিন এই বেগবান নেশার ঢেউ লেগেছিল। ভ্রমণ-বিলাস চরিতার্থ করবার জন্য রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণ সে সময় দামী দামী শকট তৈরী করিয়েছিলেন। তাদের কারুকার্য এবং গঠননৈপুণ্য আজও দর্শককে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে। জাতীয় সংরক্ষণশালায় এই সব সংরক্ষিত পুরাতন শকট পর্তুগালের গর্বের জিনিস।

পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে এইসব শকট তৈরী হত। শুধু লিসবনে নয়, বাইরে মাদ্রিদ, রোম, প্যারী ভিয়েনা ইত্যাদি তৎকালীন ইউরোপের শিল্প-চঞ্চল কেন্দ্রসমূহের শ্রেষ্ঠ কারিগরদিগকে ফরমাশ দিয়ে নানা ধরনের কারুকার্যখচিত শকট তৈরী করানো হয়েছিল। অর্থের প্রাচুর্য, ভ্রমণের নেশা এবং রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের চমকপ্রদ সামগ্রী লাভের বাসনা এমন কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য এবং নয়ন-মনোহর জিনিস সৃষ্টি করে গেছে যার জুড়ি পাওয়া ভার। এই সমস্ত শকটের অলঙ্করণ তৎকালীন ইউরোপীয় শিল্প-কলার একটি বিশেষ নিদর্শন।

১৮৮৯ থেকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগালের রাজা ছিলেন ডম কার্লো (Dom Carlos)। তাঁর রাণী অ্যামিলী সুন্দরী শুদ্ধ মনের অধিকারিণী এবং সংস্কৃতি ও রুচিসম্পন্না ছিলেন। রাজ-প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে নিছক নামে রাণী হয়ে থাকা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায়নি। দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনের বিভিন্ন ধারার সামগ্রিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধি কী করে হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর মনোযোগ যথেষ্ট ছিল। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে উপরোক্ত সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর পেছনে রাণী অ্যামিলীর ইচ্ছা এবং ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকলে হয়ত এটা কোনোদিনই সম্ভব হত না।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের যে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, পর্তুগালের উপকূলকেও সে নাড়া না দিয়ে পারেনি। রাজতন্ত্রবাদ সে তরঙ্গাহত হয়ে নতুনের জন্ম দিল দেশে দেশে। সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল আস্তে আস্তে—কোথাও বা পলকে। এমনি একটি মুহূর্তে ডম কার্লো এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র লিসবন শহরের একটি পার্কে একটি [illegible] গাড়িতে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলেন।

অতএব রাণী অ্যামিলীর শকট সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক ভীতি থাকা আশ্চর্য নয়। যে গাড়িতে প্রিয়তম স্বামী এবং জ্যেষ্ঠপুত্র নিহত হলেন, সেই জাতের জিনিসের স্মৃতি তাঁর পক্ষে সুখকর না হওয়ারই কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতির চিন্তা জাতীয়
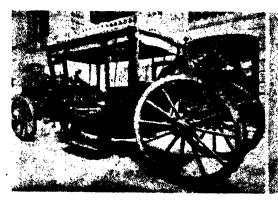
এই শকটে চড়ে রাজা তৃতীয় ফিলিপ ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে লিসবন শহরে প্রবেশ করেন।

মার্কুইস দ্য ফন্টেস যে শকটে চড়ে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে মহামান্য পোপের সঙ্গে দেখা করতে যান, তার কারুকার্য

সংরক্ষণশালার হলঘরের সাধারণ দৃশ্য

সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তিনি বুঝেছিলেন এই ধরনের একটি সংরক্ষণশালা বহির্বিশ্বে পর্তুগালের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। রাণী অ্যামিলী কিছুদিন আগে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন এবং এর পূর্বে প্রায় ৪৩ বৎসর তাঁকে নির্বাসনে কাটাতে হয়েছে।

যে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁর স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর কারণ, যে দেশ তাঁকে নির্বাসিত করেছে, সে দেশেরই একটি শিল্পকলা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সংগে নামাঙ্কিত হয়ে রাণী অ্যামিলী অমর হয়ে রইলেন।

ট্যাগাস নদীর মোহনায় অবস্থিত বেলেম নগরী লিসবন শহরের একটি উপকণ্ঠ; যেমন হাওড়া আর কলকাতা। এক সময় অবশ্য এ দুটি শহর আলাদা ছিল, কিন্তু আজ তাদের মাঝখানের সীমারেখা অবলুপ্ত। এরা দুটি মিলে এখন একটি শহর হয়েছে।

পর্তুগালের রাজাদের প্রাসাদ ছিল বেলেমে। এই রাজপ্রাসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত ইটালীয় স্থপতির কীর্তি। এই অট্টালিকায় পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট বর্তমানে বাস করেন। এটাই তাঁর আধিকারিক (অফিসিয়েল) বাসগৃহ।

উক্ত ইটালীয় স্থপতিকে সে সময় দুটি মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। একটি রাজপ্রাসাদ, আর অন্যটি অশ্বচালন শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় গৃহ (Riding School)। এই বিদ্যালয় গৃহটিতেই জাতীয় শকট সংরক্ষণ-শালা স্থাপিত হয়েছে।

একটি প্রশস্ত হলঘরে একুশটি প্রাচীন স্বর্ণ-খচিত শকট সংরক্ষিত আছে। হলঘরের চাঁদোয়া নানা ধরনের কারুকার্যে সমৃদ্ধ। সমস্ত হলঘরের চারপাশে গ্যালারী। মাত্র ৪৪ নয়া পয়সার সম-পরিমাণ পর্তুগীজ অর্থ খরচ করে দর্শক এই শকটগুলি ঘুরে ঘুরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে পারেন।

কোন কোন শকট এত ভারী যে, তাদের ওজন এক টন বা তারও বেশি হতে পারে। অলংকরণ এবং অঙ্গসজ্জার নাম করে পুরাণ এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত খোদাই করা বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ধরে রাখবার চেষ্টা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরী এ কটি শকটের বিচিত্র অলঙ্করণ

হয়েছে। এদের মান, শিল্পের মাপকাঠিতে, অত্যন্ত উঁচু জাতের সন্দেহ নেই। দেব দেবী, জলপরী, বিভিন্ন রকমের পশু এবং পাখী ইত্যাদি এই সমস্ত ছবির উপজীব্য। কোচোয়ানের বসবার জায়গা স্বর্ণখচিত এবং চারিদিক বিভিন্ন রঙ-এর মখমলে আবৃত। এই সব নয়নাভিরাম অলংকরণ দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

সাধারণত শকটগুলির পেছনের চাকার ব্যাস ছয় ফুটের উপর। সামনের চাকা অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু অধিকতর শক্তি-শালী; কারণ কোচোয়ানের বসবার জায়গা সামনের চাকার ঠিক উপরেই এবং যে সময় এইসব শকট রাস্তায় চলতো, সে সময় পর্তুগালের পথঘাট ভাল ছিল না বলে সামনে জোরাল চাকা ব্যবহার করা হত, যেহেতু সামনের চাকার উপরই চাপ বেশি পড়ত।

এই শকটগুলির মধ্যে যেটি সর্বাধিক প্রাচীন, সেটিতে চড়ে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় ফেলিপ (Felipe) লিসবন শহরে প্রবেশ করেন। রাজা ফেলিপ স্পেন এবং পর্তুগাল উভয় দেশেরই রাজা ছিলেন, কিন্তু ২৩ বৎসর রাজত্বের মধ্যে তিনি একবার মাত্র উক্ত শকটারূঢ় হয়ে পর্তুগালের মাটিতে পদার্পণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত আরও কয়েকটি শকট এই সংরক্ষণ শালায় আছে। তাদের মধ্যে রানী মারিয়া ফ্রান্সিসকার রাজকীয় শকটটি সবচেয়ে সুন্দর এবং হয়ত বা মূল্যবানও। লণ্ডনের রয়েল অ্যাকাডেমী ১৯৫৫-৫৬ সালে বার্লিংটন হাউসে তাঁদের শীতকালীন প্রদর্শনীর যে ব্যবস্থা করেন, তাতে পর্তুগীজ শিল্পকলার একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে রানী ফ্রান্সিসকার শকটটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

যাদুঘরে সংরক্ষিত অধিকাংশ শকট অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত। তখন পর্তুগালের অধিপতি ছিলেন পঞ্চম ডম জোয়াও (Dom Joao V)। তাঁর অভিষেকের সময় যে শকটটি তৈরী করানো হয়েছিল, সম্ভবত সেটিই সবচেয়ে চাকচিক্য-পূর্ণ, যদিও রানী ফ্রান্সিসকার শকটে শিল্প ও চিত্রকলা অধিকতররূপে পরিস্ফুট। ডম জোয়াওর রানী অস্ট্রিয়ার রাজ-পরিবারে সম্ভূতা ছিলেন। তাঁর জন্য তৈরী শকটটিও কম ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং চাকচিক্যপূর্ণ নয়।

হলঘরের শেষ প্রান্তে তিনটি মণিমুক্তা-খচিত বিশেষ ধরনের শকট আছে। তাদের অলংকরণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি রাজা ডম জোয়াও-র বিশেষ নির্দেশে রোমে তৈরী করানো হয়েছিল। এই গাড়ি-গুলিতে চড়ে তৎকালীন রাজদূত মার্কুইস দ্য ফন্টেস্ পর্তুগালের জন্য কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আদায় করতে মহামান্য পোপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এজন্য সে-দেশের অধিবাসীদের কাছে এই তিনটি শকটের স্বকীয় একটি আবেগপূর্ণ মূল্য আছে।

একটি শকট লণ্ডনে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। তৎকালীন লণ্ডনে এই বিশেষ ধরনের শিল্পকলা কোন্ পর্যায়ের ছিল, এর থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

দ্বিতীয় একটি হলঘরে ছোট ছোট অনেক গাড়ি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজ-প্রাসাদের শিশুরা দুই-চাকার যেসব গাড়িতে চড়ে বেড়াতো, সেইগুলি সংরক্ষিত আছে। এদের প্রত্যেকটি শিল্পচাতুর্যের বিশেষ নিদর্শন।

পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে আরও কয়েকটি বিভিন্ন জিনিসের সংগ্রহ-শালা আছে। কিন্তু শকট সংগ্রহশালা যে বৈশিষ্ট্যের দাবি করে, তা হয়ত পৃথিবীর আর কোনও যাদুঘরই করতে পারবে না।

শাঙ্গদেব

ভারতীয় সংগীতে নামকরণ

ভারতের যে সব চারুকলা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে তার মধ্যে সংগীতই বোধহয় সবচেয়ে প্রধান। তুর্কী, মোগলেরা বাইরে থেকে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁরা যখন ভারতীয় হয়ে গেলেন তখন সংগীতও স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের আপনার জিনিস হয়ে গেল। নানাভাবে তাঁরা ভারতীয় সংগীতে তাঁদের ছাপ রেখে গেছেন, গবেষণা করেছেন, নতুন সৃষ্টিতেও ব্রতী হয়েছেন। এ নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করা যেতে পারে যার ফলে এমন অনেক সূত্র পাওয়া যাবে যা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মূল্যবান উপাদান বলে পরিগণিত হবে।

সংগীত সম্বন্ধে সংস্কৃত শাস্ত্রই আমাদের প্রধান অবলম্বন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পণ্ডিতদের সহায়তায় এইসব শাস্ত্রে প্রবেশ করেছিলেন। শাস্ত্রীয় উপপত্তিক বিষয় ছাড়াও সমসাময়িক সংগীতের বহু বিবরণ তাঁরা রেখে গেছেন ফার্সীতে রচিত বিবিধ গ্রন্থে। প্রায় প্রত্যেক প্রধান মুসলমান নরপতির সময়ে সংগীত কী রকম ছিল, কারা বড় গাইয়ে ছিলেন, কী কী গান গাওয়া হত তার কিছু কিছু বিবরণ রক্ষিত হয়েছে। অথচ এসব বই মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় না। বর্তমান ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই সমস্ত পুঁথির সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। সরকারী ব্যবস্থা ছাড়া এসব কাজ হওয়া শক্ত কেননা পুঁথি জোগাড় করা কঠিন ব্যাপার। সরকার দাবী করলে পুঁথি সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সম্পাদনা এবং প্রকাশও বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সরকারের আনুকূল্য না থাকলে এ কাজ অব্যাহত গতিতে চলা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

সংগীত সম্বন্ধীয় ফার্সী বইগুলির প্রধান গুণ বিবরণ বিষয়ে ঐতিহাসিক রীতির অনুসরণ। যেটুকু লিখে রাখা দরকার, তার বেশি তাঁরা বলতে চাননি। আইনে আকবরীর তের-চোদ্দ পাতায় সংগীতের যে বিবরণ রয়েছে তা থেকে সমগ্র মোগলযুগের সংগীতের একটি চমৎকার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। নায়ক বকশু ধ্রুপদ সংগঠকদের অন্যতম। শাজাহান তার সংগৃহীত "হাজার ধ্রুপদে নায়ক বকশু" নামক একটি গ্রন্থে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সে গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না জানি না। ধ্রুপদ বলতে এখন সবাই তানসেনের কথা বলেন, কিন্তু এ বিষয়ে বকশু ছিলেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ লোক। ইনিই ছিলেন রাজা মানের প্রধান সহায়। অথচ তাঁর নাম বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে কেননা উক্ত নায়কের ঘরানা অপর গুণকারের ঘরানার চাপে মারা হয়ে গেছেন। ঔরংজেব সংগীতের সমর্থক ছিলেন না কিন্তু তাঁর আমলে ভারতীয় সংগীতের একটি প্রধান বই রাগদর্পণ লিখিত হয়। এটি মানকুতুহল নামক গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ। এ সময়েই মীর্জা রওশন জমীর সংস্কৃত গ্রন্থ পারিজাতের অনুবাদ করেছিলেন। আরো একখানা বই ছিল "শামসুল আসওয়াত"— এই সময়েই রচিত হয়। তুহফাতুল হিন্দও হবে পরবর্তীকালের রচনা নয়। এই গ্রন্থ থেকে আমাদের বহু কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়। উইলিয়ম জোন্স এই বইটিকে অবলম্বন করেই ভারতীয় সংগীতকে জানতে চেষ্টা করেছিলেন অথচ নির্মমভাবে এর নিন্দাও করেছেন। এই নিন্দা ন্যায়নিষ্ঠাকে অতিক্রম করেছে। উইলার্ড তথ্য সম্বন্ধে এই বই থেকে বারো আনা নিয়েছেন অথচ এক-আধবার এর উল্লেখ করেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর ট্রিটাইজ-এ সংকীর্ণ রাগের যে একটি বিস্তীর্ণ তালিকা আছে (যার থেকে সে যুগের অনেকেই কিছু না কিছু উদ্ধৃত করেছেন) সেটি এই গ্রন্থ থেকেই হুবহু গৃহীত অথচ তার স্বীকৃতি নেই। রাধামোহন সেন তাঁর "সংগীত তরঙ্গ" নামক গ্রন্থে রাগ-রাগিণীর ধ্যানমূর্তি বর্ণনায় যে প্রশংসা অর্জন করেছেন তা তুহফাতুল হিন্দ গ্রন্থের জন্যই সম্ভব হয়েছে। এই বর্ণনায় কেবল কাব্যকলা সৃষ্টি ছাড়া তাঁর কৃতিত্ব কমই আছে কেননা বিষয়বস্তু তাবৎ উক্ত ফার্সী গ্রন্থ থেকে নেওয়া। অথচ তিনি অসঙ্কোচে লিখে গেলেন— "রাগাদির ধ্যান দেখহ পরে। কবি সেন দাস রচনা করে॥" যদিও তিনি এই গ্রন্থের বর্ণনা

দিয়েছেন তথাপি এ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ উল্লেখ নিশ্চয়ই উচিত ছিল। স্থানে স্থানে রাধামোহন পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য হননি। রাধামোহন সঙ্কীর্ণ রাগের যে তালিকা দিয়েছেন তাতেও এই অসম্পূর্ণতা রয়েছে। দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু মিলিয়ে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে বলেই একথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারছি। তুফাতুল্ হিন্দ্ প্রত্যেকটি বর্ণনায় স্বীকার করছেন যে, সেটি রাগমালা থেকে সংগৃহীত।

শাস্ত্র ব্যতিরেকেও রাগ-রাগিনীর নাম-করণ একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। আমাদের অনেক রাগ-রাগিনী মুসলমানদের ভাল লেগেছিল এবং সেই ভাল লাগার নিদর্শন তাঁরা রেখে গেছেন নতুন নাম প্রদান করে। এর ফলে একটা মস্ত অসুবিধা হয়েছে এই যে, মূল রাগের নামটিই গেছে হারিয়ে: কিন্তু রাগসংগীতে তাঁদের চেষ্টাটা কী ভাবের ছিল, তার পরিচয় পাবার পক্ষে যেসব সাক্ষ্যের প্রয়োজন—এই নামকরণ তার অন্যতম।
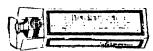
আমীর খস্রু যে-সব নাম দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বেই আমরা করেছি। তাঁর ইমন আজও আমাদের নিত্য-ব্যবহৃত রাগ। তাছাড়া দুটি বৃহৎ রাগ রয়েছে বিলাবল এবং কাফী। বিলাবল শব্দটি মূলত ফার্সী এবং কোনও দেশীয় রাগকে এই নামে ভূষিত করা হয়েছে। বুলবুল শব্দটির বহুবচন "বিলাবিল"। সম্ভবত কোনও রাগের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বুলবুলের কূজনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আরোপ করা হয়েছে। এই শব্দটি বেলাবল, বেলাওল, বেলাবলী প্রভৃতি নানা নামে বর্তমান। কাফী শব্দটি আরবীয়—অর্থ প্রাচুর্য। এই শব্দটি হিন্দী, উর্দুতে সব সময়েই ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত সিন্ধু বা সৈন্ধবীতে আকৃষ্ট হয়ে এই নামকরণ কেউ করে থাকবেন। সিন্ধু-কাফী —নামটিও বহুকাল ধরে চলে আসছে। এই-রকম আর-একটি নাম—কোকব্—অর্থ জাঁকজমক, চাকচিক্য। হিন্দুরা বলেন, কুকুভ বা ককুভ। এটি সম্ভবত বিলাবল পর্যায়ের রাগ। পূর্বে এই রাগ সেতারে প্রচুর বাজানো হত—আজকাল বড় একটা শুনি না। বিলাবলের সঙ্গে "আলাইহে" শব্দটি বিশেষভাবে জড়িত। এটি সম্ভ্রম-সূচক আরবী শব্দ। ফার্সী গ্রন্থাদিতে আমীর খস্রুর নামের সঙ্গে "আলাইহে অল রহমৎ"—এই সম্ভ্রমসূচক শব্দগুলি যুক্ত হতে দেখা যায়। পরবর্তী কালে এই শব্দটি আলহৈয়া, আলাইয়া, আলেয়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। তোড়ী—আর-একটি বড় রাগ। এটি আসলে তূরী অর্থাৎ তুর্কী। চালুক্যরাজ সোমেশ্বর সংস্কৃতে এর পরিচয় দিচ্ছেন—মধ্যমাংশা চ সম্পূর্ণা.নিষাদ ঋষভোৎকটা। গান্ধার দুর্বলা তোড়ী তুরুকী তোড়িকা ভবেৎ। বাহার আর-একটি বড় রাগ। বলা বাহুল্য, বসন্তকালে গেয় বলে মুসলমানরা এই নামকরণ করেছেন। শাহানা নামটিও ফার্সী। এর অর্থ রাজকীয় বা তদনুরূপ সম্ভ্রান্ত। সম্ভবত এটি আদিতে শাহনাই বা সানাইয়ে বাজত। পরে রাগ হিসাবেও প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আইনে আকবরী থেকে জানা যায়, আকবর একটি সুরের নাম দেন সুঘ্রাই। এটি ভারতীয় শব্দ—সুঘ্রাণ বা সুগন্ধ বোঝাবার জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছে। পূর্বে এর নাম ছিল কোড়া বা কুড়ায়িকা। প্রাচীন বাংলায় এ-রাগের বহুল প্রচলন ছিল। সুঘ্রাই কানাড়ার অন্তর্গত। সুহা কানাড়ার নামও যথেষ্ট শোনা যায়। এটিও ভারতীয় শব্দ। কোনও কোনও গ্রন্থ অনুসারে এর নাম শোভা। এইভাবে কয়েকটি নাম পাল্টে গেছে। কোনও কোনও গ্রন্থে মারোয়া নামটিকে মালোয়া বলা হয়েছে। মারু কিন্তু ফার্সী শব্দ। পারসিক সংগীতেও এই নামের একটি স্বর আছে। এছাড়া নাকাড়া জাতীয় একটি বাদ্যও মারু নামে পরিচিত। কীভাবে এটি আমাদের নানা রাগের সংগে যুক্ত হয়েছে, সেটি অনুসন্ধানের বিষয়। "মালুহা" শব্দটি কেদার রাগের সংগে যুক্ত হয়ে একটি প্রকারভেদ সৃষ্টি করেছে। উক্ত শব্দটি ফার্সী, অর্থ সৌন্দর্য। সাবনী মল্লার নামে একটি রাগ শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, এটি শ্রাবণী বা শাওনী মল্লার। কিন্তু, এটি সায়িবান মল্লারও হতে পারে। "সায়িব" শব্দে ঘন মেঘের বর্ষণ বোঝায়। গারা রাগটি আমীর খস্রু প্রবর্তন করেন বলে অনেকের ধারণা, কিন্তু এতে সন্দেহ বর্তমান। "ঘরা" বলে একটা শব্দ আছে, যার অর্থ মহত্ব, ঔজ্জ্বল্য, শ্বেতবর্ণ নানারকম হতে পারে। ভারতীয় কোনো রাগকে এই নামে ভূষিত করা আশ্চর্য নয়। শ্যাম শব্দটি সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। জৌনপুরে শর্কীদের আমলে অনেক রকমের শ্যাম গাওয়া হত। আসলে এটি শাম বা সন্ধ্যাকাল বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হওয়া আশ্চর্য নয়। শাম-কল্যাণ ক্রমে শ্যাম-কল্যাণে পরিণত হওয়া খুবই সম্ভব। এটা কিন্তু বলা উচিত যে, ফার্সী গ্রন্থাদিতে "শিয়াম" অর্থাৎ শ্যাম—এই আখ্যাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমান হেম-কল্যাণও হম্-কল্যাণ (কল্যাণসদৃশ রাগ) থেকে আসতে পারে। অবশ্য হেম-কল্যাণ না হবার সপক্ষেও কোন যুক্তি নেই: কিন্তু মুসলমানরা আমাদের রাগগুলির সমান্তরাল সুর বা নামকরণ করেছেন বলেই সন্দেহের কারণ ঘটে। পূরিয়া শব্দটি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব। পূরি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ। ফার্সীতেও একই অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি মাত্র নামের উল্লেখ করা হল। এছাড়া বিবিধ গীত এবং বাদ্যের প্রসঙ্গ তুললাম না। এই চিত্তাকর্ষক বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান অনেক বিস্তৃত-ভাবে চালানো যায়, কিন্তু, এই অনুসন্ধানে সত্যনিষ্ঠ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। একটি বিশেষ শব্দের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে কোনও মনগড়া সিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দিলে ইতিহাসের প্রতি ঘোরতর অবিচারই করা হবে।

বিদুর

ভেকধারী সিংহ

হিন্দীতে একটি বচন আছে, যার মর্মার্থ হল : "ওরে বোকা, নিজের গাঁয়ে চোর হয়ে বসে আছিস কেন? ভিন্ গাঁয়ে যা, গিয়ে ভেক ধর, লোকে যোগী বলে পুজো করবে।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যে নয়। দেশে যা নিতান্ত এরণ্ড বিদেশে তা মহাদ্রুম এমন আমরা অনেক দেখেছি।

খুশওআন্ত সিং নামক জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক যে একজন মহাপ্রতিভাধর ভারতীয় সাহিত্যিক এ-কথা হয়ত অনেকের জানা নেই। এ আমার এ তোমার দোষ......, দোষ তাঁর নয়। তিনি সেই সব ভাগ্যবান ভারতীয় সাহিত্যিকদের অন্যতম যাঁরা ইংরিজী ভাষায় উপন্যাস লেখেন; তিনি তাঁদের মত উচ্চকুলোদ্ভব যাঁদের বই বৃটেনে এবং আমেরিকায় ছাপা হয়; আর তিনি সেই সম্মানে সম্মানিত যা বিদেশে তাঁকে জনপ্রিয় করেছে, বিদেশে ভারতীয় পুরস্কার পাবার সম্মান। ইদানীং ইনি স্বদেশবাসী; শুনেছি সরকারী কোনো পত্রিকার কর্ণধার।

শ্রীখুশওআন্ত সিং 'ইন্টারন্যাশনাল লিটেরারি অ্যানুয়েল'-এ ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্প্রতি সেই লেখাটি দেখবার সৌভাগ্য হল। ইন্টারন্যাশনাল লিটেরারি অ্যানুয়েল কোনো সরকারী কাগজ নয়, তেলের মাথায় জল ঢালার মতন মামুলি মনস্তুষ্টি করার প্রচার-পত্রিকা নয়। লণ্ডনের নাম করা প্রকাশক এই বার্ষিকী প্রকাশ করেন, বৈচিত্র্য-বহুল এই প্রকাশনার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য, তার চেয়েও বোধ হয় উল্লেখযোগ্য এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক সাহিত্য পরিচয়। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পর্কে, সাহিত্যের নবতম ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কেও মোটামুটি একটি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিভাগটি যে রাখা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য ইংরেজী পাঠকের কাছে এই পরিচয় নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা যারা বোকার মত ছাই ঘেঁটে বেড়াই, এবং সেই প্রবাদে ভরসা রাখি যে, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন, তাদের কপালে মাঝে মাঝে এমন রত্ন কদাচিত জোটে যেমন জুটল খুশওঅন্ত সিংকে আবিষ্কার করে। অন্তত এই প্রবন্ধ পাঠের পর মনে হল, ইনি এক মহারত্ন। বাঙালী পাঠকের কাছে এঁর পরিচয় হওয়া দরকার। ইনি ছাই চাপা পড়ে থাকলে বাঙলা দেশ জানতে পারবে না—রত্নটি ভারতীয় সাহিত্যের কর্মশালায় বাঙলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কোন ফটকের কাছে বসিয়ে রেখেছেন।

শ্রীখুশওআন্ত সিং ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হতে হয়। ভূমিকা হিসেবে প্রাচীন সাহিত্যের—কাব্য সাহিত্যের—মামুলি যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করেই ডম্ মোরেস-এর প্রশংসা করেছেন। মোরেস যে প্রথম ভারতীয় কবি যিনি ইংরেজী কবিতা ঠিক মতন লিখতে পেরেছেন, মোরেস যে কবিতার পুরস্কার পেয়েছেন বিদেশে, এ-সমস্ত যথারীতি উল্লেখের পর লেখক মন্তব্য করেছেন:

"He left his country with no regrets......perhaps because of this renunciation Moraes is able to express the frustrations of Indian youth...."

ভারতীয় কবিতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বার নামোল্লেখ আর ডম্ মোরেসকে নিয়ে দুটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ লেখার যথার্থ কারণ কি হতে পারে আমি জানি না। লেখকের কি এই উদ্দেশ্য ছিল, গত যুগ নয় এ-যুগ নিয়ে আলোচনা করবেন? যদি তাই হবে তবে অন্যান্য বিষয়ে—যেমন ছোট গল্প বা উপন্যাস প্রসঙ্গে—প্রেমচাঁদ বারবার উল্লেখিত কেন? শ্রীখুশওঅন্ত সিং রবীন্দ্রনাথকে যে মোটামুটি ভাবেও নেড়ে চেড়ে দেখেন নি তা বোঝা যায়। পরে। ধরা যায়—মোরেসই তাঁর নাড়িতে তাল মিলেছে। আর ভারতীয় যুব-কবিদের কী লজ্জা শেষ পর্যন্ত তাদের হতাশা ব্যর্থতা ডম্ মোরেসের গলায় ধ্বনিত হল।

কবিতার পর শ্রী সিং ছোট গল্পের প্রসঙ্গ এনেছেন। ছোট গল্পে যে ভারতীয় লেখকদের প্রতিভা সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট—এই সনাতন মতটি স্বীকার করে নিয়ে লেখক প্রেম চাঁদ, মুল্কক রাজ আনন্দ, রাজা রাও এঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রেম চাঁদকে যত সার্থক ছোট গল্প লেখক হিসেবে শ্রী সিং করেছেন, অন্যদের অবশ্য তা করেন নি।

খুবই মজার কথা, শ্রী সিং মন্তব্য করেছেন যে আধুনিক ভারতীয় ছোট গল্প লেখকরা সমার সেট মম-এর দ্বারা প্রভাবিত। তাই কি? একেবারে হালের বাঙালী তরুণ লেখকরা নিশ্চয় মূর্চ্ছা যাবেন, শেষ পর্যন্ত মম্! এমন কি, আমার ধারণা তার আগের যুগের লেখকরাও এ-কথা শুনে নাসিকা কুঞ্চন করবেন। আধুনিক বাঙালী ছোট গল্পের লেখকরা আজ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আর যাই করে থাকুন, মমের সঙ্গে আঁতাত করেন নি। দু একজন, কিছুকাল আগে, মমে মনোনিবেশ করে খুব যে কীর্তি করতে পেরেছেন তাও আমার মনে হয় না। ......কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গ কেন তুলছি। শ্রীখুসওআন্ত সিং বাংলা ছোট গল্প বা ছোট গল্পের লেখকদের সম্পর্কে একটিও কথা বলেন নি, না রবীন্দ্রনাথের না প্রেমেন্দ্র মানিক তারাশঙ্করের। বাংলা ছোট গল্প সম্পর্কে এই নীরবতা নিশ্চয় ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে দিগ্গজের জ্ঞানতুল্য।

আমার ধারণা, ভারতীয় ছোট গল্পের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এ'দের অনুল্লেখ অমার্জনীয়। অমার্জনীয় বলছি এই কারণে যে, প্রেমচাঁদ যেখানে বার বার উল্লেখিত সেখানে এ'রা সহস্রবার উল্লেখের দাবী রাখেন। তা ছাড়া, ভারতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্য যে ছোট গল্পেও বাংলা ভাষার ছোট গল্পের কাছে নিতান্ত নাবালক তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ আজও বাংলা গল্প বিভিন্ন আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষায় সর্বদা অনূদিত হচ্ছে, এমন কি সরাসরি চুরি হয়ে যাচ্ছে। শ্রীখুশওআন্ত সিং কি এটা জানেন না? অথবা জেনেও লজ্জাবশত স্বীকার করতে পারেন নি। ভারতীয় সাহিত্যের ছোট গল্প বিষয়ের আলোচনায় বাংলা গল্পের স্বীকৃতি না থাকায় বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি।

শ্রীখুসওআন্ত সিংয়ের পরবর্তী প্রসঙ্গ উপন্যাস।

"......no Indian language has yet produced a first class novelist or even a good novel."

খুবই উপাদেয় কথা। আমি ভাবছিলাম এই প্রসঙ্গে কেন কমলা মার্কেণ্ডয় বা খাজা আব্বাসের নাম এল না? এলে বিস্মিত হতাম না। একজন আমেরিকার অন্যজন রাশিয়ায় বেশ নাম কুড়িয়েছেন বলে শুনি। অন্তত শ্রীমতী কমলা-র বইয়ের প্রশস্তি আমি স্বচক্ষে পড়েছি।

শ্রী সিং কিন্তু উপন্যাস প্রসঙ্গে বাঙলা ভাষার দরজায় এসেই প্রথমে কড়া নেড়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন প্রথম ভারতীয় ঔপন্যাসিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি স্কটের 'আইভ্যানহো'র দ্বারা উগ্র ভাবে প্রভাবিত হন, এবং উপন্যাস সাহিত্যের প্রবর্তন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে উপন্যাস রচনা করে অধিকতর সাফল্য লাভ করেছেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু না বঙ্কিমচন্দ্র না শরৎচন্দ্র—এমন কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি বহু উপন্যাসের রচয়িতা—তিনিও উপন্যাস-সাহিত্যকে বেশী দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবির কাছে এটা অপ্রত্যাশিত।

"His novels are devoid of plot or characterisation.... He often set out with an ambitious theme like ..Gora, but did not have the stamina to let his story run in full course. Another novel (Binodini) ....was a dismal failure...."

শ্রীখুসওআন্ত সিং 'বিনোদিনী' নামে অনূদিত যে উপন্যাসটি পড়েছেন তার ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলবেন শেষ পর্যন্ত তা স্থির করে উঠতে পারেন নি.

".....nor had he the courage to let his amorous characters consummate their lustful desires."

'চোখের বালি' যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে ভারতীয় অন্য কোন উপন্যাস যে (ষাট বছর আগে লেখা) সার্থক বলে অভিহিত হতে পারে আমি কল্পনা করতে পারি না। শ্রী সিং কি প্রত্যাশা করেছিলেন 'চোখের বালি' কামকেলির কাহিনী হয়ে থাক। যদি সেই প্রত্যাশা করে থাকেন, নিশ্চয় করেছেন খানিকটা, নয়ত সাহসের অভাবের উল্লেখ করতেন না। 'চোখের বালি'তে যে ভারতীয় আধুনিক উপন্যাসের প্রারম্ভ শ্রী সিং তা জানেন না। তিনি আরও জানেন না, অনেক খাদ্য আছে যা চতুষ্পদের, অনেক খাদ্য আছে একান্ত ভাবেই মানুষের। অন্তত রবীন্দ্রনাথ এটা মনে করতেন।

অতঃপর বাঙলা উপন্যাসের কাছ থেকে শিখেপড়ে যে হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের চলন হল শ্রী সিং তা স্বীকার করে প্রেম চাঁদ প্রসঙ্গে চলে গেছেন। প্রেমচাঁদকে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঔপন্যাসিক করতে গিয়ে তাঁর অনুরাগীরা যে কী ভাবে প্রেমচাঁদের সর্বনাশ করেছেন তার বিবরণও দিয়েছেন শ্রী সিং। 'গোদান'-এর ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ হবার পর—প্রেমচাঁদের ঔপন্যাসিক হিসেবে মহান কৃতিত্বের দাবী ধূলিস্মাৎ হয়েছে।

শ্রী সিং-এর ধারণা, ভারতীয়দের মধ্যে উপন্যাস লেখার ক্ষমতা না থাকার অন্যতম কারণ, আমাদের এ-বিষয়ে কোনো ঐতিহ্য নেই। যাঁরা ইংরেজী ভাষায় (ভারতীয়রা) উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের রচনাও দীন, মেজাজের অক্ষমতার জন্যেই বোধ হয়। মুলক রাজ আনন্দর উপন্যাস প্রসঙ্গ আলোচনায় তাঁর অন্যান্য কীর্তির কথা কেন যে বলা হয়েছে এই প্রবন্ধে আমি বুঝতে পারলাম না। অন্যান্য কয়েকজনের নাম আছে যেমন আর কে নারায়ণ এবং রুথ ঝাভালা; উভয়েই ইংরেজীতে উপন্যাস লেখেন। গোবিন্দ দেশানি আর-এক ঔপন্যাসিক যিনি ইংলণ্ডে তাঁর উপন্যাস প্রকাশের পর যথেষ্ট নাম করেছিলেন। এখন তিনি আর কিছু লেখেন না।

ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে এমন জলবৎ জ্ঞান-দান দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আরও বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে, ইংরেজী ভাষায় রচিত অথবা অনূদিত ভারতীয় লেখকদের গ্রন্থকেই শ্রীখুসওআন্ত সিং ভারতীয় সাহিত্য বলে মনে করেছেন। এ-রকম মনে করার কারণ, তাঁর উল্লিখিত সমস্ত বই হয় ইংরিজী ভাষায় রচিত—না হয় অনূদিত। বঙ্কিমচন্দ্রের শরৎচন্দ্রের তিনি যে নামোল্লেখ করেছেন, সম্ভবত এর বেশীর ভাগই কোনো প্রচলিত ধারণা থেকে সংগৃহীত। এ'দের দু একটি গ্রন্থের তর্জমাও তিনি পড়ে থাকতে পারেন। প্রবন্ধটি পড়লেই এই ফাঁকি বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সেই কথা। শ্রী সিং রবীন্দ্রনাথের দু একটি অনূদিত উপন্যাস পড়েছেন, সেই অনুবাদের মধ্যে 'গোরা' এবং 'চোখের বালি' অন্যতম।

এত অল্প বা বলা ভাল অজ্ঞ হাতে নির্বিচারে মাস্টারি করা নিশ্চয় তাঁর উচিত হয় নি। অবশ্য আজকাল এ-রকমই হয়ে থাকে, বেশীর ভাগ দায়িত্ব ভুল করে তেমন লোকদের কাঁধে চাপানো হয়, যারা অযোগ্য। অযোগ্য ব্যক্তিদের দায়-সামলানো কাজে যে ফাঁকি ভুলভ্রান্তি অজ্ঞতা থাকে খুশওআন্ত সিংয়ের লেখায় তা স্পষ্ট ভাবেই আছে।

এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আরও বক্তব্য এই যে, লেখাটি এমন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে যা বিদেশের পাঠকরা পড়বেন। খুশওআন্ত সিংয়ের প্রবন্ধ পড়লে তাঁদের ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণা হবে তা কোনো মতেই উচ্চ নয়, এমন কি মোটামুটি মাঝারিও নয়। আমি অবশ্যই বলব না, বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের ভেঁপু বাজিয়ে প্রচার করা হোক—এমনটি আর হয় না। কিন্তু এ-দাবি নিশ্চয় করব, যথোচিত প্রাপ্য ওর পাওয়া উচিত। আর তা দিতে হলে অনুমান অথবা শোনা কথায় কিংবা যৎসামান্য জ্ঞান সম্বল করে এ-ধরনের লেখার দায়িত্ব নেওয়া উচিত না। খুশওআন্ত সিং তাই নিয়েছেন।

আমার খুবই ইচ্ছে রইল পরবর্তী কোনো সময়ে খুশওআন্ত সিংয়ের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে পাঠকদের এ'র কৃতিত্ব সম্পর্কে অবহিত করব।

বাংলার ব্রতশিল্প

The Ritual Art of the Bratas of Bengal—Sudhansu Kumar Ray. Firma K. L. Mukhopadhyay, 6-A, Bancharam Akrur Lane, Calcutta-12. Rs. 16·00.

বাংলাদেশ বলতে, হয়তো আজো, একটি সুস্নিগ্ধ পল্লীপ্রাণ প্রবণতা বোঝায়। এই পল্লী-পরিধি আজ আর ভৌগোলিক অর্থে আগেকার মতো ব্যাপক না হলেও আমাদের মনোভূমির অন্তস্থ একটি অংশ। কোন্ সুদূর আর্যনিরপেক্ষ সময়সন্ধি থেকে বাংলা ও বাঙালীর প্রাণপ্রকৃতি ঘনিষ্ঠ পরিবেশে নিজেকে ব্যক্ত করেছিল, এ নিয়ে পণ্ডিত-জন যা-ই বলুন, একথা সংগত যে আমরা চিরদিনই নিজেদের চতুষ্পার্শ্বে একটি নিজস্ব নকুশা অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

শ্রীযুত সুধাংশুকুমার রায় তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে আমাদের সেই নিজস্বতা সম্পর্কে অভিনব রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। বঙ্গীয় ব্রত-শিল্পের ভিতরে যে ঐতিহ্য রয়ে গিয়েছে, সেটি তাঁর গভীর পর্যালোচনায় পাঠকের কাছে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে যথার্থ পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ। সর্বপ্রথম তিনিই বাংলার ব্রতের বিহিত আগ্রহগুলি ধরতে পেরেছিলেন। সেই কাজটিকে অঙ্গনাদের জীবন-প্রবণতার দিকে নিবদ্ধ রেখে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীও নিপুণ গবেষণা-কর্ম চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের দুটি শিল্পাশ্রয়ী। শ্রীযুত সুধাংশুকুমার রায় বিদ্বান গবেষক, এবং সেই সঙ্গে রসিকজন। ফলত তাঁর আলোচনায় অবনীন্দ্র-সূচিত কর্ম একটি সম্পন্ন সমাধা পেয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

ব্রতকেন্দ্রিক শিল্প আলপনা, পটচিত্র প্রভৃতি শিল্পাধার ও রীতির মধ্য দিয়ে কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, এবং সেই বিবর্তনের ভিতরে ভিতরে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণচৈতন্য, আকাঙ্ক্ষা ও মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে, সে বিষয়ে এটি একটি অভিজ্ঞান-গ্রন্থ। লেখকের দৃষ্টি দূরব্যাপী। তুলনীয় সূত্রগুলি তিনি সর্বদাই সুষ্ঠুরূপে ব্যবহার করেছেন। (প্রসংগত, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষের ব্রতবিষয়ক গবেষণাটির উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। অধ্যাপক ঘোষের বইটি মুদ্রিত হলে দেখা যাবে, তিনিও তাঁর আলোচনায় অ-বঙ্গীয় সমাজের সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক তুলনাসূত্র অবতারণা করেছেন।) শ্রীসুধাংশুকুমার রায় যেমন শিল্পমূল্য সম্পর্কে সজাগ, তেমনি তত্ত্বনির্ধারণে অক্লান্ত। তাঁর বইটি পড়লে আমাদের লুপ্ত রত্নগুলির বিষয়ে বোধোদয় হবে, গর্ব জাগ্রত হবে। জাতীয় ঐতিহ্যকে বৃহত্তর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন ব'লে তাঁর এই বহুমূল্য গবেষণা একটি সংস্কারমুক্ত ঐতিহাসিক বিবরণীর মর্যাদা পেয়েছে।

বইখানিতে অসংখ্য সুন্দর চিত্রপট যা প্লেট সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি চিত্রই লেখকের ভাষ্যে তথ্যময় এবং উদ্দীপক। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়কে আমরা এরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অভিনন্দিত করি।

(৫৩২।৬১)

উপন্যাস

রূপং দেহি ধনং দেহি—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থপ্রকাশ: ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম: তিন টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

জমিদারী আমল ও তার ক্ষয়িষ্ণু রূপের ভূমিকায় সমাজের যে পটপরিবর্তন ঘটেছে, তার আলেখ্য উপন্যাসটিতে রূপায়িত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় কুশলী চরিত্রাঙ্কনে। জমিদার চৌধুরাম মুখার্জি ধন ও রূপ—উভয়ই নিজ বাহুবলে অর্জন করেছিলেন। নারীমোহরূপ ব্যাধিটি বংশানুক্রমে গিয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র, উপন্যাসের নায়ক রামকানাই-এর চরিত্রে। তারই জন্য কাঞ্চনকে আত্মা ত্যাগ করতে হল, আর বৈমাত্রেয় ভাই-এর ছেলে, অর্থাৎ রামরতনের পুত্র ইঞ্জিনীয়ার সত্যপ্রিয়কে প্রায় জীবন দিতে হয়েছিল। নায়কের শ্যালক শিবচৈতন্য অত্যন্ত ভালো মানুষ। কিন্তু সেই মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে সে সত্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে। তাই আপন ভগ্নীপতির কারাবাসের জন্য তাকে দায়ী করা হলেও ন্যায়ধর্মের কাছে সে নীচ নয় এবং ঐ কারণে সে নিন্দিত নয়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মানবিক ধর্মের সামগ্রিক দিকের পরিচয় এই উপন্যাসে দিয়েছেন।

৬৯।৬২

মিস বোসের কাহিনী—বাণী রায়। গ্রন্থম্, ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—তিন টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীমতী বাণী রায় একটি বিশিষ্ট নাম। আলোচ্য উপন্যাসে তাঁর সেই অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর আবার নতুন করে পাওয়া গেল। যন্ত্রণাযুগের ঘূর্ণাবর্তে মানুষের মন যে কত দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়ী এবং সেই জটিল জাল থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে যে তার কত ব্যাকুলতা, লেখিকা সুনিপুণ কলাকৌশলে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। নীড় বাঁধবার ঘনীভূত আকাঙ্ক্ষা ছিল উচ্চশিক্ষিতা অধ্যাপিকা মিস বোসের মনে। শ্রেষ্ঠ নেতার ক্ষণিক ভালবাসার যে উষ্ণ স্পর্শ তিনি অনুভব করেছিলেন, তা স্থায়ী হল না। শিল্পীকে বিবাহ করলেন তিনি। কিন্তু প্রতারণা ও অপমানের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ভবঘুরেকে আশ্রয় করলেন। কিন্তু যে ব্যর্থ প্রণয় ও হতাশ্বাস ভবঘুরেকে পথে টেনে এনেছিল মিস বোসের পান্থশালায়, তা ক্ষণকালের বিদ্যুৎচমক তুলে মৃত্যু-মেঘের মধ্যে সে গেল মিলিয়ে। মিস বোস গৃহশিক্ষিকার চাকুরি নিয়ে ছুটলেন দেওঘরে, বিলিতী ডিগ্রীকে সম্বল করে। সেখানেও বিধি-বিড়ম্বিত জীবনের আর-এক অঙ্ক অভিনীত হল। মনিবের গৃহ পরিত্যাগ করলেন অপযশের সার্টিফিকেট নিয়ে। প্রত্যাশিত লগ্ন এলো না মিস বোসের জীবনে। বিগতযৌবনা মিস বোস কক্ষচ্যুতা সহায়-সম্বলহীনা অবস্থায় এসে পৌঁছলেন আনন্দ চৌধুরীর আশ্রয়ে। সেখানে প্রায় সমবয়সী প্রৌঢ়ের সাহচর্যে ও সহানুভূতিতে তিনি জীবন-সত্যের পুঁজি ফুরোবার পূর্ব মুহূর্তে ফিরে পেলেন আশ্রয়, জীবন-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে শান্তিলাভ করলেন সহানুভূতির তীরভূমিতে। মিস বোস বিশিষ্ট টাইপ চরিত্র হলেও, তার মধ্যে মানবাত্মার স্পন্দনধ্বনি স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। মিস বোসের সমস্যা আজকের জগতে তাঁর একার নয়, এ-সমস্যা সকল স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্টা উচ্চশিক্ষিতা নারীরই। ভালবাসাহীন, বন্ধনহীন জীবন যে নারীর পক্ষে দুর্বিষহ, এই ভাব এ-বাঙ্গনা মিস বোসের মধ্যে যেন নতুন করে মূর্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির পার্শ্বচরিত্রের মৌলিকতা বিন্দুমাত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং প্রতিবেশ-বর্ণনা ও চারিত্রিক বিশ্লেষণের তির্যক দৃষ্টিপাতে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কার্যকারণ সূত্র সহ নিগূঢ় মনস্তত্ত্বও এই উপন্যাসের অন্যতম প্রাণশক্তি।

২৪।৬২

পকেটমার—ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল। বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দামঃ টাকা ৪·৫০ নঃ পঃ।

ডক্টর ঘোষালের বিশেষ খ্যাতি 'অপরাধ বিজ্ঞান' রচনায়। 'পকেটমার' গ্রন্থে আধা-প্রেমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে শ্রীযুত ঘোষাল দেখিয়েছেন, পকেটমারদের বিভিন্ন পদ্ধতি, কলাকৌশল, তাদের সামাজিক পরিবেশ। প্রণয়-কাহিনীটি গড়ে উঠেছে একজন শিক্ষিত পুলিস অফিসারের সংগে ধীরাজবাবুর মেয়ের। ধীরাজবাবুই পকেটমার হয়। সেই সূত্রে অনুসন্ধান-পর্বে ধীরাজবাবুর মেয়ের সংগে তার পরিচয় হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিবাহ হয়নি। এবং তা হলে হয়তো ঐ ঘটনাই প্রাধান্য লাভ করতো। বরং দশ হাজার টাকা উদ্ধার হওয়ার পর ধীরাজবাবু পুলি-

ব্যবস্থিত স্থানেই মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু ঐ দশ হাজার টাকা উদ্ধার করার জন্য প্রণবকে কম মেহনত করতে হয়নি। এই উদ্ধার-পর্বেই নীচকুলশীলা সিনেমা অভিনেত্রী চামেলীর আসল রূপ দর্শনের সুযোগ ঘটে। কিন্তু পকেটমারের স্ত্রী হলেও আমিনার মধ্যে নারীত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা আমাদের মুগ্ধ করে। তবু ডক্টর ঘোষাল এটা প্রতিপাদ্য করেছেন যে, পকেটমারদের জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তি ক্ষণিকমাত্র। তাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। এবং নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করে। অবশ্য এসবের মূলে কারণ হয়তো অপরাধপ্রবণতা।

শ্রীঘোষালের কাহিনী মাঝে-মাঝে পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয়েছে। এটা ঠিক যে, পুলিস পক্ষকে নিন্দা করলে তাদের নীতিবোধ ভেঙে পড়তে পারে, কিন্তু তাদের ত্রুটিও সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরলে কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে। যারা 'পকেটমার' হয়, তারা কেন [illegible] হয়, এ-প্রশ্নেরও যথাযোগ্য উত্তর [illegible] শ্রীঘোষালের মতো বিশেষজ্ঞ [illegible] আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়।

৬।৬২

অবস্থার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের দেশাত্মবোধক মনোবৃত্তির সঙ্গে তাঁর রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশের সম্বন্ধ স্থাপনা। তার বিবরণী এক দিক থেকে সাংবাদিকও বটে; কেননা, বাংলাদেশের অগ্রণী নাট্যকার বা নাট্যসম্পৃক্ত ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর নানান্ মূল্যবান সমীক্ষা আমাদের উপহার দিয়েছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী সম্বন্ধে তিনি আমাদের যে-সব সংবাদ জ্ঞাপন করেছেন, প্রসঙ্গত তার উল্লেখ অনিবার্য।

আমরা এই গ্রন্থের বহুল সমাদর কামনা করি। (৬০৩।৬১)

কিশোর গ্রন্থ : নাটক ও গল্প

পিকনিক—[illegible]।

সকাল দুপুর সন্ধ্যা—[illegible] চৌধুরী। [illegible] প্রকাশনী [illegible] এক [illegible]।

[illegible]

টাকার গাছ—শ্রীলীনা দত্ত গুপ্ত। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এক টাকা আট আনা।

ছোটদের জন্য এই নাটকখানি

প্রবন্ধ

সাহিত্য চিন্তা—[illegible]। শান্তি লাইব্রেরী [illegible] কলকাতা—৯। তিন টাকা।

অধ্যাপক [illegible] মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সাহিত্যপাঠে ব্যাপৃত আছেন। সেই পাঠের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] বলে তাঁর [illegible] আকর্ষণীয় বোধ হয়। তাঁর কথা বলবার ধরনটি সহজ সুন্দর। কোনো কথা [illegible] কঠিন করে বলা তাঁর অভিপ্রায় নয়। সহজ [illegible] রসান্বিত করা [illegible], তিনি সে বিষয়ে তীব্ররূপে সচেতন থাকেন।

সাহিত্য পাঠের প্রণালী ও প্রয়োগবিধি সম্পর্কে তাঁর [illegible] 'সাহিত্য চিন্তা' গ্রন্থে প্রচুরভাবে বিদ্যমান। সাহিত্যের নানা শাখার গতি-প্রকৃতি, [illegible] ও নানা [illegible] সমন্বয় তাঁর বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে, সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি ও উপদেশগুলি ভেবে দেখবার মতো। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এখন [illegible] আর সমালোচনা বলতে আমরা আপ্তবাক্য সংগ্রহ বুঝে থাকি?

৬৫৪।৬১

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ—শ্রীবিনয় চৌধুরী। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দুই টাকা।

শ্রীযুত চৌধুরী তাঁর মিতায়তন গ্রন্থে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অতীত ও বর্তমান

লিখেছেন। স্বল্প সময়ের অভিনয়ের পক্ষে বেশ উপযোগী এই নাটকে বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দিতই হবে। মোটামুটি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটকের বীজ ক্রমশ উপ্ত হয়েছে।

শ্রীচৌধুরীর 'সকাল দুপুর সন্ধ্যা' শিশু ও কিশোরদের নাটক। যাদের উদ্দেশ্য করে তিনি এই নাটক লিখেছেন তাদের প্রয়োজন মিটলেই নাট্যকারের প্রয়াস সার্থক হবে। সাধারণভাবে বেশ সহজভাবেই নাটকের কাহিনী দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছে—তবে, সংলাপ কোথাও কোথাও কিছু হ্রস্ব হলে ভাল হত।

শ্রীযুক্ত নিখিল সুরের 'নতুন ডাক' একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস।

লীনা দত্ত গুপ্তার 'টাকার গাছ' কয়েকটি গল্পের সংকলন। তবু গল্পগুলির মধ্যে মোটামুটি একটা ঐক্যের সূত্র আছে। তা হলে অল্প বয়সের স্বচ্ছ ছেলেমানুষি। যাদের জন্যে এ বই রচিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে তাদের ভাল লাগবে। বিশেষ করে চলার পথে, সাবধানী ঘন্টেশ্বর, কাপালিক ও হাঁচি গল্পগুলো গোল হয়ে বসে বারবার পড়বার মত। ২৫২।৬০, ৪০৪।৬০, ৬৪৭।৬১

বিবিধ

ঘরে চলো। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রকাশক—স্বামী অপর্ণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির, আলমোড়া। মূল্য ৪·৫০।

সরল ভাষায় এমন তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ খুব অল্পই লেখা হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি স্তর, এবং প্রত্যেকটি রহস্য লইয়া বিস্ময় লইয়া এখানে আলোচিত হইয়াছে। অনেক সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই সকল চিন্তা আমাদের অত্যন্ত বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এখানে অধ্যাত্ম জীবনে যে সকল বাকা আপনার রহস্য লইয়া দেখা দেয়, তাহার সরল সহজ বোধগম্য ব্যাখ্যা দেখা যায়।

সাধারণ জীবনের জন্য এগ্রন্থ অমূল্য।

৭১।৬২

ধর্ম ও অনুভূতি (২য় ভাগ)। কুড়িয়ে পাওয়া মানিক। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পারিশার্স প্রাইভেট লিঃ। মূল্য ৩্।

পুস্তকের টাইটেল পেজেই বইখানির সারমর্ম উল্লিখিত আছে। ঠাকুরের 'কথামৃতের যৌগিক রূপ'।

এরূপ প্রয়াস আমাদের দেশে হইয়া থাকিলেও এইভাবে হয় নাই। এখানে ঠাকুরের প্রায় কথার ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি ভাবার্থ এত মনোজ্ঞ হইয়াছে যে, লেখকের সূক্ষ্মতা বোধের চেষ্টার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

১৩০।৬২

নমি নরদেবতারে—শ্রীঅতুলচন্দ্র মেইকাপ। সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ১৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—২্ টাকা।

কবি উপর্যুক্ত গ্রন্থে কোনো চিরন্তন কাব্য রচনা করেননি। যেসব পুরুষ ও মহাপুরুষ এবং মহীয়সী রমণী কর্মে অমরত্ব লাভ করেছেন, শ্রীমেইকাপ তাদের মহাজীবনের ভাষাচিত্র অংকন করেছেন। কবিতাগুলি মনীষীমঙ্গল জাতীয় হলেও লেখকের শ্রদ্ধার গুণে কবিতাগুলি সাধারণ পাঠকের ভাল লাগবে। অবশ্য মার্জিত বুদ্ধি, মন ও মনন খুঁজতে গেলে পাঠককে নিরাশ হতে হবে। কবিতাগুলির আঙ্গিক কেন আধুনিক নয়—ভূমিকায় তার উল্লেখ থাকলেও, সে জবাবদিহি যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। ৯।৬১

প্রাপ্তি-স্বীকার

বৈষ্ণব সাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী।

জল ভরা মেঘ—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমৃতের আস্বাদ—পরাশর।

বাঁকা ও রাকা—পরাশর।

বিনয়না—সুশীল রায়।

আলাদা থেকে মালাবার—দীপক চৌধুরী।

রাতের অসুর—সুভাষ সরকার।

মানুষের মন ও শিক্ষা-প্রসঙ্গ—বিভুরঞ্জন গুহ।

পৌষ-ফাল্গুনের পালা—বিভুরঞ্জন গুহ ও সুনন্দা গুহ।

চন্দ্রশেখর

চিত্রকাব্যে জীবনের মিছিল

"হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" (জালান প্রোডাকশন্স) চিত্রপরিচালক তপন সিংহের সর্বাধুনিক ছবি এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়। ভারতে তৈরী সর্বোত্তম ছায়াছবিগুলির পংক্তিভুক্ত। স্বদেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং বিদেশে বিপুল সমাদর পাবার মতই একটি অনন্যসুন্দর চিত্রসৃষ্টি "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ সাহিত্যকীর্তি এই ছবিতে এক অসামান্য শিল্পকর্মে পরিণত। হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের জীবনভাবনা ও জীবনযাপন এবং তাদের সংস্কার ও সংগ্রাম নিয়ে রচিত তারাশঙ্করের এই অপূর্ব কাহিনী।

পুঁথির পাতায় হাঁসুলীবাঁকের বিচিত্র মানুষদের উপকথা ছোটখাটো ঘটনার উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে রসের প্রবাহে বয়ে চলেছে। ছবিতে অপরূপ রূপের বাঁধ তৈরী করে রসের প্রবাহটিকে যেন বেঁধে দিয়েছেন রূপকার তপন সিংহ। ক্ষণে ক্ষণে বাঁধের উপর দিয়ে যেন উপচে পড়ছে রস, ফলে ছবিতে রূপ ও রসের একটি মধুর চিত্রকাব্য গড়ে উঠেছে। এই চিত্রকাব্য শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন। নিরুচ্ছ্বাস গীতিময়তায় আলিপ্ত। নিরলঙ্কার সৌন্দর্যে পল্লবিত।

চিত্রপটে হাঁসুলীবাঁকের একটি ছবি এঁকেছেন রূপকার। হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবনের জমাট-বাঁধা অন্ধকার, কোপাই নদী এবং বাঁশবাদির মাঠ, প্রান্তর ও কাশফুল নিয়ে আঁকা এই ছবি। হাঁসুলীবাঁকের উপকথার মানুষরা এই মনোরম পটভূমিতে যেন এসে মিছিল করে দাঁড়িয়েছে। তারা এসেছে তাদের জীবনবাসনা নিয়ে। বেদনায় কখনও তারা ভেঙে পড়ছে, বিভ্রমে কখনও দিশেহারা হচ্ছে। বাঁশবনের অন্ধকারে তাদের প্রাণের গোপন কামনাগুলো যেন কিলবিল করে ওঠে। বনওয়ারী হাঁসুলীবাঁকের মাটি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চায়। বাঁশবনের রহস্যময় শিস তার কাছে দেবতার শাসন। করালীকে হাতছানি দিয়ে ডাকে চন্দনপুর। ঘুনধরা যা কিছু পুরনো তার সব কিছুই ভেঙে দিতে চায় সে। পাখির ভরাযৌবন বাধা মানে না, শাসন মানে না। যার কাছে তার মন পড়ে আছে, অভিসারিকা হয়ে ছুটে চলে তার কাছে। নসুবালা তার গানের সুরে ও নাচের তালে

সত্যজিৎ সকাশে পার্ল বাক : সুপ্রসিদ্ধা মহিলা ঔপন্যাসিক পার্ল বাক সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। ভারতীয় পটভূমিতে একটি ছবি তোলার ব্যাপারে তিনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফটো : সুকুমার রায়।

হাঁসুলীবাঁকের প্রাণের ছন্দটি যেন ফুটিয়ে তোলে। কালোবউ বাঁশবনের অন্ধকারে পা টিপে টিপে আসে পরপুরুষের সম্ভোগের আশায়। সুচাঁদ বুড়ী হাঁসুলীবাঁকের উত্থানপতনের সাক্ষী। অতীত ও বর্তমানের সেতু।

ওরা এবং আরও অনেককে নিয়েই হাঁসুলীবাঁকের উপকথাটি গড়ে তুলেছেন চিত্রনাট্যকার-পরিচালক তপন সিংহ। একটি গোষ্ঠীজীবনকে বহু বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে তিনি উপস্থিত করেছেন তাঁর চিত্রনাট্যে। এই গোষ্ঠীজীবনে প্রত্যেকটি পুরুষ এক অবিচ্ছিন্ন জীবননাট্যের নায়ক, প্রত্যেক নারী এই নাটকের নায়িকা। নাটক এই ছবিতে বিকেন্দ্রীকৃত। একটি গোষ্ঠীজীবনের অভিলাষ ও অভীপ্সা, অবক্ষয় ও উত্তরণের পথের বাঁকে বাঁকে নাটক গড়ে উঠেছে—সহজে ও স্বচ্ছন্দে। নাটক এই ছবিতে শুধু জীবনের ভাবকল্প।

নাট্যবস্তুর বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রয়াস তপন সিংহের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় সফল ও সার্থক হয়ে উঠেছে। এই পরীক্ষামূলক চিত্রনাট্যে তিনি প্রামাণিকতা ও প্রাণধর্মের একটি অনবদ্য মুক্তবেণী রচনা করেছেন। এবং সেই সঙ্গে ছবিতে তারাশঙ্করের মূলকাহিনীর মৃত্তিকাশ্রয়ী পরিমণ্ডল ও পরিবেশটি রসমধুর করে তুলেছেন।

ছবিতে তাঁর প্রয়োগকর্ম রসসিদ্ধ। নিপুণ শিল্পীর মত তিনি কাহিনীর বহিরঙ্গ রূপ ও অন্তরঙ্গ রসটি নানা বর্ণে ও ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সভাজগতে

থেকে বিচ্ছিন্ন যারা এবং আদিম যুগের অন্ধকারে যাদের বাস, তাদের সমষ্টি জীবনে দ্বন্দ্ব ও আলোড়ন নিয়ে এল নতুন কালের যন্ত্রযুগ। ওরা চিরকাল আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়তে দেখেছে। একদিন বিকট আওয়াজে উড়ে এল সারি সারি যুদ্ধ বিমান। হাঁসুলীবাঁকের জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আকাশের গায়ে পাখি ও বিমানের একটি সুন্দর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। মুগ্ধ ও বিস্মিত হবার মত এমন অনেক আশ্চর্যসুন্দর ভাবব্যঞ্জনার দৃশ্য ছড়িয়ে রয়েছে ছবিটিতে। অপলক দৃষ্টি ও উৎকর্ণ শ্রুতি নিয়ে প্রতি মুহূর্তে অভিভূত হয়ে দেখার মত এই ছবি।

ছবির উপেক্ষণীয় ছোটখাটো ত্রুটির মধ্যে বনওয়ারীর আহত অবস্থায় পড়ে থাকার ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঘটনা আরেকটু সংক্ষিপ্ত হতে পারত। তবে তার মৃত্যুর দৃশ্যটি অপূর্ব কল্পনা-শক্তির পরিচয় দেয়। এই মুহূর্তে দূরে থেকে শিস-এর শব্দ ভেসে আসার ব্যঞ্জনাটি অতুলনীয়। সুচাঁদের কথার সংগে সংগেই ছবি শেষ হলে ভালো হোত কিনা এ-নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে ছবির শেষ দৃশ্য ক'টি—বিশেষ করে হাঁসুলীবাঁকের নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠার সময় বহুজনকর্মরত দিগন্তবিস্তারী দৃশ্যটি—বাংলা ছবিতে তুলনারহিত। অতুলনীয় এমন দৃশ্য ছবিতে আরও অনেক রয়েছে। এর মধ্যে নবদম্পতিকে নিয়ে পাল্কী চলার দৃশ্যটি একটি। ছবির সর্বাংগীন শিল্পনিষ্ঠার মধ্যে ট্রেনের কামরার সামনে পাগলের গান গেয়ে ভিক্ষা করার দৃশ্যটি একটু কৃত্রিমতার আভাস নিয়ে আসে।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথাকে প্রাণময় করে তুলেছেন ছবির শিল্পীরা। সব প্রধান শিল্পীই তাঁদের নিজস্ব চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এ'দের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (বনওয়ারী)। তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। করালীর চরিত্রটি দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন দিলীপ রায়। চরিত্রের বৈপ্লবিক প্রেরণাটি তাঁর অভিনয়ে সুন্দরভাবে বিধৃত।

নিভাননীর সুচাঁদ শুধু এ-ছবিরই নয়, বাংলা ছবির পটে একটি স্মরণীয় চরিত্র-সৃষ্টির নজির হয়ে থাকবে। উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে এই চরিত্রটি যেন ছবির পর্দায় উঠে এসেছে।

রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় পাখির প্রাণোচ্ছল চরিত্র, বিদ্রোহী মন ও প্রেমাভিলাষটি নৈপুণ্যে ও আন্তরিকতার সংগে বিশ্বাসযোগ্য ও মরমী করে তুলেছেন। নসুবালার রূপ-সজ্জায় লিলি চক্রবর্তী চরিত্রটির প্রাণচাঞ্চল্য ও মাধুর্য স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর অভিনয় ও অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেছেন। অনুভা গুপ্তার কালোবউ কিছুটা উন্নাসিকতার স্পর্শদুষ্ট হলেও এই চরিত্রচিত্রনে শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-কুশলতার পরিচয় মেলে।

পানার চরিত্রে রবি ঘোষের অভিনয় অনবদ্য। বীরেশ্বর সেন বাবু মশায়ের চরিত্রের একটি কৌতুকপ্রদ ও সহজগ্রাহ্য বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অভিনয়-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরাণ), প্রশান্তকুমার (পাগল) ও চন্দন রায় (মাতলা)। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন কেষ্টদাস, রথীন ঘোষ, রসরাজ চক্রবর্তী, দেবী নিয়োগী, সুখেন দাস প্রভৃতি।

সংগীতের মাধুর্য ছবির অন্যতম প্রধান সম্পদ। "ক্ষণিকের অতিথি"র পর তপন সিংহের এই ছবিতে সংগীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আবার নতুন করে রসবোধের পরিচয় দিলেন। তাঁর রচিত আবহ-সুর ছবির বিভিন্ন দৃশ্যের ভাবরূপটি সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছে এবং মূল আবহ-সংগীত হাঁসুলীবাঁকের জীবনের দুর্দম আবেগ ও প্রাণোচ্ছলতার আভাস দিয়েছে। ছবির গানের সুরারূপে সুশ্রাব্য যদিও একাধিক গানে অতুলপ্রসাদের জনপ্রিয় গানের সুরের প্রভাব সুস্পষ্ট। সুরেকার দরদভরা কণ্ঠে ছবির কয়েকটি গান গেয়েছেন। বেলা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "কে বিদেশী" ও অমর পালের গাওয়া "সাধুজনের একি লীলে" উপস্থাপনের গুণে

এল সি প্রোডাকসনের নির্মীয়মান ছবি "শুভ দৃষ্টি"র একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়।

আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে।

বিমল মুখোপাধ্যায় ছবির আলোকচিত্রগ্রহণে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন, বাংলা ছবিতে তার তুলনা বিরল। তাঁর ক্যামেরা ছবিটিকে বহিরঙ্গ রূপবৈভবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, আলো-আঁধারির রূপমায়া সৃষ্টিতে অসাধ্য সাধন করেছে।

কলাকৌশলের অন্যান্য কাজে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা পাবার মত কাজ দেখিয়েছেন শিল্পনির্দেশক সুনীতি মিত্র। শিল্পনির্দেশের নিখুঁত কাজে তিনি অন্তর্দৃশ্য ও বহির্দৃশ্যের পার্থক্যটি দর্শকদের বুঝতে দেননি। সুবোধ রায়ের প্রশংসনীয় সম্পাদনায় ছবিটি গতি পেয়েছে, কয়েকটি ঘটনাবহুল দৃশ্য চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। শব্দগ্রহণ (অতুল চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ, মৃণাল গুহঠাকুরতা ও শচীন চক্রবর্তী) সুষ্ঠু। রূপসজ্জার জন্য মদন পাঠক প্রশংসার অধিকারী।

বাংলা ছবিতে রুচিবিকার

সেন্সর বোর্ড নামক একটি সংস্থার অস্তিত্ব আমরা জানি, জনসাধারণ জানেন। এই সংস্থাকে দেশী অথবা বিদেশী কোন কোন ছবির ওপর অকারণে রুষ্ট হতে দেখি। আবার অকারণে প্রসন্নও বুঝি হন তাঁরা মাঝে মাঝে। তা না হলে অগ্রগামীর সর্বাধুনিক ছবি "কায়া"-য় (ডিলাক্স নিবেদিত) অসুস্থ ও বিকৃত রুচির এত সব দৃশ্য স্থান পেল কি করে? সেন্সরকর্তারা ছবির কতক দৃশ্য যে কেটে দিয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে তাদের সার্টিফিকেটে। কিন্তু কতটুকুই বা কাটলেন তাঁরা। ছবিতে আরও যে-সব দৃশ্য রয়েছে সেগুলি রুচিবান দর্শকদের পীড়া দেয়। অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে এ-সব দৃশ্য বিষতুল্য। বিদেশী এবং হিন্দী চিত্রের অশালীন ও অভব্য যৌন-উপাদানের উচ্ছিষ্টে এ-ছবি ভরপুর।

অথচ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর চিত্ররূপে এই অশালীনতা সহজেই পরিহার করা যেত। কাহিনীতে বারবণিতা আছে। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে বারবধূদের পরিবেশ। এ জন্যই কি জঘন্য যৌন-উপকরণের অবাধ আমদানীর সুযোগ মিলে গেল? যৌনবোধের স্থান জীবনে রয়েছে ঠিকই। সাহিত্যেও যৌনরসের স্থান আছে। কিন্তু জীবনবাসনায় যৌনরস অথবা যৌনবোধ যখন অপরিহার্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দেখা দেয় তখনই শিল্পের সৃষ্টি হয়। আলোচ্য ছবিতে এই শিল্পচেতনার আভাস নেই। রয়েছে শুধু অসুস্থ ও বিকৃত মনকে উত্তেজিত করে টিকিট ঘরের আনুকূল্য লাভের প্রয়াস। এবং সেই সঙ্গে অপরিণত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর যথেচ্ছাচার।

ছবির এই বিষময় দিকটি বাদ দিলে আর যা রয়েছে তার মধ্যে রসের উপকরণ কিছুটা মেলে। কিন্তু এই রস "মেলোড্রামা"র আতিশয্যে জালিত।

সত্যজিৎ রায়ের ইস্টম্যান রঙে তোলা ছবি "কাঞ্চনজঙ্ঘা"-র নায়ক-নায়িকা অরুণ মুখোপাধ্যায় ও অলকানন্দা রায়।

অন্ধকারের একটি জীবন—ছবির নায়ক জন যার অবয়ব—আলোর সন্ধান পেল। কিন্তু অন্ধকারের আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যায় বারনারী রোশনীর কাছে। লনার পবিত্র ভালোবাসা সে ভুলে যায়। অবশ্য আত্মবিস্মৃতির নিদারুণ মূল্য তাকে দিতে হয়। দুর্বৃত্তের আক্রমণে তাকে অন্ধ হতে হয়। আদর্শবাদের চরম মূল্য দেন আরও একজন। তিনি ফাদার সত্যপ্রিয়। জনের রূপান্তর চেয়েছিলেন তিনি। দুর্বৃত্তের হাতে তাঁকেও প্রাণ দিতে হয়।

ছবির কাহিনী-বিন্যাসে প্রযোজক-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার গোষ্ঠী ছবির কতক দৃশ্যে সুন্দর রসবোধ, কল্পনাশক্তি ও পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যঞ্জনা-ধর্মী প্রয়োগকর্মেও তাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন। ফ্ল্যাশব্যাক উপস্থাপনে তাঁদের কৃতিত্বও এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেলোড্রামার আকর্ষণ তাঁরা ছাড়তে পারেননি। লনাকে তাঁরা মিলিয়ে দিলেন জনের সঙ্গে। আর যে লনা তার প্রেমাস্পদের অন্ধ হয়ে পথে পথে অসহায়ভাবে ভিক্ষে করার সংবাদেও অবিচলিত—যে সন্ন্যাসিনী হবে—সে জনকে চোখে দেখবার পর আর স্থির থাকতে পারল না! একটি শিশুর মাটিতে পড়ে যাওয়ার যে ঘটনাটি লনার সন্ন্যাসের সংকল্প ত্যাগের সহায় হল, সে ঘটনাটিও মামুলী। লনার পরিবর্তনটিও অযৌক্তিক। এবং তাদের মিলন অতিনাটকীয়।

পথে পথে ভিক্ষে করার সময় অন্ধ-নায়কের "হেলপ মি" "হেলপ মি" সংলাপ হাস্যাস্পদ। হাসির উদ্রেক করে বিপদের মুখে পড়ে জন ও ফাদারের ইংরেজী সংলাপ।

উত্তমকুমার ছবির নায়ক-চরিত্রে চিত্রনাট্যের দাবী সুন্দরভাবে মিটিয়েছেন। চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর অভিনয়ে সুপরিস্ফুট। লনার রূপসজ্জায় নবাগতা নন্দিতা বসুর অভিনয় শান্ত, স্বচ্ছন্দ ও চরিত্রোপযোগী।

রোশনীর ভূমিকায় সুলতা চৌধুরীর অভিনয় বাস্তবানুগ। নায়িকার পিশিমার চরিত্রে শোভা সেনের নির্বাক অভিব্যক্তি বাঙ্ময়।

ফাদার সত্যপ্রিয়র চরিত্রে রাধামোহন ভট্টাচার্যের অভিনয় প্রশংসনীয়। নায়কের বন্ধুর চরিত্রে সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন শ্যামল ঘোষাল। অন্যান্যদের মধ্যে যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন রেণুকা লাহিড়ী, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা সিংহ, পৃথা চট্টোপাধ্যায়, ঊষা দেবী, বীরেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়, কমল ঘোষ, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সুধীন দাশগুপ্ত আবহ-সুরেরচনায় ছবির কয়েকটি দৃশ্যে আবেগ সঞ্চার করতে পেরেছেন। গানের সুরারোপে তিনি মৌলিকত্ব দেখাতে পারেননি।

রামানন্দ সেনগুপ্তের আলোকচিত্রগ্রহণ ছবির একটি বিশেষ সম্পদ। রাত্রির দৃশ্য-গুলিতে শ্রীসেনগুপ্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। দেবেশ ঘোষ ও সত্যেন চট্টো-পাধ্যায়ের শব্দানুগ্রহণ সুষ্ঠু। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ যথাযথ।

চিত্রালোচনা

বাংলা ছবি বর্তমান সপ্তাহে একটিও মুক্তিলাভ করছে না। এ সপ্তাহে একটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি হল: শাদী।

বাহার ফিল্মস-এর শাদীর প্রধান আকর্ষণ সায়রাবানু। সম্প্রতি "জংলী" হিন্দী ছবির মাধ্যমে ইনি দর্শকমনোলোভা হয়ে

বিজয়োল্লাস

(বামে) টেলিফোনে সুখবর এলো—সোফিয়া লরেন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন হলিউডের বিচারে। (দক্ষিণে) সোফিয়া তাঁর স্বামী পরিচালক কার্লো পন্টিকে তাঁর আনন্দের ভাগ দিলেন।

সান্তা মনিকায় অনুষ্ঠিত একাডেমি এওয়ার্ড বিতরণী সভায় "অস্কার" হাতে বিজয়ী শিল্পীবৃন্দ : (বাম থেকে) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা জর্জ চ্যাকিরিশ, শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সোফিয়া লরেনের পক্ষে বিগত যুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী গ্রীয়ার গারসন, শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী রিটা মোরিনো, এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ম্যাক্সিমিলিয়ান শেল।

উঠেছেন। প্রণয়মূলক কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী। মনোজ, বলরাজ সাহনী, সুলোচনা, ইন্দ্রাণী ও ওমপ্রকাশ ছবিটির অন্যান্য প্রধান শিল্পী। কৃষাণ-পাঞ্জু ছবির পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক হলেন চিত্রগুপ্ত।

* * *

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবির মধ্যে অন্যতম হল খনা। খনার কাহিনী হিন্দুদের অজানা নেই। খনার বচন চিরকালই হিন্দুদের নীতি ও কর্তব্যের সন্ধান দিয়ে এসেছে। এই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না নারীর নাটকীয় জীবনকাহিনীই এল বি প্রোডাকশন্স-এর খনার বিষয়বস্তু। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছবিটির নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ, নবদ্বীপ হালদার, প্রবীরকুমার প্রভৃতি। সঙ্গীতবহুল এই ছবির সুররচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন প্রবীরকুমার।

* * *

দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত মন নিয়ে এলাহাবাদে বেড়াতে এসেছে রবীন্দ্রনাথের নিশীথে গল্পের নায়ক। সেখানে জনৈক চিকিৎসকের সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে তার দেখা হয়। নবপরিচিতা তরুণীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে জীবনের স্বাদটি বুঝি আবার ফিরে পায় নায়ক। অগ্রগামী গোষ্ঠীর প্রযোজনা-পরিচালনায় নির্মীয়মাণ নিশীথের এ দুটি চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু। এলাহাবাদে এই দুই চরিত্রের প্রথম দেখা ও নিবিড় সান্নিধ্যের ঘটনারাজি ও সেখানকার বহির্দৃশ্যাবলীর চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ করে প্রযোজক-পরিচালক গোষ্ঠী সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সুপ্রিয়া চৌধুরী ও রাধামোহন ভট্টাচার্য ছবিটির অন্য দুই প্রধান শিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

* * *

আর ডি বনসালের নতুন ছবি "এক টুকরো আগুন"-এর নবাগতা নায়িকা সুচরিতা দাশগুপ্তা।
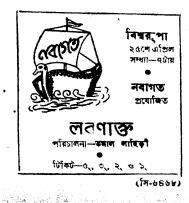
পরিচালক সুশীল ঘোষ তাঁর ইউনিট নিয়ে সম্প্রতি হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলের একাধিক গ্রামে স্বস্তিকা ফিল্মস-এর পলাশের রঙ ছবিটির বহির্দৃশ্য তুলে এনেছেন। এক গ্রাম্য কবিয়ালের ছেলের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী রচনা করেছেন বাণী বিশী। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের শিল্পীরা হলেন অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, বঙ্কিম ঘোষ, চিত্রিতা মণ্ডল ও নবাগতা সুতপা মজুমদার। ভি বালসারা ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক।

"অস্কার" সংবাদ

১৯৬১ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে "অস্কার" পুরস্কার পেয়েছে সঙ্গীতমুখর ছবি "ওয়েস্ট সাইড স্টোরি"। গত ১১ই এপ্রিল একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে হলিউডের অ্যাকাডেমি এডওয়ার্ড ঘোষিত হয় ও পুরস্কার-বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

"ওয়েস্ট সাইড স্টোরি" মোট এগারটি "অস্কার" পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য এ-ছবির পরিচালকদ্বয় রবার্ট ওয়াইজ ও জিরোম রবিনস পুরস্কৃত হয়েছেন। এই ছবির দুই শিল্পী জর্জ চ্যাকিরিস ও রিটা মোরিনো যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ও সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। তা বাদে নিম্নলিখিত বিভাগীয় উৎকর্ষের জন্যে ছবিটি "অস্কার" পুরস্কার পেয়েছে : সম্পাদনা, সুররচনা, শব্দধারণ, রঙিন চিত্রের ফটোগ্রাফি, রঙিন চিত্রের শিল্পনির্দেশনা, রঙিন চিত্রের দৃশ্যসজ্জা, এবং রঙিন চিত্রের বেশ-পরিকল্পনা।

বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে পুরস্কৃত হয়েছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান শেল ("জাজমেন্ট অ্যাট নুরেমবার্গ") এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন সোফিয়া লরেন ("টু উইমেন")। বছরের সর্বোৎকৃষ্ট বিদেশী চিত্র হিসাবে অভিহিত হয়েছে ইংগমার বার্গম্যানের "থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি" (সুইডেনের ছবি)।

সুরকার হেনরি ম্যানসিনি ("ব্রেকফাস্ট অ্যাট টিফ্যানিজ") দুটি "অস্কার"-এ সম্মানিত। "দি হাসলার" চিত্রটি সাদা-কালো ছবির ফটোগ্রাফি, শিল্প-নির্দেশনা, এবং দৃশ্যসজ্জার উৎকর্ষের জন্য তিনটি "অস্কার" লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ কাহিনী এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে "স্প্লেন্ডর ইন দি গ্রাস"। "স্পেশাল এফেক্ট"-এর উৎকর্ষের জন্য "অস্কার" পেয়েছে "দি গানস্ অব নাভারোন"। সাদা-কালো ছবিতে শ্রেষ্ঠ বেশ-পরিকল্পনার জন্য ইতালির ছবি "লা দলচে ভিতা" সম্মানিত।

বোম্বাই সমাচার

রাজ কাপুরের পরবর্তী রঙিন চিত্র "সঙ্গম"-এর একটি সঙ্গীতমুখর দৃশ্য সম্প্রতি আর কে স্টুডিওজ-এ গৃহীত হয়েছে। এই দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন বৈজয়ন্তীমালা, রাজেন্দ্রকুমার ও রাজ কাপুর।

গঙ্গা-যমুনার পর পরিচালক নীতিন বসু যে হিন্দী ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তার নাম "উম্মিদ"। ছবিটির প্রযোজক হলেন রাজন। অশোককুমার, নন্দা, জয় মুখার্জি ও লীলা নাইডু ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপদান করবেন। রবি ছবির সঙ্গীত পরিচালক।

দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা সম্প্রতি শতাধিক শিল্পীর একটি নৃত্যদৃশ্যের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান এবং শিল্পীদের পরিচালনা করেন। নয়নাভিরাম ও আড়ম্বরপূর্ণ এই নৃত্যদৃশ্যটি গৃহীত হয় এস মুখার্জি সিন্ডিকেট-এর "লীডার" ছবিটির জন্য। রাম মুখার্জি ছবিটির পরিচালক।

ভারতভূষণ-কে এবার দেখা যাবে ভক্ত সুরদাসের রূপসজ্জায়। ভক্ত সুরদাসের জীবনী নিয়ে একটি হিন্দী ছবি তৈরী করছেন নবকলা কেন্দ্র সংস্থা। কল্পনা ছবির প্রধান স্ত্রী চরিত্রে অবতরণ করেছেন। হীরাভায়ের পরিচালনায় ছবির কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

সায়রাবানু ও শাম্মি কাপুরকে "জংলী"-র পর আবার একসঙ্গে দেখা যাবে "ব্লাফ মাস্টার" ছবিতে। মনোমোহন দেশাই ছবিটির পরিচালক।

গুলো কেড়ে নিয়েছেন। সেটা ১৯৫৯ সালের কথা। মাত্র ১১ বছর বয়সে সেবারই সে প্রথম যোগ দিয়েছিল নবদ্বীপে আয়োজিত নদীয়া জেলা রাইফেল স্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে।

চিত্রা কৃষ্ণনগরেরই মেয়ে। বয়স মাত্র ১৪ বছর। লেডী কারমাইকেল স্কুলের ক্লাস টেন-এর ছাত্রী। জেলা চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়া ১৯৬০ সালে অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপেও যোগ দিয়েছে চিত্রা। কিন্তু নাম-কা সব রাইফেল-পটিয়সীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃতীয় স্থানের উপরে উঠতে পারেনি।

পরিবেশের প্রভাব আর পরিবারের প্রশ্রয়ে চিত্রার রাইফেল স্যুটিং-এ আসক্তি। একই কারণে অন্য খেলাধুলোয়ও যথেষ্ট অনুরাগ। বাবা জগদীশ বিশ্বাসও ৬ বারের ডিস্ট্রিক্ট স্যুটিং চ্যাম্পিয়ন এবং নদীয়ার নাম-করা শিকারী। নিজে একটি ব্যায়ামাগারের পরিচালক। বাঙলার নানা শহরে সেই ব্যায়ামাগারের প্রদর্শনীতে চিত্রা বোনলেস অ্যাক্টিভিটি ও জিমন্যাস্টিকসের ছলাকলা দেখিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে। রাইফেল স্যুটিং-এ সুনাম কিনেছে বাবার সঙ্গে স্যুটিং প্র্যাক্টিস করে।

ছোটবেলায় জ্যাঠামণি ও বাবার বিছানার পাশে শেলফে সাজানো বন্দুক ও রাইফেল দেখে তার শিশুমন স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী হয়ে উঠতো। তারপর বাবা যখন সেগুলির ব্যবহারে ঘরে প্রাইজ আনতে আরম্ভ করলেন তখন চিত্রারও হাত উসখুস করতে আরম্ভ করল। ওর আগ্রহ দেখে একদিন বাবা বললেন—'রাইফেল ছুঁড়বি? আয় আজ পয়লা বৈশাখ তোর হাতে খড়ি দিই।'

চিত্রা বলেছে, আনন্দে বিস্ময়ে, ভয়ে আর কৌতূহলে ও সেদিন ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কি এক অপূর্ব শিহরন বয়ে গিয়েছিল ওর শরীরে তা আজ বলা অসাধ্য।

প্রথম রাইফেল ছোঁড়ার কথা চিত্রার ভাল করেই মনে আছে। কৃষ্ণনগর পুলিস রেঞ্জে ও মাটিতে শুয়ে পড়লো। বাবা ওর হাতে আধমনী 'মার্টিনী' রাইফেলটা দিয়ে ২৫ গজ দূরে কালো কালো বৃত্ত আঁকা স্কোর কার্ডখানা সেঁটে রেখে এলেন। রাইফেলে একটা গুলী পুরে চিত্রা বেশ কিছুক্ষণ টার্গেটে তাক করল, তারপর আস্তে ট্রিগার টিপতেই বাবা ও তার বন্ধুরা চীৎকার করে উঠলেন—'তুই কি করলি রে চিত্রা, একেবারে দশে মেরে দিলি।' চিত্রা দেখল স্কোর কার্ডের কেন্দ্রবিন্দু ফুটো হয়ে গুলী বেরিয়ে গেছে। পাকাপোক্ত রাইফেল স্যুটারের পক্ষেও নাকি এমনভাবে কেন্দ্রবিন্দু বিদ্ধ করা সব সময় সম্ভব নয়।

ঐদিন থেকেই রাইফেলে নেশা ধরল ১০ বছরের ছোট মেয়ে চিত্রা বিশ্বাসের। আরম্ভ হল অনুশীলন। পড়াশুনা ও খেলাধুলোর

চিত্রা বিশ্বাস

ফাঁকে ফাঁকে রাইফেল প্র্যাক্টিস। বেশী সময় 'ড্রাই স্যুটিং' অর্থাৎ গুলী ছাড়াই বন্দুকে লক্ষ্য টিপ করে ট্রিগার টেপা। কিন্তু চিত্রার তাতে মন ভরে না। মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে। ও চায় বন্দুকে তাজা গুলী পুরে লক্ষ্যবিদ্ধ করতে।

কিন্তু সত্যিকারের রাইফেল প্র্যাক্টিস যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। আজকাল গুলী আক্রা, দাম বেশী। তবু জগদীশবাবু সুযোগ মত ওকে রেঞ্জে নিয়ে যান, ওর ভুলত্রুটি শুধরে দেন। একটু হাত খোলবার পর চিত্রা আসে বিখ্যাত রাইফেল-চালক হরিচরণ সাহার কাছে উন্নত কলাকৌশল শেখবার জন্য।

প্রায় প্রতি সপ্তাহের শনিবারে দেখা যায় বাবা আর মেয়ে রাইফেল কাঁধে করে কৃষ্ণনগর থেকে যাত্রা করছেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে শনিবার বিকেলে এবং রবিবার সকালে রাইফেল প্র্যাক্টিস করে আবার ফিরে আসছেন কৃষ্ণনগরে।

বাবার চেয়ে এখন মেয়ের আগ্রহই বেশী। লক্ষ্যভেদে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার জন্য চিত্রা বদ্ধপরিকর।

দেশী সংবাদ
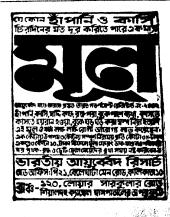
৯ই এপ্রিল—আজ প্রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনের এক ঘোষণায় ভারত সরকারের নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সহ এই মন্ত্রিসভায় ১৭ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ৬ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। আগামীকাল সকালে নূতন মন্ত্রিগণ শপথ গ্রহণ করিবেন।

মুসলমান ছাত্রদের একটি মিছিল অদ্য দুপুরে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংসে অভিযান চালায়। ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার অভিযোগে পুলিস ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে বলিয়া প্রকাশ।

আগামী দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই হাজার সমবায় সমিতি উঠিয়া যাইবে। পরিবর্তিত অবস্থায় এই সমবায় সমিতিগুলির আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই রাজ্য সরকার ইহাদের কারবার গুটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়।

১০ই এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু শ্রীমানুভাই শাকে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্ত্রিরূপে তাঁহার মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, শ্রী শা সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হওয়ায় রাজধানীতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

গতকাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে একজন রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে গোলযোগ হয় তাহাতে দুইজন সাংবাদিক ঐ হাসপাতাল ও কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসক বলিয়া বর্ণিত একদল যুবক কর্তৃক লাঞ্ছিত প্রহৃত ও লুণ্ঠিত হন। তাঁহাদের গাড়ীটিও গুণ্ডামির হাত হইতে রেহাই পায় নাই। ইহা পূর্বপরিকল্পিত ও প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ বলিয়া মনে হয়।

১১ই এপ্রিল—'মনোহর কহানিয়াঁ' পুস্তকের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় গত কয়েকদিন ধরিয়া যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা হইতেছিল, অদ্য তাহা এক অপ্রীতিকর খাতে বাঁক লয়। এইদিন ধর্মতলা স্ট্রীট, ওয়াটগঞ্জ, বেকবাগান, বেনিয়াপুকুর, কড়েয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কতকগুলি হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

কয়েকজন দুর্বৃত্ত মালদহের গাজোল থানার রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলে পাঁচজন অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ স্থানের গত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সহিত এই ঘটনার সম্পর্ক রহিয়াছে।

১২ই এপ্রিল—কলিকাতায় বিপুল সংখ্যায় পাকিস্তানী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ বর্তমানে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই ব্যাপক বে-আইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে না পারিলে অদূরভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে বড় রকমের আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর অদ্য সেক্রেটারিয়েট ভবনে কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের সরকারী হাসপাতালসমূহের অধ্যক্ষ এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া হাসপাতালের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন বলিয়া জানা যায়।

১৩ই এপ্রিল—অদ্য আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের অষ্টাদশ মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা প্রফুল্লকুমারের নির্ভীক সাংবাদিকতা, অদ্ভুত মনীষা, অকুতোভয় দেশপ্রেম, অতুলনীয় সাহিত্য প্রতিভা, বৈষ্ণবোচিত নিরহঙ্কার ও অমায়িক চরিত্র প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৪ই এপ্রিল—রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ আরও ৪ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১১ জন ডেপুটি মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গমন্ত্রী ১৭ জন, রাষ্ট্রমন্ত্রী ১০ জন এবং ডেপুটিমন্ত্রী ১১ জন।

ভারতরত্ন ডক্টর মোক্ষগুন্ডম বিশ্বেশ্বরায়া আজ সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের সময় বাঙ্গালোরে তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বয়স ১০০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি অর্ধচৈতন্য অবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন।

১৫ই এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গে তিনটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত আলোচনার পর প্রস্তাবটির গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে রাজী হইয়াছেন। এই কেন্দ্রগুলি আজিমগঞ্জ, গৌরীপুর এবং জলঢাকায় স্থাপিত হওয়ার কথা।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রনাথ দত্ত রবিবার বেলা ১২-৪০ মিনিটের সময় তাঁহার ২৫ নং গড়িয়াহাট রোডস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

৯ই এপ্রিল—ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের আলজিরিয়া নীতি ফরাসী জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে। গতকালের ফ্রান্সের শতকরা ৯০ জনের অধিক ভোটদাতা আলজিরিয় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুকূলে ভোট দিয়া 'ওয়াস'কে চরম আঘাত হানিয়াছে।

বৃটেনের অর্থমন্ত্রী শ্রীসেলুইন লয়েড আজ কমন্সসভায় সরকারের বার্ষিক বাজেট পেশ করিয়া বলেন, শেয়ার ও সম্পত্তি বাজারে সরকার ফাটকা বাজির উপর কর বসাইবে।

১০ই এপ্রিল—প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান শ্রীক্রুশ্চভের নিকট একটি বার্তা পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক তদারকির প্রস্তাব শ্রীক্রুশ্চভকে মানিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাহারা আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের এই অনুরোধ রক্ষিত না হইলে এই মাস হইতেই পশ্চিমীরা আবার পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করিবে।

১১ই এপ্রিল—প্রেসিডেন্ট সোকর্ণ গতকাল দক্ষিণ সুমাত্রায় এক জনসমাবেশে বলেন যে, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই যদি ইন্দোনেশিয়ার নিকট পশ্চিম ইরিয়ান হস্তান্তরের ব্যবস্থা হয়, তবে উহা রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে হইলেও তাঁহার কোন আপত্তি হইবে না।

মেজর জেনারেল আব্দুল করিম জাহেরুদ্দিন গতকাল বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনদিনের মধ্যেই সিরিয়ায় এক অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই সরকারের সকল সদস্যই হইবেন অসামরিক ব্যক্তি।

১২ই এপ্রিল—নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের অধিবেশন চলিবার সময় পশ্চিমী শক্তিবর্গ পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিলে রাশিয়াও অনুরূপ কোন পরীক্ষা চালাইবে না বলিয়া আজ প্রস্তাব করে কিন্তু মার্কিন ও ইংরেজ প্রতিনিধিরা রাশিয়ার কথায় বিশ্বাস করেন না বলিয়া সাফ জবাব দিয়াছেন।

পাকিস্তানের নির্বাচনী প্রচার সম্পর্কে এক অভিনব আদেশ জারী হইয়াছে। এই আদেশ মত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের একই সঙ্গে একই সভায় ভোটারদের সামনে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থিত করিতে হইবে। ভোটারদের এইসব সভা আহ্বান করিবেন স্বয়ং সরকারবাহাদুর এবং বিচার বিভাগের কর্মচারীদের সভাপতিত্বে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হইবে।

১৩ই এপ্রিল—প্রেসিডেন্ট সোকর্ণ আজ তাঁহার সমরাধ্যক্ষগণকে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করিয়া তোলার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

নেপালে বিদ্রোহীদের বেতার হইতে বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা নেপাল-সিকিম সীমান্তের ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত তাপলেজং নামের জায়গাটি দখল করিয়া লইয়াছে।

১৪ই এপ্রিল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনদিনব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বানকে বানচাল করিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

আলজিরিয়ার শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহীদের অন্যতম প্রধান নায়ক ভূতপূর্ব জেনারেল এডমণ্ড জুহো দ্বিতীয়বার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। গত বৎসর তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। তিনি ছিলেন পলাতক। গত রাত্রিতে বিচারকমণ্ডলী তাঁহার উপস্থিতিতেই তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন।

১৫ই এপ্রিল—পিকিংয়ের তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলেন যে, ভারত-চীন সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে ভারতের নিকট প্রেরিত ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পত্র গত শনিবার কম্যুনিস্ট চীনের জাতীয় পরিষদ কর্তৃক এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অনুমোদিত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
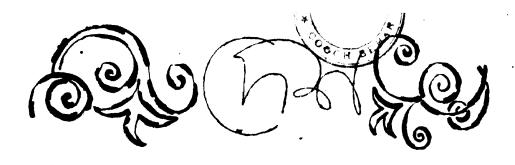
ESH 40 Nayo Paise.
Saturday, 28th April, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ২৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৫ বৈশাখ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

মধ্যবিত্তের জীবনসংকট

বাংলা নববর্ষের শুরুতেই সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী। পশ্চিম বাংলায় চালের দাম বাড়ছে; এর পর বর্ষার মরশুমে আরও বাড়বে কিনা কে জানে। নয়াদিল্লির সর্বশেষ সরকারী হিসাবে অবশ্য বলা হয়েছে, ১৯৬১-৬২ সালে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যানের পরিপাটি চিত্র থেকে তা বলে এমন কোনও ভরসা পাওয়া যায় না যে, সাধারণ মানুষের "ডাল-ভাত" সমস্যার সমাধান অদূরবর্তী কিংবা সহজলভ্য। সরকারী পরিসংখ্যান বিশারদগণের মতে আমাদের জাতীয় আয়ও নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবটা হয়ত নির্ভুল; কিন্তু গড়পড়তা আয় বাড়লেও, সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জমা খরচের হিসাবে ঘাটতিও ক্রমেই বেড়ে চলেছে সন্দেহ নেই। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরুতেই এই অবস্থা: মধ্যবিত্তের উপার্জন এবং জীবনধারণের খরচের মধ্যে কোনওদিন সমতা স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত অন্তত দেখা যায় না।

মূল্যবৃদ্ধির দুষ্ট বৃত্ত এমনই যে, একবার জিনিসপত্রের দর বৃদ্ধি পেলে পরে কখনই তা আর নামতে চায় না। ফলে বৎসর বৎসর মূল্য বৃদ্ধি; সাধারণ মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই দাম এইভাবে লাফে লাফে এগিয়ে চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে। অথচ আমাদের বৈষয়িক উন্নয়ন পরিকল্পনার রচয়িতা এবং প্রয়োগকর্তারা নিজেরাই বলে থাকেন যে, মূল্য বৃদ্ধির গতি রোধ করতে না পারলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি একটা রঙীন ফানুস মাত্র। পরিকল্পনার কল্যাণে কবে জীবনযাত্রা ব্যবস্থার দৈনন্দিন দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ মিলবে সে-কথা কেউই বলতে পারেন না। একমাত্র রূঢ় বাস্তব সত্য মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার অন্তহীন, অপরিসীম দুর্গতি ও বিড়ম্বনা।

সাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর কমানো দূরের কথা, মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করার জন্য পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট উদ্যোগী নন। উপরন্তু গভর্নমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বৎসর বৎসর নূতন নূতন যে-সব উপায় অবলম্বিত হচ্ছে তার চাপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আরও বেশী ক্লিষ্ট এবং পিষ্ট। চাল-ডালের দর বেড়েছে; কয়লার দামও বাড়তির মুখে; কেন্দ্রীয় রেল বাজেটে যাত্রিভাড়া এবং মালবহনের মাশুল বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধি অনিবার্য। কেন্দ্রীয় বাজেটে করবৃদ্ধির চাপও প্রকারান্তরে সবচেয়ে বেশী পড়বে স্বল্পবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর। এই দুষ্টবৃত্ত থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখা যায় না।

সমাজশাস্ত্রীরা বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সমাজের মেরুদণ্ড। য়ুরোপ আমেরিকার সাম্প্রতিক রাজনীতিতে যে "স্টেবিলিটি" তথা স্থিতিশীলতার আদর্শ বিশেষভাবে সমাদৃত তার মূল কথা হল মধ্যবিত্ত এবং স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা-ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান। শিল্পসমৃদ্ধ, স্বচ্ছল য়ুরোপ-আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে অবশ্য আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণ ব্যবস্থার তুলনা করা চলে না। তবে "স্টেবিলিটি" তথা স্থিতিশীলতা আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজেরও লক্ষ্য। সে-লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছুবার প্রতিশ্রুতি একেবারেই অর্থহীন যদি আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা ব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধির চাপে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। বর্তমানে সেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা মধ্যবিত্ত জীবনধারার সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তের মত অতখানি দুর্গত নয়। এই রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক, অথচ শিল্পব্যবসায়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোনোখানেই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সহজে ঠাঁই পায় না। দেশ বিভাগের ফলেও এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত এবং স্বল্পবিত্ত বহু পরিবারের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরে ও শিল্পাঞ্চলে চাকুরিজীবী এবং চাকুরিপ্রার্থীর ভিড়, কিন্তু হাজার হাজার মধ্যবিত্ত পরিবারের মান বাঁচিয়ে মাথা গুঁজবার মত জায়গা নাই। "স্টেবিলিটি" তথা স্থিতিশীলতা যদি প্রকৃতই আমাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক লক্ষ্য হয় তাহলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থিতির সমস্যা অর্থাৎ অন্নবস্ত্র বাসস্থানের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের সমস্যা সমাধানের জন্য গভর্নমেণ্টের অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য। পশ্চিম বাংলায় মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রা সংকট কঠিন থেকে কঠিনতর হওয়া শুরু করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। রকমারি পরিকল্পনা ও যোজনায় এই সংকটের তীব্রতা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা, অবিরত মূল্যবৃদ্ধির পীড়নে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পরিবার আজ দৈন্যদশার শেষ সীমায় উপনীত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই অন্তহীন দুর্গতি আর যাই হোক রাষ্ট্র ও সমাজের স্থিতিশীলতার লক্ষণ নয়।

রাজনৈতিক উচ্চাশা---
অতুল্যবাবু বললেন—'মিঃ কুট্টি, আমি ডাক্তার রায়ের সামনে কখনো ধূমপান করি না।'
রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার পুনর্বার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।
ওঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা পেল।
ইউ সি সি
মেডিকেল কলেজে সাংবাদিক প্রহৃত।
কলমের চেয়ে ডাণ্ডা জোরদার।
তোমার শত কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
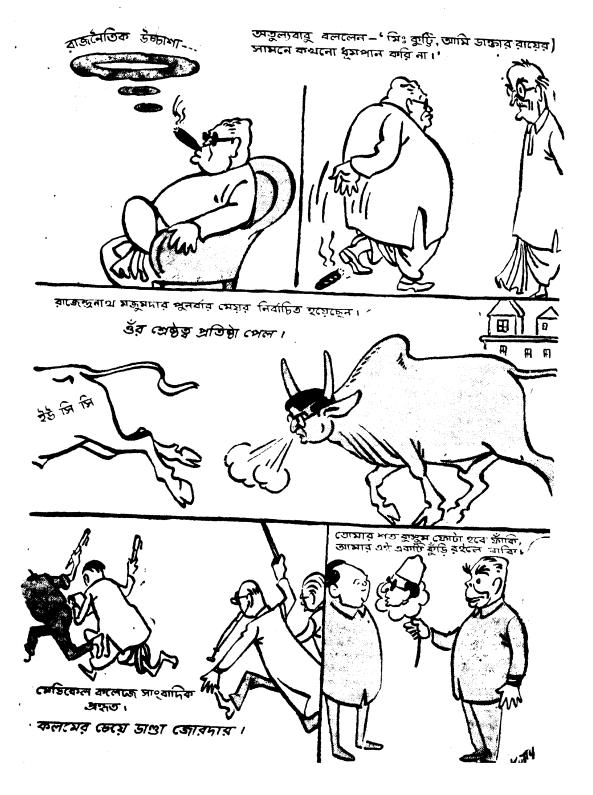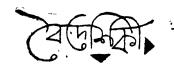
আলজেরিয়া সম্পর্কে ফরাসীদের অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছে এবং সে-গালমন্দ কিছু অকারণ শুনতে হয়নি। কিন্তু যারা গালমন্দ করেছে, তাদেরও মনে ফরাসী জাতি বর্তমানে যে মুশকিলে পড়েছে, তার জন্য কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হবে। ফরাসী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আলজেরিয়ানদের রাজনৈতিক মিটমাট এবং যুদ্ধবিরতির যে চুক্তি হয়েছে, সেটা ভণ্ডুল করে দেবার জন্য আলজেরিয়ায় যারা খুনখারাপি চালাচ্ছে, তারা ফরাসী। সেই বিদেশী ফরাসী সৈন্যদের সংস্থা ও-এ-এস-এর চেষ্টা হচ্ছে পুরোপুরি গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করা। ফরাসী গভর্নমেণ্ট যে-চুক্তি করেছেন, ফ্রান্সে গণভোটের দ্বারা সেটা বিপুলভাবে সমর্থিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ও-এ-এস-এর নৃশংস তাণ্ডব থামছে না। আলজেরিয়ান নেতারা এখনো ধৈর্য ধরে আছেন, আলজেরিয়ান জনতাকে তাঁরা এখনো মোটামুটি ভাবে শান্ত রাখতে সমর্থও হয়েছেন। আলজেরিয়ার ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোই হচ্ছে ও-এ-এস-এর এখন প্রধান চেষ্টা। কারণ আলজেরিয়ানরা যদি পুরোদমে পাল্টা সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে লেগে যায়, তাহলে ফরাসী এবং আলজেরিয়ান প্রতিনিধি সম্বলিত যে-অন্তর্বর্তীকালীন সংস্থার উপর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে, সেটাকে টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হবে এবং ফরাসী জাতির পক্ষেও আলজেরিয়ার সেই অবস্থা দূরে থেকে নীরবে দেখা কঠিন হবে। মুশলিম আলজেরিয়ান এবং ফরাসীদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি চলছে এবং ফরাসী গভর্নমেণ্টের সৈন্যরাও ফরাসীদের উপর গুলী চালাচ্ছে—এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে তখন আর ফ্রান্সের লোকেরা সেটা সইতে পারবে না, ফরাসী গভর্নমেণ্টকে তখন এমন পথ নিতে বাধ্য হতে হবে, যাতে আলজেরিয়ানদের সঙ্গে যে-মিটমাট হয়েছে, সেটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে—এই হচ্ছে ও-এ-এস-এর লক্ষ্য। ও-এ-এস-এর এই লক্ষ্য সাধনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে না পারলে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। ও-এ-এস-এর প্রধান নেতাদের মধ্যে তিনজন ধরা পড়েছেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও-এ-এস-এর কার্যকলাপ এখনো অব্যাহত আছে।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, ও-এ-এস-এর কর্তারা, যাঁরা প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের বর্তমান নীতির বিরোধী, একদা তাঁদেরই সমর্থন দ্য গলের ক্ষমতাপ্রাপ্তির সহায়ক হয়েছিল। জেনারেল সালা প্রমুখের এটা তৃতীয় বিদ্রোহ, প্রথম বিদ্রোহের অন্যতম ফল ছিল দ্য গলের ক্ষমতালাভ। বিদ্রোহী সেনাপতিদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে দ্য গলের কতকগুলি আভ্যন্তর, মানসিক অসুবিধা আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে তাঁর নিজের অভিমান। শায়েস্তা যদি করতে হয়, তবে দ্য গলই করবেন, তাতে আর কারো সাহায্য তিনি নিচ্ছেন, এটা দেখাতে তিনি চান না। সেজন্য জনসাধারণের সমর্থনেরও তিনি মাত্রা বেঁধে দিতে চান। তিনি যা করছেন বা করবেন, তার সমর্থন জনসাধারণ ঘোষণা করুক, তাঁর যথেচ্ছ চলার অধিকারের প্রতি

জনসাধারণ সমর্থন জ্ঞাপন করুক—এই পর্যন্ত। কিন্তু তিনি যা চান, এমন কোনো কিছুও সরাসরি জনমতের চাপে হবে, এটা তিনি সহ্য করতে রাজী নন। বিদ্রোহী নেতাদের শায়েস্তা যে রকম করে করা দরকার তিনিই করবেন, এ বিষয়ে তাঁর যা-নীতি, জনসাধারণের বড়ো জোর তার প্রতি সমর্থন জানাবার অধিকার আছে, কিন্তু জনসাধারণ সরাসরি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে, যাতে মনে হতে পারে যে, জনতার সমর্থনের জোরে দ্য গল কিছু করছেন—এটা তাঁর সহ্য হয় না।

সে যাই হোক, ফরাসী জাতির পক্ষে অবস্থাটার একটা বেদনাদায়ক দিক আছে। বহু সাম্রাজ্যের অবসান ইতিহাসে ঘটেছে, অনেক রকমে ঘটেছে। কিন্তু আলজেরিয়ায় ফরাসী ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অবসানটা একটু নতুন রকমে হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, আলজেরিয়ায় ফরাসী ঔপনিবেশিক বাসিন্দাদের সংখ্যা। যেখানে ঔপনিবেশিক বাসিন্দাদের সংখ্যা অল্প, সেখানে সাম্রাজ্যিক শক্তির অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে তারা একটা বিশেষ উৎকট সমস্যা সৃষ্টি করে না। আবার এমনও ইতিহাসে অনেক সময়ে হয়েছে যে, একটি বৃহৎ উপনিবেশ সাম্রাজ্যিক কেন্দ্র বা 'মাদার কাণ্ট্রি' থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে, দুর্বল কেন্দ্র তাকে বশে রাখতে পারেনি। কখনো কখনো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উপনিবেশ স্বতন্ত্র স্বাধীন হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিকরা যে-দেশে গিয়ে বসেছে, সে-দেশের আদিম অধিবাসীদের হয় তারা মেরে শেষ করেছে, অথবা তাদের একেবারে কোণঠাসা করে নগণ্য অবস্থায় নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যেখানি সাম্রাজ্যিক শক্তির সহায়তায় এমন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, যেটা লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বেশ বড়ো হলেও স্থানীয় আদিম বাসিন্দাদের সংখ্যার তুলনায় একটি 'মাইনরিটি' মাত্র, সেখানে সাম্রাজ্যিক শক্তিকে যদি বিদায় নিতে হয় তাহলেই উপনিবেশিকদের নিয়ে হয় মুস্কিল, কারণ তখন তারা নিজেদের অভ্যস্ত অর্থনৈতিক সুখসুবিধা ছেড়ে বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পারে না। যেখানে উপনিবেশিকদের সংখ্যা অতি অল্প সেখানে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেও যারা থেকে যায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার মারাত্মক রকম পরিবর্তন না হতে পারে। কিন্তু আলজেরিয়ার মতো যেখানে ঔপনিবেশিক সমাজের লোকসংখ্যা নগণ্য নয়, সেখানে ফরাসী রাজনৈতিক শক্তির অপসারণের পরে ফরাসী ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব চলে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী সেখানে ঔপনিবেশিকরা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঠেকাতে একবার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে।

আলজেরিয়ায় সেই চেষ্টাই আমরা দেখছি। এই চেষ্টার বিশেষত্ব হচ্ছে এই এখানে ঔপনিবেশিকরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে কিন্তু সেটা কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য নয়, কেন্দ্রের শক্তি যাতে প্রত্যাহৃত না হয়, কেন্দ্রের শক্তির দ্বারা যাতে ঔপনিবেশিকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব জীইয়ে রাখা যায় তার জন্য, আলজেরিয়ার গোঁড়া ফরাসী ঔপনিবেশিকরা, ও-এ-এস-এর কর্তারাও জানে যে তাদের নিজেদের শক্তির দ্বারা আলজেরিয়াকে আলাদা করে নিয়ে সেখানে প্রভুত্ব চালিয়ে যাবার শক্তি তাদের নেই। শক্তি যা আছে সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের, ফরাসী জাতির। তাই গোটা ফরাসী জাতিটাকে আলজেরিয়ায় "ইন্‌ভলবড" করে রাখা দরকার, তা নাহলে চিরদিন ঔপনিবেশিকদের সুখসুবিধা বজায় রাখার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেইজন্য আলজেরিয়াকে "ফরাসী" করে রাখতে হবে —এই স্লোগান। কিন্তু ফ্রান্স বুঝেছে যে বাঁচতে হলে আলজেরিয়ার গর্ত থেকে তাকে বেরুতেই হবে। ও-এ-এস্ গোঁড়া ঔপনিবেশিকদের অস্ত্র, তার মারটা নিজের ল্যাজেরই বাড়ি সন্দেহ নেই, কিন্তু আশা করা যায় যে ল্যাজটার জন্য প্রাণীটা প্রাণ দেবে না তবে একথা ঠিক যে ফরাসী জাতির জীবনে খুব একটা বেদনাময় অধ্যায় চলছে।

* * *

নেপালের রাজা মহেন্দ্র চার দিন দিল্লিতে থেকে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে গেলেন। তার সুফল কতটুকু হবে এখনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। প্রধানুযায়ী যে-যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হবে বা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত সেটি আমরা দেখিনি। তবে একটি প্রেস কনফারেন্সে রাজা মহেন্দ্র যে-ধরণের কথাবার্তা বলেছেন তা থেকে মনে হয় না যে তিনি তার মত বা আচরণে কোনো পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। অবশ্য রাজা মহেন্দ্রের একটা খ্যাতি আছে যে তিনি তাঁর মনের কথা সহজে ব্যক্ত করেন না। সুতরাং ভিতরে ভিতরে যদি কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েও থাকে তাহলেও চট করে সেটা ব্যক্ত করবার লোক বোধহয় তিনি নন। তাছাড়া তাঁর ভারতে আগমনের অব্যহিত পূর্বে নেপাল সরকারের দপ্তর থেকে যে একটি বিবৃতি প্রচারিত হয় এবং রাজা মহেন্দ্র ভারতবর্ষে পৌঁছেই যে-সব উক্তি করেন তাথেকে বুঝা যায় যে তিনি একটা কড়া ধমক-দেওয়া "পোজ" নিয়ে এসেছেন এবং সেই "পোজ" নিয়েই যাবেন। যদি কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা হয়ে থাকে তাহলেই এখুনি তার বাহ্য প্রকাশ আশা করা যায় না। দিল্লিতে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আলাপ করার ফলে রাজা মহেন্দ্র নিজের কিছু ভুল সংশোধন করবেন এটা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য রাজোচিত বিলম্ব আবশ্যক। সেজন্য রাজা এবং তাঁর মন্ত্রী তুলসী গিরির বক্তৃতার সুর যদি বদলায়ও তাহলেও একটু সময় লাগবে। অবশ্য অনেকের বিশ্বাস যে পরিবর্তনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হবে মন্ত্রীর পদ থেকে শ্রীতুলসী গিরির অপসারণ।

২৩-৪-৬২

কতজন লক্ষ্য করেছেন জানি না, কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদ সত্যিই চমকপ্রদ।

খবর পাওয়া গেছে যে, আমাদের টাঁকশালের প্রতিটি এক নয়া পয়সা তৈরী করতে খরচ পড়ছে নাকি দুই নয়া পয়সা।

এ খবর থেকে সরকারের অক্ষমতা, দায়িত্বহীনতা, নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে জোরালো একটা ছোট-খাটো প্রবন্ধ লেখা যায়। এক নয়া পয়সার ফুটো বাবদ দেশের রাজকোষের কি পরিমাণ সঞ্চয় যে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সংখ্যাতাত্ত্বিকদের সাহায্যে তার একটা ভয়াবহ হিসেব দেখানোও সহজ।

সে কাজ যোগ্যতর লোকেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুই-এর বদলে এক পাওয়ার এই মজার রহস্যের কথাই ভাবছি।

দ্বিগুণ খরচে এক গুণ পাওয়ার নজির কি সরকারী টাঁকশালেই শুধু এই প্রথম পাওয়া গেছে? আমাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডবল দাম অনেক কিছুর জন্যেই কি আমরা দিয়ে আসছি না!

ভুক্তভোগীমাত্রেই জানি যে, পৌরনিগম থেকে শুরু করে ধর্মাধিকরণ পর্যন্ত যেখানেই যাই ন্যায্যমূল্যের ওপরে আর একটি উপরি না দিলে কোথাও কিছুই সুলভ নয়। চিরাচরিত প্রথায়, আমাদের আলস্যে ও সহনশীল ভীরুতায় একের দাম দুই হওয়ার এ নীতি নির্বিবাদে চলে আসছে।

শুধু পুরানো মহলেই নয়, নতুন উদ্যোগ-আয়োজনের ক্ষেত্রেও এক হিসেবে এই নীতি যে আমরা চালাতে প্রস্তুত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজি বর্জনের আন্দোলন তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ বলে মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে ইংরাজি বাতিল করার উৎসাহের মধ্যে শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় নিবারণের চেষ্টাই আছে বলে ধারণা হ'তে পারে; কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের ওপর একগুণ পেতে দুগুণ বোঝা আমরা চাপাচ্ছি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নেহাৎ অন্ধ অবিবেচকের ছাড়া কারুর কিছু বলবার থাকতে পারে না। কিন্তু আজকের এই বিশাল বিচিত্র জ্ঞান-বিদ্যার জগতে সে মাতৃভাষা যদি বন্ধ দেওয়ালের কারাপ্রাচীর হয়ে শিক্ষার্থীর মনকে বন্দী করে রাখতে চায় তার চেয়ে শোচনীয় তাহলে আর কিছু হ'তে পারে

না। অদূরদর্শী এই ব্যবস্থা যদি চালু হয় তখন একবার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের জন্যে দেওয়াল গড়ে তুলে আবার আদিগন্ত শিক্ষাকে বিস্তৃত করবার জন্যেই সে দেওয়াল শিক্ষার্থীকে ভাঙতে হবে। নিতান্ত ভ্রান্ত ভাষাভিমানের তাগিদ ছাড়া এ মূঢ়তার আর কি কারণ থাকতে পারে সুস্থ মনে বুঝে ওঠা কঠিন। ইংরেজ আমাদের কপালে যে দাসত্বের কলঙ্ক লেপে দিয়েছিল তার ভাষার গায়েও এখনও তা লেগে আছে মনে করবার সংকীর্ণতা যাঁদের আছে তাঁরা এই কথাটাই জোর করে ভুলে থাকতে চান যে, পরাধীনতা সম্বন্ধে প্রথম জাতিগত সচেতনতা ও ঐক্য এই ইংরাজি ভাষাই আমাদের মধ্যে জাগিয়েছিল। শাসক হিসেবে আমাদের শৃঙ্খলিত রাখতে গিয়ে তার আত্মঘাতী অস্ত্র এই ভাষার ভেতর দিয়েই ইংরেজ নিজেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। ইতিহাসের কেনাবের এই পরম কৌতুক কিন্তু নির্মম পরিহাস হয়ে উঠবে যদি বিশাল বিশৃঙ্খল নানা বিরোধী শক্তি ও স্বার্থের টানাটানিতে ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষকে না এক সূত্রে গাঁথতে সাহায্য করেছিল সেই ইংরাজি ভাষাকে আমরা ভ্রান্ত দেশপ্রেমের দম্ভে অশুচি ও অনাবশ্যক বলে বিসর্জন দিই।

টাঁকশালে দুই ফুটো নয়া পয়সায় এক নয়া পয়সা বানাতে গিয়ে যত লোকসানই আপাতত আমাদের হোক তাতে একেবারে দেউলে হবার আশঙ্কা সত্যিই নেই। যে সব উপাদান উপকরণ এখনও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে, দেশেই সেগুলি সংগ্রহের ব্যবস্থা হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকসানের অনুপাতও ক্রমশ কমে আসবে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজি বর্জনের ব্যাপারটা ওপর থেকে দেখতে দুই-এর জায়গায় এক বলে মনে হলেও শিক্ষার্থীর পক্ষে আসলে উনো কাজ শুধু দুনো-ই করবে না, আমাদের সর্বভারতীয় ঐক্যের মূলেও ঘা দিয়ে এক-কে আবার অনেক না করে দেয়!

সর্বভারতীয় সংযোগের ভাষা হিসেবে ইংরাজির জায়গায় হিন্দিকে বসাবার জন্যে অনেকরকম যুক্তিই শোনা যায়। তার মধ্যে একটি যুক্তি এই যে, শুধু মুষ্টিমেয় শহুরে শিক্ষিতদের নিয়েই ত দেশ নয়। আমাদের শতকরা যে নব্বুই জন দেশে গাঁয়ে থাকে তাদের পক্ষে ইংরাজির চেয়ে হিন্দি শেখা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত এক ভাষার সূত্রে গাঁথবার জন্যে হিন্দিই তাই বরণীয়।

এ যুক্তির গোড়ায় গলদ প্রথমত এই যে, পল্লীবাসীর প্রতি দরদ দেখাবার নামে তাদের বর্তমান অনগ্রসরতাই এ যুক্তি ধ্রুব বলে ধরে নিতে চায়। পল্লীতে যারা জীবন কাটায় সেই শতকরা নব্বুই কি পঁচানব্বই জনের জীবনে আন্তপ্রাদেশিক ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগই আজ অল্প। সেই সুযোগই যদি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বাড়ে তাহলে তাদের শিক্ষার মানই বা শহুরেদের সমান হয়ে উঠবে না কেন? শহরে যা শেখা যায় পাড়াগাঁয়ে তা অসাধ্য এমন কোন পরিসংখ্যান কোথাও ত কোনো বৈজ্ঞানিক দাখিল করেছেন বলে জানি না।

এর পরের যুক্তি হল ইংরাজির চেয়ে হিন্দির উপযোগিতা। কিন্তু এই উপযোগিতাও তর্কাতীত বলে ত' মনে হয় না। সমস্ত দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতের প্রভাব কমবেশী যাই থাক, হিন্দীর সঙ্গে সেখানকার ভাষার কোনো আত্মীয়তা নেই। ভারতবর্ষের অন্যান্য অহিন্দি অঞ্চলে ভাষাগত সম্বন্ধ থাকলেও ইংরাজির জায়গা দখল করবার কি যোগ্যতা হিন্দী অর্জন করেছে তাও বিচার্য। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন সন্দেহ নেই। বহু বিদেশ-প্রত্যাগত বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনেছি, ভারতবর্ষের বাইরে যে কোন রাষ্ট্রদূতাবাসের দপ্তরে হিন্দী ছাড়া কোন ভাষার বই-এর নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। হিন্দীর এই একাধিপত্যে এমন ধারণা হওয়া সুতরাং অস্বাভাবিক নয় যে, বিদেশে পরিবেশন করবার মত হিন্দী ছাড়া আর কোন সাহিত্য বর্তমান ভারতে নেই। রবীন্দ্রনাথের মূল লেখা হিন্দীতে পড়তে না পেয়ে হতাশ হয়ে, তাঁর বাংলার লেখার খবর কোনো ইয়োরোপীয় দেশ সম্প্রতি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন এমন কথাও শুনেছি। স্টেশনের প্রস্তরফলককে কি মনিঅর্ডার ফর্ম জাতীয় জিনিসে হিন্দীর অখণ্ড প্রতাপ ত' দেখাই যাচ্ছে, হিন্দী প্রকাশকদের প্রায় অর্ধেক বই কিনে নেবার ব্যবস্থা করে সরকার এ ভাষাকে যথাসাধ্য ঠেলে তোলার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে আইনের জোরে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ করে তুলে ও সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে তার হিন্দী উপাধি সমান গ্রাহ্য বলে স্বীকার করে নিয়ে ভারত সরকার নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন বলেই নিন্দুকদের ধারণা। আমরা নিন্দুক নই। হিন্দীর প্রতি কোনো অহেতুক বিদ্বেষও পোষণ করি না মনে মনে। হিন্দী যদি ইংরাজির জায়গা নিয়ে তার সব কাজ সারতে পারে তাহলে অকাতরে আমরা তার শরণ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই যোগ্যতার কোনো পরিচয় কি হিন্দী এ পর্যন্ত দিতে পেরেছে? আধুনিক লিখিত হিন্দীভাষা শুধু বয়সেই অনেক প্রাদেশিক ভাষার চেয়ে ছোট নয়, রাজধানীর ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও সাহিত্য-কীর্তিতে অনেকেরই পেছনে। কত জনের মুখে ফেরে শুধু সেই সংখ্যার হিসাব দিয়েই কোনো ভাষার উৎকর্ষ বিচার হয় না। রাজশক্তির আদর আস্কারাতেও কোনো ভাষাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা যায় না যদি সে ভাষায় সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টা না জন্মায়। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও সূর্যাস্তবিহীন সাম্রাজ্যের জোরেও ইংরেজ তার ভাষাকে বড় করে তুলতে পারত না, যুগে যুগে সাহিত্যের রথী মহারথীর সেখানে আবির্ভাব যদি না ঘটত। কোনো ভাষায় প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের কি করে উদ্ভব হয় তার গূঢ় রহস্য আমাদের জানা নেই, কিন্তু রাজশক্তির প্রসাদের ভাগ বাড়িয়ে যে তাদের সৃষ্টি করা যায় না এ সত্য অবিসংবাদিত। রাজধানীর বিচারে সরকারী কাগজে কলমে হিন্দী সাহিত্যিকদের সংখ্যা শুধু প্রচুর নয়, স্থানও তাঁদের অবশ্য অনেক উঁচুতে। পদ্ম যেখানে তাঁদের অনেকের ভূষণ সেখানে অন্য অনেক ভাষার শ্রীটুকুও বিরল। কিন্তু এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতায় পিঠের ভরই শুধু জোটে, পায়ের জোর কি মাথার মাপ বাড়ে না। শক্তিমান সাহিত্যকারের স্পর্শে যে যাদু আছে ভাষায় তাই শুধু প্রাণ সঞ্চার করে বলিষ্ঠ বেগ দিতে পারে। সে যাদুস্পর্শের অভাবে কোনো ভাষা হাটের বক্তৃতা কি অফিস কাছারির বিজ্ঞাপন ইস্তাহারের কাজ চালাতে পারে, দেশের বহুমুখী মননের বাহন হতে নয়। বাঁশের বদলে সোনার লগি দিয়ে ঠেলালেও শালতি শুধু শালতি-ই। বহু সাধকের ঐকান্তিক সাধনায় গড়ে উঠে যে-জাহাজ প্রতিভার বায়ুবেগ তার পালে ধরে তার ভার শালতিতে জোর করে চাপালে ভরাডুবি ঠেকানো কঠিন বলেই মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় পশুদের ব্যবহার

মানুষের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য কোন রোগের ওষুধ আবিষ্কার করতে চিকীৎসা-বিজ্ঞানীরা জীবন্ত পশুপক্ষীর অঙ্গব্যবচ্ছেদ করেন। পশুপক্ষীকে ঐভাবে ব্যবহার বহু যুগ ধরেই চলে আসছে এবং ক্রমশই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ইদানীং আবার মহাশূন্যে প্রাণীর আচরণ পরীক্ষার জন্যও কুকুর ও বানরকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আর এটাও ঠিক যে চাঁদ বা মঙ্গল যে গ্রহেই মানুষে যাবার পরিকল্পনাকে কার্যকর করে তোলা হোক না কেন, প্রথম প্রাণী হিসেবে কুকুর বা বানরকেই পাঠানো হবে। আবার যুদ্ধের জন্য উদ্ভাবিত কোন বিষাক্ত গ্যাসের মারণ-শক্তি পরীক্ষা করার জন্যও প্রাথমিক পরীক্ষাটা পশুদের ওপর চালানো হয়।

এইভাবে শুধু বৃটেনেই ১৯৫৮ সালে ১৪,৫৫,১৯৯; ১৯৫৯ সালে ৩৪,৯৩,০২২ এবং ১৯৬০ সালে ৫৭,০১,১৮৭টি জীবন্ত প্রাণীর ওপর পরীক্ষা চালানো হয়। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৬ সাল থেকে পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রাণীর সংখ্যা বছরে কুড়ি লক্ষ করে বেড়ে চলেছে।

১৯৬০ সালে যতো প্রাণীর ওপর পরীক্ষা চালানো হয় তার মধ্যে ৩৩,৪৫,৪৬৪টি পশুরে অঙ্গব্যবচ্ছেদে কোনরূপ অনুভূতিনাশক ব্যবহার করা হয়নি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য জীবন্ত পশুর অঙ্গব্যবচ্ছেদ করতে বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রে কোনরকম অনুভূতিনাশক ব্যবহার করা হয়না বলে তাই নিয়ে বৃটেনে বেশ আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে আরো একটি চিন্তার বিষয় হচ্ছে, চিকীৎসা বিদ্যা শিক্ষায় মানুষের অঙ্গব্যবচ্ছেদের কাজে লাগে বলে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সদা-কবরিস্ত শব চুরি করে যেমন ব্যবসা চালাতো, তেমনি এখন পশুদের চুরি করে চিকীৎসা-বিদ্যা শিক্ষালয়ে বিক্রী করে।

ক্ষতচিহ্ন লাভের গৌরব

জার্মানীতে এমন একটি ক্লাব আছে যেখানকার সভ্যভুক্ত হওয়াটা বেশ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। প্রবেশের চাঁদা ধরা হয় রক্ত দিয়ে, আর সভ্যদের 'পরিচয়পত্র' হচ্ছে মুখে ক্ষতের দাগ।

যোগ্যতা প্রমাণ করতে কিভাবে তলোয়ার চালাতে হয় সেটা জানা দরকার। শুধু তাই নয় সভ্যদের তলোয়ারকেই জীবন ও মরণের সাথী বলে গণ্য করতে হবে।

সাধারণতন্ত্রী জার্মানীর ডাকবিভাগ চিঠিপত্র দ্রুত পাঠানোর জন্য আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের হাওয়া ভরা পাইপ নিয়ে পরীক্ষা করছে। এই পাইপের সাহায্যে ঘণ্টায় প্রত্যেকটি এক হাজারখানি চিঠির একশটি বাণ্ডিল পাঠানো সম্ভব এবং চলাচলের গতি ঘণ্টায় বাইশ মাইল। ছবিতে চিঠি প্রেরণ ও প্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি দেখা যাচ্ছে যার সাহায্যে বারো হাজার বাক্স পরীক্ষা করা সম্ভব

ক্লাবটির নাম বুরসশেনশাফ্‌ট বা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংগ্রামী বাহিনী।

তিনশ বছর ধরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লব্ধ ক্ষতচিহ্ন জার্মান যুবকদের কাছে একটা মস্ত গৌরব রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। আজকের দ্বন্দ্বযুদ্ধব্রতীর লক্ষ্য মাত্র একটি—কোনরকমে মুখমণ্ডলে একটি ক্ষতচিহ্ন লাভ।

তলোয়ার দীর্ঘ, ভারী এবং ক্ষুরধার। সাঁই সাঁই শব্দ তুলে শূন্যে এক আঘাতে কাগজকে দুটুকরো করে ফেলতে পারে।

চমৎকার শোভামণ্ডিত রাইন উপত্যকার এক বনে দলে দলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। একটি সংকেতের সঙ্গে ওরা তলোয়ারটা মাথার ওপর তুলে ধরে, তারপর আঙ্গুলের আর এক সংকেতে দুজন দুজন করে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়।

প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখমণ্ডল হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছেঃ পিছু হটা চলবে না।

ঝকঝকে তলোয়ারের ঝনাৎকারে বন কেঁপে উঠতে থাকে। হয়তো একজনের কপালে একটা আঁচড় লাগলো। রেফারি এবং ডাক্তার ক্ষত পরীক্ষা করে যদি দেখেন ক্ষত তেমন গভীর নয় তাহলে আবার লড়াই চালাতে বলেন। তখন কয়েক মিনিট ধরে শাণিত ইস্পাতের আবার ঝনাৎকার চলতে থাকে।

তারপর দুজনের একজন হয়তো হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। মুখমণ্ডল, কাঁধ এবং বাহু বেয়ে রক্তধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ওর বন্ধুরা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ওকে তুলে ধরে আর ডাক্তার রক্ত মুছে ক্ষতটা আঙুল দিয়ে ফাঁক করে ধরেন। ক্ষতটা দ্রুত আরোগ্য লাভ করলে চলবে না। কারণ দ্রুত আরোগ্য লাভ করলে দাগটা মিলিয়ে যাবে—আর ঐ দাগটার জন্যই যখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ!

মিনিট কতক পরে, তখনও যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে সেই আহত যুবক সবাইকে নিয়ে নিকটবর্তী এক প্রাসাদে গিয়ে বীয়ারের উন্মত্ত অধিবেশন বসায়।

ইওরোপের অধিকাংশ দেশের মতো জার্মানীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের একটা আভিজাত্যের ইতিহাস আছে।

তরবারি যুদ্ধে অর্জিত ক্ষতের অধিকারী বহুতর সুযোগ লাভ করে। দাগটি তার জীবনে এক পরম আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়।

ওটা নারীর সঙ্গে প্রণয় ব্যাপারে তাকে সাফল্য এনে দেয়। জার্মানীতে আজো বহু মেয়ে আছে যারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্জিত ক্ষতদাগ না থাকলে সে-যুবককে কাপুরুষ এবং সুতরাং বিবাহের অযোগ্য মনে করে।

কোন যুবকই এমন একটা কলঙ্ক ইচ্ছে করে সহ্য করতে চায় না।

পরিবহণ কাজে টেলিভিসন

ইংলণ্ডে লীডসের পরিবহন বিভাগ শহরের প্রধান তিনটি বাস-স্টপে টেলিভিসন ক্যামেরা খাটিয়ে রেখেছে।

ট্রাফিক ইন্সপেক্টর প্রধান কার্যালয়ে বসেই কোথাও যাত্রীর সারি খুব বড় হয়ে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গেই তা সচক্ষে দেখতে পারেন এবং

সেই রুটে একখানি অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

চীফ ট্রাফিক অফিসারের ভাষায়, টেলিভিসন ক্যামেরা বসানোর ফলে বাসে "কলার কাঁদি হয়ে যাত্রী"-দের যাওয়ার দৃশ্যও সচক্ষে দেখা যেতে পারবে।

দূরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ইন্সপেক্টর তার ক্যামেরাটি চালিত করে। এই বাবদে লাইসেন্সের খরচ হচ্ছে চৌদ্দ হাজার ন'শ পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু এর দ্বারা ইতিমধ্যেই বছরে ছাব্বিশ হাজার টাকা বাঁচানো সম্ভব হয়েছে —যা তিনজন ইন্সপেক্টরের বেতনের সমান।

এবং যদি এই নতুন খেলনাটির সহায়তায় পরিবহন বিভাগ একটি বাস চালানোর খরচ বাবদ উনত্রিশ হাজার ন'শ টাকা বাঁচায় তাহলে এটাকে একটা লাভজনক অর্থবিনিয়োগ বলা যেতে পারে।

এই ব্যবস্থা লন্ডনেও প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। লন্ডন পরিবহন বিভাগ ক্যামেরা বসাবে ভূনিম্নস্থ হোলবোর্ন স্টেশনে। কোন করিডরে ভীড় জমতে থাকলে কণ্ট্রোলার নিজের দপ্তরে বসেই সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন এবং বেড়া বদল করে লোককে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হবেন।

একটি অদ্ভুত শখ

জার্মানীর ফুটবল-শিক্ষক হের বের্গারের মতো জার্মানীর সুবৃহৎ নগরী স্টুটগার্টের বত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক মানফ্রেড ফ্রীৎস্-এরও একটি অদ্ভুত শখ আছে। তিনি সারা দুনিয়ার বিভিন্ন ফুটবল ক্লাবের ব্যাজ সংগ্রহ করেন। এই উৎসাহী সংগ্রাহক ইতিমধ্যেই ত্রিশটি দেশের ৬১৫টি ফুটবল-ক্লাবের ব্যাজ সংগ্রহ করেছেন। প্রথমে তিনি আশ-পাশের ফুটবল-ক্লাবগুলির ব্যাজ সংগ্রহ করতে সুরু করেন। কিন্তু বর্তমানে মস্কো থেকে চিলির সান্টিয়াগো পর্যন্ত এই বিশাল ভূভাগের প্রায় সবগুলি ফুটবল-টীমের ব্যাজ তাঁর কাছে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যেসব ফুটবল-ক্লাবের ব্যাজ সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে রিয়্যাল মাদ্রিদ, ডাইন্যামো, স্পার্টাক ও লোকোমোটিভ মস্কো, চের্নাফিকা লিসবন, আর্সেনাল লন্ডন, যুভেন্টাস টুরিন, ইণ্টার ন্যাশন্যাল মিলান, সান্টোস ব্রেজিল, হনফেড বুডাপেস্ট ও রেডস্টার বেলগ্রেডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া পোর্তুগীজ লীগের বারোটি ব্যাজও মানফ্রেড ফ্রীৎস সংগ্রহ করেছেন।

বিভিন্ন ফুটবল-ক্লাবের এই ব্যাজগুলি সংগ্রহ করতে আট বছর সময় লেগেছে এবং এই সংগৃহীত ব্যাজগুলির জন্য দু'হাজার মার্কের একটি বীমা আছে। মানফ্রেড ফ্রীৎস্ তাঁর এই মূল্যবান সংগ্রহ হাতে নিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করেন। তাঁর পরিশ্রম যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এম বিশ্বেশ্বরায়া

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আজ নববর্ষের প্রথম দিন। একটি উজ্জ্বল ভারতরত্নকে কাল-রত্নাকর চিরতরে হরণ করে নিলে। ভারতের এক মহামানবের জীবন-প্রদীপ চিরনির্বাপিত—যিনি একাধারে ছিলেন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার, বিশিষ্ট পরিচালক, বরেণ্য চিন্তানায়ক ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। দীর্ঘ জীবনের যে মূল সূত্রটি রেখে গেছেন ভাবীকালের জন্যে তা অম্লান থাকবে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে। কে সে মহাত্মা সন্ত যিনি অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন "ত্বম শতায়ু ভব"; সেই আশীর্বাক্য আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমবয়সী শ্রীমোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়া। ১৩৬৯ সনের ১লা বৈশাখ এই বিশ্বধাম থেকে মোক্ষধামে প্রয়াণ করেছেন। আশ্চর্য এই দিনই তাঁর পিতৃদেবের মৃত্যুতিথি।

মোক্ষগুণ্ডম সকলের কাছেই এম বিশ্বেশ্বরাইয়া নামে পরিচিত। অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন এই অলোক-সামান্য পুরুষপুঙ্গব। এঁর কর্মণ্যতার ইতি হয় নি সরকারী আইনের পঞ্চান্ন বছর বয়সে। এই কৃতী পুরুষের কর্মশীলতা শুধু বাস্তু-বিদ্যার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা, মহীশূরের শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়াস ও সফলতা স্বাধীন ভারতের নবচেতনার চিন্তা-ধারার নায়করূপে তাঁর অবদান চিরকাল তাঁকে অমর করে রাখবে। স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি পরিকল্পনার তিনি পথিকৃৎ। অর্ধশত বর্ষ আগে জাতীর উন্নতিকল্পে যা তিনি চিন্তা করে গেছেন বর্তমানের স্বাধীন ভারত সেই পথই গ্রহণ করেছে।

তখন সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে জাতীর শিক্ষা বিস্তারের

এম বিশ্বেশ্বরায়া

পথ প্রস্তুত। সেই সময় ১৮৬১ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর সুবর্ণখানির জন্য বিখ্যাত কোলার জেলার অন্তর্গত মুদ্দেনাহাল্লী গ্রামে এক বিশিষ্ট পরিবারে বিশ্বেরাইয়ার জন্ম হয়। শৈশবে চিক্কবালাপুর গ্রামের বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি নিয়মানুবর্তিতা ও অসামান্য শ্রম-শীলতার জন্য শিক্ষক ও বন্ধুমহলে অতি প্রিয় ছিলেন। শৈশবে যে নিয়মানুবর্তিতার বীজ উপ্ত হয় তা উত্তরকালে বিরাট মহীরুহে পরিণত হ'য়ে তাঁকে যশ, অর্থ, মান ও স্বাস্থ্যের অধিকারী করে। পিতা ছিলেন এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মাতা ছিলেন অতি বুদ্ধিমতী ও দৃঢ় চরিত্রের মহিলা। বালক বিশ্বেশ্বরাইয়ার পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৭৫ সালে বাঙ্গালোরে এসে তিনি উচ্চশিক্ষা শুরু করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সেন্ট্রাল কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাদ্রাজ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ চার্লস ওয়াটার্স ছাত্র বিশ্বেশ্বরাইয়ার অবিচলিত কর্তব্য-নিষ্ঠায় প্রীত হ'য়ে তাঁকে একখানি ইংরাজী অভিধান উপহার দেন। সেই প্রীতির স্মৃতি আজও তাঁর গুরু ভক্তির নিদর্শন হিসাবে তাঁর টেবিলে সংরক্ষিত আছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এদিকে অর্থাভাব। মহীশূরের তদানীন্তন দেওয়ান শ্রীরঙ্গচারলু পুণা বিজ্ঞান কলেজে পড়বার জন্য একটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন। তখনকার দিনে হাওড়ার শিবপুরে ও রুড়কীতে প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছিল এবং পুণাতেও একটি কলেজ ছিল। কিন্তু শিবপুর কলেজের মত ঐ কলেজ থেকে বি ই উপাধি দেওয়া হ'ত না। তবে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের ছাত্ররা পুণায় ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালাভ করত। কলকাতায় এসে যে সব ছাত্রের শিবপুরে ভর্তি হবার সুবিধা হ'ত না তাঁরা চলে যেতেন পুণায় ভর্তি হ'তে। বিশ্বেশ্বরাইয়া পুণার ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় ১৮৮৩ সালে নভেম্বর মাসে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এর পর শুরু হ'ল তাঁর কর্মজীবন। তিনি তাঁর কর্মজীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন 'Memoirs of my working life'। এরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ A brief memoir of my complete working life ভারত সরকারও মুদ্রিত করেন। ১৮৮৪ সালে ২৩ বৎসর বয়সে তাঁর শিক্ষা শেষ হয়। এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বোম্বাই পূর্ত বিভাগে সহকারী ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে যোগদান করেন। তখনকার দিনে পুণা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে যিনি প্রথম হতেন তিনিই পেতেন একটি সরকারী চাকুরি। বিশ্বেশ্বরাইয়ার কার্যারম্ভ হয় নাসিকে। কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার বদলি হলেন খান্দেশ জেলার ধুলিয়া শহরে। এখানে সিনিয়ার সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ডবলু এল স্ট্রেঞ্জ (W L STRANGE) সাহেবের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করার পর স্ট্রেঞ্জ সাহেব 'নাসিকে' বদলি হন। বিশ্বেশ্বরায়ার উপর প্রথম কাজের ভার পড়ল পাঞ্জরা নদী ও তার উপনদীর সহিত 'পাইপ সাইফন' সংযোগ করা। অল্পকালের মধ্যেই এ কার্য সমাপ্ত হওয়ায় সিন্ধু অঞ্চলের সুক্কুর নামক স্থানে পানীয় জলের ও ময়লা

জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার জন্য তদানীন্তন মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বেশ্বরায়াকে পত্র লেখেন। তখন তিনি প্রথম শ্রেণীর সহকারী ইঞ্জিনীয়ার—বেতন মাসিক পাঁচ শত টাকা (৫০০্)। মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার লিখলেন যে, তাঁর বর্তমান বেতনের উপর আরও ২০০্ টাকা অধিক বেতন ও ৪৫্ কি ৫০্ বাড়ি ভাড়া পাইবেন। সুক্কুর অতি গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা। এইখানে সিন্ধু নদে বাঁধ দিয়ে সেচব্যবস্থা করা হয় এবং এখানের সুক্কুর সেতু তৎকালের এক বিখ্যাত সেতু। এই অঞ্চলেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহেঞ্জোদারোর সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার করেন। তখন সুক্কুর বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল—ভিন্ন সিন্ধুপ্রদেশ গঠিত হয় নি। বর্তমানে এই অঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তানে। অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরায়া মুখ্য ইঞ্জিনীয়ারের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং বাইশ মাসের মধ্যে ঐ কার্য অতি সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করেন।

তখনকার দিনে পি ডব্লু ডি-র অন্তর্গত বাস্তুবিভাগ, সেচবিভাগ, রাস্তাবিভাগ, জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ ছিল। বর্তমানের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল না। ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে তিনি বোম্বাই প্রদেশের চারটি ডিভিশনের কাজ করেন। পরে অঞ্চলের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ও বোম্বাইয়ের জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারের পদ অলংকৃত করেন। ১৯০৬ সালে এডেনে জলকল ও ময়লাকল পরিকল্পনার জন্য প্রেরিত হন। এডেনে ঐ বৎসর আগস্ট মাস থেকে প্রায় এক বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৯০৭ সালে আর একজন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ছুটিতে যান তখন নিজের দায়িত্ব ছাড়াও সেই ভদ্রলোকের কার্যভার গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বরায়া যখন বুঝতে পারেন যে ইংরেজ রাজত্বে তাঁর কৃতিত্ব ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার করা হবে না তখন তিনি অবসর গ্রহণের উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই কাজে ইস্তফা দেন। তদানীন্তন বোম্বাইয়ের লাট সাহেব লর্ড সীডেনহাম তাঁর কর্মজীবনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বোম্বাই সরকার তাঁর বিশেষ কর্মকুশল কার্যের জন্য অতিরিক্ত পেন্‌সন্‌ দেওয়ার জন্য ১৯০৮ সালের ৬ই মার্চ ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। ইতি-মধ্যে দুইটি বিশেষ রাজ্য থেকে মুখ্য ইঞ্জি-নীয়ার পদের জন্য তাঁর নিকট আহ্বান আসে।

অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে ছুটির সময় ইতালী ভ্রমণের সময় লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের আণ্ডার সেক্রেটারী তাঁকে পত্র লেখেন যে, নিজাম সরকার বিশ্বেশ্বরায়াকে তাদের উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে চান। বিশ্বেশ্বরায়া ইতালী ও আমে-

রিকা ভ্রমণ পর্ব শেষ করে ১৫ই এপ্রিল ১৯০৯ সালে কার্যে যোগ দেন। তাঁর করণীয় বিষয় ছিল—১। হায়দরাবাদ নগরী পুনর্গঠন, ২। নগরীকে বন্যার প্রকোপ হ'তে রক্ষা, ৩। হায়দরাবাদ ও চাদরঘাট শহরের ময়লা জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। হায়দরাবাদে সাত মাস কাজ করার পর ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সালে মহীশূর রাজ্যের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ারের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর ঐ পদে অবস্থানকালে মহীশূরের বিরাট উন্নতি সাধিত হয়— রেলপথের উন্নতি, কৃষ্ণসাগর ড্যাম জল বিদ্যুৎ, কৃষির উন্নতি, মহীশূরের চিনির-কল প্রভৃতি।

১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে তদানীন্তন দেওয়ান টি আনন্দ রাও সি আই ই মহাশয়ের অবসর গ্রহণে বিশ্বেশ্বরায়া দেওয়ান-পদে উন্নীত হন। সেই সময় শিক্ষার মান, নেতাদের মধ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের অভাব, সংঘবদ্ধতার অভাব এবং অর্থনৈতিক নিম্নমান মহীশূরের উন্নয়নের পথে অন্তরায় ছিল। তিনি একে একে সেগুলি ক্রমশ দূরীভূত করতে সমর্থ হন। সেই সময় তিনি বিধান-সভা ও রাজ্যসভায় প্রতিনিধিসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক আলোচনা-পরিষদ এবং 'এফিসিয়েন্সি অডিট' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁর কার্যকালে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, 'মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, কমার্শিয়াল বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহীশূরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ঘোরতর আপত্তি জানান। কিন্তু অবশেষে সে বাধা বিদূরিত হয়।

তাঁর শাসনব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হয়। শিবসমুদ্রম্ বাঁধের সংগৃহীত জল হইতে ১৩,০০০ অশ্ব-শক্তি বৃদ্ধি ক'রে ২৫,০০০ অশ্ব-শক্তি আহরণ শুরু হয়। এই সময় নূতন রেল-লাইন বসানো, মহীশূরের জন্য একটি বিশেষ পোতাশ্রয় পরিকল্পনা, নগর উন্নয়ন, গ্রাম-উন্নয়ন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯১৬-১৭ সালে মাদ্রাজ অঞ্চলে সরকারী কার্যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হয়। তার ঢেউ মহীশূর রাজ্যেও প্রবাহিত হয়। দেওয়ান বিশ্বেশ্বরায়া এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন দেশের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, শিল্পের প্রসার, জাতিভেদ-নির্বিশেষে কর্মকুশল ব্যক্তির কর্মক্ষমতার উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। ইহার ব্যত্যয় হইলেই দেশের উন্নয়নের মান হ্রাস হবেই। মহীশূরের মহারাজের এই অব্রাহ্মণদের আন্দোলনে পরিপোষকতার ইঙ্গিত থাকায় তিনি দেওয়ানী পদ হ'তে অবসর গ্রহণে মনস্থ করেন। ১০ই ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের সংবাদে প্রাক্তন দেওয়ান শ্রীআনন্দ রাও বিশ্বেশ্বরায়াকে নিম্নলিখিত পত্র দেন।

"I have read with great emotion yesterday's Gazette Extraordinary notifying your leave of absence and last evening's Daily Post containing your valedictory address delivered at the Secretariat. I am reminded of a passage in Lord Morley's 'Life of Gladstone' which I transcribe here below as being equally applicable to yourself and to the late Mr. W. E. Gladstone:

"'You do not know how those of us regard you, who feel it a joy to live when a premier believes in righteousness. We believe in no man's infallibility, but it is restful to be sure of one man's integrity.'"

অবসর গ্রহণের পর তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নি। মহীশূরে-লৌহ-ইস্পাত-কারখানা স্থাপনের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত দেওয়ান শ্রীআলবিয়ান ব্যানার্জি মহারাজ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে বোম্বাই হ'তে তাঁকে মহীশূর রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন। লৌহ কারখানা ১৯৪৯ সালে শতকরা ৬ ভাগ মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

উপদেষ্টা-ইঞ্জিনীয়র (কনসালটিং ইঞ্জিনীয়র) হিসাবে বোম্বাই নগরী, করাচী নগরীর পরিচালন ব্যবস্থা, আর্থিক ও পৌর উন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও উপদেশ প্রদান করেন। বিভিন্ন নগরীর জলকল, ময়লা-জল নিষ্কাশন ব্যাপারে বহু উপদেশ দেন। এ ছাড়াও বহু অনুসন্ধান কমিটিতে নেতৃত্ব অথবা সদস্যের কাজে লিপ্ত থাকেন যেমন বোম্বাই কারিগরী ও শিল্পশিক্ষা কমিটি (১৯২১-২২) রাসায়নিক শিল্প প্রসারের জন্য বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, বোম্বাই সেচ অনুসন্ধান কমিটি (১৯৩৮), নূতন রাজধানী অনুসন্ধান কমিটি (১৯২২), ভারতীয় অর্থনৈতিক অনুসন্ধান কমিটি (১৯২৫), ব্যাঙ্গালোর রাজনৈতিক বিক্ষোভ অনুসন্ধান কমিটি (১৯২৯), সুক্কুর ব্যারেজ অনুসন্ধান কমিটি (১৯২৯) প্রভৃতি।

এতো বড় প্রতিভাধর ব্যক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শাসন কার্যে উৎকর্ষ ও পারদর্শিতা দেখানোর পর ক্ষান্ত থাকবেন তা সম্ভব নয়, যখন ভা র ত ব র্ষ ব্যা পী রাজনৈতিক আন্দোলন, সেই সময় রাজকার্য ধুরন্ধর বিশ্বেশ্বরায়া কেমন করে নিরস্ত থাকেন। পুনায় অবস্থান কালে বালকৃষ্ণ গোখেলের সহিত পরিচয়, পরবর্তী যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলী জিন্না, জয়াকার এবং মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি জননায়কদের সহিত কার্য করবার তাঁর সৌভাগ্য হয়। মধ্যপন্থী নেতারা বোম্বাইয়ে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনের সভাপতি স্যার
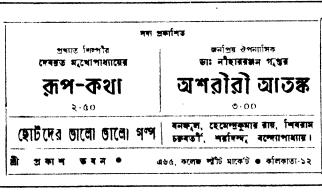
শংকরণ নায়ার মতানৈক্যের জন্য পদত্যাগ করায় স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া জিন্নার প্রস্তাবে ও মালব্যজীর সমর্থনে ঐ পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে দক্ষিণ ভারতীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

তিনি পৃথিবীর বহু দেশ বহুবার ভ্রমণ করেছেন এবং নব নব অভিজ্ঞতা দেশের ও দশের কার্যে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে তাঁর অপূর্ব কীর্তি হলো 'অটোম্যাটিক স্লুইস গেট ও ব্লক প্রথায় সেচ পদ্ধতি। প্রশাসক হিসাবে তাঁর 'এফিসিয়েন্সি অডিট' প্রথা এবং মানুষ হিসাবে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মূল সূত্রটি আগামীকালের মানুষের জন্য রেখে গেছেন।

গত বৎসর পূজোর সময় নিখিল ভারত নগর পরিকল্পনা সম্মিলনে মাদ্রাজ অধিবেশনে আমার যোগ দেবার সুযোগ হয়। সম্মিলনোত্তর প্রয়োজনীয় পরিদর্শন পরে আমি বাঙালোরে দুই ভারতরত্ন সন্দর্শনে আসি। সকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর ভেংকটরমণের সংগে আলাপ আলোচনা হয়। অপরাহ্নে আসি ৫নং কাব্বান রোড, বাঙালোরের স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার বাসভবনে। সম্মুখে খোলা জায়গা, পিছনে একতলা বাড়ি—সামনেই বড় পোস্টাফিস। দেখা হল ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক এম আর কৃষ্ণমূর্তির সংগে। তিনি বললেন, 'কয়েকমাস হ'ল খুড়োমশাই উঠতে-হাঁটতে পারেন না, কেবল শুয়ে থাকেন। কখন ঘুমোনো ভাব, কখনো জেগে। আপনি হয়তো জানেন, তিনি বিপত্নীক ও অপুত্রক। তাই আমি ও আমার স্ত্রী বাঙালোরে অধ্যাপনা করি ও খুড়োমশাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করি ও'রই বাড়িতে থেকে।' আমি বললাম, 'একবার দেখা কি সম্ভব নয়? বহু দূর থেকে আসছি আমি।' তিনি আমাকে বসিয়ে ঘরের মধ্যে গেলেন ও ফিরে এসে আমায় সংগে নিয়ে গেলেন। বাইরের বৈঠকখানা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে অনুজ্জ্বল আলো। শুভ্র বিছানায় ছোট্টটি হয়ে শুয়ে আছেন মানুষ বিশ্বেশ্বর—বিশ্বেশ্বরায়া। হাতের আঙুল নড়েই চলেছে—বোধহয় নিত্য জপক্রিয়া চলেছে। কথা বলতে পারেন না। দেখলাম সেই অসীম কর্মযোগী আজ মৃত্যুপথযাত্রী। আমার চোখ জলে ভরে উঠলো। আমি কোনগতিকে অশ্রু সংবরণ করে আমার প্রণতি জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিশ্বেশ্বরায়ার জীবনকাহিনীর অনেক কথাই আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হ'ল। আসার সময় অধ্যাপক কৃষ্ণমূর্তি আমাকে বিশ্বেশ্বরায়ার লেখা তিনটি বই উপহার দেন। আমি যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছি সেগুলি।

তাঁর অমূল্য রচনাবলীর একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা তাঁকে নানা উপাধিতে ভূষিত করেছে।

এল্ এল্ ডি (LLD)
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩১ সাল
এল্ এল্ ডি (LLD)
মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৮ „
ডি লিট্ (D Litt)
বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৭ „
ডি লিট্ (D Litt)
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ „
ডি এস্ সি (D Sc)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ „
ডি এস্ সি (D Sc)
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪ „
ডি এস্ সি (D Sc)
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭ „
ডি এস্ সি (D Sc)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ „

ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স ১৯৪৩ সালে তাঁকে আজীবন সাম্মানিক সভ্য নিযুক্ত করেন।

বিলাতের ইনস্টিটিউশন অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স তাঁর নাম তাঁদের সভ্য-তালিকায় থাকায় গৌরবান্বিত বোধ করেন। উপরন্তু তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ইনস্টিটিউট অব টাউন প্ল্যানার্স এবং ইনস্টিটিউট অব কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার্স-এর সাম্মানিক সদস্য।

নানা বিষয়ের উপর তাঁর সুচিন্তিত মতামত তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল—

(1) "Reconstructing India"
(2) "Planned Economy for India" —বর্তমান ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রদূত।
(3) Memoirs of My Working Life:
(4) Sayings—Wise or Witty
(5) A Brief Memoir of My Complete Working Life.

এ ছাড়া বহু শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার করেন যথাঃ—

(1) Prosperity Through Industry
(2) District Industrialisation Drive
(3) Village Industrialization
(4) Reconstruction in Post-War India
(5) Development of Heavy Industries in India
(6) Industrialization Scheme for Rural India
7. Industrialization Scheme in Two Parts
(8) Village Industries Handbook

এবং অর্থনৈতিক, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক বহু প্রবন্ধ আছে।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত শৈল শহর দার্জিলিঙ প্রতি বছরই দেশের এবং বিদেশের অগণিত ভ্রমণকারিদের আকর্ষণ করে। মুখ্য আকর্ষণ অতুলনীয় শোভাময় কাঞ্চনজঙ্ঘা। সারা শহরটিতে এবং আশপাশের অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা যেমন মনোরম তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ এখানকার জীবনধারা।

১। দার্জিলিঙ শহরের একাংশ; ২। দার্জিলিঙ থেকে কয়েক মাইল দূরে ঘুমের একটি বৌদ্ধ উপাসনা মন্দির; ৩। পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস, রাজভবন, পিছনে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা; ৪। দার্জিলিঙে পৌঁছবার ছোট রেল—দূর থেকে মনে হয় খেলনা গাড়ি; ৫। বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরে ধর্মচক্র হাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী

আলোকচিত্রশিল্পী

বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

চৌরঙ্গীর ব্যাঞ্জোবাদকটির উদ্দেশে
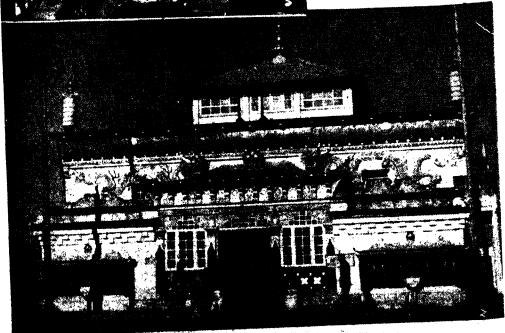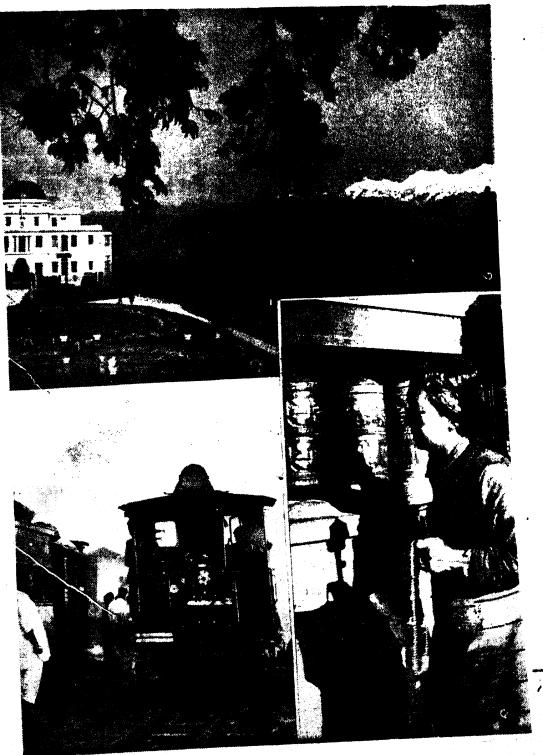
বটকৃষ্ণ দে

এবার তাকে তো দেখলাম না কো
গুনগুন সুর শুনলাম না তো,
বলতে পারো কি, সে আছে কোথায়?

সন্ধ্যা নামলো চৌরঙ্গীর বৃক্ষচূড়ায়
দূরের পুকুরে, শীতল ছায়ায়
রাত্রি আসছে নীল 'নীয়নে'র কাঁপানো-কাঁপানো
বাঁকানো রেখায়;
ভ্রমণচারীর, দিনের ক্লান্ত কর্মচারীর শ্রান্ত চলায়
অথচ শান্ত, প্রশান্ত-ধীর পায়ে-পায়ে-চলা
সে-সন্ধ্যাসঙ্গীটি আজ, বলো, রইলো কোথায়?

সারা দুপুরের কাজের জরার, ক্লান্তির কালো-কুণ্ঠন ঢেকে
বিকেল এলেই ঝলোমলো এই সাহেবী-পাড়ায়
চ'লে আসি সব ভুলে, পিছে রেখে।
এসেই শুনবো বহুশ্রুত, তবু অশ্রুত সেই স্বর-গুঞ্জন,
(আহা ঠিক যেন
আহত পাখীর মৃত্যু অধীর পাখা ঝাপটানো!)
তীক্ষ্ণ কী এক বেদনার বাণে বিদ্ধ করেছে সে আমার মন!
ধ্যানের স্বপ্নে, অন্তঃগভীরে কী যে পেয়েছে সে দুর্লভ সুর
(বাজাও, বাজাও!
আঙুলের চালে হাওয়ায় ছড়াও
—নৃত্য-মধুর বিধুর নূপুর!)

হে অন্ধ যাদুকর,
তোমার হাতের ওই ব্যাঞ্জোর রিনিঠিনি স্বর,
পরাভূত এক বন্দীর মতো আমাকে রেখেছে বাঁধা,—
হৃদয় আমার নিত্যকালের রাধা ॥

তিমিরাভিসার

আরতি দাস

জন্ম যার সন্ধ্যালগ্নে মৃত্যু শেষ রাতের প্রহরে
অন্ধকার বন্ধু তার প্রত্যূষের নামেই শিহরে,
নিষ্প্রদীপ শূন্যতায় হয়তো বা স্বপ্নের কুহকে
সূর্যের কল্পনা তার সম্পূর্ণ নিশাচর পেচকের চোখে।
জন্মের মুহূর্ত হতে সূচীভেদ্য ঘন তমিস্রার
কণ্ঠলগ্ন, শুনেছে সে নীড়ভ্রষ্ট কাকের চীৎকার
মেঘান্ধ ঝড়ের রাতে, শকুনির আরণ্য রোদন
স্পন্দিত মুহূর্তে তার রজনীর পরিপূর্ণ স্তন
আশ্বস্ত করেছে তাকে, তাই তার আত্মার আত্মীয়
মনোলোভা নিশীথিনী, অন্ধকার শ্যাম রমণীয়।

সূর্যের দৈবতগাথা অবান্তর বিস্ময় বিস্তারে
আরও কিছু অন্ধকার ভিক্ষা দাও ঈষন্মুক্ত নরকের দ্বারে।

এক লহমার জন্য

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক লহমার জন্য সমস্ত নিসর্গ মুছে দিও।
তুমি এক লহমার দৃষ্টির আলসে এই গৃহ
এই পরিচিত পথ আর ওই অভ্যস্ত পৃথিবী
মিথ্যা করে দিও।

তুমি এক লহমার দৃষ্টির আলসে এই দিন
মধ্যাহ্ননিশুতিভারে ছায়াময় সান্দ্র ও রঙীন
তৃপ্ত ঘুমঘোরে ভরে দিও।
এক লহমার জন্য ব্যাস্ত ওই সব কীর্তিজীবী

উষ্ণীষধারী মানুষ তোমার ওই দৃষ্টির আলসে
নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিও।
যেন এই পথ এই অভ্যস্ত পৃথিবী এই গৃহ
তখনও না হাত তুলে ফুটে ওঠে প্রসন্ন আশ্লেষে!

'আর কাকে সন্দেহ করেন?'

'আর কাকে করব? নাম তো বললাম।' তারক বিমূঢ়ের মত তাকাল।

'সে তো যারা মারপিট করেছে।'

'হ্যাঁ, দেবেন আর মোহিনী আর—'

'তা তো নিয়েছি লিখে।' ইন্দু দারোগা মুখটা ছুঁচলো করল: 'বলি আর কারু নাম ঢোকাতে চান না?'

বোকার মতন মুখ করে তাকিয়ে রইল তারক।

'কেউ শত্রু নেই আপনার?' ইন্দুভূষণ পেন্সিল দিয়ে ঠোকর মারল টেবিলে।

'বা, কত শত্রুই তো চারদিকে।'

'বলি শাঁসালো শত্রু কেউ নেই?'

'শাঁসালো?'

'হ্যাঁ, মশাই। যার টাকাপয়সা আছে, মানসম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি আছে—'

'তা আশু ঘোষই তো আছে।'

'তাকে জড়ান না।'

'জড়াব? সে তো বুড়ো—' আবার হাবাগোবা মুখ করল তারক।

'আমি কি আর তাকে আলিঙ্গন করতে বলছি?' চোখ একটু ছোট করল ইন্দু: 'বলছি তাকে মামলায় ঢুকিয়ে দিন। লিখুন, তার সাক্ষাতে না হোক তার প্ররোচনায়ই ঘটেছে মারপিট।'

'প্ররোচনায়? হ্যাঁ, তা একরকম বলা যায় বইকি।' তারক নিশ্বাস ছাড়ল।

'তবে তাই লিখে দিন। জানলা-ঘুলঘুলি সব বন্ধ করে দিলে চলে কী করে?' পেন্সিলের ডগা দিয়ে কান চুলকোলো ইন্দু: 'আমাদেরও তো পোষানো দরকার।'

আশু ঘোষকে গ্রেপ্তার করল পুলিস।

আশু ঘোষ সাত হাত জলের নিচে পড়ল। এটা কী হল? বাপ্পার, না বাঁমার? কার পিণ্ডি কার ঘাড়ে এনে চাপাল?

তার ছোট ভাই অনুতোষ জামিনে খালাস করে আনল আশুকে। এখনই ইন্দু দারোগার লোক টিপে দিল, কিছু হাত-চুলকানি দিলেই ছাড়া পায় বেকসুর।

বাড়ি গিয়ে দাদার কানে কানে বললে কথাটা।

'খবরদার!' হুংকার দিয়ে উঠল আশুতোষ।

'কিন্তু—'

'যা হয় হবে। পারব না দিতে-থুতে।'

ফল কী হল। চার্জ শীট হল আশুর বিরুদ্ধে।

সব দ্রুত ও সংক্ষেপ করা হচ্ছে তাই নিচুতলার হাকিম কী কটা ওদিক-সেদিক সাক্ষী নিলে ও কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করলে আর সরাসরি অন্য আসামীর সঙ্গে আশু ঘোষকেও দায়রায় সোপর্দ করলে।

ইন্দুভূষণের লোক বললে, 'এখনো দেখুন।'

'এখন আর কী দেখবার আছে!' অনুতোষ বললে, 'যা হবে বিচারে হবে, কোর্টে হবে।'

বাড়ি এসে দাদাকে বললে, 'এখন তবে ডিফেন্সটা ঠিক করতে হয়।'

'খবরদার।' আবার হুংকার ছাড়ল আশুতোষ : 'আমি লড়ব না মামলা।'

'লড়বেন না!'

'না। গিল্টি প্লিড করব। জেলে যাব বটতলার, আদালতের আনাচে-কানাচে। কে উকিল খুঁজছে চেহারা দেখলেই বুঝি বোঝা যায়। গণেশ টাউট অনুতোষের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কী মশাই, সিভিল না ক্রিমিন্যাল?

সেসনটা কোন গোত্র কে জানে। বিবরণটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করল অনুতোষ।

'বলেন কী মশাই, আশু ঘোষ আসামী?' গণেশ পর্যন্ত উলটে যাবার দাখিল।

"এখন তবে ডিফেন্সটা ঠিক করতে হয়।"

যেখানে বিচারের এই ছিরি, এই ব্যবস্থা—'

ও কি একটা কথা হল? শুধু-শুধু খোলা তলোয়ারের নিচে কেউ মাথা পাতে?

আশুতোষের স্ত্রী জয়ন্তী কেঁদে পড়ল। যে 'করে পারো বাঁচাও। যত টাকা লাগে আমি দেব।'

অনুতোষ বললে, 'দেখি। এসব লাইনে হাঁটিনি কোনো দিন। দেখি কোথায় কী আছে।'

প্রথমেই এক উকিল ধরতে হয়।

উকিল ধরে কী করে?

উকিল ধরতে টাউট লাগে।

টাউট পাই কোথায়?

বাজারে, রেল-ইস্টিশানে, পানের দোকানে, নিয়ে গেল চিত্ত উকিলের সেরেস্তায়।

চিত্ত বোস দেখল, এ তো চুনোপুঁটি নয়, দেড়মনী কাতলা।

বললে, 'সিনিয়র লাগবে।'

'যা লাগবে লাগুক।' বললে অনুতোষ, 'খরচপত্রে কার্পণ্য করব না। যে করে হোক খালাস করে আনতেই হবে। পাগল হয়ে যাবেন সতী স্ত্রী। নির্দোষও যদি ছাড়া না পায় তা হলে আর বিচার কী, সূর্য-চন্দ্র কী।'

চিল যেন বিল পেয়েছে, অঢেল খুশী হল চিত্ত। বললে, 'সব ফ্রণ্টেই লড়তে হবে। মক্কায় তো বটেই, বেমক্কায়ও।'

এটা এখন রঘু টাউটের এলাকা। গণেশ দেওয়ানীর দালাল, রঘুকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল। চোরের লাভ রাত্রিবাস, যা এক মুঠো পেয়েছে তাই গণেশের বেশী।

রঘু প্রথমে নিয়ে গেল আমলার কাছে।

'আগে পাবলিক প্রসিকিউটর ঠিক হোক।'

'হোক।' সায় দিল অনুতোষ।

'তবে দিন ভারী হাতে—'

'এটা তো আপনা থেকেই হবে।'

'তা হবে। কিন্তু আপনার বিপক্ষে একটি কমবুদ্ধি আনাড়ী রকমের পাবলিক প্রসিকিউটর হলেই কি সুবিধের হয় না?'

'ও হ্যাঁ, তা হয়।' পলকে বুঝে নিল অনুতোষ। দিল যা দেবার।

'আর এই থেকে যদি মজবুত কেউ এসেও পড়ে প্রসিকিউশনে,' রঘু বললে, 'ঠিক-ঠিক উকিল দাঁড় করাব। যেমন ওল তেমনি তেঁতুল।'

'তার মানে?' অনুতোষ যথারীতি বোকার মত মুখ করল।

'তার মানে,' আমলা বললে, 'যার সঙ্গে দুস্তি তার সঙ্গেই কুস্তি। ভাব দেখাবে লড়ছে, কিন্তু তলে-তলে নৌকো ফুটো।'

ফরিয়াদীর পক্ষে উকীল ঠিক হল কেশব দাস। অনুতোষ খোঁজ নিয়ে জানল পাকা উকিল।

তবে কী হল তদবিরে?

'কিচ্ছু না।' হুংকার ছাড়ল আশুতোষ।' 'আমলায় খেয়েছে।'

'কেশব দাস? অত ঘাবড়াবার আছে কী!' আশ্বাস দিল রঘু। 'ডিফেন্স তবে কুলদা মিত্তির। যেমন বিষ তেমনি ওঝা।'

চিত্ত বোস অনুতোষকে নিয়ে এল কুলদার চেম্বারে।

কুলদার শুধু ফি-ই মোটা নয়, চশমার ফ্রেম মোটা, চুরুট মোটা, ফাউণ্টেন পেন মোটা। কিন্তু বুদ্ধি সরু।

টাকা দেবার পরেও কুলদা নথি দেখছে না।

'বলি মশাই সাক্ষী ভাঙাতে পারবেন? জুরি তদবির করতে পারবেন? নচেৎ মিছিমিছি নথি দেখে লাভ কী?'

'তা কোথায় কী করতে হবে—' ইতি-উতি তাকাল অনুতোষ।

'ওসব আগে ঠিক করে বনেদ পাকা করুন। তারপর দেখাই কাকে বলে অ্যাডভোকেসি। কাকে বলে জুরি-অ্যাড্রেস।'

'কোথায় যেতে হবে?'

এর পরে আর রঘু নেই। এর পরে জুরির তদবিরকার। সে অন্য লোক। তার নাম গজানন।

রঘু নিয়ে এল গজাননের কাছে।

গজাননের এলাকা নেপথ্যে, অদৃশ্য-লোকে। সে কোর্টে ঘোরে না, সে ঘোরে হোটেলে বাস-স্টাণ্ডে, চায়ের দোকানে, সিনেমায়, নয় তো বাড়ি ফিরে যাবার নির্জন রাস্তায়। সে অন্ধকারের জীব, তার এক

গজাননের এলাকা নেপথ্যে, অদৃশ্য লোকে চোখে নিরিবিলি আরেক চোখে চুপি চুপি।

গজানন বললে, 'ট্রায়াল শুরু হোক। জুরির লটারির পর দেখি কে ফোরম্যান হয়।' কাঠগড়ায় অন্য আসামীদের সঙ্গে আশু ঘোষও এসে দাঁড়াল।

লোক ভেঙে পড়ল। এত বড় একটা ধনী মানী লোক সে কিনা সোপর্দ হয়েছে! ব্যাপার কী? হয়েছে কী? খুন? ব্যাংক-লুট? বলাৎকার?

আই-ও তাকাল আশুর দিকে। ভাবখানা এই, তখন কেন কিছু করেন নি? এখন মজা দেখুন।

সে ঈশ্বর দেখবেন। আশু ঘোষ মুখ ফিরিয়ে রইল।

কিন্তু অনুতোষ পারল না মুখ ফেরাতে। রামের বনবাসে লক্ষ্মণের নিষ্ক্রিয় থাকবার জো নেই।

জুরি লিস্টীকৃত হল। বটকৃষ্ণ ঘোষ ফোরম্যান।

দুপুরে গজানন বললে, 'বটবাবুকে বাগিয়েছি বহু কষ্টে। চার শো টাকায় রফা হয়েছে। সস্তাই বলতে হয়। ছ জন জুরি পঞ্চাশ টাকা করে আর বটবাবু এক শো। সব টাকাটাই বটবাবুর হাতে একমুষ্টে দিতে হবে।'

'তাই হবে। কিন্তু টাকাটা আমি নিজে দেব।' বললে অনুতোষ।

'তাই দেবেন। বটকৃষ্ণের হাতে পৌঁছুনো নিয়ে কথা।'

'কিন্তু কোথায় দেব?'

'সেও ঠিক করে এসেছি। ঘুম-ছায়া হোটেলটা চেনেন তো? তার নিচের তলায় উত্তরের ঘরের জানলার কাছে বটবাবুর সিট। কথা হয়েছে রাত দশটা নাগাদ যাবেন। দেখবেন বটবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, শুধু একটা হাত জানলার দিকে বার-করা। সেই হাতের মধ্যে নোটের তাড়াটা গুঁজে দেবেন।'

'মুখ দেখাবে না বুঝি?'

'কী করে দেখায়। শত হলেও লজ্জার ব্যাপার তো।'

ঘুম-ঘুম হোটেল ও তার চারপাশ, ঠিক রাত দশটায় হাজির হয়েছে অনুতোষ।

হ্যাঁ, এই তো সেই উত্তরমুখো নিচের ঘর। এক পলকের জন্যে অনুতোষ টর্চ টিপল। সব একেবারে পটে আঁকা। নিখুঁত।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছে বটকৃষ্ণ, তার একটা হাত জানলার দিকে বার করা, বাড়িয়ে ধরা। নিষ্পন্দ। নিরাসক্ত।

নোটের তাড়াটা গুঁজে দেবে, হঠাৎ কী খেয়াল হতে অনুতোষ কম্বল ধরে এক টান মেরে বসল।

ও হরি! বটকৃষ্ণ কোথায়, এ যে স্বয়ং গজানন।

চোর! চোর! হোটেল থেকে সমবেত একটা চিৎকার উঠতে না উঠতে প্রাণপণ ছুটে পালিয়ে গেল অনুতোষ।

পরদিন চিত্ত উকিলকে সব বললে।

চিত্ত বোস বিচলিত হল না। বললে, 'বেশ, জুরির তদবির না হয়, আমরা হাকিম তদবির করব। হাকিমকে বাগাতে পারলে জুরি কী করবে?'

সে আবার কী সর্বনাশ কে জানে।

'লাগবে কত?' কাচুমাচু মুখে জিজ্ঞেস করলে অনুতোষ।

'হাজার খানেক। একটা সম্মান আছে তো? ভয় নেই, আমি নিজে ওঁর বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসব।' চিত্ত অন্তরঙ্গ হল: 'বুঝলেন, এর বই দিচ্ছি বলে বইয়ের মধ্যে গুঁজে দেব এনভেলাপ।'

এতগুলি টাকা! অনুতোষ আশুতোষকে জানাল।

'খবরদার দিসনি।' আশু ঘোষ গর্জে উঠল: 'বইয়ের মধ্যে শুধু এনভেলাপ যাবে। টাকা যাবে চিত্তের চিত্তরঞ্জনে।'

'দেখি কুলদা মিত্তির কী বলে।' তবু অনুতোষ গাঁইগুঁই করতে লাগল।

'ওসব ধরে কিছু হবে না।' আশু ঘোষ উপরের দিকে তাকাল: 'আসলকে ধর।'

'যদি হয় খোদকারিতে হবে, খোদা ধরে তো দেখলে এতদিন।'

'দেখেছি।' আশু ঘোষ বুনো গোঁ ধরল: 'আমি যাব না কোর্টে।'

আমি খোদাকে ধরিনি, আমি খোদকে ধরেছি

'সে কী!' চোখে আঁধার দেখল অনুতোষ: 'জামিন জব্দ হবে। ধরে নিয়ে গিয়ে জেল হাজতে পুরবে।'

'নিক। পুরুক। তবে আর কোর্টে কেন, যেখানে যাবার সেখানে যাব।'

আশু ঘোষের মাথা খারাপ হয়েছে। স্ত্রীর কান্নাতেও টলল না। অনুতোষ যেমন যায় তেমনি গেল। কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গিয়ে গড়ায় কে জানে।

অনুতোষ কোর্টে গিয়ে দেখল, অভিনব। পি-পি কেশব দাস দরখাস্ত করছে আশু ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেবার অনুমতি চাই।

কোর্ট দিয়ে দিল অনুমতি।

আশুতোষ ঘোষ খালাস। যে খালাস তার আবার কোর্টে হাজির হবার কী দরকার!

আশ্চর্য, ঠিক তাক বুঝেই তো আসেনি আশু ঘোষ।

সবাই বললে, অঘটন আজো ঘটে। দেখ, দেখ ঈশ্বরবিশ্বাসের পুরস্কার।

'না, না, মোটেই ওসব কিছু নয়।' আশু ঘোষ বললে বুক ফুলিয়ে, 'আমি খোদাকে ধরিনি, আমি খোদকে ধরেছি।'

পরাশ্রিত বিদ্যা

সবিনয় নিবেদন,

দেশ, ২৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যায় সম্পাদকীয় "পরাশ্রিত বিদ্যা" প্রবন্ধটি পড়িলাম। দেশের জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞানীদের প্রতি, দেশের মূল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—সে কারণ আপনি ধন্যবাদার্হ। কোন কোন ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীর ব্যক্তি-স্বার্থবাদী আত্মকেন্দ্রিকতার আপনি নিন্দা করিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত সুখ-বিলাসের প্রতি সমস্ত লক্ষ্য না দিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেশের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

আপনি কোন্ প্রখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানীর মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন জানি না। বিজ্ঞানী হলডেন কিন্তু বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কৃতী ও মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানকর্মীরা নতুন চিন্তা ও গবেষণাকর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশীই উৎসুক—কিন্তু এই কর্মশক্তিকে যথাযথ কাজে লাগাইবার চেষ্টারই অভাব। বোম্বাই বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞানী হলডেন দেশের এই সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

বিদ্যা চিরকালই গুরুমুখী এবং গুরুদের দেশকালে সীমিত করা যায় না। কাজেই পরাশ্রিত বিদ্যা বলিতে আমি মনে করি—আপনি আত্মশক্তিতে অনাস্থা এবং পরানুগ্রহে জীবনে অর্থ ও বিলাসে প্রতিষ্ঠালাভের কথাই বলিয়াছেন।

বর্তমান যুগ গতিশীলতার যুগ। বর্তমান যুগের অনগ্রসর দেশগুলির সমস্যা হইল জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে যে দেশগুলি কর্ম করিয়া পাঁচশত বৎসর আগাইয়া রহিয়াছে তাহাদের সহিত সমতালে পা ফেলিতে হইবে। এই বিরাট কর্মটি কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা সম্ভব নয়—যদি না তিনি বিশেষ 'প্রতিভা' না হ'ন। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র নিজের চেষ্টায় পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। আচার্য রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরা আপন শক্তিতে অনুরূপ সিদ্ধি আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে খ্যাতিবান বিজ্ঞানী এখনও বেশ কয়েকজন বর্তমান। তবুও ভারতবর্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা পরাশ্রিত, পরাজিত কেন—তাহার সন্ধান আরও গোড়ায় করিতে হইবে। জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি এখন সীমাতীত—অর্জিত জ্ঞানের সম্যক পরিচয় লাভ করিতেই পৃথিবীর যে কোন অগ্রসর দেশের একটি লোকের সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়—কাজেই নতুন জ্ঞানসম্পদ সৃষ্টি করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর, স্পেশ্যালাইজড্ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত প্রতি বিভাগের সহিত সংযোগও তেমনি তীব্র। কাজেই বিজ্ঞান-কর্মীর গোড়ার শিক্ষায় কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের পাঠ থাকিলেই চলিবে না—বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগগুলির পারস্পরিক সংযোগের চিত্রগুলিও পরিষ্কার জানিতে হইবে। কাজেই প্রয়োজন হইল কর্মী তৈরীর যথার্থ সংগঠন কিংবা কর্মশালা স্থাপন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবার পর বহু বিদ্যালয় খুলিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ১৯৪৮ সালে যাহারা ৭ম-৮ম শ্রেণীর ছাত্র ছিল—তাহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী লইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ বিদেশে আসিয়াছে এবং বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া বুঝিয়াছে তাহাদের জ্ঞান কত সীমিত। এখনও অনেকখানি পথ অতিক্রম না করিলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতে পারিব না। কাজেই মূল সমস্যা হইল বিজ্ঞান-কর্মীকে যথার্থ কর্মীরূপে সৃষ্টি করিবার অভাব। শিক্ষকের অভাব। ব্যাপকতর শিক্ষাদানের অভাব। দেশ স্বাধীন হইবার পর মৌল গবেষণার পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত এবং স্বচ্ছন্দ হইয়াছে সত্য—কিন্তু সেখানে কর্মযোগীর আবির্ভাবের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ হয় নাই। আমি এমন বহু কর্মীকে জানি যাহারা নিজেদের বিদ্যায় অপূর্ণতা অনুভব করিয়া বিদেশে বিদ্যার্জনের জন্য আসিয়াছে, দেশে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া, সরকারের কোন সাহায্য না লইয়া। কারণ সরকার হইতে তাহাদের জানানো হইয়াছে বিজ্ঞানকর্মী হইলেও তাহাদের Study leave দেওয়া সম্ভব নয়। তাহারা কোনরূপ সরকারী সাহায্য পাইতে পারে না। বিদেশ হইতে আপন চেষ্টায় যথার্থ বিজ্ঞানকর্মী রূপে নিজেকে তৈরী করিয়া যখন সে দেশে ফেরে—তখন দেশের বিজ্ঞানসংগঠনগুলি হইতে ভাগ্যানুযায়ী দুরকম অভ্যর্থনা পায়। যদি তার পরিচিত কেউ সংগঠনের কর্তা-ব্যক্তি হন তবে ভাল চাকুরি মিলিল, যদি কেউ না থাকেন তবে এ সংগঠন ও সংগঠন ঘুরিয়া সুস্থ পরিবেশে কাজ করিবার সুযোগ না পাইয়া আবার বিদেশে চাকুরি করিতে ফিরিতে হয়। গত দশ বছরের ইহাই ইতিহাস। ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মী বিদেশে বসিয়া মৌল গবেষণায় নাম করিতে পারেন—অথচ ভারতবর্ষে তাহা কেন সম্ভব হয় না তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানকর্মীদের প্রতি দোষারোপ করিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। আচার্য রমনের আবিষ্কারের পর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। রমন এফেক্ট দ্বারা বহু গবেষণায় সিদ্ধি আসিতেছে—ঐ রমন এফেক্ট মাপিবার যন্ত্র ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় তৈরী হইতেছে—ভারতবর্ষে হয় নাই। কেন হয় নাই—তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না।

দেশনেতাদের দৃষ্টি যদি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি দেশাত্মবোধের প্রতি না জাগরিত হয় তবে অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিজ দায়িত্ব স্খালন হইবে মাত্র। দেশ আগাইবে না। ইতি—

বিনীত

সুজিত চক্রবর্তী

পিটাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়; পিটাসবার্গ

লেখকের ভূমিকা

সবিনয় নিবেদন,

ফুলের যেমন সৌরভ, গুণের তেমনি যশ। দুয়ের মাঝখানে যোগসূত্র সময়—লৌকিক ভাষায় যাকে আমরা ধৈর্য বা প্রতীক্ষা বলে

থাকে। কিন্তু গুণবান ব্যক্তিমাত্রেই মাঝখানের এই যোগসূত্রের কথা সবসময় স্মরণ করেন না; অথবা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, কনীনিকার সম্মুখীন অঙ্গুলির মতো, এই সত্য উপলব্ধি করতে তাঁদের উদার সুযোগ দেয় না। ফলে, তা প্রকৃত গুণগ্রাহীর পক্ষে দুঃখ-জনক হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের যদি কোনো একটি শিক্ষা থাকে, তবে তা এই যে, সমকালীন যুগের করতালিই যথার্থ গুণবান ব্যক্তির উপযুক্ত বিচারক নয়। গুণের স্বাক্ষর বহন করে যে-সব বিষয়, তাদের প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন দিক থাকতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, রুচি, শিক্ষা এবং মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে সেই দিকগুলি এক-একটি বিশেষ আবেদন বহন করে। অনেকে প্রত্যেকেই নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি গ্রহণীয় বলে মনে হলে তার সমাদর করে থাকেন। গুণবান ব্যক্তি যতক্ষণ না তাঁর বিশেষ গুণটি সমাদৃত হচ্ছে সাধারণত অতৃপ্ত থাকেন। বিগত রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্বজনীনতা ও মানবিকতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আলোচিত হয়েছে। এই আকস্মিক ও এক সুরে-বাঁধা আলোচনাগুলি পড়লে মনে হয় যেন এই সব ব্যক্তিরা সাহিত্য-ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে সুখেই কালাতিপাত করছিলেন, কিন্তু যুগপ্রয়োজনের খাতিরে আত্মরক্ষার জন্যই সহসা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঐ এক্সট্র্যাক্টগুলি পড়ে ফেলেছেন। এ-কথা তর্কাতীত যে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, প্রথমত, একমাত্র ঐ গুণগুলিই আমরা বুঝি না কেননা ঐ গুণগুলিই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বা কেন্দ্রীয় গুণ নয়। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের গুণবিচার এতে অতৃপ্ত থাকে। একটি নমুনা হিসেবে বিষয়টি উল্লেখ করা হল। অবশ্য যশোলিপ্সা তীব্রতর হলে এই অতৃপ্তির ক্ষতিপূরণ হয়ে থাকে। স্বীকার করা ভালো সে-অবস্থায় অন্তরের শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে। যথার্থ শিল্পীকে—রাষ্ট্র, সমাজ বা কোনো প্রতিষ্ঠান—কোনো সাহায্যই করতে পারেন না। সাহায্য যদি কেউ একান্তই পায় তবে সে শিল্পীর নাগরিক সত্তা, শিল্পীসত্তা নয়। একই শরীরের আশ্রয়ে যেহেতু এই দুই সত্তা প্রতিবেশী, সেই জন্য একটি সত্তার কৃতজ্ঞতাবোধের দ্বারা অপর সত্তাটির আক্রান্ত ও অসুস্থ হবার আশঙ্কা থাকে। আপনাদের পত্রিকায় (২৪ চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) 'লেখকের ভূমিকা' শীর্ষক সম্পাদকীয়টি এই পরিপ্রেক্ষিতে কালোপযোগী দায়িত্ব পালন করেছে। আপনারা সেজন্য ধন্যবাদার্হ।

শান্তনু কর
কলকাতা।

॥ ৩৮ ॥

হোটেলে ফিরতেই সত্যসুন্দরদা বললেন, "তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। শুধু শুধু রাত্রে কষ্টভোগ করলে। মার্কোপোলো ফিরে এসেছেন। সঙ্গে মিস্টার বায়রনও ছিলেন। তিনিই ওঁকে ধরে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে, বেয়ারাদের হাতে জমা করে দিয়ে চলে গেলেন।"

মার্কোপোলো কাউন্টারের সামনে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন এই হোটেলের তিনি এক নতুন আগন্তুক, এখানকার কিছুই চেনেন না, জানেন না। সত্যসুন্দরদা প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন, আমাদের সকলের দুশ্চিন্তার সংবাদও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যে মার্কোপোলো সারাদিন হোটেল মাথায় করে রাখেন, প্রতিটা খুঁটিনাটির খবর না নেওয়া পর্যন্ত নিজেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, রাতের অন্ধকারে তিনি কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে সত্যসুন্দরদার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন তোমরা সারারাত জেগে থাকো?"

সত্যসুন্দরদা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। "আপনিই তো ডিউটি চার্ট সই করেন।"

মার্কোপোলো হতাশায় মাথা নেড়েছিলেন। বলেছিলেন, "ইউজলেস। কোনো মানে হয় না। দুনিয়ার সব লোক যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এমনভাবে বোকার মতো আসর জাগিয়ে রাখবার কোনো মানে হয় না।"

মার্কোপোলোর দৃষ্টি এবার সুজাতা মিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি কিছু বলবার আগেই বোসদা জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভদ্রমহিলা হাওয়াই জাহাজের কর্মী, আমাদের অতিথি। মার্কোপোলো সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। আরও কথা বলবার ইচ্ছা ছিল বোধ হয়, কিন্তু শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন।

মিস্ মিত্র বললেন, "আমার খুব মজা লাগছিল। প্রতিদিন মাটি থেকে অনেক উঁচুতে মেঘের আড়ালে কত লোককেই তো দেখি। কিন্তু আপনাদের এখানে আরও অদ্ভুত সৃষ্টির আনাগোনা। ইচ্ছে হয়েছিল, একবার আপনাদের ম্যানেজারকে বলি, রাত্রি আর নেই।"

বোসদা প্রথমে হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওঁর জীবনে এখনও রাত্রির অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে। ওঁর জন্যে সত্যিই কষ্ট হয়।"

সুজাতা মিত্রকে তখনও কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যে একটু অবাক হয়েছি এমন নয়। বোসদা বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার গাড়িটা দিলেন, নিজেও এতোক্ষণ জেগে রইলেন।"

সুজাতা মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার গুরুদেব এখন আবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। দেখুন যদি ওঁকে সাহায্য করতে পারেন।"

আমি হেসে বললাম, "ওটা ধন্যবাদ জানানোর একটা ফর্ম।"

সুজাতা মিত্রের পিছনের বেণীটা এবার সাপের মতো দুলে উঠলো। বললেন, "ফর্মাল লোকদের আমরা তেমন পছন্দ করি না।"

বোসদা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "বছরকার দিন এইভাবে ম্যানেজমেন্ট স্টাফকে গালাগালি দিচ্ছেন। এই জন্যেই বোধ হয় প্যাসেঞ্জাররা দেশী হাওয়াই হোস্টেস পছন্দ করেন না।"

"বটে! যদি পছন্দই না করতো তা হলে আরও নতুন মেয়ে নেওয়া হচ্ছে কেন?"

"তা হলে বোঝা যাচ্ছে নতুন যারা ঢুকেছে তারা অনেক ভদ্র এবং ভালো।" বোসদা সকৌতুকে উত্তর দিলেন।

"এতো উকিলদের মতো কথা বললেন। এখানে আসবার আগে কি আদালতে প্র্যাকটিশ করতেন?"

"আদালতের কথা তুলবেন না। এ বেচারার মন খারাপ হয়ে যায়। এক আদালতের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।" আমাকে দেখিয়ে বোসদা বললেন।

আমি এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। সুজাতা মিত্রের টানা-টানা দুটো চোখে ঘুমের মেঘগুলো জড়ো হবার চেষ্টা করছে; কিন্তু কিছুতেই যেন তেমন সুবিধে করতে

পারছে না। বোসদাও বোধ হয় এবার তা লক্ষ্য করলেন। বললেন, "আই এম স্যরি। রাত্রির আর বেশিক্ষণ নেই। এতোক্ষণ ধরে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।"

একটাও পোর্টার কাছাকাছি ছিল না। সুজাতা মিত্র নিজেই সুটকেসটা তুলে নিতে যাচ্ছিলেন। আমি আড়চোখে বোসদার দিকে তাকালাম। বোসদা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিলেন। সুজাতা বোধ হয় একটু অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু বোসদা আমাকে ডুবিয়ে দিলেন। বললেন, "ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি ব্যাগ বইছেন তো হয়েছে কী? কিন্তু শ্রীমান আমার দিকে এমন কটমট করে তাকালো, যেন আমার মতন এমন সমর্থ কুলি থাকতে কোনো মহিলা তাঁর ব্যাগ বইবেন, তা সে সহ্য করবে না।"

সুজাতা মিত্র এবং বোসদা দুজনেই যেন এবার সলজ্জভাবে আমার দিকে তাকালেন। তারপর শাজাহানের দ্বারপ্রান্তে আমাকে একলা প্রহরী রেখে দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শাজাহানের নিস্তব্ধ রাত্রি এখন যেন আমার পরিচিত হয়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের এই প্রাচীন পান্থশালা আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এখন আমাকে আর বিস্মিত করে না। যেন পরিচয়ের অন্তরঙ্গতম পর্যায়ে এসে এই প্রাচীন প্রাসাদ তার কোনো রহস্যই প্রিয়বন্ধুর কাছে গোপন রাখেনি।

কিন্তু সে তো কেবল এই প্রাসাদপুরীর ইটকাঠ পাথরের কথা। এই নাট্যশালার প্রতি প্রকোষ্ঠে, ঠিক এই মুহূর্তেই কত নাটকের শুরু এবং শেষ অভিনীত হচ্ছে কে তার খোঁজ রাখে? সে-রহস্য সত্যিই যদি কোনো নিস্পৃহ সত্যানুসন্ধানীর চোখে ধরা দিত, তা হলে পৃথিবীর সাহিত্য হয়তো অসীম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত করতে সাহায্য করতো।

রাত্রের এই কর্মহীন মুহূর্তের সবচেয়ে বড়ো কাজ বোধ হয় ছড়ি হাতে করে ঘুমকে তাড়ানো, তাকে কাছে আসতে না দেওয়া। তাই চিন্তার এই বিলাসিতাটুকু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মেনে নিতে হয়। কিংবা হয়তো শাজাহানের অশরীরী আত্মা বিংশ শতাব্দীর এই আলোকোজ্জ্বল অন্ধকারে আর কাউকে না পেয়ে বেচারা রিসেপশনিস্টের উপর ভর করে, এবং তার চোখের সামনে অতীতের সোনালী সুতোয় এক নয়নাভিরাম চিন্তার জাল বুনতে শুরু করে।

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। "হ্যালো, রিসেপশন? আমি শ্রীলেখা দেবী কথা বলছি।"

শ্রীলেখা দেবী কি রাত্রে ঘুমোন নি? হয়তো নিজের ঘরদোর ছেড়ে হোটেলে রাত্রি কাটাতে এসে অস্বস্তি বোধ করছেন।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, "আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে কী ইনসট্রাকশন আছে?"

"আজ্ঞে, কাউকে আপনি কত নম্বর ঘরে আছেন বলবো না। এবং আপনার স্বামী যদি আসেন তাঁকে যেন তাড়িয়ে দেওয়া হয়।"

শ্রীলেখা দেবী যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন। প্রশ্ন করলেন, "কেউ কি আমার খোঁজ করতে এসেছিল?"

"এখনও রাত্রি রয়েছে, এখন কে আসবেন বলুন? এ-সময়ে কেউ হোটেলে আসে না।"

"বাজে কথা বলবেন না। হোটেলের কতটুকু দেখেছেন আপনি? মিস্টার স্যাটা বোসকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমার স্বামী এর আগে যতবার রাগ করে চলে এসেছি ততবার এই সময়ে এখানে এসেছেন।"

এবার সত্যিই আমার অবাক হবার পালা। শ্রীলেখা দেবী বললেন, "আপনি বাইরে একটু খোঁজ করে দেখুন তো। আমি ফোনটা ধরে রইলাম।"

কাউন্টার থেকে বেরিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর উপরেই গরদের পাঞ্জাবী এবং পায়জামাপরা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইনিই যে শ্রীলেখা দেবীর স্বামী তা সিনেমা রিপোর্টারদের ক্যামেরার কল্যাণে এদেশের কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন নেই।

বললাম, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন। "আমি তো মশাই আপনার হোটেলে ঢুকিনি। কোম্পানির রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি, তবু গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসেছেন?"

ফিরে গিয়ে টেলিফোনে খবরটা শ্রীলেখা দেবীকে জানালাম। শ্রীলেখা দেবী যেন এই সংবাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এই খবর না পেলেই যেন তিনি আশ্চর্য হতেন, হয়তো হতাশায় ভেঙে পড়তেন।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, "ওঁকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারেন।" আমি আমাদের অসুবিধার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই শ্রীলেখা দেবী বললেন, "কিন্তুর কোনো প্রশ্ন নেই, আপনি ডবল রুমের চার্জ করবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে, আবার বাইরে গেলাম। ভদ্রলোক তখনও একটা থাম ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "এক্সকিউজ মি, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ভিতরে আসুন।"

ভদ্রলোক তাঁর রক্তচক্ষু এবার আমার দিকে
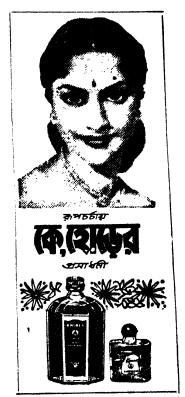
ঘোরালেন। "ধন্যবাদ। ভিতরে যাবার কোনো প্রয়োজন হবে না।"

এবার জানালাম, শ্রীলেখা দেবী তাঁকে ঘরে যেতে বলেছেন। আমি তাঁকে শ্রীলেখা দেবীর ঘর চিনিয়ে দিতে পারি।

"যথেষ্ট হয়েছে," ভদ্রলোক উদাসীনভাবে বললেন। পকেট থেকে দেশলাই বার করে ভদ্রলোক এবার একটা বিড়ি ধরালেন। চিত্রজগতের অসামান্যা তারকার স্বামীকে বিড়ি ধরাতে দেখে আমি সত্যিই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

স্বাধীনা ভদ্রলোক তাঁর রাতজাগা ঘোলাটে চোখ দুটো দিয়ে আমাকে যেন গিলে খাবার চেষ্টা করছেন। বললেন, "স্বভাবটা একটুও পাল্টাতে দিইনি। দুর্গাকে নিয়ে যখন কলকাতায় এসেছিলাম, তখন দু'জনে ছোটো শাজাহানে খেয়ে গিয়েছি। অতো সস্তায় কোথাও খেতে পাওয়া যেতো না। তখনও বিড়ি খেতাম, আর এখনও আমি সেই বিড়ি খাই। দুর্গাই আপনাদের শ্রীলেখা দেবী হয়েছেন, ছোটো শাজাহান ছেড়ে বড়-শাজাহানে এসে উঠেছেন। আমার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি।"

ভদ্রলোক কিছুতেই ভিতরে আসতে রাজী হলেন না। "সেই থেকে এই চারটে পর্যন্ত যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তা হলে আরও কিছুক্ষণ আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হবে না।" ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

কাউন্টারে ফিরে আসতে আসতেই শুনলাম টেলিফোনটা আবার বাজছে। শ্রীলেখা দেবীর যেন সামান্য দেরিও সহ্য হচ্ছে না। "হ্যালো, ওনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

বলতে হলো, "উনি আসতে রাজী হচ্ছেন না।"

শ্রীলেখা দেবী আর কালবিলম্ব না করে টেলিফোন নামিয়ে দিলেন। আমি মনে মনে বললাম, "এ আবার কী ব্যাপার? এই এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ, আবার রাত না কাটতেই নাটক!"

তবে লোকটা যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের। চোখ দুটো দেখলে সত্যিই ভয় লাগে।

শ্রীলেখা দেবী যে এখনই নিজের ঘর ছেড়ে কাউন্টারে নেমে আসবেন তা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। মেক-আপের বাইরে শ্রীলেখা দেবীর সেই মূর্তি আজও আমি ভুলিনি। চুল-টুল উস্কোখুস্কো। মুখেও রাতের সব ক্লান্তি জড়ো হয়ে রয়েছে। যেন স্টুডিওর সেটে কোনো হৃদয়বিদারক দৃশ্যে তিনি অভিনয় করছেন।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, "আমার ভয় ভয় করছে। আপনি আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত একটু আসুন না। বলা যায় না, হয়তো সঙ্গে করে অ্যাসিড নিয়ে এসেছে, আমার মুখ পুড়িয়ে দেবে।"

এমন অবস্থায় হোটেলের কর্মচারীরও কাঁদতে ইচ্ছে করে। হয়তো পুলিস কেসে জড়িয়ে শ্রীঘর বাস করতে হবে। বেশ ভয় করছিল। বছরের কোনো চাঞ্চল্যকর ফৌজদারী মামলার প্রথম অঙ্ক হয়তো আমারই চোখের সামনে অভিনীত হতে চলেছে।

একবার বারণ করলাম শ্রীলেখা দেবীকে "এমন সময় বাইরে না গেলেই নয়?"

শ্রীলেখা দেবী কোনো উত্তর দিলেন না। সোজা দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর পিছন পিছন চলতে হলো।

দরজার কাছে গিয়ে শ্রীলেখা দেবী আমাকে আর যেতে বারণ করলেন। দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম শ্রীলেখা দেবী তাঁর স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর স্বামী রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীলেখা দেবী এবার স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ও'দের মধ্যে যে কী কথা হলো, তা দূর থেকে আমার বোঝা সম্ভব ছিল না। হঠাৎ মনে হলো শ্রীলেখা দেবী ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আর তাঁর বিব্রত স্বামী তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু আরও বোঝবার আগেই দেখলাম ও'রা দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে একটা গাড়ির

মধ্যে গিয়ে উঠলেন। কোনো কথা না বলে, শ্রীলেখা দেবীর স্বামী গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছেন।

রাস্তার সামনে দিয়ে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে আমার যেন সম্বিত ফিরে এল। হঠাৎ খেয়াল হলো, বিলের টাকা দেবে কে? শ্রীলেখা দেবী পেমেণ্ট করেন নি।

ভয় হলো, এই এক রাত্রির দাম হয়তো আমার মাইনে থেকেই কাটা যাবে। কারণ বিল আদায়ের দায়িত্ব আমার। বিল চাইবার কথা ওই অবস্থার মধ্যে আমার মনে একবারও উঁকি মারেনি।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে আলোর রেখা রাস্তার উপরে এসে পড়তে শুরু করেছে।

"কালী, কালী, ব্রহ্মময়ী, মা আমার"—বলে ন্যাটাহারি বাবু গঙ্গাস্নানের জন্যে নিচেয় নেমে এসেছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, "মা গঙ্গায় ডুব দেবার অভ্যেসটা করুন। না হলে পাপের অ্যাসিডে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবেন। এই যে নিত্যহরি ভট্টাচার্য এতো পাপ ঘেঁটেও আজও মাথা উঁচু করে বালিস বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা কেবল এই মাদার গ্যাঞ্জেসের জন্যে। রোজ এই নোংরা বডিটা ধুয়ে কেচে পরিষ্কার করে নিয়ে আসছি। কত ময়লা লাগবে লাগুক না।"

আমি চুপ করে রইলাম। নিত্যহরি বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "গরীব বামুনের কথা বাসি না হলে মিষ্টি লাগবে না। মা জননীকেও কতবার বলেছিলাম। যাই করো মা, সকালে মা-গঙ্গাকে একটা পেন্নাম ঠুকে এসো। তা মা আমার কথা শুনলেন না। ইংরিজী শেখা গেরস্ত ঘরের মেয়ে কপাল দোষে পাপস্থানে এসেছিল।"

ন্যাটাহারিবাবুর চোখ দুটো যেন হঠাৎ ধক্ ধক্ করে জ্বলতে আরম্ভ করলো। "আমি কে বলুন তো মশাই? সাতকুলে তোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু লিনেন সাপ্লাই করেছি। তা বাবা, থেকে থেকে আমাকেই স্বপ্নে দেখা দেওয়া কেন?"

"হয়তো আপনি তাঁকে ভালবাসতেন, তিনিও হয়তো আপনাকে ভালবাসতেন", আমি বললাম।

ন্যাটাহারিবাবুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সযত্নে ডাকা বেদনাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। "এতো বোকা জাত, মশাই দুনিয়ায় দেখিনি। বিষ খাওয়া কী কথা গো? আমার বউ—সে মাগীও মশাই বিষ খেয়ে মরেছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরিনি বলে। মাকে বলেছিলুম—শিখ পাঞ্জাবীতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বউ আমার বিশ্বাস করলে না। বললে, 'তোমার মুখে কিসের গন্ধ?' বললাম, 'অনিয়নের গন্ধ।

'অনিয়ন? সে আবার কী' বুদ্ধিমতী মেয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করলে। রেগে বললাম, 'অনিয়ন মানে পেঁয়াজ, বাপ তো তোমায় কিছুই শেখায় নি।'

তখন মুখে আমার ভুক ভুক করে দেশী মালের গন্ধ ছাড়ছে। আমার নিজেরই বমি আসবার উপক্রম। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ছোটবেলা থেকে অনিয়ন দেখে আসছে, সব বুঝতে পারলো। তারপর ওদের এক অস্ত্র। আমাকে সংশোধন করবার একটা সুযোগ দিলে না। দুনিয়ার মেয়েদের মশায় আর কোনো ক্ষমতা নেই, শুধু বিষ খেতে জানে।

সেই থেকেই ভুগছি। সেই মহাপাপে বাউনের ছেলে ধোপার ময়লা দুহাতে ঘেঁটে মরছে। আরও খারাপ হতো, হয়তো মাথায় বজ্রাঘাত হতো, কিন্তু মা-গঙ্গা রক্ষা করছেন।"

ন্যাটাহারিবাবু এবার নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। তাঁর চোখ দুটো ছল ছল করছে। আমার হাতটা তিনি জোরে চেপে ধরলেন। করুণভাবে, পরম স্নেহে বললেন, "খুব সাবধান বাবা। কার কপালে ভগবানের অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গুপ্ত সায়েব যে কী লিখে রেখেছেন, কেউ জানে না।"

ন্যাটাহারিবাবু বিদায় নিলেন, আর কেমন যেন অস্বস্তিতে মন ভরে উঠলো। এতো দিনে ন্যাটাহারিবাবুকেও যেন চিনতে পারলাম। এক সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্নের রাত যেন আমি কোনোরকমে পেরিয়ে এলাম। বিছানায় আর কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ইচ্ছা করছিল না।

বেয়ারাকে ডেকে তুলে বললাম, "তুমি একটু পাহারা দাও, আমি আসছি।"

ভোর হয়েছে। আমাদের ঘরগুলো যেন সূর্যমিলনের মধুর সম্ভাবনায় নববধূর সলজ্জ মুখের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে।

বোসদা দরজা খুলে দিয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে হাসলেন। ওঁর হাসিতে সব সময়েই যেন আমার জন্যে অনেক আশ্বাস লুকিয়ে থাকে। মনে যেন একটু বল পেলাম।

শ্রীলেখা দেবীর ব্যাপারটা বললাম। তিনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "ভয় কী? আমি ওঁর ঠিকানা জানি। দরকার হয় টাকা চেয়ে পাঠাবো। তা অবশ্য দরকার হবে না। তিনি নিজেই চেক পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক একই ব্যাপার আগেও হয়েছে। মুখ পোড়াবার ভয়ে রাত্রে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, আবার ভোর না হতেই মিটমাট হয়ে গিয়েছে। এরকম দৃশ্য আমি, বহু দেখেছি। তোমায় বলে দেওয়া উচিত ছিল, তা হলে তুমি অযথা চিন্তা করতে না।"

আমার পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বোসদা বললেন, "ন্যাটাহারিবাবুরও বিশ্বসংসারে কেউ নেই। তাই এখানে একলা পড়ে রয়েছেন। আমাদের পুরনো ম্যানেজারের হুকুম আছে, ওঁকে যেন কখনও চাকরি ছেড়ে চলে যেতে না বলা হয়। যত বয়সই হোক শাজাহান হোটেলে ওঁর চাকরি চিরকাল বজায় থাকবে।"

বোসদা এবার একটা কাচের গেলাস আমার হাতে দিয়ে বললেন, "বাথরুম থেকে গেলাসটা ধুয়ে নিয়ে এসো। একটু দেশী মতে চা খাও। গত রাত্রিটা সত্যিই তোমার খুব খারাপ কেটেছে।"

(ক্রমশ)

পূর্ব বার্লিন। ম্যাক্সিম গোর্কী থিয়েটার। প্রথম সারির মধ্যস্থলে বসে আছি। পাশেই আছেন পূর্ব বার্লিনের বিখ্যাত হাসপাতাল "সারিথির" ক্যানসার বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ ডরফেল। ওঁর আমন্ত্রণেই আজ গোর্কী থিয়েটারে যাব। ওঁর ইচ্ছে, পৃথিবীর প্রাচীন অথচ অন্যতম ভারতীয় রচনা শূদ্রকের "বসন্ত সেনা" নাটকটি একজন ভারতীয়র সঙ্গে বসে দেখেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে গোটা পরিবার মিলে নাটকটি দেখে গেছেন। সেদিন ওঁর বাড়িতে যেতেই, সবাই মিলে অকুণ্ঠ প্রসংশা। এত প্রাচীন, অথচ এত প্রগতিশীল। তখনি ডঃ ডরফেল ঠিক করে ফেললেন—আবার আমার সঙ্গে বইটা দেখবেন। সেই সঙ্গে তিনি কুণ্ঠাও প্রকাশ করলেন—হয়ত আমার বইটা ভাল লাগবে না জার্মান শিল্পীদের অভিনয়ে।

সত্যি কথা বলতে কি, বার্লিনে আসার পর এই ভারতীয় নাটকটি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা শুনেছি। স্বপক্ষে, বিপক্ষে, দুই-ই। তাই দ্বিধা আমার যথেষ্টই ছিল। ম্লেচ্ছ ভঙ্গীতে নাটকটির না জানি কি শোচনীয় অবস্থাই দেখব। এই কারণে সাধারণত ভারতীয়রা এই নাটকটিতে পা বাড়ান না। কিছুকাল পূর্বে হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোলজি বিভাগের এক ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। অথচ আমি জানি, এই নাটকের পরিচালক ইণ্ডোলজি বিভাগের পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রকার কর্তব্যের ত্রুটি রাখেন নি। তাঁর পরিচালনায় তিনি গর্ব বোধ করতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে আবার দুটো টিকিট কাটা হ'ল। থিয়েটারের টিকিট! বিশেষ করে শনি, রবিবার! অন্তত দু সপ্তাহ আগে টিকিট বুক না করলে, থিয়েটার ব্যালে আর অপেরা দেখা অসম্ভব। অথচ পূর্ব আর পশ্চিম বার্লিনে থিয়েটার অপেরার অভাব নেই। এই ত সেদিন প্রায় ৩ কোটি মার্ক ব্যয় করে পশ্চিম বার্লিনে "জার্মান অপেরা বার্লিন"-এর উদ্বোধন হ'ল। Theatre des Westen আর Schiller Theatre-সহ অজস্র ছোট বড় থিয়েটার হল পশ্চিম বার্লিনে ছেয়ে আছে। আর পূর্ব বার্লিন! কম্যুনিস্ট নগরীতে আর যা-কিছুর অভাব থাক, থিয়েটার-ব্যালে-অপেরার যে অভাব নেই, একথা পশ্চিমের পরম কম্যুনিষ্ট-বিরোধীরাও নতমস্তকে স্বীকার করেন। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, পশ্চিম বার্লিন থেকে অজস্র নর-নারী প্রতিদিন ১ : ১ টাকা ভাঙিয়ে পূর্ব বার্লিনে কেবল থিয়েটার আর অপেরা দেখতে আসেন। সেখানে হাজার হাজার নর-নারী পশ্চিমে পালিয়ে আসার জন্য উদ্গ্রীব, সেখানে Nora Mank-এর মত প্রথম শ্রেণীর ব্যালেরিনা পশ্চিমের ঐশ্বর্যময় জীবন ছেড়ে ১৩ই আগস্টের পর পূর্ব বার্লিনের Deutsche Staatsoper-এতে (জার্মান স্টেট অপেরা) ভবিষ্যৎ জীবন বেছে নিয়েছেন। মাত্র দু'দিন আগে সুরের সম্রাট রুশ-শিল্পী চেকোভস্কির অমর রচনা "হংসহ্রদের" প্রধান চরিত্র শ্বেত-হংসীর ভূমিকায় Nora Mank-কে যদি সুরের স্রোতে ভাসমান তাঁর চঞ্চল দেহ বল্লরী, উদ্বেলিত বাহু আর গর্বিত গ্রীবা অনবদ্য মরাল ভঙ্গীমায় না দেখতাম, তবে এ প্রবন্ধ লিখতাম না। এখনো দু'চোখ জুড়ে স্বপ্নের মত সেই নীল হ্রদ, সেখানে প্রায় চল্লিশটি হংসী ভেসে বেড়াচ্ছে সুরের স্রোতে। মহিমান্বিত Staatsoper দুটো যুদ্ধের ধ্বংসের পরেও আবার উজ্জ্বল প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মেলে তাকালে অবাক হয়ে যেতে হয়, কি করে দাঁড়ালো এরা, এত বড় যুদ্ধের পর, কেবল পেটের ক্ষুধা নয়, মনের ক্ষুধাও মেটাবার কি বিপুল আয়োজন সমাধা করে ফেলেছে। দুই বার্লিন জুড়ে সারা বছর ধরে চলেছে থিয়েটার, ব্যালে, অপেরা, অর্কেস্ট্রার সমারোহ। সেক্সপীয়ার, গ্যয়টে, শিলার, বার্ণার্ড শ, ব্রেখ্‌ট্ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক নাটক পর্যন্ত সবই সপ্তাহ, মাস আর বছর জুড়ে অভিনীত হচ্ছে। তেমনি বছর ধরে এল, আজো Das Kleine Theatre

পূর্ব বার্লিনে জার্মান স্টেট অপেরা। গত যুদ্ধের সময় এই থিয়েটার-ভবনটি বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। পূর্বেকার স্থাপত্যশৈলী বজায় রেখে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

unter den Linden "Maxim Gorki Theatre"-এ স্বয়ং Lion Feuchtwanger অনূদিত শূদ্রকের "বসন্ত সেনা" নাটকটি সগৌরবে অভিনীত হয়ে চলেছে। Staatsoper-এর বিপরীত দিকে অবস্থিত স্প্রে নদীর ধারে হুমবোল্ডট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ায় গোর্কী থিয়েটার যদিও 'ক্লাইন' অর্থাৎ ছোট, কিন্তু মর্যাদায় অত্যন্ত সম্পন্নশালী। সেখানে অন্যান্য দেশী ও বিদেশী নাটকগুলির সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে ভারতের এই নাটকটি মাসের পর মাস জার্মান নর-নারীর মন জয় করে চলেছে, এটা ভারতের পক্ষে শুধু শুভ প্রচার নয়,

শুভ সূচনাও। যদিও "বসন্তসেনা" ১৯২৪ সালে নিউইয়র্কে এবং ইদানীংকালে মস্কোতেও দু' একবার অভিনীত হয়েছে, কিন্তু এমন ব্যবসাগতভাবে এর পরীক্ষা পূর্বে হয়নি কখনো।

প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভতে এখনো একটু সময় বাকী। পিছনে তাকাতেই গর্বের সংগে লক্ষ্য করলাম, উপরে নীচে কোথাও একটি আসন খালি পড়ে নেই। ডঃ ডরফেল বললেন, এরকম কেবল আজ নয়। প্রতিটি অভিনয়ে এমন পরিপূর্ণ গৃহ। অবশ্য প্রথম দিকে বেশ খালি যেত হলটি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, মানুষের মুখে মুখে নাটকটির প্রচার ততই বাড়ছে। অদূরে ভবিষ্যতে ভারতের অমর রচনাগুলি সুন্দর-ভাবে বিদেশী ভাষায় অনূদিত হলে, বিদেশী থিয়েটারে মঞ্চস্থ হতে পারে, এ-কথাই কি প্রমাণিত হচ্ছে না? কিছুকাল হ'ল, এক জার্মান বন্ধু এখানে নাটক ও থিয়েটারের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগে সহ পরিচালকের কাজ নিয়ে চলে যাবার সময় অত্যন্ত আগ্রহের সংগে ইচ্ছা প্রকাশ করে—বর্তমান সমাজ-জীবন অবলম্বনে রচিত কোন ভারতীয় নাটক যদি পেত, তাহ'লে তাঁরা তা মঞ্চস্থ করত। কেনন, এখানকার দর্শকের এক বিরাট অংশ এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল। অথচ আমাদের প্রায় কোন বইই, বিশেষ করে নাটক-উপন্যাস, জার্মান ভাষায় সোজাসুজি অনূদিত হয় না। বলতে লজ্জা বোধ হয়, এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথের জার্মানভাষায় অনূদিত বই-গুলি নিয়ে আমরা বাঙালীরা এদেশে গর্ব প্রকাশ করি, সেগুলিও বাংলা থেকে সোজা-সুজি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়নি, হয়েছিল ইংরেজী থেকে। তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে, কবিগুরুর কংকালটাই অনুভবে আসে। ইদানীং ডঃ রাধাকৃষ্ণণের বই ছাড়া আর কোন ভাল বই জার্মান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কি-না জানি না। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে একটা যুগ গেছে, যখন Feuchtwanger-এর মত কিছু সংখ্যক দার্শনিক ও লেখক বিপুল পরিশ্রমে ভারতের মর্মবাণীকে জার্মান ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। তাই সেদিন অনূদিত হয়েছিল, ভগবদ্‌গীতা থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দর কিছু রচনা, কালিদাসের শকুন্তলা থেকে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সংখ্যক বই। সেসব গ্রন্থের অনেক-গুলিই এখন আর ছাপা হয় না প্রচারের অভাবে। সেদিন এই বার্লিন নগরীতে বুদ্ধের মন্দির গড়ে ওঠে। ডাঃ ডরফেল বল্লেন, আমি খুব ভাল ভাবেই জানি, সেদিন প্রচুর সংখ্যক নর-নারী হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যার ঢেউ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়, বার্লিনে দু' একটি জার্মান

পরিবারে বিবেকানন্দর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে। তুলনা করে দেখা যায়, ইদানীং-কালে ভারতের উপর যেসব জার্মান বই প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলির বেশীর ভাগই প্রায় ভারতের বিকৃত পরিচয়। আজ আমাদের প্রয়োজন একটি শক্তিশালী বিদেশী প্রকাশালয়—সেখান থেকে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সম্পদশালী বইগুলি বিদেশী ভাষায় সুষ্ঠুভাবে অনূদিত হতে পারে ভারতের প্রচার ও মর্যাদার স্বপক্ষে।

বিশেষ মুশকিলে পড়তে হয়, যখন ডাঃ ডরফেলের মত ভারতদরদী কোন ব্যক্তি, ভারতের মঞ্চ, নাটক ও অভিনেতাদের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেন। তখন কি আর বলা যায়, সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে যে আমাদের গর্ব, সেই কলকাতা শহরে, বিশেষণ দিলে যাঁকে ছোট করা হয়, সেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর শেষ জীবনের কথা। তাঁকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, সুতরাং সে প্রসঙ্গ বাড়াতে চাই না। তবে এটুকু না বলে পারছি না—মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটের একটি প্রকাশালয়ের ছোট্ট ঘরটিতে বসে তাঁকে যে ভাবে নাটকের অনুশীলন করতে দেখেছি, মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রতিভার বিচ্ছুরণ অনুভব করেছি, আজ ইউরোপের এই বিরাট নাট্যমঞ্চগুলিতেও সেই প্রতিভার দীপ্তি খুঁজে পেলাম না। সত্যি হয়ত নেই। যাঁদের নিয়ে এদেশের নর-নারীর আলোচনার অন্ত নেই, তেমন কয়েকজনের অভিনয় দেখার সুযোগ হয়েছে। তাই বলছি—শিশির ভাদুড়ীর দুর্ভাগ্য, তিনি বাংলা দেশে জন্মেছিলেন। মনে পড়ে, ১৯৫২-৫৩ সালের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোন সভায় তীক্ষ্ম রসিকতা করে বলছিলেন—আমার মঞ্চ গেটটি তো হাই-কোর্টে ঝুলছে। বিকেল হলেই যখন দুয়ারের কাছে বসি, দেখি আবালবৃদ্ধবণিতা ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। কোথায়? না, খোঁজ নিয়ে জানি, কি একটা বিখ্যাত হিন্দী বই এসেছে শহরে, সেখানে। কি নাম হে বইটার, বল না—বলতেই কে একজন ছাত্র বলে উঠল "আওয়ারা"। আওয়ারা! ঘর ভর্তি সমস্ত ছাত্ররা প্রাণ খুলে হেসে উঠেছিল।

"আওয়ারা" এদেশেও আসে। অনেকে দেখেও। হলিউড থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ছবিই এখানে আসে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এমন কি সাধারণ মানুষের মধ্যেও সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতে খুব কম শুনেছি। এদেশের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, একটা গোটা দেশ, এমন কি শিক্ষিত সমাজ পর্যন্ত সামান্য সিনেমা আর্টিস্টের কোন বোধ নামে খেপে উঠতে পারে, বা কোন অভিনেতার আগমনে পুলিস ডাকতে হয়। অথচ এদেশে যখন International Film festival হয়, এবং সারা পৃথিবী থেকে অভিনেতারা আসেন, তখন অতি সামান্যই ভিড় জমে কুরফুরস্টেনডামে। সিনেমা ও থিয়েটারের বিরাট তফাত লক্ষ্য করা যায় বেশ ভূষায়। অর্থাৎ সাধারণ বেশে এঁরা ঘর-বার সবই করবে—এমন কি অতি সামান্য পোশাকে এঁরা সিনেমায় পর্যন্ত যাবে। কিন্তু থিয়েটার-ব্যালে আর অপেরার জন্য এঁদের সবচেয়ে প্রিয় পোশাক আর সজ্জা। সত্যি, তখন বোঝা যায়, এদেশের মেয়েদের রূপ, আর রূপের ছড়াছড়ি। মহিলাদের সেই রূপের ভিড়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়—"রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি" তবে এঁদের এই পোশাক ও অলংকারের গর্ব যতটা না মানুষকে দেখাবার জন্য, তার চাইতে অনেক বেশী ক্লাসিকাল সম্পদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ থেকে। এমন কি নাচের সময়ও এঁরা এত সুন্দর পোশাক পরে না। প্রথম পরিচয়ে কোন বান্ধবী বা মহিলাকে সিনেমায় আমন্ত্রণ জানানো অত্যন্ত অভদ্রতা। তাকে নিয়ে যেতে হবে, কোন ভাল থিয়েটার, ব্যালে বা অপেরায়। আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁরা আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

আমিও ডাঃ ডরফেলের আমন্ত্রণ সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত উপভোগ করেছিলাম। এঁদের এই প্রচেষ্টার তুলনা নেই। বইটাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির অভাব নেই, যা একজন ভারতীয়র চোখে ও কানে সহজেই ধরা পড়ার কথা। তবু এঁরা সার্থক। হাজার হাজার নরনারীকে আজ ম্যাক্সিম গোর্কী থিয়েটার একটি ভারতীয় নাটকের রূপ দিয়ে যথার্থ আনন্দ দান করছেন। সমবেত নরনারীর প্রাণ খোলা উপভোগের দৃশ্য দেখলে, ভাবতে হয়—সত্যি কি এঁরা কোন বিদেশী নাটক দেখছেন?

অভিনয়ে চারু দত্তের ভূমিকায় Gerry Wolff নিখুঁতভাবে ভারতীয় ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চলায়, বলায়, হাসিতে একটি চমৎকার ভারতীয় চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। চারু দত্তের বন্ধুর ভূমিকায় Helmut Muller দর্শকদের অবাক করে রেখেছেন। নাম ভূমিকায় Ruth Maria Kempfer চমৎকার অভিনয় করেছেন, কিন্তু ভারতীয় চরিত্র তেমন ফুটে ওঠেনি। সুরারোপ করেছেন—Gunter Hauk, পটটিতে আরো ভারতীয় প্রভাব থাকলে ভাল হত।

বিদায় নেবার কালে Dr. Dorffel বললেন—এবার নাটকটি আমার আরো অনেক বেশী ভাল লেগেছে। "বসন্তসেনা" দেখতে দেখতে সত্যি কি তোমার মনে হয়েছিল, তুমি তোমার দেশ থেকে অনেক দূরে?

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

॥ ১২ ॥

এ উত্তরের জন্য গণেশ হালদার প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চুপ করে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি এটা দৃঢ় বিশ্বাস ও চোরাই মাল পাচার করবার জন্যেই ওখানে গিয়েছিল ?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "কোন কিছু দৃঢ় করবার মতো বিদ্যেবুদ্ধির সিমেন্ট কি আছে ? নেই। তবে সেদিন ওদের ভাবভঙ্গী দেখে সন্দেহ হয়েছিল ওরা চোরাই মালই বোধহয় পাচার করছে। থলিটি বেশ ভারী ছিল, ওরকম ভারী থলি জানলা দিয়ে হাত ফসকে পড়ে গেছে একথা মন মানতে চায় না। দ্বিতীয়ত, ওই গুলি-ছোঁড়া ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকেছিল। তিনি বললেন একটা খরগোশ লক্ষ্য করে উনি গুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু খরগোশ তো ওখানে দেখিনি কোনদিন। তাছাড়া রিভলভার দিয়ে খরগোস শিকারের কথা শুনিই নি কখনও।"

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু। তারপর বললেন, "হঠাৎ আপনার ও মেয়েটির সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন ?"

গণেশ হালদার একটু ইতস্তত করতে লাগলেন বলবেন কি না। কিন্তু শেষে বলেই ফেললেন।

"আমার মনে হচ্ছে আমি মেয়েটিকে চিনি।"

"চেনেন ? আগে আলাপ ছিল ?"

"আমার কাছে এসেছিল কাল রাত্রে—"

"এসেছিল ? কি রকম ?"

এইবার গণেশ হালদারের মনে হল কাজটা অনুচিত হচ্ছে। ঝিনুকের অনুমতি না নিয়ে তার কথাটা প্রকাশ করা কি উচিত হবে ? ঝিনুক বলেছিল কথাটা গোপন রাখবেন। কেউ যেন জানতে না পারে। ঝিনুক যে চিঠি লিখবে বলেছিল সে চিঠিও এখনও আসেনি। অতগুলো টাকা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁরও এ সন্দেহ হয়েছিল যে টাকাটা নিশ্চয় চুরির টাকা। অত রাত্রে হঠাৎ এত টাকা পেল কোথায় সে ? তারপর ডাক্তার মুখার্জি'র লেখায় সেদিনের ঘটনার বিবরণ পড়ে চমকে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হল যে মেয়েটির কথা লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই সে ঝিনুক। এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে তিনি নিশ্চয় পারবেন। ঝিনুকের সঙ্গে যে লোকটি ছিল, যে ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল, সে হয়তো তার সহকারী এবং এই কথাটা ডাক্তারবাবুর মনে হয়েছিল, তাঁরও হয়েছিল। হয়তো সে তার প্রণয়ী। ব্যাপারটা কাল থেকে মনের শান্তি বিঘ্নিত করছিল তাঁর, তারপর ডাক্তারবাবুর শেষ লেখাটা পড়বার পর তিনি স্থির করে' ফেলেছিলেন ডাক্তারবাবুকেই বলতে হবে ঘটনাটা। তাঁর মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। ঝিনুককে তিনি কিছুতেই খারাপ ভাবতে পারছিলেন না। তার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ অনিবার্যভাবে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তা সত্ত্বেও তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল, না, কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। ডিটেকটিভ উপন্যাসে যেমন আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ লোককেও দোষী বলে' মনে হয়, এও হয়তো তাই হচ্ছে। ঝিনুকের মতো মেয়ে কখনও চোর হ'তে পারে না, কখনও সে একটা খুনের প্রণয়িনী হতে পারে না।

"চুপ করে' আছেন কেন ?"

ডাক্তারবাবুর কথায় যেন চমক ভাঙল হালদারের। বললেন, "আমি একটা কথা ভেবে ইতস্তত করছি। সে মেয়েটিকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে কথাটা গোপন রাখব। তাই ভাবছি—"

"এতে আর ভাবনার কি আছে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছেন তখন তা রাখতেই হবে। আমার শোনবার কোনও আগ্রহও নেই তেমন। ও সুন্দর, এইটুকুর জন্যেই ওর সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য। একটা সুন্দর ফুল, সুন্দর পাখী, সুন্দর গাছ, সুন্দর মাঠ বা সুন্দর জঙ্গল দেখবার জন্য আমি মাইলের পর মাইল ছুটোছুটি করি। সুন্দরকেই দুচোখ ভরে' দেখতে চাই। সেদিন মেয়েটি অন্ধকারে চকিতে দেখা দিয়ে চলে' গেল আর হয়তো দেখা হবে না। মনে হচ্ছিল একটা লোকসান হয়ে গেল।"

"ও যদি খারাপ হয় ও যদি চোর হয় তাহলেও ওর সম্বন্ধে আপনার এ মনোভাব থাকবে কি শেষ পর্যন্ত ?"

"থাকবে বই কি। আমরা সংসারে যে যা হয়েছি তা ঘটনার চাপে দায়ে পড়ে হয়েছি, বাধ্য হয়ে হয়েছি, We are dumb driven cattle ভালোমন্দ নিয়ে খুব বেশী মাতামাতি করবার অধিকার আমাদের নেই। আপনি সেই গ্রীক গল্পটা জানেন ?"

"কোন গল্পটা বলুন তো ? নাম কি ?"

"নামটাম আমার মনে থাকে না, গল্পটা মনে আছে। এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ক্রোধে

আত্মহারা হয়ে একটা লোককে খুন করে' ফেলেছিল। ধরাও পড়ে' গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। দোষও স্বীকার করেছিল। কারো আর সন্দেহ রইল না বিচারের ফল কি হবে। তার পক্ষের উকিল তাকে কিন্তু এক অদ্ভুত পরামর্শ দিলে। বললে, তুমি যদি একটা কাজ কর তাহলে তোমার বাঁচবার আশা আছে। কি করতে হবে? জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি। উকিল বললে, তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মেয়েটি রাজী হল। পরদিন সে যখন উলঙ্গিনী হ'য়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে তখন বিচারককে সম্বোধন করে' উকিল বললেন, ক্রোধের বশে আমরা অনেকেই অন্যায় কাজ করি। করাটাই স্বাভাবিক, স্বয়ং জিউস (Zeus) এ কাজ করেন। এ মেয়েটি নিজের দোষ স্বীকার করেছে। সে শাস্তি নেবার জন্যও প্রস্তুত। আমি কেবল আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, এই নিতান্ত স্বাভাবিক অপরাধের জন্য আপনি এমন একটা সুন্দরীকে মৃত্যুদন্ড দেবেন? সামান্য একটা কারণে ভগবানের এমন একটা অসামান্য সৃষ্টিকে নষ্ট করা কি উচিত হবে? ওর দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখুন। বিচারক রসিক ছিলেন. মেয়েটিকে মৃত্যুদন্ড দিলেন না। সভ্যজগত থেকে কালক্রমে মৃত্যুদণ্ড উঠে যাবে। হয়তো জেলখানাও যাবে। ভবিষ্যতের সমাজকে এমনভাবে গড়তে হবে যাতে সবাই সুখে থাকতে পারে। এটম বম তৈরি করে' অবশ্য তা হবে না, এমন পরিবেশ, এমন মানসিকতা তৈরি করতে হবে যাতে মানুষের খারাপ হওয়ার প্রবৃত্তি এবং প্রয়োজন কমে যাবে।"

ডাক্তারবাবু হঠাৎ চুপ করে' গেলেন। তারপর হেসে বললেন, "এই দেখুন, কি কান্ড করছি আপনার মতো পন্ডিত লোকের কাছে শফরীর মতো ফরফর করছি—"

গণেশ হালদার লজ্জিত হলেন।

"না, না, কি যে বলছেন, আমি মোটেই পন্ডিত নই। বিলিতী ডিগ্রি থাকলেই কি পন্ডিত হয়?"

হালদার মশায়ের এই কথায় ডাক্তারবাবু যেন আর একটা প্রমাণ পেলেন যে তিনি সত্যিই শিক্ষিত লোক। কিন্তু সে কথা আর বললেন না, অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"আমার একটা বিষয়ে বড় আশ্চর্য লাগে, আপনার মতো বিলিতী ডিগ্রীওলা লোক, কোন ভালো জায়গায় চাকরি পেলেন না কেন?"

হালদার মশায় হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "কারণ বোধহয় আমি উচ্চবর্ণের গরীব হিন্দু এবং বাঙালী। বাংলার বাইরে পারতপক্ষে নূতন কোনও বাঙালীকে চাকরি দেওয়া হয় না। এ'রা মুখে যতই বলুন, সভায় যতই বক্তৃতা দিন যে আমাদের প্রাদেশিকতা নেই, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় সবাই সংকীর্ণ-মনা। সব প্রদেশেই কেবল প্রাদেশিকতাই নয়, আত্মীয় পোষণ করবার জন্যেও সবাই ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে আমার পৃষ্ঠপোষক কেউ ছিল না তাই চাকরি পাইনি। তাছাড়া বাঙালী হিন্দুদের উপর আমাদের সরকারেরও যেন একটা বিশেষ রাগ আছে, মুখে যদিও সে কথা কখনও বলেন না, কিন্তু আচরণে বোঝা যায়।"

"এ রাগের কারণ কি—"

"এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে দিয়ে গেছেন দু'লাইন কবিতায়। 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে, ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে'। সে ব্যঙ্গের প্রথম শুরু স্বাধীনতার নামে গদি পাওয়া আর বাংলাদেশকে দু'ভাগ করে' দেওয়া। আমি একটা লোকের কথা জানি সে জন্তুজানোয়ারদের কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেত। তার প্রধান আনন্দ ছিল পাখীর একটা ডানা কেটে দিয়ে সেটা ছেড়ে দেওয়া। সেটা ছিন্ন রক্তাক্ত ডানা নিয়ে মাটিতে ঝটপট করতো আর তাই দেখে আনন্দ পেত লোকটা। এদের ব্যবহার দেখলে তার কথা মনে হয়।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তবে এটাও কি ঠিক নয় যে বাংলা আর পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানরা মিলে মিশে থাকতে পারেনি, থাকতে চায়নি।"

"জানি, কিন্তু সেটা উগ্র কুৎসিত রূপ ধারণ করেছিল বিদেশী শাসক ছিল বলে'। মানুষে মানুষে ভাবও হয়, ঝগড়াও হয়। তার জন্যে দেশ ভাগ করবার দরকার হয় না। একদিন লন্ডনের রাজনৈতিক ঝগড়া ঠিক আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গারই রূপ নিয়েছিল। এর আভাস পাবেন ডিকেন্সের লেখা বার্নাবি রুজ (Barnaby Rudge) বইটাতে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই দুটো তিনটে করে' রাজনৈতিক দল থাকে, তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও কম হয় না, কিন্তু তার জন্যে কেউ দেশকে ভেঙে দু'তিন টুকরো করেনি। অখন্ড ভারতে মুসলিম লীগ একটা রাজনৈতিক পার্টি হয়ে অনায়াসে থাকতে পারত, ওর জন্যে পাকিস্তান করবার দরকার ছিল না।"

"কিন্তু জিনা সাহেবের ভয় ছিল brute majority তাঁর পার্টিকে গ্রাস করে ফেলবে—"

"এরকম ভয় আজকাল অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই হয়েছে। সবাই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে আতঙ্কিত। সবারই মনে হচ্ছে বান এলো বলে', সবাই নিজের নিজের ঘটিবাটি সামলাতে ব্যস্ত। ভাষার ভিত্তিতে সবাই এখন আলাদা হ'তে চাইছে। গভর্ন-মেণ্ট প্রতি প্রদেশে সীমানা নির্দেশ করবার জন্য যে কমিটি করেছিলেন তাঁর বিচার বাংলাদেশের বেলায় ন্যায়সঙ্গত

হয়নি। তারা সবাই ভীত এবং অসন্তুষ্ট। পাঞ্জাবেও তাই। এ'রা জিন্নার দাবিকে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এ'দের দাবিকে মানতে চাইছেন না, এ'দের দাবিকে লিংগুইজম বলে' ব্যঙ্গ করছেন। এ'দের দাবির যুক্তি কি জিনার দাবির যুক্তির চেয়ে কম জোরালো?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "থাক, ওসব রাজনৈতিক তর্কের আবর্তে পড়লে থই পাব না। আমি স্রোতের কুটো, ভাসতে পেলেই সন্তুষ্ট। জলটা ঘোলাটে না পরিষ্কার, গঙ্গার না ব্রহ্মপুত্রের তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।"

"আপনি ঠিক কুটো নন, আপনি পালক, আপনার গায়ে জল লাগে না, লাগলেও সঙ্গে সঙ্গে পিছলে পড়ে সে জল। কিন্তু আমি সত্যিই কুটো, জলে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, তাই জলের সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না। রাজনীতির স্রোত কোন খাতে বইছে তার সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমরা ঘর-পোড়া গরু, আসামের কাণ্ড দেখে আরও আতঙ্কিত হয়েছি। নিজেদের দেশ থেকে উৎখাত হয়েছি, এরপর কোথায় যাব, বিহারে না দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে না উড়িষ্যায় তা নির্ভর করছে ওই রাজনৈতিকদের খেয়ালখুশির উপর, যাঁরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তাই রাজনৈতিক খবর, রাজনৈতিক আবহাওয়া আমাদের কাছে উপেক্ষার জিনিস নয়। এখানে শুনেছি আপনার দয়ায় আমার চাকরিটা হয়েছে, আপনি—"

গণেশ হালদার আর বলতে পারলেন না: তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর বাক রোধ হ'য়ে গেল।

ডাক্তারবাবুও কোন কথা বললেন না সঙ্গে সঙ্গে। একটু চুপ করে' থেকে বললেন, "একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কারো উপর কেউ দয়া করতে পারে না, সে সামর্থ্য কারো নেই। আপনি চাকরি পেয়েছেন আপনার যোগ্যতার জোরে। চলুন, এবার ওঠা যাক। এই নিন আজকের লেখাটা। দেখুন, দেখুন ওই খঞ্জনটা, ওই যে একা বাঁ ধারে চরছে। বুকটা হলদে, ডানায় চকোলেট রং। দেখতে পেয়েছেন? শীতের অতিথি হিসাবে এসেছিল, কিন্তু এখনও ফেরেনি দেখছি। এদেশের উপর মায়া বসে' গেছে না কি! সাধারণত, মায়া বসে না ওদের। ওরা নির্মম। এক জাতের পাখী আছে তারা বছরে তিন চারবার বাচ্চা তোলে। কিন্তু শেষের বাচ্চাগুলোকে অনেক সময় ফেলে পালায়। যেই মাইগ্রেশনের সময় হয়, যেই অজানা বাইরের ডাক তাদের অন্তরকে আকুল করে' তোলে তখন আর তারা পিছন ফিরে তাকায় না। কাঁচ বাচ্চাগুলোকে ফেলেই চলে যায়। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি। এখানকার সুন্দরবন দেখেছেন? চলুন সেইখানেই যাওয়া যাক।"

গণেশ হালদার মৃদু হেসে বললেন, "দেখেছি সুন্দর বন। বড়লোকের সাজানো বাগান। অনেক রকম গাছ আছে, দেখলে মনে হয় বাগানের মালিক বেশ বড়লোক।"

"আপনি যে চোখ নিয়ে বাগানটা দেখেছেন সে চোখ নিয়ে দেখলে আনন্দ পাওয়া যায় না। বাগান বড়লোকের না ছোটলোকের, বাঙ্গালীর, বিহারীর না মারোয়াড়ীর—এসব অতি অবান্তর ব্যাপার। বাগানে গিয়ে রূপ দেখবেন; গাছের রূপ, ফুলের রূপ, পাখীর রূপ, প্রজাপতির রূপ। নানারকম অদ্ভুত অচেনা পোকা দেখবেন নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়, অভিজাত গাছের পাশে পোলিটারিয়েট গাছের ভিড় দেখবেন, চন্দন গাছের বা নাগলিঙ্গম গাছের পাশে দেখবেন ঘেঁটুকে কিচ্ছু বেমানান দেখাচ্ছে না, দেখবেন নানারকম ছোট বড় সুন্দর পাথরের টুকরো ধৈর্য ভরে প্রতীক্ষা করে আছে রসিকের স্নেহস্পর্শ লাভ করবার জন্য, মাকড়সার জাল দেখবেন নানারকম। বাগানটার মালিক কে, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পৃথিবীর সমস্ত বাগানের এক এবং অদ্বিতীয় মালিক প্রকৃতি, ভগবানও বলতে পারেন তাকে। আমরা মানুষেরা দু চার দিন ফপর দালালি করি মাত্র। আমাদের এই আবদার প্রকৃতি হাসিমুখে সহ্য করেন, এও এক মজার জিনিস। উঠুন, সুন্দরবনে না যান, অন্য জায়গায় যাই চলুন। চোখ থাকলে দেখবার জিনিসের অভাব নেই। ঘেচুকে ডাকি—"

ডাক্তারবাবু পকেট থেকে হুইসল বার করে বাজালেন। ঘেচু কাছেই ছিল, এসে পড়ল।

সেদিন রাত্রে কাউকে নিয়ে মরা বিপদে পড়েছিল ঝিনুকে। সত্যিই সে রাত্রটা তার জীবনের একটা স্মরণীয় রাত্রি। দেশের বাড়িতে যে রাত্রে গুন্ডারা হানা দিয়েছিল,

সে রাত্রির কথা বাদ দিলে এমন রাত্রি তার জীবনে আর আসেনি।

কাউ তার পায়ে উপড়ে হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল শেষে।

"কি হয়েছে বল না, কাঁদছ কেন?" কাউ কোন জবাব দেয়নি।

"তোমার মায়ের কাছ থেকে এগুলো কেড়ে আনলে কেন, তাকে তো আমি দিয়েছিলাম এগুলো, এ-ও বলেছিলাম দরকার হলে তাকে আরও কিছু টাকা পাঠাব, কিন্তু তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

হঠাৎ কাউ ফুঁপিয়ে উঠল। মনে হল, কে যেন কশাঘাত করল তাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "সে জন্মের মতো চলে গেছে, আর কখনও আসবে না তোমাদের টাকা নিতে।"

"সে কি।"

"হ্যাঁ।"

কাউয়ের চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হলো।

"কি হয়েছে কি! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কাউ কিন্তু কিছুই বলল না, চোখ বড় বড় করে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল কেবল, যেন সেখানে কিছু একটা দেখছে।

"জন্মের মতো চলে গেছে মানে? কি হয়েছে বলছ না কেন?"

কাউ হঠাৎ অনুনয়ের সুরে বলল, "তুমিই বল, তোমার গয়না ছোঁবার কি যোগ্যতা ছিল ওর"—তারপরই চীৎকার করে উঠল সে—"পচা গলা বুড়ি বেশ্যা একটা। ওর এত বড় আস্পর্ধা হবে কেন! বেশ হয়েছে, বেশ করেছি।"

"কি করেছ—"

"তাকে ফেলে দিয়েছি কুয়োয়"—তারপর আবার চীৎকার করে উঠল—"খুন করেছি, খুন করেছি, নিজের মাকে খুন করেছি। বাপকেও করব, তারপর ফাঁসি যাব।"

অন্ধকারে হাত দুটো তুলে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

শিউরে উঠল ঝিনুক। কিন্তু বিপদে পড়ে আত্মহারা হবার মেয়ে নয় সে। সে কাউয়ের গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

"ছি, ওসব পাগলামি করে না। ওই মাঠের ধারে যে ন্যাড়া ইঁদারাটা আছে, তাতেই পড়ে গেছে তোমার মা? চল, এখুনি তুলতে হবে তাকে। ছি ওরকম মাথা গরম করতে নেই।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কাউ।

"চল দেরি কোরো না। লোকজন ডেকে তোমার মাকে তোলবার চেষ্টা করি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে এখনও হয়তো বাঁচবেন তিনি।"

"না বাঁচবেন না। তার গলা টিপে মেরে ফেলে দিয়েছি।"

হঠাৎ কাউ ঝিনুকের হাত দুটো ধরে মিনতির সুরে বলে উঠল, "মাসিমা, চলুন আমরা পালাই। ওই পাষণ্ড ডাক্তার ঘোষালের কাছে আপনি আছেন কেন? ও কি একটা মানুষ? ও পিশাচ, ও জানোয়ার।"

"চুপ কর।"

ধমক দিয়ে উঠল ঝিনুক।

"আমি পাগল হয়ে গেছি মাসিমা, ক্ষেপে গেছি, আমি—"

"আর একটি কথা বোলো না। আমার সঙ্গে এস।"

"আমি—"

"না, আর একটি কথা নয়, এস আমার সঙ্গে।" কঠিন কণ্ঠে এবার আদেশ করল ঝিনুক। সে আর ভিতরে ঢুকল না। ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছেই যে ভাঙা পোড়ো ইঁদারাটা ছিল, সেই দিকেই অগ্রসর হল।

কাউও তার পিছু পিছু গেল।

ইঁদারার কাছে তারা যখন গিয়ে দাঁড়াল, তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা পশ্চিম আকাশের দিকে হেলে পড়েছে। চাঁদটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠল ঝিনুক। মনে হল, কাস্তে দিয়ে কে যেন খানিকটা ছিঁড়ে নিয়েছে, চাঁদ কিন্তু নির্বিকার, শুধু হাসছে। তার পাশের তারাটাও হাসছে। আমাদের হাসিই থেমে যাবে? হঠাৎ মনে হল তার। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পাখি ডেকে উঠল একযোগে। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল একটা। তার পরই চতুর্দিক সচকিত করে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল একটা পেঁচা, একযোগে ডেকে উঠল শেয়ালগুলো। ঝিনুক বুঝতে পারল সকাল হচ্ছে। যা করবার এখুনি করতে হবে।

"আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি। তুই এখানে বসে থাক। আমাদের সাড়া পেলে তুইও কুয়ার ভিতরে নেমে যাস। তারপর আমরা এসে তোকে তুলব। আমি একটা দড়ি জোগাড় করে আনব।"

"আমি কুয়ায় নেমে যাব? কেন?"

"আমি গিয়ে থানায় বলব তোর মা হঠাৎ পড়ে গেছেন, তাকে তোলবার জন্য তুই ঝাঁপিয়ে পড়েছিস।"

"আমি পারব না ওর মধ্যে নামতে, আমি পারব না। কিছুতেই পারব না। আমাকে ওর মধ্যে নামতে বোলো না মাসিমা, আমি পারব না।"

"পালাতে পারবেই হবে। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এস আমার সামনেই নাম তুমি।"

কাউ কিছুতেই নামবে না। তারপর ঝিনুক যা করলে তা অবিশ্বাস্য। কাউ ন্যাড়া ইঁদারাটার ধারেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে ঝিনুক। চপাৎ একটা শব্দ হল।

আর্তনাদ করতে লাগল কাউ ইঁদারার ভিতর থেকে।

"এ কি করলে মাসিমা, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে।"

ঝিনুক ঝুঁকে আশ্বাস দিলে তাকে, "এক্ষুনি আসছি। ভয় নেই—"

ঝিনুকের প্রথমেই থানায় যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে গেল মিস্টার সেনের বাড়ি। ঘোষালের গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গেল। যতীশবাবুর কথা সে ভোলেনি। কিন্তু যে কথাটা প্রবলভাবে তার মনে হচ্ছিল, সে কথাটা এই—কাউয়ের মা মারা গেছে। সে আর ঘোষালকে বিরক্ত করতে আসবে না। তার অজ্ঞাতসারেই একটু আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছিল তার মনে। তারপরই মনে হল, তনিমার সংগে ঘোষালের ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে? কিছুদূর যে গড়িয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কতদূর? নিজের গাড়ি ছেড়ে এত রাত্রে ওখানে যাওয়ার মানে কি। কাউয়ের কথাগুলো তার কানে বাজছিল, ও কি একটা মানুষ? ও পিশাচ, ও জানোয়ার। গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে, দৃঢ় মুষ্ঠিতে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে সে বসে রইল, চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠল।... মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে কিছু-দূরে থামাল সে গাড়িটা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে চোরের মতো নিঃশব্দ চরণে সে গিয়ে দাঁড়াল সেনের বাড়ির সামনে। সমস্ত বাড়িটাই অন্ধকার। হঠাৎ নজরে পড়ল নীচের দিকে একটা ছোট ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। খড়খড়িটা সন্তর্পণে তুলে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করল সে। বিশেষ কিছু দেখা গেল না। তারপর সামনের দরজায় গিয়ে সে কড়াটা নাড়ল। কোন সাড়া এল না ভিতর থেকে। ঠেলতেই কিন্তু কপাটটা খুলে গেল।

সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকেই আলোকিত ঘরটা দেখতে পেল সে। সে ঘরের কপাটটাও খোলা। সেই খোলা কপাট দিয়ে সে দেখতে পেল ডাক্তার ঘোষাল মদে চুর হয়ে একটা সোফায় হেলান দিয়ে রয়েছেন, আর তার পাশেই তনিমা, সেও চুর। তাঁর একখানা হাত ঘোষালের ঘাড়ের উপর ঝুলছে। বাঘিনীর মতো একলম্ফে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। এক ঝটকায় তনিমার হাতখানা সরিয়ে দিলে ঘোষালের কাঁধ থেকে। তারপর ঘোষালকে ঝাঁকি দিয়ে বলল, "ওঠ, ওঠ, চল। গাড়ি এনেছি। সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাউয়ের মা আত্মহত্যা করেছে, শিগগির চল—"

ঘোষাল খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, তবু তিনি খাড়া হয়ে বসলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "আত্মহত্যা করেছে? হোয়াট!"

তারপর একটু ভেবে বললেন, "লাসটা কোথা!"

"মাঠের ধারে যে পোড়ো ইঁদারাটা আছে, তার মধ্যে। শীগগির চল, ওটাকে এখনি তুলতে হবে।"

তনিমার সাড় ছিল না। তার কাপড়জামাও বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঝিনুক দেখতে পেলে তার আলুলায়িত ব্লাউসের মধ্যে এক তাড়া নোট রয়েছে। বিনা দ্বিধায় নোটের তাড়াটা তুলে নিলে সে।

বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন ডাক্তার ঘোষাল। তারপর তাঁর মুখে সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি ফুটল।

"ওটা কি ঠিক হল নুকু? Isn't that a bit shady?

নুকু একথার কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। তার চোখের দৃষ্টি আরও জ্বলন্ত হয়ে উঠল কেবল। তারপর ঘোষালের হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "নষ্ট করবার মতো সময় এখন নেই। যদি না যাও, আমি নিজেই থানায় যাচ্ছি—"

থানার নামে ঘোষাল চাংগা হয়ে উঠলেন। ঝিনুক তাঁর অনেক দুষ্কৃতির খবর জানে, রাগের মাথায় যদি ফাঁস করে দেয় কিছু!

"থানায় কেন!"

"বললাম না, কাউয়ের মা মারা গেছে কুয়ায় পড়ে। কাউও লাফিয়ে পড়েছে তার সংগে সংগে। থানায় খবর দিতে হবে না? চল, চল।"

টানতে টানতে ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে মোটরে তুলল সে।

থানায় খবর দিয় অকুস্থলে পৌঁছে তারা দেখল অত ভোরেও ওই ফাঁকা মাঠের মাঝে এঁদো কুয়াটাকে ঘিরে লোক জমে গেছে বেশ। দড়ি ফেলে কাউকে তুলেওছে তারা। কাউ সর্বাংগে কাদা জল মেখে মাথা হেঁট করে একধারে বসে কাঁদছে, আর কাঁপছে। কপালের একধার দিয়ে রক্তও পড়ছে।

প্রায় সংগে সংগে এসে পড়ল পুলিসের গাড়ি। (ক্রমশ)
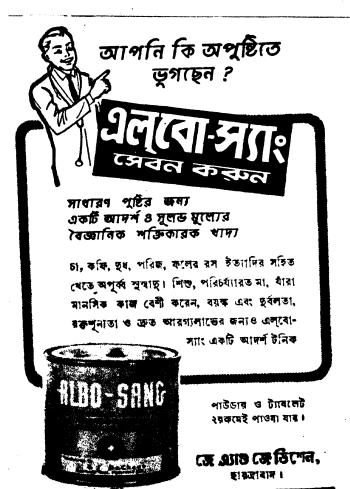
সরকারী চাকুরী ও পুলিসী তদন্ত

তারাপদ লাহিড়ী

গত ৩১শে মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপিত একটি বে-সরকারী প্রস্তাব উপলক্ষ ক'রে বিতর্ক হয়েছে। বিতর্কের বিষয় ছিল—সরকারী ও বে-সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে পুলিসী তদন্তের রিপোর্টের কার্যকারিতা থাকা উচিত কি না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সদস্যদের বক্তৃতার যে সারমর্ম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, বিধান-সভায় এই বিষয়টি সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়নি। এই বিষয়টির গুরুত্ব দলগত রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে। সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে পুলিসী তদন্তের ব্যবস্থা থাকার ফলে কোন্ দলের সুবিধা হয়েছে আর কোন্ দলের অসুবিধা হয়েছে সেটা গৌণ ব্যাপার। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, গণতান্ত্রিক রীতির সঙ্গে এই ব্যবস্থার সংগতি আছে কিনা—এবং ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিক অধিকারসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ব্যবস্থাকে ন্যায়নীতিসম্মত ব'লে মেনে নেওয়া যায় কিনা।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের সমক্ষে সকল নাগরিক সম-অধিকারসম্পন্ন ব'লে বিবেচিত হবে এবং সকল নাগরিকই আইনগত রক্ষাব্যবস্থা (protection) তুল্যভাবে ভোগ করবে। সংবিধানের ১৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে —"সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে।" এই "সমান সুযোগ" বলতে অবশ্য এ কথা বোঝায় না যে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বা দক্ষতার কথা উপেক্ষিত হবে। ১৬নং অনুচ্ছেদের মধ্যেই উপরিকথিত নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রমের উল্লেখ আছে। কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে সেগুলি অবান্তর।

এখন দেখা যাক—পুলিসী তদন্ত ও রিপোর্ট ও তার ভিত্তিতে নিয়োগ ও বরখাস্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। সরকারী চাকুরির আবেদন-কারী অন্য বিষয়ে যোগ্য বিবেচিত হওয়ার পর প্রার্থীর প্রাক্তন কার্যাবলী ইত্যাদি পুলিসী তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। পুলিসের রিপোর্ট সন্তোষজনক না হ'লে প্রার্থীর অন্য সর্ববিধ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকে চাকুরিতে নেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পুলিস তদন্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে প্রার্থীকে কর্মে নিয়োগ করা হয় এবং পরে পুলিস রিপোর্ট সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে সেই প্রার্থীকে সেই হেতুবাদে অপসারিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, পুলিসের রিপোর্টের বিবরণ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে জানানো হয় না বা অভিযোগ খণ্ডনের কোন সুযোগ তাকে দেওয়া হয় না। সুতরাং ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি আদৌ সরকারী চাকুরি পাবে কিনা, কিংবা চাকুরি পেয়ে থাকলেও তাতে বহাল থাকতে পারবে কিনা তার চূড়ান্ত নির্ধারণকর্তা পাবলিক সার্ভিস কমিশনও নন কিংবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষও নন। তার নির্ধারণকর্তা সাব্-ইন্সপেক্টার পর্যায়ের একজন পুলিস কর্মচারী। তিনি যা কিছু রিপোর্ট দেন না কেন, তার খণ্ডনের কোন ভয় নেই। কারণ তা খণ্ডন করবার সুযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কখনই পাবে না। স্থানীয় পুলিসের কর্তাব্যক্তির কাছে যদি কোন ব্যক্তি অপ্রীতি-ভাজন হন তবে পুলিসকর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে তাঁর ও তাঁর আত্মীয়দের সরকারী চাকরি পাওয়ার আশা চিরতরে নির্মূল করে দিতে পারেন। চাকরির ব্যাপারে অনুকূল রিপোর্ট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বা প্রতিকূল রিপোর্ট দেবার ভয় দেখিয়ে একজন পুলিস অফিসার একজন

চাকুরিপ্রার্থী বা তাঁর নিকট আত্মীয়ের স্বারা যা কিছু করিয়ে নিতে পারেন। আমি বলছি না যে, সব পুলিস অফিসারই উক্ত প্রকার অসদুপায় অবলম্বন ক'রে থাকেন। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় এই প্রকার অসদুপায়ের সুযোগ আছে এবং কোন অফিসার ব্যক্তিগত আক্রোশবশে বা দুর্নীতির বশে অসদুপায় অবলম্বন করলে তার কোন সুষ্ঠু প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। কাজেই এই ব্যবস্থা কখনও গণতন্ত্রসম্মত ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না। যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে যে, তাঁর গোপন রিপোর্ট নাগরিকদের সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে কার্যকরী হবে—এবং সেই রিপোর্টের সত্যতা যাচাই করবার বা তার খণ্ডন করবার কোন সুযোগ সংশ্লিষ্ট নাগরিককে দেওয়া হয় নি—সেই ব্যবস্থা স্পষ্টত সংবিধানের ১৪নং ও ১৬(১)নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মূল্যবান নাগরিক অধিকার ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় রায় দিয়ে বলেছেন যে, যে আইনে প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত, স্ব-বিবেচনানির্ভর (discretionary) বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে আইন সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদের বিরোধী। আলোচ্য ব্যাপারে পুলিস তদন্ত করাতে হবে এমন কোন আইন দেশের জনপ্রতিনিধিগণ পাস করেন নি। শুধু প্রশাসনিক হুকুমের বলেই এই অগণতান্ত্রিক, সংবিধানবিরোধী ব্যবস্থাকে চালু রাখা হয়েছে।

এই প্রসংগে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিধানসভায় বলেছেন যে—"কোন প্রার্থী সরকারী কর্মচারী হিসাবে যোগ্যতার সহিত কাজ করিতে পারিবেন কিনা অথবা তিনি ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সহিত যুক্ত আছেন কিনা তাহা জানিবার জন্য প্রার্থীর পূর্ব কার্যকলাপ জানা প্রয়োজন। তিনি যদি কোন মারমুখী জনতার অন্তর্ভুক্ত হন—জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতে অন্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য উস্কানি দেন অথবা তিনি যদি কোন অপরাধমূলক অথবা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন তবেই তিনি সরকারী চাকরির জন্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এইসব দেখিবার জন্য পূর্ব কার্যকলাপের তদন্ত দরকার হয়। এই তদন্ত কে করিবে? স্পষ্টতই ইহা পুলিসই করিবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।)

এখানে প্রশ্ন হ'চ্ছে এই যে—প্রথমত পুলিস রিপোর্ট যে সর্বক্ষেত্রে সত্য হবে তার নিশ্চয়তা কি? সমস্ত পুলিস কর্মচারীই যে ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত শত্রুতা, ক্ষমতাসীন দলের অনুগ্রহভোগের লোভ, অর্থলোভ প্রভৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত এমন কথা কি ধ'রে নেওয়া যায়? সমস্ত পুলিস কর্মচারীই কি সমান কর্তব্যপরায়ণ? শুধু ভাসা ভাসা জ্ঞান বা অপকৃষ্ট জনশ্রুতি (hearsay)র উপর নির্ভর ক'রে কোন পুলিস কর্মচারী রিপোর্ট দেবেন না—এ কথা কি জোর ক'রে বলা যায়? 'মানুষ মাত্রেই সং'—এই অনুমান যেমন ভাবপ্রবণতা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে অচল—তেমনি পুলিস কর্মচারীমাত্রেই সং ও কর্মদক্ষ এ অনুমানও অচল। বিপদ এক দিকে নয়—দুই দিকে। অসাধু ও অ-দক্ষ পুলিস কর্মচারী যেমন যোগ্য প্রার্থীর প্রতিকূলে রিপোর্ট দিতে পারেন, তেমনি অর্থ বা অনুগ্রহের লোভে বা শৈথিল্যবশত বা দক্ষতার অভাব হেতু অযোগ্য প্রার্থীর অনুকূলেও রিপোর্ট দিতে পারেন—এ সম্ভাবনাও রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—"কোন প্রার্থী যোগ্যতার সহিত কাজ করিতে পারিবেন কিনা" তা কি জনৈক পুলিস কর্মচারীর অভিমতের উপর নির্ভর করবে? কোন্ গণতান্ত্রিক দেশে এমন আইন আছে? কোন প্রার্থী "ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সহিত যুক্ত আছেন কি না" কিংবা কখনও "মারমুখী জনতার অংগীভূত" ছিলেন কি না, কিংবা "অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ" করেছিলেন কিনা—তাও কি পুলিস কর্মচারীর বিবেচনার উপরই নির্ভর করবে? এমন সহস্র সহস্র ঘটনা কি অবিরত ঘটছে না যে, পুলিস যে জনতাকে 'মারমুখী' মনে করে বা যে ব্যক্তিকে ঐ জনতায় লিপ্ত মনে করে রিপোর্ট দিলেন, আদালত সেই জনতাকে 'মারমুখী' মনে করলেন না বা সেই ব্যক্তিকে ঐরূপ জনতায় লিপ্ত ব'লে মনে করলেন না? পুলিস যে কার্যকে ধ্বংসাত্মক মনে করেছেন, আদালত তাকে ধ্বংসাত্মক মনে করেন নি—এরূপ ঘটনাও কি অহরহ ঘটছে না? ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই যে, কোন চাকুরিপ্রার্থী কি কাজ করেছেন না করেছেন তার বিষয়ে আর আদালতের রায়েরও প্রয়োজন নেই। সংশ্লিষ্ট নাগরিক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগেরও প্রশ্ন নেই। পুলিস কর্মচারীর গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই একজন নাগরিককে ও তার সন্তানসন্ততিগণকে চিরকাল একটি মূল্যবান নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে। এই ক্ষমতা পুলিস কর্মচারীর হাতে থাকলে তা যে দলবিশেষের স্বার্থে প্রযুক্ত হ'তে পারে—এ কথা কি অস্বীকার করা যায়? ডাঃ রায় "রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা"কে কি ক'রে সরকারী চাকুরি লাভের অযোগ্যতারূপে বিবেচনা করলেন—তা আমাদের বোধগম্য নয়। ডাঃ রায়ের মত প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত রাজনীতিকের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়ার পর রাজনৈতিক কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চয়ই অপরাধজনক। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে—যেখানে দলের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা হয় ও দলগত শাসন চালু থাকে সেখানে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্তির পূর্বে রাজনীতিক কাজে অংশ গ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে এবং ঐ প্রকার অংশ গ্রহণের জন্য কোন নাগরিককে সরকারী চাকুরির সুযোগ লাভে বঞ্চিত করার অর্থ তাকে শাস্তিদান, এবং ঐ প্রকার শাস্তিদান ভারতীয় সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত নাগরিক অধিকারের বিরোধী।

এ ব্যাপারে আর একটি কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত ব'লে মনে করি। পুলিসের যেখানে নিজস্ব ব্যাপার সেখানে কিন্তু পুলিসের লেখা বা পুলিসের অভিমতকে বেদবাক্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়ার বিধান নেই। বরং শুধু পুলিসকে বিশ্বাস ক'রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা আইনকর্তারা ও বিচারাধ্যক্ষগণ

অবলম্বন ক'রেছেন। পুলিস কোন অপরাধের তদন্ত করতে থাকাকালে কোন আসামী পুলিসের কাছে যে উক্তি করে—তা কখনও আদালতে ঐ আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হয় না। কোন আসামী ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে স্বীকারোক্তি করার সময়ে যদি পুলিস সেখানে শুধুমাত্র উপস্থিত থাকে তবে সেই স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যায়। কোন সাক্ষী পুলিসের কাছে কোন জবানবন্দী দিয়ে থাকলে সেই জবানবন্দী কোন মকদ্দমায় মুখ্য প্রমাণ (substantive evidence)রূপে ব্যবহৃত হয় না। পুলিসের রিপোর্ট ফৌজদারী মকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হয় না। এমন কি বিচারাধীন কোন আসামীকে জামিন দেওয়া হবে কিনা কিংবা অপরের জামিন হওয়ার যোগ্যতা কোন ব্যক্তির আছে কিনা—তা নির্ধারণের ব্যাপারেও শুধু পুলিস রিপোর্টের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করার বিরুদ্ধে উচ্চতম আদালতের বিচারপতিগণ পুনঃপুনঃ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অথচ গণতান্ত্রিক দেশে একজন নাগরিকের সরকারী কর্মে নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে সেই পুলিস রিপোর্টকেই অখণ্ডনীয় ব'লে মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা চালু রেখে বলা হচ্ছে—এইটাই গণতন্ত্র। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিধানসভার সদস্যগণের উচিত দলীয় ব্যাপারের দিক দিয়ে না দেখে সাধারণ নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বিচার করা। এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল সুদূরপ্রসারী। শুধু যে সৎ নাগরিকেরাই এর ফলে অন্যায়ভাবে দুঃখভোগ করতে পারেন এমন নয়—এই রীতি চালু থাকলে রাষ্ট্র উপযুক্ত কর্মচারীর সেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং প্রশাসনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের অনুপ্রবেশ ঘটবে এ আশঙ্কা রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যখন যে দল ক্ষমতাসীন থাকবে তারা অন্য দলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করবে—এ আশঙ্কা রয়ে গেছে। ফলে গণতন্ত্র এক স্বৈরাচারী দলতন্ত্রে পর্যবসিত হবার বিপদ রয়েছে। দলমতনির্বিশেষে সকলেরই এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।

উপসংহারে একটি মাত্র কথা বলতে চাই। ডাঃ রায় যে সরকারী কর্মচারীর আচরণবিধির দোহাই দিয়েছেন তা এ ক্ষেত্রে অচল। কারণ আচরণবিধি ভঙ্গ করার অভিযোগে কোন কর্মচারীকেই আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ না দিয়ে বরখাস্ত করা যায় না। কিন্তু নূতন কর্মপ্রার্থীদের বেলায় পুলিসের গোপন রিপোর্ট খণ্ডনের কোন সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

॥ ২ ॥

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে চিঠি লইয়া মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিল। আমি আর এক পেয়ালা চা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সত্যবতী হয়তো রাগিয়া আছে, তাহাকে ঠাণ্ডা করাও দরকার।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ চিঠি কোলে লইয়া বসিয়া আছে এবং আপন মনে হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'হাসি কিসের?'

ব্যোমকেশ বলিল—ব্যাপারটাই হাসির। চিন্তামণি কুণ্ডু মশায় কিন্তু একটি বিষয়ে ভুল করেছেন, তপনের বাড়িতে বিদ্যুৎ বাতি নিবে যাওয়ার সময়টা তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেন নি।

'তুমি কি করে তা জানলে?'

'আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তা হলে তিনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। আর একটা ভুল করেছেন, সেটা অবশ্য স্বাভাবিক।' ব্যোমকেশ আবার মৃদু বঙ্কিম হাসিতে লাগিল। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল—'অজিত, চিন্তামণিবাবুর ঘরে টেলিফোন আছে, তুমি তাঁর নম্বর খুঁজে তাঁকে ফোন কর। একটা জরুরী প্রশ্নের উত্তর দরকার। তাঁকে জিগ্যেস কর, তপনের গলার আওয়াজ কি রকম।'

'নিশ্চয় খুব জরুরী প্রশ্ন। আর কিছু জানতে চাও?'

'আর কিছু না। তাঁকে বোলো, ভাবনার কিছু নেই, আমি অবিলম্বে যাচ্ছি।'

চিন্তামণিবাবুকে ফোন করিলাম, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম—'তপনের গলার আওয়াজ চেরা-চেরা।'

ব্যোমকেশ বলিল—'চেরা-চেরা! তা হলে ঠিক ধরেছি, আর কোনো সন্দেহ নেই।'

বলিলাম—'কি ধরেছ তুমিই জান। কিন্তু চিন্তামণিবাবুর গলাও চেরা-চেরা মনে হল।'

ব্যোমকেশ বলিল—'তাতে আর আশ্চর্য কি। একে পক্ষাঘাত, তার ওপর পুলিসের আতঙ্ক—চল, বেরিয়ে পড়া যাক। কাজ সেরে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করা যাবে।'

চিন্তামণিবাবুর রাস্তাটা বেশ চওড়া নূতন রাস্তা; শহরের অন্তিম প্রান্তে

আগে কি খাবেন বলুন? চা-কোকো-ওভালটিন?

বলিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন। তপন সেনের বাসা পুলিসের পাহারা দেখিয়া সহজেই সনাক্ত করা গেল। তাহার উল্টা দিকে চিন্তামণিবাবুর দ্বিতল বাড়ি। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

আমরা দ্বারের কড়া নাড়িবার পূর্বেই হিন্দুস্থানী ভৃত্য রামাধীন দ্বার খুলিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রবেশ করিলাম। খোলা জানালার পাশে চিন্তামণিবাবু চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিলেন—'ব্যোমকেশবাবু! রাস্তায় আসতে দেখেই চিনেছি। আসুন।'

রামাধীন দুটি চেয়ার আগাইয়া দিল, আমরা বসিলাম। টেলিফোনে গলার আওয়াজ শুনিয়া চিন্তামণিবাবুর চেহারা যেমন আন্দাজ করিয়াছিলাম আসলে তেমন নয়; কৃষ্ণবর্ণ মোটাসোটা মানুষ, উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পাশে টিপাইয়ের উপর একটি দামী বাইনোকুলার রাখা রহিয়াছে।

চিন্তামণিবাবু বলিলেন—'আগে কি খাবেন বলুন। চা—কোকো—ওভালটীন—'

ব্যোমকেশ বলিল—'এখন কিছু দরকার নেই। পুলিস আজ আপনার কাছে এসেছিল নাকি?'

চিন্তামণিবাবু বলিলেন—'আসেনি আবার! দারোগা একবার আমার দিকে তেড়ে আসছে, একবার ও বাড়িতে শান্তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। কী যে চায় ওরা বুঝি না। একই প্রশ্ন পঞ্চাশবার করে। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে পারি কিনা, দৌড়তে পারি কিনা, বাইনোকুলার রেখেছি কেন, তপন সেনকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছি কেন? বলুন দেখি

ব্যোমকেশবাবু, এ সব প্রশ্নের কী জবাব দেব? জবাব দিতে দিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। এখন আপনি আমাকে বাঁচান।'

ব্যোমকেশ বলিল—'ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দারোগাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তিনি কি—!'

বলিতে বলিতে দারোগাবাবু দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দশ বারো বছর আগে বিজয় ভাদুড়ী যখন ছোট দারোগা ছিলেন তখন তাঁহার সহিত একবার পরিচয় হইয়াছিল। রোগা লম্বা বেউড় বাঁশের মত চেহারা, কিন্তু অত্যন্ত কর্মতৎপর ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি। দশ বছরে তিনি বড় দারোগা হইয়াছেন কিন্তু চেহারার তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। এবং মনও যে পূর্ববৎ সন্দেহপরায়ণ আছে তাহা তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে অনুমান করা যায়।

দ্বারের নিকট হইতে প্রখর চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ঘরে

প্রবেশ করিলেন, শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন—'ব্যোমকেশবাবু যে?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল—'চিনতে পেরেছেন দেখছি। তা—আপনার আসামী, মানে, তপন সেন ধরা পড়ল?'

বিজয় ভাদুড়ী একবার চিন্তামণিবাবুকে বক্রদৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন—'ধরা পড়েনি এখনো, কিন্তু যাবে কোথায়? আপনি হঠাৎ এখানে কী উদ্দেশ্যে, ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল—'চিন্তামণিবাবু আমার মক্কেল। ও'র বাড়িতে খুন হয়েছে, ও'র ভাড়াটে খুন করেছে, আপনারা ও'কে বিরক্ত করছেন। তাই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে উনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন।'

বিজয় ভাদুড়ী কুটিল-কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন; বোধ করি মনে মনে বিবেচনা করিলেন ব্যোমকেশকে গলা-ধাক্কা দিবেন কিনা। তারপর তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার সুর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ঝুঁকিয়া ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'একবার বাইরে আসবেন? দু'টো কথা আছে।'

'চলুন।'

আমরা ঘরের বাহিরে লম্বা বারান্দার এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। বিজয়বাবু মুখে একটা জোর-করা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, উঁচু মহলে আপনার প্রতিপত্তি আছে, আপনি যদি এ মামলায় মাথা গলাতে চান আমি আপনাকে আটকাতে পারব না। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আপনি চিন্তামণি কুণ্ডুকে সাহায্য করবেন না। আমার বিশ্বাস ও আর ঐ খোট্টা চাকরটা তলে তলে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে।'

ব্যোমকেশ স্থির হইয়া বিজয়বাবুর কথা শুনিল, তারপর বলিল—'কে খুন করেছে আপনি জানেন?'

বিজয়বাবু বলিলেন—'অবশ্য খুন করেছে তপন সেন, কিন্তু বুড়োটাও এর মধ্যে আছে।'

'বুড়োটা যদি এর মধ্যে থাকতো তা হলে তপনের নামে খুনের অভিযোগ আনতো কি?'

'ঐ খানেই চালাকি। তপনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বুড়ো নিজেকে বাঁচাতে চায়।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত স্বরে বলিল—'মাফ করবেন বিজয়বাবু, আপনি এ মামলার কিছুই বুঝতে পারেন নি।'

ভ্রূকুটি করিয়া বিজয়বাবু বলিলেন—'তার মানে?'

ব্যোমকেশ বলিল—'মানে পরে বলব। আগে আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি।—যে-ছুরি দিয়ে খুন হয়েছিল সেটা পাওয়া গেছে কি?'

'না। তপন সেটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'তপনের বাড়ি তল্লাস করে কিছু পেয়েছেন?'

'না, এমন কিছু পাইনি যাতে হদিস পাওয়া যায়। তবে সিন্দুকটা এখনো খোলা হয়নি, তার চাবি তপনের কাছে।'

'শান্তাকে জেরা করে কিছু পেয়েছেন?'

'কাজের কথা কিছু পাইনি। মাস চারেক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে; স্বামীর কাজকর্মের কথা শান্তা কিছুই জানে না।'

'হুঁ। আমি কিন্তু সব জানি। কে খুন করেছে জানি, কেন খুন করেছে জানি, এমন কি আসামী কোথায় আছে তাও জানি—'

বিজয়বাবু লাফাইয়া উঠিলেন—'জানেন তবে এতক্ষণ বলেন নি কেন?'

ব্যোমকেশ হাসিল—'সময় হলেই বলব। তার আগে আমি তপনের বাসাটা একবার ঘুরে ফিরে দেখতে চাই। আর শান্তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি অবশ্য তাকে যথেষ্ট জেরা করেছেন এবং সন্তোষজনক উত্তরও পেয়েছেন। আমি কেবল দু'চারটে প্রশ্ন করব।'

বিজয়বাবু বলিলেন—'তা বেশ। কিন্তু আসামী—'

'আসামীকেও পাবেন।'

'কোথায়? ওই বাড়িতে? আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। আগে চলুন ওই বাড়িতে। আসামীকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।'

'তার মানে—আপনি বলতে চান তপন সেন বাসায় ফিরে আসবে, কিম্বা বাসাতেই লুকিয়ে আছে—?'

'আসুন আসুন—' ব্যোমকেশ অগ্রগামী হইয়া সিঁড়ির দিকে চলিল, চিন্তামণিবাবুর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—

'চিন্তামণিবাবু, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমরা একবার ওবাড়িতে যাচ্ছি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খুনের কিনারা হয়ে যাবে।'

তারপর আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলাম।

তপনের বাসার বুকে-পিঠে পুলিস পাহারা। একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, চোর পালাইলে পুলিসের বুদ্ধি

শান্তা উদাস অসহায় ভাবে বসিয়া আছে

বাড়ে। অপরাধী যখন অপরাধ করিয়া চম্পট দিয়াছে তখন অকুস্থলের চারিপাশে কড়া পাহারা বসাইয়া কী লাভ হয় আমি আজ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

ব্যোমকেশ গলি দিয়া খিড়কির দরজার দিকে যাইতে যাইতে বলিল—'সদর আর খিড়কি দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে পালাবার আর কোনো রাস্তা নেই? পাঁচিল ডিঙিয়ে পালানো যায় না?'

দারোগা বিজয়বাবু বলিলেন,—'না।'

খিড়কির দরজায় একজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে, উপরন্তু দরজায় তালা লাগানো। বিজয়বাবুর হুকুমে পাহারাওয়ালা তালা খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে গেলাম।

ছোট্ট এক টুকরা উঠানের গায়ে দুটি ঘর, পাশে রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। ব্যোমকেশ বলিল—'বিজয়বাবু, আপনি আর অজিত শান্তার কাছে গিয়ে বসুন, আমি স্নানের ঘর আর রান্নাঘর এক নজর দেখে যাই।' বলিয়া সে পাশের দিকে চলিল।

আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি বসিবার ঘর। বেতের আসবাব দিয়া সাজানো। একটি বেতের চেয়ারে শান্তা উদাস অসহায়ভাবে বসিয়া আছে। চিন্তামণি কুণ্ডু তাহার চেহারার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা সত্য; বর্তমানে তাহার মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত; চোখ দুটিও ফুলো-ফুলো। বোধ হয় কান্নাকাটি করিয়াছে।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলে সে মুখ তুলিল। আমাকে লক্ষ্যই করিল না, বিজয়বাবুর দিকে সপ্রশ্ন চক্ষে চাহিল। বিজয়বাবু কিছু বলিলেন না, একটা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমিও বসিলাম।

তিনজনে নির্বাক বসিয়া আছি। আমি চিন্তা করিতেছি—পুলিসের জেরা শুনিয়া শুনিয়া মেয়েটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে যদি নির্দোষ হয়, স্বামীর অপরাধের সহিত তাহার যদি কোনও সংযোগ না থাকে, তবু তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু তপন ওই লোকটাকে খুন করিল কেন? যৌন ঈর্ষা? শান্তার সঙ্গে ওই লোকটার কি—?

ব্যোমকেশ শয়নকক্ষ হইতে প্রবেশ করিল; তাহার মুখ হাসি-হাসি। সে শান্তার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া স্মিতমুখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শান্তাও ক্লান্তভাবে তাহার পানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার চোখে শঙ্কা ও সতর্কতা ফুটিয়া উঠিল। সে সোজা হইয়া বসিয়া একটু বিহ্বলভাবে বলিল,—কী—কী—?'

ব্যোমকেশ প্রফুল্ল স্বরে বলিল—'আপনার শোবার ঘরে একটা ছোট লোহার সিন্দুক রয়েছে দেখলাম। ওতে কী আছে?'

শান্তা বলিল—'দারোগাবাবুকে তো বলেছি, কি আছে আমি জানি না। আমার স্বামী সিন্দুকের চাবি নিজের কাছে রাখতেন।'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'সিন্দুকের তালা ভাঙবার ব্যবস্থা করেছি।'

'বেশ, বেশ, ওতে অনেক মাল পাবেন; চোরাই মাল, দুপুরে ডাকাতির গয়নাপত্র।'—ব্যোমকেশ শান্তার দিকে ফিরিল—'আচ্ছা বলুন দেখি, আপনার স্বামী কী দাড়ি কামাতেন না? বাড়িতে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নেই।'

শান্তার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল—'তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল—'ও। আপনার স্বামী দেখছি অসামান্য লোক ছিলেন। তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন, কিন্তু বাড়িতে চটি জুতো পরতেন না। কোনো কারণ ছিল কি?'

শান্তা চক্ষু নত করিয়া বলিল—'ও'র চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, নতুন চটি কেনা হয়নি। যখন বাড়িতে থাকতেন আমার চটি পরতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল—'তাই নাকি। আপনাদের দুজনের পায়ের মাপ তা হলে সমান?'

শান্তা বলিল,—'প্রায় সমান।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বাঃ! কত সুবিধে! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর দেখছি প্রায় সবই সমান, কেবল চুলের রঙ আলাদা। চিন্তামণিবাবু জানিয়েছিলেন তপনের চুলের রঙ তামাটে। ঠিক তো?'

শান্তা ঢোক গিলিয়া বলিল—'হ্যাঁ।'

বিজয়বাবু চোখ বাহির করিয়া প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র উত্তেজনার কণ্ঠে বলিলেন—'ব্যোমকেশবাবু—!'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল—'দাঁড়ান। তৈরি থাকুন, এবার আমার শেষ প্রশ্ন।—শান্তা দেবী, চিন্তামণিবাবু দেখেছিলেন আপনার গালে মসুরের মত লাল তিল আছে। সে তিলটা গেল কোথায়?'

শান্তা চকিতে নিজের বাঁ গালে হাত দিল, তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল—'তিল! আমার গালে তো তিল নেই, চিন্তামণি বাবু ভুল দেখেছেন। হয়তো লাল কালির ছিটে লেগেছিল—'

ব্যোমকেশের মুখে হিংস্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল—'সব প্রশ্নেরই জবাব তৈরি করে রেখেছেন দেখছি। ভারি বুদ্ধি আপনার। কিন্তু এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন?' ক্ষিপ্রহস্তে সে শান্তার চুল ধরিয়া

টান দিল; সঙ্গে সঙ্গে পরচুলা খসিয়া আসিল, ভিতর হইতে ঘাড়ে-ছাঁটা তামাটে রঙের চুল বাহির হইয়া পড়িল।

শান্তাও বিদ্যুৎবেগে জবাব দিল। একটু অবনত হইয়া সে নিজের ডান পা হইতে শাড়ীর প্রান্ত তুলিল। পায়ের সঙ্গে রবারের গার্টার দিয়া আটকানো ছিল একটা লিকলিকে ছুরি। ক্ষিপ্রহস্তে ছুরি মুষ্টিতে লইয়া শান্তা ব্যোমকেশের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইল। আমি ভয়ার্ত সম্মোহিত-ভাবে শুধু চাহিয়া রহিলাম; একটি স্ত্রীলোকের সুশ্রী কোমল মুখ যে চক্ষের নিমেষে এমন কুশ্রী ও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না।

দারোগা বিজয়বাবু যদি প্রস্তুত না থাকিতেন তাহা হইলে ব্যোমকেশের প্রাণ বাঁচিত কিনা সন্দেহ। তিনি বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া শান্তার কব্জি ধরিয়া ফেলিলেন; ছুরি শান্তার মুষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িল। সে বিষাক্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া সর্প-তর্জনের মত নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল—'বিজয়বাবু, এই নিন্ আপনার খুনী আসামী, আর এই নিন খুনের অস্ত্র!'

বিজয়বাবু একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিলেন—'কিন্তু চিন্তামণিবাবু বলেছিলেন তপন সেন—'

ব্যোমকেশ বলিল—তপন সেনের অস্তিত্ব নেই বিজয়বাবু। আছেন কেবল অদ্বিতীয় শান্তা সেন; ইনিই রাত্রে তপন সেন, দিনে শান্তা সেন—সাক্ষাৎ অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি। মহীয়সী মহিলা ইনি। ভাববেন না যে, বিধুভূষণ আইচকে খুন করাই এঁর একমাত্র কীর্তি। মাস দুই আগে ইনি বর্ধমান জেলের এক গার্ডকে খুন করে জেল থেকে পালিয়েছিলেন। এঁর আসল নাম আমার জানা নেই; আপনি পুলিসের লোক, ফেরারী কয়েদীর নাম জানতে পারেন।'

বিজয়বাবু শান্তার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সুবর্তুল চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—'প্রমীলা পাল। এবার সব বুঝেছি। স্বামীকে বিষ খাওয়ানোর জন্যে তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। দু'বছর জেল খাটবার পর তুমি জেলের গার্ডকে খুন করে পালিয়েছিলে। পালিয়ে এখানে এসে একাই স্বামী-স্ত্রী সেজে লুকিয়ে ছিলে। তারপর সে-রাত্রে বিধুভূষণ তোমাকে দেখতে পায়। বিধুভূষণ তোমাকে চিনতে পেরে তোমার পিছু নিয়েছিল। এইখানে বাড়ির সামনে এসে তুমি তাকে খুন করেছ।'

ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বিজয়-বাবু বলিলেন—'কেমন এই তো?'

ব্যোমকেশ বলিল—'মোট কথা এই বটে।'

বিজয়বাবু হুঙ্কার ছাড়িলেন—'জমাদার!'

জমাদার ঘরের বাহিরেই ছিল, প্রবেশ করিল। বিজয়বাবু বলিলেন—'হাতকড়া লাগাও।'

চিন্তামণিবাবুর ঘরে বসিয়া চা পান

ক্ষিপ্র হস্তে সে শান্তার চুল ধরিয়া টান দিল

করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল—'আপনার চিঠি পড়ে খটকা লেগেছিল চিন্তামণিবাবু। আপনি ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে কখনো দেখেন নি, দূরবীন লাগিয়েও ওদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেননি। কেন? পুরুষটা বেঁটে, মেয়েটা লম্বা; তবে দুরে হাঁটু জল। ওরা সদর দরজা দিয়ে যাতায়াত করে না, খিড়কি দিয়ে আসে যায়; পুরুষটা চেরা-চেরা গলায় কথা বলে। কেন? সন্দেহ হয় যে, কোথাও একটা লুকোচুরি চলছে।

কিন্তু বেশি ফলাও করে সব কথা বলবার দরকার নেই। স্থূলভাবে ব্যাপারটা এই—জেল ভেঙে পালাবার পর প্রমীলা পালের দুটো জিনিস দরকার হয়েছিল; ছদ্মবেশ আর রোজগার। তার মাথার চুল তামাটে রঙের, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই তাকে চুল ছেঁটে পুরুষ সাজতে হল। কিন্তু দুপুরে ডাকাতি করে রোজগার করার জন্যে তার মেয়েমানুষ সাজা দরকার, তাই সে একটি সুন্দর বিলাতী পরচুলো যোগাড় করল। কোথায় চুল ছেঁটেছিল, কোথা থেকে পরচুলা যোগাড় করল আমি জানি না, কিন্তু তার দ্বৈত-জীবন আরম্ভ হল। এখন শীতকাল চলছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ সাজার খুব সুবিধা। সে নাকের নীচে একটি ছোট্ট প্রজাপতি-গোঁফ লাগালো, গায়ে কোট-প্যান্টের ওপর ওভার কোট চড়ালো, তারপর আপনার কাছে বাড়ি

ভাড়া নিতে এল; পাছে মেয়েলী গলা ধরা পড়ে তাই আপনার সঙ্গে চেরা-চেরা গলায় কথা কইল। কলকাতা শহরে ছদ্মবেশে থাকার খুব সুবিধা, পাড়া-পড়শী কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু সে লক্ষ্য করল আপনি সারাক্ষণ জানলার কাছে বসে থাকেন, আপনার বাইনোকুলার আছে। তাকে সাবধান থাকতে হবে।

সে রাত্রে আপনি শুয়ে পড়বার পর সে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি দখল করতে এল। কেউ জানতে পারল না যে মাত্র একজন লোক এসেছে, দু'জন নয়। তার সঙ্গে একটা ছোট্ট লোহার সিন্দুক ছিল, সেটা সে শোবার ঘরে রাখল।

তারপর তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। সকাল বেলা সে স্কুলে পড়াবার নাম করে বেরিয়ে যায়, দুপুর বেলা 'দুপুরে ডাকাতি' করার মতলবে ঘুরে বেড়ায়, বিকেলবেলা ফিরে আসে। আবার সন্ধ্যের পর পুরুষ সেজে বেরোয় আপনাকে ধাপ্পা দেবার জন্যে। ঘরের বিদ্যুৎ বাতি নিবিয়ে পিদ্দিম জেলে রেখে বেরোয়; তেল ফুরোলে পিদ্দিম নিবে যায়, আপনি ভাবেন শান্তা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। আপনি কেবল একটা ভুল করেছিলেন; ইলেকট্রিক বাতি যে তপন বাড়ি থেকে বেরুবার আগে নেবে সেটা লক্ষ্য করেন নি। আপনার মনে সন্দেহ ছিল না তাই লক্ষ্য করেন নি।

যাক, আপনি শুয়ে পড়বার পর সে আবার বাড়িতে ফিরে আসে এবং ঘুমোয়। একটা আলোয়ান সে সম্ভবত গুন্ডার কোটের নীচে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বেরুতো, ফেরবার সময় সেটা গায়ে জড়িয়ে নিত। তাই প্রথম যে-রাত্রে আপনি খড়খড়ি তুলে তাকে ফিরতে দেখলেন, আপনি ভাবলেন সে শান্তার গুপ্ত প্রণয়ী।

এইভাবে চলছিল। তারপর প্রমীলার হঠাৎ ভীষণ বিপদ উপস্থিত হল। বিধুভূষণ আইচ পুলিসের কর্মচারী, প্রমীলাকে আগে দেখেছিল, ছুটিতে কলকাতায় এসে সে প্রমীলাকে দেখতে পেল এবং পুরুষের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনতে পারল। সে প্রমীলার পিছু নিল। হয়তো কোনো হোটেলে দুজনের দেখা হয়েছিল। প্রমীলা নিশ্চয় তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা যখন পারল না, তখন—'

বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া ব্যোমকেশ থামিল, সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

আমি বলিলাম—'একটা কথা। বিধুভূষণকে খুন করে প্রমীলা বাড়ি ছেড়ে পালাল না কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পালাবার সময় পেল না। সে তো জানত না যে, চিন্তামণিবাবু খড়খড়ি তুলে হত্যাকান্ডটা দেখে নিয়েছেন। তাই তার বিশেষ তাড়া ছিল না; ভেবেছিল দামী জিনিসপত্র গয়নাগাটি নিয়ে ধীরে সুস্থে পালাবে। কারণ ওবাড়িতে থাকা আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়; বাড়ির সামনে লাস পড়ে আছে, পুলিস নিশ্চয় তাকে জেরা করতে আসবে। প্রমীলা পাল জেল-ভাঙা খুনী আসামী, যদি পুলিসের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে? সুতরাং নিশ্চয় সে পালাতো। কিন্তু হঠাৎ পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। তখন আর পালাবার রাস্তা নেই, প্রমীলা তাড়াতাড়ি পরচুলোটা পরে নিয়ে মেয়ে সাজল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে গালের তিলটা আঁকতে ভুলে গেল।'

'গালে তিল আঁকতো কেন?'

'দুটো চেহারায় রকমফের আনবার জন্যে। পুরুষ বেশে নাকের নীচে গোঁফ লাগাতো, আর স্ত্রী-বেশে পরচুলো ছাড়াও গালে তিল আঁকত। বুঝেছ?—'আজ তা হলে উঠি, চিন্তামণিবাবু।'

চিন্তামণিবাবু গদগদ ধন্যবাদ সহ একটি দুইশত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। আমরা ফিরিয়া চলিলাম।

বেলা দুটো বাজিতে বিলম্ব নাই। পুলিস আসামীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানে তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্ত বিজয় ভাদুড়ী মহাশয় খুনী আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া নিশ্চয় প্রচুর প্রশংসা অর্জন করিবেন।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখি সত্যবতী দরজার কাছে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের দেখিয়া ভ্রূ তুলিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। অর্থাৎ—এত দেরি যে!

ব্যোমকেশ হঠাৎ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর হাত বাড়াইয়া সত্যবতীর চিবুক একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল,—'তোমরাও কম যাওনা!'
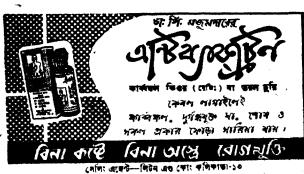
— সমাপ্ত —

সময় সাহিত্য সমালোচনা : পাঠকের চোখে

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

সমকালীন সাহিত্যালোচনা পর্যায়ের 'দুই বসন্তে' সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য উপস্থিত করছি।

আধুনিক বাংলা কবিতা আলোচনায় মুখবন্ধেই মেনে নেওয়া দরকার যে ঐতিহ্য ও সংস্কার এই দুটি প্রতিক্রিয়াশীল শব্দের মোহবন্ধন থেকে অধুনা আমরা অর্থাৎ বর্তমান সাহিত্য পাঠকেরা মুক্ত হতে পেরেছি। রাবীন্দ্রিক কিংবা তিরিশ যুগে সমগোত্রীয় কাব্য-রচনা এখন অসম্ভব ও অর্থহীন। সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষ কর্মে ও চিন্তায় আজ অনেক বেশী আধুনিক ও কলাকৌশলী। অত্যন্ত জটিল এই জীবন সমাজের সর্বস্তরে কি প্রগাঢ় অথচ শম্বুক-গতি এক নিরালোক সঞ্চারিত করছে। সাহিত্যে তথা কাব্যে যদি নতুন মূল্যবোধ এর ফলে জন্মলাভ করে, তা' কি অস্বাভাবিক বা অসংগত!

সুতরাং আধুনিক বাংলা কবিতা স্বাগত। আকৃতি, প্রকৃতি ও বক্তব্য এই ত্রি-মাত্রিক নিরিখে আধুনিক কবিতা প্রখর, স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল। ভাবীকালের কথা চিন্তা না করে, মহৎ বা শাশ্বত সৃষ্টির (?) উৎকণ্ঠা হৃদয়ে না রেখে মাত্র চলিষ্ণু কালের পরিপ্রেক্ষিতে এযুগের কবিদের বিচার সম্ভব। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত মেনে নিলে আধুনিক বাংলা কবিতায় যে দুরূহতা বা দুর্বোধ্যতার অভি-যোগ তার ষোল আনা দায় থেকে আমরা কবিদের নিষ্কৃতি দিতে পারি।

যাঁরা অভিযোগ করেন তাঁদের বক্তব্য আধুনিক কবিতার অর্থ তেমন বোঝা যায় না, যেসব চমকপ্রদ শব্দ বা উপমা ব্যবহৃত হয় সেগুলির দ্বারা পাঠকমানস আক্রান্ত ও অসুস্থ হয়, কবিতা পাঠের পর তেমন রসানন্দ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না (এই প্রসঙ্গে স্কুলপাঠ্য পদ্যের কেউ কেউ উল্লেখ করেন) এই সমস্ত অভিযোগের সম্পূর্ণ জবাব দেওয়া বর্তমান লেখকের অভিপ্রেত নয়। সমস্যা সমাধানের কয়েকটি সূত্রমাত্র দেওয়া যায়। সর্বপ্রথমে আধুনিক-বাংলা-কবিতা পাঠকদের শ্রেণী বিভাগ করা প্রয়োজন। তিনটি শ্রেণীর কল্পনা করতে পারি। যাঁরা নিয়মিত কবিতা পাঠ করেন, অবসরে চিত্ত-বিনোদন হিসাবে কবিতা পাঠ করেন, ও নিতান্ত কৌতূহলবশত দৈবাৎ কবিতা-পাঠ করেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ'দের মধ্যে অনেকে আপন আপন বিদ্যায় পণ্ডিত ও ধীমান্। কিন্তু কবিতায় যে নিজস্ব বৃত্ত তার সঙ্গে এ'দের সংযোগ স্পর্শকের একটি বিন্দুতে। আধুনিক কবিতা পাঠের পূর্বাহ্নে যে মানসপ্রস্তুতির, যে সূক্ষ্মাগ্র অনুভূতির প্রয়োজন তা এরা প্রায়শই স্বীকার করেন না। অথচ একথা সত্য কোন বস্তুতে জ্ঞান-লাভের প্রথম সোপান অনুরাগ, দ্বিতীয় আসক্তি, তৃতীয় অভ্যাস। অভ্যাস থেকে বোধ, তারপর আসে বিশ্বাস। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টি সম্বন্ধে পাঠকদের সতর্ক হওয়ার সময় হয়েছে।

Parallax Error কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকালীন একটি বিশেষ অসুবিধা। পরীক্ষকের দৃষ্টি পরীক্ষাযন্ত্রের সমতলে না রাখার ফলে এই ত্রুটি জন্মায়। আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচনায় এই Parallax Error বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কবিতায় যা দুর্বোধ্যতা বলে মনে হচ্ছে আসলে তা' কবি-মানস ও পাঠক-মানসের দ্বন্দ্বজাত একটি সাময়িক প্রাচীর। একই তলে না থাকায় কবি ও পাঠক বিপরীত শিবিরে। অথচ দুজনের আকাশ একই। সুতরাং আজ কবি ও পাঠককে একই তলে আসতে হবে। পাঠককে কবি হতে হবে। তবেই কবি ও পাঠকের একটি মাত্র সমীকরণ সম্ভব। কাজ সহজ নয়, কিন্তু 'নানা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

একথা সত্য আধুনিক কবিতায় অলৌকিক মূপাভাস প্রকট, বিক্ষিপ্তভাবে শব্দেরা দুর্বিনীত, কলাকৌশল অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু এসবই এক গূঢ় অন্বয়ে তাৎপর্যময়, গভীরতর অর্থে অনিবার্য।

আমরা দাবি করি আরও কবিতা পড়া হোক, আলোচনা চলুক। নৈরাশ্য ও অলৌকিকের পর্দা উন্মোচিত হবেই। ইতি

মতি মুখোপাধ্যায়। কুলটি।

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

সাম্প্রতিককালের কবিতা নিয়ে গবেষণা অন্তহীন : তার ক্রমশ পরিবর্তন সম্বন্ধে এবং পরিণতির দিকে আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষারত। কবিতার উৎকর্ষ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কৌতুক আলোচনা সাম্প্রতিক কালের সচেতন পাঠকমণ্ডলীকে আলোড়িত করেছে এবং প্রত্যেক কবিতা-প্রেমিকের কিছু বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক।

যুদ্ধোত্তর সমাজ-জীবনের দর্পণে প্রতি-ফলিত যে অবক্ষয়, স্বার্থদুষ্টতা, করুণা, ঈপ্সিত বেদনা এবং যন্ত্রণা তারি ইহজাগতিক অথচ পূর্ণবলয়িত রূপটি আশ্চর্য সুন্দর-ভাবে বর্তমানকালের কবিতায় প্রকাশিত।

কবিরা যতই গোত্র বদল করুন, মূল উৎসের অস্তিত্বমুখে যাত্রার পর আমাদের কাছে এ ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁরা আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে এক আর্তনাদের জগতে প্রবেশ করেছেন। তিরিশের যুগের কবিদের মানসধর্মে এই জটিল যুগ সংকটের ছায়া এত গভীর যে, তাঁরা এর জন্মলামর গর্ভ থেকে পরিত্রাণের আর্তি সময়ে সময়ে প্রকাশ করলেও একইভাবে অবস্থান করছেন। এই জন্যেই তাঁদের কবিতা বিপর্যস্ত মানসিকতার প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে।

কবিদের উপলব্ধি (প্রকৃতি, সৌন্দর্যবোধ এবং স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল) এত বেশী ব্যক্তিগত। তাঁরা এতে এত তন্ময় হয়ে প্রবিষ্ট থাকেন যে, তাঁরা তাঁদের স্বরচিত ভূগোলের ইতিহাসের বৃহত্তর অধিবাসীদের কথা সম্বন্ধে অবগত থাকেন না, পাঠক-সমাজের কথা ভাববার সময় পান না।

কবিতার ধর্ম সম্বন্ধে একটা মূল্যবান উক্তি জ্ঞাপিত হয়েছে—Poetry begins in delight and ends with wisdom এই বহুনন্দিত উক্তিটি, এ যুগের কবিদের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য নয়। অলোকরঞ্জন এর ব্যতিক্রম। আনন্দ প্রজ্ঞার এলাকাতেই কবিরা স্বমহিমায় বিরাজিত থাকবেন এটি ভাবতে শৈশবে বড় ভালো লাগত। কিন্তু তবুও ফ্রস্ট কথিত সূত্রটিকে (একমাত্র অলোকরঞ্জন ব্যতীত, যিনি নাগরিক সভ্যতার কোলাহলে বিসর্জিত নন—অপরাজিত সৈনিক) অ-কবিরা অবহেলা করছেন। কবিরা তাঁদের এই অসম্পূর্ণতা, খণ্ডতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মসচেতন।

'শব্দ' সম্বন্ধে একটা আন্দোলন লক্ষ্য করা গেল। পাঠক-পাঠিকাদের অভিযোগ, শব্দের আলিঙ্গনে তাঁরা অত্যন্তই আশ্রিত। সুনির্বাচিত শব্দের প্রতি প্রণয়, বিশেষত বক্তব্যকে যেখানে বিকশিত করা দরকার সেখানে যদি উপযুক্ত শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় তাকে 'শিল্পাদর্শের কলংকিত' অধ্যায় হিসেবে মেনে নেওয়ার সংগত কারণ নেই। তবে একই শব্দের দ্বৈত প্রয়োগ অপবিত্র, এবং অকৌলীন্যবাচক শব্দ আমাদের কবিতার জগৎ থেকে নির্বাসিত করে। ধ্রুপদী অস্তিত্বের বিন্যাস সেখানে নেই ব'লে আমরা অন্য ভূমিতে প্রস্থান করি। নারীদেহবাচক শব্দ কবিরা ব্যবহার ক'রতে অভ্যস্ত। সাধারণ পাঠকের তো কথা দূরে থাকুক চৈতন্যশীল পাঠকরা কবির প্রতি বিরূপ হন।

আধুনিক কবিতাকে লক্ষ্য ক'রে অনেকে বলেন এ যুগের কবিতায় গীতি-কবিতার সুরে আত্মপ্রকাশ করেছে। গীতি-কবিতার ধর্ম কি? কবি যেখানে স্বকীয় অনুভূতিকে সার্বজনীনভাবে অপরূপ তন্ময় হয়ে পরিবেষণ করবেন, যখন বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে পার্থক্য থাকবে না তখন সার্থক শিল্প উন্মোচিত হয়ে উঠবে। এ যুগের কবিতার ইতিহাসে একমাত্র এক কি তিন-চারজন এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারেন। সকল রকম অ্যামবিগুইটিকে লালন করে যাঁর রচনায় উচ্চারিত হবে নির্ভরমন্ত্র, ধ্রুপদী বিশ্বাসে তিনি অম্লান, অজেয়।

প্রতীকের বহুলতায় ইমেজ রচনায় এ যুগের কবিরা সত্যিই স্মরণীয়। এই কাব্য-ধারায় স্পষ্ট বাচনভঙ্গী, ধূসর বর্ণনা, বিস্তীর্ণ যন্ত্রণা, দুঃখমিশ্রিত আনন্দ, অত্যন্ত সুন্দরভাবে রূপায়িত। মণীন্দ্র রায় থেকে যাত্রা শুরু করে তরুণতম কবি পর্যন্ত প্রত্যেকেই। আমার মনে হয় প্রতীক এবং চিত্রকল্প রচনা এ যুগের কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এবং এ সব দিক থেকেই বাংলাদেশের কবি-গণের কাছে আমার নিবেদন যে অস্তি ও নেতির সংগ্রামজাত এই ভূগোলের অধিবাসী হয়েও যদি তাঁদের স্বরচিত অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণভাবে এবং উদাত্তভাবে বন্দনা ক'রে জগৎ ও জীবনকে আমাদের কাছে তুলে ধরেন, তবে আমরা যান্ত্রিক জীবনক্ষেত্র থেকেই বাংলা সাহিত্যের আলোকিত নব-পর্যায়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হবো। বিন্দু বিন্দু আশার সমবায়ে দেখবো, যা সত্য যা অনন্ত, যা অমৃত আধুনিক সাহিত্যে। সুধীর বক্সী। কাঁচরাপাড়া।

॥ ৩ ॥

মহাশয়,

সাম্প্রতিক কবিতা প্রসঙ্গে 'দুই বসন্তে' রচনায় ইচ্ছাপূর্বক তরুণতর কবিদের সিংহ-সম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কেন তা বুঝতে আমি অপারগ। দেশ পত্রিকায় কয়েকজন তরুণ কবির কবিতার বিজ্ঞাপন প্রচার করবার জন্য এমন সন্দেহ জাগ্রত হয় মূল লেখা এবং তার সম্পর্কে পাঠকদের দু'একটি পত্র প্রকাশিত হতে দেখে। কারণ মূল রচনার ত্রুটি অন্বেষণের ভান করে এগুলিও কয়েকজন মাত্র তরুণ কবির ওপর আলোক-পাত করতেই লিখিত। এই দৃষ্টিকটু ব্যাপারে মূল রচনাটির উদ্দেশ্যও ব্যর্থ করেছে ও সেখানেও তাই ভারসাম্য হারিয়েছে। তরুণ-তর কবিরা যে আশানুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন (তাঁদের আঙ্গিকে চাকচিক্য থাকা সত্ত্বেও) তার কারণ তাঁরা আধুনিকতা বলতে যৌনচেতনার উদ্ভূত ধ্যান-ধারণা নিয়েই প্রিঅকুপাইড বা ব্যস্ত; কিন্তু আধুনিকতা নিশ্চয়ই শুধু যৌনজীবনকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায় না। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক কবিতা এত বেশী লেখকের ব্যক্তি-গত মানসিক কমপ্লেক্সের জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ, যা ইউনিভার্সাল নয়, সাধারণ স্বাভাবিক মনের বক্তব্য নয়, দুর্বোধ্যতা এই কারণে। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা প্রবলেম সৃষ্টি হলেই যে তা শিল্পরূপে প্রকাশিত হবার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, এমন কোন কথা নেই, কারণ অস্বাভাবিক মনে বিচিত্র জটিল সমস্যা হাজির হয় যার রহস্য শিল্পী বা কবির দ্বারা পরীক্ষিত হবার যোগ্য নয়, তা মনস্তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়; যে ফ্যাশনের নিশান উড়িয়ে তরুণ কবিরা অগ্রসর হন, অবদমিত বাসনার বিকৃতি প্রকাশ যে আধুনিকতা নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে তা বহু পূর্বেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে-ছেন। বিশেষ গোষ্ঠী তৈরী করে 'আধুনিক' কবিরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন। জীবন থেকে আহরিত গভীর চিন্তার বিষয় তাঁদের রচনায় স্থান লাভ করেছে। সেজন্য তাঁদের লেখা দুরূহ নয়। কারণ তাঁরা নিজেরাই 'কনফিউজড'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কিন্তু আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার।" ('বিচিত্রা' দ্রষ্টব্য)। ইতি। রজত চৌধুরী, কলিকাতা—২৯।

'সার শুভংকর এখন বিশ্রাম করছেন।'

'ও'র-ও বিশ্রামের দরকার হয় তা হলে?' বিনীত পুরুষ-গলা হেসে উঠলো—'কাজের ঘোড়ার পিঠে চেপে চেপেই উনি বুঝি দু' চার মিনিটের বিশ্রাম নিতে পারেন পাশের ওই ছোট্ট পর্দা-টানা ঘরটাতে?'

'কিন্তু—' মিহি মেয়েলী গলা শোনা গেলো, 'উনি তো শীগগিরিই রিটায়ার করছেন। তারপর ও'র নিশ্চয় খুব খারাপ লাগবে?'

'কী যে বলো, মীনা—' পুরুষ-গলা প্রশ্রয়-দেয়া হাসিতে ঝরে পড়তে লাগলো। 'ও'দের মতো মহামূল্য লোককে কি আর কাজ থেকে ছুটি দেবে গঠনশীল ভারত? হয়তো এখনই কতো কনট্রাক্ট নিয়ে সাধাসিধে চলেছে, শুধু সরকার থেকে ছাড়া পাবার অপেক্ষা। তাই নয় কি লেডী মুখার্জি?'

'কাজ ডাকলে উনি না বলতে পারবেন না, —' আঃ, এতোক্ষণে দেবীর ভারি গলার আওয়াজ শোনা গেলো। এই আওয়াজ শিথিল স্নায়ুগ্রন্থিকে একমুহূর্তে সংহত করে, কর্মক্ষম করে। এই আওয়াজ পলাতক রাখালকে বাঁশি ফেলে প্রমিথিয়ুসের আগুন আনার জন্যে পাঠাতে পারে। 'তবে আমরা মনে করি, কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া ও'র পক্ষে দরকার। এতো বছর ধরেই তো খাটলেন—কাজের বাইরের জীবনকে উপভোগ তো করলেন না।'

'তা হোক। কিন্তু ও'র প্রয়োজন তো ফুরোয় নি।' পুরুষ-গলা মন্তব্য করলো। 'তা ছাড়া উনি নিজেই অলস জীবনে হাঁপিয়ে উঠবেন। কাজ ছাড়া ও'র বিশ্রী লাগবে।'

ভেতরে একটা নীল আলো জ্বলছে। আরব্য-উপন্যাসের সবুজ গালিচা মনের মাঝখানটাতে কতোকাল ধরে যেন গুটিয়ে রেখেছে কেউ। তাকে যদি ধীরে ধীরে বিছিয়ে দেওয়া যায়, সবুজ রাস্তা হবে, সবুজ মরূদ্যান। সেখানে জোনাকির বাতি, তাল-খেজুরের গাছ, উটপাখি।

দেবী পর্দা সরিয়ে ভেতরে এলেন। 'না, পারা গেলো না। বোসদের তো আমিই 'এনগেজ' করে রেখেছিলাম, এবার সহানী এসেছেন। কী নাকি জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'আবার একটা মিটিং রয়েছে চারটেয়।' শুভংকর ঘড়ির দিকে তাকান, 'তুমি যাচ্ছ কোথায় অতো ব্যস্ত হয়ে, বসো না। ড্রাইভারকে বলা আছে।'

'কী যে খালি দরকারী কথা আর মিটিং', দেবী ভ্রূভঙ্গি করলেন, 'একটু বিশ্রাম হয় না। দু মিনিট বসে নিজেরা কথা বলবো, তারও ফুরসত নেই।'

'হবে ফুরসত।' সার শুভংকর হাসতে থাকেন, 'আর দু'মাস পরেই তো পেন্সন। আয় অনেক কমে যাবে অবশ্য, তেমনি আরাম মিলবে তো।'

'আয়ের কথা কে ভাবছে—' দেবী বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটাতে বসেন, 'একটা তো মেয়ে। তারও ভালো ঘরে বরে বিয়ে দিয়েছি। টাকাতে আমাদের কী দরকার।'

'তা তো বটেই।'

'তুমি কাজ ছাড়া থাকতে পারবে কি না, সেটাই হলো প্রশ্ন।'

'তুমিই কি পারবে—' সার শুভংকর উঠে পড়েন এবার, 'এই গৌরবময় অস্তিত্বকে নির্বিকার ভুলে গিয়ে শুধু থাকা খাওয়া
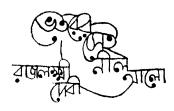
নিয়ে দিনের পর দিন গুণতে? মনে হয় না কি, বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়েছো পার্টি আর সোসাইটির নাগপাশে, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের চাটুকারী ছবিগুলোর বন্ধনে?'

'তোমার সমধর্মিনী হতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করো, আসক্তি নিয়ে এগুলো চাই নি। তোমারই উজ্জ্বল অস্তিত্বের পাশাপাশি আমিও, আমিও।'

'মুখ তোলো, দেবী। না, মন খারাপ করো না। অনেক সময় আমি বিশ্রীভাবে ঠাট্টা করি।'

দেবী হাসলেন, 'তোমার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখানেই। তারপর বেরিয়ো।'

'বাবা—' বনানী ডাকলো, 'তোমার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

'কে, বনু? তুই কখন এলি?'

'আমি তো মাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আজকে মহাবোধি স্কুলের প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনে মাকেই তো প্রাইজ দিতে হবে। মা কিন্তু এখনও তৈরী হন নি।'

'হয়ে যাবে। তোর আবার তাড়াহুড়ো বেশি।'

বনানী চা ঢালছে। সবুজ কাঞ্জীবরম শাড়িটার আঁচল হাওয়ায় দুলছে।

'বাবা, ও বলছিল—'

'কে, মৃগাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, বলছিল, তুমি যদি কোনো বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যাও, তবে ও-ও চেষ্টা করবে ঐ-ধরনের কাজের জন্যে। সরকারী চাকরিতে মাইনে বড়ো কম।'

'তোদের টাকার চিন্তা করবার কী আছে?' সার শুভংকর প্রশ্ন করলেন, 'আমার যা কিছু তোরাই তো পাবি। আমার টুটকুন দাদু পবে।'

'না বাবা, ও বলছিল, ঠিক টাকা নয়। মর্যাদাটাও আজকাল খুব বেশি ঐ ধরনের শাঁসালো চাকরিতে। মাইনের অংকটা যতো বড়ো, ততোটাই তো দপদপা?'

'হুঁ।' শুভংকর শূন্য কাপটা নামিয়ে রাখেন ভাবশূন্য মুখেই।

বাইরের ঘরে সহানী। 'শুনেছেন খবরটা, সার?'

'কী খবর?' শুভংকর স্মিতমুখেই ঘড়ি দেখেন, 'আমাকে ঠিক চারটায় বেরোতে হবে। খবর কি খুবই জরুরী?'

'গুরদয়ালজী কালকে 'সুইসাইড' করেছেন। কাল শেষ রাত্রে। এখনো 'বডি' পড়ে আছে। আমাদের কি যাওয়া উচিত নয়?'

'তোমরা যাও। নিশ্চয়ই যাবে।' শুভংকর সহসা গম্ভীর, চিন্তিত হয়ে পড়লেন, 'আমরাও চেষ্টা করবো ওখান থেকেই সোজাসুজি যেতে। হ্যাঁ, এটা নিশ্চয়ই আমাদের সকলের কাছে ও'র পাওনা। তিন বছর আগে পরে হলেই কি একটা পুরো শাসনতন্ত্র তাঁকে অবিমিশ্র ভুলে যাবে?'

'ব্লেড দিয়ে নিজের গলা কেটেছেন, সার' সহানী বিচলিত হয়ে পড়লো, 'সমস্ত কামরা রক্তে ভেসে গেছে। আর আত্মহত্যার কারণ কী লিখেছেন জানেন? অদ্ভুত, ভারী অদ্ভুত ও'র চিঠি। 'উপন্যাস পড়তে ভালো লাগে না, সমস্ত ধর্মগ্রন্থ অনেকবার শেষ করেছি, জীবনে এখন উদ্দেশ্য বা অর্থ পাচ্ছি না, তাই জীবনকে শেষ করে দিতে বাধ্য হলাম।'

'আশ্চর্য মানুষের মনের গতি।'

'খুব স্বাভাবিক গতি, নয় কি?' সহানী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'গুরুদয়ালজী কর্মনিষ্ঠ লোক, কাজ ছাড়া জীবনে ও'র বিতৃষ্ণা, দুর্বার বিতৃষ্ণা আসারই তো কথা।'

'গুরুদয়ালজী আমার ওপরওয়ালা ছিলেন'—সহানী চলে গেছে; শুভংকর এই কথাগুলো নিজেকে বলছেন: 'কিন্তু উনি কর্মনিষ্ঠ ছিলেন না, ছিলেন কর্মকীট। কাজের পোকা ও'র মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে কুরে খেয়েছিল। দিবারাত্রির জপমালা হিসাবে উনি অফিস আর ফাইলকে আশ্রয় করেছিলেন। তারপর এক আচমকা অবসাদে উনি সেই জপমালা পালটে ঈশ্বর আর ধর্মগ্রন্থের জপমালা তুলে নিলেন। একই

ধরনের অধ্যবসায় নিয়ে আক্রমণ করলেন তাদের। গুরুদয়ালজী ভুলে গিয়েছিলেন, এই নতুন জপমালায় বিবর্তন বা পরিবর্তন নেই। কতোদিন ধরে আর মালা গুনবেন, যদি কোন এক আরোহণের, বা নাম-সই দিয়ে ভাগ্য-বিধানের স্বর্ণরুদ্রাক্ষ হাতে ঘুরে না আসে।'

'গুরুদয়ালজী গাধার খাটুনিতে তাঁর মজ্জাগত উজ্জ্বল্যের অভাব পুষিয়ে একদা সেই শীর্ষে আরূঢ় হয়েছিলেন, যে-শীর্ষে আজ আমি। কিন্তু তাঁর মন ছিল না হীরার মতো নিজগুণে দ্যুতিমান, তাকে বড় জোর চকমকির সঙ্গে তুলনা করা চলে, অনেক ঘর্ষণে যে দীপ্তিমান হয়। সেই মন যখন ঘর্ষণের জন্য কিছু না পায়, কিছুই না পায়, তখন সে তো ভারী এক ম্যাটমেটে পাথর। সেই মন অখণ্ড অবসরকে উজ্জ্বল করবে কোন প্রভায়? সেই মন প্রগাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাবে।'

কিন্তু উজ্জ্বল মনের সমস্ত বাইরের বাতি নিবে গেলে এক নীল আলো জ্বলবে। এক সবুজ গালিচা, অনেককালের গুটোনো গালিচা খুলবে, খুলতেই থাকবে, ফুরোবে না। সেই উড়ন্ত কার্পেট সুষুপ্ত চেতনাকে নিয়ে যাবে হুরী, পরী, রামধনু, চাঁদ-তারার দেশে। সেখানে নিঃশব্দ নীল কুয়াশা, অস্তিত্ব নীল রেণু হয়ে ঝরে যায়।

গুরুদয়ালজীর শেষকৃত্য সেরে ফিরছিলেন। দেবীর অভিমানী মুখ মনে পড়লো, দুঃখ পেলেন বরাবরের মতো। দেবীকে তিনি কীর্তি দিয়ে জয় করেছিলেন, দেবীর বাবা ব্যারিস্টার চৌধুরীর মতো খুঁতখুঁতে লোককেও মানতে হয়েছিলো, এ প্রমিসিং ইয়ং ম্যান—, দ্যাট।'

'কীর্তি' থেকে কীর্তিতে তুমিই উঠিয়েছো।' শুভংকর স্বগত বললেন, 'তাতে দুঃখ পাও কেন? ভালোবাসার পাথেয় নিয়ে উন্নতির দ্রুতগামী ট্রেনে চড়তে পেরেছি, সে তো তোমার পক্ষে অবিমিশ্র গৌরব।'

'তা ছাড়া—' শুভংকর অতীতে ফিরে গেলেন, 'শুধু তো তুমিই দায়ী নয়। আমার জীবনটা যেন ধারাবাহিক দৌড়ের মতো আমাকে, এক আগুনের মশালকে, হাত থেকে হাতে চালান করেছে। মা-র হাত থেকে হেডমাস্টার মশাই, সেখান থেকে প্রিন্সিপাল, সবাই সতর্কের চেয়ে সতর্ক, আমি নিবে না যাই। তুমি শুধু জীবনদৌড়ের পথে দাঁড়িয়েছিলে। তুমিও আগুনের মশাল নিবতে দাও নি। তুমি দৌড়ের শেষ সীমা পর্যন্ত এনেছো, না কি, এখনও দৌড় শেষ হয়নি?'

'শুভংকর, আমার কলেজের মুখ তুমিই রাখবে।' এই কথাগুলি থেকে থেকে কানে ইন্ধনের মতো ঢেলে দিতেন অধ্যক্ষ রামরতন

সরকার। শুভংকর তাই পড়ে গেলো ভল্যুমের পর ভল্যুম, ধমনীতে গলিত আগুনের মতো উদ্দাম, মস্তিষ্কের বাতিদানে সপ্তচ্ছদী শিখা, ধ্যান, ধৃতি, অভিনিবেশ, পারিপাট্য, যোজনা, কল্পনা, প্রয়োগ। সূর্যের চেয়ে সহস্রগুণ তেজীয়ান সংকল্পে আগুনের মতো জ্বলতে জ্বলতে শুভংকর রাশি রাশি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলো।

তারও আগে চলে গেলে অংক আর ভূগোলের ক্লাসগুলি মনে পড়বে। হেড-মাস্টার মশাই তাঁর ভারী চশমা আর কালো চাপদাড়িতে দুর্ধর্ষ হ'য়ে কঠিনতম এক সমস্যার রহস্যভেদ করছেন।

'শুভংকর।'

শুভংকর পিপুলগাছের ওপর পাখি দেখছিলো।

'শুভংকর।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ সার?' উঠে দাঁড়ালো শুভংকর।

'স্কোয়াররুট বলো?'
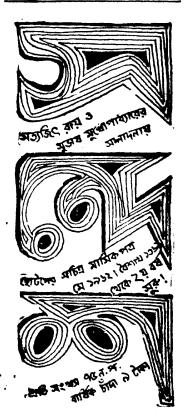
'নির্ভুল উত্তর দিচ্ছে শুভংকর। হেড-মাস্টারমশাই খুশী খুশী মুখে চশমা মুছলেন, পরলেন আবার। 'হুঁ,—বলেছো বলেছ ঠিকই। কিন্তু শুভংকর, ক্লাসে অন্য-মনস্ক হওয়া তো ঠিক নয়।'

'দুঃখিত, সার।'

'বসো।'

ভূগোলের ক্লাসেই একদিন খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলো শুভংকর। হেডমাস্টারমশাই-এর প্রশ্নের জবাবে হঠাৎ সে বলে উঠেছিল, 'বরফ, সার।'

'সাহারা মরুভূমিতে বরফ।' হেডমাস্টার মশাই অন্যমনস্ক শুভংকরকে চশমার পেছন থেকে তির্যক দৃষ্টিতে বিদ্ধ করেন, 'মেরু আর মরুর তফাতটা ভুলে গেলে না কি?'

আসলে তার আগেই হঠাৎ নীল বাতিটা জ্বালিয়ে শুভংকর নীল বরফের ঝিরঝির শুনছিলো। নীল বরফের ইগলু-বাড়ি, নীল বরফের মেজে, সীলের তেলের নরম নীল বাতির নিচে এস্কিমোদের মোলায়েম ছায়া দেখছিলো।

'এতো অন্যমনস্ক হয়ো না শুভংকর। তুমি যদি মন দাও, তাহলে কী না পারো।'

হেডমাস্টার মশাইয়ের এই কথায় নীল বাতি অনেকদিনের জন্যে নিবে গেলো। আগুনের মশাল হয়ে শুভংকর পড়া শুনলো, শুভংকর স্কলারশিপ পেলো, স্কুলের নাম উজ্জ্বল করলো।

তারও আগে চলে গেলে নরম, নীল ছেলেবয়সের দিনগুলো পাওয়া যায় না কি? খেলনার দরকার হতো না। খাটটা প্রকাণ্ড জাহাজ, মাটিতে মহাসাগরের ঢেউ। খাটের খুরো চেপে ধরলে তিমিমাছের সঙ্গে যুদ্ধ; মশারিটা সাদা মাস্তুল; চেয়ারগুলো পাহাড়, টেবিলটা চোরা বরফের ভয়ানক স্তূপ।

'কী শান্ত ছেলে তোমার, চুপচাপ খেলছে কখন থেকে?'

'শুভ, এদিকে এসো,—' মা-র ভারী গলার আওয়াজ পেয়ে শুভ থমকালো, এই আওয়াজ তাকে উজ্জ্বল আলোর দিকে ডাকে। এই মাসিকে একটা কবিতা শোনাবে না?' মনের বাতিগুলো টপাটপ টিপে জ্বালিয়ে শুভংকর তৈরি। 'কালো ভেড়া, কেন ব্যা ব্যা করছো' থেকে সংখ্যা-গোনা পর্যন্ত বিদ্যে জাহির করে মা-র দুই চোখে স্মিত গর্ব দেখলো শুভংকর, দেখলো উজ্জ্বল সার্থকতা।

'এখন খেলতে যেতে পারো তুমি—' মা বোঝেন না, নীল আলো নিশ্চিহ্ন নিবে গেছে। শুভংকর এখন অগ্নিগোলক। ইচ্ছা করলেই এখুনি সে তার মনের সম্পূর্ণ রোশনাই নেবাতে পারবে না। 'কী বলছো?'

'আমি ডিগবাজীও খেতে পারি।' ফিসফিস করে জানালো শুভংকর। ক্ষুন্ন হলো মা-র নিষ্ঠুর নিশ্চেষ্টতায়। তবু বিদ্যার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হলো না।

'সাদা ধপধপ দুধ দধি নীল আকাশ-খানি। জরদ রং কমলালেবু আমরা সবাই জানি।' আবৃত্তি শেষ করলো শুভংকর। 'আর একটা কবিতা তোমাকে শেখাই, এসো।' মা-র কোলে শুভংকর। শুভংকরের মনে বর্ণালী। 'না, এতো অন্যমনস্ক হলে আমি পারবো না।' শুভংকর মা-র এই গলা সহ্য করতে পারে না 'মন দাও, নয়তো চলে যাও।' শুভংকর নিবিয়ে দিলো রামধনু-বাতি, নরম বাতি। শুভংকর মনের ন্যাপ্‌থালিন-গন্ধ কুঠুরিতে জ্বলজ্বলে সব আলো জ্বালালো।

'বনু চলে গেছে?' পোশাক ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন করলেন সার শুভংকর।

'হ্যাঁ। তোমাকে মৃগাংকর কথা বলেছিল?'

'বলেছিল। ওদের দেখছি একটা আশা আছে, আমার আগামীর ওপর তার ভিত্তি। শেষে চোরাবালিতে তলিয়ে যাবে না তো!' হেসে উঠলেন সার শুভংকর।

'তুমি যা-ই ভাবো,' দেবী দৃঢ় হন এবার, 'আমি, আর হয়ত বনুও, প্রধানভাবে এখন ভেবে নিই যে তুমি কাজেই থাকবে। যদি তুমি ক্লান্ত বোধ করো—' দেবীর গলা হাঁসের পালকের মত মোলায়েম হলো, 'তাহলে এই সব আশা, কি বর্তমান জীবনের লোভনীয় সব আরতি কি এতোই বেশি দামী?'

'কিছুই কি দামী নয়?' সার শুভংকর গম্ভীরভাবে বলেন, 'তোমার রাজেন্দ্রাণী-দীপ্তি, আর বনানীর ডগমগে গর্ব? অবশ্য উজ্জ্বল অস্তিত্ব খানিকটা মন দিয়ে আমি তো নিজেও চেয়েছিলাম। তবু কেমন শ্রান্ত বোধ করছি।'

'গুরদয়ালজীর মৃত্যুতে তুমি আহত হয়েছো,' দেবী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তাই হঠাৎ এতো ক্লান্তি। হয়তো কাল সকালে ঘুম ভেঙেই আবার ভালো লাগবে, উৎসাহ পাবে।'

'না,—রিটায়ার করা চলবে না।' শুভংকর খুব আস্তে বলেন, দেবীর শোনার জন্যে নয়। 'ভালোবাসা এক রকমের মাশুল দাবি করে, আমাকে তা মেটাতে হবে।'

অথচ, সর্বক্ষণ, ভেতরে এক নীল বাতি জ্বলছে। নীল সমুদ্রের মতো এক বিস্তার অবগাহনের অপেক্ষা করে। সেখানে ঝিনুক, বাতিঘর, দূরে সবুজ দ্বীপ, বালু, নুলিয়া, রুপোলী চিকচিকে মাছ। সেখানে অনেক রূপ, ঢেউয়ের অপর্যাপ্ত সংগীত। সেখানে শান্তি। স্বপ্নের নীল ছায়াপথ।

[২৭]

গোসাঁইদিদির মোহান্ত বড় একটা এ-গাঁয়ে আসতো না। দূরে দূরে গাঁ দিয়ে চলে যেত সে, কোনদিন ফিরতো, কোনদিন ফিরতো না। সবাই তাই গোসাঁইদিদির সাহস দেখে বিস্মিত হতো।

গিরিজার বাবা বলতো, তোমার সাহস বলিহারি, বষ্টুমী। মোহান্ত থাকে না আদ্ধেক দিন, তবু একা একা থাকো কি করে ওই তেপান্তরের মাঠে!

মা ঠোঁট চেপে ফিসফিসিয়ে বলতো, সাহস বলে সাহস। এই বয়সে তিনটে বউ এক ঘরে থেকেও রাতে ঘুমুতে পারে না পুরুষ মানুষ না থাকলে, আর গোসাঁই দিদি তুমি কিনা...

গোসাঁইদিদি হাসতো। মিণ্টি মিণ্টি হাসি, আর মিণ্টি মিণ্টি কথা। বলতো, নিতাইগৌরকে আমার সব সমর্পণ করে বসে রইলাম, আর ভয়কে রাখবো নিজের বুকে? পুণ্য দোব আর পাপ রাখবো নিজের কাছে?

বড় সুন্দর কথা বলতো গোসাঁইদিদি।

পরীক্ষা দিয়ে সেবার যখন ফিরে এলো গিরিজা, মনে মনে ভেবে রেখেছিল গোসাঁই-দিদির কুঞ্জে গিয়ে দেখা করে আসবে শেষ-বারের মত। সেটাই গিরিজার শেষ পরীক্ষা, ফল বেরোয়নি, কিন্তু তার আগেই চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। মাস্টারীর চাকরি।

তার বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে গিরিজার।

হঠাৎ সেদিন সকাল বেলাতেই এসে হাজির হলো গোসাঁইদিদি। খঞ্জনীর শব্দ আর গোসাঁইদিদির গানের রেশটুকু ভেসে আসতেই বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো গিরিজা। কিন্তু বিস্মিত হলো গানের সঙ্গে সঙ্গে গুপীযন্ত্রের আওয়াজ শুনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সদর দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকলো গোসাঁইদিদি। হাতে খঞ্জনি, মুখে হাসি, নাকে কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার রসকলি। আর পিছনে পিছনে গুপীযন্ত্র বাজাতে বাজাতে ঢুকলো মোহান্ত। চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, তেল চুকচুকে কালো রঙ, কিন্তু চোখেমুখে কেমন একটা স্নিগ্ধ ভাব।

গিরিজাকে দেখতে পেয়েই গোসাঁইদিদি বলে উঠলো, ওরে আমার গোপাল ফিরেছে, গিরি গোবর্ধন ফিরেছে!

গিরিজা হাসলো।

গোসাঁইদিদি আবার প্রশ্ন করলে, বউ এনেছো? যাও নিয়ে এসো তাকে, বাপের বাড়িতেই রইবে নাকি চিরটাকাল?

গিরিজা হেসে বললে, চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছি গো গোসাঁইদিদি।

গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গোসাঁইদিদি বললে, চলে যাবে গাঁ থেকে? গোলামী করতে যাবে চাঁদ? কি লাভ হলো তবে পড়েশুনে।

হাসলো গিরিজা, আর তখনই গিরিজার মা এসে দাঁড়ালো। বললে, তুমিই বলো, ছেলের এতটুকু মায়া মমতা নেই বাপু, মাকে ছেড়ে নাকি থাকতে পারবি তুই, মা পারবে কিনা ভেবে দেখ।

গিরিজা কোন উত্তর দিলো না। ওর মনে তখন কত স্বপ্ন, কত আদর্শ।

নানা কথার পর গোসাঁইদিদি বললে, তোমাদের সব গাঁ সুদ্ধ নেমন্তন্ন করতে এসেছি মা। কেন্দুলে চলো কুঞ্জে, যেতে হবে তোমাদের।

গিরিজার মা হেসে বললে, তাই তোকে

এয়েছো বুঝি!

মোহান্তও হাসলো সে কথা শুনে। বললে, মোহ অন্ত হলে তবে তো মোহান্ত মা, তার কি আর জোড়বিজোড় আছে। জোড় শুধু একজনের সঙ্গে...

বলেই গুপীযন্ত্র বাজিয়ে এক কলি গান গেয়ে উঠলো মোহান্ত :

কই গো বৃন্দে সই
আমার বৃন্দাবনচন্দ্র কই
আমার কই সে নয়নের আনন্দ কই...

গোসাঁইদিদিও মোহন্তর সঙ্গে গলা মিলিয়ে এক কলি গান গেয়ে উঠেই খঞ্জনী থামালো। তারপর বললে, গোপাল, মাকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে যেও বাবা। সাঁঝ-বেলাতেই যেও। আমার নিতাইচাঁদের ভোগ পাবে, কেত্তন শুনবে...

গিরিজার মা হেসে বললে, তোমাদের মত স্বাধীন তো নই, আসুক গিরির বাবা, জিগ্যেস করি...

গোসাঁইদিদির ঠাণ্ডা চোখ জোড়া হেসে উঠলো। বললে, হ্যাঁ গো মেয়ে, কানুর কাছে যেতে কেউ আবার অনুমতি নেয়। পালিয়ে যাবে, লুকিয়ে যাবে...

গিরিজার মা হেসেই কুটিকুটি। বললে, বলো কি, লুকিয়ে যাবো?

—হ্যাঁ, লুকিয়ে যাবে, ফিরে এসে গঞ্জনা শুনবে।

বলেই আবার গান ধরলো :

গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা,
রাধাকান্ত তুমি একান্ত ভরসা।

গান থামিয়ে বললে, গুরুগঞ্জনা হলো আশীর্বাদ, যত গঞ্জনা পাবে কানু-অনুরাগ তত গাঢ় হবে।

গিরিজার মা হেসে উঠে বসলে, যাবো, যাবো, গাঁয়ের আর সব যায় তো আমিও যাবো।

আর গোসাঁইদিদির পিছনে পিছনে মোহান্তও চলে গেল। গুপীযন্ত্র আওয়াজ, খঞ্জনীর আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।

গিরিজা তখনো জানতো না তার জন্যে এমন একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে।

বিকেল থেকেই খড়ি নদীর ধার বরাবর আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে গাঁয়ের বউ-ঝির দল যেতে শুরু করলো গোসাঁইদিদির কুঞ্জের উদ্দেশে। আর সন্ধ্যের আগেই ভেসে এলো খোল-করতালের আওয়াজ।

এক সময় ছোটমা আর তার জা এসে হাজির হলো। গিরিজার মাকে বললে, চলো গো দিদি, কেত্তন শুনতে যাবে না?

গিরিজা খুশী হয়ে বললে, যাবে তুমি ছোটমা?

ছোটমা হেসে উত্তর দিলে, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি পেসাদ, সেই ভরসায় এয়েছি কিন্তু।

গিরিজা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা বললে, ও মা তুই আর না যেয়ে পারিস, তোর পরাণের বন্ধু হলো আমার বংশীধারী। বলে হাসলে ছোটমা। বংশী নয়, বংশীধারী। বাঁশির মত সুরেলা গলা।

কোলকাতার কলেজে পড়বার সময় মাঝে মাঝে ছুটিতে এসেছে গিরিজা। কখনো দেখা হয়েছে বংশীর সঙ্গে, কখনো হয়নি। তার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক আর গলায় তুলসী কাঠের মালা দেখে ঠাট্টা করেছে গিরিজা, বলেছে, ভেক নিয়েছিস বংশী? কোটালের ছেলে কিনা বোস্টম হলি?

শুনে একটুও চটেনি বংশী, হেসেছে। বলেছে, বোষ্টম কে লয় গো গিরিদাদা। তুমি আমি সবাই—একবার যে ও রসের সন্ধান পেয়েছে, সে কি চিনির রসে আর ভুলবে কোনদিন?

কি সে রস, কোন রসের সন্ধান পেয়েছে বংশী গিরিজা জানতো না। গোসাইদিদির কুঞ্জে গিয়ে সেই প্রথম তার সন্ধান পেলো।

আশপাশের গাঁয়ের জনকয়েক বোষ্টম আর বোষ্টমী গিয়ে জড়ো হয়েছে তখন কুঞ্জে। আর যত বিধবা বুড়ী। তারই মধ্যে বনপলাশির জনকয়েক। গিরিজার মা, ছোটমা, ছোটমার এক জা।

আর বংশীর শালাবউ!

শ্যামলা রঙের বছর ষোল সতেরোর একটি ছিমছাম মেয়ে, টানাটানা চোখ, চুলে কিশোরী কিশোরী ভাব। গাঁয়ের লোক বংশীর এই শালার বউটিকে নিয়ে কত কি কানাকানি করতো, কত কি বলতো। গিরিজার কানেও এসেছিল সে সব কথা।

একদিন মুখ ফুটে প্রশ্নও করেছিল গিরিজা।

বংশী হেসে বলেছিল, পেনয়ের দাম সে যে-অবধি গোপন থাকে, তার কথা কি কেউ পেকাশ করে বলে গো গিরিদাদা? সত্যি হলেও বলবো না, মিছে হলেও বলবো না।

কীর্তন মন্ডপের সামনে সেই কিশোরী চেহারার শালাবউকে, রূপোকে মুগ্ধ চোখে বসে থাকতে দেখে গিরিজার মনেও কৌতূহল জেগেছিল।

কিন্তু তারপর কখন সব কথা ভুলে গিয়েছিল বংশীর গলার সুর শুনে।

সন্ধ্যে থেকেই খোলের আওয়াজ শুরু হয়েছিল। একে একে আসরও ভরে উঠছিল। আসরে জনকয়েক বুড়ো কীর্তনীয়া এসে বসলো। মাঝখানে বিশ-বাইশ বছরের ভরালো চেহারার বংশী। তার সাজ, তার মুখের ভাব, তার চেহারা দেখে মনে হলো এ যেন অন্য মানুষ।

একে একে গৌরচন্দ্রিকা শেষ হলো।

বংশী নয়, কীর্তনীয়া বংশীদাস। সুললিত কণ্ঠে চিৎকার করলো বংশী: ভাই সব—

আসরের গুঞ্জন থেমে এলো।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, মানস চক্ষু দিয়ে ছিরিমাধবকে দেখা যায় গো, আর তেনার ব্রেজমন্ডল কি দেখা যাবে না? ভেবে লাও এই তোমার বিন্দাবন, ভাবো ছিকৃষ্ণ আছেন, গোপীনীরা আছেন, ভাবো ভোমর আছে, মউরমউরী আছে, আর যমুনার জলের মতন ছিকৃষ্ণের প্রেমলীলা বয়ে চলেছে।

অশিক্ষিত গ্রাম্য উচ্চারণ, অস্পষ্ট বর্ণনা—কিন্তু বংশীর কণ্ঠে যেন কি যাদু ছিল, মুগ্ধ হয়ে গেল সমস্ত আসর।

বংশী আবার বলতে শুরু করে! হরির নাম নিয়ে মনের পাপ ধুয়ে লাও গো, ধুয়ে লাও, দেহমন পেবিত্ত করে লাও।

গানের মত সুর করে করে বলছিল বংশী, হঠাৎ বজ্রগম্ভীর চিৎকার দিয়ে উঠলো।—চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও।

চিৎকার করে উঠেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো বংশী, ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখ-জোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। কেমন যেন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠলো সকলের চোখে মুখে। নড়েচড়ে বসলো সবাই।

যেটুকু বা গুঞ্জন ছিল, স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তারপর আবার বলতে শুরু করলে বংশী: এই অপ্রেকিত লীলা-বিলাস শোনার মত মন যদি না থাকে, চলে যাও, চলে যাও। মনে যদি কামগন্ধ থাকে, গো, দেহভাব যদি অশুচি থাকে চলে যাও। লীলাচন্দনকে যে কামপঙ্ক ভাববে তাদের জন্যে লয় গো, এ লীলাকীর্তন তাদের জন্যে লয়, তেনারা চলে যাও।

আসর যেন মুহূর্তে স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় একেবারে বদলে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে শুরু হল রূপবর্ণনা, পূর্বরাগ। তারপর কীর্তন।

যবে নব অনুরাগ...

এক একটি পদ শেষ হয় আর সখী রে সখী রে, সখী রে...গুঞ্জন একতান—মৃদু খোল করতালের আওয়াজ।

তারপর এক একটি পদের ব্যাখ্যা শুরু করে বংশী, আখর বুনে যায়। কোন পদকর্তার গান নয়, মুখে মুখে অবিশ্রাম অসংখ্য উপমায় একটি পদেরই বর্ণচ্ছটায় যেন নতুন একটি কাব্য রচনা করে বংশী। মূল পদ তার মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়।

মুগ্ধ হয়েই শুনছিল গিরিজা, আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবছিল, কিসের স্পর্শে বংশী কোটাল এমন আখুরিয়া হয়ে উঠেছে।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে বংশীর শালাবউয়ের দিকে চোখ পড়ছিল গিরিজার। দেখলে, তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

মাঝরাত অবধি কীর্তন শুনে সেদিন ফিরে এলো গিরিজা। কিন্তু সারা পথ কেউ কোন কথা বললে না। যেন সবাই অভিভূত হয়ে গেছে।

তারপর যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। আর ছোটমার সঙ্গে দেখা করতে গেল গিরিজা।

কিন্তু চৌকাঠে পা দিয়েই দেখলে সারা বাড়িতে কেমন থমথমে ভাব। কেউ কোন কথা বলছে না, ছোটমা নিথর দাঁড়িয়ে আছে খুঁটি ধরে; আর একটা গোঙানি ভেসে আসছে থেকে থেকে।

গিরিজাকে দেখেও কাছে ডাকলো না ছোটমা।

গিরিজা নিজেই এগিয়ে গেল, প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে ছোটমা?

ছোটমা ক্লান্ত বিষণ্ণ এক জোড়া চোখ তুলে গিরিজার মুখের দিকে একবার তাকালো, তারপর ইশারায় কালীমোহনের ঘরখানা দেখিয়ে দিলো।
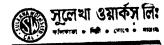
গিরিজা ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। দেখলে, বিছানায় পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছেন কালীমোহন, আর পাশে নাড়ী ধরে বসে আছেন বলগাঁর কবিরাজ।

দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়লো। ভিড় করে এলো সবাই। শুনলে।

সেদিন কালীমোহনের বিনা অনুমতিতেই নাকি কীর্তন শুনতে গিয়েছিল ছোটমা আর তার জা। মাঝ রাত্রে আসর থেকে ফিরে আসতেই প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন কালীমোহন। তার পর থেকেই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

কালীমোহনের ছেলেরা ডাক্তার আনাতে চেয়েছিল। রাজি হন নি কালীমোহন। মুখে একটি মাত্র কথা, আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

দিন কয়েক ভুগে ভুগে শেষে শান্তিতেই মারা গেলেন কালীমোহন। কান্নার রোল উঠলো ভটচায বাড়িতে।

গ্রামসুদ্ধ সকলে তাঁর শবদেহ নিয়ে দাহ করে এলো খড়ি নদীর ধারের শ্মশানে।

আর গিরিজা, একমাত্র গিরিজাই হয়তো খুশী হলো তাঁর মৃত্যুতে। ভাবলে, ছোটমা এবার মুক্তি পাবে। এতদিনের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। কালীমোহনের ভয়ে স্বামীকে দূরে ঠেলে রাখতে হবে না আর।

গিরিজার চিঠি পেয়ে দিনকয়েক পরেই গ্রামে এসে হাজির হলো ব্রজমোহন। স্টেশনে তাকে নামতে দেখেই কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো। মুহূর্তের মধ্যে আলোড়ন দেখা দিল বনপলাশির জীবনে। এমন একটা চাঞ্চল্য বুঝি আর কখনো দেখা দেয়নি। কেউ নতুন গোড়ের পাশ দিয়ে আল পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করলো, কেউ বা অকারণেই ভয় পেয়ে আড়ালে লুকিয়ে দেখলো।

ভটচায বাড়ির ব্রজমোহন নয়। প্যাণ্ট কোট ওয়েস্ট কোট পরা, পায়ে দামী জুতো, গলায় বো করা—একটি অচেনা মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো।

দূরে থেকে দেখতে পেয়েই খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে গিরিজা ছুটে এলো ছোটমার কাছে। কিন্তু সেই কৈশোরের উল্লাসে 'ছোটমা' বলে ডাকতে পারলো না।

এসে দাঁড়িয়ে রইলো দাওয়ার সামনে। আর খানিক পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ছোটমা, গিরিজাকে সামনাসামনি দেখেই প্রথমটা একটু সংকোচ বোধ করলে, তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করলে, কে, পেসাদ? বলছো কিছু?

গিরিজার সারা মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললে, ছোটমা! ব্রজকাকা আসছে। এই মাত্র দেখে এলাম নতুন গোড়ের পাড় থেকে।

কথাটা শুনেই যেন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়লো ছোটমা। প্রথমে বিস্ময়। তারপর ক্রোধ।

হঠাৎ ক্রোধে ফেটে পড়লো ছোটমা।

—কে খবর দিলো তাকে, পেসাদ?

ভয় পেয়ে গেলে গিরিজা। এ কি রূপান্তর ছোটমার? মনে হলো যেন মনের রাগ চাপতে পারছে না। শরীরে প্রৌঢ়ত্বের শিথিলতা নেমেছে তখন—তবু ছোটমার ফর্সা মুখখানা হঠাৎ যেন লাল হয়ে উঠলো রাগে।

গম্ভীর কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলে আবার, কে তাকে খবর দিলো পেসাদ?

—জানি না ছোটমা। আতঙ্কের বিস্ময়ের ঘোরে বললে গিরিজা।

আর পর মুহূর্তেই গিরিজার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে ছোটমা বলে উঠলো, ওকে ফিরে যেতে বলো পেসাদ, ফিরে যেতে বলো। বটঠাকুরের অপমান হবে, এ বংশের ভিটেতে তার পা পড়লে।

বলেই ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলো ছোটমা, গিরিজার মুখের সামনেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো ভিতর থেকে।

বিমূঢ় অভিভূত মুখে বেরিয়ে এলো গিরিজা, তারপর দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে পালালো। না, ব্রজমোহনের কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না সে, বলতে পারবে না ছোটমা কি বলেছে, কি বলতে চায়।

বিছানায় মুখ গুঁজে সারাটা দিন পড়ে রইলো গিরিজা, কারো সঙ্গে কোন কথা বললো না। প্রশ্ন করতে সাহস হলো না, ব্রজমোহন কোথায়, ছোটমা ঘর থেকে বেরিয়েছে কিনা।

সন্ধ্যের দিকে শুনতে পেল, মা বলছে, বলিহারি মনের জোর, ছোট ঠাকুরকে ফিরিয়ে দিলে বাপু, দেখা অবধি করলে না একটিবার!

মনের জোর! গিরিজার সমস্ত বুক নিঙড়ে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলে, মিথ্যে অভিমানে একটা মানুষ তার সমস্ত জীবন এমনভাবে নষ্ট করতে পারে!

তার চোখের সামনে ছোটমাকে যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছতে দেখেছে গিরিজা, মনে হয়েছে সব দুঃখের মূলে ওই কালীমোহন, সে মারা গেলেই দুজনের মাঝখান থেকে সব পাঁচিল সরে যাবে। কিন্তু এ কি হলো? এমন ভাবে ব্রজমোহনকে ফিরিয়ে দিলো ছোটমা? অপমান করে তাড়িয়ে দিলো? ও যে ভেবেছিল, জীবন সায়াহ্নে এইবার বুঝি ছোটমার মুখে হাসি ফুটবে, নতুন করে জীবন শুরু করবে।

ভুল ভেবেছিল গিরিজা। আর ভিতরে ভিতরে ছোটমার বিরুদ্ধে একটা গভীর আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছিল।

তাই যাবার দিন আবার ছোটমার সঙ্গে দেখা করতে গেল গিরিজা। তারপর এক সময় ছোটমাকে একান্তে পেয়ে বিমূঢ় গলায় প্রশ্ন করলে, এমন কেন করলে ছোটমা?

ছোটমা শান্ত দুটি চোখ তুলে তাকালো গিরিজার মুখের দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, সে তুমি বুঝবে না পেসাদ।

—বুঝবো, নিশ্চয় বুঝবো। তুমি বলো ছোটমা, কেন এমন করলে?

ছোটমা বিষণ্ণ হাসি হাসলে। তারপর হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো তার চোখ জোড়া। বলে উঠলো, আমি সব ক্ষমা করতে পারি পেসাদ, তা বলে ধর্ম ছাড়বো? মানুষের শেষ সম্বল যে ধর্ম রে পেসাদ, তাও যে ছাড়তে পারে......

কথা শেষ করতে পারলো না ছোটমা। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তার।

খানিক চুপ করে রইলো গিরিজা। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু সে তো তোমার জন্যেই ছোটমা, ব্রজকাকা নিজে বলেছে আমাকে......

বাধা দিয়ে উঠলো ছোটমা। বললে, আমার সুখটাই বড় হলো রে পেসাদ! নয় সতীন নিয়েই ঘর করতাম আমি। কতজনাই তো করে। তা বলে ধর্ম ছাড়বে? ধর্মের সংসার পাথরের গাঁথনি। সে গাঁথনি যে ভেঙে দেয়, সে সব ভাঙতে পারে, সব!

(ক্রমশ)

কবিতার সংজ্ঞা

মৃগাঙ্ক রায়

কবিতা কি—এ প্রশ্ন কাব্যতত্ত্বের শুরুতে **এবং সমাপ্তিতেও।** আসলে কাব্যতত্ত্বের **সর্বশেষ পর্যায়ে এসে তবেই এর যথাযথ উত্তর পাওয়া সম্ভব, কবিতা সম্বন্ধে সব কিছু জানা হয়ে গেলে, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে রক্ত সম্বন্ধে পরিণত হলে।** তার আগে নয়।

কবিতা কি বুঝবার আগে দেখা যাক **কবিতা কি নয়।**

কবিতা গদ্য নয়। গদ্য অর্থে আমি শুদ্ধ গদ্যের কথাই বলছি, চলতি অর্থে যা গদ্যবাচ্য তার কথা নয়।

কিন্তু গদ্য কি?

গদ্যের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার নৈর্ব্যক্তিকতা। তার মধ্যে ব্যক্তিগত উপলব্ধির স্থান নেই, তার কথা নেহাতই 'আমি'-হীন জগৎ আশ্রয়ী, একটি বিশেষ ব্যক্তির অনুভবের উচ্চারণ নয়। তার বাইরে, আবেগহীন। যদি বলি, 'হ্যাঁ মশাই, দশটা কি বেজে গেছে?' তাহলে আমার মনের একটি উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হল এবং সে উৎকণ্ঠা আমারই, ব্যক্তিগত। সুতরাং প্রশ্নটি আমার একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার দ্যোতক। অতএব একে গদ্য বলা চলবে না। কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তরদাতা যদি বলেন, 'না, ন'টা বেজে উনষাট', তা হলে সে হল গদ্য। কেননা সে উত্তরদাতা নিজস্ব অনুভূতির কথা বলছে না, তার মনের বর্ণবিচ্ছুরণ করছে না। একটি মনোনিরপেক্ষ বাস্তব ঘটনাকে বিবৃত করছে মাত্র।

গদ্য প্রয়োজনের ভাষা। সে তথ্যের বোঝা বয়ে বেড়ায়, খবর ফেরি করে ফেরে। এই বাস্তব পৃথিবীটার পক্ষে সে অপরিহার্য। হাটে বাজারে লেনদেন হয় না তাকে নইলে। চায়ের দোকানে ঢুকে যেই বললাম, 'এক কাপ চা', অমনি দোকানী এক কাপ চা এনে ঠকাস্ করে রেখে গেল আমার সামনে। অফিসে দেরি হয়ে যাবার ভয়ে যখন ছুটছি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস যখন নাভিমূল থেকে নাসাগ্র অবধি দ্রুত সঞ্চরমান এক বাবু-মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম কটা বেজেছে, সে কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির কাচে আলো ঠিকরিয়ে বলল, 'ন'টা বেজে উনষাট'। এমনি করে প্রয়োজন মেটায় গদ্য, এর খবর ওকে দিয়ে আসে, ওর খবর একে।

গদ্যের আবেদন শুধুমাত্র বুদ্ধির কাছে। হৃদয়ের কাছে নয়, অনুভূতির কাছে নয়। গদ্য তাই বিজ্ঞানের ভাষা, যুক্তির ভাষা, আইনের ভাষা। দলিলদস্তাবেজ লিখতে গদ্য চাই, প্রবন্ধ লিখতে গদ্য চাই, খবর লিখতে গদ্য চাই। আবেগের কথা তার উপজীব্য নয়, সুতরাং আবেগের কাছে পৌঁছয় না তার কথা। হৃদয় সাড়া দেয় না তার ডাকে।

এই নিজের মধ্যেই তার বন্ধন। সীমিত অর্থের দেয়াল চারদিকে। সে দেয়াল ভাঙবার শক্তি তার নেই ডিঙিয়ে যাবারও নয়। অর্থাৎ শব্দের যেটুকু প্রাথমিক অর্থ সেটুকু কথাকেই প্রকাশ করতে পারে গদ্য। কবিতা কিন্তু শব্দের সেই অর্থকে কেবলই ছাড়িয়ে যায় এবং তার ব্যঞ্জনার মধ্যে অনুরণিত হতে [illegible] সেখানেই তার আনাগোনা।

গদ্য কবিতা নয়, কিন্তু কবিতা [illegible] কি

গদ্য ব্যবহারিক প্রয়োজনের, যুক্তির, নৈর্ব্যক্তিকতার ভাষা। কবিতা ব্যক্তিগত উপলব্ধির।

কিন্তু উপলব্ধির সংজ্ঞা কি? উপলব্ধি একটিমাত্র বস্তু নয়, অনেক কিছু মিলিয়ে তার সৃষ্টি, অভিজ্ঞতা, আবেগ, বুদ্ধি, জীবনদৃষ্টি ইত্যাদি। এসব মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ মানসিক অবস্থা। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'চলাচল' কবিতাটি:

ওরা তো সব পথের মানুষ,
তুমি পথের ধারের,
ওরা কাজে চলছে ছুটে,
তুমি কাজের পারের।
বয়স তোমায় অনেক দিল,
অনেক নিল কেড়ে,
রইল যত তাহার চেয়ে
অধিক গেল ছেড়ে।
চিহ্ন পড়ে, তারে ঢাকে নতুন চিহ্ন এসে,
কোন চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয় না অবশেষে।
যেথায় ছিল চেনা লোকের নীড়
অনায়াসে জমল সেথায়
অচেনাদের ভীড়।
তুমি শান্ত হাসি হাস যখন ওরা ভাবে
ওদের বেলায় অক্ষত দিন
এমনি করে যাবে॥

পথে সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলেছে—কবিতাটির এই হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাদের ভাবখানা যেন জীবনটা চিরকালের। অথচ তারা একদিন চলে যাবে, নতুন লোক আসবে, নতুন চিহ্ন এসে পুরনো চিহ্নকে ঢেকে দেবে।

এর পশ্চাদপটে রয়েছে কবির স্মৃতি, অতীতের অভিজ্ঞতা। বয়স তকে একদিন অনেক কিছু দিয়েছিল আবার কেড়েও নিয়েছিল অনেক। বহু চেনামুখ হারিয়ে গিয়ে অচেনা মুখ দেখা দিয়েছে। এই দুয়ের, প্রত্যক্ষ এবং অতীতের, যোগফলকে কবি বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন এবং তার ফলস্বরূপ যে প্রতীতি তা-ই কবিতাটির বক্তব্য এবং তখনকার মত কবির জীবনদৃষ্টি।

কবিতার অভিজ্ঞতা যেহেতু কবির হৃদয় সম্পর্কে এসেছে সেহেতু অভিজ্ঞতার প্রকৃতি-মাফিক একটি শান্ত এবং করুণ আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সব মিলিয়ে কবিতাটি একটি পরিপূর্ণ উপলব্ধিকে প্রকাশ করছে।

কবিতার উপলব্ধি সব সময়ই ব্যক্তিগত, কিন্তু সার্বজনীনও। 'সাহিত্যে'র প্রয়োজনে তাকে সার্বজনীন হতেই হয়, যদিও শুধুমাত্র সার্বজনীনতা কবিতার পক্ষে অর্থহীন। বিশুদ্ধ সার্বজনীনতার প্রকৃতি তন্ময়, সুতরাং তার মধ্যে আবেগসঞ্চার অসম্ভব। আবেগসঞ্চারের জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষ ব্যক্তির অতীত, বর্তমান এবং মনোভঙ্গীর সংমিশ্রণ। তাই কবিতার উপলব্ধি একান্ত-ভাবেই ব্যক্তিগত।

কবিতার উপলব্ধি আবেগজড়িত বলে তার আবেদন প্রধানত হৃদয়ের কাছে। তার কথা প্রধানত হৃদয়ের কথা। যেই পড়লাম :

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই,
প্রহর হল শেষ

অমনি হৃদয় সাড়া দিয়ে উঠল। কোন একটা ব্যাকুলতা ঘুম ভেঙে চোখ মুছে জেগে উঠল। জীবন আর কতটুকু, কয়েকটা মুহূর্ত, প্রহর—এই ত শেষ হয়ে এল। কিন্তু কি বিশাল অনিঃশেষ সৌন্দর্যের মধ্যে সে এসেছে, রূপের মধ্যে, মাধুর্যের মধ্যে সে অঞ্জলি পেতে আছে। অথচ শুরু হতে না হতেই জীবন শেষ হয়ে আসে, মাধুর্যের ত শেষ পাওয়া যায় না।

কবিতার অভিজ্ঞতার হাত ধরে, তার অনুবর্তী হয়ে আসে আবেগ, আসে অনেক ধ্বনিকে বাজাতে বাজাতে। তার সঙ্গে আসে কথা, ছবি, উপমা ইত্যাদি। অভিজ্ঞতা এবং আবেগ নির্দিষ্ট করে ছন্দের চরিত্র, সেই সঙ্গে শব্দের চরিত্রও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এই প্রভাব এক তরফা নয়, পরস্পর প্রসারিত। অমিয় চক্রবর্তীর 'ডায়েরী' কবিতাটি থেকে উধৃত করছি :

আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয় আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নতুন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো।

জীবন দুঃখের মধ্য দিয়ে, সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, ধ্বংসের এবং সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আবহমানকাল চলছে, প্রতিদিন চলছে, তার শেষ নেই এবং কবিও চিরকাল সেই জীবনের কথাই বলছেন এবং তারও শেষ নেই। এই অভিজ্ঞতাকে কবি দূরে থেকে দেখছেন, বেশ খানিকটা দূরে থেকে। কবিতাটির স্তিমিত ধ্বনিপ্রবাহ এবং শান্ত আবেগ সেই দূরত্ব-জনিত। তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্বেলতা নেই। লাইন ক'টি চিৎকার করে পড়া যাবে না, খুব দ্রুততালেও নয়। গলা আপনিই নিচু হয়ে আসবে। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে যথেষ্ট সময় দিয়ে, মন্থরকণ্ঠে পড়তে হবে।

অভিজ্ঞতা আবেগহীন হতে পারে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা কবিতার কাজে লাগবে না। তার বিবৃতি হবে গদ্য। কারণ একটি বিশেষ ব্যক্তির অনুভব উপস্থাপিত নয় বলেই তা আবেগহীন। 'ডায়েরী' কবিতাটির অভিজ্ঞতা আবেগহীন হলে তার বিবরণ দার্শনিক তত্ত্বে পর্যবসিত হত, কবিতা হত না।

কবিতার উপলব্ধি রূপময়, সুতরাং কবিতাও রূপময়। চিন্তাকে, ভাবনাকে মূর্তির মত গড়ে তোলে কবিতা, তাকে রূপ দেয়। এমন কি যে কথা শুধুমাত্র চিন্তা করা সম্ভব, চোখে দেখা নয়, যার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা নেই, তাকে ও তার মূর্তি তৈরি করে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করে কবিতা। কথা তখন কথামাত্র নয়, কথার রূপ। কবির বক্তব্যকে, উপলব্ধিকে পাঠকের অনুভূতিতে পৌঁছে দিতে হয় কবিতাকে। শুধু জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তাকে অনুভব করানই প্রধান কাজ। তাই আবেদনকে করতে হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

সুতরাং কবিতায় রং চাই, সুর চাই, ছন্দ চাই। উপমা অনুপ্রাস চাই। এরা মিলেই কবিতার রূপসী শরীর। অতএব এক অর্থে কবিতা উপলব্ধির রূপময় প্রকাশ।

মেঘের ছায়া 'পড়েছে জলে'—এ ব্যাপারটাকে হয়ত এভাবেই দেখব আমরা, হয়ত এভাবেই বলব। শুধুমাত্র ঘটনাটিকে বিবৃত করব। কবি নিহিত রূপটিকে পরিস্ফুট করবেন। হয়ত বলবেন, 'জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুখ দেখছে একখণ্ড মেঘ।' অমনি একটি পুরো ছবি দেখা দিল, একটি পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হল। 'মুখ দেখছে' শব্দ দুটি জলের সঙ্গে আয়নার তুলনার ইঙ্গিতবাহী, অন্য দিকে একটি মুখেরও আভাস দিল। মেঘ যেন প্রাণবান মানুষী যে জলের আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রসাধন করছে।

কাল সারারাত খুব হাওয়া দিয়েছে—এ কথাটার কোন রূপ নেই, শুধু হাওয়ার খবরটুকু দিচ্ছে। এ কথাটাই আশ্চর্য রূপ পেয়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়:

> গভীর উচ্ছৃঙ্খল বাতাস এসেছে
>
> আকাশের বুক থেকে নেমে
>
> আমার জানালার ভিতর দিয়ে
>
> শাঁই শাঁই করে,
>
> সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত
>
> হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মত।

প্রথম লাইনের 'উচ্ছৃঙ্খল' শব্দটি এবং তৃতীয় লাইনটি লক্ষণীয়। 'উচ্ছৃঙ্খল' বিশেষণটি বাতাসের ঢেউ এবং তার সুউচ্চ চূড়ার ছবি নির্মাণ করছে। তৃতীয় লাইনটি বাতাসের সেই ঢেউয়ের তুলনা। সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত একদল জেব্রা তাদের ডোরা কাটা শরীর নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটবার সময় তাদের চিত্রিত শরীরের ঢেউ দুলে দুলে উঠছে। ছবিটির মধ্যে জেব্রা দলের শরীরের রং এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হরিৎ প্রান্তরের রং। সব মিলিয়ে যেন ছুটে-চলা হাওয়ার গায়েই নানা রং লেগেছে, যেন তার পিঠে ডোরা কেটে দিয়েছে কেউ। ফলে হাওয়া আর হাওয়া নেই, একদল চিত্রিত ধাবমান প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। অথচ হাওয়া ত দৃষ্টিগোচর নয়। তবু তাকেই রূপময় করে প্রকাশ করছে লাইন তিনটি। একে বলতে পারি হাওয়ার মূর্তি, ভাস্কর্য।

অবশ্য এমন কবিতাও হতে পারে যার রূপময়তা জীবনানন্দ দাশের কবিতাটির মত এত স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত লাইন দুটিই আবার উদ্ধৃত করছি:

> মধুরে, তোমার শেষ যে না পাই
>
> প্রহর হল শেষ

লাইন দুটি সে অর্থে রূপবান নয় যে অর্থে জীবনানন্দ লাইন কটি রূপবান। কিন্তু এরও একটি রূপ আছে, অতৃপ্ত ক্ষুধার রূপ। জীবন শেষ হয়ে এল কিন্তু সীমাহীন সৌন্দর্যের শেষ পাওয়া গেল না—এই হাহাকারের রূপ।

চলতি গদ্য রচনায় রূপের দেখা কিন্তু প্রায়ই মেলে। যেমন অবনীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা:

'যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, এক ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক

করছে। পদ্মাবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে।'

এই বর্ণনাটিকে বলব, এক ফোঁটা রক্তের রূপ। রূপময়তার জন্যেই এ আর গদ্য রইল না। কবিতার কাছাকাছি চলে এল। কিন্তু তবু এটি কবিতা নয়; কেননা এর মধ্যে একটি বিশেষ জীবনদৃষ্টি প্রস্ফুট হয়নি। তাই বর্ণনাটি কাব্যিক, কবিতা নয়।

তা হলে কবিতার যে সংজ্ঞা দাঁড়াল তা হচ্ছে : কবিতা উপলব্ধির ভাষা, যে উপলব্ধি রূপময়।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়বে যে, সংজ্ঞাটি বড় বেশি ব্যাপক। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ইত্যাদিরও এই একই সংজ্ঞা হতে পারে। কেননা, এরা সবাই তো লেখকের উপলব্ধিরই প্রকাশ, চরিত্র এবং ঘটনাসংবলিত বলে রূপময়ও। তাহলে কবিতা এবং উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটকের মধ্যে কি প্রভেদ কিছু নেই, উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটককেও কি কবিতা বলা চলবে? ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্।

উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক লেখা হয় গদ্যে (যদিও সর্বদা শুদ্ধ গদ্য নয়); কবিতা ছন্দে—এ প্রভেদ প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হবার কথা। তারপরেই মনে পড়তে পারে, উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটকের প্রধান অবলম্বন চরিত্র এবং ঘটনা, কবিতার তা নয়।

কিন্তু গদ্যেও ত (যদিও সাধারণত শুদ্ধ গদ্যে নয়) কবিতা লেখা হচ্ছে আজকাল আবার এমন উপন্যাসও লেখা হয়েছে যার একটা বড় অংশ ছন্দবন্ধ কবিতা। তাছাড়া প্রায় সব সার্থক উপন্যাস বা ছোটগল্পও, এমন কি সার্থক না হলেও, কিছু না কিছু লাইন পাওয়া যাবে যা কাব্যিক বা কবিতার নিকটবর্তী। এক শ্রেণীর নাটক ত প্রাচীন কাল থেকেই লেখা হচ্ছে যার নাম কাব্যনাট্য।

উপন্যাস ইত্যাদির মত ঘটনা এবং চরিত্র কাহিনীকাব্যেরও অবলম্বন। আবার সেই কাহিনীকাব্যে এমন বহু লাইন পাওয়া যাবে যা ছন্দবন্ধ হলেও নিছক গদ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কবিতার সঙ্গে উপন্যাস ইত্যাদির মৌলিক প্রভেদ কিছু নেই।

একমাত্র লিরিক বা সনেট জাতীয় ছোট কবিতার সঙ্গে, সে কবিতা সত্যিকারের সার্থকতা অর্জন করলে, কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

সত্যিকারের সার্থক কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ তার শব্দের অপরিবর্তনীয়তা। একটি শব্দ পাল্টে একই অর্থের অন্য শব্দ বসান অসম্ভব। এমন কবিতা সারা পৃথিবী খুঁজলে খুব কমই পাওয়া যাবে। কিন্তু সত্যিকারের সার্থক উপন্যাস বা ছোটগল্পের কিছু শব্দ, এমন কি দুটোচারটে লাইন পাল্টে দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অথচ একটি সার্থক কবিতার ক্ষেত্রে একটিমাত্র শব্দের পরিবর্তন কবিতাটিকেও পরিবর্তিত করবে, হয়ত তার বক্তব্যকে বিকৃত করবে। এ ধরনের কবিতা ছোট হওয়াই স্বাভাবিক। বড় কবিতায় শব্দের দৃঢ়বন্ধন সহজেই আলগা হয়ে যায়।

কিন্তু এ প্রভেদও মৌল নয়। কেননা, সার্থক ছোট কবিতাও একটি চরিত্রকে প্রকাশ করতে পারে, একটি ঘটনাকে বিবৃত করতে পারে। তার অর্থের ব্যাপ্তি একটি বড় উপন্যাসের ব্যাপ্তির সমান হতে পারে।

সুতরাং অবশেষে একথা বলতেই হয় যে, কবিতার কোন বিশেষ বা স্বতন্ত্র সংজ্ঞা সম্ভব নয় অথবা উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক ইত্যাদির মত ঐ সংজ্ঞা কবিতারও সংজ্ঞা।

লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট প্রসঙ্গকে বিতর্কের, অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। খুড়ো ক্রিকেটের ভাষায় মন্তব্য করিলেন—"বিরোধী দলে অনেক ন্যাটা স্পীনার আছেন; দিল্লির মাঠ স্পীন নেয়

না তা জানি তবু ওপেনিং ব্যাট হিসেবে সর্দারজী আশা করি সতর্কতার সঙ্গে খেলবেন।"

শ্যামলাল এই সঙ্গে সরণ সিংজীর অন্য ক্ষেত্রে লাক-এর উল্লেখ করে বলে—"বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত গোল্ড কাপ হকি খেলাতে সেন্ট্রাল রেলওয়ে জয়ী হয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে বিনা টিকিটে ভ্রমণ, রেল দুর্ঘটনা, ওয়াগনের মালপাচার প্রসঙ্গ না এলে সর্দারজীর গাড়ি রুখনেওয়ালা নেহি হ্যায়।"

লোকসভায় শপথ গ্রহণ অধিবেশনে কেহ পরিয়াছেন লাল পাগড়ি, কেহ নীল, কেহ গেরুয়া। আবার শপথ গ্রহণ করিয়াছেন কেহ বাংলায়, কেহ হিন্দীতে,

কেহ ইংরেজীতে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী স্মরণ করাইয়া দিলেন—"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে হের মিলন মহান; গানটি অনেকের না হলেও কারু কারু মনে থাকবার কথা। ভাষা নিয়ে লাগ ধুমাধুম করার আগে এ গানের মর্ম কথাটি স্মরণ রাখলে লোকসভার প্রতিনিধিত্ব সার্থক হবে।"

এক সংবাদে শুনিলাম লোকসভার এক পুরাতন সদস্য নাকি বর্তমান সভার অধিবেশন কালে সভাকক্ষে অনধিকার

প্রবেশ করিয়া সেখানে কিছুক্ষণ ছিলেন। —"এ নিয়ে হাসিতামাশা করার কিছু নেই, মনে মনে একাধিক পুরনো সদস্য নিশ্চয়ই সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় এক সাম্প্রতিক সভায় মন্তব্য করিয়াছেন—কৃষির উন্নতি করতে হলে ল্যাবরেটরীতে রিসার্চ করে কিছুই হইবে না, সেই গবেষণার জ্ঞান মাঠে পৌঁছে দিতে না পারলে লাভ হবে না। শ্যামলাল স্মরণ করাইয়া দিল—"খাটে খাটার লাভের গাতি, তার আধেক কাঁধে ছাতি; ঘরে বসে পুছে বাত, তার ঘরে হা-ভাত, কথাটা মন্ত্রী মশাইদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা বলতে পারব না!"

শ্রীসেন অন্য এক মন্তব্যে ঘোষণা করেন—মোট জমির অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি রচনার জন্য রাখতে হবে। খুড়ো বলিলেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয়। পঞ্চাশ উর্ধ্বের জন্য তো বটেই, তা ছাড়া অনেকের বুনো প্রকৃতির সঙ্গে লোকালয়ের পরিবেশ যে নেহাতই খাপ ছাড়া!!!"

এক সংবাদে শুনিলাম হাঁসমুরগী পালনের বাবত বরাদ্দীকৃত ব্যয়ের ৪০ শতাংশ নাকি সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর খরচ করিতে পারেন নাই।—"হয়ত ডিম থেকে বেরুবার আগেই তাঁরা মুরগীর বাচ্চা গোনায় ব্যস্ত ছিলেন"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

জনৈক বিশেষজ্ঞ নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে লবণই ক্যানসার রোগের কারণ। আমাদের জনৈক সহযাত্রী কৃত্রিম ক্ষুণ্ণ সুরে বলিলেন—"ছি ছি, ওকথা বলতে নেই, লোকেরা যে নিমকহারাম বলবে!"

বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কাহারা অবৈধ আচরণ করিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করার জন্য নাকি একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। শ্যামলাল কবিতায় মন্তব্য করিল—"যা কর ভাই আস্তে ধীরে, ঘা কর কেন খুঁচিয়ে, পাতলা একটা যবনিকা আছে, কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে!"

আচার্য বিনবা ভাবে পাকিস্তানে ভূ-দান অভিযান চালাইবার জন্য পাক-সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পাক-সরকার তাঁর প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়াছেন।—"ভূ-দানের বদলে ভূ-গ্রহণ অভিযানের অনুমতি চেয়ে দেখতে পারেন, যস্মিন দেশে যদাচার কথাটা আচার্যজী নিশ্চয়ই জানেন"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে মাছ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিমাণ বরফ পাঠাইয়া থাকেন, সংবাদে অভিযোগ, সেই বরফের বেশির ভাগই নাকি

অন্য কাজে গাপ হইয়া যায়।—"অন্য কাজটি, মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

লবণ হ্রদ বুজাইবার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সাংবাদিকদের নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের "নন্দলাল" কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত সবাইকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"সাংবাদিকদের কেহ দ্বিজেন্দ্রলালের 'পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্ত' গানটি গেয়ে শোনালে পারতেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম—একটি ক্ষুদ্রাকৃতি রেডিও ট্রান্সমিটার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা দাঁতের ন্যায় মুখে স্থাপন করা সম্ভব। উপরের ও নীচের দাঁত পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইলেই যন্ত্রটি সাংকেতিক বার্তা প্রেরণ করে।—"এখন বদসি যদি কিঞ্চিদপি হাসে, আর দন্তরুচি কৌমুদী প্রত্যক্ষ করা যাবে না বদলে দেখা যাবে ট্রান্সমিটার! তা হোক, তবে দাঁতে কাটা স্বভাব যাঁদের তাঁরা কি করবেন তাই ভাবছি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের প্রয়োগ বিষয়ে 'আর্ট-ইন-ইন্ডাস্ট্রি'র বার্ষিক প্রদর্শনী দেশের জনসাধারণের জ্ঞান ও রুচিকে উন্নততর করে তোলায় একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জন-জীবনে প্রদর্শনীটির সার্থকতা যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তা স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায় এবারের প্রদর্শনী দেখে যা গত ১৭ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর কর্তৃক উদ্বোধিত হয়।

এবারের প্রদর্শনীটি মোটামুটি চারটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত—হাতের কাজ, যান্ত্রিক উৎপাদন, গৃহস্থালী সজ্জা এবং বিজ্ঞাপন বা বাণিজ্যিক শিল্পকলা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে গৃহস্থালী সজ্জা বিভাগটি। দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতির সংগে মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহসজ্জাকে প্রয়োজন মেটানোর সংগে শিল্পরুচি সম্পন্ন করে তোলার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। দু-কামরার ফ্ল্যাটে শোবার ও বসবার ঘরের আসবাব, ছোটদের পড়ার ব্যবস্থা, রান্নার ও খাবার ব্যবস্থা এবং সংসারে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী ও সরঞ্জাম স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প পরিসরে কেমন পরিপাটি করে সাজানো সম্ভব তারই দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়েছে।

হাতের কাজ বিভাগে এবারকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য ছিল ত্রিপুরার আদিবাসীদের শিল্পকর্মের নিদর্শনগুলি। ওখানকার প্রধান পাঁচটি আদিবাসী সম্প্রদায়—চাকমা, জোমাতিয়া, ত্রিপুরী ও লুসাইদের প্রত্যেকের পরিচ্ছদ, অলংকার এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সরঞ্জামের অনেক কিছুই প্রদর্শিত হয়। কাপড়ের নক্সার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে দৃষ্টিতে পড়ে যার অনেকগুলিই অতি আধুনিক রুচিকেও পরিতুষ্ট করতে সক্ষম। পশ্চিমবংগে বস্ত্রাদির বয়নে এবং নক্সা তোলার কাজে বেশ উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেল। বস্ত্রাদি বয়ন ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পরস্পরের রচনারীতির অবলম্বন আমাদের এই বৈচিত্র্যভরা দেশের একাত্মতার পরিচয় দেয়। এই বিভাগে রকমারিতার দিক থেকেও চমৎকৃত হবার মতো দ্রষ্টব্য চোখে পড়ে। বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংস্থার হাতের নানা রকমের সুন্দর কাজ প্রদর্শনীটির মূল্য ও প্রয়োজন বাড়িয়েছে।

পারিবারিক জীবনে বা অফিসে বহুবিধ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় যার প্রায় সবই এখন আমাদের দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। সেলাই কল, টেবলফ্যান, এয়ার-সার্কুলেটার, রুম-কুলার, টেবল-ল্যাম্প, পোড়া মাটির ওপর এনামেল করা বাসনপত্র, পিতল-তামার তৈজস পত্রাদি, এনামেলের বাসন ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও যন্ত্রপাতিগুলির পরিবেশসম্মত শিল্পরুচী সম্পন্ন রূপ কিভাবে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে তারই পরিচয় পাওয়া গেল এই বিভাগটিতে। অভিনন্দন কার্ড, পোস্টার, ক্যালেণ্ডার, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির বিভাগে দেশের ঐতিহ্যের সংগে সম্পর্ক রেখেও আধুনিক শিল্পধারার অনুসৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে এ বিভাগে খুব একটা

বাইসন (স্কেচ) শিল্পীঃ নিখিল বিশ্বাস

নতুনত্ব বা মৌলিকত্বের দিকে ঝোঁক কম দেখা গেল।

* * *

বছরখানেক আগে খোলা রাস্তায় ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করায় প্রকাশচন্দ্র কর্মকারের পর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন নিখিল বিশ্বাস। বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিন্যাস এবং রঙ ও তুলির টানে বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন শিল্পীমনের পরিচয় দানে তাঁর ছবিগুলি চিত্ররসিকদের প্রশংসা অর্জন করে। গত ১৯শে এপ্রিল পার্ক স্ট্রীটস্থ আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে নিখিল বিশ্বাসের চোদ্দখানি ছবি নিয়ে তাঁর চতুর্থ একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এ প্রদর্শনীর প্রায় সব ছবিই নতুনভাবে আঁকা। এর মধ্যে তেলরঙা ছবি ছাড়া কালি কলমে আঁকা স্কেচও আছে তিনখানি।

আধুনিক শিল্পীদের পক্ষে পাশ্চাত্যের বর্তমান শিল্পধারার প্রভাব থেকে বিচ্যুত থাকা সম্ভব কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে পাশ্চাত্যের প্রভাব সত্ত্বেও নিজস্ব মৌলিকতা পরিস্ফুট করায় শক্তিশালী প্রতিভার যে কটি পরিচয় ইদানীং পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে নিখিল বিশ্বাসের স্থান আছে নিঃসন্দেহে।

প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই কোন টাইটেল নেই, কেবলমাত্র 'কম্পোজিশন' বলেই অভিহীত করা হয়েছে। এই পর্যায়ের ছবিগুলি ঠিক দুর্বোধ্য না হলেও প্রথম দৃষ্টিতে সেইরকমই মনে হয়। কিন্তু বেশ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তুলির মোটা টানে রেখার সমষ্টি ও রঙের বিচিত্র সমাবেশে বিন্যাস ভেদ একটা অপরূপ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। একটা শিল্প-বৈশিষ্ট্যের আঁচও পাওয়া যায়। রঙ পেশা-ছুরি দিয়ে আঁকা ছবিও রয়েছে কয়েকখানি।

মোহাবেশ
শিল্পী : সান্ত্বনাকুমার গোস্বামী

সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে 'ঘোড়ার পাল' (৪নং), 'মানুষের পশু বধ' 'সন্ধ্যা' (১২নং), 'রাত্রি' (১৪নং) ছবিগুলি। রঙের নির্বাচন ও তুলির টানে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষনীয়। কালি কলমে সূক্ষ্ম রেখার স্কেচখানিও শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতার পরিচয়।

প্রদর্শনীটি সাধারণের জন্য খোলা থাকবে ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত। আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীর শীতকালীন প্রদর্শনী পর্যায়ের এইটিই শেষ অনুষ্ঠান।

* * *

প্রতিভা উন্মেষিত হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে মহেঞ্জোদারো নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এদের প্রথম উদ্যোগ সান্ত্বনা-কুমার গোস্বামীর ছবির একক প্রদর্শনী যা গত ২১শে এপ্রিল উদ্বোধিত হয়েছে আকাদমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে।

কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে মডেলিং ও ভাস্কর্যে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হলেও সান্ত্বনাকুমার গোস্বামীর ছবি আঁকাতে ও খোদাই কর্মেও প্রচুর উদ্যম। প্রদর্শনীর একত্রিশখানি ছবির মধ্যে খোদাই কাজ থেকে মুদ্রিত প্রতিলিপি চোদ্দখানি এবং বাকিগুলি পেইন্টিং। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে কেবল হাঁস, মুরগী, গাভি, ছাগল প্রভৃতি পশুপক্ষীর প্রতিই ঝোঁক দেখা গেল। মাটি এবং পাতা ও ফুলের নির্যাসকে রঙ হিসেবে ব্যবহার করবারই ইনি পক্ষ-পাতি। প্রতীক নক্সায় ছবি আঁকার চেষ্টাও কিছু করেছেন। প্রদর্শিত অধিকাংশ ছবি-গুলির মধ্যেই এখনও শিক্ষানবীশীর ছাপটাই সুস্পষ্ট। "স্বপ্নদেখা", "স্বপ্নের শেষ" প্রভৃতি কয়েকখানি ছবিকে দুর্বোধ্য করার মধ্যে দিয়ে নিজেকে তথাকথিত আধুনিক শিল্পীর পর্যায়ে দাঁড় করানোর একটা ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

"ঝোপে পাখি" (৬নং), "মাতৃত্ব" (২৩), "রোদ পোয়ানো" (২৫নং) প্রভৃতি কয়েক-খানি পেইন্টিং এবং "সদ্যস্নাত" (১৭নং), "একটি পাতার আশায়" (২৯নং), "ছাগল-ছানা" (২১নং) প্রভৃতি কয়েকখানি প্রতিলিপি ছাড়া উল্লেখ করার মতো কৃতিত্ব তেমন দেখা গেল না। শিল্পী যে বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছেন—মডেলিং ও ভাস্কর্যে, তাঁর দক্ষতা কতটা অর্জিত হয়েছে সেটা দেখাবার ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল—বহু-মুখীতা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলে ভাল হতো।

উদ্যোক্তা সংস্থা মহেঞ্জোদারো তাঁদের ত্রৈমাসিক পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের সময় (অর্থাৎ তিন মাস পর) আর একজন শিল্পীর ছবির একক প্রদর্শনী করবেন বলে জানিয়েছেন।

বিদুর

প্রাচীন সাহিত্যপত্র (১)

আটান্ন বছর আগেকার—১৩১১ সালের—এক খণ্ড 'সাহিত্য' ভাগ্যক্রমে সেদিন হাতে এল। বাঙলা মাসিক পত্রিকার সেই প্রাচীন যুগে 'সাহিত্য' ছিল অতি প্রতাপান্বিত, সহযোগী অন্যান্য পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী' 'প্রবাসী'র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতির এই খ্যাতকীর্তি পত্রিকার ভক্ত ছিল অগুনতি, হয়ত শত্রুও।

আমার বা আমাদের অনেকের তখন মাতৃজঠরেও আশ্রয় জোটে নি, তারও বহু পূর্বে এই ১৩১১-র 'সাহিত্য'। আপনমনে পাতা ওলটাতে গিয়ে এমন অনেক নাম চোখে পড়ছিল বাঙলা সাহিত্যের স্মৃতিকক্ষে যাঁরা আজও স্থান করে আছেন: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্র, দীনেন্দ্রকুমার রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, যতীন্দ্র-মোহন বাগচী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার এমন বহু নাম দেখছিলাম যা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

'সাহিত্য'-র জীর্ণ, বাসি পাউরুটির মতন বাদামী রঙের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আঙুলের ডগায় যেটুকু ধুলো লাগছিল তার চেয়ে অনেক ধুলো প্রত্যহই ঘেঁটে থাকি, —কিন্তু সব ধুলো রজঃ নয়: এই ধুলোকে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তেই গ্রহণ করছিলাম। প্রাচীন পাঁচ সাত পুরুষের ধূলি মলিন অনুজ্জ্বল বৃহৎ প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়ালে যেমন এক অনুভূতি হয়, এই প্রাচীন মাসিক পত্রিকার পাতা ঘেঁটে সেই রকম এক অনুভূতি হচ্ছিল। আমরা এ-ক্ষেত্রে একটি অস্পষ্ট আত্মীয়তা অথচ প্রত্যক্ষ সংযোগহীনতা অনুভব করি। পুরাতনের এই গন্ধ অনুভব হয়ত নিতান্ত মানসিক কোনো স্মৃতি প্রক্রিয়া যার কারণ ব্যক্ত করা যায় না, তবু এই গন্ধে মন কখনো কখনো অভিভূত হয়।

'সাহিত্য' পত্রিকা থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে সেই প্রাচীনতার স্বাদ পাঠকের কাছে পরিবেশন করা বোধ হয় অসংগত হবে না। বিষয় বৈচিত্র্য, রচনার বিশিষ্ট পদ্ধতি, তৎকালীন সাহিত্য বিচার—ইত্যাদি নানা দিক থেকেই এটি উপভোগ্য হবে বলে আশা করি।

প্রথমত ধরা যাক উপন্যাস প্রসঙ্গ। সেকালেও মাসিকপত্রে ধারাবাহিক উপন্যাসের পূর্ণ সমাদর। 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনিই তখন সম্পাদক বঙ্গদর্শনের। ১৩১১-র 'সাহিত্য' পত্রিকায় উপন্যাস লিখছেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোট উপন্যাস, নাম 'মায়ার বন্ধন'। উপন্যাসটির প্রারম্ভ এই রকম :

"প্রাতঃকাল। বকুল গাছ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতেছে। আম্রমঞ্জরীর অন্তরালে থাকিয়া কোকিল প্রাণপণে ডাকিতেছে। এমন দিনে হুগলী সহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে মাখনা গ্রামে পর্ণ কুটীরে একটি বালিকা ও বৃদ্ধায় কথোপকথন হইতেছিল। বালিকা সদ্যোবিকশিত গন্ধরাজ পুষ্পের ন্যায় পরিপূর্ণা সুন্দরী। বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। বালিকা স্নানান্তে আর্দ্রবসনে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তুলসী গাছে ঝারা দিতেছিল। বৃদ্ধা দাওয়ায় বসিয়া সমস্ত দিনের গতিবিধির একটি খসড়া মানচিত্র মনে মনে আঁকিতেছিল।

'মা, আমি আর বাবুদের বাড়ি যাব না।'

'কেন মা, কি হয়েছে—কেন কাঁদিস?'

'বাবুর রকম সকম আমার ভাল বোধ হয় না। কেমন ধারা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, ভ্যাংচায়ে করে...'"

কী সংক্ষিপ্ত আয়োজনে, প্রায় কোনো রকম আয়োজন না করেই একটি উপন্যাসের শুরু হয়ে গেল। লেখক বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করলেন না পাঠক প্রস্তুত কি অপ্রস্তুত, বকুলগাছ থেকে 'পুষ্পবৃষ্টি' করিয়ে, আম গাছের আড়াল থেকে কোকিলকে 'প্রাণপণে' ডাকিয়ে নায়িকাকে হাজির করে দিলেন। এবং একটি মাত্র বিশেষণে তাঁর পঞ্চদশী নায়িকার রূপ বর্ণনা সেরে ফেললেন, সদ্য-ফোটা গন্ধরাজের ফুল। তার পরই গল্প, সরাসরি গল্প। লেখকের ভাব দেখে মনে হবে যেন এর বেশী বহ্বারম্ভে তাঁর বিন্দুমাত্র গরজ নেই, যা বোঝার এতে বোঝ, না বুঝতে চাও চোখ বন্ধ করে নিদ্রা যাও।

আমাদের এ-কালের, একেবারে হালের লেখকরা হলে এমন করে কি একটি উপন্যাস শুরু করতে পারতেন। কদাচ নয়। তাঁদের আয়োজন হত অজস্র, উপকরণ আসত বৃহৎ যজ্ঞের ফরদ মিলিয়ে। যে বকুল গাছ পুষ্প বৃষ্টি করে, আমি হলফ করে বলতে পারি, তেমন বকুল তাঁরা আমদানি

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বাঙলার কয়েকজন খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিককে শনিবার ন্যাশনাল হাই স্কুল ভবনে আয়োজিত সাহিত্য-আসরে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ছবিতে ডান দিক থেকে: শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

করতেন না, যদি বা আনতেন সেই বকুল হত শীর্ণ পত্রবিহীন বন্ধ্যা। না, কোকিল ডাকত না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কোকিল কদাচ দুপুরে ডাকে—বস্তুত সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যার ডাকের স্বর আমাদের কানে আসে তা কোকিল নয় কাক। আর নায়িকার সঙ্গে সদ্য ফোটা গন্ধরাজের তুলনা ইদানীংকালে ক্ষমার অযোগ্য। যদি তুলনাই করতে হয় তবে দশটা পাঁচটা টিচারী বা অফিস করা নায়িকাকে ফুলের বাজারে বাসি জল ছিটোনো রজনীগন্ধার সঙ্গে তুলনা করাই আজকালকার রেওয়াজ।

এই সারল্য তখনকার দিনের কবিতাতেও দেখতে পাই। অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা 'পান্থ'; তার চারটি পংক্তি এই রকম :

"কর্বুরিত নীলাকাশ—প্রশান্ত সুন্দর;
মৃদুমন্দ গন্ধবহ সুবাস-মন্থর।
দেখ—দেখ আঁখি মেলি, আলোক-পুলকে
ঝলসিছে ধবলার সুবর্ণ-শিখর!"

অথবা যতীন্দ্রমোহন বাগচী-র কবিতা :

"একে একে পঞ্চ বাণ পণে ধরি দিয়া
হৃতসর্ব মনসিজ, লাজে অভিমানে
অনন্ত যৌবন নিজ বাঁধা দিল দানে।"

আধুনিক কবিদের কাছে এইসব চরণ কেমন শোনাবে জানি না। তবে যে বৃহৎ ব্যবধান সে-যুগ এবং এ-যুগের বাঙলা কবিতার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তাতে সে-কালের কবিতা চার পুরুষ আগেকার প্রাচীন মুদ্রার মতন দেখায়। সপ্তম এডওআর্ডের আমলের টাকা দেখলে যেমন আজও আমার অদ্ভুত লাগে এই কবিতাও তেমনি যেন। হয়ত এ-সময় (প্রায় ষাট বছর আগে) রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, বাঙলা কাব্যে সদ্য প্রবেশ করেছে। সেটা 'সোনার তরীর' পরবর্তী যুগ।

ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে 'সাহিত্য' যাঁদের ওপর ভরসা রেখে কাগজ চালাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে—জলধর সেন সরোজনাথ ঘোষ প্রভৃতি অন্যতম। কিন্তু সে-সময়ে বাঙলা ছোট গল্প নিতান্ত অক্ষম নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছোট গল্প লিখে বাঙলা সাহিত্যের এই ধারাটি স্রোতময় করেছেন। 'সাহিত্য'-পত্রিকার এই খণ্ডটিতেই একটি গল্প গ্রন্থের সমালোচনায় তার স্বীকারোক্তি এই রকম : "যাদুকর কবি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পর এমন সুমিষ্ট ছোট গল্প পাঠ করি নাই। ...যাঁহারা আমাদিগকে সুরুচিপূর্ণ, মনোজ্ঞ, ভারতীর সুপবিত্র ভাণ্ডারে স্থান পাইবার জন্য ছোট গল্প দেন তাঁহারা আমাদের উত্তমর্ণ—আমরা তাঁহাদের কাছে ঋণী।"... বাংলা ছোট গল্পের সে-আমলে অন্যান্য পত্রিকার নিয়মিত লেখক অবনীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'সাহিত্য' ছোট গল্পে সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছনে পড়ে গিয়েছিল। তবু জলধর সেনের রসাত্মক গল্পগুলি 'সাহিত্যে'র সম্পদ বলে বোধ হয় গণ্য হত। জলধর সেনের এমন একটি গল্পের নমুনা দি :

"বাঙালীর মেয়ে হাজার মেম সাজুক, আর শুইয়া বসিয়া নবেল পড়িয়া দিন কাটাক, যৌবন তাহার দেহে আপনার আধিপত্যের চিহ্ন রাখিয়া যাইতে বিস্মৃত হয় না। মিস্ সোফী যখন সতের বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল, তখন একদিন সান্যাল-গৃহিণীর হৃদয়ে বাঙ্গালিনীসুলভ চাঞ্চল্যের উদয় হইল। তিনি কিঞ্চিৎ অনুযোগের স্বরে ঝঙ্কার দিয়া ডেপুটি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেখতে দেখতে মেয়েটি কলাগাছের মত বেড়ে উঠছে, ওর বিবাহের কি করচো?' স্যাণ্ডেল সাহেব সে সময় একটি গরু চুরির মামলার রায়ে নিজের বিদ্যাপ্রকাশের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি গৃহিণীর ঝঙ্কারে তাঁহাকে গোরুচোর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে হইল।'"

'সাহিত্য'-র প্রবন্ধ বিভাগ ছিল উন্নত। বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য বিদগ্ধ জনদের দ্বারা এই প্রবন্ধগুলি লেখান হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইংরাজ বর্জিত ভারতবর্ষ' হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেদান্ত দর্শন' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশ নিশ্চয় সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে গর্বের বস্তু। বিষয় বৈচিত্র্যও ছিল উল্লেখ করার মতন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রাচীন কাব্য আলোচনা থেকে শুরু করে বিদেশীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত রচনা প্রকাশ করা হত। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব—প্রায় সর্ব বিষয়ে 'সাহিত্য'-র দ্বার ছিল মুক্ত।

তথাপি 'সাহিত্য'-এর চরিত্র ছিল তার সমালোচনায় ও সাহিত্য পত্রিকার আলোচনায়। এ এক অপূর্ব বস্তু। পরবর্তী সংখ্যায় তার বিবরণ দেওয়া যাবে।

রবীন্দ্র পুরস্কার

রবীন্দ্র পুরস্কার বিষয়ে আমরা পূর্বে যে সংবাদ জানিয়েছি বর্তমানে তার সঙ্গে আরও একটি নাম যুক্ত হবে। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা তাঁর ইংরাজী গ্রন্থ ভগিনী নিবেদিতার জন্যে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬১-৬২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক সে-কারণে তিনজন হলেন।

গবেষণা

পঞ্চোপাসনা ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি, এফ-এ-এস প্রণীত; প্রকাশক—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২; মূল্য ১২ টাকা।

বিদেশী ভাষায় হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়সমূহ এবং ইহাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ঐতিহাসিক প্রণালীতে রচিত উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব না থাকিলেও ঐ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় অদ্যাবধি আলোচনা অতি অল্পই হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে 'অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" শীর্ষক সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া এই বিষয়ে আলোচনার একটি উত্তম ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন, ইহা যুগপৎ আশা ও আনন্দের কথা। 'অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় ব্যাপকভাবে না হইলেও বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত চতুর্দশটি অধ্যায়ে লেখক গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়পঞ্চকের উৎপত্তি ও বিকাশের কাহিনী ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে ভারতের আদিম ধর্মাচার ও ভক্তিবাদের উন্মেষের পটভূমিকায় হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়গুলির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ও অনুশাসনাবলীর ভূমিতে আলোচ্য পৃথক সম্প্রদায়গুলি কিভাবে পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া একটি সাধারণ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল তাহা সুষ্ঠুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সমালোচনা প্রসঙ্গে একথা প্রথমেই বলিতে হয়, গ্রন্থকারের পরিকল্পনা ও উদ্যম প্রশংসনীয়। মূর্তিতত্ত্ব, খোদিত লেখ ও মুদ্রার অনুশীলন হইতে সংগৃহীত যুক্তি প্রমাণ ব্যবহারের দিকে তাঁহার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার পূর্বগামিবৃন্দ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন নাই। এইখানে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থের কিছু নূতনত্ব আছে। কিন্তু মূর্তিবিদ্যা ও সীমাবদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের বাহিরে গ্রন্থকার যখনই কিছু বলিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহার নানারূপে পদস্খলন ঘটিয়াছে। লিখনভঙ্গী ও তথ্য পরিবেশন সম্পর্কে যেখানে তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি ঃ

(১) তাঁহার ভাষা দুর্বল, আড়ষ্ট ও স্থানে স্থানে প্রায় দুর্বোধ্য। বস্তুত তাঁহার পদবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গী ইংরাজীর অনুকরণমাত্র, বাঙলা লিখনশৈলীসম্মত নহে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ঃ "...ইহার উপরিভাগ এককেন্দ্রিক 'ক্রস' ও 'কেবল' চিহ্ন দ্বারা অলংকৃত এবং ইহার মধ্যস্থ ছিদ্রগাত্র একৈকভাবে চারিটি ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্তি ও হংসাকৃতি শাখার ঊর্ধ্বচিহ্ন দ্বারা শোভিত" (পৃঃ ২১৮-১৯)। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এবং বাঙলা গদ্যের সমসাময়িক রচনামানের সহিত অন্যভাবে পরিচিত না থাকিলে কোনও পাঠকের মনে এরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে যে, বাঙলা ভাষা বুঝি এখনও গুরুগম্ভীর তথ্যবহুল রচনার বাহন হইবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই।

(২) গ্রন্থকারের মতে অনার্যগোষ্ঠীর মধ্যে নানা জীবজন্তু যক্ষ গন্ধর্ব অসুর কিন্নর প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে ভক্তিধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ভারতবর্ষে ভক্তির আদিম রূপ (পৃঃ ৭-৮)। কিন্তু এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য, বৈদিক দেবদেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া যে সকল স্তোত্রাদি রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে এবং উপনিষদের স্থানে স্থানে ও-তো গভীর ভক্তিভাবের স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মজগতে ভক্তির ন্যায় একটি গভীর সার্বজনীন হৃদয়বৃত্তিকে কোন প্রমাণে অনার্যগণের একচেটিয়া বলা চলিতে পারে?

(৩) গ্রন্থকার একস্থলে বলিতেছেন, অনার্যগণের ভক্তির পাত্র জীব, জন্তু, পক্ষী ইত্যাদি পরবর্তী কালে হিন্দুসমাজে পূজিত দেবগণের বাহনরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বিষ্ণুবাহন গরুড়ের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৮)। আশ্চর্যের বিষয়, অন্যত্র তিনিই বলিতেছেন গরুড় পক্ষীরূপে কল্পিত বৈদিক সূর্য বা আদিত্য-বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহ নহেন (পৃঃ ৪৯-৫০)।

(৪) গ্রন্থকারের মতে গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সাম্প্রদায়িক "ভাগবত" ছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্ত হরিষেণ-প্রশস্তিতে পরোক্ষভাবে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পিত হইয়াছেন (পৃঃ ৭০-৭১)। দুটি সিদ্ধান্তের কোনটিই সত্য বলিয়া জানা যায় নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পূর্বকালীন কোনও গুপ্ত সম্রাটকেই গুপ্তানুশাসনে "ভাগবত" বা সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। হরিষেণ-প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে সাধারণভাবে দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, বিষ্ণুর উল্লেখ পর্যন্ত সেখানে নাই।

(৫) গ্রন্থকার একবার উদয়গিরির বরাহমূর্তির কালনির্দেশ করিতেছেন "খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক" (পৃঃ ৭৪)। আবার অন্যত্র

বলিতেছেন উহার নির্মাণকাল "খৃীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক" (পৃঃ ৭৭)! বিভ্রান্ত পাঠক কোনটি বিশ্বাস করিবে?

(৬) ৫২ এবং ৫৮ পৃষ্ঠার পাণিনির একটি সূত্র (২-২-৩৪) উদ্ধৃত হইয়াছে, "অল্পাচ্ তরস্!" সূত্রটির প্রকৃত পাঠ "অল্পাচ্ তরম্"। একবার এই ত্রুটি হইলে ইহাকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলা চলিত।

(৭) মোরা শিলালেখে উল্লিখিত বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব পঞ্চবীরকে বায়ুপুরাণোক্ত সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধরূপে চিহ্নিত করিতে সক্ষম হওয়া গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এবং এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত। কিন্তু ইহার ভিত্তিতে গ্রন্থকার বেসনগর, ঘোসুণ্ডি, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালেখসমূহে যেখানেই সংকর্ষণ বাসুদেব প্রভৃতির উল্লেখ পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাদের বীরদেবতা (তাঁহারা বীর-রূপে উল্লিখিত না হইলেও) মনে করিয়া বসিয়াছেন! এই সিদ্ধান্তের মূলে কোনও যুক্তি নাই। সংকর্ষণের যে একক পূজা প্রচলন ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সে প্রমাণ আছে ("সংকর্ষণ দৈবতীয়ো বা মুণ্ড-জটিলব্যঞ্জনঃ প্রহবন কর্মণা মদনরসযোগা-ভ্যামতি সন্দধ্যাৎ" কৌটিল্য, ১৩।৩)। তাহা ছাড়া উক্ত শিলালেখসমূহে উল্লিখিত দেব-গণকে ব্যূহ দেবতারূপে কল্পনা করিতে বা বাধা কোথায়? যদি গুপ্তযুগ ও তাহার বহু পরবর্তী কাল পর্যন্ত ব্যূহবাদ ও অবতারবাদ ভাগবতধর্মের অংগ হিসাবে যুগপৎ বিরাজ করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে বীরবাদ এবং ব্যূহবাদই বা কেন কিছুকাল একযোগে অবস্থান করিতে পারিবে না? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থকার জানেন না, সপ্তদশ শতকে পর্যন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে ব্যূহবাদের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৮) গ্রন্থকারের মতে জাতক খৃীষ্ট-জন্মের পরবর্তী রচনা (পৃঃ ১৩১)। ইহা তিনি কোথায় পাইয়াছেন? খৃীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ ভরহুত স্তূপের জাতক চিত্রাবলী তাহা হইলে কোথা হইতে আসিল?

(৯) আজীবিকগণের সম্পর্কে কার্ন ও বুলারের মতের স্বপক্ষে সম্প্রতি ব্যাসাম্ তাঁহার History and Doctrine of the Ajivikas গ্রন্থে কিছু নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাহার খবর রাখেন না (পৃঃ ১৫২)।

(১০) বৈষ্ণব আচার্যগণের গ্রন্থকার প্রদত্ত মত ব্যাখ্যার মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। মধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যদ্বয়, জয়তীর্থ ও ব্যাস-তীর্থের নাম তিনি করেন নাই। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান তর্কগ্রন্থ "পরপক্ষ গিরি-বজ্র" উল্লিখিত হয় নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবগোস্বামীর 'ষটসন্দর্ভ' এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গোবিন্দভাষ্য' গ্রন্থদ্বয়ের কথাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার রচিত গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"; "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান" নহে (পৃঃ ৩৫৭)।

(১১) বঙ্গদেশ যে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার প্রধানতম কেন্দ্র, এই প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা গ্রন্থকার এযাবৎ পোষণ করেন (পৃঃ ২৭৬)। কিন্তু অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে যে এই ভ্রমনিরাশ করিয়া তান্ত্রিক শক্তি উপাসনার সর্বভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (তন্ত্রকথা পৃঃ ২২-২৬), ইহা তাঁহার জানা নাই। মহা-নির্বাণতন্ত্রের আপেক্ষিক প্রাচীনত্বে তিনি বিশ্বাসী; কিন্তু এই ব্যাপারে আর্থার এভেলনের মুখে ঝাল না খাইয়া তিনি যদি কিছু অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, ইহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই এবং প্রাচীন নিবন্ধাদি গ্রন্থে ইহা হইতে কোনও উদ্ধৃতি নাই। কোনও গ্রন্থের অর্বাচীনত্বের এইগুলিই প্রমাণ।

সর্বশেষে দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া সমালোচনা শেষ করিব। ধর্মের অভিব্যক্তি ও ধর্মসম্প্রদায়ের বিবর্তন যে পরিমাণে সমাজ-বিবর্তনের অঙ্গ, ততদূরই তাহা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থকার ধর্মের সামাজিক পটভূমিকার উপর প্রায় কোনও গুরুত্ব আরোপ না করিয়া স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মসম্প্রদায়গুলির বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে তাঁহার রচনা জীবন্ত না হইয়া সংহতিহীন কিছু তথ্যের সমষ্টিতে দাঁড়াইয়াছে মাত্র। পূর্বসূরীগণের নিকট ঋণ স্বীকারেও তিনি যথোচিত ঔদার্যের পরিচয় দেন নাই। গণেশ ও গাণপত্য সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশ্বভারতীর গবেষক শ্রীহরিদাস মিত্র তাঁহার Ganapati নামক পুস্তকে তন্ত্র সম্পর্কে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁহার "তন্ত্রকথা" শীর্ষক গ্রন্থে এবং ইংরাজী ও বাঙলা প্রবন্ধে, শক্তিবাদের দর্শন সম্পর্কে পরলোকগত সুধেন্দুকুমার দাস তাঁহার Sakti or Devine Power গ্রন্থে, এবং সূর্যপূজা ও সৌর সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁহার ইংরাজী ও বাঙলা প্রবন্ধে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে বিস্তারিত ও প্রামাণ্য আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার একই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আকারে পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও কুত্রাপি ইঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা প্রশংসনীয় আচরণ নহে। এই সকল ত্রুটির জন্য গ্রন্থকারের পরি-কল্পনা প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সর্বাংশে সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ৬৫।৬১

[এই গ্রন্থটিই এবার রবীন্দ্র-পুরস্কার পাইয়াছে।]

উপন্যাস

সুখ। অন্নদাশংকর রায়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পাঁচ টাকা।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়ের নতুন উপন্যাসের নাম 'সুখ'। নামটি সহজ; এবং নামের অর্থটি সোজাসুজি অন্তরে বিদ্ধ হয়। সচরাচর যে-সব বাঙলা উপন্যাস প্রকাশিত হয়, এই উপন্যাসটি সে-রকম নয়, এটি একেবারে আলাদা জাতের বই। কেন আলাদা, তার একমাত্র উত্তর অন্নদাশংকর বর্তমান উপন্যাসে বাস্তব-সুখের সন্ধানে না গিয়ে, 'সুখ' নামক একটি ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। অন্নদাশংকরের একটি বিশেষত্ব, প্রখর বাস্তবকে তিনি প্রায়ই এড়িয়ে চলেন। তা অবশ্য দোষের নয়। তিনি আদর্শবাদী, এবং অন্তত তাঁর ইদানীংকার রচনায় সুচিন্তিত একটি আদর্শ পরিস্ফুটনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আগের উপন্যাস 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে এই প্রয়াস ছিল স্পষ্টগোচর; 'সুখ' উপন্যাসটি পূর্ণতায় উজ্জ্বল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি বলেছেন : 'অতি প্রাচীন রূপকথার মধ্যে একপ্রকার চিরন্তনতা আছে যা অতি আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও নেই। দৃশ্যত তা ছেলেদের জন্যে, তবু পড়তে জানলে তার ভিতরে গভীরতম জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়। তার ভিতর দিয়ে হস্তান্তরিত হয়েছে পিতৃপিতামহের বিজ্ঞতা। জীবনদর্শনের জন্যও আমি তার কাছে গেছি।'

'সুখ', বস্তুত, রূপকথার নির্যাস দিয়ে গঠিত। সুখ বড়ই দুর্লভ জিনিস। তা সহজলভ্য নয় বলেই তাকে অর্জন করতে হয়। উত্তর দস্তিদারের মেয়ে, মালা, প্রকৃতির কোলে লালিত। মা চায় তাকে আরও পাঁচটি মেয়ের মত গড়ে তুলতে, বাবার ধারণা অন্যরকম : মালা যেমন খুশি নিজের মত করে বেড়ে উঠুক, তার রূপকথার রাজপুত্র সন্ধান করে নিক। মালা কোথাও তাকে খুঁজে পায় না। রূপকথার জগৎ কী অলীক? তা নয়। মালা শেষ পর্যন্ত দেব-প্রিয়কেই বরণ করে। মালার সমগ্র পর্যটনের পথটি বাস্তবিক মধুর। 'যা পেয়েছে তারে অর্জন করো বিনয়ে, চির প্রণয়ে', এই আদর্শ শেষ পর্যন্ত সুন্দর হয়ে দেখা দেয়।

আধুনিক সভ্যতার সার্বিক চিন্তায় নিমগ্ন 'সুখ' অন্নদাশঙ্করের একটি সারবান সৃষ্টি। ৬১১।৬১

ঘোরা কাজার হাট—অশোক গুহ। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ, ১১-এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলি-১২। আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখক উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অসবার্ট সিটওয়েলের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন এটা সুটকেস সদৃশ্য। যে সুটকেস সজ্জিত হবে তার মালিকের রুচি এবং গন্তব্যস্থল অনুসারে। এবং ফলত আমরা যদি পরিচিত পরিবেশের বাইরের কিছু এর মধ্যে দেখে থাকি তাহলে বলার কিছু নেই। বলাবাহুল্য, গ্রন্থের মুখবন্ধ সে আলোচনার পথ রুদ্ধ করেছে। তবে সাধারণ পাঠক তাঁর এই বিপুলকায় উপন্যাসে কাব্যের আতিশয্য লক্ষ্য করতে পারেন।

অবশ্য অপরদিকে একটানা একটি কাহিনী হিসাবে পাঠ না করে সমসাময়িক চারিটি ঘটনার সমাবেশ হিসেবে যদি এই উপন্যাসকে গণ্য করা যায় তবে গ্রন্থটিকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে। বিগত দুশো বছরের বাংলাদেশ, তখনকার সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র ইত্যাদি অংকনে শ্রীযুক্ত অশোক গুহ নিঃসন্দেহে মুন্সিয়ানার পরিচয় প্রদান করেছেন। কাহিনীর পরিবেশনায় লেখকের যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত তা প্রশংসার্হ। ৫১৮।৬১

প্রাপ্তি-স্বীকার

বিচিত্র মণিপুর—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র।

(সচিত্র) শিশুমঙ্গল ও সুসন্তান লাভ—আবুল হাসানাৎ।

অন্তর্লগ্ন—শ্রীধনঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়।

লেখকদের প্রেম—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

কবি-প্রণাম — শ্রীবন্ধু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

অমিল পয়ার—বীরেন্দ্র দত্ত।

স্মৃতিকথা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

রবীন্দ্র বীক্ষা—নীলরতন সেন সম্পাদিত।

মায়া-মুক্তি—ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই।

জাভা-যাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বপন-পসারী—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই দেহ অন্য সুখ—বিমল কর।

রবীন্দ্রনাথ—প্রমথ চৌধুরী।

সীমান্ত প্রহরী—হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

বাংলার জয়

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণী উৎসব

(বিশেষ প্রতিনিধি)

চন্দ্রশেখর

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসব গত ২১শে এপ্রিল দিল্লির বিজ্ঞান-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে যতক্ষণ ছিলাম, সে-সময়টুকুর প্রতি মুহূর্তেই বাঙালী হিসাবে গর্ববোধ করেছি। এবারকার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের চারটি স্বর্ণপদকের মধ্যে তিনটিই বাঙালী চিত্রনির্মাতারা জয় করে নিয়েছেন। পুরস্কার বিজয়ীরা যখন একে একে মঞ্চের ওপর উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের কাছে এগিয়ে এলেন ও তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিলেন, তখন সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ করতালি ও হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। কাহিনীচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক-বিজয়ী "ভগিনী নিবেদিতা"র প্রযোজক অরুণ বসু পুরস্কার গ্রহণ করলেন সকলের আগে। তাঁর পর এলেন ছবির পরিচালক বিজয় বসু। উপরাষ্ট্রপতির হাত থেকে স্মারক-উপহার গ্রহণ করলেন ছবির দুই প্রধান শিল্পী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও অমরেশ দাশ।

বাঙালী কৃতী প্রয়োগশিল্পীদের মধ্যে উপরাষ্ট্রপতির হাত থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করলেন "হট্টগোল বিজয়-পালা" (হিন্দী সংস্করণ) শিশুচিত্রের প্রযোজক হরিসাধন দাশগুপ্ত। পুরস্কার নিলেন ছবির দুই পরিচালক সুনু দাশগুপ্ত ও রমু গোস্বামী। যে তিনটি শিশুচিত্র এবার প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক এবং যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তার তিনটিরই স্রষ্টা বাঙালী। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী "সাবিত্রী" শিশুচিত্রটির (হিন্দী) পরিচালক ফণী মজুমদার। তৃতীয় স্থান লাভ করেছে "নান্হে মুন্হে সিতারে"। এ-ছবির প্রযোজক-পরিচালক অজয়কুমার চক্রবর্তী।

কর্মব্যস্ততার দরুণ সত্যজিৎ রায় দিল্লিতে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক-বিজয়ী শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"-এর পরিচালক হিসাবে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর হয়ে পুরস্কারটি নিয়েছেন বি-এম-পি-এর কর্মসচিব দীপ্তেন্দু প্রামাণিক। শ্রীপ্রামাণিক "পুনশ্চ" ছবির প্রযোজক-পরিচালক মৃণাল সেনের হয়েও "সার্টিফিকেট অব মেরিট" গ্রহণ করেন। সত্যজিৎ রায়ের পক্ষ থেকে "সমাপ্তি" ছবির প্রাপ্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদকটিও গ্রহণ করেন শ্রী প্রামাণিক। "সপ্তপদী"র "সার্টিফিকেট অব মেরিট" প্রযোজকের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন আলো সরকার।

"সার্টিফিকেট অব মেরিট" বিজয়ী ওড়িয়া চিত্র "নুয়া বো-এর" পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় স্মারক উপহার গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক ভিত্তিতে "সার্টিফিকেট অব মেরিট" প্রাপ্ত "গঙ্গা-যমুনা" হিন্দী ছবির পরিচালক নীতীন বসু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

বোম্বাই থেকে পুরস্কার-বিজয়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এসেছিলেন শুধু "ধর্মপুত্র" ছবির প্রযোজক ও পরিচালক বি আর চোপরা ও যশ চোপরা।

বোম্বাই-এর পুরস্কার-প্রাপ্ত হিন্দী কাহিনীচিত্রের কোন শিল্পীকে অনুষ্ঠানে দেখা গেল না। তাঁরা আসেন নি। বহু ব্যস্ততার মধ্যে দক্ষিণ-ভারত থেকে অনেক শিল্পী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাবিত্রী গণেশ, দেবিকা, আর গণেশ, নাগেশ্বর রাও, কৃষ্ণাকুমারী, আর বিজয়কুমারী, এস এস রাজেন্দ্র প্রভৃতি শিল্পীরা এসেছিলেন। মারাঠী ছবির শিল্পীদের মধ্যে জয়শ্রী গডকর, অনন্ত মানে, কুমারী সুলোচনা প্রভৃতি শিল্পীরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের ব্যস্ততার ফাঁকে প্রসন্ন মনে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরেছিলেন। পারেন নি শুধু উল্লেখযোগ্য দুটি হিন্দি চিত্র "ধর্মপুত্র" ও "গঙ্গা-যমুনা"র জনপ্রিয় শিল্পীরা। "গঙ্গা-যমুনা"র প্রযোজক'ও অনুষ্ঠানে আসতে পারেন নি।

এবারকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের অনুষ্ঠানের প্রতি বোম্বাই-এর এই ঔদাসীন্য খুবই কৌতূহলের বিষয়। ঔদাসীন্যের কারণ কি? বাংলা ছবি ও বাঙালীর ঐতিহাসিক জয়লাভ? মোট কথা, তাঁদের অসহযোগিতা নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা ঔদার্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি।

তবে "সার্টিফিকেট অব মেরিট" প্রাপ্ত হিন্দী ছবি "প্যার কি প্যাস"-এর শিল্-

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে আয়োজিত চলচ্চিত্র-আলোচনা-চক্রে অংশ গ্রহণকারী কয়েকজনের মধ্যে ... কুমার বসু, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিংহ ও সুকুমার দাশগুপ্ত ফটো—ত্রৈলোক্য মিত্র

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সার্থক সম্মান

উপরাষ্ট্রপতি ও বিজয় বসু

উপরাষ্ট্রপতি ও এজরা মির

হরিসাধন দাশগুপ্ত

বি আর চোপরা

ফণী মজুমদার

ভূপেন হাজারিকা

অরুণ বসু ও উপরাষ্ট্রপতি।

ফটো—হেমেন মিত্র।
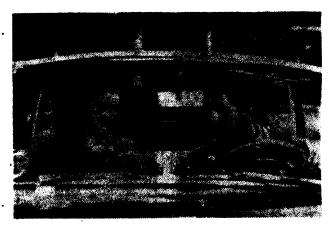
আজার ফিল্মস-এর "শাদী"র একটি দৃশ্যে সায়রাবানু ও মনোজকুমার

শিল্পী বেবী হানি ইরাণী এবারকার অনুষ্ঠানে প্রাণসঞ্চার করেছে। এই শিশু-শিল্পীকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপরাষ্ট্রপতিকে নমস্কার করতে দেখে দর্শক উল্লাস প্রকাশ করেন। "সাবিত্রী" শিশুচিত্রের শিল্পী সুচেতা সরকার স্মারক-উপহার নিতে এসে উপরাষ্ট্রপতিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। এই ঘটনাটি সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আরো যাঁরা পুরস্কার গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ভূপেন হাজারিকা (অসমিয়া ছবি "শকুন্তলা"র পরিচালক) একরা মিত্র (ফিল্মস ডিভিশন-এর প্রতিনিধি), বি আর পান্থলু (তামিল চিত্র "কাপ্পালোট্টিয়া থামিঝান"-এর প্রযোজক) ও মুখরাম শর্মা ("প্যার কি প্যাস"-এর কাহিনীকার ও প্রযোজকদের প্রতিনিধি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানের পরদিন দিল্লি কালীবাড়িতে "ভগিনী নিবেদিতা" ছবির প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দিল্লিতে উপস্থিত কলকাতার চিত্র সাংবাদিকদেরও এই সঙ্গে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বিজয় বসু ও মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। দিল্লি কালীবাড়ির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বক্তৃতা দেন জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এ কে রায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ সংবাদ দিচ্ছি। "ভগিনী নিবেদিতা" ছবিটি দেখবার জন্য দিল্লির অধিবাসীদের অভূতপূর্ব ব্যগ্রতা দেখে এলাম। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের ছবিটি দেখানো হয়। পরের দিন থেকে আয়োজন করা হয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির প্রদর্শনী। প্রথম দিন "ভগিনী নিবেদিতা"র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দুই ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে যায়। ছবিটি নিয়ে জনসাধারণের এই আগ্রহ দেখে ছবির প্রযোজকরা দিল্লিতে "ভগিনী নিবেদিতা"র নিয়মিত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। দিল্লির "ডিলাইট" সিনেমা হলে ৪ঠা মে থেকে ছবিটি দেখানো হবে।

এবারকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণী উৎসবে বক্তৃতা করেন উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডি এবং ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রীমোদী। কেন্দ্রীয় এওয়ার্ড কমিটির সভাপতি শ্রীদিবাকর এবারকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রসঙ্গে সরকারী রিপোর্ট পেশ করেন। ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের নেতৃত্বের কথা শ্রীরেড্ডী যখন তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী করতালি ও হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁর উক্তিকে আন্তরিক সমর্থন জানান।

চলচ্চিত্রের কাহিনী

সুবোধ ঘোষ

চলচ্চিত্রের কাহিনী সম্পর্কে কোন ধারণা কিংবা অভিমত অথবা জিজ্ঞাসার কথা বলবার আগে কাহিনীরই ইতিহাসের একটি বিশেষ সত্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই। এক যে ছিল রাজা—সরল ভঙ্গীর এই কাহিনী যেমন সত্যিই কাহিনী; তেমনই রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসও একটি কাহিনী। রূপকথা, উপকথা, ছোট গল্প, উপন্যাস—বর্ণনভঙ্গীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও এরা সকলেই কাহিনী। কাহিনীর জীবনেও বিচিত্র রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও একটি ব্যাপার আছে, যেটা কাহিনীর একটি বিশেষ গৌরবের ঐতিহ্য। একটি বিস্ময় বলেও মনে করা যায়। নৃত্য, সঙ্গীত, কাব্য—এরা রূপের দিক দিয়ে ভিন্নতর আর্ট হয়েও কাহিনীকে গ্রহণ করেছে। ব্যালের অবলম্বন কাহিনী, অপেরার অবলম্বন কাহিনী। কাব্যও কাহিনীকে ছন্দোময় অলংকারে সাজিয়ে নিয়ে পরিবেষণ করেছে। এমন কি চিত্রকলা এবং মূর্তিকলাও কাহিনীকে ব্যক্ত করবার প্রেরণা অস্বীকার করতে পারেনি। ভাবকলা, যার অন্য নাম অভিনয়, তা'ও একদিন স্বতন্ত্র একটি সামান্য আর্ট ছিল। কিন্তু এই আর্টও পূর্ণতার আবেদনের শক্তি লাভ করতে গিয়ে কাহিনীকে গ্রহণ ক'রে নাটকের সৃষ্টি সম্ভব করেছে। ভিন্ন ভিন্ন আর্টের অভিব্যক্তিকে কাহিনীর মর্মগত রূপের সঙ্গে সমন্বিত করা; ইংরেজী কথাটি হলো 'adaptation' ভিন্ন-ভিন্ন আর্ট তাদের আবেদন ও ব্যঞ্জনার পূর্ণতর অভিব্যক্তি সম্ভব করবার জন্য কাহিনীকে তাদের নিজেরই আত্মিক উপাদানে পরিণত করেছে। কবি রামপ্রসাদের ভাষায় এই প্রক্রিয়াটিকে বলা যায়—মনোময় মাণিক্য জেবলে দেওয়া।

চলচ্চিত্রেরও অবলম্বন কাহিনী। কাহিনী না থাকলে চলচ্চিত্র নিছক কারিগরী কৃতিত্বের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের মত চলচ্চিত্র নিজে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্ট নয়। কাহিনীকে আশ্রয় করেই সে আর্ট হতে চেয়েছে। ব্যাখ্যা করে বলবার জন্য একটি উপমার সাহায্য নিতে পারা যায়। শ্রীমতী রাধা দেখেছিলেন, এই তো সেই কেলিকদম্ব, সেই যমুনাতীর; সেই গোধেনু আছে, যমুনার নীল জলে সেই ঢেউও আছে। কিন্তু তবু সবই কেন

শূন্য মনে হয়? কারণ, সব থেকেও সেই মর্মবাণী নেই। বুঝতে অসুবিধা নেই, প্রকৃতির ছবিতে সব কিছুই ছিল: কিন্তু ছিল না সেই পরম আবেদন, (সেই emotional content) যা না থাকলে কোন সুন্দরতার ছবি, অনুভবরমনীয় হয়ে উঠতে পারে না।

চলচ্চিত্রে কিসের চিত্র? নিশ্চয় সেই জীবনেরই প্রতিচ্ছবি থাকে কাহিনী তার কথার শক্তিতে ফুটিয়ে তুলে থাকে। এবং নিশ্চয় স্বচ্ছ আলোক ও গতির, অথবা সংগীতের প্রতিচ্ছবি কিংবা প্রতিধ্বনি নয়। কাহিনীই চলচ্চিত্রের আত্মিক উপাদান। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনের অন্য সব উপকরণের কোনটিরই গুরুত্বকে লঘু করে দেখবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তারা সকলেই কাহিনীর সেবক মাত্র. কাহিনীকে পাঁচ-রকমের উপকরণের অন্যতম একটি উপকরণ বলে মনে করলে ভুল করা হবে। কাহিনী চলচ্চিত্রের রূপের মধ্যে অনুভবরমণীয় সত্তার প্রকাশ সম্ভব করে থাকে. মনোময় মাণিক্য জেলে দেয়। চলচ্চিত্র যদি কোন কাহিনীকে প্রকাশ না করে, তবে সেই চলচ্চিত্র প্রকৃত আনন্দের আর্ট হিসাবে সার্থক হতে পারবে না; যদিও বিনা কাহিনীতে একটা উপভোগ্য আমোদ অথবা শিক্ষা প্রচার করা অসম্ভব নয়, ডকুমেণ্টারি ছবি যেমন করে থাকে।

আর্ট-সমালোচক মহলে সেই নিদারুণ তর্কের এখন ক্লান্তদশা; চলচ্চিত্রকে প্রকৃত আর্ট বলে মনে করা যায় কিনা? কিন্তু স্বীকার করতে হয়েছে, মঞ্চের নাটক যদি আর্ট হয়, তবে চলচ্চিত্রও আর্ট। নাটক কাহিনীকে অভিব্যক্ত করে, চলচ্চিত্রও কাহিনীকে অভিব্যক্ত করে। চলচ্চিত্রকে চিত্রায়িত নাটক বললেই বরং ঠিক কথাটি বলা হয়। রেডিও নাটক এবং টেলিভিশন নাটকও দেখা দিয়েছে। এর অর্থ, যান্ত্রিক কুশলতার আবিষ্কার এই সব নূতন মঞ্চ কাহিনীতেই অভিনীত করে নাটক-কৌলীন্য লাভ করতে চাইছে।

চলচ্চিত্র যদি সার্কাসের ও ম্যাজিকের; কিংবা গানের ও আবৃত্তির জলসার ছবি হয়, তবে তার পক্ষে লোকরঞ্জক হতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের পক্ষে স্বকীয়তা বলে দাবি করবার কিছু রইল না। চলচ্চিত্র তবে পরকীর্তির যান্ত্রিক বাহক হয়ে গেল। কিন্তু চলচ্চিত্রের লক্ষ্য তা নয় হতেও পারে না। কাহিনীকে একটি বিশেষ নাট্য-প্রকৃতি দিয়ে রূপায়িত করাই চলচ্চিত্রের স্বকীয়তা। সাধারণ লোক-চলতি ভাষায় চলচ্চিত্রকে 'বই' বলা হয়ে থাকে। কথাটি চলচ্চিত্রের জাতিবাচক উক্তি। গোত্র নতুন; কিন্তু মূলে জাতিত্বে চলচ্চিত্র বস্তুত নাট্যায়িত কাহিনী।

এইবার আসল সমস্যার কথাটি বলতে [illegible]। চলচ্চিত্রের জগতে এমন

বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্স-এর আশু মুক্তি-প্রতীক্ষিত "বধূরে" একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস ও কমল মিত্র

আক্ষেপ ধ্বনিত হতে শোনা যায়—সবই ভাল ছিল, তবু ছবি ভাল হলো না। ভাল টাকা খরচ করা হলো, অভিনেতারা ভাল অভিনয় করলেন, ফটোগ্রাফীর কাজ ভাল, শব্দের কাজ ভাল; এবং কাহিনীও ভাল। তবু ছবিটি একটি নিকৃষ্ট সৃষ্টির উদাহরণ হয়ে দেখা দিল।

এক্ষেত্রে সবার আগে কাহিনীকেই সন্দেহ করবার প্রবণতা দেখা যায়। ধারণা করা হয়ে থাকে, কাহিনীরই মধ্যে এমন কোন ত্রুটি নিহিত আছে, যে-কারণে ছবিটি রূপে ও গুণে অধম হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এমন সন্দেহ কাহিনীর মর্যাদার প্রতি সুবিচার নয়; যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের পরিচায়কও নয়। কোন সন্দেহ নেই, কাহিনীর দুর্বলতার ছায়াছবির রূপ ও দুর্বল হয়ে যাবে। কিন্তু যে কাহিনী লিখিত কাহিনী হিসাবে অজস্র পাঠকের কাছে মনোগ্রাহী সৃষ্টি বলে স্বীকৃত, সে কাহিনী নিজের ইচ্ছায় ছবিকে অমনোগ্রাহী করে তুলতে পারে না। সে কাহিনীকে ছবিতে রূপায়িত করবার পদ্ধতির মধ্যেই কোন না কোন ভুল থাকে। কবি টেনিসনের নাটক 'বেকেট' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। দর্শকেরা অধৈর্শ হয়েছিলেন। দশদিনের পর অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমালোচকেরা নাটক 'বেকেট'কেই দোষী করেছিলেন। তাঁদের মতে, বেকেটের কাহিনীতে নাটকের গুণ নেই; তাই বেকেটের অভিনয় ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চাশ বছর পরে বিখ্যাত অভিনেতা স্যার হেনরি আরভিং এই বেকেট নাটকেরই অভিনয় করেছিলেন; এবং দর্শকেরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এইবার সমালোচকেরা কিন্তু সকলেই একবাক্যে বেকেট নাটকের কাহিনীরই নাটকীয় সৌষ্ঠবের অজস্র প্রশংসা করেছিলেন। ঘটনাটির সরল শিক্ষা

এই যে, অভিনয়ের অপকর্ষে ভাল কাহিনীর নাটকীয় ব্যঞ্জনাও বিনষ্ট হয়।

চলচ্চিত্রে কাহিনীর এই ভাল-মন্দ পরিণামের ব্যাপারে যে বিশেষ একটি কুশলতার আর্ট সবচেয়ে বেশি দায়ী, এইবার তারই কথা মনে পড়ছে। অর্থাৎ চিত্রনাট্য স্ক্রীন-প্লে। চিত্রনাট্যকে স্বচ্ছ-চিত্রের নূতন প্রতিভার নাট্যকার বলা যায়। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে দেখা গিয়েছে যে, চিত্রনাট্যের উৎকর্ষে সামান্য সাধারণ গঠনের কাহিনী ছায়া-ছবিতে অসাধারণ আবেদনের ঐশ্বর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। চলচ্চিত্রের সফলতার জন্য কাহিনীকার লেখকের প্রতিভা সাহায্য

করতে পারে ঠিকই; কিন্তু যার প্রতিভার উপর চলচ্চিত্রের কাহিনীগত রূপের সাফল্য সব চেয়ে বেশি নির্ভর করে, তিনি হলেন চিত্রনাট্যকার। বার্ণাড শ তাঁর নাটক 'সীজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রার' ছায়াছবির প্রয়োজনে নিজেই কয়েকটি ছোট দৃশ্য লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিভাধর কাহিনীকারের এই চেষ্টা একটা কৃতিত্বের কীর্তি হয়ে উঠতে পারেনি। ছায়াছবির সীজার ও ক্লিওপেট্রার রূপ তাতে বিশেষ কিছু সমৃদ্ধ হয়নি।

খুবই ভাল হতো, যদি পৃথিবীর কাহিনীকারেরা সকলেই চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্বেও গুণী হতে পারতেন। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কাহিনীকার নন, লেখক নন, এমন ব্যক্তিকেও চিত্রনাট্য লিখতে হবে। যিনি কাহিনীর লেখক, এবং যিনি লেখক নন, উভয়েরই পক্ষে চিত্রনাট্যের রচনা সমান দুরূহ কুশলতার আর্ট। সুতরাং, চলচ্চিত্রের স্বার্থের জন্য চিত্রনাট্য রচনার কাজটির মধ্যেই সবচেয়ে বেশি সাবধানতা প্রয়োজন। কাহিনীর নিজস্ব একটি অভিমান আছে। সাজবদল করে চিত্রনাটক হতে গিয়েও কাহিনী তার এই নিজস্ব অভিমানটিকে হারাতে চায় না। এটা হলো কাহিনীর রূপের অভিমান। সেখানেই সার্থক চিত্রনাটকীয় দক্ষতা, যেখানে কাহিনীর এই রূপের অভিমানের অসমাদর করা হয় না।

ভাল চলচ্চিত্র হতে হলে ভাল কাহিনীর প্রয়োজন। তার চেয়ে বড় প্রয়োজন সেই কাহিনীর ভাল চিত্রনাট্য। কিন্তু ভাল চিত্রনাট্য রচনার কোন নির্দিষ্ট মন্ত্র-কৌশল নেই। একই কাহিনীর একাধিক সার্থক চিত্রনাট্য রচনা করা সম্ভব। চিত্রনাট্য যদিও বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, চিত্রনাট্যের রচনা কিন্তু সাহিত্য কর্মেরই মত কল্পনাকুশল প্রয়াস। এর জন্যে বিশেষ প্রকারের প্রতিভা প্রয়োজন। চিত্রনাট্য হবে কাহিনীর মর্মগত সৌষ্ঠবের বান্ধব; তবেই কাহিনীর কাছ থেকে চলচ্চিত্র তার আসল প্রাপ্যের এবং দরকারের প্রায় সবটুকু পেতে পারবে।

চিত্রনাট্য রচনার কোন নির্দিষ্ট মন্ত্র-কৌশল, কোন ব্যাকরণ, কোন ধরা-বাঁধা পদ্ধতি নেই বটে, কিন্তু কয়েকটি মূল নীতি নিশ্চয় আছে। একটি পৌরাণিক গল্পে-বলা হয়েছে—বিষ্ণু একদিন দেখলেন, হাত-পা ভাঙ্গা একদল তরুণ ও তরুণী আর্তনাদ করছে। কে তোমরা? বিষ্ণুর প্রশ্নের উত্তরে তারা বললে, আমরা হলাম যত রাগ ও রাগিনী। ঋষি নারদ ভুল সুরে গান করে আমাদের এই দশা করেছে। পরিহাসের গল্প বটে; কিন্তু রূপকলার জগতে এমন করুণ ট্রাজেডি বিরল নয়। কাহিনীরও একধরণের সুর আছে, অর্থাৎ তার রূপের বিশেষ গঠন। সবাক্ ছবিতে কাহিনীকে মূর্ত করতে হলে তার বাচিক আভরণের ভার কিছুটা লঘু করে নিতে হয়, ঘটনার অজস্রতাকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়; কিন্তু যেটা তার রূপের আসল গঠন, তার রদবদল নীতিগর্হিত ব্যাপার। ভারতীয় আলংকারিকের মতে রূপের গঠন হলো রসের বিগ্রহ; ফর্ম আর্টের বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ।

চলচ্চিত্রের একটি আদর্শের সত্তাও আছে। চলচ্চিত্রেরও জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। বিদেশের ছবির হুবহু অনুকরণ কোন কাজের কথা নয়; তার প্রয়োজনও হয় না, যদিও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। দেশের চলচ্চিত্র দেশেরই অভিরুচির ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের ধারক হবে। আর্টের আবেদন বিশ্বজনীন, আর কোন ভৌগোলিক অধীনতা নেই। কিন্তু তার রূপের মধ্যে জাতীয় বিশিষ্টতার প্রকাশ থাকে; তা না হলে বাইরের পৃথিবীতেও তার বিশেষ মূল্য স্বীকৃত হয় না। বাংলার চলচ্চিত্রের পক্ষে উদ্বিগ্ন হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই; কারণ বাংলার সাহিত্যে কাহিনীগত ঐশ্চর্যের অভাব নেই। কাহিনীও জাতীয় অভিরুচির বৈচিত্র্য দিয়ে গঠিত রূপকলা। সে কাহিনী বাংলার চলচ্চিত্রে সার্থক রূপায়ণ লাভ করতে পারলে তার সমাদর বিশ্বজনীন হবে, এমন আশা অযৌক্তিক নয়। হলিউড ঔপন্যাসিক ফক্‌নার এবং নাট্যকার টেনেসি উইলিয়মসের রচিত কাহিনী চিত্রায়িত করেছে। ইংরেজ দর্শক আর সমালোচক খুশি হয়ে বলেছেন, এই ছবিতেই সুষ্ঠু মার্কিন অভিরুচির পরিচয় পাওয়া গেল। হলিউডের "নির্বিশেষ" কাহিনীর ছবিগুলি সুধীজনের কাছ থেকে এমন সম্মানের স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি।

কাহিনীর কথা চলচ্চিত্রের প্রয়োজন ও স্বার্থের শেষ কথা নয়; প্রথম কথা।

(বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের চলচ্চিত্র-অলোচনা-চক্রে পঠিত।)

চলচ্চিত্র-আলোচনা-চক্র

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের বিরাট কর্মসূচীতে গতবারের মত এবারেও চলচ্চিত্র সম্পর্কিত একটি আলোচনা-চক্র স্থান পেয়েছিল। আলোচনা-চক্রটি বসে গত ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায়।

আলোচনা-চক্রে যোগ দিয়েছিলেন দেবকীকুমার বসু, তপন সিংহ, সুবোধ ঘোষ, বিজয় বসু, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, নির্মলকুমার ঘোষ, অনিল বাগচী ও সুকুমার দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অজিতকুমার বসু।

আলোচনা-আসরে চিত্রপরিচালনা সম্পর্কে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তপন সিংহ ও বিজয় বসু। শ্রী সিংহ এই বিষয়ে ভাষণ দেবার জন্য দেবকীকুমার বসুকে অনুরোধ করেন। শ্রী বসু তাঁর ভাষণে চিত্রপরিচালকের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন, সুন্দরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তার মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বটিও চিত্রপরিচালকের ওপর ন্যস্ত। এই দায়িত্ব পালনে যিনি সক্ষম, তিনিই আদর্শ চিত্রপরিচালক।

বিজয় বসু তাঁর ভাষণে বলেন, আজকের দিনের অর্থনৈতিক সমস্যাটা সাধারণ মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। "চমৎকারা" চিন্তার বোঝা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। "চমৎকারা" চিন্তার ভারে জর্জরিত মানুষ তার দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার কথা সাময়িকভাবে ভুলতে চায় চটুল নাচ, গান আর অলীক প্রেমের উপাখ্যান সমন্বিত ছবি দেখে।......যেসব ছবির মধ্যে সত্য-নিরূপণের চেষ্টা থাকে, যার মধ্যে থাকে শিল্পলোকর্মের প্রয়াস অথবা
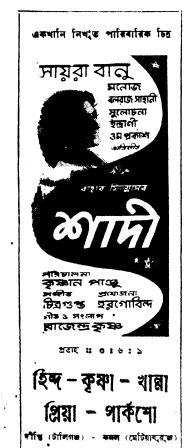
সমাজের সুখদুঃখ হাসিকান্নায় ভরা সমস্যার প্রতিফলন, সেসব ছবির বাণিজ্যিক সাফল্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে ব্যতিক্রম আছে বলেই নিয়ম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

শিল্পী হিসাবে ভাষণ দেন পাহাড়ী সান্যাল ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী সান্যাল বলেন, চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রথম শর্ত, আমি মনে করি, প্রস্তুতি। যিনি অভিনয় করবেন তাঁর যেমন প্রস্তুতির প্রয়োজন, যিনি করাবেন অর্থাৎ চিত্রপরিচালক, প্রস্তুতির প্রয়োজন তাঁরও এবং বেশী করেই। শিল্পীকে জানতে হবে কী তাঁর অভিনেয় চরিত্র, কী রূপ তাতে আরোপ করতে হবে।... কেউ কেউ বলেন, আধুনিক কালের উৎকৃষ্ট সিনেমায় আবেগের নাকি কোন স্থান নেই। আমি হৃদয়ে বিশ্বাসী। হৃদয় বিসর্জন দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করা যায় অথবা সেই সৃষ্টির আনন্দ অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়, এমন সৃষ্টিছাড়া কথায় আমার আস্থা নেই। আস্থা না থাকার জন্য কেউ যদি আমাকে "সেকেলে" কিংবা অরসিক বলতে চান তো বলুন। আমি বলব, এ জীবনটা না হয় অমন অরসিকই থেকে গেলাম।

সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অভিনয় করতে গিয়ে যে মুহূর্তে শিল্পী ভাবেন আমি অভিনয় করছি, তাঁর অভিনয় হয় নিষ্প্রাণ কলের পুতুলের মতন। উপলব্ধি অভিনয়ের প্রধান অংগ। তেমনি আত্মসংযম না থাকলে আত্মহারা হয়ে অভিনয় করলে আতিশয্যের দোষে অভিনয় হয় কলঙ্কিত।... একদিন অভিনয় করতে গিয়ে অপাঙক্তেয়, কলঙ্কিত আলাদা জগতের মানুষ হিসেবে শিল্পীদের সরিয়ে রাখার চেষ্টা যেমন হয়েছে, তেমনি আবার বিনোদিনীর মতন সমাজচ্যুত নারীও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ ও আশীর্বাদ পেয়েছেন শুধু প্রাণস্পর্শী অভিনয়ের জন্য।...বর্তমান শিল্পীদের মধ্যে আন্তরিকতার যে অভাব দেখা দিয়েছে তাতে ভাগ্যলক্ষ্মীকে পাওয়া গেলেও কলালক্ষ্মীর অবমাননা হচ্ছে। আজকে আমরা, শিল্পীরা, ফাঁকি দিয়ে বাহবা নিতে চাই কিন্তু শিল্পের দেবতার আশীর্বাদ পাই না।

চিত্রসমালোচকের ভূমিকা সম্পর্কে চিত্র-সাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ বলেন, সমালোচক ধৈর্যশীল ও শান্ত চিত্ররসিক হবেন সত্যি, তবু তাঁর ঈশ্বর-প্রদত্ত জন্মগত এক জোড়া চোখ ছাড়াও তাঁকে তাঁর তৃতীয় নয়নটি সদা উন্মুক্ত ও জাগ্রত রাখতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, এই তৃতীয় নয়নটি কী? এখানেই একজন সমালোচক সাধারণ শিক্ষিত দর্শক হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র। তৃতীয় নয়ন বলতে এখানে সজাগ অনুভূতিসম্পন্ন মনের কথা বলা হচ্ছে। যে মন সংবেদনশীল

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর "রূচিরা"-র প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

থাকা সত্ত্বেও অস্তিত্বে, বোধে, বিচারে সর্বদা আলাদা হয়ে থাকবে।......তাঁর সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে নির্ভুল শিল্পকর্মের শর্তটি উপস্থিত করে স্রষ্টার সীমায়িত বোধবুদ্ধি ও ধারণাকে অতিক্রম করে তাঁকে নতুন উপলব্ধি ও নতুন শিল্পসত্যের সন্ধান দিতে হবে। এই সাধনায় যখন সমালোচকের সিদ্ধিলাভ ঘটে, তখনই তিনি সত্যিকারের স্রষ্টা। সমালোচকের এই ভূমিকা পাঠকরা যদি নির্দ্বিধায় মেনে নেন, তবেই সমালোচক তাঁর কর্তব্যসাধনে মহৎ আনন্দের অধিকার অর্জন করে নিতে পারেন। পাঠকের সঙ্গে সমালোচকের আত্মিক সম্পর্কটি এমনিভাবেই গড়ে উঠতে পারে। এবং এই নিবিড় সম্বন্ধের ভেতর দিয়েই তাঁর পাঠক প্রসন্ন এবং সমালোচক নিজে সার্থক হয়ে উঠতে পারেন।

ছায়াছবিতে সংগীত সম্বন্ধে অনিল বাগচী বলেন, আজ ব্যবসায়িক স্বার্থে যাঁরা অনাসৃষ্টির চাহিদা বাড়াবার চেষ্টা করছেন তাঁদের নিজেদের অজ্ঞতাকে ঢাকার জন্য, তাঁরা ভেবে দেখেছেন, কত নীচে তাঁরা যাচ্ছেন, এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কত ক্ষতি করে যাচ্ছেন? আজকাল দেখছি সৃষ্টিধর্মিতার চেয়ে যুগধর্মের প্রভাবই ক্রমশ বেড়ে চলেছে, অনেকেই নতুনত্বের নামে ক্লেদপূর্ণ সংগীত পরিবেশন করে সস্তায় বাজিমাত করার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—এটা প্রগতি, না দুর্গতি, তা বিচারসাপেক্ষ নয় কি?

চিত্রপ্রযোজনা প্রসঙ্গে সুকুমার দাশগুপ্ত বলেন, প্রযোজকদের—বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্রের—সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে যাত্রাদলের রাজার কথা। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—যাত্রাদলের রাজা সাজার বাসনা কেন? এর জবাব এক কথায় দেওয়া যাবে না। কেউ বলবেন, ফাটকা খেলার নেশা প্রযোজকের রক্তের মধ্যে। কারণ চলচ্চিত্র আমাদের দেশে আজও ব্যবসার মর্যাদা পায়নি। কেউ বলবেন, অতি লোভ মানুষকে যুগ যুগ ধরে স্বর্ণখনির সন্ধানে আফ্রিকার গহন অরণ্যে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সকলেরই কি লোভ আর নেশা? সৃষ্টির তাগিদে কেউ কেউ কি জুটে আসেনি? শিল্পী যে ছবি আঁকেন, ভাস্কর যে মূর্তি গড়েন, কবি যে কাব্যরচনা করেন, সে কি শুধু ব্যবসাদারী বুদ্ধি নিয়ে?

চলচ্চিত্রের কাহিনী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ও সুচিন্তিত ভাষণ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ।

চিত্রালোচনা

বর্তমান সপ্তাহে কোন নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। একটি মাত্র হিন্দী ছবি এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটির নাম জিন্দগী ঔর খোয়াব।

নিউ থিয়েটার্স পিকচার্স-এর এই ছবিতে একটি আবেগধর্মী নাট্যকাহিনী রূপায়িত। মীনাকুমারী ও রাজেন্দ্রকুমারকে ছবিটিতে অনেকখানি পর আবার এক সঙ্গে দেখা যাবে। এস ব্যানার্জি ছবিটির পরিচালক। সুররচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন দত্তারাম।

* * *

রানাঘাটে একটি সংগীত-বিদ্যালয় খুলেছেন নায়ক। কিন্তু ছাত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একজন প্রতিশ্রুতি-সম্পন্না ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবার জন্য নায়ককে শেষ পর্যন্ত গৃহভৃত্যের কাজ নিতে হল। শিল্পভারতী প্রোডাকশন্স-এর বর্ণচোরা ছবির এই ঘটনাগুলির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি রানাঘাটে সম্পূর্ণ করে

স্টার থিয়েটারের বর্তমান নাট্যনিবেদন 'শেষাগ্নি'-এর একটি দৃশ্যে গীতা দে ও চন্দ্রশেখর।

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ইউনিট নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। পরিচালকের অগ্রজ বনফুলের "কাণ্ড" নাটকটির ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রের শিল্পী হলেন জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, গীতা দে ও গঙ্গাপদ বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

প্রযোজক বিমল ঘোষ আশু মুক্তি-প্রতীক্ষিত **বধূর** পর আরও তিনটি চিত্র-প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করছেন। ছবি তিনটি হল : **পথ ও পাথেয়, অগ্নিস্বাক্ষর ও বামনাবতার।** প্রথমোক্ত ছবিটির কাহিনী-কার নিতাই ভট্টাচার্য। দুর্গাপুরের পট-ভূমিতে এই কাহিনী বিস্তৃত। দ্বিতীয়টির কাহিনীকার শৈলেন দে। একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের নাটকীয় উপাখ্যান এই কাহিনীর অবলম্বন। তৃতীয়টি সু-পরিচিত পৌরাণিক উপাখ্যান।

এম কে জি প্রোডাকশন্স-এর আগামী নিবেদন **সাক্ষীর** কাহিনী যে খুনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সে পেশাদারী দুর্বৃত্ত নয়। শুধু খুন একটা হয়েছে এবং এর সাক্ষী এক বালক। খুনী ও বালকের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। ফলে পুলিসের তদন্তের গতিও বারবার বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই ভিন্নধর্মী রহস্য-রোমাঞ্চপূর্ণ কাহিনীই ছবির বিষয়বস্তু। পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবির কাজ শুরু হয়েছে গত ১লা বৈশাখ। ছবির বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, ছায়া দেবী, দীপক মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, ডি-জি, রেণুকা রায়, উৎপল দত্ত, বীরেশ্বর সেন ও কিশোর শিল্পী বাসুদেব।

শিবানী ফিল্মস-এর **মায়ার সংসার** দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। ছবির কাহিনী একটি নির্দ্দিষ্ট মানুষের ভাগ্য-বিড়ম্বনা এবং সংগীত-সাধিকা এক মহীয়সী নারীর আত্মত্যাগ ও একটি সংসার গড়ে তোলার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। কনক মুখোপাধ্যায় এ-ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের শিল্পীরা হলেন সন্ধ্যারানী, বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, অসিতবরন, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, দীপ্তি রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সূর্যশিখা নামে একটি নতুন ছবির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান গত ১লা বৈশাখে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়। এক আদর্শবাদীর জীবনে আদর্শ ও কামনার দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে এই ছবির কাহিনী রচিত। অগ্রদূত-গোষ্ঠীর সলিল দত্ত ছবিটি পরিচালনা করছেন। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী, অসিতবরণ, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, রেণুকা রায়, শোভা সেন, শিখা বাগ ও হরিধন মুখোপাধ্যায় ছবির মুখ্য শিল্পী। বিনয় চট্টোপাধ্যায় ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুর-রচনার দায়িত্ব পালন করবেন।

শরৎকাহিনীর হিন্দী-চিত্ররূপ

আলোক ভারতীর "সৌতেলা ভাই" হিন্দী ছবিটি দুটি বিশেষ কারণে উপভোগ্য। প্রথম কারণ, এই ছবি শরৎ-চন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল" অবলম্বনে তৈরী। দ্বিতীয় কারণ, ছবিটি মহেশ কাউল কর্তৃক সুপরিচালিত।

ছবির চিত্রনাট্য শরৎকাহিনীর মৌলিক আবেদন সুরক্ষিত। মূল কাহিনীর পরিবেশ ও আবেগরস ছবিতে নিষ্ঠার সংগে অনুসৃত। ছবিটির এই বিশেষ গুণের জন্য পরিচালক মহেশ কাউল প্রশংসা পাবেন।

তবে হিন্দী ছবির সর্বভারতীয় দর্শকদের দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিচালক ছবিতে একাধিক অনাবশ্যক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই বাহুল্যপ্রীতি সত্ত্বেও ছবিতে শরৎকাহিনী খর্বিত হয়নি।

কাহিনীর মুখ্যচরিত্র গোকুলের রূপ-সজ্জায় গুরু দত্ত'র অভিনয় প্রাণস্পর্শী। বিপিন গুপ্ত (বৈকুণ্ঠ), প্রণতি ভট্টাচার্য (বৈকুণ্ঠের দ্বিতীয়া স্ত্রী) ও রাজকুমার (বিনোদ) আন্তরিকতার সংগে অভিনয় করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে সুঅভিনয় করেছেন অসিত সেন, কানহাইয়ালাল, এস এন ব্যানার্জি ও রত্না।

অনিল বিশ্বাস ছবির সুরসংযোজনায় প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। অধিকাংশ গানের কীর্তনাঙ্গ সুরারোপ ও আবহ-সংগীত দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখে। ছবিতে একটি কাওয়ালী গানের উপস্থাপন খুবই চিত্তাকর্ষক।

কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন।

নাট্যাভিনয়

চরিত্রহীন ও **শেষরক্ষা** অভিনেতৃ সংঘের দুটি নতুন নাট্যপ্রয়াস। আগামী ৭ই ও ১৪ই মে মহাজাতি সদনে নাটক দুটি যথাক্রমে অভিনীত হবে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন নরেশ মিত্র, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, আশিসকুমার, তরুণকুমার, অনুপকুমার, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল মুখো-পাধ্যায়, মলিনা দেবী, বিপিন গুপ্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, রেবা দেবী, জয়শ্রী সেন, বেলারানী, তপতী ঘোষ ও সরযূবালা।

গীতা ব্যানার্জি

করবার জন্যে। গীতার বাবা ও মা একান্ত অনিচ্ছুক, তাঁরা কিছুতেই পাঠাবেন না মেয়েকে। কিন্তু ডাঃ হরিহর ব্যানার্জির চেষ্টায় সে অনুমতি পেলে। এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের জলে। সেদিনকার সেই প্রতিযোগিতা যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা মেয়েদের মেডলে রিলের কথা মনে করে আজও আনন্দ পাবেন। বোম্বাই প্রদেশের হয়ে যেসব মেয়ে কলকাতায় প্রতিযোগিতা করতে এসেছিলেন তাঁরা কেউই বোম্বের মেয়ে ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ইউরোপীয়। রুথ প্রেস ও পামেলো ব্যালেনটাইন ছিলেন অস্ট্রীয়, ইনস্লটাং ছিলেন আইরিশ। তাঁরা তখন যুদ্ধের আতঙ্কে নিজ বাসস্থান ছেড়ে ইভাকুয়ি হয়ে বোম্বাই শহরে বসবাস করছিলেন।

বাংলার মেয়েদের দলটি তৈরী হয়েছিল ব্যাক স্ট্রোকে রমা সেনগুপ্তা, ব্রেস্ট স্ট্রোকে গীতা ব্যানার্জি আর ফ্রি-স্টাইলে লীলা চ্যাটার্জিকে নিয়ে।

দুটি দল যখন প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল তখন সব দর্শকের মনেই একটা উত্তেজনা। বিষয়টি একটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মর্যাদা পেয়েছিল। ইউরোপীয় বনাম ভারতীয়। মুহুর্মুহু চীৎকার, হর্ষধ্বনি আর করতালির মধ্যে বাংলার মেয়েরা জয়লাভ করল। এর মধ্যে গীতার কৃতিত্ব ছিল কিছু বেশী। কারণ ব্যাক স্ট্রোকে রুথ প্রেস রমা সেনগুপ্তাকে প্রায় তিন লেংথের ব্যবধানে পিছনে ফেলে প্ল্যাটফরম ছুঁয়েছিল। ব্রেস্ট স্ট্রোকে গীতা সেই ব্যবধান অতিক্রম করে ইনস্লটাংকে এক লেংথের উপর পিছনে রেখে প্ল্যাটফরম ছুঁয়ে লীলাকে সাহায্য করে। লীলা ফ্রি-স্টাইলে সহজেই পরাজিত করে ব্যালেনটাইনকে।

এই বছরেই গীতার আবার ডাক আসে নিখিল ভারত সাঁতার প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে। প্রস্তুতি হিসাবে ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি আর শ্রীপ্রফুল্ল মল্লিক শিক্ষা দেন ব্রেস্ট স্ট্রোক, শ্রীশচীন নাগ ফ্রি-স্টাইল, আর ব্যাক স্ট্রোকের কলা-কৌশল শেখান শ্রীরাজারাম সাহু।

বলা বাহুল্য, গীতা ব্যানার্জি, রমা সেনগুপ্তা, ও লীলা চ্যাটার্জি—বাঙলার তিনটি মেয়েই লাহোরে সাঁতারের ছলাকলা দেখিয়ে বোম্বাই যায় এবং গোলওয়ালা বাথে ঐ তিনটি ইউরোপীয় মেয়ের সঙ্গে আবার প্রদর্শনী সাঁতারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

গীতা ব্যানার্জির খেলাধুলোর চর্চা হয়তো আর কিছুদিন সমান তালেই চলত। কিন্তু বি এ পরীক্ষা দেবার সময় প্লাস্টিক আলসারে আক্রান্ত হওয়ায় খেলাধুলোর জগৎ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। তবু রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষের নির্দেশে তার যোগব্যায়াম আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে বিয়ের শাঁখও বেজে ওঠে।

স্বামী ননীলাল চক্রবর্তী একটি মেয়ে ও দুটি ছেলেকে নিয়ে গীতা ব্যানার্জির এখন শান্তির সংসার। খেলাধুলোয় কারোই বিশেষ আগ্রহ নেই। তবে পিতৃকুলে গীতার খেলাধুলোর ধারা বজায় রেখেছে বোন খোকা এবং ভাইঝি সুপ্রিয়া। আলমারীতে থরে থরে সাজানো গীতার স্পোর্টসের প্রাইজ ওদের হাতছানি দিয়ে ডেকেছে এবং সেই ডাকে সাড়া দিয়ে খোকা ক্রোকে খেলায় এবং সুপ্রিয়া সাঁতারের কিছুটা চর্চা করেছে। কিন্তু গীতার মত কেউই প্রশংসা কুড়োতে পারেনি।

দেশী সংবাদ

১৬ই এপ্রিল—পোর্ট ব্লেয়ার হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল পি-ডব্লু-ডি'র দক্ষিণ আন্দামানস্থিত প্রায় সাত আট হাজার শ্রমিকের এক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করিয়া পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয় এবং ইহার ফলে ৭ জন নিহত এবং আরও বহুলোক গুরুতর আহত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আজ ঘোষণা করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত ১৯৬১ সালের ১লা নভেম্বর হইতে কার্যকর হইবে। ইহার ফলে প্রায় বিশ লক্ষ কর্মচারী উপকৃত হইবেন এবং এজন্য বৎসরে ১৩টি টাকা খরচ হইবে।

১৭ই এপ্রিল—কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, গতকাল রাত্রে মালদহ শহরে বিবদমান দুইদল লোকের মধ্যে এক গুরুতর রকমের সংঘর্ষ উক্ত শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। হাঙ্গামা এরূপ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, ঐ শহরের দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং শহরে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্যন্ত সান্ধ্য আইনও বলবৎ করা হইয়াছে।

যাঁহারা এতকাল শৌলমারি আশ্রমের সন্ন্যাসীকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলিয়া চালাইয়া আসিতেছেন, সেই শ্রেণীভুক্ত কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে উচ্ছৃংখলতার এক অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

১৮ই এপ্রিল—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার (কংগ্রেস) এবং শ্রীতুলসীচরণ পাল (নির্দলীয়) ১৯৬২-৬৩ সালের জন্য যথাক্রমে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র পদে পুনঃ নির্বাচিত হন।

নেপালের রাজা মহেন্দ্র আজ সদলবলে পোখরা হইতে তাঁহার ইলুসিন বিমানযোগে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন রাজা মহেন্দ্র, রানী রত্না ও রাজকুমারী সারদাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

১৯শে এপ্রিল—আজ রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দার স্বরন সিং লোকসভায় ১৯৬২-৬৩ সালের জন্য যে নূতন রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন, তাহাতে ১লা জুলাই হইতে সকল শ্রেণীর যাত্রিভাড়া এবং রেলওয়ের নিজস্ব মাল, ডাক ও সামরিক দ্রব্য ও রপ্তানিযোগ্য ম্যাঙ্গানিজ ব্যতীত সকল রকম মালের মাশুল কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) "হাটে বাজারে" উপন্যাস এবং শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "পঞ্চোপাসনা" নামে এক গবেষণামূলক পুস্তকের জন্য ১৯৬১-৬২ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার পাইয়াছেন।

২০শে এপ্রিল—দুইটি কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য চাউলের বাজারে সঙ্কটের ছায়া পড়িয়াছে। একদিকে চাউলের উর্ধমুখী দর বর্তমানে আরও বাড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, অন্যদিকে ধানের সরবরাহের অভাবে কলিকাতা ও আশপাশের কয়েকটি ধানকল বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২১শে এপ্রিল—কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী

হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম আজ লোকসভায় এরূপ ইংগিত দেন যে, কর্ণফুলী বাঁধের ব্যাপারে পাকিস্তানের একতরফা কাজের বিরুদ্ধে ভারত সরকার 'প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণ করিতে পারে।

বিহার সরকারের চিকিৎসা বিভাগের তরুণ পণ্ডিত হরিনাথ মিশ্র জনৈক রোগীর প্রতি ডাক্তারদের চরম অবহেলার অভিযোগের বিষয় শুনিতে পাইয়া গত ১৯শে এপ্রিল রাত্রি ১০টার সময় স্বয়ং পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটিয়া গিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দেশ, মৌচাক ও উল্টোরথ পত্রিকার পক্ষ হইতে প্রদত্ত বাংলার সাতজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীমতী সুখলতা রাও এবং কবি হরপ্রসাদ মিত্র তাঁহাদের সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ নববর্ষ উপলক্ষে বিশিষ্ট সাহিত্যিক পুরস্কার লাভ করেন।

২২শে এপ্রিল—গত ১৭ই এপ্রিল সিউড়ী হাসপাতালে ভর্তি হইবার জন্য আনীত এক রোগিনীর শোচনীয় মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় পাঁচশত লোকের এক মারমুখী জনতা সিউড়ী হাসপাতালে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

মালদহে সীমান্তের অপর পাড়ে পাক ভোলাহাটে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মহানন্দার অপর পারে পাক সীমান্ত বরাবর পরিখা খনন করা হইয়াছে। প্রকাশ, ভারত সীমান্তবর্তী চাঁদপাড়া, আইহো অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসিগণ আতঙ্কের মধ্যে কাল কাটাইতেছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই এপ্রিল—নেপালের থোরি হইতে যেসব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, নেপালী কংগ্রেসের তিন শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক একশত রাইফেল লইয়া গত ১৩ই এপ্রিল থোরি পরীক্ষা ঘাটি আক্রমণ করিয়া অধিকার করে।

কম্যুনিস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন লাই জাতীয় গণ-কংগ্রেসে বলিয়াছেন যে, পর পর তিন বছর চীনে গুরুতর রকমের জাতীয় বিপর্যয় দেখা দিয়াছে এবং জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে।

১৭ই এপ্রিল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস বর্তমান সেশনের জন্য অর্থাৎ ৩১শে মে পর্যন্ত বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৮ই এপ্রিল—আজ জেনেভা সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি শ্রীআর্থার ডীন তিন পর্যায়ের নূতন নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা পেশ করেন। ঐ পরিকল্পনায় বিভিন্ন বাছাই করা এলাকায় ক্রমিক পর্যবেক্ষণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৯শে এপ্রিল—সোভিয়েট প্রতিনিধি শ্রীজোরিন জেনেভায় আজ সম বত রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে বলেন, আটটি নিরপেক্ষ দেশ যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছে, আণবিক পরীক্ষা কার্য নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে আরও আলোচনার ভিত্তি হিসাবে রাশিয়া তাহা মানিয়া লইবে। তবে ইতিমধ্যে কোন পরীক্ষা চালান চলিবে না।

গতকাল করাচীতে কৃষিজ উন্নয়ন সম্পর্কে এক পাঁচদিনব্যাপী সেন্টো (পশ্চিম এশিয়ার পশ্চিমী শক্তি জোট) সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পর্যবেক্ষকগণ এই সম্মেলনে যোগ দিতেছেন।

২০শে এপ্রিল—নেপালের ইলাম জেলায় বিদ্রোহীদের সশস্ত্র আক্রমণের আর একটি সংবাদ পাওয়া যায়। গত সোমবার এক সংঘর্ষে রাজকীয় বাহিনীর বুলেটে পাঁচজন বিদ্রোহী নিহত এবং তাহাদের সাতজন অনুচর গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

প্যারিস হইতে সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, আজ সকালে মধ্য আলজিয়ার্সের প্রাক্তন জেনারেল রাউল সালানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইনিই আলজিয়ার্সে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নাটের গুরু, গোপন সামরিক সংস্থা "ওয়াস"-এর পাণ্ডা।

২১শে এপ্রিল—কর্তৃপক্ষের লিখিত প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় ঢাকার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ পূর্ব সংকল্প পরিবর্তন করিয়া পরীক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে বলিয়া আজ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি মানিয়া লওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জস্থিত পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল এই মর্মে ইংগিত দেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে কাশ্মীরে গণভোটের ব্যবস্থা করানোর জন্য তাঁহারা খুবই চেষ্টা করিতেছেন।

২২শে এপ্রিল—পাকিস্তানের হাই কমিশনার গতকাল লণ্ডন বিমান বন্দরের ট্যাক্সী চালকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তাহারা নবাগত পাকিস্তানীদের সহিত প্রতারণা করে এবং হাই কমিশনারের অফিসের প্রতিনিধিগণকে গালিগালাজ করে। ট্যাক্সী ড্রাইভারেরা পাকিস্তানীদের এতদূরে লইয়া যায় যে, তাহারা আর ট্যাক্সী ভাড়া দিতে পারে না। তখন ট্যাক্সী ড্রাইভারেরা পাকিস্তানীদিগকে তাহাদের দেশবাসিগণের নিকট "ক্রীতদাস" হিসাবে বিক্রয় করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটির মত। মার্কিন গভর্নমেন্টের এক হিসাবে ইহা জানা গিয়াছে। ইহার মধ্যে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সদস্য সংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। তবে চীন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ১ কোটি ৭০ লক্ষ।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা ঃ বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা

মফঃস্বল ঃ (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক ঃ শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

টেলিফোন ঃ ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।